৪র্থ বর্ষ] কার্ত্তিক, ১৩৩২ [১ম সংখ্যা

মুক্তি ও ভক্তি

১৬

ভাগবতসন্দর্ভে শ্রীজীব গোস্বামী হ্লাদিনীর পরিচয়-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

"তথা হ্লাদরূপোঽপি যয়া সংবিদুৎকর্ষরূপয়া তং হ্লাদং সম্বেত্তি সম্বেদয়তি চ সা হ্লাদিনীতি বিবেচনীয়ম্।"

অর্থাৎ "সেইরূপ ভগবান্ আনন্দস্বরূপ হইয়াও পূর্ব্ব-কথিত সংবিৎ নামক স্বরূপশক্তির উৎকর্ষরূপ যে শক্তির দ্বারা সেই আত্মানন্দকে স্বয়ং অনুভব করেন এবং অপরকে অনুভব করাইয়া থাকেন, সেই শক্তি হ্লাদিনী বলিয়া কথিত হয়।"

এই উক্তির দ্বারা বুঝা যায় যে, হ্লাদিনীকে বৈষ্ণবাচার্য্যগণ সংবিৎ শক্তির উৎকর্ষ বলিয়া বিবেচনা করেন। অর্থাৎ ভগবানের যে ত্রিবিধ শক্তির কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, যথা সন্ধিনী, সংবিৎ ও হ্লাদিনী, তাহা-দিগের মধ্যে সন্ধিনীর সারাংশকে যেমন সংবিৎ বলা হয়, সেইরূপ সংবিৎএর সারাংশকেও হ্লাদিনী বলা যাইতে পারে। বৈষ্ণবাচার্য্যগণের এই প্রকার উক্তির মূলে যে রহস্য নিহিত রহিয়াছে, তাহাই অগ্রে বুঝিতে হইবে। ভগবান্ স্বয়ং পূর্ণ সৎ হইয়াও মায়াকল্পিত বস্তুনিচয়কে যে শক্তির দ্বারা সত্তাযুক্ত করিয়া থাকেন, তাহাই সন্ধিনী শক্তি, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। সংবিৎ শক্তি এই সন্ধিনী শক্তির সার বা উৎকর্ষ। কারণ, সংবিৎ শক্তির যাহা অসাধারণ কার্য্য অর্থাৎ প্রকাশ, তাহার সহিত যদি পারমার্থিক বা ব্যবহারিক সদ্‌বস্তুর সম্বন্ধ না হয়, অর্থাৎ সদ্‌বস্তু যদি কাহারও নিকট প্রকাশিত না হয়, তাহা হইলে ফলতঃ তাহা শূন্য বা অলীক হইয়া পড়ে। সর্ব্বথা অপ্রকাশিত বস্তু কিছুতেই সৎ বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না; সুতরাং যে সন্ধিনী শক্তির প্রভাবে বস্তু সত্তার আশ্রয় হইয়া থাকে, সেই সন্ধিনীই নিজের কার্য্যকে সিদ্ধ করিবার জন্য যে শক্তির আশ্রয় লইতে বাধ্য হয়, তাহাই সন্ধিনীর সার বা উৎকর্ষ ছাড়া আর কি হইতে পারে?

একই ভগবান্ শক্তিত্রিতয়াত্মক, সুতরাং তাঁহাতে শক্তিত্রয়ের যে পরস্পর ভেদ, তাহাও তাঁহার স্বকীয় উৎকর্ষের অভিব্যক্তি তারতম্য ব্যতিরিক্ত আর কিছুই হইতে পারে না। এই ভাবে ভগবানের প্রকাশানুকূল যে সংবিৎ শক্তি আছে, সে শক্তিও যদি নিজ প্রকাশরূপ কার্য্যকে আনন্দময় করিয়া না তুলিতে পারে, তাহা হইলে সে প্রকাশও নিষ্ফল বা অকিঞ্চিৎকর হইয়া উঠে।

যাহা সৎ, তাহা যেমন প্রকাশিত না হইলে প্রকৃতপক্ষে সৎই হইতে পারে না, সেইরূপ যাহা প্রকাশ, তাহা যদি আনন্দময় না হয়, তাহা হইলে সে প্রকাশও অকিঞ্চিৎকর হইয়া থাকে। তাই শ্রুতি বলিতেছে—

"আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি।"

অর্থাৎ "প্রাণিসমূহ আনন্দ হইতেই আবির্ভূত হইয়া থাকে, আনন্দের দ্বারাই জীবিত থাকে এবং এ সংসার ছাড়িয়া আবার সেই প্রকাশময় আনন্দেই মিশিয়া যায়।"

এই আনন্দময় প্রকাশের জন্যই এ সংসার সৃষ্ট হইয়াছে, আনন্দ ইহার আদিতে, আনন্দ ইহার মধ্যে এবং আনন্দই ইহার অন্তে। সুতরাং এই আনন্দানুভব করাইবার জন্যই ভগবানের যে শক্তি সর্ব্বদা ব্যাপৃত রহিয়াছে, তাহাই হ্লাদিনী এবং তাহাকেই সংবিৎ শক্তির উৎকর্ষ বলিয়া শ্রীজীব গোস্বামী নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আনন্দময় পরমাত্মা আপনারই অংশস্বরূপ জীবনিচয়কে আত্মানন্দ অনুভব করাইয়া স্বয়ং তৃপ্তি লাভ করিয়া থাকেন এবং সেই তৃপ্তিলাভের অনুকূল যে শক্তি তাঁহার স্বরূপভূত এবং অন্যান্য সকল শক্তি অপেক্ষা যাহা উৎকৃষ্ট, সেই শক্তির নাম হ্লাদিনী। এই হ্লাদিনী শক্তি তাঁহাতে আছে বলিয়াই শ্রুতিতে তিনি রস বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। রস কাহাকে বলে? আস্বাদ্যমান আনন্দকেই শাস্ত্র রস বলিয়া নির্দ্দেশ করে। মানব যখন এ আনন্দের আস্বাদন করে, তখন তাহার অন্তঃকরণে যে সকল অনুকূল বৃত্তি বা ভাব সমুদিত হইয়া থাকে, সেই সকল ভাব বা মনোবৃত্তিনিচয়ও হ্লাদিনীর কার্য্য, ইহা বুঝিতে হইবে। তাই ব্রহ্মসংহিতায় উক্ত হইয়াছে—

"আনন্দচিন্ময়রসপ্রতিভাবিতাভি-
স্তাভির্য এব নিজরূপতয়া কলাভিঃ।
গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতং,
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥"

অর্থাৎ "সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি, অখিলের অর্থাৎ জীবের আত্মভূত হইয়াও যিনি সর্ব্বদা গোলোকেই বাস করিয়া থাকেন এবং আত্মস্বরূপ অর্থাৎ আনন্দময় ও চিন্ময় যে রস, তাহার দ্বারা পরিভাবিত এবং আপনারই রূপে উদ্ভাসিত যে কলাসমূহ, তাহার দ্বারা যিনি সর্ব্বদা পরিবেষ্টিত, সেই আনন্দময় রসরূপ দেবতাই গোবিন্দ, তিনিই আদিপুরুষ, তাঁহাকেই আমি ভজনা করি।"

ব্রহ্মসংহিতার এই শ্লোকটির তাৎপর্য্যার্থ অতি গভীর; নিরাকার, চিন্ময় ও আনন্দময় পুরুষকে রসরূপে আস্বাদন করিতে হইলে তাঁহাকে আকারবান্ ও রূপবান্ করিয়া লইতে হয়, নহিলে তাঁহাতে রসরূপতাই যে আসিতে পারে না, তাহাই এই শ্লোকটিতে অতি সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে। আনন্দ নিজ কলাসমূহের দ্বারা বেষ্টিত, আবার সেই সব কলা বা অংশ সেই চিন্ময় রসময় আনন্দের দ্বারা পরিভাবিত বা সমুজ্জীবিত হইয়াছে, একরূপ আনন্দ বহুরূপযুক্ত হইয়া গোলোকে অর্থাৎ প্রকাশময় লোকে বিরাজমান, অথচ তিনি সকল জীবের আত্মভূত হইয়াই সর্ব্বদা বিরাজমান রহিয়াছেন। এই যে ভগবত্তত্ত্ব, ইহাই হইল রস, এই রসের পরিচয় দিতে যাইয়া উপনিষদ্ বলিতেছে—

"রসো বৈ সঃ, রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বা আনন্দীভবতি।
কোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদ্যেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ।"

অর্থাৎ তিনিই রস, এই সংসারের তাপদগ্ধ জীব তাঁহাকে যখনই পায়, তখনই সে আনন্দময় হয়। আকাশের ন্যায় ভূমা এই আনন্দই রস, যদি এই রস না থাকিত, তাহা হইলে এ সংসারে কে স্পন্দিত হইত? কেই বা জীবিত থাকিতে পারিত?

এই আনন্দময় রস যখন প্রেম-সূর্য্যের নবোদিত কিরণে বিকশিত ভক্তের হৃদয়কমলে আবির্ভূত হয়, তখন অদর্শনের আবেগ, দর্শনের জড়তা, বিরহের উৎকণ্ঠা, মিলনের তৃপ্তি, ভয়ের ব্যাকুলতা, চিন্তার অবসাদ, আশার প্রফুল্লতা প্রভৃতি রসময় ভাবগুলি আরতি-প্রদীপের মত শত শত ভাবে দীপ জ্বালাইয়া তাঁহার আরতি করিতে থাকে। এই আত্মানন্দময় রসের আস্বাদনের সময় তুমি আমি এ ভেদবুদ্ধি থাকে না। অথচ অলৌকিক আস্বাদন থাকে। এই অবস্থার বর্ণন প্রসঙ্গে ভগবান্ চৈতন্যদেবের প্রিয়পার্ষদ রামানন্দ রায় বলিয়াছেন—

"অহং কান্তা কান্তস্ত্বমিতি ন তদানীং মতিরভূৎ।
মনোবৃত্তির্লুপ্তা ত্বমহমিতি নৌ ধীরপি তথা।
ভবান্ ভর্ত্তা ভার্য্যাহমিতি যদিদানীং ব্যবসিতি
তথাপি প্রাণানাং স্থিতিরিতিবিচিত্রং কিমপরম্॥"

ইহার তাৎপর্য্যার্থ এইরূপ "এমন এক সময় আসিয়াছিল, যখন আমি কান্তা, তুমি আমার কান্ত, এই প্রকার নিশ্চয় অন্তর্হিত হইয়াছিল, অন্তঃকরণ বৃত্তিরহিত হইয়াছিল, তুমি বা আমি এ প্রকার জ্ঞানও লুপ্ত হইয়াছিল, আর এখন তুমি স্বামী, আমি ভার্য্যা, এইরূপ নিশ্চয় দৃঢ় হইয়াছে, এমন হওয়ার পরও যে এ দেহে প্রাণ রহিয়াছে, ইহা অপেক্ষা বিস্ময়জনক ব্যাপার আর কি হইতে পারে?"

এই যে রসরূপ পুরুষের অপূর্ব্ব আস্বাদন, ইহাই হইল ভক্তির চরম অবস্থা বা হ্লাদিনীর পূর্ণ বিকাশ। বৈষ্ণব কবি কবিরাজ গোস্বামী ইহারই পরিচয়প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

"হ্লাদিনীর সার প্রেম, প্রেম সার ভাব।
ভাবের পরম কাষ্ঠা হয় মহাভাব॥
মহাভাবরূপা হন রাধা ঠাকুরাণী।
সর্ব্বগুণমণি কৃষ্ণ কান্তা শিরোমণি॥"

প্রেম অর্থাৎ প্রিয়তমের প্রতি হৃদয়ের দ্রবীভাবময় অনুকূলতা, ইহাই হইল হ্লাদিনীর সার। সৌন্দর্য্যের অনুভব একবার করিতে পারিলে তাহার প্রতি অন্তঃকরণের যে ঐকান্তিক অনুকূলতা, তাহাই প্রেম বলিয়া ভক্তিশাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হয়। ইহা হ্লাদিনীরই বৃত্তি বা পরিণতি। মানবের মনে এ প্রেম আবির্ভূত হয়, কিন্তু উৎপন্ন হয় না, কারণ, বৈষ্ণবাচার্য্যগণ বলিয়া থাকেন যে, প্রেম নিত্য স্ফুরণ; জীব-হৃদয়ে সুন্দর বস্তুকে উপভোগ করিবার যে অভিলাষ, তাহা এই প্রেমের অভিব্যক্তির পূর্ব্বাভাস ব্যতীত আর কিছুই নহে। বেদান্তদর্শনের জ্ঞান নিত্য হইলেও তাহার অভিব্যঞ্জক মনোবৃত্তি উৎপন্ন হয়, বলিয়া জ্ঞানকেও উৎপন্ন বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়; সেইরূপ ভক্তিশাস্ত্রে হ্লাদিনীর বৃত্তিস্বরূপ প্রেম নিত্য হইলেও তাহার অভিব্যঞ্জক জীবের অভিলাষ বা কাম সময়ে সময়ে উৎপন্ন হয় বলিয়া সেই প্রেমকেও উৎপন্ন বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়। প্রেম জীব হৃদয়ে অভিব্যক্ত হইবার পূর্ব্বে কাম বা অভিলাষের মূর্ত্তিতেই প্রথমে প্রকাশ পায় বলিয়া প্রাকৃত জনগণ প্রেম ও কামকে একই বলিয়া ধরিয়া লয়, কিন্তু বাস্তবিক ইহাদিগের মধ্যে অত্যন্ত বৈলক্ষণ্য দেখিতে পাওয়া যায়। ভাগবত-সন্দর্ভরচয়িতা বৈষ্ণবপরমাচার্য্য শ্রীজীব গোস্বামী প্রেম ও কামের স্বরূপ ও পরস্পর বৈলক্ষণ্য অতি সুন্দর ভাবে বিবৃত করিয়াছেন।

"অথ কান্তোঽয়মিতি প্রীতিঃ কান্তভাবঃ; এষ এব প্রিয়তাশব্দেন ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পরিভাষিতঃ....... লৌকিকরসিকৈরপ্যেষ রতিসংজ্ঞ স্বীক্রিয়তে। এষ এব কামতুল্যত্বাৎ শ্রীগোপিকাসু কামাদিশব্দেনাপ্যভিহিতঃ। স্মরাখ্যকামবিশেষস্তু, বৈলক্ষণ্যঞ্চ কামসামান্যং খলু স্পৃহাসামান্যাত্মকম্। প্রীতিসামান্যন্তু বিষয়ানুকুল্যাত্মক-স্তদনুগত বিষয়স্পৃহাদিময়ো জ্ঞানবিশেষ ইতি লক্ষিতম্। ততো দ্বয়োঃ সমানপ্রায়চেষ্টত্বেঽপি কামসামান্যস্য চেষ্টা স্বীয়ানুকুল্যতাৎপর্য্যা। তত্র কুব্জাদিবিষয়ানুকুল্যঞ্চ স্বসুখ-কাম্যভূতমেবেতি তত্র গৌণবৃত্তিরেব প্রীতিশব্দঃ শুদ্ধপ্রীতিমাত্রস্য চেষ্টা তু প্রিয়ানুকুল্যতাৎপর্য্যা। তত্র তদনুগতমেব চাত্মসুখমিতি মুখ্যবৃত্তিরেব প্রীতি-শব্দঃ।" - প্রীতিসন্দর্ভ।

তাৎপর্য্য—"ইহা কান্ত, এই কারণে ইহার প্রতি যাহা প্রীতি, তাহাই কান্তভাব। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু নামক গ্রন্থে এই প্রীতি প্রিয়তা শব্দের দ্বারা পরিভাষিত হইয়াছে।..............লৌকিক রসিকগণও ইহাকেই রতি বলিয়া অঙ্গীকার করিয়া থাকেন। কামের সহিত ইহার সাদৃশ্য আছে বলিয়া শ্রীগোপিকাগণের এই প্রীতিই কাম প্রভৃতি শব্দের দ্বারা অভিহিত হইয়া থাকে। স্মরনামে প্রসিদ্ধ যে কাম, তাহা কিন্তু এই প্রীতি হইতে ভিন্ন, কারণ, তাহা ইহা হইতে অত্যন্ত বিলক্ষণ। কামের সামান্যতঃ স্বরূপ হইতেছে এই যে, উহা স্পৃহাত্মক। প্রীতির সামান্যতঃ স্বরূপ এই যে, উহা বিষয়ের প্রতি অনুকূলভাব; শুধু তাহাই নহে, সেই বিষয়ের সহিত যাহার যাহার সম্বন্ধ আছে, সেই সকল বস্তুর প্রতি স্পৃহাও এই আনুকূল্যের মধ্যে প্রবিষ্ট, ইহা যে কেবল বিষয়ের প্রতি আনুকূল্য, তাহাই নহে, পরন্তু ইহা যে স্ফূর্ত্তি বা প্রকাশময়, তাহাও পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

তাহাই যদি হইল, তবে কামের ও প্রীতির চেষ্টা প্রায় সমান হইলেও আত্মার অর্থাৎ নিজের সুখ হউক, এই উদ্দেশ্যে যে চেষ্টা হইয়া থাকে, তাহাই কামের চেষ্টা। কোন স্থলে কামের চেষ্টা যদিও বিষয়ের প্রতি আনুকূল্যের কারণ হয়, তথাপি উহা তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য নহে, আত্মার সুখ বা তৃপ্তিই তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য, সেই উদ্দেশ্যসিদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহা হইয়া যায় এই মাত্র, সুতরাং কামের যে বিষয়, তাহার সুখ বা আনুকূল্য, কাম চেষ্টার মুখ্য উদ্দেশ্য হয় না, কিন্তু তাহা তাহার গৌণ উদ্দেশ্য হইতে পারে। এই কারণে সেই কামকে বুঝাইবার জন্য যদি প্রীতি শব্দের প্রয়োগ হয়, তখন বুঝিতে হইবে যে, ঐ স্থলে প্রীতি মুখ্য অর্থে প্রযুক্ত হয় নাই, কিন্তু গৌণ অর্থকে বুঝাইবার জন্যই প্রযুক্ত হইয়াছে। যাহা কিন্তু বিশুদ্ধ প্রীতি বা প্রেম, তাহার যে চেষ্টা, তাহার উদ্দেশ্য একমাত্র প্রিয়তমেরই আনুকূল্য বা সুখ, সেই সুখ হইলেই স্বতঃসিদ্ধ নিয়মবশে তাহার নিজ সুখ উদিত হয় এই মাত্র। তাই বলিয়া নিজ সুখ কখনও তাহার উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য হয় না, এই কারণে এইরূপ স্থলেই প্রীতি শব্দটি মুখ্য অর্থে প্রযুক্ত হইয়া থাকে।"

প্রীতিসন্দর্ভে কাম ও প্রীতির যেরূপ লক্ষণ প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহার দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই চরিতামৃতকার কবিরাজ গোস্বামী অতিবিশদভাবে এই কাম ও প্রীতির বৈলক্ষণ্য ফুটাইয়া তুলিয়াছেন—

"কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতি বাঞ্ছা ধরে প্রেম নাম।
আত্মেন্দ্রিয়প্রীতি বাঞ্ছা তারে বলি কাম॥"
"প্রীতির বিষয়ানন্দে তদাশ্রয়ানন্দ।
......................................॥"

এই প্রেম বা প্রীতিই হ্লাদিনীর সার বৃত্তি। নিত্য সুন্দর—লাবণ্যের সার—মাধুর্য্যের পার—চিদানন্দময় ভগবদ্‌বিগ্রহকে ভক্তহৃদয়ে প্রকাশিত করা যেমন হ্লাদিনীর কার্য্য, সেইরূপ সেই বিগ্রহের প্রতি ভক্তহৃদয়ে প্রীতি বা প্রেমের আবির্ভাব করানও হ্লাদিনীর কার্য্য, কারণ, তাহা না হইলে হ্লাদিনীর প্রকৃত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না; ভগবান্ নিরবধি আনন্দস্বরূপ হইলেও সেই আত্মানন্দ অনুভব করাইয়া জীবের জীবন সার্থক করিবার জন্য সর্ব্বদা যে শক্তির পরিচালনা করিতেছেন, সেই স্বরূপশক্তিরই নাম হ্লাদিনী, ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সুতরাং ভগবদানন্দ জীবকে অনুভূত করাইবার জন্য, হ্লাদিনী জীব-হৃদয়ে যে অনুকূল অবস্থা উৎপাদন করিবে, তাহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। কাম বা স্বার্থপরতা যে পর্য্যন্ত হৃদয়ে অবস্থান করে, সে পর্য্যন্ত চিত্ত মলিনই থাকে, মলিনচিত্তে ভগবদানন্দ অনুভূত হইতে পারে না, তাই হ্লাদিনী জীব-হৃদয়ে কামকে প্রেমরূপে পরিণত করিয়া ভগবদানন্দ অনুভব করাইবার জন্য সর্ব্বদা সমুদ্যত রহিয়াছে, সেই প্রেম হ্লাদিনীর সার অংশ, সুতরাং তাহা নিত্য, এই কারণে সেই প্রেম উৎপন্ন হইতে পারে না, কিন্তু জীবহৃদয়ে অনুকূল মনোবৃত্তিনিচয়ের সাহায্যে তাহা অভিব্যক্ত বা আবির্ভূত হইয়া থাকে। চরিতামৃতকার কবিরাজ গোস্বামীও এই কথাই বুঝাইতে যাইয়া বলিয়াছেন—"হ্লাদিনীর সার প্রেম।" ইহার পরই তিনি বলিয়াছেন—"প্রেম সার ভাব।" এক্ষণে ভাব কাহাকে বলে এবং কেনই বা তাহা প্রেমের সার বলিয়া ভক্তিশাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে, তাহারই আলোচনা করা যাইতেছে।

অভিলাষময় উল্লাসময় সৌন্দর্য্যের অনুভূতির সহিত যদি সুন্দরের প্রতি আনুকূল্য বা চিত্তপ্রবণতা আসিয়া মিশিয়া যায়, তাহা হইলে তাহাকেই প্রীতি বা প্রেম বা ভালবাসা বলা যায়, ইহা পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে। এই আনুকূল্যময় প্রীতি বা প্রেম কোন একটি ভাব বা প্রধান মনোবৃত্তির সহিত মিলিত না হইলে জীবের ভগবৎসেবা ঘটিয়া উঠে না বা সেই সেবা সফল হইতে পারে না, ইহা যে কেবল শাস্ত্রেই কথিত হইয়াছে, তাহা নহে, লৌকিক ব্যবহারক্ষেত্রেও এই নিয়মের ব্যভিচার দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রীতি মানবকে প্রীতিপাত্রের সেবার অধিকার প্রদান করে, ইহা সকলেই বুঝিয়া থাকে; প্রীতিহীন সেবা সেবাব্যপদেশ মাত্র, সে সেবা দ্বারা সেব্যও সুখী হয় না এবং সেবকও তৃপ্তি লাভ করিতে পারে না; কিন্তু এই প্রীতি কোন একটি প্রধান ভাবের সহিত মিলিত না হইলে প্রিয়তমের সেবার সাধনও হইতে পারে না। পিতা বা মাতার পুত্রের

প্রতি যে প্রীতি, তাহা তাঁহাদের বাৎসল্যরূপ ভাবের সহিত মিলিত না হইলে পুত্রের সেবা কার্য্যের অনুকূল হয় না; প্রভুর প্রতি ভৃত্যের অনুরাগও যদি ভৃত্যের আত্মগত দাস্যভাবের সহিত মিলিত না হয়, তাহা হইলে প্রভুর মনোমত সেবা ভৃত্যের দ্বারা হইয়া উঠে না; সখার সখার প্রতি যে প্রীতি, তাহা যদি সখ্যভাবের সহিত মিলিত না হয়, তবে তাহা দ্বারা সখার কর্ত্তব্য সেবার পদে পদে ত্রুটি হইয়া থাকে; এইরূপ রমণীর প্রিয়তম কান্তের প্রতি যে প্রীতি, তাহাও যদি স্ত্রীস্বভাবোচিত কান্ত বা মধুর ভাবে অনুপ্রাণিত না হয়, তাহা হইলে তাহার পতির প্রতি প্রীতি থাকিলেও তাহা দ্বারা প্রিয়তমের অনুকূল সেবা পূর্ণভাবে হইতে পারে না, ইহা লোকচরিত্রাভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেরই সুবিদিত আছে। এইরূপই প্রীতিরূপা যে ভক্তি, তাহা যদি দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য বা কান্তভাবের দ্বারা অনুপ্রাণিত না হয়, তবে তাহা দ্বারা ভক্তের ভগবৎসেবা পরিপূর্ণভাবকে লাভ করিতে সমর্থ হয় না। ভগবৎপ্রীতিরূপা ভক্তি শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই পঞ্চভাগে বিভক্ত হইলেও, শান্তভক্তগণের ভগবৎপ্রীতি উক্ত অবশিষ্ট চারিপ্রকার ভাবের অর্থাৎ দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর ভাবের কোন একটির দ্বারা অনুপ্রাণিত হয় না বলিয়া শান্তভক্তগণ ভক্তির সারসর্ব্বস্ব ভগবৎসেবানন্দে অধিকারী হইতে পারেন না। তাঁহারা ভগবানের বিশ্বোন্মাদন নিরুপম সৌন্দর্য্যের অনুভব করিতে সমর্থ, এই কারণে তাঁহাদের অন্তঃকরণ সামান্যতঃ ভগবৎপ্রীতিরূপ ভক্তিরসে সর্ব্বদা আপ্লুত থাকিলেও সেবানন্দের অনুকূল ভাবচতুষ্টয়ের কোন একটি ভাব না থাকায়, তাঁহারা ভক্তির সারসর্ব্বস্ব সেবানন্দের অনধিকারী। সুতরাং উচ্চ শ্রেণীর ভক্তিরসের আস্বাদন তাঁহাদের ঘটিয়া উঠে না, কিন্তু করুণাময় ভগবানের ঐ সর্ব্বশক্তিময়ী হ্লাদিনী শক্তির প্রভাবে কদাচিৎ ঈদৃশ ভগবৎসৌন্দর্য্য-রস-সমুদ্রে নিমগ্ন স্থির, ধীর, শান্ত ভক্তগণও প্রীতিভক্তির পূর্ণতাকারী এই ভাব-চতুষ্টয়ের কোন না কোন একটি ভাবের আবর্ত্তে পতিত হইয়া ভগবৎসেবানন্দে অধিকার লাভ পূর্ব্বক ধন্য হইয়া থাকেন। তাই ভাগবতে দেখিতে পাওয়া যায়—

> "তস্যারবিন্দনয়নস্য পদারবিন্দ-
> কিঞ্জল্কমিশ্র-তুলসী-মকরন্দ-বায়ুঃ।
> অন্তর্গতঃ স্ববিবরেণ চকার তেষাং
> সংক্ষোভমক্ষরজুষামপি চিত্ততন্বোঃ॥"

তাৎপর্য্য—অরবিন্দনেত্র সেই ভগবানের পাদপদ্মে ভক্তগণ ভক্তিভরে যে মঞ্জরী-মিশ্রিত তুলসী অর্পণ করিয়া থাকেন, চরণপদ্মের সৌরভে সুবাসিত সেই তুলসী হইতে চ্যুত মকরন্দসম্পর্কে সুবাসিত বায়ু সেই সকল শান্ত ভক্তগণের ইন্দ্রিয়বিবর দ্বারা অন্তঃকরণমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহাদের চিত্ত ও দেহের বিক্ষোভ সম্পাদন করিয়াছিল, অর্থাৎ শান্ত ভক্তিরূপ নির্ব্বিশেষ সমাধিরূপ আনন্দ হইতে বিচ্যুত হইয়া সেই সকল শান্ত ভক্তগণ দাস্য প্রভৃতি ভাবরাজ্যে প্রবেশাধিকার লাভ করিতে পাইয়াছিলেন, তাই তাঁহাদের হৃদয় দাস্যভাবে দ্রুত হইয়াছিল ও শরীর রোমাঞ্চিত হইয়াছিল। [ক্রমশঃ।

শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ।

দুঃখের প্রতি

হে দুঃখ! হে প্রিয়তম, চিরসাথী মোর;
মরমের দীর্ঘশ্বাস, তপ্ত আঁখিলোর,
অনাহার, অর্দ্ধাহার, রোগ শোক কত,
নানাবিধ অর্ঘ্যে তোমা পূজিতেছি যত;
বুভুক্ষা তোমার তত চলেছে বাড়িয়া,
কিছুতে তোমার মন না পাই সাধিয়া।

বল বল প্রিয়তম, কি দিলে তোমায়,
থাকিবে না ভেদ আর তোমায় আমায়।
অবশিষ্ট পরিজন, দুর্ব্বল শরীর
আমার বলিতে আছে যাহা অবনীর;
তাও যদি নিতে চাও, নিতে পার আজ।
তোমার সাধনা মোর জীবনের কাষ।

সৈয়দ মাশহুদ আলি।

প্রলয়ের আলো

দশম পরিচ্ছেদ

স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা

বৃদ্ধা আনা স্মিট কাউণ্ট ভন্ আরেনবর্গের সহিত পরিচিত হইবামাত্র বহুালঙ্কারমণ্ডিত হাতখানি কাউণ্টের সম্মুখে সসম্মানে প্রসারিত করিল. কাউণ্টও সেইরূপ সম্মানের সহিত তাহা মুখের কাছে তুলিয়া তাহাতে ওষ্ঠ স্পর্শ করিলেন। এই স্পর্শে আনা স্মিট স্বর্গ-সুখ অনুভব করিল, অপূর্ব্ব পুলকে তাহার সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইল। আসল তাজা কাউণ্ট তাহার করচুম্বন করিলেন! সে কি কখন এত সুখ, সৌভাগ্য ও সম্মানের কল্পনাও করিয়াছিল? এত দিনে তাহার জীবন সফল হইল।

আনা স্মিট যেন প্রতি মাসেই এইরূপ দুই দশ জন লর্ড, ডিউক বা মার্কুইস্কে স্বগৃহে আশ্রয়দানে পরিতৃপ্ত করিয়া আসিতেছে, এবং কাউণ্ট ভন আরেনবর্গ সেই সকল মহা সম্ভ্রান্ত অতিথির বিপুল বোঝার উপর অতি লঘু 'শাকের আঁটি' মাত্র—এইরূপ ভঙ্গী প্রকাশ করিয়া মুরুব্বীয়ানার সুরে বলিল, "কাউণ্ট, তুমি যখন আমার প্রিয় পুত্রের বন্ধু, তখন আমার পুত্রতুল্য, এ কথা বলাই বাহুল্য। আমি বো-দিজোবে তোমার অভ্যর্থনা করিতেছি। আশা করি, আমাদের সাদাসিধে জীবনযাপনপ্রণালী তোমার তেমন অপ্রীতিকর হইবে না। অন্ততঃ আমার যে সকল ডিউক বা মার্কুইস বন্ধুরা প্রবাস-যাপনের জন্য এখানে আসিয়া দয়া করিয়া আমার অতিথি হইয়া থাকেন, তাঁহাদের দিনগুলি বেশ আনন্দেই কাটে দেখিয়াছি।"

আনা স্মিটের বিপুল ঐশ্বর্য্যের পরিচয় পাইয়া কাউণ্ট মুগ্ধ হইলেন; তিনি সেই বৃদ্ধার অঙ্গে যে সকল বহুমূল্য হীরকালঙ্কার দেখিলেন, তাহা য়ুরোপের যে কোন ডিউক-পত্নীর গৌরব বর্দ্ধিত করিতে পা'রত বলিয়াই তাঁহার ধারণা হইল। তিনি মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "ফ্র, আপনার আদর অভ্যর্থনার আন্তরিকতায় আমি সত্যই অভিভূত হইয়া পড়িয়াছি; আপনি যে আমাকে এতখানি প্রীতির পাত্র মনে করিয়াছেন, ইহা আমার পক্ষে গৌরবের বিষয় মনে করিতেছি। আমার এই বন্ধু আমাকে পূর্ব্বে এই বলিয়া আশ্বস্ত করিয়াছিলেন যে, তাঁহার স্নেহময়ী জননীর সদাশয়তায় আমাকে মুগ্ধ হইতেই হইবে। উনি আমাকে এ কথাও অনায়াসে বলিতে পারিতেন যে, তাঁহার জননীর ন্যায় মধুরভাষিণী সুশীলা রমণী নারীজাতির মধ্যে দুর্লভ।"

আনা স্মিট লজ্জায় মুখ রাঙ্গা করিয়া অস্ফুট স্বরে বলিল, "কাউণ্ট, এই গুণহীনা নারীকে অযথা প্রশংসায় লজ্জা দিও না।"—বুড়ী লজ্জা গোপন করিবার জন্য তাহার হাতের পাখা দিয়া মুখ ঢাকিল।

কাউণ্ট মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "প্রকৃত বিনয় লজ্জাতে কিরূপ মধুর করে, আপনিই তাহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ, আপনি রমণী-সমাজের অলঙ্কার; মনে করিবেন না, আমার এ কথা মৌখিক স্তুতিবাদ মাত্র, আরেনবর্গ-বংশ চিরদিনই তোষামোদে অপটু।"

আনা স্মিট সুখের অমৃত-সাগরে ডুবিয়া তলাইবার উপক্রম হইল। তাহার একটা আশঙ্কা ছিল, কাউণ্ট হয় ত কদাকার, প্রৌঢ় এবং তাহারই মত একটি জালাবিশেষ। কাউণ্টকে দেখিয়া তাহার সেই ভ্রম দূর হইল। কাউণ্ট সুপুরুষ, বীরের মত চেহারা, সমুন্নত বলিষ্ঠ দেহ, নীলাভ নেত্রে বুদ্ধিমত্তা ও তেজস্বিতা

সুপরিস্ফুট। বয়স ত্রিশ বত্রিশের অধিক নহে, কিন্তু চেহারা দেখিয়া পঁচিশ ছাব্বিশের বেশী মনে হয় না। আনা শ্মিটের বিশ্বাস হইল—বিধাতা পুরুষ নিতান্ত কাণ্ডজ্ঞান-বর্জ্জিত অদূরদর্শী মূঢ় নয়! তাহার সামঞ্জস্যজ্ঞান আছে বটে।

আনা শ্মিট অভিনন্দনের পালা শেষ করিয়া বলিল, "কাউণ্ট, তুমি বহুদূর হইতে আসিতেছ, যুদ্ধব্যবসায়ী হইলেও পথশ্রমে ক্লান্ত হইয়াছ; বিশেষতঃ, ক্ষুধার আক্রমণে বীরপুরুষেরও পরিত্রাণ নাই! কক্ষ-পরিচারিকা তোমার কক্ষের পথ প্রদর্শন করিবে। তোমাকে ডিনারের জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে—সে জন্য আমি অর্দ্ধঘণ্টা সময় মঞ্জুর করিলাম।"

অনন্তর বৃদ্ধা পিটারকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "পিটার, তোমার বন্ধু কাউণ্ট ভন্ আরেনবর্গের জন্য যে সকল জিনিষের দরকার, সেগুলি যথাস্থানে গুছাইয়া রাখা হইয়াছে কি না, তাহার তদন্তের ভার তোমার উপর থাকিল। কোন ত্রুটি হইলে সে জন্য তুমি দায়ী।"

আনা শ্মিটকে অভিবাদন করিয়া কাউণ্ট তাঁহার বন্ধু পিটারের সঙ্গে বিশ্রামকক্ষে চলিলেন। প্রায় পাঁচ মিনিট পরে ফ্রিজ সাজসজ্জা শেষ করিয়া মায়ের সম্মুখে আসিল। বৃদ্ধা আনন্দে অধীর হইয়া ফ্রিজের কাঁধে হাত রাখিয়া বলিল, 'ফ্রিজ, কাউণ্টের ব্যবহার বড়ই মধুর। তাঁহার শিষ্টাচারে আমি মুগ্ধ হইয়া গিয়াছি, বাবা!"

আরও দশ মিনিট পরে বার্থা পরীর মত বেশ-ভূষা করিয়া মায়ের সম্মুখে আসিল। আনা শ্মিট প্রশংসমান নেত্রে কন্যার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া মনে মনে বলিল, "বার্থাকে দেখিবামাত্র কাউণ্ট যদি মোহিত হইয়া বাণবিদ্ধ কুরঙ্গের মত ছটফট না করে, তাহা হইলে বুঝিব, ছোকরা নিতান্ত অরসিক, বেহদ্দ বেকুব!"

মহামূল্য হীরকালঙ্কারে ও সুদৃশ্য পরিচ্ছদে মণ্ডিতা বার্থাকে অপরূপ রূপবতী রাজনন্দিনীর মত দেখাইতেছিল। তাহার মাথায় মুক্তার সীঁথি, কণ্ঠে হীরার নেকলেস, এবং বক্ষে প্রস্ফুটিত কুসুমস্তবক। তাহার রূপ ফাটিয়া পড়িতেছিল।

আনা শ্মিট আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া বলিল, "বার্থা, মা আমার, আজ তোমাকে ঠিক ছবিখানির মত দেখাইতেছে। এখন আমার একটি কথা মনে রাখিবে, আজ রাত্রে তোমাকে আমাদের বংশ-গৌরবের প্রতিনিধিত্ব করিতে হইবে। স্মরণ রাখিবে, তুমি যে খেলা খেলিতে যাইতেছ, তাহাতে যদি জয় লাভ করিয়া আসিতে পার, তাহা হইলে একটা সম্মানিত খেতাবের প্রভাবে আমাদের বংশ গৌরবান্বিত করিতে পারিবে। অদূর-ভবিষ্যতে তোমার কাউণ্টেস্ খেতাব লাভ হইবে। আমার মেয়ে কাউণ্টেস্ হইবে, ইহা আমার জীবনের চরম সার্থকতা—এ কথা ভুলিও না, মা! যেন আমি সকলকে বলিতে পারি—আমি কাউণ্টেস্ ভন্ আরেনবর্গের মা। যে দিন তোমার দাদারা বুক ফুলাইয়া বলিতে পারিবে—তাহারা কাউণ্ট ভন্ আরেনবর্গের শ্যালক, সে দিন আমাদের সুখের স্বপ্ন সফল হইবে। হাঁ, তুমি একটু বুদ্ধি খাটাইয়া খেলিতে পারিলে শীঘ্রই সেই সুখের দিন আসিবে। 'এ নহে স্বপন, এ নহে কাহিনী, আসিবে সে দিন আসিবে'।"—আনা শ্মিট গভীর তৃপ্তিভরে হাসিয়া হাতপাখা ঘুরাইয়া বাতাস খাইতে লাগিল। আনন্দে, উৎসাহে, উত্তেজনায় বেচারা ঘামিয়া উঠিয়াছিল।

আনা শ্মিট তাহার সম্ভ্রান্ত অতিথির অভ্যর্থনা করিয়া যে আনন্দ লাভ করিল, তাহার অতিথির আনন্দ তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক হইয়াছিল। অজস্র বিলাসের উপকরণ তাহার চতুর্দ্দিকে থরে থরে সজ্জিত; রাজ-অট্টালিকার ন্যায় সুদৃশ্য সুসজ্জিত অট্টালিকায় স্বর্ণখচিত পালঙ্ক, দুগ্ধফেননিভ শুভ্র শয্যায় অপূর্ব্ব আস্তরণ, সুকোমল পক্ষিপালকের উপাধান; য়ুরোপের কুবের-নন্দনেরা বহু চেষ্টায় ও বিপুল অর্থব্যয়েও যে সকল ভোগোপকরণ সংগ্রহ করিয়া উঠিতে পারেন না, না চাহিতেই তাহা পর্য্যাপ্ত পরিমাণে আসিয়া জুটিতেছে!—এই সুখ ও পরিতৃপ্তির মধ্যে কবলেন্‌সের সেনানিবাসের আসবাবপত্রবিহীন কক্ষে মরিচাধরা লোহার খাটিয়া-স্থিত কঠিন শয্যার ও প্রাণধারণের উপযোগী সর্ব্বপ্রকার বাহুল্য-বর্জ্জিত অনায়াসলভ্য ভোজ্যোপকরণের কথা কাউণ্টের মনে পড়িয়া গেল। তিনি মনে মনে বলিলেন, "সেই বিড়ম্বনার কথা মনে হইলে হাসি পায়। জীবনের অবশিষ্টকাল এই রকম আতিথ্য ভোগ করিতে

আমি সম্পূর্ণ রাজী আছি। এখানে কি সুখ, কি আরাম!"

বস্তুতঃ কাউণ্ট ভন্ আরেনবর্গের হৃদয় বিলাসিতা ও ভোগসুখের জন্ত হাহাকার করিত; কিন্তু তাঁহার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা ছিল না। তিনি জর্ম্মণীর যে পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এক সময় সেই পরিবারের যথেষ্ট ঐশ্বর্য্য ও সম্মান ছিল, কিন্তু কমলার কৃপায় বঞ্চিত হইয়া এখন তাঁহারা দরিদ্রের ন্যায় কাল যাপন করিতে বাধ্য হইয়াছেন,—অথচ পূর্ব্বপুরুষের রুচি, বিলাসানুরাগ ও দম্ভ তাঁহারা ত্যাগ করিতে পারেন নাই। বাবুগিরির সখ আছে, কিন্তু ব্যয় নির্ব্বাহের সামর্থ্য নাই। কাউণ্টের পিতা মধ্যবিত্ত গৃহস্থ অপেক্ষাও নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছিলেন; কিন্তু সংসার প্রতিপালনের জন্ত পরিশ্রম করা তাঁহার ন্যায় সম্রান্ত কুলীনের পক্ষে অপমানজনক মনে করিতেন। তাঁহার প্রতি মা ষষ্ঠীর যথেষ্ট অনুগ্রহ ছিল, এ জন্ত তিনি অর্থাভাবে বৃহৎ পরিবারের যথাযোগ্য গ্রাসাচ্ছাদনের ভারবহনে অসমর্থ হইলেও পদমর্য্যাদা রক্ষার জন্ত তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র বর্ত্তমান কাউণ্টকে উচ্চ শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র উচ্ছৃঙ্খলচরিত্র, ব্যসনাসক্ত ও মাতাল; কোন একটা গর্হিত কায করিয়া তিনি কলেজ হইতে বিতাড়িত হইলেন। অতঃপর তিনি সমাজে মুখ দেখান লজ্জার বিষয় মনে করিয়া 'একাকী হয়মারুহ্য জগাম গহনং বনং' —জর্ম্মণী হইতে অষ্ট্রীয়ায় পলায়ন করিলেন, অষ্ট্রীয়া হইতে তিনি রুসিয়ায় গিয়া নিরুদ্দেশ হইয়াছিলেন। চারি পাঁচ বৎসর কাল তাঁহার আত্মীয়-স্বজনরা তাঁহার সন্ধান জানিতে পারেন নাই। তিনি রুসিয়ায় গিয়া কোথায় কি ভাবে এই দীর্ঘকাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহাদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল। তাঁহার দেশত্যাগের পাঁচ বৎসর পরে এক দিন হঠাৎ জর্ম্মণীতে ফিরিয়া আসিলেন; কিন্তু কোথায় কি ভাবে এত কাল কাটাইলেন, তাহা কাহারও নিকট প্রকাশ করিলেন না। যাহা হউক, তাঁহার পিতা বৃদ্ধ কাউণ্ট তখনও জীবিত ছিলেন; তিনি তাঁহার একটি মুরুব্বীকে পুত্রের চাকরীর জন্ত ধরিয়া বসিলেন। এই মুরুব্বীটি সমর-বিভাগের কোন উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন; তিনিই এই যুবককে সামরিক বিদ্যালয়ে পাঠাইয়া কিছু দিন পরে অশ্বারোহী সৈন্যদলে ভর্ত্তি করিয়া লইলেন। পিতার মৃত্যুর পর এই যুবক কাউণ্ট আরেনবর্গ খেতাব ও সমর-বিভাগের একটি লেপ্টেনাণ্টের পদ লাভ করিলেন। এই সময়ে তাঁহার বেতনের পরিমাণ এতই অল্প ছিল যে, নিতান্ত আবশ্যক ব্যয় নির্ব্বাহ করাও তাঁহার পক্ষে কঠিন হইত। এই সময় আনা স্মিটের পুত্র পিটারের সহিত তাঁহার পরিচয় হইল। সুতরাং কাউণ্ট ভন্ আরেনবর্গ কিরূপ আগ্রহ ও উৎসাহের সহিত পিটারের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা সহজেই অনুমেয়। অনাহারক্লিষ্ট কঙ্কালসার ক্ষুধার্ত্ত বলীবর্দ্দ দীর্ঘকাল উপবাসের পর সুকোমল শ্যামল তৃণপূর্ণ ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া যেরূপ আনন্দ লাভ করে, 'বো-সিজোরে' আনা স্মিটের আতিথ্য লাভ করিয়া কাউণ্ট ভন্ আরেনবর্গ তাহা অপেক্ষা শতগুণ অধিক আনন্দিত হইলেন।

কাউণ্ট তাঁহার বিশ্রামকক্ষে প্রবেশ করিয়া হস্তমুখাদি প্রক্ষালন করিলেন, তাহার পর বিবিধ গন্ধদ্রব্যের সাহায্যে পদোচিত প্রসাধন সুসম্পন্ন করিয়া, 'প্রিয় বন্ধু' পিটারের সহিত দীপাবলিতেজে উজ্জ্বলিত নাট্যশালা সম, পুষ্পগন্ধ-সমাকুল উপবেশনকক্ষে প্রবেশ করিলেন। সেখানে আনা স্মিট ফ্রিজ ও বার্থাকে লইয়া কাউণ্টের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন; সেই কক্ষে দুই জনমাত্র বাহিরের লোক ছিল; একটি নব-বিবাহিতা তরুণী ও তাহার স্বামী। এই তরুণীটি আনা স্মিটের পিস্তুতো ভগিনী এবং তাহার জয়ঢাক!

এই তরুণীটিকে আনা স্মিটের 'জয়ঢাক' বলিয়া অভিহিত করিবার একটু কারণ আছে। সে বাল্যকাল হইতেই তাহার 'ভাগ্যবতী দিদি'র বড়ই অনুগত ছিল, দিদির প্রত্যেক কথার প্রতিধ্বনি করিত, এবং সর্ব্বত্র দিদির গুণকীর্ত্তন করিয়া বেড়াইত। আনা স্মিট জানিত, কাউণ্ট ভন্ আরেনবর্গের অভ্যর্থনা উপলক্ষে তাহাকে ও তাহার স্বামীকে নিমন্ত্রণ করিলে পরদিন প্রভাতেই এই 'বিরাট পুরুষে'র বিপুল অভ্যর্থনার সংবাদ দশগুণ অতিরঞ্জিতভাবে নগরের সর্ব্বত্র প্রচারিত হইবে। আনা স্মিট এত বড় একটা প্রলোভন সংবরণ করিতে পারে নাই।

পিটারের সঙ্গে কাউণ্ট সেই কক্ষে প্রবেশ করিবা-মাত্র আনা স্মিট বার্থার হাত ধরিয়া তাঁহার সম্মুখে গিয়া সসম্ভ্রমে বলিল, "কাউণ্ট, আমার একমাত্র কন্যা বার্থাকে তোমার সহিত পরিচিত করিবার আদেশ দান কর।"

কাউণ্ট তৎক্ষণাৎ হাসিমুখে সম্মানভরে বার্থাকে অভিবাদন করিলেন; যুবতী-সমাজের সহিত কি ভাবে মিশিতে হয়, তাহা তিনি ভালই জানিতেন, কিন্তু বার্থাকে দেখিয়া তিনি এতই বিস্মিত হইলেন যে, তাঁহাকে একটু চেষ্টা করিয়া আত্মসংবরণ করিতে হইল। এরূপ রূপবতী যুবতী তাঁহার সহিত পরিচিত হইবার জন্য সেখানে প্রতীক্ষা করিতেছিল—ইহা তিনি প্রত্যাশা করেন নাই। তাঁহার 'পরম বন্ধু' পিটার পূর্ব্বে তাঁহাকে প্রসঙ্গক্রমে বলিয়াছিল বটে—তাহার একটি ভগিনী আছে; কিন্তু রূপের গরিমায় সে রাজ-সিংহাসনে স্থান পাইবার যোগ্য, ইহা সে কোন দিন কাউণ্টের নিকট প্রকাশ করে নাই। এতক্ষণে তিনি বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার ভাগ্যাকাশ হইতে দুঃখ-দারিদ্র্যের মেঘ অপসারিত হওয়াতেই পিটারের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব হইয়াছিল এবং তিনি তাহার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

কয়েক মিনিট পরে সংবাদ আসিল—'ডিনার প্রস্তুত।' —আনা স্মিট বলিল, "কাউণ্ট, আমার কন্যাকে তোমার হাত ধরিয়া লইয়া যাইবার সম্মান লাভ করিতে দিবে কি?"

কাউণ্ট উঠিয়া হাত বাড়াইয়া দিলে বার্থা তাঁহার হাত ধরিয়া ভোজন-কক্ষের অভিমুখে অগ্রসর হইল; পূর্ব্বোক্ত তরুণীর স্বামী আনা স্মিটের হাত ধরিল; তরুণী তাহার বোন্‌পো ফ্রিজের হাত ধরিল; পিটারের হাত ধরিবার কেহ না থাকায় সে একাকী সকলের অনুসরণ করিল।

আনা স্মিট ডিনারের বিপুল আয়োজন করিয়াছিল; সে বহুমূল্যে অত্যুৎকৃষ্ট দুষ্প্রাপ্য 'রাইন মদ্য' প্রচুর পরিমাণে সংগ্রহ করিয়াছিল! এরূপ সুপেয় সুরা কাউণ্ট জীবনে আস্বাদন করেন নাই; তিনি তাহা আকণ্ঠ পান করিয়া পরিতৃপ্ত হইলেন।

আনা স্মিট কাউণ্টকে ভোজন-টেবলে বসাইয়া স্বয়ং তাঁহার এক পাশে বসিয়াছিল, বার্থাকে অন্য পাশে বসাইয়াছিল। আহারের সময় কাউণ্ট নানা কথায় বার্থার মনোরঞ্জনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন দেখিয়া আনা স্মিটের চক্ষু আনন্দে হাসিতে লাগিল।

আনা স্মিট দুই একটি কথার পর কাউণ্টকে বলিল, "কাউণ্ট, পিটার বলিতেছিল, জুরিচ তোমার সুপরিচিত; সত্য কি?"

এই প্রশ্নে কাউণ্ট যেন কিঞ্চিৎ বিব্রত হইয়া উঠিলেন, কিন্তু তৎক্ষণাৎ সাম্‌লাইয়া লইয়া বলিলেন, "হাঁ, তা—তা সে কথা বড় মিথ্যা নয়। জুরিচ আমার পরিচিত স্থান বটে। আমার বয়স যখন আঠার বৎসর, সেই সময় এখানে আমার এক মাসীর সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিলাম। মাসী তখন জুরিচেই বাস করিতেন, তিনি আমাকে প্রায় দুই বৎসর তাঁহার কাছে রাখিয়াছিলেন।"

আনা স্মিট বলিলেন, "তোমার মাসী? জুরিচে থাকিতেন? তাঁহার নামটি কি, শুনিতে পাই না?"

এই প্রশ্নে কাউণ্ট অধিকতর বিব্রত হইয়া পড়িলেন, এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া তাঁহার পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিল। কিন্তু কাউণ্ট বিলক্ষণ চতুর ও সপ্রতিভ লোক; তিনি আনা স্মিটের প্রশ্নের উত্তর না দিয়া ফোঁস করিয়া একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "আহা, বেচারার অকাল-মৃত্যুতে আমি বড়ই মর্ম্মাহত হইয়াছিলাম। বহু দিন পূর্ব্বে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।"

কাউণ্ট কথাটা চাপা দিয়াই বার্থাকে বলিলেন, "তুমি কখন জর্ম্মণীতে গিয়াছিলে?"

বার্থা বলিলেন, "না, সে সুখে আমাকে বঞ্চিত থাকিতে হইয়াছে। আমার দাদারা প্রতিজ্ঞায় কল্পতরু, তাঁহারা আমাকে জর্ম্মণী দেখাইয়া আনিবেন অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাঁহারা সেই অঙ্গীকার পালন করিতে পারিলেন না! আমার বোধ হয়, সকল দাদাই নিজেদের ভগিনী ভিন্ন অন্য লোকের ভগিনীদের সঙ্গে লইয়া দেশভ্রমণ করিতে ভালবাসেন!" —বার্থা ফ্রিজ ও পিটারের মুখের উপর কটাক্ষপাত করিয়া একটু হাসিল।

বার্থার কথায় হাসির গর্‌রা উঠিল। তাহার পর

কাউণ্ট হঠাৎ গম্ভীর হইয়া নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "বড়ই দুঃখের কথা বটে; কিন্তু আমি অনেক সময়েই দেখিয়াছি, ভগিনীরাও নিজেদের ভাইকে সযত্নে পরিহার করিয়া অন্যের ভাইদের সঙ্গে দেশ-ভ্রমণ করিতে ভালবাসে।"

কাউণ্টের কৃত্রিম গাম্ভীর্য্যে ও এই মন্তব্যে সকলেই বার্থার মুখের দিকে চাহিয়া আবার হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল, বার্থা এই হাসিতে অপ্রতিভ হইয়া মস্তক অবনত করিল; লজ্জায় তাহার চোখ মুখ লাল হইয়া উঠিল।

বার্থা লজ্জিত হইয়াছে বুঝিয়া আনা স্মিট তাহার পক্ষাবলম্বন করিয়া বলিল, "কাউণ্ট বীরপুরুষ কি না; নারীর সম্মানরক্ষাই বীরের ধর্ম্ম, এই জন্য উনি বোধ হয় অন্য লোকের ভগিনীদের দেশ-ভ্রমণের সময় সঙ্গে থাকিয়া তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণ করেন।"

কাউণ্ট মুখ লাল করিয়া দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "না, কখন না; আমি—"

আনা স্মিট বাধা দিয়া হাসিয়া বলিল, "তুমি 'না' বলিলেই কি আমি সে কথা শুনি? আমার কথা যে সত্য, তোমার মুখ দেখিয়াই তাহা বুঝিতে পারা যাইতেছে। তোমরা—যুদ্ধব্যবসায়ীরা রস-বোঝাই এক একখান মনোয়ারী জাহাজ! যুবতীর দলকে সেই রসে মসগুল করিয়া রাখ।"

কাউণ্ট বলিলেন, "আমি যুদ্ধব্যবসায়ী বটে, কিন্তু কেহ আমার ও রকম বদনাম দিতে পারে না; এই অভিযোগ আমি অস্বীকার করিব।"

আনা স্মিট কাউণ্টের কথায় কর্ণপাত না করিয়া বলিল, "আচ্ছা কাউণ্ট, বলিতে পার, তোমাদের যুদ্ধ-ব্যবসায়ীদের কোন্ বিশেষত্বের জন্য আমাদের জাতি—স্ত্রীজাতিটা তোমাদের এত পক্ষপাতিনী হইয়া উঠে?"

কাউণ্ট মাথা নোয়াইয়া হাসিয়া বলিলেন, "ফ্র, আমার মত আনাড়ীকে এই কঠিন সমস্যা-সমাধানের যোগ্য ব্যক্তি বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া আমাকে যথেষ্ট সম্মানিত করিলেন। এ সম্বন্ধে আমার ধারণা এই যে, যুবতীরা যুদ্ধব্যবসায়ীদের অতিরিক্ত পক্ষপাতিনী হয়, ইহার কারণ, তাহাদিগকে বিবাহ করিলে তাড়াতাড়ি বিধবা হইবার সুযোগ ঘটে, সুতরাং পুনর্ব্বার নূতন স্বামী লাভের আশা থাকে।"

কাউণ্টের কথা শুনিয়া রমণীত্রয় সমস্বরে গর্জ্জন করিয়া বলিল, "ছি, ছি, ধিক্, মিথ্যা কথা!"

আনা স্মিট বলিলেন, "কাউণ্ট, তুমি কোন্ অধিকারে আমার স্বজাতির সকলের মাথা এক ক্ষুরে মুড়াইতেছ বলিতে পার? আমি তাহাদের পক্ষ হইতে তোমার এই অন্যায় উক্তির প্রতিবাদ করিতেছি। আমার বিশ্বাস, নারীজাতি তোমাদের অতিরিক্ত পক্ষপাতিনী হয়, ইহার কারণ, তোমাদের অনেকেই সুপুরুষ, সাহসী, বলবান্ এবং নারীর মনোরঞ্জনে অসাধারণ তৎপর। তোমরা সহজেই তাহাদের হৃদয়ের উপর প্রভাব বিস্তার কর।"

কাউণ্টের মনে হইল, কথাগুলি তাঁহাকেই লক্ষ্য করিয়া বলা হইল; এই জন্য তিনি মুখ লাল করিয়া পুনর্ব্বার মাথা নোয়াইলেন। সকলে আবার হাসিয়া উঠিল; কিন্তু আনা স্মিট ক্ষুণ্ণভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল, "তোমাদের সবই ভাল, দোষের মধ্যে তোমাদের কাজে কথায় সামঞ্জস্য নাই; আর তোমরা ভয়ঙ্কর প্রতারক অর্থাৎ অবলার মন চুরি করিয়া ফাঁকি দিয়া সরিয়া পড়। তোমাদের বিশ্বাস করা দায়!"

সকলে আবার খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল; তখন কাউণ্ট অভিনয়ের ভঙ্গীতে বুকে হাত দিয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "এই আমি বুকে হাত দিয়া শপথ করিয়া বলিতেছি, আমার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা। আমি কায়মনোবাক্যে নিরপরাধ।"

আনা স্মিট বিচারালয়ে চেয়ারে উপবিষ্ট বিচারকের মত মুখ গম্ভীর করিয়া বলিল, "উত্তম, তুমি আপনাকে নিরপরাধ বলিতেছ; কিন্তু তুমি যে নিরপরাধ, ইহা এখন পর্য্যন্ত সপ্রমাণ হয় নাই। তোমার বিরুদ্ধে আরোপিত অভিযোগের বিচার যথাসময়ে নিষ্পন্ন হইবে। তোমার প্রতিকূলে কোন প্রমাণ আছে কি না, তাহা পরীক্ষা করিয়া তোমার দণ্ডের বা মুক্তিদানের রায় প্রকাশ করা হইবে। আপাততঃ তোমার মামলা মুলতুবী রহিল। বিচার শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত 'বো-সিজোরে' তোমার হাজত-বাসের আদেশ হইল।"

কাউণ্ট বলিলেন, "মহিলা জজের এ আদেশ শিরোধার্য্য। আমি নিজের নির্দ্দোষিতা সপ্রমাণ করিয়া সসম্মান মুক্তি লাভ করিতে পারিব, এ বিষয়ে আমার সন্দেহ নাই।"

আনা স্মিট বলিল, "যথাকালে তাহা জানিতে পারা যাইবে। তোমরা—পুরুষরা বোধ হয় কফি ও ধূমপানের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছ; অতএব আমরা এখন উঠিলাম।"

আনা স্মিট তাহার ভগিনী ও বার্থাকে সঙ্গে লইয়া সেই কক্ষ ত্যাগ করিল। আনা স্মিট তাহার ভগিনীকে একটি কক্ষে বসাইয়া রাখিয়া বার্থাকে লইয়া তাহার খাস কামরায় প্রবেশ করিল। সেই কক্ষের দ্বার রুদ্ধ করিয়া বার্থাকে পার্শ্বে বসাইয়া নিম্নস্বরে বলিল, "বার্থা, কাউণ্টকে দেখিয়া ও তাঁহার কথাবার্ত্তা শুনিয়া তোমার কিরূপ ধারণা হইল?"

বার্থা বিন্দুমাত্র উৎসাহ প্রকাশ না করিয়া সহজস্বরে বলিল, "ভালই মনে হইল।"

আনা স্মিট উত্তেজিত স্বরে বলিল, "ভালই বলিলে যথেষ্ট হইল না, অতি চমৎকার। কেমন সুরসিক, কেমন চতুর! না হবে কেন? কত বড় বংশে জন্ম? দেখ বার্থা! আমি মানুষ চিনি; আমি দর্প করিয়া বলিতেছি, তোমাকেই আমি কাউণ্টেস্ ভন আরেনবর্গ করিব। তোমাকে আমার গর্ভে ধারণ করা সেই দিন সার্থক হইবে, যে দিন আমি কাউণ্টেসের জননী বলিয়া দেশবিদেশে সম্মানিত হইব। সে দিনের আর অধিক বিলম্ব নাই।"

বার্থা কোন কথা না বলিয়া নতমস্তকে বসিয়া রহিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ

গুপ্ত সমিতি

জেনিভা নগরে 'রোন' নদের তীরে একটি অপরিচ্ছন্ন ক্ষুদ্র পল্লী ছিল; এই পল্লীর অধিকাংশ অট্টালিকা জীর্ণ; কতকগুলির দ্বার ও জানালা এরূপ সঙ্কীর্ণ যে, সেই সকল অট্টালিকায় আলোক ও বাতাস প্রবেশ করিতে পারিত না। কোন কোন অট্টালিকা দ্বিতল, কিন্তু সিঁড়িগুলি অত্যন্ত অপ্রশস্ত এবং এত জীর্ণ যে, দুই জন লোক একত্র উঠিলে তাহা ভাঙ্গিয়া পড়িবার আশঙ্কা ছিল। অধিকাংশ সিঁড়ি দিবসেই অন্ধকারাচ্ছন্ন, রাত্রিতেও সেখানে বাতি জ্বলিত না। প্রায় সকল বাড়ীর অবস্থাই এইরূপ শোচনীয়; কোন বাড়ীতে মানুষ বাস করে—বাহিরের অবস্থা দেখিয়া এরূপ মনে হইত না।

জোসেফ কুরেটকে সঙ্গে লইয়া চানস্কি নগরের বিভিন্ন পথ অতিক্রম করিয়া, অবশেষে এইরূপ একটি অট্টালিকার দ্বারদেশে উপস্থিত হইল। সেখানে ঘোর অন্ধকার বিরাজিত, কোন দিকে জনমানবের সাড়া-শব্দ নাই; একটা উৎকট দুর্গন্ধ জোসেফের নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিল। চারিদিকের নিস্তব্ধতা দেখিয়া তাহার মন কি একটা অজ্ঞাত ভয়ে পূর্ণ হইল; কিন্তু সে কোন কথা বলিল না।

চানস্কি মৃদুস্বরে জোসেফকে বলিল, "অন্ধকারে তুমি কিছুই দেখিতে পাইতেছ না; কিন্তু তোমার ভয়ের কারণ নাই, আমি তোমার হাত ধরিয়া গন্তব্যস্থানে লইয়া যাইতেছি।"

জোসেফের হাত ধরিয়া চানস্কি অট্টালিকায় প্রবেশ করিল, অন্ধকারে কয়েকটি সিঁড়ি পার হইয়া সে একটি রুদ্ধদ্বার কক্ষের দ্বারের সম্মুখে উপস্থিত হইল; সে সেই দ্বারে তিনবার মৃদু করাঘাত করিল। মুহূর্ত্ত পরে একটি বৃদ্ধা একটা ছোট ল্যাম্পসহ আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিল। বৃদ্ধার আকার-প্রকার দেখিয়াই জোসেফের চক্ষু স্থির! এরূপ কদাকার মূর্ত্তি সে পূর্ব্বে কখন দেখিয়াছিল কি না সন্দেহ; সে যেন চর্ম্মাবৃত একটি নরকঙ্কাল! চক্ষু দুটি অক্ষিকোটরে প্রবিষ্ট, মাথার চুলগুলি শণের নুড়ি, পরিধানে শতচ্ছিন্ন মলিন পরিচ্ছদ। বার্দ্ধক্যভারে তাহার দেহ বক্র।

দ্বার খুলিয়া বৃদ্ধা সোজা হইয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করিয়া হাতের ল্যাম্পটা উঁচু করিয়া ধরিল। সে কোটরপ্রবিষ্ট চক্ষুর ক্ষীণ দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া সম্মুখবর্ত্তী চানস্কিকে চিনিতে পারিল; তখন সে অস্ফুট নাকিসুরে বলিল, "নমস্কার, মসিঁয়ে চানস্কি!" চানস্কির পাশে জোসেফকে দেখিয়া হঠাৎ সে চুপ করিল; তাহার পর জোসেফের

মুখের উপর সন্দিগ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া চানস্কিকে বলিল, "তোমার সঙ্গে ওটি কে ?"

চানস্কি বলিল, "চিন্তার কোন কারণ নাই ; ইনি আমারই বন্ধু, খাঁটি লোক ; আমিই উঁহার জন্ম দায়ী।"

"ভাল কথা" বলিয়া বৃদ্ধা তাহাদিগকে সেই কক্ষে প্রবেশ করিতে ইঙ্গিত করিয়া, দ্বার ছাড়িয়া সরিয়া দাঁড়াইল। তাহারা উভয়ে ভিতরে প্রবেশ করিলে সে দ্বার রুদ্ধ করিয়া লোহার অর্গল আঁটিয়া দিল।

চানস্কির সহিত জোসেফ যে কক্ষে প্রবেশ করিল, সেই কক্ষটিও অতি জীর্ণ; তাহার দেওয়ালগুলি বিবর্ণ, কড়ি-বরগাগুলি ঝুল ও মাকড়সার জালে সমাচ্ছন্ন; কক্ষটির মধ্যস্থলে একখানি খাটিয়ার উপর একটি মলিন শয্যা প্রসারিত ছিল। তাহার পাশে একটি ছোট টেবল এবং একখানি ভাঙ্গা চেয়ার পড়িয়া ছিল।

চানস্কি জোসেফকে তাহার অনুসরণ করিতে বলিয়া একটি দ্বার খুলিয়া এক সুপ্রশস্ত কক্ষে প্রবেশ করিল। সেই কক্ষে একটি লম্বা টেবল, খান দুই বেঞ্চি ও কয়েকখানি চেয়ার ছিল। নদীর দিকে এই কক্ষের একটি বাতায়ন উন্মুক্ত ছিল, তাহার ঠিক নীচেই নদী; কিন্তু বাতায়নের সম্মুখে পর্দা থাকায় নদীর জল দেখা যাইতেছিল না।

এই কক্ষে বেঞ্চির উপর ছয় সাত জন লোক বসিয়া ছিল। তাহারা সকলেই যেন বিষাদের প্রতিমূর্ত্তি; কাহারও মুখে প্রফুল্লতা বা আনন্দের কোন চিহ্ন ছিল না। সকলেরই মলিন মুখে চিন্তার রেখা পরিস্ফুট! তাহাদের কাহারও মুখে সিগারেট, কাহারও মুখে চুরুট। তাম্রকূট-ধূমে সেই কক্ষের বায়ুস্তর ভারাক্রান্ত।

জোসেফ চানস্কির সহিত সেই কক্ষে প্রবেশ করিবামাত্র সকলেই চানস্কিকে অভিবাদন করিয়া তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে জোসেফের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। যদিও কেহ চানস্কিকে তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল না, কিন্তু সকলেই যেন জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাহাকে প্রশ্ন করিল, "এই অপরিচিত লোকটি কে? কি উদ্দেশ্যেই বা এখানে আসিয়াছে?"

চানস্কি তাহাদের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া নিম্নস্বরে বলিল, "এ আমার একটি বন্ধু, ইহার নাম মসিঁয়ে কুরেট। কুরেট জুরিচ হইতে আসিয়াছে, সেখানে স্মিট এণ্ড সন্সের কারখানায় কায করিত। সম্পূর্ণ বিশ্বাসী এবং ইস্পাতের মত দৃঢ়চিত্ত যুবক।"

চানস্কি ও জোসেফ দুইখানি চেয়ারে বসিয়া ধূমপানে প্রবৃত্ত হইল। কয়েক মিনিটের মধ্যে আরও কয়েক জন লোক সেই কক্ষে প্রবেশ করিল; তাহারাও জোসেফকে দেখিয়া যেন একটু বিস্মিত হইল এবং নিম্নস্বরে কি বলাবলি করিতে লাগিল।

আরও দশ মিনিট পরে এক জন লোক সেই কক্ষে প্রবেশ করিল; তাহাকে দেখিবামাত্র সকলেই উঠিয়া দাঁড়াইয়া সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিল। এই লোকটির নাম পলিটস্কে; সে এই গুপ্ত সমিতির সভাপতি। লোকটির মুখের গঠন কতকটা ইহুদীদিগের মুখের মত। দীর্ঘ দেহ ঈষৎ কুব্জ; ললাট প্রশস্ত, চক্ষু দুটি ক্ষুদ্র, দৃষ্টি কুটিল; মস্তকের কেশগুলি দীর্ঘ, অধিকাংশ কেশ শুভ্র। মুখে সাদা দাড়ি-গোঁফ, লম্বা দাড়ি, গোঁফ জোড়াটাও জমকাল। পলিটস্কেকে দেখিলেই মনে হইত, নিতান্ত সাধারণ লোক নহে; নেতৃত্ব করিবার শক্তি দিয়া ভগবান্ তাহাকে পৃথিবীতে পাঠাইয়াছিলেন।

আগন্তুক চেয়ারে বসিয়া রুসীয় ভাষায় বলিল, "মহাশয়েরা আমার বিলম্বজনিত ক্রটি মার্জ্জনা করিবেন; কিন্তু এই বিলম্ব আমার ইচ্ছাকৃত নহে, কোন গুরুতর জরুরী কার্য্যে আমাকে ব্যস্ত থাকিতে হইয়াছিল।"

এই লোকগুলি যে গৃহে সম্মিলিত হইয়াছিল, তাহা একটি আড্ডা বা 'ক্লাব'; এই ক্লাবের নাম 'লিবার্টি ক্লাব'। এই ক্লাবের প্রকাশ্য উদ্দেশ্য সুইট্জার্লাণ্ডপ্রবাসী দুস্থ রুসীয় প্রজাদের দুঃখপ্রশমন; কিন্তু ইহার প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ অন্য প্রকার। শত শত ব্যক্তি এই ক্লাবের সভ্য ছিল। রোন নদীর তীরসংলগ্ন এই বহু পুরাতন জীর্ণ অট্টালিকা তাহাদের 'ক্লাব-গৃহ' বলিয়া পরিচিত হইলেও তাহাদের সমিতির অধিবেশনের স্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল না। কখনও কোন 'কাফে'তে, কখন বা কোন ধনাঢ্য রুসীয়ানের বাড়ীতে, আবার অবস্থা বিবেচনায় কোন গভীর অরণ্যে তাহাদের মন্ত্রণা-সভার অধিবেশন হইত। প্রকৃতপক্ষে তাহারা

একটি রাজনীতিক সম্প্রদায়, কোন একটি সাধারণ উদ্দেশ্যে তাহারা সংঘবদ্ধ হইয়াছিল; তাহাদিগকে অতি কঠোর নিয়মে আবদ্ধ হইতে হইত এবং সভ্যগণের কেহ কোন কারণে সমিতির নিয়ম লঙ্ঘন করিলে তাহার প্রাণদণ্ড হইত।

সভাপতি পূর্ব্বোক্ত সুদীর্ঘ টেবলের মধ্যস্থলে উপবেশন করিলে সমাগত সভ্যগণ তাহার দুই পাশে সমবেত হইল। সভার কার্য্য আরম্ভ হইলে চানস্কি দণ্ডায়মান হইয়া বলিল, "সভাপতি মহাশয়, অদ্য আমাদের এই সভায় আমার একটি বন্ধুকে পরিচিত করিতে আনিয়াছি। তাহার নাম জোসেফ কুরেট।"

চানস্কির ইঙ্গিতে জোসেফ তাহার আসন হইতে উঠিয়া দাঁড়াইল। তখন চানস্কি তাহার প্রতি অঙ্গুলীনির্দ্দেশ করিয়া বলিল, "ঐ দেখুন আমার সেই বন্ধু। উহাকে আমাদের সমিতিতে গ্রহণ করিবার জন্য আপনার নিকট প্রার্থনা করিতেছি। আমাদের ভাষা এই যুবকের সুবিদিত এবং আমাদের আশা, আকাঙ্ক্ষা ও লক্ষ্যের সহিত ইহার আন্তরিক সহানুভূতি আছে। এই যুবক বিশ্বাসী, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং জীবনের প্রতি মমতাশূন্য।"

জোসেফের মুখের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাহিয়া সভাপতি যেন তাহার মনের ভিতর পর্য্যন্ত দেখিবার চেষ্টা করিল। তাহার সেই অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে জোসেফ বিন্দুমাত্র বিচলিত হইল না।

সভাপতি রুস ভাষায় জোসেফকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি রুসীয়ান?"

জোসেফ বলিল, "না।"

সভাপতি। তুমি কোন্ দেশের লোক?

জোসেফ বলিল, "আমার জন্ম জর্ম্মণীতে।"

সভাপতি। আমাদের ভাষা তুমি কোথায় শিখিলে?

জোসেফ। আমার পিতামাতা এ ভাষা জানিতেন: ইহা তাঁহাদের কাছেই শিখিয়াছি।

সভাপতি। তোমার পিতামাতা এখন জীবিত আছেন?

জোসেফ। হাঁ।

সভাপতি। তাঁহারা কোথায় আছেন?

জোসেফ। জুরিচে।

সভাপতি। এখানে তুমি কি উদ্দেশ্যে আসিয়াছ?

জোসেফ দুই এক মিনিট ভাবিয়া লইয়া বলিল, "আমি মনের ঘৃণায় জুরিচ ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিয়াছি। আমি সেখানকার একটা কারখানায় চাকরী করিতাম; কিন্তু সেখানে কুকুরের মত ব্যবহার পাইতাম; তাহা আমার অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল। যাহার কিঞ্চিৎ আত্মসম্মান ও মনুষ্যত্ব আছে, সে সেরূপ ঘৃণিত ব্যবহার সহ্য করিয়া জীবনের ভার বহন করিতে পারে না। ক্রীতদাসের ন্যায় জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা আমার অসহ্য মনে হইয়াছিল। আমি যাহাদের জন্য পরিশ্রম করিতেছিলাম, তাহারা আমার শ্রমের ফলভোগ করিয়া আমাকে যে পারিশ্রমিক দিত, তাহাতে ক্ষুধা-নিবৃত্তি হয় না; তাহার উপর তাহারা আমাকে ঘৃণা করিত, আমাকে মানুষ মনে করিত না। ইহা অসহ্য।"

জোসেফের কথা শুনিয়া সভাপতি প্রীত হইল, উৎসাহে তাহার চক্ষু মুহূর্ত্তের জন্য যেন জ্বলিয়া উঠিল; সে বলিল, "জোসেফ কুরেট, তুমি মানুষের মতই কথা বলিয়াছ। তুমি কোন্ কার্য্যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছ?"

জোসেফ। আমি পূর্ত্তকার্য্যে অভিজ্ঞ।

সভাপতি। হাঁ, এ দরকারী বিদ্যা বটে। এখন যাহা জিজ্ঞাসা করি, তাহার ঠিক উত্তর দাও,—আমাদের সমিতিতে যোগদান করিতে তোমার কি আন্তরিক ইচ্ছা ও আগ্রহ আছে?

জোসেফ। হাঁ, আছে।

সভাপতি। আমাদের সম্প্রদায় যে উচ্চ আশা ও অটল আকাঙ্ক্ষা লইয়া কায করিতেছে, তাহা তোমার ব্যক্তিগত আশা ও আকাঙ্ক্ষা ভাবিয়া আমাদের ব্রত গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছ?

জোসেফ। হাঁ, আছি। আমাকে যাহা করিতে বলা হইবে, তাহা যতই দুষ্কর হউক, করিতে প্রস্তুত আছি; যে স্থানে যাইতে বলা হইবে, সেই স্থান যতই দুর্গম ও বিঘ্নসঙ্কুল হউক—সেখানে যাইতে আপত্তি করিব না। কর্ত্তব্য যতই কঠিন হউক, প্রাণ দিয়াও তাহা পালন করিব।

সভাপতি। তোমার অঙ্গীকার সন্তোষজনক। যদি তোমাকে আমাদের মণ্ডলীতে গ্রহণ করা হয়, তাহা হইলে আমরা তোমার যোগ্যতা পরীক্ষা করিব; সে পরীক্ষা অত্যন্ত কঠোর।

জোসেফ। যতই কঠোর হউক, তাহা আমাকে বিচলিত করিতে পারিবে না। সকল কঠোরতাই আমি সহ্য করিতে প্রস্তুত।

সভাপতি। উত্তম। তুমি এখন কক্ষান্তরে গিয়া অপেক্ষা কর। আমি আমার সহযোগিগণের সহিত পরামর্শ করিব। ভাই চানস্কি, তোমার বন্ধুকে কিছু-কালের জন্য অন্য কক্ষে রাখিয়া এস।

চানস্কি জোসেফকে সঙ্গে লইয়া বাহিরের দিকের পূর্ব্বোক্ত ক্ষুদ্র কক্ষে প্রবেশ করিল; তখন সেখানে সেই বৃদ্ধা ভাঙ্গা চেয়ারে বসিয়া ছেঁড়া মোজায় তালি দিতে-ছিল। সে মুখ তুলিয়া একবার জোসেফের মুখের দিকে চাহিল, কোন কথা বলিল না। জোসেফ খাটিয়ার উপর বসিয়া একটা সিগারেট ধরাইয়া লইল। চানস্কি তাহাকে সেখানে অপেক্ষা করিতে বলিয়া সভায় যোগদান করিতে চলিল।

বৃদ্ধা জোসেফের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "তুমি কি রুসিয়া হইতে আসিয়াছ?"

জোসেফ "না" বলিয়া চুপ করিল। বৃদ্ধা তাহাকে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিল না।

প্রায় আধ ঘণ্টা পরে চানস্কি সেই কক্ষে পুনঃ প্রবেশ করিয়া জোসেফকে ডাকিয়া লইয়া গেল। সে যে চেয়ারে বসিয়াছিল, পুনর্ব্বার সেই চেয়ারে উপবেশন করিলে সভাপতি তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "জোসেফ কুরেট, তোমার বন্ধু ও আমাদের সমিতির অন্যতম সদস্য চানস্কি তোমার পরিচয়াদি সম্বন্ধে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা সন্তোষজনক হইয়াছে। তোমাকে আমাদের সমিতির সভ্যশ্রেণীভুক্ত করা সঙ্গত হইবে কি না, এ বিষয়ে আমরা যথাযোগ্য আলোচনা করিয়াছি; আলোচনায় স্থির হইয়াছে—তোমাকে আমাদের সমিতিতে গ্রহণ করা হইবে; এবং অন্যান্য সদস্য যে গুরুতর দায়িত্ব-ভার গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ তোমাকেও অর্পণ করা হইবে। কি আমাদের সমিতির সদস্যগণকে কেবল যে দায়িত্ব-ভার বহন করিতে হয়, তাহার বিনিময়ে তাঁহাদের কিছুই প্রাপ্তি নাই—এরূপ নহে। তাঁহাদের আবশ্যক ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য সমিতি হইতে উপযুক্ত পরিমাণে অর্থ-সাহায্য করা হয়; সুতরাং যাঁহাদের অর্থাগমের কোন উপায় নাই, তাঁহা-দিগকে অর্থ-কষ্ট সহ্য করিতে হয় না। এতদ্ভিন্ন যাঁহারা সুচারুরূপে কর্ত্তব্যপালন করেন, তাঁহাদিগকে যথাযোগ্য পুরস্কারও প্রদান করা হয়। তোমাকে আমাদের দলে গ্রহণ করা হইলে সম্ভবতঃ কোন দূর দেশে যাইতে হইবে। ইহাতে যথেষ্ট বিপদেরও আশঙ্কা আছে; এমন কি, তোমার প্রাণ পর্য্যন্ত যাইতে পারে।—আমি জানিতে চাই, তুমি প্রাণের মায়া বিসর্জ্জন করিয়া এই ভার লইতে রাজী আছ কি না?"

জোসেফ দৃঢ়স্বরে বলিল, "হাঁ, সম্পূর্ণ রাজী আছি।"

সভাপতি বলিল, "উত্তম। তোমার ভাবভঙ্গী দেখিয়া ও কথা শুনিয়া আমার ধারণা হইয়াছে—তুমি খাঁটি মানুষ। তিন রাত্রি পরে তুমি পুনর্ব্বার এখানে আসিয়া সমিতির নিয়মানুযায়ী শপথ গ্রহণ করিবে; তাহার পর তোমাকে আমরা দলভুক্ত করিব। সেই দিন তুমি আমাদের অসাধারণ শক্তির কিঞ্চিৎ পরিচয় পাইবে, আমাদের সমিতির নিয়ম কিরূপ কঠোর, এবং সেই সকল নিয়ম কি ভাবে প্রতিপালিত হয়, সম্ভবতঃ তাহারও শোচনীয় প্রমাণ প্রত্যক্ষ করিবার সুযোগ পাইবে। আজ বিদায়।"

চানস্কির সহিত জোসেফ নিঃশব্দে সেই কক্ষ ত্যাগ করিল; অট্টালিকার বাহিরে খোলা বাতাসে আসিয়া তাহার শরীর জুড়াইল। যতক্ষণ সে ঘরের ভিতর ছিল, রুদ্ধ বায়ুতে তাহার শ্বাসরোধের উপক্রম হইয়াছিল। গভীর রাত্রি, প্রকৃতি নিস্তব্ধ; কেবল অদূরবর্ত্তী নদীর অশ্রান্ত কল্লোল-ধ্বনি তাহার কর্ণে কি এক অজ্ঞাত রহস্যের বার্ত্তা বহন করিতে লাগিল, তাহাতে আশা বা আনন্দের আভাস ছিল না; তাহা আতঙ্ক ও নিরাশার সূচনা করিতেছিল।

উভয় বন্ধু নিঃশব্দে চিন্তাকুল চিত্তে নগরে প্রত্যাগমন করিল।

একটি কাফের সম্মুখে আসিয়া চানস্কি

জোসেফকে বলিল, "ক্ষুধা হইয়াছে? কিছু খাইয়া লইবে?"

জোসেফ বলিল, "এক পেয়ালা কাফি ও অল্প কিছু খাবার খাইয়া লইলে মন্দ হয় না। কাফে এখনও বন্ধ হয় নাই দেখিতেছি!"

চানস্কি বলিল, "না, তাহার দেরী আছে। এই ত সবে রাত্রি বারটা।"

উভয়ে কাঁফের ভিতর প্রবেশ করিয়া পানাহারে প্রবৃত্ত হইল। আহারান্তে উভয়ে পথে আসিয়া চানস্কির বাসার দিকে চলিতে লাগিল; উভয়েই নিস্তব্ধ, স্ব স্ব চিন্তায় বিভোর।

চলিতে চলিতে জোসেফ হঠাৎ চানস্কির কাঁধে হাত দিয়া বলিল, "চানস্কি, শুনিলাম, আমাকে দূরদেশে যাইতে হইবে। কোথায়,—কত দূরে?"

চানস্কি বলিল, "কিরূপে বলিব? আমার তাহা অনুমান করিবারও শক্তি নাই। এ সকল কথা কেহই পূর্ব্বে জানিতে পারে না; নির্দ্দিষ্ট সময়েও তুমি ভিন্ন অন্য কেহ জানিতে পারিবে না।"

জোসেফ বলিল, "আর একটা কথা বলিতে পার? সভাপতি বলিলেন, তোমাদের সমিতির নিয়ম কিরূপ কঠোর এবং সেই সকল নিয়ম কি ভাবে প্রতিপালিত হয়, সে দিন আমি তাহার শোচনীয় প্রমাণ প্রত্যক্ষ করিবার সুযোগ পাইব!—সে কিরূপ প্রমাণ? কেনই বা শোচনীয়?"

চানস্কি বিষণ্নভাবে বলিল, 'তোমার এই প্রশ্নেরও উত্তর দিতে পারিলাম না, ভাই! তুমি একটু ধৈর্য্য ধরিয়া এই কয়দিন অপেক্ষা কর—তাহার পর সকলই জানিতে পারিবে। বড়ই ক্লান্তি বোধ হইতেছে; বাসায় আসিয়া পড়িয়াছি, চল, তাড়াতাড়ি শুইয়া পড়ি!—আমাদের জীবন বিস্ময়কর রহস্যে আবৃত, মৃত্যুতেই এই রহস্যের সমাধান!"

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

চারের মাছ

কলোন নগরে স্মিট্ এণ্ড সন্সের একটি দোকান ছিল—এই দোকানে তাহাদের কারখানায় নির্ম্মিত নানাপ্রকার কলকব্জা বিক্রয় হইত। কাউণ্ট ভন্ আরেনবর্গ 'বো-সিজোরে' আসিয়া আনা স্মিটের আতিথ্য গ্রহণের দুই দিন পরে আনা স্মিট কলোনের দোকানের অধ্যক্ষকে একখানি পত্র লিখিল; পত্রের লেফাপার উপর লেখা হইল 'গোপনীয় ও জরুরী পত্র।' কাউণ্ট ভন্ আরেন-বর্গের সাংসারিক অবস্থা, সামাজিক মান-সম্ভ্রম, স্বভাব-চরিত্র প্রভৃতি সম্বন্ধে গোপনে অনুসন্ধান করিয়া যাহা জানিতে পারা যায়, তাহা লিখিয়া জানাইবার জন্য সেই দোকানের অধ্যক্ষকে আদেশ করা হইয়াছিল।

আনা স্মিট্ আট দশ দিন পরে সেই পত্রের উত্তর পাইল। তাহার কলোনের দোকানের অধ্যক্ষ তাহাকে যে পত্র লিখিয়াছিল, তাহার অনুবাদ নিম্নে প্রকাশিত হইল :—

"আপনি যাঁহার সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে যে আদেশ করিয়াছেন, সেই আদেশানুযায়ী যথাসাধ্য চেষ্টায় তাঁহার যতটুকু পরিচয় বিশ্বস্ত সূত্রে জানিতে পারিয়াছি, তাহা আপনার গোচর করিতেছি। বিগত ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে আরেনবর্গ পরিবারের কোন বীর পুরুষ সমর-বিভাগে কার্য্যে অসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া গৌরবপূর্ণ 'কাউণ্ট' খেতাব ও সুবিস্তীর্ণ জায়গীর লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার বংশের প্রথম সন্তান পুরুষানুক্রমে এই খেতাব ভোগ করিয়া আসি-তেছেন। শতাধিক বৎসর কাল এই বংশ ঐশ্বর্য্য ও ও মান-সম্ভ্রমে জর্ম্মণীর অভিজাত-সম্প্রদায়ে উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া ছিল, তাহার পর নানা কারণে তাঁহাদের সম্পত্তি নষ্ট হইয়া যায় এবং ক্রমে তাঁহারা দরিদ্র হইয়া পড়েন। বর্ত্তমান কাউণ্টের পিতার আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইলেও তিনি অমিত-ব্যয়ী ও বিলাসী ছিলেন, এ জন্য তাঁহার অর্থকষ্টের সীমা ছিল না। তাঁহার অনেকগুলি পুত্র, কিন্তু এক জনও মানুষ হইতে পারে নাই। বর্ত্তমান কাউণ্ট প্রথম-যৌবনে অত্যন্ত দুর্দ্দান্ত ও উচ্ছৃঙ্খল ছিলেন। তিনি স্বদেশ হইতে রুসিয়ায় গিয়া সেখানে চারি পাঁচ বৎসর বাস করিয়াছিলেন; কিন্তু কি ভাবে সেখানে কাল-যাপন করিয়াছিলেন, তাহা কেহ বলিতে পারে না। [illegible] জর্ম্মণীতে ফিরিয়া আসিয়া কোন

মুরুব্বীর সাহায্যে তিনি সমর-বিভাগে প্রবেশ করেন; কিছু দিন পূর্ব্বে তিনি লেফটেনাণ্টের পদ পাইয়াছেন। তিনি যে রেজিমেণ্টে চাকরী করিতেছেন, তাহা এখন কবলেন্সের সেনানিবাসে অবস্থিতি করিতেছে। বর্ত্তমান কাউণ্টের চরিত্রের বিরুদ্ধে কোন কথা জানিতে পারি নাই; সন্ধান লইয়া জানিয়াছি, তাঁহার রেজিমেণ্টের সকলে তাঁহাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও সম্মান করে। তিনি যে বেতন পাইয়া থাকেন, তাহা ব্যতীত তাঁহার অন্য কোন আয় নাই। আপনি বোধ হয় জানেন, জর্ম্মণীর সামরিক কর্ম্মচারিগণের বেতন অত্যন্ত অল্প, সুতরাং বেতনের সামান্য আয়ে তিনি তাঁহার খেতাবের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারেন না; তাঁহাকে অতি দীনভাবে কালযাপন করিতে হয়। জর্ম্মণীর সামরিক কর্ম্মচারীদের মধ্যে যাঁহারা অবিবাহিত, তাঁহাদের অনেকেরই এক একটি 'রক্ষিতা' আছে, কিন্তু এই কাউণ্টের সেরূপ কোন উপসর্গ নাই; ইহা হইতে মনে করিবেন না—তাঁহার নৈতিক আদর্শ উচ্চ, ঐরূপ ব্যয়সাধ্য বিলাসিতার ব্যয়নির্ব্বাহে অসমর্থ বলিয়াই তিনি সাধু পুরুষ।"

আনা স্মিট পত্রখানি পাঠ করিয়া আনন্দিত হইল। কাউণ্ট দুশ্চরিত্র নহেন, ইহা জানিতে পারিয়া সে আশ্বস্ত হইল, কাউণ্টের দারিদ্র্য সে তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধির অনুকূল বলিয়াই মনে করিল। তিনি দরিদ্র না হইলে তাঁহাকে প্রলুব্ধ করা সহজ হইত না, ইহাও সে বুঝিতে পারিল। সে ভাবিল, "অর্থের লোভ দেখাইয়া কাউণ্টকে বশীভূত করা কঠিন হইবে না। বার্থার পিতা বার্থার জন্য যে সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছে, তাহার পরিমাণ জানিতে পারিলে কাউণ্ট তাহাকে বিবাহ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিবে।"

কাউণ্ট 'বো-সিজোরে' আসিয়া মহানন্দে দশ দিন কাটাইয়া দিলেন; আনা স্মিটের অনুগ্রহে ও আগ্রহে বার্থার সহিত সর্ব্বদা তাঁহার সাক্ষাৎ হইত, মজলিসী গল্পও চলিত; কিন্তু তাঁহার কথায় বা ব্যবহারে বার্থার প্রতি অনুরাগের কোন লক্ষণ কোন দিন লক্ষিত হয় নাই। আনা স্মিট ইহাতে অসহিষ্ণু হইয়া উঠিল, এবং চারের মাছ কি করিলে টোপ গেলে, তাহাই ভাবিতে লাগিল। সে সঙ্কল্প করিল, যে উপায়েই হউক, কাউণ্টকে গাঁথিয়া ফেলিতে হইবে। একবার গাঁথিতে পারিলে লম্বা সূতা ছাড়িয়া খেলাইয়া ডাঙ্গায় তোলা তেমন কঠিন হইবে না।

মায়ের আদেশে বার্থা প্রত্যহ প্রভাতে নব নব সাজে সজ্জিত হইয়া তাহাদের সম্মানিত অতিথির সহিত সাক্ষাৎ করিত। কাউণ্ট সদালাপী ও রসিক পুরুষ; বার্থা তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া সুখী হইত; তাহার মনে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধার সঞ্চার হইয়াছিল, কিন্তু অন্য কোন ভাবের উদয় হয় নাই। সে ভাবিত, অন্যান্য অতিথির ন্যায় তিনিও কয়েক দিন পরে চলিয়া যাইবেন, তাহার পর তাহার কথা তাঁহার আর স্মরণ থাকিবে না, এবং সে-ও তাঁহাকে ভুলিয়া যাইবে।

এই সময়ের মধ্যে বার্থা জোসেফের কথা এক দিনও ভুলিতে পারে নাই। সে জোসেফকে গোপনে যে পত্র লিখিয়াছিল, জোসেফ সেই পত্রের উত্তর দিল না কেন, ইহা সে ভাবিয়া পাইল না। অবশেষে বার্থা হতাশ হইয়া পড়িল; এবং জোসেফ তাহার আশা ত্যাগ করিয়াছে, ভুল বুঝিয়া তাহার প্রতি অবিচার করিয়াছে, মনে করিয়া ক্রোধে ও অভিমানে বার্থার হৃদয় পূর্ণ হইল।

কাউণ্টের আগমনের দুই সপ্তাহ পরে এক দিন আনা স্মিট বার্থাকে বলিল, "বার্থা, কাউণ্ট তোর প্রেমে পড়িয়া গিয়াছে—এ রকম কোন লক্ষণ দেখিতেছিস কি?"

বার্থা বলিল, "না মা, একটুও নয়।"

মা বলিল, "বলিস্ কি লো, এ যে বড়ই তাজ্জবের কথা!"

বার্থা বলিল, "তাজ্জবের কথা কেন, মা? আর তোমারই বা কি রকম বিবেচনা? কাউণ্টের কুল, শীল, চরিত্র, অবস্থা প্রভৃতি সম্বন্ধে কোন খবর না লইয়াই—তিনি আমাকে ভালবাসিলেন কি না জানিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছ!"

আনা স্মিট গোপনে কাউণ্টের সকল খবর লইয়াছে, এ সংবাদ বার্থা জানিত না।

আনা স্মিট বলিল, "হাঁ মা, কাউণ্ট তোমাকে

ভালবাসিতে আরম্ভ করিয়াছেন কি না, ইহা জানিবার জন্য আমি সত্যই ব্যস্ত হইয়াছি। তোমার কাউণ্টেস্ ভন আরেনবর্গ হইবার প্রকাণ্ড সুযোগ উপস্থিত; সেই সুযোগ তুমি যে হেলায় হারাইবে—আমার মেয়ে এত নির্ব্বোধ, ইহা কি করিয়া বিশ্বাস করি? আমি কলোনে পত্র লিখিয়া কাউণ্ট সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য সকল সংবাদ জানিয়াছি এবং জানিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছি।”

মায়ের কথা শুনিয়া বার্থার মনে একটু আনন্দই হইল, জোসেফের নিষ্ঠুরতার পরিচয়ে সে তাহার উপর অত্যন্ত চটিয়া গিয়াছিল; এই জন্য সে ভাবিল, জোসেফকে ত আর পাইবার আশা নাই, এ অবস্থায় কাউণ্টেস্ হইবার সুযোগটা ত্যাগ না করাই ভাল।

বার্থা মুহূর্ত্তকাল নীরব থাকিয়া বলিল, “কিন্তু মা, আমার প্রতি কাউণ্টের মনের ভাব কিরূপ, তাহা জানিতে পারি নাই; ও প্রসঙ্গে তিনি আমাকে কোন কথা বলেন নাই। আমি তাঁহার প্রেমের ভিখারিণী, এ কথা তাঁহাকে বলি, ইহাই কি তোমার ইচ্ছা?”

আনা স্মিট দৃঢ়স্বরে বলিল, “নিশ্চয়ই না। নারী পুরুষের প্রেম ভিক্ষা করিবে—এ অতি অসঙ্গত কথা, লজ্জার কথা!—ইহা হইতেই পারে না।”

বার্থা বলিল, “তা ছাড়া আরও একটা কথা আছে।—কাউণ্ট অন্য কোন যুবতীকে মনপ্রাণ সমর্পণ করেন নাই, ইহারই বা নিশ্চয়তা কি?”

আনা স্মিট বলিল, “না, তাহা অসম্ভব নহে; তবে আমার সেরূপ মনে হয় না। যাহা হউক, আমি তাহার মনের কথা বাহির করিয়া লইতে পারিব। বল-নাচের মজলিসে যোগদানের জন্য যাহাদের নিমন্ত্রণ করিতে হইবে, আজ বৈকালে তুমি তাহাদের নামের ফর্দ্দটা প্রস্তুত করিয়া ফেলিবে; সেই সময় আমি কাউণ্টকে লইয়া বেড়াইতে বাহির হইব। বাড়ী ফিরিবার পূর্ব্বেই আমি তাহাকে ঠিক করিয়া লইতে পারিব, এ বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাক।”

আনা স্মিট সেই দিন অপরাহ্নে কাউণ্টকে তাহার গাড়ীতে তুলিয়া নগরভ্রমণে বাহির হইল। এত সুখ, এরূপ বিলাসিতা কাউণ্ট জীবনে উপভোগ করেন নাই, ইহা ত্যাগ করিয়া যাওয়া অতি কষ্টকর বলিয়াই তাঁহার মনে হইল।

আনা স্মিট বোধ হয় তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে পারিল; সে বলিল, “কাউণ্ট, তুমি দয়া করিয়া আসিয়াছ—ইহাতে আমি কত সুখী, তাহা আমার প্রকাশ করিবার সাধ্য নাই। তুমি শীঘ্রই চলিয়া যাইবে মনে হইলে দুঃখে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়।”

কাউণ্ট বলিলেন, “হাঁ, সে জন্য আমিও দুঃখিত, কিন্তু উপায় কি? আর দশ বারো দিন পরেই আমার ছুটী শেষ হইবে, সুতরাং এখানে আর সাত আট দিনের বেশী থাকিতে পারিব না।”

আনা স্মিট বলিল, ‘সেনানিবাসে তোমার দিনগুলি বেশ স্ফূর্ত্তিতেই কাটে বোধ হয়?”

কাউণ্ট বলিলেন, “না, ফ্র, ঠিক তাহার বিপরীত। দিবারাত্রি হাড়ভাঙ্গা খাটুনি, স্ফূর্ত্তি করিবার ফুরসৎ কোথায়? সামরিক কর্ম্মচারীদের কর্ত্তব্য অতি কঠোর।”

আনা স্মিট সহানুভূতিভরে বলিল, “এ গাধা খাটুনী না খাটিলেই পার, চাকরী ছাড়িয়া দিলে ত আর খাটিতে হয় না।”

কাউণ্ট দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, “চাকরী ছাড়িয়া দিব? চাকরী ছাড়িলে কি করিয়া চলিবে? আমার বাবা তাঁহার ভুয়ো খেতাব ভিন্ন চলিবার মত কোন সম্বল ত আমার জন্য রাখিয়া যান নাই!”

আনা স্মিট কাউণ্টের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, “তাও ত বটে, তা আমি তোমাকে একটা উপায় বলিয়া দিতে পারি,—কাযটা তেমন কঠিন নয়, কিন্তু চিরজীবনের মত নিশ্চিন্ত!”

কাউণ্ট প্রশ্নসূচক দৃষ্টিতে বৃদ্ধার মুখের দিকে চাহিলেন।

আনা স্মিট বলিল, ‘পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী কোন বড়লোকের মেয়ে বিবাহ করিলেই ত সকল ল্যাঠা চুকিয়া যায়।”

কাউণ্ট দূর আকাশের দিকে শূন্য দৃষ্টিতে চাহিয়া বিষণ্ণ স্বরে বলিলেন, “হাঁ, কাযটা সহজ বটে, কিন্তু বিপুল পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী কোন যুবতী ত

এ অধমকে উদ্ধার করিবার জন্ম বসিয়া নাই। আজকাল সে রকম দাঁও মেলা বড় শক্ত, ক্র!"

আনা স্মিট বলিল, "কোন দিন চেষ্টা করিয়া দেখিয়াছ? ঠিক যায়গায় চেষ্টা করিলে মিলাইতে পারিবে না,— ইহা বিশ্বাস করি না।"

কাউণ্ট বলিলেন, "কি করিয়া বলি? সে চেষ্টা ত কোন দিন করি নাই। এরূপ চিন্তা কখন আমার মাথায় আইসে নাই।"

আনা স্মিট হাসিয়া বলিল, "সে চিন্তা ত তোমার মাথায় আসিবেই না। শিকারী বিড়াল গোঁফ দেখিলেই চেনা যায়। তোমার গোঁফ দেখিয়াই বুঝিয়াছি, অন্ত শিকার লইয়া খেলা করিতেছ।"

কাউণ্ট বলিলেন, "আপনার কথার মর্ম্ম বুঝিতে পারিলাম না।"

আনা স্মিট বলিল, "বুঝিয়াছ বৈ কি। আমি কি তোমার ন্যাকামীতে ভুলি, কাউণ্ট! আমি জোর করিয়া বলিতে পারি, তুমি কোন নিঃসম্বল রূপসীর রূপের তরঙ্গে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছ তাহাকেই সর্ব্বটুক প্রেম বিলাইয়া দিয়া ফতুর হইয়া বসিয়া আছ!"

কাউণ্ট সবেগে মাথা নাড়িয়া দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "না, আপনার এই অনুমানে এক বিন্দু সত্য নাই। আপনি আমাকে ভয়ঙ্কর ভুল বুঝিয়াছেন।"

আনা স্মিট হাসিয়া বলিল, "তোমার মন চুরি যায় নাই? ঠিক বলিতেছ?"

কাউণ্ট বলিলেন, "আপনি বিশ্বাস না করিলে আর উপায় কি?"

আনা স্মিট দেখিল, ইহার পর আর অগ্রসর হইবার উপায় নাই; কিন্তু তাহার মনের কথা না বলিলেও চলে না। তাহার শকট নানা পথ ঘুরিয়া ছায়াচ্ছন্ন একটি নিভৃত পথ দিয়া চলিতে লাগিল। আনা স্মিট কথায় কথায় বলিল, "দেখ কাউণ্ট, সকল পরিবারেই কখন না কখন উপন্যাসের উপকরণ সংগ্রহ করিতে পারা যায়। এমন কি, অল্পদিন পূর্ব্বে আমার নিজের বাড়ীতেই একটা মর্ম্মস্পর্শী ঔপন্যাসিক-কাণ্ড ঘটিয়া গিয়াছে।"

কাউণ্ট ঔৎসুক্যভরে বলিলেন, "কাণ্ডটা কি, শুনিতে পাই না?"

আনা স্মিট বলিল, "তুমি ত আমার ঘরের ছেলে, তোমাকে আর বলিতে আপত্তি কি? উপন্যাস না বলিয়া তাহাকে প্রহসন বলাই ঠিক। সে বড় হাসির কথা, কাউণ্ট! প্রেমে পড়িলে মানুষের কাণ্ড-জ্ঞান বোধ হয় লোপ পায়। আমি আবার ছোটলোকের স্পর্দ্ধা সহ্য করিতে পারি না, কাষেই রঙ্গ দেখিয়া আমার অঙ্গ জ্বলিয়া গিয়াছিল! আমার এক ছুঁড়ী দাসী আছে। ছুঁড়ীটা দেখিতে শুনিতে মন্দ নয়, তাহাকে তুমি ত দেখিয়াছ।—আমি সারা গুভোপ্‌জের কথা বলিতেছি।"

কাউণ্ট বলিলেন, "হাঁ, তাহাকে দেখিয়াছি বটে।"

আনা স্মিট বলিল, "তাহারই কথা বলিতেছি।—ছুঁড়ীটা আমার বড়ই অনুগত, এই জন্য মনে করিয়াছিলাম, দেখিয়া শুনিয়া তাহার বিবাহটা আমিই দিয়া দিব। আমার কারখানায় এক ছোড়া মিস্ত্রী ছিল, ছোঁড়াটার চেহারা ভদ্রলোকের মত দেখিয়া তাহার সঙ্গে সারার সম্বন্ধ স্থির করিলাম। এ বিবাহে আমি চার হাজার ক্রাঙ্ক যৌতুক দিতে চাহিলাম, তা ছাড়া কাপড়-চোপড় যা লাগিত, সমস্ত দিতে রাজী ছিলাম। কিন্তু অবাক্ কাণ্ড! ছোঁড়াটা এতগুলি টাকাতেও ভুলিল না, সারাকে বিবাহ করিতে সম্মত হইল না, বলিয়া বসিল—সে আমার মেয়েকে চায়! ছোটলোকের স্পর্দ্ধা দেখিলে?"

কাউণ্ট সবিস্ময়ে বলিলেন, "আপনার মেয়েকে বিবাহ করিতে চাহিল?"

আনা স্মিট বলিল, "পাগল, পাগল! ছোটলোকের ছেলে, তাহার বাপ কৃষাণী করে; সে আমার কারখানার একটা মজুর বলিলেই চলে। সে কি না বিবাহ করিতে চায় আমার মেয়েকে—যে পনের লক্ষ ফ্রাঙ্কের উত্তরাধিকারিণী! কিন্তু উন্মাদের কি কাণ্ডজ্ঞান আছে?"

কাউণ্ট বিস্ময় দমন করিতে না পারিয়া বলিলেন, "কত বলিলেন? প-নে—র লক্ষ ফ্রাঙ্কের উত্তরাধিকারিণী আপনার ঐ কন্যা?"

"চারের মাছ টোপ বুঝি গেলে"—ভাবিয়া আনা স্মিট তাচ্ছীল্যভরে বলিল, "হাঁ, আমার স্বামী মৃত্যুকালে বাণ্টার জন্ম নগদ কিছু টাকা রাখিয়া গিয়াছেন, সমগ্র সম্পত্তির তুলনায় তাহা নিতান্ত সামান্য হইলেও তাহার পরিমাণ পনের লক্ষ ফ্রাঙ্কের কম নয়। আমিই তাহার

অভিভাবিকা ও 'ট্রষ্টী।' বার্থা কোন কারণে আমার অবাধ্য হইলে আমি কয়েক বৎসর এই সম্পত্তিতে তাহাকে বঞ্চিত করিয়া রাখিতে পারি—সে অধিকার আমার আছে।"

কাউণ্ট সাগ্রহে বলিলেন, "পনের লক্ষ ফ্রাঙ্ক!—তা সেই মিস্ত্রীটার ক্ষ্যাপামীর পরিচয় পাইয়া আপনি কি করিলেন?"

আনা স্মিট বলিল, "আমি? আমি তাহাকে তৎক্ষণাৎ বাড়ী হইতে বাহির করিয়া দিলাম, তাহার পর কারখানায় গিয়া হাঙ্গামা করায় পুলিস তাহাকে হাজতে লইয়া যায়। পরে সে অনেক কষ্টে খালাস পাইয়া লোকের গঞ্জনায় দেশত্যাগী হইয়াছে।"

কাউণ্ট ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন, "আপনি আমার অশিষ্ট কৌতূহল ক্ষমা করিবেন—আপনার কন্যা কি সেই মজুরটার প্রতি এক আধটু—কি বলি—পক্ষপাতের ভাব দেখাইয়াছিলেন না কি?"

এই প্রশ্ন শুনিয়া ঘৃণায় আনা স্মিটের চোখ-মুখ লাল হইয়া উঠিল। সে ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বিরাগভরে বলিল, "কাউণ্ট, কাউণ্ট, তোমার মুখের এ রকম"—বৃদ্ধার কথা শেষ হইল না, তাহার মূর্চ্ছার উপক্রম হইল! সে গাড়ীতে ঠেস দিয়া হতাশভাবে নিজের মুখে হাতপাখা ঘুরাইয়া ঠাণ্ডা হইতে লাগিল। তাহার পর নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া বলিল, "আমার মেয়ের এ রকম প্রকৃতি হইবে—ইহা কল্পনা করাও কি আমার পক্ষে অপমানজনক নহে?"

আনা স্মিটের ভাবভঙ্গী দেখিয়া কাউণ্ট উৎকণ্ঠিত হইলেন। তিনি ক্ষুব্ধ স্বরে বলিলেন, "আশা করি, আমার কথায় আপনি বিরক্ত হননি?"

আনা স্মিট বলিল, "না; কিন্তু এ যে বড়ই ঘৃণার কথা, কাউণ্ট।"

কাউণ্ট নিস্তব্ধভাবে কি ভাবিতে লাগিলেন। আনা স্মিট বুঝিতে পারিল—সেই পনের লক্ষ ফ্রাঙ্ক তাঁহার মস্তিষ্কে বিপ্লবের সৃষ্টি করিয়াছে। সে তাহার কন্যাকে 'কাউণ্টেস্' করিতে পারিবে, এ বিষয়ে তাহার আর সন্দেহ রহিল না। সে মনে মনে হাসিয়া বলিল, "কাউণ্ট, আমার ইচ্ছা, তুমি তোমার ছুটীটা আরও কিছু দিন বাড়াইয়া লও। যে অল্প কয়েক দিন আমাদের মধ্যে বাস করিলে—তাহা ত দেখিতে দেখিতে কাটিয়া গেল, আমার ছেলেদেরও ইচ্ছা; তুমি আর কিছু দিন এখানে থাক। জুরিখের চতুর্দ্দিকে অনেক সুন্দর স্থান আছে, সেগুলি তোমার ত দেখা হয় নাই। আমার ইচ্ছা, তোমাকে, পিটারকে আর বার্থাকে সঙ্গে লইয়া একবার ওয়ালেনষ্টাডে যাই।"

কাউণ্ট বলিলেন, "হাঁ, যখন এখানে আসিয়াছি, তখন এ অঞ্চলের দর্শনযোগ্য স্থানগুলি দেখিবার সুযোগ ত্যাগ করা সঙ্গত নহে। আজ রাত্রে আরও কয়েক সপ্তাহ ছুটীর জন্য পত্র লিখিব।"

আনা স্মিট খুসী হইয়া বলিল, "হাঁ, নিশ্চয়ই লিখা চাই, কাউণ্ট।"

সায়ংকালে আনা স্মিট বাড়ী ফিরিয়া খাস-কামরায় বিশ্রাম করিতে বসিলে বার্থা সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া বলিল, "খবর কি, মা! মনের ভাব কিছু বুঝিতে পারিলে?"

আনা স্মিট হাসিয়া বলিল, "নিশ্চয়ই। কাউণ্ট আরও কিছু দিন ছুটী লইয়া এখানে থাকিতে সম্মত হইয়াছে। তাহাকে সঙ্গে লইয়া ওয়ালেনষ্টাডে বেড়াইতে যাইব; তুমি ও পিটারও আমাদের সঙ্গে যাইবে।"

বার্থা বলিল, "ওয়ালেনষ্টাডে?"

আনা স্মিট বলিল, "হাঁ, সেখানে তুমি কাউণ্টের সহিত মিশিবার অধিক সুযোগ পাইবে। আমার বিশ্বাস, তুমি একটু চেষ্টা করিলেই কাউণ্টের হৃদয় জয় করিতে পারিবে; সে তোমাকে লাভ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিবে।"

বার্থা মৃদু হাসিয়া বলিল, "আমাকে, না আমার টাকাগুলি?"

আনা স্মিট বলিল, "সে একই কথা; তোমাকে বাদ দিয়া তোমার ঐশ্বর্য্য তাহার লক্ষ্য হইতেই পারে না, তোমার মূল্য সে বুঝিতে পারে। তা ছাড়া কাউণ্টেস্ ভন্ আরেনবর্গ খেতাবের মূল্য কত, তাহাও আমার জানা আছে। তুমি একটু বুঝিয়া চাল দিতে পারিলেই এ খেলায় কাউণ্টকে মাত করিতে পারিবে, মা।" বৃদ্ধার কণ্ঠস্বরে স্নেহ উথলিয়া উঠিল!

বার্থা হাসিয়া বলিল, "তা বটে; কিন্তু মা, স্মরণ

রাখিও, পেয়ালার চা মুখে উঠিবার পূর্ব্বে কতবার ফস্কাইতে পারে।" (Remember, maman, there is many a slip betwixt the cup and the lip.)

আনা ম্যিট কন্যার কথা শুনিয়া হঠাৎ অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া বলিল, "না, এবার ফস্কাইতে দিলে বুঝিব, সে তোমারই দোষ, বার্থা ! তোমার সে অপরাধ আমি নিশ্চয়ই ক্ষমা করিব না, কাউণ্টের মহিষী হইবার জন্য তোমাকে প্রাণপণ চেষ্টা করিতে হইবে। এত বড় সুযোগ পাইয়াও তুমি কাউণ্টেস্ হইতে না পারিলে আমি 'হার্টফেল' করিয়া মরিব !" [ক্রমশঃ।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

বেদ

নমি ব্রহ্মের বাঙ্ময় রূপ। মহাসিন্ধুর গর্ভ হ'তে
অশেষ তপঃ-অগ্নিতে কবে উদীরিত হ'লে ব্যোমের পথে ?
সিন্ধুত রাখি ইন্দু-মাধুরী, রুদ্র-বীর্য্যের সঙ্গে মিলে,
ব্যোম-তরঙ্গে গ্রহমণ্ডলে আদি ভারতীর জন্ম দিলে।
বিরাট তপের লক্ষ্মী বিলাসে ত্যজি বরুণের রত্নাগারে
পীযূষীভূত বহিয়া ছুটিলে মরুদ্বহে ধরার পারে
দ্যাবা পৃথিবীরে তৃপ্ত করিয়া। হে জ্ঞান সবিতা দীপ্ততপঃ,
মহামানবের মনোযজ্ঞের হুতবহ, তব চরণে নমঃ।
তব ওঙ্কার শব্দের নাদে আত্মার হ'ল জনম নব
লভি দ্বিজত্ব হলো প্রবুদ্ধ গুহাহিত 'স্ব-সুপ্ত' ভব।
হলো চঞ্চল পরমাণুদল জীবন স্পন্দ উঠিল জাগি
ঘন-আবর্ত্তে নীহারিকাগণে মনোমণ্ডল সৃজন লাগি।
ভূর্ভুবঃ স্বর্লোকের মাঝারে রচিয়া উঠিল দীধিতি-সেতু
অভ্রভেদী সুমেরুর শিখরে উড়িল জ্ঞান-চেতনার বিজয়-কেতু।
ধ্বান্তের চির অন্তক তুমি, মৃত্যুর বদন-দৈন্য ক্ষম
ভর্গদেবের অঘোর মূর্ত্তি, চরণে তোমার লক্ষ নমঃ।
চির উদাত্ত তোমার সূক্ত গ্রহ-তারকায় ধ্বনিত নভে
ভৈরবে বাজে তাণ্ডব সহ রুদ্রদেবের বিষাণ-রবে।
মেঘমল্লারে অমন্দে বাজে অম্বোধিমাঝে কম্বুনাদে
ষড়্জে বৃংহ, দীপ্ত দীপকে মরুন্মরুতেরা সতত সাধে।
রণিত গোত্রমাতার কণ্ঠে, বিশ্বজিতের বচন স্তবে,
প্রজাপতি-ঋষি-ছন্দোমন্ত্রে বৃহতী জগতী অনুষ্টুভে।
সঙ্গীত তব বৃত্ত তরঙ্গে দেবতে গ্রাত শ্রোত্ররম
গুঞ্জন গুঞ্জে পঞ্চমে রুত, প্রণব পুরুষ চরণে নমঃ।
নীল-লোহিতের ললাটনেত্রে জ্বলে চির তব তাপসী তৃষা
পঞ্চশরের নশ্বর লীলা ভস্ম করিয়া দিবস নিশা।
কুণ্ডে হোত্রে বেদী চত্বরে জাগে পিঙ্গল তোমার শিখা
নমে হিমাচল আহিতাগ্নিক ললাটে অভ্রভস্ম টীকা।
তোমায় আজো যজ্ঞীয় ধূম, পর্জ্জন্যের জন্ম দিয়া,
'কব্য' 'বিকীর' 'বলি' 'চরু'দানে জীবলোকে বাপে সঞ্জীবিয়া।
তপঃ, জন, মহঃ, পিতৃলোকের জ্ঞানদূত, চিরারাধ্য মম,
জীব-জগতের বহ্নি-জীবন, ভাস্বর তব চরণে নমঃ।
তোমার অর্চ্চি তাপস-যতির পিঙ্গল জটাকূর্চ্চে রাজে,
অরণি শমীর শিরায় শিরায় সুপ্ত অগ্নি হবির মাঝে।
জ্বলে বিপ্রের দীপ্ত নেত্রে যজ্ঞোপবীত অংসে জাগে
মন্দিরে ধূপ-দীপের বক্ষে, ক্ষত্রশূরের শরের আগে।
ভারতের ধ্রুব আধ্যাত্মিক জীবনে জ্বলিছে অমৃতরসে,
ঐহিকতার চিতার সমিধে অগ্নি মন্ত্র মন্ত্রে পশে।
রবির সবিতা, তেজোব্রহ্ম, যদিও হরেছ নিখিল তমঃ
আলোক-ভূমায় হারাই তোমায় উদ্দেশে তব লক্ষ নমঃ।
জ্ঞান জগতের তুমি হিমাদ্রি, ভারতের শুভসাধনে রত,
সংহিতা স্মৃতি-ষড়বেদাঙ্গে দিলে প্রাণ নদ-নদীর মত।
তোমার গর্ভে তাপস সকল পূজে হিরণ্য গর্ভ দেবে
ওষধিরা নব তব স্নেহরস জলিয়া ওষধি নাথেরে সেবে।
প্রজাপতিগণ বলাতক সম তোমার মেখলা ঘোরিয়া ঘুরে
তুষার-পরশ কল্যাণ রস সিঞ্চিবে নিখিলে সৃষ্টি জুড়ে;
তব সানু-ছায়ে রচে আশ্রম ব্রহ্মবিদ্যা, সত্য, শম,
'উক্থ' বচনে বিকথ তোমার, হে বিরাট তব চরণে নমঃ।
তুমি এক, তব ভূমায় প্রকাশ বহুরে ফিরায়ে এনেছ এক,
একটি মৃণালে রাজীবের কোষে কোটি কোটি রজঃ রেখেছ ঢেকে
তব সংসারে মরুতে জনক, সলিলে বন্ধু, মহীরে মাতা,
পেয়েছি তপনে সোমে সখা-রূপ, মহাব্যোমে মোরা পেয়েছি ভ্রাতা
সকলের মাঝে প্রেমের সমাজে করিয়া রেখেছ আত্মহারা
ওগো পিতামহ বক্ষকুহরে বাঁচায়ে রেখেছ মোদের ধারা।
হে অমৃতশ্রুতি মোদের জীবন তব কুণ্ডলে মুকুতাসম
ধ্বংসের ভয় আমরা রাখি না, দক্ষিণ, তোমা লক্ষ নমঃ।
তুমি আদি বাক্, চাহ প্রতিনাদ, তোমার মহিমা যায় না বুঝা
মানব-কণ্ঠে পুনরুদ্দীরণ গঙ্গার জলে গঙ্গাপূজা।
মূক হয়ে আসে এ বাগ্‌যন্ত্র, দুর্ব্বল হৃৎপিণ্ডখানি,
আত্মায় দাও বজ্রের তেজ, দাও এ কণ্ঠে দৈববাণী।
মরুদ্বর্গে ফুৎকারে মম ব্রহ্মরন্ধ্র ভর' গো ভর'
প্রাত কর মোরে জনমে জনমে যুগে যুগে রণশঙ্খ কর'।
তোমাতে আমার উদয় বিলয় ঋষি-গীত ঋক্ মন্ত্রোপম
স্বর-গ্রামের উদাত্তে পতনে, রুদ্র ! তোমার চরণে নমঃ।
সোমনামে হব সোমস্বরূপ নহ তুমি শুধু রুদ্র নহ,
সোমধারা পথে মর্ত্ত্যজনেরে মিলাও পিতৃগণের সহ।
ফুল ফল রসে গোরসে নীরসে মাধুরী সুষমা ফুটাও নিজ,
তোমারে সেবিছে সোম ক্ষীরায় সোমযাগে শত সোমপ দ্বিজ
আশিস্ তোমায় শুভশক্তিতে ঋদ্ধ করিছে ধরার ভূপে,—
বৈদ্যের করে ঔষধি ধনে, বৈশ্যের গৃহে শস্যরূপে।
জীবলোক ধারা রাখে বহমান ঘটায়ে পাবন শুভোপযম
জীবনে জীবনে প্রেমের মিলনে, হে সোম-জীবন চরণে নমঃ।
মধুমাধবের সকল মাধুরী তোমা হ'তে বয় হে চির-প্রিয়,
সোমবল্লীর উপবীত তব মধুমল্লীর উত্তরীয়।
ইন্দুতে ঝরে, সিন্ধুতে ক্ষরে, বায়ুবায়ে উড়ে মধুর রেণু
ব্যাধি ক্ষুধা হরে ওষধিমালায় ঢালে মধুধারা মেদিনী-ধেনু
শত মধুমতী তটবতী নিতি মধুর কণ্ঠে গাহিছে জয়
মধুজারে মধু-পর্কের মত করেছ ভোগ্য-সৌম্যময়।
পাপ-তাপময় মর্ত্ত্য জীবনে করিয়া তুমি মেদুর-কম,
মধুকোষে মোরা মক্ষীর মত। মধু-মহোদধি তোমায় নমঃ।

শ্রীকালিদাস রায়।

ইউক্যালিপ্টাস

ইংরাজের ভারতে আগমনের সময় হইতে অনেকগুলি বিদেশীয় উদ্ভিদের এতদ্দেশে আবিভাব হইয়াছে, কিন্তু সবগুলির প্রবর্ত্তন যে শুভজনক হইয়াছে, তাহা বলা যায় না; বাঙ্গালার জলপথ সমূহ-রুদ্ধকারী কচুরিপানা তাহার একটি প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। ইহাতে কিন্তু কিছুমাত্র সন্দেহ নাই যে, ইউক্যালিপ্টাসের প্রবর্ত্তনে ভারতের নানা স্থানে যথেষ্ট মঙ্গল সাধিত হইয়াছে। ইউক্যালিপ্টাসের আদিম বাস অষ্ট্রেলিয়ায়, কিন্তু এখন ইহা পৃথিবীর নানা স্থানে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। য়ুরোপে দক্ষিণ-ফ্রান্স, ইতালী, স্পেন, পর্ত্তুগাল, আমেরিকায় ক্যালিফর্ণিয়া, ফোরিডা, মেক্সিকো; আফ্রিকায় আল্‌জিয়ার্স, মিশর, ট্রান্সভাল এবং দক্ষিণ-এসিয়ার নানা স্থানে আজকাল অল্পবিস্তর পরিমাণে ইউক্যালিপ্টাস বৃক্ষ দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। ইউক্যালিপ্টাস গণে (genus) প্রায় ৩শত জাতি আছে, জলবায়ু ও মৃত্তিকার এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভেদ হইতেই বিভিন্ন জাতির উৎপত্তি হয়। ইউক্যালিপ্টাসের এইরূপ অবস্থানুযায়ী পরিবর্ত্তনের ক্ষমতা থাকাতেই ইহা নানা দেশে নানা অবস্থার মধ্যে জন্মিতে সমর্থ। ভারতে ইহার প্রবর্ত্তন ৮০।৮৫ বৎসরের অধিক নহে। উৎকামন্দ, সাহারাণপুর ও লক্ষ্ণৌয়ে সর্ব্বপ্রথম কয়েকটি করিয়া গাছ পরীক্ষার জন্য রোপিত হয়। এই তিনটি কেন্দ্র হইতেই যথাক্রমে দাক্ষিণাত্যে, পঞ্চনদে এবং যুক্তপ্রদেশে ইউক্যালিপ্টাস বৃক্ষের প্রসার বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। শিবপুর উদ্ভিদ-উদ্যান হইতেও বীজ এবং চারা লইয়া বঙ্গ, বিহার ও আসামে অনেকে নিজ নিজ বাগান-বাগিচায় এই উপকারী বৃক্ষের আবাদ করিয়াছেন। তথাপি বঙ্গদেশ, আসাম, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ প্রভৃতি অঞ্চলে ইহা কম সংখ্যায় দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু একবারে ইউক্যালিপ্টাস-শূন্য প্রদেশ ভারতে বোধ হয় আজকাল নাই। নানা স্থানে জন্মিলেও নীলগিরিকেই ভারতের মধ্যে ইউক্যালিপ্টাসের প্রধান আবাসভূমি বলিয়া গণ্য করিতে পারা যায়। স্থানীয় লোকের, শ্বেতাঙ্গ বাগিচাওয়ালাগণের, বিশেষতঃ বনবিভাগের চেষ্টায় এই স্থলে এত প্রচুর সংখ্যায় ইউক্যালিপ্টাস উৎপাদিত হইয়াছে যে, নীলাচলে এখন ইউক্যালিপ্টাস তৈল-শিল্পের প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর হইয়াছে।

স্বাস্থ্যের সহিত সম্বন্ধ

যে সময়ে দূষিত বাষ্প হইতে ম্যালেরিয়ার উৎপত্তি-বাদ প্রচলিত ছিল, সে সময়ে ম্যালেরিয়াদুষ্ট দেশে যথেষ্ট পরিমাণে ইউক্যালিপ্টাস বৃক্ষ রোপিত হইত। তাহাতে উক্ত প্রকার বাষ্প বিনষ্ট হইবে বলিয়া লোকের ধারণা ছিল। এখন ম্যালেরিয়া রোগের প্রকৃত কারণ আবিষ্কৃত হওয়ায় সাক্ষাৎভাবে ম্যালেরিয়া দমনের জন্য আর কেহ ইউক্যালিপ্টাস রোপণ করে না। কিন্তু ইউক্যালিপ্টাসের সহিত ম্যালেরিয়া দমনের সম্বন্ধ যে একবারেই নাই, তাহা বলা যায় না। ইহার পত্রস্থিত বায়ী তৈল সূর্য্যোত্তাপে কতক পরিমাণে বিক্ষিপ্ত হইলে বায়ুমণ্ডল যে বিশুদ্ধ হয়, তাহা অনেকেই স্বীকার করেন। তদ্ভিন্ন ইহার আরও একটি গুণ আছে। ইহার মূল অনেক দূর পর্য্যন্ত মৃত্তিকায় প্রবেশ করিয়া প্রভূত পরিমাণে রস শোষণ করিতে পারে। কঙ্করময় জমীতেও কোন কোন স্থানে বিশেষ জাতীয় ইউক্যালিপ্টাস, এমন কি, ৭০ ফুট পর্য্যন্ত মূল প্রসারণ করিয়াছে; পরীক্ষা দ্বারা ইহাও দেখা গিয়াছে যে, অন্য উদ্ভিদের তুলনায় ইহা চতুর্গুণ জল টানিতে পারে। এই জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলাশয়ের সন্নিকটে ইউক্যালিপ্টাস রোপণ করিলে ঐ সমুদয় অল্পদিনের মধ্যে শুকাইয়া যায়। জলাভাবে মশক-অণ্ড জন্মিতে না

পারায় মশককুল নির্ব্বংশ হইয়া গেলে ম্যালেরিয়া-সংক্রমণের সম্ভাবনা কম হয়। আলজিয়ার্সে ইউক্যালিপ্টাস রোপণের এইরূপ প্রত্যক্ষ ফল দেখা গিয়াছে। দুঃখের বিষয় যে, বাঙ্গালায় ইউক্যালিপ্টাসের জলশোষক গুণ এ পর্য্যন্ত সম্যকরূপে উপলব্ধ হয় নাই। আমাদিগের পল্লীসমূহে ইউক্যালিপ্টাস রোপণ দ্বারা অনেক সুফল ফলিতে পারে। ঔষধার্থ ইউক্যালিপ্টাস তৈল ও নির্যাসের ব্যবহার অনেকেই অবগত আছেন। ইহার যথেষ্ট পরিমাণে জীবাণু-নাশক গুণ থাকায় ইউক্যালিপ্টাস তৈল পচন-নিবারক, তরুণ সর্দ্দি কাসিতে ইহার শ্বাস খুবই ফলপ্রদ, তৈলমর্দ্দনে চোট লাগিয়া ব্যথা ও বাতেরও উপশম হয়। এতদ্ভিন্ন অন্যবিধ রোগে ও গৃহাদির বায়ুশোধন করিতে ইউক্যালিপ্টাস তৈল প্রয়োগের প্রথা আছে।

কাষ্ঠ ও নির্যাস

অষ্ট্রেলিয়ায় ইউক্যালিপ্টাসের প্রধান ব্যবহার কাষ্ঠরূপে। তথায় ইহার সাধারণ নাম নির্যাসবৃক্ষ অর্থাৎ gum tree. অধিকাংশ নির্যাসবৃক্ষই ঋজুভাবে অনেক উচ্চ হইয়া থাকে। শাখা-প্রশাখা অপেক্ষাকৃত কম হয়। সেই জন্য ইহার কাষ্ঠ অধিকতর মূল্যবান্। ১শত ৫০ ফুট লম্বা ও ১০ ফুট বেড়ের গাছ, যাহা হইতে ৮০ ফুট দীর্ঘ বাতি-কাঠ পাওয়া যাইতে পারে, অষ্ট্রেলিয়ার জঙ্গলে বিরল নহে। নানাবিধ কার্য্যে ইউক্যালিপ্টাস কাষ্ঠ প্রয়োগ করা যাইতে পারে, তন্মধ্যে পোত-নির্ম্মাণ, গৃহ প্রস্তুত, গৃহসজ্জা, বেড়া ও পুল তৈয়ারী, টেলিগ্রাফের খুঁটি, রেলের স্লিপার, গাড়ীর চাকা ও কৃষিযন্ত্রাদি অন্যতম। এতদ্দেশে জাড়া (Jarrah wood) নামক যে কাষ্ঠ প্রচুর পরিমাণে আমদানী হইয়া থাকে, তাহা পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়ার E. Marginata হইতে প্রাপ্ত। আরও এক জাতি (ochrophtoca) হইতে সমপ্রকারের সুদৃঢ় কাষ্ঠ পাওয়া যায়। ফলতঃ বাগিচার হিসাবে ইউক্যালিপ্টাস রোপণ করিলে জ্বালানি ব্যতীত তক্তা প্রস্তুতের উপযোগী যথেষ্ট কাষ্ঠ উৎপাদিত হইতে পারে। কতিপয় জাতীয় ইউক্যালিপ্টাস হইতে ভূর্জপত্রের ন্যায় ত্বক্ পাওয়া যায়। উহা গৃহের ছাদ তৈয়ারীতে এবং দড়িদড়া ও কাগজ প্রস্তুত ব্যাপারে ব্যবহৃত হয়। আবার কয়েকটির ছালে কষের মাত্রা নিতান্ত কম নহে। চামড়া তৈয়ারীতে উক্ত প্রকার ছালের প্রচলন আছে। ইউক্যালিপ্টাসের আঠা রক্ত অথবা নীলবর্ণ-বিশিষ্ট; লোহিত গঁদের ঔষধ প্রস্তুতে এবং উভয় প্রকার আঠা কোন কোন শিল্পে প্রয়োগ করা হইয়া থাকে। জাতি ও স্থানবিশেষে গঁদের মাত্রার তারতম্য হয় এবং এক এক সময় অতি সামান্য মাত্রায় গঁদ দেখিতে পাওয়া যায়। কোন কোন জাতীয় ইউক্যালিপ্টাসের রস নির্গত হয় এবং তাহা হইতে স্থানীয় লোকরা তাড়ী প্রস্তুত করে।

ইউক্যালিপ্টাসের আরও একটি গুণ এই যে, যথেষ্ট সংখ্যায় উৎপাদিত হইলে ইহাদের বৃক্ষশ্রেণী বায়ুমণ্ডল হইতে জলীয় বাষ্প আকর্ষণ করে। যে সকল অঞ্চলে বৃষ্টি কম হওয়ার জন্য চাষের জমীর পরিমাণ সঙ্কুচিত হইয়া আসিতেছে, সেরূপ স্থানে ইউক্যালিপ্টাসের বাগিচা প্রতিষ্ঠায় লাভ আছে। আফ্রিকায় নীলনদের ব-দ্বীপে পূর্ব্বে বৎসরে মোটে ছয় দিন বৃষ্টি হইত, চাস-আবাদ একপ্রকার উঠিয়া গিয়াছিল; কিন্তু ৬০ বৎসর ধরিয়া ইউক্যালিপ্টাস উৎপাদনের পর উক্ত দেশের অবস্থা আজকাল এরূপ দাঁড়াইয়াছে যে, বৎসরে প্রায় ৪০ দিন বৃষ্টি হয়। ফসলের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া নীলের ব-দ্বীপ ক্রমশঃ সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইয়া উঠিতেছে। উত্তর ও মধ্যভারতে এরূপ প্রায় বারিহীন, অনুর্ব্বর ভূখণ্ড সমূহের অভাব নাই। সে সকল স্থানে ইউক্যালিপ্টাসের চাষ বাঞ্ছনীয়।

বিভিন্ন স্থানের উপযোগী জাতি

ইউক্যালিপ্টাসের এত অধিক প্রকার জাতি আছে যে, প্রায় সর্ব্বপ্রকার জমী ও আবহাওয়ার উপযুক্ত জাতি পাওয়া দুর্ঘট নহে। বস্তুতঃ ভারতের প্রায় সকল অঞ্চলেই উপযুক্ত ইউক্যালিপ্টাস আছে। এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা এ স্থলে অসম্ভব; তবে মোটামুটি ২১৪টি জাতির উল্লেখ করিতে পারা যায়। পূর্ব্বে ইউক্যালিপ্টাস প্রধানতঃ সখের হিসাবেই রোপিত হইত এবং অধিকাংশ লোকের ঝোঁক globulus ও citriodoraর উপরে ছিল। তৈল উৎপাদনের পক্ষে

globulus অবশ্য সর্ব্বোৎকৃষ্ট জাতি, কিন্তু ইহা সকল স্থানের পক্ষে উপযুক্ত নহে। নীলগিরির ন্যায় আবহাওয়া-বিশিষ্ট স্থানে ইহা উৎকৃষ্টরূপ জন্মে। citriodorar প্রসার ইহা অপেক্ষা অধিক ও ইহা পাহাড় এবং সমতল প্রদেশ, উভয় স্থানেই যথেষ্ট বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। rostrata এবং tereticornis জাতির বড় বড় গাছ যুক্তপ্রদেশ ও পঞ্চনদে বিরল নহে, এবং রাস্তার ধারে, বাগানে ও উন্মুক্ত ক্ষেত্রে সমতেজেই জন্মিয়া থাকে। বড় বড় পাহাড়ের গাত্রে ও পাদদেশে albius ও microrrhynchus সহজেই আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে পারে। অপেক্ষাকৃত পাদপশূন্য পর্ব্বতমালার পক্ষে এই দুই জাতি উপযোগী। মধ্য-প্রদেশের ন্যায় অত্যুষ্ণ ও শুষ্ক স্থানের জন্য dumosa অপেক্ষা অধিকতর উপযোগী জাতি পাওয়া অসম্ভব। ইহার তৈলও উৎকৃষ্ট শ্রেণীর। নিম্ন-বঙ্গ, আসাম এবং পূর্ব্ব ও পশ্চিম উপকূলের আর্দ্র ও উষ্ণ অঞ্চলে macurthurii, patentinervis এবং roustii ইত্যাদি জাতি রোপণ করিয়া উৎকৃষ্ট ফল পাওয়া যাইতে পারে। পশ্চিম-বঙ্গের স্থানে স্থানে উইর প্রকোপে প্রায় কোন গাছ জন্মান যায় না। সেরূপ স্থানে microcorys জাতির চাষ করিতে পারা যায়। ইহা বহুল পরিমাণে উই-আক্রমণসহ। ফলতঃ ইহা স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, যেখানেই বসান হউক, ২।৪টি গাছ লাগাইয়া কোন লাভ নাই। অধিকসংখ্যক হইলেই ইউক্যালিপ্টাস ব্যবহারিক হিসাবে ফলপ্রদ হয়।

চাষ-প্রণালী

ইউক্যালিপ্টাস গাছ খুবই কষ্টসহিষ্ণু। কিন্তু সমস্ত প্রবর্ত্তিত উদ্ভিদ্‌কেই প্রথম প্রথম জন্মাইতে একটু অধিক যত্ন করিতে হয়। রোপণের পর ২।৪ বৎসর গাছের বৃদ্ধি ও পরিপুষ্টির প্রতি লক্ষ্য রাখিলে ইউক্যালিপ্টাস সুদৃঢ়ভাবে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হয়। পরে কার্য্যতঃ আর কোন পাটই আবশ্যক হয় না। চারা প্রস্তুতের জন্য উত্তমরূপে চূর্ণীকৃত দোঁয়াশ মাটী ও কাঠের ছাই মিশ্রিত করিয়া তলা প্রস্তুত করিতে হয়। উক্ত তলায় কপির বীজের ন্যায় বীজ বুনিতে পারা যায়। বীজের সহিত মোটাদানা বালি মিশ্রিত করিয়া বুনিলে তলায় সর্ব্বস্থানে সমভাবে বীজ পড়ে। বীজ বপন করিয়া তাহার উপর ১ ইঞ্চ আন্দাজ মৃত্তিকা ছড়াইয়া দিয়া মাটী একটু চাপিয়া দিতে হয়। বীজ-বপনের পূর্ব্বে ও পরে প্রতিদিন বৈকালে তলায় আবশ্যকমত জল ছিটাইয়া দেওয়া দরকার। অঙ্কুর বহির্গত হইলে জল কম করিতে পারা যায়। গাছগুলি ৬।৮ ইঞ্চ পরিমিত বড় হইলে উহাদিগকে তুলিয়া নির্ব্বাচিত স্থানে রোপণ করা হইয়া থাকে। অত্যধিক শীত ও বর্ষার সময় বাদ দিয়া বৎসরের অন্য যে কোন সময় ইউক্যালিপ্টাস বীজ বপন করিলে অকৃতকার্য্য হইবার কোন কারণ নাই। বাগিচা হিসাবে চাষ করিতে হইলে চতুর্দ্দিকে ১২ ফুট ব্যবধান রাখিয়া গাছ বসান নিয়ম। ইহা পাতার জন্য। যেখানে কেবলমাত্র কাষ্ঠ উৎপাদনই উদ্দেশ্য, সেখানে ৮।১০ ফুট ব্যবধানে পুঁতিলেও কোন ক্ষতি হয় না। প্রথম ২।১ বৎসর ক্ষেত্রে যাহাতে অধিক আগাছা না জন্মায়, তাহা দেখা দরকার। গাছ বড় হইয়া গেলে আর সেরূপ যত্ন আবশ্যক হয় না। কারণ, ইউক্যালিপ্টাসের মূল মৃত্তিকার বহু নিম্নে প্রবেশ করিয়া রস সংগ্রহ করে। ক্ষুদ্র-মূলবিশিষ্ট সাধারণ আগাছায় তাহার কিছু ক্ষতি করিতে পারে না।

তৈল উৎপাদন

ইউক্যালিপ্টাসের প্রায় ৩ শত জাতির মধ্যে কেবলমাত্র প্রায় ২৫টি জাতি তৈল উৎপাদনের উপযোগী। ভারতের অনেক স্থলে ইউক্যালিপ্টাস দৃষ্ট হইলেও শুধু নীলগিরিতেই বর্ত্তমান সময় ব্যবসায়িক হিসাবে তৈল উৎপাদিত হইতেছে। তৈল উৎপাদনক্ষম ইউক্যালিপ্টাস গাছ কাছাকাছি এত অধিক সংখ্যায় আর কোথাও নাই। নীলগিরি অঞ্চলে কত পরিমাণ জমীতে ইউক্যালিপ্টাস জন্মিয়া থাকে, তাহার ঠিক হিসাব পাওয়া যায় না, তবে বড় বড় বাগিচাগুলির মোট বর্গফল ১০ হাজার বিঘার কম হইবে না। এতদ্ভিন্ন প্রক্ষিপ্তভাবে সরকারী ও বে-সরকারী জমীতে অল্প-বিস্তর গাছ আছে। সকল জাতীয় ইউক্যালিপ্টাসের তৈল এক প্রকার নয়। গঠন উপাদানে, বর্ণে, গন্ধে ও গুণে ইহাদের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য লক্ষিত হইয়া থাকে। কিন্তু সাধারণতঃ

ইউক্যালিপ্টাস বাগিচা, দক্ষিণে ছয় বৎসর ও বামে ২ বৎসর বয়স্ক গাছ

এই সমুদয় তৈলকে স্থূলতঃ দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়া থাকে। প্রথম শ্রেণীর তৈলে phellandrene প্রধান উপাদান—E amygdalinaর তৈল ইহার আদর্শ। দ্বিতীয় শ্রেণীর তৈলের আদর্শ E. globulusএর তৈল এবং ইহার প্রধান উপাদান cineol। আপাততঃ দ্বিতীয় শ্রেণীর তৈলকেই ঔষধার্থ ব্যবহারে প্রাধান্য দেওয়া হয়, কিন্তু প্রথম শ্রেণীর তৈল যে কোন অংশে দ্বিতীয় শ্রেণী অপেক্ষা হীনতর, তাহা অনেক বিশেষজ্ঞই স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। সে যাহা হউক, দ্বিতীয় শ্রেণীর তৈলেরই আজকাল মূল্য অধিক। প্রথম শ্রেণীর তৈল প্রধানতঃ ধাতু-শিল্পে খনিজ ধাতুসংবলিত প্রস্তর (ore) হইতে ধাতব সল্‌ফাইড সমূহ পৃথক করিতে ব্যবহৃত হয়। নীলগিরি অঞ্চলে globulus জাতিরই চাষ অধিক; তারতীয় তৈল সেই জন্য দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত। প্রথম শ্রেণীর তৈল-উৎপাদনক্ষম গাছ ভারতের কোন এক স্থানে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে নাই এবং যাহাও আছে, সে সমুদায়ের এ পর্য্যন্ত সদ্ব্যবহার হয় নাই।

নীলগিরি অঞ্চলে ছোটখাট অনেকগুলি বাগিচা আছে। কুন্নুর, লডভেল্, উৎকামন্দ প্রভৃতি স্থানেই এইগুলি অবস্থিত। প্রত্যেক বড় বাগিচার মালিকের ২।১টি চোলাই যন্ত্র আছে। তদ্দ্বারা তাঁহারা স্বকীয় বাগিচা-উৎপাদিত পত্র হইতে তৈল চোলাই করেন। আবশ্যক হইলে সরকারী বাগিচা অথবা ক্ষুদ্র চাষীগণের নিকট হইতে পত্র ক্রয় করা হইয়া থাকে। বিগত মহাযুদ্ধের সময় বাহির হইতে আমদানী বন্ধ হওয়ায় ভারতে ইউক্যালিপ্টাস তৈলের বড় টানাটানি পড়িয়া যায়। সেই সময়ে বনবিভাগের রসায়নতত্ত্ববিৎ সর্দ্দার পূরণ সিংহ এই বিষয়ে অনুসন্ধান করেন। তাহার ফলে প্রকাশ পায় যে, নীলগিরি অঞ্চলে বৎসরে প্রায় ২৪ হাজার পাউণ্ড তৈল উৎপাদিত হয়। টাটকা পাতায়

তৈলের পরিমাণ প্রায় শতকরা ১·১৬ ভাগ ও প্রতি বৎসর যে পত্র ব্যবহৃত হয়, তাহার পরিমাণ প্রায় ১ হাজার ৩শত টন। ছোট বড় সকল প্রকার গাছের পাতা হইতেই তৈল চোলাই করিতে পারা যায়। তৈলের পরিমাণের হিসাবে ৫০ বৎসরের অথবা ততোধিক বয়স্ক গাছের পাতাই উত্তম। কিন্তু তৈল-শিল্পের দ্রুত সম্প্রসারণ করিতে হইলে অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সের গাছ ছাঁটিয়া দিতে পারা যায়। উক্তরূপ গাছের নবীন পল্লব হইতে যে তৈল পাওয়া যায়, তাহা পরিমাণে সামান্য কম হইলেও ব্যবসায়ের তৈল উৎপাদনের পক্ষে অধিক উপযোগী, কারণ, এইরূপ পত্র ব্যবহার করিলে ১০ বৎসরের গাছ লইয়া ও প্রত্যেক বৎসর তাহা ছাঁটিয়া দিয়া কায চলিতে পারে। এতদ্ভিন্ন তৈল-শিল্পের আর এক দিকেও উন্নতি সাধিত হইতে পারে। এখনও নীলাচলে অনেক স্থানে টাট্কা পাতা হইতে তৈল চোলাই হইয়া থাকে। যে স্থলে শুষ্ক পাতা ব্যবহার করিলে একসঙ্গে যেমন অধিক পাতা চোলাই হইতে পারে, তেমনই কারখানায় পত্র বহনের খরচ কমিয়া যায়; সঙ্গে সঙ্গে শতকরা ৫০ ভাগ তৈল উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। শুষ্ক পত্রে তৈলের মাত্র শতকরা ২·২৮ ভাগ। শীতকাল ব্যতীত অন্য সময় খোলা রৌদ্রে পাতা শুকান ঠিক নয়, তাহাতে কিছু তৈল 'উপিয়া' যাইতে পারে। গাছের নীচে পড়িয়া যে পত্র শুষ্ক হয়, মোটের মাথায় তাহাই ব্যবহার করা ভাল।

এখনও পর্য্যন্ত কতিপয় বাগিচার মালিকগণ ছোট ছোট চোলাই যন্ত্র ব্যবহার করেন। কিন্তু পড়্তা কম করিতে হইলে একসঙ্গে অন্ততঃ ২৫ মণ পত্র ব্যবহার করা উচিত। এইরূপ মধ্য আকারের চোলাই-যন্ত্র লইয়া ৩০ হাজার টাকা মূলধনে তৈলের কারখানা চালাইতে পারা যায়। অবশ্য পত্র যত অধিক দূর হইতে আনিতে হইবে, খরচ ততই অধিক পড়িবে। প্রকৃতপক্ষে কায করিয়া দেখা গিয়াছে যে, ২ শত পাউণ্ড টাট্কা পাতা হইতে ২৭½ আউন্স তৈল পাওয়া যায়। চোলাই কার্য্য সতর্কতার সহিত সম্পাদিত হইলে দ্বিতীয় বার চোলাই আবশ্যক হয় না। শুধু শুষ্ক সোডা সল্‌ফেটের মধ্য দিয়া ছাঁকিয়া লইলে উৎকৃষ্ট তৈল পাওয়া যায়। উভয় স্থলে globulus জাতি হইতে উৎপাদিত হইলেও অষ্ট্রেলীয় ও ভারতীয় তৈলে কিছু পার্থক্য আছে। শেষোক্ত তৈলে aldehydes শ্রেণীর উপাদান আদৌ নাই এবং দ্রবণীয়তা কিছু কম। কিন্তু বৃটিশ ফার্ম্মাকোপিয়ার নির্দ্দিষ্ট তৈলের স্থানে ভারতীয় তৈল ব্যবহারের কোন আপত্তি নাই। চোলাই শেষ হইয়া গেলে যে পত্র থাকিয়া যায়, তাহা হইতে আলকাতরার ন্যায় এক প্রকার কষযুক্ত সার বাহির করিতে পারা যায়। উক্ত কষায়-সার বাষ্পীয় ইঞ্জিনের বয়লারে মাখাইয়া দিলে বয়লারে সহজে মরিচা পড়ে না। কিন্তু এ পর্য্যন্ত ভারতে উক্তপ্রকার দ্রব্যের চাহিদা না হওয়ায় চোলাই যন্ত্রে ব্যবহৃত পত্র প্রায়ই ইন্ধনের কার্য্যে প্রয়োগ করা হয়।

তৈল-ব্যবসায়

নীলাচলে প্রথম ইউক্যালিপ্টাস তৈল প্রায় ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে চোলাই করা হয়। তখন ইহার কেবলমাত্র স্থানীয় কাট্‌তি ছিল। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা মহামারীর সময় এই তৈলের যথেষ্ট প্রচার হয় এবং তৎপরে বিগত মহাযুদ্ধের সময় হইতে ইহার চাহিদা অত্যধিক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত দেশোৎপন্ন তৈল দেশেই কাটিয়া যায়, সময় সময় চাহিদার অনুরূপ তৈলও পাওয়া যায় না। কিন্তু ইউক্যালিপ্টাসের তৈল-শিল্পের উন্নতিসাধন ও প্রসার বৃদ্ধি করিতে পারিলে ভারতজাত তার্পিণের ন্যায় ইহারও যে ভারতের বাহিরে চাহিদা বাড়িবে, তাহার কোন সন্দেহ নাই। আপাততঃ নীলগিরির নীলকরগণ পাঃ প্রতি ।৵০-॥০ লাভ রাখিয়া ১৸০ (পাইকারী) হইতে ২॥০ (খুচরা) দরে বড় বোতল বিক্রয় করেন। জগতের বাজারের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে হইলে এইরূপ দর কিছু অধিক। নীলগিরিতে আপাততঃ দেশীয় প্রথায় যে তৈল প্রস্তুত হয়, গড়পড়্তায় তাহার খরচ প্রতি পাউণ্ড প্রায় ১১ আনা। চোলাই-যন্ত্রের পরিবর্ত্তন, শুষ্ক পত্র ব্যবহার এবং অন্যবিধ উন্নতি-সাধন করিলে খরচ ৮ আনা কিংবা ৯ আনা হওয়া সম্ভব। তাহা হইলেই কলিকাতা অথবা বোম্বাইয়ের ন্যায় প্রধান প্রধান বাজারে প্রতি পাউণ্ড ১ টাকা দরে,
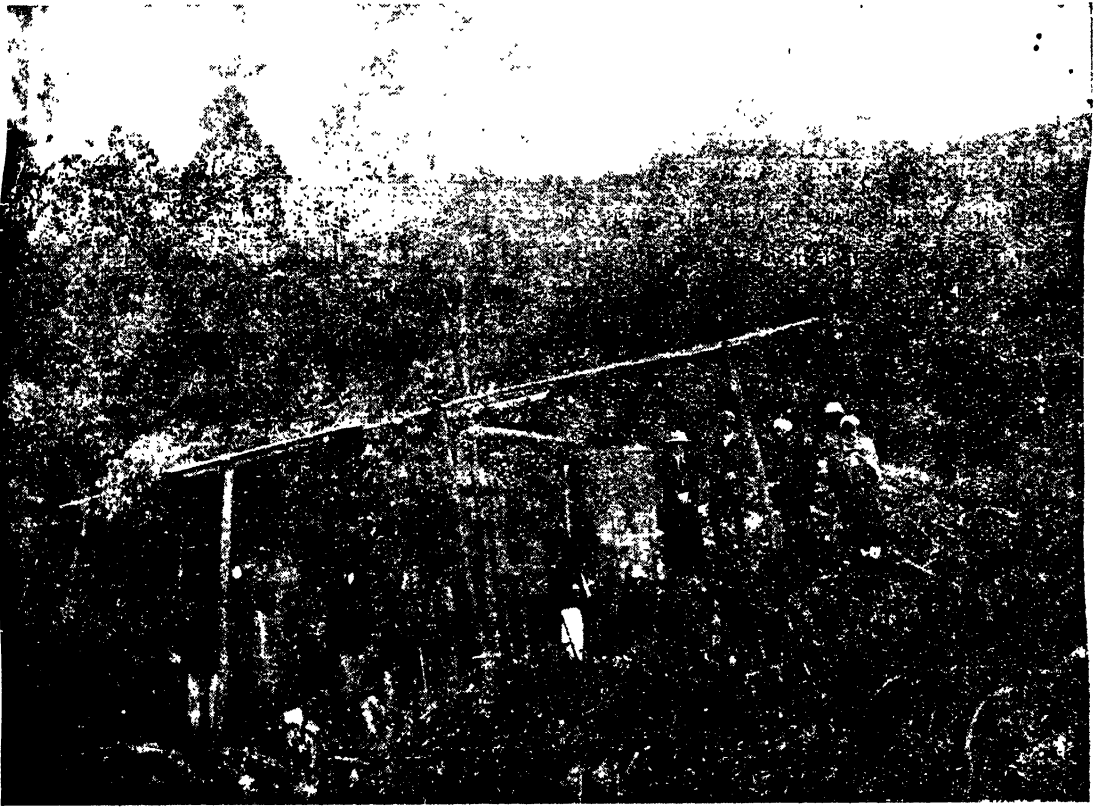
জঙ্গলের ভিতর ইউক্যালিপ্টাস তৈল চোলাই হইতেছে

দেশীয় তৈল সরবরাহ করিলেও চোলাইকরগণের যথেষ্ট লাভ থাকে। ইহাই তাঁহাদের আদর্শ হওয়া উচিত এবং এইরূপ করিতে পারিলেই আল্‌জিরীয় অথবা অন্যান্য বিদেশীয় তৈলের সহিত ভারতীয় তৈল প্রতিযোগিতা করিতে পারিবে। ইহা এ স্থলে উল্লেখযোগ্য যে, আল্‌জিয়ার্সে ইউক্যালিপ্টাস চাষ শত বৎসরের অধিক নয়, কিন্তু ইহার মধ্যেই আল্‌জিরীয় তৈল অষ্ট্রেলীয় তৈলের প্রবল প্রতিযোগী হইতে সমর্থ হইয়াছে; এই দৃষ্টান্তে প্রণোদিত হইয়া ভারতবাসী যদি ইউক্যালিপ্টাস চাষ ও তৈল উৎপাদনে মনোনিবেশ করে, তাহা হইলে ইউক্যালিপ্টাস তৈলের বাজারে তাহার প্রতিষ্ঠা অবশ্যম্ভাবী। বঙ্গদেশে ইউক্যালিপ্টাস চাষের অধিকন্তু এই সুবিধা যে, ইহা দ্বারা যেমন এক দিকে খাল, ডোবা প্রভৃতি ক্ষুদ্র জলাশয় অন্তর্হিত হইয়া ম্যালেরিয়ার প্রকোপ কমিতে পারে, তেমনই অন্য দিকে উৎকৃষ্ট কাষ্ঠ উৎপাদন অথবা ইউক্যালিপ্টাস তৈলস্বরূপ নব-শিল্পের অভ্যুদয় হইতে পারে।

শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত।

অনুরোধ

লোভের কুহকে আমি
সুপথ হারাই যদি
ও পথে যেও না বলে'
দিও বাধা নিরবধি।

যদি এ জীবনে আমি
পাই ব্যথা, পাই দুখ,
হৃদয়ে তুমি যে আছ
ভেবে যেন বাঁধি বুক।

শ্রীউমানাথ ভট্টাচার্য্য।

বাঘের মুখে

১
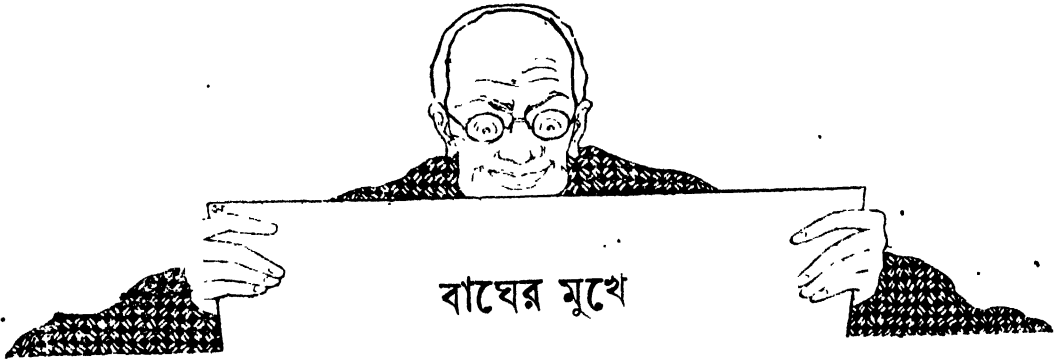
পঁচিশ ছাব্বিশ বৎসর পূর্ব্বে কার্য্যোপলক্ষে আমাকে কিছু দিন গুর্জ্জরদেশে বাস করিতে হইয়াছিল। সে অঞ্চলে তখন বাঙ্গালীর সংখ্যা নিতান্ত অল্প ছিল; মারাঠী, গুজরাটী ও পার্শী ভিন্ন বাঙ্গালীর মুখ প্রায়ই দেখিতে পাইতাম না, এ জন্য মনে হইত, আমি বুঝি স্বদেশ হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছি! গ্রীষ্মকালে গুর্জ্জরের দুর্জ্জয় গ্রীষ্ম ও মধ্যাহ্ন-মার্ত্তণ্ড-প্রতপ্ত মরু-বালুকার উত্তাপ অসহ্য মনে হইলে, বি, বি, সি, আই রেলপথে বোম্বাই-নগরে পলাইয়া আসিতাম। বোম্বাইনগরে তখন প্রবাসী বাঙ্গালীর সংখ্যা আহম্মদাবাদ, সুরাট, বরোদা প্রভৃতির তুলনায় অনেক অধিক ছিল।

একবার বোম্বাইসহরে বোম্বে-প্রবাসী এক বাঙ্গালী বন্ধু এক জন গুজরাটী ভদ্রলোকের সহিত আমার পরিচয় করিয়া দিয়াছিলেন, তাঁহার নাম রূপলাল যাদবজী ঠক্কর। ঠক্কর সাহেব সুরসিক, সদালাপী, বন্ধুবৎসল, উদ্যমশীল যুবক,—গৌরবর্ণ, সুপুরুষ। কিছু দিনের মধ্যেই আমাদের পরিচয় প্রগাঢ় বন্ধুত্বে পরিণত হইয়াছিল। ঠক্কর সাহেব প্রকাণ্ড জোয়ান; তাঁহার দেহেও অসাধারণ সামর্থ্য ছিল। তিনি উচ্চশিক্ষিত না হইলেও বড় চাকরী পাইয়াছিলেন;—বোম্বাই পুলিসের ডেপুটী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন। যৌবনসীমা অতিক্রম করিবার অল্প দিন পরেই প্লেগে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল; তিনি দীর্ঘকাল জীবিত থাকিলে যে উচ্চতর পদে প্রতিষ্ঠিত হইতেন—এ বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ ছিল না।

এক দিন অপরাহ্নে আমরা আমাদের হোটেলের বারান্দায় বসিয়া গল্প করিতেছিলাম; কথায় কথায় তাঁহাকে বলিলাম, "ঠক্কর সাহেব, তোমার বয়স ত এখনও ত্রিশ পার হয় নাই; পুলিসে চাকরী লইয়া অনেক দারোগা—ইন্‌স্পেক্টারের পদে প্রমোশন পাইবার পূর্ব্বেই বুড়া হইয়া যায়. আর তুমি এত অল্পবয়সে কি করিয়া বোম্বে পুলিসের 'ডেপুটী সুপুরণদণ্ড' হইলে, শুনিবার জন্য আমার বড়ই আগ্রহ হইয়াছে। তুমি ত বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা এক্‌জামিনও পাশ কর নাই; বুড়া বুড়া দারোগাদের ডিঙ্গাইয়া একেবারেই ইন্‌স্পেক্টার হইয়াছিলে না কি?"

ঠকরজী হাসিয়া মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "না, একবারেই ডেপুটী 'সুপারিণটিন্‌ডেণ্ট' হইয়াছি।— এক্‌জামিনও পাশ করিতে হয় নাই।"

আমি বলিলাম, "তবে?"

ঠকরজী বলিলেন, "নয়াগড়ের ঠাকুর সাহেবের সুপারিসে আমার এই চাকরী। আমি একবার বাঘের মুখ হইতে তাঁহাকে বাঁচাইয়াছিলাম; সেই ব্যাপারে আমাকে একটু গোয়েন্দাগিরিও করিতে হইয়াছিল। পুলিসে প্রবেশ করিলে আমি এই 'লাইনে' খুব 'সাইন' করিতে পারিব মনে করিয়াই তিনি তাঁহার কোন উচ্চপদস্থ ইংরাজ বন্ধুর কাছে আমার জন্য সুপারিস্ করেন, তাহার ফলে এই চাকরী।"

আমি বলিলাম, "তাহার পূর্ব্বে তুমি কি করিতে?"

ঠকরজী বলিলেন, "বোম্বের সুপ্রসিদ্ধ সার্কাসওয়ালা রস্তমজীর সার্কাসের দলে বাঘের খেলা দেখাইতাম; সাহস ও বীরত্বের পরিচয় দিয়া যথেষ্ট বাহবা এবং তাহা অপেক্ষা 'সবষ্ট্যান্‌স্যাল' জিনিষ—টাকাও নিতান্ত অল্প পাইতাম না; কিন্তু এ কাযে বিপদের আশঙ্কাও অল্প নয়। একবার একটা বে-সায়েস্তা বেয়াড়া বড় বাঘের

সঙ্গে খেলা দেখাইতে গিয়া ভবের খেলা সাঙ্গ হইবার উপক্রম হইয়াছিল! অতি কষ্টে প্রাণ লইয়া খাঁচা হইতে বাহির হইলাম। আমার মা ও স্ত্রী আমার সেই বিপদের কথা শুনিয়া আমাকে দিয়া প্রতিজ্ঞা করাইয়া লইলেন— সার্কাসের দলে আর চাকরী করিব না। অগত্যা সেই চাকরীতে ইস্তফা দিয়া, যে কিছু অর্থসঞ্চয় করিয়াছিলাম —তাহারই সদ্ব্যবহার করিতে লাগিলাম।"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "বাঘ লইয়া খেলা করিতে, এখন চোর, ডাকাত, গুণ্ডা, বাটপাড় লইয়া খেলা দেখাইতেছ। বড় বেশী তফাৎ নাই! কিন্তু এ চাকরী জুটিল কিরূপে—তাই এখন বল। ঠাকুর সসেবকে কি করিয়া বাঘের মুখ হইতে রক্ষা করিলে, তাহাই শুনিতে চাই। সে কি সার্কাসের বাঘ?"

ঠকরজী বলিলেন, "তবে শোন; সে বড় মজার কথা!"

২

ঠকরজী বলিতে আরম্ভ করিলেন:—সার্কাসের চাকরী ছাড়িয়া দিয়া অন্য চাকরীর উমেদারীতে তখন এখানেই ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলাম। কিন্তু দীর্ঘকাল সিংহ, বাঘ, ভালুক, হায়েনা, নেকড়ে প্রভৃতি বনের পশুর সঙ্গে খেলা করিয়া মনের গতি এরূপ হইয়াছিল যে, এই সকল জানোয়ার দেখিবার জন্য আমার বড়ই আগ্রহ হইত। আমার এই আগ্রহ পূর্ণ করিবার জন্য আমি মধ্যে মধ্যে বট্‌লিওয়ালার পশুশালায় বেড়াইতে যাইতাম।

তুমি বোধ হয় জান না—মালবার পাহাড়ের কাছে মিঃ বট্‌লিওয়ালার যে পশুশালা আছে, সেখানে সিংহ, বাঘ, ভালুক, নেকড়ে, উট, জিরেফা, জেব্রা প্রভৃতি নানাপ্রকার জীব-জন্তু পৃথিবীর নানা দেশ হইতে সংগ্রহ করিয়া রাখা হয়। ঐ সকল জানোয়ার সংগ্রহ করিবার জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে তাঁহাদের এজেণ্ট আছে। য়ুরোপ ও আমেরিকার অনেক ধনাঢ্য ব্যক্তি—যাঁহাদের বন্য পশু পালনের সখ আছে—ও সার্কাসওয়ালারা বট্‌লিওয়ালার পশুশালা হইতে এই সকল জানোয়ার ক্রয় করিয়া থাকেন।

এক দিন অপরাহ্ণ বেলা প্রায় ৩টার সময় আমি বেড়াইতে বেড়াইতে এই পশুশালায় উপস্থিত হইলাম। আফিসের ভিতর প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, পেস্তনজী তাঁহার ডেস্কের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া কি লিখিতেছেন। তিনি আমাকে দেখিয়া একটু হাসিয়া বসিতে বলিলেন। তাঁহার হাতের কায শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত আমি বসিয়া রহিলাম।

পেস্তনজী মিঃ বট্‌লিওয়ালার ব্যবসায়ের অংশীদার এবং ম্যানেজার। তিনি তাঁহাদের বোম্বাইয়ের আফিসে বসিয়াই ম্যানেজারী করিতেন না, বৎসরের অধিকাংশ সময় দেশদেশান্তরে ঘুরিয়া বিক্রয়োপযোগী নানা বন্য পশু সংগ্রহ করিয়াও আনিতেন। কিছু দিন পূর্ব্বে তিনি শ্যাম ও মালয়ে গিয়া কয়েকটা পশু লইয়া আসিয়াছিলেন। আমি সার্কাসের দলে চাকরী করিবার সময় পশুক্রয় উপলক্ষে মধ্যে মধ্যে এখানে আসিতাম। সেই সময় হইতে তাঁহার সহিত আমার আলাপ-পরিচয়, এমন কি, ক্রমে কিঞ্চিৎ ঘনিষ্ঠতাও হইয়াছিল।

পেস্তনজী তাঁহার হাতের কায শেষ করিয়া আমাকে বলিলেন, "খবর কি, ঠাকুর! অনেক দিন তোমার সঙ্গে দেখা নাই; শুনিলাম, সার্কাসের চাকরী ছাড়িয়া দিয়াছ। বাঘ-ভালুকে হঠাৎ অরুচি হইল কেন? বাঘের খাবার ভয়ে? না, অন্য কোন কারণ আছে?"

আমি বলিলাম, "চিরদিন কি বাঘ-ভালুক লইয়া খেলা করিতে ভাল লাগে? সাত ঘাটের জলও সহ্য হয় না। কিছু দিন এক যায়গায় চাকরী-বাকরী করিব মনে করিয়াছি। মাসখানেক আগে আর এক দিনও এখানে আসিয়াছিলাম, কিন্তু আপনাকে দেখিতে পাই নাই; শুনিয়াছিলাম, কার্য্যোপলক্ষে উত্তর-ভারতে গিয়াছিলেন।"

পেস্তনজী বলিলেন, "হাঁ, এবার নেপালের দিকে গিয়াছিলাম; সেখান হইতে সিকিমে যাই। দুই সপ্তাহ পূর্ব্বে এখানে ফিরিয়াছি।"

আমি বলিলাম, "সিকিমে গিয়াছিলেন? সে ত বাঘের রাজ্য! বাঘ ভালুক কিছু সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন কি?"

পেস্তনজী বলিলেন, "তবে কি খালি হাতে ফিরিয়াছি? দেখিতে চাও ত আমার সঙ্গে পশুশালায় চল। সিকিমে এবার আমি একা যাই-নাই; নয়াগড়ের

ঠাকুর সাহেব রাজেন্দ্রপ্রতাপ সিংও আমার সঙ্গে গিয়া সিকিম-রাজের অতিথি হইয়াছিলেন। তাঁহারও বাঘের বাতিক অল্প নয়; নয়াগড়ের পিপ্‌লস্ পার্কে তাঁহার প্রকাণ্ড চিড়িয়াখানা দেখিবার বস্তু।"

এই সকল কথা বলিতে বলিতে তিনি আমাকে লইয়া তাঁহাদের পশুশালায় প্রবেশ করিলেন। প্রায় ষাট বিঘা জমীর উপর এই পশুশালা নির্ম্মিত, তাহা উচ্চ ইষ্টকপ্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত। প্রাঙ্গণের এক অংশে নানা আকারের পাঁচ সাতটি হাতী দেখিলাম, লোহার শিকল দিয়া তাহাদের পা বাঁধা। একটা প্রকাণ্ড গুদামের দ্বার-জানালা বন্ধ; কিন্তু মাথার উপর সারি সারি 'স্কাই-লাইট' থাকায় আলো ও বাতাসের অভাব ছিল না। সেই গুদামে অনেকগুলি সুদৃঢ় লোহার খাঁচায় সিংহ, ব্যাঘ্র, ভল্লুক, নেকড়ে প্রভৃতি জানোয়ার আবদ্ধ রহিয়াছে। আমি পেস্তনজীর সঙ্গে ঘুরিয়া ঘুরিয়া জানোয়ারগুলি দেখিতে লাগিলাম। কয়েকটি নূতন আমদানী বলিয়াই মনে হইল; পূর্ব্বে সেগুলিকে দেখিতে পাই নাই।

এক পাশে একটা প্রকাণ্ড খাঁচা খালি পড়িয়া ছিল। লোহার মোটা মোটা তার জালের মত বুনিয়া, পুরু তক্তার সঙ্গে গাঁথিয়া সেই খাঁচাটি নির্ম্মিত। খাঁচাটা খালি দেখিয়া আমি পেস্তনজীকে বলিলাম,"ইহার ভিতর কোন্ মহাত্মা বিরাজ করিতেন? তিনি কোথায়?"

পেস্তনজী বলিলেন, "এই খাঁচায় সিকিম হইতে একটা প্রকাণ্ড বাঘ আসিয়াছিল। বাঘটাকে স্থানান্তরে পাঠাইয়া দিয়াছি। তুমি সে রকম বড় বাঘের সঙ্গে নিশ্চয়ই কোন দিন খেলা কর নাই।—উহার জোড়া বাঘটা অন্য খাঁচায় আছে। কি রকম ভয়ঙ্কর জানোয়ার, তাহা দেখিলেই বুঝিতে পারিবে।"

একটু তফাতে আর একটা সুদৃঢ় খাঁচায় একটি প্রকাণ্ড বাঘ ছিল। পেস্তনজীর সঙ্গে সেই খাঁচার নিকট গিয়া দাঁড়াইলাম। বাঘটা খাঁচার এক কোণে বসিয়া ছিল; আমাদের দেখিয়া উঠিয়া আসিয়া, খাঁচার শিকে মাথা ঘষিতে ঘষিতে মৃদু গর্জ্জন আরম্ভ করিল।

অতি সুদৃশ্য বাঘ, দেখিয়া বোধ হইল, বয়স ভরিয়া আসিয়াছে। আমি খাঁচার আর একটু কাছে সরিয়া গিয়া দাঁড়াইলাম।

পেস্তনজী ব্যগ্রভাবে বলিলেন, "কর কি? অত কাছে যাইও না। ভয়ঙ্কর দুর্দ্দান্ত বাঘ; ও রকম ভীষণ প্রকৃতির বাঘ এখানে আর একটিও নাই।"

আমি সবিস্ময়ে বলিলাম, "দুর্দ্দান্ত? আমি কি বাঘ দেখিয়া তাহার প্রকৃতি বুঝিতে পারি না? আমি নিশ্চয়ই ভুল করি নাই। এটা পোষা বাঘ। পরীক্ষা করিতে চান?"

আমি খাঁচার শিকের ভিতর হাত পুরিয়া দিয়া বাঘটার মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলাম। সে চোখ বুজিয়া বিড়াল-শাবকের মত আমার আদর উপভোগ করিতে লাগিল।

পেস্তনজী অদূরে স্তম্ভিতভাবে দাঁড়াইয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বাঘটাকে দেখিতে লাগিলেন। মিনিটখানেক পরে তাঁহার মুখ বিবর্ণ হইল; চক্ষুতে আতঙ্কের চিহ্ন পরিস্ফুট হইল। তিনি ভীতিবিহ্বল স্বরে বলিলেন, "এ কি হইল? ইহার অর্থ কি? তবে কি দুর্দ্দান্ত বুনোটার সঙ্গে পোষা বাঘটার অদল-বদল হইয়াছে? কি সর্ব্বনাশ! আমি এখন করি কি? এ যে সাংঘাতিক ভুল!"

পেস্তনজী হতাশভাবে একখানি টুলের উপর বসিয়া পড়িয়া আতঙ্কে দুশ্চিন্তায় ঘামিতে লাগিলেন। দেখিলাম, তাঁহার রাঙ্গা মুখ সাদা হইয়া গিয়াছে।

ব্যাপার কি, কিছুই বুঝিতে না পারিয়া সবিস্ময়ে পেস্তনজীকে বলিলাম, "ভুল! আপনি কিরূপ ভুলের কথা বলিতেছেন?"

পেস্তনজী কোন প্রকারে আত্মসংবরণ করিয়া বলিলেন, "ভ্রমক্রমে এই পোষা বাঘটার পরিবর্ত্তে সিকিম হইতে আনীত সেই দুর্দ্দান্ত বুনো বাঘটাকে নয়াগড়ের ঠাকুর সাহেবের কুঠীতে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। মহা অপরাধের কায হইয়াছে। এ কায কাহার ভ্রমে হইল, বুঝিতে পারিতেছি না। আজ যে তুমি হঠাৎ এখানে আসিয়া পড়িয়াছ, ইহা আমি পরম সৌভাগ্যের বিষয় বলিয়াই মনে করিতেছি; তুমি না আসিলে দুই চারি দিনের মধ্যে এ ভুল ধরা পড়িত না; তাহার ফল বড়ই শোচনীয় হইত।"

আমি বলিলাম, "সকল কথা খুলিয়া বলুন; আমি এখনও কিছু বুঝিতে পারি নাই।"

পেস্তনজী বলিলেন, "সকল কথা সংক্ষেপে বলিতেছি, শোন। আমি তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি, নয়াগড়ের ঠাকুর সাহেব রাজেন্দ্রপ্রতাপসিংজী আমার সঙ্গে সিকিমে গিয়া সিকিম-রাজের অতিথি হইয়াছিলেন। সিকিমরাজের প্রাসাদের দেউড়িতে দুইটি প্রকাণ্ডকায় পোষা বাঘ ছিল। ঠাকুর সাহেব এক দিন অপরাহ্ণে সেই বাঘ দুইটির কাছে গিয়া দাঁড়াইলে একটা বাঘ তাঁহার সম্মুখে আসিয়া তাঁহার হাঁটুতে মাথা ঘষিতে লাগিল; তিনি বাঘটার ব্যবহারে বিস্মিত হইয়া তাহার গলার কলার হইতে শিকলটা খুলিয়া দিতে বলিলেন। শিকল খুলিয়া দেওয়া হইলে, বাঘটা পোষা কুকুরের মত ঠাকুর সাহেবের অনুসরণ করিল, যেন তাঁহারই পোষা বাঘ! সেই দিন হইতে ঠাকুর সাহেব সেই বাঘটার বড়ই পক্ষপাতী হইয়া উঠিলেন; কিন্তু রাজার পোষা বাঘ, তাহা ত কিনিয়া লইবার জোর ছিল না। রাজা তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া এবং তাঁহারও বাঘ পুষিবার সখ আছে শুনিয়া সেই বাঘটি তাঁহাকে উপহার দিলেন। আমি সিকিম হইতে দুইটি বাঘ সংগ্রহ করিয়া এখানে চালান দিতেছিলাম; এ জন্য ঠাকুর সাহেব তাঁহার বাঘটিও আমার জিম্মা করিয়া দিলেন। তিনটি বিভিন্ন খাঁচায় বাঘগুলি এ দেশে চালান দেওয়া হইয়াছিল। পথিমধ্যে কোন খাঁচা খুলিয়া বাঘ বাহির করা হইয়াছিল কি না, জানিতে পারি নাই। যাহার উপর বাঘ লইয়া আসিবার ভার ছিল, তাহাকে খাঁচা খুলিতে নিষেধ করিয়াছিলাম। এখন দেখিতেছি, খাঁচার বাঘ বদল হইয়া গিয়াছে! এ কাণ্ড কখন্ কিরূপে হইল, কে এ জন্য দায়ী, তাহাও বুঝিতে পারিতেছি না। কলিকাতা হইতে যে জাহাজে বাঘগুলি এখানে প্রেরিত হইয়াছিল, সেই জাহাজের খোলের ভিতর এইরূপ অদল-বদল হওয়া অসম্ভব নহে। এই অদল-বদলের জন্য ঠাকুর সাহেবের পোষা বাঘ এখানে রহিয়াছে, আর আমি সেই যে দুর্দ্দান্ত বুনো বাঘ দুইটি ধরাইয়া আনিয়াছিলাম, তাহারই একটা ঠাকুর সাহেবের কুঠীতে প্রেরিত হইয়াছে। তিনটি বাঘই দেখিতে ঠিক এক রকম।"

আমি বলিলাম, "তিনটি, আর একটি কোথায়?"

পেস্তনজী বলিলেন, "মেলবোর্ণের এক সার্কাস-ওয়ালা কোম্পানীর এজেণ্ট সেটা কিনিয়া লইয়া অষ্ট্রেলিয়ায় পাঠাইয়া দিয়াছে!"

তাঁহার কথা শুনিয়া আমার মন উদ্বেগ ও আশঙ্কায় পূর্ণ হইল; তাঁহাকে বলিলাম, "পোষা বাঘ মনে করিয়া ঠাকুর সাহেব যদি অসতর্কভাবে খাঁচার দরজা খুলিয়া বাঘটাকে বাহির করেন, তাহা হইলে বাঘ খাঁচার বাহিরে আসিয়াই তাঁহাকে আক্রমণ করিবে, তাঁহাকে খাইয়া ফেলিবে! হয় ত আত্মরক্ষার সুযোগ পাইবেন না!—আপনি বাঘটা ঠাকুর সাহেবের কুঠীতে কবে পাঠাইয়াছেন?"

পেস্তনজী বলিলেন, "কলিকাতা হইতে আমরা উভয়ে একত্র বোম্বে ফিরিয়া আসি। তাহার পর তিনি নয়াগড়ে চলিয়া গিয়াছেন; বাঘটা কোথায় পাঠাইতে হইবে, কবেই বা পাঠাইতে হইবে, এ সম্বন্ধে আমি তাঁহার কোন আদেশ জানিতে না পারায় তাঁহাকে পত্র লিখিয়াছিলাম; কিন্তু সেই পত্রের উত্তর পাই নাই। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র কুমার উদয়প্রতাপসিংহ এখানেই থাকেন, কা'ল সকালে তিনি আমার সঙ্গে দেখা করিয়া বলিলেন, ঠাকুর সাহেব দুই এক দিনের মধ্যেই রাজধানী হইতে বোম্বে আসিবেন; বাঘটা তিনি অবিলম্বে তাঁহার বোম্বের কুঠীতে পাঠাইতে আদেশ করিয়াছেন। বাঘটা এখন কিছু দিন তাঁহার বোম্বের কুঠীতে থাকিবে বলিয়া তাহার বাসের জন্য একটি খোঁয়াড়ও প্রস্তুত হইয়াছে। বাঘটাকে কা'ল বৈকালেই তাঁহার কুঠীতে পাঠাইয়াছি। তিনি আজ রাত্রিতে বা আগামী কল্য সকালের ট্রেণে বোম্বে পৌঁছিবেন।"

আমি বলিলাম, "তাঁহার সৌভাগ্য যে, তাঁহার এখানে আসিতে বিলম্ব হইতেছে। আমি সার্কাসের দলের সঙ্গে দুইবার নয়াগড়ে গিয়াছিলাম। বাঘের সঙ্গে আমার খেলা দেখিয়া তিনি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন; আমাকে একটা সোনার মেডেলও দিয়াছিলেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার স্ত্রীর মৃত্যু হইয়াছে, তিনি আর বিবাহ করেন নাই। কুমার উদয়প্রতাপের সঙ্গেও আমার জানাশুনা আছে, তিনি ঠাকুর সাহেবের ছোট ভাইএর ছেলে। পিতৃহীন ভ্রাতুষ্পুত্রকে তিনি ছেলের মত প্রতিপালন করিতেছেন।"

পেস্তনজী বলিলেন, "হাঁ। কুমার সাহেব ভয়ঙ্কর বিলাসী; শুনিয়াছি, বড়ই অপব্যয়ী। তিনি এখানেই থাকেন। তাঁহার মোসাহেবগুলিও ভাল লোক নহে। ঠাকুর সাহেব নিঃসন্তান, আর বিবাহও করিলেন না; বোধ হয়, কুমার উদয়প্রতাপই তাঁহার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইবেন। কুমার সাহেব কোন কোন ইহুদী বণিকের কাছে গত ছয়মাসে না কি অনেক টাকা কর্জ্জ করিয়াছেন।"

আমি বলিলাম, "বড় লোকের ঘরে এই রকমই হইয়া থাকে। উদয়প্রতাপ কি বাঘটাকে সঙ্গে লইয়া গিয়াছেন?"

পেস্তনজী বলিলেন, "না। তিনি আসিয়া বাঘটা দেখিতে চাহিলেন, আমি তখন অন্য কাযে ব্যস্ত ছিলাম। শঙ্করজী ডেসপান্ডেকে তাঁহার সঙ্গে দিয়া বাঘ দেখাইতে পাঠাইয়াছিলাম।"

আমি বলিলাম, "শঙ্করজী ডেসপান্ডেটি কে?"

পেস্তনজী বলিলেন, "দক্ষিণী ব্রাহ্মণ যুবক, আমারই সহকারী।"

আমি বলিলাম, "কুমার সাহেব ডেস্‌পান্ডের সঙ্গে বাঘের খাঁচার কাছে গিয়া সেখানে কতক্ষণ ছিলেন?"

পেস্তনজী বলিলেন, "তা বোধ হয় পনের কুড়ি মিনিট হইবে।"

আমি বলিলাম, "ডেস্‌পান্ডে এখন কোথায়?"

পেস্তনজী বলিলেন, "একটু কাযে তাঁহাকে ডকে পাঠাইয়াছি। তোমার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়াছি। কুমার সাহেব ঠাকুর সাহেবের সম্পত্তির ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী, তবে ঠাকুর সাহেব যদি পুনর্ব্বার বিবাহ করেন ও তাঁহার সন্তান হয়, তাহা হইলে কুমার উদয়প্রতাপের কোন আশা নাই। তাহা হইলেও কুমার সাহেব ডেস্‌পান্ডের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া এই কু-কার্য্য করিয়াছেন— ইহা বিশ্বাস করা কঠিন। কুমার সাহেব তরুণ-যুবক, পিতৃব্যকে তিনি পিতার ন্যায় শ্রদ্ধাভক্তি করেন; এতদূর নিষ্ঠুরতা, কপটতা ও বিশ্বাসঘাতকতা তাঁহার অসাধ্য বলিয়াই মনে হয়।—কিন্তু এ রহস্য ভেদ করা আমার সাধ্যাতীত; তুমি একটু গোয়েন্দাগিরি করিয়া দেখিবে? তুমি ঠাকুর সাহেবকে সতর্ক করিবার ভার লইলে আমি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি।—তিনি নিশ্চয়ই আসিয়াছেন জানিলে আমি টেলিফোনে তাঁহাকে সতর্ক করিতাম।"

আমি বলিলাম, "এখনও অনেকখানি বেলা আছে; আমি এখনই ঠাকুর সাহেবের কুঠীতে যাইতেছি। তিনি আজই আসিবেন কি না সন্ধান লইব; আর যদি কুঠীতে পৌঁছিয়া থাকেন এবং তাঁহার বিপদের সম্ভাবনা বুঝিতে পারি—তাহা হইলে তাঁহার প্রাণরক্ষার চেষ্টা করিব। কিন্তু আমি নিরস্ত্র, হঠাৎ অস্ত্রের প্রয়োজন হইতেও পারে। আপনার পিস্তল ও গোটা দুই টোটা সঙ্গে রাখিতে চাই।"

"হাঁ, তুমি সঙ্গত কথাই বলিয়াছ।"—বলিয়া তিনি তাঁহার দেরাজ হইতে কল্টের একটি রিভলবার ও দুইটি গুলীভরা টোটা বাহির করিয়া দিলেন। আমি তাহা পিস্তলে পূরিয়া লইয়া পিস্তলটা পকেটে ফেলিলাম, এবং তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া, পথে আসিয়া ট্রামে চাপিলাম। ঠাকুর-সাহেবের কুঠী আমি চিনিতাম।

৪

ঠাকুর সাহেবের কুঠীতে পৌঁছিতে আমার কুড়ি মিনিটের অধিক বিলম্ব হয় নাই। যখন তাঁহার প্রাসাদের দেউড়ীতে উপস্থিত হইলাম, তখন বেলা প্রায় ৬টা। বন্দুকের উপর সঙ্গীন চড়াইয়া এক জন প্রহরী দেউড়ীতে পাহারা দিতেছিল। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "ঠাকুর সাহেব আসিয়াছেন কি?"

প্রহরী বলিল, "হাঁ, পাঁচটার ট্রেণে কোলাবা ষ্টেশনে নামিয়াছেন। দশ মিনিট পূর্ব্বে কুঠীতে পৌঁছিয়াছেন।"

"কোথায় তিনি?"

প্রহরী আমার প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার পূর্ব্বেই প্রাসাদের বাম পার্শ্বের বাগানের ভিতর হইতে একটা তীব্র আর্ত্তনাদ আমার কর্ণগোচর হইল!—আমি আর সেখানে দাঁড়াইলাম না, শব্দ লক্ষ্য করিয়া দ্রুতপদে বাগানে প্রবেশ করিলাম। প্রহরী বেচারার দেউড়ী ছাড়িয়া নড়িবার আদেশ নাই,—সে বোধ হয়, দেউড়ীতেই দাঁড়াইয়া রহিল; আমার তখন আর পশ্চাতে দৃষ্টিপাত করিবার অবসর ছিল না।

বাগানের এক প্রান্তে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম—সর্ব্বনাশ! তক্তা-ঘেরা একটা প্রশস্ত খোঁয়াড়ের মধ্যে বাঘের খাঁচার দ্বার খোলা রহিয়াছে; দুর্দ্দান্ত বাঘটা খাঁচা হইতে বাহির হইয়া থাবা গাড়িয়া বসিয়া আছে,—তাহার সম্মুখের দুই পায়ের নীচে ঠাকুর সাহেব পড়িয়া আছেন; বাঘটা মুখব্যাদান করিয়া তাঁহাকে দংশনোদ্যত!

পিস্তলটা আমি পকেট হইতে পূর্ব্বেই বাহির করিয়া লইয়াছিলাম। বাঘ মুখ নামাইয়া তীক্ষ্ণ দন্তে ঠাকুর সাহেবের কণ্ঠস্পর্শ করিবার পূর্ব্বেই 'গুড়ুম' করিয়া পিস্তলের শব্দ হইল। পিস্তলের অব্যর্থ গুলী বাঘের মস্তিষ্ক বিদীর্ণ করিল, সঙ্গে সঙ্গে সে ভীষণ গর্জ্জন করিয়া এক পাশে লাফাইয়া উল্টাইয়া পড়িল। দ্বিতীয় গুলী তাহার গ্রীবা ভেদ করিবার পূর্ব্বেই সে পঞ্চত্ব লাভ করিল।

পিস্তলের আওয়াজ শুনিয়া চারি পাঁচ জন ভৃত্য সেখানে দৌড়াইয়া আসিল, ঠাকুর সাহেব তখন উঠিয়া দাঁড়াইয়াছেন। দেখিলাম, তাঁহার কোটটার দুই তিন স্থান বাঘের নখে ফালা ফালা হইয়া ছিঁড়িয়া গিয়াছে; কিন্তু তিনি অক্ষত আছেন।

ঠাকুর সাহেব আমাকে দেখিয়াই চিনিতে পারিলেন, দুই এক পদ অগ্রসর হইয়া সাগ্রহে আমার হাত ধরিলেন, বলিলেন, "ঠকুর! তুমি এখানে?—পরমেশ্বর আমার প্রাণরক্ষার জন্যই বোধ হয় তোমাকে এখানে পাঠাইয়াছিলেন। তুমি আজ আমার জীবন রক্ষা করিয়াছ; জানি না, আমার প্রাণদাতাকে কি করিয়া কৃতজ্ঞতা জানাইব। তোমার এখানে আসিতে আর এক মিনিট বিলম্ব হইলে বাঘটা আমাকে খাইয়া ফেলিত! কিন্তু এ কি ব্যাপার! ওটা ত আমার সে বাঘ নয়; না, নিশ্চয়ই পোষা বাঘ নয়। কাহার ভ্রমে আমার জীবন বিপন্ন হইয়াছিল—জানিতে চাই। উঃ—কি বিষম ভ্রম!"

ঘেরের বাহিরে কয়েকখানি চেয়ার পড়িয়া ছিল; আমরা উভয়ে দুইখানি চেয়ারে বসিয়া পড়িলাম। আমি ঠাকুর সাহেবের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলাম, "আপনি ঠিকই বলিয়াছেন। সিকিম-রাজ আপনাকে যে বাঘটি উপহার দিয়াছিলেন—এটি সেই পোষা বাঘ নহে। এই দুই বাঘে কিরূপে অদল-বদল হইল—তাহা বুঝিতে পারা যায় নাই।"

ঠাকুর সাহেব বলিলেন, "অদল-বদল হইয়াছে!—কাহার অসতর্কতায় এরূপ হইল? এই সাংঘাতিক ভ্রমের জন্য পেস্তনজীই দায়ী, কারণ, আমার বাঘ তাহারই জিম্মায় ছিল। আমি তাহাকে যথাযোগ্য শিক্ষা দিব। সে আমার পোষা বাঘটা পাঠাইয়াছে মনে করিয়া আমি নিশ্চিন্তমনে খাঁচার দুয়ার খুলিয়া দিয়াছিলাম; বাঘটা তৎক্ষণাৎ খাঁচা হইতে বাহির হইয়া আমাকে আক্রমণ করিল। আমি নিরস্ত্র ও অসতর্ক ছিলাম, তাহার আক্রমণের বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া ভূতলশায়ী হইলাম। সেই মুহূর্ত্তে তুমি এখানে না আসিলে বাঘটা আমাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিত!"

আমি বলিলাম, "এই অদল-বদলের জন্য পেস্তনজী বা বর্টলিওয়াল দায়ী নহেন; আমার বিশ্বাস, আপনাকে হত্যা করিবার জন্য ইহা আপনার কোন শত্রুর কৌশল!"

ঠাকুর সাহেব সবিস্ময়ে বলিলেন, "আমার কোনও শত্রুর কৌশল?" মুহূর্ত্তমধ্যে তাঁহার মুখ অন্ধকার হইয়া গেল; তিনি শূন্যদৃষ্টিতে চাহিয়া অস্ফুট স্বরে বলিলেন, "কে আমার শত্রু? আমাকে হত্যা করিয়া কাহার কি স্বার্থসিদ্ধি হইত?"

সেই মুহূর্ত্তে ঠাকুর সাহেবের ভ্রাতুষ্পুত্র উদয়প্রতাপ হাঁপাইতে হাঁপাইতে পিতৃব্যের সম্মুখে আসিয়া বলিলেন, "এ কি ব্যাপার? আপনার পোষা বাঘটা না কি—"

ঠাকুর সাহেবের সকল ক্রোধ পুঞ্জীভূত হইয়া যেন সেই যুবককে দগ্ধ করিতে উদ্যত হইল!—তিনি কর্কশ স্বরে বলিলেন, "ওরে অকৃতজ্ঞ, ওরে সয়তান, এ যে তোরই ষড়যন্ত্রের ফল, ইহা কি আমি বুঝিতে পারি নাই? আমাকে হত্যা করিবার দুরভিসন্ধিতে তুইই আমার পোষা বাঘের পরিবর্ত্তে ঐ দুর্দ্দান্ত বাঘটা এখানে আনাইয়া রাখিয়াছিলি! এই ভাবে তুই তোর পিতৃব্যের স্নেহের ঋণ পরিশোধ করিতে উদ্যত হইয়াছিলি? পশুশালার ভৃত্যকে উৎকোচে বশীভূত করিয়া—" ক্রোধ ও উত্তেজনায় তাঁহার মুখে আর কথা সরিল না, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল।

উদয়প্রতাপ পিতৃব্যের অভিযোগ শুনিয়া স্তম্ভিত হইলেন; বিস্ময়বিস্ফারিতনেত্রে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া

বলিলেন, "আপনি এ কি বলিতেছেন, জ্যেঠা সাহেব! আমি আপনাকে হত্যা করিবার জন্ত ষড়যন্ত্র করিয়া বাঘ বদল করিয়াছি? এই অসম্ভব কথা বিশ্বাস করিতেও আপনার প্রবৃত্তি হইল?"

ঠাকুর সাহেব সরোষে বলিলেন, "কেন প্রবৃত্তি হইবে না? কিরূপ দুশ্চরিত্র ইতর যুবকগণের সংসর্গে তুই কালযাপন করিস্—তাহা আমার অজ্ঞাত নহে; কি ভাবে তুই ঋণজালে জড়ীভূত হইয়াছিস্—তাহাও আমি জানিতে পারিয়াছি। তোর এক জন ইহুদী মহাজন তোর কাছে দশ হাজার টাকা পাইবে; সে টাকা না পাইলে নালিশের ভয় দেখাইয়া যে পত্র লিখিয়াছিল—সেই পত্র আমার হাতেই আসিয়া পড়িয়াছিল। তুই তাড়াতাড়ি আমার গদীর উত্তরাধিকারী হইবার আশায় এই দুষ্কর্ম্ম করিয়াছিস্। তুই সে আশা ত্যাগ কর্; আমি তোকে এক কপর্দ্দকও দিব না; তোর সঙ্গে আমার আর কোন সম্বন্ধ রহিল না। আমার বাড়ী হইতে তুই দূর হইয়া যা।"

কুমার সাহেব আত্মসমর্থনের জন্ত কি বলিতে উদ্যত হইয়াছিলেন; কিন্তু তিনি আর কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই ঠাকুর সাহেব তাঁহার এক জন দরোয়ানকে বলিলেন, "এই বেইমানকে ঘাড় ধরিয়া বাড়ীর বাহির করিয়া দে। যে উহাকে আমার বাড়ীতে প্রবেশ করিতে দিবে—আমি তাহাকে সেই মুহূর্ত্তেই বরখাস্ত করিব। নয়াগড় প্রাসাদের দ্বারও উহার পক্ষে চিররুদ্ধ হইল।"

কুমার সাহেব চোখ-মুখ লাল করিয়া বলিলেন, "দরোয়ান দিয়া অপমান করিয়া আমাকে তাড়াইবার দরকার নাই; আমি এখনই চলিয়া যাইতেছি। কিন্তু স্মরণ রাখিবেন—আমি নিরপরাধ. এক দিন আপনার ভ্রম বুঝিতে পারিবেন,—আমার প্রতি অন্যায় সন্দেহের জন্ত এক দিন আপনাকে অনুতাপ করিতে হইবে। এই অবিচারের জন্ত পরমেশ্বরের নিকট ক্ষমা চাহিবেন।"

কুমার উদয়প্রতাপ তৎক্ষণাৎ তাঁহার পিতৃব্যের প্রাসাদ পরিত্যাগ করিলেন, তাঁহার নিত্য-ব্যবহার্য্য কোন সামগ্রী সঙ্গে লইলেন না, অন্ত কাহাকেও একটি কথাও বলিলেন না।

তাঁহার এই বিদায়-দৃশ্যে আমি মনে বড়ই বেদনা পাইলাম। তিনি প্রস্থান করিলে ঠাকুর সাহেব আমাকে বলিলেন, "জীবনে এই কুলাঙ্গারের মুখদর্শন করিব না; ক্ষুধার জ্বালায় লোকের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতেছে, শুনিলেও একটি পয়সা দিয়া উহাকে সাহায্য করিব না। দেখ ঠকর, উহার বয়স যখন তিন বৎসর—সেই সময় উহার পিতৃবিয়োগ হয়; উহার পিতা ভাস্করপ্রতাপ আমার কনিষ্ঠ সহোদর। তাহার মৃত্যুর পর উহাকে ছেলের মত স্নেহ-যত্নে প্রতিপালন করিয়া আসিয়াছি। আমার আশা ছিল—ছোঁড়া মানুষ হইয়া আমাদের বংশের মুখ উজ্জ্বল করিবে; কিন্তু অল্পবয়সে কুসংসর্গে মিশিয়া একেবারে অধঃপাতে গিয়াছে! জুয়া খেলিতে শিখিয়াছে; অল্পদিনে আমার অজ্ঞাতসারে হাজার হাজার টাকা কর্জ্জ করিয়াছে; অবশেষে আমার গদী পাইবার আশায় এই ভাবে আমাকে হত্যা করিবার ষড়যন্ত্র করিয়াছিল। নয়াগড়ে থাকিলে উহার এত দূর অধঃপতন হইত না; কিন্তু সেখানে কুসংসর্গে মিশিয়া অধঃপাতে যাইবার তেমন সুযোগ নাই, এই জন্ত বোম্বে ছাড়িতে চায় না, এখানেই পড়িয়া থাকে!"

আমি বলিলাম, "আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রের ভাবভঙ্গী দেখিয়া উঁহাকে নিরপরাধ বলিয়াই আমার ধারণা হইয়াছে। অপরাধী কি না—মুখ দেখিয়া বুঝিতে পারা যায়।"

ঠাকুর সাহেব কিঞ্চিৎ অসহিষ্ণুভাবে বলিলেন, "না ঠকর, তুমি উহাকে চেন না; তাই উহার ন্যাকামীতে ভুলিয়াছ। উহারই ষড়যন্ত্রে বাঘের মুখে পড়িয়া আমার প্রাণ গিয়াছিল আর কি! কৃতঘ্ন পিশাচ!"

দেখিলাম, অনেক বড়লোকের মতই ঠাকুর সাহেব প্রতিবাদ-অসহিষ্ণু। কিন্তু তাঁহার কথায় আমার ধারণা পরিবর্ত্তিত হইল না। তাঁহার সহিত তর্কবিতর্ক করিতেও প্রবৃত্তি হইল না!

সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হইয়াছিল; ঠাকুর সাহেবের অনুরোধে আমি তাঁহার সহিত বিদ্যুতালোক-সমুদ্ভাসিত সুসজ্জিত উপবেশন-কক্ষে প্রবেশ করিলাম। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে দেখিয়া—বাসায় ফিরিবার জন্ত আমার আগ্রহ হইল; কিন্তু ঠাকুর সাহেবকে একটা কথা জিজ্ঞাসা না-

করিয়া উঠিতে পারিলাম না। তিনি বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া, হাত-মুখ ধুইয়া আমার সম্মুখে আসিয়া বসিলে আমি তাঁহাকে বলিলাম, "যদি বেয়াদপি মনে না করেন ত একটা কথা জিজ্ঞাসা করি।"

ঠাকুর সাহেব বলিলেন, "অসঙ্কোচে জিজ্ঞাসা করিতে পার। তোমার কোন প্রশ্নেরই উত্তর দিতে আমার আপত্তি নাই।"

আমি বলিলাম, "আপনি যখন সিকিমে ছিলেন, সেই সময় সেই অঞ্চলের কোন লোকের প্রতি কি এরূপ কোন ব্যবহার করিয়াছিলেন—যে জন্ত সে আপনাকে শত্রু মনে করিত ?"

ঠাকুর সাহেব দুই এক মিনিট চিন্তা করিয়া বলিলেন, "কৈ না, তাহা ত স্মরণ হয় না। তবে হাঁ, এক দিন একটা লেপ্চা চাকরকে আগাগোড়া বেতাইয়া দিয়াছিলাম বটে! সিকিম-রাজ তাঁহার পোষা বাঘটা আমাকে উপহার দিলে, জানিতে পারিলাম—জংলু নামক একটা লেপ্চার উপর বাঘটার রক্ষণাবেক্ষণের ভার ছিল। এই জন্ত আমি তাহাকেই কাযে বাহাল করিলাম। তখন কি জানি, সে বেটা পাকা চোর? এক দিন সকালে আমার 'সার্টটা' খুলিয়া রাখিয়া 'গোসল' করিতে গিয়াছি; খানিক পরে ঘরে ফিরিয়া দেখি—আমার 'সার্টে' হীরার বোতাম সেটট নাই! সন্ধান লইয়া জানিতে পারিলাম—সে সময় কেবল জংলুই সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়াছিল। শেষে বেতের চোটে সে বোতাম বাহির করিয়া দিলে আমি তাহাকে তাড়াইয়া দিলাম।—এ কথা জিজ্ঞাসা করিবার কারণ কি?"

আমি বলিলাম, "লেপ্চা, গুর্খা প্রভৃতি অসভ্য পার্ব্বত্যজাতির প্রতিহিংসাবৃত্তি অত্যন্ত প্রবল। তাহাদের পীড়ন করিলে তাহারা তাহা শীঘ্র বিস্মৃত হয় না। বেত খাইয়া সে কি আপনাকে ভয় দেখাইয়াছিল ?"

ঠাকুর সাহেব বলিলেন, "তাহাকে তাড়াইয়া দেওয়ার পর আর তাহাকে দেখিতে পাই নাই। বাঘের অদল-বদল ব্যাপারের সহিত তাহার সংস্রব আছে—সন্দেহ করিতেছ না কি? না, এ একেবারেই অসম্ভব!—আমার গুণধর ভাইপোই পশুশালার কোন রক্ষীর সহিত গোপনে ষড়যন্ত্র করিয়া এই বিভ্রাট ঘটাইয়াছে, এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। তুমি গোপনে একটু সন্ধান লইলেই বোধ হয় জানিতে পারিবে—আমার এই অনুমান মিথ্যা নহে।"

আমি বলিলাম, "হাঁ, আমি গোপনে সন্ধান লইব এবং আশা করি, আপনার ভ্রান্ত ধারণা দূর করিতে পারিব।—কা'ল সন্ধ্যার পর আপনি এখানে থাকিবেন কি?"

ঠাকুর সাহেব বলিলেন, "নিশ্চয়ই থাকিব। কেন?"

আমি বলিলাম, "কা'ল আপনার সঙ্গে দেখা করিতে আসিব এবং যদি প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে আপনাকে আমার সঙ্গে বটুলিওয়ালার পশুশালায় যাইতে হইবে। আশা করি, আমার অনুরোধে আপনি এই কষ্টটুকু স্বীকার করিবেন।"

ঠাকুর সাহেব বলিলেন, "হাঁ, নিশ্চয়ই করিব; তুমি আমার জীবন রক্ষা করিয়াছ—এ কথা কি ভুলিতে পারি?"

অনন্তর তিনি সেই রাত্রিতে আমাকে তাঁহার গৃহে ভোজন করিবার জন্ত অনুরোধ করিলেন, কিন্তু আমি তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিলাম না। তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া বাসায় চলিলাম, তখন রাত্রি প্রায় ৯টা।

ঠাকুর সাহেবের কুঠী হইতে বাহির হইয়া পথের ধারে ট্রামের জন্ত দাঁড়াইয়া আছি; একটি সুবেশধারী রূপবান্ যুবক ধীরে ধীরে আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। অদূরবর্ত্তী আলোকস্তম্ভশীর্ষস্থ আলোকে চিনিতে পারিলাম, তিনি ঠাকুর সাহেবের ভ্রাতুষ্পুত্র কুমার উদয়প্রতাপ!

কুমার সাহেব বলিলেন, "ঠক্করজী, আমাকে বোধ হয় চিনিতে পারিয়াছেন। আপনার সঙ্গে আমার দুই একটি কথা আছে, তাহা বলিবার জন্তই এতক্ষণ আপনার প্রতীক্ষা করিতেছিলাম।"

আমি বলিলাম, "আপনাকে আর চিনিতে পারিব না?—আমি আপনার কথাই ভাবিতেছিলাম; কি বলিবেন, বলুন শুনি।"

কুমার সাহেব বলিলেন, "পথে দাঁড়াইয়া তাহা বলিবার সুবিধা হইবে না, চলুন, ঐ পার্কে গিয়া বসি।"

অল্প দূরে একটি 'পার্ক' ছিল। আমরা উভয়ে পার্কে প্রবেশ করিয়া একখানি বেঞ্চিতে বসিলাম।

কুমার সাহেব বলিলেন, "ঠাকুর সাহেবের ধারণা হইয়াছে, আমিই তাঁহাকে বাঘ দিয়া খাওয়াইবার ষড়যন্ত্র করিয়াছিলাম। কিন্তু সত্যই আমি এ ব্যাপারের কিছুই জানি না। পশুশালার অধ্যক্ষ পোষা বাঘের পরিবর্ত্তে একটা দুর্দ্দান্ত বুনো বাঘ পাঠাইয়াছেন—এই দুর্ঘটনার পূর্ব্বে আমি তাহা জানিতেও পারি নাই। উনি আমাকে বাল্যকাল হইতে পুত্রাধিক স্নেহে যত্নে প্রতিপালন করিতেছেন, দশ লক্ষ টাকা হাতের উপর নগদ পাইলেও উঁহার সামান্য কোন অনিষ্ট করিতে আমার প্রবৃত্তি হইত না। আমি অকৃতজ্ঞ বা বিশ্বাসঘাতক নহি; কিন্তু ঠাকুর সাহেব আমার কথা বিশ্বাস করিলেন না! আমি জুয়ার নেশায় অনেক টাকা নষ্ট করিয়াছি সত্য, উত্তমর্ণরা টাকার জন্য আমাকে পীড়াপীড়ি করিতেছে, টাকা আদায়ের জন্য নানারকম ভয় দেখাইতেছে, এ কথাও মিথ্যা নহে; কিন্তু টাকার জন্য পিতৃতুল্য হিতৈষী পিতৃব্যকে হত্যা করিবার ষড়যন্ত্র করিতে পারি, এ রকম অসম্ভব কথা কি আপনি বিশ্বাস করেন? আমি গত তিন মাসের মধ্যে জুয়ার আড্ডার ছায়াও স্পর্শ করি নাই, যাহারা আমাকে কু-পথে লইয়া যাইবার জন্য ক্রমাগত চেষ্টা করিতেছিল—তাহাদের দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া তাহাদের সংস্রব ত্যাগ করিয়াছি। আমি ঠাকুর সাহেবকে আমার মনের কথা খুলিয়া বলিয়া সমুদয় ঋণ পরিশোধের জন্য তাঁহারই শরণাপন্ন হইব মনে করিতেছিলাম· আজ রাত্রেই তাঁহাকে সকল কথা বলিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলাম; কিন্তু তিনি পাঁচটার ট্রেণে নয়াগড় হইতে বোম্বে ফিরিয়া আসিবামাত্র এই দুর্ঘটনা! আমি নিরপরাধ—অথচ আমাকে অপরাধী মনে করিয়া বাড়ী হইতে বাহির করিয়া দিলেন; জীবনে আর আমার মুখ দেখিবেন না বলিলেন!"

আমি বলিলাম, "এ জন্য আমার মনেও বড় কষ্ট হইয়াছে; কারণ, আমিও বিশ্বাস করি—আপনি নরপরাধ।"

কুমার সাহেব বলিলেন, "তাহা হইলে আমি কি আপনার সহায়তা লাভের আশা করিতে পারি না?—আমি যে সত্যই নিরপরাধ—ইহা আপনার চেষ্টায় হয় ত সপ্রমাণ হইতে পারে; বিশেষতঃ, এ সঙ্কটে আপনিই তাঁহার প্রাণরক্ষা করিয়াছেন।"

আমি বলিলাম, "আমি ঠাকুর সাহেবকে বলিয়াছি—এই রহস্যভেদের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিব। আমার চেষ্টা সফল হইলে আপনার নির্দ্দোষিতা সপ্রমাণ হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু ঠাকুর সাহেবের কুঠীতে ত আপনার স্থান নাই; আপনি এখন কোথায় আশ্রয় লইবেন?"

কুমার সাহেব বলিলেন, "আমি এখন তাজমহল হোটেলে থাকিব। আমার মায়ের হাতেও কিছু টাকা আছে, তিনি ত আমাকে ত্যাগ করিতে পারিবেন না। তাঁহাকে শীঘ্রই সকল কথা লিখিয়া জানাইব। রাত্রি অধিক হইয়াছে, আর আপনার সময় নষ্ট করিব না; নমস্কার!"

কুমার সাহেব আমার নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন।

কুমার উদয়প্রতাপের বয়স কুড়ি একুশ বৎসর, আমারও বয়স তখন পঁচিশের অধিক নহে, আমরা উভয়েই যুবক। এই জন্যই বোধ হয়, তাঁহার এই বিপদে সহানুভূতিতে আমার হৃদয় পূর্ণ হইল।

পরদিন প্রভাতে পেস্তনজীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার পিস্তল ফেরত দিলাম, এবং তাঁহাকে সকল কথাই বলিলাম

পেস্তনজী বলিলেন, "তোমার সতর্কতাতেই ঠাকুর সাহেবের প্রাণরক্ষা হইয়াছে, ইহা বড়ই আনন্দের বিষয়। বাঘটা বহু মূল্যে বিক্রয় হইত, সেটাকে গুলী করিয়া মারিতে হইল, এ জন্য আমার দুঃখ হইতেছে; কিন্তু উপায় কি? এখন মনে হইতেছে, হয় ত কুমার সাহেবের ষড়যন্ত্রেই এই বিভ্রাট হইয়াছে! তুমি কি ডেসপাণ্ডেকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবে?"

আমি বলিলাম, "না; অন্ততঃ এখন তাহা নিষ্প্রয়োজন। আমার বিশ্বাস, কুমার সাহেব নিরপরাধ, কিন্তু আমি আপনার সাহায্য না পাইলে তাঁহার

নির্দ্দোষিতা সপ্রমাণ করিতে পারিব না, রহস্যভেদেরও সম্ভাবনা দেখি না।"

এই সময় বোম্বের সরকারী পশুশালার এক জন কর্ম্মচারী পেস্তনজীর সহিত দেখা করিতে আসিলেন; সেই সুযোগে আমি একাকী পশুশালায় প্রবেশ করিয়া পূর্ব্বোক্ত গুদাম পরীক্ষা করিতে লাগিলাম। যেখানে খাঁচায় বাঘ ছিল, সেই স্থানের মেঝের উপর আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল; কয়েকটি কাল দানা পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া, তাহা কুড়াইয়া হাতে তুলিয়া লইলাম।—সেগুলি ছোলা-ভাজা!

আমি ভাবিলাম, বাঘের খাঁচার কাছে ছোলা-ভাজা পড়িয়া থাকিবার কারণ কি? বাঘে ছোলা-ভাজা খায়—ইহা আমার জানা ছিল না; এই জন্ম আমার সন্দেহ হইল, সেগুলি পশুশালার কোন রক্ষীর অঞ্চল হইতে পড়িয়া গিয়াছে।

একটু দূরে দুইটি বড় বড় খাঁচা দেখিলাম; খালি খাঁচা, একটি আর একটির উপর সংস্থাপিত। এ জন্ম তাহা 'স্কাইলাইট' পর্য্যন্ত উঁচু হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার উপরে দাঁড়াইলে গুদামের কড়ি-বরগা স্পর্শ করিতে পারা যাইত। কিছু দূরে কাঠের সিঁড়ি দেখিতে পাওয়ায় সেই সিঁড়ি টানিয়া আনিয়া তাহার সাহায্যে উপরের খাঁচাটির ছাদে উঠিলাম। সেখানে দেখিলাম, একখানি মলিন বস্ত্র প্রসারিত আছে; তাহাতে কতকগুলি ছোলা-ভাজা, মুড়ি ও একরকম গুঁড়া সঞ্চিত রহিয়াছে!—হাত দিয়া পরীক্ষা করিয়া বুঝিলাম, তাহা ভুট্টা কি বাজরীর ছাতু! ময়লা কাপড়খানির অবস্থা দেখিয়া মনে হইল, তাহার উপর কেহ শুইয়াছিল। নিকটেই একটা বস্তা জড়ান ছিল, তাহা তুলিতেই তাহার ভাঁজের ভিতর একরাশ ছোলা-ভাজা ও মুড়ি দেখিতে পাইলাম। মাথার উপর 'স্কাইলাইটের' কাচ অনেকখানি ফাঁক হইয়া আছে দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম, যে লোক এখানে ছোলা ভাজা ও মুড়ি সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছে, সে অন্যের অলক্ষ্যে এই পথে বাহির হইয়া ছাদে গিয়াছে। 'স্কাইলাইটে'র ভিতর দিয়া ছাদের দিকে চাহিলাম, দেখিলাম, একটি প্রকাণ্ড চন্দনগাছ ছাদের উপর শাখা-বাহু প্রসারিত করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। বুঝিলাম, সেই চন্দনগাছ অবলম্বন করিয়া ছাদ হইতে নীচে নামিয়া যাওয়া অত্যন্ত সহজ।

সিঁড়িখানি যথাস্থানে রাখিয়া পেস্তনজীর আফিসে ফিরিয়া আসিলাম; দেখিলাম, আগন্তুক ভদ্রলোকটি চলিয়া গিয়াছেন, পেস্তনজী তাঁহার ডেস্কের কাছে একাকী বসিয়া আছেন।

পেস্তনজী আমাকে বলিলেন, "তুমি এতক্ষণ কোথায় ছিলে? না বলিয়া চলিয়া গিয়াছ ভাবিয়া বিস্মিত হইয়াছিলাম।"

আমি বলিলাম, "পশুশালার গুদামে একটু ঘুরিয়া আসিলাম।—আপনি সিকিম হইতে আসিবার সময় সে দেশের কোনও 'আদমী'কে সঙ্গে আনিয়াছিলেন কি?"

পেস্তনজী বলিলেন, "হ্যাঁ, সীমান্তের রেল ষ্টেশনে আসিয়া দেখি, একটা লেপ্‌চা ষ্টেশনের প্লাটফর্ম্মে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। সে আমাকে বলিল, সে বুনো বাঘ পোষ মানাইতে পারে—চাকরী করিতেও রাজী আছে। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আমার সঙ্গে বোম্বাই মুলুকে গিয়া চাকরী করিতে রাজী আছে কি না? সে সম্মত হইলে আমি তাহাকে চাকরী দিয়া বাঘের খাঁচার সঙ্গে ট্রেণে তুলিয়া দিলাম। খাঁচার সঙ্গে এক জন অভিজ্ঞ লোক দেওয়াই সঙ্গত মনে হইয়াছিল, কিন্তু আমার যে দুই জন চাকর সঙ্গে ছিল, তাহারা বাঘের গাড়ীতে যাইতে আপত্তি করিতেছিল। এজন্ম লোকটাকে পাইয়া খুসী হইলাম।"

আমি বলিলাম, "ঠাকুর সাহেবকে এ কথা বলিয়াছিলেন?"

পেস্তনজী বলিলেন, "না; তিনি আগের ট্রেণেই কলিকাতায় চলিয়া আসিয়াছিলেন। কথাটা এতই তুচ্ছ যে, পরে সে কথা তাঁহাকে বলিতে স্মরণ ছিল না।"

আমি বলিলাম, "সে এখন কোথায়?"

পেস্তনজী বলিলেন, "এখানে আসিয়া সে আর থাকিতে চাহিল না। বিশেষতঃ আমার এখানে লোকেরও অভাব নাই; তাহাকে কিছু খরচপত্র দিয়া বিদায় করিয়াছি। তিন চার দিন পূর্ব্বে সে চলিয়া গিয়াছে। এ সকল কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ কেন?"

আমি বলিলাম, "এই প্রশ্নের উত্তর পরে পাইবেন। আপাততঃ আপনাকে আমার একটি অনুরোধ রক্ষা করিতে হইবে। আপনি আজ রাত্রি দশটার সময় একবার এখানে গোপনে আসিবেন, ডেস্‌পান্তেকেও হাজির থাকিতে বলিবেন।"

ব্যাপার কি, জানিবার জন্য পেস্তনজী অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। আমি তাঁহাকে বলিলাম—সেই সময় সকল কথাই জানিতে পারিবেন। তিনি আমার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন।

সেই দিন অপরাহ্নে আমি ঠাকুর সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া রাত্রি দশটার সময় বটলিওয়ালার পশুশালায় যাইবার জন্য অনুরোধ করিলাম। তিনিও সম্মত হইলেন। তাঁহাকেও তখন এই নৈশ অভিযানের কারণ বলা সঙ্গত মনে করিলাম না।

৬

রাত্রি দশটার কয়েক মিনিট পূর্ব্বে ঠাকুর সাহেবের 'ব্রুহাম' পশুশালার কিছু দূরে আসিয়া থামিলে, আমি তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া নিঃশব্দে পেস্তনজীর আফিসে প্রবেশ করিলাম। আমাদের সঙ্গে আলো ছিল না; কিন্তু কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি হইলেও তখন চন্দ্রোদয় হইয়াছিল, আমাদের কোন অসুবিধা হইল না। পেস্তনজী পূর্ব্বেই আফিসে আসিয়াছিলেন. আমরা দরজা ঠেলিয়া আফিসে প্রবেশ করিয়া দরজা বন্ধ করিলাম। ডেস্‌পান্তে আফিসের এক কোণে একখানি টুলের উপর বসিয়া ঝিমাইতেছিল। তাহার হাতে একখানা লাঠী।

পেস্তনজী আমাদিগকে বসিতে দিয়া বলিলেন, "ব্যাপার কি ঠক্কর? আমি ত কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না!"

আমি বলিলাম, "আধ ঘণ্টার মধ্যেই সকল কথা জানিতে পারিবেন। পশুশালার গুদামে আলো আছে?"

পেস্তনজী বলিলেন, "হাঁ, সারারাত্রিই সেখানে গ্যাস জ্বলে।"

আফিসের ঘড়ীতে ঠং ঠং করিয়া দশটা বাজিল। "আমি বলিলাম, চলুন, পশুশালার গুদামে যাই।"

আমরা চারি জনে আফিস হইতে বাহির হইলাম। চারিদিক্ নিস্তব্ধ; কেবল মধ্যে মধ্যে দুই একটা জানোয়ার গম্ভীর স্বরে গর্জ্জন করিতেছিল; একটা উল্লুক তাহাদের বিদ্রূপ করিবার জন্যই যেন আর একটা গুদামের খাঁচায় বসিয়া 'হুকু-হুকু' শব্দে চীৎকার করিতেছিল।

আমি ডেস্‌পান্তেকে বলিলাম, "গুদামের ওধারে প্রাচীরের পাশে যে চন্দনগাছটা আছে, তাহার অদূরে পাহারায় থাকিবে; যদি কোন লোককে দৌড়াইয়া পলায়ন করিতে দেখ—তাহাকে গ্রেপ্তার করা চাই।"

ডেস্‌পান্তে গুদামের পাশ দিয়া চলিয়া গেল। আমরা তিন জনে গুদামে প্রবেশ করিলাম। আমি নিঃশব্দে কাঠের সিঁড়িখানা পূর্ব্বোক্ত খাঁচা দুইটির গায়ে লাগাইয়া ঠাকুর সাহেবকে সিঁড়ি দিয়া আগে উঠিতে বলিলাম। তিনি উঠিলে আমি তাঁহার অনুসরণ করিলাম। পেস্তনজী সিঁড়ির নীচে দাঁড়াইয়া, উপরের দিকে হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিলেন; কিন্তু অন্ধকারে কিছুই দেখিতে পাইলেন না।

সিঁড়িখানি বেশ প্রশস্ত, আমরা দুই জনে পাশাপাশি দাঁড়াইয়া খাঁচার ছাদের দিকে চাহিলাম, কিন্তু অন্ধকারে কিছুই দেখিতে পাইলাম না।

আমি পকেট হইতে ম্যাচ-বাক্স ও বাতি বাহির করিয়া মুহূর্ত্তে বাতি জ্বালিলাম। খাঁচার উপর একটা লোক শুইয়া ছিল। আলো দেখিয়া সে লাফাইয়া উঠিল; তাহাকে দেখিয়া ঠাকুর সাহেব সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন, "কি আশ্চর্য্য! এ যে সেই চোর লেপ্‌চাটা—জংলু, সিকিমে যাহার পিঠে বেত ভাঙ্গিয়াছিলাম!"

কিন্তু তাঁহার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই জংলু এক লাফে 'স্কাইলাইটে'র ভিতর দিয়া গুদামের ছাদে উঠিল। আমিও সেই পথে তাহার অনুসরণ করিলাম; কিন্তু তাহাকে ধরিতে পারিলাম না। সে ছাদের উপর হইতে তখন চন্দনগাছে আশ্রয় লইয়াছিল; চক্ষুর নিমেষে সে চন্দনগাছের গুঁড়ি বাহিয়া বানরের মত নামিয়া গেল।

আমি চীৎকার করিয়া বলিলাম, "ডেস্‌পান্তে! আসামী ভাগে! উহাকে গ্রেপ্তার কর।"

আর গ্রেপ্তার কর! জংলু এক লাফে মাটীতে পড়িয়াই দৌড়াইতে আরম্ভ করিল। ডেস্‌পান্তে লাঠী লইয়া দ্রুতবেগে তাহার অনুসরণ করিল।

পশুশালার চতুর্দ্দিকে উচ্চ প্রাচীর; তাহা উল্লঙ্ঘন করিয়া পলায়ন করা অসম্ভব। আমরা তাড়াতাড়ি গুদাম হইতে বাহির হইয়া ফটক বন্ধ করিলাম; তাহার পর জংলুকে ধরিতে চলিলাম।

পশুশালার আঙ্গিনার এক প্রান্তে একটি সুদীর্ঘ দীঘি ছিল। জংলু তাড়া খাইয়া সেই দীঘির দিকে দৌড়াইতে লাগিল: জ্যোৎস্নালোকে দেখিলাম—সে দীঘির উচ্চ পাড়ে দাঁড়াইয়া হাঁপাইতেছে!

আমরা বিভিন্ন দিক্ হইতে তাহাকে ধরিতে চলিলাম; কোন দিক্ দিয়া পলায়নের উপায় নাই দেখিয়া সে উচ্চ পাড়ের উপর হইতে দীঘির জলে লাফাইয়া পড়িল।

দীঘিতে গভীর জল। জংলু প্রাণভয়ে দীঘির জলে লাফাইয়া পড়িল বটে, কিন্তু সে সাঁতার জানিত না। জলে ডুবিয়া, দুই এক ঢোক জল খাইয়া, সে হাত-পা ছুড়িয়া জলের উপর মাথাটা তুলিল, তাহার পর বিকট আর্ত্তনাদ করিয়া ডুবিয়া গেল, আর উঠিল না!

উজ্জ্বল চন্দ্রালোক দীঘির জলে প্রতিবিম্বিত হইতেছিল। পেস্তনজী চীৎকার করিয়া বলিলেন, "ডেস্পান্তে! জলে নামিয়া পড়, উহাকে টানিয়া তোলা চাই।"

ডেস্পান্তে বলিল, "এ রকম আদেশ করিবেন না, হুজুর! আমি জলে ডুব দিয়া উহাকে তুলিবার চেষ্টা করিলে আমাকে জড়াইয়া ধরিবে, আমিও তলাইয়া যাইব। উহাকে উদ্ধার করা আমার অসাধ্য—মরিতে পারিব না।"

সলিল-সমাধি হইতে সেই রাত্রিতে জংলুকে তীরে তুলিবার কোন ব্যবস্থা হইল না। পরদিন প্রভাতে দেখা গেল—তাহার মৃতদেহ ফুলিয়া উঠিয়া দীঘির জলে ভাসিতেছে!

* * * * *

ডেস্পান্তে বলিল, "ঐ লেপ্চাটাই খাঁচার বাঘ অদল-বদল করিয়াছিল। বাঘটা ঠাকুর সাহেবের কুঠীতে পাঠাইবার পূর্ব্বেই রাত্রিকালে সে পোষা বাঘের খাঁচা হইতে বাঘটা বাহির করিয়াছিল; তাহার পর চাকার সাহায্যে সেই খাঁচা ঠেলিয়া, দুই খাঁচার দরজা মুখোমুখী করিয়া ভিড়াইয়া দিয়াছিল। তাহার পর বুনো বাঘের খাঁচার দরজা উপরে টানিয়া তুলিয়া সেই বাঘটাকে খোঁচা মারিয়া পোষা বাঘের খাঁচায় প্রবেশ করাইয়াছিল এবং তাহার দরজা আঁটিয়া দিয়া, পোষা বাঘের খাঁচাটা আনিয়া, বুনো বাঘের খালি খাঁচার মধ্যে পোষা বাঘটাকে পূরিয়া রাখিয়াছিল। দুটি বাঘই দেখিতে ঠিক এক রকম, এই জন্য আমরা এই পরিবর্ত্তন বুঝিতে পারি নাই। বুনোটাকেই কুঠীতে পাঠাইয়াছিলাম।"

ঠাকুর সাহেব বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র সম্পূর্ণ নিরপরাধ। তিনি তাঁহাকে ডাকাইয়া লইয়া গিয়া তাঁহার নিকট ত্রুটি স্বীকার করিলেন এবং তাঁহার সমুদায় ঋণ পরিশোধ করিলেন। অনন্তর আমার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া, আমাকে যথেষ্ট পুরস্কার দান করিতে উদ্যত হইলেন। আমি পুরস্কার গ্রহণে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলে তিনি আমাকে তাঁহার 'প্রাইভেট সেক্রেটারী'র পদ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু দেশীয় রাজ্যসমূহের চাকরী কিরূপ বিপজ্জনক ও সামান্য কারণেই চাকরী যাইবার সম্ভাবনা কিরূপ প্রবল—তাহা আমার অজ্ঞাত নহে; এই জন্য আমি তাঁহাকে বলিলাম, বোম্বে গবর্মেণ্টে তিনি কোন চাকরী জুটাইয়া দিলে আমি তাহা করিতে পারি। ঠাকুর সাহেবের কোন পদস্থ ইংরাজ-বন্ধু আমার গোয়েন্দাগিরির গল্প শুনিয়া, পুলিসের চাকরীই আমার উপযুক্ত, এই বিশ্বাসে আমাকে পুলিস-বিভাগে শিক্ষানবিশীতে নিযুক্ত করিলেন; ছয় মাস পরে আমি পুলিসের ডেপুটী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হইলাম।

* * * * *

ঠকরজীর গল্প শেষ হইল; ঘড়ী খুলিয়া দেখি, রাত্রি ৯টা বাজে! আহারের ডাক পড়িল। ঠকরজীকে বিদায় দিয়া হাত-মুখ ধুইতে চলিলাম।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।
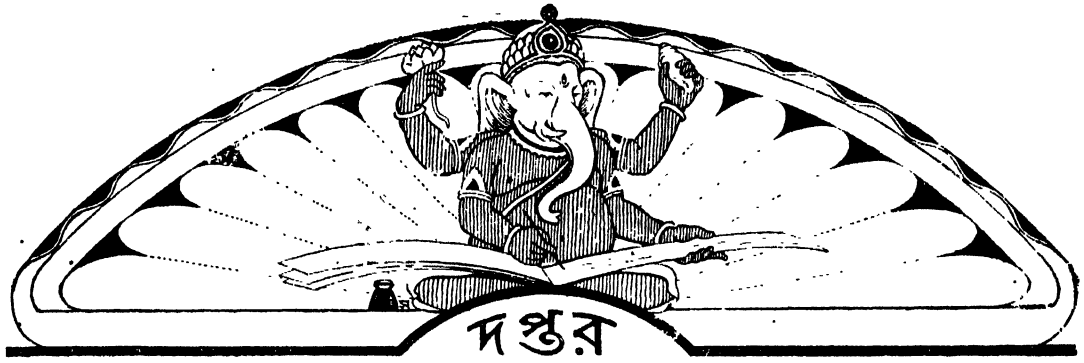
মহাত্মা গন্ধী ও ভারতে জন্ম-নিয়ন্ত্রণ

কিছুদিন পূর্ব্বে মহাত্মা গন্ধী তাঁহার 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' পত্রে একটি সুচিন্তিত প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন। ভারতে বর্ত্তমানে দারিদ্র্য-সমস্যার সমাধানের জন্য কি উপায় অবধারিত হইতে পারে, এ সম্বন্ধে কিছুকাল হইতে বিশেষ বিচার-আলোচনা চলিতেছে। মহাত্মা গন্ধীর প্রবন্ধ সেই আলোচনার ফল। প্রতীচ্য দেশের এক শ্রেণীর মনীষী এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, দারিদ্র্য-সমস্যার সমাধান মানুষেরই আয়ত্তাধীন; যদি মানুষ দরিদ্র-সংসারে জন্মের হার নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে, তাহা হইলে সে দারিদ্র্যের কঠোর নিষ্পেষণ হইতে যথাসম্ভব আত্মরক্ষায় সমর্থ হইতে পারে, কতকগুলি কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করিলে জন্ম-নিয়ন্ত্রণ সম্ভবপর হয়। অর্থাৎ প্রতীচ্যের এই শ্রেণীর বুধমণ্ডলীর—তাঁহাদের মধ্যে চিকিৎসকের সংখ্যাই অধিক—অভিমত এই যে, প্রকৃতির বিরুদ্ধে অস্বাভাবিক উপায় অবলম্বন দ্বারা স্ত্রী-পুরুষের যৌন-সম্মিলন নিয়ন্ত্রিত করিলে জন্মের সংখ্যা হ্রাস করা সম্ভবপর হয় এবং উহার ফলে দারিদ্র্য-সমস্যার সমাধানও সহজসাধ্য হয়।

মহাত্মা গন্ধী ইহার উত্তরে লিখিয়াছিলেন যে, প্রকৃতির বিরুদ্ধবাদী হওয়া মানুষের পক্ষে সমীচীন নহে। মানুষ প্রকৃতির বিরুদ্ধে অপরাধী হইলে তাহাকে সেই ত্রুটির জন্য দণ্ড ভোগ করিতে হয়। স্বেচ্ছায় সে দণ্ড গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা নাই। প্রকৃতির বিরুদ্ধ গমন না করিয়াও জন্ম-নিয়ন্ত্রণ করা যায়। জন্ম-নিয়ন্ত্রণের জন্য অস্বাভাবিক বা কৃত্রিম উপায় অবলম্বনের কোনও প্রয়োজন নাই। মানুষ অভ্যাস ও সংযমের দ্বারা স্ত্রী-পুরুষের যৌন-সম্মিলন ও জন্ম নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে। প্রাচীন ভারতের আর্য্য ঋষিরা এই সংযম অবলম্বন করিয়া অসাধ্য সাধন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা যুগ-মানবরূপে যে সংযমের ধারা এ দেশে বিধিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, অদ্যাপি তাহার প্রভাব এ দেশ হইতে একবারে বিলুপ্ত হয় নাই। আমাদের ভারতের সেই সনাতন ভাবধারা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য চেষ্টা ও অভ্যাসের প্রয়োজন। ইহা যে সহজসাধ্য, তাহা নহে, তথাপি প্রতীচ্যের অসংযত কৃত্রিম উপায় দ্বারা প্রকৃতির অবমাননা করা ও তজ্জন্য দণ্ড-ভোগ করা অপেক্ষা আমাদের ঋষি-প্রদর্শিত সংযমের পথ অবলম্বন করা আমাদের পক্ষে সর্ব্বথা শ্রেয়ঃ। ইহাতে আমরা ক্রমশঃ ভারতে জন্ম-নিয়ন্ত্রণ করিতে অভ্যস্ত হইব এবং দারিদ্র্য-সমস্যার সমাধানেও সমর্থ হইব।

মহাত্মার প্রবন্ধ ঠিক এই ভাবের না হইলেও ইহাই তাঁহার প্রবন্ধের মূল প্রতিপাদ্য তাঁহার এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবার পর প্রতীচ্যের পণ্ডিত মহলে বিশেষ চাঞ্চল্য পরিলক্ষিত হইয়াছে। খৃষ্টান ধর্ম্মপ্রচারকদিগের মধ্যে অনেকে তাঁহার অভিমত পূর্ণ সমর্থন করিয়া বলিয়াছেন যে, "অসংযত শৃঙ্খলাহীন প্রতীচ্যের পক্ষে এখন মহাত্মা প্রদর্শিত ভারতের এই সনাতন আদর্শ গ্রহণ করা কর্ত্তব্য, নতুবা ধর্ম্মহীন শিক্ষায় শিক্ষিত ও দীক্ষিত প্রতীচ্য অদূর ভবিষ্যতে ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইবে। কিন্তু অপর এক শ্রেণীর ভাবুক—তাঁহাদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক ও চিকিৎসকের সংখ্যাই অধিক—ঠিক ইহার বিপরীত মত পোষণ করেন। তাঁহাদের মধ্যে মার্গারেট স্যাঙ্গারই বিশেষ অগ্রণী। এই বিদুষী মার্কিণ মহিলা "মার্কিণ জন্ম-নিয়ন্ত্রণ সমিতির" (American Birth-control League) প্রেসিডেণ্ট। তিনি নাকি মার্কিণে 'জন্ম-নিয়ন্ত্রণ' সমস্যার আলোচনায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আখ্যা লাভ করিয়াছেন। তাঁহার লিখিত "The Pivot of civilization," "Woman and the New Race." প্রমুখ গ্রন্থ প্রতীচ্য বুধমণ্ডলীর নিকট পরম সমাদর লাভ করিয়াছে। এ হেন বিদুষী প্রতীচ্য মহিলা মহাত্মা গন্ধীর প্রবন্ধের বিরুদ্ধ সমালোচনা করিয়াছেন। তাঁহার সেই বিরুদ্ধ রচনার নাম "মহাত্মা গন্ধী এবং ভারতের জন্ম-নিয়ন্ত্রণ"। উহা তাঁহার বাণীরূপে আমাদের মারফতে ভারতবাসীকে উপহার প্রদান করা হইয়াছে। বিষয় অতীব প্রয়োজনীয়, অথচ এ সম্বন্ধে ভারতের সংবাদপত্র বা সাময়িক পত্র মহলে এ যাবৎ আশানুরূপ আলোচনা হয় নাই। এ জন্য আমরা মার্গারেট স্যাঙ্গারের সেই সুচিন্তিত প্রবন্ধের তাৎপর্য্য পাঠক-বর্গের অবগতির জন্য প্রকাশ করিতেছি:—

"ভারতের মহান্ নেতা মহাত্মা গন্ধী তাঁহার "ইয়ং ইণ্ডিয়া" পত্রে জন্ম নিয়ন্ত্রণে কৃত্রিম উপায় অবলম্বন সম্বন্ধে সম্প্রতি তাঁহার মতামত প্রকাশ করিয়াছেন। মহাত্মা লিখিয়াছেন,—"জন্ম-নিয়ন্ত্রণ করা যে অতীব প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে, সে বিষয়ে মতদ্বৈধ নাই। কিন্তু বহু যুগ হইতে ব্রহ্মচর্য্য জন্ম নিয়ন্ত্রণের একমাত্র উপায় বলিয়া গৃহীত হইয়া আসিতেছে যাঁহারা ব্রহ্মচর্য্য অভ্যাস করেন, তাঁহারা ইহা হইতে যে উপকার লাভ করেন, তাহার তুলনা নাই; কেন না, ব্রহ্মচর্য্য কখনও বিফল হয় না। যদি চিকিৎসকগণ কৃত্রিম উপায়ে জন্ম নিয়ন্ত্রণের উপদেশ না দিয়া ব্রহ্মচর্য্যপালনের জন্য উপদেশ প্রদান করেন, তাহা হইলে মানবের প্রভূত মঙ্গল সাধিত করিতে পারেন। কি উপায়ে ব্রহ্মচর্য্য অভ্যস্ত করা যায়, সে সম্বন্ধে তাঁহারা পথিনির্দ্দেশ করিতে পারেন। স্ত্রী-পুরুষের যৌন-সম্মিলন যে লালসা চরিতার্থ করিবার জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা নহে; সন্তান উৎপাদনের জন্য ইহা শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যথা,—"পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা, পুত্রপিণ্ড প্রয়োজনম" যে যৌন-সম্মিলনের উদ্দেশ্য সন্তান উৎপাদন নহে, সে যৌন-সম্মিলন পাপ।" ইহা হইতেই দেখা যাইতেছে যে, মহাত্মা গন্ধীর মতে কঠোর ব্রহ্মচর্য্যই জন্ম নিয়ন্ত্রণের একমাত্র মহৎ ও সহজ উপায়। ভারতের আধ্যাত্মিক জগতের নেতা মহাত্মা গন্ধী যখন এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তখন উহা কাহারও পক্ষে উপেক্ষণীয় নহে। তাঁহার অভিমত সম্পর্কে তুমুল আলোচনা চলিয়াছে। ভারতেই অনেকে তাঁহার অভিমতের তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন। তন্মধ্যে

অধ্যাপক আর, ডি, কার্ভের তিনখানি পত্র—যাহা 'ইণ্ডিয়ান সোসাল রিফরমার' পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল—বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অধ্যাপক কার্ভে বলেন,—"সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া এই ব্রহ্মচর্য্য নীতি প্রচারিত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু মহাত্মা গন্ধীর কল্পিত মানস-স্বর্গের বাহিরে যাহারা অবস্থান করে, অর্থাৎ সাধারণ নরনারী ব্রহ্মচর্য্য অভ্যাস ও পালন করা অসম্ভব বলিয়া বিবেচনা করে। অথচ জগতে এই নরনারীই অত্যন্ত অধিক।" 'ওয়েল ফেয়ার' নামক মাসিক পত্রেও মহাত্মা গন্ধীর অভিমতের প্রতিবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। এই পত্র লিখিয়াছেন, "জ্ঞান মানুষকে পশুতে পরিণত করিবেই, এমন কোনও কথা নাই। আমরা জানি, ডাক্তারমাত্রেই ইচ্ছা করিলে বিষ প্রদান করিয়া নরহত্যা করিতে পারেন, রাসায়নিকমাত্রেই নরঘাতক হইতে পারেন এবং সন্ন্যাসিমাত্রেই বদমায়েস হইতে পারেন। কিন্তু মানুষ স্বীয় ইচ্ছা প্রবৃত্তিকে সংযত করিতে পারে, সে জন্য অতি অল্প লোকই ইচ্ছাপূর্ব্বক অপরাধী বা পাপী হয়। বিবাহিত-জীবনের আদর্শ এক নহে, ভিন্ন দেশে ভিন্ন জাতির মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন আদর্শ পরিলক্ষিত হয়। যদি সকল মানুষকেই ন্যায্য পথে চলিতে ও চিন্তা করিতে শিক্ষিত করিতে পারা সম্ভবপর হইত, তাহা হইলে কাহারও পক্ষে পশু-জীবন অতিবাহিত করিবার আশঙ্কা থাকিত না; যেহেতু তাহারা সন্তান ব্যতিরেকে এইভাবে জীবনযাপন করিতে পারিত। মহাত্মা গন্ধী যে আশঙ্কায় চিন্তিত হইয়াছেন, তাহাতে মনে হয়, তিনি মানব-প্রকৃতিতে আস্থাবান্ নহেন।"

মহাত্মা গন্ধীর স্বদেশবাসীর এইরূপ মনের ভাব দেখিয়া মনে হয়, তাঁহার দেশবাসীর জন্ম-নিয়ন্ত্রণের ধারণার সজীবতা আছে। মহাত্মা গন্ধী কৃত্রিম উপায়ে জন্ম-নিয়ন্ত্রণের প্রতিবাদ করিয়াছেন দেখিয়া আমি আনন্দিত। কিন্তু যদি তিনি আমার জিজ্ঞাসাকে ধৃষ্টতা বলিয়া মনে না করেন, তাহা হইলে আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি, তিনি যে ভাবে স্বেচ্ছাকৃত কঠোর ব্রহ্মচর্য্যের উপদেশ দিয়াছেন, উহা হইতে মানব-প্রকৃতির বিরোধী কৃত্রিম উপায় আর কিছু আছে কি? ব্রহ্মচর্য্যের ফলে মানুষ মানবজীবনের সৌন্দর্য্য ও স্বার্থকতা বুঝিতে পারে বলিয়া মনে হয় না; বরং ভোগ হইতে বিরতির উপদেষ্টারা জীবনের গভীর উদ্দেশ্য বুঝিতে পারেন না বলিয়াই মনে হয়। তাঁহারা মানুষকে অসীম শারীরিক যন্ত্রণা ভোগ করিতে অভ্যস্ত করিয়া থাকেন। ফলে নিজের স্বাভাবিক প্রবল ভোগের বাসনা সংযত করিতে গিয়া মানুষ মনুষ্যজীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য হইতে বহুদূরে সরিয়া যায়।

ভারতের শ্রেষ্ঠ নেতার এইরূপ অবিবেচকের মত অভিমত প্রকাশে আমি দুঃখিত। ইহা দ্বারা তিনি প্রাচীনপন্থী পরিবর্ত্তনবিরোধী নীতি উপদেষ্টার পর্য্যায়ে পাতিত হইয়াছেন। তাঁহার মত দায়িত্বহীন ভাবুকের দল জগতে নানা দুঃখকষ্টের সৃষ্টি করিয়া থাকেন। আমাদের প্রতীচ্যের চিন্তাশীল লোকের দৃষ্টিতে এই শ্রেণীর নেতার প্রভাব সমাজের অনিষ্টকর বলিয়া বিবেচিত হওয়া বিস্ময়ের বিষয় নহে।

আমাদের মতে মানবজীবন পাপও নহে, রোগও নহে, ইহা উপভোগ করিবার জিনিস। মানবজীবনই মানুষের পক্ষে চরম ভূয়োদর্শন লাভ করিবার প্রধান উপকরণ, সুতরাং মানবমাত্রেরই আনন্দসহকারে অকুণ্ঠিত চিত্তে জীবন উপভোগ করা কর্ত্তব্য। মানবজীবনের ভূয়োদর্শনের একটা বড় দিক্ প্রজনন ক্রিয়া—ইহার মূলে গভীর আধ্যাত্মিকতা বিদ্যমান। প্রত্যেক মানবই অপরের কোনও অনিষ্ট না করিয়া অথবা ভূমণ্ডলের মানবজাতির ভবিষ্যৎ ভাগ্য কোনওরূপে ক্ষুণ্ণ না করিয়া প্রজনন ক্রিয়া দ্বারা আত্মোন্নতি ও আত্মতৃপ্তি সাধনের পথে অগ্রসর হইতে পারে। ত্যাগের তিক্ত ফল পথ্য করিয়া মানুষ মুক্তি লাভ করিতে পারে না। আমরা সকলেই জীবনের প্রাচুর্য্য চাহি। সুতরাং মহাত্মা গন্ধীর যশ পৃথিবীব্যাপী হইলেও তাঁহার বর্ত্তমান অভিমত আধ্যাত্মিকতার অথবা ভবিষ্যদর্শনের গভীরতা সপ্রমাণ করে না।"

মার্গারেট স্যাঙ্গার

বিদুষী মার্গারেট স্যাঙ্গার প্রতীচ্যের ভাবধারায় স্নাত—প্লাবিত। ভারতের সনাতন ভাবধারা বা আদর্শ তাঁহার ধারণার বহির্ভূত বলিয়াই মনে হয়। ব্রহ্মচর্য্য কাহাকে বলে এবং তাহার উদ্দেশ্য কি, তাহা তাঁহার পক্ষে জ্ঞাত হওয়া দুষ্কর; কেন না, তাঁহার শিক্ষা-দীক্ষার স্রোতোধারা যে খাতে প্রবাহিত, তাহাতে ব্রহ্মচর্য্য সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞান সঞ্চয় তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর নহে। ভারতে নারীত্বের চরম আদর্শ মাতৃত্ব,—গণেশ-জননী বা গোপাল ক্রোড়ে যশোদা ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এই দুই চিত্রের তুলনা জগতে এক ম্যাডোনা মূর্ত্তিতেই পাওয়া যায়। পুত্রার্থে 'ক্রিয়তে ভার্য্যা' কথার নিগূঢ় তত্ত্ব মার্গারেট স্যাঙ্গারের ধারণার অতীত, এ কথা বলা বোধ হয় ধৃষ্টতা হইবে না। সে ধারণা করিতে না পারিলে মহাত্মা গন্ধীর ব্রহ্মচর্য্যের উপদেশের মর্ম্ম গ্রহণ করা সম্ভব হইবে না। মহাত্মার উপদেশ-বাণীর সমর্থন করিয়া এ দেশে মনীষিগণের মধ্যে আলোচনা হইবে, এইরূপ আশা করি। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী এ সম্বন্ধে যে সুচিন্তিত প্রবন্ধ প্রকটিত করিয়াছেন, নিম্নে তাহা প্রকাশিত হইল। এ সম্বন্ধে ভবিষ্যতে আলোচনা হওয়া কর্ত্তব্য।

আসঙ্গ-লিপ্সা ও জন্মনিয়ন্ত্রণ

(শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী লিখিত)

আধুনিক সভ্য জগতে ভদ্র ও শিক্ষিত পুরুষ ও মহিলাদিগের মধ্যে জননিয়ন্ত্রণের আলোচনা চলিতেছে। আসঙ্গ-লিপ্সা, স্ত্রী-পুরুষের সহবাস

বজায় রাখিয়াও কি করিয়া অনিচ্ছাজাত সন্তানের জন্ম-গতি রোধ করা যায়, আলোচ্য বিষয় ইহাই।

বিষয়টি গুরু। ইচ্ছাশক্তি দ্বারা জন্ম নিয়ন্ত্রিত করিবার ইচ্ছা হওয়া মানুষের পক্ষে অস্বাভাবিক কিছু নয়—বরং মানুষের মনুষ্যত্ব-বোধেরই পরিচায়ক। আসঙ্গ-লিপ্সার সঙ্গে স্ত্রী-পুরুষ ও পুত্র-কন্যার সম্পর্ক কত ঘনিষ্ঠ—জীবনের মূলকে ইহা কত প্রভাবান্বিত করে, বর্ত্তমানের জনন-নিয়ন্ত্রণ আলোচনা ভবিষ্যদ্বংশীয়দিগকে হয় ত তাহা ভাল করিয়া বুঝাইতে পারিবে।

আসঙ্গ-লিপ্সা মানুষের স্বভাবধর্ম্ম, কিন্তু মানুষ ইহাকে সঙ্গোপনে সসঙ্কোচে রাখে। এ সঙ্কোচের এক দিক দিয়া দেখিলে যেমন মূল্য আছে, অপর দিকে ইহাতে মানুষকে জীবনের অনেকখানি সত্য শিক্ষায়ও বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছে মনে হয়।

আসঙ্গ-লিপ্সা জীবনের ধর্ম্ম। স্বামি-স্ত্রীর জীবন, পুত্র-কন্যার জীবন ইহাতেই গড়িয়া উঠে। সংসার, সমাজ, পরিবার ইহা হইতেই গঠিত হয়। মানুষের স্বাস্থ্য, সুখশান্ত জীবনের এই সুতীব্র আকাঙ্ক্ষার উপর প্রচুর পরিমাণে নির্ভর করে।

জীবনের সুখ-দুঃখের সঙ্গে আসঙ্গ-লিপ্সার এত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক—অথচ এ সম্বন্ধে মৌনতা আমাদের শোচনীয়। সঙ্কোচ ইহার প্রকাশ্য আলোচনায় বাধা হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু বর্ত্তমানে মানুষের অনিচ্ছায় সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়া মানবসমাজকে বেশ একটু ব্যতিব্যস্তই করিয়া তুলিয়াছে। তাই ব্যক্তিগত হা-হুতাশ এখন প্রকাশ্যে ধ্বনিত হইতেছে।

অনিচ্ছায় সন্তান আসিয়া দাম্পত্য-জীবনের সুখ নষ্ট করে, সংসারের অভাব বাড়ায়—স্ত্রীর শরীরই ইহাতে নষ্ট হয় বেশী। জীবনের সুখ-শান্তির বাধা এই অনিচ্ছাজাত সন্তান—সুতরাং এরূপ সন্তান যাহাতে না জন্মিতে পারে, কিংবা জন্মিলেই অঙ্কুরে বিনাশ পায়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

সন্তানের জন্মের কারণ না হওয়া বা সন্তান বিনাশ করা, ইহা শুনিয়া এ দেশে অনেকেই চমকিয়া উঠিবেন—জীব দিয়াছেন যিনি, আহার দিবেন তিনি—তবে আর সন্তানের জন্য ভাবনা কি।

আর এক দল কিন্তু সন্তানের জ্বালায় অস্থির হইয়া শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রণায় ভগবানের কাছে বার বার মিনতি জানায়—হে ভগবান্, আমাদের সন্তান দিয়া আর আমাদের জীবনকে অসহ্য করিও না।

জগতে স্বাভাবিক নিয়মে অনেক স্বামি-স্ত্রী সন্তান চাহিয়াও পাইতেছে না—অনেকে আবার ক্রমাগত পাইতে পাইতে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিতেছে। বিবাহিতদের মধ্যেই এই অবস্থা। অবিবাহিত স্ত্রী-পুরুষের আসঙ্গ-লিপ্সার ইচ্ছা বা অনিচ্ছার অনেক সন্তান জীবনের আলো দেখিবার পূর্ব্বেই অন্ধকারে ফিরিয়া যায়—অনেকে জনক-জননীর লজ্জার কারণ হইয়া থাকে। শেষোক্তগুলির জন্য আসঙ্গ-লিপ্সার ব্যভিচার ও অনেক স্থলে সমাজবিধি দায়ী। শেষোক্তটি বাদ দিলেও বিবাহিত স্ত্রী-পুরুষের জীবনেও জনন-নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন আছে।

এই প্রয়োজন বিশেষভাবে উপলব্ধি করিয়াই পাশ্চাত্য দেশে নানা স্থানে জনন-নিয়ন্ত্রণকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর দাঁড় করাইবার চেষ্টা চলিতেছে। এ সম্বন্ধে নানা পত্র ও পুস্তক প্রকাশিত হইতেছে। অনেক ক্ষেত্রে উচ্চশিক্ষিতা মহিলা ডাক্তারই ইহার অগ্রণী—শিক্ষিত পুরুষরাও এ প্রচেষ্টায় উৎসাহী।

এই জনন-নিয়ন্ত্রণ সাহিত্য-চিন্তায়, জ্ঞানে ও জীবনসম্বন্ধীয় নানা কঠোর অথচ অতি সত্য তথ্যে সমৃদ্ধ। মানবজীবনের স্বভাবধর্ম্ম আসঙ্গ-লিপ্সাকে কি ভাবে নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে, স্ত্রী ও পুরুষের মোহময় মিলনে সুখ ও দুঃখের ভাগ কত—ইহা হইতে জীবনে কত দারিদ্র আসে, এই সাহিত্যে তাহা বিশদভাবে বিবৃত হইতেছে।

জনন-নিয়ন্ত্রণের উদ্যোগী যাঁহারা, তাঁহারাও যে জনন একেবারে বন্ধ করিয়া দিয়া মুক্তির নিশ্বাস ফেলিতে চাহেন, তাহা নহে। তাঁহারা বলেন, অনিচ্ছায় জাত সন্তান সংসারের দায়ভারই শুধু বাড়ায়—স্ত্রী-পুরুষের জীবনের শান্তি নষ্ট করে, সুতরাং যেমন করিয়া হৌক, প্রকৃতির প্রতিশোধরূপী এই সন্তানকে জীবনের ভাররূপে আসিতে দেওয়া হইবে না।

অনিচ্ছাজাত সন্তানের আগমন নিরোধ করিবার উপায় কি, বর্ত্তমানে ইহা লইয়া প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে বিশেষ আলোচনা চলিতেছে। মহাত্মা গন্ধী পর্য্যন্ত এ আলোচনায় যোগ দিতে বাধ্য হইয়াছেন। জগতের চিকিৎসকমণ্ডলীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সঙ্ঘ 'বৃটিশ মেডিক্যাল এসোসিয়েসন' পর্য্যন্ত এই জনন-নিয়ন্ত্রণ সমস্যায় কি অভিমত ব্যক্ত করিবেন, তাহা ভাবিয়া ব্যাকুল হইয়াছেন।

মহাত্মা গন্ধী বিশেষ বিবেচনা করিয়া এই অভিমত দিয়াছেন—কোনরূপ কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করিয়া জনন-নিয়ন্ত্রণ করিতে গেলে, তাহাতে মানবসমাজের ঘোর অবনতি ও দুর্দ্দশাই হইবে। কিন্তু সংযম দ্বারা জনন-নিয়ন্ত্রণ করিলে তাহা ফলপ্রদ ও মানবসমাজের উন্নতিকরই হইবে।

মহাত্মা তাঁহার 'ইয়ং ইণ্ডিয়াতে' এই অভিমত ব্যক্ত করিবার পর হইতে পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের সংবাদপত্র সমূহে অনেক সুধী মহিলা ও পুরুষ লেখক ইহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন। অনেকে ইহাও বলিতেছেন, এ বিষয়ে মহাত্মার এইরূপ অভিমতদান একান্ত অনধিকারচর্চ্চা। মহাত্মার আদর্শরাজ্যে এমন সংযমী নারী ও পুরুষ থাকিতে পারে বটে, কিন্তু বাস্তবরাজ্যে ইহা নাই—সুতরাং আসঙ্গ-লিপ্সা অব্যাহত রাখিয়াও কি উপায়ে জনন নিয়ন্ত্রিত করা যায়, তাহাই দেখিতে হইবে।

মহাত্মার উপর তীব্র শ্লেষ ও বিদ্রূপকারিগণ জীবন ও জন্মকে যে ভাবে দেখিয়াছেন, মহাত্মা তাহা দেখিতে পারেন নাই। মহাত্মার দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে!

আসঙ্গ-লিপ্সা চরিতার্থের সঙ্গে মহাত্মা নব-জীবনের সৃষ্টি দেখিয়াছেন,—আসঙ্গ-লিপ্সাকে সংযত ও নিয়ন্ত্রিত করিয়া জীবনকে সুন্দর ও জননকে নিয়ন্ত্রিত করিবার উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

জনন-নিয়ন্ত্রণকামী সংসারের অনেকেই। কিন্তু জনন-নিয়ন্ত্রণে সংযম যে অপরিহার্য্য, তাহা রক্ত-মাংসের সাময়িক উত্তেজনায় বর্ত্তমান যুগে বোধ হয় কেহই স্বীকার করিতে চাহিবে না। কিন্তু জীবনে আসঙ্গ-লিপ্সার সংযমকে অস্বীকার করিয়া তাঁহারা যে প্রণালীতে সন্তান-জননকে এড়াইতে চাহিতেছেন, তাহাও কি ফলপ্রদ ও পরিণাম-সুখকর হইতেছে?

বিভিন্ন প্রকার যন্ত্রাদি প্রয়োগে ও ঔষধাদি ব্যবহারে সন্তান-জনন নিরোধের যে প্রক্রিয়া অবলম্বিত হইতেছে, তাহার সাফল্য অতি অনিশ্চিত। ইহাতে দম্পতির মনের শঙ্কা ও উদ্বেগ হ্রাস আদৌ করিতে পারে না।

অপর এক উপায়—যথেষ্ট সাবধানতাসত্ত্বেও যদি অপ্রার্থিত সন্তান আসে, তবে তাহাকে অঙ্কুরেই বিনাশ করিতে হইবে। ইহার অপর নাম ভ্রূণহত্যা। মাতৃহৃদয়ে সন্তানের অনুভূতি স্পন্দিত হইবার পূর্ব্বে যদি সন্তান-সম্ভাবনা নিরোধ করা যায়, সে এক কথা—কিন্তু মা একবার নিজ হৃদয়ে সন্তানের সাড়া পাইলে সেই সন্তানকে বিসর্জ্জন দিয়া নিজের ও অর্দ্ধাঙ্গ স্বামীর সুখকামনা কখনও করিতে পারেন কি?

মাতৃত্বের পরিপন্থী হইলেও তর্কস্থলে ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে, গর্ভযাতনা, প্রসব ও সন্তানপালনে শারীরিক ক্লেশ ও স্বাস্থ্যের

জননীর জন্য মাতা না হয় সন্তানের মুখ দেখিবার আগেই পেটে থাকিতে তাহাকে অঙ্কুর অবস্থাতেই বিসর্জ্জন দিলেন,—কিন্তু এই ভাবে জনন-নিরোধের ফল কি কখনও মাতার শরীর ও মনের পক্ষে শুভকর হয়?

এই ভাবে গর্ভনাশের ফলে নারীর কি শোচনীয় অবস্থা হয়, যাঁহারা তাহা দেখিয়াছেন, তাঁহারা কখনও এ ব্যবস্থা অনুমোদন করিবেন না। জগতের কোন যৌনমিলনতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত কিংবা বিচক্ষণ চিকিৎসক এ ব্যবস্থা অনুমোদন করেন নাই।

তাহার পর জন্ম-নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে আজ পর্য্যন্ত যত বিজ্ঞ অভিমত বাহির হইয়াছে, অভিমতদাতারা নিজেরাই তাহার কোনটি সম্বন্ধে নিশ্চিত হইতে পারেন নাই—শেষকালে আসঙ্গলিপ্সার সংযমকেই তাঁহারাও নিশ্চিত উপায় বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

অনিচ্ছার জননে নারীকেই প্রত্যক্ষভাবে ভুগিতে হয় বেশী। কারণ, গর্ভযন্ত্রণা, প্রসবক্লেশ, লালনপালন সবই তাহাকেই করিতে হয়। ক্রমাগত প্রসবে নারীর স্বাস্থ্যও একেবারে ভাঙ্গিয়া যায়। ইহার উপর বহু সন্তান দারিদ্র্য ও অশান্তির কারণ ত আছেই। এ অবস্থা হইতে উদ্ধার পাইবার সহজসাধ্য নির্ভরযোগ্য বৈজ্ঞানিক উপায় যদি কিছু বাহির হয়, তবে মানবসমাজ সাদরে তাহা গ্রহণ করিবে। কিন্তু তাহা কোন দিন সম্ভব হইবে কি?

জীবন-বিজ্ঞান সব চেয়ে বড় বিজ্ঞান—সব বিজ্ঞানের রহস্য এক দিন বুদ্ধি-গর্ব্বী মানব আয়ত্ত করিতে পারে, কিন্তু জীবন কি করিয়া আইসে ও যায়, তাহার রহস্য আবিষ্কার করিতে পারিলে আর মানব—মানব থাকিবে না।

জীবননীতির ব্যভিচার করিয়া, স্ত্রী ও পুরুষের নব-জীবনের সৃষ্টি-শক্তিকে খেলার সামগ্রী মনে করিয়া তাহার অপব্যবহার করিলে নরনারীর কাম্য সুখ কখনও আসিবে কি? ইচ্ছামত জনন-নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হইবে কি?

জনন-নিয়ন্ত্রণের আবশ্যকতা, তাহার সম্বন্ধে নানা উপায়ের বিফলতা ও সাফল্য নির্দ্ধারণের চেষ্টা সম্বন্ধে বলিবার বহু কথা আছে। কিন্তু মহাত্মার প্রতি তীব্র আক্রমণকারীদের বলিয়া রাখা ভাল যে, আলেয়ার পশ্চাতে ছুটিয়া তাঁহারা আজ জীবন ও জনন-রহস্যে সংযমের প্রভাবকে অস্বীকার করিয়া খেলা-বিজ্ঞানের আধিপত্য দিতে যাইতেছেন, তাহা হয় ত মানবসমাজকে আরও গভীরতর নিরাশার মধ্যেই লইয়া যাইবে।

—

রামপ্রসাদ ও প্রসাদী সঙ্গীত

১

প্রায় দুই শত বৎসর পূর্ব্বে যখন ইহলোক ও ইহজীবনপ্রধান পাশ্চাত্য সাধনা বঙ্গদেশে প্রবেশলাভ করিবার সুযোগ অন্বেষণে তৎপর এবং সংহতরশ্মি মুসলমান শাসন-সূর্য্য রাষ্ট্রীয় আকাশের পশ্চিমে হেলিয়া সিরাজুদ্দৌলার সিংহাসনের অন্তরালে আসন্ন সন্ধ্যার প্রতীক্ষায় আছে, যখন বৈষ্ণব-কবিকুলের যুগললীলা-সুন্দর হৃদয় রক্ত-রঞ্জন সুফী কবিসম্প্রদায়ের আকুল প্রেমগীতিরাগে সঞ্জাত হইয়া বাঙ্গালার আকাশ বাতাস আবিষ্ট করিয়া তুলিয়াছে, এবং চৈতন্যদেবের প্রতিভা-উৎসারিত নব-বৈষ্ণব আন্দোলনের প্রবল বন্যা বিকারদুষ্ট তান্ত্রিকতার বিবিধ কদাচার ভাসাইয়া দিয়া চতুর্দ্দিক উর্ব্বর করিতে করিতে আপন মহিমার সাক্ষ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছে,—সেই সময়, অসংখ্য বিদ্বজ্জন-মণ্ডলীর তৎকালীন বাসভূমি, আপাতঃজীর্ণ ও ভগ্ন অট্টালিকাবহুল আধুনিক হালিসহরের অন্তর্গত কুমারহট্ট গ্রামের ভাগীরথী-সৈকত হইতে শক্তি-সাধক রামপ্রসাদ সেনের ভক্তি-নির্ম্মল মানস-মধু সঙ্গীতে সাকার হইয়া বঙ্গদেশের পল্লীতে পল্লীতে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল।

রামপ্রসাদের সঙ্গীত একই কালে পলাশীনাটোর এমন দুইটি বিরুদ্ধ-লক্ষ্য ঐতিহাসিক অভিনেতাকে আকৃষ্ট করিয়াছিল, যাহা বাস্তবিকই বিস্ময়কর। নবদ্বীপের অধিপতি পলাশী-প্রাঙ্গণের প্রচ্ছন্ন ইংরাজ-সখা মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র যে রামপ্রসাদের অত্যন্ত গুণগ্রাহী ছিলেন, তাহা তৎপ্রদত্ত 'কবিরঞ্জন' উপাধি ও এক শত বিঘা নিষ্কর ভূমিদান কার্য্য হইতেই আমরা জানিতে পারি; কিন্তু পলাশী যজ্ঞের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলি নবাব সিরাজুদ্দৌলাও নাকি এক দিন ঘটনাক্রমে তাঁহার স্বরচিত সাধন-সঙ্গীত ও অনাড়ম্বর সহজ সুরের অভিনবত্বে এতই আনন্দিত হইয়াছিলেন যে, তাঁহাকে মুর্শিদাবাদে নিমন্ত্রণ না করিয়া পারেন নাই।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র-প্রদত্ত 'কবিরঞ্জন' উপাধির প্রত্যক্ষ ভিত্তি অবশ্য তাঁহার ফরমায়েসি কাব্য 'বিদ্যাসুন্দর'। রামপ্রসাদের এই 'বিদ্যা-সুন্দরে' কবিত্ব-শক্তি, কলা-কৌশল, হিন্দী ও সংস্কৃত ভাষার লিপি-কুশলতা প্রভৃতির পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে সত্য, তথাপি রামপ্রসাদের কবি আত্মা যে উহা রচনা করিয়া তৃপ্তি পায় নাই, তাহার প্রমাণ ঐ গ্রন্থ সম্বন্ধে কবির নিজেরই উক্তি—"গ্রন্থ যাবে গড়াগড়ি, গানে হব মত্ত।" বঙ্গীয় সাহিত্যরসিক সম্প্রদায়ের নিকট এই কাব্যখানি সমাদৃত না হওয়ার প্রথম কারণ এই যে, ঐ কাব্যের পশ্চাতে কবির মন নাই; আর দ্বিতীয় কারণ এই যে, উহার নিকট অনেকখানি ঋণী হইয়াও (১) বিলাসকলা-নৈপুণ্যে শব্দ-শিল্পে ও ছন্দের ঝঙ্কারে অধিকতর দক্ষতা প্রযুক্ত তাঁহার সমসাময়িক কবি ভারতচন্দ্র তাঁহাকে অতিক্রম করিয়াছিলেন। ভারতচন্দ্রের এলাকায়, লোকরঞ্জনের ক্ষেত্রে নিরাশ হওয়া কবিরঞ্জনের পক্ষে ভালই হইয়াছিল বলিতে হইবে, যেহেতু, এ দিকে করতালি লাভের সৌভাগ্য ঘটিলে আত্মসমাহিত রামপ্রসাদ সম্ভবতঃ পঙ্গুই হইয়া পড়িতেন, এবং যে বিশিষ্টতা তাঁহাকে ক্ষেত্রান্তরে ফুটিয়া উঠিবার অবাধ অবকাশ দিয়াছিল, তাহার চর্চাশৈথিল্যে বঙ্গীয় গীতি-সাহিত্যের অমর রামপ্রসাদকে হয় ত বা আমরা হারাইতাম।

যে সকল সঙ্গীত রচনার জন্য রামপ্রসাদের বিশেষ প্রসিদ্ধি, তাহা ছাড়া "কালী-কীর্ত্তন" নামে অপর একখানি কাব্যও তিনি রচনা করিয়াছিলেন। এখানি গীতিকবিতা ও সঙ্গীতের সমষ্টি। কবিরাজ জয়দেব "প্রলয়পয়োধিজলে ধৃতবানসি বেদম্" বলিয়া হরিস্মরণসরস-চেতা বিলাসকলা-কৌতূহলীদিগের জন্য তাঁহার গোবিন্দগীতি আরম্ভ করিয়াছিলেন, আর কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ "ভব-জলধি-নিমগ্ন-রুগ্ন জনগণ-বিনোদনকরণ-কারণ ভুবনপালিকা কালিকার" গোষ্ঠাদি লীলা বর্ণনা করিয়াছেন। গীতগোবিন্দ রাধাকৃষ্ণের মিলন ও শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলায় পরিসমাপ্ত, আর 'কালীকীর্ত্তন' হরগৌরীর সাক্ষাৎ ও ভগবতীর রাসলীলায় পর্য্যবসিত; তবে উভয় কাব্যের অন্তরে রস-সৃষ্টির পার্থক্য লক্ষ্য করিবার বিষয়। জয়দেবের রাধাকৃষ্ণকে তাঁহার মনের গতি অনুসরণ করিয়া পাঠক নায়ক-নায়িকা হিসাবেই দেখিতে বাধ্য হয়,—তাঁহার আবেগোচ্ছল ছন্দমাধুর্য্যের অতুলনীয় শব্দ-সঙ্গীত-তরঙ্গও এরূপ সংঘটনের গতিরোধ করিতে পারে না; অপর পক্ষে রামপ্রসাদের শিবপার্ব্বতীকে আমরা আপনাপন অজ্ঞাতসারেই কন্যা-জামাতা বা জনক-জননীরূপে না দেখিয়া পারি না। এ কাব্যের পরিকল্পনায় অলৌকিক কিছুই নাই; সর্ব্বজনপরিচিত সাংসারিক স্নেহ ও বাৎসল্য, শ্রদ্ধা ও প্রীতি প্রভৃতিই "উমায়" আরোপিত হইয়া

(১) ঋণের পরিচয়—'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৫৫৫-৫৫৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

তাঁহার বাল্যকাল হইতে যৌবনসীমা পর্য্যন্ত কবি-কল্পনার সূত্রে গাঁথিয়া উঠিয়াছে, এবং গোষ্ঠ হইতে রাসলীলা পর্য্যন্ত ব্রজ-গোপালের দ্বারা যাহা কিছু সম্ভব হইয়াছিল, ব্রহ্মময়ী উমার দ্বারাও তাহাই সম্ভব হইয়াছে—তবে, যে মহাশক্তি 'উমা হৈমবতী'রূপে উপনিষদের ঋষিগণকে দেখা দিয়াছিলেন, এ কাব্যের মাধুর্য্য-প্রতিমাটির সহিতও তাঁহার যোগ রক্ষিত হইয়াছে। এ যেন বৈষ্ণব-বৈশিষ্ট্যটিকে শাক্ত-বিশেষত্বের মধ্যেও শোষণ করিয়া আনা। গীতগোবিন্দে বিবৃত কেশবের দশ অবতার স্মরণ করিয়া রামপ্রসাদ তাঁহার এই ভগবতীকেও বলিয়াছেন ;—

"মৎস্য-কূর্ম্ম-বরাহাদি দশ অবতার,
নানারূপে নানা লীলা সকলি তোমার।
প্রকৃতি পুরুষ তুমি, তুমি সূক্ষ্মস্থূলা,
কে জানে তোমার মূল, তুমি বিশ্বমূলা।
বাচাতীত গুণ তব বাক্যে কত কব,
শক্তিযুক্ত শিব সদা, শক্তিলোপে শব।"

ইনি ইন্দ্রিয়সমূহের অধিষ্ঠাত্রী, নরনারী-নির্ব্বিশেষে সকলেরই সত্তামূলে চিৎ-স্বরূপা, আধার-কমলদল-বিহারিণী কুণ্ডলিনী শক্তি, ব্রহ্মাণ্ড-সংহারকর্ত্তা কালকে গ্রাস করেন বলিয়াই 'কালী' নামে পরিচিতা এবং জীবগণ ব্রহ্মরন্ধ্রে যে জগদ্‌গুরু শঙ্করের ধ্যান করে, সেই মহাযোগী শঙ্করেরও ধ্যেয়।

'শ্রীশ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন', 'সীতাবিলাপ' এবং 'আগমনী ও বিজয়া' নামে তিনটি ক্ষুদ্র কবিতাও রামপ্রসাদের লেখনী-নিঃসৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে কৃষ্ণকীর্ত্তনের কয়েকটি পংক্তি ও উপমা সুন্দর। অপর কবিতাদ্বয়ের মধ্যে এমন কোনও উল্লেখযোগ্য বিশেষত্ব নাই, যাহা অন্যত্র পাওয়া যায় নাই।

রামপ্রসাদের সংক্ষিপ্ত জীবনী তাঁহার গ্রন্থাবলীর অঙ্গেই আঁটা আছে, অতএব আমাদের এই আলোচনার মধ্যে সে সকল কথার পুনরুক্তি-দোষ ঘটাইব না ; তবে তাঁহার "ভক্তেরে ছলিতে, তনয়া-রূপেতে, বাঁধেন আসিয়া ঘরের বেড়া" এই পংক্তিটি এবং 'গান গাহিতে গাহিতে গঙ্গাজলে দেহত্যাগ' সম্বন্ধে যে প্রবাদ প্রচলিত আছে, তৎসম্বন্ধে ইহাই মাত্র বলিতে চাই যে, ঐ দুইটি ব্যাপারেরই সম্ভাব্যতা আমরা স্বীকার করি ও বিশ্বাস করি এই অর্থে যে, তাঁহার তন্ময়তা মনন ও জীবনব্যাপী ভাবনার ফলে, মনশ্চক্ষুতে প্রথমটির দর্শন এবং আবেগের আতিশয্যে দ্বিতীয়টির সংঘটন অনিবার্য্য হইতে পারে। প্রবাদের ধর্ম্মই সত্যকে পল্লবিত করা, অতএব মৃত্যুকালে উপস্থিত ব্যক্তিগণের পক্ষে ব্রহ্মরন্ধ্র-নির্গত 'জ্যোতিঃ দর্শন' বা 'কন্যা জগদম্বার পরিবর্ত্তে সশরীরে জগদম্বিকার বস্তুজগতে অবতরণ' না মানিলেও আলোচ্য প্রবন্ধপাঠ, ভগবৎ-বিশ্বাস অথবা সাধু-চরিত-মাহাত্ম্য কিছুমাত্র ব্যাহত, আহত বা লঘু হইবার যখন আশঙ্কা নাই, তখন উহা যথাস্থানে থাকিতে দিয়া অতঃপর রামপ্রসাদের গীতি-নিকুঞ্জ-অভিমুখেই আমরা অগ্রসর হইব।

২

কিন্তু এখানে একটি গুরুতর সমস্যার প্রাচীর আমাদের পথরোধ করিয়া লম্বমান আছে, আর সে প্রাচীর অতিক্রম করা ষট্‌চক্র-ভেদ করা অপেক্ষাও বুঝি বা দুরূহ ব্যাপার। প্রথম কার্য্যটি ভগবৎকৃপা ও পুরুষকারের যোগে যদিও বা সম্ভব হয়, তথাপি এই সমস্যার দুর্গ-প্রাকার যুক্তিবলে ধূলিসাৎ করা দুঃসাধ্য—কেন না, ষট্‌চক্রের নিয়ন্তা আমাদিগকে সহায়তা করিলেও এই সমস্যাচক্রের রচয়িতারা তাহা করিবেন না। সমস্যাটি এই যে, 'রামপ্রসাদী গান' বলিয়া যে সকল সঙ্গীতের সহিত আমরা পরিচিত, তাহা যদিও বা 'রামপ্রসাদের' হয়, তবে তাহা কোন্ রামপ্রসাদের ?

'বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির' হইতে প্রকাশিত 'রামপ্রসাদ সেনের গ্রন্থাবলী'র তৃতীয় সংস্করণে যে ভূমিকা যুক্ত আছে, তাহাতে প্রসাদ-প্রসঙ্গ-রচয়িতা দয়ালচন্দ্র ঘোষের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া বলা আছে—"পূর্ব্ববঙ্গে রামপ্রসাদ নামে এক ব্রাহ্মণ প্রসাদীসুরে 'দ্বিজ রামপ্রসাদ' ভণিতায় অনেক গীত রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার সেই সকল গীত কবিরঞ্জন রামপ্রসাদের বলিয়া চলিয়া যাইতেছে।" তবে ভূমিকা-লেখক এই বলিয়া ও-কথা উড়াইয়া দিয়াছেন যে, পূর্ব্ববঙ্গের কোনও প্রত্নতত্ত্ববিদ্ লেখক এ যাবৎ সেই 'দ্বিজ রামপ্রসাদের' কোনও পরিচয় দেন নাই এবং "সংস্কারাৎ দ্বিজ উচ্যতে" এই শাস্ত্রমতে বৈদ্য রাম-প্রসাদেরও দ্বিজ শব্দে অভিহিত হইবার অধিকার ছিল। তাহা ছাড়া 'দ্বিজ রামপ্রসাদ' ভণিতার গান ও রচনার ভঙ্গীতে দ্বিতীয় ব্যক্তির রচিত বলিয়া মনে হয় না।

আমাদের পক্ষে অবশ্য সমস্যার নিরাকরণ এত সহজে হইবে না—যে হেতু, আমরা 'দ্বিজ রামপ্রসাদ'কেও সনাক্ত হইতে দেখিয়াছি। অতএব অনিচ্ছাসত্ত্বেও প্রত্নতত্ত্বের বিচারে প্রবৃত্ত হইতে হইবে।

প্রায় ২৫ বৎসর পূর্ব্বে প্রকাশিত 'সাধক-সঙ্গীত' নামক একখানি সঙ্কলন-গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে শ্রীযুত কৈলাসচন্দ্র সিংহ কর্ত্তৃক লিখিত 'অবতরণিকায়' প্রকাশ—

"বঙ্গদেশে যে সকল সঙ্গীত-রচয়িতা রামপ্রসাদ জন্মগ্রহণ করিয়া-ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে ৩ জনের নাম উল্লেখযোগ্য। প্রথম রামপ্রসাদ ব্রহ্মচারী, উদাসীন, প্রকৃত সাধক। তিনি কালী নামের ঝুলি-কাঁথা সার করিয়াছিলেন। দ্বিতীয়—কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন ; ইনি গৃহী, সম্পূর্ণ সিদ্ধ না হইলেও সাধক-শ্রেণীতে স্থান পাইতে পারেন। ইঁহার মধ্যে কিয়ৎপরিমাণে ব্যবসাদারী ছিল, নচেৎ তিনি কৃষ্ণকীর্ত্তন রচনা করিতে পারিতেন না। তৃতীয়—কবিওয়ালা রামপ্রসাদ বসু।"

এই কৈলাস বাবুর বিশ্বাস যে, রামপ্রসাদী গানের মধ্যে যেগুলি সরল, সাদাসিদা ও অনাড়ম্বর এবং যেগুলি 'দ্বিজ' ভণিতাযুক্ত, সেগুলি নিশ্চিত ঐ ব্রহ্মচারীর। তাঁহার আরও বিশ্বাস যে, সাধকত্বে রামপ্রসাদ সেন ঐ ব্রহ্মচারীর কনিষ্ঠ। তবে, তাঁহার এই অভিমতের মধ্যে একটু বিচলিত-চিত্ততার পরিচয় আমরা পাই, যখন ঐ 'ব্যবসাদারী'র প্রমাণস্বরূপ, "নচেৎ তিনি কৃষ্ণকীর্ত্তন" প্রভৃতি উল্লেখের পর বলিতে চাহেন—"সাধক-সঙ্গীতের প্রথম সংস্করণে * আমরা তাঁহার (রামপ্রসাদ সেনের) সুদীর্ঘ জীবন-চরিত ও ধর্ম্মমতের আলোচনা করিয়াছিলাম, কিন্তু দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, এবার তাহা পারিলাম না ; কারণ, রামপ্রসাদ ব্রহ্মচারীর যশের মুকুট রামপ্রসাদ সেনের শিরে সংস্থাপন করিয়া নিতান্ত গর্হিত কার্য্য করিয়াছি বলিয়া আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে এবং এ জন্য আমরা সেই স্বর্গীয় সাধুপুরুষের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। যিনি সংসারকে পদে ঠেলিয়া সমস্ত জীবন কালী সাধনায় অতিবাহিত করিয়াছেন ; কালীতে আহার, কালীতে বিহার, কালীতে মনপ্রাণ সমর্পণ করিয়াছিলেন, সেই রাম-প্রসাদ ব্রহ্মচারীর সহিত কি, যিনি 'ইচ্ছাসুখে ফেলে পাশা কাঁচায়েছ পাকা গুটী' † বলিয়াছেন, সেই রামপ্রসাদ সেনের তুলনা হইতে পারে!" যত দূর দেখা যাইতেছে, তাহাতে সিংহ মহাশয়ের প্রকৃত ক্ষোভের কারণ ঐ 'কৃষ্ণকীর্ত্তন' ; ইনি সম্ভবতঃ নিজেকে 'শাক্ত' বলিয়াই বিশ্বাস করিতেন, সেই জন্যই শক্তি-উপাসক সেন মহাশয় কর্ত্তৃক কৃষ্ণকীর্ত্তন রচিত হওয়ার মূলে 'ব্যবসাদারী' ছাড়া অন্য কোনও

* এই সংস্করণটি দেখিতে পাইবার আমরা সুযোগ পাই নাই।

† এ উক্তি রামপ্রসাদ সেনের নহে, তাঁহাকে উদ্দেশ করিয়া আজু গোঁসাইয়ের। আর যদিই বা রামপ্রসাদের হইত, তাহা হইলেই বা মারাত্মক ত্রুটি কি এমন ঘটিত ?

উদারতর অর্থ দেখিতে পান নাই। আমাদের মনে হয়, যদি তাঁহার কথিত "কালীতে আহার, কালীতে বিহার, কালীতে মনপ্রাণ সমর্পণ" কাহারও জীবনে সত্য হইয়া উঠিয়া থাকে, তাহা হইলে "সংসারকে পদে ঠেলিয়া সমস্ত জীবন কালী-সাধনায় যাপন" করিবার আদৌ আবশ্যকতা থাকে না—এমন কি, তাহা করিতে গেলে, 'কালী'ও ঐ মোহ-বিকৃত-মস্তিষ্ক ব্যক্তিকে পায়ে রাখিতে বেদনা বোধ করেন। সিংহ মহাশয় কথিত "গৃহী রামপ্রসাদ" অন্ততঃ এইরূপ বিশ্বাসই যে পোষণ করিতেন, তাহা তাঁহার একটি সঙ্গীত উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি,—

"ওরে মন বলি, ভজ কালী
ইচ্ছা হয় যেই আচারে।
মুখে গুরুদত্ত মন্ত্র কর, দিবানিশি জপ তারে।
শয়নে—প্রণাম জ্ঞান, নিদ্রায় কর মাকে ধ্যান,
ও রে নগরে ফির, মনে কর—প্রদক্ষিণ শ্যামা মা'রে।
যত শোন কর্ণপুটে, সকলি মায়ের মন্ত্র বটে,
কালী পঞ্চাশৎ বর্ণময়ী, বর্ণে বর্ণে নাম ধরে।
কৌতুকে রামপ্রসাদ রটে, ব্রহ্মময়ী সর্ব্বঘটে,
ও রে, আহার কর, মনে কর—
আহুতি দিই শ্যামা মা'রে।"

এই যে সঙ্গীতটি,—ইহার ভিতর আমরা ঈশোপনিষদের "ঈশা-বাস্যমিদং সর্ব্বম্ যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ" বাদের প্রথম ও শেষ সত্যটি-কেই নবানুভূতিরসসিক্ত অবস্থায় আর একবার পাই এবং বুঝিতে পারি যে, রামপ্রসাদ 'কালী' নামে সেই শক্তিরই উপাসনা করিতেন। যিনি বিরাটতম বলিয়াই 'ব্রহ্ম' পদবাচ্য—যিনি সর্ব্বব্যাপী বলিয়া সংসারেও নিত্য-প্রকাশিতা এবং যাঁহাকে সাধনার মধ্যে সম্পূর্ণ করিয়া পাইবার জন্য কি 'গৃহ' কি 'সংসার' কিছুকেই পায়ে ঠেলিতে হয় না।

তথাপি যে ব্রাহ্মণ সাধক "সংসারকে পদে ঠেলিয়া সমস্ত জীবন কালী-সাধনায় অতিবাহিত করায়," কৈলাস বাবুর তুলনায়, সাধকত্বে সেন মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ, তাঁহার সম্যক্ পরিচয় এখনও আমরা পাই নাই; অতএব সে বিষয়ে কি জানিতে পারা যায়, তাহাও দেখি ;—

কৈলাস বাবুর নির্দ্দেশমতে—"ব্রাহ্মণকুলজাত সাধক-চূড়ামণি রামপ্রসাদ ব্রহ্মচারী ব্রহ্মপুত্র-তীরে জন্মগ্রহণ করেন। ঢাকা জিলার অন্তর্গত চিনীশপুর নামক স্থানে যে কালীবাড়ী আছে, সেই কালীবাড়ীতে তিনি জীবন যাপন করিয়াছেন। তাঁহার জন্মমৃত্যুর অব্দ নির্ণয় করা সুকঠিন। তিনি কবিত্ব প্রকাশের জন্য সঙ্গীত রচনা করিতেন না, মানবসমাজে যশোলাভ করিবার অভিলাষী ছিলেন না—স্বাধীন বনবিহঙ্গের ন্যায় স্বীয় মনোভাব সঙ্গীতে প্রকাশ করিয়া আনন্দসাগরে ভাসমান হইতেন।" এখানে দেখা যায় যে, জন্ম-মৃত্যুর অব্দ নির্ণীত না হইলেও, এবং চাক্ষুষ আলাপ-পরিচয় না থাকিলেও, জীবিত অবস্থায় তাঁহার শরীরের মধ্যে কিসের অভিলাষ বাস করিত না, বা কিসের জন্য কি করা হইত, তাহারও নির্ণয় সম্ভবপর হইয়াছে। 'আনন্দসাগরে ভাসমান' হওয়া আর 'কবিত্ব প্রকাশ' যে পরস্পর বিরোধী, এ ধারণা অবশ্য আমাদের নাই, যে হেতু, আমাদের বিশ্বাস, যাঁহার মনে 'আনন্দ-সাগর' নাই, তাঁহার 'কবিত্ব'ও নাই ; বিশেষতঃ "কবিত্ব" প্রকাশ করিবার জন্যই যদি কেহ কোমর বাঁধিয়া বসেন এবং মনের মধ্যে আনন্দের জোয়ার না আসিলেও কথা গাঁথিতে থাকেন, তাহা হইলে সে সকল কথার অন্তরে 'কবিত্ব' থাই-কি না থাকিতেও পারে। আমরা আনন্দ মাখাইয়া প্রকাশ করি বলিয়াই অত্যন্ত সরল, সহজ ও তুচ্ছ কথাও লোকের মর্ম্মস্পর্শী হয়। এই আনন্দের ব্যাপক অর্থ বেদনাও বটে, উভয়েই সমান্বয়সাপেক্ষ ; যেমন উচ্চাবচভেদে ভাগীরথীর উর্ম্মিলীলা, এই আনন্দ-বেদনাও সেইরূপ।

এ পৃথিবীতে যে সকল উন্নতচেতা মহাজন মানবসমাজের জন্য আনন্দের আয়োজন করিয়াছেন, তাঁহারা আপনাপন নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতা হইতেই তাহার তাগিদ পাইয়াছেন ; তবে যে তাঁহাদের ভাগ্যে যশোলাভ ঘটিয়া গিয়াছে, সে তাঁহাদের যশোলাভই লক্ষ্য ছিল বলিয়া নহে, কিন্তু মানবসমাজ খুসী হইয়া প্রতিদানের দায়িত্ব স্বীকার করিয়াছে বলিয়া। কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ তথাকথিত ব্রহ্মচারীর তুলনায় জনসমাজে অধিকতর প্রথিতযশা বলিয়া তিনিও যে "স্বাধীন বনবিহঙ্গের ন্যায় স্বীয় মনোভাব সঙ্গীতে প্রকাশ করিয়া আনন্দ-সাগরে ভাসমান" হইতেন না, এরূপ অনুমানের অবকাশ নাই। যে অল্পবেতনের মুহুরি স্বয়মাগত মনোভাব ভুলিয়া যাইবার আশঙ্কায়, হিসাবের খাতায়ও উহা লিপিবদ্ধ করিতেন, চাকরী খোয়াইবার কথা ভাবিতেন না—সঙ্গীত রচনায় অন্যমনস্কতায় কাযে-কর্ম্মে অনবধানতা প্রকাশ করিয়া যিনি উর্দ্ধতন কর্ম্মচারিগণের বিরক্তিভাজন হইয়াছিলেন এবং শাস্তি গ্রহণ করাইবার প্রয়াসই যাঁহার পক্ষে "শাপে বর" হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাঁহার আত্মপ্রকাশেও কোনও সঙ্কীর্ণ উদ্দেশ্য আরোপ করা চলে না।

তবে "দ্বিজ রামপ্রসাদ"ও যে এক জন ছিলেন এবং চিনীশপুরের কালীবাড়ীতেই ছিলেন, তাহা অন্যত্রও আমরা পাইয়াছি। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায় মহাশয়ের 'ঢাকার ইতিহাস' গ্রন্থের ৪০৫ পৃষ্ঠায় তাঁহার সম্বন্ধে যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহা এই ;—

"কিঞ্চিন্ন্যূনাধিক ১৫০ বৎসর যাবৎ চিনীশপুর গ্রামে দ্বিজ রাম-প্রসাদের সিদ্ধপীঠ বর্ত্তমান আছে। দেবীর নাম চীনেশ্বরী। ইহা দক্ষিণাকালীর পীঠ। কিংবদন্তী, এই রামপ্রসাদ এতদঞ্চলবাসী ছিলেন না। আত্মগোপন করিতেন বলিয়া তাঁহার সুপরিচয় সকলে জানিত না। প্রবাদ এই যে, রামপ্রসাদ নাটোরের স্বনামখ্যাত রাজা রাম-কৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ সহোদর ছিলেন। রামকৃষ্ণকে দত্তক দেওয়ার সময় তদীয় বিপুল ঐশ্বর্য্য সন্দর্শন করিয়া রামপ্রসাদের চিত্তবৈকল্য উপস্থিত হয় ; ভাবেন, উভয়েই সহোদর—তথাপি কনিষ্ঠের ভাগ্যে বিশাল বিভবপ্রাপ্তি, আর তিনি তাহার কৃপাভিখারী কেন ? বিধাতার এই বিচিত্র বিচারের বিষম সমস্যায় পড়ায় তাঁহার সংসারে বীতরাগ ও বৈরাগ্যের সূত্রপাত হয়। সেই বৈরাগ্যের পরিণাম দেবীর অনুগ্রহ-লাভ ও আদেশপ্রাপ্তি, চিনীশপুরের অরণ্যে অবস্থান, টেঙ্গুরীপাড়া-নিবাসী ৺জয়নারাণ চক্রবর্ত্তীর কন্যার পাণিগ্রহণ, পঞ্চমুণ্ডী আসন প্রস্তুত এবং বৈশাখ মাসের মঙ্গলবার অমাবস্যা তিথিতে সাধনার সিদ্ধিলাভ। ইনি 'বীরসাধক' ছিলেন। বীরসাধনার অপর নাম 'চীন-ক্রম'—সেই জন্যই তাঁহার ইষ্টদেবীর নাম 'চীনেশ্বরী' এবং সিদ্ধ-পীঠস্থানের নাম 'চিনীশপুর।' ইঁহার জন্ম ও মৃত্যুর অব্দ নির্ণীত হয় নাই। সম্ভবতঃ, ১২০০ সালের পূর্ব্বে ইনি মানবলীলা সংবরণ করেন।"

ইঁহার গীতরচনাশক্তি যা আলোচ্য প্রসাদগীতিকার সহিত সেগুলির সংমিশ্রণ সম্বন্ধে 'ঢাকার ইতিহাস'কার কিছুই বলেন নাই। তথাপি যদি কৈলাস বাবুর কথামত ধরিয়া লইতে হয় যে, তিনিও প্রসাদী সুরে গান রচনা করিয়াছেন, তবে ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে, কবিরঞ্জন রামপ্রসাদের খ্যাতিই তাঁহাকে এই কার্য্যে আকৃষ্ট করিয়াছিল এবং তিনি সেন মহাশয়ের সাহিত্যানুজই ছিলেন—অন্যথা তাঁহারই প্রসিদ্ধি পূর্ব্বে ঘটিত এবং কবিরঞ্জনের গানে তাঁহার গান না মিশাইয়া তাঁহারই গানে সেন মহাশয়ের গান মিশিত। তাহার পর যে বৈরাগ্যকে কৈলাস বাবু খুব বেশী উচ্চ ধরিয়া 'গৃহী রামপ্রসাদ'কে লঘু করিতে চাহিয়াছেন, আমরা দেখিতেছি, তাহার

মূলে, ছিল 'মাৎসর্য্য।' ফলে, পিতৃ-সংসার ত্যাগ করিলেও, জয়নারায়ণ বাবুর কন্যাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়া তিনি সংসারী হইয়াছিলেন এবং তৎপরে সিদ্ধি সম্বন্ধে যে গতানুগতিক লোক-প্রসিদ্ধি আছে, তাহাই লাভ করিয়াছিলেন। এ অবস্থায় তিনি যত বড়ই 'ব্রহ্মচারী' ও 'উদাসীন সংসারত্যাগী' হউন না কেন, তাঁহার 'বৈরাগ্য' সম্পর্কে কবি রবীন্দ্রনাথের ভাষায় আমাদিগকে বলিতে হয় ;—

"বৈরাগ্য-সাধনে মুক্তি, সে আমার নয় ;
অসংখ্য বন্ধন-মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ।"

এইবার 'দ্বিজ'-ভণিতাযুক্ত ও 'দ্বিজ'-ভণিতাশূন্য কয়েকটি পদাবলী পাশাপাশি লইয়া পরীক্ষা করা আবশ্যক যে, উহাদের মধ্যে এমন কোনও গুরুতর প্রভেদ আছে কি না, যাহাতে বুঝিতে পারা যায়—দ্বিজ রামপ্রসাদ ও রামপ্রসাদ সেন পরস্পর জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠ সাধন-সম্পর্কিত ছিলেন ;—

দ্বিজ।

১। মন রে তোর চরণ ধরি।
কালী ব'লে ডাক রে ও মন,
তি'নি ভবপারের তরী॥
কালী নামটা বড় মিঠা,
বল রে দিবা-শর্ব্বরী।
ওরে, যদি কালী করেন কৃপা,
তবে কি শমনে ডরি॥
দ্বিজ রামপ্রসাদ বলে,
কালী ব'লে যাব তরি'।
তিনি তনয় ব'লে দয়া ক'রে
তরাবেন এ ভববারি॥

সেন।

২। মায়ের চরণতলে স্থান লব।
আমি অসময়ে কোথা যাব॥
ঘরে জায়গা না হয় যদি,
বাইরে রব ক্ষতি কি গো
মায়ের নাম ভরসা ক'রে
উপবাসী প'ড়ে রব॥
প্রসাদ বলে উমা আমার,
বিদায় দিলেও নাই কো যাব॥
আমার দুই বাহু প্রসারিয়ে
চরণতলে প'ড়ে প্রাণ ত্যজিব॥

এই গীতিকা-যুগলের অন্তরে যে মাতৃ-করুণা-ভিক্ষুক নির্ভর-পরায়ণ মন আছে, তাহা একই রূপ ; দুইটি গানের ভাষাই সমান, সহজ, সরল ও অনাড়ম্বর। ইহা হইতে এমন বুঝা যায় না যে প্রথম গানটি কোনও 'বীরসাধকের', যে হেতু, উহাতে 'উদ্ধত মানস' যাহা না কি বীরচেতনার অন্যতম লক্ষণ, তাহার কিছুই নাই। 'বীরাচারে'র বাহ্য লক্ষণগুলির কথা পাড়িব না ; কেন না, তাহা আমাদের বর্ত্তমান প্রয়োজনের পক্ষে অনাবশ্যক—তবে সেই সকল বাহ্য-অনুষ্ঠান যে মনকে নিতান্তই কঠোর করে, পরন্তু কৃপার ভিখারী করে না, ইহা সহজেই অনুমান করা যায়। 'বীরাচার' যেখানে শুধুই 'মানস-বীরাচার' বা রজোগুণপ্রধান, সেখানেও সে তেজস্বী 'বিবেকানন্দ'ই গড়িয়া তুলে। বিবেকানন্দের তেজোগর্ভবাণী "wake up, ye lions of immortal bliss"এর সহিত আত্মসমর্পিত হৃদয়ের ঐ "তনয় ব'লে দয়া ক'রে তরাবেন, এই ভববারি"র তুলনা করিলেই উভয়ের প্রভেদ স্পষ্ট হইবে।

দ্বিজ।

২। এ সংসারে ডরি কারে,—
রাজা যার মা মহেশ্বরী ;
আনন্দে আনন্দময়ীর খাসতালুকে বসত করি।
নাইকো জরিপ জমাবন্দি,
তালুক হয় না লাটে বন্দী মা,
আমি ভেবে কিছু পাইনে সন্ধি.
শিব হয়েছেন কর্ম্মচারী॥
নাইকো কিছু অন্য লেঠা
দিতে হয় না মাথট-বাটা মা,
জয় দুর্গা নামে জমা আঁটা
ঐটা করি মালগুজারি।
বলে দ্বিজ রামপ্রসাদ, আছে এ মনের সাধ মা,
আমি ভক্তির জোরে কিনতে পারি ব্রহ্মময়ীর জমীদারী॥

সেন।

৩। তিলেক দাঁড়া ওরে শমন
মন ভ'রে মাকে ডাকি রে।
আমার বিপদকালে ব্রহ্মময়ী,
আসেন কি না আসেন দেখি রে॥
লয়ে যাবি সঙ্গে ক'রে তার একটা ভাবনা কি রে
তবে তারা-নামের কবচ-মালা,
বৃথা আমি গলায় রাখি রে॥
মহেশ্বরী আমার রাজা,
আমি খাসতালুকের প্রজা,
আমি কখন নাতান, কখন সাতান,
কখন বাকীর দায়ে না ঠেকি রে॥
প্রসাদ বলে মায়ের লীলা অন্যে কি জানিতে পারে।
যাঁর ত্রিলোচন পেলে না তত্ত্ব, আমি অন্ত পাব কি রে॥

এখানেও ভাবে, ভাষায় বিশেষ কোনও পার্থক্য নাই। উভয়েরই 'রাজা' মহেশ্বরী, উভয়েই, খাসতালুকের' প্রজা, উভয়েই মাতৃভক্তি-নির্ভর-দৃঢ়। এ দুটি গান দু'জনের লেখা হওয়া অসম্ভব নয়, সে ক্ষেত্রে মহেশ্বরীর বিশেষণ কেহই 'রাণী' না দিয়া উভয়েই যে 'রাজা' দিয়াছেন, তাহাতে দেখাদেখি করিয়া লেখার একটা সম্ভাবনা আইসে,—আর এক জনের হইলে ত কথাই নাই, যে হেতু, ব্যাকরণ যাই বলুক, তত্ত্ব-হিসাবে ওরূপ বিশেষণ নির্ভুল—যখন না কি সেন মহাশয় বলিয়াছেন—"প্রকৃতি-পুরুষ তুমি, তুমি সূক্ষ্মস্থূলা।" এই 'খাসতালুকের প্রজা-স্বত্বে'র কথা সেন-'প্রসাদে'র অন্য গানেও আছে, যথা :—

"আমি ক্ষেমার খাসতালুকের প্রজা।
ঐ যে ক্ষেমঙ্করী আমার রাজা॥
চেনে না আমারে শমন,
চিনলে পরে হবে সোজা॥"

এই আনন্দ-উচ্ছল তরল ভাষায় লিখিত গানগুলি ছাড়া অপেক্ষাকৃত গম্ভীর, সংযত ও গাঢ় মানসিকতার পরিচায়ক কয়েকটি গানও 'দ্বিজ' ও 'ঐ ভণিতাশূন্য' নামে প্রসাদ গ্রন্থাবলীতে পাওয়া যায়। তাহাও উদ্ধৃত করিতেছি—

"মা বসন পর,
বসন পর বসন পর মা গো, বসন পর তুমি।
চন্দনে চর্চ্চিত জবা, পদে দিব আমি গো ॥
কালীঘাটে কালী তুমি,
মা গো কৈলাসে ভবানী।
বৃন্দাবনে রাধাপ্যারী গোকুলে গোপিনী গো ॥
পাতালেতে ছিলে মা গো, হয়ে ভদ্রাকালী।
কত দেবতা করেছে পূজা, দিয়ে নরবলি গো ॥
কার বাড়ী গিয়েছিলে, মা গো কে করেছে সেবা,
শিরে দেখি রক্তচন্দন, পদে রক্তজবা গো ॥
ডানি হস্তে বরাভয়, মা গো বামহস্তে অসি,
কাটিয়া অসুরের মুণ্ড করেছ রাশি রাশি গো ॥
অসিতে রুধির-ধারা, মা গো গলে মুণ্ডমালা,
হেঁটমুখে চেয়ে দেখ পদতলে ভোলা গো ॥
মাথায় সোনার মুকুট, মা গো ঠেকেছে গগনে,
মা হয়ে বালকের পাশে, উলঙ্গ কেমনে গো।
আপনি পাগল, পতি পাগল,
মা গো আরও পাগল আছে।
দ্বিজ রামপ্রসাদ হয়েছে পাগল, চরণ পাবার আশে গো ॥"

যদি এইরূপ প্রসাদগুণবিশিষ্ট মসৃণ ভাষায় ও প্রশান্ত-গম্ভীর দ্রষ্টা-মন-মাত্র লইয়া 'দ্বিজ'-ভণিতাযুক্ত সকল গানই রচিত দেখিতাম, তাহা হইলে আমরা নিঃসংশয়ে মানিয়া লইতে পারিতাম যে, 'দ্বিজ' রামপ্রসাদ একটি বিশেষ ব্যক্তি, যিনি রামপ্রসাদ সেন হইতে বিভিন্ন। কিন্তু এইরূপ ভাবা ও রচনারীতি 'দ্বিজ'-ভণিতা-বিযুক্ত পদাবলীতে এবং 'রামপ্রসাদ 'বিদ্যাসুন্দরের' স্থানে স্থানেও দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। পদাবলী হইতে দুইটিমাত্র দৃষ্টান্ত এখানে উদ্ধার করিতেছি :—

* * * * *

১। "সংসার কেবল কাচ, কুহকে নাচায় নাচ,
মায়াবিনী-কোলে আছ প'ড়ে কারাগারে।
অহঙ্কার, দ্বেষ, রাগ, অনুকূলে অনুরাগ,
দেহরাজ্য দিলে ভাগ বল কি বিচারে ॥
যা করেছ চারা কিবা, প্রায় অবসান দিবা,
মণিদ্বীপে ভাব শিবা সদা শিবাগারে।
প্রসাদ বলে দুর্গানাম, সুধাময় মোক্ষধাম,
জপ কর অবিরাম মন-রসনা রে ॥"

* * * * *

২। "পৃথক্ প্রণব, নানা লীলা তব,
কে বুঝে এ কথা বিষম ভারী।
নিজ তনু-আধা, গুণবতী রাধা,
আপনি পুরুষ, আপনি নারী ;—
ছিল বিবসন-কটি, এবে পীত ধটি,
এলো-চুল-চূড়া-বংশী-ধারী ॥
আগেতে কুটিল, নয়ন-অপাঙ্গে,
মোহিত করেছ ত্রিপুরারি।
এবে নিজে কাল, তনু-রেখা ভাল,
ভুলালে নাগরী নয়ন ঠারি ॥"

* * * * *

প্রসাদ হাসিছে, সরসে ভাবিছে
বুঝেছি জননী মনে বিচারি।
মহাকাল কানু, শ্যাম-শ্যামা তনু,
একই সকল বুঝিতে নারি ॥

তাহা ছাড়া ঐ "বসন পর" সঙ্গীতটি 'দ্বিজ'-বিযুক্ত "ও মা, রামপ্রসাদ হয়েছে পাগল" ভণিতাতেও দেখা গিয়াছে।

যত দূর প্রমাণ পাওয়া গেল, তাহাতে চিনীশপুরের বীরসাধক'ই 'দ্বিজ'-পরিচয়ে গান লিখিতেন কি না ; লিখিলেও "বসন পর"র মত গান পূর্ব্ববঙ্গনিবাসীর পক্ষে লেখা সম্ভবপর ছিল কি না ; আর সম্ভবপর হইলেও তিনি এই লব্ধপ্রতিষ্ঠ সেন মহাশয়েরই যে অনুসরণকারী ছিলেন না, তাহার প্রমাণাভাবে কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয়ের রায় আমরা অগ্রাহ্য করিতেই বাধ্য হইতেছি। বাস্তবিকই 'দ্বিজ'-ভণিতা আছে বলিয়া, অথবা অপর কোনও ব্রাহ্মণ-সন্তানের নাম রামপ্রসাদ ছিল বলিয়া, তিনিও শক্তি-সাধনা করিতেন বলিয়া কোনও গান রামপ্রসাদ সেনের রচিত নহে, এরূপ অনুমান সঙ্গত নহে। 'দ্বিজ' শব্দের আভিধানিক অর্থ 'ক্ষত্রিয়' ও 'বৈশ্য'কেও নির্দ্দেশ করে। তাহা ছাড়া অম্বরীষ রাজার প্রশ্নের উত্তরে বশিষ্ঠ যাহা বলিয়াছিলেন, তদনুসারে—

"জাত্যা কুলেন বৃত্তেন স্বাধ্যায়েন শ্রুতেন চ।
এভিযুক্তো হি যস্তিষ্ঠেৎ নিত্যং স দ্বিজ উচ্যতে ॥
ন জাতির্ন কুলং রাজন্ ন স্বাধ্যায়ঃ শ্রুতং ন চ।
কারণানি দ্বিজত্বস্য বৃত্তমেব তু কারণম্ ॥"
—বহ্নিপুরাণ।

'দ্বিজ' শব্দের আর একটি বিশেষ অর্থ—'দ্বিবার-জন্মযুক্ত।' কামলোকে আমরা সকলেই প্রথমে ভূমিষ্ঠ হই,—তন্মধ্যে যাঁহারা আত্মশক্তিবলে বা গুরুবলে ইহজীবনেই অধ্যাত্মলোকে দ্বিতীয় জন্মলাভের অধিকারী হয়েন, তাঁহারাই 'দ্বিজ' পদবাচ্য। খৃষ্টীয় নীতিবাদে যেমন 'জল সংস্কার' বা বিশুদ্ধিকরণ এবং এক জীবনেই পুনর্জ্জন্মে বিশ্বাস যেমন ঐ ধর্ম্মনীতির একটি বিশেষ অঙ্গ, সেইরূপ এই 'দ্বিজত্ব' দানও সনাতন শুদ্ধ ধর্ম্ম-মণ্ডলের একটি বিশেষ প্রক্রিয়া এবং ব্রহ্মবিদ্যাশিক্ষার্থিগণের জন্য উদ্ভাবিত এক প্রকার 'অভিষেক।' সেন মহাশয় যে স্বয়ং সংস্কৃত ধর্ম্মশাস্ত্র ও পুরাণাদির সহিত বিশেষ পরিচিত ছিলেন, তাহার দৃষ্টান্ত তাঁহার রচনাবলীর নানা অংশে ছড়াইয়া আছে। এ অবস্থায় তিনিই যে নিজের ভণিতায় কখনও 'দ্বিজ' কখনও 'কবিরঞ্জন', কখনও 'শ্রীরামপ্রসাদ', কখনও 'দীন প্রসাদ' এবং কখনও বা শুধুই 'প্রসাদ' ব্যবহার করিতে না পারিবেন কেন, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। তথাপি এই পদাবলী যদি উভয় রামপ্রসাদেরই মিশ্র-সাহিত্য হয়, সে ক্ষেত্রেও ইহা নিশ্চয় যে, গানগুলি ভাবে, ভাষায় ও ভঙ্গীতে একই ধাতুর এবং একই জাতির।

[ক্রমশঃ।

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ ঘোষ।

লঘুভার ধাতব নৌকা

শিকারী, ধীবর এবং অন্যান্য সকলের সুবিধার জন্য এক প্রকার লঘুভার ধাতব নৌকা নির্ম্মিত হইয়াছে। এই নৌকা দীর্ঘকালস্থায়ী এবং মুড়িয়া ছোট করা যায়। মোটরের এক পার্শ্বে নৌকাকে ঝুলাইয়া রাখা চলে। এই জাতীয় নৌকা দুই শ্রেণীর। প্রথম শ্রেণীর নৌকা ১৩ ফুট দীর্ঘ, ৪২ ইঞ্চি প্রস্থ এবং ওজন প্রায় ১ মণ ৩০ সের। দ্বিতীয় শ্রেণীর অপেক্ষাকৃত বড় নৌকার দৈর্ঘ্য ১৫ ফুট, প্রস্থ ৪৪ ইঞ্চি এবং ওজন প্রায় ২ মণ। নৌকাগুলি দুই তিনটি ভাগে বিভক্ত এবং ঘন-সন্নিবিষ্টভাবে গ্রথিত। জলে পরিপূর্ণ হইলেও এই নৌকা কখনও নিমগ্ন হইবে না। ইহাতে বায়ুকক্ষের বিশেষ বন্দোবস্ত আছে। বসিবার আসনগুলি এমন ভাবে সংলগ্ন যে, ইচ্ছামত যে কোনও স্থানে সরাইয়া লওয়া যায়। আসবাবপত্র রাখিবার জন্যও নৌকাতে পর্য্যাপ্ত স্থান আছে। এই নৌকাকে অল্পসময়ের মধ্যেই জলে ভাসাইবার উপযোগী অবস্থায় আনয়ন করা চলে। অতিরিক্ত দুই জন আরোহী এই নৌকায় লইবার বন্দোবস্ত আছে। পূর্ণ এক দিনের জন্য যে সকল দ্রব্যের প্রয়োজন, তাহাও এই নৌকায় বহন করিবার মত স্থান আছে।
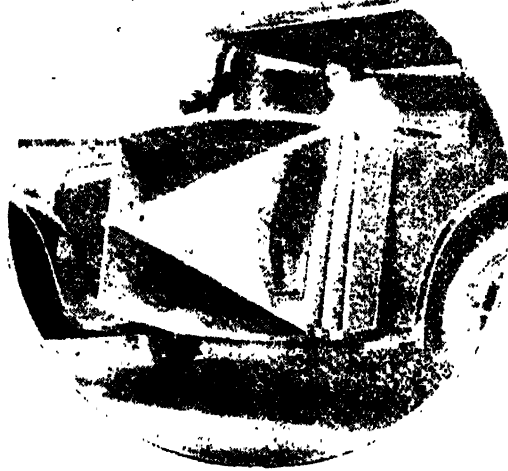
লঘুভার ধাতব নৌকা

ক্রমওয়েলের স্প্রিং চেয়ার

অলিভার ক্রমওয়েল অশ্বারোহী সেনাদলের উৎকর্ষ সম্পাদন করিয়াছিলেন। অনেক যুদ্ধে তিনি অশ্বারোহী সেনাদলের নৈপুণ্যও দেখাইয়াছিলেন। যখন গুরু কার্য্যের ভারে তিনি অশ্বারোহণে ব্যায়াম করিবার প্রকৃষ্ট সুযোগ পাইতেন না, তখন তিনি ঘরের মধ্যে উচ্চ স্প্রিংযুক্ত চেয়ারে বসিয়া ব্যায়াম করিতেন। এই চেয়ারখানি এমনই ভাবে নির্ম্মিত এবং এমন ভাবে ইহাতে স্প্রিংএর সমাবেশ ছিল,

ক্রমওয়েলের স্প্রিং-চেয়ারে প্রধান মন্ত্রী বলডুইন

যে, অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া অশ্বকে ধাবিত করিলে শরীরের যেরূপ গতিভঙ্গী হয়, এই স্প্রিংএর চেয়ারে বসিয়া ঠিক তদনুরূপ অভ্যাস তিনি বজায় রাখিতেন। এই চেয়ারখানি এখনও বিদ্যমান আছে এবং ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী বল্‌ডুইন এখন উহার মালিক।

ছত্রাকার মশারি

যে সকল দেশে মশকের অত্যন্ত উৎপাত, সে দেশে

মশারি-ছাতা ও বিলাসিনী

শ্বেতাঙ্গ বিলাসিনীদিগকে মশক-দংশনের প্রকোপ হইতে রক্ষা করিবার জন্য সংপ্রতি এক প্রকার মশারি-ছাতা নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহার উপরিভাগ ছাতার মত দেখিতে, নীচের দিকে স্থিতিস্থাপক ফিতা সন্নিবিষ্ট। এই ফিতা অঙ্গের চারিদিকে এমন ভাবে চাপিয়া বসে যে, কোথাও সামান্যমাত্রও ফাঁক থাকে না। এই মশারি-ছাতার অবগুণ্ঠনে আবৃত হইয়া বিলাসিনীরা মশক-প্রধান স্থানে অনায়াসে চলাফিরা করিতে পারিবেন।

রেডিওযোগে চিত্র

রেডিও যন্ত্রের সাহায্যে যে কোনও আলোক চিত্রের প্রতিলিপি অন্যত্র প্রেরণ করা যায়। বৈজ্ঞানিকের এই

এই প্রতিলিপি চিত্র ইথরতরঙ্গ অতিক্রম করিয়া ৫ হাজার মাইল দূরবর্ত্তী নিউইয়র্ক নগরে পৌঁছিয়াছে

আবিষ্কার ক্রমে বিস্ময়জনকভাবে সার্থক হইয়া উঠিতেছে। হনলুলু হইতে নিউইয়র্ক ৫ হাজার মাইল ব্যবধান; তার-হীন তাড়িতবার্ত্তা যন্ত্রের সাহায্যে আলোকচিত্রের প্রতি-লিপি এত দূরবর্ত্তী স্থানেও প্রেরিত হইয়াছে।

মোটরবাসে জলভরা টব

মার্কিণ দেশে যে সকল মোটরবাস দূরবর্ত্তী স্থানে যাত্রী বহন করে, তাহাদের তলদেশে জলভরা টব থাকে। যাত্রীরা সেই টবের জলে প্রসাধন করিয়া থাকে। গাড়ীর মেঝেতে এই জলের টব লুক্কায়িত থাকে। উপরে একটা ডালা আছে, উহা সরাইয়া লইলেই টবটি দেখা যায়। গাড়ী যখন দ্রুত ধাবিত হয়, সে সময়েও টব হইতে কোনও রূপে জল বাহির হইতে পারে না, কোনও শব্দও হয় না। টবের তলদেশে একটা ছিপি আছে, উহা তুলিয়া লইলে সব জল নীচে পড়িয়া যায়। যাত্রীদিগের সুবিধার জন্যই মোটরবাসের অধ্যক্ষগণ এইরূপ সুবিধাজনক বন্দোবস্ত করিয়াছেন।

মোটরবাসের তলসংলগ্ন জলের টব

উড়োকল ধরা যন্ত্র

মার্কিণের নিউইয়র্ক সহরে এক যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা দ্বারা ১০ মাইল দূরের উড়োকলের অস্তিত্ব জানা যায়। এই যন্ত্রের শিঙ্গার মত চারিটি মুখ আছে। শিঙ্গা কয়টির নিম্নদিকের মুখ শ্রোতার কর্ণে যোগ করা যায় এবং শিঙ্গাগুলিকে যে দিকে ইচ্ছা ঘুরাইতে পারা যায়। উড়োকল আকাশে উড়িলে তাহার আওয়াজ ১০ মাইল দূর হইতে এই শিঙ্গার মধ্যে আসিয়া পৌছে এবং শ্রোতা ফনোগ্রাফের মত ইহা হইতে উড়োকলের আওয়াজ শুনিতে পায়।
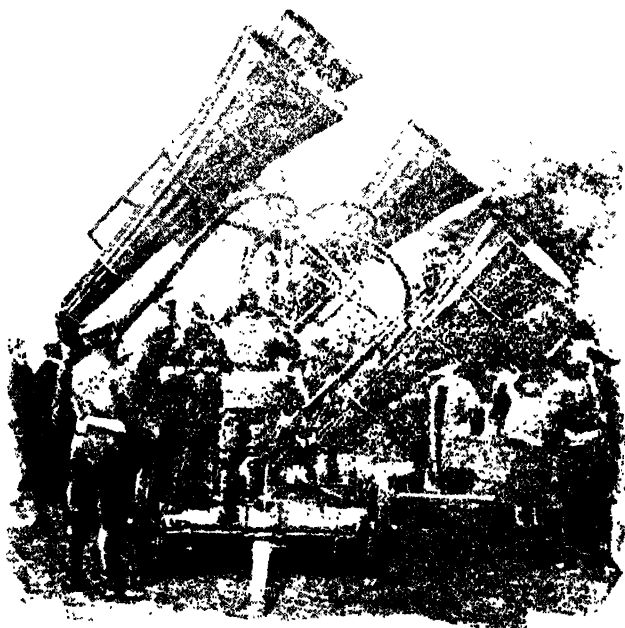
উড়োকল ধরা যন্ত্র

বিমানপোত-ধ্বংসকারী কামান

বিমানপোত ধ্বংস করিবার জন্য মার্কিণ সমরবিভাগ হইতে এক প্রকার নূতন কামান আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই কামান সহজে ব্যবহার করা যায় এবং ইহার লক্ষ্যভেদের শক্তিও অত্যন্ত অধিক। ৩ মাইল উর্দ্ধে যদি কোনও বিমানপোত থাকে, এই কামানের গোলা তাহাকে ধ্বংস

করিতে পারিবে। এই নব-নির্ম্মিত আগ্নেয়াস্ত্র হইতে প্রতি মিনিটে ৫ শত হইতে ৬ শত গোলা নিক্ষিপ্ত হয়। ইহার গোলা যেখান দিয়া যায়, দিন কিংবা রাত্রি, সকল সময়েই একটা ধূম্র-রেখা রাখিয়া যায়। তদ্দ্বারা বুঝা যায়, লক্ষ্য ঠিক হইয়াছে কি না। মার্কিণ সমরবিভাগ বিমানপোত ধ্বংস করিবার জন্য আরও নানারূপ আগ্নেয়াস্ত্র নির্ম্মাণ করিতেছেন, কিন্তু সেই সকল দ্রব্যের নির্ম্মাণ-কৌশল গোপনে রাখিবার জন্য ব্যবস্থাও হইয়াছে।
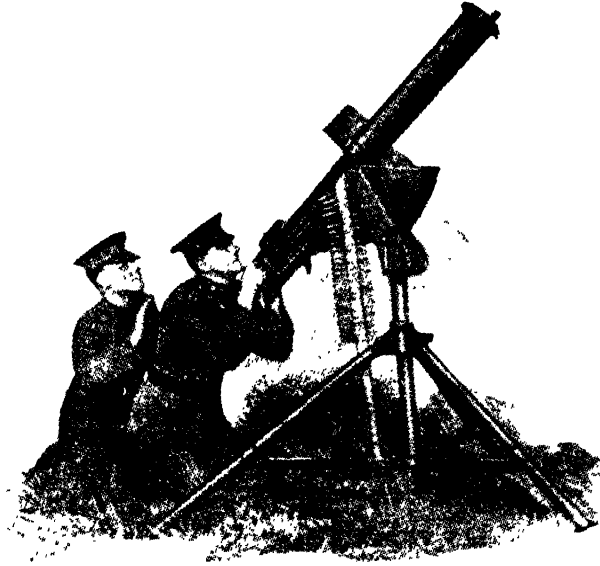
নবনির্ম্মিত বিমানপোত বিধ্বংসী আগ্নেয়াস্ত্র

চক্রযুক্ত সুট্‌কেস্

যে সকল যাত্রী পদব্রজে স্বল্পদূরবর্ত্তী স্থান অতিক্রম করিতে চাহেন, তাঁহাদের জন্য একপ্রকার সুট্‌কেস নির্ম্মিত হইয়াছে। এই সুট্‌কেসের সঙ্গে দুইটি রবারযুক্ত ক্ষুদ্র চক্র ও দীর্ঘ দণ্ড আছে। যখন প্রয়োজন না থাকে, সেই সময় চক্র ও দণ্ড সুট্‌কেসে এমন ভাবে সংলগ্ন থাকে যে, সুট্‌কেসের সৌন্দর্য্য-হানি হয় না। প্রয়োজনকালে সুট্‌কেসটি দণ্ডের সাহায্যে হস্ত দ্বারা ধৃত হইয়া বাহিত হয়। ছোট শিশুকে সুট্‌কেসের উপর বসাইয়া রাখাও চলে।

চক্রযুক্ত সুট্‌কেস

শস্য-কুটীর

সিড্‌নি সহরে কোনও বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ ৩৭ প্রকার শস্যের তৃণ ও শীষের সাহায্যে একটি কুটীর নির্ম্মাণ করিয়াছে। শস্যগুলি দশ বর্ণে বিভক্ত। কোনও প্রসিদ্ধ রাজপথের মধ্যস্থলে এই তৃণ বা শস্যকুটীর স্থাপিত হইয়াছে। কোন্ কোন্ জাতীয় শস্য সেই অঞ্চলে

ছাত্রবৃন্দের স্বহস্ত-উৎপন্ন শস্যজাত তৃণ ও শীর্ষনির্ম্মিত কুটীর

উৎপন্ন হয়, এই কুটীর দেখিলেই তাহা বুঝিতে পারা যাইবে। কারণ, সকল প্রকার শস্যের তৃণ ও শীর্ষ দ্বারা উহা শিল্পনৈপুণ্য সহকারে নির্ম্মিত হইয়াছে। উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ স্বহস্তে এই কুটীর গড়িয়া তুলিয়াছে।

পালিশ করা ধাতব দর্পণ

কোন কোন ধাতুর পাত 'নিকেল'-জাত পালিশের দ্বারা দর্পণের ন্যায় স্বচ্ছ শক্তি ধারণ করিয়া থাকে। সম্প্রতি মার্কিণের বৈজ্ঞানিকগণ এইরূপ ধাতব দর্পণ নির্ম্মাণ করিতেছেন। টেবল, দরজা এবং অন্যান্য অনেক জিনিষে কাচের পরিবর্ত্তে এইরূপ ধাতব দর্পণ ব্যবহৃত হইতেছে। এই দর্পণের একটা সুবিধা এই যে, কাচের ন্যায় ইহা ভঙ্গপ্রবণ নহে। শুনা যাইতেছে, কাচের দর্পণ অপেক্ষা এই ধাতব দর্পণ স্বল্পমূল্য এবং সহজে পরিষ্কৃত হয়।

ধাতব দর্পণে কারিগরের প্রতিবিম্ব

নিউমোনিয়া রোগের নূতন চিকিৎসাপ্রণালী

ইদানীং নিউমোনিয়ারোগীকে বস্ত্রাবাসে রাখিয়া অক্সিজেনযোগে চিকিৎসা করা হইয়া থাকে। হাঁসপাতালে ব্যবহৃত রোগীর শয্যার সঙ্গে এই বস্ত্রাবাস সংলগ্ন থাকে। প্রয়োজনানুসারে শয্যাসহ বস্ত্রাবাস ও রোগীকে স্থানান্তরিত করা যায়। শয্যা-সংলগ্ন অক্সিজেন গ্যাসের আধারের সহিত রবারের নল সন্নিবিষ্ট থাকে। বস্ত্রাবাসের দুই দিকে বাতায়ন—বহির্ভাগ হইতে ধাত্রী ও চিকিৎসক রোগীর অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিতে পারেন। যে কোনও ঘরে এই সকল দ্রব্য—উপকরণ সহজে ব্যবহৃত হইতে পারে।
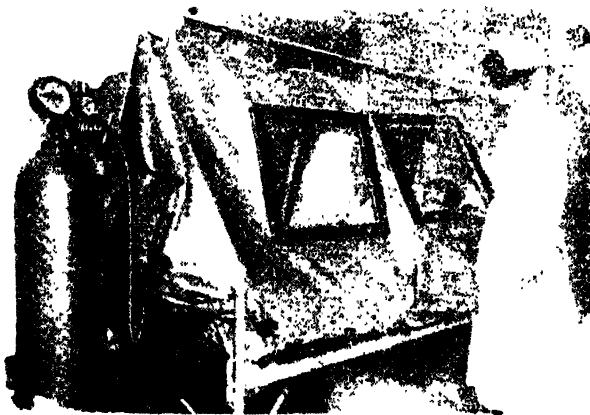
নিউমোনিয়াগ্রস্ত রোগী বস্ত্রাবাসে অক্সিজেন গ্রহণ করিতেছে

ছাতার বাঁটে বিলাসিনীর প্রসাধন-দ্রব্য

ফরাসী বিলাসিনীদিগের জন্য ছত্র-দণ্ডের বাঁটে দর্পণ, পাউডার, পফ ও অন্যান্য প্রসাধনের দ্রব্য রাখিবার ব্যবস্থা আছে। ছত্রদণ্ডের মুণ্ডটা এমনই ভাবে নির্ম্মিত যে, তাহার অভ্যন্তরস্থ কক্ষে

ছত্রদণ্ডের অভ্যন্তর হইতে বিলাসিনী পাউডার লইয়া মাখিতেছেন

উল্লিখিত দ্রব্যগুলি অনায়াসে সন্নিবিষ্ট করা যায়। দর্পণ ব্যবহারের যখন প্রয়োজন হয় না, তখন একটা আবরণের দ্বারা উহা আবৃত করিবার ব্যবস্থাও আছে। ছত্রব্যবহারকালে বিলাসিনীরা ছত্রদণ্ডের মুণ্ড বা বাট ধরিয়া থাকেন, তখন বাহির হইতে ঐ সকল দ্রব্যের অস্তিত্ব আর প্রত্যক্ষ করা যায় না।

বিমানপোতে বায়স্কোপ দেখান হইতেছে

বায়ুপূর্ণ তোষকের নৌকা

জর্ম্মণীর বার্লিন নগরে সম্প্রতি ওয়াটার প্রুফ কাপড়ে নির্ম্মিত বায়ুপূর্ণ তোষকের নৌকা প্রদর্শিত হইয়াছে। নিস্তরঙ্গ হ্রদ ও নদীতে এই নৌকায় চড়িয়া অনায়াসে জলবিহার করা চলে। ধাতুনির্ম্মিত হাল, ছোট ছোট দাঁড় এবং পাইলের বন্দোবস্ত নৌকাতে আছে। নৌকাটি অত্যন্ত লঘুভার; কিন্তু ভারবহনের অনুপযুক্ত নহে। উহা এমনই কৌশলে নির্ম্মিত যে, সহজে জলমগ্ন হইবার সম্ভাবনা নাই। রাত্রিকালে নৌকা তীরে তুলিয়া রাখা চলে এবং প্রয়োজন হইলে তাহার উপর শয়ন করিয়া আরামে রাত্রিযাপন সম্ভবপর। বায়ু বাহির করিয়া লইলে উহা সহজে বহন করিতেও পারা যায়।

বায়ুপূর্ণ তোষকের অভিনব নৌকা
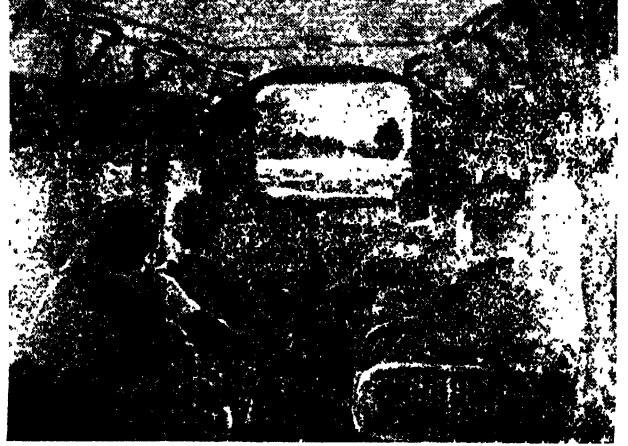
বিমানপোতে বায়স্কোপ

বিলাতের কোনও বিমানপোতের যাত্রীদিগকে আনন্দ দিবার জন্য বিমানপোতের মধ্যেই বায়স্কোপ দেখান হইয়াছিল। পোতের সম্মুখের প্রান্তে পট টাঙ্গাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। যে সকল চিত্রে দাহ্য পদার্থের সংস্পর্শ নাই, এমনই ভাবের ফিল্ম প্রদর্শিত হইয়াছে। এই প্রচেষ্টা নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হওয়ায় কর্ত্তৃপক্ষ স্থির করিয়াছেন, অতঃপর দীর্ঘযাত্রাকালে আরোহীদিগের আনন্দবিধানের জন্য বায়স্কোপের চিত্রাবলী দেখান হইবে।

বৈদ্যুতিক জুতা-পালিশের যন্ত্র
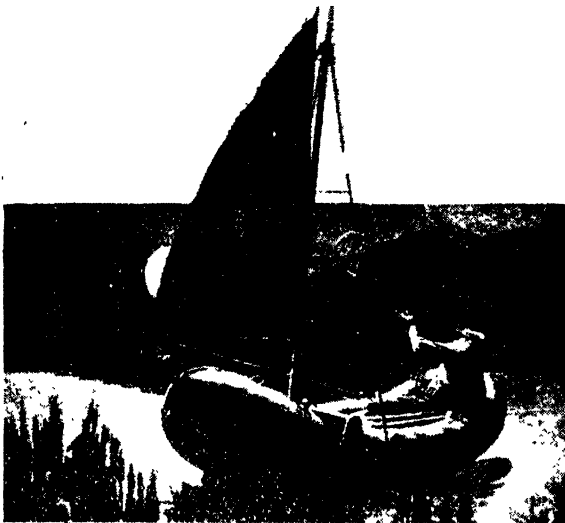
আমেরিকায় রাজপথের পার্শ্বে, হোটেলে অথবা সাধারণ প্রসাধনাগারে বৈদ্যুতিক জুতা পালিশের যন্ত্র রাখিবার ব্যবস্থা আছে। কাহারও জুতা পরিষ্কার ও ঝক্‌ঝকে করিবার প্রয়োজন হইলে এই যন্ত্রের মধ্যে এক খণ্ড নিকেল মুদ্রা ফেলিয়া দিলেই যন্ত্রের মোটর চলিতে আরম্ভ করে এবং জুতা পালিশ হইতে থাকে। যন্ত্রটি এমনই ভাবে নির্ম্মিত যে, জুতাসমেত মাত্র একটি চরণ একবারে আধারে স্থাপিত করিতে হইবে। এক পায় দাঁড়াইলে পাছে টলিয়া পড়িতে হয়, এ জন্য

একটি হাতল আছে, তাহা অবলম্বন করিয়া দাঁড়াইয়া থাকা যায়। অল্পসময়ের মধ্যে যন্ত্রের ভিতর হইতে ব্রুস বাহির হইয়া আপনা হইতে জুতা পরিষ্কার ও পালিশ করিয়া দেয়। সমস্ত দিন ও রাত্রির মধ্যে যখনই প্রয়োজন হউক না কেন, এই বৈদ্যুতিক যন্ত্রের সাহায্যে জুতা পালিশ করা চলে।

জুতা পালিশের বৈদ্যুতিক যন্ত্র

শিশু জুয়াড়ি

শ্রীমান্ অজিতকুমার দে, এই বৎসরে ডার্বি স্বইপের একটি নন ষ্টাটার প্রাইজ পাইয়াছে। ইহার বয়স ৯ মাস মাত্র। ইহার পিতামহ কেনিয়া উপনিবেশে ২৫ বৎসর কাল সরকারী চাকুরী করিয়া গত ৩ বৎসর স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। তাঁহারা এখন অমৃতসরে বাস করিতেছেন।

শ্রীমান্ অজিতকুমার দে

ঘড়ীর ফাঁদ

ফ্রান্সে চাতক পক্ষী শিকারের জন্য অভিনব ব্যবস্থা আছে। ঘড়ীর ন্যায় কলবিশিষ্ট একটি আধারের উপর পাখীর ডানার অনুকরণে দুইটি কাষ্ঠনির্ম্মিত ফাঁদ আছে। এই ডানার অঙ্গে ছোট ও বড় অনেকগুলি করিয়া দর্পণ সংলগ্ন আছে। ডানা দুইটি দ্রুত সঞ্চালিত হয়। সূর্য্যের আলোক দর্পণে প্রতিবিম্বিত হইয়া উজ্জ্বল আলোক বিকীর্ণ করিতে থাকে। ইহাতে চাতকগুলি আকৃষ্ট হইয়া যন্ত্রের কাছে আসিতে থাকে। তখন অন্তরাল হইতে শিকারী বন্দুকের গুলীতে তাহাদিগকে হত্যা করে। ফ্রান্সে এই অবাধ পাখীশিকার বন্ধ করিবার জন্য এই যন্ত্রবিক্রয়প্রথা রহিত করিবার চেষ্টা হইতেছে।

পাখীশিকারের ঘড়ীর ফাঁদ

প্রতারক

১
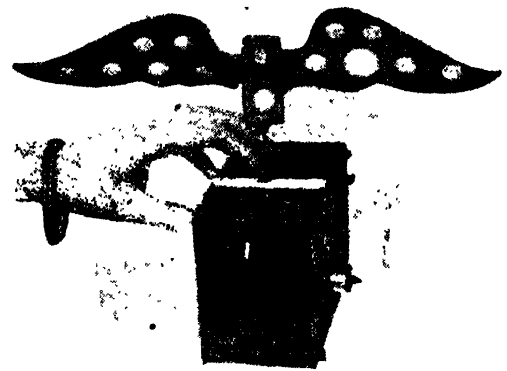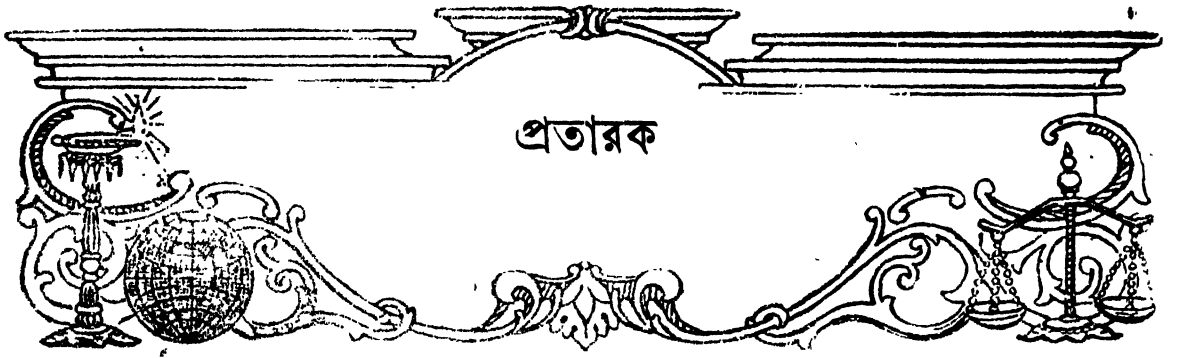
পাহাড়ের ওতরাই নামিতে নামিতে নিমাই বলিল, "যা-ই বল্, তুই একটা প্রকাণ্ড ভণ্ড।"

অগ্রবর্ত্তী যুবক পশ্চাতে না ফিরিয়াই মৃদু হাসিয়া বলিল, "ভণ্ডামিটা কোথা পেলি ?"

নিমাই বলিল, "ভণ্ড না ? গেল বছর যখন তোর গর্ভধারিণীর লোকান্তর হ'ল, তখন তোকে কাছা নিতেও দেখেছি, আবার টিফিনে কাঁটা-চামচে ধরতেও দেখেছি। দেখ্ বিমল, এগুলো ভাল না।"

বিমলেন্দু হো হো হাস্যে পাহাড়ে প্রতিধ্বনি তুলিয়া বলিল, "এই কথা! এতেই ভণ্ড হলুম? দেখ, কলম পিষে কেরাণীগিরি ক'রে গাধার খাটুনি খাটি—এতে দু' পাঁচটা রকমফিরি ক'রে না খেলে শরীর বইবে কেন? রোজই ত বাসার থোড়-বড়ি খাড়া আছেই—আফিসে যদি টিফিনের সময় দুখানা চপ-কাটলেট—"

"থাম, থাম,—তা ব'লে মা মরেছে—কাছা গলায় দিয়ে চপ-কাটলেট ?"

"তাতে কি হয়েছে? জানিস ত আমি তোদের ও সব ভিটকিলিমি বিশ্বেস করিনি। সে-বার পুরী গিয়ে বাসায় ব'সে বলরামের ভোগের সঙ্গে ফাউল রোষ্ট কি তোফাই খাওয়া গেল!"

কথাটা বলিয়া বিমলেন্দু আবার হো হো হাসিয়া উঠিল। কিন্তু এবার তাহার হাসি অঙ্কুরেই মিলাইয়া গেল। কার্ট রোডের সেই বাঁকটা ফিরিতেই হঠাৎ যেন পরীরাজ্য হইতে একটি প্রাণী বায়ুভরে উড়িয়া আসিয়া তাহার বক্ষের উপর নিপতিত হইল—তাহার ভয়ভীত কণ্ঠস্বরে কেবলমাত্র "রক্ষা কর, রক্ষা কর" কথা কয়টি ভাসিয়া আসিল—সেই আকুল আর্ত্তরবে বিমলেন্দুর হাসির রোল মুহূর্ত্তে মিলাইয়া গেল।

তখন গোধূলির আলো আঁধার—দূরে চিরতুষার-কিরীট হিমগিরির শীর্ষদেশ অস্তমিত রবিকরে গলিত সুবর্ণের ন্যায় জ্বলিতেছিল—আর নিকটে এই ভয়ত্রস্তা সুন্দরী য়ুরোপীয় যুবতীর আলুলায়িত কেশদাম যেন তাহারই প্রতিবিম্ব লইয়া কষিত কাঞ্চনের ন্যায় ঝলমল করিতেছিল।

কিন্তু তখন নৈসর্গিক ও অনৈসর্গিকের এই অপূর্ব্ব যোগাযোগ উপভোগ করিবার অবসর ছিল না—বিমলেন্দু দেখিল, অদূরে একটা গোরা সৈনিক সুন্দরীর পশ্চাদ্ধাবন করিয়া ছুটিয়া আসিতেছে। নিমাই তাহাকে দেখিয়াই নিমিষে রুদ্ধশ্বাসে যে পথে আসিয়াছিল, সেই পথেই অন্তর্দ্ধান করিল।

বিমলেন্দু কিন্তু যুবতীকে 'ভয় নাই' এই আশ্বাস প্রদান করিয়া, তাহাকে পশ্চাতে রাখিয়া মাতাল গোরাটার সম্মুখীন হইল। তাহার বলিষ্ঠ দেহ তখন উত্তেজনা হেতু দ্বিগুণ স্ফীত হইয়া উঠিয়াছিল।

গোরাটা ঝড়ের বেগে অগ্রসর হইয়া 'ড্যাম নিগার' বলিয়া যেমন তাহাকে প্রহার করিতে মুষ্টি উত্তোলন করিল, বিমলেন্দু অমনই কৌশলে প্রহার এড়াইয়া একখানি পা বাড়াইয়া দিল। গোরাটা অতিরিক্ত মদ্যপানে স্থিরমস্তিষ্ক ছিল না, পদে বাধা পাইয়া সশব্দে ধরাশায়ী হইল। বিমলেন্দু সেই অবসরে সেই ভয়ভীতা যুবতীর হস্ত ধারণ করিয়া দ্রুতপদে সে স্থান ত্যাগ করিল।

কিন্তু কয়েক পদ অগ্রসর হইবামাত্র বিমলেন্দু দেখিল, ব্যাপারটার যত সহজে নিষ্পত্তি হইয়াছিল, তত সহজে উহার অবসান হইবার সম্ভাবনা নাই। কেন না, তখন সেই গোরাটা গা ঝাড়িয়া উঠিয়া তাহাদের পশ্চাতে

বজ্রমুষ্টি উত্তোলন করিয়া ধাবমান হইয়াছিল। বিমলেন্দু তাহার মুখে-চোখে দারুণ ঘৃণা ও ক্রোধের চিহ্ন দেখিয়া সঙ্গিনীকে দৌড়িয়া পলাইতে অনুরোধ করিয়া স্বয়ং শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করিবার উদ্দেশ্যে প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইল।

বিমলেন্দু মার খাইল, মারিলও। দার্জ্জিলিংএ গ্রীষ্মে ও শরতে চাকুরী করিতে আসিলেও সে কলিকাতাবাসী। কলিকাতাতেই সে এক জন বিখ্যাত খেলোয়াড়ের নিকট মুষ্টি-যুদ্ধ শিখিয়াছিল। সুতরাং সে বিদ্যার পরিচয় দিতে সে কণামাত্র ত্রুটি করিল না। মত্তাবস্থায় গোরা সৈনিকের লক্ষ্যের স্থিরতা ছিল না, এই হেতু অল্পক্ষণের মধ্যেই সে মার খাইয়া কাবু হইয়া পড়িল, বিমলেন্দুর শেষ একটি প্রচণ্ড মুষ্ট্যাঘাতে সে পুনরায় ধরাশায়ী হইল।

তখন বিমলেন্দুর পা ও মাথা টলিতেছিল, সর্ব্বাঙ্গ ঝিমঝিম করিতেছিল। প্রহারের ফলে তাহার কপোলদেশ বিলক্ষণ স্ফীত হইয়া উঠিয়াছিল, ললাটও রুধিরাক্ত হইয়াছিল। সে দীর্ঘশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে টলিয়া যখন পথিপার্শ্বস্থ পাহাড়ের গায়ে হেলিয়া পড়িতেছিল, সেই সময়ে দুইখানি কোমল বাহুলতা তাহাকে স্নেহবন্ধনে বেষ্টন করিয়া ফেলিল। বিমলেন্দু বিস্মিত হইয়া পার্শ্বদেশে দৃষ্টিপাত করিতেই সেই সুন্দরী য়ুরোপীয় মহিলাকে দেখিতে পাইল—সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল,—"এ কি, আপনি যান নাই?"

যুবতী তাহাকে একরূপ বহন করিয়া লইয়া যাইতে যাইতে গম্ভীর স্বরে বলিল, "না। আপনি আসুন, নিকটেই জল আছে।"

নিজের রুমাল দিয়া ক্ষতস্থান বাঁধিয়া দিতে দিতে যুবতী আপনার পরিচয় দিল। বিমল মোটের উপর বুঝিল, এই ইংরাজ যুবতীর নাম মিস্ ইভ রবিনসন, তাঁহার পিতা বহুদিন বেগমপুরের পাদরী ছিলেন, তিনি গত বৎসর মারা গিয়াছেন। ইভ পিতার মৃত্যুর পর হইতে দার্জ্জিলিংএর স্কুল ছাড়িয়া দিয়াছেন বটে, কিন্তু এ বৎসর তাঁহার দার্জ্জিলিংএর বাড়ী ভাড়া না দিয়া নিজেই বাস করিতে আসিয়াছেন। স্কুলে সতীর্থদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ফিরিবার পথে এই বিপদ—মাতাল গোরাটা পথের এক স্থান হইতে তাঁহার অনুসরণ করিয়াছিল।

কুমারী ইভ সকৃতজ্ঞ নয়নে করুণকণ্ঠে বিমলেন্দুকে পুনঃ পুনঃ ধন্যবাদ দিয়া বিদায়কালে বিমলেন্দুর নাম ও লাট-দপ্তরের মেসের ঠিকানা সংগ্রহ করিতে ভুলিল না। বিমল বাঙ্গালার লাট-দপ্তরে অল্প বেতনে চাকুরী করিত।

২

সামান্য স্ফুলিঙ্গ হইতে বৃহৎ অগ্নিকাণ্ড ঘটিয়া থাকে, অতি ক্ষুদ্র উৎস হইতে বেগবতী স্রোতস্বিনীর উদ্ভব হইয়া থাকে। পূর্ব্ববর্ণিত ঘটনার দিন ছয় সাত পরে এক দিন সন্ধ্যার পর আফিস হইতে বাসায় ফিরিয়া বিমলেন্দু শুনিল, এক মেমসাহেব তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। হঠাৎ তাহার কার্ট রোডের মারামারির কথাটা মনে পড়িয়া গেল। সে বিস্মিত হইল। সে প্রায় সেই ঘটনার কথা ভুলিয়া গিয়াছিল। সে সামান্য লোক, ঘটনাক্রমে এক দিন সে এক মেমসাহেবকে মাতাল গোরার অত্যাচার হইতে রক্ষা করিয়াছে, সে জন্য মেমসাহেব তাহার বাসা বহিয়া দেখা করিতে আসিয়াছেন! এমন ত এ দেশে হয় না।

বিমল তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিল, মেমসাহেব একখানি বেতের মোড়ার উপর বসিয়া আছেন। তাহার আসবাবপত্রের মধ্যে একটা বিছানা, একটা ট্রাঙ্ক, আর এই মোড়াটা।

মিস্ রবিনসন তাহাকে দেখিয়াই দাঁড়াইয়া উঠিয়া করস্পর্শ করিয়া সহাস্যাননে বলিল, "বেশ লোক আপনি—আমি আজ ক'দিনই অপরাহ্ণে কার্ট রোডে আপনার প্রতীক্ষা করেছি। আপনি কেমন আছেন, একবার জানাতেও ত হয়!"

বিমল অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "আফিসে এখন খুব কায, বাসায় ফিরতে রাত হয়—"

"বেশ ত, একখানা পত্রও ত দিতে পারতেন—আমার ঠিকানা ত ব'লে দিয়েছিলুম। তা নিন একটু ঠাণ্ডা হয়ে। তার পর চলুন আমার বাড়ীতে, সেখানে আমার ধর্ম্মপিতা এসেছেন, আপনাকে দেখতে চেয়েছেন। তিনি এখানকার পাদরী। হাঁ, সে দিন কি খুব বেশী আঘাত লেগেছিল?"

বিমল ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "কিছু না। কিন্তু—"

"কিন্তু কি? না—আপনাকে যেতেই হবে, আমি ছাড়বো না। চলুন। দেরী করলে ফিরতে রাত হবে।"

বিমল মহা ফাঁপরে পড়িল। কিন্তু এই সুন্দরী যুবতীর সানুনয় অনুরোধ সে এড়াইতে পারিল না; পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন না করিয়াই বাসার বাহির হইয়া পড়িল। বাসার বাবুরা তাহাদের দেখিয়া গা টেপাটিপি করিয়া মুচকিয়া হাসিল। মিস্ রবিনসনের সে দিকে দৃষ্টি না থাকিলেও বিমলের দৃষ্টি হইতে উহা এড়াইয়া যাইতে পারে নাই। তাহার মুখ-চক্ষু লাল হইয়া উঠিল। বাসা হইতে বাহির হইবার পূর্ব্বে মিস্ রবিনসন নিমাইকে দেখিতে পাইয়া বলিল, "আজ আর আপনার বন্ধু বাসায় খাবেন না।"

পথে বাহির হইয়া ইভ সস্মিতবদনে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার খাওয়া-দাওয়ার প্রেজুডিস নেই বোধ হয়—আপনারা শিক্ষিত বাঙ্গালী।"

বিমল বলিল, "না, আমার থেকে আপত্তি নেই—আমরা হোটেলেও খাই। তবে আমি শিক্ষিত নই, আমি সামান্য কেরাণী।"

"কেরাণী হ'লেই কি শিক্ষিত হ'তে নেই? শিক্ষিত কাকে বলে?—যে আপনার বিপদ্‌কে তুচ্ছ জ্ঞান ক'রে অসহায় দুর্ব্বলকে রক্ষা করে, সে যদি শিক্ষিত না হয়—"

"দেখুন, ঐ কথাটা ব'লে বার বার লজ্জা দেবেন না। বাস্তবিক আমি আপনার ধর্ম্মপিতার সঙ্গে দেখা করতে যেতে লজ্জা বোধ করছি। কি বলব, আপনি নিজে এত দূর এসেছেন—আপনি বালিকা, সুন্দরী, আপনাকে সন্ধ্যের পর একলা যেতে—"

ইভ মধুর হাস্যভরা মুখখানি তুলিয়া সলাজ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, "আমি কি খুব সুন্দরী? কি বলেন আপনি?"

বিমল গম্ভীরভাবে নীরব হইয়া রহিল—তখন তাহার মনের মধ্যে ভাবসমুদ্রের তরঙ্গভঙ্গ হইতেছিল। সে ভাবিতেছিল, স্বর্গের অপ্সরীর মত এই বালিকা কি সরলা—কি কৃতজ্ঞহৃদয়া! কে সে? সামান্য বেতনের কেরাণী, আর এই ইংরাজ-দুহিতা! থাক—সে তুলনায় কায নাই।

ইভ বলিল, "কি ভাবছেন? বাসার কথা? আচ্ছা, আপনার বিয়ে হয়েছে?"

বিমলেন্দু আকাশ হইতে পড়িল। এই বালিকার চিন্তারাজ্যে কি ভাবসমষ্টির কোনও সামঞ্জস্য নাই? কোথায় বাসার কথা, আর কোথায় বিবাহ! সে ক্ষণ-কাল নীরব থাকিবার পর বলিল, "না।" কথাটা বলিবার কালে তাহার গলাটা একটু কাঁপিয়াছিল কি? কে জানে!

পথে যে দুই চারি জন য়ুরোপীয় নরনারীর সহিত তাহাদের সাক্ষাৎ হইল, তাঁহাদের বিস্মিত দৃষ্টি তাহাদিগকে অনুসরণ করিল—দুই এক জনের দৃষ্টিতে বিমলেন্দু ক্রোধ ও বিরক্তির চিহ্নও যে দেখিতে পায় নাই, এমন নহে।

পাদরী রেভারেণ্ড ডেনিস অমায়িক ভদ্র লোক, তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া বিমলেন্দু তৃপ্তি লাভ করিল। আফিসের 'সাহেবদের' সহিত তাহার সংস্রব ছিল, কিন্তু এ 'সাহেব' সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। বিমল ভাবিল, এ 'সাহেব' কি সেই সাহেব? রেভারেণ্ড ডেনিস তাহার সাহস ও উচ্চান্তঃকরণের যেরূপ প্রশংসা জুড়িয়া দিলেন, তাহাতে তাহার সেখানে তিষ্ঠান দায় হইয়া উঠিল।

ইভ তাহার অবস্থাটা সহজেই বুঝিয়াছিল, তাই তাড়াতাড়ি কথা চাপা দিবার জন্য বলিল, "কেমন মজা করেছি? মিঃ রায়কে (বিমলেন্দু রায়) এখানে আজ আনবো, এ কথা জানাইনি। মিঃ ডেনিস সে জন্যে প্রস্তুত ছিলেন না, জানতেন, আজ এখানে ডিনারের নেমন্তন্ন, এইমাত্র।" এই কথা বলিয়া সে হাসির রোলে ঘরটা ভরিয়া দিল। বিমলের মনে হইল, যেন সুধামাখা অপ্সরার গানে তাহার মনপ্রাণ ভরিয়া উঠিতেছে।

আহারের সময়ে বিমলের বাধ বাধ ঠেকিতে লাগিল বটে—তবে সে একবারে সাহেবী খানায় অনভ্যস্ত ছিল না—কিন্তু পাদরী ডেনিস, বিশেষতঃ ইভ তাহার সকল ত্রুটি সারিয়া লইল, আহারান্তে ইভ বেশপরিবর্ত্তন করিতে গেলে রেভারেণ্ড ডেনিস ইভের কতকটা পরিচয় দিলেন। বাপ-মা নাই, একমাত্র বৈমাত্রেয় ভ্রাতা,

বেগমপুরের নীলের কুঠিয়াল, সে ইভ হইতে অনেক বড়। এ জন্য তাহাকে ভগিনীর মত না দেখিয়া মেয়ের মতই দেখে। ইভ বাপের অর্দ্ধেক বিষয় ও নগদ টাকা পাইয়াছে। সে বালিকা, সবেমাত্র স্কুল ছাড়িয়াছে,—যদিও তাহার বয়সের মেয়েরা এখনও স্কুলে পড়িতেছে। দার্জ্জিলিংএ তাহার জীবনের অনেকটা সময় কাটিয়াছে বলিয়া সে এখানেই থাকিতে ভালবাসে।

বিমল কেবলমাত্র জিজ্ঞাসা করিল, "মিঃ রবিনসন যখন এত বড় লোক, তখন ছেলেমেয়েকে বিলাতে বিদ্যাশিক্ষার জন্য পাঠান নাই কেন?"

পাদরী ডেনিসের মুখ গম্ভীর হইল। তিনি বলিলেন, "সে অনেক কথা। মাত্র বছর দুই তিন তিনি অনেক টাকার মালিক হয়েছিলেন তার আগে তাঁর অবস্থা ভাল থাকলেও খুব স্বচ্ছল ছিল না। নানা কারণে তিনি সুখে থাকতে পাননি। তিনি আমার খুব বন্ধু ছিলেন। আমি আগে অনেক দিন বেগমপুরে ছিলুম কি না।"

এই সময়ে ইভ সহাস্যাননে কক্ষে প্রবেশ করিয়া বলিল, "বেগমপুরের কথা কি হচ্ছে? আমি যখন বেগমপুরে, তখন দশ বছরের—কেমন, না?"

পাদরী সস্নেহে ইভের মাথার উপর হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, "পাগলি, এখনও তুমি সেই দশ বছরেরটি আছ—"

"ইস্, তাই বুঝি? এখন ত আমি অনেক বড় হয়েছি। আমি বুঝি খুকী? হুঁ!"

বৈদ্যুতিক আলোকের নিম্নে ইভের সুন্দর মুখখানি সদ্য প্রস্ফুটিত গোলাপের মতই দেখাইতেছিল। বিমল ভাবিতেছিল, ভগবান্ কোন্ ভাগ্যবানের অদৃষ্টে এ অমূল্য রত্ন বাছিয়া রাখিয়াছেন! হঠাৎ পাদরীর কথায় তাহার মোহভঙ্গ হইল। পাদরী বলিতেছিলেন, "রাত বেশী হয়েছে, এইবার চলুন যাওয়া যাক্।" ইভ যাইতে বাধা দিতেছিল, কিন্তু বিমল পাদরীর অনুসরণ করিতে বিলম্ব করিল না।

বিদায়ের পূর্ব্বে যখন দ্বারের নিকট ইভ বিমলের করমর্দ্দন করিল, তখন বিমল দেখিল, তাহার কোমল করপল্লবখানি থর থর কাঁপিতেছে, মৃদু স্পর্শকালে সে যেন তাহার হাতে একটু—অতি সামান্য জোর চাপের আভাস পাইল। এ কি তাহার কল্পনা!

কিন্তু সে মুহূর্ত্তমাত্র। পরক্ষণেই ইভ কোমল কণ্ঠে বলিল, "আবার কবে আসছেন?"

বিমল কি জবাব দিল, তাহা তাহার মনে নাই, তখন সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডটা তাহার চক্ষুর সমক্ষে ঘুরিতেছিল। পরমুহূর্ত্তে পাদরী ডেনিস যখন ডাকিলেন, "মিঃ রায়!" তখন সে আর কালবিলম্ব না করিয়া রজনীর অন্ধকারে বাহির হইয়া পড়িল।

৩

কলিকাতার এক সম্ভ্রান্ত ধনি-গৃহে আজ একটা বড় ভোজের আয়োজন হইয়াছে। দ্বারে মোটর, ল্যাণ্ডো লাগিতেছে এবং এক এক দল নিমন্ত্রিত অতিথিকে বক্ষে লইয়া চলিয়া যাইতেছে।

বাটীর কর্ত্তা রামপ্রাণ চক্রবর্ত্তী, জমীদার—প্রকাণ্ড বিষয়ের মালিক—তাঁহার দুয়ারে অনেক পোষ্য প্রতিপালিত হয়—তাঁহার তাঁবে লোকলস্করের অভাব নাই, তাঁহার বিলাস ঐশ্বর্য্য উপমার স্থল। বিধাতা তাঁহাকে সকল সুখসম্পদেরই অধিকারী করিয়াছেন। বাহির হইতে দেখিলে তাঁহার কখনও কোনও অভাব অনুভূত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু সত্যই কি তাই?

রাত্রি ১০টা বাজিয়া গিয়াছে, শেষ অতিথিও বিদায়-গ্রহণ করিয়াছে, কর্ত্তা সারাদিনের পরিশ্রমের পর সবেমাত্র বিশ্রাম লইতেছেন। একখানি আরাম-কেদারায় অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় থাকিয়া তিনি আলবোলায় তামাকু সেবন করিতেছেন, তাঁহার অক্ষিপল্লব অর্দ্ধনিমীলিত হইয়া আসিয়াছে, এমন সময়ে মৃদু ও কোমল নারী-কণ্ঠে ডাক পড়িল, "বাবা!"

রামপ্রাণ বাবু ধড়মড়িয়া উঠিয়া বসিয়া বিস্ময়বিস্ফারিতনেত্রে বলিলেন, "কি মা? এখনও শোওনি? সারাদিন ভূতের মত খাটলি,—পাগলী কোথাকারের!"

মেয়ে কাছে আসিয়া চেয়ারের হাতল ধরিয়া দাঁড়াইল, বাপ সস্নেহে তাহার মাথার উপর হাত বুলাইতে লাগিলেন, বলিলেন, "কি চাই, মা?"

প্রতিমা হাসিয়া বলিল, "এখনও আমায় সেই কচি খুকীটি মনে করেন, না বাবা? দশটা এই বাজলো, এর মধ্যে ঘুম?"

রামপ্রাণ বাবুও হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "না হয় তুই বুড়ীই হয়েছিস। তা আমার মা ত! বুড়োর বুড়ী মা—হাঃ হাঃ হাঃ!" কিন্তু সে হাসির ভিতরেও একটু বিষাদের বেশ যে মিশান ছিল, তাহা সূক্ষ্ম মানব-চরিত্র-দর্শিমাত্রেরই বুঝিতে বেগ পাইতে হইত না। সে ভাবটা চাপা দিয়া রামপ্রাণ বাবু তাড়াতাড়ি বলিলেন, "তা যেন হ'ল, কিন্তু দরকারটা কি শুনি।"

প্রতিমা পিতার চুলগুলি দুইটি আঙ্গুলে জড়াইতে জড়াইতে ব্রীড়াবনতমুখে বলিল, "ও বাড়ীর সেজদি এসেছিল. বলছিল, ওরা দিন চেরেকের মধ্যেই অনন্তপুরে যাবে।"

কথাটা বলিবার সময়ে প্রতিমার কণ্ঠস্বর ও অঙ্গুলী দুইটি ঈষৎ কাঁপিয়াছিল, তাহা বুঝিতে রামপ্রাণ বাবুর কষ্ট হয় নাই। তিনি কেবল একটু ছোট 'হুঁ' দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তার পর?"

প্রতিমা আরও সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল, অস্পষ্ট মৃদুস্বরে কেবলমাত্র বলিল, "সাত দিনের বেশী থাকবে না, আমি যাব সঙ্গে?"

রামপ্রাণ বাবুর মুখমণ্ডল অসম্ভব গম্ভীর আকার ধারণ করিল। প্রহার খাইলে লোকের মুখ যেমন বিবর্ণ হইয়া যায়, তাঁহার মুখের আকারে কতকটা তাহার আভাস দেখা দিল। কিন্তু কষ্টে হৃদয়ের ভাব গোপন করিয়া তিনি কন্যাকে গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সেটা কি ভাল হবে এত দিনের পরে?"

"তবু—শ্বশুরের ভিটে—"

কথায় হৃদয়ের অন্তস্তলের কাতরতা মাখা!

রামপ্রাণ বাবুরও বেদনাকাতর হৃদয় হাহাকার করিয়া উঠিল—সে হাহাকারের মধ্য দিয়া তিনি পুরুষ হইলেও কন্যার শূন্য হৃদয়ের হাহাকার স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন। তাড়াতাড়ি কন্যার মাথাটা বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া কাল মেঘের রাশির মত চুলগুলির উপর হাত বুলাইয়া ব্যথিত, ক্ষুব্ধ, অভিমানাহত কণ্ঠে বলিলেন, "কেন, মা, আমি কি তোকে সুখে রাখতে পারি নি, মা?"

বাঁধের বন্ধন সহসা ক্ষুণ্ণ হইলে যেমন অগাধ জলরাশি সম্মুখে যাহা পায়, তাহাকে উদ্দাম অশান্ত শক্তিতে তৃণের মত ভাসাইয়া লইয়া যায়, তেমনই প্রতিমার রুদ্ধ হৃদয়ের দ্বার আঘাতে উন্মুক্ত হইয়া ভাববন্যাপ্রবাহ বহাইয়া দিল। সে ছুটিয়া বাহিরে যাইতেছিল, রামপ্রাণ বাবু তাহাকে বাধা দিলেন। তাহাকে আরাম-কেদারায় বসাইয়া টেবলের ড্রয়ার হইতে একখানি পত্র বাহির করিয়া তাহার হস্তে প্রদান করিলেন। কক্ষ ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে বলিলেন, "এই তার শেষ চিঠি। পড়। এত দিন লুকিয়ে রেখেছিলুম। তুমি মা অবুঝ নও, যা ভাল মনে হয়, কর। আমি একটু বাইরে যাই।"

চিঠিখানা টেবলের উপর পড়িয়া রহিল, কিছুক্ষণ সেখানা স্পর্শ করিতেও প্রতিমার হাত উঠিল না। একবার হাত বাড়াইয়াও সে হাত ফিরাইয়া লইল। তাহার হাত থর-থর করিয়া কাঁপিতেছিল, বুকও গুরু-গুরু কম্পিত হইতেছিল—সে যেন বক্ষের স্পন্দনশব্দ স্পষ্টই শুনিতে পাইতেছিল।

গৃহের উজ্জ্বল আলোক প্রতিমার দেহখানিকে স্নাত প্লাবিত করিতেছিল, সে আলোকসম্পাতে তাহার প্রথম যৌবনমুকুলিত দেহলতা অনুপম নবকিশলয়লাবণ্য ছড়াইয়া দিতেছিল, প্রতি অঙ্গভঙ্গীতে সে লাবণ্যচ্ছটা বিচ্ছুরিত হইতেছিল।

প্রতিমা আর একবার হস্ত প্রসারণ করিল। কম্পিত হস্তে পত্রখানি লইয়া সে পড়িতে লাগিল:—

"দার্জ্জিলিং-লাটদপ্তরের মেস,
১৩ই-১৯—সাল।

সবিনয়-নিবেদন,

যে পথ গ্রহণ করিয়াছি, তাহাই আমার শেষ সিদ্ধান্তের পথ। এ পথগ্রহণে আপনিও আমার সহায়তা করিয়াছেন, সুতরাং আপনারও বলিবার কিছু নাই। এখন আপনি ভিন্ন পথে যাইতে বলিতেছেন; কিন্তু গোড়া কাটিয়া আগায় জল ঢালিলে ফল হয় না। আপনি শত প্রলোভন দেখাইলেও এখন আর আমি স্বেচ্ছায় গৃহীত দারিদ্র্যের পথ ত্যাগ করিব না। আপনিই

এক দিন আপনার বা আপনার কাহারও সহিত আমার মত দরিদ্রের কোনও সম্বন্ধ নাই বলিয়া পথের কুকুরের মত তাড়াইয়া দিয়াছিলেন। আজ আমারও আপনার বা আপনার কাহারও সহিত কোনও সম্বন্ধ নাই। আপনি অর্থের সম্মান করিয়া আসিয়াছেন, মানুষের যে কোনও আত্মসম্মান থাকিতে পারে, তাহা কখনও বোধ হয় ধারণাও করেন নাই। আপনি ও আপনার নিজের ক্ষন অর্থ লইয়া সন্তোষলাভ করুন, মানুষের—বিশেষতঃ আমার মত দরিদ্র মানুষের সহিত আপনাদের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইলে কোনও ক্ষতি নাই। ইতি

বিনীত

শ্রীবিমলেন্দু রায়।"

কি ভয়ঙ্কর পত্র! এতটুকু দয়ার চিহ্ন নাই—এক ফোঁটা মায়ার সম্পর্ক নাই। মানুষ এত কঠোর হইতে পারে? প্রতিমা মনে মনে ধারণা করিয়া লইল, তাহার পিতার কিরূপ পত্রের উত্তরে এই পত্র আসিয়াছে। তিনি নিশ্চিতই কাকতি-মিনতি করিয়া পত্র লিখেন নাই —তাহা তাঁহার ধাতুসহ নহে। তথাপি কন্যার জন্য তিনি গর্ব্বোন্নত মাথা হেঁট করিয়া নিশ্চিতই তাহাকে পত্র লিখিয়াছিলেন। তাহার এই উত্তর?

একটা ভুলের কি এই প্রতিফল? মানুষ পদে পদে ভ্রম করিয়া থাকে, কিন্তু তাহার কি ক্ষমা নাই?

সে ত এমন ছিল না। যে কয়টা দিন সে তাহাকে পাইয়াছিল, তাহাতেই সে বুঝিয়াছিল, তাহার মন কি উপাদানে গঠিত। তবে? এ কি বিধাতার অভি-সম্পাত!

প্রতিমার মনে ছায়ার ন্যায় অস্পষ্ট রেখায় তাহার প্রথম বিবাহিত জীবনের কয়টা দিনের চিত্র ফুটিয়া উঠিল। তখন সে মাত্র একাদশ বর্ষের বালিকা—আর আজ তাহার পর সাত বৎসর কোথা দিয়া চলিয়া গিয়াছে। বিবাহের রাত্রিতে যখন স্ত্রী-আচার হয়, তখন আত্মীয়াগণের মুখে সে কত না স্বামীর রূপের প্রশংসা-বাদ শুনিয়াছিল। ভবানীপুরের ক'নে ঠানদি বলিয়া-ছিলেন, ছেলে ত নয়, যেন কার্ত্তিক! তাহার পর ফুল-শয্যার রাত্রি। উঃ, সে কি গুরু-গুরু বক্ষ-স্পন্দন! যখন নবদম্পতিকে পুরকামিনীরা ফুলসজ্জায় সাজাইয়া একত্র রাখিয়া চলিয়া গেল, তখন একাধিক জনের মুখে সে শুনিয়াছিল,—"যেন শিবদুর্গা!" তাহার পর—তাহার পর যখন স্বামী তাহার হাতখানি ধরিয়া মুখের অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন, তখন সে লজ্জায় একবারে অভিভূতা হইয়া উপাধানে মুখ লুকাইয়া-ছিল—স্বামী তখন যে স্বরে তাহাকে 'প্রতিমা' বলিয়া ডাকিয়াছিলেন, তখন তাহার মনে হইয়াছিল, সে সুমিষ্ট স্বর এ পৃথিবীর নয়, যেন স্বর্গরাজ্যের।

সেই দেখা—শেষ দেখা নয়—আরও দুই চারি দিন হইয়াছিল, কিন্তু,—সেই কয় রাত্রির দেখা, সে ত ভুলিবার নহে। বালিকা বয়সের কোমল মসৃণ স্মৃতি-পটে যাহা একবার অঙ্কিত হইয়া যায়, তাহার দাগ চির-দিন থাকিয়া যায়। প্রতিমা বার বার সেই সুখ-স্মৃতির রাত্রির কথা মানসে ধ্যান করিয়া আনন্দসাগরে ভাসমান হইল। তাহার বাহ্য প্রকৃতির সহিত সম্বন্ধ তখন বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল, সে তন্ময় হইয়া দেখিতেছিল,—সেই মুখ, সেই কুসুমদামসজ্জিত সুন্দর কান্ত দেহ, সেই পুষ্পশয্যা, সেই পুষ্পমালায় ভূষিত শয়নকক্ষ।

হঠাৎ বিভিন্ন চিন্তার তরঙ্গাভিঘাতে তাহার সুখ-স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। তাহার পর?—তাহার পর ঘোর অমানিশা, তাহার ক্ষুদ্র জীবন-নাটকের সুখ-অঙ্কে যবনিকাপাত। কোথা হইতে কি হইয়া গেল, পিতার সহিত স্বামীর মনোবাদ, স্বামীর গৃহত্যাগ, তাহাদের সম্বন্ধচ্ছেদ। সংসারে কত বিরোধ বিচ্ছেদ হইতেছে, আবার দুই দিন পরে মিলনও ঘটিতেছে, কিন্তু বিধাতার কি অভিশাপ! তাহাদের এ বিচ্ছেদে দীর্ঘ সপ্ত বৎসরেও মিলন ঘটাইতে দেয় নাই, জীবনান্ত কালের মধ্যে দিবে কি না কে জানে!

প্রতিমা আর একবার পত্র পাঠ করিল। কঠিন নির্ম্মম নিষ্ঠুর বিধাতা!—তাহার কি অপরাধে এই নিগ্রহ? এত লোকের মৃত্যু হয়, তাহার ভাগ্যে তাহাও জুটে না কেন?

টেবলের উপর দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া মাথা গুঁজিয়া প্রতিমা খানিকটা কাঁদিল। কিন্তু সে অধিকক্ষণ নহে। তাহার পর চোখ মুছিয়া ভাবিল, বৃথা এ অনুযোগ,

মানুষ নিজের কর্ম্মফলেই কষ্ট পায়, বিধাতার দোষ কি? বিধাতা কঠিন নহে, মানুষ কঠিন। সেও ত মানুষ,—তাহার কি অপরাধে সে তাহাকে ত্যাগ করিল? তাহার আত্মসম্মান পত্নী ত্যাগের পাপ হইতেও কি বড় হইল? সে ত তাহাকে একবার ডাকিলে পারিত—ডাকিলে সে পিতার সুখৈশ্বর্য্য ছাড়িয়া হাসিমুখে তাহার দারিদ্র্য ভাগ করিয়া লইত কি না, একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিলে পারিত! সে ত পুরুষ! তাহার আত্মসম্মান আছে, নারীর কি নাই? সে যদি হেলায় এমন করিয়া তাহাকে দূরে ঠেলিয়া রাখিতে পারে, তবে সে-ও কেন তাহাকে ভুলিবার জন্য চেষ্টা করিবে না? নারীর ত অনেক কর্ত্তব্য আছে। প্রতিমা কি কাযে ডুবিয়া থাকিয়া তাহাকে মানসরাজ্য হইতে দূরে সরাইয়া দিত পারে না? বালিকা বয়সে অস্পষ্ট মাত্র কয়টি রাত্রির দেখা—কিসের সম্বন্ধ—কিসের বন্ধন? সে যদি বন্ধন রাখিবে না, তবে সে-ই বা বন্ধন রাখিবে কেন? [ক্রমশঃ।

বিজয়া

আয় বিজয়া, যাত্রা সুরু করবো আজি তোমায় নিয়ে!
দীর্ঘ পথই চল্‌তে হবে, জমবে পাড়ি কোথায় গিয়ে!
সে দিন যখন শুনতে পেলাম,বাজলো কোথায় বোধন-বাঁশী,
ভেবেছিলাম, আস্‌লো কেবা সঙ্গে লয়ে রোদন-হাসি!
সে ত গেছে, পেলাম তোমায় পুরাতনের বক্ষ চিরে,
পড়ুক তাহার বিজয় আশিস্ আলিঙ্গনের লক্ষ শিরে।
চোখের জলে দিইনি বিদায়, বেঁধে নিছি বুকের মাঝে!
তাই ত আজি তোমায় পেলাম, পাণ্ডু বরণ সুখের সাঁঝে।
মুক্তি বাঁশী বাজিয়ে চলো, আজ যে প্রেমের সন্ধিক্ষণ—
আজকে সবাই মুক্ত স্বাধীন, কেহই ত আজ বন্দী নন!
সিদ্ধি-ভাঙের নেশার বশে, বাহির যে আজ করতো ঘর,
আপন যদি না পাই কাছে, আপন ক'রে বরবো পর।
প্রাণের প্রদীপ জ্বালিয়ে নিছি, আজকে সুমুখ, পিছন নয়!
চল্‌তে হবে বছর ধ'রে, একটা পলেই জীবন ক্ষয়।
মরণ অমর জীবন খুঁজে, সত্য খুঁজে মৃত্যুকে,
সত্যকে তাই স্বরূপ দিয়ে রাখতে হবে সম্মুখে!
যেতেই মোদের হবে যখন পথ হেঁটে পথ করবো ক্ষয়,
মরণ যদি নেহাৎ বরে, হয় ত হ'ব মৃত্যুঞ্জয়!

আয় বিজয়া, আয় বিজয়া, মুখ দেখি তোর ঘোম্‌টা খোল!
প্রাণের মাঝে খাচ্ছে দোলা, অতীত-গরব-স্মরণ-দোল।
কোন্ সে যুগের কাহিনী, কার বা যুদ্ধ, কার বা জয়—
শক্তি পূজি কোন্ সে জাতি হইল বিরাট শক্তিময়?
নীল-পঙ্কজে পূজলো কেবা শৈলরাজার নন্দিনী,
কোথায় কবে মুক্ত হলো সাগর-পারের বন্দিনী!
সকল ছবিই দেখতে পাবো, আছে লেখা তোর মুখে,
হয় তো অতীত-স্মৃতি-ব্যথার বিঁধবে সূচি মোর বুকে!
থাক বিজয়া, কাঁদে অতীত, নাইকো মায়া তাহার লাগি,
স্বপন দেখি নিশার শেষে আধেক ঘুমে আধেক জাগি!
চাই না অতীত, চাই না ভাবী, চাই যে শুধু বর্ত্তমান,
মুক্তি-জয়ের যাত্রা মোদের, অমর মোরা মূর্ত্তিমান!
এগিয়ে চলো,এগিয়ে চলো,ডাকছে কারা কোথায়? কৈ
চক্রবালের আবডালে কা'র নূপুর বেজে উঠলো অই!
দুলিয়ে চলো, দুলিয়ে চলো, ধানের ক্ষেতে শ্যাম আঁচোল,
আকাশটাকে ঘনিয়ে তোল, দিয়ে চোখের নীল কাজল!
শিউলি-ঝরা পথের 'পরে পড়ুক তোমার চরণ-রাগ,
লাখ যুগেরও একটি বরষ, এইটি শুধু স্মরণ থাক্!

শ্রীঅক্ষয়কুমার কুণ্ডু।

আমেরিকার নিগ্রো

আমেরিকার নানাবিধ সমস্যার মধ্যে নিগ্রো-সমস্যা একটি বেশ বড় রকমের সমস্যা। জাতিভেদপ্রথা ভারতের যে রকম একচেটিয়া বলিয়া পাশ্চাত্য জগতে প্রচারিত, এই নিগ্রো-সমস্যাকেও আমেরিকার সেই রকম একচেটিয়া বলা যায়। জাতিভেদ পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্রই আছে—তবে হয় ত সর্ব্বত্র একই রকমে পরিচিত না হইতে পারে।

নিগ্রো-সমস্যা আজ নূতন নয়। কলম্বসের এই দেশ আবিষ্কার ও তাহার পর দেশের চাষবাসের উন্নতির চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে নিগ্রো-সমস্যার বীজ উপ্ত হইয়াছে। বর্ত্তমানে কতকটা ফল দেখা যাইতেছে ; ভবিষ্যতে অনেক ফল ফলিতে বাকী আছে। প্রবল শীতে যখন নূতন আমেরিকাতে য়ুরোপীয়গণ জীবনধারণের জন্য চাষ-আবাদ করিতে চেষ্টা করিতে থাকেন, তখন দেশে উপযুক্ত গরু-ঘোড়া ছিল না। গরু-ঘোড়া আনয়নের সুবিধাও তখন তেমন ছিল না। তখনকার দিনে ষ্টীমারজাহাজ চলে নাই। পাইল তুলিয়া নৌকা করিয়া বিস্তৃত আটলান্টিক মহাসাগর পার হইতে হইত। নানা কারণে য়ুরোপীয় প্রবাসীরা দেখিলেন, চাষের জন্য পশু আমদানী করার তুলনায় আফ্রিকার নিগ্রো আনয়ন অপেক্ষাকৃত সহজ ও সুলভ, তাই দাস ব্যবসায়ের আরম্ভ। মুদ্রার আবিষ্কার হইতে আমরা এই লাভের দিকটা বেশ ভাল করিয়া বুঝিতে পারিয়াছি, সব দিকেই ঐ এক কথা—কিসে কম আয়াসে বেশী লাভ হইবে।

মোলাটো-নিগ্রো অভিনেত্রী

দাস-ব্যবসায় সম্বন্ধে এখানে বিশেষ কিছু বলিব না, তবে নিগ্রোদের সঙ্গে দাস-ব্যবসায়ের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, তাই এইটুকু না বলিয়া পারিলাম না। যাঁহারা আমেরিকার কথা কিছু জানেন, তাঁহারা দাসব্যবসায়ের কথাও একটু জানেন। যাঁহারা কিছু জানেন না, তাঁহারা বাঙ্গালা "টম্ কাকার কুটীর" বা ইংরাজী "Uncle Tom's Cabin" পড়িলে অনেক কথা জানিতে পারিবেন। দাসরূপে যখন নিগ্রোরা আমেরিকায় আইসে, তখন তাহাদের অবস্থা পশুর অপেক্ষা বিশেষ কিছু উন্নত ছিল বলিয়া আমেরিকানরা স্বীকার করেন না। যদিও বা কিছু ছিল, তাহাও পশুর মত জীবনযাপন করিয়া ক্রমশঃ উহারা ভুলিয়া গিয়াছিল। আমরা যেমন গৃহপালিত গরুবাছুর কুকুর-বিড়ালের আদর-যত্ন করি, আমেরিকানরাও নিগ্রোদের সেইরূপ করিত, উভয়ের উদ্দেশ্য এক,—"স্বার্থ।" নিগ্রো অকাতরে খাটিতে পারিত, তাই তাহার আদর ছিল, অক্ষম হইলে প্রহার লাভ করিত।

মার্কিণ সরকারের নার্স নিগ্রোস্বাস্থ্য-কর্ম্মচারী

পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের নিগ্রো নারী

আমেরিকানরা কাযের জন্য নিগ্রোকে দাসরূপে কিনিত। নিগ্রোকে দাস মনে করিত, দেবতা দূরের কথা, মানুষও মনে করিত না। কায না পাইলে মারিতে বা প্রয়োজন হইলে হত্যা করিতেও দ্বিধা বোধ করিত না। নিগ্রো-দাসের তখনকার অবস্থা বুঝিতে হইলে, নিগ্রোর মানুষ আকার ভুলিয়া একটি পশুর আকার মনে আনুন। মাঠে চাষা যে ভাবে গরুকে ব্যবহার করে, নিগ্রোকে সেইরূপ দেখুন। নিগ্রোদের এই অবস্থায় রাখিতে পারিলে সমস্যা হয় ত এতটা জটিল হইত না। কিন্তু তাহা হয় নাই।

বর্ত্তমান যুগ পর্য্যন্ত পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্রই স্ত্রীলোকের স্থান ঘরের ভিতরে—পুরুষের বাহিরে। পুরুষ নূতন আবিষ্কারে যায়, স্ত্রী ঘরে থাকিয়া পুরুষকে সাহায্য করে। পুরুষ যুদ্ধ করিয়া দেশ জয় করে, স্ত্রী ঘরে থাকিয়া পুরুষকে সাহায্য করে। কোথায়ও ইহার ব্যতিক্রম হইয়া থাকিলেও সাধারণ নিয়ম হিসাবে ধরিয়া লওয়া চলে যে,পুরুষ উদ্যোগী কর্ম্মী – স্ত্রী তাহার সহযোগিনী। কলম্বসের আবিষ্কারের সময়ও এই নিয়ম পালিত হইয়াছিল। যখন আমেরিকায় লোক বাস করিতে আসিয়াছিল, তখন তাহাদের স্ত্রীরা য়ুরোপের ঘরে থাকিয়া সংসারধর্ম্ম পালন করিতেন, পুরুষরা দেশ-জয়ে আসিল। ইহার ফলে সর্ব্বত্র যাহা হইয়াছে, আমেরিকায়ও তাহার কিছু ব্যতিক্রম হয় নাই।

নিগ্রোদের হাস্যরস নাটকের একটি দৃশ্য

শ্বেত আমেরিকান ও কৃষ্ণ নিগ্রোর রক্ত-মিশ্রণ আরম্ভ হইল। আমাদের দেশের মিশ্রণকে আমরা ফিরিঙ্গী বলি—এ দেশের মিশ্রণকে ইহারা 'মোলাটো' বলে। ক্রমশঃ মিশ্রণ এত বেশী হইয়াছিল যে, অনেকে দেখিতে কোনও অংশে শ্বেত আমেরিকানের অপেক্ষা অন্তরূপ হয় নাই। এত বেশী মিশ্রণ হওয়ায় পরে শ্বেতাঙ্গ মার্কিণগণ আর ইহাদিগকে দাস বলিয়া "পশু" মনে করিতে পারে নাই। মিশ্রিত মোলাটো ছেলেমেয়ে, আর শ্বেতজাতীয় ছেলেমেয়ে একই রকম চেহারা পাইতে লাগিল, তখন আর কেমন করিয়া তাহাদিগকে পশু বলা চলে? অথচ জাতিভেদ আইন অনুসারে উহারা অস্পৃশ্য। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে যেমন মিশ্রণ বাড়িতে লাগিল, তেমনই ঐ দেশে এক দল লোকের মধ্যে নিগ্রোর উপর সহানুভূতি বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অনেক বাধা-বিপদ অতিক্রম করিয়া শেষে এব্রাহাম লিংকন (১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে) নিগ্রোকে দাসত্বশৃঙ্খল হইতে আইনতঃ মুক্ত করেন।

শৃঙ্খল মুক্ত হইল বটে, কিন্তু দাসত্ব ঘুচিল না। স্বাধীনতা কেমন, তাহা তাহারা কখনও আস্বাদ করে নাই—অনেক নিগ্রো স্বাধীনতা লইতে চাহে নাই। তাহারা যেমন ছিল, তেমনই থাকিতে চায়। এ রকম জড়ভাব হওয়া বিস্ময়কর নহে। আমাদের দেশের অনেক শিক্ষিত, উদারনীতিক এরূপ জড়ভাবের বাহিরে যায়েন নাই। এ হিসাবে বরং নিগ্রোরা এখন আমাদের অপেক্ষা অনেক বেশী মনুষ্যত্ব দেখাইয়াছে। শৃঙ্খলমুক্ত হইয়া আজ ৫০ বৎসরের মধ্যে নিগ্রো আমেরিকার জাতীয় জীবনে এমন স্থান অধিকার করিয়াছে যে, আমেরিকার একটি প্রধান সমস্যা হইয়াছে নিগ্রো। সামাজিক হিসাবে নিগ্রোর সমান অধিকার আমেরিকার কোথাও আছে বলিয়া বলা যায় না। যদি দুই এক জন কোথাও উদারনীতিক লোক থাকেন—তাঁহাদিগের সংখ্যা এত কম যে, জাতি হিসাবে অতি নগণ্য। কিন্তু তবু অস্বীকার করা চলে না যে, এ রকম লোকও আমেরিকায় আছে।

আর্থিক, (Economic) রাজনীতিক ও নৈতিক হিসাবে অনেক যায়গায় নিগ্রোকে অধিকার দেওয়া হইয়াছে; কিন্তু আবার অনেক যায়গায় হয় নাই। যুক্তরাজ্যের দক্ষিণভাগে অনেক যায়গায় নিগ্রোকে ভোট দিতে দেওয়া হয় না। কোনও উচ্চপদে চাকরী দেওয়া হয় না। অনেক যায়গায় দলবদ্ধ শ্বেতাঙ্গ আমেরিকান (পশুবৎ) নিগ্রোকে জীবন্ত মারিয়া পুড়াইয়া আনন্দ লাভ করে। বাৎসরিক এমন ঘটনা ২০।২৫টি না হয়, এমন বৎসর যায় না। এক গাড়ীতে যাওয়া, এক হোটেলে থাকা, এক যায়গায় খাওয়া, এমন কি, এক নাপিতের কাছে কামান পর্য্যন্ত অনেক যায়গায় অসম্ভব। এইগুলির জন্য বলিতেছিলাম যে, নিগ্রোর শৃঙ্খল মুক্ত হইয়াছে বটে, তবে দাসত্ব যায় নাই।

আমেরিকার উত্তরভাগের লোক ও দক্ষিণ ভাগের লোকের মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। কথাটা বোধ হয় আরও একটু সোজা করিয়া বলা যায়। আমাদের দেশে যেমন বাঙ্গালী, মারাঠী, গুজরাটী, মাদ্রাজী, উড়িয়া প্রভৃতি ভেদ আছে, ইহাদেরও সেই রকম উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিম, মধ্যপশ্চিম প্রভৃতি বিভাগ অনুসারে মানসিক পার্থক্য আছে। আমাদের সঙ্গে তফাৎ এই যে, আমাদের ভাষাটা পর্য্যন্ত পৃথক্; ইহাদের ভাষা এক। দূরত্ব হিসাবে আমাদের যেমন আবার পূর্ব্ব ও পশ্চিম-বাঙ্গালায় হাব, ভাব, আদব-কায়দা, এমন কি, ভাষার পার্থক্য হয়, এ দেশেও তেমনই অনেক বিষয়ে অনেক পার্থক্য দেখা যায়। নিগ্রোদের পক্ষে দক্ষিণভাগ বড়ই খারাপ। সেখানে "সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা" শুধু শ্বেতাঙ্গের জন্য। নিগ্রো সেখানে নিগ্রো। নিউ ইয়র্কের লোকদের দক্ষিণ আমেরিকানরা বিদেশী বিধর্ম্মী বলে। কেন না, নিউ ইয়র্ক এ বিষয়ে অপেক্ষাকৃত উদার। উদারতা আরও বেশী হইত এবং সঙ্গে সঙ্গে নিগ্রো-সমস্যারও মীমাংসা হইত, যদি রক্ত-মিশ্রণ আরও অবাধে চলিতে পারিত। কিন্তু ইহারা তাহা কি কখনও হইতে দিবে?

মোলাটো নিগ্রো গায়িকা

প্রায় ২ মাস পূর্ব্বে একটি অভূতপূর্ব্ব ঘটনা নিউ ইয়র্কে ঘটে। এখানকার সুবিখ্যাত ধনকুবের ও সমাজনেতা রাইনল্যাণ্ডার বংশের উত্তরাধিকারী একটি নিগ্রো মেয়েকে স্বেচ্ছায় বিবাহ করে। প্রথম কাগজে সংবাদ প্রচারিত হয় যে, যুবক মেয়েকে নিগ্রো জানিয়াই বিবাহ করিয়াছে এবং এ জন্য সে সুখী ও গর্ব্বিত। রাইনল্যাণ্ডারের পিতা তাহাকে ত্যাজ্যপুত্র করিবার ভয় দেখান, কিন্তু তাহাতে সে ভয় পায় না। কেন না, সে সাবালক ও তাহার নিজের মাসী ও অন্য কোনও আত্মীয় তাহার নিজের নামে বহু লক্ষ ডলারের সম্পত্তি দিয়া গিয়াছেন। সুতরাং পিতার টাকা না পাইলেও তাহার ক্ষতি নাই। কিন্তু পরে কথা বদল হইয়া যায়।

বর্ত্তমানে আদালতে বিবাহচ্ছেদনের মোকর্দ্দমা চলিতেছে। যুবক বলিয়াছে যে, মেয়ে তাহাকে প্রতারণা করিয়াছে, সে যে নিগ্রো, তাহা গোপন করিয়া তাহাকে মিথ্যা কথা বলিয়াছে। আবার মেয়েটি উল্টা মোকর্দ্দমা করিয়াছে যে, তাহার স্বামীর ভালবাসা নষ্ট করার অভিসন্ধিতে এই সব করা হইতেছে এবং এ জন্য কয়েক লক্ষ টাকা দাবী করিয়াছে। ফলে যে কি দাঁড়াইবে, তাহা এখনও বলা কঠিন। এ ঘটনা নিউ ইয়র্ক বা পূর্ব্ব অঞ্চলে সম্ভব, এ ন্যায্য অধিকার নিগ্রো হইলেও মেয়েকে দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু দক্ষিণ অঞ্চলে হইলে মোকর্দ্দমা ত দূরের কথা, বিবাহের সংবাদ বাহির হইলেই হুলস্থূল পড়িয়া যাইত। নিগ্রো মেয়েকে মারিয়া ফেলাও কিছু আশ্চর্য্য মনে হইত না।

আজ নিগ্রোর মধ্যে উকীল, ডাক্তার, ব্যবসায়ী, পাদরী, অধ্যাপক এবং উচ্চ গভর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীর অভাব নাই। সহস্রপতি, লক্ষপতি, অনেক কোটিপতিও কয়েক জন আছে। থিয়েটারের অভিনেত্রী, গায়িকা, চলচ্চিত্রের নায়ক নায়িকাও এখন নিগ্রোদের মধ্যে প্রচুর দেখিতে পাওয়া যায়। বহু বাধা-বিঘ্নের মাঝে থাকিয়াও ইহারা যে উন্নতি করিয়াছে, আর কোনও জাতির ইতিহাসে এমন দেখা যায় না। এত উন্নতি করিয়াছে বলিয়াই সমস্যা এত জটিল। সে দিন ১ জন শ্বেতাঙ্গ আমেরিকান (Mr Eastman—যাঁহার ক্যামেরার ব্যবসায় আছে) ২৫ লক্ষ ডলার নিগ্রোদের বিশ্ববিদ্যালয়ে দিয়াছেন। নিগ্রোদের মধ্যে বর্ত্তমানে দুইটি দল আছে। এক দলের নেতা মার্কাস গার্ভী (Mr. Marcus Garvey) চাহেন যে, নিগ্রোরা অফ্রিকায় ফিরিয়া যাইয়া স্বাধীনভাবে সে দেশের মালিক হউক। অপর নেতা (Mr. Du Bois) মিঃ ডু বইস্ চাহেন যে, আমেরিকান নিগ্রো, আমেরিকার মানুষ হইয়া থাকুক। শ্রীশরৎচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

মাতৃ-সঙ্গীত

হে মম জননি ধন্যা,
মরতে স্বরগ-সম গণ্যা।
বিশ্বের সুষমা—সম্পদ-ভূষণা,
বিধাতৃ-মানস-কন্যা।
ত্রিংশতি-কোটিজন-জননী,
যুগ-যুগাতীত-প্রবীণা,
পীবর-পয়োধরা সুস্মের-আননী,
শাশ্বতী সুন্দরী নবীনা ;—
তব বীণা—
ওঁকার ঝঙ্কারে উথলিল সাম-গীতি-বন্যা!

জাগ মা—জাগ মা খোল আঁখি-পাতা,
একযোগে ডাকিছে ভগিনী-ভ্রাতা,
সন্তান-সন্তাপ দূর তরে—
জাগ মা নিদ্রিতা মাতা গো।
গঙ্গা-যমুনা-মণিহারা,
মুকুটিতা হেম-কূট-চূড়ে,
সাগর-মেখলা,—শ্যামল দুকুলা
ফুল-কুল অঞ্চল উড়ে ;—
ষড়ঋতু নিরত অনুরাগ-ভরে,—কূজন-গুঞ্জন-মধুরা দিগ্‌বধূরা—
ঢালে,—উদারা-মুদারা তারা-ঝারা!
জাগ মা—জাগ মা খোল আঁখি-পাতা,
একযোগে ডাকিছে ভগিনী-ভ্রাতা,
সন্তান-সন্তাপ দূর তরে—
জাগ মা নিদ্রিতা মাতা গো।
সন্তান সব তব বক্ষে,
তৎপর কলহে-দ্বন্দ্বে,
হলাহল ভক্ষে,—ছুটি সুধা-লক্ষ্যে
রুক্ষ মা উন্মাদ অন্ধে ;—
তমোময়ী নিদ্রা পরিহর জননি,—কর কর বণ্টন গুঞ্জ,—
গতি নাহি অন্য,—
ওগো,—বিরাজ লইয়া নিজ কক্ষে ;—
ভঞ্জন কর দুঃখ,—রঞ্জন কর গো—অঞ্জন দানি সব চক্ষে।
জাগ মা—জাগ মা খোল আঁখি-পাতা,
একযোগে ডাকিছে ভগিনী-ভ্রাতা,
সন্তান-সন্তাপ দূর তরে,—
জাগ মা নিদ্রিতা মাতা গো।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

গজুর ভজন

এক উপায় মাসী!

রাত্রি প্রায় দশটা বাজে, হেদোর ভিড় এক রকম নিঃশেষ হয়ে এসেছে, পুকুরের দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে একখানা বেঞ্চিতে ব'সে গজেন্দ্র একা। ১৫ দিন ক্ষয়রোগে ভুগে চন্দ্রদেবের কাল গঙ্গা লাভ হয়েছে; আকাশের-ও শারীরিক অবস্থা ভাল নয়, গায়ের আগা-গোড়া বসন্ত সব ডব্‌ডবে হয়ে পেকে উঠেছে। সাধারণ লোকের চক্ষুতে যা নক্ষত্ররাজি, গজেন্দ্রের দৃষ্টিতে আজ তা "মা'র অনুগ্রহ," কেন না, তিনি কবি এবং তাঁর মন আজ দুশ্চিন্তায় বিষাক্ত।

গজেন্দ্র জাতিতে বাঙ্গালী, পরিচ্ছদে ফিরিঙ্গী, পূজা-পার্ব্বণে হিন্দু, প্রণামী দেবার দায়ে ব্রাহ্ম, আহারে ক্রিশ্চান, ধনলিপ্সায় জৈন, মুষ্টিযুদ্ধের সম্মুখে বৌদ্ধ, আর পবিত্র প্রণয়ের মাহাত্ম্যে মামাত ভগ্নীকে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ করবার সময় দিন আষ্টেকের জন্যে আর্য্য-সমাজী হয়েছিলেন।

এই পবিত্র বন্ধন গজেন্দ্রকে সকল রকম পিতৃ-মাতৃ গোত্রবন্ধন হ'তে মুক্তি দিয়েছে। পুত্রের দন্ত-পংক্তি বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে-ই মাতা মুক্তিলাভ করেছেন। উপযুক্ত বংশধরের মনে উদার ভাবের অভি-ব্যক্তি আরম্ভেই পিতা ত্যক্ত-বিরক্ত হয়ে রক্তপিত্ত রোগে ৺ উক্ত হয়েছেন; এমন ছেলের জোড়া মেলে না, ভাল ক'রে বুঝিয়ে দেবার জন্যে-ই বিধাতা গজুর ভাই ভগ্নী কিছু-ই সৃষ্টি করেননি। মামাত ভগ্নীর উদ্বাহ-বন্ধন এবং মামীর উদ্বন্ধন ত্রিরাত্রির মধ্যে-ই চুকে গেছে। ভাগ্নের স্বাধীনতায় তিলমাত্র দীনতা নাই দেখে মামা শুভলগ্নে ভদ্রাসনখানি বিক্রয় ক'রে নিরুদ্দেশ হয়েছেন। অন্য কোন জ্ঞাতি খবর নেয় না এবং গজেন্দ্র-ও ডোণ্ট্‌কেয়ার।

তবু আজকের দিনে গজেন্দ্রের মনে পড়ছে, উপায় একমাত্র—মাসী।

শুনেছেন গজেন্দ্রের ধর্ম্মমত অতি উদার। মসিদ্‌, মন্দির, গির্জ্জে, বিহার, চৈত্য, মঠ প্রভৃতি সকল আফিস থেকে-ই ইনি এক একখানা লাইসেন্স নিয়ে রেখেছেন, যখন যা সুবিধে, তখন সেইটে ব্যবহার করেন।

বদরিকা (মিসেস্ গজেন্দ্র) প্রণয়ে চৌর্য্য ও পরিণয়ে আর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করলে-ও নিতে-থুতে একেবারে বনিয়াদি হিন্দু।

বিবাহের পর এই প্রথম পূজা। বদরিকার আট-পৌরে পরবার জন্যে পাবনা টাঙ্গাইলের ভাল মিহি শাড়ী চাই, বেড়াতে-টেড়াতে যাবার জন্যে সিল্কের অন্ততঃ তিন রঙের তিনখানা, সভাসমিতিতে যাবার জন্যে অন্ততঃ দু'খানা খদ্দর, এই দু'খানাতে-ই ত ৩০।৩২ টাকা পড়বে, ও সবের সুট মিলিয়ে সিল্কের, আদ্ধির, খদ্দরের ব্লাউজ, বডিস, জ্যাকেট। সিল্কের জুতো, চামড়ার জুতো, শাক-সব্জীর জুতো। তার পর ধর রুমাল আছে, চিরুণী, ফিতে, এসেন্স, এটসেটরা এটসেটরা। ওঃ বাবা, ভুলে গেছি, ব্যাঙ্গল ওয়াচের তাগাদা যে হনিমুনের পর থেকে-ই চলছে; এ সময় সেটা না দিলে ত পূজোর ফাঁড়া কাটবে না। এর ওপর আবার আছে উপহার প্রেরণ; অন্য কাকে-ও দিন না দিন, ওই যে দু'জন আসেন, এক জনের সঙ্গে ইমিতি পাতানো আর এক জনের সঙ্গে মফিন্ পাতানো আছে, এঁদের ত দেবেন-ই দেবেন। এর উপর বিলের উপর বিল, ফর্দ্দের উপর ফর্দ্দ আসতে আরম্ভ করেছে। উপায় একমাত্র—মাসী।

ইংরাজের উপর রেগে গজু থার্ড ক্লাসে উঠে-ই নোয়া-খালী স্কুল ছেড়ে দেয়। কুমিল্লা থেকে কলিহুঁকোর খোলের চালান আনিয়ে মামা কিছুকাল থেকে কল্-কাতায় কারবার করতেন। হুঁকোর সঙ্গে সঙ্গে-ই মাদুর, পাটী আর-ও পাঁচ রকম জিনিষ বিক্রী করতেন, আর সময় সময় কলকাতা থেকে-ও বিলিতী কাপড়, ছাতা

আর যখন যা সুবিধে হ'ত, দেশে চালান দিতেন, মামার বাসাতে থাকবার বন্দোবস্ত ক'রে গজেন্দ্র কলকাতা আর্ট স্কুলে ভর্ত্তি হন। সেখানে বছর দেড়েক দাঁড়ি টান্‌বার পরে-ই গজু বুঝতে পার্‌লে যে, যথার্থ আর্ট যা, তা এখানে কিছু-ই শেখান হয় না; একটা র‍্যাফেল ভ্যাণ্ডাইক্‌-ট্যাণ্ডাইক্‌ হবার জন্যে ইটালী যাওয়া উচিত। স্বপ্নে প্রত্যাদেশ পেয়ে চাঁদার প্রার্থনা-পত্র লিখে দু'পাঁচ যায়গায় ঘুরে এক জন পূর্ব্ববঙ্গের কবি-প্রাণ যুবক জমীদারকে কতকটা হাত-ও কর্‌লেন; কিন্তু সেই সময়ে ঐ জমীদার বাবুর অবশ্যপোষ্য শ্যালকপুত্রের ক্যামস্কাটকায় গিয়ে চরকাকাটা শিখে আসবার সখ হওয়ায়, চাঁদার ঘুঁটিটা চিকে উঠে বস্‌লো না। কাযেই গজু দু'-চারখানা বাড়ীর প্ল্যান নকল ক'রে কিছু কিছু উপার্জ্জন করে, আর দোকানদারের কাছ থেকে লিথোর ছবি এনে, ঘরে ব'সে রঙ ক'রে দিয়ে, শ' দরে যা' কিছু পায়। এই সময় থেকেই মামাতো বোন্‌ বদ্দির সঙ্গে গজুর প্রথম পরিচয়। বদ্দি বৈ বোন্‌টির আর কোন নাম ছিল না। তা'র মা'র মনে মনে ছিল যে, ক'নে দেখতে এলে মেয়ের কানে কানে শিখিয়ে দেবেন যেন নাম বলে "বদনমণি।" গজু—কবি; সুতরাং এই "আনত আনন" "মু'খানি" এটসেটেরার দিনে বদনে বেলফুল্‌ কবিতার আস্বাদ না পেয়ে গজেন্দ্র ভগ্নীর নামকরণ কর্‌লে—বদরিকা। কল্‌কাতায় উপার্জ্জনের টাকা যে কল্‌কাতায় বই-টই কিনে বাজে খরচ কর্‌বেন—মোছা-খালির মামা সে পাত্র নন, সুতরাং লেখাপড়ার সরঞ্জাম সাপ্লাইএর গ্যারাণ্টি দিয়ে বদরিকাকে শিক্ষিতা মহিলা কর্‌বার ভার গজেন্দ্র নিজে নিলে।

কবি চিত্র-শিল্পী শিক্ষক যে ছাত্রীকে ললিত বেশ বিন্যাস কর্‌তে আর চলিত প্রেমের উপন্যাস পড়তে শেখাবেন—সেটা অনায়াসে উপলব্ধি ক'রে নেওয়া যায়।

প্রায় বছর দুই আগে গজু যখন প্রথম কল্‌কাতায় আসে, তখন আশ্চর্য্য হয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে ঘোড়-গাড়ী দেখতো, ট্রাম গাড়ীর উপর রেলের মত চিম্‌নি নেই দেখে কেমন ক'রে চাকা ঘোরে—তা' ভাবতো; নলের ভিতর দিয়ে পিচকিরী ক'রে গ্যাসের বাতির মুখে তেল পৌঁছে দেয় মনে করতো; চৌরঙ্গীর দোকানের সাজানো সার্শির সাম্‌নে হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকতো; এক দিন আট আনার টিকিস কেটে থেটার দেখতে গিয়ে ছিনের ওলট-পালট দেখে ভোজ-বাজী মনে করেছিল, আর অ্যাক্টো যা'রা করে—তা'দের কোনমতেই সাধারণ মানুষ মনে কর্‌তে পারেনি। আর এক দিন বায়স্কোপের সামনের সিটে ব'সে একখানা ক্যাভালরি ফিল্মের ঘোড়াগুলো ষ্টেজের কিনারা পর্য্যন্ত দৌড়ে এসে পৌঁছতে দেখে-ই পাছে তা'র ঘাড়ের ওপর এসে পড়ে মনে ক'রে গজু বেঞ্চি থেকে উঠে দৌড়ে পালিয়ে গিছলো। কিন্তু ক্রমে সে সাহস ক'রে হামেসা বায়স্কোপ দেখতে যেতে আরম্ভ করলে, আর ঐ চলচ্চিত্র হ'তে-ই সে দস্যুতার বীরত্ব, চক্ষু বিস্ফারিত করার কস্‌ত, ভাবাভিব্যক্তির তাৎপর্য্য, আলিঙ্গনের সৌন্দর্য্য ও চুম্বনের মাধুর্য্য অনুভব করবার শক্তি পাঁচ সাত রাত্রের ভিতর-ই শিখে ফেল্‌লে। এখন সে নিজে ঘরে দোর দিয়ে একখানা টিনের আরসির ভিতর আপনার মুখভঙ্গিমা নানারূপে প্রতিবিম্বিত ক'রে কপাল কপোল চিবুক চক্ষু ও নাসার নানাবিধ জিমনষ্টিক অভ্যাস করে; ভগ্নী বদ্দিকে-ও সে হেলে-বেঁকে চিতিয়ে দাঁড়াবার, চোখ কপালে তুলে নাক ফুলিয়ে ঠোঁট কাঁপিয়ে সৌন্দর্য্যবিকাশের বৈচিত্র্য শিক্ষা দেয়; আর বাঙ্গালী গাল সহজে লাল হয় না ব'লে গজু মাঝে মাঝে গাল দু'টি টিপে দেয়, তা'তে কতকটা পুঁইমিটুলী রঙের আমেজ পাওয়া যায়।

"পণ্ডিতস্পর্শেণ পাণ্ডিত্যমুপজায়তে," এই শাস্ত্র শাসন স্মরণ ক'রে গজু বোন্‌টিকে আপনার গা ঘেঁসিয়ে বসিয়ে বিদ্যা দান করে, মাঝে মাঝে "প্রেমের গণতন্ত্র" প্রভৃতি পুস্তকের লোকাতীত শিল্প-সৌন্দর্য্যের ভাব বুঝিয়ে দেবার জন্যে তা'র কুন্তল-দলাচ্ছাদিত পিঠটিতে আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে দেয়। কখন-ও বা তা'র কপালের চুল গালের উপর ঝুলে পড়লে হাত দিয়ে তুলে দেয়। শিক্ষার অধিক ভাগ সুলভ-সিরিজের সাহায্যে চল্‌লেও "ভাই-দাদা" "বইনকে" ধর্ম্মশিক্ষা দিতে গাফিলি করে না। মহাভারতাদি পুরাণ থেকে দৃষ্টান্ত বেছে বেছে স্বর্গীয় ও সেমিস্বর্গীয় প্রণয়ে কি উদারতা ছিল, তা দেখিয়ে দেয়, যথা;—ব্রহ্মার

কন্যার প্রতি আসক্তি, চন্দ্রের প্রতি তারার পত্র, ইন্দ্রের গৌতমী গ্রহণ, পিস্‌তুত বোন সুভদ্রার সহিত অর্জ্জুনের বিবাহ, ইত্যাদি, ইত্যাদি। ভ্রাতা ভগ্নীর এই স্নেহ-দুগ্ধ যখন অজ্ঞাতভাবে প্রেমের গাঢ় রাবড়ীতে পরিণত হচ্ছিল, তখন কোন-ও কোন দেবতা অলক্ষ্যে থেকে বর্ত্তমান বঙ্গে এই অপূর্ব্ব বিবর্ত্তন দেখছিলেন, বিশেষ একটি চক্ষুহীন গ্রীক্ ঠাকুর।

* * * *

বছর চারেক কেটে গেছে। বিবেকের টিকৃটিকুকে দায়ভাগের দোহাই দিয়ে চুপ করিয়ে এক রাত্রে মাতুলের রাতুল চরণ টিপ্‌তে টিপ্‌তে অতুল কর-কৌশলে কিরূপে গজু তাঁ'র বালিসের তলা থেকে তেঁতুল বেচা দেড় শ' খানিক টাকা ভাগ্নের ন্যায্য প্রাপ্য ব'লে গ্রহণ ক'রে ভালবাসার আদেশে বাসা থেকে প্রস্থান করে; আধ ঘণ্টাটাক পরে বদি-ই বা কি উপায়ে পাপ্‌ বাপের বাড়ী ছেড়ে শিবঠাকুরের গলির মোড়ে গিয়ে নায়কের ভাড়া করা ছ্যাকড়া গাড়ীতে উঠে হাবড়া থেকে ভাগলপুরে গিয়ে উপস্থিত হয়, সে বিবরণ লিপিবদ্ধ করা লেখকের অসাধ্য।

বাঙ্গালী, হিন্দুস্থানী, উড়ে কোন-ও বামুনই যখন এ বিবাহে মন্ত্র পড়াতে স্বীকৃত হলেন না, তখন কি ভয়ে যে পাত্রটি পাত্রীটিকে নিয়ে মস্‌জিদের দ্বারে উপস্থিত না হয়ে স্থানীয় ব্রাহ্মসমাজে ও পরে এক এক ক'রে দু'টি গির্জ্জা ঘরে গিয়ে আশীর্ব্বাদ লাভে ব্যর্থমনোরথ হয়ে শেষ আর্য্যসমাজী হরজন দাসের দয়ায় ভ্রাতা-ভগ্নী ভর্ত্তা-ভাৰ্য্যায় রূপান্তরিত হয়, তা' যিনি সোঁয়াপোকাকে প্রজাপতিতে পরিণত কর্‌তে পারেন, তিনিই জানেন।

বিবাহের পর কলকেতায় ফিরে এসে গড়পারের একটি সরু গলির মধ্যে দু'জনে বাসা ক'রে আছেন। চলছে কেমন ক'রে, তা' আমরা ত আমরা—যাঁ'দের চলচে, তাঁ'রা নিজে-ও বুঝিয়ে দিতে পারেন কি না, সেটা বিশেষ সন্দেহের বিষয়।

এ কল্‌কেতা একটি আজব সহর। এখানে কেমন ক'রেই বা কা'র চলে, অচল হঠাৎ কি ক'রে সচল হয়ে দাঁড়ায়, স্বচ্ছল কি ক'রে হঠাৎ অচলতা প্রাপ্ত হয়, তা কেউ বুঝতে পারে না। এই—বাড়ী, গাড়ী, ইলেক্‌ট্রিক ফ্যান্‌, জেণ্টেলম্যান, দরজায় পিতলের প্লেট ডি, ডি, ডে, মস্ত জমীদারের বাড়ী মেয়ের বে;—দু'দিন বাদেই দেখা যায়, ভদ্রাসনখানি বিক্রী কর্‌বার জন্যে দালাল ঘুর্‌চে। আবার অনেক অনুসন্ধানে মাসিক ৮০।৮৫ টাকার উপর আর কোন আয় খুঁজে পাওয়া যায় না, অথচ মার্ব্বেল বসান, ইলেট্রিক ফিট-করা ১শত ৭৫ টাকা ভাড়া বাড়ীর তেতলায় বাস, ট্যাক্সিতে যাতায়াত, বাজে খরচের ব্যয়-ও অল্প নয়, একটি ছেলে বিলেতে ব্যারিষ্টার হ'তে গেছে, আর একটি সেণ্টজেভিয়ারে পড়ছে, মেয়ের পড়াশুনোর ছাড়া মিউসিক্ মাষ্টার পর্য্যন্ত নিযুক্ত আছে; এ যে কি ব্যাপার, তা সাধারণ গেরস্ত লোকে বুঝবে কি, যাঁরা চাঁদা আদায়ের ফাইন আর্টে মাষ্টার, তাঁরাও অনেক সময় ঠিক করতে পারেন না।

তবে গজেন্দ্রের পেণ্টার ব'লে কতকটা নাম এখন বেরিয়েচে। শুধু গজেন্দ্রের নয়, চিত্রকরদের মধ্যে অনেকেরই কার্য্যক্ষেত্র এখন প্রসারিত হয়েছে।

এক সময় কতকগুলি নাপিত ছিল, তারা নখ কাট্‌তে বাধাতো, দাড়ীতে ক্ষুর ঠেকালেই একটু রক্ত বেরুতো, চুল ছাঁট্‌তে গেলে পাঁচচুড়ো ক'রে ফেল্‌তো; ব্যাচারীদের গঙ্গার ধারে, বাজারের পথে ব'সে দিন গোটা আষ্টেক দশ পয়সা, আর কতকগুলো গালাগালমাত্র উপার্জ্জন হ'তো; কিন্তু চুলছাটার ফ্যাসানে কড়াঙ্গে-গণ্ডাকে ঢোকা অবধি সেই সব নাপিতরা এখন সাড়ে দশ আনা সাড়ে পাঁচ আনা, ন' আনা-সাত আনা, তিন আনা তের আনা গোছ চুল কপ্‌চে আজকাল কাঁচি ধর্‌লেই চার আনা থেকে ছ' আনা পায়, যে সৌখীন বাবুদের বাপটাপ এখনও পিঁজরেপোলে যাননি, খালি ছেলের চুলছাটা আর শুঁড়তোলা জুতো যোগাবার জন্যেই চাকরী করেন, তাঁরা আরও দু' আনা চার আনা বেশী দিয়ে থাকেন।

এক সময়ে আর্ট স্কুলের ফেরতাদেরও অবস্থা বড় মন্দ ছিল; অই-প্ল্যান তৈরী বা লিথোগ্রাফে রং দেওয়া বা কখন কখনও এক-আধখানা লক্ষ্মী সরস্বতীর ছবি এঁকে দোকানদারকে কপিরাইট্‌ বিক্রী। খুব যথার্থ ভাল চিত্রকররাও বড়লোকদের প্রতিকৃতি আঁকবার অর্ডার যোগাড় কর্‌তে পার্‌তো না।

এ দেশের লোকের যখন ফ্যাসানজ্ঞান ছিল না, তখন যেমন ধানকাটা নাপিতদের বিদ্যার দৌড় বুঝতে পারেনি; তেমনি কলা-জ্ঞানের অভাবে শিক্ষিত লোক এক দিন গুণাকর চিত্রকরদের আদর-ও করেনি; বঙ্গের হৃদয়চাঁদ যেই কলায় কলায় উল্‌সে উঠল, অমনি কোন লুকান খনির অন্ধকার থেকে সেমুর, ফিজ্, ক্রিকস্যাঙ্ক, গিলবার্ট, ল্যাণ্ডসিয়ার প্রভৃতি ব্রস-বীরের দল ধরাতল ও টিটাগড় কলের ধলা আঁচল উজল করতে লোক-জনের সমীপবর্ত্তী হলেন।

এই নবীন শিল্পি-সম্প্রদায়ের মধ্যে যাঁরা কুলীন, তাঁরা আঁকেন সৌন্দর্য্য, আর যাঁরা শ্রোত্রিয়, তাঁরা আঁকেন বাঁদর্য্য। কুলীনকুল কদর্য্য পুরুষজাতির ছায়া স্পর্শ করেন না, সৌন্দর্য্যের একমাত্র উপাদান যুবতী নারী তাঁদের অবলম্বন—তাঁদের আদর্শ, আবার পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতাপে নারীর পশ্চাদ্দিকের সৌন্দর্য্যস্তূপ-ই তাঁদের তুলিকা-মুখে গোলাপী রঙে প্রস্ফুটিত হয়।

একটা গ্রাম্য গল্প আছে যে, গাভী প্রসব হয়েছে শুনে কর্ত্তা বাড়ীর ভেতর গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কি বাছুর হয়েছে? অন্দরে তখন ছোট বউ বই আর কেউ ছিল না, লজ্জাবতী ঘোমটা খুলে শ্বশুরের সঙ্গে কথা কয় না, কাযে-ই আপনাকে দেখিয়ে ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিলেন যে নৈ-বাছুর।

সুরুচির দরবার থেকে কবির লেখনীর উপর ইনজংসান জারী হয়েছে, "নিবিড় নিতম্ব তোলে তুমুল তুফান", "কদম্ব বিদরে দেখি পয়োধরদম্ভ" "উলঙ্গ অঙ্গনা উরু চারু রম্ভাতরু" প্রভৃতি পদ আর সীসকের অক্ষরে চক্ষুর সামনে দেখা দেয় না। 'সধবার একাদশী'র "সান ইন ল সার" যেমন গুলীতে শরীর খারাপ হয়, সুতরাং গুলী ইজ্ ভেরী ব্যাড ব'লে মদের বোতলে আশ্রয় নিয়েছিল, তেমনি সৌন্দর্য্যের শিল্প লেখনীকে ত্যাগ ক'রে তুলিকার আশ্রয় করেছে। প্রেমিক শিল্পী—ছোট বউ পাঠকরূপ শ্বশুরের সাম্‌নে লজ্জা বিসর্জ্জন দিয়ে মুখে না কথা ক'য়ে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এঁকে দেখিয়ে দেন।

শ্রোত্রিয় শিল্পীরা বাঁদর্য্য আঁকেন ব'লে তাঁদের উপাধি হয়েছে ব্যঙ্গ কবি; রসিকরা বাপকেও মাফ করে না। গোপাল ভাঁড় অন্নদাতা রাজাকেও ছাড়ত না, ব্যঙ্গ শিল্পীরা-ও বা কেন ব্যঙ্গ কলাকে-ই ব্যঙ্গ করতে ছাড়বে? এই আর্টের বাজারে গজেন্দ্রের-ও যে পার্টস্ আছে, তা সমজদাররা বুঝতে পেরেছে। গজেন্দ্র কুলীন শিল্পী, তবে কেউ কেউ বলে যে, তিনি কখন কখন লুকিয়ে শ্রোত্রিয়দের সহিত ক্রিয়া ক'রে ভঙ্গ হয়েছেন। চিত্রকরের কার্য্যে মডেল অন্বেষণ, মডেল নির্ব্বাচন একটা শ্রম ও ব্যয়সাধ্য ব্যাপার। গজেন্দ্রের কিন্তু এইখানে-ই ভয়ঙ্কর সুবিধা; মডেল তাঁর গৃহে অঙ্কলক্ষ্মীরূপে চতুর্ব্বিংশতি ঘটিকা বিরাজমানা। বদরিকা স্নান ক'রে ভিজা কাপড়ে চুল মোছে, গজেন্দ্র ছবি আঁকে, বদরিকা খেয়ে-দেয়ে উঠে এলো-থেলো হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে, গজেন্দ্র রূপটুকু তুলীতে এঁকে তুলে নেয়, বৈকালে বদরিকা চুল বাঁধে,—অস্তাচলের আড়ালে ব'সে গজেন্দ্র পাশ্চাত্য-লাবণ্য বর্ণলীলায় ফলাতে থাকে। এ ছাড়া কলার কল্যাণে ফুলের থালা নিয়ে পূজায় বসে, কপালে দুই চক্ষু তুলে হাত জোড় ক'রে ধ্যানমগ্না হয়, বেরাল কোলে ক'রে মাতৃমূর্ত্তি দেখায়, সাদা গরদ প'রে কখন কখন বিধবা সাজে, আর বিবিধভাবে অঙ্গবিন্যাস,—সে ত ফিলিমশিল্প অধ্যয়ন ক'রে আগেই গজ্‌বাদিকে শিখিয়েছিল।

শোনা গেছে, কোন চূণের মহাজন রাজা বাহাদুর "স্বরাজ-সরোজ" ব'লে গজেন্দ্রের একখানা কিট্ সাইজের ছবি, ৩ শত টাকা মূল্যে ক্রয় করেছিলেন, তাই থেকে আড়াই শ' টাকা দিয়ে গজেন্দ্র বদরিকাকে একটা ব্রেসলেট কিনে মডেল-দক্ষিণা দেয়। সেই ছবিতে একটি জলপূর্ণ কাচের টবে ব'সে বদরিকা,—মুক্ত কেশজাল, মৃণালনাল আর জলের উপর আধ-ডোব আধ-ভাসমান এক জোড়া পদ্মের বদলে—যাক।

এই রকম ক'রে কতক ধারে কতক নগদে গজুর সংসারে খাইখরচ, বাসা-ভাড়া, ট্রাম-ভাড়া প্রভৃতি এক রকম চ'লে যাচ্ছে। কিন্তু পূজা?—ছবি-ও হাতে তৈরী নেই, ধার-ই বা দেয় কে? কোন দিকে কোন পথ নেই। একমাত্র উপায় মাসী! যাব না কি নবদ্বীপে?—দেখি।

শ্রীঅমৃতলাল বসু।

মুসলমান বৈষ্ণব কবি

চৈতন্যদেবের কালে মুসলমান হরিদাস বৈষ্ণব-শ্রেষ্ঠ ছিলেন, এ কথা সকলেই জানে। জাতিধর্ম্মভেদ তখন ভাসিয়া গিয়াছিল, যাহার মুখে হরিনাম শুনিতেন, গৌরাঙ্গ তাঁহাকেই কোল দিতেন, কাহারও জাতি জিজ্ঞাসা করিতেন না। কত মুসলমান যে বৈষ্ণব হইয়াছিলেন, তাহা বলিতে পারা যায় না। কিন্তু কয়েক জন মুসলমান কবির নাম পদকল্পতরুতে পাওয়া যায় এবং তাঁহাদের রচিত কয়েকটি পদও আছে। ক্ষোভের বিষয়, পদের সংখ্যা বড় অল্প, কিন্তু যে কয়টি পদ আছে, উত্তম। চারি জন মুসলমান কবির নাম পাওয়া যায়,—নসীর মামুদ (নসীর মহম্মদ), সৈয়দ মরতুজা (মুরতুজা) আকবর আলী এবং সালবেগ। ইঁহাদের রচিত পদ উদ্ধৃত হইল--

চলত রাম সুন্দর শ্যাম
পাচনী কাচনি বেণ বেণু
মুরলী খুরলি গানরি।
প্রিয় শ্রীদাম সুদাম মেলি
তপনতনয়া-তীরে কেলি
ধবলি সাঙলি আওরি আওরি
ফুকরি চলত কানরি॥
বয়সে কিশোর মোহন ভাতি
বদন ইন্দু জলদ কাতি
চারু চন্দ্রি গুঞ্জাহার
বদনে মদন ভানরি।
আগম নিগম বেদসার
লীলায় করত গোঠ বিহার
নসির মামুদ করত আশা
চরণে শরণ দানরি॥

* * * *

শ্যামবন্ধু চিত নিবারণ তুমি।
কোন শুভ দিনে দেখা তোমা সনে
পাশরিতে নারি আমি॥
যখন দেখিয়ে ও চাঁদবদন
ধৈরজ ধরিতে নারি।
অভাগীর প্রাণ করে আনচান
দণ্ডে দশ বার মরি॥
মোরে কর দয়া দেহ পদছায়া
শুনহ পরাণ কানু।
কুলশীল সব ভাসাইনু জলে
প্রাণ না রহে তোমা বিনু॥
সৈয়দ মরতুজা ভণে কানুর চরণে
নিবেদন শুন হরি।
সকল ছাড়িয়া রহিল তুলিয়া
জীবন মরণ ভরি॥

* * * *

দেখ দেখ প্রীতম প্যারিক সোহাগে।
স্বহস্তে বীড় শ্যাম দেত
খণ্ডিত আধ আপ লেত
পোঁছত পট পীত পীক
অতিশয় অনুরাগে॥
কাঞ্চনকে গড়ত কান
ভাতি ভাতি রাখত মান
নিরখত বদনারবিন্দ
পলকন নাহি লাগে।
কুঞ্জমে রসপুঞ্জ কেলি
পান খাওয়ে ছছকি ঝেলি
দুহুঁ শ্রীমুখ তাম্বুল পাই
আকবর আলি ভাগে॥

এই তিন কবির সম্বন্ধে কিছু জানা নাই। চতুর্থ সালবেগ। ইঁনি উড়িষ্যাবাসী, পদকল্পতরুতে ইঁহার রচিত তিনটি পদ আছে, দুইটি বাঙ্গালা, তৃতীয়টি উড়িয়া ভাষায়। সালবেগ ও লালবেগ দুই ভাই, দুই জনই বৈষ্ণব। সালবেগের রচিত গান এখনও উড়িষ্যায় গীত হয়। বাঙ্গালা পদ দুইটি এই,—

নাগরী নাগরী নাগরী।
কত প্রেমের আগোরী নব নাগরী॥
কনক কেতকী চাঁপা তড়িতবরণী।
ইন্দীবর নীলমণি জলদবসনী॥
মৃগজ পঙ্কজ মীন খঞ্জন নয়ানী।
কামধনু ভ্রমর পংক্তি ভুরু ভুজঙ্গিনী॥
নাসা তিলফুল খগ চম্পাকলি জিতা।
ঘামীজল বহন্তি বেণী ঝাঁপি ঝলকিতা॥
ভালে সে সিন্দুরবিন্দু শোভে কেশশোভা।
জিনি ইন্দীবর বাহু তমালের আভা॥
ভাল বিরাজিত উরে মোতিম-হারা।
হংস-বক-শ্রেণী গঙ্গাজল দুগ্ধধারা॥
কহে সালবেগ হীন জগত পামরা।
রসের কলিকা রাই কানু সে ভ্রমরা॥

* * * *

জয় জয় রাধে গোপাল গোপাঙ্গনা রে।
শীশ মোর মুকুট নট সোহে কটি পীততট
কিঙ্কিণী অধিক শোহাওনা রে॥
ভালে কেশর তিলক কাণে কুণ্ডল ঝলক
অধর পর মুরলী সুখ পাওনা রে।
যমুনাতট রঙ্গিণী সকল রমণীমণি
রূপ নব দামিনী গঞ্জনা রে॥
ঘন্ন ন ন ঘ রব বর উঘট ভেদ যন্ত্রবর
সাত সরতাল বিশ মূর্চ্ছনা রে।
থিগি নিগি নিধিদ্ধিকট তাগ ধেনা তিন্তিগট
সাল বেগ পূরল মন কামনা রে॥

উড়িয়া ভাষায় পদ,—

হের হো নীলগিরি রাজহি।
সুভদ্রা বলরাম সঙ্গে অনুপাম
বিমান মণ্ডল মাঝহি॥
শঙ্খ ঘণ্টা কাঁশী বেণু বীণা বাঁশী
মধুর দুন্দুভি বাজন্তি।
সেবাতি পড্যারি ঘট ভরি বারি
ঢার উতাকঙ্ক * মাখন্তি॥
জয় জয় ধ্বনি সুর নর মুনি
স্তুতি নতি প্রণিপাত হি।
শীমুখচন্দ্রক সৌরভ আউছ
গজেন্দ্র বেশক অপহি॥
জয় যদুপতি তিন লোক গতি
বহু উপহার ভোজন্তি।
মণিকোটা † চলে সালবেগ বলে
দেবনারীগণ বাচন্তি।

গৌরচন্দ্রিকা

শ্রীচৈতন্যের অভ্যুদয়ে ধর্ম্মে যেমন ভক্তিমার্গ প্রবল হয়, জাতির অভিমান তিরোহিত হয়, সেইরূপ তাঁহার মাহাত্ম্যে অতি অপূর্ব্ব অভিনব সাহিত্যের সৃষ্টি হয়। এই যুগে যে সকল পদ-রচয়িতাদিগের নাম পাওয়া যায়, তাঁহাদের মধ্যে কয়েক জন অপর অনেক গ্রন্থ রচনা করেন। তাহার কতক সংস্কৃত, কতক বাঙ্গালা। সে সকল গ্রন্থ এই আলোচনার বহির্ভূত বলিয়া এখানে উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই। ইতঃপূর্ব্বে বলিয়াছি, রাধাকৃষ্ণের প্রায় সকল প্রকার লীলার পূর্ব্বে গৌরচন্দ্রিকা আছে, অর্থাৎ কৃষ্ণপ্রেমের তন্ময়তায় চৈতন্যের সকল প্রকার ভাবাবেশ হইত, এবং সেই সকল ভাব বৈষ্ণব কবিগণ অসঙ্কোচে পরম আনন্দের সহিত বর্ণনা করিয়াছেন। সর্ব্বত্যাগী যতি সন্ন্যাসী চৈতন্য ও গোপীবল্লভ দামোদরের লীলার সাদৃশ্যের কারণ শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায়। উদ্ধবকে ব্রজপুরে পাঠাইবার সময় শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে কহিতেছেন,—

গচ্ছোদ্ধব ব্রজং সৌম্য পিত্রোর্নৌ প্রীতিমাবহ।
গোপীনাং মদ্বিয়োগাধিং মৎসন্দেশৈর্বিমোচয়॥

* উতাকঙ্ক অর্থে উবটন, অঙ্গ-সংস্কারের জন্য হরিদ্রা, তৈল, সর, ময়দা প্রভৃতি। † মণিকোটা—মণিময় অট্টালিকা।

তা মন্মনস্কা মৎপ্রাণা মদর্থে ত্যক্তদৈহিকাঃ।
মামেব দয়িতং প্রেষ্ঠমাত্মানং মনসা গতাঃ।
যে ত্যক্তলোকধর্ম্মাশ্চ মদর্থে তান্ বিভর্ম্যহম্॥ *

হে সৌম্য উদ্ধব, ব্রজে গমন করিয়া আমাদিগের পিতামাতার আনন্দ উৎপাদন কর, আমার বিরহে গোপীদিগের যে মনঃপীড়া হইয়াছে, আমার সংবাদ দ্বারা তাহা মোচন কর। তাহাদের মন আমাতেই অর্পিত, আমিই তাহাদিগের প্রাণ, আমার জন্য তাহারা দেহসম্বন্ধীয় সকলকে (পিতা পুত্র প্রভৃতিকে) ত্যাগ করিয়াছে (এবং) প্রিয়তম আত্মা আমাকেই মন দ্বারা প্রাপ্ত হইয়াছে। যাহারা আমার নিমিত্ত ঐহিক ও পারলৌকিক সুখ পরিত্যাগ করে, আমি তাহাদিগকে সুখী করিয়া থাকি

ব্রজপুরীতে গিয়া উদ্ধব গোপীদিগকে বলিতেছেন,—

অহো যূয়ং স্ম পূর্ণার্থা ভবত্যো লোকপূজিতাঃ।
বাসুদেবে ভগবতি যাসামিত্যর্পিতং মনঃ॥
দানব্রততপোহোমজপস্বাধ্যায়সংযমৈঃ।
শ্রেয়োভির্বিবিধৈশ্চান্যৈঃ কৃষ্ণে ভক্তির্হি সাধ্যতে॥
ভগবত্যুত্তমঃশ্লোকে ভবতীভিরনুত্তমা।
ভক্তিঃ প্রবর্ত্তিতা দিষ্ট্যা মুনীনামপি দুর্লভাঃ॥
দিষ্ট্যা পুত্রান্ পতীন্ দেহান্ স্বজনান্ ভবনানি চ।
হিত্বাহবৃণীত যূয়ং যৎ কৃষ্ণাখ্যপুরুষং পরম্॥ †

অহো, তোমরা নিশ্চিত লোকে পূজনীয়; কারণ, ভগবান্ বাসুদেবে তোমাদের মন সমর্পিত রহিয়াছে। দান, ব্রত, তপস্যা, হোম, জপ, বেদাধ্যয়ন, ইন্দ্রিয়দমন এবং অন্যান্য বিবিধ মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান দ্বারা শ্রীকৃষ্ণে ভক্তিসাধন করিতে হয়। সৌভাগ্যক্রমে ভগবান্ উত্তমঃশ্লোকে তোমাদিগের মুনিগণের দুর্লভ অত্যুৎকৃষ্ট ভক্তি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। ভাগ্যবলে তোমরা পুত্র, পতি, দেহ, স্বজন ও গৃহ সকল পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ নামক পরম পুরুষকে বরণ করিয়াছ।

চৈতন্যের লীলা দেখিয়া অথবা শুনিয়া এবং তাঁহাকে কৃষ্ণাবতার নিশ্চিত করিয়া জানিয়া বৈষ্ণব কবিগণ ভক্তি-প্রেমে পরিপ্লুত হইয়া বীণাপাণি বাণীকে স্মরণ করিতেই তিনি মুখরিত ঝঙ্কৃত বীণা লইয়া তাঁহাদের কণ্ঠে অবতীর্ণ হইলেন। চৈতন্যপ্রেমের বন্যার সঙ্গে সঙ্গে পীযূষপূর্ণ কাব্যধারা প্রবাহিত হইল। শুধু বঙ্গদেশে কেন, বঙ্গের বাহিরেও ইহার প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায়। হিন্দী ভক্তমাল গ্রন্থে সাধু সুকবি নাভাজী চৈতন্য অবতারের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—

গোপিনীকে অনুরাগ আগে আপ হারে শ্যাম
জান্যো য়হ লাল রঙ্গ কৈসে আবে তনমেঁ।
এ তো সব গৌর তন নখ শিখ বনী ঠনী
খুল্যো য়ো সুরঙ্গ অঙ্গ অঙ্গ রঙ্গে বনমেঁ॥

*　*　*　*

জসুমতি সুত সোঈ শচীসুত গৌর ভয়ে।

*　*　*　*

কৃষ্ণ-চৈতন্য নাম জগত প্রগট ভয়ো॥

*　*　*　*

জিতো গৌড়দেশ ভক্তি লেশহূ ন জানে কোউ
সেউ প্রেম সাগরমেঁ বোর্যো কহি হরি হৈ।

*　*　*　*

কোটি কোটি অজামীল বারি ডারে দুষ্টতা পৈ
ঐ সে হূ মগন কিয়ে ভক্তি ভূমি ভরী হৈ॥ *

অর্থ—গোপিনীর অনুরাগের কাছে শ্যাম আপনি হারিলেন; ভাবিলেন, এই (গোপীর) লাল রং কেমন করিয়া অঙ্গে আসে? ইহাদের ত দেহ নখ গৌরবর্ণ, কেশ উত্তম সজ্জিত, বনে (বৃন্দাবনে রাসবিহারে) রঙ্গাবেশে অঙ্গে অঙ্গে সৌন্দর্য্য মুক্ত হইয়াছিল।… যশোমতীসুত তিনিই শচীসুত গৌর হইলেন…কৃষ্ণ-চৈতন্য নাম জগতে প্রকটিত হইল।…যে গৌড়দেশে কেহ ভক্তির লেশমাত্র জানে না, তাহাকেও হরিনাম কহিয়া প্রেম-সাগরে ডুবাইয়া দিলেন।…কোটি কোটি অজামিলকে দুষ্টতা হইতে (রক্ষা করিয়া ঐ সাগরে) নিক্ষেপ করিলেন, ভক্তিতে এরূপ মগ্ন করিলেন যে, তাহাতে (ধরণী) ভূমি ভরিয়া আছে।

* শ্রীমদ্ভাগবত, ১০ম স্কন্ধ, ৪৬ অধ্যায়।
† ঐ ঐ ৪৭ অধ্যায়।

* ভক্তমাল গ্রন্থ দ্বিতীয় মালা।

হিন্দীভাষায় আর এক জন কবি হরিদাস লিখিয়াছেন,—

রসময় মূরতি যো গোকুল নিত্যবিহার।
মন মে উপজি বাসনা গোর ভেয় অবতার॥

*   *   *   *

নিশিদিন রাধাভাব ধরি শ্যাম ভেয় দ্যুতি গৌর।
মন ঔর আনন নয়নমে রাধা বিনু নহি ঔর॥

রসময় মূর্ত্তি যিনি নিত্য গোকুলে বিহার করিতেন, গৌরবর্ণ হইয়া অবতার হইতে তাঁহার মনে বাসনা উৎপন্ন হইল।…নিশিদিন (মনে) রাধাভাব ধারণ করিয়া শ্যামের গৌর দ্যুতি হইল, মনে, মুখে ও চক্ষুতে রাধা বিনা আর কিছু নাই। *

বৈষ্ণব-কবিরা অনেকেই চৈতন্যকে দেখেন নাই, কিন্তু তাঁহারা সকলেই চৈতন্যদেবের তিরোভাবের অল্পদিন পরেই জন্মগ্রহণ করেন। তখন গৌরাঙ্গের মাহাত্ম্যে ও তাঁহার লীলার বিচিত্রতায় বঙ্গদেশ, উৎকল, ব্রজভূমি ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হইতেছে। সুতরাং চৈতন্যের জীবনবৃত্তান্ত সম্বন্ধে তাঁহারা যাহা লিখিয়াছেন, তাহা অলীক অথবা কল্পিত নহে, কেবল লীলাপ্রকরণ কৃষ্ণলীলার সহিত সামঞ্জস্য রাখিবার কারণে কতক কল্পিত। সাদৃশ্য কেবল প্রেম ও মধুর লীলায়, কৃষ্ণ যে সকল অসুর ও দুর্বৃত্ত ব্যক্তিদিগকে নিধন করিয়াছিলেন, সে সকল কীর্ত্তি চৈতন্যলীলায় নাই। দেবকী-নন্দন বৈষ্ণব-কবি লিখিয়াছেন,—

নাহি নাহি রে গৌরাঙ্গ বিনু
দয়ার ঠাকুর নাহি আর।
কৃপাময় গুণনিধি সব সব মনোরথ
সিদ্ধিপূর্ণ পূর্ণ অবতার॥

*   *   *   *

রাজাদি অবতারে ক্রোধে নানা অস্ত্র ধরে
অসুরেরে করিল সংহার।
এবে অস্ত্র না ধরিল কারু প্রাণে না মারিল
মনশুদ্ধি করিল সবার॥

বাঙ্গালী কবি গোবিন্দদাস কৃত গৌরচন্দ্রের বর্ণনা,—

দেখত বেকত গৌরচন্দ্র
বেঢ়ল ভকত নখত বৃন্দ
অখিল ভুবন উজোরকারী
কুন্দ কনক কাঁতিয়া।
অগতি পতিত কুমুদবন্ধু
হেরত উছল রসিকসিন্ধু
হৃদয় কুহর তিমিরহারী
উদিত দিনহু রাতিয়া॥
সহজে সুন্দর মধুর দেহ
আনন্দে আনন্দ না বান্ধে থেহ
ঢুলি ঢুলি ঢুলি চলত
মত্ত করিবর গতি ভাঁতিয়া।
নটন ঘটন ভৈ গেল ভোর
গোবিন্দ মাধব মুকুন্দ বোল
রোয়ত হসত ধরণী খসত
সোহত পুলক পাঁতিয়া॥
মহিম মহিমা কো কহু ওর
নিজ পর ধরি করই কোর
প্রেম অমিঞা হরখি বরখি
তরখিত মহী মাতিয়া।
ও রসে উত্তম অধম ভাস
বঞ্চিত একলি গোবিন্দদাস
কো জানে কো বিহি গড়ল
কাঠ কঠিন ছাতিয়া॥

চৈতন্যদেবে কৃষ্ণের কৈশোরলীলার অলীক কল্পনা,—

শচীর কোঙর গৌরাঙ্গ সুন্দর
দেখিনু আঁখির কোণে।
অলখিতে চিত হরিয়া লইল
অরুণ নয়ান বাণে॥
সই মরম কহিনু তোরে।
এতেক দিবসে নদীয়া নগরে
নাগরী না রবে ঘরে॥
রমণী দেখিয়া হাসিয়া হাসিয়া
রসময় কথা কয়।

---

* ভক্তমাল, ত্রয়োবিংশ মালা।

নিচয় করিয়া মনে দঢ়াইনু
পরাণ র'বার নয় ॥
কোন পুণ্যবতী যুবতী ইহার
বুঝয়ে রস-বিলাস।
তাহার চরণ হৃদয়ে ধরিয়া
কহয়ে গোবিন্দদাস ॥

বিদ্যাপতি যেমন রাধার বয়ঃসন্ধি বর্ণনা করিয়াছেন, রাধামোহন ঠাকুর সেই ভাবে গৌরাঙ্গের কৈশোর অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন,—

দেখ সখী গোরা গোর অনুপাম।
শৈশব তরুণ লখই না পারিয়ে
তবহু জিতল কোটি কাম ॥
সুরধুনীতীরে সবহু সখা মেলি
বিহরয়ে কৌতুক রঙ্গি।
কবহু চঞ্চল গতি কবহু ধীরমতি
নিন্দিত গজগতি ভঙ্গি ॥
ধীর নয়নে ক্ষণে ভোরি নেহারই
ক্ষণে পুন কুটিল কটাখ।
কবহুঁ ধৈরজ ধরি রহই মৌন করি
কবহুঁ কহই লাখে লাখ ॥
রাধামোহন দাস কহই সতী
ইহ নব বয়সে বিলাস।
যছু লাগি কলিযুগে প্রকট শচীসুত
সোই ভাব পরকাশ ॥

পূর্ব্বরাগের অনুরূপ পদ,—

কি ক্ষণে দেখিনু গোরা নবীন কামের কোঢ়া *
সেই হইতে রহিতে নারি ঘরে।
কত না করিব ছল কত না ভরিব জল
কত যাব সুরধুনীতীরে ॥
বিধি তো বিনে বলিতে কেহো নাহি।
যত গুরু গরহিত গঞ্জন বচন কত
ফুকরি কান্দিতে নাহি ঠাঞি ॥
অরুণ নয়ানের কোণে চাহিছিল আমা পানে
পরাণে বড়সি দিয়া টানে।
কুলের ধরম মোর ছারখারে জাউক গো
না জানি কি হবে পরিণামে ॥
আপনা আপনি খাইনু ঘরের বাহির হৈনু
শুনি খোল-করতালের নাদ।
লক্ষ্মীকান্ত দাস কয় মরমে যার লাগয়
কি করিবে কুল-পরিবাদ ॥

গৌরাঙ্গের রসোদ্গার,—

অপরূপ গোরাচান্দে।
বিভোর হইয়া রাধার প্রেমে
তার গুণ কহি কান্দে ॥
নয়নে গলয়ে প্রেমের ধারা
পুলকে পূরল অঙ্গ।
খেনে গরজয়ে খেনে সে কাঁপয়ে
উথলে ভাব তরঙ্গ ॥
পারিষদগণে কহয়ে যতনে
রাধার প্রেমের কথা।
জ্ঞানদাস কহে গৌরাঙ্গ নাগর
যে লাগি আইল হেথা ॥

দানলীলায় গৌরাঙ্গের আবির্ভাব,—

গৌরাঙ্গ চাঁদের মনে কি ভাব উঠিল।
নদীয়ার মাঝে গোরা দান সিরজিল ॥
কিসে দান চাহে গোরা দ্বিজমণি।
বেত্র দিয়া আগুলিয়া রাখয়ে তরুণী ॥
দান দেহ দান দেহ বলি গোরা ডাকে।
নগরের নাগরী সব পড়িল বিপাকে ॥
কৃষ্ণ অবতারে আমি সাধিয়াছি দান।
সে ভাব পড়িল মনে বাসুদেব গান ॥

গোপীভাবের স্বপ্ন উল্লাস,—

আজুক প্রেমক নাহিক ওর।
স্বপনহি শুতল গৌরক কোর ॥
পহুঁ মুখ হেরইতে পড়লহি ভোর।
ঢরকি ঢরকি বহে লোচনে লোর ॥
উচ কুচ কাজরে হারে উজোর।
ভীগল তিলক বসন রুচি মোর ॥
মিটল অঙ্গ বেশ বহু খোর।
বাসুদেব ঘোষ কহে প্রেম আগোর ॥

* কোঢ়া (হিন্দী), কষা, চাবুক।

এ রকম পদ অনেক উদ্ধার করিবার প্রয়োজন নাই, কিন্তু এই সকল পদ হইতে রাধাকৃষ্ণের প্রেমের ও গোপী-দিগের তন্ময়তার আধ্যাত্মিক অর্থ কিছু বুঝিতে পারা যাইবে। এইরূপ গূঢ় অর্থপূর্ণ একটি পদ উদ্ধার করিয়া ক্ষান্ত হইব।

নাচত গৌরবর রসিয়া।
প্রেম পয়োধি অবধি নাহি পাওত
দিবস রজনী ফিরত ভাসি ভাসিয়া॥
সোঙরি বৃন্দাবন শ্বাস ছাড়ে ঘন ঘন
রাই রাই বোলে হাসি হাসিয়া।
নিজ মন মরম ভরম নাহি রাখত
ত্রিভঙ্গ বাজাওত বাঁশীয়া॥
মত্ত সিংহসম ঘন ঘন গরজন
চঞ্চল পদ নখ শশিয়া।
কটিতটে অরুণ বরণ বর অম্বর
খেলে উড়ত পড়ত খসিয়া॥
পুলকাঞ্চিত সব গৌর কলেবর
কাটিত অখিল পাপ পুণ্য ফাঁসিয়া।
ধরণী উপর ক্ষণে লুঠত বৈঠত
রামানন্দ ভয় লাগিয়া॥

ভণিতাশূন্য পদ

বৈষ্ণব কাব্যের সঙ্কলন গ্রন্থে ভণিতাশূন্য অথবা অসম্পূর্ণ পদ কতকগুলি পাওয়া যায়। ভিন্ন ভিন্ন সঙ্কলন গ্রন্থ একত্র করিয়া মিলাইলে কতকগুলি পদ সম্পূর্ণ হয়, কতকগুলির ভণিতাও পাওয়া যায়, কিন্তু অবশিষ্ট যে আকারে আছে, সেই আকারেই থাকে। ইহার মধ্যে কয়েকটি পদে ভাষার ও ভাবের বিশেষ কৌশল আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ কয়েকটি উদ্ধৃত করিতেছি। কয়েকটি দান-লীলায় আছে,—

ওহে নাগর কেমনে তোমার সঙ্গে
পিরীতি করিব।
সোনার বরণ তনুখানি মোর
ছুঁইলে বদন আছে তব॥
তোমার গলায় গুঞ্জা মালাগাছি
আমার গলায় গজমতি।
নিকড়ে বনের ফুলে চূড়াটি বান্ধিয়া আছ
ময়ূরপুচ্ছ তার সাথী॥
মণি মুকুতার নাহি আভরণ
সাজনী বনের ফুলে।
চূড়াটি বেড়িয়া ভ্রমর গুঞ্জরে
তাহে কি রমণী ভুলে॥
কি জানি কি ক'রে রাখালে ভুলাইয়া
আইলা কোন্ বনে থুইয়া।
আমরা রাখাল নই চতুর সমাজে রই
ভুলাইবা কি বলিয়া॥

ছুঁইলে বদন আছে তব, অর্থ, তোমার কি ছুঁইবার মুখ আছে? নিকড়ে শব্দের ব্যবহার এখন নাই, কিন্তু অর্থ বেশ সুসঙ্গত, কপর্দ্দকশূন্য।* রামেশ্বর ভট্টাচার্য্যের শিবায়ন বাঙ্গালা ভাষায় শব্দ প্রয়োগের একটি আদর্শ গ্রন্থ। তাহাতে আছে,—

দুঃখিনী দেখিতে নারি নিকড়্যে নাগর।†

আর একটি পদে শ্লেষের তীব্রতা আরও বেশী,—

কানাই কত ফরকাহ বুল।
দানী হৈয়া সে যে জন বৈসয়ে
তার ধরম গণ্ডা মূল॥
আছে যেনে তোমার চাঁচর কেশ
টানিয়া বান্ধিছ ভালে।
তাহার উপরে শিখি পাখের পাখা
জড়ান বকুল ফুলে॥
এ তাড় তোড়ল বলয় ঘাঘর
ইথে আছে বুঝি ভাড়া।
নন্দরাজ ঘরে নবনী খাইয়া
হৈয়াছ উদাস ষাঁড়া॥

অহঙ্কারে কিংবা ঠ্যাকারে ফরুকে যাওয়া এখনও চলিত কথা, চুল ফরকাইয়া অর্থাৎ মাথা নাড়িয়া গর্ব্ব প্রকাশ করা সেই রকম। অলঙ্কার ভাড়া করা, এ বিদ্রূপ বড় মর্ম্মঘাতী। আর দুর্দ্দান্ত যুবকের সহিত উদ্দাম ষাঁড়ের তুলনা এখনও লুপ্ত হয় নাই।

---

* নিকড়ে বনের ফুলে, যে বনের ফুল কিনিতে কড়ি লাগে না।
† নিকড়্যে, অর্থশূন্য নাগর।

আর একটি পদে ব্যঙ্গ ও কপট শাসন মিশ্রিত,—

ছাড় ওহে কানাই কিবা রঙ্গ কর।
যার বাতাস নিতে না পাও তার করে ধর॥
এখনি মরণ হউক এ ছিল কপালে।
বৃষভানুসুতা তনু ছুঁইলে রাখালে॥
একে সে তোমারে ভাল না বাসে কংসাসুর।
এ বোল শুনিলে হৈবে দেশ হৈতে দূর॥
কে তোমার বিষয় দিল ফেল দেখি পাটা।
তুমিও নূতন দানী আমরা নহি টুটা॥
থাকিয়া খাইবা যদি যমুনার পানি।
গোপীগণে না রাখিহ না হইও দানী॥

থাকিয়া খাইবা যদি যমুনার পানি, অর্থাৎ যদি বৃন্দাবনে বাস করিবার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে গোপীগণের পথ রোধ করিও না, দানী সাজিও না।

আর একটি হোলির পদ,—

ব্রজকে ঢেটনা * খেলত হোরি।
সঙ্গহি গোকুল বাল বিভোরি॥
বাটহি বাটহি ধরই আগোরি।
আবির গুলাল রচই ঝকঝোরি॥
কেশর কুঙ্কুম গোলাল কি রঙ্গ।
ভরি পিচকারি ভিগত অঙ্গ॥
শ্যামসুন্দর মনমোহন রায়।
সহচর সঙ্গহি ফাগু খেলায়॥

[ক্রমশঃ।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

* ঢেটনা,—হিন্দী শব্দ, ঢিট হইতে। অর্থ, নির্লজ্জ ও ভয়শূন্য কিশোরবয়স্ক বালক।

সার্থক

একটি নিমেষও আহা হারায়ে ত যায়নি কোথাও,
বাঁধা আছে অনন্তের শান্ত মন-তটে,
মাস, বর্ষ, যুগ যত কালে কালে হয়েছে উধাও
অঙ্কিত রয়েছে সবি তাঁর স্মৃতিপটে।

মানুষ ভুলেছে যাহা যে কাহিনী নাহি ইতিহাসে,
যে রাজ্যের কোন চিহ্ন কোথা নাহি পাবে,
যে নৃপ যায়নি রচি শিলালিপি কোন শৈল-পাশে,
আছে তারা—সবি আছে পরিপূর্ণ ভাবে।

কত যে বিপ্লব, কত ভাঙাগড়া গিয়াছে ভাসিয়া
ত্রাসিয়া এ ধরণীর আলোড়িত প্রাণ,
কত না আবর্ত্ত আসি মানুষের খেয়াল নাশিয়া
ডুবায়েছে কত শিল্প-সাহিত্য-বিজ্ঞান!

আমরা ভেবেছি যারে, সৃষ্টিছাড়া ছন্দমিল-হারা,
ভাবিয়াছি ছিল না ক যার প্রয়োজন,
সবি আছে চিরন্তন,—অনন্তের বক্ষে দিয়া সাড়া
করি দেয় নব নব সৃষ্টি-আয়োজন।

যা কিছু হয়েছে হবে জগতের আদি-অন্তমাঝে,
সবি এক বরমাল্যে পুষ্পদল প্রায়
ত্রিকাল জুড়িয়া সদা মহেশের কণ্ঠ তলে রাজে,
আপনি হেরিয়া ভোলা বিস্ময়ে দাঁড়ায়!

শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার মল্লিক।

টপ্পের পিতৃশ্রাদ্ধ

আমাদের Sunday (সন্‌ডে) সভায় কয়েক জন প্রবল সাহিত্যিক সভ্য আছেন, তাঁরা সাহিত্য নিয়ে বহু অনর্থও ঘটান। যে সব বিষয় চাগানো যায় না—সে সব তাঁরা অনায়াসেই বাগিয়ে থাকেন।

এই সাহিত্য-সভা প্রতি রবিবারে বিডন স্কোয়ারের সতীনাথ দের বৈঠকখানায় বসে। কালাচাঁদ খুড়ো হচ্ছেন এই সভার স্থায়ী সভাপতি। তিনি অশেষ গুণসম্পন্ন বেদাগ কুলীন, উৎকট বর্ণাশ্রমী এবং স্কলার (scholar)। scholarএর অর্থ সম্বন্ধে তিনি বলেন, যেমন "সু" সংযোগে সুব্যবস্থা, সুকোমল, সুপ্রেমিক, সুশোভন প্রভৃতি উঁচু পর্দ্দায় উঠে, তেমনি "কলার" আগে s যোগ ক'রে তাকে গৌরব দেওয়া হ'লে—তিনি হন স্কলার (scholar); আবার কলারের সঙ্গে বেশ মজে ব'লে উভয়ের এমন সুমিল।

কালাচাঁদ খুড়ো হচ্ছেন কর্ম্মকাণ্ডী লোক—অগ্নি-হোত্রী, তাঁর পেটে সর্ব্বক্ষণই আগুন জ্বলছে। পত্নী বিনা এঁদের ধর্ম্মকর্ম্ম অচল, তাই বয়সটা তৃতীয়াশ্রমের দিন ঘেঁসে এলেও, তৃতীয় পক্ষে ফেঁসে গেছেন। তবে বুদ্ধিমান্‌দের সুবিধে এই—তাঁরা সব দিক্ বজায় রাখবার রাস্তা বানাতে পারেন। খুড়োও বিবাহ আর বানপ্রস্থ কোনটাই বেহাত হ'তে দিলেন না,—বিবাহটা বনগাঁয়ে ক'রে শ্বশুরালয়ে বনং ব্রজেৎ হিসেবে বাস করছেন। সম্প্রতি পরিবারের অরুচিরোগ ধরায়, কলকেতায় বাসা নিতে হয়েছে,—কারণ, এখানে অসময়ের জিনিষটিও মিলবে,—ধানিলঙ্কার আচার, চন্দনের মোরব্বা, চরণামৃতের কুল্‌পী, মায় মহাপ্রসাদের চপ। এ ক্ষেত্রেও তিনি বানপ্রস্থ বজায় রেখেছেন—হাতীবাগানেই থাকেন। বলাই নিষ্প্রয়োজন যে, হাতীরা বনেই থাকে। জুতো (মুখ) ভ্রষ্ট হবার ভয়ে টোটকা হিসাবে জুতো জোড়াটি ঘরেই রেখে আসেন। এই সব শক্ত সমস্যার সহজ মীমাংসা করতে পারেন বলেই—তিনি Sunday সভার স্থায়ী সভাপতি।

সতীনাথ আর ঘরজামাই বিলাসবন্ধু এই দুই সাহিত্যিক গল্প লিখতে লিখতে উপন্যাসে উপস্থিত হয়েছেন, অধুনা নূতন plot (প্লট) পাচ্ছেন না—ছট্‌ফট্ ক'রে বেড়াচ্ছেন,—স্বস্তি নেই। গত সভায় তাঁরা সভার সাহায্য প্রার্থনা ক'রে বলেন—plot (প্লট) পেলে তাঁরা চট্ পূজার পূর্ব্বেই সচিত্র, সুদৃশ্য, বুকফাটা বই বাজারে হাজির ক'রে সাহিত্য-ভাণ্ডার ভরে দিতে পারেন। কিন্তু সাহিত্যিক সফরীদের দৌরাত্ম্যে plot (প্লট) তলাতে পায় না। খুড়ো সেবার দয়া ক'রে পতিতাদের দিকে ইঙ্গিত করেছিলেন ; তাতে উপন্যাস বেশ ঘোরালো হয়েও আসছিল। এমন সময় দেখি, বছর না ঘুরতে হঠাৎ তারা promotion (প্রোমোসন্) পেয়ে কেউ পুলোমা কেউ লুক্রেশিয়া দাঁড়িয়ে গেছে।

ঘরজামাই বললেন—"সাহিত্যিকদের খরচের খাঁক্‌তিতেই খেয়েছে! Brotherদের (ব্রাদারদের) দোষ দিতে পারি না—গবেষণার ল্যাবরেটারী (Laboratory) রাখা ত সোজা নয়। যাক্—এখন আমাদের একটা উপায় নিবেদন করুন,—যত ব্যানার্জ্জি, মুখার্জ্জি, ভট্টাচার্জ্জিদের উৎপাতে এনার্জ্জি (Energy) আর থাকছে না।"

অন্যতম সভ্য মাষ্টার বললেন—"আমি বলি কি, তোমরা "স্বরাজ" সব্‌জেক্ট সুরু কর না, তা হ'লে নতুন—"

ঘরজামাই বিলাসবন্ধু বিরক্তভাবে বললেন—"মাষ্টার, থামো—মিছে vex কোরো না, এ তোমার algebra নয় যে X লাগালেই ফতে। এ সব কঠিন মনস্তত্ত্বের কথা।"

যাক্, প্রশ্নটা শেষ সভাপতি খুড়োর কাছেই পৌঁছে গেল। তিনি বললেন—"পতিতা-সমস্যা এখনও যথোচিত ঘাঁটা হয়নি। তাঁদের সতীত্ব দেখাবার সকল দিক্ এখনও ফুরিয়ে ফেলাও হয়নি। তবে ঐ যে স্বরাজের কথা বললে, ওতে আমি নারাজ ; তার কারণ, আমাদের রাজের অভাব নেই, বরং "অরাজ" হ'লে গড়বার পথ বেরোয়। সিরাজ ছিলেন, ইংরাজ রয়েছেন, কবিরাজ বহুৎ, বাতরাজ গায়ে গায়ে, ধিরাজ, অধিরাজ, দেবরাজ, গন্ধরাজ, সরফরাজ, হংসরাজ, পশুরাজ,—এ সব

আছেনই। পক্ষিরাজ যথেষ্ট, ভোজরাজ আছে বিস্তর। রাজের ফর্দ্দ আমাদের দরাজ রয়েছে। এর ওপর আবার স্বরাজ সামলায় কে বল!"

"তবে ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র অপেক্ষা সাহিত্যক্ষেত্রটি ছোট নয়, এর দাম্বিত্ব বছর বছর বেড়ে চলেছে। মাসিক-গুলির পাতা ওল্‌টালেই পাত্তা পাবে, 'পতিতারা' না ফুরুতে ফুরুতেই 'অন্ধেরা' দেখা দিয়েছে। এরা এত দিন পোলের মুখে আর গির্জ্জের ফটকেই থাকতো। মাসিকে ঢুকে মনুষ্যত্ব আর মনস্তত্ত্ব দুই বেশ ফলাও হবার Field পেয়েছে। এখন অন্ধের যায়গায় 'খঞ্জ' খাড়া ক'রে দেখদিকি বাবাজীরা,ফলটা কেমন দাঁড়ায়! আমার বিশ্বাস—খঞ্জরা না দাঁড়াতে পারলেও, ফলটা ভালই দাঁড়াবে। অন্ধদের হাত ধ'রে নে যেতে হয়, খঞ্জদের কাঁধে করতেই হবে, সুতরাং অন্ধর চেয়ে খঞ্জ উঁচু চলবেই। আমার দৃঢ় ধারণা—উতরে যাবে, আর উপহারেই উঠে যাবে। 'সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত' লিখতে ভুল না বাবাজি!"

মাষ্টার বললেন—"খঞ্জরা যদি দেড় মণের বেশী ভারি হয়,—চাগাবে কে?"

বিলাসবন্ধু মুখভঙ্গী ক'রে বললে—"বোঝ না সোজ না, বেমক্কা বাধা দিও না। চাগাবার জন্যে তোমাকে ত' কেউ ডাকতে যাবে না। যে চাগাবে, আর যারে চাগাবে, তাদের গড়ন ত আমাদের কলমের মুখে।"

কালাচাঁদ খুড়ো বললেন,—"থাক্‌ ও সব। কিন্তু কোন্ ভাষায় লিখবে? বাঙ্গালা ভাষা ত আমাদের দেখতা চতুর্ম্মুখ হয়ে ব্রহ্মায় দাঁড়িয়েছে, ক্রমে দশাননে দাঁড়ানো বিচিত্র নয়। বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, আর পূর্ব্বের রবীন্দ্রনাথ এঁদের ভাষার আশা আর রেখো না। অধুনা উকিলী বা জেরা আর সওয়াল জবাবের ভাষা বা বৈঠকী ভাষা! দিব্যি কাটা কাটা বোল—বেশ আড্ডা দেওয়া চলে। কেউ কেউ এ ভাষাকে সবুজপত্রী ভাষা বলেন,—সেটা ভুল। এ ভাষা সন্দীপনী মুনির সময় থেকেই ছিল—নতুন নয়। সবুজপত্র মানেই ছিল কলার পাত, আজকাল শিক্ষিতেরা palmটাই (তাল-পাতা) পছন্দ করেছেন, অথবা তাড়াতাড়িতে পাততাড়ির তালপাতাটা প্রতীকরূপে ছেপে ফেলেছেন। কলাপাতে লেখাটা বাঙ্গালাদেশের প্রাচীন প্রথা। লেখা সম্বন্ধে সেইটাই ছিল—খুসখতের খতম্,—School Final—হাত পাকানো হিসেবে তার মূল্য যথেষ্টই। আমি অভয় দিচ্ছি—তোমরা সবুজ পথই ধরো বাবাজী, ভাষা বেশ ঝরঝরে হবে। বড় বড়রা যখন ঐ পাতেই লিখছেন, তখন ওর মার নেই, ও—সার হবেই হবে। হাজার কাপি কাটাতে পাবলিশারকে ব্যাজার হ'তে হবে না।"

মাষ্টার ব'লে উঠলেন—"বিক্রীটাই কি তবে বই লেখার উদ্দেশ্য?"

ঘরজামাই বিলাসবন্ধু বেজায় চ'টে বললেন—"নাঃ—তা কেন! ভিটেয় যে দেড়খানা ঘর এখনও ঝুঁকে আছে, তাদের ঠেশে আ-কড়ি ভরাট ক'রে রাখাই বই লেখার উদ্দেশ্য, কড়িতে আর বাঁশের চাড়া দিতে হবে না। আর নিজেরা উঠোনে open airএ (খোলা হাওয়ায়) লাউমাচার নীচে দিব্যি আরামসে শোয়া!"

মাষ্টার চুপ ক'রে থাকতে পারেন না, সকল বিষয়েই তাঁর কিছু বলা অভ্যাস। তিনি দু'বার কেসে হাঁ-টা বাগাচ্ছেন, ঠিক সেই মুহূর্ত্তে চৌকাঠে এক অদ্ভুত চেহারার আবির্ভাব হ'ল। তার বয়সটা হবে ২২।২৩, বড় বড় চুলগুলি রুক্ষ উসকো-খুসকো হ'লেও টেরি-ট্যেড়া মারেনি। চোখে সোনার চশমা, পরনে হাঁটু বহরের খদ্দর, আদুড় পা, গলায় অর্থাৎ বুকে পিঠে ট্যাড়চা ধরণে —সাত রংয়ের সিল্কের চৌখুপি উত্তরীয়! কোন খোপে সোনার জলে লেখা—"পতিতার আসন," কোন খোপে "সতীসৌধ", কোনটায় "ফুটপাথে পাওয়া", কোনটায় "ঘরে না পথে" ইত্যাদি ইত্যাদি। ছোকরা সবিনয়ে হাত জোড় ক'রে বল্‌লে, "আমি 'ভাগ্যহীন' পিতৃদায়গ্রস্ত, তাঁর ঊর্দ্ধদৈহিক উপায়ার্থে আপনাদের দ্বারস্থ হয়েছি।"

সকলে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছি, সভ্য "গররাজি" ভায়া বললেন, "যাঁরা মরতে হবে ব'লে এক দিনও ভাবেননি—আমাদের এখানে এমন সব বড় বড় রাজা, মহারাজা, রায় বাহাদুর সকালে, বিকালে, অকালে রাত্র-কালে মরেছেন; তাঁদের যোগ্য, অযোগ্য, সুযোগ্য

কোন ছেলেকেই ত কিংখাপের কাছা চড়াতে দেখিনি। তুমি দেখছি তাঁদের উঁচিয়ে উঠেছ,—আবার সাহায্য-ভিক্ষা কি রকম?"

আগন্তুক ছোকরা বললে, "সনাতন নিয়মমত আমি দ্বারস্থ হয়েছি, এই কথাই জানিয়েছি"—

গররাজি ভায়া ছিলেন তিরিক্ষি মেজাজের সভ্য—একটি জীবন্ত negative plate, তিনি বললেন, "ভাগ্য-হীন অবস্থায় লোক আত্মীয়-স্বজন আর জ্ঞাতি কুটুম্বেরই দ্বারস্থ হয়।

আগন্তুক বললে, "আজ্ঞে, বাঙ্গালা দেশের স্ত্রী-পুরুষ, বালক-বৃদ্ধ জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে যে আমার আপনার জন—"

কালাচাঁদ খুড়ো চুপটি ক'রে শুনছিলেন; বললেন, "উনি ভাগ্যহীন হলেও বাক্যহীন ত নন; আমাদের সাড়ে তিন নম্বরের নিয়মটা ভুলে যাচ্ছ কেন বাবাজি? আগে পরিচয় নিয়ে তবে কথা কইবে,—সময়টা সোজা নয়! শুনিয়ে দাও ত ছোকরা।"

আগন্তুক বললে, "আমাদের বাস্তভিটে এই কল্‌কেতাতেই। আমার নাম 'টপ্প।' পিতার নাম "গপ্প" !"

মাষ্টার চমকে উঠে বললেন, "অ্যাঁ—তিনি গত হলেন কবে? আ হাঃ—হাঃ! কি হয়েছিল?"

টপ্প। আজ্ঞে, বয়স হয়েছিল, তার ওপর ও-সব সইবে কেন! আগাগোড়া জোড়া জোড়া দীর্ঘশ্বাস, চোখ পড়লেই প্রণয়, আবার সতীসাধ্বী পতিভারা জুটলো। সইবে কেন? ছিল আমানি খাওয়া ধাত, কিন্তু যখন তখন সব চা খাওয়াতে সুরু করালে। শেষ যেটুকু ছিল, মোটরে ঘুরিয়েই ফুরিয়ে দিলে। এত উপদ্রব এক জনের ওপর—গরীব দেশে গাড়ী-বারান্দা বানাতে বানাতে আর এলবম্ গোছাতে গোছাতে একদম সাবাড়—"

মাষ্টার। আহা, তাঁর এক প্রকার অপঘাতই হ'ল!

আগন্তুক। আজ্ঞে, তা' না ত আর কি! প্রমাণও ত পাচ্ছি। নইলে আজকাল মাসিকে গল্প দেখলে মেয়ে-পুরুষে ভয় পাবেন কেন? সকলেই বলছেন, নামধাম বদলানো সেই একই মূর্ত্তি, একই সুর। কারুর দেখা প্ল্যাটফরমে, কেউ দেখেছেন বোটানিকেলে, কেউ দ্বিতলের দক্ষিণ বাতায়নে, কেউ চলন্ত মোটরে, কেহ বা থিয়েটারের কি বায়স্কোপের বাক্সে। বিভিন্ন পোষাকে সেই একই মূর্ত্তি। ভূত না হ'লে একা এত যায়গায় কি কেউ একই সময়ে দেখা দিতে পারে, না কেউ দেখতে পায়?

মাষ্টার। তা ত বটেই, তা হ'লে গল্পের গয়া দেখছি।

আগন্তুক। আজ্ঞে, তাই ত শেষ দাঁড়ালো—

অন্য সভ্য বেকার বেণী সরকার বললেন, "এটা কি আগে কিছু বুঝতে পারনি, বাবাজি?"

টপ্প। ও বয়সে তাঁর পোষাক-পরিচ্ছদে খুব ঝোঁকটা পড়েছিল বটে। ভেতরটা যত থেলো মার-ছিল, ওপরটায় ততই কিংখাপ চড়াচ্ছিলেন। তাতে বাবা বেগড়াচ্ছেন ব'লে একটু সন্দেহ যে আসেনি, তা নয়। তবে বাহ্য সম্ভ্রমে টাকাটা বেশ টানতে লাগলেন দেখে, চোখ বুজেই ছিলুম।"

মাষ্টার একটা বড় কিছু বলবার ফাঁক খুঁজছিলেন। চট গলা বাড়িয়ে সুরু করলেন, "এতে তাঁর বিচক্ষণতারই পরিচয় পাওয়া যায়, moral একটু বেগড়ায় বটে। ইংলণ্ডের এক জন নামজাদা author (লেখক) বলে-ছেন,—"A thief in fustian is a vulgar character, scracely to be thought of by persons of of refinement, but dress him in green velvet with a high-crowned hat * * * and you shall find in him the very soul of poetry and adventure."

টপ্প। উত্তম করেছেন, কিন্তু বেশী দিন চলে না। তাই ললাটলিপি হঠাৎ মলাট্ ফুঁড়ে দেখা দিলে। আমি কাঁদতে লাগলুম। বাবা বললেন—"আজ কাঁদছিস্ কি, মরেছি কি আমি আজ! কেবল ভূত হয়ে বেড়াচ্ছিলুম। এই মহালয়ার শ্রাদ্ধটা সেরে—গয়ায় যা,—রেলে concession (কন্‌সেসন্) পাবি!" বললুম—"তা হ'লে যে গল্পের দফা গয়া হয়ে যাবে!" বাবা বললেন—"তা কি হয় রে পাগল, কারবার যেমন

চলছিল, তেমনিই চলবে। অর্থাৎ লোকে চাইবে 'গল্প'—মালে মিলবে 'টল্প।' এই যা। বিষের ব্যবসাও চলে রে!"

সতীনাথ সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলে—"আচ্ছা, এর সঙ্গে উপন্যাসের কোন সম্পর্ক নেই ত?" ঘরজামাই মুসড়ে আসছিল, উত্তরটা শোনবার জন্যে গলা বাড়ালে।

টল্প বললে—"বাবাই ব'লে গেলেন—দাদারও আর বেশী দিন নয়, তাঁকেও রোগে ধরেছে,—বৈদ্যদের ব্যবস্থায় রয়েছেন। তাঁরা যা আভাস দিচ্ছেন, তাতে বুঝতে হয়—তিনি শ্বাস টানছেন; 'টুপন্যাস' বাবাজিই তাঁর কায চালাচ্ছে। দাদাকে বিলিতি রোগে ধরেছে—

"যাক্ আমার যে কাযের জন্যে আসা,—বাঙ্গালা দেশের স্ত্রী পুরুষ ছেলে বুড়ো, সকলেই বাবাকে চাইতেন, এই ভাগ্যহীনও যেন আপনাদের সেই ভালবাসা হ'তে বঞ্চিত না হয়—এই আমার বিনীত প্রার্থনা। আমি অনেক রকম দেখাবো।

"আমার দ্বিতীয় আর অদ্বিতীয় প্রার্থনা এই যে, শ্রাদ্ধ-দিবসে আপনারা নিজের নিজের ম্যানস্‌ক্রিপ্ট্ (পাণ্ডুলিপি) নিয়ে মদীয় মঞ্চে উপস্থিত হয়ে—পিতার প্রেতত্ব-মোচনকালে সেই সব 'বিরাট' পাঠ করেন। এইটি আমার একান্ত অনুরোধ। তা হলেই তাঁর দ্রুত ঊর্দ্ধগতি অবশ্যম্ভাবী। কারণ—বাঙ্গালার বিখ্যাত রোজা গঙ্গা-ময়রা ব'লে গেছেন—যে কোন ভূত তাড়াবার অমন অমোঘ উপায় আর নাই। খসড়ার তাড়া দেখলে আর তা শুনতে হবে শুনলে এমন জবর ভূত জন্মাননি যিনি ছুটে পালান না।"

ঘরজামাই একটু সুর নামিয়ে বললেন—"সেখানে তোমার টুপন্যাস ভায়ার সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ হতে পারে ত'? তাঁর সঙ্গে অনেক কাজের কথা আছে।"

টল্প বললে—"উত্তম কথা, আমি নিজেই introduce ক'রে (পরিচয় করে) দেব, ভারী আনন্দ হবে—তিনি আবার থাকবেন না! ওঃ, এমন এমন প্লট্ শোনাবেন, তাক্ হয়ে থাকবেন। আজ সকালে মুরারি বাবু এসেছিলেন, প্লট প্লট—ক'রে পাগোল। প্লট ত বলেই দিলেন, আবার উপন্যাসের নাম রাখতে বললেন—'হাওদা।' আহা, যেমন Sweet (মধুর), তেমনই শ্রুতি সুখকর। নামেই লেখক উদ্ধার হয়ে যায়।"

ঘরজামাই ব'লে উঠলেন—"উঃ, এমন নামটা হাত ছাড়া হয়ে গেল! ও রকম আরও অনেক আছে বোধ হয়?"

"ঢের"—

"তবে জেনেই রাখ, আমি আর সতীনাথ তো যাবই"—

"শুনে বড় খুসী হলুম। যাবেন বই কি"—

খুড়ো ধীরভাবে বললেন—"বৃষোৎসর্গ টর্গ নেই ত?"

"স্থানাভাব ব'লে সে সঙ্কল্প ছেড়ে দিয়েছি"—

খুড়ো তখন ঢালাও ভাবে বললেন—"তা হ'লে Sunday (সন্‌ডে) সভার সভ্যেরা নির্ভয়ে যেতে পারে, এবং যাবেও।"

টল্প খুসী হয়ে গেল। সেদিনকার সভাও ভঙ্গ হ'ল।

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

রাস-লীলা

হেমন্ত পূর্ণিমা নিশি, চন্দ্রমা-কিরণ
এলায়ে পড়েছে যেন যমুনার বুকে,
অফুরন্ত-পুষ্প-গন্ধ বহে সমীরণ
ভ'রে গেছে দশ দিক অপূর্ব্ব কৌতুকে।
উছল-কালিন্দী-কূলে নিকুঞ্জ-আলয়ে
বাজিয়া উঠিল বুঝি শ্যামের বাঁশরী,—
মিলিবারে শ্যাম সনে আকুল হৃদয়ে
ছুটিল অসংখ্য ব্রজ-গোপিকা সুন্দরী।

কি অপূর্ব্ব প্রেম-লীলা হে ব্রজ-রঞ্জন!
লক্ষ শ্যাম খেলিতেছে লক্ষ গোপী সনে;
এ যেন অনন্ত এক দম্পতি-মিলন
অনন্ত কালের তরে অনন্ত বন্ধনে।
এক দেহ দুই হয়ে যুগল মিলনে
চির-রাসে এস শ্যাম, হৃদি-বৃন্দাবনে।

শ্রীপ্রসাদকুমার রায়।

কাশ্মীরের মহারাজা

ঝিলাম

যিনি মানব-চরিত্র নখদর্পণে দেখিতেন, সেই বিশ্বকবি সেক্সপীয়র বলিয়াছেন—মানুষ যে কিছু অন্যায় করে, তাহারই স্মৃতি তাহার মৃত্যুর পরও থাকিয়া যায়, তাহার কৃত সৎকার্য্যের কথা অনেক সময়েই শবের সহিত বিলুপ্ত হয়। কাশ্মীরের মহারাজা সার প্রতাপ সিংহের ভাগ্যে কিন্তু এই নিয়মের ব্যতিক্রম হইয়াছে। তাঁহার জীবিতকালে যে ইংরাজ তাঁহাকে শত্রু ও ষড়যন্ত্রকারী বলিয়া লাঞ্ছিত করিয়াছিলেন—তাঁহাকে রাজ্যপরিচালনভার ত্যাগ করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন, তাঁহার মৃত্যুর পর সেই ইংরাজই তাঁহাকে পরম মিত্র ও রাজ্যের সুশাসক বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন!

সার প্রতাপ সিংহের রাজত্বের ইতিহাস সত্য সত্যই উপন্যাসের মত বিস্ময়কর এবং সে ইতিহাস পাঠ করিলে এ দেশে দেশীয় রাজন্যগণের অবস্থার স্বরূপ সপ্রকাশ হয়। তাঁহার রাজত্বকালে কাশ্মীর দরবারে যে নাটকের অভিনয় হইয়াছিল, তাহার শেষ অঙ্কে যবনিকাপাত হইল এবং সে নাটকের অভিনয়ে যাঁহারা যোগ দিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে প্রধান পাত্রগণ আজ সকলেই মৃত। আজ আমরা সে নাটকের ঘটনার পরিচয় প্রদান করিব।

কাশ্মীরের বর্ত্তমান রাজবংশ ইংরাজের অনুগ্রহে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত। কাশ্মীরের পুরাতন ইতিহাস প্রধানতঃ চারি ভাগে বিভক্ত—(১) 'রাজতরঙ্গিণী' নামক ঐতিহাসিক গ্রন্থে বর্ণিত হিন্দু রাজত্বকাল, (২) "সলাতিনী কাশ্মীর" অর্থাৎ কাশ্মীরী মুসলমানদিগের প্রভুত্বকাল, (৩) "পাদশাহী-ই-চঘটাই" বা "সাহান-ই-

মোঘলিয়া" অর্থাৎ মোগল বাদশাহদিগের সময়, (৪) "সাহান-ই-ডুরাণী" অর্থাৎ পাঠানদিগের প্রভুত্ব-সময়। কাশ্মীরের ইতিহাসে যেমন, ইহার অঙ্গেও তেমনই এই কয় কালের চিহ্ন বিদ্যমান। 'মার্ত্তণ্ড' মন্দিরের ও অবন্তীপুরের মন্দিরের ভগ্নাবশেষে যেমন হিন্দুদিগের, দুর্গাদিতে তেমনই মুসলমানদিগের কাশ্মীরে প্রভুত্ব-কালের চিহ্ন রহিয়াছে—সে সব পবনের হিল্লোলেরই মত নিশ্চিহ্ন হইয়া মিলাইয়া যায় নাই। কাশ্মীরের পুরাতন ইতিহাস পাঠ করিলে তাহা জানিতে পারা যায়। *

বর্ত্তমান রাজবংশ অমৃতসরে ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে (১৬ই মার্চ্চ) ইংরাজের সহিত সন্ধির চুক্তি-ফলে সৃষ্ট। মহারাজা গোলাব সিংহ এই বংশের বংশপতি। গোলাব সিংহ যৌবনে "পঞ্জাব-কেশরী" রণজিৎ সিংহের প্রিয়-পাত্র জমাদার খুশল সিংহের সেনাদলে অশ্বারোহী সৈনিক ছিলেন। স্বীয় প্রতিভাবলে তিনি অল্পদিনের মধ্যেই নায়ক হয়েন এবং রাজওড়ের সর্দ্দার আগর খাঁকে বন্দী করিয়া স্বীয় কৃতিত্বপরিচয় প্রদান করেন। সেই কার্য্যের পুরস্কার-স্বরূপ তিনি পুরুষানুক্রমে জম্মুর সর্দ্দারপদ লাভ করেন। তখন তিনি জম্মুতে যাইয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন এবং নামে লাহোর দরবারের, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে নিজের জন্য, জম্মু শাসন করিতে থাকেন এবং অল্পদিনের মধ্যেই নিকটবর্ত্তী রাজপুতদিগের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিয়া লাডক জয় করেন। রণজিৎ সিংহের নানা ত্রুটি সত্ত্বেও তিনি খৃষ্টীয় উনবিংশতি শতাব্দীতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভারতীয় বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন—তিনি একটি সাম্রাজ্য গঠিত করিয়াছিলেন। † কিন্তু তিনি উপযুক্ত ভাবে সে সাম্রাজ্য রক্ষার ব্যবস্থা করিয়া যাইতে পারেন নাই। সেই জন্য তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে চারি দিকে ষড়যন্ত্র ও বিশৃঙ্খলা আত্মপ্রকাশ করিল—তাঁহার সামন্তদিগের মধ্যে কেবল—"শ্মশান-কুক্কুরদের কাড়াকাড়ি রব" শ্রুত হইতে লাগিল। তথাপি তাঁহার সেনাদল পঞ্চদশ বৎসর পরেও ইংরাজের শৃঙ্খলাবদ্ধ সেনাদলের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে পারিয়াছিল এবং জয়লাভও যে করিতে পারে নাই, এমন নহে।

মহারাজা গোলাব সিংহ

রণজিতের মৃত্যুর পর বিশৃঙ্খলার সময় চতুর গোলাব সিংহ নিজ রাজ্য সুশাসিত করিয়া লইয়াছিলেন। তখন শিখ দরবারেও তাঁহার প্রভুত্ব ও প্রতাপ অসাধারণ। সামন্তদিগের মধ্যে ষড়যন্ত্রের ফলে কেহ বন্দুকের গুলীতে, কেহ তরবারির আঘাতে, কেহ বা বিষপ্রয়োগে নিহত হইয়াছিলেন। নর্ত্তকী ঝিন্দন মহারাণী হইয়া তাঁহার ব্রাহ্মণ উপপতি লাল সিংহকে উজীর ও তেজ সিংহকে সেনাপতি করাতেই গোলাব সিংহ বুঝিয়াছিলেন—কণ্টকের দ্বারা কণ্টক উদ্ধার করিতে হইবে। তিনি সকল পক্ষকেই সন্তুষ্ট রাখিয়া স্বয়ং অর্থ সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। তিনি জানিতেন, শিখরা ও শিখ সেনাদলে হিন্দুস্থানীরা ইংরাজ-বিদ্বেষী। তাই তিনি ইংরাজের সহিত যুদ্ধের আয়োজন করিলেন। তিনি জানিতেন, রণজিৎ এক দিন ভারতবর্ষের মানচিত্রে রক্তবর্ণে রঞ্জিত ইংরাজাধিকৃত স্থানগুলি দেখিয়া বলিয়াছিলেন, এক কালে "সব লাল হো যায়েগা"—অর্থাৎ সমগ্র ভারত ইংরাজের করতলগত হইবে। তিনি স্থির করিলেন, যুদ্ধের পর তিনিই মধ্যস্থ হইয়া সন্ধির ব্যবস্থা করিবেন এবং ফলে উভয় পক্ষের কৃতজ্ঞতা ও পুরস্কার লাভ করিবেন।

চতুর গোলাব সিংহ যাহা মনে করিয়াছিলেন, তাহাই হইল। সোবরাওণের যুদ্ধের পর তিনিই মধ্যস্থ হইয়া সন্ধি করাইয়া দিলেন এবং সেই সন্ধির সর্ত্তে লাহোর

* The Valley of Kashmir—Lawrence.

† The Punjab in Peace and War—Thorburn.

দরবার ১ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণের পরিবর্ত্তে ইংরাজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে বিপাসা ও সিন্ধুর মধ্যবর্ত্তী রাজ্যাংশ প্রদান করিলেন। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের ৯ই মার্চ্চ তারিখে এই সন্ধি হইয়া যাইবার পর ১৬ই মার্চ্চ গোলাব সিংহের সহিত ইংরাজের সন্ধি হইল এবং তিনি পুরস্কারস্বরূপ ৭৫ লক্ষ টাকা মূল্যে কাশ্মীর রাজ্য লাভ করিলেন। কোন কোন ইংরাজ এই ব্যবস্থা ভারতে ইংরাজ-শাসনের কলঙ্ক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। *

গোলাব সিংহের সহিত ইংরাজের সন্ধির সর্ত্তগুলি † এইরূপ :—

(১) বৃটিশ সরকার মহারাজা গোলাব সিংহকে ও তাঁহার ঔরসজাত পুত্রাদি বংশপরম্পরাকে স্বাধীনভাবে ভোগ-দখল করিবার জন্য সিন্ধুনদের পূর্ব্বে ও রাবী নদীর পশ্চিমে অবস্থিত সমগ্র পার্ব্বত্যপ্রদেশ হস্তান্তরিত করিয়া দিলেন। লাহোল যেমন এই হস্তান্তরিত ভূভাগের অন্তর্গত হইবে, চাম্বা তেমনই ইহার অন্তর্গত থাকিবে না। লাহোর দরবার ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের ৯ই মার্চ্চ তারিখে লাহোরের সন্ধির ৪র্থ ধারামতে যে রাজ্যাংশ ইংরাজকে প্রদান করিয়াছেন ইহা তাহারই অংশ।

(২) এই হস্তান্তরিত ভূভাগের পূর্ব্বসীমা বৃটিশ সরকার ও মহারাজা গোলাব সিংহ উভয় পক্ষের নিযুক্ত কমিশনারদিগের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইবে এবং ইহার পর জরিপ শেষ হইলে স্বতন্ত্র দলিলে বর্ণিত হইবে।

(৩) মহারাজা গোলাব সিংহকে ও তাঁহার উত্তরাধিকারীদিগকে এই রাজ্য প্রদান করায় মহারাজা বৃটিশ সরকারকে ৭৫ লক্ষ টাকা (নানকসাহী) প্রদান করিবেন। তন্মধ্যে ৫০ লক্ষ টাকা সন্ধি সহি করিবার সময় ও ২৫ লক্ষ টাকা আগামী ১লা অক্টোবর তারিখের মধ্যে দিতে হইবে।

(৪) বৃটিশ সরকারের সম্মতি ব্যতীত মহারাজা গোলাব সিংহের রাজ্যের সীমা পরিবর্ত্তিত হইতে পারিবে না।

(৫) লাহোর সরকারের সহিত বা কোন প্রতিবেশী রাজ্যের সহিত তাঁহার কোন বিবাদ বাধিলে বা কোন বিষয়ে মীমাংসা করিতে হইলে মহারাজা গোলাব সিংহ তাহা বৃটিশ সরকারকে জানাইবেন ও সেই সরকারের নির্দ্ধারণ অনুসারে কায করিবেন।

(৬) পার্ব্বত্য প্রদেশে বা নিকটবর্ত্তী স্থানে কখন যুদ্ধ হইলে, মহারাজা ও তাঁহার উত্তরাধিকারীরা আপনাদের সৈন্যসহ ইংরাজের সেনাবলের সহিত যোগ দিবেন।

(৭) মহারাজা বৃটিশ সরকারের সম্মতি ব্যতীত কোন বৃটিশ প্রজাকে বা কোন য়ুরোপীয় বা মার্কিণ প্রজাকে স্বীয় চাকরীতে বহাল করিবেন না প্রতিশ্রুতি প্রদান করিতেছেন।

(৮) ১১ই মার্চ্চ তারিখে বৃটিশ সরকারের সহিত লাহোর দরবারের যে সব সর্ত্ত স্থির হইয়াছে, মহারাজা গোলাব সিংহ তাঁহাকে প্রদত্ত ভূভাগ সম্বন্ধে সে সকলের ৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৭ম সর্ত্ত পালন করিবেন।

(৯) বৃটিশ সরকার বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে রাজ্য রক্ষায় মহারাজা গোলাব সিংহকে সাহায্য করিবেন।

(১০) মহারাজা গোলাব সিংহ বৃটিশ সরকারের প্রভুত্ব স্বীকার করিতেছেন এবং তাহার নিদর্শনস্বরূপ প্রতি বৎসর বৃটিশ সরকারকে ১টি অশ্ব, যাহার লোমে শাল প্রস্তুত হয়, সেই জাতীয় ৬টি ছাগ, ৬টি ছাগী ও ৩ জোড়া কাশ্মীর শাল প্রদান করিবেন—অঙ্গীকার করিতেছেন।

ইহার পর মহারাজা গোলাব সিংহের মৃত্যু হইলে তদীয় পুত্র মহারাজা রণবীর সিংহকে বড় লাট লর্ড ক্যানিং ১৮৬২ খৃষ্টাব্দের ৫ই মার্চ্চ তারিখে লিখেন,—

"মহারাণীর (ভিক্টোরিয়া) অভিপ্রায় এই যে, বর্ত্তমানে ভারতে যে সকল দেশীয় রাজন্য আছেন, তাঁহাদের সরকার স্থায়ী হইবে ও তাঁহাদের বংশের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকিবে। তদনুসারে আমি আপনাকে জানাইতেছি, আপনার বংশে ঔরসপুত্রের অভাব ঘটিলে বংশের রীতি ও কুলপ্রথানুসারে গৃহীত দত্তক-পুত্র ভারত সরকার কর্ত্তৃক উত্তরাধিকারী বলিয়া স্বীকৃত হইবেন। যত দিন রাজবংশ ইংরাজের প্রতি রাজভক্তি-পরায়ণ থাকিবেন ও সন্ধি-সনন্দাদির সর্ত্ত অক্ষুণ্ণ রাখিবেন, তত দিন এই সর্ত্ত ক্ষুণ্ণ হইবে না।"

---

* India and its Problems—Lilly

† Treaties etc—Aitchison. Vol 11

বর্ত্তমান কাশ্মীর রাজ্য ৫টি রাজ্যাংশের সমষ্টি—জম্মু, কাশ্মীর, লাডক, বালটীস্থান ও গিলগিট। সমগ্র কাশ্মীর রাজ্যের এক-সপ্তমাংশ মাত্র প্রকৃত কাশ্মীর। মহারাজা গোলাব সিংহের পূর্ব্বে এইগুলি কখন এক রাজার অধীন ছিল না, পরন্তু নানা ভাগে বিভক্ত হইয়া গিয়াছিল। কাশ্মীর, বালটীস্থান ও গিলগিট মুসলমান শাসনাধীন ছিল। কেবল জম্মু ও লাডক হিন্দুরাজার দ্বারা শাসিত ছিল। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে চন্দ্রবংশীয় রাজপুত রণজিৎ দেব জম্মুর রাজা ছিলেন। তাঁহার ৩ ভ্রাতার মধ্যে সর্ব্বকনিষ্ঠ সুরথ দেব গোলাব সিংহের প্রপিতামহ। রণজিৎ দেবের মৃত্যুর পর অর্দ্ধশতাব্দী কাল রাজ্য বিশৃঙ্খল অবস্থায় ছিল; তাহার পর গোলাব সিংহ তাহা জয় করিয়া লাহোর দরবারের অধীনে দখল করিতে থাকেন। সে ১৮২০ খৃষ্টাব্দের কথা। তাঁহার সেনাপতি জোরাওয়ার সিংহ ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৪০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে প্রভুর জন্য লাডক ও বালটীস্থান জয় করেন এবং ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুচেত সিংহের মৃত্যুতে তাঁহার অধিকৃত রামনগরও গোলাব সিংহের হস্তগত হয়। তাহার পর গোলাব সিংহ যে ভাবে ইংরাজের নিকট হইতে বর্ত্তমান কাশ্মীর রাজ্য লাভ করেন, তাহা আমরা পূর্ব্বে বিবৃত করিয়াছি।

মহারাজা রণবীর সিংহ

আমরা ইতঃপূর্ব্বে বলিয়াছি, কোন ইংরাজ লেখক গোলাব সিংহকে কাশ্মীরবিক্রয় ইংরাজের কলঙ্ক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়েও বহু ইংরাজ কাশ্মীর পরহস্তগত বলিয়া দুঃখ ও আক্ষেপ করেন। কারণ, মুসলমান ঐতিহাসিক সত্য সত্যই বলিয়াছেন, "কাশ্মীর ভূস্বর্গ"। * এরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য পৃথিবীর অন্য কোন দেশে বিরল। মোগল সম্রাটদিগের শাসনকালে পর্য্যটক বার্ণিয়ার কাশ্মীর দেখিয়া বলিয়াছিলেন—ইহার ভূমি "য়ুরোপের ফুলে ও বৃক্ষে মিনা করা।" * মোগল সম্রাটদিগের মধ্যে জাহাঙ্গীরই সর্ব্বাপেক্ষা বিলাসী ছিলেন। তিনি কাশ্মীর বড় ভালবাসিতেন। কাশ্মীরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে পরিবেষ্টিত হইয়া তিনি সুরা ও নূরজাহানের সৌন্দর্য্য-সুধা পান করিতেন। গল্প আছে, এক বার রাজকার্য্যে তাঁহার কাশ্মীরে যাইতে বিলম্ব ঘটে, সেই জন্য তিনি কাশ্মীরে কর্ম্মচারীদিগকে আদেশ দেন—কাশ্মীরে বসন্ত যেন চলিয়া না যায়। কর্ম্মচারীরা পর্ব্বত হইতে বরফ আনিয়া প্রান্তরে আস্তরণ রচনা করে। বাদশাহ কাশ্মীরে যাইবার পর সেই আস্তরণ গলিত হইলে তবে কাশ্মীর ফুলে ফুলে ফলময় হইয়া উঠে। ফুলে, ফলে,তরুলতায়, গিরিসৌন্দর্য্যে হ্রদের স্নিগ্ধনীলপরিসরে কাশ্মীর অতুলনীয়।

কাযেই এমন "সোনার রাজ্য" পরহস্তগত হইয়াছে বলিয়া আজ ইংরাজ দুঃখ করিতে পারেন। কিন্তু যে সময় গোলাব সিংহকে কাশ্মীর বিক্রয় করা হইয়াছিল, তখন—

(১) ভারতবর্ষে সাম্রাজ্য-বিস্তার করিয়া দায়িত্ববৃদ্ধিতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর মত ব্যবসায়িসঙ্ঘের আগ্রহ ছিল না।

(২) তখনও পঞ্জাব লাহোরদরবারের অধিকৃত। বাস্তবিক, শিখদিগের বলক্ষয় করিবার উদ্দেশ্যেই বড় লাট তাহাদের রাজ্যের পার্শ্বে ইংরাজের এই মিত্রশক্তির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং দ্বিতীয় শিখযুদ্ধের সময় গোলাব সিংহ শিখদিগকে সাহায্যদানে বিরতও হইয়াছিলেন।

* আইন-ই-আকবরী।

† Travels—Bernier.

(৩) তখন রুসিয়ার ভারতবর্ষ আক্রমণের আশঙ্কা ইংরাজ কল্পনা করিতে পারেন নাই।

(৪) ইংরাজের তখন অর্থেরও প্রয়োজন ছিল।

ইংরাজের সহিত সন্ধি শেষ করিয়া গোলাব সিংহ যখন কাশ্মীর অধিকার করিতে অল্পসংখ্যক সৈনিক পাঠাইলেন, তখন শেখ ইমাম-উদ্দীন লাহোর দরবারের তরফে তথায় শাসক। তিনি গোলাব সিংহকে কাশ্মীর অধিকার দিতে অস্বীকার করিয়া রাজধানী শ্রীনগরের সান্নিধ্যে তাঁহার সেনাদলকে পরাভূত করেন। তখন বৃটিশ সরকার গোলাব সিংহের সাহায্যার্থ সেনাদল প্রেরণ করেন ও শেষে শেখ ইমাম উদ্দীন কাশ্মীর ছাড়িয়া দেন।

গোলাব সিংহের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র রণবীর সিংহ রাজ্য লাভ করিলে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহী-বিদ্রোহ হয়। তখন তিনি ইংরাজকে বিশেষ সাহায্য করেন।

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে মহারাজা রণবীর সিংহের মৃত্যু হয় এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র মহারাজা প্রতাপ সিংহ রাজ্যলাভ করেন। তখন তাঁহার বয়স ৩৭ বৎসর হইবে। রণবীর জ্যেষ্ঠ পুত্রকে সুশিক্ষিত করিবার জন্ম বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং যৌবনে প্রতাপ সিংহ কুপথগামী হইলেও পিতার সে চেষ্টা সর্ব্বথা ব্যর্থ হয় নাই। প্রতাপ সিংহ সাহিত্য, আইন ও বিজ্ঞান আলোচনা করিয়াছিলেন। পিতার মৃত্যুর পূর্ব্বেই তিনি সংযত হইয়াছিলেন এবং রাজ্যভার গ্রহণ করিয়াই তিনি সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত-চরিত্র হয়েন। সার লেপেল গ্রিফিন প্রমুখ ইংরাজরা তাঁহার অযথা নিন্দাবাদ করিয়া তাঁহাকে লোকচক্ষুতে ঘৃণ্য প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। তিনি নিষ্ঠাবান্ হিন্দু বলিয়া মদ্য স্পর্শও করেন নাই; অথচ তাঁহাকে "মদ্যপ," "চরিত্রহীন," "হীনবৃত্তির বশবর্ত্তী" প্রভৃতি বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছিল। কি জন্য কোন কোন ইংরাজ এইরূপ অসত্য প্রচারে রত হইয়াছিলেন, তাহা পরবর্ত্তী ঘটনায় বুঝিতে পারা যায়।

অল্পদিনের মধ্যেই প্রতাপ সিংহের ঘরে ও বাহিরে প্রবল শত্রু দেখা দেয়। যুবরাজ অবস্থায় তিনি লক্ষ্য করিয়াছিলেন, কাশ্মীরের শাসন-পদ্ধতি ত্রুটি-কলঙ্কিত হইয়াছে। রাজা হইয়া তিনি সেই সকল ত্রুটি দূর করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এই কার্য্যে তাঁহার ভ্রাতৃদ্বয়ও অসাধু কর্ম্মচারিগণের মত তাঁহার শত্রু হইয়া দাঁড়াইলেন। পরলোকগত মহারাজা তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র রাজা রাম সিংহকে ও কনিষ্ঠ পুত্র রাজা অমর সিংহকে রাজ্যের কয়টি প্রধান বিভাগের ভার দিয়াছিলেন। প্রতাপ সিংহ তাঁহাদিগকে পদচ্যুত করিতে পারিলেন না। আবার ইংরাজ রেসিডেণ্ট হিন্দু-ধর্ম্মানুরক্ত—স্বল্পভাষী মহারাজার পক্ষ না লইয়া তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠতা-স্থাপনপ্রয়াসী রাজভ্রাতাদিগের পক্ষ গ্রহণ করিতে লাগিলেন। যে সকল কর্ম্মচারী স্বার্থহানি অনিবার্য্য বুঝিয়া শাসন-সংস্কারের বিরোধী হইলেন, তাঁহারা যে মহারাজার শত্রু হইয়া উঠিবেন, তাহাতে বিস্ময়ের কোন কারণ নাই।

মহারাজা প্রতাপ সিংহ

মহারাজা প্রতাপ সিংহের সিংহাসনে আরোহণ করা হইতেই যে ইংরাজ পূর্ব্বভাবের পরিবর্ত্তন করিলেন, তাহা কাশ্মীরের রেসিডেণ্ট নিয়োগেই বুঝিতে পারা যায়। তাহার পূর্ব্বে কাশ্মীরে ইংরাজ রেসিডেণ্ট ছিলেন না, ছিলেন এক জন "অফিসার অন স্পেশাল ডিউটী"

তাঁহার কায সত্য সত্যই বিশেষ ভাবের ছিল; কারণ, তিনি বৎসরে ৮ মাস শ্রীনগরে থাকিয়া তথায় সমাগত যুরোপীয়দিগের তত্ত্বাবধান করিতেন মাত্র। তাঁহার আর একটি কায ছিল—তিনি মহারাজার এক জন কর্ম্মচারীর সহিত একযোগে যুরোপীয়দিগের সহিত মহারাজার প্রজাদিগের মামলার বিচার করিতেন। মহারাজার সহিত ভারত সরকারের কোন বিষয়ের আলোচনায় তাঁহাকে মধ্যে রাখিতে হইত না এবং তিনি রাজ্যের কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপও করিতে পারিতেন না। প্রতাপ সিংহ রেসিডেণ্ট নিয়োগ ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের সন্ধিসর্ত্ত-বিরুদ্ধ বলিয়া আপত্তি করিলেও ভারত সরকার সে আপত্তি গ্রাহ্য করিলেন না। যদিও গত ৩৯ বৎসরের মধ্যে রেসিডেণ্ট নিযুক্ত করা হয় নাই এবং কাশ্মীরে যুরোপীয় পর্য্যটকবাহুল্য হেতু মহারাজার অনুরোধেই "অফিসার অন স্পেশাল ডিউটী" নিযুক্ত করা হইয়াছিল, তথাপি এ বার ভারত সরকার রেসিডেণ্ট নিযুক্ত করিলেন। রেসিডেণ্ট নিয়োগের ফলে ভারত সরকারের সহিত মহারাজার সরাসরি কোন বিষয়ের আলোচনার পথ বন্ধ হইয়া গেল। দেশীয় রাজ্যে রেসিডেণ্টদিগের ক্ষমতা কিরূপ অসাধারণ, তাহার অনেক পরিচয় অন্যত্র পাওয়া গিয়াছে—কাশ্মীরেও সে নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই। এই সময় শ্রীনগরে প্রথম ইংরাজের পতাকা উড্ডীন করা হয়। তাহাতেও প্রতাপ সিংহের প্রতিবাদ নিষ্ফল হইয়াছিল।

এই সময় মহারাজা সংবাদ পাইলেন, কাশ্মীরে বৃটিশের একটি গোরাবারিক প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রস্তাব হইতেছে। ইহাতে তিনি আতঙ্কিত হইলেন। তাঁহার আতঙ্কানুভবের কারণও ছিল। এক বার এইরূপ ভাবে বৃটিশের গোরাবারিক প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহা আর যায় না—গোয়ালিয়র রাজ্যে তাহা দেখা গিয়াছিল। প্রতাপ সিংহ দুই বার রেসিডেণ্টের কাষের প্রতিবাদ করিয়া ব্যর্থ-মনোরথ হইয়াছিলেন। তাই স্বয়ং কলিকাতায় যাইয়া এ বিষয় বড় লাট লর্ড ডাফরিণের গোচর করিবার অভিপ্রায়ে যাত্রা করিলেন। লর্ড ডাফরিণের সহিত তাঁহার সাক্ষাতের ফলে কাশ্মীরে বৃটিশ গোরাবারিক স্থাপনের প্রস্তাব পরিত্যক্ত হইল। সঙ্গে সঙ্গে আরও একটি কায হইল। কাশ্মীরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য ও সম্পদ দেখিয়া প্রলুব্ধ য়ুরোপীয়রা তথায় জমী কিনিবার আয়োজন করিতেছিলেন। দেশীয় রাজ্যে দেশীয় প্রজাপুঞ্জের মধ্যে যুরোপীয়দিগের জমী গ্রহণের নানা অসুবিধার কথা তিনি বড় লাটের গোচর করেন এবং বড় লাটও তাঁহার কথা সঙ্গত বলিয়া স্বীকার করেন।

তৎকালে ইংরাজের ভয় ছিল, রুসিয়া ভারতবর্ষ আক্রমণ করিবে। যদিও কোন অভিজ্ঞ ব্যক্তি দেখাইয়াছেন, কাশ্মীরের পথে রুসিয়ার পক্ষে ভারতবর্ষ আক্রমণ করা অসম্ভব, * তথাপি এক দল লোক, যে কারণেই বা যে উদ্দেশ্যসিদ্ধির অভিপ্রায়েই হউক, সেই ভয় প্রকাশ করিতেছিলেন। সেই দলের লোকদিগের মধ্যে সার লেপেল গ্রিফিনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি স্পষ্টই বলিয়াছিলেন, যদি কাশ্মীরে ৩০ লক্ষ ইংরাজকে বসতি করান যায়, তবে রুসিয়াকে ভারত সাম্রাজ্যের সীমা হইতে দূরে রাখিবার উপায় করা যায়। অবশ্য ৩০ লক্ষ ইংরাজকে বিলাত হইতে আনাইয়া কাশ্মীরে বাস করান সম্ভব কি না, তাহা বিবেচ্য। কিন্তু সম্ভব হইলেও তাহাতে যে কাশ্মীরের প্রজাদিগের প্রতি অসাধারণ অত্যাচার করা হয়, তাহা বলাই বাহুল্য।

মহারাজা কলিকাতায় আসিয়া বড় লাটের সহিত সাক্ষাৎ করার ফলে কাশ্মীরে ইংরাজের গোরাবারিক সংস্থাপনের প্রস্তাব স্থগিদ হইল বটে, কিন্তু তাহার পূর্ব্বেই সে জন্য যে বিষবৃক্ষের বীজ বপন করা হইয়াছিল, তাহা হইতে তখন বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়াছে এবং শেষে মহারাজাকেই তাহার ফল আস্বাদ করিতে হইয়াছিল। ইংরাজ দূত গিলগিট লইবার জন্য ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন এবং মহারাজা সে ষড়যন্ত্র প্রহত করায় তাঁহাদের ক্রোধ বর্দ্ধিত হইয়াছিল—তাঁহারা মহারাজার কনিষ্ঠ ভ্রাতা রাজা অমর সিংহের সাহায্যে তাঁহার সর্ব্বনাশসাধন করেন।

যে বৎসর মহারাজা প্রতাপ সিংহকে পরোক্ষভাবে রাজ্যচ্যুত করা হইয়াছিল, সেই বৎসর 'অমৃতবাজার পত্রিকা' সরকারী দপ্তরের একখানি গুপ্তলিপি প্রকাশ করায় দেশে ও বিদেশে বিশেষ বিক্ষোভ উপস্থিত হয়।

* Dr. Wakefield attached to Her Majesty's Field Forces.

চেনার বাগ

করিলেও যদি আমরা গিলগিট ইংরাজ রাজ্যভুক্ত করি বা নিকটবর্ত্তী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের উপর কাশ্মীরের প্রভুত্ব বিনষ্ট করি—সর্ব্বোপরি এখন আমরা যদি কাশ্মীরে বৃটিশ সেনাবল স্থাপিত করি, তবে কাশ্মীর দরবার আমাদের শত্রু হইয়া উঠিবেন, এবং ফলে বর্ত্তমান সমস্যা আরও জটিল হইয়া দাড়াইবে। আমার মতে, সেরূপ করার কোন প্রয়োজন নাই। বলা বাহুল্য, সেই সব প্রতিবেশী রাজ্যের সহিত কাশ্মীরের সম্বন্ধ আমরা নিয়ন্ত্রিত করিব, এখনই আমরা সে অধিকার

ইহারই প্রকাশফলে সরকারী সংবাদ গুপ্ত রাখিবার জন্য এক আইন বিধিবদ্ধ হয়। এই লিপি পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায়, কাশ্মীরের রেসিডেণ্ট মিষ্টার প্লাউডেন মত প্রকাশ করেন—ইংরাজ সামরিক কারণে গিলগিট অধিকার করিবেন। সেই জন্যই মহারাজা প্রতাপ সিংহের বিরুদ্ধে কু-শাসনের মিথ্যা অভিযোগ উপস্থাপিত করা হইয়াছিল। তখন সার হেনরী মর্টিমার ডুরাণ্ড ভারত সরকারের পররাষ্ট্র-সচিব। তিনি মিষ্টার প্লাউডেনের প্রস্তাবে আপত্তি করিয়া বড় লাট লর্ড ডাফরিণের নিকট নিম্নলিখিত মর্ম্মে মত পেশ করেন :—

"এ বিষয়ে আমি কাশ্মীরের রেসিডেণ্ট মিষ্টার প্লাউডেনের সহিত একমত নহি। তিনি সর্ব্ববিষয়েই কাশ্মীরের কথা অবজ্ঞা করিতে চাহেন এবং এইরূপ ভাব প্রকাশ করেন যে, আমরা যদি কোন কায চাহি—সে কায আমাদেরই করা সঙ্গত।

"এই মতলবের বিষয় আমি যতই বিবেচনা করি, ততই আমার মনে হয়—গিলগিটে দায়িত্বশীল সামরিক ব্যবস্থা সম্বন্ধে আমরা প্রকাশ্যভাবে হস্তক্ষেপ যত বর্জ্জন করিতে পারি, ততই ভাল। এ বিষয়ে কাশ্মীর দরবার আমাদের সহিত একযোগে কায সম্ভোগ করিতেছি। এমন কি, লছমন দাসের কর্ম্মচ্যুতির পর হইতে দরবার মিষ্টার প্লাউডেনকে বলিয়াছেন—তিনি যেন দরবারকে কোন কথা জিজ্ঞাসার অপেক্ষা না রাখিয়াই গিলগিটের কর্ম্মচারীদিগকে কার্য্যসম্বন্ধে উপদেশ (বা আদেশ) দেন। যদি গিলগিটে এক জন স্থিরবুদ্ধি ও বিবেচক কর্ম্মচারী থাকেন এবং তিনি অকারণে কোন কাযে হস্তক্ষেপ না করেন, তবে কাহারও (অর্থাৎ কাশ্মীর দরবারের) মনে বেদনা না দিয়া আমরা অল্পকালমধ্যেই সব ক্ষমতা হস্তগত করিতে পারিব।

"মোট কথা, আমার মতে আমরা কোনরূপ গোল
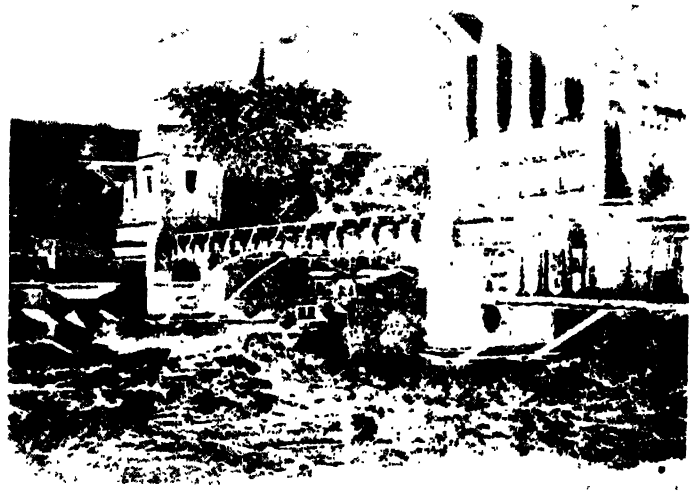
ঝিলামের উপর সেতু

না করিয়া এবং অস্থায়িভাবে এক জন বাছাই করা সামরিক কর্ম্মচারীকে (ইনটেলিজেন্স বিভাগের কাপ্টেন এ, ডুরাণ্ড) ও চিকিৎসা বিভাগের এক জন অপেক্ষাকৃত অল্পদিনের কর্ম্মচারীকে তথায় প্রেরণ করি। যে সময় ও যে স্থানে প্রয়োজন হইবে, তখন তথায় উভয়ে দরবারের সাহায্য পাইবেন এবং তাঁহারা কোনরূপ অবিবেচনার কায না করিলেই দরবার তাঁহাদের প্রকৃত কায়ের উদ্দেশ্য উপলব্ধি করিতে পারিবেন না। সামরিক বিষয়ে কোনরূপ অসুবিধা থাকিলে তাঁহারা দরবারের সম্মতি লইয়াই কায করিবেন। একবার যদি আমরা দরবারের মনে এই বিশ্বাস উৎপন্ন করিয়া দিতে পারি যে, আমরা দরবারের কল্যাণকল্পে কায করিতেছি, তবে আমাদের উদ্দেশ্যসিদ্ধিতে আর সন্দেহ থাকিবে না। ক্রমে বুঝিতে পারা যাইবে, আমি যাহা বলিতেছি, তাহাই ঠিক। আমার মনে হয়, লর্ড ক্যানিং-এর সময় যে উদ্দেশ্যসাধন করার কথা কল্পিত হইয়া পরে—বিবেচনা করিয়া, পরিত্যাগ করা হইয়াছিল, এইরূপে আমরা সে উদ্দেশ্য সাধিত করিয়া লইতে পারিব।

"শেষে দরবারের পক্ষে কাশ্মীরে যাইয়া মেজর মেলিস বর্ত্তমানে সুশাসনের অভাবগ্রস্ত কাশ্মীর রাজ্যের সুশাসনের ব্যবস্থা-বিষয়ে তাঁহার মত দাখিল করিবেন। তাহাতেই সরকারের নীতি দৃঢ় করিবার উপায় থাকিবে।

"বর্ত্তমানে সীমান্ত রক্ষার জন্য দরবারের সকল শক্তি বৃটিশ সরকারের ব্যবহার জন্য সমর্পণ করিবার অভিপ্রায় দরবার জানাইয়াছে। গিলগিটে ইংরাজের রাজনীতিক কর্ম্মচারী ও সেনাবল সংস্থাপন প্রয়োজন হইবে কি না, তাহা ৬ মাস পরে আমরা বুঝিতে পারিব।"

৬ই মে তারিখে সার মর্টিমার এই কথা লিপিবদ্ধ করেন এবং ১০ই তারিখে বড় লাট লর্ড ডাফরিণ তাহাতে মত প্রকাশ করেন "তথাস্তু" (Very well)।

সার মর্টিমারের লিপি পাঠ করিলে বুঝিতে বিলম্ব হয় না যে, তিনি চতুর রাজনীতিক ও সাম্রাজ্যবাদের পূর্ণ সমর্থক ছিলেন। এইরূপ লোক, প্রকাশ্যভাবে লোকের মনে বেদনা দিতে চাহে না—পরন্তু ছোট ছোট অত্যাচার অনাচার দৃঢ়তা সহকারে দূর করিয়া লোকের মন শঙ্কাশূন্য করে এবং তাহার পর কৃত কার্য্যের দ্বারা পরোক্ষভাবে আপনার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিয়া লয়। লর্ড লিটন "ফুলার মিনিটে" এ দেশে য়ুরোপীয়দিগের দ্বারা দেশীয় লোকের প্রতি অনুষ্ঠিত শারীরিক অত্যাচারের তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, কিন্তু কাবুল আক্রমণে ভারতের রাজস্ব জলের মত অপব্যয় করিতে কুণ্ঠা বোধ করেন নাই। লর্ড কার্জ্জন "নাইন্থ লান্সাস" সেনাদলের দ্বারা এক জন ভারতীয়ের হত্যার জন্য সমগ্র সেনাদলকে দণ্ড দিয়াছিলেন, কিন্তু জনমত পদদলিত করিয়া বঙ্গভঙ্গে তাঁহার প্রকৃত মনোভাবের পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। লর্ড ডাফরিণও চতুর রাজনীতিক ছিলেন এবং সেই জন্যই তিনি সার মর্টিমারের প্রস্তাবই সমীচীন বলিয়া মনে করিয়াছিলেন—বলে কাশ্মীর আয়ত্তাধীন না করিয়া কৌশলে সে কার্য্য সিদ্ধ করাই সঙ্গত, প্রকাশ্যে কাশ্মীর দরবারের ক্ষমতা হস্তগত না করিয়া সুশাসনের অজুহতে সে ক্ষমতা পরিচালন করাই রাজনীতিকোচিত।

কিন্তু সার মর্টিমারের পত্র পাঠ করিলেই বুঝা যায়, কাশ্মীর রাজ্য—অন্ততঃ গিলগিট অধিকার করিবার জন্য পূর্ব্ব হইতেই ষড়যন্ত্র চলিতেছিল এবং কাশ্মীরের রেসিডেণ্ট মিষ্টার প্লাউডেন গিলগিট ইংরাজরাজ্যভুক্ত করিয়া তথায় ইংরাজের সেনাবল প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য প্রস্তাবও করিয়াছিলেন।

সে প্রস্তাব লর্ড ডাফরিণ গ্রহণ করেন নাই বটে, কিন্তু মিষ্টার প্লাউডেন প্রমুখ ইংরাজ রাজকর্ম্মচারীদিগের ষড়যন্ত্রে মহারাজা প্রতাপ সিংহকে অশেষ লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছিল।

'অমৃতবাজার পত্রিকায়' সরকারের পররাষ্ট্র বিভাগের এই লিপি প্রকাশিত হওয়ায় ভারত সরকার অত্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়িলেন; কে, কোথা হইতে কিরূপে ইহা সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা লইয়া কল্পনা-জল্পনা চলিতে লাগিল। তখন 'অমৃতবাজার পত্রিকা' বহু রাজকর্ম্মচারীর ত্রুটি প্রদর্শন করাইয়া দিয়া তাঁহাদের শঙ্কা অর্জ্জন করিয়াছেন। সম্পাদক শিশিরকুমার ঘোষ কোনরূপ কৌশলে লিপি হস্তগত করিয়াছেন, কি কুশাগ্রবুদ্ধি নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় কাশ্মীর দরবারের পক্ষ হইতে অবাধে অর্থব্যয় করিয়া সরকারের দপ্তর হইতে তাহা সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহা জানিবার উপায়

আজ আর নাই। এই ২ জন বাঙ্গালী কাশ্মীরের ব্যাপারে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কায করিয়াছিলেন। নীলাম্বর বাবু প্রায় ২০ বৎসর কাশ্মীরের রাজনীতিক ব্যাপারে বিশেষভাবে লিপ্ত ছিলেন এবং কাশ্মীরের মহারাজা প্রতাপ সিংহের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীরা এক সময় এমন রটনাও করিয়াছিলেন যে, তিনি গিলগিটের পথে রুসিয়াকে ভারতে প্রবেশের উপায় করিয়া দিতে ইচ্ছুক ছিলেন। গিলগিটের পথে রুসিয়ার ভারতবর্ষ আক্রমণ করা কিরূপ অসম্ভব ব্যাপার, তাহা ভারতের মানচিত্র ও গিলগিটের অবস্থান বিবেচনা করিলেই বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু নিন্দকের রসনা কে সংযত করিতে পারে? জনরব, মহারাজা প্রতাপ সিংহ শাসনভার ত্যাগে বাধ্য হইলে নীলাম্বর বাবু যখন তাঁহার পক্ষ হইয়া আন্দোলন করিবার উদ্দেশ্যে আবশ্যক কাগজপত্র লইয়া আসিতেছিলেন, তখন ট্রেণে কয় জন লোক তাঁহার কামরায় প্রবেশ করিয়া তাঁহার দ্রব্যাদি লুণ্ঠন করে এবং তিনি প্রায় একবস্ত্রে কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হয়েন।

শিশিরকুমারের মত নীলাম্বরেরও আদি নিবাস যশোহর জিলায়। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় বিশেষ কৃতিত্ব-পরিচয় প্রদান করিয়া ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে পঞ্জাব চীফকোর্টে ওকালতী করিবার জন্য লাহোরে গমন করেন। এক বৎসরের মধ্যেই ওকালতীতে তাঁহার যশ ব্যাপ্ত হয় এবং তাঁহার প্রতিভা-পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া কাশ্মীরের সুদক্ষ প্রধান মন্ত্রী দাওয়ান কৃপারাম মহারাজা রণবীর সিংহের অনুমতি লইয়া তাঁহাকে কাশ্মীরের চীফ জজ নিযুক্ত করেন। তিনি সেই কার্য্যে রত থাকিবার সময় মহারাজা লাহোরে স্বীয় সম্পত্তির সুব্যবস্থা করিবার ভার নীলাম্বরকে প্রদান করেন। সে কার্য্যে ও চীফ জজের কার্য্যে নীলাম্বরের কৃতিত্বে মহারাজা এতই মুগ্ধ হয়েন যে, তাঁহার বেতন প্রায় দ্বিগুণ করিয়া দেন। ইহার

কাশ্মীরী নর-নারী

অল্পদিন পরে কাশ্মীরে রেশমের শিল্প প্রবর্ত্তিত হয় এবং তাহার প্রবর্ত্তনভার নীলাম্বরের উপর অর্পিত হয়। তাঁহার ব্যবস্থায় সে শিল্প বিশেষ উন্নতি লাভ করে এবং সে জন্য ভারত সরকার ও ভারত-সচিব তাঁহার প্রশংসা করেন। তিনি মহারাজা রণবীর সিংহের বিশেষ প্রিয়পাত্র হইয়া উঠেন। কিন্তু অন্য-কর্ম্মচারীরা ঈর্ষ্যাহেতু তাঁহার রেশম কুঠীর কার্য্য পরিচালন সম্বন্ধে নিন্দাবাদ করিতে থাকেন। বিরক্ত হইয়া তিনি সে কায হইতে অবসর প্রার্থনা করিলে মহারাজা তাঁহাকে অন্যতম মন্ত্রী নিযুক্ত করিয়া গুণ-গ্রাহিতার পরিচয় প্রদান করেন। মহারাজা রণবীর সিংহের মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত নীলাম্বরবাবু কাশ্মীরের অন্যতম মন্ত্রী ছিলেন। অল্প বয়সে প্রতাপ সিংহ নীলাম্বরকে প্রীতির দৃষ্টিতে দেখিতেন না বটে, কিন্তু ক্রমে তিনি তাঁহার মর্য্যাদা বুঝিতে আরম্ভ করেন। মহারাজা রণবীর সিংহও মৃত্যুশয্যায় পুত্রকে বলিয়া গিয়াছিলেন, নীলাম্বরকে তিনি যেন বিশ্বাসভাজন ও প্রভুভক্ত পরামর্শদাতা বলিয়া মনে করেন। প্রতাপ সিংহ রাজ্য পাইয়া তাঁহাকে রাজস্ব-সচিবের পদ প্রদান করেন এবং তিনিও একাগ্রতা সহকারে কর্ত্তব্য পালন করিতে থাকেন। কিন্তু তিনিই সর্ব্ব প্রথমে মহারাজার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের বিষয় ও তাঁহার সম্বন্ধে ষড়যন্ত্রকারীদিগের মনোভাব বুঝিতে পারিয়া প্রতাপ সিংহের সিংহাসনারোহণের এক বৎসর পরে ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে পদত্যাগ করিতে চাহেন। মহারাজা বার বার ৩ বার তাঁহার পদত্যাগপত্র গ্রহণ করিতে অসম্মতি জানাইয়া চতুর্থ বার তাহা গ্রহণ করেন। নীলাম্বরের কাশ্মীর দরবারে কার্য্যত্যাগে মহারাজার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীদিগের বিশেষ সুবিধা হয়। শেষে বিপন্ন হইয়া মহারাজা যখন ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে রাজ্যশাসন জন্য মন্ত্রিমণ্ডল গঠন করিবার প্রস্তাব করিয়া নীলাম্বর বাবুকে রাজস্ব সচিব করিতে চাহেন, তখন ভারত সরকারই তাহাতে প্রবলভাবে আপত্তি জ্ঞাপন করেন। ঐ বৎসর ২৫শে জুলাই তারিখে ভারত সরকার কাশ্মীরের রেসিডেণ্টকে যাহা লিখেন, তাহাতে লিখিত হয়—"ভারত সরকার রাজস্ব বিভাগের ভার দিয়া বাবু নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়কে মন্ত্রিপরিষদে নিযুক্ত করিতে অনুমতি দিতে অস্বীকার করিয়াছেন। মহারাজা যদি তাঁহাকে অন্য কোন ভাবে চাকুরী দিবার প্রস্তাব উত্থাপিত করেন, তবে আপনি মহারাজাকে জানাইতে পারেন যে, নীলাম্বরবাবুর কাশ্মীরে প্রত্যাবর্ত্তন ভারত সরকারের অভিপ্রেত নহে।" লর্ড ডাফরিণও মহারাজাকে লিখেন, "বাবু নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়কে রাজস্ব সচিব নিযুক্ত করা অভিপ্রেত বলিয়া বিবেচনা করি না।" যিনি দীর্ঘ পঞ্চদশ বর্ষকাল কাশ্মীর দরবারে যোগ্যতা সহকারে নানা কায করিয়া যশ অর্জ্জন করিয়াছিলেন, তাঁহার সম্বন্ধে ভারত সরকারের এইরূপ ভাবপ্রকাশের রহস্য কে ভেদ করিতে পারে? নীলাম্বর বাবুর কাশ্মীর দরবারে কার্য্যত্যাগের কথায় লাহোর চীফ কোর্টের উকীল যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু মহাশয় যথার্থই বলিয়াছিলেন "It became impossible for a highly honest and conscientious man to contiue in office any longer."*

সার মর্টিমারের যে লিপি 'অমৃতবাজার পত্রিকা' প্রকাশ করিয়া দেন, তাহার সকল বিষয়ই অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালিত হইয়াছিল, কেবল তিনি যে কাহারও মনে ব্যথা না দিয়া কার্য্যোদ্ধারের কথা বলিয়াছিলেন, তাহাই হয় নাই—কাশ্মীরের মহারাজা সার প্রতাপ সিংহকে বিশেষরূপ লাঞ্ছিত করা হইয়াছিল। তাই 'অমৃতবাজার' বলিয়াছিলেন, যখন সার জন গর্ষ্ট বলিয়াছিলেন—প্রতাপ সিংহের মত দুর্ব্বলচেতা লোক যদি রাজ্যভার ত্যাগের স্বীকৃতিপত্র প্রত্যাহার করেন, তাহাতেও তিনি বিস্মিত হইবেন না, লর্ড ক্রস যখন বলিয়াছিলেন, মহারাজা প্রজাদিগের উপর অত্যাচার করিয়া থাকেন; লর্ড ল্যান্সডাউন যখন বলিয়াছিলেন, মহারাজা অত্যাচারী ও কুশাসক, তখন তাঁহারা মহারাজার রাজ্যচ্যুতির প্রকৃত কারণ জানিতেন না। প্রকৃত কারণ ভারত সরকার গিলগিট হস্তগত করিতে চাহিতেছিলেন।

'অমৃতবাজার' যে বলিয়াছিলেন, সার জন গর্ষ্ট, লর্ড ক্রস ও লর্ড ল্যান্সডাউন মহারাজা প্রতাপ সিংহের রাজ্যচ্যুতির প্রকৃত কারণ অবগত ছিলেন না, সে কথা অবশ্য বিশ্বাস্য নহে। তাঁহারা জানিয়াও প্রকৃত কারণ প্রকাশ করেন নাই। 'অমৃতবাজার' যে স্পষ্ট করিয়া সে কথা

* Cashmere and its Prince.

বলেন নাই, তাহার কারণ, তখন ভারত সরকার সরকারী গুপ্ত সংবাদ প্রকাশ আদালতে দণ্ডনীয় করিবার জন্য এক আইন বিধিবদ্ধ করিতেছিলেন। 'অমৃতবাজারের' জন্য লর্ড লিটন এ দেশের দেশীয় ভাষায় পরিচালিত সংবাদপত্র সম্বন্ধে কঠোর আইন করিয়াছিলেন। 'অমৃতবাজারের' জন্য লর্ড ল্যান্সডাউন সিমলা শৈলশিরে নূতন আইন রচনা করিতেছিলেন। সেই আইনের আলোচনা-প্রসঙ্গে লর্ড ল্যান্সডাউন সুদীর্ঘ বক্তৃতায় 'অমৃতবাজারের' এই লিপি প্রকাশ আইনতঃ দণ্ডনীয় বিশ্বাসঘাতকতার ফল বলিয়া অভিহিত করেন এবং বলেন, প্রকাশিত লিপির প্রথম ও দ্বিতীয় প্যারা যে সত্য সত্যই সার মর্টিমারের লিপি হইতে উদ্ধৃত এবং তাহা মূল দলিল দেখিয়া কেহ নকল করিয়া বা স্মৃতিগত করিয়া সংবাদপত্রে দিয়াছিলেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই! পরবর্ত্তী অংশগুলি তিনি যথাযথ বিবৃত হইয়াছে—স্বীকার না করিয়া বলেন, মূল নথিতে যাহা নাই, তাহাই প্রকাশ করার উদ্দেশ্য—ভারত সরকার কাশ্মীরের মহারাজাকে রাজ্যশাসন ভারমুক্ত করার যে উদ্দেশ্য অস্বীকার করিয়াছেন, লোককে তাহাই বিশ্বাস করান। *

ভারত সরকার যে সদুদ্দেশ্যপ্রণোদিত হইয়াই কাশ্মীরের প্রজাপুঞ্জের হিতার্থ মহারাজাকে রাজ্যশাসনভার হইতে মুক্তি প্রদান করিয়াছেন, লর্ড ল্যান্সডাউন তাহাই প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস করেন। অথচ পার্লামেন্টের সদস্যরাও পুনঃ পুনঃ চাহিয়া এই ব্যাপার সম্বন্ধীয় নথিপত্র প্রাপ্ত হয়েন নাই। † লর্ড ল্যান্সডাউনের সুদীর্ঘ বক্তৃতার আলোচনা ও বিশ্লেষণ করিবার স্থান আমাদের নাই। কিন্তু তাঁহার বক্তৃতায় তিনি যে লোকের মনোভাব পরিবর্ত্তিত করাইতে অর্থাৎ লোককে সরকারের দলিল বিকৃত করিয়া প্রকাশিত করা হইয়াছে বিশ্বাস করাইতে পারেন নাই, তাহা তৎকালেই বুঝিতে পারা গিয়াছিল। তখন ইংরাজ-পরিচালিত অন্যতম পত্র ‡ বলেন, বড় লাট যে বলিয়াছেন, 'অমৃতবাজারে' প্রকাশিত লিপির প্রথম দুইট প্যারা ব্যতীত আর সবই লেখকের স্বকপোলকল্পিত, তাঁহার বক্তৃতায় সে কথা প্রতিপন্ন হয় না। বড় লাট 'অমৃতবাজারের' মূল অভিযোগ স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

* Council of Proceed ngs.
† Condemned Unheard.—Digby
‡ The "Statesman"

রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াই প্রতাপ সিংহ প্রজার কল্যাণ সাধনে আগ্রহের পরিচয় প্রদান করেন। তিনি পিতার শূন্য সিংহাসনে বসিবার পরই রাজদরবারের পক্ষ হইতে নীলাম্বর বাবু যে ঘোষণাপত্র পাঠ করেন, তাহাতে নিম্নলিখিত প্রথা ও শুল্ক হ্রাস বা উচ্ছেদ করিবার সংবাদ ছিল * —

(১) "খোদ-খাস্ত প্রথা"। এই প্রথানুসারে দরবার গ্রামের কতকটা জমী ইজারা লইতেন এবং সেই জন্য নিযুক্ত ব্যক্তিদিগকে অগ্রিম অর্থ দিতেন। এই সব লোক সে টাকা আত্মসাৎ করিয়া ভয় দেখাইয়া প্রজাদিগের নিকট হইতে বীজ লইয়া বিনাপারিশ্রমিকে তাহাদের দ্বারা চাষ করাইয়া লইত।

(২) "বেরী" প্রথা। এই প্রথানুসারে সিপাহীদিগকে বেতন বাবদ অর্থ না দিয়া খাজনা মকুব দেওয়া হইত।

(৩) জম্মুতে প্রত্যেক ১০ খানি গৃহ হইতে ১ জন সিপাহী বা অন্য কর্ম্মচারী যোগাইতে হইত, বলপূর্ব্বক সৈনিক সংগ্রহ করা হইত এবং কেহ সেনাদল ত্যাগ করিয়া যাইলে তাহার পরিজনগণকে তাহার স্থানে লোক দিতে হইত। সে সব প্রথা লুপ্ত করা হইল।

(৪) শ্রীনগরে আনীত ধান্যাদি খাদ্য দ্রব্যের উপর মণ-করা যে ২ আনা হিসাবে শুল্ক ছিল, তাহা হ্রাস করিয়া ২ পয়সা করা হইল।

(৫) কাশ্মীরে প্রত্যেক গ্রাম্যমণ্ডলীতে "হরকরা" থাকিতেন। লোকের অপরাধের সম্বন্ধে ইজাহার দেওয়া তাঁহার কায ছিল। তিনি পুলিস ও গোয়েন্দা বহাল ও বরখাস্ত করিতে পারিতেন। প্রধান কর্ম্মচারী —"হরকরা বাসী" জমীর উৎপন্ন পণ্যের উপর শতকরা ১ টাকা ৮ আনা হিসাবে পারিশ্রমিক পাইতেন। ইঁহারা যে অসদুপায়ে প্রভূত অর্থ অর্জ্জন করিতেন, তাহা বলাই বাহুল্য। সেই জন্য উজীর পান্ন হরকরা বাসীকে বৎসরে ৩৭ হাজার ৫ শত টাকা দিতে বাধ্য করেন। ইহার

* Letter of the Resident of Kashmir.

অর্দ্ধেক টাকাও হরকরা বাসীর ন্যায়সঙ্গত প্রাপ্য নহে। সুতরাং সরকারই তাঁহাকে কৃষকের উপর অত্যাচার দ্বারা অর্থ সংগ্রহে প্রবৃত্ত করাইতেন। এই বার্ষিক ৩৭ হাজার ৫ শত টাকা আদায় বন্ধ করা হইল।

(৬) কাশ্মীরে বিক্রীত অশ্বের মূল্যের অর্দ্ধাংশ যে সরকার লইতেন, সে প্রথাও পরিত্যক্ত হইল।

উপকার হইল না, তাহাদের পক্ষে কেবল ফল ও তরকারীর মূল্য হ্রাস হইল।" *

রেসিডেণ্টের কথা সত্য হইলেও বলিতে হয়, রাজ্য-প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে দরবারের আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করিয়া প্রজার কল্যাণকামনায় পূর্ব্বোক্ত ৭ দফা ব্যবস্থা করিয়া ঘোষণা করা কুশাসকের প্রকৃতিবিরুদ্ধ; সুতরাং

দোকানের সেতু

(৭) সিয়ালকোট পর্য্যন্ত ভাড়া খাটা একার ভাড়া ২ টাকা ১০ দশ আনার মধ্যে দরবার যে ১ টাকা ১১ আনা লইতেন, তাহাও আর লইবেন না।

তৎকালে রেসিডেণ্টই স্বীকার করেন :—

"মোটের উপর ইহাতে প্রজার, বিশেষ জম্মুর কৃষক-দিগের বিশেষ উপকার হইল, কারণ, তাহাদের প্রধান অভিযোগের কারণ দূর হইল। কাশ্মীরের কৃষকেরও কল্যাণ সাধিত হইল। কেবল সহরের শিল্পীদের বিশেষ

মহারাজা প্রতাপ সিংহের এই ঘোষণা হইতেই তাঁহার সুশাসন-লিপ্সার পরিচয় পাওয়া যায়।

বাস্তবিক রাজ্যপ্রাপ্তির পর যে অল্প দিন প্রতাপ সিংহ ইচ্ছানুরূপ রাজ্যশাসন করিতে পারিয়াছিলেন, তাহারই মধ্যে তিনি—অবশ্য নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় প্রমুখ কর্ম্মচারী-দিগের পরামর্শে—রাজ্যমধ্যে বহু অনাচার উন্মূলিত

* Letter to Secretary to the Government of India, Foreign Depattment, dated Jammu, Sept. 27, 1885.

উলার হ্রদে সূর্য্যাস্ত

অবন্তীপুরের ধ্বংসপ্রাপ্ত মন্দির

করিয়াছিলেন এবং নানারূপ সংস্কারের প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। কিন্তু সে জন্য তিনি ১ বৎসরের বড় অধিক সময় পায়েন নাই। আমরা নিম্নে প্রতাপ সিংহের প্রবর্ত্তিত সংস্কারব্যবস্থার প্রধানগুলির পরিচয় প্রদান করিতেছি। সে সকল বড় সাধারণ নহে :—

(১) কাশ্মীরের কোন প্রজা সেনাদল হইতে পলায়ন করিলে তাহার সন্ধান না মিলিলে তাহার আত্মীয়স্বজনকে দণ্ড দিবার প্রথা ছিল। প্রতাপ সিংহ সে প্রথা বিলুপ্ত করেন।

(২) সরকার নির্দ্দিষ্ট নামমাত্র মূল্য দিয়া কৃষকদিগের নিকট হইতে লুই (শীতবস্ত্র), ঘৃত, অশ্ব, পশম প্রভৃতি রাজকর্ম্মচারীদিগের দ্বারা ক্রয় করিতেন। ইহাতে প্রজার উপর দারুণ অত্যাচার হইত। দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইতে হইলে ধরা যায়—সরকারের যদি ২ শত লুই কিনিবার প্রয়োজন হইত, তবে প্রত্যেক তহশিলদারের উপর সামান্য দামে ১০ খানি করিয়া লুই যোগাইবার আদেশ জারি করা হইত। তহশিলদাররা সেই মূল্যে প্রজার নিকট হইতে বহু লুই ক্রয় করিয়া ১০ খানি সরকারকে দিয়া অবশিষ্ট বাজার দরে বিক্রয় করিয়া লাভবান্ হইত। মহারাজা প্রতাপ সিংহ রাজ্য লাভ করিয়াই এ প্রথা উন্মূলিত করেন।

(৩) কতকগুলি দ্রব্যের উপর রপ্তানী শুল্ক অত্যন্ত চড়া থাকায় বাণিজ্যের প্রসার লাভ হইতেছিল না। সে সব শুল্ক তুলিয়া দেওয়া হয়।

(৪) কাশ্মীরে বিক্রীত অশ্বের মূল্যের একাংশ সরকার পাইতেন, নৌকা গঠনের উপর কর ছিল; এবং শ্রীনগর হইতে চালানী পশমী কাপড়ের মূল্যের শতকরা ২০ টাকা শুল্ক হিসাবে আদায় করা হইত। শেষোক্ত শুল্ক হইতে সরকারের বার্ষিক প্রায় ২ লক্ষ টাকা আয় ছিল; কিন্তু ইহাতে পশমী কাপড়ের ব্যবসার বিশেষ ক্ষতি হইত। এই সব ব্যবস্থা রহিত করা হয়।

(৫) কাশ্মীর রাজ্যে "ধর্ম্মার্থ" বা দান জন্য, মন্দিরের জন্য ও শিক্ষার জন্য কর আদায় করা হইত। জমীর উৎপন্ন ফসলের একাংশ এই সব করের জন্য গ্রহণ করা হইত। তহশিলদাররা বা ইজারদাররা এই সব কর আদায় করিতেন এবং প্রজার উপর তজ্জন্য পীড়ন হইত। সে সব করও রহিত করা হয়।

(৬) ইষ্টক, চূণ, কাগজ ও আর কয়টি দ্রব্য প্রস্তুত করিবার একচেটিয়া অধিকার সরকারের ছিল। সরকার সেই একচেটিয়া অধিকার ত্যাগ করেন। কাগজের সম্বন্ধে মহারাজা প্রতাপ সিংহ ঘোষণা করেন—"এত দিন পর্য্যন্ত জম্মু ও কাশ্মীর প্রদেশদ্বয়ে কাগজ প্রস্তুত করিবার একচেটিয়া অধিকার প্রদত্ত হইত অর্থাৎ সরকারের নির্দ্দিষ্ট নিয়ম ব্যতীত কাগজ প্রস্তুত ও বিক্রয় করা যাইত না। আমরা অদ্য হইতে এই ব্যবস্থা বর্জ্জন করিলাম। এখন হইতে যে কেহ ইচ্ছামত কাগজ প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করিতে পারিবে।"

(৭) সময় সময় শ্রীনগর, জম্মু ও অন্যান্য সহরে আমদানী খাদ্যদ্রব্যের উপর শুল্ক আদায় করা হইত। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে, শ্রীনগরে আমদানী ১ টাকার খাদ্যদ্রব্যের জন্য ২ আনা শুল্ক আদায় হইত। কোন কোন ক্ষেত্রে শুল্ক হ্রাস করা কোথাও বা বর্জ্জন করা হয়। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দেই মহারাজা প্রতাপ সিংহ ঘোষণা করেন—"জম্মু সহরে ও প্রদেশে সব্জীর উপর শুল্ক ছিল এবং শুল্ক ইজারা দেওয়া হইত। অদ্য হইতে তাহা রহিত করা হইল। প্রজারা ইচ্ছামত সব্জী ক্রয়-বিক্রয় করিতে পারিবে।"

(৮) ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দেই মহারাজা ঘোষণা করেন, প্রজার কল্যাণকল্পে তিনি "পঞ্জ নজরং" ও "খানা পট্টী" কর তুলিয়া দিলেন। শেষোক্ত কর বিবাহের উপর আদায় করা হইত।

(৯) কাশ্মীরে মুসলমানদিগকে বিবাহের জন্য কর দিতে হইত; সে কর রহিত করা হয়।

(১০) কাহার প্রভৃতি সম্প্রদায়ের বিচার ঠিকা দেওয়া হইত। ব্যবস্থাটা এইরূপ ছিল—ঠিকাদার সরকারে টাকা দিয়া কাহার বা সেইরূপ অন্য কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে সংঘটিত সব মোকর্দ্দমার বিচার করিবার অধিকার লাভ করিত। ঠিকা বন্দোবস্তের পর কোন কাহার যদি সাধারণ আদালতে অন্য কোন কাহারের বিরুদ্ধে মোকর্দ্দমা করিত, তবে ঠিকাদার তাহাতে আপত্তি করিত। এইরূপে সাধারণ বিচারালয়ে সে সব

মোকর্দ্দমার বিচার না হওয়ায় ঠিকাদার আসামী ও ফরিয়াদীর উপর যথেচ্ছ ব্যবহার করিত। সেই প্রথা পরিত্যক্ত হয়।

(১১) কাশ্মীর ও জম্মুতে শ্রম ও খাদ্যদ্রব্য সরবরাহে বেগার প্রথা প্রচলিত ছিল। দরবার শ্রমিকের পারিশ্রমিকের ও খাদ্যদ্রব্যের মূল্যের হার নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়া আদেশ প্রচার করেন—সেই হারে টাকা না দিয়া সরকারের জন্য শ্রমিক নিযুক্ত করা বা খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করা হইবে না।

(১২) স্বর্ণকার প্রভৃতি নিপুণ শিল্পীদিগকে সরকারের কাযের জন্য যে হারে পারিশ্রমিক প্রদান করা হইত, তাহা সাধারণ হার অপেক্ষা অনেক অল্প। ইহাতে শিল্পীরা সরকারী কাযের জন্য ত অল্প হারে বেতন পাইতই, পরন্তু সরকারী কর্ম্মচারীরাও সেই হারে পারিশ্রমিক দিয়া আপনাদের কায করাইয়া লইতেন। মহারাজা প্রতাপ সিংহের আদেশে এই প্রথা পরিত্যক্ত হয়।

(১৩) ব্রাহ্মণরা প্রায়ই দণ্ড হইতে অব্যাহতি লাভ করিতেন। ইহাতে তাঁহারা আপনাদের যেমন সুবিধা করিয়া লইতেন, অন্যান্য বর্ণের তেমনই অসুবিধা ঘটাইতেন। মহারাজা প্রতাপ সিংহ স্বয়ং রক্ষণশীল হিন্দু হইলেও বিচারে অপক্ষপাতিত্ব রক্ষার জন্য নিয়ম করেন, অপরাধী জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে আইনতঃ দণ্ডিত হইবে।

(১৪) প্রজাদিগের মধ্যে উচ্চ শিক্ষা প্রচারে মনোযোগী হইয়া মহারাজা জম্মুতে একটি ও শ্রীনগরে একটি উচ্চশ্রেণীর বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেন। প্রতিষ্ঠার যে সামান্য উপকরণ বিদ্যমান ছিল, তিনি তাহারই সদ্ব্যবহার করিয়া এই বিদ্যালয়দ্বয় স্থাপিত করেন।

(১৫) জম্মুতে ও শ্রীনগরে মিউনিসিপ্যালিটীর ব্যবস্থা করা হয়। এই মিউনিসিপ্যালিটী ২টির কার্য্যপরিচালন ও উন্নতিসাধন বিষয়ে মহারাজা প্রতাপ সিংহ বিশেষ সচেষ্ট ছিলেন।

(১৬) রাজ্যমধ্যে ব্যবস্থার জন্য কর্ম্মচারীদিগের ছুটীর এবং শিক্ষা প্রভৃতির নিয়ম রচিত হয়।

মহারাজা প্রতাপ সিংহ রাজা হইয়া যে অল্পকাল ইচ্ছানুসারে ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের স্বাধীনতা সম্ভোগ করিয়াছিলেন, তাহারই মধ্যে তিনি যে সব সংস্কার প্রবর্ত্তন করেন, আমরা তাহার কয়টির উল্লেখ করিলাম। তাহাতেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন, তিনি সর্ব্বপ্রযত্নে রাজ্যের উন্নতিসাধনে চেষ্টিত হইয়াছিলেন। পূর্ব্বোক্ত ব্যবস্থাসমূহে যে রাজ্যের আয়ের হ্রাস হইয়াছিল, তাহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু প্রজার কল্যাণকামনায় প্রতাপ সিংহ সে ত্যাগ স্বীকার করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই। আর সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও মনে রাখিতে হয় যে, তিনি কাশ্মীর রাজ্যকে কোনরূপে ঋণভারাক্রান্ত করেন নাই।

কাশ্মীরে মহারাজা প্রতাপ সিংহ যে নানারূপ সংস্কার প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহা বড় লাট লর্ড ডাফরিণও অস্বীকার করিতে পারেন নাই। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের ২৮শে জুলাই তারিখে তিনি মহারাজাকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে বলা হয় :—

"সংস্কারবিষয়ে নানারূপ উন্নতি সাধিত হইয়াছে। রাজস্ব ব্যাপারে এবং পাবলিক ওয়ার্কস ও চিকিৎসা বিভাগদ্বয়ের পরিবর্ত্তনসাধনে বিশেষ প্রয়োজনীয় কায সম্পন্ন হইয়াছে।" *

কিন্তু বড় লাটের এই স্বীকারোক্তি ও প্রজার আশীর্ব্বাদ প্রতাপ সিংহকে রেসিডেণ্টের রোষ ও চক্রীদিগের ষড়যন্ত্র হইতে রক্ষা করিতে পারে নাই। যখন লর্ড ডাফরিণ এই কথা লিপিবদ্ধ করেন, তাহার পর ৮ মাস গত হইতে না হইতে মহারাজাকে রাজ্যের শাসনভারমুক্ত করা হয়। তৎকালে ভারত সরকার ভারত-সচিবকে যাহা লিখেন, তাহাতে দেখিতে পাই :—

"কাশ্মীরের অবস্থা কোন মতেই সন্তোষজনক বলা যায় না এবং রেসিডেণ্ট মিষ্টার প্লাউডেন এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন যে, যত দিন বর্ত্তমান মহারাজাকে সব ক্ষমতা সম্ভোগ করিতে দেওয়া হইবে, ততদিন উন্নতির কোন আশা করা যায় না। সেই জন্য তিনি শাসনকার্য্য হইতে মহারাজাকে সরাইয়া দিবার ব্যবস্থা করিবার জন্য ভারত সরকারকে বলিয়াছিলেন।"

তবুও ভারত সরকার তাঁহাকে তখনই শাসনব্যাপারে হস্তক্ষেপের সব ক্ষমতা ত্যাগে বাধ্য না করিয়া যদি তিনি রাজ্যশাসনক্ষমতার পরিচয় দিতে পারেন, সে জন্য অপেক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু ভারত সরকারের

* Letter to Maharaja.

সে আশা ফলবতী হয় নাই এবং বর্ত্তমান রেসিডেণ্ট কর্ণেল নিসবেটও তাঁহাকে ক্ষমতাচ্যুত করিতে বলিয়াছেন। কাযেই মহারাজাকে দিয়া ক্ষমতাত্যাগে স্বীকৃতিপত্র সহি করান হয় এবং সংপ্রতি নাভার মহারাজার সম্বন্ধে যেমন বলা হইয়াছে, তিনি স্বেচ্ছায় ক্ষমতা ত্যাগ করিয়াছেন—তখন মহারাজা প্রতাপ সিংহের সম্বন্ধেও তেমনই প্রচার করা হয়, তিনি স্বেচ্ছায় ক্ষমতা ত্যাগ করিয়াছেন ("voluntary resignation of power") * আমরা পরে এই "স্বেচ্ছাকৃত" ক্ষমতাত্যাগের স্বরূপ দেখাইয়া দিব।

প্রতাপ সিংহ কিরূপ প্রজারঞ্জক ছিলেন, তাহার পরিচয় দিবার জন্য আমরা একটিমাত্র বিষয়ের বিবরণ প্রদান করিব।—

১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের বসন্তকালে প্রতাপ সিংহ শ্রীনগরে উপস্থিত হইলেন। তখন শ্রীনগরে বিসূচিকা দেখা দিয়াছে। দেখিতে দেখিতে তাহা সংক্রামক আকার ধারণ করিয়া সমগ্র কাশ্মীর উপত্যকায় ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। রেসিডেণ্ট প্রাণভয়ে গুলমার্গে পলাইয়া যাইলেন। কিন্তু মহারাজা তাঁহার কর্ম্মস্থল ত্যাগ করিলেন না—তিনি শ্রীনগরের উপকণ্ঠে রহিলেন। এক শ্রীনগর নগরেই প্রতিদিন শতাধিক লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইতে লাগিল—দুই তিন মাসের মধ্যে রাজ্যে কয় সহস্র লোক বিসূচিকায় প্রাণত্যাগ করিল। মহারাজা নিশ্চিন্ত থাকিলেন না; পরন্তু সর্ব্বপ্রযত্নে প্রজাদিগকে রক্ষার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি মুক্তহস্তে ঔষধ-পথ্য বিতরণের ব্যবস্থা করিলেন ও চিকিৎসার সকল বন্দোবস্ত করিলেন। এক সদর ডিস্‌পেন্সারীতেই সহস্র সহস্র লোক চিকিৎসিত হইল এবং চিকিৎসায় অনেকে মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা পাইল। মফঃস্বলেও সব ডিসপেন্সারীতে এই আদর্শ অনুকৃত হইল। আমাদের মনে হয়, বর্ত্তমান যুগে ইটালীর রাজা হাম্বার্ট ব্যতীত আর কোন নৃপতি প্রজার এরূপ বিপদে আপন জীবন তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া এরূপ ব্যবস্থা করিতে পারেন নাই। ইহাতে মহারাজা প্রতাপ সিংহের প্রকৃতি-পরিচয় পাওয়া যায়।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মহারাজা রণবীর সিংহের মৃত্যুর পরই ভারত সরকার কাশ্মীরের "অফিসার অন স্পেশাল ডিউটীকে" রেসিডেণ্ট পরিণত করিয়াছিলেন। সেই পদে ৬ মাস থাকিবার পর সার অলিভার সেণ্ট জন কাশ্মীর ত্যাগ করেন ও ভারত সরকার তাঁহার স্থানে মিষ্টার প্লাউডেনকে নিযুক্ত করেন। তখন দাওয়ান অনন্তরাম প্রধান মন্ত্রী। তিনি শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন কার্য্য ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলে দাওয়ান গোবিন্দ সহায় তাঁহার স্থানে নিযুক্ত হয়েন এবং নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় অর্থ-সচিব হয়েন। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে নীলাম্বর বাবু পদত্যাগ করিলে সে মন্ত্রিমণ্ডলের কায অচল হইয়া উঠে এবং ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের বসন্তকালে দাওয়ান লছমন দাস মন্ত্রী নিযুক্ত হয়েন ও অল্পকাল পরেই তাঁহাকে পদচ্যুত করা হয়। তখন মহারাজার কনিষ্ঠ ভ্রাতা রাজা অমর সিংহ প্রধান মন্ত্রী হয়েন। ইহার পরই শাসকমণ্ডলী রচনা করা হয়—মহারাজা তাহার সভাপতি—তাঁহার দুই ভ্রাতা ও আর কয় জন সদস্য। এইরূপে প্রতাপ সিংহের ক্ষমতার ধ্বংসসাধনের সব আয়োজন সম্পূর্ণ করিয়া ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে মিষ্টার প্লাউডেন কাশ্মীর ত্যাগ করেন।

মিষ্টার প্লাউডেন কাশ্মীরে আসিয়াই প্রতাপ সিংহের বিরুদ্ধাচরণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। তিনি মহারাজার প্রতি শত্রুভাব মনে পোষণ করিয়াই যেন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন এবং দরবারের প্রতি ব্যবহারে ঘৃণার ভাব গোপন করিতেন না। তিনি সময় সময় বলিতেন, মন্ত্রিগণের উপস্থিতিতে তিনি মহারাজার সহিত কোন কথা বলিবেন না। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াই তিনি মহারাজাকে শ্রীনগরে লইয়া যাইবার জন্য ব্যস্ত হয়েন। মহারাণী পীড়িতা বলিয়া মহারাজার আগমনে বিলম্ব হইলে মিষ্টার প্লাউডেন অধীর হইয়া উঠেন এবং উদ্ধতভাবে তাঁহাকে আসিতে টেলিগ্রাফ করিতে আরম্ভ করেন ও ইঙ্গিত করেন, আগমন-বিলম্বে ভারত সরকার বিরক্ত হইবেন। এইরূপে তিনি পত্নীর রোগশয্যাপার্শ্ব হইতে পতিকে চলিয়া যাইতে বাধ্য করেন। শ্রীনগরে মহারাজা ১ মাসকাল থাকিলেও সে সময়ের মধ্যে মিষ্টার প্লাউডেন দরবার সম্বন্ধে বিশেষ কোন কথাই বলিলেন না, কেবল মহারাজা

* The Despatch from India on the deposition.

প্রজাদিগকে উচ্চশিক্ষা দিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন জানিয়া তিনি উৎকণ্ঠা প্রকাশ করেন।

মহারাজা কাশ্মীরে সমতাসূচক জমী বন্দোবস্ত করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন এবং সেই জন্য সার চার্লস এচিসনকে পত্রও লিখিয়াছিলেন। সার চার্লস পূর্ব্বে পঞ্জাবের ছোট লাট ছিলেন এবং কাশ্মীরের কল্যাণকামীও ছিলেন। সার চার্লস ২ জন লোকের নাম পাঠাইয়া মহারাজাকে তাঁহাদের মধ্যে ১ জনকে নিযুক্ত করিতে পরামর্শ দেন। মহারাজা তাঁহাকেই নির্ব্বাচনভার দিয়া বলেন, কাশ্মীরের লোকসংখ্যায় মুসলমানের প্রাবল্য হেতু মুসলমান নিয়োগেই সুবিধা হইবে। সার চার্লস তদনুসারে নির্ব্বাচন করিলে মহারাজা নির্ব্বাচিত ব্যক্তিকে চাকরী করিবার অনুমতি দিতে ভারত সরকারকে লিখেন। এই সময় মিষ্টার প্লাউডেন বলেন, ইংরাজ কর্ম্মচারী নিযুক্ত করাই ভাল। সহসা মহারাণীর পীড়াবৃদ্ধির সংবাদে ও পিতার বার্ষিক শ্রাদ্ধের সময় সমাগত বলিয়া মহারাজা জম্মু যাত্রা করিলে তিনি পথেই মিষ্টার প্লাউডেনের টেলিগ্রাম প্রাপ্ত হয়েন—মিষ্টার উইংগেটকে বন্দোবস্তের বা জমাবন্দীর জন্য নিযুক্ত করা হউক। ইহাতে সার চার্লস ও মহারাজা উভয়কেই বিব্রত হইতে হয়।

আমরা ইতঃপূর্ব্বে দাওয়ান লছমনদাসকে মন্ত্রী নিযুক্ত করিবার কথা বলিয়াছি। ইনি মিষ্টার প্লাউডেনের প্রিয়পাত্র ছিলেন। মিষ্টার প্লাউডেনই বিশেষ চেষ্টা করিয়া ইঁহাকে মন্ত্রী করিয়াছিলেন। কিন্তু দাওয়ান লছমনদাস বিলাসী ছিলেন—মন্ত্রী হইয়া তিনি কাযের ভার নিম্নস্থ কর্ম্মচারীদিগের উপর ন্যস্ত করিয়া বিশ্রাম সম্ভোগ করিতে থাকেন। বিশেষ তিনি অত্যন্ত রক্ষণশীল ছিলেন বলিয়া রক্ষণশীলতাহেতু ও স্বার্থের জন্য মহারাজার প্রবর্ত্তিত শাসন-সংস্কার ব্যবস্থায় প্রসন্ন ছিলেন না। মহারাজা যে সব শুল্ক রদ করিয়া দিয়াছিলেন, তাহাতে দরবারের আয় কমিয়া গিয়াছিল। গোলাব সিংহের সহিত দাওয়ান সাহেবের পিতার যে চুক্তি ছিল, তদনুসারে রাজস্বের হাজার টাকায় ৪ টাকা তাঁহার প্রাপ্য। রাজস্ব কমায় তাঁহার আয়ও কমিয়া গিয়াছিল বলিয়া তিনি বিরক্ত ছিলেন। তিনি সেগুলি যথাসম্ভব নষ্ট করিবার চেষ্টা করিলেন এবং রেসিডেণ্ট তাঁহার সহায় থাকায় মহারাজা কিছুই করিয়া উঠিতে পারিলেন না। রেসিডেণ্ট দাওয়ান লছমনদাসের কার্য্যে কোনরূপ আপত্তি করিলেন না এবং রাজা অমর সিংহও দাওয়ানজীর পক্ষ হইলেন। কিন্তু এততেও দাওয়ান লছমনদাসের মন্ত্রিত্ব স্থায়ী হইল না—তাঁহার মধ্যে স্থায়িত্বের উপকরণ ছিল না। প্লাউডেন-সহায় লছমনদাস যে রাজ্যের স্বার্থহানি করিতেছেন এবং মহারাজার প্রতি উদ্ধত ব্যবহার করিতেছেন, তাহা লইয়া ক্রমে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সংবাদপত্রেও আলোচনা হইতে লাগিল। রাজা অমর সিংহ সুযোগ সন্ধান করিতেছিলেন। তিনি যখন বুঝিলেন, অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সংবাদপত্রেও লছমনদাসের নিন্দা প্রকাশিত হইতেছে, তখন তিনি মহারাজার পক্ষ লইয়া মন্ত্রীকে পদচ্যুত করিতে বলিলেন। দাওয়ান লছমনদাসের মন্ত্রিত্বের অবসান হইল। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে এই ঘটনা হইল। মিষ্টার প্লাউডেন ইহার পরও কয় মাস কাশ্মীরে ছিলেন। তিনি মহারাজাকে জড়াইবার জন্য যে জাল রচনা করিয়াছিলেন, তাহা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল এবং তাঁহার উদ্ধত ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া বড় লাট লর্ড ডাফরিণ তাঁহাকে কাশ্মীর হইতে সরাইয়া দিলেন। তবে ইংরাজ কর্ম্মচারীকে সরান—তাঁহার পদোন্নতি করিয়া।

দাওয়ান লছমনদাসের মন্ত্রিত্বের অবসান হইলে মহারাজা নীলাম্বর বাবুকে কাশ্মীরে ফিরিয়া যাইয়া কার্য্যভার গ্রহণ করিতে টেলিগ্রাফ করিলেন। সে সংবাদ পাইয়াই মিষ্টার প্লাউডেন তাঁহাকে টেলিগ্রাফ করিলেন, তিনি যেন ভারত সরকারের পররাষ্ট্র বিভাগের অনুমতি ব্যতীত কাশ্মীরে চাকরী গ্রহণ না করেন। কোন্ অধিকারে তিনি তাহা করিয়াছিলেন, বলিতে পারি না।

ইহার পরও মহারাজা নীলাম্বর বাবুকে কাশ্মীরে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু নীলাম্বর বাবু রাজস্ব বিষয়ক ব্যাপারে অভিজ্ঞ নহেন, এই ছল ধরিয়া সে বারও তাঁহাকে যাইতে দেওয়া হয় নাই। তখন মহারাজা তাঁহার পরিবর্ত্তে প্রতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে নিযুক্ত করিতে চাহিলে ভারত সরকার তাহাতেও সম্মত হয়েন নাই। অথচ ভারত সরকারই প্রতুল

বাবুকে পঞ্জাব চীফ কোর্টের জজ করিয়া গুণগ্রাহিতার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন !

মহারাজার তখনও "রন্ধ্রগত শনি।" তাই মিষ্টার প্লাউডেনের স্থানে কর্ণেল নিসবেট রেসিডেণ্ট হইয়া আসিলেন। মহারাজা খাল কাটিয়া কুম্ভীর আনিলেন। মহারাজাকে শাসনক্ষমতাচ্যুত করিবার সময় ভারত সরকার কর্ণেল নিসবেটকে মহারাজার বন্ধু (personal friend) বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন। এই বন্ধুত্বের স্বরূপ জানিলে মনে হয়, ইহার মূলেও, বোধ হয়, কোন ষড়যন্ত্র ছিল। যখন মিষ্টার প্লাউডেন কাশ্মীরের রেসিডেণ্ট, সেই সময় মহারাজা একবার রাওয়ালপিণ্ডীতে যাইলে কর্ণেল নিসবেট তথায় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। তাঁহার সহিত মহারাজা রণবীর সিংহের পরিচয় ছিল এবং তিনি প্রতাপ সিংহকে বলেন, রেসিডেণ্ট হইলে তিনি বন্ধুপুত্রের উপকার-চেষ্টাই করিবেন। পরে মহারাজা সে কথার উল্লেখ করিয়া কর্ণেল নিসবেটকে লিখিয়াছিলেন—"মিষ্টার প্লাউডেন যখন কাশ্মীরের রেসিডেণ্ট, তখন রাওয়ালপিণ্ডীতে আমার সহিত আপনার সাক্ষাৎ হইলে আপনি বলিয়াছিলেন, আপনি যদি কাশ্মীরের রেসিডেণ্ট হয়েন, তবে সর্ব্বপ্রযত্নে আমার মানসম্ভ্রম বাড়াইবার চেষ্টা করিবেন।"

মহারাজার দ্বারা কর্ণেল নিসবেটকে রেসিডেণ্ট করিবার জন্য ভারত সরকারকে পত্র লিখানর মূলে কোন ষড়যন্ত্র ছিল কি না এবং মহারাজা চক্রীর চক্রে পড়িয়াছিলেন কি না, বলিতে পারি না। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে কর্ণেল নিসবেট কাশ্মীরে রেসিডেণ্ট হইয়া আসিলেন রাজা অমর সিংহের সহিত বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হইল। রাজা অমর সিংহ স্বভাবতঃ ক্ষমতাপ্রিয় ছিলেন; তাহার উপর জ্যোতিষীরা তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—গোলাব সিংহের বংশে তৃতীয় পুত্রই গদী পাইবেন। কর্ণেল নিসবেট স্বৈরাচারপ্রিয় ছিলেন—তিনি ক্ষমতাবৃদ্ধির উপায় রূপে অমর সিংহকে ব্যবহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। "যোগ্য আসি মিলিল যেন যোগ্যে।" মহারাজা রাজ্যের সম্ভ্রমরক্ষার দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতেন, রাজ্য পাইবার চেষ্টায় মান-সম্ভ্রম ক্ষুণ্ণ করিতে রাজা অমর সিংহের আপত্তি ছিল না। কিন্তু তাঁহার পক্ষে রাজ্যপ্রাপ্তির সম্ভাবনা সুদূর-পরাহত ছিল; কারণ, প্রতাপ সিংহের পুত্র না থাকিলেও পোষ্যপুত্র গ্রহণের অধিকার ছিল এবং রাজা রামসিংহ তখনও জীবিত—তাঁহার পুত্রও ছিল। কাজেই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃদ্বয়ের বংশ লোপ না পাইলে স্বাভাবিক নিয়মে অমর সিংহের রাজ্যলাভের সম্ভাবনা ছিল না। বোধ হয়, সেই জন্যই কর্ণেল নিসবেটের সঙ্গে তাঁহার একটা দেনলেনের চুক্তি হইল—কর্ণেল যথেচ্ছ ক্ষমতা ব্যবহার করিবেন, রাজা অমর সিংহ সম্ভব হইলে মহারাজার স্থান অধিকার করিবেন। মহারাজা রক্ষণশীল হিন্দু ছিলেন। অমরসিংহ য়ুরোপীয় আচার-ব্যবহারে কতকটা অভ্যস্ত বলিয়া কর্ণেলের সহিত ঘনিষ্ঠতা স্থাপনের সুযোগ পাইলেন। এই ঘনিষ্ঠতা প্রগাঢ় হইলেই মহারাজার সর্ব্বনাশের অন্যতম কারণ—তাঁহার লিখিত বলিয়া প্রচারিত পত্রগুলি পাওয়া গেল ও সেইগুলি লইয়া কর্ণেল কলিকাতায় গমন করিলেন। এই সব পত্রের ২খানি মহারাজা কর্ত্তৃক রামানন্দ নামক পুরোহিতকে লিখিত :—

(১) লর্ড ডাফরিণকে ও মিষ্টার প্লাউডেনকে হত্যার ব্যবস্থা কর।

(২) রাজা রাম সিংহ আমার শত্রু। তাহাকে হত্যা কর। তোমাকে পুরস্কার দেওয়া হইবে।

আর ২ খানি পত্র মীরণ বক্স নামক মহারাজার এক ভৃত্যকে লিখিত :

(১) তুমি আমাকে বলিয়াছিলে, দলিপ সিংহ এ দেশে আসিলে ইংরাজ পলাইয়া যাইবে। তখন আমি দলিপ সিংহের সহিত যোগ দিব।

(২) তুমি লাডক ও ইয়ারখণ্ডের পথে কাসিয়ায় বিশ্বাসী লোক পাঠাইয়া জানাইয়া দাও, আমি রুসিয়ার বন্ধু। সর্দ্দার করম সিংহের নিকট হইতে যত ইচ্ছা অর্থ লও। এ কথা যেন কেহ জানিতে না পারে।

শেষে মহারাজা রাজা অমর সিংহকেই তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের মূল বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন এবং বড় লাট লর্ড ল্যান্সডাউনকে তাহা লিখিয়াছিলেন। তিনি কনিষ্ঠ ভ্রাতা অমর সিংহকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন এবং রণবীর সিংহ কনিষ্ঠ পুত্রকে যে জায়গীর (বিশোলী) দিয়া গিয়াছিলেন, তাহার আয় অধিক নহে বলিয়া ভ্রাতাকে তাহার পরিবর্ত্তে মূল্যবান্ জায়গীর (ভদরোয়া)

চেনার বাগ—, অপর দিকের দৃশ্য।

দিয়াছিলেন। অমর সিংহের বয়স অল্প হইলেও জ্যেষ্ঠ তাঁহাকে রাজ্যে আপনার পরবর্ত্তী স্থান দান করিয়াছিলেন। কিন্তু কনিষ্ঠ জ্যেষ্ঠের প্রতি কি ব্যবহার করিয়া সেই স্নেহের প্রতিদান দিয়াছিলেন।

অবশ্য অন্যের সাহায্য ও উৎসাহ না পাইলে অমর সিংহের অসঙ্গত উচ্চাকাঙ্ক্ষা ঘৃতাহুতিপুষ্ট পাবকের মত প্রবল হইয়া উঠিতে পারিত না। সে সাহায্য ও উৎসাহ তিনি কর্ণেল নিসবেটের নিকট হইতে পাইয়াছিলেন। উভয়ের মধ্যে চুক্তির বিষয় বুঝিতে কাহারও বিলম্ব হয় না। অথচ ভারত সরকারের বিজ্ঞ ব্যক্তিরা ইহাই বুঝিতে পারেন নাই।

কর্ণেল নিসবেট কাশ্মীরে আসিবার পর হইতেই তথায় ষড়যন্ত্রের প্রাবল্য ঘটিতে আরম্ভ হয়। যে সব কর্ম্মচারী মহারাজার প্রতি অনুরক্ত, তাঁহাদিগকে কর্ম্মচ্যুত করিয়া রেসিডেণ্টের দলের বলবৃদ্ধি করা হয় এবং তাঁহাদের স্থানে বিপক্ষ দলের লোক নিযুক্ত করা হয়। যোগ্যতা দেখিয়া যে লোক নিযুক্ত করা হয় নাই, তাহার প্রমাণে বলা যাইতে পারে, যাঁহাকে জম্বুর চীফ জজ করা হয়, তিনি আইন-জ্ঞানহীন এবং বৃটিশ রাজ্যে কোথাও বিচার বিভাগে সামান্য চাকরীও পাইতেন না।

কর্ণেল নিসবেট ও রাজা অমর সিংহ ষড়যন্ত্র করিয়া মহারাজা প্রতাপ সিংহের বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ উপস্থাপিত করান, সে সকল নিম্নে বিবৃত হইল :—

(১) তিনি চরিত্রহীন।

(২) তিনি কাশ্মীরে কুশাসন প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন ও পরিচালিত করিতেছেন।

(৩) তিনি অমিতব্যয়ী।

(৪) তিনি হীনচরিত্র, অযোগ্য পারিষদপুঞ্জে পরিবৃত।

(৫) তিনি রাজদ্রোহজনক ও হত্যাকল্পে পত্রব্যবহার করিয়াছিলেন।

এই সকল অভিযোগই তাঁহাকে পরোক্ষভাবে গদী হইতে সরাইবার কারণ। [ক্রমশঃ।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

রূপের মোহ

সূচনা

আরতি শেষ হইয়াছে—দেবমন্দিরে শঙ্খ-ঘণ্টার মঙ্গলধ্বনি অনেকক্ষণ থামিয়া গিয়াছে। শ্রান্ত পথিক ভাগীরথীতীরে সোপানের উপর বসিয়া তখনও কি ভাবিতেছিল। মেঘলেশহীন চৈত্রের আকাশে ত্রয়োদশীর চাঁদ হাসিতেছে, গঙ্গার চঞ্চল জলরাশির উপর কিরণোচ্ছ্বাস—পরপারে মসীচিত্রিত বৃক্ষরাজির গাঢ় রেখা।

তাহার শরীর বলিষ্ঠ, মুখশ্রী কোমল ও সুন্দর, ললাটে প্রতিভার দীপ্ত রেখা। কিন্তু নয়ন-যুগলের দৃষ্টিতে নৈরাশ্যের ম্লান কালিমা।

চন্দ্র আরও হাসিয়া উঠিল। তীরস্থ উদ্যান হইতে পুষ্পগন্ধবাহী একটা দমকা বাতাস ছুটিয়া আসিল। পথিক সহসা নিদ্রোত্থিতের মত চমকিত হইয়া উঠিল। সে উঠিয়া পশ্চাতে ফিরিবামাত্র সহসা যেন বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল। নগ্নদেহ, শুভ্রবসন কে ঐ পুরুষ? চন্দ্রকরলেখা নবাগতের সৌম্যমূর্ত্তির স্পর্শে কি আনন্দে শিহরিয়া উঠিতেছিল?

স্তম্ভিত যুবকের দিকে চাহিয়া আগন্তুক বলিলেন, "তুমি কে, বাপু?"

"পথিক।"

"পথিক?—তা এ সময়ে গঙ্গার ধারে ব'সে কি হচ্ছে, বাপু?—কোথায় যাবে?"

যুবক অন্যমনস্কভাবে আপন মনে বলিল, "কোথায় যাব!—তা ত জানি না।" তাহার পর বলিল, "রাত্রি কত বল্‌তে পারেন?"

নবাগত ব্রাহ্মণ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে যুবকের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "রাত্রি? এক প্রহর হয়ে গেছে বোধ হয়।"

এত রাত্রি হইয়াছে!—যুবক দ্রুত স্থানত্যাগের উপক্রম করিল।

ব্রাহ্মণ বলিলেন, "তোমাকে বড় শ্রান্ত দেখছি। আমার সঙ্গে এস।"

উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই ব্রাহ্মণ অগ্রসর হইলেন, পথিকও মন্ত্রমুগ্ধবৎ তাঁহার অনুবর্ত্তী হইল।

পথের উভয় পার্শ্বে নানাবিধ ফল ও ফুলের গাছ। অনতিদূরে শ্রেণীবদ্ধভাবে উন্নতচূড় মন্দির। যুবক গণিয়া দেখিল, উহার সংখ্যা ১২। চন্দ্রালোকে শুভ্রদেহ দেবমন্দিরগুলি রজতগিরির মত ঝক ঝক্ করিতেছিল।

কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া ব্রাহ্মণ চত্বরের মধ্যবর্ত্তী অপর একটি মন্দিরের সম্মুখে দাঁড়াইলেন। মন্দিরের দ্বার তখনও উন্মুক্ত। ভিতর হইতে উজ্জ্বল আলোকপ্রবাহ বাহিরে আসিয়া পড়িয়াছিল। যুবক দেখিল, মন্দির-মধ্যে রৌপ্যরচিত শ্বেত শতদলের উপর মহাকাল শায়িত; তাঁহার বক্ষোদেশে এক পাষাণী কালীপ্রতিমা। যুবক দাঁড়াইল, দেবীমূর্ত্তিকে প্রণাম করিল। মূর্ত্তি পাষাণ-নির্ম্মিত বটে; কিন্তু সে এ কি দেখিতেছে—মাতার নয়ন-যুগল যেন প্রাণময় হইয়া উঠিয়াছে! যুবক স্তম্ভিতভাবে দাঁড়াইল। ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিল, সত্যই প্রতিমার নয়ন-যুগল হইতে যেন এক অপূর্ব্ব দীপ্তি নির্গত হইতেছিল। মর্ম্মর-মণ্ডিত গৃহতলে লুটাইয়া পড়িয়া যুবক ভাবাবেশে দেবীকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিল। যে শিল্পী এই

পাষাণমূর্ত্তি গড়িয়াছে, তাহার নিপুণতা প্রশংসনীয় ; কিন্তু যে সাধক এই প্রতিমার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তিনি নিশ্চয়ই নরকুলে ধন্য এবং অসাধারণ শক্তিশালী মহাপুরুষ।

স্নিগ্ধ কণ্ঠে ব্রাহ্মণ বলিলেন, "ওঠ! এস!"

যুবক আর একবার দেবীর পানে চাহিয়া ব্রাহ্মণের অনুগামী হইল। মন্দিরের আশে-পাশে অনেকগুলি ঘর। ব্রাহ্মণ তাহাকে লইয়া একটি কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সে কক্ষে অনেকগুলি লোক বসিয়া ছিল, কেহ বই পড়িতেছে, কেহ বা আগ্রহভরে পাঠ শুনিতে ব্যস্ত। এক জন বেহালায় সুর দিতেছিল।

ব্রাহ্মণ কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র সকলের মধ্যে যেন একটা সাড়া পড়িয়া গেল। কয়েক জন সম্ভ্রমভরে তাঁহার কাছে ছুটিয়া আসিতেই তিনি ইঙ্গিতে সকলকে বসিতে বলিলেন। যুবকের হাত ধরিয়া ব্রাহ্মণ অন্য কক্ষে প্রবেশ করিলেন। যাইবার সময় যুবক দেখিল, সকলেই নির্ব্বাক্ বিস্ময়ে তাহার দিকে চাহিয়া আছে। ক্রমান্বয়ে আরও কতিপয় কক্ষ অতিক্রমের পর একটি প্রশস্ত কক্ষে উভয়ে প্রবেশ করিলেন।

তথায় কেহ ছিল না। কিন্তু কক্ষতলে বহু পাত্র পরিপূর্ণ নানাপ্রকার খাদ্য-দ্রব্য রক্ষিত। ব্রাহ্মণ বলিলেন, "আগে কিছু খেয়ে নাও। তোমার নিশ্চয় খুব ক্ষিধে পেয়েছে।"

কথাটা মিথ্যা নহে। সত্যই যুবকের অত্যন্ত ক্ষুধা পাইয়াছিল। ব্রাহ্মণের সে আদেশও অবহেলা করিবার নহে। যুবক ব্রাহ্মণের নির্দ্দেশমত একটা পাত্র টানিয়া লইল।

এই অপরিচিত প্রৌঢ় ব্রাহ্মণের বিচিত্র ব্যবহারে যুবক সত্যই অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াছিল। তাঁহার দেহের উজ্জ্বল, স্নিগ্ধ কান্তি, শান্ত মধুর ব্যবহার, স্নেহাপ্লুত কণ্ঠস্বর—সকলই যেন অভিনব বলিয়া বোধ হইতেছিল। অপরিচিত ব্যক্তির সহিত এমন ব্যবহার ভারতবর্ষের প্রকৃতিগত হইলেও, বর্ত্তমান যুগে ক্রমেই বিরল হইয়া আসিতেছে।

আহার শেষ হইলে ব্রাহ্মণ বলিলেন, "এখন বল ত, বাপু, তুমি কে, কোথায় থাক?"

প্রশ্নের উত্তর না দিয়া যুবক বিস্মিত দৃষ্টিতে ব্রাহ্মণের নয়ন-যুগলের করুণাদীপ্ত দৃষ্টি লক্ষ্য করিতেছিল। তাহাকে নীরব দেখিয়া প্রৌঢ় আবার প্রশ্ন করিলেন। যুবকের চমক ভাঙ্গিল। ঈষৎ লজ্জিতভাবে সে একবার ব্রাহ্মণের দিকে চাহিয়া তাহার নিঃসঙ্গ জীবনের কথা তাঁহাকে বলিতে লাগিল।

সম্ভ্রান্তবংশে তাহার জন্ম, কিন্তু সংসারে আপনার বলিবার কেহ নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলি সে উত্তীর্ণ হইয়াছে,তথাপি বিবাহ করে নাই। সে বুঝিয়াছে, বিবাহই বন্ধনের দৃঢ় রজ্জু। একবার বাধা পড়িলে মুক্তিপথের সন্ধান আর পাওয়া যায় না। সংসারের সাধারণ লোক যাহাকে সুখ বলে, নগেন্দ্রনাথ তাহাতে সুখের কোনও সন্ধান পায় নাই। ইহাই তাহার মহাদুঃখ। এই বয়সে সে বহু দেশ পর্য্যটন করিয়াছে, বহু লোকের সহিত সে মিশিয়াছে, কিন্তু কোথাও সে সুখ পায় নাই। একটা বিরাট অতৃপ্তি তাহার হৃদয়ে অনুক্ষণ দীর্ঘশ্বাস ফেলিতেছে। তাহার বিশ্বাস, পৃথিবীতে সুখ নাই—আনন্দ নাই। পৃথিবীতে এমন কিছু যদি থাকিত—যাহার নেশায় সে আত্মবিস্মৃত হইতে পারে, তাহা হইলে সে বাঁচিয়া যায়। কিন্তু কোথায় সেই কর্ম্ম, কোথায় সেই বিস্মৃতি!

বলিতে বলিতে যুবকের মুখমণ্ডলে গভীর নৈরাশ্যের মসীচিহ্ন ফুটিয়া উঠিল।

তাহার কথা শুনিতে শুনিতে ব্রাহ্মণের নয়ন-যুগল যেন করুণায় আরও স্নিগ্ধ হইয়া উঠিল। মমতামধুর প্রশান্ত স্বরে তিনি বলিলেন, "ঠিক পথ ধর্‌তে পারনি, বাপু। সংসারে এত কায, আর তুমি কায খুঁজে পেলে না? লক্ষজীবনে কাযের শেষ নেই। শুধু আনন্দ, শুধু তৃপ্তি পাওয়া যায়,এমন অনন্ত কায তোমার সাম্‌নে প'ড়ে আছে। কেউ তোমাকে এত দিন পথ দেখিয়ে দেয়নি, তাই এত অশান্তি পাচ্ছ। তুমি কায কর্‌তে চাও?"

ব্রাহ্মণ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে যুবকের দিকে চাহিলেন।

নগেন্দ্রনাথ দৃঢ়স্বরে বলিল, "আমি নিজের অস্তিত্বকে ডুবিয়ে দিতে চাই, ঠাকুর! আপনি যদি এমন কোন পথের সন্ধান ব'লে দিতে পারেন, জন্মের মত আমি আপনার দাস হয়ে থাক্‌ব।"

যুবকের মস্তকে হাত রাখিয়া ব্রাহ্মণ বলিলেন, "আমি তোমার মতই এক জন লোক খুঁজছিলাম। এস বাবা, আমার সঙ্গে এস।"

ব্রাহ্মণ যুবকের হাত ধরিয়া কক্ষত্যাগ করিলেন।

প্রথম পরিচ্ছেদ

শরতের অপরাহ্ন। যমুনার জল কূলে কূলে পরিপূর্ণ হইয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। পরপারে ভুট্টা ও গমের শ্যামল ক্ষেত্র। কৃষক বালিকারা মাথায় মোট লইয়া গান গাহিতে গাহিতে গ্রামের পথে গৃহে ফিরিতেছিল।

এমন মধুর অপরাহ্নে একখানি ছোট 'জলি বোটে' তিন জন আরোহী জল ভ্রমণ করিতেছিলেন। আরোহী-দিগের মধ্যে এক জন পুরুষ, অপর দুই জন নারী। পুরুষ দুই হাতে দাঁড় টানিতেছিলেন। রমণী-যুগল চুপ করিয়া সন্ধ্যার শোভা দেখিতেছিল। উভয়েই সুন্দরী। এক জনের পরিধানে ফিরোজা রঙ্গের পার্শী শাড়ী-সোনার পাড় বসান। অঙ্গে পাতলা রেশমের রঙ্গীন ব্লাউজ, পায় জুতা, কানে হীরকখচিত সোনার ছোট প্রজাপতি; করপ্রকোষ্ঠে সোনার চুড়ী। বয়স অনুমান সপ্তদশ। মুখখানি অতি কোমল—লাবণ্যে ঢল-ঢল। নয়ন-যুগল রসরাগোজ্জ্বল, চঞ্চল, কটাক্ষময়। অপরাহ্নের অস্তগামী সূর্য্যের লোহিত আভা তাহার ভাবময় আনন অনুরঞ্জিত করিতেছিল।

অপরা অপেক্ষাকৃত বয়োজ্যেষ্ঠা। তাহার পুষ্ট—পরিপূর্ণ দেহ-লতিকায় সৌন্দর্য্যের জ্যোৎস্না যেন তরঙ্গায়িত হইয়া উঠিতেছিল। বাদামী মুখমণ্ডল মধুর ও চিত্তাকর্ষক। নয়নযুগল দীর্ঘ—তারকাদ্বয় ভ্রমরকৃষ্ণ, কিন্তু প্রথমার ন্যায় সজল ও চঞ্চল নহে, গভীর ভাবময়, স্থির—অচঞ্চল। কুঞ্চিত অলকদাম মৃদুপবনে ক্ষুদ্র ললাটের চারিপার্শ্বে উড়িয়া উড়িয়া পড়িতেছিল। পরিধানে একখানি শাদা সিল্কের শাড়ী, গায় শাদা ব্লাউজ। সুগোল মসৃণ করপ্রকোষ্ঠে সোনার চুড়ী ও ব্রেসলেট। এই শুভ্রবসনা সুন্দরীকে দেখিলেই মনে হইবে, কে যেন একখানি রজতপাত্রের উপর একটি সদ্যোবিকসিত কনক চাঁপা সাজাইয়া রাখিয়াছে।

ক্রমে সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিল। মেঘশূন্য নীল সাগরে সন্ধ্যার বৃহৎ চন্দ্র ফুলিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে নদীর বক্ষও যেন অকস্মাৎ হাসিতে ভরিয়া গেল।

"বৌ-দি! দেখ, কি সুন্দর! কি চমৎকার ছবি! এমন স্বপ্নভরা মধুর সন্ধ্যা, এমন আপনহারা চাঁদের আলো কত দিন দেখি নি!"

শুভ্রবসনা যুবতী মৃদু হাসিয়া বলিল, "তোমার সব-তাতেই কাব্য, সরযূ! আমার প্রাণে অত কবিত্ব নেই ভাই। রোজ যেমনটি দেখি, আজও তেমনই, নতুন কিছু ত দেখছি না।"

সরযূ তাহার বিশাল, ভাবময়, চঞ্চল নয়নযুগল আকাশে তুলিয়া আবেগভরে বলিল, "না, বৌদি, তোমার কথা ঠিক নয়। রোজ যেমন দেখি, আজ ঠিক তেমন নয়। অনেক তফাৎ। রাতদিন দাদার কাছে থেকে, আর বিজ্ঞানের আলোচনা ক'রে তোমার প্রাণটা গভীর গর্ত্তে ডুবে রয়েছে। নইলে এমন চমৎকার সন্ধ্যার ছবি তোমার চোখে ধরল না! বিজ্ঞান যে মানুষকে এত নীরস ক'রে তোলে, জানতাম না।"

"কে জানে, ভাই। আমি ত কোন তফাৎ বুঝতে পারছি না। সৌন্দর্য্যের অত ঘোরফের বুঝবার শক্তি আমার নেই। বিজ্ঞানের দোষ দাও কেন, ভাই, ওটা পড়বার আগেও কিছু বুঝতে পারতাম না।"

একটু নীরব থাকিয়া সরযূ বলিল, "আচ্ছা, বৌদি! সন্ধ্যার বাতাসে যখন ফুল ফোটে, তখন কি সে শোভা দেখে তোমার মন মুগ্ধ হয় না? নীল আকাশে যখন চাঁদ হাসে—সেই পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নাস্রোতে আপনাকে মিশিয়ে দিতে কি তোমার প্রাণ ব্যাকুল হয়ে ওঠে না?"

দ্বিতীয়া সুন্দরী গম্ভীরভাবে বলিল, "ফুলের গন্ধ বড় মধুর, তার শোভা সুন্দর, তা মানি। বাতাস তার সুবাস বয়ে আনে, তাতেই আমার তৃপ্তি। চাঁদের শীতল কিরণে শরীর জুড়িয়ে যায়, মনও প্রফুল্ল হয়ে ওঠে, সুতরাং তাকে আমি ভালবাসি, কিন্তু তুমি যেমন ফুলটিকে তুলে বুকের কাছে রেখে তার গন্ধ ও শোভা উপভোগ করতে চাও, আকাশে চাঁদ উঠলেই যেন তার কাছে ছুটে যেতে চাও—কিরণরাশির মধ্যে আপনাকে মিশিয়ে দিতে ইচ্ছে কর, আমার তা হয় না, ভাই।

কারণ, কোন জিনিষের শেষ দেখতে গেলে প্রায়ই ঠক্‌তে হয়। বাড়াবাড়ি কিছুই ভাল নয়। মনে কর, চাঁদের কিরণের সঙ্গে প্রাণটা মিশিয়ে দেবার জন্য যদি চাঁদের কাছে যেতে হয়, তবেই ত মুস্কিল। সেখানে যাওয়াটা বড় সুবিধাজনক নয়। কারণ, বিজ্ঞান বলে "

করতালি দিয়া সরযূ বলিয়া উঠিল, "যে আজ্ঞে, বৈজ্ঞানিকা! কিন্তু বিজ্ঞান যা বলে, আমাদের মত ক্ষুদ্রবুদ্ধি নারীর তা জেনে দরকার কি? আমরা পৃথিবীর যা কিছু মধুর, যা কিছু সুন্দর, তা দেখতে ভালবাসি, তাই পেতে চাই। কারণ, সেটা মানুষের স্বভাব। তোমার বৌদি, সবই বেয়াড়া রকমের। উৎসাহের সঙ্গে কোন ভাল জিনিষটাকে আপনার ক'রে নিতে চাও না। যেন একটু দূর—একটু তফাৎ। আপনার গণ্ডী ছেড়ে যেতে যেন তোমার বড় কষ্ট হয়।"

দ্বিতীয়া রমণী উদাসভাবে বলিল, "তা যদি পারি—গণ্ডীর মধ্যে যদি থাক্‌তে পারি, সেটা কি মন্দ? নিজের গণ্ডীর বাইরে যাওয়াটা কিছু নয়।"

সরযূও যেন সহসা গম্ভীর হইয়া পড়িল। সে বলিল, "গণ্ডী ছেড়ে যাওয়া না যাওয়া কি শুধু মানুষের ইচ্ছের উপর নির্ভর করে, বৌদি? অদৃষ্ট মানুষকে অনেক সময় সীমা ছাড়িয়ে নিয়ে যায়।"

দ্বিতীয়া দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "আমি অদৃষ্ট মানি নে। মানুষের মন তার অধীন। সে যেমন কায করবে, ফলও তেমন পাবে। কর্ম্মই সব—আমি তা ছাড়া আর কিছু বুঝি নে।"

ক্ষেপণী তুলিয়া জলের দিকে চাহিয়া যুবক কি যেন ভাবিতেছিলেন। যুবতীদিগের আলোচনায় বোধ হয় তাঁহার কান ছিল না। নৌকা যদৃচ্ছ ভাসিয়া যাইতেছিল।

বয়োজ্যেষ্ঠা সহসা বলিয়া উঠিল, "দাদা, আর বেশী দূর গিয়ে কায নেই। নৌকা ফেরাও—রাত হয়েছে।"

যুবক সহসা যেন চমকিয়া উঠিলেন। একবার আকাশের দিকে চাহিয়া মৃদু স্বরে বলিলেন, "আজকার রাতটা বড় মধুর। এখন যেন বাড়ী ফিরতে ইচ্ছে হচ্ছে না।" পরক্ষণেই দুই হাতে দাঁড় ধরিয়া বলিলেন, "নাঃ, কায নেই, ফেরা যাক্। অধ্যাপক মিত্র হয় ত আমাদের অপেক্ষায় ব'সে আছেন। অমিয়া, হালটা একবার ডাইনে ঘুরিয়ে দাও'ত, বোন্। বস্—ঠিক হয়েছে।"

সরযূ মৃদু স্বরে বলিল, "হ্যাঁ, দাদা সেই রকম মানুষই বটে! কেতাব ছেড়ে তিনি আমাদের জন্য ব'সে থাকবার লোক নন। আচ্ছা, বৌদি! তুমি দাদাকে অতটা বাড়াবাড়ি করতে দাও কেন বল দেখি? দিন নেই, রাত নেই, চব্বিশ ঘণ্টাই কেবল বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের আলোচনা। সংসারে যে একটু বিশ্রামের দরকার, তা দাদার জ্ঞান নেই। তুমিও তাতে সায় দাও। তাই ত দাদা অত বাড়াবাড়ি ক'রে তুলেছেন। আমি হ'লে—"

"তা আমি কি বারণ কচ্ছি, ভাই! শাসনের ভারটা তুমি নিজের হাতেই নাও না কেন? তোমার ভাই—আপনার জন। আমরা হলাম পরের মেয়ে!"

খোঁচা খাইয়া সরযূর মুখমণ্ডল আরক্ত হইয়া উঠিল। বৌদিদির প্রতি ক্ষুদ্র মুষ্টি উদ্যত করিয়া সে বলিল, "ছিঃ, বৌদি, তুমি বড় দুষ্ট। এ সব কথা নিয়ে ও রকম ক'রে ঠাট্টা করতে হয়?"

গম্ভীরভাবে অমিয়া বলিল, "ঠাট্টা নয়, আমি সত্যি বল্‌ছিলাম।"

"আবার ঐ কথা! আমি আজ বাড়ী গিয়ে দাদাকে সব ব'লে দেব। দেখুন, সুরেশ বাবু"—বলিয়াই কি ভাবিয়া সহসা সরযূ চুপ করিল।

অমিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, "আমারও অনেক কথা বলবার আছে, ভাই। প্রতিশোধ নিতে আমিও জানি।"

সুরেশচন্দ্র তখন গুণ গুণ স্বরে একটা গানের কলি সুরে ভাঁজিতেছিলেন। নৌকা দ্রুত চলিতেছিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

তরণী তীরে সংলগ্ন হইল। নিকটের একটা গাছের গুঁড়িতে নৌকা শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া, তাহাতে তালা বন্ধ করিয়া সুরেশচন্দ্র রাজপথে আসিয়া দাঁড়াইলেন। পথের দুই ধারে দীর্ঘাকার নিমগাছের শ্রেণী। চন্দ্রকরলেখা পত্রবহুল বৃক্ষান্তরালের ছিদ্রপথে উঁকি মারিতেছিল।

তিন জনে লঘুগতি জনবিরল পথ অতিক্রম করিয়া

সন্নিহিত এক অট্টালিকায় প্রবেশ করিলেন। প্রশস্ত হল-ঘরে দীপাধারে আলোক জ্বলিতেছিল। পার্শ্বের একটি কামরায় অধ্যাপক মিত্র গাঢ় অভিনিবেশ সহকারে কি পড়িতেছিলেন।

সুরেশচন্দ্রের কণ্ঠস্বরে আকৃষ্ট হইয়া তিনি মুখ তুলিয়া চাহিলেন। ভগিনী, পত্নী ও শ্যালককে জলবিহার হইতে ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া তিনি বইখানি মুড়িয়া রাখিলেন।

সুনীলচন্দ্রের মনে হইল, তাঁহার নীরব, সুপ্তপ্রায় গৃহ ইহাদের আগমনে সহসা যেন প্রাণ পাইয়া জাগিয়া উঠিয়াছে। তাঁহার শুষ্কপ্রায়, কর্ম্মক্লান্ত হৃদয়ের এক প্রান্তে আনন্দের শিহরণ যেন জাগিয়া উঠিল। চশমাখানি ধীরে ধীরে টেবলের উপরে রাখিয়া তিনি অপেক্ষাকৃত প্রফুল্লভাবে বলিলেন, "আজ কত দূর বেড়িয়ে এলে?"

একখানা চেয়ার টানিয়া লইয়া সুরেশচন্দ্র বলিলেন, "অনেক দূর। তুমি ত ঘরের কোণ ছেড়ে নড়বে না। সন্ধ্যার বাতাস—নদীর নির্ম্মল হাওয়া তোমার স্বাস্থ্যের পক্ষে কত প্রয়োজনীয়, নিজে বৈজ্ঞানিক হয়ে সেটা মনে রাখা উচিত।"

সরযূ হাসিয়া বলিল, "বৃথা চেষ্টা, সুরেশ বাবু! দাদা আমার ও বিষয়ে ঘোর উদাসীন। বক্তৃতা দিয়ে লোকের ভ্রম দূর করায় উনি যেমন মজবুত, আবার নিজের সম্বন্ধে ভুল করতেও ওঁর সমকক্ষ কেউ নেই।"

অধ্যাপক মিত্র সস্নেহে ভগিনীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তুই ত আজকাল খুব তর্কবাগীশ হয়ে উঠেছিস্, সরযূ!"

স্মিতহাস্যে সরযূ বলিল, "না হয়ে কি করি, দাদা। তোমরা সবাই—কেউ দার্শনিক, কেউ বৈজ্ঞানিক, মায় বৌদি পর্য্যন্ত। আর আমি তার্কিক। একটা কিছু হওয়া ত চাই।"

কক্ষতল উচ্চহাস্যে মুখরিত হইয়া উঠিল।

এমন সময় পাচক আসিয়া সংবাদ দিল—আহার্য্য প্রস্তুত। সকলে উঠিয়া ভোজনাগারের দিকে গেলেন।

আহারশেষে সকলে বসিবার ঘরে ফিরিয়া আসিলে সরযূ বলিল, "দাদা, তুমি আমাদের সঙ্গে কল্‌কাতায় যাবে না? তোমার কলেজ ত শীঘ্র বন্ধ হবে, চল, একসঙ্গে যাই।"

অমিয়া স্বামীর দিকে চাহিল। সুনীলচন্দ্র গম্ভীরভাবে বলিলেন, "তোমাদের সঙ্গে সম্ভবতঃ এবার আমার যাওয়া হবে না। বিজ্ঞান সম্বন্ধে যে বইখানা লিখছি, তার আলোচনা ও নানা রকম পরীক্ষায় আমি বিশেষ ব্যস্ত আছি। সুতরাং, সরযূ, এবার তোদের সঙ্গে বেড়ানর আশা আমি ছেড়ে দিয়েছি।"

সরযূ বলিল, "তোমার বিজ্ঞানই কি সব চেয়ে বড় হ'ল, দাদা? সংসারের আর কিছুই কি তোমার দরকার নেই?"

সহোদরার তিরস্কারে অভিমানের সুর প্রচ্ছন্ন ছিল। সুনীলচন্দ্র তাহা বুঝিলেন। মৃদু হাসিয়া তিনি বলিলেন, "রাগ করো না, লক্ষ্মী বোন্‌টি আমার! বাস্তবিক কত বড় গুরু দায়িত্ব মাথায় ক'রে নিয়েছি, তা ত তোমরা জান না। এই ছুটীর মধ্যে যদি বইখানা শেষ করতে না পারি, তা হ'লে প্রকাশকের কাছে আমায় অপদস্থ হ'তে হবে। এ যায়গা ছেড়ে অন্য কোথাও গিয়ে এ সব বই লেখাও চলে না।"

অমিয়া এতক্ষণ চুপ করিয়া ছিল। এইবার সে বলিল, "তোমাকে একা এলাহাবাদে রেখে আমিই বা কি ক'রে যাই? তোমার বড় কষ্ট হবে। নাওয়া খাওয়া কে দেখবে? আমি যাব না।"

সুনীলচন্দ্র ব্যস্তভাবে বলিলেন, "না অমিয়া, সে হবে না। তোমরা যাবে বৈ কি! পিসীমাকে অনেক দিন দেখনি, তিনি এত ক'রে লিখছেন, না গেলে ভাল দেখায় না। তার পর পুরী যাবার সাধ যখন হয়েছে, তখন সমুদ্র দেখে আসবে বৈ কি। একঘেয়ে জীবন ভাল লাগবে কেন? তোমরা যাও, আমার কোন কষ্ট হবে না। কামতা ও ভদাই যখন আছে, আমার কোন অসুবিধা হবে না। আর পারি ত শেষের দিকে আমিও তোমাদের সঙ্গে জুটে যাব। সে কথা এখন থাক্—তোমাদের যাওয়া কবে স্থির? সুরেশ নিশ্চয় সঙ্গে যাচ্ছ?"

অমিয়া বলিল, "দাদা ত যাবেনই, নইলে আমাদের নিয়ে যাবে কে?"

সুরেশ বলিলেন, "আস্‌ছে রবিবার পাঞ্জাবমেলে যাত্রা করব। কিন্তু তুমি সঙ্গে থাক্‌লে ভাল হ'ত। আমায় জান ত, সব সময় মেয়েদের সঙ্গে বেড়ান ঘ'টে উঠবে না।"

সহাস্যে সুনীলচন্দ্র বলিলেন, "সে বিষয়ে তোমার চেয়ে আমি আর এক ডিগ্রী বেশী। সুতরাং আমার যাওয়া না যাওয়া সমান। তোমার বোনের তা হ'লে দেশ-ভ্রমণের আমোদ ও উপকার হবে না। সারাদিন আমার কেতাবের পাশেই কেটে যাবে।"

তোয়ালেখানা র‍্যাকের উপর রাখিতে রাখিতে সরযূ বলিয়া উঠিল, "সে কথা মিথ্যে নয়। যেমন দেব, তেম্‌নি দেবী। ভেবেছিলাম, বৌদির ঘটে কিছু বুদ্ধি আছে। কিছুই না—দু'জনেই সমান কেতাব-কীট।"

অমিয়া সহাস্যে বলিল, "এমন দাদার এমন বোন্ কি ক'রে যে হ'ল, আমিও ত কিছুতেই ভেবে পাই না!"

সুরেশচন্দ্র সহসা ভগিনীপতির সম্মুখে আসিয়া মৃদু স্বরে বলিলেন, "সত্যই তুমি আমাদের সঙ্গে যাবে না, ঠিক করেছ? আমার কিন্তু মনে হয়, সঙ্গে গেলে ভাল হ'ত। বিয়ের পর এক দিনও তোমরা কাছ ছাড়া হওনি।"

সুনীলচন্দ্রের অধরে মৃদু হাস্যরেখা ফুটিয়া উঠিল। তিনি উচ্চহাস্যে বলিয়া উঠিলেন, "তোমার কবিত্বশক্তি দেখছি অকস্মাৎ স্ফীত হয়ে উঠেছে। দেখ, অমি, তোমার দাদার জন্য শীঘ্র একটা পাত্রী স্থির ক'রে ফেল। আমাদের ভাবী বিরহের আশঙ্কায় তোমার দাদার মন চঞ্চল হয়ে উঠেছে।"

অমিয়া দৃষ্টি নত করিয়া মৃদু স্বরে বলিল, "দাদার বিয়ের পাত্রী ত তোমার হাতেই আছে।"

অমিয়া সরযূর পানে চাহিয়া মৃদু হাসিতেই, সরযূর গ্রীবাদেশ পর্য্যন্ত যেন আরক্ত হইয়া উঠিল। সে নত-মস্তকে কার্য্যের ছলে কক্ষের অপর প্রান্তে চলিয়া গেল।

অধ্যাপক মিত্র সস্নেহে সহোদরার সঙ্কাবিনম্র মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তা ত জানি, কিন্তু সুরেশচন্দ্র যে এখনও রাজী ন'ন।"

বাধা দিয়া সুরেশ বলিলেন, "বাজে কথা রাখ, ঘড়ীর দিকে চেয়ে দেখ—বারোটা বেজে গেছে। আজ বড় পরিশ্রম হয়েছে। অমি, বাতিদানটা দাও ত।"

ভ্রাতা বিবাহ সম্বন্ধে চিরকুমার দলের গোঁড়া সভ্য। অমিয়া তাহা জানিত, সুতরাং বাতিটা জ্বালিয়া সে দাদার হাতে দিল।

সুরেশচন্দ্র শয়নগৃহের দিকে ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন। [ক্রমশঃ।

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ।

অবতরণ

উচ্চ গ্রামে বাঁধ বীণা,
আরও উচ্চে ধর তান,
গাইবে যদি পাগল হয়ে
ধর তোমার হিয়ার গান।
চাঁদের আলো সাঁঝের বাতাস,
সুনীল সিন্ধু মুক্ত আকাশ,
এ সব লয়ে ধূলার খেলা
হয়ে গেছে অবসান।

তোমার গানের গম্ভীর ধ্বনি,
উঠুক ছেড়ে এ ধরণী,
বিশ্বপতির আসন টলুক,
জেগে উঠুক বিশ্ব-প্রাণ।
চড়িয়ে আরো তাহার পরে,
বেঁধে বীণা উঁচু ক'রে,
নিখিল তখন নীরব হবে
আস্‌বে নেমে ভগবান্।

শ্রীমাধবচন্দ্র সিকদার।

বিদেশে বাঙ্গালীর সম্মান

বিদ্বান সর্ব্বত্র পূজ্যতে,—ডাক্তার সুবোধ মিত্র, এম, ডি, এফ, আর, সি, এস আমাদেরই স্বজাতি কৃষ্ণাঙ্গ বাঙ্গালী হইয়াও প্রতীচ্যে যে সম্মান ও খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন, তাহাতে আমরাও গৌরব অনুভব করিতে পারি। তিনি মাত্র অষ্টাবিংশতি বর্ষ বয়স্ক যুবক। হুগলী স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া তিনি কলিকাতার বঙ্গবাসী কলেজে অধ্যয়ন করেন ও পরে কলিকাতা মেডিকাল কলেজ হইতে ধাত্রীবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শিতা প্রদর্শন করিয়া সম্মানের সহিত এম বি, পরীক্ষা পাশ করেন

স্কুলে পঠদ্দশায় তাঁহার এক পারিবারিক দুর্ঘটনা তাঁহাকে চিকিৎসা বিদ্যায় আত্মনিয়োগ করিতে অনুপ্রাণিত করে। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃজায়ার সন্তানসম্ভাবনাকালে কয়েক জন প্রবীণ ভিষকের ভ্রান্তিতে প্রসূতি ও শিশু অস্ত্রোপচারের ফলে ইহলোক ত্যাগ করে। বন্ধু-বান্ধবগণ তাঁহাদের নামে আদালতে অভিযোগ আনয়ন করিতে অনুরোধ করেন বটে, কিন্তু মিত্রপরিবার উহাতে সম্মত হয়েন নাই। কিন্তু সেই দারুণ দুর্ঘটনা বালক সুবোধকে ধাত্রী-বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিতে অনুপ্রাণিত করে। তিনি সেই সময় প্রতিজ্ঞা করেন যে, তিনি এই বিদ্যা আয়ত্ত করিতে জীবন উৎসর্গ করিবেন।

ডাক্তার সুবোধচন্দ্র মিত্র

এই সঙ্কল্প করিয়া তিনি এম, বি, পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইবার পর ১৯২২ খৃষ্টাব্দে জার্ম্মানী যাত্রা করেন এবং বার্লিনের মাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১০ মাস কাল ধাত্রীবিদ্যা ও স্ত্রীরোগসমূহের চিকিৎসাশিক্ষায় আত্মনিয়োগ করেন। সেই সময়ে জার্ম্মাণ ভাষায় তাঁহার গবেষণামূলক প্রবন্ধাদি পাঠ করিয়া গুণগ্রাহী জার্ম্মাণ পণ্ডিতগণ তাঁহার যথেষ্ট প্রশংসা করেন। তিনি তথায় এম, ডি, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েন। জার্ম্মাণ ভিষকশ্রেষ্ঠ ডাক্তার ফ্রানজ, বার্লিনের মহিলা হাঁসপাতালে তাঁহাকে তাঁহার সহকারিরূপে নিযুক্ত করেন। তাহার পর তিনি স্বনামধন্য ডাক্তার ষ্টিকেলের সহকারী হয়েন ও ভার্চো ফ্রাঙ্কেন হাঁসপাতালের ডাক্তার ক্রিষ্টেলারের সহিত ৯ মাস কাল Gynaecological pathologyর (স্ত্রীরোগের) ব্যবহারিক কার্য্যে মনোনিবেশ করেন। এতদ্ব্যতীত তিনি বার্লিনের প্রসিদ্ধ ক্যানসার অনুসন্ধান প্রতিষ্ঠানের রেঁতগেন ও রেডিয়াম রশ্মি সাহায্যে চিকিৎসা শাখায় কার্য্য করেন। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে ইনসব্রাক বিজ্ঞান মহাসভায় তিনি বক্তৃতা করিতে আহূত হয়েন। ডাক্তার মিত্র সেই সভায় ভারতের ধাত্রীবিদ্যা ও স্ত্রীরোগ চিকিৎসাশাস্ত্রের উন্নতির ইতিহাস জার্ম্মাণ ভাষায় আলোচনা করিয়া বিদ্বন্মণ্ডলীকে চমৎকৃত করেন। বার্লিনের বহু বিজ্ঞ চিকিৎসা-বিজ্ঞান সমিতি তাঁহাকে সদস্য পদে বরণ করিয়া ধন্য হইয়াছেন। ইহার পর তিনি এফ, আর, সি, এস উপাধি লাভ করিয়া যুরোপের প্রায় সমস্ত ধাত্রীবিদ্যালয় ও হাঁসপাতাল পরিদর্শন করিয়াছেন। সময়, সুযোগ ও সুবিধা পাইলে বাঙ্গালী যে বিদেশেও কৃতিত্ব অর্জ্জন করিতে পারে, ডাক্তার সুবোধ তাহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।

বর্ব্বর কে ?

সিরিয়ার প্রাচীন সহর দামাস্কাস ফরাসীর গোলা-গুলী ও বোমা বর্ষণে প্রায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইয়াছে। যাঁহারা আরব্য উপন্যাস পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন, এই দামাস্কাস সহর কিরূপ শোভা-সম্পদশালী ছিল। যখন ফরাসী জাতির অস্তিত্ব ছিল না, অথবা ফরাসী যখন অসভ্য জঙ্গলবাসী জাতি ছিল, তখন দামাস্কাসের অধিবাসীরা জ্ঞানবিজ্ঞানে এ জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল তখনকার দিনে দামাস্কাসের সভ্যতা ও শিক্ষা আদর্শস্থানীয় ছিল। দামাস্কাসের স্থাপত্য শিল্প এখনও জগতের পরিব্রাজকের বিস্ময় উৎপাদন করিয়া থাকে। আজ সেই দামাস্কাস নগরী ফরাসীর বর্ব্বরতার ফলে ধ্বংসস্তূপে পরিণত! সহরের চারকুর ও মেডান পল্লী, হামিদিয়া

বাজার, আজম প্রাসাদ, সেণ্টপল ষ্ট্রীট (যাহা বাইবেলে 'সোজা রাস্তা' বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে),—সমস্তই ফরাসীর ৪৮ ঘণ্টা কাল গোলাগুলী বর্ষণে ধ্বংসমুখে পতিত হইয়াছে। এই প্রাচীন পবিত্র সহরের ঐতিহাসিক প্রাসাদ, পথ, বাজার ইত্যাদির কঙ্কালমাত্র এখন অবশিষ্ট আছে।

ফরাসী য়ুরোপের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শিক্ষিত, মার্জ্জিত ও সভ্য জাতি' বলিয়া গর্ব্ব প্রকাশ করিয়া থাকেন। যখন জার্ম্মাণী বেলজিয়ামের লুভেন, আঁতোয়ার্প এবং ফরাসীর ইপ্রে, রিমস প্রভৃতি সহর তোপের মুখে উড়াইয়া দিয়াছিল, তখন জার্ম্মাণীকে গথ ও ভাণ্ডালদিগের সহিত তুলনা করা হইয়াছিল। আজ দামাস্কাসের ধ্বংসের সহিত জার্ম্মাণীর সেই ধ্বংসকার্য্যের তুলনা করিয়া জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে না কি, বর্ব্বরতায় কে বড়? জার্ম্মাণীর তবু এইটুকু বলিবার ছিল যে, তাহারা তোপের বিপক্ষে বড় তোপ দাগিয়াছিল, কিন্তু ফরাসীর পক্ষে সে কথা বলা যায় না। ফরাসী দামাস্কাসের আরবদিগের সেকেলে বন্দুকের বিপক্ষে বড় বড় কামান দাগিয়াছিল। সাম্রাজ্য-গর্ব্ব ফরাসীকে এমনই অন্ধ করিয়াছে!

ফরাসীর এই বর্ব্বরতায় ফরাসী সংবাদপত্রসমূহও লজ্জায় অধোবদন হইয়াছে। 'লে জার্ণাল' জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, "জেনারল সারাইল দামাস্কাসে গোলাবর্ষণ করিবার পূর্ব্বে দামাস্কাসের বৈদেশিক দূতগণকে এই গোলাবর্ষণের বিষয়ে সতর্ক করেন নাই, ইংরাজ সংবাদদাতারা এই কথা বলিতেছেন। ইহা কি সত্য? জাতিসঙ্ঘের একটা আইন আছে যে, কোনও জাতি অপরের নগর আক্রমণ করিবার পূর্ব্বে নারী ও বালকবালিকাদিগকে সহর ছাড়িয়া চলিয়া যাইবার জন্য সতর্ক করিয়া দিয়া থাকেন—এ জন্য তাঁহারা আইনতঃ বাধ্য থাকেন। জেনারল সারাইল এই নিয়ম পালন করিয়াছিলেন কি?" সিরিয়ার ফরাসী কর্ত্তৃপক্ষ এ কথার কি জবাব দেন, তাহা দেখিবার বিষয়। আজ দামাস্কাস ধ্বংসের ফলে সমগ্র সভ্যজগতে —বিশেষতঃ মুসলমান জগতে যে চাঞ্চল্য দেখা দিবে, তাহার পরিণাম ফরাসী ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি? সাম্রাজ্যবাদীর এত অহঙ্কার তাহার পক্ষে কখনও মঙ্গলকর হইবে না, ইহা বলাই বাহুল্য।

স্যাণ্ডোর লোকান্তর

গত ১৮ই অক্টোবর তারিখে বিলাতের বৈদ্যুতিক বার্ত্তায় প্রকাশ পাইয়াছে যে, জগদ্বিখ্যাত ব্যায়ামবিদ্ ইউজিন স্যাণ্ডো ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৬৫ বৎসর হইয়াছিল। স্যাণ্ডোর ব্যায়ামের প্রণালী অভিনব ছিল। তাঁহার ডেভেলপার, তাঁহার ডাম্বেল, তাঁহার শরীরের মাংসপেশীসমূহের সঙ্কোচ ও বিস্তারের প্রথা শারীরিক ব্যায়ামসাধনার জগতে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছিল। তাঁহার প্রথানুসারে শরীরের শক্তিসঞ্চয়-যোগ-অভ্যাস ঘরের মধ্যে থাকিয়াই সম্ভবপর। এই সকল কারণে স্যাণ্ডো বহু দেশবিদেশের যুবক, বালক ও এমন কি, পরিণতবয়স্কদিগেরও পরম প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। ২৫ বৎসর পূর্ব্বে স্যাণ্ডো এই কলিকাতার পুরাতন রয়্যাল থিয়েটারে তাঁহার অভিনব ব্যায়াম-কৌশল প্রদর্শন করিয়া বাঙ্গালী যুবকগণকে মোহিত করিয়াছিলেন। তাঁহার সেই ব্যায়ামকৌশল দর্শন করিয়া বাঙ্গালী যুবকরা উঁহার প্রতি কিরূপ আকৃষ্ট হইয়াছিল, তাহা তৎকালীন জনগণ বিলক্ষণ অবগত আছেন। স্যাণ্ডো এক দিকে যেমন অসাধারণ শক্তিশালী পুরুষ ছিলেন,—বহু গুরুভার দ্রব্য অনায়াসে উত্তোলন অথবা বক্ষের উপরে ধারণ করিতে পারিতেন, তেমনই শিক্ষিত, মার্জ্জিতরুচি, বিনয়ী ও মিষ্টভাষী ছিলেন। তাঁহার ব্যায়াম সম্বন্ধে বহু গ্রন্থ কুস্তীগির পালোয়ান ও ব্যায়ামপ্রিয় লোকগণের নিকট আদর প্রাপ্ত হইয়াছিল। স্যাণ্ডো তাঁহার ডাম্বেল ও ডেভেলপার প্রমুখ ব্যায়ামোপযোগী শস্ত্র বিক্রয় করিয়া এবং শারীরিক শক্তি প্রদর্শন করিয়া জীবনে বহু অর্থ উপার্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার বহু ধনবান্ শিষ্যসামন্তও তাঁহাকে প্রচুর অর্থ-সাহায্য করিয়াছিল। স্যাণ্ডোর জীবনের উদ্দেশ্য সফল হইয়াছিল। তাঁহার ব্যায়ামনীতি জগতের প্রায় তাবৎ সভ্য দেশেই গৃহীত হইয়াছিল। স্যাণ্ডো ইহা দেখিয়া যাইতে পারিয়াছিলেন। ইহাই তাঁহার আনন্দের কারণ হইয়াছিল। তিনি জাতিতে জার্ম্মাণ ছিলেন বটে, কিন্তু ইংলণ্ডে জীবনের অধিকাংশ কাল বাস করিয়া একরূপ ইংরাজই হইয়া গিয়াছিলেন। এ দেশে বর্ত্তমানে তরুণদিগের মধ্যে স্যাণ্ডোর আদর্শ গৃহীত হইলে দেশের মঙ্গল। প্রকৃত শক্তিমান পুরুষ শক্তির অপব্যবহার করে না। যে বুনিয়াদী বড় লোক, সে পয়সার অহঙ্কার করে না, আড়ম্বরপ্রিয়তাও প্রদর্শন করে না।

জগতের শান্তি

নিরপেক্ষ সুইজারল্যাণ্ডের ম্যাগিওর হ্রদের তটে মনোহর লোকার্ণো সহরে য়ুরোপীয় শক্তিপুঞ্জের যে শান্তি-বৈঠক বসিয়াছিল, তাহাতে জার্ম্মাণীকে 'জাতে তুলিয়া' লওয়া হইয়াছে এবং সেই হেতু জগতে শান্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার পথ প্রস্তুত হইয়াছে, ইংরাজ ও ফরাসী পত্রসমূহে এই ভাবের বড় বড় প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। এই বৈঠকে যে pact বা রফা বন্দোবস্ত হইল, তাহাতে মূলতঃ এই কয়টি কথা নির্দ্ধারিত হইয়াছে :—

(১) ফরাসী ও জার্ম্মাণী ভার্সাইল সন্ধির সর্ত্তমত আপন আপন সীমানার সম্মান রক্ষা করিবেন, কেহ কাহারও সীমানা অতিক্রম করিবেন না।

(২) উভয়েই বেলজিয়ামের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে বাধ্য থাকিবেন।

(৩) বৃটেন ও ইটালী রফার সর্ত্ত যাহাতে জার্ম্মাণী ও ফ্রান্সের দ্বারা পালিত হয়, তাহা দেখিতে প্রতিশ্রুত থাকিবেন।

(৪) জার্ম্মাণীর পূর্ব্বপ্রান্তের সীমানা সম্পর্কে জার্ম্মাণী, ফ্রান্স ও পোলাণ্ডের মধ্যে একটা রফা হইল, সকলে সেই রফার সর্ত্ত মানিতে বাধ্য থাকিবেন।

এই লোকার্ণোর রফায় ইংরাজ, ফরাসী, জার্ম্মাণী প্রভৃতি সকলেই খুসী। ইংরাজ তাঁহাদের বৈদেশিক সচিব মিঃ অষ্টেন চেম্বার্লেনকে এ জন্য মাথায় করিয়া নৃত্য করিতেছে, বলিতেছে, তাঁহারই চেষ্টায় জগতে প্রকৃত শান্তি স্থাপিত হইল। ফরাসী উৎফুল্ল হইয়া ভাবিতেছেন, আবার ইংরাজের সহিত তাঁহার "আঁতাত" অথবা মিতালী জাগাইয়া তুলা হইল, পরন্তু আলশাস-লোরেণটা পাকাপোক্তরূপে হস্তগত হইল। জার্ম্মাণী ভাবিতেছে, সে আবার জাতে উঠিল, আবার শক্তিপুঞ্জের দশ জনের এক জন হইয়া জার্ম্মাণীর পূর্ব্ব-গৌরব জাগাইয়া তুলিবে। ইটালী ভাবিতেছে, মাসোলিনির কল্যাণে 'বড়দের' মধ্যে গণ্য হইয়া আবার প্রাচীন রোমক সাম্রাজ্যের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিবে।

কালনেমির লঙ্কাভাগ এইরূপ হইয়া গেল। এ দিকে কিন্তু জাপান বা জুগো-শ্লোভিয়াকে এই রফায় লওয়া হয় নাই, রুসিয়াও বাদ পড়িল। রুসিয়া যে ইহাতে সন্তুষ্ট হয় নাই, তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে। রুসিয়ার এক সোভিয়েট কর্ত্তৃপক্ষ বলিতেছে,—এই রফায় ইংরাজের দফারফা হইবে, তাহার সাম্রাজ্য ক্রমে ধ্বংসের মুখে অগ্রসর হইবে। কেন না, এই রফায় ইংরাজের সাগরপারের জ্ঞাতিকুটুম্বগণকে লওয়া হয় নাই। এবার ইংরাজের সহিত কাহারও মতান্তর হইলে উপনিবেশসমূহ তাহাতে লোক ও অর্থ সাহায্য

করিবে না। উহা হইতে উভয়ের মধ্যে ছাড়াছাড়ির ভাব উপস্থিত হইবে।

ইংরাজের নিজের দেশেও শান্তির লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। সেখানে বলড়ুইন সরকার কমিউনিষ্ট দলপতিদিগকে গ্রেপ্তার করিয়াছেন এবং কমিউনিষ্ট দল ভাঙ্গিয়া দিবার চেষ্টা করিতেছেন। শ্রমিক দলের মধ্যে বহু বেকারের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহারা সরকারের উপর সন্তুষ্ট নহে। ২৫শে অক্টোবর বিলাতের খনির মজুরদের নেতা মিঃ এ, জে, কুক ইসলিংটন সহরে এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন,—"বর্ত্তমানে প্রতি ৪ জন লোকের মধ্যে এক জন বেকার বসিয়া আছে। আগামী মে মাসের মধ্যে শতকরা ৫০ জনকে বেকার থাকিতে হইবে। এখনই ৩ লক্ষ মজুরের কাষ নাই। তাহারা উপবাসী থাকিবে না, যেরূপে হউক, পুত্রপরিবারের জন্ম সরকারের নিকট আহার্য্য আদায় করিবেই। সরকার Trade Union ভাঙ্গিয়া দিবার জন্ম গুপ্ত আয়োজন করিতেছেন। কিন্তু আমি ঐ প্রতিষ্ঠানের নেতৃরূপে শত্রুকে সতর্ক করিয়া দিতেছি যে, আমরাও তজ্জন্য প্রস্তুত আছি। আমরা যাহা করিব, তাহা এখন প্রকাশ করিব না। কিন্তু যখন সময় উপস্থিত হইবে, তখন সরকার বুঝিতে পারিবেন, তাঁহাদের সম্মুখে কি বিভীষিকা উপস্থিত হইবে।"

ইহা শান্তির লক্ষণ নহে। ঘরে এই প্রবল অশান্তি বিদ্যমান থাকিতে বাহিরে রক্ষায় কি হইবে? বিশেষতঃ বৃটেনের সাম্রাজ্যের অন্যান্য অংশেও শান্তির লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। উপনিবেশে জাতি-বৈষম্য কি অনর্থ-সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা সকলেই জানেন। চলিতেছে। মসুল লইয়া ইংরাজে তুরস্কে মনোমালিন্যের উদ্ভব হইয়াছে। লোকার্ণো রক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই গ্রীসে ও বুলগেরিয়ায় সংঘর্ষ বাধিয়াছে।

ফল কথা, সাম্রাজ্যবাদীর পররাজ্য গ্রাসের এবং পরের উপর প্রভুত্বের লিপ্সা বিদ্যমান থাকিতে জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠার কোন সম্ভাবনা নাই। শত লোকার্ণো রক্ষা হইলেও শান্তির আশা সুদূরপরাহত হইবে।

সুয়েজ খালের সূক্ষ্ম তত্ত্ব

বোম্বাইয়ের ভূতপূর্ব্ব গভর্ণর সার জর্জ্জ লয়েড মিশরের হাই কমিশনার নিযুক্ত হইয়াছেন। লাব লী ষ্টাকের হত্যাকাণ্ডের পর মিশরকে 'ধাতে' আনিবার জন্ম এই ব্যবস্থা হইয়াছে বলিয়া মনে হওয়া বিস্ময়ের বিষয় নহে। সার জর্জ্জ বোম্বাই বিভাগের শাসনদণ্ড গ্রহণের পর জনমত পদদলিত করিয়া স্বৈরাচার শাসন প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। বোম্বাই সহরের সংস্কারসাধনব্যাপারে তিনি জনমত উপেক্ষা করিয়া যথেচ্ছা ব্যয় বরাদ্দ করিয়াছিলেন। মহাত্মা গন্ধীর মত সর্ব্বজনমান্য জননায়ককে কারারুদ্ধ করিবার কারণ হইয়াছিলেন। ভারতের জাতীয় আন্দোলনকে সর্ব্বতোভাবে নিস্তেজ ও নিষ্প্রভ করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। এ হেন পাকা ব্যুরোক্রাটকে মিশরের ভাগ্যনিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য নিয়োগ করিবার মূলে গূঢ় রহস্য নিহিত আছে, এমন কথা অনেকে বলিতেছেন।
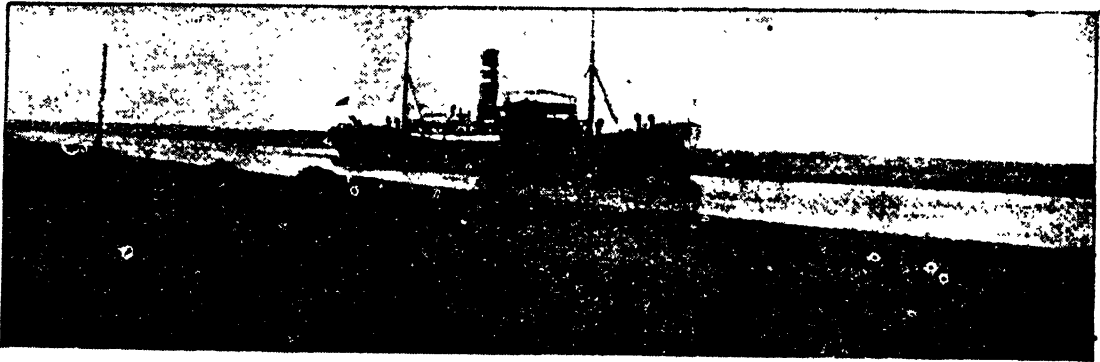
সুয়েজ খাল

ভারতের বাহিরে বৃটিশ উপনিবেশসমূহে—বিশেষতঃ আফ্রিকায় ভারতীয়ের সম্পর্কে কোণঠেসা ও বহিষ্কার আইন ভবিষ্যতের জন্য এক সর্ব্বনাশের বীজ বপন করিতেছে। এমন কি, ব্রহ্মেও ভারতীয়ের বহিষ্কার আইন বহাল করা হইয়াছে। ইংরাজ সাগরপারের জ্ঞাতি-কুটুম্বগণকে অসন্তুষ্ট করিতে সাহস করেন না। তাহাতে ফল এই হইয়াছে যে, ভারতীয়দের মধ্যে ঘোর অশান্তির সৃষ্টি করা হইতেছে। সে দিন বিলাতের চার্চ্চ কংগ্রেসে লর্ড উইলিংডন বলিয়াছেন,—"অতঃপর যে অশ্বেতজাতিদিগকে শ্বেতজাতিরা নিকৃষ্টের আসন দিয়া আসিয়াছেন, তাহাদিগকে সমানের আসন দিতে হইবে। এরূপ না করিলে যে হলাহল উত্থিত হইবে, তাহাতে অচির-ভবিষ্যতে জাতিসংঘর্ষ অপরিহার্য্য হইবে। চীনেও ঘোর অশান্তি বিরাজ করিতেছে, নবজাগ্রত চীন আপনার গণ্ডা বুঝিয়া লইবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছে। মরক্কো, সিরিয়া প্রভৃতি দেশের মুসলমান জগতেও ঘোর যুদ্ধ-বিগ্রহ

সার জর্জ্জ পাকা ব্যুরোক্রাট। তিনি ঘোর সাম্রাজ্যবাদী। বোধ হয়, লর্ড কার্জ্জনের পর তাঁহার ন্যায় সাম্রাজ্যবাদ, ইংরাজ রাজপুরুষদিগের মধ্যে অতি অল্পই আবির্ভূত হইয়াছেন। এই শ্রেণীর লোকের সাহস অদম্য। তাঁহারা পরিণামদর্শী না হইতে পারেন, কিন্তু বর্ত্তমানে সাম্রাজ্যের প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ রাখিতে সর্ব্বদা যত্নবান। তাঁহারা দেখিতেছেন, নানা যুদ্ধ বিগ্রহ এবং বিদ্রোহ-বিপ্লব ঘটিলেও বৃটিশ সাম্রাজ্য যুগ যুগ ধরিয়া অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। এক মার্কিণ রাজ্য এই সাম্রাজ্যের অঙ্গচ্যুত হওয়া ব্যতীত সাম্রাজ্যের অন্য কোনও ক্ষতি এ যাবৎ হয় নাই। বরং জার্ম্মাণ-যুদ্ধের পর হইতে সাম্রাজ্যের ক্ষমতা, প্রভাব ও প্রতিপত্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। তাঁহাদের এ জন্য এমন ধারণা হওয়া বিচিত্র নহে যে, এই সাম্রাজ্য অবিনশ্বর, ইহার ভবিষ্যৎ কখনও অমঙ্গলজনক হইতে পারে না।

সার জর্জ্জ লয়েড এই ধারণা লইয়াই বোধ হয় মিশরে প্রথম

বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে,—মিশর যত দিন বিশ্বাস না করিবে, ইংলণ্ড মিশরের বন্ধু তত দিন মিশরের আত্মনিয়ন্ত্রণের আশা পূর্ণ হইবে না। এই উক্তির মধ্যে কতকটা সাম্রাজ্য-গর্ব্বের এবং জাতিগত দম্ভের ভাব লুক্কায়িত আছে, তাহা সহজেই অনুমেয়। কোন জাতি অন্য জাতির বন্ধুতার আশ্রয় লাভ না করিলে আপনার ভাগ্যনিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবে না, ইহা কেবল সাম্রাজ্যগর্ব্বীই বলিতে পারেন। আত্মনিয়ন্ত্রণ শব্দের অর্থ কি? পরের সাহায্য ও বন্ধুত্ব লইয়া কেহ আত্মনিয়ন্ত্রণে সমর্থ হইবে, ইহা কখনও প্রকৃত আত্মনিয়ন্ত্রণ হইতে পারে না। এই বন্ধুত্বের মূলে পরের অধীনতা ও কর্তৃত্ব নিশ্চয়ই অনুসূচিত হয়। যদি যথার্থই বৃটেন মিশরের প্রতি বন্ধুত্বপ্রদর্শনে অভিলাষী হইতেন যদি তাঁহারা মিশরে সত্যই শান্তি-প্রতিষ্ঠাপ্রয়াসী হইতেন তাহা হইলে মিশরের জননায়ক জগ্লুল পাশার জাতি-গঠনের উদ্যমে সহায়তা করিতেন। মিশরের অধিকাংশ অধিবাসীই যে জগ্লুলের নেতৃত্বে সন্তুষ্ট এবং জগ্লুল-নির্দ্দিষ্ট কার্য্যপদ্ধতির পক্ষপাতী, তাহা কি বৃটেন অস্বীকার করিতে পারেন? জগ্লুল সুদান চাহিয়াছিলেন 'মিশর মিশরীয়দের জন্য' বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। ইহাই যথার্থ মিশরের পক্ষে আত্মনিয়ন্ত্রণ। তবে বৃটেনের সহিত বন্ধুত্ব করিলে মিশর আত্মনিয়ন্ত্রণে সমর্থ হইবে সার জর্জ লয়েডের এ কথা বলার তাৎপর্য্য কি? যদি মিশরকে যথার্থ সন্তুষ্ট করিবার ইচ্ছা থাকিত, তাহা হইলে আন্তর্জাতিক আপোষ দ্বারা সে কার্য্য সম্পন্ন করা সম্ভব হইত। মিশর জাতিসঙ্ঘের নিকট আত্ম-নিয়ন্ত্রণের দাবী করিয়াছিল, তাহা পূর্ণ হইল না কেন? বরং সার লী ষ্টাকের হত্যাকাণ্ডকে উপলক্ষ করিয়া মিশরকে ভয় প্রদর্শন করিয়া মিশরের যেটুকু আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা ছিল, তাহাও হরণ করা হইল।

মিশরে বৃটেনের স্বার্থ কি? মিশরে বৃটেনের নানা রক্ষিত স্বার্থ ত আছেই, পরন্তু সুয়েজ খালের স্বার্থ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। ইহা বৃটেনের প্রাচ্যের জমীদারীর প্রবেশ পথ, আগমনিগমের পথ। বৃটেন চিরদিন দার্দ্দেনেলিস প্রণালীটি আন্তর্জাতিক সম্পত্তিরূপে পরিণত করিবার জন্য জিদ করিয়াছেন,—তাহার জন ন্যায় ও ধর্ম্মের দোহাই দিয়া কত যুক্তি-তর্ক দিয়াছেন। কিন্তু সুয়েজ খালটি আন্তর্জাতিক করিবার কথা কেহ বলিলে বৃটেন কি জবাব দেন?

সার জর্জ লয়েড (এখন লর্ড লয়েড) বলিয়াছেন, 'মিশরের আশা-আকাঙ্ক্ষা যদি ন্যায় ও আইনসঙ্গত (Legitimate) হয়, তাহা হইলে মিশরকে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দেওয়া হইবে। ভাল কথা। কিন্তু মিশরের আশা-আকাঙ্ক্ষা ন্যায় ও আইনসঙ্গত কি না কে বিচার করিবে? মিশর যদি আপনার অভিপ্রায়মত কার্য্য করিবার অধিকার ভোগ করিত, তাহা হইলে সুয়েজ খাল ও সুদান কি অপরের হস্তে রাখিয়া আত্মনিয়ন্ত্রণ করিত?

মূল কথা, সুদান ও সুয়েজ খাল বৃটেনের রক্ষিত স্বার্থের অন্তর্গত রাখা চাই। বিশেষতঃ সুয়েজ খালের অধিকার বৃটেন কখনও ছাড়িতে পারেন না। সুয়েজ খালের ইতিহাস অনেকেই জানেন। কেমন করিয়া ইংরাজ তোয়েফিক পাশাকে ঋণ দান করিয়া এবং সুয়েজ খালের বণ্ড ক্রয় করিয়া সুয়েজ খালের মালিক হইয়াছেন, তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। এখনও এই খাল রক্ষার জন্য ইংরাজ কিরূপ যত্নবান, তাহার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস দিতেছি।

প্রথম যখন এই খাল কাটা হয় ভূমধ্যসাগরের সহিত লোহিত সাগরে যোগাযোগ করিবার জন্য যখন এ খালের সৃষ্টি হয়, তখন এই খালের দৈর্ঘ্য ১০২ মাইল ছিল। এখন ইহার উপর সৈয়দ বন্দরের নিকটে দৈর্ঘ্য আরও ২॥ মাইল বৃদ্ধি করা হইয়াছে। প্রথম আমলে মানুষ মজুরের দ্বারা খাল কাটা এবং খালের মাটী তোলা হইত। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রায় ৩০ হাজার মজুর এই কার্য্যে নিযুক্ত ছিল। তাহারা সকলে একসঙ্গে খননকার্য্যে নিযুক্ত হইত। ঐ বৎসরের পর হইতে কলকব্জার সাহায্যে খননকার্য্য চালান হইতেছে। বাষ্পীয় মাটীকাটা জলযান খালের বালুকারাশি কাটিয়া তুলিতেছে এবং ঐ বালুকা ধাতব নলের মধ্য দিয়া খাল হইতে ২ শত ফুট দূরে নিক্ষিপ্ত হইতেছে।

প্রথম আমলে খালের জলের গভীরতা ২৬ ফুট ছিল, তাহার পর উহা বাড়াইয়া ৩৬ ফুট করা হয়। এখন ইংরাজ খাল আরও গভীর করিবার চেষ্টা করিতেছেন। কার্য্য সম্পন্ন হইলে খালের গভীরতা ৪০ ফুট হইবে। যে সকল বড় বড় ষ্টীমার জলমধ্যে ৩১ ফুট নিমজ্জিত থাকে, এখন সেই সকল ষ্টীমার অনায়াসে সুয়েজ খালের মধ্য দিয়া যাতায়াত করিতে সমর্থ হইতেছে। পরে ৩৩ ফুট পর্য্যন্ত নিমজ্জিত জাহাজও খাল দিয়া যাতায়াত করিতে পারিবে।

পূর্ব্বে খালের নিম্নস্তরের বিস্তার ছিল মাত্র ৭২ ফুট, এখন হইয়াছে ১৫০ ফুট। পরে ইহার বিস্তার ৩ শত ফুট করা হইবে, এমন ভাবে কার্য্য করা হইতেছে। এখন খালের উপরের স্তরের (অর্থাৎ এক তট হইতে অপর তট পর্য্যন্ত) বিস্তার ৩ শত ১০ ফুট হইতে ৫২৫ ফুট। কোনও স্থানে ৩ শত ফুট, আবার কোনও স্থানে ৫ শত ফুট। এখন সর্ব্বাপেক্ষা অল্প পরিসর স্থান যাহাতে ৪ শত ৪৫ ফুটের কম না হয়, তাহার জন্য কার্য্য চালান হইতেছে। পূর্ব্বে ৪ হাজার টনের অধিক মাল-বোঝাই জাহাজ এই খাল দিয়া যাতায়াত করিতে পারিত না, এখন ২০ হাজার টন বোঝাই জাহাজ অনায়াসে খাল দিয়া যাতায়াত করিতেছে।

খাল পার হইতে ১৬ ঘণ্টা লাগে—ইহার মধ্যে ২ ঘণ্টা ষ্টেশন সমূহে জাহাজ বাঁধিতে ব্যয় হয়। প্রতি ২৪ ঘণ্টায় ১৫ খানা জাহাজ খাল দিয়া গমনাগমন করে। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে এক বৎসরে এই খাল দিয়া ৪ শত ৮৬ খানা জাহাজ যাতায়াত করিয়াছিল; ইহারা ৪ লক্ষ ৩৬ হাজার ৬ শত টন মাল বহন করিয়াছিল। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে জাহাজের সংখ্যা হইয়াছিল ৫ হাজার ৮৫ খানা এবং উহারা মাল বহন করিয়াছিল ২ কোটি ৩ হাজার ৮ শত ৮৪ টন। জার্ম্মাণ যুদ্ধের সময়ে জাহাজ যাতায়াতে স্বভাবতঃই কম হইয়াছিল। আবার সংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে ৪ হাজার ৬ শত ২১ খানা জাহাজ; মোটের উপর ২ কোটি ২১ লক্ষ ৩০ হাজার ১ শত ৭২ টন মাল লইয়া যাতায়াত করিয়াছিল।

সৈয়দ বন্দরে খালের খনন কার্য্যের যে প্রধান কার্য্যালয় আছে, সেখানে ১ হাজার ২ শত জন কারিগর কার্য্য করে। খাল খননের পর এই মরুভূমি ও জলার মধ্যে খালের তটে ৩টি বড় বড় বন্দর গজাইয়া উঠিয়াছে, ভূমধ্যসাগরতটে সৈয়দ বন্দর, খালের মাঝামাঝি ইসমালিয়া বন্দর এবং লোহিত সাগরের মুখে সুয়েজ গ্রাম হইতে ২ মাইল দূরে তোয়েফিক বন্দর। সৈয়দ বন্দরের লোক-সংখ্যা এখন ৭০ হাজার এবং উহা এখন প্রকাণ্ড কারখানা এবং ব্যবসায় বাণিজ্যের কেন্দ্র। ইসমালিয়ায় ইংরাজের শাসনকেন্দ্র অবস্থিত।

এই যে এত বড় একটা বিরাট প্রতিষ্ঠান ইহার রক্ষণকল্পে ইংরাজ জলের মত অর্থ ব্যয় করিতেছেন। এ সম্পত্তি তিনি যক্ষের মত আগুলিয়া বসিয়া আছেন। এখানে আর কাহারও দন্তস্ফুট করিবার সাধ্য নাই। কেন? লর্ড লয়েড বলিতে পারেন কি ইংরাজ পরোপকারের জন্য অথবা তীর্থ করিবার জন্য এই সুয়েজ খাল রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন? যে কারণে ভারতের অনুর্ব্বর উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ রক্ষণের জন্য ইংরাজ ভারতের প্রজার কষ্টদত্ত অর্থ জলের মত ব্যয় করিতেছেন, যে কারণে স্বদেশে বেকারের

সংখ্যা বৃদ্ধি পাইলেও ইংরাজ সিঙ্গাপুরে তাঁহার প্রাচ্য নৌ-বহরের আড্ডা স্থাপনে জলের ন্যায় অর্থব্যয় করিতে প্রস্তুত হইতেছেন, সেই কারণেই কি সুয়েজ খাল স্বীয় অধিকারে গ্রাস করিয়া রাখেন নাই? সুয়েজ খালের এই সূক্ষ্ম তত্ত্বটুকু বুঝিতে পারিলেই মিশরের আত্ম-নিয়ন্ত্রণের কথা সহজ ও সরলভাবে পরিস্ফুট হইয়া উঠিবার সুযোগ প্রদান করে না কি?

পীতাতঙ্ক

হৃতরাজ্য হৃতমান জার্ম্মাণ কাইজার বর্ত্তমানে হলাণ্ডের ডুর্ণ সহরে বন্দীর অবস্থায় কালযাপন করিতেছেন। তাঁহার পরিণত বয়সে এক সন্তান বিধবার পাণিগ্রহণের কথা সকলে বিদিত আছেন। রাজনীতির কর্ম্মকোলাহল হইতে দূরে এই নব গঠিত পাতান সংসারের শান্তিময় ক্রোড়ে অবস্থান করিয়া কাইজার জীবনের সায়াহ্নে বিশ্রাম ও শান্তি উপভোগ করিবেন এই রূপই সকলে অনুমান করিয়া ছিলেন। কিন্তু রাজনীতির কীট যাঁহার মস্তিষ্কে একবার প্রবেশ করিয়াছে, উহার প্রভাব হইতে তাঁহার মুক্তি বোধ হয় নাই। তাই কাইজার সম্প্রতি তাঁহার ডুর্ণের শান্তি-নিবাস হইতে আবার রাজনীতি ক্ষেত্রে আবির্ভূত হইয়াছেন।

কাইজার

বিলাতের 'অবজার্ভার' পত্রের কোনও প্রতিনিধির নিকট কাইজার কথায় কথায় বলিয়াছেন,—

"আমি ৩০ বৎসর পূর্ব্বে যে পীতাতঙ্কের কথা তুলিয়া সমগ্র য়ুরোপকে সতর্ক করিয়াছিলাম, সম্প্রতি উহা ভীষণ মূর্ত্তিতে দেখা দিতেছে। বহু পূর্ব্ব হইতেই এসিয়ায় যে তিনটি শক্তির সম্মিলন সংঘটিত হইয়াছে, উহা এইবার কার্য্যক্ষেত্রে স্বরূপ প্রকাশ করিতেছে। এই সম্মিলন শ্বেত জাতির বিরুদ্ধে—বিশেষতঃ অ্যাংলো-স্যাক্সন (অর্থাৎ ইংরাজ, মার্কিণ ও জার্ম্মাণ) জাতির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবে। রুসিয়ার মস্কো সোভিয়েট চীনের ২ লক্ষ লোককে বেতন দিতেছে এবং জাপান তাহাদিগকে আধুনিক সমর-প্রথায় শিক্ষিত করিতেছে। সঙ্কটসঙ্কুল সময়ে ঐ সেনা চীনের কল্যাণে ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত করা হইতেছে। এ দিকে জাপান নিজের ও রুসিয়ার জন্য প্রভূত রণপোত নির্ম্মাণ করিতেছে, পরন্তু চীনও রাসিয়ান ও জাপানী সেনানীর দ্বারা ৮ লক্ষ সেনাকে সমরকুশলী করিয়া তুলিতেছে।"

কাইজার এই বিভীষিকাময় চিত্র অঙ্কন করিয়াই ক্ষান্ত হয়েন নাই, তাঁহার উপর ফরাসীর উপরেও দোষারোপ করিতেছেন। তিনি বলিতেছেন, "ফরাসী আগুন লইয়া খেলা করিতেছেন। তিনি অ্যাংলো-স্যাক্সন জাতির বিরুদ্ধে গোপনে রুসিয়া ও জাপানের সহিত প্রীতিবন্ধনের চেষ্টা করিতেছেন। প্রতীচ্যের দুর্গের প্রাচীরে রন্ধ্র সৃষ্টি করিবার পক্ষে এই যে বলশেভিক ও এসিয়াবাসির গুপ্ত ষড়যন্ত্র চলিতেছে, একমাত্র জার্ম্মাণীই তাহা বিফল করিয়া দিতে সমর্থ। সুতরাং যদি লণ্ডন, প্যারী ও ওয়াসিংটনের কর্তৃপক্ষ প্রতীচ্যের বিপক্ষে এই ভীষণ পীতজাতির অভ্যুত্থান নিবারণ করিতে চাহেন, তাহা হইলে জার্ম্মাণীকে পুনরায় অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইতে অনুমতি প্রদান করুন, নতুবা প্রতীচ্য প্রাচ্যের এই আক্রমণ সহ্য করিতে পারিবে না।"

কাইজারের মোট কথা, আবার জার্ম্মাণীকে তাহার পূর্ব্ব গৌরবে গৌরবান্বিত কর, নতুবা প্রতীচ্যের মঙ্গল নাই। যখন মার্শাল হিণ্ডেনবার্গ জার্ম্মাণীর সাধারণতন্ত্রের প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন, তখন কাইজার আশান্বিত হইয়াছিলেন, হয় ত বা আবার তাঁহার ভাগ্য-পরিবর্ত্তন হইতে পারে। হিণ্ডেনবার্গ রাজভক্ত, কাইজারভক্ত, তিনি প্রজাতন্ত্র শাসন অপেক্ষা রাজতন্ত্র শাসনেরই পক্ষপাতী। সুতরাং হয় ত বা হিণ্ডেনবার্গ আবার তাঁহাকে জার্ম্মাণীর সিংহাসনে ফিরাইয়া আনিতে পারেন। কিন্তু দিনের পর দিন গত হইল, সে আশাতরু মুকুলিত হইল না। তাই কি কাইজার একবার নিজে আপনার ভাগ্য-পরিবর্ত্তনের উদ্দেশ্যে এই চাল চালিয়াছেন? কে জানে!

কাইজার যে পীতাতঙ্কের কথা তুলিয়াছেন, তাহার কোনও ভিত্তি আছে বলিয়া মনে হয় না। কিছুদিন পূর্ব্বে চীনের সাংহাই সহরে যে কাণ্ড ঘটিয়া গেল, তাহাতে মনে হয়, চীন নিজের বাসভূমেই পরবাসীর মত বাস করিতেছে। সাংহাইয়ের জাপানী কলে চীনা শ্রমিকের নির্য্যাতন, চীনা ছাত্রদিগের আন্দোলন এবং শ্রমিক ও ছাত্র-ধর্ম্মঘট, বৈদেশিক সামরিক পুলিসের হস্তে চীনা ছাত্র ও মজুরদিগের মৃত্যু, অপমান ও লাঞ্ছনা, সারা চীনব্যাপী ধর্ম্মঘট, চীনা জাতীয় দলের পক্ষ হইতে মহাত্মা গন্ধীকে পত্র প্রদান ও জগতের সকল জাতির নিকট ন্যায়বিচার প্রার্থনা,—এ সকল এখন ইতিহাসোক্ত ঘটনার মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। যে নির্য্যাতিত চীন জগতের নিকট বিচার প্রার্থনা করিতেছে, সেই চীন প্রতীচ্যের বিপক্ষে এক বিরাট ষড়যন্ত্রে যোগদান করিয়াছে, ইহা কিরূপে বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে? যে জাপানের হস্তে চীনারা নির্য্যাতিত হইয়াছে, সেই জাপানের সহিত চীনের ষড়যন্ত্রের কথা কে বিশ্বাস করিবে?

তাহার পর চীনে যে অমঙ্গলকর গৃহ-বিবাদ উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে কি মনে হয় যে, চীন একযোগে প্রতীচ্য আক্রমণ করিবার নিমিত্ত সমরসজ্জা করিতেছে? এ গৃহ-বিবাদ সামান্য নহে। চীনে এখন কর্ত্তা অনেক, তন্মধ্যে তিন কর্ত্তাই প্রধান। উত্তরে মাঞ্চুরিয়ার জেনারল চাঙ্গ-সো-লিন, মধ্য-চীনে জেনারল ফেঙ্গ উসিয়াঙ্গ এবং হোনানে উপেই-ফু। এই তিন কর্ত্তার মধ্যে চীনের সার্ব্বভৌমত্ব লইয়া প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতেছে। দক্ষিণে ডাক্তার সান-ইয়াট-সেন আর এক কর্ত্তা ছিলেন। তাঁহার দেহাবসানের পর দক্ষিণ চীন একরূপ কর্ত্তাহীন হইয়া রহিয়াছে। তাই আপাততঃ দক্ষিণ চীনের প্রভুত্ব লইয়া তিন কর্ত্তার মধ্যে ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতেছে।

জেনারল উপেইফু এক সময়ে সার্ব্বভৌমত্ব লাভ করিবার আয়োজন করিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত জেনারল চাঙ্গ-সো-লিনের অস্ত্র-পরীক্ষা হইতেছিল। তিনি তাঁহার হোনান-সেনা লইয়া গত বৎসর হঠাৎ রাজধানী পিকিং আক্রমণ করেন এবং পিকিংএর অন্যান্য প্রধান পুরুষকে গ্রেপ্তার করিয়া স্বয়ং পিকিংএর কর্তৃত্ব গ্রহণ করেন। পরে তিনি সসৈন্যে মাঞ্চুরিয়ায় চাঙ্গ-সো-লিনের বিপক্ষে যাত্রা করেন। যাত্রার পূর্ব্বে তিনি পিকিং সহরে তাঁহার সহকারী জেনারল ফেঙ্গ উসিয়াঙ্গকে রাখিয়া যায়েন। কিন্তু তাঁহার অনুপস্থিতিকালে জেনারল ফেঙ্গ বিদ্রোহী হইয়া স্বহস্তে কর্তৃত্বভার গ্রহণ করেন। তিনি চীন সাধারণতন্ত্রের প্রেসিডেণ্ট পদ গ্রহণ করিয়াছেন। জেনারল উপেইফু উত্তরে শত্রু চাঙ্গ-সো-লিনের বিপক্ষে আর যুদ্ধ করিতে পারিলেন না, বহু কষ্টে প্রাণ লইয়া পিহো নদে এক জাহাজে চড়িয়া হোনানে পলায়ন করেন; তিনি সেখানে প্রায় ১ লক্ষ ৮০ হাজার সৈন্য সংগ্রহ করিয়া কর্তৃত্ব করিতেছেন।

তাহা হইলেই বুঝিয়া দেখুন, চীনের অবস্থা কিরূপ। এই তিন কর্ত্তার মধ্যে পরস্পর ঘোর মনোমালিন্য ও বিবাদ। ফেঙ্গ গণতন্ত্রবাদী

বলিয়া আপনাকে জাহির করিতেছেন ; তিনি চাহেন সমগ্র চীনকে স্বাধীন করিতে ; চীনে প্রকৃত গণতন্ত্রশাসন প্রবর্ত্তন করিতে। কিন্তু তাঁহার উত্তরে ও দক্ষিণে দুই প্রবল শত্রু। দক্ষিণে উপেইফুকে তিনি ঘোর শত্রু করিয়া রাখিয়াছেন। উত্তরে চাঙ্গ-সো-লিনকে সন্তুষ্ট করিবার জন্ম তিনি যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়াছে। তবে তাঁহার এক আশা,—চাঙ্গ ও উপেইফু পরস্পর কখনও বন্ধুতাসূত্রে আবদ্ধ হইবেন না।

বর্ত্তমানে আর এক নূতন সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে। জেনারেল ফেঙ্গের অধীনস্থ চেকিয়াঙ্গ প্রদেশের সামরিক শাসনকর্ত্তা জেনারল সান-চুয়ান-ফেঙ্গ হঠাৎ সাংহাই সহরে সসৈন্যে উপস্থিত হইয়া মাঞ্চুরিয়ার কর্ত্তা চাঙ্গ-সো-লিনের বিপক্ষে এক ঘোষণাপত্র জাহির করিয়াছেন। তিনি চাঙ্গ-সো-লিনের সেনাদলকে ন্যাংকিং সহরে আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইতেছেন। কিন্তু পিকিং হইতে তাঁহার উপরওয়ালা জেনারেল ফেঙ্গের হুকুম আসিয়াছে যে, তাঁহাকে অবিলম্বে সাংহাই পরিত্যাগ করিয়া চেকিয়াঙ্গে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইবে। সান চুয়ান হয় ত এই হেতু জেনারল ফেঙ্গের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবেন। এইরূপে চীনে গৃহ-বিবাদ ক্রমশঃ বর্দ্ধমান হইতেছে। এমন অবস্থায় সমগ্র চীন কিরূপে একযোগে জাপান ও রুসিয়ার সহিত মিলিত হইয়া প্রতীচ্যের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইবে ?

চীন-সম্রাট চিয়েন লুঙ্গ ইংলণ্ডের রাজা তৃতীয় জর্জ্জকে লিখিয়াছিলেন,—"আমার স্বর্গরাজ্যের (Celestial Empire) প্রজাদের কোন অভাব নাই। তাহারা জীবনের উপযোগী সমস্ত দ্রব্যই প্রচুর পরিমাণে উপভোগ করে। সুতরাং বিদেশের বর্ব্বরদিগের সহিত তাহাদের ব্যবসায়-বাণিজ্য করিবার কোনও প্রয়োজন নাই।" সে যুগে—অর্থাৎ এক শতাব্দীরও পূর্ব্বে চীনে কোনও বৈদেশিকের প্রভুত্ব ছিল না, চীন তখন প্রকৃত স্বাধীন ছিল। তাহার পর ক্যাণ্টন সহরের 'হং' বণিকরা পিকিং সরকারের অনুমতিক্রমে কয়েক জন ইংরাজ, মার্কিণ ও অন্যান্য য়ুরোপীয় বণিকের সহিত পণ্যবিনিময় করিতে আরম্ভ করেন। পিকিং সরকার তাঁহাদের হস্তে বৈদেশিক বাণিজ্যের একচেটিয়া অধিকার প্রদান করেন। তাহাদিগকে 'হং' অথবা 'কোহং' বলা হইত, তাঁহাদের ব্যবসায়ে সাধুতা ইতিহাসপ্রথিত। তখন তাঁহারা দয়া করিয়া ইংরাজ, মার্কিণ, পর্টুগীজ প্রভৃতি কয়েকটি জাতির মুষ্টিমেয় বণিককে ক্যাণ্টন সহরে পণ্য আদান-প্রদানে সহায়তা করিতেন। কালে পোর্টুগীজরা আময় সহরে বড় রকমের ব্যবসায় কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা করে। ইহাই বিদেশীদের চীন-প্রবেশের সূত্রপাত।

তাহার পর এক শতাব্দীর মধ্যে কত পরিবর্ত্তন হইয়াছে ! ঘটনার নানা ঘাত-প্রতিঘাতের পর—বিশেষতঃ চীন-জাপান যুদ্ধের পর চীন যখন দুর্ব্বল বলিয়া প্রতিভাত হইল, তখন হইতে বিদেশীরা বণিকের পরিবর্ত্তে মিশনারী সৈন্য ও রণপোত প্রেরণ করিয়া ছলে-বলে কৌশলে চীনে রীতিমত আড্ডা গাড়িয়া বসিয়াছেন। একটা মিশনারী হত্যার পরেই বৈদেশিক শক্তিরা চীনের বুকে পদক্ষেপ করিয়া তাহার এক একটি স্থান অধিকার করিয়াছে। বক্সার বিদ্রোহের পর প্রতীচ্যের শক্তিরা ক্ষতিপূরণ আদায় করিবার অছিলায় প্রায় ৪৯টি স্থান স্বাধিকারে আনয়ন করিয়াছে। কেবল ইহাই নহে, Treaty port মাত্রেই তাহারা বাণিজ্য-শুল্ক বিষয়ে আপনাদের যথেষ্ট সুবিধা করিয়া লইয়াছে, কাষ্টম বিভাগের ব্যবস্থা ও শাসন আপনাদের হস্তে রাখিয়াছে, স্বজাতীয়ের সহিত চীনার মামলা-মোকর্দ্দমায় আপনাদের আদালত ও জুরী প্রথা বজায় রাখিয়াছে। মোটের উপর প্রতীচ্যের প্রবল শক্তিরা প্রথমে সূচের মত প্রবেশ করিয়া পরে ফাল হইয়া বাহির হইয়াছে। স্বাধীন চীন এখন নিজগৃহে অধীনের পর্য্যায়ে পরিণত হইয়াছে।

তাই আজ পীতাতঙ্কের কথা উঠিয়াছে। চীন কাহারও দেশ আক্রমণ করিতে যায় নাই কাহারও দেশের কণামাত্র স্থান বলপূর্ব্বক অধিকার করে নাই। সে নিজের ভদ্রতা ও সাধুতার মাপকাঠিতে বিদেশীকে মাপিয়া স্বদেশে তাহাদিগকে বাণিজ্যাধিকার দিয়াছিল, এখন তাহার ফল ভোগ করিতেছে। প্রতীচ্যের সাম্রাজ্য-গর্ব্বী পর ধনলিপ্সু প্রবল জাতিবর্গের লেলিহান রসনা এখন চীনকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে।

অপমানের পর অপমান, নির্য্যাতনের পর নির্য্যাতন সহ্য করিয়া চীনের যখন জাগরণ হইয়াছে,—চীন যখন আপনার গণ্ডা বুঝিয়া লইবার জন্য আত্মশক্তির উপর দণ্ডায়মান হইবার চেষ্টা করিতেছে, তখনই পীতাতঙ্কের কথা উঠিয়াছে। পাছে বলপূর্ব্বক অধিকৃত চীনের Treaty portগুলি হাতছাড়া হয়, পাছে বাণিজ্যের অন্যায় একচেটিয়া অধিকার লুপ্ত হয়, পাছে স্বজাতীয়ের বিচারের অন্যায় প্রথা ক্ষুণ্ণ হয়, পাছে কাষ্টমের কর্তৃত্বের অবসান হয়,—তাই প্রতীচ্যের মুখে আজ এই পীতাতঙ্কের কথা শুনা যাইতেছে। চীন অতীতে বিদেশীর রাজ্য আক্রমণ করিতে প্রস্তুত হয় নাই, এখনও হইতেছিল না। সে তাহার নিজের ঘর সামলাইতে যত্নবান্ হইয়াছে মাত্র। তবে এই মিথ্যা পীতাতঙ্কের কথা তুলিয়া জগতে নূতন অশান্তি সৃষ্টি করার আয়োজন কেন ?

স্মৃতি

সে নহে চিন্তার সুখ ধ্যানের মাধুরী,
সুদূর নক্ষত্র সম উজ্জ্বল সুন্দর,
তারে ভাবি শুষ্ক চিত্ত কামনা-কাতর,
নহে কি এ মরীচিকা ভ্রান্তির চাতুরী।
সে যদি হইত দিব্য প্রেমের মূরতি,
স্মৃতি তার হ'ত পূত প্রেম আরাধনা,
রতির কটাক্ষমাঝে তাহার বসতি,
লাবণ্যে জড়িত হেয় সম্ভোগ বাসনা।

সে যে ঘাতকের ছুরী রক্ত-তৃষ্ণাতুর,
অয়স-দীপ্তির পরে রুধির রক্তিমা,
ছলা তা'র হৃদি-রক্ত শোষণ চতুর,
সর্ব্বপুণ্যহীন প্রেম-দৈন্যের প্রতিমা,—
অভিশপ্ত স্মৃতি তা'র পূর্ণ হলাহলে,
দগ্ধ হোক্ ভস্ম হোক্ দীপ্ত বজ্রানলে।

মুনীন্দ্রনাথ ঘোষ।

জাতিতত্ত্ব

সূচনা

কয়েক জন বিশিষ্ট বৈদ্য, যোগী, মাহিষ্য ও কায়স্থ তাঁহাদের জাতি সম্বন্ধে প্রকাশিত কয়েকখানি পুস্তক আমার নিকট পাঠাইয়া, তৎসমস্ত আলোচনা-পূর্ব্বক যথাশাস্ত্র তাঁহাদের জাতিতত্ত্ব লিখিবার জন্য আমাকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিয়াছেন। একই সময়ে—অর্থাৎ ১৩৩১ সালের ২৯শে ফাল্গুন হইতে ১৩৩২ সালের ১৬ই জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত আড়াই মাসের মধ্যে—পরস্পর দূরবর্ত্তী ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে একই বিষয়ে আমারই উপর এই ভার অর্পিত হওয়ায়, ইহা ভগবৎপ্রেরণাই অনুমিত হইতেছে। তজ্জন্যই আমি এই "জাতিতত্ত্ব" লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। যদি কেহ ইহার প্রতিবাদ করিতে ইচ্ছুক হন (করিবেন নিশ্চিতই), তাহা হইলে সমগ্র প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবার পর এই 'মাসিক বসুমতীতেই' তাহা প্রকাশ করিবেন। অন্যত্র প্রকাশ করিলে আমার দেখিবার সুযোগ ঘটিবে না। সেই সকল প্রতিবাদের কোনও সারবত্তা থাকিলে এবং তাহাতে আমার বাস্তবিক ভ্রমপ্রমাদ প্রদর্শিত হইলে, আমি অকপটচিত্তে তাহা স্বীকার করিব। নচেৎ কোনও উত্তর দিব না ; সুধী পাঠকগণই তৎসম্বন্ধে বিচার করিবেন। সমগ্র প্রবন্ধ সম্পূর্ণ না হইলে (অর্থাৎ ৫ম পরিচ্ছেদ পর্য্যন্ত প্রকাশিত না হইলে) প্রতিবাদের উত্তর দিতে সমর্থ হইব না।

এ স্থলে আর একটি কথাও বলা আবশ্যক। অধুনা হিন্দু-সমাজের বিশিষ্ট নেতা ও শাস্তা না থাকায়, যাহার যাহা ইচ্ছা, সে তাহাই করিতেছে—ব্রাহ্মণ জুতা বেচিতেছে, মুচি বেদ পড়িতেছে ; শূদ্র ব্রাহ্মণ হইতেছে, ব্রাহ্মণ ম্লেচ্ছ হইতেছে। এই যথেচ্ছাচারের যুগে অনেকেই যোগী, স্বামী, মহর্ষি, রাজর্ষি হইয়াছেন ও হইতেছেন ; ইচ্ছা করিলে ব্রহ্মর্ষি ও দেবর্ষিও হইতে পারেন ; যুগধর্ম্মানুযায়ী এ সকল আচরণে আমাদের কোনও আপত্তি নাই। তবে অনেকেই যে স্বেচ্ছাচারের সমর্থনের জন্য শাস্ত্রের বচন তুলিয়া, তাহার কদর্থ করিয়া, শাস্ত্রকর্ত্তা ঋষিদিগের অবমাননা ও সাধারণকে প্রতারণা করিতেছেন, তাহাতেই আমাদের আপত্তি, এবং তজ্জন্যই এই আলোচনায় প্রবৃত্তি।

তদুপরি, যাঁহারা যথেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত, তাঁহারা ব্রাহ্মণ-প্রণীত শাস্ত্রের দোহাই দিয়াই স্বমত সমর্থন করিয়াও, ঈর্ষ্যাবশে সেই ব্রাহ্মণদিগের অবিসংবাদি শ্রেষ্ঠত্ব অসহমান হইয়া তাঁহাদিগকে অপমানিত করিতেছেন, সভাসমিতি প্রভৃতি সর্ব্বত্রই তাঁহাদের কুৎসা রটনা করিয়া গৌরব নষ্ট করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। তাহার কারণ, তাঁহাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হওয়ার প্রধান অন্তরায় ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণকে নিম্নে নামাইতে না পারিলে, তাঁহারা সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিতে পারিবেন না। কিন্তু ইহা তাঁহাদের নিতান্তই মতিভ্রম। একধর্ম্মাবলম্বী সমস্ত মনুষ্যের সমষ্টিকেই সমাজ বলে। তাদৃশ হিন্দু-সমাজরূপ বিরাট পুরুষের শীর্ষস্থানীয়—ব্রাহ্মণ ; অন্যান্য জাতি হস্তপদাদির ন্যায় তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। ইহা সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতেই, ভ্রমপ্রমাদ-বিপ্রলিপ্সাবিবর্জ্জিত স্বার্থপরতাপরিশূন্য সর্ব্বভূতহিতৈষী সমুদারচিত্ত ঋষিগণের প্রবর্ত্তিত, চিরন্তন নিয়ম। সেই ব্রাহ্মণজাতিকে অবনত করিয়া উন্নত হইবার দুরাশা—আর নিজের মাথা কাটিয়া সেই স্থানে পা বসাইয়া হাঁটিবার চেষ্টা—দুই-ই সমান।

এখন অনেকেই বলেন—স্বার্থপর ঋষিরা ব্রাহ্মণ ছিলেন বলিয়াই ব্রাহ্মণদিগকে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ করিয়া গিয়াছেন। এ কথাটা তাঁহাদের নিতান্ত নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচায়ক। আজকাল লোকে জন্মদাতা জীবিত পিতার কথাই প্রায় গ্রাহ্য করে না। এ অবস্থায়, যাঁহারা সামাজিক যথেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত, তাঁহারাও স্বমতসমর্থনের জন্য যেন-তেন-প্রকারেণ মনগড়া অর্থ করিয়া, যুগযুগান্তরমৃত সেই ঋষিগণের বচন প্রমাণরূপে প্রদর্শন করিয়া থাকেন। স্বার্থপর প্রতারক লোকের এত সম্মান—এত গৌরব কখনই সম্ভবপর নহে। তাঁহাদের ভাবিয়া দেখা উচিত, সাক্ষাৎ ব্রহ্মণ্যদেব, যে ব্রাহ্মণের সম্মান জগৎকে শিক্ষা দিবার জন্য, তাঁহার পদাঘাতের চিহ্ন সাদরে ও সগৌরবে স্বীয় বক্ষঃস্থলে চিরতরে উজ্জ্বলরূপে অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছেন,—স্বয়ং দ্বারকার অধীশ্বর ও জগন্নাথ হইয়াও যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়ে যে ব্রাহ্মণের পাদপ্রক্ষালনের ভার স্বেচ্ছাবশে গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই ব্রাহ্মণ কালধর্ম্মে যতই কদাচারী হউন, তাঁহার ব্রাহ্মণ্য তেজ মহাপ্রলয়েও বিলুপ্ত হইবার

নহে। বজ্রমণি বাহিরে মলাবৃত হইলেও তাহার স্বভাবসিদ্ধ জ্যোতিঃ অন্যের অগোচরে অন্তরে বিরাজমান থাকে। শমীগর্ভস্থ অলক্ষ্যমাণ অগ্নিপরমাণুই কালে কালাগ্নিতে পরিণত হইয়া দিগন্তব্যাপি বিশাল অরণ্য ভস্মীভূত করে। বিষদন্ত ভগ্ন হইলেও কৃষ্ণসর্পের তেজ যায় না, স্বভাব নষ্ট হয় না, বিষদন্ত পুনরুদ্গত হয়; নামটারও এত প্রভাব যে, শুনিলে শরীর শিহরিয়া উঠে। কিন্তু ডুণ্ডুভ যতই মাথা তুলুক, কস্মিন্‌কালেও সে ফণা বিস্তার করিতে পারিবে না; তাহার বিষদন্তও উঠিবে না; নামেও কেহ ভয় পাইবে না; যতই বিচিত্র গতি দেখাউক, সর্পজাতির উচ্চশ্রেণীতে সে কদাপি গণ্য হইবে না; সে ঢোঁড়া হইয়া জন্মিয়াছে, যাবজ্জীবন ঢোঁড়াই থাকিবে।

ব্রাহ্মণের অস্তিত্বেই হিন্দু-সমাজের অস্তিত্ব—ব্রাহ্মণের বিলোপে হিন্দু-সমাজের বিলোপ; ইহা ধ্রুব সত্য। এই জন্যই মহাভারতে "যুধিষ্ঠিরো ধর্ম্মময়ো মহাদ্রুমঃ" বলিয়া, তাহার "মূলং কৃষ্ণো ব্রহ্ম চ ব্রাহ্মণাশ্চ" বলা হইয়াছে। এ সব কথা কেহ ভাবেন না, ইহাই দুঃখের বিষয়। কথায় বলে, "দাঁত থাকিতে কেহ দাঁতের মর্য্যাদা বুঝে না।"

প্রথম পরিচ্ছেদ

অম্বষ্ঠ ও বৈদ্য

আমরা বাল্যে ও যৌবনে দেখিয়াছি, চিকিৎসাশাস্ত্রজ্ঞ প্রবীণ বৈদ্যগণ আপনাদিগকে বৈদ্য বলিয়াই পরিচয় দিতেন, কটিদেশে যজ্ঞসূত্র রাখিতেন এবং ১৫ দিন পূর্ণাশৌচ পালন করিতেন। * তার পর বার্দ্ধক্যের প্রারম্ভে ইদানীন্তন বৈদ্যগণের প্রকাশিত কয়েকখানি পুস্তক দেখিয়াছি; তাহাতে তাঁহারা আপনাদিগকে অম্বষ্ঠ বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন, ১৫ দিন অশৌচ পালনেরও সমর্থন করিয়াছেন; কিন্তু তদবধি কটিদেশে যজ্ঞসূত্র না রাখিয়া স্কন্ধে রাখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। সম্প্রতি, "ব্রাহ্মণাদ্ বৈশ্যকন্যায়ামম্বষ্ঠো নাম জায়তে" এই মনুবচনে অম্বষ্ঠের বর্ণসঙ্করত্ব প্রতিপাদিত হওয়ায় বৈদ্যেরা অম্বষ্ঠ বলিয়া পরিচয় দিতে আর প্রস্তুত নহেন। তাঁহারা সাক্ষাৎ ব্রাহ্মণ—এমন কি, প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়া শ্লাঘা প্রকাশ করিতেছেন; সেন শর্ম্মা, গুপ্ত শর্ম্মা ইত্যাদিরূপ উপাধি ব্যবহার করিতেছেন; ১০ দিন অশৌচ গ্রহণ করিয়া একাদশাহে পিত্রাদির আদ্যশ্রাদ্ধ করিতেছেন এবং অনেক বৈদ্য অধ্যাপক, অধ্যাপনার প্রারম্ভে অভিবাদনকালে, ব্রাহ্মণ ছাত্রগণের প্রতি সাগ্রহে পাদপ্রসারণ করিয়া থাকেন—তাহাতে সঙ্কোচ বোধ করেন না, এবং তজ্জন্য কুফলের আশঙ্কাকেও মনে স্থান দেন না।

অনেকে আবার আপনাদের ব্রাহ্মণত্বে এখনও সম্পূর্ণরূপে নিঃসন্দেহ হইতে না পারিয়া, নামের পর সেন শর্ম্মা ইত্যাদি উপাধি বলিয়াও, ১৫ দিন পূর্ণাশৌচ পালনের পর ষোড়শ দিনে আদ্যশ্রাদ্ধ করিয়া দু'কূলই বজায় রাখিতেছেন। কিন্তু নাম বলিবার সময় ও ব্রাহ্মণ ছাত্রের প্রতি পা বাড়াইবার সময় ব্রাহ্মণ হইব এবং অশৌচপালনে অম্বষ্ঠ থাকিব—এরূপ হইতে পারে না, "ন হি কুক্কুট্যা অণ্ডম্ একতঃ পচ্যতে, অন্যতঃ প্রসবায় কল্পতে (শাং ভাঃ) মুরগীর ডিম এক দিকে সিদ্ধ হইতেছে, আর এক দিকে তাহা হইতে বাচ্চা বাহির হইতেছে—ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব।

বৈদ্যজাতির আলোচনার জন্য যতগুলি পুস্তক পাইয়াছি, তন্মধ্যে 'বৈদ্য-প্রবোধনী'তে সকল পুস্তকের সার সঙ্কলিত, শ্রুতিস্মৃতি হইতে বহুতর প্রমাণ সংগৃহীত, ও অত্যুৎকট পাণ্ডিত্য প্রকটিত হইয়াছে বলিয়া, উহারই আলোচনা সংক্ষেপে করিব। তৎপূর্ব্বে বক্তব্য এই যে, (ক) যিনি সামাজিক এমন একটা গুরুতর ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন—বৈদ্যদিগকে "জাতে তুল্‌তে" বদ্ধপরিকর হইয়াছেন, সেই 'প্রবোধনী'-লেখক নিজের নামটি প্রকাশ করেন নাই কেন? তিনি মুখপাতেই "সত্যে নাস্তি ভয়ং ক্বচিৎ" এবং "সত্যমেব জয়তে, নানৃতম্" লিখিয়াও, কোন্ ভয়ে ও কিসে পরাজয়ের আশঙ্কায় সত্য-প্রচারেও আত্মগোপন করিয়াছেন? এই বিনামী লেখকের মীমাংসার মোহে আত্মহারা হইয়া বৈদ্যের দল যে

---

* বঙ্গদেশের স্থানে স্থানে বৈদ্যেরা ৩০ দিন অশৌচ পালন করেন —সম্পাদক

কক্কবাদ্য-করিয়া নৃত্য করিতেছেন, ইহাও নিতান্ত বিস্ময়ের বিষয়।

(খ) উক্ত পুস্তকের পরিশিষ্টে পাঁচ জন অধ্যাপকের পত্র (৪ খানি তাঁহাদের হস্তাক্ষরেই প্রদর্শিত) সংযোজিত হইয়াছে। তন্মধ্যে (১) "বঙ্গদেশের অতিপ্রসিদ্ধ স্মার্ত্ত-শিরোমণি, গবর্ণমেণ্টের উপাধি পরীক্ষার সম্পাদক" পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত দক্ষিণাচরণ স্মৃতিতীর্থ মহাশয় লিখিয়াছেন—"বৈদ্যপ্রবোধনী"-নাম্নী পুস্তিকা পাঠে আমারও বৈদ্যসম্বন্ধীয় অনেক সন্দেহ দূরীভূত হইল। বৈদ্য যে মন্বাদি-প্রোক্ত অম্বষ্ঠজাতীয় নহে, পরন্তু বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ, এতদ্বিষয়ে আমার আর কোন সন্দেহ রহিল না। কারণ, আপনাদের উদ্ধৃত শাস্ত্রীয় ও ঐতিহাসিক প্রমাণাবলী ও যুক্তিসমূহ অখণ্ডনীয় বলিয়াই আমার হৃদ্বোধ হইল।" (২) ভটপল্লীর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কাশীপতি স্মৃতিভূষণ মহাশয় লিখিয়াছেন—"বৈদ্যজাতি যে ব্রাহ্মণবর্ণ, আমরা ইহা চিরদিনই জানি এবং বিশ্বাস করি।" (৩) "সুপ্রসিদ্ধ স্মৃতি-শাস্ত্রের অধ্যাপক" পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র স্মৃতি-তীর্থ মহাশয় কলিকাতা চোরবাগান স্মৃতির টোল হইতে লিখিয়াছেন—"বৈদ্য ব্রাহ্মণ, ইহা শাস্ত্রে কথিত আছে এবং আমাদেরও সম্পূর্ণ জ্ঞান ও বিশ্বাস আছে।" (৪) "সুপ্রতিষ্ঠ স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপক পণ্ডিতবর" শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ স্মৃতিভূষণ মহাশয় লিখিয়াছেন—"আমি বৈদ্যগণের সম্বন্ধে বহু শাস্ত্রাদি ও অন্যান্য আলোচনা দ্বারা নিঃসন্দেহ হইয়াছি যে, বৈদ্যগণ অন্যান্য সদ্ব্রাহ্মণগণের ন্যায় এক শ্রেণীর সদ্ব্রাহ্মণ।" (৫) কলিকাতা হাতি-বাগান চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিদ্যারত্ন মহাশয় লিখিয়াছেন—"বৈদ্যপ্রবোধনী" পুস্তিকা পাঠ করিয়া বিশেষ আনন্দিত হইলাম। আমি ইতঃপূর্ব্বে তোমার (শ্রীইন্দুভূষণ সেন-শর্ম্মার) ভগিনীদের ব্রাহ্মণোচিত বৈদিক পদ্ধতি অনুসারে বিবাহকার্য্যাদি করিয়াছি, তাহাও তুমি জ্ঞাত আছ। যাহা হউক, তোমরা যে 'আমাদেরই' এক জন, তাহাতে কোন সংশয় নাই।... যদি কোনও বৈদ্যব্রাহ্মণের ক্রিয়াকলাপে পুরোহিত গিয়া কার্য্য করিতে অগ্রসর না হন, আমাকে জানাইলে আমি আনন্দের সহিত পৌরাহিত্য করিতেও স্বীকৃত আছি।

উক্ত অধ্যাপক মহাশয়গণকে জিজ্ঞাসা করি—তাঁহারা যখন বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্বে নিঃসংশয় হইয়াছেন, তখন বৈদ্যদিগের অন্নভোজন, সমাজে তাঁহাদের সহিত এক পঙ্‌ক্তিতে আহার এবং তাঁহাদের কুলে কন্যার আদান-প্রদান করিতে পারেন কি? এবং সমাজবন্ধন থাকিতে কস্মিন্ কালেও পারিবেন কি? তাহা যদি না পারেন, তবে অনুরোধের বশে অথবা অন্য কিছুর খাতিরে ঐরূপ অসার অভিমত ব্যক্ত করিবার প্রয়োজন কি? সাধারণের নিকট নিজেদের শাস্ত্রজ্ঞানরাহিত্যের পরিচয় দ্বারা অশ্রদ্ধেয় ও উপহাসাস্পদ হওয়া এবং পণ্ডিত নামে কলঙ্ককালিমা লেপন করা ভিন্ন ইহার আর কোনও ফল দেখি না।

শ্রাদ্ধসভায় নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণগণের ন্যায় বৈদ্যদিগকেও সুপারির সহিত যজ্ঞোপবীত দেওয়া উচিত কি না, এই বিষয়ের মীমাংসায় সন ১৩১৮ সালের ৩২শে শ্রাবণ তারিখে বহরমপুরস্থ ব্রাহ্মণ-সভার বিশেষ অধিবেশনে বঙ্গের যাবতীয় প্রধান প্রধান অধ্যাপক এবং যাবতীয় গণ্যমান্য সুপ্রসিদ্ধ সামাজিক মহোদয়গণ একবাক্যে বৈদ্যদিগকে অব্রাহ্মণ, সুতরাং যজ্ঞোপবীত দানের অপাত্র বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন। বহরমপুর-নিবাসী শ্রীযুক্ত কেদারনাথ ঘটক মহাশয় ঐ সমস্ত অভিমত সংগ্রহ করিয়া যে পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা সাধারণকে পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

১। বৈদ্যপ্রবোধনী—বৈদ্য কথাটির ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ এইরূপ। "ত্রয়ী বৈ বিদ্যা ঋচো যজূংষি সামানি।" (শতপথ ব্রাহ্মণ) বিদ্যা শব্দের মুখ্য অর্থ বেদ। যাঁহারা সেই বেদাধ্যয়ন করেন এবং বেদজ্ঞ, তাঁহারাই বৈদ্য। "তদধীতে তদ্ বেদ" এই পাণিনীয় সূত্র দ্বারা বিদ্যা + অণ্ = বৈদ্য। মতান্তরে বেদ + ষ্ণ্য = বৈদ্য।

বক্তব্য—"বেদ + ষ্ণ্য = বৈদ্য" এই ব্যুৎপত্তি ব্যাকরণ-সম্মত নহে; যেহেতু, "তদধীতে তদ্ বেদ" (তাহা যে অধ্যয়ন করে বা তাহা যে জানে) এই অর্থে ষ্ণ্য প্রত্যয়ের সূত্র নাই। পরন্তু বৈদ্য শব্দ ষ্ণ্যপ্রত্যয়ান্ত হইলে "বৈদ্যের পত্নী" অর্থে বৈদ্যীর পরিবর্ত্তে "বৈদী" এই অশিষ্ট পদ হয় (স্ত্রীলিঙ্গে ঈ প্রত্যয় পরে থাকিলে মৎস্য শব্দ ও ষ্ণ্য প্রত্যয়ের যকারের লোপ হইয়া থাকে)।

বেদজ্ঞ বা বেদাধ্যায়ীকে বৈদ্য বলে, এমন কথা কোনও শাস্ত্রেও নাই এবং লোকব্যবহারেও নাই। কাশী, বোম্বাই, গুর্জ্জর প্রভৃতি অঞ্চলে প্রাচীনকাল হইতে বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত বহু বেদাধ্যায়ী ও বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ আছেন, তাঁহাদিগকে কেহ "বৈদ্য" বলে না।

বেদজ্ঞ ও বেদাধ্যায়ী হইলেই যদি বৈদ্য হয়, তাহা হইলে যাঁহারা "বৈদ্য" বলিয়া সমাজে পরিচিত (অর্থাৎ যাঁহারা জাতি-বৈদ্য), তাঁহাদের সে জ্ঞানের ও সে অধ্যয়নের পরিচয় বৈদিক যুগ হইতে বর্ত্তমান ঐতিহাসিক যুগ পর্য্যন্ত কুত্রাপি প্রাপ্ত হওয়া যায় না কেন?

"ত্রয়ী বৈ বিদ্যা" এই শ্রুতি দেখিয়া কেবল বেদকেই বিদ্যা মনে করা ভ্রমমাত্র। যেহেতু, শাস্ত্রে বিদ্যা অষ্টাদশপ্রকার উক্ত হইয়াছে। যথা :—

"অঙ্গানি বেদাশ্চত্বারো মীমাংসা ন্যায়বিস্তরঃ।
ধর্ম্মশাস্ত্রং পুরাণঞ্চ বিদ্যা হ্যেতাশ্চতুর্দ্দশ॥
আয়ুর্ব্বেদো ধনুর্ব্বেদো গন্ধর্ব্বশ্চেতি তে ত্রয়ঃ।
অর্থশাস্ত্রং চতুর্থঞ্চ বিদ্যা হ্যষ্টাদশৈব তু॥"

—(বিষ্ণু পুঃ)

ষড়ঙ্গ (শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ, জ্যোতিষ), চতুর্ব্বেদ (সাম, যজুঃ, ঋক্, অথর্ব্ব), মীমাংসাদর্শন, ন্যায়দর্শন, ধর্ম্মশাস্ত্র (মন্বাদি স্মৃতি) ও পুরাণ—এই চতুর্দ্দশ বিদ্যা। আয়ুর্ব্বেদ, ধনুর্ব্বেদ, গান্ধর্ব্ববেদ ও অর্থশাস্ত্র (দণ্ডনীতি)— এই চারিপ্রকার লইয়াঅষ্টাদশ বিদ্যা।

বৈদ্যেরা আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করেন বলিয়া, 'প্রবোধনী'-লেখক ঐ শ্রুতি তুলিয়া আয়ুর্ব্বেদের বেদত্ব সপ্রমাণ করিতে প্রয়াস করিয়াছেন। আয়ুর্ব্বেদও বেদ হইলে, উক্ত বিষ্ণুপুরাণীয় বচনে "বেদাশ্চত্বারঃ" বলিয়া আয়ুর্ব্বেদের পৃথক্ উল্লেখ থাকিত না। ভাগবতাদি শাস্ত্রে আয়ুর্ব্বেদাদি উপবেদ বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

এতদ্দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, বেদাধ্যায়ী বা বেদজ্ঞকে বৈদ্য বলে না। বৈদ্য শব্দের শাস্ত্রসম্মত ত্রিবিধ অর্থ আছে। যথা :—

(১) "আয়ুর্ব্বেদাত্মিকাং বিদ্যাং বেত্তি অণ্। ভরতমতে বেত্তি অধীতে বা বৈদ্যঃ, চঘে কাদিতি ষ্ণঃ।"

—(অমরটীকা)

"যে বিদ্যা অর্থাৎ আয়ুর্ব্বেদরূপ বিদ্যা জানে বা অধ্যয়ন করে" এই অর্থে বিদ্যা + অণ্ বা ষ্ণ = বৈদ্য। ইহার অর্থ—চিকিৎসক; যথা, —"রোগহার্য্যগদঙ্কারো ভিষগ্‌বৈদ্যৌ চিকিৎসকে।"—(অমর)

ইহাতে জাতির বিচার নাই, ব্রাহ্মণাদি যে-কোনও জাতির মনুষ্য চিকিৎসাব্যবসায় করিলে, তাহাকেই বৈদ্য বলা যায়। এই জন্য অমর ঐ শ্লোকটি ব্রহ্ম, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্রবর্গে না ধরিয়া মনুষ্যবর্গেই ধরিয়াছেন।

(২) সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণে "পুংনাম্নঃ পুংযোগে" সূত্রের বৃত্তিতে "বৈদ্যের পত্নী" এই অর্থে উদাহরণ আছে "বৈদ্যী।" টীকাকার গোরীচন্দ্র লিখিয়াছেন—"বৈদ্যশব্দো বিদ্যাযোগাৎ পুংসো বাচকঃ, তদ্‌যোগাৎ স্ত্রিয়াং বর্ত্ততে, ন তু বিদ্যাযোগাৎ।" অর্থাৎ বিদ্যা জানার জন্য পুরুষ বৈদ্যপদবাচ্য; তাদৃশ পুরুষের সহিত বিবাহসংযোগ হেতুই তাহার পত্নী বৈদ্যী, বিদ্যা জানার জন্য বৈদ্যী নহে। সুতরাং ইহারও ব্যুৎপত্তি—বিদ্যা (চতুর্দ্দশ বিদ্যা বা সর্ব্ববিদ্যা) যে জানে, সে বৈদ্য; বিদ্যা + অণ্ বা টণ্।

(৩) জাতিবিশেষ অর্থাৎ বৈদ্য জাতি। যথা—

"চাণ্ডালো ব্রাত্যবৈদ্যৌ চ ব্রাহ্মণ্যাং ক্ষত্রিয়াসু চ।
বৈশ্যায়াঞ্চৈব শূদ্রস্য লক্ষ্যন্তেঽপসদাস্ত্রয়ঃ॥"

(মহা, অনু, ৪৮।১)

শূদ্র হইতে ব্রাহ্মণীতে উৎপন্ন পুত্র চণ্ডাল, ক্ষত্রিয়াতে উৎপন্ন পুত্র ব্রাত্য, এবং বৈশ্যাতে উৎপন্ন পুত্র বৈদ্য। এই তিন জাতি অতি নিকৃষ্ট।

এই জাতিবাচক বৈদ্য শব্দ রূঢ়—অর্থাৎ গৃহাদিবাচক মণ্ডপাদি শব্দের ন্যায় ইহার কথঞ্চিৎ ব্যুৎপত্তি করা গেলেও, বস্তুতঃ প্রকৃতিপ্রত্যয়গত কোনও অর্থ নাই। সেই হেতু যাঁহারা বৈদ্যবংশসম্ভূত হইয়াও পুরুষানুক্রমে চিকিৎসা-ব্যবসায় না করিয়া জমীদারি প্রভৃতি কার্য্য করিয়া থাকেন, তাঁহারা জাতিতে বৈদ্য বলিয়াই পরিচিত; এবং যে সকল ব্রাহ্মণ পুরুষানুক্রমে চিকিৎসা-ব্যবসায় করিতেছেন, তাঁহারা জাতিতে ব্রাহ্মণই আছেন (বৈদ্য বলিয়া পরিগণিত হন নাই)। সমাজে যাঁহারা বৈদ্য বলিয়া প্রসিদ্ধ, যাঁহারা আপনাদের ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপাদনে তৎপর,

তাঁহারা যে জাতিতে বৈদ্য, ইহা সর্ব্বজনবিদিত, এবং তাঁহাদেরও স্বীকৃত।

'প্রবোধনী'লেখক "কাচং মণিং কাঞ্চনমেকসূত্রে"র ন্যায় সর্ব্বত্রই এই ত্রিবিধ অর্থের ত্র্যহস্পর্শ ঘটাইয়া বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস করিয়াছেন, ইহা বড়ই বিচিত্র।

২। বৈঃ প্রঃ—উৎকৃষ্ট বিদ্যাসম্পন্ন সর্ব্ববেদজ্ঞ শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদিগকে "বৈদ্য" বলা হইয়াছে। এই সম্বন্ধে শ্রৌত ও স্মার্ত্ত প্রমাণ যথা—

(ক) "বিপ্রঃ স উচ্যতে ভিষক্ রক্ষোহামীবচাতনঃ।" (ঋগ্বেদ ১০ মং ৯৭ সূক্ত)। তত্র সায়নভাষ্যম্—বিপ্রঃ প্রাজ্ঞো ব্রাহ্মণঃ। অমীবা ব্যাধিঃ তস্য চাতনঃ চাতয়িতা চিকিৎসকঃ।—অর্থাৎ যে বৈদ্য ব্রাহ্মণ ব্যাধির চিকিৎসা করেন, তিনিই ভিষক্।

(খ) "ওষধয়ঃ সংবদন্তে সোমেন সহ রাজ্ঞা। যস্মৈ কৃণোতি ব্রাহ্মণস্তং রাজন্ পারয়ামসি॥" (ঋক্ ঐ) অত্র সায়নঃ—যস্মৈ রুগ্‌ণায় ব্রাহ্মণঃ ওষধিসামর্থ্যজ্ঞো ব্রাহ্মণো বৈদ্যঃ কৃণোতি করোতি চিকিৎসাম্। অর্থাৎ ওষধিসামর্থ্যজ্ঞ যে ব্রাহ্মণ বৈদ্য রুগ্‌ণের চিকিৎসা করেন ইত্যাদি।

বক্তব্য—এতদ্দ্বারা বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্ব কিরূপে সিদ্ধ হইল, বুঝিতে পারিলাম না। আবহমান কাল ধরিয়া ব্রাহ্মণেরাই সর্ব্বপ্রথম সর্ব্বশাস্ত্রের অধ্যেতা, অধ্যাপয়িতা ও গ্রন্থ-প্রণেতা। চরক প্রভৃতি বৈদ্যকগ্রন্থে আছে—ভরদ্বাজ মুনি ইন্দ্রের নিকট হইতে আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিয়া আসিলে, অঙ্গিরা প্রভৃতি ঋষিগণ তাঁহার নিকট উহা শিক্ষা করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্ণের ন্যায় সৃষ্টির প্রারম্ভেই অম্বষ্ঠ, বৈদ্য প্রভৃতি সঙ্করজাতি উৎপন্ন হয় নাই; বহুকালের পর ক্রমে ক্রমে উৎপন্ন হইয়াছে। সুতরাং প্রাচীনতম কালে রোগপ্রতীকার দ্বারা জগতের উপকারার্থ কেবল ব্রাহ্মণেরাই চিকিৎসাকার্য্য করিতেন। তজ্জন্যই ঋগ্বেদে উক্ত হইয়াছে—(ক) "বিপ্রঃ স উচ্যতে ভিষক্" ইত্যাদি। উহার সায়নভাষ্য—"...তত্র বিপ্রঃ প্রাজ্ঞো ব্রাহ্মণঃ ভিষক্ উচ্যতে।" অর্থাৎ যে স্থানে নানাবিধ ওষধি থাকে, সেই স্থানে ওষধিশক্তিজ্ঞ ব্রাহ্মণকে ভিষক্ (চিকিৎসক) বলে। 'প্রবোধনী'-লেখক ভাষ্যস্থ "ভিষক্ উচ্যতে" এই দুইটি পদ ছাড়িয়া দিয়াছেন।

(খ) "ওষধয়ঃ সংবদন্তে" ইত্যাদি ঋকের অর্থ—যে রুগ্‌ণকে ওষধিশক্তিজ্ঞ ব্রাহ্মণ বৈদ্য (অর্থাৎ ব্রাহ্মণ চিকিৎসক) চিকিৎসা করেন ইত্যাদি।

ইহাতে ঐ মন্ত্রদ্বয়ে ও তদীয় ভাষ্যে ওষধিশক্তিজ্ঞ ব্রাহ্মণকে ভিষক্ বা বৈদ্য (অর্থাৎ চিকিৎসক) বলা হইয়াছে; বৈদ্যকে ব্রাহ্মণ বলা হয় নাই। 'প্রবোধনী'-লেখক সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তির অভাবে বিপরীত বুঝিয়াছেন, অথবা স্বার্থসাধনের জন্য অপর সাধারণকে বিপরীত বুঝাইয়াছেন।

৩। বৈঃ প্রঃ—পূর্ব্বকালে যাঁহারা সর্ব্ববিদ্যাসম্পন্ন এবং সর্ব্ববর্ণের রক্ষক বা পিতৃস্বরূপ হইতেন, তাঁহাদিগকেই বৈদ্য, তাত-বৈদ্য প্রভৃতি নাম দেওয়া হইত, যথা:—

"কচ্চিদ্ দেবান্ পিতৄন্ ভৃত্যান্ গুরূন্ পিতৃসমানপি।
বৃদ্ধাংশ্চ তাতবৈদ্যাংশ্চ ব্রাহ্মণাংশ্চাভিমন্যসে॥"
(রামা, অযো, ১০০ সর্গ)

অর্থাৎ (শ্রীরামচন্দ্র ভরতকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন) তুমি দেবগণকে, পিতৃলোককে, ভৃত্যদিগকে, পিতৃস্থানীয় গুরুজনদিগকে, বৃদ্ধগণকে, তাতবৈদ্যদিগকে ও ব্রাহ্মণগণকে যথাযোগ্য সম্বর্দ্ধনা করিতেছ ত?

বক্তব্য—শ্লোকটার অনুবাদ ঠিক হয় নাই, এবং উহাতে বানান ভুলও আছে। সে যাহা হউক, সর্ব্ববর্ণের পিতৃস্বরূপকে যে তাতবৈদ্য বলে, তাহার প্রমাণ উহা কিরূপে হইল? আমরা ত "তাতবৈদ্য" নাম কখনও শুনি নাই, কোথাও দেখিও নাই। ঐ শ্লোকে "তাতবৈদ্য" বলাতেই যে বৈদ্য ব্রাহ্মণ হইয়া গেল, ইহা মনে করিবার কোনও কারণ নাই। তাতবৈদ্যই যদি ব্রাহ্মণ, তবে আবার "ব্রাহ্মণান্" কেন? বস্তুতঃ এই স্থানে "তাত" শব্দ (বৎস অর্থে) ভরতের সম্বোধন—পৃথক্ পদ। যেহেতু, রামায়ণের তিন জন প্রাচীন টীকাকারই "তাত" শব্দ ছাড়িয়া "বৈদ্যান্ ব্রাহ্মণান্" ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"বৈদ্যাঃ বিদ্যাসু নিপুণাঃ, তান্ ব্রাহ্মণান্ অভিমন্যসে বহু মন্যসে। যদ্বা বৈদ্যান্ চিকিৎসাপ্রবীণান্ ব্রাহ্মণান্। ব্রাহ্মণসামান্যবিষয়ঃ প্রশ্নোঽয়ং ভবিষ্যতি।"—বিদ্যানিপুণ ব্রাহ্মণদিগকে অথবা চিকিৎসানিপুণ ব্রাহ্মণদিগকে তুমি সম্মান কর ত? সাধারণ ব্রাহ্মণ সম্বন্ধেও এই প্রশ্ন

হইতে পারে, অর্থাৎ বিদ্বান্ বা চিকিৎসক ব্রাহ্মণদিগকে এবং তদিতর সাধারণ ব্রাহ্মণদিগকে সম্মান কর ত ?

মনুর সময়ে বৈদ্যজাতির উৎপত্তি হয় নাই। হইলে, তিনি অম্বষ্ঠের উল্লেখ করিয়া, বৈদ্যেরও উল্লেখ করিতেন। রামচন্দ্রের সময়েও বৈদ্যজাতি ছিল না জানিয়া, অথবা বৈদ্য শূদ্র হইতে বৈশ্যাগর্ভ-জাত (পূর্ব্বোক্ত বৈদ্য শব্দের ব্যুৎপত্তি দ্রষ্টব্য) সুতরাং বিলোমজ শূদ্র বলিয়া এবং অম্বষ্ঠও বর্ণসঙ্কর বলিয়া ভরতের সম্মানার্হ হইতে পারে না ভাবিয়া, কোনও টীকাকারই সে অর্থ করেন নাই।

৪। বৈঃ প্রঃ—"বিদ্যাসমাপ্তৌ ভিষজস্তৃতীয়া জাতি রুচ্যতে। অশ্নুতে বৈদ্যশব্দং হি ন বৈদ্যঃ পূর্ব্বজন্মনা॥ বিদ্যাসমাপ্তৌ ব্রাহ্মং বা সত্ত্বমার্ষমথাপি বা। ধ্রুবমাবিশতি জ্ঞানং তস্মাদ্ বৈদ্যস্ত্রিজঃ স্মৃতঃ॥" (চরক, চিকিৎসা ১ অঃ)

অর্থাৎ বিদ্যাসমাপ্তির পর চিকিৎসকের তৃতীয় জন্ম হয়, তখনই তিনি বৈদ্য উপাধি লাভ করেন, জন্মাবধি কাহারও বৈদ্য নাম হইতে পারে না। বিদ্যাসমাপ্তি হইলে বৈদ্যের হৃদয়ে ব্রাহ্মসত্ত্ব বা ব্রহ্মজ্ঞান, অথবা আর্ষজ্ঞান বিকশিত হইয়া থাকে, এই জন্য বৈদ্যকে ত্রিজ বলা হয়।

বক্তব্য—অনুবাদটি সর্ব্বাংশে বিশুদ্ধ হয় নাই; মূলের পাঠও "জ্ঞানাৎ" ("জ্ঞানং" নহে)। যাহা হউক, সে বিচার করিতে চাহি না; ইহা দ্বারা বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্ব সিদ্ধ হয় না, ইহাই দেখাইব। অগ্রে দ্বিজ না হইলে ত্রিজ হইতে পারে না। পূর্ব্বোক্ত মহাভারতীয় বচন অনুসারে বৈদ্য বিলোমজাত শূদ্র বলিয়া তাহার বৈদিক উপনয়ন-সংস্কার নিষিদ্ধ; সুতরাং সে যখন দ্বিজই নহে, তখন ত্রিজ কিরূপে হইবে? চরক সংহিতায় আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণকেই চিকিৎসক বলা হইয়াছে। বৈদিক উপনয়নসংস্কারে ব্রাহ্মণ দ্বিজ হইয়া, পরে আয়ুর্ব্বেদ সমাপনে ত্রিজ হইয়া থাকেন। "জন্মনা ব্রাহ্মণো জ্ঞেয়ঃ সংস্কারৈর্দ্বিজ উচ্যতে। বিদ্যয়া যাতি বিপ্রত্বং ত্রিভিঃ শ্রোত্রিয়লক্ষণম্॥" এই বচনে যাহাকে বিপ্র বলা হইয়াছে, চরক তাহাকেই ত্রিজ বলিয়াছেন।

সুশ্রুতে সূত্রস্থানের ২য় অধ্যায়ে চতুর্ব্বর্ণেরই আয়ুর্ব্বেদাধ্যয়ন, আয়ুর্ব্বেদিক উপনয়ন, এবং ত্রৈবর্ণিকের আয়ুর্ব্বেদাধ্যাপন বিহিত হইয়াছে। যথা:—

"ব্রাহ্মণস্ত্রয়াণাং বর্ণানামুপনয়নং কর্ত্তুমর্হতি, রাজন্যো দ্বয়স্য, বৈশ্যো বৈশ্যস্যৈবেতি। শূদ্রমপি কুলসম্পন্নং মন্ত্রবর্জ্জমুপনীতমধ্যাপয়েদিত্যেকে।" পরন্তু এই উপনয়নে মেখলা-যজ্ঞোপবীতাদি ধারণের বিধি নাই।

ইহাতে দেখা যায়, সর্ব্ববর্ণই আয়ুর্ব্বেদাধ্যয়নে অধিকারী হইলেও ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য দ্বিজ বলিয়া, আয়ুর্ব্বিদ্যা-সমাপ্তিতে তাঁহারাই ত্রিজ হন, ইহাই উক্ত শ্লোকের তাৎপর্য্য। আয়ুর্ব্বেদোপনয়নে দ্বিজ হইয়া তদ্বিদ্যা-সমাপনে ত্রিজ হয় বলিলে, দ্বিজাতিকে আয়ুর্ব্বেদোপনয়নে ত্রিজ এবং বিদ্যাসমাপ্তিতে চতুর্জ্জ বলিতে হয়; এবং "একজাতি" শূদ্রই কেবল আয়ুর্ব্বেদোপনয়নে দ্বিজ এবং বিদ্যাসমাপ্তিতে ত্রিজ হইয়া থাকে।

বৈদ্য ব্রাহ্মণ হইলে এবং চরকস্থ বৈদ্য শব্দ বৈদ্যজাতি-বাচক হইলে, ঐ চরকেই—ঐ চিকিৎসাস্থানের ঐ প্রথম অধ্যায়েই কুটীপ্রাবেশিক-রসায়নসেবনার্থ যে কুটী-নির্ম্মাণের বিধি উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহাতে বৈদ্য ও ব্রাহ্মণের পৃথক্ নির্দ্দেশ থাকিত না। যথা:—

"নৃপবৈদ্যদ্বিজাতীনাং সাধূনাং পুণ্যকর্ম্মণাম্।
নিবাসে নির্ভয়ে শস্তে প্রাপ্যোপকরণে পুরে।
দিশি পূর্ব্বোত্তরস্যাঞ্চ সুভূমৌ কারয়েৎ কুটীম্॥"

সাধু পুণ্যকর্ম্মা নৃপ, বৈদ্য ও ব্রাহ্মণদিগের যেখানে নিবাস, সেই নগরে ঈশানকোণে সুন্দর ভূমিতে কুটী নির্ম্মাণ করাইবে।

'প্রবোধনী'-লেখকের "মহর্ষিকল্প গঙ্গাধর"ও উহার টীকায় লিখিয়াছেন—"নৃপাদীনাং তস্মিন্ পুরে নৃপাদি-বাসনগরে।" তাঁহার "নৃপাদীনাং" লেখাতেই নৃপ, বৈদ্য ও দ্বিজাতির পার্থক্য প্রতিপাদিত হইতেছে। উহার পরে পুনর্ব্বার বলা হইয়াছে,—

"ইষ্টোপকরণোপেতাং সজ্জবৈদ্যৌষধদ্বিজাম্।"

ঐ কুটীতে আবশ্যক সামগ্রী, বৈদ্য, ঔষধ ও ব্রাহ্মণকে রাখিবে।

ইহাতেও বৈদ্য ও ব্রাহ্মণের পার্থক্য বুঝা যাইতেছে।

[ক্রমশঃ।

শ্রীশ্যামাচরণ কবিরত্ন বিদ্যাবারিধি।

"ঐ ভৈরবী আর গেয়ো নাকো এই প্রভাতে।"

বসুমতী প্রেস] [শিল্পী—শ্রীবিধুভূষণ রায়

হানা বাড়ী

১

অল্প বয়স হইতেই জটিল সমস্যার মীমাংসা করিবার আগ্রহ আমার কিছু প্রবল ছিল। পরে যখন নানারূপ বিলাতী 'ডিটেক্‌টিভ' কাহিনী পড়িতে লাগিলাম, তখন আমারও ঐরূপ ডিটেক্‌টিভ গোছের একটা কিছু হইয়া পড়িবার বাসনা সময়ে সময়ে মনে বেশ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিত। সেই জন্য আমি ক্রমে ক্রমে এম, এ, এবং বি, এল্, পাশ করিবার পর, যখন আত্মীয় ও বন্ধুগণের মধ্যে একটা বিষম বিবেচ্য বিষয় এই হইল যে, ব্যবহারাজীবরূপে কোন্ আদালতকে আমার অলঙ্কৃত করা উচিত, তখন আমিই তাহার সিদ্ধান্ত করিয়া স্থির করিলাম যে, ফৌজদারী আদালত ভিন্ন অপর কোথাও আমার বুদ্ধি-বৃত্তির সম্যক্ বিকাশের সম্ভাবনা অল্প। তদনুসারে, কলিকাতায় পুলিস-কোর্টে আমার ওকালতী করা সাব্যস্ত হইল।

তা' ত হইল; কিন্তু, তাহার উদ্যোগপর্ব্বের প্রথমেই বেশ একটু বেগ পাইতে হইল। আমার পৈতৃক নিবাস নদীয়া জিলায়। পিতৃদেব চিকিৎসা-ব্যবসায় দ্বারা যাহা অর্জ্জন করিতেন, তাহা হইতে দেশে সুন্দর পাকা বাস-গৃহ ও অনেক ভূসম্পত্তি করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু কলিকাতায় একটিও বাড়ী করেন নাই। কাযেই আমি কলিকাতায় 'মেসে' থাকিয়া কলেজে পড়িতাম। দুই বৎসর হইল, তিনি লোকান্তরিত হইয়াছেন। সম্পত্তি যাহা রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার আয় আমার একার পক্ষে যথেষ্ট হইলেও, ভবিষ্যৎ ভাবিয়া ব্যয় সম্বন্ধে একটু পরিমিত হওয়ারও আবশ্যকতা ছিল। সেই জন্য পুলিস-কোর্টে ওকালতী করিবার সিদ্ধান্ত হইয়া যখন ইহাও স্থির হইল যে, পঠদ্দশার চিরাভ্যস্ত 'মেস্' ছাড়িয়া আমাকে কলিকাতায় একটি স্বতন্ত্র বাসা ভাড়া করিয়া থাকিতে হইবে, তখন আমার তৎকালের আয়ের উপ-যোগী একটা স্বতন্ত্র বাড়ী পাওয়াই দুর্ঘট হইয়া পড়িল।

পূর্ব্বে যে আত্মীয় ও বন্ধুগণের উল্লেখ করিয়াছি, তাঁহারা আমার জন্য অনেক চেষ্টাতেও সস্তা অথচ ঠিক আমার মনের মত বাড়ীর সন্ধান করিতে পারিলেন না। আত্মীয়ের মধ্যে আমার দুইটি মাত্র বড় ভগ্নী ছাড়া, নিকট সম্পর্কীয় আর কেহই ছিলেন না। তাঁহারাও উভয়েই মফস্বলবাসী। সুতরাং এ বিষয়ে তাঁহাদের দ্বারা কোন সাহায্য পাওয়ার উপায় ছিল না। অবশেষে কলিকাতাবাসী এক দূর-সম্পর্কীয় বিধবা পিসীর দ্বারা এই দুরূহ সমস্যার মীমাংসা হইল।

কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের অনতিদূরে একটি বেশ নিরালা রাস্তার উপর তাঁহার নিজস্ব একটা দুই মহল-বিশিষ্ট দ্বিতল বাড়ীতে তিনি বাস করিতেন। রাস্তার নাম রামপাল লেন। কিন্তু নামে 'লেন' হইলেও, বাড়ীটা যেখানে অবস্থিত, সে স্থানটা মোটেই গলি নহে। গলিটা বেশী প্রশস্ত নয় বটে, কিন্তু ট্রাম রাস্তা হইতে পশ্চিম মুখে কিয়দ্দূর আসিয়া, একটা প্রায় সম-চতুষ্কোণ খোলা জমীর চারিদিক বেষ্টন করিয়া, উহা সেই-খানেই শেষ হইয়াছে এবং ঐ খোলা জমীর চারি পাশের ঐ রাস্তার উপর, প্রত্যেক দিকে ৫।৭ খানা করিয়া দুই বা তিনতলা বাড়ী থাকায়, ঐ স্থানটা আজকালকার ছোট একটা 'স্কোয়ার' গোছের দেখিতে হইয়াছিল। ট্রাম রাস্তার সন্নিকটে অবস্থিত হইলেও, তাহার ঘোর কোলাহল হইতে সে স্থানটা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ছিল। খোলা জমীটার চারিদিকে তারের বেড়া দিয়া ঘেরা, কিন্তু চারি দিকেই উহার ভিতরে প্রবেশের পথ আছে। সাধারণে জমীটাকে 'পোড়ো' বলিত; এবং চতুর্দ্দিকের বাড়ীগুলি সমেত ঐ পল্লীটার নাম হইয়াছিল 'রামপালের পোড়ো।'

আমার সেই জ্ঞাতি-পিসীর বাড়ীটা ঐ 'পোড়োর' উত্তর রাস্তায় অবস্থিত। তাঁহার পরিবার অল্প। দুইটি নাবালক পুত্র ও এক শিশু কন্যা লইয়া তিনি প্রায় এক

বৎসর হইল বিধবা হইয়াছেন। বাড়ীটা সামান্য পরিবারের পক্ষে অনেক বড় বলিয়া, পিসীমা বিধবা হওয়া অবধি ইহার বাহিরের অংশ ভাড়া দিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন। কিন্তু, বিশেষ পরিচিত ভদ্র পরিবার ভিন্ন অপরকে বাড়ীর এরূপে আংশিক ভাড়া দেওয়া অসুবিধাজনক বলিয়া, ইচ্ছাটা এ পর্য্যন্ত কার্য্যে পরিণত হয় নাই। এক দিন তাঁহার সহিত দেখা করিতে গিয়া, কথা-প্রসঙ্গে তাঁহাকে যখন আমার ওকালতী করিবার অভিপ্রায় ও বাড়ী খোঁজার ব্যাপার জানাইলাম, তখন তিনি বিশেষ আগ্রহ সহকারে আমাকে ঐ বাহিরের অংশ ভাড়া দিবার প্রস্তাব করিলেন। সে অংশে এক-তলায়, রাস্তার ধারেই, সদরের দুই পাশে, দুইটি ছোট ঘর ও তাহার উপরে দ্বিতলে একটি শয়নকক্ষ; তাহা ছাড়া বাহিরে কল ইত্যাদি স্বতন্ত্র। দেখিয়া আমার এত মনোমত হইল যে, তদ্দণ্ডেই ঐ অংশের মাসিক ভাড়া ২২৲ টাকা ঠিক করিয়া ফেলিলাম; এবং আরও ১৮৲ টাকা দিলে পিসীমা আমার আহারাদির সমস্ত ভার লইবেন, তাহাও স্থির হইয়া গেল।

উভয়ের সন্তোষজনকরূপে এই প্রকার ব্যবস্থা করিয়া, আমি শুভদিনে, শুভক্ষণে, সেই বাড়ীতে অধিষ্ঠিত হইলাম।

২

বাড়ী ভাড়া ত হইল। ঘরগুলাকে নিজের মনোমত-রূপে বেশ পরিপাটীভাবে সাজাইয়া, তাহাতে আরামে বাস করাও চলিতে লাগিল। নীচের দুইটি ঘরের মধ্যে বড়টিকে 'মক্কেল ঘর' নামে অভিহিত করিয়া, প্রত্যহ সকাল-সন্ধ্যায় তাহাতে 'বার দিয়া' বসিতে লাগিলাম; এবং মহা উৎসাহে, নব্য-প্রথানুসারে, হ্যাট-কোট-কলার-মণ্ডিত হইয়া, ট্রাম কোম্পানীর সাহায্যে প্রত্যহ কোর্টে যাতায়াতও করিতে লাগিলাম। কিন্তু যদিও ৩।৪ মাস এই ভাবে কাটিয়া গেল, তথাপি এ পর্য্যন্ত একটিও মক্কেল নামক জীবের সহিত সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে আমার পরিচয় ঘটিল না।

আমার এই জ্ঞাতি-পিসীমাটি লোক বেশ অমায়িক। পরস্পরের সহিত ব্যবহারে একটু ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি হওয়াতে দেখিলাম, তিনি আমার সহিত নব প্রতিষ্ঠিত রাজা-প্রজা সম্বন্ধ অপেক্ষা সাবেক আত্মীয়তার সম্পর্কটাই বজায় রাখিতে বেশী প্রয়াসী হইয়া, আমার প্রতি বেশ স্নেহপূর্ণ ব্যবহার করিতে লাগিলেন। পাঁচ বৎসর হইল মাতৃ-স্নেহ হারাইয়া অবধি ঐ জিনিষটির অভাব এতই বেশী রকম অনুভব করিতেছিলাম যে, তাহার সামান্য কণামাত্র অপরের নিকট পাইয়া যে তৃপ্তি লাভ করিতে লাগিলাম, তাহা বর্ণনার অতীত।

পিসীমা এই পাড়ায় অনেক দিনের স্থায়ী 'বাসিন্দা।' বেশ অবস্থাপন্নও বটে; বুদ্ধি-বিবেচনাতেও অনেকের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কাযেই পাড়ার প্রতিবাসিনী মহিলাগণের অনেকেই তাঁহার অনুগত। অবসরমত তাঁহাদের এ বাড়ীতে আসা-যাওয়াও যথেষ্ট ছিল। ফলে, পিসীমা যে এই পাড়াটির ভাল-মন্দ সকল রকম খবরাখবরের একটি কেন্দ্রস্থল হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, তাহা বিচিত্র নহে। আমি তাঁহার আশ্রয়ে আসিবার পর হইতে দুই বেলা আহারের সময় তিনি যখন নিকটে বসিয়া তদ্বির করিতেন, তখন নানা কথার সঙ্গে তাঁহার ঐ সব সংবাদের বোঝা আমার কাছে তিনি অনেকটা হাল্কা করিতেন। এইরূপে তাঁহার কাছে যত কথা শুনিতাম, তাহার মধ্যে প্রধানতঃ, আমাদের এই বাড়ীর প্রায় সম্মুখভাগে সেই পোড়ো-জমীর দক্ষিণের রাস্তার উপর অবস্থিত, একটা একতলা পুরাতন খালি-বাড়ীর সম্বন্ধে নানা গল্প শুনিতাম। বাড়ীটা নাকি 'হানা'; উহাতে ভূতের উপদ্রব আছে। সময়ে সময়ে রাত্রি-কালে ঐ বাড়ী হইতে বিকট চীৎকার, কখনও বা অদ্ভুত গানের শব্দ শুনা গিয়াছে। কখনও হঠাৎ অন্ধকারের মধ্যে এক দিক্ হইতে অপর দিকে একটা আলোর গতি-বিধিও অনেকে নাকি দেখিয়াছে; এবং কেহ কেহ নাকি সত্যই ও বাড়ীতে একটা ছায়াদেহ-ধারী স্ত্রী-ভূতের আকৃতিও দেখিতে পাইয়াছে! বহুকাল পূর্ব্বে নাকি ঐ বাড়ীতে একটা লোক খুন হইয়াছিল ও সেই অবধি হত ব্যক্তির প্রেতাত্মা ওখানে ঘুরিয়া বেড়ায়। বাড়ীটার এইরূপ খ্যাতি থাকায় প্রায় ১০।১৫ বৎসর হইতে উহার ভাড়া হয় নাই। বাড়ীওয়ালা সম্প্রতি বাড়ীটা মেরামত করিয়া তাহার চেহারা সুশ্রী করিয়া

দিয়াছেন বটে, কিন্তু তথাপি কেহ উহা ভাড়া লইতে অগ্রসর হয় না। ঐ বাড়ীটার সম্বন্ধে এই প্রকার যত কিছু কিংবদন্তী সে পাড়ায় প্রচলিত ছিল, পিসীমার আশ্রয়ে আসিয়া কিছু দিনের মধ্যে সে সমস্তই আমার কর্ণগোচর হইল।

ঐ বাড়ীটা যে কখনও কোনকালে ভাড়া হইবে না, পাড়ার সকলেরই মনে তাহা ধ্রুব সত্য বলিয়া বিশ্বাস ছিল। সেই জন্য পিসীমার বাড়ীতে আমার অধিষ্ঠান হইবার প্রায় মাস ছয়েক পরে হঠাৎ এক দিন পাড়ার লোক যখন দেখিল যে, তাহাদের মনের ঐ ধ্রুব-বিশ্বাসে আঘাত করিয়া, সেই হানা বাড়ীটার জানালা-কপাট সব উন্মুক্ত, এবং বাড়ীর মধ্যে এক জন অপরিচিত লোক নানাবিধ আসবাব-সরঞ্জাম আনিয়া তাহা বাসোপযোগী করিল, ও তৎপরে দিনের পর দিন তাহাতে রীতিমত বাসও করিতে লাগিল, তখন তাহারা লোকটার অসমসাহসিকতায় চমৎকৃত হইল বটে, কিন্তু পরস্পর কয়েক দিন জল্পনা-কল্পনার পর স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া ফেলিল যে, 'ভূতের' হস্তে তাহার শীঘ্রই একটা বিভীষিকাময় পরিণাম সংঘটিত হইবে; এবং সকলেই সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ফলের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। কিন্তু অনেক দিন কাটিয়া গেলেও যখন তাহার সাফল্যের কোন আভাসও দেখা গেল না, তখন তাহারা ভূত ছাড়িয়া দিয়া, লোকটার নিজের সম্বন্ধেই নানারূপ জল্পনা আরম্ভ করিয়া দিল। কয়েকদিনের মধ্যেই ঐ নবাগত লোক ও তাহার কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে সত্য বা মিথ্যা অনেক কথা রটনা হইতে লাগিল; এবং পিসীমার অনুগ্রহে সে সমস্তই যথারীতি আমার নিকটেও সরবরাহ হইতে লাগিল।

৩

আমার কিন্তু ঐ হানা বাড়ীটার বা তাহার নূতন অধিবাসীর সম্বন্ধে কোনই কৌতূহল ছিল না। সেই জন্য পিসীমা ও বিষয়ে আমাকে যে সব সংবাদ দিতেন, তাহাতে আমি বড় মনোযোগ দিতাম না। এ পর্য্যন্ত যত কথা শুনিয়াছিলাম, তাহার মোট সমষ্টি এই যে, লোকটার নাম কুঞ্জবিহারী নন্দন, বয়স পঞ্চাশের উপর। বাড়ীটাতে সে সম্পূর্ণ একাকী থাকে; সঙ্গে কোন আত্মীয়-স্বজন, এমন কি, একটা চাকর পর্য্যন্ত থাকে না। অথচ, তাহার বেশ আর্থিক স্বচ্ছলতা আছে বলিয়া বোধ হয়। তাহার পোষাক চালচলন পুরা সাহেবী ধরণের। দিনে ও রাত্রিকালে সে কোন একটা হোটেলে খাইতে যায় এবং সেই হোটেলের একটা খানসামা প্রত্যহ দুই বেলা আসিয়া, তাহার চা-পানের ব্যবস্থা ও গৃহকর্ম্মাদি করিয়া দিয়া যায়। লোকটা কাহারও সঙ্গে মিশিতে চায় না; বাড়ীটাতে আসিয়া অবধি এ পর্য্যন্ত পাড়ার কাহারও সহিত বাক্যালাপ করে নাই; এবং সেই খানসামা ছাড়া বাড়ীতে আর কাহাকেও প্রবেশ করিতেও দেয় না। রাত্রিকালে হোটেলে খাইয়া, সে প্রায়ই বেশ মাতাল অবস্থায় বাড়ী ফিরিয়া আইসে। অতএব পাড়ার লোকের মতে সে নিশ্চয়ই কোন বোম্বেটে বদমাইস, হয় ত কোন খুন-খারাবী করিয়া, অথবা কোথাও চুরি-ডাকাতী দ্বারা অনেক টাকা আত্মসাৎ করিয়া, এইরূপ নিভৃতভাবে গা-ঢাকা দিয়া রহিয়াছে।

এইরূপ নানাপ্রকার গল্প শুনিয়াও কিন্তু লোকটার সম্বন্ধে আমার বিশেষ মনোযোগ আকৃষ্ট হয় নাই। অথচ, হঠাৎ এক দিন এক সামান্য ঘটনাচক্রে উহার সহিত আমার জীবন-সূত্র এরূপে সংশ্লিষ্ট হইয়া পড়িল যে, তাহার ফলে আমার ভবিষ্যৎ-ভাগ্য সম্যক্‌রূপে নিয়ন্ত্রিত হইতে লাগিল।

সেবারে কলিকাতায় শীতটা কিছু শীঘ্রই আরম্ভ হইয়াছিল। অগ্রহায়ণ উত্তীর্ণ হইবার পূর্ব্বেই রাত্রিতে বাহির হইলে রীতিমত গরম কাপড়ের প্রয়োজন হইত। সে দিন এক বন্ধুর বাড়ীতে রাত্রিতে আহার করিয়া ফিরিতেছিলাম। যখন আমাদের সেই 'পোড়োর' কাছে আসিলাম, তখন ১১টা বাজিল। একে অন্ধকার রাত্রি, তাহাতে সেই পোড়ো জমীটার চারি পার্শ্বের রাস্তাগুলার কেবল দুইটাতে দুইটা অনতি-উজ্জ্বল গ্যাসের আলো. কলিকাতার রাত্রিকালের পুঞ্জীকৃত ধূম-রাশির মধ্যে মিট মিট করিয়া অন্ধকারটাকে যেন আরও গাঢ়তর করিতেছিল।

বড় রাস্তা হইতে গলির ভিতর দিয়া আমাদের চতুষ্কোণ পল্লীতে পৌঁছিয়া আমার বাসায় যাইতে হইলে

পোড়ো জমীর পার্শ্বের রাস্তা দিয়া যাওয়া অপেক্ষা, জমীটার উপর দিয়া গেলে কতকটা শীঘ্র হয় বলিয়া, আমি উহার ভিতরে প্রবেশ করিলাম। অল্প দূর অগ্রসর হইয়া সেই অন্ধকারমধ্যে আমার গন্তব্যপথের নিকটেই একটা ইটের ঢিপির উপর হঠাৎ একটা পুঁটলীর মত আকৃতির মধ্য হইতে, কে যেন অস্ফুট ক্রন্দনের স্বরে, থিয়েটারী ছন্দে বলিয়া উঠিল,—"অহো! এই কি রে রাজ্যসুখ?" এবং তৎপরেই কাঁদিয়া ফেলিল। আমি প্রথমটা চমকিত ও কিছু ভীতও হইয়াছিলাম। পরে সেই পুঁটলীটার নিকটে আসিয়া, ভাল করিয়া দেখিয়া বুঝিলাম যে, সেটা একটা মানুষ; দুই হাতে নিজের হাঁটু বেষ্টন করিয়া, হাতের উপর মাথা রাখিয়া বসিয়া আছে। পরিধানে পেণ্ট্‌লান ও তাহার উপর একটা লম্বা 'ওভারকোটে' সর্ব্বাঙ্গ ঢাকা। দেখিয়া, তাহার কাঁধ ধরিয়া তাহাকে নাড়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "কে মশায় আপনি? এখানে এমন ক'রে ব'সে আছেন কেন?"

লোকটা কোন উত্তর না দিয়া, ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। তখন আমি একটু সান্ত্বনা দিবার অভিপ্রায়ে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কাঁদছেন কেন, মশায়? কোন অসুখ হয়েছে কি?"

তখন মাথা না তুলিয়াই সে বলিল, "অসুখ?—হাঁ, অসুখ ছাড়া সুখ ত কিছুই খুঁজে পাই না। ওঃ! মানুষের সব রকম বিমল আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয়ে, নিজের মনে জোর ক'রে সুখ আন্‌বার চেষ্টায়, খালি মদই খাচ্ছি! মদ খেয়ে খেয়ে একেবারে জাহান্নমে গেছি,—কিন্তু সুখ ত পাচ্ছি না, বাবা!—ওঃ! সবাই শত্রু! আমার চারিদিকে শত্রু!" বলিয়া সে আবার সেইরূপে কাঁদিতে লাগিল।

লোকটা মাতাল হইয়াছে দেখিয়া একটু দৃঢ়স্বরে বলিলাম, "উঠুন, উঠুন, মশায়! রাত্রিকালে এখানে ব'সে আর হিম খাবেন না। যান, বাড়ী যান।"

"বাড়ী যাবো?—হাঁ, হাঁ, বটেই ত! কিন্তু বাড়ীটা কোথায়, খুঁজে পাচ্ছি না, বাবা! এই কাছাকাছি কোথাও হবে; কিন্তু ঠিক কোথায়, তা বুঝতে পাচ্ছি না।"

"আপনি এখন রামপালের পোড়োর মধ্যে আছেন, তা জানেন কি?"

"ওঃ! তা হ'লে ১০নং বাড়ীতে যদি কেউ আমায় পৌঁছে দেয়—"

"ও, বটে? আপনি কি মিঃ নন্দন?—তা বেশ ত; আসুন আমার সঙ্গে, আমি আপনাকে পৌঁছে দিচ্ছি।"

তাহার নাম আমার মুখ হইতে উচ্চারিত হইবামাত্র লোকটা হঠাৎ জড়তা পরিহার করিয়া একেবারে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং যেন কিছু চমকিতভাবে বলিল, "আপনি কে? আমার নাম আপনি কি ক'রে জান্‌লেন?"

আমি বলিলাম, "অত আশ্চর্য্য হবার কারণ কিছু নাই। আমি এই পাড়াতেই থাকি। ঐ হানা বাড়ীটায় আপনার আসা থেকে এখানকার সকলেই আপনার নাম শুনেছে।"

"তা হ'তে পারে। হাঁ, ভূতের বাড়ীতে থেকে আমিও একটা ভূতের মতই হয়ে আছি বটে। তা চলুন, আপনার সঙ্গেই যাই।" বলিয়া, আমার হাত ধরিয়া, লোকটা আস্তে আস্তে আমার সঙ্গে চলিতে লাগিল। ১০নং বাড়ীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া সে পকেট হইতে একটা চাবি বাহির করিল; বহির্দ্বারের তালা খুলিয়া বলিল, "যদি অনুগ্রহ ক'রে এ পর্য্যন্ত পৌঁছেই দিলেন ত আর একটু দয়া ক'রে একবার ভিতরেও আসুন। এত অন্ধকারে ভিতরে একলা যেতে আমার একটু ভয় করছে।"

আমি অনুরোধ রক্ষা করিয়া ভিতরে গেলাম। সমস্তই অন্ধকার। সদরের পাশেই একটা বসিবার ঘর। তাহার ভিতরে ঢুকিয়া দক্ষিণদিকের একটা কপাট খুলিতেই পার্শ্ববর্ত্তী ঘরের মধ্যে একটা গোল টেবলের উপর বড় একটা কেরোসিনের ল্যাম্পে মৃদু আলোক জ্বলিতেছিল দেখিলাম। লোকটা তখন ক্ষিপ্রগতিতে আমাকে পশ্চাতে রাখিয়া আলোটা উজ্জ্বল করিয়া দিল। পরে আমার দিকে আর মুখ না ফিরাইয়াই বলিল, "তা হ'লে মশায়, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। আর বেশী কষ্ট দিব না।"

আমিও আর দ্বিরুক্তি না করিয়া তৎক্ষণাৎ সেখান হইতে চলিয়া আসিলাম।

৪

পরদিন আহারের সময় মিঃ নন্দনের সম্বন্ধে পিসীমার সঙ্গে একটু ভাল করিয়া আলোচনা করিবার ইচ্ছায় ঐ হানা বাড়ীর কথা পাড়িলাম! আগে এ বিষয়ে পিসীমার গল্পগুলায় বড় মনোযোগ দিতাম না বলিয়া আজ আমি নিজেই ঐ প্রসঙ্গ উত্থাপন করায় তিনি সোৎসাহে তাহাতে যোগ দিলেন। কিন্তু পূর্ব্বেও যেমন, আজও তেমনই, তাঁহার নিজের বা তাঁহার সংবাদদাতৃগণের অনুমান, অথবা মতামত ছাড়া বিশেষ প্রামাণ্য কথা কিছুই জানিতে পারিলাম না। লোকটা এত দিন এখানে আসিয়াছে, অথচ এ পর্য্যন্ত পাড়ার কাহারও সহিত আলাপ করিল না, পেঁচার মত সমস্ত দিন বাড়ীতে থাকিয়া রাত্রিকালে বাহিরে যায় এবং সময়ে সময়ে মাতাল হইয়া বাড়ী ফিরে;—অতএব সে নিশ্চয়ই চোর, ডাকাত কিংবা নোট জাল করে;—অথবা কোন তন্ত্র-মন্ত্র-সাধক বা ঐ রকম কোন বীভৎস জীব, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই! হোটেলের যে খানসামা প্রত্যহ তাহার চা ও খাদ্য সরবরাহ ও ঘরের কায করিয়া দিয়া যায়, সেও খুব চালাক লোক; কিন্তু আমাদের পাশের বাড়ীর রঙ্গিণী ঝি-ও বড় কম নয়। সে অনেক কৌশলে ঐ খানসামার নিকট জানিয়াছে যে, নন্দন সাহেব বাড়ীতে সম্পূর্ণ একলাই থাকে; দিনের বেলাও সে সময়ে সময়ে খাবার আনাইয়া খায় এবং একাকী বসিয়া মদও খায়; আবার আপন মনে বিড়-বিড় করিয়া কি সব কথা বলে। সাম্‌নের বসিবার ঘর ও পাশের একটা শয়ন-ঘর ছাড়া বাড়ীর আর কোনও ঘর সে ব্যবহার করে না। সেগুলা সব খালি পড়িয়া আছে; তাহাতে একটি আসবাব পর্য্যন্ত নাই এবং ব্যবহৃত ঘর দুইটা ছাড়া বাড়ীর অপর কোথাও ঝাঁট-পাটও দেওয়া হয় না।

এই সব কথার পর পিসীমা শেষে নিজের মন্তব্য যোগ করিলেন যে, "ঐ ঘরগুলাতেই তা হ'লে রাত্রে ভূতের উপদ্রব বা ঐ রকম কিছু হয় বেশ বুঝা যাচ্ছে।"

আমি বলিলাম, "কিন্তু আমি ত সে রকম বোঝবার কোন কারণ দেখ্‌ছি না।"

"কেন? তা-নৈলে রাত্রে ওর কাছে যে সব লোক আসে, তারা আসে কোথা থেকে? সদর দিয়ে ত কখনও ঐ চাকরটা ছাড়া আর কোন মানুষকে ও বাড়ীতে ঢুক্‌তে কেউ দেখেনি।"

"রাত্রে যে ওখানে কোন লোক আসে, তা'র প্রমাণ কি?"

"প্রমাণ?—বাড়ীটার রাস্তার দিকে যে জানালা আছে, তা'তে একটা সাদা পর্দ্দা খাটানো থাকে, দেখেছ বোধ হয়? রাত্রে জানালাটা বন্ধ না থাকলে, আর ঘরের ভিতরে যদি আলো থাকে ত কখন কখন ঐ পর্দ্দার গায়ে একাধিক মানুষের ছায়া দেখা গিয়েছে। অথচ, পাড়ার কোন লোক,—এমন কি, রাত্রের পাহারাওলা পর্য্যন্ত কখনও ও-বাড়ীতে নন্দন সাহেব ছাড়া অন্য কোন লোককে ঢুকতে দেখেনি। তবে, সে সব লোক ওখানে আসে কি ক'রে? নিশ্চয়ই তারা মানুষ নয়,—ভূত!"

"তা হ'লে, ভূতেরও ছায়া হয়? এটা নূতন কথা শুনছি বটে! কিন্তু, দিনের বেলাও ত লোক ঢুকে থাকতে পারে? আর, সদর ছাড়া অন্য কোন দিক দিয়েও হয় ত ও-বাড়ীতে যাওয়া যায়।"

"না। দিনের বেলা ও-বাড়ীতে সেই খানসামাটা ছাড়া জনপ্রাণীও ঢোকে না। তা ছাড়া, আমি বেশ ভাল ক'রে জানি যে, সদর ছাড়া ও-বাড়ীতে ঢোকবার অন্য পথ নাই। বাড়ীটার পিছন দিকে যে বাড়ী আছে, তার উঠান আর ও বাড়ীটার উঠানের মাঝে একটা উঁচু পাঁচীল আছে; তা'তে কোন কপাট নাই। পাঁচীল না ডিঙ্গালে, এক বাড়ী থেকে অন্য বাড়ীতে যাবার উপায় নাই। পিছনের বাড়ীতে অন্য ভাড়াটে আছে; তাদের একটা ছোঁড়া চাকর আছে,—তা'র চোখ এড়ানো সহজ নয়। তুমি বিশ্বাস কর আর না কর, ও-বাড়ীতে নিশ্চয় ভূত আসে। শুধু আমি নয়,—পাড়ার সবাই জানে।"

এই বলিয়া পিসীমা আমার অবিশ্বাসী মনের প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করিয়া উঠিয়া পড়িলেন। আমিও আহারান্তে নিজের ঘরে আসিলাম।

শীঘ্রই কিন্তু পিসীমার কথার আংশিক সত্যতা অপ্রত্যাশিতরূপে সাব্যস্ত হইল।

সে দিন রবিবার; সমস্ত দিন পড়া-শুনা ও আলস্যে

কাটাইয়া, সন্ধ্যার পর বেড়াইতে বাহির হইয়াছিলাম। প্রায় ঘণ্টা দুই পরে যখন ফিরিলাম, তখনও মাথার জড়তা যায় নাই দেখিয়া বাড়ীর সম্মুখের সেই পোড়ো জমীর উপর পাদচারণ করিতে লাগিলাম। হঠাৎ হানা বাড়ী-টার দিকে নজর পড়ায় দেখিলাম, রাস্তার ধারের সেই জানালাটা খোলা এবং তাহার সংলগ্ন সাদা পর্দ্দাটা খাটানো রহিয়াছে। ঘরের মধ্যে আলোও বেশ উজ্জ্বল-ভাবে জ্বলিতেছে। অল্পক্ষণ পরেই দেখিলাম, একটা স্ত্রী-মূর্ত্তির ছায়া ঐ পর্দ্দার উপর পড়িল। সে যেন বেশ একটু উত্তেজিতভাবে অঙ্গচালনা করিতেছিল। পর-ক্ষণেই একটা পুরুষ-মূর্ত্তির ছায়াও ঐ পর্দ্দার উপর দেখা গেল এবং সে-ও ঐরূপে অঙ্গচালনা করিতেছিল। কখনও একটা মূর্ত্তি, কখনও অপরটা, অগ্রসর বা পশ্চাৎপদ হইতে-ছিল। আমিও সেই দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া ধীরে ধীরে সেই দিকে অগ্রসর হইতেছিলাম। সহসা দেখিলাম, পুরুষ মূর্ত্তিটা বেগে ধাবিত হইয়া স্ত্রী-মূর্ত্তির গলা টিপিয়া ধরিল এবং উভয়ে ঝটাপটি করিতে করিতে নীচের দিকে পড়িয়া গিয়া আমার দৃষ্টি-বহির্ভূত হইল ও পরক্ষণেই একটা অস্ফুট চীৎকার-ধ্বনি শুনিতে পাইলাম। ততক্ষণে আমিও সেই জানালাটার খুব নিকটেই উপস্থিত হইয়া-ছিলাম এবং ঐ শব্দ শুনিবামাত্র উত্তেজনাবশে, ত্বরিতপদে ঐ বাড়ীর সদর দ্বারে গিয়া তাহাতে সবলে করাঘাত করিতে লাগিলাম। অমনই তৎক্ষণাৎ সে ঘরের আলো নিবিয়া গিয়া সব অন্ধকার হইয়া গেল এবং আর কোন শব্দও শুনিতে পাইলাম না।

আরও কিয়ৎক্ষণ দরজায় ধাক্কা দিয়াও যখন কোন ফল হইল না, তখন সে স্থান ত্যাগ করিয়া গলির দিকে দ্রুত-পদে অগ্রসর হইলাম। মনে করিলাম, যদি পাহারা-ওয়ালার দেখা পাই, তাহা হইলে তাহাকে এই ঘটনার বৃত্তান্তটা বলিয়া তাহার সাহায্যে কপাট খুলাইব। কিন্তু গলিটার মুখে আসিয়া যাই তাহাতে প্রবেশ করিতে যাই-তেছি, অমনি উল্টা দিক হইতে আগন্তুক এক জন লোকের সঙ্গে এরূপ বেগে সংঘর্ষ হইল যে, উভয়কেই সেখানে দাঁড়াইতে হইল। তখন গ্যাসের আলোয় দেখি-লাম যে, লোকটা আর কেহই নহে,—স্বয়ং নন্দন সাহেব!

আমি অতিমাত্র বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "এ কি! মিঃ নন্দন না কি? আপনি এখানে? আমি মনে করেছিলাম, আপনি নিজের বাড়ীতেই আছেন।"

"দেখতেই ত পাচ্ছেন, আমি এখানে রয়েছি। নিশ্চ-য়ই তা হ'লে আমি বাড়ীতে নাই।— আমি আজ সন্ধ্যার পরেই বাহিরে গিয়েছিলাম, এই এতক্ষণে ফিরছি।— কেন বলুন দেখি?"

"আপনার বাড়ীতে তা হ'লে অন্য কোন লোক আছে কি?"

"না; আমি একাই ওখানে থাকি। আর কোন লোক ত আমার সঙ্গে থাকে না!"

"বলেন কি? আপনার কোন আত্মীয় বা পরিচিত লোক আজ দেখা করতেও আসেননি?"

"আমার আত্মীয় বা বন্ধু-বান্ধব কেউ নাই মশায়। পৃথিবীতে আমি একা!—সে যা হোক, কিন্তু এত কথা জিজ্ঞাসা করছেন কেন, বলুন দেখি?"

"আপনার কথা শুনে আমি বড়ই আশ্চর্য্য হচ্ছি, মশায়। এই বোধ হয় দশ মিনিটও হয়নি, আপনার বৈঠকখানা-ঘরে অন্ততঃ দু'জন লোক যে ছিল, তা আমি নিজে দেখেছি।"

তৎপরে, যে ঘটনা আমি এইমাত্র প্রত্যক্ষ করিয়া ছিলাম, তাহা আনুপূর্ব্বিক তাঁহাকে বলিলাম। সব শুনিয়া তিনি অবজ্ঞাভরে হাসিয়া বলিলেন, "আপনার দৃষ্টিবিভ্রম ঘটেছিল। ঘটনা যা বল্লেন, তা ওখানে হওয়া কখনও সম্ভব নয়। ওখানে আমি ছাড়া আর দ্বিতীয় লোক থাকে না, অন্য কোন লোক আজ আসেও নাই। আপনি বরং আমার সঙ্গে আসুন; আমি বাড়ীর ভিতরটা সমস্তই আপনাকে দেখাব। তা হ'লেই আপনি বুঝতে পারবেন, আপনার কথা কত দূর অসম্ভব।"

এই বলিয়া তিনি আমার হাত ধরিয়া হানা বাড়ীটার দিকে লইয়া গেলেন ও তাহার বহির্দ্বারের তালা খুলিয়া ভিতরে ঢুকিলেন। আমিও অত্যন্ত কৌতূহলী হইয়া তাঁহার অনুসরণ করিলাম। বসিবার ঘরে আলো জ্বালা হইলে দেখিলাম,—তথায় অপর কেহই নাই এবং কোন-রূপ ঝটাপটি বা গোলযোগের চিহ্নও কিছু নাই। পার্শ্বের

যে শয়নকক্ষে সে দিন ঢুকিয়াছিলাম, সে ঘরেও তাহাই দেখিলাম। কিন্তু গৃহমধ্যস্থ উজ্জ্বল আলোকে আজ নন্দন মহাশয়কে ভাল করিয়া দেখিতে পাইলাম। এ পর্য্যন্ত তাহার চেহারাটা সেরূপে দেখিবার একবারও অবকাশ পাই নাই। আজ দেখিলাম, তাহার মুখমণ্ডল সম্পূর্ণ গুম্ফশ্মশ্রুহীন এবং বামদিকের গালের উপর ওষ্ঠদ্বয়ের সংযোগস্থল হইতে প্রায় কর্ণমূল পর্য্যন্ত একটা লম্বা ক্ষতের দাগ সুস্পষ্টভাবে বিদ্যমান থাকায় তাহার গৌরবর্ণ মুখখানায় কেমন একটা বিকৃত ভাবের সৃষ্টি করিয়াছে। আরও দেখিলাম যে, তাহার বাম-হস্তের কনিষ্ঠ অঙ্গুলীটা উপরের দুইটি পর্ব্ববিহীন। বয়স বোধ হইল পঞ্চাশের কিছু বেশী হইবে; কিন্তু শরীর এত শীর্ণ ও রোগ-ক্লিষ্ট যে, তাহার বয়স তজ্জন্য আরও বেশী দেখায়।

ঘর দুইটা দেখা শেষ হইলে নন্দন সাহেব বলিলেন, "দেখছেন ত মশায়, এ দুটা ঘরে কোন গোলযোগের চিহ্নও নাই। তা ছাড়া ঐ দেখুন, বসবার ঘরের জানালাটাও ভিতর থেকে বন্ধই রয়েছে। আপনি তা হ'লে নিশ্চয়ই ভুল দেখেছিলেন।"

"আমি ত পাগল হইনি, মশায়! আমার নিজের চোখকে আমি অবিশ্বাস করতে পারি না। আমি যখন ঘটনাটা দেখেছিলাম, তখন জানালাটা খোলাই ছিল, তা'তে কোন সন্দেহ নাই। ও জানালার পর্দ্দায় অপর লোকের ছায়া, আজ আমি ছাড়া, অন্য লোকেও অন্য সময়ে দেখেছে। আর, এ কথাও আপনাকে বল্‌তে আপত্তি নাই যে, আপনার এ ভাবে এখানে একলা থাকার সম্বন্ধে পাড়ায় নানা রকম কানাকানি হচ্ছে।"

"কেন? পাড়ার লোকের এ ত বড়ই অনধিকার-চর্চ্চা! আমি নির্ব্বিরোধ লোক, আত্মীয়-স্বজন-বিহীন বৃদ্ধ। দুঃসাধ্য বহুমূত্র রোগেও ভুগছি। এখন জীবনের শেষ ক'টা দিন এই ভাবে নির্জ্জনে আপন মনে কাটাবার জন্য এখানে এসে বাস করছি। পাড়ার লোকের এতে আমার সম্বন্ধে মাথা ঘামানো বড় অন্যায় নয় কি?"

"তা হ'তে পারে, কিন্তু আপনার এই দৃশ্যতঃ একলা থাকা সত্ত্বেও, অপর লোক যে গোপনে এখানে আসে বা থাকে, তার যখন মাঝে মাঝে এইরূপ প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে, তখন লোক যে নানা কথা কইবে, তা ত আশ্চর্য্য নয়। তা ছাড়া এটা হানা বাড়ী ব'লে একটা গুজব আছে, তা ত জানেন?"

"ওঃ! ভূতকে আমি ভয় করি না। মানুষ-শত্রুকেই আমার ভয়। এখানে একা থাকি ব'লে ঐ ভয়ে এখানে আমার কাছে বেশী টাকাকড়ি বা কোন মূল্যবান্ সামগ্রী কিছুই রাখি না। ভূত এখানে আসে কি না, জানি না,—কখনও তার কোন চিহ্ন ত পাইনি। কিন্তু অপর মানুষ যে এখানে কখনও আসেনি, তার প্রমাণ ত আপনি এখনি দেখলেন? কেউ যে সদর ছাড়া অপর কোন দিক দিয়ে এখানে আস্‌তেই পারে না, তা আপনি বাড়ীটা সমস্ত একবার দেখলেই বুঝতে পারবেন। আসুন না, আমি আপনাকে সব দেখাচ্ছি।"

। ক্রমশঃ।

শ্রীসুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

হত্যাকারী

[সংস্কৃত হইতে]

সমরে বিদ্রোহে মিলে মেরেছে মানবে,
কত যে গণনা তা'র কভু কি সম্ভবে?
রোগ-শোক দুর্ভাবনা দুর্ঘটনা আর—
আরও কত বধিয়াছে মানব ধরার,
কিন্তু হায় বেশী লোক মেরেছে যে জন,
সে এক কটাক্ষভরা রমণী-নয়ন!

শ্রীবাশরীভূষণ মুখোপাধ্যায়।
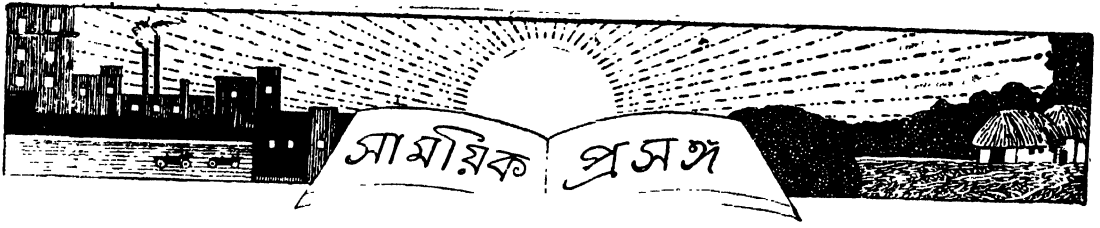
আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসুর আবিষ্কার

যে কয় জন মনীষী বর্ত্তমানে বাঙ্গালা ও বাঙ্গালীর মুখ জগতের সমক্ষে উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছেন, আচার্য্য জগদীশচন্দ্র তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। তিনি বিজ্ঞান-রাজ্যে এ যাবৎ উদ্ভিদ্-জগতের সম্পর্কে যে সমস্ত নূতন আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহাতে প্রতীচ্যের বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতমণ্ডলী বিস্মিত, স্তম্ভিত হইয়াছেন। অনেকে বলিতেছেন, তাঁহার এই সমস্ত আবিষ্কারের ফলে বিজ্ঞান-রাজ্যে আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন হইবার সম্ভাবনা,—যাহা এত দিন অসম্ভব অসত্য বলিয়া লোকের ধারণা ছিল, এখন তাহা বাস্তবে পরিণত হইবে।

উদ্ভিদের প্রাণ আছে, এ কথা বহুকাল হইতেই জগতে বিদিত। মহাভারতে উদ্ভিদের প্রাণ ও তাহার অনুভূতি সম্বন্ধে বিশদ বর্ণনা আছে। আচার্য্য জগদীশ-চন্দ্র তাঁহার আবিষ্কৃত যন্ত্রসাহায্যে উদ্ভিদের সজীবতা সপ্রমাণ করিয়াছেন। তাঁহার সেই আবিষ্কারে বিজ্ঞান-রাজ্যে একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল। সম্প্রতি তিনি তাঁহার বিজ্ঞানাগারে নিজের আবিষ্কৃত যন্ত্রসাহায্যে উদ্ভিদের পেশীর অনুভূতি সম্পর্কে আশ্চর্য্য আবিষ্কার করিয়াছেন। তাঁহার সেই অত্যাশ্চর্য্য আবিষ্কার সম্বন্ধে দার্জ্জিলিং শৈলের বক্তৃতা শুনিয়া বাঙ্গালার গভর্ণর লর্ড লিটন বলিয়াছেন;—"এই আবিষ্কার উপন্যাসের ঘটনার মত অদ্ভুত। তাঁহার আবিষ্কারে আমরা জানিতে পারিলাম যে, উদ্ভিদ্ সকল স্থাবর প্রাণিবিশেষ এবং প্রাণীরা চলন্ত উদ্ভিদ্‌বিশেষ, উভয়েই সজীব, উভয়েরই সুখ-দুঃখের অনুভূতি আছে। তাঁহার উপদেশে ভারতীয় কারিগরের দ্বারা প্রস্তুত ক্রেসকোগ্রাফ যন্ত্র মানুষের বুদ্ধিমত্তার আশ্চর্য্য পরিচয় প্রদান করে। তাঁহার বিজ্ঞানাগার দুই হিসাবে মানুষের অতীব প্রয়োজনীয়। প্রথমতঃ এই বিজ্ঞানাগারে থাকিয়া বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র তাঁহার আবিষ্কারকার্য্যে সাফল্য লাভ করিতেছেন, দ্বিতীয়তঃ এই স্থানে তিনি শিষ্যমণ্ডলী প্রস্তুত করিতেছেন, ভবিষ্যতে যাঁহারা জগতে বৈজ্ঞানিক বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিবেন এবং জগতে নূতন নূতন তথ্য আবিষ্কার করিয়া যাইবেন, তাঁহাদের হাতে খড়ি হইতেছে। আমরা তাঁহার জন্য গৌরব অনুভব করিতেছি। আজ যদি তিনি লোকান্তরিত হয়েন, তাহা হইলে তাঁহার কার্য্য তাঁহার লোকান্তরের পরেও বাঁচিয়া থাকিবে। তাঁহার ন্যায় বিজ্ঞানবিদের চিন্তার ধারা ভবিষ্যবংশীয়গণের জন্য চিরদিন প্রেরণা প্রদান করিবে। অন্যান্য নেতার কর্ম্মের ধারা তাঁহাদের জীবিতকালে লোককে অনুপ্রাণিত করিয়া থাকে। তাঁহার মহত্ত্ব অপরকেও মহৎ করিবে। তাঁহার জ্ঞান-গবেষণা অপরকে জ্ঞানী ও অনুসন্ধিৎসু করিবে। সুতরাং তিনি সাময়িক নির্ম্মাতা নহেন, অনন্তকালের নির্ম্মাতারূপে বিরাজ করিবেন।"

আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের সম্পর্কে কথাগুলি খাঁটি সত্য। তিনি যাহা জগৎকে দিয়া যাইতেছেন, তাহার বিনাশ নাই। তাঁহার বিজ্ঞানাগার কালে নালন্দা অথবা তক্ষশিলার মত বিশ্ববাসীর জ্ঞানাগারে পরিণত হইবে, এমন আশা কি করা যায় না? আচার্য্য স্বয়ং বলিয়াছেন, ইতোমধ্যেই তিনি প্রতীচ্যের বহু জ্ঞানপিপাসুর নিকট হইতে তাঁহার বিজ্ঞানাগারে আসিয়া শিক্ষা লাভ করিবার আবেদন প্রাপ্ত হইয়াছেন। সুতরাং তাঁহার মধ্য দিয়া ভারত যে জগৎকে তাহার নিজস্ব ভাবধারা বণ্টন করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইবে, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। তিনি প্রতীচ্যের কর্ম্মশক্তির সহিত ভারতের চিন্তাশক্তির যে সমন্বয় করিয়াছেন, তাহার ফল বহুদূরবিসারী হইবে। ইহাই তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য। তিনি সাধনায় সিদ্ধি লাভ করুন, দীর্ঘজীবী হইয়া ভারতের মুখোজ্জ্বল করুন, ইহাই কামনা।

আচার্য্য জগদীশচন্দ্র তাঁহার বক্তৃতায় বলিয়াছেন,—

প্রথমে দেখিলে মনে হয়, প্রাণী ও উদ্ভিদে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। প্রাণী জঙ্গম, চঞ্চল, সর্ব্বদা তাহার হৃৎপিণ্ডের কার্য্য দ্রুত চলিতেছে; অথচ উদ্ভিদ্ কার্য্য করে না, চলে-ফিরে না, সাড়া দেয় না। প্রাণীকে আঘাত করিলে সে সেই আঘাতে সঙ্কুচিত হয়, সাড়া দেয়, কিন্তু উদ্ভিদকে বার বার আঘাত করিলেও সে সঙ্কুচিত হয় না, সাড়া দেয় না। এই জন্য এতাবৎকাল লোকের ধারণা ছিল যে, উদ্ভিদের মাংসপেশী (muscular tissue) নাই। প্রাণীর হৃৎপিণ্ড সর্ব্বদা ধক্ ধক্ করিতেছে, সর্ব্বদা তাহার ধমনীতে রক্ত-চলাচল হইতেছে। উদ্ভিদে এরূপ প্রক্রিয়া পরিলক্ষিত হয় না। প্রাণীর ইন্দ্রিয়গণের বাহ্যানুভূতি আছে, বাহ্য-জগতের সম্বন্ধে ধারণা নানা ভাবে তাহার স্নায়ুর মধ্য দিয়া জ্ঞান ও অনুভূতির মন্দিরে পৌঁছিতেছে। উদ্ভিদের স্নায়ু নাই, সুতরাং অনুভূতিও নাই, সকল লোকেরই এইরূপ ধারণা। এইরূপে প্রাণী ও উদ্ভিদের প্রাণের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য আছে বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইয়াছে।

আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু

কিন্তু আমার বিজ্ঞানাগারে আজ ২৫ বৎসর যাবৎ যে সকল গবেষণা-কার্য্য চলিয়াছে, তাহাতে জানা গিয়াছে যে, এ ধারণা ভ্রান্ত, প্রাণীর ও উদ্ভিদের জীবনে কোনও প্রভেদ নাই, সকলেরই জীবনযাত্রা একই আইনের অনুশাসনে চলিতেছে—সকল জীবনই এক।

এই যে আপনাদের সম্মুখে electric recorder (বৈদ্যুতিক যন্ত্র—ক্রেসকোগ্রাফ) রক্ষিত হইয়াছে, ইহার দ্বারা প্রাণী ও উদ্ভিদের জীবনীশক্তির অস্তিত্ব নির্দ্ধারণ করা যায়। যখনই কোনও প্রাণীকে এই যন্ত্রের প্রভাবের মধ্যে আনয়ন করিয়া আঘাত করা যায়, তখনই ইহার recorder (নির্দ্ধারক অঙ্গ) তাহাতে সাড়া দেয়। এই একটি উদ্ভিদকে (বকচঞ্চুর অনুরূপ অর্থাৎ বকফুলের গাছকে) আমার যন্ত্রের সহিত সংযুক্ত করিয়া দিলাম এবং একটি আলপিন উহার অঙ্গে ফুটাইয়া দিলাম। অমনই দেখুন, যতবার এইভাবে পিন ফুটাইতেছি, ততবারই যন্ত্রের নির্দ্ধারক অঙ্গে ঐ আঘাতের সাড়া পাওয়া যাইতেছে। গাছটিকে ক্লোরোফরম করিলাম। অমনই ইহার বৈদ্যুতিক নাড়ীর স্পন্দন কমিয়া আসিতেছে এবং কিছুক্ষণ পরেই একবারে থামিয়া যাইতেছে।

ক্রেসকোগ্রাফের সাহায্যে এক সেকেণ্ডের মধ্যে উদ্ভিদের বৃদ্ধির হার নির্দ্ধারণ করা যায় এবং বর্দ্ধনের উপযোগী উত্তেজক পদার্থ দ্বারা উদ্ভিদের বৃদ্ধি অতিমাত্রায় দ্রুত করা যায়; আমার এই আবিষ্কার দেখিয়া প্রতীচ্যের বিজ্ঞানবিদরা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন। অনেকে ইহা দেখিয়াও বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। এক জন বিজ্ঞানবিদ বলিয়া উঠেন, আমি চক্ষুতে দেখিতেছি বটে, কিন্তু আমার হৃদয় বিশ্বাস করিতেছে না। অথচ এই আবিষ্কারের দ্বারা কৃষির প্রভৃত উপকার সাধিত হইতে পারে।

এই অবিশ্বাসের মূল কারণ, বহুকালের সংস্কার। ভ্রান্তধারণার এমনই প্রভাব। ইহা জ্ঞানবিস্তারে বাধা প্রদান করিয়া থাকে। এই ভ্রান্তধারণা দূর করিবার পক্ষে ভারতের চিন্তাশক্তিই বিশেষ সাহায্য করিবে। বহুকাল সংযমের দ্বারা মনকে একনিষ্ঠ হইতে শিক্ষা
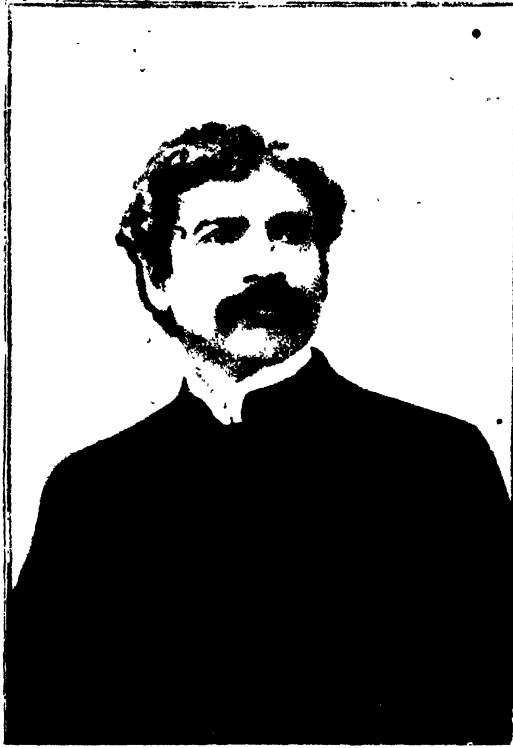
দিতে হয়, তবে ভ্রান্তধারণা দূর হয়, জ্ঞানের বিস্তার হয়। ইহাই ভারতের বিশেষত্ব।

উদ্ভিদের আভ্যন্তরীণ কল-কব্জার বিষয় জানিতে হইলে মানুষকে উদ্ভিদ হইতে হইবে এবং উদ্ভিদের হৃৎপিণ্ডের ধকধকানি অনুভব করিতে হইবে। বৈদ্যুতিক যন্ত্রের সাহায্যে উদ্ভিদের অভ্যন্তর আবিষ্কার করিতে হইবে, তাহার প্রাণের সাড়া গ্রহণ করিতে হইবে। তবেই আমরা উদ্ভিদ-জগতের মধ্যে যে আশ্চর্য্য তথ্য নিহিত আছে, তাহা জানিতে পারিব। যাহা আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা সামান্য, এখনও জ্ঞানের সমুদ্র অনাবিষ্কৃত রহিয়াছে।

আচার্য্য জগদীশচন্দ্র উদ্ভিদের পেশীসমূহ সম্বন্ধে যে নূতন অদ্ভুত আবিষ্কার করিয়াছেন, সে সম্বন্ধে পরে তিনি সকলের জ্ঞানপিপাসা নিবৃত্ত করিবেন বলিয়া আশা দিয়াছেন। তিনি বলেন, উদ্ভিদেরও মানুষের মত মাংসপেশীসমূহ বিদ্যমান আছে, তাহার স্পন্দন তাহার হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন অনুসূচিত করিয়া থাকে। লজ্জাবতী লতার (Mimosa) সঙ্কোচক্ষম পেশীর অনুভূতি অদ্ভুত। উদ্ভিদের এই সঙ্কোচক্ষম পেশীর কলকব্জা প্রাণীর মাংস-পেশীর কলকব্জার অনুরূপ। এইরূপে আচার্য্য জগদীশচন্দ্র আরও অনেক উদ্ভিদের সঙ্কোচক্ষম পেশীর উপর পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, প্রাণীর মাংসপেশীর মত উহাদেরও তিন স্তরের সঙ্কোচ-শক্তি বিদ্যমান আছে। এমন কি, তিনি যন্ত্র সাহায্যে দেখিয়াছেন যে, লজ্জাবতী লতার ভূমিতে স্থিত অংশের একটি পত্র পদদলিত হইলে সমস্ত লতাটির স্নায়ুমণ্ডলী প্রভাবিত হয় ও লতা সঙ্কুচিত হয়। যেন বিপদ সমুপাগত বুঝিয়া অন্যান্য অংশ ভয়ে সঙ্কুচিত হইয়া পড়িতেছে, এইরূপ বুঝিতে পারা যায়। আরও আশ্চর্য্যের কথা যে, উহার হরিৎ পত্রগুলি বর্ণ পরিবর্ত্তন করিয়া ধূসর বর্ণ ধারণ করে।

এই সকল আবিষ্কারের দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, উদ্ভিদরা প্রাণহীন, স্নায়ুহীন, পেশীহীন, অনুভূতিহীন স্থাবর নহে। ইহাদেরও অন্যান্য প্রাণীর মত রীতিমত অনুভূতিশক্তি আছে, ইহাদেরও প্রত্যেক অবয়ব স্নায়ু-সূত্রের দ্বারা একত্র গ্রথিত। ফলে ইহাদের অঙ্গের এক স্থানে আঘাত লাগিলে সর্ব্বাঙ্গে তাহার সাড়া পৌঁছে।

আচার্য্য জগদীশচন্দ্র এই আবিষ্কার দ্বারা জগতে অমরত্ব লাভ করিলেন, এ কথা বলাই বাহুল্য। তাঁহার গৌরবে আজ প্রাচ্য গৌরবান্বিত হইল। তাঁহার আবিষ্কারের ফলে জগতের কৃষি-রাজ্যে যুগান্তর উপস্থিত হইবে, মানবের প্রভূত মঙ্গল সাধিত হইবে। ইহা বাঙ্গালা ও বাঙ্গালীর পক্ষে কম শ্লাঘার কথা নহে।

নূতন বড়লাট

লর্ড রেডিংয়ের কার্য্যকালের অবসানের পর কোন্ ভাগ্যবান্ পুরুষ ভারতের ভাগ্যবিধাতা হইবেন, এই বিষয়ে বহু দিবস যাবৎ নানা জল্পনা-কল্পনা ও গল্প-গুজব চলিতেছিল। এত দিন পরে সকল সংশয়ের অবসান হইয়াছে, বিলাতের সরকারী সংবাদে প্রকাশ পাইয়াছে যে, অনারেবল এডোয়ার্ড উড, লর্ড রেডিংএর পর ভারতের বড়লাটের পদ গ্রহণ করিবেন। তিনি ভাইকাউন্ট হ্যালিফ্যাক্সের পুত্র এবং ভূতপূর্ব্ব ভারত-সচিব সার চার্লস উডের পৌত্র। সুতরাং তাঁহার বংশের সহিত ভারতের যে কোনও সম্পর্ক নাই, এ কথা কেহ বলিতে পারেন না।

মিঃ উড ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। প্রথমে ইটনের পাবলিক স্কুলে তাঁহার বিদ্যারম্ভ হয়, পরে অক্সফোর্ডের ক্রাইষ্ট চার্চ্চ ও অল সোলস কলেজ হইতে তিনি এম, এ, উপাধি লাভ করেন। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে তিনি পার্লামেণ্টে প্রবেশ করেন। ১৯২১-২২ খৃষ্টাব্দে তিনি ঔপনিবেশিক আণ্ডার-সেক্রেটারীর পদে নিযুক্ত হয়েন। ১৯২২ হইতে ১৯২৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি শিক্ষা-বিভাগের প্রেসিডেণ্টের পদে বসিয়াছিলেন। বর্ত্তমান বলডুইন-মন্ত্রিত্বের আমলে তিনি কৃষি-সচিবের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। সুতরাং সরকারী কার্য্যে তাঁহার ভূয়োদর্শন নাই, এমন কথাও কেহ বলিতে পারেন না।

১৯০৯ খৃষ্টাব্দে তিনি আরল অফ অন্স্লোর কনিষ্ঠা কন্যা লেডী ডোরোথি এভেলিন অগাষ্টার পাণিগ্রহণ করেন। তাঁহার তিন পুত্র ও এক কন্যা বর্ত্তমান আছেন।

ভারতের বড়লাটের পদে বসিলে তাঁহাকে নিশ্চিতই 'পিয়ার' বা লর্ডের পদে উন্নীত করা হইবে; কেন না,

ইহাই নিয়ম। তবে তিনি স্বয়ং পিয়ারের পুত্র ও উত্তরাধিকারী, সুতরাং তাঁহার পিতার জীবদ্দশায় তাঁহাকে পিয়ার করা সঙ্গত কি না, এ বিষয়ে প্রশ্ন উঠিয়াছে। কিন্তু ইহার নজীর আছে। লর্ড কার্জ্জন যখন ভারতের বড়লাটরূপে নিযুক্ত হয়েন, তখন তিনি মিঃ কার্জ্জন ছিলেন। কিন্তু তাঁহার পিতা ছিলেন ব্যারণ স্কার্সডেল। তাঁহার জীবিতাবস্থাতেই মিঃ কার্জ্জনকে লর্ড করা হইয়াছিল।

মিঃ উডের লাটপদে নিয়োগ কেন হইল, এ কথা লইয়া তর্ক উঠিয়াছে। ভারতশাসন সম্পর্কে তাঁহার কি অভিজ্ঞতা আছে, তাহা কেহ জানে না। লর্ড বার্কেনহেড ও লর্ড লিটন প্রমুখ রাজপুরুষদিগের এই পদে যখন নিয়োগের গুজব রটিয়াছিল, তখন তবু এইটুকু জানা ছিল যে, তাঁহারা ভারতের বিষয়ে যথাসম্ভব অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন। কিন্তু মিঃ উডের সম্বন্ধে এ কথা বলা যায় না। সুতরাং এই নিয়োগের কথা প্রথম প্রচারিত হইলে অনেকে বিস্মিত হইয়াছিলেন। ভারত-সম্বন্ধে তিনি যে non-entity, এ কথা অনেকের মুখে শুনা গিয়াছিল। তবে তাঁহার চরিত্র-চিত্র যে ভাবে সংবাদপত্রে চিত্রিত হইয়াছে, তাহা হইতে কেহ কেহ বুঝিয়াছেন, এ নিয়োগের মূলে সঙ্গত কারণ বিদ্যমান আছে।

শুনা যায়, পার্লামেন্টের হাউস অফ কমন্স সভায় মিঃ উডের ব্যক্তিত্ব ও বিশেষত্ব স্বীকৃত হয়। যাঁহারা তাঁহার রাজনীতিক অভিমত সমর্থন করেন না, তাঁহারাও নাকি তাঁহার তীক্ষ্ণ মেধা ও চরিত্রের মধুরতায় মুগ্ধ। অনেকে তাঁহাকে আধুনিক কালের ইংরাজদের মধ্যে উচ্চাঙ্গের রাজনীতিক বলিয়া মনে করেন। তাঁহার রাজনীতিক মত উচ্চাঙ্গের নৈতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া বিলাতে স্বীকৃত হয়। তিনি স্বয়ং জ্ঞানী ও বিদ্বান্, এ কথা সত্য, কিন্তু তাহা বলিয়া অশিক্ষিত বা অর্দ্ধশিক্ষিত লোকের প্রতি তাঁহার আন্তরিক সহানুভূতির অভাব নাই। তাঁহার অন্তর দয়া ও কোমলতায় পূর্ণ, তিনি ধার্ম্মিক, তিনি চিন্তাশীল, তিনি ওজন করিয়া কথা বলেন, তাঁহার বক্তৃতায় ভাব-প্রবণতা নাই। তিনি স্বয়ং কনজারভেটিব বটে, তথাপি শ্রমিকদিগের সুখ-দুঃখে তাঁহার পূর্ণ সহানুভূতি আছে। নিকৃষ্ট বলিয়া গৃহীত মানবের অভাব-আকাঙ্ক্ষার কথা তিনি সম্যক অবগত আছেন। এক সময়ে তিনি বলিয়াছিলেন,—"শিক্ষায় আমরা যে প্রচুর অর্থ ব্যয় করিতেছি, আমরা ভাবি, উহা দ্বারা আমাদের রাজনীতিক সমস্যার বহুল পরিমাণে সমাধান হইবে। কিন্তু আমার মনে হয়, এই অর্থব্যয়ে ভস্মে ঘৃতাহুতি দেওয়া হইতেছে। গৃহহীনের আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা, বেকারের অন্নসংস্থানের বন্দোবস্ত করা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। যে অর্থ আমরা জনসাধারণকে শিক্ষিত করিবার জন্য ব্যয় করি, তাহার সঙ্গে সঙ্গে যদি তাহাদের ভাল আশ্রয়স্থান নির্ম্মাণে এবং জীবিকার্জ্জনের বন্দোবস্ত উপলক্ষে ব্যয় করি, তবেই শিক্ষাদানের সার্থকতা থাকে, অন্যথা নহে।"

আর একবার তিনি বলিয়াছিলেন,—"মানুষের জীবনে রাজশক্তি ও প্রজাশক্তির মধ্যে সামঞ্জস্য-বিধান করাই রাজনীতির প্রধান লক্ষ্য হওয়া কর্ত্তব্য। লোকের ব্যক্তিগত অধিকার ও সমাজের সমষ্টিগত অধিকারের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করিতে পারিলে রাজনীতির সার্থকতা সম্পন্ন হইবে। ব্যষ্টির কার্য্যশক্তি ও উন্নতি-বিধান করিতে না পারিলে সমষ্টির পুষ্টি ও বৃদ্ধি হইতে পারে না। অন্য দিকে সমষ্টির প্রতি ব্যষ্টির—সমাজের প্রতি মানুষের ব্যক্তিগতভাবে কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব আছে। মানুষ সমাজবদ্ধ জীব হিসাবে সমাজের শৃঙ্খলা ও উন্নতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আপনার অধিকার ও স্বাধীনতা উপভোগ করিলে মানুষ ও সমাজের মধ্যে অধিকারের সামঞ্জস্যবিধান সম্ভবপর হয়।"

মানুষের মনের ভাব বুঝিতে পারিলে মানুষকে চিনিতে পারা যায়। এ ক্ষেত্রে মিঃ উডের মনোভাব এবং চরিত্র-চিত্র যে ভাবে অঙ্কিত হইয়াছে, তাহাতে মনে হয়, মিঃ উড ভারতের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা হইয়া আসিলে হয় ত ভারতের আশা-আকাঙ্ক্ষা সফল হইতে পারে। তিনি দরিদ্র আশ্রয়হীনের এবং বেকারের দুঃখ বুঝেন, লোকের ব্যক্তিগত অধিকার ও স্বাধীনতার মর্য্যাদা উপলব্ধি করেন। ভারতের বড়লাটের পক্ষে বর্ত্তমানে ইহাই ত প্রয়োজন। কিন্তু আমরা ঘরপোড়া—

'সিন্দুরে' মেঘ দেখিলে ভয় পাই। এ দেশে বহু ইংরাজ রাজনীতিক বহু উচ্চ আদর্শ লইয়া দেশ শাসন করিতে আইসেন। দুঃখ এই, সুয়েজ খালে প্রবেশের পূর্ব্বে তাঁহাদের সে আদর্শ ভূমধ্যসাগরেই বিসর্জ্জিত হয়। বেশী দিনের কথা নহে, বিলাতের প্রধান বিচারপতি লর্ড রেডিং বোম্বাই বন্দরে পদার্পণ করিয়া ভারতকে আশা দিয়া বলিয়াছিলেন, "আমি ভারতে ন্যায় ও ধর্ম্মের মুখ চাহিয়া সুবিচার করিতে আসিয়াছি।" তিনি স্বয়ং বিচারপতি, সুতরাং তাঁহার মুখে এ কথা শোভনই হইয়াছিল। কিন্তু প্রায় পঞ্চ বৎসর শাসনের পর লর্ড রেডিং ভারতকে কি দিয়া যাইতেছেন?—বে-আইনী বিধিবজ্র, বিনা বিচারে আটক ও কারাদণ্ড। লর্ড কার্মাইকেল এই বাঙ্গালা দেশের সুপেয় পানীয়ের অভাব মোচন করিবার সাধু উদ্দেশ্য লইয়া এ দেশে আসিয়াছিলেন, তাঁহার সেই উদ্দেশ্য কতদূর সফল হইয়াছে? লর্ড রোণাল্ডশে হুক-ওয়ার্ম ও কচুরিপানা ধ্বংসের সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, সে সঙ্কল্প কতটা কার্য্যে পরিণত হইয়াছে?

ফল কথা, যে সিভিলিয়ানী ইস্পাতের কাঠাম ভারতকে নাগপাশের মত অষ্টপৃষ্ঠে বন্ধন করিয়া রাখিয়াছে, তাহার প্রভাব মুক্ত হইয়া ইচ্ছাসত্ত্বেও কেহ ভারতের মঙ্গলবিধান করিতে পারেন না। সিবিলিয়ানি চক্রব্যূহ ভেদ করিয়া আপন ব্যক্তিত্ব ফুটাইয়া তুলিতে যদি কেহ সমর্থ হয়েন, তবেই তাঁহার কার্য্যের সার্থকতা থাকে, অন্যথা নহে।

মিঃ উড বর্ত্তমানে ইংলণ্ডের কৃষি-সচিব। বর্ত্তমান ভারত-সচিব লর্ড বার্কেনহেড ভারত সম্পর্কে তাঁহার বিখ্যাত বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন যে, অতঃপর ভারতের কৃষি সম্বন্ধে রীতিমত উন্নতি বিধান করা হইবে। তাই কি বড়লাট পদে মিঃ উডের নিয়োগ হইয়াছে? কে জানে! মিঃ উড কি সিবিলিয়ানি চক্রব্যূহ ভেদ করিয়া ভারতের কৃষির উন্নতিবিধান করিতে সমর্থ হইবেন? ভবিষ্যৎই তাহা বলিয়া দিবে।
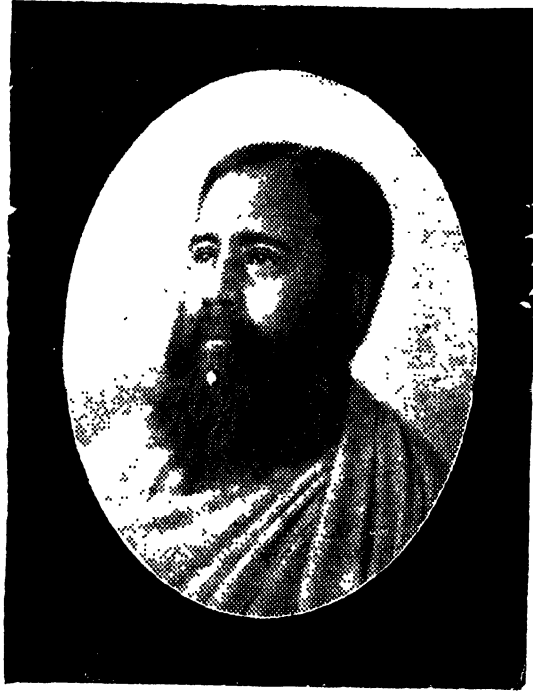
অধ্যক্ষ সারদারঞ্জন

অধ্যক্ষ সারদারঞ্জন

বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যক্ষ সারদারঞ্জন রায় গত ১৫ই কার্ত্তিক রবিবার ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় ছাত্রপ্রিয় অধ্যাপক ও অধ্যক্ষ আধুনিক কালে বিরল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তিনি একাধারে বিদ্বান্, গণিতজ্ঞ, সংস্কৃতজ্ঞ ও ব্যায়ামবিদ্ ছিলেন। তাঁহার সংস্কৃত ব্যাখ্যা পুস্তক আদর্শস্থানীয় বলিয়া ছাত্রমণ্ডলীর মধ্যে গৃহীত। দীর্ঘ ৭০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তিনি প্রফুল্ল আনন এবং বলিষ্ঠ ও দীর্ঘোন্নত দেহ অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ছাত্রগণের সহিত নানাবিধ ব্যায়াম-ক্রীড়ায় তিনি যুবকের উৎসাহ ও আগ্রহ প্রদর্শন করিতেন। পরিণত বয়স অবধি তিনি নিত্য দীর্ঘপথ ভ্রমণ ও গঙ্গাস্নান করিতেন। আমরা তাঁহাকে বহু দিবস যাবৎ 'বাবু ঘাটে' গঙ্গাস্নান করিতে ও পদব্রজে গৃহে প্রত্যাগমন করিতে দেখিয়াছি। বাঙ্গালী ছাত্রদিগের মধ্যে তিনি ক্রিকেট খেলার প্রসার বৃদ্ধি করিয়াছিলেন

এবং সর্ব্ববিধ ব্যায়াম চর্চ্চায় তিনি ছাত্রবর্গকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন।

সারদারঞ্জনের নিবাস ময়মনসিংহ জিলায় মসুয়া গ্রামে। তিনি সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ময়মনসিংহ স্কুল হইতে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর একে একে এফ, এ, বি, এ, ও এম, এ পরীক্ষায় সাফল্য লাভ করেন। গণিত শাস্ত্রে এম, এ উপাধি লাভ করিয়া তিনি প্রথমে ঢাকা কলেজে অধ্যাপকের কার্য্য গ্রহণ করেন। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে পরলোকগত বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহাকে তাঁহার মেট্রোপলিটন কলেজে অধ্যাপকের পদে ব্রতী করেন এবং তদবধি সেই কলেজেই তিনি অধ্যাপনা করিতেছিলেন। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে তিনি ভাইস-প্রিন্সিপালের পদে উন্নীত হয়েন এবং বিখ্যাত অধ্যক্ষ নগেন্দ্রনাথ ঘোষের দেহাবসানের পর তিনি বিদ্যাসাগর কলেজে অধ্যক্ষতা করিয়া আসিতেছিলেন।

তাঁহার শারীরিক বল অসাধারণ ছিল। একবার ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষ মিষ্টার বুথের সহিত তাঁহার শক্তিপরীক্ষা হইয়াছিল। নির্ভীক ও তেজস্বী সারদারঞ্জন সে সময়ে নিজের আত্মসম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন।

সারদারঞ্জনের ভ্রাতৃগণ কৃতবিদ্য, স্বনামধন্য। উপেন্দ্রকিশোর কলাবিদ্, চিত্রে ও সঙ্গীতে তিনি অসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। হাফটোনের কার্য্যে ইউ, রায়ের নাম সর্ব্বত্র পরিচিত। কুলদারঞ্জন শিল্পে ও শিশু-সাহিত্য রচনায় সুনাম অর্জ্জন করিয়াছিলেন। অধ্যাপক মুক্তিদারঞ্জন অধ্যাপনায় ও ক্রিকেট খেলায় ভ্রাতারই মত প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।

অধুনা সারদারঞ্জনের মত বাঙ্গালীর সংখ্যা হ্রাস হইয়া আসিতেছে। তেজস্বিতা, নির্ভীকতা, শক্তিশালীনতা, বিদ্যাবত্তা প্রভৃতি সদ্‌গুণে সারদারঞ্জন অলঙ্কৃত ছিলেন। বর্ত্তমান যুগের শিক্ষিত বাঙ্গালীদের মধ্যে অনেকেই তাঁহার ছাত্র। তাঁহারা গুরুর পদাঙ্ক অনুসরণ করিলে বাঙ্গালা ও বাঙ্গালী জাতির মঙ্গল হইবে সন্দেহ নাই।

রেল-সংঘর্ষ

গত ১৬ই অক্টোবর রাত্রি প্রায় দুইটার সময় পূর্ব্ববঙ্গ রেলপথে কলিকাতা হইতে প্রায় ১ শত মাইল দূরে হালসা ষ্টেশনের নিকটে ৮ নং ডাউন ঢাকা মেলের সহিত ৩৭ নং আপ পার্শেল ট্রেণের এঞ্জিনের এক ভীষণ সংঘর্ষ হইয়া গিয়াছে। ঢাকা মেলে পূজার অবকাশের পর বিস্তর যাত্রী কলিকাতায় কর্ম্মস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিল; সুতরাং গভীর রাত্রিকালে ঝড়বৃষ্টির সময় এইরূপ দৈবদুর্ঘটনায় হতাহতের সংখ্যা অধিক হওয়াই সম্ভব। অথচ সরকারী ঘোষণায় প্রকাশ, হতাহতের সংখ্যা সামান্য। কোন কোন প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনায় কিন্তু এ বিবরণ সমর্থিত হয় না। রেল কোম্পানী হালসার ৩ জন রেলকর্ম্মচারীকে অপরাধী করিয়াছেন, তাহাদের বিচার হইবে। কিন্তু কেবল এই ভাবে এত বড় গুরু দায়িত্ব সামান্য বেতনভুক্ কর্ম্মচারীদের স্কন্ধে ন্যস্ত করিলে সরকারের দায়িত্ব ঘুচে না। কোনও অবসরপ্রাপ্ত রেল-কর্ম্মচারী সংবাদপত্রে লিখিয়াছেন যে, এই সমস্ত রেল-কর্ম্মচারীর কর্ত্তব্যের বোঝা অত্যধিক, অথচ বেতন তাহার তুলনায় যৎসামান্য। এ অবস্থায় রেল-কর্ম্মচারীর অবস্থার ও সংখ্যার উন্নতিবিধান করা সরকারের কর্ত্তব্য আছে কি না, প্রথমেই বিবেচ্য। তাহার পর আর একটা কথা, আহতদিগের উদ্ধার-সাধনে যে রিলিফ-ট্রেণ প্রেরিত হইয়াছিল, তাহা প্রত্যূষে সাড়ে ৬টার পূর্ব্বে হালসা ষ্টেশনে পৌছে নাই। এমন অনেক আহত ছিল, যাহারা সময়ে সাহায্য প্রাপ্ত হইলে হয় ত বাঁচিতে পারিত। দ্বিজেন্দ্রনাথ ভৌমিকের শোচনীয় মৃত্যু ইহার জলন্ত দৃষ্টান্ত। কেন এমন হইয়াছিল? আজ যদি বিলাতে এমন অযোগ্যতা প্রদর্শিত হইত, তাহা হইলে কি হইত? এ দেশের লোকের জীবনের কি মূল্য নাই? আমাদের আশা আছে, এই ব্যাপারের এই স্থানে যবনিকাপাত হইবে না। জনসাধারণ সমস্বরে এ বিষয়ে সরকারের নিকট কৈফিয়ৎ চাহিতে দ্বিধা করিবেন না, এমন আশা আমরা অবশ্যই করিতে পারি।

শাসন-পরিষদে সতীশরঞ্জন

বাঙ্গালার এডভোকেট-জেনারেল শ্রীযুক্ত সতীশরঞ্জন দাশ মহাশয় বড়লাটের শাসন-পরিষদের আইন-সচিবের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। ইংরাজ-শাসিত ভারতে বড় লাটের শাসন-পরিষদের আইন সচিবের পদ সর্ব্বোচ্চ রাজপুরুষ বড় লাটেরই নিম্নে। এই পদে এ যাবৎ এই কয় জন ভারতবাসী নিযুক্ত হইয়াছেন,—(১) লর্ড সিংহ, (২) সার আলি ইমাম, (৩) ডাক্তার সার তেজ বাহাদুর সপরু, (৪) সার মিঞা মহম্মদ সফি, (৫) সার বেয়া নরসিংহ শর্ম্মা। সতীশরঞ্জন সার নরসিংহের পর ভারতের আইন-সচিব হইলেন।

শ্রীযুত সতীশরঞ্জন দাশ।

লর্ড ক্লাইভ যখন পলাশী যুদ্ধ-জয়ের পর বাঙ্গালার গভর্ণর নিযুক্ত হয়েন, তখন হইতেই গভর্ণরের একটা কাউন্সিলের (শাসন-পরিষদের) অস্তিত্ব ছিল। এই কাউন্সিলের ক্ষমতা ও অধিকার তখন সামান্য ছিল না। ক্লাইভ প্রথম বাঙ্গালা শাসনের পর যখন স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন, তখন গভর্ণরের কাউন্সিল বাঙ্গালার নবাব মিরজাফরকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া মীর কাসিমকে নবাবের তক্তে বসাইয়াছিলেন। তাঁহাদের ক্ষমতা তখন এমনই ছিল। তাঁহারা রাজা ভাঙ্গিতে গড়িতে পারিতেন। তবে তখনকার কাউন্সিলে ও এখনকার কাউন্সিলে প্রভেদ এই যে, কাউন্সিলে তখন বৃটিশ জাতীয় সদস্যই নিযুক্ত হইত, এ দেশীয়ের তখন ঐ পদে সমাসীন হওয়া স্বপ্নের কথা ছিল।

নবাব মীর কাসিমের সহিত যখন বাঙ্গালার ইংরাজ কর্তৃপক্ষের অন্তর্বাণিজ্য শুল্ক লইয়া মনোবাদ ঘটে, তখন গভর্ণর ভান্সিটার্টের কাউন্সিল বা শাসন-পরিষদের অন্যতম সদস্য ওয়ারেণ হেষ্টিংস নবাবকে সমর্থন করিয়াছিলেন। তাহার পর যখন ওয়ারেণ হেষ্টিংস গভর্ণর হয়েন, তখন ইংলণ্ডের রাজা তৃতীয় জর্জ্জের প্রধান মন্ত্রী লর্ড নর্থ ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে Regulating Act অর্থাৎ ভারত-শাসন নিয়ন্ত্রণ আইন পাশ করেন। ঐ আইনের সর্ত্তানুসারে দেশের শাসনভার Governor General in Council এর হস্তে অর্পিত হয়। কর্ণেল মনসন, জেনারেল ক্লেভারিং, সার ফিলিপ ফ্রান্সিস এবং রিচার্ড বারওয়েল এই চারি জন কাউন্সিলের সদস্য নিযুক্ত হয়েন। তাঁহাদের ক্ষমতা ও অধিকার সামান্য ছিল না। তখন মাঝে মাঝে এমন অবস্থা দাঁড়াইত যে, গভর্ণর-জেনারল বড় কি কাউন্সিল বড়, ইহা মীমাংসিত হইত না। সুতরাং এখনকার Reforms Act অনুসারে যে কাউন্সিল হইয়াছে, তাহা যে প্রাচীনকালের কাউন্সিল অপেক্ষা অধিক ক্ষমতা ও অধিকার ভোগ করে, এমন কথা বলা যায় না। এখনকার কাউন্সিলে (শাসন-পরিষদে) প্রধান সেনাপতি ব্যতীত ৭ জন সদস্য আছেন, তাঁহাদের মধ্যে ভারতীয়েরও স্থান হইয়াছে, এ কথা সত্য; বড় লাট কোনও কোনও স্থলে তাঁহাদের মতে সম্মতি প্রদান করেনও বটে, কিন্তু অনেক স্থলে তাঁহাদের মত উপেক্ষিত হয়—বড় লাট তাঁহার ইচ্ছানুসারে কার্য্য করিয়া থাকেন। বড় লাটের স্বেচ্ছামূলক কার্য্যে বাধা প্রদান করিবার এখনকার কালের কাউন্সিলের কোনও ক্ষমতা নাই। পঞ্জাবে যখন

সামরিক' আইন বহাল হয়, বিধিবজ্র প্রয়োগে বিনা-বিচারে যখন এ দেশের লোকের কারাদণ্ড হয়, এ দেশীয় জনতার উপর যখন অনাবশ্যক গুলী বর্ষণ করা হয়, প্রবাসে এ দেশীয়ের উপর অত্যাচারের বিরুদ্ধে যখন প্রতিবাদ উত্থাপিত করা হয়,—তখন শাসন-পরিষদের কোনও ভারতীয় সদস্যই এ যাবৎ তাহা নিবারণ করিতে সমর্থ হয়েন নাই। এই কারণে এ দেশীয়ের এই উচ্চপদে নিয়োগে আমাদের আশা করিবার বিশেষ কিছু নাই। তবে এত বড় উচ্চপদে ভারতীয়ের নিয়োগ,—এবং এই ভাবের নিয়োগের জন্ত কংগ্রেস এত দিন আন্দোলন করিয়া আসিয়াছে, সুতরাং ইহাতে যে আনন্দ প্রকাশের কারণ আছে, ইহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে।

বড় লাট লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্কের শাসনকালে ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে সর্ব্বপ্রথমে ভারতীয়গণকে উচ্চ রাজকার্য্যে গ্রহণ করিতে আরম্ভ করা হয়। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে 'চার্টার এ্যাক্ট' বিধিবদ্ধ হয়। টমাস ব্যাবিংটন মেকলে (পরে লর্ড মেকলে) এই সময়ে বিলাতের বোর্ড অফ কণ্ট্রোলের সেক্রেটারী ছিলেন। ঐ বিল যখন পার্লামেণ্টে উপস্থাপিত হয়, তখন মেকলে যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহা ইতিহাসপ্রথিত হইয়া আছে। তিনি এক স্থানে বলিয়াছিলেন, "আমাদের দেশের কোলবামফিল্ডে যদি মারামারিতে কাহারও মাথা ফাটে, তাহা হইলে বিলাতে যে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হয়, ভারতে তিনটা ভীষণ যুদ্ধ হইয়া গেলেও এ দেশে তাহার একার্দ্ধও হয় না।" বস্তুতঃ মেকলেই প্রথমে ভারতের দিকে তাঁহার দেশবাসীর সম্যক্ দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং ভারতীয়দের স্বার্থে এবং কল্যাণে শাসনযন্ত্র নিয়ন্ত্রিত করিতে বলেন। চার্টার এ্যাক্ট পাশ হওয়ায় মেকলের এক সুবিধা হইয়াছিল। ঐ এ্যাক্টের এক সর্ত্ত ছিল যে, কলিকাতার সুপ্রীম কাউন্সিলের অন্ততঃ এক জন সদস্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর চাকুরীয়া না হয়, এরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে। মেকলে ঐ পদ-প্রাপ্ত হইয়া ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে ভারতে পদার্পণ করেন। মেকলে লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্কের শাসনকালে ভারত সরকারের সুপ্রিম কাউন্সিলের আইন-সচিব হইয়াছিলেন। আইন-সচিবরূপে তিনি এই কয়টি কার্য্য করিয়াছিলেন :—

(১) সংবাদপত্রের রচনার প্রতি দৃষ্টি রাখিবার ও উহা সংযত করিবার নিমিত্ত সরকারের সেনসর ছিলেন। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে মেকলের চেষ্টায় উহা উঠিয়া যায়। মেকলে সেই সময়ে কোর্ট অফ ডাইরেক্টরদিগকে জানাইয়াছিলেন,—"সংবাদপত্র সাধারণের উপকার করে। অনেক সময়ে সংবাদপত্র অত্যাচার অনাচারের কথা সরকারের গোচর করে, সংবাদপত্র না থাকিলে হয় ত ঐ সমস্ত কথা সরকারের জানিবার উপায় থাকিত না। সংবাদপত্রের আলোচনা হেতু রাজকর্ম্মচারীরা সর্ব্বদা সতর্ক ও সশঙ্ক থাকিতে বাধ্য হয়। সংবাদপত্র দেশের শাসনকার্য্যকে কতকটা পবিত্র ও দোষরহিত করিয়া থাকে।"

(২) ব্ল্যাক এ্যাক্ট পাশ করিয়া মেকলে এ দেশে শ্বেতকায়ের একটা অন্যায় একচেটিয়া অধিকার লুপ্ত করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বে মফঃস্বলবাসী য়ুরোপীয়রা তাহাদের দেওয়ানী মামলার আপীল কলিকাতার সুপ্রিম কোর্টে আনয়ন করিবার অধিকার উপভোগ করিত। ইহাতে সুবিধা এই ছিল যে, সুপ্রিম কোর্টের জজরা রাজার অধীন এবং বিলাত হইতে আগত বলিয়া য়ুরোপীয় অপরাধীর অপরাধ লঘুভাবে বিচার করিত। মেকলের আইনে স্থির হইল, অতঃপর ঐ শ্রেণীর আপীলের মফঃস্বলের সদর কোর্টে শুনানী হইবে। এই কোর্টের বিচারকরা ছিলেন কোম্পানীর চাকুরীয়া। ইহাতে মেকলের বিরুদ্ধে কলিকাতার মুষ্টিমেয় য়ুরোপীয় সমাজ তাঁহাকে 'জুয়াচোর,' 'পাজী,' প্রভৃতি সুমিষ্ট সম্বোধন করিতে পশ্চাৎপদ হয় নাই। এই আন্দোলন কতকটা ইলবার্ট বিলের আন্দোলনের আকার ধারণ করিয়াছিল। মেকলে সেই সময়ে বলিয়াছিলেন,—"আমার মতে সদর কোর্টে আপীল আনয়নে বাধ্য করিবার প্রধান কারণ এই যে, সদর কোর্টে দেশীয়রা সুবিচার পাইবে।" অন্যত্র,—"আমি মনে করি, এই আইন পাশ করা এ দেশের পক্ষে মঙ্গলজনক। উহা পাশ করিবার ইহাই উপযুক্ত সময়। কলিকাতার মুষ্টিমেয় য়ুরোপীয় সমাজের প্রতিনিধি অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান পত্রগুলা প্রত্যহ চীৎকার করিতেছে,—'আমরা বিজেতা, আমরাই দেশের মালিক, আমরা শ্রেষ্ঠ জাতি।

আমাদের অধিকার নষ্ট করিতে এ দেশে কেহ পারে না, কেন না, আমরা পার্লামেন্টের প্রতিনিধি ব্যতীত অন্ত কাহারও অধীন নই।' উহারা আমাদিগকে বলিতেছে, আমরা স্বাধীনতার শত্রু, কেন না, আমরা মুষ্টিমেয় শ্বেতাঙ্গ অভিজাত সম্প্রদায়কে এ দেশের লক্ষ লক্ষ কৃষ্ণাঙ্গের উপর অন্যায় প্রভুত্ব করিবার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছি! এই নীতি যুক্তিতর্ক, ন্যায়বিচার, বৃটিশের সুনাম এবং ভারতীয়দের স্বার্থের ঘোর প্রতিকূল। যদি এই নীতি অনুসারে রাজ্যশাসন করা সাব্যস্ত হয়, তাহা হইলে এই মুহূর্ত্তে আমাকে সরকারী কার্য্য হইতে বরখাস্ত করা হউক, আমি আমার পদত্যাগপত্র দাখিল করিতেছি।"

বুঝিয়া দেখুন, সেই সুদূর অতীতে কাউন্সিলের আইন সচিবের কিরূপ স্বাধীনতা, তেজস্বিতা, সত্যপ্রিয়তা ও ন্যায়বাদিতা ছিল। কেবল এই সকল গুণ নহে, তাঁহাদের ক্ষমতাও কত অধিক ছিল! ইচ্ছা করিলে তাঁহারা অন্যায়ের বিরুদ্ধে এ দেশের ও বিলাতের সরকারকে নূতন আইন প্রণয়ন করাইতে পারিতেন, তাঁহাদের অরণ্যে রোদনই সার হইত না। উদ্দেশ্য সফল না হইলে তাঁহারা চাকুরী আঁকড়িয়া বসিয়া থাকিতেন না, তেজস্বিতার সহিত চাকুরীতে ইস্তফা দিতেন।

এতদ্ব্যতীত মেকলে শিক্ষাসংস্কারে ও ভারতীয় দণ্ডবিধি আইন প্রণয়নে যে সহৃদয়তা ও সার্ব্বজনীন প্রীতির পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহাও ইতিহাসপ্রথিত হইয়া থাকিবে। মেকলে ইংরাজী শিক্ষার বিস্তার প্রয়াসে বলিয়াছিলেন,—এমন দিন আসিবে, যখন এই শিক্ষার সুবিধা পাইয়া এ দেশের লোকরাও এক দিন ইংরাজের মত স্বায়ত্ত-শাসনাধিকার প্রার্থনা করিবে; সেই দিন ইংরাজের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা গৌরবের দিন হইবে সন্দেহ নাই।

লর্ড ড্যালহাউসির শাসনকালে আইন-সচিব মিঃ বেথুন শিক্ষাবিভাগে কত জনহিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাহা ইতিহাসজ্ঞমাত্রই অবগত আছেন। তখনকার কাউন্সিল ও আইন-সচিবে এবং এখনকার কাউন্সিল ও আইন-সচিবে কত প্রভেদ! তখনকার দিনে আইন-সচিব মেকলে এ দেশের লোকের স্বার্থরক্ষার জন্য স্বদেশীয় স্বজাতীয়গণের বিরুদ্ধে অকুতোভয়ে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন এবং উদ্দেশ্য সফল না হইলে পদত্যাগ পর্য্যন্ত করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। আর এখন? এখন দেশের লোকের বিনা বিচারে বে-আইনী আইনের জোরে জেল হইলেও দেশীয় আইন-সচিব অম্লানচিত্তে স্বপদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া চাকুরীর মোটা বেতন সহাস্যাননে ঘরে লইয়া যায়েন!

যাহা হউক, লর্ড বেণ্টিঙ্কের শাসনকালের সেই ১৮৩১ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের লর্ড মিণ্টোর আমলের মর্লেমিণ্টো রিফরমের মধ্যে সুদীর্ঘ ৭৮ বৎসরে ভারতীয়রা ইংরাজী শিক্ষা-দীক্ষায় অভ্যস্ত হইলেও বিশ্বাসী বা দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন বলিয়া রাজদ্বারে বিবেচিত হয় নাই,—এখনও যে হইয়াছে, তাহারও প্রমাণ নাই।

১৮৬১ খৃষ্টাব্দে বড় লাট লর্ড ক্যানিং শাসনের প্রত্যেক বিভাগে শাসন-পরিষদের এক এক জন সদস্যকে নিযুক্ত করেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি তাঁহার শাসন-পরিষদের British Cabinet বা মন্ত্রিসভার মত করিয়া গড়িয়া তুলেন। এখন সেই আদর্শ অনুসৃত হইতেছে।

১৯০৯ খৃষ্টাব্দে মর্লে-মিণ্টোর "ইণ্ডিয়া কাউন্সিল এ্যাক্ট" বিধিবদ্ধ হয়। ঐ সময়ে লর্ড সিংহ (তখন সার সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন) বড় লাটের কাউন্সিলের (শাসন পরিষদের) সদস্য (আইন-সচিব) নিযুক্ত হয়েন। তাঁহার পূর্ব্বে কোনও ভারতবাসীই এই উচ্চ পদ প্রাপ্ত হয়েন নাই।

১৯১৯ খৃষ্টাব্দে মণ্টেগু-চেমসফোর্ডের "রিফরম এ্যাক্ট" বিধিবদ্ধ হয়। এখন ঐ আইনের আমল চলিতেছে। উহার প্রভাবে এখন বড় লাটের শাসন-পরিষদে কমাণ্ডার ইন-চিফ (জঙ্গী লাট) ব্যতীত ৭ জন সদস্য আছেন। কোনও কোনও ক্ষেত্রে বড় লাট তাঁহাদের অভিমতে সম্মতি প্রদান করিয়া থাকেন; কিন্তু কোনও কোনও ক্ষেত্রে তাঁহাদের অভিমত উপেক্ষিত হয়; বড় লাট স্বেচ্ছানুসারে কার্য্য করিয়া থাকেন।

বাঙ্গালার এডভোকেট জেনারল শ্রীযুক্ত সতীশরঞ্জন দাশ সম্প্রতি এই শাসন-পরিষদের আইন-সচিবের স্থানে নিযুক্ত হইয়াছেন।

সতীশরঞ্জন ভবানীপুর রসারোডে ১৮ই ফাল্গুন, ১২৭৮ সালে (ইংরাজী ২৯শে ফেব্রুয়ারী ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে)

জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতার নাম দুর্গামোহন দাশ। চিত্তরঞ্জন তাঁহার খুল্লতাত ভুবনমোহনের পুত্র ছিলেন।

বাল্যে স্বগৃহে দেশমান্যা শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুর পিতা পরলোকগত ডাক্তার অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের নিকট সতীশরঞ্জন ২ বৎসরকাল প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন।

দ্বাদশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তিনি বিদ্যাশিক্ষার্থ বিলাত যাত্রা করেন। মিঃ আমেদ, কে গজনভি এবং পরলোকগত মনোমোহন ঘোষের পুত্র মতিমোহন ঘোষ তাঁহার সহযাত্রী ছিলেন।

সতীশরঞ্জন ম্যাঞ্চেষ্টারের এক পাবলিক স্কুলে প্রবেশ করেন। ইহার পর তিনি সিবিল সার্ভিস পরীক্ষার্থ আত্মনিয়োগ করেন। কিন্তু উহাতে অকৃতকার্য্য হইয়া যখন তিনি ও যুবক গজনভি লণ্ডনের পাটইস স্কোয়ারের রেণ এণ্ড কার্ণিয়ি বিদ্যাগারে সিবিল সার্ভিস পরীক্ষোপযোগী শিক্ষা লাভে নিযুক্ত ছিলেন, সেই সময়ে সেই স্থানে সার জন কার ও সার হেনরী হুইলারও বিদ্যাশিক্ষা করিতেছিলেন।

ইহার পর তিনি ব্যারিষ্টারী পরীক্ষার জন্য মিডল টেম্পলের আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং উহাতে উত্তীর্ণ হইয়া ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। উহার ৩ মাস পূর্ব্বে তিনি (ব্রহ্মের এডভোকেট, অধুনা পরলোকগত) মিঃ পি, সি, সেনের (প্রসন্নকুমারের) প্রথমা কন্যাকে বিবাহ করেন। এই প্রসন্নকুমারই ইতঃপূর্ব্বে সতীশরঞ্জনের পিতা দুর্গামোহনের নিকট ৩ হাজার টাকা পাইয়া বিলাতযাত্রা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সতীশরঞ্জনের এই প্রথমা পত্নী স্বয়ং গ্রাজুয়েট ছিলেন। সেই সময়ে সতীশরঞ্জন মাসিক ৪০ টাকা ভাড়ায় বিডন ষ্ট্রীটের একটি ক্ষুদ্র বাসা-বাড়ীতে অবস্থান করিতেন। প্রথমা স্ত্রীর গর্ভে তাঁহার কোনও সন্তান হয় নাই। ইহার পর তিনি মিঃ বি, এল, গুপ্তের কন্যা শ্রীমতী বনলতাকে বিবাহ করিয়াছেন। তিনি এখন বিলাতে তাঁহার পুত্রদিগের নিকটে আছেন, কনিষ্ঠ মিলহিল স্কুলে পাঠ করিতেছে, জ্যেষ্ঠ কেম্ব্রিজের ইমানুয়েল কলেজে শিক্ষালাভ করিতেছে, মুখ্যতঃ স্ত্রী-পুত্রদিগকে দেখিবার নিমিত্তই সতীশরঞ্জন সম্প্রতি বিলাত গিয়াছিলেন।

সতীশরঞ্জন ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে ষ্ট্যাণ্ডিং কাউন্সেল হয়েন। এবং ১৯২২ খৃষ্টাব্দে পাকাপোক্তরূপে বাঙ্গালার এডভোকেট জেনারল হয়েন। এইবার তিনি বড় লাটের শাসনপরিষদের আইন-সচিব হইলেন।

সতীশরঞ্জন রাজনীতিতে মডারেট আখ্যা লাভ করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার এই উচ্চপদে নিয়োগ ব্যুরোক্রেশীর অভিপ্রায়ের অনুরূপ হইয়াছে এবং তাঁহার দ্বারা দেশের প্রকৃত উন্নতি কোনক্রমে সম্ভব হইবে না, এই কথা উঠিয়াছে। দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় ব্যুরোক্রেশীর মনোনীত রাজকর্ম্মচারীর দ্বারা দেশের প্রকৃত উন্নতি সম্ভবপর হইতে পারে, এ বিশ্বাস আমাদের নাই। কোনও চরমপন্থীর দ্বারাও বিশেষ কার্য্য সম্ভব হয়, তাহাও নহে; কেন না, চরমপন্থী পাটে বসিলে সহযোগের আবহাওয়ায় তাঁহার ব্যক্তিত্ব হারাইয়া ফেলেন, এমন দৃষ্টান্তেরও অভাব নাই। পরলোকগত সার সুরেন্দ্রনাথ তাঁহার প্রথম রাজনীতিক জীবনে বিষম চরমপন্থী বলিয়া সরকারের দ্বারা বিবেচিত হইয়াছিলেন। কিন্তু যদবধি তিনি মন্ত্রী সার সুরেন্দ্রনাথ হইয়াছিলেন, তদবধি তিনি ব্যুরোক্রেশীর স্বেচ্ছাচারের বিপক্ষে আপন অস্তিত্ব প্রতিপন্ন করিতে পারেন নাই। হয় ত তাঁহার মনের ইচ্ছা ভিন্নরূপ ছিল, কিন্তু বর্ত্তমান শাসনপ্রথা যে ভাবে গঠিত, তাহাতে তাঁহার ইচ্ছা সত্ত্বেও তিনি কিছু করিয়া উঠিতে পারেন নাই। তিনি চিরদিনই নিয়মানুগ (constitutional) পথে চলিয়াছিলেন, সহযোগের দ্বারা দেশের মুক্তিতে দৃঢ়বিশ্বাসী ছিলেন; সুতরাং প্রবল ব্যুরোক্রেশীর সহিত সহযোগ করিয়া যতদূর সম্ভব মুক্তির পথ প্রশস্ত করা তাঁহার নীতি ছিল।

সতীশরঞ্জনও সার সুরেন্দ্রনাথের মত নিয়মানুগ পথের পথিক, সহযোগকামী। তাঁহার letter to my son বা পুত্রের প্রতি পত্র যাঁহারা মনোযোগ সহকারে পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাই তাহার রাজনীতির মূলনীতি বুঝিতে পারিয়াছেন। আমরা তাঁহার সেই পত্রের এক সময়ে সমালোচনা করিয়াছিলাম। উহাতে বুঝাইবার

প্রয়াস পাইয়াছিলাম যে, সতীশরঞ্জনের বিশ্বাস, বিপ্লবের অথবা অসহযোগের পথে দেশের মুক্তিসাধন সম্ভবপর নহে। সুরেন্দ্রনাথের মত সতীশরঞ্জনের দেশপ্রেমে কাহারও সন্দেহ নাই। কিন্তু তিনি দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় প্রবল ব্যুরোক্রেশীর বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগ অথবা অসহযোগ দ্বারা কিছু করা অসম্ভব বলিয়া বিবেচনা করেন। তিনি বলেন, ইংরাজ যদি বুঝে, ভারতবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়া তাহাদের স্বার্থরক্ষা সমধিক সম্ভবপর হয়—তাহাদের সাম্রাজ্যরক্ষা সম্ভবপর হয়, তাহা হইলে তাহারা এ দেশকে স্বায়ত্তশাসন অধিকার দান করিতে পশ্চাৎপদ হইবে না। সুতরাং এ দেশবাসীর কর্ত্তব্য, ইংরাজের সহিত সহযোগ করিয়া নিয়মানুগ পথে ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া ইংরাজকে বুঝাইয়া দেওয়া যে, তাহারা সাম্রাজ্যের দশ জনের এক জন হইয়া থাকিতে চাহে, সঙ্গে সঙ্গে দেশের মুক্তিকামনা করে। এ কামনা ইংরাজের শত্রুরূপে বা প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে নহে, ইংরাজের বন্ধু ও মঙ্গলকামিরূপে করিতে হইবে। সতীশরঞ্জনের এই মনোভাবটুকু বুঝিলেই তাঁহার রাজনীতি বুঝিতে কষ্ট পাইতে হইবে না।

এমন অবস্থায় সতীশরঞ্জনের পদোন্নতিতে, এক দিক দিয়া দেখিলে, দেশের লাভ ব্যতীত ক্ষতি নাই। যে যে অবস্থায় থাকিয়া যতটুকু দেশের কায করিতে পারে, ততটুকুই দেশের পক্ষে লাভ। সতীশরঞ্জন আইন-সচিবরূপে ব্যুরোক্রেশীর অপ্রতিহত ক্ষমতা ক্ষুণ্ণ করিতে না পারুন, সৎপরামর্শ দিয়া উহা সংযত করিতে পারেন। এই চাকুরী গ্রহণ করিয়া সতীশরঞ্জন অনেকটা ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন। এডভোকেট জেনারলরূপে তিনি প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিতেন, চাকুরী গ্রহণ করিয়া তাহার অনেক কম অর্থ উপার্জ্জন করিবেন, এ কথা অস্বীকার করা যায় না। তিনি যে পথে দেশের মঙ্গলচিন্তা করেন, সেই পথে দেশের জন্য ক্ষতি স্বীকার করিয়া এই চাকুরী গ্রহণ করায় তাঁহার দেশ-প্রেমের পরিচয় পাওয়া যায়।

দাশবংশ দানশৌণ্ডিকতার জন্য চিরদিন খ্যাত। সতীশরঞ্জনের দানের প্রবৃত্তির কথা চিত্তরঞ্জনেরই মত সর্ব্বজনবিদিত। কত ছাত্রের যে তিনি গ্রাসাচ্ছাদন ও পাঠের ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। দেশের সামাজিক নানা কার্য্যে দানে তিনি মুক্তহস্ত। নারীরক্ষা সমিতির প্রেসিডেণ্টরূপে তিনি কেবল কথায় নিপীড়িতা বঙ্গনারীর উদ্ধারসাধনে আত্মনিয়োগ করেন নাই, এ জন্য তিনি অকাতরে অর্থব্যয় করিয়াছেন। আজ যদি সতীশরঞ্জন শাসন-পরিষদে স্থান লাভ করিয়া নারীরক্ষা সম্পর্কে কঠোর আইন প্রণয়নে সফলতালাভ করেন, তাহাতেও দেশ উপকৃত হইবে।

তিনিও চিত্তরঞ্জনের মত হিন্দু মুসলমান মিলনে সর্ব্বদা তৎপর। তাঁহার মুসলমান-প্রীতির কথা সকলেই জানে। মিঃ আমেদ গজনভি তাঁহার বিলাতের সহযাত্রী ও বন্ধু ছিলেন, এ জন্য তিনি এক পুত্রের নামকরণ করিয়াছেন 'আমেদ।' কোনও এক মুসলমান বন্ধুর বিপদের সময়ে তিনি প্রায় ৩।৪ লক্ষ টাকা অকাতরে দান করিয়া তাঁহাকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন। আজ যদি তিনি শাসন-পরিষদে থাকিয়া হিন্দু-মুসলমান মিলনের সদুপায় নির্দ্ধারণ করিয়া সরকারের নীতিকে তাহার অনুগামী করিতে পারেন, তাহা হইলেও দেশ তাহাতে উপকৃত হইবে।

চাঁদপুরের কুলী বিভ্রাটকালে দরিদ্র বিপন্ন কুলীদিগের সাহায্যার্থ তিনি নিজ ব্যয়ে একখানা ষ্টীমার ভাড়া করিয়া কুলীদিগকে তাহাদের স্বগ্রামে পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহার প্রায় ১৫ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছিল। ইহা সামান্য কথা নহে। দেশের দরিদ্র দিনমজুরদিগের প্রতি তাঁহার যে আন্তরিক মমতা, ইহা তাঁহার আইন-সচিবের কার্য্যকালে অনেক উপকারে লাগিতে পারে। দেশের পক্ষে ইহাও পরম লাভ।

তাঁহার স্বগ্রামে তাঁহার একটি দাতব্য চিকিৎসালয় এবং স্কুল আছে। এ সকলের ব্যয় তিনি নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। ইহা হইতেও তাঁহার অন্তরের পরিচয় পাওয়া যায়। অর্থের সদ্ব্যবহার কিরূপে করিতে হয়, তাহা তিনি বিদিত আছেন।

এ সকল কার্য্যে তাঁহার স্বদেশ ও স্বজাতি-প্রীতির পরিচয় পাওয়া যায়। সুতরাং তাঁহার উচ্চ রাজকার্য্যে নিয়োগের ফলে এক দিক দিয়া দেশ যে লাভবান্ হইতে পারে, তাহাতে সন্দেহের কি অবকাশ থাকিতে পারে?

স্বরাজ্য ও অসহযোগ

রাজনীতিক্ষেত্রে মতপরিবর্ত্তন স্বাভাবিক—উহা বিশেষ দোষাবহ নহে, এ কথা জগতের বড় বড় রাজনীতিকের মুখেই শুনা যায়। কার্য্যক্ষেত্রে অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করাকে প্রতীচ্যের ভাষায় diplomacy এবং আমাদের দেশের ভাষায় কূটনীতি বলে। আর সোজা বাঙ্গালা কথায় ইহাকে ঝোঁপ বুঝিয়া কোপ মারা বলে। যাহাই হউক, রাজনীতিক্ষেত্রে কার্য্যসাফল্য লাভ করিতে হইলে এরূপ ভাবে অবস্থানুসারে মতপরিবর্ত্তন করা বুদ্ধিমত্তা ও বিবেচনার পরিচায়ক বলিয়া জগতে গৃহীত হয়।

আমাদের দেশে অধুনা স্বরাজ্য দলের কোনও কোনও নেতার কার্য্যকলাপ দেখিয়া লোকের মনে এই সন্দেহ হইতেছে যে, তাঁহাদের কথা ও কাযে সামঞ্জস্য নাই। ইহা অতীব পরিতাপের কথা সন্দেহ নাই। স্বরাজ্য দল দেশের সমস্ত রাজনীতিক দল অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী—তাঁহাদের উপরেই দেশের রাজনীতিক সমর পরিচালনের ভার ন্যস্ত, দেশের সর্ব্বপ্রধান রাজনীতিক প্রতিষ্ঠান কংগ্রেস তাঁহাদেরই দ্বারা প্রধানতঃ পরিচালিত। সুতরাং তাঁহাদের কথা ও কাযে সামঞ্জস্য থাকা যে কতদূর আবশ্যক, তাহা সহজেই অনুমেয়। যদি জনসাধারণ তাঁহাদের কার্য্যকলাপের উপর আস্থাহীন হয় তাহা হইলে দেশের কার্য্য তাঁহাদিগের দ্বারা সম্পাদিত হওয়া সম্ভবপর হইবে কিরূপে?

পণ্ডিত মতিলাল নেহরু অধুনা স্বরাজ্য দলের নেতা। তিনি পাটনার বিগত স্বরাজ্যদলীয় জেনারল কাউন্সিলে সভাপতিরূপে যে বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহা হইতে এই কয়টি কথা উদ্ধৃত করা যায় :—

(১) আমি জানি, বৃটিশ সরকারের নিকট কোনও আশা-ভরসা নাই। সুতরাং আমাদের ভবিষ্যৎ কার্য্যপন্থা কি হইবে, তাহা আমাদিগকেই নির্দ্ধারণ করিতে হইবে।

(২) আমাদের স্বরাজ্যদলীয়রা যাহাতে আগামী নির্ব্বাচনে প্রবল সংখ্যায় জয়লাভ করে, স্বরাজীরা যেন এখন হইতে তেমনই ভাবে প্রচারকার্য্য আরম্ভ করেন। পরন্তু তাঁহারা যেন দেশের গৃহে গৃহে আইন অমান্য করিবার বাণী প্রচার করেন এবং গৃহস্থমাত্রকেই বুঝাইয়া দেন যে, আইন অমান্য করা ব্যতীত আমাদের মুক্তির অন্য উপায় নাই।

পণ্ডিতজী এ কথাগুলি বলিয়া দেশকে প্রস্তুত করিতেছেন, ইহা ভাল কথা। তিনি স্বয়ং স্কীন কমিটীতে যোগদান করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই বলিয়া জনসাধারণের মনে কেমন একটা সন্দেহের ছায়াপাত হইয়াছে। তিনি ইহার কৈফিয়তে বলিয়াছেন, 'দেশের মঙ্গলের জন্য এই কমিটীতে যোগদান করা বিশেষ আবশ্যক জানিয়াই আমি ইহার সদস্য হইয়াছি।' তাহা হইলে মডারেটরা ত বলিতে পারেন, তাঁহারাও 'দেশের মঙ্গলের জন্য' সরকারের সহিত সকল বিষয়ে সহযোগ করিতেছেন এবং সংস্কার আইনের সাফল্যসাধনের জন্য আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। 'দেশের মঙ্গল' কথাটা স্থিতিস্থাপক—ব্যাপক, কিসে দেশের মঙ্গল বা অমঙ্গল হয়, সে সম্বন্ধে সকল রাজনীতিক দল একমত হইতে পারেন নাই। সুতরাং কেবলমাত্র 'দেশের মঙ্গলের' দোহাই দিয়া সহযোগের আশ্রয় লইয়া আপনাকে অসহযোগী বলিয়া প্রচার করায় কথায় ও কাযে সামঞ্জস্য থাকে না, এইরূপ মনে করা বিচিত্র নহে। বিশেষতঃ পণ্ডিতজী যখন নিজেই বলিতেছেন, 'সরকারের নিকট কোন আশা-ভরসা নাই,' তখন স্কীন কমিটীতে প্রবেশ করিয়া তিনি দেশের কি মঙ্গল প্রত্যাশা করেন?

শ্রীযুত ভি, জে, পেটেল স্বরাজ্য দলের এক জন নামজাদা চাঁই। বড় লাটের ব্যবস্থা-পরিষদে তাঁহাকে ভয় করেন না, এমন সরকারী সদস্য নাই বলিলেই হয়। তাঁহার বচনের ক্ষুরধার আস্বাদ করেন নাই, এমন সদস্যও নাই। তিনি ভীষণ চরমপন্থী বলিয়া খ্যাত। তিনিও সরকারী চাকুরী গ্রহণ করিয়াছেন, ব্যবস্থা-পরিষদের প্রেসিডেণ্টের পদে বসিয়াছেন। কেবল ইহাই নহে, তিনি প্রকাশ্যে বলিয়াছেন,—"কাযের জন্য যদি বড় লাট দশবার ডাকেন, তাহা হইলে তাঁহার আহ্বানে সাড়া দিব।" তাহাই যদি হয়, তবে ডাক্তার আবদুল্লা সুরাবর্দ্দী গভর্ণরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কি এমন অপরাধ করিয়াছিলেন? স্বরাজ্য দল সরকারী চাকুরী গ্রহণ করিবেন না বলিয়া প্রতিশ্রুত ছিলেন। তবে এই চাকুরী গ্রহণে আপত্তি উত্থাপিত হয় নাই কেন,

শ্রীযুত পেটেলই বা এখনও বিশিষ্ট স্বরাজ্য দলপতি বলিয়া কিরূপে গৃহীত হইতেছেন ? সহজ সরল জনসাধারণ এ সকল হেঁয়ালির কথা বুঝিতে না পারিয়া 'হতভম্ব' হইয়া গিয়াছে।

শ্রীযুত পেটেল ইহার উপর আর এক কায করিয়া সকলের বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছেন। কংগ্রেস কর্তৃক নিযুক্ত 'সিবিল ডিসওবিডিয়েন্স এনকোয়ারী কমিটীর' রিপোর্টে দেখিতে পাওয়া যায়, শ্রীযুত পেটেল ও আজমল খাঁ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, —"বর্ত্তমানে জনগত আইন অমান্য করিয়া সরকারের সহিত বুঝাপড়া করিয়া লওয়া অসম্ভব, এই হেতু আমরা তদপেক্ষা কিছু কম আইন অমান্য করিবার পরামর্শ দিতেছি।"

অথচ পণ্ডিত মতিলালজী এই সে দিনের পাটনা স্বরাজ্য বৈঠকে স্পষ্ট পরামর্শ দিয়াছেন, 'আইন অমান্য করা ভিন্ন আমাদের মুক্তির অন্য উপায় নাই।' স্বরাজ্য দলের নেতারা যদি এইরূপ ভিন্নমতাবলম্বী হয়েন, তাহা হইলে তাঁহাদের উপর জনসাধারণের আস্থা থাকিবে কিরূপে ? তাহারা কাহার কথা বিশ্বাস করিবে ? আবার পণ্ডিত মতিলাল পাটনার স্বরাজ্য জেনারল কাউন্সিলের সভাপতিরূপে যে বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহার নানা স্থানে আভাসে ইঙ্গিতে বুঝা গিয়াছে যে,—কাউন্সিলে প্রবেশ করিয়া সরকারকে বাধা প্রদান করাই আইন অমান্য করিবার কিছু কম বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। 'আইন অমান্য তদন্ত কমিটীর' রিপোর্টেও পণ্ডিত মতিলাল স্পষ্টই জানাইয়াছেন যে,—পূরা আইন অমান্য করার কিছু কম আইন অমান্য করার অর্থ কাউন্সিলে প্রবেশ করিয়া সরকারের কার্য্যে বাধাপ্রদান করা। কিন্তু বস্তুতঃই কি এই দুই পন্থার মধ্যে কোনও সমতা আছে ? Civil Disobedienceএ যে direct action, ত্যাগ, সাহস ও সহিষ্ণুতার প্রয়োজন হয়, Council entry and oppositionএ কি তাহার শতাংশের একাংশও হয় ? প্রথমোক্ত পথে জমী প্রস্তুত করিবার জন্য যে সময়, শ্রম ও অভ্যাস প্রয়োজন হয়, শেষোক্তে তাহার সামান্য ভগ্নাংশ মাত্রও প্রয়োজন হয় কি ?

শ্রীযুত টাম্বে।

শ্রীযুত টাম্বে আর এক জন স্বরাজ্য দলপতি। তিনি প্রথমে সরকারী কার্য্য গ্রহণের বিপক্ষে ঘোর বক্তৃতা দিয়াছিলেন, যাঁহারা মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে 'দেশদ্রোহী' আখ্যাও নাকি দিয়াছিলেন। ইহার পর কিন্তু তিনি স্বয়ং মধ্যপ্রদেশের ব্যবস্থাপক সভার সভাপতি-পদ গ্রহণ করিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করেন নাই। আবার চূড়ার উপর ময়ূরপাখার মত সম্প্রতি তিনি গভর্ণরের Executive Councilএর সদস্য পদ মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিয়াছেন! ইহা কি চমৎকার ব্যবস্থা নহে ? Do what I say, but don't do what I do,—ইংরাজীতে এইরূপ একটা কথা আছে। ইহাও যে প্রায় তাহাই হইয়া দাঁড়াইল। নলিচা আড়াল দিয়া তামাক খাওয়া আর কত দিন চলিবে ?
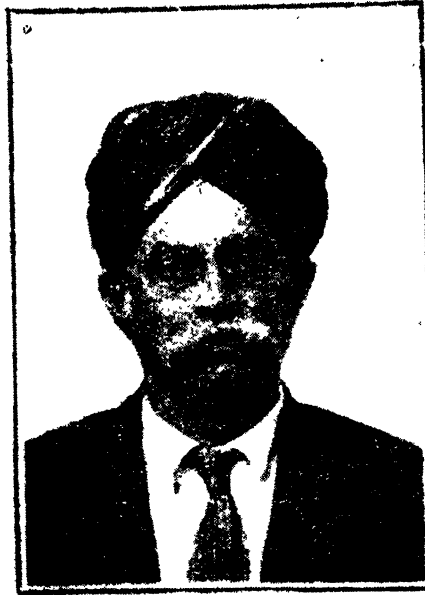
ভ্রম-সংশোধন—শ্রাবন মাসে দেশবন্ধু-স্মৃতি-সংখ্যায় 'ভারত-সূর্য্যাস্ত' চিত্রখানি শিল্পী—মণিভূষণ মজুমদারের অঙ্কিত, ভ্রমক্রমে কনীভূষণ ছাপা হইয়াছে।

শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু সম্পাদিত

কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, "বসুমতী রোটারী মেসিনে" শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ব্রাহ্মণ সুরেন্দ্রনাথ *

"কথায় সরস, কথায় বিরস, কথায় হরে প্রাণ, কথায় কেতাব পুরাণ।" যে কথা কহিতে জানে, সে কেল্লা ফতে করে। এ দেশে এখন একটা কথা উঠিয়াছে যে, 'কথায় চিঁড়া ভিজে না, কায চাই।'

মাতাল কবি যেমন মদ খাওয়ার বিরুদ্ধে জোরাল কবিতা লিখিতে হইলে বলে, "ধর, রস, আগে একটু টেনে নি, নইলে ভাল কবিতা বেরুবে না," সেইরূপ বড় বড় সভায় তা-বড় তা-বড় লেখকের মুখে শুনিতে পাইবে, কেবল কথার নিন্দা। কথাটা কিছু নহে, এ কথা বুঝাইতে তিনি একটা মহাভারত রচনা করেন। এতেই বুঝা যায় যে, কথাটাই আগে আর সব পরে। আদিতে বাক্য ছিল, এ কথা বাইবেলে কিছু মিথ্যা বলে নি, আর আমাদের শাস্ত্রে সেটা মানি বার যদি এখনও লোক থাকে, তাহা হইলে ত কথাই সার—কথাই ব্রহ্ম, কথা থেকেই সৃষ্টি ওঁকার ছাড়া এ-সব দেশে ধর্ম্ম-টর্ম্ম কিছুই নাই।

সুরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন এই কথার ভট্টাচার্য্য, অথচ তাঁহার মত কান-পাতলা লোক বাঙ্গালা দেশে আমি আর একটাও দেখি নাই। কেবলই পকেট হইতে একটা রেলওয়ে ওয়াচ বাহির করিতেছেন আর দিনের মধ্যে তাঁহার যে ৩৬ গণ্ডা কায, তার কোনটার উপরই অবিচার না হয়, সে বিষয়ে সাবধান হইতেছেন। তিনি এই নূতন হিন্দুস্থানটা গড়িয়া গিয়াছেন কেবল কথা কহিয়া। সে কালে কেবল তাঁহার কথার তারিফই শুনা যাইত—'তিনি একটা ডিমস্থিনিস—তিনি একটা সিসিরো—তিনি একটা মিরাবো, তিনি একটা গ্লাডষ্টোন, তিনি একটা পিট।' এই সব দুনিয়ার বক্তার রাজার সঙ্গে তাঁহার তুলনা, কিন্তু এ কথাটা বাহির হয় কোথা হইতে? কেবল ফাঁকা আওয়াজে কি কিছু একটা গড়িয়া উঠে? একটা সুর চাই—একটা তাল চাই, একটা ধরতা চাই, আর সকলের উপরে চাই একটা ভাব। সুরেন্দ্রনাথের বিলাতী বুলীর মধ্যে, বার্কসেরিডানের বুকনীর মধ্যে

---

* আশ্বিন মাসের মাসিকে স্থানাভাব হওয়ায় কার্ত্তিকের মাসিকে প্রকাশিত হইল।

ছিল একটা নির্ভেজাল স্বদেশী ভাব। তিনি কখন পিতৃ-পিতামহের নাম ভুলেন নাই। তাই চট করিয়া সিভিলিয়ানের খোলস—সিভিলিয়ানের মেজাজ—সিভিলিয়ানের ধাত ছাড়িতে পারিয়াছিলেন। লোকটা ঠিক বাঙ্গালার তেলে-জলে গড়া ছিল। বিলাতে পিতার মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া তাঁহার যে অবস্থা হইয়াছিল, এ দেশে যাহারা পাশের পড়া পড়বার বেলা তুনিয়া ভুলে যায়, তাহাদের ত সে রকম অবস্থা হয়ই না। সে কালে পঞ্চানন্দ ঠাট্টা করিয়া সুরেন্দ্রকে বলিতেন সুরন্ধ্র। সুরন্ধ্রই বটে. এ বাঁশীর রন্ধ্রে রন্ধ্রে কেবল দেশী সুরই বাজিয়া উঠিত। সিবিলিয়ানী ছাড়িবার বহু পূর্ব্ব হইতেই সুরেন্দ্রনাথ স্বদেশী। তাঁহার হাকিমী যাইবার কারণই হইতেছে—সে কালে 'ইংলিশম্যানে' কোন বড় সিভিলিয়ানের ভুলের কথা কওয়া। সে পুরোন কাসুন্দি আর ঘাঁটিয়া কায নাই। সুরেন্দ্রনাথের জীবনে বুঝিবার কথা এইটুকু—যাহার ভিতর যাহা নাই, তাহার ভিতর তাহা গজায় না। এই দেশটা যে কত বড়,ভিতরে ভিতরে সে বিষয়ে তাঁহার একটা গভীর রকমের বোধ ছিল। তাঁহার সেরা সেরা বক্তৃতায় দেখা যায় যে,যেমন করিয়া হউক, বুদ্ধের নিষ্ক্রামণ এবং চৈতন্যের প্রেমের কথা পাড়িবেনই পাড়িবেন।

ইদানীং বক্তৃতা করিবার সময় "যদা যদা হি ধর্ম্মস্য" এটা মুখস্থ করিয়া লইয়া যাওয়াই চাই। বক্তৃতাতেও তিনি ব্রাইটের চেলা লালমোহনের মত ইংরাজী ধরণের বক্তা ছিলেন না। তিনি যে দেশের লোক, সেই দেশের প্রাণ যাহাতে পাওয়া যায়, সেইরূপ ছিল তাঁহার বক্তৃতার ভাবভঙ্গী।

সুরেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী সুশীলা দেবী

কিন্তু যদিও সুরেন্দ্রনাথ বক্তৃতায়ই সাধারণের নিকট পরিচিত, আমি কিন্তু বক্তা সুরেন্দ্রনাথকে সুরেন্দ্রনাথই বলি না। আমি ব্রাহ্মণ সুরেন্দ্রনাথকে চিনি। যে গুণের অভাবের জন্য বিশ্বামিত্র সৃষ্টিশক্তি লাভ করিলেও বশিষ্ঠ তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া স্বীকার করেন নাই, সেই ক্ষমাগুণ সুরেন্দ্র-চরিত্রের মেরুদণ্ড বলিলেও হয়।

আমাদের বড়লোকদের মধ্যে সুরেন্দ্র বাবুর মত কেহ গালাগালি খাইয়াছেন কি না, জানি না। কেবল আজই যে লোক তাঁহাকে গালাগালি দিতেছে, তাহা নহে, তিনি আজীবনই গালাগালি খাইয়া আসিয়াছেন; কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ কখনও 'উতোর' গান নি। তাঁহার কথাই ছিল,'আমার পিঠটা এত বড় চওড়া, কে ক ঘা মারবে, মারুক না।' যে তাঁহাকে ন-কড়া ছ-কড়া করিয়াছে, সেও তাঁহার কাছে যাইলে তিনি তাহাকে বাবু-বাছা করিয়াছেন। এরূপ নিরভিমান হওয়া কি চারটিখানি কথা! জন্ম-জন্মান্তরের কত সাধনার ফলে দুর্গাচরণের উদার প্রাণটাকে খাঁটি দেশী-ভাবের ছাঁচে ঢালিয়া ভগবান্ সুরেন্দ্রনাথকে বাঙ্গালায় পাঠাইয়াছিলেন, যাহারা তাঁহার সঙ্গে ঘর করিয়াছে, তাহারাই তাহা জানে।

আজ যে এই অর্দ্ধশতাব্দীকাল গঙ্গাবাস এবং অন্তিমে সেই গঙ্গার বুকে মিলাইয়া যাওয়া—ইহা কেবল ভাগীরথী-পূত আর্য্য সভ্যতার সত্য ও সরল সেবকের পক্ষেই সম্ভব। তাই বলি, তাঁহার কথার পিছনে ছিল এমন একটা ভারতীয় ভাবের নিবিড় স্পর্শ, যাহা তিনি নিজেও ভাল করিয়া বুঝিতেন না; কা কথা অন্যেষাম্।

শ্রীশ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী।

দেশনায়কের তিরোধান

অতর্কিতে সুরেন্দ্রনাথ মহাপ্রস্থান করিলেন। মৃত্যুর কোনও ইঙ্গিত নাই, পূর্ব্বাভাস নাই। ব্যাধির গ্লানি তাঁহাকে স্পর্শ করিবার পূর্ব্বেই তিনি চলিয়া গেলেন। মরণজয়ী আত্মার নিকট জরা ও মৃত্যুর এইখানে নতি-স্বীকার। যখন শুনিলাম, তিনি আর ইহজগতে নাই, তাঁহার চিরপ্রিয় দেশমাতৃকার নিকট চিরবিদায় লইয়াছেন, তখন যেন আকাশবাণী কর্ণে প্রবেশ করিল :—

"হায়, আজ সুরেন্দ্রনাথ অন্তর্হিত হইয়াছেন, ভারতের আলোক নির্ব্বাপিত হইল !"

বাস্তবিক তিনি ভারতের আলোকস্বরূপ ছিলেন। দেশ যখন অমানিশার গাঢ় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন, ধ্বান্তরাশি দেশবাসীর বুকের উপর পুঞ্জীভূত হইয়া তাহাদিগকে অসাড় ও নির্জীব করিয়াছিল, তখন আলোকবর্ত্তিকা হস্তে তিনি পথি-প্রদর্শকরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহার অঙ্গুলি-সঙ্কেতে দেশবাসী মুক্তির পথের সন্ধান পাইয়াছিলেন। তাঁহার কম্বুকণ্ঠে যে বাণী নিনাদিত হইয়াছিল, তদ্দ্বারা তন্দ্রাতুর দেশবাসীর চমক ভাঙ্গিয়াছিল, জাড্য ও ভীরুতা পরিহার করিয়া স্বরাজসিদ্ধির পথে অগ্রসর হইতে পারিয়াছিলেন।

যে দিন সুরেন্দ্রনাথ চাকরীর বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া আপনার সকল চেষ্টা, সকল সাধনা দেশকে জাগাইবার কার্য্যে নিয়োজিত কবিলেন, ভারতের ইতিহাসে তাহা একটি স্মরণীয় দিন। তাঁহার পূর্ব্বে এরূপভাবে দেশের কাযে আপনাকে নিঃশেষে বিলাইয়া দিবার চেষ্টা কেহ করেন নাই। দেশজননীকে তিনি যথার্থই বলিতে পারিয়াছিলেন, "অন্যের অনেক আছে, আমার কেবল তুমি গো।" তাঁহার আইনব্যবসায় ছিল না, ছিল কেবল হস্তে গুরুমহাশয়ের বেত্রদণ্ড ও সম্পাদকের লেখনী। এই দুইটি অস্ত্রের প্রভাবে পরিশেষে তিনি জয়ী হইতে পারিয়াছিলেন। শিক্ষকরূপে তিনি দেশের আশাস্তম্ভ যুবকসম্প্রদায়কে মাতৃমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। দেশাত্মবোধের বীজ তিনি যাহা বপন করিয়াছিলেন, আজ তাহা শ্রীভগবানের আশীর্ব্বাদে বিশাল মহীরুহে পরিণত হইয়াছে। যখন তিনি সম্পাদকরূপে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েন, তখন লোকমতের প্রভাব বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হইত না, ক্ষীণা স্রোতস্বিনার ন্যায় তাহা প্রবাহিত হইত। আজ দেখিতে পাই, বর্ষার বারিপাতে স্ফীত, ফেনিল, জলরাশিবহুল বিশালকায়া নদীর ন্যায় দুকূল প্লাবিত করিয়া লোকমত উচ্ছ্বসিত হইয়াছে, তাহার গতিরোধ করিবার চেষ্টা করিলে ঐরাবতও ভাসিয়া যাইবে। সুরেন্দ্রনাথের সৌভাগ্য যে, এই মহান্ দৃশ্য তিনি দেখিয়া গিয়াছেন। এই কার্য্যে অনেক মহারথের কৃতিত্ব আমরা নিরূপণ করিতে পারি, তন্মধ্যে তিনি উচ্চ গৌরবময় আসনে চিরদিন অধিষ্ঠিত থাকিবেন।

সুরেন্দ্রনাথের দৌহিত্র ভাস্বরানন্দ মুখোপাধ্যায় ও দেশবন্ধুর কন্যা কল্যাণী দেবী

জীবনে তিনি কখনও পরাজয় স্বীকার করেন নাই। যখন তিনি প্রথম যৌবনে পদার্পণ করেন, আত্মীয়-স্বজন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সুদূর বিদেশে শিক্ষার্থিভাবে বাস করিতেছিলেন, তখন বয়স লইয়া এক বিষম বাধা তাঁহার সমক্ষে উপস্থিত হইল। কিন্তু তিনি দমিবার

পাত্র ছিলেন না, আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া সেই বিঘ্ন অপসারিত করেন। সিভিল সার্ভিসের গণ্ডী হইতে নিষ্কাশিত হইলে সকলে মনে করিল, তাঁহার ভবিষ্যৎ চূর্ণ হইয়া গেল, তাঁহার আশা-ভরসা ধূলিসাৎ হইল। তিনি দেখাইলেন, এত দিন অকর্ম্ম লইয়া তিনি ব্যস্ত ছিলেন, এইবার কাযের মত কায গ্রহণ করিলেন—যাহার উপর তাঁহার বিশাল ব্যক্তিত্বের ছাপ রাখিয়া যাইবেন। এই কর্ম্মের গুরুত্ব স্মরণ করিয়া তিনি সাহ্লাদে দারিদ্র্য বরণ করিয়া লইলেন। হৃদয়ের রক্ত দিয়া তিনি তাঁহার বড় সাধের রিপণ কলেজ ও "বেঙ্গলী" পত্র গঠিত করিয়াছিলেন। অভাবের তাড়নায় নিষ্পিষ্ট হইয়াও তিনি দেশের মুখ চাহিয়া এই আয়াসসাধ্য কর্ম্ম হইতে বিরত হয়েন নাই। প্রথম-জীবনের কঠোর সংগ্রামের স্মৃতি চিরদিনই তাঁহার হৃদয়ে জাগরূক ছিল। পরবর্ত্তী কালে ভাগ্যলক্ষ্মী তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইলেও সোনার বোতাম, চেন, সুদৃশ্য কলার প্রভৃতি বিলাসের উপকরণ কখনও ব্যবহার করেন নাই। পানের ডিবার ন্যায় একটা ঘড়ী সর্ব্বদা পকেটে থাকিত, অনেক সময় পিরিহাণ বোতামের অভাবে সূতা দিয়া বন্ধন করিতেন, কিন্তু সোনার চেন, বোতাম প্রভৃতি ব্যবহার করিতে অনুরোধ করিলে শিহরিয়া উঠিতেন। চিরদিনই পোষাক-পরিচ্ছদে আড়ম্বর তাঁহার আদৌ ছিল না। বাড়ীতে আসবাব-পত্রের গুরুভারে প্রপীড়িত হওয়া তিনি বিড়ম্বনা বলিয়া মনে করিতেন। সিভিলিয়ান হইয়াও বা বিলাতে গিয়া তিনি কখনও ইংরাজী পরিচ্ছদ ধারণ করেন নাই। শ্রীহট্টে জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের কর্ম্ম করিবার সময় তিনি লম্বা কোট ও Beaver cap ব্যবহার করিতেন। সাহেবিয়ানার ময়ূরপুচ্ছ ধারণ করিবার সাধ তাঁহার কখনও ছিল না।

কর্ম্মেই তাঁহার আনন্দ, কর্ম্মেই তাঁহার তৃপ্তি। ঘড়ী ধরা কায করিয়া সুনিয়ন্ত্রিত জীবন যাপন, ইহাই তাঁহার চিরদিনের অভ্যাস। যখন কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিতেন, সেই সময়ে প্রিয়তম বন্ধু বা নিকট-তম আত্মীয়সমাগমে তাঁহার আরব্ধ কার্য্যের ব্যাঘাত লক্ষ্য করিয়া বিরক্ত হইতেন। বাস্তবিক তাঁহার প্রতি "কর্ম্মযোগী" আখ্যা সুপ্রযুক্ত। দেশমাতৃকার সেবা, ইহাই ছিল তাঁহার ধর্ম্ম। অবশ্য ভগবানের জাগতিক বিধানে তাঁহার প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল। সমাজের বক্ষে ও বিশ্বের লীলায়িত গতিতে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শক্তির স্ফুরণ তিনি প্রায়ই উল্লেখ করিতেন। এই শক্তি হইতে শক্তিমান পুরুষকে অবধারণ কেবল আর একটি সোপানসাপেক্ষ, বিশ্বদেব তাঁহার কাছে দেশমাতৃকার বেশে দেখা দিয়াছিলেন। তাই তিনি বলিতেন যে, the service of the motherland is the highest form of religion—it is the truest service of god. দেশসেবার মাহাত্ম্য কিরূপ তাঁহার চিত্তকে অভিভূত করিয়াছিল, ইহা হইতে তাহা স্পষ্টই প্রতিভাত হয়। এই সেবার আবেষ্টনের মধ্যে থাকিতে তিনি বড় ভালবাসিতেন। মাতৃভূমির উন্নতিসাধন, দেশ-বাসীর স্বরাজসাধনায় সিদ্ধি—ইহা ছাড়া অপর কোনও কাম্য তাঁহার ছিল না। তাই প্রখর কর্ম্মসাধনার প্রদীপ্ত হোমানল দেশের বুকে তিনি জ্বালাইয়াছিলেন। অপরিমিত শক্তির অধিকারী হইয়া সেই শক্তি মাতৃ-চরণে নিবেদিত করিয়াছিলেন। মেধায় ও মনীষায় সমুজ্জ্বল, বাগ্‌বিভূতি সম্পর্কে অতুলনীয়, বহুমুখী প্রতিভায় সমলঙ্কৃত এবং বিরাট ও বিশাল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এই মহাপুরুষ জগতের সমক্ষে ভারতবাসীর মর্য্যাদা বৃদ্ধি করিয়া গিয়াছেন। জীবনে কখনও তিনি আরাম চাহেন নাই। তাঁহার আদর্শ ছিল to die in harness এবং ভগবান্ তাঁহার এই সাধ পূর্ণ করিয়াছেন। শুষ্ক আমোদ-প্রমোদে যোগ দিবার সময় বা বাসনা তাঁহার

সুরেন্দ্রনাথের দৌহিত্র ভাস্করানন্দের পুত্র প্রবীরকুমার

কখনও ছিল না। থিয়েটার সিনেমা প্রভৃতি দর্শন, এ দেশে বা বিলাতে তিনি কখনও করেন নাই। অপরের রসিকতায় তাঁহার আনন্দের উৎস উন্মুক্ত হইত। তিনি যথার্থ রসগ্রাহী ছিলেন, কিন্তু মিছা ক'ষে সময় নষ্ট করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব ছিল।

তাঁহার জীবনে নিরাশার ছায়া কখনও পড়ে নাই। যখন মেঘমেদুরাম্বর, চারিদিকেই ঘনঘটা, বিপদ ভ্রূকুটিভঙ্গে তাঁহার দিকে চাহিতেছে, তখনও তাঁহার উদ্যম, উৎসাহ যুবকদিগকেও পরাভূত করিত। যাঁহারা সবুজ ও কাঁচা, তাঁহাদিগের সান্নিধ্যে প্রতিদিন বহু সময় ক্ষেপণ করিয়া তিনি চিরনবীন ছিলেন—বার্দ্ধক্য তাঁহার মনকে কখনও আশ্রয় করিতে পারে নাই। এই যুবজনসুলভ বিপুল উৎসাহ তাঁহার কর্ম্মময় জীবনের ইন্ধন যোগাইয়াছিল, বুকভরা উৎসাহ লইয়া তিনি দেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে ছুটাছুটি করিয়া দেশবাসীকে আশার বাণী শুনাইয়া গিয়াছেন। তাঁহার বজ্রগম্ভীর কণ্ঠস্বর বিশ্বাসে স্থির, অচঞ্চল। তিনি সমস্ত হৃদয় দিয়া বিশ্বাস করিতেন যে, ভারতের দুঃখের অমানিশা প্রভাতের স্নিগ্ধ আলোকে বিলীন হইবে, স্বরাজ-সূর্য্য হাসি দিয়া, আলো দিয়া আবার দেশবাসীকে দুনিয়ার বুকে সুপ্রতিষ্ঠিত করবে। এই বিশ্বাস তিনি মর্ম্মে মর্ম্মে পোষণ করিতেন, এই অটুট বিশ্বাস তাঁহার সকল কর্ম্মের মধ্যে উৎসারিত হইয়াছিল। তাই তাঁহার সকল কাযেই এক প্রচণ্ড উত্তেজনা ছিল,—যাহার উত্তাপ সকলেই অনুভব করিয়া ধন্য হইত। দেশের জন্য তাঁহার ব্যথা ও ব্যাকুলতা, দেশের দুর্দ্দশা দূর করিবার তাঁহার আগ্রহ—এ সকলের উৎস ছিল স্বদেশীয়ের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় বিশ্বাস ও দেশের প্রতি অপরিসীম ভালবাসা। তাই যখন সকলে ঘুমঘোরে আচ্ছন্ন, অবসাদে দুর্ব্বল ও নিস্তেজ, সেই সুদূর অতীতে তিনি বংশীধ্বনি করিয়া দেশাত্মবোধ ও জাত্যাত্মবোধ জাগাইবার জন্য এক অভিনব উন্মাদনা আনিয়াছিলেন। এ যে কি উন্মাদনা, তা যাঁহারা ইঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছেন, তাঁহারাই বলিতে পারেন। তাঁহার বাণী মরমে প্রবেশ করিয়া প্রাণকে আকুল ক'রয়া দিত। সকলেই বুঝিল, আবার ভগীরথ শঙ্খ বাজাইয়া এক নূতন ভাবগঙ্গা আনয়ন করিয়াছেন, এই শঙ্খধ্বনি যে-ই শুনিয়াছে সে-ই মজিয়াছে।

ছিল এক দিন—যখন বাঙ্গালী ভারতের শীর্ষস্থানীয় ছিল, অন্য জাতির কাছে মনীষার গর্ব্বে স্ফীতবক্ষ হইতে পারিত। আজ "তে হি নো দিবসা গতাঃ।" তখন সুরেন্দ্রনাথকে দেখাইয়া শ্লাঘা ও স্পর্দ্ধার সহিত বাঙ্গালী বলিত, দেখ দেখ, এই আমাদের শিক্ষাদীক্ষার শ্রেষ্ঠ উৎকর্ষ, নবভারতের নব আদর্শে সর্ব্বতোভাবে অনুপ্রাণিত, স্বজাতি প্রেমের পূর্ণতায় বিভোর, জাতীয়তার গৌরবে উন্নতশির—এই মহাপুরুষকে একবার নয়নপ্রাণ ভরিয়া দেখ।

তাহার পর শেষ জীবনে সুরেন্দ্রনাথ হইলেন নীলকণ্ঠ। তাঁহার হাতেগড়া লোক তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া কত তীব্র বিষ উদ্গার করিয়াছে। কিন্তু তিনি হাসিমুখে সব সহিয়াছেন, তাঁহার হাসির আড়ালে বিষাদ বা তিক্ততা ছিল না। নীলকণ্ঠ সব বিষ কণ্ঠে ধারণ করিয়া আপন কর্ত্তব্য পালন করিয়া গিয়াছেন।

আত্মশক্তিতে তাঁহার অসীম প্রত্যয়, ইহা যদি আমাদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়, তাহা হইলে স্বরাজ অচিরলভ্য হইবে!

এক দিন সুরেন্দ্রনাথ ভারতবাসীর হৃদয়-রাজ্যের দেবতা, মনোরাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন। আবার শুভদিন আসিবে—যখন আমরা তাঁহাকে যথার্থভাবে বুঝিব, পঞ্চাশৎ বর্ষ ধরিয়া তিনি যে কার্য্য অবিচলিত নিষ্ঠা ও উদ্যমের সহিত করিয়া গিয়াছেন, তাহার অবদান দেশবাসীর শ্রদ্ধানম্র চিত্তে চিরভাস্বর হইয়া থাকিবে।

আজ কর্ম্মী শান্তির ক্রোড়ে আশ্রয়লাভ করিয়াছেন। জীবনে যে বিশ্রাম তিনি ভোগ করেন নাই, আজ সেই চিরবিশ্রামে তিনি মগ্ন। কিন্তু কালের রথচক্রের উপর তিনি যে কীর্ত্তি-বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিয়া গিয়াছেন, তাহা কখনও স্খলিত হইবার নহে।

শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

সুরেন্দ্রনাথের লোকান্তর

বর্ত্তমান ভারতের রাজনীতিক শিক্ষাগুরু, বাঙ্গালীর জীবনে নবভাবের মন্ত্রদাতা, দেশে মুক্তি-সমরের উন্মাদনার সৃষ্টিকর্ত্তা, জ্ঞানবৃদ্ধ, কর্ম্মবীর সুরেন্দ্রনাথ সমগ্র জাতিকে শোক-সাগরে ভাসাইয়া গত ২২শে শ্রাবণ বৃহস্পতিবার মধ্যাহ্নে মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন। আজ অর্দ্ধ-শতাব্দী ব্যাপিয়া যে পুরুষ সিংহের দুর্জ্জয় দুর্নিবার শক্তি ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে সুবাগ্মী, লেখক, রাজনীতিক, শিক্ষক, নায়ক ও গুরুরূপে শক্তিহীন পরাধীন তন্দ্রা-অভিভূত জাতিকে জীমূতমন্দ্রে স্বাধীনতার মাদকতা-বাণী শুনাইয়া আসিয়াছে, জীবনের সায়াহ্নেও যাঁহার কর্ম্মশক্তি পূর্ণোৎসাহে দেশসেবায় নিয়োজিত ছিল, জন্মভূমির উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যাঁহার আশার আলোকরশ্মি কখনও হীনতেজ হয় নাই, আজীবন যিনি আপনার দেশকে জগতের দৃষ্টিতে মহৎ বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত আয়াস স্বীকার করিয়া আসিয়াছেন, যিনি এক দিন এই বাঙ্গালার ও বাঙ্গালী জাতির হৃদয়ের মুকুটহীন রাজা বলিয়া শ্রদ্ধাপ্রীতি ভরে অভিনন্দিত হইয়াছিলেন, যাঁহার আন্তরিক চেষ্টায় দেশের তরুণ-সম্প্রদায় দেশপ্রেমে অনুপ্রাণিত হইয়া রাজনীতি-চর্চ্চা বরণ করিয়া লইয়াছিল, যাঁহার উৎসাহ উদ্যমের ফলে ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায় ও বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীর মধ্যে একতা ও জাতীয়তার বীজ উপ্ত হইয়াছিল,—আজ তাঁহার কম্বুকণ্ঠ নিষ্ঠুর কালের দণ্ডে নীরব, এ কথা সহসা বিশ্বাস করিতেও মন উঠে না। জন্মভূমি যে রত্নে বঞ্চিত হইলেন, সে অভাব কোনও যুগে পূর্ণ হইবে, এমন ত মনে করা যায় না। তবে সান্ত্বনা এই, সুরেন্দ্রনাথ পরিণতবয়সে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন,—তিনি জীবনে যে মহৎ কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া আমাদের মধ্যে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সে কার্য্যভার অসম্পূর্ণ রাখিয়া যায়েন নাই। তাঁহার জীবনের ব্রত সফল হইয়াছে—জাতি তাঁহার মহামন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হইয়াছে।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে দেশপূজ্য সুরেন্দ্রনাথ

সুরেন্দ্রনাথ যে সময়ে কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করেন, সে সময়ে এ দেশের কয় জন লোক রাজনীতিচর্চ্চা করিতেন? সংসারধর্ম্ম প্রতিপালন করিয়া, রাজার কর দিয়া, আইন মানিয়া এবং নিজ নিজ পৈতৃক ধর্ম্মকর্ম্ম অক্ষুন্ন রাখিয়া এই নশ্বর জীবন ইহকালে অতিবাহিত করিয়া যাওয়াই তখন দেশের আপামরসাধারণের লক্ষ্য ছিল। স্বজাতি, স্বদেশ, স্বায়ত্তশাসন, মুক্তি,—এ সকল কথা তখন কেহ জানিত কি না সন্দেহ। সুরেন্দ্রনাথ গুরুরূপে স্বদেশ ও মুক্তির বাণী দেশে আনয়ন করিলেন।

সুরেন্দ্রনাথের পূর্ব্বে হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও রামগোপাল ঘোষ অস্তমিত হইয়াছেন, উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, দাদাভাই নৌরোজী, ফেরোজশা মেটা প্রভৃতি কয়জন রাজনীতিক সুরেন্দ্রনাথের রাজনীতিক্ষেত্রে আবির্ভাবকালে ভারতবাসীর প্রাণে নূতন নূতন আশার বাণী পৌছাইয়া দিতে আরম্ভ করিয়াছেন। সুরেন্দ্রনাথ তাঁহার কার্য্যে সহায় পাইলেন আনন্দমোহন বসুকে। তাঁহাদের যত্নে ও উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত 'ভারত সভা' এ দেশে প্রথম রাজনীতিক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

সুরেন্দ্রনাথ অসাধারণ বাগ্মী ছিলেন, তাঁহার ন্যায় বাগ্মী (ইংরাজী ভাষায় এক কেশবচন্দ্র ও বিবেকানন্দ ব্যতীত) এ দেশে আর কেহ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। তাঁহাকে অনেকে গ্রীসবাসী

(জগতের শ্রেষ্ঠ বাগ্মী বলিয়া গৃহীত) ডিমস্থিনিসের সহিত তুলনা করিয়া থাকেন। শুনা যায়, বহু শ্রেষ্ঠ ইংরাজ রাজনীতিক তাঁহাকে ফক্স, পিট, সেরিডানের সহিত তুলনা করেন। বিলাতে বাসকালে তাঁহার বক্তৃতায় গ্লাডষ্টোন প্রমুখ মনীষীরা মুগ্ধ হইয়াছিলেন এবং সে জন্য অনেক সময়ে তাঁহার পক্ষাবলম্বন করিয়া ভারতের স্বার্থরক্ষার জন্য আত্মশক্তি নিয়োজিত করিয়াছিলেন। একবার বিলাতে এক সভায় কোনও ইংরাজ বক্তা ভারতের লোককে অসভ্য ও ভারতের আচার ব্যবহারকে বর্ব্বরোচিত বলিয়া তাহাদের উপর কটাক্ষপাত করিয়াছিলেন। বিলাতে বিদ্যাশিক্ষার্থী যুবক সুরেন্দ্রনাথ সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন। স্বদেশ ও স্বজাতির অযথা নিন্দা শুনিয়া সুরেন্দ্রনাথ স্থির থাকিতে পারেন নাই। তিনি সেই বক্তৃতার জবাবে বলেন, "যখন পূর্ব্ব বক্তার পুরুষরা গাছের ডালে ডালে বেড়াইতেন, আম মাংসে উদরপূর্ত্তি করিতেন, বিবাহ কাহাকে বলে, জানিতেন না, তখন ভারতের ঋষিরা জ্ঞানবিজ্ঞানচর্চ্চায় যে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, তাহার তুলনা আজিও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।" সভামধ্যে হুলস্থুল পড়িয়া যায়। অসংখ্য ইংরাজ শ্রোতার মধ্যে কে এই সাহসী বিদেশী যুবা ইংরাজকে এরূপ ভাবে বর্ণনা করে! নির্ভীক তেজস্বী সুরেন্দ্রনাথের তখন মুখ-চক্ষু দিয়া অগ্নি নির্গত হইতেছিল। স্বজাতির অপমান—স্বদেশের অপমান,—সুরেন্দ্রনাথ তাহা সহ্য করিবেন? সে বক্তৃতায় ইংরাজ শ্রোতৃমণ্ডলী গালি খাইয়াও মুগ্ধ হইয়াছিল, তাঁহার সহিত পরিচয় করিতে চাহিয়াছিল। আর একবার কলিকাতার টাউন হলে সাম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার মৃত্যুর শোকসভায় সুরেন্দ্রনাথ যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহাতে অতি বড় দাম্ভিক বক্তা লর্ড কার্জ্জনও স্তম্ভিত হইয়াছিলেন, লেডী কার্জ্জন স্বয়ং মুগ্ধ হইয়া ঘন ঘন করতালি দিয়াছিলেন। কোনও ইংরাজ সংবাদপত্রসেবী বিলাতে তাঁহার একটিমাত্র বক্তৃতা শুনিয়া বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া বলিয়াছিলেন,—"Experienced speakers in and out of Parliament found in the Babu a deal which recalled the sonorous thunders of a William Pitt: the dialectical skill of a Fox, the rich fulness of illustration of a Burke, the keen wit of a Sheridan, * * He has just followed in the wake of the greatest orators of the world of Cicero of Rome, of Pitt of England and of Mirabeau of France." এমন অযাচিত উদার উন্মুক্ত প্রশংসা এ দেশবাসী অন্য কাহারও ভাগ্যে ঘটিয়াছে বলিয়া আমার জানা নাই।

সুরেন্দ্রনাথের কন্যা শ্রীমতী সরযূবালা দেবী

ইলবার্ট বিলের সময়, মিউনিসিপ্যাল (ম্যাকেঞ্জি) আইনের সময়, বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশীর সময়,—সুরেন্দ্রনাথের সিংহনাদে কে না মুগ্ধ হইয়াছে? পান্তির মাঠে বক্তৃতাকালে জনসঙ্ঘ এত উত্তেজিত হইয়াছিল যে, তাঁহাকে মাথায় করিয়া নৃত্য করিতে উদ্যত হইয়াছিল। সুরেন্দ্রনাথ তাঁহার এই বিধিদত্ত অসাধারণ ক্ষমতা দেশের লোকের রাজনীতিশিক্ষায় এবং ছাত্রদিগের রাজনীতিশিক্ষায় নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

সুরেন্দ্রনাথ সেই দিনে শিক্ষাক্ষেত্রে উপনীত হইয়া দেশবাসীর ও তথা ছাত্রসমাজের মোহনিদ্রা ঘুচাইয়াছিলেন। শিক্ষিত ভারতবাসীকে তিনি বুঝাইয়াছিলেন

যে, রাজনীতিক্ষেত্রে ইংরাজের অনুসৃত নীতি অভ্রান্ত বা পাপস্পর্শহীন নহে। তিনিই বুঝাইয়াছিলেন যে, "আজ যিনি ছাত্র, কাল তিনি নাগরিক। নাগরিক জীবনে তাঁহাকে যে কার্য্য করিতে হইবে, ছাত্রজীবনে তাঁহাকে তাহাই শিক্ষা করিতে হইবে। নাগরিক হইয়া তাঁহাকে যে জন্মগত অধিকার রক্ষা করিবার জন্য যত্ন করিতে হইবে, ছাত্রজীবনে সেই অধিকার শিক্ষা করিতে হইবে। সুতরাং ছাত্রের পক্ষে রাজনীতি-চর্চ্চা বর্জ্জনীয় নহে, বরং প্রয়োজনীয়।" দেশে এই যে রাজনীতিক অধিকারলাভের চেষ্টায় জাতিকে উদ্‌বুদ্ধ করা —ইহার মূলই ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ। তাঁহার সময়ে আরও অনেক নেতা ছিলেন, কিন্তু সেই নেতৃবর্গের মধ্যে সুরেন্দ্রনাথই প্রথমে রাজনীতির আলোচনায় দেশকে উদ্‌বুদ্ধ করিবার নিমিত্ত ভারতের নানা স্থানে অনলবর্ষিণী বক্তৃতা করিয়াছিলেন। ইহাই পরে ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের ভিত্তি-প্রতিষ্ঠার মূল। সার হেনরী কটন তাঁহার 'নিউ ইণ্ডিয়া' গ্রন্থে এ কথা শত মুখে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

সুরেন্দ্রনাথের দৌহিত্রী শুভা

পণ্ডিত শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী সুরেন্দ্রনাথের চরিতকথা বিবৃত করিবার কালে লিখিয়াছেন, He was the maker of us all তিনি আমাদের সকলকে হাতে গড়িয়া মানুষ করিয়া তুলিয়াছেন। এ কথা খাঁটি সত্য। অশ্বিনীকুমার দত্ত, আশুতোষ চৌধুরী, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, ভূপেন্দ্রনাথ বসু, চিত্তরঞ্জন দাশ, বিপিনচন্দ্র পাল, অরবিন্দ ঘোষ, শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী,—মনীষী বাঙ্গালীর মধ্যে এমন কে আছেন, যিনি বলিতে পারেন, কোন না কোন সময়ে তিনি সুরেন্দ্রনাথের প্রভাব অনুভব করেন নাই? তাঁহার সুরস্রাবী বক্তৃতায় মুগ্ধ হয়েন নাই? অর্দ্ধ-শতাব্দী ব্যাপিয়া সুরেন্দ্রনাথের রচনা ও বক্তৃতা কেবল বাঙ্গালার নহে, সমগ্র ভারতের তরুণ-সম্প্রদায়কে ওতঃপ্রোতভাবে প্রভাবিত করিয়া আসিয়াছে, এ কথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। পরে হয় ত কেহ কেহ তাঁহার গৃহীত পথ হইতে ভিন্ন পথে চলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু প্রথমে তাঁহারা যে সুরেন্দ্রনাথের রাজনীতিক ভূয়োদর্শনের এবং শিক্ষার উৎস হইতে প্রেরণা সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা কি কেহ অস্বীকার করিতে পারেন? সুরেন্দ্রনাথ যদি জন্মগ্রহণ না করিতেন, তাহা হইলে এ দেশের রাজনীতি-চর্চ্চা হয় ত কথার কথায় পর্য্যবসিত হইত—দেশের রাজনীতিক্ষেত্রে সুরেন্দ্রনাথের এমনই প্রভাব!

সুরেন্দ্রনাথের এই প্রভাবের উৎস কোথায়? সুরেন্দ্রনাথ এক বিরাট রাজনীতিক বক্তা বলিয়াই কি তাঁহার প্রভাব দেশবাসীর উপর বিস্তৃত হইয়াছিল? না, কেবল সে জন্য নহে, সুরেন্দ্রনাথের রাজনীতিক বক্তৃতার ভিত্তি ছিল দেশপ্রেম। জগতে যাঁহারা বিখ্যাত বক্তা বলিয়া চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই দেশপ্রেমিক। দেশপ্রেমের উন্মাদনা না থাকিলে বক্তৃতায়

ঐশ্বরিক প্রভাবের মত প্রভাব অনুভূত হয় না। বার্ক, পিট, সেরিডান, দাঁতো, মিরাবো, কাভুর, ম্যাটজিনি,—সকলেই দেশপ্রেমিক ছিলেন। সুরেন্দ্রনাথও তাঁহাদের মত দেশপ্রেমিক ছিলেন। অতি শুভক্ষণে এ দেশের আমলাতন্ত্র সরকার তাঁহাকে সরকারী সিবিলিয়ানী চাকুরী হইতে বরখাস্ত করিয়াছিলেন। বিতাড়িত সিবিলিয়ান সুরেন্দ্রনাথের মনে তদবধি বিজিত পরাধীন জাতির অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা ও অসহনীয় বেদনার সুর বাজিয়া উঠে। সুরেন্দ্রনাথ সেই সুরের দ্বারা বিজিত পদানত দেশবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষার সুরে আঘাত করিয়াছিলেন, তাই সেই সুরে সুর বাজিয়া উঠিয়াছিল।

বিজিত জাতির পরনির্ভরতার অপমানের জ্বালা তুষানলের মত ধিকি ধিকি জ্বলিয়া থাকে; সামান্য বায়ু-তাড়নায় তাহা দাউ দাউ জ্বলিয়া উঠে। সুরেন্দ্রনাথের মনে যে অপমানের অগ্নি ধিকি ধিকি জ্বলিতেছিল, বঙ্গভঙ্গের সময়ে তাহা বিরাট অগ্নিকাণ্ডে পরিণত হইয়াছিল। ১৯০৫ হইতে ১৯১১ খৃষ্টাব্দের বাঙ্গালার ইতিহাস সেই অগ্নিকাণ্ডের সাক্ষ্য প্রদান করিবে। সুরেন্দ্রনাথ সে সময়ে দেশবাসীর মনে যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন, তাহার তুলনা খুঁজিয়া কোথায় পাইব? ফুলারী শাসনের গুর্খা পুলিসের অত্যাচার, ফুলারের 'সুয়া দুয়া রাণীর' শাসন-নীতির বিষময় ফল, বরিশালের লাটের ষ্টীমারে নেতৃবর্গের অপমান, বরিশাল কনফারেন্স ভঙ্গ, স্বেচ্ছাসেবকগণের উপর পুলিসের লাঠি, সুরেন্দ্রনাথের গ্রেপ্তার, নেতৃবর্গের আটক,—এ সকলের বিবরণ এখানে নিষ্প্রয়োজন। তবে এ কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, বিজিত পরাধীন জাতির পুঞ্জীভূত অসন্তোষ আকার ধারণ করিয়া বিপ্লববাদের মূর্ত্তিতে দেখা দিল। সুরেন্দ্রনাথ সে সময়ে নেতৃরূপে দেশকে কি ভাবে চালাইয়াছিলেন এবং দেশের লোক সে সময়ে তাঁহাকে কিরূপ রাজসম্মান প্রদান করিয়াছিল, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। সুরেন্দ্রনাথ সে সময়ে বাঙ্গালার সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করিয়া বিলাতী পণ্যবর্জ্জন (Boycott) আন্দোলনের অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়াছিলেন। তখন শোভাযাত্রায় তাঁহাকে নগ্নপদে পথ চলিতে দেখিয়াছি, উপবীত লইয়া ব্রাহ্মণত্বের দাবী করিতে শুনিয়াছি, জাতীয় ভাণ্ডারে অর্থসংগ্রহ করিতে দেখিয়াছি, ফেডারেশন হলের মাঠে জাতীয়-পতাকা উড্ডীন করিতে দেখিয়াছি। তখন সুরেন্দ্রনাথ দেশের রাজা,—দেশবাসীর হৃদয়-সিংহাসনের অবিসংবাদী সম্রাট।

কি সামান্য অবস্থা হইতে সুরেন্দ্রনাথ জাতীয় আন্দোলনকে বিরাট আকারে পরিণত করিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিলেও হর্ষ, বিস্ময় ও শ্রদ্ধায় হৃদয় পুলকিত হইয়া উঠে। প্রথমে সুরেন্দ্রনাথের ছাত্র-সভার কথা উল্লেখ করিব। প্রতি শুক্রবার অপরাহ্ণে এলবার্ট হলে ছাত্র-সভার অধিবেশন হইত, সুরেন্দ্রনাথ সভাপতি হইতেন। জীর্ণ ঘর, জীর্ণ বেঞ্চ-চেয়ার। গ্যাসের খরচা অধিক, তাই কলিকায় বাতি বসাইয়া কায চালান হইত। ভারত-সভার উদ্বোধনের ইতিহাসও প্রায় এইরূপ। কিন্তু এই সকল প্রতিষ্ঠানই পরে দেশে বহু শক্তিশালী রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের মূল। সুরেন্দ্রনাথের 'বেঙ্গলীর' প্রথমাবস্থাও এইরূপ। সামান্য এক সাপ্তাহিক পত্র, শেষে উহা দেশের জনমতের শক্তিশালী মুখপত্র হইয়াছিল। সুরেন্দ্রনাথের প্রথম বয়সের এই সমস্ত রাজনৈতিক আন্দোলনের উদ্যমকে দেশেরই এক সম্প্রদায় লোক ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের দৃষ্টিতে দেখিতেন। ইন্দ্রনাথের 'ভারতোদ্ধার' এবং যোগেন্দ্রনাথের 'চিনিবাস-চরিতামৃত' এই সকল গ্রন্থের নিদর্শন। লেখক স্বয়ং দেখিয়াছে, যখন আনন্দমোহন বসু বিলাতে এক ডেপুটেশন হইতে দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, সেই সময়ে সুরেন্দ্রনাথ প্রমুখ বহু নেতা তাঁহাকে যখন হাওড়া ষ্টেশন হইতে সমারোহে শোভাযাত্রা করিয়া পুষ্প-মাল্যাদি ভূষিত করিয়া অশ্বযান-যোগে কলিকাতায় আনয়ন করেন, তখন বড়বাজারে কোন কোন মাড়োয়ারী অতি কদর্য্য ভাষায় তাঁহাদের রাজনৈতিক আন্দোলনের স্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছিল। অর্থাৎ তাহারা বাঙ্গালী দর্শকদিগের সমক্ষে প্রকাশ্যভাবে বলিয়াছিল যে, বাঙ্গালী বাবুরা সাগর ডিঙ্গাইয়া লঙ্কা দগ্ধ করিয়া আসিতেছে, ইত্যাদি। ভাবিয়া দেখুন, তখনকার অবস্থা এবং এখনকার অবস্থার সহিত তাহার তুলনা করুন। এখন বড়বাজারে কংগ্রেসের মস্ত ঘাঁটি হইয়াছে, এখন বিস্তর মাড়োয়ারী কংগ্রেসের সদস্য, অনেক মাড়োয়ারী চরমপন্থী! এ অভাবনীয় পরিবর্ত্তনের মূলে

যে সুরেন্দ্রনাথের শিক্ষাদান ও প্রচারকার্য্য, তাহা কে না স্বীকার করিবে ?

সুরেন্দ্রনাথের সেই গৌরবের দিনেও দেশবাসীদের মধ্যে অনেকে জাতীয় ভাবে উদ্‌বুদ্ধ হইয়াছিল, তাঁহাকে দেশনেতা বলিতে চিনিতে শিখিয়াছিল। তিনি একাধিকবার কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট হইয়াছিলেন। পুনা কংগ্রেসের পর তদঞ্চলে রাজনীতিক প্রচারকার্য্য সাঙ্গ করিয়া তিনি যখন কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন, তখন মনোমোহন ঘোষের নেতৃত্বে দেশের তরুণসঙ্ঘ তাঁহার প্রতি যে সম্মান দেখাইয়াছিল, তাহার তুলনা বিরল। এমনও হইয়াছে যে, তরুণসঙ্ঘ তাঁহার যানের ঘোড়া খুলিয়া দিয়া নিজেরাই গাড়ী টানিয়াছেন। এ সম্মান রাজসম্মান অপেক্ষা অনেক বড়। সুরেন্দ্রনাথ জীবদ্দশায় এ সম্মান ভোগ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। জজ নরিশের চেষ্টায় যখন তাঁহার নামে আদালত-অবমাননার অভিযোগ উপস্থিত হয়, তখন তাঁহার বিচার দেখিতে হাইকোর্ট লোকে লোকারণ্য হইয়াছিল। পুলিস ফৌজ আনিয়া জনতার শান্তি রক্ষা করিতে হইয়াছিল। আবার যখন সুরেন্দ্রনাথ বঙ্গভঙ্গের বিপক্ষে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করেন, লর্ড মরলের settled factকে unsettled করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েন, তখন দেশের লোক তাঁহার ডাকে কিরূপ সাড়া দিয়াছিল, তাহা ভাঙ্গা বাঙ্গালা যোড়া লাগায় এবং রাজার দরবারী ঘোষণায় জানা যায়। সরকার কলিকাতা কর্পোরেশানকে যখন ম্যাকেঞ্জি আইনের জোরে সরকারী হুকুমের তাঁবেদারে পরিণত করিবার চেষ্টা করেন, তখন সুরেন্দ্রনাথ প্রতিবাদকল্পে অন্য ২৭ জন কমিশনারের সহিত একযোগে পদত্যাগ করিয়াছিলেন। সে সময়ে দেশের লোক তাঁহার এই দেশের আত্মসম্মানরক্ষার চেষ্টায় আত্মনিয়োগের পরিচয় পাইয়া ভক্তিশ্রদ্ধায় তাঁহার প্রতি মস্তক অবনত করিয়াছিল। রসরসিক নাট্যকার অমৃতলাল বসু তাঁহার 'সাবাস আটাস' প্রহসনে তাহা জলন্ত চিত্রে অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন।

বাঙ্গালীর হৃদয়ের রাজা সুরেন্দ্রনাথ শেষে মন্ত্রী সার সুরেন্দ্রনাথে পরিণত হইলেন কেন, তাহারও বিচিত্র কার্য্যকারণের ইতিহাস আছে। সুরেন্দ্রনাথ যখন Tribune of the people অথবা জনসঙ্ঘের প্রতিনিধি ছিলেন, তখনও তিনি যে দেশপ্রেমে অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন, মন্ত্রী সার সুরেন্দ্রনাথেও সেই দেশপ্রেমের অভাব ছিল না। কথাটা প্রথমে হেঁয়ালীর মতই বোধ হইবে। কিন্তু মানুষ সুরেন্দ্রনাথকে যে বুঝিয়াছে, সে ইহার মর্ম্ম বুঝিতে কষ্ট পাইবে না।

সুরেন্দ্রনাথের রাজনীতিক জীবনের আদ্যোপান্ত আলোচনা করিলে দেখা যাইবে, তিনি চিরদিন রাজভক্ত প্রজা, নিয়মানুগ পথের পথিক এবং শাসক ইংরাজ জাতির প্রতিশ্রুতিপরায়ণতায় ও ন্যায়বিচারে অন্ধ বিশ্বাসী রাজনীতিক। যে এই কথা কয়টি মনে রাখিবে, সে-ই বুঝিবে, কেন বাঙ্গালার মুকুটহীন রাজা পরে মন্ত্রী সার সুরেন্দ্রনাথে পরিণত হইয়াছিলেন। তিনি ইংরাজ আমলাতন্ত্র শাসনের পোষক ও ধারক রাজপুরুষদিগের কার্য্যের তীব্র সমালোচনা করিতেন বটে, কিন্তু কখনও ইংরাজ জাতির ন্যায়বিচারে আস্থাহীন হয়েন নাই। আঘাতের পর আঘাত, অপমানের পর অপমান কখনও তাঁহাকে এই বিশ্বাস হইতে টলাইতে পারে নাই। ইংরাজের প্রতি তাঁহার এই প্রগাঢ় বিশ্বাসের হেতু কি ? কারণ এই যে, সুরেন্দ্রনাথ বার্ক ও বেন্থামের রচনা-সুধা পানে ভরপুর ছিলেন, গ্লাডষ্টোন, ব্রাইট, সার হেনরী কটন ও সার উইলিয়াম ওয়েডারবার্ণ প্রমুখ ইংরাজের সাহচর্য্যে সাম্রাজ্যবাদী ইংরাজের মনুষ্যত্ব ও উদারতায় সন্দেহশূন্য হইয়াছিলেন। লোকের মনের প্রথমাবস্থায় যে ধারণা হয়, তাহা প্রায়শঃ সকল ক্ষেত্রেই চিরজীবন বদ্ধমূল হইয়া যায়। সুরেন্দ্রনাথেও তাহাই হইয়াছিল। তিনি যে শিক্ষা-দীক্ষার মধ্য দিয়া নিজের জীবনকে গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, তাহাতে ইংরাজকে তিনি আপনার রাজনীতিক গুরু বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি ইংরাজের রাজনীতির উৎস হইতে রাজনীতির রস আকণ্ঠ পান করিয়াছিলেন। তিনি ইংরাজের অনুকরণে নিয়মানুগ আন্দোলন দ্বারা স্বদেশের রাজনীতিক অধিকারপ্রাপ্তির আশায় অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন এবং ইংরাজ স্বাধীনতাপ্রিয়, সুতরাং তাঁহাকে বুঝাইতে পারিলে সে অপরের

স্বাধীনতার ব্যবস্থা করিয়া দিবে, এই বিশ্বাসে তিনি আ-জীবন তন্ময় হইয়াছিলেন।

এই ভাবে তাঁহার মন গঠিত হইয়াছিল। তাই তিনি আঘাতের পর আঘাত পাইয়াও কখনও আশা-হীন হয়েন নাই। আমলাতন্ত্র সরকার জাতিকে বার বার আশাহত করিয়াছেন,—অপমানিত, লাঞ্ছিত, দণ্ডিত করিয়াছেন, বার বার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিয়াছেন,—কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ কখনও আশার হাল ছাড়েন নাই। তিনি প্রত্যেক মেঘের অন্তরাল হইতে সূর্য্যালোক দেখিতে পাইতেন। এই হেতু 'নিয়মানুগ পথ' হইতে তিনি কখনও বিচলিত হয়েন নাই, 'সহযোগ' হইতে কখনও ভ্রষ্ট হয়েন নাই। অপরের অসহযোগের কথা এই জন্য তিনি কখনও বুঝিতে পারেন নাই, সরকারের সহিত সহযোগ ভিন্ন কখনও আমাদের স্বায়ত্ত-শাসনাধিকার লাভ হইতে পারে, ইহা ধারণাও করিতে পারেন নাই। —কোনও সমালোচক তাঁহার সহযোগমন্ত্রের এই রূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন:—"His over-growing optimism even after official acts of national betrayal and his scanning of silver linings even in platitudes and verbiagelis due to his incurable faith in British equity and justice. As a product of the New English School, he was unconsciously carried away by the bombast and tinsel of the west, which he even imitated in his speeches. In his mania for co-operation, he did not care even for self help and self-sufficiency." আমরা অবশ্য এত দূর অগ্রসর হইতে চাহি না। সুরেন্দ্রনাথ সহ-যোগের মোহে যে আত্মশক্তি পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইয়া-ছিলেন অথবা অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন, এ কথা বলিতে পারি না। মনে করুন, বরিশালের কনফারেন্স ভঙ্গের কথা। সুরেন্দ্রনাথ সে সময়ে কি সরকারের সহযোগ অগ্রাহ্য করিয়া আত্মশক্তির উপর দণ্ডায়মান হয়েন নাই—দেশের লোককে কি আত্মশক্তিতে উদ্বুদ্ধ করেন নাই? ম্যাজিষ্ট্রেট ইমার্সন যখন তাঁহাকে চোখ রাঙাইয়া ভয় দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তখন কি তিনি তাহাতে ভীত হইয়াছিলেন? না, বিরাট আমলাতন্ত্র শাসনের প্রতিভূর রুদ্র মূর্ত্তি তাঁহাকে সঙ্কল্পচ্যুত করিতে পারে নাই।

তবে তিনি বৈধ আন্দোলনের পক্ষপাতী ছিলেন, এ কথা নিশ্চয়। ম্যাজিষ্ট্রেটের অন্যায় আদেশ অমান্য করিবার সময়েও তিনি বৈধভাবে কার্য্য করিতে-ছেন বলিয়া তাঁহার পূর্ণ বিশ্বাস ছিল, বলিয়া-ছিলেন,—I am within my own rights. শক্তিপরীক্ষার জন্য ইচ্ছাপূর্ব্বক সরকারের আইন ভঙ্গ করিব, সরকারকে সর্ব্ববিষয়ে বাধা দিব,—এ সব কল্পনা সুরেন্দ্রনাথের ছিল না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তাঁহার বিশ্বাস ছিল, 'সুসভ্য ইংরাজ জাতি চিরকাল কখনও অন্যায় নীতি পোষণ করিবে না।' সুতরাং বিলাতে ও ভারতে তুল্যভাবে রাজনীতিক আন্দোলন চালাইতে পারিলে—বিলাতের জনসাধারণ ভারতে ব্যুরোক্রেশীর স্বার্থজড়িত নীতির স্বরূপ বুঝিতে পারিলেই ভারত-শাসনের নীতি পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইবে। ইংরাজের সাহচর্য্যে তাঁহার কেমন প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল, তাহার

কন্যা ও দৌহিত্রীসহ সুরেন্দ্রনাথ

একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। ১৯০২ খৃষ্টাব্দে আমেদাবাদের কংগ্রেসের সভাপতিরূপে বক্তৃতাকালে তিনি বলিয়াছিলেন,—"ইংলণ্ডই ভারতবাসীর হৃদয়ে রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষা উদ্বুদ্ধ করিয়াছে—ইংরাজের আদর্শে ভারতীয়ের রাজনৈতিক জীবন স্পন্দিত হইতেছে।" এই বিশ্বাস ও ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া তিনি পরিণত বয়সে দেশবাসীর ব্যঙ্গবিদ্রূপ উপেক্ষা করিয়া মণ্টেগু চেমসফোর্ডের দ্বৈত শাসন সফল করিতে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, দেশের লোকের 'ট্রাইবিউন' সুরেন্দ্রনাথ সার সুরেন্দ্রনাথ সাজিয়াছিলেন, সরকারের মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহাই সুরেন্দ্রনাথের প্রথম ও শেষ জীবনের পার্থক্যের গুপ্ত ইতিহাস।

সুরেন্দ্রনাথ কেন সহযোগকে জীবনের মূলমন্ত্র করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহারই রচনা হইতে উদ্ধৃত করিয়া বুঝাইতেছি। তিনি লিখিয়াছেন:—"আমাদের নিজের সামর্থ্য ও কার্য্যক্ষমতার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া আপনার পায়ের উপর আপনারা দাঁড়াইতে পারি এবং অসহযোগ সে পক্ষে আমাদিগকে সহায়তা করিতে পারে, ইহা সম্ভব হইতে পারে। কিন্তু ইহাতে আমরা এক বিষয়ে বঞ্চিত হইব। জগতের সভ্যতা এবং শিক্ষা-দীক্ষার যে পীযূষধারা পান করিয়া জাতিনিচয় জীবন্ত রহিয়াছে, এবং নিজের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর বাহিরে বিশ্বের সঞ্চিত বিদ্যা ও ভূয়োদর্শনের যে ফল উপভোগ করিতেছে, তাহা হইতে আমরা দূরে থাকিব। সহযোগের দ্বারা আমরা বহির্জ্জগতের শিক্ষা ও সভ্যতার অংশভাগী হইতে পারিব, অন্য দিকে আমরাও বহির্জ্জগতের লোককে আমাদের নিজস্ব আধ্যাত্মিক জ্ঞানের অংশ প্রদান করিতে পারিব। জগতের লোককে আমাদের দিবার অনেক জিনিষ আছে জগতের লোকের নিকটে আমাদেরও অনেক শিখিবার জিনিষ আছে।

"প্রাচীন ভিত্তির উপর আমাদিগকে দণ্ডায়মান হইতে হইবে। তাহার উপর আমরা যতই আমাদের জ্ঞানের সৌধ গড়িয়া তুলিতে থাকিব, ততই আমরা সেই জ্ঞানকে বিস্তৃতায়তন ও উদার করিতে সমর্থ হইব। জাতীয় জীবনের প্রবাহ এক অবিচ্ছিন্ন ধারায় প্রবাহিত হইয়া থাকে। অতীত বর্ত্তমানে মিলিত হয় এবং বর্ত্তমান অদৃশ্য ও সর্ব্বদা বিস্তারশীল ভবিষ্যতে মিশিয়া যায়। বর্ত্তমান ভবিষ্যতের দিকে যত অগ্রসর হয়, ততই প্রতি পদবিক্ষেপে প্রশস্ত হয় এবং চারিদিকের ভূমি উর্ব্বর করিয়া তুলে। আমাদের ভিত্তি অতীতের উপর ন্যস্ত হওয়া চাই। আমাদের অতীত ভাবধারা ও সংস্কার আমাদের জাতির ইতিহাস গঠন করিয়াছে; সেই অতীতকে ভিত্তি করিলে বর্ত্তমান ভবিষ্যৎকেও আকৃতি প্রকৃতি দিতে পারিবে।

"কিন্তু আমরা কেবল অতীতকে আঁকড়িয়া ধরিলে চলিবে না। আমরা যেখানে আছি, সেইখানে থাকিলেও চলিবে না। ভগবানের রাজ্যে কর্ম্মশূন্য হইয়া নিশ্চেষ্ট বসিয়া থাকা চলে না। অতীতের প্রতি সসম্ভ্রম দৃষ্টি রাখিয়া, বর্ত্তমানের প্রতি প্রীতিপূর্ণ আগ্রহ রাখিয়া এবং ভবিষ্যতের মঙ্গলের জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া আমাদিগকে অগ্রসর হইতে হইবেই। অগ্রসর হইবার কালে আমাদের নিজস্ব সভ্যতা, ভাবধারা ও শিক্ষা দীক্ষার সহিত বাহির হইতেও অপরের মঙ্গলময় প্রভাব গ্রহণ করিতে হইবে—উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্যবিধান করিয়া আমাদের জাতীয় জীবনের ধাতুসহ জিনিষ সঞ্চয় করিতে হইবে। উহা দ্বারা আমাদের জাতীয় জীবন নব শক্তিতে শক্তিমান্ হইবে। এইরূপে সহযোগ ও সাহচর্য্য আমাদের জাতীয় জীবনকে ক্রমবিকাশের পথ দিয়া উন্নতির পথে লইয়া যাইবে; অসহযোগ ও পরকে বর্জ্জন তাহা করিতে পারিবে না। ইহা ভিন্ন অন্য নীতি অবলম্বন করিতে গেলেই আমরা জাতি হিসাবে মরিয়া যাইব, আমাদের জাতীয় স্বার্থ ক্ষুন্ন হইবে। দেশবাসীর প্রতি ইহাই আমার বাণী। এই বাণী আমি চঞ্চলতা বা অধীরতা বশতঃ দিয়া যাইতেছি না, আমার দীর্ঘ জীবনের ভূয়োদর্শন ও চিন্তার ফলে দিয়া যাইতেছি। আমার জন্মভূমির সেবায় আমি আমার সুদীর্ঘ জীবনে যে শ্রম নিয়োজিত করিয়াছি, তাহারই ফলে বুঝিয়াছি, ইহা ভিন্ন আমাদের গত্যন্তর নাই।"

পাঠক এখন বোধ হয় বুঝিলেন, 'Saint of Non-co-operation' এবং 'Sage of Co-operation'এর মধ্যে প্রভেদ কি? সবরমতীর ত্যাগী সন্ন্যাসী যে শিক্ষা দীক্ষা ও ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া অসহযোগ মন্ত্রের প্রচার

করিয়াছেন. তাহা হইতে সুরেন্দ্রনাথের শিক্ষা দীক্ষা ও ধারণা কত বিভিন্ন। উভয়েই দেশের উন্নতিকামী, উভয়েই দেশের মুক্তিকামী. উভয়েই দেশের সম্মান ও অতীত গৌরব পুনরানয়ন করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। উভয়েই দেশপ্রেমিক, উভয়েই দেশের কার্য্যে আত্ম-নিয়োগ করিয়াছেন, উভয়েই দেশের উন্নতির জন্য বহু স্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়াছেন। এক জন ছাত্র-গঠন, সংবাদপত্র-সম্পাদন এবং আন্দোলন-আবেদন দ্বারা মায়ের কার্য্য সম্পন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, আর এক জন আপনার সুখস্বাচ্ছন্দ্য ত্যাগ করিয়া দুঃখ-বিপদ বরণ করিয়া দেশের দরিদ্রনারায়ণের সেবা করিয়া দেশবাসীর মনে দেশাত্ম-বোধ, আত্মশক্তিতে প্রত্যয় জাগাইয়াছেন এবং দেশ-বাসীকে পরনির্ভরতা ছাড়িয়া আপনার সনাতন ভাব-ধারার মধ্য দিয়া আপনাকে ফুটাইয়া তুলিতে উপদেশ দিয়াছেন। উভয়ের শিক্ষা-দীক্ষা, চিন্তার ধারা ভিন্নরূপ, তাই ত্যাগের মধ্য দিয়া মোহনচাঁদ করমচাঁদ গন্ধী আজ মহাত্মা—দেশপূজ্য, সর্বজনবরেণ্য, দেশনায়ক যুগমানব। আর সুরেন্দ্রনাথ? মন্ত্রী সার সুরেন্দ্রনাথ! দেশের চিন্তার ধারা তাই সার সুরেন্দ্রনাথের চিন্তার ধারা হইতে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত।

সুরেন্দ্রনাথের দেশপ্রেমে কাহারও সন্দেহ নাই। পঞ্জাব-কেশরী লালা লাজপৎ রায়ের মত দেশপ্রাণ পুরুষ-সিংহও বলিয়াছেন,—"কংগ্রেস ও সুরেন্দ্রনাথের মধ্যে মতভেদ উপস্থিত হইয়াছিল সত্য, কিন্তু কেহই তাঁহার উদ্দেশ্যে বা দেশভক্তিতে সন্দেহ করে নাই। মৃত্যু—সমস্ত ভেদ ধৌত করিয়া দিয়াছে। তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ দেশ-ভক্তের মধ্যে অন্যতম বলিয়া মানিয়া আমরা তাঁহার জন্য শোক প্রকাশ করিতেছি।" মহাত্মা গন্ধীও এই জ্ঞান-বৃদ্ধ দেশনায়কের পাদমূলে বসিয়া উপদেশ গ্রহণ করিতে গৌরব অনুভব করিয়াছিলেন।

সুরেন্দ্রনাথ বহুবার বলিয়াছেন, স্বায়ত্তশাসনাধিকারই ভারতবাসীর কাম্য। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে তিনি বলিয়াছিলেন, —"আমাদের দেশ শাসনে আমরা কার্য্যভার কতকাংশে গ্রহণ করিতে চাহি। আমরা কেবলমাত্র ব্যুরোক্রেশীর হস্তে সমস্ত ক্ষমতা প্রদান করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিব না। ··· কর ধার্য্য করা ব্যাপারে এবং দেশ-শাসনে আমরা জনমত প্রতিষ্ঠা করিতে চাহি।" সে আজ ৪৬ বৎসর পূর্ব্বের কথা। বুঝিতে হইবে, তখন দেশের অবস্থা কি ছিল। তখন সুরেন্দ্রনাথ দেশবাসীর মনে এই আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়াছিলেন। আজ যে দেশবাসীর মনে মুক্তির প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছে, তাহার মূল কি সুরেন্দ্রনাথ নহেন? তাঁহাকে Father of Indian Nationalism বলিলে কখনই অত্যুক্তি হয় না।

ব্যক্তিগত স্বাধীনতার প্রতি সুরেন্দ্রনাথের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল। দেশের আত্মসম্মানের প্রতিও তাঁহার খর-দৃষ্টি ছিল। ইলবার্ট বিল আন্দোলনের সময় সুরেন্দ্রনাথ দেশের লোকের আত্মসম্মানের পক্ষে যে জ্বালাময়ী বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহার তুলনা বিরল। 'বেঙ্গলী' পত্রে সুরেন্দ্রনাথের রচনা এবং সভাসমিতিতে ও কংগ্রেস কন্‌ফারেন্স আদিতে সুরেন্দ্রনাথের বক্তৃতা দেশের স্বার্থে সর্ব্বদা নিয়োজিত হইত এবং ব্যুরোক্রেশী ও এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ার ভীতি উৎপাদন করিত। সুরেন্দ্রনাথ এ জন্য সরকারের নিকট Agitator, Extremist, Revolutionary ইত্যাদি উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন; পরন্তু এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মহলে তাঁহাকে বিদ্রূপ করিয়া 'Surrender not' বলা হইত। ব্যুরোক্রেশী চিরদিনই তাঁহাকে শত্রু বলিয়া মনে করিয়া আসিয়াছেন, এ্যাংলো-ইণ্ডিয়া চিরদিনই তাঁহাকে তাহাদের স্বার্থের প্রবল প্রতি-দ্বন্দ্বী বলিয়া মনে করিয়াছে। আজ যদি ১৯০৫-১১ খৃষ্টাব্দ-গুলিকে ফিরাইয়া আনা যায়, তাহা হইলে দেখিতে পাওয়া যাইবে, এ্যাংলো-ইণ্ডিয়া আবার সুরেন্দ্রনাথকে veteran hero of hundred battles বলিয়া প্রশংসা করে কি না। সুরেন্দ্রনাথের সেই আন্দোলনকে কি এ্যাংলো-ইণ্ডিয়া 'constitutional agitation' বলিবেন, না 'constructive statesmanship' বলিবেন, তাহাই দেখিতে ইচ্ছা করে। মোট কথা, সুরেন্দ্রনাথের এই সকল আন্দোলনের ভিত্তিই ছিল দেশপ্রেম এবং ব্যুরোক্রেশীর প্রবল বাধার বিপক্ষে দেশের স্বার্থরক্ষার চেষ্টা। কংগ্রেসে, কর্পোরেশনে, কাউন্সিলে সুরেন্দ্রনাথ বহুকাল বহু পরিশ্রম করিয়া কার্য্য করিয়াছেন; ইহাতে তাঁহার মহত্ত্ব যতই না পরিস্ফুট হউক, দেশের স্বার্থের ও আত্ম-সম্মানরক্ষার জন্য তাঁহার বিপুল উদ্যম তাঁহাকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবে।

১৯১৯ খৃষ্টাব্দের মণ্টেগু-সংস্কার সুরেন্দ্রনাথের জীবনে পরিবর্ত্তন সংঘটন করিয়াছিল। অবশ্য সুরেন্দ্রনাথের দিক হইতে দেখিলে তাঁহার মতপরিবর্ত্তনের পরিচয় পাওয়া যায় না। তিনি আজীবন যাহা সাধনা করিয়া আসিয়াছিলেন, সংস্কার আইনে তাহা পাইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার দৃঢ় ধারণা হইয়াছিল। সুরেন্দ্রনাথ বুঝিয়াছিলেন যে, মণ্টেগু-সংস্কার এ দেশে প্রকৃত স্বায়ত্তশাসনের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছে। উহার যতই গলদ থাকুক, উহাকে ভিত্তি করিয়া সরকারের সহিত সহযোগ করিলে ভবিষ্যতে ভারত পূর্ণ দায়িত্বপূর্ণ শাসনাধিকার প্রাপ্ত হইবে। এইখানেই তাঁহার সহিত দেশবাসীর মতবিরোধ ঘটিয়াছিল। সুরাটে কংগ্রেসভঙ্গের পর হইতে নব্যদলের সহিত তাঁহার মতবিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল, লক্ষ্ণৌয়ে তাহা দূর হইয়াও হয় নাই। যত দিন দেশের লোক সুরেন্দ্রনাথ ও প্রাচীনপন্থী দলের বিশ্বাসের অনুবর্ত্তী হইয়া ছিল, তত দিন সুরেন্দ্রনাথ দেশের অবিসংবাদী নেতা বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছিলেন; কিন্তু দেশের লোকের সে বিশ্বাস টলিবার পর হইতে সুরেন্দ্রনাথ দেশের লোক হইতে দূরে সরিয়া গিয়াছিলেন। সুরেন্দ্রনাথের বিশ্বাস কিন্তু টলে নাই, তাই তিনি দেশের লোকের মতপরিবর্ত্তনের যুক্তিযুক্ততা বুঝিতে পারেন নাই। মণ্টেগুসংস্কার প্রবর্ত্তনের পরে দেশের লোকের সহিত তাঁহার ব্যবধান আরও অধিক প্রশস্ত হইয়া যায়। দরিদ্র কৌপীনধারী নগ্নপদ নব্য দলের ত্যাগী কর্ম্মীদিগের অসহযোগমন্ত্র তিনি বুঝিতে পারেন নাই—শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত পাশ্চাত্য রাজনীতিতে অভিজ্ঞ দেশনেতার পরিবর্ত্তে এই পাগলের দল কিরূপে নেতার আসন অধিকার করিতেছে, তাহা তাঁহার ধারণার অতীত ছিল। তিনি গঠন বুঝিতেন, কিন্তু ভাঙ্গনের মধ্য দিয়া গঠনকার্য্য কিরূপে সফল হইতে পারে, ইহা তাঁহার জীবনের শিক্ষাদীক্ষা বুঝিতে দেয় নাই। সরকার তাঁহাকে 'নাইট' উপাধিদানে সম্মানিত করেন, মন্ত্রিপদে নিযুক্ত করেন। তাঁহার ধারণা ছিল, উহা হইতে স্বায়ত্তশাসনের সৌধ গড়িয়া উঠিবে। দেশের লোক যে তাঁহার প্রাচীন নীতি মানিতেছে না, এ কথা তিনি ১৯২৩ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে বুঝিতে পারেন নাই। মন্ত্রিরূপে তিনি যখন ম্যাকেঞ্জি-মিউনিসিপ্যাল আইন পরিবর্ত্তন করেন, তখন তাঁহার মনে হইয়াছিল, তিনি বস্তুতঃই স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের প্রকৃত বীজ বপন করিলেন এবং দেশীয় চেয়ারম্যান নিযুক্ত করিলেন; সুতরাং দেশের লোক কি জন্য তাঁহার অবলম্বিত পথে চলিতে চাহিতেছে না, তাহা তিনি বুঝিতে পারেন নাই।

পঞ্চাশৎ বর্ষ ব্যাপিয়া সুরেন্দ্রনাথ দেশে রাজনীতিক আন্দোলন চালাইয়াছিলেন। রাণাডের অসাধারণ প্রতিভা অথবা সার ফেরোজশার অসামান্য কৌশল তাঁহাতে দেখা যায় নাই বটে, কিন্তু দেশপ্রেমে তিনি কাহারও অপেক্ষা ন্যূন ছিলেন না, অথবা প্রচারকার্য্যে তাঁহার সমকক্ষ কেহ ছিল বলিয়া মনে হয় না। এ কথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, তিনি দেশে রাজনীতির জমী প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন বলিয়াই অন্যান্য নেতার বীজ বপন করিবার সুবিধা ও সুযোগ হইয়াছিল।

স্বজাতির রাজনীতিক মুক্তিসাধন তাঁহার জীবনের একমাত্র সাধনা ছিল। রামমোহন রায় যেমন ধর্ম্মজগতে, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যেমন সামাজিক ও শিক্ষা-জগতে, তেমনই সুরেন্দ্রনাথ রাজনীতিক জগতে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান সভ্যতার যাহা কিছু উৎকৃষ্ট, তাহা হইতে জ্ঞান ও প্রেরণা লইয়া তিনি আমাদের জাতীয় সভ্যতার সহিত মিলনের চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং উহার উপর আমাদের জন্মভূমির নষ্টগৌরবের আসন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য প্রাণপণ প্রয়াস করিয়াছিলেন।

পারিবারিক ও সামাজিক জীবনেও সুরেন্দ্রনাথ অন্তঃকরণের মহত্ত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার মণিরামপুরের বাটীতে অতিথিসৎকারে কিরূপ তৎপর ছিলেন, তাহা অনেকে অবগত আছেন। কাহারও সহিত বিবাদ বা মত-বিরোধ হইলে, তিনি তাহা মনে করিয়া রাখিতেন না। বিরুদ্ধমতবাদী বহু বিপ্লববাদীকে তিনি পক্ষপুটে আশ্রয় দিয়া রক্ষা করিয়াছেন এবং তাঁহাদিগকে সৎপথে আনয়ন করিবার নিমিত্ত উপায় করিয়া দিয়াছেন, এমন কথা অনেক শুনা যায়। পণ্ডিত শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী রাজরোষে দণ্ডিত হইবার পর যখন মুক্তিলাভ করেন, তখন তাঁহার অসহায় অবস্থায় সুরেন্দ্রনাথ সাধ্যমত সাহায্য করিয়াছিলেন। তিনি

বারাকপুরে সুরেন্দ্রনাথের গৃহ
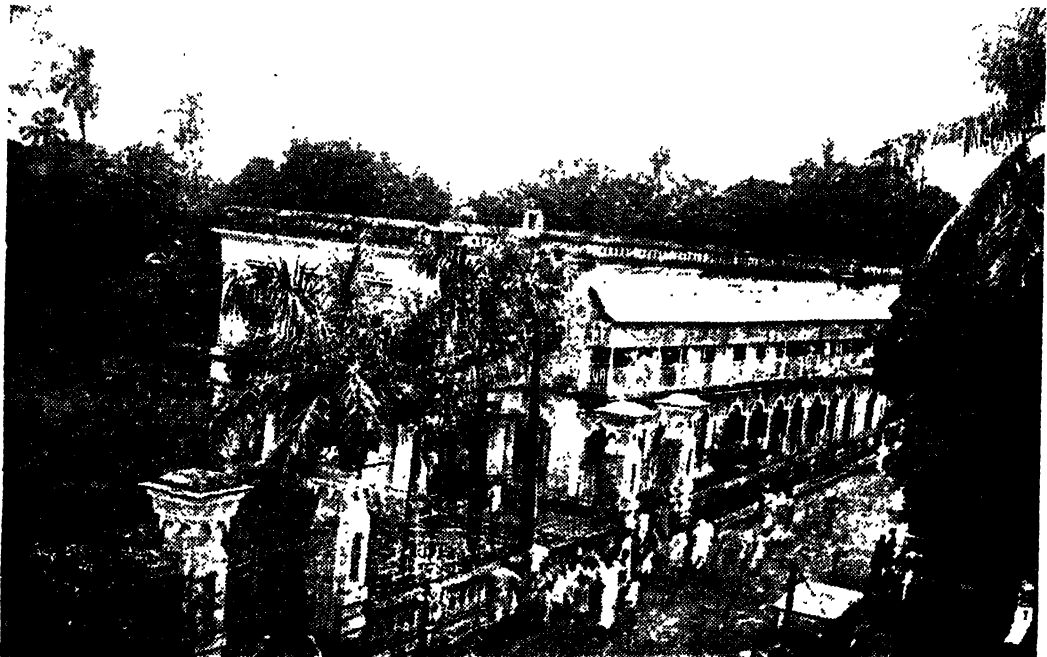
সুরেন্দ্র-ভবন—বাহিরের দৃশ্য

তাঁহাকে 'বেঙ্গলী'তে চাকুরী দিয়াছিলেন এবং এজন্য তাঁহাকে পুলিসের সুনজরে পড়িতে হইয়াছিল। কিন্তু তিনি তাহাতে বিচলিত হয়েন নাই। বাঙ্গালী বিপদে-আপদে পড়িলে তাঁহার নিকট গিয়া পড়িলে কখনও তাঁহার সাহায্যে বঞ্চিত হইত না। তিনি রঙ্গ-রহস্য বুঝিতেন এবং প্রাণ খুলিয়া হাসিতে পারিতেন। শয়নে, ভোজনে তিনি মিতাচারী ছিলেন, কখনও স্বভাবের

সুরেন্দ্রনাথের শেষ শয়ন

বিপক্ষে কায করিতেন না। তাঁহার জীবনের কার্য্য নিয়মানুগ আইনে বাঁধা ছিল। এজন্য পরিণতবয়স পর্য্যন্ত তিনি সুস্থ, সবল ও কর্ম্মক্ষম ছিলেন। তাঁহার ন্যায় বাঙ্গালী আজকাল অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি তাঁহার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে ভগবানের প্রতি এবং দেশের ও দশের প্রতি আপনার কর্ত্তব্য পালন করিয়া গিয়াছেন।

বৃহস্পতিবার ২২শে শ্রাবণ বেলা দুইটার সময় বারাকপুর হইতে সংবাদ আইসে যে, সুরেন্দ্রনাথের লোকান্তর হইয়াছে। অল্পকালের মধ্যেই দাবানলের মত কলিকাতার পথে, ঘাটে, মাঠে, স্কুলে, কলেজে, অফিসে, আদালতে সর্ব্বত্র এই শোক-সংবাদ পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। অনেকেই তখন নগ্নপদে শীঘ্রগতি যানাদিযোগে সেই জ্ঞানবৃদ্ধ দেশনেতার প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিবার উদ্দেশ্যে বারাকপুরাভিমুখে ছুটেন। এক দিন যিনি ভারতের জাতীয়তা-ভাব উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন—এক দিন যাঁহার বজ্রগম্ভীর স্বরে বাঙ্গালার সুপ্ত আত্মবোধ জাগ্রত হইয়াছিল, তাঁহার মৃত্যুসংবাদে কেহই স্থির থাকিতে পারেন নাই।

তাঁহারা মণিরামপুরের বাটীতে উপস্থিত হইয়া দেখেন, সুরেন্দ্রনাথের নশ্বর দেহ পড়িয়া রহিয়াছে। তিনি তাঁহার বাড়ীর দ্বিতলস্থ বারান্দার নিকটবর্ত্তী যে কক্ষে বরাবর শয়ন করিতেন, সেই কক্ষেই শয়ন করিয়াছিলেন। সেই কক্ষে বসিয়াই তাঁহার প্রাণবায়ু দেহপিঞ্জর হইতে বাহির হইয়া গিয়াছে। তখনও তাঁহাকে সেই কক্ষ হইতে বাহির করা হয় নাই। সেইখানেই একখানি খাটের উপর তাঁহাকে রাখা হইয়াছে। গায়ে জামা, সমস্ত শরীর

একখানি রঙিন চাদরে আচ্ছাদিত। পার্শ্বে বড় আদরের —বড় স্নেহের রোরুদ্যমানা পুত্রবধূ শ্রীমতী মায়া দেবী আর কয়েক জন আত্মীয়-আত্মীয়া পরিবৃত হইয়া বসিয়াছিলেন, পুত্র ভবশঙ্কর সেখানে ছিলেন না। তিনি নীচে বারান্দায় দাঁড়াইয়া, যাঁহারা সহানুভূতি ও শোক প্রকাশ করিবার জন্য কলিকাতা প্রভৃতি স্থান হইতে ছুটিয়া লোকের ভিড় বাড়িতে লাগিল। অল্পসময়ের মধ্যেই সুরেন্দ্রনাথের গৃহ-প্রাঙ্গণ, বারান্দা, ঘর, সম্মুখের রাস্তা প্রভৃতি লোকে পরিপূর্ণ হইয়া গেল।

বেলা যখন প্রায় ৬টা, তখন কলিকাতা হইতে ফুলের তোড়া, ফুলের মালা, দেড় মণ চন্দনকাষ্ঠ, পর্য্যাপ্ত পরিমাণ ঘৃত প্রভৃতি গিয়া পৌছে। তাহার পর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার
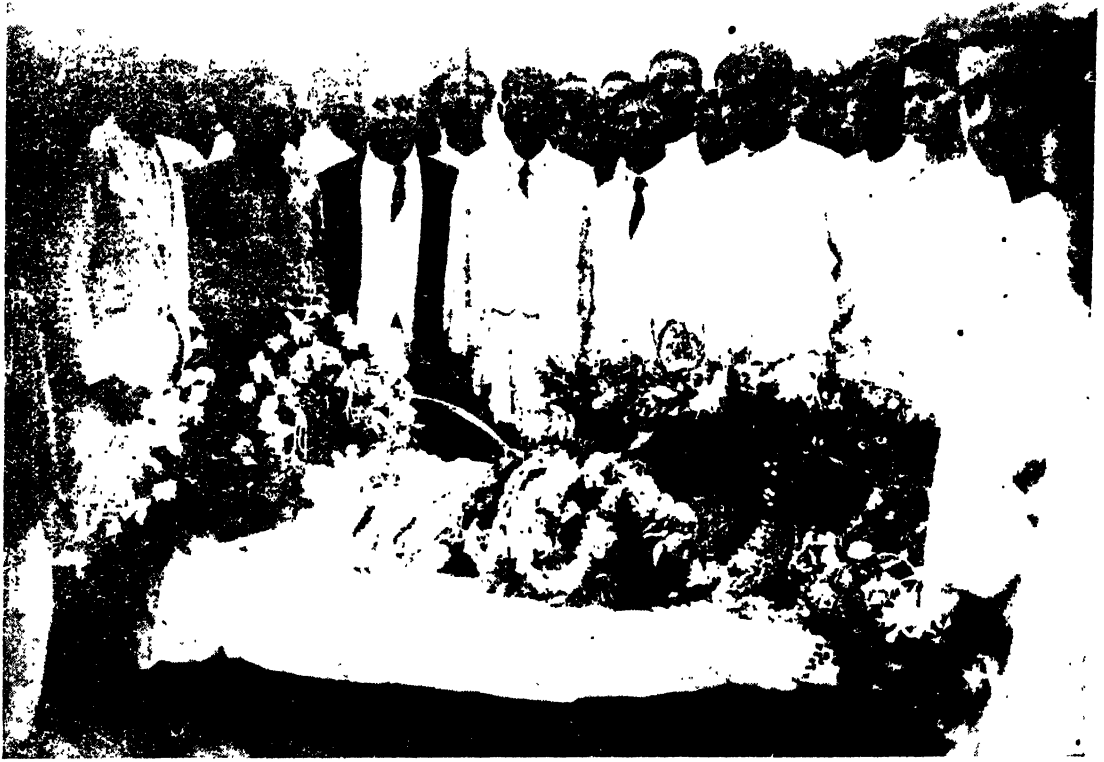
আত্মীয়-পরিবৃত সুরেন্দ্রনাথ

আসিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের সহিত পিতার মৃত্যুসম্বন্ধে কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন। জামাতা শ্রীযুত যোগেশচন্দ্র চৌধুরীও সেখানেই ছিলেন। তিনি অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ব্যবস্থাদির জন্যই বিশেষভাবে ব্যস্ত ছিলেন। এই সময় কলিকাতা, ভবানীপুর প্রভৃতি অঞ্চল হইতে এত ঘন ঘন টেলিফোনযোগে এই দুঃসংবাদের কথা জিজ্ঞাসা করা হইতেছিল যে, লোকের উৎকণ্ঠা দূর করিবার জন্য ফোনের নিকট এক জন লোক বসাইয়া রাখিতে হইয়াছিল। তার পর ক্রমে যতই সময় যাইতে লাগিল, ততই আয়োজন করা হয়। বিবিধ পুষ্পে সুসজ্জিত খট্টার উপরে সুরেন্দ্রনাথের শেষশয্যা আস্তৃত হয়। সেই কুসুমাস্তৃত শয্যায় সুরেন্দ্রনাথের নশ্বর দেহ শায়িত করিয়া পুণ্যতোয়া ভাগীরথীতীরে লইয়া যাওয়া হয়। এই স্থান সুরেন্দ্রনাথের বড়ই প্রিয় ছিল। তিনি প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে এই স্থানে পরিভ্রমণ করিতেন। যে দিন তিনি এই প্রাত্যহিক কায করিতে না পারিতেন, সেই দিন তিনি খুব অস্বস্তি বোধ করিতেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি না কি তাঁহার পুত্র ভবশঙ্করকে বলিয়া গিয়াছিলেন যে, এই স্থানেই যেন

তাঁহার সৎকার করা হয়। তাই দুই এক জন ভক্ত-বন্ধু সুরেন্দ্রনাথের শব কলিকাতায় আনিবার পক্ষপাতী হইলেও তাঁহারা বিশেষ জিদ করিতে পারেন নাই। তাঁহার সেই ইচ্ছানুসারেই পতিতপাবনী জাহ্নবীতীরে তাঁহার প্রাত্যহিক সান্ধ্যভ্রমণের স্থানে তাঁহার নশ্বর দেহ চিতাগ্নিতে ভস্মীভূত করা হইল। পণ্ডিত শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী মুখাগ্নির মন্ত্র পাঠ করিয়াছিলেন।

কুসুমাস্তৃত শয্যায় সুরেন্দ্রনাথ

আজ তাঁহার বিয়োগে দেশজননী যে সন্তান হারাইলেন, তাহার তুলনা বহু যুগ খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। বাঙ্গালার দুর্ভাগ্যে অল্পকালের মধ্যে পর পর কয়টি উজ্জ্বল রত্ন তাঁহার অঙ্ক হইতে খসিয়া পড়িল। অশ্বিনীকুমার, দুই আশুতোষ, ভূপেন্দ্রনাথ, চিত্তরঞ্জন,—তাহার উপর সুরেন্দ্রনাথ। এই এক একটি দিক্‌পালের অভাবে যে কোনও দেশই বিষম ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কিন্তু এতগুলির অল্পসময়ের মধ্যে অন্তর্দ্ধান দেশের পক্ষে কিরূপ অমঙ্গলকর, তাহা এখনও দেশের লোক ধারণা করিতে পারে নাই। শোকে মুহ্যমান, অভাবে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় জাতির পক্ষে সে ধারণা করিতে সময় লাগিবে সন্দেহ নাই। দেশের এই সঙ্কটসঙ্কুল সময়ে ভেদনীতির অমোঘ ফল হইতে দেশবাসীকে রক্ষা করিবার যাঁহারা ছিলেন, তাঁহারা একে একে মহাপ্রস্থান করিলেন। সার আশুতোষ শিক্ষা হইতে রাজনীতিতে যাইবেন কি না ভাবিতে ভাবিতে দেহত্যাগ করিয়াছেন; দেশবন্ধু দেশে শীঘ্রই একটা রাজনীতিক পরিবর্ত্তন ঘটিবে আশা করিতে করিতেই ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন; সুরেন্দ্রনাথ 'বেঙ্গলী' পত্রকে পুনরুজ্জীবিত করিতে করিতে এবং কংগ্রেসে একতা আনয়নের চেষ্টা করিতে করিতে মহাপ্রস্থান করিলেন। এই তিন বিরাট পুরুষের মৃত্যু অতর্কিতভাবে অশনিপতনের মতই বাঙ্গালীর মস্তকে নিপতিত হইয়াছে—বাঙ্গালী তাহার বিরাট ক্ষতির ধারণা করিবে কিরূপে?

বাঙ্গালায় আর কি রহিল? শিবরাত্রির সলিতার মত তিনটি মাত্র প্রাণী বাঙ্গালীর নিজস্ব বলিয়া শ্লাঘা করিবার রহিল। কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র, ডাক্তার জগদীশচন্দ্র। বিধাতা তাঁহাদিগকে দীর্ঘজীবী করুন, ইহাই কামনা।
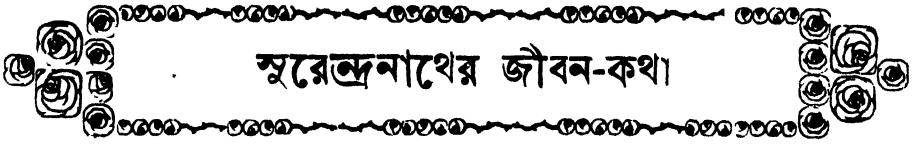
সুরেন্দ্রনাথের জীবন-কথা

সার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্ভ্রান্ত রাঢ়ীশ্রেণীয় ব্রাহ্মণের বংশধর। তাঁহার পিতা দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় গত শতাব্দীর মধ্যভাগে কলিকাতার তালতলা পল্লীর এক জন বিখ্যাত চিকিৎসক ছিলেন।

ডাক্তার দুর্গাচরণ স্বনামধন্য পুরুষ ছিলেন। ডেভিড হেয়ারের বিদ্যালয়ে অধ্যাপনাকালে তিনি ডাক্তারী বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন। ডেভিড হেয়ারের দয়া ও সাহায্যের ফলে দুর্গাচরণ পিতামাতার বাধা সত্ত্বেও শিক্ষা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার পিতামাতা গোঁড়া হিন্দু, কাযেই পুত্রকে আপনাদের সংস্কার অনুযায়ী ডাক্তারী শিক্ষায় দিতে চাহেন নাই। মিঃ হেয়ার তাঁহাকে মেডিক্যাল কলেজের লেক্চার শুনিবার সুযোগ দিবার জন্য স্কুল হইতে অনেক সময়ে বহুক্ষণ ছুটী দিতেন। এই দুর্গাচরণই পরে কলিকাতার অন্যতম প্রধান চিকিৎসক এবং পিতামাতার কর্ত্তব্যপরায়ণ পুত্র হইয়াছিলেন।

সুরেন্দ্রনাথ পিতার দ্বিতীয় পুত্র, অন্যতম পুত্র প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার কাপ্তেন জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে সুরেন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন। কলিকাতা ডাভটন কলেজে সুরেন্দ্রনাথের বাল্যশিক্ষা সমাপ্ত হয়। বাল্যকালে তিনি অতি মেধাবী ছাত্র ছিলেন এবং প্রতি বৎসর বার্ষিক পরীক্ষায় পারিতোষিক লাভ করিতেন। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে সুরেন্দ্রনাথ প্রথম বিভাগে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েন। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে তিনি বি, এ, পাশ করেন। কলেজে পাঠকালে কলেজের প্রিন্সিপাল মিষ্টার সাইম তাঁহার প্রতিভায় এত দূর আকৃষ্ট হয়েন যে, তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সুরেন্দ্রনাথকে ইংলণ্ডে সিবিল সার্ভিস পরীক্ষা দিবার জন্য পাঠাইতে তাঁহার পিতাকে অনুরোধ করেন। ডাঃ দুর্গাচরণ তদনুসারে সুরেন্দ্রনাথকে ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে প্রেরণ করেন। সুরেন্দ্রনাথ, রমেশচন্দ্র দত্ত ও বিহারীলাল গুপ্তের সমভিব্যাহারে সিভিল সার্ভিস পড়িবার জন্য ইংলণ্ড যাত্রা করেন। সেখানে তিনি অধ্যাপক গোল্ডষ্টুকার এবং হেনরী মরলি প্রমুখ বিখ্যাত পণ্ডিতগণের নিকট শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন।

সিভিল সার্ভিস পাশ

সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে সুরেন্দ্রনাথকে একটু বেগ পাইতে হইয়াছিল। তাঁহার বয়সবৃদ্ধি হইয়াছে বলিয়া সিভিল সার্ভিস কমিশনাররা তাঁহার নাম উত্তীর্ণ ছাত্রদের নামের তালিকা হইতে বাদ দেন; সুরেন্দ্রনাথ কুইন্স বেঞ্চে সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করেন; ফলে সুরেন্দ্রনাথেরই জয় হয়। সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার ফল বাহির হইলে দেখা যায়, সুরেন্দ্রনাথ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সুরেন্দ্রনাথ ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তাঁহাকে শ্রীহট্টের সহকারী ম্যাজিষ্ট্রেটপদে নিযুক্ত করা হয়। সেই পদে তিনি ২ বৎসর কাল কার্য্য করেন।

সিভিল সার্ভিস ত্যাগ

সহকারী ম্যাজিষ্ট্রেটস্বরূপে কায করিবার সময় সুরেন্দ্রনাথ একটি মামলা-সম্বন্ধীয় কয়েকটি অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েন। ইহার মধ্যে প্রথাবিরুদ্ধ ওয়ারেণ্ট দেওয়া এবং পরে মিথ্যা বিবরণ দেওয়ার অভিযোগই প্রধান। তাঁহার অপরাধের বিচারের জন্য একটি কমিশন বসে। সুরেন্দ্রনাথ তাঁহার অপরাধ স্বীকার করিলেও সেই কমিশন তাঁহাকে অপরাধী সাব্যস্ত করিলে সরকার এই সামান্য ব্যাপারকে প্রকাণ্ড জ্ঞান করিয়া সুরেন্দ্রনাথকে বার্ষিক ৬ শত টাকা পেন্সন দিয়া সিভিল সার্ভিস বিভাগ হইতে বিদায় দেন। সুরেন্দ্রনাথ মামলা কলিকাতায় স্থানান্তরিত করিবার এবং আপনার পক্ষে ভাল উকীল নিয়োগ করিবার প্রার্থনা করিলেও, তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ করা হয় নাই। তখন সুরেন্দ্রনাথের বয়স ২৩ বৎসর মাত্র।

ছাত্রের শিক্ষক

যে যুবক জীবন-যুদ্ধে প্রবেশ করিতে যাইতেছে, তাহার পক্ষে এ আঘাত কত বড় গুরু, তাহা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ ভগ্ন-হৃদয় হইবার নহেন। এই অন্যায় ও অবিচারের এক দিন প্রতীকার হইবে, এ বিশ্বাস সুরেন্দ্রনাথের ছিল। তাঁহার সে আশাও সফল হইয়াছিল। যে সুরেন্দ্রনাথকে সরকার প্রথম বয়সে চাকুরী হইতে

বরখাস্ত করিয়াছিলেন, সেই সুরেন্দ্রনাথকে সরকার পরিণত বয়সে যাচিয়া মন্ত্রিত্ব দিয়াছিলেন। উহা সুরেন্দ্রনাথের পক্ষে কত বড় নৈতিক জয়ের নিদর্শন, তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। তিনি যে অন্যায় করেন নাই, তাহা তাঁহার জীবনের দ্বারা বুঝাইবার নিমিত্ত সুরেন্দ্রনাথ বদ্ধপরিকর হইলেন। এই হেতু তিনি ছাত্রগণের শিক্ষার ভার গ্রহণ করিলেন। এত বড় মহৎ কার্য্য জগতে আর কিছু নাই, সুরেন্দ্রনাথের ইহাই ধারণা ছিল। তিনি চিরদিনই আপনাকে ছাত্র-শিক্ষক বলিয়া পরিচয় দিয়া গর্ব্বানুভব করিতেন। এ বিষয়ে তাঁহার পক্ষে বিধাতা এক সুযোগ মিলাইয়া দিলেন। প্রাতঃস্মরণীয় পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহাকে তাঁহার মেট্রোপলিটন কলেজের ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপক নিযুক্ত করেন। এই পদে কার্য্য করিয়া সুরেন্দ্রনাথ মাসিক ২ শত টাকা বেতন পাইতেন। সে ১৮৭৬ সালের কথা।

ইহার কিছু দিন পরে সুরেন্দ্রনাথ কিছু কাল সিটি কলেজে অধ্যাপকতা করেন। তার পর ফ্রি চার্চ্চ ইন্‌ষ্টিটিউসনের প্রিন্সিপালের অনুরোধে সুরেন্দ্রনাথ সেই কলেজের ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন।

রিপণ কলেজ

১৮৮২ খৃষ্টাব্দে তিনি এই কলেজের চাকুরী পরিত্যাগ করিয়া বহুবাজারে একটি ক্ষুদ্র স্কুলের প্রধান শিক্ষকতা করিতে থাকেন, সেই স্কুলটিই পরবর্ত্তী কালে "রিপণ কলেজে" পরিণত হয়। পরবর্ত্তী কালে সুরেন্দ্রনাথ কলেজটিকে একটি কমিটীর হস্তে অর্পণ করেন। সুরেন্দ্রনাথ এই রিপণ কলেজে নিজে ইংরাজী সাহিত্য পড়াইতেন এবং তাঁহার অধ্যাপনা-কৌশলে প্রতি বৎসর নূতন নূতন ছাত্র রিপণ কলেজকে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিত। ছাত্রদের প্রাণে রাজনীতিক চিন্তার উন্মেষসাধনই সুরেন্দ্রনাথের শিক্ষাপদ্ধতির প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল।

বাঙ্গালার আরণল্ড

সুরেন্দ্রনাথকে অনেকে বাঙ্গালার 'আরণল্ড' আখ্যা দিয়া থাকেন। আরণল্ড যেমন বিলাতের বিখ্যাত 'রাগবি' স্কুলটির প্রাণ ছিলেন, একরূপ তাহার জন্মদাতা ছিলেন, —সুরেন্দ্রনাথ সেইরূপ রিপণ কলেজের প্রাণ ছিলেন। তাঁহার শিক্ষকতা করিবার অসাধারণ শক্তি ছিল। যাঁহারা তাঁহার নিকট পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন, ইংরাজী সাহিত্য বা ইতিহাস পড়াইবার সময়ে তিনি কি উন্মাদনা আনয়ন করিতেন। বার্কের 'ফরাসী-বিপ্লব' পড়াইবার সময়ে তাঁহাকে ছাত্ররা অনেক সময়ে গ্রন্থ খুলিতে দেখিত না—তিনি দুই তিন পাতা অনর্গল আবৃত্তি করিয়া যাইতেন। তাঁহার ধীর গম্ভীর সুষ্ঠু উচ্চারণ ছাত্রগণকে মোহিত করিয়া দিত। এমনও হইত যে, অনেক সময়ে তাঁহার আবৃত্তির গুণে ব্যাখ্যাও সরল হইয়া যাইত। প্রেসিডেন্সি কলেজেরও বহু ছাত্র গোপনে রিপণে আসিয়া তাঁহার 'ফরাসী বিপ্লবের' ব্যাখ্যা শুনিয়া যাইত। ছাত্রসমাজে এ জন্য তাঁহার কি প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল, তাহা অনেকেই জানেন।

ভারত সভা

১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের ২৬শে জুলাই সুরেন্দ্রনাথের জীবনের একটি স্মরণীয় দিন। ঐ দিন তিনি স্বর্গীয় আনন্দমোহন বসুর সহযোগে কলিকাতায় ভারত সভা বা ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠা করেন। যে দিন ভারত-সভার প্রতিষ্ঠা হইবার দিন ধার্য্য হয়, সেই দিন সুরেন্দ্রনাথের একটি পুত্র মারা যায়। সুরেন্দ্রনাথ এই দারুণ পুত্রশোকের আঘাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত না হইয়া কর্ত্তব্য-সাধনের নিমিত্ত অপরাহ্নে ভারত-সভার প্রতিষ্ঠা করেন এবং যথারীতি বক্তৃতাও করেন।

ভারত-সভার কায

যে যুগে ভারত-সভার প্রতিষ্ঠা, সে যুগে এই ভারত-সভা দেশের অনেক কায করিয়াছিল। লর্ড সালিসবারি সিভিল সার্ভিসে প্রবেশের বয়স ২১ বৎসরের স্থানে ১৯ বৎসর করিয়া ভারতবাসীর সিভিল সার্ভিসে প্রবেশের পথ একেবারে বন্ধ করেন, সুরেন্দ্রনাথ ভারত-সভার পক্ষ হইতে ইহার তীব্র প্রতিবাদ আরম্ভ করেন। নানা স্থানে তিনি এই উপলক্ষে বক্তৃতা করিয়া বেড়ান। এই উপলক্ষে সমগ্র ভারতে যে সম্মিলিত প্রতিবাদ আরম্ভ হয়, তাহা হইতেই ভারতীয় জাতীয় মহা সমিতির ভিত্তি

স্থাপিত হয়। সুরেন্দ্রনাথের চেষ্টায় ভারত সভার প্রতিনিধিরূপে লালমোহন ঘোষ মহাশয়কে ইংলণ্ডে পাঠান হয়। তিনি সেখানে যে বক্তৃতা করেন, সেই বক্তৃতা শুনিয়া ২৪ ঘণ্টার মধ্যে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট কমন্স মহাসভায় এই প্রস্তাব উপস্থাপিত করেন যে, অতঃপর ভারতবাসীকে উচ্চ রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করা হইবে।

লর্ড লিটনের নীতির প্রতিবাদ

ভারতের ভূতপূর্ব্ব বড় লাট লর্ড লিটন প্রেস অ্যাক্ট, অস্ত্র আইন, বিদেশী কাপড়ের উপর শুল্ক হ্রাস, ইত্যাদি অপ্রীতিকর ব্যবস্থা করেন। তিনি আফগান যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া ভারতে এক অশান্তির দাবানল প্রজ্বালিত করেন। সুরেন্দ্রনাথ লর্ড লিটনের দমননীতির প্রতিবাদ করিয়া এমন তীব্র বক্তৃতা করিতে লাগিলেন যে, অবশেষে লর্ড লিটনকে পদত্যাগ করিয়া যাইতে হয় এবং উদারনীতিক দল পার্লামেণ্টে শক্তিশালী হইয়া উঠিলে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা-হরণের আইন বাতিল করা হয়।

মহামতি গ্লাডষ্টোন তখন সরকার পক্ষের বিরোধী লিবারল দলের কর্ত্তা। তিনি 'ভারত-সভার' বন্ধু ছিলেন। তিনিই পার্লামেণ্টে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতার বিপক্ষে আইনের প্রতিবাদপত্র পেশ করিয়াছিলেন। আফগান যুদ্ধের খরচাও তিনি কমাইয়াছিলেন। তিনি পার্লামেণ্টে বলিয়াছিলেন, 'এ যুদ্ধের সহিত ভারতীয়দের কোন সম্পর্ক নাই।' মহামতি গ্লাডষ্টোনের সাহায্যে সেই সময়ে ভারত-সভা অনেক কার্য্য করিয়া লইয়াছিল। তখন ভারত-সভার প্রাণ ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ। সুতরাং তখন হইতেই সুরেন্দ্রনাথ দেশসেবার ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন বলিতে হইবে।

ইংলণ্ডে প্রতিনিধি প্রেরণ

১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে সার সুরেন্দ্রনাথের প্রস্তাবে ভারতের অবস্থা ইংলণ্ডবাসীর গোচর করিবার নিমিত্ত কয়েক জন প্রতিনিধিকে স্থায়িভাবে ইংলণ্ডে রাখিবার ব্যবস্থা হয়। ফলে উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মিঃ আনন্দমোহন বসু, মিঃ নর্টন, মিঃ মুধোলকার, মিঃ যোশী ও সুরেন্দ্রনাথ এবং পরে মিঃ গোখলে ইংলণ্ডে যাইয়া ভারতের অবস্থা ইংলণ্ডবাসীর নিকট প্রচার করিতে থাকেন।

পরে ন্যাশানাল কংগ্রেস বিলাতে একখানি সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠা করিয়া ভারতীয় মতামত অনুক্ষণ প্রচার করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। পরন্তু কংগ্রেস বিলাতে একটি পার্লামেণ্ট-সংক্রান্ত কমিটীও প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ঐ কমিটী পার্লামেণ্টে ভারতীয়দিগের স্বার্থের দিকে খর দৃষ্টি রাখিত।

কর্পোরেশনে সুরেন্দ্রনাথ

১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে সুরেন্দ্রনাথ কলিকাতা কর্পোরেশনের সদস্য হয়েন। তখন সদস্যরা নির্ব্বাচিত হইতেন। পরে তিনি উত্তর-বারাকপুর মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান নিযুক্ত হয়েন। কর্পোরেশন, মিউনিসিপ্যালিটী, জিলা-বোর্ড, লোক্যালবোর্ড প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে সভ্য, চেয়ারম্যান প্রভৃতি নির্ব্বাচনের প্রথা প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য তিনিই সর্ব্বপ্রথমে আন্দোলন করিয়াছিলেন। ১৮৮৮ ও ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে তিনি কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল বিল সম্বন্ধে যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, সেই বক্তৃতা শ্রবণে সভাপতি সার হেন্‌রী হ্যারিসন মিউনিসিপ্যালিটীর কার্য্যে তাঁহার গভীর জ্ঞান দেখিয়া তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে সুরেন্দ্রনাথ কর্পোরেশনের প্রতিনিধিরূপে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নির্ব্বাচিত হয়েন। তিনি ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে এই বিলের তীব্র প্রতিবাদ করেন, কিন্তু তাঁহার ঘোরতর প্রতিবাদ সত্ত্বেও যখন বিলটি পাশ হয়, তখন তিনি ও মিউনিসিপ্যালিটীর অন্য ২৭ জন কমিশনর পদত্যাগ করেন। ২৩ বৎসর কাল তিনি মিউনিসিপ্যালিটীর কমিশনর-পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই সূত্রে হ্যারিসন, বেভালি, কটন প্রভৃতি মনীষিগণের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল।

বেঙ্গলীর সম্পাদকতা

স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (ডব্লিউ, সি, ব্যানার্জী) মহাশয়ের ও অন্য কয়েক জনের চেষ্টায় 'বেঙ্গলী' পত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে লর্ড লিটনের দমননীতির ফলে 'বেঙ্গলীর' অবস্থা যখন শোচনীয় হইয়া পড়ে, তখন সার সুরেন্দ্রনাথ উক্ত পত্রের সম্পাদকতা গ্রহণ করেন। তিনি 'বেঙ্গলীর' অভ্যুত্থানকল্পে তাঁহার সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করেন এবং অতি অল্পকালের মধ্যে 'বেঙ্গলী'

'বেঙ্গলী' কার্য্যালয়ে সহযোগিবৃন্দ-পরিবৃত সুরেন্দ্রনাথ
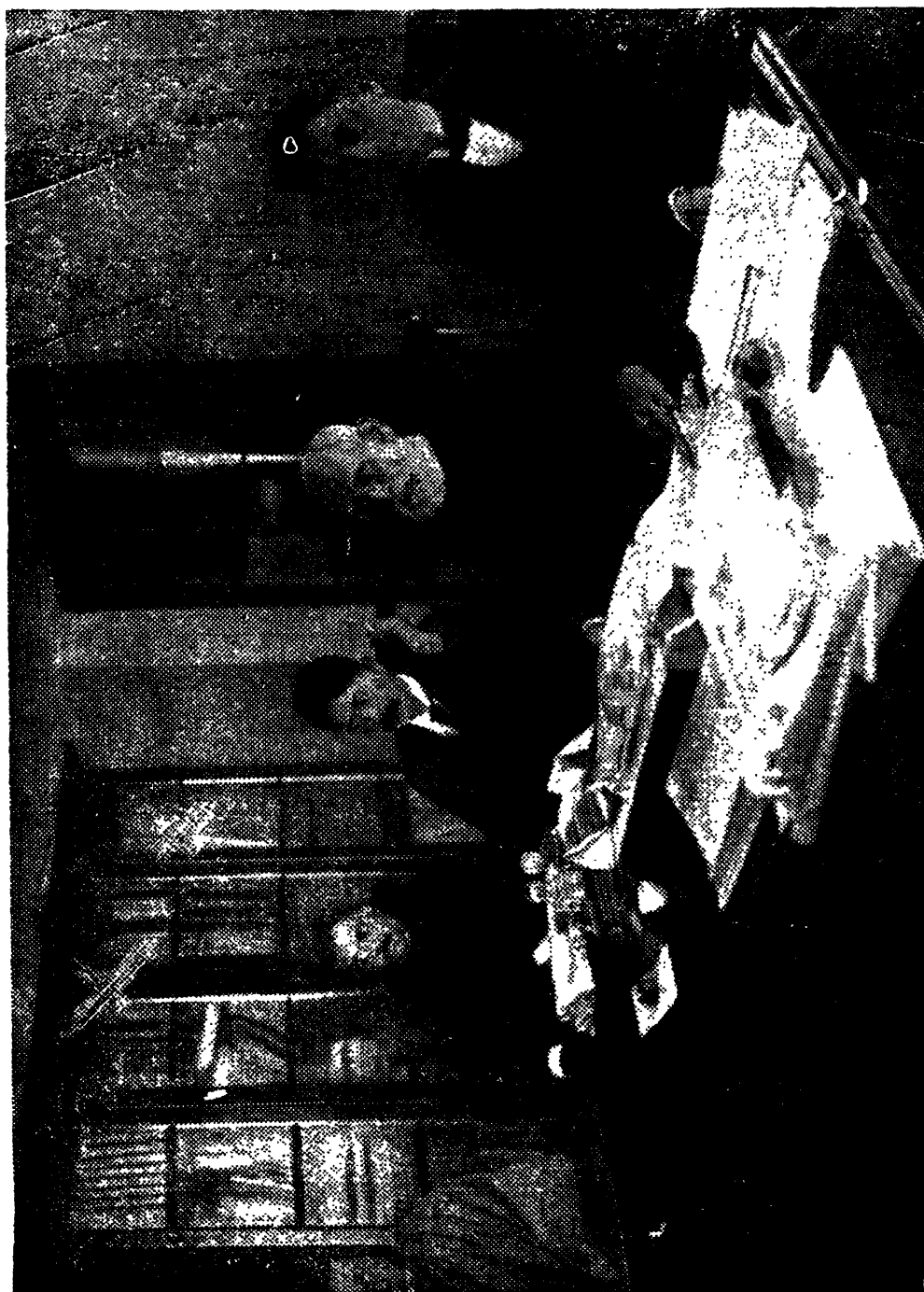
বঙ্গের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সংবাদপত্রে পরিণত হয়। তখন বেঙ্গলী সাপ্তাহিক পত্র ছিল। পরে বেঙ্গলী দৈনিকে পরিণত হয়। ঐ পত্রে সুরেন্দ্রনাথ দেশের আশা, আকাঙ্ক্ষার কথা জীবন্ত ভাষায় ফুটাইয়া তুলিয়াছিলেন।

সুরেন্দ্রনাথের কারাদণ্ড

১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে আদালত অবমাননার অপরাধে সুরেন্দ্রনাথের কারাদণ্ড হয়। ইতঃপূর্ব্বে সার সুরেন্দ্রনাথ সিভিলিয়ান ও গোরাদের অত্যাচারের কথা প্রকাশ করিয়া আমলাতন্ত্রের বিরাগভাজন হইয়াছিলেন। নীলকরদের অত্যাচারকাহিনী প্রকাশ করিয়া তিনি নীলকরদের চক্ষুঃশূল হইয়াছিলেন। ইলবার্ট বিলের আন্দোলনে সুরেন্দ্রনাথ দেশীয়দিগের অগ্রগামী হইয়াছিলেন। এ সমস্ত কারণে সরকারের বিষদৃষ্টি তাঁহার উপর পড়িয়াছিল। এ ক্ষেত্রেও সুরেন্দ্রনাথ আর একটা স্বাধীন বৃত্তির পরিচয় দিয়া রাজদ্বারে অভিযুক্ত হইলেন। কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি মিঃ নরিশ একটি পারিবারিক বিষয়ঘটিত মোকর্দ্দমার বিচারকালে আদালতে না কি শালগ্রাম উপস্থিত করিতে আদেশ করেন। একখানি সংবাদপত্র হইতে এই সংবাদ 'বেঙ্গলী' পত্রে উদ্ধৃত করা হয়। মিঃ নরিশ প্রকৃতপক্ষে সেরূপ আদেশ না করায় সুরেন্দ্রনাথের উপর বিষম ক্রোধান্বিত হয়েন। তিনি আদালত অবমাননার অপরাধে সুরেন্দ্রনাথকে অভিযুক্ত করেন। সুরেন্দ্রনাথ গ্রেপ্তার হয়েন। আদালতে তিনি ক্ষমা প্রার্থনা করেন, কিন্তু প্রার্থনা গ্রাহ্য হয় নাই। সেই সময় একমাত্র দেশীয় জজ সার রমেশচন্দ্র মিত্র সুরেন্দ্রনাথকে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করিবার জন্য বলেন। তাঁহার কথা অন্য বিচারপতিরা শুনেন না। সুরেন্দ্রনাথকে সিভিল জেলে ২ মাসের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। এই মোকর্দ্দমার বিচারফল দেখিবার নিমিত্ত হাইকোর্টের চারিদিকের বারান্দায় এত অসংখ্য লোকের সমাগম হইয়াছিল যে, সরকারকে শৃঙ্খলা রক্ষা করিবার জন্য রীতিমত সৈন্য মোতায়েন করিতে হইয়াছিল। যদি সুরেন্দ্রনাথের জরিমানা হয়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ জরিমানার টাকা পরিশোধ করা হইবে, এই আশায় স্বর্গীয় কুমার ইন্দ্রচন্দ্র সিংহ আদালত-গৃহে ১ লক্ষ টাকা লইয়া উপস্থিত ছিলেন। সুরেন্দ্রনাথের প্রতি কারাদণ্ডের আদেশ দিয়া তাঁহাকে সাধারণ কয়েদীর গাড়ীতে জেলে না পাঠাইয়া তাঁহাকে বিচারপতি মিঃ নরিশের ব্রুহামে করিয়া জেলে পাঠান হয়। উত্তেজিত জনসঙ্ঘকে এতই ভয়! দুই মাস পরে যে দিন সুরেন্দ্রনাথের মুক্তি পাইবার কথা, সে দিন লক্ষ লক্ষ লোক তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য প্রস্তুত হয়। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, তাঁহাকে দিনের বেলায় মুক্তি না দিয়া রাত্রি ৪টার সময় ছাড়িয়া দিয়া একখানা ঠিকা গাড়ীতে করিয়া তালতলায় পাঠাইয়া দেওয়া হয়। তখন বেঙ্গলী অফিস তালতলায় অবস্থিত ছিল। কলিকাতার নানা স্থানে সুরেন্দ্রনাথকে সংবর্দ্ধনা করিবার জন্য সভার অধিবেশন হয়। তন্মধ্যে ফ্রী চার্চ্চ ইন্‌ষ্টিটিউসনে (পরে ডাফ কলেজ) যে সভা হয়, সেই সভায় প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্রস্বরূপে আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, (বিচারপতি সার আশুতোষ) সুরেন্দ্রনাথের স্বাধীনচিত্ততার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া বক্তৃতা করেন।

এই কারাদণ্ডের মূলে সুরেন্দ্রনাথের স্বাধীনবৃত্তিই যে দায়ী ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। জষ্টিশ নরিশ ব্রিষ্টলবাসী ছিলেন; ব্রিষ্টল ইংলণ্ডের একটি সহর। মিঃ জন ব্রাইট ভারতের মঙ্গল করিবার উদ্দেশে মিঃ নরিশকে ভারতে পাঠাইয়াছিলেন। তখন মিঃ ব্রাইট সরকারের লোক ছিলেন। এহেন লোক সুরেন্দ্রনাথের বিপক্ষতাচরণ করিবে, ইহাই আশ্চর্য্য। লোক বলে, অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ার প্রভাবই মিঃ নরিশের এই মনোভাবপরিবর্ত্তনের কারণ। বস্তুতঃ পরে মিঃ নরিশ সুরেন্দ্রনাথের প্রতি অন্যরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন। যখন ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে সুরেন্দ্রনাথ ও তাঁহার দলের কয়েক জন প্রতিনিধি বিলাতযাত্রা করেন, তখন মিঃ নরিশের তার পাইয়া ব্রিষ্টলবাসীরা তাঁহাদিগকে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ এজন্য মিঃ নরিশকে শতমুখে সুখ্যাতি করিয়া গিয়াছেন।

ভারতীয় জাতীয় মহাসমিতি

১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে এই আদালত অবমাননার মামলার ফলে সুরেন্দ্রনাথ দেশবাসীর নিকট অবিসংবাদী নেতৃরূপে গৃহীত হয়েন। সুরেন্দ্রনাথের কারাদণ্ডের কারণ বিবৃত করিতে ব্যারিষ্টার লালমোহন ঘোষ মহাশয় ইংলণ্ডে

যায়েন। ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সেক্রেটারীরূপে সুরেন্দ্রনাথ প্রথমে কলিকাতায় ভারতীয় জাতীয় কন্‌ফারেন্সের আহ্বান করেন। আলবার্ট হলে ন্যাশনাল কন্‌ফারেন্সের অধিবেশন হয়। ভারতের মধ্যে এইটিই প্রথম রাজনীতিক কন্‌ফারেন্স। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে পুনরায় এই জাতীয় কন্‌ফারেন্সের অধিবেশন হয়। ঐ অব্দে বোম্বাইয়ে জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশন হওয়ায়, সুরেন্দ্রনাথ কলিকাতার কন্‌ফারেন্সের আয়োজন করিতে ব্যস্ত থাকায়, প্রথম জাতীয় মহাসমিতিতে যাইতে পারেন নাই। কিন্তু তাহার পর হইতে যতগুলি কংগ্রেসের অধিবেশন হইয়াছে, তাহার সবগুলিতেই সুরেন্দ্রনাথ যোগদান করিয়াছেন।

ইংলণ্ডে ডেপুটেশন

১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডবাসীর মন ভারতের দিকে আকৃষ্ট করিবার জন্য কংগ্রেস হইতে আর এক দল প্রতিনিধি ইংলণ্ডে প্রেরিত হয়েন। মিঃ এ, ও, হিউম, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মিঃ নর্টন ও মিঃ মুধোলকার এবার ইংলণ্ডে যায়েন। তখন ইংলণ্ডে মহামতি দাদাভাই নৌরজী ও সৈয়দ আলী ইমাম অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহারা এই প্রতিনিধিগণকে বিশেষ সাহায্য করেন। সুরেন্দ্রনাথ এইবার মিঃ গ্লাডষ্টোন প্রমুখ বৃটিশ বিরোধিগণের সমক্ষে এরূপ বাগ্মিতার পরিচয় দেন যে, ইংলণ্ডের সমগ্র সংবাদপত্র একবাক্যে তাঁহাকে পিট, ফক্স, বার্ক, সেরিডন প্রভৃতির সমকক্ষ বাগ্মী বলিয়া ঘোষণা করেন। এইরূপে ইংলণ্ডে কংগ্রেসের প্রথম প্রচারকার্য্য আরম্ভ হইল। বৃটিশ কংগ্রেস কমিটীর উদ্যোগে ৩০টি সভা হইয়াছিল।

ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন

ইংলণ্ডের নানা স্থানে বক্তৃতা করিয়া এবং পাশ্চাত্য জগৎকে বিস্ময়বিমুগ্ধ করিয়া সুরেন্দ্রনাথ ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। বোম্বাই ও কলিকাতায় সেবার সুরেন্দ্রনাথের বিপুল সংবর্দ্ধনা হয়। তাঁহার ন্যায়সঙ্গত দাবীর জন্য সরকার ও দেশবাসী তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয়েন।

তাঁহার আন্দোলনে সুফলও ফলিতে আরম্ভ করিয়াছিল;—

(১) জুরি নোটিফিকেশানের বিরুদ্ধে সুরেন্দ্রনাথ ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে আন্দোলন উপস্থিত করেন, উহা সরকার প্রত্যাহার করিতে বাধ্য হয়েন,

(২) ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অ্যাক্ট পাশ হয়,

(৩) উহার সংশোধনমূলক আইনও ঐ বৎসরে বিধিবদ্ধ হয়,

(৪) দেশীয় সংবাদপত্রসংক্রান্ত মুদ্রাযন্ত্র আইন রদ হয়।

১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা করপোরেশন সুরেন্দ্রনাথকে কাউন্সিলের সদস্য নির্ব্বাচিত করেন।

১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে সুরেন্দ্রনাথ পুনা কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হয়েন।

ওয়েলবী কমিশনে সাক্ষ্যদান

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে ওয়েলবী কমিশন নামে যে রয়াল কমিশন ভারত সরকারের আয়ব্যয়ের সম্বন্ধে জনসাধারণের মতামত গ্রহণের জন্য ভারতে আসিয়াছিল, সুরেন্দ্রনাথ সেই কমিশনে সাক্ষ্যদান করেন। তিনি সেই সময়ে সরকার পক্ষে মিঃ জেকবের বিবরণের যে জেরা করেন, তাহাতেই তাঁহার জ্ঞান জানা যায়।

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে লোকমান্য তিলকের প্রথমবার মোকর্দ্দমার সময় ও নাটু ভাইদের নির্ব্বাসনের সময় এবং রাজদ্রোহ আইন পাশ করিবার সময় তিনি দেশের প্রভূত কায করিয়াছিলেন। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের কংগ্রেসে তিনি ঐ তিনটি বিষয়ক প্রস্তাব উপস্থাপিত করিয়াছিলেন।

লর্ড কার্জ্জন ও সুরেন্দ্রনাথ

১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের শেষে লর্ড কার্জ্জন ভারতের বড় লাট হইয়া আইসেন। তখন মাদ্রাজে কংগ্রেসের অধিবেশন হইতেছিল। সুরেন্দ্রনাথ কংগ্রেসের পক্ষ হইতে লর্ড কার্জ্জনকে অভ্যর্থনা করেন। লর্ড কার্জ্জন দুর্ভিক্ষদমন এবং গোরা সৈনিকদের শিকার আইন প্রবর্ত্তন করিয়া লোকপ্রিয় হয়েন। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে লাহোর কংগ্রেসেও সুরেন্দ্রনাথের মারফতে লর্ড কার্জ্জনকে সুখ্যাতি করা হয়। কিন্তু পরে তিনি কলিকাতা

মিউনিসিপ্যাল বিলে সম্মতি দিয়া স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসনের মূলে কুঠারাঘাত করিয়া এ দেশবাসীর মনে আঘাত দেন। ইহাতেও সুরেন্দ্রনাথ বিশেষ কিছু বলেন নাই।

১৯০২ খৃষ্টাব্দে লর্ড কার্জ্জন বিশ্ববিদ্যালয়কে সরকারী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিয়া এবং উচ্চশিক্ষায় হস্তক্ষেপ করিয়া লোকের বিরাগভাজন হইলেন। কিন্তু তখনও সুরেন্দ্রনাথ প্রমুখ সাবধান নিয়মানুগপন্থীরা বিশেষ কিছু বলিলেন না। ১৯০২ খৃষ্টাব্দে সুরেন্দ্রনাথ দ্বিতীয়বার কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট হইলেন। সেবার আমেদাবাদে কংগ্রেসের অধিবেশন হইয়াছিল। সেবারও তাঁহার অভিভাষণে তিনি নিয়মানুগপথে ভারতের মুক্তির সন্ধান করিতে দেশবাসীকে উপদেশ দিয়াছিলেন। কিন্তু তখন হইতেই তাঁহার মনে নিয়মানুগপথে আন্দোলন করার সার্থকতায় সন্দেহ হয়। তিনি অভিভাষণে বলিয়াছিলেন, "ভারতের বৃটিশ শাসননীতিতে উদারনীতি অবলম্বন করিবার কাল অতীত হইয়া গেল, এ কথা যেন কেহ না বলিতে পারে। ইংরাজ সেই ভাবে কায করুন।" সুরেন্দ্রনাথের মনে সংশয় উপস্থিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু তখনও তিনি বৃটিশ শাসননীতির পরিবর্ত্তন বিষয়ে হতাশ্বাস হয়েন নাই।

কিন্তু ১৯০৫ সালে যখন লর্ড কার্জ্জন লক্ষ লক্ষ বাঙ্গালীর কথায় কর্ণপাত না করিয়া বঙ্গভঙ্গ করেন, তখন সুরেন্দ্রনাথ আর স্থির থাকিতে না পারিয়া তাহার তীব্র প্রতিবাদ করেন এবং বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদস্বরূপ

বিদেশী দ্রব্য বর্জ্জনের

আন্দোলন আরম্ভ করেন। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা কংগ্রেসে দাঁড়াইয়া সুরেন্দ্রনাথ বঙ্গভঙ্গের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া জলদগম্ভীরনাদে দেশবাসীকে আহ্বান করিয়া বলেন, যত দিন বঙ্গভঙ্গ রহিত না হয়—যত দিন লর্ড মর্লের "সেটেল্ড ফ্যাক্‌ট" "আনসেটেল্ড ফ্যাক্ট" পরিণত না হয়, তত দিন কেহ যেন এক বিন্দু বিলাতী দ্রব্য স্পর্শ না করে। দেশবাসী তাঁহার সে বাণী শ্রদ্ধাপ্লুত চিত্তে গ্রহণ করে এবং 'স্বদেশী আন্দোলন' নামে প্রবল আন্দোলন তখন হইতে বঙ্গে—শুধু বঙ্গে কেন, সমগ্র ভারতে আরম্ভ হয়।

এমার্শনী কাণ্ড

১৯০৬ সালে বরিশালে দেশপূজ্য অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয়ের আহ্বানে প্রাদেশিক সম্মিলনীর অধিবেশন হয়। সুরেন্দ্রনাথ সেই কন্‌ফারেন্সে বাঙ্গালার নেতৃস্বরূপে গমন করেন। তদানীন্তন জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এমার্শন কন্‌ফারেন্স ভাঙ্গিয়া দেন এবং সুরেন্দ্রনাথকে জরিমানা করেন। তখন সার ব্যামফিল্ড ফুলার পূর্ব্ববঙ্গের নূতন গভর্ণর। ফুলারীকাণ্ডের কথা সকলেরই মনে আছে।

ইম্পিরিয়াল প্রেস কন্‌ফারেন্স

এই সময়ে সুরেন্দ্রনাথ লণ্ডনে সংবাদপত্রসেবিসঙ্ঘে আমন্ত্রিত হইয়া ভারতীয় সংবাদপত্রের প্রতিনিধিরূপে যায়েন। সেই কন্‌ফারেন্সে পৃথিবীর নানা দেশ হইতে সংবাদপত্রের প্রতিনিধিগণ আসিয়াছিলেন। লর্ড বার্ণহাম সেই কন্‌ফারেন্সে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সেই কন্‌ফারেন্সে সার সুরেন্দ্রনাথ ভারতের অবস্থা সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। ভারতে ফিরিয়া আসিলে সেবারও সুরেন্দ্রনাথকে বোম্বাই ও কলিকাতায় বিপুল সংবর্দ্ধনা করা হয়।

মিণ্টো-মর্লি রিফরম

বঙ্গভঙ্গ দেশের লোকের মনে বিষম ক্ষোভ ও ক্রোধের উদ্রেক করিলেও সুরেন্দ্রনাথ কিন্তু একবারে আশাহত হয়েন নাই। লর্ড মর্লি 'সেটেল্ড ফ্যাক্টের' কথা বলিলেও মিল, গ্লাডষ্টোন, ব্রাইটের শিষ্য মরলি ভারতের প্রতি এক দিন না এক দিন সুবিচার করিবেন, এ ধারণা তাঁহার ছিল। বস্তুতঃ সেই সময়ে লর্ড মর্লি বড় লাট লর্ড মিণ্টোর সহিত যোগাযোগে ভারতের জন্য এক সংস্কার আইনের খসড়া প্রণয়ন করিতেছিলেন। সেই সময়ে দেশের লোককে স্থির ও সংযত করিয়া রাখা কত কষ্টসাধ্য, তাহা সহজেই অনুমেয়। তাহার উপর ডকাতী বোমা, রিভলভার হত্যাদির আবির্ভাবে বিলাতের কাগজওয়ালারা, 'ভারতে বিদ্রোহ', 'ভারতে বিপদ', 'ভারতে প্রলয়' ইত্যাদি বিভীষিকাপ্রদ প্রবন্ধ প্রকটিত করিতেছিলেন। এই দুইয়ের মধ্যে নিয়মানুগ নীতির

তরীখানিকে ঠিক রাখা যে কঠিন ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা তদানীন্তন অবস্থাভিজ্ঞমাত্রেই বলিতে পারেন। সুরেন্দ্রনাথ তথাপি তরীখানিকে যথাসম্ভব স্থির রাখিয়াছিলেন। যখন মর্লি-মিণ্টো'র শাসন-সংস্কার প্রকাশিত হইল, তখন উহার অনুদারতা দেখিয়াও সুরেন্দ্রনাথ প্রমুখ নিয়মানুগ পথের যাত্রীরা সানন্দে উহা গ্রহণ করেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, যাহা পাওয়া যাইতেছে, তাহাই লাভ, ভবিষ্যতে উহা আরও আনিবে।

দিল্লী দরবার ও বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ রদ

সুরেন্দ্রনাথের তীব্র আন্দোলনের ফলে এই সময়ে সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ স্বয়ং দিল্লী দরবারে উপস্থিত হইয়া বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ রদ করিবার এবং দিল্লীতে রাজধানী স্থানান্তরিত করিবার বার্ত্তা ঘোষণা করেন। সে ১৯১১ খৃষ্টাব্দের ১২ই ডিসেম্বরের কথা। তখন লর্ড হার্ডিঞ্জ ভারতের বড় লাট ও লর্ড ক্রু ভারত-সচিব। সুরেন্দ্রনাথের আন্দোলন সার্থক হইল।

ব্যবস্থাপক সভায় সুরেন্দ্রনাথ

লর্ড মর্লে যে শাসন-সংস্কার প্রবর্ত্তন করেন, তাহার ফলে সুরেন্দ্রনাথ বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হয়েন। ৮ বৎসর যাবৎ তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ছিলেন। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে তিনি বড় লাটের ব্যবস্থাপক সভায় সদস্য নির্ব্বাচিত হয়েন।

মণ্টেগু শাসন-সংস্কার

১৯১৬ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে ইম্পিরিয়াল কাউন্সিলের ১৯ জন সদস্য সরকারকে শাসন-সংস্কার সম্পর্কে এক মেমোরাণ্ডাম প্রদান করেন। সুরেন্দ্রনাথ তাঁহার 'বেঙ্গলী' পত্রে ইহা পূর্ণ সমর্থন করেন। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দের লক্ষ্ণৌ কংগ্রেস এই বিষয়ে একটি মন্তব্য গ্রহণ করেন। ইহার ফলে বিলাতের সরকার ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের ২০শে আগষ্ট তারিখে ভারতে ক্রমশঃ দায়িত্বপূর্ণ শাসন-নীতি প্রবর্ত্তন করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দেন। তাহার পরে ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের মণ্টেগু-সংস্কার বিধিবদ্ধ হয়। সুরেন্দ্রনাথ মোটের উপর উহা স্বীকার করিয়া লইলেও উহার ত্রুটি প্রদর্শন করিতে পশ্চাৎপদ হয়েন নাই;—The weakest part of the scheme is that relating to the Government of India.

১৯১৯ খৃষ্টাব্দে ভারত-শাসন আইন প্রবর্ত্তনের পর সার সুরেন্দ্রনাথকে বাঙ্গালা সরকার স্বায়ত্ত-শাসন বিভাগের মন্ত্রী নিযুক্ত করেন। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্যনির্ব্বাচনে কেহ তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন না। ১৯২০ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী সরকার তাঁহাকে "নাইট" করিয়া সার উপাধিভূষিত করেন। ৩ বৎসরকাল তিনি বাঙ্গালা সরকারের মন্ত্রিত্ব করিয়া দেশের উপকারের যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি যে কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইন রচনা করিয়া দিয়াছিলেন, তাহার ফলে আজ স্বরাজ্য দল কলিকাতা কর্পোরেশন দখল করিয়া লইতে সমর্থ হইয়াছেন।

মডারেট ডেপুটেশান

১৯১৯ খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগে লর্ড সাউথবরোর অধীনে সুরেন্দ্রনাথ এক রিফরম কমিটীতে সদস্যপদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। যে মাসে গবর্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া বিলের খসড়া প্রকাশিত হয়। পার্লামেণ্টের উভয় হাউসের সদস্যদিগকে লইয়া লর্ড সেলবোর্ণের সভাপতিত্বে এক জয়েণ্ট কমিটী নিযুক্ত হয়। সেই কমিটী বিলের আকৃতি প্রদান করেন। এই সূত্রে যে মডারেট ডেপুটেশান বিলাতে গিয়াছিল, সুরেন্দ্রনাথ তাহার সভাপতিরূপে গিয়া অবস্থা সুন্দররূপে বিবৃত করিয়াছিলেন।

১৯২৮ খৃষ্টাব্দে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার পুনরায় নির্ব্বাচন হইল—কিন্তু তাহার মধ্যে দেশের অনেক পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছিল। মহাত্মা গন্ধীর অসহযোগ মন্ত্র প্রচারের ফলে দেশে এক দল তরুণ ত্যাগীর আবির্ভাব হওয়ায়, সুরেন্দ্রনাথ এবার আর ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্ব্বাচিত হইতে পারিলেন না। স্বরাজ্য দলপতি চিত্তরঞ্জনের চেষ্টায় ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের নিকট সার সুরেন্দ্রনাথকে পরাজিত হইতে হইল। সে অপমান বৃদ্ধবয়সে সার সুরেন্দ্রনাথের পক্ষে অসহ্য হইয়াছিল। তাহার পর আর তিনি প্রকাশ্য সভায় আগমন করেন নাই। তিনি সহরের কোলাহল হইতে দূরে বারাকপুরের নিভৃত কুঞ্জে বসিয়া তাঁহার কর্ম্মময় জীবনের কাহিনী লিপিবদ্ধ

চিতানল

করিতেছিলেন। তাঁহার জীবনস্মৃতির প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে। মন্ত্রিত্বগ্রহণের পর তিনি বেঙ্গলী পত্রের সম্পাদনভার পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু মৃত্যুর মাত্র কয়েক মাস পূর্ব্বে তিনি পুনরায় বেঙ্গলীর সম্পাদন-ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি এবার আর বেঙ্গলী অফিসে আসিতেন না, তাঁহার বারাকপুরের বাটী হইতেই বেঙ্গলীর জন্য রচনা প্রেরিত হইত।

শেষ কথা

মহাত্মা গন্ধী কয়েক দিন পূর্ব্বে সার সুরেন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার বারাকপুর মণিরামপুরস্থ বাটীতে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। সে সময় সুরেন্দ্রনাথ স্বভাব-সুলভ সরলতার বশবর্ত্তী হইয়া মহাত্মাজীকে বলিয়াছিলেন যে, তিনি (সুরেন্দ্রনাথ) ৯১ বৎসর বাঁচিবেন। কিন্তু কালের আহ্বানে তাঁহাকে তৎপূর্ব্বেই দেহত্যাগ করিতে হইল। তিনি মৃত্যুর কয়েক দিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত নিয়মিত শারীরিক ব্যায়ামচর্চ্চা করিতেন। সকালে ও বিকালে তাঁহার গঙ্গাতীরস্থ বাটীর সম্মুখে পাদচারণা করিয়া বেড়ান তাঁহার নিত্য-ক্রিয়া ছিল। সামান্য ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা রোগে দিন কয়েকমাত্র ভুগিয়া সুরেন্দ্রনাথ ইহলোক হইতে প্রস্থান করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার ৭৭ বৎসর বয়স হইয়াছিল। তাঁহার একমাত্র পুত্র ভবশঙ্কর ও বহু কন্যা ও বহু আত্মীয়-স্বজন, পৌত্র, দৌহিত্র রাখিয়া বাঙ্গালার রাজনৈতিক "গুরু" সুরেন্দ্রনাথ চিরতরে চক্ষু মুদ্রিত করিয়াছেন।

সুরেন্দ্রনাথের শ্রাদ্ধবাসর

সার সুরেন্দ্রনাথ বিলাত-ফেরত হইলেও এবং অনেক সময় য়ুরোপীয় প্রথায় চলিতে অভ্যস্ত হইলেও তিনি নিজেকে কুলীন ব্রাহ্মণ বলিয়া প্রীতিলাভ করিতেন। অনেক সময় অনেক সভা-সমিতিতে তাঁহাকে ব্রাহ্মণত্বের দোহাই দিতে দেখা গিয়াছে। তাঁহার লোকান্তরে মণিরামপুরে তাঁহার প্রিয় গঙ্গাতীরে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ব্যবস্থায়—সে বিষয়ে তাঁহার শেষ ইচ্ছা-প্রকাশে তাঁহাতে হিন্দু শাস্ত্রানুযায়ী শ্রাদ্ধ-ব্যবস্থায় বিশেষ প্রীত হইয়াছেন।

গত ৩১শে শ্রাবণ রবিবার সংক্রান্তিদিবসে সুরেন্দ্রনাথের মণিরামপুরস্থিত বাটীতে শ্রাদ্ধ-ক্রিয়া সুসম্পন্ন হইয়াছে। অতি প্রত্যুষ হইতেই লোকজন কলিকাতা ও অন্যান্য স্থান হইতে দলে দলে মোটর প্রভৃতিতে বারাকপুর গমন করেন। বেলা ৮টার মধ্যে সার সুরেন্দ্রনাথের বাটীর
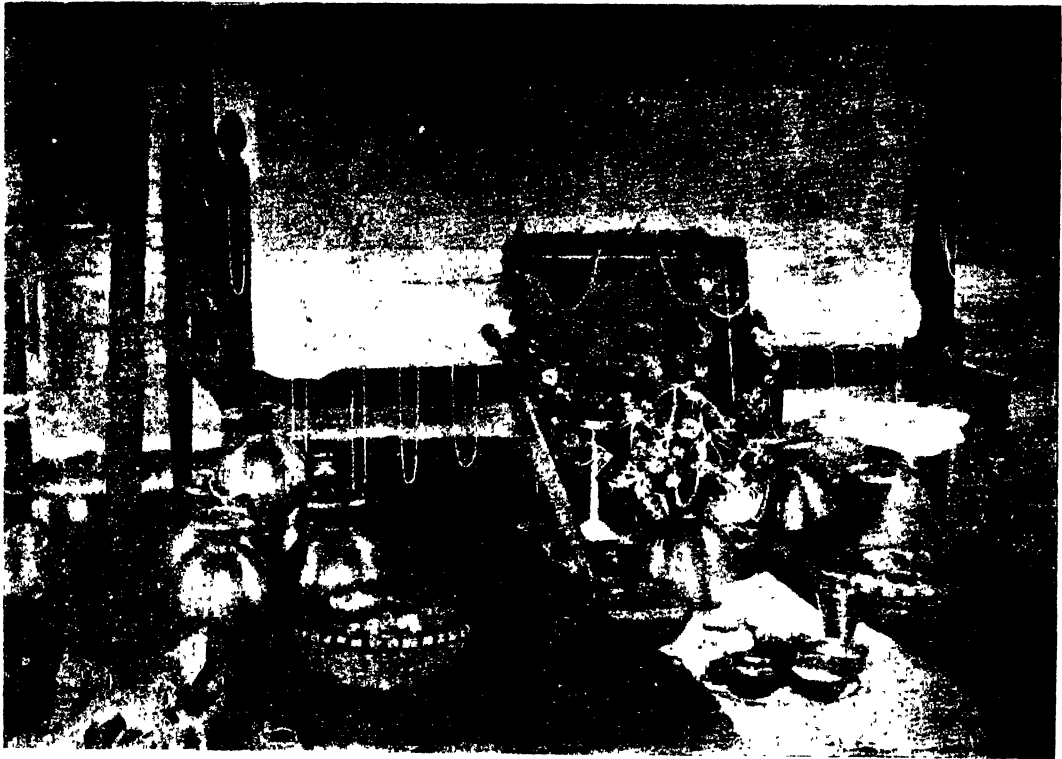
শ্রাদ্ধবাসর

হিন্দুর সেই মজ্জাগত সংস্কার যেমন প্রকাশ পাইয়াছিল, তেমনই পুত্র শ্রীমান্ ভবশঙ্কর সম্পূর্ণ হিন্দু প্রথায় মুণ্ডিত-মস্তকে পিতার শ্রাদ্ধকার্য্য যথাশাস্ত্র সম্পন্ন করিয়া তাঁহার সেই সংস্কারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন, দেখিয়া আমরা সুখী হইয়াছি। শ্রাদ্ধে যদি পরলোকগত আত্মার তৃপ্তি-সাধন হয়, তাহা হইলে আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি, কুলীন ব্রাহ্মণ-সন্তান সুরেন্দ্রনাথের আত্মাও এই

সম্মুখস্থিত প্রশস্ত রাজপথ মোটরে ভর্ত্তি হইয়া যায়। বেলা ১০টার সময় মৌলবী লিয়াকৎ হোসেন 'সাহেবে'র নেতৃত্বে এক দল যুবক নগ্নপদে সুরেন্দ্রনাথের জন্য শোকগাথা গাহিতে গাহিতে কলিকাতা হইতে যাইয়া উপস্থিত হয়। বারাকপুর ষ্টেশনে এবং মণিরামপুরের বাটীতে শ্রীযুত বি, সি চট্টোপাধ্যায়, নীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ ধীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী ও

দানোৎসর্গ

রায় সাহেব রাজেন্দ্রনাথ অভ্যাগতদের অভ্যর্থনা করেন।

বাটীর সুপ্রশস্ত প্রাঙ্গণে গঙ্গাতীরে অভ্যাগতদের জন্ম বিরাট সামিয়ানার নিম্নে বসিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। সামিয়ানার মধ্যে কীর্ত্তনের ব্যবস্থাও ছিল।

স্বতন্ত্র রামধনু বর্ণের সামিয়ানার নিম্নে শ্রাদ্ধকার্য্যের ব্যবস্থা হইয়াছিল। সেখানে খাট, বিছানা, রূপা ও পিতলের তৈজসপত্র প্রভৃতি

শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তীর মন্ত্র পাঠ

ষোড়শ এবং আদ্য-শ্রাদ্ধ ও অন্নদানের অন্যান্য দ্রব্যসম্ভার স্তরে স্তরে সাজান ছিল। চাউল, চিনি, আম্র, কদলী, আনারস ও অন্যান্য ফলপূর্ণ রূপা ও পিতলের পাত্রগুলি যথাস্থানে পরলোকগত আত্মার প্রতি নিবেদনের জন্য স্তরে স্তরে সাজান ছিল।

বেদীর সম্মুখে মৃত মহাপুরুষের একখানি বৃহৎ চিত্র পুষ্পদামে সুসজ্জিত ও স্থাপিত করা হইয়াছিল।

শ্রাদ্ধবেদী

সামিয়ানার নীচে ব্রাহ্মণগণ বেদ ও গীতা-পাঠে আত্ম-নিয়োগ করেন। বেলা প্রায় ১০টার সময় শ্রাদ্ধকার্য্য আরম্ভ হয় এবং তাহা শেষ হইতে ৩ ঘণ্টা লাগিয়াছিল। শ্রীমান্ ভবশঙ্কর মুণ্ডিত-মস্তকে কুশাসনে বসিয়া পিতৃকৃত্য সমাধা করেন। পিণ্ডদান, অন্নদান, বৃষোৎসর্গ - অনুষ্ঠানগুলি বিজ্ঞ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের তত্ত্বাবধানে সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়। দর্শকমণ্ডলী শ্রদ্ধাপ্লুত চিত্তে সে সব দর্শন করিতে থাকেন।

শ্রাদ্ধান্তে ব্রাহ্মণগণকে কলসী ও বস্ত্রাদি দান করা হয়। অপরাহ্নে ভূরিভোজের ব্যবস্থা হয়। দরিদ্রদিগকে পর্য্যাপ্ত ভিক্ষাদানে সন্তুষ্ট করা হয়।

শ্রাদ্ধক্ষেত্রে নানা সম্প্রদায়ের লোকজন, গণ্য-মান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ ও দেশবিদেশের বহু নেতা উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীদুর্গানাথ কাব্যতীর্থ।

ইংরাজের সহিত সুরেন্দ্র প্রসঙ্গ

কিছু কাল পূর্ব্বে দেশনায়ক সুরেন্দ্রনাথকে লইয়া এক জন ইংরাজের সঙ্গে আমার বেশ একটু বচসা হইয়াছিল।

ইংরাজ-মণ্ডলী আজকাল সুরেন্দ্র বাবুকে মডারেট বলিয়া খাতির করেন। কিন্তু তখনকার দিনে ইঁহাদের মতে তিনি ছিলেন এক জন ঘোর Extremist এমন কি, ইঁহাকেই তাঁহারা বিদ্রোহিতার প্রধান প্রবর্ত্তক বলিয়া মনে করিতেন। সে দিন সে ইংরাজটির তৎপ্রতি বিদ্বেষ-বিষবর্ষিত বাক্যে আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, অথচ তাঁহার সেই জ্বালাময় সমালোচনার মধ্যে বেশ একটু কৌতুকও অনুভব করিয়াছিলাম। তখন আমি 'ভারতীর' সম্পাদক ছিলাম। সম্ভবতঃ কোনও এক দিন এই বাদানুবাদ'ভারতী'রই কাযে লাগিয়া যাইবে,এই মনে করিয়া সে দিনের কাহিনী তখন খাতায় টুকিয়া রাখিয়া-ছিলাম, কিন্তু পরে আর তাহা ছাপাইবার অবসর ঘটিয়া উঠে নাই। আজ এত দিন পরে দেখিতেছি, সে কথা প্রকাশের ঠিক সময় আসিয়াছে। ভারতে জাতীয়তা উদ্বোধনের যিনি আদিগুরু, তাঁহার স্মৃতিকল্পে শ্রদ্ধা-তর্পণস্বরূপ সেই কাহিনী আজ নিম্নে বিবৃত করিতেছি।

সেই সময় মাণিকতলার বিদ্রোহী দলের বিচার চলিতেছিল। খুদিরামের সংবমাত্র ফাঁসী হইয়া গিয়াছে। সেই বিপ্লবযুগে আমি এক দিন এক জন ইংরাজ-মহিলার বাটীতে চা-পানের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গিয়াছিলাম। তাঁহার স্বামী ছিলেন একখানি সচিত্র পাক্ষিক কাগজের প্রোপ্রাইটর। আমার ছোট ছোট গল্প মধ্যে মধ্যে তাঁহাদের কাগজে প্রকাশিত হইত। সেই সূত্রেই তাঁহা-দের সহিত আমার আলাপ-পরিচয়।

চা-পানের পর মিসেস্ পি সদ্যপ্রকাশিত কাগজ-খানা আমাকে দেখিতে দিলেন। প্রথম পাতাখানা উল্টাইবামাত্র দেখিতে পাইলাম, খুদিরামের ছবি। ছবিখানি দেখিয়া অসতর্কভাবে হঠাৎ বলিয়া উঠিলাম, "খুব ত ভালমানুষী নরম চেহারা! আহা, দেখিলে মায়া করে!"

মিঃ পি বলিলেন, "কিন্তু কায যা করেছে, তা ত একটুও নরম নয়।"

আমি। তা সত্য। তবে স্ত্রীহত্যার অভিপ্রায়ে সে কিন্তু এ কায করে নাই। কিংবা তার হাতেই যে খুনটা হয়েছে, এমনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি। তা ছাড়া যে রকম তার কচি বয়স, এই বিবেচনায় গভর্ণমেণ্ট যদি তাকে ফাঁসী না দিয়ে নির্ব্বাসন-দণ্ড দিতেন, তবে আমার বিশ্বাস, ভবিষ্যতে তার জীবনের ধারা একেবারেই উল্টে যেত।

মিঃ পি বলিলেন, 'আমার মতে সঙ্গে সঙ্গে দলপতিদের লটকে দিলেই ঠিক হ'ত। এ সকল কার্য্যের জন্য আসলে দায়ী তারাই।"

আমি তাঁহার কথার কোন উত্তর না দিয়া পাতাগুলি উল্টাইয়া যাইতে লাগিলাম। দুই একখানা পাতার পরই নজরে পড়িল সুরেন্দ্র বাবুর ছবি। সবিস্ময়ে বলিয়া উঠি-লাম, "এ কি! সুরেন্দ্র বাবুও যে এখানে?"

মিঃ পি। তিনিই ত যত নষ্টের গোড়া! তিনিই ত ছেলেদের এ সকল কাযে উত্তেজিত ক'রে তুলেছেন।

আমি উত্তেজিতভাবে বলিয়া উঠিলাম, "কি বল্‌ছেন আপনি? তিনি ছেলেদের দেশানুরাগধর্ম্ম শিখিয়েছেন বটে, কিন্তু বোমা ফেল্‌তে বা গুপ্তহত্যা কর্‌তে ত শেখান নি! বিদ্রোহিতার পক্ষপাতী তিনি একেবারেই নন। তিনি একান্তই মডারেট।"

মিঃ পি অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া কহিলেন, "মডারেট! তিনি পাকা Extremist। যখন বিপিন পালের দল তাঁকে ছাড়িয়ে উঠলো, তখনই তিনি Mode-rate সাজলেন। লোকটা ভারী চালাক (clever)"।

আমি। মডারেট বা Extremist দলের মধ্যে বিশেষ কি প্রভেদ, তা আমি জানি না। তবে দেশাত্মবোধ প্রচার করাই যদি চরমপন্থাবাদ হয়, তবে ইঁহাকেই যথার্থ আদিগুরু বলা যায়। আর খুন-জখম করাই যদি চরম-পন্থীর কায হয়, তা হ'লে ইনি একান্তই মডারেট।
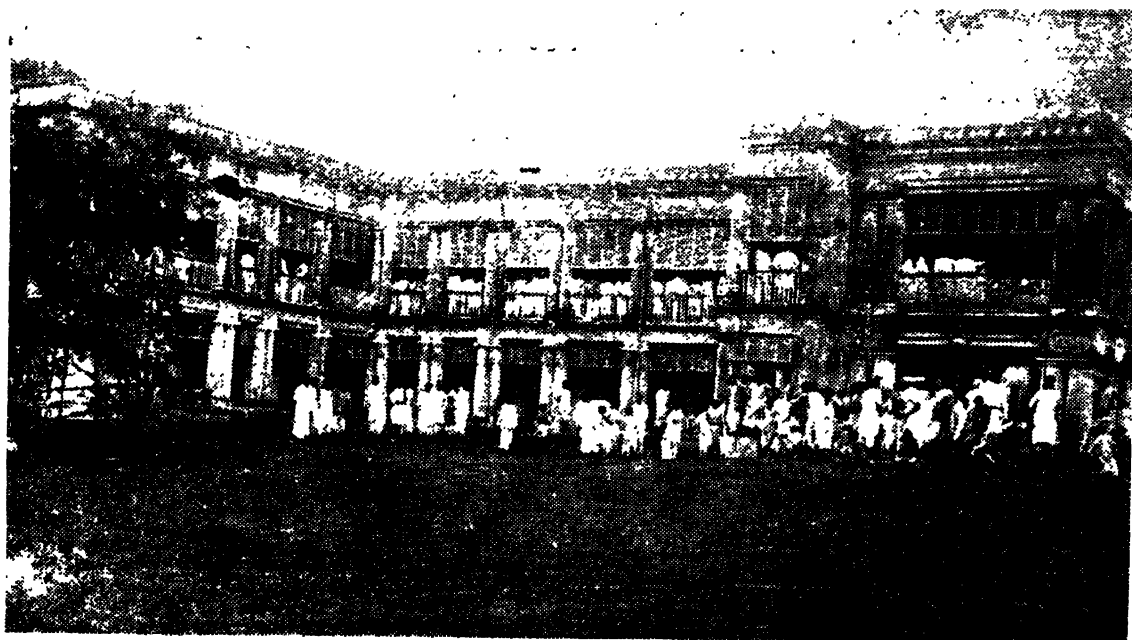
মৃত্যু-মুহূর্তে সুরেন্দ্র-ভবনে জনতা

শেষ বিদায়

কিন্তু মিঃ পি কিছুতেই তাঁহার ধূয়া ছাড়িলেন না। খুব জোরের সহিত বলিলেন, "নিশ্চয়ই তিনি extremist. Extra extremist দলের আবির্ভাবেই এখন তিনি মডারেট নাম নিয়েছেন। যেমন ইংলণ্ডে প্রথমে Liberal নামধেয় দলকে যারা ছাড়িয়ে উঠলো, তারা দাঁড়াল Radical; এ শুধু একটা নামের ঘোরফের। আসলে সব হাঙ্গামার মূল হচ্ছেন ইনি—এই সুরেন্দ্র ব্যানার্জ্জি! বরিশালের যে গোলযোগ ঘটে, সেও এঁরই জন্য। ইনি ছেলেদের ক্রমাগত এই শিক্ষা দিচ্ছেন যে, সমস্ত বাধাবিঘ্ন পদদলিত ক'রে চলো (trample under your foot)।"

আমি বলিলাম, "বাধাবিঘ্ন দলিত করার অর্থ ইংরাজ-দলন নয়। দেশের মঙ্গল করতে হলে বাধা-বিঘ্নের উপর দিয়ে চল্‌তেই হবে। এ একটা সহজ সত্য। আপনাদের "হেপেনি" (Half-a-penny) বুকের উপদেশ।"

মিঃ। তা নয়, আপনি ওকে জানেন না, ও-কথার গুপ্ত অর্থ নিশ্চয়ই ইংরাজ দলন। জানেন না কি,—উঁহাকে যে বাঙ্গালার রাজা ক'রে তুলেছে। (He was crowned as the King of Bengal)

আমি বলিলাম, "এখানে রাজা অর্থে গুরু। তিনিই কি না প্রথমে দেশানুরাগ শিক্ষা দেন।"

মিঃ পি। গুরুকে কি ছাতা ধরে? তাঁর মাথায় যে ছেলেরা ছাতা ধরেছিল।

মনে মনে হাসিয়া ভাবিলাম, হায় রে, তোমরাই ভারতের হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা। প্রকাশ্যে কহিলাম, "হাঁ, শিষ্যরা গুরুর মাথায় ছাতা ধরে বৈ কি! আপনারা কি দেখেননি, অনেক সময় শিষ্যরা গুরুর মাথায় ছাতা ধ'রে রাস্তায় শোভাযাত্রা ক'রে চলেছে।"

মিঃ পি। তা জানি আর নাই জানি, এটা ত ঠিকই জানি যে, মিঃ ব্যানার্জ্জিই ছেলেদের বয়কট শিখিয়েছেন।

আমি। তাতে দোষ হয়েছে কি? দেশোন্নতি-চেষ্টা ত রাজার বিরুদ্ধাচরণ নয়! দেশের শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি করতে গেলেই স্বদেশী পণ্যগ্রহণে বদ্ধপরিকর হ'তে হবে।

মিঃ পি। ওঃ, আপনি বল্‌ছেন স্বদেশীর কথা। কিন্তু স্বদেশী ও বয়কট, এ দুটো ত এক জিনিষ নয়।

আমি। এক বৈ কি! স্বদেশী পণ্য গ্রহণ করতে গেলেই বিদেশী বর্জ্জন অনিবার্য্য।

মিঃ পি। আপনি দেখছি, তা হ'লে ভাল ক'রে বেঙ্গলী কাগজখানা পড়েন না। কাগজখানা তলিয়ে পড়লেই বুঝা যায়, ইংরাজ বিরুদ্ধে বিদ্রোহিতা জাগানই সম্পাদকের মনোগত অভিপ্রায়। তবে সেয়ানা ছেলে এখন সুর বদলাচ্ছেন।

আমি। আপনারই ভুল। এ রকম idea আমাদের দেশেরই নয়। যদি কেউ বিদ্রোহিতা শিক্ষা দিয়ে থাকে, ত আপনারাই—

মিঃ পি "আমরা?" এইরূপে বিস্ময় প্রকাশ করিয়া একটু থামিয়া বলিলেন, "হাঁ; মিস্ নোবল্ অনেকটা mischief করেছেন, আমি জানি। কিন্তু আপনি জানেন, গভর্ণমেণ্ট সে জন্যে তাঁকে সরিয়ে দিয়েছেন?"

আমি বিস্ময় প্রকাশ করিয়া কহিলাম, "সত্যি না কি? আমি তা ত জানি না।"

মিঃ পি বলিলেন, "খুব সত্যি। এ দেশে গভর্ণমেণ্ট তাঁকে আর আস্‌তেই দেবেন না।"

তাঁর স্ত্রী এতক্ষণ নির্ব্বাকভাবে আমাদের কথাবার্ত্তা শুনিয়া যাইতেছিলেন। এইবার তিনি বলিয়া উঠিলেন, "মিস্ নোবল্ এখানে এলেই আমার স্বামীর সঙ্গে তাঁর ভয়ানক ঝগড়া হ'ত। এ দেশের বিরুদ্ধে কোনও কথা বল্লেই মিস্ নোবল্ রেগে উঠে বল্‌তেন, 'তোমার স্বামী native-hater, আমি আর এর মুখদর্শন করব না' আমি চল্লুম, আর কখনও তোমাদের বাড়ী আস্‌ব না। আমি তখন তাঁকে অন্য ঘরে নিয়ে গিয়ে ফলটল খাইয়ে ঠাণ্ডা করতুম।' কিছু পরে তিনি আবার জল হয়ে যেতেন।"

মিঃ পি বলিলেন, 'ও কথাটা কিন্তু একবারেই ঠিক নয়। আমি মোটেই native-hater নই। আমি native-দের সত্যিই ভালবাসি। এ সকল idea তাদের পক্ষেই ক্ষতিজনক। তিলক ত স্পষ্ট করেই বোমা-হত্যার প্রশংসা করেছেন।

আমি উত্তেজিত স্বরে কহিলাম, "সে ত অনুবাদের কথা। মূল লেখা থেকে ত তাঁর বিচার হয়নি! আজকাল কথায় কথায় তিলককে তাল ক'রে তুলে sedition প্রমাণের

শুদ্ধ রটে গেছে। সে কথাটা হচ্ছে liberalism is dead, ইংলণ্ডে Bright, Gladstoneএর দোহাই আজ আর কেউ দেয় না। ইতালীতে এখন আর কেউ ম্যাটসিনির নামও করে না। এমন কি, সে দেশের বই-য়ের ক্যাটালগে ম্যাটসিনির বইয়ের নাম পর্য্যন্ত পাওয়া যায় না। এর কারণ—ইউরোপে এক দিকে Imperialism আর এক দিকে Socialism এই দুয়ের চাপে liberalism মারা গিয়েছে। Imperialism এবং Socialism ও দুই হচ্ছে একই জিনিষের এ'পিঠ আর ও পিঠ যেমন Bolshevism হচ্ছে Czarismএর নূতন সংস্করণ। আর এ দুই মতই মূলে এক, দুই-ই Collectivism হতে রসরক্ত সংগ্রহ করছে। অপর পক্ষে Liberalismএর মূল-মন্ত্র হচ্ছে Individualism. সাদা বাঙ্গালায় Liberalism এর আইডিয়াল হচ্ছে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা আর Collectivismএর আইডিয়াল জাতীয় স্বার্থ অর্থাৎ অর্থ। নূতন পলিটিকাল মত সব পেটুক, এ সব মতের গোড়ায় আছে লোভী ও ক্ষুব্ধ। Imperialismএর সঙ্গে Socialismএর বিবাদ হচ্ছে আসলে এক লোভীর বিরুদ্ধে অপর লোভীর হিংসা ও ক্রোধ। সুরেন্দ্রনাথের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই বাঙ্গালার বিলেতি-দস্তুর শেষ পলিটিকাল-লিবারেলের মৃত্যু হয়েছে। আমি এ প্রবন্ধে সুরেন্দ্রনাথকে মানুষ হিসেবে বিচার করছিনে, তাঁ'র পলিটিকাল মতামতেরই বিচার করছি। পৃথিবীতে মধ্যে মধ্যে এমন সব লোক জন্মায়, যাঁ'রা এক একটি মতের বিগ্রহস্বরূপ। যাঁ'রা সমগ্র জীবন একই মতের প্রচার করেন লোক-সমাজে সেই মতের প্রতিষ্ঠা করাই তাঁ'দের জীবনের একমাত্র কার্য্য। আজকের দিনে আমরা পূর্ণ parliamentary governmentএর জন্য সবাই লালায়িত এবং ডিমোক্রেসির অন্ততঃ মুখেই সবাই ভক্ত। সুরেন্দ্রনাথ তাঁ'র শেষ জীবনে এ দুয়েরই সূত্রপাত দেখে গিয়েছেন। পলিটিকাল ক্ষেত্রে Liberalism, বিলেতে মরতে পারে, ভারতবর্ষে মরে নি, তা'র কারণ—ও পদার্থ এ দেশে আজও বড় হয়ে ওঠবার সুযোগ পায় নি, সুতরাং তা বুড়ো হয়ে মরবারও সুযোগ পায় নি। আজ যে আমরা আমাদের পলিটিকাল আইডিয়ালের নামকরণ করতে পারিনে, তা'র কারণ, এই বিংশ শতাব্দীতে এত রকম নূতন মতামত বেরিয়েছে যে, আজকের দিনে য়ুরোপে কারও মতের স্থিরতা নেই, ফলে আমাদেরও নেই। য়ুরোপ যে রোগে আক্রান্ত হয়েছে, এখন তা'র একসঙ্গে পলিটিকাল, অ্যালোপাথি, হোমিওপাথি, কবিরাজী ও হকিমি চিকিৎসা চলছে; কিন্তু আমরা জানি আর না জানি, মানি আর না মানি, সকলেই সুরেন্দ্রনাথের পলিটিকসের জের টেনে চলছি, আর সে জের আমরা একটু বেশী জোরেই টানছি,তা'তে আসল জিনিষ বদলায় না। আমাদের পলিটিকস liberalismএর একটা বড় কথা, nationalism আমাদের কাছেও সব চাইতে বড় কথা হয়ে উঠেছে। অপর সব ismএর মূলমন্ত্র হচ্ছে internationalisation. এই কথা কটি মনে রাখলেই আমরা বুঝব যে, সুরেন্দ্রনাথ পরলোকে গিয়েছেন, ইহলোকে তাঁ'র পলিটিকাল আত্মা রেখে। সে আত্মা এ যুগে আমাদের সকলের অন্তরে অমর হয়ে রয়েছে।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

পরদেশী

বসুমতী প্রেস

[শিল্পী—এস, জে, ঠাকুরসিং ।

৪র্থ বর্ষ] অগ্রহায়ণ, ১৩৩২ [২য় সংখ্যা

মহাভারত ও ইতিহাস

মহাভারত কি, বুঝিবার পূর্ব্বে মহাভারতের লেখকের পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন। প্রথমে ছোবড়া, অর্থাৎ উপকথার অংশ বলা যাউক।

চেদিদেশে পুরুবংশীয় বসু নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি ইন্দ্রের নিয়োগ অনুসারে ঐ দেশ অধিকার করেন। কিছু দিন পরে ঘোর তপস্যায় রত হইলে ইন্দ্র নিজের ইন্দ্রত্বলোপের আশঙ্কায় তাঁহাকে বলিলেন, "তুমি পৃথিবীর ঈশ্বর হও; আমি স্বর্গের রাজা থাকি।" তিনি ঐ রাজাকে একখানি বিমান দিয়াছিলেন, রাজা ঐ বিমানে চড়িয়া আকাশে বেড়াইতেন বলিয়া তাঁহার নাম উপরিচর হইল। উপরিচর রাজা নিজের পাঁচটি পুত্রকে পাঁচটি দেশের রাজা করিলেন, দেশগুলি পুত্রদের নামে খ্যাত হইল। তাঁহার রাজধানীর নিকটে শুক্তিমতী নামে এক নদী ছিল, কোলাহল নামে এক পর্ব্বত সেই নদীর গতিরোধ করে, সেই পর্ব্বতের ঔরসে শুক্তিমতী নদীর গর্ভে এক পুত্র ও এক কন্যা জন্মে। পুত্রটি পরে হইল বসু রাজার সেনাপতি; কন্যার নাম হইল গিরিকা। গিরিকা পরে উপরিচর রাজার মহিষী হয়েন। উপরিচর রাজার ঔরসে মীনরূপিণী অদ্রিকা (গিরিকা) অপ্সরার গর্ভে যমুনা-জলে এক পুত্র ও কন্যা হয়, পুত্রটিকে রাজা পালন করিলেন, কন্যাটি ধীবর-গৃহে প্রতিপালিত হইল। ঐ কন্যাটি পরে মৎস্যগন্ধা, সত্যবতী, কালী, গন্ধকালী, যোজনগন্ধা, পদ্মগন্ধা প্রভৃতি নামে বিখ্যাত হয়েন। পরাশর ঋষির ঔরসে সত্যবতীর গর্ভে যমুনাদ্বীপে ব্যাসের জন্ম হয়। ব্যাস জন্মিবামাত্র সম্পূর্ণদেহ ও সর্ব্বজ্ঞ হয়েন।

উপরে লিখিত গল্পটির নিগূঢ় তত্ত্ব পর্য্যায়ক্রমে দেওয়া কঠিন। তবে কিছু বুঝিবার চেষ্টা করিলে গল্প মর্ম্মের যথেষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যাইতে পারে। প্রথমে কোলাহল ও শুক্তিমতীর মিলন হইল। যে অচলকে সচল করে, তাহাকে পর্ব্বত বলে, অর্থাৎ যাহা দ্বারা জড়তা দূর হয়, তাহার নাম গিরি বা পর্ব্বত।

"গিরিং গিরিবদচেতনং দেহং কায়তি শব্দয়তীতি গিরিকঃ অচেতনমপি দেহাদি চেতনং করোতীত্যর্থঃ।"
"অচেতয়দচিতো দেবো অর্য্য" ইতি মন্ত্রলিঙ্গং চ।

৬৮-২৮৪ অঃ শান্তি।

অদ্রিকা মীনরূপিণী ছিলেন, 'মৎস্য ইব মৎস্যো জীবঃ সংসারনদীজলে চরতীতি।' ব্রহ্মার মানস পুত্র অর্থাৎ বেদের প্রতিবিম্ব নারদের ভাগিনেয়ের নাম হইল পর্ব্বত।

উপরিচর হইলেন পুরুবংশীয়, এই পুরু কথার তাৎপর্য্য পরে দেখিব। কোলাহল কথায় রবের ইঙ্গিত স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায়, শুক্তিমতী নদী অর্থে যে নদীতে শুক্তি আছে, তাহা বুঝায়, আর শুক্তিমতী কথায় শুভ্রা বুদ্ধি অথবা চেতনসলিলা তাহাও বুঝায়।

কন্যাটির নাম হইল সত্যবতী। এ কথাটি বেদবতী কথার রূপান্তর, "ইতি সত্যবতী শ্রুতিঃ" ১০-১৮০ অঃ শান্তি। সত্যবতীর আর একটি নাম কালী,…কালী অর্থে পরমাত্মা। তাঁহার আর একটি নাম গন্ধকালী, গন্ধ ও সুরভি দুই কথা একার্থ-বাচক। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, সুরভি কামদুঘা গো, অর্থাৎ বেদ। সেই কারণে আমাদের বাল্যবন্ধু হনুমান (কপিধর্ম্ম) গন্ধমাদন পর্ব্বত মাথায় করিয়া লইয়া আসেন, ধর্ম্ম চিরদিনই বেদের বাহন। সত্যবতী ধীবর-গৃহে প্রতিপালিত হয়েন। ধীবরের সোজা অর্থ মৎস্যজীবী জেলে; কিন্তু প্রকৃত তাৎপর্য্য ধীমতাং বরঃ। ধীমতাং কথার অর্থ ধিয়া ব্রহ্মবুদ্ধ্যা মত সম্মত। এই ধী হইল গায়ত্রীর ধী, "ধীমতাং জ্ঞানিনাং ধীঃ আত্মানুভবরূপং জ্ঞানং।"

সত্যবতীর সহিত পরাশরের মিলন হয়। পরাশরের বংশবিবরণ পরে বুঝিতে চেষ্টা করিব। পরাশরের নাম বেদনিধি পরাশর, যতিধর্ম্মকে পরাশরী বলে। যখন পরাশর যমুনা নদীর উপর দিয়া নৌকা করিয়া যাইতেছিলেন, তখন এই মিলন হয়। যম কথা হইতে যমুনা কথা উৎপন্ন হইয়াছে। অন্তরিন্দ্রিয় নিগ্রহ করাকে যম বলে। সেই ইন্দ্রিয়নিগ্রহরূপ দ্বীপে (আশ্রয়স্থানে) বেদরূপিণী মাতার গর্ভে বেদনিধি পরাশরের ঔরসে বেদব্যাসের জন্ম হয়।

যিনি বেদের ব্যাস অথবা বিস্তার করেন অথবা যিনি বেদের শাখা বিস্তার করেন, তাঁহার নাম বেদব্যাস। স্থানান্তরে লিখিত আছে, "বেদব্যাস—সরস্বতী-বাস" বেদব্যাস হইলেন হরির বাক্যসম্ভূত পুত্র। পূর্ব্বে তাঁহার নাম ছিল সারস্বত ও অপান্তরতমা। ভগবান্ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, হে পুত্র, তুমি সমস্ত মন্বন্তরে নিত্যকাল এবংবিধ বেদপ্রবর্ত্তক হইবে ৩৮-৩৯। ৩৪৯ অঃ শান্তি।

পুত্র শব্দের অর্থ প্রতিবিম্ব এবং স্বরূপ। এ সম্বন্ধে আরও একটু কথা আছে। ব্যাস জন্মবিহীন, তিনি অজ।

তমাদিকালেষু মহাবিভূতির্নারায়ণো ব্রহ্ম মহানিধাসম্।
সসর্জ্জ পুত্রার্থমুদারতেজা ব্যাসং মহাত্মানমজং পুরাণম্॥
৫-৩৪৯ শান্তি।

স্থানান্তরে লিখিত আছে, ব্যাসাখ্যপরমাত্মনে। এখন বেদব্যাস কথার প্রকৃত অর্থ সম্বন্ধে কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যাইতে পারে। ঋষি কথার অর্থে মন্ত্র এবং মন্ত্রদ্রষ্টা। কবি ও কাব্য উভয়ে একই কথা, যেমন কবি উশনা, কাব্যোশনা, সেইরূপ যোগ ও যোগী। তাহা হইলে বেদব্যাস কথার অর্থ বুঝা সহজ হয়। আখ্যায়িকারূপে বেদের ব্যাস বা বিস্তার, ইহার নাম বেদব্যাস, আর এই বিস্তার যিনি করেন, তদভিমানী কল্পিত পুরুষের নাম বেদব্যাস।

উপরিচর রাজা কে? "উপরিচরস্য রাজ্ঞো ব্যাবৃত্ত্যর্থং তস্যৈব বিশেষণমাদিত্য ইতি অদিতেঃ পুত্রো বসুর্নামেত্যর্থঃ।" বসু শব্দের আর এক অর্থ যজ্ঞের নিমিত্ত আহৃত সামগ্রী।

আমরা এ স্থলে পাইলাম, জ্ঞানরূপ সূর্য্য, অজ্ঞানতা অথবা জড়তাদূরকারী গিরিকা, চৈতন্যসলিলরূপা শুভ্রা নদী, সত্যের আশ্রয় বেদ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহরূপ যমুনা-দ্বীপ ও সরস্বতীনিবাস বেদবিস্তার অভিমানী দেবতা বেদব্যাস।

বেদব্যাসের মূর্ত্তি এইরূপে মহাভারতে চিত্রিত আছে, 'কৃষ্ণবর্ণ, পিঙ্গলবর্ণ জটা, বিশাল শ্মশ্রু, প্রদীপ্ত লোচন।' এই প্রকার রূপ না হইলে অম্বালিকা বিবর্ণা হইতেন না এবং তাঁহার পুত্র পাণ্ডুও পাণ্ডুবর্ণ হইতেন না। এই সকল না হইলে কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধও হইত না। বেদব্যাস জন্মিবামাত্র তৎক্ষণাৎ ইচ্ছানুসারে দেহবৃদ্ধি করিয়া বেদ-বেদাঙ্গ, ইতিহাস প্রভৃতি সমস্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।

মহাভারত কি, এ প্রশ্ন বিচার করিবার এখন সময় নয়, মহাভারতে কি আছে, তাহা বুঝিতে পারিলে ভবিষ্যতে ঐ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া অপেক্ষাকৃত সহজ হইবে। গ্রন্থখানির দুই রূপ; প্রথম রূপ আখ্যান, দ্বিতীয় রূপ রহস্য। ব্রহ্মা ব্যাসকে বলিয়াছিলেন, "তোমার রহস্যজ্ঞান থাকাতে তুমি দুষ্কর তপঃশালী কুলশীলসম্পন্ন সমস্ত

ঋষিকুল হইতে শ্রেষ্ঠতম।" 'জীবব্রহ্মাভেদো গ্রন্থপ্রতিপাদ্যো' ১টীঃ ১ম অঃ আদি।

জীব ও ব্রহ্মের একত্ব—'একমেব অদ্বিতীয়ং' ইহাই হইল গ্রন্থের মূল রহস্য। এই রহস্যটি একটি দীর্ঘ আখ্যায়িকার মধ্যে লুক্কায়িত আছে; এই আখ্যায়িকাটি হইল আবরক অথবা নারিকেলের ছোবড়ার অংশ।

মহাভারত একখানি আখ্যান। 'ভারত আখ্যানং' ৩২৪-২ অঃ আদি।

'মহাভারতম্ আখ্যায়' ২৯৪-২য় অঃ আদি।

'ভারতমাখ্যানং উত্তমং' ৩৩-২য় অঃ আদি।

আখ্যান, উপাখ্যান ও ইতিহাস এই তিনটি কথা মহাভারত সম্বন্ধে একই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

("মহাভারতাখ্যমিতিহাসং সর্ব্বশ্রুতিস্মৃতিসারভূতম্।)"

১টী ১ম অঃ অশ্বমেধ।

'এই আখ্যানের আশ্রয় ব্যতীত ভূমণ্ডলে কোন আখ্যানই বিদ্যমান নাই।' 'ইতিহাসঃ প্রধানার্থঃ শ্রেষ্ঠঃ সর্ব্বাগমেষ্বয়ং' ৩৬-২য় আদি।

'ইতিহাসোত্তমে' ৩৯-২য় আদি।

অভিধানে ইতিহাস কথার অর্থ এইরূপ দেওয়া আছে, 'ইতিহাসঃ—ইতিহশব্দঃ পারম্পর্য্যোপদেশোঽব্যয়ঃ, স আস্তেঽস্মিন্।'

ইতিহাস অর্থাৎ পারম্পর্য্য উপদেশ ইহাতে আছে। আখ্যান, উপাখ্যান ও ইতিহাস এই সকল কথার বিস্তৃত অর্থ দিবার প্রয়োজন নাই। মহাভারতে এই কথাগুলি কি অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা গুটিকতক উদাহরণ হইতে বুঝা যাইবে।

'শ্যেনকপোতীয় উপাখ্যানং' ১৭২-২য় আদি।

'মৎস্য উপাখ্যানং' ১৯১-২য় আদি।

'রামায়ণং উপাখ্যানং' ২০০-২য় আদি।

'অগস্ত্যমপি চাখ্যানং যত্র বাতাপিভক্ষণম্' ১৬৭-২য় আদি

'সৌকন্যামপি চাখ্যানং চ্যবনো যত্র ভার্গবঃ।'

১৭০-২য় আদি।

'পতিব্রতায়াশ্চাখ্যানং' ১৯৪-২য় আদি।

ইতিহাস কথাও এইরূপ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। 'অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্।' এই বলিয়া শান্তি ও অনুশাসনপর্ব্বে শত শত আখ্যান লিখিত হইয়াছে।

তাহা হইলে আমরা যাহাকে ইতিহাস অথবা হিষ্টী বলি, তাহার সহিত মহাভারতের যে ইতিহাস-কথা লিখিত আছে, তাহার কোন সম্পর্ক নাই।

আখ্যান কথার সম্বন্ধে আরও একটু বলা প্রয়োজন। পঞ্চতন্ত্রে তিন মৎস্যের আখ্যান আছে, মহাভারতেও সেই আখ্যান দেখিতে পাওয়া যায়, এই হইল এক প্রকার আখ্যানের উদাহরণ। অপর পক্ষে সমস্ত মহাভারত গ্রন্থ একখানি আখ্যান। তবে মহাভারত আখ্যানের একটু বিচিত্রতা আছে, এই আখ্যান পবিত্র ধর্ম্মশাস্ত্রস্বরূপ, শ্রেষ্ঠ অর্থশাস্ত্রস্বরূপ এবং মোক্ষশাস্ত্রস্বরূপ।

"ধর্ম্মশাস্ত্রমিদং পুণ্যমর্থশাস্ত্রমিদং পরম্।
মোক্ষশাস্ত্রমিদং প্রোক্তং ব্যাসেনামিতবুদ্ধিনা॥"

২৩-৬২ অঃ আদি।

স্থানান্তরে আমরা ধর্ম্মাখ্যান ও সত্যাখ্যান দেখিতে পাই। ১৪-২৪৫ অঃ শান্তি।

উপরে লিখিত হইয়াছে, আখ্যান, উপাখ্যান ও ইতিহাস এই তিন কথার প্রয়োগ কবি এক অর্থে করিয়াছেন। টীকাকার ইতিহাস কথার এই ভাবে অর্থ দিয়াছেন।

"সম্বন্ধং সম্বধাতে সজ্জতে হাতুমুপাদাতুং বা শ্রুতিমর্থং যেন তং ইতিহাসম্।" ২৮-২৯টীঃ ১৬৮ অঃ শান্তি।

তাহা হইলে সমগ্র মহাভারতের সহিত বেদের সম্বন্ধ আছে, তাহা আমরা দেখিতে পাইলাম। কবি এ কথা অনেক স্থানে উল্লেখ করিয়াছেন। "যেমন জ্ঞেয় বস্তুর মধ্যে আত্মা ও প্রিয়তম বস্তুর মধ্যে জীবন, সেইরূপ প্রধানবিষয়ক এই ইতিহাস সকল আগমের মধ্যে উৎকৃষ্ট হইয়াছে।"

"আত্মেব বেদিতব্যেষু প্রিয়েষ্বিব হি জীবিতম্।
ইতিহাসঃ প্রধানার্থঃ শ্রেষ্ঠঃ সর্ব্বাগমেষ্বয়ম্॥"

৩৬-২য় অঃ আদি।

"তস্য প্রজ্ঞাভিপন্নস্য বিচিত্রপদপর্ব্বণঃ।
সূক্ষ্মার্থন্যায়যুক্তস্য বৈদার্থৈর্ভূষিতস্য চ॥"

৪০-২ অঃ আদি।

অশেষপ্রজ্ঞানিলয়, বিচিত্রপদ ও পর্ব্বযুক্ত, সূক্ষ্মার্থ ও ন্যায়যুক্ত বেদার্থে বিভূষিত ভারতীয় কথা।

'কার্ষ্ণং বেদমিমং।' ১৮-৬২ অঃ আদি।

মহাভারত সর্ব্ববেদস্বরূপ।

"ইদং হি বেদৈঃ সমিতং পবিত্রমপি চোত্তমম্।
শ্রাব্যং শ্রুতিসুখঞ্চৈব পাবনং শীলবর্দ্ধনম্॥"

৪৯-৬২ অঃ আদি।

মহাভারত বেদতুল্য পবিত্র।

"তস্যাখ্যানবরিষ্ঠস্য বিচিত্রপদপর্ব্বণঃ।
সূক্ষ্মার্থন্যায়যুক্তস্য বেদার্থৈর্ভূষিতস্য চ॥"

১৮-১ম, আদি।

অদ্ভুত কর্ম্মকারী বেদব্যাস-প্রণীতা চতুর্ব্বেদার্থপ্রতিপাদিনী পাপভয়নিবারিণী পুণ্যসংহিতা।

"ব্রহ্মন্ বেদরহস্যঞ্চ যচ্চান্যৎ স্থাপিতং ময়া।
সাঙ্গোপনিষদাঞ্চৈব বেদানাং বিস্তরক্রিয়া॥"

৬২-১ আদি।

"ইতিহাসপুরাণানামুন্মেষং নির্ম্মিতঞ্চ যৎ।
ভূতং ভব্যং ভবিষ্যঞ্চ ত্রিবিধং কালসংজ্ঞিতম্॥"

৬৩-১ আদি।

বেদের নিগূঢ় তত্ত্ব, বেদ বেদাঙ্গ ও উপনিষদের ব্যাখ্যা, ইতিহাস ও পুরাণের প্রকাশ, বর্ত্তমান, ভূত, ভবিষ্যৎ এই কালত্রয়ের নিরূপণ।

ব্যাস ধর্ম্মকামনাবশতঃ এই ভারতের সন্দর্ভ করিয়াছেন। তিনি বেদচতুষ্টয় হইতে পৃথগ্ভূত অন্য ষষ্টি শত সহস্র সংহিতা রচনা করেন।

উপরে যে সকল অংশ উদ্ধৃত হইল, তাহা হইতে স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, মহাভারত এক ভাবে উপাখ্যান বা উপকথা এবং আর এক ভাবে বেদের অর্থপ্রকাশক উপাখ্যান আকারে গ্রন্থ। মহাভারতের দুই রূপ সমস্ত গ্রন্থ সম্বন্ধে খাটে, কেবল তাহা নহে, গ্রন্থের সকল অংশের সম্বন্ধে এ কথা সত্য। যে স্থলেই কোন আখ্যান বা ঘটনা বর্ণিত আছে, একটু চিন্তা করিলেই দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, তাহার তলে কোন না কোন নিগূঢ় তত্ত্ব প্রচ্ছন্নভাবে রহিয়াছে।

মহাভারত কি, বুঝিতে হইলে মহাভারতের এই দুই রূপ সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে।

ব্যাসরচিত মহাভারত লিখিতে কত সময় লাগিয়াছিল, মহাভারতের প্রাচীনতা, পূর্ব্বে ইহা কি ভাবে ছিল, কি করিয়া দেশমধ্যে ইহার বিস্তার হইত, এ সকল সম্বন্ধে গ্রন্থমধ্যে অনেক ইঙ্গিত আছে।

"মহতো হ্যেনসো মর্ত্ত্যান্ মোচয়েদনুকীর্ত্তিতঃ।
ত্রিভির্বর্ষৈর্লব্ধকামঃ কৃষ্ণদ্বৈপায়নো মুনিঃ॥"

৪১-৬২ অঃ, আদি।

ব্যাসদেব তিন বৎসর তপস্যা ও নিয়ম অবলম্বন করিয়া এই মহাভারত রচনা করিয়াছেন।

ব্যাসদেব পূর্ব্বকালে শ্লোকচতুষ্টয় দ্বারা এই সংহিতা রচনা করিয়া নিজ পুত্র শুকদেবকে অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন।

"উপাখ্যানৈঃ সহ জ্ঞেয়মাদ্যং ভারতমুত্তমম।
চতুর্ব্বিংশতিসাহস্রীং চক্রে ভারতসংহিতাম্॥"

১০২-১ম অঃ, আদি।

প্রথমতঃ ব্যাস উপাখ্যানভাগ ত্যাগ করিয়া চতুর্ব্বিংশতি সহস্র শ্লোক দ্বারা সংহিতা রচনা করিয়াছিলেন।

"ততোঽধ্যর্দ্ধশতং ভূয়ঃ সংক্ষেপং কৃতবানৃষিঃ।"

১০৩-১ম, আদি।

"অনুক্রমণিকাধ্যায়ং বৃত্তান্তানাং সপর্ব্বণাম।"

১০৪-১ম, আদি।

"ষষ্টিং শতসহস্রাণি চকারান্যাং স সংহিতাম্।"

১০৫-১ম, আদি।

"একং শতসহস্রন্তু মানুষেষু প্রতিষ্ঠিতম্।"

১০৭-১ম, আদি।

পরে সার্দ্ধশত শ্লোকে অনুক্রমণিকা রচনা করিলেন। পরে ৬০ লক্ষ শ্লোক রচনা করেন, তাহার ১ লক্ষ বর্ত্তমান মহাভারত।

"ভবিষ্যং পর্ব্ব চাপ্যুক্তং খিলেষ্বেবাদ্ভুতং মহৎ।
এতৎ পর্ব্বশতং পূর্ণং ব্যাসেনোক্তং মহাত্মনা॥"

৮৩-২য় অঃ, আদি।

ব্যাস এক শত পর্ব্ব কীর্ত্তন করিয়াছেন।

"যথাবৎ সূতপুত্রেণ লোমহর্ষণিনা ততঃ।
উক্তানি নৈমিষারণ্যে পর্ব্বাণ্যষ্টাদশৈব তু॥"

৮৪-২য়, আদি।

সূত উগ্রশ্রবা সংক্ষেপে অষ্টাদশ পর্ব্ব কীর্ত্তন করেন।

"শুক্লবাসাঃ শুচির্ভূত্বা ব্রাহ্মণান্ স্বস্তি বাচয়েৎ।
কীর্ত্তয়েদ্ভারতং চৈব তথা স্যাদক্ষয়ং হবিঃ।"

..১৪।১২৭ অঙ্ক।

সূত জাতি ব্যতীত ব্রাহ্মণরাও মহাভারত কীর্ত্তন করিতেন। ১৪-১২৭, অনু—৪৪-৬২ আদি।

"মন্বাদি ভারতং কেচিদাস্তীকাদি তথা পরে।
তথোপরিচরাদ্যন্যে বিপ্রাঃ সম্যগধীয়তে॥
বিবিধং সংহিতাজ্ঞানং দীপয়ন্তি মনীষিণঃ।
ব্যাখ্যাতুং কুশলাঃ কেচিদ্‌গ্রন্থান্ ধারয়িতুং পরে॥"

৫২।৫৩, ১ম অঃ, আদি।

নানা পণ্ডিত নানা স্থানে সংহিতারম্ভ বোধ করেন। কেহ কেহ নারায়ণং নমস্কৃত্য, কেহ আস্তীক পর্ব্ব, কেহ উপরিচর রাজার উপাখ্যান হইতে মহাভারতের আরম্ভ বিবেচনা করিয়া অধ্যয়ন করেন।

৫২-৫৩। ১ম অ., আদি।

ভূমণ্ডলে কোন কোন পণ্ডিত এই ইতিহাস কীর্ত্তন করিয়াছেন, কেহ কেহ সম্প্রতি করিতেছেন, ভবিষ্যৎ-কালেও অনেকে কীর্ত্তন করিবেন।

ব্রাহ্মণরা ইহাকে সংক্ষেপে ও বিস্তাররূপে ধারণা করিয়া আসিতেছেন। পণ্ডিতরা ইহার অতিশয় সমাদর করেন।

"বিস্তীর্য্যৈতন্মহজ্‌জ্ঞানমৃষিঃ সংক্ষিপ্য চাব্রবীৎ।
ইষ্টং হি বিদুষাং লোকে সমাসব্যাসধারণম্॥"

৫১-১ম, আদি।

কোন কোন বিদ্বান্ সংক্ষেপে জানিতে ইচ্ছা করেন, কেহ বা বিস্তাররূপে জানিতে চাহেন, এই নিমিত্ত ভগবান্ বেদব্যাস এই গ্রন্থ সংক্ষেপে ও বিস্তাররূপে বর্ণন করিয়াছেন। ৫১-১ম, আদি।

তিনি চারি বেদ বিভাগ করিয়া এই গ্রন্থ রচনা করেন।

উপরে উদ্ধৃত অংশ হইতে গুটিকয়েক কথা বেশ বুঝা যায়। প্রথম, যাহাকে আমরা মহাভারত বলি, তাহা কোন না কোনরূপে দেশ-মধ্যে পূর্ব্বকালে প্রচলিত ছিল। দ্বিতীয়, ভিন্ন ভিন্ন স্থানে এবং ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ইহা নানারূপে পঠিত বা কথিত হইত। তৃতীয়, ব্রাহ্মণ ও সূতগণ ইহা পাঠ এবং কীর্ত্তন করিত। শ্রাদ্ধ এবং অপরাপর পর্ব্বসময়ে ইহা পাঠ এবং কীর্ত্তন হইত, চতুর্ব্বর্ণের স্ত্রী-পুরুষ তাহা শুনিত।

মহাভারত একখানি কাব্য। কাব্যের যাহা গুণ বা লক্ষণ থাকে, মহাভারতে সেই সকল গুণ বা লক্ষণ আছে। 'মহাভারত পরম পবিত্র কাব্য।' কোন কবি ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কাব্য রচনা করিতে পারিবেন না।

কবিবররা কবিত্বশক্তির উৎকর্ষসাধনার্থ এই ভারতকে অবলম্বন করিয়াছেন। চলিত কথায় বলে, 'যাহা নাই ভারতে, তাহা নাই ভারতে।' ব্যাসোচ্ছিষ্টং জগৎ সর্ব্বং। 'মহাভারত প্রধান প্রধান কবিগণের উপজীব্য' এই যে কাব্য-কথা লিখিত হইল, ইহার দুই প্রকার অর্থ আছে। উপরে লিখিত হইয়াছে যে, কবি ও কাব্য এই দুই কথা একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। তাহা হইলে কবি কথার অর্থ হইতে কাব্য কথার তাৎপর্য্য বুঝিবার সুবিধা হইবে। কবি কথার প্রচলিত অর্থ আমরা সকলেই জানি, যে কবিতা লিখে, তাহাকেই আমরা কবি বলি। কিন্তু কবি কথার আর এক প্রকার অর্থ আছে, কবি অর্থে—ক্রান্তদ্রষ্টা, যেমন ঋষি কথার অর্থ ভবিষ্যৎদ্রষ্টা, সেইরূপ কবি কথার অর্থ—অতীতদ্রষ্টা। কবি কথার আরও অর্থ আছে, কবি অর্থে—বেদজ্ঞ এবং সর্ব্বজ্ঞ। কবিশ্রেষ্ঠ ভগবান্ হব্যবাহ।

"এবং স্তুতো হব্যবাট্ স ভগবান্ কবিরুত্তমঃ।"

৯-১৬ অঃ, উদ্।

মহাভারত পুরাণমধ্যে পরিগণিত, পুরাণের যে প্রকার পঞ্চ লক্ষণ আছে, মহাভারতেরও সেই প্রকার লক্ষণ আছে। তবে একটু কথা আছে, মহাভারতে পুরাণকথা বেদ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

"যচ্চাপি সর্ব্বগং বস্তু তচ্চৈব প্রতিপাদিতম্॥"

৭০-১ম, অঃ।

যিনি অখিল সংসার ব্যাপিয়া আছেন, সেই পরব্রহ্মই প্রতিপাদিত হইবেন। তাহা হইলে প্রশ্ন হইতে পারে, রাজা-রাণীদিগের জন্ম, মৃত্যু, যুদ্ধ, বিগ্রহাদি এ সকল কথার অবতারণার প্রয়োজন কি? সেই কারণে কবি লিখিতেছেন,—

"তপো ন কল্কোঽধ্যয়নং ন কল্কঃ
স্বাভাবিকো বেদবিধির্ন কল্কঃ।
প্রসহ্য বিত্তাহরণং ন কল্কস্তান্যেব ভাবোপহতানি কল্কঃ॥"

২৭৫-১ম, আদি।

তপস্যা, অধ্যয়ন, সন্ধ্যাবন্দনাদি সমস্ত বেদবিধি এবং রাজগণের যুদ্ধ ও নগর আক্রমণ কদাপি পাপজনক

হইতে পারে না, কিন্তু তাহা অসদভিপ্রায়ে দূষিত হইলেই পাপজনক হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। ব্যাস ধর্ম্মকামনা বশতঃ এই ভারতের সন্দর্ভ করিয়াছেন। সেই কারণে কবি বলিয়াছেন, মহাভারত সদভিপ্রায়ে পড়িতে হইবে।

মহাভারত নিয়তাত্মা ব্যক্তিদিগের শ্রোতব্য।

"ব্রাহ্মণৈর্নিয়মবদ্ভিরনন্তরং ক্ষত্রিয়ৈঃ

স্বধর্ম্মনিরতৈর্বৈশ্যৈঃ শূদ্রৈরপি।"

৮৭—৯০—৯৫ অঃ, আদি।

আর একটি কৌতুকের কথা আছে, বেদ অল্প-বিদ্য ব্যক্তির নিকটে এই ভয়ে ভীত হয়েন যে, এ ব্যক্তি আমাকে প্রহার করিবে।

"বিভেত্যল্পশ্রুতাদ্বেদো মাময়ং প্রহরিষ্যতি।"

২৬৮-১ম অঃ, আদি।

প্রথমে কথাটি কৌতুক বলিয়া মনে হয়, কিন্তু ইহার যথেষ্ট অর্থ আছে। যে সময়ে মহাভারত লিখিত হয়, সেই সময় দেশের কি অবস্থা ছিল, ঐ কথাগুলি হইতে তাহার কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এ সম্বন্ধে বুঝিতে পরে চেষ্টা করিব।

রহস্য-কথার অনেকবার উল্লেখ হইয়াছে। বেদ, রামায়ণ, মহাভারত এবং অপরাপর পুরাণগুলি রহস্যপূর্ণ। এই রহস্য কথাটির সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। রহস্য শব্দের এক প্রকার অর্থ কৌতুক বা পরিহাস। শৃঙ্গী বলিলেন, "আমি পরিহাসচ্ছলেও কখন মিথ্যা কথা কহি না।"

"নাহং মৃষা ব্রবীম্যেবং স্বৈরেষ্বপি কুতঃ শপন্।"

২-৪২ অঃ, আদি।

রহস্য কথার আর এক অর্থ গূঢ় তত্ত্ব অর্থাৎ যাহার মর্ম্ম সহজে বুঝিতে পারা যায় না। মহাভারতমধ্যে কি আছে, সে সম্বন্ধে কবি বলিতেছেন,—

"ভূতস্থানানি সর্ব্বাণি রহস্যং ত্রিবিধঞ্চ যৎ।"

৪৮-১ আদি।

দুর্গ, নগর, তীর্থক্ষেত্র প্রভৃতি সমুদয় জীবস্থান এবং ত্রিবিধ রহস্য। এই ত্রিবিধ রহস্য হইল ধর্ম্ম-রহস্য, অর্থ ও কামরহস্য। কোথাও বা যাহা ধর্ম্ম বলিয়া মনে হয়, তাহা বাস্তবিক অধর্ম্ম, কোন স্থলে বা অধর্ম্ম বাস্তবিক ধর্ম্ম হয়। এইরূপ অর্থ ও কাম সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে। মহাভারতে এই প্রকার রহস্যের উদাহরণ আছে।

রহস্য কথার আর এক অর্থ গুপ্ত। রূপকের সাহায্যে এই প্রকার রহস্য রক্ষিত হয়। নিম্নে এই প্রকার রহস্যের একটি উদাহরণ দিলাম।

দ্রৌপদী যখন সভামধ্যে অবমানিত হয়েন, সে সময়ে শ্রীকৃষ্ণ শাল্বরাজার সৌভনগর বিনাশ করিতে গিয়াছিলেন। যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, "শাল্বরাজা দ্বারকানগরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল এবং আকাশগামী সৌভনগরে অধিষ্ঠিত হইয়া দ্বারকাপুরী অবরোধ করিলেন। তৎকালে দ্বারকাপুরী নীতিশাস্ত্রবিধান অনুসারে সর্ব্বপ্রকারে সুসজ্জিত হইয়াছিল, রাজা উগ্রসেন পুরী রক্ষা করিতেছিলেন। শাল্বরাজা পুরী আক্রমণ করিলে মহাযুদ্ধ বাধিল। আমার পুত্র শাম্ব ক্ষেমবৃদ্ধি নামে শাল্বরাজের এক সেনাপতির সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিল; ক্ষেমবৃদ্ধি যুদ্ধ সহ্য করিতে না পারায় পলায়ন করিল, বেগবান্ নামে এক দৈত্য শাম্বের অভিমুখে আগমন করিল; সে দৈত্যও শাম্ব কর্ত্তৃক নিপাতিত হইল। পরে শাল্বের সহিত শাম্বের যুদ্ধ হইল, সে যুদ্ধে শাম্ব মূর্চ্ছিত ও অবসন্ন হইয়া পড়িলে তাহার সারথি তাহাকে লইয়া রণভূমি হইতে প্রস্থান করিল। পুনরায় শাম্বের সহিত শাল্বের যুদ্ধ বাধিল, এবার শাল্ব মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তাহার পর শাম্ব অগ্নির ন্যায় এক বাণ ধনুর্গুণে যোজনা করিল, তাহাতে অন্তরীক্ষে হাহাকারধ্বনি উঠিল। অনন্তর ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ নারদকে প্রদ্যুম্নের নিকট পাঠাইলেন। নারদ আসিয়া বলিলেন, 'তোমার এই শরে জগতে কেহ অবধ্য নহে, তবে শ্রীকৃষ্ণ শাল্বরাজকে বধ করিবেন, ইহাই নিশ্চিত আছে, অতএব তুমি এই শর উপসংহার কর।' শাম্ব তাহাই করিলেন। শাল্ব বিষণ্ণ হইয়া সৌভযানে আরোহণ করিয়া দ্বারকা পরিত্যাগ পূর্ব্বক আকাশ-পথে প্রস্থান করিলেন।" শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, "যখন এই ঘটনা হইতেছিল, সেই সময়ে আমি আপনার রাজসূয়-যজ্ঞে উপস্থিত ছিলাম। আমি দ্বারকায় ফিরিয়া সকল সমাচার অবগত হইলাম। শুনিলাম, শাল্বরাজা সাগরাভিমুখে যাত্রা করিতেছেন, তথায় তিনি সমুদ্রগর্ভে বিমান আরোহণে অবস্থিতি করিতেছিলেন,

আমাকে দেখিয়া তিনি যুদ্ধার্থে আগমন করিলেন। দানবরা আসিয়া শাল্বের পক্ষ হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল। সৌভপুর এক ক্রোশ আকাশে উর্দ্ধে থাকায় তথায় আমার সৈন্যদিগের প্রেরিত অস্ত্র সকল পৌছিল না। শাল্ব মায়াযুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন; আমিও মায়া দ্বারা প্রতিনিবৃত্ত করিতে লাগিলাম। আমি মায়া দ্বারা মোহপ্রাপ্ত হইয়া প্রজ্ঞা অস্ত্র যোজনা করিলাম; এমন সময় উগ্রসেন-প্রেরিত এক জন দূত আসিয়া বলিল যে, দ্বারকাধিপতি আহুক আপনাকে বলিয়াছেন, 'তুমি দ্বারকায় আগমন কর, শাল্ব তোমার পিতা বসুদেবকে হত্যা করিয়াছেন, সম্প্রতি দ্বারকা রক্ষা কর।' আমি অতি বিহ্বল হইয়া পুনরায় শাল্বের সহিত যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলাম। দেখিলাম, সৌভনগর হইতে আমার পিতা বসুদেব ভূমে পতিত হইতেছেন। আমার হস্ত হইতে শার্ঙ্গধনু পড়িয়া গেল ও আমি হতচেতন হইলাম। পরে চৈতন্য লাভ করিয়া দেখিলাম যে, সমস্তই মায়া। রথ নাই, শাল্ব নাই, আমার পিতাও নাই। অনন্তর আমি শার্ঙ্গধনুতে বাণ যোজনা করিয়া অসুরদিগের প্রতি নিক্ষেপ করিলাম। সৌভযান মায়া দ্বারা অপসৃত হওয়াতে আমি বিস্ময়াপন্ন হইলাম এবং দিব্যাস্ত্র প্রতিমন্ত্রিত করিয়া আকাশস্থিত অসুরদিগকে নিহত করিলাম। অনন্তর সেই কামগ সৌভ প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে গমন করিয়া পুনর্ব্বার আমার চক্ষুকে মোহিত করিল। তাহার পর দানবরা আমার উপর প্রস্তর নিক্ষিপ্ত করিয়া আমাকে আবৃত করিল। আমি অদৃশ্য হইলে পৃথিবী, আকাশ ও স্বর্গ হাহাকার ধ্বনিতে পরিপূর্ণ হইল, আমি বজ্রের দ্বারা সমস্ত পাষাণ বিনাশ করিলাম। আমি দানবান্তকর মৎপ্রিয় আগ্নেয়াস্ত্র ধনুতে সংযোজিত করিলাম। তাহার পর সৌভনগর আমার সুদর্শনচক্রের বলে হত ও দ্বিধাকৃত হইয়া ভূতলে পতিত হইল। সুদর্শনচক্র পুনরায় আমার হস্তে ফিরিয়া আসিলে আমি তাহা শাল্বের উপর নিক্ষেপ করিলাম। তাহাতে তাঁহার শরীর দ্বিধাকৃত হইয়া তেজোদ্বারা প্রজ্বলিত হইল, এবং দানবরাও পলায়ন করিল।"

উপরে লিখিত গল্পটি একটু দীর্ঘ হইল, কিন্তু এ গল্পে বুঝিবার অনেক সামগ্রী আছে। গাঁজাখুরির যে সমস্ত প্রয়োজনীয় অঙ্গ, সেই সমস্ত অঙ্গের কোনটারই অভাব নাই, তবে সমগ্র মহাভারত ও তাহার অন্তর্গত অসংখ্য আখ্যান এই প্রকার গল্পের অনুরূপ। গল্পটিকে গাঁজাখুরি না বলিয়া যদি কাল্পনিক বলি, তাহা হইলে কথাটি সত্য হয়। কি ধারণা অবলম্বন করিয়া কবি এইরূপ কল্পনা করিয়াছেন, তাহা মহাভারতের টীকাকার সুন্দররূপে দেখাইয়া দিয়াছেন। দ্বারকা হইল স্থূল-সূক্ষ্মদেহদ্বয়রূপ ক্ষেত্র, এই দ্বারকা সংসারসাগরমধ্যে অবস্থিত। শ্রীকৃষ্ণ তখন দ্বারকায় ছিলেন না, সেই কারণে ভগবানের বিস্মরণ হেতু এই সকল কাণ্ড ঘটে। শাল্ব হইল শাল্বাখ্য মহামোহ, সৌভ হইল কামগামী মনোরথ। মহামোহ আসিলে প্রদ্যুম্নস্বরূপ যজ্ঞাদিধর্ম্ম সেই মহামোহকে নিবারণ করিতে অক্ষম হইল। তাহার পর আমি (শ্রীকৃষ্ণ) চিত্তদ্বারকা প্রাপ্ত হইয়া আমার অধিক্ষেপকারী মোহরূপ শাল্বকে ব্রহ্মবিদ্যারূপ অস্ত্র দ্বারা হত করিলাম এবং মনোরথরূপ সৌভনগর পাতিত করিলাম।"

"সংসারসাগরমধ্যে দ্বারকাখ্যে স্থূলসূক্ষ্মদেহদ্বয়রূপে ক্ষেত্রে বিস্মরণরূপাৎ ভগবদসন্নিধানাৎ কামগং মনোরথাখ্যং সৌভমারুহ্যাগতেন শাল্বাখ্যেন মহামোহেন শোকাদ্যৈরুপদ্রুতে সতি প্রদ্যুম্নাদিস্বরূপা যজ্ঞাদয়ো ধর্ম্মাস্তং বারয়িতুমক্ষমা অভূবন্, ততোঽহং চিত্তদ্বারকামেত্য চিদাত্মানং মামধিক্ষিপন্তং শাল্বমোহমহং ব্রহ্মবিদ্যাস্ত্রেণ হতবান্ তৎপুরং চ মনোরথসৌভং পাতিতবানিতি।"

এইরূপ যুদ্ধ প্রভৃতি রূপক দ্বারা সকল স্থানেই আধ্যাত্মিকার তাৎপর্য্য অনুমান করিতে হইবে। তাহার পর আর একটি কথা আছে। এই তাৎপর্য্য শ্রুতিমূলক দেব হইল শম, অসুর হইল কামাদি গুণ, তাহাদের যুদ্ধরূপ রূপকের দ্বারা আধ্যাত্মিক অর্থ নিরূপিত হয়। তথা চ শ্রুতিঃ—"দ্বয়া হ প্রাজাপত্যা দেবাশ্চাসুরাশ্চেত্যাদিনা দেবাসুরশব্দৈঃ শমকামাদীন্ বিবক্ষিত্বা তদ্‌যুদ্ধরূপকেণাধ্যাত্মিকমর্থং নিরূপয়তি।" ১-৩টীঃ ১৪ অঃ বন।

এ স্থলে আমরা তিনটি সামগ্রী দেখিতে পাইতেছি। প্রথম একটি উপকথা, যাহাকে আমরা সচরাচর গাঁজাখুরি বলি। দ্বিতীয় আধ্যাত্মিক শিক্ষা। তৃতীয় যাহা অবলম্বন করিয়া এই আধ্যাত্মিক শিক্ষা প্রদত্ত হইয়াছে—

বেদ ও শ্রুতিঃ। উপরে লিখিত হইয়াছে, এই ভাবে কেবল সমগ্র মহাভারত গ্রন্থ নহে, মহাভারতের আখ্যানগুলিও রচিত।

"শ্রুত্যনুসারিত্বাৎ ভারতস্মৃতেঃ।"

১-৩টীঃ ১৪ অঃ বন।

"মহাভারতাখ্যমিতিহাসং সর্ব্বশ্রুতিস্মৃতিসারভূতম্।"

১টীঃ ১ম অঃ অশ্বমেধ।

এই কথার অর্থ এখন আমরা বুঝিতে পারি, যেরূপ শাম্বদৈত্যবধ, সেইরূপ মহাদেব কর্ত্তৃক ত্রিপুরধ্বংস। শ্রুতিমূলক আধ্যাত্মিক শিক্ষা একটি গল্পের আকারে প্রদর্শিত হইয়াছে। জরৎকারু উপাখ্যান সম্বন্ধে টীকাকার লিখিতেছেন,—

'অনেন রূপকেণ প্রদর্শয়তি'

১৭-১৬টীঃ ১৩ আদি।

মহাভারতে এতদ্ভিন্ন আর এক প্রকার রহস্য আছে, তাহাকে সচরাচর ব্যাসকূট বলে। বেদব্যাস ব্রহ্মাকে বলিলেন, 'আমি এইরূপ পবিত্র কাব্য রচনা করিতে সঙ্কল্প করিয়াছি; কিন্তু ভূমণ্ডলে ইহার উপযুক্ত কোন লেখক নাই।' ব্রহ্মা বলিলেন, 'তুমি গণেশকে স্মরণ কর, তিনি এই কাব্যের লেখক হইবেন।' ব্যাস তাহাই করিলেন, এবং গণেশ আসিলে বলিলেন, 'আপনি আমার মহাভারত গ্রন্থের লেখক হউন।' গণেশ বলিলেন, 'আমি লিখিতে আরম্ভ করিলে যদ্যপি আমার লেখনী ক্ষণমাত্র বিশ্রাম না করে, তাহা হইলে আমি লেখক হইতে পারি।' ব্যাস বলিলেন, 'আপনিও কোন স্থানের অর্থ না বুঝিয়া লিখিবেন না।' গণেশ 'ওঁ' বলিয়া লেখকতা কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। বেদব্যাস এই নিমিত্তই কুতূহলাক্রান্ত হইয়া মধ্যে মধ্যে গ্রন্থগ্রন্থি অর্থাৎ দুর্জ্ঞেয় শ্লোক রচনা করিয়াছেন এবং তাহাতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে, এই মহাভারতে এরূপ নিগূঢ়ার্থ অষ্ট সহস্র অষ্ট শত শ্লোক আছে, যাহার প্রকৃত অর্থ আমি জানি, শুকদেবও জানেন, সঞ্জয় জানেন কি না সন্দেহ। সেই সমস্ত গূঢ়ার্থ ব্যাসকূটের বিষয়ে দুর্বিগাহ অর্থ অদ্যাপি কেহ বিনীত শিষ্যের নিকটেও ব্যাখ্যা করিতে পারেন না।

"লেখকো ভারতস্যাস্য ভব ত্বং গণনায়ক।
ময়ৈব প্রোচ্যমানস্য মনসা কল্পিতস্য চ॥

৭৭-১ আদি।

শ্রুত্বৈতৎ প্রাহ বিঘ্নেশো যদি মে লেখনী ক্ষণম্।
লিখতো নাবতিষ্ঠেত তদা স্যাম্ লেখকো হ্যহম্॥ ৭৮
ব্যাসোঽপ্যুবাচ তং দেবমবুদ্ধ্বা মা লিখ ক্বচিৎ।
ওঁমিত্যুক্ত্বা গণেশোঽপি বভূব কিল লেখকঃ॥ ৭৯।
গ্রন্থগ্রন্থিং তদা চক্রেমুনির্গূঢ়ং কুতূহলাৎ।
যস্মিন্ প্রতিজ্ঞয়া প্রাহ মুনির্দ্বৈপায়নস্ত্বিদম্॥

৮০-১ আদি।

অষ্টৌ শ্লোকসহস্রাণি অষ্টৌ শ্লোকশতানি চ
অহং বেদ্মি শুকো বেত্তি সঞ্জয়ো বেত্তি বা ন বা॥৮১।
তৎ শ্লোককূটমদ্যাপি গ্রথিতং সুদৃঢ়ং মুনে।
ভেত্তুং ন শক্যতেঽর্থস্য গূঢ়ত্বাৎ প্রশ্রিতস্য চ॥"

৮২-১ আদি।

উপরে গল্পটির মধ্যে বালকদিগের কৌতুকের ভাব আছে বলিয়া মনে হয়, কিন্তু আমার বোধ হয়, এই 'ছেলেমানুষীর' পশ্চাতে একটি ঐতিহাসিক রহস্য রক্ষিত আছে। ব্যাস বলিলেন, "অবুদ্ধ্বা মা লিখ ক্বচিৎ", অনুবাদক ইহার অর্থ করিয়াছেন, "আপনি কোন স্থানের অর্থ না বুঝিয়া লিখিবেন না।" আমার মনে হয়, "অবুদ্ধ্বা" স্থলে "অবুদ্ধাঃ" সমীচীনতর পাঠ, মহাভারত পড়িতে পড়িতে বৌদ্ধমতবাদীদের উল্লেখ ও তাহাদের প্রতি কটাক্ষ অনেক স্থলে দেখিতে পাওয়া যাইবে। পরে এ কথার বিচার করিব। বুধ+ক্ত করিয়া বুদ্ধ কথা নিষ্পন্ন হইয়াছে, অবুদ্ধা অর্থে বুদ্ধবিপরীত অথবা অজ্ঞানতা এই দুই হইতে পারে।

'বাচঃ' শব্দ অধ্যাহার করিলে অবুদ্ধ্বা কথার প্রয়োগ দূষিত বলিয়া মনে হইবে না। উদ্ধৃত শ্লোকের মধ্যে "ক্বচিৎ" কথার ব্যবহার আছে, "কিঞ্চিৎ" কথা নাই। গণেশ "ওঁ" বলিয়া লিখিতে আরম্ভ করিলেন, এ স্থলে আমরা বৈদিক ভাবের ইঙ্গিত পাই। মহাভারতের সময় ও তৎকালে দেশের অবস্থা বুঝিবার সময়, এ প্রশ্ন পুনরায় আলোচিত হইবে।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (কর্ণেল)।

প্রলয়ের আলো

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

লোমহর্ষণ দৃশ্য

জোসেফ বুঝিয়াছিল—ভাগ্যচক্রের আবর্ত্তনে সে যে পথে পরিচালিত হইতেছে—সেই পথ অতি দুর্গম ও কণ্টকাকীর্ণ; বিপদের মেঘ চারি দিক্ হইতে তাহার মাথার উপর ঘনাইয়া আসিতেছে, তাহার ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন; কিন্তু সে ভয় পাইল না, বা মুহূর্ত্তের জন্য বিচলিত হইল না। এই সময় য়ুরোপের নানা দেশে রাজতন্ত্রের ধ্বংসসাধনের জন্য গুপ্ত সমিতিসমূহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। জোসেফ কাহারও পরামর্শে সেরূপ কোন সমিতিতে যোগদান না করে—এ জন্য তাহার পিতামাতা অনেকবার তাহাকে সতর্ক করিয়াছিল, কিন্তু তাহাদের উপদেশ বিফল হইল। প্রণয়িনী বার্থার প্রত্যাখ্যানে সে এতই মর্ম্মাহত হইয়াছিল যে, জীবনের প্রতি তাহার আর মমতা ছিল না; বিপদকে আলিঙ্গন করিতেও সে কুণ্ঠিত হইল না। আনা স্মিট্ তাহার প্রতি সুবিচার করিলে, তাহার জীবনের গতি পরিবর্ত্তিত হইত; কিন্তু বিধাতা তাহাকে সুখ-শান্তির অধিকারী করেন নাই। তাহার জীবনতরী অকূল পাথারে ভাসিয়া চলিল।

নিজের উপর জোসেফের অসাধারণ বিশ্বাস ছিল; অন্য দশ জনের মত অপমান, লাঞ্ছনা ও অবিচার সহ্য করিয়া চিরজীবন দাস্যবৃত্তি করিবে, এরূপ হীনতা কখন তাহার মনে স্থান পায় নাই। সে ভাবিত, কত লোক বুদ্ধি ও অধ্যবসায়বলে অতি হীন অবস্থা হইতে প্রভূত সম্মান ও বিপুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়াছে, স্ব স্ব ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে, সে-ই বা জীবনের যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারিবে না কেন? যাহারা আত্মশক্তিতে নির্ভর করিতে না পারিত, সে তাহাদিগকে কাপুরুষ মনে করিয়া ঘৃণা করিত। তাহার উচ্চাভিলাষের পরিচয় পাইয়া যাহারা তাহাকে উপহাস করিত, তাহাদিগকে সে কৃপার পাত্র মনে করিত। প্রণয়ে নিরাশ হইয়া তাহার মন অন্য দশ জনের মত অবসাদের জড়তায় আচ্ছন্ন হইল না, কর্ম্মক্ষেত্রে সাফল্য অর্জ্জনের জন্য অন্ধ আবেগে ধাবিত হইল; কোন বাধা-বিঘ্ন গ্রাহ্য করিল না। 'মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর-পাতন', এই সঙ্কল্প লইয়া সে জীবনের দুর্গম পথে অগ্রসর হইয়াছিল।

চানস্কির সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়া জোসেফ বুঝিতে পারিল—তাহার মনের বর্ত্তমান অবস্থায় যেরূপ লোকের সহায়তার আবশ্যক, চানস্কি ঠিক সেই প্রকৃতির মানুষ। উভয়ের আশা, আকাঙ্ক্ষা, সঙ্কল্প অভিন্ন। জোসেফ তাহার সমশ্রেণীর লোকের,—প্রভুত্বপ্রিয় ধনিসম্প্রদায় কর্ত্তৃক নিগৃহীত ও প্রতারিত বুভুক্ষু শ্রমজীবিগণের দুঃখ-দুর্দ্দশায় ব্যথিত ও বিচলিত হইয়াছিল; সে রাজনীতির ধার ধারিত না; কিন্তু চানস্কি রাজনীতিতে অভিজ্ঞ ছিল; সে ছিল—অত্যুৎসাহী নিহিলিষ্ট; তাহার বিশ্বাস ছিল—নিহিলিষ্ট-সম্প্রদায়ের সঙ্কল্পসিদ্ধির উপর সমগ্র রুস সাম্রাজ্যের মুক্তি ও উন্নতি নির্ভর করিতেছে; যে দিন তাহাদের দুরূহ ব্রত সফল হইবে—সেই দিন রুসিয়ার দুঃখের রজনীর অবসান হইবে; নবীন উষায় নবজীবনের আরম্ভ হইবে। সে বুঝিয়াছিল—যে সকল কর্ম্মবীরের প্রাণপণ চেষ্টায় ও আত্মবিসর্জ্জনে সেই চির-আকাঙ্ক্ষিত ফললাভ হইবে—জোসেফ তাহাদের অন্যতম। যে সকল কায সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিপজ্জনক, এবং যাহা সংসাধনের জন্য সাহসী, বুদ্ধিমান্, কর্ত্তব্যনিষ্ঠ ও দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ লোক নিহিলিষ্ট-সম্প্রদায়ের মধ্যে দুর্লভ, সেইরূপ কায জোসেফের দ্বারা অনায়াসে সুসম্পন্ন হইবে, এ বিষয়ে চানস্কির বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না।

এই সকল কারণেই চানস্কি জোসেফকে নিহিলিষ্টদের গুপ্ত সমিতির আড্ডায় লইয়া গিয়া সমিতির সদস্যগণের সহিত পরিচিত করিয়াছিল। সমিতির সদস্যরা তাহাকে দলভুক্ত করিবার জন্য অত্যন্ত উৎসুক হইয়াছিল। তাহার দুই চারিটি কথা শুনিয়াই তাহারা বুঝিতে পারিয়াছিল—জোসেফকে দলভুক্ত করিতে পারিলে তাহারা যথেষ্ট লাভবান্ হইবে, এরূপ কর্ম্মী হাজারের মধ্যে এক জনও আছে কি না সন্দেহ; তাহারা তাহার উপর অসঙ্কোচে কঠিন কর্ম্মের ভার ন্যস্ত করিতে পারিবে। নিহিলিষ্ট-সম্প্রদায়ের শক্তি কিরূপ প্রচণ্ড এবং তাহাদিগকে কিরূপ কঠোর নিয়মে পরিচালিত হইতে হয়, দলপতির আদেশ অগ্রাহ্য করিলে বা বিশ্বাসঘাতকতা করিলে তাহার কি ফল হয়, বিশেষতঃ, সাম্প্রদায়িক কার্য্যসিদ্ধির জন্য দলের লোক কিরূপ অকুণ্ঠিতচিত্তে মৃত্যুকে বরণ করে—ইহার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া জোসেফের মনের ভাব বুঝিবার জন্য দলপতির আগ্রহ হইল।

তৃতীয় দিন সন্ধ্যাকালে জোসেফকে লইয়া গুপ্তসমিতির পূর্ব্বোক্ত আড্ডায় যাইবার সময় চানস্কি বলিল, "দেখ জোসেফ, আমি যে সম্প্রদায়ে যোগদান করিয়াছি, সেই সম্প্রদায়ে প্রবেশ করিবার জন্য সত্যই তোমার আন্তরিক আগ্রহ হইয়াছে কি না, তাহা এখনও ভাবিয়া দেখ; তোমার ইচ্ছা না থাকিলে এখনও ফিরিবার পথ আছে; কিন্তু শপথ গ্রহণের পর আর ফিরিতে পারিবে না। তখন অনুতাপ করিয়া কোন ফল হইবে না; তখন নিষ্কৃতিলাভের একটিমাত্র পথ থাকিবে—সে মৃত্যুর পথ! এই শেষ মুহূর্ত্তে তোমার মনের কথা সরল ভাবে প্রকাশ কর।" জোসেফ অবিচলিত স্বরে বলিল, "আমার আর নূতন কিছুই বলিবার নাই। তোমাদের সম্প্রদায়ে যোগদানের জন্য আমি কৃতসঙ্কল্প হইয়াছি; ভবিষ্যতে আমি কৃত কর্ম্মের জন্য অনুতপ্ত হইতে পারি—তোমার এরূপ আশঙ্কা অমূলক।"

চানস্কি বলিল, "কিন্তু একটি বিষয় তোমার ভাবিবার আছে। আমি সকল কথাই তোমাকে খুলিয়া বলিতেছি। আমাদের অভিশপ্ত দেশের সহিত তোমার কোন সম্বন্ধ নাই। আমি পোলাণ্ডের অধিবাসী—পোল। তুমি বোধ হয় জান, পোলরা বর্ব্বর রুসিয়াকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করে। রুসিয়ার স্বেচ্ছাচারী সম্রাটের ও তাহার আমলাতন্ত্রের কঠোর আদেশে আমি আমার হৃতসর্ব্বস্ব মাতৃভূমি হইতে নির্ব্বাসিত—কারণ, আমার একমাত্র অপরাধ—আমার স্বদেশকে আমি প্রাণ অপেক্ষা অধিক ভালবাসি; আমি আমার অভাগিনী জননীর শৃঙ্খলমোচনের পক্ষপাতী।—ক্ষুদ্র পিপীলিকাও পদদলিত হইয়া দংশনের চেষ্টা করে; আমিও সঙ্কল্প করিয়াছি, রুসিয়ার রাজতন্ত্র বিধ্বস্ত করিবার জন্য, এই যথেচ্ছাচারের বনিয়াদ সমভূমি করিবার জন্য, যথাসাধ্য চেষ্টা করিব। কিন্তু রুসিয়ার বিরুদ্ধে তোমার এরূপ আক্রোশের কোনও কারণ নাই; তুমি রুসিয়ার প্রজা নহ, রুসিয়ার সহিত তোমার কোন স্বার্থ বিজড়িত নহে। এ অবস্থায় রুসিয়ার বর্ত্তমান শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া মৃত্যুকে বরণ করিবার জন্য তোমার আগ্রহ না হওয়াই সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। তুমি আমার বন্ধু; আমার পরামর্শে তুমি পরের জন্য নিজের জীবন বিপন্ন করিবে—ইহা আমি প্রার্থনীয় মনে করি না,—এই জন্যই সময় থাকিতে তোমাকে সতর্ক করিতেছি। তুমি আমার পরম বন্ধু না হইলে এ সকল কথা বলিয়া তোমাকে সঙ্কল্পচ্যুত করিবার চেষ্টা করিতাম না।" জোসেফ আবেগভরে চানস্কির দুই হাত জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "বন্ধু! তুমি আমার প্রাণের বন্ধু। তুমি আমার পরম হিতৈষী; কিন্তু অনর্থক আমাকে সতর্ক করিতেছ। তোমার সদুপদেশে আমার সঙ্কল্প বিচলিত হইবার নহে। পৃথিবীতে আমার আর কোন বন্ধন নাই। যাহার সকল আশার অবসান হইয়াছে, তাহার আর ভয় কি? জীবন ও মৃত্যু এ উভয়ই এখন আমার নিকট সমান।"

চানস্কি বলিল, "উত্তম, চল এখন যাই।"

সে দিন সন্ধ্যার পূর্ব্ব হইতেই গগনমণ্ডল গাঢ় মেঘে আচ্ছন্ন হইয়াছিল; সন্ধ্যাকালে ঝড় উঠিল। দুই বন্ধুতে যখন পথে বাহির হইল, তখন তুফান চলিতেছিল; কিন্তু সেই দুর্য্যোগ অগ্রাহ্য করিয়া তাহারা গন্তব্য পথে অগ্রসর হইল। রোন-নদের তরঙ্গরাশি গর্জ্জন করিয়া তটে আছড়াইয়া পড়িতেছিল। হ্রদের কাল জলে তখন ঝটিকার রুদ্র তাণ্ডব আরম্ভ হইয়াছিল। কাল মেঘের বুক চিরিয়া, বিদ্যুতের লোল জিহ্বা জমাট অন্ধকারকে

যেন লেহন করিয়া মুহূর্ত্তে অদৃশ্য হইতেছিল, সঙ্গে সঙ্গে গুরু গুরু মেঘগর্জ্জনে দিগ্‌দিগন্ত প্রতিধ্বনিত হইতেছিল। তাহার পর ঝম্‌ঝম্‌ শব্দে বর্ষণ আরম্ভ হইল।

উভয়ে অন্ধকারাচ্ছন্ন পথে দৌড়াইতে আরম্ভ করিল; অবশেষে তাহারা সিক্ত দেহে আড্ডায় উপস্থিত হইল। চানস্কি দলের সঙ্কেতানুযায়ী রুদ্ধ দ্বারে কয়েক বার করাঘাত কবিল। একটি প্রকাণ্ড জোয়ান দ্বার খুলিয়া চানস্কিকে অভিবাদন করিল; তাহার পর জোসেফের মুখের দিকে বক্রদৃষ্টিতে চাহিয়া নিম্নস্বরে কি জিজ্ঞাসা করিল। চানস্কি তাহাকে জানাইল, জোসেফ প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছে; তাহার গৃহপ্রবেশে আপত্তির কারণ নাই।

চানস্কি ও জোসেফ নির্দ্দিষ্ট কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিল—দ্বাদশ জন সভ্য পূর্ব্বেই সেখানে সমবেত হইয়াছেন। জোসেফ সেই কক্ষের এক কোণে একটি টেবল দেখিতে পাইল। একখানি কাল বনাত দিয়া টেবলের উপর কি একটা লম্বা জিনিষ ঢাকা ছিল।

সভ্যগণের মধ্যে কাহাকেও সে দিন সেখানে ধূমপান করিতে দেখা গেল না; সকলেই যেন অস্বাভাবিক গম্ভীর; প্রত্যেকের মুখে বিষাদের চিহ্ন পরিস্ফুট। কেহ কেহ নিম্নস্বরে আলাপ করিতেছিল।

সভাপতির আসন তখন পর্য্যন্ত খালি পড়িয়া ছিল; চানস্কি ও জোসেফ সভায় প্রবেশ করিবার কয়েক মিনিট পরে আরও কয়েক জন সভ্য সমভিব্যাহারে সভাপতি সভায় উপস্থিত হইলেন। ক্রমে কক্ষটি জনপূর্ণ হইল; প্রায় ষাট জন সভ্য সভার কার্য্যে যোগদান করিল। সভ্যমণ্ডলী চক্রাকারে বসিল; মধ্যস্থল ফাঁকা পড়িয়া রহিল। সেই কক্ষের সম্মুখস্থ কক্ষেও অনেকগুলি লোক সমবেত হইয়া মৃদুস্বরে গল্প করিতেছিল; কিন্তু সভাপতির আদেশে গুঞ্জনধ্বনি থামিয়া গেল। সভাস্থলে নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতে লাগিল। সুগম্ভীর মেঘগর্জ্জনে এবং বৃষ্টির অশ্রান্ত বর্ষণশব্দে গাম্ভীর্য্য যেন শত গুণ বর্দ্ধিত হইল।

অতঃপর সভার কার্য্য আরম্ভ হইল। সভাপতি প্রথমে একাগ্রচিত্তে গম্ভীর স্বরে তাঁহাদের কঠোর দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যে পরমেশ্বরের আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিলেন। তাহার পর এক জন লোক খৃষ্টজননী মেরীর একটি শুভ্র মর্ম্মর-মূর্ত্তি লইয়া আসিল, মেরীর ক্রোড়ে শিশু খৃষ্ট।

সভাপতির সম্মুখে একটি টেবল ছিল; মেরীর মূর্ত্তি সেই টেবলে সংস্থাপিত হইলে, জোসেফ সভাপতির আদেশে সেই মূর্ত্তির সম্মুখে উপস্থিত হইল। তাহাকে দুই হাত পশ্চাতে রাখিয়া, জননী মেরীর মুখের উপর দৃষ্টি সন্নিবদ্ধ করিয়া দাঁড়াইতে হইল।

অতঃপর সভাপতি টেবলের উপর চারি বার করাঘাত করিলেন। মুহূর্ত্ত পরে সেই কক্ষের দ্বার খুলিয়া চারি জন লোক সভাস্থলে উপস্থিত হইল; গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ আলখেল্লায় তাহাদের আপাদমস্তক আবৃত, কেবল উভয় চক্ষুর সম্মুখে দুইটি ছিদ্র; প্রত্যেকের হাতে তীক্ষ্ণধার সুদীর্ঘ ছোরা!

তাহারা দুই জন করিয়া জোসেফের দুই পাশে দাঁড়াইল; তাহার পর তাহাদের হাতের ছোরা জোসেফের দুই গালের এত কাছে উঁচু করিয়া ধরিল যে, জোসেফ মাথাটা একটু নড়াইলেই ছোরাগুলির তীক্ষ্ণ অগ্র তাহার গালে বিঁধিয়া যাইত!

এই অদ্ভুত দৃশ্যে জোসেফ মুহূর্ত্তের জন্য বিচলিত হইলেও অকম্পিত দেহে প্রস্তরমূর্ত্তির ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল। সে বুঝিয়াছিল, যে ভাবেই তাহাকে পরীক্ষা করা হউক, তাহার অনিষ্টের আশঙ্কা নাই। সেই কক্ষে যে দীপ জ্বলিতেছিল, তাহার আলো হঠাৎ এত কমাইয়া দেওয়া হইল যে, কক্ষটি প্রায় অন্ধকারাচ্ছন্ন হইল; এমন কি, কেহ কাহারও মুখও স্পষ্ট দেখিতে পাইল না! কিন্তু মুহূর্ত্ত পরে একটি 'আঁধারে' লণ্ঠন জ্বালিয়া টেবলের উপর এ ভাবে রাখা হইল যে, সেই দীপের উজ্জ্বল রশ্মি কেবলমাত্র মেরী-মূর্ত্তির মুখমণ্ডলে প্রতিফলিত হইল।

অতঃপর যে কাণ্ড ঘটিল, তাহা দেখিয়া জোসেফের বিস্ময় শতগুণ বর্দ্ধিত হইল। প্রথমেই বলিয়াছি—সেই কক্ষের এক কোণে একটি টেবল ছিল, সেই টেবলের উপর কি একটা জিনিস কাল বনাত দিয়া ঢাকা ছিল। দুই জন লোক সেই টেবলটি তুলিয়া আনিয়া জোসেফের ঠিক পশ্চাতে রাখিয়া গেল।

কয়েক মিনিট নিস্তব্ধ থাকিয়া সভাপতি উঠিয়া দাঁড়াইলেন; তিনি গম্ভীর স্বরে জোসেফকে বলিলেন, "জোসেফ কুরেট! তোমার ডান হাত দিয়া কুমারী মেরীর পা স্পর্শ কর, আর তোমার বাঁ হাতখানি আমার হাতে দাও।"

জোসেফ এই আদেশ পালন করিলে, সভাপতি

পূর্ব্ববৎ গম্ভীর স্বরে পুনর্ব্বার বলিলেন, "জোসেফ ক্রুরেট, শুনিলাম, তুমি সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ থাকিয়া, সুস্থ দেহে ও স্বাধীন ইচ্ছায় আমাদের সঙ্গে যোগদানের জন্য এখানে উপস্থিত হইয়াছ এবং দীক্ষা গ্রহণের জন্য প্রস্তুত আছ। এ কথা কি সত্য ?"

জোসেফ অবিচলিত স্বরে বলিল, "হাঁ, সত্য।"

সভাপতি বলিলেন, "আমাদের উদ্দেশ্য কি, সর্ব্বাগ্রে তাহাই তোমার গোচর করা প্রয়োজন মনে করিতেছি। রুসিয়ার যথেচ্ছাচারমূলক রাজতন্ত্র বিধ্বস্ত করিয়া, তাহার সুদৃঢ় লৌহশৃঙ্খল চূর্ণ করিয়া আমাদের মাতৃভূমির মুক্তি-বিধানই আমাদের উদ্দেশ্য। আমাদের সম্প্রদায়ে এরূপ লোক এক জনও নাই, যাহাকে রুস রাজতন্ত্রের পৈশাচিক অত্যাচারে উৎপীড়িত, নিগৃহীত ও লাঞ্ছিত হইতে না হইয়াছে। সেই সকল নরপিশাচের নিষ্ঠুর নির্য্যাতনে আমরা সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছি; আমাদের জন্মভূমি হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছি; আমাদের মস্তকের জন্য পুরস্কার ঘোষিত হইয়াছে। আমাদের অভিশপ্ত, দুর্দ্দশাগ্রস্ত, অপমানলাঞ্ছিত মাতৃভূমিতে লক্ষ লক্ষ স্বদেশবাসী অতি কঠোর আইনের নাগপাশে বন্দী হইয়া অসহ্য যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ করিতেছে। তাহাদের উপর নানা প্রকার অন্যায় কর বসাইয়া জোঁকের মত তাহাদের শোণিত শোষণ করা হইতেছে। রুসিয়ার জার সিংহাসনে বসিয়া শোণিতলোলুপ কুকুরগুলাকে লেলাইয়া দিয়াছে —তাহারা তীক্ষ্ণ দন্তে নিরুপায় প্রজার দেহের মাংস ছিঁড়িয়া খাইতেছে, আর সম্রাট তৃপ্তমনে এই পৈশাচিক আমোদ উপভোগ করিতেছে! যাহাদের হস্তে শান্তি-রক্ষার ভার অর্পিত হইয়াছে—তাহারা ইতর গুপ্তচর মাত্র, আধ 'রুবলে'র জন্য প্রজার জীবন বিপন্ন করিতেও কুণ্ঠিত নহে! নিঃসঙ্কোচে উৎকোচ আহার করিয়া বিচারকগণের উদর স্ফীত হইতেছে; বিচারালয়ে বসিয়া তাহারা বিচারের অভিনয় করিতেছে; সে বিচার প্রহসন মাত্র! সমগ্র দেশ দারিদ্র্য ও দুঃখ-কষ্টে জর্জ্জরিত; যথেচ্ছাচারী জারের অত্যাচারে সুখের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়াছে। এই অত্যাচার হইতে দেশ রক্ষা করাই আমাদের উদ্দেশ্য। যদি বিনা রক্তপাতে, বিনা বিপ্লবে আমাদের এই উদ্দেশ্য সফল করিবার আশা থাকিত, তাহা হইলে আমরা সেই উপায়ই অবলম্বন করিতাম; কিন্তু সে আশা নাই। এই জন্য আমরা সঙ্কল্প করিয়াছি, যেরূপে পারি, শত্রু নিপাত করিব। আমরা কোন শত্রুকে দয়া করিব না, কোন নিষ্ঠুর কার্য্যে কুণ্ঠিত হইব না। হাঁ, আমরা হৃদয়কে পাষাণে পরিণত করিয়াছি। আমরা জারের অস্তিত্ব বিলুপ্ত করিব, তাহার সিংহাসন ধূলিকণায় পরিণত করিব; তাহার মন্ত্রিগণকে, তাহার দুষ্টবুদ্ধি নির্য্যাতনপ্রিয় কর্ম্মচারিগণকে হত্যা করিয়া দেশে শান্তি স্থাপন করিব; এই বিশাল সাম্রাজ্যের কোটি কোটি অধিবাসিবর্গকে সুখী করিব, তাহারা স্বাধীনতার আনন্দ উপভোগ করিবে। দেশের বুকের উপর হইতে দুর্ব্বহ পাষাণভার অপসারিত হইবে। ইহাই আমাদের কামনা, ইহাই আমাদের ব্রত। এই ব্রত উদ্‌যাপনের জন্য আমাদের সর্ব্বস্ব, আমাদের জীবন উৎসর্গ করিয়াছি। আমরা জানি, ইহা অতি দুরূহ ব্রত; আমরা যে অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়াছি —তাহাতে আমাদের জীবন আহুতি প্রদত্ত হইবে, মৃত্যুকে বরণ করিতে হইবে। কিন্তু তাহাতে ক্ষতি নাই; আমাদের অভাবে—অন্য লোক আমাদের স্থান অধিকার করিবে; এক পুরুষ বিধ্বস্ত হইবে, ভবিষ্যৎ বংশীয়েরা দ্বিগুণ উৎসাহে তাহাদের অভাব পূর্ণ করিবে। পুত্র পিতার কর্ত্তব্যভার গ্রহণ করিবে। যত দিন আমাদের সঙ্কল্প সিদ্ধ না হয়—এইভাবে কায চলিবে।

"আমাদের আশা, আকাঙ্ক্ষা, আমাদের সঙ্কল্প সম্বন্ধে সকল কথাই শুনিলে; এখন বল, তুমি কায়মনোবাক্যে আমাদের সম্প্রদায়ে যোগদান করিতে সম্মত আছ কি না।—যদি তোমার ইচ্ছা না থাকে—তাহা হইলে এখনও তুমি আমাদের সংস্রব ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে পার, তাহাতে তোমার অনিষ্টের আশঙ্কা নাই।"

জোসেফ বলিল, "আপনাদের সংস্রব ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবার ইচ্ছা থাকিলে আমি এখানে আসিতাম না। আমি সঙ্কল্প স্থির করিয়া আসিয়াছি। আমার ব্যর্থ জীবনের সদ্ব্যবহার হয়—ইহাই আমার ইচ্ছা। আমাকে আপনাদের সম্প্রদায়ে গ্রহণ করুন। আমার জীবন ও মৃত্যু সার্থক হউক।"

সভাপতি বলিলেন, "উত্তম; আমাদের সম্প্রদায়ে প্রবেশ করিতে হইলে তোমাকে যথারীতি দীক্ষা গ্রহণ

করিতে হইবে। শপথ করিয়া আমাদের বশ্যতা স্বীকার করিতে হইবে। যে মন্ত্রে দীক্ষিত হইবে, আমি তাহা বলিতেছি; আমার সঙ্গে সঙ্গে তোমাকেও তাহা উচ্চারণ করিতে হইবে। বল—'আমি, জোসেফ করেট, সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর-সমক্ষে দাঁড়াইয়া এবং কুমারী মেরীর পবিত্র মূর্ত্তি স্পর্শ করিয়া সর্ব্বান্তঃকরণে এই অঙ্গীকার করিতেছি এবং শপথ করিয়া বলিতেছি যে, আমি ধীরভাবে অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা করিয়া, কাহারও দ্বারা অন্ধভাবে পরিচালিত না হইয়া, স্বেচ্ছায় 'স্বাধীনতা সমিতি'তে যোগদান করিতেছি। আমি কায়মনোবাক্যে, বিশ্বস্তভাবে এই সম্প্রদায়ের কার্য্য সম্পাদন করিব; সম্প্রদায়ের সঙ্কল্পসিদ্ধির জন্য আমার সকল শক্তি, সকল সম্বল, আমার সর্ব্বস্ব, এমন কি, জীবন পর্য্যন্ত উৎসর্গ করিব। সম্প্রদায়ের কোন গুপ্তকথা কোন কারণে কাহারও নিকট প্রকাশ করিব না; এমন কি, জীবন বিপন্ন হইলেও আমার সহকর্ম্মীদের কাহারও নাম, ধাম বা কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে কোন কথা কাহাকেও জানাইব না। আমি নির্ব্বাক্‌ভাবে মৃত্যুকে বরণ করিব, তথাপি আমার মুখ দিয়া কোন গুপ্ত কথা বাহির হইবে না। আমি যাহা জানিতে পারিব, তাহা অন্য কাহাকেও জানাইব না। সম্প্রদায়ের কার্য্যসংসাধন ভিন্ন কোন কার্য্যে আমার বিন্দুমাত্র ব্যক্তিগত স্বার্থ থাকিবে না। সম্প্রদায়ের সঙ্কল্পসিদ্ধির জন্য মানুষের যাহা সাধ্য, তাহা করিতে কুণ্ঠিত হইব না; এবং যখন যে আদেশ পাইব, বিনা প্রতিবাদে তাহা পালন করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিব, আমার বিবেকবুদ্ধি অনুসারে কোন কার্য্য অসঙ্গত বা অন্যায় বলিয়া ধারণা হইলেও কর্ত্তৃপক্ষের আদেশে পরিচালিত হইব; কোন কারণে তাহার প্রত্যাখ্যান করিব না বা সে জন্য অসন্তোষ প্রকাশ করিব না। সম্প্রদায়ের কোন কার্য্যে পৃথিবীর অন্য প্রান্তে গমনের আদেশ হইলে, মৃত্যু অপরিহার্য্য জানিয়াও সেই আদেশ পালন করিব। যদি জীবনে কোন দিন এই অঙ্গীকার ভঙ্গ করি, তাহা হইলে আমার মস্তকে যেন বিধাতার অভিসম্পাত বর্ষিত হয়'।"

জোসেফ সভাপতির কথার সঙ্গে সঙ্গে এই সকল কথা উচ্চারণ করিল। যেন সে নিজেরই শ্রাদ্ধের মন্ত্র পাঠ করিল! তাহার কণ্ঠস্বরে আন্তরিকতা ও নিষ্ঠা পরিব্যক্ত হইল। বাহিরে তখন ভীষণ দুর্য্যোগ; পুনঃ পুনঃ মেঘের সুগম্ভীর গর্জ্জন যেন তাহার অঙ্গীকারের সমর্থন করিতে লাগিল। মেঘের গর্জ্জন জোসেফকে যেন তাহার শপথের গুরুত্ব স্মরণ করাইয়া দিল।

অতঃপর সভাপতি সভাসদ্‌বৃন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "ভ্রাতৃগণ, আমাদের এই নবদীক্ষিত ভ্রাতা যথানিয়মে অঙ্গীকারপাশে আবদ্ধ হইয়া সম্প্রদায়ে যোগদান করিলেন। এই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিলে তাঁহার শাস্তি কি—উঁহাকে শুনাইয়া দাও।"

বহু কণ্ঠ হইতে উচ্চারিত হইল, "মৃত্যু।"

সঙ্গে সঙ্গে চারিখানি ছোরার তীক্ষ্ণাগ্র জোসেফের কণ্ঠ স্পর্শ করিল। সেই শীতল স্পর্শে জোসেফ শিহরিয়া উঠিল; কিন্তু মুহূর্ত্ত পরে ছোরাগুলি অপসারিত হইল।

সভাপতি ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন, "হাঁ, প্রতিজ্ঞাভঙ্গের শাস্তি মৃত্যু। কর্ত্তব্যপালনে কিছুমাত্র ত্রুটি হইলে, বিশ্বাসঘাতকতা করিলে—তাহার একমাত্র দণ্ড মৃত্যু। পৃথিবীর অপর প্রান্তে পলায়ন করিয়া লোক-নয়নের অন্তরালে থাকিলেও প্রতিজ্ঞাভঙ্গকারীর—বিশ্বাসঘাতকের নিস্তার নাই। মৃত্যু ছায়ার ন্যায় তাহার অনুসরণ করে। কিন্তু ইহা যে মিথ্যা ভয়প্রদর্শন নহে, অপরাধীকে এই শাস্তি গ্রহণ করিতে হয়, তাহার প্রমাণ চাও? সে প্রমাণ এখানেই বর্ত্তমান। প্রত্যক্ষ কর।"

মুহূর্ত্তমধ্যে সেই কক্ষের দীপালোক উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে ছোরাধারী অনুচর-চতুষ্টয় জোসেফকে ধরিয়া তাহার পশ্চাৎস্থিত টেবলের সম্মুখে দাঁড় করাইল এবং টেবলের উপর হইতে কাল বনাতখানি সরাইয়া ফেলিল। বনাতের নীচে একটি মৃতদেহ ছিল, তৎপ্রতি জোসেফের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। সে দেখিল, উহা পুরুষের মৃতদেহ।

জোসেফ বুঝিতে পারিল—মৃত ব্যক্তির বয়স পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ বৎসরের অধিক নহে। তাহার মুখ অস্ত্রাঘাতে বিকৃত; দাড়ি, গোঁফ, মস্তক মুণ্ডিত; ভ্রূ পর্য্যন্ত অপসারিত! উভয় চক্ষুর পাতাই উৎপাটিত; চক্ষুর তারা দুইটি যেন ঠেলিয়া বাহির হইয়াছে! অতি বীভৎস দৃশ্য।

এই দৃশ্য দেখিয়া জোসেফের যেন মূর্চ্ছার উপক্রম হইল; অতি কষ্টে সে আত্ম-সংবরণ করিয়া অন্য দিকে

মুখ ফিরাইল। এই নিষ্ঠুরতায় তাহার মন বিতৃষ্ণায় ভরিয়া উঠিল।

সভাপতি তাহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, "সুখের বিষয়, এরূপ দৃষ্টান্ত নিতান্ত বিরল। প্রতিজ্ঞাভঙ্গ বা বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধে এই ভাবে দণ্ডিত হইয়াছে—আমাদের সহকর্ম্মিগণের মধ্যে এরূপ লোকের সংখ্যা অধিক নহে এই ব্যক্তি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছিল; অর্থলোভে পুলিসের কাছে আমাদের গুপ্ত কথা প্রকাশ করিয়াছিল। সামান্য অর্থের লোভে যে হতভাগা লক্ষ লক্ষ স্বদেশবাসীর জীবন বিপন্ন করিতে পারে, কোটি কোটি উৎপীড়িত প্রজার আশা-আকাঙ্ক্ষা ব্যর্থ করিতে কুণ্ঠিত না হয়, তাহার এইরূপ মৃত্যুই বাঞ্ছনীয়। গত কল্য এই ব্যক্তি স্বকৃত কর্ম্মের ফল পাইয়াছে। গত ১০।১১ বৎসরের মধ্যে তিন জন মাত্র লোকের এই ভাবে প্রাণদণ্ড হইয়াছে।—প্রথম ও দ্বিতীয় অপরাধীরা স্বামি-স্ত্রী। পুরুষটি সম্ভ্রান্ত বংশের লোক, তাহার স্ত্রী ছিল—তাহার অপেক্ষাও উচ্চ বংশের মেয়ে। তাহারা স্বেচ্ছায় আমাদের এই গুপ্ত সম্প্রদায়ে যোগদান করিয়াছিল, তাহাদের সাহায্যে আমরা যথেষ্ট উপকৃত হইয়াছিলাম; কিন্তু কিছু দিন পরে আমরা জানিতে পারিলাম—আমাদের দলে যোগদান করিয়া তাহারা অনুতপ্ত হইয়াছে। আমরা তাহাদের বিশ্বাসঘাতকতার কোন পরিচয় না পাইলেও, তাহাদের দ্বারা ভবিষ্যতে আমাদের অনিষ্ট হইতে পারে, এই আশঙ্কায় তাহাদের প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রদত্ত হয়। পুরুষটিকে নৌকায় তুলিয়া হ্রদের ভিতর লইয়া গিয়া হত্যা করা হইল; তাহার মৃতদেহ হ্রদের জলে নিক্ষিপ্ত হইলেও পুলিস তাহা জলের ভিতর হইতে তুলিয়া থানায় লইয়া গিয়াছিল। তাহার স্ত্রীর কোন অনিষ্ট করিবার জন্য আমাদের আগ্রহ ছিল না; কিন্তু সে থানায় গিয়া তাহার স্বামীর মৃতদেহ চিনিতে পারিয়াছিল, আমাদের গুপ্তচর আড়ালে থাকিয়া তাহাকে তাহার মৃত স্বামীর মুখ-চুম্বন করিতে দেখিয়াছিল; সুতরাং তাহাকে জীবিত রাখা নিরাপদ নহে বুঝিয়া আমরা তাহাকেও হত্যা করিলাম। তাহাদের গৃহে দুই বৎসর বয়সের একটি শিশু পুত্র ছিল। আমাদের ইচ্ছা ছিল, সেই শিশুকে আমরাই প্রতিপালন করিব, এবং পরে তাহাকে আমাদের মন্ত্রে দীক্ষিত করিব; কিন্তু আমরা তাহাকে হাতে পাই নাই। কে কি কৌশলে তাহাকে স্থানান্তরিত করিয়াছিল—তাহাও জানিতে পারি নাই। এই সুদীর্ঘকাল আমরা বহু স্থানে তাহার অনুসন্ধান করিয়াছি, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই। যদি ভবিষ্যতে কখন তাহার সন্ধান পাই, তাহা হইলে তাহাকে আমাদের মন্ত্রে দীক্ষিত করিব; যদি সে আমাদের দলে যোগদান করিতে অসম্মত হয়, তাহা হইলে তাহাকেও তাহার পিতামাতার অনুসরণ করিতে হইবে। তুমি অবাধ্য হইলে বা বিশ্বাসঘাতকতা করিলে কি ফল হইবে, তাহা বুঝাইবার জন্যই এই সকল গোপনীয় কথা তোমার নিকট প্রকাশ করিলাম। দীক্ষা গ্রহণের পর কেহই আমাদের সংস্রব ত্যাগ করিতে পারে না, দূরদেশে পলায়ন করিলেও তাহার নিস্তার নাই; পৃথিবীর অন্য প্রান্তে গিয়া লুকাইয়া থাকিলেও তাহার মৃত্যু অপরিহার্য্য।"

জোসেফ বলিল, "আমি কখনও অবাধ্য হইব না, বিশ্বাসঘাতকতাও করিব না।"

সভাপতি বলিলেন, "হাঁ, এই বিশ্বাসেই ত তোমাকে আমাদের দলে গ্রহণ করিলাম। কয়েক দিনের মধ্যেই তুমি রুসিয়ায় প্রেরিত হইবে। তোমাকে যে দায়িত্বভার গ্রহণ করিতে হইবে, তাহা অত্যন্ত বিপজ্জনক; কিন্তু তুমি কর্ম্মঠ যুবক, চতুর ও বুদ্ধিমান্, বিশেষতঃ তুমি রুসিয়ান নহ; এই জন্য আমাদের বিশ্বাস, তোমার দ্বারা কার্য্যোদ্ধার হইবে। তুমি কৃতকার্য্য হইতে পারিলে যথাযোগ্য পুরস্কার পাইবে, তোমাকে সম্মানিত করা হইবে।—আমাদের সভার কার্য্য শেষ হইয়াছে, এখন সভা ভঙ্গ করা যাইতে পারে।"

এই কক্ষের মধ্যস্থল হইতে মেঝের একখানি তক্তা অপসারিত করা হইল, তাহার নীচে একটি সুড়ঙ্গদ্বার, জোসেফ ভূগর্ভস্থিত জলপ্রবাহের কল-কল শব্দ শুনিতে পাইল। মুহূর্ত্তমধ্যে পূর্ব্বোক্ত মৃত দেহটি টেবল হইতে নামাইয়া লইয়া সেই সুড়ঙ্গমধ্যে নিক্ষেপ করা হইল। অতঃপর সুড়ঙ্গদ্বার রুদ্ধ হইলে চানস্কি জোসেফের হাত ধরিয়া সেই অট্টালিকার বাহিরে আসিল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

টোপ গিলিল

কাউণ্ট ভন্ আরেনবর্গ বায়ুসেবন করিয়া সন্ধ্যার পর আনা স্মিটের সঙ্গে বাড়ী ফিরিলেন। আনা স্মিটের কথায় তাঁহার মন অত্যন্ত বিচলিত হইয়াছিল; তাঁহার হৃদয়ে নানা নূতন চিন্তার তুফান আরম্ভ হইল; তাঁহার মনে হইল—হঠাৎ কোথা হইতে একটা ঝড় আসিয়া তাঁহার চোখের ঠুলি উড়াইয়া লইয়া গেল! তিনি দরিদ্র, অর্থাভাবে ইচ্ছানুরূপ ভোজ্যদ্রব্যও সংগ্রহ করিতে পারেন না, মূল্যবান্ পরিচ্ছদ ও বিলাসোপকরণ ক্রয়ের সামর্থ্য ত নাই ই, অথচ ইচ্ছা করিলেই পনের লক্ষ ফ্রাঙ্কের মালিক হইতে পারেন; কোন কষ্ট নাই, পরিশ্রম নাই, বিনা চেষ্টায় এই বিপুল ঐশ্বর্য্য হস্তগত হইতে পারে—এ লোভ সংবরণ করা সাধ্যাতীত বলিয়াই তাঁহার মনে হইল! দারুণ পিপাসায় বুক ফাটিয়া যাইতেছে—এমন সময় সম্মুখে সুশীতল নির্ম্মল পানীয় জলপূর্ণ জালা দেখিয়া, সেই জলের সদ্ব্যবহার না করিয়া পিপাসা-শান্তির আশায় মরীচিকার পশ্চাতে ধাবিত হইবে—এমন নির্ব্বোধ কে আছে?—কাউণ্ট ঘরে আসিয়া উদ্‌ভ্রান্তভাবে একখানি চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন এবং আনা স্মিটের কথাগুলি মনে মনে আলোচনা করিতে লাগিলেন। কয়েক মিনিট চিন্তার পর তিনি অস্ফুটস্বরে বলিলেন, "পনের লক্ষ ফ্রাঙ্ক! দুই চারি লক্ষ নয়, এক দম্ পনের লক্ষ ফ্রাঙ্ক! উঃ, না জানি এ বেটী কত টাকার মালিক!—এই টাকাগুলা ইচ্ছা করিলেই পাইতে পারি। অতি সহজ কায। তবে তাহা না লইব কেন? সাহস হইবে না? সাহস না হইবার কারণ কি? বিপদের আশঙ্কা? ছোঃ—সে আশঙ্কা নিশ্চয়ই কাটিয়া গিয়াছে।"

তখন তাঁহার বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত হইয়াছিল; সময়টা কি ভাবে কাটিতে লাগিল, তাহা তিনি জানিতেও পারিলেন না। দ্বারে করাঘাতের শব্দ শুনিয়া তাঁহার হুঁস হইল। তিনি শুনিতে পাইলেন,—"ডিনার প্রস্তুত।"

কাউণ্ট তাড়াতাড়ি উঠিয়া ডিনারের পোষাকে সজ্জিত হইলেন; সকলে হয় ত তাঁহার প্রতীক্ষায় বসিয়া আছে, তিনি কতই বিলম্ব করিয়া ফেলিয়াছেন—ভাবিয়া বড়ই কুণ্ঠিত হইলেন; কি কৈফিয়ৎ দিবেন—তাহাই ভাবিতে ভাবিতে ভোজনাগারে চলিলেন।

আনা স্মিট কাউণ্টের মুখ দেখিয়াই বুঝিতে পারিল—ভোজন-টেবলে আসিতে বিলম্ব হওয়ায় তিনি লজ্জিত হইয়াছেন; কাউণ্ট কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই সে বলিল, "না, না, তোমার কুণ্ঠিত হইবার কোন কারণ নাই, কাউণ্ট! তোমাকে সংবাদ দেওয়াতে আমারই ক্রটি হইয়াছে, এ জন্য আমার এতই অনুতাপ হইতেছে যে, সে কথা আর কি বলিব?—তোমার চোখ-মুখ দেখিয়াই বুঝিতে পারিয়াছি, তোমার একটু ঘুম আসিয়াছিল, এ অবস্থায় তোমাকে বিরক্ত করা বড়ই বেয়াদপি হইয়াছে।"

কাউণ্ট বসিয়া পড়িয়া ঢোক গিলিয়া বলিলেন, "হাঁ, আমার, কি বলে—একটু ঢু—ঢুলুনী—"

আনা স্মিট বাধা দিয়া বলিল, "বেড়াইয়া আসিয়া আমিও যে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম! ছেলেমানুষ তুমি, অত ঘুরাঘুরির পর তোমার ঢুলুনী ত আসিতেই পারে।—ইহাতে লজ্জা পাইবার কি আছে, বাবা!"

লজ্জার হাত হইতে এত সহজে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া কাউণ্ট নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন। কর্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞতায় তাঁহার হৃদয় উদ্বেল হইয়া উঠিল। কাউণ্ট ভোজনে বসিয়া সরস গল্পে সকলকে আমোদিত করিলেন। আনা স্মিট পরিতৃপ্ত হইয়া পুত্র ফ্রিজকে বলিল, "আমাদের পরম সৌভাগ্য যে, কাউণ্টকে অতিথিরূপে পাইয়াছি। এমন মজার মজার গল্প কি আমরা কস্মিন্‌কালেও শুনিয়াছি?—এ পর্য্যন্ত কত ডিউক, মার্ক্ইস্, ব্যারণ আমাদের অতিথি হইয়াছে—কিন্তু এ রকম সরস গল্পে তাহাদের কেহ কি কোন দিনও আমাদের পরিতৃপ্ত করিতে পারিয়াছে? অন্যের সাধ্য কি?"

পরদিন বল-নাচের জন্য নিমন্ত্রণের ব্যবস্থা করিতেই এক বেলা কাটিয়া গেল। সকালে আনা স্মিট বার্থা ও কাউণ্টকে সঙ্গে লইয়া একটি নিভৃত কক্ষে নাচের মজলিস্ সম্বন্ধে পরামর্শ করিতে লাগিল। সেই সময় সে বার্থাকে কাউণ্টের কাছে রাখিয়া, এক একটা কাযের উপলক্ষে তিন চারিবার সেই কক্ষ ত্যাগ করিল এবং প্রতিবার কুড়ি পঁচিশ মিনিট ধরিয়া বাহিরে কাটাইয়া আসিতে

লাগিল। কিন্তু কাউণ্ট সঙ্কোচবশতঃই হউক, কি তখন পর্য্যন্ত কর্ত্তব্য স্থির করিতে পারেন নাই বলিয়াই হউক, বার্থাকে প্রেমের কথা বলিতে পারিলেন না; কিন্তু তিনি একটি কাষ ভুলিলেন না; সেই দিনই আরও কয়েক সপ্তাহের ছুটীর জন্য তাঁহার উপরওয়ালার কাছে দরখাস্ত পাঠাইলেন।

আনা স্মিট বলের মজলিসে যোগদানের জন্য নগরের বহু সম্ভ্রান্ত নর-নারীকে নিমন্ত্রণ করিল; সংবাদপত্রের সম্পাদকবর্গের কেহই বাদ পড়িল না। সে এক বিরাট ব্যাপার!

বলা বাহুল্য, বার্থাকেই কাউণ্টের নৃত্যসঙ্গিনী হইতে হইল। কোন কোন সুন্দরী কাউণ্টের সঙ্গে নাচিতে না পাইয়া বড়ই ক্ষুণ্ন হইল; কিন্তু তাহাদের উচ্চাভিলাষ পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা ছিল না। অনেকেই বুঝিতে পারিল—কাউণ্টকে বঁড়শীতে গাঁথিবার জন্যই এই সকল উদ্যোগ-আয়োজন। সেই মজলিসেই অনেকেই আনা স্মিটের গুপ্ত অভিসন্ধির কথা লইয়া আলোচনা করিতে লাগিল।

সেই রাত্রিতে খানার পর আনা স্মিটের সহিত ফ্র জেম্‌সার্ডের অনেক কথা হইল। ফ্র জেম্‌সার্ডের স্বামীও লৌহ-ব্যবসায়ী; আনা স্মিটের মত তাহাদেরও লোহার কারখানা ছিল, তবে তাহাদের কারবার তেমন বিস্তৃত নহে। নিজের প্রতিষ্ঠা ও গৌরব দেখাইবার জন্যই আনা স্মিট জেম্‌সার্ড-দম্পতিকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিল।

ফ্র জেম্‌সার্ড কথায় কথায় আনা স্মিটকে বলিল, "মাই ডিয়ার ফ্র স্মিট, আজ এই কয়েক ঘণ্টা যে কি আনন্দে কাটিল, তাহা বলিয়া বুঝাইতে পারিব না। তোমার অতিথি এই কাউণ্ট কি চমৎকার লোক! এই আনন্দ উপভোগের জন্য আমরা সকলেই তোমার নিকট কৃতজ্ঞ রহিলাম। আমাদের আদরিণী বার্থার প্রতি কাউণ্টের প্রাণের টানটা এতই সুস্পষ্ট যে, আমি এখনই নিঃসন্দেহে দৈববাণী করিতে পারি—কাউণ্ট তোমার জামাই না হইয়া যায় না। হাঁ, এ রকম কুলীন জামাই পাওয়া পরম সৌভাগ্যের বিষয়। আর বার্থাও কাউণ্টেস্ হইবার মতই মেয়ে বটে। বার্থা যে দিন কাউণ্টেস্ হইবে—সে দিন আমাদের কি আনন্দই হইবে! জীবনের খেলায় তোমার কাছে সকলকেই হার মানিতে হইয়াছে, এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে।"

আনা স্মিট হাসিয়া বলিল, "মাই ডিয়ার ফ্র জেম্‌সার্ড, গাছের কাঁঠালের দিকে চাহিয়া তোমাকে গোঁফে তেল দিতে দেখিয়া আমার বড় হাসি পাইতেছে; অবশ্য যদিও তোমার গোঁফ নাই! তোমার দৈববাণীটা অত্যন্ত অসাময়িক হইয়া পড়িল; তবে তোমার মত হিতৈষিণী বান্ধবীকে এ কথা বলায় দোষ নাই যে, সুদূর ভবিষ্যতে তোমার আশা হয় ত পূর্ণ হইতেও পারে।"—আনা স্মিট জানিত—ফ্র জেম্‌সার্ড কেবল যে ব্যবসায়ক্ষেত্রেই তাহার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী, এরূপ নহে, সে তাহার সৌভাগ্যের হিংসা করিত এবং আনাকে নারীসমাজের নেতৃত্ব করিতে দেখিয়া, নানা ভাবে তাহাকে অপদস্থ করিবার চেষ্টারও ক্রটি করিত না। সেই ফ্র জেম্‌সার্ডকে তাহার নিকট মুক্তকণ্ঠে পরাজয় স্বীকার করিতে দেখিয়া তাহার হৃদয় আনন্দে ও গর্ব্বে পূর্ণ হইল। তাহাকে নিমন্ত্রণ করা সার্থক মনে হইল। আনা বুঝিল, সে ঈর্ষায় জ্বলিয়া মরিতেছে।

ফ্র জেম্‌সার্ড আনা স্মিটের নিকট হইতে উঠিয়া গিয়া তাহার স্বামীর কানে কানে বলিল, "ঐশ্বর্য্যের গর্ব্বে আনা স্মিটের যেন মাটীতে পা পড়িতেছে না! মাগীর দম্ভ ও দুরাশা দেখিয়া না হাসিয়া থাকা যায় না। উহার আশা—কাউণ্ট বার্থাকে বিবাহ করিবে। মাগীর এ স্বপ্ন সফল হইবে কি না, বলা যায় না; কিন্তু কামারণীটা উহার মত কোন কামারের ছেলের সঙ্গে বার্থার বিবাহের চেষ্টা করিলেই ভাল করিত। আর, এই কাউণ্টেরই বা কি প্রবৃত্তি! শেষে কি সে টাকার লোভে একটা কামারের মেয়েকে কাউণ্টেস্ করিবে? উহার কি চালচুলো নাই?"

তাহার স্বামী টাকে হাত বুলাইয়া বলিল, "তাহাই সম্ভব। কিছু দিন সবুর কর না, অনেক কাণ্ড দেখিতে পাইবে।"

শেষ নাচ ওয়াল্‌জ্, তাহা যখন শেষ হইল—তখন রাত্রি অবসানপ্রায়। মজলিস্ ভাঙ্গিলে নিমন্ত্রিত নর-নারীরা তাহাদের ক্লোক, কোট, শাল প্রভৃতি সংগ্রহের জন্য জটলা আরম্ভ করিল। কাউণ্ট বার্থার হাত ধরিয়া টানিয়া বলিল, "এখানে কি ভয়ানক গরম। চল, আমরা বাগানে একটু বেড়াইয়া ঠাণ্ডা হইয়া আসি।"

বার্থা এ প্রস্তাবে আপত্তি করিল না, কাউণ্টের সহিত বাগানে প্রবেশ করিল। তখন পূর্ব্বাকাশ সুরঞ্জিত হইয়া আসন্ন উষার আভাস জ্ঞাপন করিতেছিল; আকাশ নির্ম্মল বায়ুপ্রবাহ সুশীতল; পুষ্পসৌরভে বায়ুস্তর সুরভিত; সুকণ্ঠ বিহঙ্গের দল তরুশাখায় বসিয়া মধুর স্বরে উষার বন্দনা-গীত আরম্ভ করিয়াছিল। বহুদূরে আল্পস্ গিরি-মালার তুষারমণ্ডিত শুভ্র শৃঙ্গে অরুণের লোহিতালোক প্রতিফলিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভার বিকাশ করিতেছিল।

কাউণ্ট ও বার্থা পরস্পরের বাহুপাশে আবদ্ধ হইয়া উদ্যানমধ্যে পাদচারণা করিতে লাগিল; কয়েক মিনিট কেহ কোন কথা বলিল না, উভয়েই নিস্তব্ধ।

কাউণ্ট চলিতে চলিতে হঠাৎ থামিয়া, বামহস্তে বার্থার কটিদেশ পরিবেষ্টিত করিয়া আবেগভরে বলিলেন, "ফ্রলিন বার্থা, আজ তুমি আমার নৃত্যসঙ্গিনী হইয়াছিলে; যদি তোমাকে আমার জীবনসঙ্গিনী হইবার জন্য অনুরোধ করি—তাহাতে কি তোমার আপত্তি হইবে?"

প্রশ্নটা এরূপ আকস্মিক যে, বার্থা হঠাৎ কোন উত্তর দিতে পারিল না; সে দুই এক মিনিট অবনত মুখে মাটীর দিকে চাহিয়া থাকিয়া অস্ফুটস্বরে বলিল, "দেখুন কাউণ্ট, এ কথা পূর্ব্বে মুহূর্ত্তের জন্যও আমার মনে হয় নাই; হঠাৎ আপনার প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন, কথাটা ভাবিয়া দেখিবার জন্য একটু সময় চাই।"

কাউণ্ট বলিলেন, "তা বেশ ত, ভাবিয়া দেখিও; কিন্তু আমি শীঘ্র উত্তর চাই; আশা করি, অনুকূল উত্তরই পাইব, কারণ, আমি স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াছি—তোমাকে ভয়ঙ্কর ভালবাসিয়া ফেলিয়াছি। এ অতি গভীর প্রেম।"

এই কথা বলিয়াই কাউণ্ট ফস্ করিয়া মুখ নামাইয়া, বার্থার ওষ্ঠে ওষ্ঠস্পর্শ করিলেন।—বার্থার চোখ-মুখ লাল হইয়া উঠিল, তাহার মনে হইল, সে চারিদিক ঝাপসা দেখিতেছে!

খানিক পরে সে তাহার ঘরে ফিরিয়া আসিয়া এক-খান চেয়ারে বসিয়া পড়িল এবং কিছুকাল চোখ বুজিয়া পড়িয়া রহিল। কয়েক মিনিট পরে দ্বারের দিকে পদ-শব্দ শুনিয়া সে চক্ষু মেলিল, দেখিল, তাহার মা সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে।

আনা স্মিট বলিল, "বার্থা, আজ তোমাকে ও কাউণ্টকে জোড়ে নাচিতে দেখিয়া সকলে কি বলাবলি করিতেছিল, শুনিয়াছ কি? তলাইয়া দেখিবার মত যাহা-দের চোখ আছে—তাহাদের চক্ষু প্রতারিত হয় নাই; আর তাহাদের অনুমান বোধ হয় অসঙ্গতও নহে।"

বার্থা ন্যাকা সাজিয়া বলিল, "কে কি অনুমান করি-য়াছে, তাহা শুনিবার জন্য আমার যেন ঘুম নাই! তা যে যাহাই অনুমান করুক, আমি একটা কথা শুনিয়াছি, তা অনুমানের চেয়ে খাঁটি।"

আনা স্মিট আবেগ-কম্পিতকণ্ঠে বলিল, "কি কথা, মা! কাউণ্ট কিছু বলিয়াছে কি?"

বার্থা বলিল, "হাঁ, একটু আগে কাউণ্ট আমার কাছে বিবাহের প্রস্তাব করিয়াছেন।"

আনা স্মিট বার্থাকে জড়াইয়া ধরিয়া তাহার মুখচুম্বন করিয়া বলিল, "পরমেশ্বর, তুমিই ধন্য! এত দিনে আমার স্বপ্ন সফল হইল।"

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

বিপৎসঙ্কুল পথে

জোসেফ ক্রুরেট গুপ্ত সমিতির আড্ডা হইতে চানস্কির সহিত তাহার বাসায় ফিরিয়া স্পষ্ট বুঝিতে পারিল, সে পূর্ব্বে যে মানুষ ছিল, সে মানুষ আর নাই! কয়েক ঘণ্টার মধ্যে তাহার জীবনের ঘোর পরিবর্ত্তন হইয়াছে। সে সেই গুপ্ত সমিতির আড্ডায় সুখ-শান্তির আশা জীব-নের মত বিসর্জ্জন দিয়া আসিয়াছে। স্বাধীনতা হারাইয়া সে বিনা মূল্যে নিহিলিষ্টদের ক্রীতদাস হইয়াছে! তাহার আর পশ্চাতে ফিরিবার উপায় নাই—সম্মুখের পথ অন্ধ-কারাচ্ছন্ন, দুর্গম, বিপৎসঙ্কুল।

সেই রাত্রেই চানস্কি তাহাদের দলের গুপ্তকথা তাহার নিকট প্রকাশ করিল। চানস্কি তাহাকে বলিল, রুসিয়ার জারকে গোপনে হত্যা করিবার জন্য তাহারা একটা ভীষণ ষড়যন্ত্র করিয়াছে। নক্সা নির্ম্মাণে চানস্কির দক্ষতা থাকায় সেণ্টপিটার্সবর্গের সেণ্টপিটার ও সেণ্ট-পল নামক সুবিখ্যাত দুর্গদ্বয়ের কয়েকখানি নক্সা প্রস্তুতের ভার তাহাকেই গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। এই দুইটি দুর্গে অনেকগুলি রাজনীতিক অপরাধী আবদ্ধ

ছিল, এবং তাহাদের প্রতি কঠোর নির্য্যাতন চলিতেছিল। চানস্কিও এই উভয় দুর্গে দীর্ঘকাল অবরুদ্ধ থাকিবার পর কোন কৌশলে পলায়ন করিয়াছিল। এই জন্যই দুর্গদ্বয়ের নক্সা প্রস্তুত করা তাহার পক্ষে কঠিন হয় নাই। ষড়যন্ত্রকারীদের আশা ছিল, চানস্কির নক্সার সাহায্যে তাহারা কয়েক জন প্রধান নিহিলিষ্টকে দুর্গ হইতে গোপনে উদ্ধার করিতে পারিবে।

রুসিয়ার বাহিরে বিভিন্ন দেশে যে সকল নিহিলিষ্ট বাস করিত, তাহাদের একটা প্রধান অসুবিধা দূর করা অত্যন্ত কঠিন হইয়া উঠিয়াছিল। রুসিয়াবাসী নিহিলিষ্টগণের সহিত সংবাদ আদান প্রদানের জন্য তাহারা ব্যাকুল হইয়া উঠিত, কিন্তু তাহার কোন উপায় ছিল না। রাজকর্ম্মচারী ও পুলিসের তীক্ষ্নদৃষ্টি অতিক্রম করিয়া কোন গুপ্তপত্র বিদেশ হইতে রুসিয়ায় বা রুসিয়া হইতে বিদেশে যাইতে পারিত না। যে সকল লোক অন্য দেশ হইতে রুসিয়ায় যাইত বা রুসিয়া হইতে দেশান্তরে যাত্রা করিত, তাহাদের জিনিষপত্র ত সতর্কতার সহিত পরীক্ষা করাই হইত, অধিকন্তু তাহাদিগকে প্রায় উলঙ্গ করিয়া তাহাদের সর্ব্বাঙ্গ খানাতল্লাস করা হইত।

জোসেফ পোল বা রুসিয়ান নহে, সে পূর্ব্বে কোন দিন রুসিয়ায় যায় নাই, তাহার ন্যায় নিঃসম্পর্কীয় লোককে নিহিলিষ্ট বলিয়া সন্দেহ করিবারও তেমন কোন কারণ ছিল না; এই জন্য চানস্কি ও তাহার সহকর্ম্মিগণের আশা হইয়াছিল—তাহাকে সংবাদ-বাহকের কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া রুসিয়ায় পাঠাইলে তাহাদের চেষ্টা সফল হইতেও পারে।

দীক্ষা গ্রহণের এক সপ্তাহ পরে জোসেফকে গুপ্তসমিতির আর একটি অধিবেশনে উপস্থিত হইতে হইল। সভাপতি তাহাকে বলিলেন, তাহাকে অবিলম্বে সেণ্টপিটার্সবার্গে যাত্রা করিতে হইবে, সেখানে একখানি পত্র লইয়া যাইতে হইবে। এই পত্রখানির কাগজ উদ্ভিজ্জাত, তাহার উপর রাসায়নিক কালী দিয়া বক্তব্য বিষয় লিখিত হইবে। কাগজখানি অত্যন্ত মোলায়েম এবং সাটীনের মত স্থিতিস্থাপক; সাধারণ কাগজের মত তাহা টানিয়া ছেঁড়া যায় না। কালীর গুণ এরূপ যে, লিখিত বিষয় সম্পূর্ণ অদৃশ্য থাকিবে, দেখিলে মনে হইবে সাদা কাগজ; অনেক 'অদৃশ্য' কালীর দাগ অগ্নির উত্তাপে বা জলে ভিজাইলে ফুটিয়া বাহির হয়, কিন্তু এই রাসায়নিক কালীর দাগ সে ভাবে ধরা পড়িবার সম্ভাবনা ছিল না। পত্র পাঠ করিবার পূর্ব্বে সেই কাগজ কয়েক প্রকার আরোক-মিশ্রিত জলে ভিজাইয়া লইতে হইত। তাহা হইলে অক্ষরগুলি ফুটিয়া উঠিত, তখন উজ্জ্বল আলোর সম্মুখে ধরিয়া পত্রখানি পাঠ করিতে হইত। তাহার পর কাগজখানি শুষ্ক হইলে অক্ষরগুলি সুদৃশ্য হইত। কোন বিখ্যাত রুসিয়ান রসায়নবিদ্ এই কাগজ ও কালী প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তিনি নিহিলিষ্ট দলভুক্ত হইয়া তাহাদের কার্য্যেই আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন। রুসিয়ান গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে নিহিলিষ্ট বলিয়া সন্দেহ করিলে, তিনি অতি কষ্টে রুসিয়া হইতে ইংলণ্ডে পলায়ন করিয়া লণ্ডনে আশ্রয় গ্রহণ করেন। বহু দিন পূর্ব্বে তিনি যক্ষ্মারোগে ভুগিয়া লণ্ডনেই প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন।

জোসেফকে একটি ওয়েষ্ট কোট দেওয়া হইল, এক জন নিহিলিষ্ট দর্জ্জি সেই পত্রখানি ওয়েষ্ট কোটের দু' পুরু কাপড়ের ভাঁজের ভিতর রাখিয়া এ ভাবে শিলাই করিয়া দিয়াছিল যে, ওয়েষ্ট কোটটি সাবধানে পরীক্ষা করিলেও সেই পত্রের অস্তিত্ব বুঝিবার উপায় ছিল না। এতদ্ভিন্ন জোসেফকে বিস্তর টাকার একখানি 'ড্রাফ্‌ট' দেওয়া হইল। ইহা কোন ফরাসী ব্যাঙ্কের 'ড্রাফ্‌ট', সেণ্টপিটার্সবর্গের কোন বিখ্যাত রুসিয়ান ব্যাঙ্ক হইতে সেই ড্রাফ্‌টের টাকা পাইবার ব্যবস্থা ছিল। ড্রাফ্‌টের চালানে যাহার নাম সন্নিবিষ্ট হইত, সে স্বয়ং ব্যাঙ্কে উপস্থিত হইয়া টাকা না লইলে অন্য কাহাকেও টাকা দেওয়া হইবে না—এইরূপ নিয়ম থাকায় ড্রাফ্‌টখানি অন্য কাহারও হস্তগত হইলে সে টাকাগুলা আদায় করিয়া লইবে, তাহার উপায় ছিল না। নিহিলিষ্ট সম্প্রদায়ের সাহায্যের জন্যই এইরূপ ড্রাফ্‌ট ব্যবহৃত হইত। এই টাকায় দরিদ্র নিহিলিষ্টগণের সাংসারিক ব্যয় নির্ব্বাহ হইত; সন্দেহক্রমে যাহাদিগকে গ্রেপ্তার করা হইত, তাহারা বিচারালয়ে অভিযুক্ত হইলে এই টাকায় তাহাদের মামলারও তদ্বির করা হইত। সুতরাং বলা বাহুল্য, এই ভাবের অনেক ড্রাফ্‌ট রুসিয়ায় প্রেরিত হইত।

ছাড়পত্র ভিন্ন কাহারও রুসিয়ায় প্রবেশের অধিকার ছিল না, এই জন্ত জোসেফকে ছদ্মনাম গ্রহণ করিতে হইল, এবং তাহাকে সেই নামের একখানি ছাড়পত্র দেওয়া হইল। সেই ছাড়পত্রখানিও জাল!—তাহাকে শিখাইয়া দেওয়া হইল—সে জর্ম্মাণ বলিয়া নিজের পরিচয় দিবে, এবং রুস ভাষায় কোন কথা জানে না বলিবে। সে কি উদ্দেশ্যে রুসিয়ায় যাইতেছে, এ কথা জিজ্ঞাসা করিলে—সে বলিবে, সেণ্টপিটার্সবর্গে সলোমন কোহেন নামক জর্ম্মাণ-সদাগরের অধীনে চাকরী করিতে যাইতেছে।—সলোমন কোহেন জর্ম্মাণ হইলেও ধর্ম্মে ইহুদী। কুড়ি বৎসর যাবৎ সে সেণ্টপিটার্সবর্গে বাণিজ্য-ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিল। সভাপতি তাহাকে এই সকল কথা বলিয়া যথাযোগ্য সতর্কতা অবলম্বন করিতে উপদেশ দিলেন। তাহার চেষ্টা বিফল হইলে নিহিলিষ্টগণের কিরূপ অনিষ্ট হইবে এবং তাহার প্রাণের আশঙ্কা কতদূর প্রবল, তাহাও তাহাকে বুঝাইয়া দিলেন।

বহু দূরদেশে ভ্রমণের সুযোগ লাভ করিয়া জোসেফ উৎফুল্ল হইল, কারণ, বৈচিত্র্যহীন জীবন তাহার অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল, এবং যে কোন পরিবর্ত্তন সে বাঞ্ছনীয় মনে করিতেছিল। তখন পর্য্যন্ত সে বার্থাকে ভুলিতে পারে নাই, বার্থার জননীর নিষ্ঠুরতা ও দুর্ব্ব্যবহার স্মরণ হইলে ক্রোধে ও ক্ষোভে সে অধীর হইয়া উঠিত। সে সঙ্কল্প করিল, এরূপ কোন দুঃসাহসের কায করিয়া বসিবে, যে কথা লইয়া দেশদেশান্তরে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইবে, এবং বার্থা সে জন্ত আপনাকেই দায়ী মনে করিয়া অনুতাপানলে দগ্ধ হইবে। বার্থাকে মর্ম্মাহত করিবার ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায় বলিয়া তাহার ধারণা হইল।

সভাপতির আদেশে পরদিন প্রভাতেই জোসেফ জেনিভা হইতে রুসিয়ায় যাত্রা করিল। সে দ্রুতগামী ডাক-গাড়ীতে না যাওয়ায় পথে তাহার পাঁচ দিন বিলম্ব হইল। ট্রেণখানি রুসিয়ার সীমায় উপস্থিত হইলে পুলিস তাহার জিনিষপত্র এবং পরিচ্ছদাদি পরীক্ষা করিয়া দেখিল, কিন্তু তাহার কাছে সন্দেহজনক কাগজপত্রাদি না পাওয়ায় তাহাকে রুসিয়ায় প্রবেশ করিতে অনুমতি দিল। তাহার আশঙ্কা ও উৎকণ্ঠা দূর হইল, পঞ্চম দিনে সে সেণ্টপিটার্সবর্গে উপনীত হইল। এই সময় রুসিয়ার প্রত্যেক রেল ষ্টেশনে যাত্রীদের ধরিয়া টানাটানি করা হইতেছিল, কাহারও কোন প্রতারণা ধরা পড়িলে তাহার আর নিষ্কৃতি ছিল না। পুলিসের এইরূপ সতর্কতা সত্ত্বেও বিভিন্ন প্রদেশের নিহিলিষ্টরা গোপনীয় সংবাদ আদান-প্রদানে অকৃতকার্য্য হয় নাই, তাহাদের কৌশলে রুসীয় পুলিসের ও কর্ত্তৃপক্ষের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইতেছিল। এ সময় জোসেফের রুসিয়ায় উপস্থিতি নিহিলিষ্টরা বড়ই প্রার্থনীয় মনে করিল।

সেণ্টপিটার্সবর্গের রেল ষ্টেশনে রুস-গবর্ণমেণ্টের কোন পদস্থ কর্ম্মচারীর একটি আফিস ছিল, ট্রেণ হইতে নামিয়া প্রত্যেক যাত্রীকে সেই আফিসে উপস্থিত হইতে হইত। সেখানে যাত্রীদের ট্রাঙ্ক, গাঁটরী প্রভৃতি খুলিয়া পরীক্ষা করা হইত, টুপী হইতে জুতা পর্য্যন্ত সকল পরিচ্ছদ খুলিয়া লইয়া ঝাড়িয়া দেখা হইত—কোন আপত্তিজনক চিঠি-পত্রাদি লুকাইয়া রাখা হইয়াছে কি না। এতদ্ভিন্ন, যাহারা কোন দূরদেশ হইতে আসিত, তাহাদিগকে নানা প্রশ্নের উত্তর দিতে হইত। তাহারা কোথা হইতে আসিতেছে, কি উদ্দেশ্যে আসিয়াছে, কোথায় থাকিবে, কত দিন থাকিবে ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার সময় ভয় পাইয়া কেহ অসংলগ্ন উত্তর দিলে তাহাকে তৎক্ষণাৎ আটক করা হইত। একটু অসতর্ক হইলেই বিপদ!

দলপতির আদেশানুসারে জোসেফ জেনিভা হইতে প্রথমে বার্লিনে উপস্থিত হইয়া সেখানে এক দিন বাস করিয়াছিল। বার্লিন হইতে সে যে টিকিট লইয়াছিল, তাহা পরীক্ষা করিয়া পূর্ব্বোক্ত রাজকর্ম্মচারী জানিতে পারিলেন—সে জার্ম্মাণ রাজধানী হইতে আসিতেছে। তাঁহার সঙ্গে একটিমাত্র ব্যাগ ছিল, তাহাতে ব্যবহারযোগ্য বস্ত্রাদি ও শ্রমজীবীদের নিত্য প্রয়োজনীয় কয়েকটি জিনিষ ছিল। এতদ্ভিন্ন একটি ঝুড়িতে মিস্ত্রীদের কাযের উপযোগী অস্ত্রাদি—(করাত, বাঁটালী, তুরপুণ ইত্যাদি) লওয়া হইয়াছিল। রাজকর্ম্মচারী রুস ভাষায় তাহাকে দুই একটি কথা জিজ্ঞাসা করিলে, সে ইঙ্গিতে বুঝাইয়া দিল—রুস ভাষা তাহার জানা নাই। অগত্যা জর্ম্মাণ ভাষায় অভিজ্ঞ এক জন দো-ভাষীর সাহায্য গ্রহণ করা হইল। দো-ভাষী জার্ম্মাণ ভাষায় তাহাকে দুই

একটি প্রশ্ন করিয়া যে উত্তর পাইল, রাজকর্ম্মচারী তাহার মর্ম্ম অবগত হইয়া জোসেফকে ছাড়িয়া দিলেন। তিনি হাসিয়া বলিলেন, "বুড়া কোহেন এমন বোকাকেও মিস্ত্রীর কাযের জন্য জর্ম্মাণী হইতে আমদানী করিয়াছে? ইহুদী কি না!"

সেণ্টপিটার্সবর্গের জনবহুল পল্লীতে কোহেনের বাড়ী। জোসেফ ষ্টেশন হইতে বাহির হইয়া কোহেনের গৃহে উপস্থিত হইল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কোহেন ইহুদী। চেহারায়, চিন্তায়, অর্থলোলুপতায় সে পাকা ইহুদী। সে কোন্ ব্যবসায় করিত—এ কথা কেহ জিজ্ঞাসা করিলে সে উত্তর পাইত—এরূপ ব্যবসায় কি থাকিতে পারে—যাহা সে না করিত? জাহাজে মাল সরবরাহের কায, ঠিকাদারের কায, মহাজনী, আড়তদারী, হার্ম্মোনিয়ম, বেহালা প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র ও ঘড়ি নির্ম্মাণ, ব্যাঙ্কার, দালালী প্রভৃতি বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে যত রকম কায আছে, সে সকলই সে করিত, এমন কি, একটি ছাপাখানা খুলিয়া তাহা হইতে সে এক-খানি সংবাদপত্রও বাহির করিত এবং স্বয়ং সেই পত্রিকার সম্পাদক ছিল! কিছু দিন পূর্ব্বে সে পেটেণ্ট ঔষধেরও একটি কারখানা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। সে মনে-প্রাণে জর্ম্মাণ ছিল, সে রুসিয়াকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করিত, কিন্তু রুসিয়ার প্রতি ভক্তিপ্রদর্শনে কেহ তাহার সমকক্ষ ছিল কি না সন্দেহ! কুড়ি বৎসর পূর্ব্বে কোহেন রুসিয়ায় আসিয়া সেণ্টপিটার্সবর্গে বাস করিতেছিল। জর্ম্মাণীতেই সে একটি খৃষ্টানের মেয়েকে বিবাহ করিয়াছিল। তাহার স্ত্রী পরম রূপবতী ছিল। তাহারা যৌবনকালে রুসিয়ায় আসিয়াছিল, তাহাদের একটি কন্যা হইয়াছিল—সে সময় তাহার বয়স চারি বৎসর। রুসিয়ায় আসিয়া কোহেন অর্থোপার্জ্জনের জন্য প্রাণপণে পরিশ্রম করিতে আরম্ভ করে। প্রথম দশ বৎসর সে তেমন অধিক অর্থ উপার্জ্জন করিতে না পারিলেও শেষ দশ বৎসরে সে বিপুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়াছিল। কিছু দিন পূর্ব্বে কতক-গুলি রুসিয়ান কোহেনের বাড়ীতে ডাকাতি করিয়াছিল, দস্যুরা কোহেন ও তাহার স্ত্রীকে বাঁধিয়া এরূপ প্রহার করিয়াছিল যে, উভয়কেই অত্যন্ত জখম হইতে হইয়া-ছিল। কোহেন সেই ধাক্কা সাম্‌লাইয়া উঠিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহার স্ত্রী আর সুস্থ হইতে পারিল না; অনেক দিন ভুগিয়া সে প্রাণত্যাগ করিল। কোহেন পত্নী-শোক ভুলিল না।

এই দুর্ঘটনায় তাহার হৃদয়ে রুসিয়ার প্রতি ঘৃণা বদ্ধমূল হইয়া উঠিল। গবর্ণমেণ্ট দস্যুদলের গ্রেপ্তারের চেষ্টা বা তাহার ক্ষতিপূরণ না করায় গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে সে খড়্গহস্ত। কিন্তু সে প্রকাশ্যতঃ গবর্ণমেণ্টের এমন 'খয়েরখাঁ' ছিল যে, তাহার রাজভক্তিতে সন্দেহ করে, কাহার সাধ্য? রাজভক্তির পুরস্কারস্বরূপ সরকারের বড় বড় 'কন্ট্রাক্টরী' তাহাকেই দেওয়া হইত। সে মুখের কথায় সকল বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের সমর্থন করিলেও গোপনে গবর্ণমেণ্টের শত্রুতাসাধনের সুযোগ অন্বেষণ করিত। ইহুদীর অধ্যবসায় ও সহিষ্ণুতা চিরপ্রসিদ্ধ। কোহেন পরম সহিষ্ণুচিত্তে সুযোগের প্রতীক্ষা করিতেছিল।

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময় কোহেনের কন্যা রেবেকার বয়স চব্বিশ বৎসর। পত্নী-বিয়োগের পর কোহেন আর বিবাহ করে নাই, রেবেকা ভিন্ন সংসারে তাহার অন্য কোন বন্ধন ছিল না। রেবেকার ন্যায় রূপবতী যুবতী সে সময় সেণ্টপিটার্সবর্গের কোন গৃহস্থ পরিবারে ত ছিলই না, এমন কি, রাজধানীর আভিজাত্য-গৌরবমণ্ডিত অতি সম্ভ্রান্ত বংশেও তেমন সুন্দরী দেখিতে পাওয়া যাইত না। রেবেকাও তাহার মাতার অকালমৃত্যুর জন্য জারের শাসনব্যবস্থাকেই দায়ী মনে করিত এবং সে তাহার পিতার ন্যায় গবর্ণমেণ্টকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করিত। যে রাজা নারীর নির্য্যাতন অনায়াসে উপেক্ষা করে, যে গবর্ণমেণ্ট নারী-নির্য্যাতকের প্রতি দণ্ডবিধানে উদাসীন, সেই রাজা ও তাঁহার শাসন-প্রণালীর ধ্বংস সে নিত্য কামনা করিত। রুসিয়ায় গবর্ণমেণ্টের এত বড় গুপ্ত শত্রু আর কেহ ছিল কি না সন্দেহ।

সলোমন কোহেন বহু দিন পূর্ব্বে নিহিলিষ্ট সম্প্রদায়ে যোগদান করিয়াছিল। নিহিলিষ্টদের সঙ্কল্পের সহিত তাহার আন্তরিক সহানুভূতি ছিল, এবং সে রুসিয়ার নিহিলিষ্টগণকে নানা ভাবে সাহায্য করিত; এমন কি, যে অর্থকে সে হৃদয়-শোণিত তুল্য মনে করিত, সেই অর্থও সে প্রচুর পরিমাণে নিহিলিষ্ট সম্প্রদায়ের হিতার্থ

মুক্তহস্তে ব্যয় করিত। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট কোন দিন তাহাকে সন্দেহ করিতে পারে নাই. রাজভক্ত সলোমন কোহেন নিহিলিষ্ট—ইহা গবর্ণমেণ্টের স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। কেহ বাইবেল ছুঁইয়া এ কথা বলিলেও গবর্ণমেণ্টের কোন কর্ম্মচারী তাহা বিশ্বাস করিতেন না. উন্মত্তের প্রলাপ মনে করিতেন।

জোসেফকে সেণ্টপিটার্সবর্গে প্রেরণ করা হইতেছে—কোহেন এ সংবাদ পূর্ব্বেই পাইয়াছিল' তাহার কারবার সংক্রান্ত চিঠিতে কৌশলে এ কথা তাহাকে জ্ঞাপন করা হইয়াছিল। সেই চিঠি রাজকর্ম্মচারীদের হাতেও পড়িয়াছিল, কিন্তু পত্রের কোন্ কথা কি অর্থে ব্যবহৃত হয়, তাহা তাহাদের বুঝিবার শক্তি ছিল না। 'রোগী সুস্থ হইয়াছে,'—এ কথা বলিলে 'নিহিলিষ্ট কয়েদী কারাগার হইতে গোপনে পলায়ন করিয়াছে' এই অর্থ বুঝাইতে পারে—এরূপ অভিধান এ পর্য্যন্ত কোন ভাষায় প্রকাশিত হয় নাই।

সলোমন কোহেনের সুবিস্তীর্ণ কর্ম্মশালায় রুসীয় কর্ম্মচারীর অভাব না থাকিলেও, তাহার বাসগৃহে রুশ নরনারীর স্থান ছিল না। জোসেফ তাহার গৃহে উপস্থিত হইলে একটি পরিচারিকা তাহার অভ্যর্থনা করিল। এই পরিচারিকাটি জর্ম্মাণ।

তাহাকে দেখিয়া পরিচারিকা বলিল, "মনিব মহাশয় আমাদের দেশ হইতে এক জন মিস্ত্রী আনাইবেন বলিয়াছিলেন; তুমিই বুঝি সেই মিস্ত্রী?—এখন কোথা হইতে আসিতেছ?"

জোসেফ বলিল, "আমি বার্লিন হইতে আসিতেছি।"

পরিচারিকা বলিল, "বহু দূর হইতে তোমাকে আসিতে হইয়াছে; পথশ্রমে তুমি কাতর হইয়াছ। আমার সঙ্গে ভিতরে চল; কিছু খাইয়া বিশ্রাম কর, তাহার পর মনিব মহাশয়কে তোমার সংবাদ জানাইব। তাঁহার সহিত দেখা করাইয়া তোমার শয়নের ব্যবস্থা করিব।"

কয়েক দিন পরে জোসেফ তৃপ্তির সহিত আহার করিয়া যেন নবজীবন লাভ করিল; তাহার ক্লান্তি দূর হইল। তাহার আহার শেষ হইলে পরিচারিকা তাহাকে সঙ্গে লইয়া অন্দরের একটি কক্ষে প্রবেশ করিল। সেই কক্ষের প্রবেশদ্বারে পশম-নির্ম্মিত একখানি অত্যন্ত স্থূল পর্দ্দা প্রসারিত ছিল। কক্ষটি অতি বৃহৎ, কিন্তু ছাদ তেমন উচ্চ নহে। সেই কক্ষের এক প্রান্তে একটি প্রকাণ্ড লোহার 'ষ্টোভ'; নানা প্রকার আস্‌বাবে কক্ষটি সুসজ্জিত। কক্ষের মধ্যস্থলে একটি বৃহৎ টেবল, টেবলের উপর নানা প্রকার খাতাপত্র, কাগজ, কেতাব থরে থরে সংরক্ষিত। কোহেন সেই টেবলের কাছে বসিয়া কি লিখিতেছিল। টেবলের উপর একটি ল্যাম্প জ্বলিতেছিল, কিন্তু তাহা পর্দ্দা দ্বারা এ ভাবে আবৃত যে, সেই কক্ষের অন্যান্য অংশের অন্ধকার অপসারিত হয় নাই। সেই কক্ষের এক কোণে আর একটি ছোট টেবলে আর একটি আলো জ্বলিতেছিল এবং একখানি চেয়ারে বসিয়া, সেই আলোকের সাহায্যে রেবেকা সিলাই করিতেছিল।

পরিচারিকা জোসেফকে সেই কক্ষে লইয়া গিয়া তাহার মনিবকে বলিল, "কর্ত্তা, আপনার নূতন মিস্ত্রী আসিয়াছে, তাহাকে লইয়া আসিলাম।"—পরিচারিকা সেই কক্ষ ত্যাগ করিল।

সলোমনের বয়স তখন পঞ্চাশ বৎসরের অধিক হয় নাই; কিন্তু তাহার আবক্ষপ্রলম্বিত দাড়ি পাকিয়া শণের মত সাদা হইয়া গিয়াছিল। তাহার চক্ষু উজ্জ্বল, দৃষ্টি অন্তর্ভেদী, নাসিকা খড়্গের ন্যায়; তাহার মাথায় প্রকাণ্ড টাক, আধখানা নারিকেল-মালার মত সাদা টুপী দিয়া মস্তকটি আবৃত। পরিধানে একটি পুরাতন গাউন। সলোমন কলমটি কানে গুঁজিয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে জোসেফের মুখের দিকে চাহিল। তাহার পর মৃদুস্বরে বলিল, "তুমিই নূতন মিস্ত্রী? তোমাকে দেখিয়া কাষের লোক বলিয়াই মনে হইতেছে।"

সলোমন উঠিয়া গিয়া স্বহস্তে দরজা বন্ধ করিয়া আসিল; তাহার পর চেয়ারে বসিয়া বলিল, "তোমার নামটি কি?"

জোসেফ বলিল, "আমার নাম জোসেফ কুরেট।"

সলোমন বলিল, "সময়ান্তরে তোমার সকল কথা শুনিব; এখন আমার কন্যার সহিত তোমার পরিচয় করিয়া দিই।"

সলোমনের কথা শুনিয়া রেবেকা উঠিয়া আসিল,

সে জোসেফের সম্মুখে হাত বাড়াইয়া দিল। জোসেফ রেবেকার মুখের দিকে চাহিয়া বিস্মিত—স্তম্ভিত হইল। এরূপ অপরূপ সুন্দরী সে জীবনে কখন দেখিয়াছে বলিয়া মনে হইল না। বার্থাও সুন্দরী, কিন্তু জোসেফের মনে হইল, বার্থা তাহার চরণ-স্পর্শেরও যোগ্য নহে। এ যেন মহিমময়ী দেবীমূর্ত্তি।

রেবেকা জোসেফের হাত ধরিয়া মধুর স্বরে বলিল, "তুমি আমার স্বদেশবাসী, তোমাকে আমাদের গৃহে অভিনন্দন করিতে আমার হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হইয়াছে। আমার চির-প্রিয় মাতৃভূমির পবিত্র স্মৃতি আমার হৃদয়ে উজ্জ্বলভাবে বিরাজ করিতেছে। আমি যখন স্বদেশের ক্রোড় হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছিলাম, তখন আমি নিতান্ত শিশু, কিন্তু দেশের কথা আমি মুহূর্ত্তের জন্য ভুলিতে পারি নাই; সেই পুণ্যভূমিতে ফিরিয়া যাইবার জন্য আমার প্রাণ কিরূপ আকুল হইয়া উঠে, তাহা আমার প্রকাশ করিবার শক্তি নাই।"

জোসেফ একটি কথাও বলিতে পারিল না, যেন তাহার বাকশক্তি বিলুপ্ত হইয়াছিল, সে মুগ্ধবৎ দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার মনে হইল, সে স্বপ্ন দেখিতেছে!

রেবেকা বোধ হয় তাহার মনের ভাব বুঝিতে পারিল, সে হাসিয়া বলিল, "তুমি পরিশ্রান্ত, এখন আর তোমার বিশ্রামের ব্যাঘাত করিব না; আশা করি, কিছু দিন তোমার এখানে থাকা হইবে। সময়ান্তরে তোমার সঙ্গে আলাপ করিব।"

রেবেকা সরিয়া গিয়া তাহার চেয়ারে বসিলে জোসেফ যেন কতকটা প্রকৃতিস্থ হইল। রেবেকার প্রতি শিষ্টাচারপ্রদর্শনের ত্রুটি হইয়াছে ভাবিয়া সে ক্ষুব্ধ হইল।

সলোমন কোহেন পুনর্ব্বার উঠিয়া গিয়া রুদ্ধ দ্বার পরীক্ষা করিয়া আসিল; তাহার পর জোসেফের কাঁধে হাত রাখিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "জোসেফ কুরেট, তুমি যে দেশে আসিয়াছ, সে দেশের ঘরের দেওয়ালগুলিরও কান আছে, পথের পাতরগুলার পর্য্যন্ত চোখ আছে। এখানে চারিদিকে চাহিয়া তোমাকে পা বাড়াইতে হইবে, এমন কি, নিশ্বাস ফেলিবার সময়েও তোমাকে সতর্ক থাকিতে হইবে। আমার কথা বুঝিতে পারিয়াছ?"

জোসেফ বলিল, "হাঁ, বুঝিয়াছি।"

সলোমন বলিল, "আমার আদেশে পরিচারিকা তোমাকে তোমার শয়নকক্ষে রাখিয়া আসিবে।—সেখানে তোমার সঙ্গে আবার আমার দেখা হইবে; তোমার যাহা বলিবার আছে, সেই সময় শুনিব, বুঝিয়াছ?"

জোসেফ বলিল, "হাঁ, বুঝিয়াছি।"

সলোমনের আহ্বানে পরিচারিকাটি সেই কক্ষে পুনঃ-প্রবেশ করিল, জোসেফ তাহার সহিত দোতলায় চলিল। দোতলার একটি কক্ষে তাহার শয়নের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল।

প্রায় দশ মিনিট পরে সলোমন কোহেন সেই কক্ষে প্রবেশ করিল; কোন দিকে কেহ আছে কি না, পরীক্ষা করিয়া সে দ্বার রুদ্ধ করিল; তাহার পর জোসেফের শয্যাপ্রান্তে উপস্থিত হইয়া বলিল, "জোসেফ, তুমি বিশ্বাসী বলিয়াই এখানে প্রেরিত হইয়াছ, ইহা নিশ্চয়ই তোমার অজ্ঞাত নহে।"

জোসেফ শয্যা হইতে উঠিয়া আসিয়া বলিল, "হাঁ, আমি বিশ্বাসের পাত্র।"—সে ছুরী দিয়া তাহার ওয়েষ্ট কোটের ভিতরের কাপড়ের পর্দ্দাটি কাটিয়া ফেলিল, এবং শিলাই খুলিয়া পূর্ব্বোক্ত ড্রাফ্‌ট ও কাগজখানি সলোমনের হাতে দিল।

সলোমন তাহা পরীক্ষা না করিয়াই পকেটে রাখিল, হাসিয়া বলিল, "জোসেফ, তুমি যেমন বিশ্বাসী, সেইরূপ বুদ্ধিমান্ ও সাহসী। তোমার কাযে আমি বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছি। এখন তুমি নিরুদ্বেগে নিদ্রা যাও।"

সলোমন সেই কক্ষ ত্যাগ করিলে জোসেফ শয্যায় শয়ন করিল বটে, কিন্তু অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার ঘুম আসিল না, রেবেকার কথাই পুনঃ পুনঃ তাহার মনে পড়িতে লাগিল; রেবেকার অপরূপ রূপ, মিষ্ট কথা, তাহার অপূর্ব্ব স্বদেশানুরাগ জোসেফের হৃদয়ে মোহজাল বিস্তার করিল; অবশেষে সে নিদ্রামগ্ন হইলেও স্বপ্নে দেখিতে পাইল, রেবেকা তাহার শিয়র-প্রান্তে দণ্ডায়মান হইয়া করুণ নয়নে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া আছে।

[ক্রমশঃ।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

নির্ব্বাসিতের দ্বীপ

কুলিয়ন দ্বীপ ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত একটি রমণীয় স্থান। এই দ্বীপের অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় ৬ হাজার। কুষ্ঠব্যাধিপীড়িত নরনারীদিগকে এই দ্বীপে নির্ব্বাসিত করিয়া রাখা হইয়া থাকে। এখানকার অধিবাসীমাত্রই কুষ্ঠরোগী।

কুলিয়ন বন্দরটি অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি। বর্ষাকাল ব্যতীত অন্য সময় দ্বীপটি সূর্য্যালোকিত। কুষ্ঠরোগীদিগের জন্য দ্বীপের একপ্রান্তে উচ্চভূমির উপর নগর নির্ম্মিত হইয়াছে। দ্বীপের পূর্ব্বভাগে একটি অন্তরীপ—তাহার উপর প্রস্তর-বিনির্ম্মিত স্পেনীয় গির্জ্জা। সমগ্র দ্বীপে এতদ্ব্যতীত আর কোনও প্রস্তর-নির্ম্মিত অট্টালিকা নাই। প্রথমতঃ এই অট্টালিকাটি দুর্গের হিসাবে ব্যবহৃত হইত। সে সময় এই দ্বীপে অতি সামান্য-সংখ্যক ঔপনিবেশিক বাস করিত। মোরো জলদস্যুগণের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্যই এই দুর্গ নির্ম্মিত হইয়াছিল। এখন আর জলদস্যুর ভীতি নাই। তবে তাহাদের বংশধরগণ ইদানীং বোর্ণিও হইতে গোপনে অহিফেন চালান দিবার ব্যবসায় করিতেছে। জল দস্যুর আক্রমণাশঙ্কা অন্তর্হিত হইবার পর হইতে দুর্গটি ধর্ম্মস্থানে পরিণত হইয়াছে। যেখানে পূর্ব্বে অস্ত্র-ঝঞ্ঝনা ও বন্দুকের শব্দ সমুত্থিত হইত, এখন তথায় ভগবানের পবিত্র নাম উচ্চারিত হইয়া থাকে। এক দারু-নির্ম্মিত উচ্চ চূড়া হইতে ঘণ্টাধ্বনি উত্থিত হইয়া কুষ্ঠরোগীদিগকে নিয়মিত সময়ে ধর্ম্মমন্দিরে সমবেত করিয়া থাকে। আর একটি চূড়া হইতে রাত্রিকালে আলোকরশ্মি বিকীর্ণ হইয়া থাকে। জলযান-সমূহ সেই আলোকধারার সাহায্যে নিরাপদে বন্দরে প্রবেশ করে। জাহাজের গতায়াত এখানে বড় একটা নাই। যখন আবহাওয়ার অবস্থা ভাল থাকে, সেই সময় মাসে একবার করিয়া জাহাজ কুলিয়ন বন্দরে আসিয়া থাকে; কখনও কখনও দেড় মাস বা দুই মাস অন্তরও জাহাজের দেখা পাইতে বিলম্ব ঘটে।

নির্ব্বাসিতের দ্বীপ—কুলিয়ন বন্দর

ধর্ম্মমন্দিরের পশ্চাদ্ভাগে 'নিপা' ও বংশনির্ম্মিত সহস্রাধিক কুটীর অবস্থিত। ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে সাধারণতঃ যে শ্রেণীর কুটীর দেখিতে পাওয়া যায়, এই কুটীরগুলি তদনুরূপ। এই কুটীরগুলি দৃঢ় নহে, একটা ঘূর্ণিবায়ু আসিলেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে। দুই চারিখানি কুটীরের অবস্থা কিছু ভাল। সম্মুখভাগ রেলিং দিয়া ঘেরা। কুষ্ঠাশ্রম যে ঢালু জমীর উপর নির্ম্মিত, তথায় বৃক্ষলতাদি ভালরূপ জন্মে না। দুই একটি ভাল গাছ অতি কষ্টে বর্দ্ধিত হইয়াছে। দ্বীপের এই অংশটি তৃণ-শস্য-বর্জ্জিত—শুধু ধূলি-সমাস্তৃত।

কুলিয়ন দ্বীপের একাংশে কুষ্ঠাশ্রম, অপরাংশে দ্বীপের শাসন-সংরক্ষণ বিভাগ। কতিপয় অট্টালিকায় রাজকর্ম্মচারীরা বসবাস করেন এবং কার্য্যালয় স্থাপিত। যে সকল বালক-বালিকা এই দ্বীপে জন্মগ্রহণের পর কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত নহে বলিয়া পরিগণিত হয়, তাহাদের বাসের জন্য একটা স্বতন্ত্র বাড়ী আছে। কুষ্ঠরোগীদিগের তত্ত্বাবধান ও চিকিৎসার জন্য যে কতিপয় চিকিৎসক, ধাত্রী এবং ধর্ম্মযাজক আছেন, তাঁহারাও কর্ম্মশেষে নগরের এই প্রান্তে অবস্থান করিয়া থাকেন।

কুষ্ঠরোগাশ্রমের ফটকের উপর লিখা আছে—"কুলিয়ন

কুষ্ঠ-উপনিবেশ।” তোরণ পার হইয়া সম্মুখে একটি ক্লব-গৃহ দেখিতে পাওয়া যাইবে। তথায় টেবল সজ্জিত। টেবলের উপর নানাবিধ পুস্তক ও সাময়িক পত্রিকা। কুষ্ঠব্যাধিপীড়িত বালক-বালিকাদিগের শিক্ষার জন্য স্কুলও এই উপনিবেশে আছে। ছাত্র-ছাত্রীগণ কুষ্ঠরোগগ্রস্ত; তাহাদের শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রীরাও কুষ্ঠরোগী। এক জন মার্কিণ-মহিলা এই উপনিবেশ দেখিবার জন্য কুলিয়নে গিয়াছিলেন। তিনি যখন কুলিয়ন দ্বীপে উপস্থিত হয়েন. তখন কুষ্ঠ শিক্ষালয়ে ১ শত ৫০ জন বালক-বালিকা প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করিতেছিল।

কুষ্ঠরোগীদিগের জন্য মৎস্য, বরফ ও বিদ্যুদালোক সরবরাহ করিবার ব্যবস্থা আছে। হাঁসপাতাল, রান্নাঘর কোন কিছুরই অভাব নাই। কুষ্ঠ উপনিবেশের অধিবাসীদিগকে অন্যত্র গিয়া আহার্য্যাদি সংগ্রহ করিতে হয় না। আশ্রমের অন্তর্গত বিস্তৃত ভূখণ্ডমধ্যে অনেকগুলি দোকান-ঘর। কোনটিতে বস্ত্রাদি, কোনও দোকানে শাক-সব্জী, কোথাও ফল-মূল প্রভৃতি সংগৃহীত হইয়া আছে। ভূমিভাগ যেখানে সর্ব্বোচ্চ—তথায় বসতি নাই—সেখানে শুধু সমাধিক্ষেত্র।

কুলিয়ন দ্বীপ পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কুষ্ঠ-উপনিবেশ। এত অধিকসংখ্যক কুষ্ঠরোগী আর কোনও স্থানে দেখিতে পাওয়া যাইবে না।

১৯০১ খৃষ্টাব্দে—ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ আমেরিকার অধিকারভুক্ত হইবার অব্যবহিত পরেই—দ্বীপপুঞ্জের কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্তদিগকে স্বতন্ত্রভাবে রাখিবার কল্পনা কার্য্যে পরিণত করিবার ব্যবস্থা হয়। অনেক অনুসন্ধানের পর কুলিয়ন দ্বীপই কুষ্ঠরোগীদিগের বাসস্থানের পক্ষে যোগ্য স্থান বলিয়া বিবেচিত হয়। ম্যানিলা হইতে কুলিয়ন দ্বীপ ২ শত মাইল (১ শত ক্রোশ) দক্ষিণে অবস্থিত। এই দ্বীপে অধিবাসীর সংখ্যা খুব অল্পই ছিল। সুতরাং তাহাদিগকে স্থানান্তরিত করিতে বিশেষ অসুবিধা ঘটে নাই। ইহা ছাড়া সুপেয় পানীয় জলের প্রাচুর্য্য থাকায়, কর্তৃপক্ষ এই দ্বীপটিকেই মনোনীত করিয়াছিলেন। দ্বীপের মধ্যে কৃষিকার্য্যের উপযোগী পর্য্যাপ্ত ভূখণ্ডও ছিল। মৎস্যের অভাবও ঘটিবে না। সন্নিহিত অপর দুই একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ ও কুলিয়ন দ্বীপের ভূমির পরিমাণ ৪ শত ৬০ বর্গ-মাইল। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে এই উপনিবেশে জাহাজে করিয়া প্রথম কুষ্ঠরোগীর দল লইয়া ডাক্তার হিসার উপস্থিত হয়েন। ইনি তখন এই দ্বীপের প্রধান স্বাস্থ্য-পরীক্ষক ডাক্তার ছিলেন। প্রথমতঃ কুষ্ঠরোগীদিগকে এই স্থানে স্বতন্ত্র অবস্থায় রাখিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল; তাহাদিগের চিকিৎসার কোনও বন্দোবস্ত তখনও হয় নাই। বৈজ্ঞানিক উপায়ে কুষ্ঠব্যাধি আরোগ্য করা সম্ভবপর কি না, পাশ্চাত্যজগতে তখন তাহার বিশেষ পরীক্ষা আরব্ধ হইয়াছে মাত্র।

কুলিয়ন দ্বীপস্থ কুষ্ঠরোগীদিগের বাসভবন

যে কয়টি দুরারোগ্য মহাব্যাধি আছে, কুষ্ঠ তাহার অন্যতম। উত্তরাধিকারসূত্রে এই ব্যাধি বহু দিন হইতে মানবজাতির মধ্যে সংক্রমিত হইয়াছে। কুষ্ঠব্যাধি সংক্রামক, ভীষণ এবং উহার নাম শুনিবামাত্র মন বিরূপ হইয়া উঠে। এই ব্যাধি হইতে আরোগ্যলাভ করা অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। শুধু পাশ্চাত্যদেশে নহে, পৃথিবীর সর্ব্বত্রই কুষ্ঠব্যাধি দুরারোগ্য বলিয়া পরিগণিত। পৃথিবীর ইতিহাস পাঠ করিলে দেখা যায়, দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বেও কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তি সমাজে অবজ্ঞাত ছিল, কেহ তাহার সন্নিধানে

কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্তগণ মোরগের লড়াই দেখাইতেছে

খৃষ্টাব্দে কাণ্টারবরীতে ইংলণ্ডের প্রথম কুষ্ঠাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়। এই দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া ইংলণ্ডের প্রত্যেক প্রধান প্রধান নগর এবং য়ুরোপের প্রসিদ্ধ স্থানসমূহে কুষ্ঠাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইতে থাকে। এক ফরাসীরাজ্যেই প্রায় ২ হাজার কুষ্ঠাশ্রম ছিল। সমগ্র য়ুরোপে অন্যান ২০ হাজার কুষ্ঠাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

কুষ্ঠরোগগ্রস্ত নরনারী মানব-সমাজে নিগৃহীত ও চির-অবজ্ঞাত। যে সকল স্থানের জনসাধারণ ইহাদিগের উপর নির্য্যাতনে বিরত, সেখানেও যাইতে ঘৃণা বোধ করিত। কোন কোন দেশে কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিকে জনসাধারণ লোষ্ট্রনিক্ষেপ করিয়া বধ করিত। য়ুরোপে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারিত হইবার পূর্ব্বে—বাইবেলের যুগে, মহাপ্রাণ যীশু কুষ্ঠব্যাধিপীড়িত নরনারীর দুর্দ্দশা দর্শনে করুণায় বিগলিতচিত্ত হইয়া তাহাদের প্রতি অনুকম্পা প্রকাশ করেন। আরিষ্টটল খৃষ্টজন্মের ৩ শত ৪৫ বৎসর পূর্ব্বে এসিয়া মাইনরে কুষ্ঠরোগের প্রাদুর্ভাবের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ভারতবর্ষের পুরাণাদিতে কুষ্ঠরোগীর নানাপ্রকার বর্ণনা আছে। কুষ্ঠব্যাধির চিকিৎসাপ্রণালীও ভারতীয় ভৈষজ্যতত্ত্বে দেখিতে পাওয়া যায়। রোমক সৈনিকগণ খৃষ্টজন্মের পূর্ব্বে এই ব্যাধি ইটালীতে প্রথম লইয়া যায়। রোম হইতে ক্রমে উহা স্পেনদেশে বিস্তৃত হয়। মধ্যযুগে, ধর্ম্মযুদ্ধের সময় এবং প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যের সূত্রপাত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র য়ুরোপে এই ব্যাধির বিস্তার ঘটে। এক সময়ে এই নিদারুণ ব্যাধি বসন্ত ও প্লেগের ন্যায় সমগ্র য়ুরোপে নিদারুণ ভীতিসঞ্চার করিয়াছিল।

প্রতীচ্যদেশ এই ব্যাধির আক্রমণ হইতে মুক্তিলাভের আশায় কুষ্ঠপ্রপীড়িত নরনারীদিগকে মানব-সমাজ হইতে স্বতন্ত্রভাবে রাখিবার পদ্ধতি অবলম্বন করে। ১০৯৬

ইহারা উপেক্ষিত অবস্থায় থাকিত। মানব-সমাজের সহিত ইহাদের কোনও সংস্রবই থাকিত না। কোনও বিশিষ্ট পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া, তাহারা যে জনসাধারণ হইতে বিভিন্ন, ইহার প্রমাণ দিতে হইত। কোনও কোনও স্থানে কুষ্ঠরোগীরা ঘণ্টা বাজাইয়া মাদ্রাজের পারিয়াদিগের ন্যায় তাহাদের আগমনসংবাদ বিজ্ঞাপিত করিত। কোনও সাধারণ জলাশয় বা নির্ঝরের নিকটে যাওয়াও তাহাদের পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল। সুস্থদেহ কোনও ব্যক্তির সহিত একত্র বসিয়া পানভোজন ত দূরের কথা, কুষ্ঠরোগী কোনও শিশুকে স্পর্শ করিতেও পাইত না। নাগরিকের কোনও প্রকার অধিকার এই দুর্ভাগ্যপীড়িত হতভাগ্যদিগের ছিল না। কোনও পুরুষ বিবাহের পর যদি জানিতে পারিত, তাহার স্ত্রী কুষ্ঠব্যাধিপীড়িত, তবে সে অনায়াসে তাহাকে ত্যাগ করিয়া অন্য রমণীর পাণিগ্রহণ করিত। নারীর পক্ষেও অনুরূপ ব্যবস্থা ছিল। ধর্ম্মমন্দিরের দ্বার কুষ্ঠরোগীর পক্ষে রুদ্ধ ছিল। তবে ধর্ম্মমন্দিরের বাহিরের প্রাচীরে কুষ্ঠরোগীদিগের জন্য ছিদ্র করিয়া রাখা হইত। সেই ছিদ্রপথে তাহারা মন্দিরের ছাদ দেখিয়া ধন্য হইত!

এইরূপ কঠোর পদ্ধতি অবলম্বন করার ফলে য়ুরোপে কুষ্ঠব্যাধির প্রকোপ বহুলাংশে হ্রাস পাইয়াছিল।

রত দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল রোগীর কাহারও হস্ত নাই, কেহ পদ-বিহীন, কাহারও সর্ব্বাঙ্গে বীভৎস রোগের ভীষণ ক্ষতচিহ্ন—দেখিবামাত্র মন আতঙ্কে ও ঘৃণায় শিহরিয়া উঠে। কিন্তু কুলিয়নের কুষ্ঠাশ্রমে এইরূপ কুষ্ঠরোগী নাই। অনেককে দেখিলেই মনে হইবে, তাহাদের দেহে কোনও ব্যাধির চিহ্নই নাই। গার্‌ট্রুড ইমারসন্ নাম্নী মার্কিণ মহিলা কুলিয়নে গিয়া কুষ্ঠাশ্রম পরিদর্শন করিয়া লিখিয়াছেন যে, অনেকেই নিয়মিত সময়ে প্রফুল্লচিত্তে স্ব স্ব কার্য্যে যোগদান করে।

স্পেনীয় পাদ্রীরা বালকদিগকে মিঠরির টুকরা বিতরণ করিতেছেন

কুলিয়নে কোনও প্রকার কর নাই। যাহাদের শরীরে সামর্থ্য আছে—তাহাদের প্রত্যেকেই কিছু না কিছু কায করিয়া থাকে। ঔপনিবেশিকদিগের প্রধান কার্য্য মাছ ধরা এবং কৃষি। দ্বীপের দক্ষিণ ও পশ্চিমাংশে উর্ব্বরা ভূমি প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান। এই অঞ্চলে কয়েক শত কুষ্ঠরোগী বসবাস করিতেছে। তাহারা জমী চাষ করিয়া শস্য, শাক-শব্জী ও ফল উৎপাদন করিতেছে। অবশ্য উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ সামান্য, কিন্তু কৃষিজাত এই সকল দ্রব্য তাহারা স্থানীয় সরকারের নিকট বিক্রয় করিয়া থাকে। ইহাতে আংশিকভাবে উপনিবেশের খাদ্যদ্রব্যের অভাব পরিপূর্ণ হইয়া থাকে। ঔপনিবেশিক সরকারের অধিক অর্থ ব্যয় করিবার সুযোগ ঘটিলে গমনাগমনের পথ প্রস্তুত হইতে পারিবে, এবং তাহাতে দূরবর্ত্তী স্থানে কৃষিকর্ম্ম করিয়া অধিকতর শস্য উৎপাদন ও বিক্রয়ের সুব্যবস্থা হইবার সম্ভাবনা। গমনাগমনের পথের অভাববশতঃ বহু ঔপনিবেশিক দ্বীপের নানা স্থানে ছড়াইয়া পড়িতে পারিতেছে না, শুধু কুলিয়ন সহরেই বাধ্য হইয়া ঘনসন্নিবিষ্টভাবে বসবাস করিতেছে।

মৎস্য শিকারের জন্য কুলিয়নে ৪টি যৌথ কারবার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। 'বান্‌সা'যোগে অথবা বাঁশের ভেলায় চড়িয়া মৎস্য-শিকারীরা উপসাগরে মৎস্য ধরিবার জন্য গমন করিয়া থাকে। নির্ব্বাসিত কুষ্ঠরোগীদিগের মধ্যে কেহ কেহ মৎস্য ধরিবার অবকাশে কখনও কখনও পলায়নের চেষ্টা করিয়া থাকে, কিন্তু তাহাদের এ প্রচেষ্টা সফল হইবার কোনও সম্ভাবনা নাই। ভেলায় চড়িয়া দুস্তর অর্ণব উত্তীর্ণ হওয়া কল্পনারও অতীত। এ জন্য এখন আর কোনও কুষ্ঠরোগী এইরূপ ব্যর্থ চেষ্টা করে না। মৎস্য শিকার করিবার জন্য যে যৌথ কারবার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহার স্বত্বাধিকারীরা স্থানীয় সরকারের সহিত এইরূপ সর্ত্ত করিয়াছেন যে, যত মাছ উঠিবে, সমুদয়ই সরকারকে বিক্রয় করিতে হইবে। স্বত্বাধিকারীরা ৩০ হইতে ৪৫ টাকা মাসিক মাহিনা দিয়া ধীবর নিযুক্ত করে। সূত্রধর, মুচি, রুটীওয়ালা, নাপিত, আলোকচিত্রকর, ফলওয়ালা, তরকারী-বিক্রেতা প্রভৃতি উপনিবেশের মধ্যে দ্রব্য বিনিময় করিয়া ব্যবসা চালাইয়া থাকে। তত্রত্য বালক-বালিকারাও কিছু না কিছু অর্থ উপার্জ্জন করে। বালকগণ অপেক্ষাকৃত ধনীর গৃহে বালকভৃত্যের কায করে; বালিকারা বয়স্ক মহিলাদিগের সঙ্গে সঙ্গে সূচের কায অথবা বস্ত্রাদি ধৌত করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিয়া থাকে। যাহারা সবল ও সুস্থ, এমন পুরুষ ব্যতীত অন্যান্য পুরুষগণ—যাহারা সরকারী কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া অর্থোপার্জ্জনে সমর্থ, এমন লোকদিগকে সরকারপক্ষ কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া তাহাদিগকে সাপ্তাহিক নির্দ্দিষ্ট ভাতা ছাড়াও

প্রায় দশ আনা করিয়া পারিশ্রমিক প্রদান করিয়া থাকেন।

তত্রত্য সরকারের প্রধান লক্ষ্য এই যে, প্রত্যেক কুষ্ঠরোগীই যেন আত্মনির্ভরশীল হইতে পারে। কিন্তু উপনিবেশ হইতে রপ্তানী করিবার কোনও পদার্থই নাই বলিয়া সরকারকে নানা অসুবিধা ভোগ করিতে হইতেছে। যে সকল নূতন কুষ্ঠরোগী এই দ্বীপে নীত হয়, সরকারপক্ষ তাহাদিগের প্রত্যেককে তিনটি পদার্থ সরবরাহ করিয়া থাকেন—পেয়ালা, সানকী ও চামচ। নবাগত রোগীদিগকে প্রথম সপ্তাহে স্বতন্ত্র স্থানে রাখা হয়। তাহার পর অস্থায়িভাবে একই গৃহে তাহাদিগকে কিছু দিন যাপন করিতে হয়। এই সময় তাহাদিগকে কিছু অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়া থাকে। কিছু কাল পরে নবাগতগণ যে সকল জিলা হইতে আসিয়াছে, তত্রত্য অনেক পুরাতন বন্ধু বা আত্মীয়ের সন্ধান এই উপনিবেশে পাইয়া থাকে। তাহারা উহাদিগকে স্ব স্ব গৃহে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যায়। ঔপনিবেশিকগণের দুই-তৃতীয়াংশ স্ব স্ব ভবনে বাস করিয়া থাকে। সাধারণতঃ কুষ্ঠরোগীদিগের আত্মীয়গণ অর্থ-সাহায্যের দ্বারা তাহাদিগকে সূত্রধরের কার্য্য শিখাইয়া থাকে। সরকারপক্ষ আংশিকভাবে যন্ত্রাদি সরবরাহ করিয়া থাকেন। সরকার প্রায় ৪ শত জন লোককে প্রত্যেক বিষয়ে নিযুক্ত করিয়া থাকেন। শান্তিরক্ষক, সূপকার, হাঁসপাতালের সহকারী, শিক্ষক, ঝাড়ুদার ও মেথর প্রভৃতি সকল কার্য্যেই কুষ্ঠরোগীরা অর্থ-বিনিময়ে কায করিয়া থাকে। প্রত্যেকেরই পারিশ্রমিকের হার দৈনিক পাঁচ সিকা। কেহ কেহ অর্থাৎ যাহারা শান্তিরক্ষক প্রভৃতি কার্য্যে নিযুক্ত হয়, তাহাদিগকে উৎকৃষ্টতর খাদ্য, জুতা এবং টুপী প্রভৃতি অতিরিক্ত দেওয়া হইয়া থাকে। বৎসরে দুই বার করিয়া সরকার সকলকে সাধারণ পরিচ্ছদ প্রদান করেন। সমগ্র উপনিবেশের মধ্যে ৫ শত জনকে সরকার খাদ্য বিলাইয়া থাকেন। যদি পর্য্যাপ্ত মৎস্য না পাওয়া যায়, তাহা হইলে সরকারপক্ষ অন্য স্থান হইতে মৎস্য আমদানী করিয়া বিলাইয়া থাকেন। প্রতি সপ্তাহে—মঙ্গলবারে সন্নিহিত দ্বীপ হইতে ছাগ-মেষাদি আমদানী করিয়া বলি দেওয়া হয়। সেই মাংস মৎস্যের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মঙ্গলবারটি উপনিবেশের একটি বিশিষ্ট দিন।

বৈদেশিকগণ কদাচিৎ এই উপনিবেশে গমন করেন। যদি কেহ কখনও তথায় পদার্পণ করেন, তখন উপনিবেশে বেশ সাড়া পড়িয়া যায়। তাঁহার সম্মানার্থ নানা প্রকার উৎসবের আয়োজন হইয়া থাকে। কুষ্ঠরোগীদিগের মধ্যে গীত-বাদ্যাদিরও আয়োজন আছে। নৃত্য-গীত, অভিনয় প্রভৃতিও কুষ্ঠরোগীদিগের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। মুরগীর লড়াই উহাদিগের প্রিয় ক্রীড়া।

কুষ্ঠাশ্রমের তোরণ

ক্যাথলিক মিশনারীরা কুষ্ঠরোগীদিগের সেবায় আত্মোৎসর্গ করিয়া থাকেন। এখানে যে সকল মিশনারী আছেন, তাঁহারা কায়মনোবাক্যে কুষ্ঠরোগীদিগের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। পরার্থে এমন ত্যাগ সত্যই বিস্ময়কর। সেবিকা নারীগণের অধিকাংশই এই উপনিবেশে প্রায় ২০ বৎসর ধরিয়া বাস করিতেছেন। কিছু দিন পূর্ব্বে যখন ম্যানিলার রাজনীতিক ব্যাপারে দেশের সমগ্র অর্থ ও চিন্তা নিযুক্ত হইয়াছিল, তখন এই নারীগণই সমগ্র কুষ্ঠ-উপনিবেশের যাবতীয় কার্য্যের ভার গ্রহণ

করিয়াছিলেন। সিষ্টার ক্যালিক্সটি ১৯২১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত একাকিনী অস্ত্র-চিকিৎসকের কায করিয়াছিলেন। কতিপয় কুষ্ঠরোগগ্রস্তা নারীর সাহায্যে তিনি প্রতি সপ্তাহে দুই শত রোগীর ক্ষত পরিষ্কার প্রভৃতি কার্য্য সম্পাদন করিতেন। হস্ত, পদ ও অঙ্গুলির উপর অস্ত্রোপচার করা, দন্ত উৎপাটন প্রভৃতি কঠিন কার্য্যগুলি তাঁহাকে একাই করিতে হইয়াছিল। দৈহিক চিকিৎসার সঙ্গে সঙ্গে রোগীদিগকে তিনি ধর্ম্মোপদেশও দিতেন। তাহাদিগের আত্মার তৃপ্তিবিধান তাঁহার জীবনের প্রধান ব্রত হইয়াছিল।

শুশ্রূষাকারিণী সেবিকাগণ সমস্ত দিন রোগীর পরিচর্য্যার পর অপরাহ্ণ সাড়ে ৫টার সময় প্রত্যহ নির্দ্দিষ্ট আবাসে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। বস্ত্রপরিবর্ত্তনের পর তাঁহারা অতি সামান্য ও সাধারণ আহার্য্য দ্বারা ক্ষুন্নিবৃত্তি করিয়া থাকেন। বড়দিনের উৎসবের সময় মিশনারী-মহিলারা তাঁহাদের ক্ষুদ্র গির্জ্জায় ভগবানের আরাধনার আয়োজন করিয়া থাকেন। ফরাসী ভাষায় ভগবানের নাম গীত হয়। গৃহের কথা এই শান্তপ্রকৃতি, পরার্থ-পরায়ণা নারীদিগের মনে কদাচিৎ উদিত হইয়া থাকে। রোগক্লিষ্ট নরনারীদিগকে সুস্থ করিয়া তুলাই তাঁহাদিগের একমাত্র উদ্দেশ্য।

উপনিবেশটি যখন প্রথম স্থাপিত হয়, কর্ত্তৃপক্ষের এই সঙ্কল্প ছিল যে, স্বাভাবিকভাবে এ স্থানের জীবনযাত্রা যাহাতে নির্ব্বাহিত হয়, তাহার ব্যবস্থা করিয়া রাখিতে হইবে। তখন সকলের বিশ্বাস ছিল যে, কুষ্ঠব্যাধি দুরারোগ্য। ঔপনিবেশিকগণ নির্দ্ধারিত জীবনের পরিসমাপ্তির জন্য প্রতীক্ষা করিয়া থাকিত। কিন্তু এই সকল রোগীর মৃত্যু ত সহজে আইসে না। কোনও রোগীকে—নিতান্ত প্রয়োজন না ঘটিলে, বন্দী করিয়া রাখা হইত না। কাযেই পুরুষ ও নারীদিগকে স্বতন্ত্রভাবে রাখিবার কোনও ব্যবস্থা ছিল না। বিবাহ ব্যাপারটা কুলিয়নে বন্ধ না থাকিলেও কর্ত্তৃপক্ষ ইহার বড় একটা প্রশ্রয় দিতেন না। কিন্তু তথাপি বিবাহ হইত। ইহার ফলে বৎসরে এই স্থানে প্রায় ৬০টি বালকবালিকা ভূমিষ্ঠ হইয়া থাকে। যাহারা বাঁচিয়া থাকে, তাহাদের অনেকের মধ্যে রোগের লক্ষণ প্রকাশও পায় না। ৬।৭ বৎসর তাহারা

কুষ্ঠাশ্রমের শুশ্রূষাকারিণীগণ

পিতৃ-মাতার নিকট অবস্থান করে। এরূপ অবস্থায় অনেকের কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনাও ঘটে।

ফিলিপাইন গবর্ণমেণ্ট প্রতি বৎসর অন্যান্য স্থান হইতে জাহাজে করিয়া অনেক কুষ্ঠরোগাক্রান্ত বালক-বালিকাকে এই উপনিবেশে লইয়া আসেন। উহার সংখ্যা কম নহে। কোনও কোনও বৎসর পাঁচ শতাধিক এইরূপ বালকবালিকা উপনিবেশে আনীত হয়। কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাদের অধিকৃত স্থানসমূহ হইতে সন্ধান করিয়া কুষ্ঠ-ব্যাধিগ্রস্ত শিশুদিগকে ধৃত করেন। বয়স্ক রোগীরা যন্ত্রণার আতিশয্যে অনেক সময় আপনা হইতে আত্ম-সমর্পণ করিয়া থাকে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হৃদয়-বিদারক দৃশ্যের অভিনয় হইয়া থাকে। মাতৃ-অঙ্কবিচ্যুত শিশু ক্রন্দন করিতে থাকে। পিতামাতার মনের অবস্থাও কল্পনা করা দুরূহ নহে।

কুষ্ঠব্যাধি উত্তরাধিকারসূত্রে ঘটে না, উহা বংশানুক্রমিক নহে। কুষ্ঠরোগাক্রান্ত দম্পতির সন্তান যে কুষ্ঠ-রোগী হইবে, এমন কোনও কথা নাই বলিয়া বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন। তবে রোগগ্রস্ত পিতামাতার সংস্রবে থাকিয়া শিশুগণ এই রোগের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া থাকে। কুষ্ঠব্যাধির সংক্রামকতা দোষ আছে। তবে অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধির ন্যায় ইহার প্রচণ্ডতা নাই। অতি ধীরে ধীরে ইহা দেহে সংক্রামিত হইয়া থাকে। কি কি কারণে ইহা ঘটিয়া থাকে, চিকিৎসকগণ এখনও তাহার মূল নির্ণয় করিতে পারেন নাই। কাহারও কাহারও মতে কুষ্ঠরোগের বীজাণু নাসিকার অভ্যন্তরে, কণ্ঠমধ্যে এবং ক্ষতস্থানে অবস্থিতি করে। হাঁচি, কাসি প্রভৃতি হইতে

এই রোগের বীজাণু অন্যদেহে সংক্রমিত হয়। কুষ্ঠরোগী যে ধূলির উপর দিয়া হাঁটিয়া যায়, তাহা হইতে রোগ সংক্রমিত হইতে পারে। এক ঘরের বদ্ধ বাতাসেও উহার বীজাণু রহিয়া যায়। স্বাস্থ্যতত্ত্বের সাধারণ নিয়মগুলি পালন করিলে কুষ্ঠব্যাধির আক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়া যাইতে পারে। রোগের বীজাণুগুলি অল্পেই বিনষ্ট হয়। এক জন রোগীর দেহ হইতে নির্গত হইবার অল্পক্ষণ পরেই তাহারা বিনষ্ট হইয়া যায়।

কুষ্ঠতত্ত্ববিদ্‌গণ এখনও স্থির করিতে পারেন নাই, কত দিনে কুষ্ঠরোগের লক্ষণ রোগীর দেহে পরিপুষ্ট হইয়া উঠিতে পারে। দুই বৎসরের কমে কোনও দেহে রোগ পরিপুষ্টিলাভ করে নাই বলিয়া বিশেষজ্ঞগণ মত প্রকাশ করিয়াছেন। একবার কোনও ৩ বৎসরের বালিকাকে দুই জন মার্কিণ শিক্ষক পোষ্য-কন্যারূপে পালন করেন। পরে তাহাকে তাঁহারা যুক্তরাজ্যে লইয়া যায়েন। ১৬ বৎসর বয়সে এই বালিকার দেহে কুষ্ঠব্যাধির লক্ষণ প্রকাশ পায়। বালিকাকে তখন ফিলিপাইন দ্বীপে ফিরাইয়া পাঠান হয়। ১৩ বৎসর পূর্ব্বে এই বালিকার দেহে রোগের বীজ প্রবেশ করিয়াছিল বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে। এই বালিকা চিকিৎসাগুণে ক্রমশঃ আরোগ্য-লাভের পথে চলিয়াছে।

ভারতবর্ষে কুষ্ঠরোগীর চিকিৎসার জন্য চালমুগরা গাছের তৈল বা নির্য্যাস ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বিশেষজ্ঞগণ এই গাছের শক্তি পরীক্ষা করিয়া বুঝিয়াছেন যে, ইহার নির্য্যাস বা তৈলে সত্যই কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত নিরাময় হইয়া থাকে। সার লিওনার্ড রজার্স চালমুগরার গাছ পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছেন যে, এই বৃক্ষে এমন গুণ আছে যে, তাহার দ্বারা কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্তকে নিরাময় করিতে পারা যায়। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ এই বৃক্ষের সাহায্যে ব্যাধি-নিবারক নানা প্রকার ঔষধ তৈয়ার করিতেছেন। ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে এই গাছের চাষ আরম্ভ হইয়াছে।

কুলিয়ন কুষ্ঠাশ্রমের শেষ সংবাদ ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে জানা যায় যে, ৩ হাজার ২ শত রোগী সাধারণভাবে চিকিৎসিত হইতেছিল, তন্মধ্যে শতকরা ৭৫ জনের রোগের উপশম হইয়াছে; এবং প্রায় সাড়ে ৪ শত রোগীর দেহে ব্যাধির বীজাণু আর পাওয়া যাইতেছে না। সম্ভবতঃ আরও ৩ শত জন এই পর্য্যায়ে শীঘ্রই উপনীত হইবে। যাহাদের শরীরে এই রোগের বীজাণুর অস্তিত্ব নাই বলিয়া বিবেচিত হইবে, তাহাদিগকে আরও দুই বৎসর পরীক্ষাধীন রাখা হইবে। যদি বীজাণুর অস্তিত্ব অবশিষ্ট থাকে, তবে দুই বৎসরের মধ্যে পুনরায় তাহার আবির্ভাব ঘটিবেই। যে সকল রোগী সম্পূর্ণভাবে ব্যাধিমুক্ত হইয়াছে, এমন অনেক লোক কুলিয়নে এখনও অবস্থান করিতেছে। ১ শত ৯৬ জন সম্পূর্ণভাবে রোগমুক্ত হইয়া স্ব স্ব দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছে।

যে সকল রোগী অন্যান্য ব্যাধিতে কষ্ট পাইয়া থাকে, তন্মধ্যে ক্ষয়রোগ এবং দৌর্ব্বল্য-সংক্রান্ত ব্যাধিতে যাহারা আক্রান্ত, তাহাদের কুষ্ঠব্যাধি সহজে নিরাময় হয় নাই। এক সময়ে কুলিয়নে ৪ হাজার ২ শত ২৫ জন রোগী চিকিৎসিত হইতেছিল, তন্মধ্যে অনেকগুলি রোগীর আশা ছাড়িয়া দিতে হইয়াছিল। কারণ, তাহাদের মধ্যে ক্ষয়-রোগাক্রান্ত লোক ছিল। শুধু অর্দ্ধেক রোগীকে কুষ্ঠব্যাধির চিকিৎসাধীন রাখা হইয়াছিল। পরীক্ষায় প্রকাশ পাইয়াছে যে, নারীরাই শীঘ্র নিরাময় হইয়া উঠে। বিশেষতঃ যাহারা যুবতী, তাহাদের রোগের আক্রমণ প্রতিহত করিবার ক্ষমতা অধিক। চালমুগরার তৈল বা নির্য্যাস লইয়া অভিজ্ঞগণ বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহাদের অভিমত, এই বৃক্ষের যে শক্তি আছে, তাহাকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে অন্যান্য ঔষধের সহিত মিলাইয়া লইলে কুষ্ঠরোগ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রশমিত হইবে। ভারতীয় বৈদ্যগণ চালমুগরার গুণের কথা অনেক পূর্ব্বেই নির্ণয় করিয়া গিয়াছেন।

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ।

রূপের মোহ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

প্রভাত হইতেই আকাশে মেঘ জমিয়া রহিয়াছে। মাঝে মাঝে দুই এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গেলেও মেঘ কাটিতেছিল না। শরতের আকাশে যেরূপ ঘনঘটা করিয়া রহিয়াছে, তাহাতে বর্ষাকাল বলিয়া ভ্রম হইতেছিল। রবিবারের দীর্ঘ দিবা কিছুতেই শেষ হইতে চাহে না। সমস্ত মধ্যাহ্ন টেনিসনের পাতা উল্টাইয়া এবং দুইটি কবিতা লিখিয়াও উদীয়মান কবি রমেন্দ্রনাথের সময় যেন ফুরাইতেছিল না। আজিকার দিনটা কাব্য-চর্চ্চার পক্ষে অনুকূল, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু সারাদিন কাহারও সহিত বাক্যালাপ না করিয়া কি থাকা যায়? মেসের অন্যান্য বন্ধু আজ সকালেই ষ্টীমারে বেড়াইতে গিয়াছে। চড়িভাতি করিবে বলিয়া ষ্টোভ প্রভৃতি এবং প্রচুর খাদ্য-দ্রব্য সঙ্গে লইয়া গিয়াছে। রমেন্দ্রও যাইবার জন্য অনুরুদ্ধ হইয়াছিল; কিন্তু প্রভাতের মেঘনম্র আকাশের অবস্থা দেখিয়া সে গৃহকোণ ছাড়িয়া ষ্টীমার পার্টির আনন্দ উপভোগ করিতে স্বীকৃত হয় নাই। বাদলার দিনে নিরালায় বসিয়া কবিতা রচনা করিবার ইচ্ছাবশতই সে জলযাত্রার প্রলোভন ত্যাগ করিয়াছিল। কিন্তু সারাদিন নির্জ্জনে থাকিবার পর কবিতা-চর্চ্চার মোহ যখন অন্তর্হিত হইল, তখন সে ভাবিল, আজ সে বড়ই ঠকিয়াছে। তরঙ্গায়িত নদীবক্ষে, দোলায়মান ষ্টীমারে চড়িয়া, প্রসন্ন স্নিগ্ধ পবনের আনন্দ-হিল্লোল উপভোগ, মেঘ-মেদুর আকাশের বিচিত্র মুগ্ধশোভা দর্শন এবং বন্ধুজনের রহস্যালাপ শ্রবণে যে তৃপ্তি জন্মিত, ঘরে বসিয়া তাহা ঘটিল না ত! সারাদিন ভ্রমণের পর হৃদয়ে যে বিমল আনন্দ জন্মিত, তাহার ফলে রাত্রিকালে উৎকৃষ্টতর কবিতা রচিত হইতে পারিত। কিন্তু এখন বৃথা অনুশোচনা করিয়া কোনও ফল নাই!

সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিল। তখনও বন্ধুবর্গ ফিরিয়া আসিল না দেখিয়া রমেন্দ্র উঠিয়া দাঁড়াইল। খাতাখানি ড্রয়ারের মধ্যে বন্ধ করিয়া সে আকাশের দিকে চাহিল। আজ রবিবার, ছাত্রটিকে পড়াইতে যাইবার প্রয়োজন নাই। বন্ধুরা ফিরিয়া না আসা পর্য্যন্ত ঘরে বসিয়া থাকাও অত্যন্ত বিরক্তিকর। রমেন্দ্র চাদরখানা স্কন্ধে ফেলিয়া পথে বাহির হইল।

তখন বৃষ্টি পড়িতেছিল না। দ্বিপ্রহরের বারিপাতে রাজপথ কর্দ্দমাক্ত, পিচ্ছিল। গ্যাসের আলোক জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। রাজপথ জনকোলাহল-মুখর। কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট ধরিয়া রমেন্দ্র উত্তরাভিমুখে চলিল। হেদোর ধারে সে খানিক বেড়াইয়া আসিবে সংকল্প করিয়াছিল।

কিয়দ্দূর অগ্রসর হইবার পর সহসা একটা চীৎকার ও গোলমাল শুনিয়া রমেন্দ্র সম্মুখে চাহিয়া দেখিল—অদূরে একখানা গাড়ী তীব্রবেগে ছুটিয়া আসিতেছে; কোচম্যান প্রাণপণ বলে রাশ টানিয়া ঘোড়াকে সংযত করিবার চেষ্টা করিতেছে; কিন্তু অশ্ব কিছুতেই বাগ মানিতেছিল না। গাড়ীর ভিতর হইতে কতিপয় ভয়ার্ত্তা রমণীর চীৎকার শুনা গেল; এক জন পুরুষ শরীরের পূর্ব্বার্দ্ধ বাহির করিয়া নামিয়া পড়িবার চেষ্টা করিতেছিলেন। রাজপথের দুই পার্শ্বে লোক জমিয়া গেল; সকলে 'থামাও, থামাও!' শব্দে চীৎকার করিতে লাগিল; কিন্তু কেহই সাহায্যার্থ অগ্রসর হইল না।

মুহূর্ত্ত দৃষ্টিপাতে রমেন্দ্র সমস্ত ব্যাপারটা বুঝিয়া লইল। সে কবি বটে; কিন্তু তাহার শরীরে অসুরের ন্যায় শক্তি ও মনে সাহস দুই-ই ছিল। ভয় কাহাকে বলে, তাহা সে জানিত না। ঘোড়া তখন ফুটপাতের উপর উঠিবার উপক্রম করিতেছিল। রমেন্দ্র একলম্ফে ঘোড়ার সম্মুখীন হইল, বিচার-বিতর্ক না করিয়াই দৃঢ়হস্তে সবলে অশ্বের মুখরজ্জু আকর্ষণ করিল। অকস্মাৎ বাধা পাইয়া ঘোড়া মুখ ছাড়াইয়া লইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। রমেন্দ্র কায়দা করিয়া ঘোড়াকে ভীমবলে রাজপথের উপর টানিয়া আনিল—গাড়ী থামিয়া গেল।

তখন চারিদিক্ হইতে লোক ছুটিয়া আসিতে লাগিল। পুরুষ অশ্বারোহী গাড়ী হইতে লাফাইয়া পড়িয়াছিলেন। রমণীরাও তাড়াতাড়ি নামিয়া পড়িলেন। সহিস আসিয়া অশ্বরজ্জু ধারণ করিল।

মুহূর্ত্তমধ্যে এত বড় কাণ্ড ঘটিয়া গেল।

আরোহী পুরুষ তখন কৃতজ্ঞভাবে বলিলেন, "আজ আপনার অনুগ্রহে আমাদের প্রাণরক্ষা হ'ল; ধন্যবাদ,—কে? তুমি— রমেন?"

আগন্তুক দৃঢ়হস্তে রমেন্দ্রর হাত চাপিয়া ধরিলেন।

"সুরেশ?—তুমি কোথা থেকে?"

"তুমিই আজ আমাদের প্রাণদাতা!"

কুণ্ঠিতভাবে রমেন্দ্র বলিল, "ও কথা ছেড়ে দাও। তুমি এত দিন পরে কোথা থেকে এলে বল ত? শুনেছিলাম, তুমি সিবিল সার্ব্বিস পাশ ক'রে বিলেত থেকে এসেছ, কিন্তু কাষ নাওনি। তার বেশী আর কোন সংবাদ জান্‌তে পারিনি।"

"সে সব অনেক কথা, পরে হবে। এটি আমার বোন্—অমিয়া। তুমি ত চেনই। আর ইনি অমিয়ার ননদ, সুনীল বাবুর কনিষ্ঠা।"

রমেন্দ্র সহসা চমকিয়া উঠিল। এই সেই অমিয়া!—কত কাল পরে দেখা!

চারিদিকে কৌতূহলী জনতা দেখিয়া সুরেশচন্দ্র বলিলেন, "চল, বাড়ী ত কাছেই—তুমিও চেন। পিসীমা তোমাকে পেলে খুশী হবেন। কতবার তোমার খোঁজ তিনি নিয়েছেন। এস, গাড়ীতে যায়গা হবে।"

রমেন্দ্র একটু ইতস্ততঃ করিতেছিল; কিন্তু জনতার সকৌতুক দৃষ্টিপাত হইতে উদ্ধার পাইবার আশায় সে সুরেশের পার্শ্বস্থ স্থান অধিকার করিল। বাল্য-বন্ধুর সহিত অতর্কিত সাক্ষাতে তাহার হৃদয়ে নানাবিধ চিন্তার উদয় হইয়াছিল।

সুরেশ কোচম্যানকে গাড়ী ধীরে ধীরে চালাইতে বলিলেন। সহিস ঘোড়ার মুখরজ্জু ধরিয়া চলিল।

সুরেশচন্দ্র বলিলেন, "তুমি নিজের বিপদ তুচ্ছ ক'রে ঘোড়ার মুখ ধরেছিলে, তোমার সাহসকে ধন্যবাদ। গাড়ীখানি ত গিয়েছিলই, তাতে দুঃখ নাই; কিন্তু অমিয়া ও সরযূর যে কি ঘট্‌ত, তা ভাবতেও এখন শরীর শিউরে উঠছে!"

যুবতী-যুগলের বক্ষস্পন্দন, বোধ হয়, তখনও সম্পূর্ণ থামে নাই, কারণ, তখনও তাহারা নির্ব্বাক্‌ভাবে বসিয়া ছিল।

রমেন্দ্র বন্ধুর কথায় কান না দিয়া, আত্মসংবরণ করিয়া অমিয়ার দিকে চাহিয়া বলিল, "আপনি আমায় চিন্‌তে পারেন?"

অমিয়া তখন কতকটা প্রকৃতিস্থ হইয়াছিল। সে বলিল, "আমাকে আপনি বল্‌বেন না। ছেলেবেলা থেকে আপনি দাদার বন্ধু। আজ মোটে ৪ বছর দেখা-সাক্ষাৎ নেই। এত দিনের পরিচয় কি এত অল্প দিনে ভোলা যায়? সে কথা যাক্, আমাদের প্রাণরক্ষার জন্য আপনাকে কি ব'লে—"

বাধা দিয়া রমেন্দ্র বলিল, "ও কথা আর তুল্‌বেন না। কোন্ ভদ্রলোক এমন অবস্থায় চুপ ক'রে থাক্‌তে পারেন? এ আর এমন কি অদ্ভুত ব্যাপার করেছি—যার জন্য আপনারা এমন কুণ্ঠিত হচ্ছেন?"

সরযূ এতক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া ছিল। রমেন্দ্র তাহার অপরিচিত, কখনও তাহাকে সে দেখে নাই, তবে বহুবার অমিয়া ও সুরেশচন্দ্রের মুখে তাহার সম্বন্ধে আলোচনা শুনিয়াছে—রমেন্দ্রর নাম তাহার অপরিচিত নহে। সে শুনিয়াছিল, রমেন্দ্রনাথ সুরেশচন্দ্রের অন্তরঙ্গ বাল্যবন্ধু। কথা কহিবার অবকাশ না পাইয়া সে এতক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া ছিল, এখন অবসর পাইবামাত্র সে বলিয়া উঠিল, "সে কথা বল্‌বেন না। পথে এত লোক ত তামাসা দেখছিল। ভদ্রলোক যে দলের মধ্যে কেউ

ছিলেন না, এমন কথা বলা যায় না। কিন্তু প্রাণের মায়া ছেড়ে—কই, আর কাউকে ত আসতে দেখলাম না! সকলের প্রাণ কি সমান?"

রমেন্দ্র এতক্ষণ সরযুকে ভাল করিয়া লক্ষ্য করে নাই। এখন সে এই প্রগল্‌ভা যুবতীকে ভাল করিয়া দেখিবার চেষ্টা করিল। গাড়ীর মধ্যে অন্ধকার, ভাল করিয়া মূর্ত্তি দেখা যায় না। সহসা রাজপথের উজ্জ্বল গ্যাসালোক যুবতীর আননে প্রতিফলিত হইল। চকিত-দৃষ্টিতে সে সরযুকে দেখিয়া লইল। যুবতী দর্শনীয় বটে!

কথা ফিরাইয়া লইয়া রমেন্দ্র বলিল, "ও সব কথা যাক। সুরেশ, এত দিন তোমায় দেখিনি, কোথায় ছিলে বল ত? একখানা চিঠি পর্য্যন্ত লেখনি। তোমাদের বাড়ীতে অনেকবার সংবাদ নিয়েছি; কিন্তু ঠিক খবর জানতে পারিনি। শুধু শুনেছিলাম, সারা ভারতবর্ষটা তুমি ঘুরে বেড়াচ্ছ।"

সুরেশচন্দ্র বলিলেন, "সে কথা ঠিক। বিলেত থেকে এসে খালি ঘুরেই বেড়িয়েছি। আজ দুই দিন এলাহাবাদ থেকে এসেছি। এঁদের আজ মন্দিরে আস্‌বার ইচ্ছে হয়েছিল, তাই এনেছিলাম। বাড়ী ফিরবার সময় গাড়ীতে উঠেছি, হঠাৎ একটা দুষ্ট ছেলে লাল দেশলাই জ্বেলে ঘোড়ার সামনে ফেলে দিল। ঘোড়াটা অনেক দিন ধ'রে আস্তাবলেই ব'সে ছিল—আলো দেখে হঠাৎ এমন ক্ষেপে গেল।"

রমেন্দ্র বলিল, "এখন কলকাতায় থাক্‌বে ত?"

"বেশী দিন নয়, বড় জোর এক হপ্তা। তার পর পুরী যাব। অমিয়া কোন দিন সমুদ্র দেখেনি, আমিও ভবঘুরে। পুরীতে কিছু দিন থেকে তার পর আর কোথায় যাওয়া যাবে, তখন ঠিক ক'রে নেব।"

"তুমি চাকরীটা নিলে না কেন বল ত? কত লোক জেলার হাকিম হবার জন্ত লালায়িত, আর তুমি হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলে দিলে? টাকার অভাব তোমার নেই, তা জানি। উদরান্নের জন্ত বল্‌ছি না; কিন্তু ক্ষমতা ও পদগৌরব—সেটা ত তুচ্ছ নয়, কলে অন্ততঃ কমিশনার পর্য্যন্ত ত হ'তে পার্‌তে!"

সুরেশচন্দ্র গম্ভীরভাবে বলিলেন, "কি জান ভাই, পরীক্ষা পাশের একটা বাতিক বা নেশা, যা বল, আমার স্বভাব আছে। সকলে বলে, ও পরীক্ষাটা কঠিন, তাই ভাবলাম, দেখাই যাক্ না কেন? তা ছাড়া বিলাতটা দেখে আসবার আগ্রহ বরাবর ছিল। তাই এক ঢিলে দুই পাখী মারা গেল। দাসত্বটা কোন কালেই বাঞ্ছনীয় নয়, কি হবে? ক্ষমতা পেয়েই বা কি কর্‌ব? সেও ত ধার-করা ক্ষমতা! তা ছাড়া ক্ষমতার গর্ব্বে শেষে কি মনুষ্যত্বটা হারাব? না ভাই, ওতে আনন্দ নেই। তাই চাকরী স্বীকার করিনি। যাক্, সে সব কথা পরে আলোচনা করা যাবে। এখন বাড়ী এসেছি, চল, নামা যাক্।"

সরযু ও অমিয়া গাড়ী হইতে নামিয়া অন্তঃপুরের দিকে চলিয়া গেল। বন্ধুর হাত ধরিয়া সুরেশচন্দ্র গাড়ী-বারান্দার সন্নিহিত সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

দ্বিতলের একটি প্রশস্ত কক্ষমধ্যে সুরেশচন্দ্র রমেন্দ্রকে লইয়া গেলেন।

টেবল, চেয়ার, সোফা প্রভৃতির পরিবর্ত্তে সমগ্র কক্ষতল সতরঞ্চ-মণ্ডিত। তাহার উপর দুগ্ধফেন-শুভ্র জাজিম শোভা পাইতেছিল। বিলাতপ্রত্যাগত উচ্চশিক্ষিত অভিজাত সম্প্রদায়ের যুবকের ঘরে এরূপ বিচিত্র সজ্জা দেখিবার কল্পনা রমেন্দ্রর স্বপ্নেরও অতীত ছিল। সে দেখিল, কক্ষপ্রাচীরের এক দিকে ঈশা, পল প্রভৃতি প্রতীচ্য মহাত্মা এবং বুদ্ধ, চৈতন্ত, নানক, রামকৃষ্ণ প্রভৃতি ভারতীয় মন্ত্রদ্রষ্টা মহাপুরুষের চিত্র। অন্তত্র সেক্সপীয়র, মিলটন, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, টেনিসন, স্কট, ডিকেন্স, টলষ্টয়, হুগো, রামমোহন, বঙ্কিমচন্দ্র, বিদ্যাসাগর, হেমচন্দ্র, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি প্রাচ্য ও প্রতীচ্য মনীষী, কবি এবং ঔপন্তাসিকের তৈলচিত্র দুলিতেছে। কয়েকখানি উৎকৃষ্ট নিসর্গচিত্রও স্থানে স্থানে বিরাজিত। গ্রন্থরাজিপূর্ণ সুবৃহৎ আলমারীগুলি প্রাচীরপার্শ্বে সংরক্ষিত।

কয়েক বৎসর রমেন্দ্র এই বাড়ীতে প্রবেশ করে নাই। ইহার মধ্যে এত পরিবর্ত্তন? সে একমনে দেখিতেছে, এমন সময় সুরেশচন্দ্র বলিলেন, "কি দেখছ? আমার রুচির পরিবর্ত্তন? বিলেত থেকে এসে সর্ব্বদা হ্যাট, কোট, পেণ্টুলেন প'রে বেড়াব, টেবল, চেয়ার ব্যবহার কর্‌ব—তা না, এই ভূমিশয্যা? না ভাই, ও

দেশ থেকে ফিরে এসে বুঝেছি, ধুতি, জামা আর ভূমি-শয্যাই বাঙ্গালীর পক্ষে প্রশস্ত।"

সে বিষয়ে রমেন্দ্রেরও মতভেদ ছিল না।

জুতা ছাড়িয়া সুরেশচন্দ্র চাপিয়া বসিলেন। পূর্ব্ব-কথার আলোচনায় উভয়ে যখন নিযুক্ত, এমন সময় ঝি আসিয়া বলিল, "দাদাবাবু, পিসীমা ডাক্‌ছেন।"

পিসীমা অর্থে সুরেশচন্দ্রর পিসীমা। পরিচারিকা বহু দিনের, সুতরাং বর্ত্তমান গৃহ-স্বামীকে মিষ্টার ঘোষের পরিবর্ত্তে দাদাবাবুই বলিত। জনৈক পরিচারক এক-বার সুরেশচন্দ্রকে 'সাহেব' বলিয়া উল্লেখ করায় তিনি তাহাকে বিশেষভাবে ধমকাইয়া দিয়াছিলেন। তদবধি বাড়ীর কেহই তাঁহাকে 'সাহেব' বলিত না।

সুরেশচন্দ্র বলিলেন, "চল, রমেন।"

সে উঠিয়া দাঁড়াইল। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে সে কতবার পিসীমার স্বহস্তপ্রস্তুত ডুমুরের ডাল্‌না, মোচার ঘণ্ট, থোড় চচ্চড়ি, চাল্‌তার অম্বল খাইয়া গিয়াছে, তাহার অন্ত নাই। আজ সেই সকল পুরাতন স্মৃতি রমেন্দ্রর মনে পড়িতেছিল।

উভয় বন্ধু অন্দরে প্রবেশ করিল। বৃদ্ধা পিসীমা একখানি মাদুরের উপর বসিয়া ছিলেন। বরাবরই তিনি এই সংসারের কর্ত্রী। ভ্রাতার সহিত ধর্ম্মমত অথবা কোন কোন বিষয়ে সামাজিক রীতিনীতি সম্বন্ধে মত-ভেদ সত্ত্বেও তিনি চিরকাল নিজের আচার-ব্যবহারের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়া আসিয়াছিলেন। সে জন্য কোন পক্ষের কোন অসুবিধা হয় নাই। এখন ভ্রাতুষ্পুত্রও পিসীমার আচার-নিষ্ঠার সম্বন্ধে কোন প্রকার প্রতিবাদ করিতেন না। বরং যাহাতে তিনি পূর্ণমাত্রায় ও স্বচ্ছন্দে আপনার মতানুযায়ী চলিতে পারেন, সে দিকে সুরেশ-চন্দ্রের বিশেষ দৃষ্টি ছিল। একান্তমনে সুরেশচন্দ্র পিসী-মাতাকে শ্রদ্ধা করিতেন এবং আমিষের পরিবর্ত্তে পিসী-মার সযত্ন-প্রস্তুত নিরামিষ তরকারীর বিশেষ ভক্ত ছিলেন।

রমেন্দ্র পিসীমার পদধূলি গ্রহণ করিল।

পিসীমা সস্নেহে বলিলেন, "কি বাবা, রমেন, অনেক দিন তোমায় দেখিনি, বাড়ীর সব ভাল?"

রমেন্দ্র পার্শ্বস্থ আলোকিত কক্ষে দৃষ্টি স্থাপন করিয়া অন্যমনে উত্তর দিল, "আজ্ঞে, হ্যাঁ।"

"অমিয়া বল্‌ছিল, আজ নাকি তুমিই তা'দের বাঁচি-য়েছ? তুমি ঘোড়ার মুখ না ধর্‌লে আজ অদেষ্টে কি যে ঘটত। চিরজীবী হয়ে বেঁচে থাক, বাবা। তোমার গায় অসুরের মত বল হোক্।"

সুরেশ বলিলেন, "সে কথা ঠিক, পিসীমা। আজ রমেন সে সময় এসে না পড়লে সর্ব্বনাশ হয়ে যেত!—অমি কোথায় গেল?"

"ঐ ঘরে আছে, বাবা। জলখাবার ঠিক ক'রে সে তোমাদের জন্য ব'সে আছে। যাও বাবা, রমেন, তুমি ত ঘরের ছেলে।"

রমেন্দ্র বন্ধুর সহিত পার্শ্বস্থ আলোকিত কক্ষে প্রবেশ করিল। এই ঘরটি সম্পূর্ণ আধুনিক ভাবে সজ্জিত। সুরেশচন্দ্রের বসিবার ঘরের মত নহে। সুরেশচন্দ্রের পিতা এই ঘরটিকে 'ড্রয়িং রুম' হিসাবে ব্যবহার করি-তেন। পাশ্চাত্য রুচি অনুসারে ইহা সুসজ্জিত। পিতার স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রকাশের জন্য কক্ষটির শোভার কোনওরূপ পরিবর্ত্তন করেন নাই।

উজ্জ্বলালোকে রমেন্দ্র দেখিল, অমিয়া একখানি গদি-আঁটা চেয়ারের উপর বসিয়া আছে। সম্মুখের একটি শ্বেত পাতরের টেবলের উপর দুইখানি পাত্রে নানাবিধ ফলমূল ও মিষ্টান্ন সজ্জিত।

তাঁহাদিগকে আসিতে দেখিয়া অমিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। রমেন্দ্র দেখিল, কি সুন্দর! কয়েক বৎসর পূর্ব্বে যেমনটি দেখিয়াছিল, এখন আর ঠিক তেমন নাই। পরিপূর্ণ যৌবনের স্রোতের আবেগে সমগ্র দেহ-নদী যেন টল টল, ঢল ঢল করিতেছিল। রমেন্দ্র চমৎকৃত হইল। এক দিন হয় ত—কিন্তু থাক্, আজ সে অতীত স্মৃতিকে জাগাইয়া কোন লাভ নাই।

কিন্তু তথাপি রমেন্দ্রর হৃদয় আলোড়িত হইল।

স্নিগ্ধ কণ্ঠে অমিয়া বলিল, "আসুন। দাদা, রমেন বাবুকে নিয়ে ঐখানে ব'স। আমাদের এখানে কিছু খেতে আপনার আপত্তি নেই ত?"

রমেন্দ্রর আনন আরক্ত হইয়া উঠিল। সে একটু তীব্রভাবে বলিল, "আপত্তি?—আশ্চর্য্য! এখানে কি না খেয়েছি? সে সব কথা ভুলে গেছেন বুঝি?"

সুরেশ হাসিয়া বলিলেন, "ছেলেবেলার কথা, মানুষ

বড় হ'লে অনেক সময় সব ভুলে যায়। কেমন, না অমি?"

অমিয়া দৃষ্টি নত করিয়া বলিল, "ভুলিনি, তবে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মতের হয় ত অনেক পরিবর্ত্তন হয়, তাই বল্‌ছিলাম।"

পার্শ্বস্থ দরজা দিয়া সরযূ কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। সে বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া আসিয়াছিল। ভ্রাতৃজায়ার পার্শ্বে আসিয়া সে অনুচ্চ কণ্ঠে বলিল, "কি সব কথা হচ্ছে, বৌদি?" পরে রমেন্দ্রর দিকে ফিরিয়া ধীরভাবে বলিল, "আপনি বসুন, দাঁড়িয়ে রইলেন যে?"

রমেন্দ্র একখানা চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিল। উন্মেষিতযৌবনা, নবপরিচিতা তরুণীর সপ্রতিভ আত্মীয়তা তাহাকে মুগ্ধ করিয়াছিল কি?

জলযোগ শেষ হইলে সরযূ বলিল, "আজকের ঘটনাটা থেকে থেকে মনে পড়ছে, আর গা-টা শিউরে উঠছে! আপনি যতই তুচ্ছ ভাবুন না, রমেন বাবু, বাস্তবিক আপনি না থাকলে—"

বাধা দিয়া রমেন্দ্র বলিল, "আপনারা ব্যাপারটাকে যেমন ভাবে দেখছেন, তাতে ভবিষ্যতে কর্ত্তব্যপালনটাও লোক বাহাদুরী ব'লে ভাবতে আরম্ভ করবে। কর্ত্তব্য ছাড়া বেশী কিছু যে আমি করেছি, তা ত মনে হয় না।"

সুরেশচন্দ্র একটা পান মুখে দিয়া বলিলেন, "কর্ত্তব্য ক'জন পালন ক'রে থাকে, ভাই?—যাক্, রমেন যখন অত কুণ্ঠিত হচ্ছে, ও বিষয়ের আলোচনা বন্ধ থাক্। ভাল কথা, তুমি নাকি আজকাল এক জন কবি হয়েছ? সে দিন তোমার 'যূথিকা' পড়ছিলাম। বেশ লিখেছ, কবিতায় প্রাণ আছে। অমিয়া ভারী কঠোর সমালোচক, সেও তোমার কাব্যের প্রশংসা করেছে।"

সরযূ সবিস্ময়ে বলিল, "ইনিই কি যূথিকার কবি রমেন্দ্রনাথ? কবির হৃদয়ে সৈনিকের ন্যায় সাহসও আছে! এটা অভিনব বটে!"

রমেন্দ্র মস্তক নত করিল।

"অমি, বইখানা আন ত। আজ কবির সামনে তাঁ'র কাব্যখানা পড়া যাক্।"

এলাহাবাদ হইতে আসিবার সময় কতকগুলি নির্ব্বাচিত গ্রন্থও সঙ্গে আসিয়াছিল। অমিয়া যথাস্থান হইতে 'যূথিকা' সংগ্রহ করিয়া আনিল।

সুরেশচন্দ্র বলিলেন, "তোমার বইখানি আমি তন্ন তন্ন ক'রে পড়েছি।"

রমেন্দ্রর হৃদয় পুলকিত হইল। সে বলিল, "বাঙ্গালা সাহিত্য, বিশেষতঃ কবিতা পড়বার ধৈর্য্য তোমার আছে, জান্‌তাম না।"

"কেন? ছাত্রজীবনের কথা কি ভুলে গেছ?"

"না, তখন ত ভালবাস্‌তে; তবে—"

"ওঃ, বিলেত গিয়েছিলুম, তাই? কেন, বিলেতে গেলে কি মাতৃভাষার চর্চ্চার অধিকার থাকে না? না, পড়তে ঘৃণা হয়?"

বিব্রতভাবে রমেন্দ্র বলিল, "তা নয়, তবে কি না—"

অমিয়া বলিল, "দাদা কবিতার ভক্ত। বাঙ্গালা সাহিত্যের অত্যন্ত অনুরাগী।"

"কিন্তু এমন দাদার এমন বোন তুমি কি ক'রে হ'লে, বৌদি? কাব্যের প্রতি তোমার যে কোন আসক্তি আছে, তা ত মনে হয় না। তবে, রমেন বাবুর ভাগ্য ভাল যে, তুমি বইখানা পড়েছ।"

সুরেশচন্দ্র হাসিয়া উঠিলেন। অমিয়ার আননেও স্মিত হাস্যের রেখা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

রমেন্দ্র এই তরুণীর সরল আলাপে প্রীতি লাভ করিল।

তার পর কাব্য আলোচনা—পাঠ আরম্ভ হইল। ঘড়ীর কাঁটা সকলের অজ্ঞাতসারে সরিয়া যখন ঢং ঢং শব্দে দশ ঘটিকা ঘোষণা করিল, তখন চমকিতভাবে রমেন্দ্র উঠিয়া দাঁড়াইল। এত রাত্রি হইয়া গিয়াছে?

আর সে অপেক্ষা করিল না, বলিল, "আজ তবে আসি, ভাই।"

সুরেশচন্দ্র বলিলেন, "কা'ল সন্ধ্যার পর তোমার এখানে নিমন্ত্রণ রইল, আস্‌তে ভুলো না।"

অমিয়া বলিল, "হ্যাঁ, আপনার আসা চাই। আপনার আসা চাই। আমরা আপনার প্রতীক্ষায় থাক্‌ব।"

রমেন্দ্র বিদায় গ্রহণকালে বলিল, "নিশ্চয় আস্‌ব।"

পিসীমাকে প্রণাম করিয়া সে অন্যমনস্কভাবে মেসের দিকে চলিল। [ক্রমশঃ।

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ।

স্বামী বিবেকানন্দ ও জাতিগঠন

১

প্রায় ছাব্বিশ বৎসর পূর্ব্বে লাহোরে এক বক্তৃতায় আচার্য্যদেব বলিয়াছিলেন, "* * বর্ত্তমান যুগের ঘোষণা-বাণী আমাদিগকে বলিতেছে, যথেষ্ট হইয়াছে, প্রতিবাদ যথেষ্ট হইয়াছে, দোষোদ্ঘাটন যথেষ্ট হইয়াছে, পুনঃ-প্রতিষ্ঠা পুনর্গঠনের সময় আসিয়াছে। সময় আসিয়াছে, এখন আমাদের সমস্ত বিক্ষিপ্ত শক্তিসমূহ একত্রিত করিতে হইবে, এক কেন্দ্রে কেন্দ্রীভূত করিতে হইবে এবং তাহার পর কেন্দ্রীভূত শক্তির সহায়তায় জাতিকে সম্মুখের পথে পরিচালিত করিতে হইবে। কেন না, বহু শতাব্দী হইল, উহার গতি একেবারে থামিয়া গিয়াছে। গৃহ মার্জ্জনা ও পরিষ্কার করা হইয়াছে, এস, আবার আমরা গৃহে বসবাস করি। পথ পরিষ্কৃত হইয়াছে, আর্য্য-সন্তানগণ এস, অগ্রসর হও।" *

ছত্রভঙ্গ জাতিকে সংহত করিয়া শক্তিকেন্দ্র প্রতিষ্ঠার এই মহাবাণী ঘোষণা করিয়াছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রথম প্রভাত হইতেই 'জাতিগঠন' কথাটা আমরা নানা জ্ঞানী, গুণী ও মনীষীর নিকট শুনিয়া আসিতেছি। আজকাল ইহার আলোচনা কেবলমাত্র সভাসমিতিতেই সংবদ্ধ নহে, দুঃখব্রতী, ত্যাগী সাধকগণ সত্যই জাতিগঠন কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। ইঁহাদের নিঃস্বার্থ সাধনায় আমরা ধীরে ধীরে আত্মসংবিৎ ফিরিয়া পাইতেছি। ভেদ, দ্বন্দ্ব, বিদ্বেষ, ঘৃণা ইত্যাদি শতাব্দীসঞ্চিত কুসংস্কার যে আমাদিগকে অনিবার্য্য ধ্বংসের পথে লইয়া চলিয়াছে, ইহা যেন কিয়ৎপরিমাণে বুঝিতে পারিতেছি। গঠন-কার্য্য সব সময়েই কঠিন। তাহার উপর আমাদের দেশে আরও কঠিন। বহু দিনের পরাধীনতা ও পর-মুখাপেক্ষিতার ফলে আমরা আত্মবিশ্বাস ও আত্মমর্য্যাদা হারাইয়া ফেলিয়াছি। দেহে ও মনে আমাদের এমন একটা স্বাভাবিক জড়ত্ব দেখা দিয়াছে যে, যাহার দুর্ব্বহ ভার ঠেলিয়া আমাদের বাসনা কর্ম্মক্ষেত্রে সার্থকতা লাভ করিতে পারে না। ফলে অক্ষম উত্তেজনার নিষ্ফলতা এক মোহময় আত্মবিস্মৃতি আনিয়া দেয়। এই আত্মবিস্মৃতিই আমাদিগকে জাতীয়তাবোধহীন মাংসপিণ্ডে পরিণত করিয়াছে। কি ব্যক্তির জীবনে, কি জাতির জীবনে এমন অস্বাভাবিক অবস্থা অধিক দিন থাকিতে পারে না—প্রাকৃতিক নিয়মে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া যখন প্রবলাকার ধারণ করে, তখন সেই বিচিত্র সংঘাতের মধ্যে ভাববিপ্লব উপস্থিত হয়। আজ ভারতবর্ষের অনেকটা সেই অবস্থা। 'জাতিগঠন' কার্য্য অত্যা-বশ্যক ও অপরিহার্য্য, এ সম্বন্ধে কাহারও লেশমাত্রও সংশয় নাই। কিন্তু কি উপায়ে, কি উদ্দেশ্যে আমরা এই বহুলায়াসসাধ্য কার্য্যে আত্মোৎসর্গ বা আত্মনিয়োগ করিব, তাহা চতুর্দ্দিকে সমুত্থিত তর্ককোলাহলে সম্যক্ বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। অনেক মনীষি-মস্তিষ্ক-মথিত নানা প্রকার সুন্দর সুন্দর 'প্রোগ্রাম' আমাদের সম্মুখে রহিয়াছে, কিন্তু কোনটাই আমাদের নিকট রুচিকর মনে হইতেছে না; একেবারে অসার বলিয়া উড়াইয়াও দিতে পারি না; আবার পূর্ণ বিশ্বাসে গ্রহণ করিয়া নিরলস কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবার বলভরসাও পাই না—প্রতিপদে আমাদের সংশয় হয়, প্রশ্ন উঠে, সমস্যা দেখা দেয়। ইহাই বুদ্ধিভেদ। চলিবার পথে ইহা যে একটা অপরিহার্য্য সঙ্কটময় অবস্থা, ইহা কে অস্বীকার করিবে? ইহাকে এড়াইয়া যাইবার কোন সুগম পন্থা আছে বলিয়া আমার মনে হয় না; ইহাকে অতিক্রম করিয়াই আমাদের যাইতে হইবে। এই সঙ্কটের পথে সাবধানে চলিতে অনেক বিলম্ব হইবে জানি; কিন্তু কোন কল্পিত সুগম পন্থার পশ্চাতে অনিশ্চিত আগ্রহে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিলে আরও অধিক বিলম্ব হইবার সম্ভাবনা।

আপনারা সকলেই দেখিতেছেন, জাতিগঠনের অতি সামান্যরূপে আরব্ধ কার্য্যও মত ও পথের তর্কে স্তব্ধপ্রায় হইবার উপক্রম হইয়াছে। আমরা যেন নৈরাশ্যে মতিভ্রান্ত হইয়াছি। কি করিব, ভাল করিয়া বুঝিয়া

* লাহোরের "হিন্দুধর্ম্মের সাধারণ ভিত্তিসমূহ" নামক প্রদত্ত বক্তৃতা হইতে উদ্ধৃত (ভারতে বিবেকানন্দ)

উঠিতে পারিতেছি না। এমন দুঃসময়ে আমরা স্বামীজীর বহুদিন পূর্ব্বে প্রদত্ত উপদেশগুলি ও সিদ্ধান্তগুলি আলোচনা করিলে নিশ্চয়ই লাভবান্ হইব। আমরা বুঝিতে পারিব, ঐকান্তিক উদ্যম ও অকৃত্রিম আগ্রহ সত্ত্বেও কেন আমাদের কার্য্য পণ্ড হয়, কিসের অভাবে কর্ম্মক্ষেত্রে আমরা অফুরন্ত প্রেরণা লাভ করি না।

আমাদের জাতীয় ভাব

'জাতিগঠন' কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে আমরা জাতীয় ভাবের সহিত সম্যক্ পরিচয় লাভ করি না। 'জাতি-গঠনে' নিযুক্ত কর্ম্মী মাত্রকেই সেই জন্য স্বামীজী পুনঃপুনঃ উপদেশ করিয়াছেন,—"প্রত্যেক মানুষের মধ্যে একটা ভাব আছে, বাইরের মানুষটা সেই ভাবের বহিঃপ্রকাশ মাত্র,—ভাষা মাত্র। সেইরূপ প্রত্যেক জাতির একটা জাতীয় ভাব আছে, এই ভাব জগতের কার্য্য করছে, সংসারের স্থিতির জন্য ইহার আবশ্যকতাটুকু ফলে যাবে, যে দিন যে জাত বা ব্যক্তির নাশ হবে। আমরা ভারত-বাসী যে এত দুঃখ দারিদ্র্য, ঘরে, বাইরে উৎপাত সয়ে বেঁচে আছি, তার মানে আমাদের একটা জাতীয় ভাব আছে, সেটা জগতের জন্য এখনও আবশ্যক।" (প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য)

আমাদের জাতীয় জীবনের যে মূল ভাব, যে নিগূঢ় আত্মশক্তি আছে, তাহার সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়লাভ সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক। জাতিগঠনের উপায়, তাহা যতই উত্তম ও চমকপ্রদ হউক না কেন, জাতীয় ভাবের সহিত তাহার ঐক্য না থাকিলে কিছুতেই কার্য্যকর হইতে পারে না। এ স্থলে এমন প্রশ্ন কেহ করিতে পারেন যে, ভারতবর্ষের অতীত ইতিহাস অস্পষ্ট। মুসলমানাধিকারের পূর্ব্বের ভারতবর্ষে কয়েকটি রাষ্ট্রবিপ্লব ও সমাজবিপ্লবের অসম্পূর্ণ আংশিক কাহিনী, যাহা নানা কাল্পনিক রূপকথায় অতিরঞ্জিত আকারে আমরা পাইতেছি, সেই প্রশ্নজটিল ইতিহাসের ধারায় জাতীয় চরিত্রের বিকাশ ও পরিপুষ্টির কোন সার্ব্বজনীন আদর্শ উদ্ধার করা কি সম্ভবপর? যে সমস্ত জাতি রাজনৈতিক স্বাধীনতার অপ্রতিহত অধিকার লইয়া বহুশতাব্দী ধরিয়া নিজেদের ভাগ্য নিজেরা গড়িয়াছে, তাহাদের সুলিখিত ইতিহাস হইতেও জাতীয় জীবনের একটা সার্ব্বভৌমিক বৈশিষ্ট্য দেখান কঠিন; ভারতবর্ষে এই কার্য্য আরও কঠিন, কেন না, শতাব্দীচয় ধরিয়া জাতীয় জীবন স্বাধীনভাবে কোন কার্য্য করিতে পারে নাই; কূর্ম্মের মত সঙ্কুচিত হইয়া আত্মরক্ষার জন্য সদা সন্ত্রস্ত জীবনযাপন—ভারতের মুসলমানাধিকারের প্রথম কয়েক শতাব্দীর ইহাই ইতিহাস। ইহার মধ্যে জাতীয় জীবনের মূল আদর্শের সর্ব্বাঙ্গীন অভিব্যক্তির অনুসন্ধান বৃথা। ভারতবর্ষের জাতীয় প্রকৃতির মূলভাব জানিতে হইলে, আমাদিগকে কয়েক সহস্র বৎসর অতীতে ফিরিয়া যাইতে হইবে; এবং বর্ত্তমানের নানা বিকৃতির মধ্যেও যে সুপ্রাচীন সভ্যতা ও শিক্ষার প্রভাব আমাদের সমাজ-জীবনে রহিয়াছে, তাহার সহিত উহার সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে হইবে। কেন না, ঐ অতীতের সহিত সম্পর্কশূন্য কোন অভিনব আদর্শ জোর করিয়া চালাইতে গেলে, জাতীয় প্রকৃতির বিরুদ্ধে আমরা অতি জঘন্য ব্যভিচার করিব। সেই জন্যই ইতিহাসের ধারায় পরম্পরাগত জাতীয় ভাবের প্রতি স্বামীজী পুনঃ পুনঃ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন।

যে সমস্ত জাতি স্বাধীনভাবে আত্মোন্নতিসাধন করিয়া ইতিহাসে বরণীয় হইয়াছে, তাহাদের সকলের মধ্যেই মানুষের কতকগুলি সাধারণ গুণ সমভাবেই বিকশিত দেখা যায়; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহাও দেখা যায় যে, একটা বিশেষ ভাবের বিশিষ্ট অভিব্যক্তি, এক একটা জাতিকে স্বতন্ত্র ও অন্যনিরপেক্ষ করিয়াছে। সেই জাতির গুণ, বিদ্যা, ঐশ্বর্য্য সমস্তই সেই মূল ভাবের দ্বারা বিকৃত হইয়া রহিয়াছে। সেইটাই যেন মূল লক্ষ্য, অন্যান্যগুলি যেন তাহাকে অব্যাহত রাখিবার উপায়। বর্ত্তমানে আমরা যে জাতির শাসনাধীন রহিয়াছি, তাহাদের জাতীয় জীবনের বিকাশের একটি প্রেরণাশক্তি অন্যান্য জাতি হইতে তাহা-দিগকে পৃথক্ করিয়াছে। অপ্রতিহত ব্যক্তি-স্বাধীনতা ইংরাজ জীবনের মূলমন্ত্র। তাহাদের রাজনীতিক বিস্তার, তাহাদের ধর্ম্ম, সমাজ, শিক্ষা, সভ্যতা, শিল্প-বাণিজ্য সমস্তই ঐ এক নীতিতে পরিচালিত। ব্যক্তি-স্বাধীনতাকে অক্ষুণ্ণ রাখিতে ইংরাজ জাতি এক দিন ক্ষিপ্ত হইয়া রাজ-হত্যা করিতেও কুণ্ঠিত হয় নাই। প্রাচীন অ্যাটিকার

সৌন্দর্য্যের আদর্শ রাষ্ট্রীকগণের জীবনে অতি আশ্চর্য্য প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। সুন্দরকে জাতীয় জীবনের সমস্ত বিভাগে বিকশিত করিয়া তুলাই ছিল তাঁহাদের মূলমন্ত্র। রাজস্বের উদ্বৃত্ত অর্থ নগরীর সৌন্দর্য্যের উৎকর্ষ-সাধনে ব্যয়িত হইত। গ্রীক-মনের এই সৌন্দর্য্যপ্রীতি তাঁহাদের শিল্পে, সাহিত্যে, স্থাপত্যে অতি সুগভীর রেখাপাত করিয়াছে। প্লেটো এথেনিয়ান রাষ্ট্রের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রতিভা সৌন্দর্য্যকেই ভূমার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিকাশ বলিয়া উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে সুন্দরের উপাসনা করিয়াছেন। মধ্যযুগে য়ুরোপীয় রাষ্ট্রগুলি ক্ষাত্রশক্তিকেই মূল আদর্শ করিয়া জাতীয় জীবন গঠন করিয়াছিল। প্রাচীন ইস্রাইলগণ কঠোর নীতিপরায়ণতার সহিত জড়িত ধর্ম্মজীবনকেই জাতীয় আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। আমাদের জাতীয় চরিত্রের মূলে যে ভাব রহিয়াছে, তাহা অতীত সভ্যতার খনি খুঁড়িয়া আবিষ্কার করিয়াছিলেন,—স্বামী বিবেকানন্দ। সেই মূল ভাব জ্ঞাতসারে অবলম্বন করিয়া ভারতের শ্রেষ্ঠ নরনারীগণ দেশসেবার মধ্য দিয়া জাতি-গঠনে প্রবৃত্ত হইবেন, ইহাই নব্য ভারতের সম্মুখে তাঁহার ঘোষণা। তিনি স্পষ্ট ভাষায় কহিয়াছেন, "ভালই হউক, মন্দই হউক, সহস্র সহস্র বর্ষ ধরিয়া ভারতে ধর্ম্মই জীবনের চরমাদর্শরূপে পরিগণিত হইয়াছে; ভালই হউক, মন্দই হউক, শত শতাব্দী ধরিয়া ভারতের বায়ু ধর্ম্মের মহান্ আদর্শসমূহে পূর্ণ রহিয়াছে; ভালই হউক, মন্দই হউক, আমরা ধর্ম্মের এই সকল আদর্শের মধ্যে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছি। ঐ ধর্ম্মভাব এক্ষণে আমাদের রক্তের সহিত মিশিয়া গিয়াছে, উহা আমাদের প্রকৃতিগত হইয়া পড়িয়াছে, আমাদের জীবনের জীবনীশক্তিরূপে দাঁড়াইয়াছে। * * এই দেশের পক্ষে তাহার বিশেষত্বসূচক ধর্ম্মজীবন পরিত্যাগ করিয়া রাজনীতি অথবা অপর কিছুকে জাতীয় জীবনের মূলভিত্তিরূপে গ্রহণ করা সম্ভব নহে। স্বল্পতম বাধার পথেই তোমরা কার্য্য করিতে পার—ধর্ম্মই ভারতের পক্ষে এই স্বল্পতম বাধার পথ। এই ধর্ম্মপথের অনুসরণ করাই ভারতের কল্যাণের একমাত্র উপায়।"

বহুদিন আত্মবিস্মৃত জাতির সম্মুখে, বিজাতীয় পথে স্বজাতির উন্নতিসাধনের নানা বিতর্ক ও বিক্ষিপ্ত চেষ্টার মধ্যে প্রথম যখন এই কথা প্রচারিত হইল যে, "ভারতবর্ষে ঐক্যবদ্ধ জাতীয় জীবনগঠনের অর্থে বুঝিতে হইবে যে, বিক্ষিপ্ত আধ্যাত্মিক শক্তিসমূহের একত্র সমাবেশ। ইহা সুনিশ্চিত যে, ভারতে জাতি বা নেশন বলিতে এমন বহু মানুষের সমবায় বুঝাইবে, যাহাদের হৃদয়-তন্ত্রী একই পারমার্থিক সুরে ঝঙ্কৃত হয়,"—তখন আমাদের চিন্তা ও চরিত্রে বাহির হইতে আরোপিত বিজাতীয় ভাবগুলি স্বাভাবিকভাবেই তারস্বরে ইহার প্রতিবাদ করিয়াছিল, এখনও করিতেছে। কিন্তু তথাপি যুগপ্রবর্ত্তক আচার্য্য চিন্তায়, চরিত্রে পরমার্থসাধনার ভিত্তির উপর জাতীয় জীবনগঠনের যে মহান্ যুগাদর্শ প্রকটিত করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এবং যে মহান্ কার্য্যে দেহপাত করিয়া গিয়াছেন, সেই অমর ভাবসমষ্টি, সেই পবিত্র চিন্তাধারায় ভারতের বায়ুমণ্ডল পরিপূর্ণ এবং জাতির জাগ্রত পুরুষগণ প্রতি নিশ্বাসে সেই ভাবরাশি গ্রহণ করিতেছেন। তাহার ফলে যে অভিনব জাতীয়তা-বোধ আমাদের প্রবুদ্ধ চৈতন্যের মধ্য দিয়া জাতীয়-চরিত্রের এক সুনিশ্চিত বৈশিষ্ট্যরূপে প্রকাশিত হইতেছে, ইহা গভীর মনঃসংযোগ ব্যতীত সহসা ধারণা করা অসম্ভব। আজ জগতের সর্ব্বত্র স্বার্থ-সংঘাতের যে বিক্ষোভ দেখা দিয়াছে, তাহার আঘাতের পর আঘাতে অস্থিমজ্জায় কম্পান্বিত হইয়া যাঁহারা বহিঃশক্তি দ্বারাই ব্যাহত করিবার উপায় চিন্তা করিতেছেন, এই সত্য তাঁহাদের চঞ্চল মানসে কখনই উদ্ভাসিত হয় না, আর যাঁহারা বাহিরের শক্তিকে প্রতিহত করিবার জন্য আত্মশক্তির সন্ধানে রত হইয়াছেন, যাঁহারা একান্তে চিন্তা করিতেছেন, নির্জ্জনে ধ্যান করিতেছেন, কঠোর সাধনায় অটুট নিষ্ঠায় সত্যানুসন্ধান করিতেছেন, তাঁহারা এই ধ্বংসের মহাশ্মশানে মহাকালের বক্ষে সৃষ্টির উদ্যত বরাভয় দেখিয়া অনুদ্বিগ্ন চিত্তে জাতিগঠনে নিযুক্ত হইতেছেন। তাঁহারা দেখিতেছেন, ভারতের অতি প্রাচীনকালের গোত্রসংবদ্ধ জাতীয় জীবনের প্রথম স্ফুরণ হইতে আজ পর্য্যন্ত ঐ এক পরমার্থসাধনার ভিত্তির উপর জাতীয়-জীবন গঠিত হইয়াছে। ঐ মূল তত্ত্বের সাধন, সংরক্ষণ ও প্রচার—এই লক্ষ্যের প্রতি ধ্রুব দৃষ্টি রাখিয়া ভারতবর্ষ তাহার রাষ্ট্র-সমাজ, শিল্প, সাহিত্য

সৃষ্টি করিয়াছে; আমাদের জাতীয় জীবনের সমস্ত তত্ত্বের বিভাগই এই পরমার্থাত্মক অতুলনীয় বৈশিষ্ট্যে অনুরঞ্জিত। আমাদের প্রাচীন রাষ্ট্রব্যবস্থা আজ প্রায় নিশ্চিহ্ন হইয়া মুছিয়া গিয়াছে, কিন্তু সমাজ-বিন্যাসের প্রতি চাহিয়া দেখিলে পরমার্থসাধনের সার্ব্বজনীন লক্ষ্যের অনেক স্মৃতি-চিহ্ন খুঁজিয়া পাওয়া যায়। সহস্র সহস্র বৎসরেও জাতির এই মূল ভাবের কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছে, যুগে যুগে নানা নূতন সম্প্রদায় উঠিয়াছে; কখনও বিকশিত, কখনও সঙ্কুচিত, কখনও বা একেবারে বিলুপ্তপ্রায় হইয়াও ভারতের এই আদর্শ বিনাশ প্রাপ্ত হয় নাই। ইস্‌লাম-পতাকাবাহী যে মহিমজাতি নূতন ধর্ম্ম, নূতন নীতি, নূতন আচারপদ্ধতি লইয়া উদ্ধত বিজয়ী বেশে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন, ভারতের আদর্শ তাঁহারাও আত্মস্থ করিয়া লইয়াছেন; একই ভাগ্যসূত্রে গাঁথা পড়িয়াছেন। ভারতের জাতীয় জীবনের এই মূলভাব পরমার্থসাধনাকে আমরা কোন বিশেষ সংজ্ঞা দ্বারা নির্দ্দেশ করিতে চাই না, কোন বিশিষ্ট সম্প্রদায়ের আদর্শরূপে ইহাকে দেখিতেও পারি না—ভারতবর্ষের আপাতপ্রতীয়মান বিরুদ্ধভাবাপন্ন বহুবিধ সম্প্রদায়ের মিলনের ভিত্তিস্বরূপ যুগযুগান্ত ধরিয়া ভারতবর্ষে যে আদর্শ দিয়াছে, সেই কল্যাণসূত্রে 'মণিগণা ইব' সকল বৈচিত্র্য একের মধ্যে বিবৃত হইয়া অখণ্ডরূপে অবিভক্ত জাতীয় জীবন পর্য্যবসিত হইবে। সাধকের ধ্যান-নেত্রে তাহাই উপলব্ধি করিতে চাই।

জাতিগঠনের উপাদান ও আদর্শ

অতি প্রাচীনকালের কথা ছাড়িয়া দিলেও, এমন কি, বৌদ্ধ উপপ্লাবনের কথা না তুলিলেও, মোগল ও পাঠান যুগেও এই জাতি-গঠনের চেষ্টা একেবারে স্তব্ধ ছিল না। ভারতবর্ষ তাহার জাতীয়তার আদর্শে যে সমস্ত মহান্ চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহার মধ্যেও আমরা গঠনের প্রয়াস দেখিতে পাই। শ্রীচৈতন্য ও নানক, কবীর ও দাদু ইত্যাদি মহাপুরুষগণ পরমার্থসাধনার ভিত্তির উপরই সনাতন ও ইস্‌লাম এই দুই পরস্পর-বিরোধী আদর্শের অপূর্ব্ব সমন্বয়সাধন করিয়া জাতি-গঠনের পথ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। আর বৃটিশ যুগে রাম-মোহন ও রাণাডে, দয়ানন্দ ও বিবেকানন্দ, সার সৈয়দ হোসেন ও হাজী মহম্মদ, তিলক ও অরবিন্দ, মহাত্মা গন্ধী ও তাঁহার পতাকাবাহিগণ পরস্পরের মধ্যে বহু পার্থক্য সত্ত্বেও জাতি-গঠনের যে আদর্শ স্ব স্ব চিন্তা ও চরিত্রে দেখাইয়াছেন, তাহা নিশ্চিতই পরমার্থ-সাধনার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। এ দেশের সমাজ-বিন্যাস, সাহিত্য-সৃষ্টি, শিল্পকলার উৎকর্ষ, এমন কি, রাজ-নীতিক অধিকারলাভের চেষ্টা পর্য্যন্ত ঐ পরমার্থ-সাধনার অনুকূলভাবে জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে। ভারতীয় চরিত্রের এই যে প্রকৃতিগত স্বাতন্ত্র্য, ইহা পরস্পর বিবাদরত, মূঢ় জন-সমষ্টির মধ্যে এখনও বিশৃঙ্খলভাবে ছড়াইয়া রহিয়াছে,—এইগুলিকে কেন্দ্রীভূত করিবার জন্য যে দিন আমরা কোন সার্থক উপায় গ্রহণ করিতে পারিব, সেই দিনই পুরাতনের ভিত্তির উপর ভারতীয় নূতন সভ্যতা গড়িয়া উঠিবে। জাতীয় চরিত্রের সেই সুপ্তশক্তি জাগ্রত হইবে। বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রথম হইতে আমরা যে ভাবে বাহিরের স্বার্থকেই জাতি-গঠনের মূল ভিত্তিরূপে গ্রহণ করিয়াছি, তাহা পরিত্যাগ করিতে হইবে। ঐহিক স্বার্থের প্রলো-ভন দ্বারা ভারতবর্ষে জাতি-গঠন সম্ভবপর হইবে না। স্বার্থের বন্ধনে বিচ্ছিন্ন অংশগুলিকে একত্র বাঁধিয়া আমরা যেমন ভারতীয় জাতি-গঠন করিবার চেষ্টা করিতে উদ্যত হই, ঠিক সেই সময়েই সাম্প্রদায়িক বিরোধ হঠাৎ অত্যন্ত মর্ম্মান্তিকরূপে বীভৎস হইয়া উঠে। ইহাতে আমরা পণ্ডশ্রমের জন্য বিরক্ত হই, মনে মনে বড় দুঃখ পাই; কিন্তু শিক্ষা লাভ করি না। অনেক ক্ষেত্রে বিরোধের সমস্ত দায়িত্ব পরের স্কন্ধে নিক্ষেপ করিয়া লোকচক্ষুতে ধূলি দিবার চেষ্টা করি সত্য, কিন্তু অন্তরে কোন সান্ত্বনা লাভ করি না। আমাদের জাতি-গঠনের সমস্ত আশাভরসা যখন বারংবার ব্যর্থতার পাষাণ-প্রাচীরে উন্মত্তের মত মাথা ঠুকিয়া আত্মহত্যা করিতে বসিয়াছে, যখন জাতির জাগ্রত পুরুষগণ মর্ম্ম-বেদনায় নৈরাশ্যে ক্ষুব্ধ হইতেছেন, তখন এ সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ যে আদর্শ আমাদের সম্মুখে ধরিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করার আবশ্যকতা বোধ করিতেছি। কথাটা

অতি পুরাতন; হয় ত আপনারা অনেকেই ইহা জানেন, বহুবার পাঠ করিয়াছেন। তথাপি দুঃসময়ে অতি সহজ পুরাতন কথাটি বিস্মৃত হইতে হয়। স্বামীজী ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে নাইনীতালস্থ কোন মুসলমান ভদ্রলোককে লিখিয়াছিলেন,—

"* * উহাকে আমরা বেদান্তই বলি আর যা-ই বলি, আসল কথা এই যে, অদ্বৈতবাদ ধর্ম্মের এবং চিন্তার সব শেষের কথা, এবং কেবল অদ্বৈতভূমি হইতেই মানুষ সকল ধর্ম্ম ও সম্প্রদায়কে প্রীতির চক্ষুতে দেখিতে পারে। আমাদের বিশ্বাস যে, উহাই ভাবী সুশিক্ষিত মানবসাধারণের ধর্ম্ম। হিন্দুগণ অন্যান্য জাতি অপেক্ষা শীঘ্র শীঘ্র এই তত্ত্বে পৌছানর বাহাদুরীটুকু পাইতে পারে (কারণ, তাহারা কি হিব্রু, কি আরবী জাতি অপেক্ষা প্রাচীনতর জাতি); কিন্তু কর্ম্ম-পরিণত বেদান্ত (Practical Vedantism) যাহা সমগ্র মানবজাতিকে নিজ আত্মা বলিয়া দেখে এবং তাহার প্রতি তদনুরূপ ব্যবহার করিয়া থাকে,—তাহা হিন্দুগণের মধ্যে সার্ব্বজনীনভাবে পুষ্ট হইতে এখনও বাকী আছে।

"পক্ষান্তরে, আমাদের অভিজ্ঞতা এই যে, যদি কোন যুগে কোন ধর্ম্মাবলম্বিগণ দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনে প্রকাশ্যরূপে এই সাম্যের সমীপবর্ত্তী হইয়া থাকেন, তবে একমাত্র ইস্‌লামধর্ম্মাবলম্বিগণই এই গৌরবের অধিকারী। হইতে পারে, এবংবিধ আচরণের যে গভীর অর্থ এবং ইহার ভিত্তিস্বরূপ যে সকল তত্ত্ব বিদ্যমান, তৎসম্বন্ধে হিন্দুগণের ধারণা খুব পরিষ্কার, কিন্তু ইস্‌লামপন্থিগণের তদ্বিষয়ে সাধারণতঃ কোন ধারণা ছিল না, এইমাত্র প্রভেদ।

"এই হেতু আমাদের দৃঢ় ধারণা যে, বেদান্তের মতবাদ যতই সূক্ষ্ম ও বিস্ময়কর হউক না কেন, কর্ম্মপরিণত ইস্‌লামধর্ম্মের সহায়তা ব্যতীত তাহা মানবসাধারণের অধিকাংশের নিকট সম্পূর্ণরূপে নিরর্থক। আমরা মানবজাতিকে সেই স্থানে লইয়া যাইতে চাই, যেখানে বেদও নাই, বাইবেলও নাই, কোরাণও নাই, মানবকে শিখাইতে হইবে যে, ধর্ম্মসকল কেবল একত্বরূপ সেই একমাত্র পরমার্থসাধনারই বিবিধ প্রকাশ মাত্র, সুতরাং প্রত্যেকেই যাঁহার যেটি সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী, তিনি সেটিকেই বাছিয়া লইতে পারেন।

"আমাদের মাতৃভূমির পক্ষে হিন্দু ও ইস্‌লামধর্ম্মরূপ এই দুই মহান্ মতের সমন্বয়ই—বৈদান্তিক মস্তিষ্ক এবং ইস্‌লামীয় দেহ—একমাত্র আশা।

"আমি দিব্যচক্ষে দেখিতেছি, বর্ত্তমানের বিশৃঙ্খলা-বিরোধের মধ্য দিয়া ভবিষ্যতের অপরাজেয় ও গরিমাময় ভারতবর্ষ বেদান্ত-মস্তিষ্ক ও ইসলাম-দেহ লইয়া অখণ্ডরূপে উত্থিত হইতেছে।"

বিরোধ যেখানে এত প্রবল, বৈচিত্র্য যেখানে এত অধিক, সেখানে জাতি-গঠনের সমস্যা অতি কঠিন হইলেও, নবযুগের এই অমরবাণী আমাদের চেতনাকে প্রতিনিয়ত গঠনকার্য্যে আহ্বান করিতেছে। মানুষে মানুষে ভেদ এখানে যতই প্রবল হউক, কোন অবস্থাতেই মানুষের হৃদয় মানুষের হৃদয়ের আহ্বানকে চিরদিন প্রত্যাখ্যান করিতে পারে না। স্বার্থ দ্বারা নহে, বাহিরের কোন সম্পদপ্রাপ্তির প্রলোভন দ্বারা নহে, পরমার্থসাধনার সংরক্ষণ ও প্রচারের দায়িত্বানুভূতি দিয়াই আমরা ভারতবর্ষে সকলের অন্তঃকরণকে স্পর্শ করিতে পারিব। জাতীয় জীবন সমষ্টিশক্তির উদ্বোধনের মহাপ্রয়াসকে ত্যাগের দ্বারা—সেবার দ্বারা সার্থক করিয়া তুলিব। যেখানে মহৎ আদর্শের সাধনায় আত্ম-বিসর্জ্জন নাই, সেখানে জাতিগত গৌরববুদ্ধির সার্থক অভিমানের অভাবে জাতির আত্মচেতনা স্ফুরিত হয় না—ইহা নিশ্চিত বুঝিয়া অসীম ধৈর্য্যের সহিত দেশের প্রাণের সহিত, জাতির আত্মার সহিত আমাদিগকে পরিচিত হইতে হইবে। 'দেশের নিকট ষোল আনা ধরা না দিলে দেশ কি কাহাকেও ধরা দেয়'—জনৈক শ্রেষ্ঠ কর্ম্মযোগীর জীবনব্যাপী অভিজ্ঞতা হইতে উচ্চারিত এই মহাবাক্য আমাদিগকে প্রতিপদে স্মরণ রাখিতে হইবে।

ভবিষ্যতের অখণ্ড জাতিদেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পরিপুষ্টি ও বিকাশের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপ আলোচনা এ স্থলে আমরা করিতে চাহি না, কেবল জাতির প্রাণশক্তিকে যে ভাবে স্বামী বিবেকানন্দ অনুভব করিয়াছিলেন, তাহারই কথঞ্চিৎ আভাস দিবার চেষ্টা করিয়াছি। প্রাণশক্তির ন্যূনাধিক্যের উপর যেমন জীবদেহের পরিপুষ্টির তারতম্য নির্ভর করে, জাতিদেহের প্রাণশক্তির

সঙ্কোচ ও বিকাশের উপরও ঠিক তেমনই জাতীয় জীবনের উত্থান-পতন নির্ভর করে। পুনঃ পুনঃ উত্তেজক সুরা পান করাইলে জীবনীশক্তিহীন জীর্ণ দেহ যেমন প্রতিক্রিয়ার মুখে অবসন্ন হইয়া মৃত্যুর কোলে ঢলিয়া পড়ে, তেমনই ভাবে বাহির হইতে ধারকরা কোন ভাবকে জোর করিয়া কোন জাতির মনে সঞ্চার করিয়া দিলে, প্রতিক্রিয়ার মুখে সন্দেহ ও নৈরাশ্যের অবসাদই সৃষ্টি করে। বিগত শতাব্দীর সমস্ত ব্যর্থ আক্ষেপ-প্রক্ষেপের নিষ্ফলতার ইতিহাস হইতে স্বামী বিবেকানন্দ এই শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। পদব্রজে সমগ্র ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিয়া তিনি যখন ভারতবর্ষের শেষ প্রস্তরখানির উপর বসিয়া কন্যাকুমারীতে তন্ময় ধ্যানে নিমগ্ন হইয়াছিলেন, তখনই ঐক্যবদ্ধ অখণ্ড ভারতবর্ষ তাঁহার ধ্যানে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছিল; তখনই তিনি বুঝিয়াছিলেন, পরমার্থসাধনার সার্ব্বভৌমিক আদর্শই হইবে নবজাতীয়তার ভিত্তি। পরমার্থকে অবজ্ঞা করিয়া কেবল ঐহিককে কামনা করিয়া আমরা পরমার্থও হারাইয়াছি, ঐহিকেরও সমস্ত সম্পদ হইতে বঞ্চিত হইয়াছি। শিল্প, বাণিজ্য, যান-বাহন, রাষ্ট্রীয় অধিকার এ সমস্তই চাই, ঐহিকের জন্য নহে, পরমার্থসাধনার অনুকূল বলিয়াই চাই।

পরের অনুকরণ করিয়া এক ঐতিহাসিক প্রহসন রচনা করিবার জন্য সহস্র সহস্র বৎসর আমরা ভারত-ভূমিতে টিকিয়া নাই—আমাদের পরভাব-প্রমত্ততাকে সংহত করিয়া ইহা নিঃশেষে বুঝিতে হইবে। আমাদের স্বদেশের ইতিহাসের সত্যকে দুঃসাধ্য সাধনার মধ্যে গ্রহণ ও বরণ করিবার শুভদিন সমাগত। জাতির অন্তর্নিহিত আত্মশক্তির সহিত বিবেকানন্দ আমাদের যে পরিচয়সাধন করাইয়া দিয়াছেন, তাহাকে তপস্যার দুরূহ উদ্যমের দ্বারা নব সৃষ্টির রূপান্তর ফুটাইয়া তুলিবার ব্রত কি আমরা আজও গ্রহণ করিব না? আমাদের সমস্ত বিক্ষিপ্ত চেষ্টা ও উদ্‌ভ্রান্ত চিন্তাকে সংযত করিয়া জাতিগঠনের মহাসাধনায় আত্মনিয়োগ করিতে কি আমরা বিমুখ হইব? *

[ক্রমশঃ।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার।

* ১৩৩১।২৯ কার্ত্তিক, থিয়োজফিক্যাল সোসাইটী হলে 'বিবেকানন্দ সমিতির' সাপ্তাহিক অধিবেশনে পঠিত।

বিবাহ-লগন

অশোকের শোণ শাখে, ঘনারুণ কৃষ্ণচূড়াদলে,
পলাশের তাম্রপুঞ্জে, সিন্দূরাক্ত চূতের ফসলে,
গৈরিক শিখরতলে, রক্তদেহে প্রত্যূষ রবির
ব্যক্ত হয়ে উঠে ঐ যেন কোন যৌবন গভীর!
কার যেন বক্ষোরাগ লাল হয়ে জাগে দিকে দিকে,
শাশ্বত কাহিনী কোন বিশ্বমর্ম্মে যায় লিখে লিখে।
বৈশাখের বায়ুস্রোতে কাহাদের উন্মুখ রভস
লুব্ধ হয়ে ছুটে চলে প্রচঞ্চল করি দিক দশ!
সহসা সবার মাঝে রুদ্ধ করি সর্ব্ব চপলতা
একটি সংযত গীতি বহি আনে স্বর্গের বারতা;
অসীম কালের ক্রোড়ে অভিনব বিস্ময়ের প্রায়
একটি লগন শুভ জন্ম নিল মধুর লীলায়!
অমৃতের পাত্র দুটি হাতে তার ভরিল উচ্ছল
আনন্দে প্লাবিত করি ধরণীর ব্যথিত অঞ্চল।
সর্ব্ব-দুঃখ-দৈন্য-ক্ষতি মাধুর্য্যেতে পরিপূর্ণ করি
একখানি স্মিত হাসি স্ফূর্ত্তি লভে শূন্যতারে ভরি!
অস্থির প্রতীক্ষা মাঝে একখানি অনঙ্গ-আসর
আসর করিয়া তোলে দম্পতির মিলন-বাসর!
বিবাহের এ লগন,—এ যে বড় প্রহেলিকাময়,
ইহার অন্তরতলে আছে মহা সত্যের বিজয়!
এ নহে নূতন ওগো, যুগে যুগে এই প্রহেলিকা
সৃষ্টির মঙ্গলতরে সন্দীপিল পূত প্রেমশিখা;
ভস্মীভূত মদনেরে পুনরায় সঞ্জীবিত করি
স্বর্গের কল্যাণরূপ নরলোকে তুলি দিল ধরি।
এই প্রহেলিকাচ্ছলে অব্যক্তের প্রকাশের পীড়া
আনন্দে পূর্ণতা লভি বধূগণ্ডে আঁকি দেয় ব্রীড়া।

শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার মল্লিক।

আবদুল করিম—রিফের রাণা প্রতাপ

গাজী মহম্মদ বিন আবদুল করিম বুঝি মুর যুদ্ধে শেষ রক্ষা করিতে পারিলেন না। অন্ততঃ ফরাসী ও স্পেনীয় পক্ষের তারের সংবাদে এইরূপ বুঝা যাইতেছে। যদিও ফরাসী তাঁহার সদম্ভ উক্তির সার্থকতা সম্পাদন করিতে পারেন নাই, মুরদেশের বর্ষার পূর্ব্বেই যুদ্ধ শেষ করিবেন বলিয়া যে সদর্প ঘোষণা করিয়াছিলেন, তাহা সফল করিতে পারেন নাই; যদিও এখনও সংবাদ আসিতেছে যে, আবদুল করিমের রাজধানী আজদির স্পেনীয়দিগের দ্বারা অধিকৃত হইয়াছে, তিনি রিফের দুর্গম পার্ব্বত্য অঞ্চলে পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করিতেছেন, পরন্তু মুররা দলে দলে ফরাসীর নিকট প্রত্যহ আত্মসমর্পণ করিতেছে এবং ফরাসীরা ক্রমশঃ ঘাঁটির পর ঘাঁটি দখল করিয়া আবদুল করিমকে বেড়াজালে ঘিরিবার উপক্রম করিতেছে,—তথাপি এখনও শেষ মীমাংসা কি ভাবে হয়, সে সম্বন্ধে কোনও স্থিরতা নাই। আবদুল করিম ইতঃপূর্ব্বে ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, যতক্ষণ মুর জাতির দেহে এক বিন্দু রক্ত থাকিবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহারা যুদ্ধে ক্ষান্ত হইবে না,—শেষ তাহারা তাহাদের অন্তঃপুরচারিণীদিগকে হত্যা করিয়া অসি-হস্তে মৃত্যুমুখে ঝাঁপাইয়া পড়িবে। মুররা বীরজাতি, তাহারা কষ্টসহিষ্ণু, ধর্ম্মভীরু, উৎসাহী ও সাহসী জাতি। তাহাদের স্বাধীনতা সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান ধন। সেই স্বাধীনতারক্ষার জন্ম যে তাহারা প্রাণপণ করিয়া বহুদিন পর্য্যন্ত খণ্ডযুদ্ধ চালাইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। সুতরাং ইতোমধ্যেই যুদ্ধের জয়পরাজয় সম্বন্ধে কিছুই নিশ্চিত সিদ্ধান্ত করা কর্ত্তব্য নহে।

এ দিকে কিন্তু স্পেনদেশে মহা উৎসব ও আনন্দের ঘটা পড়িয়া গিয়াছে। স্পেনের ডিকটেটার ও প্রধান সেনাপতি জেনারল ডি রিভেরা মুর-যুদ্ধ 'জয়' করিয়া গত ১২ই অক্টোবর তারিখে রাজধানী মাদ্রিদ সহরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। তাঁহার অভ্যর্থনার জন্ম স্পেনীয়রা বিপুল আয়োজন করিয়াছিল। তাহারা তাঁহাকে 'দেশের ত্রাণকর্ত্তা'রূপে অভিনন্দিত করিতেছে, পরন্তু মুরযুদ্ধ-জয়ী বলিয়া 'প্রিন্স অফ আলহুসিমাস' পদবী দ্বারা ভূষিত করিয়া তাঁহাকে সম্মানিত করিতে প্রস্তুত হইয়াছে।

মুরনেতা আবদুল করিম

আলহুসিমাস মুরদেশের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে একটি উপসাগর ও প্রদেশ,—আলহুসিমাস নামে একটি সহরও আছে; এই স্থানে স্পেনীয় সৈন্সরা জাহাজ হইতে অবতরণ করিয়া আজদির দখল করিতে অগ্রসর হইয়াছিল। স্পেনের রাজা আলফনসো আনন্দে অধীর হইয়া তাঁহার সেনাপতিকে বাহু প্রসারণ করিয়া আলিঙ্গন করিয়াছেন।

এই সকল দেখিয়া শুনিয়া মনে হয়, হয় ত আবদুল করিম অপর দিকে প্রবল ফরাসীর সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকিয়া আলহুসিমাসের দিকে স্পেনীয়দিগের নিকটে যুদ্ধে হটিয়া গিয়াছেন। এরূপ ত সম্ভব ছিল না, কেন না, প্রথমে যখন কেবল স্পেনের সহিত যুদ্ধ হয়, তখন আবদুল করিম স্পেনীয়দিগকে রিফাঞ্চল হইতে বিতাড়িত করিয়া সমুদ্রতটে কোণঠেসা করিয়াছিলেন। সেই স্পেনীয় যুদ্ধের ইতিহাস মনোরম। এই স্থানে তাহার আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

স্পেনীয় ও মুরের শত্রুতা আধুনিক নহে, বহু শতাব্দীর। মুররা এক দিন সঙ্কীর্ণ জিব্রালটার প্রণালী অতিক্রম করিয়া স্পেন দেশের অর্দ্ধাংশেরও অধিক অধিকার করিয়াছিল। অদ্যাপি স্পেনের প্রাচীন গ্রানাডা সহরে তাহাদের বহু স্থাপত্য-কীর্ত্তি বিদ্যমান। আলহাম্বা প্রাসাদ তন্মধ্যে অন্যতম। তাহার পর বহু যুগ শাসনের পর মুররা স্পেনের কাষ্টাইল প্রদেশের রাণী ডোনা ইসাবেল ও তাঁহার স্বামী আরাগন প্রদেশের রাজা ফার্ডিনাণ্ডের সম্মিলিত বাহিনীর নিকট পরাজিত হয়। রাণী ইসাবেল মুসলমান মুরের জেহাদের বিপক্ষে খৃষ্টান ক্রুসেড ঘোষণা করেন। তিনি তাঁহার কন্সাকে বলিয়া যায়েন,—"আমি আমার কন্সা ও জামাতাকে অনুরোধ ও আদেশ করিয়া যাইতেছি যে, তাহারা যেন খৃষ্টানধর্ম্ম রক্ষণে সর্ব্বদা যত্নবান্ থাকে এবং ইহাকে কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করে। বিধর্ম্মী মুসলমানদিগের বিপক্ষে তাহারা যেন কখনও যুদ্ধে নিবৃত্তি না দেয় এবং আফ্রিকা দেশ জয় যত দিন না সম্পন্ন হয়, তত দিন তরবারি ত্যাগ না করে।"

তদবধি স্পেনীয় ও মুরে যুদ্ধ চলিয়া আসিতেছে। স্পেনীয়রা

ক্রমে আফ্রিকার মুরদেশের কতকাংশ যুদ্ধে জয় করে। রাণী ইসাবেলের বংশধর অষ্ট্রীয়ার হাপসবার্গ ও ফ্রান্সের বুরবোঁ বংশ তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষের এই ঘোষণার আদেশ সর্ব্বতোভাবে পালন করিয়া আসিতেছেন। ফরাসীরা আফ্রিকার অনেক অংশ আক্রমণ ও জয় করিয়া ফরাসী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে; মুরদেশের দক্ষিণাঞ্চলে ফরাসীর 'রক্ষিত রাজ্য' আছে। এখন ফরাসী ও স্পেনীয় উভয় জাতিই একযোগে রাণী ইসাবেলের আদেশপালনে বদ্ধপরিকর হইয়াছে।

ফরাসীরা মুরদেশে তাহাদের মনোমত এক সুলতান খাড়া করিয়াছে, তাঁহার নাম, মুলে ইউসুফ। তিনি মরক্কোর ফরাসী শাসনকর্ত্তা মার্শাল লিওটের ক্রীড়নক মাত্র। মুরদিগের আইন অনুসারে তিনি মরক্কোর সুলতান হইতে পারেন না, কেন না, তাঁহার দুই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাই ন্যায়তঃ মরক্কোর সুলতান, ফরাসীরা তাঁহাদিগকে বলপূর্ব্বক সিংহাসনচ্যুত করিয়াছে। মুলে ইউসুফের পূর্ব্বে যিনি মুর সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন, তাঁহার নাম মুলে হাফিদ, তিনিই প্রকৃত রাজা। কিন্তু ফরাসীরা যখন দেখিলেন যে, মুলে হাফিদ স্বাধীনভাবে রাজ্যশাসন করিতে উদ্যত হইয়াছেন, তখনই অমনই তাঁহারা তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া স্পেনদেশে নির্ব্বাসিত করিলেন। এখন তিনি স্পেনেই বন্দিরূপে অবস্থান করিতেছেন। এই ভাবে দেশের স্বাধীনতা অপহৃত হওয়াতেই আবদুল করিম স্বদেশের স্বাধীনতারক্ষায় শত্রুদিগের বিপক্ষে অস্ত্রধারণ করিয়াছেন। তিনি কোনও প্রতীচ্য দেশীয় সংবাদ-সংগ্রাহককে বলিয়াছেন—"যদিই বা আমরা ফরাসী শাসনকর্ত্তা জেনারল লিওটের ক্রীড়নক কোনও মুর আরব সুলতানের কর্তৃত্ব মানিয়া চলিতে সম্মত হই, তাহা হইলেও এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে, মুলে ইউসুফের মুর-সিংহাসনে কোনও ন্যায্য দাবী নাই। তাঁহার ভ্রাতারাই সিংহাসনের যথার্থ ন্যায্য অধিকারী; কিন্তু তাঁহাদিগকে বলপূর্ব্বক সিংহাসনচ্যুত করা হইয়াছে। তাহার কারণ এই যে, তাঁহারা ফরাসী ও স্পেনের মনোমত পোষ মানেন নাই। আপনারা কি মনে করেন, মুরের মত অতীত গৌরবে গৌরবান্বিত স্বাধীনতাপ্রিয় বীর জাতি ইউসুফের মত ক্রীড়ার পুতুলের কর্তৃত্ব মাথা পাতিয়া মানিয়া লইবে? যদি ফেজ সহরের কোনও সুলতানের মুরদেশ শাসন করিবার অধিকার থাকে, তবে তিনি মুলে হাফিদ, মুলে ইউসুফ নহেন। কিন্তু আমরা তাঁহার রাজশক্তিই মানি না, ইহা আমাদের মূলনীতি। আমরা—মুরজাতি স্বভাবতঃই স্বাধীন, আমরা কোনও রাজা মানি না।"

মার্শাল লিওটে এবং মরক্কোর সুলতান মুলে ইউসুফ

ইহা হইতেই বুঝিতেছেন, কেন আবদুল করিম স্পেনের বিপক্ষে স্বাধীনতা-যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। এখন জিজ্ঞাস্য এই আবদুল করিম কে—মুরদেশে কর্তৃত্ব করিবার ইঁহার অধিকার কি?

আবদুল করিমকে য়ুরোপীয়রা আবদল ক্রিম নামে অভিহিত করিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহার প্রকৃত নাম মহম্মদ বিন আবদুল করিম। প্রায় ৪২ বৎসর পূর্ব্বে মুরদেশের স্পেনীয় রাজধানী মেলিল্লা সহরে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নামও ছিল আবদুল করিম, তিনি মেলিল্লার আরব ও রিফ মুরদিগের 'কাদি' বা সর্দ্দার ছিলেন। ঐ অঞ্চলের মুরদিগকে বেণী ওয়ারিয়াঘেল বলে। এতদঞ্চল ভূমধ্যসাগরের আলহুসিমাস উপসাগরের উপকূলে অবস্থিত।

স্পেনীয়রা সেই সময়ে রিফ দেশ অধিকার করিয়া তথায় শান্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। স্পেনীয়রা মেলিল্লা সহর ও প্রদেশ রক্ষা করিবার অছিলায় সমগ্র পূর্ব্বাঞ্চলের নানা স্থানে সামরিক ঘাঁটি ও আড্ডা বসাইয়াছিলেন। তখন স্পেনীয়দিগের বর্ব্বরতা ও নিষ্ঠুরতায় মরক্কোর উত্তর ও পূর্ব্বাঞ্চল একবারে অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল। বেণী ওয়ারিয়াঘেল বেণী বাউফ্রা ও বেণী তাউজিন অঞ্চলে স্পেনীয়রা যে সমস্ত punitive expeditions প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহা মেক্সিকো প্রদেশে কর্টেজের 'অগ্নি ও তরবারির ক্রীড়া' স্মরণ করাইয়া দেয়।

মহম্মদ আবদুল করিম বাল্যকাল হইতেই স্পেনের এই কঠোর শাসনের বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। স্পেনীয়দিগের অনুগ্রহেই তাঁহার পিতা মেলিল্লার মুরদিগের কাজী (বিচারক) ও একরূপ শাসনকর্ত্তৃরূপেই নিযুক্ত হইয়াছিলেন। মেলিল্লার পর্ব্বতবাসী রিফ-মুরদিগের নিকট তিনি বাল্যকাল হইতেই স্পেনের অত্যাচারের কথা জানিয়াছিলেন ও স্পেনের প্রতি ঘৃণার ভাব গ্রহণ করিয়াছিলেন। রিফের দশ বৎসর বয়স্ক বালক স্পেনকে শত্রুরূপে মনে করিতে অভ্যস্ত হয়। আবদুল করিম সেই প্রভাবের হস্ত এড়াইতে পারেন নাই। বিশেষতঃ বেণী ওয়ারিয়াঘেল মুররা যত অধিক স্পেনীয় অত্যাচার ভোগ করিয়াছিল, এত অন্য কোনও মুরই করে নাই। তাই আবদুল করিম বাল্যকাল হইতেই স্পেনের শত্রু।

মহম্মদ আবদুল করিম প্রথমে মেলিল্লার আরব পাঠশালায় কোরাণ শিক্ষা করেন তাহার পর অন্যান্য মুসলমান ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করেন। ইহাতে মুসলমান ধর্ম্মশাস্ত্রে ও আইনে তাঁহার অভিজ্ঞতা লাভ হয়। ১৩ বৎসর বয়সে তিনি মেলিল্লারই এক স্পেনীয় স্কুলে স্পেনীয় ভাষা, ইতিহাস, সাহিত্য, ভূগোল, গণিত, হিসাব ও খৃষ্টানধর্ম্মের প্রাথমিক পাঠ অভ্যাস করেন।

যৌবনে তিনি মেলিল্লায় পিতার হইয়া কাজীর কায করিতেন। তাঁহার আফিসের নাম ছিল Oficina Indigena. ১৯১১ হইতে ১৯১৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি এই আফিসে উকীল, এটর্ণী ও কাজীর কায করিয়াছিলেন। কেন না, লোকের পাট্টা কবুলতি লিখা বা পরীক্ষা করা এবং রিফের ধাতুসম্পদের সম্পর্কিত আইনকানুন নাড়াচাড়া করাই তাঁহার কায ছিল। এই সময়ে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা স্পেনের রাজধানী মাদ্রিদ সহরের বিদ্যালয়ে পাঠাভ্যাস করিতেছিলেন। তাঁহার ভ্রাতা অতীব মেধাবী ও তীক্ষ্ণধী। তিনি সেখানে থাকিয়া প্রতীচ্যের নানা বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিতেছিলেন। আবদুল করিমও বৃথা সময় অপব্যয় করিতেছিলেন না। Oficina Indigena আফিসে খনিজ সম্পদের আইনকানুন আলোচনা সম্পর্কে তাঁহাকে বহু ইংরাজ ও স্পেনীয় খনিজ-বিদ্যাবিদ্ ইঞ্জিনিয়ারের

সংস্পর্শে আসিতে হইয়াছিল। বিশেষতঃ বেণী ডাউজিন অঞ্চলের লৌহখনি হইতে তাঁহার দেশ কিরূপ সমৃদ্ধিশালী হইতে পারে, তাহা তিনি সেই সময়ে প্রকৃষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। আলজেসিরাস সন্ধির সর্ত্তানুসারে (যাহা প্যারী সহরের আন্তর্জাতিক সালিসি কমিশন নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছিলেন) মরক্কো মিনারল সিণ্ডিকেট কোম্পানীকে কি বিশেষ অধিকার প্রদান করা হইয়াছিল, তিনি সেই সময়ে উহা অনুসন্ধান করিতে আরম্ভ করেন।

আবদুল করিম তীক্ষ্ণধী ও ভাবপ্রবণ মুসলমান, বিশেষতঃ রিফের মুর। তাঁহার জাতির সহিত স্পেনের শত শত বৎসরের বিরোধ চলিয়া আসিতেছিল। সুতরাং তিনি যখন এই সকল আবিষ্কারের দ্বারা বুঝিলেন যে, বিদেশী বিধর্ম্মী কিরূপ অন্যায় পূর্ব্বক তাঁহার দেশের সম্পদ্ উপভোগ করিতেছে, তখন তাঁহার মন স্পেনীয়-দিগের বিপক্ষে বিষাক্ত হইয়া উঠিল। এক দিকে তিনি যেমন বুঝিলেন, স্পেনীয় শাসকরা অযোগ্য ও উৎকোচগ্রাহী, অন্যদিকে তেমনই দেখিলেন যে, তাঁহার জন্মভূমি রিফ প্রদেশ প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধিসম্পন্ন, তাঁহার দেশের খনিজ সম্পদ্ সামান্য নহে। এই সম্পদ্ হস্তগত করিতে পারিলে তাঁহার জাতি জগতে শক্তিশালী ও গণ্য-মান্য বলিয়া বিবেচিত হইবে।

আবদুল করিম নিশ্চেষ্ট বসিয়া থাকিবার মানুষ নহেন। যেমন চিন্তা, অমনই কায। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দেই তিনি স্পেনের বিপক্ষে ষড়যন্ত্র আরম্ভ করিলেন। যেমন মহারাষ্ট্র-নেতা প্রাতঃস্মরণীয় শিবাজী মহারাজ দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ মোগল দরবারের বিপক্ষে ষড়যন্ত্র করিয়া স্বদেশের স্বাধীনতালাভের সূত্রপাত করিয়াছিলেন, তেমনই আবদুল করিম বিরাট স্পেনীয় শক্তির বিরুদ্ধে ক্ষুদ্র অনিয়ন্ত্রিত রিফ যোদ্ধাকে প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। স্পেনীয় কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিলেন। পাঠকের নিশ্চিত স্মরণ আছে, শিবাজীও কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন। কিন্তু স্বাধীনচেতা দেশপ্রেমিককে কারারুদ্ধ করিয়া রাখা সহজ নহে। আবদুল করিমের রক্ষী ছিল এক রিফ মুর। তাহার সাহায্যে তিনি কারাগৃহ হইতে পলায়ন করিলেন। পলায়ন-কালে প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিতে গিয়া তিনি একখানি পা ভাঙ্গিয়া ফেলেন। তদবধি তিনি ঈষৎ খঞ্জই হইয়া আছেন। পলায়ন করিয়া তিনি বেণী ওয়ারিয়াঘেল অঞ্চলের পর্ব্বতে লুকাইয়া রহিলেন।

১৯১৯ খৃষ্টাব্দে প্রকৃত ষড়যন্ত্র ও বিদ্রোহ আরম্ভ হইল। স্পেনীয়রা এই স্বাধীনতা-যুদ্ধকে বিদ্রোহ নামে অভিহিত করিল। সকল সাম্রাজ্য-গর্ব্বী জাতই এইরূপ করিয়া থাকে। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে করিমের কনিষ্ঠ ভ্রাতা আসিয়া সেই 'বিদ্রোহে' যোগদান করিলেন। খনিজ-বিদ্যা, সামরিক ইঞ্জিনিয়ারিং এবং যুদ্ধবিদ্যায় তিনি সম্যক্ পারদর্শী হইয়া উঠিয়াছিলেন। সুতরাং করিম তাঁহার সাহায্য পাইয়া যে অতীব লাভবান্ হইলেন, ইহা বলাই বাহুল্য।

দুই ভ্রাতা ১৯২১ খৃষ্টাব্দে এক ক্ষুদ্র পার্ব্বত্য সেনাদল গঠন করিয়া সমরসাগরে ঝম্পপ্রদান করিলেন। তখন বেণী ওয়ারিয়াঘেল জাতিই তাঁহাদের প্রধান সহায়; বেণী বাউক্রা, বেণী বাউকয়া ও বেণী তাউজিন জাতির মধ্যেও কেহ কেহ ঐ যুদ্ধে তাঁহার পক্ষে যোগদান করিল। অশিক্ষিত ও অনিয়ন্ত্রিত এই যোদ্ধৃদলকে লইয়া যাহা সম্ভব, তাঁহারা সেই খণ্ডযুদ্ধ (Guerrilla) আরম্ভ করিয়া দিলেন। পাঠক দেখিবেন, এখানেও হিন্দুকুলসূর্য্য শিবাজীর সহিত মুসলমান বীর আবদুল করিমের কত সৌসাদৃশ্য! তাঁহারা স্পেনীয়দিগের যাতায়াতের ও সংবাদ আদান-প্রদানের পথ ধ্বংস ও বিপন্ন করিতে লাগিলেন, শত্রুদিগের সহিত এমনভাবে নানা স্থানে নানাভাবে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন যে, শত্রুরা বিষম ভ্রমে পতিত হইল, ভাবিল, তাঁহারা প্রবল সেনাদল সঙ্গে রণে হানা দিয়াছেন! অথচ তাঁহার সেনাবল যৎসামান্য, স্পেনীয়দিগের তুলনায় কিছুই নহে। যেখানেই দেখেন, স্পেনীয়রা অরক্ষিত অবস্থায় রহিয়াছে, সেইখানেই চিলের মত ছোঁ মারিয়া সর্ব্বস্ব গ্রাস করেন, যেখানে স্পেনীয়রা সংখ্যায় অল্প, সেখানেই অবরোধ করিয়া তাহাদিগকে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য করেন।

স্পেনীয় সেনা অতীব সাহসী, তাহারা শূরবীর যোদ্ধা। কিন্তু স্পেনীয় সেনানীরা একবারে অকর্ম্মণ্য ও অযোগ্য। তাহারা পয়সা উপায় করিতে সেনাদলে প্রবেশ করে, নাচগান ও তামাসায় সময় অতি-বাহিত করে। তাহাদের বিলাসিতা ও অযোগ্যতার ফলে স্পেনীয়রা প্রায় পরাজিত হইতে লাগিল, আবদুল করিম একে একে অনেক স্থান অধিকার করিয়া লইলেন। ১৯২১ খৃষ্টাব্দের বসন্তকাল আবদুল করিমের পক্ষে মহা আনন্দের ও গৌরবের দিন বলিতে হইবে। কেন না, ঐ সময়ে স্পেনীয় সেনাপতি জেনারল ন্যাভারো আন্নুয়েল নামক স্থানে ২০ হাজার সৈন্য সহ আবদুল করিমের হস্তে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইলেন। আশ্চর্য্যের কথা, আবদুল করিমের মুর সেনার সংখ্যা ৩ হাজারের অধিক ছিল না, পরন্তু পুরাতন মসার বন্দুক ব্যতীত তাহাদের অন্য অস্ত্র ছিল না!

এই যুদ্ধজয়ে চারিদিকে আবদুল করিমের ধন্য ধন্য রব পড়িয়া গেল। এই জয় যেন কতকটা রাণা প্রতাপের কমলমীর যুদ্ধ জয়ের মত। আবদুল করিম এই রণজয় করিয়া বন্দী স্পেনীয়দিগের নিকটে বিস্তর আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র প্রাপ্ত হইলেন। ইহার পর ক্রমশঃ স্পেনীয়রা পরাজিত হইয়া সমুদ্রতটাভিমুখে হটিয়া যাইতে লাগিল। মাদ্রিদ ও মেলিল্লার স্পেনীয় কর্ত্তৃপক্ষ লোকক্ষয়ের ভয়ে স্পেনীয় সৈন্যকে একের পর এক ঘাঁটি ছাড়িয়া হটিয়া যাইতে আদেশ করিলেন।

১৯২৪ খৃষ্টাব্দের প্রথমেই—মাত্র ২ বৎসর যুদ্ধের পর আবদুল করিম স্পেনীয়দিগের হস্ত হইতে সমগ্র রিফ প্রদেশ কাড়িয়া লইলেন, মাত্র পূর্ব্বাঞ্চলে মেলিল্লাটুকু স্পেনীয়দিগের অধিকারে রহিল। পরে ঘোহমারা ও জেবালা প্রদেশেও করিম স্পেনীয়দিগকে তাড়াইয়া লইয়া চলিলেন, এই দুইটি প্রদেশ রিফের অন্তর্ভুক্ত নহে। জেবালা প্রদেশটি মরক্কোদেশের উত্তরভাগের একবারে পশ্চিমাংশে অবস্থিত।

মুরদিগের মধ্যে দেশদ্রোহীও যে ছিল না, এমন নহে। আবদুল মালেক স্পেনীয়দিগের Harkas Amigus অথবা ভাড়াটিয়া নেটিব সেনাদলে থাকিয়া তাঁহাকে বড়ই ব্যতিব্যস্ত করিয়াছিল। ঘর-সন্ধানী বিভীষণকে যত ভয়, রাম-লক্ষ্মণকে তত ভয় করিতে হয় না। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে এই হতভাগ্য আজাব এল মিদার নামক স্থানে নিহত হয়। অতঃপর স্পেনীয়দিগের রিফ পুনরধিকার করিবার সকল আশাই সমূলে বিনষ্ট হয়।

এ দিকে আবদুল করিম ১৬ হাজার বাছা রিফ সেনা লইয়া জেবালা প্রদেশের প্রধান সহর সেম্বুয়ান অবরোধ করিলেন। স্পেনীয় পক্ষের প্রধান সেনাপতি মার্কুইস প্রাইমো ডি রিভেরা ভীত হইয়া ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে জেনারল ক্যাষ্ট্রো গিরোনাকে প্রভূত সৈন্যসমভিব্যাহারে সেম্বুয়ান সহরের উদ্ধারসাধন করিতে প্রেরণ করি-লেন। কিন্তু তাঁহার সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইল। সাহসী দুর্দ্ধর্ষ মুর সেনার প্রচণ্ড আক্রমণে ১৭ই নভেম্বর তারিখে সেম্বুয়ান মুরদিগের হস্তগত হইল। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারীর নিকটবর্ত্তী সময়ে আবদুল করিম মেলিল্লা কেন্দ্র হইতে টাঞ্জিয়ার কেন্দ্র পর্য্যন্ত সমগ্র উত্তর মরক্কো দেশ আপনার কর্ত্তৃত্বাধীনে আনয়ন করিতে সমর্থ হইলেন। দেশের ত্রাণকর্ত্তা বলিয়া তাঁহার জগৎময় বিজয় বিঘোষিত হইল। তাঁহার নাম রাণা প্রতাপ ও শিবাজীর মত, লিওনিডাস ও টেলের

মত, আনোয়ার ও কামাল পাশার মত পৃথিবীর মুক্তির ইতিহাসে সুবর্ণাক্ষরে মুদ্রিত হইবার যোগ্যতা অর্জ্জন করিল।

আবদুল করিম অসভ্য, বর্ব্বর, ক্রূর ও কপট বলিয়া য়ুরোপীয় লেখকের দ্বারা বর্ণিত হইয়াছেন। কিন্তু এ কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা। তিনি শিক্ষিত, মার্জ্জিতরুচি, তীক্ষ্ণধী, রাজনৈতিক ও যোদ্ধা। তাঁহার ভ্রাতা বহু য়ুরোপীয় সামরিক নেতা অপেক্ষা রণকুশলী শিক্ষিত যোদ্ধা। আবদুল করিম মাতৃভক্ত তিনি তাঁহার অবরোধপ্রথার কোনওরূপ কড়াকড়ি করেন না। তাঁহার ভগিনী তাঁহার বড় আদরের পাত্রী। এই ভগিনীর সন্তান প্রসবকালে আবদুল করিম অসম্ভব ব্যয় করিয়া ফরাসী ডাক্তার ও ধাত্রী আনয়ন করিয়াছিলেন। এমন লোক কখনও নিষ্ঠুর ও বর্ব্বর হইতে পারে না। আবদুল করিমের চারিটি পত্নী; মুসলমান ধর্ম্ম অনুসারে পুরুষের চারিটি পত্নী আইনসঙ্গত। তাঁহার তিনটি পুত্র; জ্যেষ্ঠটি মাত্র ৫ বৎসরের। এই বালকও অতীব মেধাবী। আবদুল করিমের ভ্রাতা তাঁহার সেনাপতি।

আবদুল করিমের রাজধানী আজদির একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আঙ্গোরা অপেক্ষাও ইহা সামরিক ও শোভার হিসাবে হীন। ১৯২১ খৃষ্টাব্দ হইতে আবদুল করিম এই সহরে রাজধানী প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। তিনি স্বয়ং এই সহরে বাস করেন না, আজদির হইতে ১৩ মাইল দূরে আইত কামারা নামক গ্রামে বাস করেন। অন্ততঃ ১৯২৫ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভকাল এই স্থানেই অতিবাহিত করিয়াছেন। ফরাসীদিগের সহিত যুদ্ধ বাধিবার পর হইতে যখন তাঁহার ভাগ্য-বিপর্য্যয় আরম্ভ হইয়াছে, যখন স্পেনীয়রা আবার ফরাসীর সহায়তায় পা ঝাড়া দিয়া উঠিয়া আজদির দখল করিয়াছে, তখন হইতে আবদুল করিম রিফের পাহাড়-পর্ব্বতের আশ্রয় লইয়াছেন বলিয়া শুনা যাইতেছে। ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। সকল স্বাধীনতা-যুদ্ধেই দেশপ্রেমিক যোদ্ধারা এইরূপ কষ্ট-বিপদের জন্য প্রস্তুত থাকেন। রাণা প্রতাপ বহুদিন পর্ব্বতে, জঙ্গলে বন্য জন্তুর ন্যায় লুক্কায়িত থাকিয়া স্বাধীনতা-যুদ্ধ চালাইয়াছিলেন।

আজদির হইতে আলহুসিমাস গ্রাম অতি নিকটে অবস্থিত। বস্তুতঃ আলহুসিমাস হইতে বড় কামান দাগিলে আজদিরে গোলা পড়ে। আলহুসিমাসের দুর্গ, রণপোত ও উড়োকল হইতে আজদিরকে সদাই শঙ্কিত হইয়া থাকিতে হয়। অথচ আবদুল করিম যখন এই স্থানে বাস করিতেন, তখন এক দিনও বিচলিত হয়েন নাই। আজদিরের আসরার নামক গিরিবর্ত্মের মুখে এক প্রশস্ত স্থানে করিমের গৃহ অবস্থিত; ইহা প্রাসাদ নহে, হর্ম্ম্য নহে, সামান্য কাঁচা ইটের একখানি ক্ষুদ্র গৃহ। স্বাধীনতাযুদ্ধের নেতৃত্ব গ্রহণের পর আবদুল করিম এই গৃহে ২ বৎসর যাবৎ বাস করিয়াছিলেন।

আজদির হইতে ১৩ মাইল দূরে আইত কামারা অবস্থিত, এ কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এই ১৩ মাইল পথ দুইটি পাহাড়ের উপর দিয়া গিয়াছে। পথটি স্পেনীয় কয়েদীদিগের দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে। আইত কামারার পাহাড়ের ক্রোড়দেশে লুক্কায়িত সুলতানের 'প্রাসাদ' অবস্থিত। এই গ্রামটি উড়োকল হইতে দেখা যায় না। সুতরাং এখানে কতকটা নিশ্চিন্ত হইয়া বাস করা সম্ভব। সুলতানের 'প্রাসাদ' আজদিরের প্রাসাদেরই অনুরূপ। ফরাসী অধিকৃত মরক্কোর সহর ও গ্রাম জনপদ ব্যতীত আইত কামারার মত এ দেশে আর কোথাও এত লোকসংখ্যা ও গৃহাদি নাই। এই গ্রামে প্রায় ২ হাজার স্পেনীয় কয়েদীই বাস করে। এই স্থানে ৪ শত রিফ সেনা সহররক্ষিরূপে বাস করে। ইহারা প্রায় সকলেই বেণী ওরায়িয়াঘেল জাতীয় মুর এবং সুলতানকে আন্তরিক ভালবাসে। এই গ্রামের সকল গৃহই মৃৎকুটীর, সুলতানের 'প্রাসাদও' এই প্রকৃতির, তবে উহা আয়তনে কিছু বড়।

পাঠক ইহা হইতেই বুঝিতেছেন, সুলতান আবদুল করিম কিরূপ প্রকৃতির লোক। তাঁহার বিলাসিতা নাই, তিনিও সামান্য প্রজার ন্যায় বাস করেন। তিনি সর্ব্বদা কার্য্যে তন্ময় হইয়া থাকেন। রাণা প্রতাপের ন্যায় তিনিও বিলাসিতা বর্জ্জন করিয়া দেশের জন্য মুক্তি-সমরে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন।

আবদুল করিম দেখিতে নাতিদীর্ঘ, নাতিস্থূল, তবে ঈষৎ হৃষ্টপুষ্ট। তাঁহার পরিচ্ছদ অতি সামান্য মূল্যের, তাহাতে বিলাসিতার নামগন্ধ নাই।

তাঁহার রাজ্যশাসনও অতি চমৎকার। মহম্মদ বিন আবদুল করিম—আবদুল করিমের ভ্রাতা, তাঁহার সেনাপতি ও সামরিক ইঞ্জিনিয়ার। সিদি মহম্মদী বিন হাজ হিতমি, আবদুল করিমের ভগিনীপতি, তিনি আবদুল করিমের দক্ষিণ হস্ত। সুলতানের যাহা কিছু লেখাপড়ার কায তিনিই করিয়া থাকেন। তিনি একরূপ প্রধান উজীর। কেবল ইহাই নহে, কিসে রিফের ভূগর্ভস্থ ধনসম্পদের সদ্ব্যবহার করিয়া দেশের উন্নতিবিধান করা যায়, অহরহ তাঁহার এই চিন্তা। তিনি ১৯২২-২৩ খৃষ্টাব্দের শীতকালে প্যারী নগরীতে এক জার্ম্মাণ ও আর এক ইংরাজ কোম্পানীর সহিত এই খনিজ সম্পদ উত্তোলনের বিষয়ে সলাপরামর্শ করিয়াছিলেন। কিন্তু বিদেশী অর্থ আনিয়া রিফের খনিজ সম্পদ উত্তোলনের সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়াছে। তবে ফরাসীর সহিত যুদ্ধ না বাধিলে বোধ হয়, এত দিন যাহা হয় বন্দোবস্ত হইয়া যাইত।

হামিদ বাউদরা সুলতানের সমর সচিব (উজীর-অল-হার্ব)। নিয়াজিদ বিন হাজ সুলতানের স্বরাষ্ট্র-সচিব। ইঁহারা উভয়েই সুলতানের ভক্ত, স্বদেশপ্রেমিক ও কর্ম্মকুশলী। ইঁহারা দুই জন ব্যতীত সুলতানের দেওয়ানের বা কাউন্সিলের আরও দুই জন উজীর আছেন। ইঁহারা সকলেই আইত কামারায় সুলতান আবদুল করিমের 'প্রাসাদে' বাস করেন এবং সকল সময়েই সুলতানের আহ্বানে রাজ্য ও সমরসংক্রান্ত পরামর্শে যোগদান করেন। দেওয়ান বা কাউন্সিল রাজ্যসংক্রান্ত গুরু লঘু সকল ব্যাপারেরই মীমাংসা করিয়া দেন।

সুলতানের ভ্রাতার অধীনে নিয়ন্ত্রিত রিফ সেনার সংখ্যা ২৫ হাজার হইবে। এতদ্ভিন্ন অনিয়ন্ত্রিত (Irregular) আরব সেনাও আছে। মোট সৈন্যসংখ্যা ৭০ হাজার হইতে পারে। বহু য়ুরোপীয়ের ধারণা আছে যে, রিফের মুর সেনা বর্ব্বর ও অনিয়ন্ত্রিত; এক এক সর্দ্দারের অধীনে এক এক (clan) যোদ্ধৃরূপে যুদ্ধের সময় একত্র হয়, আবার যুদ্ধ শেষ হইলেই যে যাহার ঘরে ফিরিয়া গিয়া চাষবাস করে। অর্থাৎ কতকটা আমাদের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের স্বাধীন পাঠানদের মত রিফের সেনার অবস্থা। কিন্তু ইহা সত্য নহে। রিফে কতকটা বাধ্যতামূলক যুদ্ধশিক্ষার ব্যবস্থা আছে। মুররা সকলেই যোদ্ধা, সুতরাং এই শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক না বলিয়া স্বেচ্ছামূলকও বলা যায়। সেনাদলে শ্রেণী-বিভাগ আছে। ৫০টি সৈন্য লইয়া একটি 'হামর্সাই' য়ুনিট গঠিত হয়, ইহার উপরিস্থ সেনানীকে কাইদ বলে। মুর সেনার মধ্যে অশ্বারোহী নাই, কেবল পদাতিক ও গোলন্দাজ, কেবল সেনানীরা অশ্বারোহী। রিফ সৈন্যরা প্রকাশ্যে বড় ধরণের যুদ্ধ করে না, তাহারা গুপ্তভাবে ওৎ পাতিয়া থাকিয়া শত্রুকে বিধ্বস্ত করে অথবা পার্ব্বত্য খণ্ডযুদ্ধ করে। গোলন্দাজ সেনা সংখ্যায় অল্প হইলেও অত্যন্ত কার্য্যপটু। মুরদিগের সকল ঘাটিতেই মেসিন গান আছে। ইহার অর্দ্ধেক হচকিস গান, স্পেনীয়দিগের নিকট যুদ্ধে প্রাপ্ত, অপরার্দ্ধ বন্দুক-চোর ব্যবসায়ীরা ফ্রান্স হইতে গোপনে সরবরাহ করিয়াছে। বড় বড় ঘাটিতে বড় বড় পার্ব্বত্য কামান রক্ষিত আছে। এ সকলের অধিকাংশ স্পেনীয়দিগের

মুর সেনাদল

নিকট হইতে কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে, অপরাংশ ফ্রান্স হইতে গুপ্তভাবে মরক্কোয় চালান হইয়াছে।

যিনি রিফদেশের রাজস্ব আদায় করেন, তাঁহার নাম আবদুল আল সালেম আল হকেতাবী। ইনি যে কিরূপে রাজ্যের ব্যয় নির্ব্বাহ করেন, তাহা কেহ বুঝিতে পারে না। আবদুল করিম এই অর্থ হইতে কত উড়োকল কিনিয়াছেন, সৈন্যদিগের বেতন যোগাইতেছেন, প্রত্যেক রাইফল বন্দুকের জন্য ১৫ হইতে ২০ ডলার (১ ডলার=৩৶০) দাম দিতেছেন। অথচ রিফে স্পেনীয় মুদ্রার প্রচলন এত অল্প যে, এ খরচা কিরূপে সরবরাহ হয়, বুঝিয়া উঠা যায় না। রিফের প্রজা টাকায় খাজানা দেয় না, পণ্যে খাজানা দেয়। এই জন্য অনেকে সন্দেহ করেন, হয় রুসিয়ান বলশেভিকরা, না হয় ফরাসী কমিউনিষ্টরা গোপনে এই অর্থসাহায্য করিতেছে। জার্ম্মাণীর ম্যানসম্যান ও ষ্টীনস কোম্পানী ভবিষ্যতে রিফের খনিজ পদার্থে বিশেষ অধিকারলাভের প্রত্যাশায় আবদুল করিমকে অর্থ যোগাইতেছে। কিন্তু এ সকল জনরবের কোনও প্রমাণ নাই।

সে যাহাই হউক, আবদুল করিম যেরূপেই হউক বা যেখান হইতেই হউক, অর্থ সংগ্রহ করিয়া প্রতীচ্যের দুইটি প্রবল জাতির বিপক্ষে এত দিন ধরিয়া ঘোর যুদ্ধ করিতেছেন, ইহাই দেখিবার বিষয়। ফরাসীর সহিত যুদ্ধ করিবার তাঁহার আদৌ ইচ্ছা ছিল না বলিয়াই মনে হয়। স্পেনই তাঁহার আজন্ম শত্রু, তাহার বিপক্ষে যুদ্ধ করাই আবদুল করিমের অভিপ্রেত ছিল। কিন্তু দৈবদুর্ব্বিপাকে তাঁহারই বন্ধু কোনও মুর জাতি—যাহারা ফরাসী সীমানার নিকটে বাস করে—সেই বন্ধু জাতি হঠাৎ ফরাসী রক্ষিত রাজ্য আক্রমণ করে। ইহা হইতেই যুদ্ধের উদ্ভব হইয়াছে।

আবদুল করিম কোনও মার্কিণ সংবাদ-সংগ্রাহককে বলিয়াছেন,—"ফরাসী-মরক্কো আক্রমণ করিবার আমার আদৌ অভিপ্রায় নাই। আমরা যদি ফরাসী কর্ত্তৃক আক্রান্ত না হই, তাহা হইলে ফরাসীর সহিত আমাদের যুদ্ধ বাধিতে পারে না—উহা আমি ভাবিতেও পারি না। যদি আমরা আক্রান্ত হই, তাহা হইলে নিশ্চিতই আত্মরক্ষা করিব। আমরা ফরাসীকে বন্ধুভাবে গ্রহণ করিবার উদ্দেশ্যে হস্তপ্রসারণ করিতেছি, তাঁহারা এই হস্ত গ্রহণ করুন, ইহাই আশা। তবে সীমান্তের গোলযোগ থাকিবেই। বেনী জেরুল অঞ্চলে এইরূপ সীমান্ত-সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু এ যাবৎ আমার রিফ সেনা একটিও ফরাসী ঘাঁটি আক্রমণ করে নাই, অথবা ফরাসী সীমানা অতিক্রম করে নাই। বেনী জেরুলে যে সীমানা-গোলযোগ ঘটিয়াছিল, ঐ ভাবের সীমানা-সমস্যার মীমাংসা করিতে হইলে উভয়পক্ষে মিলিত হইয়া সীমানা-নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। শান্তি স্থাপিত হইবার পক্ষে সীমানা-নির্দ্ধারণ করাও একটি প্রধান সর্ত্ত। এ বিষয়ে একটা কমিশন নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে ফরাসী স্পেনের সহিত একযোগে এই সীমানা-নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন, ইহাতে আমার দেশবাসীর কোনও হাত ছিল না; সুতরাং আমরা এই সীমানা-নির্দ্ধারণের সর্ত্ত মানি না।"

আবদুল করিমের এই কথায় কি মনে হয়? তিনি ফরাসীর শত্রু নহেন, তাঁহার রিফ সেনাও ফরাসী সীমানা অতিক্রম করে নাই।

হয় ত কোনও বন্ধু মূর জাতি ফরাসী সীমানা অতিক্রম করিয়া থাকিবে। কিন্তু সে জন্য তিনি কি দায়ী? স্পেনের বিপক্ষেও আবদুল করিম যুদ্ধ করিতে চাহেন নাই। স্পেন যত দিন যুদ্ধ চাহিয়াছিল, তত দিন তিনিও যুদ্ধ করিয়াছেন। তাহার পর স্পেন পরাজিত হইয়া রিফ ত্যাগ করিলে আবদুল করিম ঘোষণা করেন, "স্পেনের সহিত আর আমার শত্রুতা নাই। স্পেন শান্তি চাহিলে আমি সানন্দে সন্ধি-শান্তি করিতে প্রস্তুত আছি।"

এমন লোক শান্তিপ্রিয় কি না, জগতের নিরপেক্ষ জাতিমাত্রেই বিচার করিবেন। যুদ্ধে জয়-পরাজয় অনিশ্চিত, যদি আবদুল করিম পরিণামে পরাজিত হয়েন, তাহাতে ক্ষোভ নাই, কেন না, জগতের লোক জানিবে, তিনি বীর, স্বদেশপ্রেমিক, শান্তিকামী, দেশের স্বাধীনতার জন্য ন্যায়যুদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহাকে সে জন্য কেহ অপরাধী করিতে পারিবেন না।

মাতৃহারা

মা গো, ফিরে চাও, কথা কও মা কথা কও!
ও মা আমার খোকন ব'লে আবার কোলে লও!
রাতের আঁধার কেটে গেছে,
গাছের আগে রোদ হেসেছে,
আজ এখনো কেন মা গো নয়ন মুদে রও?
মা গো, ফিরে চাও, কথা কও মা কথা কও!

রোজ সকালে আকাশপথে,
সুয্যি ঠাকুর সোনার রথে,
আসার আগেই মুখটি আমার চুমি,
ঘাটের বাঁকা পথটি ধ'রে,
ফুলের সাজি হাতে ক'রে,
নিত্য যেতে ফুল-বাগানে আমায় রেখে তুমি।

আমি তোমার পরেই কিছু,
মা, মা, বলে পিছু পিছু,
ছুটে যেতাম ফুলবনে সে ফোটা ফুলের মাঝে।
তুমি আমায় দুষ্টু ব'লে,
হাত বাড়িয়ে নিতে কোলে,
ফুলের সঙ্গে আমায় নিয়ে ফিরতে ঘরের কাযে।

দুপুরবেলা ঘরের ছায়ায়,
পাশে শুয়ে পাখার হাওয়ায়,
হাত বুলিয়ে গান গেয়ে মা, বলতে খোকন ঘুমো,
বাইরে যেতে চাইলে মোরে,
বুকের মাঝে জড়িয়ে ধ'রে,
স্নেহের নেশায় ঘুম পাড়াতে দিয়ে হাজার চুমো!

শীতের দিনে আঙিনাতে,
রোদে ব'সে ভাত খাওয়াতে,
বল্‌তে কত শুক সারী আর পরীর দেশের কথা।
আমার যত বায়না হ'ত,
কথা তোমার বাড়ত তত,
তবু দুটি কম খেলে মা, কতই পেতে ব্যথা।

বাদল সাঁঝে আঁধার হ'লে,
মেঘের ডাকের গণ্ডগোলে,
বুকটি আমার উঠত কেঁপে মস্ত বড় ভয়ে।
তোমার বুকে মুখ লুকিয়ে,
দিতাম আমি ভয় চুকিয়ে,
মনে হতো বুকটি আছে দুর্গ-প্রাচীর হয়ে।

আজ যে আমি তোমার আগে,
উঠেছি মা আপনি জেগে,
মা, মা, ব'লে ডাক্‌ছি কত, বুক যে ভেঙ্গে যায়।
খোকারে তোর একলা ফেলে,
কোথায় মা আজ চ'লে গেলে,
কেঁদে কেঁদে হলেম সারা, আয় মা ফিরে আয়।

দুষ্টুমি আর করব নাক',
বায়না ধ'রে কাঁদব নাক',
ও মা তুমি কোথায় আছ, লও মা কোলে লও।
চাও মা হেসে চক্ষু খুলে,
দুধ দে মা গো বুকে তুলে,
প্রাণ যে আমার ফেটে গেল, কও মা কথা কও!

শ্রীঅমূল্যকুমার রায় চৌধুরী।

৪

ইভের সহিত বিমলেন্দুর এখন প্রায় নিত্যই দেখা হয়। তাহারা হাত ধরাধরি করিয়া মল রোডে বেড়ায়—কথনও কথনও ইভের বাড়ীতে পানাহার চলে। যদিও প্রথম প্রথম বিমলেন্দু এই ইংরাজ-দুহিতার সঙ্গ বর্জ্জনের চেষ্টা করিয়াছিল, তথাপি ইভ তাহা ঘটাইতে দেয় নাই। বিমলেন্দু আফিসের ফেরতা একবার তাহার সহিত দেখা না করিলে ইভ তাহার মেসে আসিত। ইহাতে মেসের বাবুরা আকারে ইঙ্গিতে তাহাকে বিদ্রূপ করিত। বিমলেন্দু সেই ভয়ে নিজেই ইভের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইত।

মেসের বাবুরা ছাড়া আর কেহ যে নেটিভের সহিত য়ুনানী বালিকার এই মিলন লক্ষ্য করে নাই, তাহা নহে। দার্জ্জিলিঙ্গ ছোট যায়গা, কলিকাতার মত বৃহৎ সহরের ন্যায় এখানে য়ুরোপীয় সমাজ বৃহৎ নহে, খুবই সীমাবদ্ধ। কাযেই যে দুই চারি জন য়ুরোপীয় নরনারী লইয়া দার্জ্জিলিঙ্গের য়ুরোপীয় সমাজ, তাঁহাদের অনেকেই এই বিসদৃশ মিলন ক্রোধ ও ঘৃণার দৃষ্টিতে লক্ষ্য করিয়াছিলেন। কলিকাতায় এমন ইঙ্গবঙ্গ-মিলন অনেক দেখা যায়, কিন্তু সে দিকে কাহারও বিশেষ লক্ষ্য থাকে না। দার্জ্জিলিঙ্গের য়ুরোপীয় সমাজ কিন্তু বিমল ও ইভকে ক্ষমা করিল না। প্রথম প্রথম কানাঘুষা, তাহার পর ঘৃণার দৃষ্টি, শেষে ইঙ্গিতে ও কথায় পর্য্যন্ত বিরোধের ভাব ফুটিয়া উঠিল। ফলে এক দিন বিমলেন্দু আফিসেই সাহেবের মিষ্ট ভর্ৎসনা লাভ করিল।

এক দিন হেড এসিষ্ট্যাণ্ট তাহাকে বড় 'সাহেবের' ঘরে ডাক পড়িয়াছে বলিয়া পাঠাইয়া দিলেন। মিঃ হজেস কক্ষদ্বার রুদ্ধ করিয়া নির্জ্জনে তাহাকে বলিলেন,—"তোমার মতলব কি?"

বিমলের অন্য যে কোনও দোষ থাকুক, সে চিরদিনই নির্ভীক। সে নির্ভয়ে বলিল,—"কিসের মতলব?"

মিঃ হজেস দাঁতে দাঁত চাপিয়া বলিলেন,—"ইমপার্টিনেণ্ট! বোঝ সব, সময়বিশেষে নেকা সাজ। তোমার চালাকি চলিবে না।"

বিমল 'সাহেবের' রুদ্রমূর্ত্তি দেখিয়াও ভীত হইল না, সমান তেজে বলিল,—"সাজার অভ্যাস আমার নেই, আমি যাহা করি, প্রকাশ্যেই ক'রে থাকি।"

"জান, আমি তোমায় চাকুরী হ'তে বরখাস্ত করতে পারি—তোমায় পাহাড় থেকে নামিয়ে দিতে পারি।"

"জানি, কিন্তু কি দোষ আমার?"

"দোষ? তুমি মিস্ রবিনসনের সঙ্গে কি উদ্দেশ্যে ঘোর ফের? তুমি নেটিভ—"

"মাপ করবেন, সে কথা বলতে আমি বাধ্য নই। আফিসে কোনও দোষ ক'রে থাকি, সাজা দিতে পারেন, কিন্তু আমার প্রাইভেট লাইফের সঙ্গে আফিসের কোনও সম্পর্ক নাই।"

'সাহেব' টেবলের উপর প্রচণ্ড মুষ্ট্যাঘাত করিয়া বলিলেন, "পাঁচশো বার আছে। আমি আজই নোটিশ দিচ্ছি, যদি তুমি আজ থেকে মিস রবিনসনের সঙ্গ না ছাড়, তা' হ'লে সাত দিনের মধ্যে তোমায় কলকাতায় ট্রান্সফার করব, যাও।"

বিমল ধীর অবিকম্পিত কণ্ঠে বলিল, "যাচ্ছি, কিন্তু জেনে রাখুন, আপনার এই অন্যায় দণ্ডের ভয়ে আমি কর্ত্তব্য হ'তে এক চুল তফাতে যাব না।"

মিঃ হজেস অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া বজ্রমুষ্টি উত্তোলন করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন, কিন্তু কি ভাবিয়া হাত নামাইয়া গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "যাও।"

বিমল চলিয়া গেল, বুঝিল, এ আফিসেও তাহার

অম্ন উঠিল। দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া সে দিনের কাষ সারিয়া বাসায় গেল। সে দিন আর তাহার ইভের সহিত সাক্ষাৎ হইল না।

কিন্তু পরদিন ইহার উপরও বড় ধাক্কা আসিল। সে পাদরী ডেনিসের এক চিঠি পাইল, তিনি সন্ধ্যার পর তাঁহার নিজের বাসায় সাক্ষাৎ করিতে বলিয়াছেন, বিশেষ জরুরী কথা। সে দিন আফিসে বিমল জবাবের হুকুম পাইল না, তবে কানাঘুষায় শুনিল, বড় 'সাহেব' এ বিষয়ে চিফ সেক্রেটারীকে লিখিয়াছেন, সরকারী চাকুরী হইতে কর্ম্মচ্যুত করা ত সহজ কথা নহে।

মিঃ ডেনিসের সহিত সাক্ষাৎ হইলে তিনি দুই একটা কথা কহিবার পর একখানি পত্র দেখাইলেন। পত্র আসিয়াছে বেগমপুর হইতে, পত্রের লেখক ইভের ভ্রাতা। সে পত্রে মিঃ রবিনসন অন্যান্য কথাপ্রসঙ্গে লিখিয়াছেন,—"দার্জ্জিলিঙ্গ হইতে খবর পাইলাম, ইভ নাকি কে একটা নিগারের সঙ্গে আজকাল খুব মিলামিশা করিতেছে। কথাটা বিশ্বাস করিতেই প্রবৃত্তি হয় না। ইহা সত্য কি? আমি ইভকে এ কথা জিজ্ঞাসা করিতেও লজ্জা বোধ করি। যদি এ কথা আংশিকও সত্য হয়, তাহা হইলে আপনি আমার হইয়া এই লোকটাকে একটা কথা বলিবেন কি? সে যদি কথায়, কাযে বা কোনও রকমে অতঃপর ইভের সংস্রবে আসে, তাহা হইলে আমি দার্জ্জিলিঙ্গে গিয়া উহাকে কুকুরের মত গুলী করিয়া মারিব।"

মিঃ ডেনিস বিমলের আরক্ত মুখের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া হাসিয়া বলিলেন,—"কি বলেন মিঃ রায়, আপনি এই পত্রের কথামত কায করিতে সম্মত আছেন?"

"আপনি তাকে লিখবেন, কুকুরের মত মারতে কেবল যে এক জন পারে, তা নয়, যে মারতে চায়, তাকেও অন্য লোকে দরকার হ'লে মারতে পারে।"

"হাঃ হাঃ! আপনার কাছে এই উত্তরেরই আশা করেছিলুম। যে কাপুরুষ, সে গোঁয়ারের হুমকিতে ভয় পায়।"

"আপনাকে একটা সাদা কথা জিজ্ঞাসা করব। এখন আপনি ইভের অভিভাবক, আপনি কি এ মেলা-মেশায় আপত্তি করেন?"

"করলে এত দিন বারণ করতুম। আমি চামড়ার তফাতে ছোট বড় মাপ করিনি—মানুষমাত্রই ভগবানের সৃষ্টি। ইভকে এ পত্র দেখিয়েছি, সে আপনাকে খুঁজছিল।"

বিমলের মুখ প্রসন্ন হইল। দিনটা যেমন আজ তাহার পক্ষে মন্দ হইয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, তেমনই দিনের শেষটা ভাল গেল। সে মিঃ ডেনিসের বাসা হইতে ইভের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেল। তখন রাত্রি ৮টা। ইভ বাসায় নাই। ইভের নেপালী ধাত্রী বলিল, ইভ তাহার খোঁজে গিয়াছে।

পথে ইভের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল, তখন পথ নির্জ্জন। ইভ তাহাকে দেখিয়াই বলিল, "বাঃ, এই যে আপনি। দেখুন ত, লোকে আমাকে জ্বালাতন করে কেন? আমার যা খুসী করব"—বলা শেষ হইল না, ইভ ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিয়া উঠিল এবং অজ্ঞাতসারে বিমলের বুকের উপর মাথাটা রক্ষা করিল।

বিমলেন্দু এমন অবস্থায় কখনও পড়ে নাই। সে সংযত হইলেও মানুষ—সুন্দরী যুবতীর সাশ্রুনয়নে প্রেমের নিদর্শন দেখিতে পাইয়া যে আকর্ষণের মোহ ত্যাগ করিতে পারে, সে হয় দেবতা, না হয় পশু। বিমলেন্দু মুহূর্ত্তের জন্য জগৎসংসার ভুলিয়া গেল—নিজেকে ভুলিয়া গেল, ইভকে বাহুবেষ্টনে আবদ্ধ করিয়া তাহার রক্তকুসুম তুল্য ওষ্ঠাধর স্পর্শ করিল। তাহার জীবন-নাটকে একটি নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইল।

৫

"বাবা, ওরই নাম কাঞ্চনজঙ্ঘা?"

"হাঁ বাবা, ঐ পাহাড়ই কাঞ্চনজঙ্ঘা।"

"কি সুন্দর, কি সুন্দর! বাবা, এ দেখে আর বাড়ী ফিরতে ইচ্ছে করে না।"

রামপ্রাণ বাবু দার্জ্জিলিঙ্গে আসিয়াছেন, সঙ্গে প্রতিমা। এখানে একখানি বাড়ী পূর্ব্বাহ্নেই ভাড়া করা হইয়াছিল। আজ মাত্র দুই দিন তাঁহারা আসিয়াছেন, আগামী কল্য বিমলেন্দুর সহিত সাক্ষাতের কথা। আজ রাত থাকিতে তাঁহারা লোক-লস্কর লইয়া সিঞ্চল পাহাড়ে উঠিয়াছেন—কাঞ্চনজঙ্ঘার সোনার বর্ণ দেখিবেন।

একটা পাহাড়ী সেলাম করিয়া বলিল, "বাবুজী, আরও আগে যাবেন?—সেখান থেকে গৌরীশঙ্করও দেখা যায়।"

রামপ্রাণ বাবু বলিলেন, "ও দিকে যে জঙ্গল।"

পাহাড়ী বলিল, "না, ওর ভেতরে আগে পথ আছে। এই খানিক আগে এক 'সাহেব' আর মেম এই দিকে গিয়েছে—তাদের সঙ্গে আপনাদের মত এক বাঙ্গালী বাবু আর এক আয়া আছে। চলুন, পথ দেখিয়ে নিয়ে যাব।"

রামপ্রাণ বাবু একটু ইতস্ততঃ করিলেন। এই অবধি পথ ভাল, কয়েক জন লোক দার্জ্জিলিঙ্গ, ঘুম ও জলাপাহাড় হইতে এইখানে বেড়াইতে আসিয়াছে, কিন্তু ইহার পর তিনি আর কাহাকেও জঙ্গলের দিকে অগ্রসর হইতে দেখেন নাই। ঐ স্থানে সকলেই জলযোগ সারিয়া লইবার যোগাড় করিতেছিল। কেহ ষ্টোভ জালিয়া চা প্রস্তুত করিতেছিল, কেহ বা নবদূর্ব্বাদলের উপর নানারূপ আস্তরণ বিছাইয়া প্লেটে করিয়া বিস্কুট, কেক ইত্যাদি সাজাইতেছিল। এক দল য়ুরোপীয় দর্শক ফটো তুলিতেছিল।

প্রতিমা এই সময়ে বিশেষ আগ্রহের সহিত আবদার করিয়া বলিল, "চল না, বাবা, গৌরীশঙ্কর দেখে আসি, আর ত আসা হবে না।"

প্রথম দুই একবার আপত্তি করিবার পর রামপ্রাণ বাবু প্রতিমার অনুরোধ এড়াইতে পারিলেন না। প্রতিমার কোন আবদারই তাঁহার নিকট অনাদৃত হইত না। অগত্যা তাঁহাদিগকে সেই নেপালী পথিপ্রদর্শককে লইয়া জঙ্গলের দিকে অগ্রসর হইতে হইল, সঙ্গে বিশ্বাসী পুরাতন ভৃত্য বৈজনাথ সিং লাঠি ঘাড়ে করিয়া চলিল।

যত দূর চক্ষু যায়, সম্মুখে, পশ্চাতে, বামে, দক্ষিণে ঘনসন্নিবিষ্ট পার্ব্বত্য জঙ্গল—তাহার হরিৎ শোভা প্রথম উষোদয়ের রক্তচ্ছটায় হাসিয়া উঠিয়াছে। কত অর্কিড, কত মরশুমী ফুল, কত লতা, কত পাতা। সুমিষ্ট পক্ষিকূজনে বনস্থলী মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে। নির্জ্জন শান্ত বনানীর শান্তরসাস্পদ শ্যাম শোভা মনপ্রাণ পুলকে ভরিয়া দিতেছিল।

এমনই করিয়া কয়জনে প্রায় অর্দ্ধ-মাইলের উপর অগ্রসর হইলে আবার এক স্থানে ফাঁকা যায়গায় তৃণাচ্ছাদিত স্বল্পপরিসর একটি ময়দান দেখিতে পাইলেন—যেন একখানি সবুজ ভেলভেটের চাদর কে সেই স্থানে সযত্নে বিছাইয়া দিয়াছে। প্রতিমা অতিরিক্ত হর্ষ ও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া ক্ষণেক নিস্তব্ধভাবে প্রকৃতির অপরূপ শোভা প্রাণ ভরিয়া দেখিয়া লইল; তাহার পর বনকুরঙ্গীর ন্যায় সেই মাঠের উপর ছুটিয়া চলিল। তাহার হৃদয় পূর্ণ—মন যেন আনন্দ-মদিরা পানে মাতাল হইয়া উঠিয়াছে। সে বলিল, "বাবা, ঐ মাঠের ওপারে গাছের মাথায় উষার আলো কেমন ঝকমক্ করছে, এস না দেখি গিয়ে।" সে কোনও উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়াই এক দৌড়ে ক্ষুদ্র মাঠের অপর প্রান্ত পানে ছুটিয়া গেল। নেপালী গাইড, 'হাঁ হাঁ' করিতে না করিতেই সে একবারে খাদের ধারে আসিয়া উপস্থিত হইল। সে জানিত না যে, আর এক পা অগ্রসর হইলেই নিম্নে প্রায় ছয় হাজার ফুট খাদ!

রামপ্রাণ বাবু কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া কেবল ফেলফেল নেত্রে চাহিয়া রহিলেন—কাঠের পুতুলের মত এক স্থানে দাঁড়াইয়া রহিলেন, এক পদও অগ্রসর হইতে পারিলেন না। রক্ষক বৈজনাথ সিং, নেপালী গাইডের সহিত প্রতিমার পশ্চাদ্ধাবন করিল বটে, কিন্তু সময়ে তাহাকে রক্ষা করিবার সুযোগ পাইল না। এমন সময়ে এক অভাবনীয় কাণ্ড ঘটিল। যেন সম্মুখস্থ ভূখণ্ড ভেদ করিয়া একটি মনুষ্যমূর্ত্তি ঠিক খাদের মুখে দেখা দিল—সে এক লম্ফে প্রতিমার সম্মুখীন হইয়া দৃঢ় বাহুবেষ্টনে তাহাকে আবদ্ধ করিয়া ফেলিল। সে যেই হউক, সে যে বিলক্ষণ বলিষ্ঠ, তাহাতে সন্দেহ ছিল না। কেন না, প্রতিমার সমস্ত চলন্ত দেহের ভারে সে যে ধাক্কা খাইয়াছিল, তাহা সামলাইয়া লইতে অপর কোন লোক সমর্থ হইত কি না সন্দেহ।

রামপ্রাণ বাবু পরিপূর্ণ হৃদয়ে ভাবগদগদকণ্ঠে তাহাকে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন, "কি ব'লে আপনাকে মনের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাব—এ কি, তুমি?" রামপ্রাণ বাবু থমকিয়া দাঁড়াইলেন। লোকটির দেহ তখনও প্রতিমার দেহ বহন করিয়া থর থর কাঁপিতেছিল, সেও

বিস্ময়বিস্ফারিত নয়নে রামপ্রাণ বাবুর দিকে তাকাইয়া রহিল, প্রতিমা ততক্ষণ মুক্ত হইয়া তাঁহাদের উভয়ের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বিস্মিত হইল। কিন্তু তাহার সে বিস্ময় অপসারিত হইতে না হইতে সে দেখিল, একটি ইংরাজ যুবতী তাহার উদ্ধারকর্ত্তা বাঙ্গালী যুবকের নয়নে দৃষ্টি মিলাইয়া ইংরাজী ভাষায় বলিতেছে,—"ইন্দু ডার্লিং; এ কায তোমায় কি সুন্দর মানায়!" পিতার নিকট প্রতিমা ইংরাজী ও সংস্কৃত শিক্ষা করিয়াছিল।

বলা বাহুল্য, ইংরাজ-দুহিতা ইভ এবং বাঙ্গালী যুবক বিমলেন্দু। পাদরী ডেনিস অগ্রসর হইয়া বিমলেন্দুর পিঠ চাপড়াইয়া বলিলেন, "মিঃ রায়, তুমি যে কাযটাই কর, সব সুন্দর—এঁরা কারা? এঁদের সঙ্গে তোমার পরিচয় আছে না কি?"

ততক্ষণ ইভ সরিয়া গিয়া দুই হাতে প্রতিমার হাত দু'খানি ধরিয়া হিন্দী ভাষায় বলিতেছিল, "ভয় কি বোন্, তুমি যে এখনও কাঁপছ! এই দেখ না, এখান থেকে ঐ বুড়ো এভারেষ্টের সাদা শণের জটা কেমন দেখা যাচ্ছে।"

ইভ তাহাকে একরূপ টানিয়া লইয়া খাদের আর এক পার্শ্বে গিয়া তাহার হাতে অপেরা গেলাসটা তুলিয়া দিল। এতক্ষণ তাহারা তিন জনে সেইখানে বসিয়া অপেরা গেলাসে গৌরীশঙ্কর দেখিতেছিল, এই জন্য দূর হইতে তাহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায় নাই।

প্রতিমা বিস্ময়ে অভিভূত হইল। কি আশ্চর্য্য! 'মেমসাহেব' এমন হয়? ইহারা ত আমাদের সঙ্গে কথা কহিতে ঘৃণা বোধ করে। এ 'মেমসাহেব' কেমন-ধারা! বোন্ বলিয়া ডাকে, গলা জড়াইয়া আদর করে, অথচ একবারে জানাশুনা নাই।

এ দিকে বিমলেন্দু পাদরী ডেনিসকে বলিতেছিল, "হাঁ, এঁর সঙ্গে জানাশুনা আছে বটে, তবে অনেক দিন দেখা নেই। চলুন, এবার ফেরা যাক। ইভ, চল, ফেরবার সময় হ'ল।"

ইভ প্রতিমাকে টানিয়া লইয়া বিমলেন্দুর কাছে গেল, বলিল, "ইন্দু, এঁদের জান? এঁরা কলকাতা হ'তে দার্জ্জিলিং বেড়াতে এসেছেন। চলুন না, আপ-নারা আমার বাসায়।"

চারিচক্ষুতে মিলন হইল—কিন্তু সে মুহূর্ত্তমাত্র। বিমলেন্দু নিমেষে চক্ষু ফিরাইয়া লইল, প্রতিমা তৎপূর্ব্বেই দৃষ্টি অন্যত্র অপসারণ করিয়াছিল। কিন্তু সেই মুহূর্ত্তমাত্র ক্ষণেই প্রতিমা বিমলেন্দুকে চিনিয়াছিল, সেই—সেই বহুদিনের ফুলশয্যার রাত্রির মিলন—আর তাহার পর মাত্র কয়দিনের দেখাশুনা। কিন্তু সে ত ভুলিবার নহে!

বিমলেন্দু ব্যগ্র হইয়া বলিল, "চলুন, মিঃ ডেনিস্, আমার গিয়েই আজ আফিসে চার্জ্জ বুঝিয়ে দিতে হবে।"

কথাটা বলিয়াই উত্তরের প্রতীক্ষা না রাখিয়া সে দ্রুতপদে অগ্রসর হইল। ইভ বিস্মিত হইল—সে তাহাকে না লইয়াই চলিল কেন, সে তাহা কিছুতেই বুঝিতে পারিল না। সে তাড়াতাড়ি প্রতিমার নিকট বিদায় লইয়া বিমলেন্দুর পশ্চাদনুসরণ করিল। মিঃ ডেনিসও রামপ্রাণ বাবুর করমর্দ্দন করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

প্রতিমা পদ-নখে মৃত্তিকা খনন করিতেছিল। হঠাৎ মুখ তুলিয়া স্পষ্ট স্বরে বলিল, "বাবা, চল, কলকাতায় ফিরে যাই, দার্জ্জিলিং ভাল না।"

রামপ্রাণ বাবুর মুখখানা পাংশুবর্ণ ধারণ করিল। তিনি কেবল 'আয় মা!' বলিয়া কন্যার হাত ধরিয়া দার্জ্জিলিংএর পথে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তাঁহার আশাহত হৃদয়ে তখন তুমুল ঝড় বহিতেছিল।

৬

বিমলেন্দুর চাকুরী গিয়াছে। তাহাকে কলিকাতার আফিসে যোগ দিবার হুকুম হইয়াছিল, সে হুকুম তামিল করে নাই, ইহাই অপরাধ। কিন্তু সে এখনও দার্জ্জিলিংএ রহিয়াছে, তবে দপ্তরের মেসে তাহার আর স্থান নাই, সে সেনিটেরিয়ামে থাকে।

এক দিন নিমাইয়ের সহিত তাহার মল রোডে সাক্ষাৎ হইল। সে পাশ কাটাইয়া চলিয়া যাইতেছিল, নিমাই ধরিয়া ফেলিল; বলিল, "তুই ত খুব ভদ্রলোক, দেখেও দেখিস না? আচ্ছা, চলছে কি ক'রে তোর বল ত?"

বিমল কাষ্ঠ-হাসি হাসিয়া বলিল, "কেন, চাকুরী না হ'লে কি দিন চলে না? ভগবান্ চালাচ্ছেন।"

রোহিণী

বসুমতী প্রেস.]

শিল্পী—শ্রীহেমেন্দ্রনাথ মজুমদার।

"ইস, তবু ভাল, ভগবান্ মালিক তা হ'লে? যাক্, এমনই ক'রে কি দিন কাটাবি? তোর ত অভাব নেই কিছু?"

"অভাব কার নেই?"

"আরে, আমি ত সব জানি। কেন, শশুরের বাড়ী কি মিষ্টি লাগে না? আহা, বুড়োর একটা মেয়ে—আর মেয়ে ত নয়, যেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মী। বুড়ো যে ক'রে আমার হাত দুটো ধ'রে কেঁদে ফেল্লে—"

"যা যা, আর কিছু কথা আছে? আমার সময় নেই, বাজে বকতে পারিনি।"

"বটে, এটা বাজে হ'ল? দেখ, তুই অতি বড় পাষণ্ড। না হয়, বুড়ো একটা ভুলই ক'রে ফেলেছে, তার কি ক্ষমা নেই? আর সেই অভাগা মেয়েটা—সে কি অপরাধ করেছে বল ত? দাঁড়া না, পালাচ্ছিস কেন?"

"না, পালাব না। কথাটা যখন পাড়লি, তখন খুলেই বলি। দেখ, পুরুষমানুষ আর সব সহ্য করতে পারে, কিন্তু ভাতের খোঁটা সইতে পারে না। বড়-মানুষের বাড়ী ঘরজামাই হয়ে থাকবার সখ আমার মোটেই নেই।"

"কি বা তোকে বলেছে? তার একটি মেয়ে—সমস্ত বিষয়-আশয়ের মালিক—তার স্বামী দেশঘর ছেড়ে যাবে সাগরপারে কেন হে? কি দুঃখে? যদি তাতে বুড়ো বাধা দিয়ে থাকে, যদি সে তার খরচটা না দিতেই চায়, তাতে কি সে খুবই অপরাধ করেছে?—কেন, সে ত সর্ব্বস্ব তোকে দিতেই চেয়েছিল। দেখ, ছেলেমানুষি করিসনি। অমন সোনার প্রতিমা—তার মুখও চাইতে হয়।"

বিমলেন্দু উত্তর করিল না, হাতের ছড়িটা পথি-পার্শ্বের ফুলগাছের উপর চালাইতে লাগিল। ক্ষণপরে বলিল, "সে ত আমায় চায় না, টাকাই চায়। তা, তাই নিয়েই থাকুক।"

"কি রকম?"

"নয় ত কি? সাত বছরের মধ্যে কি একখানা চিঠিও লিখতে পারত না? যাক্, ও কথা ছেড়ে দে। জিজ্ঞাসা করলিনি, আমি কি করছি? আমি পাদরী ডেনিস সাহেবের এক বন্ধুর ষ্টেনোগ্রাফারের কায পেয়েছি।"

"আর ইভ?"

বিমলেন্দুর মুখ গম্ভীর হইল। সে কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া বলিল, "আমার এ শুকনো জীবন-সাহারায় ইভ শীতল প্রস্রবণ।"

"ইস, একবারে যে কবি কালিদাস হয়ে পড়লি!"

বিমলেন্দু কঠোর অথচ কাতর দৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিয়া সজোরে তাহার একখানা হাত চাপিয়া ধরিল। ধরা গলায় বলিল, "শোন, নিমাই! আমি ঠিক করেছি, আমি তোদের এই কপট স্বার্থপর হিন্দুসমাজে আর থাকব না,—খৃষ্টান হব, যে সমাজে ইভের মত সরলা দেবকুমারী জন্মায়, সেই সমাজের এক জন হব। তোরা আমায় ঘৃণা করিস, করিস, কিন্তু আমার এই-ই সঙ্কল্প।"

নিমাই ব্যঙ্গের সুরে কহিল,—"আর সঙ্গে সঙ্গে দয়া ক'রে ইভের পাণিগ্রহণ করবি ত? ইডিয়ট! দেখ, বাড়াবাড়ি করিসনি—এখনও ভালয় ভালয় দার্জ্জিলিং ছেড়ে পালিয়ে যা—এখনও সময় আছে। বাঙ্গালীর ছেলে, হিন্দুর ছেলে, তেলে-জলে কখনও মিশ খায়? তার চেয়ে যার সঙ্গে তোর ইহকালের সম্বন্ধ ঠিক হয়ে গেছে, তার কাছে ফিরে যা, তোরও ভাল হবে, তাদেরও ভাল হবে, ইভেরও ভাল হবে।"

"না নিমাই, ফেরবার আর উপায় নেই। ইভকে লুকিয়ে বিয়ে করেছি।"

"অ্যাঁ, কি সর্ব্বনাশ! ভাই ইন্দু, আমি তোর বাল্য-বন্ধু, হাতে ধ'রে বিনয় ক'রে বলছি, এ মোহ ভেঙ্গে ফেল, তোর যথার্থ স্ত্রীর কাছে ফিরে যা। ওদের কি বল না, ওদের পাঁচটা বিয়ে হ'তে পারে। ওরা—"

বিমলেন্দু ক্রুদ্ধ ও উত্তেজিত সুরে বলিল,—"যার কথা কিছু জান না, তার সম্বন্ধে যা তা একটা কথা ব'লে ফেলো না। ইভকে তুমি কি মনে কর? সে যত মন্দই হোক, তবু তোমাদের বিষয়ের মালিক বড়লোকের মেয়ের মত নয়, এ কথা তোমায় জানিয়ে রাখলুম।"

কথাটা বলিয়া বিমলেন্দু আর দাঁড়াইল না, দীর্ঘ পদবিক্ষেপ করিয়া রোষভরে চলিয়া গেল, নিমাই অবাক্ হইয়া তাহার চলন্ত মূর্ত্তির দিকে তাকাইয়া রহিল।

কিছুক্ষণ পরে একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া নিমাই বলিল, "নাঃ!"

নিমাই মেসে ফিরিল না, সরাসর রামপ্রাণ বাবুর বাসার দিকে চলিল, সে তাঁহার নিকট প্রতিশ্রুতি দিয়াই বিমলের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিল।

নিমাই চলিয়া গিয়াছে, রামপ্রাণ বাবু অসম্ভব গম্ভীর হইয়া বসিবার ঘরে একমনে তাহার মুখে শোনা কথা তোলাপাড়া করিতেছেন। কিন্তু অধিকক্ষণ নহে, তাঁহার প্রাণ অস্থির হইয়া উঠিল, দ্রুতগতি উঠিয়া তিনি কক্ষে পাদচারণা করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। ভৃত্য গড়গড়ায় তামাক্ সাজিয়া দিয়া গিয়াছিল, তাহা আপনিই পুড়িয়া যাইতে লাগিল। কখনও বসেন, কখনও জানালার ধারে গিয়া দাঁড়ান, কখনও পিঞ্জরাবদ্ধ ব্যাঘ্রের মত এ দিক হইতে ও দিক পাদচারণা করিয়া বেড়ান,—তাঁহার যেন কিছুতেই স্বস্তি নাই।

পাহাড়ী চাকরটা আসিয়া বলিল, "হুজুর, দালাল এসেছে।" বাবু প্রথমে শুনিতেই পাইলেন না, চমক ভাঙ্গিলে শুনিয়া বলিলেন, "যেতে বল, বাড়ী কিনবো না।" ভৃত্য অবাক্ হইয়া চলিয়া গেল। কি আশ্চর্য্য! কা'ল যে দালালকে খবর দিয়া আনাইয়া বাড়ীর জন্য পীড়াপীড়ি করিয়াছেন—হাতে ১০ টাকার নোট গুঁজিয়া দিয়াছেন, আজ বাবু তাহার সহিত সাক্ষাৎই করিবেন না,—এ কি রকম?

কর্ত্তা হঠাৎ ডাকিলেন, "প্রতিমা!" তাঁহার অসম্ভব গম্ভীর স্বর ঘরখানা ছাইয়া ফেলিল। 'কি বাবা', বলিয়া প্রতিমা ঘরে আসিয়া পিতার মুখপানে চাহিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল, তাহার হাস্যপ্রফুল্ল আনন হঠাৎ গম্ভীর ভাব ধারণ করিল।

রামপ্রাণ বাবু গম্ভীর স্বরে বলিলেন, 'ব'স।' না জানি কি অমঙ্গলের কথা শুনিবে, এই উৎকণ্ঠায় শুষ্কমুখী প্রতিমা একখানা চৌকীর উপর বসিয়া পড়িল। তাহার মনে আশঙ্কার কথাই জাগিতেছিল,—যদি, না, না, তাহা হইতেই পারে না। সে ক্ষীণ কণ্ঠে বলিল, "কি বলবে, বাবা?"

রামপ্রাণ বাবু উত্তেজিত কণ্ঠে বলিলেন, "আয় মা, আমরা খৃষ্টান কি মুসলমান যা হয় একটা হয়ে যাই, কি বলিস?"

প্রতিমা বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া ক্ষণেক তাঁহার দিকে ফেল-ফেল চাহিয়া রহিল, তাহার পর বলিল, "কি বলছ, বাবা?"

"হুঁ, বলছি ঠিক। মুসলমান হ'তে পারবি?"

প্রতিমা হো হো হাসিয়া বলিল, "ওঃ, তাই বল। আমি বলি না জানি কি বলবে।"

"না, তামাসা না, সত্যিই বলছি, আমি মুসলমান হব, তোকেও মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষা দেব ও হিন্দুয়ানীর জাতের মুখে ঝাড়ু মেরে আমরা আশ মিটিয়ে সুখী হব। কি বলিস্?"

প্রতিমা সভয়ে বলিল, "বাবা, কি বলছ, বুঝতে পারছি না।"

রামপ্রাণ বাবু বিকট হাসিয়া বলিলেন, "বুঝছ না? খুবই বুঝছ, হাড়ে হাড়ে বুঝছো। তবে তুমি সব চেপে রাখ, আমি পারি না, এই যা। হিন্দুধর্ম্ম আমাদের ছাড়তে হবেই।"

প্রতিমা এবার দৃঢ়স্বরে বলিল, "কেন, কি দুঃখে? হিন্দুধর্ম্ম তোমায় এমন কি তাড়া দিয়েছে?"

"তাড়া দেয়নি—দাগা দিয়েছে—এই এখানে, এই বুকের ভেতরে। দুত্তোর হিন্দুয়ানীর নিয়ে কিছু করেছে! কেন, অন্য সব ধর্ম্মে পুরুষ নারীকে দূর-ছাই করলে তাদেরও দূর-ছাই করবার আইন আছে, কেবল হিন্দু হলেই শয়ে শোওয়া পর্য্যন্ত নারী বেঁধে মার খাবে? এ কি অত্যাচার? পুরুষ যা ইচ্ছে তাই করবে, নারী মুখ বুজে কেবল সহ্য ক'রে যাবে? ভগবানের আইনে তা হ'তে পারে না।"

প্রতিমা এতক্ষণে কথাটা তলাইয়া বুঝিল। বুঝিবা-মাত্র তাহার মুখখানা রাঙ্গা হইয়া উঠিল, সে তাড়াতাড়ি বলিল, "বাবা, আমার ছেলেটিকে দেখলে না? কা'ল থেকে আমি তাকে বাঙ্গালা কথা কওয়াচ্ছি। কেমন 'মা' ব'লে চুমু খায়। দেখবে বাবা, আনবো?"

রামপ্রাণ বাবু বাধা দিয়া বলিলেন, "দেখ মা, তোমায় আমায় আর ভাঁড়াভাঁড়ি চলে না, এখন সবই খোলাখুলি বলা ভাল। আমারই দোষে একটা তুচ্ছ ঘটনায় আমি

তোমার জীবনের সুখের পথে কাঁটা দিয়েছি। ভাবলুম, তার প্রায়শ্চিত্ত করব। তাই দার্জ্জিলিঙে এসেছিলুম—জান ত একখানা বাড়ীরও বায়না কচ্ছিলুম—তোদের নিয়ে সংসার পাতাবো ব'লে। কিন্তু সে আশায় ছাই পড়েছে।"

প্রতিমা কাঠ হইয়া বসিয়া শুনিয়া যাইতেছিল। তাহার ভাবসমুদ্রে তখন কি ভীষণ তরঙ্গভঙ্গ হইতেছিল, তাহা সে-ই বলিতে পারে। মুকুলিত যৌবনের অতৃপ্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা ও অফুরন্ত বাসনা লইয়াই তাহাকে এ জীবনের দীর্ঘ মেয়াদ অতিবাহিত করিতে হইবে, এই আশঙ্কা তাহার মনের মাঝে ক্ষণিক চপলা-চমকের মত জলিয়াই নিভিয়া যাইত, এখন পিতার স্পষ্ট কথায় সেই লুপ্তপ্রায় স্মৃতি সাকার অবয়ব ধারণ করিয়া মানসচক্ষুর সমক্ষে ভীষণ দৈত্যের মত দণ্ডায়মান হইল। সাহারার অনন্তবিস্তার ধূ ধূ বালুকারাশির মত নীরস কঠোর প্রাণহীন এই জীবনের পরিণাম কোথায় হইবে? কি অবলম্বন লইয়া সে এ সাহারায় বাস করিবে?

রামপ্রাণ বাবু বলিয়া যাইতে লাগিলেন, "সে যে এতটা এগিয়েছে—নিজের জাত খুইয়ে একটা ফিরিঙ্গীর মেয়েকে বিয়ে করেছে—চমকিও না, সত্যি কথা, এইমাত্র নিমাই এসে খবর দিয়ে গেল, তাদের বিয়ে হয়ে গেছে,—এতটা যে এগিয়েছে, তা বুঝতে পারিনি। পারলে দার্জ্জিলিঙে আস্‌তে পণ্ডশ্রম কর্‌তুম না। রাস্কেল ইডিয়ট এত বড় পাজী,রাগ দেখাবার জন্য নিজের ধর্ম্মপত্নীকে ত্যাগ ক'রে খৃষ্টান ফিরিঙ্গীর মেয়েকে বিয়ে করে! আর আমাদের এমনই ধর্ম্ম—এতে তার কোনও শাস্তি নেই—"

প্রতিমা মিনতির কণ্ঠে বলিল,—"বাবা, বাবা, ও কথা ছেড়েই দাও না। চল, আমরা আজই কল্‌কাতায় যাই—না হয় পুরী, না হয় যেখানেই হোক্ যাই—"

রামপ্রাণ বাবু তখনও স্থির হন নাই, বলিলেন, "হুঁ, যাব। কিন্তু যাবার আগে আমিও তাকে দেখিয়ে দোবো যে, তার উপরেও রাগ দেখিয়ে যা ইচ্ছে তাই কর্‌তে পারে, এমন লোকও আছে। সত্যি বলছি মা, আমি মুসলমান কি খৃষ্টান হবই, আর তোর আবার যোগ্য বরে বিয়ে দোবো, এ যদি আমি না করি ত আমি রামপ্রাণই নই—"

প্রতিমা বাধা দিয়া গম্ভীর স্বরে বলিল, "কেন বাবা, মনে কষ্ট পাচ্ছ? আমাদের কিসের অভাব? আমরা বাপে-ঝিয়ে কি মন্দ আছি, তার উপর ছেলেটা পেয়েছি, দেখবে বাবা?"

রামপ্রাণ বাবু বলিলেন,"যতই কথা চাপা দে, আমার সঙ্কল্প টল্‌বে না। আমি সমাজের তোয়াক্কা রাখি না। আমার মেয়ের সুখ বলি দিয়ে আমি সমাজ বুকে নিয়ে ব'সে থাক্‌তে পারিনি। কেন, এমন ত অনেক হচ্ছে? এই সে দিন এক উকীলের মেয়ে স্বামীর অত্যাচারে মুসলমান হয়ে আবার বিয়ে করেছে—"

প্রতিমা কাতর দৃষ্টিতে একবার পিতার দিকে চাহিয়া বলিল, "ছিঃ বাবা!"

রামপ্রাণ বাবু বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "কেন মা, খৃষ্টান কি মুসলমান হ'লে ত আবার বিয়ে হয়, এতে নিন্দের কথা কিছু নেই।"

প্রতিমা দ্বারের দিকে অগ্রসর হইয়া ছল-ছল নেত্রে কাতর অথচ দৃঢ়কণ্ঠে বলিল, "যার হয় তার হয়, হিঁদুর মেয়ের হয় না। সে বাঁধন কেবল এ জন্মের নয়, পর-জন্মেরও।"

প্রতিমা চলিয়া গেল। রামপ্রাণ বাবু ক্ষণেক অবাক্ হইয়া কন্যার সেই মহামহিমময়ী মূর্ত্তির পানে তাকাইয়া রহিলেন, তাহার পর আপন মনে কক্ষমধ্যে পাদচারণা করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। তাঁহার মনে এই প্রশ্ন বার বার উদয় হইতে লাগিল,—এই মাতৃহীনা বালিকাকে কে এই প্রেরণা দান করিয়াছে!

৭

ইভ যে 'ইন্দুকে' পাইয়া সুখী হইয়াছিল, তাহাতে কোনও সন্দেহ ছিল না। তাহার চোখে-মুখে, কথায়-বার্ত্তায়, হাসির তরঙ্গে, সঙ্গীতে, নৃত্যে,—প্রতি অঙ্গ-ভঙ্গীতে সে আনন্দের হিল্লোল বহিয়া যাইত। সে হিল্লোলে অঙ্গ ভাসাইয়া বিমলেন্দু অপার আনন্দ ও অফুরন্ত তৃপ্তি অনুভব করিত।

বিমলেন্দুই ইভকে 'ইন্দু' নাম শিখাইয়াছিল। এই ছোট নামটি ইভের জপমালা হইয়াছিল—সে এই নাম বড় ভালবাসিত। স্বপ্নেও কখনও কখনও সে 'ডার্লিং

ইন্দু' বলিয়া কিন্নরীকণ্ঠে শয়নকক্ষ মুখরিত করিত। বিমলেন্দু সে সময়ে তাহাকে বক্ষে ধারণ করিয়াও তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়ের গভীর অপরিমেয় অতলস্পর্শ প্রেমের অন্ত পাইত না।

কার্সিয়ঙ্গে তাহারা একটি লতাপাদপমণ্ডিত ক্ষুদ্র বনভবন ভাড়া লইয়াছিল—ইভের বংশের চিরাচরিত প্রথানুসারে বিমলেন্দু বিবাহের পর এক মাসকাল মধুবাসর করিতে বাধ্য হইয়াছিল। সেই শান্ত নির্জ্জন পল্লীবাসে তাহারা দুইটি প্রাণী কপোত-কপোতীর মত পরমানন্দে চিন্তারহিত জীবন যাপন করিত। অন্ততঃ সেই এক মাসকাল বিমলেন্দু ভাবিয়াছিল, এমনই মধুময় জীবনই বুঝি সে চিরদিন যাপন করিবে!

স্বর্গের অপ্সরীর মত—বনভবনের স্ফুটিত গোলাপের মত সুন্দরী ইভ বাগানবাড়ীটি সর্ব্বদা আলো করিয়া থাকিত! কখনও কখনও সে বনকুরঙ্গীর মত সারা বাগানে ছুটাছুটি করিয়া ইন্দুর সহিত লুকাচুরি খেলিত, আবার কখনও বা বৃক্ষশাখায় দোদুল্যমান দোলায় চড়িয়া সে ইন্দুকে দোল দিতে বলিত—যখন তাহার এলায়িত স্বর্ণপ্রভ কুঞ্চিত কেশরাশি মৃদুপবনে আন্দোলিত হইত, তখন বিমলেন্দু তাহাতে স্বর্গের সুষমা ঝরিতে দেখিত। সে কি আনন্দের—সে কি তৃপ্তির দিনই অতিবাহিত হইতেছিল! বিমলেন্দু তখন একবারও ভাবে নাই, মানুষের দিন চিরকাল সমান যায় না।

এই অনন্ত সুখের সায়রে শয়ান থাকিয়াও কিন্তু বিমলেন্দু মাঝে মাঝে আত্মবিস্মৃত হইত—তাহার একটানা সুখের স্রোতে মাঝে মাঝে যেন কি একটা প্রকাণ্ড বাধা-মাতঙ্গ গতিরোধ করিয়া দণ্ডায়মান হইত। তাহার মনে হইত, যেন কি নাই—যেন কি হারাইয়াছি—যেন কোথায় কোন্ অজানা অতীতের কোণ হইতে দূরাগত বংশীধ্বনির ন্যায় কি এক অপরূপ মধুর স্মৃতির রেখা তাহার মানস-পটে অঙ্কিত হইতেছে—কে যেন কোথা হইতে তাহাকে ধাক্কা দিয়া তাহার এই ক্ষণিক মোহনিদ্রা ভাঙ্গিয়া দিতেছে। এই সময়ে সে এমন আত্মবিস্মৃত হইত যে, ইভ বার বার ডাক দিয়াও সাড়া পাইত না—সে বিস্মিত হইয়া তাহার এই বিস্মৃতির কারণ জিজ্ঞাসা করিত—অমনই সে লজ্জায় অভিভূত হইয়া পরক্ষণেই প্রেমময়ী ইভকে বাহুপাশে বন্ধন করিয়া কত সোহাগের—কত আদরের কথায় মন ভুলাইয়া দিত। মধুবাসরের শেষাশেষি ইন্দুর এমন ভাব প্রায়শঃ ঘন ঘন হইত—ইভ তাহাতে মনে মনে দারুণ ব্যথা, দারুণ অশান্তি অনুভব করিত।

এক একবার সে ভাবিত, বুঝি বা আত্মীয়-স্বজন-বন্ধু-বান্ধব-হারা তাহার ইন্দু তাহার সমাজের সংস্পর্শের অভাব অনুভব করিতেছে। কিন্তু সেও ত তাহার প্রাণাধিকের জন্য আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব ছাড়িয়া চলিয়া আসিয়াছে—সে ত এখন তাহার সমাজ ও স্বজন কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত অস্পৃশ্য 'পারিয়ার' ন্যায় জীবন যাপন করিতেছে। সে কাহার জন্য? তবে ইন্দু এত বিমর্ষ কেন? সে ত এ অভাব অনুভব করে না, ইন্দু ত তাহার সকল অভাব পূর্ণ করিয়াছে। তবে কি সে নিজে ইন্দুর সকল অভাব পূর্ণ করিতে পারে নাই? এ নিষ্ঠুর চিন্তায় ইভের কোমল প্রাণ ক্ষতবিক্ষত হইত। সে ভাবিত, কি করিলে ইন্দুর এ অভাব পূর্ণ করা যায়?

আবার কখনও কখনও ইভের মনে আশঙ্কা হইত, হয় ত ইন্দু কার্সিয়ঙ্গে তাহার বাসায় থাকিতে বিরক্ত ও অসন্তুষ্ট হইতেছে। ইন্দু বড় অভিমানী—স্বাধীনচেতা,—সে তাহার পয়সায় কার্সিয়ঙ্গে কেন, জগতের কোথাও বাস করিতে সম্মত হইবে না। এক দিন এ বিষয়ে উভয়ের মধ্যে কথা হইয়াছিল। ইন্দু আফিস ছাড়িয়া আসিবার কালে যে বেতন পাইয়াছিল, তাহার সবই ইভের জিম্মায় রাখিয়াছিল। তাই সে ভাবিত, তাহার টাকাতেই তাহাদের খরচ চলিয়া যাইতেছে। কিন্তু এক দিন সে নেপালী আয়ার সহিত কথায় কথায় জানিল, কার্সিয়ঙ্গের এই ইন্দুভিলার (ইভ আদর করিয়া তাহাদের বাসাবাটীর এই নামকরণ করিয়াছিল) ভাড়াই মাসিক ২ শত টাকা। কি সর্ব্বনাশ! সে যে কুড়াইয়া বাড়াইয়া মাত্র ২ শত টাকাই ইভের হাতে দিয়াছিল। তবে বাড়ী ভাড়া দিয়া এই যে রাজার হালে সংসার চালান হইতেছে, ইহার খরচার যোগান আসিতেছে কোথা হইতে? বিমলেন্দু অস্থির হইল, ইভকে বলিল, "চল ইভ, আমরা দার্জ্জিলিঙে ফিরে যাই।"

ইভ সভয়ে বলিল, "কেন, এরই মধ্যে কেন, এক মাসের বাড়ী ভাড়া নেওয়া হয়েছে, মাস ফুরিয়ে যাক।"

"না, না, আমায় কাযে জয়েন করতে হবে। মিছে সময় কাটিয়ে কি হবে?"

"তুমি ত এক মাস ছুটী পেয়েছ। তবে?"

"না, ব'সে ব'সে মাইনে খাওয়া ভাল না, এতে মনিবকে ফাঁকি দেওয়া হয়। চল, কালই যাই।"

ইভ মহা ফাঁপরে পড়িল। সে এই কয়দিনেই বুঝিয়াছিল, ইন্দু কিরূপ নির্ব্বন্ধপরায়ণ। তাই তাহার মন ভুলাইবার জন্ত ব্রহ্মাস্ত্র ত্যাগ করিল, আদরে গলাটি জড়াইয়া ধরিয়া, কাঁধের উপর মাথা রাখিয়া সোহাগের সুরে বলিল, "এখানে আমরা কেমন সুখে রয়েছি, কেমন সময় কেটে যাচ্ছে। আমাদের কিসের ভাবনা, কিছুর ত অভাব নেই। নাই বা চাকুরী করলে।"

বিমলেন্দু প্রথমটা ইভের আদরে নরম হইয়া আসিয়াছিল, কিন্তু শেষ কথাটা শুনিয়া তীরের মত উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "বাঃ, বেশ ত? তা হ'লে দিন চলবে কি ক'রে?"

ইভ পুনরপি তাহাকে টানিয়া বসাইয়া বলিল, "কেন তুমি দুই দুই করছ? আমার যখন টাকার অভাব নেই, তখন তোমার থাকবে কেন? আমার যা আছে, তা তোমার নয় কি? বল, কালই আমি সব তোমার নামে লেখাপড়া ক'রে দিচ্ছি। কি বল?"

সম্মুখে উদ্যতফণা কালসর্প দেখিলে পথিক যেমন চমকিয়া উঠে, বিমলেন্দু তেমনই চমকিয়া উঠিল। এ কথায় তাহার মন আনন্দে ও প্রেমে পূর্ণ হওয়া দূরে থাকুক, এক বিষম স্মৃতির তাড়নায় তাহার মন অস্থির হইয়া উঠিল। ঠিক এমনই ভাবে তাহার দারিদ্র্যকে এক দিন উপহাস করিয়া তাহাকে আশ্রয়চ্যুত-গৃহচ্যুত-সর্ব্বস্বচ্যুত করা হইয়াছিল। আর আজ আবার?—তাও তাহারই মুখাপেক্ষিণী প্রেমভিখারিণী তদধীনজীবিতা ইভের মুখ হইতে নির্গত হইল? এ কি তাহার জীবনে বিধাতার অভিসম্পাত!

সে স্থির হইয়া বসিয়া গম্ভীর স্বরে বলিল, "ইভ, দেখ, তুমি যে আমায় আন্তরিক ভালবাস, এটা তার প্রমাণ, তা বুঝতে পারছি। কিন্তু মনে কিছু কোরো না, তোমায় আমি কড়া কথা বলতে পারিনি, কিন্তু তোমার গলগ্রহ হয়ে থাকতে কখন বোলো না।"

ইভ তাড়াতাড়ি উঠিয়া বাহুপাশে স্বামীকে আলিঙ্গন করিয়া তাহার কণ্ঠলগ্না হইয়া করুণ স্বরে বলিল, "ইন্দু ডার্লিং, এ কি কথা বলছ? তুমি পুরুষ, আমি তোমায় আমার গলগ্রহ হ'তে বলব? তবে এ ক'টা দিন—আমার জীবনের স্বপ্নের এ ক'টা দিন আমায় এমনই ক'রে তোমাকে পেতে দাও। তুমি কি জান না, তুমি আমার সর্ব্বস্ব, আমার জীবন, তোমায় ছেড়ে আমি এক দণ্ড বাঁচতে পারিনি?"

কথাগুলি বলিতে বলিতে ইভ ঝর-ঝর নয়নাসারে বিমলেন্দুর বক্ষঃস্থল ভাসাইয়া দিল। বিমলেন্দু কি করিবে, সে ত মানুষ! সে সস্নেহে তাহাকে বক্ষে ধারণ করিয়া মুখচুম্বন করিল, নয়নের জল মুছাইয়া দিল। একটু প্রকৃতিস্থ হইলে বলিল, "তুমি যা বলবে, তাই করব—কেঁদ না, ইভ ডিয়ার! এই দেখ, আমি দৌড়ুই, তুমি ধর ত।"

বিমলেন্দু দৌড়িল, ইভ হাসি-কান্নার মাঝে পরমানন্দ উপভোগ করিয়া তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিল। কিছুক্ষণ ছুটাছুটির পর যখন তাহারা ক্লান্ত হইয়া একটি লতা-বিতানের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিল, তখন বিমলেন্দু আদরে ইভের কোমল করপল্লব দুইখানি হাতের মধ্যে লইয়া বলিল, "ইভ, আমাদের এই মধুবাসরটা বেশ কেটে যাচ্ছে, না? তা যাক, কিন্তু আমাদের সংসারের জীবনের কঠোর পরীক্ষা আসছে ত? তখন ত সারাদিন এমনই কপোত কপোতী হয়ে থাকলে পেট চলবে না। তুমি সুখে বিলাসে পালিত হয়েছ, তুমি তোমার টাকায় যা ইচ্ছে সদ্ব্যবহার কোরো। আমি কিন্তু খেটেখেকো মানুষ, আমায় পরের দাসত্ব ক'রে খেতে হবে। আমি তেমনই ভাবে থাকবো। আমার দারিদ্র্যের অংশ তোমায় দিতে চাই নি। কিন্তু দরিদ্র আমি—আমাকে বিলাসের লোভ দেখিও না।"

ইভ কিছুক্ষণ নীরব রহিল, পরে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "বেশ, তাই হবে। তুমি যাতে সুখী হও, আমার তাতেই সুখ।"

নারীর হৃদয়ের উপাদান সব দেশেই সমান।

[ক্রমশঃ।

গোয়ালিয়র

কলেজে পড়িবার সময় হইতেই গোয়ালিয়র-দুর্গ দেখিবার জন্য আমার বিশেষ আগ্রহ হয়, কারণ, দুর্গটি ইতিহাসপ্রসিদ্ধ। কিন্তু বহুকাল পর্য্যন্ত সে সুযোগ উপস্থিত হয় নাই। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে কতিপয় ছাত্র এবং এক বন্ধু সমভিব্যাহারে আমি গোয়ালিয়র যাত্রা করি। যখন আমাদিগের গাড়ী "প্লাটফরম" পরিত্যাগ করিল, তখন আমার মনে পুলক এবং বিষাদ উভয়ই উপস্থিত হইল। পুলকের কারণ এই যে, এত দীর্ঘকাল পরে আমার বহু দিনের বলবতী ইচ্ছা পূর্ণ হইতে চলিল, এবং বিষাদের কারণ এই যে, এতগুলি ছাত্র লইয়া এক অজানা দূরদেশে যাত্রা করিলাম—সকলকে লইয়া পুনরায় স্বস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিব কি না, জানিতাম না।

আমরা প্রথমে বেনারেস ক্যাণ্টনমেণ্ট পৌঁছিলাম, এবং সেখান হইতে লক্ষ্মৌয়ে উপস্থিত হইলাম। লক্ষ্মৌয়ে দুই দিন থাকিয়া, সেখানকার নবাবদের কীর্ত্তিকলাপের ধ্বংসাবশেষ দেখিয়া কানপুর যাত্রা করিলাম। কানপুরে ২৩শে ডিসেম্বর বেলা ১১টায় পৌঁছিলাম এবং সেখানে দ্রষ্টব্য যাহা ছিল, বিশেষতঃ যে কূপে সিপাহী-যুদ্ধের সময় নানা সাহেব এবং তাঁহার অনুচরবর্গ ইংরাজ-মহিলাদিগকে এবং তাঁহাদের সন্তানগণকে হত্যা করিয়া নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাহা দেখিয়া সন্ধ্যা ৭টায় জি, আই, পি রেলওয়ের গাড়ীতে গোয়ালিয়র রওনা হইলাম। গাড়ীতে নানাপ্রকার চিন্তায় নিদ্রা হইল না—কেবলই মনে হইতে লাগিল যে,আমার গোয়ালিয়র-দুর্গ-দর্শন ইংরাজ কবি Wordsworthএর Yarrow Yisvitedএ পর্য্যবসিত না হয়। আমরা যে গাড়ীতে গোয়ালিয়র যাত্রা করি, সে গাড়ী মাত্র ঝাঁসি (Jhansi) পর্য্যন্ত যাইত, সুতরাং ঝাঁসি রেলওয়ে ষ্টেশনে আমাদের গাড়ী পরিবর্ত্তন করিতে হইল। ঝাঁসি হইতে গোয়ালিয়র পর্য্যন্ত বেশ কাটিয়াছিল, কারণ, আমি যে কামরায় উঠিয়াছিলাম, সেই কামরায় এক জন মারাঠা উকীল বড়দিনের ছুটীতে তাঁহার এক পুত্রকে লইয়া দিল্লী, আগরা, মথুরা প্রভৃতি ঐতিহাসিক স্থানগুলি দেখিতে যাইতেছিলেন। তিনি বিশেষ ভদ্রলোক এবং অল্পসময়ের মধ্যেই তাঁহার সহিত আমার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা জন্মিল। তিনি রাণাডে, গোখলে, তিলক প্রভৃতি মারাঠা মনীষীদিগের পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে অনেক কথা বলিলেন—যাহা কোনও পুস্তকে এ পর্য্যন্ত পাঠ করি নাই এবং সেগুলি তাঁহাদের মহত্ত্বের পরিচায়ক। ভোর ৬টায় বন্ধুটির নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক আমরা গোয়ালিয়র ষ্টেশনে অবতরণ করিলাম। কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত আমরা ষ্টেশন-প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিলাম। শ্যামল-তৃণদল-শূন্য, ধূলিবহুল, শুষ্ক, সৌন্দর্য্যহীন গোয়ালিয়র সহর আমার মনে এক প্রকার বিষাদ আনয়ন করিল, এবং এত দিনের উৎসাহ এবং আকাঙ্ক্ষা মুহূর্ত্তমধ্যে বিলীন হইয়া গেল। আমাকে অন্যমনস্ক এবং বিষণ্ণ দেখিয়া আমার ছাত্রগণ আমাকে আশ্রয় অনুসন্ধানের জন্য বলিল। আমি তখন আমার ঔদাসীন্যে লজ্জিত হইয়া ষ্টেশন-মাষ্টারকে বিশ্রামাগারে আমাদের "লগেজ" রাখিতে দিবার জন্য অনুরোধ করিলাম। দুর্ভাগ্যবশতঃ তিনি অনুরোধ রক্ষা করিলেন না; সুতরাং দ্রব্যাদি লইয়া আমরা আশ্রয়ান্বেষণে বহির্গত হইলাম। অবশেষে এক ধর্ম্মশালার সন্ধান পাইয়া সেইখানে উপস্থিত হইলাম এবং অতি কষ্টে একটি ঘর পাইলাম। শীঘ্র শীঘ্র স্নান এবং জলযোগ সমাপ্ত করিয়া আমরা বেলা ১০½টায় সহর দেখিতে বহির্গত হইলাম।

গোয়ালিয়র আসিবার প্রধান উদ্দেশ্যই গোয়ালিয়র-দুর্গ দেখা, সুতরাং কয়েকখানি টঙ্গা ভাড়া করিয়া ছাত্রদের লইয়া প্রথমে দুর্গ দেখিতে চলিলাম। পথে আর দুইটি যায়গা দেখিয়া লইলাম। প্রথমটি মহম্মদ ঘাউসের এবং অপরটি তানসেনের সমাধি-মন্দির।

মহম্মদ ঘাউস এক জন মুসলমান সাধু ছিলেন। তিনি

মহম্মদ ঘাউসের সমাধি মন্দির

মোগল সম্রাট বাবর, হুমায়ুন এবং আক্‌বরের সমসাময়িক, এবং তাঁহারা সকলেই তাঁহাকে অতিশয় শ্রদ্ধা করিতেন। (১) গোয়ালিয়র-দুর্গের প্রায় অর্দ্ধ-মাইল পূর্ব্বে এই সমাধি-মন্দির অবস্থিত। ইহা প্রস্তরনির্ম্মিত এবং প্রথম মোগল-সৌধ-শিল্পের একটি সুন্দর আদর্শ।

মহম্মদ ঘাউসের সমাধি-মন্দির

ইহা ১ শত ফুট দীর্ঘ একটি সমচতুষ্কোণ ইমারত. ইহা চারি কোণে চারিটি ষট্‌কৌণিক বুরুজ সংলগ্ন। সমাধি-কক্ষটি ৪৩ ফুট সমচতুষ্কোণ এবং ইহার চারি কোণে চারিটি সূক্ষ্মাগ্র খিলান এবং এই খিলানগুলির উপরিভাগে পাঠান সাময়িক একটি উচ্চ গুম্বজ। আক্‌বরের রাজত্বের প্রথম সময়ে এই মন্দিরটি নির্ম্মিত হইয়াছিল। সমাধি-মন্দিরটি দেখিতে অতিশয় সুন্দর এবং সমাধি-কক্ষে প্রবেশ করিলে মনে এক প্রকার পবিত্র ভাব উপস্থিত হয়। আমরা এই স্থান হইতে তানসেনের সমাধি-মন্দির দেখিতে গেলাম।

ইহা আক্‌বরের সভাসদ্ সুপ্রসিদ্ধ গায়ক এবং সঙ্গীতশাস্ত্রবিশারদ মিঞা তানসেনের সমাধিমন্দির। আক্‌বরের অধীনস্থ সামন্ত-নরপতি রামচাঁদ বাঘেলা তানসেনের

তানসেনের সমাধি মন্দির

প্রথম মুরুব্বী ছিলেন এবং এক সময়ে তাঁহাকে ১ কোটি টাকা পুরস্কারস্বরূপ দিয়াছিলেন। যখন আক্‌বর তাঁহার খ্যাতির বিষয় জানিতে পারেন, তখন তানসেনকে তাঁহার সভায় আনয়ন করিবার জন্য লোক প্রেরণ করেন এবং রাজা রামচাঁদ তাঁহাকে তাঁহার সঙ্গীত-যন্ত্রাদির সহিত বিদায় দিতে বাধ্য হয়েন। আক্‌বরের পূর্ব্বে ইব্রাহিম সুর (of the Sur Dynasty) তানসেনকে আগ্রায় আনয়ন করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। তানসেনের পুত্র তানতরঙ্গ খাঁও আক্‌বরের সভার এক জন প্রসিদ্ধ গায়ক ছিলেন। কথিত আছে, তানসেনের মত সঙ্গীতজ্ঞ ভারতবর্ষে আর কেহ জন্মগ্রহণ করেন নাই। বাবর, হুমায়ুন এবং আক্‌বরের সময় গোয়ালিয়র সঙ্গীত-চর্চ্চার জন্য বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। আক্‌বরের সভায় যতগুলি সঙ্গীতশাস্ত্র-বিশারদ ব্যক্তি ছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে দ্বাদশ জনই গোয়ালিয়র অধিবাসী। (১)

সমাধি-মন্দিরটি ২২ ফুট দীর্ঘ এবং সমচতুষ্কোণ। কবরের অনতিদূরে একটি তেঁতুলবৃক্ষ দেখিতে পাইলাম এবং শুনিলাম যে, গায়কগণ মধুর স্বর লাভ করিবার আশায় এই স্থানে আসিয়া এই বৃক্ষপত্র চর্ব্বণ করিয়া

(১) Murray's Hand Book for Traveller.
Aini Akbari, Vol. I.

(১) Aini Akbari, Vol. I.
Kennedy, History of the Moghuls, Vol. I.

থাকেন। আমাদিগের সকলেরই সুকণ্ঠ হইবার ইচ্ছা বলবতী হওয়ায় আমরাও কতকগুলি তেঁতুলপত্র চর্ব্বণ করিলাম, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদিগের স্বর এখন পর্য্যন্তও কিছুমাত্র উন্নতি লাভ করে নাই।

আমরা অতঃপর টিকিট (পাশ) ক্রয় পূর্ব্বক গোয়ালিয়র-দুর্গে প্রবেশ করিলাম। দুর্গটি একটি স্বতন্ত্র পাহাড়ের উপর অবস্থিত। (সহর হইতে ৩ শত ফুট উচ্চ)। পাহাড়টি দীর্ঘ, কিন্তু অল্প-পরিসর। ইহা দৈর্ঘ্যে পৌনে ২ মাইল এবং প্রস্থে ৬ শত হইতে ২ হাজার ৮ শত ফুট। দুর্গের সম্মুখভাগ একেবারে খাড়া। যে স্থানে পাহাড়টি স্বভাবতঃ সরল, সে স্থানটিকে ঢালু করিয়া কাটা হইয়াছে এবং স্থানে স্থানে পাহাড়ের উপরের অংশ নীচের অংশকে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। দুর্গের দৈর্ঘ্য উত্তর-পূর্ব্ব দিক্ হইতে দক্ষিণ-পশ্চিম দিক্ পর্য্যন্ত দেড় মাইল এবং পরিসর (প্রস্থ) ৩ শত গজ। দুর্গটি একটি প্রাকারে বেষ্টিত। প্রাকার-দ্বারে উপস্থিত হইবার জন্য ধাপযুক্ত (পাহাড় কাটিয়া প্রস্তুত) একটি দীর্ঘ পথ আছে এবং এই সোপান-পথের বহির্দ্দেশ একটি প্রকাণ্ড প্রস্তরনির্ম্মিত প্রাচীর দ্বারা রক্ষিত। দুর্গটি পূর্ব্বোক্ত প্রাকারের উত্তর-পূর্ব্ব কোণে অবস্থিত এবং দেখিতে অতিশয় রমণীয়। ইহা হইতে প্রতীয়মান হইতেছে যে, পূর্ব্বে এই দুর্গটি অধিকার করা দুঃসাধ্য ছিল। এই স্থলে গোয়ালিয়র দুর্গের একটি সংক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক বিবরণ অপ্রাসঙ্গিক হইবে না এবং আমার ধারণা, সকলেরই ইহা জানা উচিত, কারণ, দুর্গটি হিন্দু নরপতিগণ দ্বারা নির্ম্মিত, সুতরাং ইহা হিন্দুগণের একটি গৌরবের বস্তু।

গোয়ালিয়র-দুর্গ

কথিত আছে যে, খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে হূনদিগের নেতা তোরমান (Toramana) গোয়ালিয়র স্থাপন করেন। তাঁহার পুত্র মিহিরগুলা (Mihirgula) সূর্য্যদেবের একটি মন্দির নির্ম্মাণ করেন এবং সূর্য্যকুণ্ড নামক একটি জলাশয় খনন করেন। কিংবদন্তী আছে যে, কুশোয়া (Kuchwaha) রাজপুতবংশীয় নরপতি সূর্য্যসেন গোয়ালিপ নামক এক সন্ন্যাসীর আজ্ঞামত গোপগিরি পর্ব্বতে গোয়ালিয়র-দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। সূর্য্যসেন কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত ছিলেন। একদা তিনি মৃগয়া করিতে গোপগিরি পর্ব্বতে উপস্থিত হয়েন এবং গোয়ালিপের প্রদত্ত জল পান করিয়া তাঁহার কুষ্ঠব্যাধি দূর হয়। সন্ন্যাসী তাঁহাকে "সুহন পাল" নাম প্রদান করিয়া বলেন যে, যত দিন পর্য্যন্ত তাঁহার বংশধরগণের নামের শেষ ভাগে "পাল" শব্দ থাকিবে, তত দিন পর্য্যন্ত তাঁহারা রাজ্যচ্যুত হইবেন না। কথিত আছে যে, সূর্য্যসেনের বংশের শেষ রাজা তেজকর্ণ নাম গ্রহণ করায় সিংহাসনচ্যুত হইয়াছিলেন। কচওহা (কুশোয়া) রাজবংশের পতনের পর প্রতিহার নরপতিগণ গোয়ালিয়র অধিকার করেন (১) এবং কনোজেশ্বর মিহিরভোজ ইঁহাদিগের অন্যতম। দশম শতাব্দীর শেষভাগে কুশোয়া-বংশীয় নরপতি বজ্রদমন প্রতিহারদিগকে পরাজিত করিয়া পুনরায় গোয়ালিয়র অধিকার করেন এবং গোয়ালিয়র প্রায় দুই শতাব্দী পর্য্যন্ত কুশোয়াদিগের অধীনে থাকে। এই সময়ে গোয়ালিয়র-দুর্গে এবং নিকটবর্ত্তী স্থানে বহুসংখ্যক মন্দির নির্ম্মিত হয়। গোয়ালিয়র পুনরায় কুশোয়াদিগের হস্তচ্যুত হইয়া প্রতিহাররাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং মুসলমান আক্রমণ পর্য্যন্ত তাঁহাদিগের অধিকারে থাকে। মুসলমানদিগের মধ্যে গজনী-অধিপতি সুলতান মামুদ সর্ব্বপ্রথম গোয়ালিয়র আক্রমণ এবং অবরোধ করেন, কারণ, কনোজেশ্বর রাজ্যপাল পরিহর মামুদের নিকট বশ্যতা স্বীকার করায় গোয়ালিয়র অধিপতি এবং কালিঞ্জররাজ তাঁহাকে নিহত করেন, কিন্তু মামুদ গোয়ালিয়র অধিকার করিতে সমর্থ হয়েন নাই। (২) সাহাবুদ্দীন মহম্মদ ঘোরীর সেনাপতি কুতুবুদ্দীন ১১৯৭ খৃষ্টাব্দে প্রতিহাররাজকে পরাজিত করিয়া গোয়ালিয়র অধিকার করেন এবং গোয়ালিয়রের টাঁকশালে এক প্রকার মুদ্রা প্রস্তুত করেন, কিন্তু কিছু কাল পরেই গোয়ালিয়র পুনরায় প্রতিহারদিগের হস্তগত হয়। (৩) প্রতিহার-রাজ সারঙ্গদেবের রাজত্বকালে ১২৩২ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর সুলতান আল্‌তামাস গোয়ালিয়র আক্রমণ করেন

দুর্গের ইতিহাস

(1) Cunningham's Archaeological Survey Report Vol. 2.

(2) Aini Akbari, Vol. II. (Jarret.) Indian Mirror.

(3) Sleeman's Rambles and Recollections.

এবং প্রায় বৎসরকাল অবরোধের পর গোয়ালিয়র-দুর্গ জয় করেন। কথিত আছে যে, যখন সারঙ্গদেব যুদ্ধে জয় লাভ করা অসম্ভব দেখিলেন, তখন রাজপুত-রমণীগণ সম্মান এবং সতীত্ব রক্ষা করিবার জন্য চিতায় প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন এবং সারঙ্গদেব অনুচরবর্গসহ ভীষণ সংগ্রাম করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হয়েন। (১) যুদ্ধে জয়লাভের পর আল্তামাস গোয়ালিয়রে শিলালিপি ক্ষোদিত করিয়াছিলেন। (২) আমরা এই শিলালিপির কোনও চিহ্ন দেখিলাম না, কারণ, বর্ত্তমানে উহার কোনও অস্তিত্ব নাই। তাইমুরের দিল্লী আক্রমণের পর ১৩৯৮ খৃষ্টাব্দে তোমররাজ বীরসিংহ দেব গোয়ালিয়র-দুর্গ অধিকার করেন। (৩)

খৃষ্টীয় পনের শতাব্দীর প্রারম্ভে গোয়ালিয়রের তোমরবংশীয় নরপতিগণ দিল্লীর সুলতান (Syed Dynasty) খিজির খাঁকে কর প্রদান করিতেন। ১৪২৪ খৃষ্টাব্দে মালবের (Malwa) দ্বিতীয় সুলতান হোসেন শা গোয়ালিয়র অবরোধ করেন, কিন্তু দিল্লীর সৈয়দবংশীয় দ্বিতীয় সুলতান মুবারকের হস্তে পরাজিত হয়েন, কারণ, তোমরবংশীয় নরপতিগণ দিল্লী-সুলতানের আশ্রিত ছিলেন। (৪) মুবারকের রাজত্বকালে তোমরবংশীয় ডোঙ্গর সিংহ গোয়ালিয়রের অধিপতি ছিলেন এবং তাঁহার অধীনে গোয়ালিয়র অতিশয় সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠে। তাঁহার এবং তাঁহার পুত্র কীর্ত্তিসিংহের সময় গোয়ালিয়রের প্রস্তর-ক্ষোদিত জৈন মূর্ত্তিগুলি প্রস্তুত হয়। ১৪৬৫ খৃষ্টাব্দে জৌনপুরের (Jaunpur) শেষ মুসলমান নরপতি হোসেন শা গোয়ালিয়র অবরোধ করেন এবং তখনকার গোয়ালিয়র-রাজ তাঁহাকে কর দিতে বাধ্য হয়েন। গোয়ালিয়রের তোমরবংশীয় নরপতিগণের মধ্যে মানসিংহ (১৪৮৬ –১৫১৬ খৃঃ অঃ) সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। তিনি স্থপতিবিজ্ঞান এবং সঙ্গীতশাস্ত্রের এক জন বিশেষ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ১৫০৫ খৃষ্টাব্দে দিল্লী-সম্রাট সেকন্দর লোদী গোয়ালিয়র আক্রমণ করেন, কিন্তু মানসিংহের নিকট পরাজিত হয়েন। ১৫১৭ খৃষ্টাব্দে সেকন্দর পুনরায় গোয়ালিয়র আক্রমণের জন্য আয়োজন করেন, কিন্তু আক্রমণের পূর্ব্বেই তাঁহার মৃত্যু হয়। সেকন্দরের পরবর্ত্তী দিল্লী-সম্রাট ইব্রাহিম লোদী গোয়ালিয়র দুর্গ আক্রমণ এবং অবরোধ করেন, এই অবরোধের অল্পদিন পরেই মানসিংহের মৃত্যু হয় এবং তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র বিক্রমাদিত্য বৎসরকাল পর্য্যন্ত শত্রু-হস্ত হইতে দুর্গ রক্ষা করেন এবং অবশেষে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হয়েন। (১৫১৯ খৃষ্টাব্দ) তাঁহার পরাজয়ের পর তিনি সপরিবারে ইব্রাহিমের নিকট আগ্রায় প্রেরিত হয়েন। দিল্লী-সম্রাট তাঁহাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেন এবং বাবরের সহিত ইব্রাহিমের পাণিপথে যুদ্ধের সময় বিক্রমাদিত্য ইব্রাহিমের পক্ষে যোগদান করিয়া রণক্ষেত্রে নিহত হয়েন। (১) বিক্রমাদিত্যের মৃত্যুর পর তাঁহার পরিবারবর্গ যখন আগ্রা হইতে পলায়নের চেষ্টা করেন, তখন বাবরের পুত্র যুবরাজ হুমায়ুন তাঁহাদিগকে ধৃত করেন এবং মোগল সৈন্যদিগের হস্ত হইতে রক্ষা করেন। অনেকে বলেন যে কৃতজ্ঞতাবশতঃ বিক্রমাদিত্যের বিধবা পত্নীগণ হুমায়ুনকে কোহিনুর হীরক এবং অন্যান্য বহুমূল্য রত্নাদি উপহার প্রদান করেন। (২) আমার মতে বিক্রমাদিত্যের পত্নীগণের নিকট কোহিনুর ছিল না, কারণ, এই বহুমূল্য হীরকখণ্ড গোলকণ্ডা রাজ্যের মন্ত্রী আমীর জুমলা (কাহারও কাহারও মতে Mir Jumla) সর্ব্বপ্রথম মোগল-সম্রাট সাজাহানকে উপহার প্রদান করিয়াছিলেন (৩) এবং তাঁহার পূর্ব্বে অন্য কোনও মোগল-সম্রাট কোহিনুর প্রাপ্ত হয়েন নাই।

(1) Murray's Hand Book for Travellers,
Gwalior Fort Album.
(2) Sleeman's Rambles nd Recollections.
(3) Murray's Hand Book for Travellers.
Gwalior Fort Album.
(4) V. Smith History of India.
Indian Mirror.
Murray's Hand Book for Travellers.

(1) Cunningham's Archaeological Survey Report, Vol. 2.
Sleeman's Rambles and Recollections.
Murray's Hand Book for Travellers.
(2) Kennedy, History of the Great Moghuls, Vol.I.
Murry's Hand Book for Travellers.
(3) Bernier.
Tavernier's Travels.
Sleeman's Rambles and Recollections.

পাণিপথের যুদ্ধের পর মিবারের বিখ্যাত রাণা সঙ্গ গোয়ালিয়রের শাসনকর্ত্তা তাতার খাঁর নিকট হইতে গোয়ালিয়র অধিকার করিবার ভয়প্রদর্শন করায় তাতার খাঁ বাবরের সাহায্য প্রার্থনা করেন। বাবর রহিমদাদ নামক তাঁহার এক কর্ম্মচারীকে এক দল সৈন্যের সহিত তাতার খাঁর সাহায্যার্থ গোয়ালিয়র প্রেরণ করেন। তাতার খাঁ রহিমদাদকে দুর্গে প্রবেশ করিতে না দেওয়ায় মুসলমান ফকীর মহম্মদ ঘাউসের (যাঁহার সমাধি-মন্দির পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে) উপদেশমত রহিমদাদ কৌশল অবলম্বন পূর্ব্বক দুর্গ অধিকার করেন। এই প্রকারে গোয়ালিয়র বাবরের হস্তগত হয়। (১) কনোজের যুদ্ধে হুমায়ুনের সের খাঁর নিকট পরাজয়ের এবং তাঁহার ভারতবর্ষ হইতে পলায়নের পরও গোয়ালিয়রের শাসনকর্ত্তা (মোগল কর্ম্মচারী) আবুল কাসিম গোয়ালিয়র রক্ষা করিয়াছিলেন, কিন্তু ১৫৪২ খৃষ্টাব্দে সের খাঁ গোয়ালিয়র-দুর্গ অধিকার করেন। (২) গোয়ালিয়রে সেরসার (সম্রাট হইবার পর তিনি এই নাম গ্রহণ করেন) একটি টাঁকশাল ছিল এবং এই টাঁকশালে অনেক মুদ্রা প্রস্তুত হইয়াছিল। (৩) সেরসার মৃত্যুর পর তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র সেলিমসা (১৫৪৫—১৫৫৩) দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার প্রথম পুত্র আদিল খাঁ ইহাতে বিদ্রোহী হয়েন এবং সেই জন্য সেলিমসা তাঁহার ধন-রত্নাদি চুনার হইতে গোয়ালিয়র-দুর্গে আনয়ন করেন এবং গোয়ালিয়রে রাজধানী স্থাপন করেন। তিনি গোয়ালিয়র-দুর্গকে অধিকতর সুদৃঢ় করিয়াছিলেন। (৪) ১৫৫৩ খৃষ্টাব্দে গোয়ালিয়রে সেলিমসার মৃত্যু হয়। সেলিমসার পরবর্ত্তী সুলতান মহম্মদ আদিল কিছুকাল গোয়ালিয়র-দুর্গে বাস করিয়াছিলেন, কিন্তু পরিশেষে সুরবংশীয় ইব্রাহিম (যিনি সেলিমসার মৃত্যুর পর নিজেকে দিল্লী এবং আগ্রার বাদশা বলিয়া ঘোষণা করেন) তাঁহাকে চুনারে বিতাড়িত করিয়া গোয়ালিয়র হস্তগত করেন।

(1) Kennedy, History of the Great Moghuls, Vol. I.
(2) Kennedy, History of the Great Moghuls, Vol I.
(3) Sleeman's Rambles and Recollections.
(4) Kennedy, History of the Great Moghuls, Vol. I.

১৫৬০ খৃষ্টাব্দে মোগল-সম্রাট আকবর গোয়ালিয়র অধিকার করেন। এই সময় হইতে মোগল-সাম্রাজ্যের পতন পর্য্যন্ত গোয়ালিয়র-দুর্গ মোগল-সম্রাটদিগের অধিকারে থাকে এবং রাজনীতিক কারাগার (State Prison) রূপে ব্যবহৃত হয়।

সম্রাট আকবর, খোজা মুয়াজাম, রাজা আলি খাঁর পুত্র, বাহাদুর খাঁ প্রভৃতিকে গোয়ালিয়র-দুর্গে বন্দী অবস্থায় রাখিয়াছিলেন। (১) সাজাহান মোগল রাজ-পরিবারস্থ যে সমস্ত রাজপুত্র এবং তাঁহার রাজ্যের যে সমস্ত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে হত্যা না করিয়া গোয়ালিয়র দুর্গে বন্দী করিয়া রাখিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদিগের সম্পত্তির আয় আত্মসাৎ না করিয়া তাঁহাদিগকেই ভোগ করিতে অনুমতি দিয়াছিলেন। (২) ঔরঙ্গজেব দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিবার পর তাঁহার ভ্রাতা মুরাদবক্স, পুত্র সুলতান মহম্মদ (৩) এবং তাঁহার পত্নী (সুজার কন্যা), দারার পুত্রদ্বয় সুলেমান সুখো এবং সেপার সুখোকে গোয়ালিয়র-দুর্গে বন্দী করিয়া রাখিয়াছিলেন। (৪) ঔরঙ্গজেব যে সমস্ত রাজপুত্র এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে গোয়ালিয়র-দুর্গে বন্দী অবস্থায় প্রেরণ করিতেন, তাঁহাদিগকে এক প্রকার বিষ-প্রয়োগে হত্যা করিতেন এবং তাঁহাদিগের সম্পত্তি অধিকার করিতেন। (৫)

ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর দিল্লীর সিংহাসন লইয়া তাঁহার পুত্র বাহাদুর সা এবং আজম সার যখন বিবাদ উপস্থিত হয়, তখন আজম সা তাঁহার ভগিনী জিনাৎ-উন্নিসা বেগম এবং ঔরঙ্গজেবের পুরমহিলাগণকে এবং তাঁহার দ্রব্যসম্ভার গোয়ালিয়র-দুর্গে ঔরঙ্গজেবের মন্ত্রী আসাদ খাঁর জিম্মায় রাখিয়া ভ্রাতার বিরুদ্ধে ঢোল-পুরাভিমুখে যুদ্ধযাত্রা করেন (১৭০৭ খৃষ্টাব্দে)। জাজাউ

(1) Kennedy, History of the Great Moghuls, Vol. I
(2) Tavernier, Vol. I.
(3) Tavernier, Vol. I.
Storia D. O. Mogor.
(4) সুলতান মহম্মদ কিছুকাল পরে গোয়ালিয়র-দুর্গ হইতে সেলিমগড়ে বন্দীরূপে প্রেরিত হয়েন এবং সে স্থানে বিষপ্রয়োগে তাঁহার প্রাণনাশ করা হয়। Bernier, page 83. Ft. note 2.
(5) Tavernier, Vol. I.

নামক স্থানে উভয় ভ্রাতার সংগ্রাম হয় এবং এই সংগ্রামে আজম সা নিহত হয়েন। (১) এই ঘটনার পর গোয়ালিয়র বাহাদুর সার হস্তগত হয়। বাহাদুর সার মৃত্যুর পর হইতে দ্বিতীয় সা আলমের সিংহাসনারোহণ পর্য্যন্ত গোয়ালিয়র-দুর্গের বিশেষ কোনও উল্লেখ মোগল-ইতিহাসে দৃষ্ট হয় না।

১৭৬১ খৃষ্টাব্দে গোহাডের (Gohad) (এটওয়া এবং গোয়ালিয়রের মধ্যবর্ত্তী স্থানে গোহাড অবস্থিত এবং গোয়ালিয়র হইতে ২৮ মাইল উত্তর-পূর্ব্বে) জাঠ রাণা ভীমসিংহ গোয়ালিয়র অধিকার করেন এবং ইহার কিছু কাল পরে গোয়ালিয়র মারাঠাদিগের হস্তগত হয়। ১৭৭৭ খৃষ্টাব্দে পেশোয়ার নিকট হইতে মাধোজী সিন্ধিয়া গোয়ালিয়র প্রাপ্ত হয়েন। হেষ্টিংসের শাসনকালে মহারাষ্ট্রীয় সমরের সময় মেজর পপহাম (Major Popham) সিন্ধিয়ার সৈন্যকে পরাজিত করিয়া গোয়ালিয়র-দুর্গ অধিকার করেন। (২)

১৭৮২ খৃষ্টাব্দে সালবাইয়ের (Treaty of Salbai) সন্ধি অনুযায়ী মাধোজী সিন্ধিয়া ইংরাজের হস্তে গোয়ালিয়র অর্পণ করেন এবং ইংরাজদিগের নিকট হইতে গোহাডের রাণা পুনরায় গোয়ালিয়র প্রাপ্ত হয়েন।

১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে গোহাডের রাণা ছত্রপতির সহিত মাধোজী সিন্ধিয়ার বিবাদ উপস্থিত হয় এবং মাধোজীর ফরাসী সেনানায়ক ডি বয়েন (De Boigne) ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে গোয়ালিয়র-দুর্গ অধিকার করেন এবং মাধোজী গোহাড জয় করেন। ছত্রপতির বন্দী অবস্থায় গোয়ালিয়র-দুর্গে মৃত্যু হয়। (৩) ওয়েলেস্‌লির শাসনকালে ইংরাজদিগের সহিত মারাঠাদিগের যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে সিন্ধিয়া এবং ভোঁস্‌লা (Bhonsla) পেশোয়া বাজীরাওয়ের পক্ষসমর্থন করেন। ইংরাজ সেনাপতি হোয়াইট (White) ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে দৌলতরাও সিন্ধিয়ার নিকট হইতে গোয়ালিয়র অধিকার করেন এবং ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে যখন সন্ধি স্থাপন করেন, তখন সিন্ধিয়া পুনরায় গোয়ালিয়র প্রাপ্ত হয়েন। (১)

১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে জনকৃজি সিন্ধিয়ার মৃত্যুর পর তাঁহার বিধবা পত্নী তারাবাই বড়লাট এলেনবরার সম্মতিক্রমে এক পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন, কিন্তু অভিভাবক লইয়া তারাবাইয়ের এবং এলেনবরার বিবাদ হয়। এলেনবরা তারাবাইকে তাঁহার সৈন্যসংখ্যা হ্রাস করিতে বলেন। তারাবাই এ প্রস্তাবে সম্মত না হওয়ায় ইংরাজ সেনাপতি সার হিউ গাফ গোয়ালিয়র সৈন্যকে যুদ্ধে পরাজিত করেন। এই ঘটনার পর তারাবাইকে বৃত্তি দিয়া এলেনবরা গোয়ালিয়রের শাসন-কার্য্য চালাইবার জন্য ইংরাজ রেসিডেণ্ট (Resident) কর্ণেল স্লিমানের (Colonel Sleeman) কর্ত্তৃত্বাধীনে এক রাজপ্রতিনিধি সভা (Council of Regency) নিযুক্ত করেন। এইরূপে গোয়ালিয়র তৃতীয়বার ইংরাজদিগের হস্তগত হয়।

সিপাহী-যুদ্ধের সময় সিন্ধিয়ার সৈন্যের এক অংশ বিদ্রোহী হইয়া ঝাঁসির রাণী এবং তাঁতিয়া টোপীর (Tantia Topi) সহিত যোগদান করে। গোয়ালিয়রের নিকট সিন্ধিয়ার সহিত বিদ্রোহীদিগের এক যুদ্ধ হয় এবং এই যুদ্ধে পরাজিত হইয়া সিন্ধিয়া আগ্রায় পলায়ন করেন। ইহার পর ঝাঁসির রাণী গোয়ালিয়র-দুর্গ অধিকার পূর্ব্বক নানা সাহেবকে নূতন পেশোয়া বলিয়া ঘোষণা করেন। এই সংবাদ শ্রবণে ইংরাজ সেনাপতি সার হিউ রোজ (Sir Hugh Rose) গোয়ালিয়রে বিদ্রোহীদিগকে আক্রমণ এবং পরাজিত করেন। পুরুষের বেশ পরিধান পূর্ব্বক ঝাঁসির রাণী এই যুদ্ধে বিদ্রোহী সিপাহীদিগকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন এবং নিজেও শৌর্য্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন পূর্ব্বক যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জ্জন করেন। ইহার পর গোয়ালিয়র পুনরায় ইংরাজদিগের হস্তগত হয়, কিন্তু গোয়ালিয়র-দুর্গ তখনও বিদ্রোহীদিগের অধিকারে থাকে এবং দুই জন ইংরাজ সৈনিক কর্ম্মচারীর অদ্ভুত বীরত্বে গোয়ালিয়র-দুর্গ হইতে বিদ্রোহিগণ বিতাড়িত হয়। ইঁহাদিগের নাম লেফ্‌টেনাণ্ট রোজ (Lieut. Rose) এবং লেফ্‌টেনাণ্ট ওয়ালার

(১) Later Moghuls, Vol. I, edited by Prof. J. N. Sarkar.

(২) Trotter, History of India.
Grant Duff, History of the Mahrattas, Vol. I.

(৩) Sleeman's Rambles and Recollections.

(১) Murray's Hand Book for Travellers.

গুজারী মহল (ভিতরের দৃশ্য)

গোয়ালিয়রের তোমরবংশীয় নরপতি মানসিংহের (পূর্ব্ব-বর্ণিত) খুল্লতাত বাদলসিংহ এই স্থানে একটি উপদুর্গ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। (১৫০০ শত খৃষ্টাব্দ)। পাহাড়ের নিম্নে দক্ষিণদিকে "গুজারী মহল" নামে একটি সুন্দর দ্বিতল প্রাসাদ অবস্থিত। রাজা মানসিংহ তাঁহার প্রিয়তমা মহিষী মৃগনয়নার (তিনি জাতিতে গুজারী ছিলেন) বাসভবনের জন্য এই প্রাসাদটি নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। ইহার অভ্যন্তরে একটি বিস্তৃত প্রাঙ্গণ এবং প্রাঙ্গণের চতুর্দ্দিকে নানাপ্রকারের মূর্ত্তি ক্ষোদিত তাকবিশিষ্ট অনেকগুলি ক্ষুদ্র কক্ষ। প্রাঙ্গণের মধ্যভাগে একটি দ্বিতল গরাদ-বেষ্টিত এবং অলিন্দযুক্ত অন্তর্ভৌম (under-ground) প্রকোষ্ঠ। আমরা এই কক্ষে প্রবেশ করিয়াছিলাম, কিন্তু ইহা অতিশয় অন্ধকার। গোয়ালিয়র ষ্টেটের মিউজিয়াম (Museum) বর্ত্তমানে এই প্রাসাদে অবস্থিত। মিউজিয়ামটি অতিশয় সুন্দর। এই স্থানে গোয়ালিয়ররাজ্যে প্রাপ্ত নানাপ্রকার পুরাতন প্রস্তরমূর্ত্তি, শিলালিপি,

(Lieut. Waller)। এই সময় হইতে (২০ জুন, ১৮৫৮) ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত গোয়ালিয়র-দুর্গে এক দল ইংরাজসৈন্য অবস্থিতি করে এবং ঐ খৃষ্টাব্দে সিন্ধিয়ার নিকট হইতে ঝাঁসি গ্রহণ পূর্ব্বক ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে গোয়ালিয়র প্রত্যর্পণ করেন। বর্ত্তমান সময়ে মাধবরাও সিন্ধিয়া গোয়ালিয়রের অধিপতি।

এক্ষণে গোয়ালিয়র-দুর্গের অভ্যন্তরে দর্শনীয় স্থানসমূহের সম্বন্ধে কিছু বলিব। গোয়ালিয়র-দুর্গে প্রবেশ করিতে হইলে ছয়টি তোরণ (gate) অতিক্রম করিতে হয়। ইহাদিগের মধ্যে পাঁচটি তোরণ উল্লেখযোগ্য। প্রথমটির নাম (নিম্নদিক হইতে) "আলমগিরী গেট।"

ইহা মুতামাদ খাঁ, ঔরেঙ্গজেবের গোয়ালিয়রের শাসন কর্ত্তা, ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মাণ করেন। দ্বিতীয় তোরণের নাম "বাদলমহল গেট" ইহার অপর নাম "হিন্দোলা গেট।" কথিত আছে, পূর্ব্বে এই ফটকের নিকট একটি দোলনা ছিল এবং সেই জন্য ইহার নাম "হিন্দোলা গেট" হইয়াছে।" ইহার নাম "বাদল-মহল গেট" হইবার কারণ এই যে,

গুজারী মহল (বহির্দ্দেশ)

তাম্রলিপি, চিত্র, মুদ্রা এবং স্তম্ভ দেখিতে পাইলাম। প্রত্নতত্ত্ববিদরা এই স্থানটি অতিশয় পছন্দ করিবেন।

তৃতীয় তোরণটির নাম "গণেশ গেট।" তোমরবংশীয় রাজা নোঙ্গরসিংহ ইহা নির্ম্মাণ করান। চতুর্থটির নাম "লক্ষ্মণ গেট।" এই স্থানে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে "চতুর্ভুজ মন্দির" নামক একটি মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা পাহাড় কাটিয়া নির্ম্মিত হইয়াছে। মন্দিরাভ্যন্তরে চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তি। মন্দির-গাত্রে দুইটি সংস্কৃত উৎকীর্ণ লিপি (Inscription) বিদ্যমান এবং ইহার একটি হইতে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, ৮৭৫ খৃষ্টাব্দে মন্দিরটি প্রস্তুত হইয়াছিল।

মান-মন্দির (পূর্ব্বভাগ)

পঞ্চম এবং শেষ তোরণের নাম "হাথিয়া পাউর" অর্থাৎ "হস্তী গেট।" পূর্ব্বে একটি প্রস্তরনির্ম্মিত হস্তী এই তোরণের বহির্দ্দেশে ছিল এবং সেই জন্য ইহার নাম "হস্তী গেট" হইয়াছে। এই ফটকটি গোয়ালিয়র-দুর্গের প্রধান প্রবেশ-দ্বার। রাজা মানসিংহের সময় ইহা নির্ম্মিত হয়, এবং ইহা তাঁহার প্রাসাদের পূর্ব্বদিকের অংশবিশেষ।
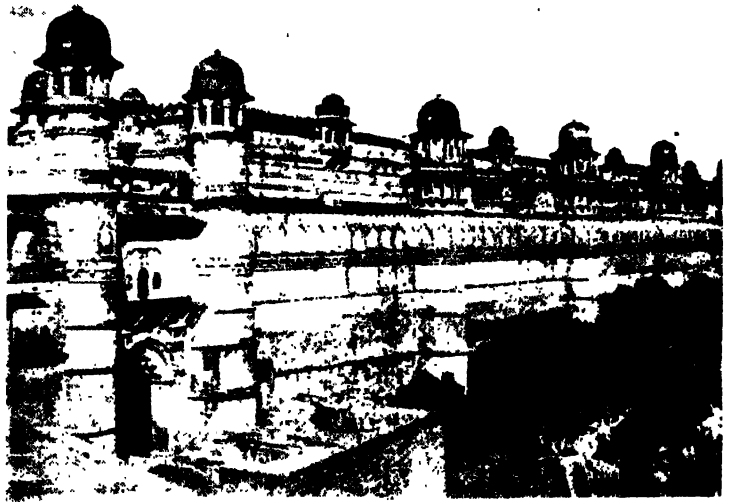
দুর্গে প্রবেশ করিয়া আমরা প্রথমে রাজা মানসিংহের (১৪৮৬—১৫১৬ খৃষ্টাব্দ) প্রাসাদ দেখিলাম। প্রাসাদটি অতিশয় সুন্দর। প্রাচীরগাত্র নীল, সবুজ, হরিদ্রা প্রভৃতি নানা বর্ণের টালি দ্বারা এরূপ ভাবে সজ্জিত যে, তাহা হইতে মনুষ্য, হংস, হস্তী, ব্যাঘ্র, কদলীবৃক্ষ প্রভৃতি নানা প্রকার সুন্দর সুন্দর চিত্র প্রস্তুত হইয়া তাহার মাধুর্য্য এবং সৌন্দর্য্য বর্দ্ধিত করিয়াছে। প্রাসাদটি দ্বিতল এবং ইহা কতকগুলি অন্তর্ভৌম দ্বিতল কক্ষবিশিষ্ট। এই কক্ষগুলি বর্ত্তমানে বাসের অনুপযুক্ত। প্রাসাদের পূর্ব্বদিকের সম্মুখভাগ ৩ শত ফুট দীর্ঘ এবং ১ শত ফুট উচ্চ এবং ইহার অনাবৃত গোলাকৃতি ছাদবিশিষ্ট পাঁচটি বৃহৎ বুরুজ আছে, এই বুরুজগুলি (tower) সুন্দর জাফরি-কার্য্যবিশিষ্ট প্রাচীর দ্বারা সংযুক্ত। প্রাসাদের দক্ষিণ-দিকের সম্মুখভাগ ১ শত ৬০ ফুট দীর্ঘ এবং ৬০ ফুট উচ্চ এবং সচ্ছিদ্র প্রাচীর-সংলগ্ন তিনটি গোলাকার বুরুজবিশিষ্ট। প্রাসাদের উত্তর এবং পশ্চিম অংশ কিয়ৎপরিমাণে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। অট্টালিকাটির অভ্যন্তরভাগে দুইটি
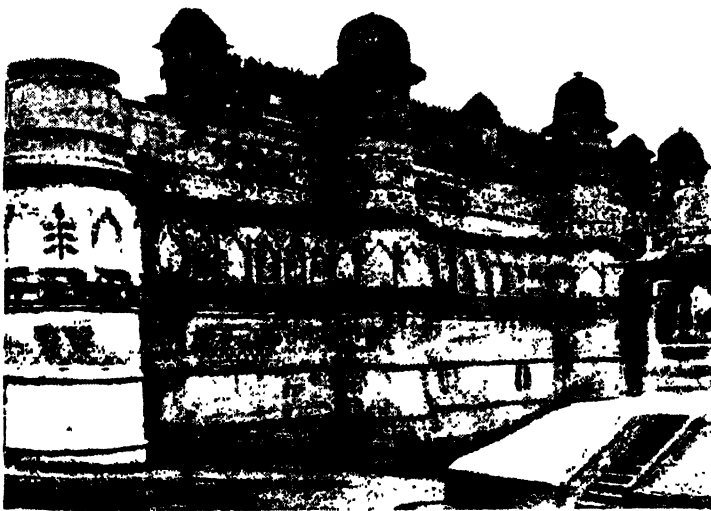
মান-মন্দির (দক্ষিণ ভাগ)

অনাবৃত প্রাঙ্গণ এবং উভয়েরই চতুর্দ্দিকে অনেকগুলি সুন্দর কক্ষ আছে। গোয়ালিয়র-দুর্গের পুরাতন অট্টালিকাসমূহের মধ্যে মানসিংহের প্রাসাদই সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর এবং এখনও ইহার পূর্ব্ব-সৌন্দর্য্য লুপ্ত হয় নাই। সম্রাট বাবর প্রাসাদটির বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। *

মানসিংহের প্রাসাদের পর রাজা বিক্রমাদিত্যের (পূর্ব্ব-বর্ণিত) প্রাসাদ। এই স্থানে উল্লেখযোগ্য কিছু দেখিলাম না। ইহার পর "কীর্ত্তিমন্দির" নামক একটি প্রাসাদ দেখিলাম। ডোঙ্গরসিংহের পুত্র কীর্ত্তিসিংহ (পূর্ব্ব-বর্ণিত) ইহা নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। এই প্রাসাদে একটি দরবারগৃহ, কতিপয় স্নানাগার, অনেকগুলি ক্ষুদ্র কক্ষ এবং একটি বৃহৎ প্রকোষ্ঠ দেখিলাম। দুর্গের উত্তরদিকে জাহাঙ্গীর এবং সাহাজাহানের প্রাসাদ অবস্থিত। প্রাসাদ দুইটি সাধারণ রকমের। বর্ত্তমানে এই স্থানে গোয়ালিয়র ষ্টেটের সামরিক দ্রব্যাদি রক্ষিত হয়। এই প্রাসাদ দুইটির উত্তর-পশ্চিমদিকে "জহর ট্যাঙ্ক" নামক একটি জলাশয় আছে।
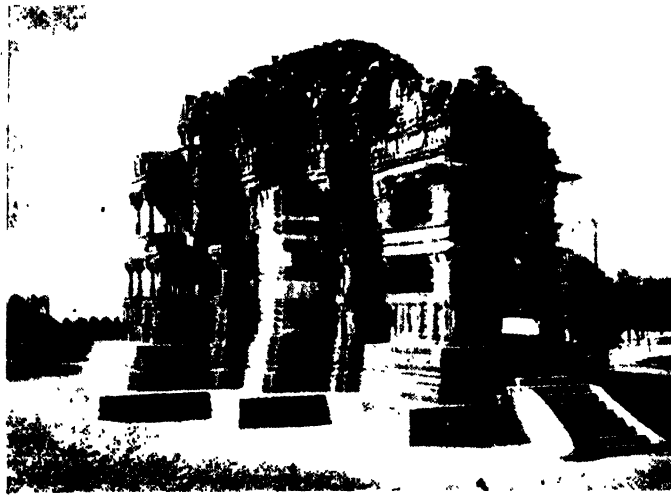
শ্বশ্রূবধূ মন্দির (বড়)

কথিত আছে যে, দিল্লীর সুলতান "আলতামাস" গোয়ালিয়র-দুর্গ অধিকার করিবার সময় এই স্থানে রাজপুত-মহিলাগণ চিতারোহণে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন।

"জহর ট্যাঙ্কের" অনতিদূরে "নউচউকির", (Nauchauki), অর্থাৎ নয়টি কারাকক্ষের ধ্বংসাবশেষ বর্ত্তমান। এই কক্ষগুলিই মোগল-সম্রাটদিগের রাজনৈতিক কারাগৃহ (state prison) ছিল। হায়! এই স্থানে কত "শাহজাদা" এবং কত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সমস্ত সুখশান্তি হইতে বঞ্চিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। যে "নউচউকি" এক সময়ে কত বীরের হৃদয়ে আতঙ্ক আনয়ন করিয়াছে, বর্ত্তমানে তাহার এই অবস্থা। এই স্থানটি দেখিয়া আমার ফরাসী রাজনীতিক কারাগার (state prison) bastilleএর কথা মনে উদয় হইল। উভয়ই কত লোকের স্বাধীনতা হরণ করিয়াছে, এবং উভয়ই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। এই স্থানটি দর্শন করিবার সময় সুলতান মোরাদ, সুলেমান সুখো, সেপার সুখো প্রভৃতি রাজপুত্রগণের দীর্ঘনিশ্বাস যেন আমাদিগের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল এবং আমাদিগকে স্তম্ভিত ও বিষণ্ণ করিল।

অতঃপর আমরা দুর্গপ্রাকারের পূর্ব্বদিকে অবস্থিত দুইটি মন্দির দেখিলাম। এই মন্দির-যুগলের নাম "শ্বশ্রূবধূ" (Sas Bahu) মন্দির। সমীপবর্ত্তী যুগল-কূপ, যুগল মন্দির প্রভৃতিকে লোক সাধারণতঃ শ্বশ্রূবধূ কূপ, শ্বশ্রূবধূ মন্দির বলিয়া থাকে, সেই জন্য এই মন্দির দুইটির নাম শ্বশ্রূবধূ মন্দির হইয়াছে। ইহাদিগের মধ্যে একটি বড় এবং অপরটি ছোট। রাজা মহীপাল (কুশোয়াবংশীয়) ১০৯৩ খৃষ্টাব্দে বড় মন্দিরটি নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। ইহা বর্ত্তমানে ৭০ ফুট উচ্চ এবং ইহার উপরিভাগ ভগ্ন অবস্থাপ্রাপ্ত। ইহার প্রবেশদ্বার উত্তরদিকে এবং বিগ্রহকক্ষ দক্ষিণদিকে অবস্থিত। মন্দিরটির তলদেশ সুন্দর ক্ষোদিত চিত্রসমূহে সুশোভিত। মন্দিরাভ্যন্তরে একটি বিস্তৃত প্রকোষ্ঠ আছে এবং তাহার তিন পার্শ্বে তিনটি দ্বারমণ্ডপ (Porch) এবং চতুর্থ পার্শ্বে (দক্ষিণদিকে) বিগ্রহ-কক্ষ। ইহার সম্মুখের (উত্তরদিকস্থ) দ্বারমণ্ডপে সংস্কৃত উৎকীর্ণ লিপি এবং মন্দিরের প্রবেশদ্বারে ও মন্দিরাভ্যন্তরে বহুসংখ্যক বিষ্ণু এবং অন্যান্য হিন্দু দেবদেবীর মূর্ত্তি দেখিলাম। ইহা হইতে মন্দিরটি হিন্দু-মন্দির বলিয়া

* Kennedy, History of the Great Moghuls, Vol. I.

শ্বশ্রূবধূ মন্দির (Sas Bahu Temple)

বিশ্বাস হয়,—যদিও অনেকে ইহাকে জৈন মন্দির বলিয়াছেন। বর্ত্তমানে বিগ্রহকক্ষে কোনও দেবমূর্ত্তি নাই। যদিও মন্দিরটি প্রায় সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে, তথাপি ইহার যে অংশটুকু বর্ত্তমান আছে, তাহা অতিশয় সুন্দর।

ছোট মন্দিরটিও বিষ্ণুমন্দির, এবং বড় মন্দিরটি সমসাময়িক। ইহা ক্রুশের (cross) আকৃতিতে নির্ম্মিত এবং চতুর্দ্দিকেই অনাবৃত। ইহা ২৩ ফুট সমচতুষ্কোণ এবং দ্বাদশটি স্তম্ভবিশিষ্ট। ইহার তলদেশও নানা প্রকার ক্ষোদিত চিত্রসমূহে শোভিত। স্তম্ভগুলি গোলাকার। ইহাদিগের পাদদেশ অষ্টকোণবিশিষ্ট এবং শীর্ষস্থান তাকসংযুক্ত এবং মধ্যস্থান ক্ষোদিত নর্ত্তকীমূর্ত্তিসমূহে সজ্জিত। মন্দিরাভ্যন্তরে কোন দেবমূর্ত্তি নাই।

এই স্থান হইতে আর একটি মন্দির দেখিতে আমরা দুর্গের পশ্চিমদিকে উপস্থিত হইলাম। পথে "সূর্য্যকুণ্ড" নামক একটি জলাশয় দেখিলাম। কথিত আছে, হুন নরপতি মিহিরগুলা (পূর্ব্ববর্ণিত) এই জলাশয়টি খনন করাইয়াছিলেন, সুতরাং দুর্গমধ্যে ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন জলাশয়।

যে মন্দিরটি দেখিতে আসিলাম, তাহার নাম "তেলিকা মন্দির।" ইহা ৬০ ফুট সমচতুষ্কোণ এবং একটি দ্বার-মণ্ডপসংযুক্ত। মন্দিরটি ১ শত ফুট উচ্চ। বহির্দ্বারের মধ্যস্থানে গরুড়ের মূর্ত্তি দেখিতে পাইলাম। পূর্ব্বে ইহা বৈষ্ণবদিগের মন্দির ছিল, কিন্তু ১৫ শত খৃষ্টাব্দ হইতে শৈবদিগের অধিকারে আছে। মন্দিরটি ক্ষোদিত মূর্ত্তিসমূহে পূর্ণ। মন্দিরের শিখরদেশ দ্রাবিড়ীয় (Dravidian style of Architecture) স্থাপত্যরীতি এবং নিম্নভাগ আর্য্যস্থাপত্যরীতি অনুসারে নির্ম্মিত হইয়াছে। এই জন্য মনে হয়, পূর্ব্বে এই মন্দিরটির নাম তেলাঙ্গানা মন্দির (দ্রাবিড়ীয় শিখরবিশিষ্ট) ছিল, এবং শেষে ইহার নাম "তেলিকা মন্দির" হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন যে, ইহা কলুদিগের
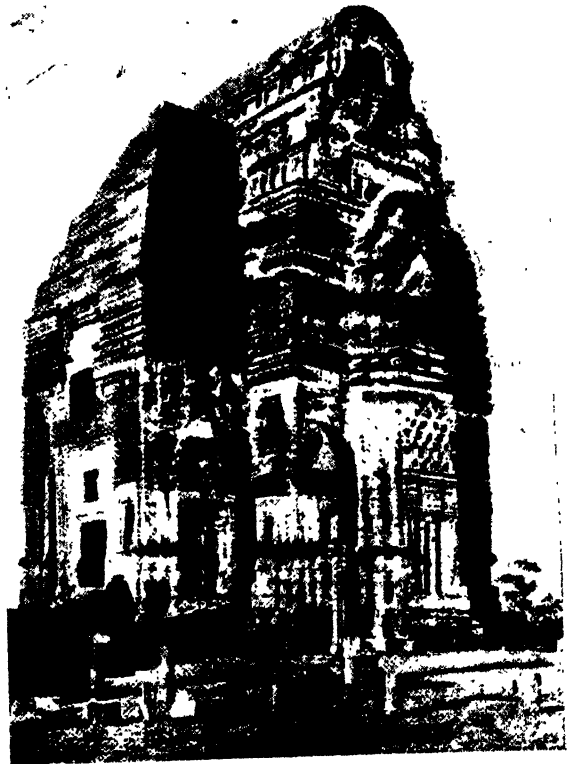
তেলিকা মন্দির

নির্ম্মিত মন্দির বলিয়া ইহার নাম "তেলিকা মন্দির" হইয়াছে।

মন্দিরটির নাম সম্বন্ধে প্রথম ব্যাখ্যা-টাই ভাল বলিয়া মনে হয়। কারণ, কেহই বলিতে পারেন না যে, কোন্ সময় এবং কি হেতু গোয়ালিয়রের কলুগণ দুর্গ-মধ্যে এই বিশাল মন্দিরটি নির্ম্মাণ করিয়াছিল। গোয়ালিয়রদুর্গ-স্থিত মন্দিরসমূহের মধ্যে এই মন্দিরটি সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ। এ মন্দিরেও কোনও দেবমূর্ত্তি দেখিলাম না। আমার মনে হয়, মুসলমানদিগের অধিকারকালে দেবমূর্ত্তিগুলি স্থানচ্যুত হইয়াছে এবং সেই সময় হইতে মন্দির সকল বিগ্রহশূন্য অবস্থায় আছে।

সরদার-তনয়দিগের বিদ্যালয় (Sardars' School)

দুর্গমধ্যে একটি ছাত্রাবাসযুক্ত (Hostel) বিদ্যালয় দেখিলাম। এই বিদ্যালয়টির নাম "Sardars School।" গোয়ালিয়র-রাজ্যের জমীদারতনয়গণ এই বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন এবং ছাত্রাবাসে থাকেন। গোয়ালিয়রের বর্ত্তমান মহারাজা মাধবরাও সিন্ধিয়া ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে এই বিদ্যালয়টি স্থাপন করিয়াছেন। এই স্থানে সাধারণ এবং সামরিক শিক্ষা প্রদান করা হয়।

প্রস্তর-ক্ষোদিত বৃহৎ জৈন তীর্থঙ্করের মূর্ত্তি (৫৭ ফিট উচ্চ)

গোলিয়রের প্রস্তরক্ষোদিত মূর্ত্তি সকল সংখ্যায় এবং বিরাট আকৃতির জন্য উত্তর-ভারতবর্ষে অদ্বিতীয়। যে পাহাড়ে দুর্গটি অবস্থিত, তাহার প্রায় চতুর্দ্দিকেই ক্ষোদিত মূর্ত্তি বর্ত্তমান। পশ্চিম এবং দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকস্থ মূর্ত্তিগুলিই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সমস্ত মূর্ত্তি জৈন তীর্থাঙ্করদিগের। ইহাদিগের মধ্যে কতকগুলি পর্ব্বত-গাত্রস্থিত গহ্বরে উপবিষ্ট এবং কতকগুলি দণ্ডায়মান। এই গহ্বরগুলির তলদেশ এবং উপরিভাগ নানাপ্রকার ক্ষোদিত চিত্রে শোভিত। তোমরবংশীয় নরপতিদ্বয়—ডোঙ্গরসিংহ এবং তাঁহার পুত্র কীর্ত্তিসিংহ এই মূর্ত্তি সকল প্রস্তুত করাইয়াছিলেন (১৪৪০-১৪৭৩ খৃষ্টাব্দ)। মোগল সম্রাট বাবর ১৫২৭ খৃষ্টাব্দে অনেকগুলি মূর্ত্তির অঙ্গহীন করিয়াছিলেন, কিন্তু জৈন সম্প্রদায় ইহাদিগের অনেক-গুলিই মেরামত করাইয়াছেন। * এই মূর্ত্তি সকলের

* Murray's Hand Book for Travellers. Gwalior Fort Album.

অপর একটি জৈন তীর্থঙ্করের মূর্ত্তি

মধ্যে ৫৭ ফুট উচ্চ একটি মূর্ত্তি আমরা দেখিয়াছিলাম। মূর্ত্তিগুলি নগ্ন অবস্থায় দেখিলাম, সুতরাং ইহা হইতে মনে হয়, রাজা ডোঙ্গরসিংহ এবং তাঁহার পুত্র কীর্ত্তিসিংহ দিগম্বর জৈন সম্প্রদায়ের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

আমরা গোয়ালিয়র-দুর্গে এই সমস্ত দেখিয়া ৪টার সময় পূর্ব্ব-লিখিত ধর্ম্মশালায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম এবং অর্দ্ধ ঘণ্টা বিশ্রামের পর মহারাজা সিন্ধিয়ার মোতি-মহল এবং জয়বিলাস প্রাসাদ দেখিতে যাত্রা করিলাম। মোতি-মহলে রাজ সেরেস্তা (secretariat office) অবস্থিত। আমরা এই স্থানে মহারাজার বিচারালয়, ব্যবস্থাপক সভাগৃহ এবং অন্যান্য কার্য্যালয় (offices) দেখিলাম। ব্যবস্থাপক সভা-প্রকোষ্ঠটি সুচারুরূপে সজ্জিত। কার্য্যালয়সমূহে উচ্চ কর্ম্মচারিগণ চেয়ার-টেবলে উপবিষ্ট হইয়া কার্য্য করিতেছিলেন, নিম্ন-কর্ম্মচারিগণ ফরাসযুক্ত গৃহতলে (floor) স্ব স্ব কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। আমাদিগের নিকট এই দৃশ্যটি অভিনব বোধ হইল। কারণ, ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের কোনও কার্য্যালয়ে এই প্রকার বন্দোবস্ত কখনও দেখি নাই।

জয়বিলাস প্রাসাদ মহারাজা সিন্ধিয়ার বাসভবন। পূর্ব্বে অনুমতি গ্রহণ না করায় আমরা ঐ প্রাসাদ দেখিতে সমর্থ হইলাম না। উভয় প্রাসাদই ভূতপূর্ব্ব সিন্ধিয়া মহারাজা জয়াজিরাওএর রাজত্বকালে নির্ম্মিত হইয়াছে।

অতঃপর আমরা একটি সুন্দর শিখ-মন্দির (Gurudwara) দর্শন করিয়া মহারাজার চিড়িয়াখানা (zoo) দেখিলাম। এই স্থানে নানাপ্রকার পশুপক্ষী আছে,—তাহাদিগের মধ্যে একটি বৃহৎ ব্যাঘ্র বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ব্যাঘ্রটি আমাদিগকে দেখিবামাত্র বজ্র-গম্ভীর নিনাদে আমাদিগের সংবর্দ্ধনা করিল এবং এই অভ্যর্থনায় আমাদিগের বীর-হৃদয় কম্পিত হইয়া উঠিল।

মোতিমহল এবং জয়বিলাস প্রাসাদ

পুরাতন গোয়ালিয়র সহর বর্ত্তমানে সম্পূর্ণ শ্রীহীন এবং ক্রমশঃ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতেছে। নূতন সহরটি দিন দিন উন্নতি লাভ করিতেছে। ইহার নাম লসকর (Lashkar)। দুর্গের দক্ষিণদিকে ইহা অবস্থিত। দৌলতরাও সিন্ধিয়া এই সহরটি স্থাপন করেন। গোয়া-লিয়রে অন্যান্য দর্শনীয় স্থানসমূহের মধ্যে ডাফরিণ সরাই (Dufferin Sarai), গ্রাণ্ড হোটেল (the Grand Hotel), এলগিন ক্লাব (the Elgin club) এবং ভিক্টোরিয়া কলেজ উল্লেখযোগ্য।

গোয়ালিয়রে এক দিনের বেশী থাকিতে পারি নাই, সুতরাং প্রধান স্থানগুলি দেখিয়া ২৪শে ডিসেম্বর রাত্রি সাড়ে ১১টায় গোয়ালিয়র পরিত্যাগ করিয়া আগ্রা যাত্রা করিলাম।

শ্রীঅতুলানন্দ সেন (অধ্যাপক)।

লক্ষ্মীছাড়া

দুয়ারে গামোছা, জুতো, পা-ধোয়ার জল
সন্ধ্যায় সাজায়ে কেহ রাখে না'ক তার;
কলসে-কাঁকণে সুর বাজে না তরল,
নাহিক' ধূপের গন্ধ, গৃহ অন্ধকার।
বিছানা পাতেনি কেহ—ছিঁড়েছে মশারি,
পাখাখানা প'ড়ে আছে মেঝের উপর;
আল্‌নাটা খ'সে গেছে—নাই সারি সারি
সাজানো-গোছানো তার কাপড়-চোপড়।

আয়নাটি ভেঙ্গে গেছে—চিরুণিটি নাই,
পানের ডিবেটি খালি, ধূলি-মলা ভরা,
ফ্রেম ভেঙে গেছে, ছবি ভূমে লুটে তাই,
চাবির তাড়াটি আছে—মরিচায় পড়া।
মেঝেতে কত কি ছাই, ভস্ম আর ধূলি,
ওলোট্-পালোট্ সব—আবোল-তাবোল;
ঝাঁট দিয়ে গুছায়নি কেহ সেইগুলি,
কপাটে উলুর ঢিবী—ভেঙ্গেছে আগল।

আঙিনায় কাঁটা গাছ—লজ্জাবতী লতা,
ভাঙ্গা হাঁড়ী, ছেঁড়া ফিতে, ভাঙ্গা কাচ-শিশি,
ভাঙ্গা শাঁখা, ভাঙ্গা চুড়ি—প'ড়ে হেথা-হোথা;
ভাঙ্গা বুক—ভাঙ্গা প্রাণ—কাঁদে দিবানিশি।
নিজ হাতে রাঁধা-বাড়া হেঁসেলে তাহার,
এই বাটি—অই থালা—কলসী সেথায়;
ভাঙ্গা চুলো, ভিজে কাঠ, চোখে জলধার,
আনমনে কাৰ, ফেনে হাত পুড়ে যায়।

খেতে খেতে ভুলে যায়—মাছিগুলি ভাতে
ভন্ ভন্ ক'রে ওড়ে—কে দেয় বাতাস?
এঁটো নিতে কত কাঁটা ফোটে তার হাতে,
পরাণে ডুকুরে ওঠে কত দীর্ঘশ্বাস।
চুলগুলি এলো-মেলো—নয়ন উদাস,
মেঘময় মুখখানি, শিথিলিত দেহ;
ধুতি-জামা উড়ানির নাহি সে বিন্যাস—
মন তা'র বন তরে সদা ছাড়ে গেহ।

দুয়ারে বসন্ত নাচে—করে না বরণ;
দুই হাতে চোখ ঢেকে মু'খানি ফিরায়;
শীতের তুহিন হিয়া করিয়া হরণ
বুকেতে চাপিয়া রাখি' লক্ষ চুমো খায়।
চাহে না চাঁদের পানে—ছোঁয় না সে ফুল;
কান ঢাকে—শোনে না সে বিহঙ্গের গান।
শিহরে পরশে যদি মলয় আকুল,
কেঁদে ওঠে পেলে কভু কুসুমের ঘ্রাণ।

* * *

বিদায় দিয়েছে সবি—সুখ-সাধ-আশা;
কবে থেকে হ'য়ে গেছে সে যে লক্ষ্যহারা!
সর্ব্বস্ব হরেছে তা'র সংসারের পাশা;
গালে হাত দিয়ে ব'সে আছে লক্ষ্মীছাড়া।

শ্রীসদাশিব বন্দ্যোপাধ্যায়।

ভারত-সভার প্রতিষ্ঠা

এখনও সে দিনের কথা মনে আছে, যে দিন ভারত-সভার জন্ম হয়। কলিকাতার শিক্ষিত যুবকমণ্ডলীর মধ্যে যে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছিল, কি করিয়া তাহা স্বদেশের রাষ্ট্রীয় বিধিব্যবস্থার মধ্যে প্রত্যক্ষভাবে গড়িয়া উঠে, ক্রমে সুরেন্দ্রনাথ তাহার আয়োজন করিতে লাগিলেন। তরবারি ধরিয়া আমরা স্বাধীন হইব, এ কল্পনাটা তখন জাগে নাই। ক্ষাত্রবীর্য্যের উপরে দেশের স্বাধীনতা যে একান্তভাবে নির্ভর করে, ইহা তখনও শিক্ষিত বাঙ্গালী একান্তভাবে অনুভব করে নাই। তখন আমাদের একটা রেষারেষি জাগিয়া উঠিয়াছিল। এ দেশের ইংরাজ অধিবাসীদিগের সঙ্গে, ব্রিটিশ প্রভুশক্তির সঙ্গে তখনও আমাদের তেমন বিরোধ জাগে নাই। আমরা আইনের গণ্ডীর ভিতরে থাকিয়া কেবল আমাদের অভাব-অভিযোগের আন্দোলন-আলোচনা করিয়াই ইংরাজ পার্লামেন্টের ধর্ম্মবুদ্ধিকে জাগাইয়া ভারতবাসীর ন্যায়সঙ্গত অধিকার লাভ করিব, ইহাই আমাদের সে কালের রাষ্ট্রনীতির মূল ভিত্তি ছিল। সুতরাং দেশব্যাপী রাষ্ট্রীয় আন্দোলন জাগাইবার জন্যই সুরেন্দ্রনাথ সর্ব্বপ্রথমে আপনার শক্তিসামর্থ্য নিয়োজিত করেন। বিলাতে যেমন লোকমতের বা বহুমতের প্রভাবে রাষ্ট্রের বিধি-ব্যবস্থা পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে, বৃটিশ-ভারতেও সেইরূপই হইবে। সকলেই সে কালে এরূপ কল্পনা করিতেছিলেন। ইংরাজীতে ইহাকেই Constitutional agitation কহে। এই পথে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা লাভ করিতে হইলে সর্ব্বত্র রাষ্ট্রীয় সভাসমিতির প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। এই সকল সমিতির বেড়াজালে সমগ্র দেশকে ঘিরিতে হইবে। ইহাই সুরেন্দ্রনাথের রাষ্ট্রীয় কর্ম্মজীবনের প্রথম পর্ব্বের প্রধান লক্ষ্য হইয়া উঠিল। এই লক্ষ্যসাধনে অগ্রসর হইয়াই তিনি সর্ব্বপ্রথমে ভারত-সভার বা Indian Association-এর প্রতিষ্ঠা করেন। এই অনুষ্ঠানে আনন্দমোহন বসু, শিবনাথ শাস্ত্রী, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, দুর্গামোহন দাশ, চিত্তরঞ্জনের জ্যেষ্ঠতাত এবং পিতা ভুবনমোহন দাশ ব্রাহ্মসমাজের এই সকল চিন্তা এবং কর্ম্মনায়করা সুরেন্দ্রনাথের এই নূতন রাষ্ট্রীয় কর্ম্মে প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এই কথাটা যাঁহারা জানেন না, যাঁহাদের মনে নাই, কোন আদর্শের প্রেরণায় যে ভারত-সভার প্রথম প্রতিষ্ঠা হয়, ইহা তাঁহারা কখনই ভাল করিয়া ধরিতে পারিবেন না। আনন্দমোহন, শিবনাথ প্রভৃতি ব্রাহ্মসমাজেও একটা সর্ব্বাঙ্গীন স্বাধীনতার আদর্শ গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ধর্ম্মসংস্কারে প্রবৃত্ত হইয়াও বিগত খৃষ্টীয় শতাব্দীর য়ুরোপীয় ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের আদর্শকে একান্তভাবে আপনার অন্তরে বরণ করিয়া লইতে পারেন নাই। শাস্ত্র-গুরুবর্জিত আত্ম-প্রত্যয়-প্রতিষ্ঠ ধর্ম্মসাধনে প্রবৃত্ত হইয়াও মহর্ষি একান্তভাবে এই আত্ম-প্রত্যয়ের হাত ধরিয়া চলিলে শেষটা কোথায় যাইয়া দাঁড়াইতে হয়, এই আত্মপ্রত্যয়ের প্রামাণ্য ও প্রাধান্যের উপরেই যে য়ুরোপে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের বা individualism-এর প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, মহর্ষি এ কথাটা বড় করিয়া ধরেন নাই। কিন্তু বিজয়-কৃষ্ণ, কেশবচন্দ্র প্রভৃতি তাঁহার যুবক শিষ্য এবং সহধর্ম্মীরা এই আদর্শের প্রেরণাতেই ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করেন। ক্রমে এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বা individualism-এর প্রভাব বাড়িয়া উঠিলে মহর্ষির ব্রাহ্ম-সমাজে প্রাচীনে-নবীনে একটা বিরোধ বাধিয়া উঠে। এই বিরোধের ফলে নবীন ব্রাহ্মের দল কেশবচন্দ্রকে অগ্রণী করিয়া দেবেন্দ্রনাথের দল হইতে ভাঙ্গিয়া পড়েন। এই নূতন স্বাধীনতার আদর্শের প্রেরণাতেই ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম-সমাজের প্রতিষ্ঠা হয়। কিন্তু এখানেও আবার কেশবচন্দ্র এবং তাঁহার আসন্ন সহকর্ম্মীদিগের সঙ্গে আনন্দমোহন, দুর্গামোহন, শিবনাথ প্রভৃতির একটা নূতন বিরোধ বাধে। কেশবচন্দ্র যে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা অথবা বিবেকের নামে দেবেন্দ্রনাথের নায়কত্বের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিলেন, সেই স্বাধীনতা এবং বিবেকের নামেই আনন্দমোহন, শিবনাথ প্রভৃতি কেশবচন্দ্র এবং তাঁহার প্রচারকগোষ্ঠীর নেতৃত্বের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়েন। দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে

বিরোধ বাধিলে কেশবচন্দ্র তাহাকে "বিবেকের যুদ্ধ" বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। ব্যক্তিগত স্বাধীনতার মর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্যই কেশবচন্দ্র দেবেন্দ্রনাথকে ছাড়িয়া চলিয়া আইসেন। আনন্দমোহন প্রভৃতি এই ব্যক্তিগত স্বাধীনতার আদর্শে নিজেদের পারিবারিক ও সামাজিক জীবন গড়িয়া তুলিতে চাহেন। কেশবচন্দ্র জাতিভেদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করিয়াছিলেন। যাঁহারা প্রচলিত প্রতিমাপূজার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকিবেন, অথবা গার্হস্থ্য ও সামাজিক অনুষ্ঠানাদিতে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম মানিয়া চলিবেন, তাঁহারা ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্যের কায করিতে পারিবেন না, এই কথা লইয়াই দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে কেশবচন্দ্র, বিজয়কৃষ্ণ প্রভৃতির বিরোধ উপস্থিত হয়। ব্রাহ্মমন্দিরে যেমন জাতিবিচার থাকিবে না, সেইরূপ অবরোধ-প্রথাও থাকিবে না। আনন্দমোহন, দুর্গামোহন, দ্বারকানাথ প্রভৃতির সঙ্গে কেশবচন্দ্রের এই লইয়াই প্রথমে বিরোধের সূত্রপাত হয়। এই বিরোধ একরূপ মিটিয়া যায়। ব্রাহ্মমন্দিরে যে সকল মহিলা পর্দ্দার বাহিরে বসিতে চাহেন, তাঁহাদের জন্য সে ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হয়। কিন্তু ইহাতেই মূল বিরোধটা নষ্ট হইল না। কেশবচন্দ্রের ব্রাহ্মসমাজেও ধীরে ধীরে একটা নূতন পৌরোহিত্য গড়িয়া উঠিতে আরম্ভ করিল। অন্যান্য বিষয়েও কেশবচন্দ্র এবং তাঁহাদের প্রচারকগণের সঙ্গে সমাজের নব্য-শিক্ষিত যুবকদলের মতভেদ জন্মিতে লাগিল। এই বিরোধটা কেশবচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ কন্যার বিবাহ উপলক্ষে পাকিয়া উঠিল। কেশবচন্দ্র অপ্রাপ্তবয়স্কা কন্যাকে ব্রাহ্মসমাজের বাহিরে কুচবেহারের অপরিণতবয়স্ক মহারাজের সঙ্গে বিবাহ দিয়া ব্রাহ্মসমাজে আবার একটা তুমুল আন্দোলন জাগাইলেন। এই আন্দোলনের ফলে আনন্দমোহন প্রভৃতি কেশবচন্দ্রের দল ছাড়িয়া নূতন ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা করিলেন। এই নূতন ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতৃগণ প্রায় সকলেই ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার সাধক ছিলেন। জীবনের সর্ব্ববিভাগে এই স্বাধীনতা বা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রতিষ্ঠা করিয়া একটা নূতন মনুষ্যত্বসাধন এবং সমাজগঠন ইঁহাদের ধর্ম্ম ও কর্ম্মজীবনের লক্ষ্য হইয়া উঠে। যে বৎসর সুরেন্দ্রনাথ ভারতসভার বা Indian Associationএর প্রতিষ্ঠা করেন, সেই বৎসরেই এই নূতন ব্রাহ্মসমাজেরও প্রতিষ্ঠা হয়। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের জন্ম হয় ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে। ভারতসভার জন্ম হয় ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে। এই দুইটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে, বাহিরে নয়, কিন্তু ভিতরে ভিতরে একটা গভীর যোগ ছিল। সর্ব্বাঙ্গীন ব্যক্তিগত স্বাধীনতা এই যোগের মূলমন্ত্র ছিল। ব্যক্তিগত পারিবারিক এবং সামাজিক জীবনে এই সর্ব্বাঙ্গীন স্বাধীনতাকে গড়িয়া তুলিবার জন্য আনন্দমোহন, শিবনাথ প্রভৃতির নেতৃত্বাধীনে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের জন্ম হয়। এই স্বাধীনতার আদর্শকেই রাষ্ট্রীয় জীবনে এবং রাষ্ট্রের বিধিব্যবস্থাতে গড়িয়া তুলিবার জন্যই ভারত-সভার প্রতিষ্ঠা হয়। এই জন্যই আনন্দমোহন প্রভৃতি ব্রাহ্মসমাজের সে কালের নেতৃবর্গ এরূপ আন্তরিকতা সহকারে ভারত-সভার প্রতিষ্ঠায় সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে যোগ দিয়াছিলেন। এই কথাটা না বুঝিলে বা ভাল করিয়া না ধরিলে সুরেন্দ্রনাথ প্রথম-জীবনে কোন্ আদর্শের প্রেরণায় স্বদেশসেবায় আত্মসমর্পণ করেন, ইহা সুস্পষ্ট করিয়া ধরিতে পারা যাইবে না। আনন্দমোহন ভারত-সভার প্রথম সভাপতি নির্ব্বাচিত হয়েন। সুরেন্দ্রনাথ সম্পাদক এবং দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হয়েন। দুর্গামোহন দাশ, শিবনাথ শাস্ত্রী, উমেশচন্দ্র দত্ত এবং ভুবনমোহন প্রভৃতি নূতন ব্রাহ্মসমাজের মুখ্যরা ভারত-সভার কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। ভারত সভার জন্মের ইতিহাসে কোন্ মহান্ আদর্শের প্রেরণায় এক দিকে সে কালের ব্রাহ্মসমাজ এবং অন্য দিকে এই নূতন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান দেশের চিন্তা, ভাব এবং কর্ম্মকে পরিচালিত করিতে চাহিয়াছিল, ইহার সন্ধান পাওয়া যায়।

ভারত-সভার প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে, সত্য কথা বলিতে গেলে, আমাদের মধ্যে কোন প্রকারের গণতন্ত্র আদর্শের প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হয় নাই। সমাজের বা রাষ্ট্রের প্রত্যেক ব্যক্তির সমান অধিকার এবং অধিকাংশের মতামতের দ্বারা রাষ্ট্রের সকল প্রকারের বিধিব্যবস্থা নির্দ্ধারিত

হইবে, ইহাই গণতন্ত্র-শাসনের পুচ্ছ-প্রতিষ্ঠা। ধনি-নির্ধন, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, স্ত্রী এবং পুরুষ সকলে মিলিয়া অধিকাংশের অভিপ্রায়ানুযায়ী রাজ্যের শাসন-সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিবে, ইহাই গণতন্ত্র-শাসনের আদর্শ। এই আদর্শ লইয়াই ভারত-সভার জন্ম হয়। ইহাই আমাদের প্রথম প্রকৃত জনসভা। ইহার পূর্ব্বে,—বহু পূর্ব্বে, কলিকাতায় জমীদার-সভার বা British Indian Associationএর প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। সকলে এই সভার সভ্য হইতে পারিত না। বিশেষভাবে জমীদারদিগের স্বত্ব-স্বার্থ রক্ষা করাই এই British Indian Associationএর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। অবশ্য British Indian Association প্রজাসাধারণের হিতসাধনেরও চেষ্টা করিতেন। জমীদারদিগের বিশেষ স্বত্ব-স্বার্থ বজায় রাখিয়া যাহাতে সাধারণ প্রজামণ্ডলীর সুখস্বচ্ছন্দতা বৃদ্ধি পায়, অথবা তাহাদের সাধারণ স্বত্বস্বাধীনতা যাহাতে সঙ্কুচিত না হয়, British Indian Associationএর কর্ত্তৃপক্ষীয়রা এ বিষয়ে যথেষ্টই চেষ্টা করিতেন। British Indian সভার যখন জন্ম হয়, তখন এই সকল শিক্ষিত জমীদার ব্যতীত প্রজার স্বত্বস্বার্থ রক্ষা করে, এমন আর কেহ ছিল না। বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন বাঙ্গালার রাষ্ট্রীয় কর্ম্মের ইতিহাসে একটা অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, এ কথা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ যখন কর্ম্মক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন, তখন বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের দ্বারা আর আমাদের নূতন রাষ্ট্রীয় জীবন নিয়ন্ত্রিত করা সম্ভব ছিল না। তখন দেশে মধ্যবিত্ত অবস্থার বহু লোক নূতন শিক্ষালাভ করিয়াছেন। বহু শিক্ষিত লোক একটা নূতন রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার প্রেরণায় চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছেন। ইঁহাদের সম্মুখে যথোপযুক্ত রাষ্ট্রীয় কর্ম্মক্ষেত্র ছিল না। ইঁহারা বৃটিশ ইণ্ডিয়ান সভায় যোগ দিতে পারিতেন না। জমীদার নহেন বলিয়া, আর বৃটিশ ইণ্ডিয়ানের নির্দ্ধারিত চাঁদা দেওয়াও তাঁহাদের পক্ষে অসাধ্য না হউক, দুঃসাধ্য ছিল। বৃটিশ ইণ্ডিয়ান সভার দ্বারা আমাদের এই নূতন অভাব মোচন হইতেছিল না। এই জন্য স্বর্গীয় শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয় একটা নূতন রাষ্ট্র-সভা গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করেন। ইহার নাম ছিল ইণ্ডিয়ান লীগ। সার রিচার্ড টেম্পল যখন বাঙ্গালার সুবাদার, সে সময় এই লীগের জন্ম হয়। কিন্তু যে কারণেই হউক, দেশের শিক্ষিত সাধারণ এই লীগের প্রতি বিশেষ অনুরক্ত হয়েন নাই। বৃটিশ ইণ্ডিয়ান সভা যেমন বড় বড় জমীদারদিগের মধ্যে আবদ্ধ ছিল, ইণ্ডিয়ান লীগও সেইরূপ স্বল্পসংখ্যক শিক্ষিত লোকের মধ্যেই আবদ্ধ হয়। উহা সর্ব্বসাধারণের চিত্তকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। এই জন্য আর একটা রাষ্ট্রীয় সভার বা প্রতিষ্ঠানের জন্য দেশের শিক্ষিত সাধারণ একরূপ উন্মুখ হইয়াছিলেন, এ কথা বলা যায়।

ভারত-সভার জন্ম এই দীর্ঘকাল পরেও যেন চক্ষুর উপরে ভাসিতেছে। সম্প্রতি যেখানে Albert Instituteএর প্রকাণ্ড বাড়ী গড়িয়া উঠিয়াছে, ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে এইখানে Albert Hall ছিল। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে তখনকার Prince of Wales এ দেশে আসেন। তাঁহার স্মৃতি-রক্ষার জন্য কেশবচন্দ্র চাঁদা তুলিয়া এই Albert Hallএর প্রতিষ্ঠা করেন। দোতলায় একটা বড় হল ছিল। সেখানে সাধারণ-সভা-সমিতি হইত। বাড়ীর অন্যান্য স্থান Albert-schoolএরই দখলে ছিল। Albert school আর এখন নাই। Albert schoolএরই একটা ঘরে নীচের তলায় ভারত-সভার জন্ম হয়। এখনকার হিসাবে সভাটা যে বড় হইয়াছিল, তাহা নহে। কিন্তু সভাগৃহ এবং তাহার পাশের ঘরগুলি লোকে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। সভাপতি কে ছিলেন, মনে নাই। ভারতসভা প্রতিষ্ঠিত হউক, প্রস্তাব উপস্থিত হইলে ইণ্ডিয়ান লীগের পক্ষ হইতে ঘোরতর আপত্তি উঠে। স্বর্গীয় কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই আপত্তি তুলেন। সুরেন্দ্র বাবুর মতই প্রায় কালী বাবুরও অসাধারণ বাগ্‌বিভূতি ছিল। কোন কোন দিক দিয়া কালী বাবুর বাগ্মিতা সুরেন্দ্র বাবুর বাগ্মিতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠই ছিল। কিন্তু সুরেন্দ্র বাবু যে ভাবে শ্রোতৃবর্গকে মাতাইয়া তুলিতে পারিতেন, কালী বাবু ঠিক ততটা পারিতেন না। কালী বাবু খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। এই কারণেও তাঁহার বাগ্মিতা স্বদেশবাসীর অন্তরে তাঁহার গুণের উপযোগী প্রভাব বিস্তার

করিতে পারে নাই। এই দিনে বিশেষতঃ কালী বাবু লীগের পক্ষ সমর্থন করিতে দাঁড়াইয়া শিক্ষিত লোকমতের প্রতিকূলতাই করিয়াছিলেন। তথাপি তাঁহার মোহিনী বাক্‌শক্তির প্রতিরোধ এবং ঘন যুক্তিজাল ছেদন করা সহজ ছিল না। এমন আশঙ্কা হইয়াছিল যে, বুঝি বা ভারতসভার প্রতিষ্ঠা অসম্ভব হইয়া উঠে। সুরেন্দ্রনাথ প্রথমে এই সভায় উপস্থিত ছিলেন না। সে দিন তাঁহার প্রথম পুত্র অত্যন্ত পীড়িত ছিল। জীবনের আশা একরূপ ছিল না। এই জন্য সুরেন্দ্রনাথ সভায় আসিতে পারেন নাই। কিন্তু কালী বাবুর প্রতিবাদে যখন সভার উদ্দেশ্য বিফল হইবার আশঙ্কা হইল, তখন তাঁহাকে আনিবার জন্য লোক ছুটিল। সুরেন্দ্রনাথ তখন তালতলায় পৈতৃক ভদ্রাসনে বাস করিতেন। সভার দূত যখন উপস্থিত হইল, তাহার অল্পক্ষণ পূর্ব্বেই বাড়ীতে ক্রন্দনের রোল উঠিয়াছে। সুরেন্দ্রনাথ শিশুর মৃতদেহের নিকটে ধূল্যবলুণ্ঠিত জীবনের প্রথম শোকের তীব্র আঘাতে ছটফট করিতেছেন। কিন্তু যখন কর্ত্তব্যের ডাক পৌঁছিল, তিনি না আসিলে ভারত-সভার প্রতিষ্ঠার আয়োজন পণ্ড হইয়া যাইবে, ইহা শুনিলেন, তখন অমনই গা ঝাড়িয়া মৃত শিশু এবং তাহার শোকাকুলা জননীকে ছাড়িয়া সভাস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পুত্রশোকাতুর জনকের এই দেশসেবা-নিষ্ঠা দেখিয়া সকলে আশ্চর্য্য হইয়া গেল। ইহার পরে ভারত-সভার প্রতিষ্ঠা আর আটকাইয়া রাখা সম্ভব হইল না। এই ঘটনায় দেশের শিক্ষিত লোক দেখিল যে, সুরেন্দ্রনাথের স্বদেশ এবং স্বজাতির সেবা তাঁহার পুত্র হইতে প্রিয়। সুরেন্দ্রনাথের পূর্ব্বে কোন বাঙ্গালী তাহার দেশকে এবং দেশের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতাকে এতটা ভালবাসে, ইহার প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। সুরেন্দ্রনাথের এই স্বদেশপ্রেমের উপরেই তাঁহার প্রায় অর্দ্ধশতাব্দীব্যাপী রাষ্ট্রনায়কত্বের প্রতিষ্ঠা হয়।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

কবির ভাব এসেছে

বেলারে বেঁধেছে সাঁঝের সোনালি গাঁটে।
বিদায়ের রোদ পড়েছে পুকুর পাটে॥

পূরবীর গন্ধ, ছড়ায়ে করবী,
গায় ওগো, গীত লোহিতবরণ;
ঘুমে-ভেজা কত কথা করে জাগরণ।

রোমের বিভব স্মরিয়া বকুল
ভূমে ঝরে পড়ে মলিন আকুল।

আর্য্যের গৌরব, সৌরভ স্মরণে,
লোটে বোয়োণীয়া অরুণ চরণে;
লোটে কোমল কাঁঠালী, শ্যামল শিমুল।

ভোরের ঘুমের স্বপন কার,
শিথিল খোঁপার হারাণ-হার,
যৌবনজড়ানো, বরাঙ্গ ঘেরিয়া,
নহে অতি অবনত, তেমন তেরিয়া,
কে আসে গো কে আসে,
যেন হাসে অধরাকাশে।

মু'খানি মানানো দু'খানি নয়ন,
নাশার বালিশে থুইয়া আলিস,
চেতনা লতায়ে করেছে শয়ন।

অমার নিশির শিশির-ঝারা,
পীত ঝেঁপে ছোটে হ'য়ে দিশেহারা,
উন্মাদ আনন্দ মসির ঐশ্বর্য্যে,
সে চুল চঞ্চল-কুঞ্চন-প্রাচুর্য্যে,
অধৈর্য্য করেছে সৌন্দর্য্যের জ্যোতি লতিকায়।

অলস-কলস দোলায়ে কাঁকালে।
প্রভাতী বিভাস ভাসিছে বিকালে॥

পা-টি মাটী ছোঁয় না,
গা-টি যেন নোয় না,
আথে ভরা বুকখানি,
তোলে না ত মুখখানি;—

ওলো, কথা কও, কথা কও;
গুটি দুই বাণী বেঁধে—
আহা, আদরের বাণী বেঁধে চাদরের খুঁটে—
কেঁদে চ'লে যাই।

কার তুমি কারাগার,
কা'রে কর অধিকার,
হারাতে চেতনা চায় কে তোর চরণে;—
জুড়ানো জিলাপী নেশা গোলাপী-মরণে।

শ্রীঅমৃতলাল বসু।

ছানা বাড়ী

৬

আমার অনিচ্ছাসত্ত্বেও লোকটা তখন আমাকে এক প্রকার জোর করিয়াই বাড়ীর ভিতরের অংশে লইয়া গেল এবং আলো ধরিয়া একে একে সমস্ত দেখাইতে লাগিল।

দেখিলাম, বৈঠকখানা ও তাহার পার্শ্বের সেই শয়ন-ঘর, এ দুইটি বেশ উত্তমরূপে সাজানো। আসবাবগুলা বেশ সৌখীন ও দামী। লোকটার সখ ও পয়সা দুই-ই আছে বোধ হয়। উঠানের দুই দিকে অন্য কয়েকটা ঘর ও এক পাশে স্নানের ঘর ও পাইখানা। উঠানের এক কোণে ভাঙ্গাচোরা দ্রব্যাদি ও আবর্জ্জনাপূর্ণ একটা ছোট ঘর। সেই ঘরের পর হইতে উঠানের অপর দিক পর্য্যন্ত প্রায় একতলা সমান উচ্চ একটা পাকা প্রাচীর সম্পূর্ণরূপে এ বাড়ীকে তাহার পশ্চাতের বাড়ী হইতে পৃথক্ করিয়া রাখিয়াছে। নন্দন সাহেবের ব্যবহৃত ঐ দুইটি ঘর এবং পাইখানা ও স্নানের ঘর ব্যতীত বাড়ীর অন্য সব অংশই অত্যন্ত অযত্ন-রক্ষিত ও ধূলিময় দেখিলাম। অন্যান্য ঘরে কোন আসবাবও নাই। উঠানের পার্শ্ববর্ত্তী ঘরগুলা এবং প্রাচীরটা বিশেষ লক্ষ্য করিয়াও পিছনের বাড়ীতে যাতায়াতের কোন পথ দেখিতে পাইলাম না। একতলা সমান উচ্চ প্রাচীর লঙ্ঘন করিয়া চোর-ডাকাত আসা সম্ভব বটে; কিন্তু সচরাচর সাধারণ লোকের ঐরূপ পথে যাতায়াত করা সমীচীন মনে হইল না। বিশেষতঃ পিছনের বাড়ীতে অপর লোক যখন বাস করিতেছে, তখন ওরূপে যাতায়াত এক প্রকার অসম্ভবই মনে হইল।

নন্দন সাহেবও ঐ ভাবেই আমাকে কথাটা বুঝাইবার জন্য একটু বেশী রকম প্রয়াস পাইতে লাগিলেন এবং আমি যাহা দেখিয়াছিলাম, তাহা সম্পূর্ণই ভ্রমাত্মক সাব্যস্ত করিতে বড়ই ব্যগ্র হইতেছিলেন বোধ হইল। বাড়ী পর্য্যবেক্ষণের পর পুনরায় বাহিরের ঘরে আসিয়া আমি প্রস্থানোদ্যত হইলে তিনি বলিলেন, "কেমন, মশায়! এইবারে নিজে সব দেখে বেশ বুঝলেন ত, আপনাদের ধারণাগুলা কত ভুল?"

আমি বলিলাম, "না, মশায়! জানালার পর্দ্দায় অপর লোকের ছায়াও যে এই কিছুক্ষণ আগে নিজেই দেখেছি কি না,—সেই জন্য সেটা ভুল ব'লে বিশ্বাস করতে পারি না।"

"অন্ততঃ পাড়ার যে সব লোক আমার কথা আলোচনা করেন, তাঁদের ত আপনি যা দেখলেন, তা বল্‌তে পারেন?"

"মাফ করবেন, নন্দন মশায়! আমি এ পর্য্যন্ত কখনও পাড়ার লোকের সঙ্গে আপনার সম্বন্ধে কোন আলোচনাই করিনি। আপনার সঙ্গেও আমার আলাপ এত সামান্য যে, আপনার বিষয়ে কা'কেও কোন কথা বলা উচিত মনে করি না। বাড়ীটার ব্যবস্থা যে রকমই হোক, আজ যে আপনার এই ঘরে অপর লোক এসেছিল, তা'তে কোন সন্দেহ নাই। অথচ আপনি সে কথাটা মিথ্যা প্রমাণ করবার জন্য কেন এত উৎসুক, তা বুঝতে পাচ্ছি না এবং বুঝতে আমি ইচ্ছাও করি না। এখন তবে আমি বিদায় হই, আপনি বিশ্রাম করুন।"

আমি যাইতে উদ্যত হইলে তিনি বলিলেন, "আপনি দেখছি আমাকে কিছু সন্দিগ্ধভাবে দেখছেন। কিন্তু আপনাকে সত্যই বলছি যে, আমি নিতান্ত নিরীহ প্রকৃতির লোক; কারও কোন সংস্রবে থাকতে চাই না। নিজের রুগ্নদেহ নিয়ে জীবনের বাকি ক'টা দিন শান্তিতে কাটাইবার জন্যই এখানে একাকী বাস করছি। তবু আমার শত্রুরা আমাকে কিছুতেই শান্তি দিতে চায় না। তাদেরই জালায় নাম ভাঁড়িয়ে এই অজ্ঞাতবাস করছি। অথচ কেন যে তারা আমার অমঙ্গলের চেষ্টা করে, তা আমি কিছুই জানি না। আমি যা'দের বন্ধু ব'লে জান্‌তাম, তারাও আমার শত্রু। আমি তাদেরও ছেড়েছি,—আর আমার পুরানো নামও ছেড়েছি। কুঞ্জবিহারী

নন্দন! বাঃ! কি মজার নামটা!—হাঃ হাঃ!—যাক, আমার দুঃখ-কাহিনী ব'লে আর আপনাকে বিরক্ত করতে চাই না। কিন্তু আমাকে বিশ্বাস করুন আর না করুন, আপনাকে বেশ বল্‌তে পারি যে, আমি কারও কোন অনিষ্ট-চেষ্টায় এখানে আসিনি। বরং আমারই অনিষ্ট-চেষ্টায় আমার শত্রুরা সব ঘুরে বেড়াচ্ছে।"

"তা হ'লে পুলিসে খবর দেন না কেন?"

"পুলিস? সর্ব্বনাশ! ভদ্রলোকে যেন কখনও ও পাল্লায় না পড়ে।"

"জানি না, আপনি কেন ও কথা বলছেন। আপনার কথা আপনারই থাক; আমার জানবার কোন আবশ্যক নাই। এখন আমি তবে চল্লাম, মশায়!" বলিয়া আমি আর অপেক্ষা না করিয়া, তথা হইতে প্রস্থান করিয়া বাসায় প্রত্যাগমন করিলাম।

৭

এই ঘটনার কিছুদিন পরে, এক দিন সকালে আমাদের পাড়ার সকলে শুনিয়া স্তম্ভিত হইল যে, বৃদ্ধ নন্দন সাহেবকে পূর্ব্বরাত্রিতে কে হত্যা করিয়া গিয়াছে।

হোটেলের সেই খানসামাটা, (পরে জানিলাম, তাহার নাম রহিম), প্রত্যহ সকালে যেমন সাহেবের প্রাতরাশের আয়োজন করিতে ঐ বাড়ীতে আসে, সে দিনও সেইরূপ আসিয়াছিল। বহির্দ্বার ভিতর হইতে অর্গলবদ্ধ থাকে বলিয়া, সে প্রত্যহ যেমন বাহিরের কড়া নাড়িয়া সাহেবকে তাহার আগমনবার্ত্তা জানায়, সে দিনও সে তাহাই করিয়াছিল। কিন্তু বহুক্ষণ কড়া নাড়িয়াও যখন সাহেবকে জাগাইতে পারে নাই, তখন কপাটে সবলে আঘাত করিতে ও চীৎকার করিয়া সাহেবকে ডাকাডাকি করিতে থাকে। ঐ গোলমালে পাশের দুই একটা বাড়ীর ভৃত্যরা কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া, তাহার সহিত একযোগে বহুক্ষণ ধরিয়া নানাপ্রকারে সাহেবের নিদ্রাভঙ্গের চেষ্টা করিতে থাকে। ইত্যবসরে, ঐ সব গোলযোগ শুনিয়া পাড়ার অনেক লোকই তথায় উপস্থিত হইল, এবং ক্রমে আমিও সেখানে হাজির হইলাম।

পসার না থাকিলেও আমি পুলিস-কোর্টের এক জন উকীল, তাহা পাড়ার প্রায় সকলেই জানিয়াছিল। এরূপ একটা সংশয়জনক ব্যাপারে বোধ হয় আমা দ্বারা বেশী সাহায্য হইবে ভাবিয়া, সমবেত প্রতিবেশীরা সকলে আমাকেই "মুরুব্বী" ঠিক করিল, এবং উপস্থিত ক্ষেত্রে কার্য্য পরিচালনের ভার আমার উপরেই ন্যস্ত করিল। আমি তখন ঘাঁটীর পাহারাওয়ালাকে ডাকিবার জন্য লোক পাঠাইলাম। কিন্তু বলা বোধ হয় বাহুল্য যে, ওরূপ গোলযোগের সময় সর্ব্বত্রই যেমন ঐ জাতীয় জীবের সন্ধান পাওয়া দুর্ঘট হয়, এ ক্ষেত্রেও তাহার অন্যথা হইল না। কাযেই উপায়ান্তর না দেখিয়া আমি রহিম খানসামাকে সঙ্গে লইয়া, নিকটস্থ থানায় সংবাদ দিতে গেলাম।

পুলিসের প্রচলিত কার্য্যপদ্ধতি অনুসারে তাহাদের সাহায্য পাইতে কত বিলম্ব হইত, তাহা বলিতে পারি না; কিন্তু আমার ব্যবসায়ের সৌকর্য্যার্থে আমি এই থানার পদস্থ কর্ম্মচারীদের সঙ্গে পূর্ব্বেই কিঞ্চিৎ আলাপ-পরিচয় করিয়া রাখিয়াছিলাম বলিয়া শীঘ্রই আমার কার্য্যোদ্ধার হইল। দারোগা বাবু দুই জন কনষ্টেবল সঙ্গে লইয়া এবং আমার পরামর্শে পথে এক জন ছুতারকে সংগ্রহ করিয়া, আমাদের সহিত যথাসম্ভব ক্ষিপ্রগতিতে ১০ নং বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। পরে সেই ছুতারের সাহায্যে বহির্দ্বারের ভিতরের অর্গল অনেক কষ্টে খোলা হইলে, পুলিসের লোকের সঙ্গে আমরা অনেকেই বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলাম। সেখানেও আবার বাধা পড়িল। বসিবার ঘরের কপাটটাও ভিতর হইতে অর্গলবদ্ধ থাকায়, তাহাও ঐ ছুতারের দ্বারা খোলা হইল। কিন্তু শয়ন ঘরের দ্বারে পৌছিয়া সেরূপ কোন বাধা পড়িল না; তাহা ঠেলিবামাত্র খুলিয়া গেল এবং তখন সেই ঘরের মধ্যে একটা বীভৎস দৃশ্য আমাদের নয়নগোচর হইল।

দেখিলাম, ঘরের এক স্থানে একটা তেপায়া টেবল ও একখানা চেয়ার উল্টিয়া পড়িয়া আছে এবং তাহার নিকটেই নন্দন সাহেবের দেহটাও মেঝের উপরে উপুড় হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। ঘরের মধ্যে অস্পষ্ট আলোকে ও লোকের ভীড়ে, ব্যাপারটা প্রথম দৃষ্টিতে ভাল করিয়া বুঝা গেল না। বোধ হইল, হয় ত সাহেব রাত্রিতে বেশী মাতাল হইয়া পড়িয়া গিয়াছিল এবং পরে উত্থানশক্তি রহিত হওয়ায় ঐখানেই পড়িয়া

ঘুমাইতেছে। কিন্তু ক্রমে ঘরের সব জানালা-কপাট খোলা হইলে দেখা গেল যে, সাহেব যেখানে পড়িয়া আছে, তাহার নিকটেই ঠিক তাহার বক্ষের সংলগ্ন সতরঞ্চের উপর অনেকটা স্থান রক্তে প্লাবিত রহিয়াছে। তাহার পর দারোগা বাবু তাহার অঙ্গ স্পর্শ করিয়া যখন বলিলেন যে, তাহা হিমবৎ শীতল, তখন সাহেব যে মৃত, তাহাতে আর কাহারও সংশয় রহিল না।

তখন বেলা প্রায় নয়টা। দারোগা মহাশয় আর বিলম্ব না করিয়া, ব্যাপারটার রীতিমত পুলিস-পদ্ধতি অনুসারে তদন্ত আরম্ভ করিয়া দিলেন। মৃত-ব্যক্তির দেহ তদন্তের সময় তাহাকে চীৎ করিয়া ফেলায় দেখা গেল যে, ঠিক তাহার হৃৎপিণ্ডের উপর একটা তীক্ষ্ণধার অস্ত্রের গভীর ক্ষত রহিয়াছে ও তাহা হইতে প্রভূত রক্তস্রাব হইয়া সতরঞ্চের ঐ অংশ প্লাবিত করিয়াছে। সেই এক আঘাতেই যে লোকটার মৃত্যু হইয়াছে, তাহা দেখিলেই বেশ বুঝা যায়। কিন্তু যে অস্ত্র দ্বারা এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইয়াছিল, তাহা অনেক অনুসন্ধানেও খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। সাহেবের পরিহিত বস্ত্রাদি এবং ঐ দুইটা ঘরের দেরাজ-টেবল ও তন্মধ্যস্থ জিনিষপত্র বিশেষরূপে অনুসন্ধান করিয়াও একটি সোনার ঘড়ি ও চেন, একটি সোনার আংটী এবং নগদ প্রায় এক শত টাকা ছাড়া অপর কোন মূল্যবান্ সামগ্রী বা কোন কাগজপত্র কিছুই পাওয়া গেল না।

তৎপরে বাড়ীটার অন্যান্য অংশ পরিদর্শন করিয়া এবং উপস্থিত লোকদিগের মধ্যে কয়েক জনের এজাহার লইয়া, দারোগা মহাশয় তাঁহার তদন্ত শেষ করিলেন। মৃতব্যক্তি এ পাড়ার কাহারও পরিচিত নহে এবং কেহ তাহার কোন আত্মীয় বা বন্ধুবান্ধবকে চিনে না শুনিয়া, তাহার দেহ পরে 'সনাক্ত' করাইবার অভিপ্রায়ে, এক জন ফটোগ্রাফার আনাইয়া, শবদেহের কয়েকটি ছায়া-চিত্রও লওয়াইলেন। পরে, মেডিক্যাল কলেজের মৃতাবাসে (মর্গে) লাস চালান দিয়া, তিনি তখনকার মত তাঁহার কর্ত্তব্য কর্ম্মের সমাধা করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

৮

আমি যখন বাসায় ফিরিলাম, তখন বেলা প্রায় ১২টা। স্নানাহার সারিয়া পিসীমার কৌতূহল নিবারণ করিতে আরও অনেক বেলা হইয়া গেল। সে দিন সরস্বতী-পূজার ছুটী ছিল বলিয়া কোন অসুবিধা হইল না; নহিলে কোর্টে যাওয়ারূপ আমার নিত্যকর্ম্মে নিশ্চয়ই বাধা পড়িত।

পরদিন সকালে খবরের কাগজে ঐ হত্যাকাণ্ডের একটা বিস্তৃত বিবরণ বাহির হইয়াছে দেখিলাম। মাঝে মাঝে কিছু কল্পিত ও রঞ্জিত হইলেও, মোটের উপর ঘটনাটা প্রায় যথাযথই বিবৃত হইয়াছিল। আমার ও রহিমের নিকট পুলিস যাহা যাহা জানিয়াছিল, তাহাও ইহাতে স্থান পাইয়াছিল। এই সংবাদপত্র হইতে জানিলাম যে, হত ব্যক্তির চেহারার একটি লিখিত বিবরণ পুলিস প্রত্যেক থানায় পাঠাইয়াছে। আরও জানিলাম যে, লাস মেডিক্যাল কলেজে আনীত হইবার পরে তাহার 'পোষ্ট-মর্টেম'-রূপ অবশ্যম্ভাবী সদ্গতি ও তৎপরে কাশী মিত্রের ঘাটে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হইয়া গিয়াছে। পোষ্ট-মর্টেমের ফলে, ডাক্তারের রিপোর্ট হইতে জানা যায় যে, তাঁহার মতে হৃৎপিণ্ডে অস্ত্রাঘাতই লোকটার মৃত্যুর কারণ; অস্ত্রটা খুব তীক্ষ্ণ-ধার-বিশিষ্ট ও সূক্ষ্মাগ্র, কিন্তু বেশী দীর্ঘ নহে এবং প্রস্থেও কম; এক দিকে মোটা ও ফলকটা বক্র। ক্ষত পরীক্ষায় তাঁহার এরূপ অনুমান হয় যে, অস্ত্রটা একটা ছোট ও অপ্রশস্ত 'ভোজালী' হওয়াই সম্ভব। ডাক্তারের বিবেচনায় হতব্যক্তির মৃত্যু, আন্দাজ রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় হইয়াছিল।

ইহার কয়েক দিন পরে প্রচলিত নিয়মানুসারে "করোনার কোর্টে" এই হত্যাব্যাপারের তদন্ত ("ইন্‌কোএষ্ট") হইল। পুলিস-তদন্তের সময় যে সব লোকের এজাহার লওয়া হইয়াছিল, এখানেও তাহাদের সকলকেই পুনরায় সাক্ষ্য দিতে হইল। আমিও বাদ গেলাম না। তাহা ছাড়া পোষ্ট-মর্টেমের ডাক্তার, থাঁটির পাহারাওয়ালা, ঐ হানা বাড়ীর বাড়ীওয়ালা ইত্যাদি আরও কয়েক জনের সাক্ষ্য লওয়া হইল। কিন্তু ফলে পুলিস-তদন্তের অপেক্ষা অধিক কিছু লাভ হইল না। কে

যে হত্যাকারী এবং হত ব্যক্তির আসল পরিচয়ই বা কি, তাহা কিছুই জানা গেল না। শেষে করোনার ও জুরির মতে সাব্যস্ত হইল যে, "কুঞ্জবিহারী নন্দন নামে পরিচিত, ১০ নং রামপাল লেন নিবাসী ব্যক্তিকে ছোট 'ভোজালীর' (বা 'কুকরী') স্থায় কোন বক্র ফলকযুক্ত তীক্ষ্ণধার ছোরার দ্বারা কোন অজ্ঞাত লোক গত—জানুয়ারী তারিখে (সরস্বতীপূজার পূর্ব্ব-রাত্রিতে) আন্দাজ ১২টার সময় হত্যা করিয়াছে। হত ব্যক্তির আসল নাম ও পরিচয় অজ্ঞাত।"

এই রহস্তময় ব্যাপারের এইরূপ সন্তোষজনক মীমাংসা হওয়ায় দেশের শান্তিরক্ষার কর্ত্তারা তাঁহাদের বিধিবদ্ধ নিয়মানুযায়ী সকল কর্ত্তব্য-কর্ম্ম রীতিমত অনুষ্ঠিত হইয়াছে দেখিয়া বোধ হয় বেশ পরিতৃপ্ত হইলেন।—নিত্য নূতন খবরের সরবরাহকার সংবাদপত্রগুলাও আর এ বিষয়ে কোন উচ্চবাচ্য করিল না এবং নব নব উত্তেজনা-প্রয়াসী সহরবাসীরাও এ সম্বন্ধে আর মাথা ঘামাইবার কোন কারণ দেখিল না।

আমার মনে কিন্তু শান্তির বড় ব্যাঘাত জন্মিতে লাগিল। তথাকথিত নন্দন সাহেবের সহিত আমার কোনও সংস্রব না থাকিলেও, এক রকম আমার চোখের সম্মুখে এমন একটা হত্যাকাণ্ড ঘটিয়া গেল, অথচ হত ব্যক্তির বা তাহার হত্যাকারীর কোন নিরাকরণ না হইয়াই ঘটনাটার উপর যবনিকা-পতন হইয়া গেল,—ইহাতে আমার স্বাভাবিক কৌতূহল-প্রবণ মনে মোটেই তৃপ্তি বোধ হইল না। অবসর হইলেই আমি ঐ বিষয় লইয়া নিজের মনে নানারূপ আলোচনা করিতাম; কিন্তু রহস্য-উদ্ঘাটনের একটি ক্ষীণ সূত্রও খুঁজিয়া না পাওয়ায় মনের অশান্তিটার কিছুই উপশম হইতেছিল না।

৯

আমার বিবেচনায় এই প্রহেলিকাময় ঘটনা সম্বন্ধে মীমাংসার বিষয় মোট তিনটি। ১ম, কুঞ্জবিহারী নন্দন নামীয় ব্যক্তির বাস্তবিক পরিচয় কি? ২য়, হত্যাকারী কে? ৩য়, হত্যার কারণ বা উদ্দেশ্য কি?

প্রথম প্রশ্নের উত্তর পাইবার আপাততঃ কোন সম্ভাবনাই দেখা গেল না। লোকটা এক দিন নিজ-মুখে আমাকে বলিয়াছিল যে, কুঞ্জবিহারী নন্দন নামটা তাহার আসল নাম নহে; কিন্তু তাহার বাস্তবিক নাম কি বা কোথায় তাহার নিবাস, তাহা সে আমাকে বা অন্য কাহাকেও জানায় নাই। করোনার কোর্টে এ সম্বন্ধে যে সকল সাক্ষ্য লওয়া হইয়াছিল, তাহা দ্বারা কিছুই প্রকাশ পায় নাই। রহিম প্রথম হইতেই লোকটার আহারাদি সরবরাহ ও গৃহকর্ম্ম করিত, কিন্তু এ পর্য্যন্ত সে ঐ নন্দন সাহেব ছাড়া তাহার অন্য কোন নাম সাহেবের নিকট বা অপর কাহারও নিকট শুনে নাই। এমন কি, অপর কোন লোককেই সে ও-বাড়ীতে কখনও দেখে নাই। তাহার হোটেলের মনিবও সাক্ষ্য দিয়াছিল যে, সাহেব প্রত্যহ রাত্রিতে ঐ হোটেলে আহার ও মদ্যপান করিত এবং কখন কখন দিনেও আহার করিতে আসিত। কিন্তু ঐ নাম ছাড়া তাহার অপর কোন নাম সে কখনও শুনে নাই বা কখনও কোন দ্বিতীয় ব্যক্তির সঙ্গে তাহাকে ঐ হোটেলে আসিতে বা একত্র আহারাদি করিতে দেখে নাই। প্রতি মাসের শেষে তাহার নিকট যাহা প্রাপ্য হইত, তাহা সে হিসাব দেখিয়া চুকাইয়া দিত।

পুলিস-তদন্তের ফলেও লোকটার কোন চিঠিপত্র বা তাহার পরিচয়-জ্ঞাপক কোন কাগজাদি কিছুই পাওয়া যায় নাই। পরিধানের বস্ত্রাদি বা গৃহের আসবাব সরঞ্জাম হইতেও তাহার নাম-ধাম জানিবার কোন নিদর্শন বা সাঙ্কেতিক চিহ্ন পাওয়া যায় নাই। করোনার-কোর্টে তাহার বাড়ীওয়ালা যাহা বলিয়াছেন, তাহাতেও নূতন তথ্য কিছু জানা যায় নাই। তিনিও ঐ কুঞ্জবিহারী নন্দন ছাড়া তাহার অন্য কোন নাম কখনও শুনেন নাই। বাড়ীর ভাড়া সে যথাসময়ে নিজে আসিয়া চুকাইয়া দিত। কখনও তাহার কাছে তাগাদা করিতে যাইবারও প্রয়োজন হয় নাই।

কাযেই লোকটার যথার্থ নাম বা পরিচয় জানিবার কোনই উপায় এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই।

দ্বিতীয় প্রশ্নের মীমাংসা ত একেবারেই অসাধ্য বোধ হইল। হত্যাকারী নিজের সামান্যমাত্র চিহ্নও রাখিয়া যায় নাই। যে অস্ত্র দ্বারা হত্যা সম্পন্ন হইয়াছিল, তাহা একটা অপ্রশস্ত ও ছোট ভোজালী বলিয়া অনুমিত হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহার অস্তিত্ব কোথাও খুঁজিয়া

পাওয়া যায় নাই। হত্যাকারী ও তাহার অস্ত্র—দুই-ই যেন কোন ভৌতিক প্রক্রিয়াবলে আকাশে বিলীন হইয়া গিয়া বাড়ীটার 'হানা' নামের সার্থকতা সপ্রমাণ করিয়া দিয়াছিল। হত্যাকাণ্ডের পূর্ব্বে আমি স্বয়ং বাড়ীটার অভ্যন্তর যত দূর দেখিয়াছিলাম, তাহাতে সদর ভিন্ন অপর কোন দিক হইতে তাহাতে প্রবেশের কোন পথ দেখি নাই। পরে পুলিসের তদন্তেও একই ফল হইয়াছিল। একমাত্র রহিম ছাড়া বাহিরের কোন লোক যে ও-বাড়ীতে যাতায়াত করিত, তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। জানালার পর্দ্দায় সেই ছায়াদর্শন ব্যতীত ও-বাড়ীতে কোন সময়ে অপর কোন লোকের অস্তিত্বের কোন নিদর্শন কেহ কখনও পায় নাই। তাহা ছাড়া রহিম করোনার-কোর্টে সাক্ষ্য দিবার সময় বলিয়াছিল যে, পূর্ব্বদিন বৈকালে সে যখন সাহেবকে চা খাওয়াইয়া ও গৃহকর্ম্ম সারিয়া আসিয়াছিল, তখন সাহেব ছাড়া অন্য কোন লোক সে বাড়ীতে ছিল না। থাঁটীর যে পাহারা-ওয়ালা রাত্রির প্রথমাংশে ঐ অঞ্চলে পাহারায় নিযুক্ত ছিল, তাহার সাক্ষ্যে জানা যায় যে, সাহেব অন্য দিনের ন্যায় সে দিনেও রাত্রি প্রায় দশটার সময় নিজের চাবি দ্বারা বহির্দ্বার খুলিয়া একাকী বাড়ীতে প্রবেশ করিয়াছিল; তাহার সঙ্গে আর কেহ ছিল না এবং সেই পাহারাওয়ালা ও তাহার পরবর্ত্তী অপর পাহারাওয়ালাও বলিয়াছে যে, রাত্রির মধ্যে তাহারা অন্য কাহাকেও ঐ বাড়ীতে সদরের দিক দিয়া প্রবেশ করিতে দেখে নাই। তাহা হইলে হত্যাকারী কি উপায়ে ও-বাড়ীতে আসিল এবং কিরূপেই বা প্রস্থান করিল ?

তৃতীয় প্রশ্ন হত্যার উদ্দেশ্য কি ?—হত ব্যক্তির ও হত্যাকারীর পরিচয় যখন পাওয়া যাইতেছে না, তখন হত্যার উদ্দেশ্য স্থির করা আরও দুঃসাধ্য। মৃত ব্যক্তি যত দিন এ পাড়ায় বাস করিয়াছিল, তত দিন সকলেই তাহাকে সম্পূর্ণ নিরুপদ্রব ও নিরীহ গোছেরই দেখিয়াছিল। তাহার নিজের মুখেই কেবল আমি একবার শুনিয়াছিলাম যে, তাহার শত্রু আছে এবং সে শত্রুভয়ে ভীত। কিন্তু তাহা ছাড়া কেহ তাহার কোন শত্রু বা মিত্র কাহারও সহিত তাহাকে বাক্যালাপ পর্য্যন্ত করিতে দেখে নাই। লোকটার পঞ্চাশের উপর বয়স হইয়াছিল; তাহাতে আবার বহুমূত্র রোগেও না কি ভুগিতেছিল; শরীরও নিতান্ত ক্ষীণ ছিল, তাহার উপর নিত্য সুরাপান করিত। এ অবস্থায় সে যে আর বেশী দিন বাঁচিত, তাহা বোধ হয় না। তবে এরূপ নির্ব্বিরোধ রোগক্লিষ্ট বৃদ্ধকে হত্যা করিবার অভিপ্রায় কি হইতে পারে ?—চুরি ? কিন্তু লোকটার আর্থিক স্বচ্ছলতা থাকিলেও সে যে নিজের কাছে বেশী টাকা বা মূল্যবান্ সামগ্রী রাখিত না, তাহা আমাকে নিজমুখে বলিয়াও ছিল এবং পুলিস-তদন্তের ফলে তাহা সপ্রমাণও হইয়াছিল। যাহা কিছু টাকা-কড়ি, ঘড়ি, চেন, আংটী ও বস্ত্রাদি ছিল, তাহা ত কিছুই চোরে লইয়া যায় নাই ?—তবে কি কারণে এই হত্যা সাধিত হইল ?

এই সকল আলোচনার ফলে আমার মনে রহস্যটা ক্রমেই যেন অধিকতর দুর্ভেদ্য হইয়া পড়িতে লাগিল। এ বিষয়ে আমার মাথা ঘামাইবার কোন আবশ্যকতাই ছিল না, তাহা জানিতাম; অথচ মনের উপর ঐ সব চিন্তাগুলার আক্রমণ রোধ করিতেও পারিতাম না। কাযেই মনের অশান্তিও দূর হইতেছিল না।

[ক্রমশঃ।

শ্রীসুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

অন্তর

কুসুম চয়নে মিছে যাস্ কেন
অন্তরে ফুল-বন;
সেথা বসি তোর আপন স্বামীর
কর রূপ দরশন।

শ্রীকমলকৃষ্ণ মজুমদার

চিত্তরঞ্জন-কথা

চিত্তরঞ্জনের পুষ্পস্তবকাবৃত শবদেহের অভূতপূর্ব্ব শোভা-যাত্রা সন্দর্শন করিলাম। তাঁহার শ্রাদ্ধবাসরে অযুত লোকের জনতার মধ্যে আপনাকে হারাইলাম। তাঁহার শোক-সভায় সহস্র লোকের সমক্ষে বক্তৃতা করিলাম। একাধিক সাময়িক পত্রিকায় তাঁহার স্মৃতিকথা লিখিলাম। অথচ চিত্তরঞ্জন যে ইহসংসারে নাই, এখনও এ অনুভূতি খুব গভীর হয় নাই।

বিগত ৫ বৎসরকাল চিত্তরঞ্জনকে না দেখিয়া তাঁহার কথা সর্ব্বদাই ভাবিয়াছি। এই ৫ বৎসরের মধ্যে বোধ হয়, পাঁচ সাত বার তাঁহার সঙ্গে চোখোচোখি হইয়াছে। চারিবারমাত্র তাঁহার বাড়ীতে যাইয়া তাঁহাকে দেখিয়াছি ও তাঁহার সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিয়াছি। অথচ এক সময় ছিল, যখন চিত্তরঞ্জন কলিকাতায় থাকিলে প্রতিদিন না হউক, প্রতি সপ্তাহে দুই তিন বার করিয়া তাঁহার সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হইত। গত ৫ বৎসরকাল আমাদের উভয়ের মুখ-দেখাদেখি ছিল না বলিলেও হয়। আর এই জন্যই চিত্তরঞ্জনকে চোখে দেখিতেছি না বলিয়া তিনি যে বাঁচিয়া নাই, এ কথা ভাবিতে পারি না।

ধর্ম্ম ও রাষ্ট্র মানুষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভাবনা। ধর্ম্মের সঙ্গে তাহার ইহ-পারলৌকিক কল্যাণ জড়িত; রাষ্ট্র-ব্যবস্থার উপর মানুষের ঐহিক অভ্যুদয় প্রতিষ্ঠিত। এই জন্য মানুষ ধর্ম্ম ও রাষ্ট্র লইয়া যত মত্ত হয়, জীবনের আর কোন ব্যাপার লইয়া তত মাতিয়া উঠে না। আর এই জন্যই ধর্ম্ম এবং রাষ্ট্র লইয়াই মানুষের সঙ্গে মানুষের সর্ব্বাপেক্ষা গুরু ও তীব্র বিরোধ বাধিয়া উঠে। ধর্ম্মমতের বিরোধ আধুনিক মানুষকে ততটা ক্ষেপাইয়া তুলে না। ধর্ম্ম সম্বন্ধে আমাদিগকে আজিকালি অনেকটা উদার এবং উদাসীন করিয়াছে। ধর্ম্মসম্বন্ধীয় মতবাদ একটা ব্যক্তিগত ব্যাপার। এক দিন ধর্ম্মমতের সঙ্গে সামাজিক সম্বন্ধের যে আত্যন্তিক ঘনিষ্ঠতা ছিল, এখন তাহা নাই। বিভিন্ন ধর্ম্মমতাবলম্বী লোক এক সমাজে পরস্পরের সঙ্গে কেবল শান্তিতে নহে, পরন্তু অকৃত্রিম সৌহার্দ্দ্য রক্ষা করিয়া বাস করিতেছে। এমন কি, কোথাও কোথাও এক পরিবারের মধ্যেও নানা ধর্ম্মমতাবলম্বী লোক স্বচ্ছন্দে একত্র বাস করিয়া থাকে। স্বামী উদার হিন্দু, স্ত্রী উদার খৃষ্টীয়ান, পুত্র না-হিন্দু না-খৃষ্টীয়ান,—এই কলিকাতা সহরে অতি সম্ভ্রান্ত পরিবারে এমনও দৃষ্টান্ত দেখিয়াছি। আর এমন পতিপরায়ণা পত্নী, পত্নী-বৎসল অনুরাগী পতি এবং পিতৃ-মাতৃভক্ত পুত্রও সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। এরূপ দৃষ্টান্ত আধুনিক সমাজেই সম্ভব। ধর্ম্মমত লইয়া আমরা এখন আর পরস্পরের সঙ্গে বিবাদ করিতে চাহি না ও যাই না। কিন্তু রাষ্ট্রীয় মতবিরোধে এই উদারতা রক্ষা করা সম্ভব হয় না। ধর্ম্মের ফলাফল অপ্রত্যক্ষ। সে ফলাফল মোটের উপরে মানুষ একাকীই ভোগ করে। কিন্তু রাষ্ট্রীয় কর্ম্মের ফলাফল প্রত্যক্ষ। সমগ্র সমাজ তাহার ভাগী হয়। এই জন্য রাষ্ট্রীয় মতবাদ বা আদর্শে বিরোধ হইলে বর্ত্তমানকালে মানুষের সঙ্গে মানুষের সখ্য ও সাহচর্য্যের যেরূপ গুরু ব্যাঘাত উৎপন্ন হয়, ধর্ম্ম-মতের বিরোধে সেরূপ হয় না। বিগত ৫ বৎসরকাল চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে আমার এই বিরোধই জাগিয়াছিল। সুতরাং তিনিও আমার কাছে আসিতেন না, আমিও তাঁহার কাছে ঘেঁসিতাম না। এই ব্যবধানে কিন্তু আমা-দের শরীরটাকেই পৃথক্ রাখিয়াছিল, চিত্তকে পরস্পর হইতে একেবারে দূরে ঠেলিয়া ফেলিতে পারে নাই।

৪ বৎসর পূর্ব্বে ১৯২১ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে আমি অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিলাম। ৩ মাস কাল ডাক্তার বালিস হইতে মাথা তুলিতে দেন নাই। এই জীবন-মরণের সন্ধিক্ষণে কল্যাণীয়া বাসন্তী আমাকে দেখিতে আইসেন। চিত্তরঞ্জন তখন কারারুদ্ধ; কিন্তু সর্ব্বদাই বাসন্তীর নিকট আমার খবর লইতেন। ইহার পূর্ব্ব হইতেই আমাদের পরস্পরের মধ্যে দেখা-শুনা বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। বাসন্তী যে দিন আমাকে দেখিতে আইসেন, তখন আমার কথা কহিবার শক্তি ও অধিকার ছিল না। শ্লেটে লিখিয়া মনোভাব ব্যক্ত করিতাম। মনে আছে, সে দিন বাসন্তীকে এই কথা লিখিয়াছিলাম,

"যে রাজ্যে তোমাদের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ, যেখানে আমি তোমাদিগকে চিনি ও তোমরা আমাকে চেন, সে রাজ্য ধর্ম্মের মতবাদ বা রাষ্ট্রকর্ম্মের কোলাহলের অনেক উপরে। সাময়িক মতদ্বন্দ্ব অথবা বাহিরের ঝগড়া-বিবাদ আমাদের সে সম্বন্ধকে স্পর্শ করিতে পারে না, নষ্ট করা ত দূরের কথা। এই কথাটাই এই রোগশয্যায় পড়িয়া অনেকবার ভাবিয়াছি। ঠাকুর এ শয্যা হইতে আবার সুস্থ করিয়া তুলিবেন কি না, জানি না। কিন্তু তোমাকে দেখিয়া এই কথাটাই বলিতে ইচ্ছা হইল। চিত্তের সঙ্গে দেখা হইলে তাহাকেও এই কথাটা বলিও।"

রোগশয্যা হইতে উঠিয়াও বহুদিন ঘরের বাহির হইতে পারি নাই। প্রায় ৬ মাস পরে প্রথমে যখন বাড়ীর বাহির হইলাম, তাহার ৫।৭ দিন মধ্যেই চিত্তরঞ্জনের কনিষ্ঠা কন্যার বিবাহ হয়। বিবাহ-সভার জনতার মধ্যে যাইতে সাহস হয় নাই। কিন্তু পরদিবস বর-কন্যাকে আশীর্ব্বাদ করিতে যাই। এই দিনই বহু দিন পরে চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে আমার চাক্ষুষ দেখা হয়। দেখা হয় মাত্র, কিন্তু বিশেষ কোন কথা হয় নাই ; সে সুযোগ এবং অবসর ঘটে নাই।

ইহার ৫।৬ মাস পরে আর এক দিন চিত্তরঞ্জনকে ময়দানে দেখিতে পাই। চিত্তরঞ্জন মোটর করিয়া ময়দানে যাইয়া গাড়ী হইতে নামেন। আমিও সেই সময় গাড়ী করিয়া কলিকাতা যাইতেছিলাম। তাঁহাকে দেখিয়া কথা না কহিয়া থাকিতে পারিলাম না। কাছে ডাকিয়া কুশলসংবাদ জিজ্ঞাসা করিলাম। কিন্তু তাঁহার চিন্তা-ভারগ্রস্ত মুখ দেখিয়া প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। চিত্তরঞ্জন তাঁহার পথে চলিয়া গেলেন ; আমিও আমার পথে চলিয়া গেলাম। তাঁহার মনের কথা জানি না ; কিন্তু এই পথের দেখাতে আমার প্রাণকে পূর্ব্বতন স্নেহের স্মৃতিতে তোলপাড় করিয়া তুলিল। সারাপথ কেবলই ভাবিতে লাগিলাম, চিত্তরঞ্জন বর্ত্তমান রাষ্ট্রীয় লোকনায়কত্বের হট্টকোলাহলের মধ্যে কতটা একাকী হইয়া পড়িয়াছেন। ইচ্ছা হইল, তখনই একবার যাইয়া তাঁহাকে দেখিয়া আসি। রাত্রিকালে বাড়ী ফিরিয়া ছেলেমেয়েদিগকে বলিলাম, একবার এখনই চিত্তের বাড়ী যাই। কিন্তু কি জানি, লোকে কিছু বলে, তাঁহার সাঙ্গোপাঙ্গেরা কি ভাবে আমাকে দেখিবে, এই ভাবিয়া যাওয়া হইল না। কিন্তু সে দিনের সেই অভিজ্ঞতাতে বুঝিয়াছিলাম, তুচ্ছ রাষ্ট্রীয় মতবাদের বিরোধের কত উপরে আমাদের পরস্পরের সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত ছিল।

তাহার পর শেষ দেখা, গত পৌষমাসে। ইতিমধ্যে আরও দুই একবার প্রকাশ্য সভায় এবং একবার ব্যবস্থাপক সভার সভ্যনির্ব্বাচনসময়ে তাঁহার বাড়ীতে দেখা হইয়াছিল। সে সকল উল্লেখযোগ্য নহে। বেলগাঁও হইতে যখন চিত্তরঞ্জন ফিরিয়া আসিয়া অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়েন, তখন দুই দিন আমি তাঁহাকে দেখিতে যাই। আমি তাঁহার শয্যাপার্শ্বে যাই, প্রথম দিন তাঁহার এক জন আসন্ন পরিচারক একেবারেই তাহা ইচ্ছা করেন নাই। এঁরা ত জানেন না, চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে আমার কি সম্বন্ধ। আমি ত আর বাহিরের লোকের মত 'এত্তেলা' দিয়া তাঁহার অন্তঃপুরে যাই নাই। আগে যেমন একেবারে উপরে উঠিয়া বাসন্তীর খোঁজ করিতাম, এ দিনও তাহাই করিলাম। বাসন্তীকে দেখিয়াই জিজ্ঞাসা করিলাম, "চিত্তের না কি বড় অসুখ ? আজই শুনিতে পাইয়াছি, কেমন আছে ?" বাসন্তী কহিলেন, "ঐ ঘরে আছেন, যান না।" তখন সেই আসন্ন পরিচারকটি একটু আপত্তি করিলেন,—কহিলেন, 'disturb করা কি ভাল হবে ?' বা এইরূপ একটা কিছু। বাসন্তী বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "তুমি কি বল ? বিপিন বাবু দেখতে যাবেন না ?" এ দিন তাঁহার রোগের কথাই হইল। অন্য কথা কিই বা হইবে ? বরিশাল হইতে ফিরিয়া আসিয়া যখন ডাক্তারের হুকুমে আমি বাড়ীতে আবদ্ধ হইয়াছিলাম, তখন বাসন্তী আমাকে দেখিতে আসেন। কথাপ্রসঙ্গে বাসন্তী কহিয়াছিলেন যে, চিত্ত আমার সঙ্গে দেখা করিতে সাহস পান না, কি জানি, আমার কোন প্রকার উত্তেজনা হয়। কিন্তু সর্ব্বদাই আমার খবরাখবর লইয়া থাকেন। সে সময়ের আর এক দিনের কথা মনে পড়িল। চিত্তের আর এক জন আধুনিক আসন্ন সহচর আমাকে দেখিতে আসিয়া কহিলেন, "শ্রীযুত চিত্তরঞ্জন ও তাঁহার পত্নী আপনাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করেন।" আমি হাসিয়া উত্তর করিলাম, "বোধ হয়, ইহার পরেই আমি শুনিতে পাইব যে, আমার জ্যেষ্ঠা কন্যা ও বড় জামাতা-

আমাকে শ্রদ্ধা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।" এই ভদ্রলোক আমার কথার মর্ম্ম বুঝিলেন কি না, জানি না; তবে তাঁহাদের কথাতে বুঝিলাম, চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে আমার কোন্ যায়গায় ও কি সম্বন্ধ, ইঁহারা তাহার কোনই খোঁজখবর রাখেন না।

শেষ দেখার কথা কহিতেছিলাম। সে দিন তাঁহার অসুখের খুব বাড়াবাড়ি যাইতেছে। আমি যখন গেলাম, তখন ডাক্তার নীলরতন সরকার, ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় ও ডাক্তার খগেন্দ্রনাথ ঘোষ সেখানে উপস্থিত ছিলেন। খগেন্দ্র বাবু কেবল ডাক্তার নহেন, চিত্তরঞ্জনের অতি নিকট-আত্মীয়। চিত্তরঞ্জন তাঁহার মামাশ্বশুর। খগেন্দ্র বাবু আমাকে কহিলেন, "আপনাকেও আজ রোগীর সঙ্গে দেখা করিতে দিব না।" আমি কহিলাম, "বেশ। আমিও ত তাহাকে দেখিতে আসি নাই, তাহার খবর লইতেই আসিয়াছি।" কিছুক্ষণ পাশের ঘরে বসিয়া আমি চলিয়া আসিতেছি, এমন সময় চিররঞ্জন আমাকে পিছন হইতে ডাকিয়া বলিল, "বাবা আপনাকে ডাকিতেছেন।" জানি না, কি করিয়া আমি যে তাঁহার বাড়ী গিয়াছি, চিত্তরঞ্জন ইহা জানিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার ডাকে আমি তাঁহার রোগশয্যাপার্শ্বে যাইয়া বসিলাম। আমাদের মধ্যে একটিও বাক্যবিনিময় হইল না। আমি নীরবে তাঁহার রোগক্লিষ্ট অঙ্গে হাত বুলাইতে লাগিলাম। এই আমার সঙ্গে তাঁহার শেষ দেখা। চিত্তরঞ্জন ক্রমে রোগের সঙ্কট অবস্থা অতিক্রম করিলেন। পরদিবস হইতে তাঁহাকে দেখিতে না যাইয়া প্রতিদিন দু'বেলা বাড়ী হইতে "ফোনে" খবর লইতাম। ইহার অল্পদিন পরেই আমি দিল্লী চলিয়া যাই। চিত্তরঞ্জনও পাটনায় চলিয়া যায়েন। দিল্লী হইতে ফিরিবার সময় দু'একবার ইচ্ছা হইয়াছিল যে, পাটনায় নামিয়া চিত্তরঞ্জনকে একটু নিরালায় দেখিয়া আসি। সেই শেষ দেখার পর হইতেই আমার মনে মনে কেমন একটা ধারণা জন্মিতেছিল যে, চিত্তরঞ্জন আবার আমাদের পূর্ব্ব-স্নেহ ও সাহচর্য্যের সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হউক, ইহা ইচ্ছা করিতেছিলেন। নভেম্বর মাসে যখন বোম্বাইয়ে Unity Conference বা মিলন-বৈঠক বসে, তখনই ইহার প্রমাণ পাইয়াছিলাম। ঐ উপলক্ষে বহুদিন পরে আবার আমরা দেশের সেবাকার্য্যে পরস্পরের পাশাপাশি হইয়া বসি। স্বরাজ্য দলের ইচ্ছা ছিল যে, এই বৈঠকের মুখ দিয়া তাঁহারা এই কথাটি জাহির করান্ যে, বাঙ্গালায় নূতন ধরপাকড়ের আইন তাঁহাদিগকে বাঁধিবার জন্যই জারি হইয়াছে। আমি এ কথা বিশ্বাস করি নাই এবং যাহাতে Conference এরূপ কোন মন্তব্য গ্রহণ না করেন, তাহার চেষ্টা করিতেছিলাম। চিত্তরঞ্জন যে এ কথা জানিতেন না, এমন মনে করি না। অথচ ইহা সত্ত্বেও আমার সঙ্গে যাহাতে পূর্ব্বকার সাহচর্য্যের সম্বন্ধ পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়, পাকেপ্রকারে ইহার চেষ্টা করিয়াছিলেন। অতি নিকট-বন্ধুদিগের মধ্যে কোন কারণে ব্যবধান ঘটিলে তাহারা যেমন মুখ ফুটিয়া আবার মিলিবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিতে পারে না, অথচ ঠারেঠোরে পাকেপ্রকারে সে চেষ্টা করে, চিত্তরঞ্জন বোম্বাইয়ে তাহাই করিয়াছিলেন; আমাদের পূর্ব্বকার সাহচর্য্যের স্মৃতি জাগাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। দু'একটা সামান্য ঘটনাতে ইহা বুঝিয়াছিলাম। কিন্তু মানুষ নিজের কর্ম্মের দাস। গত ৫ বৎসরের কর্ম্মবন্ধন ছিন্ন করা তাঁহার পক্ষেও সহজ ছিল না, আমার পক্ষেও নহে। সুতরাং এই ব্যবধান ইহলোকে আর ঘুচিল না।

চিত্তরঞ্জনের আধুনিক আসন্ন সহচরদিগের জবানী মাঝে মাঝে গত ১ বৎসরের মধ্যে যে সকল কথা শুনিয়াছি, তাহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে ইদানীং চিত্তরঞ্জন তাঁহার পুরাতন সহকর্ম্মীদিগের সঙ্গে পুনরায় মিলিয়া কায করিবার জন্য কতটা পরিমাণে যে ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছিলেন, ইহা বুঝিতে পারা যায়। বিধাতা তাঁহার সে আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিলেন না। আমাদের সে সৌভাগ্য আর হইল না। আজ বারংবার এই কথাই ভাবি।

১৯০০ খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি আমি আমার প্রথম বিলাত-প্রবাস হইতে ফিরিয়া আসিলে, চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে আমার সখ্য ও সাহচর্য্যের সম্বন্ধের সূত্রপাত হয়। অবশ্য ইহার পূর্ব্ব হইতেই চিত্তরঞ্জনকে আমি চিনিতাম। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে চিত্তরঞ্জনকে আমি প্রথম দেখি। তাঁহার পিতৃব্য দুর্গামোহন দাশ মহাশয়ের সঙ্গে আমার বিশেষ আত্মীয়তা ছিল। দুর্গামোহন বাবু আমাকে পুত্রের ন্যায়

স্নেহ করিতেন; আমিও তাঁহাকে পিতার ন্যায় ভক্তি করিতাম। ঐ সময়ে দুর্গামোহন বাবু তাঁহার দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুত্র সতীশরঞ্জন ও জ্যোতিষরঞ্জনকে স্কুল হইতে ছাড়াইয়া আমার হাতে তাহাদের শিক্ষার ভার অর্পণ করেন। সে সময়ে দুর্গামোহন বাবু ও ভুবন বাবু পিপ্পলপটি রোডে (এখন ইহাকে এল্‌গিন্ রোড কহে) এক বাড়ীতে বাস করিতেন। এই সূত্রে আমি প্রথম চিত্তরঞ্জনকে দেখি। চিত্তরঞ্জন তখন বালক অথবা বয়ঃসন্ধিতে উপস্থিত। ইহার পরে চিত্তরঞ্জন যখন প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়েন, তখনও দুই একবার কলিকাতা Students Associationএর ছাত্র-সম্মিলনের সম্পাদকরূপে আমার কাছে গিয়াছিলেন। মনে পড়ে, একবার এলবার্ট হলে তাঁহাদের একটা সভায় আমি উপস্থিত ছিলাম। ঐ উপলক্ষে প্রথম চিত্তরঞ্জনের বক্তৃতাও শুনি। ইহার পরে চিত্তরঞ্জন বিলাত গেলেও মাঝে মাঝে সংবাদপত্রে তাঁহার কথা পড়িয়াছিলাম। বিলাতে ছাত্রাবস্থায় তিনি দুই একটা বক্তৃতা দিয়াছিলেন, সে খবরও রাখিতাম। সে সকল বক্তৃতায় সে দেশের শ্রোতৃমণ্ডলীর নিকট তাঁহার কতকটা প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, ইহাও জানিতাম। ব্যারিষ্টার হইয়া দেশে ফিরিয়া আসিলে চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে অনেক দিন দেখাশুনা হয় নাই। ব্রাহ্মসমাজের প্রচার-কার্য্যে আমিও বাহিরে বাহিরে ঘুরিয়া বেড়াইতাম; চিত্তরঞ্জনও ব্রাহ্মসমাজের কাছ ঘেঁসিতেন না। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে আমি বিলাত যাই। দুই বৎসর পরে দেশে ফিরিয়া ভবানীপুরে সাউথ সুবর্ব্বন স্কুলে একটা বক্তৃতা দেই। এই সভাতে আমার বক্তৃতার পরে আমাকে ধন্যবাদ দিতে উঠিয়া চিত্তরঞ্জন বক্তৃতা করেন। এই বক্তৃতায় তিনি ব্রাহ্ম-সমাজের সঙ্কীর্ণ মতবাদের ও অসাম্প্রদায়িকতা-অভিমানী সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতার উপরে তীব্র আক্রমণ করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে আমার প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা প্রকাশ করেন। ব্রাহ্ম-আদর্শ প্রচারে সচেষ্ট থাকিলেও ব্রাহ্ম-সমাজের আমলাতন্ত্রের সঙ্গে আমারও তখন একটা বিরোধ বাধিয়া উঠিতেছিল। বিলাত যাইবার পূর্ব্ব হইতেই আমি ব্রাহ্মধর্ম্মকে বিদেশীয় সাধনার প্রভাব হইতে মুক্ত করিয়া ভারতের সনাতন সাধনার সঙ্গে যুক্ত করিয়া জাতীয় আকার দিবার জন্য চেষ্টা করিতেছিলাম। সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের তত্ত্ববিদ্যা সভার এক বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে আমি "ব্রাহ্মধর্ম্ম-জাতীয় ও সার্ব্বভৌমিক" এই বিষয়ে একটা প্রবন্ধ পাঠ করি। সিটি কলেজের অধ্যক্ষ উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় সভাপতি ছিলেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কর্ত্তৃপক্ষীয়রা প্রায় সকলেই এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম মূল-তত্ত্ব-সিদ্ধান্তে এবং আদর্শে সার্ব্বজনীন হইলেও আকারে, সাধনায়, অনুষ্ঠানাদিতে ভারতের পুরাতন সাধনা-ধারা হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে পারে না। কোনও সজীব ধর্ম্মই তাহার সামাজিক আধার ও আবেষ্টন এবং ঐতিহাসিক অভিব্যক্তির খাত ছাড়াইয়া যায় না, যাইতে পারে না। সেরূপ চেষ্টা ইহাকে ভয়াবহ পরধর্ম্মে পরিণত করে। ইহাই আমার প্রবন্ধের মূল কথা ছিল। দ্বিতীয়তঃ সার্ব্বভৌমিক বলিতে আমরা একটা নির্ব্বিশেষ সত্য বা আদর্শকেই বুঝি। এ বস্তু নিরাকার, ভাবমাত্র। এই সার্ব্বভৌমিক সত্য বা আদর্শ ভিন্ন ভিন্ন দেশে এবং কালে সেই দেশের এবং কালের উপযোগী বিশিষ্ট আকারে আপনাকে আকারিত করিয়া তুলে। ব্রাহ্মধর্ম্ম সার্ব্বজনীন আদর্শের অনুসরণ করিতে যাইয়া ভারতের বিশিষ্ট শাস্ত্র, সাধনা, সমাজ, সভ্যতা এবং অভিব্যক্তিধারা হইতে আপনাকে বিচ্ছিন্ন করিলে আপনার শক্তি, সত্য এবং সফলতার সম্ভাবনা হারাইয়া না-হিন্দু, না-মুসলমান, না-খৃষ্টীয়ান হইয়া একটা উদ্ভট ও উৎকট জগা-খিচুড়িতে পরিণত হইবে। ব্রাহ্ম-সমাজকে বাঁচাইয়া রাখিতে হইলে, হিন্দুর শাস্ত্রের দেশকালপাত্রোপযোগী সদ্‌যুক্তি-সম্মত এবং প্রাচীন মীমাংসকদিগের মূল সূত্রাবলম্বী ব্যাখ্যার উপরে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। ৪০ বৎসর পূর্ব্বে বিলাতে অ্যাংলিকান-মণ্ডলীর নায়কেরা যেরূপ খৃষ্টীয়ান ধর্ম্মশাস্ত্র ও সাধনাকে re-interpret, re-explain এবং re-adjust করিয়া আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানসম্মত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, আমাদের ব্রাহ্ম-সমাজকেও পুরাতন হিন্দুশাস্ত্র ও সাধনা সম্বন্ধে সেই চেষ্টাই করিতে হইবে। তাহা হইলেই ব্রাহ্ম-সমাজ জাতীয়তা ও সার্ব্বভৌমিকতার সত্য এবং সঙ্গত সমন্বয়সাধন করিয়া আপনার ইষ্টলাভে সমর্থ হইবে। ইহাই আমার প্রবন্ধের

প্রতিপাদ্য ছিল। ইহা লইয়া ব্রাহ্ম-সমাজে একটা তীব্র মতবিরোধ দাঁড়াইয়া যায়। উমেশ বাবু প্রভৃতি আমার মূল সিদ্ধান্ত সমর্থন করেন। অন্যদিকে এক দল ইহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। প্রতিপক্ষীয়রাই কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগের মধ্যে দলে ভারী ছিলেন। বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিলে ইঁহারা ব্রাহ্ম-সমাজের প্রচারকার্য্যে আমাদের এই নূতন জাতীয়তার আদর্শকে কোণঠ্যাসা করিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। চিত্তরঞ্জন ব্রাহ্ম-সমাজের কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগের এই সঙ্কীর্ণতারই তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। আমরা, ব্রাহ্মসমাজের জাতীয় দল, যে ভাবে ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্ম সাধনাকে ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছিলাম, চিত্তরঞ্জন অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে তাহার সমর্থন করেন। এই হইতেই চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে আমার সখ্যের এবং সাহচর্য্যের সূত্রপাত হয়।

ব্রাহ্মসমাজের এই সংস্কার-ব্রতে সেকালে আমাদের চিন্তানায়ক ছিলেন আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল। স্বর্গীয় প্যারীমোহন দাশ ব্রজেন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ শিষ্য ও সমসাধক ছিলেন। ব্রজেন্দ্র বাবু, প্যারী বাবু এবং আমার সঙ্গে এই সময়ে চিত্তরঞ্জনের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতা জন্মে। চিত্তরঞ্জন প্রথম যৌবনে কতকটা হার্বার্ট স্পেনসারের মতানুবর্ত্তী ছিলেন। স্পেনসারের অজ্ঞেয় ঈশ্বরতত্ত্ব হইতে প্রত্যক্ষ ব্রহ্মতত্ত্বে যাইতে হইলে উপনিষদ্ ধর্ম্মের মত এমন সোজা, সরল সত্যোপেত পথ আর দ্বিতীয় নাই। এই পথেই প্রাচীন মীমাংসকদিগের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া আমরা ব্রাহ্মসমাজ এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের জাতীয়তা এবং সার্ব্বভৌমিকতার সমন্বয়সাধনের চেষ্টা করিয়াছিলাম। চিত্তরঞ্জন এই পথেই আমাদিগের সহযাত্রী হয়েন। ইহার পূর্ব্বে তাঁহার পিতা এবং পিতৃব্যের ধর্ম্মসিদ্ধান্তের বা ধর্ম্মের আদর্শের সঙ্গে চিত্তরঞ্জনের কোনও প্রকারের আন্তরিক যোগ ছিল না। ব্রাহ্মসমাজে জন্মিয়াও তিনি ব্রাহ্মসমাজের বাহিরেই পড়িয়া ছিলেন। কিন্তু এই সময় হইতেই তিনি ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে কিয়ৎপরিমাণে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আবদ্ধ হয়েন। এই সূত্রেই চিত্তরঞ্জন ভবানীপুর ব্রাহ্মসম্মিলন-সমাজের প্রতিষ্ঠাকল্পে এবং ইহার মন্দির-গঠনে তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ উৎসাহ-সহকারে আপনার শক্তি, সময় এবং অর্থ নিয়োগ করিয়াছিলেন। আমি তখন ভবানীপুর সমাজের আচার্য্য ছিলাম। ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যব্যপদেশে চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে আমার সখ্য ও সাহচর্য্য ক্রমশঃ ঘনিষ্ঠতর ও নিবিড় হইয়া উঠে।

ইহার পরেই স্বদেশী আন্দোলনের বান ডাকিয়া উঠে। এই ভাবতরঙ্গে চিত্তরঞ্জনও ঝাঁপাইয়া পড়েন। এই সময় হইতে ১৫।১৬ বৎসর কাল কি ধর্ম্মানুশীলনে, কি দেশসেবায়, কি রাষ্ট্রীয় আন্দোলনে, কি সমাজ-সংস্কারে, কি সাহিত্য-চর্চ্চায় আমরা দুই জনে পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হইয়া এক উপাসনার উপাসক, একই সাধনার সাধক, একই মন্ত্রের জাপকরূপে নিরবচ্ছিন্নভাবে পরস্পরের হাত ধরিয়া চলিয়াছিলাম। সে কথা বলিতে গেলে বর্ত্তমান প্রবন্ধ অতিকায় হইয়া উঠিবে। ঈশ্বর-ইচ্ছায় চিত্তরঞ্জনের স্মৃতিজড়িত সে কাহিনী বারান্তরে বিবৃত করিতে ইচ্ছা রহিল।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

"ভৈরবী গেয়ো না—"

[কার্ত্তিক মাসের 'মাসিক বসুমতী'র চিত্র দর্শনে]

প্রভাত না হ'তে কোথা হ'তে সেজে এলে গো।
কখন্ করেছ স্নান, চা-টুকু করিয়ে পান,
ছাঁচি পান খেলে গো॥

কখন্ ইরির মধ্যে
শোভিলে কবরী-পদ্মে.
চিকণ করিলে চুল বকুলেতে সুবাসিত তেলে গো॥

বসেছ মিউজিক টুলে,
পিঠের কাপড় খুলে,
সলাজে সেমিজ দেখি দেছ খুলে ফেলে গো॥
নারী-ধর্ম্ম-কর্ম্ম নিয়া,
বাজাইছ হার্ম্মোনিয়া,
সংসারে সুখের সিন্ধু উথলে গা ঢেলে গো;—
প্রভাতী ভৈরবী কণ্ঠে কোথা থেকে পেলে গো॥

শ্রীঅমৃতলাল বসু।

২

নবদ্বীপ -নদীয়া—নদে। সব ক'টি নামের-ই সার্থকতা আছে। এমন নদীঘেরা স্থান বঙ্গদেশে আর নেই। পদ্মা, ভাগীরথী, মাথাভাঙ্গা, জলঙ্গী, কপোতাক্ষী, ইছামতী, চুর্ণী আপনাদের হাতে গড়া এই দ্বীপটিকে ঘিরে-ঘুরে বেড়ে রেখেছে। প্রবাহিণী-অঙ্গজা এই ভূমিখানির বক্ষ এমন সরস অথচ এত উন্নত যে, আপন আশ্রয়স্থিত মানবের অন্নের জন্য বসুমতী এখানে যেমন ধান্যপ্রসূতি, রবিশস্যের-ও তেমন-ই সোনার সূতিকাগার। ইষ্টকস্তূপের দাপ, ষ্টীমের প্রতাপ এখন-ও নদীয়ার প্রকৃতির প্রকৃত রূপকে বিকৃত করিতে পারে নাই; এখন-ও নদের বন আছে আর সেই বনে শিকারীর প্রাণকে ভিখারী করিয়া তুলিতে ব্যাঘ্র আছে—বরাহ আছে, আর-ও কত কি দন্তি-নখি-শৃঙ্গীর দল।

এই নবদ্বীপে-ই বঙ্গের শেষ রাজা সিংহাসন পাতিয়া বসিয়াছিলেন; এই নদের পলাশীতে-ই বিলাতী খালাসী ওয়াটসনের জাহাজ কামানের আওয়াজ করিয়া ও ক্লাইবের কারসাজী ভোজবাজী দেখাইয়া এ দেশে নবাব নামকে শাসনের আসন হইতে সরাইয়া উপাধিতে পরিণত করাইয়া দিয়াছে।

ইংরাজ-রাজত্বের অগ্নিক্ষেত্রের মাঝে সে দিন নদীয়াবাসী প্রজাশক্তির প্রভাব দেখাইয়া লাঠীর বলে নীলের লীলাবসান অভিনয় করিয়াছিল। কৃষ্ণনগরের গোড়-গোয়ালার বাহুবল বঙ্গদেশে প্রবাদবাক্যের ন্যায় প্রচলিত ছিল।

ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক যুগে নবদ্বীপের ন্যায় পণ্ডিত আর কোথায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন! পুথি লিখিতে বাধাপ্রাপ্ত হইয়া শ্রীমদ্ রঘুনাথ শিরোমণি মিথিলার গুপ্ত ধন সমগ্র ন্যায়শাস্ত্রটা কণ্ঠস্থ করিয়া নিজ বাস্তুতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। নব্যন্যায়ের সৃষ্টি এই নবদ্বীপে-ই।

তার পর সেই নবদ্বীপচন্দ্র গোরাচাঁদের কথা। ঈশ্বর-প্রেমের অনুরাগ-রসে নরনারীর হৃদয়কে চির-সঞ্জীবিত করিতে ভগবান্ শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব এই নবদ্বীপে-ই নিমাই নামে ভূমিষ্ঠ হয়েন। সেই রসের সঞ্চারে-ই বঙ্গের কবিত্বশক্তি পূর্ণ প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিল; বঙ্গকণ্ঠ মধু হইতে মধুরতর কীর্ত্তনগীতে মানব-মন মাতোয়ারা করিয়া তুলিল; উন্মাদ নর্ত্তন বৈষ্ণবের বাহুতে কাজী-বিজয়ী বল আনিল। শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর কৃপায় জাতিভেদের বেষ্টনীবন্ধন খণ্ডন করিয়া হিন্দু মুসলমানকে, মুসলমান হিন্দুকে, ব্রাহ্মণ চণ্ডালকে আলিঙ্গন করিল।

বঙ্গদেশের শেষ সমাজরাজ রাজেন্দ্র কৃষ্ণচন্দ্রের উদয় এই নবদ্বীপে-ই। ঐ চন্দ্রের সিতরশ্মিতে-ই অমর ভারতচন্দ্রের অতুলনীয় কবিত্ব-প্রতিভা লোকলোচনের দৃষ্টিভূত হয়; ঐ চন্দ্রালোকে দাঁড়াইয়াই ভক্তবীর রামপ্রসাদ গাহিয়াছিলেন :—

"এ সংসারে ডরি কারে,—
রাজা যার মা মহেশ্বরী;
আনন্দে আনন্দময়ীর খাসতালুকে বসত করি।"

ঐ চন্দ্রকিরণে-ই আজু গোঁসাইয়ের শ্লেষ, গোপাল ভাঁড়ের হাসি, ভাদুড়ীর পাদপূরণ-মাধুরী বিকসিত হয়। কৃষ্ণচন্দ্রের শুভদৃষ্টিতে-ই কৃষ্ণনগরে মৃৎমূর্ত্তি-শিল্পের সৃষ্টি।

পৃথিবীর মানচিত্রে নবদ্বীপের ন্যায় স্থান আর কোথায় আছে! বিলাতী চশমাচোখে বাঙ্গালী আমরা

আজ দূরে—দূরান্তরে দৃষ্টিশক্তির প্রয়োগ করিয়া রোমের পোপের প্রাসাদস্থ উচ্চচূড়া দেখি, সভ্যতার সূতিকাগার বলিয়া সেই রোমের ব্যাখ্যা করি; গ্রীসের পাণ্ডিত্য, ইটালীর শিল্প, ভিনিসের ঐশ্বর্য্যকল্পনায় আত্মহারা হই। ধূসর পুরাবৃত্ত অধ্যয়ন করিয়া মিশর স্মরণে ধন্য হই; জেরুজিলাম, মক্কা, মদিনার বন্দনা গান-ও করিয়া থাকি। পারস্যের আস্তে সভ্যতার হাস্য আমাদের দ্বারা উপেক্ষিত নয়। চীন-ও চিনি; শ্রীশ্রীবুদ্ধদেবের লীলাভূমি মগধও কাহাকে কাহাকে মুগ্ধ করে, কিন্তু জনকয়েক বৈষ্ণব-বৈষ্ণবী ভিন্ন নবদ্বীপ আর কার প্রাণ আকৃষ্ট করে!

হায় নবদ্বীপ! তুমি যে মাটীতে গড়া, তুমি যে কুটীরের পাড়া, তোমার সাড়া কি এই ইংরাজীপড়া প্রাণে পশিতে পারে? থাক নবদ্বীপ! চুপ ক'রে থাক; তুমি চির-শান্ত, শান্ত হয়েই থাক। আপনার মনে মনে রেখ, তোমার বুকে এক দিন রাজার সিংহাসন পাতা ছিল, তোমার লাঠীর জোরে মাটী রক্ষা হ'ত। তুমি পাণ্ডিত্যের তীর্থ, কবিত্বের তীর্থ, কীর্ত্তনের তীর্থ; নর-রূপধারী ভগবানের শ্রীচরণস্পর্শে তোমার প্রত্যেক ধূলি-কণা পবিত্র, আর সুদূর পশ্চিমে বন কাটিয়া শ্রীশ্রীবৃন্দাবনকে সোনার টোপর পরাইয়াছিলে তুমি!

* * * * *

আর আজ? তোমার কিঞ্চিৎ গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছে আমাদের চক্ষুতে রেল কোম্পানী। অই শোন, বাঁশী বাজিল—রেল থামিল, নামিল আমাদের গজু।

বাড়ী থেকে বেরিয়েছিলেন গজেন্দ্র তাঁর মামুলী পোষাক হাটকোটে; সেই পোষাকে হাবড়া ষ্টেশনে কুলীদের কাছে 'সাহেব' সম্ভাষণ আদায় ক'রে সেকেণ্ড ক্লাস কামরায় ব্যাণ্ডেল পর্য্যন্ত একই মূর্ত্তিতে পৌছিলেন। গজুর শোনা ছিল, ব্যাণ্ডেল পার হয়ে ত্রিবেণীমুখো হ'লেই জেণ্টেলম্যানের রাজত্বের শেষ হবে; সুতরাং বাঁশবেড়ে পৌছিবার আগেই গজু একেবারে মূর্ত্তি পরিবর্ত্তন ক'রে, জি, হাইট থেকে গজেন্দ্রজীবন হাইত হয়ে দাঁড়ালেন; মাথায় চেরা সীঁতি, গায়ে চেক্ টুইলের লম্বা পাঞ্জাবী না কি বলে তাই, পরণে চুলপেড়ে ধুতি, সিল্কের চাদর একখানা বগলের নীচে থেকে কাঁধের ওপর দিয়ে ঘুরে গেল। গন্তব্য স্থানে পৌছে মাসীর বাড়ী খুঁজেপেতে নিতে বেলা আর থাকবে না ভেবে গজু একটা টিফিন-বাক্স ক'রে কিছু খাবার নিয়েছিলেন। জেণ্টেলম্যানের সরহদ্দ পার হয়েই 'সাহেব' সেকেণ্ড ক্লাস ছেড়ে নতুন টিকিট কিনে থার্ড ক্লাসে উঠেন। এ পদ্ধতিটা গজেন্দ্রের নতুন আবিষ্কার নয়; কলকাতায় এমন বাবু বিরল নয়, যাঁরা শিয়ালা থেকে চৌরঙ্গী পর্য্যন্ত ট্রামে গিয়ে সেখান থেকে একখানি ট্যাক্সি ভাড়া ক'রে এলগিন রোডবাসী কোন রাজা বা জমীদারের সঙ্গে দেখা করতে তাঁর গেটের ভিতর ঢোকেন। ত্রিবেণীতে কতকগুলি যাত্রী নেমে যাওয়ায় গজু গাড়ীতে একটু ফাঁকা হয়ে বসবার অবসর পেলে, আর পোর্টম্যাণ্ট থেকে একখানি এনামেলের শানকী বা'র ক'রে প্রাতরাশের উদ্যোগ করলে। সাহেবের সঙ্গে, কি সাহেবী হোটেলে খাওয়া আজ পর্য্যন্ত গজুর কপালে ঘটেনি, কিন্তু সাহেবরা যে ছুরি, কাঁটা, চাম্‌চে ছাড়া খায় না, এ কথা তার অবশ্য জানা ছিল; গজুর ব্রেকফাষ্টের যোগাড় দেখে গাড়ীর যাত্রীরা ত অবাক্! সেই চাকা চাকা কাটা পাঁউরুটী, আলুসিদ্ধ, ডিমসিদ্ধ, সিঁদুরেপটী থেকে কেনা কিছু শিখ-কাবাব, নুণ, মরিচের গুঁড়া, রাইগোলা আর তার উপর দুটো কলা এবং চার চারটা সন্দেশ। ছুরি ক'রে মাষ্টার্ড কাটিয়ে তুলে রুটীতে মাখিয়ে গজু যখন মুখে পূরলে, তখন সহযাত্রীরা গা টেপাটেপি করতে লাগল, আর কোণেবসা একটি ছোকরা বাবু মুখ টিপে টিপে হাস্‌তে লাগল। গজু মনে মনে ভাবলে, বাঙ্গালী পোষাক হ'লে-ও আমার খাবার ধরণ দেখে এরা অবশ্য আমাকে সম্মানের চোখে দেখছে। মাষ্টার্ডটা গজুর অতি প্রিয় খাদ্য, সুতরাং সে রুটী, আলু, ডিম, কাবাব, এমন কি, কলাতেও একটু মাষ্টার্ড মাখিয়ে সুস্বাদু ক'রে নিলে, কেবল সন্দেশের বেলা একটু মরিচের গুঁড়ো দিয়ে নিয়েছিল; কারণ, ছেলেবেলা দেশে থাকতে-থাকতে-ই লঙ্কামরিচ না মিশিয়ে কোন জিনিষ সে খেতে পারত না।

গজুর বরাতে গাড়ীখানি কাটোয়া ষ্টেশনে থামতে কামরাটি একেবারেই খালি হয়ে গেল; রইল খালি সে আর এক-কোণেবসা ছোকরাটি। দু'টি ভদ্রসন্তান

একসঙ্গে এক গাড়ীতে, একেবারে বাইরের দিকে চেয়ে টেলিগ্রাফের খুঁটি গুণতে গুণতে যাওয়া একেবারে অসম্ভব, সুতরাং ছোকরাটি কথাবার্ত্তা আরম্ভ ক'রে দিলে।

ছোকরা। মশাই নামবেন কোথা?

গজু। ন্যাভাডীপ্।

ছোকরা। ওঃ, তা হ'লে বেশ, একসঙ্গেই বাকি পথটুকু যাওয়া যাবে।

গজু। আপনিও ন্যাভাডীপে হল্ট করবেন?

ছোকরা। আজ্ঞে, নবদ্বীপেই আমার বাড়ী।

গজু। ওঃ, কোয়াইট দি কো-একস্কিডেন্স। আপনার সঙ্গে ইন্‌ট্রোডিউস হয়ে ভারি হ্যাপিনেশ হলাম। আপনার নামটা জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?

ছোকরা। নিশ্চয়। আমার নাম শ্রীচারুচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

ছোকরাটির এইখানে একটু পরিচয় আবশ্যক। বাড়ী নবদ্বীপ, ভাল গৃহস্থ-সন্তান, তবে সংসারের ভরসা ছিল পিতার একটি রেলে চাকরী; চারু যখন কৃষ্ণনগর কলেজে সেকেণ্ড ইয়ারে পড়ে, সেই সময় তার পিতা হঠাৎ চাকরীস্থানে মারা যান, সামান্য দেনা ছাড়া আর কিছু রেখে যেতে পারেননি। যখন ই, বি, আর-এ চাকরী করতেন, তখন চোদ্দ পনের বছরের ভিতর প্রভিডেণ্ট ফণ্ডে কিছু টাকা জ'মে গিয়েছিল, কিন্তু বড় মেয়ের বিয়ের সময় খরচের অভাবে সে চাকরী রিজাইন দিয়ে প্রভিডেণ্ট ফণ্ডের টাকা তুলে নন। মাস আষ্টেক পরে চেষ্টা ক'রে ই,আই,আর-এ ঢোকেন,সেই বছর পাঁচ ছয়ে কি-ই বা জমেছিল, বড় জোর তাতে দেনাটা শোধ গেল; কিন্তু সংসারে মা, বিধবা পিসী, ভাই, বোন, নিজে, কাযেই চারুকে কলেজ ছেড়ে চাকরীর চেষ্টা দেখতে হয়। কলেজের বিদ্যাকে কর্ম্মক্ষেত্রে খাটাতে গেলে যে শিক্ষাটুকু চাই, তা গ্রাজুয়েট অণ্ডার-গ্রাজুয়েট কারুই একেবারে হয় না, চারুর-ও তা হয়নি; সুতরাং শুধু ইংরাজী বলবার বা লেখবার জন্য হাতে হাতে মাইনে দিয়ে কে বেচারীকে চাকরী দেবে বল? সুকণ্ঠ চারু ছেলেবেলা থেকে বেশ গাইতে পারত, হারমোনিয়ম-ও বাজাত, ডাইনে-বাঁয়াতে-ও একটু হাত ছিল, কলেজের রিসাইটেসনে দু'বার মেডেল পেয়েছে; তার মনে হ'ল, থিয়েটারে ঢুকলে হয় না? চারুর চেষ্টা বিফল হ'ল; সে সুরসিক, তার কথায় বেশ রস ছিল, আবশ্যকমত দৃষ্টি-ক্ষেত্রে মিষ্ট হাসি-ও ফুটত—অশ্রু-বৃষ্টি-ও হ'ত,কিন্তু উন্নতি-শীল থিয়েটার করতে হ'লে যে আর্টের দরকার, তা তা'র হাতে-পায়ে চোখে-নাকে কোথা-ও ছিল না, কাযেই কোন ম্যানেজার-ই তা'কে পার্ট দিতে রাজী হলেন না। একটি থিয়েটারে ক'দিন ধ'রে মুখ চূণ ক'রে আনাগোনা করায় সেখানকার নৃত্য-শিক্ষক এককড়ি বাবুর প্রাণে চারুর প্রতি যেন একটু মমতা জন্মেছিল, তিনি এক দিন চারুকে বাইরে ডেকে নিয়ে আলাদা বললেন, "ওহে ছোকরা, এখানে মিছিমিছি কেন হাঁটাহাঁটি করছ, হেথা সব বড় বড় এক্‌টার থাকতে তোমাকে কি আগে-ভাগেই হিরোর পার্ট দেবে? বছর দুই কাটা সৈন্য সাজার পর কি হয় বলা যায় না। এক কর্ম্ম কর, যাত্রার দলে ঢুকে পড়।" চারু যেন অবাক্ হয়ে ব'লে ফেল্‌লে,—"অ্যাঁ!" এককড়ি বাবু বল্‌লেন, "অ্যাঁ-ফ্যাঁ নয়, আমার কথা শোন, হ্যাঁ ব'লে ফেল। আজকাল আর সে যাত্রার দল নেই, অনেক লেখাপড়া-শেখা ভদ্রলোক যাত্রায় এক্ট করছে, খুব সম্মানে আছে। আমার সঙ্গে এক খুব বড় যাত্রার অধিকারীর আলাপ আছে, আমি সখ ক'রে তা'দের একটা পালায় নাচ শিখিয়েছিলুম; এখন দল কলকেতায় আছে; ঠিকানা লিখে দিচ্ছি, কা'ল বেলা একটার সময় আমার বাড়ী যেও, সঙ্গে ক'রে নে' গিয়ে সব ঠিক ক'রে দেব; তোমার গানও শুনেছি, সলিলকি-ও শুনেছি, এট্ প্রেজেণ্ট ফরটি রুপীজ ত দেবেই, তার পর দু'তিনটে আসর জমালেই তোমার মাইনে তুমি আপনি-ই বাড়িয়ে নিতে পারবে।" চারু একটু আমতা আমতা ক'রে বল্‌লে, "আজ্ঞে, একবার বাড়ীতে জিজ্ঞাসা ক'রে—"

এক। বাড়ী—কোথায় তোমার বাড়ী?

চারু। আজ্ঞে নবদ্বীপ।

এক। নবদ্বীপ! বল্‌তে গেলে নবদ্বীপে-ই ত যাত্রার জন্ম। মহাপ্রভু চৈতন্যদেব যাত্রা গেয়েছেন আর তুমি যাত্রা করতে পার না! ভারি আমার এ-লে পাশ রে!

এ যুক্তির পর চারুর আর অস্বীকৃত হ'তে সাহস হ'ল না। সেই অবধি চারু যাত্রার দলে ঢুকেছে। আপনার আবৃত্তির কৌশলে গীতের ঝঙ্কারে আসরের পর আসর জমিয়েছে; বড় বড় জমীদারের ঘরে সাদরে অভ্যর্থিত ও পুরস্কৃত হয়েছে; তার উপর তা'র শিষ্ট ভদ্র ব্যবহার দলের মধ্যে একটা শৃঙ্খলা ও মর্য্যাদাবোধের সৃষ্টি করেছে। সম্প্রদায়স্থ একেবারে নিরক্ষর লোক-ও এখন আর অভদ্র কথা মুখে আনে না। রাত্রে আহার করলে গলা খারাপ হয়ে যায়, এ কুসংস্কার অধিকারীর মন থেকে দূর হয়েছে, দু'বেলা খাবার বন্দোবস্ত ও পূর্ব্বাপেক্ষা ভাল হয়েছে; অবশ্য অধিকারী মহাশয় ও চারু আসন পেতে বসে আর তা'দের ভাতে একটু ঘি-ও পড়ে, একটা দুধের বাটি-ও কাছে থাকে। ষ্টেশন থেকে দূরে যেতে হলে কোথা-ও কোথা-ও পাল্কী পায়, কোথা-ও বা তা'র পূরো একখানা গরুর গাড়ী। চারু অভিনয় করে, গান গায়, হারমোনিয়াম বাজায়, দরকার হ'লে ডাইনে-বাঁয়াটা টেনে নেয়, দলস্থ প্রসিদ্ধ বেয়ালাবাদক মদন দত্ত নিজে তা'কে বেয়ালা শিক্ষা দেন; এক্ষণে খোরাক বাদে চারুর মাসিক বেতন দেড় শত টাকা। তা'র নিজের রচিত একখানি পালা সম্প্রতি মহলা দেওয়া হচ্ছে, সেখানি জ'মে গেলে-ই খুব সম্ভব সে কিছু কিছু বখরা পাবে। পূজোয় দল বেরিয়ে পড়লে রাসের পূর্ব্বে আর ছুটী পাবে না, তাই এই ভাদ্র মাসের গোড়ায় গোড়ায় কিছুদিনের ছুটী নিয়ে চারু দেশে যাচ্ছে। দল সম্প্রতি দু'চারটে বারোয়ারীতলার বায়না নিয়েছে, চারুর তাতে যোগ দিবার তত প্রয়োজন নেই।

চারু ব্যাণ্ডেলে গজু সাহেবকে সেকেণ্ড ক্লাশ থেকে নামতে দেখেছে, তার পর তা'কে থার্ড ক্লাশ কামরায় ঢুকতে দেখেছে; সেখানে কাপড় বদলান টিফিন খাওয়া সব-ই চারুর নজরে পড়েছে, সুতরাং সে গজুকে অনেকটা বুঝতে পেরেছিল; এর উপর যখন সাহেবের মুখে "ক্লাভাডীপ" "কো-এক্সিডেন্স" শুনলে, তখন একেবারে তাকে সে চিনে ফেল্লে। বলেছি, চারু বেশ রসিক ছিল; তাতে তত ক্ষতি নাই, তা'র একটি দোষ ছিল, সে প্র্যাক্‌টিক্যাল জোকার; এ বিদ্যা সে ছেলেবেলায় স্কুলে, তার পর কলেজে, কখন কখন যাত্রার দলে-ও খাটাতে ছাড়েনি। ক্লাভাডীপের উপর এ বিদ্যা প্রকাশ করতে চারুর বড্ড লোভ হ'ল।

চারুচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ব'লে নিজের পরিচয় দিয়েই সে জিজ্ঞাসা করলে, "মশায়ের নামটি কি জিজ্ঞাসা করতে পারি?"

গজু। অফ কোর্শ, বাট—বাট—

চারু। আপনার নাম বটকৃষ্ট?

গজু। নো—নো! (পকেট হাতড়ান)

চারু। নামটা কি পকেটের ভিতর ছিল?

গজু। ইয়েস—নো—

চারু। ভেরি ওয়েল।

গজু। তা না—এই কার্ডকেশটা বোধ হয় ভুলে এসেছি।

চারু। তা ফার্ষ্ট পারসন উপস্থিত থাকতে থার্ড পারসনে প্রয়োজন কি?

গজু। ওঃ! আপনি ইংরাজী জানেন?

চারু। যৎসামান্য।

গজু। আমার নাম হচ্ছে জি, হাইট। আপনি বোধ হয় প্রসিদ্ধ পেণ্টার মিঃ হাইটের নাম শুনেছেন, আমি-ই সেই হাইট।

চারু। পেণ্টার—আপনি কি পেণ্ট করেন?

গজু। কি পেণ্ট করি?

চারু। আজ্ঞে, পেণ্টার ত অনেক রকম আছে; কেউ ঘর পেণ্ট করে, কেউ জানালা-দরজা পেণ্ট করে, কেউ সিন পেণ্ট করে, কেউ মুখ পেণ্ট করে—

গজু। আমি ছবি পেণ্ট করি। সৌন্দর্য্যবিকাশ—বুঝেছেন, সৌন্দর্য্যবিকাশ! কলার লীলা—ভাবের অভিব্যক্তি।

চারু। ভাবের অতিভক্তি?

গজু। এঁ্যা! বাঙ্গালাটাও এখনও ভাল ক'রে শেখেননি;—আপনি কি করেন?—পড়াশুনো?

চারু। না, পড়াশুনো আর হ'ল কই।

গজু। তবে?

চারু। চাকরী করি।

গজু। চাকরী! দাসত্ব—গোলামী!

চারু। ছবি আঁকতে শিখিনি, কি করি বলুন?

গজু। কেন, মুটেগিরি—রেলওয়ে পোর্টার ;—আমি রাস্তা ঝাঁট দিয়ে খেতে রাজী, তবু কখন চাকরী করব না ; অত্যাচারী ইংরাজ—তার দাসত্ব ?

চারু। আমি কেরাণী নই—ইংরাজের চাকরী করি না। আমি যে কায করি, তা শুনলে আপনি আমাকে আরও ঘৃণা করবেন।

গজু। সে কি ? পুলিসে নাকি ? আপনি গোয়েন্দা ? আমি "অত্যাচারী ইংরাজ" বলেছি, ফাঁকি দিয়ে শুনে নিলেন, রিপোর্ট করবেন ?

চারু। ভয় পাচ্ছেন কেন ? আমি পুলিসের লোক নই। আমি যাত্রাওয়ালা।

গজু। অ্যাঁ! যাত্রাওয়ালা ? আর এতক্ষণ আমি 'আপনি মহাশয়' করছিলুম। তুমি ত আচ্ছা অসভ্য, আগে আমায় বলা উচিত ছিল।

চারু। যাত্রাটা এত ছোটলোকের কায মনে করছেন কেন ?

গজু। করব না ? যাত্রাতে মোটে আর্ট নেই, কলা—কলা, কলা নেই।

চারু। আজ্ঞে, তা স্বীকার করছি। যাত্রা আদতে কলা দেখায় না ; অধিকারী মশায় আমাকে মাসে দেড় শত টাকা দেন, আরও বিশ চল্লিশ টাকা পাওয়া যায়।

গজু। (সবিস্ময়ে) অ্যাঁ ! দেড়শ' টাকা মাসে যাত্রার মাইনে ! বেগ ইওর পার্ডন, আপনি ত জেন্টলম্যান। তা—তা—আপনার সঙ্গে আলাপ ক'রে বড় অনারেবল হলুম। আমায় যদি আপনাদের দলে ইন্ট্রোডিউস ক'রে দেন, আমি অনেক ইমপ্রুভমেণ্ট ক'রে দিতে পারি ; মাফ করবেন, ভাব-টাব আপনাদের ভাল প্রকাশ হয় না। আর্টে আমি এক জন এস্পেসিকিষ্ট, আমি আপনাদের এমন দাঁড়ানর ভঙ্গী, হস্তবিস্ফারণ, চক্ষু নিক্রামণ সব দেখিয়ে দিতে পারি যে, আসরে নেমে আপনারা থিয়েটারওয়ালাদের জব্দ ক'রে দিতে পারবেন।

চারু। আপনার অবসর হবে কখন্! আপনি এক জন বড় পেণ্টার ; কালে এক জন ভেণ্ডাইক কি ময়েলো হ'তে পারবেন।

গজু। আর মশাই, দুর্ভাগা বঙ্গদেশ! দুরাত্মা ইংরাজ—সত্য বলছেন আপনি পুলিস নন ?

চারু। আজ্ঞে না।

গজু। দুরাত্মা—দুর্ব্বৃত্ত—দুর্গন্ধ—দুর্ঘট—দুর্জ্জয় ইংরাজ, কি বলব, এই বঙ্গদেশের সমস্ত পাট, সমস্ত কাঠ আর সমস্ত আর্ট লুঠ নিয়ে বিলাতে চালান দিয়েছে। আমার ছবি আজ যদি বিলাতে ছাপা হ'ত, তা হ'লে আমি সেখানে পোয়েট লরিগেট টাইটেল পেতাম, আর এক একখানা ছবি সেখানকার লর্ডরা দু' হাজার গিনি দিয়ে কিনত।

চারু মনে মনে বুঝে নিলে যে, স্বদেশপ্রেমিক স্বাধীন সাহেবের টাকার স্বপ্নে বিশেষ অনুরাগ ; যাত্রাওয়ালা শুনে আমাকে 'তুমি'র ক্লাসে নামিয়ে দিয়েছিলেন, আবার দেড়শ' টাকা মাইনে শুনে তখনই ডবল প্রমোশান। সুতরাং সে আর একটু বোমা মেরে দেখবার জন্য বললে,—"টাকা কি জানেন মশাই, বিলাতে-ও ফলে না, ভারতবর্ষে-ও ফলে না ; টাকা ফলে কপালে। এই দেখুন না, আমাদের নবদ্বীপে এক জন বৈষ্ণব ঠাকুরুণ আছেন, কেউ বলে তাঁর লাখ টাকা, কেউ বা বলে পঞ্চাশ হাজার ; মোদ্দা যত টাকাই থাকুক, এক পয়সাও তাঁকে পরিশ্রম ক'রে রোজগার করতে হয়নি।"

গজু। কত বললেন, পঞ্চাশ হাজার—লাখ টাকা—একটা বোষ্টমীর—ভিক্ষা ক'রে জমিয়েছে না কি ?

চারু। বালাই, এক জন দিয়ে গেছে—তার সর্ব্বস্ব দিয়ে গেছে। সে লোকটা শুনেছি কোত্থেকে এসে নবদ্বীপে একখানি বাসনের দোকান করেছিল, সঙ্গে আসে ঐ স্ত্রীলোকটি, বলত আমার পরিবার, তা ভগবান্ জানেন। বছর কুড়িকের ভেতর বিস্তর টাকা রোজগার ক'রে ম'রে যাবার সময় ঐ তারিণী দাসীর নামে সব লিখে প'ড়ে দিয়ে যায়।

গজু। (সবিস্ময়ে) তারিণী দাসী—তারিণী দাসী—মাসী না কি ?

চারু। সে কি, কা'র মাসী ?

গজু। না না, রসুন—রসুন ; কি বললেন, তারিণী দাসী—

চারু। এখন আর তারিণী দাসী নয়, কুঞ্জতারিণীর নামে বোষ্টমরা আজকাল মোচ্ছব করে। বাসনের পয়সা পেয়ে বড়মানুষ হয়েছে ব'লে সাধারণ লোক তার নাম রেখেছে, কাঁসারী কুঞ্জ।

গজু। (সোৎসাহে) নেভার মাইন কাঁসারী—নেভার মাইন শাঁখারী—হাড়ী, মুচি, চাঁড়াল! পতিত জাতিকে উন্নত করতে-ই আমার জন্ম। ডিপ্রেস ক্লাসকে প্রমোশন দিতে-ই হবে। সার সার, আই এম মোষ্ট গ্ল্যাডষ্টোন ইন্‌ট্রোডিউস উইথ ইউ। আমার এখন মনে পড়ছে, ভেরি নিয়ার রিলেটিভেস, আমি তাঁর-ই ওখানে যাচ্ছি।

চারু। সেই কুঞ্জতারিণীর বাড়ী, এই চেহারায়—এই কাপড়ে?

গজু। কেন—কেন, চেহারা কি খারাপ?

চারু। না না, ঐ কাবুল করা চুল, সাঁথি কাটা, কালাপেড়ে ধুতি, পাঞ্জাবী জামা।

গজু। তবে কি সাহেবী পোষাকটা আবার পরব না কি? দেখে ভয় পাবে।

চারু। কাঁসারী কুঞ্জ পুলিসকে ভয় করে না, তা সাহেবকে। সে মহা বোষ্টম, বামুনের পায়ে মাথা নোয়ায় না, তা আর কা'র কথা। গোঁসাই বা বোষ্টম ভিন্ন আর কেউ তার বাড়ীতে ঢুকতে পায় না।

গজু। তবে তুমি ব্রাদার—বুঝেছ সার, যদি একটা উপায় ক'রে দিতে পার, যাতে আমি তার কাছে পৌছতে পারি।

চারু। একমাত্র উপায় আছে।

গজু। স্পীক্ মি—স্পীক্ মি, বল কি উপায়? দেখুন, আপনি ত জানেন, আমাদের বাঙ্গালীর ভিতর একেবারে একতা নেই; আমি যে কাগজে ছবি দিয়ে টুয়েলভ রূপী চার্জ্জ করি, আর এক জন গিয়ে অমনি এইট্ রূপীতে রাজী হয়। আর গয়ারাম ব'লে এক বেটা ব্রাদার-ইন্-ল আছে, সে ত হোয়াট গেট—ছাট প্রফিট; কাযেই আয় অত্যন্ত কম হয়ে দাঁড়িয়েছে; তার ওপর এই পূজো মর্কেট ইন্ দি ফ্রণ্ট, একেবারে এম্‌টি হাত হয়ে পড়েছি; ওন্‌লি—ওন্‌লি উপায় মাসী।

চারু। তিনি কি আপনার মাসী হন?

গজু। সহোদর; আমার মাদারের ব্রাদারের আপনার শিষ্টার। এত টাকা কি করে সে?

চারু। তা দান আছে। এক দিকে বেশ হাত-খোলা; মোদ্দা গোঁসাই কি ভেকধারী বোষ্টম, নইলে তিন দিন খাওয়া হয়নি ব'লে কেউ দরজায় গিয়ে প'ড়ে থাকলেও এক মুঠো চাল দেবে না। যদি আমার পরামর্শ শোনেন, তা বোন্‌পোই হ'ন আর যাই ই হোন, এ বেশে গিয়ে একেবারে মাসীর কাছে উপস্থিত হবেন না, তা হ'লে অমনি ধূলো-পায়ে বিদায়। অন্ত কোথাও দু' পাঁচ দিন বাসা ক'রে থেকে, পাকা বোষ্টম সেজে—হ্যাঁ, ভাল কথা, যদি ব্রজবল্লভ গোস্বামীকে ধ'রে তাঁর সুপারিস যোগাড় করতে পারেন, তা হ'লে অব্যর্থ, বেশ কিছু পেয়ে যেতে পারেন।

গজু। সে আবার কে?

চারু। ঐ গোস্বামী মশাই-ই হচ্ছেন, সোনার কাঠী—রূপার কাঠী, তাঁর কথায় চৈতন্ত-মঙ্গল ছাপাবার জন্ত একটা লোককে দু' হাজার টাকা দিয়ে দিয়েছিল। গোঁসাইটা নেহাৎ কশাই নয়, সব ঝোলটাই নিজের কোলে টানে না, তবে বোষ্টম কি গোঁসাই—গোঁসাই কি বোষ্টম।

গজু। কোথায় বাসা করি, আমি ত কিছুই চিনিনি—তার ওপর তোমার সঙ্গে ত সব পরামর্শ করা চাই ব্রাদার।

চারু। (ঈষৎ হাস্ত করিয়া) যদি যাত্রাওয়ালা ব'লে অবজ্ঞা না করেন, তবে এ গরীবের বাড়ীতে দু' পাঁচ দিন—আমি ব্রাহ্মণ।

গজু। ব্রাহ্মণ—তোমার সঙ্গে দেখা না হ'লে ত সব মাটী হয়ে গিয়েছিল, তুমি আমার ব্রাদার—ব্রাদার কি, ব্রাদ্রার্স—ফাদার—মাই ফাদার। তোমার বাড়ী অবশ্য আমি ঘোষ্ট হব।

গাড়ী নবদ্বীপ ষ্টেশনে থামল, গজু নেমেছেন; ঐ দেখুন, পথে আগে আগে চারু—পেছনে গজু.—মনে মনে চিন্তা, বোষ্টম—তা ঐটেই বাকি আছে, কি করি—একমাত্র উপায় মাসী।

[ক্রমশঃ।

শ্রীঅমৃতলাল বসু।

রামপ্রসাদ ও প্রসাদী সঙ্গীত

৩

এ কালের কবি স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার বড়াল তাঁহার প্রসিদ্ধ 'বঙ্গভূমি', শীর্ষক কবিতায় দেশ-মাতৃকার গৌরব-স্মরণ-কল্পে বঙ্গদেশকে 'মুকুন্দ-প্রসাদ-মধু-বঙ্কিম-জননী' বলিয়া আহ্বান করিয়াছেন। দুই শতাব্দী পরেও ইংরাজী-শিক্ষা-আলোড়িত আধুনিক কবিচিত্ত হইতে রামপ্রসাদের স্মৃতি যে স্খলিত হইয়া পড়ে নাই সে শুধু তাঁহার ঐ এক পদাবলীরই গুণে। রামপ্রসাদের এই সকল গীতি গুঞ্জনের কেন্দ্রস্থলে যিনি দণ্ডায়মানা, তিনি 'কালী'—কবির সহিত জননী-সন্তান-সম্বন্ধে তিনি আবদ্ধা—কবির চিত্তমধুপ ভক্তিসূত্রে এই পরমা শক্তির পাদপদ্মে যুক্ত—তৃতীয় ব্যক্তি-হিসাবে তিনি এখানে প্রকৃতি পুরুষ, রাধাকৃষ্ণ বা কোনও দেবদেবীর দ্বৈত-লীলার দ্রষ্টা বা কাব্যকার নহেন, পরন্তু অনন্যনিষ্ঠায় এক অদ্বৈত মানস-প্রতিমার উপাসক। শিবকে আমরা মধ্যে মধ্যে এই গীতি-নিকুঞ্জে দেখিতে পাই বটে, কিন্তু শুধু এই কথাটি বুঝাইবার জন্যই তিনি দেখা দেন যে কবি রামপ্রসাদের আকাঙ্ক্ষিত ঐ পাদপদ্ম তাঁহার শিবত্ব পদেরও অদ্বিতীয় সনদ। কবির লক্ষ্য,—প্রাণপণে শুধু চেষ্টা করিতে থাকা—"শিবের সর্ব্বস্ব-ধন মায়ের চরণ, যদি আন্‌তে পারি হ'রে।" তবে, এই হরণকার্য্যে ভয়ের কারণ আছে—

"জাগা ঘরে চুরি করা,
ইথে যদি পড়ে ধরা?"

শিব স্বয়ং যে চরণের দ্বারে সজাগ প্রহরী, তাহা চুরি করিতে গিয়া যদি ধরা পড়িতে হয়? উত্তর—

"তবে মানবদেহের দফা সারা,
বেঁধে লবে কৈলাসপুরে।"

কিন্তু ইহা ভয়ের না অভয়ের কথা? বড় জোর সে ক্ষেত্রে কৈলাসপুরীতে বাঁধিয়া লইয়া যাইবে এবং মানবদেহের মেয়াদ ফুরাইবে। কিন্তু লক্ষ্যই যে তাই—ঐ কৈলাসপুরীই যে রামপ্রসাদের অনাদিকালের আদিম ঘর! সেই জন্যই তাঁহার "ক্ষেত্রে কর্ম্ম" বিধানের সংকল্পও অপূর্ব্ব! যদি তাহাই ঘটে—"যদি যাইতে পারি ঘরে," তাহা হইলে—

"ভক্তিবাণ্ হরকে মেরে,
শিবত্ব পদ লব কেড়ে।"

বস্তুতঃ এই সঙ্গীতটি হইতেই আমরা রামপ্রসাদের শক্তিসাধনলক্ষ্য ধারণা করিবার অবকাশ পাই। তথাপি মনের মধ্যে এই প্রশ্নটি পর ক্ষণেই জাগিয়া উঠে যে, কবি তাঁহার এই লক্ষ্যলাভে সমর্থ হইয়াছিলেন কি না? কবির নিজের জবানীতে দেখি:—

"কালীপদ আকাশেতে মন-ঘুড়িখান উড়তেছিল,
কলুষ-কুবাতাস পেয়ে
ঘুড়ি, গোপ্তা খেয়ে প'ড়ে গেল।
মায়া কান্নি হ'ল ভারী,
ঘুড়ি আর রাখিতে নারি
দারাপত্য মায়া-দড়ি
এরা দু'জন জয়ী হ'ল।"

এইরূপ আরও অনেক সঙ্গীতে দেখিতে পাই যে, তিনি বারংবার আপনার লক্ষ্যসাধনের এমন অনেক বিঘ্ন কল্পনা করিয়াছেন, যেগুলিকে তাঁহার ঐ আরাধ্যা কালীর মধ্যে সমন্বিত করিয়া তুলিতে পারা যায় নাই বলিয়াই দুঃখ জাগিয়াছে ও অবসাদ দেখা দিয়াছে। অথচ এই কালীকে তিনি "মায়াতীত নিজে মায়া"রূপেও কল্পনা করিয়াছেন; এ কথার অর্থ অবশ্য এই যে, 'মায়া'র দিকে যিনি বন্ধন, 'মায়ার অতীত'দিকে তিনিই 'মুক্তি'—দুই দিকেই তিনিই ব্যক্ত; মায়ার দিক যদি মায়ার অতীত দিককে আচ্ছন্ন করে, তবেই তাহা বন্ধন হইয়া দাঁড়ায়, অপরপক্ষে মায়ার অতীত দিক যদি মায়াকে প্রকাশ না করে, তবে সৃষ্টিই অসম্ভব হইয়া পড়ে—নিজেকে যদি 'মায়ার অতীত' অবস্থায় তুলিতে পারি, তবে মায়া আর বন্ধন না থাকিয়া মুক্তির আনন্দেই উদ্ভাসিত হইয়া উঠে, শিখা ও আলোককে পরস্পর অবিরোধী সম্পূর্ণতারূপেই দেখিতে পারি এবং বন্ধনের মধ্যেই মুক্তিকে পাইয়া 'মায়া দড়ি' সম্বন্ধেও ভয়হীন হই,—কেন না, সে ক্ষেত্রে নিঃসংশয়ে বুঝি যে, 'মায়ের কোল' মায়ার মধ্যেও প্রসারিত আছে। বলা বাহুল্য, এ সঙ্গীতটিতে ইহার বিপরীত ধারণাই সূচিত হইয়াছে—আর এই বিপরীত ধারণা তাঁহার নিজেরই মুক্তিকে খণ্ডিত ও দুর্ব্বল করিয়া তুলিয়াছে। লক্ষ্য স্থির হইয়া গিয়াছে, অথচ লক্ষ্যস্থলে পৌঁছিবার উপায়গুলি পূর্ণতা প্রাপ্ত হইতেছে না—নানা দিক হইতে নানা বিঘ্ন আসিয়া পথরোধ করিতেছে—এমনই অবস্থায় মনে যে চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়, তাহার পরিচয় রামপ্রসাদের গানে আমরা বারংবার পাই। আরও কয়েকটি উদাহরণ লওয়া যাক:—

১। "দুঃখের কথা শোন মা তারা।
আমার ঘর ভাল নয় পরাৎপরা।
*　　*　　*　　*
এ সংসারেতে সং সাজিয়ে
সার হ'ল গো দুখের ভরা।
রামপ্রসাদের কথা লও মা,
এ ঘরে বসতি করা।
ঘরের কর্ত্তা যে জন স্থির নহে মন
দু'জনেতে কল্লে সারা।"...

এখানে এই অভিযোগই দেখিতেছি যে, 'ঘরের কর্ত্তা মন' ষড়রিপুকে নিয়ন্ত্রিত করিবার অধিকার এখনও না পাইয়া তৎকর্ত্তৃক চালিত, সুতরাং অস্থির রহিয়াছে। ভাগবত সত্য এখনও অস্পষ্ট, সুতরাং ঘর, সংসার ও জীবন স্বতন্ত্র সত্তার দুঃখেই ভারাক্রান্ত। অথচ

যে 'মন' সম্বন্ধে রামপ্রসাদ অভিযোগ করিয়াছেন, সেই 'মন'কে ভগবানের দানরূপে পাইয়া পারস্যের কবি সেখ সাদী স্রষ্টার নিকট কৃতজ্ঞতাই প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন :—

"করেছো সম্রাট্ অন্তরে দিয়া ত্রিলোক চালক মন,
দশ ইন্দ্রিয়ে দশ দিকে যার উদ্যত প্রহরণ ;
তবু 'চরণী সংশয় দীন ভয়ে ভয়ে হই সারা
পাছে না কর গো! প্রতি দিবসের আহার্য্য আয়োজন।"

এই দ্বিবিধ কবি-দৃষ্টির পার্থক্য সম্বন্ধে আমরা কোনও অভিমত প্রকাশ করিব না—কেবলমাত্র পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করাই আমাদের উদ্দেশ্য। রামপ্রসাদ মনকে বলিয়াছেন, "পাঁচ সোয়ারের ঘোড়া" আর সাদীর ঐ মন অবশ্য দশ ঘোড়ার সোয়ার। দুইটি বিপরীত কেন্দ্র হইতে দু'জনে মনকে দেখিয়াছেন—

* * * *

২। "ভূতের বেগার খাটিব কত।
তারা, বল্ আমায় খাটাবি কত॥
আমি ভাবি এক, হয় আর
সুখ নাই মা কদাচিত।
পঞ্চদিকে নিয়ে বেড়ায়
এ দেহের পঞ্চভূত॥...

* * * *

৩। মা, আমায় ঘুরাবি কত।
কলুর চোখ ঢাকা বলদের মত॥
ভবের গাছে জুড়ে দিয়ে মা
পাক দিতেছ অবিরত॥" ইত্যাদি।

* * * *

এ সমস্তই সেই অবস্থার চিত্র—যখন লক্ষ্যলাভ হয় নাই—যখন "ব্রহ্মময়ী সর্ব্বঘটে" এই সত্য বুদ্ধির ক্ষেত্রে দেখা দিলেও বোধিমূলে প্রতিষ্ঠা পায় নাই। কোনও কোনও সমালোচক বলিয়াছেন যে, দুঃখবাদই না কি ভারতবর্ষের বিশিষ্ট বাণী এবং এই দুঃখ-নিবৃত্তির উপায়-উদ্ভাবনাতেই ভারতীয় সাধনার নিগূঢ় পরিচয় নিহিত। কৈলাস বাবুও বলিয়াছেন—"ভারতের সাধনার লক্ষ্য যা, আত্যন্তিক দুঃখ-নিবৃত্তি—রামপ্রসাদের সাধনারও তাহাই লক্ষ্য, আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক এই ত্রিবিধ দুঃখ হইতে পরিত্রাণলাভ। ইহাই প্রাচ্যদর্শনের বিশেষত্ব—পাশ্চাত্যদর্শন অন্যরূপ, উহা কেবল মন লইয়াই ব্যস্ত।" এরূপ উক্তি অ'শ্য প্রাচ্য বা পাশ্চাত্য কোনও প্রকার 'দর্শন' সম্বন্ধেই মানুষের বুদ্ধির দৃষ্টিকে এক পদও অগ্রসর করে না, কেন না, মনকে লইয়া ব্যস্ততা প্রকাশ না করিলে কি প্রাচ্য কি পাশ্চাত্য কোনও দর্শনই খাড়া হইতে পারে না, তা' ছাড়া ত্রিবিধ 'দুঃখ' আছে অথচ 'মন' নাই, এরূপ হেঁয়ালী বুঝিয়া উঠাও দায়। রামপ্রসাদ স্বয়ং অবশ্য ভারতীয় 'ষড়্দর্শন'কে ছটা অন্ধ বলিয়াই প্রচার করিয়াছেন এবং উহাদের দুঃখবাদের বিপুল গৌরব সগৌরবে উপেক্ষা করিয়াই, স্থানান্তরে 'ভক্তি' ও 'আনন্দ'কেই তাঁহার জননীর 'দর্শনী' বলিয়া বুঝাইয়াছেন, * তথাপি 'ষড়্দর্শন' যে তাঁহার মনের গায়ে দুঃখ মাখাইয়া দিতে ছাড়ে নাই, বুঝি বা সে ঐ গালাগালি খাওয়ারই রাগে। ফল কথা, ষড়্দর্শনের ষট্চক্র যে রামপ্রসাদের মত বিশ্বাস বলিষ্ঠ ব্যক্তির পক্ষেও নিতান্ত সহজভেদ্য হয় নাই, তাহা এই স্তরের সঙ্গীতগুলিতে আমরা স্পষ্ট দেখিতে পাই। এই সাধনমার্গের অবশ্যম্ভাবী অতৃপ্তির কথা এ যুগের জগৎ বিখ্যাত কবি রবীন্দ্রনাথের মুখেও আমরা বারংবার শুনিয়াছি ; একটিমাত্র দৃষ্টান্ত দেখাই :—

"ভুবন হইতে বাহিরিয়া আসে ভুবনমোহিনী মায়া,
যৌবনভরা বাহুপাশে তার বেষ্টন করে কায়া ;
শ্লথ হয়ে আসে হৃদয়তন্ত্রী, বীণা যায় খ'সে পড়ি'
নাহি বাজে আর হরিনাম গান বরষ বরষ ধরি',
হরিহীন সেই অনাথ বাসনা পিয়াসে জগতে ফি'রে—
বাড়ে তৃষা কোথা পিপাসার জল আকুল লবণ-নীরে।"

রামপ্রসাদেও দেখি—

"সাধের ঘুমে ঘুম ভাঙ্গে না।
ভাল পেয়েছ ভবে কাল-বিছানা॥
এই যে সুখের নিশি
জেনেছ কি ভোর হবে না।
তোমার কোলেতে কামনা-কান্তা
তারে ছেড়ে পাশ ফের না॥"

এখানেও স্পষ্টতঃই এক 'নেতি'বাদ প্রত্যক্ষীভূত, 'কামনা-কান্তা'কে ব্রহ্মবিচ্ছিন্ন কিছু বুঝিয়াছি বলিয়াই তাহাকে ত্যাগ করিবার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইয়াছে ; কিন্তু ত্যাগ না করিয়া ব্রহ্মের সহিত ইহার যোগও সম্ভব। এক কথায়, যে কেন্দ্র হইতে দেখিলে সমস্ত আপাতঃ বৈষম্যকেই এক অখণ্ড সত্তার বিচিত্র লীলা-হিল্লোলরূপেই গ্রহণ করা যায় এবং যে কেন্দ্রীয় দৃষ্টি বলিতে চায়—

"তোমার অসীমে প্রাণ-মন লয়ে
যত দূরে আমি যাই,
কোথাও মৃত্যু কোথাও দুঃখ
কোথা বিচ্ছেদ নাই ;
মৃত্যু সে ধরি মৃত্যুর রূপ,
দুঃখ সে হয় দুঃখের কূপ
তোমা হ'তে যবে স্বতন্ত্র হয়ে
আপনার পানে চাই।
অন্তর-গ্লানি, সংসার-ভার,
পলক ফেলিতে কোথা একাকার,
তোমার স্বরূপ জীবনের মাঝে
রাখিবারে যদি পাই"—

সেই স্বরূপ-দৃষ্টির পরিচয় এই জাতীয় সঙ্গীতগুলির ভিতর আকার লাভ করে নাই। এই জন্যই রামপ্রসাদের "এ সংসার ধোঁকার টাটি" নামক গানটিকে লক্ষ্য করিয়া অচ্যুত গোস্বামী যে পংক্তি কতিপয় নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে কেবলমাত্র সরস পরিহাস ছাড়া সত্যের একটি নির্ম্মল প্রকাশও আমরা দেখিতে পাই। রামপ্রসাদের—

"গর্ভে যখন যোগী তখন
ভূমে প'ড়ে খেলেম মাটী। (১)
ওরে ধাত্রীতে কেটেছে নাড়ী,
মায়ার বেড়ি কিসে কাটি॥

* "ষড়্দর্শনে দর্শন পেলে না, আগম নিগম তন্ত্রসারে।
সে যে ভক্তিরসের রসিক, সদানন্দে বিরাজ করে পুরে॥"

(১) এই কয়টি পংক্তির ধারণার সহিত 'ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের "ode on immortality"র জন্মসম্পর্কিত ধারণার চমৎকার সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। পৃথিবীতে জন্মলাভ যে যোগবিচ্ছিন্ন হইয়া ভগবৎ-সান্নিধ্য হইতে দূরে যাওয়া, এরূপ কথা সেখানেও দেখি :—

রমণী-বচনে সুধা, সুধা নয় সে বিষের বাটি
আগে ইচ্ছা-সুখে পান ক'রে,
বিষের জ্বালায় ছটফটি।"

এই গানটি এবং অনুরূপ আরও কয়েকটি গানের সহিত রবীন্দ্রনাথের নিম্নোদ্ধৃত গানটির যদি তুলনা করা যায়, তাহা হইলে দেখিব যে, 'মায়ার 'বেড়ী' বা 'বিষের বাটি'রূপে একের পক্ষে যেগুলি অসার উপকরণ, অপরের চক্ষুতে তাহা কি ভাবে সুসমঞ্জস হইয়া উঠিয়াছে :—

"জীবনে আমার যত আনন্দ
পেয়েছি দিবস-রাত,
সবার মাঝারে তোমারে আজিকে
স্মরিব জীবননাথ।
যে দিন তোমার জগত নিরখি'
হরষে পরাণ উঠেছে পুলকি'
সে দিন আমার নয়নে হয়েছে
তোমারি নয়নপাত।
পিতা, মাতা, ভ্রাতা, প্রিয় পরিবার
মিত্র আমার, পুত্র আমার
সকলের সাথে হৃদয়ে প্রবেশি'
তুমি আছ মোর সাথ—
সব আনন্দ মাঝারে তোমারে
স্মরিব জীবননাথ।"

এখানে অবশ্য ত্রিবিধ দুঃখবাদের বনেদী গৌরব-গান নাই, ইহা আনন্দবাদ বা জীবন্মুক্তিবাদ, তথাপি ইহাও ভারতবর্ষীয়—এমন কি, রামপ্রসাদেরই সেই "শয়নে প্রণাম জ্ঞান, নিদ্রায় কর মা'কে ধ্যান" সঙ্গীতের অঙ্গীভূত ধারণাই স্পষ্ট ও সুপ্রতিষ্ঠিত প্রকাশ। এখানেও আমরা কেবলমাত্র পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্যই দুইটি বিভিন্ন কবি দৃষ্টির নমুনা পাশাপাশি ধরিয়া দিলাম—ভাল-মন্দ বা ছোট-বড় নির্দ্দেশ করিবার অভিপ্রায়ে নহে। আর প্রকৃতপক্ষে, সংসারকে ভগবৎ-বিরোধী কিছু ভাবিয়া সত্যই যে রামপ্রসাদ সারাজীবন অশান্তি ভোগ করিয়াছেন, তাহাও নহে; আত্ম-স্বাতন্ত্র্যকে বিশ্ব-নিয়মের বা জগৎ-স্রোতের বিরুদ্ধে একান্ত করিয়া না ধরিয়া ভগবৎপ্রতিষ্ঠ বা 'কালী'পদে উৎসর্গীকৃত জীবনই তিনি যাপন করিতে চাহিয়াছিলেন, তাই সমস্ত দুঃখ নিবেদন ও অসন্তোষ প্রকাশের মাঝখানেও 'বুড়ী ছুঁইয়া' থাকার শান্তি ও তৃপ্তি তাঁহাকে পরিত্যাগ করে নাই। প্রকাশ, প্রণালীর খুঁটিনাটির ক্রম না ধরিয়া যদি তাঁহার চক্ষুতেই তাঁহার জগৎ দেখিবার চেষ্টা করি, তাহা হইলে বুঝিব যে, এই এক 'কালী' নাম স্মরণের মধ্যেই তাঁহার মন এতখানি ভরিয়া উঠিত, যাহার মৃত্যুঞ্জয়ী আনন্দই তাঁহার দৃষ্টি-বৈষম্যকে ছাপাইয়া উঠিবার পক্ষে যথেষ্ট ছিল।

এই "কালী" নামটা "বড়ই মিঠা" তাঁহার কাছে ত ছিলই—তার পর,—

"প্রসাদ বলে কুতূহলে,
এমন মেয়ে কোথায় ছিল।
না দেখে নাম শুনে কানে
মন গিয়ে তায় লিপ্ত হলো।"

এ যেন রাধিকারই সেই—"কেবা শুনাইল শ্যাম নাম; কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো, আকুল করিল মোর প্রাণ।" যদি রামপ্রসাদের অন্তরে প্রবেশ করিতে চাই, তবে ঐ নামের গুরুত্বই আমাদের প্রথম ও প্রধান বিবেচ্য হওয়া উচিত, যেহেতু, তাঁহার মুখের কথা নানা দিকে ধাবিত হইলে মনটি বরাবরই এইখানে একনিষ্ঠ হইয়া আছে—এইখানেই তাঁহার আশা-ভরসা, বল-বিশ্বাস, প্রীতি-ভক্তি, মুক্তি ও তৃপ্তি সমস্তই।

৪

নামের এই মাহাত্ম্য-বুদ্ধির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া রামপ্রসাদের 'কালী'র প্রকৃতির কথা ভাবিলে আমরা দেখিতে পাই যে, ইনি সেই ভয়ঙ্করী উগ্রা সংহাররূপিণী নহেন, যিনি নাকি—

"বিচিত্র-খট্বাঙ্গ-ধরা নর মালা-বিভূষণা,
দ্বীপি-চর্ম্মপরীধানা শুষ্কমাংসাতিভৈরবা,
অতিবিস্তার-বদনা জিহ্বা ললন-ভীষণা,
নিমগ্নারক্তনয়না নাদাপুরিতদিঙ্মুখা।"

পরন্তু, এমন এক স্নেহ-করুণাময়ী বাৎসল্য-সর্ব্বস্ব মাতৃ-মূর্ত্তি—যাঁহার নিকট আবদার চলে, যাঁহার সহিত কলহ করিয়া খুসী হওয়া যায়, এমন কি, যাঁহাকে গালাগালি দিলেও বড় কিছু যায় আসে না। ইনি পালোয়ানদের কাঁচা মুণ্ড কাটা অপেক্ষা "সগুণে নির্গুণে বাধিয়ে বিবাদ ঢেলা দিয়ে ঢেলা" ভাঙ্গিবার খেলাতেই বেশী আমোদ পান।...পারস্যের জ্যোতির্ব্বিদ্ কবি ওমর খৈয়াম যেমন সৃষ্টির ভিতর নানারূপ আবিলতা দেখিয়া ভগবান্ ও মানুষের মধ্যে ক্ষমার আদান-প্রদান ছাড়া অন্য কোনপ্রকার রফায় রাজী না হইয়া বলেন,—

"শিল্পী ওগো, গড়লে যদি মর্ত্তভূমি মলিনতমা;
নন্দনেরও গোপন বুকে সর্পজীবন রাখলে জমা,
কলঙ্কিত মানব-জগৎ যে সব পাপে তাহার লাগি'
ক্ষমা কর মনুষ্যদেব, মানুষ তোমায় করছে ক্ষমা।"

রামপ্রসাদও সেইরূপ মনের উর্দ্ধগতি ও অধোগতি এই উভয়েরই জন্য তাঁহার ইষ্টদেবীকে দায়ী করিয়া শুনান,—

"মন গরীবের কি দোষ আছে?
তুমি বাজীকরের মেয়ে শ্যামা,
যেমন নাচাও তেমনি নাচে!"...

প্রথম উক্তিটি দার্শনিকের, আর দ্বিতীয় উক্তিটি শ্রদ্ধা ও স্নেহে পরিপূর্ণ হৃদয়ের। সেই জন্য রামপ্রসাদ ওমরের মত দোষ দিয়াই থামেন নাই, দোষ নিবারণের দায়িত্ব আপন অন্তরে জাগ্রত কালীর দিকে আকর্ষণ করিয়াও লইয়াছেন এবং মনকে শিষ্য করিয়া ও তাহার গুরুর আসনে বসিয়া এইভাবে তাহাকে কেন্দ্রস্থ হইবারও পথ দেখাইয়াছেন,—

"আয় মন বেড়াতে যাবি।
কালী-কল্পতরুতলে গিয়া,
চারি ফল কুড়ায়ে খাবি।
প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি জায়া,
তা'র নিবৃত্তিরে সঙ্গে লবি।

"জন্ম নহে অন্ত কিছু, শুধু বিস্মরণ আর ঘুমাইয়া পড়া;
আত্মা যাহা জাগে সাথে ধ্রুবতারাসম,
আসে ছাড়ি' লোকান্তর অতি দূরতম,
অর্দ্ধ-নগ্ন, অর্দ্ধ মগ্ন,—আধ-সুপ্তি-চেতনায় গড়া।
রবির আভাসে ভরা সুরঞ্জিত মেঘমালা প্রায়
বিভুবক্ষ গৃহ ছুটি' উঠি মোরা ফুটিয়া ধরায়
[illegible]বচিহ্নিত মহামহিমায়।
শৈশবেরে, ঘেরি' ঘেরি' স্বর্গরাজ্য শতদিকে ভাসে—
ক্রম-বিবর্জ্জিত বাল্যে কারার প্রাচীর-ছায়া ধীরে ধীরে ঘনাইয়া আসে।"

ওরে, বিবেক নামে জ্যেষ্ঠ পুত্র
তত্ত্বকথা তায় শুধাবি ॥
অশুচি শুচিকে লয়ে দিব্য ঘরে কবে শুবি।
যখন দুই সতীনে পিরীত হবে
তখন শ্যামা মা'কে পাবি ॥
অহঙ্কার আর অবিদ্যা তোর
পিতা-মাতায় তাড়ায়ে দিবি।
যদি মোহ-গর্ত্তে টেনে লয়, মন
ধৈর্য্য খুঁটা ধ'রে রবি ॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম দুটো অজা, তুচ্ছ হেড়ে বেঁধে দিবি।
যদি না মানে নিষেধ, তবে
জ্ঞান-খড়্গে বলি দিবি।
প্রথম ভার্য্যার সন্তানেরে
দূরে হ'তে বুঝাইবি।
যদি না মানে প্রবোধ,
জ্ঞান-সিন্ধুজলে ডুবাইবি ॥
প্রসাদ বলে এমন হ'লে
কালের কাছে জবাব দিবি।
তবে বাপু—বাছা—বাপের ঠাকুর
মনের মতন মন হবি।"...

এই সঙ্গীতে যে 'নিবৃত্তি'কে সঙ্গে লওয়ার কথা উঠিয়াছে, তাহাতে আমরা এরূপ বুঝি না যে, তিনি সংসার-ত্যাগরূপ বৈরাগ্যকে বা লোকারণ্য ছাড়িয়া উদ্ভিজ্জ অরণ্যাবাসকেই শ্রেয় বিবেচনা করিয়াছেন, বরং ইহাই বুঝি যে, জীবনের বিচিত্র কর্ম্মপথের মূল পাথেয়-হিসাবে 'অনাসক্তি'কেই প্রাণ-মূলে ধরিয়া তিনি 'মায়ার রাজ্যে' গা ভাসাইয়া থাকিবার জন্য * 'মায়াতীত'-স্বরূপেই প্রতিষ্ঠা চাহিয়াছেন। ইহা এই জন্যই আবশ্যক যে, নির্লিপ্ত বা অনাসক্ত চিত্তের স্বচ্ছ মুকুরেই সৃষ্টিকেন্দ্রের নির্ম্মল নিষ্কলঙ্ক আনন্দ-স্বরূপা প্রেম-প্রতিমার প্রতিবিম্বপাত ঘটিতে পারে—আসক্তি-আবিল মানস-দর্পণে নহে। এই কেন্দ্রীয়া প্রেম-প্রতিমাই 'মা' · ভক্ত রামপ্রসাদের কালী—যাঁহার সহিত ভক্তি যোগসূত্রে আবদ্ধ থাকিয়া রূপে-রসে অপরূপ ব্রহ্মাণ্ডচক্র ঘুরিয়া চলিয়াছে; যাঁহার প্রেম-জ্যোতিঃ ভগ্ন ও বক্র, অস্পষ্ট ও মলিন মানস-দর্পণগুলির প্রকৃতি-বৈষম্যের অনুপাতে দিকে দিকে খণ্ডিত হইয়া আছে, যাঁহাকে আচ্ছন্ন করিয়া আমাদের ব্যক্তিগত বাসনার দিশাহারা তরঙ্গ বিক্ষোভ স্বার্থ-তৃপ্তিসাধনের জন্য নানাদিকে ধাবিত হইতেছে এবং অহঙ্কারের চরমসীমায়, সৃষ্টিমর্ম্মমূলের এই নির্ম্মল মাতৃদর্পণে প্রতিফলিত আপনাপন বিদ্রোহী অন্তঃপ্রকৃতির মুখ দেখিতে পাওয়াকে আকস্মিক খড়্গাঘাতের মতই স্বাতন্ত্র্য-বুদ্ধির দ্বারে ফিরিয়া পাইতেছে—এই মা, যাঁহাকে স্বতন্ত্র বাসনার যবনিকা সরাইয়া পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ করিবামাত্র আমাদের জীবনের অর্থ আমূল পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইবে, সকল ছিন্ন স্বার্থই এক পরমার্থে উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে; শুচি-অশুচি, ধর্ম্মাধর্ম্ম ও জন্ম-মৃত্যুর যাবতীয় কুহেলিকাই এক অবিচ্ছিন্ন আনন্দ-কিরণসম্পাতে মিলাইয়া যাইবে, যে সৃষ্টি আমাদিগকে কাঁদাইতেছে, তাহা সর্ব্বাঙ্গ দিয়া দৃষ্টির সম্মুখে হাসিতে থাকিবে, আর সেই পুণ্যমুহূর্ত্তে,—

"হৃদি-পদ্ম উঠবে ফুটে, মনের আঁধার যাবে ছুটে,
ধরাতলে পড়বো লুটে, তারা ব'লে হব সারা;
ত্যজিব সব ভেদাভেদ ঘুচে যাবে মনের খেদ
ওরে, শত শত সত্য বেদ,
তারা আমার নিরাকারা।"...

সে দিন আর শুধু শাস্ত্রের দোহাই দিয়া নয়, গুরুবাক্য বলিয়া নয় বা বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্যেও নয়—কিন্তু প্রত্যেক ইন্দ্রিয়দ্বারে দণ্ডায়মান বিশ্ব-জগৎ-বৈচিত্র্যের ভিতর এবং বোধিমূলের প্রত্যেকটি প্রবাহ দিয়া দেখিব ও দেখাইব,—

"মা বিরাজে সর্ব্বঘটে,
ওরে আঁখি অন্ধ দেখ মা'কে
তিমিরে তিমির-হরা।"

* * * *

রামপ্রসাদের পদাবলী সম্পর্কে ইহুদীরাজ 'ডেভিডে'র স্তোত্র এবং 'হাফিজে'র গজলগুলির কথা কাহারও কাহারও মনে আসিয়াছে। হাফিজের 'দিওয়ান' বা 'গজল গ্রন্থ' আপাততঃ আমাদের হাতের কাছে নাই, তবে যত দূর স্মরণ হয়, তাহাতে হাফিজের প্রেম-গীতির সহিত আমাদের বিদ্যাপতি বা চণ্ডীদাসের সাদৃশ্য যত সন্নিকট, রামপ্রসাদের তত নহে। হাফিজের প্রেম সাধনা ও রামপ্রসাদের মাতৃভাব-সাধনার দার্শনিক জমী ও দৃষ্টির প্রণালী বিভিন্ন। হাফিজের প্রেম যেখানে ইন্দ্রিয়রাজ্য অতিক্রম করিয়া অতীন্দ্রিয় লোককে স্পর্শ করিয়াছে, সেখানেও তাঁহার ব্যক্তিত্বই দেবতা হইয়া উঠিয়াছেন। এই দেবতা কামনার ফলদাতা, অন্তর্য্যামী,—অপরপক্ষে রামপ্রসাদের মা কামনা নিবারণের অব্যর্থ শক্তি, 'আমি'কে নাশ করিয়া জাগা 'তুমি,' হৃৎকমল-মঞ্চে অধিষ্ঠিতা, জগৎ-সংসারের অদ্বিতীয় সত্তা এবং স্বাতন্ত্র্য বিবেকীর সর্ব্বপ্রকার ভোগের নিরাশকর্ত্রী ও যোগগম্যা। তথাপি সত্যেন্দ্র দত্তের অনূদিত 'রুবাইয়াৎ'কতিপয় হইতে হাফিজের তিনটি চতুষ্পদী এখানে ধরিয়া দিতেছি, রামপ্রসাদের সহিত তুলনা করিয়া সূক্ষ্ম প্রভেদ যাহাই চোখে পড়ুক, অন্ততঃ একই ব্যক্তির আলোচনার মাঝখানে, তাহাতে রস-বৈচিত্র্যের আস্বাদনও পাওয়া যাইবে।

হাফিজ

সকল কামনা সফল করিতে তুমি আছ কৃপাময়,
তুমি কাজী, তুমি কোরাণ আমার তুমি মোর সমুদয়,
আমার মনের কথাটি তোমায় কি আর জানাব আমি?
তোমার অজানা কি আছে জগতে, তুমি অন্তর্য্যামী।

* * * *

হৃদয়ে করেছি কাঁদিবার ঠাঁই, তোমার বিরহে স্বামী!
সান্ত্বনা, তাও রেখেছি হৃদয়ে যতনে লুকায়ে আমি;
শত ঝঞ্ঝার আঘাতে পরাণ যতই পীড়িছ প্রভু!
অটল হৃদয়—প্রত্যয় তার ভাঙিয়া পড়ে না তবু।

* * * *

মরণের বাণ এ দেহ-দেউল যখন করিবে চূর্ণ,
সেই মুহূর্ত্তে জীবন-পাত্র ভরিয়া হইবে পূর্ণ!
তখন হাফেজ সতর্ক থেকো, যবে লয়ে যাবে তুলি'
জীবন-গৃহের সব তৈজস ক্রমশঃ কালের কুলি।

* * * *

ডেভিড সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, ডেভিডের ভগবৎবুদ্ধি এবং রামপ্রসাদের ভগবৎ-ধারণা আদৌ এক নহে। ডেভিডের 'লর্ড' বিশ্বের নেপথ্যে নেপথ্যে ভ্রাম্যমাণ কোনও এক প্রবল-প্রতাপান্বিত ব্যক্তিত্ব, যিনি, তাঁহাতে আস্থাবান্ ব্যক্তিদিগকে বিপন্মুক্ত করেন, তাঁহার

* "প্রসাদ বলে থাক ব'সে, ভবার্ণবে ভাসিয়ে ভেলা।
যখন আসবে জোয়ার উজিয়ে যাবে,
ভাটিয়ে যাবে ভাটার বেলা॥"
রবীন্দ্রনাথও বলিয়াছেন,—
"জগত-স্রোতে ভাসিয়া চল যে যেথা আছ ভাই।"

প্রশংসাকারীদের শত্রু সংহার করেন এবং তদ্বিশ্বাসী-জনকর্ত্তৃক সভা-সমিতিতে আপনার নাম বিঘোষিত দেখিলে খুসী হয়েন। একটি স্তোত্র উদ্ধৃত করিতেছি,—

"Be not thou far from me, O Lord: O my strengtp, haste thee to help me. Save me from the lion's mouth : for thou hast heard me from the horns of the unicorns. I will declare thy name unto my brethren : in the midst of the Congregation will I praise thee"—ইহা সেই ধরণের স্তুতি, যাহা বলিতে চায়—"মা কালী, এই বিপদ থেকে আমায় উদ্ধার কর মা, আমি তোমাকে জোড়া মোষ খাওয়াবো।" ডেভিডের এই ভগবান্ 'ভয়ঙ্কর' বলিয়াই প্রশংসার্হ, 'আনন্দ-স্বরূপ' বলিয়া ভক্তি-বরণীয় নহে। দৃষ্টান্ত:—Ye that fear the Lord praise him: all ye the seed of Jocob glorify him ; and fear him all ye the seed of Israil."

বলা বাহুল্য যে, রামপ্রসাদের ভগবৎবিজ্ঞান সম্পূর্ণ অন্য শ্রেণীর,—এখানে ভক্তিই মুখ্য, * ভগবান্ গৌণ,—হৃদয় হৃদয়ে ভক্তি-উদ্রেকের প্রতীক বলিয়াই তিনি দেয়। ভক্তি যখন জাগিয়াছে, তখন নাম ও রূপ হারাইয়া লইয়া তিনি সরিয়া পড়িলেও লোকসান নাই, যেহেতু, তখন তিনি "রসো বৈ সঃ।"

ঐ ডেভিডের ভগবান্, বা "ভয়ে ভক্তি উদ্রেক করাইবার কর্ত্তা" এ দেশেও যে প্রকারান্তরে নাই, তাহা নহে। আমাদের শীতলা, মনসা, ওলাবিবি প্রভৃতি উক্ত জাতীয়। তাহা ছাড়া, সবুজ পত্র-সম্পাদক প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের ধারণা যদি সত্য হয়, তবে শাক্ত-সম্প্রদায়ের 'শক্তি'সম্বন্ধীয় আদিম বুদ্ধিও এই জাতীয়। "ধনং দেহি, যশো দেহি দ্বিষো জহি"—এই শাক্তপ্রার্থনার মূলে যে মানসিকতা আছে, তাহা ঐ ডেভিডেরই নিকট আত্মীয়। তবে ঐ প্রার্থনা শুনিবামাত্র মনে হয়, যথোচিত প্রেমের অভাবেই মানুষ ধরিয়া লয় যে, এক দল বিদ্বেষী তাহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়া আছে, অতএব তাহাকে হনন করিবার জন্য শস্ত্রহস্ত হওয়াই দরকার। এমন মনোবৃত্তির মূলে আধ্যাত্মিক ভীরুতাই বর্ত্তমান। 'অসি-ধরা, আর 'বাঁশী-ধরা' হাতের প্রভেদই এইখানে যে, 'অসি-ধরা' শত্রু ভীতিগ্রস্ত, সুতরাং মারমুখী ; আর বাঁশী-ধরা 'বেপরোয়া,' কারণ, স্বভাবতঃই সে ধরিয়া লইতে পারিয়াছে যে, সে অজাতশত্রু।

শক্তি-উপাসনার মূলে যে মনোভাব কার্য্যকারী হইয়াছিল, তাহা প্রমথ বাবুর মতে-এই —

"Nature in Bengal is not always benign —she has also her angry moods Ours is the land of earthquakes and cyclones. of devastating floods and tidal waves, we live face to face with the destructive forces of nature and it is impossible for us to ignore her terrible aspect. Shakta poetry represents the lyrical cry of the human soul in presence of all that is tremendous and death-dealing in the universe."

প্রমথ বাবুর প্রচারিত এই মনস্তত্ত্বই যদি শাক্ত কবিতার প্রাণ হয়, তবে রামপ্রসাদের কবিতা অবশ্য শাক্ত-কবিতা নয়—খাঁটি বৈষ্ণব কবিতা। কারণ, 'ভয়ঙ্করের সম্মুখে লুটাইয়া পড়া মনের' কথা দূরে থাক, মনের সহজাত আনন্দ হইতে উৎসারিত ভক্তির আঘাতে সকল ভয় চূরমার করাতেই এগুলির বিশেষত্ব। শক্তির খাঁড়াধরা ও মুণ্ডমালা-পরা একটা আকৃতি অনেক কবিতায় আছে বটে, কিন্তু তাঁহার প্রকৃতি এতই বদল হইয়া গিয়াছে যে, ঐ আকার একটা 'সখ-পরিয়া-পরা সাজ' বলিয়াই মনে হয়,—প্রকৃতিরই বাহ্যস্ফুরণ বলিয়া মনে করা চলে না। প্রমথ বাবুও যে তাহা লক্ষ্য করেন নাই, এমন নহে ; সেইজন্যই রামপ্রসাদ সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন,—

"The Bengalee mind however humanised the motherhood of shakti, and the greatest of our shakti poets...Ramprosad—sang of her loving kindness in such simple and deep tones, that his songs are amongst the most popular in Bengal."

রামপ্রসাদের হাতে শক্তির উগ্রমূর্ত্তি humanised হইয়া আসিবার কারণ সম্ভবতঃ এই যে, তিনি চৈতন্যদেবের humanitarian movement এর ২ শত বৎসর পরবর্ত্তী হওয়ায় স্বভাবতঃই তাঁহার আবেষ্টনীর ভিতর দিয়া উক্ত মতবাদের সৌন্দর্য্য ও কোমলতা শোষণ করিবার অবকাশ পাইয়াছিলেন।

[ক্রমশঃ।

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ ঘোষ।

* "সকলের সার ভক্তি, মুক্তি তার দাসী।"—রামপ্রসাদ।

মোগলযুগে আমোদ-প্রমোদ

গুরু রাজকার্য্যজনিত শ্রম ও অবসাদ অপনোদনকল্পে বিবিধ আমোদ-প্রমোদের প্রয়োজনীয়তা মোগল বাদশাহরা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তৎপূর্ব্বে মৃগয়া বা অশ্বারোহণে কন্দুক ক্রীড়া ব্যতিরেকে অপর কোন-রূপে সুখে সময় কাটাইবার উপায় দিল্লীর সুলতানগণের আমলে ছিল কি না জানা নাই। প্রবল পরাক্রান্ত ভারতের অধীশ্বর আকবরের রাজত্বকালে যে সব ক্রীড়া-কৌতুক প্রচলিত ছিল, তাহার বিবরণ সর্ব্ব-পরিচিত ঐতিহাসিক আবুল ফজল তাঁহার লিখিত আইন-ই-আকবরীতে বিশদভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

আবুল ফজলের বিবরণে সর্ব্বপ্রথমে যাহা আমাদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তাহা হইতেছে, "চোগান" বা আজকালকার পোলো (polo) খেলা-বিশেষ। শুনা যায়, আকবর স্বয়ং এই খেলায় পারদর্শী ছিলেন। আবুল ফজল এই ক্রীড়ার মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিয়াছেন এবং ইহার একান্ত প্রয়োজনীয়তা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। অশ্বচালনায় দক্ষতা অর্জ্জন করাই এই খেলার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। "চোগান" খেলা হইত মাঠে দশ জন খেলোয়াড় লইয়া আর ইহাতে দল নির্ণয় করা হইত পাশা নিক্ষেপ করিয়া। প্রত্যেক খেলোয়াড়ের হস্তে "বল" লইয়া যাইবার নিমিত্ত একটি করিয়া দীর্ঘ দণ্ডের ব্যবস্থা ছিল। প্রতি ২০ মিনিট অন্তর দুইটি করিয়া খেলোয়াড় বদল হইত। কোন দল জয়লাভ করিলে "নাকরার" (ঢাকবিশেষ) ঘন নিনাদে জয় ঘোষণা করিত। সময়বিশেষে বাদশাহের আজ্ঞায় এই খেলা রাত্রিকালেও হইয়াছে, এমত দেখা যায়। অবশ্য স্মরণ রাখিতে হইবে যে, রাত্রি-কালে খেলার সরঞ্জামে কিছু বিশিষ্টতা থাকিত। খেলিবার গোলক-গুলি (বল) অগ্নির দ্বারা প্রজ্বলিত হইত এবং চতুর্দ্দিকে আলোর ব্যবস্থা করায় স্থানটাকে যে দিবসের ন্যায় উজ্জ্বল দেখাইত, তাহা সহজেই অনুমেয়। সইঅদ্ আবদুল্লা খাঁ এই খেলার তত্ত্বাবধায়ক ও ও সর্ব্বময় কর্ত্তা ছিলেন এবং তিনি সচরাচর "চোগান বেগী" বা চোগান খেলার পরিদর্শক বলিয়া অভিহিত হইতেন। আগ্রা হইতে প্রায় তিন মাইল ব্যবধানে ঘরিওয়ালী নামক স্থানে এই খেলার জায়গা নির্দ্দিষ্ট ছিল।

পারাবত উড্ডয়ন তৎকালীন এক উন্মাদনাজনক ক্রীড়ার মধ্যে পরিগণিত হইত। পারাবতগুলি যে কেবল কৌতুক নিমিত্ত ব্যবহৃত হইত, তাহা নহে। ইহারা সচরাচর অতি নিপুণতা ও দক্ষতার

সহিত পত্রবাহকের কায করিত দেখা গিয়াছে। সুদূর ইরাণ বা তুরাণ হইতে তদ্দেশীয় নৃপতিবৃন্দ স্থানীয় উৎকৃষ্টতম পারাবত আকবরের মনোরঞ্জনার্থ প্রেরণ করিতেন। গাত্রের বিভিন্ন বর্ণ, বিশিষ্ট দৈহিক গঠন ও কৌশল, এইগুলির উপর প্রত্যেক পারাবতের নামকরণ নির্ভর করিত। নীল চীনা বাসনের মত গাত্রের বর্ণ হইলে তাহার নাম হইত "চীনা"; জলের রং হইলে "আব"; চন্দ্রের ন্যায় পুচ্ছাগ্র হইলে "মাহদুম্", মশালের ন্যায় পুচ্ছাগ্র হইলে "মশালদুম্।" "বাঘা" পারাবতের প্রভাতে লোকদিগকে নিদ্রা হইতে জাগ্রত করাই ছিল কায; দ্রুত আবর্ত্তন গতির জন্য "লোটন" বিখ্যাত ছিল; আর মস্তক উন্নত করিয়া সগর্ব্বে পাদচালনায় "লক্কা" ও বড় একটা "কেওকেটা" ছিল না। বোধ হয়, বলিতে হইবে না যে, শেষোক্ত দুইটি পারাবতের সহিত আধুনিক যুগেও সকলের পরিচয় আছে। বাদশাহ যখন রাজধানী ছাড়িয়া দেশভ্রমণে বহির্গত হইতেন, তখন তাঁহার সঙ্গে এক পাল পারাবত থাকিত। আর এইগুলির তত্ত্বাবধানের ভার ছিল প্রায় ২ হাজার ভৃত্যের উপর এবং তাহাদিগের মাসিক বেতন ২ হইতে ৪৮ টাকা পর্য্যন্ত নিরূপিত ছিল। আবুল ফজল তাঁহার পুস্তকে পারাবতগুলির নির্দ্দিষ্ট খাদ্য কত ছিল বা তাহাদিগকে কি খাইতে দেওয়া হইত, ইহ ও বিবৃত করিতে বিস্মৃত হয়েন নাই। লিখিয়াছেন যে, সাধারণতঃ প্রায় ১ শত পারাবতের জন্য ৪ হইতে ৭ সের ধান্য বরাদ্দ ছিল।

তাসখেলাও আকবর বাদশাহের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিল এবং ইহাতেও তাঁহার মৌলিকত্ব ও বুদ্ধিমত্তা প্রস্ফুটিত হইয়াছে। তিনি স্বীয় উর্ব্বর মস্তিষ্কজাত অভিনব প্রণালী দ্বারা খেলিবার নিয়মাবলী প্রণয়ন করেন ও তাসগুলিকে নূতন করিয়া শ্রেণীবিভাগ দ্বারা নামকরণের আমূল পরিবর্ত্তন করেন। সৌভাগ্যক্রমে আমরা সেই নূতন নামকরণের বিবরণ প্রাপ্ত হই। এই স্থানে বলা অসঙ্গত হইবে না যে, আধুনিক তাসখেলায় যেমন সর্ব্বসমেত ৫২খানি তাস, চার রঙ্গে বা শ্রেণীতে বিভক্ত থাকে, মোগল যুগে (বিশেষতঃ আকবরের সময়ে) তাসের সংখ্যা ছিল ৮৮খানি এবং এইগুলি ৮ ভাগে বা setএ বিভক্ত ছিল। প্রথম সেটের নাম ছিল ধনপতি, ধনপতি স্বয়ং ছিলেন নিজের setএর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, অর্থাৎ আজকালকার "টেক্কা" বা ace; তাঁহার অপরাপর অনুচরবর্গ ছিলেন, উজীর, মণিকার, তৌলকারক, মুদ্রাকারক, সর্ব্বশুদ্ধ এগার জন। ব্যবসায়ানুযায়ী প্রত্যেকেরই প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত থাকিত। "দানকর্ত্তা", সেই নামে পরিচিত শ্রেণীর অধীশ্বর ছিলেন এবং তাঁহার সহচরগণ ছিল উজীর, কাগজ প্রস্তুতকারক, দপ্তরী ইত্যাদি। "ব্যবহার্য্য বস্তুনির্ম্মাতা", নিজের শ্রেণীর ছিলেন কর্ত্তা এবং তাঁহার উজীর বা অন্যান্য পারিষদগণের অভাব ছিল না। চতুর্থ শ্রেণী, "বীণাবাদক", তাঁহার উজীর ও অনুচরবর্গ; পঞ্চম "স্বর্ণদানকর্ত্তা", তাঁহার মন্ত্রী এবং অপর সহচরগণ প্রত্যেকেই টাকশালের ভৃত্য; ষষ্ঠ, "তরবারি অধ্যক্ষ," উজীর ও আনুষঙ্গিক লোক লস্কর, কেহ বর্ম্ম প্রস্তুতকারক, কাহারও বা কায কামান বা বন্দুক পরিষ্কার করা; সপ্তম, "মুকুটরাজ", তিনিও কম যাইতেন না, কারণ, তাঁহারও মন্ত্রী বা পারিষদবর্গ সকলেই তাঁহার সভা আলোকিত করিত, এবং সর্ব্বপরিশেষে অষ্টম শ্রেণীর নামকরণ বা সেই বিভাগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিল "দাসরাজ", ইহার অনুচর সকলেই ছিল "দাস", কেহ বসিয়া, কেহ বা শয়ন করিয়া, আর কেহ মদ্যপানে বা ভগবদ্ আরাধনায় রত—এই সকল চিত্রই সেই বিভাগের মূল দ্রষ্টব্য।

উক্ত বিবরণ পাঠে আমাদের মনে প্রথমেই প্রশ্নের উদয় হয়, ঐ শ্রেণীগুলির উল্লিখিতরূপ বিভাগকরণ বা উক্তরূপ অঙ্কনের কোন কারণ ছিল কি না? আবুল ফজল স্বয়ং সে প্রশ্নের অতি সন্তোষজনক উত্তর দানে আমাদিগকে অনাবশ্যক গবেষণা হইতে রেহাই দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মতে এই বিভিন্ন বিভাগ বা চিত্র-অঙ্কনের মূল উদ্দেশ্য ছিল, প্রজাবর্গকে রাজত্বের অবস্থা বিজ্ঞাপিত করা বা রাজ্য শাসনঘটিত বিভাগগুলিকে চিত্রিত আকারে জনসাধারণের নয়নগোচর করা। বস্তুতঃ সাধারণ অজ্ঞ ব্যক্তির তদানীন্তন আর্থিক, রাজনীতিক বা সামরিক অবস্থার আভাস এই তাস-ক্রীড়া সহযোগে অতি পরিষ্কার ভাবে হৃদয়ঙ্গম হইত। সুতরাং এক কথায়—খেলা ও শিক্ষা দুই-ই হইত।

চৌপর (chauper) বা পাশাখেলা। ইহাও সেই যুগে আমোদ উপভোগের এক উপায়ের মধ্যে পরিগণিত হইত। কর্ম্মনাশা হইলেও ইহার যে উপকারিতা দেখা যায় না, তাহা নহে, কারণ,ইহা খেলোয়াড়দিগকে ক্রোধ দমন করিতে এবং সেই সঙ্গে সহিষ্ণু হইতে শিক্ষা দিত। ইহার খেলিবার উপকরণ বা ইহার নিয়মাদি জানিতে আমাদিগকে কষ্ট পাইতে হয় না। খেলিবার সময় উভয় পক্ষ বাজী রাখিত। অসদুপায়ে যাহাতে কেহ জয়লাভ করিতে না পারে, তাহারও বিধিব্যবস্থা ছিল। এমন কি, কোন খেলোয়াড় নির্দ্ধারিত সময়ের পরে ক্রীড়াক্ষেত্রে উপস্থিত হইলে, তাহার শাস্তি ছিল এক রৌপ্যমুদ্রা জরিমানা। খেলার সময় প্রতারণা নিষিদ্ধ ছিল। প্রতারককে এক স্বর্ণমুদ্রা "আক্কেল সেলামী" দিতে হইত। পাঠকবর্গ শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত না হইয়া থাকিতে পারিবেন না যে, কখন কখন একটি "দান" প্রায় ৩ মাস পর্য্যন্ত খেলা হইয়াছে, এইরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই, এবং সর্ব্বাপেক্ষা কৌতুকজনক এই যে, খেলোয়াড়দিগের মধ্যে কাহারও খেলা সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বে বাটী যাইবার অনুমতি ছিল না। অবশ্য বলা বাহুল্য যে, তাহারা যে না খাইয়া খেলিত, তাহা নহে। তবে আহারের ব্যবস্থা ক্রীড়াক্ষেত্রেই করা হইত এবং আহার্য্যদ্রব্য বোধ হয় খেলোয়াড় নিজেরা বাটী হইতে আনাইয়া লইত।

"চন্দনমণ্ডল" তৎকালীন অপর একটি ক্রীড়াবিশেষ ছিল, ইহাও অক্ষ সাহায্যে খেলা হইত এবং ইহার "ছক" দেখিতে ছিল বৃত্তাকার, ১৬টি সামন্তরিক ক্ষেত্র (parallelogram) দ্বারা বিভক্ত। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, সাধারণতঃ ১৬ জন লোকের দ্বারা এই খেলা সম্পন্ন হইত। ইহা খেলিবার নিয়মাবলী আইন-ই-আকবরীতে বিশদভাবে লিপিবদ্ধ করা আছে। পাঠকবর্গের ধৈর্য্যচ্যুতি ও প্রবন্ধ দীর্ঘ হইবার সম্ভাবনা হেতু সে সম্বন্ধে নীরব থাকিতে হইতেছে। অনুসন্ধিৎসু পাঠক-পাঠিকা উল্লিখিত পুস্তক পাঠ করিলে এই খেলার বিস্তারিত "আইন-কানুন" অবগত হইতে পারিবেন।

স্ত্রীলোকদিগের প্রমোদস্থানের মধ্যে আনন্দবাজারই ছিল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রত্নালঙ্কারভূষিতা বহুমূল্যবস্ত্রপরিহিতা অসূর্য্যম্পশ্যরূপা সুন্দরীনিচয়ের আগমনে এবং তাঁহাদের ভূষণ-শিঞ্জনে ও সুমধুর কোলাহলে স্থানটি মুখরিত ও মনোরম হইত। ক্রেতা বা বিক্রেতা সকলেই ছিলেন স্ত্রীজাতীয়। পুরুষদিগের সে স্থানে যাইবার নিয়ম ছিল না। কথিত আছে যে, আমীরওমরাহের বা মধ্যবিত্ত গৃহস্থের বালকবালিকাদিগের বিবাহাদির কথাবার্ত্তা এই স্থানে সুচারুরূপে অনুষ্ঠিত হইত।

সে কালের শ্রমিক বা শিল্প প্রদর্শনীও দর্শনীয় ছিল বলা যাইতে পারে। এই সব প্রদর্শনীতে নানা প্রদেশজাত শিল্পদ্রব্যাদি আনীত হইত। এই প্রকার শিল্পপ্রদর্শনী দ্বারা দেশজাত দ্রব্যের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি সম্পন্ন করাই প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। ইহা ব্যতিরেকে সেই যুগের শিল্পপ্রদর্শনীর আরও একটি উপকারিতা ছিল; তাহা এই যে, সাধারণ বা দরিদ্র ব্যক্তি—যাহাদের রাজদরবারের কর্ম্মচারীদিগকে কিঞ্চিৎ দক্ষিণা না দিয়া প্রবেশলাভ করিবার উপায়ান্তর ছিল না,

তাহারা এই সকল ক্ষেত্রে স্বহস্তে নিজের সুখদুঃখের "আর্জ্জি" বাদশাহের সম্মুখে "পেশ" করিবার প্রকৃষ্ট অবসর পাইত।

নব বর্ষের প্রথম দিন এক সামাজিক উৎসবের অনুষ্ঠান হইত এবং ইহা ব্যতিরেকে পারস্ত দেশের প্রথা অনুযায়ী মাসের নাম অনুসারে দিনগুলিতে ভোজোৎসব সম্পন্ন হইত। বাস্তবিক এই সকল দিনে সারা দেশে আনন্দ-কোলাহলের সাড়া পড়িয়া যাইত। কি গরীব, কি গৃহস্থ, কি ধনী সকলেই প্রাণ খুলিয়া উৎসবে যোগ দিতেন। মনে হয়, দুঃখ-কষ্টকে উপেক্ষা বা তাচ্ছিল্য করাই এই উৎসবগুলির উদ্দেশ্য ছিল।

রাজদেহ-তার নির্ণয় একটি বিশেষ পর্ব্বের মধ্যে পরিগণিত ছিল। তুলাযন্ত্রের এক ধারে বাদশাহ উপবেশন করিতেন এবং অপর ধারে তাঁহার দেহের পরিমাণ অনুসারে স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, ঘৃত, লোহ, ধান্য, লবণ প্রভৃতি রক্ষিত হইত। অবশেষে এই দ্রব্যগুলি জাতি বা ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সাধারণে বিতরিত হইত। এই স্থানে পাঠক-পাঠিকাদিগকে একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, প্রাচীন ভারতে হিন্দুরাজগণেরও আমলে এই প্রথা প্রচলনের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। হর্ষবর্দ্ধন হইতে ছত্রপতি শিবাজী পর্য্যন্ত অনেক হিন্দু নরপতির রাজত্বকালে এই নিয়মের উদাহরণ পাওয়া যায়।

অপর একটি বিশেষ স্মরণীয় ও আনন্দময় উৎসবের দিনে বাদশাহ অপরাধীর অপরাধ ক্ষমা করিতেন ও রাজকর্ম্মচারী বা সাধারণ ব্যক্তিকে তাহাদিগের সৎকর্ম্মানুযায়ী পুরস্কৃত করিতেন।

উল্লিখিত উৎসব ব্যতিরেকে শারীরিক শক্তির উৎকর্ষসাধনের নিমিত্ত আয়োজনের ত্রুটি দেখা যায় না। সিরিয়া, তুরাণ, গুজ্জর প্রভৃতি দূরদেশাগত মল্লরথিগণ রাজ-দরবারে একত্র হইতেন। বাদশাহ তাঁহাদিগকে সাহায্য করিতে পরাঙ্মুখ হইতেন না। তৎকালীন মল্লবীরগণ ইতিহাসের পৃষ্ঠে চিরস্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন। বিশেষ উল্লেখযোগ্য বীরগণের নাম প্রদত্ত হইল। যথা,—মির্জ্জা খাঁ, মহম্মদ কুলী, গণেশ, শ্রীরাম, বৈজনাথ, সাধুদয়াল, কানাইহা, মহম্মদ আলী, কাসিম ইত্যাদি।

"সমশের বাজ" বা তরবারি ক্রীড়ক তাহার অত্যদ্ভুত ক্রীড়া-কৌশল বা তরবারি চালনার দক্ষতা ও সতর্কতা বাদশাহ, আমীর-ওমরাহ বা সাধারণের সমক্ষে দেখাইয়া সকলের মনে যুগপৎ ভীতি ও কৌতুক সঞ্চার করিত।

হস্তী, মৃগ, গরু, মোরগ, ভেড়া, ছাগল ইত্যাদির লড়াই তখনকার দিনে বিশেষ দ্রষ্টব্য ছিল। স্থানবিশেষে এখনও এই প্রথার কতক প্রচলন আছে। আকবর বাদশাহের প্রায় দ্বাদশ সহস্র 'লড়াইয়ে' হরিণ ছিল। প্রত্যেক মৃগকে কি পরিমাণ আহার্য্য দেওয়া হইত, তাহারও ব্যবস্থার ত্রুটি সমসাময়িক ইতিহাস আইন-ই-আকবরীতে লক্ষিত হয় না।

এই গেল মোটামুটি মোগল যুগ, বিশেষতঃ আকবরের রাজত্বকালীন ভারতে প্রচলিত আমোদ-প্রমোদের একটি বিবরণ। পাঠক-পাঠিকাগণ হয় ত লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে, ইহাদিগের মধ্যে কতকগুলি হিন্দু-আমলের পুরাতন বা নূতন পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ, কতক বা মোগল আমলেরই বিশেষত্ব।

শ্রীকমলকৃষ্ণ বসু (এম্-এ অধ্যাপক)

একখানা প্রাচীন দলিল

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে সুপ্রসিদ্ধ "সাহিত্য" পত্রে "বঙ্গের সামাজিক ইতিহাসের এক পৃষ্ঠা" নামে এক প্রবন্ধ বাহির হয়। উহাতে প্রাচীন কালের সামাজিক প্রথা, দাস-দাসী বিক্রয়, 'বামুনা-বামুনী' দান প্রভৃতি নানা রকম দলিল-জাতের উল্লেখ ছিল। আমরা জানি, অতি অল্পকাল পূর্ব্বে আসামের শ্রীহট্টাদি অঞ্চলে দাস-দাসী বিক্রয় হইত। সম্প্রতি কতকগুলি পুরাতন পুথির ভিতরে আমাদের বাড়ীতে একখানা প্রাচীন দলিলের খসড়া পাওয়া গিয়াছে। ইহাতে জানা যায় যে, ৯০ বৎসর পূর্ব্বেও ঢাকা জিলার বিক্রমপুর মহেশ্বরদী অঞ্চলে দাস দাসীর বিক্রয় না হউক—পিতৃপুরুষের স্বর্গার্থ দাসদাসীসহ সম্পত্তির উৎসর্গ-আইন-বিগর্হিত বলিয়া পরিগণিত হইত না।

পাঠকগণের অবগতির জন্য আমরা নিম্নে দলিলখানা যথাযথ উদ্ধৃত করিলাম। মূল কাগজে কতিপয় অক্ষর উঠিয়া গিয়াছে এবং অনেক বর্ণাশুদ্ধি আছে।

শ্রীহরিঃ

ইয়াদি কির্দ্দ শ্রীযুক্ত রাজমাধব শর্ম্মণঃ ওরফে বামনানন্দ চক্রবর্ত্তী সুদার চরিত্রেষু—

শ্রীশিবপ্রসাদ শর্ম্মণা ওরফে রুদ্ররাম শর্ম্মা কস্য লিখনঃ কায্যঞ্চ আগে পরগণে নরুল্লাপুর সরকার বাজুহার মহাল ধনেশা তপে সদরাবাদ, আমার বৈহিত্র জগবন্ধু মোতফা তালুক বনামে তালুক রতিদেব চক্রবর্ত্তী খারিজ। মারফত রামবান্ধব সেন, জিলা শাদরাব শদ (?) মবলগ ৩ টাকা ১৮ গণ্ডা সিক্কা লিখা যায়। এই তালুক মজকুর কিস্মত বাগবাড়ী গএরহ ও মোতফা মজকুরের দাসদাসি গএরহ মিলিকয়াত শাস্ত্র অনুসারে পণ্ডিত আনের বেবস্তামতে অধিকারী আমি হই। অতএব এই তালুক ও দাসদাসী মাল মিলিকয়াত গএরহ ও মোতফা মজকুরের পিত্রি পিতামহ স্বর্গার্থে তোমাকে উৎসর্গ দিলাম।

আপনে তালুক মজকুরের সদর মালগুজারি আদা(য়) পুর্ব্বক দখলকার হইয়া তালুক মজকুর মর দাসদাসী মাল মিলিকয়াত গএরহ দান-বিক্রি ক্রাদিকারি হওয়া ও আপনে ও আপনার পুত্র পৌত্রের ক্রে) ক্রমে) যথেষ্ট বিলশ করিতে রহ। অতএ আপন খুসিতে বাজি বকরতে বহাল-দবিঅতে শ-ইচ্ছা পু(র্ব্বে)ক উৎসর্গ দিলাম।"

পাঠকগণ দেখিবেন যে, শ্রীশিবপ্রসাদ শর্ম্মা উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত তাঁহার দৌহিত্রের সম্পত্তি শ্রীরাজমাধব শর্ম্মাকে দান করিতেছেন। দাতা শ্রীশিবপ্রসাদ 'শাস্ত্র অনুসারে পণ্ডিত আনের 'বেবস্তামতে' 'তালুক মজকুর কিসমত বাগবাড়ী, মোতফা মজকুরের দাসদাসী গএরহ' অধিকারী আছেন। সুতরাং তিনি আপনি খুসিতে বহাল তবিয়তে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক উক্ত তালুক দাসদাসী মাল মিলিকয়াত গএরহ রাজমাধব শর্ম্মাকে উৎসর্গ করিতেছেন। দাসদাসী সহ প্রাপ্ত সমস্ত সম্পত্তিতে তাঁহার সম্পূর্ণ অধিকার থাকিবে। রাজমাধব শর্ম্মা পরে দাসদাসী বিক্রয় করিয়াছিলেন কি না, তাহা জানা যায় নাই। কিন্তু ইহা অনুমান করা অনুচিত হইবে না যে, তিনি উপহারস্বরূপ-শিব-প্রসাদ শর্ম্মা হইতে কয়েক জন দাসদাসী পাইয়াছিলেন এবং দাস-দাসীগণও নিরাপত্তিতে এই দান স্বীকার করিয়াছিল।

পাঠকপাঠিকাগণ বোধ হয় লক্ষ্য করিয়াছেন, দলিলখানাতে লেখক বা সাক্ষী কাহারও দস্তখত নাই, এমন কি, সন তারিখ পর্য্যন্ত উল্লিখিত নাই। আমরা পূর্ব্বেই জানাইয়াছি যে, দলিলখানা একটি খসড়া (draft) মাত্র। তথাপি ইহার সন তারিখ আমরা ইহার অপর পৃষ্ঠায় লিখিত আর একখানা খসড়া হইতে জানিতে পারি। খসড়াখানা এইরূপ,—

"অঙ্কে চৌদ্দ টাকা

অঙ্কে মবলগ চৌদ্দ টাকা সিক্কা শ্রীশিবপ্রসাদ শর্ম্মা হইতে নগদ নিলাম। মেয়াদ সন ১২৩১ সনের ২৫শে চৈত্র। ইতি সন ১২৩১, ২৮ আসি(ন)।"

উক্ত দুইখানা খসড়াই এক হাতের লেখা। বোধ হয়, এক তারিখে এক বায়গাতে বসিয়াই খসড়া দুইখানা প্রস্তুত হইয়াছিল। শ্রীশিব-প্রসাদ শর্ম্মার নিবাস ছিল ঢাকা জিলার অধীন বিক্রমপুর পরগণার অন্তর্গত ফুরসাইল গ্রামে। এই গ্রামের অধিকাংশ এখন বিশালা ধলেশ্বরীর অতল গর্ভে নিমজ্জিত। শিবপ্রসাদের বংশধরগণের বাড়ীও ধলেশ্বরী নদী গ্রাস করিয়াছে।

নরুল্লাপুর ও বাগবাড়ী, মহেশ্বরদী পরগণাতে অবস্থিত। তপে সদরাবাদ এবং জিলে শদরাবাদ শদ (?) যে কোন স্থানকে বলা হইয়াছে, তাহা ঢাকার ইতিহাস, বিক্রমপুরের ইতিহাস, সুবর্ণ গ্রামের ইতিহাস প্রভৃতির আলোচকগণ মীমাংসা করিবেন।

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য।

বাঙ্গালা সাহিত্যের একটি ধারা *

ন্যূনাধিক ৪০ বৎসর পূর্ব্বে মাতৃভাষার চর্চ্চায় শিক্ষিত বাঙ্গালীর অনুরাগ যখন ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠিতেছিল, তখন ভারতীর স্বর্ণ-বীণার গুঞ্জনধ্বনি কর্ণে প্রবেশ করিলেও, অনেককে মুগ্ধ করিতে পারে নাই। ভক্ত-সেবকের সংখ্যা তখন মুষ্টিমেয় বলিলেই হয়। কবিবর রবীন্দ্রনাথ তখন ভাল করিয়া আসরে অবতীর্ণ হয়েন নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের অমর প্রতিভা-সূর্য্য মধ্যাহ্ন-গগনে প্রদীপ্ত আলোকরশ্মি বিকীর্ণ করিতেছিল। সাহিত্য-সম্রাটের লেখনী-নিঃসৃত মহাবাণী আত্মবিস্মৃত বাঙ্গালীজাতিকে উদ্বুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিয়াছে মাত্র। তখন বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসাবলী ব্যতীত, তারক বাবুর স্বর্ণলতা এবং রমেশচন্দ্রের 'শত-বর্ষ' বাঙ্গালার উপন্যাসরাজ্যের রত্নস্বরূপ আলোক বিকীর্ণ করিতেছিল। কথা-সাহিত্যে তখনও ছোট গল্পের আমদানী হয় নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের 'রাধারাণী,' 'যুগলাঙ্গুরীয়' এবং 'ইন্দিরা' নামক তিনখানি ক্ষুদ্র উপন্যাস তখন ছোট গল্পের রাজ্যে প্রথম প্রবেশ করিয়াছে।

বাঙ্গালী তখনও ছোট গল্পের রসের সন্ধান ভাল করিয়া পায় নাই। রূপ, রস ও মাধুর্য্য-পূর্ণ ফরাসী গল্প-সাহিত্য বাঙ্গালী পাঠককে মুগ্ধ করিলেও বাঙ্গালী সাহিত্যিক তখনও মাতৃভাষায় ছোট গল্প রচনা করিবার প্রয়াস পান নাই। 'ভারতী ও বালকে' স্বর্ণকুমারী দেবীর ও কবি রবীন্দ্রনাথের যে সকল আখ্যায়িকা প্রকাশিত হইয়াছিল, উহাকেও ঠিক ছোট গল্পের পর্য্যায়ভুক্ত করা যায় না। যত দূর মনে পড়ে, পণ্ডিত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত সুপ্রসিদ্ধ "সাহিত্য" পত্রে "ফুলদানী" শীর্ষক অনুদিত গল্পটিই বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রথম ছোট গল্প। শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয় উহার রচয়িতা।

ইহার অব্যবহিত পরেই গল্প-সাহিত্যের যুগান্তরের কাল। কবিবর রবীন্দ্রনাথ তাঁহার পীযুষবর্ষী লেখনীর সাহায্যে—অপূর্ব্ব তুলিকাঘাতে ছোট গল্প রচনা করিতে আরম্ভ করেন। শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, দীনেন্দ্রকুমার রায়, সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে নানা প্রকার বিচিত্র রসের উপাদানে ছোট গল্প লিখিয়া বাঙ্গালী পাঠকবর্গের কৌতূহল উদ্দীপিত করিতে লাগিলেন। তদানীন্তন বাঙ্গালা মাসিক পত্রের পৃষ্ঠে যাঁহারা গল্প-সাহিত্যের রসধারা প্রবাহিত করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে রস রচনায় সিদ্ধহস্ত পণ্ডিত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার, হেমেন্দ্রপ্রসাদ, জলধর সেন (রায় বাহাদুর), হরিসাধন, যোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়, শৈলেশচন্দ্র মজুমদার, সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার (রায় বাহাদুর), প্রকাশচন্দ্র দত্ত, নলিনীমোহন মুখোপাধ্যায়, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নলিনীভূষণ গুহ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ৺জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুদিত গল্পগুলি সাহিত্যের বিশিষ্ট সম্পদ। উপন্যাস-রচনার সঙ্গে সঙ্গে গল্প-সাহিত্য রচনায় বাঙ্গালী সাহিত্যিকদিগের ঐকান্তিক অনুরাগ দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে আরম্ভ করিল। শক্তিশালী লেখক-লেখিকাগণ কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, সত্যেন্দ্রকুমার বসু, ফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, ফণীন্দ্রনাথ পাল, যতীন্দ্রনাথ গুপ্ত, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র, উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, মাণিক ভট্টাচার্য্য, শ্রীমতী অনুরূপা দেবী, শ্রীমতী নিরুপমা দেবী প্রভৃতি নানারূপে মানব-মনোবৃত্তির বিশ্লেষণে ছোট গল্পের সম্পদ বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। বাঙ্গালার গল্প-সাহিত্য পরিপুষ্ট হইয়া উঠিল। বাঙ্গালী পাঠক ছোট গল্পের রসাস্বাদ করিয়া পরিতৃপ্ত হইতে লাগিল।

তাহার পর প্লাবনের যুগ। ক্রমে দলে দলে লেখক-লেখিকা গল্পের আসরে অবতীর্ণ হইলেন। মাসিক, পাক্ষিক, সাপ্তাহিক, দৈনিক—সকল প্রকার পত্রে তরুণতরুণীর দল গল্পের অর্ঘ্যভার লইয়া মাতৃপূজায় অবহিত হইলেন। তাঁহাদের সকলের নাম উল্লেখ করিবার স্থান এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে নাই। অনেকের রচনায় প্রতিভা ও শক্তির পরিচয় সুস্পষ্ট। এখনও বন্যার প্রবাহ পূর্ণ বেগে বহিতেছে। খণ্ড-কবিতার ন্যায় ছোট গল্পের প্রাচুর্য্যে বাঙ্গালা সাহিত্য ভারাক্রান্ত। দলে দলে লেখক-লেখিকা প্রতিদিনই সাহিত্য-কাননে সমবেত হইতেছেন। কিন্তু শক্তি সত্ত্বেও সকলের মধ্যে সাধনার সংযম দেখিতে পাওয়া যায় না। বর্ত্তমানে বলা কঠিন, গল্পের পাঠক অথবা লেখক, কাহার সংখ্যা অধিক।

ছোট গল্পের দ্রুত উন্নতি ও পরিপুষ্টি সাধিত হইলেও এখানে একটা কথার উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হইবে বলিয়া মনে হয় না। ত্রিশ বৎসরব্যাপী, সাহিত্য-সেবার অভিজ্ঞতার ফলে আমার মনে এই ধারণা জন্মিয়াছে, বাঙ্গালী পাঠক ছোট গল্পের ভক্ত হইলেও উহার মর্য্যাদা-রক্ষায় উদাসীন। মাসিক পত্রের পৃষ্ঠেই তাহার সমাদর; তাহার পর কদাচিৎ সে সম্মান লাভ করিয়া থাকে। খণ্ড-কবিতা, ছোট গল্প—ছোট বলিয়াই কি সম্পূর্ণ কাব্য ও উপন্যাসের মত সমাদর লাভ করিতে পারে না?

প্রতীচ্য দেশে গল্প সাহিত্যের অত্যন্ত সমাদর। ছোট গল্প রচনা করিয়া বহু সাহিত্যিক অক্ষয় যশঃ, প্রভূত সম্মান, অসামান্য প্রতিপত্তি ও অর্থ লাভ করিয়াছেন। য়ুরোপ ও আমেরিকার তুলনায়, বাঙ্গালা দেশে গল্প সাহিত্য যেরূপ পরিপুষ্ট হইয়াছে, তাহাতে পৃথিবীর সাহিত্যে ছোট গল্পের আসরে তাহা মর্য্যাদায় হীন নহে। নিরপেক্ষ তুলনামূলক সমালোচনা হইলে, সংখ্যার অনুপাতে না হউক, গুণের হিসাবে—শিল্প-চাতুর্য্যের ও রস-মাধুর্য্যের হিসাবে বঙ্গ-সাহিত্যের ছোট গল্প প্রতীচ্য দেশের ছোট গল্পের পার্শ্বে সমাদরে স্থান পাইবার যোগ্য, এ কথা অসঙ্কোচে বলিতে পারা যায়।

প্রতীচ্য পণ্ডিতগণ ছোট গল্পের যে সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাতে কাহিনী বা উপাখ্যানমাত্রকেই ছোট গল্প বলা চলে না। কোনও একটা মনোবৃত্তির বিকাশ, রসের পরিপুষ্টি-প্রদর্শনই ছোট গল্পের উদ্দেশ্য। অল্প পরিসরের মধ্যে কোনও একটা রসকে নিপুণতার সহিত ফুটাইয়া তুলা অসাধারণ শক্তির পরিচায়ক। মানব-চরিত্রে সম্যক্ জ্ঞান, গভীর অনুভূতি এবং প্রকাশক্ষমতা না থাকিলে ছোট গল্প রচনা করা সম্ভবপর হয় না। উপন্যাস-রচনায় লেখক কোনও চরিত্রকে ফুটাইয়া তুলিবার যে অবকাশ পায়েন, ছোট গল্প-লেখকের পক্ষে সে অবকাশ নাই। তাঁহাকে অল্প পরিসরের মধ্যে তুলিকার দুই চারিটা রেখাপাতের সাহায্যে মানব-মনের গোপন তথ্যটি অঙ্কিত

* বাঁশবেড়িয়া বাণী-সম্মিলনীর পঞ্চম বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত সভাপতির অভিভাষণ হইতে গৃহীত।

করিতে হয়। উৎকৃষ্ট চিত্রকর ও উৎকৃষ্ট গল্প-লেখক একই শ্রেণীর ভাবুক। ইঙ্গিতই তাঁহাদের শ্রেষ্ঠ সম্পদ।

ফরাসী সাহিত্য এই শ্রেণীর ছোট গল্পের সম্পদে পরিপূর্ণ। এ বিষয়ে সমগ্র সভ্যজাতি ফরাসী সাহিত্যের কাছে ঋণী। বাঙ্গালা সাহিত্য ফরাসী সাহিত্যের ন্যায় ছোট গল্পের সম্পদে পরিপূর্ণ না হইলেও এ কথা অকুণ্ঠিতচিত্তে বলা যায় যে, বাঙ্গালী সাহিত্যিকগণের মধ্যে শক্তিশালী ছোট গল্প-লেখক আবির্ভূত হইয়াছেন এবং তাঁহাদের রস-রচনা কালজয়ী হইয়া সাহিত্যে অমরত্ব লাভ করিবে; তবে এইরূপ সাহিত্যিকের সংখ্যা অল্প, তাহাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

বড়ই আশা ও আনন্দের কথা, আমাদের আরাধ্যা ভাষা-জননী এখন দরিদ্রা, নিরাভরণা নহেন। বঙ্গের কৃতী সন্তানগণ নানা উপচারে মায়ের পূজায় অবহিত হইয়াছেন। বিবিধ রত্নাভরণে তাঁহার অঙ্গ হইতে সৌন্দর্য্যের অপূর্ব্ব প্রভা বিচ্ছুরিত হইতেছে। দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, কাব্য, উপন্যাস—কথা-সাহিত্যের নানা স্তরে শক্তিশালী লেখকগণ অপূর্ব্ব রচনাসম্ভার আহরণ করিয়া আনিতেছেন। বর্ণ ও তুলিকার স্পর্শে চিত্রশিল্পীরা কল্পনার মায়ালোক সৃষ্টি করিতেছেন। কিন্তু একটা কথা আমাদিগকে বিশেষভাবে স্মরণ রাখিতে হইবে। জাতীয়তার বৈশিষ্ট্য হারাইলে চলিবে না। জাতির বৈশিষ্ট্যই তাহার পরিচয়। কাব্য, উপন্যাস, গল্প ও চিত্রে জাতির বিশিষ্ট পরিচয় প্রকটিত হইয়া অনন্তকাল ধরিয়া সেই জাতিকে অন্য জাতি হইতে বিভিন্ন বলিয়া বুঝিতে শিখায় এবং তাহার স্বাতন্ত্র্যকে গৌরবমণ্ডিত করিয়া তুলে। বাঙ্গালার একটা বৈশিষ্ট্য আছে, বাঙ্গালী জাতির একটা স্বতন্ত্র ভাবধারা আছে। সেই স্বাতন্ত্র্য, বৈশিষ্ট্যই বাঙ্গালী জাতির পরিচয়। বাঙ্গালী সেই ভাবধারাকে হারাইতে প্রস্তুত নহে। উহা অন্তর্হিত হইলে বাঙ্গালীকে আর কেহ চিনিতে পারিবে না। যাহার পরিচয় নাই, তাহার জীবনেরও কোন সার্থকতা থাকিতে পারে না। বাঙ্গালার চিন্তাশীল মনীষীরা আমাদিগকে এই কথা কায়মনোবাক্যে স্মরণ রাখিবার জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিয়াছেন। সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন আত্মবিস্মৃত বাঙ্গালী জাতিকে এই কথা বারংবার মনে করাইয়া দিয়াছেন। স্বামী বিবেকানন্দ নবজাগ্রত বাঙ্গালীকে সতর্কভাবে সেই ভাবধারাকে অক্ষুণ্ণ রাখিবার উপদেশবাণী শুনাইয়া গিয়াছেন।

কিন্তু সত্যের অনুরোধে, গভীর দুঃখের সহিত স্বীকার করিতে হইতেছে, বাঙ্গালী সাহিত্যিকদিগের মধ্যে সকলেই সর্ব্বপ্রযত্নে জাতির ভাবধারাকে অক্ষুণ্ণ রাখিবার চেষ্টা করিতেছেন না। কেহ কেহ প্রতীচ্যের ভাবধারার প্রবাহকে বাঙ্গালার পবিত্র ভাগীরথী প্রবাহে মিশাইয়া দিয়া বাঙ্গালী জাতিকে বিদ্রূপ করিতেছেন। তথাকথিত 'আর্টের' দোহাই দিয়া তাঁহারা গলিত, দুর্গন্ধ, পচা মালের আমদানী করিতেছেন। 'আর্ট' বলিতে রূপ বা রস বুঝায়। সৌন্দর্য্য—রূপ বা রস, সত্য ও শিবকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না। যাহা সত্য, তাহা শিব ও সুন্দর। যাহা শিব, তাহা সত্য ও সুন্দর। যাহা সুন্দর, তাহা শিব ও সত্যের আলোকে সদা প্রদীপ্ত ও মধুর। যাহা ব্যষ্টি ও সমষ্টির পক্ষে অকল্যাণকর, তাহা জাতির পক্ষে অশিব, তাহা কোনও মতেই সুন্দর হইতে পারে না। য়ুরোপের মাপকাঠি দিয়া ভারতবর্ষের ভাবধারাকে—বাঙ্গালীর চিন্তা ও জীবনধারা পরিমাপ করিলে চলিবে না। য়ুরোপ ও ভারতবর্ষ এক নহে, এক হইতে পারে না। যে দেশের নারীর মাতৃত্বের চরম স্ফূর্ত্তিই বিশেষত্ব, যেখানে নানাভাবে মাতৃপূজার ব্যবস্থা, যে জাতি সকল অনুষ্ঠানেই মা'কে দেখিতে পায়, তাহার সেই ভাবধারাকে নূতন খাতে বহাইয়া দিবার চেষ্টা শুধু নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচায়ক নহে, ঘোরতর দেশ-দ্রোহিতার নিদর্শন।

মাতৃপূজার এমন বিচিত্র ও মহান্ আয়োজন কোন্ দেশে আছে? দেশজননীকে, শক্তিরূপিণী দশভুজার মূর্ত্তি গড়িয়া পূজা, সৌভাগ্য-লক্ষ্মীকে ইন্দিরারূপে আরাধনা, বিদ্যা ও জ্ঞানকে বীণাবাদিনী ভারতীরূপে কল্পনা করা, মনসা, ষষ্ঠী, শীতলা প্রভৃতি নানাভাবে জাতির মনে মায়ের রূপ ফুটাইয়া রাখিবার ব্যবস্থা কোন্ দেশে আছে? বাঙ্গালী বুঝিয়াছিল, মা-ই জাতির সর্ব্বস্ব। তাই নারীকে সর্ব্বপ্রকারে মাতৃভাবে দর্শন করিবার ব্যবস্থা। জাতির দুর্ভাগ্যক্রমে নানা ভাগ্যবিপর্য্যয়ের ফলে বাঙ্গালী এখন নারীকে মা বলিয়া ভাবিতে ভুলিয়া গিয়াছে।

কথা-সাহিত্যের মধ্যে দ্রুত আবর্জ্জনার প্রাচুর্য্য ঘটিতেছে। বস্তু-তন্ত্রহীন জীবনযাত্রার চিত্র, শব্দের আড়ম্বরে, লিপি-চাতুর্য্যের প্রভাবে বাঙ্গালী পাঠকবর্গের সম্মুখে বাস্তব চিত্র বলিয়া উপস্থাপিত করা হইতেছে। সুবিস্তীর্ণ বাঙ্গালাদেশে, কোটি কোটি নরনারীর মধ্যে যে জীবনধারার কোনও সন্ধান পাওয়া যায় না—যাহা অবাস্তব, অপ্রকৃত, অসামাজিক এবং জাতির চিরন্তন সংস্কারের বিরোধী, এমন অনেক চিত্র ইদানীং বাঙ্গালা সাহিত্যে, মিথ্যা রূপ গ্রহণ করিয়া প্রবেশ করিতেছে। বিলাতী মূর্ত্তিকে হ্যাটকোট, গাউন ছাড়াইয়া ধুতি, জামা ও শাড়ী পরাইলে তাহা কি বাঙ্গালীর মূর্ত্তি বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে? প্রত্যেক দেশের একটা আবহাওয়া আছে, প্রত্যেক জাতির একটা পারিপার্শ্বিক আবেষ্টন আছে, একটা চিরন্তন সংস্কার আছে। মনোবৃত্তি সেই আবহাওয়া, পারিপার্শ্বিক আবেষ্টন এবং চিরন্তন সংস্কারের প্রভাব হইতে মুক্ত হইতে পারে না—হওয়া সম্ভবপর নহে। একই প্রেম, স্নেহ, ভক্তি প্রভৃতি চিরন্তন সত্য হইলেও তাহার বিকাশ, সর্ব্বাঙ্গীন স্ফূর্ত্তি একই ভাবে সকল দেশে সম্ভবপর কি না, আপনারা সুধীজন বিবেচনা করিয়া দেখিতে পারেন। সন্তানের প্রতি মাতার বাৎসল্য মানব মনের চিরন্তন সত্য হইলেও তাহার প্রকাশ য়ুরোপে যে ভাবে দেখা দেয়, ভারতবর্ষে কি তাহার প্রকাশে কোনও বৈচিত্র্য নাই? আকাশে মেঘ জমিয়া কোনও দেশে বৃষ্টিরূপে দেখা দেয়, আবার কোথাও বা তুষারপাত হইয়া মেঘ অন্তর্হিত হয়। প্রকৃতির খেলা-ঘরে এ বৈচিত্র্য যখন নানা ভাবে দেখিতে পাওয়া যায়, তখন মানব-মনোবৃত্তিও পারিপার্শ্বিক অবস্থায় প্রভাবে বিচিত্রভাবে, বিশিষ্টরূপে তাহার কার্য্য করিবে না কেন? বাঙ্গালী সাহিত্যিককে এই বৈশিষ্ট্যের প্রতি অবহিত হইয়া রচনায় অগ্রসর হইতে হইবে।

কথা-সাহিত্যের ন্যায় চিত্রশিল্পেও অনাচার প্রবেশ করিয়াছে। এক একখানি চিত্র এক একটি খণ্ডকাব্য বা ছোট গল্প। চিত্রাঙ্কনে শিল্পীরা ইদানীং সমধিক নৈপুণ্য প্রকাশ করিতেছেন, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই বাঙ্গালার ভাবধারাকে উপেক্ষা করিয়া চলিয়াছেন। নগ্নতাকে তাঁহারা এমনই ভাবে চিত্রের আদর্শ করিয়া তুলিয়াছেন যে, বাঙ্গালী মা লজ্জায় অধোবদন। বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন, 'অনুকরণ গালি নহে,' কিন্তু যে অনুকরণে জাতির বৈশিষ্ট্য বিলুপ্ত হয় তাহা কখনই আদর্শ হইতে পারে না, তাহাতে কল্যাণও ঘটে না। প্রতীচ্যের মোহে অনেকে এমনই উদ্‌ভ্রান্ত যে, তাঁহারা মনে রাখেন না যে, তাঁহারা বাঙ্গালীর ঘরের চিত্র অঙ্কিত করিতেছেন।

বাঙ্গালা সাহিত্যে এখন নিরপেক্ষ সমালোচকের অভাব। সম্যক্-রূপে আলোচনা করিবার শক্তি ও সাহস ইদানীং বাঙ্গালী সাহিত্যিক-গণের মধ্যে তেমন দেখিতে পাওয়া যায় না। সাহিত্যকে নিয়ন্ত্রিত করিতে হইলে প্রকৃত সমালোচনার প্রয়োজন। এই গুরু দায়িত্ব সম্পাদন করিবার জন্য বাঙ্গালী সাহিত্যিকগণের মধ্য হইতে অন্ততঃ কয়েক জনকে সমালোচকরূপে কর্ম্মক্ষেত্রে আবির্ভূত হইতে হইবে। সাহিত্য ও চিত্রে যে বীভৎস রসের প্লাবন বহিতেছে, তাহাতে

বাঙ্গালার পুরুষত্ব, নারীত্ব—মাতৃত্ব, জাতীয়তা সবই ভাসিয়া যাইতেছে। দেশাত্মবোধ, জাতীয়তা যাঁহাদের মধ্যে জাগিয়াছে, স্বজাতির কল্যাণ-কল্পে যাঁহাদের অনুরাগ আছে, তাঁহারা আর উদাসীন না থাকিয়া জাতীয় সাহিত্যের গতিপথ নির্দ্ধারিত করিয়া দিন। বসিয়া বসিয়া শুধু আক্ষেপ করিবার দিন আর নাই। স্পষ্টবাদিতার দিন আসিয়াছে। পণ্ডিত সমাজপতির তিরোধানের পর বাঙ্গালা সাহিত্যের সমালোচনা এক প্রকার অন্তর্হিতই হইয়াছে। সত্য কথা বলিয়া অন্যের অপ্রিয়ভাজন হইবার আশঙ্কায় কেহ সাহিত্য-সমালোচনায় অগ্রসর হয়েন না। সংপ্রতি দুই একখানি মাসিকপত্রে সংক্ষিপ্ত মন্তব্যের সূত্রপাত হইয়াছে, কিন্তু তাহাও পর্য্যাপ্ত নহে। আরও বিস্তৃতভাবে সমালোচনার প্রয়োজন।

আমার ও আমার পূর্ব্বপুরুষগণের জন্মভূমি এই বসিরহাট মহকুমায় যে সকল সাহিত্যিক জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম স্মরণ করা আমার কর্তব্য। মাতৃভাষার চর্চ্চা করিয়া তাঁহারা আমাদিগকে পথ দেখাইয়া গিয়াছেন। সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগে স্ব স্ব শক্তি অনুসারে তাঁহারা যাহা দান করিয়া গিয়াছেন, তাহা উপেক্ষণীয় নহে। ফকিরচন্দ্র বসুর "উজীর-পুত্র", যোগেন্দ্রনাথ ঘোষের "বঙ্গের বীরপুত্র", "সুখ মরীচিকা", "জ্ঞানবিকাশ", হরলাল রায়ের "ইন্দুমতী" প্রভৃতি, জ্ঞানচন্দ্র রায়ের "যৌন-তত্ত্ব", "গো-তত্ত্ব" প্রভৃতি, পণ্ডিত কালীবর বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের "পাতঞ্জল দর্শন" প্রভৃতি, কৃষ্ণচন্দ্র রায় চৌধুরীর নানাবিধ নাটক, সতীশচন্দ্র রায় চৌধুরীর "বঙ্গীয় কায়স্থসমাজ" বঙ্গ সাহিত্যের সম্পদ। মৃগাঙ্কধর রায় দীর্ঘকাল "দাসীর" সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। তাঁহারা আজ লোকান্তরে; কিন্তু তাঁহাদের রচনা-সম্পদ্ আমাদিগকে প্রলুব্ধ ও উৎসাহিত করিবে না?

এই মহকুমায় বহু সাহিত্য-সেবীর উদ্ভব হইয়াছে। এখনও বহু সাহিত্যিক তাঁহাদের লেখনী চালনা করিয়া বঙ্গভাষার সম্পদ্ বৃদ্ধি করিতেছেন। সুপ্রসিদ্ধ হাস্যরসিক শ্রীযুত অমৃতলাল বসুর নাম কোন্ বাঙ্গালীর অপরিচিত? তাঁহার রচিত নানা নাটক, প্রহসন এবং রস-রচনা প্রতিদিন বাঙ্গালী পাঠকের চিত্তবিনোদন করিয়া থাকে। সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুত নিখিলনাথ রায় 'মুরশিদাবাদ-কাহিনী', 'মুরশিদাবাদের ইতিহাস' প্রভৃতি নানা গ্রন্থ রচনা করিয়া ইতিহাসের ভাণ্ডারে অমূল্য সম্পদ্ দান করিয়াছেন। "বৈজয়ী", "বাদশা পিরু", "প্রজাপতি" প্রভৃতি সুপাঠ্য সুমধুর বিচিত্র উপন্যাস এবং "ভারত-ভ্রমণ" প্রভৃতি রচনা করিয়া শ্রীযুত সত্যেন্দ্রকুমার বসু অশেষ যশঃ উপার্জ্জন করিয়াছেন। সাহিত্যের তপোবনে সাধনা করিয়া সিদ্ধিলাভের পর এখনও নবোদ্যমে তিনি বাঙ্গালার সাহিত্য-ভাণ্ডারে অজস্র রত্ন উপহার দিতেছেন। "রিজিয়া" প্রণেতা শ্রীযুত মনোমোহন রায় এখনও তপস্যা করিতেছেন। মৌলবী সহিদুল্লাহ ভাষাতত্ত্বের আলোচনায় সমাধিমগ্ন। বৈষ্ণব কবি শ্রীযুত ভুজঙ্গধর রায় "গোধূলি", "রাকা" প্রভৃতিতে মাধুর্য্য-রস সৃষ্টি করিয়া এখন বৃন্দাবনের নানা বিচিত্র কাহিনী শুনাইতেছেন। শ্রীমান্ দিগ্বিজয় রায় চৌধুরী "গ্রীক দর্শন" রচনার পর ঐতিহাসিক তথ্যের সন্ধানে ব্যাপৃত। সুকবি মুনীন্দ্রনাথ ঘোষের বীণা এত দিন পরে চিরকালের জন্য নীরব হইয়া গেল। এই সাধক কবি অপূর্ব্ব প্রতিভা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কৈশোর হইতে তিনি বীণা বাজাইতে আরম্ভ করেন। প্রায় ৩৫ বৎসর ধরিয়া নানা ছন্দে, বিভিন্ন সুরে অতি মধুর সঙ্গীত-ধ্বনি শুনাইয়া ব্যাধিপীড়িত, দারিদ্র্য-লাঞ্ছিত কবি আজ অনন্ত নিদ্রায় নিদ্রিত। শুধু মাসিকপত্রের পৃষ্ঠেই তাঁহার রচিত অসংখ্য কবিতা রহিয়া গেল।

নবীন কবি শ্রীযুত যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বিজয়মাধব মণ্ডল, সাদাৎ হোসেন প্রভৃতি বঙ্গ-ভারতীর সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া আছেন, তাঁহাদের সাধনা সার্থক হউক। "পল্লী-বাণী" প্রচারকালে বসিরহাট মহকুমায় অনেকগুলি সাহিত্যসেবীর সন্ধান পাওয়া গিয়াছিল। কবি শ্রীযুত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, শ্রীমতী স্বর্ণপ্রভা মজুমদার, শ্রীমান্ সুরজিৎ দত্ত, শ্রীমান্ হিরণকুমার রায় চৌধুরী, শান্তিকুমার রায় চৌধুরী প্রভৃতি সাহিত্যসেবায় রত আছেন। শ্রীমান্ অমলকুমার দত্ত মাসিক পত্রে মাঝে মাঝে দেখা দিয়া থাকেন। শ্রীযুত শরৎচন্দ্র রায় চৌধুরী আইনের কূটতর্ক লইয়া বিব্রত হইয়াও মাঝে মাঝে বঙ্গবাণীর চরণে অর্ঘ্য লইয়া উপস্থিত হয়েন। "পল্লীবাণীর" শ্রীযুত দ্বিজেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী ইতিহাসের সেবা করিতেছেন। শ্রীমান্ কুমুদচন্দ্র রায় চৌধুরী "বঙ্গবাণী"র সেবায় সমগ্র অবসরকাল নিয়োগ করিয়াও 'দেশবন্ধুর জীবন-কথা' প্রভৃতি রচনায় নিযুক্ত আছেন। শ্রীমান্ বিভাসচন্দ্র কাব্য-লক্ষ্মীর আরাধনা করিতেছেন। শ্রীযুত সতীশচন্দ্র বসু "নির্ম্মাল্য" ও "সাহিত্যে"র যুগে বঙ্গবাণীর সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন; ইদানীং তাঁহার বীণা নীরব। শ্রীযুত যতীন্দ্রমোহন বসু মাসিক পত্রে নানা প্রবন্ধাদি লিখিয়াছিলেন।

শরতের মঙ্গলস্পর্শ আজ আকাশে, বৃক্ষপত্রে, নদীর জলে স্বপ্নের ইন্দ্রজাল রচনা করিয়াছে! শারদ লক্ষ্মীর বন্দনা-গান-মুখরিত পল্লী-প্রাঙ্গণের মধুর দৃশ্য দীন সাহিত্য-সেবীর নয়নকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। আমাদের এই জন্মভূমির নানা অতীত গৌরবের বিস্মৃতপ্রায় কাহিনী আজ নূতন করিয়া আমার চিত্তকে অভিভূত করিতেছে। নবীন কবি ও ঔপন্যাসিক, ঐতিহাসিক—আপনারা এই মাটীর অন্তর্নিহিত অতীত কাহিনীর গুঞ্জনধ্বনি শুনিতে পাইতেছেন না? বৃক্ষরাজিশোভিত, ফলফুলপূর্ণ আনন্দ-উদ্যান কেমন করিয়া আজ কসাড়বনে পর্য্যবসিত হইয়াছে, স্বাস্থ্যসম্পদপূর্ণ পল্লী অরণ্যে পরিণত হইয়াছে, সুস্থ সবল দেশবাসীর দেহ রোগ-জীর্ণ অস্থিচর্ম্মসার হইয়াছে—প্রাচুর্য্য ও পরিপূর্ণতার শ্রী অভাব ও দৈন্যের মলিনতায় আবিল হইয়াছে, তাহার মর্ম্মান্তিক, ব্যথিত স্বর আপনাদের কর্ণে প্রবেশ করিতেছে না কি? মায়ের সন্তান হইয়া আজ মায়ের জাতিকে কলুষিত দৃষ্টিতে অপবিত্র করিবার দুর্ভাগ্য ঘটিয়াছে বলিয়া কি ক্ষোভে ও দুঃখে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে না? কবি, তোমার বীণায় নূতন রাগিণীর ঝঙ্কার তুলিয়া জাতিকে বীরবাণী শুনাও; ঔপন্যাসিক, তোমার লেখনী মাতৃবন্দনার পবিত্র চিত্র অঙ্কিত করুক। রূপ ও রস, ইন্দ্রিয়ঘটিত কদর্য্য লালসার পূতিগন্ধবিশিষ্ট বীভৎস চিত্র ব্যতিরেকেও বিচিত্র মহিমায় ফুটিয়া উঠিতে পারে, তাহা দেখাইয়া দাও। বাঙ্গালার প্রাণ, বাঙ্গালার ভাবধারা বাঙ্গালীর হৃদয়ে বহাইয়া দাও। জাতি আবার নূতন করিয়া গড়িয়া উঠুক। বঙ্কিমচন্দ্র চিত্তরঞ্জন, বিবেকানন্দের স্বপ্নকে সার্থক করিয়া তুল। যদি তাহা না পার, তবে ব্যর্থ চেষ্টার দ্বারা সাহিত্যের তপোবনে অমেধ্য বস্তু সংগ্রহ করিয়া তাহার পবিত্রতাকে নষ্ট করিও না।

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ।

প্রায়শ্চিত্ত

এনট্রান্স পাশ করিয়া পবিত্রকুমার কলেজে পড়িবার চেষ্টায় কলিকাতায় আসিল। বাড়ীর অবস্থা বড়ই খারাপ, তবুও তাহার পড়িবার বিশেষ ইচ্ছা ছিল। তাই প্রাইভেট টিউসনি করিয়া ও বড়লোকের সাহায্য যোগাড় করিয়া পড়াশুনা করিবার চেষ্টা দেখিতে লাগিল; কিন্তু কিছু দিন কলিকাতায় থাকিয়া বি, এ, এম, এ, পাশকরা ছেলেদের অবস্থা যখন সে বুঝিতে পারিল, তখন পড়াশুনার চেষ্টা ত্যাগ করিয়া চাকুরীর চেষ্টায় লাগিল।

তাহার এক জন আত্মীয় পুলিসে বড় চাকুরী করিতেন। তাঁহার কৃপায় পুলিসে অনেকের চাকুরী হইয়াছে, এবং পবিত্রকুমারের হইবার আশা ছিল; কিন্তু সে পুলিসে চাকুরী করিতে অস্বীকৃত হইল। অন্যত্র যথেষ্ট চেষ্টা করিয়া এক বৎসর নানারূপ কষ্টে কাটাইয়া যখন আর কোন উপায়ই দেখিল না, তখন বাধ্য হইয়া সে পুলিসের চাকুরী গ্রহণ করিল, এবং কিছু দিন পরে দারোগারূপে বাঙ্গালা দেশের কোন থানায় প্রেরিত হইল।

পবিত্রকুমারের কাকা চিরজীবন দারিদ্র্যে কাটাইয়া, শেষজীবনে ভাইপো দারোগা হইল দেখিয়া, সত্বরই খড়ের ঘরকে ইষ্টকময় গৃহে পরিণত করিবার সুখস্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন এবং প্রত্যেক পত্রে তাঁহার মুর্খ ভাইপোটিকে পয়সা জিনিষটা চিনিতে উপদেশ দিতে লাগিলেন ও তাঁহার পরিচিত কে কে পুলিসে চাকুরী করিয়া বড় বড় সম্পত্তি কিনিয়াছে এবং কে পুলিসের সামান্য কনেষ্টবল হইয়া তাহার স্ত্রীর সর্ব্বাঙ্গ সোনার গহনায় মুড়িয়া দিয়াছে, তাহার উদাহরণও যথাসাধ্য দিতে লাগিলেন।

পবিত্রকুমার বিশেষ মিতব্যয়িতার সঙ্গে নিজের ব্যয় চালাইয়া মাহিনার টাকা হইতে যে কয়টি টাকা বাঁচিত, তাহা মাস মাস কাকাকে মণি-অর্ডার করিয়া পাঠাইয়া দিত। কাকা মনে করিতেন—ভাইপো আমার আজকাল পুলিসে ঢুকিয়া চালাক হইয়াছে,—টাকা নিজের কাছে জমাইতেছে। তাই সেই জমান টাকা হইতে কিছু মোটা টাকা হাত করিবার জন্য সর্ব্বদাই ভাইপোকে কিছু বেশী করিয়া টাকা পাঠাইতে লিখিতেন, এবং বেশী টাকার প্রয়োজনেরও নানারূপ কারণ প্রদর্শন করিতেন। পবিত্রকুমার সে সব কথার কোন উত্তর না দিয়া নিজের ধারণামত কর্ত্তব্য পালন করিয়া যাইত।

এক বৎসর পরে পবিত্রকুমার বাড়ী আসিল। কাকা মনে করিলেন, কতকটা মোটা টাকা সেভিংস ব্যাঙ্ক হইতে উঠাইয়া নিশ্চয়ই সে সঙ্গে আনিয়াছে, এবং এইবার বাড়ীতে দালান দিবার জন্য ইটের মিস্ত্রী শ্যামাচরণকে হাটে দেখিতে পাইয়া সত্বর তাহাকে তাঁহার বাটীতে দেখা করিতে বলিলেন। কিন্তু কাকা যখন দেখিলেন যে, সে মাসিক যে কয়টি টাকা পাঠায়, তাহাই মণি-অর্ডার না করিয়া সঙ্গে আনিয়াছে, তখন তিনি হতাশ হইয়া পাড়ায় পাড়ায় বলিয়া বেড়াইতে লাগিলেন যে, ভাইপোকে এত ক'রে মানুষ করলাম, সে এমন পর হয়ে গেল! স্ত্রীলোকরা বলিল—'এখনও বিয়ে হয় নাই। পুলিসে চাকুরী করে, তার কাছে আবার টাকা নাই! আর যে সে চাকরী নয়,—একেবারে দারোগা!'

বন্ধুবান্ধবরা দেখিল, পুলিসে বৎসরাবধি চাকুরী করিয়াও পবিত্রকুমারের বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই,—সে সেই আগেকার সাদাসিদে লোকটিই রহিয়াছে! তাহারা জিজ্ঞাসা করিল--"কত টাকা আন্‌লে হে?"

"খরচ-খরচা বাদে যা বাঁচে, তা ত পাঠিয়েই দি, টাকা আর কোথা থেকে আন্‌বো?"

কেহ কেহ বিশ্বাস করিল। তাহারা ভাবিল, 'এর কর্ম্ম নয় পুলিসে চাকুরী করা, এ যে একেবারে দৈত্যকুলের প্রহ্লাদ!' কেহ বলিল, 'সময়ে হবে!' কেহ বা বলিল, 'কুবের ভাণ্ডারে ব'সে উপবাসী! একটা সোনার আংটীও হাতে নাই!' আবার কেহ কেহ বিজ্ঞের মত মাথা নাড়িয়া মন্তব্য প্রকাশ করিল, 'তোমরাও যেমন! ও হাতে অনেক টাকা জমিয়েছে, ভারি চালাক লোক কি না!—বাইরে কিছু দেখায় না!'

পাড়ায় পবিত্রকুমারের এক জন খুড়ী-মা ছিলেন। তিনি তাহাকে বড়ই স্নেহের দৃষ্টিতে দেখিতেন। পবিত্রর মায়ের সঙ্গে তাঁহার প্রগাঢ় সখীত্ব ছিল। তাই তিনি মাতৃ-হৃদয়ের সমস্ত স্নেহ দিয়া সর্ব্বদা এই মাতৃহারা ছেলেটির মঙ্গল কামনা করিতেন। খুড়ী-মা বলিলেন,—"পবিত্র, শুনলাম, পুলিসে চাকরী ক'রেও তুমি ঘুস লও না। শুনে বড়ই সুখী হ'লাম, ভগবান্ তোমার ধর্ম্মে মতি রাখুন! তোমার মা সতী ছিলেন, বাবাও ধর্ম্মভীরু লোক ছিলেন। তাঁদের নাম রেখো, বাবা!"

পবিত্রকুমারের চক্ষু আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল,—তাহাকে সহানুভূতি করিতে অন্ততঃ এক জনও আছে! সে খুড়ীমার চরণধূলি লইয়া মাথায় দিল।

পবিত্রকুমারের কাকা অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিলেন, বিবাহ দেওয়া ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে ছেলে হাতে আসিবে না। কাকী বলিলেন—'তাতে যদি একেবারে ফস্কে যায়। বৌ নিয়ে চ'লে যায়, খরচপত্র না দেয়, আর বাড়ী না আসে!' কাকা উত্তর করিলেন—'বেশ ছোট্ট একটি মেয়ে আন্‌তে হবে, আর তাকে গ'ড়ে-পিটে ঠিক মনের মত ক'রে তুল্‌তে হবে। তোমার বাপের বাড়ীর কোন আত্মীয়ের মেয়ে পেলে সব চেয়ে ভাল হয়।'

বাড়ী হইতে যাইবার সময় তাহার কাকা কাকী বলিলেন—"তোমার এখন বিবাহ করা কর্ত্তব্য। আমরা চেষ্টায় থাকিলাম, পরে জানাব। আর টুনিরও ত বিয়ের বয়স হ'ল, ওর বিয়েতে তোমাকে কিছু মোটা টাকা দিতেই হবে, তা না হ'লে জাত থাক্‌বে না।"

পবিত্রকুমার সৎপথে চলিত বলিয়া উচ্চ ও নীচ কোন কর্ম্মচারীই তাহাকে সুনজরে দেখিত না; এ জন্য তাহাকে নানা অসুবিধা ভোগ করিতে হইত। উপরিওয়ালা বড় কর্ম্মচারীর সহিত তাহার প্রায়ই খিটিমিটি হইতে লাগিল। সে ক্রমাগত বদলী হইতে লাগিল,—যত খারাপ যায়গা, যত কঠিন কায, সব তাহারই ঘাড়ে পড়িতে লাগিল। সে বিরক্ত হইয়া ভাবিল—এখানে নিজের বিবেকবুদ্ধি অনুসারে কায করিবার যো নাই, এ ছাই চাক্‌রী ছেড়ে দিই। কিন্তু কি করিয়া সংসার চলিবে, সেই ভাবনায় সে পুনরায় উৎসাহের সহিত কায করিতে লাগিল।

এক জন দারোগা পবিত্রকুমারের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। তিনি প্রৌঢ় ব্যক্তি; তাঁহার অন্তরটি ছিল অতি সৎপ্রকৃতির, কিন্তু সাংসারিক অভিজ্ঞতাবশতঃ তিনি সংসারের সুরে সুর মিলাইয়া চলিতেন। পবিত্রকুমার তাঁহাকে নিজের দুঃখের কাহিনী সবিস্তারে বলিল। তিনি বলিলেন, 'দেখ, এমন ক'রে চাক্‌রী কর্‌তে তুমি পার্‌বে না। নিজে যদি সব প্রলোভন পায়ে দ'লে স্থির থাক্‌তে পার, তবুও লোক তোমায় টিক্‌তে দেবে না। তা বাদে সংসারে যখন অনটন, তখন অত কঠোরতা চলবে না, আর আজকালের দিনে একেবারে সাধু কেই বা আছে বল ত! আমার মতে কাহারও উপর অত্যাচার না ক'রে, অন্যায়ের পক্ষসমর্থন না ক'রে, পুরস্কার-ভাবে যা পাওয়া যায়, সেটা নেওয়ায় দোষ কি?'

পবিত্র অনেক ভাবিল—এক একবার সেও ভাবিল, তাই ত, দোষই বা কি? কিন্তু তবুও মন কেমন খুঁৎখুঁৎ করে; অমন ভাবে কায কর্‌তে চায় না। দূর হউক গে ছাই, সংসারের অধিকাংশ লোকই ত অসৎপথে চলে, মিথ্যা কথা কে না বলে? সবাই যদি নরকে পচিয়া মরে, তবে সেও না হয় মরিবে। আত্মীয়-স্বজনের এত কষ্ট আর সহ্য হয় না। একে দারিদ্র্য-কষ্ট—সংসার-খরচের জন্য ভাল করিয়া কোন জিনিষ প্রাণ ভরিয়া খাইতে পায় না, সংসারের লোককেও সুখী করিবার উপায় নাই। সহযোগীরাও সবাই অসন্তুষ্ট; নিম্নতন কর্ম্মচারীরা বলে—'বাবু আমাদের পাওনা মার্‌লেন, আমাদের ছেলেপুলে কি ক'রে বাঁচবে?' এত লোকের অভিশাপ কুড়িয়ে কায কি? Eat, drink and be merry এই principleই হ'ল এই কলিকালের ঠিক উপযুক্ত!

সে দিন তাহাদের সেই সদর থানায় অনেকগুলি মফঃস্বলের পুলিস কর্ম্মচারী আসিয়া জুটিয়াছিলেন, কাযে কাযেই একটা বড় রকমের 'জল্‌সা'র বন্দোবস্ত হইল, নাচ, গান, পানভোজন ইত্যাদি আয়োজনের কোন ত্রুটি রহিল না। পবিত্রকুমারেরও নিমন্ত্রণ হইল। এ সব ব্যাপারে নিমন্ত্রণ তাহার বরাবরই হইত, কিন্তু সে কখনও যাইত না। আজ তাহার মনে হইল, সাংসারিক মানুষের জীবন কঠোর ব্রহ্মচারীর জীবন নহে। সবাই কেমন

আমোদ-আহ্লাদ করিতেছে, সে কেন এমন নিরানন্দ, নিঃসঙ্গভাবে বেড়াইবে! না, সে আজ যাইবে; সকলের সঙ্গে না মিশিলে পয়সা উপার্জ্জনের পথ ঠিক ধরা যাইবে না।

সে মনকে চাবুক মারিতে মারিতে 'জলসা'র স্থানে লইয়া আসিল, কিন্তু সেখানে উপস্থিত হইয়া তাহার মন অত্যন্ত দমিয়া গেল। সকলে তাহার বিশেষ আদর অভ্যর্থনা করিতে লাগিল এবং দলে ভিড়াইবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিল। দুই এক জন বলিল, "আচ্ছা, একেবারে বেশী টানাটানি ভাল নয়, তা হ'লে রশি ছিঁড়ে যাবে, আস্তে আস্তে হাত আসুক " সে বসিয়া বসিয়া সব দেখিতে লাগিল। যে সব কাণ্ড সেখানে দেখিল, তাহাতে তাহার মন একেবারেই দমিয়া গেল; তাহার মনে হইল, এ সব তাহার বিবেকের ও সংস্কারের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ। এ সব কায সে জীবনে কখনও করিতে পারিবে না। টাকার দরকার, টাকাই না হয় আবশ্যকমত কিছু কিছু লইবে; কিন্তু এ সব দলে কখনও মিশিবে না। তাহার পর সে আরও অনেক চিন্তা করিয়া বুঝিল যে, অসৎ উপায়ে অর্থ উপার্জ্জন করিলে, এ পথে এক দিন আসিতে হইবেই। সে এ পথে আসিতে চায় না, তাহার উচিত হইতেছে, এ পথের পাথেয়টা একেবারেই সংগ্রহ না করা। সে ভাবিয়া দেখিল যে, তাহার মত লোকের সব ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হওয়া ভিন্ন আর কোন উপায়ই নাই। সেখানকার সেই সব বীভৎস দৃশ্য,—মাতালের উলঙ্গ নৃত্য ও হল্লা, বারবিলাসিনীর নির্লজ্জ ব্যবহার ইত্যাদি দেখিয়া তাহার সমস্ত অন্তর ঘৃণায়, লজ্জায় ও বিরক্তিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। সকলের অজ্ঞাতসারে কোন্ মুহূর্ত্তে যে সে সেই স্থান ত্যাগ করিল, তাহা কেহ জানিতেও পারিল না।

সে প্রত্যহই রাত্রিকালে নির্জ্জনে বসিয়া ভাবে, সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়া চলিয়া যাইবে; আবার প্রভাত হইলে দিনের আলোর সঙ্গে সঙ্গে মনের মাঝে কর্ম্মোৎসাহ জাগিয়া উঠে, সে কর্ম্মসাগরে ঝাঁপাইয়া পড়ে। এমনই করিয়া আরও কিছু দিন কাটিল। ইতোমধ্যে তাহার বিবাহের জন্য কাকার চিঠি কয়েকবার আসিয়াছে। সে উত্তরে স্পষ্ট লিখিয়া দিয়াছে যে, সে এখন বিবাহ করিবে না।

কাকা মহাশয় সে সুর বদলাইয়া টুনির বিবাহের সুর ধরিয়াছেন। পবিত্র জানিত যে, টুনির বয়স মোটে নয় বৎসর; কিন্তু কাকা লিখিলেন, 'টুনিকে আর রাখা যায় না, লোকনিন্দা হচ্ছে, মোটা টাকার কতদূর কি হ'ল?' সে বিরক্ত হইয়া উত্তর লিখিয়া দিল যে, সে মোটা টাকা দিতে পারিবে না; তাহাকে যেন এ বিষয়ে আর বিরক্ত করা না হয়। কাকা দেখিলেন, ছেলের চিঠির সুর বদলাইয়া গিয়াছে, সে নিরীহ ভাল মানুষটি আর নাই। তিনি লিখিলেন—"না খাইয়া তোমাকে এত কষ্ট করিয়া মানুষ করিলাম, এখন যদি তুমি আমাদের দুঃখ না দেখ, তবে আমাদের আত্মহত্যা করা ছাড়া আর উপায় নাই। যদি জাতরক্ষা না হয়, তবে বাঁচিয়া লাভ নাই। তোমার হাতে টাকা নাই, এ কথা আমি বিশ্বাস করি না। কেবল আমাকে ফাঁকি দিতেছ।"

দুঃখে ও অভিমানে তাহার হৃদয় ভরিয়া আসিল। সে ভাবিল—সাধু জীবনযাপনের মূল্য সংসারে কোথাও নাই। যদি কিছু মূল্য থাকে, তবে সে কেবল নিজের কাছে! ঈশ্বরের কাছেও যে আছে, তাহাও ত সে দেখিতে পাইতেছে না। সে যতই সৎপথে থাকিতে চেষ্টা করিতেছে, ততই বিপদ আপদ, দুঃখ-কষ্ট দৈবের অনুগ্রহে ঘাড়ে আসিয়া চাপিতেছে। এখন উপায় কি?

এই সময়ে একটা খুনী মোকর্দ্দমার তদন্তের ভার তাহার উপর পড়িল। আসামী পক্ষ বলিল যে, কলমটা একটু এদিক থেকে ওদিকে ঘুরাইয়া দিলেই তাহারা তাহাকে নগদ দুইটি হাজার টাকা দিবে। সে ভাবিল, এই টাকটা লইলে সে কাকার উৎপীড়ন হইতে মুক্তি পাইবে। ভবিষ্যতে আর না হয় কখনও সে কিছু লইবে না।

সে স্বীকার করিল। তাহারা দুই হাজার টাকার নোট আনিয়া তাহার হাতে দিল।

মোকর্দ্দমা হইল। পবিত্রকুমারের একটু কলম ঘুরানর ফলে প্রকৃত আসামী মুক্তি পাইল ও অপর একটি নির্দ্দোষ লোকের ফাঁসির হুকুম হইয়া গেল। পবিত্রকুমার

এই সংবাদ শুনিয়া একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেল! এতটা যে হইতে পারে, ইহা তাহার ধারণার অতীত ছিল। সে অনেকক্ষণ ধরিয়া ভাবিয়া তাহার কর্ত্তব্য স্থির করিয়া ফেলিল।

টাকাটা তখনও পর্য্যন্ত তাহারই নিকটে ছিল ডাকে পাঠাইলে পাছে ধরা পড়ে, এই ভয়ে তাহার কাকাকে আসিতে চিঠি লিখিয়াছিল। নোটগুলা একখানা 'ইনসিওর' খামের মাঝে ভরিয়া যাহার নিকট হইতে লইয়াছিল, তাহার নামে ডাকে পাঠাইয়া দিল; ঐ সঙ্গে একটুকরা কাগজে লিখিয়া দিল—"আপনার টাকা গ্রহণ করিতে পারিলাম না, ক্ষমা করিবেন।" কাকাকে একখানি পত্র লিখিল যে, তাঁহার আর এখানে আসিবার প্রয়োজন নাই, সে তাঁহার অযোগ্য সন্তান: তাহার দ্বারা তাঁহাদের কোনই উপকার হইল না। সে যে অন্যায় কায করিয়াছে, তজ্জন্য তাহার মৃত্যুই একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত। তাই সে তাঁহাদের শ্রীচরণে এ জীবনের মত বিদায় চাহিতেছে। তাহার পর সে জজ সাহেবের নামে আদালতের কাগজে একখানি দরখাস্ত লিখিল। তাহাতে মোকর্দ্দমার সত্য বিবরণ যাহা সে জানিত, সমস্ত লিখিয়া, প্রয়োজনে পড়িয়া অর্থ লইবার কথা ও মিথ্যা রিপোর্ট দিবার কথা সমস্ত স্বীকার করিল। সে লিখিল, একটি নির্দ্দোষ প্রাণীর জীবন যাইতেছে দেখিয়া এখন তাহার চৈতন্য হইয়াছে যে, সে কত বড় অন্যায় কায করিয়াছে। সে টাকা ফেরত দিয়াছে এবং তাহার এই কাতর অনুরোধ যে, পুনরায় বিচার করিয়া নির্দ্দোষ ব্যক্তিকে মুক্তিদান ও দোষীর শাস্তিবিধান করিয়া ন্যায়ের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ন করা হউক। সে আরও লিখিল—"আমার এই সব কথা বিশ্বাসযোগ্য কি না, সে সম্বন্ধে অনেক তর্ক উঠিতে পারে। আমি আমার নিজের জীবন দিয়া সব তর্কের মুখ বন্ধ করিয়া দিতেছি, এবং সেই নির্দ্দোষ ব্যক্তিকে বাঁচাইবার অন্য কোন নিশ্চিত উপায়ও নাই। আর আমি যে অন্যায় করিয়াছি, তাহার প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ এই আশা-আকাঙ্ক্ষাময় পৃথিবী ত্যাগ করিয়া, নিজেকে ইহ-লোকের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য হইতে বঞ্চিত করিলাম এবং পরলোকেও আত্মহত্যা-পাতকের জন্য অনন্ত নরক ভোগ করিতে চলিলাম।" সে দরখাস্তখানা রেজেষ্টারী করিয়া ডাকে পাঠাইয়া দিয়া বাসায় ফিরিয়া আসিয়া ঘরের দরজা বন্ধ করিল। সহসা ঘরের ভিতর রিভল-ভারের আওয়াজ হওয়ায় লোক দরজার ফাঁক দিয়া দেখিল, সব শেষ হইয়া গিয়াছে।

শ্রীরমেশচন্দ্র বসু।

হৃদয়ের তান

[কার্ত্তিক মাসের 'মাসিক বসুমতী'র ১ম চিত্র দর্শনে]

বালিশে হেলায়ে মাথা
এলায়ে পড়েছে হাত।
আধ চিৎপাত শুয়ে, আধ কিছু কাত॥

আরেকখানি করে,
বামা ইঙ্গিত করে,
বুকে মূল্যবান্,
"হৃদয়ের তান"
বেজে উঠে ফুটে লাজ টুটে
বসন সরেছে হঠাৎ॥

সীঁতিতে সিঁদুর অধর মধুর তার,
গলে হেমহার, আহা হা বাহার,
মরি কি খুলেছে হায়!—
জানুযোড়া কোলে,
প্রকাশে ভূগোলে,
পদ-কোকনদে যেন ছেড়ে গেছে ধাত॥
এ কলার বিচিত্র বিভূতি,
'স্বাহা স্বাহা' বলিয়া আহুতি,
কিংবা "হরেকৃষ্ণ" বলি, হ'ল অন্তর্জ্জলি
এলো না ত প্রাণনাথ॥

শ্রীঅমৃতলাল বসু।

ঘাস, বাঁশ ও বেত

কোন প্রসিদ্ধ লেখক বলিয়াছেন যে, আমরা সেই উদ্ভিদকেই আগাছা বলি, যাহার ব্যবহার আমরা অবগত নহি। কথাটা খুবই সত্য। বন্য মানবের নিকট দুই চারিটি উদ্ভিদ ব্যতীত সুবিশাল উদ্ভিদ্‌রাজ্য আগাছাময় বলিয়াই প্রতীয়মান হইত। শতাব্দীর পর শতাব্দী যেমন মানবের জ্ঞানের পরিসর বৃদ্ধি লাভ করিতেছে, তেমনই ব্যবহার্য্য উদ্ভিদের সংখ্যা বাড়িয়া চলিয়াছে। সাধারণ লোক ঘাসের ব্যবহার পূর্ব্বে কমই জানিত; সেই জন্য নগণ্য জিনিষকে 'তৃণ তুল্য' জ্ঞান করার কথা এখনও শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু বিশেষভাবে পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, তৃণ-বর্গের (Gramineae) ন্যায় এরূপ বহুজাতিবিশিষ্ট ও বহুদেশব্যাপী উদ্ভিদ-সমষ্টির সংখ্যা নিতান্তই কম। মনুষ্যের প্রধান খাদ্য ধান্য, যব, গম, ভুট্টা ইত্যাদি ঘাসের বীজ ভিন্ন আর কিছুই নহে। গৃহ প্রস্তুত ও সজ্জার অনেক উপকরণই তৃণশ্রেষ্ঠ বাঁশ হইতে সামান্য উলু পর্য্যন্ত সরবরাহ করিয়া থাকে। ইক্ষু ও উহার নিকট-আত্মীয়রা শর্করা উৎপাদন করে; আবার বর্ত্তমান যুগের একটি অত্যাবশ্যক দ্রব্য—কাগজ নানা জাতীয় বাঁশ ও ঘাস হইতে উৎপাদিত হইতেছে। গন্ধ-দ্রব্য ও ঔষধ প্রস্তুতেও ঘাসের প্রয়োজনীয়তা আছে—গন্ধতৃণ, খস্‌খস্, রসা তৈল প্রভৃতি তাহার উদাহরণ। ঘাস-জাতীয় উদ্ভিদের উপকারিতা যে কত, তাহা উক্ত ব্যবহারসমূহ হইতে বুঝিতে পারা যায়। বেত অবশ্য এত প্রকার কাযে আইসে না; কিন্তু যে সকল দেশে যথেষ্ট পরিমাণ বেত জন্মায়, তথায় বাঁশের ন্যায়ই বেত নানা প্রকার কার্য্যে ব্যবহৃত হয়। পূর্ব্বে এ দেশে বেতের সেতু প্রস্তুত হইত এবং প্রাচীন ভারতে কোন কোন শ্রেণীর সমুদ্রগামী পোতের চতুর্দ্দিকে যে বেতের ছাউনি দেওয়া হইত, তাহারও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

তৃণ-মূলক শিল্প

ঘাস হইতে নানা প্রকার পদার্থ পাওয়া যায় এবং ঘাসের ব্যবহারও বহুবিধ। সে সমুদয় আলোচনা করিবার বর্ত্তমান প্রবন্ধে স্থান নাই। আমরা এ স্থলে প্রধানতঃ যে সমুদয় কুটীর-শিল্প ঘাসের সাহায্যে চলিতেছে এবং বৈজ্ঞানিক প্রথা অবলম্বনে যে সমুদয়ের উন্নতি সম্ভবপর, কেবলমাত্র সেই প্রকারের দুই চারিটি শিল্পের উল্লেখ করিব। বিহারের মত বঙ্গদেশে সুদূর বিস্তৃত দূর্ব্বাক্ষেত্র সুলভ না হইলেও বাঙ্গালার বহুবিধ গৃহস্থালী কার্য্যে প্রয়োগ-উপযোগী নল, শর ও অন্য জাতীয় ঘাসের অভাব নাই। বহুকাল হইতে এতদ্দেশে বহু-প্রকার নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্যের জন্য তৃণ-জাতীয় উদ্ভিদ্ ব্যবহৃত হইতেছে। কিন্তু বঙ্গদেশের গৃহশিল্পে কয়েকটি জাতির বিশেষ প্রাধান্য এখনও লক্ষিত হয়। নিম্নে তাহাদিগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল :—

১। **নল**—(Phragmites Karka) অন্য প্রদেশের নল অপেক্ষা বাঙ্গালার নল কিছু ছোট, কিন্তু অধিক ঝাড়াল ; দুই বৎসরে ইহা পরিপক্ক হইয়া ৬।৮ হাত দীর্ঘ হয়। নদী এবং অন্যান্য জলাশয়ের ধারে অনুর্ব্বর জমীতে নলের ঝোপ স্বভাবতঃই জন্মিয়া থাকে। দরমা ও নৌকার ছাউনিতে নল ব্যবহৃত হয়। সাপুড়িয়াগণ মোটা নল হইতে তাহাদের বাঁশী প্রস্তুত করে। পরীক্ষা দ্বারা জানা গিয়াছে যে, নল হইতে শতকরা ৩৯ ভাগ অপরিষ্কৃত পিণ্ড (pulp) পাওয়া যাইতে পারে এবং সেই জন্য ইহা কাগজ প্রস্তুতের উৎকৃষ্ট উপাদান বলিয়া গণ্য হয়।

উলু (Imperata arundinacea) ইহার সহিত সকলেই পরিচিত আছেন এবং অনেক কৃষক দ্বারা ইহা

অবিমিশ্র অমঙ্গলরূপে পরিগণিত হয়। ইহার ৩।৪টি উপজাতি আছে। সমতল প্রদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া হিমালয়ের ৭ হাজার ফুট উচ্চ অঞ্চল পর্য্যন্তও উলু দৃষ্ট হয়। নিকৃষ্ট পশুখাদ্য ও গরীব গৃহস্থের গৃহাচ্ছাদন উপাদানস্বরূপ উলুর অল্পবিস্তর ব্যবহার আছে। কিন্তু হিন্দু, চীন এবং মালয় দেশে ইহা প্রচুর পরিমাণে কাগজের কলে ব্যবহৃত হইতেছে।

৩। **কুশ**—(Eragrostis Cynos uroides) অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা বঙ্গে ইহা কম হইলেও স্থানবিশেষে যথেষ্ট পরিমাণে কুশ জন্মিয়া থাকে। জ্বালানী, বসিবার আসন ও দড়িদড়া প্রস্তুতেই ইহার প্রধান ব্যবহার।

৪। **মুঞ্জ**—(Saccharum ciliare) ইহাও বঙ্গদেশে অপেক্ষাকৃত কম এবং কুশের ন্যায়ই ইহা ব্যবহৃত হয়। কিন্তু এই জাতীয় ঘাস কুশ অপেক্ষা বড় এবং ইহা হইতে প্রস্তুত দ্রব্যাদিও অধিক মজবুত। শতকরা ৪০ ভাগ পরিমাণে বিবর্ণ পিণ্ড পাওয়া যায় বলিয়া মুঞ্জ কাগজ উৎপাদনের জন্য বিশেষ উপযোগী।

৫। **শর**—(Saccharum rundinaceum) শরের ২।৩টি উপজাতি আছে। ইহারা ১৫।১৬ হাত পর্য্যন্ত উচ্চ হয়; পূর্ণ পরিপুষ্টি হইতে প্রায় ৪ বৎসর লাগে। ফুল ধরিলেই ইহা কাটিবার উপযুক্ত হয়। ইহা হইতে যেমন উৎকৃষ্ট কাগজ তৈয়ারী হয়, তেমনই ইহার ফলনও অধিক; অন্য ঘাসের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ। গৃহ-নির্ম্মাণ ও গৃহস্থালীর নানাবিধ কার্য্যে ইহার প্রচলন আগে খুবই ছিল এবং এখনও কতক পরিমাণে আছে।

৬। **খড়ি**—(Saccharum Fuscum) খড়ির কলম উঠিয়া গেলেও গ্রাম্য অঞ্চলে এখনও অদৃশ্য হয় নাই। খড়ি বঙ্গদেশের অনেক স্থলেই সুলভ। ইহার ব্যবহার শরের মত এবং ইহাও কাগজের উৎকৃষ্ট উপাদান।

৭। **বাইব**—(Ischaemum angustifolium) ইহার অন্য নাম সাবাই ঘাস। পশ্চিম-বঙ্গের স্থানে স্থানে ইহা দৃষ্ট হয়; কিন্তু মধ্য ও উত্তর-ভারতে ইহার প্রসার অধিক। ইহাই বর্ত্তমান সময়ে কাগজ প্রস্তুতের উৎকৃষ্ট উপাদান বলিয়া বিবেচিত হয় এবং সেই জন্য কাগজের কলসমূহে ইহার কাটতি সমধিক। ভূমধ্য সাগরের তটদেশে উৎপাদিত নানা প্রকারের 'এস্ পাটো' ঘাস পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট কাগজের উপাদান বলিয়া পরিচিত। বাইব সর্ব্বাংশে তাহারই সমতুল্য। বিগত ২৫ বৎসর ধরিয়া কাগজের কলসমূহে বাইব ঘাস ব্যবহৃত হইয়া তাহা স্পষ্টই প্রমাণিত হইয়াছে।

তৃণ সদৃশ উপকরণ

ঘাস হইতে যেরূপ দড়ি-দড়া, মাদুর, ঝাঁপ, দরমা, টাট ইত্যাদি প্রস্তুত হয়, সেইরূপ অন্যান্য অনেক উদ্ভিদ হইতেও হইয়া থাকে। সে সমুদয়ের উল্লেখ করিবার এ স্থলে স্থানাভাব। তবুও ২।৪টির ব্যবসায়িক প্রাধান্য এত অধিক যে, উহাদের উল্লেখ না করিয়া থাকা যায় না। মুথা বর্গীয় উদ্ভিদ (cyperaceae) তৃণবর্গের নিকট-আত্মীয়। এই বর্গভুক্ত দুইটি উদ্ভিদ বঙ্গের মাদুর-শিল্পের ভিত্তি।

পাটি (Cyperus exaltatus var dives) সুন্দরবনে এবং বঙ্গের অন্যত্র জলাভূমিতে ইহা প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে এবং ইহার পুষ্পদণ্ড হইতেই বালন্দের মাদুর প্রস্তুত হয়। কম মজবুত হইলেও দরে সস্তা বলিয়া এই মাদুরের যথেষ্ট কাটতি আছে। প্রতি বৎসর বহু শত নৌকা বোঝাই হইয়া পাটি সুন্দরবন হইতে আইসে এবং ইহা হইতে মাদুর প্রস্তুত করিয়া অনেকে জীবিকা অর্জ্জন করে। শীতলপাটির গাছ স্বতন্ত্র। উহা বর্ত্তমান প্রবন্ধের বিষয়ীভূত নহে।

মাদুর কাঠি—কলিকাতায় মাদুরপটিতে যে উচ্চ শ্রেণীর মাদুর দৃষ্ট হয়, তাহা সমবর্গীয় উদ্ভিদ (cyperus tegetum) হইতে প্রস্তুত। ইহাকে সচরাচর মাদুর কাঠি বলে। পূর্ব্ব-বঙ্গের দুই এক স্থলে এবং বর্দ্ধমানে ইহার চাষ থাকিলেও মেদিনীপুরের সবঙ্গ অঞ্চলই এই শ্রেণীর মাদুর উৎপাদনের প্রধান কেন্দ্র। ত্রিকোণাকার ৪।৫ ফুট লম্বা পুষ্পদণ্ডগুলিকে সরু অথবা মোটা করিয়া চিরিয়া লইবার হিসাবে পাতলা অথবা পুরু মাদুর প্রস্তুত হয়। পাতলা মাদুর সুতা দিয়া বোনা হয় বলিয়া ইহাকে

সূতার মাদুরও বলা হয়; অন্য নাম মছলন্দ। উৎসাহের অভাবে সূতার মাদুর-শিল্পের অবনতি হইয়াছে। বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত, মার্ব্বেল প্রস্তরের ন্যায় পালিশযুক্ত, শীতল মছলন্দ আজকাল বিরল। নবাবী আমলে সূক্ষ্ম মাদুর-শিল্পে বঙ্গদেশ অন্য সকল প্রদেশকে পরাভূত করিলেও এক্ষণে ইহা দক্ষিণ-ভারতের মাদুর-শিল্পের নিকট নতশির। সেখানেও মাদুর কাঠির গাছ সমবর্গীয়—C. corymbosa van pangorei; এবং প্রস্তুত-প্রণালীও প্রায় একরূপ; কিন্তু মাদুর আকারে ছোট এবং চিত্রাঙ্কনের আদর্শও অন্যরূপ। তিনেভিলে, ভেলোর, ইন্দ্রাবতী প্রভৃতি স্থানে মাদ্রাজী মাদুরের শিল্প বেশ সমৃদ্ধিশালী। এ স্থলে ইহা বলাও আবশ্যক যে, যে উপাদান হইতে চীনারা অতি সুন্দর মাদুর প্রস্তুত করিয়া বিদেশে বহু পরিমাণে চালান দেয় অর্থাৎ cyperus malaccensis 'চামাটি পাটি', তাহা মধ্য ও পূর্ব্ব-বঙ্গে এবং শ্রীহট্ট ও সুন্দরবনে প্রচুর পরিমাণে আছে; কিন্তু এখনও পর্য্যাপ্ত কার্য্যে প্রয়োগ করা হয় নাই। বলা বাহুল্য যে, সুদৃশ্য প্রাচ্য মাদুরের প্রতীচ্যের বাজারে, বিশেষতঃ মার্কিণে খুবই আদর আছে।

হোগলার মাদুরের প্রচলন বঙ্গদেশে ততটা নাই; কিন্তু ভারতের অন্যত্র ইহা বালন্দের মাদুরের ন্যায়ই ব্যবহৃত হয়। হোগলার পুষ্পদণ্ড এবং পাতা উভয়ই কাযে লাগে। হোগলার টাট্টির গ্রামাঞ্চলে যে বহুবিধ ব্যবহার হয়, তাহা সকলেই জানেন। নৌকা ও ডিঙ্গী-ডোঙ্গায় হোগলা যে অত্যাবশ্যক, তাহা নদীকূলবাসী বাঙ্গালীমাত্রই অবগত আছেন।

বাঁশের ব্যবহার

জগতের সমস্ত গ্রীষ্মপ্রধান দেশেই বাঁশের প্রাধান্য অধিক এবং সেই নিমিত্তই এই সমুদয় দেশে বহু পুরাকাল হইতে বাঁশ নানাবিধ কাযে প্রয়োগ হইয়া আসিতেছে। ভারতের সমতল দেশে সর্ব্বত্রই বাঁশ আছে এবং হিমালয়ের দশ হাজার ফুট উচ্চ শৃঙ্গে পর্য্যন্তও বাঁশ দেখিতে পাওয়া যায়। বঙ্গে বোধ হয়, এমন কোন গ্রাম নাই, যেখানে ২।৪ ঝাড় বাঁশ নাই। অবশ্য সকল জাতি সর্ব্বত্র সুলভ নয়; হিমালয়ের পাদদেশ হইতে বঙ্গের পূর্ব্ব-সীমান্ত পর্য্যন্ত বড় বাঁশের বাহুল্য। গৃহনির্ম্মাণ ও পুল প্রস্তুত হইতে আরম্ভ করিয়া বাঁশ যে কত প্রকার স্থূল ও সূক্ষ্ম শিল্পে নিযুক্ত হইয়া থাকে, তাহার সামান্য বর্ণনা করিতেও একটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধের প্রয়োজন হয়। ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, বাঙ্গালায় ডোমের সংখ্যা নিতান্ত কম নয় এবং বংশশিল্পই ইহাদের প্রধান অবলম্বন ছিল। জাপানের ন্যায় বাঁশের সূক্ষ্ম শিল্প এ দেশে বিকাশ পাইবার কখন অবসর পায় নাই; তথাপি ২৫।৩০ বৎসর পূর্ব্বের প্রস্তুত যে সমুদয় গৃহসজ্জার নমুনা এখনও দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, বাঙ্গালী ডোম উৎসাহ পাইলে উচ্চ শ্রেণীর কায করিতে পারে।

বর্ত্তমান সময়ে অবশ্য বাঁশের সর্ব্বপ্রধান ব্যবহার কাগজ-পিণ্ড (paper-pulp) প্রস্তুত বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। কিন্তু তাহা হইলেও অনাদিকাল হইতে বাঁশের যে সমস্ত ব্যবহার হইয়া আসিতেছে, সেগুলি উঠিয়া যাইবে না। প্রতি বৎসর যে কি বিপুল পরিমাণ বাঁশ দেশমধ্যে ব্যবহৃত হয়, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। জঙ্গলসমূহ হইতে প্রায় ১৫ কোটি বাঁশ কাটা হয়; অন্ততঃ সমসংখ্যক বাঁশ যে গ্রাম্য ঝাড় হইতে বাহির করা হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। অন্যান্য অনেক ফসলের ন্যায় বাঁশও এতদ্দেশে অযত্নে উৎপাদিত হইয়া থাকে। বিভিন্ন প্রকার শিল্পের জন্য বিভিন্ন জাতীয় বাঁশ আবশ্যক হয়; সেরূপভাবে নির্ব্বাচন করিয়া খুব কম স্থানেই এ দেশে বাঁশ-চাষের প্রথা আছে। আমাদের দেশে তলদা বাঁশই সাধারণ বাঁশ। ইহা খুব শীঘ্র বাড়ে ও প্রায় ৭০।৮০ ফুট উচ্চ ও ৫।৬ ইঞ্চ ব্যাসযুক্ত হয় বলিয়া লোক ইহাকেই পছন্দ করে। মালয় দেশের রাজ-বাঁশ (Dendrocalamus gigantea) প্রায় ১ শত ২৫ ফুট উচ্চ এবং উহার নিম্নাংশের ব্যাস প্রায় ১২ ইঞ্চ। তলদা বাঁশের ন্যায় ইহাও বর্ষার প্রারম্ভে গড়ে প্রতিদিন ১ হাত করিয়া বাড়িয়া থাকে। ইহার এবং অন্য দুই চারি জাতীয় উৎকৃষ্ট যষ্টি ও ছিপ প্রভৃতি প্রস্তুতের উপযোগী নিরেট ও দৃঢ় বাঁশের প্রবর্ত্তন হওয়া বিশেষ বাঞ্ছনীয়।

বেতের কায

সিঙ্গাপুর, মলকা প্রভৃতি দেশ হইতে কলিকাতায় বেত আমদানী হইতে দেখিয়া অনেকে মনে করেন যে,

এ দেশে বুঝি উৎকৃষ্ট বেত হয় না। বাস্তবিক কিন্তু তাহা নয়। দুই একটি বিশেষ উদ্দেশ্য ব্যতীত অপর সকল কার্য্যেরই উপযোগী বেত ভারতে পাওয়া যায়। বস্তুতঃ পূর্ব্ব-হিমালয়ের পাদদেশ হইতে বঙ্গের পূর্ব্বসীমা দিয়া আসাম পর্য্যন্ত বেতের নিবিড় জঙ্গল বিস্তৃত। স্থানে স্থানে ইহা এত ঘন ও দুর্গম যে, মানুষের কথা দূরে থাকুক, বড় বড় বন্য জন্তুও এ প্রকার জঙ্গলকে ভয় করে। এই সমুদয় বেতবনে নানা জাতীয় বেত পাওয়া যায়; কিন্তু তন্মধ্যে নিম্নলিখিত জাতিগুলি প্রধান :—

চট্টগ্রাম অঞ্চলের কড়কা বেত (calamus tatifolius) ইহা দৈর্ঘ্যে খুব বড় হয় এবং সাধারণ লাঠির ন্যায় মোটাও হইয়া থাকে; হুড়ুম বেত কিছু ছোট হইলেও অধিক মোটা; চাঁচি বেত (C. tenuis) সাধারণ কলমের মত মোটা, ইহা বড় বড় গাছের উপরেও লতাইয়া যায়; মাদুরী বেত (C. gracilis) সরু, কিন্তু দেখিতে সুন্দর।

দার্জ্জিলিং অঞ্চলের গৌরী বেত (C. acanthospathus) প্রসিদ্ধ; কড়কা বেতও এই স্থানে পাওয়া যায়।

শ্রীহট্ট অঞ্চলের দেবমল্লার বেত ২।৩ শত হাত দীর্ঘ এবং মুষ্টিপরিমিত মোটা হয়; ইহার এক একটি 'পাপ' ১২।১৫ ইঞ্চ লম্বা। এই জিলার তিলা নামক উচ্চ স্থানের জঙ্গলে আরও ২।৪ জাতীয় বেত এবং কেতকীর প্রাদুর্ভাব যথেষ্ট।

গোলা বেত (Daemonorops jevkinsianus) এবং বড় বেত (C. fasicularis) বঙ্গের অনেক স্থানে এবং উড়িষ্যায় সুলভ। বেঙ্গল-নাগপুর রেলের বালুগাঁ ষ্টেশন বেত-ব্যবসায়ের একটি কেন্দ্র।

চেয়ার, টেবল, আরাম-কেদারা, পেঁটরা, বাক্স প্রভৃতি সকল রকম দ্রব্যই বেত হইতে প্রস্তুত হয়। বেত ও বাঁশ সহযোগে উত্তম উত্তম আসবাব কোন কোন কারাগৃহে (যথা মেদিনীপুর) প্রস্তুত হয়। কারা শিল্পের (Prison industry) মধ্যে ইহা একটি উচ্চ স্থান অধিকার করে।

বেত, বাঁকারি ইত্যাদির শিল্পে প্রয়োগ

ঘাস, বাঁশ, বেত ও সমপ্রকারের উপাদান দ্বারা যে নানা প্রকার দ্রব্যাদি উৎপাদিত হইতে পারে, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। সমষ্টিভাবে এইরূপ উপাদান-জাত দ্রব্যাদিকে এক এক সময় wicker work বলা হয়; কিন্তু মাদুর, দরমা প্রভৃতি প্রকৃত প্রস্তাবে wicker work-এর অন্তর্গত নয়। স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, এখনও এই শ্রেণীর দ্রব্যগুলির মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি সচরাচর প্রস্তুত হয় :—

কয়েকটি প্রচলিত বাঁশ, বেত ও ঘাস দ্বারা প্রস্তুত দ্রব্যের নমুনা

১। ঝুড়ি, চেঙ্গারী, ধামা ইত্যাদি বাঙ্গালীর গৃহস্থালীর নানা কাযে এইরূপ দ্রব্য আবশ্যক হয় বলিয়াই প্রায় সকল জিলাতেই এইরূপ দ্রব্য প্রস্তুত হয়।

২। দরমা;—গৃহ নির্ম্মাণ ও অন্যবিধ কাযে ইহার প্রয়োজন সমধিক; সেই জন্য ইহাও পূর্ব্বোক্তের ন্যায় সাধারণ।

৩। প্রকৃত ঘাসের মাদুর রাজসাহী ও মেদিনীপুর জিলায় এখন দরিদ্র কৃষকের বাড়ীতে দেখা যায়; এগুলি বেশ মোটা এবং কঠিন-ব্যবহারসহ, তাহার পর উৎকর্ষ অনুসারে যথাক্রমে বালন্দের মাদুর, মোটা কাঠির মাদুর ও সূতার মাদুর। মেদিনীপুর, যশোহর, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, খুলনা, রাজসাহী এবং রঙ্গপুর জিলায় যাহারা মাদুর বয়ন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে, তাহাদের সংখ্যা নিতান্ত কম নয়।

৪। সৌখীন আসবাব;—যশোহর ও মেদিনীপুর জিলায় বাঁশ ও বেতের চেয়ার, টেবল, মোড়া, আরাম-কেদারা ইত্যাদি সামান্য পরিমাণে প্রস্তুত হয়। ত্রিপুরা ও চট্টগ্রামে প্রস্তুত আসবাবও মন্দ নহে।

ব্যাগ, টিফিন বাস্কেট প্রভৃতিও আজকাল হাওড়া জিলায় প্রস্তুত হইতেছে।

৫। বিবিধ দ্রব্য ;—লাঠি, ছাতার বাঁট, বস্ত্রাদির হাতল ইত্যাদি বিবিধ প্রকারের দ্রব্যও কলিকাতায় প্রস্তুত হয়।

উক্ত প্রকারের দ্রব্যাদি ব্যতীত রুচির পরিবর্ত্তন অনুসারে পুরাতন ধরণের বদলে হাল ফ্যাসানের দুই চারটি জিনিষ দেখা দিয়াছে। কিন্তু বঙ্গদেশে যাহারা ঘাস, বাঁশ, বেত প্রভৃতির দ্রব্যাদি নির্ম্মাণ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে, তাহাদের অবস্থা উন্নত হওয়া দূরের কথা, বরং অবনত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে কোন তথ্য না পাইলেও সরকারী শেষ শিল্পবিষয়ক বিবরণী ও অন্যান্য কাগজপত্র হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, আজকাল বঙ্গদেশের কোন জিলাতেই এই শ্রেণীর কার্য্যে নিযুক্ত ২০ হাজারের অধিক লোক নাই। মাদুর ব্যবসারের জন্যই বোধ হয়, মেদিনীপুরে উক্ত শ্রেণীর ১৬ হাজার লোক আছে ; তৎপরে যশোহরে ৯ ; বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া ও নদীয়া প্রত্যেকে ৮, বীরভূম, পাবনা, ঢাকা ও ময়মনসিংহ প্রত্যেকে ৭ ; দিনাজপুর ও চট্টগ্রাম জিলায় এই শ্রেণীর লোকের আনুমানিক সংখ্যা ৫ হাজার। তন্নিম্নের সংখ্যা এ স্থলে দেওয়া হইল না ; কারণ, সেরূপ জিলায় এই শ্রেণীর কায যে অতি সামান্য, তাহা সহজেই বোধগম্য।

শিল্পের পুনর্গঠন

যাঁহারা জাপান অথবা জর্ম্মণীতে wicker work জাতীয় শিল্প কতদূর উন্নতি লাভ করিয়াছে, তাহা

অধুনা জর্ম্মণীতে উচ্চ শ্রেণীর আসবাব প্রস্তুত হইতেছে

অবগত আছেন, তাঁহারা আদৌ অস্বীকার করিবেন না যে, আমাদের দেশে এই শিল্পের পুষ্টি লাভ করিবার যথেষ্ট সুযোগ আছে। সম্প্রতি জর্ম্মণীতে প্রস্তুত কয়েকটি শিল্পের চিত্র দেওয়া হইল।

ইহার সহিত প্রথম চিত্রের তুলনা করিলে স্পষ্টই দেখা যাইবে যে, এতদ্দেশে এইরূপ শিল্প কত পশ্চাতে পড়িয়া আছে। অথচ কাঁচা মালের এবং অপেক্ষাকৃত সুলভ মজুরীর এখানে অভাব নাই। বর্ত্তমান জগতে কাষ্ঠের মূল্য ক্রমশঃ চড়িয়া যাইতেছে ; সেই জন্য নিকৃষ্ট কাষ্ঠের উপর উৎকৃষ্ট কাষ্ঠের পাতলা আচ্ছাদন Veneer দিয়া প্রস্তুত করা আসবাবের ব্যবহার ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিয়াছে। তাহাতেও মধ্যবিত্ত লোক ইচ্ছামত কাঠের আসবাব ক্রয় করিতে পারে না। এই সুযোগ বুঝিয়া জর্ম্মণী ও জাপান এরূপ গৃহসজ্জা ও নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি ঘাস, বাঁশ, বেত, সমুদ্র-শৈবাল ও অন্যান্য সাধারণ উদ্ভিদ সাহায্যে প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিয়াছে—যাহা দেখিতে মনোরম, গঠনে মজবুত অথচ কাঠ অপেক্ষা দামে অনেক সুলভ। যদি সূক্ষ্ম শিল্প শিক্ষা দেওয়ার কোন কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান এতদ্দেশে থাকিত, তাহা হইলে আধুনিক প্রথা অনুসারে এইরূপ শিল্পের জন্য উপযুক্ত উপাদান নির্ব্বাচন, তাহাদের সদ্ব্যবহার, বাজারে কাটাইবার পদ্ধতি প্রভৃতি বিষয়ক উপদেশ দেওয়া ও প্রকৃত প্রস্তাবে কায শিখাইয়া দেওয়ার সুবিধা হইত। দুর্ভাগ্য বশতঃ তাহা নাই। কিন্তু তাহা হইলেও আজকাল যাঁহারা পল্লী-সংস্কারকার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, তাঁহারা চেষ্টা করিলে এইরূপ আনুষঙ্গিক শিল্পের (Subsidiary industry) কতকটা উন্নতি হইতে পারে।

এইরূপ শ্রেণীর শিল্প প্রধানতঃ হস্ত দ্বারাই এতাবৎকাল পরিচালিত হইয়া আসিতেছিল। মাদুর প্রভৃতি প্রস্তুতের জন্য যে তাঁত ইত্যাদি এখনও ব্যবহার হয়, তাহাকে ঠিক কল বলা যায় না। কিন্তু বিদেশীয় বণিকরা একসঙ্গে বহু পরিমাণ মাল প্রস্তুত করাইয়া উৎপাদনের খরচা কমাইবার জন্য এই প্রকার আদিম কালের গৃহ শিল্পের কাযেও কলের প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। কলে প্রস্তুত এইরূপ একটি কেদারার নমুনা এ স্থলে

প্রদর্শিত হইল। ইহাতে প্রথমে শূন্য ফ্রেম অথবা কাঠামটি প্রস্তুত হইয়া যায়; তৎপরে উহার সহিত গদি ও অন্যান্য কারুকার্য্যাদি সুদৃঢ়ভাবে আটকাইয়া দেওয়া হয়। সমস্ত দ্রব্যটি এরূপ সুকৌশলে প্রস্তুত যে, সহজে ইহার যোড় প্রভৃতি ধরিবার উপায় নাই; অবিকল হস্তনির্ম্মিত কেদারা। অধিকন্তু হস্তনির্ম্মিত কেদারা হইতে ইহার সুবিধা এই যে, ইহার অংশগুলি খুলিয়া ফেলিয়া
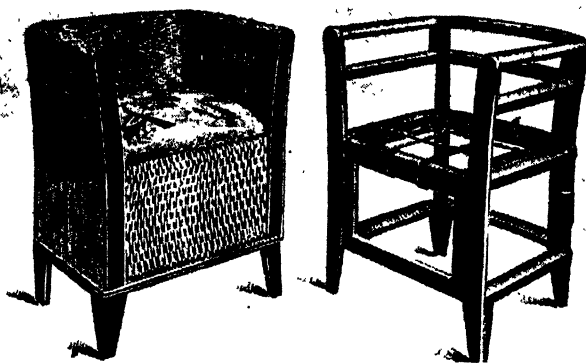
কলে প্রস্তুত বাঁশ, বেত অথবা সমশ্রেণীর উপাদানের প্রস্তুত আসবাব।
দক্ষিণে শূন্য ফ্রেম, বামে সম্পূর্ণ প্রস্তুতাকৃতি কেদারা

অন্যত্র লইয়া গিয়া যুড়িয়া লওয়া চলে। এতদ্দেশে এই প্রকার শিল্পে কল ব্যবহার করিবার সময় এখনও আইসে নাই। প্রথমে হাতের কাযেই বিদেশীয় শিল্পীর সমকক্ষ হওয়া আবশ্যক। যেরূপ কল সামান্য সামান্য দ্রব্য অথবা মাদুর ইত্যাদি উৎপাদনের জন্য প্রয়োজন, তাহা দেশীয় উপাদানে দেশীয় মিস্ত্রীর দ্বারাই প্রস্তুত হইতে পারে।

শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত।

আশুতোষ তর্কভূষণ

যশোহর লক্ষ্মীপাশা থানার এলাকাধীন মল্লিকপুর গ্রামের বিখ্যাত পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় আশুতোষ তর্কভূষণ মহাশয়ের মৃত্যুতে বাঙ্গালা যথার্থই একটি পণ্ডিত রত্নে বঞ্চিত হইয়াছে।

তর্কভূষণ মহাশয় ১২৬৮ সালের ২০শে ভাদ্র তারিখে মল্লিকপুরের প্রসিদ্ধ চট্টোপাধ্যায় বংশে জন্মগ্রহণ করেন। স্বর্গীয় বিশ্বনাথ শিরোমণি তাঁহার পিতামহ এবং স্বর্গগত উমাচরণ তর্কালঙ্কার তাঁহার পিতা।

তর্কভূষণ মহাশয়ের পাণ্ডিত্যের বিষয় বিদ্বান্ মাত্রেই অবগত আছেন। তিনি কুসুমাঞ্জলির সটীক বঙ্গানুবাদ করেন।

৺রায় রাজেন্দ্রনাথ শাস্ত্রী বাহাদুর কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া তিনি নব-ন্যায়ের বঙ্গানুবাদ করিতে আরম্ভ করেন। শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন এই কার্য্য তিনি সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই। মাত্র একখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছিল; উহাতে তিনি নব-ন্যায়ের প্রয়োজন, পারিভাষিক শব্দ প্রয়োগের উপযোগিতা এবং তাহার অর্থ ও প্রত্যক্ষ নিরূপণ পর্য্যন্ত লিপিবদ্ধ করিয়া যায়েন।

আশুতোষ নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাঁহার ধর্ম্মভাব অতীব প্রবল ছিল। তিনি স্বীয় ভিক্ষালব্ধ অর্থে স্বগ্রামে একটি শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন।

৭
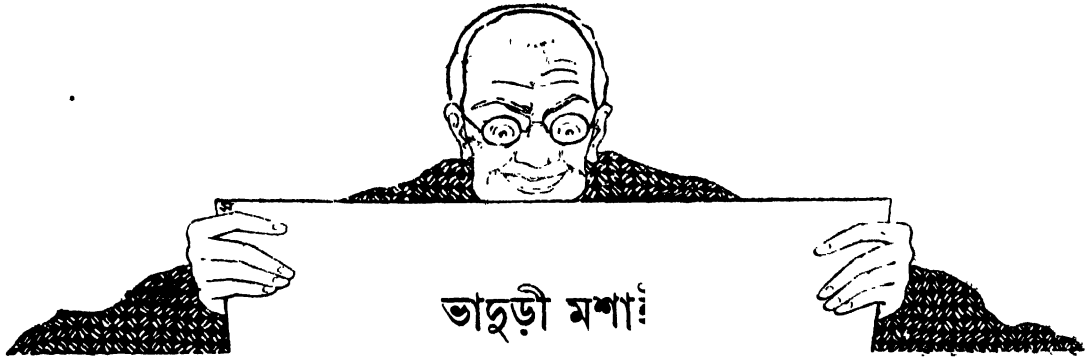
বেলা দশটা আন্দাজ দেবস্থানে নক্সা দেগে দু'জনে সিগারেট ধরালেন, আচার্য্য সভক্তি পূজারীকেও একটি দিলেন, পূজারীর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতেই তিনি প্রণয়বদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন।

নক্সার পাতনামা দেখে আচার্য্য উৎসাহের সহিত বল্লেন, "শেখা বিদ্যে না হ'লে এমনটি হয় না—পাকা হাত বটে! এক মেটেতেই এই—বাঃ—বাঃ! দিদি দেখলে ভারী খুসী হবেন!"

নবনী হাসতে হাসতে বল্লে,—"আপনি ভাল বল্লে আর ফল কি? আপনার মত খাঁটি সমঝদার দাতা-কর্ণদের ভেতর কেউ বেরিয়ে পড়েন—তবে না।"

আচার্য্য বল্লেন, "কায-কর্ম্মের কথা বলছ? আরে রাম, চাকরীতে মারো ঝাড়ু। তোমার ভাবনা কি বাবাজী, যে হাত দেখছি, মধুপুরেই একটা পাহাড় পছন্দ ক'রে 'মধুগুহা' বানিয়ে ফেল,—অজন্তার আওয়াজ থেমে যাবে। মাসিক সাহিত্যের dropsy department (সোথ বিভাগটা) চুপসে হাল্কা হবে।—fill upএর (গতর বাড়ানোর) নূতন মেওয়া মিলবে। খাঁদা-বোঁচা, ল্যাংড়া-ঝুলো, কন্ধকাটা 'কলা' আর গিলতে পারা যায় না।"

নবনী বল্লে, "উত্তম আজ্ঞা করেছেন, কিন্তু আমার ইচ্ছা, বাইরে দু'একটা খণ্ডপ্রলয় (ছুটো কায) ক'রে গুহা প্রবেশ করি।"

আচার্য্য:—তা বেশ,—সে ত তোফা কথা। নক্সা দেখে পর্য্যন্ত ভাবছি, ঠিক তোমার উপযুক্ত একটা কায সামনেই রয়েছে, বাবাজী! বাহাদুরী কাঠ চ্যালা করতে পারবে ত?

নবনী সহাস্যে বল্লে, "তা পারবো না কেন? সে আর শক্তটা কি?"

আচার্য্য সোৎসাহে মাথা নেড়ে বল্লেন, "বাস্,—মার দিয়া! কুড়ুলের মুখেই কর্ম্ম। ঢেঁকী বানাতে লেগে যাও। আর জগন্নাথদেব নবকলেবর ধারণ করেন জান ত! আহা! দারুভূত মুরারি! দেখ বাবাজী, তোমার ওই শ্রী sketch,—বাঙ্গালায় কি বোলব হে? ঐ বাঘা-দাগার এক আঁচড়েই বুঝে নিয়েছি—সম্প্রতি ও কাযটির জন্যে তোমার চেয়ে উপযুক্ত কারিগর কেউ জন্মগ্রহণ করেনি। ঢেঁকী আর জগন্নাথ, আহা,—রাজ-যোটক দাঁড়িয়ে যাবে। একেই বলে রথ দেখা আর কলা বেচা। দেখে নিও, আমি ব'লে দিচ্ছি, বাবাজী,—তুমি হাত লাগিয়েছ কি উতরে গেছে। পড়তে পাবে না, বাবাজী—পড়তে পাবে না। ও দু'টিই হিঁদুর ইহ-কাল-পরকালের জিনিষ। জগন্নাথদেবের ত কথাই নেই,—বড়লোকের ঘরজামায়ের পাকা নমুনো,—কেয়া হাত গুটিয়ে ইয়া ভোগ লাগাচ্ছেন। শ্বশুরের ওপর দেবতার কৃপাও কম নয়—হীরের আংটী, কব্জী-ঘড়ি, দস্তানা, ডাইনষ্টিক্ বাদ দিয়েছেন! আর ঢেঁকী ত—'এক এব সুহৃদ্!' স্বর্গে গেলেও ধান ভেনে দেয়,—জান তো।"

নবনী আমোদপ্রিয় যুবা, সে এখানে এসে ভারি মুস্কিলে পড়েছিল। আজ আচার্য্যকে খাঁটি অবস্থায় পেয়ে 'দিনগুলো কাটবে ভাল' এই ভেবে মনে মনে ভারি খুসী হচ্ছিল। সে বল্লে, "আপনি একটু ঝেড়ে আশীর্ব্বাদ করুন, তা হ'লেই—"

আচার্য্য বল্লেন, "সে বলতে হবে কেন, বাবাজী—সে কি এখনও বাকি আছে।" ইত্যাদি কথায় সিগারেট

ভস্ম ক'রে দু'জনে উঠে পড়লেন। আচার্য্য বেশ আনন্দে ছিলেন, দেবস্থানে এলেই শোধন করা পাত্র পেতেন,—বাসার মাড়োয়ারী দরোয়ানের বাগানের ভাঙ! নবনীর সঙ্গেও বেশ বনিয়ে নিয়েছিলেন। পুত্রকামীদের চিন্তা ছিল স্বতন্ত্র, এঁদের স্ফূর্ত্তিতে দিন কাটানো। দু'জনে নানা রহস্যালাপে বাসায় ফিরলেন।

নবনীর ছিল মালকোচা, লপেটা, পাঞ্জাবী আর সোনার চশমা। আচার্য্যের ছিল মটকা নামাবলী, নাগরা; অধিকন্তু টিকি দাড়ী আর সিঁদুরের ফোঁটা। বনের বাইরে এসে বেশ স্বচ্ছন্দ গলায় আচার্য্য সুরু করলেন, "গুপ্ত কাযের যায়গাই এই, আধ মাইলের মধ্যে মানুষের সাড়া-শব্দ নেই। আমাদের কাযটিও রাত আটটার সময়। কোন শালা জানতেও পারবে না, নির্ব্বিঘ্নে হয়ে যাবে। আর—যা কল বানিয়েছ, একবার করে-কম্মে ফেলতে পারলেই ফতে। অনেক মাথা ঘামিয়েছ, বাবাজী, আর একটা সিগারেট ধরিয়ে ফেল।"

নবনী বললে, "আমিও ঠিক এই ইচ্ছা করছিলুম।" এই ব'লে সে দাঁড়িয়ে গেল।

আচার্য্য বললেন, "করবে বই কি বাবাজী,—বৃথা কথা কইবো কেন?"

উভয়ে দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরাতে গিয়ে দেখলেন, হাত ছয়েক পেছনে একটি না-যুবা না-প্রৌঢ় আসছেন, তিনি কাছাকাছি হয়ে হাসি মুখে জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনারা এই পূজোর বন্ধে নূতন এসেছেন বুঝি? এখানে এক হপ্তার জন্যে এলেও উপকার পাওয়া যায়। আমার জীবনের আশাই ছিল না, মাসখানেক হ'ল এসেছি—এই দেখছেন ত! তবে খুব বেড়ানো চাই, এই তিন মাইল ঘুরে আসছি, তা হ'লেই তিন দু'গুণে ছয় হ'ল। বাসাটা বড় দূরে, এই যা অসুবিধা,—পরের বাসায় থাকা কি না!"

অনেক কথাই তিনি একটানে ব'লে গেলেন। খুব মিশুক লোক, দু'মিনিটেই আলাপ-পরিচয় হয়ে গেল। কানে কম শোনেন, নাম মতিলাল বাগচী।

নবনী তাঁকেও একটি সিগারেট দিয়ে তিন জনে আলাপ করতে করতে বাসায় ফিরলেন।

"আমি এই দিকেই বেড়াতে আসি, মনের মত লোক পাওয়া বড় ভাগ্যের কথা মশাই। প্রাণের কথা না হ'লে প্রাণ বাঁচে কি? স্বাস্থ্যের জন্যে যেমন আলো চাই, বাতাস চাই, তেমনই প্রাণ খুলে কথা কবার আড্ডাও চাই। আশ্চর্য্য, 'হাইজিন' লেখকদের এত বড় দরকারী কথাটার দিকে হুঁস নেই! আপনাদের ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করছে না। বেলা না হ'লে চা খেতে যেতুম, আচ্ছা, কা'ল হবে," ইত্যাদি ব'লে বাগচী মশায় বিদায় নিলেন।

নবনী বললে, "বাঃ, লোকটি কি মিশুক! এক মুহূর্ত্তে যেন কত আপনার! চেহারাও বেশ, নিশ্চয়ই খুব ভদ্র বংশের।"

আচার্য্য বললেন, "সুজলা সুফলা দেশের লোক একদম মোলায়েম। ফলগুলোই দেখ না—ফল দেখেই ত বিচার—ফুটি, আতা, পেঁপে, কলা, আহা! দু'দিনেই সুজলা! পুরুতকে আর নৈবিদ্যি বাড়ী পর্য্যন্ত নে যেতে হয় না, পথেই পচ ধরে,—জল কাটে! এক ভাগ মাটী, তিন ভাগ জল—সে আমাদেরই এই বাঙ্গালা দেশটিতেই পাবে, বাবাজী—দু'টিই সেরা জিনিষ।"

নবনী হাসছিল বটে, কিন্তু মনে মনে আচার্য্যের প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট হচ্ছিল।

এই ভাবে স্ফূর্ত্তিতে বেশ দিন কাটতে লাগল। বাগচী মশায়ের সঙ্গে আলাপটাও ঘন হয়ে দাঁড়াল। তিনি এক দিন চা খেতে খেতে শুনিয়ে দিলেন, "বারেন্দ্র শ্রেণীর মধ্যে কেবল আপনাদেরই পেয়েছি, এখানে রোজ একবার না এলে থাকতে পারি না।" দু'দিন লুচি পাঁঠাও খেয়ে গেলেন;—বেশ খোলাখুলি আলাপ হয়ে গেল। লজ্জার খাতিরেই হোক বা যে কারণেই হোক, পুত্র-কামনায় সাষ্টাঙ্গ কাঠামোর কথাটি কেবল বাদ থাকত।

৮

পাঁজিতে পূজা এসে গেল।

তারিণী সামন্ত "কারণের" কেস, ভাদুড়ী মশাইএর চেলীর জোড়, আচার্য্যের গরদের জোড়, মাতঙ্গিনীর মা'র পার্শী, প্যাটার্ণের বেনারসী, "ব্লাউস্ পীস্" প্রভৃতি নিয়ে হাজির হয়ে গেল।

মধুপুরের রাস্তা হেসে উঠলো। পূজার পাট তুলে দিয়ে বাবুরা সরে এলেও,—পোষাকের পাট,—পথে চাঁদের হাট সাজিয়ে দিলে। বিদ্বান্, মূর্খ, কর্ত্তা, সম্বন্ধী, সরকার—সব একাকার! পরিবার-পরিচারিকার প্রভেদ ঘুচে গেছে। ছেলেমেয়েরা নানা বেশে জনস্রোতে যেন ফুলের মত হেসে ভেসে বেড়াচ্ছে!

বাবুরা কেহই কম নন, সকলেই বাঘ মারতে মারতে চলছেন;—কারুর মুখে ছোট কথা নেই। মোটর, মাইন্, ফ্যান্, ফেল্পস্, পেলেটি, প্যালল্, হ্যামিল্টন্, হেমো, গ্লোবিউল্, বিলিয়ার্ড, টেনিস্, ডার্বি ইত্যাদি ইত্যাদি বড় চর্চ্চাই চলেছে। Comfort (আয়েস) ছাড়া কথা নেই,—থাকবার কথাও নয়।

কোন কথাটার মাথামুণ্ডু নেই, কারণ, একের মুখ থেকে অন্যে ছোঁ মেরে নিচ্ছে। নিজের কথাটা শোনাবার তরে সকলেই ব্যস্ত। এক জন বল্লেন, ফেল্পস্ ছাড়া কারও cut (কাট ছাঁট) আমি ব্যবহারই করি না। এই Home spun (বিলেতে বোনা) উইণ্ডসার গল্ফ।—তাঁ'র শ্রোতাকে টেনে অপর এক জন নিজের হাতটা এগিয়ে ধ'রে আংটী দেখিয়ে বল্‌ছেন,—"বেটারা বলে স্বদেশী—স্বদেশী! হ্যামিল্টন্ ছাড়া এ রকম পালিস কেউ ক'রে দিক না দেখি! এ তা'দের ম্যাকাডামাইজিং মেটিরিয়েল্ (রাস্তা মেরামতের মশলা) নয়! বুঝলে ধীরেন, আর এই লকেটটা" ব'লে তিনি সেটা এগিয়ে ধ'রে কি বল্‌তে যাচ্ছিলেন; অপর এক জন ব'লে উঠলেন,—"কাযের কথাটা শোন, বিজয়ার রাত্রে রায় বাহাদুর গার্ডেন পার্টি দিচ্ছেন। এ পকায়ো মারা পূজো নয়!—পেলেটিতে টেলিগ্রাম চ'লে গেল। মিস্ মলিনা গাইবেন,—কি গ্রাণ্ড গলা! 'মলয় আসিয়ে' একবার ধর্‌লে প্রলয় ক'রে ছাড়বেন!"

এক জন বল্লেন, "I propose—Twice cheers in anticipation." সকলে তিন বার হিপ্ হিপ্ হুরুরে ব'লে এক পাক ঘুরে দাঁড়ালেন।

সাঁওতাল মজুররা কাযে যাচ্ছিল, চমকে থমকে—দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলো। মজুরণীরা প্রত্যেকে প্রত্যেককে ঠেলে কি একটা হাসির কথা করে গাইতে গাইতে চ'লে গেল।

মিহির বাবু বল্লেন, "আজ বার্ক্লেকে দেখতে পাচ্ছি না!"

ধীরেন বাবু বল্লেন, "রক্ষে কর, যতক্ষণ না আসেন, ততক্ষণই ভাল;—আমার কথাটা শেষ হ'তে দিন!"

বিষ্ণু বাবু একটু পেছিয়ে পড়েছিলেন, হ্যাট-কোটই তাঁ'র পরিধেয়। লম্বা লম্বা পা ফেলে দলে পৌঁছেই বল্লেন, "হ্যালো, গুডমর্ণিং! মিষ্টার বার্ক্লে আজ—"

মিহির বাবু বল্লেন, "এই আপনার কথাই ভাবছিলুম, দেরী হ'ল যে?"

বিষ্ণু বাবু বল্লেন, "এই দেখুন না, মিষ্টার বার্ক্লে এক আরজেণ্ট টেলিগ্রাফ ক'রে বসেছেন! একটা রেস্ হর্স (Race horse) কিনবেন, তা আমি না পছন্দ ক'রে দিলে হবে না! হাই ফ্যামিলির (High familyর) ছেলে, নিজে ত কখনও কিছু করেনি! আমার কি কোথাও নড়বার যো আছে! সে দিন সেই বল্‌ছিলুম না—"

ধীরেন মিহিরকে গা টিপে বল্লে, "এই মাথা খেলে, থামাও দাদা!"

বিষ্ণু ব'লে চল্লেন, "বার্ক্লেকে কি পোষাকে ভাল দেখায়, তাও আমাকে ব'লে দিতে হবে। মিসেস্ বার্ক্লে প্রায়ই প্রাইভেট্ সেক্রেটারীর কাছে যান—মস্ত সব connection (সম্পর্ক), ডিউক অফ মার্লবরোর মেয়ে কি না! সে দিন হেসে বল্লেন—"

এই সময় আচার্য্যকে আসতে দেখে বিরক্তভাবে unwelome visitor (আপুদে আগন্তুক) ব'লে, তিনি ভুরু কুঁচকে তাঁর দিকে চেয়ে রইলেন।

রায়সাহেব কৈবল্য বাবু ব'লে উঠলেন, "ম্যাডাপুরে এ বেয়াড়া মূর্ত্তির আমদানী কোত্থেকে হ'ল! চাঁদা চাইবে না কি!"

কে এক জন চুপি স্বরে বললেন, "সেও ভাল—দু একখানা দিতে রাজি আছি, বাবা,—বার্ক্লে থামলে যে বাঁচি!"

কথাটা রজনী বাবুর কানে পৌঁছয়নি, তিনি কৈবল্য বাবুর কথা শুনে বললেন—"ও সব চাল এখানে চলবে না!"

ইন্দু বাবু বললেন—"বেটা যে ফাঁট টেনেছে, এই

ব'লে দেখ না—কন্যাদায়! রোজগার যেন ওই বেটাদের জন্যে।"

মুনসেফ্ বাবু বললেন—"দেখ না ভাগাচ্ছি—"

বিষ্ণু বাবু অসহিষ্ণু হয়ে উঠছিলেন, তিনি আরম্ভ ক'রে দিলেন—"খাঁটি ইংরাজ কি না, মিষ্টার বার্ক্লে আজ এগারো বছরেও বিষ্ণু উচ্চারণ করতে পারলেন না, লেখেনও Beast-you ডাকেনও Beast-you! ওঁর মুখে এমন মিঠে শোনায়—"

আচার্য্য এসে পড়ায় মুনসেফ্ বাবু একটু এগিয়ে নমস্কার ক'রে বললেন, "মশাইকে নতুন দেখছি, এখানে কেউ 'প্রিতিমে' এনেছেন না কি?"

আচার্য্য সহাস্যে উত্তর দিলেন—"এনেছেন ত অনেকেই দেখছি।"

সকলে অবাক হয়ে আচার্য্যের দিকে ফিরে চাইলেন।

মুনসেফ্ বাবু বললেন—"না—সে কথা নয়, তবে এ অঞ্চলে—"

আচার্য্য বক্তাকে অবসর না দিয়ে নিজেই বললেন—"লোকের ভুলচুক্ হওয়াটা ত আশ্চর্য্য নয়; তবে তাতে ডুবে শুদ্ধ্ হওয়া চলে।"

বিষ্ণু বাবু থাকতে পারছিলেন না—বললেন, "বুঝলেন, আমি এত দিন জানতুম না যে, মিষ্টার বার্ক্লে'র বকিংহাম প্যালেসের এক পাঁচীলে ঘর—"

অমৃত বাবু জনান্তিকে বল্লেন,—"জ্বালালে বাবা, যেন ভূতে পেয়েছে—"

আচার্য্য শুনতে পেয়ে হাসিমুখে বললেন—"ভয় কি, কর্ম্মনাশায় পিণ্ড দিন না,—গয়ার কায নয়!"

এক দরের লোক নয়—তবু—অতটা মাখামাখিভাবে আচার্য্যের কথা কওয়াটা মুনসেফ্ বাবুর পছন্দ হচ্ছিল না! তিনি তাঁর কথায় কান না দিয়ে, জিজ্ঞাসা করলেন—"হাত দেখা আসে?"

"আসে বইকি,—জর না কি? ম্যাডাপুরে ত জর হবার কথা নয়। জর হ'লে ত এখানকার নামী রোগটা দেবে যায়।"

মুনসেফ্ বাবু জিজ্ঞাসা করলেন,—"নামী রোগটা?"

"স্থানটাকে আপনারাই Madipur (ম্যাডাপুর) বলেন না?"

মুনসেফ্ বাবু আর কথা কইতে না পেয়ে থ হয়ে চেয়ে রইলেন।

বিষ্ণু বাবু ফাঁক্ পেতেই ধরলেন—"সে দিন কি মজাই হয়েছিল! একখানা সাত পাতা রিপোর্ট দেড় ঘণ্টায় লিখে দি, মিষ্টার বার্ক্লে ত দেখেই অবাক্। তার পর পিট চাপড়ে বললেন—'এ সব তুমি না লিখলে কোন এ্যাংলো ইণ্ডিয়ানকে দিয়েও আমার বিশ্বাস হয় না। এর আরো দু'কাপি টাইপ করিয়ে আমাকে দিও, বুঝলে?' দেখি এই 'New year list-এ' নব বর্ষের (হর্ষ) তালিকায়—"

সতীশ বাবু নেপথ্যে—"পাগল না কি!"

আচার্য্য তাঁর দিকে ফিরে বললেন,—"ম্যাডাপুরে অন্য সব রোগ সারতে পারে—বৃদ্ধি পায় কেবল ওইটিই; সাহেবরা না দেখে আর Etymology ঠিক করে নি! —আচ্ছা, এখন নমস্কার স্যারেরা (Sirs)।"

বিষ্ণু বাবু সুরু করলেন—"দেখুন, সে দিন মিষ্টার বার্ক্লে—"

মোহিত বাবু আর সইতে না পেরে ব'লে ফেললেন—"কি পাপ!"

আচার্য্য একটু উঁচু গলায় ডাকলেন—"এস নবনী বাবু—ট্রেণ বোধ হয় এসে গেল। মোটরখানা আজ না এলে আমাকে কল্‌কেতায় ফিরতেই হবে। এ রকম ক'রে হেঁটে বেড়ানো আমার কর্ম্ম নয়। Comfort (আরাম) খোয়াতে আসা নয় ত!"

দু'পা তফাতে ছ'সাতটি উৎসাহী বাবু-সায়েব রাই-সহরের জমীদার পশুপতি বাবুকে ঘিরে তাঁর aim-এর (লক্ষ্যের) প্রশংসা করছিলেন। তাঁর হাফ্-প্যান্ট গেলা সার্টের উপর হ্যাট্, আর হাতে বন্দুক ছিল। তিনি এইমাত্র দু'টি ঘুঘু মেরে, বন্দুকের নল ধ'রে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে, তাঁদের প্রশংসাবাণী উপভোগ করতে করতে—ফড়াৎ ক'রে পকেট থেকে সিল্কের সুগন্ধী রুমালখানা টেনে, কপালের ঘাম মুছলেন। সামনেই রক্তাক্ত ঘুঘু দু'টির ডানা তখনও থর্‌থর্ ক'রে কাঁপছিল।

মোটরের কথাটা কানে যাওয়ায় সাঁ ক'রে ঘুরে আচার্য্যের দিকে ঝুঁকে প্রশ্ন করলেন—"কার মোটর মশাই?"

আচার্য্য সে কথাটার জবাব মুলতুবী রেখে ব'লে উঠলেন—"এ কি! আপনি মারলেন না কি? খুব সাফাই ত, ছটাকে জিনিষ মারাতেই ত হাতের সার্থকতা। বাস্তগুলোর তবু গতর আছে,—এখানে দেখছি যথেষ্ট,—হাত লাগান না! আচ্ছা, সে কথা পরে হবে,—মোটরের কথা বলছেন? এখন সখের মধ্যে ঐ একটিমাত্র আছে।"

পশুপতি বাবু জিজ্ঞাসা করলেন—"ইংলিশ না কি? মেকারটা কে?"

আচার্য্য পশুপতি বাবুর দিকে চেয়ে খুব সহজভাবে বললেন—"এখানা মিনার্ভা।"

ধীরেন—Power?

সুধেন্দু—Speed?

প্রশ্নোত্তরে পাঁচ মিনিট কেটে গেল! বোঝা গেল, আচার্য্য এতক্ষণে তাঁদের এক জন ব'লে গৃহীত হয়েছেন! সকলের দৃষ্টিই তাঁর ওপর!

কেবল বিষ্ণু বাবু ছটফট্ করছিলেন, মাঝখানেই শরৎ বাবুকে ঠেলে আরম্ভ করলেন, "মিষ্টার বার্কে', বুঝলে?"

এবার আচার্য্য তাঁর কথাটা কেড়ে নিয়ে নিজেই সুরু ক'রে দিলেন, বললেন, "বুঝবো আর কি, বরাবর আপনার কথাতেই আমার একটা কান রেখেছি। আজ ষ্টুপিড্ আশুটো মানুষ হয়ে যেতো, তিনি সইতে পারলেন না! মিষ্টার বার্কে', কত বড় ঘরোয়ানা—ডিভনশায়ারের সম্বন্ধী! হাইডপার্কে ওঁর পূর্ব্ব-পুরুষের ষ্ট্যাচ্যু (মর্ম্মর-মূর্ত্তি) রয়েছে, স্বর্ণাক্ষরে লেখা—'টেম্‌স্ নদীর পোল-প্রণেতার স্মরণার্থে।' ভাইটে বুঝলেন, গ্রাজুয়েটা গরম! খুব ভালবাসতেন, কিন্তু ওঁদের ধারামত "অ্যাস্-ইউ" (Ass-you) ব'লে ডাকতেন আর লিখতেনও। রাসকেল্ বরদাস্ত করতে পারলে না। সকলের কি সুর-বোধ থাকে, ওর মিষ্টতা তাঁর উপলব্ধি হ'ল না। মরুক্ গে যাক্!"

বিষ্ণু বাবু প্রথমটা অবাক্ মেরে গিয়েছিলেন, ক্রমে তাঁর হুস্ ধরেছিল। বললেন, "আপনি ওঁদের চিনলেন কি ক'রে?"

"ওঁর ভগ্নীকে যে 'মেঘদূত' আর 'মুগ্ধবোধ' পড়াতুম!"

শরৎ বাবু বড় উকীল, আচার্য্যকে বললেন, "অভদ্রতা না হয় ত, এখন আপনার বিষয়কর্ম্ম—"

আচার্য্য সহাস্তে ও সহজভাবে উত্তর দিলেন—"এই সকলে যা ক'রে থাকে, তাই; অর্থাৎটা না বলাই ভদ্রতা, তবে between brothers (ভাই ভায়ের মধ্যে) অন্তের মাথায় হাত বুলিয়ে খাওয়া আর ঘুরে বেড়ানো,—সেটা অবশ্য আয়েস আর আরামের ঘুরুণী হওয়া চাই! তবে যদুপুরের রাজার সঙ্গে খুব intimacy (ঘনিষ্ঠতা) থাকায় (আমরা অভিন্ন বন্ধু), তাই যেখানেই থাকি,—এই আর কি! আচ্ছা, আজ তবে চললুম,—মোটরখানার জন্যে বড় অসুবিধে বোধ করছি;—এসে না ষ্টেশনে প'ড়ে থাকে। এস নবনী—"

"ইনি?"

"ইনি ইঞ্জিনিয়ার আবার রিসার্চ স্কলারও (Research scholarও)। এই বন্ধের পরেই Sind Excavationএ লাগবার আদেশ পেয়েছেন। সেখানে না কি আর্য্য সভ্যতার বিপুল সম্ভার মাটীর নীচে মুখ লুকিয়ে আছে। উনি শুনেছেন—even ভীম নাগের সন্দেশের পাক পর্য্যন্ত তাঁরা না কি প্রস্তরফলকে অবিনশ্বর ক'রে রেখে গেছেন। ওঁকে অনেক ক'রে এই কটা দিন আটকে রেখেছি।" এই ব'লে আচার্য্য হাসতেই সকলে যোগ দিলেন।

"আচ্ছা, আর নয়, এসো হে।"

মুন্সেফ বাবু এতক্ষণ থ হয়ে ছিলেন, তাঁর jurisprudence (ব্যবহারবিদ্যা) জল হয়ে এসেছিল। বললেন—"একটা কথা—বিজয়ার দিন আমাদের পার্টি আছে, আপনার আপত্তি না থাকে ত—"

আচার্য্য উৎসাহের সুরে বললেন—"সে কি,—কিছু না, কিছু না। এই ত চাই। এখানে আসা কি কেবল ঠাকুর-চচ্চড়ি চিবুতে! Bill of fareএর Shareটা (পাত খরচাটা) শুনতে পেলে—"

"আপনাদের মত লোক পাওয়াটাই মস্ত একটা acquisition পরম লাভ! সে সব নয়, রায় বাহাদুর নিজে আমাদের host। (ভোজদাতা)"

"বেশ কথা, তবে by turn (এক এক করেই) চলুক না। আচ্ছা, তবে এখন চললুম, মোটরখানার

অঙ্গ চঞ্চল হয়েছি। অভদ্রতা ক্ষমা করবেন, এসো হে, নমস্কার—নমস্কার।”

আচার্য্য আর নবনী ষ্টেশনের রাস্তা নিলেন।

বাবুদের মধ্যে এক জন বললেন, “বেশ লোক, কাটবে ভাল। কি স্ফূর্ত্তি দেখেছেন?”

অপর এক জন বললেন, “বেম্পতি বাঁধা যে!”

বিষ্ণু বাবু দ’মে গিয়েছিলেন, ফাঁক পেতেই মাথা নেড়ে আরম্ভ ক’রে দিলেন, “শুনলেন ত ডিভন-শায়ারের! তবে উনি আর হুঁঃ!—মিষ্টার বার্কে্র।”

আর শোনা গেল না।

নবনী এতক্ষণ অবাক্ হয়ে শুনছিল, এই বার আচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করলে,—“ষ্টেশনে সত্যি যাবেন না কি,—কার মোটর?”

আচার্য্য সহাস্যে বলিলেন,—“পাগল না কি,—মোটর আবার কার? ওরা দুনিয়ায় ওইগুলোকেই পরমার্থ ব’লে জানে; ওদের কাছে ওর মান মা-বাপের চেয়ে ঢের বেশী। ও-নাম না করলে কি রক্ষে ছিল! ‘পূজারী’—পরে—‘হাত দেখা আসে ত’ ব’লে সুরুই ত হয়েছিল! তার পর প্রশ্ন হ’ত—‘রাঁধতে পার?’ —মোটর বল্‌তেই বুঝে নিলে—মানুষ! হাওয়া উলটো বইলো,—আওয়াজ থেমে গেল! বুঝলে বাবাজী!”

বিস্ময়বিমুগ্ধ নবনী সহাস্যে বললে,—“খুব মজা করে-ছেন ত,—আপনিও ত কম নন দেখছি।”

আচার্য্য সহজভাবে বললেন—“আমার ত কম হবার কথা নয়, বাবাজী! আমি যে দেশের দশ জন লোকের এক জন,—আমাকে যে আজন্ম দুঃখ-কষ্টের মধ্যে রাস্তা ক’রে পার হবার চেষ্টা করতে হয়েছে। তাই পোলাও-কালিয়াও খেতে পারি, আবার মুড়ি খেয়ে গামছা প’রে বেশ সহজভাবে দিন কাটাতেও পারি। কিন্তু ওদের থেকে টাকাটা বাদ দিলেই—বদ্ রং! কল-কব্জা এলিয়ে যায়, কাটামোর খড় বেরিয়ে পড়ে! তা ব’লে সবাই তা নয়, তবে অনেকেই ঘুঘ্‌মারা সব্যসাচী আর বার্কলে বাতিকগ্রস্ত, তথা মোটর-মুগ্ধ! আমাদের গরীব দেশের ওরা কেউ নয়। যাক,—এই বার বাসার রাস্তা ধর—”

একটু নীরব থেকে কি ভেবে, আবার তিনি সুরু করলেন,—“দেখ বাবাজী—ইচ্ছে ত করি—pure nonsense নিয়ে (নিছক বাজে কথায়) দিন কটা কাটিয়ে দি; তার চেয়ে সুখ আর নেই—ঝঞ্ঝাট কমে। কিন্তু তোমাকে ভালবেসে ফেলেছি, তাই দু’একটা দর-কারি কথাও বেরিয়ে পড়ে।” [ক্রমশঃ।

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

স্মৃতি

বাঁধনের ডোর ছিঁড়ে গেছে মোর,
হয়েছে ভাঙন সুরু,
মিলনের লাগি, আবেগে পরাণ
কাঁপে আজ দুরু দুরু।

কোন্ সুদূরের সন্ধ্যাবেলায়
নিরালা সেতুর পরে,
স্বপন-বুলান পরশ তোমার
হিয়া দিল যেন ভ’রে।

গভীর তোমার কাজল নয়নে
কত কথা ছিল লেখা,
সুপ্ত হাসিটি অধরে আমার
তুমি এনেছিলে একা।

তৃষিত আমার তৃষ্ণা বাড়ায়ে
চলি গেলে কোন্ দূরে,
শ্লথ অঞ্চল মুক্ত কবরী
লুটাল ধরণী’পরে।

দুটি ফোঁটা জল কাল আঁখি হ’তে
সহসা পড়িল ঝ’রে,
মুছায়ে অশ্রু আসিব আবার
বলি চলি গেলে দূরে।

এসেছে জ্যোৎস্না, এসেছে সন্ধ্যা
এসেছে মলয় ছুটি’,
তুমি ত এলে না—স্মৃতিটুকু শুধু
মানসে উঠিল ফুটি।

শ্রীবৈদ্যনাথ সিংহ।

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস

ভূতত্ত্ব-বিভাগ

হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ব বিভাগে এই শাখার অধিবেশন হয়। সভাপতি ডাঃ পিলগ্রিম ডি, এস, সি। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে ভূতত্ত্বে পারদর্শী বৈজ্ঞানিকগণ আসিয়া এই সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। সুদূর রেঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডাঃ ষ্টাম্প, ডি, এস্ সি, সীমান্তপ্রদেশ হইতে মেজর ডেভিস্, কলিকাতা হইতে ডাঃ পাস্কো, ডি, এস্ সি, অধ্যক্ষ সরকারী ভূতত্ত্ব-বিভাগ, ডাঃ পিলগ্রিম, মিঃ ওয়াডিয়া, অধ্যাপক হেমচন্দ্র দাসগুপ্ত প্রভৃতি এবং ভারতের অন্যান্য প্রদেশ হইতে অনেকেই আসিয়াছিলেন; এই সভায় ২৫টি মৌলিক অনুসন্ধানমূলক প্রবন্ধ পাঠ করা হয়। সকল প্রবন্ধই উচ্চাঙ্গের। তবে তন্মধ্যে মেজর ডেভিসের প্রবন্ধগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য; কারণ, প্রকৃতপক্ষে তিনি যুদ্ধব্যবসায়ী; অবসর-সময় বৃথা আমোদে নষ্ট না করিয়া জগতের জ্ঞানভাণ্ডার বৃদ্ধি করিতে তৎপর রহিয়াছেন; ভূতত্ত্বের একটি অংশ "প্রস্তরীভূত মৃত জীব-শরীরতত্ত্ব" (Palaeontology) বিশেষভাবে শিক্ষা করিয়া তৎসাহায্যে গত যুগের নূতন নূতন প্রাণীর প্রস্তরীভূত শরীর আবিষ্কার করিয়া সীমান্তপ্রদেশের শিলাসমূহের ইতিহাস সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ করিতেছেন। তাঁহার ৩টি মৌলিক প্রবন্ধ সভাগৃহে পঠিত হইয়াছিল। ডাঃ ষ্টাম্প ব্রহ্ম প্রদেশের ভূতত্ত্ব অবগত হইতে সচেষ্ট আছেন এবং তাঁহার লিখিত দুইটি প্রবন্ধই ঐ দেশস্থ ভূতত্ত্ব-সম্বন্ধীয়। ডাঃ ষ্টাম্প অদ্ভুতকর্ম্মা; তিনি বয়সে নবীন হইলেও অনুসন্ধানমূলক বহু প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন এবং ভূতত্ত্ব-চর্চ্চায় তিনি এতই আনন্দ লাভ করেন যে, গত মহাযুদ্ধের সময় যুদ্ধকার্য্যে সংশ্লিষ্ট হইয়া বেলজিয়মে অবস্থানকালীন মৃত্যুর সম্মুখীন হইয়াও ভূতত্ত্ব-চর্চ্চায় নিরস্ত হয়েন নাই; এবং সেই সময়ে বেলজিয়মের ভূতত্ত্বসম্বন্ধীয় বহু নূতন তথ্য বৈজ্ঞানিক জগতে প্রচার করায় তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

ডাক্তার পিলগ্রিম

"শিলাতত্ত্বের" (petrology) দিক দিয়া দেখিলে অধ্যাপক কৃষ্ণকুমার মাথুরের ও তাঁহার সহকর্ম্মীদের অনুসন্ধানমূলক প্রবন্ধদ্বয় প্রথম শ্রেণীর আখ্যা

পাইতে পারে। ডাঃ পাস্কো ও সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধ দুইটির ভূয়সী প্রশংসা করেন। অসীম কষ্ট স্বীকার ও প্রভূত অর্থব্যয় করিয়া সুদূর কাথিয়াবাড়ে গিয়া সেখানকার গিরণার (Girnar) পর্ব্বতশিলার সমুদায় বিবরণ তিনি প্রথম প্রবন্ধে প্রকাশ করেন। দ্বিতীয় প্রবন্ধে গুর্জ্জরের দাঁতা রাজ্যের ভূতত্ত্ব এবং তথায় মূল্যবান্ কি কি ধাতু পাওয়া যাইতে পারে, তাহার বিবরণ প্রকাশ করেন। তাঁহার উদ্যম প্রশংসনীয়—এ যাবৎকাল পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের ভূতত্ত্ব-সম্বন্ধীয় নূতন নূতন তথ্য সরকারী ভূতত্ত্ব-বিভাগীয় (Geological Survey of India) ইংরাজ রাজকর্ম্মচারীরা আবিষ্কার করিয়া আসিতেছিলেন। বেসরকারী কোন সম্প্রদায়ের উদ্যম এই প্রথম; আমাদের দেশের অধিকাংশ দেশীয় রাজ্যের ভূতত্ত্ব আমরা অবগত নহি; ক্রমে ক্রমে যদি সেই সকল তথ্য ভারতবাসী কর্ত্তৃক প্রচারিত হয়, তবে পৃথিবীর জ্ঞানভাণ্ডার বৃদ্ধি করিতে ভারতসন্তান যে যথেষ্ট সাহায্য করিবেন, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। অন্যান্য প্রবন্ধের মধ্যে ডাঃ সাহনির আসান্সোলের নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে গোওয়ামা প্রস্তরমধ্যে আবিষ্কৃত প্রস্তরীভূত পুরাকালের একটি গাছের গুঁড়ির—(fossil of a tree trunk) বৃত্তান্ত এবং অধ্যাপক হেমচন্দ্র দাসগুপ্ত মহাশয়ের লিখিত দেওলী হইতে প্রাপ্ত কয়েকটি প্রাণীর প্রস্তরীভূত জীবিতাবশেষের বৃত্তান্ত উল্লেখযোগ্য। জম্মু কলেজের সুযোগ্য অধ্যাপক মহাশয় কতকগুলি ফসিল্ দৃষ্টে জম্মু ও কাশ্মীর প্রদেশের শিলা-ইতিহাস-সংবলিত ৩টি প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন।

১৬ই জানুয়ারী এই শাখার সভাপতি তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করেন। ভারতবর্ষীয় স্তন্যপায়ী জন্তুদের অতীত যুগের ইতিহাস এবং কোন্ কোন্ দেশে গিয়া তাহারা বসবাস করে, তাহা তিনি মানচিত্রের সাহায্যে সুন্দরভাবে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। তিনি বলেন যে, ইওসিন (Eocene) সময়ের পর হইতে হিমালয় পর্ব্বতের জন্ম হইবার পর ভারতবর্ষ এবং মধ্য-এসিয়া এই দুই দেশের যাতায়াতের পথ বন্ধ হওয়ায় এক দেশ হইতে অন্য দেশে জন্তুদিগের যাতায়াত করা অত্যন্ত দুরূহ হইয়া উঠে; কিন্তু আফ্রিকা ও ভারতের মধ্যে অপেক্ষাকৃত সহজ পথ থাকায় সেই পথে তাহারা যাতায়াত করিতে থাকে; এই স্থলপথ এখন সমুদ্রমধ্যে নিমজ্জিত হইয়া গিয়াছে এবং এ পথ যে এক সময়ে ছিল, তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

ডাঃ কটার্ কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ইওসিন (Eocene) সময়ের প্রাণীর জীবিতাবশেষ ব্রহ্মপ্রদেশস্থ পাকু জিলায় আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাহাদের অপেক্ষা প্রাচীন কোন জন্তু আজ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। টাপির ও জলগণ্ডারের পূর্ব্বপুরুষ সুবৃহৎ টাইটানোথিরস্ (Titanotheres) যে উত্তর-আমেরিকা হইতে আসিয়া এই দেশে বসবাস করিয়াছিল, তাহা আমরা বুঝিতে পারি।

মধ্য-ইওসিন্ সময়কার শূকরের অস্থি য়ুরোপের অনেক যায়গায় পাওয়া গিয়াছে এবং অনুমান করা হয়, তাহারা সকলেই মধ্য-আফ্রিকাদেশ হইতে আসিয়াছিল। নিম্ন-ইওসিন্ সময়ে ভারতে শূকররা আসিতে আরম্ভ করে; এই সময়ে শূকরদের প্রিয় জলাভূমিতে অধুনালুপ্ত অন্য এক প্রকার জন্তু "এ্যানৃথ্রাকোথিরস্" বাস করিত; তাহারা দেখিতে অনেকটা শূকরের মত, কিন্তু তাহাদের দন্ত বিভিন্ন প্রকার ছিল। এই জাতীয় জন্তু ব্রহ্ম ও বেলুচিস্থানের ইওসিন্ এবং নিম্ন-মায়োসিন্ সময়ের শিলামধ্যে যত প্রকার এবং যত সংখ্যক পাওয়া যায়, জগতের অন্য কোথাও তত প্রকার এবং অনুরূপ সংখ্যায় পাওয়া যায় না। মধ্য-ইওসিন্ সময়ে শূকরদিগের প্রধান শত্রু এ্যানৃথ্রাকোথিরসের ধ্বংস হইলে অসংখ্য শূকর ভারতে আসিয়া বসবাস করিতে থাকে। অধুনা জগতে যে সমস্ত শূকর আছে, তাহারা সকলেই যে এই সময়কার ভারতবর্ষীয় শূকরের বংশধর, তাহা অনুমান করিবার যথেষ্ট কারণ আছে।

ভারতে "জলহস্তীর" আগমন কোন্ দেশ হইতে হইয়াছিল, তাহা আমরা সঠিক অবগত নহি। বেলুচিস্থানের নিম্ন-মায়োসিন শিলামধ্যে সর্ব্বপ্রাচীন জলহস্তীর এক খণ্ড চোয়াল আবিষ্কৃত হয়, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, তাহাতে কোন দাঁত ছিল না। জলহস্তীর প্রথমে ছয়টি কৃন্তন দন্ত ছিল, পরে তাহার হ্রাস হইয়া চারিটি হয় এবং আধুনিক যে সকল জলহস্তী আফ্রিকায় পাওয়া যায়,

তাহাদের ২টি করিয়া দন্ত বর্ত্তমান। তবেই দেখা যাইতেছে, বেলুচিস্থানে এমন এক শ্রেণীর (species) জলহস্তী বর্ত্তমান ছিল, যাহার দন্ত মোটেই ছিল না।

সভাপতি মহাশয় আরও বলেন যে, হস্তী ও তাহার পূর্ব্বপুরুষ ষ্টেগোডন্ (Stegodon) ভারতভূমিতেই প্রথম সৃষ্ট হয়; তাহার পর প্লায়োসিন্ (Pliocene) সময়ে জগতের অন্যত্র গিয়া তাহারা বসবাস করিতে থাকে।

মিশরের নিম্ন ওলিগোসিন্ শিলামধ্যে জন্তুশ্রেষ্ঠ কপিদের (Anthropoid ape) প্রথম পরিচয় পাওয়া যাইলেও, মনে হয়, ভারতেই তাহাদিগের ক্রমবিকাশ হইয়াছে। মানবের আবির্ভাব প্রথমে কোন্ দেশে হয়, তাহা আমরা সঠিকভাবে বলিতে পারি না, তবে প্রাচীনতম মনুষ্যের ধ্বংসাবশেষ (javan pithecanthropous) প্রাচ্য ভূমিতেই আবিষ্কৃত হইয়াছে।

উষ্ট্রের সৃষ্টি উত্তর-আমেরিকাতেই প্রথম হয়, কেন না, সে দেশে ইওসিন সময়কার শিলামধ্যে উষ্ট্রের বহু পরিচয় পাওয়া যায়। প্লায়োসিন্ যুগের শেষসময়ে তাহারা মধ্য-এসিয়া হইতে ভারতে আইসে, কিন্তু য়ুরোপে তাহারা কখনও যায় নাই।

ঘোটকদিগের উৎপত্তি সম্বন্ধে সভাপতি মহাশয় বলেন যে, তাহারাও উষ্ট্রের মত উত্তর-আমেরিকাতে প্রথম সৃষ্ট হয় এবং পরে মধ্য-এসিয়া হইয়া ভারতে আসিয়া তাহারা বাস করে।

"গণ্ডার" জাতি সম্বন্ধে ডাঃ পিলগ্রিম্ বলেন যে, উত্তর-আমেরিকা হইতে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে দলে দলে অন্য স্থানে তাহারা যাইতে থাকে; এবং ঐ জাতীয় এক প্রকার অদ্ভুত শ্রেণীর জীবের একটি জীবিতাবশেষ বেলুচিস্থানে পাওয়া যায়। ইহা আকারে হস্তী অপেক্ষাও বৃহৎ এবং ইহার মাথার খুলীটি ৫ ফুট লম্বা; পরে তুর্কীস্থান এবং চীনদেশেও ইহার জীবিতাবশেষ আবিষ্কৃত হয়। সুমাত্রাদেশীয় দুইটি শৃঙ্গবিশিষ্ট গণ্ডার যাহারা আজি কালি পূর্ব্ববঙ্গে বর্ত্তমান আছে, তাহাদের আদিম নিবাস য়ুরোপ। একখড়্গবিশিষ্ট ভারতীয় গণ্ডারের পরিচয় অন্য কোন দেশে পাওয়া যায় না; কাজেই মনে হয়, তাহাদের উৎপত্তি ভারতেই হইয়াছিল।

নিম্ন-মায়োসিনের শেষাংশে ভারত য়ুরোপ হইতে পৃথক হইয়া যায়; সুতরাং দুই দেশের জন্তু বিভিন্ন প্রকার হইতে থাকে। প্লায়োসিনের প্রথমে য়ুরোপের জন্তুদিগের মধ্যে ঘোর পরিবর্ত্তন ঘটে। এসিয়া এবং য়ুরোপের মধ্যস্থ সমুদ্র শুষ্ক হওয়ায় অথবা সমুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কতকগুলি হ্রদে পরিণত হওয়ার ফলে যে সকল প্রাণীর মধ্য-এসিয়ায় ক্রম-বিকাশ হইতেছিল, তাহারা দলে দলে নূতন স্থলপথে য়ুরোপ ভূমিতে প্রবেশ করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ তিন খুরবিশিষ্ট ঘোটক হিপরিয়ন্, জিরাফ, হায়েনা, কুকুর, বিড়াল ইত্যাদির নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। দক্ষিণ-য়ুরোপে প্রথমে ইহারা গিয়া বাস করিতে থাকে; কিন্তু সেখানে অধিক দিন স্থায়ী হইতে পারে নাই। পরে তাহারা আফ্রিকায় গিয়া বাস করে এবং আজিও এই সকল জন্তু সেখানে অবস্থান করিতেছে। প্লায়োসিনের শেষাংশে য়ুরোপ হইতে তাহারা লুপ্ত হইয়া যায়।

ডাঃ পিলগ্রিমের মতে শেষ দলে যে সকল জন্তু য়ুরোপ অথবা মধ্য-এসিয়া হইতে ভারতে আগমন করে, তাহাদের মধ্যে—নর্ম্মদাদেশীয় হস্তী, হিমালয়-প্রদেশস্থ পিঙ্গল বর্ণের ভল্লুক, সিংহ, ব্যাঘ্র ইত্যাদির উল্লেখ করা যাইতে পারে।

উত্তর-আফ্রিকা এবং য়ুরোপে আজকাল যে প্রকার হায়েনা পাওয়া যায়, সেই প্রকারের হায়েনা কিছু দিনের জন্য ভারতে বাস করিয়াছিল; কারণ, কারনুলে প্লায়সটোমিন সময়ের শিলামধ্যে তাহাদের জীবিতাবশেষ পাওয়া গিয়াছে। এই দেশের বন্য শূকরের সহিত য়ুরোপীয় শূকরের সাদৃশ্য থাকায় মনে হয়, তাহারা উত্তর-দেশ হইতে ভারতে আগমন করে।

পরিশেষে সভাপতি মহাশয় স্বীকার করেন যে, স্তন্যপায়ী জন্তুদিগের ইতিহাস আমরা সম্যক্‌রূপে অবগত নহি এবং ভারতে ঐকান্তিক যত্নসহকারে অনুসন্ধান করিলে এমন অনেক তথ্য আবিষ্কার করিতে পারা যায়, যাহার সাহায্যে স্তন্যপায়ী জীবদিগের প্রকৃত উৎপত্তিস্থল, ক্রমবিকাশ প্রভৃতি আমরা সঠিকভাবে অবগত হইতে পারি।

চিকিৎসা-বিভাগ

লেঃ কর্ণেল এফ্, পি, ম্যাকি, ও, বি, ইঃ, আই, এম্, এস্ এই বিভাগের সভাপতি হইয়াছিলেন।

এই বিভাগে সর্ব্বসমেত ৩৯ টা মৌলিক প্রবন্ধ গৃহীত হয়, তন্মধ্যে যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদের প্রবন্ধ পাঠ করা হয়। অধিকাংশ গবেষণাই বাঙ্গালীর; মিঃ গাঙ্গুলী একাই ৮টি মৌলিক প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। চিকিৎসাশাস্ত্রের প্রায় সকল বিভাগেই ভারতে যে গবেষণা হইতেছে, তাহা আমরা প্রবন্ধগুলি হইতে অবগত হইতে পারি। পাঠের পর প্রায় প্রত্যেক প্রবন্ধেরই আলোচনা হয়। পরিশেষে সভায় একটি মন্তব্য গৃহীত হয় যে, ভারত গভর্ণমেণ্ট এবং প্রাদেশিক গভর্মেণ্টকে অনুরোধ করা যাইতেছে যে, ভারতে সংক্রামক রোগের বৃদ্ধির জন্য মৃত্যু-সংখ্যা অসম্ভবরূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহার আশু নিবারণের জন্য সরকারী স্বাস্থ্য-বিভাগগুলির উন্নতি করা আবশ্যক এবং রোগ-নিবারণের জন্য নূতন নূতন প্রক্রিয়া অবলম্বন করিতে হইলে ভারতের সর্ব্বত্র গবেষণা-মন্দিরের প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন।

লেঃ কর্ণেল এফ, সি, ম্যাকি

সভাপতির অভিভাষণে লেঃ ম্যাকি বিশদরূপে বুঝাইয়া দেন, মশকাদি বিভিন্ন কীটের দংশনে কিরূপ বিভিন্ন প্রকার রোগের আক্রমণ হইতে পারে এবং তাহার ফলে মৃত্যুর সংখ্যা কিরূপভাবে বৃদ্ধি পায়। তিনি বলেন, নানা প্রকার কীটের দংশনে বীজাণু শরীরে প্রবিষ্ট হওয়ায় মৃত্যুর সংখ্যা ভারতে ভয়াবহরূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে; ইহার আশু নিবারণের উপায় না আবিষ্কার করিতে পারিলে ভারতের পক্ষে বিশেষ অমঙ্গলজনক। তিনি আরও বলেন যে, যত দিন না রোগের প্রতীকার করা যায়, তত দিন ভারতের আর্থিক, সামাজিক কোন প্রকার উন্নতি হইতে পারে না, অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে আর চলিবে না। সভাপতি মহাশয় আশা করেন যে, প্রাচ্যের অপরাপর জাতি নিদ্রা হইতে যেমন জাগ্রত হইয়াছে, তেমনই ভারতবাসীরও নিদ্রা-ভঙ্গ হইয়াছে এবং রোগ দূর করিবার জন্য তাহারা বদ্ধ-পরিকর হইয়াছে; বহু রোগের প্রতিষেধক উপায় দেখিয়া তাহাদের বিশ্বাস হইয়াছে যে, সকল প্রকার রোগই উপযুক্ত উপায় অবলম্বন করিতে পারিলে দূর করিতে পারা যায়। লেঃ ম্যাকি মহোদয়ের প্রধান বক্তব্য এই যে, আমরা যেন কোন প্রকার রোগে আক্রান্ত হইয়া না পড়ি, তাহার জন্য আমাদের সতর্ক হইয়া থাকা উচিত এবং ব্যাধির প্রতীকারের জন্য আমরা সাধ্যমত অর্থ যেন ব্যয় করিতে পারি; রোগে আক্রান্ত হইলে ঔষধপ্রয়োগে তাহা হইতে পরিত্রাণ লাভ অপেক্ষা যাহাতে আক্রান্ত না হইতে হয়, তাহার জন্য উপায় অবলম্বন করা শ্রেয়ঃ নহে কি? তিনি বলেন যে, মৃত্যুসংখ্যার—বিশেষতঃ শিশুমৃত্যুসংখ্যার হ্রাস করিলে স্বাস্থ্যবান্ হইয়া অপেক্ষাকৃত অধিক দিন জীবিত থাকিতে পারা যায়—ইহা পাশ্চাত্য জগতে গত শতাব্দীর শেষ অর্দ্ধাংশে প্রমাণিত হইয়াছে এবং এইরূপ আশাতীত ফললাভের প্রধান কারণ, সে দেশে রোগের প্রতিষেধক যথেষ্ট উপায় অবলম্বন করা হইয়াছিল এবং ঔষধপ্রয়োগে রোগ-নিবারণের দ্বারা কখনও এরূপ ফল লাভ করিতে পারা যাইত না। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে যে সকল রোগের আধিক্য দেখা যায়, তাহাদের প্রকৃতি
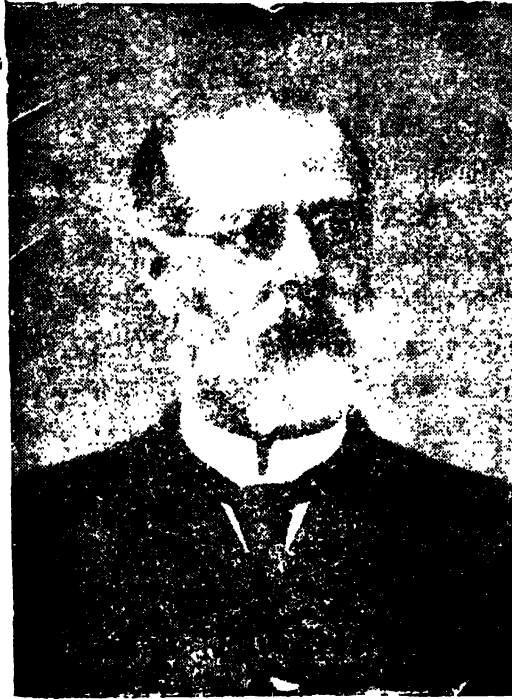
এবং নিবারণের উপায় নির্ণয় করিতে হইলে, বহু গবেষণা-মন্দির স্থাপন করা উচিত এবং যে যে স্থানে সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব হইতেছে, তথায় উক্ত মন্দিরের সেবকগণ গিয়া রোগের সঠিক কারণ ও নিবারণের উপায় করিলে তবে ভারতবাসী ভীষণ রোগের কবল হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারিবে।

কৃষি-তত্ত্ব-বিভাগ

মিঃ আর, এস্, ফিন্‌লোবি, এস্, সি, এফ, আই. সি, এই বিভাগে সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

কৃষি তত্ত্ব এবং পশু-চিকিৎসা-সংক্রান্ত প্রায় প্রত্যেক বিষয় সম্বন্ধে মৌলিক গবেষণা এই বিভাগে গৃহীত ও আলোচিত হইয়াছিল। মুক্তেশ্বরের Imperial Bacteriological Laboratoryতে মিঃ হাওয়ার্ড ও তাঁহার সহকর্মী কর্ত্তৃক কৃত গোপালন ইত্যাদি শীর্ষক পরীক্ষামূলক কয়েকটি মৌলিক প্রবন্ধ পঠিত হয়।

মিঃ আর, এস্, ফিন্‌লো

এই সকল বিষয় সম্বন্ধে মিঃ এস্ কে সেনের দুইটি প্রবন্ধ উল্লেখযোগ্য। কৃষি-তত্ত্বে "দুধের ব্যাকটরিওলজি" (bacteriology) শীর্ষক মিঃ ওয়ালটনের গবেষণা, "উৎকৃষ্ট ধান্যের জন্য জমীতে কিরূপ সার দেওয়া কর্ত্তব্য" শীর্ষক এবং "জমীতে নাইট্রোজেন ও পটাশের পরিমাপ কি উপায়ে সম্ভবপর" শীর্ষক মিঃ সিবানের গবেষণা উল্লেখযোগ্য। এই সভায় যে সকল মৌলিক গবেষণা গৃহীত হয়, তাহাদিগকে ৪ ভাগে বিভক্ত করা হয়। (১) কৃষি-রসায়ন (Agricultural Chemistry), (২) পশু-চিকিৎসা, (৩) কৃষি উদ্ভিদ-তত্ত্ব (Agricultural Botany), (৪) কৃষিতত্ত্ব। সর্ব্বসমেত ৫৫টি মৌলিক প্রবন্ধ গৃহীত হইয়াছিল।

সরকারী কৃষি-বিভাগের চেষ্টায় ভারতে কৃষিকার্য্যে কিরূপ উন্নতি হইয়াছে এবং হইতেছে, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ সভাপতি মহাশয় তাঁহার অভিভাষণে বলেন। তাঁহার মতে কোন নূতন বিষয় প্রচলন করিবার পূর্ব্বে সেই বিষয়ের সম্বন্ধে যথেষ্ট গবেষণা হওয়া আবশ্যক এবং সেই উপায় অবলম্বন করিলে কি কি উপকার পাওয়া যাইবে, তাহা চাষীদের বিশেষ করিয়া দেখাইয়া দেওয়া উচিত; এই উপায় অবলম্বন না করায় ফলে উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্য্যন্ত কোন প্রকার উন্নতি হওয়া সম্ভবপর ছিল না। উন্নত শস্যের (Improved crops) আবাদে কি পরিমাণ শস্য পাওয়া যাইতে পারে এবং কি প্রকার উৎকর্ষ হইয়াছে, তাহা কৃষকরা মাত্র ১৯১০ খৃষ্টাব্দে বুঝিতে পারিয়াছে; এই প্রসঙ্গে সভাপতি মহাশয় দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলেন যে, উন্নত শস্যের আবাদ বহু স্থানে হইলেও সমগ্র কর্ষিত ভূমির তুলনায় তাহা সামান্য। কৃষি-বিভাগ কর্ত্তৃক অনুমোদিত অন্যান্য উপায় কৃষকরা অবলম্বন না করার কয়েকটি কারণ তিনি দেখাইয়াছিলেন। প্রধান কারণ, তাঁহার মতে কৃষকের অর্থাভাব। উন্নত প্রণালীতে চাষ-আবাদ করিতে হইলে মূলধনের প্রয়োজন; ভারতের কৃষকদের আর্থিক অবস্থা এতই হীন যে, তাহারা প্রত্যহ উদরপূর্ত্তি করিয়া যথেষ্ট খাইতে পায় না, অর্থব্যয় করিয়া কৃত্রিম সার ও যন্ত্রাদি কোথা হইতে ক্রয় করিবে? তিনি বলেন, সমবায় সমিতি ইত্যাদি স্থাপন করিয়া ভারত গভর্ণমেণ্টের কৃষকদিগকে অর্থসাহায্য করা প্রধান কর্ত্তব্য। আর কালবিলম্ব না করিয়া দেশের সর্ব্বত্র যাহাতে উন্নত প্রণালীতে চাষ-আবাদ করা হয়, তাহা করা উচিত। জমীতে উপযুক্ত সার প্রদান ও জল নিকাশ ইত্যাদি করিবার আর একটি উদ্দেশ্য শস্যকে সতেজ রাখা এবং যাহাতে শস্য কোন প্রকার রোগে আক্রান্ত না হইয়া পড়ে। যে সকল কারণ হইতে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন তন্মধ্যে কতকগুলি কারণ নিম্নে লিখিত হইল।

(১) জমীতে পটাশের অভাব হইলে (Rhizoctonia) রিজোকটোনিয়া কর্ত্তৃক পাট আক্রান্ত হয়।

(২) Diplodia Chorchori কর্ত্তৃক আক্রান্ত ব্যাধিগ্রস্ত পাটকে জমীতে সোডিয়ম্ সাল্‌ফেট (Sodium sulphate) দিয়া রোগমুক্ত করা যাইতে পারে।

(৩) মশক কর্ত্তৃক আক্রান্ত চা-গাছের বৃদ্ধি বন্ধ হইলে পটাশ প্রয়োগ করিয়া তাহাকে রোগমুক্ত করা যায়।

(৪) পূর্ব্ববঙ্গের আমগাছগুলি এক প্রকার কীট কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া পড়িত; বাঙ্গালার ব্রহ্মপুত্র নদীর পূর্ব্বভাগের স্থানগুলিতে কত আমগাছ যে এই প্রকার কীট কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া নষ্ট হইয়া গিয়াছে, তাহার আর ইয়ত্তা নাই;—আমগাছ যে সকল জমীতে উৎপন্ন হয়, সেই জমী উপযুক্ত কর্ষিত হইলে কীটের হাত হইতে নিস্তার পাওয়া যায়; ইহা প্রমাণিত হইয়াছে।

তিনি পরিশেষে বলেন যে, শস্তের আকারবৃদ্ধি হইলেই চলিবে না। পরন্তু আমাদিগকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে, যাহাতে শস্য সতেজ ও সবল থাকিয়া রোগের আক্রমণ হইতে নিজেকে বাঁচাইয়া রাখিতে পারে। এই বিষয়ে সবিশেষ লক্ষ্য রাখিলে বুভুক্ষু লক্ষ লক্ষ নর-নারীর অন্নসংস্থান হইতে পারে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

[ক্রমশঃ।

শ্রীশিবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।

হতাশ প্রেম

হয় ত কারে আপন মনে ভাবছ ব'সে প্রিয়!
মনের মত হইনি ব'লে আমি তোমার কাছে,
বাসছ ভালো প্রাণের চেয়ে হৃদয়-নিধি দিয়েও
অনুসরণ কচ্ছি তবু আমি তোমার পাছে,
যামিনীর এই মধুর আলো
লাগছে না আর আমার ভালো,
প্রাণটা আমার স্বতঃই যে হায়
তোমার তরেই নাচে।

প্রেমের দ্বারে আঘাত ক'রে ফিরিয়ে দেছ যে দিন
মুসড়ে গেছে হৃদয়খানি হারিয়ে যাবার ভয়ে,
প্রাণের মাঝে নীরবতা জেগেছে গো সে দিন
জড়িয়ে গেছে তোমায় আমা অটুট অক্ষয়ে;
হতাশ প্রেমের গোপন ব্যথা,
মিলনের হায় আকুলতা,
তোমার সাথেই চ'লে গেছে
অপরূপ বিস্ময়ে।

দূরে যতই যাচ্ছি আমি জড়িয়ে আছে স্মৃতি
হৃদয় মেলি' দেখছি তোমা প্রতি ক্ষণে ক্ষণে,
বিরহের হায় লেশটি যে গো জাগছে প্রাণে নিতি
যামিনী মোর কাটছে যেন শুধুই জাগরণে;
জানছি তোমার পাবার আশা,
মিথ্যা শুধুই ভালবাসা,
তবু তোমার কথা কেন
ভাবছি সদাই মনে!

শ্রীমতী বিদ্যুৎপ্রভা দেবী।

অঙ্গুলির ছাপ অভ্রান্ত নহে

এত দিন সভ্য মানবজাতির ধারণা ছিল, প্রত্যেক মানুষের অঙ্গুলির ছাপ স্বতন্ত্র। পৃথিবীতে কোনও দুই ব্যক্তির অঙ্গুলির ছাপ এক প্রকার হইতে পারে না—প্রকৃত লোককে সনাক্ত করিবার পক্ষে তাহার অঙ্গুলির ছাপ আইন-আদালতে অভ্রান্ত প্রমাণরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কিন্তু আমেরিকার লস্ এঞ্জেলেসের মিল্টন কার্লসন্ নামক জনৈক বিশেষজ্ঞ বৈজ্ঞানিক উপায়ে সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, অঙ্গুলির ছাপ অভ্রান্ত নহে। হস্তলিপি, টাইপরাইটিং এবং অঙ্গুলির ছাপ বিশ্লেষণ করিয়া তিনি প্রমাণ করিয়াছেন যে, অঙ্গুলির ছাপ জাল করা যাইতে পারে।

মিল্টন্ কার্লসন অণুবীক্ষণ যন্ত্রযোগে জাল হস্তলিপি পরীক্ষা করিতেছেন
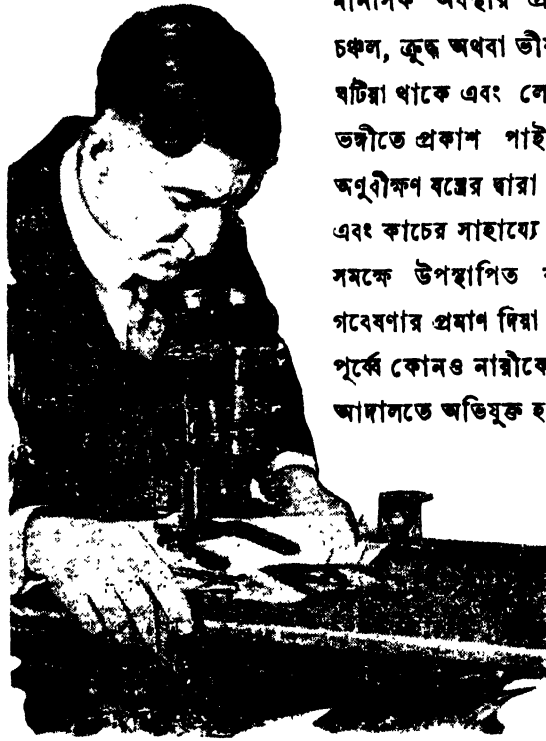
বহুপ্রকার অণুবীক্ষণ যন্ত্র, পরিমাপক যন্ত্র ও আলোকচিত্র গ্রহণের ক্যামেরা প্রভৃতির সাহায্যে তিনি সম্প্রতি অনেকগুলি মোকর্দ্দমার অভ্রান্ত প্রমাণগুলিকে জাল প্রতিপন্ন করিয়া বিচারক ও আইনজ্ঞগণের বিস্ময়োৎপাদন করিয়াছেন। তিনি বলেন, কোন লোকের হস্তলিপি দেখিয়া নির্দ্দেশ করা যায়, সেই ব্যক্তি কিরূপ মানসিক অবস্থার প্রভাবে উহা লিখিয়াছেন। শান্ত, চঞ্চল, ক্রুদ্ধ অথবা ভীষণ অবস্থায় লিখনভঙ্গীর ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকে এবং লেখকের চরিত্রের ছাপ সেই লিখনভঙ্গীতে প্রকাশ পাইয়া থাকে। মূল লিখিত বিষয়টি অণুবীক্ষণ যন্ত্রের দ্বারা পরীক্ষা করিয়া, উহা আলোকচিত্র এবং কাচের সাহায্যে সহস্রগুণ বর্দ্ধিতাকারে জুরীদিগের সমক্ষে উপস্থাপিত করিয়া তিনি তাঁহাদিগকে নিজের গবেষণার প্রমাণ দিয়া সন্তুষ্ট করিয়াছেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কোনও নারীকে হত্যা করার অপরাধে এক ব্যক্তি আদালতে অভিযুক্ত হয়। যে হোটেলে এই হত্যাকাণ্ড ঘটে, তাহার কোনও গৃহের কপাটের উপর লোকটির অঙ্গুলির ছাপ পড়িয়াছিল। হত্যাকাণ্ডের সময় নারী ও পুরুষের মধ্যে ধস্তাধস্তি হইয়াছিল। সেই সময়ে আক্রমণকারী পুরুষের অঙ্গুলির ছাপ দরজার কপাটে পড়িয়াছিল। বাদিপক্ষ আদালতে প্রমাণ করেন যে,

অভিযুক্ত ব্যক্তির অঙ্গুলির ছাপের সহিত কপাটের উপর লিপ্ত অঙ্গুলির ছাপ একই। এই অভ্রান্ত প্রমাণের বলে লোকটিকে আসামীর কাঠড়ায় টানিয়া আনা হয়। কিন্তু কার্লসন্ প্রমাণ করিয়া দেন যে, উক্ত অঙ্গুলির ছাপ জাল। তৃতীয় ব্যক্তির দ্বারা ঐ ছাপ দরজার কপাটের উপর লিপ্ত করা হইয়াছিল এবং হত্যাকাণ্ডের পূর্ব্বে আক্রান্ত নারীর সহিত আক্রমণকারী পুরুষের যে ধস্তাধস্তি হইয়াছিল, তাহা সর্ব্বৈব মিথ্যা। কার্লসনের প্রমাণ-প্রয়োগ অভ্রান্ত বলিয়া গৃহীত হওয়ায় আসামী মুক্তি পাইয়াছিল।

কার্লসন্ প্রমাণ করিয়াছেন, রবারষ্ট্যাম্পের সাহায্যে যেমন কোনও ব্যক্তির স্বাক্ষর জাল করা সহজ, অঙ্গুলির ছাপও সেই প্রকারে সহজে জাল করা সম্ভবপর। মানুষ যখন নিদ্রিত থাকে, সেই অবস্থায় তাহার অজ্ঞাতসারে তাহার অঙ্গুলির ছাপ গ্রহণ করা বিচিত্র নহে। কোনও দলিলে কাহারও অঙ্গুলির ছাপ থাকিলে তাহা যে সেই ব্যক্তির জ্ঞাতসারে গৃহীত, এমন মনে করিবার সন্দেহের অবকাশ আছে; সুতরাং তাঁহার মতে অঙ্গুলির ছাপকে কোনও বিষয়ে অভ্রান্ত প্রমাণস্বরূপ গ্রহণ করা যাইতে পারে না। তাঁহার মতে, মানুষের হস্তাক্ষর, অঙ্গুলির ছাপ অপেক্ষা খাঁটি প্রমাণ। কারণ, যদি কেহ অপরের হস্তাক্ষর জাল করে, তবে তাহা যে জাল, তাহা প্রমাণ করিবার অনেক প্রকার কৌশল আছে। হস্তলিপি পরীক্ষায় বিশেষজ্ঞগণ চেষ্টা করিলে, জালিয়াৎ লেখকের হস্তাক্ষর, লেখনীর প্রয়োগ-প্রণালী, কাগজ এবং যাহার উপর রাখিয়া লিখিত বিষয় লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহার উপরিভাগ বিশ্লেষণের দ্বারা স্থির করিতে পারেন, কোন্ লেখাটি খাঁটি বা কোন্‌টি জাল। কোন একটি ব্যাপারে কার্লসন প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন যে, যে কাগজে দলিল সম্পাদিত হইয়াছিল, তাহা এমনই পাতলা যে, টেবলের উপরে ফেলিয়া কখনই তাহা সে ভাবে লিখিত হইতে পারে না। এই ব্যাপারে, সাক্ষী যে টেবলের উপর কাগজ রাখিয়া লিখিয়াছিল বলিয়া প্রমাণ দিয়াছিল, কার্লসন্ সেই টেবলের উপরিভাগের আলোক-চিত্র লইয়া বিশেষ শক্তিশালী কাচের সাহায্যে প্রমাণ করিয়া দিয়াছিলেন যে, সেই টেবলের উপরিভাগ এমনই অসমতল যে, তাহার উপর ঐরূপ পাতলা কাগজ রাখিয়া ঐ ভাবে দলিল লিপিবদ্ধ করিলে লিখনপ্রণালী স্বতন্ত্র আকার ধারণ করিত।
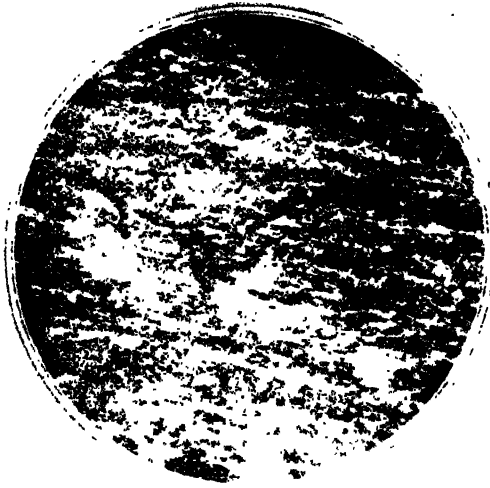
টেবলের উপরিভাগে—সূক্ষ্ম কলমের সাহায্যে পাতলা কাগজের উপর সম্পাদিত দলিল লিখিত হইতে পারে না

কার্লসন্ আরও প্রমাণ করিয়াছেন, পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জালিয়াৎ কোনও লেখকের স্বাক্ষরকে সম্পূর্ণভাবে জাল করিতে পারে না। পৃথিবীর কোনও লোকই তাহার নিজের নাম দুইবার একই ভাবে স্বাক্ষর করিতে পারে না; কিন্তু তাহার বর্ণবিন্যাস-প্রণালীর এমন একটা বৈশিষ্ট্য আছে, যাহাতে কোনও স্বাক্ষর যে তাহারই, তাহা বিশেষজ্ঞগণ ধরিতে পারেন। বর্ণবিন্যাস-প্রণালী ও লিখনভঙ্গীর অনুশীলনের দ্বারা বিশেষজ্ঞগণ কোন্‌টা জাল ও কোন্‌টা খাঁটি, তাহা নিঃসংশয়ে নির্দ্দেশ করিতে পারেন। কোনও একটা প্রসিদ্ধ মোকর্দ্দমায় সাক্ষ্যদান-কালে কার্লসন্ বলিয়াছিলেন যে, স্বাক্ষরকারীর অপেক্ষাও বিশেষজ্ঞগণের মত মূল্যবান্।

প্রতিপক্ষের এটর্ণী তাহাতে তাঁহাকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, "আপনি কি বলিতে চাহেন যে, আমার নিজের লেখা আপনি যেমন চিনেন, আমি তেমন জানি না ?"

উত্তরে কার্লসন্ বলেন, "কোনও ব্যক্তিকে তাহারই স্বহস্তলিখিত বিষয়কে তাহারই লিখিত কি না, প্রশ্ন করা অপেক্ষা বিশেষজ্ঞের অভিমত গ্রহণই বাঞ্ছনীয়, কারণ,
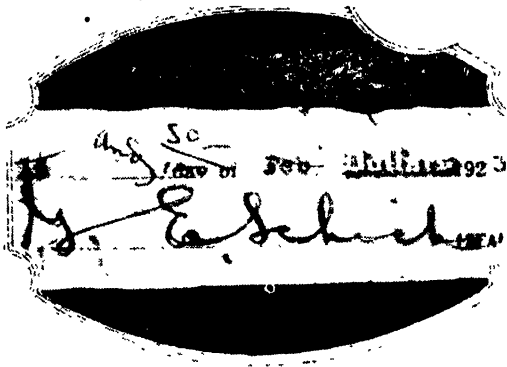
আসল হস্তাক্ষর ও নকল স্বাক্ষর একের উপর অপরটি আরোপ করিয়া কার্লসন জাল প্রতিপন্ন করিয়াছেন

অভিজ্ঞ ব্যক্তি নিঃসংশয়ে প্রমাণ করিয়া দিতে পারেন, প্রকৃতই সেই স্বাক্ষর বা লিখিত বিষয়টি তাহারই দ্বারা সম্পাদিত হইয়াছে কি না।"

এটর্ণী ঐ বিষয়ে আর প্রশ্ন না করিয়া অন্য কথা পাড়িলেন এবং কিয়ৎকাল পরে এক খণ্ড কাগজ বাহির করিলেন। তাহাতে ভিন্ন হস্তের লিখিত অনেকগুলি পদ দেখিতে পাওয়া গেল। এটর্ণী কার্লসনের হস্তে কাগজটি দিয়া প্রশ্ন করিলেন, কয় জন এই কাগজে লিখিয়াছে, তাহা তাঁহাকে বলিয়া দিতে হইবে। আর কতগুলি লেখনীই বা ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহাও জানিতে চাহিলেন। কার্লসন্ অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে উহা পরীক্ষা করিতে চাহিলেন। দ্বিপ্রহরে উহা পরীক্ষা করিবার পর অনুরূপ আর একখানি কাগজে উল্লিখিত লেখাগুলি নকল করিয়া ফেলিলেন। তাহার পর অপরাহ্নে আদালতে আসিয়া শেষোক্ত কাগজখানি এটর্ণীর টেবলে রাখিয়া দিলেন।

সওয়াল-জবাব আরম্ভ হইলে ব্যবহারাজীব সেই কাগজখানি লইয়া পরীক্ষা করিলেন এবং বিদ্রূপস্বরে প্রশ্ন করিলেন, "অভিজ্ঞ মহাশয়, আপনি যদি কাগজখানি পরীক্ষা করিয়া থাকেন, তবে আদালতে স্পষ্ট করিয়া বলুন, ক'জন ইহার লেখক?"

কার্লসন্ বলিলেন, "এক জন লোক, একটিমাত্র কলমের সাহায্যে লিখিয়াছে।"

"ঠিক বল্‌ছেন?"

"নিশ্চয়ই!"

এটর্ণী চীৎকার করিয়া বলিলেন, "কিন্তু আমি প্রমাণ দিচ্ছি, দুটি কলমের সাহায্যে আমি নিজে সবটা লিখেছি।" তিনি কলম দুইটি বাহির করিলেন।

এই ছুরীর উপর রক্তাক্ষরে কার্লসন জাল অঙ্গুলির ছাপ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। বামে প্রেমপত্র—ইহা দ্বারা প্রকৃত আসামীকে আবিষ্কার করিয়াছিলেন

কার্লসন বলিলেন, "আপনার হাতে যে কাগজখানা আছে, ওটা ত নকল" এই বলিয়া তিনি আসল কাগজখানা পকেট হইতে বাহির করিয়া দিলেন।

স্বল্লাহারে শক্তিরক্ষা

জাপানে লোকসংখ্যার অনুপাতে কৃষিকার্য্যের উপযোগী ক্ষেত্রের পরিমাণ অত্যন্ত কম। সুতরাং খাদ্যদ্রব্যের সমস্যা জাপানে অত্যন্ত জটিল। প্রায়ই জাপানকে এ জন্য নানা অসুবিধা ভোগ করিতে

জাপানী বৈজ্ঞানিক ট্রেডমিলে স্বল্লাহারী জাপানী সৈনিকের শক্তি পরীক্ষা করিতেছেন

হয়। স্বল্লাহারে মানুষ পরিশ্রমশক্তিকে অব্যাহত রাখিয়া জীবনযাত্রার পথে নির্ব্বিবাদে চলিতে পারে কি না, এই বিষয় লইয়া জাপানের জনৈক বিজ্ঞানবিদ্ নানাপ্রকার যন্ত্র আবিষ্কার করিয়া পরীক্ষাকার্য্য চালাইতেছেন। অত্যন্ত কম ও সাধারণ আহার্য্য পরিমাপ করিয়া পরীক্ষার্থী মানুষকে আহার করিতে দিয়া উদ্ভাবিত যন্ত্রের সাহায্যে তাহার কর্ম্মক্ষমতার পরীক্ষা লওয়া হইতেছে। বৈজ্ঞানিক প্রত্যহ পরীক্ষার্থী লোকটিকে একটি Tredmill এ চড়াইয়া দেন। উহার উপর পাদচারণা করিবামাত্র যে শক্তি উৎপন্ন হয়, তদ্দ্বারা আর একটি সংশ্লিষ্ট যন্ত্র আবর্ত্তিত হইতে থাকে। লোকটি নির্দ্দিষ্ট কয়েক ঘণ্টা ধরিয়া ট্রেডমিলে কার্য্য করিলে বুঝা যায় যে,স্বল্লাহারে তাহার পরিশ্রমক্ষমতা অব্যাহত থাকিতেছে কি না। লোকটির নাসিকার উপর একটি 'ফনেল' সংযুক্ত থাকে। তাহাতে পরীক্ষার্থীর শ্বাস-প্রশ্বাসক্রিয়ার পরিচয়ও বৈজ্ঞানিক পাইয়া থাকেন।

ভাবী অভ্রভেদী অট্টালিকা

ভাবী অভ্রভেদী অট্টালিকা

সভ্যতা-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অত্যুচ্চ অট্টালিকাসমূহও প্রতীচ্য জগতে নির্ম্মিত হইয়াছে। 'উলওয়ার্থ টাওয়ার' নামক অট্টালিকা উচ্চতার জন্য প্রসিদ্ধ। ইহার উচ্চতা ৭ শত ৫০ ফুট। কিন্তু নিউইয়র্কের জনৈক প্রসিদ্ধ স্থপতি সম্প্রতি মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, দেশের আইনকানুন বজায় রাখিয়া লৌহ ও প্রস্তরের সাহায্যে "উলওয়ার্থ টাওয়ারের" দ্বিগুণ উচ্চ—অভ্রভেদী অট্টালিকা নির্ম্মাণ করা অসম্ভব নহে। তিনি নক্সা রচনা করিয়া বলিয়াছেন যে, অদূর-ভবিষ্যতে ১ হাজার ৫ শত ফুট উচ্চ অট্টালিকা নির্ম্মিত হইতে পারে। এই বহুতলসংযুক্ত অট্টালিকার চূড়া ক্রমশঃ সূচের ন্যায় সূক্ষ্ম আকার ধারণ করিবে। তাঁহার নক্সার চিত্র, পাঠক প্রদত্ত ছবিতে দেখিতে পাইবেন। উত্তরকালে এইরূপ অত্যুচ্চ অট্টালিকা মার্কিণ দেশকে অলঙ্কৃত করিয়া তুলিবে, এ সম্বন্ধে বহু এঞ্জিনিয়ারও ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন। নিউ ইয়র্কের স্থপতি-সঙ্ঘের প্রেসিডেণ্ট মিঃ হার্ভে করবেট বলিতেছেন, অদূর-ভবিষ্যতে সহরের সর্ব্বত্রই অর্দ্ধমাইল উচ্চ অট্টালিকা বিনির্ম্মিত হইবে। তখন না কি পথ হইতে মোটরগাড়ীসমূহও অন্তর্হিত হইবে—জনসাধারণ এক বাড়ী হইতে অন্য বাড়ীতে যাইবার সময় হেলান প্লাটফরমের সাহায্য গ্রহণ করিবে। প্রত্যেক অট্টালিকায় দোদুল্যমান ছাদ নির্ম্মিত হইবে। গৃহনির্ম্মাণের যাবতীয় সরঞ্জাম বর্ণবৈচিত্র্য-বহুল হইবে।
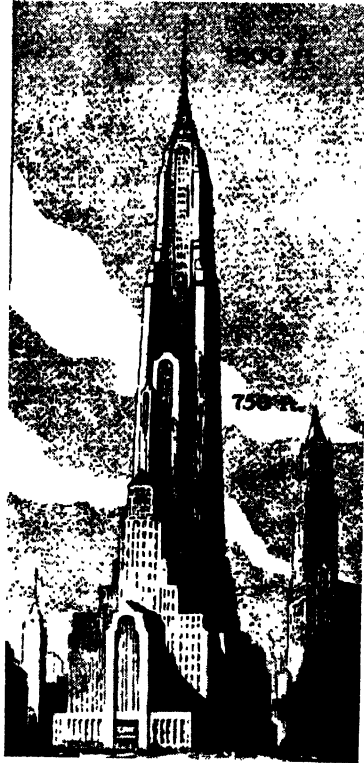
তোষকের নৌকা

আমেরিকায় এক নূতন প্রকার তোষকের নৌকা প্রস্তুত হইয়াছে। এই তোষক জলে আদৌ আর্দ্র হইবে না। যে কারখানা হইতে এই নৌকা প্রস্তুত হইয়াছে, তাহার এক জন প্রতিনিধি, গ্যাসোলিন মোটরযুক্ত

তোষকের নৌকা চড়িয়া নির্ম্মাতার প্রতিনিধি জলভ্রমণ করিতেছেন

একখানি তোষকের নৌকায় চড়িয়া এক নদীতে উক্ত নৌকা অনেক ঘণ্টা চালাইয়াছিলেন। এক প্রকার গাছের সূক্ষ্ম ও লঘু তন্তু দ্বারা তোষকের অভ্যন্তরভাগ পরিপূর্ণ করা হইয়া থাকে। এই তোষকের নৌকা যেমন লঘু-ভার, তেমনই দীর্ঘকালস্থায়ী।

পকেট ছাতা

আমেরিকায় সংপ্রতি এক প্রকার ছত্র নির্ম্মিত হইয়াছে; এই ছাতা ব্যাগে অথবা পকেটে করিয়া বেড়ান যায়। ছাতার হাতলটি অনেকটা দূরবীক্ষণ যন্ত্রের আকারবিশিষ্ট। মুড়িয়া রাখিলে ইহার দৈর্ঘ্য মাত্র ১০ ইঞ্চ এবং পরিধি দুই ইঞ্চ মাত্র। মুঠার কাছে একটু চাপ দিয়া ঘুরাইলেই ছাতাটি বন্ধ হইয়া যায়। খুলিবার প্রয়োজন হইলে বিপরীত দিকে ঘুরাইবামাত্র উহা বিস্তৃত হইয়া পড়িবে। ভ্রমণকারীর পক্ষে এইরূপ ছত্র বিশেষ প্রয়োজনীয়।

বামহস্তে পকেটে রাখিবার অবস্থায় ছত্র—দক্ষিণ হস্তে ছত্রের বিস্তৃত অবস্থা

বালকের কীর্ত্তি

নিউইয়র্কের জনৈক বালক কিছু শিরীষ ও দন্ত পরিষ্কার করিবার কাঠির সাহায্যে 'ইফেল্ টাওয়ারের' একটা নকল মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়াছে। বালকটি এই নমুনার অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিতে ৩ শত ঘণ্টা পরিশ্রম করিয়াছিল। ১১ হাজার দাঁতের কাঠি গৃহ-নির্ম্মাণে ব্যবহৃত হইয়াছে। বালক এমন নৈপুণ্য সহকারে এই 'মডেল' তৈয়ার করিয়াছে যে, আসলের সহিত কোনও স্থানেই বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম ঘটে নাই। নির্ম্মাণ-কৌশলে এঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যার প্রকৃষ্ট পরিচয়ও পাওয়া গিয়াছে। বালকটি দন্ত-চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়নের অবকাশে এই গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছে।

মার্কিণ ঔপন্যাসিকের কিশোর নায়ক-যুগলের প্রস্তরমূর্ত্তি

ঔপন্যাসিকের গ্রন্থ-নায়ক

প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক মার্কটোয়েনের গ্রন্থের কিশোর নায়ক 'টম্ সভার' ও 'হকল্‌বেরী ফিন্'এর মূর্ত্তি গড়িয়া জনৈক প্রসিদ্ধ ভাস্কর হ্যানিবাল্ মো (Hannibal Mo) নগরে স্থাপিত করিয়াছেন। প্রসিদ্ধ মার্কিণ সাহিত্যিক মার্কটোয়েন এই নগরে দীর্ঘকাল বাস করিয়াছিলেন। ভাস্কর মূর্ত্তিযুগলকে গ্রন্থ-বর্ণিতভাবেই অঙ্কিত করিয়াছেন—ঠিক যেন তাহারা অরণ্যমধ্য হইতে নির্গত হইতেছে। ভাস্করের নির্ম্মিত মূর্ত্তিযুগলে অসাধারণ শিল্পনৈপুণ্য প্রদর্শিত হইয়াছে।

দাঁতের কাঠির সাহায্যে বালক ইফেল টাওয়ারের নকল মূর্ত্তি গড়িতেছে

দক্ষিণ-আমেরিকায় বৈদ্যুতিক মানচিত্র

দক্ষিণ-আমেরিকার বৈদ্যুতিক মানচিত্র

সিন্‌সিনেটি বিদ্যালয়ের কয়েক জন উচ্চশ্রেণীর ছাত্র দক্ষিণ-আমেরিকার একখানি বৈদ্যুতিক মানচিত্র প্রস্তুত করিয়াছে। ভূগোল শিক্ষায় ছাত্রের আগ্রহ বর্দ্ধিত করিবার উদ্দেশ্যে এই ব্যবস্থা। মানচিত্রের পশ্চাতে বৈদ্যুতিক 'বাল্‌ব'গুলি এমনভাবে সংস্থাপিত হইয়াছে যে, সুইচের চাবী টিপিলেই নির্দ্দিষ্ট স্থানে আলোক জ্বলিয়া উঠিবে। ইহাতে পাঠার্থীর ভূগোলপাঠের স্পৃহা ও কৌতূহল অতিমাত্রায় বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। মানচিত্র-খানিকে যেখানে ইচ্ছা চিত্রের ন্যায় সরাইয়া লইয়া যাইতে পারা যায়।

বিচিত্র বিমানপোত

স্পেনীয় এঞ্জিনিয়ার ডন্ জে, দেলা সিবৃভা সম্প্রতি এক-খানি বিচিত্র বিমানপোত নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এই পোতের নাম 'অটোজিরো'। আলোচ্য বিমান পোত-খানি কলকব্জার বিচিত্র সন্নিবেশ-কৌশলে আপনা হই-তেই পাখীর ন্যায় আকাশ-পথে উড্ডীন হইতে পারে। বিশ্বের বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকগণ এত দিন সাধনা করিয়াও এইরূপ ভাবে কোনও বিমান-রথ নির্ম্মাণ করিতে পারেন নাই। সুকৌশলী বৈজ্ঞানিক ডন্ সিবৃভার এই আবিষ্কারে বৈজ্ঞানিকগণ বিস্মিত হইয়াছেন। কাবুন্‌-বয়ো বিমান-পোতাশ্রয়ে (Aerodrome) 'অটোজিরো'র পক্ষিগতির ক্রীড়া প্রদর্শিত হইয়াছিল। পাখীর সহিত ইহার আকৃতিগত সাদৃশ্য অত্যন্ত অল্প হইলেও আরোহণ-অবরোহণকালে উহার ডানাগুলি ঠিক পাখীর ডানার মতই সঞ্চালিত হইতে থাকে। 'অটোজিরো' সোজা-সুজিভাবে অবরোহণ ও আরোহণ করিতে পারে। সাধারণ বিমানপোতের ন্যায় এই নবাবিষ্কৃত বিমান-রথ আঁকিয়া বাঁকিয়া নানাবিধ গতি-কৌশলেও পাখীর ন্যায় ডানা সঞ্চার করিয়া প্রদর্শনীক্ষেত্রে সমবেত বৈজ্ঞানিক দার্শনিকগণের বিস্ময়োৎপাদন করিয়াছিল।

রেশম ও সূচের কীর্ত্তি

এক জন কিশোরী সম্প্রতি রেশমসূত্র ও সূচের সাহায্যে আমেরিকার রাষ্ট্রপতি কুলিজের এক বিচিত্র প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়াছে। চিত্রটি নানা বর্ণের সূত্রসম্মিলনে অতি অপূর্ব্ব দর্শন হইয়াছে। এই চিত্র দর্শনে অভিজ্ঞগণ পর্য্যন্ত কিশোরীর নৈপুণ্যের প্রশংসা করিয়াছেন। কিশোরী মিসেস্ কুলিজের প্রতিমূর্ত্তি অনুরূপ উপায়ে রচনা করিতেছে। উহা সমাপ্ত হইলে চিত্রযুগল 'হোয়াইট হাউসে' উপহৃত হইবে।

রেশমসূত্র ও সূচের সাহায্যে রাষ্ট্রপতি কুলিজের প্রতিমূর্ত্তি

সীমন্তিনী

[গল্প]

১

বিপত্নীক বিশ্বম্ভর ভট্টাচার্য্য যখন দীর্ঘকাল ভারত সরকারের অধীনে চাকুরী করিবার পর অবসর গ্রহণ করিয়া স্বগৃহে ফিরিলেন, তখন ৭ বৎসরের মেয়ে মাধুরীকে তাগার ঠাকুরদাদার হস্তে সমর্পণ করিয়া বৃদ্ধের পুত্র ও পুত্রবধূ উভয়েই এক বৎসরের মধ্যে অকালে এই পৃথিবী হইতে অবসর লইলেন। ঠাকুরদাদা ও নাতনী এখন উভয়ে উভয়ের শেষ অবলম্বন !

বিশ্বম্ভর শুধুই ভাবেন, 'ভগবান্. এমন হইল কেন ? কোন্ পাপের ফলে তাঁহার জীবন সকল দিক্ দিয়া এমন ভাবে অভিশপ্ত হইয়া গেল ?' জীবনের মধ্যাহ্নেই তাঁহার পত্নীবিয়োগ হয়, গৃহহীন হইয়াও পুত্র-পুত্রবধূর মুখ চাহিয়া পুনরায় বাসা বাঁধিতে চাহিলেন, কিন্তু অদৃষ্টের বিড়ম্বনায় তাহাও ভূমিসাৎ ধূলিসাৎ হইয়া গেল !

তরুণ শোক সময়ের প্রলেপে পুরাতন হইয়া আসিল, কিন্তু শোকে বৃদ্ধের পঞ্জর ভাঙ্গিয়া গেল। এত দিন নিজে আশার কুহকে ঘুরিয়াছেন, পরকালের চিন্তা করিবার অবসর পান নাই। এখন জীবনের বাকী দিনগুলি ভগবানের চিন্তায় কাটাইয়া দিবেন ভাবিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় এক বৃদ্ধা আত্মীয়াকে তাঁহার গৃহে প্রতিষ্ঠিত করিলেন, এবং বিষয়-সম্পত্তির একটা ব্যবস্থা করিয়া কোন তীর্থস্থানে যাইয়া বাস করিবেন স্থির করিলেন। অনেক বৃদ্ধ, বৃদ্ধা আত্মীয়ই সঙ্গে যাইতে প্রস্তুত হইলেন ও বিশ্বম্ভরকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন যে, সুদূর বিদেশে একমাত্র বালিকা পৌত্রীকে লইয়া তাঁহার অনেক কষ্ট হইবে। কিন্তু তিনি কোন কথাই কানে তুলিলেন না, শুধু বলিলেন যে, তিনি আর নূতন করিয়া মায়ার বন্ধন সৃষ্টি করিতে চাহেন না ; এবং সকল শুভাকাঙ্খী আত্মীয়-বন্ধুবান্ধবের উপদেশ অবহেলা করিয়া পুরোহিত ডাকাইয়া শুভদিনে কাশীধাম যাইবার জন্ত রেলে উঠিলেন।

বিশ্বম্ভরের জনৈক অবসরপ্রাপ্ত সহকর্ম্মী কাশীবাস করিতেছিলেন। তিনি তাঁহার ঠিকানা পূর্ব্বেই সংগ্রহ করিয়া তাঁহার রওনা হইবার সংবাদ তারযোগে জানাইয়াছিলেন। কাশী ষ্টেশনে গাড়ী পোঁছিলেই দেখিতে পাইলেন, তাঁহার বৃদ্ধ বন্ধু যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় তাঁহাদের অপেক্ষায় প্লাটফরমে দাঁড়াইয়া আছেন। যোগেন্দ্র বাবু বিশ্বম্ভর ও মাধুরীকে গাড়ী হইতে নামাইয়া লইলেন এবং নৌকাযোগে বাসা অভিমুখে রওনা হইলেন।

যোগেন্দ্র বাবুর বাসা গঙ্গার ঠিক উপরেই। তিনি স্ত্রী ও কনিষ্ঠা পুত্রবধূকে লইয়া এই বাড়ীতে বাস করেন। যোগেন্দ্র বাবুর দুই পুত্র। জ্যেষ্ঠপুত্র সাধারণতঃ সপরিবারে দেশের বাড়ীতে বাস করেন। কনিষ্ঠ পুত্র ম্যাট্রিকুলেশান পরীক্ষায় পাশ হইয়া হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িতেছিল।

বিশ্বম্ভরের জন্ত গঙ্গামহল পল্লীতে বাসা ঠিক হইল, ও একটি প্রৌঢ়া ব্রাহ্মণকন্তা রাঁধুনী নিযুক্ত হইল। কিন্তু যোগেন্দ্র বাবুর নিকট বিদায় পাইয়া নিজের বাসায় যাইতে ৫।৬ দিন বিলম্ব হইল। এই কয় দিন দুই বৃদ্ধ একত্র গঙ্গাস্নান ও দেবতাদর্শনে গত জীবনের নানা প্রসঙ্গের আলোচনায় কাটাইলেন। যোগেন্দ্র বাবুর বালিকা পুত্রবধূ কমলার সঙ্গে মাধুরীও কয় দিন খুব আমোদে কাটাইল ও তাহাদের মধ্যে বিশেষ ভালবাসা জন্মিল।

গঙ্গামহলের যে বাসায় বিশ্বম্ভর আসিলেন, উহা একটি বৃহৎ বাড়ী। উহার ভিন্ন ভিন্ন অংশে ভিন্ন ভিন্ন ভাড়াটিয়া বাস করে। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের জন্ত দ্বিতলে একটি অংশ ভাড়া লওয়া হইয়াছিল। নিয়মিতরূপে সন্ধ্যা-অর্চ্চনা, দেবদর্শন ও গঙ্গাতীরে পৌত্রীকে লইয়া বেড়াইয়া তাঁহার দিনগুলি বেশ কাটিতে লাগিল।

২

মাধুরী বড় হইয়াছে, অর্থাৎ যে বয়সে হিন্দুঘরের মেয়ের বিবাহ না হইলে লোকসমাজে অভিভাবকদের লাঞ্ছনা ও গঞ্জনা আরম্ভ হয়, সেই বয়স হইয়াছে। ১৩।১৪ বৎসরের হিন্দুঘরের মেয়ে, অথচ বিশ্বম্ভর তাহার বিবাহের কোন উদ্যোগই করিতেছেন না দেখিয়া অপর অংশের ভাড়াটিয়ারা প্রথমে নিজেদের মধ্যে আন্দোলন আরম্ভ করিল ও পরে প্রকাশ্যভাবেই বৃদ্ধকে আক্রমণ করিতে লাগিল। বিশ্বম্ভর কোন কথাই কানে তুলেন না, কখন কখন বিরক্ত হইলে বলেন, নাতনীর বিবাহ দিবেন না। ইহার উপর আর শুভানুধ্যায়ীদের তর্ক চলে না, তাহারা বৃদ্ধকে পাগল ঠিক করিয়া যুদ্ধপ্রয়াসী মনকে শান্ত করিল।

কিশোরী মাধুরীর তীক্ষ্ণ মেধা ও শিক্ষালাভের আগ্রহ প্রবল দেখিয়া বিশ্বম্ভর স্বয়ং তাহাকে যত্ন করিয়া পড়াইতে লাগিলেন। অল্প দিনের মধ্যেই মাধুরী রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি অনেক ধর্ম্মগ্রন্থও পড়িয়া ফেলিল।

সে দিন শুক্লা একাদশী। বৈকালে দশাশ্বমেধ ঘাটে কোথাও রামায়ণগান, কোথাও শাস্ত্র-আলোচনা, কোথাও কথকতা হইতেছে। সর্ব্বত্রই ভীড়। বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, যুবক-যুবতী, বালক-বালিকা নিজেদের মনোমত সঙ্গী খুঁজিয়া লইয়াছে। মাধুরী ঠাকুরদাদার সঙ্গে একটি ঘাটের সিঁড়ির উপরের ধাপে বসিয়া ছিল। কত নৌকা সান্ধ্য-বায়ুসেবী আরোহী লইয়া গঙ্গায় এ দিক ও দিক চলিতেছে ফিরিতেছে। এমন সময় মাধুরী দেখিতে পাইল, একখানি নৌকা হইতে কে তাহাকে ইঙ্গিত করিয়া ডাকিতেছে। মাধুরী ও বিশ্বম্ভরের দৃষ্টি সেই দিকে আকৃষ্ট করিল।

নৌকাখানি তাহাদের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল ও নিকটে আসিলে তাহারা দেখিল, নৌকায় যোগেন্দ্র বাবুর স্ত্রী, পুত্রবধূ ও দুই জন যুবক। গঙ্গামহল বাসায় আসিবার পর মাধুরী ঠাকুরদাদার সঙ্গে

ফুটিয়া উঠিল। মাধুরী এতক্ষণ দূর হইতে খোলা জানালার মধ্য দিয়া বিশ্বম্ভরকে দেখিতেছিল, চিঠি কে লিখিয়াছে, তাহা জানিবার জন্ত তাহার অত্যন্ত আগ্রহ হইতেছিল, অথচ অকারণ দ্বিধা ও লজ্জায় বিশ্বম্ভরকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতেও পারিতেছিল না। বিশ্বম্ভরকে অতিশয় চিন্তান্বিত দেখিয়া ও অমঙ্গল সংবাদ আশঙ্কা করিয়া শেষে মাধুরী ঘরের মধ্যে যাইয়া, কোথা হইতে চিঠি আসিয়াছে, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল। বিশ্বম্ভর মাধুরীর কথায় যেন চমকিয়া উঠিলেন, ও কেমন যেন অপ্রস্তুতভাবে বলিলেন, "হ্যাঁ, খবর ভাল, সত্যেনের চিঠি, সে ভাল আছে, তার এম, এ পাশের খবর দিয়েছে। সে আর অতুল সামনের বুধবারে কাশীতে আসবে লিখেছে।" মাধুরী বুঝিল, বিশ্বম্ভর চিঠির অনেক কথাই গোপন করিলেন। বুঝিল, এই পাশের খবর ও তাহাদের কাশীতে আসিবার কথার মধ্যে এমন কি আছে, যাহা পড়িয়া বিশ্বম্ভর এমন গুম্ হইয়া বসিয়া চিন্তা করিতে পারেন? যখন বিশ্বম্ভর আর কোন কথা না বলিয়াই চিঠিখানি বালিসের তলায় রাখিয়া মাধুরীর দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া শুইয়া পড়িলেন, তখন মাধুরীর চিত্ত অভিমানের বেদনায় টন্ টন্ করিতে লাগিল; সেও আর কোন কথা না বলিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া রান্নাঘরের দিকে গেল। সেখানে রাঁধুনী যখন তাহার পুরাতন রহস্যের পুনরাবৃত্তি করিয়া বলিল, সে কি তাহার ঠাকুরদাদাকেই পতিত্বে বরণ করিবে, তখন মাধুরী হাসিয়া রাঁধুনীকে ভর্ৎসনা করিয়া সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল ও তাহার বিছানায় যাইয়া মুখ গুঁজিয়া শুইয়া রহিল।

এ দিকে বিশ্বম্ভর অনেকক্ষণ চুপ করিয়া শুইয়া থাকিয়া উঠিয়া বসিলেন ও বালিসের তলা হইতে চিঠিখানি বাহির করিয়া আবার পড়িতে লাগিলেন। পড়া শেষ হইলে ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন ও মাধুরীকে ডাকিলেন। তাহার কোন সাড়া না পাইয়া রান্নাঘরে খোঁজ করিলেন, সেখানেও তাহাকে না দেখিয়া শেষে তাহার শয়নঘরে গেলেন। মাধুরী শুইয়াছিল, বিশ্বম্ভর ডাকিতেই উঠিয়া বসিল। কিছুক্ষণ কেহই কোন কথা কহিল না। বিশ্বম্ভর জিজ্ঞাসা করিলেন, "এমন দুপুরবেলা শুয়ে কেন, কোন অসুখ করেনি ত দিদি?"

মাধুরী বলিল, "না।" এমন সময় রাঁধুনী খবর দিল, রান্না প্রস্তুত। নিয়মমত আজও মাধুরী ঠাকুরদাদার সঙ্গে রান্নাঘরে গেল, আজও পাখা লইয়া হাওয়া করিতে বসিল, কিন্তু অন্ত দিনের মত বৃদ্ধের খাওয়ার সময় গল্প জমিল না।

এইরূপে বিশ্বম্ভর ও মাধুরীর মধ্যে ক্রমশঃ একটি ব্যবধান সৃষ্টি হইতে লাগিল। এই দুই জন প্রাণীর একের অন্তের ছাড়া কোন আশ্রয় ছিল না, সঙ্গীও ছিল না; অথচ ইহাদের পরস্পরের মধ্যে যে সহজ সরল ভাব ছিল, তাহাও ক্ষুণ্ণ হইয়া যাইতেছে। মাধুরী ভাবিল, বিশ্বম্ভর তাহার নিকট হইতে অনেক কথা গোপন করিতেছেন। বিশ্বম্ভর ভাবিলেন, মাধুরী এখন আর পূর্ব্বের সেই ছোট্ট বালিকাটি নাই, এখন সে তাহার নিজের সুখ-দুঃখের বিষয় চিন্তা করিতে শিখিয়াছে।

বিশ্বম্ভর ও সত্যেনের মধ্যে খুব চিঠি যাওয়া-আসা করিতে লাগিল। মাধুরী সত্যেন সম্বন্ধে পূর্ব্বে অসঙ্কোচে অনেক কথা চিন্তা করিয়াছে, প্রকাশ্যে বিশ্বম্ভরকে তাহার সম্বন্ধে অনেক কথা জিজ্ঞাসাও করিয়াছে, কিন্তু যে দিন কমলা তাহাকে ঠাট্টা করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন— "আমার দাদাকে তোর পছন্দ হয় ত বল ঘটকালি করি"—সেই দিন হইতেই সত্যেন সম্বন্ধে তাহার একটা লজ্জা আসিয়া পড়িয়াছে। এখন আবার সত্যেন ও বিশ্বম্ভরের মধ্যে ঘন ঘন চিঠি আসা-যাওয়া দেখিয়া মাধুরী ইহা স্থির বুঝিয়াছিল যে, সে নিজেই এই দুই জন প্রাণীর চিন্তার ও আলোচনার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

সে দিন বিশ্বম্ভর বৈকালে বেড়াইতে যাইবার সময় মাধুরীকে কাছে ডাকিয়া মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে স্নেহ-সরস কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন—"দিদি, সত্যেন যে বইগুলি পাঠিয়েছিল, সেগুলি সব পড়া হয়েছে?" মাধুরী দেখিল, সে ঠিকই অনুমান করিয়াছিল, তবুও বলিল, "কে পাঠিয়েছিল, তা কি ক'রে বলব, তবে বইগুলো পড়েছি; তোমাকেও ত প'ড়ে শুনিয়েছি।" বিশ্বম্ভর যেন আপন মনেই বলিতে লাগিলেন,—"বেশ ছেলেটি সত্যেন, শুধু লেখাপড়ায় নয়। খবরের কাগজে দেখলাম, সত্যেন ও আর কয়টি হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলে মিলে নানা রকম সমাজহিতকর কাযের অনুষ্ঠান করেছে, তারা স্ত্রী-শিক্ষা প্রচার করবে, বালিকা বিধবার বিবাহ চলিত করবে, নিরক্ষর চাষীদের জন্ত রাত্রে বিনা মাইনায় স্কুল করবে, চরকা কাটা শেখাবে, আরও কত কি! এমন যদি দেশের সব ছেলে মানুষ হ'ত, তা হ'লে দেশের অবস্থা দু'দিনে বদলে যেত। তা, শোন দিদি, কা'ল অতুল ও সত্যেন কাশী আসছে, এক দিন তাদের এখানে খেতে বলতে হয়, পরশু তাদের এখানে নিমন্ত্রণ করা যাক্, কেমন?" মাধুরী শুধু বলিল—"বেশ ত।"

বিশ্বম্ভর বেড়াইতে বাহির হইয়া গেলেন, সঙ্গে মাধুরী গেল না, এখন সে প্রায়ই যায় না। বাড়ীর খোলা ছাদ হইতে গঙ্গা দেখা যায়, মাধুরী সেই ছাদে পায়চারি করিয়া বেড়াইতে লাগিল। চিন্তার পর চিন্তার তরঙ্গ আসিয়া তাহার মনকে আঘাত করিতে লাগিল। সত্যেন তাহাকে বইগুলি পাঠাইল কেন? কেন বিশ্বম্ভর প্রথমে এই উপহারদাতার নাম তাহার কাছে গোপন করিয়াছিলেন, কেন আবার তিনি সত্যেনের প্রশংসায় সহস্রমুখ হইয়াছেন? সে মনে মনে সিদ্ধান্ত করিল, তাহাকে লইয়াই বিশ্বম্ভর ও সত্যেনের মধ্যে গোপন পরামর্শ চলিতেছে। ইহার মূলে নিশ্চয়ই কমলা আছে। মাধুরী ভাবিতে লাগিল, এক দিন কমলা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, সত্যেনকে সে ভালবাসে কি না। মুখ ফুটিয়া সে কিছু বলিতে পারে নাই, কিন্তু বোধ হয়, কমলা তাহার মনের কথা বুঝিতে পারিয়া এখন ঘটকালি করিতেছে! ছি, ছি, সে বোধ হয় সত্যেনকেও বলিয়াছে যে, সে তাহাকে ভালবাসে! কি লজ্জা! কি লজ্জা! সত্যেনকে পরশু আসিবার জন্ত নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে। সে আসিলে মাধুরী কি করিয়া তাহার সম্মুখে বাহির হইবে? অথচ তাহার সম্মুখে বাহির না হইবার, তাহার সঙ্গে কথা না কহিবার ত প্রকাশ্য কোন কারণই বিদ্যমান নাই! অনেক ভাবিয়াও যখন কোন কূল-কিনারা পাইল না, তখন মাধুরী নীচে নামিয়া গিয়া রাঁধুনীর কাছে বসিল।

পরদিন ডাকে কমলার নিকট হইতে মাধুরী একখানা চিঠি পাইল। কমলা লিখিয়াছে,—

"ভাই মাধুরী, আজ তোমাকে একটি সুসংবাদ দিব। দাদা তোমার জন্ত তাঁহার চিরকুমার ব্রত ভঙ্গ করিতে রাজী হইয়াছেন। দাদা তাঁহার ভগিনীপতিকে কি বলিয়াছেন জান? 'মাধুরীকে বিবাহ করিলে আমার ব্রত ভঙ্গ হইবে না, আমার জীবনের মহাব্রত সফল হইবে।' ভাই, তোমার কোন্ গুণের সোনার কাঠির পরশে দাদার মনের এই ব্রত উদ্‌যাপনের ঘুমন্ত বাসনা জাগাইয়া দিলে? কা'ল দাদা ও তিনি নাগোয়া হইতে আসিবেন, কারণ, জানই ত তিনি পড়া শেষ করিয়া সেইখানেই চাকুরী করিতেছেন, তাঁহার কলেজ বন্ধ হইয়াছে; আর দাদা এবার এম্, এ পাশ হইয়াছেন, কা'ল আমরা সকলে তোমাদের ওখানে যাইব। আজ তবে আসি, ভাই, বউদিদি।

তোমার দিদিমণি
কমলা।"

"যদি গাহন করিতে চাহ, এস নেমে এস, হেথা
গহনতলে।"

বসুমতী প্রেস]

[শিল্পী—শ্রীগিরীন্দ্রনাথ বসু।

মাধুরী লজ্জা ও গর্ব্বে রাঙ্গা হইয়া উঠিল। সে নিভৃতে যাইয়া গলায় অঞ্জলি দিয়া ভগবানের উদ্দেশ্যে বারংবার প্রণাম করিল। তাহার সমস্ত শরীরের মধ্য দিয়া—মজ্জায় মজ্জায় শিরায় শিরায়—অননুভূতপূর্ব্ব পুলক-স্পন্দন বহিয়া যাইতেছিল।

নির্দ্দিষ্ট দিনে কমলা স্বামী ও ভ্রাতাকে সঙ্গে লইয়া বিশ্বম্ভরের বাড়ীতে আসিল।

আহারাদির পর বিশ্বম্ভর, অতুল ও কমলার মধ্যে অনেক পরামর্শ হইল। পঞ্জিকা দেখিয়া বিবাহের দিনও স্থির হইয়া গেল। কমলা তাহার মাকে পূর্ব্বেই সমস্ত লিখিয়াছিল। একমাত্র পুত্রের বিবাহে মত হওয়ায় তিনি অত্যন্ত আহ্লাদের সহিত বিবাহে তাঁহার সম্মতি জানাইয়াছিলেন।

৫

বিবাহের কয়েক মাস পরেই সত্যেন পাটনা কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক নিযুক্ত হইল। গঙ্গামহলের বাসা ছাড়িয়া দিয়া দেবকী-নন্দন হাবলীর একটি বড় বাড়ীতে বিশ্বম্ভর মাধুরীকে লইয়া উঠিয়া আসিলেন। সত্যেন ছুটী পাইলেই কাশীতে আইসে। মা পাটনার বাসায় পুত্রের নিকট থাকেন, তিনিও কখন কখন কাশী আসিয়া বিশ্বনাথ দর্শন করিয়া যায়েন। মায়ের ইচ্ছা পুত্রবধূকে পাটনার বাসায় লইয়া আসেন, কিন্তু বিশ্বম্ভরের কষ্ট হইবে ভাবিয়া আপাততঃ মাধুরী পিতামহের কাছেই রহিয়া গেল।

সত্যেন ও মাধুরী প্রেমের বন্যায় ভাসিয়া চলিয়াছিল। এই দম্পতি যেন কত যুগ ধরিয়া পরস্পর পরস্পরকে ভালবাসিয়া আসিতেছে। সত্যেনের যে ভালবাসা মাধুরী জীবনে শ্রেষ্ঠ আশীর্ব্বাদ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল, এখন সেই ভালবাসা যেন ক্রমেই গভীরতর হইতে লাগিল। মাধুরী ভাবিত, পৃথিবীর প্রথম সৃষ্টি হইতে যেন তাহারা পরস্পরকে এমনই ভাবে ভালবাসিয়া আসিতেছে। অনন্ত-কাল ধরিয়া উভয়ে উভয়ের জন্য সৃষ্ট। মাধুরী কখনই বিশ্বাস করিতে পারিত না যে, এই জীবনেই এই আকর্ষণের ও প্রেমের আরম্ভ এবং এই জীবনেই তাহার শেষ।

সত্যেন প্রথম দর্শনেই মাধুরীর প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল। যতই দিন যাইতে লাগিল, ততই এই আকর্ষণ শক্তিশালী হইতে লাগিল, ততই তাহার প্রেম গভীর হইতে লাগিল। এই প্রেমে তরলতা ছিল না, মাদকতা ছিল না—ছিল শুধু মাধুর্য্য আর সম্ভ্রম। এই রমণী-রত্নকে লাভ করিয়া যে তাহার জীবন ধন্য হইয়াছে, পূর্ণ হইয়াছে, তাহার বহুদিনের সাধনা সার্থক হইয়াছে, সে তাহা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছিল।

এই দুই জন প্রেমের তীর্থযাত্রীর জীবনযাত্রা যখন পরিপূর্ণ গতিতে ও মধুর ছন্দে চলিতেছিল, তখন অকস্মাৎ একটি কাল মেঘ উঠিয়া মুহূর্ত্তে মাধুরীর অদৃষ্ট-আকাশকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল।

সেবার চন্দ্রগ্রহণ উপলক্ষে মহাযোগ উপস্থিত। কাশীতে সমগ্র ভারতবর্ষ হইতে দলে দলে যাত্রী আসিতেছে। গঙ্গার ঘাটের দৃশ্য অপূর্ব্ব। অগণিত যাত্রী পোঁটলা-পুঁটলি লইয়া সমস্ত খোলা যায়গা পূর্ণ করিয়া ফেলিয়াছে।

চন্দ্রগ্রহণের আর এক দিন বাকি। মধ্যাহ্ন আহারের পর বিশ্রামান্তে বিশ্বম্ভর কুচবিহার রাজবাড়ীতে ভাগবত পাঠ শুনিতে গিয়াছেন। তিনি সন্ধ্যায় সময় মাধুরীকে লইয়া গঙ্গার ঘাটে বেড়াইতে যাইবেন বলিয়া মাধুরী সকাল সকাল হাতের কায সারিয়া লইয়া চুল বাঁধিতে বসিয়াছে। যে মুকুরে মাধুরী মুখ দেখিতেছে, সেই মুকুর সত্যেনের দেওয়া। চুল বাঁধিতে বাঁধিতে কত কথাই মনে পড়িতেছে। এক দিন কমলা চুল বাঁধিয়া দিতেছিল ও মাধুরীর সঙ্গে গল্প করিতেছিল। তাহাদের কথাও শেষ হইতেছে না, চুল বাঁধাও ফুরাইতেছে না। কিছুক্ষণ মাধুরী কমলার কথা শুনিতে পাইল না। পরে অদূরে চাপা হাসির শব্দ শুনিয়া মুখ তুলিয়া সেই দিকে চাহিতেই দেখে, দরজার আড়ালে দাঁড়াইয়া কমলা মুখে কাপড় গুঁজিয়া হাসিতেছে এবং পিছনে ফিরিয়া দেখে, তাহার স্বামী চুলের গোছা হাতে লইয়া বেণী বাঁধিবার নিষ্ফল চেষ্টা করিতেছে। সে যে কি লজ্জার কথা, তাহা ভাবিতে মাধুরীর মুখ লাল হইয়া উঠিল। কখন্ যে কমলা উঠিয়া গিয়াছিল, আর কখন্ যে সত্যেন আসিয়া তাহার পিঠের কাছে বসিয়াছিল, তাহা যদি মাধুরী একটুও জানিতে পারিয়া থাকে!

অনেক বিলম্বে মাধুরীর চুল বাঁধা শেষ হইল। সযত্নে কপালে টিপটি পরিয়া সীমন্তে সিঁদুর পরিতেছে, এমন সময় বাহিরের দরজার কড়া নড়িয়া উঠিল। রাঁধুনী নীচেই ছিল, সে কড়া নাড়ার ধরণ দেখিয়া বুঝিল, বিশ্বম্ভর নহে, অপর কেহ কড়া নাড়িতেছে। সে দরজা না খুলিয়াই জিজ্ঞাসা করিল, "কে গা?" তার পর কি কথা হইল, মাধুরী উপর হইতে শুনিতে পাইল না। তবে দেখিল, রাঁধুনী দরজা খুলিয়া দিল এবং কয়েক জন আগন্তুক বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া সেইখানেই দাঁড়াইয়া রহিল। আগন্তুকের মধ্যে এক জন বৃদ্ধ পুরুষ, অপর তিন জন স্ত্রীলোক,—একটি বৃদ্ধা, অপর দুই জন মধ্য-বয়স্কা। সকলের সঙ্গেই পোঁটলা পুঁটলি রহিয়াছে। চেহারা দেখিয়া মাধুরী মুহূর্ত্তেই অনুমান করিয়া লইল, ইহারা যোগ উপলক্ষে কাশীতে গঙ্গাস্নানের জন্য আসিয়াছে। বৃদ্ধটি ভিতরে প্রবেশ করিয়া মাটীতেই বসিয়া পড়িল এবং চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল, "ওগো ঝি, জল দাও ত, হাত-পা ধুই। বাপ, কি ঘোরাটাই না ঘুরেছি, বাসা কি আর মেলে। যাক্, ওগো ঝি, ভট্টাচার্য্যি মশাই কোথায় গেছেন, বল্লে,—ভাগবত শুনতে? আহা হা, পুণ্যধাম কাশীধামে এসেই যেন শরীর-মন জুড়িয়ে গেল।" এইরূপে বৃদ্ধটি অনেকক্ষণ ধরিয়া অনর্গল বকিয়া যাইতে লাগিল। রাঁধুনীকে ঝি বলিয়া সম্বোধন করায় রাঁধুনী খুব চটিয়া যাইতেছিল। স্ত্রীলোকগুলি ইতোমধ্যে রাঁধুনীর সঙ্গে কলতলায় গিয়া হাত-মুখ ধুইয়া উপরে উঠিল ও মাধুরীর নিকট যাইয়া দাঁড়াইল। মাধুরী একটি মাদুর বিছাইয়া তাহাদিগকে বসিতে দিল। বৃদ্ধা স্ত্রীলোকটি মাধুরীর সঙ্গে কথা সুরু করিল। বৃদ্ধা কহিল, "আমরা আস্‌ছি বর্দ্ধমান জেলা থেকে। ভাবলাম, এই তিন কাল গিয়ে এক কাল বাকি, এখন যদি একটু ধর্ম্ম-কর্ম্ম না কর্‌ব ত কর্‌ব কখন্! ঠাকুর-দেবতার স্থানে বাস কর্‌বার পুণ্যি নিয়ে ত আর আসিনি, তাই ভাবলাম, বাবা বিশ্বনাথের ধামে যখন আপনাদেরই লোক রয়েছে, তখন আর ভাবনা কি, একবার দর্শনটা ক'রে আসি।"

বৃদ্ধা একটু থামিল, পরে মাধুরীকে জিজ্ঞাসা করিল, "ভট্টাচার্য্যি কি নাতনীকে নিয়েই ভাগবত শুন্‌তে গেছেন? আহা হা, এমন ভাল মানুষের অদেষ্টে এমন কষ্ট লেখা ছিল! গুরু, গুরু, সকলই তোমার ইচ্ছা।"

যখন বৃদ্ধাটি কথা কহিতেছিল, তখন অপর স্ত্রীলোকগুলি মাধুরীর মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া ছিল। বৃদ্ধার সকল কথা মাধুরী বুঝিতে পারিতেছিল না। কাহার মন্দ ভাগ্যের কথা ভাবিয়া বৃদ্ধা ব্যথিত হইল, বুঝিতে পারিল না। তাহার মনে হইল, বোধ হয়, ইহারা বাড়ী ভুল করিয়া এই বাড়ীতে আসিয়াছে। মাধুরী জিজ্ঞাসা করিল, "আপনারা কোন্ ভট্টাচার্য্যির কথা বল্‌ছেন, বাড়ী ভুল করেন নি ত?"

বৃদ্ধা সন্ত্রস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এ পরাজের বিশ্বম্ভর ভট্টাচার্য্যের বাসা নয়? যে কোম্পানীর চাকুরী করত, এখন পেন্‌সিল নিয়ে বিধবা নাতনীকে নিয়ে কাশীবাস কর্‌ছে?"

মাধুরী বিধবা নাতনীর কথায় শিহরিয়া উঠিল, তাহার বুক দুরু দুরু করিতে লাগিল। মাধুরী বুঝিল, ইহারা ভুল করিয়াছে, অথচ

বিশ্বম্ভরের প্রকৃত পরিচয় ত ইহারা দিল! মাধুরী মূঢ়ের মত বসিয়া রহিল।

মাধুরীর কোন উত্তর না পাইয়া বৃদ্ধা আবার জিজ্ঞাসা করিল, "কেন গা, এ কি বিশ্বম্ভর ভট্টাচার্য্যের বাসা নয়?"

মাধুরীর বুকের মধ্যে ঢিপ ঢিপ করিতেছিল, রক্ত যেন দ্রুত তালে চলিতে চলিতে মাঝে মাঝে থামিয়া যাইতেছিল। ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনারা তাহার কোন্ নাতনীর কথা বলছেন?"

বৃদ্ধা বলিল, "ও মা, কোন্ নাত্‌নী আবার গো! ভট্টাচার্য্যির ত ঐ একই নাত্‌নী! তারই ত বুড়ো বড় সাধে বিয়ে দিয়েছিল, আমাদেরই গ্রামের মথুর চক্রবর্ত্তীর ছেলে বৈদ্যনাথের সঙ্গে। আহা, সে যেন হরগৌরীর মিলন গো, হরগৌরীর মিলন। ৫ বছরের ক'নে আর ১০ বছরের বর; কিন্তু বছরও ঘুরলো না গো, বছরও ঘুরলো না।" বৃদ্ধা দেখিল যে, মাধুরী মূর্চ্ছিতার মত পড়িয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে, তখনই সে চীৎকার করিয়া রাঁধুনীকে ডাকিতে লাগিল, "ওগো মেয়ে, তুমি শীগ্‌গির উপরে এসো, তোমাদের বৌএর বুঝি মূর্চ্ছার ব্যামো আছে, দেখ, কেমন কচ্ছে।"

চীৎকার শুনিয়া রাঁধুনী ছুটিয়া আসিল। আগন্তুক বৃদ্ধটি পোঁটলা হইতে একখানা কাপড় বাহির করিয়া তাহা বিছাইয়া এতক্ষণ নীচেই শুইয়া ঘুমাইতেছিল, তাহারও ঘুম ভাঙ্গিয়া গেলে সেও উপরে ছুটিয়া আসিল এবং তাহার বাক্যের স্রোত পুনরায় ছুটাইয়া দিল। মাধুরী অনেকটা প্রকৃতিস্থ হইলে রাঁধুনী বলিল, "কেন এমন হ'ল দিদি, এমন ত কখনও দেখিনি। বুড়োও গিয়েছে কখন, এখনও ফেরবার নাম নাই। দাদাবাবুকে ত সেই যে কি বলে টেলিগার না কি তাই ক'রে দিলে হয়।"

আগন্তুক বৃদ্ধ অত্যন্ত বিজ্ঞের মত বলিতে লাগিল, এই মূর্চ্ছা রোগের নাম হিষ্টিরিয়া, ইহাতে বিশেষ কোন ভয়ের কারণ নাই এবং চোখে-মুখে জলের ঝাপটা দিবার পরামর্শ দিয়া তাহার সঙ্গী স্ত্রীলোকদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিল, ইতোমধ্যে মধ্যবয়স্কা স্ত্রীলোক দুইটি তাহাদের নিজেদের মধ্যে চুপি চুপি কি বলাবলি করিতেছিল, মাধুরী একটু সুস্থ হইলে রাঁধুনীকে একটু আড়ালে ডাকিয়া লইয়া তাহার নিকট হইতে যাহা জানিল ও শুনিল, তাহাতে তাহারা সকলেই বিস্ময় ও ঘৃণায় স্তম্ভিত হইয়া গেল এবং মুহূর্ত্তেই তাহা বাড়ীময় রাষ্ট্র হইয়া গেল ও মাধুরীর জীবনের সমস্ত ওলট-পালট করিয়া দিল!

৬

মাধুরী বাল-বিধবা। পাঁচ বৎসর বয়সে তাহার যে বিবাহ হইয়াছিল, আজ মাধুরী তাহা জানিল। এই স্ত্রীলোক কয়টির মুখে বিশ্বম্ভরের যে মন্দভাগ্য নাত্‌নীর কথা শুনিল, সে যে মাধুরী, তাহা সে বুঝিল। কথা যখন রাষ্ট্র হইয়া পড়িল, আগন্তুক বৃদ্ধ যখন সকল কথা শুনিয়া এক দণ্ডও দাঁড়াইল না, এ বাড়ীতে জলস্পর্শ পর্য্যন্ত আর না করিয়া নানা রকম মন্তব্য প্রকাশ করিতে করিতে সঙ্গীদের লইয়া চলিয়া গেল, তখন মাধুরীর চিত্ত লজ্জায়, ক্ষোভে ও ঘৃণায় ক্ষতবিক্ষত হইতে লাগিল। তাহার মনে হইল, সমস্ত পৃথিবী তাহাকে প্রতারণা করিবার জন্য ষড়্‌যন্ত্র করিয়াছে, বিশ্বম্ভর তাহার সর্ব্বপ্রধান শত্রু, তিনিই তাহাকে এমন করিয়া অপমান করিলেন, জগতে তাহার মত ঘৃণিত জীব বোধ হয় আর কেহই নাই। তাহার মত হতভাগিনী নারী যে হিন্দুকুলে আর এক জনও নাই—ইহাই সে স্থির জানিল। এখন সে কি করিবে, কোথায় যাইবে ভাবিয়া পাইল না। সমস্ত পৃথিবী যেন তাহার কাছে শূন্য, মরুভূমি বলিয়া মনে হইতে লাগিল। কোথায়ও তাহার আশ্রয় নাই, সে সকলেরই পরিত্যক্তা, ঘৃণাভরে সকলেই তাহার দিক হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া লইতেছে এবং অসাক্ষাতে তাহার মন্দ ভাগ্য লইয়া পরিহাস করিতেছে, ইহাই মাধুরীর মনে হইতে লাগিল।

রাত্রি হইয়া গেল। মাধুরী বিছানায় শুইয়া উপুড় হইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। কতক্ষণ তাহার এই ভাবে কাটিল, তাহা সে জানিতে পারিল না। যখন বিশ্বম্ভর তাহার শিয়রের কাছে বসিয়া তাহার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে স্নিগ্ধ কণ্ঠে ডাকিলেন, "দিদি, দিদি," তখন অনেক রাত্রি হইয়া গিয়াছে। বিশ্বম্ভরের মুখের দিকে মাধুরী চাহিতে পারিল না। তাহার মন বিশ্বম্ভরের প্রতি ঘৃণায়, অভিমানে ও রোষে ভরিয়াছিল। সে যেমন শুইয়াছিল, তেমনই শুইয়া রহিল, কোন সাড়া দিল না। বিশ্বম্ভর অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া উঠিয়া গেলেন।

সমস্ত রাত্রি মাধুরী জাগিয়া কাটাইল। এখন সে কি করিবে, কি রকম আচরণ এখন তাহার পক্ষে শোভন হইবে, ইহাই সে চিন্তা করিতে লাগিল, কিন্তু কোন যুক্তিই তাহার মনোমত হইল না। অথচ এই রাত্রির মধ্যেই তাহাকে সমস্ত ঠিক করিয়া ফেলিতে হইবে। রাত্রির গোপন নীরবতার মধ্যেই সে তাহার নিজের সঙ্গে একটা বুঝাপড়া করিয়া লইতে চায়। দিনের আলোর সঙ্গে সঙ্গেই তাহার লাঞ্ছনা আরম্ভ হইবে, সমাজের শাসনকর্ত্তারা তাহার উপর বিচারে বসিবেন এবং প্রাণদণ্ডেরও অধিক যে শাস্তি, তাহাই তাহার জন্য নির্দ্ধারিত হইবে।

রাত্রি প্রভাত হইয়া গেল, কিন্তু মাধুরীর কর্ত্তব্য স্থির হইল না। সে ভয়ে ভয়ে ঘর হইতে বাহির হইল এবং নিঃশব্দে নীচে নামিয়া গেল। পাছে রাঁধুনীর সঙ্গে দেখা হয়, এই আশঙ্কায় রান্নাঘরের দিকে গেল না, কলতলায়ও না। কোথায় যাইতেছে, তাহার ঠিক নাই, অথচ তাহাকে একটা কিছু করিতে হইবে। তখনও রাত্রির অন্ধকার সম্পূর্ণরূপে কাটে নাই, রাস্তায় বেশী লোকচলাচল তখনও আরম্ভ হয় নাই, দেবালয়ে নহবতের বাজনা তখনও বাজিয়া উঠে নাই। মাধুরী ধীরে ধীরে দরজা খুলিয়া বাহির হইয়া পড়িল ও গঙ্গার রাস্তা ধরিয়া চলিল। দশাশ্বমেধঘাটে যখন পৌঁছিল, তখন ভোর হইয়া গিয়াছে। উষাস্নানার্থী দুই এক জন করিয়া স্নান করিতে আসিতেছে। গঙ্গার তরঙ্গ তখনও আলোড়িত হইয়া উঠে নাই। মাধুরী একটি নিভৃত সোপানে বসিল এবং গঙ্গায় যেমন ভোরের বাতাসে তরঙ্গের খেলা চলিতেছিল, মাধুরীর মনেও তেমনই চিন্তার তরঙ্গ খেলিতে লাগিল। হাতের শাঁখা ও সোনার বালা ও চুড়ির প্রতি দৃষ্টি পড়িতেই মাধুরী যেন সর্ব্বাঙ্গে ভীষণ জ্বালা অনুভব করিতে লাগিল। সেগুলি যেন আগুনের বেষ্টন হইয়া মাধুরীর সর্ব্বদেহ দগ্ধ করিতে লাগিল। ছি! ছি! কেন সে তাহার এই সাজসজ্জা লইয়া এখনও গঙ্গায় ডুবিয়া মরে নাই? তাহার প্রাণের মায়া কি এতই বেশী, সত্যই কি তবে সে দ্বিচারিণী? গঙ্গায় ডুবিয়া মরিলে ত হয়—ইহা মনে হইতেই মাধুরী যেন একটা মুক্তির পথের অনুসন্ধান পাইল। এতক্ষণ ইহা তাহার মনেই আইসে নাই। মাধুরীর প্রাণের ব্যথা অনেকটা হাল্কা হইয়া গেল। সে স্থির করিল, গঙ্গার এই শীতল জলে তাহার প্রাণের জ্বালা জুড়াইবে।

মাধুরী যেখানে বসিয়াছিল, সেখানে রৌদ্র আসিয়া পড়িয়াছে, ঘাটে স্নানার্থীর ভীড় আরম্ভ হইয়াছে। সহসা যেন তাহার ধ্যান-ভঙ্গ হইল এবং গঙ্গার ঘাটে সে কি করিয়া এত লোকের সম্মুখে বসিয়া আছে, ভাবিয়া লজ্জিত হইয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইতেই সম্মুখে বিশ্বম্ভরকে দেখিতে পাইল। দুই জনের কেহই কোন কথা না বলিয়া বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইল। যখন তাহারা বাড়ীতে প্রবেশ করিল, তখনও কেহ কাহাকে কোন কথা বলিল না।

মাধুরী এখন তাহার কর্ত্তব্য স্থির করিয়া ফেলিয়াছে, মুক্তির পথের অনুসন্ধান পাইয়াছে, এখন আর তাহার প্রাণে কোন গ্লানি নাই,

বিশ্বম্ভরের প্রতি কোন রোষ নাই। বিশ্বম্ভরের উপর এখন আর তাহার কোন অভিমান নাই, বরং এখন তাঁহার জন্য দুঃখ বোধ হইতেছে। এই বৃদ্ধ মাধুরীর সুখের জন্যই ত তাঁহার নিজের সংস্কারের মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছেন! এই ত্যাগ কি সাধারণ ত্যাগ! ইহার জন্য কি বৃদ্ধের হৃদয় ছিঁড়িয়া টুক্‌রা টুক্‌রা হইয়া যায় নাই? মাধুরী এখন বিশ্বম্ভরের পূর্ব্বের অনেক অবোধ্য আচরণ বুঝিতে পারিল। বুঝিল, বিধবা নাত্‌নীর আবার বিবাহ দিবেন কি না, ইহা স্থির করিতে তাঁহার প্রাণে কত দ্বন্দ্ব হইয়া গিয়াছে। এখন মাধুরী বেশ বুঝিতে পারিল, কেন বিশ্বম্ভর তাহার সঙ্গে বিধবা-বিবাহ ভাল কি মন্দ, ইহা লইয়া তর্ক করিতেন, কেন তিনি বিদ্যাসাগরের শাস্ত্রব্যাখ্যা বিচার করিতেন। এ সমস্তই ত তাহার মনকে দৃঢ় করিবার জন্য।

মাধুরীর নিজের মনে নূতন করিয়া দ্বন্দ্ব আরম্ভ হইল। প্রথম উত্তেজনার অবসানে যখন তাহার মন অনেকটা শান্ত ভাব ধারণ করিল, তখন তাহার মনে নানারূপ বিচার ও তর্ক উপস্থিত হইতে লাগিল। তাহার পুনরায় বিবাহ দিয়া বিশ্বম্ভর কি অন্যায় করিয়াছেন, তাহা বুঝিবার চেষ্টা করিল। ৫ বৎসর বয়সে—জ্ঞানের উন্মেষের পূর্ব্বেই বিবাহের নামে তাহাকে লইয়া যে ছেলেখেলা হইয়াছিল এবং যাহা ১ বৎসরের মধ্যেই ছেলেখেলার মতই ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, যাহার বিন্দুমাত্র স্মৃতিও তাহার মনে সামান্যমাত্রও রেখাপাত করিয়া যায় নাই এবং এত দিন পর্য্যন্ত যে ঘটনার আভাস পর্য্যন্তও সে কাহারও নিকট হইতে কখনও পায় নাই, তাহাই কি তাহার সমগ্র জীবন পূর্ণ করিয়া রাখিবে? শৈশবের এই ঘটনাটি কি সত্যেনের সঙ্গে তাহার মিলনকে কলুষিত করিয়া দিবে? সত্যেনের সঙ্গে তাহার বিবাহের বিরুদ্ধে কোন যুক্তিই মাধুরী পাইল না, তবুও তাহার মন বলিল, ইহার কোথায়ও দোষ রহিয়া গিয়াছে, যাহা সে ধরিতে পারিতেছে না। বুদ্ধি ও বিবেচনা তাহাকে ক্ষমা করিলেও তাহার সমস্ত সঞ্চিত সংস্কার এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া দাঁড়াইল। তবুও সত্যেনের প্রতি তাহার যে প্রেম, তাহা যে বৈধ নহে, অনাবিল নহে, তাহা ত মাধুরী কোনমতেই স্বীকার করিতে পারে না! অথচ সংস্কার বলিতেছে, সে প্রেমে তাহার অধিকার নাই, সে মিলনে তাহার মঙ্গল নাই। আবার তখনই তাহার প্রাণের অন্তস্তল হইতে প্রশ্ন হইতেছে, এই অধিকার হইতে সে বঞ্চিত হইবে কেন? তাহাদের মিলনে অমঙ্গল কোথায়?

যখন এই দ্বন্দ্ব বাড়িয়াই চলিতে লাগিল ও মাধুরী তাহার মনে কোন স্থির মীমাংসা খুঁজিয়া পাইল না, তখন হঠাৎ তাহার মনে হইল, বিশ্বম্ভরের এই কার্য্যে অন্য কাহারও ক্ষতি হউক বা না হউক, সত্যেনের প্রতি ঘোর অন্যায় করা হইয়াছে। বিশ্বম্ভর যে তাঁহাকে প্রতারণা করিয়াছেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। মাধুরী তখন বুঝিতে পারিল, এইখানেই তাহার পাপ। এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্য সে প্রস্তুত। সে সত্যেনের নিকট হইতে ইহার জন্য শাস্তি লইয়া স্বচ্ছন্দচিত্তে মরিবে। সত্যেনকে তাহার আপনার বলিবার অধিকার মাধুরীর আছে কি না, তাহার বিচার মাধুরীর মনে উদিত হইল না, কিন্তু এই ভুল ভাঙ্গিয়া গেলে যে সত্যেনের সঙ্গে তাহার সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে, ইহা ভাবিতে মাধুরীর অবোধ মন কাঁদিয়া উঠিল। সে অনেকক্ষণ ধরিয়া কাঁদিল, পরে কাগজ-কলম লইয়া সত্যেনকে চিঠি লিখিতে বসিল। কেমন করিয়া চিঠি আরম্ভ করিবে, কি লিখিবে, কোন কথাই গুছাইয়া মনে আসিল না। কি বলিয়া সম্বোধন করিবে, ইহা লইয়াই প্রথমে গোলে পড়িল। অনেক লিখিয়া ও কাটিয়া সে লিখিল,—

"দেবতা,

আজ আপনাকে যে নিদারুণ সংবাদ দিব, তাহা সহ্য করিবার শক্তি আপনার আছে বলিয়াই আপনাকে দেবতা বলিয়া সম্বোধন করিলাম। এই মন্দভাগিনী নারী যে কত বড় পাতকিনী, আপনার স্বর্গীয় প্রেম যে কিরূপ অপাত্রে অর্পিত হইয়াছিল, তাহা কি করিয়া বুঝাইয়া দিব?

আপনি এত দিন অমৃত বলিয়া গরল পান করিয়াছেন। আপনি যাহাকে আদর করিয়া স্বর্গের কুসুমের সঙ্গে তুলনা করিতেন, সে কুসুমে যে কত বড় বিষাক্ত কীট রহিয়াছে, তাহা আপনি জানিতেন না।

প্রভু, এক দিন আপনি আমাকে ভালবাসিয়াছিলেন, আজ আমি তার খুব বড় প্রতিদান দিব। শুনিয়াছি, প্রেমের স্পর্শে পাপী মুক্তি পায়। তবে কি আমিও মুক্তির আশা করিব? কিন্তু আমার পাপের ত প্রায়শ্চিত্ত নাই।

না, আপনাকে আর অধিকক্ষণ সংশয়ের মধ্যে রাখিব না। শুধু একটি কথা জিজ্ঞাসা করিব. তার পর—তার পর যে সংবাদ দিবার জন্য এই চিঠি লিখিতে বসিয়াছি, তাহা দিব।

বাসি-ঝরা ফুলে কি দেবতার পূজা হয়?. দেবতা-পূজার দুর্নিবার বাসনার সৌরভে ও রঙ্গে ভরিয়া পড়িয়াও যদি সে ফুল সুরভি ও রঙীন থাকে, তবুও কি সে দেবসেবার অযোগ্য?

আপনি ভয়ানকরূপে প্রতারিত হইয়াছেন। আপনি যাহাকে বিবাহ করিয়াছিলেন, সে বিধবা। সুতরাং সে দ্বিচারিণী, কলঙ্কিনী।"

চিঠি পাঠাইয়া দিয়া মাধুরী কাঁদিতে বসিল। এখন আর সত্যেন তাহার কেহ নহে। সে যে তাহার কেহ ছিল, ইহা ভাবিলেও তাহার পাপ! সে তাহার স্মৃতি-পূজা হইতেও বঞ্চিত। না,—না, তাহা কি হইতে পারে? ভাল-মন্দর বিচার কি এতই সহজ? মানুষের গড়া শৃঙ্খলই কি বিধাতার শাসন-যন্ত্র? মাধুরী যতই সত্যেনের চিন্তা মন হইতে দূর করিয়া দিতে চায়, ততই তাহার মনকে বেশী করিয়া অধিকার করিয়া বসে। মাধুরীর মন এইরূপে যুদ্ধ করিয়া ক্ষতবিক্ষত হইয়া অবসন্ন হইয়া পড়িল। সে স্থির করিল, আর মনের সঙ্গে যুদ্ধ করিবে না। সে যদি পাতকিনীই হইয়া থাকে, তবে তাহার অসংযত মন তাহার পাপের বোঝা আর কতই বাড়াইবে? সে তাহার পাপের জন্য চরম শাস্তি নির্দ্ধারিত করিয়া রাখিয়াছে, সুতরাং সে এখন মনের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা উপভোগ করিতে ভয় করে না।

মাধুরী তাহার শয়নঘরে প্রবেশ করিল। দরজা বন্ধ করিয়া তাহার হাতবাক্স খুলিল। সযত্নে রক্ষিত সত্যেনের লেখা চিঠিগুলি বাহির করিয়া তন্ময় হইয়া প্রত্যেকখানি পড়িল। তার পর সেগুলি বন্ধ করিয়া রাখিয়া নীচে নামিয়া গেল। বাগানে যাইয়া ফুলগাছ হইতে প্রত্যেকটি ফুল সযত্নে তুলিয়া আনিয়া ঘরে আসিয়া মালা গাঁথিল এবং প্রাচীরবিলম্বিত সত্যেনের ফটোখানিতে ফুলের মালা পরাইয়া তাহা বুকে চাপিয়া ধরিল। সে আজ কোন বাধা, নিয়ম মানিবে না। তাহার উন্মত্ত মন যাহা চায়, সে তাহাই তাহাকে দিবে। তাহার মনে হইল, এই বিশ্বে সত্যেন ও মাধুরী ছাড়া, আর কেহ নাই।

এই ধ্যান যখন ভাঙ্গিল, তখন মাধুরীর চিত্ত আশায় আশঙ্কায় দুলিতে লাগিল। আজ সকালের ডাকে দেওয়া চিঠি কালই ভোরে তাঁহার নিকট পাটনায় পৌঁছিবে এবং কালই তিনি চিঠি লিখিলে সে চিঠি পরশু সকালে সে পাইবে। সে চিঠি কি তাহার জন্য মৃত্যুদণ্ড বহন করিয়া আনিবে না?

আশায় আশঙ্কায় মাধুরীর দিন যাইতে লাগিল। আজ তাহার সত্যেনের নিকট হইতে চিঠি পাইবার দিন। কিন্তু যদি সত্যেন আর তাহাকে চিঠি না লেখে? এ আশঙ্কা ত মাধুরীর মনে একবারও হয় নাই। সে যে নির্দ্দিষ্ট দিনে চিঠি পাইবেই, ইহাই স্থির জানিত, কিন্তু নির্দ্দিষ্ট দিন উপস্থিত হইলে তাহার এই দৃঢ় বিশ্বাস শিথিল হইতে লাগিল। ঠিকই ত, সত্যেন আর তাহাকে চিঠি লিখিবে কেন?

মাধুরী আর কোন্ অধিকারে সত্যেনের কাছে চিঠির দাবী করিবে? মাধুরীর চিত্ত যখন নিরাশায় ছাইয়া যাইতে লাগিল, তখন বাহির-দরজার কড়া নাড়িয়া ভগবানের দূতের মত পিয়ন হাঁকল—"চিঠি।" মাধুরী যেখানে বসিয়া ছিল, নিশ্বাস রুদ্ধ করিয়া সেইখানেই বসিয়া রহিল; শুনিতে পাইল, রাঁধুনী দরজা খুলিয়া চিঠি লইল ও উপরে উঠিয়া বিশ্বম্ভরের ঘরে প্রবেশ করিল। বিশ্বম্ভরের সঙ্গে কি কথা হইল, পরে রাঁধুনীর পায়ের শব্দ ক্রমশঃ নিকটে শুনা যাইতে লাগিল এবং একটু পরেই খোলা জানালার ভিতর দিয়া একখানি খামের চিঠি মাধুরীর কোলের কাছে আসিয়া পড়িল। মাধুরীর মনে হইল, পিয়নের হাত হইতে তাহার নিকট চিঠি পৌঁছিতে এক যুগ কাটিয়া গিয়াছে। চিঠিখানা মাথায় ঠেকাইয়া সে বুকে চাপিয়া ধরিল। পরে শিরোনামার প্রত্যেকটি অক্ষর যত্নের সহিত পড়িয়া কম্পিত হস্তে চিঠিখানি খুলিয়া ফেলিল। বুক দুরু দুরু করিতে লাগিল, অশ্রুর পর্দা আসিয়া চোখের দৃষ্টি ঝাপসা করিয়া দিল, যাহা পড়িল, তাহারও সম্পূর্ণ অর্থবোধ হইল না, যাহাও অর্থবোধ হইল, তাহাও বিশ্বাস করিবার সাহস হইতেছিল না। সত্যেন লিখিয়াছে,—

"কল্যাণীয়াসু,

মাধুরী, আজ আমার জীবনের পরিপূর্ণ আনন্দের দিন। এই শুভদিনের প্রতীক্ষায় আমি অধীর হইয়াছিলাম। আমাদের মিলনকে ব্যর্থ করিয়া দিতে পারে, এমন শক্তি কি কাহারও আছে? অর্থহীন সংস্কারের রক্তচক্ষু দেখিয়া আমরা কি ভগবানের দানকে অবহেলা করিব? বিবেকবুদ্ধিতে যাহা সুন্দর, তাহা কি লাঞ্ছিত হইবার যোগ্য? মাধুরী, তোমার মধ্যে যে দেবতা রহিয়াছেন, তাঁহাকে বিচার-আসনে বসাইয়া ভালমন্দর বিচার করিও। যাহা সত্য, তাহাই শিব; মঙ্গল হইতে অমঙ্গলের আশঙ্কা কোথায়?

আমি প্রতারিত হই নাই। যথাসময়ে ক্ষমাভিক্ষা করিয়া লইব, এই ভরসাতে আমরাই তোমাকে প্রতারিত করিয়াছি। এ বিবাহে প্রথমে ঠাকুরদাদার আদৌ মত ছিল না—আমিই তাঁহাকে সম্মত করাইয়াছিলাম। এ বিবাহে আমাদের প্রাণের দেবতা কখনই ক্ষুণ্ন হন নাই—আমাদের প্রেমের মিলনে তাঁহারই জয় ঘোষিত হইয়াছে।

আমি কা'ল কাশী পৌঁছিব। তোমার প্রশ্নের যদি উত্তর চাও, তখন দিব। অজ্ঞান শিশুর বৈধব্য হইতে যুবতীর বৈধব্যের পার্থক্য কোথায়, যদি বুঝিয়া না থাক, তাহাও বুঝাইয়া দিব।

আশীর্ব্বাদক
সত্যেন।"

মাধুরী বার বার চিঠি পড়িল। সকল কথা বুঝিল না, যাহা বুঝিল, তাহাতেই তাহার হৃদয়-মন পুলকে ভরিয়া গেল। মনের কোন কোণে কোন ব্যথা রহিল না। তাহার অন্তরের নিভৃত প্রান্ত হইতে ধ্বনিত হইতে লাগিল, "তুমি আমার-ই, তুমি আমার-ই,মম শূন্য গগনবিহারী।"

প্রেমপুলকিত চিত্তে সত্যেনের ফটোর সম্মুখে তাহার চিঠিখানি রাখিয়া গলায় অঞ্চল জড়াইয়া মাধুরী তাহার সমস্ত অন্তঃকরণ দিয়া যখন প্রণাম করিল, তখন খোলা জানালার মধ্য দিয়া মূর্ত্তিমান্ আশীর্ব্বাদের মত মাধুরীর মাথার উপর রৌদ্র আসিয়া পড়িল ও তাহার সীমন্তের সিন্দুররেখা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

শ্রীদিগিন্দ্রনাথ মজুমদার (অধ্যাপক)।

ফুলের মূল্য

"ফুলটা না কি ভালবাসো বড়—
এনেছি তাই ফুল-শয্যার ফুল,
এর লাগি কি দিতে তুমি পার?
এমন কুসুম পরশ-তৃষাকুল!"

"আমি আজি ইহার লাগি শুধু"—
কহিল প্রেমিক মুখে মধুর হাসি,—
"চুম্বন এক দিতে পারি মধু-
ভরা যাহায় আদর সোহাগরাশি!"

"হেথায় আছে ফুল ষোড়শীর
প্রিয়ের আশে খোঁপায় গুঁজে রাখা,
এর লাগি কি দিতে পার বীর?"
"একবারটি দিতে পারি দেখা!"

"হোথায় দেখ আছে দেবের পায়ে
ভক্তিভরে অর্ঘ্য দেওয়ার ফুল,
দিতে পার কি তার বিনিময়ে
হবে যাহা তাহার সমতুল?"

নম্র প্রেমিক কহিল "দিতে পারি
পবিত্র এই ফুলকে দেবতার
কায়মন মোর এক সকলি করি
প্রাণের আমার একটি নমস্কার!"

"এ ফুল প্রিয়ের শেষ সমাধির,—
আজকে দেখ এই শেষ মোর দান—"
কহিল প্রেমিক আবেগ-অধীর—
"এর লাগি মোর দিতে পারি প্রাণ!"

শ্রীবিজয়মাধব মণ্ডল।

দেবোত্তর আইন

শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ খইতান হিন্দু দেবোত্তর আইনের সংশোধন প্রার্থনা করিয়া কাউন্সিলে এক প্রস্তাব উপস্থাপিত করিয়াছেন। এই প্রস্তাব যদি আইনে পরিণত হয়, তাহা হইলে হিন্দু দেবোত্তর সম্পত্তির তত্ত্বাবধানের ভার যে কতকাংশে সরকারের হস্তে ন্যস্ত হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে সুখের বিষয়, প্রস্তাবক ব্যবস্থাপক সভার গত ৯ই ডিসেম্বরের অধিবেশনে তাঁহার প্রস্তাবের বিপক্ষে প্রতিবাদের গুরুত্ব বুঝিয়া আপাততঃ প্রস্তাব তুলিয়া লইয়াছেন। তবে আগামী জানুয়ারীর অধিবেশনে কাউন্সিলকে নোটিশ দিয়া প্রস্তাব পুনরায় পেশ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন।

হিন্দুতীর্থ ও মঠের অধিকারী পাণ্ডা ও অধিকারিগণ কোন কোন স্থলে তাঁহাদের অধিকার ও ক্ষমতার যে অপব্যবহার করিয়াছেন, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। আমাদের এই বাঙ্গালার তারকেশ্বরের মন্দিরের মোহান্ত সতীশগিরি নানা অনাচারের অভিযোগে হিন্দু জনসাধারণের দরবারে অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বেও মোহান্ত মাধবগিরির আমলে বহু অনাচার ও অত্যাচার-অসদ্ব্যবহারের অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছিল। সতীশগিরির আমলে অনাচারের বিপক্ষে সত্যাগ্রহ আন্দোলন হইয়াছিল, ফলে অন্যূন এক সহস্র বাঙ্গালী যুবক এ জন্য কারাবরণ করিয়াছিল এবং পাঁচ ছয় জন মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল।

তীর্থ ও মঠে এরূপ অনাচার অনুষ্ঠিত না হয়, তাহারই জন্য এই আইনের পাণ্ডুলিপি উপস্থাপিত করা হইয়াছে। এমন বিল নূতন নহে। আনন্দ চার্লুর বিলের সময় হইতে এ যাবৎ এমন বিলের আয়োজন চলিয়া আসিতেছে। হিন্দু জনসাধারণের পক্ষ হইতে এই বিলের পক্ষে ও বিপক্ষে অনেক কথা বলিবার আছে।

যাঁহারা বিলের পক্ষপাতী, তাঁহারা বলেন, অনাচারী মোহান্তরা এতই ক্ষমতাশালী ও এতই ধনী যে, তাঁহাদের অনাচার নিবারণে জনসাধারণ কিছুই করিয়া উঠিতে পারে না। সঙ্ঘবদ্ধভাবে কায করাও সকল ক্ষেত্রে সম্ভবপর হইয়া উঠে না। অথচ অনাচারনিবারণ করাও বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে, নতুবা দেবস্থানসমূহ কলুষিত ও অপবিত্র হইয়া উঠিবে, লোক আর তীর্থস্থানে যাইতে চাহিবে না। মঠাধিকারী সন্ন্যাসী-মোহান্তের ভোগবিলাসের চরম হইয়াছে। হিন্দু জনসাধারণের ভক্তিদত্ত দেবপূজার অর্থে তাহারা দেবতার পূজারাধনার সুবন্দোবস্ত যত না করুক, আপনাদের বিলাসলালসা চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত সেই অর্থ নিয়োজিত করিতে সর্ব্বদা যত্নবান্। তাহাদের হস্তী, অশ্ব, যান-বাহন, আহারবিহার, কামক্রীড়া ইত্যাদি রাজা-মহারাজার ভোগবিলাসকে অতিক্রম করিয়াছে। দেবতার অর্থে তাহারা সাধারণের হিতকর কোনও কার্য্যের অনুষ্ঠান করে না— যাত্রীদিগের উপর পীড়ন করা ছাড়া তাহারা তাহাদের বসবাসের ও পূজারাধনার কোনও সুযোগ করিয়া দেয় না। যখন এই অনাচারস্রোতনিবারণে হিন্দু জনসাধারণের সঙ্ঘবদ্ধভাবে কোনও প্রতীকারোপায় নির্ণয় করা সহজসাধ্য হইতেছে না, তখন সরকারের সাহায্য লইয়া কাউন্সিলের মধ্য দিয়া এমন আইন বিধিবদ্ধ করিয়া লওয়া কর্ত্তব্য, যাহাতে ভবিষ্যতে এই ভাবের অনাচার ও অন্যায় অনুষ্ঠিত হইতে না পারে।

এ যুক্তির সারবত্তা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। তীর্থস্থানের অনাচার দূর হয়, ইহা কোন্ হিন্দুর কামনা নহে? কিন্তু অপর পক্ষেও অনেক কথা বলিবার আছে। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণাপত্রে বলা হইয়াছিল যে, এ দেশের লোকের ধর্ম্মে সরকার কখনও হস্তক্ষেপ করিবেন না, যে যাহার ধর্ম্মকর্ম্ম নির্ব্বিঘ্নে বিনা বাধায় সম্পন্ন করিতে পাইবে। সরকার কাহারও ধর্ম্মে কোনরূপ কর্ত্তৃত্বাধিকার গ্রহণ করিবেন না। এই

ঘোষণা এ দেশের 'ম্যাগ্নাকার্টা' বলিয়া অভিহিত হয়। সুতরাং সরকারের মারফতে আমাদের ধর্ম্মের সম্পর্কে কোনওরূপ আইনের কড়াকড়ি করাইয়া লইলে আমাদিগকেই স্বেচ্ছায় এই অধিকার হইতে বঞ্চিত হইতে হইবে। ইহা কোনওরূপেই বাঞ্ছনীয় হইতে পারে না। আমাদের অন্য কোনওরূপ স্বাধীনতা থাকুক বা নাই থাকুক, ধর্ম্মগত স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখা চাই-ই।

হিন্দুর ধর্ম্মের আদর্শ ও সনাতন ধর্ম্মকর্ম্ম অক্ষুণ্ণ রাখিবার নিমিত্ত তীর্থ ও মঠাদির প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। এই সকল মন্দির ও মঠের প্রতিষ্ঠা, অস্তিত্ব ও পুষ্টিবিধানের জন্য দেবোত্তর অর্থ ও সম্পত্তি নিয়োজিত হইয়াছিল। ধার্ম্মিক ধনকুবেরগণের দানের অর্থ ও সম্পত্তি, মঠ ও মন্দির প্রতিষ্ঠার ভিত্তি এবং জনসাধারণের পূজা মানসিক ইহাদের অস্তিত্ব ও পুষ্টিসাধনে সহায়তা করিয়া থাকে। দানের ও পূজার প্রথম অবস্থা হইতেই নিয়ম হইয়াছিল যে, মঠাধিকারীরা সর্ব্ববিধ বিলাসলালসা বর্জ্জন করিয়া সংযমী সন্ন্যাসীর ন্যায় বাস করিবেন। এখন মঠাধিকারী যদি সে নিয়মের ব্যতিক্রম করেন, তাহা হইলে হিন্দু ধার্ম্মিক ধনকুবেরদিগের বংশধররা এবং হিন্দু জনসাধারণ সঙ্ঘবদ্ধভাবে সেই অনাচার দূর করিবেন।

শঙ্করাচার্য্য ধর্ম্মগত আইন-কানুন করিয়া গিয়াছিলেন যে, মঠাধিকারী ও মোহান্তদিগের পদ চিরস্থায়ী হইবে না। গুণ-বিচার করিয়া মোহান্ত নিয়োগ করা হইবে। অদ্যাপি মঠাধিকারী বা মোহান্তদিগের মধ্যে এই নিয়ম পালিত হইয়া আসিতেছে। তবে কি জন্য অনাচারনিবারণে সরকারের সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে?

সন্ন্যাসী, মোহান্ত বা মঠাধিকারীর দুইটি অধিকার আছে। ক্ষুধা পাইলে তিনি আহার্য্য চাহিতে পারেন, এবং পীড়া হইলে চিকিৎসা ও ঔষধ দাবী করিতে পারেন। গৃহস্থদিগের কর্ত্তব্য, মোহান্ত-সন্ন্যাসীদিগের এই অভাব দূর করা। তাহার অধিক অধিকার তাঁহারা সন্ন্যাসীদিগকে দিতে আইনতঃ বাধ্য নহেন। সন্ন্যাসীর নিজস্ব বলিয়া কোনও সম্পত্তি থাকিতে পারে না। এ কথা গোবর্দ্ধন মঠের মোহান্ত স্বয়ং শঙ্করাচার্য্যজী স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং যত দিন মোহান্ত ও মঠাধিকারীরা দেবতার সম্পত্তির এই ভাবে তত্ত্বাবধান করেন, তত দিন তাঁহারা স্বপদে থাকিবার যোগ্য, অন্যথা নহেন। তাঁহাদের শারীরিক বা মানসিক অবনতি ঘটিলেই তাঁহারা অপর যোগ্য সন্ন্যাসীকে মঠের বা মন্দিরের ভার দিতে বাধ্য। এ বিষয়ে হিন্দু জনসাধারণ তাঁহাদিগকে বাধ্য করিতে পারে, ইহাই শ্রীশঙ্করাচার্য্য-প্রবর্ত্তিত মঠ ও মন্দিরের নিয়ম, ইহাতে সরকারের হস্তক্ষেপ কখনই বাঞ্ছনীয় হইতে পারে না, এ কথা গোবর্দ্ধন মঠের শঙ্করাচার্য্যজী বলিয়াছেন। কিন্তু কিরূপে হিন্দু জনসাধারণ প্রবল শক্তিশালী মোহান্ত ও মঠাধিকারীদিগকে মঠ ও মন্দিরের আইন মানিতে বাধ্য করিবে, ইহাই হইল সমস্যা। গোবর্দ্ধন মঠের শঙ্করাচার্য্যজী বলেন, এ জন্য হিন্দু জনসাধারণের পক্ষ হইতে এক কমিটী গঠন করা আবশ্যক, উহার নাম হইবে "সাম্প্রদায়িক কমিটী।" কমিটী যদি হিন্দু জনসাধারণের যথার্থ মঙ্গল চিন্তা করিয়া কায়মনে কার্য্য করেন, তাহা হইলে হিন্দু জনমত তাঁহাদিগকে নিশ্চিত সমর্থন করিয়া অচিরকালমধ্যে বলশালী করিয়া তুলিতে সমর্থ হইবে। এ জন্য জনসাধারণের মধ্যে প্রচারকার্য্যেরও বিশেষ আবশ্যক। একবার জনমত জাগ্রত হইলে এবং 'সাম্প্রদায়িক কমিটী' ক্ষমতাশালী হইলে মোহান্ত ও মঠাধিকারীরা সরকারের আদালতে না গিয়া 'ধার্ম্মিক প্রজার' দরবারে আসিতে বাধ্য হইবে।

বস্তুতঃ কথাটা ভাবিয়া দেখিবার। আমাদের নিজের হস্তে প্রতীকারের উপায় থাকিতে পরের দ্বারস্থ হইবার প্রয়োজন কি? জনমত জাগ্রত হইলে যে প্রবল শক্তিশালী মোহান্তেরও আসন টলাইয়া দিতে পারে, তাহার পরিচয় তারকেশ্বরে পাওয়া গিয়াছে। ভাইকম সত্যাগ্রহের ফলেও ত্রিবাঙ্কুরে রাজসিংহাসন পর্য্যন্ত কম্পিত হইয়াছে, পরন্তু আকালী শিখের আন্দোলনে বৃটিশ ব্যুরোক্রেশীকেও মতপরিবর্ত্তন করিতে হইয়াছে। চাই কেবল সঙ্ঘবদ্ধতা, একাগ্রতা, সহনক্ষমতা এবং মতের দৃঢ়তা। সে সদ্গুণরাশির সম্মিলিত স্রোতে সকল বাধাবিঘ্নই ভাসিয়া যাইবে।

হিন্দু-সমাজে নির্য্যাতিতা নারী

বাঙ্গালা দেশে—বিশেষতঃ পূর্ব্ববঙ্গে নারী-নির্য্যাতন ম্যালেরিয়া, কালাজ্বরের মত একটা বিষম রোগে পরিণত

হইয়াছে, অবস্থাভিজ্ঞমাত্রই ইহা বিদিত আছেন। এ রোগের নিদান ও প্রতীকার বা প্রতিবেধব্যবস্থা সম্বন্ধে নারী-রক্ষা-সমিতি যথেষ্ট শ্রম ও অর্থব্যয় স্বীকার করিয়া গবেষণা করিয়াছেন। উহাতে জানা যায়, অর্থ-কষ্ট বা আশ্রয়ের অভাবই ইহার মূল কারণ, তাহার উপর পিশাচপ্রকৃতির লম্পট দুর্ব্বৃত্তের কামলালসাও ইহার অন্যতম কারণ। এই দুই কারণের জড় মারিতে হইলে সমাজের জাগরণ ও শাসন অতীব প্রয়োজনীয়। হিন্দু-সমাজ অসাড় অজগরের মত পড়িয়া আছে। সে সমাজের জাগরণ সর্ব্বপ্রথমেই আবশ্যক। যাহাতে আশ্রয়হীনা নারী পরের গলগ্রহ হইয়া পীড়ন ও অত্যাচার সহ্য করিয়া উদরান্নসংস্থানে বাধ্য না হয়,—কোনওরূপ কায়িক শ্রমে আপন উদরান্ন সংস্থান করিতে পারে, সমাজের সেই ব্যবস্থা করা উচিত। পরন্তু নিপীড়িতা নির্দ্দোষ নারীকে সমাজে স্থান দিতে হইবে। হিন্দুসমাজের এখন ইহাই প্রথম ও প্রধান সামাজিক কর্ত্তব্য। মুসলমান সমাজকেও অত্যাচারী কামুক মুসলমানদিগের সামাজিক দণ্ডবিধানের ব্যবস্থা করিতে হইবে। সকল সমাজেই এরূপ দুর্ব্বৃত্তের অসদ্ভাব নাই, এ কথা সত্য। কিন্তু বাঙ্গালায় যে সমস্ত নারী-নির্য্যাতন হইয়াছে, তাহাতে অপরাধী দুর্ব্বৃত্তের মধ্যে মুসলমানের সংখ্যাই অধিক। এই হেতু মুসলমান-সমাজকে এ বিষয়ে দণ্ডবিধানে অবহিত হইতে হইবে। যাহাতে এরূপ দুর্ব্বৃত্ত পশুপ্রকৃতির লোক সমাজে ঘৃণা ও অবজ্ঞার পাত্র হইয়া থাকে, তাহার জন্য হিন্দু ও মুসলমান উভয় সমাজ-কেই সচেষ্ট হইতে হইবে। মাতৃজাতির অমর্য্যাদায় জাতি উৎসন্নের পথে অগ্রসর হয়। এ কথাটা অনুক্ষণ বাঙ্গালী হিন্দু-মুসলমানকে স্মরণ রাখিতে হইবে।

এই যে গাইবান্ধার মোক্তারের কন্যা অভাগী সুহাসিনী হিন্দু গৃহস্থের কুলবধূ হইয়াও কয়জন দুর্ব্বৃত্ত কামুক মুসলমানের পাপচক্ষুতে পড়িয়া লাঞ্ছিতা ও অবমানিতা হইল, শেষে স্বামী ও শ্বশুরের গৃহে সমাদরে গৃহীতা হইয়াও নির্ম্মম নিষ্ঠুর সমাজের নিকট অস্পৃশ্য হইয়া রহিল, ইহার জন্য দায়ী কে? প্রথম মুসলমান-সমাজ, দ্বিতীয় হিন্দু-সমাজ। মুসলমান দুর্ব্বৃত্তগণ তাহার সতীত্বনাশের জন্য তাহাকে নানা প্রকারে নির্য্যাতন করিয়াছিল। হতভাগীর পিতা বহু কষ্টে তাহার উদ্ধারসাধন করেন। এ বিষয়ে বাঙ্গালী মুসলমান-সমাজের কি কোনও কর্ত্তব্য নাই? আমাদের বিশ্বাস, ভদ্র শিক্ষিত ধর্ম্মভীরু মুসলমানমাত্রই এই ব্যাপারে ক্ষুব্ধ, ব্যথিত ও লজ্জিত হইয়াছেন। তাঁহারাও গৃহস্থ, পুত্র-কলত্র লইয়া বাস করেন, তাঁহারাও মাতৃজাতির সম্মান করিয়া থাকেন। তাঁহারা যদি এই দুর্ব্বৃত্ত পিশাচ-প্রকৃতির স্বধর্ম্মীদিগের ব্যবহারের তীব্র প্রতিবাদ করেন, তাহাদের সামাজিক দণ্ডের ব্যবস্থা করেন, তাহা হইলে ভবিষ্যতে বহু মঙ্গল সাধিত হইতে পারে। সামাজিক শাসনের ভয় থাকিলে দুর্ব্বৃত্তরা ভবিষ্যতে পাপপ্রবৃত্তি দমন করিতে সচেষ্ট থাকিবে। নতুবা শত আদালতের কারাদণ্ডে এই বিষম ব্যাধি যাইবার নহে।

আর হিন্দুসমাজকে কি বলিতে ইচ্ছা করে? গত ৬ই অগ্রহায়ণ সুহাসিনী ময়মনসিংহ মুক্তাগাছায় শ্বশুরা-লয়ে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছে। সে যে এই অধঃ-পতিত সমাজের সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত হইয়া সকল জ্বালাযন্ত্রণা, অপবাদ, কলঙ্কের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিচারালয়ের আশ্রয় লাভ করিয়াছে, ইহাই একমাত্র সান্ত্বনা!

সুহাসিনীকে তাহার স্বামী পুনরায় গ্রহণ করিয়াছিল। তাহার শ্বশুরও তাহাকে পুত্রবধূরূপে অন্তঃপুরে স্থান দান করিয়াছিলেন। কিন্তু যে হিন্দুসমাজ উচ্ছৃঙ্খল, সুরাপায়ী, বারবনিতাবিলাসীর কোনও দণ্ডের ব্যবস্থা করে না, সেই সমাজ অভাগী সুহাসিনীকে তাহার অঙ্কে স্থান দেয় নাই। ইহা কি সামান্য মর্ম্মপীড়া ও মনোদুঃখের কারণ! তাহার স্বামী ও শ্বশুর তাহারই জন্য সমাজে 'অচল', এ বেদনা তাহার বুকে বড়ই বাজিয়াছিল। তাই সে দিন দিন শুকাইয়া গিয়া অকালে ইহলোক ত্যাগ করিল। এ নারীহত্যার জন্য দায়ী কে?

মৃত্যুর কয়েক দিন পূর্ব্বে সুহাসিনী নারীরক্ষা-সমিতির শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয়কে লিখিয়াছিল :—

"নিবেদন এই যে, পিতা ভগবান্ আমাকে স্বামীর সংসারে আনিয়াছেন, উপলক্ষ আপনারাই। আপ-নারা যে উপকার করিয়াছেন, তাহা জীবনে বিস্মৃত

হইবার নহে। এখানে আসার পরে শ্বশুরের কায গিয়াছে। তাঁহাকে একঘরে করিয়াছে এবং এইরূপ হইয়াছে যে. জীবনে আমার সমাজে উঠিবার সম্ভাবনা নাই। ইঁহারা আমার হাতে খায়েন নাই, খাইলে কি হইত. জানি না। ভগবানের সৃষ্টির মধ্যে আমার মত হতভাগী দ্বিতীয়া আছে কি না সন্দেহ। এখন ইঁহাদের এমন অবস্থা যে, না খাইয়া মরিবার উপক্রম। সংসারে এক তিল শান্তি নাই। এখন আমার ইচ্ছা যে, কোন আশ্রমে আমার জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলি কাটাইয়া দিই। ইহা আমার প্রাণের একান্ত বাসনা। আপনার কি মত জানাইবেন। যদি ভাল বুঝেন, আমার স্বামীর দ্বারা কিংবা আপনি নিজে আমাকে লইয়া যাইবেন। পত্র পাওয়ামাত্র অভিমত জানাইবেন।"

অভাগী সুহাসিনী! এই নির্য্যাতিতা বালিকা কি মনোদুঃখ পাইয়া ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছে, তাহা পত্রের ছত্রে ছত্রে প্রকাশ। ধন্য হিন্দুসমাজ! ধন্য তোমার ন্যায়বিচার! এই বালিকার প্রতি রক্তবিন্দু কি ন্যায্য বিচারের জন্য লোকেশ্বরের দরবারে বিচারপ্রার্থী হইবে না? হিন্দু-সমাজ! তুমি অচল হিমাচলের মত গর্ব্বোন্নত শির আকাশে তুলিয়া দাঁড়াইয়া থাক, তোমার পাদমূলে নগণ্য ক্ষুদ্র তটিনী তোমার করুণা-বারির অভাবে শুকাইয়া যাউক, তাহাতে ক্ষতি কি? তোমার যুগযুগ-সঞ্চিত সংস্কারের বিরাট আবর্জ্জনা-স্তূপ কোমলা অনাদৃতা বালিকার রক্তসিক্ত উদ্ভিন্ন হৃৎপিণ্ড যুগান্ত পর্য্যন্ত আবরণ করিয়া থাকিবে, সন্দেহ কি?

কুলীর মৃত্যু

এ দেশের শ্বেতাঙ্গের হস্তে কৃষ্ণাঙ্গের মৃত্যু এবং ফলে শ্বেতাঙ্গের বিচারে অব্যাহতির ঘটনা বিরল নহে। ফুলার মিনিটের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া শুকুরমণির মামলা, সপ্তদশ ল্যান্সারের গোরা সৈনিকের মামলা, মুলিগানের মামলা, আগরার মামলা, জব্বলপুরের মামলা, হংস শিকারের মামলা, বৈরাগীর মামলা,—এমন কত মামলার উল্লেখ করা যাইতে পারে। আমাদের কথা নহে, স্বয়ং বড় লাট লর্ড রেডিং ১৯২১ খৃষ্টাব্দে বলিয়াছিলেন,—

"আমার বিশ্বাস, সময় সময় য়ুরোপীয়রা ভারতীয়দিগের প্রতি যে অনিষ্টাচার ও অত্যাচার-অনাচার করে, জাতিবিদ্বেষের তাহা অন্যতম কারণ। এ সমস্ত অত্যাচার-অনাচারঘটিত মামলার বিচার সর্ব্বক্ষেত্রে যে সন্তোষজনক হয় না, তাহাও অস্বীকার করা যায় না। ভারতীয়দের বিশ্বাস, এই ভাবের কৃষ্ণাঙ্গ-শ্বেতাঙ্গ মামলায় সকল সময়ে সুবিচার হয় না।"

যাহাতে ভবিষ্যতে এমন অনাচার ও অবিচার না হয়, তাহার ব্যবস্থা করিবেন বলিয়া লর্ড রেডিং সে সময়ে আশ্বাসও দিয়াছিলেন।

কিন্তু সে আশ্বাসপ্রদানে কি ফল হইয়াছে? সম্প্রতি আসাম জোড়হাট অঞ্চলে তেলু নামক চা-বাগিচার এক ভারতীয় কুলীকে পথিপার্শ্বে মৃত অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে দেখা যায়। তাহার অঙ্গে আঘাতের চিহ্ন ছিল। পুলিস-তদন্তের ফলে ওথা চাবাগানের ম্যানেজার মিঃ বিয়েটী এই কুলীর হত্যাব্যাপারে অপরাধিরূপে অভিযুক্ত হয়েন। দায়রার জজ মিঃ জ্যাক ৫ জন জুরীকে লইয়া বিচারে বসেন। বিচারে আসামী বে-কসুর খালাস পাইয়াছে।

বিচারকালে প্রকাশ পাইয়াছে যে, তেলু পূর্ব্বে আসামীর বাগিচায় স্ত্রীপুত্র লইয়া চাকুরী করিত। তাহার স্ত্রীকে প্রহার করিয়াছিল, সে বিয়েটীর নামে এই অভিযোগ আনয়ন করিয়াছিল। তৎপরে সে অন্য বাগানে কায করিতে চলিয়া যায়। আসামী তাহার উপর প্রসন্ন ছিল না, তাহাকে তাহার বাগানে আসিতে দিত না। ঘটনার দিন তাহার বাগানের এলাকায় তেলু প্রবেশ করিয়াছে শুনিয়া সে স্বয়ং তেলুকে তাড়াইয়া দিতে যায়। তাহার নিজের কথায় প্রকাশ, সে তেলুকে চলিয়া যাইতে বলে, তেলু যাইতে চাহে নাই; তাহার পর উভয়ে বচসা হয়। সে তখন তেলুর হাত হইতে ছড়ি কাড়িয়া লইতে তেলু পড়িয়া যায়। সে তেলুর হাত ধরিয়া তুলিয়া আবার চলিয়া যাইতে বলে। তেলু অতঃপর সরকারী রাস্তায় যাইয়া জামা-চাদর ফেলিয়া

ছুটিয়া পলাইয়া যায়। সে কি করিতেছে, দেখিতে গিয়া বিয়েটী দেখিতে পায়, সে ছুটিয়া আবার সরকারী রাস্তায় গিয়াছে ও নালা ডিঙ্গাইবার সময় মুখ থুবড়িয়া পড়িয়া গিয়াছে। বিয়েটী তাহাকে ধরিয়া উঠায় ও বাড়ী যাইতে বলে। কিন্তু তেলু আবার পড়িয়া যায়।

এ বর্ণনার অসঙ্গতি স্বতঃই প্রতিপন্ন হয়। তাহার বিশ্লেষণ অনাবশ্যক। তাহার পর জোড়হাটের সিবিল সার্জ্জন তেলুর শব পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছেন :—

"তেলুর দেহে প্রায় অর্দ্ধ ইঞ্চ দীর্ঘ একটা থেঁতলান চিহ্ন ছিল। তদ্ভিন্ন বক্ষের উপর ও উভয় হাঁটুর নিম্নে আঘাতজনিত ক্ষতচিহ্ন দেখা গিয়াছিল। পঞ্জরের পঞ্চম অস্থিখানি ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল এবং প্লীহা ফাটিয়া যাওয়ায় ও সে জন্য উদরমধ্যে রক্ত সঞ্চিত হওয়ায় তাহার মৃত্যু হইয়াছিল। সে যখন ভূপতিত ছিল, সেই সময় কেহ তাহাকে সজোরে পদাঘাত করাতেই তাহার পঞ্জরের অস্থি ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। সাধারণতঃ পড়িয়া গেলে সেরূপ অস্থি ভাঙ্গিতে পারে না। এমন কি, লাঠির আঘাতেও তাহা সংঘটিত হইতে পারে না।"

এখন জিজ্ঞাস্য, এমন পদাঘাত কে করিল? ঘটনার দিন তেলুর সহিত কোনও লোকের কলহ হইয়াছিল বলিয়া কোনও সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া যায় নাই; কেবল মিঃ বিয়েটীর সহিত যাহা কিছু বচসা হইয়াছিল। মিঃ বিয়েটীর তাড়া খাইয়া তাহার এক সঙ্গী দৌড়িয়া পলাইয়াছিল, সে-ও জামা-চাদর ফেলিয়া পলাইতে গিয়াছিল। মিঃ বিয়েটী তাহার প্রতি অপ্রসন্ন ছিল, সে সে জন্য তাহাকে তাড়া করিয়াছিল, ইহা অনুমান করিলে বিশেষ দোষ হয় না। যাহার ভয়ে তেলু ঊর্দ্ধশ্বাসে পলাইয়াছিল, সে যে তেলুর সহিত মিষ্ট ভাষায় কথা কহিয়া চলিয়া যাইতে বলিবে, ইহা কিরূপে বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে? সিবিল সার্জ্জন বলেন, তেলুর বক্ষঃপঞ্জর ভগ্ন ও প্লীহা দীর্ণ হইয়াছিল, সে আপনি পড়িয়া গিয়া এমন হয় নাই, কাহারও সজোরে পদাঘাতের ফলে এমন হইয়াছিল। এ পদাঘাত করিল কি ভূতে?

অথচ আসামীর স্বদেশীয় স্বজাতীয় জুরীরা তাহাকে বেকসুর খালাস দিল! জজের আর উপায়ান্তর কি? তিনি ত জুরীর অভিমত মানিতে বাধ্য। বস্! তাহা হইলেই ব্যাপারের এইখানেই যবনিকাপাত হইল, তেলু এখন নিশ্চিন্ত পরলোকযাত্রা করিতে পারে! ইহার পর শ্রীহট্টের মাধবপুর চা-বাগানের দশরথ নামক এক কুলীহত্যার মামলা হইয়া গিয়াছে। এ মামলার আসামীও বাগানের য়ুরোপীয় ম্যানেজার, তাহার নাম মিঃ উইলসন। বিচারে তাহার মাত্র ২ শত টাকা অর্থদণ্ড হইয়াছে! লর্ড রেডিং এই প্রকৃতির বিচার-প্রহসনের অবসান করিতে চাহিয়াছিলেন না?

কার্পাসের উপর অন্তঃশুল্ক

সম্প্রতি এ দেশের কলজাত কার্পাস-বস্ত্রের উপর অন্তঃশুল্ক ৩ মাসের জন্য উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। বোম্বাই ও আমেদাবাদ সহরে দেশীয় কার্পাস-বস্ত্রের কলের সংখ্যা অল্প নহে। কিছু দিন হইতে বোম্বাইয়ের কলসমূহে শ্রমিকদিগের ধর্ম্মঘট হইয়াছিল। ফলে বহু কল বন্ধ হইয়া গিয়াছিল, কতক কলে কায কমাইয়া দেওয়া হইয়াছিল এবং লক্ষাধিক শ্রমজীবী বেকার বসিয়া ছিল।

এ ধর্ম্মঘটের কারণ কি? কলওয়ালারা বলেন, বিদেশী কাপড়ের প্রতিযোগিতা। স্বদেশী শিল্পকে বাঁচাইতে হইলে বিদেশজাত বস্ত্রের উপর শুল্ক বৃদ্ধি করা এবং সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশজাত বস্ত্রের উপর শুল্ক উঠাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। তাহা করা হয় নাই বলিয়া কলওয়ালারা আশানুরূপ দরে কাপড় কাটাইতে পারেন নাই এবং সে জন্য কলে নূতন কাপড় বানাইতে পারেন নাই। পুরাতন মালই গুদামবন্দী হইয়া আছে, তাহার উপর নূতন মাল খরচা করিয়া বানাইবার সখ তাঁহাদের নাই। প্রতিযোগিতায় যদি তাঁহারা দাঁড়াইতে পারেন, যদি অন্তঃশুল্ক উঠাইয়া দিয়া তাঁহাদিগকে সস্তা দরে কাপড় বেচিবার সুবিধা করিয়া দেওয়া হয়, তবেই তাঁহারা আবার জোরে কল চালাইতে পারেন, আবার শ্রমিকদিগকে পূরা বেতন ও পূরা সময় খাটিতে দিতে পারেন। ইহাই কলওয়ালাদিগের পক্ষের কথা। প্রথমে এ বিষয়ে বিশেষ আন্দোলন হইয়াছিল, কর্ত্তৃপক্ষের নিকটে ডেপুটেশান প্রেরিত হইয়াছিল, এমন কি, কলওয়ালা ও শ্রমিকদিগের সম্মিলিত সভায় এ সম্বন্ধে মন্তব্যও গৃহীত হইয়াছিল। কিন্তু সরকার মুখে এ বিষয়ে সহানুভূতি প্রকাশ করিলেও

কার্য্যক্ষেত্রে প্রতীকারের কোনও ব্যবস্থা করেন নাই। ইহাতে ফল এই হয় যে, কলওয়ালারা (১) কলের অনেক কায কমাইয়া দেন, (২) কুলী-মজুরের বেতন কমাইয়া দেন, (৩) কাযের সময় সংক্ষেপ করেন, (৪) অনেক কল একবারে বন্ধ করিয়া দেন।

বেতন ও কাযের সময় কমাইয়া দেওয়া যে মুহূর্ত্তে আরম্ভ হইল, সেই মুহূর্ত্ত হইতে কুলীমজুররাও ধর্ম্মঘট করিয়া দলে দলে কায ছাড়িয়া দিতে লাগিল। ইহাতে কলওয়ালাদেরই সুবিধা হইল। অনেক কলওয়ালাকে এ জন্য বাধ্য হইয়া কল বন্ধ করিতে হইল। শেষে এমন অবস্থা উপস্থিত হইল যে, বেকার জন-মজুরের দ্বারা সহরের শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা হইল।

সম্ভবতঃ এই অবস্থা দেখিয়াই সরকার ৩ মাস কালের জন্য পরীক্ষাস্বরূপ কার্পাসবাসের উপর অন্তঃশুল্ক উঠাইয়া দিয়াছেন। বহুদিন হইতে এই অন্যায় অনাচার এ দেশের উপর অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে। এ দেশের কার্পাস-শিল্পের উপর শুল্কপ্রতিষ্ঠা যে অন্যায় ও অসঙ্গত, সে কথা লর্ড ল্যান্সডাউন হইতে আরম্ভ করিয়া অনেক লাট স্বীকার করিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু বিলাতের ল্যাঙ্কাশায়ারের কার্পাস-শিল্প রক্ষার জন্য এ যাবৎ এই অন্যায় অনাচারের উচ্ছেদ সাধিত হয় নাই। সে দিন বিলাতের রাষ্ট্র-সচিব সার জয়েনসন হিক্স কোনও বক্তৃতায় স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, "ভারতের স্বার্থের জন্য আমরা ভারত শাসন করি, এ কথা বলা প্রকাণ্ড ভণ্ডামী ব্যতীত আর কিছুই নহে। আমরা আমাদের স্বার্থের জন্য—বিশেষতঃ ল্যাঙ্কাশায়ারের স্বার্থের জন্য ভারত শাসন করিয়া থাকি।"

কথাটা তিক্ত হইলেও সত্য। এ বিষয়ে আরও অনেক প্রমাণ আছে। প্রয়োজন হইলে আমরা তাহা অতীত ইতিহাস হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিতে পারি।

জার্ম্মাণ যুদ্ধকালে বিলাতী কার্পাস-পণ্যের উপর নির্দ্ধারিত শুল্ক অপেক্ষা ভারতে উৎপন্ন কার্পাস-পণ্যের উপর শুল্ক কতকটা কমাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। ইহাতে ল্যাঙ্কাশায়ারের তাঁতিরা একবারে ক্ষেপিয়া উঠিয়াছিল, পার্লামেণ্টে তুমুল আন্দোলন তুলিয়াছিল। কিন্তু তদানীন্তন ভারত-সচিব সে আন্দোলনে বিচলিত হয়েন নাই। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, তাঁহার দেশের তাঁতিদের আবদার অন্যায়, পরন্তু ভারতের প্রতি এত দিন অন্যায় আচরণ করা হইয়াছে, তাই তিনি তাহাদের চীৎকারে কর্ণপাত করেন নাই।

অথচ এই অন্যায় আংশিকভাবে রক্ষা করিয়া আসা হইতেছে। ভারতবাসীদের তীব্র প্রতিবাদে ও আবেদন-নিবেদনে কোনও ফল হয় নাই। লর্ড রেডিংএর সরকার বরাবর বলিয়া আসিয়াছেন যে, সরকারী তহবিলে টাকার টানাটানি থাকিতে এই Excise duty অন্তঃশুল্ক কিছুতেই উঠাইতে পারা যাইবে না।

এখন settled fact, unsettled হইল, লর্ড রেডিংকে বিশেষ অর্ডিনান্স জারি করিয়া এই শুল্ক আপাততঃ ৩ মাস কালের জন্য তুলিয়া দিতে হইল। এমন আরও হইয়াছে। লর্ড মর্লের বঙ্গভঙ্গরূপ settled factও জনমতের প্রাবল্যে unsettled করিতে হইয়াছিল; শিখ গুরুদ্বার আন্দোলন সম্বন্ধে পঞ্জাব সরকারকে settled fact, unsettled করিতে হইয়াছিল।

বোম্বাইএর শ্রমিকগণের জয় হউক, কেন না, তাহাদের ধর্ম্মঘটই অসম্ভবকে সম্ভব করিয়াছে। গত ১৬ই অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার বড় লাট লর্ড রেডিং এক অর্ডিনান্সের দ্বারা ঘোষণা করিয়াছেন যে, ডিসেম্বর,জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী,—এই ৩ মাসের জন্য দেশীয় কার্পাস-পণ্যের উপর শুল্ক আদায় করা বন্ধ করা হইবে। যদি আগামী বর্ষের সালতামামী হিসাব-নিকাশের সময় অনুমানমত দেখা যায়, হিসাবে ভুল হয় নাই, তাহা হইলে সরকার এই অন্তঃশুল্কের সম্পূর্ণ বিলোপসাধনের প্রস্তাব উপস্থাপিত করিবেন।

জনমতের এমন জয় বহু দিন হয় নাই। কিন্তু এ জয়ে যেন বোম্বাইয়ের মিলওয়ালারা তাঁহাদের কর্ত্তব্য-পথ হইতে ভ্রষ্ট না হয়েন। তাঁহারা জার্ম্মাণ-যুদ্ধকালে অসম্ভাবিত অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। কিন্তু সে সময়ে তাঁহাদের মাথা টলিয়াছিল। তাঁহারা প্রচুর লাভবান্ হইয়াও দেশের দরিদ্র জনগণের মুখ তাকান নাই। অংশীদারদিগকে তাঁহারা অধিক ডিভিডেণ্ড দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু কাপড়ের মূল্য হ্রাসে তেমন আগ্রহ প্রকাশ করেন নাই. এরূপ ভাবে কায করিলে তাঁহারা

দেশের লোকের সহানুভূতিলাভে বঞ্চিত হইবেন। আরও এক বিষয়ে তাঁহারা দেশের লোকের মনে ব্যথা দিতেছেন। নাটালের কয়লা কিছু সস্তা দরে পায়েন বলিয়া তাঁহারা বাঙ্গালার কয়লা লইতে সম্মত নহেন। অথচ বাঙ্গালাই তাঁহাদের কাপড়ের প্রধান খরিদ্দার। এ বিষয়ে তাঁহাদিগকে কিছু স্বার্থত্যাগ করিতে হইবে। তাঁহাদের মধ্যে পনেরো আনা কলের মালিকই দেশীয়। অথচ তাঁহারা দেশীয় হইয়াও যে দক্ষিণ-আফ্রিকায় তাঁহাদের দেশের লোক অপমানিত, লাঞ্ছিত ও বিতাড়িত হইতেছে, সেই দক্ষিণ-আফ্রিকার কয়লা লইতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করেন না, সামান্য স্বার্থত্যাগ করিতে চাহেন না। তাহা হইলে বাঙ্গালার লোকও ত বলিতে পারে যে, তাহারাও স্বার্থত্যাগ করিয়া তাঁহাদের কলজাত পণ্য ক্রয় করিবে না, বিদেশী বিলাতী ও জাপানী কলজাত পণ্য ক্রয় করিবে। সুতরাং সকলকেই দেশের মুখ চাহিয়া অল্প-বিস্তর স্বার্থত্যাগ করিতেই হইবে, নতুবা পরস্পর সহানুভূতিপ্রদর্শনের সুযোগ থাকিবে না।

বিলাতের শ্রমিক সদস্য ও ভারতবর্ষ

বিলাতের শ্রমিক সদস্য মিঃ টমাস জনষ্টন এবং ডাণ্ডি জুট মিল এসোসিয়েশনের সম্পাদক মিঃ সাইম এ দেশে বেড়াইতে আসিয়াছেন। তাঁহারা কোনও রাজনীতিক উদ্দেশ্যসাধনে এ দেশে আইসেন নাই, এ দেশের শ্রমিকদিগের অবস্থা প্রত্যক্ষ করিতে আসিয়াছেন, এ কথা তাঁহাদের মুখেই প্রকাশ। মিঃ জনষ্টন কলিকাতার মির্জ্জাপুর পার্কে বক্তৃতাকালে যে কয়টি কথা বলিয়াছেন, তাহাতে যে রাজনীতির সম্পর্ক একবারে নাই, এমন কথা বলা যায় না। তাঁহার বক্তৃতার মূল কথা কয়টি এই,—

(১) বে-আইনী আইনে এ দেশের শতাধিক লোককে আটক রাখা সভ্য দেশের আইনসঙ্গত নহে,

(২) এ দেশের শ্রমিক সম্প্রদায় যে ভীষণ বস্তীতে বাস করে, তাহা মনুষ্যের আবাসযোগ্য নহে, তাহাদের অবস্থার উন্নতিবিধানের জন্য সকলের সচেষ্ট হওয়া কর্ত্তব্য,

(৩) এ জন্য ভারতবাসীদের একযোগে পরস্পর সহযোগ করিয়া কর্ম্মপথে অগ্রসর হওয়া কর্ত্তব্য,

(৪) এ দেশের শতকরা ৫ জন লোক শিক্ষালাভ করিতেছে, অবশিষ্ট ৯৫ জন অশিক্ষিত; বৃটিশ সাম্রাজ্যের প্রত্যেক প্রজার শিক্ষালাভ করা জন্মগত অধিকার। এ জন্য প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য,—অশিক্ষিতগণের শিক্ষাবিধানের উপায় উদ্ভাবন করা; শিক্ষালাভ না করিলে জনসাধারণ আপনাদের অবস্থা সম্যক্ বুঝিতে পারিবে না,

(৫) বিলাতের লেবার পার্টি ভারতের আত্ম-নিয়ন্ত্রণের বিশেষ পক্ষপাতী; ভারত যাহাতে দক্ষিণ-আফ্রিকার মত হোমরুল পায়, তাহার জন্য লেবার পার্টির চেষ্টা করা উচিত।

কথাগুলি শুনিতে ভাল। মিঃ কেয়ার হার্ডি হইতে আরম্ভ করিয়া এ যাবৎ অনেক শ্রমিক সদস্য এ দেশে আসিয়াছেন এবং এ দেশের স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে কথা কহিয়াছেন। লেবার পার্টির বর্ত্তমান দলপতি মিঃ রামজে ম্যাকডোনাল্ডও এ দেশের সম্পর্কে ভূয়োদর্শন লাভ করিয়া তাঁহার কেতাবে মতামত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাহাতে এ দেশের লোকের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি তাঁহার যথেষ্ট সহানুভূতির পরিচয় পাওয়া যায়। মিঃ জনষ্টনও স্বল্পদিনে এ দেশের সম্পর্কে যে ভূয়োদর্শন লাভ করিয়াছেন, তাহা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। এ দেশের আমলাতন্ত্র সরকার যে বিধিবজ্রের দণ্ডাঘাতে লোকের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ভঙ্গ করিয়াছেন, তাহা তিনি 'বর্ব্বর'জনোচিত বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন, যাহাতে তাহাদের প্রকাশ্যে বিচার হয়, তাহার জন্য বিলাতে গিয়া তাঁহার দলকে অনুরোধ করিবেন। কিন্তু তিনি কি ভুলিয়া গিয়াছেন, এই বিধিবজ্র কাহার আমলে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল? তাঁহাদেরই দলপতি মিঃ ম্যাকডোনাল্ড যখন ইংলণ্ডের শাসন-পাটে বসিয়াছিলেন, তখন এই বিধিবজ্র ভারতের বুকে হানা হইয়াছিল। তবে?

অবশ্য তাঁহার সাধু উদ্দেশ্যে কেহ সন্দেহ করে না। এমন সাধু উদ্দেশ্য লইয়া অনেক 'বৃটিশার'ই এ দেশে আসিয়া থাকেন। এমন কি, লর্ড কার্ম্মাইকেল, লর্ড রোণাল্ডশে ও লর্ড রেডিংয়ের মত বৃটিশ রাজপুরুষ হৃদয়ে ভারতের মঙ্গলবিধানের সঙ্কল্প লইয়া ভারতে পদার্পণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের সে সাধু

উদ্দেশ্য কোথায় বিলীন হইয়া গেল? যে 'ইস্পাতের কাঠাম' অক্ষুণ্ণ রাখিবার কথা মিঃ র‍্যামজে ম্যাকডোণাল্ডও ভুলেন নাই এবং যাহা লর্ড রেডিং তাঁহার উপরওয়ালা লর্ড বার্কেণহেডের সহিত একযোগে রক্ষা করিতে বদ্ধপরিকর—তাহার প্রভাব এড়াইতে পারে, এমন শক্তিমান কে আছে?

তবে মিঃ জনষ্টন ভারতের একটা মঙ্গল করিলেও করিতে পারেন। তিনি স্বয়ং গঙ্গার তটবর্ত্তী পাটের কলের দরিদ্র কুলীমজুরসমূহের দুর্দ্দশা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। তিনি তাহাদের বস্তীর শোচনীয় অস্বাস্থ্যকর অবস্থা দেখিয়াছেন,—তাহাদের কষ্টকর জীবন দেখিয়া হৃদয়ে ব্যথা অনুভব করিয়াছেন, তাহাদের সামান্ত বেতন ও অভাব-অভিযোগের কথা শুনিয়াছেন। তাই তিনি ব্যথিত হৃদয়ে এ দেশের জনসাধারণকে এই শ্রমিকদিগের য়ুনিয়নের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হইতে উপদেশ দিয়াছেন। এ দেশের লোকের কর্ত্তব্য —এ দেশের লোক কতটা পালন করিবে, তাহা তাহারাই বলিতে পারে; কিন্তু তিনি ত তাঁহার স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া এ বিষয়ে আন্দোলন করিয়া তাঁহার স্বজাতীয় কলের মালিকদিগকে দরিদ্র শ্রমজীবীদিগের প্রতি মনুষ্যোচিত ব্যবহার করাইতে বাধ্য করিতে পারেন। এ বিষয়ে মিঃ সাইম তাঁহার সহায় হইতে পারেন। তিনি ডাণ্ডি জুট মিল এসোসিয়েশানের সেক্রেটারী। গঙ্গার তটবর্ত্তী কলওয়ালারাও প্রায়ই তাঁহার স্বদেশীয় স্বজাতীয়,—তাঁহাদের সহিত ডাণ্ডির জুটওয়ালাদের কি সম্পর্ক আছে, তিনিই বলিতে পারেন। তবে ব্যবসায়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা যে উভয় শ্রেণীর কলওয়ালাদের মধ্যে বিদ্যমান, তাহা অনেকেই জানে। ডাণ্ডির কলওয়ালারা যে এ দেশে আসিয়া কলের প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প করিয়াছেন, তাহাও প্রকাশ পাইয়াছে। মিঃ সাইম যে তাহার অগ্রদূত হইয়া আইসেন নাই, তাহাই বা কে বলিতে পারে? আমাদের পক্ষে উভয়েই সমান—কেন না, এই ব্যবসায়ে আমাদের যে ঘাসজল বরাদ্দ আছে, তাহাই থাকিবে। তবু মিঃ সাইমের ডাণ্ডি জুট মিলওয়ালারা যদি প্রতিযোগিতার খাতিরে মন্দের ভাল করিতে পারেন, তাহা হইলেও দরিদ্র ভারতীয় শ্রমিকের উপকার হইতে পারে।

পেজের মামলা

বহুদিন পরে বিচারপতি পেজের মামলার যবনিকা-পতন হইয়াছে। বিচারপতি ওয়ামসলে ও চক্রবর্ত্তী সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, যখন ত্রুটি স্বীকার করিলে এই ভাবের মামলার অবসান হয়, তখন আর পুনরায় তদন্ত-বিচারের প্রয়োজন নাই; সেই হেতু যখন আসামী এক প্রকার ত্রুটি স্বীকার করিয়াছেন, তখন উহাই তাঁহারা বর্ত্তমান ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত বলিয়া মনে করিয়াছেন।

আমরা বিচারপতিদ্বয়ের বিচারসিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে অথবা ব্যক্তিগতভাবে আসামী জজ পেজের বিরুদ্ধে কোন প্রকার মন্তব্য প্রকাশ করিতে চাহি না। কিন্তু এই ভাবের মামলার এইরূপ নিষ্পত্তি হইলে যে তাহার সাধারণ ফল শুভ হয় না, সে কথা অবশ্যই বলিব। মামলাটা কি? কর্পোরেশানের এক জন কর্ম্মচারী বিচারপতি পেজের গৃহে জলের ট্যাক্স আদায় করিতে গিয়াছিলেন, বিচারপতি পেজ তাঁহাকে ট্যাক্স ত দেন না-ই, পরন্তু অপমান ও প্রহার পর্য্যন্ত করিয়াছিলেন,—ইহাই অভিযোগ।

হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতিদ্বয় যে শেষ বিচার সিদ্ধান্ত করিয়া দিলেন, তাহার ফলে এই কয়টি কথা আদৌ মীমাংসিত হইল না :—

(১) বিচারপতি পেজ অন্যায়রূপে কর্পোরেশানের কর্ম্মচারীকে প্রহার ও অপমান করিয়াছিলেন কি না?

(২) কর্পোরেশানের উক্ত কর্ম্মচারী তাঁহার কর্ত্তব্যপালনের অতিরিক্ত কোনও অন্যায় কার্য্য করিয়াছিলেন কি না, এবং যদি না করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার কর্ত্তব্য কার্য্যে এইরূপে বাধা দিবার কাহারও অধিকার ছিল কি না?

(৩) কর্পোরেশানের কোনও কর্ম্মচারী অতঃপর কর্ত্তব্যপালনে এইরূপে বাধা প্রাপ্ত হইলে যদি অতঃপর কর্ত্তব্যপালনে ইতস্ততঃ করে, তবে কর্পোরেশান তাহাকে কর্ত্তব্য অবহেলার জন্য দায়ী করিতে পারেন কি না?

(৪) যেহেতু কর্পোরেশান মহামান্য হাইকোর্টের শরণ লইয়াও নিজ কর্ম্মচারীর প্রতি প্রবলের অন্যায় আচরণের কোনও প্রতীকারলাভে সমর্থ হইলেন না,

সেই হেতু ভবিষ্যতে তাঁহারা তাঁহাদের কর্ম্মচারীকে জবরদস্ত করদাতার নিকট কর আদায় করিতে পাঠাইতে বাধ্য করিতে পারেন কি না ?

(৫) বিচারপতি চক্রবর্ত্তী স্বতন্ত্র রায়ে যেরূপ আভাস দিয়াছেন, তাহাতে বুঝা যায় যে, তিনি বিচারপতি পেজকে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ বলিয়া মনে করেন নাই। তবেই বুঝিতে হইবে, বিচারপতি পেজ নিজের কোর্টে পাইয়া করপোরেশানের ন্যায্য প্রাপ্য আদায় ত দেনই নাই, বরং করপোরেশানের প্রেরিত আদায়ী কর্ম্মচারীকে অপমান করিয়াছেন। এক জন সাধারণ করদাতা এরূপ করিলে তাহার পক্ষে তবু বলিবার কথা ছিল যে, সে আইন জানে না। তথাপি তাহার কঠোর দণ্ড হইত। কিন্তু যদি মহামান্য হাইকোর্টের বিচারপতির দ্বারা এরূপ আচরণ সম্ভব হয়, তাহা হইলে তিনি কি হাইকোর্টের পবিত্র বিচারাসনে অধিষ্ঠিত থাকিবার উপযুক্ত ?

(৬) বিচারপতি ওয়ামস্লে রায়ে বলিয়াছেন যে, নিম্ন-আদালতের ম্যাজিষ্ট্রেট এই মামলায় যে বিচারপদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা নানা দিক দিয়াই ভ্রান্ত। সুতরাং তাঁহার বিচারসিদ্ধান্তও ভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে। বিচারপতি চক্রবর্ত্তী তাঁহার স্বতন্ত্র রায়ে বলিয়াছেন যে, "ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারপদ্ধতি আগাগোড়াই বে-আইনী। তিনি যদি দুই এক জন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়া আসামীর উপর সমন জারি করিতেন, তাহা হইলে উভয় পক্ষের মধ্যে একটা আপোষ-নিষ্পত্তি হইয়া যাইত।" সুতরাং বুঝা যাইতেছে, নিম্ন-আদালতের বিচারক তাঁহার কর্ত্তব্যপালনে ঘোর অবহেলা প্রদর্শন করিয়াছেন। এমন বিচারক স্বপদে প্রতিষ্ঠিত থাকিলে ইংরাজের ন্যায়-বিচারের সুনাম কি বর্দ্ধিত হইবে?

এই সমস্যাগুলির কে উত্তর প্রদান করিবে ? সাধারণতঃ অর্দ্ধশিক্ষিত পশুপ্রকৃতির নিকৃষ্ট শ্রেণীর ধলা চামড়ার লোক এ দেশের অসহায় দুর্ব্বল লোকের উপর অনাচার আচরণ করিয়া থাকে। ইহাতে দেশে জাতিগত বিদ্বেষ ও অসন্তোষ নিত্য বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। উদ্ধত পিশাচ-প্রকৃতি য়ুরোপীয়ের এই কাপুরুষোচিত কার্য্যে উচ্চপদস্থ রাজপুরুষরাও যে নিতান্ত ক্ষুব্ধ, লজ্জিত ও বিপন্ন হয়েন, তাহার প্রমাণও পাওয়া যায়। লর্ড রেডিং এই হেতু জাতিবিদ্বেষ আইন প্রণয়নকালে বলিয়াছিলেন যে, এইরূপ কালা ধলা মামলার অবসান করিবার প্রাণপণ চেষ্টা করিতে হইবে।

এই ব্যাপারে নিকৃষ্ট অর্দ্ধশিক্ষিত পশুপ্রকৃতির য়ুরোপীয় অভিযুক্ত হয় নাই, অভিযুক্ত হইয়াছিলেন শিক্ষিত উচ্চপদস্থ মান্যগণ্য হাইকোর্টের বিচারপতি পেজ! তাঁহার নিকট দেশের লোক কি আশা করে? তাঁহার ন্যায় উচ্চপদস্থ বিচারক দেশের লোককে শ্বেতাঙ্গের অন্যায় ও অনাচার হইতে রক্ষা করিবেন। তাঁহাদের নিকট দেশের লোক ন্যায়বিচার, ধৈর্য্য ও চিত্তসংযমের আশা করে। কিন্তু রক্ষকই যদি ভক্ষক হয়, তাহা হইলে উপায় কি ? উপায়, এই ভাবের উদ্ধতপ্রকৃতি ও অসংযমী লোক যত বড়ই পদস্থ হউন না, তাঁহাকে সেই পদ হইতে বিচ্যুত করা, সেই সম্ভ্রমের পদ যাহাতে কলঙ্কিত না হয়, তাহার ব্যবস্থা করা। দেশের 'শান্তি ও শৃঙ্খলার' নামে যাঁহারা শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতেছেন, তাঁহারা এ ব্যাপারে নীরব কেন ?

শিক্ষার বিফলতা

সার তেজবাহাদুর সপরু গত ৭ই নভেম্বর লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশন উপলক্ষে যে বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহাতে তিনি বুঝাইবার প্রয়াস পাইয়াছেন যে, এ দেশে ইংরাজ-শাসনের আমলে যে সকল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাদের শিক্ষাদান নিষ্ফল হইয়াছে। যে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাদানের ফলে সার তেজবাহাদুর সপরুর মত ইংরাজ শাসনের গুণগ্রাহী ব্যুরোক্রেসীর অনুগৃহীত মনীষী ভারতীয়ের উদ্ভব হয়, আজ তাঁহার মুখে সেই শিক্ষাদান নিষ্ফল হইয়াছে শুনিলে মনটা চমকিত হইয়া উঠে না কি ?

সার তেজ বাহাদুর কিন্তু যে কারণে বর্ত্তমান বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ী শিক্ষার নিষ্ফলতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন, তাহা আমরা সমীচীন বলিয়া মনে করি না। তিনি ইংরাজের প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনটি যুগ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন:—

(১) প্রথম যুগ। কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার পর একপুরুষকাল এই শিক্ষার প্রভাবে আমরা বিজাতীয় বিধর্ম্মিভাবাপন্ন হইয়া গিয়াছিলাম। প্রতীচ্যের যাহা কিছু নূতন দেখিয়াছিলাম, তাহাতেই আমরা মুগ্ধ হইয়া দেশের চিরাচরিত আচার-ব্যবহার, শিক্ষা-দীক্ষা, ধর্ম্ম এবং অবদানপরম্পরার প্রতি উপেক্ষা ও অবজ্ঞার দৃষ্টিপাত করিতে অভ্যস্ত হইয়াছিলাম। এই হেতু রক্ষণশীল ভারতীয়ের সহিত 'শিক্ষিত' ভারতীয়ের সংঘর্ষও উপস্থিত হইয়াছিল। রক্ষণশীলরা শিক্ষাকে অর্থ উপায়ের এবং সমাজে মান্যস্থান লাভ করার পক্ষে উপযোগী মনে করিয়া ঐ শিক্ষা একবারে বর্জ্জন করে নাই বটে, তবে ঐ শিক্ষা দেশে যথার্থ শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যসাধনে নিষ্ফল হইয়াছিল। মাত্র উহা দ্বারা কতকগুলি লোক 'বিজাতীয়' হইয়া গিয়াছিল, আর কতকগুলি কেবল উহাকে অর্থকরী বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল।

(২) দ্বিতীয় যুগ। বিদেশী রাজনীতি ও ইতিহাসে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া এই যুগের ভারতীয়রা ইংরাজের নিকট তাহাদেরই দেশের প্রথামত স্বায়ত্ত-শাসনাধিকার লাভের জন্য চেষ্টিত হইয়াছিল। ইংরাজ বুঝিলেন, ভারতীয়দের শিক্ষালাভে 'চোখ' ফুটিয়াছে, সুতরাং এ শিক্ষা কুফল উৎপাদন করিয়াছে; অতএব তাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে স্বাধীন চিন্তার আকর মিল, বেন্থাম, বার্ক, মেকলে তুলিয়া দিলেন। কাযেই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সাফল্যলাভ করে নাই।

(৩) তৃতীয় ও শেষ যুগ। অতঃপর যাহাতে ভাল কেরাণী বা নিম্নপদস্থ কর্ম্মচারী গড়া যায়, এই ভাবের শিক্ষাদান-প্রথাই চলিয়া আসিতেছে। শিক্ষিতগণের যে যোগ্যতা-অর্জ্জনই মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়া উচিত এবং শিক্ষার লক্ষ্যই যে তাহা হওয়া উচিত, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষায় তাহা একবারে ভুলিয়া যাওয়া হইয়াছিল। সার তেজ বাহাদুর বলেন, গত ৪০।৫০ বৎসর ধরিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাকার্য্য যে ভাবে পরিচালিত হইয়া আসিতেছে, তাহাতে এইরূপ ধরণের শিক্ষিত লোক প্রস্তুত হইতেছিল যে, তাহারা যোগ্যতার সহিত সরকারী কার্য্য সম্পাদন করিতে পারে এবং উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীর হুকুম অনুসারে কায চালাইতে পারে। কিন্তু তাহারা যাহাতে উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীদিগের যোগ্যতা অর্জ্জন করিতে পারে, সেরূপ শিক্ষা দেওয়া হয় নাই। এই হিসাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সাফল্যলাভ করে নাই।

সার তেজ বাহাদুর যে তিন যুগের হিসাব দেখাইয়াছেন, তাহা তাঁহার মতাবলম্বী ভারতীয়ের যোগ্য হইয়াছে সন্দেহ নাই। দুঃখের বিষয়, এ দেশে ইংরাজের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাদানের নিষ্ফলতার যেটা সর্ব্বাপেক্ষা বড় দিক, সেটা সার তেজ বাহাদুর দেখান নাই বা দেখাইতে পারেন নাই।

তিনি প্রথম যুগের যে চিত্রাঙ্কন করিয়াছেন, তাহা হইতেই বুঝিয়াছেন যে, এ দেশে ইংরাজের প্রবর্ত্তিত শিক্ষাদানের সঙ্গে সঙ্গে আমরা জাতীয়তা হারাইতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। সার তেজ বাহাদুর গোড়াটা ধরিয়াছেন ঠিক, তবে মাঝে খেই হারাইয়া ফেলিয়াছেন। আমরা সেই বিকৃত শিক্ষার ফলে 'দেশের ঠাকুর ফেলিয়া বিদেশের কুকুর' পূজিতেও আরম্ভ করিয়াছিলাম; সকল বিষয়ে দেশকে অবজ্ঞা করিয়া বিদেশকে অনুকরণ করিতে শিখিয়াছিলাম; ফলে আমাদের মধ্যে একটা দাসত্বের মনোবৃত্তি জাগিয়া উঠিয়াছিল। সেই দাস-মনোবৃত্তির নাগপাশ হইতে আমরা এখনও মুক্ত হই নাই, আমরা এখনও তাহার প্রভাবে যেন ভূতাবিষ্টের মত হইয়া আছি। আমরা জাতীয়তা হারাইয়া, ধর্ম্ম হারাইয়া, সমাজ হারাইয়া একটা দাসমনোবৃত্তিচালিত যন্ত্রে পরিণত হইয়াছি, নিজের বিশেষত্ব বিসর্জ্জন দিয়া মৃগতৃষ্ণিকার ভ্রান্ত মৃগের ন্যায় বিদেশীয় বিজাতীয় শিক্ষার মোহ-মরীচিকায় উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া ধাবিত হইয়াছি। ইহাই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার প্রকৃত নিষ্ফলতা।

সহযোগের উত্তরে সহযোগ

অসহযোগের ব্যাখ্যা লইয়া যেমন মহাত্মা গন্ধীর মন্ত্র-শিষ্যগণের মধ্যে মতবিরোধ ঘটিয়াছিল, ফলে পরিবর্ত্তন-বিরোধী ও কাউন্সিলকামী এই দুই দলে অসহযোগীরা বিভক্ত হইয়া গিয়াছিল, তেমনই সহযোগের সীমা ও পরিমাপ লইয়া স্বরাজী কাউন্সিলকামীদিগের মধ্যেও

মতবিরোধ ঘটিয়াছে এবং উহার ফলে দল ভাঙ্গিয়া যাইতে বসিয়াছে। মহাত্মা গন্ধীর বর্জ্জননীতির মধ্যে কাউন্সিলবর্জ্জন অন্যতম—উহাকে অন্যতম প্রধান বর্জ্জন-নীতি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। মহাত্মা বলিয়াছিলেন, কাউন্সিলের কাযে আত্মশক্তির ক্ষয় বা অপচয় করিলে দেশের ও জাতির গঠনকার্য্যে শক্তি নিয়োগ করিবার সুযোগ থাকে না; বিশেষতঃ কাউন্সিলপ্রবেশ দ্বারা দেশে স্বরাজ আনয়ন করা সম্ভব হইবে না। স্বরাজ্য দলের প্রতিষ্ঠাতা এবং নেতা পরলোকগত দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মহাত্মাজীর মন্ত্রশিষ্য হইলেও কারামুক্তির পর হইতে গঠনকার্য্য (চরকা ইত্যাদি) অপেক্ষা কাউন্সিল-প্রবেশের উপর অধিকতর আস্থা স্থাপন করিয়াছিলেন এবং নিজের ব্যক্তিত্বের প্রভাবে দেশের চিন্তাস্রোত অনেকটা ফিরাইয়া দিয়াছিলেন। দেশবন্ধু অসহযোগ অর্থে কাউন্সিলের মধ্য দিয়া সরকারের সহিত অসহযোগকেও বুঝিয়াছিলেন। যাহাতে কাউন্সিলে প্রবেশ করিয়া অসহযোগীরা ক্রমাগত আমলাতন্ত্র সরকারের কার্য্যে বাধা-প্রদানের দ্বারা কাউন্সিলের ও সংস্কার আইনের অসারতা দেখাইয়া দিতে পারে অথবা দ্বৈতশাসনের উচ্ছেদসাধন করিতে পারে, দেশবন্ধুর কাউন্সিলপ্রবেশ ও অসহযোগ মন্ত্রের তাহাই উদ্দেশ্য ছিল। সে উদ্দেশ্য তিনি কতক পরিমাণে সফল করিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালায় দ্বৈত-শাসনের অবসান হইয়াছে। এখন বাঙ্গালার আমলাতন্ত্র সরকারের স্বেচ্ছাচার শাসনের নগ্ন মূর্ত্তি আবার পূর্ব্বের মত প্রকট হইয়া উঠিয়াছে।

কিন্তু দেশবন্ধুর ব্যক্তিত্বের অভাবে কাউন্সিলে স্বরাজীদের অসহযোগনীতি সম্বন্ধে মতের মিল হইতেছে না। দেশবন্ধু যেমন মহাত্মা গন্ধীর বিশুদ্ধ অসহযোগের বিপক্ষে বিদ্রোহী হইয়া নূতন পন্থা খুঁজিয়া বাহির করিয়াছিলেন, তেমনই বর্ত্তমান স্বরাজীদের মধ্যে কেলকার, জয়াকর, অ্যানে প্রমুখ দলপতিরা স্বরাজী-নেতা পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর অসহযোগ ব্যাখ্যার সহিত একমত হইতে পারিতেছেন না। তাঁহারা লোকমান্ত তিলকের Responsive co-operation নীতির পক্ষপাতী হইতে চাহিতেছেন। ইহার অর্থ এই যে, সরকার কাউন্সিলের কার্য্যে সহানুভূতি দেখাইয়া যতটুকু সহযোগ করিতে প্রস্তুত হইবেন, ততটুকু পরিমাণে তাঁহারাও সহযোগ করিতে প্রস্তুত থাকিবেন,—এমন কি, প্রয়োজন হইলে তাঁহারা মন্ত্রিত্বের মত সরকারী চাকুরী গ্রহণ করিতেও পশ্চাৎপদ হইবেন না। পণ্ডিত মতিলাল ইহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছেন যে, তাহা হইতেই পারে না, হইলে স্বরাজ্য দলের মূলনীতি ভঙ্গ করা হইবে। মিঃ টাম্বের সরকারী চাকুরী গ্রহণের পর হইতে উভয় দলে বিরোধ আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। ইহা পূর্ব্ব-সংখ্যার মাসিক বসুমতীতে বলা হইয়াছে।

কেলকার জয়াকরের দল বলিতেছেন, পণ্ডিত মতিলাল যদি অসহযোগী বাধাপ্রদানকারী হইয়াও স্কীন কমিটীতে প্রবেশ করিতে পারেন, এবং শ্রীযুক্ত পেটেল ব্যবস্থাপরিষদের প্রেসিডেণ্ট হইয়া বলিতে পারেন যে, প্রয়োজন হইলে তিনি দিনে দশবার বড় লাটের সহিত দেখা করিতেও প্রস্তুত আছেন, তাহা হইলে শ্রীযুক্ত টাম্বের সরকারী চাকুরী গ্রহণে আপত্তি কি আছে? অসহযোগের স্বরূপ এবং পরিমাপ কি? উহা কে নির্দ্ধারণ করিবে?

উভয় দলের মধ্যে রফার চেষ্টাও হইতেছে। মান্দ্রাজের স্বরাজীদের মধ্যে শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস আয়েঙ্গারের শান্তিপ্রয়াসী বলিয়া সুনাম আছে। লালা লাজপৎ রায়েরও মধ্যস্থ হইয়া বিবাধ মিটাইবার শক্তি আছে। ইঁহারা সকলেই উভয়পক্ষে বিরোধের অবসানের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু জয়াকর ও কেলকারের দল বলিয়াছেন,—"যাহাতে সহযোগের প্রত্যুত্তরে সহযোগনীতির ক্ষতি হয় অথবা উহার প্রচারে বাধা পড়ে, এমন সর্ত্তে আমরা রফায় সম্মত হইব না। পণ্ডিত মতিলাল যদি প্রতিশ্রুতি দেন যে, আগামী নির্ব্বাচনকালে স্বরাজী দল এই নীতি অবলম্বন করিবে, তাহা হইলে তাঁহারা আপাততঃ প্রচারকার্য্য স্থগিত রাখিতে পারেন। কিন্তু এরূপ প্রতিশ্রুতি না দিলে নূতন দলকে স্বরাজ্য দলের মধ্যে থাকিতে দিয়া তাহাদের নীতির প্রচার করিতে দিতে হইবে। কিন্তু যদি পণ্ডিত মতিলাল সম্মত না হইয়া দলের মধ্যে সঙ্ঘবদ্ধতা ও শৃঙ্খলারক্ষার জন্য জিদ করেন, তাহা হইলে Responsive

co-operationists অথবা কেলকারের নূতন দল স্বরাজ্য দল ছাড়িয়া দিয়া নূতন দল গঠন করিবেন।"

সুতরাং মিলন যে সংঘটিত হইবে, এমন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। একটা কথার মারপেঁচ উপলক্ষে আরও অধিক মতবিরোধ ঘটিয়াছে। পণ্ডিত মতিলাল বলিতেছেন, দেশবন্ধু দাশ তাঁহার ফরিদপুরের বক্তৃতায় যে Honourable Co-operation অথবা সম্মানজনক সহযোগের কথা বলিয়াছিলেন, তিনি তাহা মানিয়া লইয়া কার্য্য করিতে প্রস্তুত আছেন। জয়াকর-কেলকারের দল বলিতেছেন, তাঁহারা Responsive Co-operation অথবা সহযোগের উত্তরে সহযোগ দিতে প্রস্তুত আছেন। তাহা হইলেই বুঝা যাইতেছে, উভয় দলের মধ্যে honourable ও responsive এই দুইটি কথা লইয়াই যত গোলযোগের উদ্ভব হইয়াছে।

এখন এই কথা দুইটির ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করিলে কি দেখা যায়? পণ্ডিত মতিলাল তাঁহার honourable কথার ব্যাখ্যা করিয়া বলিতেছেন যে, "দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে, যদি সরকার শাসন-সংস্কারের সংস্কারের উদ্দেশ্যে দেশের প্রার্থনা অনুসারে একটি রয়েল কমিশন নিযুক্ত করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের কার্য্য 'সম্মানজনক' বলিয়া মানিয়া লওয়া যাইতে পারে। সরকার যদি এই ভাবের একটা gesture অথবা জনমতের অনুকূল কার্য্য না করেন, তাহা হইলে স্বরাজ্য দল তাঁহাদের সহিত সহযোগ করিতে সম্মত হইবেন না, কোনরূপ সরকারী চাকুরী গ্রহণ করিবেন না।" জয়াকর-কেলকারের দল বলিতেছেন, "সরকার কি করেন বা না করেন, তাহা দেখিয়া সরকারী চাকুরী গ্রহণের বিপক্ষে বাধা রাখা হইবে না; তবে চাকুরী গ্রহণ করা হইবে বলিয়া কাউন্সিলে বাধাপ্রদান-নীতি পরিত্যক্ত হইবে না।"

দেশের লোক এখন বুঝুন, উভয় পক্ষের মধ্যে এরূপ মত-বিরোধ থাকিলে মিলন কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে। এক পক্ষ বলিতেছেন, মন্ত্রী-গিরি বা অন্য কোনও সরকারী চাকুরী লওয়ার বিপক্ষে বাধা উঠাইয়া দিতেই হইবে, অপর পক্ষ বলিতেছেন, তাহা হইতেই পারে না, সরকার জনমতের প্রতি পূর্ব্বে সম্মান প্রদর্শন করুন, তাহার পর চাকুরী গ্রহণ করা হইবে। এ অবস্থায় রফা হইতেই পারে না।

অবস্থা দেখিয়া মনে হয়, স্বরাজ্য দলের সকলেরই এখন সরকারী চাকুরী গ্রহণে কোনও আপত্তি নাই; তবে এক দল বলিতেছেন, সরকার ডাকুন বা নাই ডাকুন, আমরা খাইতে যাইবই, আর অন্য দল বলিতেছেন, এইবার ডাকিলেই যাইব। প্রভেদ এইটুকু। ইহাতে আমাদের দরজীর দোকানে উটের প্রবেশলাভের গল্প মনে পড়িতেছে। দারুণ বৃষ্টিতে দাঁড়াইয়া উট ভিজিতেছিল। দরজীকে অনুরোধ করিয়া উট প্রথমে মাথাটা তাহার দোকানে রক্ষা করিয়া জল-ঝড় হইতে বাঁচাইল। তাহার পর সম্মুখের পা দুইখানা; পরে পিছনের পা দুইখানা; শেষে লেজটুকুও বাদ গেল না।

তবে সম্প্রতি উভয় দলের মধ্যে এই সর্ত্ত হইয়াছে যে, আগামী কানপুর কংগ্রেস পর্য্যন্ত উভয় দলের মধ্যে বিরোধ মুলতুবী থাকিবে, কংগ্রেসের সময় স্বরাজ্য দল তথায় সমবেত হইলে যৎকর্ত্তব্য অবধারণ করা হইবে।

এইরূপই যে হইবে, তাহা পূর্ব্বে জানাই ছিল। বাঘ একবার রক্তের আস্বাদ পাইলে ক্রমাগত রক্তের আশায় ঘুরিয়া থাকে। কাউন্সিলে প্রবেশ করিলে শত বাধা-প্রদান সত্ত্বেও সরকারের সহিত সহযোগ করিতেই হয়,—সে সহযোগ যত সামান্যই হউক, তাহাতে ক্ষতি নাই। একবার সূত্রপ্রমাণ সহযোগ হইতে পারিলে শেষে রজ্জু-প্রমাণ সহযোগের ফাঁদ গলায় পরিতেই হইবে। ইহাই নিয়ম। এখন ত কথা উঠিবেই, সহযোগের বা অসহযোগের পরিমাপ কি? কোন কমিটীতে প্রবেশ লাভ করাতে বা কোন বন্ধু-পুত্রের সরকারী চাকুরীলাভে সহায়তা দান করাতে কতটুকু সহযোগ করা হয়, তাহা কে নির্ণয় করিবে? কাউন্সিলপ্রবেশের অবশ্যম্ভাবী ফল এইরূপ হইবে বলিয়াই কি ভবিষ্যদর্শী মহাত্মা গন্ধী স্বরাজীদিগকে বেপরোয়া কংগ্রেসী ক্ষমতা দিবার কথা পাড়িয়াছিলেন? তিনি কি দেখিতেছিলেন, দৌড় কত দূর? কে জানে!

—

শ্রীযুত বলাইদাস চট্টোপাধ্যায়

বিখ্যাত মোহনবাগান ফুটবল ক্লাবের প্রথম শ্রেণীর খেলোয়াড় বলাইদাস বাঙ্গালী তরুণ দলের পরম প্রিয়। তিনি নানাবিধ ব্যায়াম-ক্রীড়ায় কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া দেশীয় বিদেশীয় সকল শ্রেণীর লোকের প্রীতির কারণ হইয়াছেন।

সার সুরেন্দ্রনাথ লিখিয়া গিয়াছেন, "আমি জীবনে যাহা কিছু উন্নতিসাধন করিয়াছি, তাহার মূলে আমার রীতিমত ব্যায়ামের অভ্যাসকে নির্দ্দেশ করিতে পারি।...আমার প্রথম জীবনে আমাদের বাড়ীতে এক আখড়া ছিল। আমরা প্রত্যহ সেই আখড়ায় ব্যায়াম অভ্যাস করিতাম—উহা আমাদের বাধ্যতামূলক শিক্ষার

শ্রীযুত বলাইদাস চট্টোপাধ্যায়

সদৃশ ছিল। এই অভ্যাসের গুণে আমার ভ্রাতা ক্যাপ্টেন জিতেন্দ্রনাথ বাঙ্গালীর মধ্যে ব্যায়ামপটুদিগের রাজা (Prince among Bengalia thletes) হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন।"

বাঙ্গালী তরুণদিগের মধ্যে অধুনা ব্যায়ামের প্রতি আগ্রহ দেখা যাইতেছে। জাতির পক্ষে ইহা শুভলক্ষণ বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। সন্তরণ, বাচখেলা, দৌড়ঝাঁপ, উল্লম্ফন প্রভৃতি দেশীয় খেলার সঙ্গে সঙ্গে ফুটবল, ক্রিকেট, হকি, মুষ্টিযুদ্ধ প্রভৃতি বিদেশী খেলাও বাঙ্গালীর জাতীয় খেলার মধ্যে পরিগণিত হইতেছে। অনুকূল অবস্থায় পরিমিতরূপ ব্যায়ামে শরীর সবল ও সুস্থ হয়, এ কথা সকলেই জানে। আত্মসম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে শারীরিক বলসঞ্চয় করা যে প্রথম ও প্রধান প্রয়োজন, তাহা বোধ হয়, কাহাকেও বুঝাইতে হইবে না।

বলাইদাসও বাল্যজীবন হইতে ব্যায়ামসাধনা করিয়া আসিতেছেন। এ ক্ষেত্রে তাঁহার সমকক্ষ এ দেশে বিরল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

বলাইদাস ১৯০০ খৃষ্টাব্দে বর্দ্ধমান জিলার অন্তর্গত কালনা মহকুমার নিকট ইছাপুর বালাকন গ্রামে তাঁহার মাতামহ অন্নদাপ্রসাদ ঘটকের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে মোহনবাগান দলের হইয়া ফুটবল

খেলিতে গিয়া বিশেষ সুনাম পাইয়াছিলেন এবং ডার-হাম লাইট ইনফ্যান্ট্রি রেজিমেণ্ট দলের দৌড়বাজকে পরাস্ত করিয়া লেসলি কাপটি আত্মসাৎ করিয়াছিলেন। মোহনবাগানের সেণ্টার হাফ ব্যাকরূপে তিনি খেলায় দেশী বিদেশী সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন।

কলিকাতা হকি এসোসিয়েশনের সুযোগ্য সেক্রেটারী মিঃ এ, বি, রসার কতকগুলি বাছাই বাঙ্গালী খেলোয়াড় লইয়া রেঙ্গুন, সিঙ্গাপুর ও জাভা দ্বীপে খেলিতে গিয়াছিলেন। বলাইদাস সে দলে ছিলেন এবং সে সকল স্থানেও বিশেষ সুনাম অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

বিগত ১৭ই এপ্রেল তারিখে তিনি বক্সিংএ বার্ট টমাসকে ৪ রাউণ্ডে পরাজিত করিয়াছেন। তাঁহার মুষ্ট্যাঘাতের সময় ইংরাজ দর্শকরা এত সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন যে, তাঁহার বাজী শেষ হইবার পরেও ১০ মিনিট কাল করতালিধ্বনি হইয়াছিল।

বলাইদাস অনেকগুলি ভারতীয় বালককে তাঁহার মত সকল প্রকার খেলায় শিক্ষা দান করিতেছেন। তিনি দীর্ঘজীবী হউন। বাঙ্গালার তরুণ সম্প্রদায় তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া শারীরিক শক্তিসঞ্চয় করুন, আত্মসম্মান জ্ঞানে উদ্বুদ্ধ হউন, ইহাই কামনা।

পরলোকে ললিতমোহন সিংহ রায়

চকদীঘির ক্ষত্রিয় জমীদার রায় বাহাদুর ললিতমোহন সিংহ রায় গত ৪ঠা অগ্রহায়ণ প্রাতঃকালে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। বাঙ্গালায় যে সকল রাজপুত-পরিবার বহু পূর্ব্বে বসবাস করিয়াছিলেন, চকদীঘির সিংহ রায় বংশ তাঁহাদের অন্যতম। বহু কাল এ দেশে বসবাসের ফলে তাঁহারা প্রায় বাঙ্গালীই হইয়া গিয়াছিলেন। বাঙ্গালীর প্রায় সর্ব্ববিধ সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্ম্মগত কার্য্যে তাঁহারা এ যাবৎ আত্মনিয়োগ করিয়া আসিতেছেন। বাঙ্গালায় তাঁহাদের বহুবিধ সদনুষ্ঠানেরও পরিচয়ের অসদ্ভাব নাই। বাঙ্গালীর সুখ-দুঃখ তাঁহারা নিজস্ব করিয়া লইয়াছিলেন।

পরলোকগত ললিতমোহন পূর্ব্বপুরুষগণের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছিলেন। তিনি বাঙ্গালার বহু সাধারণ জনহিতকর কার্য্যে যোগদান করিতেন। তিনি শিক্ষিত, মিষ্টভাষী ও জনপ্রিয় ছিলেন। বাঙ্গালা ভাষার প্রতি তাঁহার যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। তাঁহার রচিত শ্যামা-সঙ্গীতাদি এ দেশের সাহিত্যানুরাগীদিগের নিকট আদর পাইয়াছিল। তিনি বিশালকায় ও সুদর্শন ছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে কবি কালিদাসের এই উক্তি বিশেষরূপে প্রযুজ্য,—

"ব্যূঢ়োরস্কো বৃষস্কন্ধঃ
শালপ্রাংশুর্মহাভুজঃ।
ক্ষাত্রকর্ম্মক্ষমং দেহং
ক্ষাত্রধর্ম্ম ইবাশ্রিতঃ॥"

ললিতমোহন সিংহ রায়

১৯১০ হইতে ২৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বাঙ্গালার ব্যবস্থাপরিষদে তিনি বর্দ্ধমান বিভাগের জমীদারশ্রেণীর নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি ছিলেন। তাঁহার মাতুল পরলোকগত সারদাপ্রসাদ সিংহ রায় স্বগ্রামে বহু সদনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন, তন্মধ্যে চকদীঘির দাতব্য হাঁসপাতাল অন্যতম। এই হাঁসপাতালরক্ষাকল্পে ললিতমোহন বিশেষ আগ্রহান্বিত ছিলেন। প্রজাদের অভাব-অভিযোগের কথা তিনি স্বয়ং শ্রবণ করিতেন। রাজা মণিলাল সিংহ রায় ও শ্রীযুত রজনীকান্ত সিংহ রায় তাঁহার জামাতা। লেফটেনেণ্ট বিজয়প্রসাদ সিংহ রায় তাঁহার দৌহিত্র। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়ঃক্রম ৬৮ বৎসর হইয়াছিল।

বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদ

দীর্ঘাবকাশের পর গত ৩রা ও ৪ঠা ডিসেম্বর বাঙ্গালা কাউন্সিলের শীতের অধিবেশন আরম্ভ হইয়াছে। আমলাতন্ত্র সরকার বাঙ্গালা হইতে দ্বৈতশাসন তুলিয়া লইতে বাধ্য হইবার পরে কাউন্সিলের অধিবেশনে জনমতের 'হাওয়া' কোন্ দিকে বহে, তাহা দেখিবার জন্য অনেকের আগ্রহ যে না হইয়াছিল, এমন নহে। বাঙ্গালার অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ও মডারেট পত্রমহলে স্বরাজ্য দলের division in the camp লক্ষ্য করিয়া মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছিল যে, এবার কাউন্সিলে জনমত নিশ্চিতই স্বরাজ্য দলের ভাঙ্গাহাটে ভাঙ্গন-নীতির ভাঙ্গা কপালের পথ গ্রহণ করিবে না; এমন কি, চৌরঙ্গীর 'ভারতবন্ধু' সরকারকে উদাসীন থাকিতে নিষেধ করিয়া একবার উঠিয়া পড়িয়া কোমর বাঁধিয়া দ্বৈতশাসন প্রবর্ত্তনে মডারেটদিগের সহিত একযোগে কার্য্য করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। সুতরাং এই কাউন্সিলে কি হয়, জানিবার জন্য আগ্রহ হওয়াটা বিস্ময়ের বিষয় নহে।

৪ঠা তারিখের অধিবেশনেই জনমতের গতি নির্ণীত হইয়া গিয়াছে। প্রথম দিনে মহারাজা ক্ষৌণীশচন্দ্রের প্রস্তাবে বাঙ্গালার প্রজাস্বত্ব আইন সংশোধনের পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধে বিচার আলোচনার ভার এক সিলেক্ট কমিটীর উপর অর্পিত হইয়াছে। এই দিনের অধিবেশন সম্বন্ধে এখন বলিবার বিশেষ কিছু নাই। সিলেক্ট কমিটীর সিদ্ধান্ত প্রকাশিত না হইলে কোন কথা বলা চলে না।

দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে সরকারপক্ষের উপস্থাপিত তিনটি প্রস্তাবই ব্যবস্থাপক সভায় না-মঞ্জুর হইয়াছে,—(১) বালী সেতুর জন্য বাঙ্গালার পক্ষ হইতে আংশিক ব্যয়বরাদ্দ করিবার প্রস্তাব, (২) বাঙ্গালার অঙ্গে শ্রীহট্টের যোজনা করিয়া দিবার বিপক্ষে প্রস্তাব, (৩) বাঙ্গালার মিউনিসিপ্যালিটীসমূহের সংশোধন-সম্পর্কিত বিলের সম্বন্ধে প্রস্তাব।

এই তিনটির কোনটিই ব্যবস্থাপক সভায় গৃহীত হয় নাই। ইহাতে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়া মহলে নৈরাশ্যের তপ্তশ্বাস বহিয়াছে। তাঁহারা বলিতেছেন, "আর কোনও আশা নাই, দ্বৈতশাসন বাঙ্গালায় চলিবার সম্ভাবনা নাই। 'মরিয়াও না মরে রাম, এ কেমন বৈরী?' স্বরাজ্য দল ছত্রভঙ্গ হইলেও তাহাদের ভাঙ্গনের প্রভাব ত বিন্দুমাত্র হ্রাস হয় নাই। তবে?"

শীতের মরশুমে ৮ই ডিসেম্বর হইতে আরও ৪ দিন কাউন্সিলের অধিবেশন হইবার কথা ছিল। এই ৪ দিনে ন্যূনাধিক ১ শত ৩০টি মন্তব্য পেশ হইবার কথা। তন্মধ্যে দুইটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য,—(১) গত বৎসর কাউন্সিল যে মন্ত্রীদিগের বেতন মঞ্জুর করেন নাই, সেই মন্ত্রীদিগের বেতন দেওয়া হউক, ইহা গৃহীত হইয়াছে। (২) বঙ্গে দ্বৈতশাসন পুনঃপ্রবর্ত্তিত হউক, অর্থাৎ যে হস্তান্তরিত বিভাগগুলি সরকার নিজ হস্তে গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা পুনরায় হস্তান্তরিত করা হউক। এই প্রস্তাব প্রত্যাহার করা হইয়াছে।

এই দুইটি মন্তব্য উপস্থাপিত হইবার পূর্ব্বে বাঙ্গালার স্বরাজ্য দলের বর্ত্তমান নেতা শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত প্রস্তাব করেন যে, সম্প্রতি বাঙ্গালার রাজনীতিক বন্দীদিগের মধ্যে তিন জনের ঘটনায় যে ব্যবহারের কথা শুনা গিয়াছে, সে সম্বন্ধে কাউন্সিলকে বিচারালোচনার অবসর প্রদানের নিমিত্ত কাউন্সিল মুলতুবী রাখা হউক। সরকারপক্ষে সার হিউ ষ্টিফেনসন ইহাতে আপত্তি করেন। কিন্তু ৮টি ভোটের জোরে সরকারপক্ষের পরাজয় হয় এবং শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহনের প্রস্তাব গৃহীত হয়।

এ পরাজয়েও হাওয়ার গতি বুঝিতে পারা যাইতেছে। বাঙ্গালার রাজবন্দীদের অবস্থার উন্নতির বিষয়ে ভারতীয়দের মধ্যে সকল শ্রেণীর রাজনীতিকই যে একমত, তাহা এই ভোটের আধিক্য দেখিয়াই বুঝা যাইতেছে। স্বরাজীরা আপন দলের সদস্যদের সমর্থন লাভ করিয়াছেন, ইহাতে বোধ হয়,দেশের যথার্থ মঙ্গলকর কার্য্যে তাঁহারা প্রথমাবধি স্বদলের বিশ্বাস অর্জ্জন করিয়া আসিতেছেন। মাঝে তাঁহাদের দলের মধ্যে মতবিরোধ উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু সে জন্য প্রকৃত জনহিতকর কার্য্যে তাঁহারা স্বদলভুক্তদিগের সহানুভূতি ও সাহার্য্য হইতে কখনও বঞ্চিত হয়েন নাই। মডারেট ও ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টদের মধ্য হইতেও বহু সদস্য স্বরাজ্যদলপতির দিকে ভোট দিয়াছেন; সুতরাং শেষ কে হাসে, তাহা এখনও বলা যায় না।

কাউন্সিলে আর একটি প্রয়োজনীয় মন্তব্য উপস্থাপিত হইয়াছিল। প্রস্তাবক ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় প্রস্তাব করেন যে, 'সরকার কাউন্সিলের ৮ জন ভারতীয় সদস্য ও ২ জন বিশেষজ্ঞকে লইয়া একটি কমিটী গঠিত করুন। ঐ কমিটী ভাগীরথীর জল কি কারণে অপবিত্র হয়, তাহার কারণ অনুসন্ধান করুন এবং ভবিষ্যতে আর যাহাতে সে কারণ বিদ্যমান না থাকে অর্থাৎ ভাগীরথীর জল যাহাতে আর অপবিত্র না হয়, তাহার উপায় নির্দ্ধারণ করুন।" তাঁহার এই প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। ইহা যে সময়োপযোগী হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ভাগীরথীর জল অপবিত্র হওয়ায় কেবল যে হিন্দুর ধর্ম্মকর্ম্মে ব্যাঘাত ঘটিতেছে,তাহা নহে. ভাগীরথীর উভয় তটবর্ত্তী স্থানসমূহ ইহার জন্য অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠিয়াছে। প্রস্তাবমত কার্য্য হইলে এই অনাচারের কারণ দূর হইতে পারে।

লর্ড সিংহের উপদেশ-সুধা

ব্যুরোক্রেশীর অনুগ্রহ-অনুকম্পার আওতায় পরিবর্দ্ধিত লর্ড সিংহ বহু ভাগ্যবিপর্য্যয়ের পর পরিণত বয়সে আশাভঙ্গ হেতু মস্তিষ্কবিকৃতি রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন বলিয়া শুনা গিয়াছিল। সম্প্রতি তিনি রোগজনিত নির্জ্জনবাস হইতে সহসা নিষ্ক্রান্ত হইয়া ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে আবার দেখা দিয়াছেন, তাঁহার অনুপম উপদেশ-সুধা-বর্ষণে এ দেশের লোককে আপ্যায়িত করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার উপদেশের গতি-প্রকৃতি দেখিয়া মনে সন্দেহ না হইতে পারে না যে, তাঁহার রোগ এখনও তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করে নাই।

অযাচিতভাবে দেশের লোককে উপদেশ দিতে অগ্রসর হইয়া লর্ড সিংহ বলিয়াছেন, "আমি এখনও বলিতেছি, ভারতবাসী স্বায়ত্ত-শাসনের যোগ্যতা অর্জ্জন করে নাই।" কেন করে নাই, তাহার কারণ দেখাইয়া রায়পুরের লর্ড বলিতেছেন, "ভারতে শাসনযন্ত্র চালাইবার মত যোগ্য ব্যক্তি যথেষ্ট আছেন বটে, কিন্তু তাহা হইলেও ইহা বুঝিতে হইবে না যে, যে গণতন্ত্রমূলক স্বরাজ আমাদের কাম্য, আমরা ১৯১৫ হইতে ১৯২৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত আমাদের কার্য্য দ্বারা সেই গণতন্ত্রমূলক স্বরাজলাভের অধিকতর যোগ্য হইয়াছি।" এইখানেই লর্ড সিংহ ক্ষান্ত হয়েন নাই, তিনি এই অপরূপ উক্তির টীকাও সঙ্গে সঙ্গে করিয়া ফেলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "কতকগুলি স্বৈরশাসকের সৃষ্টি করিয়া দেশের শাসনযন্ত্র পরিচালনা করা যায় বটে, কিন্তু তাহা হইলে উহা ত দেশের লোকের (অর্থাৎ জনসাধারণের) দ্বারা পরিচালিত শাসনযন্ত্র হইবে না। জনসাধারণ দ্বারা পরিচালিত শাসনযন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করা দুরূহ ব্যাপার। শ্বেতকায় ব্যুরোক্রেশীর পরিবর্ত্তে কৃষ্ণকায় ব্যুরোক্রেশীর প্রতিষ্ঠা করিলেই অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে না। সুতরাং গণতন্ত্রমূলক স্বরাজ প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে জনসাধারণকে অগ্রে তাহার যোগ্যতা লাভ করিতে হইবে।"

কথাটায় নূতনত্ব কিছুই নাই। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের জাতীয় কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্টরূপে তিনি এই ভাবের কথাই বলিয়াছিলেন,—আমরা এখনও স্বরাজলাভের যোগ্যতা অর্জ্জন করি নাই।

কিন্তু লর্ড সিংহকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, কবে কোন্ দেশে জনসাধারণ অগ্রে শাসনযন্ত্রের কল-কব্জার রহস্য অবগত হইয়া—সে বিষয়ে জ্ঞানের পরিপক্কতা লাভ করিয়া গণতন্ত্রমূলক শাসনাধিকার লাভ করিয়াছে, তাহা হইলে তিনি কি উত্তর দিবেন? লোককে জলে নামিতে না দিলে লোক কিরূপে সাঁতার শিখিবে? তিনি কি বলিতে পারেন যে, ফ্রান্স ও মার্কিণের মত গণতন্ত্রশাসিত দেশের জনসাধারণ দীর্ঘকাল স্বরাজ উপভোগ করিবার পর এখনও শাসনযন্ত্রের সকল রহস্য অবগত হইয়াছে? দেশের জনসাধারণ কোনও দেশে শাসনযন্ত্র পরিচালনা করে না, তাহাদের মধ্যে যাঁহারা শিক্ষিত ও অবস্থাভিজ্ঞ, সেই সকল প্রতিনিধিই তাহাদের হইয়া শাসনযন্ত্র পরিচালনা করিয়া থাকেন। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, মার্কিণ—সকল দেশেরই এই ব্যবস্থা। তবে ভারতের বেলা এ নিয়মের ব্যতিক্রম হইবে কেন? ইংলণ্ডেরই লেখক মিঃ বনার ১৯২৩ খৃষ্টাব্দের 'নাইন্‌টিস্থ সেঞ্চুরী' পত্রে লিখিয়াছিলেন, "দেশের জনসাধারণ, জনসাধারণ হিসাবে শাসনকার্য্য পরিচালনে অসমর্থ, তাহারা সে কথা বিলক্ষণ অবগত আছে, পরন্তু শাসনযন্ত্র পরিচালনা

করিবার ইচ্ছাও তাহারা প্রকাশ করে না।” তবে? তবে কি লর্ড সিংহের মাপকাঠি লইয়া ভারতবাসীকে প্রলয়ান্ত কাল পর্য্যন্ত জনসাধারণের যোগ্যতালাভের জন্য অপেক্ষা করিতে হইবে?

আমাদের মনে হয়, অসুস্থ শরীরে লর্ড সিংহের বর্ত্তমান রাজনীতিক ঘূর্ণীপাকে ঝম্পপ্রদান করা ভাল হয় নাই।

শ্মশানে সোনার প্রদীপ

দেশের লোক দুই বেলা পেট পুরিয়া খাইতে পায় না, সরকারী তহবিলে অর্থাভাবে তাহাদের রোগের আবশ্যকমত প্রতীকার-ব্যবস্থা হয় না, সুপেয় পানীয়ের ব্যবস্থা হয় না, কচুরীপানা উচ্ছেদের উদ্যোগ-আয়োজন অঙ্কুরেই লয়প্রাপ্ত হয়—অথচ এ দেশে ভাগ্য-বিধাতাদের বিলাস-ব্যসনে অর্থ বণ্টন করিতে বলিবার ও সমর্থন করিবার উকীলের অভাব হয় না। এ দেশের ইহাই বিশেষত্ব। কথা উঠিয়াছে, হাওড়ার জীর্ণ সেতু ভাঙ্গিয়া বিরাটকলেবর নূতন ধরণের সেতু প্রস্তুত কর, সহরের বুকের উপর বিমান-রেলপথ নির্ম্মাণ কর, টালীগঞ্জে পার্ক ও খাল কর, বেহালায় বাচ-খেলার আড্ডা কর। ফর্দ্দ খুবই লম্বাচোড়া। এ ফর্দ্দ করিতে বিশেষ ভাবনাচিন্তা নাই, কেন না, গৌরীসেন আছে, টাকার ভাবনা কি?

এ দেশের ভাগ্যবিধাতা ক্লাইভ ষ্ট্রীট ও চৌরঙ্গীর কর্ত্তাদের ভোগ-বিলাস চরিতার্থ করিবার মূলে যে একটা গূঢ় রহস্য নিহিত আছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বিলাতে বেকার-সমস্যা দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছে। ভারতের কামধেনু দোহন করিতে পারিলে সে সমস্যা অবসানের কতকটা সদুপায় হয়। সেখানকার কল-কারখানাওয়ালা যদি ভারতে রেল, পুল ও অন্যান্য যন্ত্রপাতির অর্ডার প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে অনেক বেকারের কায জুটে। ইহা যে এই সব ‘সহরের উন্নতির’ কতকটা মূল কারণ,তাহা অনুমানে বুঝিয়া লওয়া যায়। খাইবার রেল নির্ম্মাণে আড়াই কোটি টাকা ব্যয় হইয়াছে। টাকাটা অবশ্য ভারতের। এই রেল নির্ম্মাণে ভারতবাসীর কি উপকার হইয়াছে? সত্য বটে, সীমান্ত জাতিরা রেলের সম্পর্কে জনমজুরী পাইয়াছিল,কিন্তু বক্রী কাযগুলা? সাজ-সরঞ্জাম কোথা হইতে আসিল? এই রেল হইতে ভারতের কি আয় হইবে? সাইলক বলিয়াছিল,—Money breeds টাকা ফল প্রসব করে। এ ক্ষেত্রে খাইবার রেল ভারতের জন্য কি স্বর্ণডিম্ব প্রসব করিবে?

এই ভাবে পার্ক, খাল, পুল, রেলও পয়দা হইবে। ইহাতে দরিদ্র ভারত-প্রজার কি লাভ হইবে, কর্ত্তৃপক্ষ তাহা বুঝাইয়া দিবেন কি?

শ্রীযুত রাইমোহন রায় চৌধুরী

বালিয়াটীর সুপ্রসিদ্ধ জমীদার শ্রীযুত রাইমোহন রায় চৌধুরী মহাশয় রোগমুক্ত হইয়া আবার স্বদেশ-সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। দেশে জলাশয়, চিকিৎসালয়,

শ্রীযুত রাইমোহন রায় চৌধুরী

হাট, বিদ্যালয়প্রতিষ্ঠা প্রভৃতির জন্য ইঁহাদের ব্যয়বাহুল্য চিরপ্রসিদ্ধ। সম্প্রতি বালিয়াটীতে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

ভাইকম সত্যাগ্রহে ত্রিবাঙ্কুড়ের রাজমাতা

ত্রিবাঙ্কুড়ের রাজমাতা তাঁহার রাজ্যমধ্যে ভাইকম সত্যাগ্রহীদের প্রতি যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহার জন্য তিনি নিশ্চিতই হিন্দু জনসাধারণের শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছেন। তাঁহার রাজ্যমধ্যে ভাইকম সহরের দেবমন্দিরের প্রবেশ-পথে জনসাধারণের প্রবেশাধিকার ছিল না। অন্ত্যজ ও অস্পৃশ্য বলিয়া যাহারা অভিহিত, তাহারা 'মনুষ্য' বলিয়া স্বীকৃত হয় না; ইহাই দাক্ষিণাত্যের সমাজবিধি। ইহারই বিপক্ষে ভাইকমে সত্যাগ্রহ আন্দোলন হইয়াছিল।

বর্ত্তমানে ভারতে মুক্তি-সমর চলিতেছে। এ সময় কেবল রাজনীতিক্ষেত্রে নহে, ধর্ম্ম ও সমাজনীতিক্ষেত্রেও এই সময়ে দেশের নবজাগ্রত জনমত আকুল আগ্রহভরে ঝম্পপ্রদান করিয়াছে।

ত্রিবাঙ্কুড়ের রাজমাতা

ধর্ম্মক্ষেত্রে আমরা পঞ্জাবে এবং তারকেশ্বরে এই মুক্তি-সমরের পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছি। পঞ্জাবের শিখ গুরুদ্বার আন্দোলনে যে বিরাট ত্যাগের দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত হইয়াছে, তাহাতে জনসাধারণের অসাধারণ সহন-ক্ষমতার ভিত্তির উপর যে মুক্তির শুদ্ধ পবিত্র মন্দির অচিরে গঠিত হইয়া

মাদ্রাজের গবর্ণর লর্ড গসেন ও ত্রিবাঙ্কুড়ের নাবালক মহারাজা

আকাশে গর্ব্বোন্নত শির উত্তোলন করিয়া দণ্ডায়মান হইবে, এমন আশা স্বতঃই মনে উদয় হয়। তারকেশ্বরেও বাঙ্গালার জনসাধারণের যে ত্যাগ, যে সঙ্ঘবদ্ধতা, যে শৃঙ্খলা ও যে সহন-ক্ষমতার উজ্জ্বল আদর্শ পরিদৃষ্ট হইয়াছে, তাহাতে মনে হয়, এই আদর্শ বিফল হইবার নহে, উহার পুণ্যপ্রভাব দেশমধ্যে অশেষ কল্যাণ সাধিত করিবার হেতু হইবে। যুগ-যুগ-সঞ্চিত সংস্কারের বিরাট আবর্জ্জনাস্তূপ অপসারিত করিয়া দেশের সনাতন ভাবধারা সহজ, সরল, অনাবিল ও অনায়াসগতিতে ধাবিত হইবে, এই মুক্তি-সমরের প্রাণপ্রতিষ্ঠায় তাহারই আভাস পাওয়া যাইতেছে।

অস্পৃশ্যতা-পাপ আমাদিগকে বিরাট অজগরের মত অষ্টপৃষ্ঠে বন্ধন করিয়া রাখিয়াছে। যুগ যুগ ধরিয়া এই পাপ সমাজ-শরীরে প্রবেশ করিয়া সমাজকে জর্জ্জরিত করিয়াছে। এ পাপ হইতেও মুক্তির চেষ্টা হইতেছে। দাক্ষিণাত্যের রামেশ্বর, মীনাক্ষীসুন্দর, শ্রীরঙ্গ প্রভৃতি মন্দিরের গর্ভগৃহে অন্য পরে কা কথা, আর্য্যাবর্ত্তের ব্রাহ্মণ-গণেরও প্রবেশাধিকার নাই। দাক্ষিণাত্যের তামিল ব্রাহ্মণ পাণ্ডারা বলিয়া থাকেন যে, বিন্ধ্য পর্ব্বতের উত্তরস্থ ব্রাহ্মণরাও শূদ্রভাবাপন্ন, যেহেতু, তাঁহারা তামাকু সেবন করিয়া থাকেন, মৎস্য আহার করিয়া থাকেন। এ বিষয়ে আমাদের বিশেষ অভিজ্ঞতা আছে। আমরা রামেশ্বরে এইরূপে বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছিলাম। আমাদের সহিত এক জন বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ছিলেন, পাণ্ডারা

তাঁহাকেও গর্ভগৃহে প্রবেশ করিতে দেয় নাই। তর্ক-বিতর্ককালে আমরা শুনিয়াছিলাম, বাঙ্গালার এক সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ জমীদার এই অবরনস্তির কথা শুনিয়া মাদ্রাজ হইতে দেশে ফিরিয়া গিয়াছিলেন, অথচ তিনি বিস্তর খরচ করিয়া রামেশ্বর শিবলিঙ্গের উপরে ঢালিবার জন্ম গঙ্গোত্রী হইতে গঙ্গাজল আনয়ন করিয়াছিলেন! নেপালের মহারাণা চন্দ্রসমসের জঙ্গ বাহাদুরজীও সপরিবারে রামেশ্বরদেবকে পূজা করিতে গিয়া বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাহার পর তিনি বলপূর্ব্বক পূজার কার্য্য সমাধা করিয়া ১০ সহস্র মুদ্রা প্রণামী দিয়াছিলেন।

ভদ্র ও উচ্চবংশীয় আর্য্যাবর্ত্তবাসীর প্রতি এই ব্যবহার। তবেই বুঝিয়া দেখুন, দাক্ষিণাত্যের অন্ত্যজ অস্পৃশ্যদিগের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করা হয়! এই হতভাগ্যরা মন্দিরের অভ্যন্তরে ত প্রবেশ করিতে পারেই না, মন্দিরে যাইবার পথেও তাহাদের প্রবেশ নিষেধ। কেবল ভাইকমে কেন, ভারতের অন্যত্র 'অন্ত্যজ অস্পৃশ্য'দিগের প্রতি তথাকথিত উচ্চবর্ণীয়া যেরূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাহা মানুষ পশুর প্রতিও করে না। শুনা যায়, সিন্ধুপ্রদেশে একটি ব্রাহ্মণ বালক গ্রামের কূপের মধ্যে দৈবাৎ পড়িয়া গিয়াছিল। সেখানে কতকগুলি ব্রাহ্মণ-মহিলা উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা বালকের উদ্ধারের উপায় করিতে না পারিয়া কেবল চীৎকার ও হা-হুতাশ করিতেছিলেন। এমন সময়ে ঐ পথ দিয়া কয়জন দোসাদ বা চামার জাতীয় লোক দিনমজুরী করিতে যাইতেছিল। তাহারা ব্যাপার শুনিয়া দৌড়িয়া বালকের উদ্ধার-সাধন করিতে গেল। কিন্তু ব্রাহ্মণ মহিলারা কূপের পথ আগুলিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "খবরদার, ওদিকে যাস নি, জল ছুঁলে অপবিত্র হবে।"

বুঝিয়া দেখুন, ব্যাপার যদি সত্য হয়, তাহা হইলে অবস্থা কি ভীষণ! আপনাদেরই এক বালকের অপঘাত মৃত্যু হইতেছে, অথচ তাহার জীবনরক্ষার উপায় থাকিতেও স্পর্শের ভয়ে তাহার প্রাণরক্ষা করিতেও তাঁহারা অনুমতি প্রদান করিলেন না! ইহা হইতে সংস্কারের প্রভাব কিরূপ ভীষণ, বুঝিতে বিলম্ব হয় না। 'অন্ত্যজ' হিন্দু, মুসলমান বা খৃষ্টান হইলে হিন্দুর নিকট যে অধিকার প্রাপ্ত হয়, হিন্দু থাকিলে তাহা প্রাপ্ত হয় না। এ জন্ম দলে দলে হিন্দু ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়া থাকে। অথচ হিন্দু-সমাজের চৈতন্ম হয় না। অস্পৃশ্যতাবর্জ্জন মন্ত্রের প্রবর্ত্তক মহাত্মা গন্ধী বলিয়াছেন, "একত্র পান-ভোজন বা বিবাহের আদানপ্রদান সকল জাতির প্রবর্ত্তন করার সম্পর্ক ইহাতে নাই, মানুষের প্রতি মানুষের মত ব্যবহার করারই প্রয়োজন।" ভাইকমে 'অন্ত্যজরা' মানুষের মত ব্যবহার পায় নাই বলিয়া সত্যাগ্রহ আন্দোলন হইয়াছিল। সে আন্দোলনে কেবল যে অস্পৃশ্যরা আত্মনিয়োগ করিয়াছিল, তাহা নহে, স্থানীয় কংগ্রেস কমিটীর বহু সম্ভ্রান্ত সদস্যও তাহাতে যোগদান করিয়া কষ্ট-বিপদ সহ্য করিয়াছিলেন। মহাত্মা গন্ধী এই আন্দোলনে পূর্ণ সহানুভূতি জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। এ মুক্তি-সমরে জনমতের জয় হইয়াছে, জনসাধারণের কষ্টসহন ক্ষমতা সফল হইয়াছে, জনসাধারণ মন্দিরের পথে প্রবেশের অধিকার লাভ করিয়াছে।

এই জয়ে ত্রিবাঙ্কুড়ের রাজমাতারও অংশ আছে। রাজমাতা পরম বুদ্ধিমতী ও বিদুষী। তিনি স্বামীর মৃত্যুর পর হইতে নবীন মহারাজার অভিভাবিকারূপে সুশৃঙ্খলার সহিত রাজ্যশাসন করিতেছেন। তাঁহার দয়া, সৌজন্য এবং জনহিতকর কার্য্য লোকবিশ্রুত। মহাত্মা গন্ধী তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া অস্পৃশ্যতা-পাপের কথা বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। রাজমাতা এই বরেণ্য অতিথির যথেষ্ট সমাদর করিয়া ধৈর্য্যসহকারে তাঁহার যুক্তিতর্ক শ্রবণ করিয়াছিলেন এবং একটা আপোষ বন্দোবস্ত করিবেন বলিয়া আশা দিয়াছিলেন। তাহারই ফলে আজ ভাইকমে সত্যাগ্রহের জয় হইয়াছে, জনসাধারণ মন্দিরপথে প্রবেশাধিকার লাভ করিয়াছে। এখন আবার মন্দিরপ্রবেশাধিকারলাভের জন্ম আন্দোলনের আয়োজন হইতেছে।

রাজমাতা জনমতের সম্মান রক্ষা করিয়া তাঁহার রাজনীতিকতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। তিনি দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া দাক্ষিণাত্যের অস্পৃশ্যতা-পাপ দূর করিতে আত্মশক্তি নিয়োজিত করুন, ইহাই কামনা।

মহাভিনিষ্ক্রমণ

দিন আসে, দিন যায়; কিন্তু কি ভাবে আসে এবং কি ভাবে যায়? যিনি পৃথিবীর অন্ধকার মোচন করিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, কি দৃষ্ট, কি অদৃষ্ট, কি দূরবাসী, কি নিকটবাসী, কি ভূত কালের, কি ভবিষ্যৎ কালের যে কোন প্রাণী হউক না কেন, সকলকে সুখী করিতে বদ্ধপরিকর হইয়া যিনি ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছেন, প্রমোদ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া তিনি কি দিন কাটাইতে পারেন? সংসারের ক্ষণস্থায়ী সুখভোগে কি তিনি বদ্ধ থাকিতে পারেন?

অন্তঃপুরের চতুর্দ্দিকে নরপতি শুদ্ধোধন প্রচুর ভোগবিলাসের ব্যবস্থা করিয়াছেন। সুবেশা নর্ত্তকীগণ হাব-ভাব, তান-লয়সংযোগে মধুর সঙ্গীত গাহিতেছে। হাস্যময়ী, প্রেমময়ী গোপা স্বামীর আনন্দবর্দ্ধনার্থ কি না করিতেছেন? কিন্তু যিনি সমগ্র জাতির দুঃখ দূর করিবার সুমহৎ ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন, রাজান্তঃপুরের প্রচুর ভোগবিলাসের ও আড়ম্বরের মধ্যেও তাঁহার চিত্তে শান্তি ছিল না। তাই আদরিণী যশোধরার পার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়াও সিদ্ধার্থ বলিতেছেন:—

"বদ্ধ আছি প্রমোদ-ভবনে
বিশাল বিস্তার স্থান তোরণ-বাহিরে।
ভাবি প্রিয়ে, এসেছি কি কাযে,
কি কাযে কাটাই দিন?
অজ্ঞান-আঁধারে রয়েছি সংসারে,
কারাবাসে প্রফুল্ল অন্তরে,
বারেক না ভাবি জীবনের লক্ষ্য কিবা?"

গোপা ভাবিয়া আকুল! কিসে প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম স্বামীর মনে এরূপ উদাস ভাব জন্মে? কি প্রকারে তাঁহার এই ব্যাকুলতা দূর হয়? ভোগ-সুখের প্রতি আকৃষ্ট রাখিবার জন্য নরপতি কি না করিতেছেন? পুত্রের জন্যই ত তিনি অহোরাত্র আকুল। কিসে পুত্রের মনে শান্তি হয়? তাঁহার উদাসীন চিত্তকে ভোগাসক্তির দিকে আকৃষ্ট রাখিবার জন্য তাঁহাকে বিবাহপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। নিত্য নূতন নৃত্য-গীত-আমোদ-প্রমোদের বিশেষ ব্যবস্থা করিতেছেন। তবে? তবে কি গোপা স্বামীর চিত্তবিনোদনে সমর্থ নহেন? স্বামী কি তাঁহারই জন্য সংসারে অনাসক্ত? সাধ্বী স্ত্রীর মনে অশান্তির সীমা নাই। কি কারণে, কি অপরাধে তিনি স্বামীকে আপন করিতে পারিতেছেন না? তাই গোপা ম্রিয়মাণা।

সুবুদ্ধি সিদ্ধার্থ স্ত্রীর আক্ষেপের কারণ বুঝিতে পারিলেন। না, না, তোমার জন্য এ উদাসভাব নয়!

"যত দিন দেখি নাই বদন তোমার,
শূন্যময় হেরিতাম সুন্দর সংসার;
এখন আমি তব, তুমি হে আমার,
ছায়া কোথা আর?
সকলি আলোকময়।"

যশোধরা স্বামীর কথায় আহ্লাদিতা হইলেন। মনের আঁধার কাটিয়া গেল। তাই ত! ইহা কি সম্ভব হয়? যে স্বামী তাঁহাকে সহস্র সহস্র নারীর মধ্য হইতে স্বেচ্ছায় স্বয়ং দেখিয়া নির্ব্বাচিত করিয়াছেন, যাঁহার আদরে তিনি গরবিণী, তিনি কি তাঁহাকে না ভালবাসিয়া পারেন? তথাপি তিনি স্বামীকে নিজ স্বপ্নবৃত্তান্ত না বলিয়া থাকিতে পারিলেন না।

গোপা এক অদ্ভুত, আশ্চর্য্য স্বপ্ন দেখিয়াছেন। জগতে এক ভীষণ প্রলয় হইয়াছে। পর্ব্বতসমূহ উৎপাটিত হইয়াছে, সূর্য্য অন্ধকারে আবৃত; চন্দ্র স্বর্গ হইতে ভূমিতলে পতিত হইয়াছে। তাঁহার নিজ মুকুট ভূমিতলে গড়াগড়ি যাইতেছে; সুবর্ণের অলঙ্কার, মণিময় হার ছিন্নভিন্ন। তাঁহার হস্তপদ কর্ত্তিত হইয়াছে। যে শয্যায় উভয়ে সুখে শায়িত ছিলেন, সে শয্যা শোভাহীন; স্বামীর রত্নময় অলঙ্কার ইতস্ততঃ প্রক্ষিপ্ত। নগর হইতে ভীষণ জলন্ত অগ্নি ছুটিতেছে। প্রমোদ-কাননের সুবর্ণ-দণ্ডগুলি ছত্রভঙ্গ; পুষ্পবাটিকা বজ্রাঘাতে ধ্বংস হইয়াছে। দূরে সমুদ্রের জলরাশি উত্তপ্ত—মেরু টলায়মান।

গোপা স্বপ্নবৃত্তান্ত বলিতে বলিতে কাঁপিতে লাগিলেন। তাঁহার চিত্তে সুখ নাই। অজানিত বিপদের আশঙ্কা করিয়া তিনি একান্ত ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িতেছিলেন। বুঝি ভবিষ্যৎ বক্তৃগণের বাণী সফল হয়! বুঝি স্বামী তাঁহাকে ত্যাগ করেন! সুবাদিনী ভয়ে কাঁপিতেছিলেন।

সিদ্ধার্থ সাধ্বীকে আশ্বাস দিতে লাগিলেন ;—"সে কি, উহাতে ভয়ের কি আছে ? স্বপ্ন অমূলক চিন্তামাত্র। উহাতে আস্থাস্থাপনের কিছুই নাই। তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া, মায়া-শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া, পুত্রকে ফেলিয়া তিনি কোথায় যাইবেন ? অসম্ভব।"

গোপা স্বামীর কথায় আশ্বস্ত হইলেন। সখীগণ মধুর সঙ্গীতে তাঁহার চিত্তবিনোদন করিতে লাগিল। প্রমোদাগারে উভয়েই নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন।

গভীর রাত্রিতে স্বামি-স্ত্রী পর্য্যাঙ্কোপরি নিদ্রিত। জগৎ নিস্তব্ধ। কিন্তু দূর হইতে কে যেন গাহিতেছিল —

"কি কাযে এসেছি কি কাযে গেল,
কে জানে কেমন কি খেলা হ'ল!
প্রবাহের বারি, রহিতে কি পারি,
যাই, যাই কোথা—কূল কি নাই ?
কর হে চেতন, কে আছ চেতন,
কত দিনে আর ভাঙ্গিবে স্বপন ?
যে আছ চেতন, ঘুমাও না আর,
দারুণ এ ঘোর নিবিড় আঁধার ;
কর তমোনাশ, হও হে প্রকাশ,
তোমা বিনে আর নাহিক উপায়
তব পদে তাই শরণ চাই।"

সিদ্ধার্থ নিদ্রিত, কিন্তু এই সঙ্গীত তাঁহার কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল। তিনি জাগ্রত হইলেন। পার্শ্বে গোপা, চতুর্দ্দিকে নর্ত্তকীগণ। এখন আর তাহাদের সে হাব-ভাব নাই ; তাহাদের তনু আর আবেশে অবশ নহে। এখন তাহাদের বিকৃত ভাব, তাহারা সংজ্ঞাহীন, শবের ন্যায় পতিত। গবাক্ষ দিয়া চন্দ্রকিরণ আসিতেছিল—সে স্নিগ্ধ কিরণমালা ত এখন আর সিদ্ধার্থের ভাল লাগিতেছিল না—উহা এখন বিষময় বোধ হইতেছিল। তাই সিদ্ধার্থ বলিলেন,—

"ধিক্ ধিক্ মানবের সংস্কার!
মরুভূমি-মাঝে ভ্রমে মরীচিকা পাছে পাছে!
ভুলি আশার ছলনে,
ঐ সুখ—ঐ সুখ বলি,
ধেয়ে যায় উন্মত্তের প্রায় ;
শতবার প্রতারিত, তবু নাহি শিখে,
শত দুঃখে ভ্রান্তি নাহি ঘুচে।
যেতে চাই—রাখে যেন ধ'রে।"

সিদ্ধার্থ বুঝিলেন, আর বিলম্ব করিবেন না। যতই বিলম্ব করিবেন, ততই মায়া বাড়িবে, নিগড় আরও কঠিন হইবে। যে কার্য্যের জন্য ধরাধামে আসিয়াছেন, সে কার্য্য সমাধান করা কঠিন হইবে, হয় ত আর সময় আসিবে না। তাই তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। সংসার-বন্ধন ছিন্ন করিতেই হইবে। পিতার আদর, স্ত্রীর প্রেম, পুত্রের মায়া—সব বৃথা। রাজ্যৈশ্বর্য্যভোগ, সুখের প্রলোভন আর তাঁহাকে প্রলুব্ধ করিয়া রাখিতে পারিল না। জনক ও মাতৃস্বসার স্নেহপাশে, "আজন্ম অধ্যুষিত প্রাসাদের সুখস্মৃতি" আর তাঁহাকে বদ্ধ করিতে পারিল না। শৃঙ্খলমোচন হইল, অনন্ত জীবের অব্যক্ত আহ্বানে, তিনি সর্ব্বত্যাগী হইলেন ; মহাদুঃখে নিপতিত অসহায় প্রাণীর উদ্ধারের জন্য তিনি ক্ষুদ্র প্রমোদ-আগারের ক্ষণস্থায়ী আনন্দ বর্জ্জন করিয়া, ছন্দককে অশ্ব আনয়নার্থ আহ্বান করিলেন। ক্ষুদ্র কপিলাবস্তু আর তাঁহাকে আবদ্ধ রাখিতে পারিল না। জগতের দুঃখ-মোচনের জন্য, আরব্ধ কার্য্য সমাধা করিবার জন্য, সঙ্কল্পসিদ্ধির নিমিত্ত তিনি সব বিসর্জ্জন দিয়া নিজ ভূমি পরিবর্জ্জন করিলেন। ক্ষুদ্র রাজধানী, ক্ষুদ্রতর প্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া তিনি এক্ষণে বিশাল, বিরাট পৃথিবীর দুঃখমোচনে অগ্রগামী হইলেন।

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার (অধ্যাপক, এম, এ)।

রাজমাতা—১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের প্রতিকৃতি

রাজমাতা আলেকজান্দ্রা

ইংলণ্ডের রাজমাতা আলেকজান্দ্রা ৮১ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। প্রায় ৬৩ বৎসর পূর্ব্বে ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের ৭ই মার্চ্চ তারিখে ১৯ বৎসর বয়সে রাজকুমারী আলেকজান্দ্রা বিলাতে পদার্পণ করেন। তিনি ডেনমার্কের রাজা নবম ক্রিশ্চিয়ানের কন্যা, তাঁহার সহিত মহারাণী ভিক্টোরিয়ার জ্যেষ্ঠ পুত্র যুবরাজ (প্রিন্স অফ ওয়েল্‌স) এলবার্ট এডোয়ার্ডের বিবাহের কথা স্থির হইয়াছিল। সুতরাং তিনি ইংলণ্ডের রাজবংশের চিরাচরিত প্রথানুসারে রাজপুত্রের ভাবী বধূরূপে ইংলণ্ডে আসিয়াছিলেন। ইংলণ্ডে পদার্পণের তিন দিন পরে তাঁহাদের উদ্বাহক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

রাজমাতা—১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের প্রতিকৃতি

বিবাহের পর হইতেই রাজকুমারী আলেকজান্দ্রা একবারে ইংরাজ রাজকুলবধূই হইয়া যায়েন। তিনি পরমা সুন্দরী, মিতভাষিণী, কোমলপ্রাণ ও নানা সদগুণশালিনী ছিলেন। এ জন্য ইংরাজ জাতি প্রথমাবধিই তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল। তাঁহাকে বহু লেখক sweetheart of the nation বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ইহা সামান্য সুখ্যাতির কথা নহে।

১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে তাঁহার জন্ম হয়। রুসিয়ার জার প্রথম নিকোলাসের কন্যা প্রিন্সেস আলেকজান্দ্রা তাঁহার ধর্ম্মমাতা ও নিকট আত্মীয়া ছিলেন, তাঁহার নামেই তাঁহার নামকরণ হইয়াছিল। তাঁহার পুরা নাম প্রকাণ্ড, ক্যারোলাইন মেরি সার্লোট লুইসি জুলি আলেকজান্দ্রা। কিন্তু শেষোক্ত নামটিই ইংলণ্ডের লোকের প্রিয়।

৬০ বৎসরকাল তিনি ইংলণ্ডের জনসাধারণের হৃদয়ের উপর আধিপত্য করিয়া আসিয়াছেন। ডিন ষ্টানলি তাঁহার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—"আলেকজান্দ্রা অতীব সরলপ্রকৃতি এবং লোকের চিত্তহরণকারিণী।" বিখ্যাত ঔপন্যাসিক চার্লস ডিকেন্স তাঁহার সম্বন্ধে লিখিয়া গিয়াছেন যে, "আলেকজান্দ্রা কেবল ভয়ভীতা লজ্জাশীলা বালিকা নহেন, তাঁহার মুখমণ্ডলে এমন একটা গাম্ভীর্য্য ও ঔদার্য্য দেখা যায়, যাহাতে মনে হয় যে, তাঁহার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য আছে, একটা নিজস্ব বলিয়া জিনিষ আছে।"

বিবাহের ২১ বৎসর পরে

তাঁহার সুদীর্ঘ বিবাহিত জীবনের অধিকাংশ কাল তিনি 'প্রিন্সেস'রূপেই অতিবাহিত করিয়াছিলেন; কিন্তু মহারাণী ভিক্টোরিয়ার শেষ জীবনে তাঁহাকেই রাজপ্রাসাদের 'গৃহিণীর' কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইত। অথচ তিনি অপেক্ষাকৃত শান্ত নির্জ্জন জীবনযাপন করিতে ভালবাসিতেন। তাঁহার স্বামী যখন যুবরাজরূপে ভারতে আইসেন, তখন তিনি তাঁহার সঙ্গে ভারতযাত্রা করেন নাই।

মহারাণী ভিক্টোরিয়ার দেহাবসানের পর তিনি ইংলণ্ডেশ্বরী হইয়াছিলেন, ইংলণ্ডেশ্বর সপ্তম এডোয়ার্ডের সহধর্ম্মিণীরূপে রাজ্যের সুখ-দুঃখের অংশভাগিনী হইয়াছিলেন। তাঁহার অন্তঃকরণ অতি কোমল ছিল। ব্যথিত পীড়িতদিগের প্রতি তাঁহার সহানুভূতি অকৃত্রিম ছিল। এই জন্য রাজ্যের লোক তাঁহাকে

১৮৮০ খৃষ্টাব্দে ওয়েলসের যুবরাজপত্নী রূপে

আন্তরিক ভালবাসিত, ভক্তি শ্রদ্ধা করিত। কুমারী ফ্লোরেন্স নাইটিংগেল সেবাধর্ম্মের যে পথ দেখাইয়া গিয়াছিলেন, মহারাণী আলেকজান্দ্রা সেই পথ অনুসরণ করিয়াছিলেন। বুয়র-যুদ্ধকালে তিনি সেবারতা নারী সমিতির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং ১৯০২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার ইম্পিরিয়াল মিলিটারী নার্সিং সার্ভিসের প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। তাঁহার স্বামী সপ্তম এডোয়ার্ড যেমন peace maker অথবা শান্তিপ্রতিষ্ঠাতা বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন, তেমনই তিনিও আহত ও পীড়িতের সেবাকারিণী আখ্যা লাভ করিয়াছিলেন।

জীবনে তিনি পুত্রশোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রিন্স এলবার্ট ভিক্টর (যিনি ভারত-ভ্রমণে আসিয়াছিলেন) বিবাহের অব্যবহিত পূর্ব্বেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়েন, সে শোক তাঁহাকে বড়ই বাজিয়াছিল। স্বামিহারা হইবার পর হইতে তিনি একবারে নির্জ্জন বাস গ্রহণ করিয়াছিলেন।

আজ তাঁহার বিয়োগে সমগ্র সভ্য জগৎ ব্যথা প্রকাশ করিতেছে। যিনি মানুষের মনের উপর এরূপ প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন, তিনি যে সৌভাগ্যবতী, ইহাতে সন্দেহ নাই।

রাজমাতা—আধুনিক প্রতিকৃতি

শিকার-বেশে আলেকজান্দ্রা

স্পষ্ট কথা

চিনির মোড়কে মোড়া নিমের বড়ী অপেক্ষা খাঁটি ভাজা নিম অনেক ভাল। ভারতের সম্পর্কে আমাদের ভাগ্য-বিধাতাদের মুখে অনেক লম্বাচৌড়া গালভরা উদার আশার কথা শুনা যায়। কখনও শুনি, আমরা বৃটিশ সাম্রাজ্যের অংশীদার; কখনও ঘোষণা হয়, আমরা বৃটিশ নাগরিকের অধিকার পাইয়াছি; আবার কখনও বা বড় গলায় কর্তারা বক্তৃতা করেন যে, তাঁহারা বন্ধুত্ব ও সহযোগের হাত বাড়াইয়াই আছেন, আমরা কেবল gestureটুকু করিলেই হয়।

এ ভাবের কথা শুনিতে শুনিতে মন তিক্ত হইয়া গিয়াছে। তবু ইহার মধ্যে যদি দুই একটা প্রকৃত সত্য কথা শুনা যায়, তাহা হইলেও মনটা খুসী হয়। একবার কলিকাতার গৌরাঙ্গ বণিক ওয়াটসন সাহেব আমাদিগকে দাঁত দেখাইতে তাঁহার দেশের লোককে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। আর একবার 'পাইওনিয়ার' পত্র আমাদিগকে তাঁহার জাতের Tiger qualities দেখাইয়াছিলেন। আর অতিরিক্ত অধিকার চাহিলেই—Thus far and no farther এর গণ্ডীর বাহিরে এক পদ অগ্রসর হইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেই, ওপক্ষ হইতে তরবারি-ঝঞ্ঝনা যে কতবার হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। আমাদের মনিবরা তখন বলিয়াছেন, We have won India by the sword, and we mean to keep it by the sword.

এ সকল দেখিয়া শুনিয়াও কিন্তু আমাদের দেশের এক শ্রেণীর ভাবুকের অটল বিশ্বাস টলে না,—তাঁহারা জানেন, এক পরম কারুণিক বিধাতাপুরুষ দয়াপরবশ হইয়া ইংরাজের হস্তে আমাদের মত নাবালক নালায়েক জাতির অভিভাবকত্বের ভার সমর্পণ করিয়াছেন এবং ইংরাজ নানা কষ্ট, নানা স্বার্থত্যাগ স্বীকার করিয়া আমাদের মঙ্গলের ও স্বার্থের জন্য এ দেশ শাসন করিতেছেন; তাঁহাদের অবগতির জন্য আমরা তাঁহাদিগকে মনিবের দেশের স্বরাষ্ট্র-সচিব সার জয়েনসন হিক্সের সে দিনের একটা বক্তৃতা পাঠ করিতে বলি। তারের সংবাদে প্রকাশ, সার জয়েনসন সেই বক্তৃতায় ইংরাজ শ্রোতৃমণ্ডলীকে বলিয়াছেন, "আমরা ভারতের স্বার্থের বা মঙ্গলের জন্য ভারত শাসন করিতেছি, এ কথাটা একবারে পাহাড়ে মিথ্যা।" শ্রোতৃমণ্ডলী অমনই সমস্বরে বলিয়া উঠেন, shame shame! সার জয়েনসন জবাব দেন, "লজ্জার কথাই বল, আর যাহাই বল, আমি যাহা বলিতেছি, তাহা খাঁটি সত্য। আমি ভারতকে সভ্যতালোকে আনয়ন করার কার্য্যে সহানুভূতি প্রকাশ করি, নিজেও এই কার্য্য অনেক করিয়াছি। কিন্তু তাহা বলিয়া আমি এত ভণ্ড নহি যে, বলিব, আমরা ভারতীয়দের স্বার্থের জন্য ভারত শাসন করিতেছি। ভারতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বৃটিশ পণ্য—বিশেষতঃ লাঙ্কাশায়ারের পণ্য কাটিয়া থাকে। এই জন্যই আমরা ভারত শাসন করিতেছি।" কেমন? এ কি সহযোগ "প্রেমনদীতে বইছে তুফান" না?

জড়বাদের বিপক্ষে বিদ্রোহ

জড়বাদী প্রতীচ্য জড়জগতের প্রাকৃতিক শক্তিকে শৃঙ্খলিত করিয়া আপনার ধনাগম ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সুবিধা করিয়া লইতেছে বটে, কিন্তু প্রতীচ্যের সকলেই যে আধ্যাত্মিক উন্নতিমার্গে বিচরণ করিতে আগ্রহান্বিত নহে, এমন কথা বলা যায় না। প্রতীচ্যের বহু মনীষী তাঁহাদের দেশে জড়ের পূজার প্রাবল্য দেখিয়া তাহার বিপক্ষে বিদ্রোহী হইয়াছেন। মনীষী রোমেঁ রোঁলা তাহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। জড়বাদের লীলাভূমি নবীন মার্কিণের বহু ভাবুক জড়বাদের অপকারিতা বুঝিয়াছেন, তাঁহারা প্রতীচ্যের আধ্যাত্মিক অবনতিতে চিন্তান্বিতও হইয়াছেন। স্বামী বিবেকানন্দ এক দিন ভারতের আধ্যাত্মিকতার বাণী লইয়া প্রতীচ্যকে অনুপ্রাণিত করিয়াছিলেন, সে দেশের সর্ব্বত্র তাঁহার বহু শিষ্য-সামন্ত হইয়াছিল। আমরা তাঁহার বহু মার্কিণ-শিষ্য ও শিষ্যা দেখিয়াছিলাম; তন্মধ্যে মিঃ টি, জে, হারিসন ও মিসেস্ হারিসনের নাম উল্লেখযোগ্য।

এ দেশের অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায় মহাত্মা গন্ধীর আধ্যাত্মিকতা ও মনোবলের গভীর তত্ত্ব বুঝিতে পারেন না, ইহার জন্য তাঁহাকে তাঁহারা নানারূপ বিদ্রূপ-ব্যঙ্গ করিতেও পরাঙ্মুখ নহেন। কিন্তু তাঁহাদের স্বদেশের কুমারী ম্যাডেলিন শ্লেড দেশে থাকিয়াও মহাত্মার বাণী সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তিনি কিছুদিন পূর্ব্বে মহাত্মার সবরমতী আশ্রমে উপস্থিত হইয়া আশ্রম-বাসিনী হইয়াছেন। তিনি বিদুষী, চিত্রাঙ্কন ও সঙ্গীত-বিদ্যাতেও বিশেষ পারদর্শিনী। তিনি প্রতীচ্যের জড়বাদের মধ্যে লালিত-পালিত হইয়াও এক্ষণে আশ্রমে থাকিয়া আশ্রমবাসীদিগের কঠোর ব্রহ্মচর্য্য ও সেবাধর্ম্ম সর্ব্বতোভাবে পালন করিতেছেন। তিনি খদ্দর পরিধান করেন, স্বহস্তে সূতা কাটেন, এমন কি, মেথরের কায পর্য্যন্ত প্রফুল্লচিত্তে করিয়া থাকেন।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় সবরমতী আশ্রমে তাঁহার সহিত কথোপকথন করিয়াছিলেন। কুমারী শ্লেড তাঁহার প্রশ্নের উত্তরে বলেন, "বহু দিন যাবৎ আমি মহাত্মা গন্ধীর বাণীতে অনুপ্রাণিত হইয়াছি। গত কয় বৎসর যাবৎ আমি বিলাতেও কঠোর সংযমের মধ্যে থাকিয়া জীবন যাপন করিয়াছি। প্রতীচ্যে যে জড়বাদমূলক সভ্যতা দিন দিন পুষ্টিলাভ করিতেছে, আমি তাহার ঘোর বিরোধী। আমার বিশ্বাস, এই জড়বাদের পথে অধিক দিন অগ্রসর হইলে প্রতীচ্য উৎসন্নের পথে যাইবে। এই সভ্যতার ফলে এক দিকে যেমন বহু ক্রোরপতির উদ্ভব হইতেছে, তেমনই অপর দিকে দরিদ্র ক্ষুধাতুর আশ্রয়হীন লক্ষ লক্ষ লোক নিত্য অসন্তোষ ও অভাবের মধ্যে বাস করিতেছে। তাহাদের জীবনে অধ্যাত্মবাদের স্থান নাই। তাহারা অর্থার্জ্জনের পিপাসায় সর্ব্বত্র ছুটাছুটি করিতেছে। ঐ সমস্ত দেখিয়া আমার মনে ভাবান্তর উপস্থিত হয় এবং তাহার পর অনেক চিন্তা করিবার পর মনে শান্তিলাভ করিবার জন্য আমি মহাত্মার আশ্রমে চলিয়া আসিয়াছি। এখানে আসিয়া আমার উদ্দেশ্য সার্থক হইয়াছে। এই আশ্রমে অশান্তি ও অসন্তোষের লেশমাত্র নাই। আমার মনে হয়, ভারতকে পুনর্জ্জীবিত করিতে হইলে, ভারতের প্রকৃত উন্নতিসাধন করিতে হইলে এ দেশে আবার কুটীর-শিল্পের প্রতিষ্ঠা ও উন্নতিসাধন করিতে হইবে। কলকারখানার যুগ ক্রমেই চলিয়া যাইবে। সেই জন্য এখানে আমি চরকা দ্বারা সূতাকাটা ও তাঁতে বস্ত্রবয়ন দেখিয়া প্রীতি লাভ করিয়াছি। ভারতের সর্ব্বত্র চরকা ও তাঁত চালাইতে পারিলে, ভারত স্বাবলম্বী হইবে। সমগ্র জগৎ জড়বাদের মোহে পড়িয়া বিপন্ন হইয়াছে। জগতের চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রই জগৎকে এই আসন্ন বিপদ হইতে রক্ষা করুন, ইহাই তাঁহাদের প্রধান কর্ত্তব্য।"

প্রতীচ্যের ভোগবিলাসের মধ্যে লালিতা-পালিতা এই কুমারীর এরূপ পরিবর্ত্তন শুভ লক্ষণ সন্দেহ নাই। মহাত্মা গন্ধীর বাণী যে জগতে এমন পরিবর্ত্তন আনয়ন করিতে সমর্থ হইয়াছে, ইহা জগতের বিশেষ সৌভাগ্য বলিতে হইবে। কালে মহাত্মার প্রদর্শিত ভারতের সনাতন ভাবধারা জগৎকে জড়বাদের মোহ হইতে পরিত্রাণ করিতে পারিবে, ইহা হইতে এমন আশা কি করা যায় না?

ভ্রম-সংশোধন—"নির্ব্বাসিতের দ্বীপ" প্রবন্ধে ১৬৫ ও ১৬৬ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত চিত্রের নাম দুইটি উল্টা হইয়া গিয়াছে। ১৬৫ পৃষ্ঠার চিত্রের নাম "কুষ্ঠাশ্রমের শুশ্রূষাকারিণীগণ" এবং ১৬৬ পৃষ্ঠার চিত্রের নাম "কুষ্ঠাশ্রমের তোরণ" হইবে।

শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু সম্পাদিত
কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, "বসুমতী রোটারী মেসিনে" শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বসুমতী প্রেস]　　　　তন্ময়　　　　[শিল্পী—শ্রীহেমেন্দ্রনাথ মজুমদার ।

৪র্থ বর্ষ] পৌষ, ১৩৩২ [৩য় সংখ্যা

মহাভারত ও ইতিহাস

২

মহাভারত নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে কবি গ্রন্থমধ্যে নানা স্থানে ইঙ্গিত দিয়াছেন। 'শান্তনু রাজার দেদীপ্যমান ইতিহাস মহাভারত বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে।'

"মহাভাগ্যঞ্চ নৃপতের্ভারতস্য মহাত্মনঃ।

যস্যেতিহাসো দ্যুতিমান্ মহাভারতমুচ্যতে ॥"

—৪৯-৯৯, আদিপর্ব্ব।

কবি আর এক স্থানে বলিতেছেন, 'ভরতবংশীয়গণের সুমহৎ জন্মবৃত্তান্ত ইহাতে বর্ণিত আছে। এই নিমিত্ত ইহাকে ভারত বলা যায় এবং মহত্ত্ব ও ভারত-তত্ত্ব হেতু ইহা মহাভারত নামে কীর্ত্তিত হইয়া থাকে।'

আর এক স্থানে লিখিত আছে, 'ভারতকুলের মহৎ জন্মবৃত্তান্ত ইহাতে কীর্ত্তিত আছে; এই নিমিত্ত ইহার নাম মহাভারত।'

এই যে তিন প্রকার মহাভারত নামের উৎপত্তি দেওয়া হইল, ইহা গল্প মহাভারত নামের উৎপত্তি। এতদ্ভিন্ন মহাভারত কথার নিগূঢ় অর্থ আছে।

ভরত, ভারত, ভারতী এই তিনটি কথা আছে, প্রথমে ভারত ও ভারতী এই দুইটি কথা দেখা যাউক্। ভারত কথার অর্থ ভরতবংশজাত। কৌরব ও পাণ্ডবগণকে ভারত বলিত, যেমন ভারতান্=পাণ্ডবান্।

—১০-১৬২, উদ্যোগপর্ব্ব।

ভারতম্=ভীমং—২৯-১৪ অঃ, ভীষ্মপর্ব্ব।

ভারতমহামাত্রম্=ভরতবংশশ্রেষ্ঠং দুঃশাসনম্।

—১৮-১১৭ অঃ, ভীষ্মপর্ব্ব।

ভারতী কথার অর্থ বচনং, সরস্বতী; যেমন 'স্বরব্যঞ্জনসংস্কারা ভারতী শব্দলক্ষণা।'—২৩-৪৩, বনপর্ব্ব।

কবি লিখিতেছেন—

"ঈরয়ন্তং ভারতীং ভারতানামভ্যর্চ্চনীয়াম্।"

—২-৭১, উদ্যোগপর্ব্ব।

টীকাকার অর্থ করিতেছেন, ভারতানাং পাণ্ডবানাং ভারতীং বাচম্ ঈরয়ন্তম্।

"পাণ্ডবদিগের কথা যাহারা আমাদের সভায় বলিতেছে।"

তাহা হইলে ভারত ও ভারতী কথার মধ্যে যে প্রভেদ আছে, তাহা সহজে দেখা যায়। তথাপি এ স্থলে দুইটি কথা লইয়া একটু রহস্য আছে বলিয়া মনে হয়। সংস্কৃত ভাষায় একই অর্থে অকার স্থানে দীর্ঘ ঈকারের

প্রয়োগ অনেক স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়; তাহাতে তাৎপর্য্যের কোন প্রভেদ হয় না,—যেমন নদ, নদী। পুংলিঙ্গ অকারান্ত পুত্র শব্দের পরে বসিয়াছে বলিয়া ব্রহ্মপুত্র নদ হইল; আর আকারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ গঙ্গা শব্দ পরে বসিয়াছে বলিয়া গঙ্গা নদী হইল। এইরূপ নগর, নগরী, দধীচ, দধীচি; পুর, পুরি, পুরী ইত্যাদি। তাহা হইলে ভারত ও ভারতী এই দুইটি কথা যে এক, তাহা বলা যায় না।

উপরে লিখিত হইয়াছে, ভরতের বংশজাতদিগের সাধারণ নাম ছিল ভারত। কিন্তু কবি ভরত কথাও ভারত অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন, যেমন—

"ভরতাঃ = ভরতবংশ্যা ভীষ্মাদয়ঃ।"

—১৬-৭২, উদ্যোগপর্ব্ব।

যদি ভারত ও ভারতী একই কথা হয়, (যেমন নদ ও নদী) এবং ভরত ও ভারত যদি এক কথা হয়, তাহা হইলে এই তিনটি কথা প্রয়োজন অনুসারে একই অর্থে ব্যবহার হইতে না পারে, তাহা বলা যায় না।

ভরত কথা সম্বন্ধে আরও কিছু বলা যাইতে পারে। "তদভিমানী অথবা তদভিমানিনী দেবতা" এই বচনটির ব্যাখ্যা করা সহজ নহে। পূর্ব্বে ইহার উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে—ব্রহ্মা ও বেদ। ব্রহ্মা হইলেন বেদাভিমানী দেবতা; কবি অন্য স্থলে ব্রহ্মবিৎ অর্থে ব্রহ্মা কথা ব্যবহার করিয়াছেন। —৭১-২৮৪, শান্তিপর্ব্ব।

সেইরূপ ঋষি অর্থে মন্ত্র ও মন্ত্রদ্রষ্টা; সেইরূপ কবি ও কাব্যকাব্যানি শুক্রপ্রোক্তানি নীতিশাস্ত্রাণি।

—৩৪-১২৪, শান্তিপর্ব্ব।

যোগ ও যোগী এক কথা —২৩-২০০ অঃ, শান্তিপর্ব্ব।

বেদব্যাস অর্থে বেদের বিভাগ এবং বেদের বিভাগ অভিমানী দেবতা। বাক্ অর্থে বাক্য এবং বাক্ অর্থে জিহ্বা। —৯-৩৬, অনুশাসনপর্ব্ব।

ভরত শব্দের নানা অর্থ আছে; তন্মধ্যে অলঙ্কার-আদি শাস্ত্রের সূত্রকর্ত্তার নাম ভরত। ঐরূপ ভারত শব্দের এক অর্থ গ্রন্থভেদঃ। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, ভরত, ভারত ও ভারতী এই তিন কথার ভিতর একই অর্থের ইঙ্গিত আছে, কবি প্রয়োজন অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন স্থলে ভিন্ন ভিন্ন অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। পরে এ সম্বন্ধে আলোচনা হইবে।

ভারত ও ভারতী এই দুই যদি এক কথা হয়, তাহা হইলে মহাভারতের অর্থ হয় মহা কথা। মহা শব্দ মহৎ শব্দের রূপান্তর। এই মহৎ শব্দের অসংখ্য অর্থ হইতে পারে। দার্শনিকরা এই শব্দের নানা প্রকার ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। যেমন 'মহতঃ অহঙ্কার।' 'অব্যক্তং মহান্ অহঙ্কারঃ পঞ্চতন্মাত্রাণি একাদশেন্দ্রিয়াণি পঞ্চ মহাভূতানি পঞ্চবিংশো ভোক্তেতি।' —৪১-১৭, অনুশাসনপর্ব্ব।

অনেক প্রকার অর্থ থাকিলেও মহৎ শব্দের তলে একটি মৌলিক অর্থ আছে—পরমাত্মা; মহতে = কৃষ্ণায়।

—৬৭-৯০, উদ্যোগপর্ব্ব।

পরমাত্মা অর্থ হইতে মোক্ষ অর্থ দূর নয়। যেমন মহতে = মোক্ষায়; 'মহতী বিমোক্ষাখ্যসিদ্ধি।' তাহা হইলে মহাভারত কথার অর্থ হইল মহা কথা, পূজ্য কথা, কৃষ্ণের কথা, মোক্ষের কথা। পূর্ব্বে দেখিয়াছি, রামায়ণ কথার অর্থও মোক্ষ কথা।

ভারত কথার সম্বন্ধে আরও একটু রহস্য থাকিলেও থাকিতে পারে। প্রথমে বলা হইয়াছে, পুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে ঘটনাগুলি প্রায় কোন নৈসর্গিক পদার্থ আশ্রয় করিয়া বর্ণিত হইয়াছে। ভা কথার অর্থ জ্যোতি এবং ভ চক্র, এ উভয়েই মনে আসে। আর দিবসের মাতার নাম রতা; প্রজাপতির ঔরসে রতার গর্ভে দিবসের জন্ম হয়, তাহা হইলে ভারত কথার সহিত জ্যোতি ও আলোক ইহাদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। কুরুপাণ্ডবদিগের বংশবিবরণ বুঝিবার সময় পুনরায় এ প্রশ্ন আলোচিত হইবে।

হিন্দুধর্ম্মে অলৌকিকের স্থান নাই, যাহা বুদ্ধির অগম্য, সে সম্বন্ধে কোন আলোচনা নাই, বুদ্ধির অতীত এই কথা মাত্র বলা আছে, সেই কারণে (মিরাকল্ অথবা সুপার-নেচারল্) অস্বাভাবিক কোন ঘটনা হিন্দুরা কখন বিশ্বাস করে না; কখন তাহাদের আশ্রয় গ্রহণ করে না। আমরা পুরাণ বুঝিতে পারি না বলিয়া তাহাদিগকে "গাঁজাখোরি" বলি; পুরাণলেখকদিগকে (মহাভারতও পুরাণমধ্যে গণ্য) অনেক প্রকার শিক্ষা প্রদান করিতে হইত; সে শিক্ষা বা শস্য খোল-ছোবড়ার মধ্যে লুক্কায়িত রাখিতে হইত। এইরূপ করিবার কারণ পরে বুঝিতে চেষ্টা করিব। একে নানা প্রকার রহস্য, তাহার উপর নানা প্রকার আবরণ; দুই হাজার বৎসরের বিশাল ও দুর্ভেদ্য জটা উন্মোচন করিয়া এক একগাছি চুল মূল হইতে ডগা পর্য্যন্ত কুলাইয়া বাছিয়া

গুছাইয়া সাজাইয়া রাখা এক প্রকার অসম্ভব। অথচ পুরাণ-লেখকগণ জটা ছাড়াইবার কৌশল অর্থাৎ রহস্য উদ্ঘাটনের উপায় সম্বন্ধে যথেষ্ট ইঙ্গিত দিয়া গিয়াছেন।

নানা প্রকার পুরাণলেখক গ্রন্থের রহস্য রক্ষা করিয়াছেন। ব্যাকরণের সাহায্য ও কথার খেলা এই দুইটি হইল প্রধান অবলম্বন। বেদের নিরুক্ত আছে, পুরাণে বৈদিক নিরুক্তের সদৃশ নিরুক্ত না থাকিলেও পৌরাণিক ভাষার মর্ম্ম উদ্ঘাটন করিতে বিশেষ নির্ব্বাচন ও বাক্যার্থের বিশেষ প্রয়োগ পদে পদে দেখিতে পাওয়া যায়, মহাভারত-কার লিখিয়াছেন ;—

"নিরুক্তমস্য যো বেদ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।
ভরতানাং যতশ্চায়মিতিহাসো মহাদ্ভুতঃ ॥"

—৪০-৬২, আদিপর্ব্ব।

ভরতকুলের মহৎ জন্মবৃত্তান্ত ইহাতে বর্ণিত আছে, এই নিমিত্ত ইহার নাম মহাভারত। যিনি মহাভারত শব্দের এই ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ অবগত আছেন, তাঁহার সমুদয় পাপ ধ্বংস হয় ; যে হেতু, ইহাতে ভরতকুলের মহাদ্ভুত ইতিহাস বর্ণিত আছে, তন্নিমিত্ত ইহা কীর্ত্তন করিলে মানবগণের মহা-পাতক বিমোচন হয়। এই অনুবাদ যে ভুল, তাহা বলা যায় না, তবে ইহা অসম্পূর্ণ, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সাধারণ পাঠ্য প্রবন্ধ ব্যাকরণ অথবা নিরুক্তের বিস্তারিত আলোচনার স্থান নয়, তথাপি কিছু না বলিলে পৌরাণিক রহস্যের মর্ম্ম বুঝা কঠিন হইবে। উপরে বলিয়াছি, ব্যাকরণ ও কথার খেলার সাহায্যে পৌরাণিক রহস্য প্রধানতঃ রক্ষিত হইয়াছে। যাহা প্রকটন করে, তাহাকে ব্যাকরণ বলে। ব্যাকরণ বেদাঙ্গের অন্তর্গত। ব্যাকরণের নামান্তর শিষ্ট-প্রয়োগ। শিষ্ট, ভদ্র অথবা আর্য্যগণ যে ভাবে কথা রচনা করেন, তাহারই নাম শিষ্টপ্রয়োগ। কিন্তু শিষ্ট কথার অপর অর্থও আছে।

"ততঃ প্রসূতা বিদ্বাংসঃ শিষ্টা ব্রহ্মর্ষিসত্তমাঃ।"

—৩৫-১, আদিপর্ব্ব।

সর্ব্বগুণসম্পন্ন বিদ্বান্ ও শিষ্ট ব্রহ্মর্ষিগণ জন্মগ্রহণ করিলেন। এ স্থলে শিষ্ট অর্থে কেবল ভদ্র বলিয়া মনে হয় না। স্থানান্তরে লিখিত আছে—

"যো হ্যন্তে ব্রাহ্মণঃ শিষ্টঃ স আত্মরতিরুচ্যতে।"

—১৯-২৫০, শান্তিপর্ব্ব।

যে শিষ্ট ব্রাহ্মণ ইন্দ্রিয় সকলকে প্রমাদ হইতে সম্যক্‌রূপে রক্ষা করত ধ্যানাবলম্বন পূর্ব্বক অবস্থান করেন, তাঁহাকেই আত্মরতি বলা যায়।

এ স্থলে শিষ্ট কথার সহিত তত্ত্বজ্ঞান ও অবিদ্যার বিপরীত বিদ্যা এই ভাবের সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায়।

বিশ্বামিত্র বলিতেছেন,—

"শিষ্টা বৈ কারণং ধর্ম্মে তদ্‌বৃত্তং অনুবর্ত্তয়ে।"

—৩-১৪১, শান্তিপর্ব্ব।

কবি স্থানান্তরে লিখিতেছেন,—

"লোকাচারেষু সম্ভূতা বেদোক্তাঃ শিষ্টসম্মতা।"

—৩১-১, বনপর্ব্ব।

অনুবাদক ইহার অর্থ দিতেছেন যে, সকল সদ্‌গুণ বেদোক্ত লোকাচারপ্রচলিত শিষ্টসম্মত, কিন্তু টীকাকার শিষ্ট কথার অন্য অর্থ দিতেছেন। শিষ্টানাং—"বেদপ্রামাণ্য-বাদিনাম্।"

এই অর্থ টি বিশেষ ভাবিবার সামগ্রী।

মহাভারতের সময় দেশে ঘোর বিপ্লব চলিতেছিল। এক দল হইল বেদপ্রামাণ্যবাদী, অপর দলে বেদ-বিরোধী অসংখ্য সম্প্রদায় ছিল ; যাহারা বেদকে প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করিতেন না। বেদপ্রামাণ্যবাদীরা হইলেন শিষ্ট, তাহারা যে ভাবে কথা রচনা করিতেন এবং ব্যাখ্যা করিতেন, তাহার নাম শিষ্টপ্রয়োগ।

স্থানান্তরে—১৪-১০৩, শান্তিপর্ব্ব।

টীকাকার সুশিক্ষিতৈঃ কথার অর্থ দিতেছেন, ভাষ্য-কথাবিশারদৈঃ। আমরা মহাভারতে অসংখ্য স্থানে ব্যাকরণের নিয়মের ব্যতিক্রম দেখিতে পাই। যে স্থলে কোন কথা ব্যাকরণসূত্র দ্বারা গঠিত না হয়, সে কথাগুলি সম্বন্ধে নিপাতনে সিদ্ধ, এই কথা বলা হয়।

"পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ।" এইরূপ নানা উপায় আছে। পূর্ব্বে দেখিয়াছি, সীতা কথা এইভাবে সাধিত হইয়াছে। তাহার পর আর্ষপ্রয়োগ। মন্ত্রদ্রষ্টা বেদপ্রামাণ্যবাদী ঋষিগণ আলোচিত বিষয়ের গৌরব বশতঃ বাক্য অথবা ভাষা প্রয়োজন অনুসারে গঠিত করিয়াছেন।

ঋষিপ্রণীতং ইতি আর্ষম্।

মহাভারতে অন্ততঃ সহস্র স্থানে আর্ষপ্রয়োগের উদা-হরণ আছে। সাধারণ ব্যাকরণের প্রায় প্রত্যেক সূত্রের

ব্যতিক্রম আর্ষপ্রয়োগে দেখিতে পাওয়া যায়। আর এক প্রকারে মহাভারতলেখক ব্যাকরণের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার নাম স্বার্থে প্রয়োগ। স্বার্থে ক, যেমন বাল=বালক। জন=জনক। অর্ভ=অর্ভক। স্বার্থে ণিচ, যেমন গমিষ্যতি, গময়িষ্যতি। রমন্তি, রময়ন্তি। স্বার্থে তদ্ধিত; যেমন—শব+ইব=শাব, রব+ইব=রাব, লোহ+ইব=লৌহ; চোর=ইব=চৌর; চণ্ডাল+ইব=চাণ্ডাল; অবসথ+ইব=আবসথ; তেজস+ইব=তৈজস; বিশম্পায়ন+ইব=বৈশম্পায়ন; দ্বীপায়ন+ইব=দ্বৈপায়ন; ইত্যাদি ইত্যাদি।

ব্যাকরণের সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রমের উদাহরণ যথেষ্ট আছে;—যেমন—সম+অঙ্গ=সমঙ্গ; অষ্ট+বক্র=অষ্টাবক্র; তাহার পর রলয়োঃ সাবর্ণাৎ দৃভীভয়ে আদলৃভ্যাং উদ্দারক—উদ্দালক; চরাচর, চলাচল। এতদ্ব্যতীত বর্ণান্তর প্রয়োগ আছে। যেমন,—জটা ও সটা; দম্পতি, জম্পতি; কিল্মিষ, কিল্বিষ; প্রলাপ, প্রলাব; গোতম, গোদম; সনাদন, সনাতন। কোথাও বা অক্ষর-বিশেষের আদেশ হয়, যেমন;—রক্ষণার্থ অব ধাতু স্থানে র আদেশ হইয়া রবি কথা গঠিত হইয়াছে, কোন কোন স্থলে কবি বৈদিক ব্যাকরণের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, ইহাকে ছান্দস প্রয়োগ বলে। কোন স্থলে কবি এরূপ কথার গঠন করিয়াছেন, যাহা বুঝিবার নিমিত্ত কোন ব্যাকরণের সূত্র দেখিতে পাওয়া যায় না। যেমন,—কুলে যাহার তুল্য সুন্দর নাই, তাহার নাম নকুল। যিনি স্পর্শ করিলে রোগ মুক্ত হয় এবং পুনঃ যৌবন হয়, তাঁহার নাম শান্তনু।

"যং যং করাভ্যাং স্পর্শতি জীর্ণং স সুখমশ্নুতে।
পুনর্যুবা চ ভবতি তস্মাৎ তং শান্তনুং বিদুঃ॥"

--৪৬-৯৫, আদিপর্ব্ব।

এইরূপে নানা প্রকারে পুরাণ-প্রণেতৃগণ নিজেদের প্রয়োজন অনুসারে কথার গঠন করিয়াছেন, অথবা কথাগুলির অর্থ দিয়াছেন। এক ধাতু হইতে ভিন্ন ভিন্ন অর্থ-প্রকাশক অনেক কথা গঠিত হইতে পারে, এ কথা সকলেই জানে। যেমন,—আহার, প্রহার ইত্যাদি এবং এক কথার নানা অর্থ হয়, যেমন,—আত্মা, গো ইত্যাদি। এই সকল কথার কোন্ স্থানে কি অর্থে প্রয়োগ হইয়াছে, অনেক সময় নির্ণয় করা কঠিন। তাহার পর পর্য্যায়বাচক শব্দ আছে, নানা অর্থবাচক শব্দ আছে—একাক্ষর কোষ আছে। মহাভারত প্রভৃতি পুরাণলেখকগণ রহস্যরক্ষার নিমিত্ত অসংখ্য স্থানে এই সকল উপায়ের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন।

মহাভারতমধ্যে অন্ততঃ সহস্র কথা রহস্যপূর্ণ। দু'চারিটি মাত্র উদাহরণ দিলাম। কুশীলব কথার অর্থ নট, আর এক অর্থ ফাল-লেখা, কথাটির আর এক প্রকার অর্থ আছে,—কুশীলং বাতি গচ্ছতি যঃ অর্থাৎ দুরাচার। উত্তর কথার অর্থে উত্তরদিক হইতে পারে এবং উৎকৃষ্ট হইতে পারে। আত্মা স্বার্থে নিরুপাধিস্বরূপং প্রত্যঞ্চম্। -৭৮-২০০, দ্রোণপর্ব্ব।

আত্মা কথার অর্থ শরীর, মন ও স্বয়ং=আত্মানং শরীরং। —৭৯-২০০, দ্রোণপর্ব্ব।

বিরাগবসনা কথাটি প্রথমে মনে হয়, বৈরাগ্য যাহার বসন, কিন্তু কথাটির প্রকৃত অর্থ নানা পৃথগ্ বিধরাগাণি বসনানি যেষাং তে বিরাগবসনঃ। —১৬-২০। ১২, কর্ণপর্ব্ব।

প্রণয়াৎ কথার অর্থ স্নেহ বশতঃ। কথাটির অন্য অর্থ প্রকৃষ্টাৎ ন্যায়াৎ যুক্তিযুক্ত ইত্যর্থঃ। —১-৩২, কর্ণপর্ব্ব।

বিহঙ্গ কথা হইতে যথেষ্ট কৌতুক পাওয়া যায়। বিহঙ্গ হইল পক্ষী, পক্ষী হইল দ্বিজ; দ্বিজ হইলেন ব্রাহ্মণ। আবার বিহঙ্গ অর্থে বাণ; নদ ও নদী যদি এক কথা হয়, তাহা হইলে বাণ ও বাণি এ উভয়ের মধ্যে কোন প্রভেদ থাকিবে না। বিধর্ম্মী কথার সাধারণ অর্থ বিপরীত অথবা বিগর্হিত ধর্ম্মানুসরণকারী; কিন্তু ইহার অন্য অর্থও আছে; কথাটি ভগবানের বিশেষণ। যিনি ধর্ম্ম বা গুণের অতীত। প্রতিশ্রুত কথাটির এক অর্থ অঙ্গীকৃত; উহার আর এক অর্থ প্রতিস্বন। কুনৃপ অর্থে মন্দ রাজা, অপর অর্থে কুৎসিতান্নরান্ পাতীতি নীচপরিজন ইত্যর্থ।

—১০।২, শল্যপর্ব্ব।

কৃষ্ণ নেত্র বলিলে কৃষ্ণবর্ণ নেত্র বুঝায় না, ইহার অর্থ,—কৃষ্ণ যাঁহার নেতা।

কৃষ্ণ নেত্রং নেতা যস্য স তথা। —১৫-৪, শল্যপর্ব্ব।

অসার কথা বলিলে অপদার্থ হেয় বুঝায়, কিন্তু অসার কথার আর এক অর্থ আছে, এ কথাটিও ভগবানের গুণবাচক।

নাস্তি সারো যস্মাদন্যঃ কেবলানন্দঃ।

—১৯০-১৪, অনুশাসনপর্ব্ব।

প্রাজ্ঞ কথার অর্থ বিচক্ষণ, কিন্তু ইহার অন্য অর্থ প্রকৃষ্টেন অজ্ঞঃ অর্থাৎ বিশেষরূপে অজ্ঞ। কথার খেলাতে কৌতুক আছে, সন্দেহ নাই। পরে দেখিব, ইহার যথার্থ মর্ম্ম না বুঝিয়া আমাদের যথেষ্ট অনিষ্টও ঘটিয়াছে। যাঁহারা বিষ্ণু, শিব প্রভৃতির স্তব পড়িয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, স্তবগুলি প্রায়ই কতকগুলি গুণবাচক শব্দ গ্রথিত করিয়া রচিত হইয়াছে। কোন কোন স্তবে এইরূপ সহস্রাধিক কথা সন্নিবিষ্ট আছে। কথাগুলি ভগবানের নাম। যাঁহারা সেই শব্দগুলির নিগূঢ় অর্থ বুঝিতে চেষ্টা করেন, তাঁহারা দেখিতে পান যে, প্রতি কথাটি দর্শনমূলক। কল্পনার সাহায্যে দার্শনিক তাৎপর্য্যটিকে রূপ ও গুণ দেওয়া হইয়াছে। তাহার ফলে কথাটি ঐ প্রকার আকৃতি ধারণ করিয়াছে। এই সকলের সাহায্যে রহস্য এইরূপ ভাবে লুক্কায়িত থাকে যে, তাহাদের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত লোকে সন্দেহ করে না।

এখন মহাভারতে কি আছে, বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক। যে স্থত্রে মহাভারত লিখিত হইল, তাহার এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ। অর্জ্জুনের পুত্রের নাম অভিমন্যু, অভিমন্যুর পুত্রের নাম পরীক্ষিত। পরীক্ষিত এক দিন মৃগয়া করিতে গিয়াছিলেন। তিনি বনমধ্যে গোপ্রচারে আসীন ধ্যানমগ্ন একটি মুনিকে দেখিতে পান। পলায়িত মৃগের কথা জিজ্ঞাসা করিলে মৌনাবলম্বী মুনি কোন উত্তর করিলেন না, পরীক্ষিত ক্রুদ্ধ হইয়া একটি মৃত সর্প সেই মুনির গলায় ঝুলাইয়া দিয়া সে স্থান হইতে চলিয়া গেলেন। ঐ মুনির নাম ছিল শমী, তাঁহার শৃঙ্গী বলিয়া একটি পুত্র ছিল; যখন পিতার পরীক্ষিতের হস্তে এই দুর্দ্দশা ঘটিয়াছিল, তখন শৃঙ্গী ব্রহ্মার নিকট গিয়াছিলেন। ফিরিয়া আসিলে পিতার এই অবস্থা দেখিয়া তিনি ক্রোধভরে পরীক্ষিতকে শাপ প্রদান করিলেন যে, সাত দিনের মধ্যে তক্ষকদংশনে তাঁহার মৃত্যু হইবে। ফলে তাহাই হইল।

পরীক্ষিতের চারি পুত্র ছিল, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ জন্মেজয় রাজসিংহাসনে আরোহণ করেন। পিতার তক্ষকদংশনে মৃত্যুর কথা শুনিয়া জন্মেজয় সর্পকুল ধ্বংস করিতে একটি সর্প-সত্রের আয়োজন করেন, সেই যজ্ঞে ব্যাসদেব, তাঁহার শিষ্য বৈশম্পায়ন প্রভৃতি নানা ঋষি এবং লোমহর্ষণ নামে এক জন সূত উপস্থিত ছিলেন। সর্পসত্রে যখন অবকাশ হইত, সেই সময়ে সভাতে বেদমূলক নানা প্রকার কথার আলোচনা হইত। সেই সূত্রে মহাভারত আখ্যান কথিত হয়। বৈশম্পায়ন নিজ গুরু ব্যাসের আদেশে যজ্ঞ-সভাতে এই আখ্যানটি বলেন। সর্পসত্র সমাপ্ত হইলে সূত-পুত্র লোমহর্ষণ (সৌতি) নানা স্থান পর্য্যটন করিতে করিতে নৈমিষারণ্যে শৌনক মুনির আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হয়েন এবং তথায় শৌনক প্রভৃতি ঋষিগণের অনুরোধক্রমে বৈশম্পায়নের মুখ হইতে মহাভারত নামে যে আখ্যানটি শুনিয়াছিলেন, সেই আখ্যানটি তত্রত্য ঋষিগণের নিকটে কীর্ত্তন করেন। মহাভারতের মধ্যে 'ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন, ভীষ্ম বলিলেন' প্রভৃতি কথার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। বাহুল্য নিবারণের নিমিত্ত এইরূপ লিখিত হইয়াছে। সম্পূর্ণ লিখিতে হইলে বলিতে হইত, সৌতি শৌনককে বলিলেন যে, বৈশম্পায়ন জন্মেজয়কে বলিয়াছিলেন যে, ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম এই কথা বলিয়াছিলেন।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, মহাভারত একখানি পুরাণমধ্যে পরিগণিত। পুরাণে বংশ, বংশানুচরিত প্রভৃতি পাঁচটি লক্ষণ থাকে, মহাভারতেও কুরুপাণ্ডবদিগের উৎপত্তির কথা আছে, সে বর্ণনাটি কিছু দীর্ঘ। পরে তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিব। যুধিষ্ঠির হইতে প্রতীপ পাঁচ পুরুষ ঊর্দ্ধে অবস্থিত। প্রতীপ হইতে কুরুপাণ্ডবদিগের বংশ-বিবরণ বিস্তৃতভাবে দেওয়া আছে। সংক্ষেপে গল্পটি এইরূপ।

এক দিন দেবগণ ব্রহ্মার নিকট উপবিষ্ট ছিলেন, ইক্ষ্বাকু-বংশীয় মহাভীষ নামে এক জন রাজর্ষি তথায় উপস্থিত থাকেন। এমন সময় গঙ্গা সেই স্থান দিয়া যাইতেছিলেন। যাইতে যাইতে বায়ুবশে তাঁহার পরিধেয় বস্ত্র কিছু ক্ষুভিত হয়, সেই অবস্থা দেখিয়া সকল দেবগণই অধোমুখ হয়েন। কেবল মহাভীষ মস্তক অবনত করেন নাই। এই অশিষ্টাচারের জন্য তাঁহার প্রতি অভিশাপ হইল যে, তুমি পৃথিবীতে গিয়া প্রতীপ নামে রাজা হইবে। এই ঘটনার কিছু পূর্ব্বে আর এক ব্যাপার ঘটিয়াছিল। এক দিন আট জন বসু সস্ত্রীক বশিষ্ঠের আশ্রমে বেড়াইতে গিয়াছিলেন। বশিষ্ঠ তখন আশ্রমে ছিলেন না, ঐ অষ্ট বসুর মধ্যে দ্যুনামক এক জন বসুর স্ত্রী বশিষ্ঠের নন্দিনী নামক গাভীকে লইতে ব্যগ্রতা প্রকাশ করেন। তিনি শুনিয়াছিলেন, ঐ নন্দিনীর দুগ্ধ পান করিলে স্ত্রীলোক চিরযৌবনা হয়, তাঁহারই

এক সখীর নিমিত্ত তিনি নন্দিনীকে ধরিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। বশিষ্ঠ ফিরিয়া আসিয়া যখন সমস্ত ব্যাপার অবগত হইলেন, তখন তিনি ঐ অষ্ট বসুদিগকে অভিশাপ দিলেন যে, তোমরা পৃথিবীতে গিয়া মানবী-গর্ভে জন্মগ্রহণ করিবে। বসুগণ অনেক অনুনয়-বিনয় করিলেন, বশিষ্ঠ বলিলেন যে, তোমরা মানবীগর্ভে জন্মিবে, তবে পৃথিবীতে তোমাদের এক বৎসরের অধিক থাকিতে হইবে না, কিন্তু ঐ দ্যুনামক বসুকে অনেক দিন পৃথিবীতে থাকিতে হইবে।

গঙ্গা প্রতীপের ঐরূপ আচরণ ভাবিতে ভাবিতে চলিয়া যাইতেছিলেন, এমন সময় পথমধ্যে দেখিলেন যে, আট জন বসু তাঁহার নিকট আসিতেছেন—গঙ্গা কি হইয়াছে, জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা তাহাদের প্রতি বশিষ্ঠ-প্রদত্ত অভিশাপের কথা জানাইলেন এবং অনেক খেদ ও দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিলেন যে, যখন আমাদের মানবীগর্ভে জন্মিতে হইবে, তুমি এই কর, যেন তোমার গর্ভে আমাদের জন্ম হয়।

সময়ে মহাভীষ প্রতীপ নামে হস্তিনাতে রাজা হইলেন। তিনি এক দিন বসিয়া আছেন, এমন সময়ে অসামান্য রূপসম্পন্না একটি কামিনী আসিয়া তাঁহার কোলে বসিল। প্রতীপ জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কে ? কি চাও ?"

কামিনীটি বলিল, "আমি গঙ্গা, আমার ইচ্ছা, আমাকে তুমি বিবাহ কর।"

প্রতীপ বলিলেন, "তাহা হবে না ; তুমি আমার দক্ষিণ উরুতে বসিয়াছ, ঐ স্থান পুত্র, কন্যা ও পুত্র-বধূর। তবে তুমি এক কায কর, আমার শান্তনু বলিয়া এক পুত্র আছে, তুমি তাহাকে বিবাহ কর।" কালক্রমে প্রতীপের মৃত্যু হইল ও শান্তনু হস্তিনাপুরে রাজা হইলেন। তিনি ঐ সকল কথা কিছুই জানিতেন না। এক দিন ঘটনাক্রমে গঙ্গার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়, গঙ্গার অলৌকিক রূপে মুগ্ধ হইয়া শান্তনু তাঁহাকে বিবাহ করিতে ব্যগ্রতা প্রকাশ করেন। গঙ্গা বলিলেন, "আমি তোমাকে এক অঙ্গীকারে বিবাহ করিতে পারি।"

শান্তনু জিজ্ঞাসা করিলে গঙ্গা বলিলেন, "তোমাকে বিবাহ করিবার পর আমি যাহাই করি না কেন, তুমি আমাকে আমার কর্ম্ম সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন বা প্রতিবাদ করিতে পারিবে না। যদি কর, আমি তৎক্ষণাৎ তোমার নিকট হইতে চলিয়া যাইব।" শান্তনু সেইরূপ অঙ্গীকার করিলেন।

গঙ্গার সহিত শান্তনুর বিবাহ হইল ও ক্রমে ক্রমে গঙ্গার গর্ভে শান্তনুর ঔরসে সাতটি পুত্র জন্মিল। শান্তনু দেখিলেন যে, শিশুগুলি জন্মিবামাত্র গঙ্গা প্রত্যেককেই গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করেন। তিনি বিবাহের পূর্ব্বে যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, সেই প্রতিজ্ঞার অনুরোধে গঙ্গাকে কিছু বলিতে পারিলেন না। তবে যখন অষ্টম শিশুটি ভূমিষ্ঠ হইল, তখন তিনি আর থাকিতে পারিলেন না। নির্ম্মমতার জন্য স্বপুত্রঘাতিনী গঙ্গাকে অনেক ভৎসনা করিলেন এবং অষ্টম পুত্রটিকে বিনাশ করিতে নিষেধ করিলেন।

গঙ্গা তখন তাঁহাকে পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করাইয়া দিলেন এবং বলিলেন, "তুমি নিজ অঙ্গীকার ভঙ্গ করিলে, আর আমি তোমার নিকট থাকিব না।" এই বলিয়া গঙ্গা চলিয়া গেলেন এবং নিজ পুত্রটিকেও সঙ্গে লইয়া গেলেন।

এই ঘটনার অনেক বৎসর পরে শান্তনুর সহিত গঙ্গাতীরে একটি বালকের সহিত সাক্ষাৎ হয়। গঙ্গার সহিতও তখন তাঁহার দেখা হয়। শান্তনু গঙ্গার কথায় বুঝিতে পারিলেন যে, ঐ বালকটি তাঁহারই ঔরসজাত সন্তান। তিনি নিজ পুত্রটিকে লইয়া হস্তিনাপুরে ফিরিয়া আসিলেন। ঐ বালকটি শান্তনু-তনয় গাঙ্গেয় ভীষ্ম।

পরে ভীষ্ম বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে শান্তনু এক দিন মৃগয়া করিতে করিতে বনমধ্যে একটি মধুর আঘ্রাণ পাইলেন। সুগন্ধটি কোথা হইতে আসিতেছে, তাহা অনুসন্ধান করিতে গিয়া তিনি একটি ধীবরের গৃহে উপস্থিত হইলেন। তথায় একটি পরমাসুন্দরী যুবতীকে দেখিতে পাইলেন এবং বুঝিলেন যে, সেই সুমিষ্ট গন্ধ উহারই গাত্র হইতে আসিতেছিল। শান্তনু রাজধানীতে ফিরিয়া আসিলেন, কিন্তু তিনি সেই কন্যাটির রূপে মুগ্ধ হইয়াছিলেন—তাহাকে বিবাহ করিতে ব্যাকুল হইলেন।

ভীষ্ম পিতার মনোভাব বুঝিতে পারিয়া সেই কন্যাটিকে নিজ পিতার নিমিত্ত ঐ ধীবরের নিকট প্রার্থনা করেন। নিষাদরাজ বলিল, যদি ঐ কন্যার গর্ভজাত পুত্র শান্তনুর মৃত্যুর পর তাঁহার রাজ্যাধিকারী হয়, তবে তিনি রাজা শান্তনুকে নিজ কন্যা গন্ধবতীকে দান করিবেন। ভীষ্ম

তাহাতে সম্মত হইলেন এবং নিজে কখন বিবাহ করিবেন না, তাহাও প্রতিজ্ঞা করিলেন। এই ভীষণ প্রতিজ্ঞার নিমিত্ত তাঁহার নাম হইল সত্যব্রত ভীষ্ম। সত্যবতীর গর্ভে শান্তনুর ঔরসে তিনটি পুত্র জন্মে, তন্মধ্যে বিচিত্রবীর্য্য পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করেন। ভীষ্ম বৈমাত্র ভ্রাতা বিচিত্রবীর্য্যের নিমিত্ত অম্বা, অম্বিকা ও অম্বালিকা নাম্নী কাশীরাজের তিন দুহিতাকে স্বয়ংবরসভা হইতে অপরাপর রাজগণ সমক্ষে হরণ করিয়া হস্তিনাপুরে লইয়া আইসেন। অম্বা পূর্ব্বে শল্যরাজকে আত্মপ্রদান করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন; সেই কারণে তিনি হস্তিনাপুর হইতে চলিয়া গেলেন। অম্বিকা ও অম্বালিকার সহিত বিচিত্রবীর্য্যের বিবাহ হইল। তাঁহার সন্তান না হওয়াতে অম্বিকার গর্ভে ব্যাসের ঔরসে ধৃতরাষ্ট্রের জন্ম হয়, অম্বালিকার গর্ভে ব্যাসের ঔরসে পাণ্ডুর জন্ম হয় এবং অম্বিকা কর্তৃক নিযুক্তা এক দাসীর গর্ভে ব্যাসের ঔরসে ক্ষত্তা বিদুরের জন্ম হয়। ধৃতরাষ্ট্র বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে সুবলরাজতনয়া গান্ধারীকে বিবাহ করেন। পাণ্ডু বসুদেবের ভগিনী রাজা কুন্তিভোজ কর্তৃক প্রতিপালিতা কুন্তীকে বিবাহ করেন। তিনি মদ্রাজকন্যা মাদ্রীকে দ্বিতীয় দাররূপে পরিগ্রহ করেন। জ্যেষ্ঠ ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ বলিয়া পিতার মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতা পাণ্ডু রাজা হয়েন। কিছুকাল রাজত্ব করিয়া পাণ্ডু দুই স্ত্রীর সহিত বনগমন করেন। পাণ্ডুকে পূর্ব্বে এক মুনি শাপ দিয়াছিলেন যে, পুত্রজনন তাঁহার পক্ষে মৃত্যুর কারণ হইবে। সেই কারণে তাঁহার কোন পুত্র জন্মে নাই। কুন্তী যখন কন্যা অবস্থায় পিতৃগৃহে ছিলেন, তখন দুর্ব্বাসা মুনি তাঁহার পরিচর্য্যায় প্রীত হইয়া তাঁহাকে এই বর দেন যে, তিনি যে কোন দেবতাকে স্মরণ করিবেন, সেই দেবতা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইবেন। এইরূপে পিতৃগৃহে কুন্তীর গর্ভে সূর্য্যের ঔরসে কর্ণের জন্ম হয়। পুত্র জন্মিবামাত্র কুন্তী তাহাকে নদীতে ভাসাইয়া দেন, কর্ণ সূতবংশীয় অধিরথ নামে রথকার-গৃহে প্রতিপালিত হয়। স্বামীর সহিত বনবাসকালে কুন্তীর গর্ভে ধর্ম্মের ঔরসে যুধিষ্ঠিরের জন্ম হয়, পবনের ঔরসে ভীমের ও ইন্দ্রের ঔরসে অর্জ্জুনের জন্ম হয় এবং অশ্বিনী-কুমারদ্বয়ের ঔরসে মাদ্রীর গর্ভে নকুল-সহদেবের জন্ম হয়।

বনে অবস্থানকালে শতশৃঙ্গ পর্ব্বতে পাণ্ডুর মৃত্যু হয়। সেই স্থানের মুনিগণ পাণ্ডুর মৃতদেহ ও পুত্রগণ লইয়া হস্তিনাপুরে আইসেন। মাদ্রী স্বামীর চিতায় আরোহণ করেন। ব্যাসের বরপ্রভাবে ধৃতরাষ্ট্রের ঔরসে গান্ধারীর গর্ভে দুর্য্যোধন প্রভৃতি শত পুত্র ও একটি কন্যা জন্মে। বালকেরা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাহাদিগকে ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা দিবার নিমিত্ত ভীষ্ম দ্রোণাচার্য্যকে গুরুরূপে নিযুক্ত করেন। সূতঘরে প্রতিপালিত কর্ণও তাহাদের সহিত অস্ত্রশিক্ষা লাভ করে। প্রথম হইতেই ভীম ও দুর্য্যোধনের মধ্যে এবং কর্ণ ও অর্জ্জুনের মধ্যে ঈর্ষা ও বৈরিতা জন্মে। যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পাণ্ডুপুত্রগণ পুরবাসীদিগের প্রিয় ছিলেন। দুর্য্যোধনের মনে আশঙ্কা হইত যে, পুরবাসিগণ তাঁহাকে উপেক্ষা করিয়া যুধিষ্ঠিরকে রাজসিংহাসনে বসাইবে। এই আশঙ্কায় তিনি পিতার সহিত পরামর্শ করিয়া কুন্তীর সহিত পঞ্চপাণ্ডবকে বারণাবতে প্রেরণ করেন। তথায় তাঁহার আজ্ঞাক্রমে পুরোচন নামে এক ব্যক্তি একটি জতু-গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া রাখিয়াছিল। সেই গৃহে পাণ্ডবেরা আসিয়া বাস করিল। বিদুর পূর্ব্বেই দুর্য্যোধনের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়াছিলেন এবং তৎসম্বন্ধে যুধিষ্ঠিরকে অগ্রেই সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন। অবসর বুঝিয়া এক রজনীতে পাণ্ডবগণ গৃহে আগুন লাগাইয়া মাতার সহিত পলায়ন করিলেন। দুর্য্যোধনের ভয়ে তাঁহারা ব্রাহ্মণবেশ ধারণ করিয়া দেশে দেশে পর্য্যটন করিতেছিলেন। দ্রুপদ রাজার কন্যা দ্রৌপদীর স্বয়ংবর হইবে শুনিয়া তাঁহারা পাঞ্চাল দেশের রাজধানীতে আগমন করিলেন। অর্জ্জুন দ্রৌপদীর স্বয়ংবর-সভায় লক্ষ্য-ভেদ করিয়া দ্রৌপদীকে লাভ করিলেন। পরে কুন্তীর কথা অনুসারে দ্রৌপদী পঞ্চ-পাণ্ডবের স্ত্রী হইলেন।

রাজা ধৃতরাষ্ট্র এই সকল সংবাদ অবগত হইয়া সস্ত্রীক পঞ্চ-পাণ্ডবকে হস্তিনাপুরে আনয়ন করিলেন এবং তাঁহাদিগকে রাজ্যের এক অংশ প্রদান করিলেন। পাণ্ডবেরা ইন্দ্রপ্রস্থে রাজধানী স্থাপন করিয়া বাস করিতে লাগিলেন। এই সময়ে অর্জ্জুন দ্বাদশ বৎসরের নিমিত্ত বনে গমন করেন। বনবাসের কাল অতীত হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে তিনি কৃষ্ণের ভগিনী সুভদ্রাকে হরণ করিয়া বিবাহ করেন। ইন্দ্রপ্রস্থে বাসকালে অগ্নির অনুরোধে তিনি কৃষ্ণের সারথ্যে খাণ্ডববন দাহন করেন। অগ্নি প্রীত হইয়া তাঁহাকে গাণ্ডীব ধনু ও দুইটি অক্ষয় তূণীর প্রদান করিলেন।

ইহার পরে রাজা যুধিষ্ঠির রাজসূয়যজ্ঞ করেন। সেই সূত্রে সকল দেশ হইতে রাজগণ প্রভূত রত্ন ও অপরাপর দ্রব্য

উপঢৌকন প্রদান করেন। ইহাতে দুর্য্যোধনের মনে ঈর্ষা জন্মে। ধৃতরাষ্ট্র সততই নিজ পুত্র দুর্য্যোধনকে পাণ্ডবদিগের সহিত শত্রুতা করিতে নিষেধ করিতেন, তিনি তাহাকে বলিলেন, 'পাণ্ডুপুত্রেরা তোমার বাহুস্বরূপ, অতএব তাহা-দিগকে ছেদন করিও না।' দুর্য্যোধন নিজ মাতুল শকুনির সহিত পরামর্শ করিয়া পিতাকে অনুরোধ করিলেন, যাহাতে পাণ্ডবগণ হস্তিনাপুরে আসিয়া তাঁহার সহিত দ্যূতক্রীড়া করেন। যুধিষ্ঠির সম্মত হইলেন এবং দ্রৌপদী ও ভ্রাতা-দিগের সহিত হস্তিনাপুরে দ্যূতক্রীড়া করিতে আসিলেন।

এত দূর পর্য্যন্ত যে আখ্যায়িকাটি প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত রহস্যপূর্ণ, সেই রহস্যগুলি আনুপূর্ব্বিক উদ্ঘাটন করা অসম্ভব। তবে রহস্য যে আছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই; বুঝিবার নিমিত্ত কবি যে সকল ইঙ্গিত দিয়াছেন, সে সম্বন্ধে বোধ হয় কিছু বলা যাইতে পারে।

রামায়ণে রাম হইলেন শুদ্ধ ব্রহ্ম, সীতা শুক্লা নিষ্পাপা, গল্পপক্ষে রাম ও সীতার চরিত্রে কোন প্রকার মল বা দোষ নাই। মহাভারতে কৃষ্ণবর্ণের কিছু আধিক্য দেখা যায়। লেখক স্বয়ং কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস। শ্রীকৃষ্ণ মহাভারতের কেন্দ্রমূর্ত্তি, কৃষ্ণ হইলেন শুদ্ধসত্ত্বময় জ্ঞানবিগ্রহ পরমাত্মা।

—১১১-১, আদিপর্ব্ব।

অর্জ্জুন কৃষ্ণবর্ণ, দ্রৌপদীর নাম কৃষ্ণা; কিন্তু দ্রৌপদীর নাম সম্বন্ধে একটু কৌতুক আছে। কৃষ্ণা অর্থে শ্যামা, শ্যামা কথার অর্থ নিত্য ষোড়শী অর্থাৎ চিরযৌবনা। কবি ইহাদের সকলের চিত্রে কিছু-না-কিছু কলঙ্কের রেখা অঙ্কিত করিতে সঙ্কুচিত হয়েন নাই। শ্রীকৃষ্ণকে কবি দুই এক অবস্থায় লজ্জা অনুভব করাইয়াছেন; অর্জ্জুনকে নানা স্থানে কবি হীনবর্ণে চিত্রিত করিয়াছেন। সেইরূপ যুধিষ্ঠির প্রভৃতিকে কবি কৃষ্ণবর্ণে রঞ্জিত করিতে ত্রুটি করেন নাই। বলা বাহুল্য, দার্শনিক এবং ঐতিহাসিক রহস্য রক্ষা করিতে কবিকে এই-রূপ কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু এইরূপ বর্ণনার পশ্চাতে সে সময়ের দেশের রাজনীতিক ও সামাজিক অবস্থার আবছায়া স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। স্থূল কথা, মহাভারতের সর্ব্বত্রই মিশ্রিত বর্ণের চিত্র কিছু অধিক। যিনি দেবগুরু বৃহস্পতি, তিনি আবার দৈত্যগুরু শুক্র। দুষ্মন্ত যখন কণ্ব মুনির আশ্রমে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তখন তিনি আশ্রমমধ্যে বেদপাঠী ব্রাহ্মণদিগকে দেখিলেন; আর সেই স্থানেই চার্ব্বাকগণকে দেখিলেন। বলরাম হইলেন সংকর্ষণ, শ্রীকৃষ্ণ ও সংকর্ষণ ইঁহারা হইলেন চতুর্ব্ব্যূহের দুই জন অন্যতম পুরুষ। অথচ অর্জ্জুন হইলেন শ্রীকৃষ্ণের সখা; আর দুর্য্যো-ধন হইলেন বলরামের প্রিয়শিষ্য। কুরুপাণ্ডবদিগের বংশ-বিবরণসময়ে এই মিশ্রিত বর্ণের উদাহরণ যথেষ্ট দেখিতে পাওয়া যাইবে।

মহাভারতের মহাভীষ, বিভীষণের ভীষ ও ভীষ্ম এই তিনেরই মধ্যে সাদৃশ্য আছে। মহাভীষ ও ভীষ্ম উভয়েই প্রথমে দোষ করিয়াছিলেন। পৃথিবীতে জন্মিয়াও এক-কালে পাপশূন্য হয়েন নাই। মহাভীষের নাম হইল প্রতীপ, অর্থাৎ প্রতিকূল; চেতন-সলিলা গঙ্গার সহিত তাঁহার মিলন হইল না। জ্ঞানের সহিত শান্ত অর্থাৎ উপরমের বিবাহ হইল, তথাপি একটু কিন্তু আছে, শান্তনু হইলেন শান্ত—নু। ন বিতর্কে। কবিও ইহার যথেষ্ট ইঙ্গিত দিয়াছেন। উপ-যুক্ত পুত্র ভীষ্ম বর্ত্তমান থাকিতে তিনি স্বয়ং ক্ষত্রিয় হইয়া ধীবরকন্যার রূপের মোহে আকৃষ্ট হইয়া এ প্রকার অন্যায় অঙ্গীকারে তাহাকে বিবাহ করিতে ব্যাকুল হইতেন না। সেই কারণে গঙ্গাও তাঁহার নিকট চিরদিন বাস করেন নাই। আখ্যায়িকাটির আর আর রহস্যগুলির কথা পরে বিবৃত হইবে।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (কর্ণেল)।

অজানা পথ

জানালার পাশে ব'সে, অজানা পথের পানে
চেয়ে থেকে ভাবি মনে অতীতের কোনখানে
প্রথম উহার বুকে পথিকের পদ-লেখা—
বিষ্ণু-বক্ষে চিহ্নসম সহসা দিছিল দেখা!

শ্রীউষাবালা সেন।

প্রলয়ের আলো

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

পাকা কথা

কাউণ্ট ভন আরেনবর্গের অনুরাগের পরিচয় পাইয়া বার্থা প্রথম কয়েক দিন বড়ই অস্বচ্ছন্দতা অনুভব করিল; তাহার মনে হইল, কাউণ্টকে বিবাহ করিলে জোসেফ কুরেটের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হইবে। তাহাকে ভালবাসিয়া জোসেফকে যথেষ্ট নির্য্যাতন সহ্য করিতে হইয়াছে; এমন কি, তাহার জন্যই জোসেফকে দেশত্যাগী হইতে হইয়াছে। জোসেফের প্রেমের স্মৃতি মন হইতে মুছিয়া ফেলিয়া সে কি করিয়া কাউণ্টকে বিবাহ করিবে? কাযটা বড়ই গর্হিত হইবে। কিন্তু ক্রমে তাহার মনের ভাব পরিবর্ত্তিত হইল। শিলাখণ্ডের উপর দীর্ঘকাল ধরিয়া ক্রমাগত জলবিন্দুপাতে শিলারও ক্ষয় হয়; মায়ের অবিশ্রান্ত উপদেশে ও অনুরোধে বার্থার মনও নরম হইল। তাহার ধারণা হইল, তাহার ন্যায় সম্ভ্রান্তবংশীয়া মহিলার জোসেফ কুরেটের ন্যায় সামান্য লোকের প্রণয়ে মুগ্ধ হইয়া নিতান্ত 'ছেলেমানুষী' হইয়াছিল, মোহে ভুলিয়া সে যে ভুল করিয়াছিল, তাহা পাগ্‌লামী ভিন্ন আর কি? কাউণ্টের সহিত জোসেফের তুলনা? ছি, ছি, সে কি ভুলই করিয়াছিল!—এই ভ্রম সংশোধন করাই বার্থা বাঞ্ছনীয় মনে করিল। সে কাউণ্টের পক্ষপাতিনী হইল।

কিন্তু বার্থা কাউণ্ট ভন আরেনবর্গকে অন্তরের সঙ্গে ভালবাসিতে পারিল কি না সন্দেহ। এ যেন পোষাকী প্রেম! কাউণ্টের স্তুতিবাদে তাহার রূপযৌবনের গর্ব্ব পরিতৃপ্ত হইয়াছিল; 'কাউণ্টেস্ ভন আরেনবর্গ' খেতাব যে কোন নারীর আকাঙ্ক্ষার সামগ্রী বলিয়াই তাহার ধারণা হইল। এই সম্মান ও গৌরব উপেক্ষা করা মূঢ়তা বলিয়াই তাহার বিশ্বাস হইল। কিন্তু সে স্থিরচিত্তে তাহার হৃদয়ভাব বিশ্লেষণ করিলে বুঝিতে পারিত, জোসেফকেই সে প্রাণ ভরিয়া ভালবাসে, কাউণ্টের প্রতি তাহার পক্ষপাত মোহমাত্র। প্রেম পাকা সোনা, মোহ গিল্টি!

নারীর মন ভুলাইবার কৌশলে কাউণ্ট অসাধারণ দক্ষ ছিলেন; কোন্ রমণীর প্রকৃতি কিরূপ, তাহা বুঝিয়া তিনি তাহার মনোরঞ্জনে এরূপ নৈপুণ্য প্রকাশ করিতেন যে, অতি সহজেই সে তাঁহার পক্ষপাতিনী হইত। কাউণ্ট আনা স্মিটকে যেন যাদু করিয়া ফেলিলেন। রূপে, গুণে, রুচির উৎকর্ষতায়, বংশের শ্রেষ্ঠতায় কাউণ্ট যে তাহার 'জামাই হইবার' উপযুক্ত, এবং তাঁহার অপেক্ষা যোগ্যতর জামাই সমস্ত য়ুরোপ খুঁজিয়া আর একটিও মিলিবে না—এ বিষয়ে সে নিঃসন্দেহ হইল! কাউণ্ট আরও কিছু দিনের ছুটীর জন্য যে আবেদনপত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহা মঞ্জুর হইয়াছিল। সুতরাং তাঁহার আর তাড়াতাড়ি করিবার কারণ রহিল না। শাশুড়ীর সহিত জামাতার যেরূপ ঘনিষ্ঠতা হয়, আনা স্মিটের সঙ্গে কাউণ্টের সেইরূপই ঘনিষ্ঠতা হইল। সকলেই বুঝিল, কাউণ্ট শীঘ্রই সেই বাড়ীর জামাই হইবেন। কাউণ্ট আনা স্মিটের গৃহে 'জামাই আদরে' দিনপাত করিতে লাগিলেন। কি স্ফূর্ত্তি!

কিন্তু অধিক মাখামাখির ফলে পিটার কাউণ্টের প্রতি কতকটা বীতস্পৃহ হইয়া উঠিল। তাহার শ্রদ্ধা কমিয়া গেল; তাহার ধারণা হইল—কাউণ্ট সঙ্কীর্ণচেতা, লোভী ও মৎলববাজ। সে কাউণ্টের প্রতি অসম্মান বা অশ্রদ্ধা প্রকাশ না করিলেও মনে করিত—এতখানি বাড়াবাড়ি বড়ই অশোভন, উপাধি ভিন্ন তাঁহার এরূপ কোন সম্বল নাই—যে জন্য তাঁহাকে ওভাবে মাথায় তুলিয়া নৃত্য করা সঙ্গত হইতে পারে। তাহার মা যখন বার্থাকে একাকী

কাউন্টের সঙ্গে অরণ্যে কান্তারে ভ্রমণে পাঠাইত, সামাজিক প্রথা অনুসারে ইহাও দোষাবহ বলিয়াই পিটারের মনে হইত; কিন্তু সে মায়ের ভয়ে এই অশোভন কার্য্যের প্রতিবাদ করিত না। বুড়ী মনে করিত, কাউণ্ট আর দু'দিন পরেই ত বার্থাকে বিবাহ করিবে, তবে আর তাহাকে একাকী কাউন্টের সঙ্গে যেখানে সেখানে পাঠাইতে দোষ কি? কাউণ্ট ত টোপ গিলিয়াছেই, এই সুযোগে মেয়েটা যদি তাহাকে ভাল করিয়া গাঁথিতে পারে—তাহার সুব্যবস্থায় সে ঔদাসীন্য প্রকাশ করিবে কেন? উভয়ের মিশামিশি যত বেশী হয়—ততই ভাল! কাউণ্ট বার্থার প্রতি প্রণয়প্রদর্শনে যদিও কোন দিন কার্পণ্য প্রকাশ করেন নাই, তথাপি প্রচলিত প্রথায় প্রকাশ্যভাবে সম্মতিজ্ঞাপন করেন নাই। সে সময় বিবাহসম্বন্ধ স্থির হইলে উভয় পক্ষে একটা চুক্তিনামা (Contract) লেখাপড়া হইত। কাউণ্ট তখন পর্য্যন্ত তত দূর অগ্রসর না হওয়ায় আনা স্মিট সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ হইতে পারে নাই; টোপ গিলিয়াও যদি শিকার ফস্‌কাইয়া যায় ত কাদা মাখাই সার হইবে!

ক্রমে কাউন্টের ছুটী শেষ হইয়া আসিল; তখনও তিনি বিবাহের প্রস্তাব করিলেন না। এ জন্য আনা স্মিট উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিল। তাহার আশঙ্কা হইল, বার্থাকে বিবাহ করিবার জন্য কাউন্টের আন্তরিক আগ্রহ নাই, তাঁহার সুদীর্ঘ অবসরটা তাহার বাড়ীতে 'জামাই আদরে' কাটাইবার জন্যই কাউণ্ট মিথ্যা আশা দিয়া তাহাকে ভুলাইয়া রাখিয়াছেন। তাহার এই অনুমান সত্য হইলে—ওঃ, কি সাংঘাতিক প্রতারণা! সে কি করিয়া সমাজে মুখ দেখাইবে? লজ্জায় তাহাকে দেশত্যাগিনী হইতে হইবে। কাউণ্ট ফাঁকা কথায় আর তাহাকে ভুলাইয়া রাখিতে না পারেন, কথাটা 'পাকা' হইয়া যায়, এই উদ্দেশ্যে আনা স্মিট এক দিন অপরাহ্নে কাউণ্টকে তাহার খাস-কামরায় আহ্বান করিল।

কাউণ্ট সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া একখানি আরাম-কেদারায় উপবেশন করিলে আনা স্মিট বলিল,"দেখ কাউণ্ট, তুমি হয় ত মনে করিতেছ, আমি হঠাৎ তোমাকে আমার খাস-কামরায় ডাকিয়া পাঠাইলাম কেন? তোমার সঙ্গে গোপনে আমার দুই একটা জরুরী কথা আছে;—হাঁ, আমাদের উভয়ের পক্ষেই সমান জরুরী। তুমি এত দিন আমার এখানে থাকায় আমরা সকলেই কত আনন্দিত হইয়াছি, তাহা তোমাকে বুঝাইতে পারিব না; সে আনন্দ অনির্ব্বচনীয়, কেবল উপভোগ্য; কিন্তু বড়ই ক্ষোভের বিষয় যে, তোমার ছুটী শেষ হইতে আর অধিক বিলম্ব নাই। শুনিলাম, আগামী সপ্তাহেই তোমাকে তোমার 'রেজিমেণ্টে' যোগদান করিতে হইবে। এ কথা কি সত্য?"

কাউণ্ট বলিলেন, "হাঁ, বড়ই দুঃখের বিষয় বটে, কিন্তু সত্য। সরকারের চাকুরী লইয়া যত দিন ইচ্ছা ছুটী ভোগ করা যায় না—ইহা যে বড়ই বিড়ম্বনাজনক, তা কি করিয়া অস্বীকার করি?"

আনা স্মিট মিনিট দুই নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিল, "তুমি বার্থার কিরূপ পক্ষপাতী হইয়াছ, তাহার প্রতি তোমার আকর্ষণ কিরূপ প্রবল—তাহা কেবল আমি কেন, সকলেই লক্ষ্য করিয়াছে বাবা! এমন কি, স্থানীয় সম্ভ্রান্ত সমাজে তোমাদের এই ঘনিষ্ঠতা আলোচনার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমি বার্থার মা, সুতরাং তাহার ভবিষ্যতের চিন্তা আমার পক্ষে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক—ইহা তোমাকে স্বীকার করিতেই হইবে। এই জন্য তাহার সম্বন্ধে তুমি কি স্থির করিয়াছ, তোমার মনের ভাব কি, তাহা জানিবার জন্য আমার বড়ই আগ্রহ হইয়াছে।"

আনা স্মিটের কথা শুনিয়া কাউণ্ট যেন বড়ই বিব্রত হইয়া উঠিলেন; তাহার মুখের দিকে চাহিতেও যেন লজ্জা হইল। কিন্তু তাঁহার এই ভাব স্থায়ী হইল না। তিনি ঢোক গিলিয়া বলিলেন, "হাঁ—ইয়ে—তা—আমি আপনার কন্যাকে প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিয়াছি, এ কথা স্বীকার করিতে কুণ্ঠার কোন কারণ দেখি না।"

আনা স্মিটের বুকের উপর হইতে যেন একটা পাহাড় নামিয়া গেল। সে মনে মনে অত্যন্ত খুসী হইয়া একটু হাসিয়া বলিল, "আঃ, তোমার কথা শুনিয়া আমার যে কি আনন্দ হইল!—কিন্তু একটা কথা যে এখনও বুঝিতে পারিতেছি না। তোমাদের এই ভালবাসার পরিণাম কি, তাহা চিন্তা করিয়াছ?"

কাউণ্ট ঈষৎ আবেগভরে বলিলেন, "দেখুন ফ্র, আমি অনেক পূর্ব্বেই আপনার কন্যার নিকট বিবাহের প্রস্তাব করিতাম; কিন্তু তাহা করিতে আমার সাহস হয় নাই

কেন জানেন? আপনাকেও সে কথা বলি বলি করিয়া এত দিন বলিতে পারি নাই; আমার এই দুর্ব্বলতা আপনি মার্জ্জনা করিবেন।—কথা এই যে, অতি সম্ভ্রান্ত বংশে আমার জন্ম হইলেও আমি চাকরী করিয়া যে যৎসামান্ত বেতন পাই, তাহা ব্যতীত আমার অন্য কোন আয় নাই; তাহার উপর আমার বংশোচিত মান-সম্ভ্রম বজায় রাখিতে গিয়া আমাকে কতকগুলা টাকা দেনা করিতে হইয়াছে। আমার চাকরীর আয় হইতে সেই ঋণ পরিশোধের কোন উপায় দেখিতেছি না; এ অবস্থায় বিবাহের মত ব্যয়সাধ্য সখ কি করিয়া পূর্ণ করি? আমার আর্থিক অবস্থা সচ্ছল হইলে এত দিন আপনার কন্যার পাণি প্রার্থনা করিতাম।”

আনা স্মিট উত্তেজিত স্বরে বলিল, “এই কথা? এই তুচ্ছ কারণে তুমি চিরজীবন অশান্তি ভোগ করিবে, আর আমার মেয়েটারও জীবনের সুখ, শান্তি, আশা, আনন্দ নষ্ট করিবে? তুমি যদি বার্থাকে নিরাশ করিয়া চলিয়া যাও—তাহা হইলে তাহার কি দশা হইবে, কোনও দিন ভাবিয়া দেখিয়াছ কি? আমি কি তোমাকে এক দিন কথায় কথায় বলি নাই—আমার স্বামী বার্থার জন্য যে সম্পত্তি উইল করিয়া দিয়া গিয়াছেন—তাহার মূল্য দশ লক্ষ ফ্রাঙ্ক? —আমি এই সম্পত্তি হাতে লইয়া নানা ভাবে তাহার উন্নতি করিয়াছি; কিছু দিনের মধ্যেই তাহার মূল্য পনের লক্ষ ফ্রাঙ্ক হইবে। বার্থাকে বিবাহ করিয়া যে এই পনের লক্ষ ফ্রাঙ্কের মালিক হইবে, তাহাকেও ভবিষ্যতে অর্থাভাবে কষ্ট পাইতে হইবে—এ কথা শুনিলে কি না হাসিয়া থাকা যায়? এই অর্থ কি তোমার সামাজিক সম্ভ্রমরক্ষা বা সাংসারিক ব্যয়নির্ব্বাহের পক্ষে যথেষ্ট নহে?”

কাউণ্ট আত্মসংবরণে অসমর্থ হইয়া বিহ্বল স্বরে বলিয়া উঠিলেন, “যথেষ্ট নহে? যথেষ্ট অপেক্ষা অনেক অধিক! আমাদের দেশে এরূপ জমীদার অল্পই আছে, যাহাদের সম্পত্তির মূল্য পনের লক্ষ ফ্রাঙ্কের অধিক। এরূপ সম্পত্তির আশা আমার সর্ব্বাপেক্ষা অসম্ভব স্বপ্নেরও অগোচর!”

আনা স্মিট হাসিয়া বলিল, “কিন্তু তোমার অসম্ভব স্বপ্ন সফল হওয়া কত সহজ, এখন বুঝিলে ত? সে কথা থাক্। এই তুচ্ছ কারণ ভিন্ন বিবাহে আপত্তি হইবার আর কোন কারণ আছে কি? আমি তোমার হিতৈষিণী, আমার কাছে কোন কথা গোপন করিও না বাবা!”

কাউণ্ট মস্তক অবনত করিলেন। আনা স্মিট সে সময় সাফল্য-গর্ব্বে বিভোর না হইলে দেখিতে পাইত, তাহার প্রশ্নে কাউণ্টের মুখ লাল হইয়া উঠিয়াছে, এবং চক্ষুতে উদ্বেগ ও চাঞ্চল্য পরিস্ফুট হইয়াছে। তাহা দেখিলে আনা স্মিট অনুমান করিতে পারিত—কাউণ্টের জীবনেতিহাসের কোন কোন পৃষ্ঠা সম্ভবতঃ মসী।লপ্ত ছিল, এবং সে অযোগ্য পাত্রে কন্যা-সম্প্রদান করিতে উদ্যত হইয়াছে। কিন্তু আনা স্মিট কাউণ্টের এই ভাবান্তর লক্ষ্য করিবার অবসর পাইল না।

কাউণ্ট মুহূর্ত্তমধ্যে আত্মসংবরণ করিয়া দৃঢ় স্বরে বলিলেন, “না, বিবাহের অন্য কোন প্রতিবন্ধক নাই।”

আনা স্মিট উৎসাহভরে বলিল, “উত্তম, তাহা হইলে তুমি বাগ্‌দানে সম্মত আছ?”

কাউণ্ট বলিলেন, “নিশ্চয়ই।”

আনা স্মিট বলিল, “আমি অবিলম্বেই বাগ্‌দানের সংবাদ যথারীতি প্রচারিত করিব, তাহার পর তোমার সুবিধা বুঝিয়া বিবাহের দিন স্থির করিও।”

কাউণ্ট বলিলেন, “তাহাই হইবে। আপনার কাছে আজ অসঙ্কোচে আমার মনের কথা প্রকাশ করিয়া কি আনন্দ হইয়াছে, তাহা আপনাকে বলিয়া বুঝাইতে পারিব না। আপনাকে সরলভাবে আর একটা কথা বলিব, তাহা শুনিয়া আপনি আমাকে নির্লজ্জ বলিয়া উপহাস করিবেন না। আমি যাহাতে অবিলম্বে আমার উত্তমর্ণগণের কবল হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারি, আপনাকে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। আর—আর সমর-বিভাগ হইতে স্বেচ্ছায় আমার নাম অপসারিত করিতে কিছু টাকা খরচ হইবে, সে টাকাটাও—”

কাউণ্ট কথা শেষ না করিয়া মাথা চুল্‌কাইতে লাগিলেন।

আনা স্মিট প্রসন্ন হাস্যে বলিল, “ও কথা বলিতে আর লজ্জা কি বাবা! তা, কত টাকা হইলে তোমার ঋণ পরিশোধ, আর কি বলে—পণ্টন হইতে তোমার নাম খারিজ করিতে পারিবে, বল।”

কাউণ্টের তখনও মাথা চুল্‌কাইতেছিল; সুতরাং তিনি মাথা হইতে হাত না নামাইয়া মাথা নামাইয়া কুণ্ঠিতভাবে বলিলেন, “ঠিক যে কত টাকা লাগিবে, তা এখন

আন্দাজ করিয়া বলা শক্ত; তবে আমার বিশ্বাস, খুব বেশী না হইলেও, অন্ততঃ এক লাখ ফ্রাঙ্ক পাইলেই এই ছুটো ধাক্কা আমি সাম্‌লাইতে পারিব।"

কথাটা বলিয়াই তিনি মাথা তুলিয়া উৎকণ্ঠিতভাবে আনা স্মিটের মুখের দিকে চাহিলেন। তাঁহার মনে হইল, বিবাহের প্রস্তাব পাকা হইবার পূর্ব্বে এতগুলি টাকা চাহিয়া বসা হয় ত সঙ্গত হইল না; এক লাখ ফ্রাঙ্ক বাহির করিয়া দিতে হইবে ভাবিয়া মাগী হঠাৎ বাঁকিয়া বসিলেই সব মাটী!—কিন্তু আনা স্মিটের মুখভাবের কোন পরিবর্ত্তন হইল না দেখিয়া তিনি আশ্বস্ত হইলেন; শেষে বুড়ীর কথা শুনিয়া তিনি কেবল বিস্মিত নহে, স্তম্ভিত হইলেন!

আনা স্মিট অবজ্ঞাভরে বলিল, "মোট এক লক্ষ ফ্রাঙ্ক! এই সামান্য টাকার কথা বলিতে তোমার অত সঙ্কোচ হইতেছিল? কি আশ্চর্য্য! এই টাকা ত যে কোন দিন আমার তহবিলে আমদানী হয়! তুমি এখান হইতে যাইবার পূর্ব্বে আমাকে স্মরণ করাইয়া দিও, টাকা পাইবে।"

কাউণ্ট আনন্দে উৎসাহে আত্মবিস্মৃত হইয়া লাফাইয়া উঠিলেন এবং ছুই হাতে বুড়ীর গলা জড়াইয়া ধরিয়া তাহার ছুই গালে ছুই চুমা দিলেন! গদগদ স্বরে বলিলেন, "তুমি সত্যই আমার মা! আজ তোমাকে প্রাণ ভরিয়া মা বলিয়া ডাকিয়া ধন্য হইলাম।"

ধন্য রূপচাঁদ! ধন্য তোমার মোহিনী শক্তি!

বুড়ী বলিল, "আর আমি তোমাকে জামাই সম্বোধন করিয়া কৃতার্থ হই। এখন চল জামাই বাবাজী, গাড়ী করিয়া একটু বেড়াইয়া আসি। বার্থাকেও কাপড়-চোপড় পরিয়া প্রস্তুত হইতে বলি।"

দশ মিনিট পরে আনা স্মিট বার্থার ঘরে গিয়া ছুই হাতে বার্থাকে জড়াইয়া ধরিল এবং তাহাকে বুকে লইয়া আবেগ-ভরে তাহার মুখচুম্বন করিল।

ব্যাপার কি বুঝিতে না পারিয়া বার্থা সবিস্ময়ে বলিল, "কি হইয়াছে, মা! তোমাকে এত খুসী দেখিতেছি কেন?"

আনা স্মিট বলিল, "তুমি এখন আর বার্থা স্মিট নও, মা, আজ হইতে তুমি কাউণ্টেস্ ভন আরেনবর্গ! কাউণ্টেস্ ভন আরেনবর্গ! তুমি আমার অভিবাদন গ্রহণ কর। আজ আমার জীবন সার্থক।"

বার্থা বলিল, "তোমার কথা বুঝিতে পারিলাম না, মা! কি হইয়াছে?"

আনা স্মিট বলিল, "আমার জীবনের স্বপ্ন সফল হইয়াছে। কাউণ্ট তোমাকে বিবাহ করিতে সম্মত হইয়াছেন। কথা পাকা হইয়া গিয়াছে; এইমাত্র সব ঠিক করিয়া আসিলাম; ছুই দিনের মধ্যেই বাগ্দানের সংবাদ প্রচারিত হইবে।"

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

বাজিমাৎ

কাউণ্ট ভন আরেনবর্গের সহিত বার্থার বিবাহের প্রস্তাব স্থির হওয়ায় আনা স্মিটের এতই আনন্দ হইল যে, তাহার মাথা ঘুরিয়া গেল! কাউণ্টের শ্যালক বলিয়া সমাজে পরিচিত হইবার আশায় ফ্রিজও অত্যন্ত উৎফুল্ল হইয়া উঠিল; তথাপি তাহার মনে হইল—তাহার মা একটু বেশী রকম বাড়াবাড়ি করিতেছে। কিন্তু পিটার একটু চাপা মেজাজের লোক, সে তেমন উৎসাহ প্রকাশ করিল না; তাহার মনে হইল,—এত তাড়াতাড়ি বিবাহ না দিলেই ভাল হইত। সকল দিক না দেখিয়া, ধীরভাবে চিন্তা না করিয়া তাড়াতাড়ি বিবাহ দিলে অনেক সময় পস্তাইতে হয়, এ কথাও সে বলিতে কুণ্ঠিত হইল না।

পিটারের মন্তব্য শুনিয়া আনা স্মিট একটু অসন্তুষ্ট হইল। সে উত্তেজিত স্বরে বলিল, "সে দিনের ছেলে তুমি, তোমার ত ভারী বুদ্ধি! সকল দায়িত্ব আমি নিজের ঘাড়ে লইয়া কাউণ্টের সঙ্গে বার্থার বিবাহ দিতেছি; আমি ভুল করি নাই, ইহা তোমরা পরে বুঝিতে পারিবে। তোমার সন্দেহ আস্থাস্থাপনের অযোগ্য!"

পিটার মায়ের প্রকৃতি বুঝিত; আনা স্মিট একেই প্রতিবাদ-অসহিষ্ণু, তাহার উপর বিবাহটা শীঘ্র শেষ করিবার জন্য তাহার ছুর্দ্দমনীয় জিদ দেখিয়া পিটার আর কোন কথা বলিল না। সে ভাবিল, "হবেও বা! মায়ের মত বুদ্ধিমতী রমণী পৃথিবীতে আর কয় জন জন্মিয়াছে?"

আনা স্মিট কাউণ্টের সহিত তাহার কন্যার বাগ্‌দানের সংবাদ স্থানীয় সংবাদপত্রসমূহে প্রকাশের ব্যবস্থা করিয়াই ক্ষান্ত হইল না ; সে কাউণ্টের বংশমর্য্যাদা ও নানা সদ্‌গুণের বিবরণ লিখিয়া একখানি পত্র ছাপিল এবং তাহা তাহার আত্মীয়, বন্ধু ও পরিচিত ভদ্রলোকগুলির নিকট পাঠাইয়া দিল। সে সঙ্কল্প করিল, বার্থার বিবাহে এরূপ আড়ম্বর করিবে যে, তাহা দেখিয়া সকলকেই একবাক্যে স্বীকার করিতে হইবে, তেমন জাঁক জুরিচে কেহ কখন দেখে নাই !

বাগ্‌দান-পর্ব্ব যথানিয়মে সুসম্পন্ন হইবার কয়েক দিন পর কাউণ্ট তাঁহার কর্ম্মস্থানে যাত্রা করিলেন ; জুরিচ-ত্যাগের পূর্ব্বদিন কাউণ্ট আনা স্মিটকে টাকার কথা বলিলে আনা স্মিট তাঁহাকে প্রতিশ্রুত অর্থ প্রদান করিল। বিবাহের পূর্ব্বেই কাউণ্টকে এতগুলি টাকা দেওয়া হইল দেখিয়া ফ্রিজ বড়ই অসন্তুষ্ট হইল। সে রাগ করিয়া বলিল, "মা, তোমার এক বিন্দু কাণ্ডজ্ঞান নাই ! হইলেনই বা উনি কাউণ্ট ; উঁহার প্রকৃতি, প্রবৃত্তি, অবস্থা সম্বন্ধে কোন কথা আমরা জানি না বলিলেও চলে ; উনি আমাদের অতিথি হইয়া কিছু দিন এখানে বাস করিয়াছেন এবং তোমার পীড়াপীড়িতে বার্থাকে বিবাহ করিতে সম্মত হইয়াছেন ; কিন্তু তাহা উঁহার মনের কথা কি না, উনি এখানে ফিরিয়া আসিয়া বিবাহ করিবেন কি না, কে বলিবে ? তুমি উঁহার দমবাজিতে ভুলিয়া বিবাহের আগেই এতগুলি টাকা দিয়া ফেলিলে ! এই রকম চালাকী করিয়া দাঁও মারা ইঁহার পেশা কি না, তাহাই বা কে বলিবে? শেষে তোমাকে পস্তাইয়া মরিতে না হয় !"

পুত্রের কথায় আনা স্মিট রাগিয়া আগুন হইল। কাউণ্ট দম্‌বাজ ! এই ভাবে দাঁও মারা তাঁহার পেশা ! এ রকম গ্লানিকর অশ্রাব্য কথা বলিতেও ফ্রিজের সাহস হইল? আনা স্মিট চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া বলিল, "ফ্রিজ, তোমার মুখ ভারী আল্‌গা ; কাউণ্টের মত সম্মানিত লোকের বিরুদ্ধে এ সকল কথা বলিতে তোমার লজ্জা হইল না ? ছি, ছি, তুমি এত অভদ্র ! কেন তুমি অনধিকারচর্চ্চা করিতে আসিয়াছ ? টাকা আমার ; আমার টাকা আমি জলে ফেলিব, ইচ্ছামত বিলাইয়া দিব ; আমার কার্য্যের প্রতিবাদ করিবার তোমার কি অধিকার ? আমার কোন কথার বা কার্য্যের প্রতিবাদ করিলে তোমার মঙ্গল হইবে না।"

মায়ের কাছে তাড়া খাইয়া ফ্রিজ আর মাথা তুলিয়া কোন কথা বলিতে সাহস করিল না। পিটারও মায়ের এই অপব্যয়ের প্রতিবাদ করিতে উদ্যত হইয়াছিল, কিন্তু ফ্রিজের অবস্থা দেখিয়া সে সতর্ক হইল। মাকে চটাইলে মঙ্গল নাই, ইহা সে বেশ ভালই জানিত। এতগুলি টাকা পরহস্তগত হইল দেখিয়া ফ্রিজ ও পিটার অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইলেও কাউণ্টের সহিত বার্থার বিবাহ তাহারা অত্যন্ত বাঞ্ছনীয় বলিয়াই মনে করিয়াছিল। কাউণ্টের শ্যালক এবং কাউণ্টেসের ভাই বলিয়া সর্ব্বত্র পরিচিত হইবার জন্য তাহা-দের বড়ই আগ্রহ হইয়াছিল ; তবে এতগুলি টাকা হাতে পাইয়া যদি কাউণ্টের মতপরিবর্ত্তন হয়, তিনি বিবাহ করিতে না আইসেন—তাহা হইলে টাকাও গেল, কাউণ্টের শ্যালক হইবার সৌভাগ্যেও বঞ্চিত হইতে হইল—ভাবিয়া উভয়ে এত দূর কাতর হইয়াছিল।

ফ্রিজ বা পিটার কাউণ্টের বিরুদ্ধে অসাধুতা বা লোভের ইঙ্গিত করিলে তাহাতে আনা স্মিটের ত রাগ হইবারই কথা, কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে, বাগ্‌দানের পর বার্থাও কাউণ্টের এরূপ পক্ষপাতিনী হইয়াছিল যে, কাউণ্টের রুচি ও প্রবৃত্তির কেহ নিন্দা করিলে সে তাহা সহ্য করিতে পারিত না ! মায়ের মনোবৃত্তি তাহার হৃদয়েও সংক্রামিত হইয়াছিল। কি এক অপূর্ব্ব মাদকতায় তাহার হৃদয় আচ্ছন্ন হইয়াছিল, এই মোহ প্রেম নহে ; সে তখনও জোসেফকে ভুলিতে পারে নাই। জোসেফের সরল, সুন্দর, উদার মুখ মধ্যে মধ্যে তাহার মনে পড়িত ; বেদনায় তাহার হৃদয় টন্‌-টন্ করিয়া উঠিত। তখনই নিজের উপর তাহার রাগ হইত এবং কৃষকপুত্র জোসেফের স্মৃতি মন হইতে মুছিয়া ফেলিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিত। কিন্তু প্রথম যৌব-নের নবীন প্রেম তাহার ধমনীর শোণিত-প্রবাহের সঙ্গে যেন মিশিয়া গিয়াছিল, সহস্র চেষ্টাতেও সে তাহার প্রভাব অতিক্রম করিতে পারিত না ; তখন সে জোসেফকে অপ্রণয়ী, নিষ্ঠুর, অবিশ্বাসী প্রতিপন্ন করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিত ! সে চিত্তচাঞ্চল্য দমন করিবার জন্য বিষয়া-স্তরে মনোনিবেশ করিল। মায়ের সঙ্গে বাজারের দোকানে দোকানে ঘুরিয়া বিবাহোপলক্ষে ব্যবহারোপযোগী নানা প্রকার সখের জিনিষ ক্রয় করিয়া বেড়াইতে লাগিল। কিন্তু আনা স্মিটের স্বদেশানুরাগ যতই প্রবল হউক, কোন স্বদেশী

পরিচ্ছদ তাহার পছন্দ হইল না ; 'ফ্যাসনের রাণী' প্যারিসের দিকেই তাহার মন পড়িয়া রহিল। এই দুর্ব্বলতা য়ুরোপের প্রত্যেক দেশের ধনশালিনী নারীমাত্রেরই মজ্জাগত। সুইটজারল্যাণ্ড ত দূরের কথা, ইংলণ্ড ও আমেরিকার মহিলা-সম্প্রদায়েরও বিশ্বাস, পরিচ্ছদ-নির্ম্মাণে প্যারিসের দর্জ্জিরা জগতে অতুলনীয়! আনা স্মিটের ধারণা হইল, কাউণ্ট-পত্নীর ব্যবহারযোগ্য পরিচ্ছদ সুইটজারল্যাণ্ডের কোন নগরে সংগৃহীত হইবার সম্ভাবনা নাই ; এই জন্য সে বহু অর্থব্যয় করিয়া প্যারিসে রাশি রাশি পরিচ্ছদের 'ফরমাস' পাঠাইল। বিবাহের এক সপ্তাহ পূর্ব্ব হইতে আনা স্মিটের বাসভবন অলকায় পরিণত হইল এবং সেই শোভা দেখিবার জন্য বহু দূরবর্ত্তী পল্লী হইতে দলে দলে লোক আসিতে লাগিল।

বার্থার দিনগুলি বেশ আনন্দে কাটিতে লাগিল ; এখন তাহার বিন্দুমাত্র অবসর নাই। প্রত্যহ প্রভাতে সে ডাকঘরে আর্দ্দালী পাঠায়, প্রত্যহই সে কাউণ্টের নিকট হইতে এসেন্স-সুবাসিত এক একখানি সুদীর্ঘ পত্র পায় ; তাহার প্রতি ছত্রে মধু ক্ষরিতে থাকে! প্রেমলিপি-রচনায় বার্থা এখন শিক্ষানবীশ নহে ; বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া জোসেফকে সে গোপনে প্রেমের পত্র লিখিত, তাহার সেই অভ্যাস এখন কাযে লাগিল। কাউণ্টের পত্র পাঠ করিয়া দীর্ঘতর পত্রে তাহার যথাযোগ্য উত্তর লিখিতে দিবাভাগ সুখস্বপ্নের ন্যায় অতিবাহিত হইত। তাহাদের উভয়ের উত্তর-প্রত্যুত্তরে যেন 'প্রেমের কুস্তি' চলিত ; উভয়েরই চেষ্টা পত্রের ভাষায় প্রেমের প্রগাঢ়তা পরিব্যক্ত করিয়া পরস্পরকে পরাজিত করিবে!—প্রেমলিপি ডাকঘরে পাঠাইয়া, পরী সাজিয়া সে সান্ধ্যভ্রমণে বাহির হইত ; সন্ধ্যার পর দর্জ্জিদের কায-কর্ম্ম পরীক্ষা করিত ; তাহার পর আহারান্তে শয়ন করিতে যাইত। সমস্ত দিনের মধ্যে বেচারা এক মিনিট ফুরসৎ পাইত না।

কাউণ্ট আনা স্মিটকে লিখিয়াছিল—ডিসেম্বর মাসের পূর্ব্বে পল্টনের চাকরীতে তাহার ইস্তফা দেওয়ার সুযোগ হইবে না ; অতএব বিবাহের দিন যেন ডিসেম্বর মাসেই ধার্য্য করা হয়।—এ কথা শুনিয়া বার্থার কত অভিমান! এই দীর্ঘ বিরহ তাহার অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু তাহার অভিমান-ভরা অনুযোগে কোন ফল হইল না। ডিসেম্বর মাসেই বিবাহের দিন স্থির হইল। তবে কাউণ্ট নভেম্বরেই আসিবেন লিখিয়া বার্থাকে আশ্বস্ত করিলেন।

কাউণ্ট নভেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে পল্টনের চাকরীতে ইস্তফা দিয়া বিবাহ করিতে আসিলেন ; কিন্তু এবার তিনি একা আসিলেন না। তাঁহার সঙ্গে একটি খুড়তুতো ভাই ও একটি আর্দ্দালী আসিল ; এই আর্দ্দালীটি তাঁহার পল্টনের 'সিপাই' ছিল।

বিবাহের পূর্ব্বরাত্রে আনন্দে, উৎসাহে, কায-কর্ম্মে কাহারও নিদ্রা হইল না। বিনিদ্র বিভাবরী প্রভাত হইল ; কিন্তু সে দিন কি দুর্যোগ! এরূপ ভীষণ দুর্দ্দিনে কখন কাহার বিবাহ হইয়াছে কি না সন্দেহ। প্রভাত হইতেই মুষলধারে বর্ষণ আরম্ভ হইয়াছিল ; তাহার পর যতই বেলা অধিক হইল, ততই ঝটিকা-প্রকোপ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল! ঝটিকাবেগে হ্রদের জলরাশি আলোড়িত ও উচ্ছ্বসিত হইয়া নগর-পথ পরিপ্লাবিত করিল। প্রলয়ের মেঘ যেন মাথার উপর ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম করিল ; তাহার পর শুভ্র তুষাররাশি গিরিশৃঙ্গ হইতে প্রচণ্ড ঝটিকা-প্রবাহে বিক্ষিপ্ত হইয়া, সমগ্র নগর আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল ; যেন প্রলয়কাল সমাগত!

বিধাতার এই অবিচারে আনা স্মিটের ক্রোধ ও ক্ষোভের সীমা রহিল না। তাহার কন্যার বিবাহের দিন পরমেশ্বরের এ কি প্রতিকূলতা! পরমেশ্বর তাহার কারখানার কর্ম্মচারী হইলে এই ধৃষ্টতার উপযুক্ত প্রতিফল পাইতেন ; আনা স্মিট তাঁহাকে চাকরী হইতে বরখাস্ত করিয়াই ক্ষান্ত হইত না, জোসেফ কুরেটের মত তাঁহাকেও চূর্ণ করিত! কিন্তু বিধাতাকে হাতে না পাওয়ায় তাহার মর্ম্মাহত হওয়াই সার হইল। সে জলের মত অর্থব্যয় করিয়া যে অদৃষ্টপূর্ব্ব সমারোহের ব্যবস্থা করিয়াছিল, রুদ্রের একটি ফুৎকারে তাহা নিশ্চিহ্ন হইয়া মুছিয়া গেল! বৃষ্টির অবিশ্রান্ত বর্ষণে, ঝটিকার প্রচণ্ড আবর্ত্তে, বহুদূরব্যাপী তুষার-সম্পাতে তাহার বিপুল আয়োজন পণ্ড হওয়ায়, তাহার উৎসব-মুখর প্রমোদাগার যেন নিরানন্দময় শ্মশানে পরিণত হইল! তাহার আনন্দের হাট ভাঙ্গিয়া প্রলয়ের ঝটিকা হো হো শব্দে বিদ্রূপের হাসি হাসিতে লাগিল।

সকল দেশের নারী অল্পাধিকপরিমাণে অন্ধ সংস্কারের

বশবর্ত্তিনী; আনা স্মিট এই কুসংস্কারের প্রভাব অতিক্রম করিতে পারে নাই; তাহার মনে হইল, এই আকস্মিক দুর্যোগ বার্থার বিবাহিত জীবনের অশুভ সূচনা করিতেছে; হয় ত এই বিবাহের ফল কল্যাণপ্রদ হইবে না; বার্থার ভবিষ্যৎ জীবন হয় ত এইরূপ ঝটিকাবিক্ষুব্ধ অশান্তিসঙ্কুল হইবে।—এ কথা চিন্তা করিয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গ ভয়ে কণ্টকিত হইয়া উঠিল। সে প্রথমে মনে করিল, বিবাহের দিন পরিবর্ত্তিত করিবে; কিন্তু সকল আয়োজন পণ্ড করিয়া অনির্দ্দিষ্ট ভবিষ্যতে নূতন আয়োজন করা অসম্ভব বুঝিয়া, সে কথা মুখে আনিতে তাহার সাহস হইল না। সেই দুর্যোগের মধ্যেই সে শুভকার্য্য শেষ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইল।

নির্দ্দিষ্ট সময়ে বিবাহের দল ভজনালয় অভিমুখে যাত্রা করিল বটে, কিন্তু ঝড়ে তাহারা ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। তখন এরূপ বেগে তুষার-বৃষ্টি হইতেছিল যে, সমস্ত আকাশ গাঢ় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন, এক হাত দূরের বস্তুও দেখিবার উপায় ছিল না! কোন প্রকারে গীর্জ্জায় উপস্থিত হইবার পর, বিবাহ শেষ হইলে বার্থা যখন 'কাউণ্টেস্' হইয়া মাতৃভবনে প্রত্যাগমন করিল, তখনও প্রকৃতির ভাবান্তর লক্ষিত হইল না। মেয়ে 'কাউণ্টেস্' হইয়াছে দেখিয়া আনা স্মিটের সকল ক্ষোভ দূর হইল; সে যেন সুখের সপ্তম স্বর্গে বিচরণ করিতে লাগিল! তাহার উচ্চাভিলাষ এত দিনে পূর্ণ হইল; সে এখন কাউণ্টেসের জননী! বার্থাকে গর্ভে ধারণ করা সে সার্থক মনে করিল। অতঃপর শতাধিক পুরুষ ও মহিলা ভোজনে বসিল। সে এক বিরাট ব্যাপার! যেন রাজকীয় উৎসব!

আকাশ অপেক্ষাকৃত পরিষ্কৃত হইলে কাউণ্টেস্ তাহার স্বামীর সহিত রেল-ষ্টেশনে যাত্রা করিল, কারণ, জর্ম্মণীতে তাহাদের 'মধুচন্দ্রমা'-যাপনের ব্যবস্থা হইয়াছিল।

এইরূপে বার্থার জীবন-নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কের অভিনয় আরম্ভ হইল। পাঠক-পাঠিকাগণ ধৈর্য্য ধারণ করিয়া অপেক্ষা করিতে পারিলে ক্রমে অবশিষ্ট অঙ্কগুলির অভিনয়ও দেখিতে পাইবেন।

এখানে একটি ক্ষুদ্র ঘটনার কথা বলিব।

স্মিট এণ্ড সন্সের লোহার কারখানায় একটি যুবক কারিগর চাকরী করিত; তাহার নাম ক্লিন্‌জিলি।—সে জোসেফ কুরেটের পরম বন্ধু। জোসেফ সেণ্টপিটার্স-বর্গে উপস্থিত হইয়া ক্লিন্‌জিলিকে মধ্যে মধ্যে পত্র লিখিত। কাউণ্ট ভন আরেনবর্গের সহিত বার্থার বিবাহের পর সে জোসেফকে একখানি দীর্ঘ পত্র লিখিয়াছিল। সেই পত্রের একাংশ আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম :—

"তুমি আমাকে অনুরোধ করিয়াছিলে—ফ্রলিন স্মিট (বার্থা) সম্বন্ধে কোন কথা যেন তোমাকে লিখিতে ভুলিয়া না যাই। কিন্তু তাহার সম্বন্ধে এবার তোমাকে যে সংবাদ দিতেছি, তাহা পাঠ করিয়া তুমি নিশ্চয়ই আনন্দিত হইবে না। প্রায় এক সপ্তাহ পূর্ব্বে কাউণ্ট ভন আরেনবর্গ নামক একটা জর্ম্মাণের সহিত তাহার বিবাহ হইয়াছে শুনিয়া তুমি কি বিস্মিত হইবে? এই লোকটার সম্বন্ধে কোন কথা আমরা জানিতে পারি নাই; তাহার কথা লইয়া হাটে-বাজারে যথেষ্ট আলোচনা চলিতেছে! কেহ কেহ বলিতেছে, লোকটা ভয়ঙ্কর ভণ্ড ও ধড়িবাজ, আমাদের কর্ত্রীকে চালবাজিতে মাৎ করিয়াছে! তবে লোকটার যে কাণা-কড়িরও সম্বল নাই, সাধারণের এই ধারণা সত্য বলিয়াই মনে হয়; কর্ত্রী তাহাকে বিস্তর টাকা ঘুস দিয়া মেয়েটি গছাইয়াছেন—এরূপ জনরবও শুনিতে পাইতেছি। কাউণ্ট জামাই পাইয়া অহঙ্কারে মাটীতে তাঁহার পা পড়িতেছে না, কিন্তু আমার বিশ্বাস, শীঘ্রই তাঁহাকে পস্তাইতে হইবে। বিবাহে যে রকম জাঁকজমক হইয়াছিল—তেমন সমারোহ আর কখন দেখি নাই; কোন রাজকন্যার বিবাহেও বোধ হয়, ও রকম ধূমধাম হয় না! সে দিন কারখানার কায-কর্ম্ম বন্ধ ছিল, আমরা সকলেই নিমন্ত্রিত হইয়াছিলাম। গীর্জ্জায় যখন বিবাহ হইতেছিল, তখন ভীষণ দুর্যোগ; কিন্তু সেই দুর্যোগের মধ্যেই আমরা বিবাহ দেখিতে গিয়াছিলাম। তখন বার্থার মুখ দেখিয়া, এই বিবাহে সে যে খুব সুখী হইয়াছে, এরূপ মনে হইল না। তবে তাহার পোষাক ও অলঙ্কারের ঘটা দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হইয়াছিলাম বটে। কাউণ্টের চেহারা ও ভাব-ভঙ্গী দেখিয়া মনে হয়, লোকটা ফক্কড় ও অপদার্থ।

আশা করি, এই বিবাহের সংবাদ শুনিয়া তুমি বুক ফাটিয়া মরিবে না। তুমি ফ্রলিন স্মিটের কথা ভুলিয়া যাও। রুসিয়ায় গিয়াছ, বোধ হয়, এখন কিছু দিন সেখানেই থাকিবে। এই সুযোগে কোন একটা সুন্দরী রুসবালার প্রেমে পড়িতে পারিবে না? ইহা অপেক্ষা সে অনেক ভাল হইবে।"

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

দুর্ভেদ্য রহস্য

জোসেফ কুরেট সেণ্টপিটার্সবর্গে আসিয়া সলোমন কোহেনের আশ্রয়ে বেশ সুখে ছিল। সলোমন কোহেন কয়েক দিনেই বুঝিতে পারিল, জোসেফের মত কাযের লোক বড়ই দুর্লভ; নিহিলিষ্টদের পরম সৌভাগ্য যে, সে তাহাদের দলে যোগ দিয়াছে। সলোমন জোসেফকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতে লাগিল।

জনসাধারণের সহিত সলোমনের যথেষ্ট পার্থক্য ছিল; অনেক বিষয়েই তাহার অসাধারণত্ব বুঝিতে পারা যাইত। প্রাচীন যুগের সলোমন 'মহাজ্ঞানী' বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন; সলোমন কোহেনেরও সেই নামধারণ সার্থক হইয়াছিল। সে এরূপ তীক্ষ্ণদৃষ্টিসম্পন্ন, কূটনীতিজ্ঞ, বিবেচক, দূরদর্শী, বুদ্ধিমান্ ও সতর্ক ছিল যে, রুসিয়ার পক্ষে সে বিপজ্জনক হইয়া উঠিয়াছিল; তাহাকে নিহিলিষ্ট সম্প্রদায়ের মেরুদণ্ড বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সে নিহিলিষ্ট সম্প্রদায়কে নানা ভাবে সাহায্য করিলেও সর্ব্বদা এরূপ সতর্ক থাকিত যে, পুলিস কোন দিন তাহাকে রুস গবর্ণমেণ্টের শত্রু বলিয়া সন্দেহ করিতে পারে নাই; সে যে অত্যুৎসাহী নিহিলিষ্ট, ইহা পুলিসের ও রাজপুরুষগণের স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। নিহিলিষ্ট নেতৃবর্গের সহিত তাহার পত্রব্যবহারের বিরাম ছিল না; সে রুস রাজধানীতে বসিয়া অলক্ষ্য সূত্রসঞ্চালনে তাহাদিগকে পরিচালিত করিত; কিন্তু গবর্ণমেণ্টের গুপ্তচররা এ সকল ব্যাপার জানিতে পারিত না। এই জন্যই বলিতেছি, সলোমন কোহেন সাধারণ লোক ছিল না। অবশ্য, নিহিলিষ্ট নেতৃবৃন্দের স্বভাবসিদ্ধ সতর্কতাও তাহার সাফল্যলাভের অন্যতম কারণ। তাহার কথায় ও ব্যবহারে সকলেরই ধারণা হইত, এরূপ সরলপ্রকৃতি, বিনয়ী, সদাশয় লোক জগতে দুর্লভ!

লোকের ধারণা ছিল, সলোমন কোহেন 'টাকার কুমীর'; সে নানা উপায়ে প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিত বটে, কিন্তু তাহার ব্যয়ের পরিমাণ এত অধিক ছিল যে, সে অধিক কিছু সঞ্চয় করিতে পারে নাই। সে নানা কারবারে লিপ্ত ছিল, এ জন্য জোসেফের কাযের অভাব হইল না। সে দেখিত, জোসেফ যখন যে কাযের ভার পাইত, তাহা অপূর্ব দক্ষতার সহিত সুসম্পন্ন করিত।

সলোমন কোহেনের কন্যা রেবেকা অসামান্য রূপের জন্য খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। সকলেই তাহার রূপের প্রশংসা করিত। সে যেরূপ ধীরপ্রকৃতি, সেইরূপ স্বল্পভাষিণী। প্রগল্‌ভা যুবতীরা তাহার গাম্ভীর্য্য ও চিন্তাশীলতার নিন্দা করিত; মুখরা চপলার দল তাহাকে গর্ব্বিতা মনে করিত। এই নিরীহ শান্ত যুবতীকে দেখিয়া বা তাহার সহিত আলাপ করিয়া কেহই বুঝিতে পারিত না, তাহার সঙ্কল্প কিরূপ দৃঢ়, তাহার প্রতিহিংসা-বৃত্তি কিরূপ প্রখর!

অল্পদিনেই জোসেফের সহিত রেবেকার বন্ধুত্ব হইল। রেবেকার সদয় ব্যবহারে জোসেফ তাহার বশীভূত হইল। আত্মীয়-স্বজনের সংস্রববিচ্যুত, প্রবাসী জোসেফ রেবেকার সহানুভূতি ও মমতার পরিচয় পাইয়া তাহার নিকট কৃতজ্ঞ না হইয়া থাকিতে পারিল না। কিন্তু সে তাহার কৃতজ্ঞতা কোন দিন বাক্যে প্রকাশ করিবার চেষ্টা করে নাই। জোসেফ তাহার অপরূপ রূপ-লাবণ্যে মুগ্ধ হইয়াছিল বটে, কিন্তু সে মোহ তখনও লালসা-বর্জ্জিত; মহিমময়ী দেবমূর্ত্তি দেখিলে ভক্তের মনে যে ভাবের উদয় হয়, রেবেকার প্রতি তাহার মনের ভাব তখনও সেইরূপ। উভয়ের বন্ধুত্ব ক্রমে প্রগাঢ় হইয়া উঠিল। এই সময় জোসেফ তাহার বন্ধুর পত্রে কাউণ্ট ভন আরেনবর্গের সহিত বার্থার বিবাহের সংবাদ জানিতে পারিল। এই সংবাদে জোসেফ বড়ই অধীর হইয়া উঠিল। সে ভাবিয়াছিল, ব্যাপারটা নিতান্ত তুচ্ছ মনে করিয়া ঔদাসীন্য ও অবজ্ঞা প্রকাশ করিবে। কিন্তু তাহার হৃদয় বিদ্রোহী হইয়া উঠিল; সে চিত্ত সংযত করিতে পারিল না। তাহার আশা ছিল, প্রতিকূল অবস্থার সহিত সংগ্রাম করিয়া সে এক দিন জয় লাভ করিবে, তখন বার্থাকে লাভ করা হয় ত অসম্ভব হইবে না; কিন্তু বার্থার বিবাহের সংবাদ শুনিয়া আশার ক্ষীণ আলোকশিখা নির্ব্বাপিত হইল। বার্থা তাহাকে প্রতারিত করিয়াছিল, প্রেমের অভিনয়ে তাহাকে মুগ্ধ করিয়া তাহার হৃদয় লইয়া খেলা করিয়াছিল, এই ধারণাই তাহার অধিকতর মর্ম্মপীড়ার কারণ হইল; নিজের জীবনে ঘৃণা হইল; কিন্তু রেবেকার স্নেহে ও যত্নে সে কতকটা প্রকৃতিস্থ হইল; তাহার মনে হইল, যদি সে রেবেকার প্রণয় লাভ করিতে পারে,

তাহা হইলে আবার সে সুখী হইবে। অতীতের স্মৃতি মন হইতে মুছিয়া ফেলিয়া আবার নূতন করিয়া সংসারের পথে অগ্রসর হইবে। বার্থা তাহার মুখের দিকে চাহিল না, তাহার হৃদয়ভরা প্রেম পদদলিত করিয়া অন্যের হস্তে আত্মসমর্পণ করিল; সে কেন তাহার জন্য হা-হুতাশ করিয়া মরিবে? জোসেফের হৃদয় রেবেকাময় হইল!

কিন্তু অদ্ভুত এই নারীর প্রকৃতি! তাহার হৃদয়-রহস্য দুর্জ্ঞেয়। রেবেকা তাহাকে স্নেহ করে, যত্ন করে, তাহার প্রতি মমতায় রেবেকার কোমল হৃদয় পূর্ণ; কিন্তু রেবেকা তাহাকে প্রেমাস্পদ মনে করে বা তাহাকে প্রণয়িনীর ন্যায় ভালবাসে—ইহা সে বিশ্বাস করিতে পারিল না।—রেবেকা কোন দিনই তাহার নিকট সে ভাব প্রকাশ করে নাই। রেবেকার মনের ভাব সে বুঝিতে পারিল না; অথচ একবার নারীর প্রণয়ে নিরাশ হইয়া রেবেকার নিকট তাহার মনের ভাব প্রকাশ করিতেও সাহস হইল না। অবশেষে সে স্থির করিল, আর আগুন লইয়া খেলা করিবে না; সলোমন কোহেনের আশ্রয় ত্যাগ করিবে এবং আশাহীন উদ্দেশ্যহীন জীবন লইয়া দেশদেশান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইবে—যত দিন মৃত্যু আসিয়া তাহার সকল সন্তাপ না হরণ করে!

এইরূপ যখন তাহার মনের অবস্থা, সেই সময় এক দিন সে সংবাদ পাইল, কোন জরুরি কার্য্যে তাহাকে সুইটজারল্যাণ্ডে যাত্রা করিবার জন্য অবিলম্বে প্রস্তুত হইতে হইবে! এই সংবাদে সে বড়ই কাতর হইয়া পড়িল, এবং রেবেকার সান্নিধ্য ত্যাগ করা তাহার পক্ষে কত কষ্টকর—তাহা বুঝিতে পারিল! কিন্তু নিহিলিষ্ট দলপতির আদেশ অলঙ্ঘনীয়—তাহাও সে জানিত; সুতরাং ইচ্ছা না থাকিলেও তাহাকে সুইটজারল্যাণ্ডে প্রত্যাগমন করিতেই হইবে। সে এই আদেশ খণ্ডনের কোন উপায় না দেখিয়া অবশেষে সলোমন কোহেনের শরণাপন্ন হইল। সুইটজারল্যাণ্ডে না গিয়া সে যাহাতে তাহার নিকট থাকিতে পারে—তাহারই ব্যবস্থা করিবার জন্য অনুরোধ করিল। সলোমন বলিল, তাহার চেষ্টা সফল হইবার সম্ভাবনা নাই; দলপতির আদেশ পালন করিতেই হইবে। কিন্তু সে জোসেফের প্রার্থনা হঠাৎ অগ্রাহ্য না করিয়া, তাহার অনুকূলে চেষ্টা করিতে সম্মত হইল। জোসেফকে ছাড়িয়া দিতে তাহারও ইচ্ছা ছিল না; জোসেফের ন্যায় কার্য্যদক্ষ ও বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী তাহার সুবিস্তীর্ণ কর্ম্মশালায় আর একটিও ছিল না, জোসেফকে ছাড়িয়া দিলে তাহার কাযকর্ম্মের যথেষ্ট ক্ষতি হইবে—ইহাও সে জানিত।

কিন্তু জোসেফ তাহার আশ্রয় ত্যাগ করিয়া যাইতে অসম্মত কেন—ইহা জানিবার জন্য সলোমনের আগ্রহ হইল। সে বলিল, "সুইটজারল্যাণ্ড তোমার স্বদেশ; স্বদেশ যাইতে ইচ্ছা না হয় কার?—তুমি এ সুযোগ ত্যাগ করিতেছ কেন?"

জোসেফ বলিল, "আপনার নিকট পিতার স্নেহ পাইয়াছি; আমি এখানে বড়ই সুখে আছি।"

সলোমন বলিল, "ইহাই কি তোমার স্বদেশপ্রত্যাগমনে অনিচ্ছার একমাত্র কারণ?"

জোসেফ অবনত মুখে বলিল, "দেশে আমার কোন বন্ধন নাই; এখানে আমি—আমি—"

সলোমন বলিল, "কি বলিতেছিলে বল, বলিতে কুণ্ঠিত হইতেছ কেন?"

জোসেফ বলিল, "আমি আপনার কন্যাকে ভালবাসিয়া ফেলিয়াছি!"

জোসেফের কথা শুনিয়া সলোমনের মুখ হঠাৎ অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া উঠিল, ক্রোধে চক্ষু যেন জ্বলিয়া উঠিল; কিন্তু সে তৎক্ষণাৎ মনের ভাব গোপন করিয়া সংযত স্বরে বলিল, "রেবেকাও কি তোমাকে ভালবাসে?"

জোসেফ ক্ষুণ্ণভাবে বলিল, "জানি না, তাঁহার মনের ভাব কোন দিন বুঝিতে পারি নাই।"

সলোমন বলিল, "তাহার মনের ভাব জানিবার জন্য কোন দিন চেষ্টা করিয়াছ? তাহাকে সে কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছ?"

জোসেফ বলিল, "না; সে কথা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে আমার সাহস হয় নাই। আমার কথা শুনিয়া আপনি কি রাগ করিলেন? আমি তাঁহাকে প্রাণ ভরিয়া ভালবাসি। দেবী তিনি, আমি মনে মনে তাঁহাকে ভক্তের মত শ্রদ্ধার পুষ্পাঞ্জলি দিয়া আসিয়াছি, এ আমার অপরাধ কি না, জানি না, কিন্তু এ কথা স্থির যে, আপনার ইচ্ছার প্রতিকূলে আমি কোন কায করিব না।"

সলোমন অচঞ্চল স্বরে বলিল, "না জোসেফ, আমি তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট হই নাই, রাগও করি নাই।"

সলোমনের কথায় সাহস পাইয়া জোসেফ বলিল, "আপনি রাগ করেন নাই শুনিয়া আমার বড় আনন্দ হইল ; একটা কথা জানিতে আমার অত্যন্ত আগ্রহ হইয়াছে। আমার কোন আশা আছে কি ?"

জোসেফের প্রশ্নে সলোমনের মুখমণ্ডল অস্বাভাবিক গম্ভীর হইয়া উঠিল ; তাহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল, দারুণ উত্তেজনায় তাহার উভয় হস্ত মুষ্টিবদ্ধ হইল, সুগৌর প্রশস্ত ললাটের শিরা ফুলিয়া উঠিল এবং ভ্রূ কুঞ্চিত হইল। জোসেফ তাহার এই ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া ভীত হইল ; সে কি বলিতে উদ্যত হইয়াছে, এমন সময় সলোমন হাত তুলিয়া তাহাকে নীরব থাকিতে ইঙ্গিত করিয়া দৃঢ়স্বরে বলিল, "জোসেফ, তুমি এ আশা ত্যাগ কর। তোমার আশা পূর্ণ হওয়া অসম্ভব ; হাঁ, সম্পূর্ণ অসম্ভব।"

জোসেফ সবিস্ময়ে বলিল, "আপনি অসঙ্গত না বলিয়া অসম্ভব বলিলেন কেন ?"

সলোমন জোসেফের মুখের উপর স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া ধীর গম্ভীর স্বরে বলিল, "না, অসঙ্গত না হইলেও অসম্ভব। আমি আবার বলিতেছি—সম্পূর্ণ অসম্ভব। এ আশা তুমি হৃদয় হইতে বিসর্জ্জন কর।"

জোসেফ কুণ্ঠিতভাবে বলিল, "আপনি বিজ্ঞ, বিবেচক ; তথাপি আপনি আমাকে আমার ধমনীর শোণিত-প্রবাহ রুদ্ধ করিতে আদেশ করিতেছেন। আমার আশা পূর্ণ হওয়া অসম্ভব কেন—তাহা কি জানিতে পারি না ?"

সলোমন যেন কিঞ্চিৎ বিব্রত হইয়া বলিল, "জোসেফ কুরেট ! আমি তোমার কৌতূহল দূর করিতে পারিব না ; অন্ততঃ এখন নহে।"

জোসেফ আর কোন কথা না বলিয়া ক্ষুব্ধ হৃদয়ে অবনত মস্তকে সেই কক্ষ ত্যাগে উদ্যত হইয়াছে, এমন সময় সলোমন পূর্ব্ববৎ গম্ভীর স্বরে বলিল, "শোন জোসেফ, একটা কথা জানিতে চাই ; তুমি যে রেবেকাকে ভালবাসিয়াছ—ইহা কি সে জানিতে পারিয়াছে ? এরূপ সন্দেহও কি তাহার মনে স্থান পাইয়াছে ?"

জোসেফ ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "জানি না ; তবে কেহ ভালবাসিলে নারীরা তাহা বুঝিতে পারে না, ইহা বিশ্বাস করা কঠিন। নারীর হৃদয় দর্পণের ন্যায় স্বচ্ছ, প্রেমিকের প্রেম তাহাতে প্রতিবিম্বিত হয়।"

সলোমন এ কথা শুনিয়া জোসেফকে যাহা বলিল, তাহাতে তাহার বিস্ময় শতগুণ বর্দ্ধিত হইল !

সলোমন বলিল, "তুমি প্রেমিকের মতই কথা বলিয়াছ। তোমার প্রণয় ঘনীভূত হইবার পূর্ব্বে নিঃসন্দেহ হওয়াই কর্ত্তব্য। তুমি আমাকে যে সকল কথা বলিলে—এই সকল কথা রেবেকাকেও বলিয়া দেখ। তাহা হইলে তাহার মনের ভাব বুঝিতে পারিবে ; বুঝিতে পারিবে, তোমার আশা পূর্ণ হইবার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা নাই।"

কিন্তু জোসেফ তিন দিনের মধ্যেও রেবেকাকে কোন কথা বলিতে সাহস করিল না। তাহার প্রতি রেবেকার মনের ভাব কিরূপ—তাহার ইঙ্গিতে, কথায়, ব্যবহারে তাহাই পরীক্ষা করিতে লাগিল। শেষে তাহার ধারণা হইল, রেবেকা তাহাকে নিশ্চয়ই ভালবাসে। কিন্তু রেবেকা তাহার প্রতি আসক্তা হইলেও তাহাদের বিবাহে কি বাধা থাকিতে পারে—জোসেফ তাহা বুঝিতে পারিল না। সে জানিত, সলোমন কোহেন তাহার দারিদ্র্যকে অপরাধ মনে করে না। নিহিলিষ্টরা সাম্যবাদী। তবে বাধা কি ?

জোসেফ রেবেকার মনের ভাব জানিবার জন্য ব্যগ্র হইল ; কিন্তু কথাটা জিজ্ঞাসা করিতে সঙ্কোচ বোধ করিল, শীঘ্র তেমন সুযোগও পাইল না। অবশেষে এক দিন সুযোগ জুটিয়া গেল ; বোধ হয়, সলোমন কোহেন ইচ্ছা করিয়াই সুযোগটা জুটাইয়া দিল। সলোমন রেবেকাকে এক দিন কোন থিয়েটারে 'অপেরা' দেখাইতে লইয়া যাইবে বলিয়া প্রতিশ্রুত হইল। নির্দ্দিষ্ট দিন সন্ধ্যার পর রেবেকা সাজসজ্জা করিয়া তাহার পিতাকে বলিল, "এস বাবা, থিয়েটারে যাই।"

সলোমন তখন টেবলের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া কি লিখিতেছিল ; সে মুখ তুলিয়া বলিল, "ভারি একটা জরুরি কাযে ব্যস্ত আছি, মা ! আমার ত তোমার সঙ্গে যাইবার অবসর হইবে না।"

রেবেকা বলিল, "সে কি বাবা ! আমি যে কাপড়-চোপড় পরিয়া প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছি ! তোমার কায আছে, আমার সঙ্গে যাইতে পারিবে না, এ কথা আগে বলিলেই পারিতে।"

সলোমন বলিল, "আমি যাইতে না পারিলেও তোমার

কোন অসুবিধা হইবে না, জোসেফ কুরেট তোমার সঙ্গে যাইবে।”

রেবেকা পিতার আদেশে জোসেফকে সঙ্গে লইয়া অপেরা দেখিতে চলিল।

তাহারা উভয়ে একত্র রঙ্গালয়ে উপস্থিত হইল; কিন্তু জোসেফ 'বলি বলি' করিয়াও কথাটা বলিতে পারিল না, ভাবিল, 'অপেরা' দেখিয়া বাড়ী ফিরিবার সময় বলিলেই চলিবে।

কয়েক ঘণ্টা পর অভিনয় শেষ হইলে, তাহারা রঙ্গালয়ের বাহিরে আসিল। শীতের রাত্রি। পথে বরফ জমিয়া লোহার মত শক্ত হইয়াছিল। আকাশ নির্মেঘ; নক্ষত্রগুলি এরূপ উজ্জ্বল প্রভা বিকীর্ণ করিতেছিল যে, মেরুসন্নিহিত দেশ ভিন্ন অন্যত্র সেরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না। জোসেফ ও রেবেকা পশুলোম-নির্ম্মিত স্থূল পরিচ্ছদে সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিয়া, অনাবৃত শ্লেজ্ গাড়ীতে পাশাপাশি বসিয়া বাড়ী চলিল।

গাড়ী তুষারমণ্ডিত পথে চলিতে আরম্ভ করিলে জোসেফ রেবেকাকে বলিল, “তোমাকে সঙ্গে লইয়া এই ভাবে বেড়াইতে পাওয়ায় আমার যে কি আনন্দ হইতেছে—তাহা তোমাকে বুঝাইতে পারিব না রেবেকা।”

রেবেকা বলিল, “আনন্দটা যে তুমি একাই উপভোগ করিতেছ—এরূপ মনে করিও না; আমারও খুব আনন্দ হইয়াছে।”

রেবেকার কথা শুনিয়া জোসেফের মুখ লাল হইয়া উঠিল; তাহার হৃদয় সবেগে স্পন্দিত হইতে লাগিল। তাহার বিশ্বাস হইল—আশা পূর্ণ হইবে। সে বলিল, “তোমার কথা শুনিয়া বড়ই সুখী হইলাম, রেবেকা! কারণ—কারণ—”

কারণটা কি, তাহা আর তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল না, কথাগুলা যেন তাহার গলায় বাধিয়া গেল!

রেবেকা স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে জোসেফের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, “কারণ—বলিয়াই চুপ করিলে কেন? কি বলিতেছিলে, বল।”

রেবেকার সহানুভূতিপূর্ণ সুকোমল কণ্ঠস্বরে জোসেফের সঙ্কোচ দূর হইল, একটু সাহসও হইল। সে তাহার পুরুদস্তানামণ্ডিত হাতখানি রেবেকার হাতের উপর রাখিয়া কম্পিত স্বরে বলিল, “কারণ, আমি তোমাকে ভালবাসি।”

জোসেফের কথা শুনিয়া রেবেকা চঞ্চল হইয়া উঠিল; সে স্থির দৃষ্টিতে একবার জোসেফের মুখের দিকে চাহিয়া মুখ ফিরাইল। নৈশ অন্ধকারে দৃষ্টি অবরুদ্ধ না হইলে জোসেফ দেখিতে পাইত—রেবেকার নীল শতদলের মত চক্ষু দুটি জলে ভাসিতেছে!

কিন্তু রেবেকার ভাবান্তর সে বুঝিতে পারিল, তাই সভয়ে বলিল, “আমার কথায় রাগ করিলে কি?”

রেবেকা মানসিক চাঞ্চল্য দমন করিয়া ধীর স্বরে বলিল, “না জোসেফ, তোমার কথায় আমি রাগ করি নাই।”

জোসেফ একটু অভিমানের সুরে বলিল, “রাগ কর নাই, তবে আমার কথা শুনিয়া ও রকম চঞ্চল হইয়া উঠিলে কেন? বল, রেবেকা, বল,—আমি তোমার অপ্রীতিভাজন নহি—আমার এই ধারণা কি ভ্রান্ত?”

রেবেকা যেন মোরিয়া হইয়া উঠিয়া দৃঢ় স্বরে বলিল, “জোসেফ কুরেট, তুমি বুঝিতে পার নাই—আমার বুকে ছুরি মারিয়া আমাকে কিরূপ যন্ত্রণা দিতেছ!”

জোসেফ স্তম্ভিত হইয়া ক্ষণকাল নিস্তব্ধভাবে বসিয়া রহিল, তাহার পর অস্ফুট স্বরে বলিল, “তোমার কথাগুলি হেঁয়ালীর মত দুর্ব্বোধ্য; আমি উহার মর্ম্ম বুঝিতে পারিলাম না!”

রেবেকা বলিল, “ও হেঁয়ালীই থাক, তোমাকে উহার মর্ম্ম বুঝিতে হইবে না।”

জোসেফ বলিল, “না রেবেকা, উহা আমাকে জানিতেই হইবে। যদি বুঝিতাম, আমার প্রার্থনায় তুমি অসন্তুষ্ট হইয়াছ, তাহা হইলে ইহা জানিবার জন্য নিশ্চয়ই আগ্রহ প্রকাশ করিতাম না। কিন্তু আমি জানি, আমাকে তুমি উপেক্ষা কর না।”

রেবেকা মনে ব্যথা পাইয়া বলিল, “তোমাকে উপেক্ষা করিব? আমার হৃদয় কি নারী-হৃদয় নহে?”

জোসেফ রেবেকার মুখের কাছে মুখ আনিয়া আবেগভরে বলিল, “তাহা হইলে তুমি আমাকে সত্যই ভালবাস?”

এ কথায় রেবেকা পুনর্ব্বার অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল; মিনিট দুই সে কোন কথা বলিতে পারিল না, শেষে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, “হাঁ, আমি তোমাকে ভালবাসি;

ভগিনী তাহার ভাইকে যে রকম ভালবাসে, সেই রকম ভালবাসি।"

জোসেফ দীর্ঘনিশ্বাসে বলিয়া ফেলিল, "কিন্তু আমি তোমার ও রকম ভালবাসা চাহি না, রেবেকা! আমি ত তোমার ভাই নই; নারী তাহার প্রিয়তমকে যে ভাবে ভালবাসে, আমি তোমার সেই ভালবাসার প্রার্থী। আমি তোমাকে লাভ করিতে চাই।"

রেবেকা কাতর কণ্ঠে বলিল, "জোসেফ, তুমি আর আমার বুকে ছুরি মারিও না। এ যন্ত্রণা অসহ্য!"

জোসেফ ক্ষুব্ধ স্বরে বলিল, "আমি তোমার বুকে ছুরি মারিতেছি? কোন নারী তাহার প্রণয়ীর মুখে প্রেমের কথা শুনিয়া তাহা কি ছুরিকাঘাতের মত যন্ত্রণাদায়ক মনে করে? তুমি ত স্বীকার করিয়াছ, আমাকে ভালবাস।"

বেরেকা বলিল, "হাঁ, ভগিনী ভাইকে যে রকম ভালবাসে, আমি তোমাকে ঠিক সেই রকম ভালবাসি।"

জোসেফ বলিল, "আমি ত তোমার ভ্রাতৃস্নেহের প্রার্থী নহি; আমি চাহি তোমার হৃদয়; আমি তোমাকে পত্নীরূপে লাভ করিতে চাহি।"

রেবেকা এবার দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া নীরবে রোদন করিল; অশ্রুরাশিতে তাহার হাতের দস্তানা ভিজিয়া গেল। উদ্বেল হৃদয়াবেগ দমন করিতে না পারায় সে ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া জোসেফ বিস্ময়ে অভিভূত হইল। জোসেফ জানিত, রেবেকার চিত্তসংযমের শক্তি অসাধারণ, দুঃখ-কষ্টে সে বিচলিত হয় না; সে অনেকবার রেবেকার নয়নে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দেখিয়াছে, কিন্তু কখন অশ্রু দেখিতে পায় নাই; অশ্রুপাত করা যেন তাহার পক্ষে অস্বাভাবিক। সেই রেবেকার নয়নে অশ্রুর ধারা বহিতেছে!—ইহার কারণ বুঝিতে না পারিয়া জোসেফ হতবুদ্ধি হইল; তাহার মুখে কথা সরিল না।

মনের ভার লঘু হইলে রেবেকা মুখ তুলিয়া ভগ্ন স্বরে বলিল, "জোসেফ, ও সকল কথা আমাকে আর কখন বলিও না; কারণ, আমি তোমাকে বিবাহ করিতে পারিব না। আমাদের মিলন অসম্ভব।"

জোসেফ বলিল, "আমাদের মিলন অসম্ভব?"

রেবেকা দৃঢ় স্বরে বলিল, "হাঁ, পূর্ব্বেও বলিয়াছি, এখন আবার বলিতেছি—এ জীবনে আমাদের মিলন অসম্ভব।"

জোসেফ বলিল, "কিন্তু আমাকে কি ইহার কারণ জানিতে দিবে না?"

রেবেকা বলিল, "এখন আমাকে ও কথা জিজ্ঞাসা করিও না। ভবিষ্যতে হয় ত তোমাকে তাহা বলিতে পারিব। আমি তোমাকে সহোদরের মত ভালবাসিব; তুমি আমাকে ভগিনীর মতই দেখিও। তোমাকে বিবাহ করা—আমার অসাধ্য।"

জোসেফ আর কোন কথা বলিল না; অবশিষ্ট পথটুকু তাহারা মৌনভাবে অতিক্রম করিল। আশার যে ক্ষীণ শিখা জোসেফের হৃদয়ে মৃদুপ্রভা বিকাশ করিতেছিল, তাহার ভাগ্যবিড়ম্বনায় তাহা নির্ব্বাপিত হইল। নিরাশার গাঢ় অন্ধকারে তাহার হৃদয় আচ্ছন্ন হইল। সে মর্ম্মাহত হইয়া মনে মনে বলিল, "বাঁচিয়া আর সুখ কি? এখন মৃত্যুতেই আমার শান্তি। যেরূপে হউক, মরিয়া এ জালা জুড়াইব। জীবন আমার পক্ষে বিড়ম্বনামাত্র।"

শকটখানি সলোমনের গৃহদ্বারে উপস্থিত হইলে জোসেফ রেবেকাকে নামাইয়া দিল; তাহার পর তাহার হাত ধরিয়া লইয়া চলিল। অন্ধকারে কিছু দূর অগ্রসর হইয়া জোসেফ হঠাৎ থামিল এবং রেবেকাকে মৃদু স্বরে বলিল, "রেবেকা, তোমার অনুরোধ বা আদেশ আমার নিকট অলঙ্ঘনীয়। আমি তোমার প্রস্তাবেই সম্মত হইলাম। তোমাকে ভগিনীর মতই ভালবাসিব। কিন্তু আমার মনের কথা তুমি জানিতে পারিয়াছ; প্রেয়সী নারীর প্রতি প্রেমিক পুরুষ যে ভাবে আকৃষ্ট হয়, আমিও তোমার প্রতি সেইরূপ আকৃষ্ট হইয়াছি; এই আকর্ষণ হইতে মুক্ত হওয়া আমার অসাধ্য। প্রণয়িনীকে বক্ষে ধারণ করিয়া যে সুখ, প্রণয়িনীর অধরে অধর স্পর্শ করিয়া সে আনন্দ ও তৃপ্তি, একবার মুহূর্ত্তের জন্য আমাকে সেই সুখ, সেই আনন্দ ও তৃপ্তি লাভ করিতে দাও; ইহাই আমার অন্ধকারাচ্ছন্ন, দুর্গম, মরুময় জীবনপথের পাথেয় হউক।"

রেবেকা কোন কথা বলিল না; সে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া জোসেফের বুকে মাথা রাখিল; তখন জোসেফ উন্মত্তপ্রায় হইয়া তাহাকে আলিঙ্গন-পাশে আবদ্ধ করিল এবং ব্যাকুলভাবে তাহার মুখচুম্বন করিল। রেবেকাও জোসেফের তৃষাতুর ওষ্ঠে মুহূর্ত্তমাত্র স্থায়ী প্রণয়িনীর অধিকারের ছাপ মারিয়া দিল; তাহার পর সুদৃঢ় ভুজবন্ধন হইতে তাহাকে

মুক্তিদান করিয়া কোমল স্বরে বলিল, "কি মধুর মাদকতা! কিন্তু জোসেফ, যদি তোমার অঙ্গীকার পালনের ইচ্ছা থাকে—তাহা হইলে তুমি আর কখন আমাকে এ ভাবে প্রলুব্ধ করিও না!"

জোসেফ বলিল, "এই মুহূর্ত্তে আমার মৃত্যু হইলে সে মৃত্যু কি সুখের হইত!"

রেবেকা ব্যগ্রভাবে বলিল, "না, না, ও কথা মুখে আনিও না; যে আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছে—তাহাকে শাস্তি দেওয়ার জন্য তোমাকে বাঁচিয়া থাকিতে হইবে।"

এ আবার কি কথা?—জোসেফ বিস্ময়ের অতল গর্ভে তলাইয়া গেল!

[ক্রমশঃ।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

আকুলতা

দূরে ঐ বনে বনে পাখী করে কলরব,
তোমার কথাটি মনে পড়ে,
সারাটি হৃদয় মোর ভেদিয়া আঁধার ঘোর
তোমার স্মৃতিতে যায় ভ'রে।

ঐ ঘন নীলাকাশ,
বন-কুসুমের বাস,
পাতায় পাতায় শ্যামলতা,
প্রভাত-বাতাসটুকু কি যেন আবেগ-মাখা
ভরা কি নীরব আকুলতা!

এবার বিদায়-ক্ষণে তুমি ত ছিলে না কাছে—
কেহ ত কাতর আঁখি তুলি',
বেদনা-ব্যাকুল বুকে চাহেনি আমার পানে,
দেয়নি বিদায় 'এস' বলি'।

বাতায়নে কারো আঁখি,
ছিল না ত অশ্রু মাখি,
শূন্য কুটীর ছিল শুধু,
দু'পাশে ধানের ক্ষেত মাঝে সরু আল ধরি'
এসেছি একেলা ওগো বঁধু।

অদূরে খেজুর-ঝোপ—শ্রান্ত গোধনগুলি
আলসে শুইয়া পাশে তার,
আধেক মুদিত আঁখি, মনে হয় বুকে বুঝি
তাহাদেরো ভাবনার ভার!

স্নিগ্ধ বটের ছায়,
ভাবনা-বিহীন তায়,
রাখালেরা খেলে লুকোচুরি,
সরম ভাঙিয়া মোর অস্ফুট রোদন-ধ্বনি
উঠেছিল সারা হৃদি জুড়ি'।

সুন্দর সে মুখখানি দেখিয়াছি কতবার
তবু গো নূতন পলে পলে,
করুণ-মিনতি-মাখা শূন্য নয়ন হ'তে
বেদনা যে জল হয়ে গলে।

প্রবাস-যামিনী কবে
জানি না বিগত হবে,
কবে হবে মধুর মিলন।
যুগল-হৃদয় মাঝে পুলক উঠিবে দুলে
সুধাময় হবে এ জীবন!

শ্রীকালীপদ ঘোষ।

স্বামী বিবেকানন্দ ও জাতিগঠন

২

আর্য্য, দ্রাবিড়, শক, হুন, তুর্কী, পাঠান, মোগল ও য়ুরোপীয় নানা দেশ হইতে আগত নানা জাতি এ দেশে রহিয়াছে। ভাষা, আচার-ব্যবহার ইত্যাদির এত বিচিত্র সমাবেশের ফলে মানুষে মানুষে পার্থক্য এখানে এত বেশী যে, ইহার মধ্যে ঐক্য কোথায়, সহসা বলা কঠিন। সনাতন ধর্ম্ম, বৌদ্ধধর্ম্ম, খৃষ্টান ও ইস্‌লামধর্ম্ম, জগতের এই চারিটি প্রধান ধর্ম্ম—এই ভারতবর্ষেই আসিয়া একত্র মিলিয়াছে। এই মিলনের ভিত্তি বা মূলনীতি সহসা আমাদের স্থূলদৃষ্টিতে প্রতিভাত না হইলেও, আমরা সমাজ-জীবনে ইহা স্পষ্টই উপলব্ধি করি যে, বেদান্ত-ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ভারতের নিজস্ব যাহা কিছু, তাহার সহিত অন্যান্য অভ্যাগত জাতির ধর্ম্ম ও আদর্শ একত্র করিয়া ভারতবর্ষ তাহার বিশিষ্ট প্রকৃতি অনুযায়ী এক অতি বৃহৎ সামাজিক সম্মিলনের আয়োজন করিয়া রাখিয়াছে। এই আয়োজনকে যাহাতে আমরা সার্থক করিয়া তুলিতে পারি, তাহার জন্য স্বামী বিবেকানন্দ যে সার্ব্বজনীন সম্মিলনভূমির প্রতি আমাদিগকে লক্ষ্য রাখিতে উপদেশ করিয়াছেন, তাহা পূর্ব্ব-প্রবন্ধে যথাসাধ্য আলোচনা করিতে চেষ্টা করিয়াছি। "ভাবী ভারত গঠনে ধর্ম্মের ঐক্যসাধন অনিবার্য্যরূপে প্রয়োজন। এই ভারতভূমির পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম, উত্তর হইতে দক্ষিণ সর্ব্বত্র এক ধর্ম্ম সকলকে স্বীকার করিতে হইবে"—এ কথা যিনি বলিয়াছেন, তিনি এক ধর্ম্ম কথাটা সচরাচর যে অর্থে ব্যবহৃত হয়, সে অর্থে ব্যবহার করেন নাই। 'আমাদের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত সমূহ যতই বিভিন্ন হউক, উহাদের যতই বিভিন্ন দাবী থাকুক, তথাপি কতকগুলি এমন সিদ্ধান্ত আছে, যাহাতে সকল সম্প্রদায়ই একমত।' পূর্ব্ব-প্রবন্ধে ইহাকেই আমরা 'পরমার্থ-সাধনা' বলিয়াছি।

ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িক ঐক্যসাধন করিয়া জাতি-গঠনের জন্য আমাদের এই স্বদেশীয় উপায়টি সম্বন্ধে অনেকের নানা প্রকার সন্দেহ আছে। পাশ্চাত্যদেশাগত নানা ভাব আত্মস্থ করিয়া আমাদের অনেকের চিত্তে এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছে যে, যে বৈদেশিক জাতীয় প্রকৃতির সম্পূর্ণ বিপরীত শাসনপ্রণালীর বন্ধন ভারতের সমস্ত বিচ্ছিন্ন সঙ্ঘকে এক শৃঙ্খলে বাঁধিয়াছে, তাহাই আমাদিগকে ঐক্য দান করিবে এই রাষ্ট্রীয় পরাধীনতা ও পরমুখাপেক্ষিতার বজ্রবন্ধনকে যাঁহারা ঐক্যসাধনের উপায়রূপে গ্রহণ করিয়া নিশ্চিন্তভাবে কালাতিপাত করিতে চাহেন, স্বামীজী তাঁহাদের দলের ছিলেন না। বন্ধন দ্বারা কতকগুলি দেহকে একত্র করিলেই মিলন সাধিত হয় না। বাহিরের এই বন্ধন যতই দৃঢ় হউক, এক দিন যদি সহসা কোন কারণে ইহা শিথিল হইয়া যায়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ আমরা বিভক্ত, বিচ্ছিন্ন ও ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িব। সেই জন্য বন্ধনের শক্তি অপেক্ষা আত্মশক্তিতেই স্বামীজী অধিকতর বিশ্বাসী ছিলেন এবং তাঁহার স্বদেশ সহস্র সহস্র বৎসরের বিপ্লবের মধ্য দিয়াও যে অব্যাহত সত্যকে চিরদিন বহন করিয়া আসিয়াছে, সেই সত্যের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল। এই বিশ্বাসের উপর দাঁড়াইয়াই তিনি এ দেশে ইংরাজ-শাসনের বন্ধনটাকে একটা ঐতিহাসিক দুর্ঘটনা বলিয়া মনে করিতেন না। তিনি ইহার প্রয়োজনীয়তা ও যথাযোগ্য সার্থকতাও স্বীকার করিতেন। ইংরাজ-শাসন ভারতবর্ষকে যে কৃত্রিম ঐক্য দান করিয়াছে, তাহাকে একটা সুযোগরূপে গ্রহণ করিয়া কার্য্য করাই তাঁহার অভিপ্রায় ছিল। তিনি বিশ্বাস করি-তেন, যখন আমরা ভিতরের দিক হইতে মিলিতে পারিব, তখন বাহিরের এই বন্ধনটা স্বাভাবিকরূপেই খসিয়া পড়িয়া যাইবে। ভিতরের দিক হইতে মিলিবার চেষ্টা না করিয়া, জাতিগঠনের উপাদানগুলিকে কাযে না লাগাইয়া আমরা যদি পুনঃ পুনঃ এই লৌহ-কঠিন বন্ধনশৃঙ্খলটার উপর মাথা কুটিতে থাকি, তাহা হইলে শৃঙ্খল একটুও শিথিল হইবে না—এবং আমরাই আহত হইয়া, ব্যাহত হইয়া অধিকতর দুর্ব্বল ও উন্মার্গগামী হইয়া পড়িব।

ভিন্নজাতি ও আদর্শের সামঞ্জস্যবিধান

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, পরমার্থতত্ত্বের সাধন, সংরক্ষণ ও প্রচার এই ত্রিবিধ দায়িত্ববোধের ভিত্তির উপর ভারতীয় সভ্যতা ও জাতি গড়িয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু কালবশে ইহা অব্যাহত থাকে নাই। বৌদ্ধ-উপপ্লাবনের পর ভাটার

মুখে এক অতি বৃহৎ উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যেও ভারতের প্রতিভা এই দায়িত্ববোধ বিস্মৃত হয় নাই; কিন্তু প্রতিকূল অবস্থার চাপে পড়িয়া পরমার্থ-তত্ত্বের প্রচার অপেক্ষা সাধন ও সংরক্ষণের উপরই অধিকতর দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছিল। দুঃখের বিষয়, যে প্রয়োজনে সংরক্ষণ-নীতি অবলম্বিত হইয়াছিল, সেই প্রয়োজন চলিয়া গেলেও, এই সংরক্ষণের ভাব ভারতবর্ষ ত্যাগ করিতে পারিল না। অতিমাত্রায় সংরক্ষণ-নীতির ফলে ভারতের অধিকাংশ লোক জাতির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভাব-সম্পদ হইতে বঞ্চিত হইল। ভারতের যাহা কিছু মহান্ তত্ত্ব, তাহাতে অল্পসংখ্যক ব্যক্তি নিজেদের এক-চেটিয়া অধিকার বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। যাহারা দেশের অধিকাংশ, তাহাদের সহিত ভারতের জাতীয় ধারার প্রাণগত যোগ বিচ্ছিন্ন হইল। অধিকাংশের এই দুর্গতিই ভারতে মুসলমান অধিকারের কারণ। মুসলমান-শাসন এই একচেটিয়া অধিকারের দাবীকে বহুল পরিমাণে হ্রাস করিয়া ফেলিয়াছিল। "মুসলমানের ভারতাধিকার দরিদ্র পদদলিতের উদ্ধারের কারণ হইয়াছিল। এই জন্যই আমা-দের এক-পঞ্চমাংশ ভারতবাসী মুসলমান হইয়া গিয়াছিল। কেবল তরবারির বলে ইহা সাধিত হয় নাই। কেবল তরবারি ও বন্দুকের বলে ইহা সাধিত হইয়াছিল, ইহা মনে করা পাগ্‌লামী মাত্র।" মুসলমান-শাসন যখন উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদের একচেটিয়া অধিকারকে আশ্রয় ও প্রশ্রয় দিল না, তখন নানা দিক্ হইতে নানা মনীষী ও ধর্ম্মসংস্কারক পর-সংঘাতের সহিত সামঞ্জস্যসাধনের কার্য্য আরম্ভ করিয়া দিলেন, এবং আজ পর্য্যন্তও সেই সংরক্ষণ-নীতি ও এক-চেটিয়া অধিকারের বিরুদ্ধে সামঞ্জস্যসাধনের সজীব প্রতি-ক্রিয়া চলিতেছে। পাঠান ও মোগল যুগ হইতে বৃটিশযুগ পর্য্যন্ত ভাঙ্গা-গড়ার এই ইতিহাসের ধারাটিকে স্বামীজী স্পষ্টভাবে অনুভব করিয়াছিলেন। বিদেশী শিল্প ও সভ্যতার পুনঃ পুনঃ আক্রমণে বিধ্বস্ত ও বিপর্য্যস্ত জাতি যে শক্তির বলে ভারতবর্ষে এখনও টিকিয়া আছে, ভারতের সেই সনাতন প্রাণশক্তির মৃত্যুবিজয়ী মহিমা তাঁহার ধ্যানে ধরা দিয়াছিল, তাঁহার বাক্যে স্ফুরিত হইয়াছিল, তাঁহার কর্ম্মে মূর্ত্তিগ্রহণ করিয়াছিল। তিনি দেখিয়াছিলেন, ভারতে সামঞ্জস্যবিধান করিয়া জাতিগঠনের কার্য্য স্তব্ধ হইয়া নাই; সমাজের নানা স্তরে ইহা নানা আকারে চলিতেছে; তথাপি ইহার গতি দ্রুততর করিবার জন্য সজ্ঞানে আমা-দিগকে জাতিগঠনে প্রবৃত্ত হইতে হইবে, ইহাই স্বামীজীর অভিপ্রায় ছিল।

জাতিগঠনের কার্য্যপ্রণালী

ভারতবর্ষের প্রাণশক্তির সম্যক্ পরিচয় লাভ যদি আজ আমরা করিতে পারি এবং সজ্ঞানে জাতির সেবায় নিযুক্ত হইতে পারি, তাহা হইলে পরাধীনতার সকল লজ্জা, ভিক্ষার সমস্ত দৈন্য এক দিনেই অন্তর্হিত হইয়া যাইবে। আমাদের গুরুদায়িত্বপালনের কর্ম্মক্ষেত্রে দাঁড়াইলে, আমরা দেখিব, পৃথিবীর কোন জাতির নিকটই আমরা ছোট নহি, অক্ষম নহি, দুর্ব্বল নহি। পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রচণ্ড সংঘাত, সৈন্য ও পণ্য লইয়া স্বার্থান্ধ অভিযান—ভারতবর্ষকে পরাহত করিতে পারে নাই, ইহা আমাদের শক্তিকে মুক্তি দিয়াছে, আমাদের বুদ্ধিকে স্বাধীন করিয়াছে। সহস্র অমঙ্গল-উৎ-পাতের মধ্যে ইহা যে এই পরমমঙ্গলসাধন করিয়াছে, তাহার প্রতিদানে আমরাও মঙ্গলই ফিরাইয়া দিব, কল্যাণ-সাধনেই ব্রতী হইব। 'ভারতবর্ষের উপযুক্ত আধ্যাত্মিক অধিকার জগতে পুনঃপ্রতিষ্ঠা' করিতে হইবে, এবং সেই দিকে ধ্রুবদৃষ্টি রাখিয়া আমাদের জাতিগঠনের কার্য্যপ্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে।

অতিমাত্রায় সংরক্ষণ-নীতিমূলক সমাজব্যবস্থার ফলে, ভাবপ্রবাহ রুদ্ধস্রোত ও পঙ্কিল হইয়া পড়িয়াছে,—ইহার পথের বাধা সরাইয়া দিতে হইবে। পরমার্থতত্ত্বের কেবল সংরক্ষণ নহে, সাধন ও প্রকারের ব্রত গ্রহণ করিতে হইবে। আমাদের অসহায় ও অক্ষম অবস্থার কথা আমরা জানি। সহস্র বৎসরের নানা কুসংস্কার আমাদের মনকে অভিভূত করিয়া রাখিয়াছে, তাহাও জানি—এক বিপরীত শিক্ষা ও সভ্যতার প্রবল ঘূর্ণাবর্ত্তে পড়িয়া আমরা যে প্রতিদিন উৎসন্নের মুখে ছুটিয়া চলিয়াছি, তাহাও সকলে অস্থিমজ্জায় অনুভব করিতেছি। মোট কথা, আমাদের জাতীয় জীবনের সহস্র দুর্গতির কঙ্কালসার দৈন্য সকলের দৃষ্টির সম্মুখেই প্রতিভাত, অতএব সেগুলি সবিস্তার আর্ত্তনাদ সহকারে বর্ণনা করিয়া কোনও ফল নাই। বর্ত্তমান ভারতের এই জড়দেহকে—অতীতকালের পরম্পরাগত মহৎ-স্মৃতি ও বৃহৎ-ভাবের দ্বারা সবল, সজীব করিয়া তুলিবার জন্য যে

জীবন-প্রবাহ জাতির অঙ্গপ্রত্যঙ্গে সঞ্চারিত করিয়া দিতে হইবে, তাহার দায়িত্বের বিঘ্নবহুল জটিলতাকে পরিহার করিয়া কোন সহজ উপায়ে জাতিগঠনের ইন্দ্রজালবিদ্যা নাই। যাঁহারা কলরব-বহুল আন্দোলনের উত্তেজনার যাদুবিদ্যাকেই প্রয়োজনসাধনের সহজ সুলভ উপায় বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদের সাধু উদ্দেশ্যের সহিত সহানুভূতিসম্পন্ন হইয়াও, স্বামীজী তাঁহাদের উপায়ের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইতে পারেন নাই। তিনি স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন,—"উপস্থিত অবস্থার মধ্য দিয়াই কেবল কার্য্যে অগ্রসর হইতে পারা যায়, অন্য উপায় নাই। ভাল-মন্দ বিচারের শক্তি সকলের আছে, কিন্তু তিনিই বীর, যিনি এই সমস্ত ভ্রমপ্রমাদ ও দুঃখপূর্ণ সংসারের তরঙ্গে পশ্চাৎপদ না হইয়া, এক হস্তে অশ্রুবারি মোচন করেন ও অপর অকম্পিত হস্তে উদ্ধারের পথ প্রদর্শন করেন। এক দিকে গতানুগতিক জড়পিণ্ড সমাজ, অন্য দিকে অস্থির ধৈর্য্যহীন অগ্নিবর্ষণকারী সংস্কারক; কল্যাণের পথ এই দুইএর মধ্যবর্ত্তী। জাপানে শুনিয়াছিলাম যে, সে দেশের বালিকাদিগের বিশ্বাস এই যে, যদি ক্রীড়াপুত্তলিকাকে হৃদয়ের সহিত ভালবাসা যায়, সে জীবিত হইবে। * * * আমারও বিশ্বাস যে, যদি কেউ এই হতশ্রী, বিগতভাগ্য, লুপ্তবুদ্ধি, পরপদদলিত, চিরবুভুক্ষিত, কলহশীল ও পরশ্রীকাতর ভারতবাসীকে প্রাণের সহিত ভালবাসে, তবে ভারত আবার জাগিবে। যখন শত শত মহাপ্রাণ নরনারী বিলাসভোগসুখেচ্ছা বিসর্জ্জন করিয়া কায়মনোবাক্যে দারিদ্র্য ও মূর্খতার ঘনাবর্ত্তে ক্রমশঃ উত্তরোত্তর নিমজ্জনকারী কোটি কোটি স্বদেশীয় নরনারীর কল্যাণ কামনা করিবে, তখন ভারত জাগিবে। আমার ন্যায় ক্ষুদ্র জীবনেও ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি যে, সদুদ্দেশ্য, অকপটতা ও অনন্ত প্রেম বিশ্ব বিজয় করিতে সমর্থ। উক্ত গুণশালী এক জন কোটি কোটি কপট ও নিষ্ঠুরের দুর্ব্বুদ্ধি নাশ করিতে সমর্থ।"

এইরূপ এক দল অকপট স্বদেশপ্রেমিক কর্ম্মী লইয়া স্বামীজী সমগ্র ভারতে কতকগুলি শিক্ষালয় স্থাপন করিতে চাহিয়াছিলেন। সেই শিক্ষালয়গুলি হইবে জাতির শক্তিকেন্দ্র। এখান হইতে কৃতবিদ্য শিক্ষক ও প্রচারকগণ ক্রমে সমগ্র জাতির লৌকিক শিক্ষা ও ধর্ম্মপ্রচারের দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন। ধর্ম্মপ্রচার বলিতে অবশ্য স্বামীজী উপনিষদের প্রাণপ্রদ বীর্য্যপ্রদ তত্ত্বগুলির কথাই বলিয়াছেন, হাজার বৎসরের কদাচারগুলির কথা বলেন নাই। বেদান্তের এই সকল মহান্ তত্ত্ব কেবল গিরিগুহায় বা অরণ্যে আবদ্ধ থাকিবে না, বিচারালয়ে, ভজনালয়ে, দরিদ্রের কুটীরে, মৎস্যজীবীর গৃহে, ছাত্রের অধ্যয়নাগারে সর্ব্বত্র এই সকল তত্ত্ব আলোচিত ও কার্য্যে পরিণত করিতে হইবে।

এই শিক্ষাদান ও শিক্ষাদানের জন্য কর্ম্মসঙ্ঘ গঠন—জাতিগঠনের প্রথম ও প্রধান প্রয়োজন বলিয়া তিনি মনে করিতেন। তিনি বলিয়াছেন, "প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, যে জাতির মধ্যে জনসাধারণের ভিতর বিদ্যাবুদ্ধি যত পরিমাণে প্রচারিত, সে জাতি তত পরিমাণে উন্নত। ভারতবর্ষের যে সর্ব্বনাশ হইয়াছে, তাহার মূলকারণ ঐটি, দেশীয় সমগ্র বিদ্যাবুদ্ধি এক মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যে রাজশাসন ও দম্ভবলে আবদ্ধ করা। যদি পুনরায় আমাদিগকে উঠিতে হয়, তাহা হইলে ঐ পথ ধরিয়া অর্থাৎ সাধারণ জনগণের মধ্যে বিদ্যাপ্রচার করিয়া। * * * কেবল শিক্ষা, শিক্ষা, শিক্ষা। য়ুরোপের বহু নগর পর্য্যটন করিয়া তাহাদের দরিদ্রের সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও বিদ্যা দেখিয়া আমাদের গরীবদের কথা মনে পড়িয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতাম। কেন এ পার্থক্য হইল?—শিক্ষা, জবাব পাইলাম।—শিক্ষাবলে আত্মপ্রত্যয়, আত্মপ্রত্যয়বলে অন্তর্নিহিত ব্রহ্ম জাগিয়া উঠিতেছেন, আর আমাদের ক্রমেই তিনি সঙ্কুচিত হচ্ছেন। নিউইয়র্কে দেখিতাম, Irish Colonists (আমেরিকাপ্রবাসী আইরিশগণ) আসিতেছে— ইংরাজপদ-নিপীড়িত, বিগতশ্রী, হৃতসর্ব্বস্ব, মহাদরিদ্র, মহামূর্খ—সম্বল একটি লাঠী ও তার অগ্রবিলম্বিত একটি ছেঁড়া কাপড়ের পুঁটলী। তার চলন সভয়, তার চাউনি সভয়। ছ'মাস পরে আর এক দৃশ্য।—সে সোজা হয়ে চল্‌ছে, তার বেশভূষা বদ্‌লে গেছে, তার চাউনিতে, তার চলনে আর সে ভয় ভয় ভাব নেই। কেন এমন হ'ল? আমার বেদান্ত বল্‌ছেন যে, ঐ Irish Colonistকে তাহার স্বদেশে চারিদিকে ঘৃণার মধ্যে রাখা হয়েছিল—সমস্ত প্রকৃতি একবাক্যে বল্‌ছিল, Pat, তোর আর আশা নাই, তুই জন্মেছিস্ গোলাম। থাক্‌বি গোলাম—আজন্ম শুন্‌তে শুন্‌তে Patএর তাই বিশ্বাস হ'ল, নিজেকে Pat হিপ্‌নোটাইজ কল্লে যে, সে অতি নীচ, সঙ্কুচিত হয়ে গেল। আর আমেরিকায় নামিবামাত্র চারি

দিক থেকে ধ্বনি উঠ্‌লো—Pat, তুইও মানুষ, আমরাও মানুষ, মানুষেই ত সব করেছে, তোর আমার মত মানুষ সব কর্‌তে পারে, বুকে সাহস বাঁধ। Pat ঘাড় তুল্লে, দেখলে, ঠিক কথাই ত, ভিতরের ব্রহ্ম জেগে উঠ্‌লেন।"

আমরা আজকাল জাতিগঠনের জন্য নানাপ্রকার উপায় চিন্তা করিতেছি, কিন্তু যে ভীতি, যে দৌর্ব্বল্য আমাদের জাতীয় জীবনকে পঙ্গু করিয়াছে, তাহা দূর করিবার জন্য কি করিয়াছি? আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের নিকট হইতে দায়স্বরূপ প্রাপ্ত যে তত্ত্বসমূহ আমরা উপনিষদ বা বেদান্তের আকারে পাইয়াছি, সেগুলি শক্তির বৃহৎ আকর-স্বরূপ, ইহা স্বামী বিবেকানন্দ পুনঃ পুনঃ আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতে শ্রান্তি বোধ করেন নাই। "উহার দ্বারা সমগ্র জগৎকে পুনরুজ্জীবিত এবং শক্তি ও বীর্য্যশালী করিতে পারা যায়। সকল জাতির, সকল মতের, সকল সম্প্রদায়ের দুর্ব্বল দুঃখী পদদলিতগণকে উহা উচ্চরবে আহ্বান করিয়া নিজের পায়ের উপর দাঁড়াইয়া মুক্ত হইতে বলে। মুক্তি বা স্বাধীনতা—দৈহিক স্বাধীনতা, মানসিক স্বাধীনতা, আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা, ইহাই উপনিষদের মূলমন্ত্র।"

স্বামী বিবেকানন্দের জাতিগঠনমূলক কার্য্যপ্রণালীর আলোচনায় আমরা মোটামুটি দেখিলাম,—

১। ভারতের জাতীয় জীবনের মেরুদণ্ডস্বরূপ ধর্ম্ম—যাহা বিভিন্নপ্রকার মতবৈচিত্র্যের প্রসারতা হেতু ক্ষুদ্র বৃহৎ নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে, তাহার সমন্বয়-সাধন।

২। এই সমন্বয়সাধনের জন্য বিভিন্নপ্রকার মত-বৈচিত্র্যগুলিকে অস্বীকার করিতে হইবে না, পরন্তু পূর্ণ-ভাবে গ্রহণ করিয়া পরমার্থ-তত্ত্বের সাধন, সংরক্ষণ ও প্রচারের সার্ব্বভৌমিক ভিত্তির উপর স্থান দান করিতে হইবে। যে সার্ব্বজনীন কার্য্যপ্রণালী এই ঐক্যকে সার্থক করিবে, তাহা ত্যাগ ও সেবা।

৩। যাঁহারা ভবিষ্যৎ ভারতের উদ্বোধনকল্পে প্রকৃতই স্বার্থত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছেন, তাঁহাদিগকে এই নবযুগ-ধর্ম্ম সেবাব্রত গ্রহণ করিতে হইবে। ভারতের বিশাল জনসঙ্ঘ—যাহারা ক্রমাগত বহু শতাব্দী ধরিয়া নিষ্পেষিত ও পদদলিত হইয়া আসিতেছে—তাহাদিগের স্পন্দহীন লুপ্তপ্রায় মনুষ্যত্বকে খাদ্য দিয়া, বিদ্যা দিয়া, আত্মজ্ঞান দিয়া উদ্‌বুদ্ধ করিতে হইবে। ত্যাগ ও সেবাব্রত সহায়ে এই সুপ্রাচীন জাতির পুনরুত্থান অনিবার্য্য।

৪। যাঁহারা এইরূপে দেশকল্যাণকামনায় আত্মোৎসর্গ করিবেন, তাঁহাদিগকে কেন্দ্রসংহত হইয়া সমগ্র ভারতে কতকগুলি শিক্ষালয় স্থাপন করিতে হইবে। কতকগুলি বীর্য্যবান্, সম্পূর্ণ, অকপট, তেজস্বী ও বিশ্বাসী যুবককে আচার্য্য, প্রচারক ও লৌকিক বিদ্যাশিক্ষাদাতৃরূপে গড়িয়া তুলিতে হইবে।

"পবিত্রতার অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া, ভগবানে দৃঢ়-বিশ্বাসরূপ বর্ম্মে সজ্জিত হইয়া, দরিদ্র, পতিত ও পদদলিতদের প্রতি সহানুভূতিজনিত সিংহবিক্রমে বুক বাঁধিয়া, সমগ্র ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিয়া, মুক্তিসেবা, সামাজিক উন্নয়ন ও সাম্যের মঙ্গলময়ী বার্ত্তা দ্বারে দ্বারে প্রচার করিবার জন্য" বিবেকানন্দ এক দল চরিত্রবান্ নরনারীকে আহ্বান করিয়াছিলেন; সে আহ্বান আমাদের হৃদয়কে উদ্‌বুদ্ধ করিতেছে, তাহা তখনই বুঝিতে পারি, যখন দেখি, অজ্ঞাত অখ্যাত পল্লীর বুকে আজ দুই চারি জন কর্ম্মী অনলস সেবা-ব্রতে দীন-দরিদ্র, অজ্ঞ-মূর্খের কল্যাণসাধনে নিযুক্ত রহিয়াছেন; যখন দেখি, দুর্ভিক্ষে, বন্যায়, ঝঞ্ঝায়, মহামারীতে জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে সকলের দ্বারে দ্বারে গিয়া অন্ন-বস্ত্র বিতরণ করিতে মহানুভব যুবকগণ সঙ্কোচ বোধ করিতেছেন না, বিরক্তি বোধ করিতেছেন না। সমগ্রের জন্য ব্যষ্টির এই যে মমত্ববোধ যৎসামান্যরূপে জাতীয় জীবনে দেখা দিয়াছে, ইহার পূর্ণাবস্থা আমরা কল্পনানেত্রে প্রত্যক্ষ করিব। মানুষে মানুষে ঐকান্তিক ভেদের দেশে এই একাত্মানুভূতির সুলক্ষণকে গর্ব্বের সহিত অভিনন্দিত করিব। জাতিগঠনকার্য্যের যে মঙ্গলকে আজ আমাদের দেশের তরুণরা ত্যাগ ও সংযমের দ্বারা বহন করিয়া আনিতেছেন, ইহার জন্যই ত দুঃখিনী জন্মভূমি অনন্তকালের পথে প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া ছিলেন। আজ তাঁহার চিত্তে অপমান-মোচনের আশা হইয়াছে, আজ তিনি আশ্বাস পাইতেছেন, আনন্দে প্রস্তুত হইতেছেন। কিসের জন্য? যুগযুগান্তের যে সম্পদরাজি তাঁহার অতীতকালের পুণ্যস্মৃতি পুত্রগণ তাঁহার নিকট গচ্ছিত রাখিয়া গিয়াছিলেন, সেই অনাদৃত বহুকালসঞ্চিত রত্নরাজি আবর্জ্জনার মধ্য হইতে বাহিরে

আনিয়া দেশজননী নবগৌরবে সন্তানগণকে দান করিতেন। মহান্ ভাবসম্পদের উত্তরাধিকারসূত্রে ছোট-বড় সকল ভারতবাসী আপনার ভ্রাতৃত্বকে সার্থক করিয়া তুলিবে। সেই শুভদিন আসিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত, আমরা যেন কোন যথাবিহিত কর্ম্মকে ফাঁকি দিবার চেষ্টা না করি, লোক যেন আমাদের ভ্রষ্ট জীবনের দুর্ম্মতিকে উত্তেজিত ও ক্ষুব্ধ করিয়া কোন বিজাতীয় পন্থায় অন্ধবেগে পরিচালিত না করে। আমাদের চিত্তকে সমস্ত বিকৃতি হইতে রক্ষা করিবার যে স্বাভাবিক শক্তি অর্জ্জন করিবার কৌশল স্বামী বিবেকানন্দ শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন, ভয়ে বা দৌর্ব্বল্যে তাহা গ্রহণ করিতে যেন আমরা সঙ্কুচিত না হই। যে কল্যাণের পথে রহিয়াছে, তাহার কখনও দুর্গতি হয় না, ইহা বিশ্বাস করিয়া বিবেকানন্দ-প্রদর্শিত পন্থায় জাতিগঠন করিবার দিন আসিয়াছে।*

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার।

* ১৩৩০, ৭ই অগ্রহায়ণ, শনিবার 'থিয়োজফিক্যাল সোসাইটী হলে' 'বিবেকানন্দ সমিতির' সাপ্তাহিক অধিবেশনে পঠিত।

তবু

অকারণে কেহ বেদনা দিয়েছে
দেছে কলঙ্ক কেহ,
কৃতঘ্নতায় প্রতিশোধ দেছে
করেছি যাদের স্নেহ।
কপট এসেছে বন্ধুর বেশে
করেছে অনেক ক্ষতি।
তবু জগদীশ তোমার জগৎ
সদয় আমার প্রতি।

মূর্খ এসেছে উপদেশ দিতে
নীরবে সহেছি তাহা,
ভণ্ড গোপনে ছুরিকা হানিয়া
সুমুখে বলেছে 'আহা'!
ইতর এসেছে ভদ্র সাজিয়া
যদিও শিখাতে নীতি,
তবু জগদীশ তোমার জগৎ
সদয় আমার প্রতি।

স্বর্ণ যদিও ছলিতে এসেছে
হেরি দরিদ্র মোরে,
দস্যু এসেছে আত্মার দ্বারে
সাধুর পোষাক প'রে।
যদিও অভাব অনাটন বহু
দিয়াছে এ বসুমতী—
তবু জগদীশ তোমার জগৎ
সদয় আমার প্রতি।

যা চেয়েছি তাহা পাই নাই বটে
না চেয়ে পেয়েছি কত,
অযুত প্রীতির প্রলেপ পেয়েছি
জুড়াতে বুকের ক্ষত।
যদিও দুঃখের মরুতে শুষেছে
সুখের সরস্বতী,
তবু জগদীশ তোমার জগৎ
সদয় আমার প্রতি।

অপরিচিতের প্রণয় দিয়েছে
অচেনার ভালবাসা,
পরকে করেছে আপন অধিক
নিরাশে দিয়েছে আশা।
এসেছে আঁধার শেফালী করেছে
সুরভিত বনবীথি,
জয় জগদীশ তোমার জগৎ
সদয় আমার প্রতি।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

আরবী—ফার্শী—উর্দ্দূ

প্রত্যেক ভাষার একটা নিজস্ব সুর ও বিশেষত্ব আছে, তেমনি তাহার লিপির বিশেষত্ব যোজন-কৌশলও আছে। কোন ভাষা শিক্ষা করিবার সঙ্গে সঙ্গে সেই ভাষার অক্ষরের গঠন-প্রণালী কিরূপ, তাহার বিশেষত্ব কোথায় এবং ঐ লিপি-যোজন-প্রণালী কিরূপ, ইহার প্রতি দৃষ্টি রাখিলে, সে ভাষা আয়ত্ত করা খুব সহজ হইয়া পড়ে। যুগে যুগে সব ভাষাই সংস্কৃত হইয়াছে, এই সঙ্গে লিপি-সংস্কারও হইয়াছে, লিপির এই ক্রমবিকাশের প্রতি দৃষ্টি রাখাও কর্ত্তব্য; বিভিন্ন ভাষার যে বর্ত্তমান গতি ও রূপ দেখা যায়, দুই শত বা পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে কিন্তু তাহার সে "রূপ" ছিল না; এখনকার সে ভাষা যেন একটি ফুট্‌ফুটে মেয়ে; তাহার বাল্য-জীবনটা পশ্চাতে রাখিয়া তারুণ্যের উজ্জ্বল বিভায় সকলকে বিস্মিত করিয়া দিয়া ধীরে ধীরে যৌবনের অপরূপ সৌন্দর্য্যে দিক্ আলো করিয়াছে।

আরবী বর্ণমালা

প্রাচীন ভারতে প্রচলিত খরোষ্ঠীলিপি আরবীর মত দক্ষিণদিক হইতে আরম্ভ হইয়া বামদিকে শেষ হইত। আবার পারস্যের প্রাচীন লিপি আমাদের বাঙ্গালা ও সংস্কৃত লিপির মতই বামদিক হইতে আরম্ভ হইয়া দক্ষিণদিকে শেষ হইত। এই দুই লিপির ক্রমবিকাশের ইতিহাসও আশ্চর্য্য-জনক। প্রাচীন ভারতের ব্রাহ্মী লিপির ক্রমবিকাশের ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাই, এই লিপিই সংস্কৃত হইয়া ক্রমে বর্ত্তমান যুগে সুসভ্য দেবনাগরী বা হিন্দী অক্ষরে পরিণত হইয়াছে। সিমেটিক লিপি হইতে আরবী, ফার্শী প্রভৃতি লিপির উৎপত্তি হইয়াছে। পূর্ব্বে এই সিমেটিক লিপির প্রভাব যথেষ্ট ছিল; এই লিপি হইতে হিওরেটিক, ফিনীশিয়ান, সেবিয়ন, অরমিক প্রভৃতি লিপির উদ্ভব হইয়াছে, আবার গ্রীক ও ল্যাটিন বর্ণমালায় ইহার বিশেষ আধিপত্য, আর অতি সভ্য ইংরাজী বর্ণমালা সিমেটিকেরই জয়ঘোষণা করিতেছে, * প্রভেদ যা কিছু বর্ণমালার গঠন-সৌষ্ঠবে ও বর্ণবিন্যাসে।

আরবীলিপি আলোচনা করিলে দেখিতে পাই, ইহা একটি ছত্রভঙ্গ অসম্পূর্ণ লিপি, কাযেই এ ভাষাও অসম্পূর্ণ। যদিও উর্দ্দূ বর্ণমালা ও ভাষায় এই ভাষা ও লিপি বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে, তথাপি আমাদের কাছে ইহা অসম্পূর্ণ। সিমেটিক বর্ণমালা মাত্র ২২টি এবং ইহা হইতে মাত্র ১৮টি সুর উচ্চারিত হয়। আরবীর বর্ণসংখ্যা ৩০টি, কিন্তু ইহা হইতেও ঐ ১৮টি সুরই বাহির হয়;—অ, ব, ত, স বা শ, জ Y বা Z{A, হ, খ, দ, র, গ, ফ, ক, ল, ম, ন, ও, ই এবং এ। ফার্শী ও উর্দ্দূ বর্ণমালার সংখ্যা আরও বেশী, সে কথা পরে বলিতেছি। আমাদের বাঙ্গালা ও সংস্কৃত প্রভৃতি বর্ণমালার যেমন কবর্গ, চবর্গ ইত্যাদি বৈজ্ঞানিক বর্গীকরণ আছে এবং ইহারা কণ্ঠ্যবর্ণ, ওষ্ঠ্যবর্ণ, দন্ত্যবর্ণ ইত্যাদি যেমন সুবিন্যস্তভাবে সজ্জিত, এমন সজ্জিত ও সুবিন্যস্ত বর্ণমালা অন্য কোন ভাষায় নাই। সিমেটিক লিপির সহিত ভারতীয় লিপির বিশেষ বিশেষত্ব এই যে, শব্দের সহিত ব্যবহৃত বর্ণের পাঠের সহিত স্বতন্ত্র বর্ণের পাঠের

* অল্‌ফা, বীটা, গামা, ডেল্টা, পাই, থীটা, জীটা, কীটা ইত্যাদি গ্রীক ও ল্যাটিন বর্ণমালার সহিত সিমেটিক ও আরবী বর্ণমালা অলিফ, বে, তে, সে, জীম, হে, খে দাল, জাল ইত্যাদির বেশ মিল আছে, আর ইংরাজী বর্ণমালা এ, বি, সী, ডী-র পক্ষেও এই কথাই খাটে।

অনৈক্য ; এই বৈষম্য ভারতীয় লিপিতে নাই। ভারতীয় লিপিতে লিখিত কোন শব্দের কোথাও ক বা গ লেখা হইলে উহা ক বা গ'ই পড়া হইবে, কিন্তু সিমেটিকে উচ্চারণের রূপ পরিবর্ত্তিত হইয়া উহা কাফ্ ও গিমেল্, আরবী-ফার্শীতে কাফ্ ও গাফ্ এবং ইংরাজীতে কে ও জী উচ্চারিত হইবে। আরবী-ফার্শীতে হ্রস্ব-দীর্ঘ-জ্ঞাপক কোন চিহ্ন নাই, কাযেই আরবী-ফার্শী ইত্যাদি লিপি ও ভাষা আমাদের কাছে,—এমন কি, বঙ্গীয় সাধারণ মুসলমানগণের নিকটও হেঁয়ালিবিশেষ। *

আরবী বর্ণমালা এইরূপ অলিফ্, বে, তে, সে, জীম্, হে, খে, দাল্, জাল্, রে, জে, সিন, শীন, শোয়াদ, জোয়াদ, † তো, জো, এইন, গেইন, ফে, কাফ্, কাফ্ লাম, মীম, নুন, ওয়াও, হে, হমজা, ইয়েও, ইয়াএ ; এই ৩০টি বর্ণ হইতে পূর্ব্বোক্ত ১৮টি সুর বাহির হয়। ইহার মধ্যে স ও জএর দুই ভাগ করা যাইতে পারে, শীন ও শোয়াদের উচ্চারণ আমাদের "শ"এর মত হইবে এবং জীমের উচ্চারণ ঠিক আমাদের "জ"এর ন্যায় হইবে, জ শ্রেণীর জাল, জে, জোয়াদ, জো এই বর্ণ চারিটির স্পষ্ট উচ্চারণ-নির্দ্দেশক বর্ণ আমাদের ভাষায় নাই। দন্ত ও জিহ্বার সাহায্যে ইংরাজী "Z" বর্ণ যেরূপ উচ্চারিত হয়, এই বর্ণচতুষ্টয় ঠিক সেইরূপেই উচ্চারিত হইবে, যেমন, Zal, Zea এইন ও গেইন অক্ষর দুটির উচ্চারণের সুর লিখিয়া বুঝাইবার মত বর্ণ ইংরাজী বা বাঙ্গালা, কোন বর্ণমালায় নাই, এই বর্ণ দুটির উচ্চারণে বিশেষত্ব আছে, বর্ণ দুটি খুব গাম্ভীর্য্যের সহিত কণ্ঠ হইতে আরম্ভ হইয়া দন্ত ও জিহ্বায় শেষ হয়। ফের্ উচ্চারণ ইংরাজী "F"এর মত, ছোট কাফের উচ্চারণ বাঙ্গালা "ক" বা ইংরাজী "K"এর ন্যায়, বড় কাফের উচ্চারণ বিশেষভাবের, ইহাও গম্ভীরভাবে কণ্ঠ হইতে আরম্ভ হইয়া দন্ত ও ওষ্ঠে শেষ হয়, ইংরাজী "Q" দিয়া অক্ষরটি উচ্চারিত হইতে পারে। লাম্, মীম্, নুন্ যথাক্রমে L. M. N. বা ল, ম, ন। 'ওয়াও'এর উচ্চারণ বাঙ্গালার 'ও' এবং ইংরাজী "O"র মত, আরবীর ছোট ইয়ে ও বড় ইয়াএ'র উচ্চারণ বাঙ্গালার ই ও এ'র মত। অলিফ্, ওয়াও, হম্জা, ইয়ে ও ইয়াএ এই পাঁচটি অক্ষর আরবী স্বরবর্ণ। এই গেল আরবী উচ্চারণ ও বর্ণপরিচয়ের কথা।

ঘ, ছ, ঝ, থ, ধ, ঠ, ড, ঢ, প, ভ ইত্যাদি সুর বা ঐ বর্ণযুক্ত উচ্চারণ আরবী ভাষার কোথাও নাই। অনেকে বলেন—"শুভান্-অল্লাহ্", তাহাতে সন্দেহ হয়, "ভ" বর্ণ আরবীতে আছে, কিন্তু কোরাণ, হদিস্ অনুসন্ধান করিয়াছি, কোথাও "ভ" পাই নাই, উহার শুদ্ধ উচ্চারণ "শুব্-হান্-অল্লাহ", উদাহরণস্বরূপ "শুব্-হান্-অল্লাহ ও অল-হম্-দুলিল্লাহে ও অল্লাহ্, ইল্-ললাহু ও অল্লাহু অক্‌বর অলাহল ওলা-কুওয়ত ইল্লা বিল্লাহ অলি-অল্ল-অজীম।"—তৃতীয় কলমা, কোরাণ।

আরবী, ফার্শী বা উর্দ্দুতে আকার ও ইকার-সূচক মাত্র তিনটি চিহ্ন আছে,—জবর, জের ও পেশ। জবর আকার-সূচক চিহ্ন, 'ত'কে তা করিতে হইলে তোয় বর্ণে জবর দিতে হয়, যেমন—তোয় জবর তা। জের চিহ্ন ইকার ও একার এবং পেশচিহ্ন ওকার ও উকার উভয় রূপেই ব্যবহৃত হয়, এই চিহ্নদ্বয় ব্যবহারের কোন বিশেষ নিয়ম নাই, পাঠ ও শব্দ-অনুযায়ী ইহার রূপভেদ হয় ; অর্থাৎ তোয় জের দিলে তি ও তে দুইই হয়, আবার তোয় পেশ দিলে তো এবং তুও হয়।

আরবীতে আর একটি চিহ্ন আছে, উহাকে "দোজবর" বলে। কোন বর্ণে এই চিহ্ন প্রয়োগ করিলে,তাহার আকার, ইকার উচ্চারণ ত থাকিবেই, উপরন্তু সঙ্গে সঙ্গে "ন" উচ্চারিত হইবে, যেমন, বে দোজবর্ বন্, বে দোজের্ বিন্, বে দো পেশ বুন্।

তস্‌দীদ্, জযম্ ও মওকুফ্ এই তিনটি চিহ্ন আরবী, ফার্শী ও উর্দ্দু তিন ভাষাতেই আছে। যে বর্ণ তস্‌দীদ্ চিহ্নযুক্ত, উহা দ্বিত্ব উচ্চারিত হয়, যেমন বাচ্চার শব্দে চে বর্ণে তস্‌দীদ্ যুক্ত হইয়া উহার দ্বিত্ব হইয়াছে। দুইটি বর্ণকে একই সঙ্গে যুক্ত করিয়া

* আরবী বা ফার্শী ভাষায় কোথাও "ছ" শব্দ নাই, তবুও শিক্ষিত বঙ্গীয় মুসলমান সম্পাদকগণ কেন যে শ বা স স্থানে ছ ব্যবহার করেন, তাহা বুঝিতে পারি না, ছএর এই ছিছিকারে আশ্চর্য্য হইয়াছি।

† জোয়াদ্ বর্ণের উচ্চারণ লইয়া মুসলমানগণের মধ্যে মতভেদ আছে। সুন্নীসম্প্রদায় বর্ণটিকে "জোয়াদ্" বলেন, শীয়াগণ বলেন—জোয়াদ্। শীয়াগণ "হাত বাঁধিয়া" নেমাজ পড়েন না এবং "অমীন" শব্দ জোরে উচ্চারণ করেন, ইহা লইয়া মধ্যে মধ্যে দুই সম্প্রদায়ে হাতাহাতি হইয়া যায়। দুই সম্প্রদায়ে এইরূপ বিস্তর মতভেদ আছে। "অল্ হমদুলিল্লাহ-রব্ব-অল্-অমীন্" এই পদে এবং কোরাণের স্থানে স্থানে "অমীন্" শব্দ আছে।

উচ্চারণ করিবার জন্য সাঙ্কেতিক চিহ্নরূপে জযম্ ব্যবহৃত হয়। মওকুফ্ বা হসন্ত বর্ণ, ইহা প্রকাশের কোন চিহ্ন নাই, পাঠ অনুসারে বুঝিয়া লইতে হইবে। মওকুফ্ বর্ণ দিয়া কোন শব্দ আরম্ভ হয় না। উপরি-উক্ত তিনটি চিহ্নই বর্ণের উপরে থাকে।

আরবী বর্ণমালার আরও কতকগুলি বিশেষত্ব আছে। আরবী ভাষায় যত্র-তত্র অলিফ ওলাম অর্থাৎ "অল্" শব্দ লিখিত হয়, কিন্তু উচ্চারিত হয় না। কোথাও কোথাও অলিফ-লামের মাত্র লাম উচ্চারিত হয়, আবার শব্দবিশেষে দুইটির একটিও উচ্চারিত হয় না; এই উচ্চারণ লোপের বিশেষ নিয়ম আছে।

হরুফে কমরী

অলিফ ও লামের পরে যদি অলিফ, বে, জীম্, হে, খে, এইন, গেইন, ফে, কাফ্, কাফ্, মীম, ওয়াও, হে ও ইয়ে এই বর্ণগুলি থাকে, তাহা হইলে অলিফ্ ও লাম উচ্চারিত হয় না, কেবলমাত্র লাম্ উচ্চারিত হয়, যেমন, নূরুল্-এইন, হওল-মক্দুর, বিল্-ফ্যাল্; এই শব্দ-গুলির মধ্যে অলিফ্-লাম্ রহিয়াছে, কিন্তু অলিফ্ উচ্চারিত হয় নাই। আরবীতে উপরি-উক্ত বর্ণগুলিকে 'হরুফে কমরী" বলে।

হরুফে শমসী

আবার এই "অল" বা অলিফ্-লাম্ বর্ণ যদি—তে, সে, দাল্, জাল্, রে, জে, সিন, শীন্, শোয়াদ্, জোয়াদ্, তো, জো, লাম ও নুন্ বর্ণের পূর্ব্বে থাকে, তাহা হইলে অলিফ্-লাম্ বা অল্ একেবারেই উচ্চারিত হয় না, অলিফ্-লামের পরবর্ত্তী বর্ণে তস্দীদ্ চিহ্ন দেওয়া হয় এবং ঐ বর্ণ দ্বিত্ব উচ্চারিত হয়; যেমন, "ইনদ্-ত্তা-কীদ্" শব্দটির বানান এইরূপ, এইন নুন জের-ইন, দাল্-অলিফ্-লাম্ জযম্ দ, তে অলিফ জবর তা, কাফ ইয়ে জেরকী, দালমওকুফ, এখানে অলিফ্-লাম থাকা সত্ত্বেও উহা উচ্চারিত না হইয়া পরবর্ত্তী বর্ণে তস্দীদ্ লাগিয়া ঐ বর্ণ দ্বিত্ব হইয়াছে। আরবীতে উপরি-উক্ত বর্ণগুলিকে "হরুফে শমসী" বলা হয়।

আরবী ভাষায় "নুন্" বর্ণের উচ্চারণ কোথাও বা আংশিক, কোথাও বা সম্পূর্ণরূপে লুপ্ত হইয়া যায়, ইহারও একটা নিয়ম আছে।

ঈদ্গাম্

সাকীন্ (হসন্ত) নুনের পর ইয়ে, নুন্ বা মীম্ থাকিলে, সাকীন্ নুনের স্বর আংশিকভাবে লুপ্ত হইয়া যায়, বাঙ্গালার চন্দ্রবিন্দুর ন্যায় ঐ নুন অনুনাসিক স্বরে উচ্চারিত হয়, যেমন—মইঁ-অ-কুলু, শব্দটির বানানে নুন্ থাকিলেও স্পষ্ট উচ্চারিত হইতেছে না।

আবার সাকীন্ নুনের পর যদি রে বা লাম্ থাকে, তাহা হইলে ঐ নুনের উচ্চারণ একেবারেই হইবে না, যেমন—"মীরব্বি-হীম", শব্দটির বানান এই—মীম্ নুন্ জের [illegible] জবর তস্দীদ্ র, বে জের তস্দীদ্ ব্বি, হেজেরহী মীম্ সাকীন্। নুনের পর রে বর্ণ থাকায় নুনের উচ্চারণ লুপ্ত হইয়াছে। আরবীতে এই নিয়মটিকে "ঈদ্গাম্" বলে।
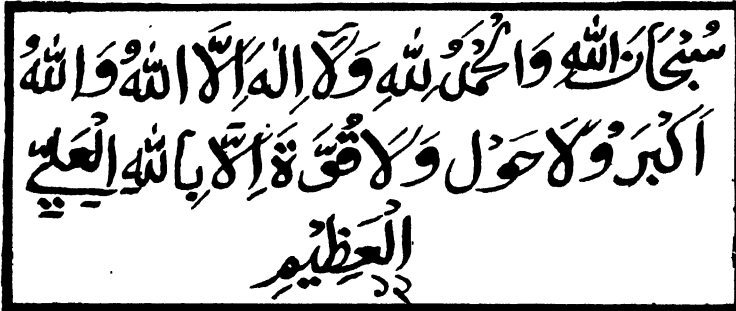
আরবী কল্মা

ভারতের আরবী শিক্ষার্থিগণকে অলিফ্ বে, তে ইত্যাদি সরল সুরেই বর্ণপরিচয় করান হয়, কিন্তু আরব অধিবাসীর আরবী বর্ণমালার উচ্চারণ অল্-অলিফু ও-অল-হমজতু, অব্বাও, অত্তাও ইত্যাদি সুরে। মোটামুটি ভাবে আরবী বর্ণপরিচয়ের বর্ণন করিলাম, এইবার আরবী ভাষার কথা।

এই ভাষা পড়িবার ভঙ্গী কিরূপ, তাহা লিখিয়া বুঝান যায় না, বুঝিতে হইলে পাঠকের মুখে শুনিতে হয়। স্থানে স্থানে খুব জলদ, এত দ্রুত পাঠ যে, আরবী ভাষায় খুব দক্ষ পাঠক ছাড়া ভাষার সৌন্দর্য্য বজায় রাখিয়া পড়িতে পারেন না; আবার যায়গায় যায়গায় এত ঠায় পড়িতে হয় যে, সে

সম্বন্ধেও ঐ কথাই খাটে, আরবীতে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা না থাকিলে, কোথায় যে দ্রুত পড়িতে হইবে আর কোথায়ই বা খুব টানিয়া পড়িতে হইবে, তাহা স্থির করা কঠিন এবং আরবী শব্দ অন্য ভাষার অক্ষরে লিখিয়া প্রকাশ করাও অসম্ভব। * এই ভাষা পঠিত হয় এক বিচিত্র সুরে। বিচিত্র ভাষার একটু নমুনা এই—"মীন্-অল্-অয্যাবে অখ্‌রজ খরজত খারেজীন মীনন্নারে হদীকন অওলা তথ্‌ফ্ খৌফন্ খরজন্ খবীরন্।"

এইবার ফার্শীর কথা। ফার্শী বর্ণমালার সংখ্যা ৩৩টি, আরবী বর্ণমালার মত সমস্ত বর্ণই ইহাতে আছে, পে, চে ও গাফ্ এই তিনটি বর্ণ ফার্শীতে বেশী, আর একটি অতিরিক্ত বর্ণ যে X বা Zea ফার্শীতে আছে, কিন্তু এটি গণনা না করিলেও চলে। বর্ণমালাকে ফার্শীতে "হরুফে তহজ্জী" বলে। আরবী বর্ণগুলি যে সুরে উচ্চারিত হয়, ফার্শীর সেই সেই বর্ণ ঠিক ঐ সুরেই উচ্চারণ করিতে হইবে। সে, হে, সোয়াদ, জোয়াদ, তো, জো, এইন ও কাফ্ ফার্শীর এই আটটি বর্ণ আরবী শব্দে ব্যবহৃত হয়, সেই জন্য এগুলিকে "হরুফে আরবী" বলা হয়। মূলতঃ ফার্শী বর্ণমালা মাত্র চব্বিশটি, ইহার মধ্যে পে, চে, যে Zea ও গাফ্ এই বর্ণ-চতুষ্টয় ফার্শীর নিজস্ব বর্ণ, ইহা কেবল ফার্শী শব্দে ব্যবহৃত হয়। বর্ণের সহিত বর্ণ যুক্ত করিবার চিহ্নগুলিকে "হরাকৎ" বলে, আবার যে বর্ণে কোন হরাকৎ নাই, সে বর্ণ "মতহর-রক্"। মতহর-রক্ তিন প্রকার ;—সকুন্ (জযম), তস্‌দীদ্ ও মওকুফ্। হরাকৎ তিনটি ;—ফতহ্, কশরহ্ ও যম্মহ (Zamma)। ফতহ বা জবর,—বর্ণের উপরে দেওয়া হয় এবং ইহার উচ্চারণ কতক অলিফ্ বা অএর মত, স্থান-বিশেষে টানিয়া পড়িলে আ হয়, যে বর্ণে এই চিহ্ন থাকে, তাহাকে "মফতুহ" বলে। কশ্‌রহ বা জের, বর্ণের নীচে থাকে, ইহার উচ্চারণ কতকটা এর ন্যায়, টানিয়া পড়িলেই সুর বাহির হয়, যে বর্ণে এই চিহ্ন থাকে, তাহাকে "মক্‌শুর" বলে। যম্মহ বা পেশ, বর্ণের উপরে কিছু বামে থাকে, ইহার উচ্চারণ প্রায় 'ও'র মত, স্থানে স্থানে 'উ'ও উচ্চারিত হয়। যম্মহ-চিহ্নিত বর্ণ "মযমুম্" নামে অভিহিত হয়। সকুন (জযম) চিহ্নিত বর্ণকে "সাকিন", তস্‌দীদ্ বর্ণ "হরুফে মসদদ্" এবং চিহ্ন বা মাত্রাশূন্য বর্ণকে "মওকুফ" বলে। জবর্, জের্ ও পেশ্ এবং তস্‌দীদ, জযম্ ও মওকুফের কথা আরবী ভাষার বর্ণনায় বিস্তৃতভাবে বলিয়াছি।

ا ب پ ت ٹ ث ج چ ح خ د ڈ ذ ر ڑ ز ژ س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ہ ی ے

ফার্শী ও উর্দ্দু বর্ণমালা ; টে, ডাল, ড়ে ও হমজা উর্দ্দুতে বেশী আছে।

ফার্শী ও উর্দ্দু বর্ণমালা
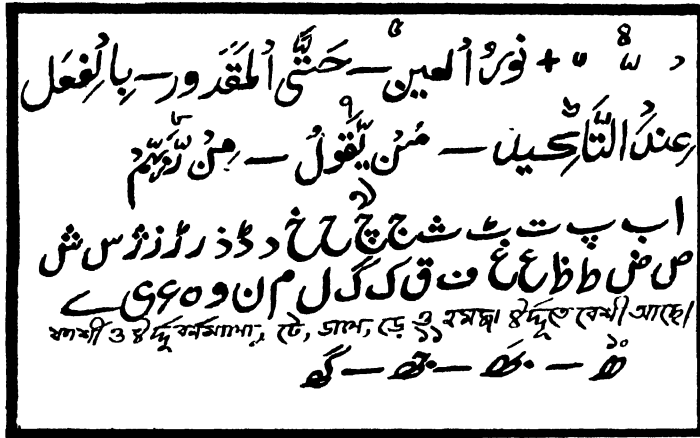
আমার বিশ্বাস, ফার্শী খুব শীঘ্র শেখা যায়। ইহার পাঠ-প্রণালী আরবীর মত তত কঠিন নয়—অর্থও সরল। ফার্শী ভাষা এত শ্রুতিমধুর যে, অর্থ না বুঝিতে পারিলেও শুনিতে ইচ্ছা হয়। এই ভাষার দু'একটি প্রশ্নোত্তর নীচে তুলিয়া দিলাম।

"বাএদ্ কি মন্ খিলাফে রাএ পিদরম্ নকুনম্",—পিতার আজ্ঞার অবাধ্য না হওয়া আমার কর্ত্তব্য। "ইঁ বাদাম্ অজকী খরিদী"—এই বাদাম কাহার নিকট হইতে কিনিয়াছ ?—"মন নখরিদম্, আঁ কস্ আমদ ওইঁজা গুজাস্ত", আমি কিনি নাই, এক ব্যক্তি এখানে আসিয়াছিল, সেই ফেলিয়া গিয়াছে। "অন্দরাঁ দমকি বীমার জাঁ বিদাদ্ জনে দস্ত বর সর জদ্ ও মন গীরিস্তম"—মুমূর্ষু ব্যক্তি প্রাণত্যাগ করায় স্ত্রীলোকটি কপাল চাপড়াইলেন ও আমি কাঁদিলাম। ফার্শী ভাষার সৌন্দর্য্য বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে কবিতায়, শাদী "করীমা"

* শ্রীযুত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার কয়েকটি প্রবন্ধে ঐতিহাসিক ব্যক্তিগণের আরবী-ফার্শী নামের যে সংশোধন করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার এ বিষয়ে সম্যক্ অভিজ্ঞতার অভাব আছে বলিয়া মনে করা অসঙ্গত হয় না।

রচনার প্রারম্ভে করীমের চরণে নতমস্তকে সমস্ত অপরাধের মার্জ্জনা চাহিয়াছেন,—

"করীমা ব বখ্‌শাএ বর হালেমা,
কি হস্তম অসীরে কমন্দে হওয়া।
নদারে মগইরজ তু ফরিয়াদ রস্‌,
তুইয়া শীয়াঁ রাখতা বখ্‌শও বস্‌।
নিগেহদার্‌ মারা জীরাহে খতা,
খতাদর গুজারো শওয়াবম মুমা।

শেষ ছত্রের অর্থ স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়,—আমার সমস্ত খতা ক্ষমা করিয়া শওয়াব্‌ (আশিস্‌) দাও।

মুসলমানদের মধ্যেই উর্দ্দূ ভাষা চলিত থাকিলেও ভারতই এই ভাষার জন্মস্থান। কেহ বলেন, দিল্লীই উর্দ্দূর জন্মভূমি; কেহ বলেন, লাহোর। সকল ভাষার শব্দসংগ্রহ এই ভাষায় আছে, তাই ইহার অন্য নাম "লস্করী ভাষা।" উর্দ্দূ বর্ণমালা সর্ব্বসমেত ৩৭টি। টে, ডাল, ড়ে ও হমজা এই বর্ণ চারিটি ইহাতে বেশী আছে। আরবী ফার্শীর মত ঘ, ভ, ঝ প্রভৃতি আলাদা বর্ণ ইহাতেও নাই, কিন্তু অন্য উপায়ে উর্দ্দূ বৈয়াকরণিকগণ এই বর্ণগুলির সৃষ্টি করিয়া লইয়াছেন। ইংরাজীতে যেমন Combined letterএর সাহায্যে ঘ, ছ ইত্যাদি বর্ণ আমরা তৈয়ার করিয়া থাকি, উর্দ্দূতে তেমনই কেবলমাত্র হের সাহায্যে ঘ, ভ, ঝ প্রভৃতি যে কোন বর্ণ তৈয়ার করা যায়, যেমন বে হে জবর ভ, জীম্‌ হে জবর ঝ, গাফ্‌ হে জবর—ঘ ইত্যাদি। অন্য বর্ণের সহিত যুক্ত হইলে হের আকার বদলাইয়া যায়। অন্যান্য সমস্ত নিয়ম ও বর্ণের উচ্চারণ আরবী ও ফার্শীর মত। জবর, জের, পেশ ও তস্‌দীদ, জযম্‌ ইত্যাদি সমস্তই ইহাতে আছে এবং ব্যবহার-প্রণালী ও উচ্চারণ একই। উর্দ্দূ ভাষা অল্পদিনে শেখা যায়, কারণ, এই ভাষাভাষীর সহিত আমরা পরিচিত, যাঁহারা পশ্চিমাঞ্চলে থাকেন, প্রকারান্তরে ইহাই তাঁহাদের কথ্য-ভাষা।

উর্দ্দূ গদ্য এইরূপ,—"নমাজ সে ফারিগ্‌ হোতে হী জনাজে কো উঠাকর লে চলে, চল্‌তে ওঅক্ত্‌ অগর কলমহ শরীফ ও অগৈরে পড়ে তো দীল মে পড়ে, আওয়াজ সে পড়না মকরুহ হৈ।"—তালিম-অল্‌-ইসলাম ৪র্থ ভাগ, পৃষ্ঠা ২৫।

উর্দ্দূ কবিতা বা গান এইরূপ,—

"ফীরাক জানা মৈ হমনে সাকী
লোহু পিয়া হৈ সরাব করকে,
শন্‌ম্‌ নে মেরা জীগর্‌ জলায়া তো
মৈনে খায়া কবাব করকে।
জরা জো রুখ্‌ সে নকাব সরকি
তো মার ডালা হিজাব করকে।
মেরে জনাজে পে মেরা কাতিল
নামাজ পড় কর ইয়ে কহ রহা হৈ—
লে অব তো সর্‌ সে অয়জাব উতরা
চলা হুঁকারে শওয়াব করকে।
নফ্‌ল বুল্‌-বুল্‌ খুসী সে হরগীজ জো
গুল্‌কে ফুলা নহী সমাতা,
গয়া ওহ অত্তার কী দুকান পর,
ফীর উসনে বেচা গুলাব করকে।"

গানটির অর্থ ও ভাব বড়ই মর্ম্মস্পর্শী।

শ্রীবিমলকান্তি মুখোপাধ্যায়।

জন্মভূমি

শৈশবের লীলাভূমি পবিত্র রসাল!
কৈশোরের ক্রীড়াক্ষেত্র বিচিত্র বিশাল।
প্রেমের পবিত্র কুঞ্জ সরস যৌবনে!
সাধনার তপোবন বার্দ্ধক্য জীবনে।
জননী মহিমময়ি! তোমারে প্রণমি!
স্বর্গ হ'তে শ্রেষ্ঠ তুমি মাতঃ জন্মভূমি।

শ্রীমোহিতকুমার হাজরা
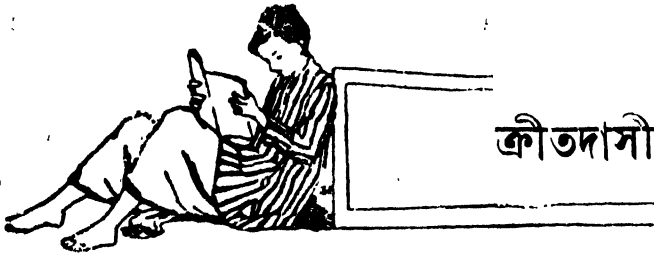
ক্রীতদাসী

তখনও ভোর হয় নাই, গাছের পাতায়-লতায় ফলে-ফুলে নিশির শিশির মুক্তাবিন্দুর মত ঝলমল করিতেছে, দুই একটা পাখী কুলায় হইতে আহার অন্বেষণে বাহির হইতেছে, দূরে নিবিড় নীল পাহাড়ের মাথার উপর রাঙ্গা উষার রাঙ্গা আভা মৃদু তুলিকাস্পর্শে পরম সুন্দর চিত্র অঙ্কিত করিতেছে। আমি তখনও তাম্বুর মধ্যে কম্বল মুড়ি দিয়া শুইয়া আছি। বাহির হইতে মহাদেব থাপ্পা ডাকিল, "বাবুজী, মেলায় যাবে না, এর পর রোদ উঠবে যে!"

আমি তাড়াতাড়ি কম্বল ফেলিয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম, বাহিরে আসিয়া একবার চারিদিকে চাহিয়া প্রকৃতির প্রথম প্রভাতের নগ্নমূর্ত্তি দেখিয়া লইলাম, বলিলাম, "তাই ত, রাত পুইয়ে এসেছে। নাও মহাদেব, সব যোগাড় ক'রে নাও, আমি এলুম ব'লে।"

যত শীঘ্র সম্ভব প্রাতঃকৃত্য সম্পন্ন করিলাম। স্বল্পক্ষণ পরেই সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইয়া মহাদেবকে সঙ্গে লইয়া পথে বাহির হইয়া পড়িলাম।

শীতের প্রভাত, তাহাতে পাহাড়ের তরাই অঞ্চল। কনকনে হাওয়ায় গরম কাপড়ের মধ্যে থাকিয়াও হাড় কাঁপিতেছিল, হাত অবশ হইয়া যাইতেছিল, বুক গুরু-গুরু করিতেছিল। নেপাল তরাই অঞ্চলে সরকারী জরিপের কার্য্যে আজ ছয় মাস হইল নিযুক্ত হইয়াছি। মাত্র চব্বিশ বৎসর বয়সে পেটের দায়ে আত্মীয়-স্বজন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া এই সুদূর প্রবাসে নির্ব্বাসিত শুষ্ক জীবন অতিবাহিত করিতেছি। শ্বাপদসঙ্কুল ঘন জঙ্গলমধ্যে অপেক্ষাকৃত পরিস্কৃত তৃণাচ্ছাদিত ময়দানে আমাদের তাম্বু পড়িয়াছে। আমিই এই 'নিরস্তপাদপদেশে এরণ্ডের' মত সর্ব্বে সর্ব্বময় কর্ত্তা, আমার তাঁবে বিস্তর সরকারী লোকলস্কর।

মহাদেব গাইড হইয়া চলিতেছে, আমি তাহার পশ্চাদনুসরণ করিতেছি। সেই প্রত্যুষেই কত পাহাড়ী নরনারী আমাদেরই মত মেলার উদ্দেশ্যে চলিয়াছে, তাহাদের স্কন্ধে ও পৃষ্ঠদেশে নানা পণ্যসম্ভার।

পথ চলিতে চলিতে মহাদেব বলিল, "বাবুজী, এ মস্ত মেলা, এত বড় মেলা এ অঞ্চলে আর কোনও সময়ে হয় না।"

আমি হাসিলাম। ভাবিলাম, কূপবদ্ধ মণ্ডুক এই পাহাড়ী, তাহার ক্ষুদ্র গণ্ডীর বাহিরের জগতের কোন সংবাদই রাখে না, তাহার পক্ষে এই জঙ্গলের মেলা যে মস্ত মেলা হইবে, তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় কি আছে? জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোদের নেপালীরাও কি এ মেলায় আসে?"

মহাদেব দূরের ধূমায়মান পাহাড়ের পর পাহাড়ের শ্রেণীর দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া বলিল, "ঐ পাহাড়ের ও-পার হ'তে হাজার হাজার নেপালী এই মেলায় জমায়েৎ হবে। এখানে সারা বছরের গেরোস্থালীর মাল খরিদ-বিক্রী ক'রে পাহাড়ে ফিরে যাবে, আবার এক বছর পরে মেলায় আসবে।"

আমি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম, "মেলায় কি সব বিকিকিনি হয়? গেরোস্থালীর মাল ছাড়া আর কিছু হয় না?"

মহাদেব সগর্ব্বে বলিল, "হয় না? কত কি বিকিকিনি হয়। গরু, ছাগল, ভেড়া, মোষ, কুকরী, বঁটী, হাল,—কত কি! আর একটা জিনিষ বিকিকিনি হয়, যা আর কোথাও হয় না। বল দিক বাবুজী, সে জিনিষ কি?"

আমি বলিলাম, "তোদের কি জিনিষ বিকিকিনি হয়, তা আমি জানবো কি ক'রে?"

মহাদেব হাসিয়া বলিল, "মানুষ, বাবুজী, মানুষ! মেয়েলোক মদ্দলোক এই মেলায় বিকি-কিনি হয়।"

আমার বিস্ময়ের সীমা রহিল না। এই বিংশ শতাব্দীর সভ্যতার দিনে ইংরাজ রাজত্বের সীমানায় মানুষ বেচা-কেনা হয়, ইহা কি আশ্চর্য্যের কথা নহে?

ক্ষণেক নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিলাম, "সে কি রকম? কারা বেচে? কাদের বেচে? কেনেই বা কারা?"

মহাদেব আমাকে চমকিত করিয়া পরম আনন্দ ও গর্ব্ব

অনুভব করিতেছিল। সে আমার বিস্ময়ের মাত্রা আরও বর্দ্ধিত করিয়া গম্ভীরস্বরে বলিল, "দেখতেই পাবে বাবুজী, আমি আর কি বলবো ?"

অদূরে জনস্রোত দেখিয়া, কোলাহল শুনিয়া বুঝিলাম, মেলার নিকটবর্ত্তী হইয়াছি। মহাদেব মিথ্যা গর্ব্ব করে নাই, মেলা মস্ত মেলাই বটে। পাহাড়ের পাদমূলে বহু বিস্তৃত প্রান্তরে মেলা বসিয়াছে। তখন উষোদয় হইয়াছে। সেই প্রথম প্রভাতালোকে দেখিলাম, বিরাট জনসমুদ্র যেন অম্বুধির মত তরঙ্গের ঘাত-প্রতিঘাতে গর্জ্জন করিতেছে। অসংখ্য নরনারী, অপার অপরিমেয় পণ্যসম্ভার! নানাবর্ণের শীতবস্ত্রে আচ্ছাদিত পাহাড়ী নরনারী যেন এক বিরাট পুষ্পোদ্যানের নানাবর্ণের পুষ্পের মতই অনুমিত হইতেছে। আমি মহাদেবের সঙ্গে সেই বিরাট জনসমুদ্রে গা ভাসাইয়া দিলাম।

২

আমার পাদদ্বয় ভূমি স্পর্শ করিতেছিল কি না সন্দেহ। কখনও কখনও সেই জনসমুদ্রের অতল তলে তলাইয়া যাইবার আশঙ্কা হইতে লাগিল। এক স্থানে ভিড়ের চাপে আমরা উভয়ে উভয়ের সঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলাম। বহু কষ্টে সেই ভিড়ের চাপ হইতে আত্মরক্ষা করিয়া বাহিরে অপেক্ষাকৃত ফাঁকা যায়গায় আসিয়া চীৎকার করিয়া ডাকিলাম, "মহাদেব!" কে সাড়া দিবে? বুঝিলাম, বিরাট জনসমুদ্র মহাদেবকে গ্রাস করিয়াছে।

সঙ্গিহারা—গাইড-হারা হইয়া ক্ষণেক উদ্‌ভ্রান্তের মত এদিক ওদিক ঘুরিয়া বেড়াইলাম। গগনের থালে তখন জবাকুসমসঙ্কাশ মহাদ্যুতি তপনদেব আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন, সূর্য্যালোকে সারা জগৎ হাসিতেছে, কেবল সঙ্গিহারা আমি,—আমার মুখে হাসির কোনও চিহ্ন ছিল না। বার বার চারিদিকে ঘুরিলাম, কিন্তু কোথাও মহাদেবকে পাইলাম না। মেলায় গৃহস্থালীর কিছু কিছু জিনিষ কিনিব, দুই একখানা পাহাড়ী কম্বল ও নেপালী কুকরী কিনিব, মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু কিছুই ভাল লাগিল না, মহাদেব না হইলে কে কিনিয়া দিবে ?

পরিশ্রান্ত হইয়া এক প্রান্তে আসিয়া কোমলাস্তৃত তৃণশয্যার উপর বসিয়া পড়িলাম। নাতিদূরে বহু পাহাড়ী নরনারী কম্বল জড়াইয়া বসিয়া ছিল, তাহাদের মধ্যে অনেকেই অল্পবয়স্ক। বালক-বালিকা, কিশোর-কিশোরী ও যুবক-যুবতীর সংখ্যাই অধিক, তবে পুরুষ অপেক্ষা নারীর ভাগই বেশী। এক জন বয়স্ক পাহাড়ী এক এক নারী বা পুরুষকে কাছে আনিয়া দাঁড় করাইতেছে এবং পাহাড়ী ভাষায় উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছে, "কে খরিদ্দার আছ, এই বালিকাকে কিনিবে, ইহার বয়স ১৩ বৎসর।"

তখনই মনটা চমকিত হইয়া উঠিল। মহাদেব যে নরনারী বিকিকিনির কথা বলিয়াছিল, ইহাই ত তাই! কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া আমি সেই মানুষ বেচার হাটের দিকে অগ্রসর হইলাম।

কত বিকি-কিনি হইল। দেখিলাম, ক্রেতা বা বিক্রেতা এই মানুষ বেচায় কোনরূপ বিস্ময় প্রকাশ করিতেছে না। যেমন ঘৃত, লবণ, তৈল, তণ্ডুল কেনা-বেচা হয়, মানুষও তেমনই কেনা-বেচা হইতেছে, পাহাড়ীরা চিরাচরিত প্রথানুসারে ইহাতে অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে, তাহাদের মনুষ্যোচিত অন্তরের কোমল বৃত্তিনিচয় ইহাতে বিন্দুমাত্র আহত হইতেছে না। আমি বাঙ্গালী, এ বীভৎস দৃশ্য আমার পক্ষে অসহনীয় বেদনার কারণ হইল। আমি বিরক্ত হইয়া স্থান ত্যাগ করিবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। এমন সময়ে একটি অভাবনীয় দৃশ্য দেখিয়া আমি স্তম্ভিত হইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইলাম। এতক্ষণ যে সমস্ত পুরুষ ও নারী ক্রীত-বিক্রীত হইতেছিল, তাহাদের মধ্যে প্রায় সকলেই সাধারণ পাহাড়ী, তাহাদের বিশেষত্ব কিছুই ছিল না। কিন্তু হঠাৎ আমার দৃষ্টি একটি তরুণীর প্রতি আকৃষ্ট হইল। তরুণী এক-বেণীধরা, কালভুজঙ্গীর মত সেই বেণী পৃষ্ঠদেশে জানু পর্য্যন্ত বিলম্বিত। তাহার উভয় গণ্ডে দুইটি গোলাপ-কোরক ফুটিয়াছিল। তাহার সর্ব্বাঙ্গে প্রথম যৌবনের লাবণ্য বহিয়া যাইতেছিল। সাধারণ পাহাড়ীয়াদের মত তাহার চক্ষু ও নাসিকা ক্ষুদ্র ও গোলাকার ছিল না—নীলোৎপলের মত নয়নযুগল আয়ত, নাসিকা কবি-বর্ণিত তিল-ফুলের মত সরল ও উন্নত। সর্ব্বোপরি তাহার মুখে চোখে এমন একটা করুণ কোমল কাতরতার ভাব জড়ান-মাখান ছিল, যাহা দেখিলেই তাহার দিকে দৃষ্টি স্বতঃই আকৃষ্ট হয়। যৌবনের বা রূপের যাদু এমনই যে, মানুষের মনের উপর তাহার প্রভাব বিস্তার করিবেই। আমিও

মানুষ, আমি বহ্নিমুখে পতঙ্গের মত তাহাতে আকৃষ্ট হইলাম।

ছয় মাস কাল অহরহ পাহাড়ীয়াদের সহিত জীবন-যাপনের ফলে আমি পাহাড়ী ভাষা বলিতে ও বুঝিতে অভ্যস্ত হইয়াছিলাম। সুতরাং ক্রীতদাসী-বিক্রেতার কথা বুঝিতে বিলম্ব হইল না। বিক্রেতা বলিতেছিল, যুবতীর মূল্য এক বৎসর কালের জন্য ৫০৲ টাকা।

কি জানি কেন, হঠাৎ এই তরুণীকে ক্রয় করিবার বাসনা আমার মনে জাগিয়া উঠিল। আমি বাঙ্গালী,—এ ক্রয়-বিক্রয়ে আমার কোনও সহানুভূতি থাকিবার কথা নহে, কিন্তু তরুণীর আয়ত নয়নদ্বয়ের করুণ কাতর দৃষ্টি আমাকে যেন তাহার দিকে সবলে আকর্ষণ করিল। আমি অগ্রসর হইয়া বিক্রেতাকে আমার মনেব অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলাম। পাহাড়ী নরনারীরা সবিস্ময়ে আমার দিকে তাকাইয়া রহিল,—বাঙ্গালী বাবুরা কখনও এরূপ করিয়াছে বলিয়া হয় ত তাহাদের জানা ছিল না।

অতি অল্প কথায় বিকিকিনি হইয়া গেল। আমি তরুণীকে লইয়া মেলার বাহিরে চলিয়া আসিলাম, আমার অন্য কিছু পণ্য সংগ্রহ করা হইল না।

তরুণীর সঙ্গে একটি বৃদ্ধ পাহাড়ী আসিতেছিল, সে বলিল, "বাবুজী, তুমি এই বিকিকিনির নিয়ম-কানুন জান?"

আমি বলিলাম, "না।"

সে বলিল, "তবে সব কথা জেনে রাখ। এই কন্যা আজ হ'তে এক বৎসর কাল তোমার ক্রীতদাসী হয়ে থাকবে। এর উপর তোমার পূর্ণ অধিকার থাকবে। এক বছরের পর ওকে আমি নিয়ে যাব, আমি ওর বাপ। যদি এর মধ্যে তোমাদের সন্তান হয়,—"

আমি চমকিত হইলাম। সন্তান! তবে কি এই তরুণীর দেহভোগেও ক্রেতা অধিকারী! আমি বলিলাম, "সে কি?"

বৃদ্ধ বলিল, "হাঁ, এই-ই নিয়ম। ওর দেহের উপর তোমার অধিকার থাকবে। কিন্তু সন্তান হ'লে সে সন্তান তোমার হবে না, এই কন্যা এক বছর পরে সেই সন্তান নিয়ে ঘরে ফিরে আসবে।"

আমি গম্ভীরভাবে বলিলাম, "হুঁ, আর কিছু নিয়ম আছে?"

বৃদ্ধ বলিল, "আছে। এই এক বছরের মধ্যে তোমায় ওকে খেতে পরতে দিতে হবে। মনের অমিল হ'লে ওকে এক বছরের মধ্যে তাড়িয়ে দিতে পারবে না, কাছেই রাখতে হবে। ঠিক এক বছর পরে তুমি যেখানেই থাক, আমি সেখানে গিয়ে একে দাবী করব। কেমন, এতে রাজী আছ?"

আমি ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জ্ঞাপন করিলাম। বৃদ্ধ বলিয়া যাইতে লাগিল, "আরও একটা সর্ত্ত আছে। তোমাদের মধ্যে যদি ভালবাসা হয়, তা হলেও একে বিবাহ করতে পারবে না। এক বছর পরে আমি বা আমার ছেলে অথবা আমার বংশের কোনও পুরুষ এসে যদি দেখে, তুমি এ নিয়ম ভঙ্গ করেছ, তা' হ'লে তোমাকে হত্যা করবো।"

আমি শিহরিয়া উঠিলাম। বলিলাম, "সে ভয় নেই। এর চোখে মুখে দুঃখের ভাব দেখে আমার করুণা জেগে উঠেছে, আমি ওর প্রতি ভাল ব্যবহারই করব।"

বৃদ্ধ সে কথা যেন শুনে নাই, এমনই ভাব দেখাইয়া বলিল, "তবে এক বছর পরে এসে যদি দেখি, তোমাদের দুজনেরই বিবাহের ইচ্ছা হয়েছে, তা হ'লে আমি নিজে তোমাদের বিয়ে দেবো। কেমন, সব কথা ভাল ক'রে বুঝলে? এই কটা নিয়ম পালন করলে কোনও গোল থাকবে না। এরও কটা নিয়ম মানতে হবে। তোমার সুখ ও আরামের অথবা ভোগের জন্যে এর দেহের দ্বারা যা সম্ভব হয়, তা এ করতে বাধ্য থাকবে। না করলে এক বৎসর পরে একে তার প্রমাণ পেলে আমি তোমার টাকা ফিরিয়ে দিয়ে যাব। বাবুজী, তবে আসি।"

বৃদ্ধ চলিয়া গেল। যাইবার পূর্ব্বে সে কন্যার দিকে ফিরিয়া চাহিল না। তরুণীর অশ্রুসজল দৃষ্টি যতক্ষণ তাহার চলন্ত মূর্ত্তির প্রতি নিবদ্ধ রহিল, ততক্ষণ আমি সেই প্রান্তর-মধ্যে দাঁড়াইয়া বিস্ময়াপ্লুতমনে আকাশ-পাতাল ভাবিতে লাগিলাম।

৩

সাবিত্রী অন্যান্য পাহাড়ীয়াদের মত জলকে ভয় করে; তরুণীর নাম সাবিত্রী। সে পারতপক্ষে স্নান করিতে চাহে না, জলের সম্পর্ক রাখিতে চাহে না। সে অপরিষ্কার

অপরিচ্ছন্ন। তাহার স্বভাবতঃ ভ্রমরকৃষ্ণ কুঞ্চিত কেশদাম তৈলাভাবে সদাই রুক্ষ থাকিত, তাহার অপরূপ রূপ সত্ত্বেও তাহার দেহ হইতে সর্ব্বদা একটা বিকট গন্ধ ছড়াইয়া পড়িত। এ জন্য আমি তাহাকে আমার নিকটে বড় একটা আসিতে দিতাম না। সে ঘর ঝাঁট দিত, বাসন মাজ্জিত, বিছানার পাট করিত, এমন কি, কাঠ-চেলা করিত, মোটও বহিত; কিন্তু আমি তাহাকে আমার পানীয় বা আহার্য্য সংগ্রহের বা ব্যবস্থার বিষয়ে কোন ভার দিতাম না। মহাদেব থাপ্পা আমার কাছে অনেক দিন থাকিয়া বাঙ্গালীর মত হইয়া গিয়াছিল, তাহার উপর ঐ সব ভার ছিল। সে পারত-পক্ষে কথা কহিত না, নীরবে আপন কর্ত্তব্য পালন করিয়া যাইত, তাহাকে ডাকিলে নীরবে আসিয়া দাঁড়াইত এবং আদেশ শুনিয়া তৎক্ষণাৎ তাহা পালন করিতে যাইত।

প্রথম যে দিন সে আমার কাযে ভর্ত্তি হয়, সেই দিন রাত্রিকালে আমার শয়নের পর সে নীরবে আমার তাম্বুতে প্রবেশ করিয়া নীরবে আমার শয্যাপ্রান্তে বসিয়া নীরবে আমার পদসেবা করিতে লাগিল। সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম, কাযেই শয়ন-মাত্র তন্দ্রাভিভূত হইয়াছিলাম। হঠাৎ পদদ্বয়ে কোমল হস্তস্পর্শে আমার তন্দ্রাঘোর কাটিয়া গেল, বিস্মিতনেত্রে চাহিয়া দেখিলাম, সাবিত্রী আমার পদসেবা করিতেছে। আমি ক্ষিপ্রগতি পদদ্বয় সরাইয়া লইয়া তীরের মত দাঁড়াইয়া উঠিলাম, গম্ভীর স্বরে সাবিত্রীকে বলিলাম, "কে তোমাকে এখানে আস্‌তে বল্‌লে? যাও।"

সাবিত্রীও দাঁড়াইয়া উঠিয়াছিল। সে তাহার বন-কুরঙ্গীর মত বিশাল আয়ত নীলোৎপলতুল্য নয়নের দৃষ্টি আমার মুখের উপর স্থাপিত করিল; তাহাতে বিস্ময়, ভয় ও কুণ্ঠার চিহ্ন স্পষ্ট প্রকট হইয়া উঠিয়াছিল।

আমি আবার উচ্চস্বরে বলিলাম, "যাও।"

সাবিত্রী বুকের উপর হাত রাখিয়া কেবল একটি কথা উচ্চারণ করিল, 'কেটি।' এই বোধ হয়, তাহার প্রথম সম্ভাষণ। পাহাড়ীয়ারা ক্রীতদাসীকে কেটি বলে।

আমি রুষ্টস্বরে বলিলাম, "তা হোক। তুমি পার্শ্বের তাঁবুতে গিয়ে শোও। আর কোনও দিন আমার শোবার সময়ে এখানে এস না।"

তখন সাবিত্রীর নয়নযুগলে যে ভক্তি, শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার ভাব ফুটিয়া উঠিতে দেখিয়াছিলাম, তাহা ইহজীবনে ভুলিতে পারি নাই। পরদিন হইতে সাবিত্রীকে অপেক্ষাকৃত প্রফুল্লমুখে গৃহস্থালীর কায করিতে দেখিয়াছি। তবে তাহার বিষাদমাখা আননের ধীর-গম্ভীর ব্যথিত ভাব একবারে অন্তর্হিত হয় নাই, তাহার গভীর নীরবতার অবিচ্ছিন্নতাও কখনও ক্ষুণ্ণ হয় নাই।

একটি বিষয়ে সাবিত্রী ঘড়ির কাঁটার মত কায করিয়া যাইত। জল-ঝড়, শীত-গ্রীষ্ম,—যাহাই হউক, সে প্রত্যূষে ও সন্ধ্যায় তাম্বু হইতে দূরে পাহাড়ের দিকে প্রত্যহ বেড়াইতে যাইত। তাহাকে কখনও এ বিষয়ে অমনোযোগী হইতে দেখি নাই।

এক দিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে আমার হাতে কোনও কায ছিল না, আমি সে জন্য একটু দূরে ভ্রমণ করিতে বাহির হইয়াছিলাম। যে স্থান হইতে নীল নিবিড় পাহাড়ের শ্রেণী স্পষ্ট দেখা যায়, সেই স্থানের নিকটবর্ত্তী হইয়া দূর হইতে দেখিলাম, একটি নারী-মূর্ত্তি পাহাড়ের উপর অস্তগমনোন্মুখ তপনদেবের প্রতি নির্নিমেষনয়নে চাহিয়া রহিয়াছে। বায়ু-তাড়নায় তাহার গাত্রাবরণখানি উড্ডীয়মান হইতেছিল—সে দিকে তাহার দৃষ্টি ছিল না। তাহার পৃষ্ঠদেশে লম্বিত বেণী দোদুল্যমান হইতেছিল, দূর হইতে তাহাকে যেন চিত্রার্পিত প্রতিমার মত দেখাইতেছিল। আমি দ্রুতগতি অগ্রসর হইলাম। কেন সে প্রত্যহ এই স্থানে আসিয়া পাহাড়ের প্রতি স্থিরদৃষ্টি হইয়া দণ্ডায়মান হয়, জানিবার জন্য আমার কৌতূহল উদ্দীপ্ত হইয়াছিল।

আমি তাহার নিকটবর্ত্তী হইয়া স্নেহার্দ্রস্বরে ডাকিলাম, "সাবিত্রি!"

সাবিত্রী চমকিত হইয়া পশ্চাতে ফিরিয়া দেখিল, তাহার মুখে-চোখে আশঙ্কার চিহ্ন প্রকটিত হইয়াছিল। চোর চুরি করিতে গিয়া ধরা পড়িলে তাহার মুখের ভাব যেমন হয়, সাবিত্রীর মুখেও তেমনই আশঙ্কার ভাব জাগিয়া উঠিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "এখানে তুমি কি করিতেছ? প্রত্যহ এখানে আসিয়া কি দেখ?"

সাবিত্রী এতক্ষণে আপনাকে সামলাইয়া লইয়াছিল, সে বিন্দুমাত্র সঙ্কুচিত না হইয়া পাহাড়ের দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিল। নাতিদূরে পাহাড়ের পর পাহাড়ের শ্রেণী বিশাল সমুদ্রবক্ষে যেন তরঙ্গমালার মত অনুমিত হইতেছিল।

অস্তাচলগামী সূর্য্যের রক্ত আভা পাহাড়ের মাথার উপর ঝকমক করিতেছিল। সে সময়ে পাহাড়ের যে শোভা হইয়াছিল, তাহা কবির তুলিকারই যোগ্য উপকরণ। আমি বলিলাম, "পাহাড় দেখিতেছিলে? কেন, ওখানে কি দেখ?"

এত দিন পরে সাবিত্রীর মুখে একের অধিক কথা শুনিতে পাইলাম। সে বলিল, "ঐ পাহাড়ের ওপারে আমাদের ঘর। সেখানে আমার সব আছে।"

আমি বুঝিলাম, আমি যেমন প্রত্যহ আমার সোনার বাঙ্গালার একখানি নিভৃত পল্লীর শ্যামশোভা দেখিবার জন্য ব্যাকুল হই, সাবিত্রীও তেমনই তাহার পাহাড়ে ঘেরা জন্মদা পল্লীভূমির দর্শনের জন্য প্রত্যহ ব্যাকুল হয়, তাহার আকুল আকাঙ্ক্ষা মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া সাঁঝে-সকালে এইখানে দেখা দেয়। সহানুভূতিতে আমার অন্তর ভরিয়া গেল, পুনরপি স্নেহার্দ্রকণ্ঠে বলিলাম, "ঐ ওপারে যেখানে তোমার সব আছে, সেইখানে যেতে চাও? কেন, তোমার কি এখানে কোনও কষ্ট হচ্ছে?"

সাবিত্রী এবার কোনও কথা কহিল না, নীরবে নতমুখে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার হৃদয়ের অন্তস্তলে তখন ভাব-সমুদ্রের কি তরঙ্গভঙ্গ হইতেছিল, প্রবাসী আমি, আমার বুভুক্ষু হৃদয়ের নিত্য হাহাকারের মধ্য দিয়া তাহা বুঝিয়া লইতে আমার বিলম্ব হইল না, অবিকম্পিত কণ্ঠে বলিলাম, "সাবিত্রি, সত্যই তুমি ঐখানে ঐ পাহাড়ের পরপারে ফিরে যেতে চাও? যাও, আমি তোমায় কোনও বাধা দেবো না।"

সাবিত্রীর পাষাণের মত সুখ-দুঃখের অনুভূতিশূন্য মুখমণ্ডলে এক অপূর্ব্ব রক্তরাগ ফুটিয়া উঠিল, আয়ত লোচন দুইটি কি এক অপূর্ব্ব জ্যোতিতে ধক-ধক জ্বলিয়া উঠিল, আমার মনে হইল, যেন নিশ্চল মৃন্ময় প্রতিমায় প্রাণসঞ্চার হইয়াছে। সে করুণ ব্যথাহত স্বরে উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল, "সত্যি বলছ, বাবুজী? আমায় দেশে ফিরে যেতে হুকুম দিচ্ছ?"

আমি বলিলাম, "হুকুম না সাবিত্রি, আমি তোমায় আনন্দের সঙ্গে ইচ্ছা ক'রে যাবার জন্যে অনুরোধ করছি। কেন তুমি ইচ্ছার বিরুদ্ধে এখানে প'ড়ে থাকবে, আমি তোমার মনে ব্যথা দিতে চাই না।"

সাবিত্রী তখনও আমার কথা বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না। এমন ত হয় না। তবে কি বাবুজী তাহার সহিত রহস্য করিতেছেন? সে আবার উত্তেজিত স্বরে বলিল, "তামাসা না বাবুজী, সত্যি?"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "হাঁ, সত্যি। তুমি যদি এখনই দেশে ফিরে যেতে যাও, স্বচ্ছন্দে যেতে পার। আমি তোমায় বাধা দেবো না, কেউ বাধা দেবে না। এই নাও, পথের খরচা।"

আমি তাহাকে কিছু অর্থ দিবার জন্য হস্ত প্রসারণ করিলাম, সে দুই পদ পিছাইয়া গেল, হাত দুইখানি বুকের উপর রাখিয়া আবার বলিল, "আমার খরিদ করার টাকা? সে টাকার কি হবে?"

আমি বলিলাম, "আমি সে টাকা একবার দিয়েছি, আর ফিরিয়ে চাইনে। এই রাত্রিকালে একলা যেতে পারবে?"

সাবিত্রী দৃঢ়স্বরে বলিল, "খুব পারব; আমার ভয় নেই। রাতে এমন একলা যাওয়া আসা আমার খুব অভ্যেস আছে।"

আমি বলিলাম, "তবে এই টাকা নাও।"

সাবিত্রী করপ্রসারণ করিয়া টাকা লইল। তাহার পর সে আমার মুখের দিকে তাকাইয়া গভীর কৃতজ্ঞতার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল এবং আর কিছু না বলিয়া পাহাড়ের দিকে অগ্রসর হইল। মুহূর্ত্তের মধ্যেই সে সন্ধ্যার অন্ধকারে মিলাইয়া গেল।

৪

বাসায় ফিরিয়া আমার মনটা ভাল ছিল না। যেন কি নাই, যেন কি হারাইয়াছি, যেন হৃদয়ের আশা-আকাঙ্ক্ষার মধ্যে কি একটা জিনিষ ফাঁকা হইয়া গিয়াছে,—এমনই অবস্থা হইল। ভাল করিয়া আহার করিতে পারিলাম না। আত্মসম্মানে একটা আঘাত পাইলাম বলিয়া মনে হইল। এই পাহাড়ী তরুণীর প্রতি এ যাবৎ কোনওরূপ মন্দ ব্যবহার করি নাই, বরং যতটা মনে পড়ে, খুব সদয় ব্যবহারই করিয়াছি। তবে কি সে সদয় বা নির্দ্দয় ব্যবহারের অতীত? তাহার অশিক্ষিত, অমার্জ্জিত মনে কি কৃতজ্ঞতা বলিয়া কোনও মনোবৃত্তির ছাপ অঙ্কিত হয় নাই? অজ্ঞাতে আমি

কি তাহার মনে কোনওরূপ ব্যথা দিবার কারণ হইয়াছি? আমি কি তাহাকে ধরিয়া রাখিবার মত কোনওরূপ আকর্ষণের ব্যবস্থা করি নাই? আত্মীয়-স্বজনের আকর্ষণ অথবা স্বাধীনতালাভের আকর্ষণ যে এ ক্ষেত্রে তাহার অন্য সকল মনোবৃত্তির আকর্ষণ অপেক্ষা অধিক প্রবল হইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারিলাম।

ভাবিতে ভাবিতে তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িলাম। কিন্তু সে তন্দ্রা অধিকক্ষণ স্থায়ী হইল না। সাবিত্রীর আসার পর প্রথম রাত্রিতে যেমন আমার পদদ্বয়ে কোমল হস্তস্পর্শের অনুভূতিলাভে জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছিলাম, তেমনই এবারেও হঠাৎ কাহার হস্তস্পর্শে আমি জাগিয়া উঠিলাম; চোখে হাত ঘষিয়া চাহিয়া দেখিলাম, সাবিত্রী সেই প্রথম দিনের মত আমার পদসেবায় রত রহিয়াছে!

আমি তীরের মত উঠিয়া বসিয়া সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলাম, "এ কি সাবিত্রি, তুমি? তুমি দেশে ফিরিয়া যাও নাই?"

সাবিত্রী নতমুখে কেবল বলিল, "না।"

আমি বলিলাম, "না? কেন, যাও নাই কেন? আমি ত তোমায় মুক্তি দিয়েছি।"

সাবিত্রী বলিল, "মুক্তি চাহি না, মুক্তিতে আমার অধিকার নাই।"

আমি উত্তরোত্তর বিস্মিত হইয়া বলিলাম, "কেন নাই? আমি তোমায় কিনেছি, আমিই মুক্তি দিয়েছি। তবে?"

সাবিত্রী বলিল, "তুমি যদি তাড়িয়ে না দাও, বাবুজী, তা হ'লে আমি যাব না। এক বছর আমার যাবার অধিকার নেই।"

আমি বলিলাম, "কেন, টাকা দিয়েছি ব'লে? টাকা আমি ফিরে নিতে চাই না।"

সাবিত্রী ক্ষণকাল নীরবে রহিল, তাহার পর ধীরে ধীরে বলিল, "টাকা ফিরিয়ে দেবার ক্ষমতা আমার বাপুজীর নেই, দিলেও আমি যাব না। বাবুজী, আমায় তাড়িয়ে দিও না, অন্ততঃ এক বছর তোমার সেবা করতে দাও।"

কথাটা বলিয়া সাবিত্রী কাতর করুণদৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে আকুল আগ্রহে চাহিয়া রহিল। আমার বিস্ময়ের সীমা রহিল না। সাবিত্রী এত কথা ত কখনও বলে নাই। আজ কি অজ্ঞাত কারণে তাহার এই ভাবান্তর!

সাবিত্রী আবার করুণস্বরে বলিতে লাগিল, "বাবুজী, তুমি আমায় যা করতে বল, তাই করব, তুমি আমায় তাড়িয়ে দিও না। এখন থেকে আমি তোমাদের বাঙ্গালীর মত হ'তে চেষ্টা করব, আমার জন্যে তোমার কখনও বিরক্তি বা ঘৃণা হবে না।"

উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়াই সাবিত্রী ধীরে ধীরে তাম্বুর বাহিরে চলিয়া গেল। আশ্চর্য্য তরুণী!

পরদিন হইতে লক্ষ্য করিলাম, সাবিত্রী প্রত্যহ স্নান করে, সর্ব্বদা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে, পরিধেয় বস্ত্রাদি সাধ্যমত ময়লাশূন্য রাখে। প্রাতে ও সন্ধ্যায় আর সে পাহাড় দেখিতে যায় না, তৎপরিবর্ত্তে জঙ্গলে গিয়া বনফুল সংগ্রহ করিয়া আনিয়া মালা গাঁথিয়া কেশের শোভা বর্দ্ধন করে, অনুক্ষণ হাসিমুখে কায করিয়া যায়। তাহার মুকুলিত যৌবনে যে অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য্য দেখা দিয়াছিল, তাহা যেন কোন যাদুকরের মায়াদণ্ডের স্পর্শে ক্রমেই অপসারিত হইতে লাগিল। আর আমার সেবার কথা?—তাহা আর কি বলিব। প্রবাসে আমার এই নিঃসঙ্গ জীবনে সে যেন একাধারে জননী, কন্যা, ভগিনী, পত্নী ও দাসীরূপে আমার সকল অভাব দূর করিয়া সকল প্রকার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যবিধান করিতে লাগিল। আমার মুখের কথাটি খসিবার অবসর হইত না,—সে যেন কোনও দৈবশক্তিবলে আমার মনের কথা জানিতে পারিয়া আমার আদেশের প্রতীক্ষা না করিয়া আমার বাঞ্ছিত কার্য্য সম্পন্ন করিয়া যাইতে লাগিল। কি অক্লান্ত পরিশ্রমী সে, কি কর্ম্মতন্ময়তা তাহার, সে সেবার তুলনা কোথায় খুঁজিয়া পাইব?

যতই দিন যাইতে লাগিল, ততই ভুলিয়া যাইতে লাগিলাম যে, আমি বাঙ্গালী, আমি অনিলেন্দু রায়, আমারও দেশ-ঘর আছে, আমারও জননী-ভগিনী আত্মীয়-স্বজন আছে, আমারও আপনার বলিবার মত অনেক কিছু আছে। এই অতি দূরের পাহাড়ী তরুণী কি জানি কিসে অজ্ঞাতসারে আমার জীবনের প্রায় সমস্ত স্থানটা জুড়িয়া বসিল। একবার আমি রোগাক্রান্ত হইলে সে প্রায় এক পক্ষকাল আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়া আমার সেবা

করিয়াছিল। জ্বরত্যাগের পর যখনই চেতনা হইত, তখনই দেখিতাম, সে তাহার ক্ষুদ্র করপল্লবে আমার পদসেবা করিতেছে, অথবা তালবৃন্ত ব্যজন করিতেছে। কখনও কখনও জ্ঞান হইলে তাহার দিকে চাহিয়া দেখিলে মনে হইত, সে কি এক অপার্থিব দৃষ্টিতে নির্নিমেষে আমার দিকে চাহিয়া আছে,—সে চাহনিতে যেন সে সর্ব্বস্ব হারাইয়া আপনাকে বিলাইয়া দিয়াছে। এ তন্ময়তার সময়ে তাহাকে কি সুন্দরই দেখাইত!

এক দিন আমাদের জরীপ বিভাগের 'বড় সাহেব' 'ইন্‌স্পেকসনে' আসিলেন। তাঁহার জন্য পূর্ব্বাহ্ণেই বড় তাম্বু পড়িয়াছিল। তাঁহার আগমনের পরদিন তাহার তাম্বুতে আমার ডাক পড়িল। আমি কাগজপত্র লইয়া তথায় হাজির হইলাম। তাঁহাকে কাগজপত্র বুঝাইয়া দিতে আমার অনেকটা সময় গেল। আমি সেই সময়ের মধ্যে তাহার তাম্বুর আসবাবপত্র দেখিয়া লইলাম। তন্মধ্যে একটা জিনিষের প্রতি আমার খুবই লোভ হইয়াছিল। সেটি একটি সুদৃশ্য সুচিক্কণ ব্যাঘ্রচর্ম্ম। সেখানি তাঁহার ইজি-চেয়ারের উপর আস্তৃত ছিল।

আমার তাম্বুতে ফিরিয়া আমি মহাদেব থাপ্পার সহিত কথা কহিতে কহিতে ব্যাঘ্রচর্ম্মের কথা পাড়িলাম এবং তাহাকে বলিলাম, "ঐরূপ একখানা চর্ম্ম কি এখানে সংগ্রহ করা যায় না, যাহা দাম লাগে দিব, আমার উহাতে বড় লোভ হইয়াছে।" সেই সময়ে সাবিত্রী আমার দপ্তরের বাহিরে একটা বাশের মোড়ার উপর বসিয়া আমার একটা জামার বোতাম আঁটিতেছিল, সে সূচিকার্য্যে সিদ্ধহস্ত ছিল।

পরদিন বেলা ৯টার সময় আমি বাহিরে জরীপের কার্য্যে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছি, এমন সময়ে সাবিত্রী আসিয়া বলিল, "বাবুজী, একবার আমার সঙ্গে যাবে নালার ধারে, তোমায় একটা জিনিষ দেখাব।"

আমি কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া বলিলাম, "কি জিনিষ, সাবিত্রি?"

সে বলিল, "দেখতেই পাবে।" স্বল্পভাষিণী আর কিছু বলিল না। আমি বলিলাম, "তা ঐ দিকেই ত যাব। চল, তোমার জিনিষ দেখি গিয়ে।"

সাবিত্রী আসিবার পর আমাদের তাম্বু পাহাড়ের কোলের দিকে অনেকটা সরাইয়া লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। জরীপের কার্য্যে ৫।৬ মাস অন্তর এমন ভাবে তাম্বু সরান হইয়া থাকে। মহাদেব থাপ্পা ও কয়জন কুলীকে লইয়া আমি ও সাবিত্রী পাহাড়ের দিকে অগ্রসর হইলাম।

পাহাড়ের উপর হইতে কয়েকটা ঝরণা নামিয়া আসিয়াছে এবং একত্র মিলিত হইয়া ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনীর আকারে প্রবাহিত হইয়াছে। শীতকাল, সুতরাং তাহাতে অধিক জল ছিল না, সরু সুতার মত ঝির-ঝির করিয়া স্রোতোধারা প্রবাহিত হইতেছিল। নদীর আশেপাশে ঝোপ, জঙ্গল ও কাঁটাবন, সেগুলি খুবই ঘন-সন্নিবিষ্ট। ইচ্ছা করিলে হিংস্র জন্তু তাহার মধ্যে অনায়াসে লুকাইয়া থাকিতে পারে। এ জন্য আমি আগ্নেয়াস্ত্র সঙ্গে লইয়া জরীপ করিতে যাইতাম। এ দিনও অস্ত্র লইতে ভুলি নাই।

সাবিত্রী নদীর তটে উপনীত হইয়া পাহাড়ের দিকে আরও খানিকটা পথ অগ্রসর হইল, আমরাও কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া তাহার পশ্চাদনুসরণ করিলাম। সেখানে ঝোপ-জঙ্গল আরও গাঢ় ও ঘন হইয়া আসিয়াছে। হঠাৎ একটা ঝোপের পার্শ্বে সাবিত্রী থমকিয়া দাঁড়াইল এবং অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া বলিল, "ঐ ঝোপের ও-পাশে নদীর জলের ধারে—"

সেখানে ঝোপ-জঙ্গল একেবারে নদীর জলের ধারে আসিয়া মিশিয়াছে। ঝোপের অপর পার্শ্বে উপনীত হইয়া দেখিলাম, প্রায় জলের উপর একটা প্রকাণ্ড পশুর মৃতদেহ পড়িয়া রহিয়াছে। ভাল করিয়া দেখিতেই বুঝিলাম, সেটা ব্যাঘ্রের মৃতদেহ। তাহার দক্ষিণ চক্ষুতে একটি বাণ বিদ্ধ রহিয়াছে এবং তথা হইতে রক্তের ধারা তাহার মুখমণ্ডলে গড়াইয়া পড়িয়াছে, সে রক্ত গাঢ়, ঈষৎ নীলাভ। বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া সেই দিকে কিছুক্ষণ নির্নিমেষ নয়নে চাহিয়া রহিলাম। আমার লোকজন হর্ষবিস্ময়ে কোলাহল করিয়া উঠিল।

আমি প্রকৃতিস্থ হইলে জিজ্ঞাসা করিলাম, "সাবিত্রি, তুমিই কি এই বাঘ শিকার করেছ?"

সাবিত্রী নতমুখে বলিল, "তুমি যে বাঘের ছাল চেয়েছিলে, বাবুজী।"

কোনও উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়া সাবিত্রী তাম্বুর দিকে চলিয়া গেল, একবার পশ্চাতে ফিরিয়াও দেখিল না।

আমি স্তম্ভিত হইয়া রহিলাম, আমার ভাবসমুদ্রে তখন ভীষণ তরঙ্গভঙ্গ হইতেছিল।

আমার তন্ময়তা ভঙ্গ করিয়া মহাদেব বলিল, "বাবুজী, আমাদের পাহাড়ী ছেলে-মেয়ে বাঘ শিকার করতে জানে। সবাই যে জানে, তা নয়, তবে অনেকে জানে। সাবিত্রীরা পাহাড়-জঙ্গলের সন্তান!"

আমি বলিলাম, "তা ত বুঝলুম। কিন্তু কা'ল তোমায় আমায় বাঘছালের কথা হয়েছে, এর মধ্যে সাবিত্রী বাঘ মারলে কখন্?"

মহাদেব বলিল, "কা'ল রাত্রিতে সাবিত্রী কুলীদের তাঁবু থেকে তীর-ধনু চেয়ে নিয়েছিল। আজ ভোরে নদীর ধারে ওঁৎ পেতে ছিল, বাঘ জল খেতে এলে শিকার করেছে।"

আমি বিস্মিত স্তম্ভিত হইয়া রহিলাম। কেবল বলিলাম, "কি অব্যর্থ সন্ধান!"

৫

আমাদের জরীপের কায প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। ইহার মধ্যে আমাকে কয়েকবার স্থান পরিবর্ত্তন করিতে হইয়াছে। এখন যেখানে আসিয়াছি, সেখানে একটা বড় নদীর ধারে তাম্বু পড়িয়াছে। ফাল্গুন মাসের মাঝামাঝি সময়, নদী প্রশস্ত হইলেও জলের বহতা সামান্য, হাঁটিয়া পার হওয়া যায়।

সাবিত্রীর অক্লান্ত নীরব সেবায় আমার অন্তর তাহার প্রতি একটা অনির্ব্বচনীয় স্নেহরসে ভরিয়া উঠিতেছিল। লোক যেমন ছোট ভগিনীকে স্নেহের দৃষ্টিতে দেখে, আমিও সাবিত্রীকে তেমনই দেখিতাম, সে আমার এই নির্ব্বাসিত শুষ্ক জীবন-মরুর সাহারায় শীতল প্রস্রবণ। সে এখন নিত্য আমার শয়নকালে কিছুক্ষণ পদসেবা করে, নিষেধ করিলে কিছুতেই শুনে না, বকাবকি করিলে তাহার আয়ত নয়নদ্বয় হইতে এমন করুণ কাতর দৃষ্টি ঝরিয়া পড়ে যে, সে সময়ে তাহাকে অদেয় আমার কিছুই থাকে না। বস্তুতঃ তাহার মঙ্গল হস্তস্পর্শে আমার অযত্ন-বিন্যস্ত প্রাণহীন গৃহস্থালীতে প্রাণের সঞ্চার হইয়াছিল। কিন্তু সে যে আমার হৃদয়ের কতখানি স্থান জুড়িয়া বসিয়াছিল, তাহা তখন বুঝিতে পারি নাই। যখন বুঝিলাম, তখন আর সে সে কথা বুঝিবার সুযোগ পাইল না।

কয়দিন হইতে আকাশে খুবই মেঘ করিয়াছে। আকাশে মাঝে মাঝে গুরুগম্ভীর গর্জ্জন হইতেছে, কিন্তু প্রবল বাতাসে মেঘ কাটিয়া যাইতেছে, বর্ষণ হইতেছে না। কিন্তু তাহা হইলেও আবার আকাশে মেঘের সঞ্চার হইতেছে, প্রতি মুহূর্ত্তেই বৃষ্টির আশঙ্কা যে না হইতেছে, এমন নহে।

সে দিন নদীর ওপারে অনেক দূরে আমার জরীপে যাইবার কথা। শেষ রাত্রিতে সামান্য বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে, সুতরাং শীতটাও শেষ অস্তিত্ব জানাইয়া যাইবার অবসর প্রাপ্ত হইয়াছে। রাত্রিতে শয্যা গ্রহণের পর লেপ মুড়ি দিতে হইয়াছিল; কিন্তু সাবিত্রীর কোমল করস্পর্শে মনে হইল, যেন লেপের ভিতরেও আমার পায়ে কে বরফ ঢালিয়া দিতেছে। আমি পদদ্বয় টানিয়া লইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলাম, "আজ আর পা টেপে না, যাও, শোও গিয়ে, সাবিত্রি!"

সাবিত্রী ম্লানমুখে হাত গুটাইয়া লইল, কিন্তু যেমন শয্যাপার্শ্বে প্রত্যহ বাশের মোড়ার উপর বসিয়া থাকে, তেমনই বসিয়া থাকিতে বিরত হইল না। আমি একটু উষ্ণ হইয়া বলিলাম, "কই, গেলে না?"

সাবিত্রী বলিল, "এই যাই। বাবুজী, আমায় তাড়িয়ে দিলেই কি বাচ?"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "না, না, তোমায় এই শীতে খাওয়ার পর ব'সে থাকতে কষ্ট হবে বলেই যেতে বলছি।"

সাবিত্রী কতকটা অভিমানের সুরে বলিল, "আমি যাব না। যতক্ষণ তুমি না ঘুমুবে, ততক্ষণ এখান থেকে নড়ব না। আচ্ছা বাবুজী, আমার যাবার সময় এলে যদি আমি না যাই, তা হ'লে কি আমায় তাড়িয়ে দেবে?"

আমি বিস্মিত হইলাম। সাবিত্রী এত কথা কখনও বলে না। বলিলাম, "তাড়িয়ে দেব কেন? তোমার যতক্ষণ ইচ্ছে থাক না, কেবল পা টিপে দিও না।"

সাবিত্রী ক্ষণকাল গম্ভীর হইয়া রহিল। তখন বাহিরেও গম্ভীরা প্রকৃতির বুকে গুরুগম্ভীর গর্জ্জন হইতেছিল।

তাহার পর সাবিত্রী ধরা-গলায় বলিল, "আজকের রাতের কথা বলছি না। বছর ফুরুলে যখন গাঁয়ে ফিরে যাবার সময় হবে, তখন—"

আমি বুঝিলাম। মনটা আমার বড়ই চঞ্চল হইয়া উঠিল। তাই ত, সে দিনেরও ত আর বেশী বিলম্ব নাই।

সাবিত্রী-হীন জীবন,—সে কেমন, তাহা ত কল্পনাও করিতে পারি না। এ কয় মাসে সে যেন আমার এই নিঃসঙ্গ জীবনের একটা অংশই হইয়া গিয়াছে। ক্ষুব্ধ ব্যথিত কণ্ঠে বলিলাম, "তুমি যদি আমায় ছেড়ে যাও, তা হ'লে আমি ত তোমায় ধ'রে রাখ্‌তে পারব না। তোমার আত্মীয়-স্বজন তোমায় ত কড়ার মত নিয়ে যাবেই।"

সাবিত্রী গম্ভীর স্বরে বলিল, "আর আমি ইচ্ছা ক'রে যদি না যাই?"

আমি ধড়মড়িয়া উঠিয়া বসিলাম, সাবিত্রীর হাত দু'খানি ধরিয়া আকুল আগ্রহভরে বলিলাম, "সত্যি যাবে না, সাবিত্রি? না, তামাসা করছ, ওঃ!"

সাবিত্রী তাহার মাথাটা আমার পায়ের উপর রাখিয়া মুখ গুঁজিয়া নীরবে পড়িয়া রহিল, ঠিক সেই সময়ে কড় কড় শব্দে অতি নিকটেই বজ্রাঘাত হইল, বিদ্যুতালোকে চারিদিক ঝলসিয়া উঠিল, সাবিত্রী আরও জোরে আমার পা-দু'খানা জড়াইয়া ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া কাঁদিতে লাগিল।

আমার বিস্ময়ের সীমা রহিল না। এই নিরক্ষর পাহাড়ী বালিকার মনে এমন কি ভাবের উদয় হইয়াছে যে, সে তাহাকে সামলাইতে পারিতেছে না? সে ত এমন কখনও করে না। সে স্বভাবতঃ ধীর-গম্ভীরা, স্বল্পভাষিণী, শান্তস্বভাবা, ভয় বা লজ্জা তাহাকে কখনও অভিভূত করিয়াছে বলিয়া জানি না। সস্নেহে তাহার নবকিশলয়-লাবণ্যমাখা মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া বলিলাম, "সাবিত্রি! এ কি, কাঁদছ? কেন, ভয় পেয়েছ? কিসের ভয়? এই ত আমি কাছে রয়েছি। দেখ আমার দিকে চেয়ে, অমন বাজ কত পড়ে।"

মুহূর্ত্তে সাবিত্রীর অভাবনীয় পরিবর্ত্তন হইল; সে আমার স্পর্শ হইতে তৎক্ষণাৎ মুক্ত হইয়া কিছু দূরে সরিয়া গেল। হাসিয়া বলিল, "কিছু হয়নি, বাবুজী। আমরা বাজে ভয় পাই নে। তুমি শোও।"

বলিয়াই সে বেণী দোলাইয়া চলিয়া গেল। আশ্চর্য্য বালিকা! এই কান্না, এই হাসি!

মুহূর্ত্তমধ্যেই কিন্তু সাবিত্রী ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "একটা কথা, বাবুজী। কা'ল ভোরে নদী পেরিও না।"

আমি বিস্মিত হইয়া বলিলাম, "কেন? তা কি হয়? নদী আমায় পেরুতেই হবে, জরীপের কাজ জরুরী, পড়তে পারে না।"

সাবিত্রী তথাপি বলিল, "তবুও পেরিও না, একটা দিনে কি এসে যাবে, পরের দিনে যেও।"

সাবিত্রী চলিয়া গেল। আমি হাসিয়া মনে মনে বলিলাম, বালিকার খেয়াল, যখন ধরেছে এই জেদ, শীগ্‌গীর ছাড়বে না।

শেষরাত্রিতে মহাদেব আমায় তুলিয়া দিল। তাড়াতাড়ি শৌচ সমাপন করিয়া ও চা-বিস্কুটাদি জলযোগ করিয়া সদল-বলে সসরঞ্জামে বাহির হইয়া পড়িলাম। সে সময়ে সাবিত্রীর কথা মনেও ছিল না।

শেষ রাত্রিতে কিছু বৃষ্টি হইয়াছিল। আমরা যখন বাহির হইলাম, তখন বারি ঝরিতেছিল। আকাশ তখনও ঘোর ঘনঘটাচ্ছন্ন, গুরু গুরু মেঘগর্জ্জন ও বিদ্যুৎবিকাশও হইতেছিল।

নদীর নিকটে যখন পৌছিলাম, তখন ভোর হইয়াছে। দূর হইতে দেখা গেল, নদীতে জলের বিস্তারবৃদ্ধি হইয়াছে। কা'ল যে নদীতে ধু ধু চরের মধ্যে সূতার মত ঝির-ঝির করিয়া জল বহিতেছিল, আজ তাহা ক্ষুদ্র খালের আকার ধারণ করিয়াছে, তাহাতে জলকল্লোল শুনা যাইতেছে।

নদীর তটে উপনীত হইয়া পার্শ্বের এক ঝোপের আড়ালে একটি মনুষ্যমূর্ত্তি দেখিতে পাইলাম। এই দুর্য্যোগে কায না থাকিলে কে এমন লোক আছে যে, এই নদীতটে আসিয়া নিশ্চেষ্ট বসিয়া থাকে? বিশেষতঃ এখানে বাঘের ও অন্যান্য হিংস্র জন্তুর ভয় আছে। এই সময়ে মহাদেব বলিয়া উঠিল, "বাবুজী, ওখানে সাবিত্রী ব'সে কেন? এ দুয্যগে একলা এসেছে ও?"

আমি যতটা বিস্মিত হইলাম, তদপেক্ষা ক্রুদ্ধ হইলাম, পরুষকণ্ঠে বলিলাম, "এ কি সাবিত্রি? তুমি এখানে একলা ব'সে কি করছ? এই জলঝড়, এত ভোরে এখানে এসেছ কেন? বাঘ-শিকার করা কি শেষ হয় নি?"

সাবিত্রী যেমন বসিয়া ছিল, তেমনই বসিয়া রহিল, বলিল, "আমার কায আছে।"

আমি অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলাম, "কায আছে! যাও, এখুনি যাও তাম্বুতে। শুনলে, আমি হুকুম করছি তোমাকে।"

সাবিত্রীর বিশাল নয়নদ্বয় ধক্-ধক্ জ্বলিয়া উঠিল। কিন্তু সে মুহূর্ত্তমাত্র, তাহার পর কোন কথা না বলিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং তাম্বুর দিকে দুই চারি পদ অগ্রসর হইল।

আমরা নিশ্চিন্ত হইয়া নদীগর্ভে অবতরণ করিলাম। জানু পর্য্যন্ত জলে মগ্ন হইল। কন্যা কিন্তু পায়ের পাতা-টুকুমাত্র ডুবিয়াছিল। সামান্য জল, কিন্তু কি ভীষণ তাহার স্রোত! মহাদেব আমায় ধরিয়া লইয়া না চলিলে হয় ত আমি নদী পার হইতেই পারিতাম না। নদীর জলে অবতরণ করিয়াছি,—এমন সময়ে কোথা হইতে কি এক অভাবনীয় কাণ্ড ঘটিয়া গেল। যত দিন বাঁচিয়া থাকিব, সে দিনের সেই ঘটনার স্মৃতি অনুক্ষণ স্মৃতিপটে জাগরূক থাকিবে।

অকস্মাৎ শতবজ্র-নির্ঘোষে দিগ্ দিগন্ত ধ্বনিত-প্রতি-ধ্বনিত করিয়া অগাধ অপরিমেয় জলরাশি পাহাড়ের উপর হইতে ছুটিয়া আসিল, বিধুনিত কার্পাসরাশির ন্যায় তাহার ফেনপুঞ্জ যেন টগবগ করিয়া ফুটিতে লাগিল,—আর সেই উদ্দাম আবিল উন্মত্ত জলরাশি সম্মুখে যাহা কিছু বাধা পাইল, হয় তাহা দলিত মথিত করিয়া, না হয় ঘোর গর্জ্জনে স্রোতোমুখে ভাসাইয়া লইয়া চলিল। সে ভীষণ তাণ্ডবনৃত্য যে না দেখিয়াছে, সে উহার ধারণা করিতে পারিবে না।

মুহূর্ত্তমাত্র আমি যেন মন্ত্রমুগ্ধের মত সেই দ্রুত ধাবমান জলরাশির দিকে চাহিয়া রহিলাম, মুহূর্ত্ত পরেই যে কুলাল-চক্রের ন্যায় ঘোর গভীর রবে ঘূর্ণায়মান জলাবর্ত্ত আমাকে গ্রাস করিয়া স্রোতোমুখে ভাসাইয়া লইয়া চলিবে, তখন আমার সে জ্ঞান ছিল না। মহাদেব আমার হস্তমুক্ত হইয়া তটাভিমুখে প্রাণপণে দৌড়িয়া অগ্রসর হইল। আমার কিন্তু হস্তপদ অবশ হইয়া গিয়াছিল, আমি এক পদও নড়িতে পারিলাম না। কিন্তু সেই সময়ে কাহার দুইখানি কোমল বাহু আমাকে দৃঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়া সবলে তটাভিমুখে আকর্ষণ করিয়া লইয়া চলিল, সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ জলস্রোত আমাদিগকে প্রচণ্ডবেগে আঘাত করিয়া পাতিত করিল। আমি সংজ্ঞাশূন্য হইলাম।

যখন জ্ঞান হইল, তখন দেখিলাম, আমি আমার তাম্বুর শয্যায় শয়ন করিয়া আছি, আমার আশে-পাশে লোক-জন, সকলেরই মুখে ভয় ও উদ্বেগের চিহ্ন। সরকারী ডাক্তার বাবু পিয়ারেলাল তাহাদিগকে আশ্বাস দিয়া বলিতেছেন, "ভয় কি, আর ভয় নাই, বাবু এইবার উঠে বসবেন দেখ না। ভয় ঐ সাবিত্রীর জন্যে।"

সাবিত্রীর নাম শুনিয়া ধড়মড়িয়া উঠিয়া বসিলাম, ব্যাকুলকণ্ঠে ভীতিব্যঞ্জক স্বরে ডাক্তার বাবুর হাত দুখানা ধরিয়া বলিলাম, "সাবিত্রী? সে কোথায়, কেমন আছে? সেই না আমায় বাঁচিয়েছে?"

ডাক্তার বাবু বলিলেন, "উত্তেজিত হবেন না, সবই বলছি। আপনার যা বিপদ কেটে গেছে, তা সাবিত্রী না থাকলে কাট্‌ত না। আমি সবই শুনেছি। যখন পাহাড়ের ঢল নেবেছিল, তখন সাবিত্রী আপনাকে বুকে জড়িয়ে ধ'রে সেই ঢলের মুখে ধাক্কার উপর ধাক্কা খেয়েছিল। ওরা পাহাড়ী মেয়ে, খুব শক্ত জান্ ওদের। তবে বুদ্ধির কায করেছিল, প্রথম মুখেই সে আপনাকে নিয়ে একখানা বড় পাথর জড়িয়ে পড়েছিল। তাই ধাক্কার উপর ধাক্কা খেয়ে তার মাথাটা থেঁৎলে গেছে বটে, তবু নিজে সব আঘাত সয়ে নিয়ে আপনাকে বাঁচাতে পেরেছিল। উঃ, ধন্য মেয়ে বটে! এবার ওকে ভাল ক'রে ইনাম দেবেন। তবে দুঃখু এই, বেঁচে উঠলে হয়! আহা হা, ছেলেমানুষ!"

আমি উন্মত্তের মত শয্যা হইতে লাফাইয়া পড়িলাম, ডাক্তার বাবু ও অন্যান্য লোকজন "হাঁ হাঁ" করিতে করিতেই আমি একবারে পার্শ্বের কামরায় সাবিত্রীর শয্যাপার্শ্বে গিয়া নতজানু হইয়া বসিয়া পড়িলাম, সাবিত্রী তখন হাঁপাই-তেছিল, সে জাগিয়াছিল; তাহার মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। আমাকে দেখিয়াই তাহার বেদনাক্লিষ্ট পাণ্ডুর বদন ঈষৎ রক্তাক্ত হইয়া উঠিল, চক্ষু দুটি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, মুখমণ্ডল আনন্দ ও তৃপ্তির আলোকে হাসিয়া উঠিল। আমি আবেগ-ভরে তাহার একখানি হাত ধরিয়া বলিলাম, "সাবিত্রি! সাবিত্রি! এ কি করলে সাবিত্রি! আর মাসখানেক পরে তোমার বাপ এলে আমি তাকে গচ্ছিত ধন কি ক'রে দেবো?"

আমার চক্ষু ফাটিয়া দরবিগলিতধারে অশ্রুপাত হই-তেছিল। সাবিত্রীর মুখে অপার্থিব হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল, সে আমার হাতখানা তাহার মুখে বুকে বুলাইতে বুলাইতে ইঙ্গিতে অন্য লোকজনকে সরাইয়া দিতে বলিল। আমি তৎক্ষণাৎ তাহার অনুরোধ পালন করিলাম।

তখন সাবিত্রী আমার মুখের উপর পুলকিত তৃপ্তির দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া ক্ষীণ কণ্ঠে বলিল, "কাঁদছ বাবুজী, আমার জন্যে কাঁদছ? ছি!"

আমি চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলিলাম, "এ কি করলি, সাবিত্রি? আমার জন্যে প্রাণ দিলি?"

সাবিত্রীর মুখচক্ষু আরও উজ্জল হইয়া উঠিল, সে ধীর স্থির অবিকম্পিত কণ্ঠে বলিল, "তোমার জন্যে প্রাণ দেবো, এটা কি একটা বড় কথা হ'ল, বাবুজী? তুমি আমায় যা দিয়েছ, এ জন্মে তা ত কোথাও পাইনি।"

সাবিত্রী খুবই হাঁপাইতে লাগিল। আমি তাহাকে নীরব থাকিতে বলিয়া ডাক্তার বাবুকে ডাকিবার উদ্দেশ্যে দাঁড়াইতে গেলাম, সাবিত্রী বাধা দিয়া করুণ দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "আমার সময় হয়ে এসেছে। এরা বলছে, আজ তিন দিন অজ্ঞান ছিলুম, মাথার যন্ত্রণায় চৈতন্য ছিল না। ডাক্তার বাবু বলেছেন, বেঁচে থাকলেও আর মাথা ঠিক থাকবে না, পাগল হয়ে যাব। ভগবানের দয়ায় তা হয় নি, এর জন্যে তাঁর পায়ে কত মাথা কুটেছি। কিন্তু জ্ঞানের বদলে প্রাণ দিতে হবে। তা হোক, কিন্তু তবু জ্ঞান হ'ল ব'লে তোমায় দেখে মরতে পারবো, না হ'লে কি হ'ত?"

আশ্চর্য্য! এই নিরক্ষর পাহাড়ী বালিকার কি অন্তর্দৃষ্টি আসিয়াছে? মরণকালেই ত লোকের এমন হয়। আমার প্রাণটা হাহাকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল; বলিলাম, "সাবিত্রি, যখন জানতে পেরেছি, তখন ত আর তোমায় ছাড়ব না!"

সাবিত্রীর চক্ষু অসম্ভব উজ্জল হইয়া উঠিল, সে আমায় কি বলিতে যাইতেছিল, হঠাৎ তাহার স্বর বদ্ধ হইল, হস্তপদ অবশ হইয়া আসিল, দেহ আমার বক্ষে এলাইয়া পড়িল। আমি ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিলাম। সকলে যখন কামরায় আসিল, তখন সব শেষ হইয়া গিয়াছে!

তাহার পর? তাহার পর সেই পার্ব্বত্য নদীতটে স্বর্ণপ্রতিমা বিসর্জ্জন করিয়া আসিলাম। এই পরিণত বয়সে নিঃসঙ্গ জীবনে সে স্মৃতির হস্ত হইতে এক দিনও নিষ্কৃতি পাই না!

নবান্ন

আজি নবান্নে নূতন ধান্য আনি,
সাজাও তোমার অর্ঘ্যের থালিখানি।
দুয়ারে দুয়ারে আলিপনা রেখাগুলি,
বহে গৌরবে লক্ষ্মীর পদধূলি।
নব মঞ্জরী দুয়ারে দুয়ারে বাঁধা,
মন্দ গন্ধে হতেছে পায়স রাঁধা।
অতিথি এসেছে, বর গৃহরাণী সবে,
আজি সুমধুর পুণ্য শঙ্খ-রবে।
আঙ্গিনায় দাও পাতিয়া দর্ভাসন,
আজি সন্তান প্রণমিবে শ্রীচরণ।

ঘরে পাকা ধান আসিতেছে ভারে ভার,
দিক বিমোহিছে রূপে ও গন্ধে তার।
জননী ধরণী আজি অকাতর করে,
শস্য বিতরে সন্তান ঘরে ঘরে।
মঙ্গল দীপখানি দেবী আজ জ্বালো,
কলাপাতে নব পায়স ও পিঠা ঢালো।
অমৃত সুরভি সিঞ্চিত হ'ক তায়,
লক্ষ্মী করুণা তাহে যেন গ'লে যায়।
ভক্ত অতিথে কর তাহা বিতরণ,
সার্থক হ'ক শুভ নবান্ন ক্ষণ।

শ্রীফটিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

যৌন-নির্ব্বাচন ও সৌন্দর্য্যবুদ্ধি

কবি সিলার বলিয়াছেন, ক্ষুধা ও প্রেম এই উভয় শক্তির বলে জগদ্‌যন্ত্র চালিত হইয়া থাকে। সাধারণ অর্থে ব্যক্তি-জীবন রক্ষার নিমিত্ত আহার্য্যের প্রতি যে আসক্তি, তাহার নাম 'ক্ষুধা।' ইহা মুখ্যতঃ ব্যক্তি-জীবনের সহিত সম্পর্কিত হইলেও ইহার দ্বারা প্রকৃতির মহত্তর উদ্দেশ্য সাধিত হয়। এক গ্রাস আহার্য্যের জন্য শতাধিক প্রাণীর মধ্যে কলহ। সেই কলহের ফলে দুর্ব্বল এবং অযোগ্যের বিনাশ এবং অপসরণ ঘটে এবং সবল ও যোগ্যতর প্রাণী তাহাদের স্থান অধিকার করিয়া লয়। এইরূপে জাতির জীবনের উন্নতি হইয়া থাকে। 'প্রেম' কথাটার একটু ব্যাপক অর্থ আছে, উহা ইংরাজী altruism। নিজের জীবন রক্ষা করিবার নিমিত্ত প্রত্যেক প্রাণী আহার করে, বিশ্রাম করে, আত্মরক্ষা করে। এই তিন কার্য্য ছাড়া সে সন্তান উৎপাদন, শিশুপালন প্রভৃতি আরও কতকগুলা কায করিয়া থাকে। ব্যক্তি-জীবনের হিসাবে এই সকল কার্য্যের প্রয়োজন নাই। বংশ এবং জাতির স্রোত প্রবাহিত রাখিবার নিমিত্ত সন্তান উৎপাদন ও প্রতিপালনের প্রয়োজন হয়। জীবের জীবন বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, উহার দুইটা বিভাগ আছে;—একটা ব্যক্তিগত, অপরটা জাতিগত; একটা স্বার্থপর, অপরটা নিঃস্বার্থ। সন্তান প্রতিপালনের জন্য স্নেহ, বাৎসল্য প্রভৃতি যে সকল গুণের আবশ্যক, তৎসমুদায়ই ঐ 'প্রেম' কথাটার অন্তর্গত। স্বার্থে ক্ষুধা ও পরার্থে প্রেম সংসাররূপী এঞ্জিন-কলের জল ও কয়লাস্বরূপ।

জাতির জীবন রক্ষা ও তাহার অভ্যুন্নতি প্রকৃতির মুখ্য উদ্দেশ্য। জাতি-জীবন রক্ষার জন্য ব্যক্তি-জীবনের প্রয়োজন; সুতরাং উহা গৌণ। জাতির জীবন-রক্ষার জন্য যদি ব্যক্তি-জীবন সমর্পণ করিতে হয়, তাহাতেও ক্ষতি নাই এবং তাহা হইয়াও থাকে। এমন অনেক জীব আছে, সন্তান প্রসব করিবার পরই তাহাদের মৃত্যু হয়। এই সকল জীব সাধারণতঃ এককালে একাধিক সন্তান প্রসব করিয়া থাকে। এই ব্যাপারে একটা মাতৃজীবন নষ্ট হয় বটে, কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে একাধিক জীবন লাভ হয় এবং তদ্দ্বারা জীবের বংশবিস্তার ঘটিয়া থাকে। পাঁচটার জন্য একটাকে বিসর্জ্জন করা প্রাকৃতিক ধর্ম্ম। ফল পাকিলেই ওষধির জীবনান্ত হয়, কিন্তু মরণের পূর্ব্বে প্রত্যেক বৃক্ষটি বহুসংখ্যক বীজের মধ্যে বহুসংখ্যক নূতন বৃক্ষের প্রাণ সঞ্চিত রাখিয়া যায়।

জাতির জীবন রক্ষা ও উহার বিস্তার নৈসর্গিক নিয়মে ঘটিয়া থাকে। বহুবিধ প্রণালীতে ইহা সংঘটিত হয়। ইহার সংঘটন প্রকৃতি দেবীর প্রধান উদ্দেশ্য। অভিব্যক্তি-বাদের হিসাবে জগতের প্রত্যেক স্তরে প্রত্যেক রন্ধ্রে ধীরে ধীরে অভ্যুন্নতি হইতেছে। এই উন্নতি শুধু বাহ্য এবং দৈহিক নহে—ইহা আভ্যন্তরিক এবং নৈতিকও বটে। এই অভ্যুন্নতির নিমিত্ত প্রকৃতি দেবী উন্মাদিনী। যেমন করিয়া হউক উন্নতি চাই। ইহাতে যদি সহস্র সহস্র প্রাণনাশ হয়, ক্ষতি নাই। হিসাব-নিকাশের খতিয়ানে লাভ দেখিতে পাইলেই হইল। নানাবিধ উপায়ে, নানা প্রকার প্রণালীতে এই নৈসর্গিক উদ্দেশ্য সাধিত হইতেছে। তন্মধ্যে জাতির জীবনরক্ষার প্রধান উপায় পুনরুৎপাদন। বিভিন্ন শ্রেণীর প্রাণী ও উদ্ভিদের মধ্যে এই পুনরুৎপাদন প্রথা বিভিন্ন প্রকার। বর্ত্তমান প্রসঙ্গে এই সম্বন্ধে আমরা স্থূলভাবে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

জাতিগত জীবনের হিসাবে সন্তানোৎপাদন আবশ্যক। ইহাতে বংশের রক্ষা ও বিস্তার ঘটিয়া থাকে বটে, কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনের হিসাবে ইহা নিষ্প্রয়োজন। অপিচ, এই কার্য্য ব্যক্তি-জীবনের একটা প্রকাণ্ড অন্তরায়। নিজের জীবন রক্ষা ও ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য জীব সর্ব্বদা ব্যস্ত ও ক্লান্ত। তাহার উপর যখন সন্তানের জীবনরক্ষা ও ক্ষুন্নিবৃত্তির ভার আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন তাহার জীবন দুর্ব্বহ হইয়া পড়ে। সন্তানোৎপাদনে প্রাকৃতিক উদ্দেশ্য সাধিত হয় বটে, কিন্তু তাহাতে জীবের কি আইসে যায়? ব্যক্তি-জীবনের হিসাবে এই কার্য্যে তাহার লাভ নাই, বরং ক্ষতিই আছে।

জীব মরিতে চাহে না—সে তাহার জীবনকে এতই ভালবাসে এবং মরণকে এতই ভয় করে। অতি দুঃখী এবং

দুর্ব্বহ-জীবন-ভারাক্রান্ত ব্যক্তিও বাঁচিতে চায়—আবহমান কাল বাঁচিতে চায়। সমস্ত দিন ধরিয়া কাঠ কাটিয়া শ্রান্ত-ক্লান্ত কাঠুরিয়া জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণ হইয়া পথিপার্শ্বে কাঠের বোঝা নামাইয়া যমকে আহ্বান করিতে লাগিল। জীবনে তাহার আর প্রয়োজন বা আসক্তি নাই, তখন তাহার পক্ষে মরণই শ্রেয়ঃ। আহ্বানে যম আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তৎক্ষণাৎ কাঠুরিয়ার প্রকৃত জ্ঞানোদয় হইল। যম জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমায় ডাকিতেছ কেন?" কাঠুরিয়া উত্তর করিল, "এই কাঠের বোঝাটা আমার মাথায় তুলিয়া দিবার জন্য।" সুতরাং দেখা যাইতেছে, সাময়িক দুঃখ-কষ্টের তাড়নায় কাঠুরিয়ার জীবনের প্রতি যে অনাসক্তি জন্মিয়াছিল, তাহা ক্ষণিক এবং উহা আন্তরিক নহে। অবশ্য পুনঃ পুনঃ দুঃখ-ক্লেশে মানুষের মানসিক শক্তি অবসন্ন হইয়া পড়ে এবং অনেক স্থলে সে আত্মহত্যাও করিয়া থাকে, কিন্তু আত্মহত্যার প্রবৃত্তি মানবের স্বাভাবিক বা সাধারণ প্রবৃত্তি নহে, উহা সাময়িক উত্তেজনাবশতঃ উন্মত্ততার জন্য ঘটিয়া থাকে। আত্মহত্যার কালে আত্মহা ব্যক্তি উন্মত্ত। সাধারণ হিসাবে মানবের চরম আয়ু এক শতাব্দী। স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান এবং আত্মরক্ষার প্রণালীর উন্নতিসাধন করিয়া সে যদি দেড় শত অথবা দুই শত বৎসর বাঁচিতে পারে, ব্যক্তিগত হিসাবে তাহাতেই তাহার পরম লাভ। সমাজ-জীবনের জন্য সন্তান উৎপাদন ও পালনকার্য্যের পরিবর্ত্তে সে যদি উক্তরূপ চেষ্টা করে, তাহা হইলে তাহার আকাঙ্ক্ষা প্রত্যক্ষ-ভাবে চরিতার্থ হয়, কিন্তু সাধারণতঃ দেখা যায় যে, তাহা হয় না। অতি ক্ষুদ্র উদ্ভিদ্ ও প্রাণী হইতে আরম্ভ করিয়া উন্নত মানব পর্য্যন্ত যন্ত্রচালিতের ন্যায় এক অনির্দ্দিষ্ট প্রচ্ছন্ন-শক্তির তাড়নায় প্রকৃতি-নির্দ্দিষ্ট পুনরুৎপাদন প্রথার অনুসরণ করিয়া থাকে এবং সেই কার্য্যে সে বহু কষ্টভোগ ও ব্যক্তি-জীবন ক্ষয় করিতে বাধ্য হয়।

ইহা কেন হয়? জীব প্রকৃতির কলেজে প্রাণবিজ্ঞানের অধ্যাপকের নিকট লেক্‌চার শুনিয়া এবং তাহা হইতে সমাজ-জীবনরক্ষার উপযোগিতা সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিয়া যে এই কার্য্যে ব্রতী হয়, এমন নহে। সন্তানোৎপাদনের ন্যায় ঝঞ্ঝাটে বুদ্ধিমান্ জীবমাত্রই স্বতঃ রাজি হইবে না, ইহা জানিয়াই চতুরা প্রকৃতিদেবী কৌশল অবলম্বন করিয়াছে। কয়েক প্রকার তাড়না, প্রেরণা ও আসক্তির সৃষ্টি করিয়া তদ্দ্বারা জীবকে অভিভূত এবং বশীভূত করিয়া প্রকৃতি তাহার উদ্দেশ্যসাধন করিয়া লইতেছে। উক্ত তাড়না, প্রেরণা ও আসক্তি দুই প্রকার;—মানসিক ও দৈহিক। সন্তানের জন্য বাৎসল্য, করুণা ও ব্যগ্রতা এইগুলি মানসিক, আর ইন্দ্রিয়াসক্তি দৈহিক তাড়না। দৈহিক তাড়না ইন্দ্রিয়লিপ্সা যৌন সঙ্গমের নিমিত্ত জীবকে উত্তেজিত করে। তখন ইন্দ্রিয়তৃপ্তিই জীবের উদ্দেশ্য। ঐ কার্য্যের চরম উদ্দেশ্য যে সন্তানোৎপাদন এবং বংশরক্ষা, এ কথা সে তখন ভাবে না। উপস্থিত প্রবৃত্তির বশেই সে তখন উন্মত্ত হইয়া পড়ে। নতুবা বংশরক্ষার উপযোগিতা-বিষয়ক লেক্‌চর শুনিয়া, বোধ হয়, খুব অল্পসংখ্যক ব্যক্তি সন্তানোৎপাদনে রাজি হইত। বাৎসল্য প্রভৃতি নৈতিক বৃত্তিগুলি যথা-সময়ে আপনি আসিয়া উপস্থিত হয় এবং তদ্দ্বারা জীব সন্তানের প্রতিপালনে নিযুক্ত হইয়া থাকে। এই বৃত্তিগুলি পরার্থপর। ইহাদের সাহায্যে প্রকৃতির মহত্তর উদ্দেশ্য সমাজ-জীবন রক্ষিত হইয়া থাকে।

অতি ক্ষুদ্র হইতে আরম্ভ করিয়া উন্নত শ্রেণীর প্রাণী ও উদ্ভিদের মধ্যে বিভিন্ন প্রণালীতে পুনরুৎপাদনক্রিয়া সাধিত হয়। কোন কোন এক-কোষ উদ্ভিদ্ ও প্রাণী পুনরুৎপাদ-নের সময় উপস্থিত হইলে তাহাদের শরীর লম্বা করিতে থাকে। এইরূপে উহাদের মধ্যদেশ ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হইয়া খণ্ডিত হইয়া পড়ে এবং প্রত্যেক খণ্ড এক একটি স্বতন্ত্র প্রাণিদেহে পরিণত হইয়া একাধিক জীবের উৎপত্তি করে। এই প্রণালী —যাহাতে এক হইতে একাধিকের উৎপত্তি হয়—প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের হিসাবে প্রকৃষ্ট প্রণালী নহে। কারণ, ইহার দ্বারা একাধিক প্রাণীর সৃষ্টি হয় বটে, কিন্তু জীবন-সংগ্রামের সহায়ক শক্তির আদৌ উন্নতি হয় না। কারণ, এ স্থলে সন্তান মাতারই অংশ, সুতরাং সেই একই মাতার এক প্রকার শক্তি ও প্রবৃত্তিরাজির ধারা সন্তানের দেহে প্রবাহিত হইয়া থাকে। উৎকর্ষের নিমিত্ত সে নূতনতর শক্তির সহযোগ লাভ করিতে পারে না। প্রাচীন পরিবেষ্টনীর মধ্যে তাহার জীবনযাত্রা একরূপে চলিয়া যায়। কিন্তু নূতন এবং অপ্রত্যা-শিত অবস্থা উপস্থিত হইলে তাহার আত্মরক্ষা কঠিন হইয়া পড়ে। এরূপ জীবের আত্মরক্ষা ও বংশরক্ষায় যথেষ্ট যোগ্যতা নাই। এই এক হইতে একাধিকের সৃষ্টি পুনরুৎপাদন-প্রথার নিম্নতর স্তর। উন্নত জীবের পক্ষে ইহা উপযোগী নহে।

ক্ষুদ্র অথচ অপেক্ষাকৃত উন্নত কতিপয় শ্রেণীর কীটের পুনরুৎপাদন প্রথায় একটু বৈচিত্র্য দেখা যায়। উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইলে প্রত্যেক দুইটা কীট পরস্পরকে আকৃষ্ট করে এবং নিকটবর্ত্তী হইলে উভয়ে মিলিত হইয়া এক হইয়া যায়। ইহার ফলে পৃথক্ পৃথক্ কীটের বিভিন্ন সংস্কার ও প্রবৃত্তিরাজি একত্র হইয়া অভিনব যুক্ত-প্রবৃত্তির সৃষ্টি হয়। এইরূপ সংমিলনের নাম conjugation বা সঙ্গম। সঙ্গমের পর কীটগুলি কিছুকাল যাপন করে এবং উপযুক্ত সময়ে দুই বা ততোধিক খণ্ডে বিভক্ত হইয়া একাধিক প্রাণী উৎপন্ন করিয়া থাকে। এই প্রাণীদের মধ্যে মাতৃ-কীটের যুক্ত প্রবৃত্তিরাজি বর্ত্তমান; সুতরাং ইহা জীবনসংগ্রামে যোগ্যতর এবং এই যোগ্যতার উপর জাতিজীবন নির্ভর করে। বিভিন্ন শক্তির সমবায়ে যে শক্তির সৃষ্টি হয়, তাহা উৎকৃষ্ট শক্তি। উৎকর্ষসাধন প্রকৃতির সর্ব্বপ্রধান উদ্দেশ্য। ব্যক্তি-জীবন ও সমাজ-জীবনরক্ষার অনুকূল প্রবৃত্তির উৎকর্ষ-সাধনের উদ্দেশ্যে এই সংমিশ্রণ প্রথা প্রচলিত। ইহার দ্বারা নূতন এবং যোগ্যতর জীবনের সৃষ্টি হইয়া থাকে। এই উদ্দেশ্যেই আমাদের সমাজে সমান গোত্রে বিবাহ নিষিদ্ধ।

উচ্চ শ্রেণীর বহুকোষ উদ্ভিদ্ ও প্রাণিদেহ প্রণিধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ইহাদের দেহে এক এক শ্রেণীর কোষ জীবদেহের পরিপোষণ, আত্মরক্ষা, পুনরুৎপাদন প্রভৃতি জীবনধারণ ও বংশরক্ষার অনুকূল কার্য্যে পৃথক্‌ভাবে নিযুক্ত। তন্মধ্যে যে কোষগুলি পুনরুৎপাদন কার্য্যে নিযুক্ত, তাহা-দিগকে মোটামুটি দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। এক শ্রেণীর নাম ডিম্বকোষ, গর্ভকোষ বা মাতৃকোষ, অপর শ্রেণীর নাম পুং-কোষ। গর্ভকোষ ও পুং-কোষের সম্মিলনে সন্তান উৎপন্ন হয়। কোনও কোনও জীব-শরীরে এই উভয় কোষই বিদ্যমান। সাধারণতঃ কোনও কোনও উচ্চশ্রেণীর জীবদেহে উক্ত উভয় প্রকার কোষের মধ্যে এক প্রকার কোষ পূর্ণ বিকশিত এবং অপর কোষ একেবারে লুপ্ত। যাহাদের দেহে পুং-কোষ বিকশিত, তাহারা পুরুষ এবং তাহাদের দেহে গর্ভকোষ লুপ্ত। পক্ষান্তরে, যাহাদের গর্ভ-কোষ বিকশিত, তাহারা স্ত্রী এবং তাহাদের দেহে পুং-কোষ লুপ্ত থাকে। কিন্তু পুরুষ হউক অথবা স্ত্রী হউক, অণুবীক্ষ-ণের সাহায্যে প্রত্যেকের দেহে লুপ্ত কোষের সত্তা প্রমাণিত করিতে পারা যায়।

সাধারণতঃ দেখা যায়, পুং-কোষ অপেক্ষা গর্ভকোষ আকারে বৃহত্তর; কারণ, উহার মধ্যে ভবিষ্য ভ্রূণের প্রাণ-ধারণ ও বৃদ্ধির নিমিত্ত আহার্য্য অথবা পরিপোষণের উপ-যোগী পদার্থ সঞ্চিত থাকে। প্রাণী অথবা উদ্ভিদ যখন প্রথম জন্মগ্রহণ করে, তখন সে অত্যন্ত দুর্ব্বল। এত দুর্ব্বল যে, সে জীবন-সংগ্রামে যোগদান করিতে অসমর্থ। পরের মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইয়া আহার করিবার ক্ষমতা তখনও সে লাভ করিতে পারে না। সেই কারণে জীবনরক্ষার নিমিত্ত সে তখন মাতৃবদান্যতার উপর নির্ভর করিয়া থাকে। যত দিন সে জীবন-সংগ্রামে সম্পূর্ণ উপযুক্ত না হয়, তত দিন পর্য্যন্ত সে মাতৃকোষ-সঞ্চিত পদার্থের দ্বারা আত্মপুষ্টি সাধন করিয়া থাকে। শুধু আয়তনে বৃহত্তর নহে, গর্ভকোষের স্বভাব স্থির। পক্ষান্তরে, ক্ষুদ্রতর পুং-কোষের স্বভাব অত্যন্ত চঞ্চল। গর্ভকোষের সহিত সঙ্গত হইবার নিমিত্ত ইহারা নিয়ত সচল। বহুবিধ জলচর প্রাণীর জীবনেতিহাস আলো-চনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, পুং-কোষ পুরুষের দেহ হইতে জলমধ্যে পরিত্যক্ত হইলে, উহা গর্ভকোষের সন্ধানে নিয়ত তীব্রবেগে ছুটাছুটি করে। কিন্তু গর্ভকোষ কখন সেরূপ করে না। পুষ্পশালী বৃক্ষে সাধারণতঃ দুই প্রকার ফুল ফুটে—পুং-পুষ্প ও স্ত্রীপুষ্প। পুং-পুষ্পের পুং-কেশরে পরাগ থাকে এবং সেই পরাগে পুং-কোষ বিদ্যমান। স্ত্রী-পুষ্পের গর্ভ-কেশরের মূলদেশে গর্ভ-কোষ থাকে। আবার এমন অনেক ফুল আছে, যাহাতে পুং-কেশর ও গর্ভ-কেশর উভয়ই বর্ত্তমান। পুং-কোষ এবং গর্ভ-কোষ একই পুষ্পে থাক অথবা স্বতন্ত্র পুষ্পে থাক, ফল এবং বীজের উৎপত্তি-সাধনের নিমিত্ত উহাদের সম্মিলনের প্রয়ো-জন। গর্ভ-কোষ নিয়ত স্থির, অচঞ্চল। স্থান ত্যাগ করিয়া উহা কোথাও যায় না বা উহার কোথাও যাইবার প্রয়োজন হয় না। যে কোন প্রকারে হউক, পুং-কোষ গর্ভকোষের সন্নিধানে উপস্থিত হইলে সম্মিলন ঘটে এবং ঐ যুক্ত-কোষ গর্ভকোষের স্থানেই বিকশিত হইয়া ভ্রূণ অথবা বীজে পরিণত হইয়া থাকে। বায়ুপ্রবাহের দ্বারা পুং-কোষস্থ পরাগরেণু গর্ভকোষে নীত হয়। মধুলুব্ধ মক্ষিকা ও ভ্রমরগণ পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে পরিভ্রমণ করিয়া থাকে; তাহাদের পক্ষ-পুট ও হস্ত-পদাদিতে সংলগ্ন হইয়া পুং-কোষস্থ পরাগ গর্ভকোষে উপস্থিত হয় এবং এইরূপে পুনরুৎপাদন-কার্য্য সংসাধিত হইয়া থাকে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, পুং-কোষের ধর্ম্ম চাঞ্চল্য এবং গর্ভকোষের ধর্ম্ম স্থাণুত্ব। এই উভয় কোষের প্রকৃতি তাহাদের আধারীভূত প্রাণী ও উদ্ভিদের শরীরে প্রতিফলিত হইয়া তাহাদের স্বভাবকেও নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে। পুরুষরাই সাধারণতঃ স্ত্রীজাতির অনুসরণ অনুসন্ধান করে এবং প্রণয়োদ্দীপক ললিত সবিভ্রম বিলাস, বর্ণগরিমা, সুগন্ধ, সুমধুর প্রণয়-সম্ভাষ প্রভৃতি দ্বারা তাহাদিগকে আকৃষ্ট ও মুগ্ধ করিয়া থাকে। উজ্জলবর্ণ পুষ্পরাজি তাহাদের বর্ণবৈচিত্র্যের সাহায্যে অলিগণকে আকৃষ্ট করে। রূপহীন অনেক পুষ্প সাধারণতঃ সুগন্ধ হয়; সেই সুগন্ধে মত্ত হইয়া তাহারা তৎসন্নিধানে উপনীত হয়। অলিগণের পক্ষসংলগ্ন পরাগ গর্ভকোষে নীত হয় এবং সেই উপায়ে বৃক্ষের বংশরক্ষা হয়। পুং-কোকিল তাহার সুমধুর পঞ্চম স্বরে কোকিলার মনোরঞ্জন করে। শিখী তাহার ইন্দ্রধনুদ্যুতি কলাপ বিকীর্ণ ও আনর্ত্তিত করিয়া শিখিনীর অন্তরে সুরতাভিলাষ জাগরিত করিয়া তুলে। বর্ষাগমে প্রমত্ত দর্দ্দুর তাহার ঐকতান-মাধুর্য্যে, নীরব নিশীথে ঝিল্লী তাহার অবিশ্রান্ত সঙ্গীতে এবং তামসী রজনীতে খদ্যোত তাহার অপূর্ব্ব মাণিক্যদ্যুতিতে কান্তাহৃদয়ে সঙ্গমেচ্ছার সৃষ্টি করিয়া থাকে। এমন কি, শ্রীভগবান্ বিষ্ণুকেও এক সময়ে প্রকৃতির এই নিয়ম পালন করিতে হইয়াছিল। "বর্হেণেব স্ফুরিতরুচিনা গোপবেশস্য বিষ্ণোঃ"—সরমসঙ্কুচিতা ননদী-বিদ্রূপ-সন্ত্রস্তা গোপাঙ্গনার হৃদয়ে আকুলতা উৎপাদন করিবার নিমিত্ত শ্রীহরিকে গোপবেশ ধারণ করিতে হইয়াছিল। তিনি শিখিপুচ্ছশোভিত সুচারু আনন ঈষৎ বক্র করিয়া অপূর্ব্ব বঙ্কিমঠামে বেণুরন্ধ্রে ফুৎকার দিয়া যে অনৈসর্গিক সুরলহরী বিকীর্ণ করিয়াছিলেন, তাহাতে মুগ্ধ চরাচর সেই সুরস্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছিল—অবলা গোপবালার ত কথাই নাই। তাহারা তখন সংসার ভুলিয়া গেল, শাশুড়ী-ননদের ভয় হৃদয় হইতে তিরোহিত হইল, এক সুরে এক ভাবে এক দিকে তাহাদের মন আকৃষ্ট হইতে লাগিল, হিতাহিতবোধ লুপ্ত হইল, প্রকৃতির জয় হইল। স্নানার্থ আকণ্ঠ-নিমজ্জিতা সুন্দরী সেই ভাবে রহিল। স্নানার্থিনী বিগলদ্বসনা গোপিকা সলিলমধ্যে অবতরণের পূর্ব্বে কুন্তলদাম কবরীমুক্ত করিতেছিল—সে সেই ভাবে রহিল। কুম্ভপূরণকালে সলিলোপরি অবনতাঙ্গী গোপবালা সেই ভাবেই রহিল—কলসী কক্ষে তুলিয়া লইতে ভুলিয়া গেল। অভ্যঞ্জন সোপানপীঠে পড়িয়া রহিল—কেহ তাহার সদ্ব্যবহার করিল না। স্নানান্তে সিক্তবসনা, মুক্তকেশী, কুম্ভকক্ষা যুবতী স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিল, এমন সময় সেই শ্রীমুখচুম্বিত বেণুদণ্ড অপূর্ব্ব সুরতরঙ্গ নিঃসৃত করিল; যুবতী নিশ্চল নিস্পন্দ—সে পথেই দাঁড়াইয়া রহিল, হয় ত পূর্ণকুম্ভ কক্ষচ্যুত হইয়া ধূলায় পড়িয়া গেল; কিন্তু তাহার ভ্রূক্ষেপ নাই। সে একদৃষ্টে সেই অমূর্ত্ত সুরের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার আকুল হৃদয় বুঝি বলিতেছিল—

"আমায় বাঁশীতে ডেকেছে কে!
তারে ব'লে আসি তোমার বাঁশী
আমার প্রাণে বেজেছে।"

শ্রীভগবান্ দেখিলেন, গোপবধূগণের এই ভাবান্তর তাঁহার প্রতি প্রত্যাদেশ নহে, ইহা সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ। তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ হইল। প্রকৃতি জয়লাভ করিল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পুরুষের স্বভাব চাঞ্চল্য, আর স্ত্রীজাতির স্বভাব স্থৈর্য্য। উন্নত শ্রেণীর জীব প্রকৃতি-নির্দ্দিষ্ট পুনরুৎপাদন প্রথার বশবর্ত্তী হইয়া যৌন-নির্ব্বাচনে নিযুক্ত হয়। এই কার্য্যের উপায় ও পন্থা নানাবিধ। উদ্ভিদ্ জগতে পুষ্পের বর্ণবৈচিত্র্য, মধু, সুগন্ধ প্রভৃতি এই কার্য্যে সহায়তা করিয়া থাকে। ইতর জীবরাও তাহাদের বর্ণবৈচিত্র্য, সৌন্দর্য্যবৃদ্ধি, সুকণ্ঠ, নানাবিধ চঞ্চল ভাবভঙ্গী এবং নানাবিধ শক্তি প্রভৃতি দ্বারা যৌন-নির্ব্বাচনে সমর্থ হয়। পাশব শক্তির সাহায্যে কিরূপে যৌন-নির্ব্বাচন সাধিত হয়, পণ্ডিত পাইক্রাফট্-বর্ণিত উত্তর-মহাসাগরবাসী সীল নামক প্রাণীর বিবরণ হইতে তাহার একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ পাওয়া যায়।

সীল জাতির যৌন-নির্ব্বাচনের একটা নির্দ্দিষ্ট কাল আছে। পূর্ণবয়স্ক বলবান্ পুরুষ-সীল সমুদ্রমধ্যে বাস করে। যৌনসঙ্গমকালের প্রায় এক মাস পূর্ব্বে সে সাগর-তীরবর্ত্তী শৈলে গিয়া উপস্থিত হয় এবং স্ত্রী-সীলের জন্য অপেক্ষা করিতে থাকে। যথাকালে স্ত্রী-সীলরা যখন তথায় আসিয়া উপস্থিত হয়, পুরুষটি তখন তাহাদিগকে পর্ব্বতের উপর তুলিয়া লয় এবং নূতন আর এক দলের জন্য অপেক্ষা করে। এইরূপে সে অনেকগুলি স্ত্রী-সীলকে ঘিরিয়া বসিয়া থাকে। সময় সময় স্ত্রীগণ সংখ্যায় অত্যধিক হইয়া পড়ে; কিন্তু তাহাতে তাহার ভ্রূক্ষেপ নাই। অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল পুরুষ-সীলরা সেই পাহাড়ে উঠিতে সময় সময় চেষ্টা করে। কিন্তু

পূর্ব্ব-বিজেতার আস্ফালনে তাহাদিগকে নিরাশ হইয়া ফিরিতে হয়। অনেক সময় হয় ত কোন তুল্যবলশালী পুরুষ-সীল তথায় আসিয়া দুই তিনটি স্ত্রীসীলকে লইয়া পলায়ন করিতে থাকে। তখন উভয় সীলের মধ্যে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ বাধিয়া যায়। কখন কখন তাহারা একটি স্ত্রী-সীলকে ধরিয়া উভয় দিক হইতে টানাটানি আরম্ভ করে। ফলে সেই স্ত্রী-সীলের মৃত্যু ঘটে। দলস্থ কোন স্ত্রী পলায়ন করিবার প্রয়াস করিলে অথবা তদুদ্দেশ্যে কোনরূপ চাঞ্চল্য প্রকাশ করিলে পুরুষটি গর্জ্জন করিয়া তাহাকে তিরস্কার করে। তিরস্কারে শাসিত না হইলে সে তাহার গলদেশে ভয়ঙ্করভাবে দংশন করিয়া তাহাকে রক্তাক্তদেহে ভূপাতিত করিয়া থাকে। এইরূপে প্রত্যেক বৎসর চঞ্চল স্বভাবের নিরাকরণ এবং স্ত্রী-সীলের স্বভাবসিদ্ধ শান্ত প্রকৃতির উৎকর্ষসাধন হয়। প্রায় তিন মাস ধরিয়া এই ব্যাপার চলিতে থাকে। এই সময়ের মধ্যে পুরুষ-সীল সর্ব্বদাই ব্যস্ত ও সতর্ক। সে প্রায় অনাহারেই তিন মাসকাল যাপন করিয়া জীর্ণ-শীর্ণ দুর্ব্বল দেহে সমুদ্র-মধ্যে প্রত্যাগমন করে।

পাশব শক্তির সাহায্যে যৌন-নির্ব্বাচন অনেক বানর-সমাজেও দেখিতে পাওয়া যায়। বানরসমাজে বীর হনুমান বলিয়া পরিচিত একটা পুরুষ-দলপতি থাকে। দলের অপর বানরগণ কেবল স্ত্রী। স্বীয় দৈহিক শক্তির প্রভাবে ঐ বীর হনুমান অপর কোন পুরুষকে দলের মধ্যে প্রবেশ করিতে দেয় না। দলস্থ কোন স্ত্রী যদি পুং-সন্তান প্রসব করে, দলপতি তৎক্ষণাৎ সেই সন্তানকে বধ করিয়া ভবিষ্যৎ প্রতিযোগিতার মূলোচ্ছেদ করিয়া থাকে। দলপতি বৃদ্ধ হইয়া দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে অন্য স্থান হইতে পুরুষ হনুমান আসিয়া তাহাকে বধ করিয়া ফেলে এবং দলের অধিনায়কত্ব অধিকার করিয়া লয়।

মানবজাতি বানরের বিজ্ঞানসম্মত বংশধর। আদিম-কালের অসভ্য মানব পশুর সহিত বনে বাস করিত এবং পশুর ন্যায় বনজাত উদ্ভিদ্ ও প্রাণিমাংস ভক্ষণ করিয়া জীবনধারণ করিত। সভ্যতার আলোক তখন তাহাদের মধ্যে প্রবেশ করে নাই। তখনকার মানব-চরিত্রে মানবত্ব অপেক্ষা বানরত্বের প্রভাব অধিকতর ছিল। প্রজ্ঞাশালী জীব হইলেও সে কালের অপরিণত মানুষের জীবনযাত্রা প্রধানতঃ পাশবিক সংস্কারের সাহায্যে অতিবাহিত হইত। তাহার প্রজ্ঞার পরিমাণ খুব সামান্য। সেই অর্দ্ধকপি-মানব-সমাজে বানরের ন্যায় পাশবিক শক্তির সাহায্যে যৌন-নির্ব্বাচন সংসাধিত হইত। এতদ্ব্যতীত অনেক স্তন্যপায়ী জীব, ভেক, কীটপতঙ্গ প্রভৃতি শ্রেণীর মধ্যে উক্ত প্রথা প্রচলিত আছে।

সভ্য য়ুরোপীয়দের সমাজে সে দিন পর্য্যন্ত duel প্রথার প্রচলন ছিল। একই স্ত্রীর প্রণয়াভিলাষী দুই জন পুরুষের মধ্যে যোগ্যতা duel যুদ্ধ দ্বারা প্রমাণিত হইত। সভ্য হিন্দুগণের স্মৃতিশাস্ত্রে "ব্রাহ্মং দৈবং প্রাজাপত্যং আর্ষং আসুর-রাক্ষসম্। গান্ধর্ব্বঞ্চ পিশাচঞ্চ" এই অষ্টবিধ বিবাহ-প্রথার ব্যবস্থা আছে। তন্মধ্যে সম্প্রতি ব্রাহ্ম ও আসুরপ্রথা প্রচলিত, কিন্তু এমন এক কাল ছিল, যখন হিন্দুসমাজে রাক্ষস প্রথায় অর্থাৎ দৈহিক শক্তির সাহায্যে স্ত্রীলাভ শাস্ত্রসঙ্গত ছিল।

যৌন-নির্ব্বাচনের সাহায্যে প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের উদ্দেশ্য অনেক পরিমাণে সংসাধিত হইয়া থাকে। বিভিন্ন জীবের জীবনযাত্রার রীতি ও তদর্থে প্রয়োজনীয় শক্তি বিভিন্ন প্রকার। যে সকল শ্রেণীর জীব পাশব শক্তির সাহায্যে যৌন-নির্ব্বাচন সাধন করে, তাহাদের পুরুষরা স্বভাবতঃ স্ত্রীজাতি অপেক্ষা বলবত্তর এবং দংষ্ট্রানখরাদি-প্রহরণশালী। ইহা প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের সহায়ক। যে পুরুষ সর্ব্বাপেক্ষা চতুর, দ্রুতগামী, সাহসী, বলবান্ ও যুদ্ধক্ষম, সেই যুদ্ধে জয় লাভ করে, দুর্ব্বলকে বহিষ্কৃত করিয়া দেয় অথবা বধ করিয়া ফেলে, এবং স্বকীয় প্রকৃষ্ট শক্তি সন্তানের চরিত্রে নিহিত করিয়া থাকে। এইরূপে যৌন-নির্ব্বাচনের সাহায্যে প্রত্যেক জীব স্ব স্ব জীবনযাত্রার অনুকূল উৎকৃষ্ট শক্তি অর্জ্জন করিয়া অভ্যুন্নতি লাভ করিতেছে। ক্ষিপ্রগতি মৃগ-জীবনের উপযোগী, মৃগ তাহাই লাভ করিতেছে। ব্যাঘ্রাদি হিংস্র প্রাণী সুতীক্ষ্ণ নখদংষ্ট্রা ও চতুরতা লাভ করিতেছে। উড়িবার শক্তি, নীড়নির্ম্মাণে বিচক্ষণতা এবং আহারান্বেষণে কুশলতা পক্ষিজীবনের উপযোগী, সে তাহাতেই পটুত্ব লাভ করিতেছে। মানুষ প্রজ্ঞাশালী জীব, জীবনসংগ্রামে প্রজ্ঞাই তাহার প্রধান সহায়। বংশানুক্রমে মানবের প্রজ্ঞাশক্তির বিকাশ ও উন্নতি হইতেছে। এইরূপে সমগ্র জগৎ অভিব্যক্তির পন্থায় উৎকর্ষের দিকে ধাবিত। অভ্যুন্নতি প্রকৃতির চরম উদ্দেশ্য।

সভ্য মানব প্রজ্ঞাজীবী। তাহার চরিত্রে ইতর জীবের ন্যায় সংস্কারের প্রাধান্য নাই। প্রজ্ঞাবুদ্ধির বলে সে সকল

প্রাণীর উপর প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। প্রজ্ঞা কেবলমাত্র একটা মৌলিক বুদ্ধি নহে। ইহা জীবের জীবনযাত্রার উপযোগী বহুবিধ বুদ্ধির সমষ্টি। সেই বহুবিধ এবং বহু-সংখ্যক বুদ্ধিবৃত্তিগুলিকে ব্যষ্টিভাবে না ধরিয়া সমষ্টিভাবে এক কথায় প্রজ্ঞা নামে অভিহিত করা হয়। প্রজ্ঞার উপাদানীভূত বুদ্ধিগুলির মধ্যে একটির নাম সৌন্দর্য্যবুদ্ধি। সৌন্দর্য্যের অর্থ কি? আমরা কাহাকে সুন্দর এবং কাহা-কেই বা কুৎসিত বলিয়া থাকি? সুন্দরের লক্ষণ কি? আমাদের ইন্দ্রিয়গণের সাহায্যে আমরা রূপরস-গন্ধাদির সত্তা অনুভব করিয়া থাকি। রূপ-রস-গন্ধাদির মধ্যে যাহা আমাদের ইন্দ্রিয় ও মনকে তৃপ্ত করে, তুষ্ট করে, যাহা আমা-দের জীবনযাত্রার সুখকর ও মঙ্গলকর, তাহাই সুন্দর। বর্ণ-গৌরবে ভানূদয় সুন্দর—ইহা রূপজ সৌন্দর্য্য। শর্করাদির মিষ্ট রস রসনেন্দ্রিয়ের তৃপ্তিজনক—ইহা সুন্দর, এই সৌন্দর্য্য রসজ। শেফালি-মল্লিকার গন্ধ আমাদের নাসার তৃপ্তি-সাধন করে—ইহা সুন্দর, ইহা গন্ধজ সৌন্দর্য্য। বীণা-নিক্কণ সুন্দর—কারণ, তজ্জনিত সুরধারা আমাদের শ্রবণেন্দ্রিয়ের তৃপ্তিসাধক। কোমলাঙ্গী ভামিনীর আলিঙ্গন সুন্দর—কোমল স্পর্শে হর্ষ উপস্থিত হয়। শ্রীভগবান্ সুন্দর—তাঁহার সৌন্দর্য্যে ভক্তের অন্তরিন্দ্রিয় উল্লসিত হইয়া উঠে। আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি সৌন্দর্য্যবোধের দ্বারস্বরূপ। সৌন্দর্য্যের পরিধি ইন্দ্রিয়ের সংখ্যার উপর নির্ভর করিয়া থাকে।

সৌন্দর্য্য-বুদ্ধি প্রজ্ঞাশালীদের মধ্যে এত প্রবল যে, অনেক স্থলে মনুষ্য, এমন কি, দেবতাকেও তদ্দ্বারা অভিভূত হইতে হয়। অপহৃতপত্নী রামচন্দ্র জায়ার অন্বেষণে পম্পা সরোবর-তীরে উপস্থিত হইলেন। তথায় স্তনাভিরাম-স্তবকাভিনম্রা তটাশোকলতার সৌন্দর্য্যরাশি দাশরথির হৃদয়ে কান্তালিঙ্গনেচ্ছা জাগরিত করিয়া তুলিয়াছিল। তাই তিনি ভ্রান্তভাবে উহাকে আলিঙ্গন করিতে প্রয়াস পাইয়া-ছিলেন। "পর্য্যাপ্ত-পুষ্পস্তবকাবনম্রা সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেব" গিরিরাজনন্দিনীর মোহিনী মূর্ত্তি বীরাসনে অধ্যাসীন সুগভীর ধ্যাননিরত যোগেন্দ্রেরও যোগাসনকে বিচলিত করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

মানবচরিত্রে প্রজ্ঞাবুদ্ধি যথেষ্ট পরিমাণে বিকাশলাভ করে বটে, কিন্তু তাই বলিয়া উহা মানবজাতির একচেটিয়া অধিকার নহে। মনুষ্যেতর নানা জীবের চরিত্রেও অল্পবিস্তর প্রজ্ঞাবুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। অনেক ইতর জীবের প্রজ্ঞাবুদ্ধি আছে বলিয়াই বঙ্কিমচন্দ্রের কমলাকান্ত উদরান্নের নিমিত্ত কলুর গৃহে সমুপস্থিত কুকুর ও বৃষের বিভিন্ন কার্য্য-প্রণালী দর্শন করিয়া পলিটিক্সের ক্ষেত্রে বিসমার্ক ও উল্‌সী অনুসৃত দুইটা পন্থা নির্ণয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সৌন্দর্য্যবুদ্ধি প্রজ্ঞার অঙ্গীভূত। সুতরাং প্রজ্ঞাশালী ইতর জীবেরও সৌন্দর্য্যবুদ্ধি আছে। এই সকল জীব তাহাদের সৌন্দর্য্যবুদ্ধির সাহায্যে যৌন-নির্ব্বাচনসাধন করিয়া থাকে। সেই জন্য বর্ষাগমে কান্দর্প্য প্রভাবে উত্তেজিত হইয়া "বিকীর্ণ-বিস্তীর্ণ-কলাপশোভিতং সসম্ভ্রমালিঙ্গনচুম্বনাকুলং প্রবৃত্তনৃত্যং বর্হিণাম্ কুলম্" কান্তাহৃদয়ে সৌন্দর্য্যবুদ্ধি জাগরিত করিয়া তুলে। কোকিল যখন তাহার সুমধুর স্বরলহরী বিকীর্ণ করিতে থাকে, তখন কোকিলার অন্তরে কান্তসমাগমেচ্ছা স্বতঃই উদ্‌বুদ্ধ হইয়া উঠে। জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে সুকণ্ঠ পাপিয়া নির্জ্জন তরুশাখায় বসিয়া যে গান করে, তাহার সুরতরঙ্গে আকাশ বাতাস আকুল হইয়া উঠে, স্ত্রী-পাপিয়ার হৃদয়ের ত কথাই নাই।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, স্থৈর্য্য স্ত্রীজাতির ধর্ম্ম। সাধারণতঃ দেখা যায়, অচঞ্চলস্বভাবা স্ত্রীজাতির সৌন্দর্য্যবুদ্ধিতে সাড়া দিবার নিমিত্ত যে প্রয়াস, তাহা চঞ্চলপ্রকৃতি পুরুষের। পুরুষ তাহার সুররূপাদির প্রভাবে কান্তাহৃদয়ে আকুল বাসনা-সৃজনে চেষ্টা করে। কিন্তু সে কৃতকার্য্য হইল কি না, তাহা স্ত্রীজাতির সামান্য দুই একটা চঞ্চল লক্ষণে প্রকাশ পাইয়া থাকে। "স্ত্রীণামাদ্যং প্রণয়বচনং বিভ্রমো হি প্রিয়েষু"—প্রিয়ের নিকট বিভ্রমবিলাস প্রদর্শনই রমণীদের প্রথম প্রেম-সূচক বাক্যস্বরূপ।

মানবজাতির স্ত্রী ও পুরুষ তুল্যভাবে প্রজ্ঞাশালী ও সৌন্দর্য্যবুদ্ধিতে বুদ্ধিমান্। এ স্থলে যৌন-নির্ব্বাচনের উদ্দেশ্যে উভয়েই পরস্পরের অন্তরকে আকৃষ্ট করিবার জন্য চেষ্টা করে। পুরুষ এবং স্ত্রী উভয়েই প্রসাধনে নিযুক্ত হয়। স্ত্রী যেমন পুরুষকে সুন্দর দেখিতে চায়, পুরুষও তেমনই বাসনা করে যে, তাহার প্রণয়িনী সৌন্দর্য্যশালিনী হউক।

শ্রীউমাপতি বাজপেয়ী।

রামপ্রসাদ ও প্রসাদী সঙ্গীত

৫

রামপ্রসাদ সম্বন্ধে এরূপ অপবাদের কথাও আমরা শুনিয়াছি যে. তিনি "বৈষ্ণব-বিদ্বেষী ছিলেন।" 'কৃষ্ণ-কীর্ত্তন' লিখিয়া 'শাক্ত' কৈলাস বাবুর সার্টিফিকেট যেমন তিনি খোয়াইয়াছেন, তেমনই আবার 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য'-রচয়িতা শ্রীযুত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের নিকট ঐ 'বিদ্বেষী' বদনামের ভাগীও হইয়াছেন। প্রমাণস্বরূপ দীনেশ বাবু তাঁহার 'বিদ্যাসুন্দর' হইতে তথাকথিত বিদ্বেষের কিছু নমুনাও উদ্ধৃত করিয়াছেন, যথা—

"থাসা চীরা বহির্ব্বাস, রাঙ্গা চীরা মাথে,
চিকণ গুধড়ী গায়, বাঁকা কোৎকা হাতে।
মুঞ্জ গুঞ্জ ছড়া গলে, ঠাঁই ঠাঁই ছাব,
দুই ভাই ভজে তারা সৃষ্টিছাড়া ভাব।
পৃষ্ঠদেশে গ্রন্থ ঝোলে থান সাত আট.
ভেকা লোকে ভুলাইতে ভাল জানে ঠাট।
ভুগলামি ভাবে ভাব জন্মে থেকে থেকে
বীরভদ্র অদ্বৈত বিষম উঠে ডেকে।"...

এই বর্ণনাটি কোটালের নিয়োজিত সেই সকল ছদ্মবেশী চরের, যাহারা চোর অন্বেষণের অজুহাতে নগরময় বিষম উৎপাত করিয়া বেড়াইতেছে। ইহার মধ্যে হরকরা, পাটনি, দাতা, ব্রজবাসী, অবধৌত, ব্রহ্মচারী প্রভৃতির ভেকধারীরাও আছে। তথাপি উদ্ধৃত বর্ণনার মূলে কবির বিদ্রূপ কাহাদের লক্ষ্য করিয়াছে, তাহা তাঁহার নিজের উক্তিতেই প্রকাশ,—

"গৌড়রাজ্যে গোঁড়াগুলা চলে যে যে ঠাটে,
সেরূপে ভ্রময়ে কত হাটে ঘাটে মাঠে।"...

গোঁড়ামিকে পরিহাস করা আর "বৈষ্ণব-বিদ্বেষ" অবশ্যই এক কথা নহে। 'বোষ্টোমি আদপ-কায়দা' দুরস্ত হইলেই বিষ্ণু-উপাসক বা "বৈষ্ণব" হওয়া যায় না, সুতরাং রামপ্রসাদের ঐ বাহ্য ভড়ং সম্বন্ধীয় রসিকতাকে দীনেশ বাবুর উদাহরণ সমেত ব্যাখ্যা সত্ত্বেও 'বৈষ্ণব-বিদ্বেষ' বলিয়া গ্রাহ্য করা চলিতেছে না। বিশেষতঃ, যখন রামপ্রসাদের কণ্ঠে আমরা শুনি,—

"ও মন, তোর ভ্রম গেল না।
পেয়ে শক্তিতত্ত্ব হলি মত্ত,
হরিহর তোর এক হলো না॥
বৃন্দাবন আর কাশীধামের
মূল-কথা মনে বোঝ না—
কেবল ভবচক্রে বেড়াও ঘুরে
ক'রে আত্মপ্রতারণা॥
অসি বাঁশীর মর্ম্ম বুঝে (তোমার)
কর্ম্ম করা আর হ'ল না।
যমুনা আর জাহ্নবীকে
এক ভাবে মনে ভাব না॥
প্রসাদ বলে, গণ্ডগোলে
এই যে কপট উপাসনা।
(তুমি) শ্যাম শ্যামাকে প্রভেদ কর,
চক্ষু থাকৃতে হ'লে কাণা।"

তখন বুঝি যে, বৈষ্ণব-বিদ্বেষ ত দূরের কথা, চিরপ্রসিদ্ধ 'শাক্ত-বৈষ্ণব'-দ্বন্দ্বের সহজ সমন্বয় -পথই তাঁহার অন্তরের মধ্যে খুলিয়া গিয়াছিল। 'বঙ্গদর্শনে'র সমসাময়িক "প্রচার" নামক মাসিকপত্রে 'বেদের ঈশ্বরবাদ' শীর্ষক প্রবন্ধে দেখা যায় যে, রামপ্রসাদের এই বৈশিষ্ট্যটি ঐ প্রবন্ধকারের নজরে পড়িয়াছে। তিনি বলিয়াছেন,—"আমরা ঋগ্বেদ হইতেই আরম্ভ করি, আর রামপ্রসাদের শ্যামা-বিষয় হইতেই আরম্ভ করি, সেই কৃষ্ণোক্ত ধর্ম্মেই উপস্থিত হইব। রামপ্রসাদ কালী নামে পরব্রহ্মেরই উপাসনা করিতেন,—

"প্রসাদ বলে ভক্তি মুক্তি উভয়কে মাথে ধরেছি,
এবার শ্যামার নাম ব্রহ্ম জেনে ধর্ম্মকর্ম্ম সব ছেড়েছি।"

আমরা পূর্ব্বেও দেখিয়াছি যে, রামপ্রসাদের গানে সেই Pantheistic ভগবৎধারণা বা "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"বাদ প্রকাশ পাইয়াছে, যাহাতে আহারে, বিহারে, শয়নে, নিদ্রায়, শ্রবণে ও মননে সংসারকে নিত্য ব্রহ্মের সম্মুখে রাখিবার জন্য তিনি মনের সহিত বোঝাপড়া আরম্ভ করিয়াছেন। আমাদের উদ্ধৃত উদাহরণটি ছাড়া আরও অনেক গানে এই ভাব-সাধনার বিশেষ ধারাটি পুনঃ পুনঃ দেখা দিলেও, এই "Living and moving in God"এর বিবাদী ভাবও যে অনেক পাওয়া যায়, তাহাও আমরা দেখাইয়া আসিয়াছি। প্রথমটিকে লক্ষ্য ও দ্বিতীয়টিকে লক্ষ্যসাধনের উপায় হিসাবে দেখিতে পারিলে তাঁহার ভাব-সাধনার কার্য্যকারণ সম্বন্ধ আমরা ঠিক মতই বুঝিব এবং ঐ বৈষম্যের একটি অর্থও পাইব। অতঃপর পদাবলী অধ্যয়ন এইখানেই শেষ করিয়া রামপ্রসাদের অন্য কয়েকটি বিশেষত্বের কথা পাড়িব।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'বিসর্জ্জন' নামক নাট্য-কাব্যে 'দেবীর প্রীত্যর্থে বলিদান' সম্বন্ধে যে মর্ম্মস্পর্শী চিত্রটি আঁকিয়া রাখিয়াছেন, তাহার সহিত অনেকেই পরিচিত। কিন্তু শাক্ত-পরিবারের চিরাচরিত কর্ম্মানুষ্ঠানের ভিতর জন্মগ্রহণ করিয়াও রামপ্রসাদ তাঁহার স্বতঃসিদ্ধ স্বভাবের ভিতর হইতেই এই প্রথাগত মেষ-মহিষাদি বলিদানের বিরুদ্ধবাদ যে কত সুন্দর করিয়া সংক্ষেপে প্রচার করিয়াছিলেন, নিম্নোদ্ধৃত ছত্র-কতিপয়ই তাহার সাক্ষী,—

"জগতকে সাজাচ্ছেন যে মা,
দিয়ে কত রত্ন সোনা,
ওরে, কোন্ লাজে সাজাতে চাস্ তায়
দিয়ে ছার ডাকের গহনা॥
জগৎকে খাওয়াচ্ছেন যে মা,
সুমধুর খাদ্য নানা।
ওরে, কোন্ লাজে খাওয়াতে চাস্ তায়
আলো চাল আর বুট-ভিজানা॥
জগৎকে পালিছেন যে মা
সাদরে, তাই কি জান না।
ওরে, কেমন ক'রে দিতে চাস বলি
মেষ-মহিষ আর ছাগল-ছানা॥"

আজ পর্য্যন্ত বাহ্য আড়ম্বরময় প্রতিমা-পূজার অযৌক্তিকতা সম্বন্ধে মিশনারী বন্ধুরা সুযোগ পাইলেই আমাদিগকে উপদেশ দিয়া থাকেন এবং ঢাক-ঢোলের বাদ্যে ঘুমের ব্যাঘাত ঘটে বলিয়া বিজ্ঞ হাস্যে প্রশ্ন করেন—"We should like to ask our Hindu readers in all seriousness—'who are these gods who delight in all this clatter fuss and dancing girls, making night hideous and preventing sleep?' Why is their taste in music so very crude there pleasure so very carnal?"—অনাত্মীয়বৎ এরূপ প্রশ্ন খামকা কাহারও মুখ হইতে শুনিলে মানুষের জেদই বাড়ে এবং অনুরূপ ত্রুটির কথা তুলিয়া প্রশ্নকারীদের বিবিধ আচার-অনুষ্ঠানেও দোষারোপ করিবার ইচ্ছা হয়, কিন্তু এ ক্ষেত্রে তাহা না করিয়া সর্ব্বতোভাবে ইংরাজী প্রভাববর্জ্জিত রামপ্রসাদের কাছে আসিলেই আমরা দেখিতে পাইব যে, তথাকথিত উপদেশ পাইবার বহু পূর্ব্বেই তিনি স্বয়ং কত বড় কথা নিজেকে শুনাইয়াছেন,—

"মন তোর এত ভাবনা ক্যানে।
একবার কালী ব'লে বস রে ধ্যানে॥
জাঁকজমকে করলে পূজা
অহঙ্কার হয় মনে মনে।
তুমি লুকিয়ে তাঁরে কর রে পূজা
জানবে না রে জগজ্জনে॥
ধাতু পাষাণ মাটীর মূর্ত্তি
কাজ কি রে তোর সে গঠনে।
তুমি মনোময় প্রতিমা গড়ি'
বসাও হৃদি-পদ্মাসনে॥
* * *
ঝাড় লণ্ঠন বাতির আলো,
কাজ কি রে তোর সে রোশনাইয়ে,
তুমি মনোময় মাণিক্য জ্বেলে
দাও না জ্বলুক নিশিদিনে॥
মেষ-ছাগল আর মহিষাদি
কাজ কি রে তোর বলিদানে।
তুমি জয় কালী জয় কালী ব'লে
বলি দাও ষড়-রিপুগণে॥"
* * *

প্রসাদ-গীতিকার মধ্যে তিনটি মাত্র গান পাওয়া যায়, যাহাতে 'সুরা'র কথা আছে এবং 'তন্ময়তা'র রূপক হিসাবে তাহার ব্যবহার আছে। ইহা হইতে ধরিয়া লওয়া হয় যে, তিনি সুরা পান করিতেন। তিনি সুরা পান করিতেন কি না, সে অবশ্য স্বতন্ত্র কথা, তবে ঐ গীতিত্রয়ের ভিতর হইতে এরূপ অনুমানের কোনও অবকাশ পাওয়া যায় না। ওমর, হাফিজ ও রুমির সুরা-বিলাস জগদ্বিখ্যাত এবং সেই সুরাকে ভগবৎপ্রেমোন্মত্ততার রূপক হিসাবেও তাঁহাদের কাব্যে ব্যবহৃত দেখিতে পাওয়া যায়। এই কবিদের কল্পনার খোরাক যে বস্তুগত্যা 'সুরার পিয়ালা' হইতেই আসিয়াছে, তাহাও বুঝিতে বিলম্ব হয় না—বিশেষতঃ ওমর খৈয়াম ত সুরার সাকার প্রেমে বিভোর হইয়া বিধানই দিয়া গিয়াছেন,—

"পান কর ভাই যাবজ্জীবন,
যারেক মলে ফিরবে না আর
এই কথাটিই সঠিক জানি।"

তাহা ছাড়া, তাঁহার সুরা (যদিও ওমর-বিভোর সুহৃদ-সম্প্রদায়ের মতে রামপ্রসাদেরই "জ্ঞান-শুঁড়ীতে চুয়ায় ভাটি, পান করে মোর মন-মাতালে"র অনুরূপ) ভক্তি-রসের দ্যোতক বলিয়াও মনে হয় না। চিরন্তন দার্শনিক প্রশ্ন,—

"বিশ্বভুবনখানির কোলে, কোত্থেকে বা কোন্ কারণে,
কিছুই নাহি বুঝতে পারি আস্‌ছি ভেসে স্রোতের টানে;
শূন্য করি' এ কোল আবার, দম্‌কা-হাওয়ার ঘূর্ণিবেগে,
বেরিয়ে যাবো কোথায়, কেন?—পাইনে যে তা'র কোনই মানে।"

এই প্রশ্নের কোনও সদুত্তরের অভাবজনিত হতাশাই তিনি সুরা-বিলাসে ডুবাইতে চাহিয়াছিলেন,—কিন্তু রামপ্রসাদের অবস্থা অন্যরূপ; নিছক দার্শনিকতা ছিল তাঁহার মতে অজ্ঞতেরই নামান্তর। তাঁহার সঙ্গীতে যে 'সুরার কথা' প্রসঙ্গত আসিয়া পড়িয়াছে, তাহা সুফীসম্প্রদায়ের ন্যায় তাঁহার কাব্যের প্রধান অঙ্গ বা বিশিষ্ট উপকরণ নয় বলিয়াই, মনে হয় যে, তাঁহার জীবনেও ইহার উল্লেখযোগ্য কোনও স্থান ছিল না। অবশ্য এ সকল কথা বিচারের সামাজিক মূল্য যাহাই থাকুক, সাহিত্যিক মূল্য এক বিন্দুও নাই; যেহেতু, জীবনের অভ্যাস হৃদয়ের অমরতাকে ছাপাইয়া উঠিতে পারে না। হাফিজ, রুমি, ওমর প্রভৃতির পানপাত্র তাঁহাদের জীবনের সঙ্গে সঙ্গেই ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, কিন্তু তাঁহাদের হৃদয় আজও জগতে অমর হইয়া আছে।

রামপ্রসাদের জীবনব্যাপী চিন্তা ও ধ্যান-ধারণার সহিত আমরা একরূপ পরিচিত হইয়া আসিলাম। এইবার মৃত্যু সম্বন্ধে তাঁহার ধারণার পরিচয়টুকু গ্রহণ করিয়া এ আলোচনা শেষ করিতে চাই। মৃত্যু সম্বন্ধে সাধারণতঃ লোকের মনে একটি বিভীষিকা থাকিয়া গিয়াছে, কারণ, তাহার অভ্যন্তর আমাদের জ্ঞানের নিকট অন্ধকারে আচ্ছন্ন। এই সাধারণ বিভীষিকাকে 'শমন' নাম দিয়া 'কালী' নামের জোরে তাহাকে তাড়াইবার চেষ্টা আমরা প্রসাদ-পদাবলীতে অনেক পাই—অবশ্য মনের মধ্যে বলসঞ্চয় করিয়া মৃত্যু সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নির্ভয় হইবার সাধনা ছাড়া আর কিছুই নয়। আমাদের দেশের শাস্ত্রকার ও সমাজপতিরা মৃত্যুর মূর্ত্তি ও মৃত্যুপারের ব্যাপার যথাসাধ্য ভয়ঙ্কর করিয়া আঁকিয়া গিয়াছেন এবং মানুষকে ভয় দেখাইয়া ধর্ম্মকার্য্যে প্রবৃত্ত করিবার জন্য "গৃহীত ইব কেশেষু মৃত্যুনা" বলা অপেক্ষা বড় ভয়ের কথা বুঝি বা আর ধারণাতেও আনিতে পারেন নাই—এতই ভয়ানক আমাদের এই মৃত্যু। এ বিষয়ে রামপ্রসাদের বিশ্বাস খুবই সহজ, স্বচ্ছ ও অনাড়ম্বর হইয়া উঠিয়াছিল দেখা যায়। সে বিশ্বাস এই,—

যে কারণেই হউক, বিশ্বচেতনাই দানা বাঁধিয়া আমাদের মধ্যে বিশেষ চেতনায় পরিণত হইয়াছে, আর ইহাই জীবন। অপর পক্ষে, এই বিশেষ-চেতনাই সময়ান্তরে বিশ্ব-চেতনায় মিশাইয়া যাইবে আর তাহাই মৃত্যু। ইহার মধ্যে যমদূত, স্বর্গ, নরক, পাপ-পুণ্যের শাস্তি

বা পুরস্কার, ভূত-প্রেত, সালোক্য সাযুজ্য প্রভৃতি কোনও বালাই নাই। এ কালের লোকান্তরিত কবি দ্বিজেন্দ্রলাল বুঝিয়াছিলেন,—

"মৃত্যু যদি সুখশূন্য, মৃত্যু দুঃখহীন ;
বিনা সুখ-দুঃখ ভার, একাকার, নির্ব্বিকার,
নির্ভয়ে হইয়া যাব পরব্রহ্মে লীন।"

রামপ্রসাদও গাহিয়াছেন,—

"এক ঘরেতে বাস করিছে পঞ্চ জনে মিলে-জুলে ;
সে যে সময় হইলে আপনা আপনি
যে যার স্থানে যাবে চ লে।
প্রসাদ বলে যা' ছিলি ভাই,
তাই হবি রে নিদানকালে ;
যেমন জলের বিম্ব জলে উদয়
জল হয়ে সে মিশায় জলে।"...

এ ধারণা অবশ্য রামপ্রসাদের উদ্ভাবিত কোনও নূতন ধারণা নহে ; এখানে তিনি দার্শনিকেরই শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছেন। এই কথা মানিয়াই ওমর খৈয়াম 'জীবনের' উপর জোর দিয়া দাঁড়াইয়াছেন, এই কথা মানিয়াই পাশ্চাত্য সাধনা ইহলোক ও ইহজীবন-প্রধান এবং এই কথা উপলব্ধি করিয়া গার্হস্থ্য-জীবন অঙ্গীকার করিলে আমরাও শঙ্করের মন লইয়া, পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল ভগবৎ-প্রতিষ্ঠ গৃহি জীবন যাপন করিতে করিতে জীবনের আনন্দকণাগুলিকে যথাসময়ে আনন্দসাগরে মিলাইয়া দিতে সমর্থ হইব।

এতক্ষণের আলোচনায় আমরা বিশেষভাবে এই কথাটিই বুঝিয়া আসিলাম যে, প্রসাদ-পদাবলী প্রধানতঃ "শান্তি-বিজ্ঞান"। সমাজ-গঠন, জাতিগঠন, মানুষের প্রতি মানুষের ব্যবহার-নির্দ্দেশ, স্বদেশ-প্রীতি, বিশ্ব-প্রীতি, রাজনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতি কিছুই ইহার লক্ষ্য নহে—কেবল আত্মাকে লক্ষ্য করিয়াই ইহা সর্ব্বসাধারণের আত্মীয়। ইংরাজীতে যাহাকে বলে 'one-man-deep literature' বা এক-মানুষ-ভোর গভীর সাহিত্য, প্রসাদ-গীতিকাও তাই। এই অশান্তি-চঞ্চল জগতে কি করিয়া মনের শান্তিতে থাকা যায়, শুষ্ক জীবনকে কেমন করিয়া রস-সুমধুর করিয়া রাখা যায় এবং মানুষের যাবতীয় প্রচেষ্টার অন্তরালে দণ্ডায়মান মৃত্যুকেও কেমন করিয়া নিশ্বাস প্রশ্বাসেরই মত সহজগম্য করিয়া তুলা যায়, প্রসাদ-সাহিত্য তাহা আমাদিগকে দেখাইয়া দিতে পারে। যে চিত্তশুদ্ধি বঙ্কিমচন্দ্রের মতে হিন্দুশাস্ত্রের প্রথম ও শেষ কথা, তাহা লাভ করিবার জন্য রাম-প্রসাদ আমাদিগকে সহায়তা করেন। তিনি আমাদের সকলেরই বন্ধু ও আত্মীয়, শ্রদ্ধার পাত্র ও শান্তি-পথের প্রদর্শক ; অন্তরে সন্ন্যাস, হৃদয়ে ভক্তি এবং জীবনে কর্ত্তব্যনিষ্ঠা লইয়া গার্হস্থ্যধর্ম্ম পালন করায় তিনি আমাদের বা প্রত্যেক গৃহীরই এক উজ্জ্বল আদর্শ। তাঁহার পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাপূর্ণ নমস্কার নিবেদন করিয়া এ আলোচনা আমরা শেষ করিলাম। *

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ ঘোষ।

অসমীয়া বৈষ্ণবধর্ম্ম

বৈষ্ণবধর্ম্ম অতি প্রাচীন ধর্ম্ম। কোন্ সময় হইতে কি ভাবে এই ধর্ম্ম চলিয়া আসিয়াছে, তাহার বিবরণ সঠিকরূপে অবগত হওয়া অতীব দুরূহ। ভারতবর্ষে প্রধানতঃ ৬টি বৈষ্ণবসম্প্রদায় আছে, যথা,—শ্রীবৈষ্ণব, মাধবাচার্য্য, রামানন্দী, বল্লভাচারী, চৈতন্যপন্থী ও মহাপুরুষীয়া। নদীয়ার শ্রীচৈতন্যদেব কখনও কামরূপের কোন স্থানে পদার্পণ করেন নাই। অসমীয়া বৈষ্ণবশাস্ত্রে অনভিজ্ঞ গৌহাটী, দক্ষিণপাট প্রভৃতি স্থানের জনকয়েক ব্যক্তি মহাপ্রভুকে সেখানে খাড়া করিতে বৃথা প্রয়াস পাইয়াছেন। পাঠকবর্গের অবগতির জন্য শ্রীচৈতন্যদেবের বিষয়ে পরে আমরা কিছু আলোচনা করিব।

আসামে "মহাপুরুষীয়া বৈষ্ণবসম্প্রদায়" অত্যন্ত প্রখ্যাত। কায়স্থ-বংশীয় শঙ্করদেব প্রাচীন বৈষ্ণবশাস্ত্রের বিধান অনুযায়ী সেখানে এই ধর্ম্ম প্রচার করেন। তাঁহার পূর্ব্বে কোন কোন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত মধ্যে মধ্যে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিতেন মাত্র। শঙ্করদেব মহাপুরুষ ছিলেন বলিয়া তৎপ্রচারিত বৈষ্ণবধর্ম্ম "মহাপুরুষীয়া ধর্ম্ম" নামে অভিহিত শঙ্করদেব নামদেবের ন্যায় 'রুক্মিণী-কৃষ্ণ', বল্লভদেবের ন্যায় 'গোপী-কৃষ্ণ', শ্রীচৈতন্যদেবের ন্যায় রাধাকৃষ্ণ' ও রামানন্দের ন্যায় 'সীতারাম'এর যুগল-উপাসনার বিরোধী ছিলেন। তিনি তদীয় শিষ্য-গণকে কেবল শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দাস্যভাবে অনুরাগী হইতে উপদেশ দিয়াছিলেন। তাঁহার মতে—একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করিলে মুক্তি লাভ করা যায়, অন্য দেবদেবীর অর্চ্চনা নিষ্প্রয়োজন। এই শঙ্করদেবের ৭ জন প্রসিদ্ধ শিষ্য তাঁহারই পন্থানুসরণ করিয়া প্রাচীন কামরূপ রাজ্যের নানা স্থানে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করেন। দৈত্যারি ঠাকুর রচিত পুথিতে এই ৭ জন শিষ্যের নাম পাওয়া যায়,—

"তান হস্তে হৈব আচার্য্য সাত জন।
সি সবাতো হস্তে হৈব লোকর তারণ ॥
রামরায়, হরি, দামোদর বিপ্রবর।
মধু, হরি, নারায়ণ মাধব শ্রেষ্ঠতর ॥
পরম অমূল্য ভক্তি মহাধর্ম্মচয়।
সবে তার মাধবক অর্পিলা নিশ্চয় ॥
দামোদর, মাধবক ধর্ম্মত থাপিলা।
নিজ কার্য্য সাধি কালে বৈকুণ্ঠে চলিলা ॥"

শঙ্করদেবের দেহত্যাগের পর তদীয় ধর্ম্মগদী লইয়া মাধবদেব ও দামোদরদেবের মধ্যে বিরোধ বাধে। এই মাধবদেব জাতিতে কায়স্থ এবং দামোদরদেব জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন। মাধবদেব গুরুর গদী প্রাপ্ত হইলে ব্রাহ্মণ দামোদরদেব মর্ম্মাহত হইয়া একটি স্বতন্ত্র দল গঠন করেন। তিনি ব্রাহ্মণ ছিলেন বলিয়া তাঁহার দলের লোকেরা আপনাদিগকে আর "মহাপুরুষীয়া" না বলিয়া "বামুনীয়া" বলিয়া পরিচয় দিতে লাগিলেন এবং পরবর্ত্তী কালে প্রচার করিয়া দিলেন যে, তাঁহাদের গুরু "দামোদরদেব" নদীয়ার শ্রীচৈতন্যদেবের শিষ্য ছিলেন—শূদ্র শঙ্করদেবের সহিত তাঁহার কোন সম্বন্ধ ছিল না। কিন্তু উজনীয়া অঞ্চলের দামোদরীয়া শ্রীশ্রীদক্ষিণপটীয়া অধিকারী মহোদয় বলেন,—"মহাপুরুষীয়া ও দামোদরী পূর্ব্বে প্রায় এক মিল আছিল। যদিও পরে মাধবে গণ্ডগোল করি কিছু প্রভেদ করিল"—বাঁহী, ৩য় বৎসর, ১০ম সংখ্যা, ভাদ ৪৬৯ পিঠি।

"সৎসম্প্রদায় কথা" নামক পুথিতে উল্লেখ আছে যে, "দামোদর-দেব শ্রীচৈতন্যদেবের নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন।" ইহা গৌহাটী অঞ্চলের কোন অল্পশিক্ষিত 'বামুনীয়া' দলের লোকের লেখা বলিয়া মনে হয়। ইহার গোড়া হইতে শেষ পর্য্যন্ত মামুলী কথার অবতারণা। আমরা দেখিতে পাই, দামোদরদেবের শরণমন্ত্র শঙ্করদেবের চারি নাম, অথচ শ্রীচৈতন্যদেবের মন্ত্র ষোলনামাত্মক। সৎসম্প্রদায় ইহার উত্তর দিয়াছে,—"চৈতন্যের গোড়াতে চারি নাম ছিল। তিনি উড়িষ্যার রাজা শূদ্র প্রতাপরুদ্রকে তিন নাম * দিলে পর

* হালিসহর রামপ্রসাদ সম্মেলনের বাৎসরিক সভায় পঠিত এবং প্রতিযোগিতায় মেডেল প্রাপ্ত।

* তিন নাম—দামোদরী শূদ্রেরাও তিন নাম ও ব্রাহ্মণরা চারি নাম পান ; মহাপুরুষীয়রা সকলেই চারি নাম পাইয়া থাকেন।—লেখক।

রাজা অন্ন বলিয়া অবজ্ঞা করেন এবং সেই অবজ্ঞা দোষে তাঁহার গলা বাঁকিয়া যায়। তখন শ্রীচৈতন্য সেই তিন নামকে যোল করিয়া জনসমাজে প্রচার করেন।" পাঠক! এই রকম মামুলী গল্প শ্রীচৈতন্য-চরিতের কোথাও আছে কি? সৎসম্প্রদায়ের যুক্তি এই ধরণের। ইহাতে আছে,—চৈতন্য আসামে আসিয়া নারদের অভিনয় করিয়াছিলেন,—

"পাদে হাতে বীণা ধরি কৃষ্ণনাম গাই নারদ শ্রেষ্ঠা দেখাইলা।"
—৩০ পৃষ্ঠা।

"পাদে চৈতন্ত তাঙ্ক তত্ত্বজ্ঞান দি ওরেবাক গৈলা।"—৩১ পৃষ্ঠা।

ইহা হইতেই প্রমাণ হইয়া গেল, শ্রীচৈতন্তদেব আসামে আসিয়াছিলেন।

নীলকণ্ঠ-কৃত দামোদর-চরিত্র পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, নদীয়াতে শ্রীচৈতন্তদেবের সহিত শঙ্করদেবের দেখাশুনা হয়। চৈতন্ত এক টুক্‌রা ভূর্জ্জপত্রে মন্ত্র লিখিয়া শঙ্করের পুরোহিত রামরামদেবের হস্তে দিয়া বলিলেন, "ইহা দামোদরদেবকে দিও।" তীর্থ হইতে ফিরিয়া আসিয়া রামরাম হরিমন্দিরে সেই ভূর্জ্জপত্র দামোদরদেবকে যথাবিধি দিলেন,—

হরিধ্বনি করিলন্ত ভক্ত নিরন্তর।
লভিলা সৎসঙ্গ আবে চুলিলা সত্বর॥
খামে ভাঙি পত্র পাছে দামোদরে চাইলা।
শরণ ভজন শিক্ষা চারি নাম পাইলা॥
গঙ্গাজল প্রসাদ শঙ্করে আনি দিলা।
দামোদরে গঙ্গাজল মাথাত করিলা॥—নীলকণ্ঠ।

এই নীলকণ্ঠ বামুনীয়া সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন। তাঁহার লিখিত উপরি-উক্ত পদমধ্যে দামোদরদেবের "চারি নাম" প্রাপ্তির কথার উল্লেখ আছে। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, শ্রীচৈতন্তের "যোল নাম" শঙ্করদেবের "চারি নাম"। যাহা হউক, পাঠক! আপনারা বিচার করিয়া দেখুন, ভূর্জ্জপত্রে মন্ত্র লিখিয়া লোক মারফতে পাঠাইয়া দিয়া তাহাকে শিষ্য করিবার বিধি কোন্ শাস্ত্রে আছে?

দামোদরদেবের চরিত্র বিষয়ে "গুরুলীলা" প্রধান শাস্ত্র। ইহাতে শ্রীচৈতন্তদেবের নিকট হইতে দামোদরদেবের দীক্ষা, শরণ বা সৎ-উপদেশ গ্রহণ সম্বন্ধে কোন কথার উল্লেখ নাই,—

বরাহ কুণ্ডত পূর্ব্বে চৈতন্ত আছিলা।
মণিকূটে দুয়োজনে সম্ভাষণ ভৈলা॥
পরম আনন্দে দুয়ো দুইকো আশ্বাসিলা।
তথা হন্তে চৈতন্ত জগন্নাথে গৈলা॥—রামরায়।

এই পদ হইতে গুরু-শিষ্যের কোন সম্বন্ধ পাওয়া যায় না, বরং বুঝা যায় যে, পরস্পর পরস্পরকে মণিকূটে দেখিতে পাইবার কালে বন্ধুভাবে সম্ভাষণানন্তর চলিয়া গেলেন।

উক্ত রামরায়-কৃত গুরুলীলাতে আমরা দেখিতে পাই যে, দামোদর-দেব পরবর্ত্তী কালে কুচবিহার-বাসী "বেদুরা" ব্রাহ্মণ নামক জনৈক চৈতন্তপন্থীকে মন্ত্র দিয়া নিজ সম্প্রদায়ভুক্ত করেন। দামোদরদেব শ্রীচৈতন্তদেবের নিকট হইতে মন্ত্র বা শিক্ষা পাইলে আপন গুরুর শিষ্যকে পুনরায় নিজ শিষ্য করিতেন কি? এ সম্বন্ধে গৌহাটীর প্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিদ্ শ্রীযুত হেমচন্দ্র গোস্বামী মহোদয় কি বলেন?

বামুনীয়া দলের কেহ কেহ বলেন,—শ্রীচৈতন্তদেব কামরূপের হাজোর নিকটে গুহায় বাস করিয়াছিলেন বলিয়া স্থানীয় লোকেরা এখনও উঁহাকে "চৈতন্ত গোকা" বলেন। তাঁহারা জানিয়া রাখুন যে, নদীয়ায় শ্রীচৈতন্যের পূর্ব্বনাম "নিমাই।" দীক্ষাপ্রাপ্তির এক বৎসর পরে তিনি কেশব ভারতীর নিকট "শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য" নাম প্রাপ্ত হয়েন। চৈতন্য নামধারী আরও কয়েক জন সন্ন্যাসীর নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। নিমাইয়ের পরবর্ত্তী নাম "চৈতন্য" নহে—তাঁহার নাম হইয়াছিল শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য—আপার আসামে একটি কেরোসিন তৈলের খনির নাম "মার্ঘেরিটা।" জনৈক ইটালী দেশীয় ইঞ্জিনিয়ার প্রথমে উহা খনন করেন এবং তাঁহার দেশের তৎকালীন রাণীর নাম অনুসারে উহার নাম রাখেন "মার্ঘেরিটা।" স্থানের নাম শুনিয়া "মার্ঘেরিটা আসামে আসিয়াছিলেন।" কেহ বলিলে যেমন শুনায়, পাঠক! নদীয়ার শ্রীচৈতন্যের এখানে আগমন সম্বন্ধেও কি কি তদ্রূপ শুনায় না?

চৈতন্য-ভাগবতে (পৃঃ ১০৪) আছে, নিমাই পণ্ডিত ঘোর তার্কিক ছিলেন এবং পণ্ডিত অবস্থায় তিনি বঙ্গদেশ ভ্রমণ করেন,—

"বঙ্গদেশে মহাপ্রভু হইলা প্রবেশ।
অদ্যাপিও সেই ভাগ্যে ধন্য বঙ্গদেশ॥"

এখানে "বঙ্গদেশ"এর কথা আছে, "পূর্ব্বদেশ"এর কথা নাই। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুত অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি মহাশয় ব্যাখ্যা করিয়াছেন, (শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত উত্তরাংশ, ২৪৯ পৃষ্ঠা)—"প্রাজ্ঞ গ্রন্থকার কর্ত্তৃক সর্ব্ব বঙ্গদেশ পদের প্রয়োগ হওয়ায় কেবল পদ্মাতীরবর্ত্তী ফরিদপুরাদি নহে, শ্রীহট্ট, ময়মনসিংহ আদি সমস্ত পূর্ব্ববঙ্গ উদ্দিষ্ট হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়।" এক্ষণে পূর্ব্বোক্ত বামুনীয়া দলের কথাপ্রসঙ্গে উল্লেখ-যোগ্য যে, পূর্ব্ববঙ্গ বলিলে তন্মধ্যে কামরূপ পড়ে না। শ্রীচৈতন্য-দেবের সময়েও কামরূপ একটি স্বতন্ত্র দেশ ছিল;

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, "মহাপুরুষ শঙ্করদেব ১৪৫১ শকাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।" তিনি ১৯ বৎসর বয়ঃক্রমকালে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। শ্রীচৈতন্যদেবের জন্ম-শক ১৪০৭। তিনি ২৪ বৎসর বয়ঃক্রমকালে দীক্ষা প্রাপ্ত হইয়া সন্ন্যাসী হয়েন। শ্রীমৎ বৃন্দাবন দাস কৃত "চৈতন্য-ভাগবত"এ কিংবা শ্রীমৎ কৃষ্ণদাস কবিরাজ কৃত "চৈতন্য-চরিতামৃত"এ মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের কামরূপগমনের কিংবা দামোদরদেবের তাঁহার নিকট শিষ্যত্ব গ্রহণের কোন কথাই নাই। মহাপ্রভুর মানবলীলা সংবরণের অনতিকাল পরেই "শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত" রচিত হয়। ইহা একখানি প্রামাণিক গৌড়ীয় বৈষ্ণবগ্রন্থ। ইহা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করা হইল,—

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নবদ্বীপে অবতরি।
অষ্টচল্লিশ বৎসর প্রকট বিহরি॥
চৌদ্দ শত সাত শকে জন্মের প্রমাণ।
চৌদ্দ শত পঞ্চান্নে হৈল অন্তর্দ্ধান॥
চব্বিশ বৎসর প্রভু কৈল গৃহবাস।
নিরন্তর কৈল প্রেমভক্তির প্রকাশ॥
চব্বিশ বৎসর শেষে করিয়া সন্ন্যাস।
চব্বিশ বৎসর কৈল নীলাচলে বাস॥
তার মধ্যে ছয় বৎসর গমনাগমন।
কভু দক্ষিণ কভু গৌড় কভু বৃন্দাবন॥
অষ্টাদশ বৎসর রহিল নীলাচলে।
কৃষ্ণপ্রেম-নামামৃতে ভাসাইলা সকলে॥"
—১৩শ পরিচ্ছেদ।

পুনশ্চ:—

"চব্বিশ বৎসর ঐছে নবদ্বীপ গ্রামে।
লওয়াইল সর্ব্বলোকে কৃষ্ণপ্রেম নামে॥
চব্বিশ বৎসর ছিলা করিয়া সন্ন্যাস।
ভক্তগণ লৈঞা কৈল নীলাচলে বাস॥

তার মধ্যে নীলাচলে ছয় বৎসর।
নৃত্য-গীত প্রেমভক্তি দান নিরন্তর॥
সেতুবন্ধ আর গৌড় ব্যাপি বৃন্দাবন।
প্রেম নাম প্রচারিয়া করিলা ভ্রমণ॥
এই মধ্যলীলা নাম লীলার মুখ্যধাম।
শেষ অষ্টাদশ বর্ষ অন্ত্যলীলা নাম॥
তার মধ্যে ছয় বর্ষ ভক্তগণ সঙ্গে।
প্রেমভক্তি লওয়াইলা নৃত্য-গীত-রঙ্গে॥
দ্বাদশ বৎসর শেষ রহিলা নীলাচলে।
প্রেমাবস্থা শিখাইলা আস্বাদনচ্ছলে॥
রাত্রি-দিবসে কৃষ্ণ-বিরহ-স্ফুরণ।
উন্মাদের চেষ্টা করে প্রলাপ বচন॥
শ্রীরাধার প্রলাপ যৈছে উদ্ধব দর্শনে।
সেই মত উন্মাদ প্রলাপ করে রাত্রিদিনে॥"

১৩শ পরিচ্ছেদ।

এতদ্ব্যতীত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠে জানা যায়—অতঃপর তাঁহার বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া গিয়াছিল। তিনি চটক পর্ব্বতকে গোবর্দ্ধন বলিয়া ভাবিতেন, গঙ্গা ও নীল সমুদ্রকে যমুনা জ্ঞানে তাহাতে ঝাঁপাইয়া পড়িতে উদ্যত হইতেন, উপবনকে ভ্রমে বৃন্দাবন বলিতেন, উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতেন, মূর্চ্ছা যাইতেন, ঘাসে মুখ ঘষিয়া ঘা করিতেন; ভক্তগণ তাঁহাকে গৃহমধ্যে আবদ্ধ রাখিয়া ভ্রমণ করিতেন, ইত্যাদি।

চৈতন্যচরিতামৃতের গ্রন্থকার শ্রীমৎ কৃষ্ণদাস কবিরাজ স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, শেষ ১৮ বৎসর মধ্যে শ্রীচৈতন্য নীলাচল হইতে আর কোথায়ও যান নাই—

"বৃন্দাবন হৈতে যদি নীলাচলে আইলা।
আঠার বৎসর তাহা বাস, কাঁহা নাহি গৈলা॥"

—মধ্যলীলা, ১ম পরিচ্ছেদ।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, শ্রীমৎ বৃন্দাবন দাস "শ্রীচৈতন্য-ভাগবত" রচনা করেন। এখানে উল্লেখযোগ্য শ্রীমৎ কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

"কৃষ্ণলীলা ভাগবতে কহে বেদব্যাস।
চৈতন্যলীলাতে ব্যাস বৃন্দাবন দাস॥"

ভক্তরা ভগবানকে নানাভাবে উপলব্ধি ও আস্বাদন করিয়া থাকেন। কামরূপের মহাপুরুষ শঙ্করদেবের দাস্যভাব, নদীয়ার শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সাম্যভাব। দাস্যপ্রেমের ভক্তরা ভগবান্‌কে প্রচুর সম্ভ্রম ও গৌরব দেখান—তুমি প্রভু, আমি দাস। এই প্রেমে ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে ব্যবধান থাকিয়া যায়, ভক্তের মমত্ববোধের খর্ব্ব হয়। এই জন্য মহাপ্রভু দাস্যপ্রেম অনুমোদন করিলেও উহাকে উত্তম বলেন নাই। দাস্যভাবে আসিলেই সেবার প্রয়োজন হয়। সাকার ভিন্ন নিরাকারের সেবার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু গীতাতে পরস্পরের প্রীতির আদানপ্রদানের ব্যাপারও অভিব্যক্ত হয় নাই। গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ে ভক্তি বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই অধ্যায়ই বিরাট-রূপ দর্শনের অব্যবহিত পরবর্ত্তী অধ্যায়। বিরাটরূপ দর্শনের পর ভক্তি ব্যতীত বোধ হয় আর কোন বিষয়ের অবতারণা যুক্তিযুক্ত হয় না।

স্মরণাতীত কালে প্রাচীন বঙ্গে যে সকল জাতির লোক আসিয়া নিজ নিজ প্রভাব বিস্তারের প্রয়াস পান, তন্মধ্যে দ্রাবিড়* মঙ্গলীয় ও আর্য্যগণ উল্লেখযোগ্য। দ্রাবিড়রা অতি প্রাচীন জাতি। এই জাতি এককালে সমগ্র ভারতবর্ষে আপনাদের আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। পুরুষমূর্ত্তির সহিত স্ত্রীমূর্ত্তির পূজা তাহাদেরই মধ্যে প্রচলিত ছিল। তাহাদের যুগলতত্ত্ব জয়দেব, বিদ্যাপতি প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিদের পদাবলীতে সর্ব্বপ্রথম ফুটিয়া উঠে। শ্রীচৈতন্যদেব সেই তত্ত্ব গ্রহণ করায় তাঁহার শিষ্যগণ নানা স্থানে যুগল উপাসনাবিধি প্রবর্ত্তিত করেন। মহাপুরুষ শঙ্করদেবের দামোদরদেব, মাধবদেব প্রভৃতি শিষ্য গীতা ও ভাগবতকে মূল ধর্ম্মগ্রন্থ বলিয়া মানিয়া লওয়ায় একমাত্র শ্রীকৃষ্ণে শরণ লইতে তাঁহাদের শিষ্যগণকে উপদেশ দিয়াছিলেন।

রাম রায় কৃত দামোদর চরিত্র (গুরুলীলা) হইতে অবগত হওয়া যায় যে, দামোদরদেব একমাত্র "নামধর্ম্ম" প্রচার করিয়াছিলেন। উহাতে তান্ত্রিক ধর্ম্মের কোন আভাস পাওয়া যায় না। এই চরিত পুথিতে আছে—কোচরাজ পরীক্ষিৎ দামোদরদেবকে ছাগ বলি দিয়া পূজা করিবার আজ্ঞা দিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার ধর্ম্মমত প্রাণিহিংসা বিরুদ্ধ বলিয়া তিনি তাঁহার রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া বিজয়পুরে যাত্রা করিয়াছিলেন,—

তীর্থক সেবন দেবী উপাসন ধর্ম্মকর্ম্ম যাগ-যোগ।
রামকৃষ্ণ নামে সকলে সিজয় ন লাগে একো উদ্যোগ॥
তহিতে বহন্ত গঙ্গা যমুনাও গোদাবরি সরস্বতী।
আন তীর্থ যত, আছে পৃথিবীতে, স্নানে পায় সদ্গতি॥
অচ্যুতর যৈতে, উদার চরিত প্রসঙ্গ করে সতত।
তীর্থর সমান, হোয়ে সেহি স্থান গীতা ভাগবত মত॥
এতেকেসে রাম কৃষ্ণনাম বিনে, ন জানোহোঁ আসি আন।
কৃষ্ণর নামত, ধর্ম্ম-কর্ম্ম যত সবার আশ্রয় স্থান॥"

গোপালদেব

পূর্ব্বে আমরা মহাপুরুষ শঙ্করদেবের শিষ্য মাধবদেবের কথা বলিয়াছি। এই মাধবদেবের গোপালদেব * নামে এক প্রসিদ্ধ শিষ্য ছিলেন। তদীয় সম্প্রদায়ের লোকরা আপনাদিগকে "গোপালদেবী" বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। গোপালদেব ১৪৬৩ শকে আসাম প্রদেশস্থ শিবসাগর জিলার নাজিরা নগরীর নিকটস্থ খোখোরা গ্রামে কামেশ্বর ভূঞার ঔরসে বক্রাঙ্গী দেবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। গোপালের পূর্ব্বপুরুষের নাম রুদ্রেশ্বর: তৎপুত্র সৌরেশ্বর, তৎপুত্র সিংহেশ্বর, তৎপুত্র গোপেশ্বর, তৎপুত্র গোপালেশ্বর ও তৎপুত্র কামেশ্বর এই গোপালের পিতা। গোপালদেব কামরূপ জিলার বরপেটা হইতে প্রায় ১০ মাইল দূরে ভবানীপুর নামক স্থানে একটি সত্র স্থাপন করিয়াছিলেন, এ জন্য তিনি ভবানীপুরীয়া গোপাল আতা নামে অভিহিত হয়েন। গোপাল ভবানীপুর সত্র ব্যতীত জোয়ারাদি, কালজার, লুয়াচুর ও কথাম্নি সত্র স্থাপন করেন। গোপাল আতার পুত্রের নাম কমল-লোচন। তৎপুত্রের নাম রামকৃষ্ণ, তৎপুত্র "যাদবানন্দ" দোকাচাপড়ি সত্র, "মাধবানন্দ" আমগুড়ি, "দেবকীনন্দ" কলাকাটা, "স্বরূপানন্দ" ধোপাবধ, "রামানন্দ" নাচনিপাড় ও হেমারবড়ি সত্র স্থাপন করেন।

গোপালদেবের প্রধান ছয় জন ব্রাহ্মণ ও ছয় জন কায়স্থ শিষ্য ছিলেন। কায়স্থ-শিষ্যদিগের নাম ও প্রতিষ্ঠিত সত্রের নাম যথা,—

* দ্রাবিড়—প্রাগৈতিহাসিক যুগে বাঙ্গালাদেশে দ্রাবিড়গণ যে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন, দামোলিপ্তি (তমোলুকের নামান্তর) নামই তাহার অন্যতম প্রমাণ। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, বহুকাল পূর্ব্বে এই নগরী দামোন বা দ্রাবিড় জাতির অধিকৃত ছিল।

* গোপালদেব—বিগত বৈশাখ সংখ্যার "মাসিক বসুমতী" পত্রিকায় গোপালদেবকে কলিতা জাতীয় বলিয়া ভুলক্রমে উল্লেখ করা হইয়াছিল। কলিতারা বঙ্গদেশীয় কায়স্থদিগের সমতুল্য (পদমর্য্যাদায়) ইহাও বলা হইয়াছিল। এ জন্য এখানে উল্লেখযোগ্য যে, কলিতা-জাতির বিধবা-বিবাহ আছে। বঙ্গদেশে মাত্র ৪১৩টি অস্পৃশ্য হিন্দু-জাতির মধ্যে এই প্রথা কখনও কখনও আমরা দেখিতে পাই।

(১) বাঁহবাড়ী সত্রের সংস্থাপক বড় যত্নমণি ; (২) হালধিআটি ও দহঘরিয়া সত্রের সংস্থাপক "নারায়ণদেব" ; (৩) গজেলা সত্রের সঙ্গ যদুমণি , (৪) নঘরিয়া সত্রের সনাতনদেব ; (৫) মায়ামরা সত্রের অনিরুদ্ধ ; এবং তেজপুর মহকুমার গামেরির নিকটস্থ দলৈপো সত্রের সংস্থাপক সনাতন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, গোপালদেবের "কৃষ্ণ-নাম"ধারী দুই জন প্রসিদ্ধ শিষ্য ছিলেন ; তন্মধ্যে প্রথম কৃষ্ণের অপর নাম মুরারি। ইনি চরাইবহি সত্রের সংস্থাপক। এই সত্রটি মাজুলী দ্বীপস্থ আহতগুরি সত্র হইতে ১॥ মাইল দূরে অবস্থিত। দ্বিতীয় কৃষ্ণের নাম পরমানন্দ। ইনি হাবুঙ্গিয়া-সংস্থাপক।

মহাপুরুষীয়া সম্প্রদায়ের ধর্ম্মমত

শঙ্করদেবের ধ্যান বর্ণনায় যে ধ্যানের কথা আছে, তাহা মানস-ধ্যান। ঈশ্বর-চিন্তা হেতু প্রথম অবস্থায় মানুষের পক্ষে একটি রূপ চিন্তা করা বা ধ্যান করা দরকার ; নতুবা চিত্তস্থির হয় না—কোন ধারণা জন্মিতে পারে না। এই জন্য শঙ্করদেব শিক্ষা দিয়াছিলেন,—"মুখে বোলাঁ রাম, হৃদয়ে ধরাঁ রূপ।" তৎশিষ্য মাধবদেব নিরাকার ঈশ্বরসাধনা শিক্ষা দিয়াছিলেন। ঈশ্বর যে নির্গুণ, নিরাকার, নির্ব্বিকার ও চৈতন্য-স্বরূপ, তাহাও শঙ্করদেব বলিয়াছেন। সগুণ ঈশ্বরের আরাধনা করিতে করিতে জ্ঞানোন্নতি হইলে নির্গুণ ঈশ্বরের সাধনা করা যায়।

শ্রীবিজয়ভূষণ ঘোষ চৌধুরী।

প্রাচীন ভারতে দাস-দাসী

পৃথিবীতে বহুকাল হইতে ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসী ব্যবহার করিবার প্রথা চলিয়া আসিতেছে। যত দিন হইতে মানবের ইতিহাস পাওয়া যাইতেছে, এই প্রথাও সেই সঙ্গে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। মিশরের পিরামিড এই দাসগণ নির্ম্মাণ করিয়াছিল। প্রাচীন গ্রীস ও রোমে এ প্রথা ছিল ; ব্যাবিলন, পারস্য ও চীনে এ প্রথা ছিল। প্রাচীন ভারতেও ইহার অস্তিত্বের বিবরণ পাওয়া যায়। আজকাল পৃথিবী হইতে এই নিষ্ঠুর প্রথা নির্ব্বাসিতপ্রায় হইয়াছে। কেবল মুসলমান-অধিকৃত রাজ্যসমূহে এবং চীন দেশের স্থানে স্থানে এখনও ইহা বর্ত্তমান থাকিয়া অতীতের সাক্ষ্য দিতেছে।*

প্রাচীন রোমের ইতিহাসে দেখা যায়, তথায় দাসগণ বড়ই নির্দ্দয়-রূপে ব্যবহৃত হইত। কেহ প্রভুর নিকট হইতে পলায়ন করিলে তাহার প্রাণদণ্ড হইত। কাহাকেও সিংহের মুখে নিক্ষেপ করা হইত, কাহাকেও কুক্কুর দ্বারা ভক্ষণ করান হইত, ইত্যাদি।

মুসলমান যুগে এক বাদশাহ অন্য কোন রাজার রাজ্য জয় করিলে সে বিজিত রাজ্যের উচ্চ নীচ সর্ব্বশ্রেণীর নরনারীকে বন্দী করিয়া লইয়া গিয়া বিক্রয় করিত। আবার অন্য কোন পরাক্রান্ত রাজা আসিয়া হয় ত উক্ত বিজেতার স্ত্রীপুত্রকে বন্দী করিয়া লইয়া গিয়া দাসদাসীরূপে ব্যবহার করিত, না হয় বিক্রয় করিত। ইহার উপর দস্যু-তস্কর ছিল ; তাহারা সুযোগ পাইলেই অপরের স্ত্রীপুত্রাদি অপহরণ করিয়া লইয়া যাইত ও দাসী-হাটায় বিক্রয় করিত।

যাঁহারা আমেরিকার ইতিহাস জানেন, তাঁহারা জানেন, দাসগণ তথায় কিরূপ নিষ্ঠুরভাবে ব্যবহৃত হইত। ক্রীতদাস ও পশুতে কোন প্রভেদ হইত না।

প্রাচীন ভারতেও এই সমস্ত ব্যাপার অনুষ্ঠিত হইত, তবে অনেক কম পরিমাণে। আর দাস-দাসীগণের প্রতি নিষ্ঠুর আচরণের কোন বিবরণ মহাভারতে পাওয়া যায় না। তবে কথা এই যে, মনুষ্য ক্রয়-বিক্রয় করা প্রথাটিই একটি নিষ্ঠুরতা। চিরজীবনের জন্য এক জন লোকের স্বাধীনতালোপ, ইহা অপেক্ষা ঘোরতর নিষ্ঠুরতা আর কি হইতে পারে ?—প্রাচীন ভারতে দাসদাসীদিগের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করা হইত, তাহা ভালরূপ অবগত হওয়া না যাইলেও কিরূপ ভাবে দাসদাসীর আদান প্রদান চলিত, তাহা বেশ জানিতে পারা যায়। আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহাই দেখাইতে চেষ্টা করিব।

এই সমস্ত দাসদাসী নানা উপায়ে সংগৃহীত হইত। কোন কোন স্থানে নিম্নশ্রেণীর লোকরা আপনাদের স্ত্রীপুত্র বিক্রয় করিত।

শল্য কর্ণকে বলিতেছেন, "হে সূতপুত্র! আতুর ব্যক্তিকে পরিত্যাগ ও পুত্রকলত্রদিগকে বিক্রয় করা অঙ্গদেশে সবিশেষ প্রচলিত আছে।"—কর্ণপর্ব্ব ৪৬।

যুদ্ধে জয়লাভ হইলে বিজেতৃগণ পরাজিত ব্যক্তির স্ত্রীপুত্র, দাস-দাসী সমস্ত গ্রহণ করিতেন।

ঘোষযাত্রাকালে চিত্রসেন গন্ধর্ব্ব রাজা দুর্য্যোধনকে পরাস্ত করিয়া তাঁহার স্ত্রীপুত্র দাস-দাসী সমস্তই বন্ধন করিয়া লইয়া যাইতেছিল।—বনপর্ব্ব ২৪১।

সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে বলিতেছেন, "হে মহারাজ! অনন্তর পাণ্ডব-পক্ষীয় বীরগণ শিবিরমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক আপনার অসংখ্য দাস দাসী এবং সমুদয় সুবর্ণ, রজত, মণি, মুক্তা, বিবিধ আভরণ, কম্বল ও অজিন প্রভৃতি নানা প্রকার ধন প্রাপ্ত হইয়া তুমুল কোলাহল করিতে লাগিলেন।"—শল্যপর্ব্ব ৬৩।

অন্যত্র,—

"ধর্ম্মরাজ এই বলিয়া জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্রের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক বৃকোদরকে দুর্য্যোধনের প্রাসাদ-পরিশোভিত, নানা রত্ন-খচিত, দাস-দাসী-সমন্বিত ইন্দ্রালয় তুল্য গৃহ ; অর্জ্জুনকে দুর্য্যোধন-গৃহের ন্যায় সুদৃশ্য মাল্যসংযুক্ত হেমতোরণবিভূষিত, দাস দাসী ও ধন-ধান্য-পরিপূর্ণ দুঃশাসন-ভবন ; নকুলকে দুর্ম্মর্ষণের সুবর্ণমণি মণ্ডিত কুবেরভবন তুল্য প্রাসাদ এবং প্রাণাধিক সহদেবকে দুর্ম্মুখের কমলদলাক্ষী কামিনীগণে পরিপূর্ণ কনকভূষিত গৃহ প্রদান করিলেন।"—শান্তিপর্ব্ব ৪৪।

দস্যুদল সুযোগ পাইলেই স্ত্রীলোকগণকে অপহরণ করিত। যদুবংশধ্বংসের পর "অর্জ্জুন যখন যদুকুলকামিনীগণকে লইয়া হস্তিনাপুরী গমন করিতেছিলেন, তখন পথিমধ্যে কতকগুলি দস্যু তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিল। পরিশেষে সেই দস্যুগণ তাঁহার (অর্জ্জুনের) সম্মুখ হইতেই বৃষ্ণি ও অন্ধকদিগের অতি উৎকৃষ্ট কামিনীগণকে অপহরণ করিয়া পলায়ন করিল।"—মৌষলপর্ব্ব ৭।

যখন কোন রাজা প্রবলপরাক্রান্ত হইয়া রাজসূয় বা অশ্বমেধ যজ্ঞ করিতেন, তখন তাঁহার অধীনস্থ নরপতিগণ অর্থ ও অন্যান্য দ্রব্যের সহিত দাস-দাসী 'উপঢৌকন' প্রদান করিতেন। দাস-দাসী উপ-ঢৌকন দেওয়া মুসলমান যুগেও প্রচলিত ছিল।

রাজা যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধযজ্ঞসময়ে নানা দেশ-সমাগত "নরপতি-গণও ধর্ম্মরাজের হিতসাধনার্থ বিবিধ রত্ন, স্ত্রী, অশ্ব ও আয়ুধ লইয়া হস্তিনায় আগমন করিতে লাগিলেন।"—আশ্বমেধিক পর্ব্ব ৮৫।

দুর্য্যোধন যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়যজ্ঞের ঐশ্বর্য্য বর্ণনা করিতেছেন। "শত সহস্র গোসেবী ব্রাহ্মণ ও দাসবর্গ মহাত্মা যুধিষ্ঠিরের প্রীতির নিমিত্ত বিচিত্রবর্ণ ত্রিশত উষ্ট্র, বড়বা, রাশীকৃত বলি ও স্বর্ণময় কমণ্ডলু এবং কাপালিকদেশ-নিবাসিনী লক্ষ দাসী সমভিব্যাহারে প্রবেশিতে না পারিয়া দ্বারদেশে দণ্ডায়মান আছেন।"—সভাপর্ব্ব ৫০।

রাজা বা উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণ যখন কন্যার বিবাহ দিতেন, তখন কন্যার সহিত বহুসংখ্যক দাসী জামাতার গৃহে পাঠাইতেন।

---

* নেপালেও এই প্রথা বর্ত্তমানে আছে। বর্ত্তমান রাজা এই প্রথা রহিত করিয়া দিবার চেষ্টা করিতেছেন।—বসুঃ সঃ।

পাণ্ডবগণের সহিত দ্রৌপদীর "পরিণয় সম্পন্ন হইলে দ্রুপদরাজ পাণ্ডবদিগকে বহুবিধ ধন, পর্ব্বতের ন্যায় মহোন্নত এক শত হস্তী, মহার্হ বেশভূষা-বিভূষিত এক শত দাসী এবং সুবর্ণালঙ্কৃত ও সুবর্ণ-প্রগ্রহোপেত অশ্বচতুষ্টয়-যোজিত এক শত রথ প্রদান করিলেন।"—আদিপর্ব্ব ১৯৮।

রাজা যযাতি যখন দেবযানীকে বিবাহ করেন, তখন "তিনি মহর্ষি শুক্র ও দানবগণ কর্তৃক সমাদৃত ও সৎকৃত হইয়া সেই দুই সহস্র কন্যার সহিত শর্ম্মিষ্ঠা ও দেবযানীকে সমভিব্যাহারে লইয়া নিজ রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিলেন।"—আদিপর্ব্ব ৮১।

এই সকল দাসী জামাতার উপপত্নীরূপে ব্যবহৃত হইত।

শর্ম্মিষ্ঠা একদা যযাতিকে বলিতেছেন, "সখীর পতি ও আপন পতি উভয়েই তুল্য এবং একের বিবাহে অন্যের বিবাহ সিদ্ধ হইয়া থাকে; অতএব যখন আমার সখী তোমাকে পতিত্বে বরণ করিয়াছেন, তখন আমারও বরণ করা হইয়াছে।"—আদিপর্ব্ব ৮২।

এই উক্তি হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, স্ত্রীর সখী বা দাসীগণকে পত্নীস্থানীয়া বলিয়া মনে করা হইত।

ব্যাসদেবের ঔরসে ও দাসী-গর্ভে বিদুরের জন্ম হয়।—আদিপর্ব্ব ১০৬।

যখন গান্ধারী গর্ভবতী ছিলেন, তখন এক জন বৈশ্যা দাসী ধৃতরাষ্ট্রের সেবা করিয়াছিল। ঐ বৈশ্যার গর্ভে যুযুৎসুর জন্ম হয়।—আদিপর্ব্ব ১১৫।

দীর্ঘতমা ঋষির ঔরসে ও বলি রাজার দাসীর গর্ভে কাক্ষীবৎ প্রভৃতি একাদশ পুত্র উৎপন্ন হয়।—আদিপর্ব্ব ১০৪।

এই সমস্ত দাস-দাসী নৃত্যগীত শিখিত।

"মহাত্মা যুধিষ্ঠিরের নৃত্যগীত-বিশারদ শত সহস্র দাসী ছিল।"—বনপর্ব্ব ২৩২।

গৃহে অতিথি বা নিমন্ত্রিত ব্যক্তি আসিলে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ রমণী প্রদান দ্বারা তাঁহাদিগের অভ্যর্থনা করিতেন। রাজসূয় যজ্ঞের সময় "ধর্ম্মরাজ সমস্ত নিমন্ত্রিত জনগণকে পৃথক্ পৃথক্ গো সমূহ, শয্যা, অসংখ্য সুবর্ণ ও দিব্যাভরণ ভূষিতা, রূপযৌবনবতী, সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী রমণী প্রদান করিলেন।"—সভাপর্ব্ব ৩২।

অর্জ্জুন অস্ত্রশিক্ষার্থ স্বর্গে গমন করিলে "ইন্দ্র চিত্রসেনকে নির্জ্জনে আহ্বান করিয়া কহিলেন, হে গন্ধর্ব্বরাজ! অদ্য তুমি অপ্সরোবরা উর্ব্বশীর নিকট গমন কর এবং সে এখানে আসিয়া যেন ফাল্গুনির মনোরথ সফল করে, ইহাও আদেশ করিবে।"—বনপর্ব্ব ৪৫।

ইন্দ্র যখন কর্ণের নিকট কুণ্ডল ও বর্ম্ম গ্রহণ করিতে গিয়াছিলেন, তখন কর্ণ তাঁহাকে ব্রাহ্মণবেশে আগত দেখিয়া কহিলেন, "হে ব্রহ্মন্! সুবর্ণাভরণবিভূষিতা প্রমদা অথবা গোসমূহপূর্ণ গ্রাম, ইহার মধ্যে কি প্রদান করিব বলুন।"—বনপর্ব্ব ৩০৯।

মহারাজ যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধযজ্ঞ সমাপ্ত হইলে, "পরিশেষে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির নরপতিদিগকে অসংখ্য হস্তী, অশ্ব, বস্ত্র, অলঙ্কার, রত্ন ও স্ত্রী প্রদান করিয়া বিদায় করিতে লাগিলেন।"—আশ্বমেধিকপর্ব্ব ৮৯।

শ্রীকৃষ্ণ যখন সন্ধির আশায় দুর্য্যোধনসমীপে গমন করেন, তখন ধৃতরাষ্ট্র বিদুরকে কহিতেছেন, "একবর্ণ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বাহ্লীকদেশীয় চারি চারি অশ্বে সংযোজিত সুবর্ণনির্ম্মিত ষোড়শ রথ……সুবর্ণবর্ণ অজাতাপত্য দশ দাসী, তৎসংখ্যক দাস……তাঁহাকে প্রদান করিব।"—উদ্যোগপর্ব্ব ৮৫।

রাজা বা সম্ভ্রান্ত লোক কাহারও উপর সন্তুষ্ট হইলে তাহাকে ধনরত্নের সহিত দাসী উপহার দিতেন। কর্ণ কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে এক দিন বলিতেছেন, "হে বীরগণ! আজি তোমাদিগের মধ্যে যিনি আমাকে মহাত্মা ধনঞ্জয়কে দেখাইয়া দিবেন, তিনি যাহা প্রার্থনা করিবেন, আমি তাঁহাকে তাহাই প্রদান করিব।" যদি তিনি তাহাতে সন্তুষ্ট না হয়েন, "তাহা হইলে কাংস্যনির্ম্মিত দোহনপাত্রসমবেত এক শত দুগ্ধবতী গাভী, এক শত গ্রাম এবং অশ্বতরীযুক্ত সুকেশী যুবতীগণ-সমবেত শ্বেতবর্ণ রথ প্রদান করিব।" ইহাতেও সন্তুষ্ট না হইলে…… "অজাতপুত্র এক শত কামিনী প্রদান করিব।" তাহাতেও যদি সন্তুষ্ট না হয়েন, "তাহা হইলে অন্যান্য জিনিষের সহিত মগধদেশসম্ভূত এক শত নবযৌবনসম্পন্না নিষ্ককণ্ঠ দাসী ও অন্যান্য পদার্থ প্রদান করিব।"—কর্ণপর্ব্ব ৩৯।

মগধদেশীয়া দাসীর আদর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ছিল।

বৈণ্য রাজা সিদ্ধান্তপক্ষের যাথার্থ্য শ্রবণে প্রথম স্তুতিবাদক অত্রির প্রতি একান্ত প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া কহিলেন, "হে দ্বিজোত্তম! আপনি সর্ব্বজ্ঞ এবং আমাকে নরোত্তম ও সর্ব্বদেব তুল্য বলিয়া কীর্ত্তন করিলেন, এই নিমিত্ত আমি আপনাকে বসন-ভূষণে বিভূষিত দাসী সহস্র, দশ কোটি সুবর্ণ ও দশ রজতভার সমর্পণ করিতেছি, গ্রহণ করুন।"—বনপর্ব্ব ১৮৫।

ব্রাহ্মণদিগকে ধর্ম্মার্থ অন্যান্য দ্রব্যের সহিত দাসদাসী দান করা হইত। মহারাজ পৌরব "প্রতি যজ্ঞে মদস্রাবী সুবর্ণবর্ণ দশ সহস্র হস্তী, ধ্বজপতাকা-পরিশোভিত রথ, সহস্র সহস্র সুবর্ণালঙ্কৃত কন্যা…দান করিতেন।" সেই সুবিস্তীর্ণ যজ্ঞে দাসদাসী দক্ষিণা প্রদান করিয়াছিলেন।—দ্রোণপর্ব্ব ৫৭।

মহারাজ ভগীরথ "রাজা ও রাজপুত্রগণকে পরাভব করিয়া হেমালঙ্কার-ভূষিত দশ লক্ষ কন্যা ব্রাহ্মণগণকে প্রদান করেন।"—দ্রোণপর্ব্ব ৬০।

মহারাজ অম্বরীষ ব্রাহ্মণগণকে অন্যান্য দ্রব্যের সহিত "অসংখ্য ভূপতি ও রাজপুত্র প্রদান করিয়াছিলেন।"—দ্রোণপর্ব্ব ৬৪।

মহারাজ শশবিন্দু ব্রাহ্মণগণকে দশ কোটি পুত্র ও তদপেক্ষা অধিকসংখ্যক কন্যা দান করেন।—দ্রোণপর্ব্ব ৬৮।

কর্ণ একদা অজ্ঞানতা নিবন্ধন কোন ব্রাহ্মণের হোমধেনুসম্ভূত বৎসকে সংহার করিয়াছিলেন। তিনি শল্যকে কহিতেছেন, "আমি শত শত দীর্ঘদন্ত হস্তী ও অসংখ্য দাসদাসী প্রদান করিয়াও তাঁহাকে প্রসন্ন করিতে সমর্থ হইলাম না।"—কর্ণপর্ব্ব ৪০।

নকুল যুধিষ্ঠিরকে বলিতেছেন, "আমরা যদি ব্রাহ্মণগণকে অশ্ব, গো, দাসী, সমলঙ্কৃত হস্তী, গ্রাম, জনপদ, ক্ষেত্র ও গৃহ প্রদান না করিয়া মাৎসর্য্যপরায়ণ হয়, তাহা হইলে আমাদিগকে নিশ্চয়ই কলিস্বরূপ হইতে হইবে।"—শান্তিপর্ব্ব ১২।

অঙ্গাধিপতি মহারাজ বৃহদ্রথ ব্রাহ্মণগণকে দশ লক্ষ সুবর্ণালঙ্কৃত কন্যা দান করিয়াছিলেন।"—শান্তিপর্ব্ব ২৯।

গৌতম নামে এক জন ব্রাহ্মণ এক ধনবান্ দস্যুর নিকট খাদ্যসামগ্রী ও বাসস্থান প্রার্থনা করেন। "ব্রাহ্মণ প্রার্থনা করিবামাত্র দস্যু তাঁহার বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া তাঁহাকে নূতন বস্ত্র ও এক যুবতী দাসী প্রদান করিল।"—শান্তিপর্ব্ব ১৬৮।

মহর্ষি গৌতম একটি হস্তি-শিশু পালন করিয়াছিলেন। ধৃতরাষ্ট্র সেই হস্তীটিকে লইবার ইচ্ছায় গৌতমকে কহিলেন, "মহর্ষে! আমি আপনাকে সহস্র গোধন, এক শত দাসী, পঞ্চ শত স্বর্ণ-মুদ্রা ও অন্যান্য নানাবিধ ধন প্রদান করিতেছি, আপনি তৎসমুদয় লইয়া আমাকে এই হস্তীটি প্রদান করুন।"—অনুশাসনপর্ব্ব ১০২।

যুধিষ্ঠির বিদুরকে বলিলেন, "ধৃতরাষ্ট্র ব্রাহ্মণদিগকে রত্ন, গাভী, দাস, দাসী, মেষ, ছাগ প্রভৃতি যাহা দান করিতে বাসনা করেন, তাহাই গ্রহণ করিয়া অনায়াসে ব্রাহ্মণ, অন্ধ ও দীন দরিদ্রদিগকে প্রদান করুন।"—আশ্রমবাসিকপর্ব্ব ১৩।

দাস দাসীগণ ছাগ-মেষের মতই একটা পদার্থ ছিল।

অনন্তর ধৃতরাষ্ট্র "সুহৃদ্‌গণের প্রত্যেকের নামোল্লেখ পূর্ব্বক অন্ন, পান, যান……দাস, দাসী……ও বরাঙ্গনা সমুদয় প্রদান করিতে লাগিলেন।"—আশ্রমবাসিক পর্ব্ব ১৪।

ধৃতরাষ্ট্র, কুন্তী ও গান্ধারীর শ্রাদ্ধকালে ব্রাহ্মণগণকে শয্যা, খাদ্য-দ্রব্য, মণিমুক্তা……সমলঙ্কৃত দাসী প্রদান করা হইল।"—আশ্রমবাসিকপর্ব্ব ৩৯।

বৈশম্পায়ন জনমেজয়কে কহিতেছেন, "এই ইতিহাস শ্রবণ করিতে আরম্ভ করিয়া সাধ্যানুসারে ভক্তি পূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণকে বিবিধ রত্ন, গাভী, কাংস্যময় দোহনপাত্র, অলঙ্কৃতা কন্যা, বিবিধ যান, বিচিত্র হর্ম্ম্য……প্রভৃতি দান করা কর্ত্তব্য।"—স্বর্গারোহণপর্ব্ব ৬।

ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে কহিতেছেন, "……যাঁহারা যাচকদিগকে গো, অশ্ব, সুবর্ণ, যান, বাহন এবং বিবাহোচিত অলঙ্কার, বস্ত্র ও দাসদাসী প্রদান করিয়া থাকেন,……তাঁহারাই স্বর্গলাভ করিয়া থাকেন।"—অনুশাসনপর্ব্ব ২৩।

ক্লীব বা নপুংসক দাস রাখিবার প্রথাও তৎকালে প্রচলিত ছিল। হনুমান ভীমকে উপদেশ দিতেছেন, "ধর্ম্মকার্য্যে ধার্ম্মিক, অর্থকার্য্যে পণ্ডিত, স্ত্রীলোকের নিকট ক্লীব ও ক্রূরকর্ম্মে ক্রূরদিগকে নিয়োগ করিবে।"—বনপর্ব্ব ১৫০।

নপুংসকগণ অন্তঃপুরে প্রহরীর কার্য্য করিত।

কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে কৌরবপক্ষীয় বীরগণ নিহত হইলে "বৃদ্ধ অমাত্যগণ স্ত্রী ও ক্লীবদিগের সহিত উহাতে (কৌরব শিবিরে) অবস্থান করিতেছিলেন।"—শল্যপর্ব্ব ৬৩।

বৃদ্ধ অমাত্যগণ স্ত্রীলোকদিগের রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন।

নপুংসকদিগকে অন্তঃপুরে স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষক নিযুক্ত করা হইত। অর্জ্জুন নপুংসক সাজিয়া বিরাটরাজার অন্তঃপুরে উত্তরাকে নৃত্য-গীত শিক্ষা দিতেন।

নৈতিক যুগে আর্য্যদিগের দাসদাসী ব্যবহার অনেক কমিয়া গিয়াছিল। ইহার আভাসও মহাভারতে পাওয়া যায়। তবে একেবারে উঠিয়া যায় নাই। কারণ, পরবর্ত্তী কালে অর্থাৎ ঐতিহাসিক যুগেও এ প্রথা ভারতে বর্ত্তমান ছিল। অনুশাসনপর্ব্বে ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে উপদেশ দিতেছেন, "দিবা-বিহার এবং ঋতুমতী স্ত্রী, কুমারী ও দাসীর সহিত সংসর্গ করা নিতান্ত দূষণীয়।"—অনুশাসনপর্ব্ব ১০৪।

শ্রীঅমূল্যচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

উদাসী

তোমরা বাছিয়া লও, যাহা কিছু ভাল পাও,
পরস্পর বিভাগ করিয়া ;
যত কিছু পরিতাপ, যত কিছু অভিশাপ,
রেখে যাও আমার লাগিয়া।

দখিণা মলয় বায়ু, বাড়ে যাতে পরমায়ু,
লও বুকে তোমরা পাতিয়া ;
দগ্ধ বায়ু সাহারায়, পরাণ জ্বালিয়া যায়,
তাই রে'খো আমার লাগিয়া।

নক্ষত্রখচিতাকাশে, সুবিমল চাঁদ হাসে,
দেখ তাহা তোমরা চাহিয়া ;
অমানিশা অন্ধকার, মেঘাবৃত চারিধার
থাক্ তাহা আমার লাগিয়া।

চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় তোমরা সকলে খেও,
স্বর্ণ-খাটে থাকিও শুইয়া ;
পরিত্যক্ত ভস্ম ছাই, যাতে কিছু কায নাই,
রেখো তাহা আমার লাগিয়া।

শান্তি সুখ ভালবাসা, নিতি নব নব আশা,
থেক সব তোমরা লইয়া ;
ঘৃণা কষ্ট অনাদর যাহে দুখ বহুতর,
রেখো তাই আমার লাগিয়া।

প্রশংসা তোমরা লও, যেইখানে যাহা পাও,
সদা অতি যতন করিয়া ;
লোকনিন্দা অপবাদ, নাহি যাতে কারও সাধ,
থাক্ তাহা আমার লাগিয়া।

অনাঘ্রাত সুকুমার, সুবাস কুসুম হার,
পর সবে জীবন ভরিয়া ;
অপবিত্র অপকৃষ্ট, যাহে প্রাণ হয় নষ্ট,
রেখো তাই আমার লাগিয়া।

না লাগে আঁচড় ঘা, কণ্টকে না ফুটে পা',
থাক সুখে সকলে বাঁচিয়া ;
পড়ুক অশনি মাথে, ক্ষতি নাই কারো তাতে,
আমি যদি যাই গো মরিয়া।

শ্রীমতী হেমপ্রভা নাহা।

খেজুরী বন্দর

ভাগীরথীর মোহানার পশ্চিমতটবর্ত্তী নিভৃত বিলাতী ঝাউ-শ্রেণীর (Casuarina tree) মধ্যে বিখ্যাত প্রাচীন বন্দর খেজুরীর দুই একটি অট্টালিকা সমুদ্র-যাত্রিগণের দৃষ্টিপথবর্ত্তী হইয়া থাকিবে। খেজুরী মেদিনীপুর জিলার কাঁথি মহকুমায় অবস্থিত। ইহা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে একটি প্রয়োজনীয় পোতাশ্রয় ছিল। এক দিন খেজুরীর নদীবক্ষে শত শত অর্ণবযান আশ্রয় লাভ করিত,—নানা দেশবাসী সার্থবাহিগণের কোলাহলে এই স্থান মুখরিত থাকিত। ইহার অত্যল্প কাল স্থায়ী অতীত জীবনেতিহাসের গৌরবময় পৃষ্ঠা উন্মুক্ত করিলে সুখসৌভাগ্যের জ্বলন্ত কাহিনী চিত্রিত দেখা যায়।

ভাগীরথীর পলিতে যে সমস্ত দেশভাগ ক্রমান্বয়ে উদ্ভূত হইয়াছে, তন্মধ্যে খেজুরী অন্যতম। প্রাচীনযুগে সুদূর তাম্রলিপ্তির নিকটবর্ত্তী বঙ্গোপসাগর আজ খেজুরী-সীমান্তবর্ত্তী হইয়া বিরাজ করিতেছে;—আজিও সমুদ্র-গর্ভে যে সমস্ত নূতন চরের সৃষ্টি ও পুষ্টি সাধিত হইতেছে—অদূর-ভবিষ্যতে তাহা যে উর্ব্বর ও সুশ্যামল মূর্ত্তিতে জাগ্রত হইয়া বঙ্গভূমির কলেবরের বৃদ্ধিসাধন পূর্ব্বক খেজুরীকে সমুদ্র হইতে দূরবর্ত্তী করিবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে খেজুরীর অবয়ব-সংগঠন আরম্ভ হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। ডি ব্যারোজ (১) (১৫৫৩) ও ব্লেভের (১) (১৬৬০) মানচিত্রে খেজুরী ও হিজলীর অবস্থানপ্রদেশে একটি দ্বীপ উদ্ভূত হইতেছে দেখা যায়। ভ্যালেনটীন (২) (১৬৬০), জর্জ্জ হিরোণ (৩) (১৬৮২) ও বৌরীর (৪) (১৬৮৭) মানচিত্রে হিজলী ও খেজুরী দুইটি দ্বীপাকারে স্বতন্ত্রভাবে চিহ্নিত হইয়াছে। যখন কলিকাতার প্রতিষ্ঠাতা জব চার্ণক ১৬৮৭ খৃষ্টাব্দে সায়েস্তা খাঁ কর্ত্তৃক হুগলী হইতে বিতাড়িত হইয়া আশ্রয়োদ্দেশে হিজলীতে আগমন পূর্ব্বক বাদশাহী সৈন্য কর্ত্তৃক আক্রান্ত ও অবরুদ্ধ হয়েন, সে সময় খেজুরী স্বতন্ত্র দ্বীপাকারে বর্ত্তমান ছিল। ১৭০৩ খৃষ্টাব্দের নাবিকগণের, (৫) ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দের হুইট্‌চার্চ্চের (৬), ১৭৭০

খেজুরীর সমাধিক্ষেত্র ও পরিত্যক্ত খেজুরী
(পোষ্ট আফিসের উপর হইতে গৃহীত)

(১) Map of Bengal in Jao De Barros' Da Asia, Pt. II.

(১) Reproduced copy of Blaev's Magni Mogoleo Imperium in his *Theatrum Orbis Terrarum*, vol. II, in J. A. S. B., pt. I, 1873; also Blochmann's *contributions to the Geography and History of Bengal, Appendix.*

(২) Vanden Broucke's Map of Bengal in Valentyn's Memoir, vol. V.

(৩) George Heron's Chart of Point Palmyra to Hugli in the Bay of Bengal,—*Hedges' Diary, vol. III, Appendix.*

(৪) Thomas Bowery's Chart of the Hughly River in his *Geographical Account of the countries round the Bay of Bengal.*

(৫) Midnapore Dt. Gazetteer, p. 9.

(৬) Whitchurch's map of Bengal from actual survey, reproduced by Cap. Melville in Surveyor General's Office, Calcutta, May, 1866.

খৃষ্টাব্দের বোল্টের (১) ও ১৭৮০ খৃষ্টাব্দের রেণেলের (২) মানচিত্রে খেজুরী দ্বীপ দৃষ্ট হয়। খেজুরী ও হিজলী দ্বীপ-দ্বয়ের ব্যবধানবর্ত্তী জলভাগের নাম কাউখালি নদী ছিল। কাউখালির আলোক-গৃহের নিকটে এই নদীর ক্ষীণ অবশেষ এখনও "কাউখালির খাল"রূপে বর্ত্তমান আছে। উত্তরদিকে এই দ্বীপদ্বয়কে স্থলভাগ হইতে বিচ্ছিন্নকারী জল-স্রোতের চিহ্ন 'কুঞ্জপুর খাল'-রূপে এখনও দৃষ্ট হয়। (৩) হিরোণের মানচিত্রে এই জল-স্রোতগুলি পাঁচ হইতে সাত 'বাম' (Fathom) পর্য্যন্ত গভীর বলিয়া চিহ্নিত আছে। সম্ভবতঃ উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে খেজুরী দেশ-ভাগের সহিত সংযুক্ত হইয়া থাকিবে। ১৮০২ খৃষ্টাব্দে লবণ রপ্তানীর সুবিধার জন্য কুঞ্জপুর খালের পঙ্কোদ্ধারের বিষয় সরকারী কাগজপত্রে জানা যায়। (৪)

কাউখালি আলোকগৃহ

[৮০ ফুট উচ্চ ; × চিহ্নিত স্থান ভূমি হইতে ১৩½ ফুট ঊর্দ্ধে ; এই স্থানে একটি প্রস্তরফলক আছে, উহা ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের বন্যার প্লাবনের উচ্চতাজ্ঞাপক]

"খেজুরী" নাম সম্ভবতঃ খেজুরগাছের সংস্রবে সৃষ্ট হইয়া থাকিবে। এই স্থান 'খেজুরী' অপেক্ষা 'খাজুরী' নামেই অধিক পরিচিত। বৌরী 'খেজুরী'কে 'খাজুরী' (casuree) করিয়াছেন। ১৭০১ খৃষ্টাব্দের নাবিকদিগের চার্টে 'গ্যাজুরী' (Gajouri) আছে। (১) ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে ডি, এনভিল্‌'ক্যাজোরী' (Cajori) লিখিয়াছেন। (২) সেয়ার (১৭৭৮) কর্ত্তৃক প্রস্তুত মানচিত্রগুলিতে ক্যাজোরী (Cajori) দেখা যায়। (৩) রেণেলের ম্যাপে (১৭৮০) কাদ্‌জেরী (Cudjere) পাওয়া যায়। (৪) এই নাম-গুলি 'খাজুরীর'ই বৈদেশিক স্বরূপ হইতে পারে। বৈদে-শিক লেখকগণ স্ব স্ব স্বভাব-সুলভ উচ্চারণের তারতম্যে 'খেজুরী' নামের আরও নানাপ্রকার বানান লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। যথা,—হিরোণ Kedgerye, উইলিয়ম্ হেজেস্ Kegeria, (৫) হ্যামিল্টন Kidgerie, (৬) ১৬৭৯ খৃষ্টাব্দের হুগলী কুঠীর কাগজপত্রে Kedgaree (৭) প্রভৃতি। ইম্পিরিয়াল্ গেজে-টিয়ারে Khijuri ও Kijuri, মেদিনীপুর গেজেটিয়ারে Khejri এবং বেলীর সেটেল্-মেণ্ট রিপোর্টে Kajooreah আছে। (৮) বর্ত্তমান পোর্ট ট্রাষ্ট সারভে Khajuri বা "Date palm place"

(১) *Midnapore Gazetteer, p. 9.*

(২) Rennell's Atlas Plate No. XIX.

(৩) "The Kunjapur Khal was then a deep, broad stream, which completely cut off Khejri and Hijli from mainland, and these again were divided into two distinct islands by the river Cowcolly of which the channel now completely vanishes" Wilson's *Early Annals of the English in Bengal, vol. I, p. 105.*

(৪) 'In 1802 the Kunjapur Khal from the Rasulpur to the Hugli was excavated to facilitate the carriage of salt to Calcutta, and possibly the Khal follows the 'line of the old branch which made Hijli an island". A. K. Jameson's *Final Report on the survey and settlement operations in the Dist. of Midnapore, p. 6.*

(১) *Hedges Diary vol. III p. 208.*

(২) Yule and Burnell's *Hobson-Jobson* S. V. Kedgeree.

(৩) *Hedges Diary vol. III p. 208.*

(৪) Rennell's Atlas, Sheet No. XIV.

(৫) *Hedges Diary vol. I p. 67.*

(৬) *Hedges Diary vol. III p. 208.*

(৭) *Factory records*, Hugli No. 2, 1679, 27th April quoted by Temple in *Bowery.*

(৮) H. V. Bayley's *Report on the settlement of the Majnamootah Estate in the district of Midnapore, 1844. p. 85, para 25.*

করিয়াছেন। (৪) সারভে ইণ্ডিয়া প্রকাশিত Bengal sheetএ এই বানানই দেখা যায়। (৫) নামটি বর্ত্তমান Khajri ও Kedgeree দুই প্রকারে লিখিত হয়। থানার নাম Khajri এবং পোষ্ট আফিসের নাম Kedgeree; খেজুরীর সুখ-সৌভাগ্যের দিনে শেষোক্ত নাম ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। সম্ভবতঃ 'খেজুরী'কে মুখরোচক খিচুড়ি নামক খাদ্যের সমসংজ্ঞক ভাবিয়া য়ুরোপীয়রা Kedgeree করিয়াছেন! কারণ, খিচুড়িকে ইংরাজীতে Kedgeree বলে। আমাদের মনে হয়, নদী বা খালের মুখে নৌকা প্রভৃতির আশ্রয়স্থানে দৃশ্যমানভাবে একটি খেজুরগাছ বর্ত্তমান ছিল,—তাহা দেখিয়া দেশীয় নৌ-চালকরা 'খেজুরী' নামকরণ করিয়া থাকিবে। খেজুরী বন্দরকেই স্থানীয় লোক 'খাজুরী ঘাট' বলিত। নৌকা বা জাহাজের মালপত্র 'ওঠা-নামা' করিবার স্থানকে 'ঘাট' বলে। যশোহর জিলায় খাজুরিয়া গ্রাম আছে,—সেখানে খেজুরের সংস্রবে এই নামের সৃষ্টি বলিয়া বেশ অনুমান হয়। কাঁথি মহকুমাতেই সবং থানায় অন্যতম খাজুরী গ্রাম আছে। (৬) এই নামও খেজুরগাছের নিদর্শন ভিন্ন অন্য কি হইতে পারে?— গাছের নামের অনুকরণে বাঙ্গালার বহু পল্লীর নাম সৃষ্ট। হিজলী, পিপলী, গরাণিয়া, তেঁতুলিয়া, করাঞ্জি প্রভৃতির উল্লেখ করা যাইতে পারে। কলাগেছে, আমগেছে, পলাশবাড়ী, জামবাড়ী প্রভৃতির ত কথাই নাই। খেজুরীর পাশেই তালপাটী গ্রাম, খাল ও ঘাট আছে। সম্ভবতঃ তালগাছের নামসংস্রবে তালপাটী (তালপত্রী?) হইয়া থাকিবে। দূর হইতে দৃশ্যমান তাল ও খেজুরগাছ দ্বারা নদী বা খালগুলিকে চিনিবার উপায়ের জন্য এই সমস্ত নামের সৃষ্টি হওয়াই সম্ভব।

হিজলীর লোক-বিশ্রুত তাজ খাঁ মসনদ্-ই-আলীর বংশীয়গণের রাজত্বলোপের পর (১৬৬১), (১) খেজুরী ও হিজলীদ্বীপদ্বয় পর্ত্তুগীজ ও মগ-দস্যুদিগের অত্যাচারে অধিবাসিবর্জ্জিত হইয়া হিংস্রজন্তুপূর্ণ অরণ্যে পরিণত হয়। হিরোণ ও রেণেলের মানচিত্রে এই সমস্ত স্থানে দীর্ঘ অরণ্য ("Long wood") ও ঘনসন্নিবিষ্ট বৃক্ষাবলী চিহ্নিত আছে। ওলন্দাজ লেখক স্কাউটেন্ (Ganter Schouten) লিখিয়াছেন,—"আমরা ১৬৬৪ খৃষ্টাব্দের ১৬ই জানুয়ারী জলেশ্বর নদী (২) বামে রাখিয়া (গঙ্গার মোহানার দিকে) যাইতেছিলাম। এখানে দেশভাগে কিয়দ্দূর বিস্তৃত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অরণ্য দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল। ঐ সমস্ত অরণ্য সর্প, গণ্ডার, বন্য-মহিষ ও ব্যাঘ্রাদি হিংস্রজন্তুতে পূর্ণ ছিল। এই জন্য বঙ্গদেশের লোক সমুদ্রসন্নিহিত স্থানে বাস করে না।" (৩) তাজ খাঁ মসনদ্-ই-আলীর সমৃদ্ধিপূর্ণ রাজধানী হিজলী এবং তাহার উপকণ্ঠ খেজুরীর এই দুরবস্থা বোম্বেটে ও লুণ্ঠকগণের নির্দ্দয়-হস্তের চিহ্ন ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। সারদ্বীপের নিকটবর্ত্তী রোগস্ রিভার (Rogues' River) (৪) এই সমস্ত জল-দস্যুর আড্ডা ছিল। ইহারা দুর্দ্ধর্ষ ডাকাতী ও লুণ্ঠনবৃত্তিতে গঙ্গার মোহানাবর্ত্তী সমগ্র সুন্দরবন, হিজলী ও খেজুরী প্রভৃতি সমৃদ্ধ স্থানগুলি জনমানবহীন অরণ্যে পরিণত করিয়াছিল। (৫)

(১) *Hedges' Diary vol. III, p. 208.*

(২) Bengal sheet No. $73\frac{0}{8}$

(৩) Thana Salang, Jurisdiction list village No. 313;

(৬) ম্যাপ দৃষ্টে জানা যায়, বগুড়া, ভূপাল ও টৌচী উপত্যকায় খাজুরী (Khajuri) এবং ফেরাবাদের দুই স্থানে "খেজুর হাট" আছে।

(১) Valentyn's Memoir, vol. V, p. 158; *cf.* রামপুর নবাবের লাইব্রেরীতে রক্ষিত ফার্সী "মরকত-ই-হাসান" হস্তলিপি (শ্রদ্ধেয় ঐতিহাসিক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয়ের অনুগ্রহে প্রাপ্ত।)

"Hijli has been conquered by the imperial forces. Bahadur with his family has been captured as a punishment for his disobedience (*i. e.* rebellion) [probably in Jan. or Feb. 1661]" *Maraqat—folio No. 116.*

(২) জলেশ্বর নদী সম্ভবতঃ সুবর্ণরেখাকে উদ্দেশ করিয়া বলা হইয়াছে।

(৩) Schouten's *Voiage aux Indes Orientales. vol. ii, p.* 143 (Sir R. Temple's translation).

(৪) হেজেসের টীকাকার Mr. Barlowর মতে রোগস্ রিভার বর্ত্তমান 'চ্যানেল ক্রীক' (মাড়গঙ্গা নদী) (*Hedges Diary vol. III p. 208*) Hobson-Jobsonএ Yule and Burnell ইহা 'কুল্পী ক্রীক' বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। (*Hobson-Jobson* s. v. Rogues' River).

(৫) *cf.* Bernier—"They made women slaves, great and small, with strange cruelty, and burst all they could not carry away. And hence it is that there are seen in the mouth of the Ganges so many fine cities quite deserted."

কোম্পানীর বঙ্গদেশীয় কুঠীসমূহের প্রথম গবর্ণর উইলিয়ম হেজেস্ ১৬৮৩ খৃষ্টাব্দে খেজুরী দ্বীপে অবতরণ করিয়া একটি পুরাতন মৃন্ময় দুর্গের ভগ্নাবশেষ দেখিয়াছিলেন। উহাতে দুইটি ছোট কামান ছিল। ষ্ট্রীন্‌শ্যাম মাষ্টার ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে বোধ হয় এই দুর্গকেই লবণ প্রস্তুতের কারখানারক্ষার্থ মোগল-নির্ম্মিত দুর্গ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। (১)স্কাউটেন ১৬৬৪ খৃষ্টাব্দে গঙ্গার মোহানাবর্ত্তী অরণ্যের মধ্যে একটি মৃত্তিকা-নির্ম্মিত দুর্গ দেখিয়াছিলেন,—উহাতে কতকগুলি দুর্দ্দশাপন্ন কৃষ্ণাঙ্গ ছিল। (২) সম্ভবতঃ এই দুর্গ মসনদ্-ই-আলী ও তদ্বংশীয়গণের দুর্গের ভগ্নাবশেষ। শাহজাহানের রাজত্ব-সময়ে এই সমস্ত জলদস্যুর অত্যাচার নিবারণ-জন্য হিজলীতে ফৌজদারীর পদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। (৩) হিজলীর তাজ খাঁ মসনদ্-ই-আলী ও তদ্বংশীয়গণ ফৌজদারের ভার প্রাপ্ত হইয়া এই দুর্গ নির্ম্মাণ করেন বলিয়া সম্ভব। পর্ত্তুগীজ মিশনরী সিব্যাষ্টিয়ান্ ম্যানরিক্ ১৬২৯ খৃষ্টাব্দে গঙ্গাসাগরের সমীপবর্ত্তী চরে পোত-দুর্ঘটনায় হিজলীর উপকূলে উপস্থিত হইলে মসনদ্-ই-আলীর রক্ষিসৈন্য ও রণতরী মোগলদিগের পক্ষে তাঁহাদিগের জাহাজাদি আটক করিয়াছিলেন। (১) যাহা হউক, হেজেস্ এই দ্বীপটিতে প্রচুর বরাহ, হরিণ, মহিষ ও ব্যাঘ্রাদি বন্যজন্তু দেখিয়াছিলেন। এই দ্বীপটি তাঁহার নিকট উর্ব্বর ও আনন্দদায়ক বোধ হইয়াছিল। (২) হেজেস্ কথিত খেজুরীতে এই সমস্ত বন্যজন্তুনিবাস—ইহার দস্যুর উপদ্রবে উচ্ছিন্ন হওয়ারই সমর্থন করে। বর্ত্তমান সময়ে খেজুরী অঞ্চলে মৃত্তিকা-গর্ভে যে সমস্ত ভগ্ন দেব-মূর্ত্তি আদি পাওয়া যায়, তাহাতে ইহার প্রাচীন জননিবাসই প্রতিপন্ন হয়। (৩) হিজলী দ্বীপের যমজ সহোদরা এবং প্রায় একাঙ্গীভূতা খেজুরী কখনও হিজলীর গৌরবের দিনে পরিত্যক্ত অরণ্য ছিল না। চার্ণক দস্যুবিধ্বস্ত হিজলীকে ভয়ঙ্কর স্থান (direful place) বলিয়াছিলেন। (৪)

খেজুরীর নিকট রসুলপুরের মোহানা
(এইখানে 'কপালকুণ্ডলা'র নবকুমারের বাত্যাতাড়িত নৌকা প্রবেশ করিয়াছিল)

অষ্টাদশ শতাব্দীতে কালক্রমে নদীর বহতা (channel) পরিবর্ত্তিত হওয়ায় খেজুরী একটি পোতাশ্রয়ে (Anchorage) পরিণত হয়। হিজলী জিলাভুক্ত খেজুরী ১৭৬৫

(১) "On the other side was the western channel by the island of Hijli, where the Mogul had built a small fort to protect his salt works." *Diary of Streynsham Master.*

(২) 'Therefore, on our way we only saw a little clay fort where some Negroes were existing wretchedly enough." *Schouten, vol. ii, p. 143*—Temple's translation.

(৩) "The Arakanese and Portuguese pirates now began to commit depredations on the Orissa coast and in Hijli. Tracts of lands became depopulated and the ryots left their fields. Shahjahan thereupon annexed Hijli to Bengal so as to enable the imperial fleets stationed at Dacca to guard against these piratical raids.' J. A. Campos, *History of the Portuguese in Bengal, p 95.*

cf. Hunter's *S. A. B. vol. III, p. 199*"——this Foujdari or Magistracy was made apparently for the purpose of subjecting the whole coast liable to the invasions of the Maghs, to the Royal jurisdiction of the Nawara or Admiralty fleet of boats stationed at Dacca.

(১) *Bengal: Past and Present, vol. XII*, 1916, pp. 281-286—Padre Maestro Fray Seb. Manrique in Bengal.

(২) *Hedges' Diary vol. ii p. 67.*

(৩) সম্প্রতি জনকাবাড়ী গ্রামের শ্রীযুত বরেন্দ্রকৃষ্ণ মিশ্রার একটি ও সাত বন্দ গ্রামে একটি পুষ্করিণী খননে সুন্দর ভগ্ন দেবমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। ঐগুলি লেখকের নিকট রক্ষিত আছে।

(৪) W. W. Hunter's *History of British India.*

খৃষ্টাব্দে কোম্পানীর দেওয়ানী গ্রহণের সময় বৃটিশ অধিকার-ভুক্ত হয়। (১) সুতরাং খেজুরী এই সময়ে বা ইহার অত্যল্পকাল পরে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কার্য্যস্থল হইয়া থাকিবে। কোম্পানীর আমলে দস্যু-বিধ্বস্ত খেজুরীর বন-জঙ্গল কাটিয়া মনুষ্যবাসোপযোগী করা হয়। এই জন্য খেজুরীকে রাজস্বসম্বন্ধীয় কাগজপত্রে 'জঙ্গলবুরি' মৌজা বলে। মেদিনীপুর কালেক্টরীতে রক্ষিত ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দের পঞ্চবার্ষিক লিপিতে (Quinquinnial Register) জনৈক বন্দোবস্তগ্রহীতার দখলে খেজুরীর উনত্রিশ বাটি (২) ১৫ বিঘা ৮ ছটাক জমী দৃষ্ট হয়। (৩) সম্ভবতঃ এই ব্যক্তিকে জঙ্গল আবাদের জন্য বন্দোবস্ত দেওয়া হইয়াছিল।

ইতঃপূর্ব্বে কোম্পানীর বৃহৎকায় বাণিজ্য-জাহাজগুলি বালেশ্বর পর্য্যন্ত আসিলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাহাজে মালপত্র পরিবর্ত্তিত করিয়া হুগলী পর্য্যন্ত প্রেরিত হইত। কারণ, ঐ সমস্ত জাহাজ ভাগীরথীর মোহানায় চরবহুলতার জন্য আর এই দিকে অগ্রসর হইতে পারিত না। সর্ব্বপ্রথম ১৬৭২ খৃষ্টাব্দে ক্যাপ্টেন জেমস্ "রেবেকা" নামক জাহাজকে পথিপ্রদর্শক নাবিকের (Pilot) সাহায্যে ভাগীরথী পর্য্যন্ত আনিতে সমর্থ হয়েন। ক্যাপ্টেন ষ্ট্যাফোর্ড ১৬৭৯ খৃষ্টাব্দে 'ফ্যাল্‌কন' (Falcon) নামক জাহাজ ভাগীরথী পর্য্যন্ত আনয়ন করেন; ঐ সময় হইতে বালেশ্বরে বৃহৎ জাহাজগুলির মাল পরিবর্ত্তন না হইয়া হিজলীতে পরিবর্ত্তিত হইবার রীতি হয়। (৪) এই সময় হিজলী বন্দরের স্থানাধিকার করে। ইহার অত্যল্পকাল পরে খেজুরীও সামুদ্রিক বন্দর ও বাণিজ্য-কেন্দ্রস্থল হইবার সূচনা দেখাইয়াছিল, কারণ, উইলিয়াম হেজেস্ তাঁহার বিখ্যাত রোজনামচায় লিখিয়াছেন, ১৬৮৪ খৃষ্টাব্দে পর্ত্তুগীজরা খেজুরী ও হিজলী দ্বীপদ্বয় অধিকার করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিল। (১) খেজুরীর প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি না হইলে ইহা পর্ত্তুগীজদিগের প্রলোভনের বস্তু হইতে পারিত না। অতঃপর কোম্পানীর বাণিজ্য-সমৃদ্ধির দিনে জাহাজের মালপত্র পরিবর্ত্তনের কার্য্য খেজুরীতে সংঘটিত হইলে স্থানটি সুরম্য নগরের শ্রী-শোভা ধারণ করে। (২)

এসিষ্টাণ্ট রিভার সারভেয়র মিষ্টার রীক্‌স্ (H. G. Reaks) খেজুরী সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—"কলিকাতার অভ্যুদয়ের সহিত সামুদ্রিক নৌ-যাত্রীর আরম্ভ-পথ খেজুরীতে সুন্দর পোতাশ্রয় সৃষ্ট হওয়ায় উহা একটি প্রয়োজনীয় স্থানে পরিণত হয়। মোহানার ঐ স্থান হইতে ভাগীরথীর পথে কলিকাতা পর্য্যন্ত যাতায়াত বৃহৎ জলযানগুলির পক্ষে কষ্ট-সাধ্য ও বিপজ্জনক ছিল বলিয়া পথিমধ্যে খেজুরীতে এই সমস্ত জাহাজ অবস্থান করিত এবং সেই স্থানে মালপত্র ও আরোহী পরিবর্ত্তিত করিয়া 'শ্লুপ' (sloop) নামক ক্ষুদ্র জাহাজের সাহায্যে কলিকাতায় আমদানী-রপ্তানী চলিত। প্রতিনিধির (Agent) নিবাস-গৃহ, পোর্ট অফিস এবং জাহাজযাত্রিগণের জন্য বিশ্রামকক্ষ (wating room) নির্ম্মিত হইয়া স্থানটি একটি সহরে পরিণত হইয়া উঠিল। তৎকালীন "কলিকাতা গেজেটে" প্রকাশিত পশ্চাল্লিখিত বিজ্ঞাপন দর্শনে জানা যাইবে,—অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ-ভাগে এই স্থান কিরূপ সমৃদ্ধিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল;—"১৭৯২ খৃষ্টাব্দের ২৯শে মে তারিখে খেজুরীতে অল্পাধিক ৮ বিঘা জমীর উপর অবস্থিত একটি বৃহৎ বাহির-'দালান' (hall), চারিটি শয়ন-গৃহ এবং উন্মুক্ত বারান্দা-সংবলিত একটি দ্বিতল অট্টালিকা নীলামে বিক্রীত হইবে।"

"এই সময়ে খেজুরী হইতে কলিকাতা যাতায়াত নৌকা দ্বারা নিষ্পন্ন হইত। কলিকাতায় প্রচারিত সংবাদপত্রসমূহ দ্বারা প্রেরিত দ্রুতগামী ডিঙ্গী নৌকাগুলি খেজুরী হইতে

---

(১) "Hijili and Tamluk did not come under company's administration until the grant of the Diwani in 1765." Firminger's *Fifth Report, vol. I, Introduction, p. cxxiii.*

(২) 'বাটি' উড়িষ্যার প্রচলিত এক প্রকার ভূমির পরিমাণ—২০ বিঘাতে এক 'বাটি' হয়। এই হিসাবে খেজুরীর বন্দোবস্তকৃত ভূমি স্থানীয় মাপের প্রায় ৬০০/ বিঘা হয়। এই পরিমাণ ষ্ট্যাণ্ডার্ড ৭৫০/ বিঘার উর্দ্ধ হইবে। খেজুরীর প্রচলিত এক বিঘা=(৭ ফুঃ ১০½" ই × ২) (৭" ফুঃ ১০½" × ১৬) বা ২২০৫ বর্গ গজ। বর্ত্তমান সময়ে খেজুরী মৌজার পরিমাণ ষ্ট্যাণ্ডার্ড বিঘা। সম্ভবতঃ প্রাগুক্ত বন্দোবস্ত আনুমানিকভাবে হইয়া থাকিবে।

(৩) Bayley's *Majnamootlah Report, p. 85.*

(৪) Bowery's *countries round the Bay of Bengal, p. 166, n2,*

(১) Yule, *Diary of Hedges, vol. I, p. 172.*

(২) খেজুরী কোন্ সময় হইতে পোতাশ্রয়ে পরিণত হয়, ঠিক জানা যায় না। সম্ভবতঃ ১৭৮০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্ববর্ত্তী কোনও সময়ে হইয়া থাকিবে। কারণ, ঐ সময়ে প্রস্তুত রেণেলের মানচিত্রে (sheet no xix) খেজুরী দ্বীপের তীরভূমির পার্শ্ব দিয়াই জাহাজের পথ (Cadjaree Road) চিহ্নিত আছে।

বহিঃসমুদ্রে গমন করিয়া য়ুরোপের সর্ব্বপ্রথম সংবাদের জন্য নবাগত জাহাজে উপস্থিত হইত। সহরে এইরূপে লব্ধ নূতন সংবাদ প্রচারের জন্য স্বভাবতঃই একটি উত্তেজনাপূর্ণ 'দৌড়াদৌড়ি' পড়িয়া যাইত। উত্তরকালে কলিকাতা পর্য্যন্ত 'পাখা' (arms) সঞ্চালনশীল সঙ্কেতবাহক মঞ্চসমূহ প্রতিষ্ঠিত হইয়া সংবাদ আদান-প্রদান নির্ব্বাহ হয়। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে বৈদ্যুতিক বার্ত্তাবহ যন্ত্র-স্থাপন দ্বারা এই প্রথার পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছিল। এখনও কতকগুলি সংবাদ-বহনের উচ্চ সঙ্কেত-মঞ্চ নদীতীরে বর্ত্তমান ; বড়ুল (Brul), ধঙ্গা (?) ও হুগলী পয়েণ্টে এরূপ দেখিতে পাওয়া যাইবে। ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে খেজুরী হইতে কলিকাতা যাতায়াত কিরূপ সহজসাধ্য ছিল, তাহা ঐ বৎসরের ১৯শে আগষ্ট তারিখের এই বিজ্ঞাপন দর্শনে জানা যাইবে,— 'বেরিংটন জাহাজের মিডশিপম্যান নামক কর্ম্মচারী জন্ ল্যাম্ব গত ২০শে জুলাই খেজুরীস্থিত উক্ত জাহাজ হইতে পলায়ন করিয়া অত্যল্পক্ষণ পরেই কলিকাতায় দৃষ্ট হইয়াছিল।' ১৬৩৬ খৃষ্টাব্দে শুল্ক-বিভাগের কর্ম্মচারিগণ খেজুরীতে জাহাজগুলি পরিদর্শন পূর্ব্বক সমুদ্রযাত্রার অনুমতি প্রদান করিতেন। খেজুরীর সমীপবর্ত্তী নদীপথ ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান থাকিয়া পরে মধ্যনদীতে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। অতঃপর খেজুরী পোতাশ্রয় ও নদীপ্রণালী সত্বরে বিনষ্ট হয়। জাহাজ গমনাগমন বর্জ্জিত হইয়া খেজুরী অপ্রয়োজনীয় হইয়া উঠে। এক্ষণে এই স্থানে দর্শনীয় বস্তুর মধ্যে একটি জোয়ার-ভাটার সঙ্কেত-নির্দ্দেশক যন্ত্র (Tidal semaphore) ও সময়ক্রমে সম্মিলিত বাজার মাত্র দৃষ্ট হয়।" (১)

সঙ্কেতের জন্য ব্যবহৃত কামান (Signalling gun)

১৮০৮ খৃষ্টাব্দের "কলিকাতা গেজেটে"র বিজ্ঞাপন-স্তম্ভে খেজুরীতে একটি বাড়ী বিক্রয়ের এইরূপ বিজ্ঞাপন দেখা যায়,—"খেজুরী এষ্টেট। আগামী বৃহস্পতিবার ১১ই ফেব্রুয়ারী, ১৮০৮ খৃষ্টাব্দ, টুলো কোম্পানীর (Tulloh & Co) নীলাম-গৃহে পরলোকগত শ্রীযুত জন রাসেল ও উইলিয়াম্ হল্যাণ্ডের সম্পত্তির একজিকিউটরগণের অনুমতিক্রমে খেজুরীস্থিত যে বাড়ীতে ইতঃপূর্ব্বে শ্রীযুত রাসেল্ ও হল্যাণ্ডের (Messrs Russel and Holland) কার্য্যালয় অবস্থিত ছিল—সেই মূল্যবান্ ও সুবিখ্যাত দ্বিতল অট্টালিকা (Valuable and wellknown upper roomed house) এবং অন্যান্য সুবিস্তৃত গৃহাদি সায় ন্যূনাধিক ১ শত বিঘা ভূমি সম্পূর্ণ (without reserve) প্রকাশ্য নীলামে বিক্রীত হইবে।" (১) এই বিজ্ঞাপন খেজুরীর এককালীন সুখ-সৌভাগ্যের পরিচায়ক সন্দেহ নাই।

১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে ফরাসীদিগের কতকগুলি রণতরী বালেশ্বরে কয়েকটি ইংরাজ-জাহাজ ধৃত করে, তজ্জন্য খেজুরীস্থিত বৃটিশ জাহাজগুলি ফরাসী কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনায় কলিকাতায় আতঙ্ক উপস্থিত হইয়াছিল। নদীর মন্দাবস্থা ও প্রতিকূল বায়ুর জন্য খেজুরী হইতে জাহাজগুলি কলিকাতা আনিবার চেষ্টা সফল হয় নাই। (২) ইহার কয়েক বর্ষ

(১) *Bengal : Past and Present, Vol, II, no 2, April, 1918.*

(১) Hug David Sanderson's *Selections from Calcutta Gazette, vol, II;* (*1806-1815*).

(২) "Calcutta in January 1763 was in a panic, as the French fleet was in Balasore Roads and had captured several English vessels. It was found they could not remove the ships from Kedgeree to Calcutta as they could not easily return on account of the unfavourable winds and very dangerous channels."

Long's *Notes from selections from records of the Govt. of India Introduction, p. 40,*

Also, *ibid p, 295,* "A French fleet at Balasore."

পরে একবার খেজুরী হইতে ফরাসীদিগের রসদ সংগ্রহে বাধাপ্রদানের জন্য ইংরাজদিগের সৈন্যসমাবেশ আবশ্যক হইয়াছিল। জলেশ্বরের নিকট মোহনপুরে বস্ত্র-ব্যবসায়-ব্যপদেশে মঁসিয়ে অস্যাঁট (Monsieur Aussant) নামক জনৈক ফরাসী রেসিডেণ্ট থাকিতেন। তাঁহার শরীররক্ষী রাখিবার সর্ত্ত লইয়া ইংরাজদিগের সহিত বিবাদ উপস্থিত হয়। কর্ত্তৃপক্ষের নির্দ্দেশমতে (১) মেদিনীপুরের ইংরাজ রেসিডেণ্ট জন পীয়ার্স লেপ্টনাণ্ট বেট্‌ম্যান নামক সৈন্যাধ্যক্ষকে দুই দল সৈন্য লইয়া খেজুরী ও হিজলীতে প্রেরণ করেন। ফরাসী বা ওলন্দাজগণ কর্ত্তৃক খেজুরীর উপকূলে যুদ্ধ-জাহাজ ভিড়াইয়া রসদ গ্রহণের সম্ভাবনা ছিল। বেট্‌ম্যানের প্রতি আদেশ ছিল—মালপত্র বহনোপযোগী গবাদি দেশের ভিতরের দিকে ২০ মাইল দূরে সরাইয়া দিবেন এবং সমুদায় রসদাদি নষ্ট করিবেন। বেট্‌ম্যান সৈন্যদলসহ উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, ফরাসীরা খেজুরীতে প্রচুর চাউল সংগৃহীত করিয়া রাখিয়াছে এবং এই স্থানের অধিবাসীরাও ফরাসীদিগের পক্ষপাতী হইয়া পড়িয়াছে। (২) যাহা হউক, ফরাসীদিগের বিরুদ্ধ মনোভাবের চিহ্ন না পাইয়া ১৭৭০ খৃষ্টাব্দের বর্ষাকালে সৈন্যদল অপসৃত করা হয়। (১)

'বাউটা' মঞ্চ ও প্রাঙ্গণ- এইখানে Signal mast ছিল
(Backgroundএ ভাগীরথীর মোহানা; বামপার্শ্বে অস্পষ্টভাবে একটি জাহাজ দেখা যাইতেছে)
(১) কামানবাহী গাড়ী। (২) কামান। (৩) তিনটি প্রোথিত ক্ষুদ্র কামান।

কোম্পানীর আমলের খেজুরীর পথে নৌ-দস্যুর উৎপাত ছিল। এ জন্য সরকার বাহাদুর ভাগীরথীর মোহানার পথে নানা স্থানে 'গার্ড বোট' বা চৌকি নৌকার ব্যবস্থা করেন। এই সকল নৌকা পুলিসের তত্ত্বাবধানে নদীর নানা স্থানে পাহারা দিত। ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দের ২৪শে এপ্রিল তারিখযুক্ত একটি সরকারী আদেশ হইতে জানা যায়, গবর্ণর জেনারেল বাহাদুর হিজলীর ম্যাজিষ্ট্রেটকে অন্যান্য কয়েকটি স্থান ব্যতীত তালপাটী হইতে হিজলীর বাক পর্য্যন্ত ৭ ও ৮ নং বোটের পাহারার বন্দোবস্ত করিলেন বলিয়া জানাইতেছেন। প্রত্যেক চৌকি নৌকায় একটি করিয়া লাল নিশান ও সেই নিশানের উপর সাদা অক্ষরে বাঙ্গালা ভাষায় নৌকার নম্বর থাকিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। (২)

[ক্রমশঃ।

শ্রীমহেন্দ্রনাথ করণ।

(১) John Cartier's letter to John Pierce, dated 3rd March, 1770 Calcutta—Firmenger's *Bengal District Records, Midnapore, vol II, p, 180.*

(২) "Mr. Bateman had written to say that upon enquiry he found there was a great deal of rice at Khajri belonging to the French and several peons with it. As the people seemed to be quite under the French, he thought it not improbable that they might move the rice into the jungles." J. C Price's *Note on the History of Midnapore, vol, I p, 79.*

(১) *Midnapore Dt. Gazetteer, p. 46.*

(২) কলিকাতা এ কাল ও সেকাল, শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়, ৬৭০ পৃষ্ঠা।

রূপের মোহ

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

রমেন্দ্রের কবিতাচর্চ্চায় বেশ বিঘ্ন ঘটিতে লাগিল।

বাল্যবন্ধুর গৃহে প্রায়ই আহারের ও ভ্রমণের নিমন্ত্রণ। আজ নৌকাযোগে বোটানিক্যাল গার্ডেন, কা'ল চিড়িয়াখানা, পরশু যাদুঘর ইত্যাদি। যে কোনও দর্শনীয় স্থানে যাইবার সময় সুরেশচন্দ্র রমেন্দ্রকে লইয়া যাইতেন। সুরেশচন্দ্রের, বিশেষতঃ অমিয়া ও সরযূর সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ সে এড়াইতে পারিত না; এড়াইবার জন্য সে বিশেষ চেষ্টাও করিত না। যে দিন কোথাও যাওয়া ঘটিত না, সে দিন আহারাদির পর খালি গল্প ও নানাবিধ বিষয়ের আলোচনা চলিত। কবিতাচর্চ্চায় বিশেষ বিঘ্ন ঘটিতেছিল বলিয়া রমেন্দ্র যে বিশেষ ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল, তাহার ব্যবহার দেখিয়া কেহ তাহা অনুমান করিতে পারিত না। মার্জ্জিতরুচি, বিদুষী তরুণীদিগের সাহচর্য্যে সে ভালই ছিল। প্রথমতঃ একটু সঙ্কোচ ও কুণ্ঠা অনুভব করিত; কিন্তু শেষে এমন দাঁড়াইল যে, সে নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বেই বন্ধুগৃহে হাজির হইত এবং যে সময়ে মেসে ফিরিয়া আসিলে চলিতে পারিত, সে সময়টাও সে তথায় বসিয়া নানা আলোচনায় যোগ দিত।

যে ভারতীর স্বর্ণবীণার মধুর গুঞ্জনে তাহার চিত্ত অধিকাংশ সময় মগ্ন হইয়া থাকিত, এখন একেবারে তাঁহার কুঞ্জসীমার বাহিরে চলিয়া যাওয়ায় মাঝে মাঝে তাহার চিত্তে অতৃপ্তির একটা ছায়াপাত হইত বটে; কিন্তু তাহা অতি ক্ষীণ ও মুহূর্ত্তস্থায়ী। অন্য পক্ষের প্রবল আকর্ষণে মনের সে অস্বাচ্ছন্দ্য-অবস্থা অল্পেই অন্তর্হিত হইত। অমিয়ার ধীর, অথচ সহজ, সরল আলাপ-ব্যবহারে তাহার হৃদয়-বীণার কোন অলক্ষ্য তন্ত্রীতে যে মধুর রাগিণীর মধুর সুর বাজিয়া উঠিত, তাহারই ধ্যানে সে যেন নিমগ্ন হইয়া পড়িতেছিল।

আজ সন্ধ্যায় রমেন্দ্র একটু সকাল সকাল মেসে ফিরিয়া আসিয়াছিল। অমিয়া ও সরযূর কোন আত্মীয়ভবনে নিমন্ত্রণ ছিল, তাই সে ছাত্রকে পড়াইয়াই সোজা মেসে তাড়াতাড়ি ফিরিয়া আসিয়াছিল। আহারাদির পর টেবলের সম্মুখে বসিয়া সে তাহার কবিতার খাতাখানি টানিয়া বাহির করিল। কয়েক দিন পূর্ব্বে সে একটি কবিতার কয়েকটি চরণ লিখিয়াছিল, অদ্যাবধি তাহা সমাপ্ত হয় নাই। সেই অর্দ্ধরচিত কবিতাটি সমাপ্ত করিবার সে চেষ্টা করিতে লাগিল।

সম্মুখের খোলা জানালা দিয়া নক্ষত্রচিত্রিত আকাশের অনেকখানি দেখা যাইতেছিল। রমেন্দ্র দোয়াতের পার্শ্বে কলমটি রাখিয়া দিয়া নীরবে সেই দিকে চাহিয়া রহিল।

ধ্যান আজ কিছুতেই যেন একাগ্র হইতে চাহিতেছিল না। কল্পনার ধ্যান করিতে গিয়া এ কাহার চিত্র মানসপটের সমগ্র স্থানটি অধিকার করিয়া বসিতেছে? কি মধুর মুগ্ধচ্ছবি! যৌবনের প্রথম প্রভাতের মুকুলিত সৌন্দর্য্য এখন দলরাজি-বিকশিত পদ্মের ন্যায় চারিদিকে কি শোভার বিস্তারই না করিয়াছে। বর্ণে, গন্ধে, ঔজ্জ্বল্যে কি পূর্ণ পরিণতিই ঘটিয়াছে! অতীতের স্বপ্ন আবার কেন নূতন করিয়া তাহার চিত্তকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তুলিতেছে! এ চিন্তা তাহার পক্ষে নিষিদ্ধ, তবু কেন সে তাহার মনকে এই নিষিদ্ধ চিন্তার আবর্ত্তে আকৃষ্ট হইতে দিল? সঙ্গত নহে,

তাহা সে জানে, তথাপি, তপনতাপবিগলিত তুষারধারার ন্যায় আকস্মিক চিন্তাস্রোত অতর্কিতভাবে তাহার চিত্তকে কোথায় ভাসাইয়া লইয়া চলিয়াছে ?

রমেন্দ্র উঠিয়া দাঁড়াইল—অধীরভাবে গৃহমধ্যে পাদচারণা করিতে লাগিল। জামার পকেটে হাত পড়িবামাত্র সে থমকিয়া দাঁড়াইল। সকালে দেশের পত্র আসিয়াছিল; তখন সে ষ্টীমারে বেড়াইতে যাইবে বলিয়া সুরেশের বাড়ী যাইতেছিল। কাযেই পত্রখানি না পড়িয়াই পকেটে রাখিয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছিল। সমস্ত দিনের উৎসাহ, আনন্দ ও উত্তেজনার আতিশয্যে চিঠির কথা সে সম্পূর্ণ ভুলিয়া গিয়াছিল। এখন পকেটে হাত দিবামাত্র উহা তাহার হাতে ঠেকিল।

খামের উপরের শিরোনামা পড়িয়া রমেন্দ্র একবার মুখ বিকৃত করিল। ধীরে ধীরে খামখানা ছিঁড়িয়া ফেলিল। নারী-হস্তাক্ষরে পত্রখানি লিখিত। যে লিখিয়াছে, সে তাহারই পত্নী—সহধর্ম্মিণী!

কিন্তু কি সাধারণভাবেই না লিখিত! সম্বোধন হইতে নাম স্বাক্ষর পর্য্যন্ত—শুষ্ক, পুরাতন, বৈচিত্র্যহীন! নদীর গর্ভ বিদ্যমান, কিন্তু কূলপ্লাবী জলস্রোত কোথায় ?

"অনেক দিন আপনি দেশে আসেন নাই; এবার পূজার সময় আসিবেন কি? মা আপনাকে দেখিবার জন্য বড় ব্যস্ত। আগে কয়েকখানি পত্র লিখিয়াছি, কিন্তু উত্তর কখনও পাই নাই।"

বিন্দুমাত্র সরসতা নাই! যে পত্রে হৃদয়ের উচ্ছ্বাস ব্যক্ত না হইল, তাহা লিখিবার সার্থকতা কোথায় ?

ক্ষুব্ধচিত্তে রমেন্দ্রনাথ শত খণ্ডে চিঠিখানা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া শয্যার উপর বসিল। চিন্তাস্রোত ভিন্ন পথে চলিল। এম্‌-এ পরীক্ষায় প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইবার পর তাহার বিবাহ দিবার জন্য মাতার কি প্রাণপণ আগ্রহ ও চেষ্টা! কিন্তু কোনমতেই সে বিবাহ করিবে না, আজীবন চিরকৌমার্য্য পালন করিবে। অবশিষ্ট জীবন সে শুষ্ক কল্পনার ধ্যানেই কাটাইয়া দিবে। বিবাহে তাহার সুখ নাই। যাহাকে পাইলে তাহার জীবন সার্থক ও ধন্য হইত, সমাজ ও অবস্থা তাহাকে সে অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়াছিল। সুতরাং বিবাহ সে কখনই করিবে না। কিন্তু মাতার নয়নাশ্রুর কাছে তাহাকে পরাজয় স্বীকার করিতে হইয়াছিল। পিতাকে সে শৈশবে দেখিয়াছিল, তাঁহার কথা রমেন্দ্রের ভাল স্মরণ নাই। মাতার স্নেহদৃষ্টিই সর্ব্বদা তাহাকে অক্ষয় কবচের মত রক্ষা করিয়া আসিয়াছে। তাহাদের আর্থিক অবস্থা ভালই ছিল। মাতার শাসন ও পালননৈপুণ্যে সে সুশিক্ষায় বঞ্চিত হয় নাই। জননী একাধারে তাহার পিতা ও মাতার আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

মাতার আগ্রহাতিশয়ে অবশেষে তাহাকে বিবাহ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু প্রাচ্য ও প্রতীচ্য শিক্ষার সংমিশ্রণে সে যে অপূর্ব্ব আদর্শ মনের মধ্যে গড়িয়া রাখিয়াছিল, পত্নী তেমন হইল না, কাহারও হয় না। প্রতিভার বর্ণ কালো না হইলেও সে গৌরী নহে, তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভাও নহে। সুতরাং কল্পনাসেবী তরুণ যুবকের আদর্শের কাছে নিতান্তই তুচ্ছ। সমালোচনারও অযোগ্য। ধনী পিতার কন্যা বটে; মোটামুটি লেখা-পড়াও হয় ত সে কিছু শিখিয়াছিল; কিন্তু রমেন্দ্র যাহা চায়, বাঙ্গালীর ঘরের হিন্দু-কুললক্ষ্মীদিগের নিকট তাহা সে দুষ্প্রাপ্যই মনে করিয়াছিল। বিশেষতঃ মনের আশা সফল না হওয়ায়, চঞ্চল মানসিক অবস্থায় বিবাহ ঘটায়, সে এমনই বিরসচিত্তে ছিল যে, পত্নীর সহিত আলাপ-পরিচয়েরও চেষ্টা করে নাই। সুতরাং রমেন্দ্রের কবিহৃদয়ে সঙ্গিনীর জন্য যে প্রেম-নদীর উদ্দাম বেগ অনুভূত হইত, তাহার প্রবাহ পত্নীর দিকে প্রবাহিত না হইয়া খণ্ডকবিতা রচনায় চরিতার্থ হইতে লাগিল।

স্ত্রীর সহিত তাহার কতটুকুই বা পরিচয়? বিবাহের প্রথম বৎসরে বারকয়েকের বেশী তাহার সহিত সাক্ষাৎই হয় নাই। যদি উভয় পক্ষের আগ্রহ থাকে, তাহা হইলে দুই তিনবারের সাক্ষাতেও যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়া থাকে; কিন্তু তাহাদের পরস্পরের হৃদয়ের আদান-প্রদান ঘটিবার পর্য্যাপ্ত শুভ সুযোগ আসিয়াছিল কি না, ভবিতব্যতাই তাহার বিচারক। স্ত্রী যখন পিত্রালয় হইতে স্বামিগৃহে আসিত, রমেন্দ্র সে সময় রায়চাঁদ-প্রেমচাঁদ ও আইন পড়ার অজুহতে কলিকাতায় থাকিত; যখন প্রতিভা পিত্রালয়ে যাইত—অবসর করিয়া তখন সে জননীর চরণ-বন্দনার জন্য দেশে যাইত।

রমেন্দ্রের মাতা বুদ্ধিমতী ও পাকা গৃহিণী হইলেও এত দিনে তিনি পুত্রের চালাকী ধরিতে পারেন নাই—বধূর প্রতি রমেন্দ্রের উপেক্ষার আভাস পান নাই। রমেন্দ্র সে জন্য যেরূপ

সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছিল, তাহা ছলনাপূর্ণ হইলেও, সহসা তাহাতে তাহাকে দোষী করা যায় না; অন্ততঃ রমেন্দ্র মনকে তাহাই বুঝাইয়াছিল। মাতা পুত্রকে বিশ্বাস করিতেন, সত্যই সে পড়া-শুনা লইয়া বিব্রত—সেই সাধনাই তাহার একান্ত লক্ষ্য, ইহা বুঝিয়া পড়া শেস না হওয়া পর্য্যন্ত মাতাও পুত্রকে বাড়ী আসিবার জন্য জিদ করিতেন না। তাহা ছাড়া এম্-এ পাশের পর সে কোনও রাজকুমারকে পড়াইবার ভার গ্রহণ করায়, তাহার অবসরও অল্প, ইহাও মাতাকে সে বুঝাইয়াছিল। এ অর্থ উপার্জ্জনের কোন প্রয়োজন ছিল না; কিন্তু স্বোপার্জ্জিত অর্থে সে শিক্ষা সমাপ্ত করিবে, সে জন্য পৈতৃক সম্পত্তির কপর্দ্দকমাত্র সে ব্যয় করিবে না, এই সঙ্কল্পের কথা সে বুঝাইয়া দিয়াছিল। বুদ্ধিমতী মাতা পুত্রের স্বাবলম্বনের ইচ্ছাকে ক্ষুণ্ণ করিতে সম্মত ছিলেন না। জীবনের প্রথম অবস্থা হইতেই যদি সন্তান আপনার পায় ভর দিয়া দাঁড়াইতে পারে, সে ত সুখের কথা।

উল্লিখিত কারণে সে ঘন ঘন বাড়ী আসিবার পথ বন্ধ করিয়া দিয়াছিল। মাতাও ভাবিতেন, আর কত দিন? লেখা-পড়া শেষ করিয়া বাড়ী আসিয়া বসুক, তখন পুত্র রীতিমত গৃহস্থালী আরম্ভ করিবে।

রমেন্দ্র জানালার ধারে দাঁড়াইয়া অতীত ও বর্ত্তমান জীবন—এবং জীবনের ব্যর্থতা সম্বন্ধে চিন্তা করিতেছিল। বাস্তবিক, যে পুরুষের ভাগ্যে মনোমত পত্নীলাভ ঘটে—সেই সুখী, বিধাতার শ্রেষ্ঠ দানই তাহাই। কিন্তু কি দুর্ভাগা সে, যাহা সে চাহিয়াছিল, তাহা সে পায় নাই। ভারতবর্ষের আদর্শ হিসাবে, পত্নী স্বামীর সহায়, সচিব, সখী, শিষ্যা, জীবন-সঙ্গিনী—এক কথায় সর্ব্বস্ব। কিন্তু প্রতিভা কি তাই? সে কি তাহার পার্শ্বচারিণী হইবার যোগ্য? এই যে সে কত রজনী বিনিদ্র অবস্থায় কাটাইয়া, কল্পনার কুঞ্জ হইতে কত মনোরম, সুগন্ধী পুষ্প সযত্নে আহরণ করিয়া আনিয়াছে, তাহার পত্নী কি সে সকলের মর্ম্ম বুঝিয়াছে? প্রীতিভাজন বন্ধু-বান্ধবদিগকে সে তাহার রচিত "যূথিকা" পাঠাইয়াছিল, সঙ্গে সঙ্গে পত্নীকেও একখানি বই ডাকযোগে পাঠাইয়া দিয়াছিল; কিন্তু কই, প্রতিভা ত সে সম্বন্ধে একটি কথাও তাহাকে লিখিয়া জানায় নাই! তাহার স্বামী কবি, এ সৌভাগ্যে তাহার আনন্দ হইবার কথা নহে কি? কবিতা বুঝিবার শক্তি থাকিলে ত? অর্দ্ধশিক্ষিতা পল্লীবাসিনী নারীর সে বুদ্ধি কোথায়? হয় ত খানকয়েক উপন্যাসই পড়িয়াছে। তাহাও কি বুঝিতে পারে, ছাই? হয় ত শুধু গল্পাংশই পড়িয়া যায়। উপন্যাসে যে সকল অপূর্ব্ব তত্ত্ব, বর্ণনাবৈচিত্র্য এবং চরিত্রের সৌন্দর্য্য থাকে, তাহা বুঝিবার ও বিশ্লেষণ করিবার ক্ষমতা তাহাদের কোথায়? পল্লীনারী এ সকল রসমাধুর্য্যের আস্বাদ পাইবে কিরূপে? প্রেম কত মহৎ, কি সুন্দর! ইহার অনুভূতি বধূর কল্পনার অতীত। হায়! তাহার মত হতভাগ্য আর কে আছে? তাহার জীবন চিরদিনের জন্য ব্যর্থ, নিষ্ফল হইয়া গিয়াছে!

রমেন্দ্র আকুল দৃষ্টিতে তারকাচিত্রিত স্তব্ধ গগন পানে চাহিয়া রহিল। সেখানে আশ্বাসের কোনও আভাস কি সে দেখিতে পাইতেছিল?

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

"বৌমা!"

"যাই, মা।"

অনুচ্চ, মৃদু কণ্ঠে উত্তর দিয়া গোময়লিপ্তহস্তে পুত্রবধূ কাছে আসিলে শাশুড়ী সস্নেহে বলিলেন, "এত ভোরে উঠেছ কেন, মা? এত কি কায যে, রাত পোহাতে না পোহাতে বিছানা ছেড়ে উঠেছ? ঠাণ্ডা লেগে অসুখ করবে যে!"

পুত্রবধূ প্রতিভা দৃষ্টি নত করিয়া মৃদু হাসিল। শরতের প্রভাতে ঠাণ্ডার ভয়! মা যেন কেমন!

রমেন্দ্রের মাতা বলিলেন, "হাত ধুয়ে এস, মা লক্ষ্মি! বড়বৌ বাকি কায করবে'খন। আহা, খেটে খেটে বাছার আমার শরীর কালি হয়ে গেছে।"

হাস্য দমন করিয়া মৃদু স্বরে প্রতিভা বলিল, "আমি বেশী খাটি কই, মা? আপনি আমায় মোটে কায করতেই দেন না। সকালবেলা তুলসীতলায় গোবর-ন্দতা না দিলে মন ভাল থাকে না, তাই মা দিচ্ছিলাম।"

"তা বেশ করেছ। এখন যাও, হাত-পা ধুয়ে এস। কাপড় ছেড়ে ঘরে যাও, খাবার ঢাকা আছে, আগে খেয়ে নাও। তাড়াতাড়ি রান্নাঘরে যাবার দরকার নেই, আজ আমি রাঁধব।"

প্রতিভা চলিয়া গেল। গৃহিণী বারান্দায় বসিয়া তাড়াতাড়ি মালা করিতে লাগিলেন।

শরৎপ্রভাতের রৌদ্র গোময়লিপ্ত উঠানে পড়িয়া হাসিতেছিল। অদূরে গোয়ালঘরের সম্মুখে কয়েকটি পয়স্বিনী গাভী রোমন্থ করিতেছিল। দোহনাবশেষ পালানে মুখ রাখিয়া বাছুরগুলি দুগ্ধপানের চেষ্টা করিতেছিল।

এমন সময় শাক-সব্জী ও তরকারীপূর্ণ একটা প্রকাণ্ড ঝুড়ি মাথায় লইয়া এক ব্যক্তি প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া ডাকিল, "মা!"

মালা রাখিয়া গৃহিণী বলিলেন, "ওতে কি রে, মাধু?"

মাধব বারান্দায় ঝুড়ি নামাইতে নামাইতে বলিল, "বাগানের তরকারী। আজ তুমি নিজে রাঁধবে ব'লে বেশী ক'রে এনেছি।"

মাধব জাতিতে গোয়ালা। পাঁচ বৎসর বয়সে পিতৃ-মাতৃহীন, আত্মীয়স্বজনপরিত্যক্ত বালক, রমেন্দ্রের পিতা পার্ব্বতীচরণের আশ্রয় লাভ করে। পার্ব্বতীচরণ বেণীপুরের জমীদারদিগের দেওয়ান ছিলেন। মেদিনীপুর তালুক হইতে বাড়ী ফিরিবার সময় এই অনাথ বালকটিকে পাইয়া তিনি তাহাকে সঙ্গে করিয়া আনেন এবং পুত্রনির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করিতে থাকেন। তদবধি সে এই পরিবারেরই এক জন হইয়া গিয়াছিল। পিতামাতা বলিতে সে পার্ব্বতী-চরণ ও তাঁহার পত্নীকেই বুঝিত। পার্ব্বতীচরণ মাধবকে গ্রাম্য বিদ্যালয়ে মাইনর পর্য্যন্ত পড়াইয়াছিলেন। তাহার পর তাহাকে জমীদারীকার্য্যে পাকা করিয়া তুলেন। কোনও পিতৃমাতৃহীনা গোপ-বালিকার সহিত মাধবের বিবাহও দিয়া-ছিলেন। মাধব পত্নীসহ পার্ব্বতীচরণের বাড়ীতেই থাকিত।

যত দিন কর্ত্তা জীবিত ছিলেন, মাধব তাঁহার সঙ্গে সঙ্গেই ফিরিত। তাঁহার ৮ বৎসরের একমাত্র সন্তান ও সহধর্ম্মিণীকে রাখিয়া যখন তিনি এক দিন দোকান-পাট তুলিয়া লইলেন, তখন মাধবও আপনাকে পিতৃহীন মনে করিয়াছিল। জমীদারের কার্য্য ছাড়িয়া দিয়া মাধব তখন পার্ব্বতীচরণের তালুকের তত্ত্বাবধান করিতে লাগিল। পার্ব্বতীচরণ যে সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাহাতে সালিয়ানা প্রায় ৫ হাজার টাকা মুনাফা ছিল। কোথায় কোন্ সম্পত্তি কি ভাবে আছে, সমস্তই মাধবের নখদর্পণে ছিল; সুতরাং পার্ব্বতীচরণের অবিদ্যমানে কেহ তাঁহার বিধবা ও নাবালক পুত্রকে ফাঁকি দিতে পারিল না। মাধবকে সকলেই যমের মত ভয় করিত। তাহার দেহে অগাধ বল, হৃদয়ে অপরিসীম সাহস ছিল। কুস্তি, লাঠিখেলা অথবা মামলা-মোকর্দ্দমায় আশপাশের ৮৷৯ খানা গ্রামের মধ্যে মাধবের সমকক্ষ কেহই ছিল না।

মাধবের এখন ৪৫ বৎসর বয়স হইলেও তাহার পেশীবহুল, ঋজু ও বলিষ্ঠ শরীরের দিকে চাহিলে কেহ তাহার বয়স ত্রিশ বৎসরের বেশী বলিয়া অনুমান করিতে পারিত না। তাহার মাথার একটি কেশ পর্য্যন্ত পাকে নাই, ললাটে একটিও কুঞ্চিত রেখাপাত হয় নাই। মাধব নিজের হাতে পার্ব্বতীচরণের বাগানে শাক-সব্জীর আবাদ করিত, খামার জমীতে লাঙ্গল ধরিয়া ধান-কড়াইএর চাষ করিত। মাথায় করিয়া তরকারীর ঝোড়া বহন করিতে তাহার আত্মসম্ভ্রমে এতটুকু আঘাত লাগিত না। এ সংসারের যে সে বড় ছেলে! তাহার সন্তানাদির সম্ভাবনা ছিল না। স্বামী ও স্ত্রী মিলিয়া বাড়ীর সব কাযই করিত। বাড়ীতে দাসদাসীর বাহুল্য ছিল না।

রমেন্দ্রের মাতা প্রায় বলিতেন যে, কৃষাণ রাখিয়া চাষ করিলে দোষ কি? মাধবের অত পরিশ্রম করা উচিত নয়। উত্তরে মাধব হাসিয়া বলিত, "মা, তুমি আশীর্ব্বাদ কর—এ দেহ সামান্য মেহনতে ভেঙ্গে পড়বে না! যে পয়সা মজুরকে দেব, তা'তে দেবতা, অভ্যাগতের সেবা হবে।" তবে বেশী পরিমাণে আবাদের প্রয়োজন হইলে সে নগদা মজুরের সাহায্য লইত।

পর্ব্বতীচরণের গৃহ হইতে এ পর্য্যন্ত কখনও কোনও অতিথি বিমুখ হয় নাই। বেলা ৪টাই বাজুক অথবা রাত্রি দ্বিপ্রহরই হউক, যখনই কোন অতিথি বা ভিখারী আসিত, মাধব তাহাকে পরিতোষ পূর্ব্বক না খাওয়াইয়া ছাড়িয়া দিত না।

মাধব জমীদারীকার্য্যে যেমন মজবুত ছিল, কৃষিকার্য্যেও তাহার মাথা তেমনই খেলিত। সে প্রতি বৎসর বাড়ীর সংলগ্ন বিস্তৃত ভূখণ্ডে নানাবিধ শাক-সব্জীর আবাদ করিত। লাউ, কুমড়া, বেগুন, মূলা, শিম, বরবটী, আলু, পটল প্রভৃতি সময়োপযোগী সকল প্রকার জিনিষই পর্য্যাপ্ত পরি-মাণে উৎপন্ন হইত। নারিকেল, সুপারী, কদলীবৃক্ষ শ্রেণীবদ্ধভাবে বাগানের শোভা ও সম্পদ বৃদ্ধি করিত। নারিকেল হইতে বৎসরের উপযোগী তৈলও জন্মিত। সুপারী

কিনিতে হইত না। ক্ষেত্রে যে সরিষা জন্মিত, তাহা হইতে সংবৎসরের তৈল ত হইতই, অধিকন্তু কিছু উদ্‌বৃত্তও থাকিত। বাড়ীতে চাষের জন্য চারি জোড়া বলদ ছিল, অবসরকালে মাধব তাহাদিগকে ঘানিগাছে জুড়িয়া দিত। দুইটি বৃহৎ পুষ্করিণী ছিল—একটিতে মাধব চারা মাছ জন্মাইত, অপরটিতে মাছ বড় হইত। বাড়ীতে কয়েকটি পয়স্বিনী গাভী ছিল। মাধবের ব্যবস্থাগুণে একই সময়ে সকলে দুগ্ধ প্রদান করিত না। অথচ সারা বৎসর পর্য্যাপ্ত দুগ্ধ উৎপন্ন হইত। দুগ্ধ হইতে মাখন ও সর তুলিয়া মাধব যে ঘৃত প্রস্তুত করিত, তাহাতে পার্ব্বতীচরণের বাড়ীর ব্যবহারের উপযোগী ঘৃত কোনও দিন বাজার হইতে কিনিতে হয় নাই।

এইরূপে মাধবের কর্ম্মকুশলতায় রমেন্দ্রের মাতা তালুকের আয় হইতে অতি সামান্য অর্থ লইয়াই সংসারের যাবতীয় কায চালাইতেন। অধিকাংশ অর্থ সঞ্চিত হইত। তবে সস্তার বাজারে মাধব কিছু অর্থ লইয়া ধান, চাউল কিনিয়া ব্যবসায় করিত। সুদ লইয়া টাকা ধার দেওয়া মাধবের কোষ্ঠীতে লেখে নাই। পার্ব্বতীচরণ কখনও সুদ লইতেন না। তাহার জীবনে এই স্বধর্ম্মপরায়ণ ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তির চরিত্রের আদর্শ রেখাপাত করিয়াছিল। মাধব কখনও সুদ লইয়া টাকা খাটাইত না, কিন্তু বিপদের সময় অর্থসাহায্য পায় নাই, এমন লোক সে গ্রামের মধ্যে কেহই ছিল না। সুদের উপর মাধবের বিজাতীয় ঘৃণা ছিল।

স্বদেশী আন্দোলনে মাধব কোনও দিন সাক্ষাৎসম্বন্ধে যোগ দেয় নাই; তাহার যৌবনের প্রথম অবস্থায় স্বদেশী আন্দোলনের জন্মও হয় নাই, কিন্তু দেশী জিনিষ পাইলে সে কখনও বিদেশী জিনিষ ব্যবহার করিতে চাহিত না। পার্ব্বতীচরণের গৃহে বিদেশী জিনিষের বড় একটা প্রবেশাধিকার ছিল না। ইংরাজী সে বেশী পড়ে নাই সত্য, কিন্তু তাহা না পড়িয়াও দেশের মাটীর প্রতি তাহার যে শ্রদ্ধা, ভক্তি ও বিশ্বাস ছিল, বোধ হয়, অনেক দেশনেতার তাহার অর্দ্ধেকও ছিল না।

মাধব তরকারীর ঝোড়া রোয়াকের উপর নামাইয়া, কোমর হইতে গামোছা খুলিয়া লইয়া ঘাম মুছিয়া ফেলিল। তাহার পর গৃহকর্ত্রীর সম্মুখে বসিয়া ঝোড়া হইতে একে একে ফল-মূল ও তরকারীগুলি নামাইয়া রাখিতে লাগিল।

গাছের বড় বড় পাকা পেঁপে একপাশে রাখিয়া মাধব বলিল, "মা, খোকার চিঠি পেয়েছ? সে কবে আসবে?"

মাধব এখনও রমেন্দ্রকে খোকা বলিয়া ডাকিত।

জননী বলিলেন, "চার পাঁচ দিন আগে একখানা পোষ্ট-কার্ড লিখেছিল, কিন্তু আসবার দিনের কথা তাতে কিছু লেখেনি।"

মাধব বলিল, "সে পেঁপে বড় ভালবাসে ব'লে গাছের পেঁপেতে হাত দেইনি। এগুলো একেবারে পেকে উঠেছে, তাই তোমার জন্য আনলুম। পূজোর ত আর বেশী দেরী নেই। কবে আসবে, তা লিখলে না কেন?"

মাতা বলিলেন, "একজামিনের পড়ায় বুঝি খুব ব্যস্ত আছে।"

মাধব হাই তুলিয়া তুড়ি দিতে দিতে বলিল, "আমি এখন আবার ক্ষেতের দিকে চল্লুম, মা। তুমি সকাল সকাল কায সেরে নিও।"

মাধব চলিয়া গেলে তাহার স্ত্রী রাধারাণী গোয়ালঘরের কায সারিয়া কুটনা কুটিতে বসিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

দ্বিপ্রহরে, আহারশেষে রমেন্দ্রের মাতা কাশীরাম দাসের মহাভারত পড়িতেছিলেন। পার্শ্বে রাধারাণী ও প্রতিভা বসিয়া সেই পুণ্যকাহিনী শুনিতেছিল। প্রতিভা পিতৃগৃহে শিক্ষা পাইয়াছিল। আধুনিক হিসাবে সে সুশিক্ষিতা ছিল কি না, তাহা বলা যায় না। তবে সুপণ্ডিত পিতার নিকট হইতে শিক্ষা পাইয়া বাঙ্গালাভাষায় তাহার নিতান্ত মন্দ অধিকার জন্মে নাই। চারুপাঠ তৃতীয় ভাগ, রামবনবাস, নবনারী, ভূদেববাবুর পারিবারিক প্রবন্ধ, সামাজিক প্রবন্ধ প্রভৃতি গ্রন্থ সে বিদ্যালয়ের ছাত্রীর ন্যায় ব্যাকরণ ও সাহিত্য হিসাবে অধ্যয়ন করিয়াছিল। ব্যাকরণ কৌমুদীর চারি ভাগই তাহার কণ্ঠস্থ ছিল। ইংরাজী ও সংস্কৃত-সাহিত্যে সুপণ্ডিত পিতা স্বয়ং সন্তানকে শিক্ষা দিতেন। বালিকা-বিদ্যালয়ে কখনও কন্যাদিগকে যাইতে দেন নাই। চাণক্য-শ্লোক ছাড়া, গীতার বহু শ্লোক প্রতিভার কণ্ঠাগ্রে ছিল। কালিদাসের কয়েকখানি কাব্যও সে পড়িয়াছিল। ইংরাজীও যে সে কিছু না নত, তাহা নহে। কিন্তু স্বভাবতঃ
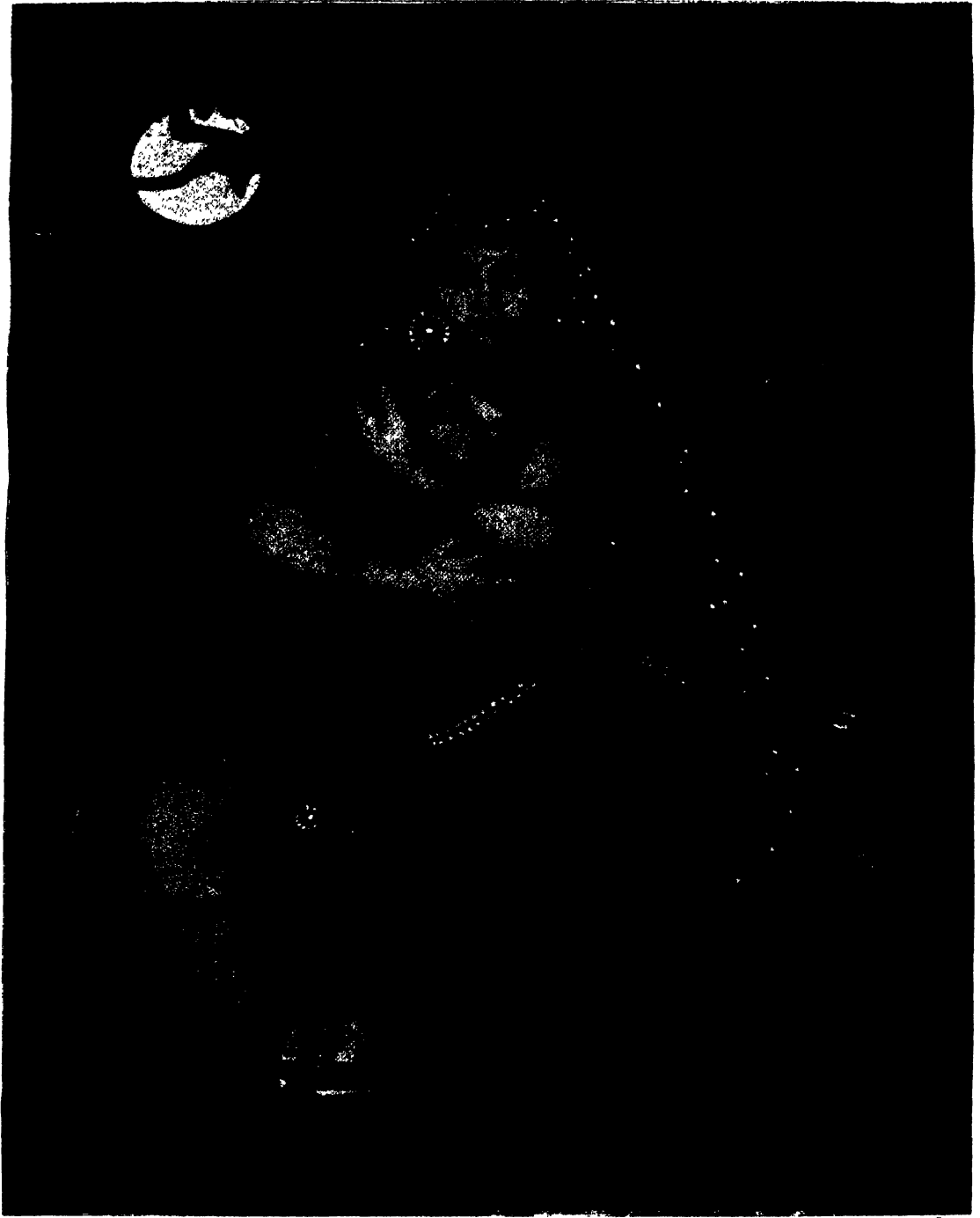
"শতেক বরষ পরে, বধুয়া মিলল ঘরে,
রাধিকার অন্তরে উল্লাস।
হারানিধি পাইনু বলি, লইয়া হৃদয়ে তুলি,
রাখিতে না সহে অবকাশ।"

বসুমতী প্রেস] [শিল্পী—শ্রীসতীশচন্দ্র সিংহ।

স্বল্পভাষিণী এবং লজ্জাশীলা বলিয়া প্রতিভা কখনও কাহারও নিকট নিজের বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় দিবার চেষ্টা করিত না। সে যে পিতার শিক্ষাগুণে ভাষা-সাহিত্যে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিল, এ সংবাদ তাহার শ্বশুরালয়ের কেহই জানিতেন না। রমেন্দ্র ত জানিবার জন্য কোন দিন চেষ্টাও করে নাই। প্রতিভাও এমনই ভাবে থাকিত যে, লেখাপড়ার প্রতি তাহার কিরূপ আগ্রহ এবং তাহার অধিকারই বা কত দূর, তাহা কেহ বুঝিতে পারিত না।

তবে কেহ যদি গোপনে তাহার বড় কাপড়ের ট্রাঙ্কটি খুলিয়া দেখিত, তাহা হইলে, গীতা, কুমারসম্ভব, উত্তররামচরিত প্রভৃতি কয়েকখানি সংস্কৃত গ্রন্থ এবং মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত, বাহ্যবস্তুর সহিত মানব-প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার, সামাজিক ও পারিবারিক প্রবন্ধ এবং কৃষ্ণচরিত্র প্রভৃতি বাঙ্গালা ভাষার কয়েকখানি উপাদেয় গ্রন্থ দেখিতে পাইত। সেগুলি তাহার পিতার দান। গভীর রজনীতে অথবা নির্জ্জন স্থানে গোপনে অবকাশমত সেগুলি প্রতিভা অধ্যয়ন করিত।

শাশুড়ী মহাভারত পড়িতেছিলেন। পুত্রবধূ সাগ্রহে তাহা শুনিতেছিল। পিতৃগৃহে সে কতবার যে এই অমৃত-গ্রন্থ পড়িয়াছে! রামায়ণ ও মহাভারতের সে একনিষ্ঠ উপাসিকা। এমন চমৎকার গ্রন্থ কোন্ সাহিত্যে আর আছে? রামের পিতৃভক্তি, লক্ষ্মণের ভ্রাতৃস্নেহ, পৃথিবীর আদর্শ, সীতার পতিপ্রেম ও সহিষ্ণুতা যুগ যুগ ধরিয়া পৃথিবীতে অমৃত ছড়াইতে থাকিবে। ভীষ্মের মত দেবচরিত্র কোথায় দেখিতে পাওয়া যায়? যুধিষ্ঠিরের ন্যায় সত্যনিষ্ঠা, ধৈর্য্য ও মহত্ত্ব কে দেখাইতে পারিয়াছে? সাবিত্রীর ন্যায় সতীগর্ব্ব পৃথিবীর নারীসমাজের আদর্শ। ধ্রুব সত্য মৃত্যুকে কর্ম্মফলের দ্বারা—একনিষ্ঠ সাধনার দ্বারা কে কোথায় জয় করিতে পারিয়াছিল? সমগ্র পৃথিবীর ইতিহাসে এমন দ্বিতীয় চিত্র আছে কি? সুপণ্ডিত পিতার নিকট হইতে এই সকল তত্ত্ব সে উত্তমরূপে আয়ত্ত করিয়া লইয়াছিল।

প্রত্যহ গৃহকর্ম্ম সমাধার পর কর্ত্রী মহাভারত বা রামায়ণ পাঠে অবসরকাল যাপন করিতেন। সেই সময় পুত্রবধূ তাঁহার কাছে বসিয়া থাকিত। ইহা তাঁহাদের নিত্যকার্য্যের মধ্যে ছিল। ইহাতে পাঠিকা ও শ্রোতার—কোন পক্ষেরই অবসাদ কখনও দেখা যাইত না।

অপরাহ্ণের আলোকরশ্মি গাছের পাতার ফাঁক দিয়া, খোলা জানালার মধ্য দিয়া প্রতিভার মুখে আসিয়া পড়িয়াছিল। তখন তাহার মুখে অবগুণ্ঠনের দীর্ঘ পরিসর ছিল না, কখনও থাকিত না। ইহাতে তাহার শাশুড়ীর নিষেধ ছিল। পুত্রবধূ বাড়ীর মেয়ে—মা'র কাছে মেয়ের অবগুণ্ঠনের অন্তরাল সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন। প্রতিভা নিবিষ্টমনে সেই অমৃত-কাহিনী শুনিতেছিল। শাশুড়ী তখন সহসা স্বামিপরিত্যক্তা রাজরাণী দময়ন্তীর অসহায় অবস্থার কথা পড়িতেছিলেন। সে করুণকাহিনী বহুবার শ্রুত বা পঠিত হইলেও প্রতিভার প্রাণে নূতন বেদনার সঞ্চার করিল। তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়টুকু অসহায়া রাজরাণীর সেই অবস্থার কথা কল্পনা করিয়া যেন ফুলিয়া দুলিয়া উঠিল। কল্পনাবলে সে যেন তখন নিজের মানস-দৃষ্টির সম্মুখে কাননে পরিত্যক্তা, অর্দ্ধবসনা সুন্দরীর চিত্র দেখিতে পাইতেছিল। নিদ্রাভঙ্গের পর একমাত্র আশ্রয় স্বামীকে দেখিতে না পাইয়া পতিগতপ্রাণা নারীর প্রাণে কিরূপ যন্ত্রণা, কাতরতা ও নৈরাশ্যের উদয় হইয়াছিল, তাহা অনুভব করা নারীর পক্ষে—বিশেষতঃ ভারতীয় রমণীর পক্ষে নিতান্তই সহজ। প্রতিভার আয়ত লোচনযুগলে সমবেদনার অশ্রু ছল-ছল করিয়া উঠিল। অন্যের অগোচরে সে অশ্রুবিন্দু অঞ্চলে মুছিয়া ফেলিল।

গৃহিণীর কণ্ঠস্বরও আর্দ্র হইয়া আসিয়াছিল। তিনি অন্যমনস্কভাবে পুত্রবধূর দিকে চাহিলেন। সে দৃষ্টি ইচ্ছাকৃত নহে। অনেক সময় মানুষ শুধু শুধু চাহিয়া দেখে—এ দৃষ্টিও সেইরূপ। করুণ, শোকাবহ কাহিনী পাঠ বা শ্রবণকালে সাধারণতঃ অনেকেরই ভাবান্তর ঘটিয়া থাকে; প্রতিভার এরূপ ভাবান্তর তিনি অনেক সময়ই লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু আজ তাহার অশ্রুসিক্ত মুখমণ্ডল দেখিয়া তাঁহার কোমল মাতৃহৃদয় যেন অকস্মাৎ শিহরিয়া উঠিল। কোন কারণ হয় ত ছিল না, তথাপি তাঁহার চিত্ত করুণায় ভরিয়া উঠিল। গৃহিণী পড়া বন্ধ করিয়া বলিলেন, "বেলা গেল; আজ এই পর্য্যন্ত থাক। মা লক্ষ্মি! দেখ ত আমার মাথায় পাকা চুল আছে কি না?"

পাকা চুলের অভাব নিশ্চয়ই ছিল না। প্রতিভা পাকা চুল বাছিতে বসিয়া গেল,

এমন সময় বাহিরে হরকরা ডাকিল, "চিঠি আছে !"

কর্ত্রী রাধারাণীকে চিঠি লইয়া আসিতে বলিলেন।

পত্রহস্তে মাধবের পত্নী ফিরিয়া আসিল। কর্ত্রী চিঠি দেখিয়াই বুঝিলেন, রমেন্দ্র লিখিয়াছে। এবার পরীক্ষার বিলম্ব আছে, রাজকুমারের সহিত দেশভ্রমণে যাইবার প্রয়োজন হইবে না, এ সংবাদ তিনি পূর্ব্বেই জানিয়াছিলেন। শরীর অসুস্থ বলিয়া রাজকুমার দার্জ্জিলিঙ্গে চলিয়া গিয়াছেন, সে সংবাদ রমেন্দ্রই পূর্ব্বে লিখিয়াছিল।

আশাস্পন্দিত হৃদয়ে মাতা পুত্রের পত্র পড়িতে লাগিলেন। পাঠশেষে তাঁহার মুখমণ্ডল গম্ভীর হইল। রমেন্দ্র লিখিয়াছে, পরীক্ষার বিলম্ব থাকিলেও এইবার শেষ পরীক্ষা, সুতরাং এখন দেশে গেলে তাহার পক্ষে বি-এল পরীক্ষায় চরম সার্থকতালাভে নানা বিঘ্ন ঘটিতে পারে। রায়চাঁদ-প্রেমচাঁদ বৃত্তিলাভের জন্য সে যে চেষ্টা করিতেছে, তাহাতেও বাধা পড়িবার সম্ভাবনা। এই কয় বৎসর ধরিয়া সে এই বৃত্তিলাভের জন্য পরিশ্রম করিয়াছে—পাছে সাধনা ব্যর্থ হয়, সেই আশঙ্কায় এত দিন সে এই পরীক্ষা দেয় নাই। কিন্তু এইবার সে সকল প্রকার পরীক্ষা দেওয়ার হাঙ্গামা মিটাইয়া ফেলিবে—ছাত্রজীবন সমাপ্ত করিয়া সে মাতার কোলে ফিরিয়া গিয়া সংসারের দায়িত্ব গ্রহণ করিবে। সুতরাং পূজার সময় দেশে না গিয়া সে কলিকাতাতেই থাকিবে, সে জন্য সে মাতার অনুমতি চাহিয়াছে! তবে হয় ত হঠাৎ দুই এক দিনের জন্য সে মাতৃচরণ-বন্দনা করিতে দেশে যাইতেও পারে, ইত্যাদি।

সন্ধ্যার সময় মাধব ক্ষেত্র হইতে গৃহে ফিরিলে কর্ত্রী তাহার হস্তে রমেন্দ্রের পত্রখানি দিলেন। সে উহা পড়িয়া বলিল, "পূজার সময় ক'দিনের জন্য বাড়ী এলে পড়ার কি ক্ষতি হবে বুঝলুম না, মা! পূজার সময় দেশে আসবে না, এ কি রকম কথা?"

মাতা বলিলেন, "মাধব, সে হবে না। পূজোর সময় কোন বার বৌমাকে আনি নে। এবার এনেছি, বুঝে-সুজেই এনেছি, সুতরাং ছেলেকে বাড়ী আসতেই হবে। এখনও ত পূজোর কয় দিন বাকি আছে, তুমি কলকাতায় গিয়ে তাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে এস।"

"সেই কথাই ভাল। মিত্তিরদের কাছে ধানের বাবদ পাঁচ শ টাকা পাওনা আছে, বুধবার সেই টাকাটা দেবার কথা। আজ রবিবার, মাঝে আর দুটো দিন—বুধবার রাতে বা বৃহস্পতিবার সকালে আমি কলকাতায় যাব।"

"তাকে বুঝিয়ে দিও যে, বেশী দিন আমি তাকে এখানে রাখব না। লক্ষ্মীপূজোর পরই তাকে ছেড়ে দেব। তাতে তার পড়া-শোনার কোন ক্ষতি হবে না। লেখাপড়ার ক্ষতি হ'তে পারে ভেবেই এত দিন আমি তাকে কোন ঝঞ্ঝাটের মধ্যে ফেলিনি—বৌমাকেও বেশীর ভাগ বাপের বাড়ীতে রেখেছি। কিন্তু এখন আমিই বেশ বুঝতে পারছি, তার ক্ষতির কোন সম্ভাবনা নেই। তাকে বলো, আমি নিজেই তাকে আসবার জন্য বিশেষ ক'রে ব'লে দিয়েছি। তার আসা চাই।"

প্রতিভা তখন তুলসীতলে সন্ধ্যাদীপ জ্বালাইয়া, অলক্ষ্য দেবতার উদ্দেশে প্রণাম করিয়া উঠিতেছিল।

কর্ত্রী সেই দিকে চাহিয়া দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "বুঝেছ, মাধু, রমেনের কোন রকম ওজর আপত্তি আমি এবার শুনবো না—সেটা তাকে বুঝিয়ে দিও। তা'কে সঙ্গে ক'রে আনা চাই!" [ক্রমশঃ।

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ।

দর্শন

[কবীর]

প্রিয়তম-সাথে ক'রে নে রে প্রেম
কি ভাবিস্ বার বার;
নাবিকের সাথে মিলন না হ'লে
কেমনে হবি রে পার?

দেখিবার সাধ যদি থাকে তাঁরে
দর্পণ মাজ তবে—
ধূলা-ভরা যদি থাকে সে মুকুর
কোথা হ'তে দেখা হবে?

শ্রীকমলকৃষ্ণ মজুমদার

কলিকাতা ও সহরতলী—৫৪ বৎসর পূর্ব্বে

ইংরাজী ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের ঠিক শ্রাবণ মাসে আমি প্রথম কলিকাতায় আসি। দেখিতে দেখিতে সুদীর্ঘ ৫৮ বৎসর অতীত হইয়া গেল। সে সময়ের কলিকাতা কিরূপ ছিল, আর আজ কি হইয়াছে, উহা যেন নখদর্পণে দেখিতে পাইতেছি। কবি সত্যই বলিয়াছেন—"স্মৃতি শুধু জেগে থাকে।" বাস্তবিক তখন কি ছিল, আর এখন কি হইয়াছে, তাহা শুনিবার জন্য অনেকের আগ্রহ হইতে পারে, বিশেষতঃ যুবকবৃন্দের। আমার মত বৃদ্ধদিগের নিকটে অবশ্য আমার নূতন কিছু বলিবার নাই।

প্রথম যখন কলিকাতায় আসিলাম, তখন আমাদের বাসা ছিল ভারতীয় ব্রাহ্মসমাজের সন্নিকটে, তখন ব্রহ্মানন্দ কেশব সেন ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারার্থ বিলাত গমন করিয়াছেন। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলে সেই সময়কার কলিকাতার কোনও প্রতিকৃতি আছে কি না, জানি না। তখন সবেমাত্র খিলান করা পয়ঃপ্রণালী (drain) কলিকাতায় প্রবর্ত্তিত হইতেছে, দুই চারিটি রাজপথ প্রস্তুত হইতেছে এবং নূতন জলের কল আসিয়াছে। হিন্দু-সমাজের অনেকে সেই কলের জল অপবিত্র বলিয়া ব্যবহার করিতে নারাজ ছিলেন। অধিকাংশ হিন্দু-গৃহস্থের গৃহে উড়িয়া ভারীদিগের দ্বারা ভারে তোলা গঙ্গাজল ব্যবহৃত হইত। এক ভার অর্থাৎ দুই কলস জলের দুই আনা মূল্য ছিল। সুতরাং আজকাল আমরা জলের জন্য যে টেক্স দিই, সেটাকে টেক্স বলা অন্যায়; পূর্ব্বের তুলনায় আমাদের অনেক পয়সা বাঁচিয়া যায়। তখন প্রতি বাড়ীতে মাটার সাধারণ পাতকুয়া ছিল, তাহার জলে থালা-বাসন মাজা প্রভৃতি গৃহস্থালীর যাবতীয় কায স্বচ্ছন্দে নির্ব্বাহ হইত। আর ভারীরা যে গঙ্গাজল বা হেদুয়া, লালদিঘী, গোলদিঘী প্রভৃতি হইতে যে জল আনিত, তাহা কেবল পানীয়রূপে ব্যবহৃত হইত। পথে এক শ্রেণীর লোক "কুয়োর ঘটা তোলাবে" বলিয়া হাঁকিত। তাহাদের সহিত দড়ি ও কাঁটা থাকিত। তাহারা এখন আর নাই বলিলেই হয়। এরূপ অনেক পেশারই বিলোপ সাধিত হইয়াছে। পথের দুই পার্শ্বে উন্মুক্ত পয়ঃপ্রণালী (পগার) ছিল। সেই পগার দিয়া অতি কদর্য্য পঙ্কিল আবিল

কেশবচন্দ্র সেন

জলের স্রোত বহিত। সেই জলের (chemical character)এর কথা বলিতে চাহি না। তাহাতে ছিল না, এমন জিনিষ নাই, তাহার গন্ধে নাসিকা কুঞ্চিত করিতে হইত; আর সেই পগারের পারে গৃহস্থবাড়ী, দোকান প্রভৃতি ছিল। প্রত্যেক পগার পার হওয়ার জন্য সাঁকো ছিল। অনেক সময় এমন দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে যে, গাড়ী ঘোড়া একেবারে তাহার ভিতর গিয়া পড়িয়াছে। এখনকার মত পূর্ত্তবিভাগ মিউনিসিপ্যালিটীর তখন হয় নাই। পয়ঃপ্রণালী ইত্যাদিতে কতরূপ জীব যে ভাসিয়া বেড়াইত, তাহার ইয়ত্তা ছিল না। দুর্গন্ধে অন্নপ্রাশনের অন্ন উঠিয়া যাইবার উপক্রম হইত। পায়খানার মলও তাহাতে ঢালা হইত। আমার সম্পর্কীয় জ্যেঠা মহাশয় প্রভৃতি যাঁহারা তখন কলিকাতায় চাকুরী করিতেন, তাঁহারা বলিতেন, হাট-খোলা, কুমারটুলী প্রভৃতি অঞ্চলে অনেক মেথর গঙ্গায় বিষ্ঠা ঢালিত, স্রোতে সে সমস্ত ভাসিয়া বেড়াইত। কাপড় কাচিবার সময় তাহাতে সেই মল লাগিয়া যাইত, আর স্নানের সময় সীমন্তিনীদের কেশগুচ্ছে তাহা জড়িত হইয়া যাইত। সে এক অদ্ভুত ব্যাপার ছিল! তখনকার তুলনায় এখন কলিকাতা স্বর্গ।
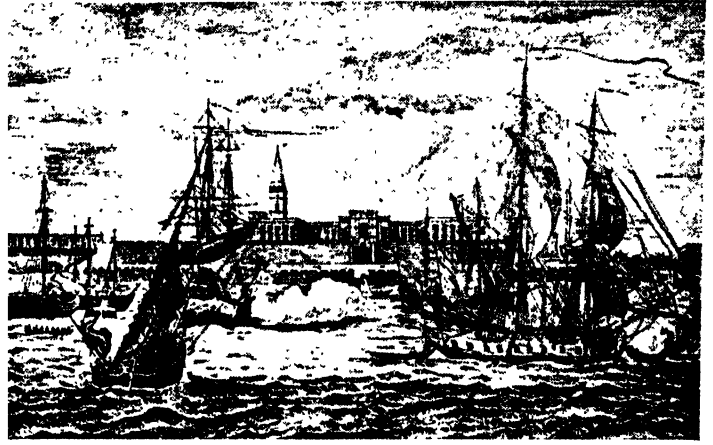
ফোর্ট উইলিয়ম---১৭৩৬

গঙ্গাতে সর্ব্বদা পাইলের জাহাজ দেখা যাইত। য়ুরোপ হইতে যে সমস্ত সমুদ্রপোত পণ্যসম্ভার লইয়া এ দেশে আসিত, তাহা পাইল খাটাইয়া উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরিয়া কলিকাতায় আসিয়া উপনীত হইত। তবে তখন সুয়েজ-খাল সবেমাত্র কাটা হইতেছে।

সেণ্ট এ্যানে চার্চ্চ—১৭৫৬

প্রায় ১ শত ১০ বৎসর পূর্ব্বেকার কথা, কবি ঈশ্বর গুপ্তের বয়স তখন ৩ কি ৪ বৎসর হইবে, সবেমাত্র তিনি কলিকাতায় আসিয়াছেন। তিনি ছিলেন স্বভাবকবি, চেষ্টা বা কষ্টকল্পনা করিয়া তাঁহাকে কবি হইতে হয় নাই। কলিকাতায় কি দেখিয়াছ, জিজ্ঞাসা করিলে, অমনি তিনি বলিয়া উঠিতেন,—

"রেতে মশা দিনে মাছি,
এই নিয়ে ভাই কলকেতায় আছি।"

কলিকাতায় কি প্রকার আবর্জ্জনা ও ময়লা ছিল এবং কলেরার প্রকোপ কিরূপ ছিল, তাহা এই মশা-মাছি হইতেই বুঝা যায়। সে সব কথা ভাবিলেও এখন আতঙ্ক হয়।

এখন যেখানে প্রেসিডেন্সী কলেজ, সেখানে আমরা সর্ব্বাঙ্গে কর্দ্দমলিপ্ত হইয়া হেয়ার স্কুলে হাজির হইতাম। হেয়ার স্কুলের স্থানে তখন খোলা মাঠ ছিল, তখন স্কুলের নাম পরিবর্ত্তন করিয়া হেয়ার স্কুল রাখা হয়। একতালা

বাড়ীতে ভবানীচরণ দত্ত লেনে তখন হেয়ার স্কুল বসিত। এখন যেখানে সংস্কৃত কলেজ, উহার অপর পার্শ্বে ছিল প্রেসিডেন্সী কলেজ। তখন হেয়ার স্কুলের মাত্র ২।৩খানি ঘর ছিল, আর যে যায়গা খালি ছিল, সেখানে ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে লর্ড নর্থব্রুক বর্ত্তমান প্রেসিডেন্সী কলেজের ভিত্তি স্থাপন করেন। প্রিন্সিপাল মিঃ টনী য়ুনিভারসিটীর কয়েকজন প্রতিষ্ঠাবান্ মেধাবী ছাত্র লইয়া শিক্ষাকার্য্য আরম্ভ করেন। কেশবচন্দ্রের অনুজ কৃষ্ণবিহারী সেন তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। আমরা পাশের উচ্চ ভিটার উপর দাঁড়াইয়া সে সব অনুষ্ঠান দেখিয়াছিলাম। এখনকার হেয়ার স্কুল তখন সবেমাত্র নির্ম্মিত হইতেছে। তখন পুরান এলবার্ট হলও সংস্থাপিত হয় নাই। উহার পর যে বাড়ীতে হয়, উহার ২।৩খানি ঘর ভাড়া লইয়া ক্লাশের কায চলিয়া যাইত, তাহারই একটা হলে প্রেসিডেন্সী কলেজের অতিরিক্ত রসায়ন শাস্ত্র বিষয়ে লেক্‌চার দেওয়া হইত। তখন বর্ত্তমান হাইকোর্টের বিল্ডিং তৈয়ারী হইতেছে। এখন যেখানে আলিপুরের সংলগ্ন সার্কুলার রোডের উপর ইলেক্‌ট্রিক সাপ্লাই ডিপার্টমেণ্টের কতকগুলি গবর্ণমেণ্টের কারখানা-ঘর আছে, সেখানে ছিল সদর দেওয়ানী আদালত। কিছু দিন পরে উহা হাইকোর্টে পরিণত হইলে নব-নির্ম্মিত বর্ত্তমান বাড়ীতে উঠিয়া গেল। যাদুঘর তখন নির্ম্মিত হইতেছিল। পার্ক ষ্ট্রীটে এসিয়াটিক সোসাইটীর হলে যাদুঘর অবস্থিত ছিল, এখনও শকটচালকরা তাহাকে "পুরানো যাদুঘর" বলে। চোরবাগানে রাজেন্দ্র মল্লিকের বাড়ীতে এক চিড়িয়াখানা ছিল, তাহাতে অনেক রকম পশুপক্ষী ও সরীসৃপাদি ছিল, দলে দলে লোক তাহা দেখিতে যাইত। কলেজের মধ্যে প্রেসিডেন্সী, জেনারেল এসেমব্লী ও লণ্ডন মিশনারীর খুব নাম ছিল। কলিকাতায় ২।৪টি মাত্র স্কুল ছিল। সমস্ত বাঙ্গালায় এখন ৯ শত হাই স্কুল আছে, তখন মাত্র প্রত্যেক জিলায় এক একটি গভর্ণমেণ্ট স্কুল ছিল, সব জিলায় ছিল কি-না মনে পড়ে না। যখন আমার পিতা আমায় কলিকাতায় আনয়ন করিলেন, তখন আমাদের গ্রামে আমার পিতার প্রতিষ্ঠিত একটা মাইনর স্কুল ছিল। গ্রামে মাইনর স্কুল থাকিলে তখন সে গ্রাম ধন্য হইত। লোক ভাবিত, না জানি কি একটাই হইয়াছে। তখন অরিয়েণ্টেল সেমিনারী, মেট্রোপলিটান, হিন্দু ও হেয়ার স্কুলের যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। কলিকাতার ট্রেণিং একাডেমী নামক স্কুলটিও তখন ছিল।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

১৮৭০ খৃষ্টাব্দের পর কেশবচন্দ্র বিলাত হইতে ফিরিয়া আইসেন এবং "সুলভ সমাচার" নামক একখানি পত্রিকার প্রচলন করেন। তাহাতে অনেক সংবাদ থাকিত; কিন্তু দাম ছিল মোটে এক পয়সা। এ রকম স্বল্পমূল্যের সংবাদপত্র পূর্ব্বে আর ছিল না। অবশ্য, বাঙ্গালা "সোমপ্রকাশ" লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাপ্তাহিক পত্রিকা ছিল। সাধুভাষায় লিখিত হইত বলিয়া উহা শিক্ষিতসমাজের মুখপত্রস্বরূপ ছিল। শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের মাতুল দ্বারিকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় উহার সম্পাদক ছিলেন। তিনি সংস্কৃত কলেজের

অধ্যাপকও ছিলেন। তখনকার দিনে গবর্ণমেণ্ট কলেজের অধ্যাপকের পক্ষে সংবাদপত্রের সম্পাদক হইতে বাধা ছিল না। এমন কি, এডুকেশন গেজেট নামক পত্রিকাখানির সম্পাদক ছিলেন গবর্ণমেণ্টেরই বেতনভোগী এক জন উচ্চ-রাজকর্ম্মচারী-- স্বনামধন্য ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। এডুকেশন গেজেটে তখন ভারতের অশান্তির কথাও প্রকাশিত হইত. এখন কোন সরকারী কর্ম্মচারী যদি কোনও কাগজের সম্পাদক হয়েন এবং তাহাতে যদি ভারতের অশান্তির কথা বাহির হয়, তবে সে কর্ম্মচারীর ভাগ্যে গবর্ণমেণ্টের কিরূপ কৃপাদৃষ্টি পড়ে, আশা করি, তাহা বলিয়া দিবার প্রয়োজন নাই। তখন খবরের কাগজ অত্যন্ত নিরীহ ও ভাল ছিল, তাহাদের রচনায় গবর্ণমেণ্ট কিছুমাত্র আপত্তি করিতেন না, বরং অভাব অভিযোগ জানাইবার জন্য উৎসাহ দান করিতেন।

দেখিতে দেখিতে যুগান্তর উপস্থিত হইল। হাইকোর্ট নূতন বাড়ীতে স্থানান্তরিত হইলে পর পিতা মহাশয় আমাকে মাঝে মাঝে নিজের মামলা-মোকর্দ্দমার তদ্বিরের জন্য সঙ্গে লইয়া যাইতেন। বিলাতী জজদিগকে দেখিয়া তখন অবাক্ হইয়া যাইতাম। আজ আমাদের দেশী লোকরাও জজ হইতেছেন। পরলোকগত দ্বারিকানাথ মিত্র মহাশয়কেও আমি দেখিয়াছি।

১৮৭২ খৃষ্টাব্দে এক দিন আমাদের দেশের কপোতাক্ষী নদীর তটে সাগরদাঁড়ীর কবি ও ব্যারিষ্টার মধুসূদন দত্তের সঙ্গে আমার পিতা আমাকে পরিচয় করিয়া দিলেন। তখন আমি বালকমাত্র। বোধ হয়, ইংরাজী ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে লর্ড মেও আন্দামান পরিদর্শন করিতে যায়েন, সেখানে শের আলী নামক এক জন ওহাবী তাঁহাকে হত্যা করে। সে সময়ে কিছুদিনের জন্য হাইকোর্ট বোধ হয় এখনকার টাউন-হলে বসিত। সেখানেও জজ নর্ম্ম্যানকে আর এক জন ওহাবী ছুরিকাঘাত করে। অল্পসময়ের মধ্যে দুই জন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী নিহত হইলেন। ইহাতে মহা আতঙ্ক উপস্থিত হয়। এই সকলের মূলে ওহাবী ষড়্যন্ত্র আছে বলিয়া গবর্ণমেণ্টের সন্দেহ হইল। তাই এই ব্যাপার উপলক্ষে অনেক কাণ্ডকারখানা হইল। আমীর আলী নামক এক জন ধনী ওহাবীর বিচার হয় ও তাহাকে আন্দামানে দ্বীপান্তরিত করা যায়।

চৌরঙ্গীর একাংশ—১৮১২ খৃঃ

কলিকাতার শ্রীবৃদ্ধি ও প্রসার তখনও আরম্ভ হয় নাই। তখনকার চৌরঙ্গী ও এখনকার চৌরঙ্গীতে অনেক প্রভেদ। এ কালের মত বিরাট হর্ম্ম্য তখন মাত্র ২।৪টি হইয়াছে। উইলসন্ হোটেল তখন অবশ্য ছিল, কিন্তু এ কালের মত এত প্রকাণ্ড ছিল না। আর তখন কলিকাতার ধন-দৌলৎ এখনকার এক-দশমাংশও ছিল কি না সন্দেহ। ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রসার তেমন ছিল না। পাট তখন এ দেশে জন্মিত না বলিলেই চলে। পল্লীগ্রামে গৃহস্থের প্রয়োজনানুযায়ী পাট চাষ হইত। গো-বন্ধনের, ঘর বা বাগানের বেড়ার এবং মৃৎকুটীরের চাল ছাইবার জন্য রজ্জু

প্রস্তুত করিতে পাটের আবশ্যক হইত। তখন প্রতি পল্লীগৃহস্থ অবসর-মত পাট হইতে সূতা পাকাইত। তখন পাট বড একটা রপ্তানী হইত না। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের পর হইতে পাটের রপ্তানী আরম্ভ হয়। তখন দুই একটি পাটের কারখানা হইতেছে। এখন কলিকাতা বন্দর হইতে পাট ও বোম্বাই বন্দর হইতে তুলার রপ্তানী বাদ দিলে কি অবস্থা হয়, তা কল্পনায় আইসে না।

কাউন্সিল হাউস—১৮১২ খৃঃ

হাওড়ার লোকসংখ্যার অধিকাংশই পাটের ব্যবসাদার ও কুলী লইয়া গণিত। বজবজ হইতে আরম্ভ করিয়া ত্রিবেণী পর্য্যন্ত হুগলীর উভয় তটে ৮১টি পাটের কল আছে। প্রত্যেক পাটের কলে গড়ে ৭।৫ হাজার শ্রমজীবী আছে। এইরূপে প্রায় ৩।৪ লক্ষ লোক আজ জীবিকা অর্জ্জন করিতেছে। যখন পাট হয় নাই, তখন চাউলও অত্যন্ত কম হইত, চাউলের রপ্তানীও খুব কম ছিল। আমাদের ছেলেবেলায় পাঁচ সিকা মণ চাউল বিক্রয় হইতে দেখিয়াছি। তাহার পর দেড় টাকা, পৌনে দুই টাকা। দেশী জিনিষের দুর্ম্মূল্যতা চাউলের দর দেখিয়া বুঝা যায়। আমাদের দেশী মোটা চাউল যখন পাঁচ সিকা, দেড় টাকা, তখন কলিকাতায় না হয় ২ টাকা, আর আজকাল ৯ টাকা হইতে ১০ টাকা পর্য্যন্ত। আমি যখন কলিকাতায়
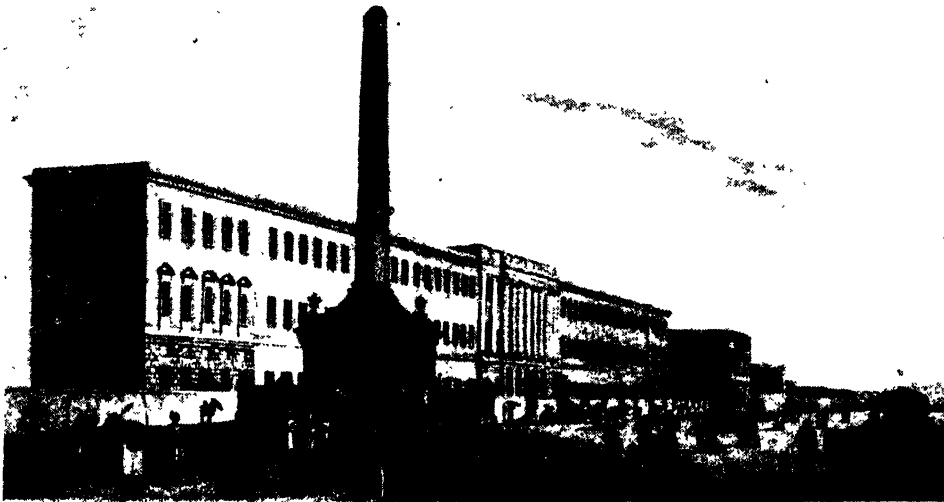
রাইটার্স বিল্ডিং—১৮১২ খৃঃ

আসি, তখন বিশুদ্ধ ঘৃত ছিল মণ প্রতি ১৮ টাকা, আর এখন বিশুদ্ধ ঘৃত ত বাজারেই পাওয়া যায় না।

যাহার গৃহে গরু আছে, যে নিজে ননী-মাখন করে, সে উহা হইতে বিশুদ্ধ ঘৃত পাইতে পারে। বাজারে যে ঘৃত বিশুদ্ধ বলিয়া চলে, তাহাতেও কিছু না কিছু ভেজাল আছেই, আর তাহাও ৩ টাকা সেরের কমে পাওয়া দুষ্কর।

এখন যেমন এ দেশে কেরোসিনের বহুল প্রচার হও-য়াতে টিনের ক্যানে-স্তারা অজস্র মিলে, তখন তাহা ছিল না—কেন না, কেরোসিন তৈলের ব্যবহার হইত না। মটকির বিশুদ্ধ ঘৃত মণ প্রতি ১৫ হইতে ১৮ টাকা মূল্যে পাওয়া যাইত এবং চর্ব্বি, মহুয়া প্রভৃতির তৈল ভেজাল দেওয়া হইত না। মিঠাই, কচুরী, গজা, জিলিপী প্রভৃতি ৫ আনা হইতে ৬ আনা সের মূল্যে পাওয়া যাইত। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে বিহার অঞ্চলে ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। আমার পিতা এই জন্য তাড়াতাড়ি এক গাড়ী অর্থাৎ ২০ মণ বালাম চাউল ১১ সিকা মূল্যে ক্রয় করিলেন। বলা বাহুল্য, মহাজনরা এই সংবাদ পাইবার পূর্ব্বেই কিছু দর চড়াইয়াছিলেন, নচেৎ বাজার দর আড়াই টাকার বেশী হইত না। এখন সেই চাউলের বাজার দর ১০ টাকা। আমরা যে বাড়ীতে মাসিক ৩০ টাকা ভাড়ায় থাকিতাম, তাহার ভাড়া এখন অন্যূন দেড় শত টাকা। তখনকার দিনে আজকালকার মত এত বেশী পয়সা, সিকি, দুয়ানীর প্রাচুর্য্য ছিল না। সাধারণ কেনাবেচা কড়ি দিয়া চলিত। যাহার যতটুকু জিনিষ আবশ্যক, কড়ি মূল্যে তাহা ক্রয় করিত। আজকাল সামান্য পানওয়ালীও এক পয়সার কমে পান বিক্রয় করে না!

এসপ্লানেডের একাংশ—১৮১২ খৃঃ

এসপ্লানেড রো—১৮৩৬ খৃঃ

বলা বাহুল্য, গঙ্গার সেতু তাহার অনেক পরে হইয়াছে,—বোধ হয় ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে। এই পুলের বিখ্যাত এঞ্জিনিয়ার সার ব্রাডফোর্ড লেস্‌লী (Sir Bradford Leslie) এখন জীবিত আছেন। বয়স অন্ততঃ ৯০এর অধিক হইবে। তখনকার বড়বাজার আর এখনকার বড়বাজারে অনেক প্রভেদ। তখন কতক কতক মাড়োয়ারী কলিকাতায় আসিয়া যথেষ্ট প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল বটে। বিলাতী কাপড়ের আমদানী তাহারাই আরম্ভ করিয়াছিল। সে সময় ২।৪ জন বাঙ্গালী বিদেশী সওদাগরী হৌসের মুচ্ছুদ্দী ছিল। প্রাণকৃষ্ণ লাহা কোম্পানী, অর্থাৎ রাজা

চিৎপুর রোডের দৃশ্য—১৮১২ খৃঃ

হৃষীকেশ লাহাদের পূর্ব্বপুরুষ ও শিবকৃষ্ণ এণ্ড কোম্পানী প্রভৃতি ২।৪টি বড় বড় বাঙ্গালী ফারম (Firm) ছিল, ইঁহারা বিলাতী মাল আমদানী করিতেন। কিন্তু ক্রমে ক্রমে আমাদের অপটুতা ও শ্রম-বিমুখতা বশতঃ মাড়োয়ারীরা সেই সমস্ত পদ দখল করিয়া লইয়াছে। সে সময় বড়বাজারে অনেক বাঙ্গালীর বাড়ী ছিল। বিশেষতঃ তখন চোরবাগানের মল্লিকদের, জোড়াসাঁকোর শ্যাম মল্লিক প্রভৃতির লব্ধপ্রতিষ্ঠ ধনী বলিয়া খ্যাতি ছিল। আর এখন যদি মাড়োয়ারীদের সহিত তাঁহাদের তুলনা করেন, তাহা হইলে কি দেখিতে পাইবেন? রাজা হৃষীকেশ লাহাকে

আমি অনেক সময় বলিয়া থাকি, এমন অনেক মাড়োয়ারী ভাটিয়া আছেন, যাঁহারা তাঁহার মত লোককে এক হাটে কিনিয়া অন্য হাটে বেচিতে পারেন। এক এক জন মাড়োয়ারী আছেন, যিনি অল্পসময়ের মধ্যে ২।৪ কোটি টাকা রোজগার করেন, আবার হয় ত ততোধিক অল্পসময়ের মধ্যে সেই পরিমাণ টাকা লোকসান দিয়া থাকেন। অথচ তাহাতে তাঁহাদের ভ্রূক্ষেপ নাই।

বোম্বাইয়ে বৎসর তিনেক পূর্ব্বে মথুরাদাস গোকুলদাস একাই বোধ হয় ৪ কোটি টাকা ব্যবসায়ে লোকসান দেন, কিন্তু তিনি মাথা খাড়া করিয়া রহিলেন—কতকগুলি কাপড়ের কারবারের managing agency তাঁহাকে অবশ্য ছাড়িতে হইল। বিলাতে তাঁহার যে ঘোড়দৌড়ের ঘোড়া ছিল, তাহাদের দাম ৫০ লক্ষ টাকার কম হইবে না। তাঁহার জননী তখন তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া বলেন, "তুই ভাবিস্ না। আমার যে জহরৎ, মণি, মুক্তা আছে, তার দাম ফেলে ছাড়য়ে দিলেও ১ কোটি টাকা হবে, তোর ইন্‌সলভেন্সী নিতে হবে না।" বড়বাজারেও এইরূপ দুই দশ জন ভাটিয়া, মাড়োয়ারী আছেন। পূর্ব্বে বলিয়াছি, বড়বাজারে তখন অনেক বাঙ্গালীর বাড়ী ছিল। কিন্তু ক্রমে ক্রমে মাড়োয়ারীরা সে সকল দখল করিয়াছে। আমি যখন মফঃস্বলে যাই, তখন বলিয়া থাকি British Conquest of Bengal এবং মাড়োয়ারী Conquest of Pengal, ইত্যাদি। এ জন্য অনেক মাড়োয়ারী আমার উপর বিরক্ত হয়েন। কিন্তু আমি নিন্দার জন্য বলি না। স্বজাতিকে উদ্যোগী পুরুষ হইতে বলিয়া থাকি। এখন যদি বলি,

ইংরাজরা দেশের সব ধন লুণ্ঠন করিয়া লইতেছে, তখন ভাবিবেন না, ইংরাজকে ডাকাইত বলিতেছি; সে বলার অর্থ—'তোমরা দেশবাসীরা জাগ।' আমার অনেক মাড়োয়ারী মক্কেল আছেন, অনেক সময় ভিক্ষার জন্য তাঁহাদের দ্বারস্থ হইতে হয়। তাঁহারা আমাকে খুলনা দুর্ভিক্ষ ও উত্তর-বঙ্গ-প্লাবন উপলক্ষে মুক্তহস্তে হাজার হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

এক সময়ে বড়বাজারে বাঙ্গালীর অনেক বাস্তুভিটা ও জমী ছিল। এখন অবশ্য দেখিতে গেলে বর্দ্ধমানের ও কাশিমবাজারের মহারাজাদের এক আনা আন্দাজ যায়গা আছে। এক দিকে হুগলীর পুল, এ দিকে গঙ্গা, ও দিকে হাইকোর্ট পর্য্যন্ত, আর এ দিকে কুমারটুলীর কাছাকাছি Y. M. C. A. এই সমস্ত পল্লী মাড়োয়ারী-দিগের দখলে আসিয়াছে। আর্ম্মেনিয়ান্ আছে, ইহুদী আছে, ইংরাজ আছে—ইহারা সমস্ত জমী বাঙ্গালীর নিকট হইতে ক্রয় করিয়া লইয়াছে; আর অভাগা বাঙ্গালী 'ভিটে-মাটী-চ্যুত' হইয়া ক্রমে এই সংগ্রামে হটিয়া আসিতেছে। এক্ষণে দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া বাঙ্গালী পৈতৃক সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া ভিটাশূন্য হইয়াছে। যাহাকে peaceful penetration বলিয়া থাকে, সেই প্রথায় ক্রমান্বয়ে চোরবাগান, বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট পার হইয়া সারকুলার রোডের উপর পর্য্যন্ত মাড়োয়ারীরা আসিয়া পড়িয়াছে। এমন কি, অনেক মাড়োয়ারী, ভাটিয়া আছেন, যাঁহারা চৌরঙ্গী অঞ্চলে বড় বড় বাড়ীর মালিক হইয়া তথায় বাস করেন। যাঁহারা একটু শিক্ষিত ও মার্জ্জিতরুচি, তাঁহারা আবার য়ুরোপীয়দের মত থাকিতে শিখিয়াছেন। তাহার উপর সেণ্ট্রাল এভিনিউর দুই পার্শ্বে আমাদের চোখের উপর যে সব ৪।৫ তালা বাড়ী হইতেছে, তাহার মধ্যে শতকরা একখানা বাড়ীও বাঙ্গালীর কি না সন্দেহ।

মদনমোহনের মন্দির—১৮১২ খৃঃ

বিখ্যাত বাগ্মী ও ভারত-বন্ধু জন ব্রাইটের (John Bright) কথায়—We are homeless stangers in the land we once called our own.

গঙ্গায় তখন ষ্টীমার একপ্রকার ছিল না বলিলেই হয়। অধিকাংশ মাস্তলওয়ালা পাইল-তোলা জাহাজ ছিল। সুয়েজ কেনাল ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে কাটা হয়। তখন হইতে সুয়েজের ভিতর দিয়া ষ্টীমার চলিতে থাকে। তাহাতে ব্যবসা-বাণিজ্য-জগতে যুগান্তর উপস্থিত হয়, কারণ, উত্তমাশা অন্তরীপ বেষ্টন করিয়া পালীজাহাজকে এ দেশে আসিতে হইত। তাহাতে প্রায় ৩।৪ মাস, কখনও ৬ মাস সময় লাগিত; কাযেই পণ্যসম্ভার অতি উচ্চ মূল্যে বিক্রয় করিতে হইত। কিন্তু সুয়েজ খাল হওয়ার পর ৩।৪ সপ্তাহে লণ্ডন হইতে কলিকাতা আসা সম্ভব হইল; ফলে পণ্য অতি সস্তায় বিক্রয় হইতে লাগিল।
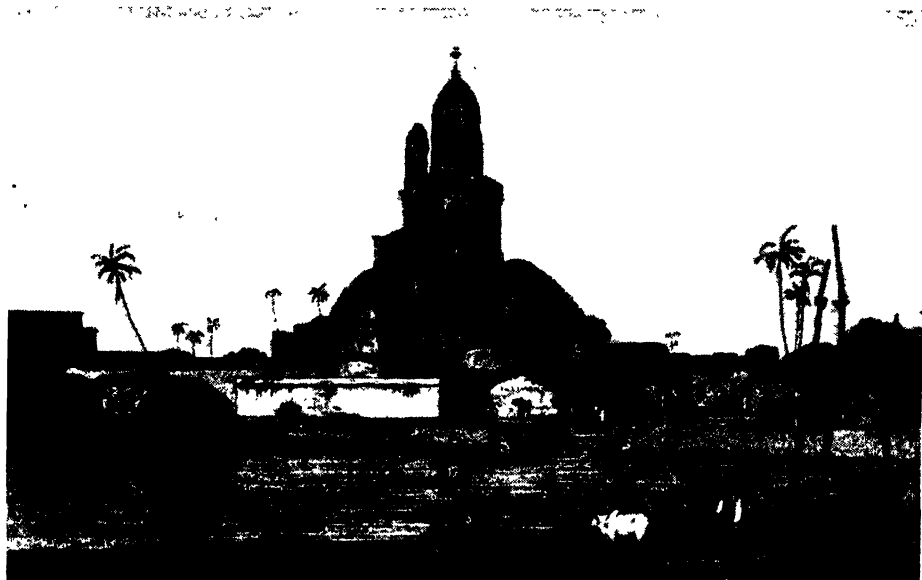
শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়।

১৭

সর্ব্বসুন্দর শ্রীভগবান্‌কে দেখিবার জন্য জীবের ঐকান্তিক আকাঙ্ক্ষাই ভক্তির প্ররোহভূমি। এই ভূমি শ্রবণকীর্ত্তনাদি-রূপ সাধন-ভক্তির নির্ম্মল সলিলধারায় সর্ব্বদা সিক্ত হইলে ইহাতেই শ্রীভগবদ্দর্শন হয় এবং তাহার ফলে পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট ভাব-ভক্তির উদয় হইয়া থাকে।

কুন্তী দেবীর স্তবপ্রসঙ্গে শ্রীমদভাগবতেও ইহাই স্পষ্ট-ভাবে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে—

"শৃণ্বন্তি গায়ন্তি গৃণন্ত্যভীক্ষ্ণশঃ
স্মরন্তি নন্দন্তি তবেহিতং জনাঃ
ত এব পশ্যন্ত্যচিরেণ তাবকং
ভবপ্রবাহোপরমং পদাম্বুজম্ ॥"

যাঁহারা অবিরত তোমার লীলাচরিত শ্রবণ করে, গান করে, বর্ণন করে, স্মরণ করে ও অভিনন্দন করে, তাহারা অচিরকালেই তোমার পাদপদ্মের দর্শন লাভ করিতে সমর্থ হয়, সেই পাদপদ্মই এই দুঃখময় সংসার-নিবৃত্তির একমাত্র উপায়।

এই দর্শনাভিলাষ দর্শনীয় শ্রীভগবান্‌কে পাইয়া যখন ভাবরূপে পরিণত হয়, তখন আর সাধন-ভক্তির আবশ্যকতা থাকে না, এই ভাবাবস্থাকে আনয়ন করিয়া ভক্তকে কৃতার্থ করাই হ্লাদিনীশক্তির মুখ্য কার্য্য। এক কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, শ্রীভগবানের জগৎসৃষ্টিরও ইহাই মুখ্য উদ্দেশ্য।

সচ্চিদানন্দবিগ্রহ রসস্বরূপ শ্রীভগবান্ স্বীয় অচিন্ত্য লীলাশক্তিপ্রভাবে আপনিই আপনা হইতে জীবনিচয়কে এই মায়াময় বিশ্বরাজ্যে প্রবেশ করাইয়াছেন কেন? ইহার উত্তর, জীবনিবহকে চরিতার্থ ও পরিপূর্ণ করা। সৃষ্টির পূর্ব্বে জীবের দেহাত্মাভিমান ছিল না, সুতরাং তাহার সাংসারিক কোন দুঃখই ছিল না, ইহা স্থির, তবে তাহাকে ভবপ্রপঞ্চে প্রবেশ করাইয়া অশেষ প্রকারের সংসার-দুঃখ ভোগ করাই-বার আবশ্যকতা কি ছিল? এই দুরূহ প্রশ্নের উত্তর কোন দার্শনিকই যে ভাল করিয়া দিতে পারিয়াছেন, ইহা মনে হয় না, কারণ, ভারতের দার্শনিক আচার্য্যগণ সকলেই মুক্তি-বাদী, তাঁহাদের সকলেরই চরম বা পরম লক্ষ্য মুক্তি। সৃষ্টির পূর্ব্বে কিন্তু সকল জীবই মুক্ত অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার দুঃখ হইতে নির্ম্মুক্ত ছিল, ইহাও তাঁহারা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন, ইহাই যখন তাঁহাদের সকলেরই সিদ্ধান্ত হইল, তাহা হইলে ইচ্ছা না থাকিলেও তাঁহাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে যে, ভগবান্‌ই আমাদের, অর্থাৎ বদ্ধজীব-নিবহের সকল প্রকার দুঃখভোগের একমাত্র কারণ। তিনি যদি নিজের ইচ্ছায় এই বৈষম্যময় সৃষ্টি না করিতেন, তাহা হইলে আমাদের মধ্যে কেহই কোন প্রকার দুঃখভোগ করিত না, সুতরাং আমাদিগকে দুঃখের সংসারে প্রবেশ করাইয়া তিনি আমাদের প্রতি নির্দ্দয় ব্যবহারই করিয়া-ছেন। জ্ঞানবাদিগণ বলিবেন, জীবের প্রাক্তন কর্ম্মানুসারেই তাহার সংসার-দুঃখ-ভোগ হয়; ইহাতে শ্রীভগবানের কোন হাতই নাই। এ প্রকার উত্তর কিন্তু মনকে তুষ্ট করিতে পারে না। কারণ, এই প্রকার কল্পনা করিলে শ্রীভগবানের অপ্রতিহত স্বাতন্ত্র্য ও কারুণ্যের ব্যাঘাত হয়। শ্রুতি কিন্তু তাঁহার পরিপূর্ণ স্বাতন্ত্র্য নিঃসন্দিগ্ধভাবে উদ্‌ঘোষিত করিতেছে—

"সর্ব্বজ্ঞতা তৃপ্তিরনাদিবোধঃ
স্বতন্ত্রতা নিত্যমলুপ্তশক্তিঃ।
অনন্তশক্তিশ্চ বিভোর্বিধিজ্ঞাঃ
ষড়াহুরঙ্গানি মহেশ্বরস্য।"

যাঁহারা বেদতাৎপর্য্য বুঝেন, তাঁহারা বলিয়া থাকেন যে, সেই সর্ব্বত্র অবস্থিত মহেশ্বরের ছয়টি নিত্য সিদ্ধ গুণ

আছে, যথা—সর্ব্বজ্ঞতা, তৃপ্তি, অনাদিবোধ, স্বতন্ত্রতা, অলুপ্ত শক্তি ও অনন্ত শক্তি। শুধু ইহাই নহে—শ্রুতি আরও বলিয়া থাকে—

"স এষ তং সাধুকর্ম্ম কারয়তি যং উন্নিনীষতি, স বা এষ তং অশুভং কর্ম্ম কারয়তি যমধো নিনীষতি।"

যাহাকে উন্নত করিতে ইচ্ছা করেন, সেই এই ভগবান্ তাহাকে পুণ্যকর্ম্ম করাইয়া থাকেন, আবার যাহাকে অবনত করিতে ইচ্ছা করেন, তাহাকে তিনিই অশুভ কর্ম্ম করাইয়া থাকেন।

মুক্তিবাদী জ্ঞানী দার্শনিকের মতে এই প্রকার ভগবত্তত্ত্বের স্বরূপ সামঞ্জস্যের সহিত সিদ্ধ হয় না এবং ভক্তিসিদ্ধান্তেরও অনুকূল হয় না, এই কারণে শ্রীভগবানের শ্রীমুখনির্গত শ্রুতির পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া ভক্তিবাদী গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ বলিয়া থাকেন যে, শ্রীভগবান্ স্বীয় অপ্রতিহত অচিন্ত্যশক্তি-প্রভাবে জীবকে বিষম সংসারে প্রবেশ করাইয়া থাকেন এবং দুঃখভোগও করাইয়া থাকেন। এই দুঃখভোগরূপ ভগবদ্বিরহের অনুভূতি যথাযথ না হইলে, রসরূপ নিরবধি আনন্দময় শ্রীভগবানের সহিত জীবের ভাবময় মধুর মিলনের অপার আনন্দ সাক্ষাৎ-কৃত হইতে পারে না। বিরহই মিলনের পূর্ণতা সম্পাদন করিয়া থাকে, বিরহের পূর্ণ অনুভূতি যাহার নাই, মিলনের বিমল আনন্দ তাহার পক্ষে গগন-কুসুমের ন্যায় অলীক, তাই নিত্য মিলনের নিরবধি সম্ভোগানন্দ অনুভব করাইয়া জীব-নিবহকে আনন্দভুক্ করিবার জন্য করুণাময় শ্রীভগবান্ মায়াশক্তির দ্বারা এই বৈষম্যময় প্রপঞ্চ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। সৃষ্টির পূর্ব্বে জীবনিবহ তাঁহাতে অগ্নিতে বিস্ফুলিঙ্গসমূহের ন্যায় অবিভক্ত অবস্থায় বর্ত্তমান ছিল, তৎকালে বিরহানুভূতি না থাকায়, জীব-রসরূপ শ্রীভগবানের আস্বাদনানন্দ অনুভব করিতে সমর্থ ছিল না, সুতরাং আনন্দভুক্ও ছিল না—সেই জীবসমূহকে হ্লাদিনীর স্ফূর্ত্তি দ্বারা আত্মানন্দ অনুভব করাই-বার জন্য এই সুখ-দুঃখময় প্রপঞ্চ, তিনি নিজ অঘটন-ঘটনা-পটীয়সী মায়াশক্তির দ্বারা রচনা করিয়াছেন, বাহিরের মায়িক সুখের আস্বাদনে বহির্মুখী বৃত্তির দ্বারা পরিচালিত হইলে, জীব দেহাধ্যাস বশতঃ ভগবদ্‌বৈমুখ্যকে প্রাপ্ত হয়, সঙ্গে সঙ্গে মায়িক দুঃখ, শোক ও বিপদের আবর্ত্তে পতিত হয় এবং নিত্য প্রাপ্ত সুখরূপী ভগবানের আস্বাদনে বঞ্চিত হয়, এইরূপে তাহার সংসারদুঃখভোগ করিতে করিতে সকল দুঃখের নিদান বলিয়া দেহ প্রভৃতিতে বৈরাগ্য লাভ করিবার অবসর হয়, সেই অবস্থায় করুণাময় শ্রীভগ-বানের স্বরূপশক্তি হ্লাদিনীর প্রভাবে তাহার ভগবদ্বিরহেরও তীব্র অনুভূতি জাগিয়া উঠে এবং তাঁহাকেই পাইবার জন্য তীব্র অভিলাষ উৎপন্ন হয়, ইহাই হইল জীবের শ্রীভগবানের প্রতি আসক্তির বা ভক্তির প্রথমাবস্থা, ইহাকেই বৈষ্ণবা-চার্য্যগণ ভগবৎ-প্রেমের অঙ্কুরাবস্থা কহিয়া থাকেন। তীব্র দর্শনাভিলাষের নিরন্তর ঘৃতাহুতিতে জাজ্জ্বল্যমান ভগবদ্-বিরহাগ্নির দারুণ তাপময়ী জ্বালায় চিত্ত তখন জ্বলিত হইয়া দ্রবীভাব প্রাপ্ত হয়, সেই দ্রুতচিত্ত অশ্রুধারারূপে পরিণত হয় এবং সেই অশ্রুধারা নয়নে বহিতে আরম্ভ করিলে, বাহ্যরূপাসক্তিরূপ নয়নের মল প্রক্ষালিত হইয়া যায়, এই ভাবে নয়ন বিশুদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে তাহা দ্বারা চির-আকাঙ্ক্ষিত সর্ব্বসুন্দর শ্যামসুন্দরের মনোহর সূক্ষ্মরূপ সাধ-কের দর্শনযোগ্য হইয়া থাকে।

তাই ভক্ত কবি গাহিয়াছেন—

"সর্ব্বত্র কৃষ্ণের মূর্ত্তি করে ঝলমল।
সেই দেখে আঁখি যার হয় নিরমল॥
অন্ধীভূত নেত্র যার বিষয় ধূলিতে।
কেমনে সে সূক্ষ্ম মূর্ত্তি পাইবে দেখিতে॥"

সাধনা-সিদ্ধির এই প্রথম সূচনারূপ অঙ্কুরাবস্থার বিশেষ পরিচয় শ্রীমদ্‌ভাগবতেও অতি সুন্দরভাবে প্রদত্ত হইয়াছে, যথা—

"এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা
জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়-
ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ॥"

এই প্রকার ব্রতাবলম্বী সাধক নিজের ইষ্ট শ্রীভগ-বানের নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে তাহাতেই অনুরক্ত হইয়া থাকে—সেই অনুরাগবশে তাহার চিত্ত বিগলিত হয়, তখন সে অকস্মাৎ হাসিয়া থাকে, আবার কখনও রোদন করে, কখনও উচ্চৈঃস্বরে তাঁহাকে ডাকিয়া থাকে এবং গানও করে, তখন সে আর এ সংসারের লোক থাকে না, নিজ ভাবেই উন্মত্তের ন্যায় সে নৃত্যও করে।

এই লোকবাহ্য অবস্থায় উপনীত হইলে ভক্ত এ সংসারে যাহা কিছু দর্শন করে, সর্ব্বত্রই তাহার শ্রীভগবানের স্বরূপ-দৃষ্টি হইয়া থাকে, এ জগৎ সকলই তখন তাহার নিকট শ্রীকৃষ্ণময় হইয়া যায়।

তখন—

"খং বায়ুমগ্নিং সলিলং মহীং চ
জ্যোতীংষি সত্ত্বানি দিশো দ্রুমাদীন্।
সরিৎসমুদ্রাংশ্চ হরেঃ শরীরম্
যৎকিঞ্চ ভূতং প্রণমেদনন্যঃ॥"—(ভাগবত)

আকাশ, অনিল, অনল, সলিল, পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য্য প্রভৃতি জ্যোতিষ্কনিচয়, মনুষ্য, গো, মহিষ, ছাগ প্রভৃতি প্রাণিসমূহ—পূর্ব্ব-পশ্চিম উত্তর-দক্ষিণ উর্দ্ধ ও অধোদিক-চক্রবালে পরিদৃশ্যমান তরু, গুল্ম, লতা, বৃক্ষ প্রভৃতি স্থাবর-নিবহ, নদী বা সমুদ্র সকল প্রাপঞ্চিক বস্তুই তাহার নয়নে প্রাপঞ্চিক সত্তা হইতে বিচ্যুত হয়, সকল বস্তুই তাহার সম্মুখে সেই আনন্দময় শ্রীহরির জ্যোতির্ম্ময় শরীর বলিয়া প্রতীত হয়—তাই সে যাহা কিছু দেখে, তাহাতেই শ্রীভগবানের চিদানন্দময় বিগ্রহের স্ফূর্ত্তি দেখিয়া ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া থাকে।

এই প্রকার সর্ব্বত্র সর্ব্বদা ভগবৎস্ফূর্ত্তির সঙ্গে সঙ্গে অনাদি-কালসঞ্চিত দেহাত্মভাবের প্রবল সংস্কার বশতঃ কদাচিৎ দ্বৈতস্ফূর্ত্তিরূপ ভগবদ্‌বিরহের তীব্র অনুভূতিই ভগবৎপ্রেমের ভাবময় বিবর্ত্ত, এই ভাবময় বিবর্ত্তের অপূর্ব্ব আস্বাদনই ভক্ত-জীবনে জীবন্মুক্তি,কলিযুগ-পাবনাবতার শ্রীচৈতন্যদেবই ইহার চরম বা পরম আদর্শ, নিজ মুখে আপনার এই অপ্রাকৃত ভক্তিদশার পরিচয়প্রসঙ্গে তিনি ইহাই ব্যক্ত করিয়াছেন—

"এই মত দিনে দিনে স্বরূপ রামানন্দ সনে
নিজ ভাব করেন বিদিত।
বাহ্যে বিষ-জ্বালা হয় ভিতরে আনন্দময়
কৃষ্ণপ্রেমার অদ্ভুত চরিত॥
এই প্রেমার আস্বাদন তপ্ত ইক্ষু চর্ব্বণ
মুখ জ্বলে, না যায় ত্যজন।
সেই প্রেমা যার মনে তার বিক্রম সেই জানে
বিষামৃতে একত্র মিলন॥
—(চৈতন্য-চরিতামৃত)

শ্রীগৌরাঙ্গদেবের এই ভাবোন্মাদময় ভগবৎপ্রেমের পূর্ণ-বিকাশ ব্রজধামেই হইয়াছিল, তাই বৈষ্ণবকবিকুল-ধুরন্ধর শ্রীরূপ গোস্বামী বিদগ্ধমাধব নামক কৃষ্ণলীলা-নাটকে ইহার পরিচয়প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

"পীড়াভির্নবকালকূটকটুতা গর্ব্বস্য নির্ব্বাসনো
নিঃস্যন্দেন মুদাং সুধামধুরিমাহঙ্কারসঙ্কোচনঃ।
প্রেমা সুন্দরি নন্দনন্দনপরো জাগর্ত্তি যস্যান্তরে
জ্ঞায়ন্তে স্ফুটমস্য বক্রমধুরস্তেনৈব বিক্রান্তয়ঃ॥"

বিরহের দারুণ পীড়ানিবহে এই প্রেম নূতন কালকূটের তীব্রতামূলক গর্ব্বকে নির্ব্বাসিত করিয়া থাকে, আবার প্রিয়-তমের নিত্য স্ফূর্ত্তিজনিত যে অপার আনন্দ অনুভূত হয়, সেই আনন্দের নিঃস্যন্দে সুধার ও মাধুর্য্যের অহঙ্কার সঙ্কু-চিত হইয়া যায়, হে সুন্দরি! নন্দনন্দনের প্রতি এই প্রেম যাহার মনে উদিত হয়, সেই ব্যক্তিই ইহার বক্র অথচ মধুর বিক্রম অনুভব করিতে সমর্থ হয়।

এই মধুররসাত্মক প্রেম-ভক্তির সহিত মুক্তির তুলনা হইতে পারে না, কারণ, ইহা অভাবময় নহে, পরন্তু ইহা সর্ব্বোচ্চসর্ব্ব দুঃখবিরোধী ভাবস্বরূপ, মানবোচিত মনো-বৃত্তির পরিপূর্ণ বিকাশই এই ভক্তির স্বভাব, মোক্ষে মনোবৃত্তিনিচয়ের আত্যন্তিক ধ্বংসমাত্রই হইয়া থাকে, সে অবস্থায় আস্বাদয়িতা না থাকায় আস্বাদ্য কিছুই থাকে না,—এই কারণে সেই মোক্ষের প্রতি কাহারও প্রীতি হওয়া উচিত নহে। যে নির্ব্বাণে সকল প্রকার কর্ত্তব্যের উচ্ছেদ হয়, যেখানে জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা এই ত্রিপুটী-ভাব।বগলিত হয়, অহংসত্তার আত্যান্তক উচ্ছেদ যাহার স্বরূপ, সেই নির্ব্বাণে রসতত্ত্ববিদ্ ভক্তের রুচি হওয়া কখনই সম্ভবপর নহে। কবিচূড়ামণি রসজ্ঞ কবি কবিকর্ণপূর তাই বলিয়াছেন,—

"নির্ব্বাণ-নিম্বফলমেব রসানভিজ্ঞা-
শ্চূষন্তু নাম, রসতত্ত্ববিদো বয়ন্তু।
শ্যামামৃতং মদনমন্থরগোপরামা
নেত্রাঞ্চলীচুলুকিতাবসিতং পিবামঃ॥"
—চৈতন্যচন্দ্রোদয় ৭ম অঙ্ক।

যাহারা রসতত্ত্বে অনভিজ্ঞ, তাহারা নির্ব্বাণরূপ নিম্ব-ফলের প্রতি অভিলাষযুক্ত হউক, আমরা কিন্তু রসতত্ত্বের

আস্বাদন করিতে সমর্থ হইয়াছি, এই কারণে কাম যাহাদের প্রেমে পরিণত হইয়া স্থৈর্য্য প্রাপ্ত হইয়াছিল, সেই সকল গোপ-রমণীগণের নয়নৈকদেশ হইতে পীতশেষভাবে নির্গলিত শ্যামরসরূপ অমৃতই আমরা পান করিয়া থাকি।

সংসারে জীবমাত্রই আনন্দকামনা করে, আনন্দের জন্যই সকলে কার্য্যতৎপর, সেই আনন্দের আস্বাদ যাহাতে অসম্ভব, এরূপ নির্ব্বাণমুক্তি কোন্ বিবেকী ব্যক্তির স্পৃহণীয় হইতে পারে? কাহারও না। জ্ঞানী বলিবেন, সংসার যখন দুঃখে ভরা, আমার আমিত্ব থাকিতে যখন আমার দুঃখের হস্ত হইতে নিষ্কৃতির সম্ভাবনা নাই, তখন দুঃখের হস্ত হইতে নিষ্কৃতিলাভের জন্য আমার আমিত্বের উচ্ছেদও স্পৃহণীয় হইবে না কেন?— ভক্ত বলেন, সংসার দুঃখময় কাহার দোষে? আনন্দময় লীলাপর শ্রীহরি সংসারকে আনন্দময় করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, দেহাভিমানী ইন্দ্রিয়-সুখলম্পট সংসারী জীব ভোগের তৃষায় ব্যাকুল হইয়া নিজ কর্ত্তব্য বুঝে না বা বুঝিয়াও করিতে চাহে না, নিজে শ্রীভগবানের নিত্যদাস হইয়াও তুচ্ছ কর্ত্তৃত্বাভিমানের বশে সে প্রভু হইতে চাহে, তাই তাহার পক্ষে স্বভাববশে সংসার দুঃখময় হইয়া দাঁড়ায়, এই সকল অনর্থের মূল হইতেছে তাহার ভগবদ্বৈমুখ্য, সে যদি ভগবদ্বিমুখ না হইয়া আপনার স্বতঃসিদ্ধ ভগবদ্দাসভাবকে বুঝিতে পারে, তাহা হইলে তাহার ইন্দ্রিয়-লৌল্য স্বতই নিবৃত্ত হয় এবং ভগবদ্ভজনে প্রবৃত্তিও জাগিয়া উঠে—সেই প্রবৃত্তি দ্বারা পরিচালিত জীবের দেহাত্মভ্রান্তি আপনিই সরিয়া পড়ে,— সর্ব্বজীবে ভগবৎসত্তার পরিপূর্ণ ভাব দেখিতে পাইয়া সর্ব্বাত্মভূত হরির সেবায় তখন সে অধিকার প্রাপ্ত হয়, এবং সাধনভক্তির প্রভাবে ভগবদ্ভজনানন্দে অধিকারী হইয়া থাকে। সে আনন্দের আস্বাদন যাহার ভাগ্যে ঘটে, তাহার পক্ষে এ সংসারের কোন বস্তু বা কোন অবস্থাই দুঃখের কারণ হইতে পারে না, তাহার নিকটে সংসারের সকল বস্তুই সুখময় হইয়া উঠে—সে ভজনানন্দে আত্মপর-ভেদদর্শনে অসমর্থ হয় এবং প্রকৃত হরিসেবক হয়, সুতরাং তাহার পক্ষে জীবন দুঃখের হেতু নহে, অলৌকিক অপার আনন্দেরই হেতু হইয়া থাকে, তখন তাহার আমিত্ব দেহ, ইন্দ্রিয়, কলত্র-পুত্র প্রভৃতিতে সীমাবদ্ধ থাকে না—তাহার আত্মসত্তায় সংসার পরিপূর্ণ হইয়া যায়। তাই শাস্ত্র বলিতেছে,—

"নিরহং যত্র চিৎসত্তা সা তুর্য্যা মুক্তিরুচ্যতে।
পূর্ণাহন্তাময়ী ভক্তিস্তর্য্যাতীতা নিগদ্যতে॥"

যে অবস্থায় চিৎসত্তা অহঙ্কারবর্জ্জিত হয়, তাহাকে তুরীয় মুক্তি বলা যায়, আর অহংভাব যে অবস্থায় পরিপূর্ণতা লাভ করে, তাহাকেই ভক্তি কহে। এই ভক্তি তুরীয় অবস্থা হইতেও অতীত, এই ভক্তির উদয় হইলে মানব-আত্মা বিশ্বাত্মা হইয়া উঠে, মুক্তি এরূপ অবস্থায় স্বয়ং উপস্থিত হইলেও ভক্ত তাহার প্রতি উপেক্ষাই করিয়া থাকে। তাই শাস্ত্র বলিতেছে,—

"সিদ্ধয়ঃ পরমাশ্চর্য্যা মুক্তয়ঃ পরমাদ্ভুতাঃ।
হরিভক্তিমহাদেব্যাশ্চেটিকাবদনুব্রতাঃ॥"

বিচিত্র প্রকারের অণিমাদি সিদ্ধিনিচয় এবং পরমাদ্ভুতস্বরূপ মুক্তিসমূহ—হরিভক্তিরূপা মহাদেবীর পরিচারিকা দাসীর ন্যায় অনুসরণ করিয়া থাকে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া মুক্তি ও ভক্তির স্বরূপনির্ণয়প্রসঙ্গে আমার যাহা বক্তব্য, তাহার উপসংহার এইখানেই করা গেল। আমি যাহা বলিয়াছি, তাহা নিতান্ত অল্প হইলেও পাঠকবর্গের ধৈর্য্য-ভঙ্গভয়ে বাধ্য হইয়া আপাততঃ এইখানেই এই প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি। যাঁহারা এ বিষয়ে অধিক অনুসন্ধান করিতে চাহেন, তাঁহারা ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ও ভাগবত-সন্দর্ভ প্রভৃতি গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থনিবহের পর্য্যালোচনা করিবেন।

শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ।

শিল্প-মঞ্জরী

জ্যাকেট সেমিজ ঃ—বঙ্গের নারী জাতির মধ্যে ইহা একটি প্রিয় লজ্জানিবারণোপযোগী সেমিজ। এই সেমিজের প্রচলন অধিকাংশ সময় সৌখীন নারী-সমাজেই দেখিতে পাওয়া যায়।

সরঞ্জাম ঃ—(Materials) কাপড় দু'লম্বা অর্থাৎ ৪৪" ইঞ্চি লম্বা হইলে ২ গজ ২৭" ইঞ্চি।

জ্যাকেটের মাপ ঃ—জ্যাকেটের মাপ লইতে হইলে কাঁধ হইতে হাটু ৯" ইঞ্চি নীচে পর্য্যন্ত মাপ লইতে হয় অথবা মেয়েদের পছন্দানুযায়ী লওয়া দরকার। মনে করুন ঃ—

লম্বা—৪৪" ছাতি—৩২" কোমর ২৮" পুট—৬" পুট হাতা—১৫" মোহরী—১৩" সেস্ত—১৫"

জ্যাকেট সেমিজের কয় অংশ কাপড় দরকার ঃ—সম্মুখ ও পিছন, দুই হাতা, বোতাম পটী, হাতের মোহরীর পটী।

জ্যাকেট সেমিজ করিবার প্রণালী ঃ—যে কাপড়ের জ্যাকেট সেমিজ হইবে, তাহার চওড়া দিকে ডবল ভাঁজ করিয়া লম্বা মাপের ৪" ইঞ্চি কাপড় বেশী লইয়া অর্থাৎ ৪৪"+৪"=৪৮" ইঞ্চি স্থানে দাগ করিতে হইবে। মনে করুন, ক, খ ৪৮" এই লাইনের উপর চিহ্ন করিতে হইবে, ক বিন্দু ছাতির মাপের ¼ অংশে ৮"—২"=৬" ইঞ্চি স্থানে গ চিহ্ন করিয়া ঘ ১½" ইঞ্চি নীচে ক, চ সেস্ত মাপ ১৫" ইঞ্চি চ, ত ১½" ক, খ লাইনের ভিতর ভাগে চিহ্ন করিয়া ক বিন্দু হইতে ত চিহ্নে দাগ কাটিয়া ত, ফ ২ ইঞ্চি নীচে সোজা অংশে দাগিয়া লইতে হইবে। এখন ক, ড পুট মাপ ৬" ইঞ্চি+¼"=৬¼" ইঞ্চি চিহ্ন করিয়া ড বিন্দু হইতে গ, ছ লাইন পর্য্যন্ত সোজা ভাবে দাগিতে হইবে। ঘ, জ ছাতির ¼ অংশ ৮"+১=৯" ইঞ্চি স্থানে চিহ্ন করিয়া ত বিন্দু হইতে কোমরের মাপের ¼ অংশ ৭"+১=৮" ইঞ্চি স্থানে ঘ চিহ্ন করিয়া চ, ট সংযোগ করিতে হইবে।

এখন সেমিজের ঘের খ বিন্দু হইতে ছ বিন্দু পর্য্যন্ত ১৬" ইঞ্চি খ লাইন হইতে ১½" ইঞ্চি উপরে ছ বিন্দু চিহ্ন করিয়া চিত্রানুযায়ী দাগিয়া ট, প সংযোগ করিতে হইবে।
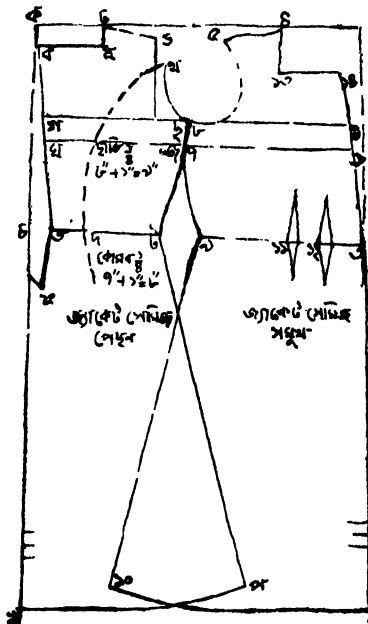
১নং চিত্র

জ্যাকেট-সেমিজে জ্যাকেটের ন্যায় একটি ভাঁজ অথবা দুইটি ভাঁজও দেওয়া যায়, সেইটি ড, ছ অর্দ্ধেক থ বিন্দু ত বিন্দু হইতে ২" ইঞ্চি দূরে দ বিন্দু চিহ্ন করিয়া থ, দ বাঁকা ভাবে চিত্রানুযায়ী সংযোগ করিতে হইবে। গলার অংশ দাগিবার সময় ড বিন্দু হইতে ২½" ইঞ্চি ভিতর অথবা যে, যে ভাবের খোলা পছন্দ করে, সেই অনুরূপ ঢ বিন্দু চিহ্ন করিয়া ধ বিন্দু ২" ইঞ্চি নীচে সোজা চিহ্ন করিয়া ক, খ লাইনের সঙ্গে ধ, ব সোজা লাইনে সংযোগ করিয়া লইলে সেমিজের পিছনকার অংশ দাগ দেওয়া হইল। এখন ব, ধ, ঢ, ড, থ, ছ, ট, ছ ও খ দাগে কাটিয়া লইলে পিছনের অংশ কাটা হইল।

সম্মুখের অংশ কাটিবার সময় কাপড়কে ডবল ভাঁজ করিয়া সম লম্বা কাপড় লইয়া সম্মুখের অংশ দাগিতে হইবে। গ, ছ লাইনে ৮, ১ সোজা লাইন টানিয়া ছাতির মাপ লইতে হইবে। ঘ, জ ছাতির অংশ ৯" ইঞ্চি ৬ বিন্দু ছাতির মাপের ৩২"+৬"=৩৮" ইঞ্চি তাহার অর্দ্ধেক ১৯" ইঞ্চি স্থানে ঘ, জ ছাতির অংশ বাদ দিয়া ১০" ইঞ্চি স্থানে ৭ বিন্দু চিহ্ন করিয়া ত, ট কোমরের মাপের ৮" ইঞ্চি ৩ বিন্দু কোমরের মাপের ২৮"+৭"=৩৫" ইঞ্চি তাহার অর্দ্ধেক ১৭½" ইঞ্চি ত, ট পিছনের অংশে ৮" ইঞ্চি বাদ দিয়া অবশিষ্ট ৯½" ইঞ্চি ৯ বিন্দু চিহ্ন করিয়া ঘেরের অংশ খ, ছ ১৬" ঘের সঙ্গে সম অংশ ২ বিন্দু খ লাইনের সমান রাখিয়া ছ বিন্দু ও স বিন্দু ১৬" ইঞ্চি রাখিতে হইবে। এখন ডবল ভাঁজে দেখা যায়, ৩২" ইঞ্চি ছাতির মাপের সমান রহিল মোট ঘের ৬৪" ইঞ্চি। সেমিজের ঘের সায়ার ঘেরের মত বেশী থাকিলে ক্ষতি হয় না, কম হইলে চলা-ফেরার পক্ষে বড়ই কষ্টকর হয়। এখন ৮, ৯ ও ১০ বিন্দু চিত্রানুযায়ী সংযোগ করিতে হইবে। কোমরের ১১ ও ১২ দাগে দুই চিত্রানুযায়ী ১" ইঞ্চি পরিমাণ টেকিন দিয়া লইতে হইবে, যাহাতে কোমরে টাইট হইয়া বসে। এখন কাঁধ মোহড়া ও গলার অংশ কাটিতে হইবে। ড বিন্দু হইতে ঢ বিন্দু, ড বিন্দুও ৫ বিন্দু আর ঢ বিন্দুতে ৪ বিন্দু সমান রাখিয়া চিত্রানুযায়ী ½" ইঞ্চি উপরে চিত্রানুযায়ী বাঁকাভাবে দাগিতে হইবে। ৫ ও ৮ চিত্রানুযায়ী ভিতরে রাখিয়া দাগিয়া লইতে হইবে যে, পিছনকার মোহড়া ও সম্মুখের মোহড়া একত্র ছাতির মাপের অর্দ্ধেক অর্থাৎ ছাতি ৩২" ইঞ্চি অর্দ্ধেক ১৬" ইঞ্চি হইয়াছে কি না দেখিতে হইবে। মোহড়ার অংশ দাগ দেওয়া হইলে গলার অংশ দাগ দিতে হইবে। গলা যত বেশীর ভাগ খোলা রাখিবার ইচ্ছা হয়, তত বেশী রাখিতে হইবে। পিছনকার অংশ ঢ, ধ ২" ইঞ্চি কাটা হইয়াছে। সম্মুখের অংশে ততোধিক ৪, ১৩ বিন্দুতে রাখিলে ৪" পরিমাণ রাখিয়া ১৩ বিন্দু হইতে ১৪ বিন্দু সোজাভাবে সংযোগ করিয়া ১৪ ও ৩ বিন্দু একটু বাঁকা-ভাবে চিত্রানুযায়ী সংযোগ করিলে সেমিজের পিছনকার অংশ দাগ দেওয়া হইল। এখন ৩, ১৪, ১৩, ৪, ৫, ৮, ৭, ৯, ১০ ও ২ দাগে কাটিয়া লইলে সম্মুখের অংশ কাটা হইল। ৩ ও ২ সেন্তের লাইন হইতে সম্মুখের অংশে জোড়া থাকিবে।

হাতের অংশ কাটিবার নিয়মঃ—কাপড়কে লম্বা দিকে ছাট বাদ দিয়া পুট হাতার মাপ অনুযায়ী কাপড়কে ডবল ভাঁজ করিয়া এড়ের দিকে ছাতির ⅛ অংশ ২" ইঞ্চি যোগ দিয়া হাতের মোহড়ার অংশ লইতে হইবে। ভ বিন্দু হইতে শ বিন্দু ছাতির মাপের ⅛ অংশ ৮+২"=১০" ইঞ্চি, পুট ৬" ইঞ্চি বাদ দিয়া ভ, য ১৫" ইঞ্চি য বিন্দু হইতে মোহ-রীর অর্দ্ধেক ৬½"+৩"=৯½" ইঞ্চি ব বিন্দু চিহ্ন করিয়া য, ছ যত ইঞ্চি দূরে পিছনের কাপড় আছে, তত ইঞ্চি ভ,ল চিহ্ন করিয়া ল, জ-র সোজা দাগিয়া ভ-র সংযোগ করিয়া ভ-র বাঁকাভাবে সংযোগ করিয়া লইতে হইবে। এখন র বিন্দু ব বিন্দুতে যোগ করিয়া ভ, র, ব ও য দাগে কাটিয়া লইলে হাতের অংশ কাটা হইল।
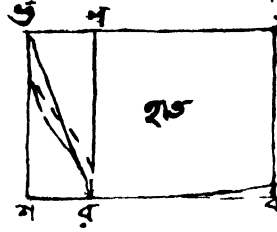
২নং চিত্র

জ্যাকেট-সেমিজ সেলাই ঃ—প্রথমতঃ পিছনের অংশের মাঝখানে ফ, ত ও ধ দাগে খিলনী দিয়া দ, থ দাগে ½" ইঞ্চি পরিমাণ ভাঁজ করিয়া খিলনী দিয়া পরে বকেয়া দিতে হইবে। গলার অংশে পিছনের অংশ দুই ভাঁজকে খুলিয়া ঢ, ধ ও ব লাইনে ইনসেসন বসাইয়া সম্মুখের অংশে ১৪ বিন্দু হইতে ৩ বিন্দু পর্য্যন্ত বোতামপটী ও কাজঘরপটী বসাইয়া লইতে হইবে। বোতামপটী ও কাজঘরপটী বসানো হইয়া গেলে ৪, ১৩ ও ১৪ বিন্দুতে গলার অংশে ইনসেসন বসাইয়া সম্মুখের দুই অংশে ১১ ও ১২ বিন্দু স্থানে দুই দিকে দুইটি করিয়া ৪টি টিকিন দিয়া

৩নং চিত্র

লইতে হইবে। এখন কাঁধ ও পাশের অংশ জুড়িয়া নীচের ঘেরের অংশে ১½" ইঞ্চি পরিমাণ একটি প্লেট ভাঙ্গিয়া সেলাই দিয়া তথার ৩" ইঞ্চি উপরে তিনটি সরু প্লেট সেলাই দিয়া হাতের অংশে মোহরী স্থানে মোহরী মাপের ১½" ইঞ্চি বেশী, মনে করুন ১৩" ইঞ্চি মোহরী + ১½" ইঞ্চি = ১৪½" ইঞ্চি পরিমাণ লম্বা ইনসেসনের পরিমাণ চওড়া এক টুক্‌রা ফলকে ইনসেসনের সঙ্গে ভাঁজ করিয়া মোহরী যতটুকু কাপড় বেশী আছে, তাহাকে কুচি দিয়া জুড়িতে হইবে। তাহার পর বগলের নীচের অংশ জুড়িয়া মোহড়ায় লাগাইয়া সম্মুখে ৫ বা ৬টি বোতাম-ঘর করিয়া সমস্থানে বোতাম বসাইয়া লইলে "জ্যাকেট-সেমিজ" সেলাই হইল।

শিল্পী শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়।

বসুধৈব কুটুম্বকম্

১

ক্ষুদ্র তৃণ—তার সনে
বাঁধা আছি কি বন্ধনে,
আমি নাহি জানি।
ধরণীর আস্তরণে
কবে ছিনু শষ্পাসনে,
আজ নাহি মানি।

২

রুধি রবি-শশি-পথ
যুগ যুগ হিমবৎ
আছে অবিচল;
বিরাট পাষাণ-দেহ,
হয় ত আমারি কেহ—
আমি ক্ষীণবল।

৩

সীমাহীন পারাবার
গরজিছে অনিবার
ভাঙ্গিতে দু'কূল;
ভয়ে তার পানে চাই,—
সে হয় ত মোর ভাই,
আজি কেন ভুল?

৪

উর্ব্বরা করিয়া ভূমি
ধায় নদী তট চুমি'—
মাতৃ-স্তন্যধারা;
জননী বলিতে তায়
কেন মোর প্রাণ চায়?
আমি মাতৃহারা।

৫

ঊর্দ্ধে গ্রহ-পরিবার
ঘুরিতেছে অনিবার—
শশাঙ্ক তপন।
আলো, তাপ অকাতরে
দেয় মর্ত্তবাসী নরে,
তারা যে আপন।

৬

নক্ষত্রের অনীকিনী—
আমি তাহাদের চিনি
চির-পরিচয়ে;
তারা মোর নহে পর,
ঘুরি জন্ম-জন্মান্তর
তাহাদের লয়ে।

৭

আসে যায় ঋতুদল,
দেয় মোরে ফুল-ফল
বড় ভালবেসে।
মেঘ তার লয়ে ঝারি
ঢালে ধরাপৃষ্ঠে বারি—
শস্য উঠে হেসে।

৮

জড়-চৈতন্যের ভেদ,—
আমি এ বুঝি না বেদ,—
মূক বা বাঙ্ময়,
সর্ব্বভূতে আত্মীয়তা,—
আমি বুঝি সার কথা,
পর কেহ নয়।

শ্রীগিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়

৮

সমুদ্রসৈকতে কত বালক-বালিকা ছুটাছুটি করিতেছে, কত নর-নারী বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করিতেছে। এখনও সূর্য্যাস্ত হয় নাই—দূরে চক্রবালে অস্তমিতপ্রায় তপনদেবের রক্তিম আভা আকাশ ও জল রক্তাভ করিয়াছে, কিন্তু মেঘের তলদেশ গোধূলির ধূসর ছায়ায় মলিন হইয়াছে। হু-হু হু-হু বায়ুর অবিশ্রান্ত গর্জ্জন, হা-হা হা-হা মহাসমুদ্রের অনন্ত তরঙ্গভঙ্গ। তরঙ্গের উপর তরঙ্গ চড়িয়া তটপ্রান্তের উদ্দেশে তীরবেগে ছুটিতেছে, মধ্যপথে দ্বিধাভিন্ন হইয়া অর্দ্ধবৃত্তাকারে সৈকতে আসিয়া আছাড়িয়া পড়িতেছে, আবার সৈকতে বাধা প্রাপ্ত হইয়া লজ্জায় শির অবনত করিয়া দূরে ছুটিয়া পলায়ন করিতেছে। সৈকতের সহিত সমুদ্রের এইরূপ অবিশ্রান্ত ক্রীড়া চলিতেছে। সে ভীমকান্ত সৌন্দর্য্যের এ জগতে কি তুলনা আছে!

একটি ক্ষুদ্র শিশু সৈকতে বসিয়া একান্তে বালুকার ক্ষুদ্র ঘর নির্ম্মাণ করিতেছিল, আর তাহারই নিকটে বসিয়া একটি সুন্দরী যুবতী তন্ময়চিত্তে সমুদ্র ও সৈকতের স্নিগ্ধ-গম্ভীর সংগ্রাম নিরীক্ষণ করিতেছিল। কেহ দেখিলে অনুমান করিবে, তাহার বাহ্যজ্ঞান রহিত হইয়াছে। বস্তুতঃ তাহার দৃষ্টি কোনও দিকে নিবদ্ধ ছিল না—কেবল বেলাভূমিতে সেই তরঙ্গভঙ্গ-ভীষণ মহাসমুদ্রের আছাড়ি-পিছাড়ির প্রতি স্থির লক্ষ্য ছিল। সিকতাময় বেলার দুগ্ধস্নিগ্ধ ধবলিমার সহিত যখন অম্বুধির উদ্গারিত ফেনপুঞ্জের সুখ-সম্মিলন হইতেছিল, তখন তাহার হৃদয়ও বিশুদ্ধ আনন্দে ভরিয়া যাইতেছিল—বিশাল লবণাম্বুরাশি যতই তালে তালে নৃত্য করিতেছিল, ততই তাহার মনও সঙ্গে সঙ্গে সুখাবেশে বিভোর হইয়া উঠিতেছিল। একবার সে অস্ফুট আনন্দ-গুঞ্জনে বলিয়া উঠিল, "মরি মরি! কি শোভা! কি শোভা!"

গৃহনির্ম্মাণে নিবিষ্টচিত্ত বালক তাহার কণ্ঠস্বরে আকৃষ্ট হইয়াছিল, বলিল, "কি বল্‌লে মা?"

যুবতী চমকিত হইয়া ধ্যানরাজ্য হইতে বাস্তব জগতে নামিয়া আসিল, স্মিতহাস্যের সহিত বলিল, "কিছু না, তোর ঘর গড়া হ'ল?"

বালক বলিল, "এই হ'ল। কেন মা, রোজই কি তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরতে হবে? কেন, ঐ ত কত লোক রয়েছে, ওরা ত যাচ্ছে না।"

যুবতী হাসিয়া তাহার অঙ্গে এক মুষ্টি বালুকা ছুড়িয়া মারিয়া বলিল, "তা তুই ওদের সঙ্গে থাক না, শৈল, আমি যাই।"

বালক (শৈল) খেলা ফেলিয়া ছুটিয়া আসিয়া যুবতীর গলা জড়াইয়া ধরিয়া আদরে চুম্বন করিয়া বলিল, "দুষ্টু মা-টা! চল না মা, বাড়ী যাই, দাদা আবার বকবে।"

যুবতী সস্নেহে বালককে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া বার বার তাহার মুখচুম্বন করিল—মনে হইতেছিল, যেন তাহার বুভুক্ষ হৃদয় বালককে অফুরন্ত স্নেহ-অমিয়ধারা বণ্টন করিয়াও তৃপ্তি পাইতেছিল না। সুমিষ্ট স্বরে সে বলিল, "না বাবা, আরও একটু খেল, এখনও বৈজনাথ তাড়া দেয় নি।"

বালক তথাপি তাহার আলিঙ্গনপাশ হইতে মুক্ত হইতে ইচ্ছা করিল না, বলিল, "হাঁ মা, এইখানেই আমরা থাকব।"

যুবতী বলিল, "হাঁ রে, তাই হবে। আচ্ছা শৈল, তোর পাহাড় ভাল লাগে, না, এই সমুদ্দুর ভাল লাগে?"

বালক বিজ্ঞের ন্যায় বলিল, "আমার দুই-ই ভাল লাগে।"

যুবতী হো-হো হাসিয়া উঠিল। বালক অপ্রস্তুত হইয়া বলিল, "না মা, এইখানটাই ভাল লাগে। বল, আর পাহাড়ে ফিরে যাবে না, কেমন?"

বলা বাহুল্য, প্রতিমারা পুরী আসিয়াছে। দার্জ্জিলিঙ্গের ঘটনার পর বৎসরাধিককাল অতীত হইয়া গিয়াছে। ইতোমধ্যে তাহারা নানা স্থান ঘুরিয়া আজ দুই মাস হইল পুরীতে বাস করিতেছে। দার্জ্জিলিঙ্গে প্রতিমা এই নেপালী অনাথ বালকটিকে কুড়াইয়া পাইয়াছিল। এই মাতৃহীন বালকের পিতা যে কয় দিন প্রতিমাদের বাড়ী চাকুরী করিয়াছিল, সেই কয় দিনেই এই বালক প্রতিমার হৃদয় অধিকার করিয়া বসিয়াছিল। তাহারা কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তনের পূর্ব্বে হঠাৎ অর্জ্জুন থাপ্পা কলেরায় মারা যায়। তদবধি এই আশ্রয়হীন বালক শৈলনাথ থাপ্পা ইহাদের নিকটেই আছে। বালক তাহাকে মা বলিয়াই জানে—তাহারই নিকট বাঙ্গালীর ছেলের মত বাঙ্গালা ভাষায় লিখিতে, পড়িতে ও কথা কহিতে শিখিয়াছে।

তাই বালক যখন নিজ হইতেই আর পাহাড়ে ফিরিয়া যাইবে না বলিল, তখন প্রতিমার হৃদয় আনন্দের আতিশয্যে ভরিয়া উঠিল—তাহার নয়ন-কমল অশ্রুসিক্ত হইল—তাহার স্নেহ-যত্ন আজ সার্থক হইয়াছে, এ আনন্দ সে রাখিবে কোথা?

পুলকিত স্নেহভরে বালকের মাথাটা বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া প্রতিমা বলিল, "আচ্ছা শৈল, সত্যি বলবি, তোর আর পাহাড়ে যেতে ইচ্ছে করে না?"

বালক আরও বুকের কাছে ঘেঁসিয়া বসিয়া গভীর কণ্ঠে বলিল, "না মা, তুমি যেখানে, আমি সেইখানে থাকতে ভালবাসি।"

প্রতিমার দেহ-মন কি এক অপূর্ব্ব অনাস্বাদিত-পূর্ব্ব ভাবাবেশে ভরিয়া গেল—বড় বড় তপ্ত ফোঁটা গণ্ডস্থল বাহিয়া ঝরিয়া পড়িল—শরীর থর-থর কাঁপিয়া উঠিল।

"মা, তুমি কাঁদছ? কেন মা? চল মা, বাসায় যাই", শৈল কথা কয়টা বলিতে বলিতে প্রতিমাকে টানিয়া কয়েক পদ অগ্রসর হইল, বৃদ্ধ দ্বারপাল প্রকাণ্ড যষ্টি স্কন্ধে লইয়া তাহাদের পশ্চাদনুসরণ করিল। একটা দমকা পাগলা বায়ু সমুদ্র বাহিয়া আসিয়া সৈকতে হু-হু শব্দ করিয়া উড়িয়া গেল, বায়ুভরে বালুকারাশি চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া ঘনান্ধকারে ভরিয়া গেল, মুহূর্ত্তকাল হস্তপরিমিত দূরের কোনও বস্তুই দেখা গেল না। প্রতিমা প্রাণপণে বালককে জড়াইয়া ধরিয়া রহিল বটে, কিন্তু প্রবল বেগবান্ বায়ু তাহার ওড়নাখানা মুহূর্ত্তে উড়াইয়া লইয়া গেল।

যখন আবার প্রকৃতি শান্তমূর্ত্তি ধারণ করিল, তখন সমুদ্র-সৈকতে অনেকে বসিয়া পড়িয়াছে, অনেকে ভয়ে কাঁপিতেছে, অনেকে চোখের বালি মুছিতেছে, অনেকে সমুদ্রশীকরপৃক্ত বসনাঞ্চল নিঙড়াইতেছে, প্রতিমার দ্বারপাল অদূরে সৈকতে শায়িত নৌকার গায়ে জড়ান ওড়নাখানার উদ্ধারসাধন করিতে ছুটিয়াছে। প্রতিমার কিন্তু কোনও দিকে দৃষ্টি ছিল না, সে শৈলকে ক্রোড়ে লইয়া তটভূমি পশ্চাতে রাখিয়া মহা-সমুদ্রের দিকে তাকাইয়া ছিল। তখনও বায়ুতাড়িত বিশাল বারিধির চাঞ্চল্য নিবারিত হয় নাই। সে কি স্নিগ্ধ-গম্ভীর ভয়াল ভীষণ প্রাণোন্মাদকর দৃশ্য! সে তরঙ্গে তরঙ্গে ঘাত-প্রতিঘাত—সে দলিত মথিত মহাসিন্ধুর ক্রোধোন্মত্ত উদ্দাম নৃত্য—সে তুলাতন্তুতে অগাধ অপরিমেয় তুলা-বিধূননের ন্যায় সৈকত-সান্নিধ্যে সফেন তরঙ্গভঙ্গ,—সে দৃশ্য যে একবার দেখিয়াছে, সে ত জীবনে ভুলিতে পারিবে না।

হঠাৎ শৈল শিশুসুলভ কৌতূহলবশে চীৎকার করিয়া উঠিল, "মা, ও মা, দেখ মা, ঐ মেমসাহেব দৌড়ে আসছে, ওর চুলের রাশ চার দিকে কেমন উড়ছে, মুখখানা ঢেকে ফেলেছে।"

প্রতিমা চমকিত হইয়া পশ্চাতে মুখ ফিরাইতেই দেখিল, অতি নিকটেই অপূর্ব্ব চঞ্চলা ক্রীড়ারতা যুবতী-মূর্ত্তি!—সেই য়ুনানী মহিলা বস্তুতঃই যেন বাহ্যজ্ঞানরহিতা হইয়া প্রকৃতির হাসি-কান্নায় আপনাকে ঢালিয়া দিয়া সমুদ্রসৈকতে উদ্দাম আনন্দে ছুটাছুটি করিতেছিল। কি সুন্দর সে নবকিশলয়-লাবণ্যমাখা ঢল-ঢল মুখমণ্ডল! গোধূলির আলো-আঁধারে তাহাকে যেন পরীরাজ্যের রাজকন্যার মতই দেখাইতেছিল। প্রতিমা তাহার মুখের উপর বিস্ময়হর্ষ-পরিপূরিত দৃষ্টি নিবদ্ধ করিতেই সেই য়ুনানী যুবতী হঠাৎ থমকিয়া দণ্ডায়মান হইল। ছুটাছুটির জন্য তখনও তাহার ঘন ঘন শ্বাস নির্গত হইতেছিল, বক্ষঃস্থল কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছিল। কিন্তু সে মুহূর্ত্তমাত্র।

যুবতী ছুটিয়া আসিয়া দুই হাতে প্রতিমার একখানি হাত চাপিয়া ধরিয়া হাস্যস্ফুরিতাধরে ভাঙ্গা ভাঙ্গা বাঙ্গালায় জিজ্ঞাসা করিল,—"আমাকে চিন্‌তে পারেন? সেই যে দার্জ্জিলিঙ্গে সিঞ্চড়ে দেখা হয়েছিল? আপনারা পালিয়ে

এলেন কেন? আমি কত খোঁজ করেছিলুম। ছিঃ ছিঃ, এক দিন দেখা করতেও নেই? আমি সেই এক দিনেই আপনাকে কত ভালবেসেছিলুম—এক দিনও ভুলতে পারি নি। কোথায় আছেন? ক'দিন থাকবেন? এখান থেকে কিন্তু পালাতে দোবো না।"

ইভ এক রাশ কথা কহিয়া ফেলিল, প্রতিমাকে জবাব দিবার অবসরই দিল না। প্রতিমা শৈলকে ক্রোড় হইতে নামাইয়া যোড়হাতে ইভকে নমস্কার করিল, মৃদুস্বরে বলিল, "আপনারা ভাল আছেন? কবে এলেন?"

ইভের সদা হাস্যপ্রফুল্লানন মলিন হইল, সে ঢোক গিলিয়া বলিল, "আমরা আজই পুরী এক্সপ্রেসে এসেছি। আমি বেশ আছি, কিন্তু আমার স্বামী—এই যে তিনি সঙ্গেই আসছিলেন, কোথায় পেছিয়ে পড়েছেন, দুর্ব্বল কি না!"

প্রতিমার দৃষ্টি স্বভাবতঃই ইভের উৎকণ্ঠিত শঙ্কিত দৃষ্টির পথানুসরণ করিল। আবার চারি চক্ষুর মিলন হইল। সেই সিঞ্চড়ে ঊষার প্রথম রাগদীপ্ত সুন্দর প্রভাতে, আর আজ বর্ষ পরে সমুদ্রসৈকতে গোধূলির আলো-আঁধারে! প্রতিমার সমস্ত শরীরের রক্তস্রোত যেন নিমিষে ছুটিয়া আসিয়া মুখমণ্ডল আরক্তিম করিয়া তুলিল; কিন্তু সে ক্ষণমাত্র, পরক্ষণেই মুখখানিকে পাংশুবর্ণ করিয়া দিয়া রক্তস্রোত চলিয়া গেল, প্রতিমা দৃষ্টি অবনত করিল।

ইভ ছুটিয়া গিয়া বিমলেন্দুর হস্ত ধারণ করিয়া বলিল, "ইন্দু, ডার্লিং, চিনতে পারছো না এঁকে? ইস, বড় হাঁপাচ্ছো যে, বড্ড বেশী পরিশ্রম হয়েছে।" বলিতে বলিতে ইভ বিমলেন্দুর একখানি হাত আপনার কাঁধের উপর তুলিয়া দিয়া তাহার দেহের সমস্ত ভারটা পরম যত্নভরে আপনার উপরে তুলিয়া লইল। ইভ বলিয়া যাইতে লাগিল, "আমি বারণ করেছিলুম, শুনলে না। সারা রাত গাড়ীর কষ্ট গিয়েছে, আজ বিশ্রাম নিলেই হ'ত।"

বিমলেন্দু নারীর সম্মুখে এই ভাবে ব্যবহৃত হইয়া বিষম লজ্জিত হইয়াছিল। সে তাড়াতাড়ি আপনাকে ইভের বাহুবন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া বলিল, "না, কষ্ট হবে কেন? চল, ঐখানটায় গিয়ে বসি।"

তখনও বিমলেন্দু হাঁপাইতেছিল। য়ুরোপীয় পরিচ্ছদে তাহাকে প্রতিমা প্রথমে মুহূর্ত্তকাল চিনিতে পারে নাই; কিন্তু না চিনিবার আরও যথেষ্ট কারণ যে ছিল না, এমন নহে। এই কি সেই বলিষ্ঠ, সুস্থ, যুবক বিমলেন্দু? এক বৎসরে কি পরিবর্ত্তন! শীর্ণ দেহ, চক্ষু কোটরগত, দেহের বর্ণ মলিন!

ইভ তাহার কথাটা কাড়িয়া লইয়া বলিল, "বাঃ, বেশ ত! এঁর সঙ্গে আলাপ না করেই যাবে, এ কি রকম কথা? সিঞ্চড়েই না বলেছিলে, এঁদের সঙ্গে তোমার জানা-শোনা আছে? বোন্, তুমি এঁকে জান?"

প্রতিমা মহা বিপদে পড়িল—সে বিমলেন্দুকে দেখিয়াই মুখের অবগুণ্ঠন টানিয়া দিয়া শৈলর হাত ধরিয়া অবনতদৃষ্টি হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল। বিমলেন্দুকে কোন জবাব দিবার অবসর না দিয়াই সে স্পষ্ট খোলা গলায় বলিল, "না, জানি না। হয় ত বাবার সঙ্গে জানা-শোনা থাকতে পারে। আয় শৈল।"

কথাটা বলিয়া সে উচ্চ তটভূমির দিকে অগ্রসর হইতে পা বাড়াইল। ইভ তাহাকে বাধা দিয়া বলিল, "বাঃ, আপনি বেশ ভদ্রলোক ত? কোথায় বাসা নিয়েছেন ব'লে যান। না হয় চলুন, আজই আপনার ওখানে বেড়িয়ে আসছি। আমরা 'সি ভিলা' ভাড়া করেছি—ঐ যে ঐ নিশান উড়ছে। আমায় না জানিয়ে কিন্তু এবার পালাতে পারবেন না, প্রতিজ্ঞা করুন।"

প্রতিমা মহা ফাঁপরে পড়িল, সে যত সঙ্গ ত্যাগ করিতে চায়, এই মায়াবিনী মেয়েটা ততই তাহাকে আঁকড়িয়া ধরে, বিধাতার এ কি অপূর্ব্ব খেলা! সে কি জবাব দিবে ভাবিতেছিল, কিন্তু তৎপূর্ব্বেই বিমলেন্দু ব্যথিত অভিমানাহত কণ্ঠে বলিল, "ইভ, তুমি ছেলেমানুষ! দেখছ না, ওঁরা তোমাদের সঙ্গে মিশতে চান না। বিশেষ ওঁরা বড়লোক। এস, যাই।"

ইভ কিন্তু কোন কথা শুনিল না, সে ছুটিয়া গিয়া প্রতিমার একখানি হাত ধরিল, বলিল, "বলুন, আমায় না জানিয়ে কোথাও যাবেন না, বলুন।"

প্রতিমা তাহার সরল শিশুর মত আব্দার দেখিয়া হাসি চাপিয়া রাখিতে পারিল না, বলিল, "আচ্ছা, তাই হবে। কিন্তু আমরা বেশী দিন এখানে থাকব না, তা ব'লে রাখছি।" প্রতিমা তাহাদের ঠিকানা বলিয়া দিল।

ইভ মহা সন্তুষ্ট হইয়া তাহার হস্তচুম্বন করিল, বিমলেন্দুর দিকে ফিরিয়া মৃদু হাসিয়া বলিল, "দেখলে ইন্দু, আমার

কথা থাকলো কি না—তুমি কি না বল, এঁরা বড় লোক, গরীবের সঙ্গে মেশেন না।"

বিমলেন্দু ব্যঙ্গের হাসি হাসিয়া বলিল, "হাঁ, মিশবেন না কেন, যেখানে এক পক্ষে মন জুগিয়ে চলা, সেখানে মেলা-মেশায় গোল থাকে না।"

আঘাতের উপর আঘাত—প্রতিমার নীলোৎপল নয়ন-যুগল দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল, সে-ও সমান ওজনে জবাব দিল, "যাদের নিজের সামর্থ্যে কোন কিছু কুলোয় না, যারা পরের আঁচল ধ'রে বেড়ায়, তারাই তাদের ছোট মনের মাপে অপরকেও মেপে বেড়ায়।"

সে আর উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়া হন হন করিয়া চলিয়া গেল। বিমলেন্দুর পাণ্ডুর বদনমণ্ডল আরক্তিম হইয়া উঠিয়াছিল। ইভ উভয়ের মুখের দিকে চাহিয়া কিছু বুঝিতে না পারিয়া বিস্মিত হইল।

৯

পাঁচ দিনের মিলামিশাতে উভয়ে উভয়ের প্রতি শীঘ্রই আকৃষ্ট হইয়া পড়িল। ইভ পূর্ব্ব হইতেই প্রতিমাকে প্রীতির দৃষ্টিতে দেখিয়াছিল, সুতরাং তাহার মত স্নেহপ্রবণ প্রকৃতিতে প্রতিমার প্রতি অতি শীঘ্র গভীর স্নেহ প্রেমের নিগড়ে আবদ্ধ হওয়া কঠিন হয় নাই। প্রতিমা স্বভাবতঃ গম্ভীর—সে সহজে বাহিরের লোকের সহিত মিশিত না, এজন্য অনেকে তাহাকে গর্ব্বিতা ধনাহঙ্কারস্ফীতা বলিয়া মনে করিত। সে তাহাতে ভ্রূক্ষেপও করিত না। কিন্তু ইভের বেলা তাহার গাম্ভীর্য্য কোথায় উড়িয়া গিয়াছিল। ইভের সরল শিশুর মত আবদার ও বাহানার স্নেহের দাবী তাহাকে এমন এক আকর্ষণের গণ্ডীর মধ্যে আনিয়া ফেলিয়াছিল যে, দূরে পলাইবার ইচ্ছা থাকিলেও সে পলাইতে পারে নাই। শেষে মাসাধিককাল গত হইলে এমন অবস্থা হইল যে, কেহ কাহাকেও দিনান্তে একবার না দেখিলে থাকিতে পারিত না।

তাহাদের মধ্যে এমন ঘনিষ্ঠতা বিরাজিত হইলেও ইভ একটা ব্যাপার লক্ষ্য করিয়া বিস্মিত হইত। প্রতিমা পারতপক্ষে তাহার স্বামীর সঙ্গ কামনা করিত না। দৈব-ক্রমে তাঁহার সহিত প্রতিমার সাক্ষাৎ ঘটিয়া গেলে প্রতিমা কোন না কোন ছল ধরিয়া অন্যত্র চলিয়া যাইত—দুই এক মুহূর্ত্ত থাকিলেও বিমলেন্দুর চেষ্টা সত্ত্বেও কোনওরূপ বাক্যা-লাপে যোগদান করিত না। বিমলেন্দু ইহাতে যে মনে আঘাত পাইত—সে চিহ্ন তাহার মুখে চোখে ফুটিয়া উঠিত। অথচ প্রতিমা তাহা দেখিয়াও লক্ষ্য করিত না।

ইভ এ সকল খুঁটিনাটি লক্ষ্য করিয়াছিল। সে ভাবিত, হয় ত হিন্দু অন্তঃপুরচারিকাদিগের পক্ষে পরপুরুষের সহিত এইরূপ ব্যবহারই স্বাভাবিক; তবে প্রতিমার পিতার সহিত বিমলেন্দুর পরিচয় আছে বলিয়া হয় ত সে তাহার সম্মুখে বাহির হয়, কিন্তু তাহা বলিয়া তাহার সহিত আলাপ-পরিচয় বা ঘনিষ্ঠতা হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে। প্রতিমার পিতাও ঘুণাক্ষরেও জানিতে দিতেন না যে, তাঁহাদের সহিত বিমলেন্দুর কোনও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। যাহাই হউক, এজন্য সে প্রতিমার সহিত জগতের আর সকল বিষয়ে আলাপ-পরিচয় করিলেও কেবল স্বামীর কথা পাড়িত না।

এক দিন কিন্তু প্রতিমাই অযাচিতভাবে তাহার স্বামীর কথা পাড়িল। দুই জনে এক দিন সমুদ্রবেলায় বসিয়া আছে, অদূরে শৈল খেলা করিতেছে। হঠাৎ উভয়ে দেখিল, একটা শীর্ণকায় লোক কাসিতে কাসিতে শ্বাসরুদ্ধ হইয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে—সে সৈকতে বসিয়া পড়িয়া সবলে মাথাটা চাপিয়া ধরিয়াছে আর তাহার সঙ্গী আত্মীয় তাহাকে ধরিয়া রহিয়াছে, কি করিবে, স্থির করিতে পারি-তেছে না। কিন্তু সে ক্ষণমাত্র, তাহার পরেই তাহার সে অবস্থাটা কাটিয়া গেল, সেও উঠিয়া সঙ্গীর সহিত অন্যত্র চলিয়া গেল।

প্রতিমা আনমনে হঠাৎ বলিয়া ফেলিল, "আচ্ছা ভাই, তোমার স্বামী এক বৎসরে এত রোগা হয়ে গিয়েছিলেন কেন? দার্জ্জিলিঙ্গে ত এমন ছিলেন না।"

কথাটা বলিয়াই তাহার চোখমুখ লাল হইয়া উঠিল, সে তাড়াতাড়ি কথাটা চাপা দিবার জন্য বলিল, "প্রথম প্রথম এক দিন তাঁকে এইখানে বেড়াতে বেড়াতে কাসতে দেখেছি, তাই বলছি।"

ইভ তাহার ভাববৈলক্ষণ্য লক্ষ্য করে নাই। স্বামীর স্বাস্থ্য সম্পর্কে প্রশ্ন হইবামাত্র তাহার স্বভাবতঃ হাস্যোজ্জ্বল মুখমণ্ডল সহসা গম্ভীর আকার ধারণ করিল। সে বিষাদ-ভরা কাতর কণ্ঠে ধীরে ধীরে বলিল, "সে অনেক কথা, সেই জন্যই ত এখানে এসেছি। আচ্ছা ভাই, ঠিক ক'রে বল

ত—তুমি মিথ্যে বলবে না জানি, তাই জিজ্ঞাসা করছি, তুমি প্রথমে যা দেখেছিলে, তার চেয়ে কতকটা উন্নতি হয়নি কি ?"

ইভ তীব্র উৎকণ্ঠার সহিত উত্তরের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। প্রতিমা প্রথমটা থতমত খাইয়া গেল বটে, কিন্তু পরক্ষণেই প্রকৃতিস্থ হইয়া সহজ সরলভাবেই বলিল, "হাঁ, খুবই হয়েছে। হবারই কথা।"

ইভ সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল, "কেন ?"

প্রতিমা মৃদু হাসিয়া বলিল, "হবে না ? এমন লক্ষ্মীর সেবাতেও যদি না হয়, তবে কিসে হবে জানি না।"

ইভ কিন্তু সন্তুষ্ট হইল না—সে আরও কিছু ভরসার কথার আশা করিয়াছিল। বলিল, "ওঃ, এই কথা ! আমি আর তাঁর কি সেবা করতে পেরেছি ? সাধ মিটিয়ে ত সেবা কর্‌তে পেলুম না।"

বলিতে বলিতে ইভের আয়ত নয়নদ্বয় অশ্রুপ্লুত হইয়া উঠিল। প্রতিমা বিস্মিত হইল। কি আশ্চর্য্য ! ইহারা এত ভালবাসিতে জানে ? প্রতিমার ধারণা অন্যরূপ ছিল। ইংরাজ জাতির মধ্যে এমন লক্ষ্মী থাকিতে পারে, এ ধারণা তাহার ছিল না। সে শুনিয়াছিল, আজ এক বৎসর যাবৎ ইভ কি অসাধারণ ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার সহিত অক্লান্ত পরিশ্রমে রুগ্ন স্বামীর সেবা করিয়াছে। ইভের নেপালী আয়া কত দিন তাহাকে নির্জ্জনে সেই সেবার পরিচয় দিয়াছে। বিবাহের পর হইতেই বিমলেন্দুর স্বাস্থ্য-ভঙ্গ হয়। প্রথমে সে কিছুতেই পত্নীর গলগ্রহ হইয়া থাকিতে চাহে নাই—যত দিন উঠিতে দাঁড়াইতে পারিয়াছে, তত দিন চাকুরী করিয়াছে। যখন একবারে শয্যা লইয়াছে—যখন তাহার একবারে উত্থানশক্তি রহিত হইয়াছে, তখন হইতে ইভ তাহার সকল ভার গ্রহণ করিয়াছে। কেবল পত্নীর মত নহে, জননীর মত, ভগিনীর মত, দাসীর মত ভার গ্রহণ করিয়াছে। তাহার ক্লান্তি, বিরক্তি, ঘৃণা,—কিছুই ছিল না, ৬।৭ মাস কাল সে দুই হাতে স্বামীর মলমূত্র পরিষ্কৃত করিয়াছে, বহু বিনিদ্র রজনী অতিবাহিত করিয়াছে, কিসে স্বামী বিন্দুমাত্রও অস্বাচ্ছন্দ্য উপভোগ না করেন, প্রাণপণে তাহার ব্যবস্থা করিয়াছে। এ জন্য সে কায়িক বা মানসিক কোন শ্রমেরই ত্রুটি করে নাই, অর্থ-ব্যয়ে কণামাত্র কার্পণ্য করে নাই। চিকিৎসকরা যেখানে বায়ুপরিবর্ত্তনের নিমিত্ত লইয়া যাইতে উপদেশ দিয়াছেন, সেইখানেই লইয়া গিয়াছে। এই অল্পবয়সে সে যেরূপ ধীর স্থিরভাবে স্বামীর চিকিৎসা ও সেবার সকল ব্যবস্থা করিয়াছে, তাহাতে বিজ্ঞ বহুদর্শী চিকিৎসকগণেরও বিস্ময় উৎপাদিত হইয়াছে।

ইচ্ছা থাকুক বা না থাকুক, প্রতিমাকে এ সকল কথা শুনিতে হইয়াছিল, সে নিজেও ক্বচিৎ কখনও ইভেদের 'সি ভিলায়' গিয়া ইভের অক্লান্ত স্বামি-সেবা প্রত্যক্ষ করিয়াছিল। ইংরাজ-বালিকার এ মধুময় চরিত্রগুণে সে একবারে মুগ্ধ হইয়াছিল—ইহার জন্য সমগ্র ইংরাজ জাতির প্রতি প্রীতি-শ্রদ্ধায় তাহার হৃদয় ভরিয়া উঠিয়াছিল। এখন ইভের মুখে শেষ কথাটা শুনিয়া ও ইভের চোখে জল দেখিয়া প্রতিমার সমস্ত প্রাণের ভালবাসাটা ইভের দিকে ছুটিয়া গেল, সে দুই হাতে ইভকে বুকের মাঝে টানিয়া লইয়া হর্ষগর্ব্বভরে বলিল, "সকল পত্নীই এমনই ক'রে স্বামি-সেবা করবার সৌভাগ্য অর্জ্জন করে, এইটেই প্রার্থনা করি।"

ইভ প্রতিমার কাঁধের উপর মাথা রাখিয়া অশ্রু-গদগদ-কণ্ঠে বলিল, "এক একবার মনে হয়, যদি আমার প্রাণ দিয়েও তাঁর স্বাস্থ্য ফিরিয়ে আনতে পারা যায়, তা হ'লে প্রাণ দিয়েও দেখি। ভাই, তুমি বিবাহিত নও, প্রাণ দিয়ে কখনও ভালবাস নি, আমার মনের কি যাতনা, বুঝতে পারবে না। যে দিন হ'তে দেখেছি, আমার প্রাণাধিকের ভালবাসা ও আদর-যত্নের মধ্যেও কি একটা অভাব থেকে যাচ্ছে—যে দিন থেকে বুঝেছি, আমার এই প্রাণটার সমস্ত ভালবাসা দিয়েও তাঁর অশান্ত মনকে শান্ত করতে পারিনি, যে দিন থেকে জানতে পেরেছি, সকল সুখের—সকল আরামের মধ্যে থেকেও তিনি কি জানি কিসের একটা অভাব অনুভব করছেন, সেই দিন থেকেই বুঝে ছিলুম, তাঁর স্বাস্থ্যভঙ্গ হচ্ছে। মনই ত সব, মন ভাঙ্গলে দেহ কোথায় থাকে ? কত চিকিৎসা করিয়েছি, কত রকমে তাঁর মন ভোলাবার চেষ্টা করেছি, কিছুতেই পারি নি। এক একবার মনে হ'ত, হয় ত আত্মীয়-স্বজন, স্বধর্ম্ম, সমাজ ছেড়ে এসে তাঁর মন হু হু করছে—আমার ভালবাসা সে অভাব পূর্ণ করতে পারছে না। কিন্তু পরে বুঝেছি, সে অভাব অন্য কিছুর। কি সে অভাব, আমায় কে ব'লে

দেবে?—আমি প্রাণ দিয়ে সে অভাব ঘোচাবার চেষ্টা করব। এক বৎসর এখানে সেখানে নিয়ে বেড়িয়েছি, অনেক ক'রে এখন তাঁকে কতকটা সুস্থ করেছি, এক একবার মনে হয়েছে, তাঁর সে অভাব বুঝি আর নেই। বড় আশায় পুরী এসেছি। এখানে এসে ভাল আছেন। এখন প্রায় তাঁর মুখে হাসি দেখতে পাই। কিন্তু একটা ভয় নতুন ক'রে জেগে উঠছে। মনে হচ্ছে, মাঝে মাঝে ক্বচিৎ কখনও যেন সেই পূর্ব্বের অভাবের ভাবটা দেখা দিচ্ছে।"

প্রতিমা চঞ্চল হইয়া উঠিল, বলিল, "না, না, ও তোমার মিথ্যে কল্পনা। ভালবাসার জনের সম্বন্ধে অমন আশঙ্কা হয় ত পদে পদেই হয়।"

ইভ উঠিয়া বসিয়াছিল, এখন আর সে কাঁদিতেছিল না। আশায় উৎফুল্ল হইয়া বলিল, "তাই হোক, তোমার কথাই সত্য হোক। ভাই, তুমি যে আমার মনে কি সান্ত্বনা দিলে, বলতে পারিনি। সত্যি বলছ, এমনই আশঙ্কা হয়? তুমি কি ক'রে জানলে, তুমি ত কাউকে ভালবাসনি।"

প্রতিমা মহা ফাঁপরে পড়িল, সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া বলিল, "ঐ দেখ, কথায় কথায় সন্ধ্যে হয়ে এল। শৈল, শৈল! দেখ, ছেলেটা খেলা করতে করতে কোথায় এগিয়ে গেছে।"

ইভ যাইতে যাইতে বলিল, "হাঁ—ভাল কথা, দিন সাতেকের জন্যে আমরা চিল্কা দেখতে যাব, তুমি যাবে? না ভাই, 'না' কথা শুনবো না, আমি মিঃ চক্রবর্ত্তীর হাতে পায়ে পড়ব, বল, যাবে বল? না হ'লে জানবো, তুমি আমায় ভালবাস না।"

তাহার বালিকার ন্যায় আগ্রহাতিশয্য দেখিয়া প্রতিমা হাসিয়া ফেলিল। সে ইভকে বুঝিয়াও বুঝিতে পারিল না। এই মেয়েটি এই বালিকা, পরমুহূর্ত্তেই জ্ঞানবৃদ্ধা বর্ষিয়সী নারী; এই হাসে, এই কাঁদে; ইহার সকলই বিচিত্র। প্রতিমা বলিল, "আচ্ছা, সে তখন দেখা যাবে। এখন চল ত ঘরে যাই। উঃ, আকাশ আঁধার ক'রে আসছে, ঝড় উঠলো ব'লে, চল চল।"

উভয়ে শৈলর হাত ধরিয়া দ্রুতপদে তটারোহণ করিতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে হু হু ঝড় নামিল।

১০

চিল্কা হ্রদের দৃশ্য যে একবার দেখিয়াছে, সে জীবনে তাহা ভুলিতে পারিবে না। মাদ্রাজের দিক যাইতে দক্ষিণ পার্শ্বে পাহাড়ের পর পাহাড়ের শ্রেণী, বামপার্শ্বে দূরদিগন্তবিসারী হ্রদের জলরাশি, মধ্যে রেলের লাইন। কোথাও কোথাও চিল্কাবারি মৃদুস্পর্শে রেল-লাইনের চরণ চুম্বন করিতেছে। শ্যামল সুন্দর ছোট ছোট পাহাড়-গুলি দূর হইতে গাঢ় নীল মেঘের মতই অনুমিত হইতেছে; হ্রদের বুকের মাঝে ক্ষুদ্রায়তন দ্বীপগুলি মুক্তাহারের মধ্যে মরকতমণির মত শোভা পাইতেছে; কোথাও জলচর বিহঙ্গ পরম আনন্দে হ্রদের জলে সাঁতার দিতেছে; কোথাও বা দ্বীপের পশুপক্ষী হ্রদের তটে দেখা দিয়া অন্তর্হিত হইতেছে; দূরে শঙ্খশ্বেত পাইল তুলিয়া কত তরণী ভাসিয়া যাইতেছে—সেগুলি জলচর পক্ষীর মতই অনুমিত হই-তেছে। প্রতিমা বিস্ময়বিস্ফারিতনেত্রে প্রকৃতির এই সকল দৃশ্য দেখিতেছে, আর ইভ তাহাকে কতই না তামাসা করিয়া জ্বালাতন করিতেছে। সে এক কি সুখের দিনই অতিবাহিত হইতেছে!

প্রতিমা কিছুতেই পুরুষদিগের সহিত এক গাড়ীতে যাইতে চাহে নাই। তাহাদের জন্য একখানা প্রথম শ্রেণীর কামরা রিজার্ভ করা হইয়াছিল। পার্শ্বের কামরায় পুরুষরা উঠিয়াছিলেন। প্রতিমা ও ইভ শৈলকে লইয়া যে গাড়ীতে ছিল, তাহাতে গার্ড সাহেবের দৃষ্টিটা কিছু খর রকমেরই পড়িয়াছিল। কিন্তু বিমলেন্দু প্রতি ষ্টেশনে নামিয়া তাহাদের তত্ত্ব লইতেছিল, এ জন্য গার্ড সাহেবের লোলুপ দৃষ্টি অধিকক্ষণ তাহাদের কামরার দিকে স্থায়ী হইতে পারিতেছিল না। ইহাতে ইভের কিছু আসিয়া না গেলেও প্রতিমার খুবই একটা অসুবিধা বোধ হইতেছিল। একে ত প্রথমে সে চিল্কায় আসিতেই চাহে নাই, তাহার উপর (যদিও বা সে ইভের অথবা পিতার অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া তাহাদের সঙ্গী হইয়াছিল) বিমলে-ন্দুর সঙ্গ তাহার নিকটে অতীব বিসদৃশই অনুভূত হইতে-ছিল। সে যত না গার্ড সাহেবের দৃষ্টিপাতে অস্বস্তি অনুভব করিতেছিল, বিমলেন্দুর সহিত দৃষ্টি-বিনিময়ে ততোধিক বিরক্তি বোধ করিতেছিল। সে এ জন্য

কোন ষ্টেশনে গাড়ী থামিলেই প্লাটফরমের অপর পার্শ্বে উঠিয়া গিয়া বসিতেছিল। ইহাতে ইভ বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিলে সে বলিয়াছিল, ষ্টেশনে যে এক গাদা লোক দাঁড়াইয়া থাকে!

ইভ তাহাতে হাসিয়া জবাব দিয়াছিল, "এই যে শুনি, তোমাদের মধ্যে আর তেমন আবরু নেই!"

রম্ভা ষ্টেশনে নামিবামাত্র স্থানীয় ঠাকুরের পাণ্ডারা তাহাদিগকে পুষ্পমাল্যে ভূষিত করিয়া দিল—উদ্দেশ্য কিছু দক্ষিণা আদায় করা। ইভকে প্রথমে তাহারা মালা দিতে সাহস করে নাই, কিন্তু ইভ যখন ষ্টেশন-প্লাটফরম হাস্য-মুখরিত করিয়া নিজের কণ্ঠ মাল্যপরিধানের জন্য বাড়াইয়া দিল, তখন পাণ্ডাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বড় মালা দিবার প্রতিযোগিতার ধুম পড়িয়া গেল।

চিল্কায় তাহাদের প্রথম দুই তিন দিন বেশ কাটিল। প্রতিমা এক দিন নিজে চিল্কার মাছ রাঁধিয়া সকলকে খাওয়াইল। ইভ ইতঃপূর্ব্বে কয়দিন প্রতিমার হাতে রাঁধা পোলাও, কোর্ম্মা, কাটলেট, চপ খাইয়াছিল—উহা তাহার অতীব উপাদেয় বলিয়াই মনে হইয়াছিল, কিন্তু এই মাছের তরকারী তেল দিয়া রাঁধা হইতেছে দেখিয়াই সে প্রথমে উহার প্রতি বীতরাগ হইয়াছিল। কিন্তু প্রতিমার অনুরোধে সে অনিচ্ছাসত্বেও যখন একটু তরকারী খাইল, তখন আর ভুলিতে পারিল না, 'আরও দাও আরও দাও' করিয়া তাহাকে উদ্ব্যস্ত করিয়া তুলিল। সে রন্ধনে প্রতিমাকে প্রথম শ্রেণীর সার্টিফিকেট দান করিল। একটা বিষয়ে সে প্রতিমাকে কিছুতেই সম্মত করিতে পারে নাই। প্রতিমা পুরীতে এক দিনও মৎস্য-মাংস আহার করে নাই, এখানেও করিল না। পীড়াপীড়ি করিলে বলিত, তীর্থে আসিয়া নিরামিষ খাইতে হয়। ইভ ধর্ম্মের কথা শুনিয়া আর কোনও আপত্তি করিত না। আর এক বিষয়ে ইভ প্রতিমাকে জিদ করিতে দেখিয়াছিল। সে এক দিন হঠাৎ দেখিয়াছিল, প্রতিমা চুল বাঁধিবার সময় চিরণীর অগ্রভাগে অতি সামান্য সিন্দুরবিন্দু তুলিয়া লইয়া সীমন্তে স্পর্শ করিতেছে। সে জানিত, হিন্দু সধবা নারীরাই সীমন্ত সিন্দুর-রঞ্জিত করিয়া থাকে। এ জন্য সে প্রতিমার নিকট কৈফিয়ৎ চাহিলে প্রতিমার সমস্ত মুখখানা রাঙ্গা হইয়া উঠিয়াছিল, সে কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিয়াছিল, 'সধবারা সীমন্তে সিন্দুর লেপন করে,, অন্যের পক্ষে সিন্দুর স্পর্শ করিলে দোষ নাই।'

এক দিন তাহারা চিল্কায় নৌবিহারে গেল। এই দিন ইভের জীবনে অতি স্মরণীয় দিন—কেন না, এই দিন হইতে তাহার ক্ষুদ্র জীবন-নাটকের দ্বিতীয় ও শেষ অঙ্ক আরম্ভ হইয়াছিল। মাঝিরা লগি মারিয়া নৌকা লইয়া যাইতেছিল। চিল্কার গভীরতা প্রায় সর্ব্বত্রই অতি সামান্য, কাযেই বহুদূর পর্য্যন্ত কেবল লগি মারিয়াই নৌকা লইয়া যাওয়া যায়। ইভ ও প্রতিমা এক পার্শ্বে বসিয়াছিল। প্রতিমা জলে হাত ডুবাইয়া জল লইয়া খেলা করিতেছিল। সকলেই কথা কহিতেছিল, কেবল প্রতিমা তাহাতে যোগদান করে নাই, সে অনন্যমনা হইয়া দূরে পাইলভরে গমনশীল নৌকাগুলির গতিবিধি নিরীক্ষণ করিতেছিল। শৈল দুই চারিবার কোনও কিছু নূতন দেখিলে হর্ষভরে তাহার 'মাকে' জানাইতেছিল বটে, কিন্তু প্রতিমা তাহা দেখিয়াও নীরব রহিল। পথে এক স্থানে জলের বুকে ক্ষুদ্র শিলাখণ্ডের উপর একটি কাঠের ঘর জাগিয়াছিল। যেমন শিলা, তদনুরূপ ঘর—যেন ছেলেদের খেলার ঘর। বায়ুতাড়িত চিল্কার তরঙ্গ মাঝে মাঝে তাহার পাদমূল চুম্বন করিতেছিল,—এমন কি, তরঙ্গ উচ্চ হইলে কক্ষের মধ্য দিয়া চলিয়া যাইতেছিল। বিমলেন্দু গল্প করিল, এটা এক পাগ্‌লা সাহেবের ঘর। সে রাত্রিকালে একাকী এই ঘরে কখনও কখনও বাস করিত। বিশেষতঃ ঘোর ঝঞ্ঝাবাতের সময় ঘনকৃষ্ণা রজনীতে সে এই ঘরে থাকিতে বড় ভালবাসিত। ইভ সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল, "এত যায়গা থাকতে এখানে বাস করত কেন?"

বিমলেন্দু বলিল, "খেয়াল! এই দেখ না, সকলে আমরা গল্প-গুজব করছি, তোমার বন্ধু কিন্তু আপনার খেয়ালে আছেন।"

প্রতিমার মুখমণ্ডল আরক্তিম হইয়া উঠিল। সে দৃষ্টি অবনত করিয়া রহিল। রামপ্রাণ বাবু গম্ভীরভাবে বলিলেন, "মানুষ কখন্ কি খেয়ালে থাকে, তা কেউ বলতে পারে না। এমনও দেখা যায়, মানুষ খেয়ালের বশে কসাইয়ের মত কায করে, অথচ মনে ভাবে, সে মস্ত কর্ত্তব্যপালন করছে।"

ব্যাপারটা গুরুগম্ভীর হইয়া যায় দেখিয়া ইভ উচ্চ হাস্য করিয়া বলিল, "দেখ দেখি ভাই, তুমি আপনার মনে আছ

ব'লে কত কথা উঠ্‌ছে। না হয় দুটো কথা কইলে। শুনেছি, ইন্দু তোমাদের আত্মীয়, নিতান্ত পরপুরুষ নয়, তবে কথা কইতে দোষ কি ?"

নৌকার মধ্যে দারুণ গম্ভীরতা দেখা দিল, কেহই কথা কহে না, ইভ ও শৈল ছাড়া অপর তিন প্রাণী মহা অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল।

এই সময়ে শৈল সকলকে অস্বস্তির হাত হইতে বাঁচাইয়া দিল, চীৎকার করিয়া বলিল, "দেখ মা, ঐ বুড়ো নৌকা-খানা কি রকম ক'রে হেলেদুলে পাগলের মত আসছে।"

বস্তুতঃ প্রকাণ্ড একখানা বোঝাই নৌকা পাইলভরে হেলিয়া দুলিয়া তাহাদের দিকে অগ্রসর হইতেছিল, তাহার যেন দিগ্বিদিক্‌জ্ঞান ছিল না। তাহার আশে-পাশে আরও কয়খানা নৌকা অগ্রসর হইতেছিল বটে, কিন্তু তাহাদের গতিবিধি এমন অসংযত ছিল না। আসল কথা, এই নৌকার অতি জীর্ণ হালখানা জলে মোচড় দিতে গিয়া ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল; সুতরাং নৌকার গতিবিধির উপর মাঝির কোনও হাত ছিল না, সে কেবল 'সামাল সামাল' হাঁক দিয়া সম্মুখের নৌকাগুলিকে সতর্কতা অবলম্বন করিতে বলিতে-ছিল। মুহূর্ত্তমধ্যে অভাবনীয় কাণ্ড ঘটিয়া গেল। মাঝি প্রকাণ্ড নৌকাখানা বহু চেষ্টার ফলেও সামলাইতে পারিল না—সেখানা প্রচণ্ডবেগে ইভদের ক্ষুদ্র নৌকার উপর আসিয়া পড়িল। নৌকার সমস্ত বেগটা ক্ষুদ্র নৌকার উপর অনুভূত হইল না বটে, কিন্তু যেটুকু ধাক্কা লাগিল, তাহাতেও প্রচণ্ডতা সহ্য করিতে না পারিয়া ক্ষুদ্র নৌকাখানা কাঁপিতে কাঁপিতে এক পার্শ্বে কাৎ হইয়া পড়িল, সঙ্গে সঙ্গে ইভ বহু কষ্টে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইলেও প্রতিমা সে আক্রমণের বেগ প্রতিহত করিতে পারিল না, চক্ষুর পলকে চিক্কার আবিল জলরাশির মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইল। নৌকাবাহীরা 'কি হইল' 'কি হইল' বলিয়া চীৎকার করিতে না করিতেই বিমলেন্দু জলে ঝম্প প্রদান করিল।

নিমিষের মধ্যে এতটা কাণ্ড ঘটিয়া গেল। ইভও ধাক্কা খাইয়া প্রায় জলে পড়িবার উপক্রম করিয়াছিল; কিন্তু প্রতিমার দেহে বাধা পাইয়া কোনও রূপে তিষ্টিয়া গেল—আর প্রতিমা তাহার দেহের ভারে কোনও রূপে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইল না। ইভ দেখিয়াছিল, বিমলেন্দুর ব্যগ্র দৃষ্টি পূর্ব্বাপর প্রতিমার প্রতিই নিবদ্ধ ছিল। সে দৃষ্টিতে কি আকুলতা বিজড়িত ছিল, তাহা সে ভিন্ন অন্য কেহ লক্ষ্য করে নাই।

মাঝিরা নৌকা সামলাইয়া লইবার পূর্ব্বেই বিমলেন্দু প্রতিমার দেহ বক্ষে লইয়া নৌকায় উঠিল। তখন সে জ্ঞান-হারার মতই হইয়াছিল—সে জলমগ্না প্রতিমার উদর হইতে জল-নিষ্কাশনের চেষ্টা না করিয়া তাহাকে প্রাণপণে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া ভীতিবিহ্বলনেত্রে কাতরকণ্ঠে কেবল ডাকিতেছিল, "প্রতিমা! প্রতিমা!"

রামপ্রাণ বাবু এই সময়ে প্রতিমার অচৈতন্য দেহ তাহার বাহুবেষ্টন হইতে মুক্ত করিয়া নানা কৃত্রিম প্রক্রিয়ার দ্বারা তাহার শ্বাস বহাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, পরন্তু মাঝিকে নৌকা তীরে লইয়া যাইতে আদেশ করিলেন। শৈল 'মা মা' করিয়া ডুকুরিয়া কাঁদিয়া উঠিয়াছিল। রাম-প্রাণ বাবু ধমক দিয়া তাহাকে ক্রন্দন হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিলেন। বস্তুতঃ নৌকার মধ্যে একা তিনিই তখন প্রকৃতিস্থ ছিলেন বলিয়া ব্যাপার সহজেই সহজ আকার ধারণ করিল। দেখিতে দেখিতে প্রতিমা নয়ন উন্মীলন করিল—আবার চারি চক্ষুতে মিলন হইল। তখনও প্রতিমা বিমলেন্দুর দৃষ্টিতে দৃষ্টি সংবদ্ধ করিয়াই নিমিষে দৃষ্টি অবনমিত করিয়া লইল, তাহার পাংশুবর্ণ মুখমণ্ডল আরক্তিম হইয়া উঠিল।

ইভ আদ্যোপান্ত সমস্তই প্রত্যক্ষ করিয়াছিল—কিন্তু সে আড়ষ্ট হইয়া বসিয়াছিল। তাহার সম্মুখে সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ঘুরিতেছিল—সে সবই দেখিতেছিল, অথচ কিছু তলাইয়া বুঝিতে পারিতেছিল না। তাহার যেন সকল ঘটনাই স্বপ্নের মত মনে হইতেছিল। কেবল একটা কথা সে কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছিল না—তাহার স্বামী অমন করিয়া প্রতিমাকে কাতরকণ্ঠে নাম ধরিয়া ডাকিয়াছিল কেন—তাহার স্বামী প্রতিমার দিকে অমন করিয়া চাহিয়াছিল কেন! প্রতিমা তাহার কে?

[ক্রমশঃ।

কুইনাইন উৎপাদন

ম্যালেরিয়া ভারতের সমস্ত প্রদেশে, বিশেষতঃ বঙ্গ-দেশে যে কি সর্ব্বনাশসাধন করিতেছে, তাহা সকলেই অবগত আছেন। সাময়িক পত্রাদিতে এই বিষয়ের এত আলোচনা হইয়াছে ও হইতেছে যে, সরকারী অঙ্কাদি উদ্ধৃত করিয়া ম্যালেরিয়া দ্বারা বিপুল জনক্ষয় প্রতিপন্ন করিতে যাওয়া অনাবশ্যক। কেরোসিন প্রয়োগে মশক-ডিম্ব ও কীড়া বিনাশ, পয়ঃপ্রণালীর সংস্কার, জঙ্গল পরিষ্কার, বিশেষজাতীয় মৎস্য চাষ, গৃহপালিত পশ্বাদির দ্বারা ম্যালেরিয়াবীজ-বাহক মশক আকর্ষণ (Blood Feed) ইত্যাদি ম্যালেরিয়া নিবারণের অনেক উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত ম্যালেরিয়া চিকিৎসায় যে সমুদয় ঔষধ ব্যবহৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে কুইনাইনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। সুতরাং ভারতবাসীর পক্ষে কুই-নাইন যে বহু মূল্যবান্ পদার্থ, তাহা স্বতঃই প্রতীয়মান হয়। যে গাছের ত্বক্ হইতে কুইনাইন প্রস্তুত হয়, তাহার নাম সিঙ্কোনা (Cinchona)। ভারতে এখনও দেশের অভাবপূরণের অনুরূপ সিঙ্কোনা উৎপাদিত হয় নাই।

সিঙ্কোনার ইতিহাস

সিঙ্কোনা ভারতের আদিম উদ্ভিদ নহে। দক্ষিণ-আমেরিকার বলিভিয়া, পেরু, ইকুয়াডর, কলম্বিয়া, ভেনেজুয়েলা প্রভৃতি অঞ্চলের পার্ব্বত্য প্রদেশই ইহার জন্মস্থান। সিঙ্কোনা-বল্কলের জ্বর-নাশক গুণ প্রথমতঃ ১৬৪০ খৃষ্টাব্দে প্রধানতঃ, স্পেনবাসিগণ কর্ত্তৃক য়ুরোপে প্রচারিত হয়। এক শতাব্দীর পর কোন্ গাছ হইতে এই ত্বক পাওয়া যায়, তাহা নির্দ্ধারিত হয়। আবার তাহারও এক শতাব্দী পর অর্থাৎ ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে, প্যারী নগরের প্রসিদ্ধ উদ্ভিদ্‌তাত্ত্বিক উদ্যানে সিঙ্কোনা রোপিত হইয়া সিঙ্কোনাত্বকের উৎপত্তিসম্বন্ধীয় সমস্ত বাদানুবাদের মীমাংসা করিয়া দেয়। ইহাই নিজ জন্মস্থানের বাহিরে সিঙ্কোনা বৃক্ষের প্রথম চাষ। তাহার পর সিঙ্কোনা যবদ্বীপ, ভারত, সিংহল, সেণ্ট হেলেনা, পূর্ব্ব-আফ্রিকা প্রভৃতি নানা দেশে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। এখন আর কুইনাইনের জন্য কেহ দক্ষিণ-আমেরিকার উপর নির্ভর করে না। বরং দক্ষিণ আমেরিকাকেই অন্যত্র আবশ্যক কুইনাইন ক্রয় করিতে হয়।

ভারতে সিঙ্কোনা-প্রবর্ত্তন খুব অধিক দিন হয় নাই। লেডী ক্যানিং দেশমধ্যে স্থানে স্থানে জ্বরের অত্যধিক প্রকোপ দেখিয়া সিঙ্কোনা বৃক্ষ আনাইয়া ভারতে রোপণ করিতে অগ্রসর হয়েন। তাঁহার চেষ্টাতেই Sir Clements Markham সিঙ্কোনা-বীজ ও গাছ আনিবার জন্য ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণ-আমেরিকা যাত্রা করেন। প্রথমে বিফলমনোরথ হইলেও, অবশেষে ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে নীলগিরি পর্ব্বতের উৎকামন্দে সিঙ্কোনাবীজ রোপিত হয়। এই বীজগুলি Cinchona Calisaya ও C. Succirubra জাতীয়। পরবর্ত্তী ফেব্রুয়ারী মাসে C. Officinalisএর বীজও আসিয়া পড়ে।

ভারতে সিঙ্কোনা-প্রবর্ত্তনের অল্পদিন পরেই এমন একটি ঘটনা ঘটে, যাহাতে কুইনাইন-বাজারের নেতৃত্ব ইংরাজের হস্তচ্যুত হইয়া হল্যাণ্ডবাসিগণের করতলগত হয়। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে মিঃ লেজার নামক জনৈক ইংরাজ দক্ষিণ-আমেরিকায় উৎকৃষ্ট পশম উৎপাদনোপযোগী মেষের অনুসন্ধানে গমন করেন। সেই উপলক্ষে তিনি কিয়ৎ-পরিমাণ সিঙ্কোনাবীজও সংগ্রহ করিয়াছিলেন। য়ুরোপে ফিরিয়া আসিয়া তিনি উক্ত বীজগুলি প্রথমতঃ ইংরাজ সরকারকেই দিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু সরকারী কাযে যেমন দীর্ঘসূত্রতা হইয়া থাকে, এ ক্ষেত্রেও তাহাই হইল। অগত্যা মিঃ লেজার ওলন্দাজ সরকারকেই

মাত্র ৩ শত ৬০ টাকায় বীজগুলি বিক্রয় করিলেন। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ওলন্দাজ সরকার যবদ্বীপে সিঙ্কোনা-প্রবর্ত্তনের চেষ্টা করিতেছিলেন। এখন তাঁহারা এই বীজগুলি হাতে পাইয়া অপ্রত্যাশিত সুবিধা লাভ করিলেন। তখনও কিন্তু জানা ছিল না যে, মিঃ লেজার কর্ত্তৃক সংগৃহীত বীজ কুইনাইন উৎপাদনের পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া পরিগণিত হইবে। কালক্রমে তাহা প্রকাশ পাইল। এই সমুদায় বীজ হইতে উৎপাদিত ২০ হাজার গাছই যবদ্বীপে বর্ত্তমান বহুবিস্তৃত সিঙ্কোনা চাষের সূত্রপাত করিয়াছিল। বলা বাহুল্য যে, জগতের মধ্যে যবদ্বীপ এখন সিঙ্কোনা চাষ ও কুইনাইন উৎপাদনের প্রধান কেন্দ্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অন্য সমস্ত দেশ ইহার অনেক পশ্চাতে পড়িয়া আছে। ভারতের পক্ষে সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, মিঃ লেজারের সিঙ্কোনার (C. Calisaya Var Ledgeriana) কিয়দংশ বীজ মিঃ মণি নামক এক জন ভারত-প্রবাসী ইংরাজ সওদাগর ক্রয় করেন। অনেক হস্তপরিবর্ত্তনের পর ঐ বীজগুলি সিকিম প্রভৃতি অঞ্চলে গিয়া পৌঁছায়। বর্ত্তমান সময় বাঙ্গালার সিঙ্কোনা বাগিচার Ledgeriana উপজাতির গাছের সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

সিঙ্কোনার পত্র, ফল ও ফুলবিশিষ্ট শাখা

সিঙ্কোনার জাতি ও চাষ

সিঙ্কোনার অন্যূন ৪০টি জাতি আছে; তন্মধ্যে এতদ্দেশের পক্ষে চারিটি জাতিই প্রধান। বল্কলের বর্ণ অনুসারে জাতিগুলি বাজারচলিত নামকরণ হইয়াছে।

১। Cinchona Calisaya;—পীত বল্কল (yellow bark) গাছ ছোট ও ঝাড়াল; কাণ্ডের ব্যাস ১ ফুটেরও অধিক; পূর্ব্ব হিমালয়ে সতেজে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

২। C. Calisaya Var, Ledgeriana; ইহা প্রকৃতপক্ষে উপরি-উক্তের উপজাতি। অপেক্ষাকৃত ছোট গাছ এবং ত্বকের পরিমাণও কম; কিন্তু ত্বকে কুইনাইনের পরিমাণ অন্য সমস্ত জাতি অপেক্ষা অধিক; ইহাও পূর্ব্ব-হিমালয়ে ও ব্রহ্মদেশের স্থানে স্থানে বেশ জন্মায়।

৩। C. Officinalis পাণ্ডু বল্কল Pale or crown bark; গাছ প্রায় ২০ ফুট উচ্চ, কিন্তু সুদৃঢ় শাখাপ্রশাখা-বিশিষ্ট নয়; সিকিমে ইহার চাষ পরিত্যক্ত হইয়াছে; পক্ষান্তরে নীলগিরি পর্ব্বতে ইহার চাষ সমধিক।

৪। C. Succirubra; রক্ত বল্কল (Red Bark); সিঙ্কোনা জাতিসমূহের মধ্যে ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা কষ্টসহ এবং দাক্ষিণাত্যে, সাতপুরা পর্ব্বতে, উত্তর-বঙ্গে, ব্রহ্মদেশে সর্ব্বত্রই ইহা উৎপাদিত হইতেছে। গাছ ৫০ ফুট পর্য্যন্ত উচ্চ হয়।

উক্ত কয়েকটি জাতি ব্যতীত সিঙ্কোনার কতিপয় বর্ণ-সঙ্কর আছে। তন্মধ্যে অনেকগুলি পরীক্ষাধীন; কিন্তু ইহা স্থির যে, উক্ত সঙ্কর সমূহের মধ্যে দুই চারিটি অল্পোচ্চ স্থানের পক্ষে উপযোগী হইবে।

সিঙ্কোনা বল্কল

সিঙ্কোনার চাষ নিতান্ত সহজ নহে। এক দিকে অধিক উচ্চ পর্ব্বতশৃঙ্গে যেমন সিঙ্কোনাবৃক্ষের সম্যক্ পরিপুষ্টি হয় না, তেমনই অন্য দিকে অল্পোচ্চ স্থানে উৎপাদিত সিঙ্কোনা-বল্কলে কুইনাইনের মাত্রা কম থাকে। যেখানে অল্প হইলেও বৎসরের সকল সময় সমভাবে বারিপাত হইয়া থাকে, সেইরূপ পর্ব্বতগাত্রে সিঙ্কোনা ভাল জন্মায়। পুরাতন উন্মুক্ত প্রান্তর

অপেক্ষা নূতন জঙ্গলকাটা জমী সিঙ্কোনার পক্ষে প্রশস্ত। যবদ্বীপে সিঙ্কোনা যে এত উত্তমরূপে জন্মায়, তাহার প্রধান কারণ, উক্ত দেশের আগ্নেয়গিরি-প্রস্রবণ-সম্ভূত মৃত্তিকা বলিয়াই অনেকে মনে করেন। সিঙ্কোনার চারা প্রথমে তলায় প্রস্তুত করিতে হয়, তৎপরে নির্দ্দিষ্ট বয়সে গাছগুলি উঠাইয়া ক্ষেত্রে রোপণ করিতে হয়। বঙ্গ অপেক্ষা ব্রহ্মদেশে অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক গাছ তুলিয়া বসাইয়া সুফল পাওয়া গিয়াছে। তৃতীয় হইতে পঞ্চম বৎসরের মধ্যে কতকগুলি (প্রায় এক-চতুর্থাংশ) গাছ তুলিয়া ফেলিয়া বাগিচা পাতলা করিয়া দিতে হয়। এইরূপ তুলিয়া-ফেলা গাছের ত্বক্‌ই প্রথম ফসল। ১২।১৪ বৎসর পরে গাছগুলিকে একেবারে সমূলে উৎপাটন করাই চলিত প্রথা। কাণ্ড ও মূলের সংযোগস্থলের ২ হাত লম্বা বল্কলই সর্ব্বাপেক্ষা ভাল। শাখাপ্রশাখা ছেদন করিয়া অথবা কাণ্ড কাটিয়া দিয়াও ত্বক্ সংগ্রহ করা হয়। কাণ্ড-কর্ত্তনই (Coppicing) আজকাল প্রকৃষ্ট প্রথা বলিয়া গণ্য হইতেছে। বীজ হইতেই সিঙ্কোনা-চারা তৈয়ারী হয়, কিন্তু উৎকৃষ্ট গাছের বীজ হইতে দেওয়া হয় না; উক্ত শ্রেণীর অন্য গাছের সহিত কলম বাঁধা হইয়া থাকে। নিড়ানি প্রভৃতি সিঙ্কোনা চাষের আরও অনেক তদ্বির আছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে তৎসমুদায় উল্লেখের স্থানাভাব। ফলতঃ, ইহা স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, সতেজে গাছ বৃদ্ধি পাইলেই হইল না, উহার ত্বকে যথেষ্ট পরিমাণ কুইনাইন ও অন্যান্য উপক্ষার (alkaloid) বিদ্যমান থাকা বরং অধিক প্রয়োজনীয়। বাঙ্গালার সিঙ্কোনায় কুইনাইনের মাত্রা শতকরা ৪·০৩ হইতে ৫·১৯ ভাগ; ব্রহ্মদেশে তদপেক্ষা কিছু অধিক, কিন্তু যবদ্বীপের বল্কলে শতকরা ৮ ভাগেরও অধিক কুইনাইন পাওয়া যায়। কুইনাইন চাষের জমী বৃদ্ধি পাওয়া খুবই বাঞ্ছনীয়; কিন্তু তদপেক্ষা অধিক দরকারী কায—রাসায়নিক বিশ্লেষণে ও নির্ব্বাচন দ্বারা এমন সিঙ্কোনা জাতির উদ্ভব করা, যাহা কুইনাইনের মাত্রায় যবদ্বীপের বল্কলের সমকক্ষ হইবে।

সিঙ্কোনা-বাগিচা

সমগ্র ভারতে বর্ত্তমান সময় চারিটি সিঙ্কোনা-বাগিচা আছে। তাহার মধ্যে দুইটি নূতন ও পরীক্ষাধীন এবং দুইটি পুরাতন ও বহু বৎসর ধরিয়া বল্কল উৎপাদন করিতেছে। আমরা ইতঃপূর্ব্বে ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে দাক্ষিণাত্যে সিঙ্কোনা-প্রবর্ত্তনের বিষয় উল্লেখ করিয়াছি। উহার এক বৎসর পরে সিকিম-প্রান্তে উত্তর-বঙ্গে সিঙ্কোনা রোপিত হয়। এখন নাডুবত্তমই দাক্ষিণাত্যে সরকারী সিঙ্কোনা-চাষের কেন্দ্র। ইহা উৎকামন্দের নিকট অবস্থিত। উক্ত স্থলে চাষের জমী ৪ হাজার একরের কিছু অধিক। তাহার মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশ জমীতে গবর্ণমেণ্ট খাসে চাষ করিয়া থাকেন, অবশিষ্ট জমীতে অন্যান্য ব্যক্তি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে চাষ করে। বাঙ্গালার সিঙ্কোনা-বাগিচা দার্জ্জিলিংএর নিকটবর্ত্তী মংপু এবং মংসং নামক স্থানদ্বয়ে অবস্থিত। এই দুইটি বাগিচায় ৩ হাজার ৫৫ একর জমীতে সিঙ্কোনা রোপিত হইয়াছে, কিন্তু কিঞ্চিদূর্দ্ধ ২ শত একর জমী ফসল প্রদানের উপযোগী হইয়াছে। বঙ্গদেশের বাগিচায় পাঁচ জাতীয় সিঙ্কোনা উৎপাদিত হয়; চাষের জমীর আধিক্যের পরিমাণে উহাদিগের নাম যথাক্রমে,—Ledgeriana, Ledgeriana × succirubra, Officinalis, Ledgeriana × Officinalis এবং Succirubra। এই বাগিচায় আজকাল একর প্রতি প্রায় ২ হাজার ৭ শত ৫৭ পাউণ্ড বল্কল পাওয়া যাইতেছে।

নূতন বাগিচার মধ্যে দাক্ষিণাত্যে অন্নমালয় পর্ব্বতের বাগিচা সবেমাত্র আরম্ভ হইয়াছে। ব্রহ্মদেশের টাভয় অঞ্চলে কিছু দিন হইল একটি বাগিচা ছিল, উহাতে ফসল সন্তোষজনক না হওয়ায় বাগিচা ক্রমশঃ মারগুই প্রদেশে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। ১৯২৩-২৪ খৃষ্টাব্দের বিবরণীতে দেখা যায় যে, মারগুই বাগিচায় সিঙ্কোনা বেশ ভালরূপ জন্মাইবার সম্ভাবনা আছে। ইতোমধ্যেই যে বল্কলের রাসায়নিক পরীক্ষা হইয়াছে, তাহাতে ভারতের অন্য স্থানজাত বল্কল অপেক্ষা এ স্থানের বল্কলে অধিক মাত্রায় কুইনাইন পাওয়া যাইতেছে। এই মন্তব্য Ledgeriana জাতির পক্ষেই প্রযুজ্য। Succirubra জাতি ততটা সফল হয় নাই, কিন্তু বঙ্গদেশের বাগিচার দুই একটি সঙ্কর জাতি যে মারগুই ক্ষেত্রে উত্তমরূপ জন্মিবে, তাহা কর্ত্তৃপক্ষগণ আশা করেন।

কুইনাইনের কারখানা

শুদ্ধ সিঙ্কোনা উৎপাদন করিলেই কার্য্য শেষ হইল না। বল্কল বিদেশে চালান দিয়া বণিকের সামান্য লাভ হইতে পারে বটে, কিন্তু তাহাতে দেশের কিছুমাত্র উপকার নাই।

ভারত হইতে সিঙ্কোনার রপ্তানী কয়েক বৎসর কমিয়া আসিতেছিল, কিন্তু সম্প্রতি আবার বাড়িয়া চলিয়াছে। সিঙ্কোনা রোপণের পর হইতেই সরকার কুইনাইন উৎপাদনের চেষ্টা করিতে থাকেন। এসিয়ার মধ্যে সর্ব্বপ্রথম উৎকামন্দে মিঃ ব্রাউটন কর্ত্তৃক কুইনাইন প্রস্তুত হয়। উহাকে Amorphous quinine বলা হইত এবং উহাতে তিনটি উপক্ষারের মিশ্রণ ছিল। উহার মূল্য ছিল আউন্স প্রতি দেড় টাকা। তৎপরে ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশীয় কুইনাইন কারখানায় Cinchona febrifuge তৈয়ারী হয়। সিঙ্কোনা-বল্কলের সমস্ত বীর্য্য অথবা উপক্ষারসমূহ ইহাতে বিদ্যমান। Quinine Sulphate তাহার আরও কিছু দিন পরে বাহির হইয়াছে। বিশুদ্ধ Quinine Sulphate বায়ু সংস্পর্শে কিছু ময়লা হইয়া যায় এবং সূক্ষ্ম দানাও বাধে না। সামান্য পরিমাণ Cinchonidine সংযোগ করিয়া দিলেই এই দোষ শুধরাইয়া যায়। সেই জন্য Ledgeriana জাতি কুইনাইন প্রস্তুতের জন্য সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী হইলেও, উহার সহিত সামান্য পরিমাণ Succirubra মিশ্রিত করিয়া উৎকৃষ্ট দানাদার Quinine Sulphate প্রস্তুত হইয়া থাকে।

এ স্থলে আরও একটি বিষয়ের উল্লেখ আবশ্যক। পূর্ব্বে চিকিৎসকগণ ও সাধারণ ব্যক্তিবর্গের ধারণা ছিল যে, কুইনাইন সিঙ্কোনার একমাত্র কার্য্যকর উপক্ষার। কিন্তু বঙ্গদেশে বহুবিধ পরীক্ষার ফলে আজকাল কতিপয় ডাক্তার মত প্রকাশ করিতেছেন যে, সিঙ্কোনা-বল্কলের সমস্ত উপক্ষারগুলির বিশেষ বিশেষ ক্রিয়া আছে এবং কোন কোন প্রকারের ম্যালেরিয়া জ্বরে কুইনাইন অপেক্ষা সিঙ্কোনা-ছালের উপক্ষার-সমষ্টি অর্থাৎ Cinchona febrifuge অধিকতর ফলপ্রদ। সেই জন্য C. Succirubra জাতির চাষের পরিসরবৃদ্ধির চেষ্টা হইতেছে। এখনও কিন্তু কুইনাইনের কারখানায় কুইনাইনই প্রধান উৎপাদিত দ্রব্য, যদিও অপর উপক্ষারগুলি প্রস্তুত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। বঙ্গদেশীয় কুইনাইন কারখানায় কোন্ কোন্ কুইনাইন উপক্ষার কি পরিমাণ প্রস্তুত হয়, তাহা নিম্নলিখিত তালিকা হইতে বুঝিতে পারা যাইবে ;—

কুইনাইন সলফেট্ (Quinine Sulphate)	২১ হাজার ৫ শত ৫০ পাউণ্ড
অন্যান্য কুইনাইনের যৌগিক দ্রব্য (other Quinine Salts)	৪ শত ৮৪ পাউণ্ড
কুইনিডিন্ সলফেট্ (Quinidine Sulphate)	১১ পাউণ্ড
অন্যান্য কুইনিডিন্ যৌগিক দ্রব্য (Quinidine Salts)	৬ পাউণ্ড
সিঙ্কোনেডিন্-ঘটিত দ্রব্যাদি (Cinchonidine Salts)	৭ পাউণ্ড
কুইনিওডিন্ (Quiniodine)	৭৮ পাউণ্ড
সিঙ্কোনা ফেব্রিফিউজ (Cinchona febrifuge)	৮ হাজার ২ শত ৯৪ পাউণ্ড

বাঙ্গালার কুইনাইনের কারখানায় শুধু যে তৎসংলগ্ন বাগিচা-উৎপাদিত সিঙ্কোনা-বল্কল হইতে কুইনাইন প্রস্তুত হয়, তাহা নহে। ওলন্দাজ গবর্ণমেণ্টের সহিত ১৯২৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত চুক্তি করিয়া ভারত-গবর্ণমেণ্ট প্রতি বৎসর কিয়ৎপরিমাণে কুইনাইন ও সিঙ্কোনা-ছাল যবদ্বীপ হইতে আনয়ন করেন। উক্ত ছাল হইতে কুইনাইন নিষ্কাশন বাঙ্গালার কারখানাতেই পূর্ব্বে হইত; সম্প্রতি ছাল মান্দ্রাজ ও বঙ্গ উভয় স্থানের কারখানার মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হইতেছে। গত বৎসর উক্তরূপ যবদ্বীপজাত ৪ লক্ষ ৩০ হাজার ৬ শত ৪ পাউণ্ড বল্কল হইতে ২৪ হাজার ৯ শত ৫৬ পাউণ্ড Qunine Sulphate এবং ৪ হাজার ৯ শত ৮৩ পাউণ্ড Cinchona febrifuge প্রস্তুত হইয়াছে। অবশ্য এই কুইনাইন বঙ্গদেশে ব্যবহারের জন্য নহে। ভারত-গবর্ণমেণ্টই ইহার মালিক।

কুইনাইনের চাহিদা

কিছু দিবস পূর্ব্বে লণ্ডনের Imperial Instituteএর কর্ত্তৃপক্ষগণ জগতের কুইনাইন-সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া অনুমান করেন যে, আপাততঃ মোটামুটি নিম্নলিখিত পরিমাণে সিঙ্কোনা-ছাল পৃথিবীতে উৎপাদিত হয় ;—

যবদ্বীপ	২ শত ৩০ লক্ষ পাউণ্ড
ভারত	২০ " "
অন্যান্য দেশ	৪ " "
মোট	২ শত ৫৩ লক্ষ পাউণ্ড

বৃটিশ সাম্রাজ্যে কুইনাইনের চাহিদা সম্বন্ধে তাঁহাদিগের অনুমান নিম্নরূপ ;—

ইংলণ্ডের যুক্তরাজ্য ২ হাজার ৫ শত ৩০ হাজার আউন্স
ভারত ২২ " ২ " ৪০ " "
সাম্রাজ্যভুক্ত অন্যান্য দেশ ২ " " পাউণ্ড।
অথবা মোটামুটি ৮০ লক্ষ আউন্স।

সাম্রাজ্যের অন্যান্য দেশ সম্বন্ধে যাহাই হউক, ভারত সম্বন্ধে যে এইরূপ অনুমান ঠিক নয়, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। ১৯২২-২৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ৫ বৎসরে ভারতে সিঙ্কোনা চাষের জমী ৪ হাজার ৮ শত ৪০ একর হইতে ৭ হাজার ১ শত ১৫ একরে দাঁড়াইয়াছে। উহার মধ্যে ৪ হাজার ১ শত ১৫ একর মাদ্রাজে এবং অবশিষ্ট বাঙ্গালায়; অন্য কোন প্রদেশেই এখনও সিঙ্কোনার ব্যবসায়োপযোগী চাষ হয় নাই। ইহাও স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, উক্ত পরিমাণ জমীতে রোপিত সমস্ত সিঙ্কোনা-গাছই ফসল প্রদানের উপযুক্ত হয় নাই। বঙ্গদেশের বাগিচায় ৩ হাজার একর রোপিত জমীর মধ্যে কেবলমাত্র ২ শত একর জমী হইতে এখন ফসল পাওয়া যাইতেছে। গড়পড়তা একর প্রতি ফলনের হার ২ হাজার ৭ শত পাউণ্ড ছাল ধরিলে বাঙ্গালায় উৎপাদনের মাত্রা প্রায় সাড়ে ৫ লক্ষ পাউণ্ডে দাঁড়ায়; মাদ্রাজে তদপেক্ষা কিছু অধিক হইবে। ফলতঃ কোনক্রমেই ভারতজাত সিঙ্কোনা-বল্কলের পরিমাণ ১২ লক্ষ পাউণ্ডের অধিক হইবে না। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ভারতোৎপাদিত সমস্ত ছালের দেশমধ্যে সদ্ব্যবহার হয় না। ১৯২৩-২৪ ও ১৯২৪-২৫ খৃষ্টাব্দে যথাক্রমে ২, ৩৮, ৩৯৭ এবং ৫ লক্ষ ৫৯ হাজার ৫ শত ৯২ পাউণ্ড সিঙ্কোনাত্বক্ বিদেশে চালান গিয়াছিল।

অতঃপর কুইনাইনের আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, বাঙ্গালার কারখানায় বঙ্গদেশ ও ভারত-সরকারের জন্য ১৯২৩-২৪ খৃষ্টাব্দে মোট ৫৬ হাজার ৮ শত ২২ পাউণ্ড সিঙ্কোনা উপক্ষার সমূহ প্রস্তুত হইয়াছিল। মাদ্রাজেও উক্ত সময়ে উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় ৬ হাজার পাউণ্ড। উভয়ের সমষ্টি করিলে ১ লক্ষ ১৬ হাজার ৮ শত ২২ পাউণ্ড হয়। কিন্তু Imperial Instituteএর মতে ভারতে ১ লক্ষ ২৫ হাজার পাউণ্ড সিঙ্কোনা উপক্ষার প্রস্তুত হয়। মাদ্রাজ ও বঙ্গের কারখানায় উৎপাদিত সিঙ্কোনা উপক্ষার সমূহ দেশমধ্যে ত কাটিয়া যায়ই; এতদ্ভিন্ন ২৮ লক্ষ ৮ হাজার ৭ শত ৩৪ পাউণ্ড (১৯২৪-২৫) কুইনাইন বিদেশ হইতে আমদানী হইয়া থাকে। সুতরাং ভারতে কুইনাইনের দরকার মোটে ১ লক্ষ ३০ হাজার পাউণ্ড বলিয়া অনুমান করা ভ্রমাত্মক। উহার দ্বিগুণের অধিক কুইনাইন এখনই ভারতে কাটিতেছে। তবুও যথেষ্ট অভাব রহিয়াছে। ভারত গবর্ণমেণ্ট এ পর্য্যন্ত তাঁহাদের কুইনাইন কেবলমাত্র পঞ্চনদে দিতে পারিতেছেন। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে Cinchona Conference দিল্লীর অধিবেশনে মাদ্রাজ ও বঙ্গদেশকে যে কুইনাইন দেওয়ার জন্য অনুমোদন করেন, তাহা এখনও কার্য্যে পরিণত হয় নাই।

ভারতবাসীর সুযোগ

উত্তম স্বাস্থ্য ব্যতীত কোন ব্যক্তি অথবা কোন জাতি উন্নতি লাভ করিতে পারে না। ম্যালেরিয়া যে প্রতিনিয়ত আমাদিগের জাতীয় স্বাস্থ্যের মূলে কুঠারাঘাত করিতেছে, তাহা সকলেরই জানা আছে। সেই জন্য ম্যালেরিয়ার একমাত্র প্রতীকার—সিঙ্কোনা-উপক্ষারাবলী উৎপাদনে আমাদিগের যে কত স্বার্থ আছে, তাহা বলা অনাবশ্যক। এ পর্য্যন্ত কুইনাইন-শিল্প সরকারের হস্তেই রহিয়াছে; তাহার প্রধান কারণ—সিঙ্কোনা-বাগিচাওয়ালা তাঁহারা এবং কারখানাওয়ালাও তাঁহারা। দেশে লক্ষ লক্ষ লোক ম্যালেরিয়ার কবলে পতিত হইলেও সরকার যে বিনামূল্যে অথবা স্বল্পমূল্যে কুইনাইন বিক্রয় করেন, তাহা কেহ মনে করিবেন না। যে কুইনাইন প্রস্তুত করিতে পাউণ্ড প্রতি ৭ টাকার কিছু বেশী পড়ে, তাহাই ২৭ টাকা দরে বিক্রয় হয়। ভারত-গবর্ণমেণ্ট বঙ্গদেশের কারখানায় খরচ দিয়া কুইনাইন প্রস্তুত করাইয়া লইয়া এবং উচ্চ বাজারদরে বিক্রয় করিয়া যথেষ্ট লাভ করেন। সুতরাং কুইনাইন-শিল্পে যে লাভ নাই, তাহা বলা যায় না। কিন্তু সরকারের হাত হইতে মুক্ত না হইলে কুইনাইন-শিল্প দ্বারা সাধারণের কোন লাভ হইতেছে না এবং সুদূর পল্লীগ্রামের ম্যালেরিয়া-রোগীর চিকিৎসারও কোন সুব্যবস্থা হইতেছে না। দেশের লোক এই কার্য্যে অবহিত না হইলে উন্নতির কোন ভরসা নাই। কারণ, কুইনাইন-শিল্পের ভিত্তি সিঙ্কোনা-চাষ। মাদ্রাজে বে-সরকারী চাষ কতক পরিমাণে আছে, কিন্তু বাঙ্গালায় উক্তরূপ চাষ একবারে নাই বলিলেই চলে। সিঙ্কোনা একটি অনন্যসাধারণ ফসল। ইহার জন্য অবশ্য বিশেষ প্রকারের স্থান, জমী ও জলহাওয়া দরকার। তথাপি ইহা

স্বীকার করা যায় না যে, যে কয়েকটি স্থানে আপাততঃ সিঙ্কোনা-চাষ হইতেছে, তদ্ভিন্ন ভারতে আর কুত্রাপি উহার উপযুক্ত স্থান নাই। বস্তুতঃ বাঙ্গালার জলপাইগুড়ি ও দার্জ্জিলিং জিলায়,আসামের মিকির পর্ব্বতে, কুমায়ুনের কিয়দংশে, পঞ্চনদের হিমালয়ভুক্ত অঞ্চলে এবং দেশীয় রাজ্যাদির মধ্যে সিকিম, ভুটান, নেপাল ও পার্ব্বত্য ত্রিপুরায় সিঙ্কোনা-চাষ করিলে সাফল্যলাভ সম্বন্ধে সন্দেহ খুবই কম। প্রথমে কাঁচা-মাল উৎপাদিত না হইলে কারখানা স্থাপনের চেষ্টা করা বৃথা। অবশ্য সরকারী কারখানাদ্বয় কেবলমাত্র নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ বল্কল ব্যবহার করিতে পারে। দেশে উৎপাদিত ছাল অনেক সময়ে খরিদ্দার অভাবে বিদেশে চালান যায়। সেরূপ ছাল লইয়া একটি ছোট কারখানা চলিতে পারে। কিন্তু ঐরূপ অনিশ্চিত সরবরাহের উপর নির্ভর করিয়া অথবা যবদ্বীপ হইতে বল্কল আনাইয়া কারখানা খুলিবার চেষ্টা সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। যবদ্বীপে যেমন অগ্রে স্থানীয় বাগিচার সহিত চুক্তি করিয়া লইয়া পরে কারখানা খোলা হয়, তদ্রূপ করাই ভাল। ফলতঃ, উৎপাদনের মূল্যের উপর সামান্য লাভ রাখিয়া যত দিন না ভারতের ন্যায় দরিদ্র দেশে কুইনাইন যথেষ্ট পরিমাণে বিতরণ করিতে পারা যায়, তত দিন আমাদিগের ম্যালেরিয়ার হস্ত হইতে নিষ্কৃতিলাভের কোন উপায় নাই; এবং তাহা করিতে হইলেই সাধারণের সিঙ্কোনা-চাষের উপর মনঃসংযোগ করা আবশ্যক।

শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত।

প্রার্থনা

আমারে ফুটিতে দিও ফুলের মতন
কানেনের এক পাশে নিভৃত শাখায়,
নূতন আলোক দিও মেলিতে নয়ন—
নিভৃতে রাখিও ঢাকি পাতার ছায়ায়!

সবলের অত্যাচারে—অন্যায় বিচারে,
দুর্ব্বলের বক্ষে যেথা পড়ে পদাঘাত
এই মোর ক্ষুদ্র বক্ষে রক্ষিয়া তাহারে,
আমারে ধরিতে দিও সে তীব্র আঘাত!

ব্যথিতের চোখে যেথা ঝরে অশ্রুধার
আমারে মুছিতে দিও আঁচলে সে জল,
যে বীণা ভাঙ্গিয়া গেছে, ছিঁড়ে গেছে তার,
সে বীণে তুলিতে দিও রাগিণী কোমল!

উদ্দাম সিন্ধুর বুকে নাবিক যেথায়
ভগ্নপোত, প্রকৃতির দুর্য্যোগ আঁধারে,
ক্ষুদ্র মোর তরীখানি বাহিয়া সেথায়
আমারে যাইতে দিও ঝঞ্ঝার মাঝারে।

সৌন্দর্য্যের দস্যু যারা—মূর্ত্ত অভিশাপ
তাদের নাশিতে দিও বাহুতে আমার
অদম্য অজেয় শক্তি; নাশিতে সে পাপ
ঝলকে যেন সে মম প্রেম-তরবার।

আমারে মরিতে দিও হাসিতে হাসিতে
নীরবে ঝরিয়া পড়া ফুলের মতন,
ধূলি-কণা পূত করি নিঝুম নিশীথে
নীরবে মিশিতে দিও ধূলির মতন!

শ্রীবিজয়মাধব মণ্ডল

সূর্য্যাতপ-নিবারক 'কলার'

জার্ম্মাণীতে সম্প্রতি এক প্রকার 'কলার' বা গলাবন্ধ নির্ম্মিত হইয়াছে। স্নানার্থিনী নারীগণ স্বাভাবিক অর্থাৎ বায়ুপূর্ণ না করিয়া গলদেশে ধারণ করিলে স্নানের সময় উহা সূর্য্যাতপ হইতে স্কন্ধ ও গলদেশকে রক্ষা করে। বায়ুপূর্ণ অবস্থায় গলদেশে ধারণ করিলে, সন্তরণকালে কলার'টি 'বোয়া' (Buoy)র ন্যায় দেহকে ভাসাইয়া

সূর্য্যাতপনিবারক গলাবন্ধ বা 'কলার'

রাখে। ইহাতে প্রথম শিক্ষার্থিনী সন্তরণকারিণী বহু দূর পর্য্যন্ত অনায়াসে সাঁতার দিতে পারেন। কলারটি অত্যন্ত লঘুভার হইলেও পরীক্ষার ফলে দেখা গিয়াছে যে, ইহা স্নানবেশপরিহিতা দুই জন নারীর ভার সহনে সমর্থ—এক জন সৈনিক তাহার যাবতীয় দ্রব্যসম্ভার সহ ইহার সাহায্যে জলে ভাসিয়া থাকিতে পারে।

কাচের বোতলের শক্তিপরীক্ষা

ছোট ছোট খালি বোতলগুলির শক্তিপরীক্ষার জন্য আমেরিকার কোনও পশুশালায় সম্প্রতি এক অপূর্ব্ব পদ্ধতি অবলম্বিত হইয়াছিল। একখানি সুদৃঢ়, প্রশস্ত তক্তার উপর ৪টি পাইট বোতল রাখিয়া তাহার উপর আর একখানি

কাচের বোতলের শক্তিপরীক্ষা

অনুরূপ তক্তা বসাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। পশুশালার এক হস্তী এই তক্তার আসনে উপবিষ্ট হইলে বোতলগুলির একটিও ভাঙ্গিয়া যায় নাই। হস্তীটির ওজন ১ শত সাড়ে ৫৮ মণ। এই বিরাট ওজনের চাপে শুধু এক দিকের বোতল কাষ্ঠের তক্তার মধ্যে এক ইঞ্চি বসিয়া গিয়াছিল।

প্রাগৈতিহাসিক যুগের চিত্র

প্রাগৈতিহাসিক যুগে গুহাবাসী নরনারী গুহাগাত্রে পশু-পক্ষীর চিত্র ক্ষোদিত করিয়া থাকিত। 'জিয়ন ন্যাশনাল

গুহাগাত্রে ক্ষোদিত পশুর চিত্র

পার্ক' সন্নিহিত কোনও গুহামধ্যে এইরূপ আদিম যুগের চিত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রত্নতাত্ত্বিকগণ স্থির করিয়াছেন যে, বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে গুহাবাসী নরনারী দৃঢ় প্রস্তরগাত্রে ঐ সকল চিত্র ক্ষোদিত করিয়াছিল। চিত্রের বিষয় শুধু পশু—হরিণ, ডিনোসর প্রভৃতি।

মর্ম্মরপ্রস্তর-রচিত সঙ্গীতাগার

রোডস দ্বীপের জনৈক কোটিপতি এমনই সঙ্গীতপ্রিয় যে, প্রচুর অর্থব্যয়ে তিনি প্রভিডেন্স সহরে রজার উইলিয়ম পার্কে একটি সঙ্গীতাগার নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। এই ভবনটি আগাগোড়া মর্ম্মরপ্রস্তরে নির্ম্মিত। উদ্যানের যে স্থানে সঙ্গীতাগারটি নির্ম্মিত, তাহার চারি পার্শ্বে তৃণাস্তৃত শ্যামল ক্ষেত্র। প্রয়োজন হইলে ৫০ হাজার শ্রোতা একসঙ্গে বসিয়া তথায় সঙ্গীত শ্রবণ করিতে পারে। বাদক ও গায়কগণ সঙ্গীতগৃহের সোপানে বসিয়া সঙ্গীতালাপ করিয়া শ্রোতৃগণকে পরিতৃপ্ত করিয়া থাকে।
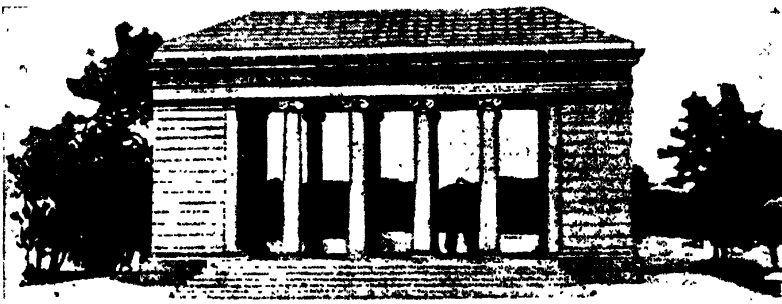
মর্ম্মরপ্রস্তরনির্ম্মিত সুবৃহৎ সঙ্গীতাগার

পঞ্চবর্ণের পেন্‌সিল

চিত্র-শিল্পী প্রভৃতির ব্যবহারের জন্য এক প্রকার নূতন পেন্‌সিল আমেরিকার বাজারে বিক্রীত হইতেছে। এই পেন্‌সিলের আধারে পঞ্চ বিভিন্ন বর্ণের সীসা আছে। যে বর্ণের পেন্‌সিলের প্রয়োজন, আধারসংশ্লিষ্ট একটা ক্ষুদ্র 'ড্রম্' ঘুরাইলেই সেই বর্ণের সীসা, আধারস্থ সূক্ষ্ম মুখের কাছে উপস্থিত হইবে। সীসা ফুরাইয়া গেলে মুখ খুলিয়া সেই বর্ণের সীসা ভরিয়া লইতে হয়।

পঞ্চবর্ণের পেন্‌সিল— দক্ষিণদিকে বর্ণনির্দ্দেশক অংশ অবস্থিত

আলোকিত ইফেল-চূড়া

প্যারীর সুপ্রসিদ্ধ 'ইফেল্ টাওয়ার' সম্প্রতি সহস্র সহস্র বৈদ্যুতিক 'বল্‌বের' সাহায্যে আলোকিত করা হইতেছে। জনৈক

ফরাসী মোটর-নির্ম্মাতা ।বজ্ঞাপন দিবার অভিপ্রায়ে ফরাসী সরকারের নিকট হইতে বহু অর্থ দিয়া উহা জমা লইয়াছেন। সমগ্র স্তম্ভটি যখন বৈদ্যুতিক আলোকে ঝলসিত হইয়া উঠে, তখন নগরের যে কোনও স্থান হইতে উহা দৃষ্টিগোচর হয়। ইফেলের উচ্চতা ৯ শত ৮৪ ফুট, ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে উহা নির্ম্মিত হয়। জগতের বিভিন্ন স্থান হইতে দর্শকগণ এই স্তম্ভের উপর উঠিয়া সমগ্র নগরটিকে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া থাকে।
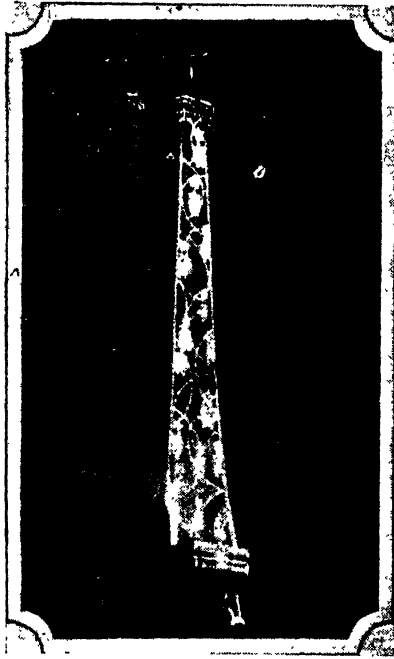
বিদ্যুতালোকে উদ্ভাসিত 'ইফেল্ টাওয়ার'

নিদ্রায় দৈহিক ওজনের হ্রাস

রাত্রিকালে নিদ্রার পর প্রত্যেক মানুষেরই দেহের ওজন কমিয়া যায়, ইহা বৈজ্ঞানিক সত্য। আমেরিকার 'কার্ণেজি ইন্‌ষ্টিটিউশনে' সম্প্রতি একপ্রকার তুলাযন্ত্র ব্যবহৃত হইতেছে—ইহাতে নিদ্রাভঙ্গের পর প্রতিদিন কতটুকু দৈহিক ওজন হ্রাস পায়, তাহা জানিতে পারা যায়। অবশ্য নিদ্রার পর দৈহিক ওজন অতি সামান্য পরিমাণেই হ্রাস পাইয়া থাকে। এই তুলাযন্ত্র এমনই ভাবে নির্ম্মিত যে, অতি সামান্য পরিমাণ হ্রাস-বৃদ্ধিও ইহাতে ধরা পড়িয়া থাকে। এমন কি, শরীর ঘর্ম্মাক্ত হইবার পর দেহের ওজন অতি সামান্য হ্রাস পাইলেও এই যন্ত্র তাহা নির্ভুলভাবে নির্দ্দেশ করিবে দিবানিদ্রাতেও শরীর লঘু হয়, রাত্রিকালের নিদ্রার ফলে এবং দিবা নিদ্রায় মানুষের কি প্রকার ওজন কমিয়া যায়, এই যন্ত্রের সাহায্যে তাহাও বুঝিতে পারা যায়।

সূক্ষ্মতম ওজন পরিমাপ করিবার তুলাযন্ত্র

শ্যাম-রাজদম্পতি

রাজা ষষ্ঠ রাম ও রাণী সুবদনা

গত ২৬শে নবেম্বর তারিখে শ্যামদেশের রাজা ষষ্ঠ রাম পরলোক গমন করিয়াছেন। কিছু দিন পূর্ব্বে তিনি তাঁহার মহিষীকে রাজরাণী হইবার অনুপযুক্ত মনে করিয়া তাঁহাকে রাজকীয় সম্মান হইতে অবসর প্রদান করিয়াছিলেন এবং রাজকুমারী সুবদনার পাণিগ্রহণ করেন। তাঁহার মৃত্যুর কয়েক দিন পূর্ব্বে রাণী সুবদনার একটি কন্যাসন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। বাঙ্গালীরা কোনও এক সময়ে শ্যামদেশে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন; তাহার বহু ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে। বিশেষতঃ শ্যামরাজবংশের বহু পুরুষ ও নারীর নাম

বাঙ্গালীর মত। যেমন রাজা চূড়ালঙ্করণ, রাজা ষষ্ঠ রাম, সুবদনা প্রভৃতি। রাজা রামের কোনও পুত্রসন্তান নাই। বর্ত্তমানে তাঁহার ভ্রাতা সুখোদয়ের রাজকুমার প্রজ্ঞাধিপক নূতন রাজা হইয়াছেন।

ষট্‌চক্র মোটর বাস্‌

জার্ম্মাণীতে ষট্‌চক্র-বিশিষ্ট মোটর বাস নির্ম্মিত হইয়াছে। ড্রেস্‌ডেন্‌ সহরে দাঙ্গা-হাঙ্গামা ঘটিলে পুলিস-প্রহরীরা এই বাসে করিয়া ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়। ইহাতে ৩২ জন পুলিস বসিতে পারে। এই শ্রেণীর বাস্‌ অত্যন্ত দ্রুতগতিবিশিষ্ট। সামরিক প্রথা ও শৃঙ্খলা বজায় রাখিয়া পুলিস-প্রহরীরা এই বাসে উঠে এবং নামিয়া পড়ে। ইহাতে অযথা সময় নষ্ট হয় না এবং বিন্দুমাত্র বিশৃঙ্খলা ঘটিবার অবকাশ পায় না।
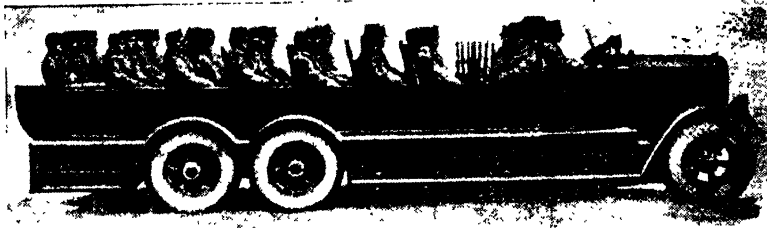
৩২ জন পুলিস-প্রহরীসহ ষট্‌চক্র মোটর বাস্‌

পেঁয়াজ ছাড়াইবার কৌশল

পেঁয়াজ ছাড়াইতে গেলেই উহার ঝাঁঝে চোখে জল আইসে। এ জন্য পাশ্চাত্য নারীরা ঢাকা কাচের ঠুলি ব্যবহার করিয়া থাকেন। ঠুলি পরিয়া থাকিলে পেঁয়াজের ঝাঁঝ লাগিয়া চোখে জল আসিতে পারে না। বাঙ্গালাদেশের নারীরা চোখে ঠুলি পরেন না, পেঁয়াজ ছাড়াইবার সময় বঁটীর অগ্রভাগে একটা পেঁয়াজ বিদ্ধ করিয়া রাখেন, তাহাতে পেঁয়াজের ঝাঁঝ চোখে লাগে না, জলও পড়ে না।

ঠুলি পরিয়া পেঁয়াজ ছাড়ান

রাজপথের আলোক-স্তম্ভে ফুলের সাজি

পেন্‌সিল্‌-ভানিয়ার রাজপথগুলিকে নয়নস্নিগ্ধকর রাখিবার উদ্দেশে পথিপার্শ্বস্থ আলোক-স্তম্ভগুলি দ্রাক্ষালতা ও পুষ্পভারে সুসজ্জিত রাখা হয়। এমন ভাবে লতা ও ফুলের সাজি সংস্থাপিত থাকে যে, তাহাতে আলোকপাতে কোনও রূপ অসুবিধা ঘটে না এবং পথচারী লোকদিগের দৃষ্টিরোধও করে না। পথিপার্শ্বে এইরূপ লতা-পুষ্পশোভিত শত শত আলোক-স্তম্ভের অবস্থানে রাজপথগুলি কতকটা উদ্যানের মত মনোরম বোধ হয়।

লতা-পুষ্পশোভিত আলোক-স্তম্ভ

প্রাগৈতিহাসিক যুগের অস্থি

দক্ষিণ আমেরিকায় "Valley of the Giants" নামক উপত্যকাভূমি খনন করিতে করিতে সম্প্রতি এক বিরাট

প্রাগৈতিহাসিক ।ডনোসরের উরুদেশের অস্থি

প্রাগৈতিহাসিক যুগের 'ডিনোসরে'র অস্থিখণ্ড আবিষ্কৃত হইয়াছে। বিশেষজ্ঞগণ স্থির করিয়াছেন, এই অস্থিখণ্ড 'ডিনোসরে'র উরুদেশের একটি অংশ মাত্র।

মাদ্রাজে দেশবন্ধু স্মৃতি-সৌধ

গত ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি মাদ্রাজ সহরে 'দেশবন্ধু-নিকেতনে' পরলোকগত দেশ-নেতা চিত্তরঞ্জন দাশের একটি স্মৃতি-মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই মন্দিরের মধ্যে দেশবন্ধুর আবক্ষোমূর্ত্তি রক্ষিত হইয়াছে। মন্দিরটি ভারতীয় স্থপতি-শিল্পের প্রকৃষ্ট নিদর্শন। বড় লাটের ব্যবস্থা-পরিষদের অন্যতম সদস্য শ্রীযুত তুলসীচরণ গোস্বামী মহাশয় ঐ মূর্ত্তির আবরণ উন্মোচন করিয়াছেন। মাদ্রাজ এ বিষয়ে যে পথ দেখাইয়াছেন, বাঙ্গালী নিজের প্রদেশে— বাঙ্গালার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নেতার সম্বন্ধে সে পরিচয় দিতে পারে নাই।

মাদ্রাজে দেশবন্ধু-মন্দির ও মূর্ত্তি

কাষ্ঠনির্ম্মিত পয়ঃপ্রণালী
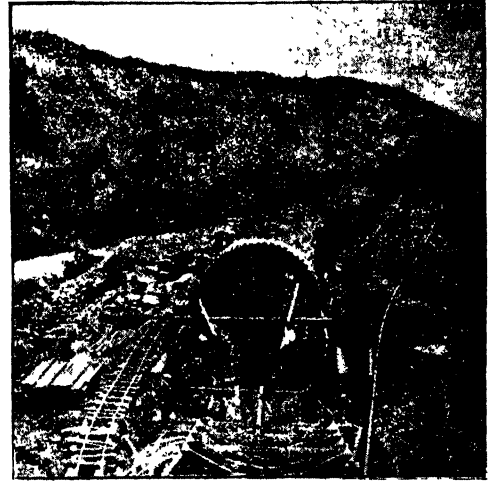
সুবৃহৎ দারুনির্ম্মিত পয়ঃপ্রণালী

মার্কিণে উত্তর-কালি-ফার্ণিয়া প্রদেশে "কালিফোর্ণিয়া অরেগণ পাউয়ার কোম্পানী" দুইটি ইষ্টকনির্ম্মিত পয়ঃপ্রণালীকে একটি দারুনির্ম্মিত পয়ঃপ্রণালীর দ্বারা সংযুক্ত করিয়া দিয়াছেন। নদীতে বাঁধ দিয়া যে জল কোম্পানী নিজের কাযে ব্যবহার করিতেছিলেন, উল্লিখিত সুবৃহৎ পয়ঃপ্রণালীর মধ্য দিয়া সেই জলস্রোত দেড় মাইল দূরবর্ত্তী অপর একটি স্থানে লইয়া যাওয়া হইতেছে। দারু-নির্ম্মিত পয়ঃপ্রণালীর মধ্যভাগ ১৬ ফুট ব্যাসবিশিষ্ট। উহার দৈর্ঘ্য ১ হাজার ৩ শত ১৬ ফুট। যে কাষ্ঠসমূহের দ্বারা পয়ঃপ্রণালী নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহা ৪ ইঞ্চি পুরু। পয়ঃপ্রণালী ইস্পাতের বেষ্টনীর দ্বারা আবদ্ধ। এই প্রণালী-পথে প্রতি সেকেণ্ডে ২ হাজার ঘন-ফুট জল নির্গত

হইয়া থাকে, অর্থাৎ ১ কোটি ২০ লক্ষ ব্যক্তির প্রত্যেকের জন্য প্রতিদিন ১ শত গ্যালন জল সরবরাহ হইয়া থাকে। এমন বৃহৎ দারুনির্ম্মিত পয়ঃপ্রণালী পৃথিবীর কুত্রাপি দেখিতে পাওয়া যায় না।

বিমানপোতে নারীর টেনিস-ক্রীড়া
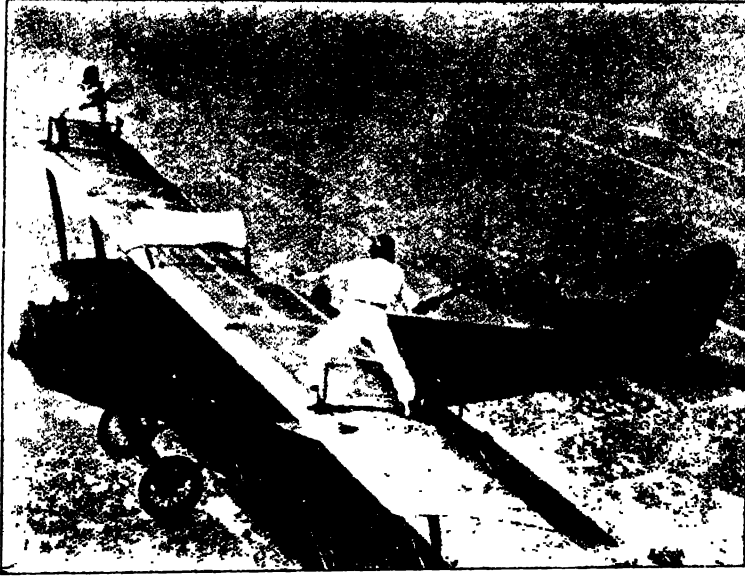
বিমানরথে মিস্ গ্লাডিস্ রয় আইভান অন্‌গারের সহিত টেনিস্ খেলিতেছেন

মার্কিণ নারীগণ সকল বিষয়েই অগ্রগামিনী। সে দিন লস্ এঞ্জেলেস্ নগরে বিমানপোতের উপর মিস্ গ্লাডিস্ রয় টেনিস্-ক্রীড়ায় অপূর্ব্ব সাহস ও ক্রীড়া-নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন। বিমানপোত ৩হাজার ফুট উর্দ্ধে উত্থিত হইলে, তিনি পোতের ছাদের উপর দাঁড়াইয়া আইভান্ অন্‌গার নামক জনৈক যুবকের সহিত টেনিস খেলিতে আরম্ভ করেন। পোতখানি তখন আকাশপথে দ্রুতগতিতে ধাবিত হইতেছিল। নিম্ন হইতে দর্শকদল এই নারীর বিচিত্র সাহস দর্শনে বিস্ময়বিমুগ্ধ হইয়াছিল।

স্নানার্থীর মুদ্রাধার

আমেরিকার শিল্পী একপ্রকার মুদ্রাধার নিৰ্ম্মাণ করিয়াছেন, উহা রবার হইতে প্রস্তুত। সন্তরণকারী বা স্নানার্থীরা উহা বামহস্তের মণিবন্ধে ধারণ করিতে পারেন। মুদ্রাধারটি এমনই ভাবে নির্ম্মিত যে, উহা জলে নষ্ট হয় না, ছিঁড়িয়া যায় না। সন্তরণকারী উহার মধ্যে মুদ্রা বা চাবি প্রভৃতি রাখিয়া অনায়াসে জলবিহার করিতে পারেন।

স্নানার্থীর রবারের মুদ্রাধার

প্রসিদ্ধ ডুবো জাহাজ

কোনও মার্কিণপত্রে বৃটিশের একখানি সুবৃহৎ ও শ্রেষ্ঠ ডুবো জাহাজের বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। এই জাহাজ নির্ম্মাণ করিতে প্রায় ১ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হইয়াছে। জাহাজখানি একাদিক্রমে আড়াই দিন অনায়াসে জলের মধ্যে ডুবিয়া থাকিতে পারে এবং সেই সময়ের মধ্যে ২০ হাজার মাইল পথ অতিক্রম করিতে সমর্থ। জাহাজখানির দৈর্ঘ্য ৩ শত ৫০ ফুট এবং উহাতে ১ শত ২১ জন
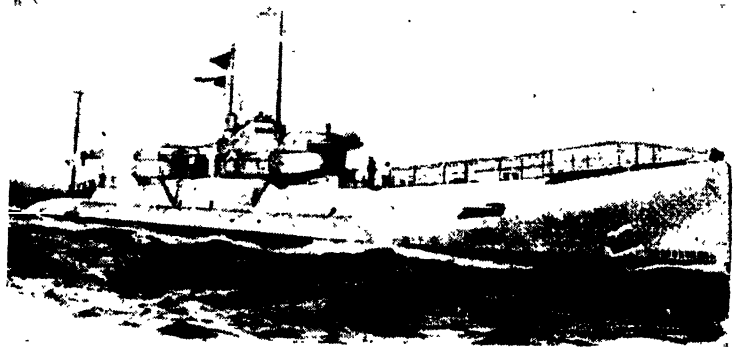
প্রসিদ্ধ ডুবো জাহাজ

নাবিক থাকে। জাহাজের অন্যান্য বিবরণ সামরিক বিধান অনুসারে অপ্রকাশ্য এবং কর্তৃপক্ষ সে সকল সংবাদ বাহিরের কাহাকেও অবগত হইতে দেন না।

প্যারী নগরীর বৈদ্যুতিক মানচিত্র

প্যারী নগরীর বিশিষ্ট দ্রষ্টব্য স্থান-সংবলিত একখানি মানচিত্র নগরের বিশিষ্ট স্থানে রক্ষিত আছে। এই মানচিত্র ঘষা কাচের উপর অঙ্কিত এবং বৈদ্যুতিক আলোকে
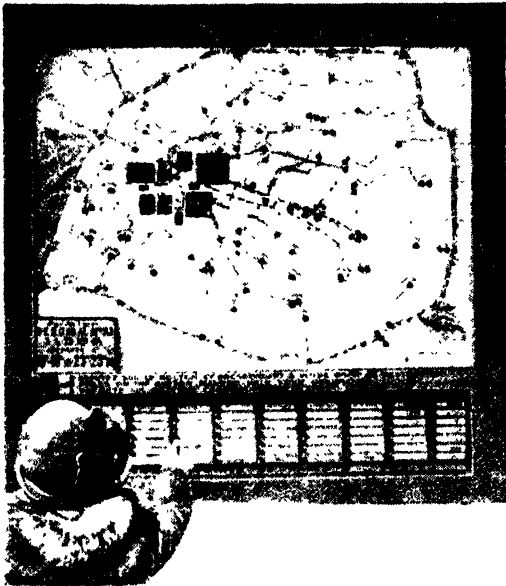
প্যারীর বৈদ্যুতিক মানচিত্র

উদ্ভাসিত করা যায়। বৈদেশিকগণ এই মানচিত্রের সাহায্যে কোনও পরিদর্শক ব্যতীত দর্শনীয় স্থানে গমন করিতে পারেন। মানচিত্রের তলদেশে প্রসিদ্ধ স্থানগুলির নাম লিখিত আছে, পার্শ্বে একটি করিয়া বোতাম। বোতাম টিপিলেই সেই স্থানের আলোক জ্বলিয়া উঠিবে, এবং কি উপায়ে কোথা দিয়া তথায় পৌছিতে পারা যায়, তাহাও প্রদর্শিত হইবে। মানচিত্রের পঞ্চাশাধিক বিভিন্ন দিক্ হইতে সেই স্থানে যাইবার আলোকিত পথ দেখিতে পাওয়া যায়। বিভিন্ন দিকের পরিচয় চিত্রের বামকোণে সাঙ্কেতিক অক্ষরে লিখিত আছে। মানচিত্রেও সেই সকল সাঙ্কেতিক অক্ষর বিদ্যমান। কোন্ পথে কিরূপ ভাবে গমন করিতে পারা যায়, তাহারও একটি তালিকা আছে।

সূর্য্য-পরিচালিত আলোকাধার

লণ্ডনের ক্রয়ডন্‌স্থিত বিমানপোতাশ্রয়ের কাছে একটি আলোক স্থাপিত হইয়াছে। এই আলোক এমনই কৌশলে নির্ম্মিত যে, সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই উহা আপনা হইতে নির্ব্বাপিত হয় এবং সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গেই আপনা হইতে প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। আলোকাধারে একটি 'ভাল্‌ব' (Valve) বা ছিপি সন্নিবিষ্ট আছে। এই 'ভাল্‌ব' বা ছিপি
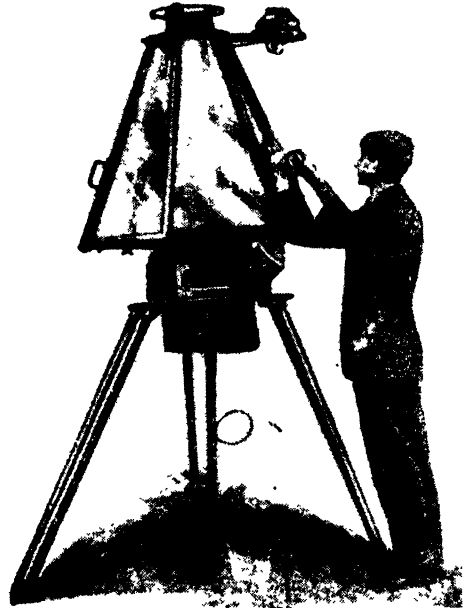
সূর্য্য-পরিচালিত বিচিত্র আলোকাধার

নিম্নস্থ আধারস্থিত গ্যাসকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে। ইহা সূর্য্যালোকস্পর্শমাত্রই গ্যাসপ্রবাহকে বন্ধ করিয়া দেয় এবং আলোক অন্তর্হিত হইবামাত্রই গ্যাসের নির্গমপথ মুক্ত করিয়া ফেলে। সুতরাং এই আলোক প্রজ্বলিত করিবার জন্য কোনও লোকের প্রয়োজন হয় না। শুধু গ্যাসের আধারে গ্যাস জন্মাইবার পদার্থ মাঝে মাঝে সরবরাহ করিতে হয়। তাহাও সর্ব্বদা নহে, একবার আধারটি পূর্ণ করিয়া রাখিলে কয়েক সপ্তাহ আর তাহা স্পর্শ করিবার প্রয়োজন হয় না।

হানাবাড়ী

১০
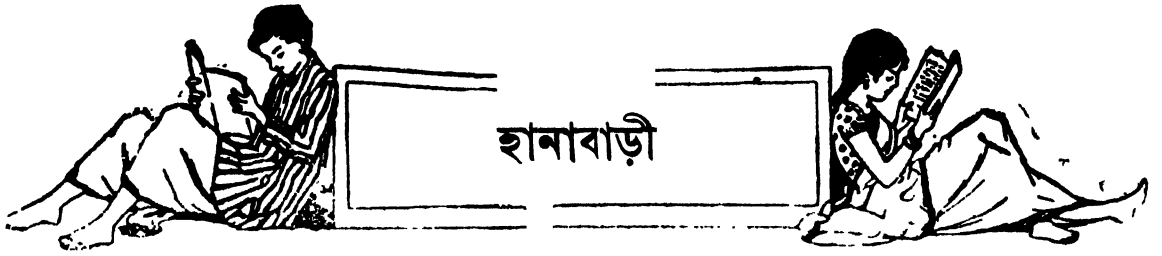
করোণার-কোর্টের তদন্তের প্রায় এক সপ্তাহ পরে, একদিন সকালে, আমার মক্কেল-শূন্য বসিবার ঘরে, আরাম কেদারায় অর্দ্ধশায়িত অবস্থায়, গরম চায়ের বাটীতে ঈষৎ চুমুক দিতে দিতে, আমি মোকর্দ্দমার নথি-পত্র অভাবে খবরের কাগজখানাতে মনঃসংযোগ করিবার উপক্রম করিতেছিলাম—এমন সময় পুলিসের পোষাকধারী একজন বাঙ্গালী সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া 'মাথার হেল্‌মেট্' নামীয় টুপিটা টেবলের উপর রাখিয়া, বাঙ্গালীর মতই আমাকে অভিবাদন করিলেন। আমিও যথারীতি প্রত্যভিবাদন করিয়া তাঁহাকে আমার সম্মুখের একখানা চেয়ারে বসিতে আহ্বান করিলাম। তিনি বসিয়া, টুপিটা আবার সেই চেয়ারের নীচে রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মশাইয়ের নামই তো অরুণকুমার দত্ত?"

আমি সম্মতি-সূচক ঘাড় নাড়িলে, তিনি বলিতে লাগিলেন, "আপনার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে আলাপ না থাক্‌লেও, আমি আপনার নাম শুনেছি। আপনি পুলিস-কোর্টে প্র্যাক্‌টিস্ করেন, তা'ও জানি।"

আমাদের পাড়ার সেই হত্যা ব্যাপারের সংস্রবে, সম্প্রতি আমার নাম ও "পেশা"টা অন্যান্য সাক্ষীদের নামের সঙ্গে সংবাদপত্রে প্রচার হওয়ায়, তাহা ইদানীং অনেকেরই গোচরীভূত হওয়া কিছু বিচিত্র নয় বটে; কিন্তু আমার 'প্র্যাক্‌টিস' যে এখনও কেবল ট্রাম ভাড়া দিয়া আদালতে যাওয়া আসাতেই সীমাবদ্ধ ছিল, এ কথাটাও যে সকলেই জানিত, তাহা আমি স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি। যাহা হউক, আমি উপযুক্ত গাম্ভীর্য্য সহকারে, সৌজন্য পূর্ণ মস্তক সঞ্চালন করিয়া, জিজ্ঞাসা করিলাম, "মশায়ের নামটা জান্‌তে পারি কি?"

তিনি ঈষৎ গর্ব্বিতভাবে বলিলেন, "আমার নাম বোধ হয় আপনি শুনে থাকবেন,—আমি সি, আই, ডি'র নলিনী গাঙ্গুলী। এন্, গাঙ্গুলী বল্লেই বোধ হয় সহজে বুঝতে পারবেন।"

আমার নিশ্চয়ই বড় দুর্ভাগ্য যে, নামটা কখনও শুনিয়াছি বলিয়া স্মরণ হইল না। লোকটি যেরূপ দাম্ভিকতা সহকারে নিজের নাম প্রকাশ করিলেন, তাহাতে নামটা বোধ হয় খুবই সুপরিচিত;—অথচ আমি তাহা এ পর্য্যন্ত শুনি নাই বলিলে, হয় তো আমিই 'খেলো' হইব ভাবিয়া আমি বলিলাম, "ওঃ! বটে?—তা বেশ হয়েছে, আপনার সঙ্গে আলাপ হ'য়ে বড়ই কৃতার্থ হ'লাম।—চা খাবেন কি?"

"নাঃ! থাক,—আমি চা খেয়েই বেরিয়েছি। এখন একটু কাযের কথা কওয়া যা'ক্। আপনাদের এ পাড়ার ঐ ১০ নং বাড়ীর হত্যা ব্যাপার সম্বন্ধে সে দিন যে ইন্‌কোয়েষ্ট (Inquest) হয়ে গিয়েছে, তা'তে কে যে হত্যাকারী, সে বিষয়ে কিছুই সিদ্ধান্ত হয় নি। সেই জন্য সি, আই, ডি-র উপর এ বিষয়ে তদন্তের ভার পড়েছে এবং কর্ত্তৃপক্ষ আমাকেই এই কার্য্যে নিযুক্ত করেছেন"—বলিয়া, তিনি যেন আরও একটু গর্ব্বিতভাবে আমার দিকে চাহিলেন।

আমি ভাব বুঝিয়া লইলাম, "ও! তা' ভালই হয়েছে। কর্ত্তৃপক্ষ যে এ বিষয়ে সচেষ্ট হয়েছেন, তা জেনে বড় সুখী হ'লাম। ব্যাপারটা যেমন জটিল, তেমনি ঠিক উপযুক্ত লোকের হাতেই তার মীমাংসার ভার পড়েছে। আপনি অবশ্যই কৃতকার্য্য হবেন।"

"আমার পক্ষে সে জন্য চেষ্টার নিশ্চয়ই ত্রুটি হবে না। করোণার কোর্টে যে সব লোকের সাক্ষ্য লওয়া হয়েছিল, আমি ইতোমধ্যেই তাদের প্রায় সকলের সঙ্গে দেখা করে, তাদের আপন মুখের কথা সব শুনেছি। ও বাড়ীটা ভাল করে পরিদর্শন করেছি। এখন আপনার মুখে হতব্যক্তির কথা কিছু শুনতে পেলেই, এ দিকের কায আমার শেষ হবে।"

"আমার যা কিছু বলবার ছিল, সবই ত আমি পুলিস

তদন্তের সময় এবং করোণার কোর্টেও বলেছি! আপনি বোধ হয় তা দেখে থাকবেন ?"

"হাঁ তা অবশ্যই দেখেছি। কিন্তু তবু, আরও যদি কিছু আপনার কাছে জানা যায়, এই আশায় আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।"

"না, মশায়! তার চেয়ে বেশী কিছু আর আমি জানি না।"

"তাই ত! তা হ'লে ত দেখ্ছি কোন দিকেই কিছু কিনারা করা মুস্কিল! আপনি বোধ হয় বুঝেছেন যে, এ ক্ষেত্রে হত্যাকারীর সন্ধান পেতে হ'লে, আগে হতব্যক্তির পূর্ব্ব পরিচয়টা ঠিক জানা দরকার। কিন্তু, তার পূর্ব্ব-কাহিনী জানবার যখন উপায় কিছু দেখা যাচ্ছে না, তখন হত্যাকারীর সন্ধানেরই বা উপায় কি ?"

"আপনি কি বেশ নিঃসংশয়ে বলছেন যে, উপায় কিছু নাই ?"

"এতে আর সংশয়ের কথা কি আছে ? সকল দিকেই একটা অলঙ্ঘ্যনীয় বাধা এসে অনুসন্ধানের পথ বন্ধ করছে। খুনী লোকটা, তার অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে সম্পূর্ণ নিরুদ্দেশ হ'য়েছে। দুইয়ের কোনটির কোন চিহ্ন পর্য্যন্ত পাওয়া যাচ্ছে না। বাড়ীটার মধ্যে আমি বিশেষরূপে অনুসন্ধান করেও, ও দুইয়ের কোনটিরই কোন নিদর্শন পেলাম না। কোন্ পথ দিয়ে লোকটা ও বাড়ীতে ঢুকলো বা তা থেকে বেরুলো, তারও কোন সন্ধান পাওয়া গেল না।"

"অথচ, যে উপায়েই হোক, ওখানে বাইরের লোক যে আস্ত এবং নন্দন সাহেব যে তা জান্ত,—শুধু জান্ত নয়, অপরের কাছে তা লুকাবারও চেষ্টা কর্ত,- তাতে কোন সন্দেহ নাই।"

"সে কি ? আপনার কথা আমি বুঝতে পাচ্ছি না।"

"কেন ? আমি করোণার-কোর্টে যে এজাহার দিয়েছিলাম, সেটা মনে করে দেখ্লেই বুঝতে পারবেন যে, আমি সেই জানালার পর্দ্দার উপর ছায়ার কথা বল্ছি। আমি যখন ঐ পর্দ্দার গায়ে এক জন স্ত্রীলোক ও এক জন পুরুষের ছায়া দেখেছিলাম, তখন নন্দন সাহেব বাড়ীতে ছিল না; কারণ, তার অল্পক্ষণ পরেই, বাড়ীর সাম্নের রাস্তার মোড়ে তার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। কিন্তু, তাকে যখন আমি ঐ কথা বল্লাম, সে তখন দৃশ্যটা আমার কল্পনামূলক ব'লে প্রমাণ করবার জন্য এত ব্যগ্র হ'ল যে, বাড়ীতে অন্য কেউ নাই, বা আস্তেও পারে না, তাই দেখাবার জন্য সে আমাকে জেদ ক'রে বাড়ীর মধ্যে নিয়ে গেল।"

"আপনি গিয়ে কি দেখ্লেন ?"

"লোকটা বাড়ীর ভিতরের সমস্তটাই আমাকে দেখালে। কিন্তু যদিও বাড়ীতে অপর কোন লোক, কিংবা যাতায়াতের অপর কোন পথ দেখ্তে পেলাম না বটে, তবু, অল্পক্ষণ পূর্ব্বেই যে এক জন স্ত্রী ও এক জন পুরুষ সেখানে ছিল, তাতে আমার কোনই সংশয় নাই। কি উপায়ে তারা এসেছিল বা গিয়েছিল, তা অবশ্য আমি এখনও বুঝতে পারি নি।"

"ঐ পথটা আবিষ্কার করাই বিশেষ দরকার। তা হ'লেই বুঝা যায় যে, হত্যাকারী সেই পথ দিয়ে এসেছিল।"

"হাঁ, তা ত নিশ্চয়; কিন্তু তা হ'লে হত্যাকারীকে বার করবার কোন উপায় হবে ব'লে আমার বোধ হয় না।"

১১

আমার কথা শুনিয়া গাঙ্গুলী মহাশয় কিয়ৎক্ষণ চিন্তান্বিত-ভাবে নীরবে বসিয়া রহিলেন। পরে বলিলেন, "তা হ'লে আপনার বিবেচনায় এখন কি করা উচিত ?"

"দেখুন, এ বিষয়ে আমি অনেক চিন্তা করেছি। তার ফলে আমার মনে হয় যে, এ সম্বন্ধে এমন দুই একটা বিশিষ্ট লক্ষণ আছে, যার দিকে আমাদের প্রথমেই মনোযোগ দেওয়া দরকার। প্রথমতঃ,—হত ব্যক্তি ঐ হানাবাড়ীতে এসে, নাম ভাঁড়িয়ে অজ্ঞাতবাস করছিল। তার কারণ কি ? সে আমাকে বলেছিল যে, শত্রু-ভয়ে সে ঐ রকম করেছিল। কথা সত্য কি না ? দ্বিতীয়তঃ,—তার কাছে কোন নিভৃত পথ দিয়ে লুকিয়ে অপর লোক আস্ত। তারই বা কারণ কি ? এই দুইটা প্রশ্নের উত্তর বার করতে পারলেই বোধ হয় এই হত্যা-রহস্যের মীমাংসা হ'তে পারে। সেই জন্য আমার মতে সর্ব্বপ্রথমেই আমাদের ঐ লোকটার পূর্ব্ববৃত্তান্ত জানবার চেষ্টা করা উচিত।"

"আমিও ত গোড়ায় আপনাকে সেই কথাই বলেছি! কিন্তু কি উপায়ে তার পূর্ব্ব-ইতিহাস জানা যায়,—তাই ত সমস্যা!"

মনসা দেবী

"কেন?—তার আসল নাম-ধাম জান্‌তে পার্‌লেই ত ও সমস্তার মীমাংসা হ'তে পারে?"

গাঙ্গুলী মহাশয় একটু শ্লেষ করিয়া বলিলেন, "খুব সহজ কথা বল্লেন বটে! কিন্তু তা জান্‌বার উপায় কিছু আছে ব'লে ত বোধ হয় না।"

আমিও প্রত্যুত্তরে ঈষৎ বিরক্তভাবেই বলিলাম, "কেন?—বিজ্ঞাপনের দ্বারা?"

তিনি যেন কিছু বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "বিজ্ঞাপন? সে কি? কিসের বিজ্ঞাপন?"

"কেন? আজকাল খবরের কাগজে এই রকম কত বিজ্ঞাপন বার হয়, তা কি আপনি দেখেন নি? কুঞ্জবিহারী নন্দন নামধারী ঐ লোকটার একটা বিশদ বিবরণ,—তার মুখে একটা দীর্ঘ ক্ষতের দাগ, একটা কনিষ্ঠ অঙ্গুলীর অভাব, ইত্যাদি,—ইংরেজী ও বাঙ্গালা কাগজে প্রকাশ করে এবং 'হ্যাণ্ডবিলে' ছাপিয়ে বিতরণ করে দেখ্‌তে হানি কি?"

সি, আই, ডি বাবুর আত্মাভিমানে কিছু আঘাত লাগিল বোধ হয়। তিনি বেশ একটু শ্লেষভরে হাসিয়া বলিলেন, "পুলিসের লোককে এত কাঁচা মনে করবেন না মশায়! ঐ রকম বিবরণ এর মধ্যেই "হ্যাণ্ডবিলে" লিখে, সহরের প্রত্যেক থানায় লট্‌কে দেওয়া হয়েছে জান্‌বেন।"

"খবরের কাগজে দেওয়া হয়েছে কি?"

"না, তা আবশ্যক ব'লে বোধ হয় না।"

"মাফ করবেন গাঙ্গুলী মশায়! আপনাদের কায অবশ্য আপনারাই ভাল বুঝেন। কিন্তু আমার মনে হয় যে, থানায় হ্যাণ্ডবিল লট্‌কে দেওয়ায়, জনসাধারণের তা নজরে পড়বার সম্ভাবনা খুবই সামান্য। সংবাদপত্রে প্রকাশ্যভাবে বিজ্ঞাপন দিলে, সে সম্ভাবনাটা বেশী হয় না কি?—আপনাকে অবশ্য আমি পরামর্শ দিচ্ছি, তা ভাববেন না।"

"আচ্ছা, আপনার কথাটা বিবেচনা ক'রে দেখা যাবে এখন। আপাততঃ তা হ'লে আপনার আর সময় নষ্ট ক'রব না। এখন বিদায় হই।"

"আপনি যে কষ্ট স্বীকার ক'রে এতক্ষণ আমার সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করলেন, তাতে আমি বাস্তবিক কৃতার্থ হয়েছি। এখন আপনাকে আমার একটু অনুরোধ জানিয়ে রাখি। যদি কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়াই মনস্থ করেন, তা হ'লে তার ফলাফল কি হয়, যদি অনুগ্রহ ক'রে আমাকে জান্‌তে দেন ত বড় আপ্যায়িত হব।"

"কেন, আপনার এতে স্বার্থ কি?"

"স্বার্থ বিশেষ কিছু নাই বটে, কিন্তু ব্যাপারটা আমাদেরই পাড়ার, এবং এতই রহস্যময় যে, আপনি যে যে উপায়ে এই রহস্য ভেদ করবেন, সে সব এবং তার ফলাফলগুলা জান্‌তে আমার কৌতূহল হওয়াটা কিছু আশ্চর্য্য বা অন্যায় মনে করেন কি?"

"না; সেটা স্বাভাবিক বটে। তা বেশ! এ বিষয়ে যখন যেমন খবর হবে, আপনাকে জানাব।"

পরদিন সকালেই খবরের কাগজে আমার পরামর্শ অনুযায়ী এক বিজ্ঞাপন বাহির হইয়াছে দেখিলাম এবং তাহার প্রায় এক সপ্তাহ পরে গাঙ্গুলী মহাশয় আবার আমার সঙ্গে দেখা করিলেন। এবার আত্মম্ভরিতার ভাব একেবারেই পরিহার করিয়া বলিলেন, "পুলিসের ধরা-বাঁধা নিয়মের চেয়ে আপনার পরামর্শটায় শীঘ্রই ফল ফলেছে দেখ্‌ছি। বিজ্ঞাপনের উত্তরে গত কল্য একখানা চিঠি পেয়েছি। বৰ্দ্ধমান থেকে এক ব্যক্তি লিখেছেন যে, বিজ্ঞাপনের বিবরণ পড়ে তাঁর অনুমান হয় যে, হত ব্যক্তি তাঁর জামাতা। তিনি নিজের মেয়েকে নিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করতে আগামী কল্য বেলা ৩টার সময় আসবেন, লিখেছেন। সে সময়ে আপনি যদি উপস্থিত থাক্‌তে ইচ্ছা করেন ত আমার আফিসে ঐ সময় আসতে পারেন।"

আমি আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া বলিলাম, "আপনার এ অনুগ্রহে আমি বড়ই আপ্যায়িত হলাম, গাঙ্গুলী মশায়! আমি নিশ্চয়ই যথাসময়ে যাব। লোকটির নাম কি?"

"চিঠিতে নাম সহি আছে,—করালীপ্রসাদ সেন!"

"তিনি পুলিসের ফটোগ্রাফ দেখে কি বলেন, দেখা যাবে।"

"হাঁ, সেটাই হবে আসল প্রমাণ।"

তাহার পর আগামী কল্য তাঁহার আফিসে আমাদের পুনর্মিলনের বন্দোবস্ত স্থির করিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন।

[ক্রমশঃ।

শ্রীসুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (এটর্ণী)।
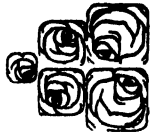
কংগ্রেস

গত ২৬শে ডিসেম্বর যুক্তপ্রদেশের কানপুর সহরে ভারতীয় ন্যাশনাল কংগ্রেসের একচত্বারিংশৎ অধিবেশনের উদ্বোধন হইয়াছিল। এ বিষয়ে যুক্তপ্রদেশ বাঙ্গালা অপেক্ষা সৌভাগ্যবান্, কেন না, বাঙ্গালায় এক কলিকাতা ব্যতীত অন্য কোনও সহরে এ যাবৎ কংগ্রেসের অধিবেশন হয় নাই, অথচ যুক্তপ্রদেশের এলাহাবাদ, লক্ষ্ণৌ, কাশী প্রভৃতি সহরে ইতঃপূর্ব্বে কংগ্রেসের অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। কানপুর সহর হইতে প্রায় ৩ মাইল দূরে এক ক্রোশব্যাপী বিরাট ময়দানে কংগ্রেস-মণ্ডপ ও তৎসংশ্লিষ্ট দপ্তরাদি নির্ম্মিত হইয়াছিল। ঐ স্থানটির নাম রক্ষিত হইয়াছিল—'তিলক নগর।' তিলক নগরের কংগ্রেস-মণ্ডপের সম্মুখে একটি মাঠ, ফোয়ারা ও গাছপালা দিয়া সাজান হইয়াছিল, উহার চারিদিকে দোকান। ইহার নাম দেওয়া হইয়াছিল—'গন্ধী চক।' এইরূপে 'কেলকার ময়দান', 'দেশবন্ধু-রোড', 'নেহরু রোড', 'সৌকৎ-রোড' প্রভৃতি পথের দেশনেতৃগণের

তিলক নগরের দৃশ্য

তিলকনগরের বাজারের দৃশ্য

নামে নামকরণ করা হইয়াছিল। বিরাট তিলক নগর ও এই সকল পথ-ঘাট নির্ম্মাণে ও নামকরণে দেশের লোক যে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদের স্বাবলম্বন ও আত্ম-সম্মান জ্ঞানের সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যায়। মুক্তি-পথের পথিকের পক্ষে এমন পরিচয় প্রদান খুবই শোভন হইয়াছে। পরের উপর নির্ভর না করিয়া যে দেশের লোক গঠনকার্য্যে (পথ-ঘাট-নির্ম্মাণে, আলোক ও জলের ব্যবস্থায়, আহার্য্য পানীয়ের ব্যবস্থায়, সংবাদ আদান-প্রদানের ব্যবস্থায় এবং শান্তিরক্ষায়) সম্যক্ অভিজ্ঞতা লাভ করিতেছে, কানপুরের কংগ্রেস তাহার সাক্ষ্যপ্রদান করিতেছে। অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি কানপুরের ডাক্তার মুরারিলাল ও কানপুরবাসীরা এ বিষয়ে পরিশ্রমে ও অর্থব্যয়ে কার্পণ্য প্রদর্শন করেন নাই। কানপুরের প্রসিদ্ধ বণিক যোগীলাল কমলা-পৎ একাই এতদর্থে ২৫ হাজার টাকা চাঁদা দিয়াছিলেন।
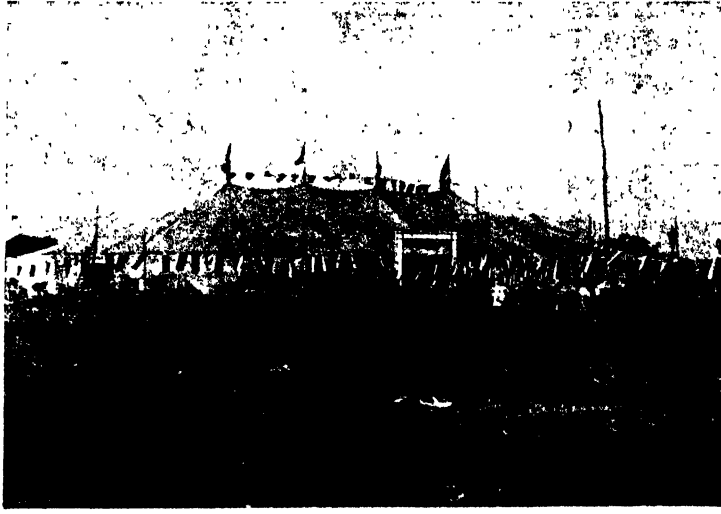
কংগ্রেসের মণ্ডপ

তিলক নগরের দক্ষিণাংশে বাগান-বাটীর মধ্যে সভা-নেত্রীর বাসের জন্য একটি 'বাঙ্গলো' নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। প্রথমে জনরব রটে যে, কমিউনিষ্টরা ও হিন্দু-সভার সদস্য-গণ সভানেত্রী শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুর অভ্যর্থনায়

কংগ্রেস-মণ্ডপের সিংহদ্বার

গোলযোগ ঘটাইবেন ; কিন্তু তাহা হয় নাই। তাঁহার অভ্যর্থনা অপূর্ব্ব হইয়াছিল, পত্রপুষ্পমাল্যে ও আলোক-সজ্জায় পথিপার্শ্বস্থ গৃহাদি সজ্জিত করা হইয়াছিল, কানপুরের জনসাধারণ সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহার প্রতি শোভাযাত্রার সময়ে প্রীতি-শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়াছিল।

হইবারই কথা, কেন না, এ দেশের লোক স্বতঃই নারীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকে। তাহার পর শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুর মত শিক্ষিতা, বিদুষী, সর্ব্বজনপ্রিয়া, দেশপ্রেমিকা নারীর সম্মান সর্ব্বত্র। ইতঃপূর্ব্বে আফ্রিকার প্রবাসী ভারতীয়রা তাঁহাকে তত্রত্য কংগ্রেসে সভানেত্রীর পদে বরণ করিয়া অন্তরের শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। মহাত্মা গন্ধী কংগ্রেসে তাহার উপর সভানেতৃত্বের ভারার্পণের সময়ে বলিয়াছিলেন, "তাঁহার অনুপম বাগ্মিতা ও অকাট্য যুক্তিবলে দক্ষিণ আফ্রিকার য়ুরোপীয়রাও মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি সিংহের বিবরে গিয়া তাহাকে বশীভূত করিয়াছিলেন। লোক মনে করে যে, শ্রীমতী সরোজিনী যদি দক্ষিণ আফ্রিকায় এখন গমন করেন, তাহা হইলে এসিয়াবাসীদের বিরুদ্ধে যে আইন বিধিবদ্ধ করিবার চেষ্টা হইতেছে, তাহা এখনও নিবারিত হইতে পারে। আমার তত্রত্য অনেক ইংরাজ বন্ধু এই মর্ম্মে আমাকে পত্র দিয়াছেন। ইহাতেই প্রমাণ হইতেছে যে, যোগ্য ব্যক্তির স্কন্ধেই এবার কংগ্রেস পরিচালনের ভার অর্পিত হইয়াছে।"

কানপুর কংগ্রেসের সভানেত্রী শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু

মহাত্মার সদিচ্ছা ও প্রশংসাবাদ বহন করিয়া এবং সমগ্র দেশবাসীর প্রীতি-শ্রদ্ধার অর্ঘ্য মস্তকে ধারণ করিয়া শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু এবার কংগ্রেসে সভানেতৃত্ব করিয়াছেন। দেশ তাঁহার নিকট কতই না পূর্ণ হৃদয়ে উপদেশের পীযূষধারা পাইবার আশা করিয়াছিল!

সভানেত্রীর অভিভাষণ

শ্রীমতী সরোজিনী ভারতের কবিকুঞ্জের কোকিল। সুতরাং তাঁহার অভিভাষণ কবিত্বের প্রতিভায় সমুজ্জ্বল হইবে, তাঁহার ভাষা ও ভাব স্বচ্ছ নির্ম্মল অনায়াসগতি স্রোতোধারার ন্যায় প্রবাহিত হইবে, ভারতের অসংখ্য লোক তাহা মুগ্ধচিত্তে শ্রবণ করিবে, তাহার প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইবে,—ইহাতে সন্দেহের অবকাশ ছিল না।

কংগ্রেস এ দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জাতীয় রাজনীতিক

প্রতিষ্ঠান। প্রতি বৎসর যিনি কংগ্রেসের পরম গৌরবময় পদে সমাসীন হয়েন, তাঁহার নিকট এ দেশের জনগণ ভবিষ্যৎ কর্ম্মনীতির আভাসের আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকে। যে-সময়ে দেশ রাজনীতিক মতদ্বন্দ্বে ও সাম্প্রদায়িক কলহে ছিন্ন-ভিন্ন, সে সময়ে কংগ্রেসের সভাপতি এই কলহ-দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়া কি কর্ম্মপদ্ধতি নির্দ্দেশ করিয়া দেন, তাহা জানিবার জন্য লোক আগ্রহান্বিত হইবেই। এই হেতু জনসাধারণ সরোজিনী দেবীর নিকট সেই পদ্ধতি নির্দ্ধারণের আশা করিয়াছিল।

দিল্লীর অতিরিক্ত কংগ্রেসে স্বরাজ্য দলকে ব্যবস্থাপক সভা প্রবেশে অনুমতি প্রদান করা হইয়াছিল। কোকনদ কংগ্রেসে সেই ব্যবস্থাই অনুমোদিত হইয়াছিল। কারামুক্তির পর মহাত্মা গন্ধী বেলগাও কংগ্রেসে দিল্লী ও কোকনদের নির্দ্ধারণ নাকচ করেন নাই। স্বরাজ্য দল সেই নির্দ্ধারণ অনুসারে কংগ্রেসের রাজনীতিক কার্য্যভার প্রাপ্ত হইয়া কংগ্রেসের কার্য্য পরিচালিত করিতেছিলেন। ইহার পর দুইটি ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছে :—(১) কংগ্রেসকে পুনরায় রাজনীতিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা হইয়াছে, (২) স্বরাজ্য দলের মধ্যে এক সম্প্রদায় অসহযোগ ও সর্ব্বদা বাধাপ্রদান-নীতি পরিহার করিয়া সহযোগের উত্তরে সহযোগ (Responsive Co-operation) নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন।

কংগ্রেস মণ্ডপে সভানেত্রী শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুর অভিভাষণ পাঠ

তাই এবার কংগ্রেসে দেশবাসী আশা করিয়াছিল যে, সভানেত্রী তাঁহার অভিভাষণে ভবিষ্যৎ কর্ম্মপদ্ধতি নির্দ্ধারণ করিয়া দিবেন, পরন্তু স্বরাজ্য দল সহযোগের উত্তরে সহযোগ-নীতি গ্রহণ করিবেন কি না, তাহাও নির্দ্ধারণ করিয়া দিবেন।

সভানেত্রী তাঁহার নাতিদীর্ঘ অভিভাষণে কি ভাবে এই দুই সমস্যার সমাধান করিয়াছেন, তাহাই বিশেষ বিবেচ্য। প্রথমেই সভানেত্রী সুললিত সুষ্ঠুভাষায় আমাদের পরস্পর বিদ্বেষ ও দ্বন্দ্বের কথা, পরন্তু আমাদের চরম অবনতি ও সহায়হীনতার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। আমরা যে কর্ণধারহীন হইয়া আমাদের আহত আত্মসম্মান ও দাসত্বের ভারে অবসন্ন হইয়া সাম্রাজ্যবাদীর ক্রীড়নক রূপে ভারতের রাজনীতির মহাসমুদ্রে ভাসিয়া চলিতেছি, সে কথার উল্লেখ করিতে সভানেত্রী বিস্মৃত হয়েন নাই।

এ অবস্থার—এ চরম দুর্দ্দশার প্রতীকার কিরূপে সম্ভব হইবে? শ্রীমতী সরোজিনী দেবী এক কথায় এই প্রতীকারের পথ নির্দ্দেশ করিয়াছেন :—(১) গ্রাম-গঠনের নিশ্চিত বিভাগ নির্ণয়, (২) জনগণের শিক্ষার ব্যবস্থা নির্দ্ধারণ, (৩) সামরিক শিক্ষার ব্যবস্থা নির্দ্ধারণ এবং (৪) রাজনীতিক প্রচার-কার্য্যের ব্যবস্থা নির্দ্দেশ।

এতদ্ব্যতীত তিনি আরও দুইটি উপায়ের কথা উল্লেখ

করিয়াছেন :—(১) সাগরপারের প্রবাসী ভারতীয়গণকে সাহায্য প্রদান, (২) হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে একতা বিধান।

উপসংহারে সভানেত্রী বলিয়াছেন, "যদি ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদের বসন্ত মরশুমের শেষেও সরকার আমাদের স্বরাজ্যের দাবীর উত্তরে আন্তরিক প্রত্যুত্তর না দেন, তাহা হইলে কংগ্রেস তাহার সদস্যগণকে ব্যবস্থা-পরিষদসমূহের সদস্যপদ ত্যাগ করিতে এবং সরকারের বিপক্ষে আন্দোলন চালাইতে অনুজ্ঞা প্রদান করিবেন।

মোটামুটি ইহাই এ বৎসরের সভানেত্রীর অভিভাষণের সার কথা।
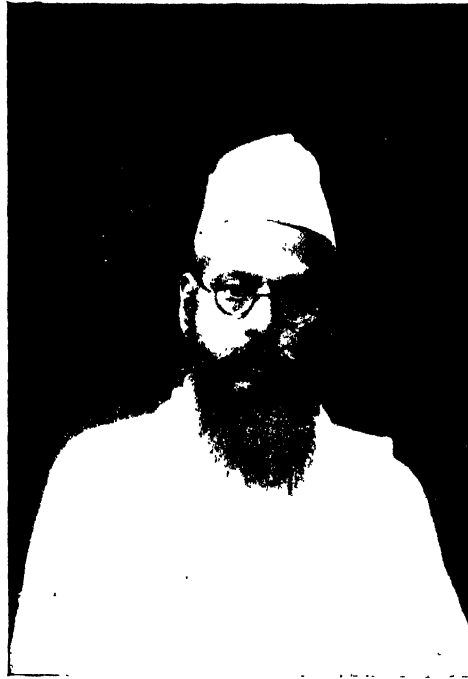
অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি—ডাঃ মুরারিলাল

এ সকল ইঙ্গিতের বিশ্লেষণ করিয়া সভানেত্রী প্রথমেই বলিয়াছেন, "মহাত্মা গন্ধী আমাদিগকে যে অপূর্ব্ব ত্যাগের মন্ত্র প্রদান করিয়াছেন, তাহাকেই আদর্শ করিয়া লইতে হইবে। বন্ধন হইতে জাতির মুক্তির যে গুহ্য মন্ত্র তিনি আমাদিগকে শিখাইয়াছিলেন, আমরা আমাদের দৌর্ব্বল্য হেতু তাহার উপযুক্ত হইতে পারি নাই। অতি অল্পকাল মাত্র আমরা মানুষের মত আমাদের পূর্ব্বপুরুষের অনুসৃত সেই মহামন্ত্রকে আদর্শ করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে ঝাঁপাইয়া পড়িতে পারিয়াছিলাম। ইতিহাস ইহার পরে যাহাই বলুক, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে

অভ্যর্থনা-সমিতির সহকারী সভাপতি—
বারাণসীর পণ্ডিত ভগবানদাস

প্রদর্শনী সমিতির সম্পাদক—পণ্ডিত রামস্বরূপ গুপ্ত

অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক—পণ্ডিত গণেশশঙ্কর বিদ্যার্থী

অভ্যর্থনা সমিতির সহকারী সভাপতি
এলাহাবাদের শ্রীযুত পুরুষোত্তম দাস টাণ্ডন

যে, মহাত্মা গন্ধীর অহিংস অসহযোগ মন্ত্র প্রবল বাত্যার মত আমাদের গতানুগতিক জাতীয়-জীবনকে টলাইয়া দিয়াছিল, তাহার অসাড়তার মধ্যে স্পন্দনের অনুপ্রেরণা আনয়ন করিয়াছিল। এখনও তাহার প্রভাব আমাদের জাতীয়-জীবনের সহিত ওতঃ-প্রোতভাবে বিজড়িত আছে। সুতরাং যে কর্ম্মপদ্ধতিই আমরা নির্দ্ধারণ করি, এই যুগপ্রবর্ত্তক প্রভাবকে আদর্শ রাখিয়া আমাদিগকে কর্ম্ম-ক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে হইবে।"

এই মহান্ আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া আমরা প্রথমেই
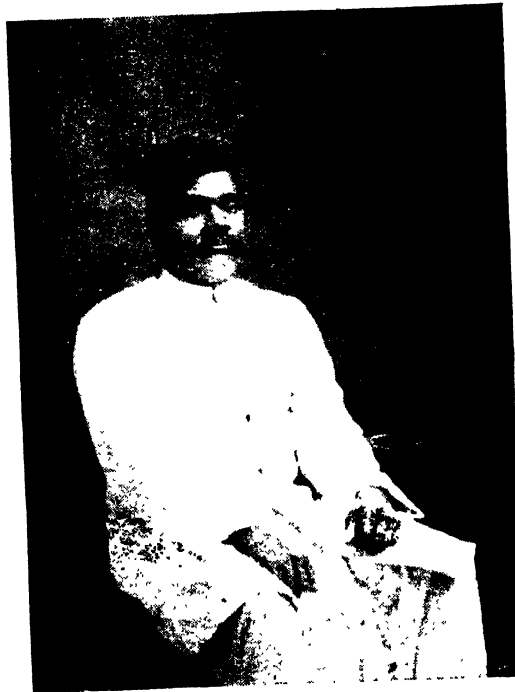
অর্থ সমিতির সম্পাদক—পণ্ডিত রামকুমার

গ্রাম ও জাতিগঠন কার্য্যে অগ্রসর হইব। আমাদের ছিন্নভিন্ন শক্তিশূন্য জাতীয়-জীবনের আগ্রহ, উদ্যম ও উৎসাহকে পুনরায় শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া এই কার্য্যে আত্ম-নিয়োগ করিতে হইবে। যাহাতে আমাদের সামাজিক, অর্থনীতিক, শ্রমশিল্পসম্বন্ধীয় এবং মানসিক উন্নতি সম্ভব-পর হয়, তাহার জন্য কংগ্রে-সকে কয়েকটি নির্দ্দিষ্ট বিভা-গের সৃষ্টি করিতে হইবে। প্রত্যেক বিভাগের উপর জাতি ও গ্রাম-গঠনের একটি ভার অর্পিত করিতে হইবে। দেশবন্ধু দাশ যে ভাবে গ্রাম ও জাতি-গঠনের স্বপ্ন

দেখিয়াছিলেন, সেই ভাবে আমাদিগকে কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে হইবে। যাহাতে দেশবাসী আত্ম-

স্বেচ্ছাসেবক সমিতির সম্পাদক—শ্রীযুত জি, জি, যোগ
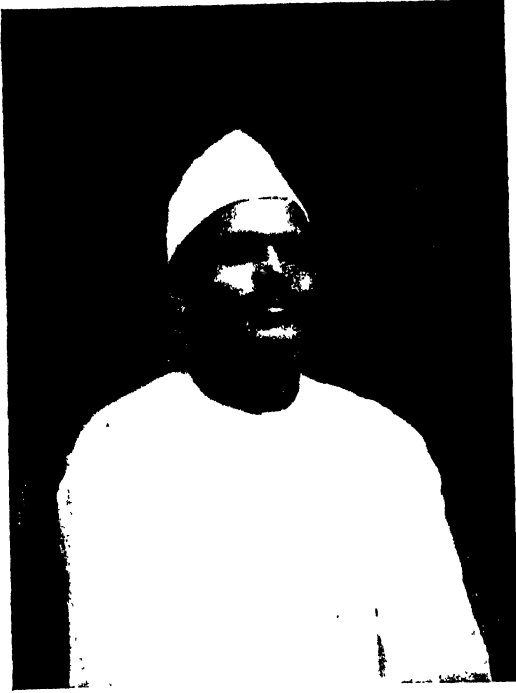
নির্ভরশীল, আত্মপ্রত্যয়ী ও আত্মসম্মান জ্ঞানে প্রবুদ্ধ হইতে পারে, তাহাই হইবে গ্রাম ও জাতি-গঠনের মূল লক্ষ্য। আর হল ও চরকাকে নিদর্শন রাখিয়া—শিক্ষা-প্রচারে উৎসাহী হইতে হইবে—যাহাতে সেই শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হইয়া আমাদের অভাগা দরিদ্র কৃষককুল দুঃখ-দারিদ্র্য ও রোগ-শোকের পেষণ হইতে মুক্তি পায়, তাহাই করিতে হইবে।

গ্রাম-গঠনের সঙ্গে সঙ্গে শ্রমশিল্পের পুনর্গঠন করিতে হইবে। এই শিল্পে নিযুক্ত আমাদের শ্রমিক ভ্রাতৃবর্গকে সঙ্ঘবদ্ধ ও যথাসম্ভব শিক্ষিত করিতে হইবে। যাহাতে তাহারা জনপূর্ণ ক্ষুদ্র অস্বাস্থ্যকর গৃহে পশুর মত জীবন যাপন করিতে বাধ্য না হয়, যাহাতে তাহাদের বেতন ন্যায়-সঙ্গত হয়, যাহাতে তাহারা বিশুদ্ধ পবিত্র আনন্দময় জীবন যাপন করিতে সমর্থ হয়,—এমনই ভাবে কংগ্রেসকে কার্য্যারম্ভ করিতে হইবে। ধনী ও শ্রমিকের মধ্যে যাহাতে সদ্ভাব ও সহযোগিতা প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহাই করিতে হইবে।

শিক্ষাক্ষেত্রে আমাদিগকে পরাধীনতা হেতু দাসমনোবৃত্তি হইতে সর্ব্বাগ্রে অব্যাহতি লাভ করিতে হইবে। যাহাতে আমরা ব্যর্থ অনুকরণপ্রিয়তা এবং কৃত্রিমতার প্রভাব হইতে মুক্ত হইয়া আমাদের সনাতন ভাবধারার অনুযায়ী শিক্ষালাভে আমাদের বংশধরগণকে দীক্ষিত করিতে পারি, আবার আমাদিগকে তাহাই করিতে হইবে এবং প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের জ্ঞানবিজ্ঞানের মধ্যে যাহা কিছু মঙ্গলকর, তাহাই গ্রহণ করিয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে হইবে।

সামরিক শিক্ষাকে আমাদের জাতীয় শিক্ষার বাধ্যতা-মূলক অঙ্গে পরিণত করিতে হইবে। সরকার স্কীণ কমিটী বসাইয়া এ সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্তেই উপনীত হউন না, কংগ্রেসের কর্ত্তব্য,—এই মুহূর্ত্ত হইতে এক জাতীয় 'মিলিশিয়া' (সেনা-দল) গঠনে প্রবৃত্ত হওয়া, বর্ত্তমান্ জাতীয় স্বেচ্ছাসেবক-মণ্ডলীকে ভিত্তি করিয়া এই 'মিলিশিয়া' গঠন করিলেই চলিবে। কেবল স্থলে নহে, জলে ও আকাশপথের সমর-শিক্ষায়ও আমাদের যুবকগণকে অভ্যস্ত করিবার উপায় নির্দ্ধারণ করিতে হইবে।

মহিলা স্বেচ্ছাসেবিকাদের কর্ত্রী—শ্রীমতী সাঙ্গবাঈ দীক্ষিত

আমাদের সাগরপারের প্রবাসী ভারতীয় ভ্রাতৃবর্গের প্রতি শ্বেতকায় জাতিরা যে অপমানকর ব্যবহার করিতেছে,

তাহার জন্য তাহাদিগের সাহায্যে আমাদিগকে অগ্রসর হইতে হইবে। আমাদের মনুষ্যত্ব ও আত্মসম্মান এই কর্ত্তব্যের পথ আমাদিগকে দেখাইয়া দিতেছে। এ জন্য কংগ্রেসের একটি "সাগরপার বিভাগের" প্রতিষ্ঠা করা কর্ত্তব্য। এই বিভাগ সাগরপারের ভারতীয়গণের স্বার্থের প্রতি সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিবেন।

সর্ব্বত্র ভারতীয় দাবীর কথা, ভারতের আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা, প্রচারিত করিতে হইবে। এ জন্য কংগ্রেসের প্রচার-বিভাগ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন। জাতীয় সংবাদপত্রসমূহ এ বিষয়ে অনেক পরিমাণে সাহায্য করিতে পারিবেন। বিশেষতঃ বিদেশে বিশ্বাসযোগ্য সংবাদ প্রচারের ব্যবস্থা করিতে হইবে। যাহাতে ভারতের সম্বন্ধে সত্য সংবাদ প্রচারিত হয়, তাহারও ব্যবস্থা করিতে হইবে।

স্বদেশী প্রদর্শনীর দৃশ্য

মহাত্মা গন্ধী স্বদেশী প্রদর্শনীর মধ্যে প্রবেশ করিতেছেন
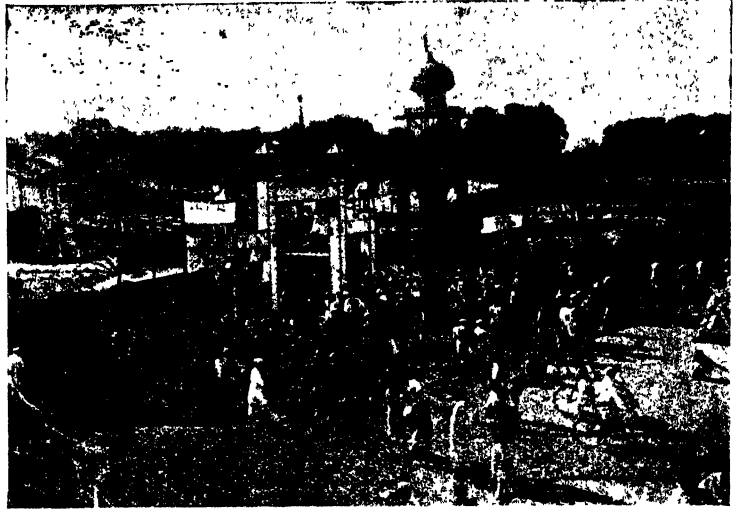
হিন্দু-মুসলমানের বিবাদে আমাদের সর্ব্বনাশ হইতেছে। যদি তাঁহারা পরস্পর ক্ষমাঘৃণা করিতে অভ্যস্ত হয়েন, তাহা হইলে এ বিবাদের অবসান হইতে পারে। যদি তাঁহারা পরস্পর পরস্পরের ধর্ম্মের সৌন্দর্য্যটুকুর প্রতি শ্রদ্ধাবান্ হইতে পারেন, যদি তাঁহারা পরস্পর পরস্পরের প্রাচীন উন্নত সভ্যতার গৌরবে গৌরব অনুভব করিতে অভ্যস্ত হয়েন, তাহা হইলে তাঁহাদের বিবাদ ত অচিরে কথার কথায় পর্য্যবসিত হইবে। এ বিষয়ে উভয় সম্প্রদায়ের নারীজাতি যথেষ্ট কার্য্য করিতে পারেন। তাঁহারা যদি পরস্পর সখিত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হয়েন, যদি তাঁহারা আপন সন্তানগণকে পরস্পর প্রীতি-শ্রদ্ধার ভাব পোষণ করিতে শিক্ষা প্রদান করেন, বাল্যকাল হইতে যদি তাঁহারা তাহাদিগকে বন্ধুত্বের আবহাওয়ায় গড়িয়া তুলিতে পারেন, তাহা হইলে কার্য্য কত সহজ ও সরল হয়!

জাতি ও গ্রাম-গঠনের পথে কংগ্রেসের এইগুলি প্রধান কার্য্য। তবে সত্বর স্বরাজলাভই হইল কংগ্রেসের মূল লক্ষ্য। এখনও কতকগুলি কংগ্রেসকর্ম্মী আছেন, যাঁহারা সনাতন অসহযোগ-নীতি মানিয়া চলেন। তাঁহারা মহাত্মার এই মঙ্গলজনক নীতি কায়মনে অনুসরণ করিয়া ব্যবস্থাপক সভাসমূহের সার্থকতা স্বীকার করেন না, উহার সহিত সংস্রব রাখিতে চাহেন না। তাঁহারা চরকা ও খদ্দর প্রচারে এবং অস্পৃশ্যতা নিবারণে আত্মনিয়োগ করা স্বরাজলাভের প্রধান

স্বদেশী প্রদর্শনীতে মহাত্মা গন্ধীর বক্তৃতা

উপকরণ বলিয়া মনে করেন। এই হেতু বর্ত্তমানে শৃঙ্খলা ও সঙ্ঘবদ্ধ স্বরাজ্য দলই কংগ্রেসের একমাত্র রাজনীতিক দল-রূপে ব্যুরোক্রেশীর সহিত প্রকৃত রাজনীতিক সংগ্রামে প্রবৃত্ত রহিয়াছেন। জাতির জীবন-মরণের সন্ধিক্ষণে সকল শ্রেণীর রাজনীতিকেরই কি কংগ্রেসে প্রবেশ করিয়া এক হইয়া স্বরাজ-সংগ্রামে প্রবৃত্ত হওয়া কর্ত্তব্য নহে? সকল শ্রেণীর রাজনীতিকই সংস্কার আইনকে মিথ্যা সংস্কার বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। সকলেই এই ভূয়া সংস্কারের পরিবর্ত্তে প্রকৃত সংস্কার কামনা করিতেছেন। সকলেরই ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন চরম লক্ষ্য। মিসেস বেসাণ্টের কমনওয়েলথ বিলে সেই মনোভাব বিশেষরূপে ব্যক্ত হইয়াছে। বড়লাটের ব্যবস্থা-পরিষদ হইতেও সেই দাবীর কথা ব্যক্ত হইয়াছে। সেই দাবীর কম কোনও দাবীতে ভারতবাসী সন্তুষ্ট হইতে পারিবে না, ভারতবাসীর আত্মসম্মান তৃপ্ত হইতে পারিবে না।

ভারতবাসী তাহার ন্যায্য অধিকার ও দাবীর কথা ব্যক্ত করিয়াছে। এখন গভর্ণমেণ্ট তাঁহাদের পক্ষ হইতে ইহার উত্তর প্রদান করুন। গভর্ণমেণ্ট এখন ইহার কি উত্তর দেন, তাহা জানিয়া আমাদের ভবিষ্যৎ কার্য্যপদ্ধতি নির্দ্ধারিত হইবে। যদি গভর্ণমেণ্ট ইহার উত্তরে আন্তরিকতা ও উদারতা প্রদর্শন করেন, ভালই, নচেৎ ব্যবস্থা-পরিষদের বসন্ত মরশুমের শেষেও যদি আমরা আমাদের ন্যায্য দাবীর আন্তরিক ও উদার উত্তর না পাই, তাহা হইলে কংগ্রেস তাঁহার সমস্ত কর্ম্মীকে ব্যবস্থা-পরিষদ সমূহের সদস্য পদ ত্যাগ করিতে অনুজ্ঞা প্রদান করিবেন এবং কৈলাস হইতে কন্যাকুমারী পর্য্যন্ত ও সিন্ধু হইতে ব্রহ্মপুত্র পর্য্যন্ত সমগ্র ভারতে এমন তেজোগর্ভ বিরাট আন্দোলন উপস্থিত করিবেন, যাহাতে দেশবাসী সর্ব্বস্ব পণ করিয়া জন্মভূমির মুক্তিসাধনে বদ্ধপরিকর হইতে অভ্যস্ত হইবে। এই মুক্তিসংগ্রামে আমরা ভয় হইতে মুক্ত হই, ইহাই সর্ব্বনিয়ন্তা ভগবানের নিকট আমার আন্তরিক প্রার্থনা।

কি শিখিলাম ?

ইহাই কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুর অভিভাষণের সার মর্ম্ম। ইহা দ্বারা তিনি এ বৎসরের

জাতীয় পতাকার উৎসবে লালা লাজপৎ রায়ের প্রার্থনা
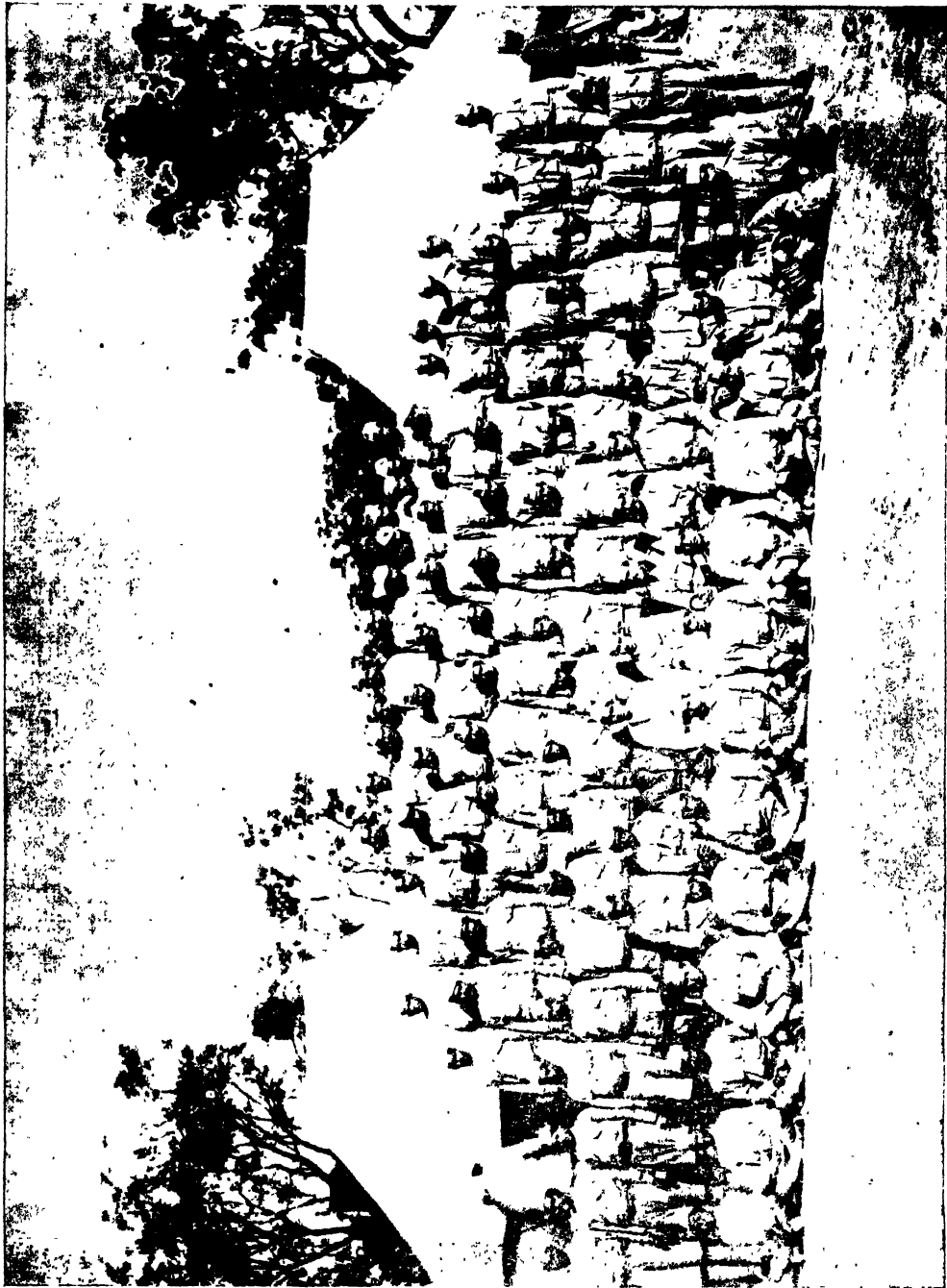
পুরুষ স্বেচ্ছাসেবক

মত আমাদের রাজনীতিক কর্ত্তব্যপথ নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছেন। একদিকে তিনি আমাদিগকে গ্রাম ও জাতি-গঠন করিতে উপদেশ দিয়াছেন, অপর দিকে তিনি গভর্ণমেণ্টকে ভয় দেখাইয়া বলিয়াছেন যে, যদি আগামী বসন্ত কালের মধ্যে তাঁহারা আমাদের কমনওয়েলথ্ বিলের দাবীর অথবা ব্যবস্থা-পরিষদ-নির্দ্দিষ্ট দাবীর অনুরূপ সংস্কার প্রবর্ত্তিত না করেন, তাহা হইলে দেশে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করিয়া কংগ্রেস দেশবাসীকে চরম ত্যাগার্থ প্রস্তুত করিবেন এবং আত্মশক্তিবলে জন্মভূমির মুক্তি সাধন করিবেন। এই দুইটি ভাবধারার মধ্যে আমরা সামঞ্জস্য খুঁজিয়া পাই না। যদি গ্রাম ও জাতিগঠন করা এযাবৎ সম্পন্ন না হইয়া থাকে, তবে আগামী বসন্ত কালের মধ্যে প্রবলপ্রতাপ সরকারকে ভয় দেখাইয়া কার্য্যোদ্ধার করা কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে? জগতে কোন সরকারই স্বেচ্ছায় বহুকালের অধিকার বা ক্ষমতা পরিহার করেন না, জনমতের প্রবল শক্তিই তাঁহাকে সে বিষয়ে বাধ্য করিতে পারে, অন্যথা নহে। ফ্রান্স, রাসিয়া, আয়ার্লাণ্ড প্রভৃতি দেশের দৃষ্টান্ত ছাড়িয়া দিতেছি, কেন না, সে সব দেশে রক্তপাতের মধ্য দিয়া দেশের মুক্তি সাধিত হইয়াছে। কিন্তু ফিন্‌লাণ্ডের দৃষ্টান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। যখন রাসিয়ার জারের অপ্রতিহত শাসনের প্রভাব ফিন্‌লাণ্ডেও বিসর্পিত, সেই সময়ে ফিন্‌লাণ্ডের জনগণ স্বায়ত্ত-শাসন লাভের জন্য বিরাট আন্দোলন উপস্থিত করে। সে আন্দোলনে জারেরও আসন টলিয়াছিল। জার শেষে বাধ্য হইয়া ফিন্‌লাণ্ডকে স্বায়ত্ত-শাসন দিবেন বলিয়া ঘোষণা করেন। কিন্তু যে দিন ফিন্‌লাণ্ডের প্রকৃত পার্লামেণ্টের উদ্বোধন হইবার কথা, সেইদিন হঠাৎ জারের সেনাদল ফিন্‌লাণ্ডের সমস্ত প্রতিষ্ঠান, সমস্ত 'আটঘাট' অধিকার করিয়া রহিল, জারের বাল্টিক নৌ-বাহিনী ফিন্‌লাণ্ডের উপর গোলাবর্ষণের জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিল। সকলেই জানিল, ফিন্‌লাণ্ডের মুক্তির আশা সাগরের অতল তলে তলাইয়া গেল। কিন্তু ঠিক সেই সময়ে ফিন্‌লাণ্ডের দেশপ্রেমিকরা একদিনে একযোগে সমস্ত সরকারী কার্য্যের সংস্রব ত্যাগ করিতে দেশবাসীকে প্রবুদ্ধ করিলেন। সে কি বিরাট ব্যাপার! সরকারী ডাক, তার, রেল, যান-বাহন, দপ্তর, খাজনাখানা,—কোথাও কেহ কার্য্যে আসিল না, জারের সরকার প্রমাদ গণিলেন। ভয়প্রদর্শনে, লোভপ্রদর্শনে, যুক্তিতর্ক কাকুতিমিনতি প্রয়োগে,—কিছুতেই তাঁহারা কার্পণ্য প্রদর্শন করিলেন না। কিন্তু ফিন্‌লাণ্ডবাসী অটল অচল,—তাহারা জন্মভূমির মুক্তি সাধনের জন্য সর্ব্বস্ব পণ করিয়াছে, কোনও ত্যাগ-স্বীকারে তাহারা কাতর নহে। তখন জারের সরকার বাধ্য হইয়া ফিন্‌লাণ্ডকে প্রকৃত মুক্তি প্রদান করিলেন!

ইহা অধিক দিনের কথা নহে, রাসিয়ার শেষ জারের শাসনকালেই ঘটিয়াছিল। অবশ্য ফিনলাণ্ডের সহিত ভারতের তুলনা করা যায় না। ফিন্‌লাণ্ড ক্ষুদ্র দেশ, ফিনরা এক জাতি, একই সভ্যতার অন্তর্গত। সুতরাং তাহাদের পক্ষে একদিনে যাহা সম্ভব হইয়াছিল, ভারতে তাহা একদিনে সম্ভব নহে। ভারত একটা মহাদেশ বলিলেও হয়। এ দেশে নানা জাতির, নানা ধর্ম্মীর বাস। তাহাদের সকলের সভ্যতা একই যুগের বা একই পর্য্যায়ের নহে। তাহাদের চিন্তার ও ভাবের ধারাও সকল ক্ষেত্রে এক নহে। সুতরাং ফিনলাণ্ডের লোকের মত তাহাদিগকে ত্যাগসহন ক্ষমতায় অভ্যস্ত করিতে হইলে তাহাদের মধ্যে চিন্তার বা ভাবের যে সামঞ্জস্য-সাধন প্রয়োজন, তাহা অবশ্যই সময়-সাপেক্ষ।

ভারতে নবযুগপ্রবর্ত্তক মুক্তিমন্ত্রের গুরু মহাত্মা গন্ধী ১৯২১ খৃষ্টাব্দে ভারতে বহুল পরিমাণে যে ফিন্‌লাণ্ডের অবস্থা আনয়ন করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার বিরুদ্ধবাদীরাও স্বীকার করিয়া থাকেন। তাঁহার কর্ম্মপদ্ধতির প্রধান তিনটি উপকরণ ছিল,—(১) হিন্দু-মুসলমান মিলন, (২) অস্পৃশ্যতা-নিবারণ, (৩) চরকা ও খদ্দর প্রচার ও প্রচলন। এই তিন উপকরণকে ভিত্তি করিয়া তিনি ভারতে ভাবের সামঞ্জস্য প্রয়োজন মত আনয়ন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। উহার ফলে জনগণ জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে স্বরাজ লাভের উদ্দেশ্যে ত্যাগ স্বীকারে অভ্যস্ত হইয়াছিল, মহাত্মা ভারতে এক জাতি গঠনে সাফল্যলাভ করিয়াছিলেন। তাই সেই সময়ে আমীর ফকীর হইয়াছিল, সামান্য দেশকর্ম্মী হইতে সুখে পালিত রাজ্যাধিকারী পর্য্যন্ত অনেকেই দুঃখ কষ্ট বিপদের কণ্টকমুকুট শিরে ধারণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। হিন্দু, মুসলমান, জৈন, খৃষ্টান, শিখ, পার্শী,—এমন কোনও জাতি ছিল না, যাহার মধ্য হইতে
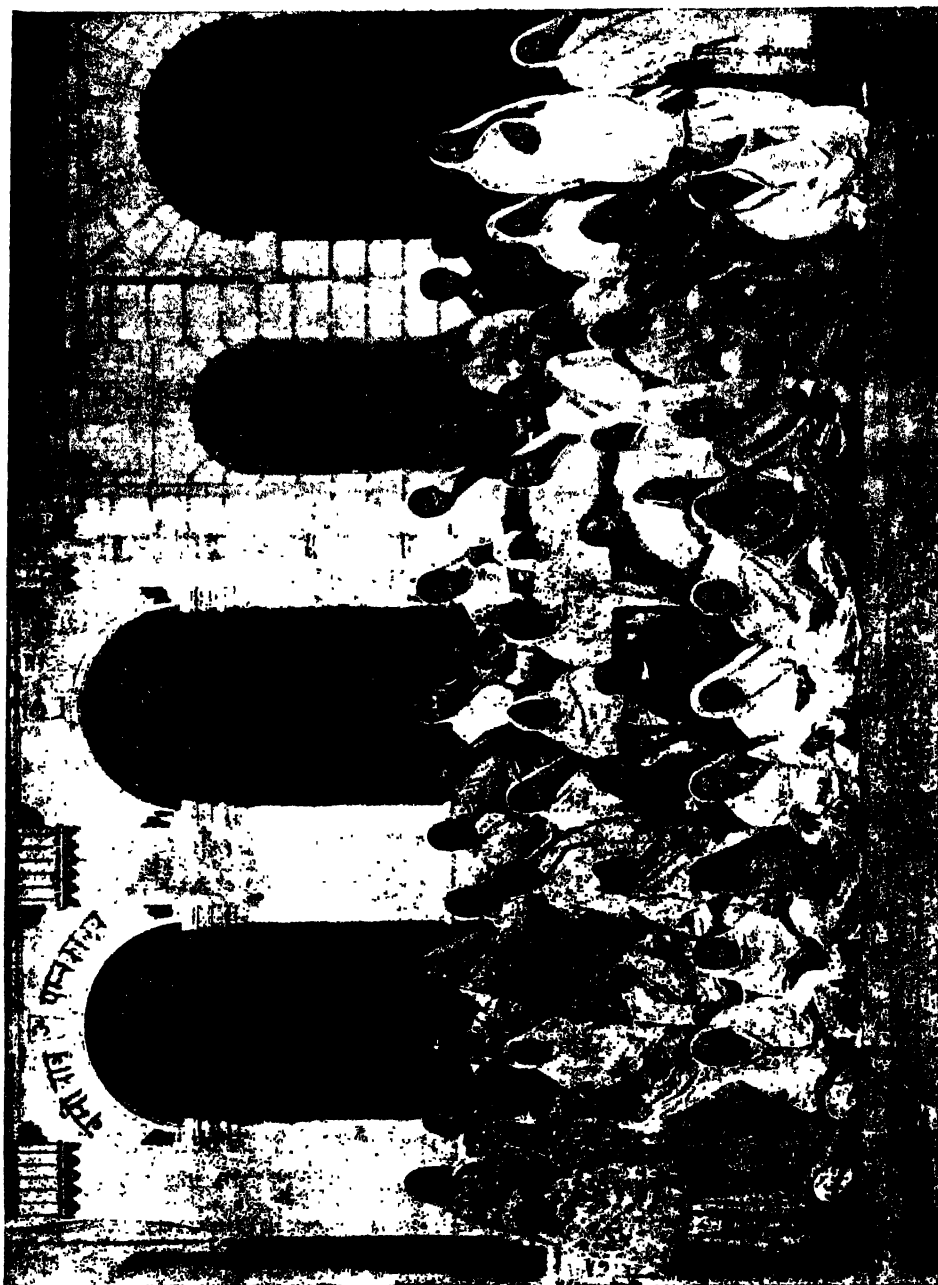
মহিলা স্বেচ্ছাসেবক

কষ্টসহনক্ষম দেশকর্ম্মীর উদ্ভব হয় নাই। এমন কি নেপালী দেশকর্ম্মী নরনারীও কারাবরণ করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। ভারতে তখন এক নবযুগের উদয় হইয়াছিল! অহিংস অসহযোগের পক্ষে মুক্তিলাভের এমন দৃষ্টান্ত জগতে বিরল। সে যুগ স্বল্পকালস্থায়ী হইলেও ভারতের ইতিহাসে উহার মূল্য আছে। উহার প্রভাব কেবল ভারতে নহে, জগতের অন্যত্রও বিসর্পিত হইয়াছিল। মিশর, তুর্কী, চীন, জার্ম্মাণী, মার্কিণ প্রভৃতি নানা দেশে উহার বিজয় ঘোষিত হইয়াছিল, কোন কোন দেশ সেই নীতি গ্রহণ করিয়াছিল। সর্ব্বাপেক্ষা সাফল্যের কথা এই যে, উহাতে প্রবলপ্রতাপ আমলাতন্ত্র সরকার বিচলিত হইয়া এক সময়ে রফার কথায় সম্মত হইয়াছিলেন।

তাহার পর অন্ধকার যুগ। আমরা তাহাতেই এখন বিচরণ করিতেছি। পরস্পর দ্বেষ, হিংসা, সন্দেহ, অবিশ্বাস,—এ যুগের লক্ষণ। বরদোলিতে এ যুগের আরম্ভ। বোম্বাই, আমেদাবাদ, চৌরীচৌরা এই যুগ আনয়ন করিয়াছে। মহাত্মা বুঝিয়াছিলেন যে, দেশের লোক সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইতে পারে নাই, তাই তিনি আবার নূতন করিয়া জাতি গঠনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। হিন্দু-মুসলমান-মিলন, অস্পৃশ্যতা পরিহার এবং চরকা ও খদ্দর প্রচলনকে তিনি উহার প্রধান উপকরণ বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। গ্রাম-জনপদে চরকা ও খদ্দর প্রচলন দ্বারা দরিদ্র জনসাধারণের অর্থকষ্ট নিবারণ হইতে পারে, পরন্তু সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে আদানপ্রদানের ফলে প্রীতির ভাব সঞ্চারিত হইতে পারে, এ কথা মহাত্মা বুঝিয়াছিলেন। সুতরাং এই পথে চিত্তশুদ্ধি লাভ করিয়া ত্যাগসহনের ক্ষমতা অর্জ্জন করিতে বলিয়া মহাত্মা নূতনভাবে ভারতকে গড়িয়া তুলিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাহার পর তাঁহার কারাদণ্ড, সঙ্গে সঙ্গে দেশে অবসাদ ও মতদ্বন্দ্বের আবির্ভাব।

মতদ্বন্দ্বের ফলে কাউন্সিল-প্রবেশের মোহ আসিয়াছিল। উহার বিষময় ফল এখন আমরা সকলেই প্রত্যক্ষ করিতেছি। প্রথমেই উহাতে আমরা ত্যাগের পথ ত্যাগ করিয়া সাম্প্রদায়িক স্বার্থদ্বন্দ্বের পথে অগ্রসর হইয়াছি। হিন্দু-মুসলমানে আবার বিরোধের উদ্ভব ইহার প্রথম বিষময় ফল। তাহার পর উত্তেজনার পথে আমরা মুক্তির ইঙ্গিত লইয়া প্রকৃত মুক্তির পথের সন্ধান হারাইয়াছি, আমাদের জাতীয় শক্তি দ্বিধা ভিন্ন করিয়া শক্তির ক্ষয় করিয়াছি। শেষ ফল;—যে সরকারী সম্মানের ও চাকুরীর মোহ আমরা বিসর্জ্জন করিয়া কষ্টসহনে অভ্যস্ত হইতেছিলাম, সেই মোহে আবার আকৃষ্ট হইয়াছি। মিঃ থাম্বে হইতে আরম্ভ করিয়া জয়াকর, কেলকার, পেটেল, মতিলাল,—ইহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। ইহাঁদের মধ্যে একে অপরকে 'সহযোগকামী' বলিয়া অভিযুক্ত করিতেছেন। কাহারও বা সহযোগের উত্তরে সহযোগ নীতি; আবার কাহারও সম্মানকর সহযোগ নীতি।

কংগ্রেসে এবার পণ্ডিত মতিলালের সম্মানকর সহযোগ নীতি গৃহীত হইয়াছে, জয়াকর কেলকারের সহযোগের উত্তরে সহযোগ নীতির পরাজয় হইয়াছে। ফলে কিন্তু সহযোগ নীতিই প্রকারান্তরে গৃহীত হইয়াছে। সরকারকে সময় দেওয়া হইতেছে, যদি সরকার সেই সময়ের মধ্যে আমাদের সম্মানজনক সহযোগের বিনিময়ে সম্মানজনক সহযোগের আভাস ইঙ্গিত প্রদান না করেন, তাহা হইলে আমরা দেশকে আইন অমান্য করিবার জন্য প্রস্তুত হইবার অনুকূলে ভীষণ আন্দোলন দ্বারা গঠন করিব। শ্রীমতী সরোজিনী কংগ্রেসের সভানেত্রী-রূপে তাহাই সমর্থন করিয়াছেন, তাহার অধিক নূতন কিছু দিতে পারেন নাই।

সরকারকে এমন ইঙ্গিত ও আভাস দিবার জন্য ভয় প্রদর্শন করা যে আর হয় নাই, তাহা নহে। পূর্ব্বে এরূপ একাধিকবার হইয়াছে। তাহার ফল কি হইয়াছে? সুতরাং এবার বার বার তিন বার ভয়প্রদর্শনের চেষ্টা হইতেছে কি? কংগ্রেসকর্ম্মী কাউন্সিল ত্যাগ করিলেই কি সরকারের শাসন-কার্য্য অচল হইবে? বাঙ্গালার দ্বৈত-শাসন নষ্ট হইয়াছে, সরকার নিজ ইচ্ছামত শাসন চালাইতেছেন; তাহাতে কি শাসনের কার্য্য অচল হইয়াছে? তবে এই মিথ্যা ভয়প্রদর্শনে ফল কি? শ্রীমতী সরোজিনী এই অসার নীতির অনুমোদন কারয়া তাঁহার কর্ত্তব্য পালন করিতে পারেন নাই।

শ্রীমতী সরোজিনী সরকারকে কাউন্সিলের মধ্য দিয়া ভয়প্রদর্শনের পর ভয়প্রদর্শন সফল না হইলে গ্রাম ও জাতিগঠন-কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিতে চাহেন। কেন, সে জন্য অপেক্ষা না করিয়া কি গ্রাম ও জাতিগঠন এখন

হইতেই আরম্ভ করা যায় না? গ্রাম ও জাতির অর্থাৎ মূক জনসাধারণের মধ্যেই যে আমাদের সমস্ত শক্তি নিহিত, তাহা বোধ হয় তিনি অস্বীকার করিতে পারেন না। অতি অল্প দিন পূর্ব্বে যুক্তপ্রদেশের আমলাতন্ত্রের শাসনকর্ত্তা স্থানীয় জমিদারদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন,—এই জনসাধারণই আপনাদের প্রভু (Master), এ কথাটা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবেন। জনসাধারণই গ্রাম ও জাতি। এত দিন তাহাদের সম্বন্ধ হইতে বিচ্ছিন্ন ছিল বলিয়াই কংগ্রেস ধনী, বিলাসী, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অবসর-বিনোদনের ক্ষেত্র ছিল। মহাত্মা গন্ধীই প্রথমে প্রকৃত পক্ষে জনসাধারণের সহিত কংগ্রেসের সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া কংগ্রেসে মত্তমাতঙ্গের শক্তি আনয়ন করিয়াছিলেন—তাহার প্রভাব এখনও অনুভূত হইতেছে। তাঁহার সময় হইতেই কৃষাণ ও শ্রমিক আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে, কংগ্রেস সার্ব্বজনীন প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে। মহাত্মা গন্ধীর এত শক্তি কিসে? তাঁহার মনোবল সর্ব্বজনবিদিত। সেই অপূর্ব্ব মনোবলের ফলে তিনি আজীবন সেবাব্রত গ্রহণ করিয়া জনসাধারণের মধ্যে তাঁহার প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন। জনসাধারণের সেবা তাঁহার জীবনের ব্রত, তাই আজ ভারতের দিগ্‌দিগন্তে যেখানেই তাঁহার আবির্ভাব হয়, সেই স্থানেই জনগণ তাঁহার 'দর্শনের' জন্য উন্মত্ত হয়, 'মহাত্মা গন্ধী' জয়-রবে গগন-পবন মুখরিত করে।

কংগ্রেস জনগণের উপর সে প্রভাবে বঞ্চিত হইলে কংগ্রেসের কি মূল্য থাকে? শ্রীমতী সরোজিনী প্রথমে কাউন্সিলের প্রভাবের উপর নির্ভর করিয়া পরে জনসেবা গ্রহণ করিতে চাহিয়াছেন। এইখানেই তাঁহার অভিভাষণের অসাফল্য স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। কাউন্সিলের মায়ার প্রভাব মুক্ত হইতে না পারিয়া কংগ্রেস-নেত্রী কংগ্রেসের মহান আদর্শ ও লক্ষ্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছেন।

সেদিন শ্রীযুক্ত রাজাগোপালাচারী মাদ্রাজের জাতীয় দলকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন,—You are doing nothing in the Councils, really nothing. The idea of obstruction is dead and gone. It is impossible to revive it. What is the use of impotent cry for Home Rule without power behind the cry? Win affection and gratitude of our masses and you will be invincible. Win it by service rendered by saving people from wretchedness and want, by abolition of drink trade.

ইহাই প্রকৃত মুক্তির পথ, ইহাই আমাদিগকে গ্রহণ করিতে হইবে। মহাত্মা গন্ধী স্বরাজ্য দলকে সমর্থন করিলেও কংগ্রেসের স্বদেশী প্রদর্শনীতে এই কথাই বলিয়াছেন,—"চরকা খদ্দরে গ্রাম ও জাতি গঠন কর, হিন্দু-মুসলমানে প্রীতিস্থাপন কর, অস্পৃশ্যতা দূর কর, গ্রামে গিয়া জনসাধারণের মধ্যে কার্য্য কর।" ইহাতে একাগ্রতা চাই, উৎসাহ চাই, স্বার্থত্যাগ চাই, দেশপ্রেম চাই। নতুবা শত কাউন্সিলের মধ্য দিয়া ভয়প্রদর্শন করিলেও আমাদের ব্রত সফল হইবে না।

শ্রীমতী সরোজিনী পূর্ণান্তঃকরণে দেশবাসীকে এই পথ দেখাইতে পারেন নাই। দেশের সম্মুখে কি কি প্রবল সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে, কেবল তাহা বর্ণনা করিয়া গেলে সমস্যা সমাধানের উপায় নির্দ্দেশ করা হয় না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ হিন্দু-মুসলমান সমস্যা সম্পর্কে তাঁহার পরামর্শ ও উপদেশের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। তিনি ইঙ্গিত করিয়াছেন, উভয় সম্প্রদায় যদি mutual forbearance অর্থাৎ পরস্পর ক্ষমাঘৃণা করেন এবং উভয় সম্প্রদায়ের নারীগণ যদি পরস্পর প্রীতি প্রদর্শন করেন ও পুত্রকন্যাগণকে পরস্পরের প্রতি সহিষ্ণু ও প্রীতিভাবাপন্ন হইতে শিক্ষা দেন, তাহা হইলে এই সমস্যার সমাধান হইতে পারে। কিন্তু এই 'যদি' কথাটা কিরূপে বাস্তবে পরিণত হইবে, তাহা তাঁহার অভিভাষণে নাই। সার আবদর রহিমের মত মুসলমান কালাপাহাড় থাকিতে এই 'যদি' কি কখনও বাস্তবে পরিণত হইবে? হিন্দু ও মুসলমান নারীরা কিরূপে পরস্পর মিলিত হইবেন ও প্রীতির জলসা করিবেন, তাহা অভিভাষণে নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। কেবল কতকগুলি গলিত 'চর্ব্বিত-চর্ব্বণ' মুখে বলিয়া গেলে সমস্যার প্রকৃত সমাধান করা হয় না। অভিভাষণে একটাও নূতন কর্ম্মপদ্ধতির (Line of Action) উল্লেখ নাই। কেবল এক বিষয়ে কিছু অভিনবত্ব আছে, কংগ্রেসের কর্ম্মকাণ্ড চালাইবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন

বিভাগের সৃষ্টি। কিন্তু জাতির জীবন মরণের সমস্যা-সমাধানে শিখিবার বা জানিবার কিছুই অভিভাষণে নাই।

আয়ার্লণ্ডের মুক্তিদূত টেরেন্স ম্যাক্-সুইনী বলিয়াছিলেন, "The only condition on the fulfilment of which the freedom of a subject nation depends, is her real will to freedom, পরাধীন জাতির মুক্তি তাহার মুক্ত হইবার আন্তরিক ইচ্ছার উপর নির্ভর করে।" দেশবাসীর মধ্যে মুক্তির এই আন্তরিক ইচ্ছা জাগ্রত না হইলে অপরকে শত ভয়-প্রদর্শনেও মুক্তি আসিবে না। যতদিন আমরা জনসাধারণের মধ্যে সেই ইচ্ছার ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতে সমর্থ না হইব, ততদিন আমরা কাউন্সিল খেলাঘরের খেলানা ও মারামারি লইয়াই ব্যস্ত থাকিব।

এই ইচ্ছার ক্ষেত্র কিরূপে প্রস্তুত করিতে হইবে? তাহারা কি, কত বড়—বিরাট, কিরূপ শক্তিশালী, সঙ্ঘবদ্ধভাবে কামনা করিলে তাহাদের নিকট কি অজেয় থাকিতে পারে,—এ সকল কথা তাহাদিগকে বুঝাইতে হইবে। কেন তাহারা অদৃষ্টের উপর সকল অপরাধের বোঝা চাপাইয়া অম্লানবদনে দুঃখ-শোক-জরা-মৃত্যু সহিয়া গতানুগতিক জীবন যাপন করিয়া যায়, তাহা তাহাদিগকে জানাইতে হইবে। এজন্য তাহাদের মধ্যে বসবাস, তাহাদের সুখ-দুঃখে সহানুভূতি ও সমবেদনা প্রদর্শন, তাহাদের সেবা পরিচর্য্যা প্রয়োজন। এ বিষয়ে আমরা অনভ্যস্ত নহি। দেশে দুর্ভিক্ষে, মহামারীতে, মেলায়, প্লাবনে আমাদের কর্ম্মীরা তাহাতে অভ্যস্ত হইয়াছে। এখন চাই তাহার সঙ্ঘবদ্ধ চেষ্টা।

কিন্তু প্রথমেই এই সেবাব্রতধারী 'মিশনারীদের' আপনাদের চিত্তশুদ্ধি করা প্রয়োজন। এজন্য তাঁহাদিগকে প্রথমেই অন্তরে দেশপ্রেম জাগাইতে হইবে। দেশবন্ধু দাশ বলিয়াছিলেন, স্বরাজ অন্তরের, বাহিরের নহে। অন্তরে মুক্তির সন্ধান পাইলেই বাহিরে মুক্তির বাসনা জাগিয়া উঠে। দেশকর্ম্মীদিগকে তাই অন্তরে মুক্তির সন্ধানের অনুকূল মনোবৃত্তিতে অভ্যস্ত হইতে হইবে। বিকৃত শিক্ষার মনোবৃত্তি পরিহার করিয়া দেশের সনাতন ভাব-ধারায় অনুপ্রাণিত হইতে হইবে। আচার্য্য জগদীশচন্দ্র যেমন বারাণসী বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশনের অভিভাষণে উদ্ভিদের দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইয়াছিলেন যে, "বৃক্ষ তাহার জন্মস্থলের মৃত্তিকার মধ্যে দৃঢ়ভাবে মূল প্রবেশ করাইয়া দিয়া প্রতিষ্ঠিত থাকে বলিয়া সে বাহিরের আঘাত সহ্য করিবার ক্ষমতা অর্জ্জন করে", তেমনই কর্ম্মীরা তাহাদের সনাতন ভাব ধারা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া সময়ের পরিবর্ত্তনের তরঙ্গাভিঘাত সহ্য করিয়া দণ্ডায়মান হইতে সমর্থ হয়। আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বলেন, "ভারত তাহার সনাতন ভাবধারার সূত্র কখনও হারায় নাই, তাহার বৈশিষ্ট্য নানা পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া জাগাইয়া রাখিয়াছে; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সেই পরিবর্ত্তনের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া চলিয়াছে।" এই ভাবে মনোবৃত্তির বিকাশ করিয়া চিত্তশুদ্ধি করিতে হইবে। তাহা হইলে দেশকর্ম্মীরা গ্রাম ও জাতিগঠনে সমর্থ হইবেন।

যুগপ্রবর্ত্তক মহাত্মা গন্ধী এখনও জ্ঞানের বর্ত্তিকালোক হস্তে লইয়া নিরাশার ঘনান্ধকারের মধ্যে আমাদিগকে মুক্তির পথ দেখাইয়া দিতেছেন। শ্রীমতী সরোজিনী মহাত্মার মন্ত্রশিষ্যা—তিনি গুরুনির্দ্দিষ্ট ত্যাগমন্ত্রেরও পক্ষপাতিনী; কিন্তু দুঃখের কথা, তিনি গুরুর উপর একান্ত নির্ভরশীল হইতে পারেন নাই, তাই তাঁহার মন সংশয়দোলায় দোদুল্যমান হইয়াছে। সে সংশয়াকুল মন লইয়া দেশবাসীকে কর্ত্তব্য পথ দেখাইয়া দেওয়া কাহারও পক্ষে সম্ভব নহে!

সান্ত্বনা

যদি কোন দিন জীবনের পথ
দুঃখময় মনে হয়,
যদি কভু তব সুখের গগন
হয় মেঘে মেঘময়,

যদি গিয়ে পড় অকূল সাগরে
শ্রান্ত বিহগ সম,
ঊর্দ্ধে চাহিয়ো, সেথায় পথিক!
আছে সুখ অনুপম।

শ্রীউমানাথ ভট্টাচার্য্য

পারস্যে আবার নাদীর শা

প্রাচীন পারস্য বা ইরাণের শা-ইন-শাহের রাজতক্ত হইতে কাজার রাজবংশ অপসারিত হইলেন এবং তাঁহাদের স্থলে এক অজ্ঞাত কুলশীল সামান্য ব্যক্তি সিংহাসনে উপবেশন করিলেন,—তাঁহার নাম রেজা খাঁ পহ্লবী অর্থাৎ পহ্লবীবংশীয় রেজা খাঁ (পহ্লবীবংশীয়গণের নাম ভারতের ইতিহাসেও পাওয়া যায়, তবে পারস্যের এই পহ্লবী-বংশীয়দিগের সহিত তাঁহাদের সংস্রব ছিল কি না, প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের তাহা আলোচনীয়)। রেজা খাঁ সামান্য কৃষাণের পুত্র, অথচ তিনি আজ নাদীরের সিংহাসনে উপবিষ্ট। তবে নাদীর শা দিল্লীর ময়ূর সিংহাসন লুণ্ঠন করিয়া পারস্যে আনয়ন করিয়াছিলেন এবং সেই সিংহাসনে বসিয়া দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপে অর্দ্ধ এসিয়া শাসন করিয়াছিলেন; রেজা খাঁর সেই ময়ূর সিংহাসন নাই, তিনি পারস্যের তক্ত-ই-তাউসে বসিয়া রাজ্যশাসন করিতেছেন। নাদীরের মত তাঁহার রাজ্য-বিস্তারের কামনা নাই, বিদেশ জয়যাত্রার আগ্রহও নাই; কিন্তু তাহা হইলেও নাদীর শা তাঁহার আদর্শ। আবার পারস্য নাদীরের আমলের পারস্যের মত কিরূপে জগতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিবে, এই আকুল কামনা, রেজা খাঁর অস্থিমজ্জাগত।

ইরাণ—গোলাপ বুলবুলের দেশ ইরাণ, ভাস্কর্য্য-শিল্পে, কলা-সৌন্দর্য্যবিকাশে অতুলনীয় ইরাণ, হাফিজ, সাদীর, ওমর খায়েমের ইরাণ,—যে ইরাণের কলাশিল্পী জগতে অতুল শিল্প নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছেন, সেই ইরাণ আবার কিরূপে জগতে গর্ব্বোন্নত শির উত্তোলন করিয়া জ্ঞান-বিজ্ঞানে, ঐশ্বর্য্য-সম্পদে অন্যান্য স্বাধীন জাতির ন্যায় দণ্ডায়মান হইবে, রেজা খাঁর তাহাই আকাঙ্ক্ষা, সে আকাঙ্ক্ষায় তাঁহার অন্তর অহর্নিশ পূর্ণ হইয়া আছে। অথচ রেজা খাঁ কে? তিনি ত সামান্য সৈনিকরূপে অসি হস্তে ভাগ্যপথ পরিষ্কৃত করিয়াছেন, তিনি নিজের অপূর্ব্ব প্রতিভার বলে আজ পারস্যের শা-ইন-শা হইয়াছেন। যে পারস্য জরথুস্ত্র, সাইরাস, দরিয়াস, সোহ্‌রাব রস্তম, হাফিজ, সাদী, জামাল-উদ্দীন, শা আব্বাস, নাদীর শার লীলাক্ষেত্র ছিল, আজ সেই পারস্যে সামান্য সৈনিক রেজা খাঁ কিরূপে শীর্ষস্থানীয় হইতে সমর্থ হইলেন?

রেজা খাঁ পহ্লবী

জার্ম্মাণ যুদ্ধকালে জার্ম্মানীর মার্কিণ দূত মিঃ জেরার্ড বলিয়াছিলেন, জগতে 'সম্রাটের যুগ' অতীত হইল, গণতন্ত্রের যুগ আরম্ভ হইল; অর্থাৎ অপ্রতিহতশক্তি স্বেচ্ছাচারী সম্রাটরা আর ভবিষ্যতে রাজ্য-শাসন করিতে পারিবেন না, রাজা আর প্রায় কেহ থাকিবেন না। যদি কেহ থাকেন, তাঁহাকে জনসাধারণের ইচ্ছাশক্তির মুখ চাহিয়া রাজ্যশাসন করিতে হইবে। বস্তুতঃ রুসিয়া, জার্ম্মাণী, অষ্ট্রীয়া, জেকোশ্লাভিয়া, পোলাণ্ড, হাঙ্গারী, তুর্কী, চীন প্রভৃতি দেশে রাজশাসনতন্ত্রের পরিবর্ত্তে গণশাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল; পরন্তু পারস্য, মিশর প্রভৃতি দেশেও রাজা থাকিলেও জনগণের প্রতিনিধি-সভা দেশের শাসনকার্য্য নিয়ন্ত্রিত করিতেছিলেন। এ সকল দেখিয়া শুনিয়া গণতন্ত্রের যুগ আসিয়াছে বলিয়া মনে হওয়া বিচিত্র নহে।

কিন্তু তাহার পর যে যুগ আসিয়াছে, তাহাতে মাসোলিনি, প্রি মিভেরা, লেনিন, চাঙ্গ-সোলিন, উপেইফু প্রভৃতি Dictator বা ভাগ্যনিয়ামকের আবির্ভাব হইয়াছে, তাঁহারা তাঁহাদের ব্যক্তিত্বের প্রভাবে নানা দেশে স্বেচ্ছাচার প্রণোদিত শাসনতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। সুতরাং স্বেচ্ছাচার শাসনের যুগ যে চিরতরে অস্তমিত হইয়াছে, এ কথা নিঃসংশয়ে বলা যায় না। চীনের মত যুগ যুগ রাজশাসন নিয়ন্ত্রিত দেশেও যখন গণতন্ত্র শাসন প্রতিষ্ঠিত হইবার পরেও স্বেচ্ছাচারী নিয়ামকের আবির্ভাব সম্ভব হইয়াছে, তখন প্রাচীন পারস্যেও যুগ যুগ প্রচলিত রাজ-শাসনের যে পুনঃ প্রবর্ত্তন হইবে না, ইহা কেহ নিশ্চিতরূপে বলিতে পারেন না। পারস্যে রেজা খাঁর আবির্ভাব ইহাতেই সম্ভব হইয়াছে।

পহ্লবীরা এক সময়ে ইরাণ শাসন করিয়াছিলেন। জেন্দ রাজবংশের পর ইরাণে পহ্লবী-বংশের উদয় হইয়াছিল। কাস্পীয় সাগরের দক্ষিণে পার্ব্বত্য মাজেন্দরাণ জিলার আলাসৎ নামক স্থানে রেজা খাঁর জন্মস্থান, ঐ স্থানেই পহ্লবীবংশীয়রা বহু প্রাচীন কাল হইতে প্রভাব বিস্তার করিয়া আসিতেছেন।

ইরাণের বর্ত্তমান ইতিহাসে রেজা খাঁর উদ্ভব ও উন্নতি উপন্যাসের ঘটনাবলীর মত বিচিত্র ও মনোরম। সামান্য সৈনিক হইতে তিনি ক্রমে পারস্যের প্রধান মন্ত্রী ও সমর-সচিবের পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। জার্ম্মাণ যুদ্ধের পূর্ব্বে প্রাচীন ইরাণ ইংরাজ ও রুসের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইয়াছিল, উত্তর ইরাণ রুসিয়ার Sphere of influence এবং দক্ষিণ ইরাণ ইংরাজের Sphere of influenceরূপে পরিণত হইয়াছিল; শাহ তাঁহাদের ক্রীড়নকে পরিণত হইয়াছিলেন। পারস্যের তৈলের খনি উভয় শক্তির আকর্ষণের বিষয় হইয়াছিল। এই তৈলের মালিকানি স্বত্বলাভের জন্য আন্তর্জাতিক চক্রান্তের সৃষ্টি হইয়াছিল। ইরাণ উভয়ের মধ্যে ভাগাভাগি হইয়া যাইতে বসিয়াছিল। মহাযুদ্ধের ফলে রুসিয়ায় অন্তর্বিপ্লব উপস্থিত হইলে ইরাণে রুসিয়ার প্রভাব শিথিলমূল হইয়া পড়ে। মেধাবী রেজা খাঁ সে সুযোগ পরিত্যাগ

করেন নাই। গাজী মুস্তাফা কামাল পাশা যেমন তুর্কী সুলতানকে (খলিফাকে) পদচ্যুত করিয়া তুরস্কে নূতন শাসন প্রবর্তন করিয়াছিলেন, গাজী আবদুল করিম যেমন ফরাসী ও স্পেনের ক্রীড়নক মরক্কোর সুলতানের শাসন না মানিয়া রিফদেশে নূতন শাসন প্রবর্তন করিয়াছিলেন, রেজা খাঁও তেমনই ইরাণকে পরের প্রভাব হইতে মুক্ত করিয়া ইরাণে নূতন শাসন প্রবর্তন করিলেন। জগতে এইরূপে নানা দেশে মোশলেম শক্তির প্রকৃত প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইল। এ জন্য রেজা খাঁ ইরাণের নবযুগ প্রবর্তকরূপে—ইরাণের মুক্তি-দূতরূপে ইতিহাসে সুবর্ণাক্ষরে নামাঙ্কিত করিয়া রাখিলেন।

সাইরাসের রাজত্বকালে ইরাণ জগতের সাম্রাজ্যগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের আসন লাভ করিয়াছিল। তিনি লাইডিয়ার ধনকুবের রাজা ক্রিসাসকে রণে পরাজিত করিয়াছিলেন এবং মিডস ও ব্যাবিলোনিয়ানদিগকেও পরাস্ত করিয়া তাহাদের রাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন। ক্যামবাইসাস, দরায়ুস ও শেরের (Xerexes) রাজত্বকালে মিশর ও এসিয়ামাইনর ইরাণের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। সে যুগে ইরাণ জলে স্থলে সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী রাজ্য বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল। মধ্যযুগে সেলুসি, সাসানিয়ান, সেলজুক ও সুফি প্রভৃতি কত রাজত্বের এই প্রদেশে উত্থান-পতন হইয়াছে। জেঙ্গিস খাঁ এক সময়ে এই দেশ জয় করিয়াছিলেন। তাহার পর ইংলণ্ডে হানোভার রাজত্বকালে নাদীর শাহ আবার ইরাণকে শ্রেষ্ঠত্বের পদে উন্নীত করিয়াছিলেন। তিনিই জেঙ্গিস. অত্তিলা ও তাইমুরের মত এসিয়ার শেষ নেপোলিয়ান। আমেদ শা আবদালির সময়েও ইরাণ আবার একবার ঐহিক উন্নতির শীর্ষদেশে উপনীত হইয়াছিল।

শা আমেদ মির্জ্জা

বর্ত্তমান কালে কাজার রাজবংশের শা নাসীরুদ্দীন পারস্যের শেষ স্বাধীন নৃপতি। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে তিনি এক ধর্ম্মান্ধ আততায়ীর হস্তে নিহত হয়েন। তাঁহার উত্তরাধিকারী শা মোজাফর ঋণের দায়ে ইংরাজ ও রুসের ক্রীড়নকরূপে পরিণত হয়েন। তখন পারস্যের জনসাধারণ তাঁহার উপর অসন্তুষ্ট হইয়া গণতন্ত্র শাসনপ্রতিষ্ঠার জন্য তাঁহাকে উত্যক্ত করিয়া তুলে। তাহারই ফলে ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে পারস্যে প্রথম 'মজলিস' বা প্রজার প্রতিনিধি সভার (Parliament) উদ্বোধন হয়।

নাসীরুদ্দীনের উত্তরাধিকারী মহম্মদ আলি নব-প্রবর্ত্তিত মজলিস মানিয়া চলিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হয়েন। কিন্তু মজলিসে ক্রমে গোলযোগ উপস্থিত হইল। প্রাচীন রাজতন্ত্র-প্রয়াসী দলের সহিত নবীন সংস্কারকামী দলের মনোমালিন্য উপস্থিত হইল; ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে শাহের প্রাণনাশের এক ষড়্‌যন্ত্র ধরা পড়িল। তখন মহম্মদ আলি তাঁহার রুসিয়ান কসাকগণের সাহায্যে মজলিস ভাঙ্গিয়া দিলেন। বিলাতে যেমন ColonelPride's purge বা বলপূর্ব্বক পার্লামেণ্ট ভঙ্গ করা হইয়াছিল, মহম্মদ আলিও তেমনই ভাবে পারস্যের নব-প্রবর্ত্তিত পার্লামেণ্ট ভঙ্গ করিয়া দিলেন।

ইহার পর পারস্যের ভাশানালিষ্ট দেশপ্রেমিকরা চারিদিকে বিদ্রোহ ধ্বজা উত্তোলন করিলেন এবং এমন কি রাজধানী তিহারাণেও রাজপক্ষে ও প্রজাপক্ষে যুদ্ধ চলিল। শেষে শাহকে রুসিয়ান দূতাবাসে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইল। শাহ সিংহাসন ত্যাগ করিয়া বৃত্তিভোগী হইয়া রুসিয়ার ওডেসা বন্দরে বাস করিতে সম্মত হইলেন। তাঁহার নাবালক পুত্র শা আমেদ মিরজাকে পারস্যের সিংহাসনে বসান হইল। সেই সময়ে মার্কিণজাতীয় মিঃ সুষ্টারকে পারস্যের অর্থনৈতিক পরামর্শদাতা নিযুক্ত করা হইল। কিন্তু তিনি শীঘ্রই পদত্যাগ করিলেন। তিনি সেই সময়ে বলিয়াছিলেন যে, ইংরাজ ও রুসিয়ার চক্রান্তে পারস্যে স্বাধীন শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠার উপায় ছিল না।

১৯১৪ খৃষ্টাব্দে নবীন শাহের রাজ্যাভিষেকের সঙ্গে সঙ্গে আবার মজলিস বসিল। তখন জার্ম্মাণ-যুদ্ধ বাধিয়াছে। শাহ জার্ম্মাণীর বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইলেন। শা আমেদ মির্জ্জা রাজ্যশাসনে একবারেই অকর্ম্মণ্যতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তিনি দুর্ব্বলচিত্ত, আমোদপ্রিয়, ভোগী ও বিলাসী। তাঁহার বয়স এখন ৩০ বৎসরের অধিক নহে। কিন্তু এই বয়সের মধ্যেই তিনি য়ুরোপে—বিশেষতঃ প্যারী সহরে সুরা ও সুন্দরী লইয়া কালাতিপাত করিতে অভ্যস্ত হইয়াছিলেন। রাজ্যের উন্নতিবিধানে তিনি একেবারেই অমনোযোগী ছিলেন। তাই আজ তাঁহাকে ৩০ বৎসর অতিক্রম করিতে না করিতে রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া প্যারী সহরে সামান্য লোকের ন্যায় বাস করিতে হইতেছে। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে শাহ নিজের রাজ্য ছাড়িয়া প্যারী যাত্রা করেন এবং সেখানে সুরা ও সুন্দরী লইয়া এবং জুয়া খেলিয়া কালাতিপাত করিতে থাকেন। দরিদ্র পারসীক প্রজার কষ্ট-দত্ত অর্থ এইরূপে ব্যয়িত হইতে থাকে। সুতরাং আজ যে তাঁহাকে পারস্যের জনমত সিংহাসনচ্যুত করিয়াছে, এ জন্য দুঃখ বা অনুতাপের কথা কিছুই নাই। এখন তাঁহাকে বৃত্তিভোগী হইয়া জীবনের অবশিষ্ট কাল অতিবাহিত করিতে হইবে। তবে তাঁহার এক সান্ত্বনা এই যে, তিনি বহু মূল্যের রত্নালঙ্কার প্রাপ্ত হইয়াছেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আজ যিনি পারস্যের দণ্ডমণ্ডের কর্ত্তা হইলেন, সেই মহম্মদ রেজা খাঁ পহ্লবী কৃষাণের সন্তান। বাল্যে তাঁহার শিক্ষার কোনও সুযোগ হয় নাই; কিন্তু তিনি পরে এই অভাব নিজের চেষ্টায় পূর্ণ করিয়াছিলেন।

প্রথম জীবনে রেজা খাঁ পারসীক কসাক সৈন্যদলের এক জন সামান্য সৈনিক ছিলেন। জার্ম্মাণ যুদ্ধের পূর্ব্বে রুসিয়ান সেনানীদের দ্বারা এই সৈন্যদল পারস্যে গঠিত হইয়াছিল। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে রেজা খাঁ সামান্য সৈনিক হইতে নিজ কৃতিত্বে সেনাপতির পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। ঐ সময়ে পারস্যের শাহ আমেদ মিরজা ইংরাজের সহিত এক সন্ধিবন্ধনে আবদ্ধ হইতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ইহাতে পারস্যে নানা স্থানে প্রজা বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। তীক্ষ্ণধী রেজা খাঁ দেখিলেন, উহাই উপযুক্ত অবসর। তিনি এক দিন শীতের সন্ধ্যায় কাসভিন সহর হইতে সসৈন্যে রাজধানী তিহারণের অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

তৎপূর্ব্বে ১৯২০ খৃষ্টাব্দে পারস্যের কসাক সৈন্যদলের রুসিয়ান সেনানীরা পারস্য হইতে বিতাড়িত হইয়াছিলেন। তাঁহারা জারের ভক্ত ছিলেন এবং রাজতন্ত্র শাসনের পক্ষপাতী ছিলেন। সুতরাং বলশেভিক গভর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগকে কোনও সাহায্য প্রদান করিতে ন

না। বলশেভিকরা ১৯২০ খৃষ্টাব্দে পারস্যের সেনাদলকে পরাজিত করিয়া এনজেলি অধিকার করে ও রেস্ত অভিমুখে অগ্রসর হয়। কিন্তু তথায় বৃটিশ সৈন্য কর্ত্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হইয়া হটিয়া যায়। ইংরাজের সেনাপতি আয়রণসাইড ঐ সময়ে শা আমেদকে রুসিয়ান সেনানীদিগকে কর্ম্মচ্যুত করিতে বাধ্য করেন। রেজা খাঁ সেই অবসর ত্যাগ করিলেন না। তিনি সেই সময়ে পারসীক কসাক সৈন্যদলের সেনাপতিত্ব গ্রহণ করিলেন। ইংরাজের সহিত তাঁহার সদ্ভাব ছিল।

রেজা খাঁ এইরূপে সেনাপতিত্ব গ্রহণ করিয়া রাজধানী তিহারাণ আক্রমণ করিলেন এবং পুরাতন শাসনতন্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া নূতন গভর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠা করিলেন। তিনি জিয়াউদ্দীনকে মজলিসের প্রধান মন্ত্রীর পদে বসাইয়া নিজেই শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু জিয়াউদ্দীনের গভর্ণমেন্ট শীঘ্রই পদত্যাগ করিলেন। তাহার পর অল্প দিনের মধ্যে কয়েকটি গভর্ণমেন্টের উত্থান-পতন হইল। রেজা খাঁ সেই সময়ে পারস্যের Dictator বা ভাগ্যনিয়ামক হইলেন। তখন তিনিই প্রকৃতপক্ষে পারস্যে সর্ব্বেসর্ব্বা হইলেন। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে রেজা খাঁ স্বয়ং প্রধান মন্ত্রীর পদ গ্রহণ করিলেন। তৎপূর্ব্বে তিনি সমর-সচিব ও সর্দ্দার সিপা (প্রধান সেনাপতি) ছিলেন। ঐ বৎসরেই শাহ আমেদ য়ুরোপ যাত্রা করেন।

প্রধানের পদে বরিত হইয়া রেজা খাঁ অশান্ত পারস্যে শৃঙ্খলা ও শান্তি আনয়নের জন্য প্রাণপণ প্রয়াস পাইলেন। তিনি পারস্যের সেনাদলের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র; এত দিন পরে তাঁহার আমলে পারসীক সেনারা রীতিমত বেতন, আহার্য্য ও পরিচ্ছদ পাইতে লাগিল। ইহাই তাঁহার জনপ্রিয়তার কারণ।

তিনি সৈন্যগণকে শৃঙ্খলা ও য়ুরোপীয় প্রথায় সমর শিক্ষা দিতে লাগিলেন। পারস্যের সীমান্ত সমূহেও তিনি সুশাসন ও শৃঙ্খলার প্রবর্ত্তন করিলেন; বিশেষতঃ যেখানে তৈলের খনিসমূহ অবস্থিত, সেই লুরিস্থানে তাঁহার অমোঘ শাসনদণ্ড ন্যায় ও ধর্ম্মের নিদর্শনরূপে পরিচালিত হইতে লাগিল। ইহাতে পারস্যের সম্পদ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। আরবীস্থানেও (পারস্যের একটি প্রদেশ) তিনি পারস্যের শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত করিলেন। তত্রত্য মোহাম্মেরার শেখ খাসাল এত দিন তিহারণের কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করেন নাই তাঁহার দস্যুতা ও অত্যাচারে স্থানীয় অধিবাসিবৃন্দ সর্ব্বদা সশঙ্ক ছিল। শেখ খাসালকে তিনি দমন করিলেন বটে, কিন্তু তিনি তাঁহার প্রতি কঠিন ব্যবহার করেন নাই। বরং তিনি দয়া ও সৌজন্য প্রকাশের দ্বারা তাঁহাকে বশীভূত করিয়াছেন। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে তিনি পারস্যের বিখ্যাত দস্যু-সর্দ্দার (পারস্যের রবিণ হুড) কুচলিক খাঁকে এবং কুর্দ্দ সর্দ্দার সিমকোকে দমন করিলেন। পরন্তু মেসেদের বিদ্রোহ উপশমিত করিলেন। ইহার পরে ক্রমে ক্রমে বক্তিয়ারী ও কাসগাই জাতীয় দুর্দ্ধর্ষ বিদ্রোহীরা তাঁহার নিকট পরাজয় স্বীকার করিল। ঐ বৎসরের মে মাসে ইংরাজরাও উত্তর পারস্য হইতে তাঁহাদের সৈন্য অপসারণ করিলেন। এখন কেবলমাত্র পারসীক বালুচিস্থানে শান্তি প্রতিষ্ঠা করার কার্য্য অবশিষ্ট আছে; নতুবা রেজা খাঁ অতি অল্পসময়ের মধ্যে পারস্যের সর্ব্বত্র যে ভাবে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তাহাতে জগতের লোকের বিস্মিত হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

দস্যুতা নিবারিত এবং শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা হওয়ায় রাজ্যমধ্যে প্রজারা সুখে ও নিরাপদে বাস করিতেছে এবং ব্যবসায়-বাণিজ্যের ধীরে ধীরে উন্নতি হইতে আরম্ভ করিয়াছে রেজা খাঁ ইহাতেও ক্ষান্ত হয়েন নাই। তিনি ডাক্তার মিলস পাউয়ের অধীনে এক মার্কিণ অর্থনীতিক কমিশন বসাইয়াছেন। এই কমিশন অল্পদিনেই পারস্যের আর্থনীতিক অবস্থার যথেষ্ট উন্নতি সাধনে সমর্থ হইয়াছেন।

১৯২৪ খৃষ্টাব্দে পারস্যে এক গণতন্ত্র শাসন প্রতিষ্ঠা করিবার কথা উঠে। রেজা খাঁ নিয়ামক হইবার পরেই শাহ আমেদ য়ুরোপে গিয়া বাস করিতে থাকেন, এ কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সুতরাং পারস্যে কিরূপ শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তিত থাকে, ইহা এক সমস্যার বিষয় হইয়া উঠে। মৌলভী ও মোল্লারা গণতন্ত্র শাসন প্রতিষ্ঠার ঘোর প্রতিবাদ করিলেন। রেজা খাঁ মুসলমান তীর্থস্থানসমূহে ধর্ম্মকার্য্য সম্পন্ন করিয়া মোল্লাগণের প্রীতি অর্জ্জন করিলেন। তাহার পর ১৯২৫ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে তীর্থভ্রমণের পর রাজধানীতে আসিয়া রেজা খাঁ ঘোষণা করিলেন যে, তিনি অতঃপর শাহের নিকট রাজ্যশাসনের জন্য দায়ী থাকিবেন না, দায়ী থাকিবেন মজলিসের নিকট; অন্যথা তিনি প্রধান মন্ত্রীর পদ ত্যাগ করিবেন। তখন মজলিসের সদস্যগণ প্রমাদ গণিলেন। যিনি পারস্যের একমাত্র ত্রাণকর্ত্তা—যিনি নবপারস্যের অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিষ্ঠাতা—যিনি প্রাচীনের অবসাদ ও অন্ধকার দূর করিয়া নবীনের উৎসাহ ও আলোক আনয়ন করিয়াছেন, তিনি যদি রাজ্যশাসন কার্য্য হইতে দূরে থাকেন, তাহা হইলে পারস্যের দশা কি হইবে? মোল্লা ও মৌলভীগণও ভাবিলেন, যে শাহ বিদেশে বিধর্ম্মীর সহিত আমোদ-প্রমোদে কালহরণ করিতেছেন, তাঁহার অপেক্ষা ধর্ম্মপ্রাণ রেজা খাঁ কত গুণ শ্রেষ্ঠ! সুতরাং সকলে একযোগে শাহকে পদত্যাগ করিবার জন্য সংবাদ জ্ঞাপন করিলেন। শাহ তাহাতে সম্মত হইলেননা। মজলিস ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাস পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিলেন। তখনও শাহের সঙ্কল্প টলে নাই। সুতরাং অনেক চিন্তার পর মজলিস গত নভেম্বর মাসে কাজারবংশের শেষ নৃপতি শা আমেদ মিরজাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া সাময়িকভাবে রেজা খাঁ পহ্লবীকে পারস্যের রাজপদে অভিষেক করিবার মন্তব্য গ্রহণ করিলেন এবং Constituent Assemblyর উপর নূতন রাজা নির্ব্বাচন করিবার ভার প্রদান করিলেন। তাহার পর উক্ত এসেম্ব্লি ২৫৭ ভোটে রেজা খাঁ পহ্লবীকে পারস্যের শাহ-ইন্-শাহ পদে অভিষিক্ত করিয়াছেন। স্থির হইয়াছে, অতঃপর (১) পুরুষগণ পারস্যের শাহ হইবেন, (২) রেজা খাঁর পুত্র যুবরাজ হইবেন, (৩) যুবরাজের জননী পারস্যবাসিনী হওয়া চাই, (৪) রাজ-অভিভাবক আর থাকিবে না। রাজ-অভিষেক কার্য্য সূচনার পর এসেম্ব্লী মুলতুবি হইয়াছে।

পারস্যের এ যুগের যুগপুরুষ রেজা খাঁ দেখিতে দীর্ঘ, বলিষ্ঠ, সুপুরুষ; এক কথায় "ব্যূঢ়োরস্কঃ বৃষস্কন্ধঃ শালপ্রাংশুঃ মহাভুজঃ।" তাঁহার বিশাল ললাটে নির্ভীকতার ও সাহসিকতার ছাপ যেন স্বতঃই অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে।

রেজা খাঁ যৌবনে বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছেন। তিনি প্রত্যহ পারস্যের "রেয়াদ" (বজ্র) নামক সংবাদপত্র পাঠ করিতেন। কলিকাতার 'হাবলুল মতিন' সংবাদপত্রের পারস্যে বহুল প্রচার ছিল; কিন্তু ঐ কাগজের প্রচার পারস্যে বন্ধ হইয়া যাইবার পর রেয়াদের প্রচার বৃদ্ধি হয়। 'রেয়াদ' পাঠ করিয়া রেজা খাঁ তাঁহার জন্মভূমির দুর্দ্দশা কথা জানিতে পারেন। তাঁহার জীবনে সংবাদপত্রের ভাব সামান্য নহে।

রেজা খাঁর অধীনে পারস্যে যে নবগঠিত সেনাদল প্রস্তুত হইয়াছে, তাহার তুলনা পারস্যে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তাঁহার ৮০ সহস্র সুশিক্ষিত সেনার সম্বন্ধে কোনও বিদেশী পর্য্যটক বলিয়াছেন, উহা Models of efficiency যোগ্যতার আদর্শ!

রেজা খাঁ সিংহাসন প্রাপ্ত হইবার পরেই সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীকে দয়াপ্রদর্শন করিয়া মুক্তিদান করিয়াছেন ভূতপূর্ব্ব কাজার রাজবংশের সকলের বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়াছেন তাঁহাদিগকে ক্ষমা করিয়া স্বচ্ছন্দে পারস্যে বাস করিতে দিয়াছেন, ভূতপূর্ব্ব শাহেরও সকল অপরাধ মার্জ্জনা করিয়াছেন। পারস্যের ইতিহাসে এ উদারতা নূতন বলিতে হইবে। আমাদের আশা, শা রেজা আবার পারস্যকে এসিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ শক্তিরূপে পরিণত করিতে সমর্থ হইবেন।

বঙ্কিম-স্মৃতি *

কৈশোরে যখন সাহিত্য সেবায় নিযুক্ত ছিলাম ও যখন 'সাহিত্য' পত্রিকার সহযোগী সম্পাদকের ভার আমার উপরে ন্যস্ত ছিল, তখন বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে একবার গিয়াছিলাম —সে সময় তাঁহার নিকট হইতে যথেষ্ট উপদেশ ও উৎসাহ প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। তাঁহার সহিত আমার সম্বন্ধ কতকটা পুরুষানুক্রমিক বলিতে পারি, কারণ আমার পূজ্যপাদ শ্বশুর মহাশয় রমেশচন্দ্র দত্ত যখন বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে বাঙ্গালা রচনা করিবার ইচ্ছা ও অসামর্থ্য জানান, তখন বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহাকে সাহিত্য সেবায় উৎসাহিত করিয়া বলেন যে, আপনাদের মত শিক্ষিত লোকের বাঙ্গালা রচনায় কুণ্ঠাবোধ করা উচিত নহে—আপনারা যাহাই লিখিবেন, তাহাই বাঙ্গালা হইবে। বঙ্কিমচন্দ্র আমার পত্নীকে তাঁহার গ্রন্থাবলী নিজ হস্তে নাম লিখিয়া উপহার দিয়াছিলেন। সে গ্রন্থাবলী আমি সযত্নে তুলিয়া রাখিয়াছি।

বহুদিন প্রবাসের ফলে যেমন দেশের সহিত সংস্রব বিচ্ছিন্ন হইয়া আইসে, তেমনই নানা কারণে বঙ্গসাহিত্যের সহিত আমার সম্বন্ধ ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছিল। জীবনের অপরাহ্নে সেই সম্বন্ধ দৃঢ় করিবার এই সুযোগলাভে আমি কৃতার্থ হইয়াছি।

বঙ্গবাসীর নিকট বঙ্কিমচন্দ্র এত সুপরিচিত যে, তাঁহার জীবন-বৃত্তান্ত আলোচনা করা বাহুল্য দোষযুক্ত মনে হইতে পারে। কিন্তু ক্ষণজন্মা মহাপুরুষের সংখ্যা এ দেশে অতি অল্প এবং দেশবাসী তাঁহাদের স্মৃতি-রক্ষণে ও তাঁহাদিগের প্রদর্শিত পথানুসরণে সাধারণতঃ উদাসীন। এই সকল মহাজনের জীবনের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত যে কোন প্রকারে সদাসর্ব্বদা দেশবাসীর সমক্ষে প্রদীপ্ত রাখিতে পারিলে অসাড় শরীরে প্রাণসঞ্চারের সম্ভাবনা হইতে পারে। সেই কারণে তাঁহাদিগের জীবন-বৃত্তান্তের আলোচনা নিতান্ত নিষ্ফল ও নিষ্প্রয়োজন নহে

১৭৬১ শকাব্দে ১৩ই আষাঢ় তারিখে বঙ্কিমচন্দ্র এই ভিটায় জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যে হুগলী কলেজে বিদ্যাশিক্ষা করেন। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াই ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ প্রাপ্ত হয়েন। কর্ম্মসূত্রে নানা স্থান পরিভ্রমণ করিয়া শেষজীবনে আলীপুরে আইসেন ও ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করেন।

১৩০০ সালের ২৬শে চৈত্র তারিখে দেশবাসীকে শোক-সাগরে নিমজ্জিত করিয়া তিনি দেহত্যাগ করেন।

বাল্যকাল হইতেই তাঁহার সাহিত্যানুরাগ অত্যন্ত প্রবল ছিল। পাঠ্যাবস্থাতেই পদ্য রচনা করিয়া মধ্যে মধ্যে 'প্রভাকর' ও অন্যান্য পত্রে প্রকাশ করিতেন। সুকবি ও আমার পূর্ব্বপুরুষ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ইঁহার প্রথম সাহিত্য-গুরু। পঞ্চদশ বৎসর বয়সে "ললিতা ও মানস" নামক একখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ তিনি প্রণয়ন করেন। ২৭ বৎসর বয়সে তাঁহার প্রসিদ্ধ উপন্যাস "দুর্গেশ নন্দিনী" প্রকাশিত হয়। এই একখানি গ্রন্থেই বঙ্কিমচন্দ্র সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর লেখক বলিয়া পরিচিত হয়েন। তাহার পর যে সকল উপন্যাস রচনা করেন, তাহার মধ্যে কোনও একখানি লিখিলেই বোধ হয় তিনি অমরত্ব লাভ করিতে পারিতেন। এই উপন্যাসগুলির মধ্যে কয়েকখানি য়ুরোপীয় ভাষায় অনূদিত হইয়াছে।

১২৭৯ বঙ্গাব্দে তিনি "বঙ্গদর্শন" নামে একখানি নূতন ধরণের মাসিকপত্র প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। বঙ্গে "বঙ্গদর্শন" বিদ্যালোচনা বিষয়ে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্র উহার সম্পাদন ভার পরিত্যাগ করিলে ১২৮২ সালে ঐ মাসিকপত্র বন্ধ হইয়া যায়।

বঙ্কিমচন্দ্র কেবল যে উপন্যাস রচনাতেই কৃতিত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন, এমত নহে। "ধর্ম্মতত্ত্বে" ও "কৃষ্ণচরিত্রে" তাঁহার সূক্ষ্মদর্শিতার, দূরদর্শিতার ও সুযুক্তিপূর্ণ গবেষণার পরিচয় পাওয়া যায়।

যে সময় সাহিত্যক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের উদয় হয়, তখন অনাদৃতা, অসম্মানিতা বঙ্গভাষার অতি দীন-মলিন অবস্থা। সেই সময় বঙ্কিম আপনার সমস্ত শিক্ষা, অনুরাগ ও প্রতিভা উপহার লইয়া সেই উপেক্ষিতা দীনহীনা বঙ্গভাষার চরণে সমর্পণ করেন। তখন নবপ্রবর্ত্তিত ইংরাজী শিক্ষার স্রোতে সকলেই ভাসমান। ইংরাজীতে দুই ছত্র রচনা করিতে পারিলেই শিক্ষিত যুবক গর্ব্বে স্ফীত হইতেন। বঙ্গভাষার প্রতি অনুরাগ গ্রাম্য বর্ব্বরতা বলিয়া পরিগণিত হইত। সেই সময় বঙ্কিম তাঁহার সুশিক্ষা ও অসাধারণ ধীশক্তি প্রভৃতি ধনরত্নরাজি বঙ্গভাষার পদে নিবেদন করেন। সৌভাগ্যগর্ব্বে সেই অনাদর-মলিন ভাষার মুখে সহসা অপূর্ব্ব লক্ষ্মীশ্রী প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে। তাঁহার অলৌকিক প্রতিভার আলোকে বঙ্গবাসী বঙ্গভাষার স্বরূপ অন্বেষণে প্রবৃত্ত হয় ও তাঁহারই উৎসাহে সাদরে মাতৃভাষার পূজা করিতে আরম্ভ করে।

সাহিত্যক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের স্থান নির্দ্দেশ অথবা তাঁহার অশেষবিধ রচনাবলীর সমালোচনা করা আমার ক্ষমতাতীত এবং এই অভিভাষণের অভিপ্রায় বহির্ভূত। বঙ্কিমচন্দ্র যে বঙ্গ-সাহিত্যের নবযুগ প্রবর্ত্তক, তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত। তিনি কেবল যে দেশব্যাপী একটি ভাবের আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিলেন, তাহা নহে। সেই আন্দোলন উপযুক্ত সীমা অতিক্রম করিয়া ভাষাকে বিপথে না লইয়া যায়, সে বিষয়েও তিনি বিশেষ মনোযোগী ছিলেন। প্রায় অনেক স্থলেই লেখক ও সমালোচক সম্প্রদায় স্বতন্ত্র হইয়া থাকে। কিন্তু বঙ্গসাহিত্যের যে অবস্থায় বঙ্কিমের উদয়, সে সময়ে একই লোক দুই কার্য্যের ভার গ্রহণ না করিলে সাহিত্য এত দ্রুত উন্নতি লাভ করিতে পারিত না। বঙ্কিম ভিন্ন আর কেহ উভয় কার্য্য দক্ষতার সহিত পরিচালনা করিতে পারিতেন না। এক দিকে গঠন—অপর দিকে রক্ষণ ও বিপথ হইতে নিবারণ এই দুই কার্য্য বঙ্কিম তাঁহার রচনা ও সমালোচনার দ্বারা একাকী করিয়াছিলেন। সাহিত্যের পক্ষে যাহা কিছু কণ্টকস্থানীয়—যাহা কিছু অমার্জ্জনীয়, তাহা তাঁহার কঠোর কশাঘাতে ও সুতীক্ষ্ণ বিদ্রূপে নির্ম্মূল করিতেন। সাহিত্যে উচ্চাদর্শ গঠনের ও সেই আদর্শ রক্ষণের ভার তিনি স্বহস্তেই রাখিয়াছিলেন। তাই যখন সাহিত্যের গভীর প্রশান্ত-সরোবর হইতে প্রস্রবণের প্রবল উৎস তিনি উদ্ঘাটন করিয়াছিলেন, তখন তাহাকে উদ্দাম অপ্রতিহতরূপে প্রবাহিত হইতে দেন নাই। লেখক হিসাবে তিনি যেমন নির্ম্মল শুভ্র সংযত হাস্যরস সাহিত্যে প্রথম আনয়ন করেন এবং হাস্যরসকে উপদ্রববিজড়িত আদি রসের এবং নিম্নশ্রেণীর প্রহসনের পংক্তি হইতে উন্নত করিয়া উচ্চতর শ্রেণীতে অধিষ্ঠিত করেন, সমালোচক হিসাবে তেমনই সুসঙ্গতি, সুরুচি ও শিষ্টতার সীমা নির্দ্দেশ করিয়া দেন।

সাধারণতঃ একটি ধারণা অনেকের আছে যে, সরকারী কার্য্য করিলে মানুষ সকল কর্ম্মের অযোগ্য হইয়া পড়ে। বঙ্কিমের জীবন অনুধাবন করিলে এই ধারণা ভিত্তিহীন বলিয়া প্রমাণিত হইবে।

* কাঁঠালপাড়া বঙ্কিম সাহিত্য-সম্মেলনের তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণ হইতে গৃহীত।

রাজকার্য্যে তাঁহাকে কখন হয় ত সাময়িক অপ্রীতিকর জীবন যাপন করিতে হইয়াছে, কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন সুখ ও শান্তি এই জরামৃত্যু শোক-বিজড়িত সংসারে কাহারও ভাগ্যে সম্ভব হয় না এবং তিনি যে ব্যবসায়ী হউন না কেন, সুখ ও দুঃখের ভার সমভাবে তাঁহাকে বহন করিতে হয়। যিনি সেই সুখ ও দুঃখের ভার সমভাবে বহন করিয়া কর্ত্তব্যপালনে অবিচলিত থাকিয়া জীবনসংগ্রামে জয়লাভ করেন, তিনিই প্রকৃত মহাপুরুষ। বঙ্কিমচন্দ্রের অসামান্য প্রতিভার সহিত কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও অসামান্য স্বদেশ-প্রেম সুন্দরভাবে মিশ্রিত ছিল।

অধিকাংশ গ্রন্থেই তাঁহার সেই উদার হৃদয়ের স্বদেশ-প্রেমিকতার উচ্ছ্বাস সুপরিস্ফুট। তাঁহার তিরোভাবের কত বৎসর পরে তাঁহারই মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া দেশবাসী স্বদেশ-প্রেমের আবেগ অনুভব করে। তিনি বাঙ্গালার যে বিচিত্র রূপ তাঁহার মানসনেত্রে দেখিয়াছিলেন, কত বৎসর পরে সেই ছবির ছায়া আমাদের নয়নপথে উদিত হইতেছে। মঙ্গলময়ের বিধানে কত কালে—কত চেষ্টার ফলে যে সেই ছবি পরিস্ফুট হইয়া উঠিবে, তাহা কল্পনা করিতেও সাহস হয় না।

বঙ্কিমচন্দ্রের স্বর্গারোহণের অব্যবহিত পরে কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ কোন শোক-সভায় আক্ষেপ করিয়াছিলেন,—"আজ বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর পরেও আমরা সভা ডাকিয়া সাময়িক পত্রে বিলাপসূচক প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়া আপনার কর্ত্তব্য সাধন করিতে উদ্যত হইয়াছি। তার অধিক আর কিছুতে হস্তক্ষেপ করিতে সাহস হয় না। প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা বা কোনরূপ স্মরণচিহ্ন স্থাপনের প্রস্তাব করিতে প্রবৃত্তি হয় না। পূর্ব্ব অভিজ্ঞতা হইতে জানা গিয়াছে যে, চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনা অধিক। উপর্য্যুপরি বারংবার অকৃতজ্ঞতা ও অনুৎসাহের পরিচয় দিলে ক্রমে আর আত্মসম্মানের লেশমাত্র থাকিবে না এবং ভবিষ্যতে প্রবন্ধ লিখিয়া শোকের আড়ম্বর করিতেও কুণ্ঠা বোধ হইবে।"

তাঁহার মৃত্যুর ৩১ বৎসর পরে আজও তাঁহার পুণ্য জন্মভূমির উপর মর্ম্মর-প্রস্তর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠানকল্পে সাহায্যের জন্য দ্বারে দ্বারে আমাদের ঘুরিয়া বেড়াইতে হইতেছে!

রাজনীতি, সমাজ, ধর্ম্ম, ভাষা ও স্বদেশ-প্রীতি প্রবুদ্ধ করিতে স্বর্গীয় রাজা রামমোহন রায়ের পরবর্ত্তী বোধ হয় কোন বাঙ্গালীই বঙ্কিমচন্দ্রের ন্যায় অকুণ্ঠিতভাবে সাহায্য করিতে সমর্থ হয়েন নাই। দেশবাসীর সেই চিরঋণের কণামাত্র একটি মর্ম্মর প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার দ্বারা পরিশোধ করিবার জন্য আজও আমাদের এতই লুব্ধ আশা—এতই নিষ্ফল প্রয়াস!

আমার বিশ্বাস, বঙ্গবাসী—বঙ্গভাষী—সাহিত্যসেবী ও দেশকর্ম্মী অকৃতজ্ঞতা-কলঙ্ক-মুক্ত হইতে পরাঙ্মুখ হইবেন না।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত (আই-সি-এস্)।

বৃহৎ বরণ

ওরে আজ রোস্‌নে দূরে
দাঁড়া সে বুকটি ঘেঁসে,
ছুড়ে ফ্যাল্ ভাবনা ভীতি
আবেগে যাক্ তা ভেসে';
আজি আর নাই রে মানা,
পৃথিবীর নাই সীমানা,
যত দূর দৃষ্টি চলে
সবুজে সবুজ মেশে।

এ কি এ উন্মাদনা!
ধ'রে যে রাখতে নারি,
হৃদয়ের বাঁধ ভেঙ্গেছে
ছুটেছে ভাব-জোয়ারী!
এস আজ আস্‌বে যদি
এ হিয়ার নাই অবধি,
আমি আর নাই রে আমি
গিয়েছি আপনা ছাড়ি'!

ছুটেছে প্রাণ ছুটেছে
প্রেমেরি দিগ্বিজয়ে,
স'রে আজ যাস্‌নে কোণে
লুকিয়ে' রোস্‌নে ভয়ে।
বুকে আজ আয় রে সবাই
নিখিলে প্রাণ পেতে চাই—
ছোট এ গণ্ডী ছেড়ে'
বৃহতে মগ্ন হ'য়ে।

ভেসে আয় দৈন্যরাশি
বিপদের বন্যাসহ;
অপমান আর অত্যাচার
এ প্রাণের অর্ঘ্য লহ।
সুধা-বিষ কান্না-হাসি
সবারে তুল্য বাসি,
প্রাণের এ তীর্থশালে
কেহ আজ তুচ্ছ নহ।

শ্রীনলিনী গুপ্ত, এম-এ

পরলোকে মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ রায়

বিগত ২১শে পৌষ মঙ্গলবার বেলা ১টা ৩৭ মিনিটের সময় নাটোরের স্বনামধন্য মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ রায়—প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী ভবানীর বংশধর পরলোক গমন করিয়াছেন। কয়েক দিবস পূর্ব্বে মহারাজ সখ করিয়া পৌত্র ও কয়েকজন পুরবাসীর সহিত পদব্রজে এল্‌গিন রোড অতিক্রম করিতেছিলেন। সেই সময়ে একখানা ভাড়াটিয়া ট্যাক্সি গাড়ীর আঘাতে তিনি ভূপতিত হয়েন। তাহার ফলে সংজ্ঞাশূন্য অবস্থায় সময় যাপনের পর জগদিন্দ্রনাথ আকস্মিক দুর্ঘটনায় একাদশ দিবসে সকল প্রকার চিকিৎসার অতীত হইয়াছেন।

সন ১২৭৫ সালে ৪ঠা কার্ত্তিক জগদিন্দ্রনাথের জন্ম হয়। নাটোরের মহারাণী ব্রজসুন্দরী তাঁহাকে দত্তক পুত্ররূপে গ্রহণ করেন। ৮ বৎসর বয়ঃক্রম কালে ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে জগদিন্দ্রনাথ 'মহারাজ' উপাধি প্রাপ্ত হয়েন। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার বিবাহ হয়। মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ রাজসাহী বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেন। আমরা তাঁহারই মুখে শুনিয়াছি যে, বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভকালে তিনি যাঁহার শিক্ষাধীন ছিলেন, সেই উন্নতমনা শিক্ষকের অভিভাবকতায় তাঁহার জীবনের অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। আভিজাত্যগর্ব্ব কোনও দিন তাঁহার হৃদয়কে বৃথা অহঙ্কারে স্ফীত করিতে পারে নাই। বাল্য ও কৈশোরের সেই সুখময় জীবনের কথা তিনি "শ্রুতিস্মৃতি" শীর্ষক আত্মজীবনকথাতেও লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর জগদিন্দ্রনাথ কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে বি, এ পর্য্যন্ত বাহিরের ছাত্রহিসাবে পাঠ করিয়াছিলেন। ইংরাজী, সংস্কৃত ও বাঙ্গালা সাহিত্য ব্যতীত দর্শন শাস্ত্রেও মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। আমরা জানি, দর্শনশাস্ত্রে তাঁহার এমনই প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি ছিল যে, তিনি এম্, এ ক্লাশের দর্শন-শিক্ষার্থীর পাঠেও সাহায্য করিতেন।

ইন্দিরার বরপুত্র হইলেও দেবী ভারতীর স্বর্ণবীণার মধুর ঝঙ্কার জগদিন্দ্রনাথকে আকৃষ্ট করিয়াছিল। তিনি এমনই অধ্যয়নানুরাগী ছিলেন যে, সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান, দর্শন সকল প্রকার শাস্ত্রকে অধিকার করিবার জন্য জীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিতেন। গুণদক্ষ শিক্ষকের সহায়তায় তিনি সঙ্গীতশাস্ত্রেও সম্যক্ বুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার ন্যায় মৃদঙ্গবাদক অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যাইত।

কাব্যকলার অনুরাগী হইয়াও তিনি ব্যায়ামের বিষয়ে পক্ষপাতী ছিলেন। প্রসিদ্ধ মল্লের নিকট হইতে তিনি মল্লবিদ্যা আয়ত্ত করিয়াছিলেন। ক্রিকেট ক্রীড়ায় তাঁহার এমন অনুরাগ ছিল যে, বিগত ১৯০২ খৃষ্টাব্দে তিনি স্বয়ং একটি 'ক্রিকেট টিম,' প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার উৎকর্ষ সাধনের জন্য বহু অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন। প্রায় দ্বাদশবর্ষ ধরিয়া এই দলটি ভারতবর্ষে নানাস্থানে ক্রীড়ায় প্রতিযোগিতা করিয়াছিল।

মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। ইহার পর ১৮৯৭ এবং ১৯১২ খৃষ্টাব্দে দুইবার সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়া কার্য্য করিয়াছিলেন।

বাঙ্গালার জমীদারগণের অধিকাংশ রাজনীতিক আন্দোলনে যোগদান করিয়া গবর্ণমেণ্টের অপ্রিয়ভাজন হইতে চাহেন না; কিন্তু মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ দেশের সুসন্তান ছিলেন, তিনি কংগ্রেসের সহিত সংস্রব রাখিয়া দীর্ঘকাল দেশের সেবা করিয়াছিলেন। মনে পড়ে, স্বদেশী আন্দোলনের প্রথম যুগে যখন দেশাত্মবোধের প্রেরণায় সমগ্র বঙ্গদেশে জাগরণের সাড়া পড়িয়াছিল, সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি সমগ্র দেশকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিয়াছিল, বাঙ্গালার মুকুটহীন সম্রাট্

লেখক ও দৌহিত্রসহ মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ রায়
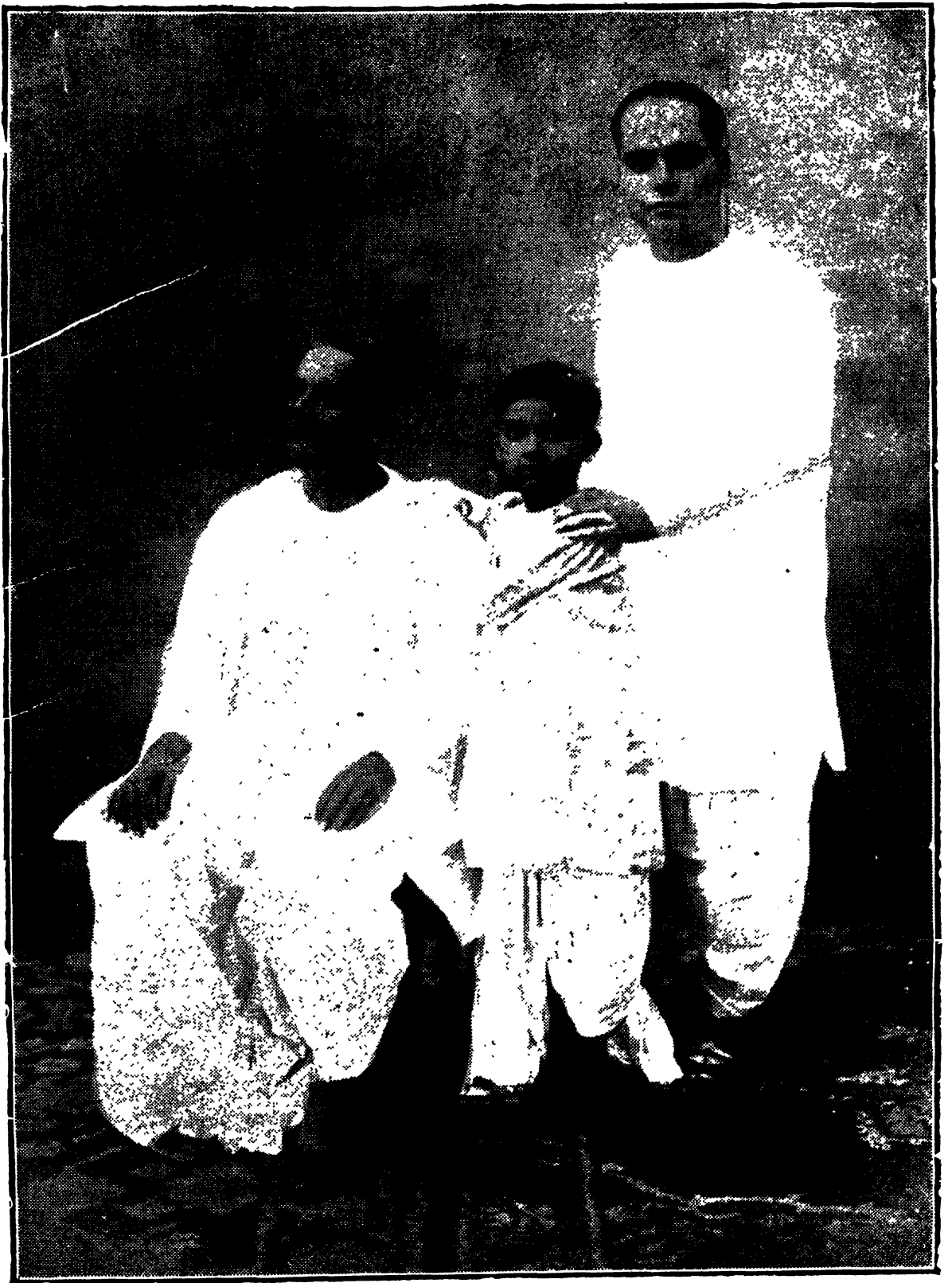
সুরেন্দ্রনাথের জলদগম্ভীর বাণী সমুদ্রমেখলা ভারতবর্ষকে অতিক্রম করিয়া সুদূর প্রতীচ্যদেশে অনুরণিত হইয়াছিল, তখন নাটোরের মহারাজ জগদিন্দ্রনাথও দেশপূজার আহ্বানে সাড়া না দিয়া পারেন নাই।

যৌবনের চলচঞ্চল উদ্দাম আবেগ অনেকটা স্থির হইয়া আসিবার পর জগদিন্দ্রনাথ রাজনীতিক্ষেত্রে আর তেমনভাবে যোগ দিতে পারেন নাই। তখন বীণাপাণির কমলবনে সমগ্র মন-প্রাণ দিয়া তিনি কুসুম চয়ন আরম্ভ করিয়াছিলেন। সাহিত্যের তিনি অনুরক্ত ভক্ত ছিলেন। জীবনের উপভোগ্য যাবতীয় বিষয়ে অনুরাগ থাকিলেও তাঁহার প্রাণ ভারতীর তপোবনে ধ্যাননিরত হইয়াছিল। ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও ভক্তি সহকারে তিনি আজীবন সাহিত্য-চর্চ্চা করিয়া আসিয়াছিলেন সত্য; কিন্তু তথাপি, প্রকাশ্য-ভাবে যোগদান না করিলেও শেষের দিকে দেশের জাতীয় জাগরণ সম্বন্ধে তিনি কোনও দিন অনবহিত ছিলেন না।

বঙ্গ সাহিত্যের সেবক ও পাঠকবর্গ সাহিত্যিক জগদিন্দ্রনাথকে কোনও দিন বিস্মৃত হইতে পারিবেন না। বাঙ্গালা সাহিত্যে তাহার একটা স্থান আছে এবং থাকিবে। তাঁহার ভাষায় একটা সহজ স্বচ্ছন্দগতি দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রাম্যতাদোষ তাঁহার রচনাপ্রণালীর কুত্রাপি দেখিতে পাওয়া যায় না। সাহিত্য সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্র এবং কবিবর রবীন্দ্রনাথ—উভয়েরই তিনি ভক্ত ও অনুরাগী ছিলেন। জগদিন্দ্রনাথ কয়েকখানি উপাদেয় গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। "সন্ধ্যাতারা" "দারার দুর্ভাগ্য," 'নূরজাহান' পাঠ করিলে তাঁহার কবিত্ব শক্তি এবং ইতিহাস জ্ঞানের প্রচুর পরিচয় পাওয়া যায়। সাহিত্যের পরিপুষ্টি সাধনের জন্য তিনি "মর্ম্মবাণী" নামক একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করেন। একবর্ষকাল পরিচালনার পর "মানসী" মাসিক-পত্রিকার সহিত "মর্ম্মবাণী" সম্মিলিত হয়। এই দুইখানি পত্রিকারই তিনি সম্পাদক ছিলেন। সম্মিলিত "মানসী ও মর্ম্মবাণী" পরিচালন কালে জগদিন্দ্রনাথ সাহিত্যানুরাগের প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রদান করেন। "শ্রুতিস্মৃতি" শীর্ষক ধারা-বাহিক প্রবন্ধে তিনি আত্মজীবন-কাহিনী বিবৃত করিতে-ছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন দেশের নানা বিবরণ দক্ষ ঐতিহাসিকের লেখনীচালনায় ফুটিয়া উঠিতেছিল।

সামাজিক জীবনে জগদিন্দ্রনাথের ন্যায় ব্যক্তি অধুনা দুর্ল্লভ বলিলেই হয়। বাঙ্গালার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও পুরাতন অভি-জাত ব্রাহ্মণ জমীদার গৃহের বংশধর হইয়াও আভিজাত্যগর্ব্ব তাঁহাতে দেখিতে পাওয়া যাইত না। সকল সম্প্রদায়ের সকল অবস্থার লোকের সহিত তিনি এমনই অসঙ্কোচে মিলামিশা করিতেন যে, কেহ বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা অনুভব করিতে পারিত না। যিনি যে ব্যবসায়ীই হউন না কেন, জগদিন্দ্রনাথ অল্পক্ষণের আলাপেই তাঁহার সহিত সেই বিষয়ে এমন আলোচনায় মগ্ন হইতেন যে, নবাগত বুঝিতেই পারিতেন না যে, বিষয়টি তাঁহার প্রিয় নহে। সকল বিষয়েই আলো-চনা করিবার মত সংগ্রহ ও জ্ঞান তাঁহার ছিল। অতি অল্প আলাপেই তিনি যে কোনও ব্যক্তির সহিত আপনার জনের মত ব্যবহার করিতেন।

বন্ধুবাৎসল্য জগদিন্দ্রনাথের চরিত্রের একটা বৈশিষ্ট্য ছিল। দরিদ্র সতীর্থ বা বন্ধুর বিপদ আপদে তিনি যেভাবে সকল প্রকার সাহায্য ও শুশ্রূষা করিতেন, তাহা অভিজাত সম্প্রদায় কেন, সাধারণ ব্যক্তির পক্ষেও অনুকরণীয়। এ সম্বন্ধে অনেক কাহিনী—রচা কথা নহে—আছে, প্রত্যেকটি উপন্যাসের মত রোমাঞ্চকর ও স্বর্ণাক্ষরে লিখিয়া রাখিবার যোগ্য।

জগদিন্দ্রনাথ সাহিত্যের তপোবনে সাধনা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার রচনায় প্রসাদগুণ ও ভাব-মাধুর্য্য বাঙ্গালার সম্পদ হিসাবে চিরস্থায়ী হইবার যোগ্য। আজ তাঁহার অকাল বিয়োগে বাঙ্গালা সাহিত্যের যে ক্ষতি হইল, তাহা বাঙ্গালী পাঠক মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিবে। অভিজাত বংশের সন্তান, ধনীর দুলাল হইয়া জগদিন্দ্রনাথ যে ভাবে সাহিত্যের সেবা করিয়া গিয়াছেন, তাহা শুধু প্রশংসনীয় নহে, অনুকরণযোগ্য। মুন্সীগঞ্জের বিগত সাহিত্য সম্মিলনে মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। সে সময়ে তিনি যে অভিভাষণ পাঠ করিয়াছিলেন, তাহাতে জ্ঞাতব্য বহু বিষয় ছিল। উহাই তাঁহার শেষ অভিভাষণ। বাঙ্গালা সাহিত্যে আর তাঁহার লেখনী-প্রসূত অনবদ্য ভাষার ঝঙ্কার শুনিতে পাওয়া যাইবে না। ৫৮ বৎসর বয়সে, আকস্মিক দুর্ঘটনায় এই মৃত্যু যে অত্যন্ত করুণ ও শোকাবহ, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। মহারাণী স্বামিহীনা হইয়া যে প্রচণ্ড শোক পাইয়াছেন, তাহাতে আমরা সমবেদনা প্রকাশ করিতেছি। পুত্র

যোগেন্দ্রনাথ ও কন্যা বিভাবতী পিতৃশোকে যে আঘাত পাইয়াছেন, তাহাতে আমরা ব্যথিত। ভগবান বন্ধুবৎসল সাহিত্যপ্রেমিক মহাপ্রাণ মহারাজের পরলোকগত আত্মার তৃপ্তি ও শান্তি বিধান করুন।

ডাক্তার চন্দ্রশেখর কালী

ডাক্তার চন্দ্রশেখর কালী

গত ১৯শে পৌষ বেলা ১২টার পর কলিকাতার প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার চন্দ্রশেখর কালী মহাশয় ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। ঢাকা জিলার ধামরাই-গ্রামে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল। তাঁহার পিতা প্রাণধন কালী মহাশয় পুত্রকে ইংরাজী বিদ্যায় শিক্ষিত করিলেও হিন্দু আদর্শে তাঁহাকে গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। ঢাকা হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া চন্দ্রশেখর কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে শিক্ষালাভ করেন। ডাক্তারী পাশ করিবার পর তিনি পাবনায় এলোপ্যাথি মতে চিকিৎসা ব্যবসায় আরম্ভ করেন; কিন্তু পরে এলোপ্যাথিতে বীতশ্রদ্ধ হইয়া হোমিওপ্যাথিমতে চিকিৎসা করিতে আরম্ভ করেন এবং পরে কলিকাতায় আসিয়া অল্পকালের মধ্যেই সহরের অন্যতম প্রধান হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক বলিয়া পরিগণিত হয়েন। সেই সময়ে তিনি বহু দুরারোগ্য ব্যাধির চিকিৎসা করিয়া সুনাম অর্জ্জন করিয়াছিলেন। অনেকের নিকট তিনি ধন্বন্তরী বলিয়া গৃহীত হইয়াছিলেন। আমরা কয়েকটি রোগে তাঁহার আশ্চর্য্য ক্ষমতার পরিচয় পাইয়াছিলাম। কোনও এক দরিদ্রের facial paralysis রোগে তিনি মাত্র এক ফোঁটা ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা রোগীকে স্বল্প কাল মধ্যে নির্ব্যাধি করিয়াছিলেন। এলোপ্যাথিক চিকিৎসকগণ সেই কঠিন রোগে অস্ত্রোপচার করিবার কথা পাড়িয়াছিলেন। বাঙ্গালা ভাষায় তিনি কয়েকখানি উৎকৃষ্ট হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা-গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। উহাতে এ দেশের বহু চিকিৎসা-শিক্ষার্থী উপকৃত হইয়াছে। তাঁহার প্রস্তুত কয়েকটি বিশেষ রোগের বিশেষ ঔষধের সুনাম আছে। তাঁহার রচিত কয়েকটি দেব-দেবীর সঙ্গীত বাঙ্গালা ভাষার সম্পদ মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে। যাত্রা, কীর্ত্তন, কথকতা ও রামায়ণ গান ইত্যাদি জাতীয় সঙ্গীত ও অভিনয় আদিতে তিনি পরমানন্দ লাভ করিতেন। এ বিষয়ে তাঁহার গুণগ্রাহিতার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। এমন কি, আমরা তাঁহাকে কোন কোন পালার গান সম্পূর্ণরূপে আবৃত্তি করিতে শুনিয়াছি, অনেক ছড়া

কাটিতে শুনিয়াছি। বস্তুতঃ বাঙ্গালা সাহিত্যের এই অঙ্গের প্রতি তাঁহার যে শ্রদ্ধা ছিল, তাহা অধুনা নবীন সাহিত্যানুরাগীদিগের মধ্যে বিরল। তিনি আকারে বিরাট ছিলেন, নৈতিক শক্তিও তাঁহার সামান্য ছিল না। আড়ংঘাটার রেলসংঘর্ষ কালে তিনি কত আহত অভাগার সেবা করিয়াছিলেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। শুনিয়াছি, তিনি সেই সময়ে নিজের যজ্ঞোপবীত ছিঁড়িয়া তদ্দারা আহতের অঙ্গে ব্যাণ্ডেজ বাধিয়া দিয়াছিলেন। আহতগণকে সন্তর্পণে স্থানান্তরিত করিবার সময়ে তাঁহার দৈহিক শক্তির সম্যক পরিচয় প্রস্ফুট হইয়াছিল। তিনি আনুষ্ঠানিক শুদ্ধাচারী হিন্দু ব্রাহ্মণ ছিলেন। জপতপ যজ্ঞ হোমে তাঁহার অনেক সময় অতিবাহিত হইত। তাঁহার কলিকাতার বাটীতে প্রতিবৎসর সমারোহে পূজাপার্ব্বণ সম্পন্ন হইত। সে সময়ে তিনি প্রাচীনকালের হিন্দু গৃহস্থের মত নানা জনের মধ্যে আনন্দ বিতরণ করিতেন। বস্তুতঃ তাঁহার মত 'সেকালের' গুণগ্রাহী ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু গৃহস্থের সংখ্যা ক্রমেই হ্রাস হইয়া আসিতেছে। তিন পুত্র ও তিন কন্যা রাখিয়া পরিণত বয়সে ডাক্তার চন্দ্রশেখর কালী পরলোক গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স প্রায় ৭০ বৎসর হইয়াছিল। এ জন্য তাঁহার মৃত্যুতে শোক করিবার কিছুই নাই। এ যুগের বাঙ্গালী তাঁহার মত 'হিন্দু গৃহস্থের জীবন' যাপন করিতে পারিলে তাঁহার স্মৃতির সম্মান রক্ষিত হইবে।

ঋণী

আখিরী যে হ'য়ে এল,
মিছে কেন জের টানা।
মিটিয়ে দিতে হবে এবার,
যে যা পাবে ষোল আনা।

দু' হাত পেতে ঋণ করেছি,
ভাবিনিক ভবিষ্যৎ।
দু' চোখ বুজেই ক'রে গেছি
খতের উপর দস্তখৎ।

পাহাড় প্রমাণ দাঁড়িয়ে গেছে
সুদে আসল বাকি জায়ে।
ভিটে-ভাটা যা ছিল মোর
তাও গিয়েছে দেনার দায়ে।

সর্ব্বস্বান্ত হ'য়ে এখন;
ভার হয়েছে জীবন কাটা।
দিবানিশি ভাবছি যে তাই
নাই যে কিছু পুঁজিপাটা।

ভালবাসার দাবী নিয়ে
ডিক্রীজারী করা আছে।
আপন বল্‌তে যা আছে তাও
নীলাম হ'য়ে যায় গো পাছে।

নিঃস্ব হ'য়ে বিশ্ব-মাঝে
ভিক্ষা মাগি গাঁয়ে গাঁয়ে।
বিনিময়ে বিকিয়ে যাব
কবে আমি তা'দের পায়ে।

সবার কাছেই ঋণী আমি
সবাই যে চায় কিনে নিতে।
(আমার) জীবন-মরণ যাহার হাতে
চায় না যে সে ছেড়ে দিতে।

শ্রীপ্রমথনাথ বসু

রাজমাতা আলেকজান্দ্রা

বাঙ্গালীর কবি মধুসূদন গাহিয়াছেন,—

"সেই ধন্য নরকুলে, লোকে যারে নাহি ভুলে,
মনের মন্দিরে নিত্য সেবে সর্ব্বজন।"

বস্তুতঃ যে সকল নরনারী জগতে তাঁহাদের ব্যক্তিত্বের প্রভাব রক্ষা করিয়া ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে পারেন, তাঁহারাই সার্থক জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন। এ হিসাবে ইংলণ্ডের রাজমাতা মহারাণী আলেকজান্দ্রা নরকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া ধন্য হইয়াছেন। তাঁহার সুদীর্ঘ এক-অশীতিবর্ষব্যাপী জীবন উপন্যাসের মত মনোরম। ইংলণ্ডের রাজনীতিক, সামাজিক এবং পারিবারিক জীবনে আলেকজান্দ্রা এই সুদীর্ঘকাল যে প্রভাব বিস্তার করিয়া গিয়াছেন, তাহার তুলনা বিরল। ইংলণ্ডের রাজকবি টেনিসন এই Sea King's daughter অথবা সাগর-রাজকন্যাকে অভিনন্দিত করিয়া যে কবিতা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা আজিও ইংলণ্ডের জনসাধারণের তাঁহার প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধাপ্রীতির পরিচায়ক। টেনিসন সেই সময়ে লিখিয়াছিলেন,—"Joy to the people and joy to the crown, come to us Love us and make us your own. এস জনসাধারণের আনন্দ, এস রাজসিংহাসনের আনন্দ, এস তুমি, আমাদিগকে ভালবাস, আমাদিগকে আপনার করিয়া লও।" আলেকজান্দ্রা মাত্র উনবিংশ বর্ষ বয়সে ইংলণ্ডের রাজপুত্রবধূরূপে ইংলণ্ডে পদার্পণ করিয়াছিলেন এবং এই সাদর প্রীতিপূর্ণ আহ্বানের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছিলেন। ইহা তাঁহার পক্ষে সামান্য গৌরবের কথা নহে। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে যখন এই দিনেমার রাজকুমারী ইংলণ্ডের যুবরাজ এডোয়ার্ডের মনোনীতা বধূরূপে ইংলণ্ডে আগমন করেন, তখন হইতে তাঁহার চিরবিদায়ের দিন পর্য্যন্ত তিনি কবি টেনিসনের আহ্বানের প্রত্যুত্তর প্রদান করিয়াছিলেন, তাঁহার পারিবারিক, সামাজিক এবং রাজনীতিক জীবনে জাতির ভালবাসা, ভক্তি ও শ্রদ্ধা অর্জ্জনে সমর্থ হইয়াছিলেন।

বর-কন্যাবেশে সম্রাট্ এডোয়ার্ড ও রাণী আলেকজান্দ্রা

আজ তাঁহার শোকে ইংরাজ জাতি মুহ্যমান। আজ ইংরাজ জাতি তাঁহাকে হারাইয়া যেন আপনার অতি নিকট-আত্মীয়কে হারাইয়াছে বলিয়া মনে করিতেছে। তাঁহার ব্যক্তিত্বের প্রভাব তাঁহার মৃত্যুতে যেন শত সৌরকরোজ্জ্বল প্রভায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। গত ২০শে নভেম্বর শুক্রবার বেলা ৫টা ২৫ মিনিটের সময় আলেকজান্দ্রা সান্‌ড্রিংহাম রাজপ্রাসাদে ৮১ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। উহার পরের রবিবারের প্রাতঃকালে তাঁহার নশ্বর দেহ সান্‌ড্রিংহাম প্রাসাদ হইতে সান্‌ড্রিংহাম গির্জ্জায় স্থানান্তরিত করা হয়। যতক্ষণ দেহ লণ্ডনে স্থানান্তরিত করা হয় নাই, ততক্ষণ উহা গির্জ্জার বেদীর পার্শ্বদেশে রক্ষিত হইয়াছিল। ঐ রবিবারে গির্জ্জায় তাঁহার মৃত্যুকালীন ধর্ম্মকার্য্য সম্পাদিত হইয়াছিল। রাজা পঞ্চম জর্জ্জ ও রাণী মেরী এবং রাজপরিবারের অন্যান্য বংশধর এই ধর্ম্মকার্য্যে যোগদান করিয়াছিলেন। তাহার পর জনসাধারণকে এই পবিত্র মন্দিরে তাহাদের চিরপ্রিয় রাজমাতাকে একবার শেষ দেখা দেখিবার

নিমিত্ত অনুমতি প্রদান করা হইয়াছিল। রাজ-পরিবারের এই শোকে ইংলণ্ডের ধনী, নির্ধন, পণ্ডিত, মূর্খ, আপামর সাধারণ সন্তপ্ত হৃদয়ে সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছিল,—রাজমাতার প্রতি তাহাদের আন্তরিক শ্রদ্ধাপ্রীতি জ্ঞাপন করিয়াছিল। এই শ্রদ্ধাপ্রীতি-প্রদর্শন কেবল রাজমাতা বলিয়া নহে, ইহাকে নারীত্বের, মাতৃত্বের, পত্নীত্বের প্রতি জাতির সম্মানপ্রদর্শন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তাঁহার সৌন্দর্য্যের, তাঁহার কোমলতার, তাঁহার মধুরতার, তাঁহার মহানুভবতার, তাঁহার দয়াদাক্ষিণ্যের প্রতি এই সম্মান প্রদর্শিত হইয়াছিল। ষাট বৎসর ধরিয়া যে নারী এই ভাবে একটা বিরাট জাতির হৃদয়-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকিবার উপযোগী গুণরাশি অর্জ্জন করিতে পারেন, তাঁহার প্রতি হৃদয় স্বতঃই শ্রদ্ধায় ভরিয়া যায়। যে মহীয়সী নারীর গুণকীর্ত্তনে ডিকেন্স, থ্যাকারে, টেনিসন, পাদরী উইলবারফোর্স ও ডিন ষ্ট্যানলীর মত খ্যাতনামা লোক শতমুখ হইতে পারেন, তাঁহার জীবনকথা স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হইয়া থাকিবার যোগ্য।

রাণী আলেকজান্দ্রার মুকুটোৎসব—১৯০২ খৃঃ
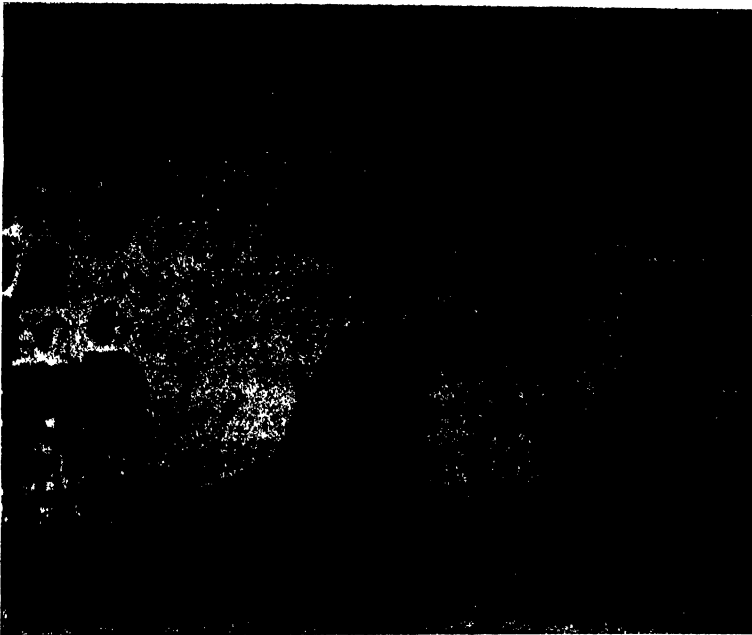
কি গুণে আলেকজান্দ্রা ইংরাজ জাতিকে এরূপে মুগ্ধ করিতে পারিয়াছিলেন? এক জন ইংরাজ লেখক তাঁহার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—"She was a dignified lady, an exceptional wife and mother, a devoted relative and friend, but she was also tolerant, unassuming, natural as well as tactful in manner, charitable in mind and action, and altogether charming." তাঁহার দুর্ব্বলতাও যে ছিল না, এমন নহে, কিন্তু তাঁহার জীবনে সে দুর্ব্বলতাও দোষ না

সেণ্ট জর্জ্জ চ্যাপেল গীর্জ্জায় রাণী আলেকজান্দ্রার বিবাহ

হইয়া গুণে পরিণত হইয়াছিল,—তিনি হৃদয়ের মহত্বে, দয়ায়, করুণায় যোগ্য অযোগ্য বিচার করিতে পারিতেন না, দুঃস্থ প্রার্থী ও অসুস্থ রোগাতুর তাঁহার নিকট যোগ্যতা অযোগ্যতার মাপকাঠিতে বিচার পাইত না। তাঁহার নারী-

বিবাহ সঙ্গিনীসহ রাণী আলেকজান্দ্রা

সুলভ করুণার উৎস সকলের জন্য সকল সময়ে সমানভাবেই উন্মুক্ত ছিল। এমন নারীর জীবন-কথা লিপিবদ্ধ করিতে আনন্দ আছে।

সাগরবেষ্টিত ক্ষুদ্র দিনেমার রাজ্যের জগতের মানচিত্রে স্থান অতি সামান্য নহে। অতি প্রাচীন কাল হইতেই এই ক্ষুদ্র দেশের 'সাগর-রাজারা' নানা দেশের ইতিহাসের পত্রাঙ্কে তাঁহাদের নামের প্রভাব রাখিয়া গিয়াছেন। দিনেমার রাজবংশ য়ুরোপের নানা রাজ্যের নানা সিংহাসনে নানা রাজা প্রদান করিয়াছেন। অতি প্রাচীনকাল হইতেই তাঁহারা নির্ভয়ে দুস্তর সাগর পার হইয়া নানা দিগ্‌-দেশ জয় করিয়াছেন, নানা দেশে নানা নূতন মিশ্রিত জাতির সৃষ্টি করিয়াছেন। ইংলণ্ডের রাজা কেনিউট দিনেমারজাতীয় ছিলেন। কেনিউটের সময় হইতে ইংলণ্ডে দিনেমার জাতির প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। অ্যাংলো-সাক্সন বা নর্ম্মাণদের মত দিনেমার জাতিও ইংরাজ জাতির পূর্ব্বপুরুষ। তাঁহাদের রাজবংশের সহিত ইংলণ্ডের রাজবংশের বিবাহের আদানপ্রদান বহুবারই হইয়াছিল। রাজা হেরল্ডের জননী গাইথা দিনেমার রাজবংশীয়া ছিলেন। স্কটলণ্ডের রাজা তৃতীয় এলেকজাণ্ডারের কন্যা নরওয়ের রাজা পঞ্চম এরিকের পত্নী হইয়াছিলেন, নরওয়ের রাজারা দিনেমার রাজবংশের সহিত ঘনিষ্ঠ রক্তসম্বন্ধে আবদ্ধ ছিলেন। পরবর্ত্তী কালে ইংলণ্ডের রাজা প্রথম জেমস দিনেমার-রাজ দ্বিতীয় ফ্রেডারিকের কন্যা এ্যানকে বিবাহ করিয়াছিলেন। ইংলণ্ডের রাণী এ্যান ডেনমার্কের রাজকুমার জর্জ্জকে বিবাহ করিয়াছিলেন। ইংলণ্ডের রাজা দ্বিতীয় জর্জ্জের কন্যা রাজকুমারী লুইসি ডেনমার্কের রাজা পঞ্চম ফ্রেডারিকের সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। সুতরাং আলেকজান্দ্রা বিবাহসূত্রে যে রাজবংশের বধূ হইয়াছিলেন, সেই রাজবংশের সহিত তাঁহার পিতৃবংশের রক্ত-সম্বন্ধ বিদ্যমান ছিল। তিনি নিজের কন্যাকে দিনেমার রাজকুমার চার্লসের হস্তে দান করিয়াছিলেন।

রাজমাতা আলেকজান্দ্রার জীবন কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে,—(১)রাজকুমারী-রূপে তাঁহার বাল্যকাল, (২) যুবরাজ-পত্নী রূপে তাঁহার বিবাহিত জীবনকাল,
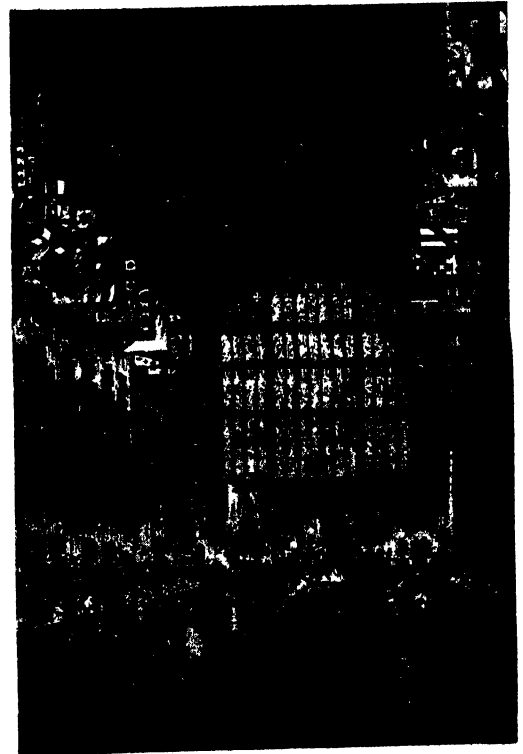
সেণ্টজর্জ্জ চ্যাপেলে গীর্জ্জার মধ্যে বিবাহ-সভা

(৩) মহারাণী-রূপে তাঁহার রাজনীতিক জীবনকাল এবং (৪) রাজমাতারূপে তাঁহার বৈধব্যকাল।

প্রথমেই তাঁহার বাল্যকালের কথা বলা যাউক। আলেকজান্দ্রা ক্যারোলাইন মেরি চার্লোটী লুইসি জুলি ডেনমার্কের রাজধানী কোপেনহেগেন সহরের গুল রাজ-প্রাসাদে ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের ১লা ডিসেম্বর তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা গ্লাক্সবার্গ ও ব্রেচেনবার্গের রাজকুমার ক্রিশ্চিয়ান, মাতা হেসির রাজকুমারী লুইসি। যখন তাঁহার কন্যার জন্ম হয়, তখন রাজকুমার ক্রিশ্চিয়ান স্বপ্নেও ভাবেন নাই যে, তিনি এক দিন ডেনমার্কের সিংহাসনে

রাণী আলেকজান্দ্রা (প্রথম প্রসূতী বেশে)

আরোহণ করিবেন। তিনি পত্নীর অধিকারসূত্রে এই রাজপদ লাভ করিয়াছিলেন। ডেনমার্কের রাজা অষ্টম ক্রিশ্চিয়ান অপুত্রক অবস্থায় পরলোকগমন করেন, ইহাই রাজকুমার ক্রিশ্চিয়ানের পত্নীর মারফতে সিংহাসনলাভের কারণ হইয়াছিল। রাজকুমার ক্রিশ্চিয়ান রাজা অষ্টম ক্রিশ্চিয়ানের অনুগ্রহে বিদ্যাশিক্ষা এবং সমরশিক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার পত্নী রাজা ক্রিশ্চিয়ানের ভ্রাতুষ্পুত্রী ছিলেন।

রাজকুমার ক্রিশ্চিয়ান ও রাজকুমারী লুইসি সামান্য অবস্থায় তাঁহাদের প্রথম বিবাহিত জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তাঁহাদের গুলপ্রাসাদ তাঁহাদের নিজের ছিল না, রাজা অষ্টম ক্রিশ্চিয়ান তাঁহাদিগকে ঐ প্রাসাদে বাস করিতে দিয়াছিলেন। ঐ প্রাসাদের সৌন্দর্য্যসৌষ্ঠব হিসাবে কোন বৈশিষ্ট্য ছিল না। কিন্তু আলেকজান্দ্রার মাতা রাজকুমারী লুইসি পাকা গৃহিণী ছিলেন, স্বয়ং পরিশ্রমী ও মিতব্যয়ী ছিলেন; এই হেতু সংসারে তাঁহাদের অসন্তোষ বা কষ্ট ছিল না। তিনি স্বয়ং পুত্র-কন্যাকে লেখাপড়া শিখাইতেন। বালকরা বড় হইলে তাহাদের জন্য শিক্ষক নিযুক্ত হইত। বিদ্যাশিক্ষা ব্যতীত বালিকাদিগকে রাজকুমারী লুইসি রুগ্নের সেবা, আপনাদের কাপড়-জামা তৈয়ারী এবং গৃহস্থালীর সমস্ত কার্য্যের বিদ্যা শিক্ষা দিতেন। রাজকুমারী আলেকজান্দ্রার বাল্যজীবন এইরূপে জননীর প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল। ভবিষ্যতে এই প্রভাব

অশ্বপৃষ্ঠে সম্রাট্ এডোয়ার্ড ও রাণী আলেকজান্দ্রা

কত দূর ফলপ্রসূ হইয়াছিল, তাহা সর্ব্বজনবিদিত। সাধারণ গৃহস্থের দুঃখ-কষ্টময় জীবনের যে শিক্ষায় বালক-বালিকার জীবনের হাতে খড়ি হয়, আলেকজান্দ্রার তাহার অভাব ছিল না।

রাজকুমারী আলেকজান্দ্রা যখন অষ্টম বর্ষের বালিকা, তখন ১৮৫২ খৃষ্টাব্দের লণ্ডন সন্ধি অনুসারে রাজকুমার ক্রিশ্চিয়ান ডেনমার্কের ভাবী রাজারূপে স্বীকৃত হইলেন। ইহার পর এই ভাগ্যপরিবর্ত্তনের ফলে তিনি বাসের জন্য বার্ণষ্টর্ফ দুর্গ প্রাপ্ত হইলেন। এই দুর্গ পল্লীর শান্ত-শীতল ক্রোড়ে অবস্থিত। এই স্থানে রাজপরিবার পরম আনন্দে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। ইহা তাঁহাদের এত

প্রিয় যে, পরিবারের কন্যারা বিবাহিত হইয়া স্বামীর ঘর করিতে যাইবার পরে ও প্রতি বৎসর অন্ততঃ একবার এই স্থানে সমবেত হইতেন।

ভ্রাতা ও ভগিনীগণের সহিত রাজকুমারী আলেকজান্দ্রা এইরূপে সামান্য অবস্থায় বাল্য অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতামাতার অর্থের স্বচ্ছলতা ছিল না বটে, তথাপি মানুষের চরিত্র-গঠনে শিশুকাল হইতে যে সকল উপকরণের প্রয়োজন হয়, আলেকজান্দ্রার তাহার অভাব ছিল না। বিখ্যাত ভাস্কর ওয়ালডেমার মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত এই রাজপরিবারের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন এবং প্রায়শঃ তাঁহাদের আতিথ্য গ্রহণ করিতেন। আলেকজান্দ্রার জন্মগ্রহণের অব্যবহিত পূর্ব্বেই তাঁহার মৃত্যু হয়। কিন্তু তাঁহার নানা মর্ম্মরমূর্ত্তি গুলপ্রাসাদের পার্শ্বস্থ যাতুঘরে সংরক্ষিত হইয়াছিল বলিয়া রাজকুমারীর বাল্যকালে উহা প্রায়ই দেখিবার এবং ওয়ালডেমার সম্বন্ধে নানা গল্প শুনিবার সুযোগ হইত। রোসেনবার্গ শ্লট নামক আর এক রাজপ্রাসাদে দিনেমার রাজা-

রাণী আলেকজান্দ্রা—শিশুগণকে অশ্বপৃষ্ঠে লইয়া

পুত্র, পৌত্রী ও পৌত্রীর পুত্রসহ রাজমাতা

তাঁহার জননী পাকা গৃহিণী ছিলেন, এ কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তিনি তাঁহার গৃহে সে সময়ের বহু কলাবিদ্যা-বিশারদকে আমন্ত্রণ করিতেন এবং তাঁহাদের সংস্পর্শে আসিয়া আলেকজান্দ্রার প্রতিভাবিকাশের ও অভিজ্ঞতাবৃদ্ধির ভিত্তি-পত্তন হইয়াছিল। সেই সময়ে হান্স এণ্ডার্সন তাঁহার বিখ্যাত Fairy Tales অথবা পরীর গল্প লিখিতেছিলেন। তিনি প্রায়শঃ গুলপ্রাসাদে আমন্ত্রিত হইয়া রাজপরিবারের সম্মুখে সন্ধ্যার পরে তাঁহার "Ugly Duckling" অথবা "Little Mermaid" গ্রন্থ হইতে রচনা পাঠ করিয়া শুনাইতেন। দিগের বহুকালসঞ্চিত নানা বিখ্যাত চিত্র ও মূর্ত্তি আদিও এই রাজপরিবারের প্রায় নিত্যই নয়ন-মন চরিতার্থ করিত। রাজার পুস্তকাগারে ৪ লক্ষ অমূল্য গ্রন্থ সংগৃহীত ছিল; আলেকজান্দ্রা উহার প্রভাবেও প্রভাবান্বিতা হইয়াছিলেন। সেই সময়ে বিখ্যাত গায়িকা জেনী লিণ্ড কোপেনহেগেন সহরে তাঁহার গানে আপামর সাধারণকে মোহিত করিতেছিলেন। আলেকজান্দ্রার তাঁহার গান শুনিবার সৌভাগ্যলাভ হইয়াছিল। আলেকজান্দ্রার জননী প্রথমে তাঁহাকে সঙ্গীতবিদ্যা শিক্ষা দিয়াছিলেন, তাহার পর নৃত্য ও গী

শিক্ষকরাও তাঁহাকে শিক্ষিতা করিয়াছিলেন। নৃত্যে তিনি যশস্বিনী হইয়াছিলেন। কুমারী নাডসেন (Xnudsen) নাম্নী বিদুষী শিক্ষয়িত্রীর নিকট তিনি ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং সে জন্য ভবিষ্যতে চিরদিন তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ ছিলেন। সূচিকার্য্যে, রন্ধনকার্য্যে এবং গৃহস্থালীর অন্যান্য কার্য্যে তাঁহার জননী তাঁহাকে বিশেষ পারদর্শিনী করিয়াছিলেন।

যখন তাঁহার পিতা যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া বার্ণ-ষ্টফের্ ‌র রাজপ্রাসাদে বসবাস করিতে লাগিলেন, তখন তিনি সপরিবারে সরল ও আড়ম্বরশূন্য জীবনযাপন করিতেছিলেন। প্রকৃতির ছায়াশীতল শ্যামল ক্রোড়ে রাজপ্রাসাদ অবস্থিত ছিল ; প্রতি রবিবারে রাজপরিবার এক মাইল দূরে জেন্-টফট গ্রামের গ্রাম্য গির্জ্জায় ভজনা করিতে যাইতেন এবং মাঝে মাঝে বনভোজন করিতেন ও নদীতে বাচ খেলিতে যাইতেন। রাজকুমারীদের মধ্যে কথা হইত, ভবিষ্যতে কে

পুত্রকন্যাসহ রাণী আলেকজান্ড্রা

কি হইতে চাহেন। কেহ বলিতেন, আমি সুন্দরী হইব, কেহ বলিতেন, আমি যশোলাভ করিব ; আলেকজান্ড্রা বলিতেন, আমি লোকের ভালবাসা অর্জ্জন করিব। তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবনে সেই আশা পূর্ণ হইয়াছিল।

মাত্র দুই বৎসর বয়সে আলেকজান্ড্রা প্রথম দেশভ্রমণ করেন। মেন নদতটে রামপেনহেম প্রাসাদ তাঁহার জননীর পিত্রালয় ; সেখানে তিনি দুই বৎসর বয়সে রাজপরিবারের অন্যান্য রাজকুমার ও কুমারীদের সহিত নীত হইয়াছিলেন। ভবিষ্যতে বড় হইয়া আলেকজান্ড্রা এই প্রাসাদে বৎসরে একবার যাত্রা করিতেন এবং রাজপরিবারের অন্যান্য বংশধরদিগের সহিত জার্ম্মাণ, ফরাসী ও ইংরাজী ভাষায় কথা কহিতেন। এই প্রাসাদেই আলেকজান্ড্রা টেকের রাজকুমারীর সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন এবং সেই সূত্রে ইংরাজ রাজপরিবারেরও সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন। ইংলণ্ডের বর্ত্তমান রাণী মেরী এই টেক-পরিবারেই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

পৃষ্ঠদেশে জ্যেষ্ঠা কন্যাসহ রাণী আলেকজান্ড্রা

দশ বৎসর বয়সে আলেকজান্দ্রা প্রথম ইংলণ্ডে গিয়াছিলেন। বাকিংহাম প্রাসাদে মহারাণী ভিক্টোরিয়া বালকবালিকাগণকে ভোজ দিয়াছিলেন, আলেকজান্দ্রা তাহাতে উপস্থিত ছিলেন।

যখন আলেকজান্দ্রা সপ্তদশবর্ষীয়া সুন্দরী যুবতী, তখন তাঁহার সহিত ইংলণ্ডের রাজকুমার এডওয়ার্ডের সাক্ষাৎ ও পরিচয় হয়। তখন রাজকুমার এডওয়ার্ড বিংশতিবর্ষীয় যুবক। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে প্রিন্স অফ ওয়েলস্ এডওয়ার্ড ওয়ার্মস্

রাণী আলেকজান্দ্রা চরকা চালাইতেছেন

গির্জ্জায় রাজকুমারীকে দৈবক্রমে দেখিতে পায়েন। সেই প্রথম সাক্ষাতেই তিনি তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট ও অনুরক্ত হয়েন। পরবৎসর আবার বেলজিয়ামের রাজদরবারে উভয়ের সাক্ষাৎ হয়। ফলে মহারাণী ভিক্টোরিয়া বেলজিয়ামের রাজপ্রাসাদে গিয়া রাজকুমারী আলেকজান্দ্রাকে দেখিয়া আইসেন এবং ১৮৬২ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে রাজকুমার ও রাজকুমারী বেলজিয়ামের লায়েকেন প্রাসাদে পরস্পর বাগ্দত্তা হয়েন। হেসির রাজপ্রাসাদে (মাতুলালয়ে) যখন রাজকুমারীর নিকটাত্মীয়রা এই বাগ্দানের কথা জিজ্ঞাসা করেন, তখন রাজকুমারী আলেকজান্দ্রা হাসিয়া যুবরাজের একখানি ক্ষুদ্র ফটো বাহির করিয়া বলেন, এই আমার স্বামী।

বিবাহিত জীবন—প্রিন্সেস্ অফ ওয়েলস্

বিবাহের কথা স্থির হইয়া গেলে ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের ২৮শে ফেব্রুয়ারী তারিখে রাজকুমারী আলেকজান্দ্রা তাঁহার বাল্য

মহারাণী ভিক্টোরিয়ার জুবিলী বৎসরে রাণী আলেকজান্দ্রা

ও কৈশোরের লীলাস্থল হইতে ইংলণ্ড যাত্রা করিলেন। তখন তিনি ঊনবিংশতিবর্ষীয়া সুন্দরী যুবতী। ভবিষ্যতে তিনি যেমন নিজ গুণে ইংরাজ জাতির চিত্ত জয় করিয়াছিলেন, তেমনই এই সময়ে তাঁহার স্বজাতিরও মন হরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার ইংলণ্ডযাত্রাকালে কোপেনহেগেনের জনসঙ্ঘ দলে দলে কাতারে কাতারে তাঁহাকে একবার দেখিবার জন্য রেল-লাইনের পার্শ্ব দিয়া ছুটিয়া চলিয়াছিল। গ্রামবাসীরা পত্রে-পুষ্পে তাহাদের গৃহ সজ্জিত করিয়াছিল।

স্বামীর মৃত্যু শয্যায় রাণী আলেকজান্দ্রা

তিনি আলেকজান্দ্রার সম্মুখে তাঁহার এই কবিতা স্বয়ং আবৃত্তি করিয়াছিলেন। রাজকুমারী ধৈর্য্যসহকারে আদ্যোপান্ত কবিতা শ্রবণ করিয়াছিলেন। যখন টেনিসন পাঠকালে এই চরণটি আবৃত্তি করেন,—"Blissful bride of a Blissful heir," তখন রাজকুমারীর ধৈর্য্যের বাধ ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, তিনি সরল উন্মুক্ত প্রাণে হাস্য করিয়াছিলেন, কবি টেনিসনও সেই হাসিতে যোগদান করিয়াছিলেন।

উইণ্ডসর প্রাসাদে আগমন করিবার তিন দিন পরে রাজকুমারী সেণ্টজর্জ্জ গির্জ্জায় রাজকুমার এডওয়ার্ডের সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হয়েন। নয় দিন মধুবাসরের পর

জনগণের এমন প্রীতি-শ্রদ্ধা অর্জ্জন করা সকলের ভাগ্যে ঘটে না।

ইংলণ্ডে ভাবী রাজপুত্রবধূর অভ্যর্থনা এক বিরাট ব্যাপার, তাহার তুলনা ইতিহাসে বিরল। ৮ই মার্চ্চ তারিখের প্রাতঃকালে রাজকুমারী আলেকজান্দ্রা গ্রেভসেণ্ড বন্দরে অবতরণ করেন এবং সেই দিনই লণ্ডনে উপস্থিত হয়েন। তখন বিরাট জনসঙ্ঘ তাঁহাকে দেখিবার এবং অভ্যর্থনা করিবার জন্য উন্মত্ত হইয়াছিল। ইংরাজ ঐতিহাসিকরাই বলেন, এরূপ বিরাট জনতা ইহার পূর্ব্বে বা পরে ইংলণ্ডে আর কখনও হয় নাই। শোভাযাত্রার পথে পথাতিক্রম করা অত্যন্ত দুরূহ হইয়াছিল। এক সময়ে টেম্পলবারের নিকট রাজকুমারীর শকট জনতার পেষণে উল্টাইয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছিল। সে সময়ে পুলিস অতি কষ্টে শান্তিরক্ষা করিয়াছিল। রাজকুমারী কিন্তু সেই সঙ্কটসঙ্কুল অবস্থাতেও অসাধারণ ধৈর্য্য ও নির্ভীকতার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। উইণ্ডসর প্রাসাদে উপস্থিত হওয়া পর্য্যন্ত সমস্ত পথেই এইরূপ জনতা ছিল। রাজকবি টেনিসন তাঁহার 'Ode of Welcome' কবিতায় রাজকুমারীকে সাদরে ইংলণ্ডে অভিনন্দিত করিয়াছিলেন। ইহার কিছু দিন পরে

শোক পরিচ্ছদে রাণী আলেকজান্দ্রা

রাজকুমার ও রাজকুমারী সেণ্টজেমস্ প্রাসাদে এক বিরাট সামাজিক সম্মেলনের আয়োজন করেন। ইংরাজ-সমাজ এই স্থানে দম্পতিকে প্রীতিভরে বাহুপ্রসারণ করিয়া বক্ষে ধারণ করেন। ইহার পর রাজকুমারী যতই জনসাধারণের নিকট পরিচিত হইতে লাগিলেন, ততই দিন দিন জনগণ তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইতে লাগিল। লণ্ডনের গিল্ডহলের ভোজে সহরের লর্ড মেয়র ও এলডারম্যানগণ তাঁহাকে সম্মানিত করিলেন। জুন মাসে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় রাজকুমারীকে

রাণী আলেকজান্দ্রার পিতা

অভিনন্দিত করিলেন। ইহার পর দম্পতি শরৎকালে স্কটলণ্ডে ভ্রমণ করিতে যায়েন।

জননী আলেকজান্দ্রা

৮ই জান্নুয়ারী তারিখে ফ্রগমোর প্রাসাদে তাঁহার প্রথম সন্তান প্রিন্স এলবার্ট ভিক্টর (ডিউক অফ ক্লেয়ারেন্স) জন্মগ্রহণ করেন। তখন তাঁহার বয়স মাত্র বিংশতি বৎসর। তাঁহার মাতৃত্বের প্রথম প্রভাতেই সন্তান-পালনের কর্ত্তব্যবুদ্ধি জাগ্রত হইয়াছিল। সে কর্ত্তব্যে তিনি এতই তন্ময় হইয়াছিলেন যে, এই বৎসরের প্রথম ভাগে তিনি কদাচিৎ প্রকাশ্যে দেখা দিতেন। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের মে মাসে প্রিন্স জর্জ্জ (বর্ত্তমান সম্রাট) মার্লবরো প্রাসাদে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পূর্ব্ব-বৎসরে দম্পতি ডেনমার্কে ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছিলেন। সেখানে তাঁহাদের সহিত হান্স এণ্ডার্সনের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। প্রিন্স জর্জ্জের জন্মগ্রহণের পরের মাসে মার্লবরো প্রাসাদে এক অগ্নিকাণ্ড ঘটে। প্রাসাদে গোলযোগ উপস্থিত হইলে প্রিন্স এডওয়ার্ড কালিঝুলি-মাখা মুখে ব্যস্তভাবে পত্নীর নিকট উপস্থিত হইয়া বলেন,—"ছেলেদের নার্সারিতে আগুন লাগিয়াছে, কিন্তু কোনও ভয় নাই, এখনই আগুন নিভাইতেছি। চল, অন্যত্র নিরাপদ স্থানে তোমায় রাখিয়া আসি।" ইহার পর যুবরাজ স্বয়ং অন্যান্য

রাণী আলেকজান্দ্রার মাতা

লোকের সহিত অগ্নি নির্ব্বাণ করিতে যায়েন। ঘরের মেঝে খুঁড়িয়া ফেলিবার সময় একখানা তক্তা সরিয়া যাওয়ায় তিনি নীচে পড়িয়া যায়েন। দৈবক্রমে তিনি বিশেষ আঘাত প্রাপ্ত হয়েন নাই।

এই সময়ে প্রুসিয়ানরা ডেনমার্ক আক্রমণ করিয়াছিল। পিতৃরাজ্য আক্রান্ত হওয়ায় আলেকজান্দ্রা বিচলিত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু কোন দিন ইংলণ্ডকে পিতৃপক্ষ সমর্থনে উৎসাহিত করিবার জন্য তাঁহার প্রভাব বিস্তার করেন নাই। এক দিন রাজকুমারী বিয়েট্রিসকে তিনি জিজ্ঞাসা করেন, "তুমি কি উপহার চাও?" বিয়েট্রিস অনুচ্চস্বরে বলেন,—"If you please, I should like Bismark's head on a charger"

১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের শরৎকালে রাজকুমারী কর্ণওয়ালের

বোটাল্লাক টিনখনি দেখিতে যায়েন। এই ভাবে নানা শ্রমিক-কেন্দ্রে গমন করিয়া তিনি পরে শ্রমিকগণের ভালবাসা অর্জ্জনে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি অনাড়ম্বর জীবনযাপন করিতেন, কিন্তু জনগণের মঙ্গলবিধানে সর্ব্বদা সচেষ্ট ছিলেন। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে তিনি শ্লাউয়ের অনাথ আশ্রমের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে তিনি ফার্ণিংহামের অনাথ বালকগণের আশ্রমপ্রতিষ্ঠা করেন এবং পরে ডেনমার্ক হইয়া ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে মিশর ভ্রমণ করিয়া আইসেন।

১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহার প্রথম কন্যার (প্রিন্সেস্ রয়্যালের) জন্ম হয়। ঐ বৎসরেই তাঁহার জানুদেশে বাতব্যাধি দেখা দেয়। বহুদিন উহাতে কষ্ট পাইবার পর জুলাই মাসে ব্যাধিমুক্ত হয়েন। কিন্তু তদবধি তিনি সামান্যরূপ খুঁড়াইয়া চলিতে বাধ্য হয়েন। এ জন্য

স্যানড্রিংহাম প্রাসাদ—এই প্রাসাদে রাজমাতার মৃত্যু হইয়াছে

স্যানড্রিংহাম প্রাসাদ—পূর্ব্বদিকের দৃশ্য

তাঁহার খঞ্জতাকে ইংরাজ Aiexandra Limp বলিয়া থাকে।

ইহার দুই বৎসর পরে তাঁহারা স্ত্রী-পুরুষে আয়ার্ল্যাণ্ড, ওয়েলস্, প্যারী, ডেনমার্ক, বার্লিন, ভায়েনা, ভূমধ্যসাগর, মিশর, তুর্কী ও ক্রাইমিয়া প্রদেশ পরিভ্রমণ করিয়া আইসেন। মিশরের নীল নদে নৌকা-ভ্রমণকালে রাজকুমারীর ক্যাবিনের পার্শ্বস্থ কামরায় এক

উপলক্ষে জনসাধারণের সমক্ষে প্রথম বক্তৃতা প্রদান করেন।

১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে রাজকুমারী অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়েন। পীড়া উপশমের পর তিনি জার্ম্মাণীর উইসবেডেনের স্বাস্থ্যাবাসে গিয়া নষ্ট স্বাস্থ্য ফিরিয়া পায়েন। পরবৎসর আয়ার্ল্যাণ্ডে ভ্রমণ করেন। সেখানেও তিনি জনগণের চিত্ত জয় করেন। ঐ বৎসরেই তিনি আর একবার স্কটলণ্ড যাত্রা

অগ্নিকাণ্ড ঘটিয়াছিল, তবে সময়ে উহা নির্ব্বাপিত হইয়াছিল।

১৮৭১ খৃষ্টাব্দে রাজকুমারীর তৃতীয় পুত্র আলেকজান্দার এলবার্ট জন্মগ্রহণ করিবামাত্র এক দিন জীবিত ছিলেন। ইহার অব্যবহিত পরেই তাঁহার আর এক ভীষণ পরীক্ষার সময় উপস্থিত হয়। ঐ বৎসরেই যুবরাজ মারলবরো প্রাসাদে টাইফয়েড রোগে অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়েন। সেই স্থান হইতে সাণ্ড্রিংহাম প্রাসাদে তাঁহাকে স্থানান্তরিত করা হইল। মাসাধিককাল রাজকুমারী অক্লান্ত পরিশ্রমে স্বামীর সেবা ও পরিচর্য্যা করিয়াছিলেন। গির্জ্জায় ভজনা করিতে যাওয়া ছাড়া অথবা প্রজাগণকে বড়দিনের উপহার দিতে যাওয়া ছাড়া তিনি এক মুহূর্ত্তও প্রাসাদ ত্যাগ করিতেন না। তবে তাঁহারই প্রাসাদের টাইফয়েড রোগাক্রান্ত এক অশ্ব-পালককে একবার দেখিতে গিয়াছিলেন বটে। তিনি কিরূপ পরের ব্যথায় ব্যথা অনুভব করিতেন, তাহা ইহাতেই বুঝা যায়। এই গুণবতী রাজকুমারী এইরূপে স্বামীর সেবা ও পরের দুঃখে সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়া জনগণের হৃদয়ে আপনার সিংহাসন এত দৃঢ় করিয়াছিলেন যে, তাহারা যথার্থই তাঁহার অনুরক্ত ভক্ত হইয়াছিল। এ যাবৎ ইংলণ্ডের জনসাধারণ রাজপরিবারকে তেমন প্রীতির দৃষ্টিতে দেখিত না, আপনার বলিয়া মনে করিত না। আলেকজান্দ্রার চরিত্র-গুণে আকৃষ্ট হইয়া তাহারা যথার্থ রাজভক্ত হইয়া পড়িল।
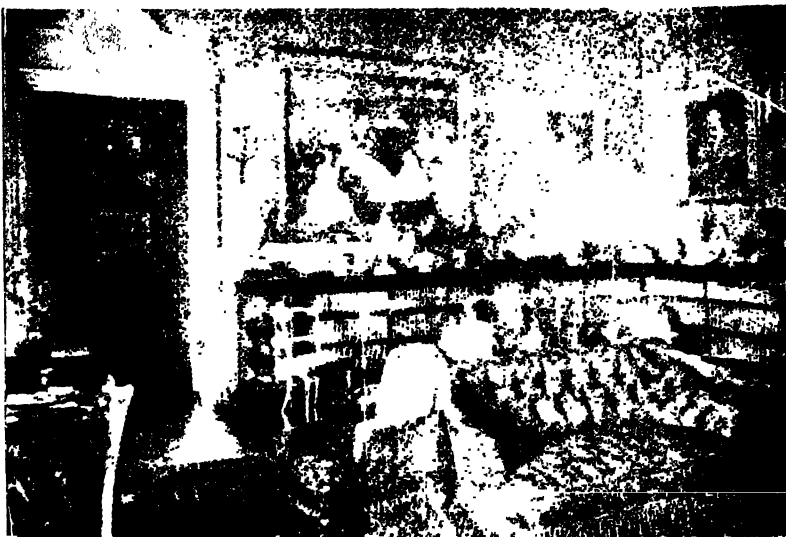
স্যানড্রিংহাম প্রাসাদের ড্রয়িং রুম

যুবরাজ বহুকষ্টে আরোগ্য-লাভ করিবার পর মহারাণী ভিক্টোরিয়া সপরিবারে সেণ্টপল ভজনাগারে ভগবান্‌কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতে যান। তাহার পর রাজদম্পতি কয়েকটি জনসাধারণের কার্য্যে আত্মনিয়োগ করেন। তন্মধ্যে বেথনাল গ্রীণের যাদুঘর প্রতিষ্ঠা, গ্রাণ্ড অর্মণ্ড ষ্ট্রীটের বালকবালিকাগণের হাঁসপাতাল প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। কিন্তু এ সকল কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিলেও তিনি এক দিনেরও জন্য জননীর

স্যানড্রিংহাম প্রাসাদের ড্রয়িংরুমে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার দরবার চিত্র

কর্ত্তব্য অবহেলা করেন নাই। নিজের মাতার নিকট বাল্যে যে শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন, স্বয়ং জননী হইয়া সেই শিক্ষা অনুসারে সন্তান-পালনে তিনি সর্ব্বদা তৎপর ছিলেন। তিনি পুত্র-কন্যার সহিত শিশুর মত ক্রীড়া করিতেন।

১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে তিনি ডিউক অফ এডিনবরার বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির করিবার জন্য রুসিয়া যাত্রা করেন। ইহার কিছু পরে দেশে ফিরিয়া তিনি তাঁহার পুত্রদ্বয়কে নৌ-সামরিক বিদ্যাশিক্ষার্থ বিদায় দেন। এই শিক্ষা সম্পূর্ণ হইতে ১৮৮২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত অতিবাহিত হইয়াছিল।

১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে যুবরাজ এডওয়ার্ড ভারত-যাত্রা করেন। রাজকুমারী আলেকজান্দ্রা ক্যালে বন্দর পর্য্যন্ত যুবরাজের সহগমন করিয়াছিলেন। ইহার পরে উপর্য্যুপরি তিনি কয়টি শোক পায়েন। তাঁহার ভ্রাতার পত্নী হেসির গ্রাণ্ড ডাচেস এলিস এবং তাঁহার নিকট-আত্মীয় ডিউক অফ এলব্যানি এই সময়ে অকালে কালগ্রাসে পতিত হয়েন।
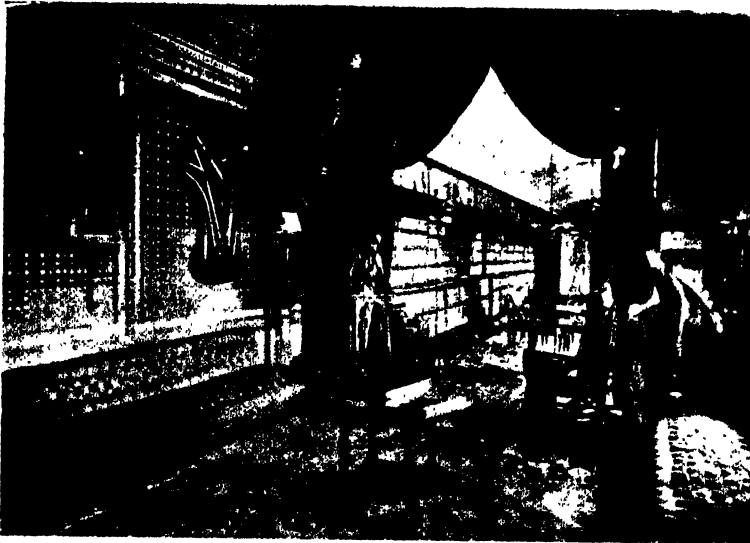
স্যানড্রিংহাম প্রাসাদের লাইব্রেরী-কক্ষ

মহারাণী ভিক্টোরিয়া পরিণত বয়সের জন্য সাধারণ কার্য্যে পূর্ব্বের মত আর যোগদান করিতে পারিতেন না; এ জন্য রাজকুমারীকে প্রায়শঃ তাঁহার হইয়া রাজ-কর্ত্তব্য পালন করিতে হইত। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে মহারাণীর Golden Jubilee এবং যুবরাজ ও যুবরাজ-পত্নীর Silver wedding এই সময়ে সমারোহে সম্পন্ন হয়। এই দুই ব্যাপারে আলেকজান্দ্রাকেই রাজপরিবারের গৃহিণীরূপে কর্ত্তব্যপালন করিতে হইয়াছিল। সে সময়ে তিনি জগতের নানা স্থান হইতে যে সমস্ত প্রীতি-উপহার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহাতে মারলবরো প্রাসাদের Indian roomটি ভরিয়া গিয়াছিল। ইহাতেই বুঝা যায়, তিনি কিরূপ জনপ্রীতি অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

১৮৯১ খৃষ্টাব্দ আলেকজান্দ্রার পক্ষে অতি দুর্ব্বৎসররূপে দেখা দিল। ঐ বৎসরে তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র ডিউক অফ ইয়র্ক (বর্ত্তমান সম্রাট) কঠিন রোগে আক্রান্ত হইলেন। আলেকজান্দ্রা অহোরাত্র পুত্রের রোগশয্যাপার্শ্বে বসিয়া সেবা-পরিচর্য্যা করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় পুত্র আরোগ্যলাভ করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ডিউক অফ ক্লেয়ারেন্স ১৮৯২ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে অকালে ইহলোক ত্যাগ করিলেন। ইহার পূর্ব্বে টেকের রাজকুমারী মেরীর সহিত তাঁহার বিবাহের কথা স্থির হইয়া গিয়াছিল। এই শোক আলেকজান্দ্রাকে কিরূপ বাজিয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমেয়। কিছুকাল তিনি শোকে মুহ্যমান হইয়া কোনওরূপ সাধারণ কার্য্যে আর যোগদান করেন নাই, এমন কি, প্রাসাদ হইতেও বাহির হয়েন নাই।

পরবৎসর (১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে) ডিউক অফ ইয়র্কের সহিত টেকের রাজকুমারীর উদ্বাহক্রিয়া সম্পন্ন হইল। সেই সময়ে আবার আলেকজান্দ্রা কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু তখনও তাঁহার আননে শোকের গভীর ছায়া একবারে মিলাইয়া যায় নাই। এই সময়ে আলেকজান্দ্রা পপলারের Seaman's Mission, ব্ল্যাকওয়াল হাঁসপাতালের আকস্মিক দুর্ঘটনার ওয়ার্ড এবং টাওয়ার ব্রিজের ভিত্তিপ্রতিষ্ঠার উৎসবে যোগদান করেন। বুয়র-যুদ্ধে একখানি হাঁসপাতাল জাহাজের নামকরণ তাঁহারই নামে হইয়াছিল। তিনি জাহাজ প্রেরণের উৎসবে উপস্থিত ছিলেন।

১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জননী ডেনমার্কের রাণীর মৃত্যু

হয়। কথিত আছে, মাতার রোগশয্যাপার্শ্বে তিনি একাদিক্রমে ১৬ ঘণ্টাকাল রোগের সেবা-পরিচর্য্যায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। পরে প্রতি বৎসর তিনি একবার জননীর সমাধি-মন্দিরে ভক্তি-প্রীতির উপহার প্রদান করিতে যাইতেন।

সপরিবারে রাণী আলেকজান্দ্রা ও সম্রাট্ এডোয়ার্ড

১৯০০ খৃষ্টাব্দে যুবরাজ ও যুবরাজ-পত্নী কোপেনহেগেনে যাত্রা করিয়াছিলেন। ব্রুসেলস সহর হইতে যখন গাড়ী ছাড়ে, তখন সিপিডো নামক এক যুবক, দম্পতির গাড়ীর ফুটবোর্ডে লাফাইয়া উঠিয়া যুবরাজকে লক্ষ্য করিয়া পর পর দুইটি গুলী ছুড়ে। সৌভাগ্যক্রমে তাহার সন্ধান ব্যর্থ হইয়া যায়। যুবক তৎক্ষণাৎ ধৃত হয়। সে সময়ে আলেকজান্দ্রার মনের অবস্থা কিরূপ হইয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমেয়।

মহারাণী আলেকজান্দ্রা

১৯০১ খৃষ্টাব্দের ২২শে জানুয়ারী তারিখে মহারাণী ভিক্টোরিয়া ইহলোক ত্যাগ করেন। সেই সময়ে আলেকজান্দ্রা অসবোর্ণ প্রাসাদে অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহার পুত্র ডিউক অফ ইয়র্ক তখন রোগশয্যায় শায়িত। যে সময়ে তাঁহার সম্মুখে সংসারের এই ভীষণ পরীক্ষা সমুপস্থিত, সেই সময়ে তাঁহার উপর গুরু কর্ত্তব্যভার অর্পিত হইল। ৩৮ বৎসর কাল যিনি প্রিন্সেস অফ ওয়েলসরূপে জনগণের প্রীতি-শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিতেছিলেন, আজ তাঁহাকে বিধাতার বিধানে ইংলণ্ডের রাজসিংহাসনে স্বামীর পার্শ্বে সমাসীন হইয়া সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠ মহিলারূপে কর্ত্তব্য পালন করিতে হইল। সে কর্ত্তব্য পালনে তিনি কখনও পরাঙ্মুখ হয়েন নাই। তাঁহার পরবর্ত্তী জীবনে তাহার বহু পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

মহারাণীরূপে আলেকজান্দ্রা Leader of Fashion এবং First Lady of the Empire হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার পারিবারিক জীবনে তিনি যথাপূর্ব্ব আড়ম্বররহিত হইয়া জননী ও পত্নীরূপে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। সাধারণতঃ লোক রাজরাণীর জীবনকে যে ভাবে দেখিয়া থাকে, আলেকজান্দ্রা পারিবারিক জীবনে তাহা হইতে দূরে থাকিয়া শান্ত অনাড়ম্বর জীবন-যাপনে সুখলাভ করিতে লাগিলেন। পুত্র-কন্যাকে এবং পশুপক্ষীকে ভালবাসা তাঁহার জীবনের একটা প্রধান অঙ্গ ছিল। সংবাদপত্রে নিত্য রাজরাণীর দৈনন্দিন জীবনযাপন যে ভাবে বিবৃত হইয়া থাকে, আলেকজান্দ্রা স্বামী ও পুত্র-কন্যার সহিত সেই ভাবে জীবনযাপন করিতেন না, অন্যান্য সাধারণ গৃহস্থের ন্যায় সংসারের সুখ-দুঃখে মগ্ন হইয়া থাকিতেন, এ কথা ধারণা করাও যেন কঠিন হইয়া পড়ে। কিন্তু প্রকৃতই তিনি সেই ভাবে জীবনযাপন করিতেন;

য়ুরোপে ও মার্কিণে অধুনা দেখা যায়, পুত্রের জনক-জননীরা আপনাদের আমোদ-প্রমোদে ও বিলাস-লালসায় এমন মগ্ন থাকেন যে, পুত্র-কন্যার শিক্ষা বা চরিত্রগঠনে মনোযোগ দিবার অবসর প্রাপ্ত হয়েন না। মার্কিণে ইহা এক বিষম সমস্যার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যাহাকে Home influence বা জনক-জননীর প্রভাব বলে, আজ-কাল সন্তান-সন্ততিরা তাহা হইতে বঞ্চিত হইয়া উচ্ছৃঙ্খল ও অসংযমী হইতে অভ্যস্ত হইতেছে। মহারাণী আলেকজান্দ্রা কিন্তু এই অপরাধে কখনও অপরাধিনী হয়েন নাই। শত রাজকার্য্যের মধ্যেও তিনি নিজ পুত্র-কন্যাকে 'গৃহের প্রভাব' হইতে বঞ্চিত করেন নাই। ইহা তাঁহার ন্যায় ভোগ-বিলাসে লালিতাপালিতা নারীর পক্ষে অল্প গুণের পরিচায়ক নহে। ধাত্রী ও শিক্ষকের হস্তে পুত্র-কন্যার ভারার্পণ করিয়া তিনি কখনও নিশ্চিন্ত হয়েন নাই। তিনি পুত্র-কন্যাকে লইয়া খেলা ও আমোদ-প্রমোদ করিতেন, অশ্বা-রোহণে বা নৌকারোহণে ভ্রমণ করিতেন, বিদেশযাত্রা করিতেন। এ জন্য পুত্র-কন্যারাও তাঁহাকে আন্তরিক ভালবাসিতেন, ভক্তি-শ্রদ্ধা করিতেন। প্রিন্স 'এডি' যখন জন্মগ্রহণ করেন, তখন হইতে তিনি যেমন অনেক সময় নার্সারিতে থাকিতেন, পুত্রকে স্নান করাইয়া কাপড়-চোপড় পরাইয়া দিতেন, তাহার সহিত খেলা করিতেন, তেমনই মহারাণী হইয়াও তিনি বয়স্ক পুত্রগণের শিক্ষা ও সেবাপরি-চর্য্যার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন।

১৯০১ খৃষ্টাব্দের ১২ই ফেব্রুয়ারী তারিখে আলেকজান্দ্রা স্বামীর সহিত প্রথম রাজকার্য্যে যোগদান করিলেন, রাজা সপ্তম এডোয়ার্ডের প্রথম পার্লামেণ্টে উদ্বোধনের উৎসবে উপস্থিত হইলেন। তিনি কিরূপ স্বদেশী পণ্যের অনুরাগিণী ছিলেন, তাহা ২০শে আগষ্ট তারিখের তাঁহার পত্রে জানা যায়। ঐ পত্রে তিনি ইংলণ্ডের মহিলাগণকে সম্বোধন করিয়া বলেন যে, "আমাদের রাজ্যাভিষেক উৎসবে যাঁহারা উপস্থিত থাকিবেন, তাঁহারা যেন ইংলণ্ডে প্রস্তুত পরি-চ্ছদ পরিধান করিয়া আগমন করেন।"

রাণী আলেকজান্দ্রার "ডেনিস গোশাল।"

১৯০২ খৃষ্টাব্দের ২২শে জুন তারিখে রাজা এডোয়ার্ড ও রাণী আলেকজান্দ্রার রাজ্যাভিষেক উৎসব সম্পন্ন হইবার কথা ছিল। কিন্তু সম্রাট সপ্তম এডোয়ার্ড এই সময়ে হঠাৎ অসুস্থ হইয়া পড়েন বলিয়া রাজ্যাভিষেক মুলতুবী থাকে। ৯ই আগষ্ট তারিখে রাজ্যাভিষেক-ক্রিয়া সুসম্পন্ন হইল। সে সময়ে যাঁহারা তথায় উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা মহারাণী আলেক-জান্দ্রার রাজোচিত গাম্ভীর্য্য ও ঔদার্য্য পরিলক্ষিত করিয়া প্রীতি-লাভ করিয়াছিলেন।

ঐ বৎসরের ২৪শে অক্টোবর তারিখে রাজদম্পতি লণ্ডনে প্রথম শোভাযাত্রা করিয়া প্রজাগণের মধ্যে শকটারোহণে ভ্রমণ করেন এবং গিল্ড হলে তাঁহাদিগকে ভোজ দেওয়া হয়। ২৭শে ডিসেম্বর তারিখে মহারাণী আলেকজান্দ্রা বুয়র-যুদ্ধে নিহত বৃটিশ সৈনিকগণের ১৪৬৫ জন বিধবা ও পুত্রকন্যাগণকে এক বিরাট ভোজ দেন।

ডবলিন ইউনিভারসিটিতে মহারাণী আলেকজান্দ্রার "ডাক্তার অফ মিউজিক" উপাধিপ্রাপ্তি

১৯০৩ খৃষ্টাব্দে মহারাণী আলেক-জান্দ্রা হাঁসপাতাল, রোগীর সেবা-পরিচর্য্যা প্রতিষ্ঠান সমূহের প্রতিষ্ঠায়

আত্মনিয়োগ করেন। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের ১৭ই জুলাই তারিখে তিনি বৃটিশ রেড ক্রশ সোসাইটীর প্রথম সভায় সভানেতৃত্ব করিয়াছিলেন। ঐ প্রতিষ্ঠান পরে জার্ম্মাণ-যুদ্ধে মানুষের শোকতাপ ও ব্যথাহরণে কত সহায়তা করিবে, তখন তাহা কেহ ধারণাও করেন নাই। ১৩ই নবেম্বর তারিখে মহারাণী জনগণের দ্বারস্থ হইয়া ভিক্ষা-প্রার্থনা করেন —যাহাতে দরিদ্র, উপবাস-ক্লিষ্ট বেকার লোকগণ শীত-কালে কষ্ট না পায়, তাহার জন্য দেশের হৃদয়বান্ সম্পন্ন লোকদিগকে সাহায্য করিতে অনুরোধ করেন। ফলে ১ লক্ষ ২৫ হাজার পাউণ্ড মুদ্রা এতদর্থে সংগৃহীত হইয়াছিল। ইহাতে দুইটি বিষয় পরিস্ফুট হয়,—

(১) মহারাণী আলেকজান্দ্রার পরদুঃখ কাতরতা,

(২) ইংলণ্ডের জনগণের তাঁহার প্রতি প্রীতিশ্রদ্ধা।

১৯০৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার পিতা ডেনমার্কের রাজা নবম ক্রিশ্চিয়ান পরলোকগমন করেন। মহারাণী তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগদান করিয়াছিলেন।

১৯০৭ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে রাজ-দম্পতি প্যারী যাত্রা করেন। সেখানে তাঁহাদের বিরাট অভ্যর্থনা হইয়াছিল। সেখানে ফরাসী জনসাধারণ তাঁহাদিগকে আন্তরিক প্রীতিশ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়াছিল। রাজা এডোয়ার্ড সার্থক Peace maker আখ্যা লাভ করিয়াছিলেন। মহারাণী আলেকজান্দ্রাও সার্থক Sweet heart of the world আখ্যা লাভ করিয়াছিলেন।

ইহার পর কয় বৎসর রাজ-দম্পতি নানা রাজ্যে ভ্রমণ করেন এবং কাউয়েস ও লণ্ডনে, রুসিয়া, ইটালী ও নরওয়ে প্রভৃতি দেশের নানা রাজা রাণীকে সাদরে অভ্যর্থনা করেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা সাধারণের হিতকর নানা অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। সে সকল কার্য্যের বিস্তৃত বিবরণ এ স্থলে অনাবশ্যক। ইহা বলিলে যথেষ্ট হইবে যে, তাঁহারা য়ুরোপ ও মার্কিণের নানা রাজ্যের সহিত প্রীতি-বন্ধন দৃঢ় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, সঙ্গে সঙ্গে সাম্রাজ্যের সমস্ত প্রজার প্রীতি-শ্রদ্ধা অর্জ্জনে সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন।

উপবিষ্ট কুইন ভিক্টোরিয়া, ক্রোড়ে বর্ত্তমান প্রিন্স অফ ওয়েল্‌স, দক্ষিণে রাণী আলেকজান্দ্রা এবং রাণী মেরী

রাজমাতা

পরম আনন্দে ও গৌরবে রাজদম্পতির জীবন অতিবাহিত হইতেছিল। কিন্তু চিরদিন সমান যায় না। মানুষের জীবনে সুখের সঙ্গে দুঃখের পরীক্ষার কাল সর্ব্বসময়েই বিদ্যমান। মহারাণী আলেকজান্দ্রাই বা সে নিয়মের বন্ধন হইতে অব্যাহতি পাইবেন কেন? ১৯১০ খৃষ্টাব্দের মে মাসে মহারাণী করফিউ দ্বীপে ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন। ৫ই মে তারিখে তিনি সেখানে তার পাইলেন যে, তাঁহার স্বামী সাংঘাতিক রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন। করফিউ হইতে ডোভারে যত শীঘ্র পৌছান যায়, মহারাণী তাহা অপেক্ষা বিন্দুমাত্র সময় অপব্যয় করিলেন না। ডোভারে উপস্থিত হইয়া তিনি দেখিলেন, যেন সারা ইংলণ্ড এক গভীর চিন্তা-সাগরে মগ্ন—লোকের আনন্দ ও আমোদ-প্রমোদ যেন কোন যাদুকরের মায়াদণ্ডে নিমিষে অন্তর্হিত হইয়াছে। ঐ দিন ও তৎপরদিন বাকিংহাম রাজপ্রাসাদ হইতে সম্রাটের অবস্থাজ্ঞাপক নানা ঘোষণা ঘণ্টায় ঘণ্টায় প্রকাশিত হইতে লাগিল। ৬ই মে সব শেষ! রাত্রি প্রায় ১২টার সময় মহারাণী আলেকজান্দ্রা বিধবা হইলেন।

পার্লামেণ্টে রাণী আলেকজান্দ্রা ১৯০৫ খৃঃ

এই আকস্মিক দুর্ঘটনায় মহারাণী আলেকজান্দ্রা শোকে মুহ্যমান হয়েন নাই। তিনি জানিতেন, বিধাতার অমোঘ দণ্ড হইতে রাজা-প্রজা কাহারও অব্যাহতি নাই। আরও জানিতেন যে, তাঁহার এই গভীর শোকে আপামর সাধারণ প্রজার পূর্ণ সহানুভূতিই তাঁহার যথেষ্ট সান্ত্বনা। সেই সহানুভূতির উত্তরে তিনি প্রজাগণকে সম্বোধন করিয়া লিখিয়াছিলেন,—"From the depths of my poor heart I wish to express to the whole nation and to our kind people we love so well my deep—felt thanks for all their touching sympathey in my over whelming sorrow and unspeakable anguish. Give me a thought in your prayers which will comfort and sustain me in all I have yet to go through."

শোকে আচ্ছন্ন হইলেও তিনি জগতের লোকের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া একবারে নির্জ্জন জীবনযাপন করেন নাই, বরং তাহাদের সহানুভূতি ও সমবেদনার বাণী পাইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। কবি টেনিসন তাঁহার "In Memorium" কাব্যে শোকাচ্ছন্নের মুখ দিয়া বলাইয়াছিলেন, "I will not shut me from my kind, আমি মানবজাতি হইতে দূরে আমাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিব না, অর্থাৎ শোকে মুহ্যমান হইলেও আবার আমি জগতের সুখ-দুঃখের অংশ গ্রহণ করিব।" মহারাণী আলেকজান্দ্রাও এই চরিত্রের মত একবারে নির্জ্জনবাসিনী যোগিনী সাজেন নাই। স্বামীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময়ে তিনি তৎসম্পর্কিত সমস্ত আচার-অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়াছিলেন। সেই অন্ত্যে-ষ্টিক্রিয়াকালের একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। সপ্তম এডোয়ার্ডের মৃতদেহ সমাধিস্থানে বহন করিয়া লইয়া যাওয়া হইতেছে, রাজা পঞ্চম জর্জ্জ, তাঁহার পুত্রদ্বয় এবং মহারাণী আলেকজান্দ্রা পশ্চাতে শকটারোহণে শবানুগমন করিতেছেন। সেই শবানুগমনকারীদিগের মধ্যে কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়ামও ছিলেন। যখন সমাধি-ক্ষেত্রে শোভাযাত্রা উপস্থিত হইল, তখন এক জন অশ্বপাল মহারাণীর শকট-দ্বার উন্মোচনার্থ প্রস্তুত হইল। অমনই কোথা হইতে অতর্কিতভাবে কাইজার উইলিয়াম তাঁহার ঘনকৃষ্ণ অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া একলম্ফে অগ্রসর হইয়া মহারাণীর শকটের দ্বার উন্মোচন করিয়া সম্ভ্রমভরে তাঁহাকে ভূতলে অবতরণ করাইলেন। নারীর প্রতি এই সম্মান-প্রদর্শন কাইজারের পক্ষে সে সময়ে অতি শোভনই হইয়াছিল।

তাহার পর বৈধব্যদশায় মহারাণী আলেকজান্দ্রা এই-ভাবেই জীবনের অবশিষ্ট কাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তিনি একবারে সন্ন্যাসিনী সাজেন নাই বটে, কিন্তু আর তিনি জনসাধারণের সমারোহ বা উৎসবব্যাপারে প্রাণ খুলিয়া যোগদান করেন নাই। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে জনসাধারণ আর তাঁহাকে সাধারণ কার্য্যে বড় একটা দেখিতে পায় নাই। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে ধীরে ধীরে আবার তিনি দুই একটি জনহিতকর কার্য্যে যোগদান করিতে লাগিলেন। ঐ বৎসর ২৬শে জুন তারিখটি "আলেকজান্দ্রাদিন" নামে অভিহিত। ঐ দিন তিনি হাঁসপাতাল-সম্পর্কিত উৎসবে প্রথম সাধারণ কার্য্যে দেখা দেন। ইহার এক মাস পূর্ব্বে তিনি আর একটি শোক প্রাপ্ত হয়েন, তাঁহার ভ্রাতা ডেনমার্কের রাজা অষ্টম ফ্রেডারিক পরলোক-গমন করেন। মহারাণী আলেকজান্দ্রা সে শোকও সহ্য করিয়া এই জনহিতকর কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়া সান্ত্বনা লাভ করেন। ইহার পরবৎসর তিনি আর এক শোক প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার আর এক ভ্রাতা গ্রীসের রাজা, আততায়ীর হস্তে নিহত হয়েন। ঐ বৎসর তাঁহার ইংলণ্ডে আগ-মনের পঞ্চাশৎ বাৎসরিক।

রাণী আলেকজান্দ্রা (ক্রোড়দেশে ২টি কুকুর)

১৯১৪ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা আগষ্ট তারিখে ইংলণ্ড জার্ম্মাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। সেই বিশ্বযুদ্ধকালে রাজ-মাতা আলেকজান্দ্রা আহত ও রুগ্ন সৈনিকগণের সেবা-পরি-চর্য্যা কার্য্যে তাঁহার জীবন উৎসর্গ করিলেন। তখন তাঁহার বয়স সত্তর বৎসর। অথচ সেই পরিণত বয়সে তিনি অক্লান্ত পরিশ্রমে এই সেবাপরিচর্য্যার ভার গ্রহণ করিতে বিন্দুমাত্র কাতর হয়েন নাই। তাঁহার সে সময়ের কার্য্যের পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। হাঁসপাতাল-পরিদর্শন, আহত সৈনিকগণের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধান, রণসম্ভার প্রস্তুতের কার-খানা পরিদর্শন, যুদ্ধে নিযুক্ত সৈনিকগণের জন্য দাতব্য চাঁদা আদায় কার্য্য, সেবাপরিচর্য্যার নিয়মকানুন নির্দ্দেশ, সৈনিকগণের পরিবারবর্গের ভরণপোষণের ব্যবস্থা প্রভৃতি

রাণী আলেকজান্দ্রার শববাহক দল

তাঁহার পৌত্র ডিউক অফ ইয়র্কের বিবাহ হইল। সে আনন্দে রাজমাতা যোগদান করিয়াছিলেন।

তাহার পর দুই বৎসর তিনি সাণ্ড্রিংহাম প্রাসাদে শান্ত নির্জ্জন বাস করিয়া আসিতেছিলেন। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের ১লা ডিসেম্বর তিনি অশীতি বৎসরে পদার্পণ করিলেন। তখনও কেহ বুঝিতে পারে নাই যে, তাঁহার ইহকালের লীলা সাঙ্গ হইয়া আসিতেছে। তখনও তিনি শকটারোহণে ভ্রমণ

ব্যাপারে তাঁহাকে কখনও শিথিলপ্রযত্ন হইতে দেখা যায় নাই। যুদ্ধ-বিরতির পর ছয় মাস কাল পর্য্যন্ত তিনি ইহাতে প্রাণমন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। এইখানেই তাঁহার নারীত্ব ও মাতৃত্ব পূর্ণাঙ্গে ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

১৯২০ খৃষ্টাব্দে তিনি অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়েন। সেই সময় হইতে তাঁহাকে সাধারণ কার্য্যে অতিরিক্ত পরিশ্রম করিতে দেওয়া হয় নাই। ১৯২১ খৃষ্টাব্দ হইতে আবার তিনি ধীরে ধীরে সাধারণ কার্য্যে যোগদান করিতে আরম্ভ করেন। গৃহের কোণে আবদ্ধ হইয়া থাকা তাঁহার প্রকৃতি-বিরুদ্ধ ছিল। ১৯২২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার পৌত্রী প্রিন্সেস মেরীর উদ্বাহক্রিয়া সম্পন্ন হইল। তখন হইতে আবার তাঁহার সাধারণ কার্য্যের গুরুভার বৃদ্ধি হইল। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে রাজকুমারী মেরীর প্রথম সন্তান ভূমিষ্ঠ হইল, রাজমাতা আলেকজান্দ্রা পৌত্রীর পুত্রের মুখদর্শন করিলেন ঐ বৎসর তাঁহার ইংলণ্ড আগমনের ষষ্টি বাৎসরিক। ঐ বৎসরের ২৬শে এপ্রেল তারিখে

করিতেন। গত ১৮ই নভেম্বর তারিখেও তিনি শকটারোহণে বায়ু সেবন করিয়াছিলেন। ১৯শে নভেম্বর সংবাদপত্রে ঘোষিত হইল, রাজমাতা অসুস্থ, হৃদ্‌রোগে সাংঘাতিকভাবে আক্রান্ত। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দের ২০শে নভেম্বর তারিখে তাঁহার আত্মা এই নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়া ইহলোক হইতে চির-বিদায় গ্রহণ করিল। সৌভাগ্যবতী নারী দীর্ঘ রোগভোগে কষ্ট না পাইয়া পুত্র-কলত্র রাখিয়া অনন্তধামে চলিয়া গেলেন।

রাণী আলেকজান্দ্রার শবযাত্রার দৃশ্য

রাজমাতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া

রাজমাতা আলেকজান্দ্রার মৃত্যুর পর তাঁহার দেহ স্যাণ্ড্রিং-হাম প্রাসাদের শয়নকক্ষে শয্যার উপর রক্ষিত হয়। নানা পুষ্পে তাঁহার দেহ শোভিত করা হইয়াছিল। এক জন প্রত্যক্ষদর্শী বর্ণনা করিয়াছেন যে, সেই সময়ে তাঁহার চিরনিদ্রায় মগ্ন মুখমণ্ডলে অপূর্ব্ব শান্তি বিরাজ করিতেছিল, তখন যেন তাঁহাকে "ত্রিশ বৎসরের অধিকবয়স্কা বলিয়া বোধ হইতেছিল না।" তাঁহার আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, ভৃত্য পরিজন এবং প্রজাবর্গকে একে একে অথবা দুই জন করিয়া একসঙ্গে তাঁহাকে শেষ দেখা দেখিতে দেওয়া হইয়াছিল।

তাহার পর তাঁহার দেহ গান-ক্যারেজে করিয়া স্যাণ্ড্রিং-হাম জমীদারীর মধ্য দিয়া স্যাণ্ড্রিংহাম গির্জ্জায় স্থানান্তরিত করা হয়। ২৬শে নভেম্বর তারিখের অপরাহ্লে গির্জ্জায় রাজপরিবার শবাধারের পার্শ্বে বসিয়া প্রার্থনা করেন। পরে গির্জ্জা হইতে উলফার্টন ষ্টেশনে এবং উলফার্টন ষ্টেশন হইতে রেলযোগে লণ্ডন লইয়া যাওয়া হয়। লণ্ডনের কিংস ক্রস ষ্টেশন হইতে রাজমাতার দেহ সেণ্ট জেমস প্রাসাদে ও পরে তথা হইতে ওয়েষ্ট মিনিষ্টার এবিতে নীত হয়। তথায় ভজনাকার্য্যের পর উইণ্ডসর দুর্গের এলবার্ট মেমোরিয়াল চ্যাপেলে কফিন রক্ষিত হয়। ইহার পর তাঁহার দেহ সেণ্ট জর্জ্জেস রাজকীয় চ্যাপেলে রাজা সপ্তম এডোয়ার্ডের কবরের পার্শ্বে রক্ষিত হইবার কথা।

উলফার্টন ষ্টেশনে দেহ নীত হইবার কালে রাজা পঞ্চম জর্জ্জ, যুবরাজ প্রিন্স অফ ওয়েলস, নরওয়ের যুবরাজ, ডিউক অফ ইয়র্ক এবং প্রিন্স হেনরী গান-ক্যারেজের পশ্চাতে নগ্নমস্তকে পদব্রজে ২ মাইল পথ গমন করেন। রাণী মেরী, রাণী মড, রাজকুমারী ভিক্টোরিয়া এবং গ্রীসের রাজকুমারী শকটারোহণে তাঁহাদের অনুসরণ করেন। স্থানীয় জনগণও সেই শেষ যাত্রায় তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাপ্রীতি প্রদর্শনের জন্য অনুগমন করিয়াছিল। রাজমাতার শবাধারের উপর রক্ষিত পুষ্পমাল্যাদির সংখ্যা সমধিক হইয়াছিল। পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্র খৃষ্টান ভজনালয়ে তাঁহার আত্মার মঙ্গল কামনা করিয়া প্রার্থনা করা হইয়াছিল। এইরূপে জগতের অসংখ্য লোকের শ্রদ্ধাপ্রীতি অর্জ্জন করিয়া পরিণত বয়সে আলেক-জান্দ্রা পরলোকে প্রস্থান করিয়াছেন। তাঁহার Gentle lady of Sandringham আখ্যা চিরদিন তাঁহার জন-প্রিয়তার পরিচয় প্রদান করিবে সন্দেহ নাই।

স্যানড্রিংহাম প্রাসাদ হইতে উলফারটন ষ্টেশনে রাণী আলেকজান্দ্রার শবের শোভাযাত্রা

গজুর ভজন

৩

গজু যে মাসী খুঁজিতে নবদ্বীপ যাচ্ছে, এ কথা সে বদ্দিকে বলেনি। নবদ্বীপ-টবদ্বীপের মত বোষ্টম ভিখিরীর আড্ডা যে গজেন্দ্র-জীবনের দরের লোক চেনে, ফিজি, হাইটের পোজিসানের জেণ্টেলম্যানের মাসী-ফাসী গোছ কিম্ভূত কুটম্ব থাকতে পারে, এ কথা সে স্ত্রীর কাছে কিংবা অন্য কোন ভদ্রসমাজে স্বীকার করতে সাহস করে না।

এই শিক্ষা সভ্যতা আত্ম-প্রতিষ্ঠার দিনে এখনও এমন লোকের অভাব নেই যাঁরা গজুর স্বভাবের এই বিশেষত্ব প্রশংসার চক্ষুতে দেখেন না, ফলে এই দোষে সেই সব লোক নিজেরা ঠকে মরেন।

ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ, নবশাখ প্রভৃতি জাতিভেদের আভিধানিক আখ্যা আজও প্রচলিত আছে বটে, উন্নত-সমাজ কিন্তু এখন অন্যরূপ বর্ণাশ্রমের সৃষ্টি করেছে। অনেকে মনে করেন, বিলাত-ফেরত বাবুরা এক জাত; কিন্তু সেটা একেবারে ভুল সংস্কার; বিয়াল্লিস মোহরী ব্যারিষ্টার আর তিনশো টাকা মাসমাহিনার ল-লেক্‌চারার এক জাতি নয়! মোটর-চড়া বি-এল্ আর ট্রামমাত্র গতি বি-এল্ জাতিতে আলাদা। বত্রিশ-ষোল ভিজিটের ডাক্তার বৈদ্য আর দু'চার টাকার ডাকে হাজির ডাক্তার-বৈদ্য পাংক্তেয় নয়। এইরূপ শিক্ষক জাতির মধ্যে কেরাণী জাতির মধ্যে-ও পৈতার বহরের ভিন্নতা আছে; সামবেদীর পৈতা যত লম্বা, যজুর্ব্বেদীর পৈতা তার অর্দ্ধেকও নয়। সুতরাং উচ্চ জাতি ব'লে পরিচয় দিয়ে সমাজের সম্মান নিতে হ'লে লোককে অনেকটা লেফাপা দোরস্ত হ'য়ে চল্‌তে হয়।

ইক্ষুরস প্রকৃতির দান; কলার কৌশলে সেই রস শর্করায় পরিণত হয়। দুগ্ধ ও স্বভাব-সৃজিত সুধা কলার প্রক্রিয়ায় মানুষ সেই দুগ্ধকে অম্লসংযোগে দধি বা ছানায় পরিণত ক'রে, আস্বাদের মাধুর্য্য-বৈচিত্র্য উপভোগ করে।

সভ্যতার সঙ্গে কলার উৎকর্ষের বৃদ্ধি হ'লে চিনি ও ছানারূপ প্রকৃতির বিকৃতিপ্রাপ্ত পদার্থদ্বয় একত্র মিলিত হ'য়ে মনোহরা সন্দেশ নামে অভিহিত হয়; পাক্‌পটুতা ঐ সন্দেশকে রসালগ্রাহ্য সুস্বাদু ক'রে দেয়।

সত্য স্বভাবের দান, কিন্তু যেমন পাকা সোনায় একটু খাদ না মিশালে গহনা গড়া যায় না, তেম্‌নি বিষয়-কর্ম্মে বা সামাজিক আদান-প্রদানে খাঁটি সত্যে Current coin অর্থাৎ বাজার চলন মুদ্রা তৈরী করা যায় না; টাকা, আধুলি, সিকি ভেদে ভাগ বুঝে একটু মিথ্যার খাদ মিশান একান্ত আবশ্যক। সংসারী লোক যে সত্য কথা কইতে পারে, এ কেউ-ই বিশ্বাস করে না, এই জন্যই দোকানে দরকরা-কষির সৃষ্টি, হাফ-প্রাইস্-সেল্ এত মিষ্টি। লোকে যদি কথায় কথায় দশ বিশ লাখ টাকায় রাজা উজীর মারে, তবে পাঁচ জনে বলে বটে,—"অত জাঁক কিছু নয়, ওঁর দেড় লাখ, দু'লাখ টাকা থাকে ত ঢের।" অন্ততঃ আটশো টাকা মাসিক আয় প্রচার না কল্লে বন্ধু-বান্ধব ব্যাপারী মহাজন সেটা মনে মনে দু'শো-আড়াইশো ব'লে ধ'রে নেয় না।

যদি-ও আজ পর্য্যন্ত গজেন্দ্র-জীবনের মাসিক আয় গড়ে সত্তর-আশী টাকার উপর পৌঁছায় নি, তবু সে কথার আভাষে চালচলনে এমন একটা লেফাপা বজায় রেখে চলে, যাতে অতি কুটিল বাড়ীওয়ালা ও জটিল দোকানদার-ও সে যে অন্ততঃ টাকা শ'তিনেক পায়, তা ঠিক ক'রে রেখেছে। মফঃস্বলের লোকের এর উপর আর একটা বড় সুবিধা আছে, যা খাঁটি কলিকাতাবাসীদের আদৌ নেই।

পূর্ব্ব-সংস্কার হ'তে আমরা এখন-ও বিশ্বাস করি যে, পল্লীবাসী লোকের কিছু না কিছু ভূসম্পত্তি আছে-ই আছে। এদের মধ্যে-ই আবার অনেকে-ই কথায় কথায় "আমাদের প্রজারা", "খাজানা আদায়", "কালেক্টরী", "মামলা," "সরীকানি" প্রভৃতি সেরেস্তা মাফিক বুলির ফোড়নে আলাপকারী এমন পাক ক'রে তোলেন যে, আমরা তাঁদের

ছোট-খাট জমীদার বা যোদ্দার না মনে ক'রে পারি না। কলাবিৎ গজেন্দ্র অবশ্যই এ সনাতন প্রথা কার্য্যক্ষেত্রে খাটাতে কসুর করেনি। কিন্তু মফঃস্বলবাসীদের যেমন এক দিকে ঐ সুবিধা, অন্য দিকে তেমনই একটা বিশেষ অসুবিধা আছে; কল্‌কাতা ত্যাগ ক'রে তাঁ'রা দেশে গেলে-ই বা অন্যত্র রওনা হ'লে এখানকার পাওনাদারদের মনে বড় বড় জমীদারদের সম্বন্ধে-ও কেমন একটা খট্‌কা লাগে, তা গজুর মত লোকের ত কথা-ই নাই।

গজুর হ্যাট্‌-কোট-টাই আর বদরিকার বুট্‌ বেসলেট দেখে বাড়ীওয়ালা বাড়ীর চাবি খুলে দেন। ছোট-খাটো পরিপাটী দোতলাটি ও তার কাশ্মিরী বারাণ্ডা দেখে বহু-বাজারের এক জন ক্যাবিনেট মেকার পঞ্চাশ টাকার মাত্র একখানি চেক পেয়ে কৌচ, কেদারা, টেবিল, আলমারী, টিপয়, সাইডবোর্ড, দেরাজ, হোয়াটনট, খাট প্রভৃতিতে প্রায় ছ'শো টাকার আস্‌বাবে ঘরগুলি সাজিয়ে দেয়। যার অমন সাজান-গোছান বাড়ী, ফ্রেঞ্চকাট্‌ দাড়ী, আর স্বাধীনা স্ত্রীর সিল্কের সাড়ী, তা'কে কোন্‌ দোকানদার না আহার্য্য আর কোন্‌ "এণ্ড কোং" না ব্যবহার্য্য বস্ত্রাদি সরবরাহ করে!

দোকানদারদের মধ্যে কি একটা ফ্রি মেসনরি আছে তা বোঝা যায় না, কিন্তু গড়পাড়ের মুদী ক'দিন যেই সাহেবকে ঢুক্‌তে-বেরুতে না দেখে মুখভারী করা চাকর-দের মুখে "কে জানে কোথায় গেছে" শুনে তাই তো—তাই তো কর্ত্তে সুরু কল্লে, অমনি কোত্থেকে কি টেলি-প্যাথিতে যেন বৌবাজার ধর্ম্মতলা রাধাবাজার প্রভৃতি সব আড়ঙের এণ্ড কোংরা হোইট্‌ সাহেবের বাড়ী বিল পাঠাতে সুরু ক'রে দিলে।

বদরিকা শুধু ব্যতিব্যস্ত নয়, সন্ত্রস্ত। বলা গেছে মাসী বা নবদ্বীপ এ রকম কোন কথা গজু স্ত্রীকে-ও বলেনি আর কা'কেও বলেনি; সে ব'লে গেছে ব্যাঙ্গমা বেগমের একখানা লাইফ সাইজ ছবি আঁকবার জন্য মালদহের নবাব-বাড়ী থেকে একটা তা'র এসেছে, তাই সে যাচ্ছে। কিন্তু রাধাবাজারের ক্লক মার্চ্চেণ্ট টমাস্‌ সিদ্ধি এণ্ড কোং পি, এম্‌, বাগ্‌চীর ডাইরেক্টরী খুলে মালদহে কোন নবাবের নাম না দেখে বড়-ই উদ্বিগ্ন হ'য়ে পড়েছেন, আর তাঁ'র বুকের ধুক্‌-ধুকুনিটুকু ব্যোম-তরঙ্গে বাহিত হ'য়ে হোইট সাহেবের কৃপাপ্রাপ্ত সকল দোকানদারকে-ই গালে হাত দিয়ে ভাবতে বসিয়ে দেছে।

আজ সকাল থেকে রাঁধুনী চাকর-বাকর কায করা বন্ধ ক'রে দিয়েছে। সকলেরই বাড়ী থেকে জরুরী চিঠি এসেছে;—বেয়ারার বাপ মরে মরে, দেখবার ইচ্ছে থাকে তো পত্রপাঠ চ'লে আসে, ছোক্‌রা চাকরটির দেশে বে'র সম্বন্ধ ঠিক হয়েছে, যেতেই হবে; আর বামুনঠাকুরের দেশে সব জমী সেট্‌লমেণ্ট হচ্ছে—সে রাত্রিতে-ই না রওনা হ'লে দেড় বিঘের জমীদারীতে একটা ভয়ানক গোলমাল হ'য়ে যাবে। তিন চার মাস ধ'রে সকলের-ই মাইনে বাকী পড়েছে, সাহেব কবে ফিরবেন ঠিক নেই, অত বড় মেম সাহেবের হাতে নিশ্চয়ই টাকা আছে, তিনি কেন গরীবদের টাকাগুলি চুকিয়ে দিচ্ছেন না। ঘরে এক দানা চাল, এক গুঁড়ো ময়দা বা এক টুক্‌রো কয়লা পর্য্যন্ত নাই। টাকার অভাবে কয়লাওলা ওয়াগন থেকে ডিলিভারী নিতে পাচ্ছে না, মুদীর দোকানে ভাল চাল নেই, এখন যা আছে, তা সাহেব মুখে দিতে পার্‌বে না, ময়দার ইলেক্‌ট্রিক কলের মালিক এক ছোঁড়া মাড়োয়ারী—আর অধিক বলবার প্রয়োজন নেই।

বেলা ১১টা বেজে গেছে, উপবাসী বদরিকা অন্ত ভক্ষ্যের চিন্তার পারে কাল পরশুর পানে চেয়ে যেন একটু ঝাপ্‌সা ঝাপ্‌সা দেখছে।

পাড়াগেঁয়ে মেয়ে ছোটবেলায় দেশে থাকতে কল্‌কেতা সহরের কত রকম আজগুবী গল্প শুনতো। সেথা রাস্তায় পয়সা ছড়ানো থাকে, মফঃস্বলের লোক গিয়ে ধুলোমুঠো ধর্‌লে সোনা মুঠো হ'য়ে যায়, সেখানকার বাবুরা গাড়ী ভিন্ন এক পা নড়ে না, ঝিয়েদের পর্য্যন্ত গা-ভরা সোনাদানা, ভাল ঘরের মেয়েরা তো সেজে-গুজে গড়ের মাঠের ধানের ক্ষেতে, কালীঘাটের চৌরঙ্গীতে মনুমেণ্টের ওপর বেড়িয়ে বেড়ায়। দশ বছরের মেয়ে মার সঙ্গে কল্‌কেতায় এসে বাপের বাসায় যদিও এ সব কলকেতাগিরি দেখতে পায়নি, তবু কলসী কাঁকে ক'রে পুকুর থেকে জল-ও আন্‌তে হ'ত না, ধান সিজুতে-ও হ'ত না, আর থালা-ঘটি-ও বড় একটা মাজতে হ'ত না। কিন্তু গজু দাদার মুখে লম্বা লম্বা কথা শুনে আর "প্রথম চুম্বন" "স্বামীর বন্ধু-দর্শনে" প্রভৃতি কবিতা, "বিধবা ধোপানী", "সতীত্বের জগন্নাথ তীর্থ" প্রভৃতি

উপন্যাস পাঠ করে তা'র বাবা যে এখন-ও যে বাঙ্গাল সেই বাঙ্গাল আছে, এটা সে বিলক্ষণ রকম বুঝতে পেরেছিল, আর ঐ রকম বর্ব্বর বাবা জাতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ক'রে "সোনার বাংলাকে" ডায়মণ্ডকাটা করবার জন্যই যে গজেন্দ্রের ন্যায় যুবা এবং বদরিকার ন্যায় যুবতীর জন্ম এটাও তা'র দাদা তা'কে উদ্দীপনার ভাষায় বুঝিয়ে দিয়েছিল।

এই জন্যেই রাখাল যেমন বাজার থেকে হাঁসের ডিম সেদ্ধ কিনে খেয়ে এক দিন ভারত-উদ্ধারের পথে অনেকটা এগিয়ে গেলুম মনে করেছিল, তেম্‌নি বদি-ও গজু দাদাকে লুকিয়ে বিয়ে করতে সম্মত হ'য়ে সংস্কারের একটি প্রদীপ্ত দৃষ্টান্ত দিয়ে সমাজের বাকরোধ ক'রে দেবে ভেবেছিল।

মোছলমানী খানায় আর মোছলমানী তামাকে, "খাইয়ে" তত মজা পায় না, দূরে ব'সে যে খাখে সে ঘ্রাণে ঐ দুটো জিনিস যত লোভনীয় মনে করে। প্রণয়রূপ বিলিতী খানাটাও অনেকটা ঐ রকম। যৌবনের জ্বলন্ত উনুনে পাকে চড়ালে প্রণয় যত মিষ্টি লাগে, বিবাহের পর সান্‌কিতে বেড়ে খাবার সময় ততটা সুখকর প্রায় হয় না; হাতে চর্ব্বি চট্‌চট্‌ কর্ত্তে থাকে, মাংসের ছিব্‌ড়ে দাঁতের ফাঁকে ঢুকে যায়, অন্যমনস্কে এক একবার হাড় কামড় দিলে দাঁত কন্‌কনিয়ে ওঠে, আর পরদিন প্রভাতে উদ্গারে বাসী পেঁয়াজ-রসুনের— বুঝেছেন তো।

যিনি যত-ই মন্ত্রগুপ্তি জানুন, স্বামীর ভেতরকার কথা স্ত্রী আর খানসামা খানিকটা টের পাবে-ই পাবে। এক-দিকে যেমন বদি গজুর মনোগ্রাম ছাপা চিঠির কাগজ এন্‌ভেলাপ পিওন বই কলিং বেল ইলেকট্রিক ফ্যান প্রভৃতিকে যতটা রিয়েলিষ্টিক মনে কর্ত্তো, অন্য দিকে তেম্‌নি তার ক্যাশবাক্সটিকে একটি জাপান পালিশ-করা রোমান্টিক পদার্থ ব'লে-ই ভাবতো; আর চেক বইখানি আয়রণ-সেফে না রেখে ওয়েষ্ট পেপার বাস্‌কেটে রাখলে-ই বেশী মানানসই হয় মনে কর্ত্তো।

বিবাহের পর মাস তিনেক যেন একটা ফুলের মালার স্বপ্নের মত চ'লে গেল। তখন "প্রিয়তম" "ব—আমার" "চোখে চোখে হাঁসি" "ফোলা চুলের রাশি" অমাবস্যার নিশিতেও নবীন জীবন দুটিতে পূর্ণিমার শশীর সুধাবৃষ্টি করতো। কিন্তু কাযের তাড়া, রান্নাঘরের সাঁতলানর সাঁড়া, গোছান-খিতানোর দরকার, তাগাদার সরকার, যখন সেই স্বপ্নের মোহ ভেঙে দিলে তখন দুজনের-ই আলাপের সুর একটু ফিরে গেল।

ভায়ের গলায় মালা দিয়ে বদি দেখলে যে, দেশে, সমাজে বা সংবাদপত্রে তেমন একটা কিমাশ্চর্য্য কিমাশ্চর্য্য ধ্বনি উত্থিত হলো না; একখানা সাপ্তাহিকে গয়ারামটা যা একটা ব্যঙ্গ-চিত্র দিয়েছিল মাত্র।

মাতার আত্মহত্যা ও পিতার নিরুদ্দেশ-ও কন্যার মনে বেশ একটু বেদনার ধাক্কা দিলে। তার পর—তার পর বদি যেন গজুর অঙ্গ থেকে স্বামীর সুঘ্রাণ অপেক্ষা দাদার গন্ধটা-ই বেশী ক'রে পেতে লাগলো।

এততে-ও বদি অনেকটা টেনেটুনে আপনাকে সাম্‌লে রেখেছিল, কিন্তু এ ক'দিনের তাগাদা আর আজ একেবারে ভাঁড়ার খালি, চাকর-বাকররা হাত গুটিয়ে ব'সে আছে দেখে বেচারা একেবারে দমে গেল।

আদত কথা, বিবাহ জিনিষটা এক রকম জোড় কলম বাঁধা; এক গাছে দুটো কচি ডাল একটু ছুলেছেলে এক-সঙ্গে বেঁধে দিলে দিনকতকের জন্য জুড়ে যেতে পারে বটে, কিন্তু তা থেকে শেকড় বেরোয় না; একটি শেকড়-শুদ্ধ ছোট চারার সঙ্গে অন্য একটি বড় গাছের তেজীয়ান্‌ নূতন শাখা জুড়ে দিয়ে যে কলম হয়, তাই শেকড় গেড়ে মাটীতে বসে আর ফল-ও দেয়। য়ুরোপেও শুনেছি কজিন-বিবাহ ইদানীং ক'মে আসছে।

এ ক্ষেত্রে-ও মূলের অভাবে দুটি ডাল অল্পদিনের মধ্যে ফাঁক হ'য়ে যেতে লাগলো; প্রথম যৌবনে তপ্তরক্তজনিত আসক্তিকে প্রণয় নাম দিয়ে দুজনকে একত্র বাঁধবার জন্যে যে সুতাগাছটি জড়ানো হয়েছিল, সেটি মোটে ভাল ক'রে চরকায় কাটা নয় কেবল হাত-পাকান, কাযেই দুদিনে আল্‌গা হ'য়ে গেল।

বেলা বারটা বেজে গেছে, মুখখানি শুকিয়ে জলটুকু পর্য্যন্ত মুখে না দিয়ে বদরিকা ঘরটিতে ব'সে আছে; এমন সময়ে তার বোনের চেয়ে-ও আপনার প্রিয়তমা সখিদ্বয় অরু ও নিপু, সৌহৃদ্য সম্বোধনে ইমিত্তি ও মফিন্‌, জাপানী সিল্কের শাড়ী জড়ানো সৌন্দর্য্য নিয়ে সবুট-চরণ-চাঞ্চল্যে হাস্‌তে হাস্‌তে দন্তপংক্তির জলুস্‌ দেখিয়ে প্রবেশ কল্লেন। অরু একেবারে তাড়াতাড়ি গিয়ে তার ব্লাউজের আস্তানা-আবৃত চারু-বাহুলতার আলিঙ্গনে বদরিকাকে আবদ্ধ ক'রে

বল্লে ;—"আমাদের অন্যায় হয়েছে ভাই, তুমি ক'দিন একলাটি আছ, আসতে পারিনি ; কি জান ভাই ইমির্ত্তি, শুনেছ ত আমাদের মিষ্টার চাকী আর তোমার মফিনের তিনি মিষ্টার চক্রবর্ত্তী পতিত জাতিকে উন্নত করবার জন্য কি রকম প্রাণপণ চেষ্টা কচ্ছেন—"

নিপু। শুনে আশ্চর্য্য হবে মফিন, গেল মাসে উনি একবার দেশে গেছলেন, সেখানে এক জন নমঃশূদ্রদের বাড়ী একটি আঠার বছরের ছেলে মারা যায়, তাদের বাড়ীর লোকরা কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে সেই মড়া নিয়ে যখন নদীর বাগে শোভা-যাত্রা করে, তখন মিষ্টার চক্রবর্ত্তী কারুর কথায় দৃক্‌পাত না ক'রে বরাবর তাদের সঙ্গে আগে আগে ফুলের মালা গলায় দিয়ে ফুল ছড়াতে ছড়াতে গিয়েছিলেন।

অরু। আর পরশু রাত্রতে তুমি-ই না ত্যাগ স্বীকারের কি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দেখালে! স্বহস্তে মেথরদের উঠান ঝাড়ু দিয়ে—

বদি। মেথরের উঠান!

অরু। হ্যাঁ। দীনদুঃখী পতিতের বেদনায় যখন পুরুষের বুক কেঁদে উঠেছে, তখন আমরা নারীজাতি কি পশ্চাতে প'ড়ে থাক্‌বো?

আমাদের পাড়ায় এক মেথরদের বাড়ী ছিল, তাদের কার্য্যে সাহায্য করবার জন্য, উৎসবের আনন্দে যোগ দেবার অভিপ্রায়ে—

নিপু। তোমার ইমির্ত্তি কম্মু'র মার হাতের তৈরী হাজারিবাগি পিঠে পর্য্যন্ত আহ্লাদ ক'রে খেয়েছেন।

অরু। সে ত আমি খেয়েছি-ই, আর তুমি যে ভাই সেই বাল্‌তি-মালতী-মালা-বেষ্টিতা-মেথরাঙ্গন স্বহস্তে ঝাড়ু দিয়ে দিলে!

বদি। তা—তা—

অরু। এ বিষয়ে অবশ্য মিষ্টার চক্রবর্ত্তীকে ধন্যবাদ দিতে হয়; কেন না তিনি ঐ কাযের জন্য নিপুকে একগাছা নূতন ময়ূরপুচ্ছের বুরুষ কিনে দিয়েছিলেন।

নিপু। আর তুমি-ও ত সেই উঠানে আলপনা দিয়ে দিলে ভাই। কি চমৎকার সে রচনা-ই ইমির্ত্তি, যেন সব সত্যিকার নোট, সত্যিকার কোম্পানীর কাগজ—

অরু। আর সেই কমিক—হাসির ছবিটা!

নিপু। হ্যাঁ হ্যাঁ সে ভাই বড় মজা;—যে পিঁড়েতে বর-ক'নে দাঁড়াবে তার উপর আল্‌পনা দিয়ে অরু যে একটা টিকিওয়ালা পৈতে-পরা বুড়ো ভট্‌চার্য্যি বামুনের মূর্ত্তি এঁকে দিয়েছিল; তা দেখলে মিষ্টার হাইট্‌ও সুখ্যাতি না ক'রে থাক্‌তে পার্‌তেন না।

অরু। ভাল কথা, ইনি ফিরেছেন?

বদি। না।

অরু। কবে ফির্‌বেন?

বদি। বলতে পারি না।

অরু। চিঠি পত্র—

বদি। কিছু পাইনি।

নিপু। একটা কথা শুন্‌ছিলুম—অবশ্য গুজবে আমরা বিশ্বাস করি না—

অরু। আর মালদহের মতন পুরাতন সহরে যে এক জন-ও নবাব নেই, এটা কি বিশ্বাসযোগ্য?

নিপু। কল্‌কাতার দোকানদারগুলোর চিরকাল এক রোগ; সলিয়ে ফলিয়ে জোর ক'রে সব জিনিষ গছাবে, তার পর বলা নেই কওয়া নেই বিলের উপর বিল পাঠান!

ঠিক এই সময়ে বদির ঝি যেন ক্ষুব্ধোমুখী হ'য়ে বক্‌তে-বক্‌তে ঘরের মধ্যে এসে বল্‌তে লাগলো;—"আ মলো হাড়-হাবাতে হতচ্ছাড়া সব, মর, মর—চার চারটে দরোয়ান্ আর দু' মিন্‌ষে সরকার না কি বলে তাই; বন্নু সবাইকে, খুব দশ কথা শুনিয়ে দিনু, আ গেলো যা, সাহেব ফিরুক, ট্যাকা রোজগার কর্ত্তে গেছে, দুশো পাঁচশো নিয়ে ঘরকে আসুক, তখন বিল দেখাস্, কিল তুলিস্; ভদ্দর ঘরের মেয়ের ওপর এ উৎপাত কেন? বেচারা একে এই বেলা পর্য্যন্ত মুখে জলটুকু দেয়নি;—"

নিপু। অরু!

অরু। নিপু!

নিপু। তবে সত্যি?

অরু। দেখছি ত তাই।

নিপু। মিথ্যা! মিথ্যা! সব মিথ্যা!

অরু। উঃ প্রতারণা! প্রতারণা! মিথ্যা!

বদি। কেন কি হ'লো ইমির্ত্তি, কি হ'লো ভাই মফিন্?

নিপু। এখন-ও প্রতারণা! এখন-ও ইমির্ত্তি! এখন-ও মফিন্!

বদি। তবে কি বলবো ?

অরু। নতজানু হ'য়ে ক্ষমাপ্রার্থনা করা তোমার উচিত।

নিপু। আমাকে যে নারকলের খাবার তৈরী ক'রে সিল্কের জ্যাকেট দিয়ে তত্ত্ব করেছিলে, তা প্রতারণা !

অরু। আমার বিবাহের বাৎসরিক উৎসবের দিনে যে রূপোর পাউডারের কৌটা দেওয়া হয়েছিল, তাও প্রতারণা ; আমি মিথ্যার উপহার গ্রহণ করিছি ; কি পাপ !

নিপু। এখন-ও আমরা লেডী মনে ক'রে আপনার লোকের মত কথা বল্‌ছিলুম—মানা করেনি—উপোস ক'রে মর্চ্চে বলেনি !

অরু। যার একটা জলখাবার পয়সা নেই, ঘরে বোধ হয় চাল-ও নেই, সে কি না আস্পর্দ্ধা ক'রে আমাদের নিজের সঙ্গে একাসনে বসিয়েছে।

নিপু। অন্নহীন ! ইতর ! ইতর ! ধিক্ ! ধিক্ ! এস অরু, আমরা এখনি সকলকে সাবধান ক'রে দিই ; সোসাইটী গেল ! মেথর-মিত্রা নৃপেন্দ্রকুমারী আত্মমর্য্যাদার তাড়নায় অরুণার কর-তরুশাখা ধরিয়া খরপদে গৃহত্যাগ করিয়া গেলেন।

বদি কাঁদিয়া ফেলিল ; এ কান্নায় কলা প্রকাশের আভাষও ছিল না, একেবারে বুকখানা ফেটে রক্ত যেন গ'লে জল হ'য়ে পল্লীবালার চোখ দিয়ে গড়িয়ে ঝর্-ঝর্ ক'রে প'ড়ে গেল।

আর ঝি—সে তো একেবারে অবাক্ !

যদি কেউ এ লেখাটা পড়েন, তা হ'লে ভেবে দেখবেন কথাটা বড় সোজা নয় ; ঝি অবাক্ ! যে খোলার-ঘর-বাসিনী সকালে-বিকেলে-কায-ক'র্ত্তে-আসুনি, কথায়-কথায়-মনিবের-ওপর-কসুনি, বাবু-ধাক্কা-পরিহিতা, চুড়ী-বলয়িতা কাণে মাকড়ি নাকে আঁকড়ি নিজে চাকরী ক'র্ত্তে এসে আট্‌টার মধ্যে বাসন মেজে দিয়ে, মনিবের আফিসের চাকরীটি বজায় রেখে দেয়, সেই ঝি-জাতি-সম্ভবা আমাদের এই নিম্বমুখী ঝি,—বদরিকার জন্য জীবন বিসর্জ্জনে সমর্থা মফিন্ ইমির্ত্তির কীর্ত্তি দেখে ঝাঁটা নিয়ে তেড়ে যাওয়া চুলোয় যাক্, মুখে একটা রা কাড়্‌তেও পার্লে না। বেচারী আস্তে আস্তে মেজেয় ব'সে প'ড়ে, একটু যেন অপ্রস্তুতভাবে প্রভুপত্নীর দিকে চেয়ে ব'ল্লে ;—তা—তা—মা, শুখ্যি ঢ'লে প'ড়্‌তে যায়, এতবেলা মুয়ে একটু জলও দেও নি, তা—তা—আমি হাঁড়ীটে চড়িয়ে দেব ? কয়লা এখনও দিন দুয়ের মত ঘরকে আছে, লুকিয়ে রাখ্‌ছিনু।

বদ। হাঁড়ী চড়াবে তুমি !

ঝি। হাঁ মা, মিন্‌সেগুণোর হ্যাঁপায় প'ড়ে আমিও গোসা ক'রে ঘর চ'লে গেছ্‌নু ; রান্না ক'রে দু মুঠো খাবার পর মনটা যেন কেমন আকুটে উঠ্‌লো, তাই ঘর থে এক নোট চাল, এক মুঠো ডাল আর গোটা দুই আলু টালু এনেছি,—এত বেলায় বাজারকে গেলে মাছ টাছ কি আর পেঁতু ;—তা' দি না দুটি চড়িয়ে, আহা ছেলেমানুষ কি উপুষী থাকৃতে পারে !

বদরিকার চোখের জল এখনও শুকোয় নি, কথা-গুলো-ও যেন গলার ভেতর দে ঠেলে ঠেলে বেরোতে লাগ্‌লো ;—ব'ল্লে—"তা' তুমি কেন এতটা ক'র্ত্তে গে'লে—গরিব মানুষ—"

ঝি। অ হরি ! আমরা আবার গরিব হনু কদ্দিন থে ? যানাদের সোনাদানা আছে তানারাই তো ধন কড়ি খোয়া গেলে গরিব হয় ; আমরা বড়লোক-ও নই, ক্যাঙ্গাল-ও নই, ছিরকালটা ঝি আছি ছিরকালটাই ঝি থাক্‌ব—গতর যদ্দিন টেঁক্‌বে। দশ বছর আগে যে ভাত খেয়েছি আজও সেই ভাত খাচ্ছি, দশ বছর পরেও সেই ভাত খাব।

বদ। তা আমিই কেন রাঁধি না।

ঝি। কোন্ বুক নিয়ে রাঁধ্‌বে মা ; অই ঝক্‌মকে ডাইনি দুটো বাণ মেরে যে তোমার আদ্দেক রক্ত চুষে খেয়ে গেল ! আমিই দিচ্ছি ঝপ্ ক'রে দুটো সেদ্ধ ক'রে ;—তোম্‌রা তো আর জাত্ ফাত মানো না।

বদ। জাত না—জাত না, তবে তুমি—

ঝি। (ঈষৎ হাসিয়া) তা বটে—তা বটে, দেহোটা একটু অশুরুদ্ধু ; কিন্তু মা তোমার এই বিয়ের কথা আমি জানি, পাঁচ জনে পাঁচ কথা বল্‌বে ব'লে কারুর কাছে ভাঙি নি।

বদ। (সচকিতে) আমার বিয়ের কথা ! তা—তা—তুমি কি জানো ?

ঝি। (নিম্নস্বরে) সাহেব তো তোমার পিশুতো

ভাই; বাঙালীর ঘরে মুরগীই খাও জুতোই পর, ভাই বোনে তো আর বিয়ে হয় না, ও এক রকম রাখারাখি ;—

বদি একেবারে মেজেয় লুটিয়ে প'ড়ে ডুকরে কাঁদতে লাগ্‌লো। ঝি সস্নেহে তাকে তুলে বুকের কাছে টেনে নিয়ে চোখ মুছোতে মুছোতে ব'ল্লে, "মা ভচ্ছনা করিনি, ভচ্ছনা করিনি, বুকে বাজবে মনে ক'রেও বলিনি, একে দিশী লোক, তায় ছেলেমানুষ, কিছু তো জানো না; আমি সব ভাল ভাল লোকের কাছে শুনিচি তোমার পেটে একটা হ'লে, বাছা সাহেবের একটা দাঁতখোটা খ'ড়্‌কে এক পাটী ছেঁড়া জুতোও পাবে না।"

বদি ফোঁপাতে ফোঁপাতে ব'ল্লে, "সে কি, সে কি তুমি এ সব কথা কোত্থেকে জান্‌লে?

ঝি। ওমা, তোমরাই কি একা কাগচ পড়, আমাদের-ও খবরের কাগচ আছে।

বদি। তোমাদের খবরের কাগচ্‌?

ঝি। গঙ্গার ঘাট্‌ মা গঙ্গার ঘাট;—গঙ্গার ঘাট্‌ আমাদের খবরের কাগচ্‌। আমার এক মাসী যে নিত্যি গঙ্গার চ্ছান করে, তিনি জগন্নাথের ঘাটে এক আলোচালের গদীর মণ্ডড়াদারণী।

বদি আর কোনো কথা কহিল না; বাপের বাড়ী ছাড়ার পর এমন মিষ্টি ভাত সে আগে খায়নি।

মরণ যে কত মিষ্টি, তা শোক তাপ নৈরাশ্যের জ্বালার সময় ঘুম এসে মানুষকে এক একবার বুঝিয়ে দে যায়।

কিন্তু ঘণ্টা দুই-ও বদি ভাল ক'রে সে সোয়াস্তিটুকু ভোগ ক'র্ত্তে পেলে না। নীচেয় চাকর-বাকর পাওনাদারদের গোল আর বাড়ীওলার সরকার দরওয়ানের কর্কশ চীৎকারে সে কি একটা স্বপ্নের মাঝখানে ধড়মড়িয়ে জেগে উঠে বাইরে এসে দেখে যে নীচেয় মহা তর্জ্জন গর্জ্জন; বৌবাজারের বাবুতে আর বাড়ীওলার দরওয়ানে যেন লড়াই বেধেছে, এক জন বস্‌বার ঘর থেকে টেবিল চেয়ার সব টেনে বের কর্ব্বে আর এক জন তা বের ক'র্ত্তে দেবে না—ভাড়ার জন্যে আটক রাখ্‌বে। আকাশের পানে চাইতে গিয়ে বদি দেখ্‌লে যে পাশের সব বাড়ীর বৌ-টৌ গিন্নী-টিন্নী খড়খড়ি খুলে কি ছাতে উঠে যেন বরযাত্রা বা প্রতিমা বিসর্জ্জনের মজা দেখ্‌ছেন; কাযেই সে আবার ঘরে ঢুকে দেয়ালে হাতখানা দিয়ে কাঠ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলো; লুটিয়ে পড়্‌বার ক্ষমতাও তার নাই।

* * * * * * * *

খান্‌ দুত্তিন বাড়ী ছাড়িয়ে একটি সরু গলির ভেতর এক ঘর গৃহস্থ ব্রাহ্ম পরিবার বাস ক'র্ত্তেন, পাড়ার দু'চার ঘর ব্রাহ্ম ছাড়া তাঁদের অপর বাড়ীর সঙ্গে বড় মেশামিশি ছিল না, বিশেষ মেয়েয় মেয়েয়। হঠাৎ তাঁদের বাড়ীর গিন্নী সেই ঘরে ঢুকে বদির হাতখানি ধ'রে ব'ল্লেন; "আয় মা আমার সঙ্গে আয়, একে ছেলেমানুষ তায় একা ভয় পাবারই তো কথা!

বদি কোনও কথা কহিল না, এই ব্রাহ্মগৃহিণীর স্নেহমাখা হাতের আকর্ষণে তিন বছরের শিশুর চলনে তার পা দুখানি মাত্র চলিয়া বাটীর বাহিরে গেল। যাবার সময় দেখলে একটি ভদ্রলোক—বোধ হয় তার রক্ষাকর্ত্রীর পুত্র—বাটীর চাবিটি তাঁর নিজের জামীনে রাখার বন্দোবস্ত ক'চ্ছেন।

* * * * * * * *

বিবাহের তাৎপর্য্য বদি ঝিয়ের কাছে বুঝেছে; ব্রাহ্মগৃহিণী তার ধাত্রীকার্য্য শিক্ষার বন্দোবস্ত ক'রে দিয়ে তাকে মেয়ের মত নিজের বাড়ীতে রেখেছেন।

গজেন্দ্রের জীবনে এখন সত্যসত্যই একমাত্র উপায়—মাসি!

[ক্রমশঃ।

শ্রীঅমৃতলাল বসু।
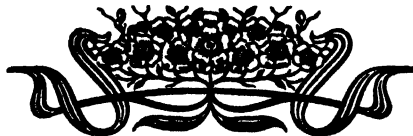
শোচনীয় মৃত্যুসংবাদ

বাঙ্গালার সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার-দীনবন্ধু মিত্র মহাশয়ের তৃতীয় পুত্র রায় বাহাদুর বঙ্কিমচন্দ্র মিত্র তাঁহার কলিকাতার "দীন-ধাম" ভবনে বিগত ২৯শে অগ্রহায়ণ আত্মহত্যা করিয়া ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। ইংরাজী ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে যশোহর জিলার অন্তঃপাতী চৌবেড়িয়া গ্রামে বঙ্কিমচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যে তিনি কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুলে বিদ্যাশিক্ষা করেন এবং তৎপরে কলিকাতায় আসিয়া শিক্ষা সম্পন্ন করেন। এম্-এ ও বি-এল্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে তিনি মুন্সেফী চাকুরী গ্রহণ করেন এবং নানাস্থানে চাকুরী করিবার পর ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে সবজজের পদে উন্নীত হয়েন। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে তিনি কলিকাতা ছোট আদালতের জজের পদে নিযুক্ত হয়েন। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে মেদিনীপুরের প্রসিদ্ধ সরকারী উকীল রায় বিপিনবিহারী দত্ত বাহাদুরের জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী প্রিয়ম্বদার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। গত ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার পত্নী বিয়োগ হয়। তাঁহার কয়েকটি পুত্র-কন্যা বিদ্যমান।

বঙ্কিমচন্দ্র অমর পিতার বহু সদ্‌গুণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে তাঁহার সাহিত্যানুরাগ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উল্লেখযোগ্য। সরকারী কার্য্যে যোগ্যতা প্রদর্শনের ফলে তিনি রায় বাহাদুর উপাধিতে সম্মানিত হইয়াছিলেন, কিন্তু এই সরকারী কার্য্য সম্পাদন করিবার কালেও তিনি তাঁহার মাতৃভাষার সেবায় আত্মনিয়োগ করিবার অবসর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি সুকবি, তাঁহার বহু কবিতা নানা মাসিকপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। সেই সকল কবিতা একত্র গ্রথিত করিয়া তিনি 'অকিঞ্চন' নামে এক কাব্যগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। 'চীবর' তাঁহার আর একখানি কাব্যগ্রন্থ। ভারতধর্ম্মমহামণ্ডল তাঁহাকে 'কবিভূষণ' উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র সরল, অনাড়ম্বর জীবন যাপন করিতেন। তাঁহার সৌজন্য ও অমায়িকতা তাঁহার জীবনে বহু বন্ধুলাভের সোপান হইয়াছিল। "দীন-ধামে" (তাঁহার পিতা দীনবন্ধুর নামে এই ভবনের নামকরণ করা হইয়াছিল) বহু সময়ে বহু সাহিত্যিকের সমাগম হইত। বঙ্কিমচন্দ্র এ সকল সামাজিক ও সাহিত্যিক মিলনে পরমানন্দ লাভ করিতেন।

বঙ্কিমচন্দ্র পারিবারিক জীবনে অনেক শোক-তাপ পাইয়াছেন। পরিণত বয়সে পত্নী-বিয়োগ-ব্যথা তাঁহাকে বড়ই বাজিয়াছিল। তাহার উপর তাঁহার এক পুত্র-বিয়োগে তিনি অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছিলেন। এ শোক তিনি সহ্য করিতে পারেন নাই, আত্মহত্যা করিয়া ইহজগতের সকল শোক-তাপের প্রভাব হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন। তাঁহার এই অস্বাভাবিক মৃত্যুতে আমরা স্তম্ভিত হইয়াছি। শিক্ষিত, সুচরিত্র, কৃতবিদ্য লোক এইভাবে ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিলে মনে অস্বস্তি অনুভব করাই স্বাভাবিক।

ইদানীং তিনি অনিদ্রা ও মূত্রকৃচ্ছ্র রোগে কষ্ট পাইতেছিলেন। বোধ হয়, ইহাও তাঁহার অপমৃত্যুর অন্য এক কারণ। ঘটনার দিন তিনি তাঁহার ভবনের স্নানাগারে সর্ব্বাঙ্গ স্পিরিট সিক্ত করিয়া অগ্নিদাহে ইহলীলা সাঙ্গ করিয়াছেন।

মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৬৫ বৎসর হইয়াছিল। অতীব দুঃখের কথা, তাঁহার বর্ষীয়সী জননী এখনও বর্ত্তমান!
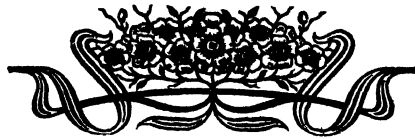
সম্পাদক—শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু

কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, 'বসুমতী' বৈদ্যুতিক-রোটারী-মেসিনে শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মুদ্রিত ও প্রকাশিত

অনন্ত-শয়নে

বসুমতী প্রেস]

[প্রাচীন চিত্র হইতে।

৪র্থ বর্ষ] মাঘ, ১৩৩২ [৪র্থ সংখ্যা

রসশাস্ত্র

৩

অলঙ্কারশাস্ত্র বা রসশাস্ত্রের যে সকল গ্রন্থ বর্ত্তমান সময়ে প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের মধ্যে ভরত মুনি প্রণীত 'নাট্যশাস্ত্রই' সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়; ভরত-প্রণীত নাট্যশাস্ত্রের পূর্ব্ববর্ত্তী কোন রস-গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। এই নাট্যশাস্ত্র ঠিক কোন্ সময়ে বিরচিত হইয়াছিল, তাহা নিশ্চিত করিয়া বলিতে পারা যায় না, কিন্তু খৃষ্ট-পূর্ব্ববর্ত্তী প্রথম শতাব্দীতেও ইহা যে প্রচলিত ছিল, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ভরত-নাট্যসূত্র এক্ষণে আমরা যে আকারে দেখিতে পাইতেছি—সেই আকারে ইহা প্রচলিত হইবার পূর্ব্বেও সংস্কৃত ভাষায় বহু কাব্যগ্রন্থ প্রচলিত ছিল, তাহা এই ভরত-সূত্র হইতেই জানিতে পারা যায়। ঐ সকল কাব্য ও নাটক প্রভৃতিতে রসময় কবিতার সন্নিবেশ-প্রণালী দেখিলেও বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, তৎকালে রসশাস্ত্রের সম্যক্ আলোচনা ভারতবর্ষে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। শুধু তাহাই নহে, কালিদাস প্রভৃতি পরবর্ত্তী মহাকবিগণ যে সকল ছন্দের বহুল ব্যবহার করিতেন, সেই সকল ছন্দ অর্থাৎ শার্দ্দূল বিক্রীড়িত, স্রগ্ধরা, বসন্ত তিলক, শিখরিণী, ইন্দ্রবজ্রা ও উপেন্দ্রবজ্রা প্রভৃতি ছন্দঃও সেই সময় কবি-গণের মধ্যে সুপ্রচলিত ছিল। এই প্রকার বহু আভ্যন্তরীণ প্রমাণ দ্বারা ইহা অনায়াসেই প্রতিপন্ন হয় যে, এই ভরত-নাট্যসূত্র রচিত হইবার বহু শতাব্দী পূর্ব্ব হইতেই সুমার্জ্জিত, রুচিসঙ্গত, সুসংস্কৃত বহু দৃশ্য ও শ্রব্য-কাব্য ভারতে প্রচলিত ছিল! দৃশ্যকাব্য কি ভাবে রচিত হইলে তাৎকালিক শিষ্ট সামাজিকগণ কর্ত্তৃক আদৃত হইত এবং দৃশ্যকাব্য রচনার মুখ্য উদ্দেশ্যই বা কি, তাহা অতি স্পষ্টভাবে ভরতসূত্রে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। নাটক প্রভৃতি দৃশ্যকাব্যের দ্বারা সমাজে কি কি উপকার সাধিত হইয়া থাকে—তাহা বর্ণনা করিতে যাইয়া ভরত মুনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা বর্ত্তমান সময়ের নাটকরচয়িতা কবিগণের বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

"ধর্ম্মো ধর্ম্মপ্রবৃত্তানাং কামাঃ কামার্থসেবিনাম্।
নিগ্রহো দুর্ব্বিনীতানাং মত্তানাং দমনক্রিয়া॥
ক্লীবানামপি যূনাং বা উৎসাহেশ্বরমানিনাং।
অবোধানাং বিবোধশ্চ বৈদগ্ধ্যং বিদুষামপি॥
ঈশ্বরাণাং বিলাসশ্চ রতিরুদ্বিগ্নচেতসাম্।
সর্ব্বোপজীবিনামর্থঃ।" ইত্যাদি।

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যাহাদের ধর্ম্মে প্রবৃত্তি আছে—তাহাদের ধর্ম্ম এই দৃশ্যকাব্য হইতে হইয়া থাকে—যাহারা কামার্থ সাধক তাহাদের কামও ইহা হইতে হইয়া থাকে, দুর্ব্বিনীতগণ ইহা দ্বারা নিগৃহীত হয়, মদমত্ত ব্যক্তিগণের দমনও ইহা দ্বারা হয়, যাহারা ক্লীব-প্রকৃতি, তাহাদেরও ইহা দ্বারা দাস্ত হইতে পারে। উচ্ছৃঙ্খল-চরিত্র তরুণগণ, ঐশ্বর্য্যাভিমানী ও বোধহীন ব্যক্তিগণ এই নাটক হইতে কর্ত্তব্য-বোধ লাভ করিতে পারে, বিদ্বৎসমাজও ইহার দ্বারা বৈদগ্ধও লাভ করিয়া থাকে। উদ্বিগ্নচিত্ত ব্যক্তিগণের ইহাতে চিত্ত উল্লসিত হয়, এক কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয় যে, সকল প্রকার প্রয়োজনের অপেক্ষাকারী ব্যক্তিগণ ইহা দ্বারা নিজ নিজ অভীষ্ট লাভ করিতে সমর্থ হইয়া থাকে।

ভরত মুনির এই প্রকার উক্তি সমূহের দ্বারা স্পষ্টই প্রতীত হয় যে, প্রাচীন ভারতে দৃশ্যকাব্যের উদ্দেশ্য কেবল লোকের চিত্তরঞ্জনই ছিল তাহা নহে, কিন্তু চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে লোকনিবহের সৎকার্য্যে প্রবৃত্তি এবং অসৎকার্য্য হইতে নিবৃত্তির উৎপাদন দ্বারা সমাজের পরমকল্যাণ-সাধনই তাহার প্রধান ও অনুপেক্ষণীয় উদ্দেশ্য ছিল। যাহারা উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তির বশে বিধি-নিষেধ উল্লঙ্ঘন করিয়া সামাজিক অশান্তির উৎপাদন করিয়া থাকে, ব্রহ্মাস্বাদসদৃশ বিশুদ্ধ রসাস্বাদনের দ্বারা বিশুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে নিজের ও সমাজের হিতকর কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করাই রসাত্মক কাব্যের মুখ্যতম উদ্দেশ্য হওয়া উচিত, এ কথা কবিকে ভুলিলে চলিবে কেন? পূর্ব্বজন্মের বহু সুকৃতির ফলে যাঁহারা এ সংসারে কবিত্বশক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহারা যদি কেবল নিজ খেয়ালের বশবর্ত্তী হন এবং সেই খেয়ালের বশে জনচিত্তদূষক কাব্যরচনা করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের সেইরূপ উচ্ছৃঙ্খল কাব্যরচনা সমাজের সর্ব্বনাশের পথকে উন্মুক্ত করিয়া দেয়, এই কারণে তাঁহারা শিষ্ট সামাজিকগণের অশ্রদ্ধারই পাত্র হইয়া থাকেন।

ভরত মুনির পরবর্ত্তী ভারতীয় আলঙ্কারিক আচার্য্য-গণের মধ্যে আনন্দবর্দ্ধনাচার্য্যের নামই সর্ব্বপ্রথমে উল্লেখ-যোগ্য। আনন্দবর্দ্ধন খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর শেষভাগে কাশ্মীরদেশে বিদ্যমান ছিলেন। এই সময়ে অবন্তী বর্ম্মা কাশ্মীরের নরপতি ছিলেন,ইহা রাজতরঙ্গিণী নামক সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃত ইতিহাস-গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। আনন্দবর্দ্ধনা-চার্য্যের 'ধ্বন্যালোক' নামক গ্রন্থে কাব্য সমালোচনা অতি সুন্দরভাবে করা হইয়াছে। অভিনব গুপ্তপাদাচার্য্য ও মম্মট ভট্ট প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ অলঙ্কারাচার্য্যগণও কাব্যসমালোচনা বিষয়ে আনন্দবর্দ্ধনাচার্য্যেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া প্রভূত যশঃ অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন, এই আনন্দবর্দ্ধনাচার্য্য স্ব-প্রণীত ধ্বন্যালোক নামক গ্রন্থে এক স্থানে বলিয়াছেন,—

"অনৌচিত্যাদৃতে নান্যদ্রসভঙ্গস্য কারণম্।
প্রসিদ্ধৌচিত্যবন্ধস্তু রসস্যোপনিষৎ পরা॥"

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, অনুচিত বর্ণনা ব্যতিরেকে রসভঙ্গের অন্য কোন কারণই নাই। লোকসমাজে যাহা উচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ, তদনুকূলভাবে যদি কাব্য বিরচিত হয়, তাহা হইলে সেই কাব্যকে রসের পরম উপনিষদ্ বলিয়া বুঝিতে হইবে।

উপনিষৎ সমূহে সর্ব্বদোষবিবর্জ্জিত ব্রহ্মরূপ রসের তত্ত্ব উপদিষ্ট হইয়া থাকে, কাব্যেরও প্রতিপাদ্য সেই রসতত্ত্ব, ব্রহ্মের ন্যায় বিশুদ্ধ সেই রসতত্ত্বের প্রতিপাদক যে কাব্য, তাহাতে যদি মানসিক অশুদ্ধির হেতু কোন বিষয় বর্ণিত না হয়, তাহা হইলেই সেই কাব্য উপনিষদের ন্যায় শিষ্ট-সমাজে আদৃত ও শ্রদ্ধেয় হইয়া থাকে—ইহাই হইল আনন্দ-বর্দ্ধনাচার্য্যের উল্লিখিত শ্লোকটির অভিপ্রায়।

এই নিজকৃত শ্লোকটির তাৎপর্য্য বর্ণনপ্রসঙ্গে তিনি স্বয়ং কি বলিয়াছেন? তিনি বলিয়াছেন,—

"ইয়ৎ তু উচ্যতে ভরতাদি স্থিতিং চানুবর্ত্তমানেন মহা-কবিপ্রবন্ধান্ পর্য্যালোচয়তা স্বপ্রতিভাং চানুসরতা কবিনা অবহিতচেতসাভূত্বা বিভাবাদ্যৌচিত্যভ্রংশ পরিত্যাগে পরঃপ্রযত্নো বিধেয়ঃ। ঔচিত্যবতঃ কথা শরীরস্য বৃত্তস্য উৎপ্রেক্ষিতস্য বা গ্রহো ব্যঞ্জক ইত্যনেন এতৎ প্রতি-পাদয়তি যৎ ইতিহাসাদিষু রসবতীষু কথাসু বিবিধাসু সতীষু অপি যৎ তত্র বিভাবাদ্যৌচিত্যবৎ কথা শরীরং তদেবগ্রাহ্যং নেতরৎ। বৃত্তাদপিচ কথা শরীরাদুৎপ্রেক্ষিতে

বিশেষতঃ প্রযত্নবতা ভবিতব্যং। তত্রহি অনবধানাৎ স্খলতঃ কবেরব্যুৎপত্তি সম্ভাবনা মহতী ভবতি।"

ইহাই বলা হইতেছে যে, ভরত প্রভৃতি যে মর্য্যাদা বাঁধিয়া দিয়াছেন, কবি তাহার অনুবর্ত্তন করিবেন, অন্যান্য মহাকবিগণের রচিত কাব্যনিচয় তিনি ভাল করিয়া অনুশীলন করিবেন এবং নিজ প্রতিভারও অনুসরণ করিবেন। অবলম্বন এবং উদ্দীপন প্রভৃতি রস-সৃষ্টির উপাদান সমূহের ঔচিত্যের ব্যাঘাত যাহাতে না হয়, এইভাবে অবহিতচেতা হইয়া তিনি কাব্য-নির্ম্মাণে প্রযত্নপর হইবেন, কথার উপাদানস্বরূপ যে বস্তু, তাহা কল্পিত বা ইতিবৃত্তমূলক হউক—সর্ব্বথা তাহা লোকসমাজের অনুকূল বা উচিত হওয়া আবশ্যক, এইরূপ কথা বস্তুতঃ রসের ব্যঞ্জক হইয়া থাকে। এই প্রকার নির্দ্দেশ করিয়া উক্ত শ্লোকের রচয়িতা ইহাই বুঝাইতে চাহেন যে, ইতিহাস প্রভৃতি নানাপ্রকার রসসমন্বিত কথা বিদ্যমান থাকিলেও তাহার মধ্যে যে কথা-বস্তুতে বিভাবাদির ঔচিত্য বিদ্যমান আছে, সেই কথা-বস্তুকেই আশ্রয় করিয়া কাব্যনির্ম্মাণ বিষয়ে কবি প্রযত্নপর হইবেন, এইরূপ না করিয়া অনবধানবশতঃ যদি নিজ কর্ত্তব্য বিষয়ে কবি স্খলিতপদ হন, তাহা হইলে তিনি অব্যুৎপন্ন বলিয়া শিষ্ট-সমাজে সম্ভাবিত হইতে পারেন, অর্থাৎ শিষ্টসমাজে তাঁহার রচিত কাব্য উপেক্ষিত হইয়া থাকে।

কবির প্রতিভা জনসমাজের হিতকরী হওয়াই আবশ্যক, উচ্ছৃঙ্খল-প্রকৃতি যুবক বা অবিবেকী বৃদ্ধগণের চিত্তরঞ্জন করিয়া আপাতমধুর খ্যাতি বা অর্থ উপার্জ্জন করা কবি-প্রতিভার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত নহে, এইরূপ কবিত্বশক্তির অপব্যবহার করিয়া কেহ কিয়ৎকালের জন্য অজ্ঞ জনসমাজে মহান্ আদর পাইতে পারেন, কিন্তু তাঁহার এইরূপ স্বপ্রতিভার অপব্যবহার কবিসমাজের পক্ষে কখনও অনুকরণীয় হওয়া উচিত নহে—ইহাও আনন্দবর্দ্ধনাচার্য্য অতি স্পষ্টভাবে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—

"পূর্ব্বে বিশৃঙ্খলগিরঃ কবয়ঃ প্রাপ্তকীর্ত্তয়ঃ।
তান্ সমাশ্রিত্য ন ত্যাজ্যা নীতিরেষা মনীষিণা॥
বাল্মীকি-ব্যাসমুখ্যাশ্চ যে প্রখ্যাতাঃ কবীশ্বরাঃ।
তদভিপ্রায়বাহ্যোঽয়ং নাস্মাভির্দর্শিতো নয়ঃ॥"

পূর্ব্বকালে অসংযতভাষী বহু কবি প্রাকৃত সমাজে কীর্ত্তি লাভ করিয়া গিয়াছেন ইহা সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহাদিগের অনুকরণ করিতে যাইয়া এই শিষ্ট জনানুমোদিত ঔচিত্যমার্গ কদাপিও বর্জ্জনীয় নহে, বাল্মীকি ও বেদব্যাস প্রভৃতি ভুবন-প্রখ্যাত কবীশ্বরগণের অভিপ্রেত নহে বলিয়া এই ঔচিত্য পরিহারনীতি বিষয়ে আমরা কোন প্রকার উপদেশ করিতে প্রবৃত্ত হই নাই।

আনন্দবর্দ্ধনাচার্য্য কাব্যরচনার প্রকৃত উদ্দেশ্য বর্ণন-প্রসঙ্গে আরও বলিয়াছেন যে,—

"শৃঙ্গাররসাঙ্গৈরুন্মুখীকৃতাঃ সন্তো হি বিনেয়াঃ সুখং বিনয়োপদেশং গৃহ্ণন্তি। সদাচারোপদেশরূপা হি নাটকাদি, গোষ্ঠী বিনেয়জনহিতার্থমেব মুনিভিরবতারিতা।"

আদি রসের যাহা অঙ্গ বা উপকরণ, তাহার বর্ণনা দ্বারা বিনেয় ব্যক্তিগণকে কাব্যশ্রবণে বা নাট্যাদি দর্শনে উন্মুখ করিবার মুখ্য উদ্দেশ্যই এই যে, এই ভাবে কাব্যশ্রবণে উন্মুখ বিনেয়গণ অনায়াসে বিনয় শিক্ষা করিতে সমর্থ হইয়া থাকে। নাটক প্রভৃতি গোষ্ঠী সদাচারের উপদেশ স্বরূপই হইয়া থাকে। শিক্ষণীয় জনসাধারণের উপকারের জন্যই মুনিগণ এই প্রকার নাটকাদি গোষ্ঠীর অবতারণা করিয়াছেন।

ভরত মুনি ও আনন্দবর্দ্ধনাচার্য্য প্রভৃতি রসাত্মক কাব্যের দুরদর্শী সমালোচক মহাত্মাগণ কাব্য ও নাটকাদির উদ্দেশ্য যে ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা প্রদর্শিত হইল। পরবর্ত্তী কবি ও সমালোচকগণও প্রাচীন ভারতে কাব্যানুশীলন বিষয়ে এই পদ্ধতিরই অনুসরণ করিয়া গিয়াছেন। তাই এক জন প্রাচীন মহাকবি বলিয়াছেন,—

"যদা প্রকৃত্যৈব জনস্য রাগিণো
দৃশং প্রদীপ্তোহৃদি মন্মথানলঃ।
তদাত্রভূয়ঃ কিমনর্থপণ্ডিতৈঃ
কুকাব্য হব্যাহুতয়ঃ সমর্পিতাঃ॥"

প্রাকৃত নরনারীগণের হৃদয়ে স্বভাবতই কামানল যখন সর্ব্বদাই প্রজ্বলিত রহিয়াছে, তখন আবার অনর্থ পণ্ডিতগণ কেন তাহাতে কুকাব্যরূপ হবির আহুতি প্রদান করিয়া থাকে?

মহাকবির লক্ষণ-নির্দ্দেশ প্রসঙ্গেও অলঙ্কার-শাস্ত্রে এইরূপ উল্লিখিত হইয়াছে,—

"সাধ্বীব ভারতী ভাতি স্বক্তি সদ্‌ব্রতচারিণী।
গ্রাম্যার্থ বস্তুসংস্পর্শ বহিরঙ্গা মহাকবেঃ॥"

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যদি মহাকবির ভারতী স্বক্তি অর্থাৎ সাধু বিষয়ক উপদেশরূপ সদ্‌ব্রতচারিণী হয় এবং গ্রাম্যার্থ বস্তুর সহিত সংস্পর্শ বর্জ্জিতা হয়, তবেই তাহা সাধ্বী পতিব্রতার ন্যায় শোভা পাইয়া থাকে। প্রাচীন কবি জগদ্ধরও বলিয়াছেন,—

অস্থানে গমিতালয়ং হতধিয়াং বাগ্‌দেবতা কল্পতে
ধিক্‌কারায় পরাভবায় মহতে তাপায় পাপায় বা।
স্থানে তু ব্যয়িতা সতাং প্রভবতি প্রখ্যাতয়ে ভূতয়ে
চেতোনির্ব্বৃতয়ে পরোপকৃতয়ে শান্ত্যৈ শিবাবাপ্তয়ে॥"

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, বিকৃত-বুদ্ধি কবিগণের ভারতী কুৎসিত বিষয়নিবহের বর্ণনায় ব্যয়িত হইয়া থাকে এবং তাহার পরিণাম ইহাই হয় যে, সেই ভারতী লোকনিন্দা, পরাভব, পরিতাপ বা পাপ প্রবৃত্তির হেতু হইয়া পড়ে, কিন্তু সুকবিগণের ভারতী সদ্‌বস্তুবর্ণনার্থ ব্যয়িত হয়, তাহার পরিণামও ইহা হয় যে, তাহা এ সংসারে যশঃ, ঐশ্বর্য্য, অন্তঃকরণপ্রসাদ, পরোপকার শান্তি ও পরমানন্দের কারণ হইয়া থাকে। আর এক জন মহাকবিও বলিয়াছেন,—

"স্বাধীনোরসনাঞ্চলঃ পরিচিতাঃ শব্দাঃ কিয়ন্তঃ ক্বচিৎ
ক্ষৌণীন্দ্রো ন নিয়ামকঃ পরিষদঃ শান্তাঃ স্বতন্ত্রং জগৎ।
তদ্‌যূয়ং কবয়োবয়ং বয়মিতি প্রস্তাবনাহুং কৃতি
স্বচ্ছন্দং প্রতিসদ্ম গর্জ্জত বয়ং মৌনব্রতালম্বিনঃ॥"

জিহ্বার অগ্রভাগ কাহারও অধীন নহে, কতকগুলি বর্ণের সহিতও পরিচয় হইয়াছে, কোথায়ও রাজা শাসন করিতে প্রস্তুত নহেন, বিদ্বৎসভাও শান্তি অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে, জগৎও উচ্ছৃঙ্খল হইয়া যাহা ইচ্ছা, তাহাই করিতে উদ্যত, সুতরাং তোমরা—'আমরা সকলে কবি' এই বলিয়া প্রচণ্ড হুঙ্কারের সহিত যথেচ্ছভাবে গর্জ্জন করিতে থাক। আমরা আর কি বলিব, মৌনব্রতই আমাদের পক্ষে এ ক্ষেত্রে একমাত্র অবলম্বনীয় হইয়াছে।

কাব্যের উদ্দেশ্য কি? তাহারই পরিচয় প্রসঙ্গে নাট্যাচার্য্য ভরত মুনি হইতে আরম্ভ করিয়া বহু আলঙ্কারিক ও কাব্যসমালোচক আচার্য্যগণের অভিমত অল্প-বিস্তর ভাবে সমুদ্ধৃত হইল, ইহা দ্বারা সুস্পষ্টভাবে ইহাই প্রমাণিত হইতেছে যে, সংস্কৃত রসময় সাহিত্যের মুখ্য উদ্দেশ্য—ভাব বিশুদ্ধি সহকৃত সাধারণ মনোরঞ্জন—উচ্ছৃঙ্খলতা পরিহার করিয়া রসাস্বাদন দ্বারা জনসাধারণের নৈতিক উন্নতি সম্পাদন করাই প্রাচীনকালবর্ত্তী মহাকবিগণের জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। সুন্দর ও কুৎসিত, ভাল বা মন্দ উভয়ই কবি-কল্পনা হইতে প্রসূত হইয়া থাকে। কবিতা-সুন্দরীর কোমলস্পর্শে কঠিনও কোমল হয়, কুৎসিতও সুন্দর বলিয়া প্রতীত হয়, ইহা ধ্রুব সত্য; কিন্তু তাই বলিয়া অশিব বস্তুর আকার বদলাইয়া উন্মাদনার আকারে সুন্দর করিয়া লোকচক্ষুতে প্রতিভাত করা কবির কর্ত্তব্য নহে। যে অশিবকে শিব করিয়া গড়িতে পারে, তাহার শিব ও সুন্দরকে আরও শিব আর সুন্দর করিয়া সাজাইবার শক্তি যে বিলক্ষণ আছে, তাহা কে অস্বীকার করিবে? সেই শক্তির সাহায্যে দুঃখের সংসারকে সুখে পরিণত করিবার জন্য শ্রীভগবান্ অসাধারণ কবিত্ব-শক্তি দ্বারা মণ্ডিত করিয়া যাঁহাদিগকে এই সংসারে প্রেরণ করিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে জিদের বা খেয়ালের বশবর্ত্তী হইয়া সেই শক্তির অপব্যবহার দ্বারা সমাজকে অশিব-পথে টানিয়া লইয়া বিপ্লবের সৃষ্টি করা সভ্য ও শিষ্টসমাজে কিছুতেই কর্ত্তব্য নহে—ইহাই ছিল প্রাচীন ভারতের কাব্য-সমালোচক আচার্য্যগণের সুপ্রতিষ্ঠিত সিদ্ধান্ত। উল্লিখিত প্রমাণ-নিচয় অবিসম্বাদিতভাবে তাহাই বলিয়া দিতেছে।

বর্ত্তমান সময়ে আমাদের জাতীয় সাহিত্য এই প্রাচীন ভারতের অলঙ্কারাচার্য্যগণের মতের অনুবর্ত্তী কি না, অথবা উক্ত মতের অনুবর্ত্তন আমাদিগের দেশের সাহিত্যরথিগণের পক্ষে কর্ত্তব্য কি না, তাহার বিচার এখন করিব না; কারণ প্রাচীন ভারতের আলঙ্কারিকগণ যে রসতত্ত্বকে উক্ত সিদ্ধান্তের বশবর্ত্তী করিয়াছিলেন, সেই রসতত্ত্বের বিস্তৃত আলোচনা না করিয়া ঐরূপ বিচারে অগ্রসর হওয়া উচিত নহে, এই কারণে এক্ষণে তাঁহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া কাব্যের প্রাণভূত সেই রসতত্ত্বেরই অবতারণা করা যাইতেছে। নাট্যসূত্রকার ভরত মুনি বলিয়াছেন—

"বিভাবানুভাবব্যভিচারিসংযোগাদ্ রসনিষ্পত্তিঃ।"

ইহার অর্থ—এই বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারিভাবের পরস্পর সংযোগে রস নিষ্পত্তি হইয়া থাকে।

রসনিষ্পত্তির কারণ এই বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারি ভাবের প্রকৃত স্বরূপ কি, তাহা ভাল করিয়া না বুঝিলে উক্ত রস-লক্ষণটি বুঝিতে পারা যায় না ; এই কারণে এক্ষণে এই বিভাবাদির স্বরূপ কি, তাহা নির্দ্দেশ করা যাইতেছে। কাব্য-প্রকাশকার মম্মট ভট্ট বলিয়াছেন,—

"কারণান্যথ কার্য্যাণি সহকারীণি যানি চ।
রত্যাদিঃ স্থায়িনো লোকে তানি চেৎ কাব্যনাট্যয়োঃ॥
বিভাবা অনুভাবাশ্চ কথ্যন্তে ব্যভিচারিণঃ।
ব্যক্তঃ সতৈর্বিভাবাদ্যৈঃ স্থায়ীভাবো রসঃ স্মৃতঃ॥"

ইহার তাৎপর্য্য এই—লোকে অনুরাগ প্রভৃতি স্থায়ি-ভাবের যাহা কারণ, কার্য্য ও সহকারী, তাহা যদি কাব্য ও নাটকে বর্ণিত বা অভিনীত হয়, তাহা হইলে তাহারই কথা ক্রমে বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারিভাব এইরূপ তিনটি শব্দের দ্বারা অভিহিত হইয়া থাকে। এই বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারিভাবের দ্বারা অনুরাগ প্রভৃতি স্থায়িভাব যদি অভিব্যক্ত হয়, তাহা হইলে সেই অভিব্যক্ত অনুরাগ প্রভৃতি স্থায়িভাবই রসরূপে পরিণত হয়, প্রাচীন রসতত্ত্ববিদ্ আচার্য্যগণ এইরূপই রসতত্ত্ব হইয়া থাকে, ইহা বলিয়া থাকেন। ভরত মুনির রস-লক্ষণ বুঝাইতে যাইয়া কাব্য-প্রকাশকার যাহা বলিয়াছেন, তাহার প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝিতে হইলে একটু বিস্তৃত ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে, অর্থাৎ ভাব শব্দের অর্থ কি, স্থায়িভাব কাহাকে বলে, বিভাব, অনু-ভাব ও ব্যভিচারিভাবের সহিত এই স্থায়িভাবের সম্বন্ধ কিরূপ, এই কয়টি বিষয় বিশিষ্টভাবে না বুঝিতে পারিলে এই শ্লোক দুইটির মধ্যে যে রসতত্ত্বের রহস্য নিহিত আছে, তাহার স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায় না। এই কারণে এক্ষণে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে ঐ কয়টি বিষয়ের স্বরূপ কি, তাহা বুঝিবার জন্য প্রযত্ন করা যাইতেছে। সুতরাং আগামী প্রবন্ধে তাহারই বিস্তৃত আলোচনা করা যাইবে।

শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ।

ঋণ

তোমার ধার যে শুধব আমি
কি ধন এমন আছে,
ভেবে আমি কূল পাই না
শুধাই তোমার কাছে।

জন্মাবধি প্রতি দিবস
প্রতি ক্ষণে ক্ষণে
ভরে আমার এ দেহ-প্রাণ
তোমার দেওয়া দানে।

যখন তোমার দয়া স্মরি
পুলকে প্রাণ উঠে ভরি',
তোমায় কিছু পাই না দিতে
মরি বিষম লাজে।

ভাল-মন্দ আজীবনের
কর্ম্ম যত আছে,
তাই নিয়ে আজ বিকাইব
আমি তোমার কাছে।

তবু ঋণের না হ'লে শোধ,
মনে তখন যেন প্রবোধ,
ঋণ নয় গো ভিক্ষা সব
আমায় দিয়েছ যে।

শ্রীরামকান্ত ভট্টাচার্য্য, এম্-এস্-সি

উলুখড়ের বিপদ

১

"রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয় উলুখড়ের প্রাণ যায়"—মতি বিশ্বাস রাগের মাথায় যখন ছোট ভাই সুরেশকে পৃথক্ করিয়া দিতে সঙ্কল্পবদ্ধ হইল এবং সুরেশও দাদার ক্রোধকে সম্পূর্ণ উপেক্ষার দৃষ্টিতে দেখিয়া পৃথক্ হইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইল, তখন মতিলালের স্ত্রী মহেশ্বরীর অবস্থা ঠিক যুধ্যমান পরস্পরের মধ্যবর্ত্তী উলুখড়ের অবস্থার মতই সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিল।

বারো বৎসর বয়সে মহেশ্বরী প্রথম যখন স্বামীর ঘর করিতে আসিয়াছিল, তখন তাহার শাশুড়ী ঠাকুরাণী তিন বৎসর-বয়স্ক সুরেশকে তাহার হাতে সঁপিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত চিত্তে পরলোক যাত্রা করিয়াছিলেন। তদবধি মহেশ্বরীই সেই মাতৃহীন শিশুর মাতৃস্থান অধিকার করিয়া এমন স্নেহ-যত্নে তাহার লালনপালন করিয়া আসিতে লাগিল যে, সুরেশ কোন দিনই মাতার অভাব অনুভব করিতে পারিল না। অল্পদিনের মধ্যেই সে মাতার ক্ষীণ-স্মৃতি বিস্মৃত হইয়া মহেশ্বরীকেই মাতৃজ্ঞান করিয়া লইল এবং যত দিন না তাহার জ্ঞান-বুদ্ধি পরিপক্ক হইল, তত দিন পর্য্যন্ত সে মহেশ্বরীকেই মা বলিয়া ডাকিয়া মাতৃসম্বোধনের তৃপ্তি উপ-ভোগ করিতে লাগিল। পরিশেষে তাহার জ্ঞান-বুদ্ধি জন্মিলে মহেশ্বরী—বিশেষতঃ মেজবৌ অন্নদা ও পাড়ার পাঁচ জন যখন তাহাকে বুঝাইয়া দিল যে, মাতৃবৎ স্নেহে লালন-পালন করিলেও মহেশ্বরী প্রকৃতপক্ষে তাহার গর্ভধারিণী মাতা নহে—বড় ভায়ের স্ত্রী বৌদিদি, সুতরাং তাহাকে মা বলিয়া না ডাকিয়া বৌদিদি বলিয়া ডাকাই সঙ্গত, তখন অগত্যা সুরেশ সুমধুর মাতৃসম্বোধন ত্যাগ করিয়া মহেশ্বরীকে বৌদি বলিয়াই ডাকিতে আরম্ভ করিল। প্রথম প্রথম কিছুদিন বৌদি বলিয়া ডাকিতে তাহার বাধিয়া যাইত এবং সে অন্তরের মধ্যে একটা নিদারুণ ব্যথা ও অতৃপ্তি অনুভব করিত। ক্রমে অভ্যাস হইয়া গেলে আর তাহার কোন কষ্টই রহিল না।

তা বড় হইয়া বৌদি বলিয়া ডাকিলেও সে মহেশ্বরীর স্নেহযত্ন হইতে কিছুমাত্র বঞ্চিত হইল না, নিজেও বৌদির নিকট হইতে মাতার নিকট প্রাপ্য স্নেহ আদায় করিয়া লইতে তিলমাত্র ক্রটী করিল না। মেজবৌ অন্নদা তাহার অতিরিক্ত আদর-আব্দারকে নিতান্ত অন্যায় ও অসহ্য বোধ করিলেও মহেশ্বরীর নিকট কিন্তু তাহা কিছুমাত্র অসহ্য বোধ হইত না। বরং সে নিজের পেটের ছেলে নেপালের আব্দারকে উপেক্ষা করিয়া সর্ব্বাগ্রে সুরেশের আব্দার পূর্ণ করিয়া দিত। অন্নদা ইহাতে বিরক্তি অনুভব করিয়া নেপালের পক্ষাবলম্বন পূর্ব্বক সময়ে সময়ে স্নেহসহকারে বলিত, "ন্যাপলা পেটের ছেলে, ও বড় জোর ম'লে একটা পিণ্ডী দেবে, কিন্তু ঠাকুরপো তোমার স্বর্গের সিঁড়ি বেঁধে দেবে, দিদি।"

মহেশ্বরী হাসিয়া উত্তর করিত, "স্বর্গের সিঁড়ি ন্যাপলাও বাঁধবে না, সুরেশও বাঁধবে না মেজবৌ, তবে আঁতের চেয়ে ছড়ের টান কত বেশী, তুই যদি পরের ছেলেকে মানুষ করতিস্, তা হ'লে বুঝতে পারতিস্।"

বলা বাহুল্য, সুরেশ আদর-যত্ন মহেশ্বরীর নিকট যতটা পাইত, অন্নদার কাছে তাহার কিছুই পাইত না, পাইবার প্রত্যাশাও করিত না। ভাইদের কাহারও কাছে তাহার আব্দার তেমন খাটিত না। বড় ভাই মতিলালের কাছে কত-কটা খাটিলেও মেজো ভাই হীরালাল ত তাহাকে দেখিতেই পারিত না। বড় বৌয়ের অতিরিক্ত আদরে সুরোর যে পরকাল নষ্ট হইয়া যাইতেছে, এমন অভিযোগ সে জ্যেষ্ঠের নিকট প্রায়ই উপস্থাপিত করিত। মতিলাল কখন বা অভিযোগের গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া সুরেশকে একটু শাসন করিত, কখন বা তাহার পরকালরক্ষার জন্য বড়বৌকে দুই চারি কথায় উপদেশ দিয়াই নিরস্ত হইত।

তা হীরালাল যে সুরেশের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ করিত, তাহা নহে। শুধু হীরালাল কেন, মহেশ্বরী ছাড়া আর সকলেই সুরেশের পরিণাম চিন্তা করিয়া ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিল।

ছয় বৎসরে পা দিতেই মতিলাল কনিষ্ঠকে পাঠশালায় ভর্ত্তি করিয়া দিয়াছিল। উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত করিবার অভিপ্রায়ে সে যে সুরেশকে পাঠশালায় ভর্ত্তি করিয়া দিয়াছিল, তাহা নহে। উচ্চশিক্ষায় তাহার প্রয়োজনও ছিল না। তবে চাষীর ছেলে, নিজের হিসাব-গণ্ডা বুঝিতে পারে, রামায়ণ মহাভারতটা পড়িয়া শুনাইতে পারে, এতটুকু বিদ্যা হইলেই যথেষ্ট। এই আশায় বাজে খরচের বিরোধী হইলেও মতিলাল গুরু মহাশয়ের বেতনস্বরূপ মাসে চারি আনা বাজে খরচ করিতে প্রস্তুত হইয়াছিল।

হীরালাল কিন্তু প্রায়ই তাহাকে সংবাদ দিত, লেখাপড়া শিখাইবার আশায় সুরেশকে পাঠশালায় দিলেও সুরেশ মাসের মধ্যে দশটা দিন পাঠশালায় উপস্থিত হয় কি না সন্দেহ। আজ পেট-কামড়ানি, আজ পায়ে ব্যথা, আজ যাইতে ইচ্ছা নাই, ইত্যাদি ওজরে বড়বৌকে ভুলাইয়া সে ঘরে বসিয়া থাকে। পাঠশালার পড়ুয়া ছেলেরা তাহাকে ধরিতে আসিলে বড়বৌ তাহাদের দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দেয়। তা ছাড়া পাঠশালায় যাইবার জন্য বাহির হইলেও দশ দিন সে পাঠশালায় যায় না; গয়লাদের গোয়াল ঘরে পাতা-দোয়াত লুকাইয়া রাখিয়া গয়লাদের ক্ষেতা, ঘোষেদের বেজা, মাইতিদের নফরার সঙ্গে মিলিয়া গুলিদাণ্ডা খেলিতে থাকে, গাছে উঠিয়া আম-জাম পাড়িয়া খায়, গাছের কোটরে কোটরে পাখীর ছানা খুঁজিয়া বেড়ায়।

মতিলাল এ জন্য সময়ে সময়ে সুরেশকে শাসন করিতে যাইত, কিন্তু মহেশ্বরীর অঞ্চলাশ্রয়ে সে এমন নিরাপদ হইয়া ছিল যে, মতিলালের শাসনের কঠোরতা তাহাকে স্পর্শমাত্র করিতে পারিত না।

বছর পাঁচেক পাঠশালায় যাতায়াত করিবার পর মতিলাল এক দিন সুরেশের বিদ্যার পরীক্ষা লইবার জন্য আম-কাঠের গাছ-সিন্দুক হইতে ন্যাকড়ায় বাঁধা জীর্ণ কাশীদাসী মহাভারতখানা বাহির করিয়া সুরেশকে তাহা পড়িতে দিল। সুরেশের বিদ্যা কিন্তু তখন বর্ণপরিচয় দ্বিতীয় ভাগ অতিক্রম করিতে পারে নাই। সুতরাং মহাভারত দেখিয়া তাহার চক্ষু স্থির হইল, বানান করিয়া দুই এক ছত্র কষ্টে-সৃষ্টে পড়িয়াই নীরব হইয়া রহিল। মতিলাল বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "খুব পড়েছিস্, এখন বৌদির কাছ থেকে পয়সা নিয়ে মুড়কী-বাতাসা কিনে খেয়ে আয়।"

বিরক্তি-কুঞ্চিত মুখে মতিলাল বলিল, "নাঃ, লেখাপড়া তোর কিচ্ছু হবে না। মিছে কেন মাসে চার গণ্ডা পয়সা গুরুমশায়কে প্রেণামী দিই। তার চাইতে কাল থেকে মাঠে গিয়ে ক্ষেতের কায শিখবি।"

গুরু মহাশয়ের নির্ম্মম শাসন হইতে অব্যাহতি লাভের সুযোগ পাইয়া সুরেশের আনন্দের সীমা রহিল না। কিন্তু ক্ষেতের কাযে লাগিয়া সুরেশ যখন দেখিল, দ্বিতীয় ভাগের বানান মুখস্থ করা হইতে ইহা কিছুমাত্র সুখপ্রদ নহে এবং পাঠশালায় বরং ফাঁকি দিয়া খেলিবার উপায় আছে, কিন্তু এ কাযে সে উপায় কিছুমাত্র নাই, ফাঁকি দিতে গেলে হীরালালের কঠোর হস্ত তাহার কর্ণযুগলকে আরক্ত করিয়া দেয়, তখন সুরেশের আনন্দ নিরানন্দে পরিণত হইল। দুই চারি দিন কায করিয়াই সে পা-হাতের বেদনা, পেট-কামড়ানি, মাথাধরা ইত্যাদি ওজর দেখাইয়া, কোন দিন বা খুব সকালেই বিছানা হইতে উঠিয়া পলায়ন করিয়া ক্ষেতের কাযের কঠোরতা হইতে মুক্তিলাভের জন্য চেষ্টিত হইল। মতিলাল যে এ জন্য তাহাকে তাড়না করিত না, তাহা নহে; কিন্তু মহেশ্বরীর অঞ্চলাশ্রয়ে মেঘাচ্ছাদিত সূর্য্য-কিরণের ন্যায় তাহার নিকট তেমন দুঃসহ বোধ হইত না। মতিলাল অধিক তাড়না করিতে গেলে মহেশ্বরী অভিমানক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলিত, "দেখ, নিজের ভাই ব'লে জোর দেখিয়ে যদি ওকে শাসন করতে যাও, তা হ'লে ওর সব ভার নিতে হবে কিন্তু তোমাকে। আমি ওর কিছুতেই আর নেই।"

মতিলাল তাহাকে বুঝাইয়া বলিত, "তুমি রাগ কচ্ছো বটে বড়বৌ, কিন্তু ও ছোঁড়া লেখাপড়াও শিখলে না, চাষের কাযেও লাগবে না, তা হ'লে খাবে কি ক'রে?"

অভিমান-গম্ভীর মুখে মহেশ্বরী বলিত, "যেমন ক'রে পারে, তেমন ক'রেই খাবে। ওর কি এরি মধ্যে চাষে খাটবার বয়স হয়েছে? ওর মা নাই, তাই ওকে নিয়ে তোমরা যা খুসী তাই কচ্ছো, বেঁচে থাকলে কি ওই বারো বছরের দুধের ছেলেকে রোদে পুড়ে, জলে ভিজে, মাঠে খাটতে পাঠাতো?"

সুরেশের মাতৃহীনতার দুঃখস্মরণে মহেশ্বরীর চোখে জল আসিত। মতিলাল লজ্জায় আর কিছু বলিতে পারিত না। হীরালাল কিন্তু বেশ চড়া সুরে বলিত, "যাই বল দাদা, বড়বৌ কিন্তু ওর পরকালটি খাচ্ছে।"

মতিলালও ইহা বুঝিত, বুঝিলেও কিন্তু স্ত্রীর মর্ম্মকাতরতা স্মরণে কোন উত্তর দিতে পারিত না। শুধু হীরালালের স্পষ্টবাদিতার জন্য মনে মনে তাহার উপর একটা বিরক্তি পোষণ করিত।

২

হীরালালের ভবিষ্যৎ বাণীই কিন্তু যথার্থ হইল। এক দিকে অতিরিক্ত আদর, অন্য দিকে শাসনের অভাব,—ইহার ফলে সুরেশ ক্রমেই উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিল; দিনে দিনে সুরেশের বিরুদ্ধে নানাবিধ অভিযোগ আসিয়া মতিলালকে উত্যক্ত করিয়া তুলিল। দীনু মাইতি ক্ষেতের সব চেয়ে বড় তরমুজটা খাইতে দেয় নাই বলিয়া সুরেশ রাগে রাত্রি-কালে তাহার ক্ষেতের সমস্ত তরমুজগাছ উপড়াইয়া দিয়াছে, জীবন ঘোষ আম খাওয়ার জন্য গালাগালি করিয়াছিল বলিয়া এক রাত্রির মধ্যে তাহার বাগানের সমস্ত গাছের আম উজাড় করিয়া দিয়া আসিয়াছে, গোবরার মা পাঁচ টাকা দামের খাসীটা দুই টাকায় বিক্রয় করে নাই, এই অপরাধে সঙ্গীদের সহিত মিলিয়া তাহার খাসীটাকে লুকাইয়া কাটিয়া খাইয়াছে, হরিশ দত্ত তাহার খিড়কী পুকুরে ছিপ ফেলিতে দেয় নাই বলিয়া পুষ্করিণীতে বিষাক্ত বৃক্ষপত্র নিক্ষেপ পূর্ব্বক পুকুরের সব মাছ মারিয়া ফেলিয়াছে, ইত্যাদি অভিযোগ প্রায়ই আসিয়া মতিলালের কানে উঠিত। মতিলালের জিজ্ঞাসার উত্তরে সুরেশ কখন অপরাধ স্বীকার করিত, কখন বা অভিযোগ মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দিত। মতিলাল কোন দিন তাহাকে গালাগালি বা উপদেশ দিয়াই নিরস্ত হইত, যে দিন বেশী রাগ হইত, সে দিন দুই চারি ঘা প্রহারও দিত। প্রহারের ফল কিন্তু বিপরীত হইত। প্রহৃত হইয়া সুরেশ রাগে বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া যাইত, দুই এক দিন তাহার উদ্দেশ পাওয়া যাইত না। তাহার নিরুদ্দেশে মহেশ্বরী কিন্তু কাঁদিয়া আকুল হইত। মতিলালকে তখন কাজকর্ম্ম ফেলিয়া, এ বাড়ী সে বাড়ী, এ গ্রাম সে গ্রাম ঘুরিয়া সুরেশকে খুঁজিয়া আনিতে হইত। অনেক সময় আবার যথেষ্ট সাধ্যসাধনা না করিলে সে ঘরে ফিরিতে চাহিত না। স্ত্রীর অনুরোধে বাধ্য হইয়া মতিলালকে সাধ্যসাধনাও করিতে হইত, এবং এটাকে সে নিজের ক্রোধবশতঃ কৃতকার্য্যের প্রায়শ্চিত্ত বলিয়াই জ্ঞান করিত।

হীরালাল জ্যেষ্ঠের এই কর্ম্মভোগ দেখিয়া শ্লেষ সহকারে বলিত, "শাসন করতে গিয়ে পায়ে ধরার চাইতে শাসন না করাই ভাল, দাদা।"

এ কথায় মতিলাল যথেষ্ট আঘাত পাইলেও আঘাতের বেদনা চাপিয়া, মুখে কাষ্ঠহাসি হাসিয়া বলিত, "কি কর্‌বো রে হীরু, 'মা'র পেটের ভাই, মেরে গেলেও ফিরে চাই'— দুষ্ট বজ্জাত হয়েছে ব'লে ওকে শাসনও কত্তে হবে, আবার ভাই ব'লে কোলেও টেনে নিতে হবে।"

জ্যেষ্ঠের ধৈর্য্য দেখিয়া হীরালাল আশ্চর্য্যান্বিত হইত।

এক দিন কিন্তু মতিলালের ধৈর্য্য একেবারেই বিচলিত হইল। সে দিন হারাণী বৈষ্ণবী আসিয়া সরোদনে জানাইল যে, সুরেশের জ্বালায় গ্রামে তাহার বাস করা দায় হইয়া উঠিয়াছে। সে গরীব বৈষ্ণবের মেয়ে, পাঁচ বাড়ীতে ভিক্ষা করিয়া খায়, কিন্তু সুরেশ তাহার পরকাল খাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে। কয়েক দিন হইতে সে প্রত্যহ সন্ধ্যার পর হারাণীর গৃহে গিয়া আড্ডা দিতে আরম্ভ করিয়াছিল। হারাণী ইহাতে বিরক্ত হইলেও মুখের উপর স্পষ্ট কিছু বলিতে পারে নাই। কিন্তু ক্রমেই সুরেশ বাড়াবাড়ি আরম্ভ করিতেছে দেখিয়া সে না বলিয়া থাকিতে পারে নাই। গত কল্য সন্ধ্যার পর সুরেশ তাহার গৃহে উপস্থিত হইলে হারাণী তাহাকে সেখানে ঢুকিতে নিষেধ করিয়া দিয়াছিল। ইহার ফলে সুরেশ রাত্রিকালে তাহার ঘরের দরজায় জানালায় ধাক্কা দিয়াছে, বাড়ীতে ইট-পাটকেল, এমন কি, কতকগুলা গরুর হাড় পর্য্যন্ত ফেলিয়াছে, দরজায় একটা ছাগলের চামড়া ঝুলাইয়া দিয়া আসিয়াছে। মতিলাল ইহার প্র।তবিধান না করিলে হারাণী গ্রামের আরও দশ জন লোককে জানাইবে, তার পর না হয় এখানকার বাস উঠাইয়া অন্যত্র চলিয়া যাইবে।

মতিলাল মাঠ হইতে আসিয়া সবেমাত্র স্নান করিতে যাইতেছিল, হারাণীর উপর অত্যাচারের কাহিনী শুনিয়া সে রাগে কাঁপিতে লাগিল। হীরালাল গভীর আক্ষেপ প্রকাশ করিয়া বলিল, "শুধু হারাণীকেই দেশ ছেড়ে যেতে হবে না দাদা, আমাদেরও শীগ্‌গীর দেশত্যাগ করতে হবে। সুরো যে রকম অন্যায় অত্যাচার আরম্ভ করেছে, তাতে লোকের কাছে দিন দিন মুখ দেখান দায় হ'য়ে উঠছে। তোমার

সহ্য গুণ আছে দাদা, সব স'য়ে থাকতে পারবে, আমাকে কিন্তু দেশ ছেড়ে পালাতেই হবে।"

মতিলাল ক্রোধে গর্জ্জন করিয়া বলিল, "কাউকে দেশ-ত্যাগ করতে হবে না হীরু, আজ ওই হতভাগাকে বাড়ী-ছাড়া করবো।"

মতিলাল ফিরিয়া সুরেশকে ডাকিয়া হারাণীর অভি-যোগের সত্যাসত্য জিজ্ঞাসা করিল। সুরেশ তখন নিজের দোষ চাপিয়া হারাণীর সম্বন্ধে এমন কতকগুলা কুৎসিত অভিযোগ ব্যক্ত করিতে লাগিল যে, তচ্ছ্রবণে মতিলাল অধৈর্য্য হইয়া উঠিল। সে রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে গিয়া সুরেশের ঘাড় চাপিয়া ধরিল। সুরেশ কিন্তু তখন আর বালক নহে, অষ্টাদশ বর্ষীয় যুবক। সুতরাং সে এক ঝাঁকানিতে জ্যেষ্ঠের হস্ত হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া লইল এবং সে দিন সে ভয়ে পলাইয়া না গিয়া মতিলালের সম্মুখে বুক ফুলাইয়া দাঁড়াইয়া দৃপ্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "কেন বল তো, রোজ রোজ আমাকে মারতে আসবে?"

রোষ-বিকৃত কণ্ঠে মতিলাল বলিল, "মারবো না তো তোকে আদর করবো না কি। তুই এমন সব অন্যায় কায করিস্ কেন?"

ঘাড় উঁচু করিয়া সদর্পে সুরেশ উত্তর করিল, "আমার খুসী।"

সুরেশের এতটা স্পর্দ্ধা হীরালালের অসহ্য হইল; সে হস্তাস্ফালনপূর্ব্বক রাগে যেন কাঁপিতে কাঁপিতে চীৎকার করিয়া উত্তর করিল, "কি, এত দূর আস্পর্দ্ধা হ'য়েছে তোর! বেরো হতভাগা বাড়ী থেকে।"

বিকৃত মুখভঙ্গী সহকারে সুরেশ বলিল, "বেরো বাড়ী থেকে! বাড়ী তোমার একার না কি?"

সুরেশের উত্তর শ্রবণে কেবল হীরালাল নয়, মতিলালও স্তম্ভিত হইল। অদূরে মহেশ্বরী দাঁড়াইয়াছিল। মতিলাল বক্রদৃষ্টিতে একবার তাহার দিকে চাহিল। সে দৃষ্টির অর্থ—তোমার আদরের পরিণাম দেখ। মহেশ্বরীও ইহা বুঝিল। বুঝিয়া সে লজ্জারক্ত মুখখানা স্বামীর দিক হইতে ফিরাইয়া লইয়া সুরেশকে সম্বোধন করিয়া বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে বলিল, "কি বল্লি রে, সুরো?"

তাহার প্রশ্নে সুরেশ কিন্তু একটুও লজ্জিত বা ভীত হইল না। নির্ভীকভাবে উত্তর করিল, "কেন বলবো না, ভয় না কি? বিনি দোষে রোজ রোজ আমাকে মারতে আসবে, বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেবে। কেন, আমি বুঝি বাড়ীর কেউ নয়?"

"তুই হতভাগা কুলাঙ্গার!" বলিয়া মতিলাল রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে তাহাকে মারিবার জন্য অগ্রসর হইল। হীরালাল আসিয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিল, ধীর-গম্ভীর স্বরে সান্ত্বনা দিয়া বলিল, "ওর সঙ্গে মারামারি ক'রে কি হবে দাদা? তা'তে শুধু লোক হাসবে এইমাত্র?"

সক্ষোভে মতিলাল বলিল, "তাই ব'লে ও হতভাগা বুকে বসে দাড়ী ওপ্ড়াবে?"

হীরালাল বলিল, "দাড়ী ওপ্ড়াবার কায যখন করেছ দাদা, তখন তার উপায় কি? ও এখন আর ছেলেমানুষটি নয়, মারতে গেলে হয় ত মার খেতেও হবে। বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিতেও পারবে না; ও ঠিকই বলেছে, বাড়ী কারও একার নয়।"

ক্রোধ-রক্তমুখে মতিলাল বলিল, "বাড়ী কারও একার নয় যখন, তখন সব ভাগ-যোগ ক'রে নিয়ে ওর যা ইচ্ছা তাই করুক।"

অন্তরাল হইতে অন্নদা অনুচ্চস্বরে বলিয়া উঠিল, "ওগো, তাই দাও গো, তাই দাও। মা গো মা, শুনে শুনে ভয়ে যেন পেটের ভেতর হাত-পা সেঁধোয়। হারাণী বোষ্টমী, মার বয়সী, তার সঙ্গে যখন এমন ব্যাভার, তখন আমরা ত কোন্ ছার। না বাবু, আমি ত আর ওকে নিয়ে ঘর করতে পারবো না।"

সুরেশ জ্বলন্ত দৃষ্টিতে অন্তরালস্থিতা অন্নদার দিকে চাহিয়া বলিল, "বেশ, আমিও কাউকে নিয়ে ঘর করতে বলি না।"

মতিলাল জিজ্ঞাসা করিল, "আলাদা হবি তুই?"

"হাঁ, হব।"

হীরালাল বলিল, "তাই হোক্ দাদা, কালই লোকজন ডেকে ওকে আলাদা ক'রে দাও।"

মতিলাল বলিল, "কাল নয়, আজিই—এখুনি।"

সেই দিনই বৈকালে পাড়ার দুই জন লোককে মধ্যস্থ রাখিয়া ধান, চাল, ঘটী, বাটি যাহা কিছু ছিল, সমস্তই ভাগ করিয়া দেওয়া হইল। ভাগ ঠিক হইলে হীরালাল সুরেশকে ডাকিয়া বলিল, "তোর ভাগ দেখে নিয়ে যা, সুরো।"

সুরেশ নিজের ঘরের ভিতর হইতে উত্তর দিল, "যার বেশী গরজ হবে, সে নিজেই দেখে নিয়ে যাবে।"

অগত্যা হীরালাল ও অন্নদা উভয়ে সুরেশের ভাগ তাহার ঘরে পৌছাইয়া দিয়া আসিল। মতিলাল বলিল, "জমী-যায়গা যা আছে, কাল সে সব ভাগ ক'রে নিতে হবে।"

সুরেশ বলিল, "আমি যখন খাটতে পারি না, তখন জমী-যায়গা নিয়ে করবো কি ?"

"তা হ'লে জমী-যায়গার ভাগ নিবি না ?"

"না।"

"খাবি কি ?"

"সে ভাবনা আমার, তোমাদের নয়, দাদা।"

ভাগযোগ সব মিটিয়া গেলে মহেশ্বরী স্বামীকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "হাঁ গা, করলে কি ? সুরোকে আলাদা ক'রে দিলে ?"

বিরক্তি সহকারে মতিলাল বলিল, "আমি আলাদা ক'রে দিলাম, না ও হতভাগা নিজেই আলাদা হলো !"

মহেশ্বরী বলিল, "ওর একটুও জ্ঞান-বুদ্ধি থাকলে কি আলাদা হয়। কিন্তু ছেলেমানুষের সঙ্গে তুমিও ছেলেমানুষ হ'লে।"

বিরক্তি-কুঞ্চিত মুখে মতিলাল বলিল, "অন্যায় আদর দিয়ে তুমি ওকে যতটুকু বাড়িয়ে তুলতে হয় তা তুলেছ। এখন ওর হাতে হু'চার-ঘা মার আমাকে খাওয়ালে যদি তোমার মনস্কামনা সিদ্ধ হয়, তা হ'লে বল, কালই আবার ওকে এক ক'রে নিই।"

মহেশ্বরী আর কিছু বলিল না। শুধু নীরবে বেদনার একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিল।

রাত্রিকালে মতিলাল জিজ্ঞাসা করিল, "সুরো এ বেলা খেলে কি ?"

মহেশ্বরী উত্তর দিল, "ছাই।"

মতিলাল বলিল, "এ বেলা ভাত এক মুঠো দিলেই পারতে। রাত-উপোসী পড়ে রইলো।"

তর্জ্জন সহকারে মহেশ্বরী বলিল, "থাক্ গে উপোসী। যে বড় ভাইকে মারতে যেতে পারে, বড় ভায়ের সঙ্গে আলাদা হ'তে পারে, তাকে আমি সেধে ভাত দিতে যাব। গলায় দড়ি আমার !"

স্ত্রীর কথায় মতিলাল শুধু একটু হাসিল ; কোন উত্তর দিল না।

৩

পরদিন সকালে উঠিয়া মহেশ্বরী দেখিল, সুরেশ উপবাস-ক্লিষ্ট মুখাবরণ হাঁড়ীর মত গম্ভীর করিয়া বাহিরে চলিয়া গেল। দেখিয়া মহেশ্বরীর কষ্টও হইল, রাগও হইল। আহা, এক দণ্ড ক্ষুধার জ্বালা সহ্য করিতে পারে না, কিন্তু কাল সেই কোন্ 'তুপুরে' এক মুঠা খাইয়াছে, বাকি দিন-রাত্রিটা উপবাসে কাটিয়া গেল। এই উপবাস দিতে সুরেশকে যে কতটা কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছে, তাহা মনে করিতেই মহেশ্বরীর চোখে জল আসিল। আহা, মুখখানা শুকাইয়া যেন আম্‌সী হইয়াছে, চোখ তুইটা বসিয়া গিয়াছে।

কিন্তু কি রাগ এই একরত্তি ছোঁড়ার ! সমস্ত রাত্রিটা উপবাসে কাটাইয়া দিয়াছে, ক্ষুধার যাতনায় ছট্‌ফট্ করিয়াছে, হয় ত রাত্রিকালে ঘুমাইতেও পারে নাই, তথাপি সে মহেশ্বরীর কাছে আসিল না, তাহাকে কোন কথাই বলিল না। আসিলে—খাইতে চাহিলে মহেশ্বরী কি তাহাকে খাইতে না দিয়া থাকিতে পারিত ? ভাইরা না হয় উহাকে আলাদা করিয়া দিয়াছে, মহেশ্বরী ত দেয় নাই। সুতরাং তাহার কাছে আসিতে আপত্তি কি ছিল ? ভাই পর করিয়া দিয়াছে বলিয়া সে কি মহেশ্বরীকেও পর করিয়া ফেলিল ? হা রে অকৃতজ্ঞ ! সকালে তাহার সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল, কিন্তু মুখ তুলিয়া একবার তাহার দিকে চাহিয়াও গেল না। ইহাকেই বলে পর। নিজের পেটের ছেলে হইলে এক দিনে কি এতটা পর ভাবিয়া লইতে পারিত !

সুরেশের অকৃতজ্ঞতায় মহেশ্বরীর অন্তরটা ক্রোধে ও অভিমানে যেন ফুলিয়া উঠিতে থাকিল। সে গৃহকর্ম্মে মনোযোগ দিয়া সুরেশের চিন্তাটাকে মন হইতে অপসারিত করিয়া দিতে প্রয়াসী হইল। অথচ গৃহকর্ম্মের ব্যস্ততার মধ্যেই তাহার লক্ষ্য রহিল, সুরেশ বাড়ীতে ফিরিল কি না।

রান্না চাপাইয়া অন্নদা জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁ দিদি, ঠাকুরপোর চাল নেব কি ?"

বিরক্তি-বিকৃত স্বরে মহেশ্বরী বলিল, "তার চাল নিতে যাবি কেন বল্ ত ? সে আলাদা হয়েছে জানিস্ না বুঝি।"

অন্নদা ধীরে ধীরে মাথা নাড়িয়া বলিল, "জানি, কিন্তু তার ত রান্না-বান্নার কোন উজ্যুগ দেখ্‌ছি না। এর পর দুপুরবেলা যদি বল, তাকে ভাত দিতে হবে—"

গর্জ্জন করিয়া মহেশ্বরী বলিল, "না না, আমি তাকে ভাত দিতে যাবো না ; তার চালও তোকে নিতে হবে না।"

মধ্যাহ্ন অতীত প্রায়। তখনও সুরেশ ফিরিল না। সকলের খাওয়া হইয়া গেল, মতিলাল ও হীরালাল মাঠে চলিয়া গেল। অন্নদা ছেলেমেয়েদের খাওয়াইয়া ধোয়াইয়া মহেশ্বরীকে খাইতে ডাকিল। মহেশ্বরী বলিল, "আমার পেটটা বড় কামড়াচ্ছে. আমি এখন খাব না. আমার ভাত তুলে রাখ্।"

অন্নদা তাহার ভাত তুলিয়া রাখিয়া নিজে খাইতে বসিল। মহেশ্বরী ঘরের দাবায় আঁচল পাতিয়া শুইয়া পড়িল। পড়িয়া পড়িয়া ভাবিতে লাগিল, হতভাগা গেল কোথায়? সকালে উঠিয়া বাহিরে গিয়াছে, এখনও দেখা নাই। রাগ করিয়া কোথাও চলিয়া গেল না কি? কিন্তু যখন নিজের ভাগ বুঝিয়া লইতে শিখিয়াছে, তখন রাগ করিয়া চলিয়া যাইবে কেন? কোথায় টো টো করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। কিন্তু পেটের জ্বালা দূর করিবার কি উপায় করিল? কি খাইবে আজ? জানি না; কাল রাত্রির মত বিধাতা আজও তাহার কপালে কিছু মাপিয়াছে কি না। পাড়ার কেহ কি ডাকিয়া এক মুঠো ভাত খাওয়াইবে না?

সুরেশ ধীরে ধীরে বাটীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। মহেশ্বরী উদ্বেগ-চঞ্চল দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়াই বুঝিতে পারিল, এখন পর্য্যন্ত তাহার খাওয়া হয় নাই। খাওয়া হইলে মুখখানা অমন শুক্‌না দেখাইত না, পেটটা ভিতর দিকে চলিয়া যাইত না। হা হতভাগ্য, এতখানি বেলা পর্য্যন্ত না খাইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলি! বেলা এক প্রহর হইলে তুই যে ক্ষুধায় দাঁড়াইতে পারিতিস্ না। সুরেশের অনাহার-বিশুষ্ক ম্লান মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া মহেশ্বরীর বুকের ভিতরটা টক্-টক্ করিতে লাগিল।

বাড়ীতে ঢুকিয়া সুরেশ উঠানের মাঝামাঝি আসিয়া একবার থমকিয়া দাঁড়াইল এবং ইতস্ততঃ চঞ্চল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া মহেশ্বরীর চোখে চোখ পড়িতেই যেন তীব্র ক্রোধে তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইয়া লইল; তার পর ধীরে ধীরে গিয়া নিজের ঘরের দাবায় উঠিয়া বসিল।

মহেশ্বরী জিজ্ঞাসা করিল, "এত বেলা পর্য্যন্ত কোথায় ছিলি রে, সুরো?"

ভারীমুখে সুরেশ উত্তর দিল, "চুলোয়।"

"কি খেলি?"

"ছাই-পাঁশ।"

তীব্র তিরস্কারের স্বরে মহেশ্বরী বলিল, "চুলোয় থাক্‌তে যাবি কেন, ছাই-পাঁশই বা খেতে যাবি কেন? আজকাল নিজের ভাগ-বখ্‌রা বুঝে নিতে শিখেছিস, হারাণী বোষ্টমীর দরজায় ধাক্কা দিতে বাহাদুর হয়েছিস, বড় ভাইকে মার্‌তে যেতে—তার সঙ্গে আলাদা হ'তে পেরেছিস, আর এক মুঠো ফুটিয়ে খেতে গতর হলো না।"

ক্রুদ্ধ শ্বাপদের ন্যায় জলন্ত দৃষ্টি উন্নমিত করিয়া ভারী গলায় সুরেশ উত্তর করিল, "দেখ বৌদি, হারাণী বোষ্টমী—যাক্, আমার কথায় তোমরা বিশ্বাস কর্‌তে যাবে কেন। কিন্তু আমাকে যখন আলাদা ক'রে দিয়েছ, তখন আমি খাই না খাই, সে খোঁজে তোমাদের দরকার কি বল ত? তোমরা নিজের পেট ঠাণ্ডা ক'রে শুয়ে আছ, থাক।"

বলিতে বলিতে সুরেশের কণ্ঠটা যেন রুদ্ধ হইয়া আসিল। সে দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং ক্ষিপ্রপদে ঘরে ঢুকিয়া সশব্দে বিছানার উপর শুইয়া পড়িল। মহেশ্বরী স্তব্ধশ্বাসে তাহার ঘরের দরজার দিকে চাহিয়া পড়িয়া রহিল। হা নির্ব্বোধ! কে পেট ঠাণ্ডা করিয়া শুইয়া আছে রে! মহেশ্বরী? তাহার যদি সে ক্ষমতাই থাকিত, তাহা হইলে তোর মত নিমকহারামের সঙ্গে সে মুখ তুলিয়া এত কথা কহিত না। এত দিনেও তুই তাহাকে চিনিতে পারিলি না! তোর দুর্ভাগ্য নয়, দুর্ভাগ্য মহেশ্বরীর নিজের।

অন্নদা আহার করিতে করিতে সকল কথাই শুনিতে-ছিল। এক্ষণে সে যেন গভীর সমবেদনাপূর্ণ কণ্ঠে মহেশ্বরীকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "হায় দিদি, কা'কে তুমি এত কথা বলছো? ও কি আর তোমার সে সুরো আছে। ওর এখন লম্বা লম্বা হাত-পা, লম্বা লম্বা কথা হয়েছে। ও এখন আর কার তোয়াক্কা রাখে? তা নইলে গাঁয়ে-ঘরে কি এমন একটা কেলেঙ্কারী করতে পারে, মা-বাপের তুল্যি বড় ভাই—তাকে তেড়ে মার্‌তে যায়। মা গো মা, ঘেন্নায় পাড়ায় মুখ দেখাবার যো নাই!"

মহেশ্বরী তীব্র ভ্রুকুটী করিয়া পাশ ফিরিয়া শুইল।

৪

রাত্রিতে মতিলাল খাইতে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "সুরো আজ খেলে কি ? রান্না-বান্না করেছে ?"

মহেশ্বরী বলিল, "পোড়া কপাল ! সুরো রেঁধে খাবে,— রাঁধতে জানলে ত ? এক ঘটী জল নিয়ে খেতে জানে না।"

মতিলাল জিজ্ঞাসা করিল, "তা হ'লে খেলে কি ?"

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া মহেশ্বরী উত্তর দিল, "খেয়েছে ছাই। কাল রাত থেকে উপোস দিয়ে শুকিয়ে পড়ে রয়েছে।"

স্ত্রীর মুখের উপর বক্র কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া ঈষৎ শ্লেষ-হাস্যসহকারে মতিলাল বলিল, "সুরো একা শুকিয়ে রয়েছে, না তোমাকে শুদ্ধ শুকিয়ে রেখেছে ?"

যেন গভীর উপেক্ষায় ঠোঁট ফুলাইয়া মহেশ্বরী বলিল, "কপাল আর কি ! তার জন্যে আমি শুকিয়ে মর্‌তে যাব কেন ? সে আমার বত্রিশ নাড়ী-ছেঁড়া পেটের ছেলে না কি যে, তাকে না খাইয়ে খেতে পারবো না।"

"তা হ'লেই হলো" বলিয়া মতিলাল আহার শেষ করিয়া উঠিল। হীরালালের খাওয়া আগেই হইয়া গিয়াছিল। সুতরাং অন্নদা মহেশ্বরীকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "ও বেলা পেট কামড়াচ্ছে ব'লে খেলে না, এ বেলা খাবে ত দিদি ? ভাত বাড়ি ?"

মহেশ্বরী যেন গর্জ্জিয়া উঠিল ; বলিল, "ও বেলা অসুখ ছিল ব'লে খাই নি, এ বেলা খাব না কেন বল্ ত ? তোরা সব আমাকে মনে করেছিস্ কি ? বাড়ীতে আমাকে টিক্‌তে দিবি, না বাড়ী ছাড়া করবি বল্ দেখি ?"

অপ্রতিভভাবে অন্নদা বলিল, "না না, তোমার অসুখ সেরে গিয়েছে কি না তাই জিগ্যেস্ কচ্ছি। নাও, এসে খেতে বসো।"

মহেশ্বরী রাগে রাগেই আসিয়া খাইতে বসিল বটে, কিন্তু খাওয়া তাহার পক্ষে যেন বিষম দায় হইয়া উঠিল। সম্মুখের ঘরে সুরো কাল রাত্রি হইতে না খাইয়া দাঁতে দাঁত দিয়া পড়িয়া রহিয়াছে, আর সে ভাতের থালা লইয়া স্বচ্ছন্দে খাইতে বসিয়াছে ! হা ভগবান্, এগুলা ভাত, না বিষ ? সুরোকে উপবাসী রাখিয়া এ বিষ সে কিরূপে গলাধঃ করিবে ? ভাল, সুরো ছেলেমানুষ, সে একটা দুষ্কর্ম্ম করিয়া লজ্জায় হউক, রাগে হউক, না হয় তাহার কাছে আসিতে পারে নাই, কিন্তু বুড়া মাগী সে, সে-ই বা কোন্ গিয়া ডাকিয়াছে, আয় সুরো, খাবি আয় ! আজ যদি সুরোর মা থাকিত, তাহা হইলে তিনিও কি তাহারই মত চুপ করিয়া থাকিতে পারিতেন ? মহেশ্বরীর মনে হইল, এই ভাতগুলা লইয়া সুরোকে বুঝাইয়া শান্ত করাইয়া খাওয়াইয়া আইসে। যতই রাগ হউক, তাহার কথা সুরো কখনই ঠেলিতে পারিবে না। কিন্তু স্বামী, মেজো ঠাকুরপো, মেজো-বৌ, ইহারা বলিবে কি ? ইহারা কি তাহার নির্ল্লজ্জতা দেখিয়া মুখ বাকাইয়া হাসিবে না ?

অন্নদা বলিল, "ভাত নিয়ে নাড়াচাড়াই করো যে দিদি, খাও না।"

মহেশ্বরী অগত্যা এক গ্রাস ভাত লইয়া মুখে তুলিতে গেল। কিন্তু মুখের কাছে ভাতের গ্রাস আনিতেই সুরোর অনাহার-ক্লিষ্ট মুখখানা চোখের সাম্‌নে যেন ভাসিয়া উঠিল ; তাহার কম্পিত হস্ত হইতে ভাতগুলা ঝর্-ঝর্ করিয়া পাতের উপর পড়িয়া গেল। চোখ ফাটিয়া জল বাহির হইবার উপক্রম করিল ; মহেশ্বরী বহু কষ্টে তাহা রোধ করিয়া রহিল।

অন্নদা বক্র কটাক্ষে তাহার ভাব-ভঙ্গী নিরীক্ষণ করিতেছিল। সে হাসিটা কষ্টে চাপিয়া বলিল, "ব'সে রইলে যে, দিদি ?"

অশ্রুরুদ্ধ-কণ্ঠে মহেশ্বরী বলিয়া উঠিল, "আমার মোটেই ক্ষিদে নাই মেজো-বৌ, আমি খেতে পারবো না।"

মহেশ্বরী হাতের অবশিষ্ট ভাতগুলাকে পাতের উপর আছাড়িয়া ফেলিল। ঈষৎ হাসিয়া অন্নদা বলিল, "খেতে যে পারবে না, তা আমি জানি দিদি, কিন্তু এ রকম না খেয়ে ক'দিন থাক্‌বে বল দেখি ? তার চেয়ে আর এক কায কর, হাঁড়ীতে ভাত রয়েছে, আমি হাত ধুয়ে এসে বেড়ে দিই। তুমি ঠাকুরপোকে ডেকে খাইয়ে নিজেও এক মুঠো খাও।"

রোষপ্রদীপ্ত-কণ্ঠে গর্জ্জন করিয়া মহেশ্বরী বলিল. "কি বল্‌লি মেজো-বৌ, সে হতভাগাকে আমি সেধে খাওয়াতে যাব ? সে কাল থেকে আমার সঙ্গে কথা পর্য্যন্ত কয় না, তা জানিস্।"

"কেন তোমার সঙ্গে কথা কইতে যাব ?"

সুরেশকে দেখিয়া মহেশ্বরী ও অন্নদা উভয়েই বিস্ময়ে

চমকিয়া উঠিল। সুরেশ জ্বলন্ত দৃষ্টিতে মহেশ্বরীর মুখের দিকে চাহিয়া রোষদীপ্ত কণ্ঠে বলিল, "আমাকে যখন তোমরা জোর ক'রে আলাদা ক'রে দিয়েছ, তখন কেন আমি তোমার সঙ্গে কথা কইতে যাব?"

অশ্রুপ্লাবিত কণ্ঠে মহেশ্বরী ডাকিল, "সুরো!"

জোরে মাথা নাড়িয়া উত্তেজিতভাবে সুরেশ বলিল, "আগে বল, কেন তোমরা আমাকে আলাদা ক'রে দিলে? দিয়েছ যদি, আমার বদলে তুমি উপোস দিয়ে শুকিয়ে মরবে কেন?"

কথার সঙ্গে সঙ্গে সুরেশের গলাটা যেন ধরিয়া আসিল। মহেশ্বরী ঈষৎ হাসিল; সত্বর উঠিয়া বাঁ হাত দিয়া তাহার একখানা হাত চাপিয়া ধরিল; শান্ত-কোমলকণ্ঠে বলিল, "যে আলাদা ক'রে দিয়েছে সে দিয়েছে। তুই এখন ভাত খাবি?"

ঘাড় বাঁকাইয়া সুরেশ বলিল, "যারা আমাকে আলাদা ক'রে দিয়েছে, তাদের ভাত আমি খেতে যাব কেন?"

মহেশ্বরী বলিল, "এ ভাত তাদের নয়, আমার ভাত—আমার ভাগের ভাত। এ ভাত তোকে খেতেই হ'বে সুরো।"

মহেশ্বরী তাহাকে টানিয়া আনিয়া ভাতের কাছে বসাইয়া দিল। বলিল, "যদি আমাকে উপোস রেখে মেরে ফেল্‌তে না চাস্, তবে ভাত খা বল্‌ছি!"

মহেশ্বরী নিজের হাতে ভাতের গ্রাস লইয়া তাহার মুখে তুলিয়া দিল। সুরেশ সে ভাত মুখ হইতে ফেলিতে পারিল না, কিন্তু তাহা গলাধঃ করিতে করিতে তাহার দুই চোখ দিয়া ঝর ঝর অশ্রুধারা গড়াইয়া পড়িল। মহেশ্বরী গ্রাসের পর গ্রাস তুলিয়া তাহার মুখে দিতে থাকিল।

অন্নদা হাতের ভাত হাতে রাখিয়া বিস্ময়-বিস্ফারিত দৃষ্টিতে সেই দিকে চাহিয়া রহিল।

৫

পরদিন খানিক বেলা হইলে সুরেশ একটা হাঁড়ী লইয়া রান্না চাপাইতে গেল, দেখিয়া অন্নদা আশ্চর্য্যান্বিত-ভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "আজ রাঁধবে না কি, ঠাকুর-পো?"

গম্ভীর মুখে সুরেশ উত্তর দিল, "রাঁধবো না তো খাব কি? রোজ রোজ উপোস দিতে যাব না কি?"

কুঞ্চিত মুখে অন্নদা বলিল, "উপোস দিতেই বা যাবে কেন? হাত আছে, পা আছে, এক মুঠো ফুটিয়ে খাওয়া বৈ তো না।"

মহেশ্বরী জিজ্ঞাসা করিল, "কি রাঁধবি রে?"

মুখ মচ্‌কাইয়া সুরেশ বলিল, "যা হয়—ভাতে ভাত।"

বলিয়া সে উনান ধরাইতে গেল। কিন্তু উনান ধরাইবার কৌশল সে জানিত না; সুতরাং বিস্তর পাতা-কুটী কাঠ ঘুঁটে উনানে গুজিয়া দিলেও উনান ধরিল না। পাতা কুটী সব পুড়িয়া গেল, কিন্তু কাঠের গায়ে আগুন ধরিল না, কেবল অর্দ্ধ-দগ্ধ ঘুঁটেগুলা হইতে ধূমরাশি উত্থিত হইয়া স্থানটাকে অন্ধকারময় করিয়া তুলিল। উনানে ফুঁ দিতে দিতে সুরেশের চোখ দুইটা লাল হইয়া আসিল, ধোঁয়ায় চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। সুরেশের বিরক্তির সীমা রহিল না। তাহার ইচ্ছা হইল, কাষ্ঠখণ্ডের আঘাতে হাঁড়ীসমেত উনানটাকে চুরমার করিয়া দিয়া ঘরে গিয়া শুইয়া পড়ে, সাত দিন উপবাস দিতে হইলেও এমন ঝক্‌মারির কাযে হাত দিবে না। শুইয়াও পড়িত সে, যদি মেজো বৌয়ের বিদ্রূপোক্তির ভয় না থাকিত। পশ্চাৎপদ হইলে এখনই হয় ত মেজো-বৌ টিট্‌কারি দিয়া বলিবে, "কি ঠাকুর-পো, রাঁধতে পারলে না?" না, যেমন করিয়াই হউক, উনান ধরাইয়া অন্ততঃ আজিকার মতও এক মুঠা ফুটাইয়া খাইতে হইবে।

সুরেশ পুনরায় পাতা-কুটী সংগ্রহ করিয়া আনিয়া উনান ধরাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু তাহার সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইল। পাতা-কুটীগুলা ধূ ধূ করিয়া পুড়িয়া গেল, কিন্তু কাঠ ধরিল না, মোটা মোটা কাঠের চেলাগুলার গায়ে শুধু খানিকটা করিয়া কালি পড়িল মাত্র। অনবরত ফুৎকার দিতে দিতে সুরেশের চোক দুইটা জালা করিতে লাগিল। তাহার যেন ডাক ছাড়িয়া কাঁদিতে ইচ্ছা হইল। অদূরে বসিয়া অন্নদা কুট্‌নো কুটিতে কুটিতে মুখ টিপিয়া হাসিতে লাগিল।

মহেশ্বরী স্নান করিতে গিয়াছিল। সে ফিরিয়া আসিয়া সুরেশের দুর্দ্দশা দেখিয়া ভিজা কাপড়েই তথায় ছুটিয়া আসিল এবং সুরেশকে তিরস্কার করিয়া বলিল, "সেই থেকে উনান ধরাচ্ছিস্? তবেই তুই আলাদা রেঁধে খেয়েছিস্ আর কি। সর আমি দেখি?"

মহেশ্বরী উনানের ভিতর হইতে কাঠ-ঘুঁটেগুলা বাহির করিয়া প্রথমতঃ খানকয়েক পাতলা কাঠ সাজাইয়া দিল, তার পর পাতা জ্বালিয়া দিতেই কাঠগুলা সহজেই ধরিয়া উঠিল। মহেশ্বরী বলিল, "এইবার হাঁড়ীতে জল দে।"

হাঁড়ীতে কতটা জল এবং কি পরিমাণ চাউল দিতে হইবে, তাহা দেখাইয়া দিয়া মহেশ্বরী কাপড় ছাড়িতে গেল। সুরেশ চাউলের সঙ্গে কয়েকটা আলু ফেলিয়া দিয়া ফাঁকে গিয়া হাওয়ায় বসিল; মাঝে মাঝে আসিয়া উনানে কাঠ দিয়া যাইতে লাগিল।

ফুটিয়া ফুটিয়া ভাত সিদ্ধ হইলে সুরেশ অনেক কষ্টে ভাতের হাঁড়ী উনান হইতে নামাইল, কিন্তু তাহার ফেন ঝাড়া তাহার পক্ষে নিতান্তই দুঃসাধ্য বলিয়া বোধ হইল। মহেশ্বরীও তাহা জানিত। সে আসিয়া এই দুঃসাধ্য কার্য্য সহজেই সুসম্পন্ন করিয়া দিল।

অন্নদা একটু শ্লেষের হাসি হাসিয়া বলিল, "ঠাকুরপো ত খুবই রাঁধলে!"

মহেশ্বরী বলিল, "তুইও যেমন পাগল মেজো-বৌ, ও এখনও খেয়ে আঁচাতে জানে না, ও নিজে রেঁধে খাবে। তোর ভাসুরের যেমন পাগলামি!"

অন্নদা মুখখানাকে একটু গম্ভীর করিয়া বলিল, "তা কায কি দিদি এমন পাগলামীতে? আলাদা খেলেও তোমাকেই যখন সব ক'রে দিতে হবে, তখন এর চাইতে একত্তরে খেলেই ত হয়।"

ঈষৎ ক্রুদ্ধভাবে মহেশ্বরী বলিল, "সে ত তোর আমার কথায় হবে না মেজো-বৌ, যারা আলাদা ক'রে দিয়েছে, তারা বুঝবে। কিন্তু আলাদা ক'রে দিয়েছে ব'লেই সুরো যে একেবারে পর হ'য়ে গিয়েছে, তা মনে করিস্ না।"

অন্নদা আর কোন উত্তর করিল না, শুধু অবজ্ঞায় ঠোঁটটা একটু ফুলাইল মাত্র।

সুরেশ সেই দিন স্বহস্ত-প্রস্তুত অন্ন ভক্ষণ করিতে করিতে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল, "উপোস দিয়ে শুকিয়ে মরতে হয় তাও স্বীকার, তবু নিজে রেঁধে খেতে আর যাব না।"

পরদিন কিন্তু তাহাকে আর রাঁধিতে হইল না, মহেশ্বরী সকাল সকাল স্নান সারিয়া আসিয়া তাহাকে রাঁধিয়া দিল।

অন্নদার কিন্তু ইহা ভাল লাগিল না; সে রাগে গর্-গর্ করিল এবং সংসারের কাযের অছিলা করিয়া পাঁচ কথা কহিতে লাগিল। মহেশ্বরী সে কথায় তেমন কান দিল না।

কিন্তু মতিলাল যখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁ বড়-বৌ, তুমি না কি রোজ রোজ সুরোকে রেঁধে দাও?" তখন মহেশ্বরী কতকটা দুঃখিত এবং কতকটা রুষ্টভাবে উত্তর করিল, "হাঁ দিই, দিতে তুমি বারণ কর না কি?"

মতিলাল একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "আমি বারণ করি না বটে, কিন্তু হীরু বলছিল, তা হ'লে ওকে আলাদা ক'রে দেওয়ার কি দরকার ছিল?"

মহেশ্বরী ক্রুদ্ধভাবেই উত্তর দিল, "দরকার কি ছিল না ছিল, তা তোমরাই জান। কিন্তু আলাদা ক'রে দিয়েছ ব'লে ও যে খেতে পাবে না, উপোস দিয়ে থাকবে, তা আমি দেখতে পারবো না। আমি ওকে মানুষ করেছি।"

মতিলাল বলিল, "মানুষ করেছ ব'লে ওকে যদি শাসন করতে না দাও, তা হ'লে ওর পরকাল তুমিই নষ্ট করবে, বড়বৌ।"

ভ্রূভঙ্গী করিয়া মহেশ্বরী বলিল, "শাসন করতে হয় বুঝি খেতে না দিয়ে?"

মতিলাল বলিল, "যেমন রোগ তেমনি ওষুধ। দু' বেলা তৈরী ভাত খাচ্ছে, আর স্ফূর্ত্তি ক'রে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিন্তু দু' দিন উপোস দিতে হ'লেই দেখবে, এ স্ফূর্ত্তি আর থাকবে না।"

মহেশ্বরী বলিল, "উপোস ত এক দিন এক রাত দিয়েছিল।"

মতিলাল বলিল, "কিন্তু আর একটা রাত না যেতেই তুমি ডেকে এনে খাইয়েছিলে। রাগ করো না বড়বৌ, তোমার অবশ্য প্রাণের টান আছে, না খাইয়ে থাকতে পারলে না। কিন্তু তাতে ওর পরকালটা যে মাটী হ'য়ে যাচ্ছে, তা ত তুমি বুঝছ না।"

একটু ভাবিয়া মহেশ্বরী বলিল, "বেশ, আমি রেঁধে না খাওয়ালেই যদি ওর পরকাল ভাল হয়, কাল থেকে আমি আর রেঁধে দেব না।"

৬

পরদিন সুরেশ ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিয়া মহেশ্বরীকে জিজ্ঞাসা করিল, "আমার রান্না হয়েছে, বৌদি?"

মহেশ্বরী গম্ভীরভাবে উত্তর দিল, "না।"

আশ্চর্য্যের সহিত সুরেশ বলিল, "বাঃ রে, এতখানি বেলা হলো, এখনও রান্না হয় নি?"

ক্রুদ্ধস্বরে মহেশ্বরী বলিল, "না, হয় নি। কে তোমার চাকরাণী আছে বল ত, রোজ রোজ তোমাকে রেঁধে দেবে?"

মুখ ভার করিয়া সুরেশ বলিল, "রেঁধে দিলেই বুঝি চাকরাণী হয় ?"

তীব্র তিরস্কারের স্বরে মহেশ্বরী বলিল, "হাঁ, হয়। তুমি সকাল থেকে উঠে গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়িয়ে আসবে, আর আমি তোমার জন্যে ভাত তৈরী ক'রে রাখবো,—কেন, আমার কি এমন দায় পড়েছে বল ত। তোর কি কায-কর্ম্ম কিছুই নাই ?"

সুরেশ বলিল, "কায-কর্ম্ম আর কি আছে ? কাযের মধ্যে মাঠের খাটুনী ত ? তা ও কায আমার দ্বারা হবে না।"

মহেশ্বরী বলিল, "মাঠে খাট্‌তে না পারিস, লাটসাহেবের চাকরীই বা কোন্ কচ্ছিস্ ?"

সুরেশ বলিল, "লাটসাহেবের চাকরী না করি, টো টো কোম্পানীর চাকরী কচ্ছি ত।"

মহেশ্বরী শ্লেষভরে বলিল, "টো টো কোম্পানীর চাকরী করলেই যদি পেট ভরে, ভরুক।"

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সুরেশ জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি তা হ'লে আর আমাকে রেঁধে দেবে না ?"

দৃঢ়কণ্ঠে মহেশ্বরী উত্তর দিল, "না, দেব না।"

"আচ্ছা, দাও কি না দেখা যাবে" বলিয়া সুরেশ তাহার সম্মুখ হইতে দ্রুতপদে প্রস্থান করিল। অন্নদা মহেশ্বরীকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "দেখলে দিদি, আলাদা হয়েও তেজ একটু কমে নি। জোর দেখিয়ে কায করিয়ে নেবে! যেন বিনি-মাইনের দাসী-বাঁদী। তোমার লজ্জা নেই ব'লেই দিদি, তুমি ওর কায ক'রে দিতে যাও, আমার ত ওর মুখের দিকেও চাইতে ইচ্ছা করে না।"

মহেশ্বরী তাহার কথার উত্তর না দিয়া নীরবে মাছ কুটিতে লাগিল।

খানিক পরে মহেশ্বরী উঁকি দিয়া দেখিল, সুরেশ চুপ করিয়া শুইয়া রহিয়াছে। মহেশ্বরী কোন কথা না বলিয়া নিজের কাযে মন দিল।

সকলের খাওয়া-দাওয়া হইয়া গেলে মহেশ্বরী ও অন্নদা খাইতে বসিল। খাইতে বসিয়া অন্নদা বলিল, "রান্না হয় নি শুনে বাবু বুঝি রাগ ক'রে শুয়ে রইলেন! এক মুঠো রেঁধে খেতে গতর হলো না। ভালা কুড়ে ব্যাটাছেলে যা হোক্।"

মহেশ্বরী তাহাকে ধমক্ দিয়া বলিল, "চুলোয় যাক্ সে! তার কথায় তোর আমার কি দরকার বল্ ত।"

বলিয়া মহেশ্বরী সুরেশের উপর আপনার ক্রোধ ও বিরক্তি যেন অন্নদাকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিবার অভি-প্রায়ে ক্ষিপ্রহস্তে ভাতের গ্রাস মুখে তুলিতে লাগিল। আজ তাহার আহারে এতটা ব্যস্ততা দেখিয়া অন্নদা বিস্মিত হইল।

খাইতে খাইতে মহেশ্বরী এক একবার বক্রদৃষ্টিতে সুরে-শের ঘরের দরজার দিকে চাহিতে লাগিল। যেন তাহার ইচ্ছা, সুরেশও তাহাকে খাইতে দেখিয়া বুঝিতে পারে যে, মহেশ্বরী তাহার উপর কতটা বিরক্ত হইয়াছে, তাহাকে অভুক্ত রাখিয়াও সে খাইতে দ্বিধা বোধ করে নাই।

মহেশ্বরীর ইচ্ছা অপূর্ণ রহিল না। খাওয়া শেষ হইয়া আসিয়াছে, এমন সময় সুরেশ উঠিয়া ঘরের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল এবং ম্লানমুখে করুণনেত্রে একবার আহারনিরতা মহেশ্বরীর দিকে চাহিয়াই দ্রুতপদে বাড়ীর বাহির হইয়া গেল! অন্নদা বলিল, "না খেয়েই বাবু বেরিয়ে গেলেন কোথায় ?"

তীব্র ঘৃণাবিমিশ্র কণ্ঠে "চুলোয়" বলিয়া মহেশ্বরী পাতের অবশিষ্ট ভাতগুলাকে অন্নদার দিকে ঠেলিয়া দিয়া বলিল, "আর খেতে পাচ্ছি না। পারিস্ ত তুই খেয়ে নে, মেজোবৌ।"

বিস্ময়-বিমিশ্র স্বরে অন্নদা বলিয়া উঠিল, "ও মা, কতই বা ভাত খেয়েছ তুমি? প্রায় অর্দ্ধেক ভাতই যে পড়ে রয়েছে। মাছ পর্য্যন্ত খাও নি এখনও।"

মুখ মচ্‌কাইয়া মহেশ্বরী বলিল, "মাছ ক'দিন থেকেই খেতে পারি না, কেমন যেন গন্ধ ছাড়ে। তুই খা।"

বলিয়াই মহেশ্বরী তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িল এবং কয়েক-খান উচ্ছিষ্ট পাত্র লইয়া তাড়াতাড়ি ঘাটের দিকে চলিয়া গেল। আর একটু বসিয়া থাকিলেই অন্নদা দেখিতে পাইত, তাহার চোখের কোল ছাপাইয়া অশ্রুরাশি ঠেলিয়া বাহির হইবার উপক্রম করিতেছে।

সেই দিন রাত্রিতে মহেশ্বরী জোর গলায় স্বামীকে জানাইল, "ওগো, তোমার কথাই রেখেছি আমি, আজ আর সুরোকে রেঁধে দিই নাই। বিশ্বাস না হয়, দেখ গিয়ে, আজ সে উপোস দিয়ে পেট কোলে ক'রে পড়ে রয়েছে।"

কথা সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে মহেশ্বরীর চোখের পাতাগুলা

এমন ভারী হইয়া আসিল যে, সে আর স্বামীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাহার উত্তর শুনিবার জন্য অপেক্ষা পর্য্যন্ত করিতে পারিল না।

৭

রাত্রিতে বিছানায় পড়িয়া সুরেশ ভাবিতেছিল, অভিমান বড়, না ক্ষুধার তাড়না বড়? তাহার মন স্পষ্ট উত্তর দিল, "ক্ষুধার তাড়নাই বড়।" মনের কাছে এই নিঃসন্দিগ্ধ উত্তর পাইয়া সুরেশ আর শুইয়া থাকিতে পারিল না, ধড়-মড় করিয়া বিছানার উপর উঠিয়া বসিল। কিন্তু লজ্জা, মান, অভিমান, ক্রোধ—সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল এই ক্ষুধার তাড়না নিবৃত্তির উপায় কি? সারাদিনের অনাহার। আর এক দিনও তাহাকে অনাহারে কাটাইতে হইয়াছিল। কিন্তু সে দিনের অনাহারের সঙ্গে আজিকার অনাহারের প্রভেদ আছে। সে দিন সে ঘরে ভাত পাইবে না জানিয়া লোকের গাছের পেয়ারা, পেঁপে, কলা, জামরুল আত্মসাৎ করিয়া ক্ষুধাটাকে তেমন প্রবল হইতে দেয় নাই। আজ কিন্তু সুরেশ সেরূপ কোন চেষ্টাই করে নাই। সময়ে ভাত এক মুঠা পাইবে জানিয়া সে নিশ্চিন্ত চিত্তে ঘরে ফিরিয়াছিল। কিন্তু ঘরে ফিরিয়া যখন দেখিল, ভাত পাইবার আশা নাই, তাহার একমাত্র আশাস্থল-বৌদি পর্য্যন্ত তাহার উপর বিরূপ হইয়া, তাহাকে না খাওয়াইয়া নিজে স্বচ্ছন্দে ভাতের পাথর লইয়া বসিয়াছে, তখন তাহার মনে হইল, সারা জগৎটার মধ্যে তাহাকে এক মুঠা ক্ষুধার অন্ন দিতে আর কেহই নাই—সংসারে সে একেবারে অসহায়! দূর হউক, সংসারে যাহার কেহই নাই, তাহার খাওয়াটাই বা থাকে কেন? কতকটা দুঃখে—কতকটা ক্রোধে সুরেশ মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল, "নাঃ, তাহাকে খাইতে না দিয়া সকলে যখন সন্তুষ্ট, তখন সে আর খাইবেই না।" এই দুর্জ্জয় প্রতিজ্ঞাটাকে মনের ভিতর জাগাইয়া রাখিয়া সুরেশ সারা বিকালটা গ্রামের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত ঘুরিয়া আসিল বটে, কিন্তু খাইবার জন্য কোন চেষ্টাই করিল না। দত্তদের পুকুর পাড়ের গাছের থোলো থোলো জামরুলগুলাও তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারিল না।

ঘুরিয়া-ফিরিয়া সুরেশ সন্ধ্যার পর যখন বাড়ী ফিরিল, তখন ক্ষুধায় তাহার সর্ব্বশরীর ঝিম্ ঝিম্ করিতেছে, মাথাটা যেন ঘুরিয়া পড়িতেছে। কিন্তু আজ তাহার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, ক্ষুধার তাড়নাকে সে পরাজিত করিবে, কিছুই খাইবে না। সুরেশ অবসন্ন দেহে ঘরের দরজা ভেজাইয়া দিয়া শুইয়া পড়িল, এবং চক্ষু মুদিয়া ঘুমাইবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল।

কিন্তু কি বিপদ্! ঘুম যে আজ চোখে আসিতেই চাহে না। বেশীক্ষণ চক্ষু মুদিয়াও থাকা যায় না, চোখ টন্ টন্ করে। কাযেই সুরেশ কখনও চোখ বুজিয়া, কখন বা চোখ চাহিয়াই বিছানার উপর পড়িয়া রহিল। পড়িয়া পড়িয়া সে খোলা জানালা দিয়া দেখিল, ছেলেদের খাওয়া হইয়া গেল, মেজদার খাওয়া হইল। খানিক পরে বড়দা আসিয়া খাইল। এইবার বৌদির পালা। আজও বৌদি খাইতে বসিয়া হয় তো সে দিনকার মত টানিয়া লইয়া গিয়া খাওয়াইবার জন্য চেষ্টা করিবে। কিন্তু নাঃ, সে দিনকার মত যতই টানাটানি করুক, আজ সে কিছুতেই খাইবে না। সারাদিন উপবাসী রাখিয়া রাত্রিকালে আদর দেখাইয়া এক মুঠা খাওয়ান,—এমন খাওয়ায় দরকার কি? সুরেশ মনটাকে দৃঢ় করিয়া লইয়া স্থির করিল, "আজ বৌদি যতই ডাকুক, যতই টানাটানি করুক, কিছুতেই সে খাইবে না।"

কিন্তু কৈ, কেহই তো তাহাকে ডাকিল না? মেজ-বৌ খাইয়া, আঁচাইয়া রান্নাঘরে চাবী দিল, বৌদি তাহাকে ধান সিদ্ধ করিবার জন্য কাল খুব ভোরে উঠিতে আদেশ দিয়া ঘরের দরজা বন্ধ করিল। বাড়ীতে আর কাহারও কোনই সাড়া-শব্দ নাই। বৌদি তাহা হইলে রাত্রিকালে ভাত খাইল না। অম্বলের অসুখের জন্য মাঝে মাঝে তাহাকে রাত্রিকালে ভাত বন্ধ দিতে হয়। আজও বোধ হয় তাহাই হইল। কিন্তু হতভাগা অম্বলটা দেখা দিবার আর কি দিন পাইল না? বৌদির সস্নেহ অনুরোধের উত্তরে সুরেশ যে কঠোর দৃঢ়তা দেখাইবে বলিয়া প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহা দেখাইবার সুযোগ দিল না?

রাত্রির গভীরতার সঙ্গে বাড়ীখানা যতই নিস্তব্ধ হইয়া আসিতে লাগিল, সুরেশের চাঞ্চল্য ততই যেন বাড়িয়া উঠিল। আচ্ছা, বাড়ীর লোকগুলা কি নিষ্ঠুর! একটা লোক যে সারাদিনটা না খাইয়া রহিয়াছে, তাহার সম্বন্ধে কোন তথ্য লওয়াই ইহারা আবশ্যক বিবেচনা করিল না? ইহাদের মনে কি একটুও দয়ামায়া নাই? উহারা বলিলেও সুরেশ ত খাইত না, কিন্তু উহাদের একবার বলাটাও কি

উচিত ছিল না? নাঃ, সুরেশ সাত দিন না খাইয়া থাকিবে, তথাপি এই লোকগুলার প্রদত্ত খাদ্য গ্রহণ করিবে না।

কিন্তু এ কি, ঘুম যে কিছুতেই আসে না। পেটের ভিতর যেন একটা ভীষণ দাহ চলিতেছে। মনে হইতেছে, যেন একটা প্রচণ্ড দাবানল প্রজ্বলিত হইয়া বিশ্ব-সংসারকে দগ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছে। কানের পাশে যেন হাজার হাজার ঝিঁ ঝিঁ পোকা আসিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিয়াছে। ওঃ, কি ভয়ানক যাতনা এই ক্ষুধানলের! সংসারের সকল কষ্ট সহ্য হয়, কিন্তু এ কষ্ট যে অসহ্য!

যখন নিতান্ত অসহ্য বোধ হইল, তখন সুরেশ আর শুইয়া থাকিতে পারিল না, উঠিয়া বিছানার উপর বসিল। নাঃ, এ অনল নির্ব্বাপিত না করিলে স্থির থাকিবার উপায় নাই। কি দিয়া ইহাকে নির্ব্বাপিত করিবে? ঘরে ত কিছুই নাই। ঘরে শুধু চাউল আছে। কিন্তু এত রাত্রিতে উঠিয়া উনান ধরাইয়া রাঁধিয়া খাওয়া—আরে রাম, সে কায সুরেশের দ্বারা হইবে না, রাঁধিতে পারিবেও না সে। শুনা যায়, পেটের জ্বালায় ত লোকে শুকনা চাউল খাইয়াই ক্ষুন্নিবৃত্তি করে। তবে আর চিন্তা কি!

সুরেশ আলো জ্বালিয়া চাউলের পাত্র হইতে সেরখানেক চাউল ঢালিয়া লইল এবং গভীর আগ্রহের সহিত এক মুষ্টি চাউল মুখগহ্বরে নিক্ষেপ করিল। হরি হরি, শুক্না চাউলও কি খাওয়া যায়? যে খাইতে পারে, সে মানুষ নয়—রাক্ষস। অতি কষ্টে মুখ মধ্যস্থ চাউলগুলি চিবাইয়া সুরেশ এক ঘটি জল গলায় ঢালিয়া দিল এবং নিতান্ত হতাশভাবে অবশিষ্ট চাউলগুলাকে এক পাশে সরাইয়া রাখিল।

জল পান করিয়া সুরেশ একটা তৃপ্তি অনুভব করিল বটে, কিন্তু তাহা স্বল্পকালের জন্য। অল্পক্ষণ পরেই তাহার মনে হইল, না, এমন করিয়া না খাইয়া থাকা যাইবে না। ইহারা যদি নিতান্তই খাইতে না দেয়, খাওয়ার অন্য উপায় যাহা হউক করিতেই হইবে। ব্যাটাছেলে, হাত-পা আছে, এমন করিয়া উপবাস দিয়াই বা থাকিব কেন? বিদেশে চলিয়া গেলে মুটেগিরি করিলেও ত পেটে খাইতে পাওয়া যাইবে। কিন্তু তাহার আগে ইহাদের সঙ্গে একটা 'হেস্ত-নেস্ত' করিয়া লওয়া দরকার। 'হেস্ত-নেস্ত' আর কি, বৌদির কাছে—বড়দার কাছে সাফ জবাব লইতে হইবে, উহাদের মন্তব্যটা কি? নতুবা বৌদি ইহার পর দুঃখ করিতে পারে। কাল সকালেই—সকালে কেন, আজ এখনই জবাব লইয়া কাল সকালে যাহা হয় করিব।

কথাটা ভাবিয়াই সুরেশ তড়াক্ করিয়া উঠিয়া ঘরের দরজা খুলিয়া ফেলিল এবং দৃঢ়সঙ্কল্পে মন বাঁধিয়া বেশ জোরে পা ফেলিয়া মতিলালের ঘরের দরজায় গিয়া ডাকিল, "বৌদি!"

৮

বাড়ীর আর সকলে ঘুমাইলেও মহেশ্বরী তখনও ঘুমাইতে পারে নাই; হতভাগা সুরোর অনাহার-ক্লিষ্ট মুখখানাকে চোখের সামনে রাখিয়া তাহার জন্য যে কি উপায় অবলম্বন করিবে, পড়িয়া পড়িয়া ব্যাকুলচিত্তে তাহাই ভাবিতেছিল। সুতরাং সুরেশের ডাক শুনিয়াই সে চমকিতভাবে উত্তর দিল, "কে রে, সুরো!"

সুরেশ বলিল, "হাঁ আমি। বড়দা কি ঘুমিয়েছে?"

"ঘুমিয়েছে। কেন বল্ দেখি?"

"কেন কি? ডেকে দাও বড়দাকে। তুমিও ওঠো, আমার দরকারী কথা।"

মহেশ্বরী তাড়াতাড়ি উঠিয়া আলো জ্বালিয়া দরজা খুলিল। দরজা খোলার শব্দে মতিলালের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। মহেশ্বরী তাহাকে বলিল, "ওঠো ত একবার, সুরো ডাক্‌ছে।"

"সুরো ডাকছে? কেন রে, সুরো?" বলিয়াই মতিলাল ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল। সুরেশ ঘরে ঢুকিয়া মতি-লালের সম্মুখে মেঝের উপর ঝাঁকিয়া বসিয়া বলিল, "একটা কথা আছে তোমার সঙ্গে বড়দা।"

"কি কথা রে?"

"কথা অপর কিছু নয়, তোমাদের মতলবটা কি খুলে বল দেখি?"

একটু বিস্ময়ের সহিত মতিলাল জিজ্ঞাসা করিল, "মত-লব? মতলব কিসের, সুরো?"

"কিসের মতলব?" অশ্রুকাতর চোখ দুইটা জ্যেষ্ঠের মুখের উপর নিবদ্ধ করিয়া দুঃখ-গাঢ় কণ্ঠে সুরেশ বলিয়া উঠিল, "কিসের মতলব? কি জন্যে আমাকে আলাদা ক'রে দিলে বল ত? আমি কি এমন দোষ করেছি, যার জন্যে

আমাকে তোমরা উপোস দিইয়ে রেখেছ ? আমি কি তোমাদের কেউ নই ?"

বলিতে বলিতে অভিমানের অশ্রুধারায় সুরেশের চোখ-মুখ ভাসিয়া গেল। দৃঢ়তার সহিত সাফ জবাব লইতে আসিয়া কাঁদিয়া ফেলিয়া সুরেশ যেন লজ্জিত হইয়া পড়িল। সে লজ্জায় দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া ফুলিতে ফুলিতে বলিল, "আমি কি এতই পর হ'য়ে গিয়েছি যে, সারাদিন না খেয়ে বিছানায় পড়ে ছট্‌ফট্‌ কচ্ছি, আর তোমরা দিব্যি খেয়ে-দেয়ে—"

সুরেশ আর বলিতে পারিল না ; উচ্ছ্বসিত বাষ্পে তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল। মতিলাল মাথাটা হেঁট করিয়া নীরবে বসিয়া রহিল। মহেশ্বরী অগ্রসর হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি গো, চুপ ক'রে রইলে যে ?"

মতিলাল একটা ক্ষুদ্র নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "চুপ ক'রে থাকবো না ত কি করবো ?"

"তোমার নিজের ছেলে হ'লে কি করতে ?"

"নিজের ছেলে অবাধ্য হ'লে তাকেও ঠিক এই রকমে শাসন করতাম।"

মহেশ্বরীর চোখ দুইটা যেন জ্বলিয়া উঠিল ; গর্ব্বস্ফীত কণ্ঠে বলিল, "আচ্ছা, কর ত দেখি শাসন। ওর মা নাই ব'লে তোমরা যা ইচ্ছা তাই করতে চাও বুঝি ? কাল থেকে আমি আর তোমার কোন কথাই শুনবো না ; ওকে রেঁধে ভাত দেব, দেখি, তোমরা আমার কি করতে পার।"

মতিলাল বিস্ময়চকিত দৃষ্টিতে স্ত্রীর গর্ব্বপ্রদীপ্ত মুখের দিকে চাহিল।

পরদিন রান্না শেষ করিয়া মহেশ্বরী সুরোকে ডাকিয়া ভাত বাড়িয়া দিলে অন্নদা গভীর বিস্ময় ও শঙ্কা অনুভব করিয়া বলিল, "হাঁ দিদি, ঠাকুরপোকে ভাত দিলে, ওরা ত কিছু বলবে না ?"

তাহার দিকে চোখ পাকাইয়া চাহিয়া মহেশ্বরী উত্তর করিল, "শুধু বলবে না, মাথাটা পর্য্যন্ত কেটে নেবে। আচ্ছা মেজবৌ, ওরা না হয় পুরুষমানুষ, যা মনে আসে তাই করতে পারে। কিন্তু তুই ত মেয়েমানুষ, ছেলের মা, তোর বুকটাও কি পুরুষদের মতই শক্ত !"

মহেশ্বরীর এই তিরস্কারে অন্নদা একটুও লজ্জা অনুভব করিল না, বরং যেন গভীর অবজ্ঞায় নাসাগ্র কুঞ্চিত করিল।

হীরালাল জ্যেষ্ঠকে সম্ভাষণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁ দাদা, সুরো কি তা হ'লে আবার এক অন্নেই থাকবে ?"

ঈষৎ হাসিয়া মতিলাল উত্তর করিল, "তাই রইলো বৈ কি রে, ভাই। কি জানিস, মেয়েমানুষগুলো থাকতে কাউকে শাসন করা যাবে না। আমরা পুরুষমানুষ, মনে করলে খুন-জখমও ক'রে ফেলতে পারি, কিন্তু এই মেয়েমানুষগুলো ত ততটা পেরে ওঠে না।"

ক্রোধ-গম্ভীর মুখে হীরালাল বলিল, "তা হ'লে দেখছি, বড়বৌই সুরোর পরকালটা নষ্ট করলে।"

সহাস্যে মতিলাল বলিল, "যে পাপ করবে, সে-ই ভুগবে। আমরা কেন খুন ক'রে পাপের ভাগী হ'তে যাই।"

হীরালাল আর কোন প্রতিবাদ করিতে পারিল না বটে, কিন্তু জ্যেষ্ঠের স্ত্রৈণতা দর্শনে ঘৃণায় মুখখানা বিকৃত করিল। মহেশ্বরী কিন্তু বিষম সঙ্কট হইতে মুক্তিলাভ করিয়া শ্রদ্ধা-সজল নেত্রে স্বামীর মুখের দিকে চাহিল।

শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

প্রেম-স্মৃতি

সঙ্গীতের মৃদুস্বর ধীরে ধীরে হইলে বিলীন
অন্তঃকর্ণে বাজে তার সুর,
মধুময়ী মল্লিকার দলগুলি হইলে মলিন
ঘ্রাণে জাগে গন্ধ সুমধুর।

বৃন্ত হ'তে ঝরে যবে সুকোমল গোলাপের দল
ঝরাপাতা রচে শয্যা তার,
তুমি গেছ, তব স্মৃতি তেমতি রচিল হৃদি-তল
প্রণয়ের বাসর তোমার।

শ্রীভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী।

খেজুরী বন্দর

২

ভারতবর্ষে সংস্থাপিত সর্ব্বপ্রথম টেলিগ্রাফ লাইন কলিকাতা হইতে খেজুরীর সহিত সংযোজিত হইয়াছিল। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের রসায়নাধ্যাপক ডাক্তার ও'শাগ্‌নেসী (Dr. W. B. O' Shaughnessey) কলিকাতা হইতে ডায়মণ্ডহারবার এবং বিষ্ণুপুর, মায়াপুর, কুকড়াহাটি ও খেজুরী পর্য্যন্ত সর্ব্বসমেত ৮২ মাইলব্যাপী টেলিগ্রাফ লাইন স্থাপন করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হন। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে কুকড়াহাটি হইতে খেজুরী লাইন উন্মুক্ত হয়। তৎকালে ডাঃ ও'শাগ্‌নেসীর উদ্ভাবিত এক প্রকার ক্ষুদ্র বৈদ্যুতিক যন্ত্রসাহায্যে সংবাদ গৃহীত হইত; পরে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে মোর্স উদ্ভাবিত যন্ত্র প্রচলিত হয়। (১)

খেজুরীর পোষ্ট আফিসের কার্য্য সুবিস্তৃত ছিল। য়ুরোপীয় ব্যবসায়ী, জাহাজের যাত্রী ও নাবিকগণের সহিত কার্য্য-সম্বন্ধের জন্য এই পোষ্ট আফিসের ভার উচ্চ বেতনভোগী ইংরাজ-কর্ম্মচারীর উপর ন্যস্ত থাকিত। ইহার অধীনে অনেকগুলি ডাক-নৌকা সমুদ্রস্থিত জাহাজে যাতায়াত করিয়া চিঠিপত্রাদির আদান-প্রদান করিত। এই ডাক-নৌকাগুলির দাঁড়ি-মাঝি ও পোষ্ট আফিসের দেশীয় কর্ম্মচারী-দিগের অবস্থানের জন্য পোষ্ট আফিস-গৃহের পার্শ্বেই শ্রেণীবদ্ধ-ভাবে দ্বাদশটি কক্ষ-বিশিষ্ট প্রকাণ্ড 'ব্যারাক্' ছিল, তাহা অযত্নে অতি অল্পদিন মাত্র ভূমিসাৎ হইয়াছে। ডাক-নৌকার কর্ম্মচারিগণের কর্ত্তব্য-সম্পাদন বিপদ-বর্জ্জিত ছিল না। "কলিকাতা গেজেটে" ১৮০৬ খৃষ্টাব্দের ২০শে আগষ্ট তারিখে পোষ্টমাষ্টার জেনারাল প্রদত্ত একটি বিজ্ঞাপনে জানা যায়—খেজুরীর একটি ডাক-নৌকা চিঠিপত্রাদি জাহাজে বিলি করিয়া সাগরদ্বীপের নিকট তীরদেশে নোঙ্গরাবদ্ধ ছিল, এমন সময় একটি ব্যাঘ্র লাফ দিয়া নৌকায় উঠিয়া দাঁড়ি-মাঝির এক ব্যক্তিকে লইয়া গিয়াছিল। ইহার ফলে আরও দুই জন আহত হয় এবং নৌকাখানি উল্টাইয়া যায়।(১) একবার 'মেরীমেড' নামক জাহাজের কর্ম্ম-চারিগণ খেজুরীর একটি ডাক-নৌকার কর্ত্তব্য কার্য্যে ব্যাঘাত উৎপন্ন করায় ফোর্ট উইলিয়ম হইতে সকৌন্সিল গবর্ণর জেনারল ১৮০০ খৃষ্টাব্দের ১৮ই ডিসেম্বর তারিখে ভবিষ্যতে খেজুরীর পোষ্টমাষ্টারের অধীনস্থ কোনও ব্যক্তির সহিত এইরূপ ব্যবহারের জন্য কঠোর শাস্তির বিষয় 'কলিকাতা গেজেটে' বিজ্ঞাপিত করেন।(২) ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে মিঃ জে, বোটেল্‌হো (J. Botellho) খেজুরীর পোষ্ট-মাষ্টার ছিলেন। ইনি পোর্টমাষ্টার এবং অবৈতনিক ম্যাজি-ষ্ট্রেটেরও কার্য্য করিতেন। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের ভীষণ ঝটিকা-বর্ত্তে পুত্র ইউজীন ও পত্নী মেরীসহ ইনি নিহত হন।

শুনা যায়, প্রাণাধিক পুত্র প্রথমে নিরুদ্দিষ্ট হওয়ায়, শোকাতুর দম্পতি একটি সিন্দুকের উপর আরোহণপূর্ব্বক পুত্রের সন্ধানে বন্যার জলরাশিতে ভাসমান হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। খেজুরীর য়ুরোপীয় সমাধিক্ষেত্রে ইঁহারা সপরিবারে সমাহিত আছেন। পরবর্ত্তী পোর্ট ও পোষ্টমাষ্টার মিঃ ডবলিউ টি, মিলার এই সমাধিতে প্রস্তরলিপি যোজিত করেন।

প্রাচীরবেষ্টিত খেজুরীর য়ুরোপীয় সমাধিক্ষেত্রটি এখনও গবর্ণমেণ্ট সুসংস্কৃত অবস্থায় রক্ষা করিতেছেন। সমাধিক্ষেত্রে মোট তেত্রিশটি সমাধি আছে, তন্মধ্যে একুশটি ক্ষোদিত লিপিযুক্ত। সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন লিপিটির সময় ১৮০০ খৃষ্টাব্দ। এই সমাধিটি একটি নাবিকের, লিপিটি এক্ষণে পাওয়া যায় না। একটি অস্পষ্ট ও ভগ্ন লিপিফলক আছে—সম্ভবতঃ সেইটিই এই সমাধির লিপি হইবে। কেহ কেহ বলেন, লিপিবিহীন সমাধিগুলি আরও পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ের।(৩) বর্ত্তমান লিপিগুলির মধ্যে প্রাচীনতম লিপিটি ১৮১৮

---

(১) *Imperial Gazetteer of India (1907), vol III, p, 437.*

(১) H. Sanderson's *Selections from Calcutta Gazette vol. IV.* (1806-1815) p 71.

(২) W. S. Setonkar's *Selections from Calcutta Gazette vol III.* (1798 - 1805) p. 74.

(৩) "A few years ago the earliest inscriptions which could be found was on a detatched and broken slab, dated 1880 and to the memory of the boatswain of a ship, but some of the graves without inscriptions were probably of an earlier date." *Midnapore Gazetteer, p, 200.*

খৃষ্টাব্দের ১০ই সেপ্টেম্বর তারিখযুক্ত। কাঁথির পূর্ব্ববিভাগের সুপারভাইজার মিঃ এমোস্ ওয়েষ্টের সমাধিটি সর্ব্বাপেক্ষা আধুনিক ;—ইহার তারিখ ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের ১০ই অক্টোবর। সমাধিগুলির অধিকাংশই নৌ ও সৈন্যবিভাগীয় কর্ম্মচারিগণের। নিম্নে লিপিযুক্ত সমাধিগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইতেছে :—

১। নীল ম্যাক্ ইনেস্—"ডুনিরা" জাহাজের মিডশিপ্‌ম্যান্—মৃত্যু ১০ই সেপ্টেম্বর, ১৮১৮।

৭। সারা—হেন্‌রী অসবর্ণের পত্নী—মৃত্যু ৩রা জানুয়ারী, ১৮২৫।

৮। ডবলিউ, এ, চামার, ভাগলপুরের জজ ও ম্যাজিষ্ট্রেট—মৃত্যু ১৬ই জানুয়ারী, ১৮২৬।

৯। ক্যাপটেন্ জেমস্ রীড, বেঙ্গল নেটিভ ইন্‌ফ্যাণ্ট্রী, ১ম রেজিমেণ্ট—মৃত্যু ২৩শে নভেম্বর, ১৮২৬।

১০। ডবলিউ, এইচ, ব্রেট্—কোম্পানীর বঙ্গদেশীয় নৌবিভাগের মেট্—মৃত্যু ১৩ই আগষ্ট, ১৮২৬।

খেজুরীর সমাধিক্ষেত্রের দৃশ্য

২। কুমারী সারলটী অ্যানি—মিডলসেক্সবাসী রেভারেণ্ড টমাস্ ব্র্যাকেনের কন্যা—মৃত্যু ১২ই নভেম্বর, ১৮২০।

৩। হোর‍্যাশিও নেলসন্ ড্যালাস্, "লেডী মেল্‌ভিল্" জাহাজের পঞ্চম অফিসার—মৃত্যু ২৮শে জুলাই, ১৮২০।

৪। এমেলিয়া—দিনাজপুরের জজ ও ম্যাজিষ্ট্রেট এডওয়ার্ড ম্যাক্সওয়েলের পত্নী—মৃত্যু ২৬শে জুলাই ১৮২২।

৫। চার্লস্ রাসেল ক্রোম্‌লীন্, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্ম্মচারী—মৃত্যু ২৬শে সেপ্টেম্বর, ১৮২২।

৬। রবার্ট আলেকজাণ্ডার বেণ্টলী—কলিকাতাবাসী—মৃত্যু ২২শে নবেম্বর, ১৮২৫।

১১। জোস্ কার্টিস্ ষ্টেপলটন্—নৌবিভাগের ব্রাঞ্চ পাইলট্—মৃত্যু ১৪ই আগষ্ট, ১৮২৬।

১২। জর্জ্জ ফর্বস্, এম, ডি—অ্যাসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন—মৃত্যু ২৩শে অক্টোবর, ১৮৩৭।

১৩। ক্যাপ্‌টেন্ উইলিয়ম্ পীট্—"ফর্বস্" ষ্টীমারের অধ্যক্ষ—মৃত্যু ১৭ই জুন, ১৮৩৭।

১৪। রবার্ট পীচার—"ভ্যান্সিটার্ট" জাহাজের ১ম অফিসার—মৃত্যু ১৯শে আগষ্ট, ১৮৩৭।

১৫। জে, এইচ, বার্লো—সিভিল সার্ভিস্—মৃত্যু ১১ই সেপ্টেম্বর, ১৮৪১।

১৬। ক্যাপ্টেন জেমস্ ম্যাসন্, আমেরিকান জাহাজ "কোরিঙ্গা"—মৃত্যু ১৯শে মে, ১৮৫৩।

১৭। চার্লস্ উইলিয়মসন, মাঞ্চেষ্টরের জর্জ্জ উইলিয়মসনের পুত্র—মৃত্যু ১লা ডিসেম্বর, ১৮৫৪।

১৮। মাইকেল হোগ্যান্—"এ, বি, টমসন্" নামক অ্যামেরিক্যান জাহাজের মাষ্টার—মৃত্যু ৫ই জুলাই, ১৮৫৫।

১৯। চার্লস্ লিটন, পাইলট্ জাহাজ "ষ্যালুউইন"—মৃত্যু ২৫শে নভেম্বর, ১৮৫৮।

২০। জে, বোটেলহো, পত্নী মেরী ও পুত্র ইউজীন—৫ই অক্টোবর, ১৮৬৪।

২১। এমোস্ ওথেষ্ট, সুপারভাইজার পূর্ত্তবিভাগ—মৃত্যু ১০ই অক্টোবর, ১৮৬৫।

কতকগুলি সমাধিলিপি এতই মর্ম্মস্পর্শী যে, পাঠ করিলে অশ্রুসংবরণ করা যায় না। নির্জ্জন প্রকৃতির মুক্তাকাশের চন্দ্রাতপ নিম্নে সুষুপ্ত আত্মাগুলি অনাবিল শান্তির ক্রোড়ে শায়িত। ভাগীরথী মধুর কলসঙ্গীতে এই মহানিদ্রায় সুধাবর্ষণ করে! সাগর-স্নাত চঞ্চল সমীরণ বন্য কুসুমের সুবাস লইয়া সমাধিগুলি সুস্নিগ্ধ করিয়া তুলে! মেদিনীপুরের ঐতিহাসিক সুহৃদ্বর যোগেশচন্দ্র খেজুরীর সমাধিক্ষেত্র বর্ণনায় লিখিয়াছেন—"প্রকৃতি দেবীর স্নেহময় কোলে খাজুরীর নীরব সমাধিক্ষেত্রটি হৃদয়ে শান্তির ভাব আনয়ন করে। গম্ভীর নির্জ্জনতা এখানে দেদীপ্যমান। জনকোলাহল এখানে নীরব। পাছে মৃত ব্যক্তিদিগের শান্তির নিদ্রা ভঙ্গ হয়, সে জন্য জড়প্রকৃতিও যেন ভীত ও চকিত।"(১) এই পবিত্রতার নির্জ্জনতার মধ্যে গভীর নিশীথে জ্যোৎস্নাহাসি মুখরিত সুদূর মেঘলোক হইতে দেবদূতগণ সমাহিত আত্মাগুলির জন্য কে জানে কি সুধাই না বহিয়া আনে!

খেজুরীর সে শ্রী-সৌষ্ঠব আর নাই। যে জনপূর্ণ নগরী এক সময়ে নানা দেশীয় মানবের কোলাহলে মুখরিত হইয়া থাকিত, সুরম্য সৌধশ্রেণীতে বিভূষিত হইয়া যাহা এককালে প্রাসাদ-নগরীর সৌষ্ঠব ধারণ করিয়াছিল, আজ তাহা ভ্রষ্টশ্রী হিংস্র জন্তুপূর্ণ অরণ্যভূমি! শৃগালের বীভৎস চীৎকার ও বিহঙ্গের কলধ্বনিমাত্র তাহার নিস্পন্দ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতে বর্ত্তমান! উপর্য্যুপরি প্লাবনাদি নৈসর্গিক বিপ্লবে শ্রীসম্পদময়ী খেজুরী বিধ্বস্ত হইয়াছে।

১৭৬০ খৃষ্টাব্দে খেজুরীর নিকটস্থ নদীপথ অল্পে অল্পে অগভীর হইয়া উঠিতেছিল।(১) কিন্তু ১৮০৭ খৃষ্টাব্দের হুগলী নদীর সারভে রিপোর্টে খেজুরী নৌপথের অবস্থা উত্তম ছিল বলিয়াই জানা যায়।(২) কালক্রমে উপর্য্যুপরি ঝটিকাবর্ত্ত ও প্লাবনের আতিশয্যে খেজুরীবন্দর ধ্বংস ও নদীপ্রণালী (channel) পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। ইতিমধ্যে সাগরদ্বীপের নিকট New Anchorage বা নূতন পোতাশ্রয় গঠিত হইয়া উঠিয়াছিল। ১৮২২ খৃষ্টাব্দের কলিকাতা জেনারাল পোষ্টাফিসের একটি বিজ্ঞাপনে জানা যায়, খেজুরী হইতে ডাক-নৌকাগুলির সাগরদ্বীপ পর্য্যন্ত যাওয়া-আসা বিপজ্জনক বিবেচিত হওয়ায়, কলিকাতা হইতে সরাসরি New Anchorage পর্য্যন্ত জাহাজে ডাক আদান-প্রদানের ব্যবস্থা হইয়াছিল।(৩) সুতরাং এই সময়ের পূর্ব্বেই ভাগীরথীর খেজুরীর নিকটস্থ 'চ্যানেল্' পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল—মনে করা যায়। ইতোমধ্যে ডায়মণ্ডহারবার বন্দরে পরিণত হওয়ায়, সেখানে খেজুরীর ন্যায় শুল্কবিভাগীয় কার্য্যালয়াদি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।(৪)

১৮০৭ খৃষ্টাব্দের ১০ই মার্চ্চের ভীষণ ঝটিকায় খেজুরী-বন্দরের যথেষ্ট ক্ষতিসাধিত হইয়াছিল। তৎকালীন 'ইণ্ডিয়া গেজেটে' এই ঝটিকা সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে—"খেজুরী,

(১) শ্রীযুত যোগেশচন্দ্র বসু প্রণীত "মেদিনীপুরের ইতিহাস" ১ম খণ্ড, ৩১৩ পৃঃ।

(১) "In 1760 in consequence of the river getting worse, vessels at Kedgeree were not to draw more than 16 feet."

Long's *Selections from unpublished Record of the Govt. of India. vol, I, Introduction, p, xxviii.*

(২) "For going out or coming in of Kedgeree finds good water, not having less than 16 feet at low water spring tide." *India Gazette, Aug 13, 1807, Ibid, p. 503*

(৩) H. D. Sanderson's *Selections from Calcutta Gazette, vol, V, p, 641.*

(৪) "At Diamond Harbour the Company's ships usually unload their outward and receive the greater part of their homeward bound cargoes, from whence they proceed to Saugor roads, where the remainder is taken in."

Hamilton's *East India Gazetteer of 1815.*

খেজুরীতে ভাগীরথী-তীরে শবদাহ দৃশ্য

গ্রামবাসীরা গলা পর্য্যন্ত জলে বালক-বালিকাগুলিকে মাথায় করিয়া বালি-আড়ির দিকে আসিতেছে। এ পর্য্যন্ত এই দুর্ঘটনায় হতব্যক্তির সংখ্যা নির্ণীত হয় নাই ;—কিন্তু সমস্ত বিবরণ দৃষ্টে আমাদের মনে হয়—মৃতের সংখ্যা অত্যধিক হইবে। * * ৬০ বৎসর পূর্ব্বে একবার এইরূপ দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল বলিয়া লোকে বলিতেছে। এরূপ
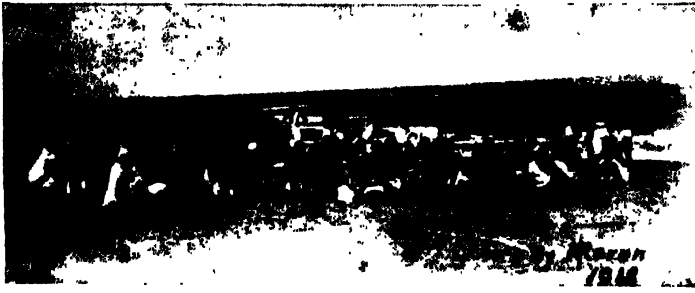
সাগরদ্বীপ ও নৌপথবর্ত্তী জাহাজাদির ক্ষতি সম্বন্ধে প্রত্যহ সংবাদ আসিতেছে। * * * ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে সংঘটিত পশ্চিম-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের ভীষণ ঝড়ের ন্যায় এই ঝড় ভয়ঙ্কর হইয়াছিল।(১) ইহার কয়েক বৎসর পরেই ১৮২৩ খৃষ্টাব্দের ২৭শে মে তারিখের ভীষণ ঝটিকাবর্ত্ত খেজুরী পোতাশ্রয়ের সর্ব্বনাশ সাধন করে। এই ঝটিকা-প্রসঙ্গে 'কলিকাতা গেজেটে' প্রকাশিত বিবরণের কিয়দংশ উদ্ধৃত হইতেছে ;—

"গত ২৭শে তারিখের রজনীতে এক অতি ভীষণ ঝটিকাবর্ত্ত নিকটবর্ত্তী ৬৭ মাইল স্থান আচ্ছন্ন করিয়া খেজুরী উপকূলের বিলক্ষণ ক্ষতি সাধিত করিয়াছে। নদী কিংবা বৃষ্টির জল দ্বারা এই প্লাবন ঘটিয়াছে—আমরা তাহা জানিতে পারি নাই ;—কিন্তু এই স্থানের নিম্নাবস্থানের বিষয় ভাবিয়া আমাদের মনে হয়, এই অনিষ্টের পূরণ হইতে বহুদিন লাগিবে। আমরা গভীর দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে—কেবলমাত্র এই দুর্ঘটনাই ঘটে নাই। নদীবক্ষে যে পরিমাণ ক্ষতি সংঘটিত হইয়াছে—তাহা উপকূল অপেক্ষাও ভয়ঙ্কর এবং দুর্ভাগ্যবশতঃ অপেক্ষাকৃত অল্প প্রতীকারসাধ্য ! * * রাত্রির অন্ধকারে ক্ষতির পরিমাণ নির্ণয় করা যায় নাই ;—প্রভাত হইলে হৃদয়বিদারক দৃশ্য দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল ! দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিম—যত দূর দৃষ্টি যায়, সমুদায় দেশ সলিলগর্ভে নিহিত !

(১) *India Gazette, Aug. 13. Tuesday, 1807.* Seton Ker's *Calcutta Gazette, Selections. vol, IV p. 177,*

ভীষণ ঝড় সংবাদদাতা কখনও দেখেন নাই,—অথবা অতি প্রাচীন লোকেও এরূপ ঝড়ের কথা স্মরণ করিতে পারে নাই। খেজুরী উপকূল সম্বন্ধে সংবাদদাতার বর্ণনা প্রকৃতই বিষাদজনক। জাহাজের ধ্বংসাবশেষে নদীতীর পরিপূর্ণ ! সংবাদদাতার ভাষায় বলিতে গেলে বলা যায়,—সেখানে জাহাজের যে কোনও অংশ—অতিকায় মাস্তুল হইতে ক্ষুদ্র পেরেক পর্য্যন্ত দৃষ্টিপথে পতিত হইবে। সমুদ্রজলের প্লাবন সম্বন্ধে এই কথা বলিলে যথেষ্ট হইবে যে, ক্যাপ্টেন রৌসন্ সমুদ্রের সীমা হইতে বহুদূরে একটি পুষ্করিণীতে স্নান করিতে গিয়াছিলেন—তাহার জল বঙ্গোপসাগরের জলের ন্যায় তুল্য লবণাক্ত !"(১) এই ঝটিকায় নিকটবর্ত্তী জাহাজ পরিচালন পথের সমুদায় 'বয়া' (Buoy) নষ্ট হইয়াছিল এবং মরিশস্‌গামী "লিভারপুল", দক্ষিণ-আমেরিকাগামী "হেলেন্", "ওরাক্যাবেসা", কটকযাত্রী "কটক" প্রভৃতি বৃহৎ ও ক্ষুদ্র জাহাজগুলি খেজুরীর নিকট চরে আহত হইয়া ধ্বংস হয়।

অতঃপর ১৮৩১ ও ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের ভীষণ বন্যার প্লাবন

(১) Sanderson's *Calcutta Gazette selections vol V, pp. 43-47.*

শবদাহের অপর দৃশ্য

খেজুরীর দুরবস্থা বর্দ্ধিত করে। শেষোক্ত বর্ষের বন্যায় নদী ও সমুদ্রোপকূল বিধ্বস্ত হইয়াছিল; জলমগ্ন হইয়া বহু মনুষ্য ও গবাদি প্রাণত্যাগ করিয়াছিল। এই জীব ও জনপদ-ধ্বংসকারী ভীষণ বন্যার বিবরণ মিঃ বেলীর সেটেলমেণ্ট বিবরণীতে আছে। এ দেশে ইহাকে "চব্বিশ সালের লোণা ছয় লাপি" বলে। বেলীর মতে এই দুর্ব্বিপাকে এতদঞ্চলের একচতুর্থাংশ মাত্র লোক জীবিত ছিল। ইহার জলপ্রবাহের ভীষণ তরঙ্গাঘাত সমুদ্রবেষ্টক উচ্চ বাঁধ ও স্বতঃসৃষ্ট বালিআড়িগুলি সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত করিয়াছিল।(১)

১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের সেটেলমেণ্টের কাগজপত্র দৃষ্টিগোচর করিলে খেজুরীর তৎপূর্ব্বেই ধ্বংসমুখে পতিত হইবার বিষয় অবগত হওয়া যায়। জরিপি চিঠায় (২) কয়েক বিঘা জমী পূর্ব্বের আফিস-গৃহ ও বর্ত্তমান বালুচর বলিয়া জরিপ আছে। এই চিঠায় তৎকালীন অবশিষ্ট খেজুরীবাজারের ১৯খানি দোকান এবং ২৬ জন বারবনিতার বাসগৃহের পরিচয় পাওয়া যায়, ৮ জন সারঙ্গের (Serang) ঘর-বাড়ী জরিপ আছে। শুল্কবিভাগের গৃহ, খেজুরী থানা, গবর্ণমেণ্টের কয়েকটি 'আটচালা', বাবুর্চ্চিখানা, বাগিচা, গোরস্থান, 'বাউটা'মঞ্চ (Signal mast), সরকারের কয়েকটি 'কুঠি' প্রভৃতি এই জরিপি চিঠায় স্থান পাইয়াছে। "মিঃ এন, এন, বোস সাহেব" সম্ভবতঃ ঐ সময়ে খেজুরীর পোর্ট ও পোষ্টমাষ্টার ছিলেন; শঙ্কর বাবুর্চ্চি, খেউরু খানসামা প্রভৃতি ইঁহারই পরিচারক ছিল বলিয়া বোধ হয়—চিঠায় এই সমস্ত নাম স্থান পাইয়াছে। "হিউম সাহেবের বিবি"র নামে কিছু জমীর জরিপ দেখা যায়; সম্ভবতঃ ইনিই তৎসময়ে খেজুরীর শেষ ইংরাজ বাসিন্দা। অন্য কোনও ইংরাজ অধিবাসীর নাম চিঠায় নাই। সুতরাং য়ুরোপীয়ান্ পল্লীটি ইতঃপূর্ব্বেই ভাগীরথী ধ্বংস করিয়াছিল। খেজুরী বন্দর ও বাজারের তখন বেশ নিষ্প্রভ অবস্থা সিদ্ধান্ত করা যায়। মিঃ বেলী লিখিত ঐ সময়ের সেটেলমেণ্ট রিপোর্টে জানা যায়, খেজুরীতে শুল্কবিভাগের জন্য পাঁচটি কক্ষবিশিষ্ট একটি কাঁচা বাংলো এবং পোষ্টমাষ্টার ও তাঁহার সহকারিগণের জন্য দুইটি ইষ্টকালয় ছিল। বোধ হয় এই দুইটিই এখনও বর্ত্তমান। ইহা ছাড়া খেজুরীর অধিবাসীদিগের সাতখানি ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহের উল্লেখ আছে। খেজুরী থানা খেজুরী বন্দরের নিকটেই অবস্থিত ছিল। (১) উহাতে এক জন দারোগা, এক জন জমাদার ও ছয় জন বরকন্দাজ অবস্থান করিত। বর্ত্তমান খেজুরী থানার ন্যায় ইহা সুবিস্তৃত ছিল না। ইহার অধীনে কেবলমাত্র খেজুরী, সাহেবনগর, আলিচক, বামনচক ও ভাঙ্গনমারি এই কয়খানি গ্রাম ছিল। বর্ত্তমান খেজুরী থানাভুক্ত অন্যান্য শতাধিক গ্রাম "হাঁড়িয়া কাঞ্চননগর" থানার এলাকাভুক্ত ছিল। খেজুরীর ব্যবসায় দ্রব্যের মধ্যে স্থানীয় মুসলমানগণ টাট্‌কা মাংস, মুরগী ও ফল, শাক-শব্জী জাহাজে লইয়া বিক্রয় করিত।(২)

তাহার পর ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের বন্যা। ভাগীরথী এত ক ল ধরিয়া গর্ভসাৎ করিতে করিতে খেজুরীর যাহা বাকী রাখিয়াছিলেন,—এই নির্ম্মম ঝটিকাবর্ত্ত তাহা নিশ্চিহ্ন করিয়াছে। ইহাই এ দেশে প্রসিদ্ধ 'বায়াত্তর সালের বন্যা'। এই বন্যায় সমুদ্রজলপ্রবাহ তীরবর্ত্তী সমুচ্চ বাঁধের উর্দ্ধে প্রায় সার্দ্ধ চারি হস্ত উচ্চে উচ্ছ্বসিত হইয়া সমগ্র দেশ প্লাবিত করিয়াছিল। ঐতিহাসিক হাণ্টার এই বন্যার বিস্তৃত হৃদয়বিদারক বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন।(৩) তখন খেজুরীর সৌভাগ্য-সূর্য্য প্রায় অস্তগামী, দুই একটি কীর্ত্তি যাহা অবশেষ ছিল, এই নৈসর্গিক বিপ্লবে তাহার অবসান হয়। এই প্রদেশবাসী প্রায় বারো আনা লোক এই বন্যায় প্রাণত্যাগ করে। মৃত্যু সংখ্যার ভীষণতা সম্বন্ধে একটি দৃষ্টান্ত দিলে যথেষ্ট হইবে যে, এতদঞ্চলের একটি দায়রা সোপর্দ্দ ডাকাতী মোকর্দ্দমায় ৩২ জন সাক্ষী ছিল, কিন্তু বন্যার পর তাহাদিগের মধ্যে দুই জনকে মাত্র জীবিত পাওয়া গিয়াছিল! এই বন্যার জলস্রোতের বেগে খেজুরীর সামুদ্রিক বাঁধ (Embankment) ভগ্ন হইয়া এক স্থানে জলপ্রপাতের ন্যায় জল পড়িয়া একটি সুগভীর হ্রদের সৃষ্টি হইয়াছিল,—তাহা এখনও বর্ত্তমান।

(১) Bayley's *Majnamutha Settlement Report, 1844, p 98.*

(২) ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দের ১৯শে মার্চ্চ হইতে ২৯শে এপ্রিল পর্য্যন্ত মিঃ চার্লস্ পিটার হোয়াইট ডেপুটী কালেক্টরের অধীনে খেজুরী জরীপ হইয়া চিঠা প্রস্তুত হয়। উক্ত চিঠা মেদিনীপুর কালেক্টরীতে রক্ষিত আছে।

(১) বর্ত্তমান খেজুরী থানা ৩ মাইল দূরবর্ত্তী জনকা গ্রামে অবস্থিত।

(২) Bayley's *Majnamutha Report, 1844, pp, 96-105.*

(৩) Hunter's *S. A B. vol III, pp. 200-227.*

খেজুরী বন্দরের য়ুরোপীয়ান বসতির সুরম্য হর্ম্ম্যগুলি নিশ্চিহ্নরূপে লুপ্ত হইয়াছে। এক্ষণে এই স্থান দেখিয়া কেহই ধারণা করিতে পারিবেন না যে, ইহা এক সময়ে এত সমৃদ্ধিপূর্ণ ছিল। য়ুরোপীয়দিগের বাস-সংস্রবের চিহ্নস্বরূপ এই স্থানটির 'সাহেবনগর' আখ্যা বর্ত্তমান আছে মাত্র। 'সাহেব নগর' এক্ষণে কৃষকের হলকর্ষিত ভূমিমাত্র! প্রাচীন স্মৃতির শেষ নিদর্শনস্বরূপ দুইটি ইষ্টকালয় এখনও বর্ত্তমান। একটি পোষ্ট আফিস ভবন ;—অল্প দিন হইল খেজুরী পোষ্ট আফিসটিও ঐ স্থান হইতে লোকালয়ে স্থানান্তরিত হইয়াছে। এই সুন্দর বাটীখানি গবর্ণমেণ্ট বিক্রয়েচ্ছু হইয়াছেন। সংস্কারের অভাবে গৃহটি জীর্ণ হইয়া পড়িতেছে। অন্যটিতে পূর্ত্ত বিভাগীয় কর্ম্মচারী অবস্থান করেন এবং ইহার এ কাংশ ডাক-বাংলোরূপে ব্যবহৃত হয়। পোষ্ট আফিসগৃহের ঠিক সম্মুখেই 'বাউটা' প্রদানের মাস্তলদণ্ড (Signal mast) ছিল। তাহার কর্ত্তিত তলদেশ ও সোপানযুক্ত মঞ্চ এখনও বর্ত্তমান। ঐ স্থানে একটি কামান ও কামানবাহী লৌহশকট আছে। কামানটিতে ১৭৯৮ খৃঃ ক্ষোদিত আছে। ইহা সঙ্কেতের (Signalling) জন্য ব্যবহৃত হইত। 'বাউটা' মঞ্চের প্রাঙ্গণে তিনটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কামান একত্র প্রোথিত দেখা যায়। বন্দরের হিন্দুকর্ম্মচারী ও ডাক-নৌকার হিন্দু নাবিকগণ যেখানে মহোৎসবে ৺গঙ্গাপূজা করিত,—সেই বিস্তীর্ণ প্রান্তর এখনও "গঙ্গাপূজার বাড়ী"রূপে বর্ত্তমান। মুসলমান লস্করর প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সুসজ্জিত 'তাজিয়া' লইয়া ভাঙ্গনমারির 'কারবেলা' ময়দানে বিপুলোল্লাসে 'মহরম' নিষ্পন্ন করিত। খেজুরীর 'বালুবস্তি' নামক পল্লী নানা প্রদেশবাসী জাহাজের মুসলমান লস্করদিগের উপনিবেশ; এখনও তাহাদের কতকগুলি বংশধর জাহাজে কার্য্য করিয়া থাকে। খেজুরী বাজারের আর অস্তিত্ব নাই; তাহা এখন ভাগীরথীর কুক্ষিগত। যেখানে হাট বসিত, তাহা এক্ষণে নিবিড় অরণ্য! মানবের হাট ভাঙ্গিয়া অহি-নকুল-শৃগালের আস্তানা হইয়াছে! এখানে আসিলে কবির এই উক্তি মনে পড়ে,—
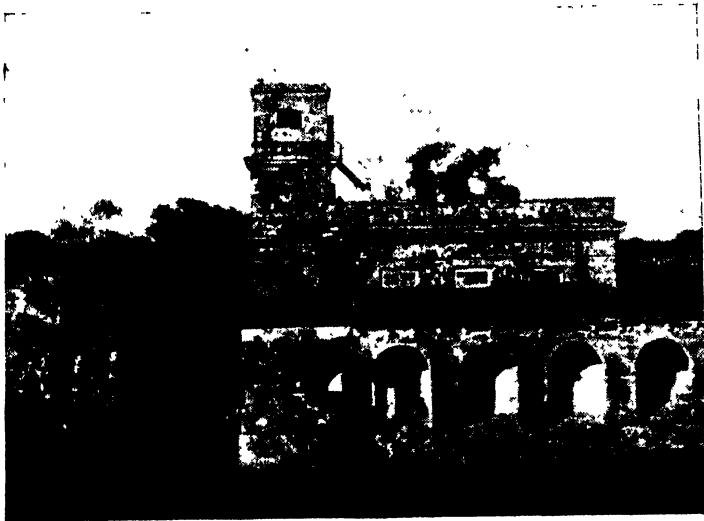
"Amidst these lovely regions
* * nature dwells
In awful solitude, and nought is seen
But the wild herds that
own no master's stall."

খেজুরীর পরিত্যক্ত পোষ্ট আফিস—(নদীতীরবর্ত্তী এই বাড়ীটি গভর্ণমেণ্ট বিক্রয় করিবেন)

খেজুরীতে "হালাম শাহের দীঘি" নামক একটি প্রকাণ্ড আয়তন বিশুষ্ক সরোবর বর্ত্তমান। ইহার কোনও ইতিহাস পাওয়া যায় না। এই দীঘি "হালাম শাহ" নামক কোন ব্যক্তির খনিত, কি ইহার নাম "আলম্‌সায়র" (সাগর) দীঘি, তাহা ঐতিহাসিকগণের আলোচ্য। বঙ্গ-জননী-মন্দিরের অর্ণব-তোরণে সতর্ক প্রহরিরূপে কাউখালির সমুচ্চ আলোকস্তম্ভ খেজুরীর সীমান্তদেশে দণ্ডায়মান আছে। এই আলোক-গৃহ—ইহার নির্ম্মাণের সময় ১৮১০ খৃষ্টাব্দ—হইতে এতাবৎ আলোক প্রদান করিয়া বর্ত্তমান বর্ষে নদী-প্রণালীর (channel) পরিবর্ত্তনের জন্য অনাবশ্যক ও অব্যবহার্য্যবোধে পরিত্যক্ত হইয়াছে। অদূরেই বিশ্রুতনামা হিজলীর নবাব তাজ খাঁ মসনদ্-ই-আলীর সংস্থাপিত মসজিদ—বঙ্গোপসাগরের ভীষণ তরঙ্গাভিঘাত উপেক্ষা করিয়া সগর্ব্বে স্থাপয়িতার কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে।

জব চার্ণকের আশ্রয়লাভের সময় (১৬৮৭ খৃঃ) হিজলী ভীষণ ম্যালেরিয়াপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। হিজলীতে গিয়া ম্যালেরিয়ার কবল হইতে অক্ষত শরীর ও সতেজ প্রাণ লইয়া প্রত্যাবর্তনের অসম্ভবতা একটি দেশীয় প্রবাদের সৃষ্টি করিয়াছিল। (১) একই স্থানে অবস্থিত খেজুরীর তদানীন্তন স্বাস্থ্য সম্বন্ধেও এই কথাই প্রযোজ্য কল্পনা করা যাইতে পারে। হিজলী ও খেজুরী তখন পর্ত্তুগীজ ও মগ অত্যাচারে জন-মানবহীন অরণ্যে পর্য্যবসিত হইয়াছিল, লোক-চেষ্টার অভাবে তীর-বর্ত্তী বেষ্টন-বাঁধ ইত্যাদি ভগ্ন হইয়া স্থানটি জোয়ার-প্লাবনের নিত্য লীলাক্ষেত্ররূপে সদাসর্ব্বদা আদ্র থাকিত, সুতরাং ইহার জলবায়ু স্বাস্থ্যপ্রদ ছিল না। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে খেজুরীর সুখ-সৌভাগ্যের দিনে বহু ইংরাজ স্বাস্থ্যলাভার্থ খেজুরীতে আসিয়া বাস করিতেন, দুই একটি সমাধি-লিপিতে ইহার পরিচয় পাওয়া যায়। অতঃপর লবণ-ব্যবসায়ের বিস্তৃতির জন্য খেজুরী পুনরায় অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠে। বর্ত্তমান 'জলপাই' (২) বলিয়া কথিত সমুদ্রতীরবর্ত্তী জমীগুলিতে সমুদ্রের লবণাক্ত জল জোয়ারের দ্বারা প্রবিষ্ট করাইয়া আটক রাখা হইত। ঐ জলের লবণাক্ত পলিমৃত্তিকার পরিস্রবণ দ্বারা লবণ প্রস্তুত হইত। এই বদ্ধজল পচিয়া দূষিত বাষ্পের দ্বারা অস্বাস্থ্যের বীজ ছড়াইত। মিঃ বেলী তাঁহার ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের সেটেলমেণ্ট রিপোর্টে এখানকার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—এ দেশের জলবায়ু দেশীয়দিগের উপযোগী হইলেও বিদেশী ব্যক্তির পক্ষে মহা অনিষ্টজনক ছিল। লবণ প্রস্তুতের জমীগুলি হইতে নিঃসৃত দূষিত বাষ্পই ইহার কারণ বলিয়া তিনি অনুমান করেন। (১) যাহা হউক, কালক্রমে লবণ প্রস্তুতের কারখানা উঠিয়া যাওয়ায় এবং জঙ্গলাদি পরিষ্কৃত হইয়া জন-নিবাস বর্দ্ধিত হওয়ায় খেজুরী এখন স্বাস্থ্য-সম্পদে ভরিয়া উঠিয়াছে। এককালে ম্যালেরিয়ার আবাসস্থল বলিয়া নিন্দিত খেজুরী আজ ম্যালেরিয়া-পীড়িতের আশ্রয়স্থল হইয়া উঠিয়াছে। সমুদ্র-স্নাত স্নিগ্ধ সমীরণ নিদাঘের প্রচণ্ড উষ্ণতাকেও বসন্তের দিবসগুলির ন্যায় মধুর করিয়া রাখে। প্রায় তিন বৎসর পূর্ব্বে পূজ্যপাদ লেপ্টনাণ্ট কর্ণেল শ্রীযুত উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্-ডি, আই, এম্, এস, (অবসরপ্রাপ্ত) মহোদয় এই দীন লেখকের সহিত পরিচয়সূত্রে খেজুরীতে গ্রীষ্ম-যাপন করিয়াছিলেন। এই স্থানের জলবায়ু তাঁহার নিকট এতই উৎকৃষ্ট ও প্রীতিপ্রদ বোধ হইয়াছিল যে, তিনি বলিয়াছিলেন,—এই স্থান ভারতবর্ষের বিখ্যাত স্বাস্থ্যকর স্থানগুলির মধ্যে অন্যতম গণ্য হইবার দাবী রাখে। এরূপ সুলভ (২) ও শান্তিপূর্ণ জীবনযাত্রা তাঁহার মতে অন্য কোনও স্বাস্থ্যকর স্থানে সম্ভব নহে। তিনি এই স্থান ওয়াল্টেয়ার অপেক্ষাও কোন কোন বিষয়ে অধিকতর স্বাস্থ্য
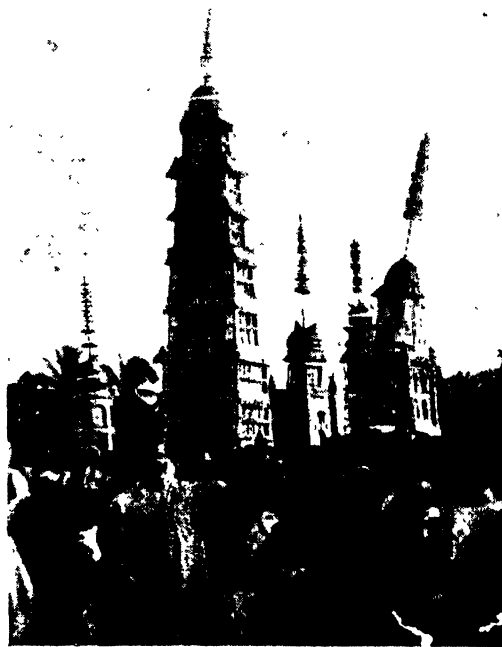
খেজুরীর মহরমের মিছিল

(১) "So fatally malarious was the spot that the difference between going to Hijili and returning thence passed into a Hindustani proverb."

Wilson's *Early Annals, vol I, p, 165.*

c/f also Hunter's *History of British India*—"Yet so unhealthy that it had passed into a native proverb, it is one thing to go to Hijili but quite another to come back alive"

(২) "The Jalpai lands, it may be explained. were lands which being exposed to the overflow of tidal water, were strongly impregnated with saline matter."

Midnapore Gazeteer p, 104.

(১) Bayley's *Majnamutah Report 1844, p, 104.*

(২) খেজুরীতে বিশুদ্ধ খাঁটি দুধের সের /১০ হইতে ৶০ আনা। তরিতরকারীও দুর্ম্মূল্য নহে। চাউলও সস্তা।

মনে করিয়াছিলেন। এমন কি, তিনি অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, তাঁহার বার্দ্ধক্যাবস্থা না হইলে তিনি এখানে গৃহনির্ম্মাণ করিয়া স্থায়ী গ্রীষ্মাবাস করিতেন। যাতায়াতের অসুবিধাই এই সুস্বাস্থ্যপূর্ণ স্থানকে লোক-লোচনের অন্তরালে রাখিয়াছে। আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি, বহুদিনের ম্যালেরিয়া-পীড়িত অনেক জীর্ণ রোগী দৈবাৎ বা কর্ম্মোপলক্ষে এই স্থানে আসিয়া স্বাস্থ্য ও লাবণ্য লইয়া প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছেন। ম্যালেরিয়া-পীড়িত বঙ্গবাসী পুরী-ওয়াল্টেয়ার-দার্জ্জিলিং-মধুপুর ঘুরপাক খাইতেছেন, কিন্তু গৃহের কোণে কলিকাতা হইতে অদূরবর্ত্তী—ডায়মণ্ড-হারবার হইতে নৌকাযোগে অনুকূল বাতাসে মাত্র দুই ঘণ্টার পথ খেজুরীর তৃপ্তিপ্রদ জলবায়ুর রোগনাশক শক্তির পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন কি? *

শ্রীমহেন্দ্রনাথ করণ।

* এই প্রবন্ধের কতকগুলি ফটোগ্রাফ শ্রীনগেন্দ্রনাথ জানা কর্তৃক প্রদত্ত।

স্বামী বিবেকানন্দ

যে দিন আসিলে তুমি এ ধরার ধূলার প্রাঙ্গণে,
হে সন্ন্যাসী বীর,
বিধাতা আঁকিয়া দিল স্বহস্তে তোমার শুভ্র ভালে
দীপ্ত রাজ-টীকা জয়শ্রীর!
সে দিন এ বঙ্গদেশ কল্পনাও করেনি কখনো
কি মহান্ সুরে—
বাজিবে ধর্ম্মের ভেরী ঋষির উদার-কণ্ঠে
দুঃখ-ক্লিষ্ট এ জগৎ জুড়ে!
যৌবন আনিল তব তীব্র এক অশান্ত পিপাসা
শুধু তাঁর লাগি—
যার তরে দিবানিশি কেঁদে কেঁদে খুঁজিয়া বেড়ায়
কত সাধু, ত্যাগী ও বৈরাগী।
দৃপ্ত মন অহঙ্কারে ছুটিল জ্ঞানের পথ ধরি'
উন্মাদ হইয়া,
যে তৃষা পীড়িছে তারে, ভাবিল, মিটাবে সেই তৃষা
জ্ঞান-বারিধির বারি পিয়া!
জ্ঞানের জটিল পথে পথহারা হয়ে গেলে তুমি,
হে বিবেক-স্বামী,—
রুদ্ধ হৃদয়ের তব যত সব অশান্ত ক্রন্দন
শুনিলেন নিজে অন্তর্য্যামী!
মুক্ত-জ্ঞান সৌম্য শান্ত নিঃস্ব এক পূজারী ব্রাহ্মণ
দিল সে বারতা—
সংশয়-তিমির নাশি' আলোকিয়া মানস-জগৎ
দেখা তোমা দিলা জগন্মাতা!
তার পরে কাটাইলে কত মাস, বরষ কত না
ফিরি দেশে দেশে,
গৈরিক বসন পরি' যষ্টিখানি হাতে লয়ে শুধু
অন্তরে মাগিয়া পরমেশে!
পাশ্চাত্য সভ্যতা-মোহে মুগ্ধ এই অধ্যাত্ম ভারতে
করিলে প্রচার—
"ভগবান্ শ্রেষ্ঠ সত্য, হে ভারত, কেন ভোলো আজ
সনাতন সত্য সারাৎসার!"

অন্তরে প্রেরণা পেয়ে সিন্ধুপারে পাশ্চাত্য প্রদেশে
করিয়া প্রয়াণ,
ধর্ম্ম মহাসভামাঝে ভারতের প্রতিনিধিরূপে—
গাহিলে আত্মার জয় গান!
হৃদে বসি' হৃষীকেশ বাণী নিজে তব কণ্ঠে থাকি'
দিলা তোমা সুর,
নির্ব্বাক বিস্ময়ে স্তব্ধ হ'ল শুনি প্রতীচীর লোকে
সেই গীত কিবা সুমধুর!
সনাতন হিন্দুধর্ম্ম প্রচারিয়া ভারতে ফিরিলে
ভারতের ধন,
ভারতবাসীর নাম সমুজ্জ্বল হইল জগতে
শান্তিবার্ত্তা শুনিল ভুবন!
পরাধীন ভারতেরে রত হেরি পরানুসরণে,
হইয়া ব্যথিত,
তব দেব-কণ্ঠ হ'তে তেজোদীপ্ত দিব্য বাণী
হইলা স্ফুরিত—
"পর-অনুবাদে তব কভু মুক্তি নাই, হে ভারত!
ক্লৈব্য ত্যাগ কর,
তোমার আদর্শ নারী, পূজ্যা সীতা, দময়ন্তী, সতী
সর্ব্বত্যাগী আদর্শ শঙ্কর!"
মোহনিদ্রা দূরে গেল,— ভারত শুনিল এই
অপূর্ব্ব বারতা,
আত্মান্বেষী হয়ে পুন দীক্ষা নিল তব পাশে
নব-ভারতের জন্মদাতা!
তোমার প্রদত্ত মন্ত্র সেই হ'তে জপিছে ভারত
হে বিশ্ব-প্রেমিক,
শিক্ষা দিয়ে, সেবা দিয়ে, প্রেম দিয়ে ভরিলে স্বদেশে
মূর্ত্তিমান ত্যাগের প্রতীক!
রোগে-শোকে দুঃখে-তাপে তপ্ত-ক্লান্ত অভাগিনী ধরা,—
তোমা বুকে ধরি'
জুড়াইল বুক তার, স্নিগ্ধ হ'ল প্রতি ধূলিকণা
ঋষি-হস্তে লভি' শান্তি-বারি!

শ্রীচণ্ডীদাস মুখোপাধ্যায়।

কাশ্মীরের মহারাজা

২
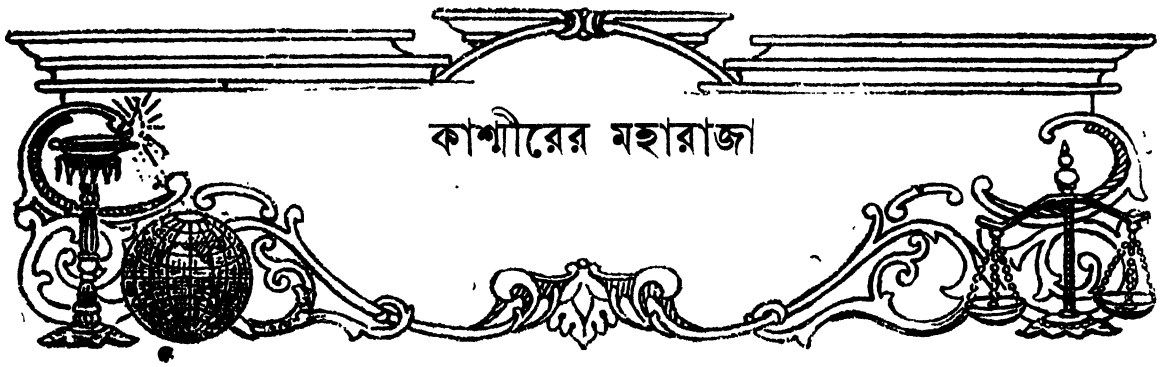
মহারাজা প্রতাপসিংহের বিরুদ্ধে যে সকল অভিযোগ উপস্থাপিত করা হইয়াছিল, আমরা এখন সে সকলের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

মহারাজার বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ, তিনি চরিত্রহীন। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, প্রতাপসিংহ যৌবনে কুপথগামী হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাকে সুশিক্ষিত করিবার জন্য তাঁহার পিতা যে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা সর্ব্বতোভাবে ব্যর্থ হয় নাই; বিশেষ পিতার মৃত্যুর পূর্ব্বেই তিনি সংযত হইয়াছিলেন এবং রাজ্যভার গ্রহণ করিয়াই সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত-চরিত্র হয়েন। তাঁহার চরিত্রহীনতার কোন কথা রাজ্যে উঠে নাই। কেবল তাহাই নহে, চরিত্রহীনতা রাজ্যে কুশাসনের কারণ না হইলে ইংরাজরাজ কোন দেশীয় রাজ্যে রাজাকে রাজ্যচ্যুত করেন নাই। বর্ত্তমান সময়েও কোন কোন দেশীয় রাজার সম্বন্ধে চরিত্রগত নানা কুৎসা-কথা ইংরাজের আদালতে আলোচিত হইলেও, ইংরাজরাজ তাঁহার সম্বন্ধে কোন দ্রুত ব্যবস্থাই করেন নাই। বিলাতের কোন কোন রাজার চরিত্রদোষ ইতিহাস-প্রসিদ্ধ। কিন্তু সে জন্য বিলাতের প্রজারা কি তাঁহাদিগকে রাজ্যচ্যুত করিয়াছে?

কাশ্মীরের বর্ত্তমান মহারাজা হরি সিংহ

দ্বিতীয় অভিযোগ—তিনি কাশ্মীরে কুশাসন প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন ও পরিচালিত করিতেছেন। আমরা ইতঃপূর্ব্বে তাঁহার শাসন-সংস্কারপ্রীতি সম্বন্ধে যে সকল কথা বলিয়াছি, তাহাতে কি মনে হয়, প্রতাপ সিংহ রাজা হইয়া কাশ্মীরে কুশাসন প্রবর্ত্তিত ও পরিচালিত করিয়াছিলেন?

রাজ্যলাভের সঙ্গে সঙ্গে তিনি যে ঘোষণা করেন, তাহাতেই তিনি কতকগুলি অনাচারদ্যোতক শুল্ক বর্জ্জন করেন। ফলে রাজস্ব কমিয়া যাইলেও প্রজার কল্যাণ সাধিত হয়। ইতঃপূর্ব্বে আমরা মিষ্টার প্ল্যাউডেনের জিদে মিষ্টার উইংগেট নামক এক জন কর্ম্মচারীকে কাশ্মীরে জমাবন্দীর জন্য নিযুক্ত করার কথা বলিয়াছি। এরূপ মনে করা অসঙ্গত নহে যে, মিষ্টার উইংগেট কাশ্মীরের ব্যবস্থায় ত্রুটি নির্দ্দেশ করিবার উদ্দেশ্যেই নিযুক্ত হইয়াছিলেন। সেই মিষ্টার উইংগেট ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের ১লা আগষ্ট তারিখে মহারাজার বরাবর জরিপ-জমাবন্দী সম্বন্ধে যে রিপোর্ট পেশ করেন, তাহাতে মহারাজার কাছে স্বীকার করিয়াছিলেন—"আ প না র সহিত সাক্ষাতের ফলে আমার বিশ্বাস জন্মিয়াছে, দরিদ্রের প্রতি আপনি সর্ব্বদাই সহানুভূতিশীল, আপনি ভূমি-সংক্রান্ত সমস্যায় মনোযোগী এবং সর্ব্বোপরি আপনি রাজকর্ম্মচারীদিগের অনাচার হইতে কৃষককুলকে রক্ষা করিতে কৃতসঙ্কল্প।" * যাহার সম্বন্ধে ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে এই কথা বলা হইয়াছিল, ৮ মাস যাইতে না যাইতেই যে তাঁহাকে কুশাসনের প্রবর্ত্তক ও পরিচালক বলিয়া রাজ্যশাসনভারচ্যুত করা হয়, ইহা কি বিস্ময়ের বিষয় নহে?

মিষ্টার ডিগবী তাঁহার কাশ্মীর সম্বন্ধীয় পুস্তকে লিখিয়াছিলেন, মিষ্টার উইংগেটের অনুমান, কাশ্মীরে জনসংখ্যার

* Para 71

হ্রাস হইয়াছে। কাশ্মীরের সম্বন্ধে ইহা অনুমান মাত্র হইলেও বৃটিশ-শাসিত ভারতে কোন কোন জিলায় ২ বৎসরে জনসংখ্যা শতকরা ৩৩ জন হিসাবে কমিয়াছে। সুতরাং ইংরাজের পক্ষে জনসংখ্যা হ্রাসের কথা তুলিয়া কাশ্মীরে কুশাসনের অভিযোগ উপস্থাপিত করা শোভা পায় না। ঊনবিংশ শতাব্দীতে কাশ্মীরে মাত্র ২ বার দুর্ভিক্ষ প্রবলভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, আর বৃটিশ-শাসিত ভারতবর্ষে ১৮ বৎসরে ২ কোটি লোক অনাহারে

হ্রদ

প্রাণত্যাগ করিয়াছে। তাহার পর কথা—কাশ্মীরে ভূমিকর অধিক হওয়ায় কৃষকদিগের পক্ষে তাহা প্রদান কষ্টসাধ্য। এই অপবাধে যদি রাজাকে রাজ্যচ্যুত করা সঙ্গত হয়, তবে ভারতে ইংরাজ সরকারের সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য? ভারত সরকারের কর্ম্মচারী সার চার্লস এলিয়ট স্বীকার করিয়াছেন—"আমি নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি, আমাদের কৃষক দিগের অর্দ্ধাংশ সমগ্র বৎসরে কখন উদর পূরিয়া আহার করিতে পায় না।" কাশ্মীরে কখন এমন ব্যাপার ঘটে নাই। কর্ণেল ম্যালিসন বলিয়াছেন—"বিলাতের আদর্শ ধরিলে অযোধ্যা প্রদেশে কখন সুশাসন হয় নাই।" * ভারতে দুর্ভিক্ষ কমিশনের অন্যতম সদস্য সার হেনরী ক্যানিংহাম বলিয়াছেন, ইংরাজ-শাসিত ভারতে ঝান্সীতে অধিবাসীরা ঋণভারগ্রস্ত ও সর্ব্বস্বান্ত—তাহার কারণ :—

(১) সিপাহী-বিদ্রোহের সময় অযোধ্যায় সরকার প্রজার নিকট হইতে কর আদায় করিয়া লইলে ইংরাজ সরকার প্রজাকে পুনরায় সেই কর দিতে বাধ্য করিয়াছিলেন।

(২) ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে অজন্মা হয়। পরবৎসরও ভাল শস্য না হওয়ায় গবাদি পশুর এক-চতুর্থাংশ মরিয়া যায় এবং দরিদ্র অধিবাসীরা হয় অনাহারে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, নহে ত গোয়ালিয়রে বা মালোয়ায় চলিয়া যায়। এই অবস্থায় ইংরাজ রাজকর্ম্মচারীরা কড়া তাগাদা দিয়া খাজনা আদায় করায় প্রজারা চড়া সুদে টাকা ধার করিয়া মহাজনের জালে পড়ে। বৃটিশ সরকারের আদালতে মহাজনদিগের পক্ষই সমর্থিত হয়; এই কাযের ফলে ও দুর্ভিক্ষে লোকের দারিদ্র্য অতি ভীষণ হইয়া উঠিয়াছে।

* Histroy of the Indian Meutiny.

মহারাজা প্রতাপসিংহের শাসনে কাশ্মীরে কখন এরূপ ব্যাপার হইয়াছে, প্রমাণিত হয় নাই।

মহারাজার বিরুদ্ধে তৃতীয় অভিযোগ—তিনি অমিতব্যয়ী। সরকার বলেন, "রাজ্যের রাজস্ব-ব্যাপার বিশৃঙ্খল"—সে বিশৃঙ্খলা "আপনার অমিতব্যয়িতায় বর্দ্ধিত হইয়াছে"; কারণ, "আপনি অত্যন্ত বেহিসাবীভাবে রাজ্যের রাজস্ব ব্যয় করিয়াছেন।"

এ কথা যদি সত্য হইত যে, কাশ্মীরের রাজকোষ শূন্য হইয়াছিল, তবে সে জন্য মহারাজার সঙ্গে সঙ্গে ভারত সরকারেরও লজ্জিত হইবার বিশেষ কারণ ছিল। কারণ, সেই অবস্থাতেও ভারত সরকারের জন্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মহারাজাকে অনেক টাকা ব্যয় করিতে হইয়াছিল।

আমরা প্রথমে মহারাজার অমিতব্যয়িতার বিষয় আলোচনা করিব। যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু সে সম্বন্ধে বলিয়াছেন :—

"মহারাজার বিরুদ্ধে এই অভিযোগে যদি বুঝিতে হয়, তিনি রাজস্বের অপব্যয় করিয়াছিলেন, তবে সে অভিযোগ সর্ব্বতোভাবে ভিত্তিহীন। রাজস্ব সম্বন্ধে অমিতব্যয়ী হওয়া ত পরের কথা, তিনি বিশেষ সতর্ক ও মিতব্যয়ী ছিলেন। পিতার প্রবর্ত্তিত আদর্শের অনুসরণ করিয়া তিনি রাজ্যলাভ করিবার পরই স্বীয় পারিবারিক ও নিজ ব্যয়ের জন্য নির্দ্দিষ্ট মাসহারা লইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন এবং কিছু দিন পরে তাহার পরিমাণও কমাইয়াছিলেন। তাঁহার পদমর্য্যাদা বিবেচনা করিলে এই মাসহারার পরিমাণ—৪৩ হাজার টাকা অত্যধিক নহে। অবশ্য এই টাকা তিনি যথেচ্ছা ব্যয় করিতেন। রাজ্যপ্রাপ্তি হইতে আলোচ্যসময় পর্য্যন্ত তিনি ৬ বা ৭ বাবদে অধিক অর্থ ব্যয় করিয়াছেন—

কাশ্মীর বাজার

(১) পিতৃশ্রাদ্ধে

(২) লর্ড ডাফরিণের সহিত সাক্ষাৎ করিতে কলিকাতায় গমনে

(৩) কর্ম্মচারীদিগের পূর্ব্বপ্রাপ্য বেতন পরিশোধে

(৪) রাজ্যাভিষেককালে

(৫) তিনি যুবরাজ অবস্থায় যে ঋণ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা পরিশোধে

(৬) পিতার বার্ষিক শ্রাদ্ধে

(৭) রাজা অমরসিংহ বিপত্নীক হইলে তাহার দ্বিতীয় বিবাহে।

"প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও ষষ্ঠ বাবদে খরচে কেহ সঙ্গত আপত্তি করিতে পারেন না। পঞ্চম বাবদ সম্বন্ধে কথা উঠিতে পারে এবং ইহা লইয়া মহারাজার সহিত তাঁহার মন্ত্রিগণের তর্কবিতর্কও হইয়াছিল। তিনি যদি তাঁহার উত্তমর্ণদিগকে প্রতারিত করিতে চাহিতেন, তবে সহজেই তাহা করিতে পারিতেন! উত্তমর্ণরা তাঁহার আদালত ব্যতীত অন্যত্র তাঁহার বিরুদ্ধে নালিশ রুজু করিতে পারিতেন না এবং ইচ্ছা করিলে তিনি স্বীয় প্রভাবে নিজ বিচারালয়ে আপনার পক্ষে সুবিধাজনক বিচার-ব্যবস্থা করিলে তাঁহারা আর ডিক্রী পাইতেন না বা পাইলেও তাহা জারি করিতে পারিতেন না। কিন্তু উদার-হৃদয় মহারাজা সেরূপ কার্য্য করিতে পারেন না। তিনি তাঁহার উত্তমর্ণদিগকে তাহাদের প্রাপ্য অর্থে বঞ্চিত করিবার কল্পনা ঘৃণাসহকারে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তিনি মন্ত্রিগণের সহিত এই বিষয় লইয়া তর্ক করেন—বলেন, তিনি সত্য সত্যই ঋণ গ্রহণ করিয়াছিলেন; তিনি বলেন, ঋণ শোধ না করিলে তিনি প্রত্যবায়গ্রস্ত হইবেন

এবং শাস্ত্রোক্তি উদ্ধৃত করিয়া দেখান, সেরূপ কার্য্যের ফলে তিনি ইহলোকে অপযশ ও পরলোকে দণ্ড অর্জ্জন করিবেন। মন্ত্রীরা ইহার পর আর কিছু বলিতে পারেন নাই এবং মহারাজা ঋণ শোধ করিয়া বিবেক-বুদ্ধির ও ন্যায়নিষ্ঠার পরিচয় দিয়াছিলেন. সপ্তম বাবদে ব্যয় কম করিলেও চলিতে পারিত। তবে রাজা অমরসিংহ তখনও অল্পবয়স্ক, মহারাজও তাঁহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। কাযেই এই ব্যয়ও একান্ত অপরাধ বলিয়া বিবেচনা করা যায় না। মোটের উপর ব্যয়ও এত অধিক হয় নাই যে, তাহার বিশেষ নিন্দা করা সঙ্গত। ইহার উপর নির্ভর করিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে অমিতব্যয়িতার অভিযোগ উপস্থাপিত করা ভাসমান তৃণের উপর প্রস্তরনির্ম্মিত সেতুর ভিত্তিস্থাপনের মত নির্ব্বুদ্ধিতার কার্য্য।"

নিসাতবাগ

ভারত সরকার মহারাজার অকর্ম্মণ্যতার প্রমাণস্বরূপ বলিয়াছিলেন, তাঁহার শাসনে রাজকোষ শূন্য হইয়াছিল। যদি এ কথা সত্য হয়, তবে জিজ্ঞাসা করিতে হয়, সে জন্য দায়ী কে? রাজকোষ শূন্য করিবার কোন দায়িত্ব কি ভারত সরকারের ছিল না? ভারত সরকারের কর্ম্মচারীদিগের প্রভাবেই নিম্নলিখিত ব্যয় হইয়াছিল,—

(১) ভারত সরকারকে ঋণ দান	২৫ লক্ষ টাকা
(২) ঝিলাম উপত্যকা কার্ট রোডে বার্ষিক ব্যয়	৬ লক্ষ টাকা
(৩) ঝিলাম-শিয়ালকোট রেলপথের ব্যয় (এক বৎসরে প্রদত্ত)	১৩ লক্ষ টাকা
(৪) জম্মুতে জলের কলের ব্যয়	৩ " "

কেবল ইহাই নহে। যে সময় বড় লাট লর্ড ডাফরিণ মহারাজাকে রাজস্ব-ব্যয় সম্বন্ধে সতর্ক হইতে বলিতেছিলেন, সেই সময়েই কাশ্মীর দরবার হইতে লেডী ডাফরিণ মেডিক্যাল ফণ্ড কমিটীতে ৫০ হাজার টাকা ও লাহোরে এচিসন কলেজে ২৫ হাজার টাকা লওয়া হয়। যখন কাশ্মীরের রাজকোষ পূর্ণ নহে, সেই সময় তাঁহার পত্নীর কর্ত্তৃত্বাধীন ভাণ্ডারের জন্য ৫০ হাজার টাকা লইতে সম্মত হওয়া কি বড় লাটের পক্ষে সঙ্গত হইয়াছিল? সে প্রশ্নের উত্তর কে দিবে?

তাহার পর? ১৮৮৮-৮৯ খৃষ্টাব্দে কয় জন য়ুরোপীয় শিয়ালকোটের নিকটে শিকার করিতে যাইলে তাহাদের জন্য দরবারের প্রায় ৫০ হাজার টাকা ব্যয় হয়। গুলমার্গে একটি ও জম্মুতে আর একটি নূতন রেসিডেন্সী-গৃহ নির্ম্মিত হইতেছিল, শেষোক্ত গৃহের জন্য ১ লক্ষ টাকা ও তাহার আসবাবের জন্য ২৫ হাজার টাকা ব্যয় বরাদ্দ হইয়াছিল; অথচ রেসিডেণ্ট তথায় অধিক সময় বাস করিতেন না এবং শিয়ালকোট পর্য্যন্ত রেলপথ রচিত হইলে বৎসরে আরও অল্পকাল বাস করিবেন স্থির ছিল। এ সব ব্যয় মহারাজার আগ্রহে করা হইয়াছে, না—ইহার দায়িত্ব পরোক্ষভাবে ভারত সরকারের ও প্রত্যক্ষভাবে সেই সরকারের প্রতিনিধির? যে সময় লর্ড ল্যান্সডাউন কাশ্মীরের রাজকোষ "শূন্য" বলিয়া প্রচারিত করিয়াছিলেন, সেই সময় রাজ্যের ব্যবসার জন্য অনাবশ্যক রেলপথ রচনায় ১৩ লক্ষ টাকা ব্যয় করা কি সঙ্গত? জঙ্গীলাট কাশ্মীরভ্রমণে যাওয়ায় দরবারের

১ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল। যাহারা তাঁহার সঙ্গে গিয়াছিল, তাহারা সকলেই—তাঁহার খাস সেক্রেটারী হইতে ঘাসিয়াড়া পর্য্যন্ত প্রত্যেক লোক—দরবারের অতিথি বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল। কপূর্রতলার মহারাজা কাশ্মীরে গমন করায় দরবারের ৫০ হাজার টাকার অধিক ব্যয় হয়, অথচ মহারাজ প্রতাপসিংহ তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করেন নাই! ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে লর্ড ডাফরিণ কাশ্মীর যাইবেন বলিয়া আয়োজনে দরবারের লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। তবে তিনি না যাওয়ায় আরও ২ লক্ষ টাকা ব্যয় হয় নাই।

যাঁহারা মহারাজা প্রতাপ-সিংহের বিরুদ্ধে রাজস্ব সম্বন্ধে অমিতব্যয়িতার অভিযোগ উপস্থাপিত করিয়াছিলেন, তাহারা রাজ্যের ব্যয় কিরূপে বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন, তাহা দ্রষ্টব্য। মহারাজার হস্ত হইতে শাসন-ভার কাড়িয়া লইবার পর যে ব্যবস্থা হয়, তাহাতেই তাহা বুঝিতে পারা যায়—

(১) রেসিডেণ্টের কাছে যে উকীল থাকেন, তিনি পূর্ব্বে মাসিক ৬৬ টাকা বেতন পাইতেন। তাঁহার স্থানে রাজা অমরসিংহের এক জন লোককে মাসিক ৪ শত টাকা বেতনে নিযুক্ত করা হয়।

শঙ্করাচার্য্যের মন্দির

(২) তোষাখানার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীর বেতন মাসিক ২ শত টাকা ছিল। তাঁহার স্থানে রাজা অমরসিংহের ভৃত্যের পিতাকে মাসিক ৬ শত টাকা বেতনে নিযুক্ত করা হয়।

(৩) মাসিক ৫ শত টাকা বেতনে এক জন ফটোগ্রাফার নিযুক্ত করা হয়। তাহার কায রাজা অমরসিংহের কাছে থাকা।

(৪) ধনজীভাই নামক এক ব্যক্তি কর্ণেল নিসবেটের প্রিয়পাত্র। সে মারীর রাস্তায় টঙ্গা (অশ্বযান) চালিত করায় মাসিক ৫ শত টাকা হিসাবে পায়। অথচ জম্মুর রাস্তায় ডাক চলাচলের সঙ্গে তাহার কোন সম্বন্ধ ছিল না।

(৫) কাশ্মীরে য়ুরোপীয় যাত্রীদিগের অভ্যর্থনার ব্যবস্থা করিবার জন্য মাসিক ৫ শত টাকা বেতনে এক জন মণ্ডল নিযুক্ত করা হয়।

(৬) পূর্ব্বে মারীর রাস্তায় যে "নেটিভ ডাক্তার" ছিলেন—তিনি মাসিক ৫০ টাকা বা ঐরূপ বেতন পাইতেন। তাঁহার স্থানে মাসিক ৩ শত টাকা বেতনে এক জন য়ুরোপীয়ান রাখিবার বন্দোবস্ত হয়।

(৭) পূর্ব্বের দেশীয় ঠিকা-দারের স্থানে দ্বিগুণ টাকায় মারী রাস্তায় স্পেডিং কোম্পানীকে ঠিকা দেওয়া হয়।

(৮) শ্রীনগরে পানীয় জলের অভাব নাই—কেবল তথায় আবর্জ্জনা দূর করিবার ব্যবস্থা শোচনীয়। সেই শোচনীয় ব্যবস্থার সংস্কার-চেষ্টা না করিয়া জলের কলের জন্য কয় লক্ষ টাকা ব্যয়ের কল্পনা হয়।

(৯) শ্রীনগরের সান্নিধ্যে গুপকারে ও গুলমার্গে য়ুরোপীয়দিগের জন্য জমী মাপ করা হয় এবং উদ্যান, বিলাসবীথি প্রভৃতি রচনার জন্য নক্সাও প্রস্তুত করা হয়।

(১০) দরবারের খরচে কাশ্মীরে ঘোড়দৌড়, বন-ভোজন প্রভৃতি চলিতে থাকে।

সুতরাং মহারাজার আমলের ব্যয় অপেক্ষা তাহার পরই অধিক অপব্যয় হয়।

কর্ণেল নিসবেটের জন্য দরবারের কত খরচ হইত—তিনি দরবারের খরচে কিরূপে শিয়ালকোটে ও লাহোরে "রাজার হালে" বাস করিতেন, সে সব কথা তৎকালে 'ষ্টেটসম্যানে' আলোচিত হইয়াছিল।
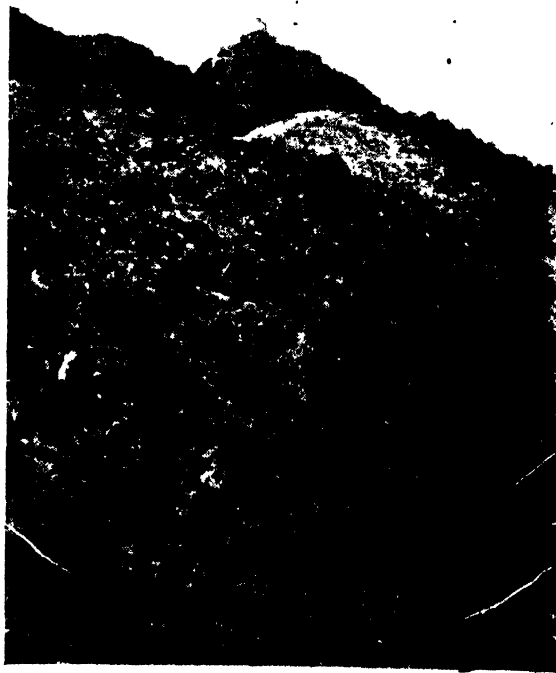
মহারাজার বিরুদ্ধে চতুর্থ অভিযোগ—তিনি হীনচরিত্র ও অযোগ্য পারিষদপুঞ্জে পরিবৃত। যাঁহারা কাশ্মীর দরবারের বিষয় বিশেষরূপ জানিতেন, তাঁহারা বলিয়াছেন—এ কথা সত্য যে, মহারাজা তাঁহার কয় জন ভৃত্যের ও কর্ম্মচারীর উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহারা তাঁহার পুরাতন ভৃত্য এবং তাহাদের প্রতি তাঁহার বিশ্বাসে বিস্ময়ের কোন কারণ থাকিতে পারে না। এরূপ ব্যাপার কেবল যে রাজপরিবারেই দেখা যায়, এমনও নহে; অনেক সাধারণ লোকের গৃহেও ইহা লক্ষিত হয়। মহারাজার এরূপ ভাবের বিশেষ কারণও যে ছিল না, এমন নহে। মহারাজা যেন কেমন একটা কুসংস্কার হেতু তাহাকে চাকরীতে বহাল রাখিয়াছিলেন। ইহা তাঁহার দৌর্ব্বল্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। অলৌকিক শক্তিতে বিশ্বাস থাকিলে সময় সময় যে এমন হয়, রুসিয়ার হতভাগ্য রাজপরিবারেও তাহা দেখা গিয়াছে—রাসপুটকিন জার নিকোলাসের মহিষীর উপর যে প্রভাব প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, তাহা বিস্ময়কর।

মহারাজার বিরুদ্ধে শেষ অভিযোগ—তিনি রাজদ্রোহজনক ও হত্যাকল্পে পত্র ব্যবহার করিয়াছিলেন। যদিও সরকার বলিয়াছিলেন, তাঁহারা এই অভিযোগে অতিরিক্ত
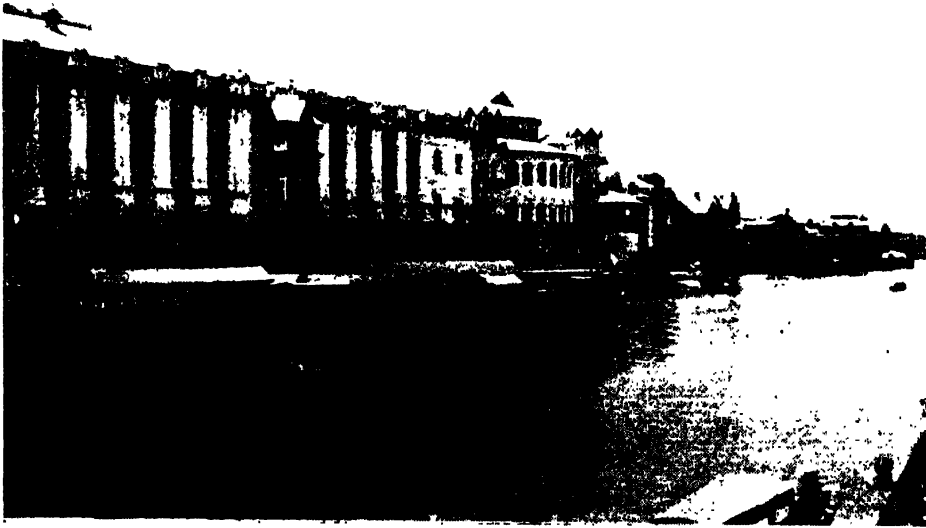
প্রাসাদ

কাশ্মীরে রাজদরবারে ষড়্যন্ত্রের অন্ত ছিল না, কাযেই রাজার পক্ষে বিশ্বাসী অনুচরে পরিবৃত থাকাই স্বাভাবিক—তিনি নূতন লোককে রাজপ্রাসাদে নিযুক্ত করিলে তাঁহার জীবনও বিপন্ন হইতে পারিত। সুতরাং পরিচিত পুরাতন লোকদিগকে সরান কখনই সঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হইতে পারিত না। কিন্তু ভৃত্যবর্গ যে তাঁহার বিশেষ প্রিয়পাত্র বলিয়া বিবেচিত হইতে পারিত, এমনও নহে। করুণ-হৃদয় প্রভু বিশ্বাসী ও প্রভুভক্ত ভৃত্যকে যে ভাবে দেখেন, তাহাতে ভৃত্যকে প্রিয়পাত্র বলা যায় না। তবে এক জন জ্যোতিষী তাঁহার উপর বিশেষ প্রভাব স্থাপন করিয়াছিল। সে যে সর্ব্বতোভাবে বিশ্বাসযোগ্য নহে, তাহা জানিয়াও বিশ্বাস স্থাপন করেন না, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক গুরু অভিযোগ এবং সরকার যে ইহা অবিশ্বাস করিয়াছিলেন, এমনও মনে হয় না। এই সব পত্রের কথা আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। সেই সব পত্র লইয়া কর্ণেল নিসবেট কলিকাতায় বড় লাটকে দেখাইতে গমন করেন। কর্ণেল নিসবেট কিরূপে এই সব পত্র হস্তগত করেন, সে সম্বন্ধে নানা মত ব্যক্ত হইয়াছিল। কিন্তু তৎকালে কোন অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান পত্র যে বলিয়াছিলেন, মহারাজার অনিষ্টান্বেষী রাজা অমরসিংহের দ্বারাই সে সব পত্র কর্ণেল নিসবেটের কাছে নীত হয়, তাহা যথার্থ বলিয়া মনে হয়। মহারাজা প্রতাপসিংহ বড় লাটকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন,

তাহাতে তিনিও বলিয়াছিলেন, এ সব ব্যাপারের মূলে রাজা অমরসিংহ আছেন। সে সব পত্র পরীক্ষা করিলেই বুঝা যায়—সেগুলি কোন অসম-সাহসী ব্যক্তির জাল করা জিনিষ। কর্ণেল নিসবেট কেমন করিয়া সেগুলিকে যথার্থ ও বিশ্বাসযোগ্য বিবেচনা করিয়া সেগুলি লইয়া বড় লাটের কাছে পেশ করিতে গিয়াছিলেন, তাহাই বিস্ময়ের বিষয়।

আমরা ইতঃপূর্ব্বে ৪ খানি পত্রের অনুবাদ প্রদান করিয়াছি। এই সব পত্রের ২ খানি রামানন্দ নামক পুরোহিতকে ও ২ খানি তাঁহার মীরণবক্স নামক ভৃত্যকে লিখিত। এই দুই জনই সর্ব্বদা মহারাজার কাছে থাকিত। তবে তিনি তাহাদিগকে পত্র লিখিবেন কেন? আর ইহাদিগের মত লোককে এরূপ গুরু বিষয়ে পত্র লিখা কি সম্ভব বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে? এ সব পত্রে স্বাক্ষর বা তারিখ ছিল না। আরও সন্দেহের কথা, পত্রগুলি জাল বলিয়া মহারাজা সেগুলি দেখিতে চাহিলেও কর্ণেল নিসবেট তাঁহাকে দেখান নাই।

এরূপ ক্ষেত্রে ভারত সরকারের পক্ষে এই সব পত্রে বিশেষ বিশ্বাস স্থাপন করার কথা স্বীকার করা সঙ্গত নহে। কিন্তু ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের ৩রা এপ্রিল তারিখে ভারত সরকার ভারত-সচিবকে যে পত্র লিখেন, তাহাতে লিখিত ছিল—"আমরা এই সব পত্রের অতিরিক্ত গুরুত্ব স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি; কারণ, এক বৎসর পূর্ব্বেও আমরা এইরূপ কতকগুলি পত্র পাইয়াছিলাম এবং মহারাজার ত্রুটিও আমাদের অজ্ঞাত নহে।" এই পত্রের শেষাংশে মহারাজার উপর যে বক্রোক্তি আছে, মহারাজার পত্রের উত্তরে লিখিত বড় লাট লর্ড ল্যান্সডাউনের পত্রেও তাহা পুনরুক্ত হইয়াছিল—"আপনি (মহারাজা) যে সব পত্রের কথা বলিয়াছেন, গত বসন্তকালে সে সকলের প্রতি আমার মনোযোগ আকৃষ্ট করা হইয়াছিল। ইহার অনেকগুলি যথার্থ বলিয়াই মনে হয়। আমি পূর্ব্বে ভারত সরকারের হস্তগত যে সব পত্রের কথা বলিয়াছি, সে সকলের সহিত এগুলির সাদৃশ্যও অসাধারণ।" ইহাতে মনে হয়, সরকার অন্ততঃ কতকগুলি পত্র জাল নহে—আসল বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছিলেন। অথচ পূর্ব্বোদ্ধৃত কথার পরই বড় লাট লিখিয়াছিলেন:—"আপনি যে মনে করিয়াছেন, আমার সরকার কেবল এই সব পত্রের উপর নির্ভর করিয়া কায (আপনাকে রাজ্যশাসনভার মুক্ত) করেন নাই, তাহা সত্য। যদি এ সব পত্রই আসল হইত, তাহা হইলেও আমি মনে করিতে পারিতাম না যে, এ সব ইচ্ছাপূর্ব্বক বা এ সকলের প্রকৃত অর্থ বুঝিয়া লিখিত হইয়াছিল।" বড় লাটের এই উক্তিকে ক্ষতে ক্ষারক্ষেপ বলা যাইতে পারে। কারণ, ইহাতে বলা হয়:—

(১) মহারাজার পক্ষে এরূপ পত্র লিখা অসম্ভব নহে।

(২) মহারাজা এতই নির্ব্বোধ যে, তিনি এ সব পত্র লিখিয়া থাকিলেও পত্রগুলি অবজ্ঞা ও উপেক্ষার যোগ্য।

প্রকৃতপক্ষে মহারাজা নির্ব্বোধ ছিলেন না। তিনি লর্ড ল্যান্সডাউনকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিলে তাঁহাকে নির্ব্বোধ মনে করা যায় না, পরন্তু মনে বিশ্বাস জন্মে, তাঁহাকে আত্মপক্ষসমর্থনের ও আপনাকে নিরপরাধ প্রতিপন্ন করিবার কোনরূপ সুযোগ না দিয়া ভারত সরকার তাঁহার প্রতি অনাচারই করিয়াছিলেন। তাঁহার ব্যাপারে সেই "দশচক্রে ভগবান ভূত" গল্প মনে পড়ে।

মহারাজার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র পাকা হইলে ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে রাজা অমরসিংহ শিয়ালকোটে রেসিডেণ্টের কাছে গমন করিলেন। ষড়যন্ত্রের মধ্যে রেসিডেণ্ট, রাজা অমরসিংহ ও রাজস্ব-সচিব পণ্ডিত সুরাজ কৌল ছিলেন। শিয়ালকোটে দুই দিন মাত্র থাকিয়া রাজা অমরসিংহ তাঁহার দ্রব্যাদি তথায় ফেলিয়া রাখিয়া মহারাজার কাছে আসিয়া রেসিডেণ্টের সঙ্গে কলিকাতায় যাইবার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। মহারাজা রেসিডেণ্টের কলিকাতায় যাইবার কোন কথা পূর্ব্বে শুনেন নাই; তিনি যাত্রার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে রাজা অমরসিংহ বলিলেন, কাশ্মীর রাজ-পরিবারের মান-সম্ভ্রম যাইতে বসিয়াছে, তাঁহাদের সর্ব্বনাশ হইয়াছে, কতকগুলি পত্র পাওয়া গিয়াছে—তাহাতে প্রমাণ হইয়াছে, মহারাজা রুসিয়ার সহিত ও দলিপসিংহের সহিত ষড়যন্ত্র করিতেছেন। এই কথা বলিয়া তিনি রেসিডেণ্টের সঙ্গে কলিকাতায় যাইবার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। মহারাজা এই রহস্যজনক উক্তিতে একান্ত বিস্মিত হইলেন। তিনি রাজা অমরসিংহকে কলিকাতায় যাইবার অনুমতি দিতে অস্বীকার করিলেন এবং তাঁহার সহিত জম্মুতে সাক্ষাৎ

করিবার জন্য রেসিডেণ্টকে পত্র লিখিলেন। দুই দিন কাটিয়া গেল; রেসিডেণ্ট কোন উত্তর দিলেন না। মহারাজা বিব্রত হইয়া পড়িলেন। এ দিকে কতকগুলি অবিশ্বাসী কর্ম্মচারী তাঁহাকে ভয় দেখাইবার জন্য তাঁহার কি হইবে, সে সম্বন্ধে নানারূপ অতিরঞ্জিত কথা বলিতে লাগিল। মহারাজা বলিলেন, তিনি সেরূপ পত্র লিখেন নাই। অমরসিংহ বলিলেন, পত্রের লিখা তাঁহার বলিয়াই মনে হয়; কেবল স্বাক্ষর সম্বন্ধে সন্দেহ আছে। অথচ পত্রগুলিতে স্বাক্ষরই ছিল না! তখন মহারাজা বুঝিলেন, ষড়যন্ত্রের মূলে অমরসিংহ ছিলেন। বিশ্বাসঘাতক কর্ম্মচারিদলে পরিবৃত, স্বীয় ভ্রাতার দ্বারা বিপন্ন, অপমানিত ও আপনার ভবিষ্যৎ ভাবিয়া ভীত মহারাজা এমনই বিচলিত হইলেন যে, দুই দিন অনাহারে রহিলেন। তিনি বলিলেন, "যদি ইংরাজ ইচ্ছা করে, তবে আমার রাজ্যের যে কোন অংশ লউক—সেনানিবাস প্রতিষ্ঠিত করুক। তাহারা আমাকে এমনভাবে কষ্ট দেয় ও অপমানিত করে কেন?"

অমরসিংহের দল বুঝিলেন, তাঁহাদের কার্য্যসিদ্ধির সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। রেসিডেণ্টকে সে কথা জানান হইল। কোন সংবাদ না দিয়া রেসিডেণ্ট জম্মুতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ও মহারাজার সহিত সাক্ষাৎ করিবার পূর্ব্বে রাজা অমরসিংহের সহিত গোপনে পরামর্শ করিলেন। তিনি মহারাজার সহিত অত্যন্ত অশিষ্ট ও উদ্ধতভাবে ব্যবহার করিলেন। তিনি বলিলেন, বড় লাট অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং মহারাজার যদি প্রাণরক্ষা হয়, তবে তিনি আপনাকে ভাগ্যবান্ বলিয়া বিবেচনা করিতে পারিবেন।

মহারাজা দৃঢ়তাসহকারে বলিলেন, পত্রগুলি কখনই তাঁহার লিখা নহে। তিনি সেগুলি দেখিতে চাহিলে রেসিডেণ্ট উদ্ধতভাবে বলিলেন, পত্রগুলি যে তাঁহারই লিখিত, সে বিষয়ে তাঁহার কোন সন্দেহ নাই; তিনি সে বিষয়ে আর কোন কথা শুনিতে চাহেন না। শেষে তিনি বলিলেন, কি করিলে মহারাজা রক্ষা পাইতে পারেন, তাহা তিনি রাজা অমরসিংহকে বলিয়া গেলেন; মহারাজা যদি আদালতে বিচারের অপমান হইতে অব্যাহতিলাভ করিতে চাহেন, তবে যেন তিনি সেইভাবে কায করেন। এই কথা বলিয়া তিনি একখানি অনুশাসনের খসড়া রাখিয়া চলিয়া গেলেন। রাজা অমরসিংহ তাহা মহারাজাকে দিয়া তদনুসারে অনুশাসন প্রচার করিতে বলিলেন। মহারাজা তাহাতে অসম্মত হইলেন। সে দিন তিন চারি বার তাঁহার পরামর্শ-পরিষদের অধিবেশন হইল। অমরসিংহের দলস্থ মন্ত্রীরা মহারাজাকে নানারূপ ভয় দেখাইয়া অনুশাসনে স্বাক্ষর করিতে বলিতে লাগিলেন। রেসিডেণ্ট সেই অনুশাসন লইবার জন্য জম্মুতেই ছিলেন। অমরসিংহ বলিলেন, তিনি রেসিডেণ্টকে লিখিবেন, মহারাজা স্বাক্ষর করিতে অসম্মত।

পরদিন রেসিডেণ্টের লিখিত পত্রের অনুবাদ মহারাজাকে প্রদত্ত হইল এবং অবস্থাবিপাকে পড়িয়া তিনি এই "স্বেচ্ছায় ক্ষমতাত্যাগপত্র" স্বাক্ষর করিলেন। আমরা নিম্নে সেই ফার্শী পত্রের অনুবাদ প্রদান করিতেছি,—

নানা গুণশালী, প্রিয় ভ্রাতা রাজা অমরসিংহজী,

রাজ্যের উন্নতির জন্য বৃটিশ সরকারের অনুকরণে শাসনপদ্ধতির সংস্কার আমাদের অভিপ্রেত বলিয়া আমি ৫ বৎসরের জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণে গঠিত শাসকসঙ্ঘের উপর জম্মু ও কাশ্মীরের শাসনভার অর্পণ করিলাম,—

রাজা রামসিংহ

রাজা অমরসিংহ

ভারত সরকারের সহিত পরামর্শ করিয়া নিযুক্ত এক জন অভিজ্ঞ য়ুরোপীয় কর্ম্মচারী। ইনি দরবারের কর্ম্মচারী বলিয়া বিবেচিত হইবেন এবং মাসিক ২ হাজার টাকা হইতে ৩ হাজার টাকা বেতন পাইবেন।

রায় বাহাদুর পণ্ডিত সুরাজ কৌল

রায় বাহাদুর পণ্ডিত ভগরাম

এই শাসকসঙ্ঘ ৫ বৎসর কাল সকল বিভাগে শাসনকার্য্য পরিচালিত করিবেন। ৫ বৎসরের মধ্যে সঙ্ঘের শেষোক্ত ৩ জন সদস্যের কাহারও পদ শূন্য হইলে আমার সম্মতিক্রমে ভারত সরকার সে পদে নূতন সদস্য নিযুক্ত করিবেন।

এই ৫ বৎসর কাল অতীত হইলে আমি রাজ্যশাসন সম্বন্ধে যেরূপ ব্যবস্থা সঙ্গত বিবেচনা করিব, সেইরূপ ব্যবস্থা করিতে পারিব। বর্ত্তমান পরোয়ানার তারিখ হইতে ৫ বৎসর পূর্ব্বোক্ত ব্যবস্থা চলিবে। মহলাতের অর্থাৎ প্রাসাদের বা আমার ব্যক্তিগত কোন ব্যাপারের সহিত এই শাসকসঙ্ঘের কোন সম্বন্ধ থাকিবে না এবং

তাঁহারা সে সব বিষয়ে কোনরূপে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না। মহলাতের ও আমার নিজ খরচ বাবদে যে টাকা বরাদ্দ আছে, তাহা পূর্ব্ববৎ বরাদ্দ থাকিবে। শাসক-পরিষদ সে সব বরাদ্দ কমাইতে পারিবেন না। মহলাতে বা খাসে যে সব জায়গীর বা স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি আছে, সে সব আমার কর্ত্তৃত্বাধীন থাকিবে এবং শাসকসঙ্ঘ সে সকলে কোনরূপে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না। বিবাহে, মৃত্যুতে এবং অন্যান্য ঐহিক ও পারত্রিক কার্য্যে আমার যে ব্যয় হইবে, সে সব দরবার দিবেন।

আমার ভ্রাতৃগণের মধ্যে কেহ আমার অনুমতি অনুসারে শাসক-মণ্ডলীর সভাপতি নিযুক্ত হইবেন।

পূর্ব্বোক্ত ৫ বৎসরের মধ্যে আমি রাজ্যের শাসন-কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিব না। কিন্তু অন্য হিসাবে কাশ্মীরের মহারাজার মর্য্যাদা ও স্বাধীনতা আমারই থাকিবে।

আমার অনুমতি ব্যতীত শাসকমণ্ডলী কোন রাজ্যের বা ভারত সরকারের সহিত কোন নূতন চুক্তি করিতে অথবা আমার বা আমার পূর্ব্বপুরুষদিগের কৃত কোন চুক্তি পুনরায় করিতে বা পরিবর্ত্তিত করিতে পারিবেন না।

আমার অনুমতি ব্যতীত তাঁহারা কাহাকেও জায়গীর দিতে, জমীর পাট্টা দিতে, দরবারের কোন স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করিতে বা হস্তান্তর করিতে পারিবেন না।

তারিখ ২৭শে ফাল্গুন, ১৯৪৫ সম্বৎ।

এই পরোয়ানাই বৃটিশ সরকার কর্ত্তৃক স্বেচ্ছাকৃত পদত্যাগপত্র বলিয়া অভিহিত হইয়াছিল। স্বেচ্ছায় পদত্যাগের যে দৃষ্টান্ত অল্পদিন পূর্ব্বে নাভার মহারাজা রিপুদমন সিংহের ব্যাপারে দেখা গিয়াছে, ইহা কোন কোন বিষয়ে তাহার অনুরূপ হইলেও সকল বিষয়ে নহে। মহারাজা প্রতাপসিংহও মহারাজা রিপুদমন সিংহের মত স্বেচ্ছায় এই পত্রে স্বাক্ষর করার কথা অস্বীকার করিয়াছিলেন—সাদৃশ্য এই পর্য্যন্ত। আলোচ্য পরোয়ানা, পদত্যাগপত্র নহে, ইহা মহারাজা প্রতাপসিংহ কর্ত্তৃক তাঁহার প্রধান মন্ত্রীর উপর জারি-করা পরোয়ানা। ইহাতে রেসিডেণ্টের বা ভারত সরকারের কোন কথাও নাই। এই অস্থায়ী বন্দোবস্তেও মহারাজার কতকগুলি ক্ষমতা নিজ হস্তে রক্ষিত হইয়াছিল।

কিন্তু ভারত সরকার যে ইচ্ছা করিয়া ইহাকে পদত্যাগ-পত্র নামে অভিহিত করিয়াছিলেন, তাহার কারণ, তাঁহারা ইহার সর্ত্তগুলিও মানিয়া চলেন নাই। সেই জন্য ভারত সরকার ভারত-সচিবকে লিখিয়াছিলেন,*—

"আমরা কাশ্মীরের যে বন্দোবস্ত করিব, তাহা সর্ব্বতোভাবে মহারাজা প্রতাপসিংহের পদত্যাগপত্রের ভিত্তির উপরই প্রতিষ্ঠিত হইবে না। কারণ, তিনি, তাঁহার মানসম্ভ্রম রক্ষা করিবার ও তিনি অন্যরূপে যে সব সুবিধা পাইতে পারিতেন না, সেই সব পাইবার চেষ্টায় এই পত্র রচিত করিয়াছেন। ইহার কতকগুলি সর্ত্ত মানিলে অসুবিধা অনিবার্য্য। সুতরাং আমরা এই পত্র মহারাজার রাজ্য-শাসনে অক্ষমতার স্বীকারোক্তি বলিয়া গ্রহণ করিব এবং সাধারণভাবে ব্যবস্থা করিতে প্রবৃত্ত হইব।"

এইরূপে রেসিডেণ্টের কথায় মহারাজার কথা অবিশ্বাস করিয়া ভারত সরকার পূর্ব্বকৃত সন্ধির সর্ত্ত ভঙ্গ করিয়া মহারাজা প্রতাপসিংহকে রাজ্যভারমুক্ত ও অপমানিত করিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে বিনা বিচারে অপরাধী স্থির করিয়া লইয়া যে স্বৈরশাসনপ্রিয়তার পূর্ণপরিচয় প্রকট করিয়াছিলেন, সেই ঘটনার পর বিনা বিচারে শত শত ভারতীয় প্রজার স্বাধীনতা হরণ করায় তাহাই পুনরায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

* Despatch, dated Simla, 3rd April, 1889.

কোথা গেছি ফিরে ?

কোথা গেছি ফিরে ?
সুখে দুঃখে অনাসক্ত, যে আমার চিরভক্ত
পরহিত-ব্রত যার মনের মন্দিরে,
হেলার অতিথি আমি তথা গেছি ফিরে।

শ্রীবাশরীভূষণ মুখোপাধ্যায়।

প্রলয়ের আলো

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

গভীর নিশীথে

রেবেকা কোহেনের সহিত জোসেফ কুরেটের যে সকল কথা হইয়াছিল, তাহা তাহারা কাহারও নিকট প্রকাশ করিল না; এমন কি, তাহারাও আর কোন দিন এই প্রসঙ্গের আলোচনা করিল না। সেই ঘটনার প্রায় এক সপ্তাহ পরে এক দিন প্রভাতে রেবেকার পিতা সলোমন কোহেন জোসেফকে বলিল, "বিবাহ সম্বন্ধে রেবেকার মত জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে কি?"

জোসেফ বলিল, "হাঁ, জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম।"

সলোমন। "সে কি বলিল?"

জোসেফ। "আপনার কথাই সত্য, তিনি বলিলেন, আমার আশা পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা নাই।"

সলোমানের মুখ হঠাৎ গম্ভীর হইয়া উঠিল, সে মুহূর্ত্ত-কাল নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিল, "অসম্ভব কেন—তাহা তোমাকে বলিয়াছে কি?"

জোসেফ। "না"।

সলোমন কোহেন জোসেফকে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিল না। জোসেফও রহস্যভেদের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিল না, যদিও রেবেকার গুপ্তকথা জানিবার জন্য তাহার কৌতূহল অসংবরণীয় হইয়াছিল। সে মনে করিল, রেবেকা কোন না কোন দিন তাহাকে মনের কথা খুলিয়া বলিবে, কিন্তু রেবেকা কোন কথা বলিল না।

জোসেফ ক্রমে অধীর হইয়া উঠিল, তাহার হৃদয় অশান্তি ও অসন্তোষে পূর্ণ হইল। রেবেকার সুন্দর মুখ তাহার মনের উপর অসামান্য প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, অথচ সে জানিত তাহাকে লাভ করিবার আশা নাই, তাহাদের মিলনের পথে যে সুদুস্তর ব্যবধান বর্ত্তমান, তাহা অতিক্রম করা তাহার অসাধ্য! রেবেকা তাহার প্রতি আদর-যত্ন প্রদর্শনে মুহূর্ত্তের জন্য বিন্দুমাত্র ঔদাসীন্য প্রকাশ না করায়, এই ঘনিষ্ঠতা তাহার দুঃসহ হইয়া উঠিল। অবশেষে জোসেফ কোন উত্তেজনাপূর্ণ কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়া, তাহার শোচনীয় অবস্থা বিস্মৃত হইবার সঙ্কল্প করিল। কিন্তু তাহার ইচ্ছার স্বাধীনতা না থাকায় তাহাকে নিশ্চেষ্ট-ভাবে বৈচিত্র্যহীন দিনগুলি অতিবাহিত করিতে হইল।

জুরিচ পরিত্যাগের পর জোসেফ তাহার পিতামাতাকে একখানিও পত্র লিখে নাই, তাহাদেরও কোন সংবাদ সে জানিতে পারে নাই। সে সঙ্কল্প করিয়াছিল, আর্থিক অবস্থার উন্নতি না হইলে তাহাদিগকে চিঠিপত্র লিখিবে না। তাহাদের কোন আপদ-বিপদ ঘটিলে সে তাহার বন্ধু ক্লিন্‌জেলের পত্রে তাহা জানিতে পারিত। ক্লিন্‌জেল তাহাদের প্রসঙ্গে কোন কথা না লিখায়, জোসেফের ধারণা হইয়াছিল, তাহার পিতামাতা শারীরিক সুস্থ আছে।

জোসেফ কুরেটকে রুসিয়ায় প্রেরণ করিয়া নিহিলিষ্টরা নিশ্চেষ্ট ছিল না। তাহারা একটি অতি ভীষণ ও গভীর ষড়্‌যন্ত্র সফল করিবার জন্য নিঃশব্দে চেষ্টা করিতেছিল, কোনরূপে তাহা ব্যর্থ হইতে না পারে, এ বিষয়ে তাহাদের তীক্ষ্ণদৃষ্টি ছিল। জোসেফ সলোমনের নিকট জানিতে পারিয়াছিল, এই ষড়্‌যন্ত্র সফল করিবার জন্য শীঘ্রই তাহাকে কোন কঠিন দায়িত্বভার প্রদত্ত হইবে। কিন্তু সেই দায়িত্বভার কি, তাহা সে জানিতে পারে নাই, এই-জন্য সে উৎকণ্ঠিতচিত্তে কর্ত্তৃপক্ষের আদেশের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। নিহিলিষ্ট সম্প্রদায়ের অধিনায়কের আজ্ঞাবাহী ভৃত্যরূপে অন্ধভাবে তাঁহার আদেশ পালনের জন্য জোসেফের বিন্দুমাত্র আগ্রহ ছিল না; কঠোর দায়িত্ব-ভার গ্রহণ করিয়া অন্য সকলকে পশ্চাতে রাখিয়া সে প্রলয়ানলের সম্মুখীন হইবে এবং স্বাধীনতার সংগ্রামে

সেনাপতির স্থান অধিকার করিবে, এই উচ্চাভিলাষ সে মুহূর্ত্তের জন্য ত্যাগ করিতে পারে নাই।

জোসেফ এক দিন সলোমনের নিকট তাহার মনের কথা খুলিয়া বলিল; সে বলিল, "দেখুন, যদি কোন বিপজ্জনক দায়িত্বভার গ্রহণ করিয়া দুর্ভাগ্যক্রমে আমাকে ধরা পড়িতে হয়, তাহা হইলে আমার মৃত্যু অনিবার্য্য! কিন্তু আমার মৃত্যুতে কাহার কি ক্ষতি? আমার পিতা-মাতা ভিন্ন অন্য কেহই আমার জন্য অশ্রুপাত করিবে না, কিন্তু কালে তাঁহারা সে শোক ভুলিয়া যাইবেন। পুত্র-বিয়োগব্যথা পিতামাতার হৃদয়েও স্থিরস্থায়ী হয় না।"

সলোমন অবিচলিত স্বরে বলিল, "বৎস, তোমার এই উচ্ছ্বাস দমন কর। আমাদের সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্য সফল করিতে হইলে তিনটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে—প্রথম সতর্কতা, দ্বিতীয় দূরদৃষ্টি, তৃতীয় সহিষ্ণুতা। তুমি ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া সুযোগের প্রতীক্ষা কর, তোমার আশা যথাসময়ে পূর্ণ হইবে। সহিষ্ণুতার অভাব হইলে আমাদের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইবে, আমাদের বিনাশ অপরিহার্য্য হইবে।"

এই সকল প্রসঙ্গের আলোচনার দুই সপ্তাহ পরে, এক দিন গভীর রাত্রিতে জোসেফের শয়নকক্ষের দ্বারদেশে কাহার করাঘাতের শব্দ হইল, সেই শব্দে জোসেফের নিদ্রাভঙ্গ হইল। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সলোমন কোহেনের বাস-গৃহের সর্ব্বোচ্চ তলের একটি কক্ষ জোসেফের শয়নের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, সেই কক্ষটি অট্টালিকার এক প্রান্তে অবস্থিত। সেই কক্ষের নিকটে অন্য কোন কক্ষ ছিল না, অন্যান্য কক্ষের সহিত তাহা সংস্রব-রহিত। এই কক্ষে সলোমন জোসেফের সহিত গুপ্ত পরামর্শ করিত, কেহ লুকাইয়া থাকিয়া তাহাদের পরামর্শ শুনিবে—তাহার সম্ভাবনা ছিল না বলিয়াই সলোমন এই কক্ষে জোসেফের শয়নের ব্যবস্থা করিয়াছিল।

দ্বারে পুনঃ পুনঃ করাঘাত-শব্দ শুনিয়া জোসেফ শয্যা হইতে উঠিয়া গিয়া নিঃশব্দে দ্বার খুলিয়া দিল। সে দেখিল, সলোমন কোহেন দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াইয়া আছে! তাহার পরিধানে গাউন, মাথায় কাল মখমলের টুপী, পায়ে চটি জুতা এবং হাতে একটি আঁধারে লণ্ঠন, তাহার ভিতর বাতি জ্বলিতেছিল।

সলোমন কোহেন, জোসেফের শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিল, তাহার পর নিম্নস্বরে বলিল, "তোমার সঙ্গে দুই একটা কথা আছে, জোসেফ।"

সেই গভীর রাত্রিতে সলোমন অত্যন্ত সতর্কভাবে এই কক্ষে প্রবেশ করিলেও, এক জন লোকের তীক্ষ্ণদৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারিল না। সে দ্বার রুদ্ধ করিবার অল্প কাল পরে এক জন লোক নিঃশব্দ পদসঞ্চারে দ্বারদেশে উপস্থিত হইল এবং দ্বারে কর্ণসংযোগ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল! অনেক সময় অতি সতর্কতায় সতর্কতার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়—এ ক্ষেত্রেও তাহাই হইল। সে যথাসাধ্য সতর্কতা অবলম্বন করিয়াও শত্রুপক্ষের গুপ্তচরের তীক্ষ্ণদৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারিল না।

সলোমন তাহার হাতের লণ্ঠনটা টেবিলের উপর রাখিয়া চেয়ারে বসিয়া পড়িল, তাহার পর তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চারি দিকে চাহিয়া নিম্নস্বরে বলিল, "জোসেফ, তুমি যে সুযোগের প্রতীক্ষা করিতেছিলে—এত দিনে সেই সুযোগ উপস্থিত।"

আনন্দে জোসেফের মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, উৎসাহে তাহার চক্ষু দুইটি মুহূর্ত্তের জন্য জ্বলিয়া উঠিল। সে স্পন্দিত বক্ষে আবেগ-কম্পিত-স্বরে বলিল, "উত্তম সংবাদ।"

সলোমন তাহার ভাবান্তর লক্ষ্য না করিয়া বলিল, "আমি বিশ্বস্তসূত্রে সংবাদ পাইলাম, আমাদের আরব্ধ কার্য্য দীর্ঘকাল পরে সফল হইবার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। সুখশান্তিহীন অভিশপ্ত দেশের হতভাগ্য নরনারীগণের যুগ-যুগব্যাপী দুঃখ-দুর্গতি মোচনের জন্য শীঘ্রই একটি অতি ভীষণ ষড়্‌যন্ত্র সফল করিবার চেষ্টা হইবে। এই ষড়্‌যন্ত্র কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য এত কাল ধরিয়া যে সকল উদ্যোগ আয়োজন চলিতেছিল—এখন তাহা সম্পূর্ণপ্রায়; দুই একটি কায মাত্র বাকী আছে। যদি আমাদের সৌভাগ্যক্রমে এই ষড়্‌যন্ত্র সফল হয়, তাহা হইলে সমগ্র সভ্যজগত বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইবে। এ দেশের শাসনপদ্ধতির এরূপ আমূল পরিবর্ত্তন হইবে—যাহা এখন পর্য্যন্ত সমগ্র য়ুরোপখণ্ডের স্বপ্নেরও অগোচর!"

জোসেফ স্পন্দিত-বক্ষে জিজ্ঞাসা করিল, "এই ষড়্‌যন্ত্রের উদ্দেশ্য কি?"

সলোমন কোহেন তৎক্ষণাৎ এই প্রশ্নের উত্তর না দিয়া পুনর্ব্বার সেই কক্ষের চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিল, তাহার পর

জোসেফের মুখের উপর নির্নিমেষ দৃষ্টি স্থাপিত করিয়া নিম্ন স্বরে বলিল, "রুস-সম্রাটের প্রাণসংহার !"

কথাটা শুনিয়া জোসেফের বুকের উপর যেন জোরে জোরে দুরমুসের ঘা পড়িতে লাগিল ! তাহার মুখ হঠাৎ নীল হইয়া গেল এবং তাহার সর্ব্বাঙ্গ কণ্টকিত হইল।

সলোমন কোহেন তাহার এই পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিল, সে বিস্মিত হইয়া বলিল, "বৎস, তোমার হৃদয় অতি কোমল। তোমার হৃদয়কে ইস্পাতের মত কঠিন করিতে হইবে। যদি এই কঠিন কার্য্যসাধনে তোমার মনে সঙ্কোচ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে এখনও তোমার প্রতি-নিবৃত্ত হইবার সময় আছে, আর পদমাত্র অগ্রসর হইলে ফিরিবার উপায় থাকিবে না। অসমসাহসী লোক ভিন্ন, এই সকল কঠিন কার্য্য অন্যের অসাধ্য ; যাহারা 'মরিয়া' হইতে না পারে, এ সকল কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে যাওয়া তাহাদের পক্ষে বিড়ম্বনা মাত্র! তুমি এখনও তোমার হৃদয়কে পাষাণে পরিণত করিতে পার নাই।"

সলোমনের কথা শুনিয়া জোসেফ লজ্জিত হইল, তাহার একটু রাগও হইল, সে মনে করিল—সলোমন তাহাকে কাপুরুষ মনে করিয়া অবজ্ঞাভরে এই ভাবে তিরস্কার করিল ! এই জন্য তাহার আত্মসম্মানে আঘাত লাগিল। সে রঙ্গমঞ্চের অভিনেতার মত বক্ষে করাঘাত করিয়া সগর্ব্বে বলিল, "মহাশয়, আপনি আমাকে ভুল বুঝিয়াছেন ! আমি স্বীকার করি, আমি বয়সে নবীন, স্বীকার করি, আমি প্রবীণের সুদীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারি নাই, কিন্তু সংসারে কত জন আমার মত আশাভঙ্গ হইয়াছে ? আমার মত আর কয় জনের জীবনের সকল সাধ, সকল কামনা ভাগ্য-বিড়ম্বনায় চূর্ণ হইয়াছে ?—জগতে এরূপ হতভাগ্য আর কয় জন আছে—যাহাদের হৃদয় আঘাতের পর আঘাতে, আমার হৃদয়ের মত অসাড় হইয়া গিয়াছে ! দয়া করিয়া আপনি আমাকে ভুল বুঝিবেন না, আমার সঙ্কল্পের দৃঢ়তায় ও নিষ্ঠায় আপনারা অনায়াসে নির্ভর করিতে পারেন। ন্যায়ের পক্ষ সমর্থন করিতেছি, এই বিশ্বাস লইয়া, যে কোন দুষ্কর ও ভীষণ কার্য্যভার গ্রহণ করিতে আমি সম্পূর্ণ প্রস্তুত আছি। মৃত্যুভয় আমাকে সঙ্কল্পচ্যুত করিতে পারিবে না—আমার এ কথা আপনি বিশ্বাস করুন।"

সলোমন কোহেন কোমল স্বরে বলিল, "বৎস, জোসেফ, তুমি মনে আঘাত পাও এ উদ্দেশ্যে আমি তোমাকে ও সকল কথা বলি নাই। আমি জানি, তোমার কর্ত্তব্যনিষ্ঠা প্রশংসনীয় ; জানি, তোমার সাহস ও সঙ্কল্পের দৃঢ়তায় আমি সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতে পারি। এখন তোমার সেই সাহস ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠার পরীক্ষাকাল সমুপস্থিত। কাল রাত্রি ১২টার সময় এই নগরের কোন নির্জ্জন পল্লীতে আমাদের সমিতির গুপ্ত অধিবেশন হইবে ; সেই অধিবেশনে কয়েকটি প্রয়োজনীয় বিষয়ের মীমাংসা হইবে। তোমাকে কোন কঠিন দায়িত্বভার প্রদানের প্রস্তাব হইবে। এই কার্য্যে তোমার জীবন বিপন্ন হইবে ; সম্ভবতঃ, তোমাকে জীবন উৎসর্গ করিতে হইবে ; কিন্তু তাহাতে আক্ষেপের কারণ নাই। স্বাধীনতা লাভের চেষ্টায় মৃত্যুকে বরণ করা গৌরবের বিষয়। এ দেশের কোটি কোটি অধিবাসী যথেচ্ছাচারী সম্রাটের কঠোর শাসনে মৃত্যুর অধিক যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে, তাহা হইতে তাহাদিগকে নিষ্কৃতি দানই আমাদের চরম লক্ষ্য।"

জোসেফ সলোমন কোহেনের কথা শুনিতে শুনিতে অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল ; সে মন সংযত করিয়া দৃঢ়স্বরে বলিল, "আমি মৃত্যুভয়ে কাতর নহি ; আমাকে যে কার্য্যভার প্রদান করা হইবে, তাহা সম্পন্ন করিতে কুণ্ঠিত হইব না।"

সলোমান কোহেন এবার চেয়ার হইতে উঠিয়া মহা উৎসাহে জোসেফের করমর্দ্দন করিল ; হাসিয়া বলিল, "বৎস, তোমার সাহস প্রশংসনীয়, পরমেশ্বর এই ভীষণ বিপদে তোমার জীবন রক্ষা করুন ; তুমি কার্য্যোদ্ধার করিয়া নির্ব্বিঘ্নে প্রত্যাগমন করিতে পারিলে আমি কত আনন্দিত হইব—তাহা তুমি বুঝিতে পারিবে না। কাল রাত্রি সাড়ে এগারটার সময় এই বাড়ী হইতে বাহির হইয়া রাজপথে উপস্থিত হইবে এবং পথের অপর প্রান্তে দৃষ্টিপাত করিলে ছিন্ন পরিচ্ছদধারিণী, রুক্ষকেশা, অনশনক্লিষ্টা একটি ভিখা-রিণীকে দেখিতে পাইবে। সে তোমাকে কোন কথা বলিবে না ; এমন কি, তোমাকে দেখিতে পাইয়াছে, এরূপ ভাবও প্রকাশ করিবে না। তুমি নিঃশব্দে তাহার অনুসরণ করিবে। সে যেন তোমার দৃষ্টি অতিক্রম করিতে না পারে। তাহার অনুসরণ করিয়া এক মাইল দূরে একটি

পুরাতন অট্টালিকার সম্মুখে উপস্থিত হইবে। তুমি অন্ধকারেই সেই অট্টালিকায় প্রবেশ করিবে। কয়েক মিনিট পরে একজন লোক তোমাকে লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিবে, 'কে যায়?' তুমি অসঙ্কোচে উত্তর দিবে, 'স্বাধীনতা।' এই শব্দটিই গুপ্ত সমিতিতে প্রবেশাধিকারের সাঙ্কেতিক নিদর্শন। সেই লোকটি তখন তোমার হাত ধরিয়া কতকগুলি সোপান পার করিয়া ভূগর্ভে লইয়া যাইবে, ভূগর্ভস্থ একটি কক্ষে প্রবেশ করিবে। সেই কক্ষেই কাল গুপ্তসমিতির অধিবেশন হইবে। তোমাকে যাহা যাহা করিতে হইবে, তাহা বলিলাম, কথাগুলি স্মরণ রাখিবে, এখন তুমি শয়ন করিতে যাও, আমার কিছুই বলিবার নাই।"

সলোমান কোহেনের কথা শেষ হইয়াছে বুঝিয়া যে লোকটি দ্বারে কর্ণসংযোগ করিয়া তাহাদের পরামর্শ শুনিতেছিল, সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া অতি সন্তর্পণে লঘু পদবিক্ষেপে অদৃশ্য হইল। সলোমান দ্বার খুলিয়া, যে পথে আসিয়াছিল, সেই পথে চলিয়া গেল। সেই গভীর নিশীথে কেহ যে চোরের মত গোপনে আসিয়া তাহাদের গুপ্ত পরামর্শ শুনিয়া গিয়াছে, সলোমানের মনে মুহূর্ত্তের জন্য এ সন্দেহ স্থান পাইল না।

সলোমান জোসেফকে শয়ন করিতে বলিল; কিন্তু দারুণ উত্তেজনায় তাহার মাথা গরম হইয়াছিল, শয়ন করিয়াও সে ঘুমাইতে পারিল না। তাহার সম্মুখে সুদীর্ঘ জীবন—কর্ম্মময় গৌরবময় বৈচিত্র্যময়; কত আশার, কত কামনার, কত আনন্দ ও বিষাদের, আলোক ও ছায়ার সুদৃশ্য চিত্র তাহার নিদ্রাহীন নয়নের সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া মিলাইয়া যাইতে লাগিল। সে দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া চক্ষু মুদিয়া বলিল, "এইবার বোধ হয় সব শেষ! রেবেকা! রেবেকা!"

বিংশ পরিচ্ছেদ

বোবা হিসাব-নবিশ

পরদিন জোসেফ যথানিয়মে তাহার দৈনন্দিন কায করিতে লাগিল বটে, কিন্তু তাহার অন্যমনস্ক ও বিষণ্ণভাব লক্ষ্য করিয়া অনেকে বিস্মিত হইল; সে মনের ভাব গোপন করিবার চেষ্টা করিল না।

সেই দিন রেবেকা তাহার পিতার নিকট জানিতে পারিল, গভীর রাত্রিতে নিহিলিষ্টদের গুপ্ত সমিতির যে অধিবেশন হইবে, সেই অধিবেশনে জোসেফকে উপস্থিত থাকিতে হইবে। এই সংবাদে রেবেকা অত্যন্ত ভীত ও উৎকণ্ঠিত হইল; তাহার মনে কষ্টও হইল। সে একবার গোপনে জোসেফের সহিত সাক্ষাতের জন্য উৎসুক হইল; কিন্তু সারাদিন নিভৃতে সাক্ষাতের সুযোগ হইল না। সন্ধ্যার পূর্ব্বে সে জোসেফের সহিত দেখা করিল।

রেবেকা জোসেফকে বিচলিতস্বরে বলিল, "শুনিলাম, আজই আমাদিগকে একটি ভীষণ অগ্নি পরীক্ষার সম্মুখীন হইতে হইবে; তোমাকেই না কি সেই প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে লাফাইয়া পড়িতে হইবে। এই শোচনীয় বিয়োগান্ত নাটকের তুমিই প্রধান নায়ক নির্ব্বাচিত হইয়াছ।"

রেবেকার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইল, তাহার বিচলিত কণ্ঠস্বর শুনিয়া, তাহার আবেগ ও উৎকণ্ঠা লক্ষ্য করিয়া, জোসেফ বুঝিতে পারিল, রেবেকা তাহাকে কত ভালবাসে, রেবেকার হৃদয়ের কতখানি অংশ সে অধিকার করিয়াছে। জোসেফ রেবেকার কথায় অত্যন্ত ব্যথিত ও বিচলিত হইয়া কম্পিতস্বরে বলিল, "তোমার কথা সত্য; বোধ হয় আজ রাত্রিতে আমার মৃত্যুর পারোয়ানা বাহির হইবে।"

রেবেকার বুকের ভিতর কাঁপিয়া উঠিল, তাহার চক্ষুতে আতঙ্কের চিহ্ন পরিস্ফুট হইল; সে অস্ফুটস্বরে বলিল, "অতি ভয়ানক কথা! তুমি কেন ইহাদের দলে যোগদান করিলে?"

জোসেফ বাহ্যিক ঔদাসীন্য প্রকাশ করিয়া, একটু হাসিয়া বলিল, "তাহাতে কাহার কি ক্ষতি?"

রেবেকা বলিল, "ক্ষতি? হাঁ ক্ষতি আছে বৈ কি! তোমার বয়স অল্প, তোমার জীবনের এখনও অনেক বাকি। তোমার জীবনের প্রভাতকাল মাত্র অতীত হইয়াছে; এখনও তুমি জীবন-মধ্যাহ্নে উপনীত হও নাই। এই অল্প বয়সেই তুমি কেন এরূপ নিরাশ হইয়াছ? জীবনকে এতই বিড়ম্বনাপূর্ণ ও ভারবহ মনে করিতেছ যে, যে ব্যাপারে তোমার ব্যক্তিগত স্বার্থ নাই, তাহাতে জড়াইয়া পড়িয়া আত্মোৎসর্গে উদ্যত হইয়াছ।"

জোসেফ ক্ষুব্ধ স্বরে বলিল, "রেবেকা, আমি 'মরিয়া' হইয়া এ কাজ করিয়াছি। জীবনের প্রভাতে মৃত্যুকে বরণ করিতে হইলে মানুষের মত মরাই ভাল। কুকুরের মত অন্যের মুখাপেক্ষী হইয়া বাঁচিয়া থাকায় লাভ কি?

রেবেকা বলিল, "বুঝিয়াছি, তোমার আশাভঙ্গ হইয়াছে, তুমি জীবনকে ব্যর্থ মনে করিতেছ। কিন্তু এত হতাশ হইয়াছ কেন? সকলের কি সকল আশা পূর্ণ হয়? আমি যে মনস্তাপ সহ্য করিতেছি, তাহার তুলনায় তোমার মনের কষ্ট অতি তুচ্ছ। তথাপি আমি জীবন রাখিয়াছি; আমি বাঁচিয়া থাকিতে চাই—কারণ আমার প্রতিহিংসা চরিতার্থ হয় নাই। অত্যাচারের প্রতিফল দিতে না পারিলে আমি মরিয়াও সুখী হইতে পারিব না।"

রেবেকার কথা শুনিয়া জোসেফের প্রচ্ছন্ন কৌতূহল প্রবল হইয়া উঠিল; সে বলিল, "রেবেকা, তোমার আশা-ভঙ্গের কারণ কি? তুমি এ কথা আমাকে বলিতে কি জন্য কুণ্ঠিতা? তোমার উপকার করিবার জন্য আমি পৃথিবীর অন্য প্রান্তে যাইতেও প্রস্তুত আছি। যদি কেহ তোমার অপকার করিয়া থাকে, আমি তাহার কুকর্ম্মের প্রতিফল দিব; না পারি, সেই চেষ্টায় প্রাণ বিসর্জ্জন করিব, কারণ আমি তোমাকে ভালবাসি। আমি যাহাই করি, আমার হৃদয়-ভরা প্রেম গোপন করিতে পারিব না। তোমার এই ভাই-ভগিনীর অভিনয় আমার অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। বিড়ম্বনা!"

রেবেকা ভগ্নস্বরে বলিল, "তুমি আর আমাকে প্রেমের কথা বলিও না, আমাকে ও কথা বলা নিষ্ফল। এ কথা ত আমি তোমাকে অনেক বার বলিয়াছি। তবে কেন পুনঃ পুনঃ ভালবাসার কথা বলিয়া আমার মনে কষ্ট দিতেছ?"

জোসেফ বলিল, "কিন্তু তুমি যে সত্যই আমাকে ভালবাস।"

রেবেকা মুখ ফিরাইয়া বলিল, "হাঁ, ভগিনী ভাইকে যেমন ভালবাসে।"

জোসেফ তাহার হাত ধরিয়া আবেগভরে বলিল, "ও কথা শুনিতে বেশ, কিন্তু তাহাতে প্রেমের ক্ষুধা মিটে না; তাহাতে তৃপ্তি নাই।"

রেবেকা অতি কষ্টে আত্মসংবরণ করিয়া হাত টানিয়া লইয়া বলিল, "তুমি তোমার অমূল্য জীবন নষ্ট করিও না, এখনও সতর্ক হও। সাধ করিয়া আগুনে ঝাঁপ দিও না। আমার অপমানকারীকে প্রতিফল দানের জন্যও তোমাকে বাঁচিয়া থাকিতে হইবে, এ কথা কি তোমাকে বলি নাই? আমি সত্যই বড় নির্য্যাতন ভোগ করিয়াছি; যে আমাকে পীড়ন করিয়াছে, তাহাকে তুমি যথাযোগ্য শাস্তি দান করিবে।"

জোসেফ। তোমার জীবন কি জন্য বিষময় হইয়াছে, তাহা কি আমাকে বলিবে না?

রেবেকা। এক দিন হয় ত বলিতে পারি, কিন্তু এখন নহে।

জোসেফ। এখন না বলিবার কারণ?

রেবেকা। নানা কারণে আমি তোমাকে এখন কৌতূহল দমন করিতে অনুরোধ করিতেছি। তুমি ধৈর্য্য অবলম্বন কর। এক দিন তুমি সকল কথাই জানিতে পারিবে। আমিই তোমাকে বলিব, কিন্তু এখন আমি কোন কথা প্রকাশ করিতে পারিব না।

রেবেকা জোসেফকে অন্য কোন প্রশ্ন করিবার অবসর না দিয়া হঠাৎ উঠিয়া প্রস্থান করিল। জোসেফ ম্রিয়মাণ ও হতাশ হইয়া পড়িল; জীবনের প্রতি আর তাহার মায়া-মমতা রহিল না। যেন একটা প্রচণ্ড ঝটিকা আসিয়া তাহার জীবন-তরণীর বন্ধন-রজ্জু ছিঁড়িয়া, তাহা অকূলে ভাসাইয়া লইয়া চলিল। তাহা ডুবিয়া যাউক বা অসীম পারাবারে ভাসিয়া যাউক, ফল সমান বলিয়াই তাহার মনে হইল। জোসেফ অন্ধকারাচ্ছন্ন নিভৃত কক্ষে একাকী বসিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "আজ আমার ভাগ্যফল নির্ণীত হইবে।" কিন্তু তাহার অদৃষ্টে কি আছে, তাহার পরিণাম কি, তাহা সে অনুমান করিতে পারিল না।

সলোমন কোহেনের একটি রুস-কর্ম্মচারী ছিল, তাহার নাম আলেকজান্দার কাল্‌নকি। দুই বৎসর হইতে সে সলোমনের হিসাব-রক্ষকের কর্ম্মে নিযুক্ত ছিল। সে সলোমনের বাস-গৃহেই বাস করিত। সলোমন তাহাকে বিশ্বাসী কর্ম্মচারী বলিয়াই জানিত, কিন্তু ব্যবসায় সংক্রান্ত কার্য্য ভিন্ন তাহার সহিত অন্য কোন প্রসঙ্গের আলোচনা করিত না। সলোমন তাহাকে একটু শ্রদ্ধা করিত, এ জন্য কোন কোন বিষয়ে অন্যান্য কর্ম্মচারী অপেক্ষা তাহার কিঞ্চিৎ স্বাধীনতা ছিল। লোকটা অত্যন্ত অল্পভাষী বলিয়া সকলে তাহাকে 'বোবা হিসাবনবিশ' বলিয়া বিদ্রূপ করিত। কিন্তু সে কাহারও উপহাসে কর্ণপাত করিত না। সে উত্তর-রুসিয়া হইতে সেণ্টপিটার্সবর্গে চাকরী করিতে

আসিয়াছিল, কিন্তু কেহই তাহার জীবনের ইতিহাস জানিত না। সে অনেক বড় লোকের প্রশংসাপত্র ও সুপারিশ-চিঠি আনিয়াছিল; সেই সকল চিঠিপত্রে নির্ভর করিয়া সলোমন কোহেন তাহাকে চাকরীতে নিযুক্ত করিয়াছিল। হিসাবের কার্য্যে সে সুদক্ষ ছিল এবং তাহার সতর্কতায় অন্য কোন কর্ম্মচারী কোহেনের ক্ষতি করিতে পারিত না। সে নিজের সম্বন্ধে কোন কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিত না। প্রভুর স্বার্থই তাহার একমাত্র লক্ষ্য ছিল। লোকটি সুপুরুষ, চক্ষু দুইটি উজ্জ্বল, চুলগুলি গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ। অল্পভাষী, চতুর এবং খাঁটি লোক বলিয়া সকলে তাহাকে সমীহ করিয়া চলিত। সলোমনের সংসারের অতি সামান্য বিষয়ও তাহার তীক্ষ্ণদৃষ্টি অতিক্রম করিত না। কোন বিষয়ে তাহাকে বিস্ময় প্রকাশ করিতে দেখা যায় নাই এবং তাহার হৃদয়ে কোন সুকুমার বৃত্তি আছে. ইহা বিশ্বাস করিতে কাহারও প্রবৃত্তি হইত না। কিন্তু কথাটা সত্য নহে, কারণ খেজুর গাছের মত তাহার বহির্ভাগ নীরস হইলেও তাহার অন্তরে রস ছিল। সে তাহার প্রভু-কন্যা রেবেকাকে ভালবাসিয়াছিল।

কাল্‌নকিকে লোকে বোবা বলিয়া উপহাস করিলেও রেবেকার সহিত আলাপ করিবার সুযোগ সে কখন ত্যাগ করিত না। তাহার উজ্জ্বল চক্ষু দুইটি সর্ব্বদা ব্যাকুলভাবে রেবেকার অনুসরণ করিত। অরসিক বলিয়া তাহার দুর্নাম থাকিলেও, রেবেকার মনোরঞ্জনের জন্য সে কোন দিন চেষ্টার ত্রুটি করে নাই। কিন্তু সে বেচারা রেবেকার মনের উপর বিন্দুমাত্র প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। রেবেকা তাহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া মনে মনে হাসিত এবং মজা দেখিবার জন্য কখন কখন তাহার সহিত রসিকতা করিত। তখন কাল্‌নকির মনে হইত, সে আকাশের চাঁদ হাতে পাইয়াছে! রেবেকা সত্যই তাহার প্রেমে মজিয়া গিয়াছে। রেবেকা সলোমনের একমাত্র কন্যা, তাহার বিপুল সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী, সুতরাং কাল্‌নকি অনেক সময় 'আকাশে কিল্লা বানাইয়া' আত্ম-প্রসাদ উপভোগ করিত। রেবেকা তাহাকে প্রকাশ্যভাবে অবজ্ঞা করিত না, বরং তাহাকে মিষ্ট কথায় প্রতারিত করিয়া আনন্দ উপভোগ করিত। কাল্‌নকি ইহাতে সাহস পাইয়া এক দিন রেবেকাকে বলিয়া ফেলিল, "আমি তোমাকে বড্ড ভালবাসি, আমাকে তোমার গোলাম করিয়া লও, আমি কৃতার্থ হই। বল আমাকে বিবাহ করিবে?"

তাহার স্পর্দ্ধায় রেবেকা প্রথমে হতবুদ্ধি হইয়া রহিল, তাহার পর তাহার হৃদয় ক্রোধে পূর্ণ হইল, সে বুঝিতে পারিল—কুকুরকে 'নাই' দিয়া বড়ই কুকর্ম্ম করিয়াছে! কিন্তু সে মনের ভাব গোপন করিয়া বলিল—তাহাদের বিবাহের সম্ভাবনা নাই, কাল্‌নকি যেন তাহাকে লাভ করিবার আশা ত্যাগ করে।

কিন্তু কাল্‌নকি রেবেকার কথা বিশ্বাস করিল না। তাহার ধারণা হইল—রেবেকার অসম্মতি মৌখিক মাত্র; তাহার ন্যায় সুপুরুষ সলোমনের হিতাকাঙ্ক্ষী সেবক রেবেকাকে বিবাহ করিতে চাহিতেছে—ইহা রেবেকার সৌভাগ্য! অবশেষে যখন সে বুঝিল, রেবেকা তাহাকে ভালবাসে না, তাহাকে মিষ্ট কথায় প্রতারিত করিয়াছে—তখন তাহার রাগ হইল; কাল্‌নকি প্রতিজ্ঞা করিল, এই দুর্ল্লভ রত্ন লাভের জন্য সে শেষ পর্য্যন্ত চেষ্টা করিবে, ইহাতে সলোমন সর্ব্বস্বান্ত হয়—তাহাকে পথে বসিতে হয়, তাহাতেও আপত্তি নাই। কিন্তু সে মুখে কোন কথা বলিল না, বা আর কোন দিন রেবেকার নিকট প্রেম প্রকাশ করিল না। সে অত্যন্ত দুঃখিতভাবে হতাশ হৃদয়ে তাহার কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে লাগিল। কি অনলে তাহার হৃদয় দগ্ধ হইতেছে, কাল্‌নকি তাহা কাহাকেও বুঝিতে দিল না।

কাল্‌নকি রেবেকাকে ভালবাসিয়াছে বা তাহাকে বিবাহ করিবার জন্য ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে—রেবেকা এ কথা তাহার পিতার নিকট প্রকাশ করিল না, নিতান্ত তুচ্ছ কথা ভাবিয়া সে তাহা উপেক্ষা করিল। বিশেষতঃ, সলোমন কোহেন নিজের কায-কর্ম্ম লইয়া সর্ব্বদা এরূপ ব্যস্ত থাকিত যে, রেবেকা এই সকল বাজে কথার আলোচনায় তাহার সময় নষ্ট করা অত্যন্ত অসঙ্গত মনে করিল। এই জন্য সলোমন কিছুই জানিতে পারিল না। তাহার কন্যা কর্তৃক উপেক্ষিত হইয়া তাহার বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী শত্রু হইয়া উঠিতে পারে, এ কথা জানিতে পারিলে সলোমন সতর্ক হইবার সুযোগ পাইত, কিন্তু রেবেকার অদূরদর্শিতায় সে সেই সুযোগে বঞ্চিত হইল, ইহা তাহার পরম দুর্ভাগ্যের বিষয়।

কাল্‌নকি প্রত্যাখ্যাত হইয়া হা-হুতাশ করিয়া মরিতেছে না, রেবেকার সহিত হাস্যালাপে বিরত হইয়া গম্ভীরভাবে নিজের কায-কর্ম্ম করিয়া যাইতেছে দেখিয়া রেবেকা ভাবিল, তাহার রূপের নেশা কাটিয়া গিয়াছে, সে নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া সতর্ক হইয়াছে—ভবিষ্যতে আর তাহাকে বিরক্ত করিবে না। সুতরাং রেবেকা তাহার সম্বন্ধে অনেকটা নিশ্চিন্ত হইল। সে কি চরিত্রের লোক, কিরূপ কুটিল ও স্বার্থপর, ইহা রেবেকা বুঝিতে পারে নাই। তাহার এই ভ্রমের ফল কিরূপ বিষময় হইবে, রেবেকার তাহা ধারণা করিবার শক্তি ছিল না।

কাল্‌নকি রেবেকাকে বিবাহের প্রস্তাব করিয়া প্রত্যাখ্যাত হইয়াছিল, জোসেফ কুরেট ইহা জানিতে পারে নাই। জোসেফ নিজের কায-কর্ম্ম লইয়া ব্যস্ত থাকিত, সে কাল্‌নকিকে চিনিলেও, তাহাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা ছিল না। জোসেফ যে রাত্রিতে গুপ্তসমিতির অধিবেশনে যোগদানের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল, সেই দিন অপরাহ্নে কাল্‌নকি তাহাকে পথের দিকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া তাহার সম্মুখে আসিয়া বলিল, "তোমার সঙ্গে গোপনে আমার দুই একটি কথা আছে।"

জোসেফ সবিস্ময়ে বলিল, "আমার সঙ্গে?"

কাল্‌নকি গম্ভীরস্বরে বলিল, "হাঁ, জোসেফ কুরেট, তোমারই সঙ্গে।"

জোসেফ কাল্‌নকির মুখের উপর সন্দিগ্ধচিত্তে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "কি কথা?"

কাল্‌নকি বলিল, "আধ ঘণ্টার জন্য আমার সঙ্গে আসিতে পারিবে না? চলিতে চলিতেই তাহা শুনিতে পাইবে।"

উভয়ে একত্র চলিতে আরম্ভ করিল, কয়েক মিনিট পরে কাল্‌নকি হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি রেবেকা কোহেনের সঙ্গে প্রেমালাপ আরম্ভ করিয়াছ?"

জোসেফ কাল্‌নকির এই অশিষ্ট প্রশ্নে এতই বিস্মিত ও বিরক্ত হইল যে, দুই এক মিনিট সে কথা বলিতে পারিল না, জোসেফ থমকিয়া দাঁড়াইয়া, হতবুদ্ধি হইয়া কাল্‌নকির মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার পর হঠাৎ সন্দেহ হইল—কাল্‌নকিও রেবেকার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী, সুতরাং তাহাকে প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করিয়া ক্রুদ্ধ হইয়াছে।

জোসেফ, কাল্‌নকির প্রশ্নের উত্তর না দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি কোন দিন রেবেকা কোহেনকে ভালবাসা জানাইয়াছ?"

কাল্‌নকি ক্রোধে উত্তেজিত হইয়া বিচলিত স্বরে বলিল, "আমি তোমাকে যে প্রশ্ন করিয়াছি, তোমার ও কথা তাহার উত্তর নহে। হাঁ, আমি আমার প্রশ্নের উত্তর চাহি, আমার দাবী পূর্ণ কর।"

জোসেফ ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া বলিল, "দাবী! কিসের দাবী?"

কাল্‌নকি বলিল, "উত্তরের দাবী। কিন্তু তুমি আমাকে ভুল বুঝিও না, তোমার সঙ্গে আমার ঝগড়া করিবার ইচ্ছা নাই। আমি জানি, তুমি রেবেকা কোহেনকে প্রেমের কথা বলিয়া ভুলাইবার চেষ্টা করিতেছ, কিন্তু সে তোমাকে বিন্দুমাত্রও আশা-ভরসা দিয়াছে কি না, ইহাই তোমার কাছে জানিতে চাই।"

জোসেফ ভুল বুঝিল, সে মনে মনে বলিল, "তাই বটে! রেবেকা এই লোকটাকে ভালবাসিয়া ফেলিয়াছে, এই জন্যই সে আমার হৃদয়-ভরা প্রেম প্রত্যাখ্যান করিয়াছে! ওঃ, এই সহজ কথাটা এত দিন বুঝিতে পারি নাই!"—তাহার দুর্ভাগ্য, সে রেবেকার হৃদয়ের পরিচয় পাইয়াও, এতদিনেও তাহাকে চিনিতে পারিল না। এই রুসিয়ানটাকে তাহার প্রণয়ী মনে করিয়া ক্রোধে ও ক্ষোভে উত্তেজিত হইয়া উঠিল! ইহার ফল কিরূপ শোচনীয় হইতে পারে, তাহাও সে ভাবিয়া দেখিবার অবসর পাইল না। দুই একটি প্রশ্নের বাঁকা উত্তর না দিলে জোসেফ যাহাকে বন্ধুশ্রেণীভুক্ত করিতে পারিত, কথার দোষে সে তাহার মহাশত্রু হইল!

জোসেফ মুহূর্ত্তকাল নীরব থাকিয়া বলিল, "আমি তোমাকে এইমাত্র বলিতে পারি—রেবেকা কোহেন আমাকে ঘৃণা করে না।"

জোসেফের কথা শুনিয়া কাল্‌নকি ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল। তাহার কৃষ্ণবর্ণ চক্ষুতারকা হইতে ক্রোধানল বিকীর্ণ হইতে লাগিল। কাল্‌নকির ধারণা হইল, রেবেকা জোসেফ কুরেটকে ভালবাসে বলিয়াই তাহার প্রেম প্রত্যাখ্যান করিয়াছে! নিদারুণ উত্তেজনায় সে উভয় হস্ত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া জোসেফকে বিকৃতস্বরে বলিল, "তোমাকে হত্যা করিলে আমার মনের জ্বালা জুড়াইত।"

কাল্‌নকির ভাব-ভঙ্গী দেখিয়া ও কথা শুনিয়া জোসেফ দুই হাত দূরে সরিয়া দাঁড়াইল, সবিস্ময়ে বলিল, "আমাকে হত্যা করিবার জন্য তোমার এরূপ আগ্রহের কারণ কি ?"

কাল্‌নকি উত্তেজিত স্বরে বলিল, "এখনও তাহার কারণ বুঝিতে পার নাই ? তুমি আমার প্রণয়-পথের দুর্লঙ্ঘ্য বাধা, আমি যাহাকে বিবাহ করিয়া সুখী হইতে পারিতাম, তুমি তাহাকে আমার নিকট হইতে কাড়িয়া লইবার চেষ্টা করিতেছ ! তুমি হঠাৎ কোথা হইতে আসিয়া আমার জীবনের সুখশান্তি হরণ করিতে উদ্যত হইয়াছ। তোমার এই ধৃষ্টতা আমি ক্ষমা করিতে প্রস্তুত নহি। তোমাকে হত্যা না করিলে আমার মনের জ্বালা জুড়াইবে না।"

রেবেকা কাল্‌নকিকে ভালবাসে বলিয়াই তাহার প্রেম প্রত্যাখ্যান করিয়াছে, এ বিষয়ে জোসেফের আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ রহিল না ! তাহার হৃদয়েও সুতীক্ষ্ণ ঈর্ষানল জ্বলিয়া উঠিল। কেহই নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিল না ! রেবেকা তাহাদের উভয়েরই প্রেম প্রত্যাখ্যান করিয়াছে, ইহা বুঝিতে পারিলে তাহাদের বিবাদ আর অধিক দূর অগ্রসর হইত না। কিন্তু একই নারীর প্রতি আসক্ত যুবকদ্বয়ের মন সুযুক্তিতে আকৃষ্ট হইল না। উভয়েই পরস্পরকে মহাশত্রু মনে করিতে লাগিল।

জোসেফ কঠোরস্বরে বলিয়া উঠিল, "তুমি রেবেকাকে ভালবাস ; হাঁ, নিশ্চয়ই ভালবাস ! কিন্তু তোমার মত একটা বর্ব্বর বিদেশীকে ভালবাসার পরিণাম কি, তাহা একদিন সে বুঝিতে পারিবে। সুতীব্র অনুশোচনার আগুনে তাহার জীবনের সকল সুখশান্তি ভস্মীভূত হইবে।"

কাল্‌নকি জোসেফের এই তীব্র মন্তব্য সহ্য করিতে পারিল না, সে তৎক্ষণাৎ জোসেফের সম্মুখে লাফাইয়া পড়িয়া দুই হাতে তাহার গলা টিপিয়া ধরিল ! কিন্তু জোসেফ কাল্‌নকি অপেক্ষা বলবান ও ব্যায়ামে সুনিপুণ ছিল, জোসেফ তাহার কবল হইতে অবলীলাক্রমে মুক্তি লাভ করিয়া উভয় হস্তে তাহাকে ঊর্দ্ধে তুলিল এবং অদূরবর্ত্তী অট্টালিকা প্রাচীরে সবলে নিক্ষেপ করিল।

সেই সময় দুই জন পথিক সেই পথে অগ্রসর হইতেছিল, কাল্‌নকি প্রাচীরগাত্রে নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র তাহারা ঘটনা-স্থলে উপস্থিত হইয়া, যুবকদ্বয়ের কলহের কারণ জানিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিল, জোসেফ তাহাদের নিকট কোন কথা প্রকাশ করা অসঙ্গত মনে করিয়া নিঃশব্দে সেই স্থান ত্যাগ করিল। কাল্‌নকি আহত হইলেও অতি কষ্টে ধরাশয্যা ত্যাগ করিল, আঘাতের বেদনা অপেক্ষা পরাজয়ের হীনতায় সে অধিকতর কাতর হইল। সে পথিকদ্বয়ের কোন প্রশ্ন কানে না তুলিয়া টলিতে টলিতে জোসেফের অনুসরণ করিল, এবং তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া ঘুসি তুলিয়া বলিল, "শোন জোসেফ কুরেট, আজ তুমি আমার প্রতি যে ব্যবহার করিলে, তোমাকে ইহার অতি ভীষণ প্রতিফল ভোগ করিতে হইবে।"

জোসেফ তখন রাগে থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল ; তাহার সংযম বিলুপ্ত হইয়াছিল। সে তীব্র স্বরে বলিল, "আমাকে ভয় দেখাইতে তোমার লজ্জা হইতেছে না ? পুনর্ব্বার যদি আমার অঙ্গস্পর্শ কর, তাহা হইলে আমি তোমাকে মাটীতে ফেলিয়া পিষিয়া মারিব।"

কাল্‌নকি বলিল, "গুণ্ডামীতে আমি অনভ্যস্ত ; ইতর গুণ্ডার মত মারামারি করিয়া লোক হাসাইবার জন্য আগ্রহও আমার নাই। কিন্তু পুনর্ব্বার বলিতেছি, তোমাকে অতি কঠিন শাস্তি পাইতে হইবে ; তোমার হৃদয়ের শোণিতের বিনিময়ে এই অপমানের ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে। তুমি জান না আমি তোমাকে মুঠায় পুরিয়াছি ; আমার কবল হইতে তোমার নিস্তারলাভের উপায় নাই।"

কাল্‌নকি সবেগে প্রস্থান করিল। তাহার শেষ কথাগুলির মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া জোসেফ অত্যন্ত ভীত ও উৎকণ্ঠিত হইল। কাল্‌নকির স্পর্দ্ধিত উক্তি কি অর্থহীন প্রলাপ ? জোসেফ ইহা বিশ্বাস করিতে পারিল না ; তাহার সন্দেহ হইল, কাল্‌নকি কোন কৌশলে তাহার গুপ্ত কথা জানিতে পারিয়াছে ! ইহার ফল কিরূপ শোচনীয় হইতে পারে চিন্তা করিয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গ ভয়ে কণ্টকিত হইয়া উঠিল। ভাবিয়া সে কিছুই স্থির করিতে পারিল না ; অবশেষে সে মনে মনে বলিল, "কাল্‌নকি ক্রোধান্ধ হইয়া ও কথা বলিয়া গেল ; উহার কথার কোন মূল্য নাই ! সে আমার কি অনিষ্ট করিবে ? আমার গুপ্ত কথা তাহার জানিবার সম্ভাবনা কোথায় ?"

কিন্তু মনে মনে এইরূপ তর্ক বিতর্ক করিয়া জোসেফ নিশ্চিন্ত হইতে পারিল না। কি একটা আশঙ্কা ও উদ্বেগ

তাহার মনের ভিতর কাঁটার মত বিঁধিয়া রহিল। অবশেষে সে গৃহে উপস্থিত হইয়া মনে মনে এই সকল কথারই আলোচনা করিতে লাগিল। প্রায় এক ঘণ্টা পরে জোসেফ রেবেকার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "আলেকজান্দার কাল্‌নকি সম্বন্ধে তুমি সকল কথা জান কি?"

রেবেকা জোসেফের প্রশ্নে হঠাৎ অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া উঠিল, তাহার মুখ শুকাইয়া গেল, সে চঞ্চলভাবে অস্ফুটস্বরে বলিল, "তুমি ও কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ কেন?"

জোসেফ বলিল, "কারণ আছে; আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিবে না?"

রেবেকা মিনিট দুই নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিল, "আমি যাহা জানি, তাহা তোমার নিকট প্রকাশ করিতে বাধা নাই। কাল্‌নকি একবার আমার নিকট বিবাহের প্রস্তাব করিয়াছিল; কিন্তু আমি তাহা প্রত্যাখান করিয়াছিলাম।"

জোসেফ সহজস্বরে বলিল, "আমি তাহা জানি।"

রেবেকা ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিল, "তুমি জান? এ কথা তুমি কিরূপে জানিলে?"

জোসেফ বলিল, "কাল্‌নকিই আমাকে বলিয়াছে।"

জোসেফ সকল বিবরণ সবিস্তার রেবেকার গোচর করিল। তাহার পর সে রেবেকাকে স্তব্ধভাবে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া বলিল, "কাল্‌নকি আমাকে যে কথা বলিয়া ভয় দেখাইয়াছে, তাহাতে সত্যই কি ভয়ের কারণ আছে?" রেবেকা মুখ ভার করিয়া বলিল, "না আমার ত সেরূপ মনে হয় না। অপমানিত হইলে লোকে কত কথা বলিয়া ভয় দেখায়, তাহার মূলে কি সত্য থাকে? আমার বিশ্বাস, সে আমাদের কোন গুপ্ত সংবাদ জানে না। সে আর তোমার প্রতি অত্যাচার করিবার চেষ্টা করিবে না, কারণ সে তোমার বলের পরিচয় পাইয়াছে। সুতরাং তুমি কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিতে পার।"

এ কথায় জোসেফ অপেক্ষাকৃত নিশ্চিন্ত হইল; কিন্তু তাহার মনের খট্‌কা দূর হইল না। সে সঙ্কল্প করিল, কাল্‌নকির গতিবিধির প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিবে; এবং তাহার সন্দেহের কথা শীঘ্রই সলোমন কোহেনের গোচর করিয়া তাহাকে সতর্ক করিবে। সলোমন নিহিলিষ্ট, এ কথা যদি কাল্‌নকি জানিতে পারিয়া থাকে, তাহা হইলে সকলেরই সর্ব্বনাশ অনিবার্য্য।

[ক্রমশঃ।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

কবে?

আমার স্রোত ফুরাবে কবে
আমার কৈ রে পারাবার?
আমার পথের অন্ত হবে কবে,
আমার কৈ রে পুরীর দ্বার?
ফুটবে কবে আমার কমল-কলি,
আমার কৈ উষা, কৈ রবি?
কৈ সুধাকর, প্রাণ-চকোরের মম
তৃষা মিট্‌বে কবে সবি?
কত দেশ ঘুরব লতা হয়ে,
আমার কৈ রে সে বিটপী;—
তাহার পায়ে, জড়াবো তার গায়ে
কবে আমায় তারে সঁপি?

মরি আমি মরীচিকার মৃগ,
দূরে কত দূরে জল?
জ্বলে তৃষার তুষানলে দেহ,
হ'ব কখন সুশীতল?
গ্রীষ্মে আমার যায় পৃথিবী জ্বলে,
কবে আস্‌বে রে বরষা?
বসন্ত রে আস্‌বে কবে, শীতে
প্রাণের নাই কিছু ভরসা!
নৌকা আমার ছুট্‌ছে অকূলেতে,
কবে কূলের পাব দেখা?
কখন পাব প্রাণের সাথীরে যে,
আমি রইতে নারি একা।

শ্রীদুর্গামোহন কুশারী।

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস

উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব-বিভাগ

বারাণসী হিন্দু বিশ্ব-বিদ্যালয়ে উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব-বিভাগে এই সভার অধিবেশন হয়; সভাপতি—অধ্যাপক আর, এস্, ইনামদার, বি এ, বি এ জি। ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত হইতে বহু গণ্য-মান্য বৈজ্ঞানিক এই বিভাগে যোগদান করিতে আসিয়াছিলেন; তাঁহাদের মধ্যে মিঃ ও মিসেস্ হাওয়ার্ড, ডাঃ সাহ্‌নি, ডাঃ অগর্‌কার্, অধ্যাপক কাশ্যপের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। সুপ্রসিদ্ধ উদ্ভিদ্ বৈজ্ঞানিক সার জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের উপস্থিতিতে সভার গৌরব যে সমধিক বৃদ্ধি পাইত, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। উদ্ভিদ্‌-তত্ত্বের প্রত্যেক বিষয় সম্বন্ধে গবেষণা-মূলক প্রবন্ধ পঠিত ও আলোচিত হয়। হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ইনামদার ও তাঁহার সহকর্ম্মীদের কর্ত্তৃক লিখিত সাতটি মৌলিক প্রবন্ধ আলোচিত হয়। ডাঃ অগর্‌কার্ পূর্ব্ব-নেপালের বহু স্থান গত চারি বৎসরে ভ্রমণ করিয়া সেই সকল স্থানের উদ্ভিদ্-বৃত্তান্ত প্রকাশ করেন। হিমালয়ের উদ্ভিদের পরিচয় তাঁহার মৌলিক প্রবন্ধ হইতে আমরা পাই। সর্ব্বসমেত ৫৬টি মৌলিক প্রবন্ধ এই বিভাগে পঠিত হইয়াছিল।

সভাপতি তাঁহার অভিভাষণে "উদ্ভিদের মধ্যে শারীরিক ক্রিয়ার স্বয়ং ব্যবস্থা" (Auto regulation of Physiological Processes in Plants) সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। নির্জ্জীব পদার্থ-নিচয় যেরূপ রসায়ন ও পদার্থ-শাস্ত্রীয় নিয়মের বশীভূত, জীবিত পদার্থ সেইরূপই বশীভূত। কিন্তু জীবিতের মধ্যে এত প্রকার জটিল ক্রিয়া হইতে থাকে যে, প্রথমে মনে সন্দেহ হয় না যে, তাহারা ঐ সকল নিয়ম পালন করিয়া চলে না। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। নানা প্রকার শারীরিক ক্রিয়ার (Physiological processes) প্রকৃতি ও কার্য্যের আলোচনা করিয়া সার জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের "Law of Product" যে সঠিক নহে, ইহা তিনি প্রকাশ করেন। হিন্দু বিশ্ব-বিদ্যালয়ের Laboratoryতে এই বিষয়ে তিনি বহু পরীক্ষা করিয়াছেন; সেই সকল পরীক্ষা হইতে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, উদ্ভিদের মধ্যে যে সকল নিয়ামক ঘটনা (Regulatory Phenomena) দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারা আপনা আপনি হইয়া থাকে; অন্য কোন ক্রিয়ার উপর নির্ভর করে না। উদ্ভিদের মধ্যে বিভিন্ন শারীরিক ক্রিয়ার পরস্পরের সম্বন্ধ তিনি বিশেষ করিয়া বর্ণনা করেন এবং বলেন, এই সকল ক্রিয়ার এক-মাত্র উদ্দেশ্য—যাহাতে উদ্ভিদ্‌টি সম্যকরূপে বৃদ্ধি পায়। একটি উদ্ভিদকে কেবলমাত্র জীবিত পদার্থ বলিয়া ভাবিলে চলিবে না, পরন্তু ভাবিতে হইবে যে, তাহারা রাসায়নিক ও পদার্থ-বিদ্যা-সম্বন্ধীয় বিভিন্ন ক্রিয়ার ফলে সৃষ্ট বস্তু। তাঁহার মতে এই বিষয়ের ব্যবহারিক ও অব্যবহারিক উভয় দিকেরই যথেষ্ট চর্চ্চা হওয়া আবশ্যক। উপবর্গের (Species) উৎপত্তি ও ক্রম-বিকাশ, জীবিত প্রাণীর নির্ম্মাণ-বিধান ইত্যাদি প্রশ্নের সমাধান অব্যবহারিক (Theoretical) দিক চর্চ্চা করিলে করা যাইতে পারে। ব্যবহারিক (Practial) বিষয়গুলি সমাধান করিতে হইলে এই বিষয়ে যাঁহারা গবেষণায় নিযুক্ত, তাঁহাদিগের সহিত ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের সরকারী কৃষি-বিভাগের কর্ম্মচারীদিগের সহযোগিতা একান্ত আবশ্যক। সভাপতি মহাশয় আশা করেন যে, অদূর-ভবিষ্যতে এরূপ সহযোগিতা নিশ্চিতই হইবে।

নৃতত্ত্ব-বিভাগঃ—(Anthropology)

সভাপতি—অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ এম,এ (ক্যাণ্টাব) এই বিভাগে ২২টি মৌলিক প্রবন্ধ গৃহীত হইয়াছিল। "স্মৃতিস্তম্ভ" শীর্ষক প্রবন্ধটি প্রথমে পঠিত হয়। মহীশূর প্রদেশান্তর্গত হালগুর, এবং চেমাপুতনার (Chemaputna) সন্নিকটবর্ত্তী কয়েকটি স্থানে বহু প্রাচীন কতকগুলি স্মৃতি-স্তম্ভ দেখা যায়। মিঃ বি, রাও ঐ সকল স্মৃতিস্তম্ভের সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া তাহাদের বয়স এবং শ্রেণী বিভাগ করেন; তিনি প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে তাহাদিগকে বিভক্ত করিয়াছিলেন,—(১) সমাধিস্তম্ভ (২) বীরোপাসক স্তম্ভ (৩) দেবতার আবাসভূমিজনিত স্মৃতিস্তম্ভ।

দ্বিতীয় প্রবন্ধটি মিঃ সম্পৎ আয়েঙ্গার মহাশয় রচনা করিয়াছিলেন। তিনি বহু প্রাচীন কালের কতকগুলি ধাতু-নির্ম্মিত যন্ত্রাদি অবিষ্কার করিয়াছেন; তন্মধ্য হইতে প্রায় ৪০টি সভায় প্রদর্শন করেন। ঐ শ্রেণীর আধুনিক যন্ত্রাদি অপেক্ষা তাহারা কোন অংশে হীন নহে। তিনি প্রমাণ করেন, বহুপূর্ব্বে দক্ষিণ-ভারতে লৌহের কারখানা ছিল; তথায় সকল প্রকার যন্ত্রাদি নির্ম্মিত হইত।

ধীরেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয় মধ্য-ভারতের কোল, মুণ্ডা প্রভৃতি জাতিদের ধর্ম্ম, রীতি, আচার, সঙ্গীতচর্চ্চা ইত্যাদি আলোচনা করিয়া তাঁহার গবেষণা ৪টি মৌলিক প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করেন। ঐ সকল জাতি উল্কি পরিতে বড় ভালবাসে; ইহার কারণ উল্লেখে তিনি দেখাইয়াছেন যে, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিবার জন্যই উল্কির প্রচলন; উহা ধর্ম্মের অন্তর্গত বলিয়া নহে। কোলদের ধর্ম্ম সম্বন্ধে তিনি বিশেষ আলোচনা করিয়াছেন। প্রধান বঙ্গা (হিতকারী ও অহিতকারী ভূতযোনি) দিগের স্বরূপ ও কার্য্যাবলী, এবং "মাঘো" (শীত), "বা" (বসন্ত), "দেসউলি বঙ্গা" (বীরপূজা), "জন্নাম" ইত্যাদি প্রচলিত উৎসবের বিবরণী প্রকাশ করেন। বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত কয়েক শত কোলের দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি পরিমাপ করিয়া তাহাদিগের শারীরিক গঠনের বিশেষত্ব তিনি দেখাইয়াছিলেন; পরিশেষে কোলদের সঙ্গীতাদি আলোচনা করিয়া মজুমদার মহাশয় তাঁহার বক্তব্য সমাপ্ত করেন। অবশিষ্ট যে সকল প্রবন্ধ পঠিত হইয়াছিল, তাহার মধ্যে মিঃ আয়েঙ্গারের মহীশূরের যোগী সম্প্রদায়ের আচার-ব্যবহার-সংবলিত প্রবন্ধটি উল্লেখযোগ্য। (Race mixture in Bengal) "বাঙ্গালায় বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণ" বিষয়ে সভাপতি মহাশয় বক্তৃতা করেন; তাঁহার বক্তব্য ম্যাজিক লণ্ঠন সাহায্যে সুন্দরভাবে সরস করিয়া তুলিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের বহু জাতির (Caste) এবং সম্প্রদায়ের (Tribe) শারীরিক গঠনের পরিমাপ তিনি সংগ্রহ করিয়াছেন; ইহা হইতে তিনি অনুমান করেন যে, বিভিন্ন জাতির মধ্যে যে সাদৃশ্য দেখা যায়, তাহার কারণ সহজে প্রমাণ করিতে পারা যায় না; তাঁহার মতে ভারতের প্রত্যেক বর্ণের (Caste) সহিত অন্য দুইটি বর্ণের সাদৃশ্য দেখা যায়; একটি সেই প্রদেশের উচ্চ অথবা হীনবর্ণ, অপরটি ভারতের অন্য প্রদেশের সমবর্ণ। জাতিবর্গের পরস্পরের সাদৃশ্যমূলক পুরাতন মতবাদগুলি বিচার করিয়া তিনি নিজের মত প্রকাশ করেন; অধুনা নৃতত্ত্ব, বিজ্ঞান-পর্য্যায়ভুক্ত হইতে পারে কি না, সে বিষয়ে তিনি যথেষ্ট সন্দেহ প্রকাশ করেন; তবে নৃতত্ত্বের আলোচনা যথেষ্ট পরিমাণে হইলে ইহার সাহায্যে বহু সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারা যাইবে বলিয়া আশা করা যায়।

প্রাণি-তত্ত্ব-বিভাগ—(Zoology)

সভাপতি—ডাঃ বেণীপ্রসাদ ডি, এস্ সি।

এই বিভাগে সর্ব্বশুদ্ধ ২৫টি মৌলিক প্রবন্ধ গৃহীত হইয়াছিল। সুপ্রসিদ্ধ প্রাণিতত্ত্ববিদ্ ডাঃ বেণীপ্রসাদ মহাশয় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার অভিভাষণে শম্বূকজাতীয় জীবের শ্বাসেন্দ্রিয়ের ক্রম-বিকাশ (Evolution of gills in gastoropod) সম্বন্ধে তাঁহার গবেষণার ফল প্রকাশ করেন। প্রত্যেক যুগের প্রাণী পরীক্ষা করিয়া কিরূপে ধীরে ধীরে শ্বাসযন্ত্রের বিকাশ হইয়াছে, তাহা তিনি অতি সুন্দরভাবে বর্ণনা করিয়াছিলেন। হিন্দু বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধ্যাপক চন্দ্রভাল জলোকার বীর্য্য-কীট সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি বলেন যে, ইহারা অতি ক্ষুদ্র এবং লক্ষ লক্ষ কীট একত্র বাস করে। অণুবীক্ষণ যন্ত্রে ইহাদের আকার তিনি পরীক্ষা করিয়াছেন; দৈর্ঘ্যে ইহারা মাত্র '০৩০৬ মিলীমিটার (Millimeter); কাযেই ইহাদিগকে সহজে দেখিতে পাওয়া যায় না। কোষের মধ্য হইতে

যেখানে উহারা সৃষ্ট হয়—সেখানে উহারা একটি নলের মধ্য দিয়া বহির্গত হইয়া যায়। হিন্দু বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রধান অধ্যাপক ডাঃ মেহরা একটি অন্য জীবালম্বী কীট (Parasite) আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহারই বিবরণী তিনি তাঁহার মৌলিক প্রবন্ধে প্রকাশ করেন। এই প্রকার কীট ভেকের উদরের নাড়ীর ভিতর বাস করিয়া থাকে। ইহাদের আকার চেপ্টা এবং দৈর্ঘ্যে ইহারা প্রায় ½ ইঞ্চি। ইহারা শরীরের অগ্রভাগ দ্বারা নাড়ীর পার্শ্ব-গাত্রে সংযুক্ত হইয়া থাকে এবং সংযুক্ত হওয়াকালীন মুখ ঘুরাইয়া চতুর্দ্দিক হইতে খাদ্য সংগ্রহ করে। ভেকের অন্ত্র হইতে বাহির করিলে প্রায়ই ইহারা বাঁচে না; কিন্তু উপযুক্ত খাদ্য প্রদান করিয়া দুই একটিকে জীবিত রাখিতে পারা যায়, ইহা দেখা গিয়াছে।

শ্রীনগরে প্রায় ২ মাস অবস্থান করিয়া মিঃ বি, কে, মল্লিক এবং মিঃ বি, এল, ভাটিয়া প্রায় ৩১ প্রকার প্রোটোজোয়া পরীক্ষা করিয়া তাঁহাদের গবেষণা প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই সকল প্রাণী আবদ্ধ জলে বাস করিয়া থাকে; বিশেষতঃ যেখানে জলজ উদ্ভিদ্ থাকে, সেখানে ইহাদিগকে অধিক সংখ্যায় দেখা যায়। ডালহ্রদ এবং অন্যান্য হ্রদ হইতে ইহাদিগকে লইয়া বৈজ্ঞানিকদ্বয় গবেষণা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মতে এখানে যে সকল জাতি (Species) দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের মধ্যে ১৭ প্রকার ভারতের অন্য কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না; তিনটি ব্যতিরেকে অপরগুলিতে স্থানীয় বিশেষত্ব বিশেষ কিছু দেখা যায় না; য়ুরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন প্রান্তে প্রাপ্ত প্রোটোজোয়ার বর্ণনার সহিত ইহাদের প্রভেদ অতি অল্পই দেখা যায়। বোলতার একটি বৃহৎ চাকের বর্ণনা মিঃ চোপরা তাঁহার প্রবন্ধে প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই চাকটি সম্প্রতি Zoological Survey of India কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছে; উহার আকার অনেকটা নাশপাতির মত এবং ইহা দৈর্ঘ্যে ৩ ফুটেরও অধিক। ইহাতে মাত্র দুইটি দ্বার আছে এবং একটি স্তর দ্বারা সম্পূর্ণ আবৃত। মিঃ এস, কে, দত্ত গঙ্গা-জল হইতে প্রাপ্ত Rhadscaclid Turdellarianএর শারীরিক যন্ত্রের বিষয় পরীক্ষা করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, এরূপ প্রাণী গঙ্গায় অতি অল্পই আবিষ্কৃত হইয়াছে; ইহাদের প্রকৃতি আমরা বিশেষ অবগত নহি; কাযেই ইহাদের বিষয় সবিশেষ পরীক্ষা করা আবশ্যক।

রসায়ন-বিভাগ

হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন-বিভাগে এই সভার অধিবেশন হয়। সভাপতি—ডাঃ জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ ডি, এস্ সি। ভারতের রসায়নবিদ্ পণ্ডিতগণ উপস্থিত থাকিয়া এই সভার অশেষ গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। অন্যান্য বিভাগ অপেক্ষা এই বিভাগে সদস্যসংখ্যা অধিক ছিল। এই বিভাগে ১০৮টি মৌলিক প্রবন্ধ গৃহীত হয়। উপস্থিত বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, ডাঃ জ্ঞানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ডাঃ নীলরতন ধর, ডাঃ মেঘনাদ সাহা, ডাঃ দে, ডাঃ ওয়াসমন, ও ডাঃ ভাটনাগরের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রবর্গ অধ্যাপক ডাঃ ভাটনাগরের তত্ত্বাবধানে ৬টি মৌলিক পরীক্ষামূলক প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন; ঐ রচনাগুলির মধ্যে শ্রীমান আশুতোষ গাঙ্গুলীর রচনা উপস্থিত বৈজ্ঞানিকগণ কর্ত্তৃক বিশেষ প্রশংসিত হইয়াছিল। অধ্যাপক জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ আলোক-রসায়ন (Photo Chemistry) সম্বন্ধে তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করেন। আলোক-রসায়ন শাস্ত্রে ডাঃ ঘোষ গবেষণা করিয়া যে সমস্ত নূতন তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহাই তিনি প্রকাশ করেন। আলোক-রসায়ন ক্রিয়াকে তিনি প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন।

(১) দুই বা ততোধিক দ্রব্যের সংমিশ্রণে নূতন দ্রব্য সৃষ্ট হয়; যে সমস্ত রাসায়নিক ক্রিয়ায় এই নূতন দ্রব্যের কার্য্যকরী ক্ষমতা (Energy) মূল দ্রব্যগুলি হইতে অধিকতর।

(২) যে সমস্ত ক্রিয়ার মূল দ্রব্যগুলির কার্য্যকরী ক্ষমতা সৃষ্ট নূতন পদার্থ হইতে অধিকতর।

আলোক-রাসায়নিক ক্রিয়াগুলির মূল প্রকৃতি এবং এই বিষয় সম্বন্ধে প্রচলিত মতবাদগুলি (Theory) তিনি বিশদরূপে বর্ণনা করেন। তাঁহার মতে যে সকল ঘটনার ফলে প্রকাশ-বিসর্জ্জক শক্তি (Radiant Energy) রসায়ন-সম্বন্ধীয় শক্তিতে পরিবর্ত্তিত এবং রসায়ন-সম্বন্ধীয় শক্তি (Chemical Energy) প্রকাশ-বিসর্জ্জক শক্তিতে পরিবর্ত্তিত হয়, সেই সমুদায় ঘটনা আলোক-রসায়ন শাস্ত্রের অন্তর্গত। তিনি বলেন যে, আলোক-রসায়ন এবং তরুলতার বৃদ্ধি ও কার্বন্ ডাই-অক্সাইড্ (Carbon di-oxide) গ্রহণের মধ্যে যথেষ্ট সম্বন্ধ আছে; এইরূপ প্রাকৃতিক অনেক

ঘটনার প্রকৃতি আলোক-রসায়ন শাস্ত্রের সাহায্যে অবগত হইতে পারা যাইবে। রসায়ন শাস্ত্রের এই অংশ অবগত হইবার জন্য সভাপতি মহাশয় গবেষণায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন এবং এত অল্প সময়ের মধ্যে এতদূর সফল-কাম হইয়াছেন যে, বৈজ্ঞানিক জগতের সর্ব্বত্র পরিচিত ও সম্মানিত হইয়াছেন।

এই বিভাগে যে সমস্ত মৌলিক প্রবন্ধ পঠিত হয়, তাহার অধিকাংশ ডাঃ ভাটনাগর, ডাঃ নীলরতন ধর, ডাঃ জ্ঞানচন্দ্র পদার্থের পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে, প্ল্যাটিনম্ ধাতুর Valency স্থির থাকে না; পরন্তু প্রত্যেক বারেই পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী তাঁহার প্রবন্ধে দেখাইয়াছেন যে, কি কি কারণের জন্য লৌহে মরিচা পড়ে এবং তাহার নিবারণের উপায়ই বা কি?

এই বিভাগে ভারতীয় রাসায়নিক সমাজের প্রথম অধি-বেশন, সার প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে হইয়াছিল। ডাঃ জ্ঞানচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (সম্পাদক) মহাশয় বলেন

বাম হইতে দক্ষিণে—(১) অধ্যাপক কে, কে, ম্যাথু; (২) অধ্যাপক আর, এস, ইনামদার; (৩) হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ এ, বি, ধ্রুব; (৪) আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়; (৫) ডাক্তার নীলরতন ধর; (৬) অধ্যাপক শ্যামচরণ দে; (৭) অধ্যাপক এম, বি, রেনে।

মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক রচিত হইয়াছিল। আচার্য্য সার প্রফুল্ল-চন্দ্র রায় মহাশয় প্ল্যাটিনম্ ধাতুর Valencyর ভিন্নতা (Varying Valency of Valency) সম্বন্ধে সারগর্ভ পরীক্ষামূলক মৌলিক প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে, প্ল্যাটিনম্ ক্লোরাইডের (Platinum chloride) সহিত ডাই ইথিল সল্‌ফাইডের (Di Ethyl Sulphide) সংমিশ্রণফলে ভিন্ন ভিন্ন যৌগিক পদার্থের (compound) সৃষ্টি হয়; এবম্প্রকারে প্রস্তুত প্রত্যেক

যে, এই সমাজে প্রায় ১ শত ৭০ জন সদস্য মনোনীত হইয়াছেন এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বৎসরে ১ হাজার, ৫ শত টাকা এবং ভারতের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ও অর্থ-সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। তিনি আরও বলেন যে, ভার-তীয় রাসায়নিক সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, ইহা শুনিয়া য়ুরোপ ও আমেরিকার বহু রাসায়নিক সমাজ আনন্দবার্ত্তা জ্ঞাপন করিয়াছে। সার প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় তাঁহার অভিভাষণে বলেন যে, রোম ও গ্রীক সভ্যতার বহু পূর্ব্বে ভারতীয়রা

পরীক্ষামূলক পদ্ধতি অবগত ছিলেন এবং অনেক বৈজ্ঞানিক তথ্য আবিষ্কার করিয়াছিলেন। পাশ্চাত্য জগতের বিজ্ঞান-সেবার তিনি অশেষ প্রশংসা করেন এবং আশা করেন, ভারতের গৌরব-রবি যাহা অধুনা অস্তমিত হইয়াছে, তাহার পুনরুদয় পাশ্চাত্যবাসীদের সহিত সহযোগিতায় কার্য্য করিলে অতি শীঘ্র হইবে; সে দিন প্রাচ্য ও প্রতীচ্য মিলিত হইয়া মানবের হিতকর বহু কার্য্য করিতে সমর্থ হইবে। তিনি বলেন যে, রাজনীতিক মত-ভেদ অবশ্য থাকিবে; কিন্তু বিদ্যামন্দিরে প্রবেশ করিলে জাতি, বর্ণ, ধর্ম্মের কিছুই প্রভেদ থাকিবে না। সভাপতির অভিভাষণ ম্যাজিক লণ্ঠন সাহায্যে অতিশয় হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল।

ডাঃ ফষ্টার সভাপতি মহোদয়কে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া বলেন যে, রাজনীতি-ভেদ ভুলিয়া বৈজ্ঞানিক গবেষণায় আত্মনিয়োগ করা একান্ত আবশ্যক।

মনোবিজ্ঞান-বিভাগ—(Psychology)

সভাপতি—অধ্যাপক নরেন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত, এম, এ, পি, এচ, ডি। মনোবিজ্ঞান-বিভাগের অধিবেশন এই বৎসর প্রথম হয়। প্রথম সভাপতি বঙ্গের এক জন সুকৃতী সন্তান নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন, বাঙ্গালীর এ পরম সৌভাগ্যের কথা। ডাঃ সেন গুপ্ত মহাশয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজের মনোবিজ্ঞানের অধ্যাপক। তিনি এক জন প্রথম শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক, তাঁহার পরীক্ষাগারে গবেষণায় আত্ম-নিয়োগ করিয়া তিনি নূতন নূতন বৈজ্ঞানিক তথ্য আবিষ্কার করিয়া বিশ্বের জ্ঞান-ভাণ্ডারের শ্রীবৃদ্ধি করিতেছেন। প্রায় ২৫টি মৌলিক প্রবন্ধ এই বিভাগে গৃহীত হইয়াছিল; সভাপতি মহাশয় তাঁহার অভিভাষণে ভারতে মনোবিজ্ঞানের উপযুক্ত চর্চ্চা না হওয়ার জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলেন যে, কিরূপ পদ্ধতি অবলম্বনে শিক্ষার প্রচলন হওয়া উচিত ইত্যাদি বহু প্রয়োজনীয় বিষয়ের মীমাংসা মনোবিজ্ঞানের সাহায্যে করা যাইতে পারে। তিনি বলেন যে, পাশ্চাত্য জগতে মনোবিজ্ঞানের অশেষ উন্নতি হইয়াছে; পুরাতন মতবাদগুলি পরিত্যক্ত হইয়া নূতন নূতন মতবাদের সৃষ্টি হইতেছে; অধুনা মনোবিজ্ঞান ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ নহে; ইহার কার্য্যকরী শক্তি অত্যদ্ভুত; পাশ্চাত্য

শ্রীশিবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

বামে—নরেন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত

বৈজ্ঞানিকরা ইহার সাহায্যে সভ্য জগতের সর্ব্বত্র জাতির মানসিক শক্তির বৃদ্ধি করিতেছেন; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ভারতে ইহার সম্যক চর্চ্চা না হওয়ার ফলে ইহার কিছুমাত্র প্রভাব ভারতে দেখা যায় না। ভারতে প্রায় শতাধিক শিক্ষালয়ে ইহার শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে, কিন্তু তত্রাচ বহু বিষয় যাহা মনোবিজ্ঞান সাহায্যে স্থির করা যাইতে পারে, তাহা অমীমাংসিত হইয়া রহিয়াছে। শিক্ষা-সমস্যা আমাদিগের দৃষ্টি সর্ব্বপ্রথমে আকৃষ্ট করে; অধুনা যে প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে, তাহা ভারত-সন্তানের মনের উপর কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিতেছে, তাহার আলোচনা হওয়া উচিত। ভারত-সন্তানের বয়ো-বৃদ্ধির সহিত মানসিক শক্তি কি ভাবে বিকাশ লাভ করে এবং তাহার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া বিভিন্ন বয়সের জন্য শিক্ষার বিভিন্ন বিষয়গুলি কিরূপে নির্ব্বাচন করিতে হইবে, স্থির করিতে হইলে মনোবিজ্ঞানের সাহায্য লওয়া আবশ্যক। ইহা ব্যতিরেকে সামাজিক মনস্তত্ত্বের বহু অমীমাংসিত বিষয়ের মীমাংসা হওয়া অতি প্রয়োজনীয়। ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস মনোবিজ্ঞান সাহায্যে সঠিক অবগত হইতে পারা যায়; কিন্তু দুঃখের বিষয়, এতাবৎকাল পর্য্যন্ত ইহার কোন চেষ্টা দেখা যায় নাই। আমরা অতীতের মহিমা অবগত হইতে সচেষ্ট; কিন্তু মনোবিজ্ঞানের সাহায্য না লওয়ার ফলে আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষ আর্য্য ঋষিগণের মানসিক ক্ষমতার ক্রম-বিকাশ এবং তাহার যাথার্থ্য পরিমাপে আমরা অসমর্থ। জাতীয় জীবনের উন্নতি করিতে হইলে আমাদিগের অনেকখানি শক্তি এই বিষয়ে প্রয়োগ করা উচিত। ভারতে মনোবিজ্ঞানের উন্নতি না হওয়ার কারণ সভাপতি মহাশয় বলেন যে, আমাদের দেশে এই বিজ্ঞান এ যাবৎকাল পর্য্যন্ত পুথিগত বিদ্যা-ভাবে শিক্ষা দেওয়া হইত; কিন্তু ইহার সিদ্ধান্তগুলির সত্যতা পরীক্ষাগারে পরীক্ষা করা হইত না। এ বিষয় যথার্থরূপে শিক্ষা দিতে হইলে পরীক্ষাগার (Laboratory) স্থাপন করিয়া হাতে-কলমে শিক্ষা দেওয়া উচিত। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। পরীক্ষাগার স্থাপনে বিশেষ অর্থ-ব্যয় হয় না; কিন্তু তত্রাচ ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং কলেজে পরীক্ষাগার স্থাপিত না হওয়ার কারণ কি বুঝিতে পারা যায় না। সভাপতি মহাশয় তাঁহার অভিভাষণের শেষে বলেন যে, মনোবিজ্ঞান যথার্থভাবে শিক্ষা দিতে হইলে এবং প্রয়োজনীয় বিষয়গুলির মীমাংসা করিতে হইলে ভারতীয় মনোবৈজ্ঞানিকদিগের একযোগে কার্য্য করা আবশ্যক।

শ্রীশিবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।

সন্ধ্যা

অস্ত রবির কনক আভায়
গাছের পাতা রাঙিয়ে দিয়ে
পূরবের কোন্ সুদূর হ'তে
সন্ধ্যা আসে জগৎ ছেয়ে।

শ্রান্ত জগৎ শান্তির আশায়
সাঁজের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ে
সে-ও যে তাহার ধূসর বাসটা
ছড়িয়ে দেছে জগৎ জুড়ে।

কর্ম্ম অন্তে কৃষকের দল
আনন্দেতে ফিরছে ঘরে
শান্ত সাঁঝের মধুর ছবি
দেখছে তথা প্রাণটা ভ'রে।

বিহগ-নিচয় আপন গানে
পল্লীটাকে মুখর ক'রে
পল্লীমাঝে স্বরগ-ছবি
আনন্দেতে তুলছে গ'ড়ে।

শান্তি-হারা বিরাম-বিহীন
চল্‌ছি আমি অবিরত
কবে হবে সন্ধ্যা আমার
চলবই বা আবার কত?

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ দে

রূপের মোহ

অষ্টম পরিচ্ছেদ

"চমৎকার!—অতি অপূর্ব্ব!—এমন আর দেখি নাই!"

"রমেন বাবু, আপনি কবি, এ সৌন্দর্য্যের রস ত আপনি ভালরকমই বুঝ্‌বেন; কিন্তু বাস্তবিক এ দৃশ্যে আমাদেরও প্রাণ কানায় কানায় ভ'রে উঠেছে; কেমন, না, বৌদি?"

সরযূর প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়া অমিয়া দিক্‌চক্রবালে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া রহিল। সীমাহীন সমুদ্রের অগাধ জলরাশি প্রভাত-আলোকস্পর্শে শিহরিয়া উঠিতেছিল। তরুণ তপন যেন নাচিতে নাচিতে সমুদ্রগর্ভ হইতে এক লম্ফে প্রাচী আকাশে আসন গ্রহণ করিল! মুহূর্ত্তে যেন সমুদ্রের জলরাশির বর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। অসহ্য পুলকে অধীর হইয়া গভীর-গর্জ্জনে তরঙ্গের পর তরঙ্গ আসিয়া তটভূমিতে আছাড় খাইতে লাগিল। দূরে—বহু দূরে—যত দূর দৃষ্টি চলে, শুধুই জলবিস্তার! কোথায় ইহার শেষ?—পরপারে সে কোন্ রাজ্য? জলধিবক্ষে কুহেলিকার ধূম্র যবনিকা দুলিতেছিল, তাহার অপর প্রান্তে কোন্ মায়াপুরীর সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে?

মুগ্ধের ন্যায় সকলেই সেই বিচিত্র রূপের আধার সমুদ্রের পানে চাহিয়া ছিল। সুরেশচন্দ্র বহু বার সমুদ্র দেখিয়াছেন, জাহাজে চড়িয়া দিনের পর দিন যাপন করিয়াছেন; কিন্তু তথাপি তাঁহারও চিত্ত এ দৃশ্যে অভিভূত হইল। অনন্ত রূপবৈচিত্র্যময় সমুদ্র চিরদিনই নূতন—বৈচিত্র্যই ইহার বৈশিষ্ট্য। যত দেখ, কিছুতেই তৃপ্তি নাই, প্রতি বারই মনে হইবে, এমন আর দেখি নাই। প্রতিদিনই নূতন ছবি—প্রতি মুহূর্ত্তেই বর্ণ-পরিবর্ত্তন।

সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই বাতাস ক্রমশঃ প্রবল হইতে লাগিল। ধীবরগণ নৌকা সমুদ্রে ভাসাইয়া দিল। তরঙ্গের নৃত্যলীলার সঙ্গে সঙ্গে ডিঙ্গিগুলি একবার তরঙ্গশীর্ষে চড়িয়া বসিতেছিল, আবার কোথায় অন্তর্হিত হইতেছিল। সরযূ নির্ব্বাক বিস্ময়ে সমুদ্রচারী ধীবরদিগের দুঃসাহস-লীলা দেখিতেছিল। সহসা শিহরিয়া সে বলিয়া উঠিল, "ওদের ভয় নেই?—এখনই ডুবে যাবে যে!"

পার্শ্বেই সুরেশচন্দ্র দাঁড়াইয়া ছিলেন; তিনি বলিলেন, "সে ভয় ওদের নেই। এ সব নৌকো সহজে ডোবেও না।"

ক্রমে রৌদ্রের উত্তাপ বাড়িয়া উঠিল। তখন প্রাতর্ভ্রমণ সারিয়া সকলে গৃহাভিমুখে ফিরিয়া চলিল। সুরেশচন্দ্রের বাসাও সমুদ্রতটে। তিনিও সকলকে লইয়া বাসার দিকে চলিলেন।

বাড়ীটি খুব বড় নহে। বাহিরের দিকে একটি বড় ঘর। সুরেশ ও রমেন্দ্র এই ঘরটি দখল করিয়াছিলেন। দুই দিকে দুইখানা ক্যাম্পখাট, মধ্যে একটা ছোট টেবল। অন্দরের দিকে দুইটি ঘর। যেটি বড়—অমিয়া ও সরযূ তাহাতে থাকিত। কোণের ঘরটি পিসীমার অধিকারে ছিল। পাক-গৃহের সংলগ্ন দুইটি ঘরের একটিতে চাকর, ব্রাহ্মণ রাত্রিতে শয়ন করিত, অপরটিতে আহারাদি হইত। পিসীমার রন্ধনাদি বারান্দার এক প্রান্তে হইত। প্রত্যেক শয়নকক্ষে যাইবার জন্য ভিতর হইতে একটি করিয়া অতিরিক্ত দরজা ছিল। অন্দরের ঘর হইতে বাহিরের ঘরে আসিবার দরজাটি বন্ধ থাকিত, সুতরাং সুরেশচন্দ্র ও রমেন্দ্র নিশ্চিন্তভাবে বাহিরের ঘরটি অধিকার করিয়া রাখিয়াছিলেন।

বাসায় ফিরিয়া চা-পান করিয়া সুরেশচন্দ্র বলিলেন, "আমি একবার খানিক ঘুরে আসি। বাজারের দিকেও যাব; তুমি যাবে, না লিখ্‌বে?"

রমেন্দ্র তখন কবিতার খাতা খুলিয়া বসিয়াছিল। সে বলিল, "না ভাই, এ বেলা আর নড়্‌ছি না। কবিতাটা আজ শেষ করতেই হবে।"

"তবে তুমি থাক" বলিয়া সুরেশচন্দ্র ছড়ি হাতে লইয়া বাহির হইলেন।

রমেন্দ্রনাথ সমুদ্রের দিকে মুখ করিয়া বসিল।

কক্ষ নির্জ্জন; বাতায়নপথে সীমাহীন জল-বিস্তার দেখা যাইতেছিল। অবিশ্রান্ত তরঙ্গ-গর্জ্জনের ভৈরবরাগ কি মধুর, কি অপূর্ব্ব! রমেন্দ্রের হৃদয়ে কল্পনার প্রবাহ ছুটিতেছিল। সে ধ্যানের চিত্র অক্ষরে ফুটাইয়া তুলিতে লাগিল।

বহুক্ষণ পরে রচনা সমাপ্ত হইল। স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া কবি, রচিত কবিতাটি একবার পড়িয়া লইল। হৃদয়ের অন্তঃপুরে যে চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তুলিকাঘাতে তাহার সৌন্দর্য্য কি সম্পূর্ণরূপে সে ব্যক্ত করিতে পারিয়াছে? না—তাহা অসম্ভব। কেহ কোন দিন তাহা পারে নাই,সে-ই বা পারিবে কিরূপে!

রমেন্দ্র উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার চিত্ত এখন অপেক্ষাকৃত লঘুভার—প্রসন্ন। ঘড়ীর দিকে চাহিয়া সে দেখিল, প্রায় দুই ঘণ্টা সে ভারতীর আরাধনা করিয়াছে।

আজ পাঁচ দিন তাহারা পুরীধামে আসিয়াছে। এই কয় দিন ধরিয়া তাহার জীবনও যেন একটা নূতন পথে চলিয়াছে। অনাস্বাদিতপূর্ব্ব কোন রস ও সৌন্দর্য্যের পূর্ণপাত্র কেহ যেন তাহার হৃদয়ের উপকূলে দাঁড়াইয়া তাহারই ওষ্ঠপ্রান্তে ধরিয়া রাখিয়াছে, কোন এক বিচিত্র মুহূর্ত্তে হয় ত সে তাহা আকণ্ঠ পান করিয়া চরিতার্থতালাভ করিতে পারে, এমনই একটা ভাব আজ কয়দিন হইতে তাহার চিত্তকে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে।

বাতায়নপথে সে দেখিতে পাইল, শত শত পুণ্যকামী নরনারী সমুদ্রে স্নান করিতে নামিয়াছে। দেখিবামাত্র সমুদ্রস্নানের জন্য তাহার চিত্ত অধীর হইয়া উঠিল। প্রথম দিন স্নান করিতে নামিয়া সে বড় বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিল। সমুদ্রস্নানের নিয়ম সে জানিত না। অন্যান্য অনভিজ্ঞ স্নানার্থীর ন্যায় তটভূমিতে দাঁড়াইয়া স্নান করিতে গিয়া, তরঙ্গাঘাতে বেলাভূমিতে লুণ্ঠিত হইয়াছিল। তাহার পর এ কয়দিন সে সমুদ্রস্নানের দিকে ঘেঁসিত না। আজ কথাচ্ছলে সুরেশচন্দ্রের নিকট হইতে স্নানের কৌশলটি সে জানিতে পারিয়াছিল। অগাধ জলরাশির মধ্যে তরঙ্গের উপর চড়িয়া স্নানের যে কি অপূর্ব্ব আনন্দ, আজ তাহা উপভোগের জন্য রমেন্দ্র প্রস্তুত হইল।

তৈলমর্দ্দনান্তে 'গামোছা' লইয়া সে বাহির হইল। এমন সময় পশ্চাৎ হইতে মধুর বামাকণ্ঠে কেহ বলিল, "রমেন বাবু, স্নানে যাচ্ছেন না কি?"

রমেন্দ্র ফিরিয়া দেখিল, সরযূ ও অমিয়া।

সরযূ বলিল, "আমরাও যাচ্ছি, দাঁড়ান।"

রমেন্দ্র সবিস্ময়ে বলিল, "সমুদ্রস্নান আপনাদের মত বাঙ্গালীর মেয়ের সাজে না—বড় মুস্কিলে পড়্‌বেন।"

সরযূ হাসিয়া বলিল, "আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমাদের জন্য কোন ভয় নেই। আজ নতুন নয়, আমরা রোজই স্নান করি। চলুন, দেখ্‌বেন, তরঙ্গ আমাদের কোন ক্ষতি করতে পার্‌বে না।"

রমেন্দ্র একবার উভয়ের বেশের দিকে চাহিয়া প্রশংসাভরে বলিল, "সেমিজের উপর মোটা কাপড় পরেছেন, এটা খুব বুদ্ধিমতীর মত কায হয়েছে বল্‌তে হবে।"

সরযূ বলিল, "আমাদের অভিজ্ঞতার অন্য পরিচয়ও স্নানের সময় দেখ্‌তে পাবেন। চলুন না।"

তিন জন স্নানের ঘাটের দিকে চলিলেন। নিকটেই "স্বর্গদুয়ার!"

নবম পরিচ্ছেদ

পূর্ব্বরাত্রিতে সামান্য ঝড় হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু প্রভাতের পর হইতে গত রজনীর দুর্য্যোগের কোন লক্ষণই প্রকৃতিতে বিদ্যমান ছিল না। আকাশ মেঘশূন্য; সূর্য্যের অম্লান জ্যোতিঃ সমুদ্রবক্ষে নব নব বর্ণরাগের প্রকাশ করিতেছিল। শুধু তরঙ্গগুলি অন্য দিনের তুলনায় বিপুলকায়।

পুরীর সমুদ্র যাহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারা জানেন, তটভূমি হইতে সমুদ্রবক্ষের কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত জলের গভীরতা তেমন বেশী নহে। যতদূর ইচ্ছা নামিয়া স্নান করা যাইতে
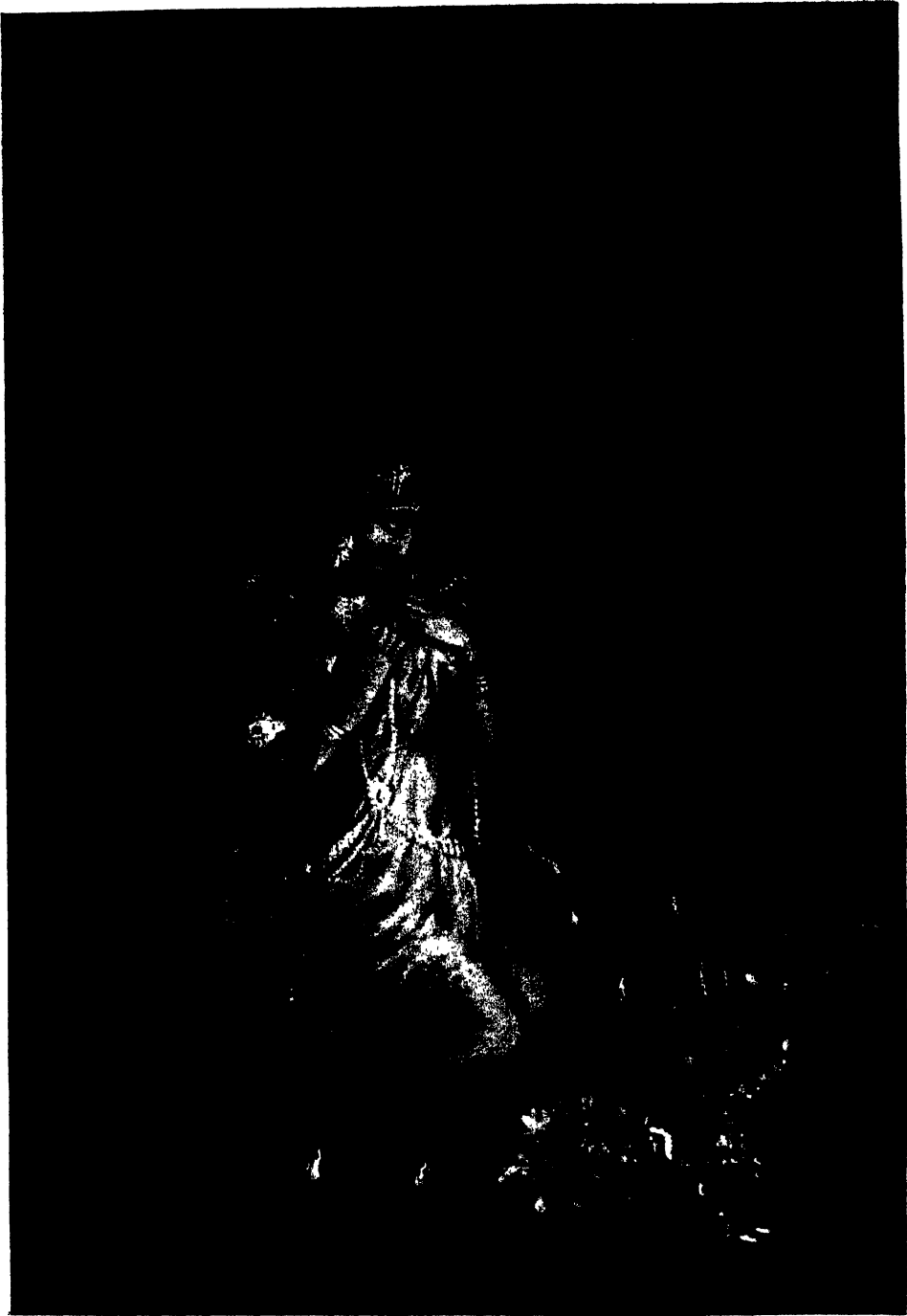
ধ্যানে

বসুমতী প্রেস]　　　　[শিল্পী—শ্রীচারুচন্দ্র সেন গুপ্ত।

পারে, বিপদের কোন আশঙ্কা নাই। শুধু তরঙ্গ যখন গভীর গর্জ্জনে ছুটিয়া আইসে, সেই সময় মাথা পাতিয়া দাও, তরঙ্গ তোমার কোনরূপ অনিষ্ট না করিয়া চলিয়া যাইবে, অথবা একটু লাফাইয়া উঠ, অমনই তরঙ্গ তোমাকে মাতার ন্যায় স্নেহে কোলে তুলিয়া লইয়া আবার সেইখানেই দাঁড় করাইয়া দিয়া চলিয়া যাইবে। যদি বা দৈবাৎ পদস্খলন ঘটে, তাহাতেও কোন বিপদের আশঙ্কা নাই; অন্য তরঙ্গ আসিয়া তোমাকে কূলে রাখিয়া যাইবে। প্রবাদ আছে, সমুদ্র কাহারও দান গ্রহণ করে না। কোন কিছু ফেলিয়া দাও, তরঙ্গ পর-মুহূর্ত্তে তাহা তোমার কাছেই রাখিয়া যাইবে।

স্বর্গদুয়ারের ঘাটে বহু নরনারী স্নান করিতেছিল। রমেন্দ্র, অমিয়া ও সরযূ তথায় আসিল। প্রতি মুহূর্ত্তেই তরঙ্গ তটভূমি প্লাবিত করিয়া যাইতেছিল। কোন কোন তরঙ্গ অল্পদূর আসিয়াই ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল। অনভিজ্ঞগণ তটভূমিতে জানু পাতিয়া, মাথা বাড়াইয়া তরঙ্গপ্রবাহে স্নান সারিতেছিল। কেহ অসতর্ক হইলেই বেলাভূমিতে তাহার দেহ গড়াগড়ি যাইবে।

রমেন্দ্র দেখিল, অমিয়া ও সরযূ অবলীলাক্রমে সমুদ্রগর্ভে নামিয়া যাইতেছে। তরঙ্গ-পীড়নে তাহাদের কোন অনিষ্ট হইল না। অপূর্ব্ব কৌশলে তাহারা তরঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে নামিতে নামিতে, উঠিতে উঠিতে অগ্রসর হইতেছিল। রমেন্দ্রও তাহাদের দেখাদেখি সমুদ্রগর্ভে অবতরণ করিল। অল্পক্ষণেই সে বুঝিতে পারিল, ইহাতে স্নানের বড় আনন্দ। রমেন্দ্রের দেহ সমুদ্র-তরঙ্গের বিচিত্র স্পর্শে শিহরিয়া উঠিতে লাগিল। দীর্ঘকাল ব্যায়ামশিক্ষার ফলে অল্পসময়ের মধ্যেই সে সমুদ্র-স্নানের কৌশলটি আয়ত্ত করিয়া লইল। সরযূ ও অমিয়া অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছিল, জল তথায় অগভীর। রমেন্দ্রও তরঙ্গে নাচিতে নাচিতে নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল।

যাঁহারা সমুদ্র-স্নানে অভ্যস্ত, অথবা সমুদ্র-তরঙ্গের সহিত যাঁহারা নানারূপে পরিচিত আছেন, তাঁহারা পুরীর সমুদ্রেও ঝড়ের পরদিবস স্নান করিবার জন্য অধিক দূর অগ্রসর হইবেন না। কারণ, তাঁহারা জানেন, প্রকৃতির বিপর্য্যয়ে পুরীর সমুদ্র-তরঙ্গেরও পরিবর্ত্তন ঘটে। জলের নীচে, স্রোতের বিপরীত একটা বেগ জন্মে। অধিক জলে নামিলে যদি দৈবাৎ পা সরিয়া যায়, তাহা হইলে অনেক সময় সেই নিম্নপ্রবাহিত স্রোতের টানে স্নানার্থীকে বিপন্ন হইতে হয়।

সরযূ ও অমিয়া এ তত্ত্বটি জানিত না, রমেন্দ্ররও সে অভিজ্ঞতা ছিল না। কিন্তু অল্পসময়ের মধ্যে সে বুঝিল, অধিক দূর অগ্রসর হওয়া সমীচীন নহে। কারণ, সে জলের নীচে যেন আরও একটা প্রবাহের টান সামান্যরূপ অনুভব করিতেছিল। সে ইতোমধ্যে সরযূ ও অমিয়াকে ছাড়াইয়া অগ্রসর হইয়াছিল। কতিপয় 'নুলিয়া' বালক নিকটেই তরঙ্গের উপর লাফালাফি করিতেছিল। ইহা ছাড়া অন্য কোন সাহসী স্নানার্থী ততদূর আসে নাই। সরযূ ও অমিয়াকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া রমেন্দ্র বলিয়া উঠিল, "এ দিকে আর আসবেন না, টান বড় বেশী।"

কিন্তু তাহার নিষেধ কে শুনে? রমেন্দ্র যদি আজ নূতন স্নান করিতে নামিয়া ওখানে যাইতে পারে, তাহারা পারিবে না? কিন্তু তাহারা বুঝিতে পারে নাই যে, রমেন্দ্র তাহার ব্যায়ামপটুতা ও দৈহিক শক্তির সহায়তায় যে বেগ কোন রকমে এড়াইতে পারিতেছিল, তাহাদের মত কোমলা নারীর পক্ষে তাহা সহজসাধ্য নহে। উহারা রমেন্দ্রের পার্শ্বে দাঁড়াইবামাত্র একটা প্রবল সমুদ্র-তরঙ্গ ছুটিয়া আসিল। সরযূ ও অমিয়া পূর্ব্বশিক্ষামত তরঙ্গের উপর চড়িয়া বসিল। তরঙ্গ তাহাদিগকে সেইখানে নামাইয়া দিয়া চলিয়া গেল বটে, কিন্তু এবার তাহারা ঠিক দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিল না। উপরের স্রোতের প্রতিকূল নিম্ন-প্রবাহের টানে তাহাদের পা সরিয়া গেল, তাহারা বুঝিল—অধিক জলে দ্রুত তাহাদিগকে টানিয়া লইয়া চলিয়াছে। ভয়ে উভয়েরই মুখ হইতে আর্ত্ত চীৎকার বাহির হইল। রমেন্দ্র তাহাদের বিপদ বুঝিতে পারিয়াই উভয় বাহুর সাহায্যে তাহাদিগকে টানিয়া তুলিতে গেল। কিন্তু সরযূকে ধরিতে পারিল না। এক জন নুলিয়া বালক তাহাকে ক্ষিপ্রহস্তে টানিয়া তুলিল। রমেন্দ্র অমিয়ার হাত ধরিয়া সবলে আকর্ষণ করিল। বিপদের সময় মানুষ প্রায় হিসাব করিয়া কায করে না, সে জ্ঞান তখন থাকে না। অমিয়া তখন ঠিক কি করিয়াছিল, তাহা তাহার বোধগম্য ছিল না, তবে কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য সে সময় তাহাকে রমেন্দ্রের দেহে আশ্রয় গ্রহণ যে করিতে হইয়াছিল, ইহা খুবই সত্য।

মুহূর্ত্তমধ্যে এত বড় ব্যাপারটা ঘটিয়া গেল। অন্য বড় কেহ এ ঘটনা লক্ষ্য করিবার অবকাশ পায় নাই। যথাসম্ভব ক্ষিপ্রপদে সকলে তীরে ফিরিয়া চলিল। তখনও সরযূ ও অমিয়ার দেহ আশঙ্কায় থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল। তীরে উঠিয়া হুলিয়া বালককে রমেন্দ্র তাহাদের বাসায় যাইবার জন্য অনুরোধ করিল।

পথ চলিতে চলিতে রমেন্দ্র বলিল, "আপনাদের অত দূর যাওয়া উচিত হয় নি। উঃ! কি বিপদই কেটে গেল!"

অমিয়া তখনও প্রকৃতিস্থ হইতে পারে নাই। সরযূর চরণযুগল তখনও কাঁপিতেছিল। সে বলিল, "আমরা রোজই ত অত দূর যাই, ওর বেশীও গিয়ে থাকি। আজ যে এমন হবে, কে জানে?"

দশম পরিচ্ছেদ

সমুদ্র-স্নানের ঘটনার পর হইতেই রমেন্দ্রের মনের ভিতর একটা বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। অমিয়ার সহিত তাহার বহু দিনের জানাশুনা। কিছুকাল পূর্ব্বে অমিয়াকে বিবাহ করিবার জন্য সে উন্মত্তবৎও হইয়াছিল, কিন্তু নানা কারণে সে বিবাহ হয় নাই। প্রথম যৌবনের স্মৃতি সে একরূপ ভুলিয়া গিয়াছিল। এমন অনেকেরই হয়। কিন্তু কলিকাতার রাজপথে গাড়ীর দুর্ঘটনা হইতে অমিয়া প্রভৃতিকে রক্ষা করিবার পর ঘন ঘন আত্মীয়তার অবকাশে রমেন্দ্রের হৃদয়ে লুপ্তপ্রায় পূর্ব্বস্মৃতি আবার জাগিয়া উঠিয়াছিল। ক্রমে তাহার নিরবলম্ব হৃদয়ে—কারণ বিবাহ হইলেও স্ত্রীর প্রতি তাহার বিন্দুমাত্র আসক্তি না থাকায় মন একান্ত শূন্য অবস্থায় ছিল—অমিয়ার মোহিনী মূর্ত্তি জাগিয়া উঠিতে লাগিল। রমেন্দ্র বুঝিত, অমিয়ার চিন্তাকে তাহার হৃদয়ে স্থান দিবার অধিকার তাহার নাই, কারণ সে পরস্ত্রী এবং রমেন্দ্রও বিবাহিত। কিন্তু তাহার চিত্ত কিছুতেই এই বাধা মানিয়া চলিতে পারিতেছিল না। যদি অমিয়ার নিকট হইতে সে দূরে থাকিতে পারিত, তাহা হইলে হয় ত সে মনের দুর্দ্দমনীয় ইচ্ছাকে অনেকটা সংযত করিতে পারিত। এত দিন ত সে এক রকম সবই ভুলিয়া গিয়াছিল। কিন্তু প্রথম যৌবনের স্বপ্ন-স্মৃতি আবার যখন নূতন করিয়া মনে জাগিয়া উঠিল, যাহাকে অবলম্বন করিয়া তরুণ-হৃদয় উদ্দাম কল্পনা-বলে মনের রাজ্যে একটা নূতন স্বর্গ রচনা করিয়াছিল, আবার তাহাকে প্রতিদিন কাছাকাছি পাইয়া তাহার সহিত সর্ব্বদা নানাপ্রকারে ভাবের আদান-প্রদান চলিতে লাগিল, তখন ত উচ্ছৃঙ্খল মনকে ঠেকাইয়া রাখা বড় সহজ ব্যাপার নহে। যদি পরিণীতা স্ত্রীর প্রতি তাহার বিন্দুমাত্র আকর্ষণও থাকিত, তাহা হইলে সম্ভবতঃ তাহার মনে এত শীঘ্র আন্দোলন উপস্থিত হইত না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে যে বিবাহিত, অনেক সময় সে ধারণাও তাহার থাকিত না। অমিয়া সরযূ ও সুরেশচন্দ্রের নিকটেও তাহার পরিণয়ের কথা সে ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ করে নাই। এ পরিচয় দিবার প্রয়োজনও এ পর্য্যন্ত ঘটে নাই।

কলিকাতায় অবস্থানকালে, অমিয়ার সহিত প্রতিদিনের সাহচর্য্যের ফলে রমেন্দ্রের মনে যে ভাব জাগিয়া উঠিয়াছিল, পুরীতে আসিবার পর তাহা দিন দিন পুষ্ট হইয়া উঠিতেছিল। সমুদ্র-স্নানের পর তাহার মনের বিকার সীমা ছাড়াইবার উপক্রম করিল।

সমুদ্রের স্রোতোবেগে আকৃষ্ট হইয়া অমিয়া যখন গভীরতর জলের দিকে চলিয়া যাইতেছিল, সেই সময় অপূর্ব্ব কৌশলে রমেন্দ্র তাহাকে ধরিয়া ফেলিয়াছিল। ভীতা সুন্দরী তখন একান্তভাবে কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য রমেন্দ্রের বিশাল বক্ষে আশ্রয় লইয়াছিল। তাহার তখনকার শঙ্কাব্যাকুল নেত্রের দৃষ্টি, মৃণাল-বাহুর বন্ধনস্পর্শ রমেন্দ্রের হৃদয়ে বিষম বিপ্লব বাধাইয়া দিয়াছিল।

স্পর্শ জিনিষটা তুচ্ছ নহে। উহার শক্তি অমোঘ, অব্যর্থ। এ সম্বন্ধে রমেন্দ্র পুস্তকে অনেক কথাই পড়িয়াছিল। কিন্তু পূর্ব্বে কখনও সে ইহার প্রভাব উপলব্ধি করিবার অবকাশ পায় নাই। এখন সে বুঝিতে পারিল, মানব-মনোবৃত্তি-বিশেষজ্ঞের চিত্রকরগণ যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা অতিরঞ্জন নহে। যাহাকে মনে মনে বিশেষ প্রীতিভাজন বলিয়া জানি, বিশ্বাস করি, যাহাকে পাইলে জীবনের সার্থকতা হইল বলিয়া মনে করা যায়, যাহাকে লাভ করিবার জন্য মন দুর্দ্দমনীয় ইচ্ছায় পূর্ণ, এমন ব্যক্তিকে যতক্ষণ না স্পর্শ করা যায়, ততক্ষণ হয় ত আত্মদমনের সামর্থ্য থাকিলেও থাকিতে পারে, কিন্তু একবার যদি বাঞ্ছিত বা বাঞ্ছিতার দেহের স্পর্শ কোনরূপে অনুভূত

হয়, তাহা হইলেই সর্ব্বনাশ! তখন শীতল স্পর্শও প্রচণ্ড অনলের দহনজ্বালায় পরিণত হয়। সে অবস্থায় শরীর ও মনকে সংযমের বাঁধনে বাঁধিয়া রাখিতে পারে এমন শক্তিমান পুরুষ বা দৃঢ়চেতা নারীর সংখ্যা জগতে খুব কমই দেখিতে পাওয়া যাইবে।

রমেন্দ্র এইরূপ অনেক কথাই পড়িয়াছিল, কিন্তু বিশ্বাস করিতে পারিত না। এখন সে নিজের ভ্রম মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিতে পারিল। অমিয়ার দেহের ক্ষণিক স্পর্শ-স্মৃতি থাকিয়া থাকিয়া তাহার মনে বিপ্লবের ধূমায়িত অগ্নিকে জ্বালাইয়া তুলিতে লাগিল। কোনমতেই সে অমিয়ার নিষিদ্ধ চিন্তাকে মস্তিষ্ক হইতে বিতাড়িত করিতে পারিল না। যতই সে দৃঢ়তা সহকারে স্মৃতির জ্বালা ভুলিবার চেষ্টা করিতে লাগিল, জ্বালা যেন ততই প্রবল হইয়া উঠিতে লাগিল।

দিনের মধ্যে শত বার অমিয়ার সংস্রবে আসিতে হয়। তখন কিরূপ দৃঢ়তার সহিত উচ্ছৃঙ্খল মনকে সংযত রাখিতে হয়, তাহা কি রমেন্দ্র বুঝিতে পারে না? সে কি ভীষণ সংগ্রাম! বিদ্রোহী হৃদয় নয়ন ও আননে আত্মপ্রকাশ করিতে চাহে, কিন্তু ভদ্রতা, শিক্ষাভিমান ও আত্মমর্য্যাদা-জ্ঞান হৃদয়ের এই নগ্ন ভাবটিকে নানারূপে ঢাকিয়া রাখিবার চেষ্টা করে। এইরূপে মনকে আঁখিঠার দিয়া, আত্মবঞ্চনা করিয়া চলাফেরা করা কত কঠিন কার্য্য, রমেন্দ্র তাহা পদে পদে অনুভব করিতে লাগিল। সে বুঝিতেছিল, তাহার চিত্ত ক্রমেই দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে, বাসনার প্রবল স্রোতে হৃদয় ভাসিয়া চলিয়াছে। অথচ বাহিরে সে ভাব প্রকাশ করিবার কোনও উপায় নাই, সঙ্গতও নহে।

রমেন্দ্র তাহার কামনা-সুন্দরীর চিত্র কবিতায় ফুটাইয়া তুলিতে লাগিল। সমস্ত প্রাণ ঢালিয়া সে নিজের এই নূতন অভিজ্ঞতার কথা কাব্য-চিত্রে আঁকিয়া তুলিল। মন এইরূপে কবিতার মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করিতে লাগিল, তাহাতে কতকটা তৃপ্তি জন্মিতেছিল বটে, কিন্তু শিরায় শিরায়—রক্তের কণায় কণায় যে আগুন জ্বলিতেছিল, তাহার নিবৃত্তি ঘটিল না। বরং সন্ধুক্ষিত বহ্নির ন্যায় উহা আরও গভীরভাবে অন্তরকে আচ্ছন্ন করিয়া জ্বলিতে লাগিল।

রমেন্দ্র বুঝিল, ইচ্ছা করিলেও অমিয়ার চিন্তার স্মৃতি হইতে তাহার অব্যাহতির পথ নাই। কারণ, সবই যদি শুধু কল্পনা হইত, তবে হয় ত এক দিন সে সব ভুলিতে পারিত। কিন্তু ইহা ত নিছক কল্পনা নহে। শরীরিণী মানসী মূর্ত্তিকে সকল সময়ে সে প্রত্যক্ষ করিতেছে, আলাপ, আপ্যায়ন এবং সর্ব্বদা কাছাকাছি পাইলে ভুলিবার অবকাশ কোথায়? সুতরাং অজগর সর্প শত বেষ্টনে তাহার শিকারকে যেমন পিষ্ট করিতে থাকে, রমেন্দ্রের চিত্তও অমিয়ার চিন্তারূপ নাগিনীর শত পাকে বাঁধা পড়িয়া তেমনই পিষ্ট হইতে লাগিল।

সময়ে সময়ে তাহার প্রাণ যখন হাঁপাইয়া উঠিত, তখন সে এক একবার আপনাকে মুক্ত করিবার জন্য ব্যর্থ ব্যাকুলতা প্রকাশ করিত। পরক্ষণেই মোহ আসিয়া আবার তাহাকে অভিভূত করিত। তখন নির্জ্জীবভাবে, স্বপ্নাবিষ্টেরই মত সেই অবস্থার ভিতর দিয়া সে চলিতে আরম্ভ করিত।

সমস্ত জানিয়া শুনিয়াই ইচ্ছাপূর্ব্বক সে এই অভিনব মানসিক অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। যখন আত্মরক্ষার উপায় ছিল, তখন সে বিন্দুমাত্র চেষ্টাও করে নাই। তাহার পর যখন সে আপনার মানসিক অধঃপতনের পর্য্যাপ্ত পরিচয় পাইল, তখন সে যুক্তির দ্বারা মনকে বুঝাইল, হইতে পারে, ইহা সামাজিক বিধি-ব্যবস্থার প্রতিকূল, কিন্তু নিত্য মানবের বিধি-নিষেধের গণ্ডীর মধ্যে ইহাকে ফেলা যায় না। সেই যুক্তির দোহাই পাড়িয়া সে আদর্শের উচ্চ শৃঙ্গ হইতে ক্রমেই নীচে নামিয়া আসিয়াছে। পথের কোথায় এখন অতলস্পর্শ গহ্বর মুখব্যাদান করিয়া তাহার পতনের প্রতীক্ষা করিতেছে, সে দিকে লক্ষ্য রাখিবার বিন্দুমাত্র আগ্রহও তাহার ছিল না।

আর অমিয়া? হাঁ—রমেন্দ্রের সঙ্গ, তাহার সহিত আলাপ, আলোচনা সবই অমিয়ার কাছে প্রীতিপ্রদ ছিল। যৌবনের প্রথম বিকাশকাল পর্য্যন্ত যাহার সহিত সর্ব্বদা অসঙ্কোচে মেলামিশা করা গিয়াছে—মতের আদান-প্রদান দীর্ঘকাল ধরিয়া যাহার সহিত চলিয়াছিল, সহোদরের যে প্রিয় সুহৃদ, নিজের খেলারও সাথী, এমন কি, এক দিন যিনি তাহার জীবনের সখারূপে নির্ব্বাচিতও হইয়াছিলেন, চারি বৎসর পরে তাঁহার সহিত অতর্কিত মিলনে সে

অবশ্যই আনন্দ অনুভব করিয়াছিল। তাহার পক্ষে উহা যে খুবই স্বাভাবিক, ইহা সে মনেও ভাবিয়াছিল। বিশেষতঃ এক দিন যে পরম প্রীতিভাজন শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু ছিল, সে যদি জীবনরক্ষায় সহায়তা করে, তবে স্বতঃই তাহার প্রতি চিত্ত আকৃষ্ট হয়, ইহা যে মানব-হৃদয়ের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম। রমেন্দ্রের অমায়িক ব্যবহার, কবি-হৃদয়ের উচ্ছ্বাসভরা আলাপ-আলোচনা প্রকৃতই অমিয়াকে কতকটা মুগ্ধ করিয়াছিল, তাহা সে অস্বীকার করিতে পারে না এবং তাহার কোন প্রয়োজনও সে অনুভব করে নাই। কোনও বিবাহিতা সাধ্বী নারী প্রিয়দর্শন প্রীতিভাজন বাল্যবন্ধুকে যেরূপ শ্রদ্ধা ও প্রীতির দৃষ্টিতে দেখে, অমিয়াও ঠিক সেই ভাবে রমেন্দ্রকে গ্রহণ করিয়াছিল। তাহাতে অনাবিল সখ্য ছাড়া আর কিছুই ছিল না।

কিন্তু শ্রদ্ধা ও সখ্য বাধা না পাইলে ক্রমশঃ আরও অনেক দূর যে অগ্রসর হইতে পারে, অমিয়ার মনে একবারও সে চিন্তার উদয় হয় নাই। প্রথমতঃ অনেকেরই তাহা হয় না। রমেন্দ্রের ব্যবহারে বাহ্যতঃ সে এমন কোনও ইঙ্গিত পর্য্যন্ত পায় নাই—যাহাতে তাহার মনে কোনও প্রশ্ন উঠিতে পারে। সুতরাং সে বাল্য-সুহৃদ, সুকবি রমেন্দ্রকে অপর্য্যাপ্ত শ্রদ্ধা ও প্রীতিদান করিয়া আসিতেছিল।

সমুদ্র-স্নানের সময় সে মুহূর্ত্তের জন্য রমেন্দ্রের বিশাল দেহে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল, কিন্তু সে স্পর্শে যে কোনও বিরুদ্ধ ভাব ক্রমে মনে উদিত হইতে পারে, এমন দুশ্চিন্তা জন্মিবার অবকাশ তাহার হৃদয়ে হয় নাই। যদি মনের মধ্যে কোন মোহ সৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহা এমনই প্রচ্ছন্ন-ভাবে এবং অজ্ঞাতসারে শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হইতেছিল যে, অমিয়ার আত্মবোধ তাহাতে উদ্‌বুদ্ধ হয় নাই।

সুতরাং রমেন্দ্র কতকটা জ্ঞাতসারে যে নিষিদ্ধ মোহে আপনাকে জড়াইয়া ফেলিবার সুবিধা দিতেছিল, অমিয়া অজ্ঞাতসারেই হয় ত সেই পথে চলিতেছিল। মানুষ এমনই করিয়া বুঝি পথিভ্রান্ত হয়! আত্মানুশীলন এবং কোনও নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যে আত্মনির্ভরের অভাবেই মানুষকে অপথে বিপথে গিয়া কতই না কর্ম্মভোগের দুঃখ-যন্ত্রণা সহ্য করিতে হয়!

এমনই করিয়া কর্ম্মসূত্র উভয়কে কোথায় টানিয়া লইয়া যাইতেছিল? [ক্রমশঃ।

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ।

গোধূলি-লগনে

হের মোর স্বর্ণ-সৌধমালা পশ্চিম-গগনে!
আমি আলো, এসো ওগো ছায়া!—গোধূলি-লগনে,
লাজ-নম্র নত মুখে, এসো বধূ-বেশে,
আঁধারের লুটায়ে আঁচল;
বরণ করিব তোমা' দিবা-অবশেষে,
এসো মোর আঁখির কাজল!

কুসুমিতা কুঞ্জ-লতিকারা দুলিয়া দোদুল,
গাঁথে মোর মিলনের মালা, সুরভি-মঞ্জুল।
তটিনীর কুলু-কুলু ওঠে জয়গান,
বিহঙ্গিনী গাহিছে মঙ্গল,
ওই হের ধীরে ধীরে ওঠে চন্দ্রকলা—
সোহাগের প্রদীপ উজ্জল!

সীমাহীন চন্দ্রাতপ-তলে জ্যোতিষ্ক সকল—
রচিয়াছে পরিণয়-সভা আঁখি ঝল্-মল্।
প্রকৃতির পূর্ণকুম্ভ মহাসিন্ধু-নীরে
এলো চুলে ক'রে এসো স্নান;
তুমি চাহ, আমি চাহি—দুঁহু দুঁহু পানে,
বাদ্য সে যে আরতির তান!

কুঞ্জে রচে কানন-কামিনী কুসুম-শয়ন,
এসো ভুঞ্জি সুখনিশি, করি' স্বপন-চয়ন!
আলো-ছায়া ঝিকি-মিকি মিলনের পরে,
সমীরণ মৃদু অনুরাগে—
দিনান্তের ক্লান্ত মোর তপ্ত তনুখানি
সুশীতল প্রেম তব মাগে!

এসো ছায়া! পরো গলে, খুলে দিই
কিরণের হার,
ভেদ নাই—আলো ছায়া, তুমি-আমি
মিলে একাকার!

শ্রীসদাশিব বন্দ্যোপাধ্যায়।

আহার্য্য তৈল ও তৈলজ আহার্য্য

মানব-সভ্যতার উন্মেষের সময় হইতেই যে তৈলের প্রচলন আরম্ভ হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। তিল হইতেই তৈল শব্দের উৎপত্তি এবং চারি হাজার বৎসর পূর্ব্বেও ভারতে তিল উৎপাদনের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ভারত, আফ্রিকা, আমেরিকা প্রভৃতি নানাদেশে বন্য ও কর্ষিত তৈল-ফসল পুরাকালাবধি যথেষ্ট পরিমাণে উৎপাদিত হইয়া আসিলেও ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্য্যন্ত ব্যবহারিক হিসাবে তৈলবীজ সমূহের যে পূর্ণ সদ্ব্যবহার হইত, তাহা বলিতে পারা যায় না। এতদ্দেশে এ পর্য্যন্ত তৈল প্রধানতঃ রন্ধন কার্য্যে, কিয়ৎ পরিমাণ গাত্র মর্দ্দনে, ঔষধে নানাবিধ শিল্পে ও গার্হস্থ্য ব্যাপারে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। উন্নতিশীল প্রতীচ্যে অবশ্য তৈলের ব্যবহারের ক্ষেত্র আরও কিছু প্রশস্ত—সাবান, বাতি রং ইত্যাদি প্রস্তুতেও কয়েক জাতীয় তৈলের ব্যবহার হইতেছিল। কিন্তু তৈলের প্রকৃত সদ্ব্যবহার হইতে আরম্ভ হইয়াছে বিগত মহাযুদ্ধের সময় হইতে। যখনই মিত্র-শক্তিবর্গ মধ্য-য়ুরোপে নানা প্রকার প্রাণীজ আহার্য্য দ্রব্য ও যুদ্ধোপকরণ প্রস্তুতোপযোগী কাঁচা মাল প্রবেশের পথ রুদ্ধ করিলেন, তখন হইতেই উদ্ভিজ্জ তৈল হইতে বিবিধ প্রকার আবশ্যক দ্রব্য প্রস্তুতের প্রচার-চেষ্টা চলিতে থাকিল। অপেক্ষাকৃত অল্পদিনের মধ্যেই জর্ম্মণ বৈজ্ঞানিকগণ শুধুই যে চর্ব্বি, গ্লিসরিণ, চামড়া পালিশ ও কল মসৃণ করার তৈল এবং অন্যান্য অপরিহার্য্য সমরোপাদান উদ্ভিজ্জ তৈল হইতে প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইলেন তাহা নহে; বস্তুতঃ দেশের সেরূপ সঙ্কটের সময় তাঁহারা তৈল হইতে এমন এক শ্রেণীর পুষ্টিকর আহার্য্য প্রস্তুত করিলেন, যাহা স্বল্পমূল্যে ক্রয় ও আহার করিয়া জনসাধারণ দুগ্ধ, মাখন, পনির প্রভৃতির অভাব ও অত্যন্ত মহার্ঘতা সত্ত্বেও শরীর রক্ষা করিতে সমর্থ হইল! সেই সময় হইতেই তৈলজ আহার্য্যের যে সব শিল্প প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, জর্ম্মণী এখনও তাহাতে অগ্রণী হইয়া আছে। যুদ্ধাবসানের পর যে গুরু অর্থকৃচ্ছ্রতা জগতের নানা স্থানে দেখা দিয়াছে, তাহাও এই শিল্পকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে; অধিক অর্থব্যয় করিয়া দুগ্ধ, মাখন, ঘৃত, পনির প্রভৃতি ক্রয় করা যতই অসাধ্য হইয়া উঠিতেছে, এইরূপ আহার্য্যের কাটতি ততই বাড়িতেছে।

ভারতের তৈলবীজ

আফ্রিকার তৈল-শস্যের সংখ্যা ভারত অপেক্ষা অধিক হইলেও উহাদের মধ্যে অনেকগুলিরই ব্যবসায়ে প্রাধান্য কম। ভারতই জগতের মধ্যে তৈল-শস্য উৎপাদনের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র। এতদ্দেশে মোট যে পরিমাণ জমিতে ফসল উৎপাদিত হয়, তাহার শতকরা প্রায় ৫½ভাগ তৈলশস্য দ্বারা অধিকৃত। ভারতের জমির অনুসারে ইহা সামান্য হইলেও অন্য দেশের তুলনায় প্রায় ১ কোটি ৪০ লক্ষ একর তৈল শস্যের জমিকে বিপুল পরিমাণ জমি বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। সেই জন্যই অন্যান্য দেশ ভারতের তৈল-শস্যের উপর ক্রমশঃই অধিকতর লোলুপ দৃষ্টি ফেলিতেছে। গত ১৯২১-২২ খৃষ্টাব্দে তৈল-শস্যের জমি অর্দ্ধলক্ষ অধিক পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। তাহার পর আবার বাজার মন্দার জন্য কিছু কমিয়া গিয়াছে। ভারতের তৈল-ফসলের মধ্যে চারিটিই সর্ব্বপ্রধান; উহাদের চাষের জমির অঙ্কাদি হইতে তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যাইবে:— রাই ও সরিষা ৩৮ লক্ষ একর; তিল ৩১ লক্ষ; কার্পাস, মহুয়া এবং পোস্তা বীজ হইতেও আহার্য্য তৈল পাওয়া যায়। এ দেশ হিসাবে বিবেচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যে, ভারতের সমগ্র তৈল-বীজের এক-চতুর্থাংশ মাদ্রাজ প্রদেশেই উৎপন্ন হয়; তৎপরেই মধ্য-প্রদেশ এবং বিহার ও উড়িষ্যার স্থান (প্রত্যেকে শতকরা ১৫ ভাগ); বঙ্গদেশে কেবলমাত্র শতকরা ৮ ভাগ তৈল-বীজের জমি অবস্থিত।

তৈল-শিল্পের বর্ত্তমান অবস্থা

দেশীয় ঘানির সাহায্যে প্রতি গ্রামেই যে অল্প বিস্তর তৈল নিষ্কাশন করা হয় তাহা সকলেই জানেন। কি পরিমাণ তৈল যে দেশমধ্যে ব্যবহৃত হয়, তাহা অধিক নির্দ্ধারণ করিবার উপায় নাই। তবে মোটামুটি হিসাবে ধরিতে পারা যায় যে, প্রতিবৎসর ভারতে প্রায় ৫০ লক্ষ টন তৈল-বীজ উৎপাদিত হয়। এই পরিমাণ বীজের মূল্য গড়-পড়তায় প্রায় ৭৫ কোটি টাকা, ইহার মধ্যে ২৫ কোটি টাকার বীজ তৈল, খৈল ইত্যাদি বিদেশে চালান যায় বলিয়া ধরিলে অসঙ্গত হইবে না। অবশিষ্টের কাটৃতি দেশেই হইয়া থাকে। সমষ্টিভাবে দেখিতে গেলে এতদ্দেশে তৈল-শিল্পের পরিসর খুব বড় বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। সমস্ত ভারতে তৈলের বৃহৎ কারখানার সংখ্যা ১ শত ২৫এর অধিক হইবে না; তন্মধ্যে তিন-চতুর্থাংশ কল বঙ্গদেশে অবস্থিত; বাকিগুলি ব্রহ্মদেশে। এই কয়েকটি কলের কথা ছাড়িয়া দিলে দেখা যায় যে, আপাততঃ তৈল-শিল্প যাহাদের হাতে ন্যস্ত আছে, তাহারা যেমন অশিক্ষিত, তেমনিই অর্থবলহীন; এবং নিষ্কাশনপ্রথা যেমন অপচয়-মূলক, উৎপাদিত তৈলও তেমনই নিকৃষ্ট শ্রেণীর। দেশমধ্যে তৈলের বড় কারখানা প্রতিষ্ঠার কথা দূরে থাকুক, আজকাল যে সমস্ত উন্নত আদর্শের ছোট ছোট কলও প্রস্তুত হইয়াছে, তাহারও গ্রামাঞ্চলে বড় একটা ব্যবহার দৃষ্ট হয় না। যাহাকে সাধারণতঃ কলের তৈল বলে, তাহাতে সময়ে সময়ে এত বিভিন্ন প্রকারের ভেজাল দেখিতে পাওয়া যায় যে,বোধ হয় ব্যবসায়িগণ সুবিধা পাইলেই কোন জিনিষই মিশাইতে দ্বিধা বোধ করে না। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতায় সরিষার তৈলে 'পাকড়া' অথবা কুসুম ফলের বীজের তৈল মিশ্রণ ও তজ্জনিত সাধারণের স্বাস্থ্যহানি, তাহার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। যতক্ষণ না তৈল-শিল্প সুশিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ দ্বারা পরিচালিত হয় এবং তাঁহারা নানাবিধ আহার্য্য তৈলের পুষ্টিকর গুণাবলী অক্ষুণ্ণ রাখিয়া বৈজ্ঞানিক প্রথায় তৈল প্রস্তুত করিতে অগ্রসর না হয়েন, ততক্ষণ ভারতে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর তৈল উৎপাদনের আশা খুবই কম।

তৈল-নিষ্কাশণ-প্রথা

যে কোন তৈল-বীজকে কুটিয়া জলের সহিত কিছুক্ষণ ফুটাইলেই উহা হইতে যে তৈলকণাগুলি বিচ্যুত হইয়া জলের উপর ভাসিয়া উঠে—তাহা মানব বহু পূর্ব্বেই আবিষ্কার করিয়াছিল। এখনও অনেক দেশের আদিম লোকরা উক্ত প্রথাতেই তৈল বাহির করে। এতদ্দেশেও কোন কোন পল্লীগ্রামে নারিকেল-শাঁস হইতে ফুটন্ত জল সাহায্যে তৈল প্রস্তুত করা হয়। ঘানিতে পেষণ করিয়া তৈল বাহির করা তদপেক্ষা উন্নত প্রথা, যদিও ইহার উদ্ভবও স্মরণাতীতকাল পূর্ব্বে হইয়াছিল। চাপ দ্বারা তৈল নিষ্কাশণপ্রথা দুই প্রকারের;—'ঠাণ্ডা' অর্থাৎ এ স্থলে বীজের খোসা ছাড়ান হয় না; সমস্ত বীজের উপরই চাপ দেওয়া হয় এবং খৈলে খোসা সমেত বীজ থাকে। 'গরম' প্রথায় তৈল-নিষ্কাশণের পূর্ব্বে খোসা ছাড়াইয়া লইয়া ও শাঁসে ঈষৎ পরিমাণে তাপ প্রয়োগ করিয়া উষ্ট্র-লোমের থলিয়ায় পুরিয়া চাপ দেওয়া হয়। চাপ দিয়া তৈল-নিষ্কাশণের অনেক প্রকার যন্ত্রপাতি আছে; তন্মধ্যে কতকগুলি বিভিন্ন ধরণের হাইড্রলিক প্রেস (Hydraulic Press) অন্যতম। নানাপ্রকারের চাপযন্ত্রের ও খোসা ভাঙ্গিবার, শাঁস উত্তপ্ত করার ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতির বিবরণ প্রদান করিবার স্থান বর্ত্তমান প্রবন্ধে নাই। তবে এইমাত্র এখানে বলিতে পারা যায় যে, কোন প্রকার চাপযন্ত্রেই তৈল একবারে নিঃশেষ হইয়া বাহির হইয়া যায় না। খৈলে অল্পবিস্তর পরিমাণ তৈল থাকে। তদ্ভিন্ন যে সমস্ত বীজে তৈলের মাত্রা অধিক, তৎসমুদয়ই সাধারণ চাপযন্ত্রের উপযুক্ত; সে সকল বীজে তৈলের মাত্রা কম, সেগুলির তৈল চাপ দ্বারা নিষ্কাশণ করিয়া লাভ হয় না। ভারতের ন্যায় দেশে—যেখানে মজুরী সস্তা এবং অধিক তৈলযুক্ত বীজ সহজেই পাওয়া যায়—উন্নত আদর্শে প্রস্তুত চাপযন্ত্র পল্লীগ্রামে মনুষ্য অথবা পশু-বল দিয়া চালাইবার যথেষ্ট সুযোগ আছে। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে যে সমুদয় নিষ্কাশণ-প্রথা আবিষ্কৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে বায়বী দ্রাবণ (Volatile Solvents) দ্বারা তৈল-নিষ্কাশণ প্রথাই সর্ব্বাপেক্ষা কম অপচয়-মূলক, অপেক্ষাকৃত সহজ এবং উৎকৃষ্ট শ্রেণীর তৈল-প্রদায়ী। এ স্থলে উক্ত প্রথার সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল;—প্রথমে বীজগুলিকে ঝাড়িয়া উত্তমরূপে বাছিয়া লওয়া হয়, তৎপরে বীজের কাঠিন্য, আকার ও অন্যান্য স্বাভাবিক গুণ অনুসারে বিট তোলা (ribbed) কিংবা মসৃণ পেষণযন্ত্রে পিষিয়া
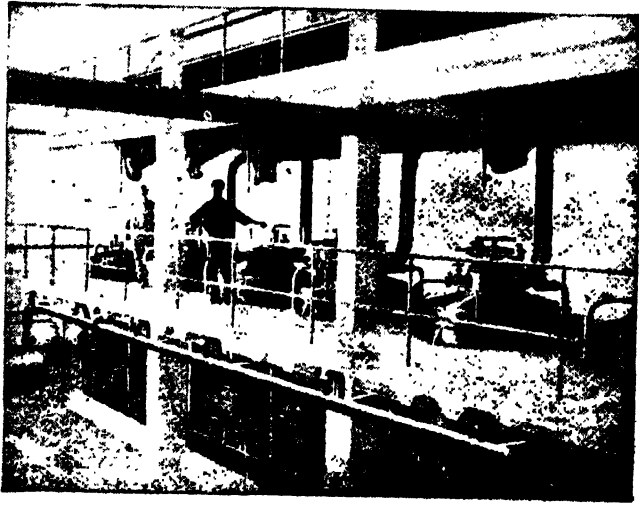
স্থায়ী দ্রাবণ-প্রথায় তৈল-নিষ্কাশণের কারখানা

তৈল বীজকে সূক্ষ্ম ধূলিতে পরিণত করা হইয়া থাকে। অতঃপর বড় বড় নলাকার পাত্রের মধ্যে উক্ত চূর্ণকে পূরিয়া উপযুক্ত পরিমাণ দ্রাবণসংযোগ করা দরকার। এই পাত্রগুলিকে নিষ্কাশক অথবা Extractor বলে। বৃহৎ কারখানা সমূহে একটি নিষ্কাশকের পরিবর্ত্তে পাশাপাশি ৩।৪টি নিষ্কাষক সজ্জিত থাকে। প্রথম নিষ্কাসক হইতে তৈলযুক্ত দ্রাবণ দ্বিতীয়ে, তাহা হইতে তৃতীয়ে এবং এইরূপে শেষেরটিতে গিয়া পড়ে। বলা বাহুল্য যে, শেষটি হইতে বাহির হইয়া আসার সময় দ্রাবণ প্রচুর পরিমাণে তৈল লইয়া আইসে। নিষ্কাষক হইতে দ্রাবণ বাহির হইয়া আসিলে উহাকে চোলাই যন্ত্রের মধ্যে চালাইয়া দেওয়া হয়। এই যন্ত্রের সাহায্যে তৈল ও দ্রাবণ পৃথক্ হইয়া যায়; তৈল পাত্রেই থাকে এবং দ্রাবণ অন্য আধারে গিয়া জমা হয়। চোলাই করার পূর্ব্বে ও পরে ছাঁকনি দ্বারা ছাঁকিয়া যাহাতে কোনরূপে তৈলের সহিত বীজের কণা প্রভৃতি চলিয়া আসিতে না পারে, তদ্বিষয়ে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করিলে তৈল খুব উৎকৃষ্ট শ্রেণীর হয়। তৈল হইতে দ্রাবণ অপসৃত করার পর তৈল হইতে খৈল পৃথক করিয়া দেওয়া হয়। স্থায়ী দ্রাবণ দ্বারা নিষ্কাশণ-প্রথায় খৈলে প্রায় তৈল থাকে না বলিলেই চলে। কিন্তু উহাতে শতকরা ১৬ হইতে ২৫ ভাগ শৈত্য থাকে। এই পরিমাণ শৈত্য থাকিলে গুদামজাত করিয়া রাখিলে মাল খারাপ হইয়া যাইতে পারে বলিয়া শুষ্ক করার ফলে আবার খৈল দিয়া শৈত্যের মাত্রা অর্দ্ধেক করিয়া লওয়াই নিয়ম। সাধারণ খৈলে তৈল অধিক থাকে বলিয়া উঁহা পশুদিগের পক্ষে দুষ্পাচ্য হয়, কিন্তু এইরূপ প্রথায় যে খৈল (groats) পাওয়া যায়, তাহা যেমন পুষ্টিকর তেমনই অধিক দিন স্থায়ী। এ স্থলে বলা আবশ্যক যে, যে সমস্ত দ্রব্য সাধারণতঃ দ্রাবণরূপে ব্যবহৃত হয়, তন্মধ্যে Petrol, Benzene, Spirit এবং Chlorinated hydrocarbonই প্রধান। তৈলোৎপাদক দ্রব্যবিশেষে ইহার একটি বা অন্যটি ব্যবহৃত হয় এবং সময়ে সময়ে একাধিক বস্তুর মিশ্রণও প্রয়োগ করা হইয়া থাকে।

তৈল শোধন-প্রণালী

পূর্ব্বোক্ত কয়েকটি প্রথার মধ্যে যে কোনটি দ্বারা তৈল প্রস্তুত হউক না কেন, উহা সম্পূর্ণভাবে পরিষ্কৃত হয় না। তাহা করিতে হইলে তৈলের স্বাদ, গন্ধ ও বর্ণ নষ্ট করা আবশ্যক। বিলাতে হাল্ নামক স্থানে এবং জর্ম্মণীর হামবর্গে যেমন তৈল-নিষ্কাশণের বড় বড় কারখানা আছে, তেমনই তৈল-শোধনের কারখানাও রহিয়াছে। এইরূপ শোধনের কারখানায় তৈল আসিলেই প্রথমে তাহার অম্লত্বের মাত্রা ও স্বরূপ নির্ণয় করা হইয়া থাকে এবং তদনুসারে কি প্রণালীতে উহা শোধিত করা হইবে, তাহা নির্দ্ধারিত করা হয়। সচরাচর উদ্ভিজ্জ তৈলসমূহে কতকগুলি বসা-মূলক অম্ল (fatty acids) ব্যতীত অণ্ড লাল ও আটাবৎ দ্রব্যও থাকে। এইগুলি যতদূর সম্ভব অপসৃত করিয়া না দিলে তৈলের স্বাদ খারাপ হয় এবং উহা বেশী দিন স্থায়ী হয় না। সেই জন্য আহার্য্য তৈল প্রস্তুতে এই বিষয়ের উপরই সমধিক দৃষ্টি রাখিতে হয়। তৈল-শোধনের প্রথম স্তরই উক্তরূপ free fatty acid পৃথক্ করিয়া দেওয়া। এতদুদ্দেশ্যে তৈলকে এক প্রকার চোলাই যন্ত্রের মধ্যে চালাইয়া দিয়া, আবশ্যক মত তাপ প্রয়োগ করিয়া উহার সহিত কষ্টিক্ সোডা মিশ্রিত করিয়া দেওয়া হয়। পূর্ব্বোক্ত অম্লগুলি সোডার সংস্পর্শে

আসিলেই সাবানে পরিণত হইয়া অধঃস্থ হয়। পরে সাবান জমিয়া গেলে পাত্রের নিম্নদিকের গম্বুজাকার অংশ খুলিয়া সাবান বাহির করিয়া লইয়া পাত্রান্তরে রাখা হইয়া থাকে। এইরূপ সাবান হইতে আবার কিয়ৎপরিমাণে তৈল বাহির করিয়া লইয়া অবশিষ্টাংশ সাবানের কলওয়ালাগণকে বিক্রয় করিয়া শোধনকারিগণ বেশ লাভ করেন।

তৈল অম্লমুক্ত হইলে দ্বিতীয় স্তরে উহাকে ধুইবার, শুষ্ক করিবার ও বর্ণহীন করিবার ব্যবস্থা করিতে হয়। পুনরায় আর একটি বড় পাত্রের মধ্যে তৈল চালাইয়া উহাকে বারংবার লবণাক্ত গরম জল দিয়া ধুইলে সাবানের আর যাহা কিছু ক্ষুদ্রাংশ থাকে, সমস্তই বাহির হইয়া যায়। তৎপরে উত্তপ্ত বাষ্প প্রয়োগ করিয়া তৈল শুষ্ক করা হইয়া থাকে। ইহার পরের স্তরের কায শুষ্কীকৃত তৈলকে বর্ণহীন করা। তৈলের রং নষ্ট করিবার জন্য নানাপ্রকার দ্রব্য ব্যবহৃত হয়, কিন্তু তন্মধ্যে এক প্রকার সাজিমাটীই সর্ব্বাপেক্ষা ভাল। উত্তপ্ত তৈলে এই প্রকার মৃত্তিকা মিশাইয়া দিয়া কিয়ৎক্ষণ ধরিয়া তৈল নাড়িতে হয়; ক্রমশঃ সমস্ত তৈলই বিবর্ণ হইয়া যায়। তৎপরে উত্তমরূপে একাধিকবার ছাঁকিয়া পরিষ্কৃত তৈল বাহির করিয়া লইতে হয়।

যে সমস্ত তৈল দ্বারা মাখন অথবা অন্যান্য আহার্য্য পদার্থ প্রস্তুত হয়, তৎসমুদয়কে প্রথমে সম্পূর্ণরূপে গন্ধহীন করা দরকার। গন্ধ নাশ করিবার পাত্রও একটি চোলাই-যন্ত্র। বার বার উত্তপ্ত বায়ু প্রয়োগ করিলে এবং অধিক তাপিত জল বাষ্পের সহিত চোলাই করিলে সমস্ত গন্ধজল বা দ্রব্যই তৈল হইতে বাহির হইয়া গিয়া অন্যত্র জমা হয়। কিছুক্ষণ এইরূপ বাষ্প প্রয়োগের পর যখন একবারেই স্বাদ ও গন্ধহীন তৈল যন্ত্র হইতে বহির্গত হইতে আরম্ভ হয়, তখন তাপ বন্ধ করিয়া দিয়া তৈলকে ক্রমশঃ শীতল করা হইয়া থাকে। শীতল হওয়ার পর আবার একবার তৈলকে ছাঁকা আবশ্যক। ইহা এ স্থলে উল্লেখযোগ্য যে, উল্লিখিত যন্ত্রগুলির কয়েকটিতে বায়ুবিরহিত প্রথায় (Vacuum) তাপ প্রয়োগ করিবার ব্যবস্থা আছে। তদ্দ্বারা ময়লা প্রবেশের পথ রুদ্ধ হইয়া নির্ম্মল তৈল প্রস্তুত হইয়া থাকে।

তৈল-শোধনের কারখানা

তৈলজাত খাদ্যদ্রব্য

যে প্রণালীদ্বারা বর্ত্তমান সময় ভাল মন্দ প্রায় সকল প্রকার তৈলকেই খাদ্য-তৈলে পরিণত করা হইতেছে, তাহার নাম Hydrogenation; এতদ্দ্বারা সচরাচর যে সব তৈল তরল অবস্থায় থাকে, সেগুলিকে জমাইয়া কঠিন করিয়া ফেলিতে পারা যায়। জমাইতে হইলে পূর্ব্ব প্রকারে শোধিত তৈল লইয়া, একটি প্রশস্ত বদ্ধ পাত্রে রাখিয়া উহাতে আবশ্যক পরিমাণ উত্তাপ প্রয়োগ করা হয়। Nickel, Palladium অথবা অন্য কোন Catalyst, তৎপরে সামান্য পরিমাণ একটু তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া উহা পম্প করিয়া পূর্ব্বোক্ত তৈলাধারে চালাইয়া দেওয়া হয়। অতঃপর পাত্রমধ্যে হাইড্রোজেন বাষ্প চালান হইতে থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে পাত্রাভ্যন্তরস্থিত ঘূর্ণ্যমান পাখা দ্বারা তৈল আলোড়িত হইতে থাকে। তৈল Catalyst সাহায্যে দরকার মত হাইড্রোজেন শোধন করিয়া লইলে উহাকে ছাঁকিয়া Catalyst পৃথক করিয়া দেওয়া হয়। তৈল ক্রমশঃ ঘনীভূত হইয়া জমিয়া যায়। এই প্রণালীতে তৈলের যে রাসায়নিক পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়, তাহাতে পুষ্টিকর গুণের কোন ক্ষতি হয় না। আমরা পূর্ব্বে যে সমস্ত তৈলের নামোল্লেখ করিয়াছি, তদ্ব্যতীত জলপাই, বাদাম, তিসি, পুন্নাগ প্রভৃতির তৈলও খাদ্য তৈলে পরিণত করা হইয়াছে। ফলতঃ এই কঠিনীভূত করার প্রণালী তৈল-জগতে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে

এবং উদ্ভিজ্জ তৈলসমূহের ব্যবহারক্ষেত্রের পরিসর সমধিক পরিমাণে বাড়িয়া গিয়াছে। এখন তৈলজাত দুগ্ধ, মাখন, নবনী, আইস-ক্রিম প্রভৃতি নানা প্রকার দ্রব্য বাজারে দেখা দিয়াছে ও দিতেছে। কালক্রমে এই শ্রেণীর দ্রব্যের যে কাটতি অধিক হইবে, সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নাই। ইতঃপূর্ব্বে আমরা তৈল-শোধনের মূল প্রণালীর বর্ণনা করিয়াছি। এই প্রকারের শোধিত তৈল লইয়া এক শ্রেণীর বিলাতী কলওয়ালাগণ আহার্য্য প্রস্তুতে প্রয়োগ
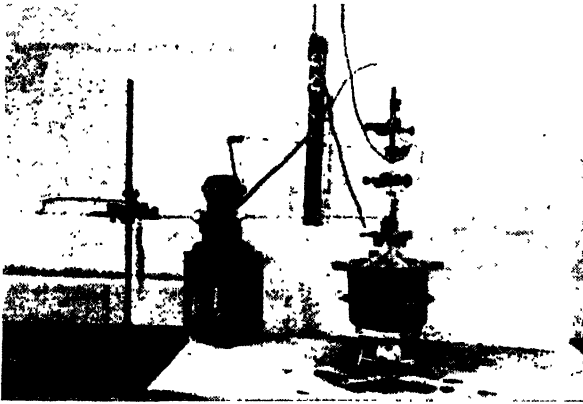
তৈল কাঠিন্যভূত করিবার যন্ত্র

করেন। তৈলজ আহার্য্য প্রস্তুতে বিলক্ষণ রাসায়নিক জ্ঞান ও কৌশল প্রদর্শিত হয়। মাখন অথবা ঘৃতের সমতুল্য উদ্ভিজ্জ তৈল হইতে যে সমস্ত দ্রব্য তৈয়ারী হয়, তাহাদিগকে প্রধানতঃ দুইটি ভাগে বিভক্ত করিতে পারা যায়:—Nut margarine ইহা শ্বেতাভ এবং ইহাতে কোন প্রাণীজ চর্ব্বি থাকে না; Oleo margarineএর বর্ণ অনেকটা স্বাভাবিক মাখনের ন্যায় এবং স্বাদও তদ্রূপ; ইহাতে প্রাণীজ বশাও থাকিতে পারে। উভয় প্রকার পদার্থই একাধিক জাতীয় তৈল অথবা বশার সংমিশ্রণে এবং সময়ে সময়ে প্রকৃত দুগ্ধ ও মাখন সহযোগে প্রস্তুত হয়। ঘূর্ণ্যমান শীতল (Chilled) ড্রামের উপর উক্ত মিশ্রণ ছড়াইয়া দিলে উহা সঙ্গে সঙ্গেই তুষার কণাবৎ জমিয়া নীচে একটি বিশেষ পাত্রে পড়িয়া যায়। উক্ত প্রকারের কণারাশি ২।৪ দিন রাখিয়া দিলে উহাতে স্বাভাবিক মাখনের গন্ধ অনুভূত হয়। তখন আবার বিশেষ প্রকারের কল দিয়া তৈলকণারাশি মাড়িয়া, অনাবশ্যক জলের মাত্রা বাহির করিয়া দিয়া প্যাক্ করা হয়।

এ পর্য্যন্ত এতদ্দেশে বিশুদ্ধ আহার্য্য তৈল প্রস্তুতের যে সমুদয় চেষ্টা হইয়াছে, তন্মধ্যে কোচিনে টাটা কোম্পানির নারিকেল তৈলের কারখানা ও বোম্বাইয়ের নিকট কার্পাস-বীজ-তৈলের কারখানা অন্যতম। কিন্তু ভারতের ন্যায় বিশাল দেশের পক্ষে তাহা কিছুই নহে। যে সমুদয় উৎকৃষ্ট তৈল-বীজ সাহায্যে আমরা সহজেই আহার্য্য তৈল-শিল্প গঠন করিয়া তুলিতে পারি, সেগুলির আদৌ সদ্ব্যবহার হইতেছে না। বরং বিদেশীয় বণিকগণ এই সমুদয় বীজ ও খৈল লইয়া গিয়া তৈল ও তৈলজ আহার্য্য প্রস্তুত করিয়া ভারতেই চালান দিতেছেন। মৎস্য,মাংস, দুগ্ধ প্রভৃতি ক্রমশঃ এত মহার্ঘ্য হইয়া পড়িতেছে যে, মধ্যবিত্ত লোকরা আবশ্যক পরিমাণ ঐ সমুদয় দ্রব্য ব্যবহার করিতে পারিতেছেন না। তৈলজ আহার্য্য এইরূপ অবস্থায় যথেষ্ট উপকারে আসিতে পারে; অন্ততঃ বিশুদ্ধভাবে প্রস্তুত হইলে ইহা যে নকল ঘৃত এবং দূষিত দুগ্ধ অপেক্ষা অনেক ভাল, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত।

প্রেমপত্র

ঊষার উদয়ে নীল উদার আকাশ,
বিলুপ্ত তারকাপুঞ্জ, মন্দ তন্দ্রাবেশ,
তরুচ্ছায়ে মায়া-মণিমালার প্রকাশ,
কূজনে কাঁপিছে বন; দীর্ঘরাত্রি শেষ।

নিশ্বসিছে সমীরণ আনন্দ-আবেগে,
কুমুদ-কুসুম কত কেলি কুতূহলী,
কোমল-অলক্ত-রক্ত ভূর্জ্জপত্র মেঘে,
রবি-রশ্মি বর্ণরঙ্গ—স্বর্ণ রেখাবলী।

কে লিখেছে প্রেমপত্র,—কি বিরহ-ব্যথা,
কার মিলনের বাঞ্ছা রেখায় লেখায়,
কে লেখে কে দেখে, আর পড়ি প্রতি কথা,
প্রেম দেবতারে মর্ম্মবেদনা জানায়?

কোথা কবি কালিদাস, প্রেমপত্র পড়ি'
দেখাবে অলকা নবপ্রেম স্বপ্ন গড়ি'।

মুনীন্দ্রনাথ ঘোষ।

ত্যাগীর লাভ
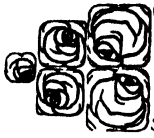
বাড়ী ফিরিয়াই অনুকে দেখিতে পাওয়া যাইবে, রতন এই আশাই করিয়া আসিতেছিল; কিন্তু বাড়ীতে আসিয়া যখন তাহাকে দেখিতে পাওয়া গেল না, তখন তাহার মুখের সে প্রফুল্ল ভাবটা চকিতে অন্তর্হিত হইয়া গেল, শ্রাবণ-আকাশের মত তাহার মুখ অন্ধকার হইয়া উঠিল। সে কাকিমাকে প্রণাম করিবার আগেই জিজ্ঞাসা করিল, "কাকিমা, অনু কোথায় গেছে ?"

কাকিমা একটু বক্রভাবে উত্তর দিলেন, "সে এক ছেলে বাপু; বললুম তোর দাদা আসবে,—এত ক'রে বেচারা পত্র দিয়েছে, আর দুটো দিন বাড়ীতে থাক, তারপর না হয় মামার বাড়ী যাস.--কি বলব বাবা, আমার একটি কথা যদি শোনে, যেমন আমার দাদার ছেলে এল, অমনি তার সঙ্গে চলে গেল।"

রতন একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে হঠাৎ সামলাইয়া লইল; নাঃ, অনুর জন্য একটা দীর্ঘনিশ্বাসও উচিত নয়। এতকাল পরে তাহার সাথী দাদা আসিতেছে, সে দুইটা দিনমাত্র অপেক্ষা করিয়া যাইতে পারিল না? এমন নয় যে দাদা পত্র দেয় নাই? আসিবার দিন ঠিক করিয়া রতন সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিয়া পত্র দিয়াছে, অনু যেন তাহার না আসা পর্য্যন্ত কোথাও না যায়। সেই অনু,—যাহার জন্য সে দিন-রাত্রি ভাবে, সে কি না সেই স্নেহপূর্ণ-হৃদয় দাদার কথা একটিবারও ভাবিল না, দাদা অমুক দিন—অমুক সময়ে আসিবে জানিয়াও চলিয়া গেল ?

নিদারুণ দুঃখে রতনের বুকটা ভাঙ্গিয়া পড়িতে চাহিতেছিল, এতকাল পরে স্বদেশে আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে ফিরিয়া আসার যে আনন্দ, তাহা সে কিছুতেই অনুভব করিতে পারিতেছিল না। অনেক কষ্টে সে নিজের মধ্যে ধৈর্য্য আনিয়া কাকিমার আদেশমত আনীত জিনিস কয়টি তাঁহাকে মিলাইয়া দিল, ছোট বোন সুশীর জন্য পুতুল, বাক্স প্রভৃতি অনেক জিনিষ আনিয়াছিল, সে সব তাহাকে দিয়া তাহার মুখে হাসির লহর দেখিল। সংসারে যাহাকে সে যথার্থ আন্তরিক ভালবাসিত—যাহাকে একটিবার দেখার জন্য তাহার মনটা বড় ছটফট করিতেছিল, কেবল তাহাকেই সে পাইল না, তাহার জন্য পছন্দ করিয়া আনা জিনিষগুলা ব্যাগের মধ্যেই পড়িয়া রহিল।

অনুপম কাকিমার একমাত্র পুত্র, রতনের অপেক্ষা বৎসর তিনেকের ছোট। রতন যখন মাত্র দুই বৎসরের, তখন তাহার মা মারা যান, ছেলেটিকে স্বামী ও জা'য়ের হাতে দিয়া গিয়াছিলেন। স্বামী আর বিবাহ করেন নাই। ভ্রাতৃজায়ার হস্তে পুত্রটিকে দিয়া তিনি বিশ্বাস করিতে পারেন নাই, তাহার কারণও ছিল। তিনি লাহোরে কায করিতেন, বৎসরে একবারমাত্র দেশে আসিতেন; রতন কাকিমার কাছেই মানুষ হইতেছিল, অতটুকু ছেলেকে নিজের কাছে লইয়া গিয়া রাখিবার সাহস পিতা করিতে পারেন নাই।

অনুপমের জন্মের পর রতন কাকিমার নিকট হইতে পূর্ব্বেকার মত আদর-যত্ন আর পায় নাই, ইহা যথার্থ সত্য কথা। কাকা কিশোর বাবু কাযের জন্য সমস্ত দিন বাহিরে বাহিরেই থাকিতেন, ভিতরে স্ত্রী কি ভাবে রতনকে লালন-পালন করিতেছেন, সে খবর তিনি বিশেষভাবে জানিতে পারেন নাই।

এক দিন বালক রতনের তত্ত্বাবধানে চতুর্থবর্ষীয় শিশু অনুকে রাখিয়া কাকিমা কার্য্যান্তরে গিয়াছিলেন; দুষ্ট অনুকে রতন কিছুতেই সামলাইয়া রাখিতে পারে নাই, অনু সিঁড়ির উপর হইতে গড়াইয়া নীচে পড়িয়া গিয়াছিল। এই অপরাধের জন্য রতনকে সারাদিনের মত একটা ঘরে বন্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল, তাহাকে কিছু আহার করিতে দেওয়া হয় নাই; বালক ক্ষুধায় কাতর হইয়া মাকে ডাকিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। এ সমস্ত কথা কিশোর বাবুর কানে উঠে নাই, উঠিলে এতদূর ঘটিতে পারিত না। দৈবক্রমে সেই দিনই রতনের পিতা বিনোদ বাবু আসিয়া পড়িলেন; নিজের চোখে ছেলের দুর্দ্দশা দেখিয়া তিনি তাহাকে নিজের কাছে লাহোরে লইয়া গেলেন, সেইখানে সে লেখাপড়া শিখিতে লাগিল।

এখানে এত শাস্তি পাইলেও রতন যাইবার সময় বড় কম কাঁদিয়া যায় নাই; কেন না, অনুপমকে সে বড় ভালবাসিত। রতনকে কাছে লইয়া গিয়া পিতা দেশে আসার

সংখ্যা খুবই কমাইয়া দিলেন, হয় ত কোন বৎসর আসিতেন, কোন বৎসর আসিতেন না। পিতার সহিত রতনও আসিত, অনুপমকে লইয়া তখন তাহার আনন্দের সীমা থাকিত না। তিন বৎসরের মাত্র বড় হইয়া সে অনুপমকে ছেলেমানুষ মনে করিয়া উপদেশ দিত, গম্ভীরভাবে তাহার পড়া লইত, শাসন করিত।

রতন এম, এ পাশ করিয়া সম্প্রতি লাহোরেই একটা কাযে নিযুক্ত হইয়াছিল, অনুপম কলিকাতায় থাকিয়া বি, এ পড়িতেছিল।

গত বৎসর লাহোরেই বিনোদ বাবু মারা যান, পিতার মৃত্যুর পর রতনের দেশে আসা এই প্রথম। সে ছয় মাসের ছুটী লইয়া আসিয়াছে, এই ছয়টা মাস সে দেশে আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে আনন্দে কাটাইয়া দিতে চায়।

রতনের এখানে আসাটাকে কাকিমা মোটেই সুনজরে দেখিতে পারেন নাই। তাহার আসিবার পত্রখানি লইয়া তিনি স্বামীকে বলিলেন, "ওগো, রতন এবার কি করতে আসছে, তা জানো?"

স্ত্রীর কথা শুনিয়া কিশোর বাবু আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন, বলিলেন, "কার কথা বলছো,—রতনের? কি করতে সে আস্‌ছে—আশ্চর্য্য প্রশ্ন! অনেক কাল সে দেশে আসেনি, প্রায় চার পাঁচ বছর হবে। তাকে কি চিরকালই সেই ভূতের দেশে থাকতে হবে?"

কাকিমা গম্ভীর হাস্যের সহিত বলিলেন, "তাই বটে; সাধে কি লোকে তোমায় ঠকায়? এমন নির্ব্বুদ্ধি লোক পেলে কে না ঠকিয়ে দু' হাতে জিনিষ নেবে? তোমার হয়েছে কি,—এর পর যদি 'মালা' হাতে করে স্ত্রী-পুত্র নিয়ে গাছ-তলায় না বসতে হয় ত আমার নামই ঠিক নয়, এ আমি ঠিক বলছি, দেখে নিয়ো।"

কিশোর বাবু নির্ব্বাক-বিস্ময়ে শুধু স্ত্রীর দিকে চাহিয়া রহিলেন, কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না, কেন এত জিনিষ থাকিতে নারিকেলের মালা হাতে করিয়া স্ত্রী-পুত্রসহ তাঁহাকে পথের ধারে গাছতলায় বসিতে হইবে। তিনি একটু উৎকণ্ঠিতও হইলেন, কেন না, যে সময়ের উল্লেখ করা হইল, সে সময়টা বড়ই খারাপ। হেতুটা সময় থাকিতে জানা গেলে প্রতীকার সম্ভব হইতেও পারে।

স্বামীর স্তম্ভিত মুখ ও বিস্ফারিত চোখের দিকে চাহিয়া কাকিমার ক্রোধ আরও বাড়িয়া গেল; তিনি মুখের সম্মুখে হাতখানা নাড়িয়া বলিলেন, "নেকা যেন, কিছু বুঝতে পারেন না। রতন যে এতকাল বাদে দেশে আসছে, এর একটা কোন উদ্দেশ্য নেই, তাই মনে ভাবছ? এই যে বাড়ী-ঘর—বাগান-পুকুর, এ সবই ত রতনের বাপের টাকায় হয়েছে। শুনেছি, তোমাদের না কি এইখানটায় দু'খানি মাত্র মেটে ঘর ছিল, পাঁচ সাত কাঠা মাত্র জমী ছিল; এখানকার এই জমিদারী, তিনতালা বাড়ী, এ সব রতনের বাপ নিজের টাকায় করেছেন।"

"আর আমি বুঝি কিছুই করি নি, ছোট বউ, আমি বুঝি কেবল—"

ক্রোধের আতিশয্যে কিশোর বাবুর কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল।

কাকিমা বলিলেন, "ভারি ত তোমার মাইনে ছিল, তাইতে তুমি করেছ—বলতে একটু মুখেও বাধছে না, এই আশ্চর্য্য। দলিল-পত্র সবই রতনের বাপের নামে, তোমার নামে কিছুই নেই। রতন কি কিছু বোঝে না, সে এখন আর সেই ছেলেমানুষটি নেই, সবই সে বুঝতে পেরেছে, তাই এবার তার সম্পত্তি সে অধিকার করতে আসছে। সে সামান্য একটা চাকরি নিয়ে পড়ে থাকবে সেই দুর লাহোরে, আর তুমি তার বাড়ী-ঘর জমী-জমা স্বচ্ছন্দে ভোগ করবে, সে কি হ'তে পারে? আমার কথা দেখে নিয়ো, সে এবার এই সব ভোগ-দখল করতেই আসছে।"

কিশোর বাবু দীপ্তমুখে মাথা হেলাইয়া বলিলেন, "সে ঠিক কথাই বলেছ, ছোট বউ; আমি তাকে এই জন্যে আসতে বলেছি বলেই ত সে আসছে, নইলে—"

"তুমি তাকে আসতে বলেছ?—"

কাকিমা এক মুহূর্ত্ত স্তব্ধ হইয়া রহিলেন, তখনই সে স্তব্ধতা কাটিয়া গেল, দীপ্তকণ্ঠে তিনি বলিলেন,"তুমি লিখেছ আজ আসতে? তাই ত আমিও ভাবছি, নইলে কে এমন 'ঘরের ঢেঁকি কুমীর' আছে, নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মারছে। অনুকে পথের ভিখিরী করছো—তুমিই?"

হতভম্ব হইয়া গিয়া কিশোর বাবু মাথা চুলকাইয়া বলিলেন, "কেন, পথের ভিখিরী হ'ল সে কি করে? রতন তেমন ছেলেই নয়,ছোট বউ, তুমি যা ভাবছ, সে তা কখনই করতে পারবে না। অনুকে অহর্নিশি দেখছ, তার পাশে

রতনকে দাঁড় করিয়ে দেখ, দু'জনে ঠিক সমান কিংবা কার চেয়ে কে বেশী। ও সব তোমার কি যে ভাবনা ছোট বউ, ও সব ভেবে মিথ্যে মন খারাপ করো না। এ কথা যথার্থ যে, তার বাপের মাথার ঘাম পায় ফেলে উপার্জ্জনের ফল নির্ব্বিবাদে ভোগ করছি আমরা, আর সে যথার্থ উত্তরাধিকারী হ'য়ে এর একটি পয়সা,একটা জিনিষ পায় নি। মাসিক সামান্য দেড়শো টাকার জন্যে সে মাথার ঘাম পায় ফেলে কেন বাপু, দেশের ছেলে দেশে এসে থাক, যা তোর বাপ করে রেখে গেছে, তা আজ খায় কে? দেড়শো টাকা মাইনে দিয়ে আজ পাঁচটা ম্যানেজার সে নিজেই যে রাখতে পারে, যথার্থ কি না বল, ছোট বউ।"

অত্যন্ত খুসি হইয়া কিশোর বাবু হাসিতে লাগিলেন। স্বামীর নির্ব্বুদ্ধিতা দেখিয়া স্ত্রীর সর্ব্বাঙ্গ জলিতেছিল, মুখখানা কঠিন করিয়া তিনি সরিয়া গেলেন।

অনুপম খুব লাফালাফি করিয়া বেড়াইতেছিল, "উঃ, আমি তাঁর চাকর কি না, তাই যে দিন বাবু বাড়ী আসবেন, সে দিন আমার বাড়ী থাকা চাই-ই। মনে করছে আর কি দুদিন বাদে আমিই ত জমিদার হ'ব, এখন হ'তে হুকুমটা চালিয়ে নেওয়া যাক। আমি কখনই এ হুকুম শুনব না, তাকে জানাব যে, আমি তাকে থোড়াই কেয়ার করি।"

সুটকেশের মধ্যে আবশ্যক দুই চারিখানা কাপড় জামা গুছাইয়া লইয়া সে মাতুলালয়ে যাত্রা করিল, বেগতিক দেখিয়া কিশোর বাবু পুত্রকে বুঝাইতে গেলেন, পুত্র তাঁহাকে বলিল, "বাবা, তুমি কিছু বোঝ না, মানুষ চিনতে তোমার এখনও ঢের দেরী আছে। বছরখানেকের মধ্যেই চিনতে পারবে,তখন বুঝতে পারবে আমি ঠিক কাযই করেছি কি না।"

কিশোর বাবু পিছাইয়া পড়িলেন, মনে মনে ভাবিলেন, এ শতাব্দীর ছেলেগুলা বাপকে মানিতে চায় না। হায় রে সে কাল! তাঁহারা যে মাথা সোজা করিয়া পিতার সম্মুখে দাঁড়াইতে পারেন নাই!

রতন এখানে আসিয়া রহিয়া গেল। দীর্ঘদিন প্রবাসে থাকিয়া প্রাণটা তাহার হাঁফাইয়া উঠিয়াছিল,সে তাই কাকার স্নেহপূর্ণ পত্রখানি পাইবামাত্র ছুটিয়া আসিয়াছে। অনুকে বলিবে বলিয়া কত কথা সে মনের মধ্যে সাজাইয়া আনিয়াছিল, তাহার একটা কথাও বলা হইল না।

রতন আসিবার কিছু দিন পরে মাতুলালয় হইতে অনুর লিখিত একখানা পত্র দৈবক্রমে রতনের হাতেই আসিয়া পড়িল। অনুপম জানিত, পত্র যথাস্থানে পৌছিবে, কেহ তাহার পত্র পড়িবে না, সেই জন্য অত্যন্ত সাধারণভাবেই সে পত্রখানা দিয়াছিল।

পত্রে অনু সামান্য দুই চারি কথার মাঝখানে লিখিয়াছিল, দাদা থাকিতে সে এ বাড়ীতে আসিতে চায় না, সেই জন্য এখন সে মামার বাড়ীতেই থাকিবে এবং সেখান হইতেই বি, এ, পরীক্ষা দিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে।

পত্রখানা কখন যে রতনের হাত হইতে খসিয়া পড়িল, তাহা সে জানে না, রতন আত্মহারা হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। অনু যে এ কথা লিখিতে পারে, ইহা তাহার স্বপ্নেরও অগোচর। রতন জানে, অনুকে সে যেমন প্রাণ ঢালিয়া ভালবাসে, অনুও তাহাকে তেমনই ভালবাসে; শুধু অনুর স্মৃতি-রঞ্জিত করিয়া সে প্রবাসের দিনগুলি যাপন করিত। অবকাশকালে সে অনুর দীর্ঘ পত্রগুলা বাহির করিয়া একই পত্র বোধ হয় পঞ্চাশবার করিয়া পড়িত। সে সব পত্রে কি গভীর ভালবাসা! কত স্নেহ তাহাতে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত! সে কি শুধু মিথ্যা স্তোক দিয়া তাহার দাদাকে ভুলাইয়া রাখিয়াছিল?

দুই হাতে মাথা চাপিয়া ধরিয়া রতন অনুর কথাই ভাবিতে লাগিল।

সান্ত্বনা দিতে যখন কেহ না থাকে, তখন অধীর মন আপনাকেই আপনি সান্ত্বনা দেয় দেখা যায়। রতনের মনে ধীরে ধীরে একটি সান্ত্বনার বাণী ভাসিয়া উঠিল,—এ মিথ্যা কথা নহে ত? অনু হয় ত তাহার মন বুঝিবার জন্যই এমন সাধারণ ভাবে পত্রখানা দিয়াছে, সে নিশ্চয়ই জানে, এ পত্র তাহার হাতে পড়িবেই। হাঁ, ইহাই সম্ভব, এমন ভয়ানক কথা কখনই সত্য হইতে পারে না।

তাহার বিবর্ণ মুখে আবার চিরন্তন হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল। পত্রখানা তুলিয়া লইয়া কাকিমার কাছে গিয়া হাসিমুখে সেখানা তাঁহার হাতে দিয়া বলিল, "অনু কি দুষ্ট হয়েছে দেখেছ, কাকিমা, কি রকম করে পত্রখানা লিখেছে একবার দেখ। সে আমায় পরীক্ষা করছে,—দেখছে আমি পত্র পেয়ে পাগল হয়ে যাই কি না। তেমনই বোকা কি না আমি যে, এই সামান্য পত্রখানা পেয়ে এই মিথ্যেটাকেই যথার্থ বলে মেনে নেব?"

কাকিমার মুখখানা এতটুকু হইয়া গেল। তিনি তাড়াতাড়ি পত্রখানা কুড়াইয়া লইয়া শুষ্ক হাসি হাসিয়া বলিলেন, "তাই ত, বোকা ত তুমি হওনি বাবা, তার কাযের দ্বারাই সে বোকা হ'য়ে গেল। সে স্পষ্টই ত দেখছে যে—"

কথাটা আর শেষ করা হইল না, কি একটা গলার মধ্যে বাধিয়া যাওয়ায় তিনি ভীষণ রকম একটা বিষম খাইলেন।

অনু আসিল না; দিনের পর দিন—সপ্তাহের পর সপ্তাহ কাটিয়া চলিল, অনু ফিরিল না।

বিবর্ণ মুখে রতন বলিল, "অনু তবে যথার্থ কথাই লিখেছে কাকিমা, আমি থাকতে সে আর বোধ হয় এখানে আসবে না। আমি তার কি করেছি কাকিমা, আমি যে তাকে এখনও সেই ছোটবেলার মতই ভালবাসি।"

রতনের চক্ষু দুইটি অশ্রুতে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল, গোপন করিবার জন্যই সে তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইল।

কাকিমা ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, "সে কি কথা, বাবা, তাও কি হ'তে পারে কখনও? অনু দাদা বলতে বাঁচে না, সে কখনও সত্যি এ কথা বলতে পারে? নতুন জায়গায় গেছে, সমবয়সী কয়টি পেয়েছে, তাই চট করে আসছে না। সখ মিটলেই আপনি আসবে।"

বিষণ্ণ সুরে রতন বলিল, "তত দিনে আমিও ত চলে যাব কাকিমা, আমার সঙ্গে তার আর দেখা হবে না।"

কাকিমা বলিলেন, "সে কি কথা? এখানে থাকো, জমিজমাগুলো নইলে—"

শুষ্ক হাসি হাসিয়া রতন বলিল, "আমি ও সব বুঝিনে কাকিমা, কাকা আছেন, চিরকাল যেমন তিনি দেখছেন, তেমনই দেখবেন।"

প্রায় তের চৌদ্দ বৎসরের কথা, বিনোদ বাবুর অকৃত্রিম বন্ধু হাইকোর্টের এটর্ণি হেমলাল বাবু প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তাঁহার কন্যার সহিত রতনের বিবাহ দিতে হইবে। মেয়েটি মাত্র চার পাঁচ বৎসরের ও রতন এগার বার বৎসরের বালকমাত্র। বিনোদ বাবু বাঙ্গালায় আসিলেই হেম বাবুর বাসায় গিয়া দুই চারি দিন বিশ্রাম লইতেন, রতনও সেখানে মহানন্দে খেলিয়া বেড়াইত, হেম বাবুর স্ত্রী এই মাতৃ-হারা সুদর্শন বালকটির ব্যবহারে ও চতুরতায় বড়ই প্রীত হইয়াছিলেন। এই ছেলেটির মায়ের অভাব তিনি নিজেকে দিয়া পূর্ণ করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছিলেন, তাই আশাকে দিয়া তাহাকে কাছে পাইবার প্রস্তাবটা তিনিই করিয়াছিলেন।

এ প্রস্তাবে বিনোদ বাবু আনন্দের সহিত সম্মত হইয়াছিলেন। মেয়েটি পিতামাতার একমাত্র সন্তান, কিন্তু শুধু এই জন্যই তিনি তাহাকে পাইতে চান নাই; ইহার রূপ ও গুণও তাঁহাকে আকর্ষণ করিয়াছিল। পুত্রের ভাবী স্ত্রীরূপে তিনি আশাকেই নির্ব্বাচিত করিয়াছিলেন।

আশা ম্যাট্রিক পাস করিয়াছিল। হিন্দুর মেয়ের পক্ষে এই লেখাপড়াই যথেষ্ট মনে করিয়া তাহার পিতামাতা তাহাকে আর পড়ান নাই। রতনের পথ চাহিয়া তাঁহারা কন্যাকে এই অষ্টাদশ বৎসর পর্য্যন্ত অবিবাহিতা রাখিয়াছেন। রতনকে দেশে ফিরিয়া আসিয়া বিবাহ করিবার জন্য তাঁহারাও উপর্য্যুপরি কয়েকখানি পত্র দিয়াছেন।

পিতা যে এই বিবাহ-সম্বন্ধ ঠিক করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, এ কথা নিজের মুখে কাকাকে জানাইতে রতন বড় লজ্জাবোধ করিতেছিল। আশার একখানি ফটো তাহার কাছে ছিল এবং হেম বাবুর একখানি পত্রও ছিল; এখন এই পত্র ও ফটোখানি কোন রকমে কাকার সম্মুখে গোপনে চালান করিতে পারিলে হয়। বিশ্বাস আছে, কাকা পত্র পড়িয়া এবং ফটো দেখিয়া সবিশেষ বুঝিতে পারিবেন।

আশাকে রতন যথার্থই ভালবাসিত; কিন্তু বাক্যে বা ব্যবহারে সে কথা সে কোনও দিন প্রকাশ করে নাই। সে জানিত, তাহার পরলোকগত পিতার সম্মতি এবং আশার পিতামাতার আন্তরিক আগ্রহের ফলে সে অবশ্যই আশাকে লাভ করিয়া চরিতার্থ হইবে। কিন্তু সম্প্রতি হেমলাল বাবু লাহোরের ঠিকানায় তাহাকে যে পত্র দিয়াছেন, তাহার এক স্থানে লিখিত ছিল যে, রতনের অনাবশ্যক বিলম্বে তাঁহারা ক্রমেই নিরুৎসাহ হইয়া পড়িতেছেন। যদি একান্তই তাহার বিবাহের অভিপ্রায় না থাকে, তবে বাধ্য হইয়া তাঁহাকে অন্যত্র কন্যাদান করিতে হইবে। হিন্দুর ঘরের মেয়ে আর রাখা ত যায় না। অন্যত্র হইতে আর একটা ভাল সম্বন্ধ আসিয়াছে। রতন আর বিলম্ব করিলে বাধ্য হইয়া সেই পাত্রেই তাঁহাকে কন্যার বিবাহ দিতে হইবে।

হেমলাল বাবুর শেষ পত্রখানা বার-দুই পড়িয়া রতন ব্যাগ হইতে আশার ফটো বাহির করিয়া তন্ময় হইয়া

দেখিতে লাগিল। এই আশা যে তাহার বাগদত্তা, সে অন্যের হইবে, এ কি সহ্য হয়? না, আজ যেমন করিয়াই হউক, কাকাকে সব বলা চাই-ই, নহিলে তাহারই সব যায় যে!

চঞ্চল চরণক্ষেপে চতুর্দ্দিক শব্দায়িত করিয়া ছুটিতে ছুটিতে সুশী আসিয়া পড়িল। "কার ছবি দাদা,—দেখি?"

ফস করিয়া রতনের হাত হইতে ফটোখানা টানিয়া লইয়া একটি বারের জন্য পলকের দৃষ্টিপাত করিয়া সহজ সুরেই সে বলিল, "ও, বউদির ছবি দেখছ?"

"বউদি,—বউদি কে?"

রতন একবারে অবাক্ হইয়া গেল। তাহার সহিত আশার বিবাহ হইবে, এ কথা তবে বাড়ীর সকলেই জানে।

উচ্চ হাসিয়া সুশী বলিল, "ও মা, সে কথা তুমি জান না বড়দা? এই মেয়ের নাম আশা না? এর সঙ্গে দাদার বিয়ের সম্বন্ধ ঠিক হয়ে গেছে; আশীর্ব্বাদ পর্য্যন্ত হয়ে গেছে যে! এই ত বৈশাখ মাসেই বিয়ে হবে, সব ঠিক। হ্যাঁ, বড়দা, তোমার সঙ্গে না কি এর বিয়ে হওয়ার কথা ছিল?"

রতন একবারে স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল, তাহার মনে হইতেছিল, এমন আঘাত সে জীবনে আর কখনও পায় নাই। এক দিন সে আর একটা দুঃসহ আঘাত পাইয়াছিল, সে তাহার পিতার মৃত্যুর দিনে; কিন্তু সে অসহ্য শোকেও সে সান্ত্বনা পাইয়াছিল। আজিকার এ বেদনায় সে সান্ত্বনা পাইবে কোথায়?

আঘাতের প্রথম বেদনাটা সামলাইয়া লইতে রতনের কয়েক মুহূর্ত্ত কাটিয়া গেল; তাহার পরই সে বিবর্ণ মুখে বলিয়া উঠিল, "কে বললে এর সঙ্গে আমার বিয়ে হওয়ার কথা ছিল?"

সুশী হাসিয়া উঠিয়া করতালি দিয়া বলিল, "আহা! আমি যেন কিছু জানিনে। মা আর দাদা এক দিন এই সব কথাই ত বলছিল, আমি সেখানে বসে পুতুল খেলতে খেলতে সব শুনেছি। হুঁ হুঁ, আমার চোখে ধূলো দেওয়া অমনি কি না।"

সুশী খানিকটা খুব হাসিয়া লইয়া তাহার পরক্ষণেই হঠাৎ গম্ভীর হইয়া উঠিয়া বলিল, "হ্যাঁ বড়দা, তা তুমিই কেন একে বিয়ে করলে না? দাদা বলছিল অরুণ দাদার কাছে, তুমি না কি একে খুব ভালবাস, সেই জন্য দাদা একে বিয়ে করবেই। কেন দাদা, এ রকম—"

তিরস্কারের সুরে রতন বলিল, "ছোটমুখে ও সব কথা মোটেই মানায় না সুশী, তুই যা খেলা কর গিয়ে। ও সব ব্যাপার নিয়ে তোকে এখন হ'তে বুড়োর মত মাথা ঘামাতে হবে না।"

মাথা দুলাইয়া সুশী বলিল, "না, মাথা ঘামাতে হবে না বই কি, যা শুনেছি তাও বলব না? তুমি না কি তোমার বাড়ী-ঘর, বাগান-পুকুর নিতে এসেছ দাদা, আমাদের সকলকে না কি তাড়িয়ে দেবে?"

রতন জিজ্ঞাসা করিল, "কে বললে?"

সুশী উত্তর দিল, "মা তোমার এখানে আসার আগে বাবাকে বলছিলেন, আমি লুকিয়ে থেকে সব শুনেছি। আমাদের কেন তাড়িয়ে দেবে দাদা! আমরা কি করেছি?"

গম্ভীর স্বরে রতন বলিল, "কিছু করিস্ নি বোন, কিছু করিস্ নি। হ্যাঁ রে সুশী, আমায় দেখে কি তেমনি মনে হয়, আমি কি তোদের তাড়িয়ে দিতে পারি? এ বাড়ী-ঘর, বাগান-পুকুর, যার কথা তুই বলছিস, এ সবই যে তোদের বোন, আমি এখানে দু'দিনের জন্যে এসেছি, কিছুই ত নিতে আসি নি। কাকা যদি আমায় না দেখতেন, কাকিমা যদি আমায় কোলে তুলে না নিতেন, এত দিন কোথায় থাকতুম? সংসারের সঙ্গে সকল সম্পর্কই আমার উঠে যেত যে! আমি নেমকহারাম নই, আমি জীবন থাকতে সে কথা ত ভুলতে পারব না, ভাই।"

রতনের অন্তরে কতখানি গভীর ক্ষত উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহা তাহার বাহ্য ভাব দেখিয়া কেহই বুঝিতে পারিল না। কেহ জানিতে পারিল না, তাহার বুকের অভ্যন্তরে রাবণের চিতা জ্বলিতেছে, সেই চিতায় তাহার শান্তি, সুখ সবই পুড়িয়া গিয়াছে।

চৈত্র মাস শেষ হইয়া আসিল। রতন গিয়া কাকাকে জানাইল, সে দুই তিন দিনের মধ্যে তাহার কার্য্যস্থল লাহোর চলিয়া যাইবে।

কিশোর বাবু কি লিখিতেছিলেন, হাতের কলমটা ফেলিয়া তাহার মুখপানে তাকাইয়া বলিলেন, ছয় মাসের ছুটী নিয়ে এসেছিস, তিন মাসও পুরো হয় নি। এর মধ্যে চলে যাবি কি, রতন?"

রতন নতমস্তকে বলিল, "হ্যাঁ কাকা, বড় দরকার পড়েছে—সেই জন্যে—"

চিরপূজ্য পিতৃসম কাকার কাছে রতন জ্ঞানে কখনও মিথ্যা কথা বলে নাই; আজ এই মিথ্যা কথাগুলি বলিতে তাহার হৃদয় শতধা হইয়া যাইতেছিল, তথাপি বলিতে হইল, আর উপায় নাই।

কিশোর বাবু অকস্মাৎ দীপ্ত হইয়া উঠিয়া বলিলেন, "তা পড়ুক দরকার, আমি তোকে আর সেখানে যেতে দেব না। এই বাড়ী-ঘর সবই তোর, দাদা মুখের রক্ত তুলে বাড়ী-ঘর, জমিদারী করে গেছেন—সে কি পরের জন্যে? তাঁর একমাত্র দুলাল তুই থাকবি বিদেশে--সামান্য দেড়শো টাকার জন্য বুকের রক্ত জল করবি, আর পরে তোর বিষয়-সম্পত্তি লুঠে খাবে, তোর টাকায় বড়মানুষী করবে, এ হতেই পারে না রতন।"

শান্ত সুরে রতন জিজ্ঞাসা করিল, "পর কে কাকা?"

কাকা কথাটা বলিয়া ফেলিয়া সামলাইয়া লইবার জন্য ইতস্ততঃ করিতেছিলেন। নেহাৎ ভালমানুষ কাকার এই অবস্থা দেখিয়া রতনের চিত্ত ব্যথিত হইয়া উঠিল, সে বলিল, "আপনি বুঝি নিজেদের পর বলছেন; এ কথাটা কেমন করে মুখে আনলেন, কাকা? জগতে আপনাদের চেয়ে আমার আপনার আর কেউ আছে কি? আপনাদের স্নেহ যদি আমি না পেতুম, তা হ'লে আমায় কোথায় যেতে হ'ত, আমার যে কোন অস্তিত্বই থাকত না। বাবা আপনাকে জানেন ব'লেই আপনার হাতে সব বিষয় দিয়ে গেছেন, আমায় আপনার আদেশমত চলবার উপদেশ দিয়ে গেছেন। না কাকা, আপনি আপনাদের পর বলবেন না, ওতে মনে হয়—আপনারা আমায় পর ক'রে দিচ্ছেন।"

তাহার চোখ দিয়া টপ্ টপ্ করিয়া কয়েক ফোঁটা জল ঝরিয়া পড়িল।

ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া কিশোর বাবু তাহাকে টানিয়া বসাইলেন, "কাঁদছিস্ রতন,—হ্যাঁ রে, কাঁদছিস কেন রে? সত্যই কি আমি তোকে পর ভাবতে পারি, আমি যে তোকে অনুর চেয়েও ভালবাসি। অনু তোর অনেক পরে এসেছে, বুকের ভালবাসাটা তুই যে আগে নিয়েছিস। কেউ কি আজ সে কথা জানে, কেউ না, কেউ জানে না। এক জন জানতেন, সে দাদা আমার স্বর্গে চলে গেছেন, আমি তাঁর কাছ ছাড়া জগতে আর এক প্রাণীর কাছে আমার কথা প্রকাশ করিনে। সকলে কত কথা বলে, তোর জমিদারী বাড়ী-ঘর সব নিজের নামে করে নেওয়ার জন্যে কত শিক্ষা দেয়, ওরে, আমি কি তোর সেই কাকা যে তোর জিনিষ আমি নেব? যক্ষের মতন তোর জিনিষ আমি আগলে নিয়ে বসে আছি, অনুকে পর্য্যন্ত কিছুতে হাত দেবার অধিকার দিই নি। কত অপমান যে এতে আমায় সইতে হয় রতন, আজ যদি তোর বাপ থাকতেন, তাঁর কাছে সব কথা বলে মনের ভার হাল্কা করে ফেলতুম।" তাঁহার কণ্ঠস্বর একেবারেই রুদ্ধ হইয়া গেল, তিনি তাড়াতাড়ি অন্য দিকে মুখ ফিরাইলেন।

ব্যথিতই ব্যথিতের মর্ম্ম বুঝে, নিপীড়িত নিপীড়িতের বেদনা বুঝে, দরিদ্রই দরিদ্রের দারিদ্র্য-কষ্ট বুঝে; ঠিক সেই জন্যই রতন কাকাকে বুঝিল, কাকা-ভাইপোর চোখের জল এক জনের উদ্দেশেই ছুটিল।

কিশোর বাবু চকিতে আপনাকে সামলাইয়া লইলেন, আর্দ্রকণ্ঠে বলিলেন, "তা বলে তুই চলে গেলে চলবে না রতন, বিয়ে করে সংসারী হয়ে এইখানেই থাক। দাদা বলেছিলেন, হেম বাবুর মেয়ে আশাকে যেন পুত্রবধূ করা হয়; সে সম্বন্ধ আমি ঠিক করে রেখেছি, এই বৈশাখেই বিয়ে দেব ঠিক করেছি। অনুকেও পাঠিয়েছিলুম, সে তার কয়টি বন্ধুকে নিয়ে গিয়ে দেখে এসে শতমুখে প্রশংসা করলে। বৈশাখ মাসে বিয়ে করে বউমাকে এনে বাড়ীতে বস, আমার কর্ত্তব্যও শেষ হয়ে যাক।"

হায় রে! সরল হৃদয় কাকা অনুকে বুঝি দাদার পাত্রী দেখিতে পাঠাইয়াছিলেন; সে যে নিজের সম্বন্ধ নিজেই ঠিক করিয়া আসিয়াছে, কাকা তাহা এখনও জানেন না। না, এ কথা তাঁহাকে জানান হইবে না, তাঁহার ব্যথাভরা মনটাকে একেবারে ভাঙ্গিয়া চূর্ণ করিয়া ফেলা কখনই উচিত নয়। তিনি যে বড় সরল, তাঁহার মন যে বড় উদার।

রতন খানিকটা চুপ করিয়া রহিল, সকল দ্বিধা-সঙ্কোচকে দমন করিয়া ফেলিয়া হঠাৎ সে বলিয়া উঠিল, "আমি তাকে বিয়ে করতে পারব না কাকা।"

কিশোর বাবু আকাশ হইতে পড়িলেন, বিস্ফারিত

চোখের দৃষ্টি তাহার মুখের উপর রাখিয়া বলিলেন, "তাকে বিয়ে করবি নে, সে কি কথা বলছিস রতন? দাদা যে তার সঙ্গে তোর বিয়ের সম্বন্ধ করে রেখেছেন, তাঁর সে কথা রাখবি নে?"

বড় ব্যথায় রতন হাসিল, বলিল, "বাবা আমাদের ছোট বেলার কারও প্রকৃতি না জেনেই বিয়ের সম্বন্ধ করে রাখলেও সে যদি আমায় তার উপযুক্ত না মনে করে বা আমি তাকে উপযুক্ত না মনে করি; তবু সব বুঝেও বাবার আদেশ রাখতে চিরকালের জন্যে দুঃখবরণ করে নিতে হবে? কাকা, আমাদের বিয়ে করতেই হবে?"

কিশোর বাবু মাথা চুলকাইয়া চিন্তিত মুখে বলিলেন, "তা বটে; তবে তোমার যদি মত না হয়, থাক। কিন্তু আমি কথা দিয়েছি যে রতন?"

ব্যাকুলভাবে তিনি রতনের দিকে তাকাইলেন।

শান্ত স্বরে রতন বলিল. "আপনার একটুও ভাবতে হবে না কাকা, আমি অনুর সঙ্গে তার বিয়ে দেওয়ার কথা বলছি, কেন না, আমি জানি অনুর সঙ্গে তার ঠিক মিল হবে। আমি আশাকে বেশ জানি, আমাদের ঘরে যাকে বলে রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী, সে বাস্তবিকই তাই। কাকিমা তার মত পুত্রবধূ পেয়ে সুখী হবেন, আপনিও অসুখী হবেন না। অনু তাকে দেখেছে, আমি জানি, পছন্দও করেছে, তাকে বিয়ে করতে অনু রাজি হবে। আপনি একবার অনুমতি দিন কাকা, আমি আনন্দের সঙ্গে এতে মত দিচ্ছি, যাতে বিয়েটা হয়, তার জন্যে হেম বাবুকে পত্রও দিচ্ছি। আপনি ভাবছেন, আশা আমার বাগদত্তা, আর এমন রূপ ও গুণ থাকা সত্ত্বেও কেন আমি তাকে বিয়ে করলুম না, কিন্তু কাকা, বিয়ে করতে আমার মোটেই ইচ্ছা নাই, সেই জন্যে—"

একটা দিকে কূল পাইয়া কিশোর বাবু যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন, অন্য দিকে রতন বিবাহ করিতে চায় না শুনিয়া তেমনই উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন; ব্যগ্রকণ্ঠে তিনি বলিলেন, "তুই মোটেই বিয়ে করবিনে রতন, সে কি কথা বলছিস?"

কাকার উদ্বিগ্নভাব দেখিয়া রতন হাসিল, "তাই কি হয় কাকা; বিয়ে করব বই কি, তবে দু'চার বছর পরে। জমিদারী যেমন চালাচ্ছেন, তেমনিই চালান, দু'চার বছর পরে আমি ফিরে এসে সব ভার নেব, আপনাকে তখন কিছু ভাবতে হবে না।"

রতন কিছুতেই কাকা কাকিমার অনুরোধ রাখিতে পারিল না। কাকিমা যখন শুনিলেন, সে জমিদারী লইবে না এবং আশার সহিত অনুর বিবাহ-সম্বন্ধ ঠিক করিয়া দিয়া নিজে আবার সুদূর সেই লাহোরে চলিয়া যাইতেছে, তখন রতনের উপর তাঁহার পুত্রাধিক মায়া উৎসাকারে ঝরিয়া পড়িল। তিনি কিছুতেই রতনকে ছাড়িলেন না, চোখের জল ফেলিয়া অন্ততঃ পক্ষে ভাইয়ের বিবাহকাল পর্য্যন্ত দেশে থাকিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিলেন, অনুর পত্র দেখাইলেন, সে আগামী কল্য বাড়ী আসিবে। মাঝে আর পনেরটা দিনমাত্র আছে, এই কয়টা দিন পরে রতন যাইতে পারে, তখন তিনি আপত্তি করিবেন না।

রতন অচল, অটল। সে জানাইল, তাহার উপরওয়ালা তাহাকে জরুরী তার দিয়াছেন। সে না হয় পূজার সময়ে আসিয়া দিন কত দেশে থাকিবে, সেই সময় অনুর সহিত তাহার দেখা হইবে এবং ভ্রাতৃবধূকেও সে সেই সময়ে দেখিবে। সকলের নিকট হইতে বিদায় লইয়া অকম্পিতপদে সে জন্মের মতই দেশ ছাড়িয়া চলিয়া গেল— আর ফিরিয়াও চাহিল না।

অনুপমের বিবাহ আশার সহিত সম্পন্ন হইয়া গেল।

বিবাহের ঠিক নির্দ্দিষ্ট দিনে রতনের নিকট হইতে নববধূ আশালতার নামে একখানি রেজেষ্ট্রী করা দান-পত্র আসিয়া পৌঁছাইল, তাহার সহিত কিশোর বাবুর নামে একখানি পত্রও ছিল। পত্রে সে মোটামুটি জানাইয়াছিল, সে আর দেশে ফিরিবে না, দেশের সহিত সকল সম্বন্ধ সে এবার গিয়া মিটাইয়া আসিয়াছে। নববধূকে যৌতুকস্বরূপ তাহার কিছু দিবার অধিকার নিশ্চয়ই আছে, কেন না, রতনের বড় স্নেহের ভ্রাতা অনুপমের স্ত্রী; শুধু এই সম্পর্কটুকু মনে করিয়া সে তাহার পৈতৃক স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি তাহার নামে লেখাপড়া করিয়া দিল। ভবিষ্যতে তাহার জন্য আর কাহাকেও ভাবিতে হইবে না, সকলে যেন তাহাকে বাস্তব জগতের বহির্ভূত বলিয়া মনে করে; সেই জন্যই সে নিজের নির্ব্বাসন নিজেই নির্ব্বাচন করিয়া লইল।

কিশোর বাবুর চোখের উপর হইতে একখানি রহস্যময়

পর্দ্দা যেন হঠাৎ খসিয়া পড়িয়া গেল, তিনি খানিক স্তম্ভিত-ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া শেষে পত্রহস্তে স্ত্রীর সন্ধানে ছুটিলেন। পথের মাঝে তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া তীব্রকণ্ঠে মুখে যাহা আসিল, তাহাই বলিয়া গেলেন; তাঁহাদের চক্রান্তে পড়িয়াই যে রতন আজ চিরকালের জন্য প্রবাসী হইল, নিজের সর্ব্বস্ব পরকে বিলাইয়া ফকির সাজিল, কথা বলিতে বলিতে হঠাৎ তাঁহার কণ্ঠস্বরের তীব্রতা জলে ভিজিয়া কোমল হইয়া পড়িল, চোখ ছাপাইয়া খানিকটা জল ঝর ঝর করিয়া ঝরিয়া পড়িল।

কিশোর বাবু দানপত্রখানা স্ত্রীর গাত্রে ছুড়িয়া ফেলিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে বলিলেন, "এই রইল দানপত্র। ভবিষ্যতে তোমাদের জমিদারী তোমরাই চালিও। তার বাপ-মা কেউ নেই বলে তোমরা সবাই ষড়যন্ত্র করে যে তাকে সর্ব্বস্বহারা করে সেখানে নিঃসহায়ভাবে একলা ফেলে রাখবে, তা হ'তে পারে না। আমি ত এখনও মরিনি, আমি যতক্ষণ বেঁচে আছি, ততক্ষণ আমি তারই সেই স্নেহময় কাকা, তোমরা তাকে ত্যাগ করেছ, আমি তাকে বুকে তুলে নেব। এ দানপত্র আমি এখনই নষ্ট করে ফেলতে পারি, কেন না, এখনও আমার ইচ্ছায় কায চলতে পারে—তোমাদের স্থান যথার্থই আমি গাছতলায় নির্দ্দেশ করে দিতে পারি; কিন্তু তা আমি ক'রব না। তার এই ত্যাগ তাকে বড় মহিমাময় করে দিয়েছে, আমি তাকে বড় ভালবাসি বলেই নীচু করতে পারব না। তার ত্যক্ত এই সম্পত্তি অভিশাপের মতই তোমাদের বুক চেপে বসে থাক, নড়তে চড়তে যেন বুকের মধ্যে কাঁটা বেঁধে—এ তারই দান যার সুখশান্তি সব তোমরা কেড়ে নিয়েছ। সে বড় আশা করে সংসারী হ'তে এসেছিল—তোমরা তার সুখের ঘরে আগুন দিয়ে পথ হতেই তাকে বিদায় করেছ। উঃ, সব রকমে কি রকম বঞ্চনাই না করেছ তাকে, সেইগুলো মনে ক'র, তা হলে তার মহত্বটাও বুঝতে পারবে। তোমাদের সব আছে, তার আমি ছাড়া এ জগতে আর কেউ নেই, তাই আমি তার কাছেই চললুম, তোমাদের সঙ্গে আমার সম্পর্কও চিরকালের মত ফুরিয়ে গেল।"

সেই দিনই বাক্স-বিছানা গুছাইয়া কাহারও অনুরোধ অনুনয়ে কর্ণপাত না করিয়া কিশোর বাবু রতনের নিকট যাত্রা করিলেন।

নিজের সর্ব্বস্ব দানের ব্যথা রতনকে এতটুকু কষ্ট দিতে পারে নাই। অন্তরে হয় ত মেঘ জমিয়াছিল, বাহিরে তাহার আভাস কিছুমাত্র ছিল না:

সকাল বেলাটায় রতন মুখহাত ধুইয়া আসিয়া সবেমাত্র চায়ের কাপে হাত দিয়াছে, ঠিক সেই সময়ে কাকা আসিয়া পড়িলেন। হাতের কাপ নামিয়া পড়িল, কাকা তাহাকে বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। ব্যাপারটা বুঝিতে রতনের বিন্দুমাত্র বিলম্ব হইল না, তথাপি সে রুদ্ধকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি এখানে এলেন কেন, কাকা?"

"কেন এসেছি তাই জিজ্ঞাসা করছিস রতন? আমি তোর কাছে—এখানে থাকতে এসেছি। নিজের অতুল বৈভব, শান্তিসুখ সব বিসর্জ্জন দিয়ে এখানে দুঃখপূর্ণ নির্ব্বাসিত জীবন ভোগ করতে তুই চাস, আমিও তোর সাথী হয়ে এখানে থাক্‌ব। সংসারের দেনাপাওনা সব চুকিয়ে দিয়ে এসেছি, ওদের সঙ্গে আর আমার কোনও সম্পর্ক নেই। স্বামীর কর্ত্তব্য পালন করেছি, পিতার কর্ত্তব্য পালন করেছি, কাকার কর্ত্তব্য পালন করতে পারিনি, তাই পালন করতে এসেছি। তুই আমায় বাধা দিস নে রতন, তুই যেন আমায় ফিরে পাঠাতে চাস নে; মনে কর, যদি আজ তোর বাপ থাক্‌তেন, তাঁকে কি ঠেকিয়ে রাখতে পারতিস? আমি তোর সেই বাপেরই ভাই,একই রক্ত আমাদের দেহে ছিল—এখনও আমার আছে, তাই তোর বাপ স্বর্গ হ'তে তাঁর ইচ্ছা আমার প্রাণে প্রেরণ করেছেন; আমি তাঁর আদেশ পালন করব, তোকে ফেলে প্রাণ থাকতে কোথাও যাব না।"

রতনের দুইটি চোখ জলে পূর্ণ হইয়া উঠিল, সে মুখ ফিরাইয়া বলিল, "না, না, কাকা আপনাকে কোথাও যেতে হবে না। আমরা পিতাপুত্রে এখানে বেশ সুখে দিনগুলো কাটিয়ে দেব। আপনি বসুন, আমি আপনার স্নান করবার উদ্যোগ করতে চাকরটাকে বলে দেই।"

শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী সরস্বতী।

৪
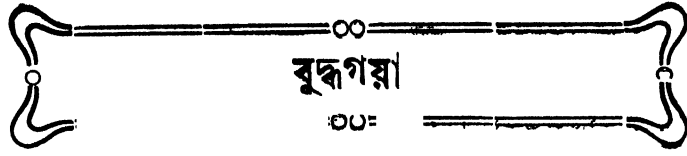
বুদ্ধগয়ায় যে সমস্ত দেবমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হিন্দুর নিকটে নূতন। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রথম অবস্থায় মূর্ত্তি-পূজা প্রচলিত ছিল না। বুদ্ধদেবের মৃত্যুর পর তাঁহার ভস্ম আট ভাগে বিভক্ত করিয়া আটটি দেশের রাজাকে দেওয়া হইয়াছিল। তাঁহারা এই ভস্মের উপরে "চৈত্য" নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। চিতার ভস্মের আধার বলিয়া এই জাতীয় ইমারতের নাম চৈত্য। গৌতম বুদ্ধ যখন বাঁচিয়া ছিলেন, চৈত্য আছে। বুদ্ধগয়ায় মহাবোধি মন্দিরের উত্তর দিকে ছোট বড় অতি প্রাচীনকালের অনেকগুলি পাথরের চৈত্য দেখিতে পাওয়া যায়। পরবর্ত্তীকালে চৈত্য লম্বায় বাড়িয়া গিয়াছিল। বাঙ্গালা দেশের পাল রাজাদের আমলে একটি গোল পাথরের বেদীর উপরে অর্দ্ধ বৃত্তাকার স্তূপ নির্ম্মাণ করা হইত। ক্রমে ক্রমে এই পাথরের বেদীটি লম্বা হইয়া উঠিয়া একটি ছোট মন্দিরের আকার ধারণ করিয়াছিল।
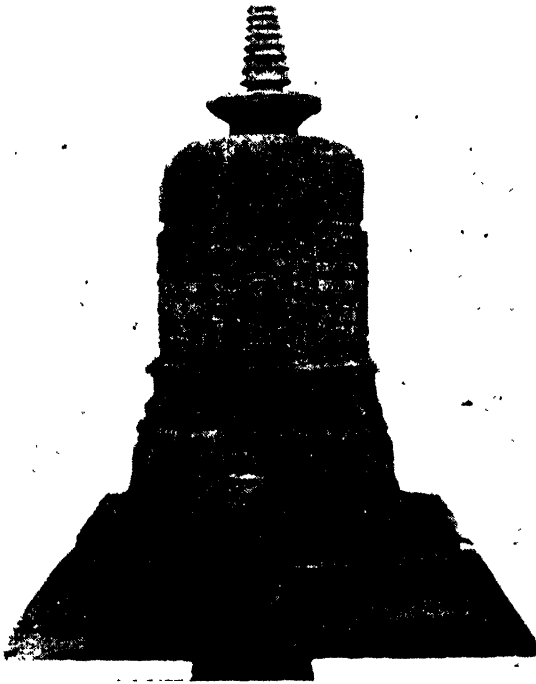
পালরাজের আমলের চৈত্য

সেনরাজাদের আমলের চৈত্য

তখনই চৈত্য কি রকম আকারের হইবে, তাহার বর্ণনা করিয়াছিলেন। অতি প্রাচীনকালের চৈত্যগুলি অর্দ্ধ বৃত্তাকার। বুদ্ধদেবের ভিক্ষাপাত্র বা মাটীর মালসা উল্টাইয়া রাখিলে দেখিতে যে রকম হয়, প্রাচীনকালের চৈত্যগুলি ঠিক সেই রকম। রাওলপিণ্ডির নিকটে মানকিয়ালা গ্রামে, তক্ষশিলার নিকটে এবং মালব দেশে ভিলসার নিকটে সাঞ্চী গ্রামে এই জাতীয় পুরাতন স্তূপ বা

এই জাতীয় চৈত্য সেন রাজাদের আমলে তৈয়ারী হইত এবং ইহার অনেকগুলি বুদ্ধগয়ায় পাওয়া গিয়াছে। এই চৈত্য আবার দুই রকমের; স্মারক চৈত্য এবং গর্ভচৈত্য। স্মারক চৈত্যগুলি নিরেট। কাশীর নিকটে সারনাথে, যেখানে গৌতম বুদ্ধ প্রথম ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছিলেন, তাহার নিকটে একটি বড় পাথরের নিরেট বা স্মারক চৈত্য আছে। ফাঁপা বা গর্ভ চৈত্যগুলিতে বুদ্ধের, তাঁহার শিষ্যবর্গের

অথবা কোন বিখ্যাত বৌদ্ধ সাধুর অস্থি বা ভস্ম রাখা হইত। মানকিয়ালা বা সরস্বতীর চৈত্যে এই রকম ভস্মাবশেষ পাওয়া গিয়াছে। এই জাতীয় ছোট গর্ভচৈত্য বুদ্ধ গয়ায় অনেক পাওয়া গিয়াছে। চৈত্যের চারিদিকে সাধারণতঃ চারিটি কুলুঙ্গী দেখিতে পাওয়া যায় এবং এক একটি কুলুঙ্গীতে সাধারণতঃ বুদ্ধের এক একটি মূর্ত্তি থাকে। তাঁহার কাঠের ও ধাতুর মূর্ত্তি তৈয়ারী হইয়াছিল। আমরা যে সমস্ত বুদ্ধমূর্ত্তি পাইয়াছি, তাহার মধ্যে পশ্চিম পঞ্জাবের এবং আফগানিস্থানে গ্রীক্ শিল্পীদের নির্ম্মিত মূর্ত্তি সর্ব্ব-প্রাচীন। গান্ধারের গ্রীক্‌শিল্পীরা যে ভাবে মূর্ত্তি তৈয়ারী করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের পরে প্রায় হাজার বৎসর ধরিয়া ঠিক সেই রকমভাবেই বুদ্ধের মূর্ত্তি তৈয়ারী হইত।

পাথরের তোরণের নিকটবর্ত্তী চৈত্য

শ্রাবস্তীর তীর্থিক পরাজয়ের মূর্ত্তি

বুদ্ধগয়া-মন্দিরের সম্মুখে পাথরের তোরণের নিকটে যে মাঝারি পাথরের চৈত্যটি আছে, তাহাতে কিন্তু বুদ্ধের মৃত্যুর পরিবর্ত্তে তাঁহার জীবনের চারিটি প্রধান ঘটনা আছে। একদিকের কুলুঙ্গীতে বৈশালীতে মর্কট-হ্রদের তীরে একটি বানর কর্ত্তৃক গৌতম বৌদ্ধকে মধু প্রদানের চিত্র, অপর দিকে শ্রাবস্তীতে গৌতম বুদ্ধ কর্ত্তৃক ছয় জন তীর্থিক পণ্ডিতের পরাজয় চিত্র, তৃতীয় দিকে সঙ্কাশ্য নগরে গৌতমের ত্রয়স্ত্রিংশ স্বর্গ হইতে অবতরণ প্রভৃতি নানাবিধ চিত্র আছে।

কোন্ সময়ে বৌদ্ধধর্ম্মে মূর্ত্তিপূজা আরম্ভ হইয়াছিল, তাহা ঠিক করিয়া বলিতে পারা যায় না। তবে শুনিতে পাওয়া যায় যে, গৌতম বুদ্ধ যখন বাঁচিয়াছিলেন, তখনই

খৃষ্টাব্দের অষ্টম শতকে মগধ দেশের শিল্পীরা এক নূতন রকমের মূর্ত্তি গড়িতে আরম্ভ করিলেন। এই সময় হইতে বাঙ্গালা ও বিহারের বুদ্ধমূর্ত্তি কেবল গৌতম বুদ্ধের আকার নহে, তাঁহার জীবনের এক একটি প্রধান ঘটনার চিত্র। যেমন শ্রাবস্তীর তীর্থিক পরাজয়ের চিত্র, উরুবিল্ব বা বুদ্ধ-গয়ার গৌতমের সম্বোধিলাভের চিত্র। বুদ্ধগয়ায় যত মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে, তাহার মধ্যে সম্বোধিলাভের মূর্ত্তি সংখ্যায় অধিক। মূল মহাবোধি মন্দিরের ভিতরে বেদীর উপরে এবং মন্দিরের পশ্চাতে বোধিবৃক্ষের মূলে যে দুইটি মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা উরুবিল্ব বা বুদ্ধগয়ায় গৌতমের সম্যক সম্বোধি বা বুদ্ধত্বলাভের অবস্থার মূর্ত্তি।
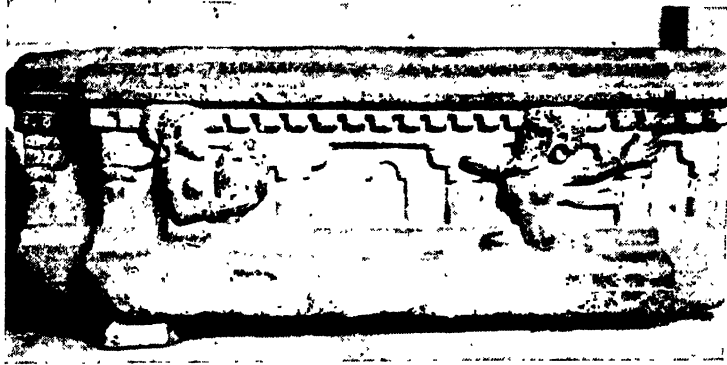
উরুবিল্ব বা বুদ্ধ গয়ার গৌতমের সম্বোধি লাভের মূর্ত্তি পীঠ

বৌদ্ধধর্ম্মের শেষ দশায় বৌদ্ধরা বর্ত্তমান কালের হিন্দুদের মত নানা দলে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে একদল ক্রমে ক্রমে গৌতমের সঙ্গে সঙ্গে অনেক বুদ্ধ ও দেবতাকে পূজা করিতেছেন। এই সমস্ত দেবতার মধ্যে কতকগুলি আমাদের দশমহাবিদ্যার ছিন্নমস্তার মত ভীতিপ্রদ। ইংরাজী-নবীশ পণ্ডিতরা এই শ্রেণীর বৌদ্ধ দেবতাদিগকে বৌদ্ধ তান্ত্রিক দেবতা আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। ক্রমে এই জাতীয় দেবতা সংখ্যায় এত বাড়িয়া গিয়াছিল যে, তাহাদের পরিচয় নির্ণয় করিবার জন্য বড় বড় পুস্তক লিখিতে হইয়াছিল। এই শ্রেণীর বৌদ্ধদের কথায় বা ভাষায় আমরা যাহাকে দেবতার ধ্যান বলিয়া থাকি, তাহার নাম সাধনা। সাধনার সংখ্যা বাড়িয়া গেলে তাহার জন্য অভিধানের মত বড় বড় গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। এই সমস্ত গ্রন্থের নাম—সাধনমালা বা সাধন-সমুচ্চয়। সম্প্রতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের পুত্র অধ্যাপক শ্রীযুত বিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য অনেকগুলি সাধনমালা একত্র করিয়া বরোদার মহারাজা শ্রীযুক্ত সায়াজীরাও গাইকোবারের ব্যয়ে মুদ্রিত করাইয়াছেন। পণ্ডিতদিগের নিকটে বুদ্ধ বোধিসত্ত্ব এবং বহু দেবতা-সমন্বিত বৌদ্ধধর্ম্মের শাখার নাম বজ্রযান বা মন্ত্রযান। এই প্রকার বৌদ্ধধর্ম্মের দেবতা কি প্রকার বীভৎস বা অশ্লীল, তাহা একটি সাধনা পড়িয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। বুদ্ধগয়ায় যে হিন্দু-মঠ আছে, তাহার দক্ষিণ দিকের তোরণের বাম পার্শ্বে একটি অন্ধকার ঘরে দুই তিনটি প্রকাণ্ড বজ্রযানের দেবমূর্ত্তি আছে। তাহাদের মধ্যে ত্রৈলোক্য বিজয়ের মূর্ত্তি প্রধান। যুগলবদ্ধ নরনারীর বক্ষের উপরে প্রত্যালীঢ় পদে উর্দ্ধলিঙ্গ অষ্ট-ভুজ চতুর্বক্ত্র পুরুষ মূর্ত্তি ত্রৈলোক্য বিজয়ের সাধনা বা ধ্যান এইরূপঃ—

"ত্রৈলোক্য বিজয় ভট্টারকং, নীলং, চতুর্ম্মুখং, অষ্টভুজং; প্রথম মুখং, ক্রোধশৃঙ্গারং, দক্ষিণম্,রৌদ্রম্, বামম্, বীভৎসম্, পৃষ্ঠম্ বীররসম্; দ্বাভ্যাং ঘণ্টা-বজ্রান্বিত হস্তাভ্যাম্ হৃদি বজ্র হুঙ্কারঃ মুদ্রাধরম্; দক্ষিণ ত্রিকরৈঃ খট্বাঙ্গাঙ্কুশ-বাণধরম্ বাম ত্রিকরৈঃ চাপপাশ বজ্রধরম্; প্রত্যালীঢ়েন বামপাদাক্রান্তঃ মহেশ্বর মস্তকং দক্ষিণ পাদাবষ্টব্ধ গৌরী স্তনযুগলং, বুদ্ধস্রগদাম মালাদি বিচিত্রাম্বরাভরণধারিণং আত্মানম্ বিচিন্ত্য মুদ্রান্ বন্ধয়েৎ।"

ত্রৈলোক্য বিজয়

পূজার নিয়ম অনেকটা আমাদের তান্ত্রিক পূজার মত। গোড়ায় যন্ত্রে দেব স্থাপন করিতে হয়। পঞ্চবর্ণের গুঁড়া

দিয়া যন্ত্র আঁকিতে হয়। দেবতাদের যন্ত্র সম্বন্ধে অনেক গ্রন্থ আছে। বুদ্ধগয়ার বর্ত্তমান মোহান্ত শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদয়াল গিরির নিকটে নেপাল দেশে লেখা একখানি অতি প্রাচীন যন্ত্রগ্রন্থ আছে। ইহার নাম—"চাতুর্ব্বিংশতি সাহস্রিক যন্ত্রাবিধানং"। পনর বৎসর পূর্ব্বে মোহান্ত মহারাজা ইহা আমাকে দিয়াছিলেন এবং মগধ ও গৌড়ের ভাস্কর্য্যশিল্প সম্বন্ধে আমি যাহা কিছু লিখিয়াছি, তাহার অধিকাংশ এই গ্রন্থের সাহায্যে লিখিত। ত্রৈলোক্য-বিজয়ের যন্ত্রের সম্বন্ধে সাধনমালায় এই পরিচয় পাওয়া যায় :—

"সূর্য্যে নীল হুঙ্কারম্"

অর্থাৎ হরিদ্রা বর্ণের গুঁড়ায় দ্বাদশ কোন আদিত্য বা সূর্য্য আঁকিয়া তাহার উপরে অর্থাৎ কেন্দ্রে নীল বর্ণের গুঁড়া দিয়া ষট্‌কোণচক্রে "হুং" এই বীজটি লিখিতে হয়। দেব-প্রতিষ্ঠার পরে মুদ্রাবন্ধন করিতে হয়। সে সম্বন্ধেও সাধন-মালায় নির্দ্দেশ আছে।

যথা :—তত্র মুষ্টিদ্বয়ং পৃষ্ঠলগ্নং কৃত্বা ফণীয়সীদ্বয়ং শৃঙ্খলা কারেণ যোজয়েৎ।

তাহার পরে মন্ত্রোচ্চারণ।

এই মন্ত্র আমাদের তান্ত্রিক পূজার বীজের মত, যথা, "ওঁং হ্রীং হ্রাং হ্রৈং হুং স্বাহা।"

কালে গৌতমবুদ্ধ হিন্দুর দেবতা হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। বুদ্ধ কেমন করিয়া বিষ্ণুর দশ অবতারের মধ্যে এক অবতার হইয়া উঠিলেন, তাহা অতি আশ্চর্য্যজনক। আমরা বিষ্ণুর দশ অবতারের যে সমস্ত মূর্ত্তি পাই, তাহার মধ্যে নবম অবতার বুদ্ধের মূর্ত্তি, বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা গৌতম বুদ্ধের মূর্ত্তির মত হিন্দুরা বিশেষতঃ ব্রাহ্মণরা সহজে গৌতমকে দেবত্ব প্রদান করেন নাই। মগধ—এমন কি সমস্ত ভারতবর্ষ যখন বৌদ্ধ-প্রধান হইয়া উঠিল, তখন হিন্দুরা বাধ্য হইয়া বুদ্ধের পূজা আরম্ভ করিলেন। মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, রাম, রাম, রাম, বুদ্ধ, কল্কী এই দশ অবতারের মধ্যে বুদ্ধাবতার পালরাজাদের সময়েও সকল হিন্দু স্বীকার করিত না। গয়া জেলায় টিকারী গ্রামের নিকটে কোঞ্চ গ্রামে একটি অতি প্রাচীন মন্দির আছে। এই মন্দিরে দশ অবতারের যে পাথরের মূর্ত্তি আছে, তাহাতে বুদ্ধ অবতারের মূর্ত্তি নাই। ইহাতে মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, ত্রিবিক্রম, পরশুরাম, রামচন্দ্র, বলরাম, ও কল্কীর মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। এই মূর্ত্তিটিও পালরাজাদের আম-লের তৈয়ারী এবং ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, খৃষ্টাব্দের দশম শতক পর্য্যন্ত গৌতম বুদ্ধ বিষ্ণুর অবতার-রূপে হিন্দুধর্ম্মে প্রবেশ করিতে পারেন নাই। কতক হিন্দু তাঁহাকে অবতার বলিয়া মানিত, কিন্তু সকলে মানিত না। বুদ্ধকে বিষ্ণুর অবতাররূপে পূজা করিবার প্রধান কারণ ভারতে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা। ব্রাহ্মণরা যখন দেখিলেন যে, হিন্দুর দেবতার পূজা অপেক্ষা বুদ্ধের পূজা লোকের প্রিয়, তখন তাঁহারা বুদ্ধকে হিন্দুর দেবতা করিয়া লইতে প্রস্তুত হইলেন। বুদ্ধ বিষ্ণুর নবম অবতার হইলেন। কিন্তু হিন্দুর বুদ্ধ আর বৌদ্ধের বুদ্ধে একটু তফাৎ রহিয়া গেল। হিন্দুর বুদ্ধ ব্রাহ্মণসন্তান, শাক্যজাতীয় ক্ষত্রিয় নহেন; তাঁহার জন্ম গয়া জেলায়—কপিলবাস্তুতে নহে। কিন্তু হিন্দুরা দশ অবতারের মূর্ত্তিতে বুদ্ধের মূর্ত্তি গড়িবার সময়ে বৌদ্ধরা যে ভাবে শাক্যরাজ-পুত্র, ক্ষত্রিয় জাতীয় গৌতম সিদ্ধার্থের মূর্ত্তি গড়িত, ঠিক তাহারই অনুকরণ করিত। এইরূপে সেকালের ব্রাহ্মণরা কোন গতিকে হিন্দুধর্ম্মের মান বাঁচাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। বুদ্ধ-গয়ার মোহান্ত মহা-রাজের এক জন বেতনভোগী লেখকের লেখায় পড়িলাম যে, মহাবোধি-মন্দিরের ভিতরে যে বুদ্ধ-মূর্ত্তি আছে, তাহা না কি ব্রাহ্মণজাতীয় বিষ্ণুর অবতার গয়ায় জাত বুদ্ধের মূর্ত্তি। এই পণ্ডিতটি বোধ হয় জানেন না যে, হিন্দুবংশীয় এক জন রাজার ব্যয়ে কমাদেশের রাজ-পণ্ডিত খৃষ্টাব্দের দ্বাদশ শতকে গৌতম সিদ্ধার্থের মূর্ত্তি বলিয়া এই মূর্ত্তিটি তৈয়ার করাইয়াছিলেন।

বৌদ্ধের প্রধানতীর্থ বলিয়া বুদ্ধগয়া কিন্তু কখনই বৌদ্ধের একাধিকার ছিল না। ইতিহাসের সকল যুগেই বুদ্ধ-গয়ায় হিন্দুর মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। সিংহল দেশের এক ভিক্ষু গণেশের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। বুদ্ধ-গয়ায় অনেক-গুলি বিষ্ণুমূর্ত্তি আছে। ধর্ম্মপালের রাজত্বের ছাব্বিশ বৎসরে কেশব নামক এক জন ভাস্কর একটি চতুর্ম্মুখ মহাদেবের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। রঘুনন্দনের সময়ে গয়াশ্রাদ্ধে মহাবোধিতে পিণ্ড দেওয়ার প্রথা সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

পৌরাণিক-প্রসঙ্গ

নৃতত্ত্ববিদ্ (Anthropologist) পণ্ডিতগণের মতে ভারতবর্ষীয় হিন্দুগণ এবং বিদেশীয় খৃষ্টান অথবা মুসলমানগণ সকলেই পরস্পরের জাতি গোষ্ঠি। পরন্তু এ কথা যে ভাষাতত্ত্ববিদ্গণের দ্বারাও স্থিরীকৃত হইয়াছে, তাহা সকলেই জ্ঞাত আছেন।

আমরাও অন্যত্র দেখিয়া বিস্মিত হইব যে, পৃথিবীতে পৃথক্ পৃথক্ নানা দেশে নানাজাতির মধ্যে যে সকল অপ্রাকৃতিক ও অতিমানুষিক ধারণা, বিশ্বাস অথবা সংস্কার উক্ত সমস্ত বিভিন্ন জাতীয় পুরাণ, আখ্যান বা জনশ্রুতিতে প্রচলিত আছে, তাহাদের প্রত্যেকের ভিতরেই কেমন চমৎকার একটা আদর্শ বর্ত্তমান। এ বিষয়ে রাজস্থান বলেন,—"প্রাচীনকালের ধর্ম্মনীতি, বংশাভিধান ও অন্যান্য বিষয়ের পরস্পর সৌসাদৃশ্য পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্টই বোধ হয়—হিন্দু, চীন, তাতার ও মোগলজাতি এক বংশতরুরই ভিন্ন ভিন্ন শাখা মাত্র।" সামান্য ও সংক্ষিপ্ত করিয়া কতকগুলি পৌরাণিক প্রসঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করা যাইতেছে। যথা,—

মনু

ভারতবাসী হিন্দুগণের আদিপুরুষ মনু। (বৈবস্বত মনু,—স্মৃতিকার মনু নহেন)।

মিশর দেশের আদি মানবের নাম মিনিস্ (Menes)।

ফ্রিজিয়ানদের মনুর নাম ম্যানিস্ (Manis)।

লিডিয়ায় তাঁহার নাম মেনস্ (Manes)।

গ্রীসে তিনি মাইনস্ (Minos) এবং জার্ম্মানীতে ম্যান্নাস (Mannas)।

আয়ু

পুরাণে বর্ণিত আছে,—বৈবস্বত মনুর কন্যা ইলা কোন সময়ে উদ্যানে পাদচারণ করিতেছিলেন, তথায় বুধ তাঁহার রূপে বিমুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে পত্নীত্বে বরণ করেন, ফলে যে সন্তান জন্মে তাহা হইতেই চন্দ্রবংশের উৎপত্তি এবং এই বংশেই আয়ুর জন্ম হয়।

তাতারীয় গোত্রপতির নাম মোগল। (হিন্দুদিগেরও মৌদ্গল্য গোত্র আছে।) উক্ত মোগলের দ্বিতীয় পুত্রের নাম আয়ু।

চীন দেশীয় পৌরাণিক কিংবদন্তীতে আছে—একদা এক গ্রহ (ফো বা বুধ) ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছেন,—সহসা এক রূপসী রমণী তাঁহার দৃষ্টিতে পড়িল, গ্রহরাজ তাঁহাকে বলপূর্ব্বক পত্নীত্বে গ্রহণ করিলেন, তাহাতে আয়ু নামক পুত্রের উৎপত্তি হইল।

পৃথিবীর সৃষ্টি

আমাদের পুরাণের মতে ভগবান্ বিষ্ণু মধুকৈটভ দৈত্যকে যুদ্ধে নিহত করেন, সেই দৈত্যের মেদ হইতেই মেদিনী অর্থাৎ পৃথিবীর সৃষ্টি।

বাবিলনের পুরাবৃত্তে আছে,—দেবতা মারভুক্ জল দৈত্য টায়া-মাট্কে হত্যা করিয়া জলের উপর পৃথিবী সৃষ্টি করেন।

মহাপ্লাবন ও কূর্ম্ম

মহাপ্লাবনের কথা পৃথিবীর প্রত্যেক জাতির পুরাণেই অল্পবিস্তর বিবৃত হইয়াছে। হিন্দু পুরাণে মহাপ্লাবনের পর কূর্ম্ম পৃষ্ঠে করিয়া পৃথিবীকে বহন করিতেছে।

পারস্যের পুরাকাহিনীতেও কূর্ম্ম জলপ্লাবনের পর পৃথিবীকে পৃষ্ঠে ধারণ করিয়া আছে।

উত্তর আমেরিকার আদিম অধিবাসিগণের কূর্ম্মকাহিনী হিন্দুগণেরই অনুরূপ।

আফ্রিকার জুলু জাতির পুরাবৃত্তে একটি ভীষণ কূর্ম্ম পৃথিবীকে পৃষ্ঠে বহন করিতেছে।

ইহুদী ও মধ্য যুগের য়ুরোপীয়গণের মধ্যেও কূর্ম্মের পৃথিবীকে পৃষ্ঠে করিয়া বহন করিবার কাহিনী প্রচলিত আছে।

ভূমিকম্প

আমাদের দেশের অশিক্ষিত সাধারণের বিশ্বাস—বসুমতী মাথা নাড়িলে ভূমিকম্প হইয়া থাকে।

উত্তর আমেরিকার আদিম লোকরা মনে করে,—ধরিত্রীবাহন কূর্ম্ম নড়িলে চড়িলেই ভূকম্পন হয়।

মঙ্গোলিয়ার লামারা বলে, পৃথিবীর বাহন ভেক অঙ্গ দোলাইয়া ভূমিকম্প উপস্থিত করে।

মুসলমানগণের পুরাবৃত্তে পৃথিবাহন বৃষ অঙ্গ সঞ্চালন করিলে ভূকম্পন হইয়া থাকে।

সেলিবাস দ্বীপবাসীদের ধারণা, পৃথিবীবাহক বরাহ সময় সময় গাত্র কণ্ডুয়ন করিবার জন্য বৃক্ষে অঙ্গ ঘর্ষণ করিলেই ভূমিকম্প হয়।

অতএব দেখা যাইতেছে, ইহাদের সকলেরই বিশ্বাস এই যে, কোন না কোন জীবের অঙ্গসঞ্চালনেই ভূমিকম্প উপস্থিত হইয়া থাকে।

পৃথিবী ও আকাশ

ঋগ্বেদ বলেন,—দ্যৌস্ পিতর এবং পৃথি মাতর্, অর্থাৎ আকাশ পিতা ও পৃথিবী মাতা।

চীনবাসীদের মতেও আকাশ পিতা এবং পৃথিবী মাতা।

গ্রীকদিগের মতে জিয়ুস (স্বর্গ) হইতেছেন পিতা এবং ডিমিটার (পৃথিবী) হইতেছেন মাতা।

পলিনেসিয়ার মাওয়ারী জাতি স্বর্গকে পিতা এবং পৃথিবীকে মাতা বলিয়া থাকে।

দক্ষিণ আমেরিকার পেরুভিয়ান্ ও উত্তর আমেরিকার আদিম জাতি এবং য়ুরোপের ফিন্স্, ল্যাপ্, এস্থ্ ও অ্যাংলো-স্যাক্সন জাতিদের মতেও পৃথিবী মানবের জননী।

সূর্য্যদেবতা

আমাদের বেদে 'মিত্র' বা সূর্য্য দেবতার উল্লেখ আছে।

পারসিকদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রে 'মিথ্র' দেবতার বর্ণনা আছে। 'মিথ্র'ই সূর্য্য। হেরোডোটাসের সময়েও পারসিকগণ মিথ্রের উপাসনা করিয়াছেন। 'মিত্র' ও 'মিথ্র' উভয়েই অশ্বযোজিত রথে আরোহণ করেন।

এসিয়া মাইনরের পুরাকালীন মিডানি রাজ্যেও 'মিত্র' বা সূর্য্য-দেবতা পূজিত হইতেন।

প্রাচীন আসীরিয়ার কাশ জাতিদের দেবতাও 'সুরিয়স্' বা সূর্য্য।

প্রাচীন বাবিলনের সুমের এবং সেমেটিক্ বংশীয় আকাদ্ জাতিও সূর্য্যদেবতার পূজা করিতেন।

মিশর দেশেও 'রি' বা সূর্য্যদেবতা সকলের পূজ্য ছিলেন। সে দেশের রাজবংশ 'রি' বা সূর্য্যদেবতা হইতেই উৎপন্ন, সুতরাং রাজারাও সকলের পূজ্য ছিলেন। ভারতবর্ষের রাজন্যগণও সূর্য্যবংশীয় বলিয়া কথিত হয়েন এবং তাঁহারাও প্রজাগণের পূজ্য হইতেন।

চন্দ্র ও সূর্য্য

আমাদের দেশে চন্দ্র ও সূর্য্য দুই ভাই। গ্রীক্ পুরাণে এপোলো (সূর্য্য) ভ্রাতা এবং ডায়েনা (চন্দ্র) ভগিনী।

মিশরে সাইরিস্ বা সূর্য্য ভ্রাতা এবং আইসিস্ বা চন্দ্র ভগিনী। সে দেশে ভ্রাতা-ভগিনীর বিবাহ বৈধ হওয়ায় তাঁহারা আবার স্বামী-স্ত্রীও বটে।

আমেরিকার পেরুদেশেও চন্দ্র-সূর্য্য যথাক্রমে ভগিনী ও ভ্রাতা।

কিন্তু তুষারাচ্ছন্ন মেরু প্রদেশে এস্কিমো জাতিদের মতে চন্দ্রই ভ্রাতা এবং সূর্য্যই ভগিনী।

গ্রহণ

আমাদের দেশে চন্দ্র বা সূর্য্য রাহুগ্রস্ত হইলে গ্রহণ লাগে।

চীন ও শ্যাম দেশে আমাদের রাহুর অনুরূপ এক অসুরগ্রস্ত হওয়ায় চন্দ্র-সূর্য্যের গ্রহণ হয়।

মঙ্গোলিয়াতেও চন্দ্র-সূর্য্য রাহুগ্রস্ত হওয়ায় গ্রহণ লাগিয়া থাকে। তাহাদের রাহুর নাম 'আরাচা'।

আমেরিকার আদিম অধিবাসীদের বিশ্বাস ঠিক্ আমাদেরই অনুরূপ—রাহুগ্রাসে গ্রহণ উপস্থিত হয়।

পলিনেসীয় দ্বীপপুঞ্জে ক্রুদ্ধ উপদেবতা চন্দ্র-সূর্য্যকে গ্রাস করায় গ্রহণ হয়।

সকল দেশেই গ্রহণকালে চন্দ্রসূর্য্যকে রক্ষার নিমিত্ত কোলাহল হইয়া থাকে।

চন্দ্রের কলঙ্ক

আমাদের পুরাণে লিখিত হয় যে, চন্দ্রের কাসরোগ হওয়ায় তিনি বৈদ্যের আদেশক্রমে রোগ উপশমের জন্য একটি শশককে অঙ্কে ধারণ করিয়া থাকেন। এইজন্যই চন্দ্রের একটি নাম শশাঙ্ক এবং তাঁহার ক্রোড়স্থিত ঐ শশকটিই ছায়াকারে কলঙ্কস্বরূপ দেখা যায়।

সিংহলের পৌরাণিক কাহিনীতে কথিত হয় যে, ভগবান্ বুদ্ধদেব বনের মধ্যে কঠোর তপস্যায় নিরত থাকার সময় একবার অত্যন্ত ক্ষুধিত হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং তাঁহার সেই ক্ষুন্নিবারণের জন্য একটি শশক জীবন উৎসর্গ করিয়াছিল। সেই পুণ্যে শশকটি চন্দ্রলোকে স্থান প্রাপ্ত হয়েন এবং চন্দ্রের মধ্যে অবস্থিত ঐ শশকটিই কলঙ্কাকারে দেখা যায়।

দক্ষিণ আফ্রিকার নামাকোয়া জাতির পুরা কাহিনীতে আছে,—একদা চন্দ্র পৃথিবীতে একটি প্রয়োজনীয় সংবাদ শশকের মারফতে প্রেরণ করেন; শশক একটি ভুল সংবাদ প্রদান করিয়া ফিরিয়া আসে। তাহাতে চন্দ্র অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে মারিতে উদ্যত হইলে ঐ শশক প্রাণ ভয়ে ছুটিয়া পলায়ন করে। চন্দ্রে দৃষ্ট কলঙ্ক ঐ পলায়মান শশকটি।

ফিজি দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসীরা বলে,—চন্দ্র একবার শশককে প্রহার করায়, সে দন্ত-নখাঘাতে চন্দ্রের মুখখানি ক্ষতবিক্ষত করিয়াছিল, সে চিহ্ন আজও পর্য্যন্ত চন্দ্রবদনে দৃষ্ট হয়।

আমাদের দেশে চন্দ্রের আর একটি কলঙ্ক আখ্যান বর্ণিত আছে। চন্দ্র বৃহস্পতির নিকট অধ্যয়নকালে গুরুপত্নী হরণ করায় তাঁহার ঐ কলঙ্ক হইয়াছে।

আসাম অঞ্চলে খাসিয়াদের মধ্যে আর একটি আখ্যায়িকা প্রচলিত আছে। একদা চন্দ্র তাঁহার শাশুড়ী ঠাকুরাণীর নিকট অবৈধ আসক্তি প্রকাশ করায় তিনি জামাতার আননে অঙ্গার নিক্ষেপ করেন, তাহাতে চন্দ্রবদন দগ্ধ হইয়া ঐ কলঙ্ক উৎপন্ন করিয়াছে।

য়ুরোপে লাপ্ জাতিদিগের পুরাণ কাহিনীতে কথিত হয় যে, চন্দ্রদেব গোপনে শুকতারার সহিত প্রণয় করায় তাঁহার স্ত্রী ক্রুদ্ধ হইয়া নখরাঘাতে চন্দ্রমুখ ক্ষতবিক্ষত করিয়া দিয়াছেন, সেই চিহ্নই চন্দ্রমুখে দৃষ্ট কলঙ্ক।

রামধনু

আমরা বলি রামধনু অথবা ইন্দ্রধনু।

য়ুরোপের ফিন্ জাতি ইহাকে বজ্রপাণি টায়ারের ধনু বলে।

ইস্রায়েলবাসীরা ইহাকে জিহোভার ধনু বলে।

ইংরাজেরা সোজা বলেন, বৃষ্টি ধনু বা রেণ-বো (Rain-bow)।

ছায়াপথ

আমরা বলি ছায়াপথ।

শ্যামবাসীদের মতে শ্বেতহস্তীর পথ।

আফ্রিকার বাসুতো জাতি ইহাকে দেবতাদিগের পথ বলে।

ফিজি জাতি বলে প্রেতাত্মার পথ।

সিরিয়া, সারসিয়া ও তুরস্কের লোকরা বলে তৃণপথ।

গ্রীক পুরাণে উহা দেবরাজ জুপিটারের প্রাসাদ গমনের পথ।

স্পেনদেশের লোক বলে সেন্টিয়াগোর পথ।

ইংরাজরা বলেন, দুগ্ধপথ (Milky way)।

সহমরণ

আমাদের দেশে সতীগণকে মৃত স্বামীর সহিত চিতানলে সহমরণে প্রেরণ করা হইত। রাজা রামমোহন রায়ের চেষ্টায় এবং লর্ড বেণ্টিঙ্কের অনুকম্পায় উক্ত প্রথা আমাদের দেশ হইতে উঠিয়া গিয়াছে।

আফ্রিকার গিনি নিগ্রোদের বড় লোকের মৃত্যু হইলে তাহার অনেকগুলি স্ত্রীকে সহমরণের জন্য হত্যা করা হইত।

আফ্রিকার আশাণ্টি রাজ্যে রাজা মরিলে তাঁহার রাণীগুলিকে এবং দাসগণকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করিয়া মৃতের সহগামী করা হইত।

আফ্রিকার দাহোমী রাজ্যেও ঠিক্ এই প্রথা আছে।

নিউজীলণ্ডে কোন লোকের মৃত্যু হইলে তাহার স্ত্রীকে গলায় ফাঁসী দিয়া সহমরণ ঘটাইবার জন্য একগাছি রজ্জু দেওয়া হইত।

হেরোডোটাসের ইতিবৃত্তে জানা যায়—প্রাচীন শাকদ্বীপবাসীদের কাহারও মৃত্যু হইলে তাহার পত্নীগণকে শ্বাসরুদ্ধ করিয়া হত্যাপূর্ব্বক মৃত স্বামীর সহিত সমাধিস্থ করা হইত।

তৈমুরলঙ্গের মৃত্যু হইলে তাঁহার বহুসংখ্যক স্ত্রীকে হত্যা করিয়া সহগামিনী করা হইয়াছিল।

পেরুদেশের রাজার মৃত্যু হইলে তাঁহার স্ত্রীগণ উদ্বন্ধনে সহমরণ করিতে বাধ্য হইত।

প্রাচীনকালে গ্রীসদেশেও সহমরণ-প্রথা প্রচলিত ছিল।

বলি

আমাদের পুরাণে 'নরমেধ' যজ্ঞের উল্লেখ আছে। পূর্ব্বে তান্ত্রিক বা কাপালিকগণ দেবতার প্রীত্যর্থ নরবলি দিত। এখনও এ দেশে হিন্দু ও মুসলমান উভয়েরই মধ্যে পশুবলি বর্ত্তমান আছে।

আফ্রিকার দাহোমী রাজ্যে অজস্র নরবলির বিবরণ আছে। সে দেশের রাজারাও আমাদের দেশের তান্ত্রিকদিগের ন্যায় মানুষের মাথার খুলিতে করিয়া মদ্য পান করে।

পশ্চিম আফ্রিকাবাসী পৌত্তলিকগণ তাহাদের দেবতার সম্মুখে বহুবিধ বলি দিয়া থাকে।

অন্যান্য নানাদেশে এখনও নানারূপ বলির প্রথা বিদ্যমান আছে। বাহুল্য বিবেচনায় উল্লিখিত হইল না।

দাসপ্রথা

পৃথিবীর সর্ব্বত্র—বিশেষতঃ অনুন্নত দেশগুলির মধ্যে রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্ম্মসম্পর্কীয় নানাপ্রকারের দাসত্বপ্রথা প্রচলিত ছিল এবং অল্পবিস্তর এখনও আছে। উহার পুনরুল্লেখ করিতে গেলে স্বতন্ত্র একখানি গ্রন্থ সঙ্কলনের প্রয়োজন হয়। দৃষ্টান্তরূপে আমাদের দেশের কথাই যথেষ্ট হইবে যে, ধর্ম্মবিধান মতে এ দেশের শূদ্রজাতিরা সকলেই ব্রাহ্মণের অক্রীত নিত্য দাস এবং এই দাসভাব ও প্রভুতা এখনও আমাদের দেশের সর্ব্বত্র, বিশেষতঃ পল্লীগ্রামগুলিতে উৎকটরূপে বর্ত্তমান দেখা যায়।

শ্রীমণিকান্ত হালদার।

প্রাচীন বাঙ্গালা-সাহিত্যে বৌদ্ধ-প্রভাব

কিছুদিন পূর্ব্বেও লোকের ধারণা ছিল, বিদ্যাসাগর মহাশয়ই বাঙ্গালা ভাষার জন্মদাতা। আধুনিককালে বাণীর একনিষ্ঠ সাধকগণের গবেষণা ও অধ্যবসায়, সত্যানুসন্ধিৎসা, জ্ঞাননিষ্ঠা, সত্যানুরক্তি ও স্বদেশপ্রেম প্রাচীন বাঙ্গালা-সাহিত্যের গহন বনে পথ আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছে। এক্ষণে আমরা বুঝিতেছি, আধুনিক য়ুরোপের কোন ভাষা হইতেই আমাদের বঙ্গভাষা নবীনা নহেন। খৃষ্টের পঞ্চ শত বর্ষ পূর্ব্বেও আমরা দেখিতে পাই যে, বুদ্ধদেব বঙ্গলিপি শিক্ষা করিতেছেন। আর্য্যভাষা বঙ্গের আদিম অসভ্য অধিবাসিগণের দেশজ ভাষার সহিত মিশ্রিত হইয়া জনসাধারণের কথিত প্রাকৃত ভাষার সৃষ্টি করিয়াছিল। গৌড় প্রাকৃত নামে অভিহিত এই কথিত ভাষা বঙ্গভাষায় পরিণতি লাভ করিয়াছে। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত সংস্কৃত পুরোহিত ও শাস্ত্রের ভাষা ছিল। সংস্কৃতই উচ্চচিন্তা ও ভাব প্রকাশ করিবার একমাত্র দ্বারস্বরূপ বিবেচিত হইত। পণ্ডিতগণ ও সমাজের উপরিস্থগণের ভাব প্রকাশের জন্য "পৈশাচী ভাষা" ব্যবহৃত হইত না। কিন্তু স্বাধীনতা-প্রয়াসী বৌদ্ধভাব-প্রণোদিত বাঙ্গালী কবিগণ সংস্কৃত ভাষাকে অবজ্ঞা করিয়া জনসাধারণের ভাষায় নিজ হৃদয়ের ভাব ব্যক্ত করিতে সাহসী হইয়াছিলেন। সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যে পূত-ভাব-জাহ্নবীর ক্ষীণধারা শত শত বাঙ্গালী কবির হৃদয়ে প্রবাহিত হইয়াছিল, তাহাই এখন বিশাল নদের সৃষ্টি করিয়াছে এবং সরস্বতীর বরপুত্রগণ তাহার স্নিগ্ধ শীতল বারিতে অবগাহন করিয়া বরাভয়দায়িনী মাতার পূজার জন্য ভক্তি-চন্দন-কবিত্ব-কুসুম অর্ঘ্য লইয়া বিশ্বজননীর দ্বারে দণ্ডায়মান।

খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দী হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম ব্রাহ্মণ্যপ্রভাব দ্বারা ম্লান হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের মধ্যে পৌরাণিকতার প্রবাহ প্রসার লাভ করিতে লাগিল। বুদ্ধপূজা ও বৌদ্ধ-তন্ত্রকে ব্রাহ্মণগণ নিজ ধর্ম্মান্তর্গত করিয়া আত্মস্থ করিতে ব্যাপৃত ছিলেন। গুপ্ত যুগে ব্রাহ্মণ ধর্ম্মের পুনরুত্থানের সময় বৌদ্ধ ধর্ম্ম নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া ঘোর পৌত্তলিকতায় ও বহুবিধ ভূতপ্রেত প্রভৃতির পূজায় পর্য্যবসিত হইয়াছিল। দূরদর্শী ও কার্য্যকুশল ব্রাহ্মণগণ এই সুযোগে ব্রহ্মবিজ্ঞান ও অধ্যাত্মদর্শনের অত্যুন্নত শিখর হইতে অবতরণ করিয়া নিরাকারবাদ ও একেশ্বরবাদের ধবলাগিরির সমুন্নত শিখর হইতে নামিয়া আসিয়া, সানুদেশস্থিত অজ্ঞ জনসাধারণের মনোজ্ঞ করিয়া মূর্ত্তিপূজা ও প্রতীক উপাসনা প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। দ্রাবিড় কোলেরীয় জাতির উপাস্য শালগ্রাম শিলা ও দানব-দস্যু এবং নাগগণের উপাস্য শিলালিঙ্গ বৈদিক মন্ত্রপূত হইয়া বৈদিক বিষ্ণু-মহেশ্বর প্রভৃতি দেবতার গোষ্ঠীভুক্ত হইয়া পড়িলেন। এইরূপে উচ্চ ব্রহ্মবিজ্ঞানের, একমেবাদ্বিতীয়ম্ বিরাটের ভাবসাধনা হইতে মূর্ত্তিপূজার নিম্ন সোপানে অবতরণ জগতের ইতিহাসে বিরল। কিন্তু ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদের মন্ত্র, উপাসনা, পূজাবিধি সরল সংস্কৃতেই রচনা করিয়াছিলেন। অপর দিকে বৌদ্ধগণ তাঁহাদের বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘরূপ ত্রিরত্নের মধ্যে ধর্ম্মের উদ্দেশ্যে কাব্য ও গান রচনা করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মঠাকুরের পূজাপদ্ধতি ও মাহাত্ম্য-সংকীর্ত্তনের জন্য যে কবিতা রচিত হইয়াছিল, তাহাতেই বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি। বাঙ্গালী কবিগণ নিজ স্বাতন্ত্র্যরক্ষাধর্ম্মের বশবর্ত্তী হইয়া বঙ্গসাহিত্যকে সংস্কৃতের পদাশ্রয় হইতে উদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। অষ্টম শতাব্দী হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত বৌদ্ধধর্ম্ম যে জীবন-মরণ যুদ্ধে নিযুক্ত হইয়াছিল, তাহার শেষ প্রচেষ্টা ধর্ম্মমঙ্গলের ধর্ম্মঠাকুর পূজা। মুসলমান কর্ত্তৃক ভারত আক্রমণের পূর্ব্ব হইতে বাঙ্গালা ভাষায় পুস্তক দেখিতে পাওয়া যায়। নাথপন্থের যোগিগণ ও সিদ্ধাচার্য্যগণের রচনার সময় হইতে বাঙ্গালা দেশ বিজাতি কর্ত্তৃক পরাজিত ও অধিকৃত হইবার কাল পর্য্যন্ত বাঙ্গালা সাহিত্যের শৈশবকাল বলিতে হইবে। মুসলমান বিজয়ের পূর্ব্বে বৌদ্ধগণ একটি বিরাট বাঙ্গালা সাহিত্য সৃষ্টি করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার নিদর্শন অতি অল্পই পাওয়া যায়।

কিছুদিন পূর্ব্বে পণ্ডিত শ্রীযুত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় "বৌদ্ধ গান ও দোঁহা" নামক একখানি পুস্তক ছাপাইয়াছেন। তাঁহার মতে খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী হইতে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে এই সমস্ত দোঁহা লিখিত হইয়াছিল। ইহাতে বৌদ্ধ সহজিয়া ধর্ম্মের মত দেখিতে পাওয়া যায়। এই মতের সমস্ত বই সন্ধ্যা ভাষায় লেখা। সন্ধ্যাভাষার অর্থ "আলো-আঁধারি ভাষা, কতক আলো, কতক অন্ধকার, খানিক বুঝা যায়, খানিক বুঝা যায় না।" এই সমস্ত উচ্চ অঙ্গের ধর্ম্ম কথার মধ্যে, আপাতদৃষ্ট সহজ বাক্যের মধ্যে না কি একটা অজানা ভাব লুক্কায়িত আছে, যাঁহারা সাধন-ভজন করেন ও সেই পথের পন্থী, তাঁহারাই তাহা বুঝেন, অপরে পারে না। যাঁহারা এই ভাষায় গান লিখিতেন, তাঁহাদিগকে সিদ্ধাচার্য্য বলে। তাঁহারা এখনও তিব্বতে পূজা পাইয়া থাকেন। তাঁহাদের মস্তকে জটা ও দেহ উলঙ্গ। সহজিয়া গানগুলি কীর্ত্তনের পদে লিখিত এবং তৎকালে ইহা "চর্য্যাপদ" নামে অভিহিত হইত। চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয় বলেন, লুই সর্ব্বপ্রথম সিদ্ধাচার্য্য। শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে "খৃষ্টীয় ৯ম শতাব্দীতে বৌদ্ধদিগের মধ্যে লুই সহজ ধর্ম্ম প্রচার করেন। সেই সময় তাঁহার চেলারা অনেকে সংকীর্ত্তনের পদ লেখে ও দোঁহা লেখে।" এই সমস্ত দোঁহার গুরুকে সর্ব্বোচ্চ স্থান দেওয়া হইয়াছে। তাঁহার জ্ঞানাঞ্জন শলাকা দ্বারা মোহ-নিদ্রিত মানবের চক্ষু খুলিয়া যায়। ধর্ম্মের

সূক্ষ্মতম তত্ত্ব উদ্‌ঘাটনে তিনিই একমাত্র সহায়ক। শ্রীগুরুমুখপদ্ম নিঃসৃত উপদেশ মানব মনের আবিলতা ও কালিমা ঘুচাইতে সমর্থ। তিনিই ভবসাগরে একমাত্র দিক্‌দর্শন যন্ত্র। পুস্তকপাঠ বৃথা। পুস্তকপাঠে ধর্ম্মের গূঢ় মর্ম্ম বুঝা যায় না। গুরুর বচন বিনা বাক্যব্যয়ে গ্রহণ করিতে হইবে। তিনি বুদ্ধ হইতেও শ্রেষ্ঠ। বেদপাঠ করিলে যদি ব্রাহ্মণ হওয়া যায়, সংস্কার করিলে যদি ব্রাহ্মণ হওয়া যায় এবং অগ্নিতে ঘৃত ঢালিলে যদি মুক্তি লাভ হয়, তাহা হইলে চণ্ডালও ব্রাহ্মণ হইতে পারে ও মুক্তির অধিকারী হইতে পারে। বেদ যখন শুদ্ধ শিক্ষা দেয় না, বেদ প্রামাণ্য নহে বেদ অপৌরুষেয় নহে। হীনযান ও মহাযান পথাবলম্বিগণও মোক্ষপদ প্রাপ্ত হইতে পারে না। গুরুমুখী সহজ পন্থাই একমাত্র পন্থা। সহজিয়া মতের সমস্ত পুস্তক এই এক কথাই উচ্চকণ্ঠে প্রচার করে।

ডাক ও খনার বচনে বৌদ্ধভাব প্রতিফলিত হইয়াছে। পুষ্করিণী খনন, বৃক্ষ রোপণ প্রভৃতি জনহিতকর সদনুষ্ঠান ও সাধারণ গৃহস্থের কাযকর্ম্ম, কৃষিতত্ত্ব, বৃষ্টিফল, চন্দ্রগ্রহণ প্রভৃতি প্রাকৃতিক দৃশ্যের কারণ নির্দ্দেশ ও তাহার যথাযথ বর্ণনা এই সকল বচনে অতি সুন্দররূপে সরল সহজ সাধারণের বোধগম্য ভাষায় রচিত হইয়াছে দেখিয়া অনেকে অনুমান করেন যে, এই বচনগুলি বৌদ্ধ যুগে লিখিত হইয়াছিল। বোধ হয়, বাঙ্গালার কৃষকগণ ও গ্রহাচার্য্যরা ভূয়োদর্শন ও বহুদর্শিতা অনুসারে প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখিয়া তাঁহাদের অভিজ্ঞতা-সংবলিত ছড়া রচনা করিয়াছিল। এই ছড়াগুলি লোকপরম্পরায় চলিয়া আসিয়াছে। যে যখন পারিয়াছে, তাহার নিজের রচিত ছড়াগুলিও তাহার সঙ্গে জুড়িয়া দিয়াছে।

গোরক্ষবিজয় নামক একখানি পুরাতন কাব্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। লেখার ধরণ ও ভাষার আকৃতি দেখিয়া বোধ হয় কাব্যখানি খৃষ্টীয় একাদশ কিংবা দ্বাদশ শতাব্দীতে লিখিত হইয়াছিল। ভবানীদাস, ফয়জুল্লা, ভীমদাস প্রভৃতি পরবর্ত্তীকালের কতিপয় কবি ইহার ভাষার উপর হস্তক্ষেপ করিয়া ইহাকে সরল ও সহজবোধ্য করিয়া তুলিয়াছেন। অষ্টম কিংবা নবম শতাব্দীতে যখন সহজ ধর্ম্ম প্রচারিত হইতেছিল, ঠিক সেই সময় কিংবা উহার অব্যবহিত পূর্ব্বে নাথধর্ম্মও প্রচারিত হইয়াছিল। মীননাথ নামে এক সাধক নাথ-সম্প্রদায় স্থাপন করেন। ইঁহারা বঙ্গদেশ ও ভারতবর্ষের অপরাপর স্থানে প্রাধান্য বিস্তার করিয়াছিলেন। বৌদ্ধধর্ম্ম ও শৈবধর্ম্মের সংমিশ্রণে মীননাথ এই নাথধর্ম্ম গঠন করিয়া প্রচার করিতেছিলেন। মীননাথের প্রধান শিষ্য গোরক্ষনাথ সম্ভবতঃ পঞ্জাবের জলন্ধর নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়া বাঙ্গালাদেশে জীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিয়াছিলেন। এ দেশের বহুলোক তাঁহার ধর্ম্মমত গ্রহণ করিয়াছিল। নাথ গীতিকার মধ্যে নাথসম্প্রদায়ের উচ্চভাব ও ধর্ম্মের বহুবিধ কথা আছে। গোরক্ষ বিজয় ও ময়নামতীর গান একই যুগ এবং একই সম্প্রদায়ের পুস্তক। দুই গ্রন্থের মধ্যে সাদৃশ্য বর্ত্তমান। উভয়ের মধ্যে বৌদ্ধ মহাযান ধর্ম্মের অনেক কথা সন্নিবেশিত আছে। গোরক্ষবিজয় অতি উপাদেয় গ্রন্থ। প্রাচীন বাঙ্গালা-সাহিত্যে ইহা এক অপূর্ব্ব জিনিষ। গোরক্ষ যোগীর চরিত্র শুভ্র হিমালয়ের মত দণ্ডায়মান। ভগবতী দেবীর সমস্ত প্রলোভনের অগ্নি-পরীক্ষায় তিনি কিরূপে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন, দেখিলে দুর্ব্বল মানব হৃদয়ে নূতন বলের সঞ্চার হয়। স্বয়ং মীননাথ পর্য্যন্ত যে মায়ায় মুগ্ধ হইয়াছিলেন,—তাহা তাঁহার শিষ্য গোরক্ষনাথকে বদ্ধ করিতে পারে নাই। তাঁহার হস্তে মৃদঙ্গ যেন জীবন্ত ভাব ধারণ করিয়াছিল। মৃদঙ্গে হাত দিয়া "কায়া সাধ কায়া সাধ" বোলে তিনি কদলিপত্তনের রাজপ্রাসাদ প্রকম্পিত করিয়াছিলেন। তাঁহার ন্যায় গুরুভক্তির জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত জগতে বিরল। গোরক্ষ-বিজয় প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যে আলোকস্তম্ভের ন্যায় আমাদের পথনির্দ্দেশ করিতেছে।

খৃষ্টীয় একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে গোবিন্দচন্দ্র পাল বঙ্গে রাজত্ব করিতেছিলেন। গোবিন্দচন্দ্রের পিতার নাম মাণিকচন্দ্র ও মাতার নাম ময়নামতী গোবিন্দচন্দ্রের সন্ন্যাসের কথা সমস্ত ভারতে প্রচারিত হইয়া এক অভিনব ভাবের উদ্রেক করিয়াছিল। বঙ্গীয় পালরাজগণের যশোগাথা পঞ্জাবে, মহারাষ্ট্রে, উড়িষ্যায় ও হিন্দুস্থানে প্রচারিত হইয়া শত শত নরনারীর যুগপৎ, আনন্দ ও শোক উৎপাদন করিয়াছিল। মাণিকচন্দ্রের স্ত্রী ময়নামতী গুরুর নিকট মহাজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু হাড়িসিদ্ধাকে গুরুরূপে বরণ করিতে স্বামী অনিচ্ছুক হওয়ায় তাঁহার মৃত্যু ঘটিয়াছিল। ময়নামতী স্বামীর চিতায় প্রবেশ করিলেন, কিন্তু গোরক্ষনাথের বরে তাঁহার শরীর রক্ষা হইল। অষ্টাদশ বর্ষে গোপীচন্দ্রের রাজ্যাভিষেক হইল। তিনি মাতার আজ্ঞায় সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং হাড়িসিদ্ধার নিকট জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। মাণিকচন্দ্র রাজার গানে বৌদ্ধপ্রভাব পরিস্ফুট এবং বাঙ্গালার তদানীন্তন সামাজিক চিত্র সুন্দরভাবে প্রতিফলিত হইয়াছে।

রামাই পণ্ডিতের শূন্য পুরাণ ধর্ম্মপূজা বিষয়ক প্রধান গ্রন্থ। রামাই পণ্ডিত মহারাজ দ্বিতীয় ধর্ম্মপালের রাজত্বকালে খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। শূন্য পুরাণের একান্নটি অধ্যায়ের মধ্যে ৫টি অধ্যায় সৃষ্টিপত্তন সম্বন্ধে। রামাই মহাযান পথাবলম্বী বৌদ্ধগণের মত অবলম্বন করিয়া সৃষ্টিপত্তন অধ্যায় লিখিয়াছিলেন।

বাঙ্গালায় বৌদ্ধপ্রভাব হিন্দুত্বস্রোতে মিশিয়া গিয়া সাহিত্যক্ষেত্রে ক্ষীণভাবে প্রবাহিত হইয়াছিল। শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণব ধর্ম্মের ত্রিধারা প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের মরুপ্রান্তরে বৃক্ষলতা-তৃণশস্পের শ্যামল শোভায় নয়ন ও মনের আনন্দবিধান করিয়াছে। এই জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তির উচ্ছ্বাসে কবি-হৃদয় বিলোড়িত হইয়াছিল এবং দেশকাল ও পাত্রভেদে এক অপরূপ আকার ধারণ করিয়াছিল।

হিন্দুধর্ম্মের অভ্যুত্থানে শৈবসম্প্রদায় নিজ ধর্ম্মপ্রচারে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। শৈব ধর্ম্মাচার্য্যগণ প্রথম জনসাধারণের মনোরঞ্জনে চেষ্টিত হইয়াছিলেন। অদ্বৈত-দর্শনের জীব-ব্রহ্মৈক্যসাধনা শৈবধর্ম্মের ভিত্তি। শৈবগণ দ্বৈতবাদিগণের ন্যায় সগুণ ব্রহ্মের উপাসক নহেন। শিব ত্রিগুণাতীত আনন্দময় পুরুষ। নির্গুণ ব্রহ্মের ন্যায় তিনি স্থির-নিশ্চেষ্ট। জীবমাত্রেই বৈরাগ্যসম্পন্ন হইলে, সাধনার উচ্চশিখরে অবস্থিত হইয়া মায়াতীত তুরীয় অবস্থা প্রাপ্ত হইলে শিবত্ব লাভ করিবে, ইহাই শৈবধর্ম্মের শিক্ষা। শিব পরম সন্ন্যাসী, সংসারের সুখ দুঃখে অবিচলিত। বৌদ্ধধর্ম্ম সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম—গৃহীর ধর্ম্ম নহে। বুদ্ধপূজাপদ্ধতি দেশময় প্রচারিত হইলে এবং বৌদ্ধ ধর্ম্মানুযায়ী সন্ন্যাস আপামর জনসাধারণের মধ্যে বিস্তৃত হইয়া পড়িলে শৈবসম্প্রদায় বৌদ্ধধর্ম্মকে আত্মস্থ করিয়া লইয়াছিলেন। বৈরাগ্য গুরু বুদ্ধদেবের আসনে পরম সন্ন্যাসী মহেশ্বরকে প্রতিষ্ঠিত করিতে বিশেষ কোন আয়াসের প্রয়োজন হয় নাই। শ্রমণগণের হরিদ্রাবসন গৈরিক বর্ণ ধারণ করিয়াছে মুণ্ডিত শির হিন্দুসাধক জটাজালে আবৃত হইয়াছে, কিন্তু শিবের উচ্চ আদর্শ ও সন্ন্যাসভাব সাধারণের মন আকৃষ্ট করিতে সমর্থ হয় নাই। শৈবগণের সংসারবিদ্বেষী আদর্শ বাঙ্গালী কবির আন্তরিক প্রীতি-ভক্তির উৎস প্রবাহিত করিতে পারে নাই। শিব শ্মশানে-মশানে ঘুরিয়া বেড়ান, তাঁহার সহচর-অনুচর ভূত-প্রেত। শিবের মহিমা অদ্যাপি সন্ন্যাসীর গাজনতলায় ও শ্মশানে কীর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে। জড় ও ভোলানাথ সংসারের গৃহচ্ছায়া হইতে অদ্যাপি নির্ব্বাসিত হইয়া রহিয়াছেন। "কিন্তু বাঙ্গালী কবির কি অসমসাহসিকতা? কত বড় দুঃসাহস! বাঙ্গালী কবি শিবের সেই "রজত-গিরিনিভ" গাত্রে কলঙ্ক-কালিমা লেপন করিতে ছাড়েন নাই।" মহামহিমান্বিত পুরাণের সাক্ষ্য অবজ্ঞা করিয়া বাঙ্গালী বৌদ্ধ-কবি শিবকে কৃষকের দেবতারূপে কল্পনা করিয়াছেন। বৌদ্ধ শিবে

পৌরাণিক শিবের নিশ্চেষ্টতা নাই, সংসার বৈরাগ্যের ভাব নাই। রামাই পণ্ডিত শিবকে ধর্ম্ম পূজার সহায়ক করিয়াছেন। রজনী প্রভাতে দিগম্বর দ্বারে দ্বারে ভিক্ষার জন্য ঘুরিয়া বেড়ান। ভক্ত কবি তাঁহাকে ধান্য রোপণের উপদেশ দিতেছেন; কারণ গৃহে অন্ন থাকিলে অনশনে দেহ ক্লিষ্ট হইবে না। কেননা ব্যাঘ্রের চর্ম্ম পরিধানের কষ্ট দেখিয়া কবি তাঁহাকে কার্পাস চাষ করিতে বলিতেছেন: গাত্রে বিভূতি মাখিতে দেখিয়া তিল-সরিষার চাষ করিতে অনুরোধ করিতেছেন। ধর্ম্ম পূজার সুবিধার জন্য মুগ, ইক্ষু ও কলা চাষ করিতেও বলিতেছেন। অতএব আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, বৌদ্ধ বাঙ্গালী কবি হিন্দুর সন্ন্যাসী নিশ্চেষ্ট শিবকে শ্মশান হইতে টানিয়া আনিয়া ও তাঁহার দুঃখে বিগলিত হইয়া ধর্ম্মপূজার উপকরণ সংগ্রাহকরূপে চিত্রিত করিয়াছেন।

বাঙ্গালীর স্নেহপ্রবণ ভক্তিরসসিক্ত হৃদয় শৈবগণের অসামাজিক ও সংসার-বিতৃষ্ণার আদর্শ গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় নাই। বাঙ্গালী মাতৃ-উপাসক। মাতৃভাবের উদ্দীপনায় বাঙ্গালী সিদ্ধহস্ত। এই মধুর ও শান্তভাব তন্ত্রে ভীষণতায় পর্য্যবসিত হইয়া জাতীয় জীবনে এক নব-যুগের অবতারণা করিয়াছিল। বাঙ্গালী শক্তি উপাসক। সরলমতি বৈদিক আর্য্যগণের পুরদেবতাগণ দার্শনিক ঔপনিষদিক যুগে ক্লীবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং বহুকাল পরে বাঙ্গালী সেই ক্লীবত্ব স্ত্রীত্বে মাতৃত্বে পরিণত করিয়া তাঁহাকে আদ্যাশক্তিরূপে পূজা করিয়াছেন। এই ভাবের বশবর্ত্তী হইয়া ব্রাহ্মণগণ বৌদ্ধ ডোম পুরোহিতগণের হারিতী দেবীকে সময়োপযোগী করিয়া ব্রণনাশিনী শীতলা মূর্ত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। "কর-চরণহীনা, সিন্দুরলিপ্তাঙ্গী, শঙ্খ বা ধাতুখচিত ব্রণচিহ্নাঙ্কিতা মুখমণ্ডলমাত্রাবশিষ্টা" শীতলা প্রতিমা "বৌদ্ধসংস্রবের অকাট্য প্রমাণ" বলিয়া শ্রীযুত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় বলিয়াছেন। শীতলা পূজা এখনও বাঙ্গালার গ্রামে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, এখনও বিস্ফোটক রোগের প্রাদুর্ভাবের সময় বাঙ্গালী গৃহস্থ ক্রোধপ্রশমনার্থ ঢাকঢোল বাদ্যাদি সহযোগে তাঁহার পূজার ব্যবস্থা করিয়া থাকেন এবং এখনও দূরপল্লীর শীতলা মন্দির-প্রাঙ্গণে চামর-মন্দিরা সহযোগে গীত শীতলা-মাহাত্ম্য সকল শ্রেণীর স্ত্রীলোকগণের মনে ভীতি ও ভক্তির সঞ্চার করে।

মনসা-মঙ্গলের সর্ব্বত্রেই শিবভক্তের সহিত মনসাদেবীর সংগ্রাম দৃষ্ট হয়। শৈবধর্ম্মকে পরাস্ত ও নির্জ্জিত করিবার জন্যই মনসামঙ্গল রচিত হইয়াছিল। নদ-নদী-বহুল সর্পসঙ্কুল বঙ্গভূমির দেবী বিষহরী। চাঁদ সদাগর পরম শৈব, কিন্তু তাঁহাকে বহুবিধ লাঞ্ছনা ভোগ করাইয়া শিব নিজ দুহিতা শীতলার মহিমাপ্রচারে সাহায্য করিয়াছেন। জলাময় বঙ্গদেশে সর্পের উপদ্রব প্রচুর। সাধারণের সর্পভয় নিবারণকল্পে সর্পের দেবতা কল্পনা স্বাভাবিক এবং এইজন্য মনসাদেবীর পূজা দ্বারা তাঁহার ক্রূর ও সহজক্রুদ্ধ অনুচরগণকে হস্তগত করিয়া পুত্রপৌত্র ও আত্মরক্ষা করিবার জন্য মনসাদেবীর শরণাপন্ন হইবার প্রচেষ্টা। এইরূপে সুবচনী, মঙ্গলচণ্ডী, কমলাদেবী প্রভৃতি বহু দেবীর পূজা ও গান প্রচলিত হইতে লাগিল। কত মাতৃপূজক বাঙ্গালী কবি যে শক্তি-দেবতার পূজা করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই, কিন্তু অধিকাংশ স্থলে তাঁহাদের কবিতার উচ্চ অঙ্গের সাহিত্য-রস প্রকটিত হয় নাই। তবে এই বঙ্গদেশজাত সংস্কৃত-সম্পর্কশূন্য কাব্য ও পাঁচালী সমূহের মধ্যে বহু সমাজ ও পরিবারের রীতিনীতি আলেখ্যের ন্যায় প্রতিফলিত হইয়াছে। গ্রামের ছায়াশীতল কুটীরে ও মুক্ত মন্দির-প্রাঙ্গণে যে গীত-লহরী বাঙ্গালী গ্রাম্য কবির হৃদয় হইতে উৎসারিত হইয়াছিল—তাহার কবি-হৃদয় যে কমনীয় রমণীয় অতুলনীয় মহাশক্তির মাতৃমূর্ত্তি কল্পনা করিতে সমর্থ হইয়াছিল, তাহা অদ্যাপি কোটি কোটি বঙ্গবাসীর ভক্তি-প্রীতি আকৃষ্ট করিতে সমর্থ হইতেছে। বাঙ্গালীর সাম্প্রতিক জীবনআরম্ভ হইবার পূর্ব্বে তাহার প্রাত্যহিক জীবনের ছায়ায় যে সুখদুঃখ প্রীতি-ভালবাসা ও ভক্তির নিত্য অভিনয় ঘটিত, তাহা এই সমস্ত স্বভাব কবির চিত্রে সুন্দরভাবে প্রকাশ পাইয়াছে।

শ্রীহরিপদ ঘোষাল, বিদ্যাবিনোদ।

ব্রহ্মার অপূর্ব্ব সৃষ্টি *

পিতামহ ব্রহ্মা সমস্ত ভুবন ও ভূত সমূহ সৃষ্টি করিবার পর—হস্তে আর অন্য কোন কায না থাকায় চিন্তান্বিত অবস্থায় বেশ কয়দিন কাটাইয়া দিলেন। তিনি সৃষ্টিকর্ত্তা হইয়া মহা মুস্কিল করিয়া ফেলিয়াছেন, কেন না, অনবরত বিরামহীন কায করিয়া যাওয়াই তাঁহার স্বভাব হইয়া পড়িয়াছে। কয়েক দিন চিন্তা করিয়াই কাটাইলেন। চিন্তা ত মস্ত কায! তাহার পর দিব্যদৃষ্টিতে একবার মর্ত্ত্যলোক দেখিয়া লইলেন।

পিতামহ দেখিলেন,—মানবগণ মায়া বা দম্ভ শূন্য বলিয়া বেশ সরলতা সহকারে বাস করিতেছে। বড়লোক, ছোটলোক, চাকর-মনিব ভেদ নাই, সুতরাং দুঃখের সম্ভাবনা নাই। সকলেই বেশ সুখী। এক আধ জন যদি বেশী ধনী বা বড়লোক হইতে চাহে, তবে অন্য অনেককে নির্ধন বা ছোটলোক হইতে হইবে, অর্থাৎ দশ জনকে প্রতারণা বা বঞ্চনা করিয়া এক জনকে ধনী হইতে হইবে, নতুবা ধনী হইবার "নান্যঃ পন্থাঃ বিদ্যতে"। পিতামহের সৃষ্ট মানব তখন সকলেই সরল (আর্জ্জব যোগবিশেষাৎ), কাযেই প্রবঞ্চনা-প্রতারণার ধার তাহারা ধারে না। পিতামহ বোধ হয় ভাবিলেন, তাই ত, কাযটা ত বড় খারাপ হইয়া পড়িয়াছে, ধনী-দরিদ্র ভেদ নাই—এও কি চলে! যাহাই হউক, একটা বিহিত উপায় করিতে হইবে। সৃষ্টিকর্ত্তার মাথা—কত রং-বেরংএর খেয়াল খেলিতে লাগিল! শেষে 'মিলিত নয়নে' স্বল্পকাল থাকিয়া তিনি মায়ার সাহায্যে এক নূতন জীব সৃষ্টি করিলেন।

পূর্ব্বে (বোধ হয় পূর্ব্বকল্পে) এক জন দৈত্য ছিলেন—যাঁহার প্রতাপে দেবতাদিগের ক্ষমতা হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছিল ও সমৃদ্ধি স্তম্ভিত হইয়াছিল; ইঁহার নাম জম্ভ। † পিতামহের পূর্ব্বকল্পের সকল কথাই স্মরণ থাকে, তিনি নূতন সৃষ্ট জীবটির নাম ঐ জম্ভ দৈত্যেরই নামে রাখিলেন, কেবল চ বর্গের তৃতীয় বর্ণের স্থানে ত বর্গের তৃতীয় বর্ণের আদেশ করিলেন মাত্র। এই দম্ভের আকৃতি—হস্তে তাঁহার পুস্তক, কুশগুচ্ছ, এক শূন্য কমণ্ডলু, মৃগচর্ম্ম, খনিত্র ও নিজেরই হৃদয়ের মত কুটিলাগ্র এক দণ্ড। মস্তক তাঁহার মুণ্ডিত—শিখাব্যতীত,—সেই শিখার মূলে শ্বেতপুষ্প, সেই শ্বেতপুষ্প বেড়িয়া কুশের বেড়। গ্রীবা তাঁহার কাঠের মত শুষ্ক, ওষ্ঠদ্বয় জপক্রিয়ায় ঈষৎ চঞ্চল, চক্ষু ধ্যান-স্তিমিত। দুই হস্তে রুদ্রাক্ষের বলয়। তিনি 'মৃৎপরিপূর্ণ' ‡ এক পাত্র ধারণ করিয়া আছেন। (এই মৃত্তিকা গঙ্গামৃত্তিকা কি না, তাহা শাস্ত্রে লেখা নাই; আর, তিনি 'বহন' করিতেছিলেন মাত্র লেখা আছে, তা হাতে করিয়া কিংবা রজ্জু দ্বারা গলদেশ হইতে ঝুলাইয়া তাহা লেখা নাই)।

পিতামহ অবশ্যই পবিত্র ব্রহ্মলোকে বসিয়া দম্ভের সৃষ্টি করিয়া-ছিলেন। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়! দম্ভ, সৃষ্ট হইবামাত্র পাছে

---

* গৌহাটী "পূর্ণিমা সম্মেলনে" পঠিত।

† অথর্ব্ববেদ—২।৩।২।

মহাভারত—১।২১০৫।

ভাগবত—৮।১০।২১।

মার্কণ্ডেয় পুরাণ—১৮।১৬।

হিরণ্যকশিপুর শ্বশুরের নাম ছিল জম্ভ। ভাগবত—৬।১৮।১২।

‡ মৃৎপরিপূর্ণং বহন্ পাত্রং। ৭০।

কোনরূপ অশুচিসংস্পর্শে তাঁহার শৌচ নষ্ট হইয়া যায় এই ভয়ে—নিজেকে (ব্রহ্মলোকেও) যথাসম্ভব অন্যের স্পর্শ হইতে বাঁচাইয়া দণ্ডায়মান থাকিলেন। * এখন তাঁহাকে বসিবার আসন দেয় কে? সপ্তর্ষিগণ দম্ভের বেশভূষা ভাবভঙ্গী দেখিয়া তাঁহাকে সসম্ভ্রমে প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া সরিয়া দাঁড়াইলেন। ব্রহ্মা, যিনি লীলাচ্ছলে ইতঃপূর্ব্বে সমস্ত বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি দম্ভকে দেখিয়া নিজের সৃষ্টিশক্তির তারিফ না করিয়া থাকিতে পারিলেন না. তাঁহার এমনই বিস্ময় ও হর্ষ উপস্থিত হইল যে, তিনি নিঃস্পন্দভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। অগস্ত্য দম্ভের অতি তীব্র তপস্যার চিহ্ন দেখিয়া হীনপ্রভ হইলেন। বশিষ্ঠ দেখিলেন যে, তাঁহার নিজের তপস্যা দম্ভের তুলনায় কিছুই নহে, কাযেই লজ্জায় পৃষ্ঠ সঙ্কুচিত করিয়া সরিয়া গেলেন। নারদ নিজের তপস্যার প্রতি আর সমধিক আস্থা রাখিতে পারিলেন না। জমদগ্নি নিজের জানুদ্বয়ের মধ্যে মুখ লুকাইলেন। বিশ্বামিত্র ভয়ে অন্য দিকে মুখ ফিরাইলেন। এ দিকে দম্ভ অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত দণ্ডায়মান থাকিয়া ক্ষুব্ধ হইতেছেন দেখিয়া ব্রহ্মা বলিলেন, "হে পুত্র, এরূপ মহৎ গুণমণ্ডিত তুমি যে আমার ক্রোড়ে বসিবার উপযুক্ত, অতএব আমার ক্রোড়েই উপবেশন কর।" এই কথা শুনিয়া দম্ভ একবার চারিদিক দেখিয়া লইলেন—পাছে অজ্ঞাতসারে কোন অপবিত্র দ্রব্যের সংস্পর্শ হইয়া পড়ে—পরে হস্তে জল লইয়া ব্রহ্মার ক্রোড়দেশে অভ্যুক্ষণ করিলেন। (ব্রহ্মার ক্রোড় ত পবিত্র! আবার জলের ছিটা কেন? সাবধান হওয়া ভাল, ব্রহ্মার হয় ত তেমন শৌচ জ্ঞান নাই) এবং আলগাভাবে সসঙ্কোচে তাহাতে উপবেশন করিলেন। † (দম্ভের কমণ্ডলু শূন্য ছিল, ব্রহ্মার ক্রোড়ে বসিবার পূর্ব্বে বোধ হয় জল কোন স্থান হইতে আনিয়াছিলেন। এই জল গঙ্গার জল ছিল কি না তাহা শাস্ত্রে লেখে না, তবে ব্রহ্মলোক যদি স্বর্গেই হয়, তাহা হইলে স্বর্গের মন্দাকিনী হইতেই জল লইয়াছিলেন—এরূপ অনুমান আমরা করিতে পারি। মন্দাকিনী গঙ্গাই ত! তবে স্বর্গের গঙ্গা। গঙ্গার জলের মতই কি মন্দাকিনীর জল দম্ভের মতে পবিত্র? কে জানে? যাহাই হউক্, জলের ছিটা দিয়া উপবেশন করিলেন)। উপবেশন করিয়াই ব্রহ্মাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, মহাশয়! আপনি উচ্চৈঃস্বরে বাক্যালাপ করিবেন না, যদি একান্তই আবশ্যক হয়, তবে ভবদীয় হস্ত দ্বারা মুখরন্ধ্র আচ্ছাদন করিয়া বাক্য ব্যবহার করিবেন। দেখিবেন যেন আপনার মুখনিঃসৃত বায়ু আমাকে স্পর্শ না করে; ‡ স্পর্শ করিলেই আমি অশুচি হইয়া যাইব। কেন না, আপনার মুখনিঃসৃত হইলেও ত সে মুখ নিঃসৃত বটে, অতএব উচ্ছিষ্ট!" ব্রহ্মা এই কথা শ্রবণ করিয়া ও তাহার অতুলনীয় শৌচ দেখিয়া সহাস্যবদনে বলিলেন, তোমার নাম যে রাখিয়াছি দম্ভ, ইহা সার্থক বটে। বৎস, তুমি আমার এ হেন রত্ন, কেবল স্বর্গে শোভা পাইবে তা কি হয়! সসাগরা পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া পৃথিবীর সর্ব্বপ্রকার সুখভোগ কর। আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি, তোমাকে সম্যক্‌ভাবে চিনিতে কেহই পারিবে না।"

ব্রহ্মার আদেশ পাইয়া দম্ভ মর্ত্ত্যলোকে অবতরণ করিলেন। এখন আর তাঁহাকে চিনিবার উপায় নাই। তিনি সূক্ষ্মভাবে প্রবেশ করিলেন, প্রথমেই গুরুদিগের হৃদয়ে, দীক্ষিতের হৃদয়ে; বালক ও তপস্বীর হৃদয়ে, গণক, চিকিৎসক, সেবক, বণিক, স্বর্ণকার, নট, ভট, গায়ক, যাচক সকলেরই হৃদয়ে প্রবেশ করিলেন। মানব জগৎ জয় করিয়া গেলেন প্রাণীদিগের § জগতে, সেখান হইতে গেলেন উদ্ভিদ্ জগতে। সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করিয়া, দিগ্বিজয় করিয়া নিজের জয়পতাকা নিখাত করিলেন—গৌড়দেশে। * বাহ্লীক দেশের লোকের বচনে দম্ভ,—প্রাচ্য ও দাক্ষিণাত্যদিগের ব্রত-নিয়মে দম্ভ,—কাশ্মীরীয়দিগের পদমর্য্যাদায় দম্ভ,—আর গৌড়ীয়গণের সর্ব্ব বিষয়েই দম্ভ।

খুব গুপ্তভাবে দম্ভ বিচরণ করিলেও তাঁহাকে চিনিয়া লইবার উপায় কিছু কিছু শাস্ত্রে নির্দ্দেশ করা আছে।

দম্ভবৃক্ষ—নিমীলিত নয়ন ইহার মূল, সুচিরস্নানার্দ্র কেশের জল ইহাকে সিক্ত করে, শুচি বায়ু ইহার পুষ্প এবং নানাবিধ সুখ ইহার ফল। (স্ব-কল্পিত সুখ)।

বকদম্ভ—অতিরিক্ত ব্রত নিয়মপরায়ণতা ও তজ্জন্য দম্ভ।

কূর্ম্মদম্ভ—ব্রতনিয়ম পালন অথচ লোক না জানুক—এই ভাবজনিত দম্ভ।

মার্জ্জারদম্ভ—নিভৃত স্থানে গমন, নিভৃত স্থানে নিয়মপালন, অথচ ঘোর স্বভাব।

ইহাদের মধ্যে বকদম্ভ জমীদার, কূর্ম্মদম্ভ ছোটখাট রাজা আর মার্জ্জারদম্ভ দম্ভরাজ্যের সার্ব্বভৌম নরপতি।

সাধারণ লক্ষণ—শ্মশ্রু-গুম্ফমণ্ডিত বা শ্মশ্রুগুম্ফহীন, কেশযুক্ত বা জটিল বা মুণ্ডিত মস্তক—যাহাই হউক না কেন, দম্ভের এইগুলি সাধারণ লক্ষণ;—ইনি (শৌচায়) বহু পরিমাণে মৃত্তিকা ব্যবহার করেন, ওজন ও হিসাব করিয়া কথা বলেন, ধীরে ধীরে পাদক্ষেপ করেন, কখনও কখনও অঙ্গুলিভঙ্গ (আঙ্গুল মট্‌কান) করেন, নানাবিধ বিবাদ করিতে ও বাধাইতে পণ্ডিত, লোকজনের সমক্ষে জপপরায়ণ, নগরের রাজপথে ধ্যান করিতে বসেন বা যেন ধ্যান করিতেছেন এইরূপভাবে চলেন, মধ্যে মধ্যে কর্ণের কোণ স্পর্শ করেন, ললাটে বিস্তীর্ণ তিলক দ্বারা অনুষ্ঠিত দেবপূজার বিজ্ঞাপন দেন। ইনি নির্গুণ লোকের নিকট সম্মানপ্রার্থী, গুণবানদিগের সমাজে গুরু; আত্মীয়-স্বজনদ্বেষী, পরের প্রতি করুণাময় বন্ধু। কার্য্যের দায় ঠেকিলে শতবার অন্যের কাছে যান ও খোসামোদ করেন; কার্য্যশেষ হইলে উপকারীকে দেখিয়া ভ্রূভঙ্গ করেন ও মৌনী থাকেন।

বিশেষ প্রকারের দম্ভ যে কত আছে, তাহার সংখ্যা করা বিষম ব্যাপার। দুই চারিটির নাম দেওয়া গেল। নিঃস্পৃহ দম্ভ—অর্থাৎ আমি সকল বিষয়েই নিঃস্পৃহ, এই ভাবজনিত দম্ভ। এই নিঃস্পৃহ দম্ভের তুলনা হয় না। শুচি দম্ভ বা শম দম্ভ বা স্নাতক দম্ভ বা সমাধি দম্ভ। ইহারা কেহই নিঃস্পৃহ দম্ভের শতাংশেও তুল্য নহেন। শমদম্ভ—সমজনিত দম্ভ; স্নাতকদম্ভ ব্রহ্মচর্য্যসমাপনান্তে দম্ভ; সমাধিদম্ভ, সাধন করিতে করিতে আমার সমাধি হয়, তবে আমাকে আর পায় কে—এই ভাবজনিত দম্ভ। শুচিদম্ভ যিনি—তিনি (সত্যকার) শৌচ অর্থাৎ শুচিতা বা (মনের) পবিত্রতার বিরোধী (কার্য্যতঃ), কিন্তু (বাহ্যশৌচের নিমিত্ত) 'মৃৎক্ষয়কারী'; ইনি নিজের বান্ধবদিগকেও স্পর্শ করেন না; ইনি বিশ্বামিত্রত্ব লাভ করিয়া থাকেন। † (ব্যাকরণের একটু নীরস কচকচির মধ্যে প্রবেশ করিতে হইল, রসিকগণ ক্ষমা করিবেন। বিশ্বের মিত্র অর্থাৎ সকলেরই বন্ধু বা হিতকারী এই অর্থে "মিত্রে চর্ষৌ" (পাণিনি ৬।৩।১৩০) সূত্র অনুসারে বিশ্বামিত্র শব্দ নিষ্পন্ন হয়। এই বিশ্বামিত্র ঋষি ছিলেন, গায়ত্রী মন্ত্র ইঁহারই দ্বারা দৃষ্ট, কিন্তু 'মৃৎক্ষয়কারী স্ববান্ধবাস্পর্শী' যিনি বিশ্বামিত্র=বিশ্ব+অমিত্র, অর্থাৎ সকলেরই শত্রু এই অর্থে)। ‡

সূক্ষ্ম অবস্থায় (abstract) যে দম্ভ আমাদের জগতে বাস করিতেছেন—তাঁহার পিতা বা জনক অতি-পরিপুষ্ট লোভ, জননী

* রক্ষন্ পরসংস্পর্শং শৌচার্থী ব্রহ্মলোকেঽপি। ৭২।

† অভ্যুক্ষ্য বারিমুষ্ট্যা কৃচ্ছ্রেণোপাবিশদ্দম্ভঃ। ৮১।

‡ স্পৃষ্টো ন ত্বাং যথান্তবাতাংশৈঃ। ৮২।

§ দম্ভো বিবেশ পশ্চাদন্তরমিহ পক্ষিবৃক্ষাণাম্। ৯২।

* বিনিবেশ্য গৌড়বিষয়ে নিজজয়কেতুং ইত্যাদি। ৮৬।

† দম্ভঃ সর্ব্বত্র গৌড়ানাম্। ৮৭।

‡ বিশ্বামিত্রত্বমায়াতি ।৬০।

কপটতা, সহোদর কূট, গৃহিণী কুটিলতা আর পুত্র হুঙ্কার। (পুত্র পিতৃ-শরীরের বহিঃ প্রকাশ ধরিয়া লইলে দম্ভের পুত্র হুঙ্কারকে চেনা সহজ হইবে। যথা,—যে কোন ভাল দ্রব্য বা ভাব বা কথা দম্ভ দেখুন বা শুনুন না কেন, খুব গম্ভীরভাবে নাক তুলিয়া তাচ্ছিল্যভরে বলিবেন, হুঁ,—হুঁ,—এ আর কি ?' ঢের দেখা আছে, ইত্যাদি।)

দম্ভের চিত্রকরের পরিচয় *,—

নাম—মহাকবি ক্ষেমেন্দ্র ওরফে ব্যাসদাস।

নিবাস—কাশ্মীর।

বয়স—প্রায় ৯ শত বৎসর। ইনি খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর লোক।

পেশা—গ্রন্থরচনা। কম-বেশী ৩০ খানা গ্রন্থ ইঁহার রচিত বলিয়া জানা গিয়াছে। "বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতা" ইঁহারই রচিত।

উপরে যে চিত্র দেওয়া হইল, তাহা 'কলাবিলাস' নামক গ্রন্থের প্রথম সর্গে আছে।

যিনি এই চিত্র ভাল করিয়া দেখিয়া নিজে চিত্রের ভাব দ্বারা আক্রান্ত হইতে পারিবেন, বিদ্যুচ্চঞ্চলা লক্ষ্মী তাঁহার গৃহে অচলা হইয়া বাস করিবেন। ইতি ফলশ্রুতি। *

* কাশ্মীররাজ 'অনন্তরাজের' সময়ে ইনি বর্ত্তমান ছিলেন। অনন্তরাজের রাজ্যকাল ১০২৮-১০৬৩ খৃঃ অব্দ, পরে বিজয়েশ্বরে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত। অনন্তরাজ ১০৮১ খৃঃ অব্দে আত্মহত্যা করেন। রাজতরঙ্গিণী ৭।১৩৪-৪৫২। ক্ষেমেন্দ্র প্রণীত "ঔচিত্যবিচার চর্চ্চা"র ও "সুবৃত্ত তিলকে"র (ও অন্যান্য গ্রন্থের) শেষ অংশে ক্ষেমেন্দ্র নিজ পরিচয় দিয়াছেন। রাজতরঙ্গিণীকার কলহন ১।১৩ শ্লোকে ক্ষেমেন্দ্র প্রণীত নৃপাবলীর উল্লেখ করিয়াছেন। কলহনের প্রায় ১ শত বৎসর পূর্ব্বে ক্ষেমেন্দ্র বর্ত্তমান ছিলেন।

* ১।৩৯।

শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়।

পথহারা

কার পানে তুমি চেয়ে আছ ওগো
জেগে আছ সারা রাতিটি।
কে পথ হারায়ে খুঁজিছে কাহারে
জান কি গো শুক তারাটি।

অচেনা অজানা কোন্ পথে গেছে
সে যে গো আমার চলিয়া।
মোর সাথে দেখা হয়নি যে তার
যায় নাই কিছু বলিয়া।

স্তবধ তখন গভীরা রজনী
পাখী উঠে পাখা ঝাড়িয়া।
শন্ শন্ শন্ বহে সমীরণ
তরু-শাখা-শির নাড়িয়া।

একাকিনী সে যে কেমনে কি করে
বাহিরিল পথে জানিনি।
পথ খুঁজে খুঁজে সারা হবে সে যে
কখনো যে পথে চলেনি।

তুমি যে জাগিয়া রয়েছ গো তারা
তবু সে কি পথ হারাবে !
ঘুমায়ে পড়িলে কে দিবে জাগায়ে
কার কাছে যেয়ে দাঁড়াবে ;

পথ চলি চলি হয় ত অলসে
পথের ধূলায় লুটাবে।
কেঁদে কেঁদে আহা সারা হয়ে গেলে
কেবা আর তারে ভুলাবে।

নয়নে নয়নে রাখিয়া তোমার
দাও তারে পথ দেখায়ে।
জাগিছেন যেথা জগতের নাথ
লবে তারে হাত বাড়ায়ে।

শ্রীপ্রমথনাথ বসু

মহাভারত ও ভারতবর্ষের ইতিহাস

মহাভারত কি, বুঝিতে হইলে রামায়ণ কি, প্রথমে বুঝিতে চেষ্টা করা প্রয়োজন। "বেদে, রামায়ণে, পবিত্র পুরাণে ও ভারতে, আদি অন্ত ও মধ্যে হরি সর্ব্বত্র গীত হয়েন। ইহাতে পবিত্র বিষ্ণু কথা ও সনাতন শ্রুতি সমুদয় কীর্ত্তিত হয়।"—৯৩-৯৪, ৬ অঃ, স্বর্গারোহণ।

এই মাত্র বলিলে কথাটি পরিষ্কাররূপে বুঝা যায় না। এই সকল গ্রন্থে নানা প্রকার রহস্য সূক্ষ্ম অথবা ঘন আবরণের পশ্চাতে রক্ষিত আছে। এই রহস্যগুলি কেবল মহাভারতের সার তাহা নহে; 'সরহস্য বেদ' বেদ পাঠের নিয়ম ছিল। সুপরিচিত নারিকেল ফলের গঠন হইতে এ রহস্যের স্থান কতকটা বুঝা যাইবে। একটি শুষ্ক নারিকেল ফলে স্থূলতঃ তিন ভাগ আছে, প্রথম কাষ্ঠময় খোল, দ্বিতীয় বহিরাবরণ ছোবড়া, তৃতীয় উপাদেয় এবং পুষ্টিকর খাদ্য, শস্য বা শাঁস।

বেদ কি? কতকগুলি জ্যোতিঃ পদার্থের স্তুতি—"স্তুতার্থমিহ দেবানাং বেদাঃ সৃষ্টা স্বয়ম্ভুবা"।—৫০, ৩২৭ অঃ, শান্তি।

ইহাই য়ুরোপীয়দিগের "চাষার গান"। স্থানান্তরে লিখিত আছে—"এষা ত্রয়ী পুরাণানাং দেবতানাং শাশ্বতী"।

৬৯-১০০ অঃ, আদি।

পুরাণ সকলের মূলীভূত ও দেবতাদিগের প্রমাণীভূত যে বেদ, তাহাতে সর্ব্বদা ইহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই জড় তারকাগুলি হইল স্থূলভাবে বেদের 'খোল'। যেমন খোল আশ্রয় করিয়া নারিকেলের ছোবড়া থাকে, সেইরূপ এই নৈসর্গিক পদার্থগুলি আশ্রয় করিয়া বেদ লিখিত হইয়াছে। মৃগশিরার উৎপত্তি, শুনঃশেফ প্রভৃতির গল্প হইল 'ছোব্ড়া', এই খোল ও ছোব্ড়ার মধ্যে মানব জাতীয় জীবনী মন্ত্র লুক্কায়িত রহিয়াছে।

"বেদানাং উপনিষৎ সত্যং"

বেদ সকলের রহস্য সত্য। (সত্যং—ব্রহ্মতত্ত্বাবেদকো উপনিষৎ।—৭২-১৮ অনুঃ।

অনেকে স্মৃতি চিত্রের (টেপেষ্ট্রী) বর্ণনা শুনিয়াছেন। কোন একটি বিশেষ ঘটনা লইয়া প্রায় এইগুলি চিত্রিত হইত। ভিন্ন ভিন্ন রঙ্গের সূতার দ্বারা মোটা কাপড়ের উপর ছুঁচের সাহায্যে গাছ, পাতা, ফুল, হরিণ, কুকুর, ঘোড়া; স্ত্রী-পুরুষ লইয়া এই সকল চিত্র লিখিত থাকিত। প্রায়ই কোন সুদীর্ঘ ঘরের এক দিকের দেওয়ালে এইরূপ স্মৃতি চিত্র দ্বারা আবৃত থাকিত। নিকট হইতে দেখিলে কতকগুলি গাছ, পাতা, ফুল, মানুষ, পশু প্রভৃতি পৃথক্ পৃথক্ ও পরস্পর অসম্বদ্ধ বলিয়া মনে হইত। একটু দূরে দাঁড়াইয়া মনোযোগ করিয়া দেখিলে সমগ্র আলেখ্যটির তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম হইত। তখন বুঝা যাইত, সমগ্র চিত্রটি একটি ঘটনার অভিব্যক্তি। কোথাও বা মৃগয়া হইতেছে, কোথাও বা যুদ্ধ হইতেছে, কোথাও বা অভিষেক হইতেছে; বৃক্ষ, তরু, লতা, মানুষ, পশু, পক্ষী প্রভৃতি সেই ঘটনাগুলি অভিনয় করিতেছে। মহাভারত অবিকল তদ্রূপ। তবে সচরাচর আলেখ্য অপেক্ষা কেবল আয়তনে নয়—গাম্ভীর্য্যে লক্ষগুণে মুগ্ধকর। এক লক্ষ শ্লোকের দ্বারা এই বিশাল চিত্রপট অঙ্কিত হইয়াছে। যদি এক সহস্র ভাগে এই চিত্রখানি বিভক্ত করা যায়, তাহা হইলেও প্রতি অংশ এক একখানি সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর চিত্রপট বলিয়া মনে হইবে। অথচ এই বিশাল কাব্যে একই কথা প্রতিপাদিত হইয়াছে। সে কথাটির নাম ব্রহ্মাদ্বৈতবাদ অথবা জীব ব্রহ্ম ভেদ।

ঈদৃশং হরিং নমস্কৃত্য ব্যাসস্য মত মথাতো ব্রহ্ম জিজ্ঞাস্যেত্যাদি সূত্রৈর্নির্ণীতং যদ্ ব্রহ্মাদ্বৈত্যং তৎপ্রকর্ষেণ নানোপাখ্যানোপবৃংহনেন বক্ষ্যামি।—২৫-১ম অঃ আদি।

পুরাণান্তরে লিখিত আছে, যখন মহাভারত প্রণীত হইবে স্থির হইল, তখন ব্রহ্মা ব্যাসকে বলিলেন, তুমি বাল্মীকির নিকট যাও, কি ভাবে মহাভারত লিখিত হইবে, তিনি উপদেশ দিবেন। একটু চিন্তা করিলেই দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, রামায়ণ ও মহাভারতের আখ্যায়িকার মধ্যে অনেক সাদৃশ্য আছে। উভয়েই দুই ক্ষত্রিয় রাজবংশের কথা। রামায়ণে রামচন্দ্র স্বয়ম্বরে সীতাকে লাভ করেন; মহাভারতে অর্জ্জুন স্বয়ম্বরে

দ্রৌপদীকে লাভ করেন। রামায়ণে রামচন্দ্র চতুর্দ্দশ বৎসর বনে বাস করেন ও রাবণ সীতাকে হরণ করে। মহাভারতে দুর্য্যোধন প্রভৃতি ধৃতরাষ্ট্র-পুত্ররা দ্রৌপদীকে অপমান করে ও পাণ্ডবগণ বার বৎসর বনে বাস করেন। রামায়ণে রাবণ সবংশে নিহত হয়; মহাভারতে কৌরবরা বিনষ্ট হয়। পরিশেষে রামায়ণে রাম অযোধ্যায় রাজা হইলেন, যুধিষ্ঠিরও হস্তিনাপুরে রাজা হইলেন। দুইটি আখ্যায়িকার এই সাদৃশ্য ব্যতীত আরও নানা প্রকার সাদৃশ্য ও বৈষম্য পরে দেখা হইবে।

রামায়ণের কাহিনী সকল হিন্দুরই জানা আছে। অযোধ্যাপুরীতে অজ নামে এক রাজা ছিলেন। অজের পুত্র দশরথ। দশরথের তিন মহিষী ছিলেন, কাহারও সন্তান হয় নাই। পুত্রের নিমিত্ত যজ্ঞ করিতে তিনি ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিকে নিজ পুরীতে আনয়ন করেন। সেই মুনির যজ্ঞপ্রভাবে রাজা দশরথের জ্যেষ্ঠা মহিষী কোশল-রাজ-কন্যা কৌশল্যার গর্ভে রামচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন ও অপর দুই মহিষীর গর্ভে আর তিন পুত্রের জন্ম হয়। রামের রাজ্যাভিষেকের সময় উপস্থিত হইলে মন্থরা নাম্নী দাসীর ষড়যন্ত্রের ফলে রামচন্দ্র চতুর্দ্দশ বৎসরের নিমিত্ত সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত বনে গমন করেন ও তাঁহার বৈমাত্র ভ্রাতা ভরত তাঁহার স্থানে রাজ্যপালন করেন। বনবাসকালে লঙ্কার অধিপতি রাবণ রামের অনুপস্থিতি সময়ে সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া যায়। রামচন্দ্র বানররাজ সুগ্রীবের সহিত মিত্রতা করিয়া হনুমান প্রভৃতির সাহায্যে রাবণকে সবংশে নিহত করিয়া সীতাকে উদ্ধার করেন ও পরে অযোধ্যার সিংহাসনে আরোহণ করেন।

এই হইল স্থূলতঃ আখ্যায়িকা অথবা 'ছোবড়া' অংশ। ইহার নিগূঢ় রহস্য আছে। সেই রহস্য বুঝিতে হইলে অপর একটি ধর্ম্মের একটি আখ্যায়িকার উল্লেখ করিতে হয়। ইহুদীদিগের ধর্ম্ম-গ্রন্থ টেষ্টামেণ্টে লিখিত আছে যে, ঈশ্বর সৃষ্টির শেষ করিবার পরে আদম্ নামে এক জন মানুষকে সৃষ্টি করেন এবং তাঁহাকে একটি উদ্যানে বাস করিতে দেন। আদমের নিদ্রাকালে ঈশ্বর আদমের একখানি পঞ্জর-অস্থি লইয়া ইভা নামে এক জন স্ত্রীলোক নির্ম্মাণ করেন এবং তাহাকে আদমের সহচারিণী করিয়া দেন। যে উদ্যানে আদম ও ইভা বাস করিত, সেই উদ্যানে মানুষের উপভোগযোগ্য সকল সামগ্রীই ছিল। ঈশ্বর আদম ও ইভাকে এই আজ্ঞা করেন যে, তোমরা এই স্থানের যাবতীয় সামগ্রী উপভোগ করিবে; কিন্তু একটি আপেল ফলের বৃক্ষ আছে, সেই গাছের ফল কখনও আস্বাদন করিও না। ঈশ্বরের আদেশ লঙ্ঘন করিয়া এক দিন আদম ও ইভা সেই নিষিদ্ধ ফল আস্বাদন করিল। ঈশ্বর এই ঘটনা জানিতে পারিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন এবং আদম্ ও ইভাকে সেই স্বর্গীয় উদ্যান হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। ইহাই হইল ইহুদী খৃষ্টান্ ও ইস্‌লাম ধর্ম্মের "মানবের পতন।"

ইহুদীদিগের ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া খৃষ্টান্ ধর্ম্ম গঠিত হয়, এবং এই দুই ধর্ম্ম ভিত্তি করিয়া ইস্‌লাম ধর্ম্মের উৎপত্তি হয়। ওল্ড টেষ্টামেণ্ট এই তিন ধর্ম্মেই প্রামাণ্য ঈশ্বর-কথিত ধর্ম্মগ্রন্থ বলিয়া পরিগণিত। এই তিন ধর্ম্মের সাধারণ নাম সেমেটিক ধর্ম্ম।

উপরে যে আখ্যায়িকা লিখিত হইল, তাহার দুই প্রকার অর্থ করা হয়। এক অর্থ এই যে, বাস্তবিকই এই সকল ঘটনা ঘটিয়াছিল; দ্বিতীয় অর্থ, ইহা একটি কল্পনা-প্রসূত রূপক মাত্র, ইহার নিগূঢ় অর্থ আছে। সৃষ্টিকালে মনুষ্য নিষ্পাপ ছিল; ইন্দ্রিয়ের বশীভূত হইয়া মনুষ্যের পতন হইল। ইন্দ্রিয় সংযম না করিতে পারিলে ঈশ্বর-সান্নিধ্য অর্থাৎ মোক্ষলাভ হয় না। ইহুদিরা সম্ভবতঃ অন্য ধর্ম্ম হইতে এরূপ প্রবাদ পায়। প্রাচীন পারসিকদিগের মধ্যে এই গল্প ছিল। মেন্‌সিনা ও মেন্‌সিনী পুরুষ ও স্ত্রী এক সঙ্গে বাস করিত। তাহাদেরও নিমিত্ত একটি নিষিদ্ধ খাদ্য ছিল। তাহা ফল নয়, ছাগ-দুগ্ধ। সে স্থানেও স্ত্রীলোকের প্রলোভনে পড়িয়া পুরুষ ও স্ত্রী উভয়ে সেই নিষিদ্ধ সামগ্রী উপভোগ করে এবং তাহাতে তাহাদের পতন হয়। পুরাতন গ্রীক্ দার্শনিকদিগের মধ্যে এক সম্প্রদায়ের মত ছিল যে, সকল জড় পদার্থই পাপপূর্ণ, কেবল আত্মাই নিষ্পাপ।

এখন রামায়ণ আখ্যায়িকার গূঢ় তাৎপর্য্য বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক। অযোধ্যাপুরীতে অজ নামে এক রাজা ছিলেন, তাঁহার দশরথ নামে এক পুত্র ছিল। দশরথের কোন সন্তান হয় নাই। অজ অর্থে ব্রহ্মা "অজা বিষ্ণু হর ছাগাঃ।" ব্রহ্মা হইলেন বেদ অভিমানী দেবতা। ব্রহ্মা অর্থে বেদ। ব্রহ্মা কথার এই অর্থ মহাভারত ব্যতিত উপনিষদ প্রভৃতি অপর গ্রন্থেও দেখিতে পাওয়া যায়। দশরথ হইলেন অজের

পুত্র, দশ শব্দ সহস্রবাচী, রথ শব্দের অর্থ এক অর্থ "পরলোক প্রাপকোরথঃ", যান কথাও এই অর্থে ব্যবহৃত হয়। তাহা হইলে অজের পুত্র দশরথ, ইহার তাৎপর্য্য এই যে বেদে পরলোকপ্রাপ্তি সম্বন্ধে নানা উপায় কথিত আছে। এই ভাবে অন্য প্রকারেও ব্যক্ত আছে।

"বহুশ্রয়ো বহুমুখো ধর্ম্মহৃদি সমাশ্রিতঃ"। ২৬-২৭৯ আদি

অন্যত্র যুধিষ্ঠির বলিতেছেন,—

"মহাশয়ং ধর্ম্মোপথো, বহু শাখাশ্চ ভারত"। ৩।১৬০শ

আরও একস্থলে লিখিত আছে,—

"দশ লক্ষণসংযুক্তো ধর্ম্ম অর্থ কাম এবচ"। ৬২-২৮৪ অঃ শান্তি

স্থানান্তরে আছে,—

"অনেকান্তং বহুদ্বারং ধর্ম্মমাহু মনীষিনঃ" ।১৮-২২ অঃ অনু

ইহাই হইল দশরথ শব্দের এক প্রকার তাৎপর্য্য। ইহার আর এক অর্থ হইতে পারে; যজ্ঞ পন্থাকে দাশরথ পন্থা বলিত।

শাশ্বতোহয়ং ভূতি পথো নাস্যান্তমনু শুশ্রম্।

মহান্—দাশরথ পন্থা মা রাজন্ কু পথং গমঃ॥ ৩৭-৮ অঃ শান্তি

এবং "অনাদিরনন্তশ্চায়ং যজ্ঞীয়ঃ পন্থা ইত্যাহ,—শাশ্বত ইতি। দাশরথঃ একঃ পশুঃ দ্বৌ পত্নী যজোমানৌ ত্রয়োবেদাঃ চত্বার ঋত্বিজ ইতিঃ দাশরথাশ্চ প্রচরন্তি যস্মিন্ স দশরথঃ স এব দাশরথঃ"। ৩৭-৮ অঃ টীঃ

যে যজ্ঞে যজমান স্বয়ং পত্নীর সহিত দীক্ষিত হন, এবং একটি পশু,তিন বেদ ও চারি জন ঋত্বিক এই দশটি অবস্থিতি করে, সেই দাশরথ নামক মহান্ যজ্ঞীয় পথই নিত্য। উহার ফল অবিনশ্বর, এইরূপ শ্রুত আছে। এই দুই প্রকার অর্থের বিচার পরে করিব, তবে এই স্থানে বলিয়া রাখি যে, দ্বিতীয় অর্থটি সমীচীন বলিয়া মনে হয়।

দশরথের কোন পুত্র হয় নাই। তিনি পুত্রের জন্য যজ্ঞ করিতে ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিকে আনয়ন করেন। এই ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিকে বুঝিতে আর একটি আখ্যায়িকার উল্লেখ প্রয়োজন।

মগধদেশে এক সময়ে দ্বাদশ বার্ষিকী অনাবৃষ্টি হয় ও তাহার ফলে অনেক প্রজা বিনষ্ট হয়। এই আপদ দূরীকরণের নিমিত্ত নানা চেষ্টা হইল, কিন্তু সকল চেষ্টাই বিফল হয়। পরিশেষে রাজপুরোহিতগণ বলিলেন, যদি বিভাণ্ডক ঋষির পুত্র ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিকে এ দেশে আনিতে পারেন, তাহা হইলেই বৃষ্টি হইবে। বিভাণ্ডক মুনির একমাত্র ঋষ্যশৃঙ্গ নামে পুত্র আছে। তিনি তাঁহার উপর বিশেষ অনুরক্ত। পিতার নিকট হইতে পুত্রকে এ দেশে আনয়ন করিতে কাহারাও সাধ্য নাই। নানা প্রকার পরামর্শ হইল, কি উপায়ে ঋষ্যশৃঙ্গকে মগধে আনয়ন করা যায়। পরে স্থির হইল, যদি কেহ তাঁহাকে ভুলাইয়া আনিতে পারে, তবেই তাঁহার মগধে আসা সম্ভব হয়। পুরুষকে ভুলাইতে স্ত্রীলোকের শক্তি চিরপ্রসিদ্ধ। কিন্তু এরূপ স্ত্রীলোক পাওয়া যায় কোথায়? ঋষ্যশৃঙ্গ বিশেষ উগ্রতপা ছিলেন। তপস্যা করিতে করিতে তাঁহার হরিণের ন্যায় শৃঙ্গ নির্গত হইয়াছিল। (ঋষ্য=হরিণ)। তিনি কখনও স্ত্রীলোক দেখেন নাই এবং পিতা ভিন্ন অপর কাহাকেও দর্শন করেন নাই। পিতা-পুত্রে নির্জ্জন বনে কঠোর তপস্যা করিতেন, রাজানুচরেরা তাঁহাকে প্রলুব্ধ করিয়া আনিবার নিমিত্ত রাজপুর-স্থিত গণিকাদিগকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। কিন্তু মুনির কোপে ভস্ম হইবার আশঙ্কায় তাঁহার নিকট কেহই যাইতে সম্মত হইল না। অবশেষে একজন গণিকা রাজদণ্ডের ভয়ে স্বীকৃত হইল।

যে বনে বিভাণ্ডক মুনির আশ্রম ছিল, তাহারই অনতিদূরে সে একখানি নৌকা করিয়া উপস্থিত হইল। পরদিন যখন বিভাণ্ডক মুনি ফলমূল অন্বেষণে বনমধ্যে নির্গত হইয়াছিলেন, উপযুক্ত সময় বুঝিয়া সেই গণিকা ঋষ্যশৃঙ্গ আশ্রমে প্রবেশ করিল। ঋষ্যশৃঙ্গ পূর্ব্বে কখনও স্ত্রীলোক দেখেন নাই, আগন্তুক আপনাকে মুনিকুমার বলিয়া পরিচয় দিল। সেই অভিনব মুনিকুমারের সহিত ঋষ্যশৃঙ্গ অতি আনন্দে দিন যাপন করিলেন। দিবা অবসানে গণিকা যখন বুঝিল যে, বিভাণ্ডক মুনির আশ্রমে ফিরিবার সময় হইয়াছে, তখন সে ঋষ্যশৃঙ্গের নিকট বিদায় লইয়া আশ্রম হইতে অপসৃত হইল। সায়ংকালে বিভাণ্ডক মুনি আশ্রমে আসিলে ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি তাঁহাকে নূতন প্রকার মুনি-কুমারের কথা বলিলেন, কি আনন্দে তাহার সহিত দিন যাপন করিয়াছিলেন,তাহাও বলিলেন এবং পাছে সে পুনরায় না আসে অথবা কখন সে আসিবে, তাহার জন্য পিতার নিকট বিশেষ ব্যাকুলতা প্রকাশ করিলেন। মহাভারতে এই আখ্যায়িকাটি অতিশয় কৌতুহলপূর্ণ। বিভাণ্ডক মুনি

ভিতরকার রহস্য কিছু বুঝিতে পারিলেন না। পরদিনও উপযুক্ত সময় বুঝিয়া সেই গণিকা মুনি-কুমাররূপে উপস্থিত হইল এবং উভয়ে পূর্ব্বদিনের ন্যায় আনন্দে দিন যাপন করিলেন। এইরূপ দুই তিন দিন অতিবাহিত হইলে সেই ছদ্মবেশী মুনিকুমার ঋষ্যশৃঙ্গকে বলিল যে, আমারও আশ্রম আছে, তুমি তথায় চল। সে পূর্ব্বে নিজ নৌকাখানি আশ্রমের ন্যায় সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছিল, ঋষ্যশৃঙ্গও বিস্রব্ধ চিত্তে মুনিকুমারের আশ্রমের ভিতর প্রবেশ করিলেন। এইরূপ ছল দ্বারা ঋষ্যশৃঙ্গকে মগধে আনা হইল এবং তাহার ফলে পর্জ্জন্য দেব বারিবর্ষণ করিলেন, দুর্ভিক্ষ দূর হইল এবং প্রজারাও রক্ষা পাইল।

এখন ভিতরকার রহস্য বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক্। উপরে বলা হইয়াছে যে, উগ্র তপস্যা করিতে করিতে ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির মাথা হইতে হরিণের ন্যায় শৃঙ্গ নির্গত হইয়াছিল। এই কারণে তাঁহার নাম হইয়াছিল ঋষ্যশৃঙ্গ। আরও একটু অলৌকিক বৃত্তান্ত আছে; ঋষ্যশৃঙ্গ মৃগীর গর্ভজাত, সেই হেতু হরিণের ন্যায় তাঁহার শৃঙ্গ উঠিয়াছিল।

যাহা হউক, এখানে একটু কথা আছে, ঋষ্যশৃঙ্গ পদটি সাধিত হইয়াছে,—ঋষি + অশৃঙ্গ = ঋষ্যশৃঙ্গ। যে ঋষি অশৃঙ্গ, সেই ঋষ্যশৃঙ্গ। শৃঙ্গ অর্থে কামোদ্রেক। "শৃঙ্গং হি মন্মথোদ্ভেদস্তদা গমন হেতুক। উত্তম প্রকৃতি প্রায়োরসঃ শৃঙ্গার উচ্যতে"। (অমর) যে ঋষির কামের সহিত পরিচয় নাই, সেই হইল ঋষ্যশৃঙ্গ। উপরে যে ছোবড়া অথবা গল্প বলা হইয়াছে, তাহাতে এই ভাবের ইঙ্গিত যথেষ্ট আছে। তাঁহার পিতার নাম বিভাণ্ডক, শেষের "ক" অক্ষরের বিশেষ কোন অর্থ নাই, উহা স্বার্থে 'ক' প্রত্যয়, যেমন বলে, বালক। বিভাণ্ড কথার অর্থ স্পষ্ট। বিভা + অণ্ড = বিভাণ্ড। শ্রুতি স্মৃতি-পুরাণ প্রভৃতিতে পরমাত্মার রূপ জ্যোতির্ম্ময় অণ্ডরূপে কল্পিত হইয়াছে। ইন্দ্রিয় দমন ও পরব্রহ্মের পিতা-পুত্র সম্বন্ধে অর্থাৎ প্রসূত প্রসবিতা সম্বন্ধে দার্শনিক কবির কল্পনা মাত্র।

ঋষ্যশৃঙ্গ উপাখ্যানে, শৃঙ্গ অর্থে কামরিপু বুঝাইল। উপাখ্যানান্তরে যখন বৃদ্ধা কুমারী বিবাহ করিতে স্বীকৃতা হইল, তখন তাহাকে যে বিবাহ করে, কবি তাঁহার নাম দিয়াছেন, 'শৃঙ্গবান'।

অন্য এক স্থলে আর এক শৃঙ্গীকে দেখিতে পাই। মুনিকুমার শৃঙ্গী পিতার অবমাননায়, রাজা পরীক্ষিতকে শাপ দেন যে, সপ্তাহমধ্যে তক্ষক দংশনে তাঁহার মৃত্যু হইবে। এ স্থলে ক্রোধ হইল, ক্রোধ রিপু, কবি এই রিপু সম্বন্ধে আরও অনেক কথা বলিয়াছেন। এই শৃঙ্গীর পিতার নাম দিয়াছেন, শমী—অর্থাৎ যিনি ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করেন। বিদ্যা থাকিলেও ক্রোধ জয় হয় না।

ঋষেস্তস্য তু পুত্ত্রোঽভূত গবিজাতা মহাযশাঃ।
শৃঙ্গীনাম মহাতেজা স্তিগ্মবীর্য্যোঽতি কোপিনঃ॥
২-৫০ অঃ আদি।

গবিজাত :—গো গর্ভজাতঃ অর্থাৎ অধীত বিদ্যা। ঋষ্যশৃঙ্গ মৃগগর্ভজাত তাহারও ঐ অর্থ; উভয় কথা একই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। শৃঙ্গী প্রায়ই ব্রহ্মার নিকট গমন করিতেন।

ব্রহ্মাণং উপতস্থে বৈ কালে কালে সুসংযতঃ॥
২৬-৪০ অঃ আদি।

কবি দেখাইয়াছেন যে, বংশগৌরবে অথবা শাস্ত্র কিংবা বেদপাঠে ইন্দ্রিয় জয় হয় না।

"বর্দ্ধতে চ প্রভবতাং কোপঃ অতীব মহাত্মনাং।"
৫-৪১ অঃ আদি।

মহাত্মাগণের প্রভাববৃদ্ধির সহিত কোপও সাতিশয় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে।

রিপুজয়ের নিমিত্ত সাধনা অথবা তপস্যা প্রয়োজন। ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিকে মগধে আনিবার প্রয়োজন হইল, মগধ অবৈদিক বৌদ্ধ মতের কেন্দ্রস্থল। যে স্থলে যজ্ঞ হয় না, অথবা বেদের সম্মান হয় না, সেই স্থানে অনাবৃষ্টি এবং প্রজাক্ষয় হয়।

ন ব্রহ্মচারী চরণাদপেতো যথা ব্রহ্ম ব্রহ্মণী ত্রাণমিচ্ছেৎ।
আশ্চর্য্যতো বর্ষতি তত্র দেবস্তত্রাভীক্ষ্ণং দুঃসহাশ্চাবিশন্তি॥
১৫-৭৩ শান্তি।

নক্ষত্রিয়ং ব্রহ্ম ব্রাহ্মণজাতির্ব্রহ্মচারীচরণাৎ অধীত শাখাতঃ অপেতঃ দস্যুভির্ব্বারিতঃ সন্ ব্রহ্মাণী বেদেঽধ্যেতব্যে ত্রাণং রক্ষণমিচ্ছেৎ রক্ষিতুরভাবত্তদা দেবস্তত্র আশ্চর্য্যতো বর্ষতি তত্র বর্ষং অত্যন্তং দুর্লভমিত্যর্থঃ। দুঃসহা মারীদুর্ভিক্ষাদয়ঃ। অব্রহ্মচারী নাশ্চর্য্যত ইতি চ পাঠে ব্রহ্মচরণাদ পেতত্বাদ ব্রহ্মচারী বেদাধ্যয়ন শূন্যঃ সন্ত্রাণমিচ্ছেত্তর্হি তত্রাশ্চর্য্যতোঽপিন বর্ষতীতি যোজ্যম্। ১৫ টীঃ

যখন ব্রহ্মচারিগণ দস্যু কর্ত্তৃক নিবারিত হইয়া স্বীয় অধীত শাখা পরিত্যাগ করেন এবং ব্রাহ্মণগণ স্বীয় অধ্যেতব্য বেদের আশ্রয় পরিত্যাগ করেন, তৎকালে দেবরাজ অল্প বারি-বর্ষণ করেন এবং তথায় নিয়ত বহুবিধ উৎপাত সকল উপস্থিত হইয়া থাকে।

এই কারণে অভিনয় স্থান হইল মগধ দেশ, মগধ দেশের রাজা লোমপাদ অঙ্গ দেশের অধিপতি ছিলেন; তিনি ব্রাহ্মণদিগের প্রতি মিথ্যা ব্যবহার করিয়াছিলেন।

মহাভারতে অনেক স্থলে অনাবৃষ্টির কথা আছে। প্রায় সকল স্থানেই এই ভাবের ইঙ্গিত পাওয়া যায় "অনাবৃষ্টির দ্বারা ঋষিদিগের মৃত্যু হয়।"

বয়ং ঋষয় ত্বত্তঃ (সরস্বত্যাঃ) অধীমহি বেদান্।
কদাচিৎ অনাবৃষ্ট্যামৃত্যেষ্ ঋষিষু সম্প্রদায়োচ্ছেদে সতি
ইতি ভাবঃ॥
৩১-৪২ অঃ শল্য টীঃ।

শ্রুতিতে আছে, "প্রাণেভ্যো দেবা দেবেভ্যোঃ লোকাঃ॥

লোমপাদ রাজা ব্রাহ্মণদিগের সহিত অসদ্ব্যবহার করিলে, ব্রাহ্মণরা তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন। যদৃচ্ছাক্রমে নৃপতি কর্ত্তৃক তাঁহার পুরোহিতের প্রতি অহিতাচরণ হওয়াতে জগৎপতি ইন্দ্র তাঁহার রাজ্যে বারি-বর্ষণ করিলেন না। তাহাতে সমস্ত প্রজা পীড়িত হইতে লাগিল। ৪২-৪৩-১১০ অঃ, বনপর্ব্ব।

আমরা এই স্থানে মগধ, অঙ্গ দেশ, ব্রাহ্মণের প্রতি দুর্ব্যবহার, যজ্ঞলোপ, অনাবৃষ্টি, প্রজাক্ষয় এই সকল কথা লইয়া একটি শৃঙ্খলা দেখিতে পাই।

এই ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিকে রাজা দশরথ পুত্রের নিমিত্ত যজ্ঞ করিতে অযোধ্যায় লইয়া যান ও তাঁহারই যজ্ঞপ্রভাবে রামের জন্ম হয়। কোশল দেশকথার সম্বন্ধে একটু রহস্য আছে। মহাভারতে পরে দেখা যাইবে যে, হিমালয়, কাশী, গঙ্গা প্রভৃতি কথা একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। অযোধ্যা কখন গঙ্গাতীরে অবস্থিত, কখন গোমতীতীরে, কখন সরযূতীরে; হস্তিনাপুর কখন ভাগীরথীর নিকট, কখন বা পঞ্চনদের অন্তর্গত; বিদেহ কখন বা মগধে, কখন বা হিমালয়ে; সেইরূপ কোশল দেশ বঙ্গ হইতে দাক্ষিণাত্যে যাইবার পথে পড়ে; "দক্ষিণে কোশলাধিপতি বেম্বাতটের অধীশ্বর কান্তারবর্গ ও পূর্ব্ব কোশলস্থ নরপতিগণকে সহদেব সমরে পরাভূত করিলেন"। আর এক কোশল দেশ, বর্ত্তমান যুক্তপ্রদেশের অন্তর্গত বলিয়া মনে হয়। অযোধ্যাকে উত্তর কোশল বলিত; কখনও কেবল কোশল বলিত।

"ততোঃ বিগনয়ণ্ রাজা মনসা কোশলাধিপঃ।
২৫-৭৩ অঃ, বনপর্ব্ব।

এ স্থলে রাজা হইল অযোধ্যার রাজা ঋতুপর্ণ।

এই কোশল-কথা নানাভাবে লিখিত হয়। কোসল, কোশল, কোষল; বলা বাহুল্য, প্রতি কথাই নিগূঢ় অর্থের নিমিত্ত ভিন্ন ভিন্ন ভাবে লিখিত হয়। "যে দেশে যে বস্তুর দ্বারা উপলক্ষিত, সেই বস্তুর নামে সেই দেশের নামকরণ হয়"। আমার বোধ হয় কোশল-কথার সহিত কাশী-কথার সম্বন্ধ আছে। কুশ ও কাশ শব্দ হইতে কোশল ও কাশী এই দুইটি কথা নিষ্পন্ন হয়। কোশল=কুশ+অণ ঘে ল; কাশী=কাশ+অন ঘে ঈপ্। কাশ অর্থে তৃণ, দর্ভপত্র। কুশ অর্থেও ঐ প্রকার বুঝায়। কুশ ও কাশ উভয়ের সহিত যজ্ঞের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক; কাশীর নামান্তর তপস্থলি, দ্বারকার নাম কুশস্থলি; রামচন্দ্রের পুত্র কুশ, তাঁহার স্থাপিত নগরের নাম কুশধ্বজ। বিচিত্রবীর্য্যঃ খলু কৌশল্যাত্মজ অম্বিকাম্বালিকা কাশিরাজ দুহিতরাবুপযেমে। ৫১-৯৫ অঃ, আদিপর্ব্ব।

এ স্থলে কাশিরাজের স্ত্রী হইলেন কৌশল্যা। কুশ, যজ্ঞ, কাশী এ সকল কথার তলে একই ভাব আছে; কুশ ও কাশ দ্বারা উপলক্ষিত স্থানের নাম হইল কোশল এবং কাশী; আর এক পক্ষে কুশ এবং কাশ যজ্ঞের চিহ্ন। যজ্ঞ লইয়াই বৈদিক ও বৌদ্ধ মতের প্রধানতঃ বিরোধ হয়। কাশী হইল যজ্ঞপন্থার প্রধান আশ্রয়স্থান, আর এক পক্ষে কাশী হইল যজ্ঞের নিদর্শন; সেই কারণে মহাভারতে ভিন্ন ভিন্ন রূপে কাশীর উল্লেখ প্রায়ই দেখিতে পাইব। কাশিরাজের দুহিতাদিগকে ভীষ্ম হরণ করেন; তাহাই তাঁহার মৃত্যুর মূল কারণ হয়। জন্মেজয় কাশিপতি সুবর্ণবর্ম্মার কন্যা বপুষ্টমাকে বিবাহ করেন।

'সুবর্ণবর্ম্মানমুপেত্য কাশিপং বপুষ্টমার্থং বরয়াম্প্রচক্রমুঃ।
৮-৪৪ অঃ, আদিপর্ব্ব।

এ স্থলে রহস্যটি স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে,

যজ্ঞার্থ ইজ্ ধাতু হইতে জন্মেজয় কথার উৎপত্তি, আর স্তোম অর্থে যজ্ঞ; স্থানান্তরে দেখিতে পাই, জনকরাজ-পত্নী হইলেন কোশল-রাজনন্দিনী। তাহা হইলে যজ্ঞপন্থা (দশরথ) কুশ উপলক্ষিত যজ্ঞের (কোশল) সহিত মিলিত হইবে, তাহা সহজে বোঝা যায়। এই কাশীতে আসিয়া (সারনাথ) বুদ্ধদেব ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন করেন।

সেই কোশলরাজ অথবা যজ্ঞাভিমানী কাশীরাজ-দুহিতার গর্ভে রামচন্দ্রের জন্ম হয়। ইহার দুই প্রকার অর্থ হইতে পারে। বেদে পরলোক সম্বন্ধে নানাপ্রকার উপায় কথিত আছে; অথবা যজ্ঞ (কর্ম্মকাণ্ড) স্বর্গ কিংবা মোক্ষের উপায় বলিয়া কথিত আছে; এই দুই অর্থের মধ্যে যে অর্থেই সমীচীন বোধ হউক না কেন, উভয় সম্বন্ধেই এক কথা খাটে। ইন্দ্রিয় নিগ্রহ হইল শুদ্ধ ব্রহ্ম উদয়ের একমাত্র উপায়।

এই ভাব মহাভারতের অসংখ্য স্থলে লিখিত আছে। আমাদের ধর্ম্মের ইহা হইল মূল ভিত্তি।

অঙ্গ সঞ্জয় মে মাংস পন্থানমকুতোভয়ম্।
যেন গত্বা হৃষীকেশং প্রাপ্নুয়াং সিদ্ধিমুত্তমাম্ ॥ ১৬।
না কৃতাত্মা কৃতাত্মানং জাতু বিত্থার্জ্জনার্দ্দনম্।
আত্মনস্ত ক্রিয়াপায়ো নান্যত্রেন্দ্রিয় নিগ্রহাৎ ॥

১৭-৬৯ অঃ উদ্।

তাত সঞ্জয়! যাহাতে কিছুমাত্র ভয়ের সম্ভাবনা নাই, যদ্দারা কেশবের সন্নিহিত হইয়া আমি উত্তমাসিদ্ধি প্রাপ্ত হইতে পারি, সেই পথ আমাকে বল। সঞ্জয় কহিলেন, অকৃতাত্মা পুরুষ কখন কৃতাত্মা জনার্দ্দনকে জানিতে পারে না, আত্মক্রিয়ার উপায় ও ইন্দ্রিয়নিগ্রহ ভিন্ন আর কিছুই নাই।

উপাখ্যানে পতিব্রতা স্ত্রীলোক ব্রাহ্মণকে শিক্ষা প্রদান করিতেছেন,—

ইন্দ্রিয়ানাং নিগ্রহঞ্চ শাশ্বতং দ্বিজসত্তম।
সত্যার্জ্জবে ধর্ম্মমাহুঃ পরম্ ধর্ম্ম বিদোজনাঃ ॥

৪০-২০৫ অঃ, বনপর্ব্ব।

হে দ্বিজসত্তম! দম, সারল্য ও ইন্দ্রিয়নিগ্রহ এই কয়টি ব্রাহ্মণের শাশ্বত ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

দুজ্জ্ঞেয়ঃ শাশ্বতো ধর্ম্মঃ স চ সত্যে প্রতিষ্ঠিতঃ।
শ্রুতিপ্রমাণো ধর্ম্মঃ স্যাদিতি বৃদ্ধানুশাসনং ॥

৪১-২০৫ অঃ বনপর্ব্ব।

শাশ্বত ধর্ম্মটি দুজ্জ্ঞেয়—তাহা সত্যেতেই প্রতিষ্ঠিত আছে। পণ্ডিতদিগের অনুশাসন এই যে, শ্রুতিই ধর্ম্মের পরিমাপক, সেই শ্রুতিতে ধর্ম্ম বহুপ্রকার দৃষ্ট হইয়া থাকে; সুতরাং তাহা অতিশয় সূক্ষ্ম। সাবিত্রী যমকে বলিয়াছিলেন, সকল আশ্রমেই ইন্দ্রিয় জয়, ইহা ধর্ম্মের মূল।

নানাত্মবন্তস্ত বনে চরন্তি ধর্ম্মং চ বাসং চ পরিশ্রমং চ।
বিজ্ঞানতো ধর্ম্মমুদাহরন্তি তস্মাৎ সন্তো ধর্ম্মমাহুঃ প্রধানম্ ॥

২৪-২৯৩ বনপর্ব্ব।

অজিতেন্দ্রিয় লোকরা বনে থাকিয়া গার্হস্থ্যবিহিত যজ্ঞাদি ধর্ম্মেরও অনুষ্ঠান করে না, চিরব্রহ্মচর্য্যও অবলম্বন করে না এবং সন্ন্যাসও আশ্রয় করে না। জিতেন্দ্রিয় পুরুষরা উক্ত আশ্রমধর্ম্ম সকলের আচরণ করিয়া থাকেন। ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে বলিতেছেন,—

ধর্ম্মস্য বিধয়ো নৈ কে যে বৈ প্রোক্তা মহর্ষিভিঃ।
স্বং স্বং বিজ্ঞানমাশ্রিত্য দমস্তেষাং পরায়নম্ ॥

৩-১৬০ অঃ, শান্তিপর্ব্ব।

ভীষ্ম বলিলেন, মহর্ষিগণ ধর্ম্মের যে যে অনুষ্ঠান বলিয়াছেন, তাহা নানাবিধ; নিজ নিজ বিজ্ঞান অবলম্বনপূর্ব্বক ইন্দ্রিয়নিগ্রহই তাহাদিগের মধ্যে পরম শ্রেষ্ঠ।

সেমেটিক ধর্ম্মের সহিত হিন্দুধর্ম্মের ইন্দ্রিয়জয় সম্বন্ধে কিছু সাদৃশ্য আছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। একটু অগ্রসর হইলে ভাবের পার্থক্য যথেষ্ট দেখা যাইবে। মানবের পতন বলিয়া কোন কল্পনা হিন্দুধর্ম্মে নাই। সেমেটিক ধর্ম্মে মানবের পতন হইল প্রথম সূত্র। হিন্দুধর্ম্মের ক্রমমুক্তি এবং সদ্যমুক্তি এই দুইটি হইল মূল ভিত্তি। এই কথা পরে আলোচিত হইবে।

ঋষ্যশৃঙ্গ সম্বন্ধে আর একটি কথা বাকি আছে,—......যথাকালে ঋষ্যশৃঙ্গের বিবাহ হইল, তাঁহার স্ত্রীর নাম ছিল শান্তা। শান্তা অর্থে উপরতি, রিপুদমন করিতে না পারিলে শান্তির সহিত মিলন হয় না।

সীতার সহিত রামের বিবাহ হয়। এই সীতা কল্পনাটি কি? প্রথমে কথিত হইয়াছে যে, রামায়ণ মহাভারত

প্রভৃতি গ্রন্থের গঠন নারিকেল ফলের অনুকরণে তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়। প্রথমে 'খোল' বা আশ্রয়ের অংশ, দ্বিতীয় গল্প বা 'ছোবড়া' অংশ, তৃতীয় সার বা 'শস্য' অংশ। এ কথা সমস্ত গ্রন্থ সম্বন্ধে খাটে; কেবল তাহা নহে, গ্রন্থের সকল অংশেই এই ভাবের তিন প্রকার বিভাগ দেখিতে পাওয়া যায়।

'সীতা লাঙ্গল পদ্ধতিঃ' অঃ কোঃ।

গল্প হইতেছে যে, জনক রাজা ভূমিতে লাঙ্গল দিবার সময় সীতাকে প্রাপ্ত হয়েন। চাষ করিলে ভূমিতে যে একটি রেখা পতিত হয়, তাহাকে সীতা বলে।

'সীবেণ খন্যতে' কিন্তু সাধারণ ব্যাকরণের নিয়মানুসারে এইভাবে কথাটি সাধিত হয় না। সেই কারণে সীতা কথাটি—

"পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ"

সীতা লাঙ্গল রেখাস্যাৎ ব্যোম গঙ্গা চ জানকী।
সীতা নভঃ সরিতি লাঙ্গলপদ্ধতৌ চ
শীতো দশাননরিপোঃ সহধর্ম্মিণী চ॥
শীতং স্মৃতং হিমগুণে চ তদন্বিতে চ
শীতোহলসে চ বহবার তরৌ চ দৃষ্টিঃ ইতি তালব্যাদৌ
ধরণিঃ। অঃ টীঃ।

এই 'ব্যোমগঙ্গা নভঃ সরিৎ'—আকাশব্যাপী বিস্তৃত ছায়াপথ হইল,—"সীতা কল্পনার খোল" বা ভৌতিক আশ্রয়।

"ভাগীরথীং সুতীর্থাঞ্চ সীতায় (শীতায়) বিমলপঙ্কজাম্।
৪৯-১৪৫ অঃ, বনপর্ব্ব।

সিতা অর্থে শুক্লা অর্থাৎ নিষ্পাপা। তাহা হইলে কথাটির তিনটি রূপ সিতা, সীতা, শীতা। এই তিনটি কথারই পৃথক্ পৃথক্ অর্থ আছে। সেই তিনটি ভাব একত্র করিয়া, কবি ব্যাকরণের সাধারণ নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিয়া সীতা কথাটি গঠিত করিয়াছেন। পাপলেশসংস্পর্শবিরহিতা অমলধবলা, কোটি নক্ষত্রপ্রভা, শুদ্ধব্রহ্মের সহচরী হইলেন—রামের সীতা।

সীতা জনকরাজ-দুহিতা। ভূমি হইতে উত্থিতা, পৃথিবীর কন্যা। জনক ও জন উভয়েই এক কথা। স্বার্থে 'ক' প্রত্যয় করিয়া "জনক" কথা নিষ্পন্ন হইয়াছে। স্থানান্তরে জনককে জনরাজ বলিয়া উল্লেখ আছে। এ জন কে?

আখ্যান পঞ্চমৈর্বেদৈ র্ভূয়িষ্ঠং কথ্যতে জনঃ
৪১-৪৩ অঃ, উদ্‌পর্ব্ব।

ইতিহাসাদি আখ্যানে ও ঋগাদি চতুর্ব্বেদে ভূমানন্দ পরমাত্মাকে জন, অর্থাৎ স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগৎ বলিয়া উল্লেখ করেন। স্থানান্তরে দেখিতে পাই, জনকের সম্বোধন 'নারায়ণ'।

রামচন্দ্র সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত বনে গমন করেন, অর্থাৎ বৈদিক সত্য স্থাপন তৎকালে প্রয়োজন হয়। সীতাকে রাবণ হরণ করিল, সীতাকে হরণ না করিলে যুদ্ধ বাধে না, রামচন্দ্র বানরগণের সাহায্যে রাবণকে সবংশে হত করিলেন। এ রাবণ কে?

রাবণের পরিচয় দিতে হইলে তাহার বংশের কিছু পরিচয় দিতে হয়। কশ্যপের দিতি নামে এক স্ত্রী ছিলেন, দিতির গর্ভে সপ্তর্ষির অন্যতম পুলস্ত ঋষির জন্ম হয়। পুলস্তের বিশ্রবা নামে এক পুত্র জন্মে, বিশ্রবার বৈশ্রবন বলিয়া এক কুরূপ পুত্র হয়; ঐ পুত্রের নাম হইল কুবের। বিশ্রবনের কুবের ব্যতীত রাবণ, কুম্ভবর্ণ, বিভীষণ নামে আর তিনটি পুত্র জন্মে। মহাভারত ও অপরাপর পুরাণে রাবণের জন্ম ও তাহার ভ্রাতাদিগের সংখ্যা ও জন্ম সম্বন্ধে নানাপ্রকার বর্ণনা আছে, কিন্তু তাহাতে আখ্যায়িকাটির মূল রহস্য সম্বন্ধে বিশেষ প্রভেদ হয় না।

এই সকল কথার অর্থ বুঝিতে আর একটু অগ্রসর হইতে হয়। 'দ্বে সুপর্ণে' এই কথা দুইটি সকলের পরিচিত। সুপর্ণ অর্থে শোভন পক্ষযুক্ত অর্থাৎ সুরূপ। উপমন্যু যখন অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে স্তব করিতেছেন, তখন তিনি তাহাদিগকে সম্বোধন করিলেন, হে সুনাসিকদ্বয়! অর্থাৎ শোভন নাসিক। এইভাবে সুপর্ব্ব এবং সুবর্ণ কথারও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এ সু কথার বিপরীত অর্থ কু। বিশ্রবা অথবা বিশ্রবন কথাটির অর্থ বিপরীত, অথবা বিগর্হিত শ্রবণ অর্থাৎ শ্রুতি। বিশ্রবণের পুত্র কুবেরের রূপ পুরাণে এইরূপ বর্ণিত আছে,—

কুৎসায়াস্তু কুশব্দোহয়ং শরীরঞ্চেদ মুচ্যতে।
কুশরীরস্বাচ্চ নাম্না তেন বৈ স কুবেরকঃ॥

অর্থাৎ কুবের হইলেন কু শব্দ এবং কু শরীর। কুবের কথার তলে একটু রহস্য আছে। বের অর্থে বিরোধ। বৈর প্রিয়ং পুরুষং—বের পুরুষম্। কুবের নৈঋতগণকে রক্ষা করেন, নৈঋতি অর্থে পাপ।

পুরাণে রাবণের রূপ এইরূপ বর্ণিত আছে,—

শঙ্কুকর্ণো দশগ্রীবঃ পিঙ্গলো রক্তমূর্দ্ধজঃ।
চতুষ্পাদ্বিংশতি ভূজো মহাকায়ো মহাবলঃ॥
জাত্যঞ্জন-নিভোমর্দ্দ লোহিত গ্রীব এব চ।

এই বিচিত্র বর্ণনার ভিতর যথেষ্ট অর্থ আছে। রু+ণিচ্+অন, ঘে=রাবণ, অর্থাৎ শব্দকারী। এই রাবণ হইল দশানন, "আননং লপনং" যাহা হইতে প্রলাপ কল্পনা কথা প্রভৃতি উৎপত্তি হইয়াছে। তাহা হইলে দশানন, রাবণ অর্থে হইল সহস্র প্রকার (নানাপ্রকার) প্রলাপ কথা, তাহারই অভিমানি দেবতা বা পুরুষ। "রাবণ চতুর্যুগানাং রাজা" অর্থাৎ সত্যের শত্রু চিরকালই আছে। তিনি পূর্ব্বজন্মে হিরণ্যকশিপু দৈত্য ছিলেন, হিরণ্যকশিপু হইলেন দৈত্যগণের আদিপুরুষ। সীতার উদ্ধারের অর্থ সম্বন্ধে কবি বিলক্ষণ ইঙ্গিত দিয়াছেন,—রামচন্দ্র... নষ্ট বেদ ও শ্রুতি উদ্ধারের ন্যায় ভার্য্যাকে উদ্ধার করিলেন।

রাজ্যে ত্বভিষিচ্য লঙ্কায়াং রাক্ষসেন্দ্র বিভীষণ।
ধাৰ্ম্মিকং ভক্তিমন্তঞ্চ ভক্তানুগতবৎসলং॥
ততঃ প্রত্যাহৃতা ভার্য্যা নষ্টাবেদ-শ্রুতির্যথা।

১২-১৪৮ অঃ, বনপৰ্ব্ব।

স্থূলস্ফিক্ বিকৃতো রাজস্বযূথপরিবারিত।
শঙ্কুকর্ণোসহ্য বক্তো মলিনো ঘোরদর্শনঃ॥

১১৬-১১৭ শান্তিপৰ্ব্ব।

চণ্ডালদের রূপবর্ণনায় শঙ্কুকর্ণ লিখিত হইত। চণ্ডাল কাহাকে বলিব, পরে দেখিব।

রাবণের ভ্রাতা হইলেন কুম্ভকর্ণ, বড় ভাই হইলেন শঙ্কুকর্ণ, এ ভাই হইলেন কুম্ভকর্ণ। 'ছোবড়া' অর্থ সহজেই বুঝা যায়। কুম্ভ অর্থাৎ কলসীর ন্যায় কর্ণ যাহার। এখন রহস্যটা দেখা যাক্, কর্ণ হইল শ্রুতি, বাপের নাম ছিল শ্রবণ; কুম্ভ অর্থে কৌশিক। কৌশিকের সহিত অনেক স্থলে ভিন্ন ভিন্ন রূপে দেখা হইবে। বিশ্বামিত্রের অপর নাম কৌশিক, এই বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের আশ্রম হইতে সুরভী নাম্নী ধেনু অপহরণ করিতে যান; পরে দেখা যাইবে, সুরভী হইল বেদমাতা "সর্ব্বকাম দুঘা"; তাহা হইলে কুম্ভকর্ণ হইল অবৈদিক শ্রুতি; স্মরণ রাখিতে হইবে কুশী নগর ও কুশী নদী বুদ্ধের জীবনে উভয়ই প্রসিদ্ধ। রব বিরোধ প্রভৃতি কথার তাৎপর্য্য আর একটি শব্দবাচী শব্দ হইতে পরিস্ফুট হইবে।

অকুজনেন বা মোক্ষং নাম্নু কুজেৎ কথঞ্চন।

৬০—৬৯ অঃ কর্ণপর্ব্ব।

যাহারা তর্ক দ্বারা হরণেচ্ছু হইয়া কদাচিৎ ধর্ম্ম ইচ্ছা করে, যদি কোন কথা না বলিয়া তাহাদের নিকট হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়, তবে কোনক্রমে বাক্যালাপ করিবে না।

অকুজনেন বেদ শব্দ রাহিত্যেন তদ্বিরুদ্ধং ধর্ম্মং মোক্ষং বা বেদ বাহ্যমিচ্ছন্তিতান্ প্রতি নাম্নু কুজেৎ তৈঃ সহঃ সংবাদমপি ন কুর্য্যাদ সম্ভাষ্যাস্তে তেন বেদা বিরোধ শতি যদন্যসা সুখকরং তদ্ধর্থ ইত্যর্থঃ। ৬০টি

কুৎসিৎ রূপ কুবের, কৌশিক শ্রুতি কুম্ভকর্ণ, বিবিধ অথবা বিগর্হিত শ্রুতি বিশ্রবন, ইহাদের সম্বন্ধে কবি একটি সুন্দর ইঙ্গিত দিয়াছেন। বনপর্ব্বে ভীম যুধিষ্ঠিরকে বলিতেছেন—

শ্রোত্রিয়স্যেব তে রাজন্মন্দ কস্যাবিপশ্চিতঃ।
অনুবাক হতা বুদ্ধির্নৈষা তত্বার্থ দর্শিনী॥

১৯—৩৫ অঃ বনপৰ্ব্ব।

যেরূপ অবিদ্বান কুৎসিৎ শ্রোত্রিয়ের বুদ্ধি শ্রুতিবিশেষ দ্বারা নিহত হওয়াতে তত্বার্থ দর্শন করিতে পারে না, সেইরূপ আপনার এই বুদ্ধি তত্বার্থদর্শিনী নহে। বিবাদ কথার এক অর্থ বিবিধ বেদবাদ।

বিভীষণ কে হইল? বিভীষণের 'উপকথা' অর্থ হইতেছে নির্ভয়, তাহার আচরণ নির্ভয়ের ন্যায় ছিল। তিনি প্রবল পরাক্রমশালী জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাবণের তপশ্চরণের নিমিত্ত সকল সময় তিরস্কার ও ভৎসনা করিতেন, পরে তাহার কোপ উপেক্ষা করিয়া রামের সহিত মিলিত হন। এখন রহস্যটা বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক।

ভীষ+ভিষ=বিভীষ, ভিষ ও ভিষক একই কথা। এ দুইটি ভীষক কে? একটু চিন্তা করিলেই বুঝা যাইবে যে, ইহারা স্বর্গবৈদ্য অশ্বিনীকুমারদ্বয়। এই অশ্বিনী কুমারদ্বয় সম্বন্ধে প্রগাঢ় রহস্য আছে, এ রহস্যের 'খোল' হইল

দুইটি পরিচিত তারকা। ইহার সম্বন্ধে 'ছোবড়া' অথবা আখ্যায়িকা যথেষ্ট আছে, একটি আখ্যায়িকা হইতে এ রহস্যের কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এক সময় ইন্দ্রপ্রমুখ দেবতাগণ বলিলেন যে, অশ্বিনীকুমারদ্বয় স্বর্গের বৈদ্যমাত্র, উঁহারা যজ্ঞভাগ গ্রহণের উপযুক্ত নহেন, এই লইয়া মত-বিরোধ হয়; পরিশেষে চ্যবন ঋষির চেষ্টায় অশ্বিনীকুমার-দ্বয়ের দেবত্ব প্রতিপন্ন হইল। আর একটু রহস্য আছে, অশ্বিনীকুমারদ্বয় গুহ্যকগণমধ্যে পরিগণিত অর্থাৎ প্রথমে ইহারা অদেব ছিলেন, পরে দেব হইলেন। স্বর্গেও বর্ণভেদ আছে; শাস্ত্রানুসারে অশ্বিনীকুমারদ্বয় হইলেন শূদ্রবর্ণ। অথচ উতঙ্ক যখন অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে স্তব করিতেছেন, তখন তাঁহাদিগকে পরমাত্মারূপে বর্ণন করিতেছেন। এই আখ্যায়িকাটি চিন্তা করিলে বিভীষণ সম্বন্ধে একটু ইঙ্গিত পাওয়া যায়। অশ্বিনীকুমারদ্বয় প্রথমে দেব ছিলেন না, পরে দেব হইলেন, বিভীষণও তদ্রূপ। প্রথমে তিনি রাক্ষসকুলে জন্ম গ্রহণ করেন; পরে তিনি নিজগুণে রামের সহিত মিলিত হন। অর্থাৎ ভগবৎ-সামীপ্য লাভ করেন।

রামচন্দ্র সুগ্রীব প্রমুখ বানরগণের সাহায্যে রাবণ কুম্ভকর্ণ প্রভৃতিকে বধ করেন। বানরের নামান্তর কপি, কপি অর্থে ধর্ম্ম, এ কারণে অর্জ্জুনের রথ কপিধ্বজ। কপি-গণের রাজা হইলেন সুগ্রীব; রাবণ ছিল দশগ্রীব, রামচন্দ্র ঋষ্যমুখ পর্ব্বতের সানুদেশে বাস করিতেন। ঋষ্যমুখ হইল ঋষি অমুখ অর্থাৎ অপ্রলাপ। রামচন্দ্র কুম্ভকর্ণ ও রাবণকে ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা অর্থাৎ বেদরূপ অস্ত্রধারণে বিনাশ করেন।

তাহা হইলে কথা কি হইল? নানা প্রকার বেদাশ্রিত অথচ কুযুক্তিপূর্ণ বেদ-বিরোধি প্রলাপ সদৃশ মত ছিল। শুদ্ধ চৈতন্য অথবা পরমাত্মার প্রভাবে বেদ প্রামাণ্যে সেই মতগুলি খণ্ডিত হইল। আর একটি মাত্র কথা বাকি রহিল, রামের সহচরী হইলেন নির্ম্মলা চেতনা স্বরূপা সীতা, আর রাবণের স্ত্রী হইলেন মন্দোদরী। 'ছোবড়া' হিসাবে মন্দোদরী অর্থে ক্ষীণ কটি, প্রকৃত অর্থে মূঢ়তা-প্রসবিত্রী। রামায়ণ যে রহস্যপূর্ণ, মহাভারত লেখক এক স্থানে তাহার সুন্দর ইঙ্গিত দিতেছেন।

"বাল্মীকিবৎ তে নিভৃতং স্বাধ্যায়ং"

আস্তিক পরীক্ষিৎকে বলিলেন, আপনার বীর্য্য বাল্মীকির বীর্য্যের ন্যায় গুপ্ত।

রামের বংশধর হইলেন কুশী-লব। 'ছোবড়া' হিসাবে তৃণের অগ্রভাগ লইয়া কুশ নির্ম্মিত হইয়াছিল। কুশীলব আর এক অর্থে ব্যবহৃত হয়, যাহারা গান করিয়া বেড়ায়; অর্থাৎ হরিনাম, স্তুতিপাঠক বন্দী ও গায়কের দ্বারা বিস্তারিত হইল। তাহা হইলে রামায়ণ কথার কি অর্থ? এ সম্বন্ধে নানা মত হইতে পারে, এক অর্থ এই যে রাম = শুদ্ধ চৈতন্য + অয়ণ = লয় স্থান অর্থাৎ মোক্ষ কথা। এ স্থানে আমরা রামায়ণের নিকট বিদায় লইব। যাহাদের কথা উপরে বলিলাম, তাহাদের মধ্যে অনেকের সহিত শীঘ্র সাক্ষাৎ হইবে।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (কর্ণেল)।

স্মরণে

হ'য়েছিলি গৃহশোভা, নয়ন-মানস-লোভা,
স্বরগ সুষমা মাখা লাবণ্যের খনি।

সুধামাখা সম্বোধন, সাথে "মা বা" আলাপন,
চিরতরে অস্তমিত নয়নের মণি।

তোর ভালবাসা হায়, জীবনে কি ভুলা যায়,
প্রেমগুণে প্রাণ মোর তুই বেধেছিলি।

কি দোষ দেখিয়া আজ, জীবন প্রভাতে বাজ,
হানিয়া মাথার মাঝ, তুই ছেড়ে গেলি!

রোগে শীর্ণ তনুখানি, তবু কি মধুর বাণী,
তবু কি মমতা-মাখা মুখে মৃদু হাস।

অত শিশু তবু যেন, বহু বিজ্ঞ বৃদ্ধ হেন,
চাহনিতে হৃদয়ের ভাব সুপ্রকাশ।

না বলিয়া কোথা গেলি, সব সঙ্গী দূরে ফেলি,
কোন্ নন্দনের বনে করিতে বিহার?

উত্তর-অয়ন মাঘে, যোগী যথা সদা জাগে,
শুভ শুক্ল সপ্তমীতে নিশার নীহার;
সাথে ল'য়ে গেলি চলে আঁধারি আগার॥

শ্রীসতীশচন্দ্র শাস্ত্রী।

প্রতারক

১১

ঝড় উঠিয়াছে। প্রচণ্ড পাগ্‌লা বায়ুর সহিত সমুদ্র-বারির ভীষণ সংগ্রাম চলিয়াছে—সে সংগ্রামে উভয়েই আর্ত্তনাদ করিতেছে—পুরীর নিশীথ রাত্রির অন্ধ-তমিস্রা ভেদ করিয়া সে আর্ত্তনাদ পল্লীতে পল্লীতে ছড়াইয়া পড়িতেছে। এক একবার মনে হইতেছে, বুঝি বা ভীম প্রভঞ্জন প্রলয়-তাণ্ডবে সমগ্র সহরখানা দলিত মথিত করিয়া চলিয়া যাইতেছে।

এ ভীষণ রজনীতে ইভ একা পুরীর 'সি ভিলার' কক্ষ-দ্বার রুদ্ধ করিয়া বসিয়া আছে—তাহার স্বামী আজ ক্লাবে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গিয়াছে। অন্য সময় হইলে এতক্ষণ ইভ স্থির থাকিতে পারিত না, স্বামীর সন্ধানে নিশ্চিতই বাহির হইত। সে ইংরাজ-দুহিতা, ভয় কাহাকে বলে জানিত না। কিন্তু আজ তাহার মন কি এক দুশ্চিন্তায় আলোড়িত হইতেছিল। বহিঃপ্রকৃতির সহিত তাহার অন্তরের কি বিশেষ সম্বন্ধ ছিল?

বাহিরে প্রকৃতির বক্ষে যেমন ভীষণ ঝড় বহিতেছিল, ইভের অন্তরেও আজ তাহারও অপেক্ষা ভীষণতর ঝড় বহিতেছিল। সে একখানা পত্র মুষ্টিবদ্ধ করিয়া কক্ষালোকের দিকে পলকহীন দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া চেয়ারে বসিয়াছিল। তাহার শ্বাসক্রিয়া চলিতেছিল কি না বুঝিবার উপায় ছিল না। সহসা তাহাকে দেখিলে নিশ্চল মর্ম্মর-মূর্ত্তি বলিয়া অনুমিত হওয়া বিস্ময়ের বিষয় নহে।

সে কি ভাবিতেছিল? ভাবিতেছিল অনেক কথা—ভাবিতেছিল আকাশ-পাতাল। বায়ু থাকিয়া থাকিয়া হু হু শব্দে গর্জ্জিয়া উঠিতেছিল—কিন্তু সে দিকে ইভের আদৌ লক্ষ্য ছিল না। বহুক্ষণ এইভাবে থাকিবার পর সে একটি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিল, মনে হইল যেন নিঃশ্বাসের সঙ্গে তাহার প্রাণটাও বাহির হইয়া গেল! কিন্তু পরক্ষণেই সে যেন কথঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া পত্রপাঠে মনোনিবেশ করিল। উঃ, কি পত্র! পত্রখানি এই,—

দার্জ্জিলিং

সেক্রেটেরিয়েট মেস।

ভাই ইন্দু! তোমায় এখন ভাই বলে ডাকতে কেমন বাধ বাধ ঠেকে, এ জন্য অপরাধী বোধ হয় আমি নই। তুমি এক লাফে যে সাগরে ঝাঁপিয়ে পড়েছো, সেটা একটা প্রকাণ্ড অন্তরালের মত তোমার ও আমার মধ্যে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে—কোনও কালে তা দূর হবে বলে ত মনে হয় না।

শুনছি তুমি হনিমুনে বেরিয়েছো। বেশ করেছো। খুব সুখে ও মনের আনন্দে আছ, তাও বুঝতে পারছি। কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করব, ইচ্ছে হয় জবাব দিও, না হয় দিও না। তোমার একলার সুখ আর আনন্দের জন্যে দু-দু'টো বালিকার সর্ব্বনাশ করলে কেন? তুমি ভণ্ড হও আর নাই হও, তা ব'লে তুমি যে এমন নিষ্ঠুর হয়ে বেচারী নারী-জাতের প্রতি দয়ামায়াহীন আচরণ করতে পার, এতটা স্বার্থপর ব'লে তোমায় জানতুম না। ভাব দেখি, তুমি তোমার শ্বশুরের উপর রাগ ক'রে বেচারী প্রতিমার কি সর্ব্বনাশটাই করেছো? এটা কি পুরুষ-মানুষের উপযুক্ত কায হয়েছে? প্রতিমাকে ত তুমি এক দিন আগুন সাক্ষী রেখে স্ত্রী বলে নিয়েছ। তবে? সে কি অপরাধ করলে? সে হিঁদুর মেয়ে, জান তার ডাইভোর্স নেই—কাযেই তার জীবনটাকে কত বড় কসাইয়ের মত পায়ে করে দলেছ, মনে ভেবে দেখ দেখি! তোমরা এখান থেকে যাবার পূর্ব্বেই প্রতিমাদের সঙ্গে এক দিন দেখা

করতে গেছলুম। লক্ষ্মী মেয়ে—এত চাপা যে মনের কষ্ট ঘুণাক্ষরেও জানতে দেয় নি, কিন্তু না দিলে কি হবে, তার মুখে চোখে সে দিন কি দেখেছিলুম জান? যে লোক মরছে, তার মুখে চোখে যে ভাব ফুটে উঠে, তাই দেখেছিলুম। মুহূর্ত্তে দেখা দিয়েই সে সরে পড়েছিল। তার পর তার বাপ আমায় বলেছিলেন, যদি আইনে নরঘাতীর প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা থাকে, তা হ'লে তোমার প্রাণদণ্ড হয় না কেন? যে এক ঘায়ে মানুষ মারে, সে অধিক অপরাধ করে, না যে তিলে তিলে পলে পলে মানুষকে জীবনেও মেরে রাখে,—তার অপরাধ অধিক?

আর অভাগিনী ইভ! ইংরাজের মেয়ে ইভেরও তুমি কি সর্ব্বনাশ করেছ, একবার ভেবে দেখেছ কি? তাদের সমাজে এক সঙ্গে দুটো বিয়ে নেই—এক স্ত্রী জীবিত থাকতে অপর স্ত্রী গ্রহণ করলে দ্বিতীয় বারের স্ত্রী বিবাহিত বলেই গ্রাহ্য হয় না। আজ দু'দিন না হয় ভণ্ডামি ক'রে ইভের কাছে তোমার প্রথম বিয়ের কথা লুকিয়ে রাখবে—তার পর? যখন সে কথা প্রকাশ হবে,—সে দিনের কথা ভেবে রেখেছ কি? ছিঃ, ছিঃ, তোমার ভণ্ডামী অনেক জানতুম, কিন্তু তুমি যে এত বড় স্বার্থপর—নিজের সুখের জন্য দু' দু'টো জীবকে এমন ক'রে হত্যা করতে পার, তা জানতুম না। ইচ্ছে করে, তোমার এই কসাইগিরির কথা জগতের সুমুখে চেঁচিয়ে ব'লে মনটা খালাস করি। কিন্তু তাতেই বা লাভ কি? ইভকে সব কথা খুলে ব'লে তবে বিবাহ করেছ বলে মনে হয় না। ইচ্ছে করে, তাকেও জানিয়ে দিই। কিন্তু—তাতেও ফল নেই। যতটা দেখিছি শুনিছি, তাতে মনে হয় মেয়েটা যথার্থ প্রাণ দিয়ে তোমায় ভালবাসে। তার এই সুখের স্বপ্ন ভেঙ্গে দেওয়াও যা, আর তাকে খাঁড়ার ঘায়ে কেটে ফেলাও তা। আমি তা করতে পারব না। জান ত আমি কিরূপ ভীরু? গোরাটাকে যে দিন তুমি মেরে ইভকে রক্ষে করেছিলে, সে দিন আমি ঝড়ের আগেই ছুটে পালিয়েছিলুম। আমি বাড়ীতে কারো ফোড়া অস্তর দেখতে পারি নি।

যাক, যে জন্য চিঠিখানা লেখা, তা বলা হয় নি। রামপ্রাণবাবু কলকেতা যাবার আগে তোমায় জানাতে বলে গিয়েছিলেন যে, এর পর তিনি মুসলমান হয়ে মেয়ের আবার বিয়ে দেবেন। সুতরাং এখন থেকে তাঁদের সঙ্গে তোমার আর কোনও সম্বন্ধ থাকতে পারে না। এই বুঝে কায কোরো। ভবিষ্যতে যদি কোথাও কোন সূত্রে তাঁদের সঙ্গে তোমার দৈবাৎ দেখা হয়, তা হলে পরিচয়ের চেষ্টা কোরো না, করলে দরোয়ানের দ্বারা অপমান হবে। তবে বিয়ের সময়ে তিনি যে কলকেতার বাড়ী আর ১০ হাজার টাকা নগদ যৌতুক দিয়েছিলেন, তা আর ফিরিয়ে নেবেন না। ভিখিরীকে দান ক'রে ফিরিয়ে নেওয়া তিনি ন্যায্য মনে করেন না। তুমি যখন ইচ্ছা ঐ বাড়ীর দলীল ও ওয়ারবণ্ডের কাগজ চাইলেই পেতে পার। আমায় জানালেই হবে, তাঁদের বিরক্ত করবার প্রয়োজন নেই। তাঁরা আমায় তাঁদের ঠিকানা দিয়ে গেছেন।

তোমরা কার্সিয়ঙ্গে হনিমুন করছ জেনে পত্র দিলুম। কার্সিয়ঙ্গে এখনও আছ কি না, জানি না। না থাকলেও পত্র যথাস্থানে পৌছিবে। পত্র না পাও, আমি দায়ে খালাস। ইতি তোমার--না, তোমার না, এমনই

নিমাই।

একবার, দুইবার, বার বার পত্রখানা পাঠ করিয়াও যেন ইভের পাঠ সাঙ্গ হইতেছিল না—শেষবার সে ঠিক পড়িতেছিল কি না বুঝিতে পারিতেছিল না। পত্রের অক্ষরগুলা যেন পুতুলের আকার ধারণ করিয়া তাহার চক্ষুর সমক্ষে নাচিতেছিল। পড়িতে পড়িতে তাহার শরীরটা আগুন হইয়া উঠিল, মাথার ভিতর রি রি করিয়া উঠিল, প্রতিক্ষণেই তাহার মনে হইতেছিল, এইবার বুঝি তাহার চিন্তাশক্তি লুপ্ত হয়। সে তীরের মত দাঁড়াইয়া উঠিয়া পত্রখানা পদতলে দলিত করিল, ওষ্ঠে ওষ্ঠ দংশন করিয়া কক্ষতলে পা ঠুকিয়া আপন মনে গর্জ্জিয়া উঠিল,—"ভণ্ড! প্রতারক!" পরক্ষণে আবার কি ভাবিয়া পত্রখানা কুড়াইয়া লইয়া কক্ষে দ্রুত পাদচারণা করিয়া বেড়াইতে লাগিল। শেষে পুনরায় আসন গ্রহণ করিয়া দুই হাতে মাথা টিপিয়া ধরিয়া বলিল, এ কি, আমি পাগল হবো না কি? না, না!

আবার সে উঠিয়া ঘরের মধ্যে ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিল। একবার একটা জানালা খুলিয়া দিল, হু হু শব্দে ঝড়জলে তাহার অঙ্গ ভিজাইয়া দিল, কক্ষতলও জলে ভাসিয়া গেল। তখন তাহার চৈতন্য হইল, সে তাড়াতাড়ি জানালা বন্ধ করিয়া আসিয়া আসনে বসিল।

কিছুক্ষণ স্থিরভাবে বসিয়া সে আপনার অবস্থার কথা ভাবিল। সে কি ছিল, কি হইয়াছে। কিসের জন্য, কাহার জন্য, সে আজ তাহার সমাজে পরিত্যক্তা হইয়াছে? আত্মীয়-স্বজন, ভাই-বন্ধু, সকলে তাহাকে অস্পৃশ্য অপাংক্তেয় বলিয়া বিষবৎ দূরে পরিত্যাগ করিয়াছে। যাহাকে তাহার ভাই 'নিগার' বলিয়া ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করে, যাহাকে তাহার ভাই গুলী করিয়া মারিতে চাহিয়াছিল, সে তাহার কে, তাহার জন্য সে কি না করিয়াছে? তাহার তাই এই পুরস্কার, এই পুরস্কার! ভণ্ড, কপট, প্রতারক, —ইহাই কি নেটিভের স্বভাব?

ক্রোধে ক্ষোভে তাহার মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ ধারণ করিল। কেন সে গুরুজন ও আত্মীয়স্বজনের নিষেধ শুনে নাই? কেন আত্মহারা হইয়া অন্ধকারে ঝাঁপ দিয়াছিল? কেন না বুঝিয়া, না জানিয়া বিজাতি বিধর্ম্মীকে আত্মসমর্পণ করিয়াছিল? স্বহস্তে বিষপান করিয়াছে, তাহার ফলভোগ তাহাকে করিতেই হইবে। বিশ্বাসঘাতক, প্রতারক,— তাহার সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ নাই।

পর মুহূর্ত্তেই আবার কি ভাবিয়া কক্ষমধ্যে পাদচারণা করিয়া বেড়াইতে লাগিল। তাহার বিবাহিত জীবনের অতীত মুহূর্ত্তসমূহ একে একে মানসপটে ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। কি প্রেম, কি আত্মনির্ভরতা, কি তন্ময়তা! তাহার স্বামীর মত এমন গুণবান কয় জন হয়? কার্সিয়ঙ্গে শ্যামলশোভায় আচ্ছাদিত পর্ব্বতগাত্রে নির্ঝর সঙ্গীত শুনিতে শুনিতে তাহারা উভয়ে কত দিন আহার-নিদ্রা ভুলিয়াছে। কাশ্মীরের ডলহ্রদে সুসজ্জিত বিরাম-তরণীতে ভ্রমণ—জ্যোৎস্না-পুলকিতা যামিনীতে হ্রদের জলে শত চন্দ্রের শত প্রতিবিম্ব-পাত—মাঝির মুখে বাঁশীর গান,—সে যেন এখনও তাহার কানে বাজিতেছে। সেই উভয়ে উভয়ের কণ্ঠালিঙ্গনে আবদ্ধ লইয়া গান শোনা আর জগৎসংসার ভুলিয়া যাওয়া,—সে সব কি ভোলা যায়, সে সব কি ভুলিবার জিনিষ? যমুনাজলে তাজের মর্ম্মরস্বপ্নের স্বর্গীয় প্রতিবিম্ব কতবার দুই জনে নিরালয়ে বসিয়া উপভোগ করিয়াছে!

তাহার পর দিন দিন স্বামীর রোগবৃদ্ধি—তাহার সেবার সুযোগ। সদাই হারাই হারাই ভয়,—বাহুপাশে ঢাকিয়া রাখিয়া সাবিত্রীর মত যমের সহিত সেই সংগ্রাম, সে সেবায় ত তৃপ্তি নাই, মনে হইত, যদি প্রাণটা তিলে তিলে ক্ষয় করিয়া স্বামীর মুখে হাসি ফুটাইতে পারি! বেদনা-কাতর একান্ত-নির্ভর স্বামী যখন তাহার বক্ষে ঘুমাইয়া ক্ষীণাতিক্ষীণ স্বরে যেন পৃথিবীর অপর পার হইতে ডাকিত,—ইভ, ইহা জন্মের মতন খেলা সাঙ্গ হইল, তখন তাহার প্রাণটা কি করিয়া উঠিত!

ইভ আর পারিল না, ছুটিয়া গিয়া চেয়ারে বসিয়া টেবলে মুখ গুঁজিয়া ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। সেই অজস্র-ধারে কান্না, প্রাণটা যেন অনেকটা হালকা হইয়া গেল। ফুকারিয়া —বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে ফুকারিয়া উঠিল,—"কোথায় তুমি স্বামী, এস আমার দুর্ব্বল হৃদয়ে বল দাও। আমার সন্ধিগ্ধ মন, যে যা বলে বলুক, তুমি আমারই আছ। এ চিঠি জাল, আমি চোরের মত লুকিয়ে তোমার চিঠি বার করেছি, কি শাস্তি দেবে দাও।"

ইভ তীরের মত দাঁড়াইয়া উঠিল। তাহার চোখে তখন জল ছিল না, দৃষ্টি কঠোর, মুখ গম্ভীর। সে ভাবিতে-ছিল, সন্ধিগ্ধ মন, কেন সন্ধিগ্ধ মন? তাহার সন্দেহের কি কোনও কারণ ছিল না? ছিল বৈ কি? এই পুরীধামে প্রতি-মাকে দেখিয়া অবধি তাহার স্বামী কি হইয়া গিয়াছে? সে দিন চিল্কা হ্রদে আর কেহ দেখুক বা না দেখুক, সে ত দেখি-য়াছে, স্বামীর চোখের দৃষ্টি; সে ত বুঝিয়াছে স্বামীর হৃদয়ের ভাব! না, আর একদিনও না, কাল সে দার্জ্জিলিঙ্গ চলিয়া যাইবে। এই নেটিভের সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ নাই। সেখানে গিয়া বিবাহ-বন্ধন বিচ্ছিন্ন করিলেই হইবে।

কড় কড় শব্দে অশনিপতন হইল, সমস্ত জগৎটা যেন কাঁপিয়া উঠিল। ভীম প্রভঞ্জন তখন বৃষ্টির নায়েগ্রাপ্রপাত ঘাটে মাঠে হাটে ছড়াইয়া দিতেছিল, ঘন ঘন গুরুগম্ভীর মেঘ-গর্জ্জনে ও দামিনীবিকাশে জগৎ চমকিত করিয়া দিতেছিল।

ইভও ঈষৎ চমকিত হইল, মুহূর্ত্তকাল তাহার ভাবনা-স্রোতে বাধা পড়িল। কিন্তু সে মুহূর্ত্তমাত্র। সে আবার চেয়ারে বসিয়া পড়িল, একখানা চিঠির কাগজ লইয়া লিখিতে বসিল। নির্ম্মম নিষ্ঠুর চিঠির বাণী—তাহার সহিত আজ হইতে কোনও সম্বন্ধ নাই, তাহার শঠতা, তাহার প্রবঞ্চনা, তাহার কাপুরুষতা তাহাকে তাহা হইতে অনেক দূরে সরাইয়া লইয়া গিয়াছে, এখন উভয়ে দূরে থাকিলে মঙ্গল—না, না, তাহা হইবে না, সে ইংরাজ-দুহিতা, ভীরু কাপুরুষের মত মুখ ঢাকিয়া পলায়ন করিবে? তাহা হইলে দুর্ব্বিনীত শঠের

শাস্তি হইল কৈ? সে ত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিতে পারিলেই স্বস্তি পায়। না, তাহা হইবে না, তাহাকেও দণ্ডে দণ্ডে তিলে তিলে প্রিয়জনের বিরহ-দুঃখ অনুভব করাইতে হইবে। যে তুষের আগুন আজ হইতে তাহার হৃদয়ে ধীকি ধীকি জ্বলিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহার অংশ তাহাকেও ভোগ করাইতে হইবে। দূর হউক পত্র!

ইভ দলিত মর্দ্দিত পত্রখানি ছুড়িয়া ফেলিল। পরক্ষণে কি ভাবিয়া আবার তাহা তুলিয়া লইল। বাহিরে প্রকৃতি তুমুল ঝড় তুলিয়া প্রলয় মূর্ত্তিতে তখনও গর্জ্জন করিতেছিল, ইভের মনের ঝড়ও তেমনই সমান বহিতে লাগিল! কখনও বেগ সামান্য মন্দ হয়, কখনও বাড়ে। এইরূপে হাসি-কান্নার, স্বস্তি-অস্বস্তির, আশা-নিরাশার, আলোক-অন্ধকারের মধ্যে কখনও ভাসিয়া কখনও ডুবিয়া তাহার বিনিদ্র চক্ষুর উপর দিয়া রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত হইয়া গেল। তখনও তাহার স্বামী ভিলায় প্রত্যাবর্ত্তন করে নাই। করিয়াছিল কি না, সে বিষয়ে তাহার সাড়াও ছিল না। সে আর একবার গবাক্ষ খুলিয়া বহিঃপ্রকৃতির প্রলয় তাণ্ডব দেখিয়া লইয়া বসিবার ও শুইবার কক্ষের মধ্যস্থ দ্বার বন্ধ করিয়া বসিবার কক্ষেরই একখানা আরাম-কেদারায় কুণ্ডলীর আকারে শুইয়া পড়িল; বেশ পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তন করিল না। সে তখনও আকাশ-পাতাল ভাবিতেছিল, তাহার ধূ ধূ ভাবনার সাহারার অন্ত ছিল না। কত রাত্রিতে শ্রান্তা, চিন্তাভারগ্রস্তা যাতনাক্লিষ্টা, বালিকা ঘুমাইয়াছিল, তাহা সেই বলিতে পারে। একবারে বিনিদ্র রজনী অতিবাহিত করিয়াছিল কি না, তাহাই বা কে বলিতে পারে? এমনই-ভাবে জগতের কত দেশে কত মর্ম্মপীড়িতের কাতর চক্ষুর উপর দিয়া বিনিদ্র রজনী অতিবাহিত হইয়া যায়, তাহা মানুষের ভাগ্যবিধাতাই জানেন।

১২

যে দুর্য্যোগের সময় ইভ বাণবিদ্ধা হরিণীর মত মর্ম্মবেদনায় ছটফট্ করিতেছিল, সে সময়ে তাহার সকল সুখ—সকল দুঃখের কারণ স্বামী কোথায় ছিল? সে তখন প্রতিমাদের বাড়ীর শৈলকে রাজকন্যার গল্প বলিতেছিল, আর নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও ভদ্রতার খাতিরে প্রতিমা কাঠ হইয়া সেই ঘরের এক কোণে বসিয়াছিল।

অনেকে হয় ত আশ্চর্য্য হইবেন। যে বিমলেন্দুর রামপ্রাণ বাবুর গৃহে প্রবেশ নিষিদ্ধ হইয়াছিল—এমন কি, অপমানিত হইয়া বিতাড়িত হইবার আশঙ্কা ছিল—আজ সেই গৃহে বিমলেন্দু কেবল প্রবেশ নহে, রীতিমত আড্ডা গাড়িয়া বসিয়াছে, ইহাতে বিস্মিত হইবার কারণ যে নাই, তাহা বলা যায় না। কেন এমন অভাবনীয় পরিবর্ত্তন হইল?

এ যোগাযোগের প্রথম পর্ব্ব ইভই ঘটাইয়াছিল। তাহার সরল স্নেহপ্রবণ প্রাণ প্রতিমাকে প্রথম দিনেই ভালবাসিয়া ফেলিয়াছিল। পুরীতে যতই দিন যাইতে লাগিল, ততই উভয়ের মধ্যে সখ্য ও প্রণয় গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইতে লাগিল, শেষে এমন অবস্থা হইল, কেহ কাহাকেও এক দিন না দেখিলে থাকিতে পারিত না।

অবশ্য এই স্নেহপ্রেমের আবহাওয়ার প্রভাব যে রামপ্রাণ বাবু বা বিমলেন্দুকে অল্পাধিক অভিভূত করে নাই, এমন কথা বলা যায় না। প্রতিমা ইভকে ভগিনীর মত ভালবাসিতে শিখিয়াছিল, ভগিনীর মতই দেখিত; রামপ্রাণ বাবুও ক্রমশঃ এই পরম যাদুকরী, স্নেহময়ী ইংরাজবালিকাটিকে অতি আপনার জন বলিয়া মনে করিতে অভ্যস্ত হইয়াছিলেন। প্রতিমা ক্রমশঃ বিমলেন্দুকে তাহার ভগিনীর স্বামী বলিয়া ভাবিতে শিখিয়াছিল, সে যে কোনও কালে বিমলেন্দুর বিবাহিতা পত্নী ছিল, এ কথা সে অথবা রামপ্রাণ বাবু অধিকাংশ সময় বিস্মৃত হইতেন। এমনই ইভের মায়ার বন্ধন—এমনই তাহার যাদুকরী বিদ্যা!

তবে এই ভাবটা থাকিত যতক্ষণ বিমলেন্দু ইভের সঙ্গছাড়া না হইয়া তাহাদের সহিত দেখাসাক্ষাৎ করিত বা কথাবার্ত্তা কহিত। বিমলেন্দু একাকী কখনও রামপ্রাণ বাবুর বাসায় নিমন্ত্রিত হইত না তাহার নিমন্ত্রণ যে কেবল ইভের স্বামী বলিয়া, উহা সে হাড়ে হাড়ে অনুভব করিত। তবে বিমলেন্দু একটা বিষয়ে অল্পদিনেই প্রতিমাকে জয় করিয়া ফেলিয়াছিল, সে শৈলকে কয়দিনে এমন বশ করিয়াছিল যে, যে দিন শৈল বিমলেন্দুর মুখে রূপ-কথার গল্প না শুনিত, সে দিন তাহার ভাল করিয়া ঘুম হইত না। বিমলেন্দু বাল্যকাল হইতেই ছেলে ভালবাসিত, ছেলে বশ করিতে জানিত।

যে দিন হইতে বিমলেন্দু চিল্কার জল হইতে প্রতিমাকে উদ্ধার করিয়াছিল, সেই দিন হইতে রামপ্রাণ বাবুর গৃহে সে ইচ্ছা করিলেই তাহার পক্ষে অবারিত দ্বার করিতে পারিত, কিন্তু তাহার কেমন বাধ বাধ ঠেকিত—বাতাসে নীয়মান নিশানের চীনাংশুকের মত মনটা সে দিকে ধাবিত হইলেও তাহার দেহটা কেবল চক্ষুলজ্জার খাতিরে সে দিকে ইভের সঙ্গ ব্যতীত যাইতে চাহিত না। বিশেষতঃ প্রতিমা এ যাবৎ কখনও তাহার সহিত নির্জ্জনে অবস্থান করে নাই, নির্জ্জনতার উপক্রম হইলেই সে কোনও না কোনও ছুতায় অন্যত্র চলিয়া যাইত। বিমলেন্দু বুঝিত, প্রতিমা তাহাকে এখনও আন্তরিক ঘৃণা করে; বুঝিত, আর অনুশোচনায় তাহার অন্তর ভরিয়া উঠিত। .ক করিলে যেমন ছিল তেমন হয়! তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি?

ঘটনার দিন বিমলেন্দুর ক্লাবে নিমন্ত্রণ ছিল। সে সন্ধ্যার পূর্ব্বেই সাজিয়া-গুজিয়া বাহির হইয়াছিল। ইভের মাথা ধরিয়াছিল বলিয়া সে একাকী সমুদ্রতীর হইয়া ক্লাবে যাইবে স্থির করিয়াছিল। সমুদ্রতীরে উপস্থিত হইয়া তাহার হৃদয় চন্দ্রোদয়ে মহোদধির মত আলোড়িত হইয়া উঠিল—সে অনতিদূরে বৃদ্ধ দ্বারপাল বৈজনাথের সহিত প্রতিমা ও শৈলকে বেড়াইতে দেখিয়াছিল। কিন্তু তাহার এই হর্ষ ক্ষণস্থায়ী হইল। তাহাকে দেখিবামাত্র প্রতিমা ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা করিল, 'ইভকে নিয়ে এলেন না?'

বিমলেন্দু বলিল, 'না, তার বড্ড মাথা ধরেছে।' অমনই প্রতিমা বলিল, "ওঃ, তা হ'লে তাকে একবার দেখে আসি, আপনি শৈলকে নিয়ে একটু বেড়াবেন, আমি কিছু পরে বৈজনাথকে পাঠিয়ে দেব।" জবাবের প্রতীক্ষা না করিয়া প্রতিমা দ্বারপালকে লইয়া চলিয়া গেল। বিমলেন্দুর হাসিভরা মুখখানা আঁধার হইয়া গেল, তাহার মনে হইল, সমুদ্রতট যেন লোকারণ্যশূন্য হইয়া গিয়াছে। শৈল কিন্তু তাহাকে দেখিয়াই গল্পের জন্য ধরিয়া বসিল। তখন বিমলেন্দুর কিছুই ভাল লাগিতেছিল না। তথাপি বালকের আব্দার সে এড়াইতে পারিল না, রাজকন্যার গল্প বলিতে বলিতে সমুদ্রতীরে পরিক্রমণ করিতে লাগিল। বালক তাহাকে প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করিয়া জ্বালাতন করিয়া তুলিল। সে আজ একটা সঙ্কল্প করিয়াই প্রতিমাদের সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিল। যে সুযোগ সে এত দিন অনুসন্ধান করিতেছিল, আজ বিধাতা তাহা ঘটাইয়া দিয়াছিলেন। রামপ্রাণ বাবু হঠাৎ জরুরী তার পাইয়া বিষয়-কর্ম্মের জন্য আজই অপরাহ্নে কলিকাতা রওয়ানা হইয়াছিলেন। সুতরাং প্রতিমাকে নির্জ্জনে পাইবার তাহার আজ খুবই সুযোগ উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু প্রতিমা ত ধরা দেয় না!

টিপ টিপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছিল, বর্ষার আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল। হঠাৎ দেখিতে দেখিতে বায়ু শন্ শন্ শব্দে গর্জ্জিয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে বড় বড় ফোঁটা পড়িতে লাগিল। দুর্য্যোগের আশঙ্কা করিয়া বিমলেন্দু শৈলকে লইয়া দ্রুতগতি তাহাদের বাসার দিকে অগ্রসর হইল; বাসা নিকটেই। কিন্তু বাসায় পৌছিবার পূর্ব্বেই গুরু গুরু মেঘ গর্জ্জন করিয়া উঠিল, ঘন ঘন বিজলী চমকিতে লাগিল, কড় কড় করিয়া বাজ ডাকিল, ক্রমে ঝম্ ঝম্ করিয়া মুষলধারায় জল নামিল। তখন অনন্যোপায় হইয়া বিমলেন্দু শৈলকে ক্রোড়ে তুলিয়া দৌড়াইতে আরম্ভ করিল।

বাসায় পৌছিয়াই বিমলেন্দু বৈজনাথের মুখে শুনিল, তাহাদের মেমসাহেবের সহিত দেখা করা হয় নাই, ঝড়বৃষ্টির আশঙ্কায় তাহারা ঘরেই ফিরিয়া আসিয়াছে, দিদিমণি ভিতরে আছে। 'দিদিমণি' যে ভিতরে ছিলেন, তাহার প্রমাণ পাইতে বিমলেন্দুর বিলম্ব হইল না, কেন না, তখনই দাসী আসিয়া পরিবর্ত্তনের জন্য তাহাকে ও শৈলকে বস্ত্র দিয়া গেল।

বাহিরে প্রকৃতি ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিলেও বিমলেন্দু ভিতরে একটা অনাস্বাদিতপূর্ব্ব তৃপ্তি ও শান্তি অনুভব করিতেছিল—বুঝি এমনটি সে কখনও অনুভব করে নাই। কেন,—তাহা সে নিজেই বলিতে পারে না। তাহার মনে হইল যেন এই তাহার নিজের ঘর, এইখানে সে যেমন আরাম অনুভব করিতেছে, এমন সে নিজের বাড়ীতে এক-দিনও করে নাই। শৈল ঝড়-বৃষ্টি কিছুই মানিল না, সে সেই দুর্য্যোগেও গল্পের জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। বিমলেন্দুর মনটা খুবই তৃপ্ত ছিল, কাযেই সে হর্ষভরে তাহাকে ক্রোড়ে লইয়া একখানা আরাম-কেদারায় বসিয়া রাজপুত্র ও রাজকন্যার গল্প বলিতে আরম্ভ করিল। সেই সময়ে চা ও কিছু ফল মিষ্টান্ন লইয়া দাসীর সঙ্গে প্রতিমা

সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। দাসী চা ও মিষ্টান্নাদি রাখিয়া প্রস্থান করিল। প্রতিমা একবার বলিল, খান। তাহার পর যেন নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও একখানা চেয়ারে বসিয়া পড়িল। তাহার বস্তুতঃই অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ হইতেছিল, কিন্তু উপায় নাই, পিতার অনুপস্থিতিতে সে পরিচিত অতিথিকে আদর-আপ্যায়ন না করিলে শোভন হয় না, ভদ্রতা থাকে না।

শৈল জিজ্ঞাসা করিল, তার পর?

বিমলেন্দু বলিল, তার পর রাজপুত্র মনের দুঃখে চলে গেল। সে যে রাজকন্যাকে খুব ভালবাসত, তা ত আর মুখ ফুটে বলতে পেলে না, তাই রাজকন্যা মনে করলেন, সে ইচ্ছে করেই চলে যাচ্ছে, তাই তিনিও থাকৃতে বললেন না।

শৈল জিজ্ঞাসা করিল, রাজপুত্র কোথায় গেল?

বিমলেন্দু আবার বলিতে লাগিল, যে দিকে দু'চক্ষু যায়। আগে ত রাজপুত্র রাজকন্যাকে ভাল করে চিনতে পারে নি, কেবল চোখের দেখা দেখেছিল। তার পর যখন চিনতে পারলে, তখন বুঝতে পারলে কি জিনিষ হারিয়েছে।

শৈল বলিল, তা রাজপুত্র কেন রাজকন্যাকে বল্‌লে না যে, সে তাকে ভালবাসে?

বিমলেন্দু অভিমানাহত কণ্ঠে বলিল, তা কি ক'রে বলবে? সে যে দোষ করেছিল, তার জন্যে রাজকন্যা ত তাকে ক্ষমা করেনি।

শৈল বলিল, কেন দোষ করেছিল?

বিমলেন্দু বলিল, তাকে ভূতে পেয়েছিল তাই। রাগে মানুষের জ্ঞান থাকে না, কিছু দেখতে পায় না। তাই রাগ করে রাজপুত্র রাজকন্যাকে অপমান করেছিল।

এই সময়ে প্রতিভা উঠিয়া দাঁড়াইল। এতক্ষণ সে একখানা খবরের কাগজের আড়ালে মুখ ঢাকিয়া বসিয়াছিল। বলিল, তা হলে আপনারা গল্প করুন, আমি আসছি।

বিমলেন্দুও দাড়াইয়া উঠিল, বলিল, না, আপনার আর কষ্ট করে আসবার দরকার নেই, আমি যাচ্ছি।

কথাটা বলিয়া সে দ্বারের দিকে অগ্রসর হইল। প্রতিমা প্রথমটা কিছু বলিল না, কিন্তু সে দ্বারপথে পৌছিবামাত্র বলিল, সে কি, আপনি কি পাগল হয়েছেন? এই দুর্য্যুগে কোথায় যাবেন?

শৈলও এইবার ছুটিয়া গিয়া বিমলেন্দুর হাত ধরিয়া টানিল। অগত্যা বিমলেন্দু ফিরিয়া আসিয়া বলিল, যাঁদের বাড়ী, তাঁরাই যদি চলে যান, তা হ'লে এখানে থাকার প্রয়োজন?

প্রতিমা মহা ফাঁপরে পড়িল, সে ন যযৌ ন তস্থৌ অবস্থায় দাঁড়াইয়া নতদৃষ্টি হইয়া পদনখে মেঝের কার্পেট খুঁটিতে লাগিল। কক্ষের গম্ভীরতা উভয়ের পক্ষে অসহনীয় হইয়া উঠিল। শৈল সেইক্ষণে উভয়ের অস্বস্তি দূর করিয়া হাসিয়া উঠিল, বলিল, বাঃ বাঃ আপনি যাবেন বুঝি, আপনার জন্য খাবার হবে না বুঝি?

বিমলেন্দু সতৃষ্ণনয়নে প্রতিমার দিকে চাহিল, কিন্তু প্রতিমার দৃষ্টি তখনও অবনমিত, তাহার আরক্ত মুখমণ্ডলে দুইটি কমল ফুটিয়া উঠিয়াছিল। বিমলেন্দু হাসিয়া বলিল, না, না, তোমাদের অত কষ্ট করতে হবে না, আমার ক্লাবে নেমন্তন্ন আছে।

দুষ্ট শৈল তথাপি বলিল, ইস, এই বিষ্টিতে যায় বুঝি। আসুন, তার পরে রাজপুত্র কোথায় গেল বলবেন আসুন।

সে হাত ধরিয়া বিমলেন্দুকে ঘরের মধ্যে টানিয়া লইয়া গেল। প্রতিমা এতক্ষণে কথা কহিল, বলিল, না শৈল, আর গল্প শোনে না, রাত ৮টা বেজে গেছে, খাবে চল।

তাহার পর বিমলেন্দুর দিকে স্থির শান্ত গম্ভীর দৃষ্টি স্থাপিত করিয়া বলিল, আপনি একটু দেরী করুন, এ বৃষ্টিতে যথার্থই না খেয়ে যেতে পাবেন না, বাবা থাকলেও যেতে দিতেন না,—কাউকে না।

বিমলেন্দু বলিল, না, না, আমি যাই, আমার নেমন্তন্ন আছে।

প্রতিমা ঈষৎ রুক্ষস্বরে বলিল, এই যে বললেন কিছু আগে, ইভের অসুখ, মাথা ধরেছে। তবে নেমন্তন্ন নিলেন কেন?

বিমলেন্দু কম্পিত-কণ্ঠে বলিল, নেমন্তন্ন নেবার সময় ত অসুখ আসে নি, তখন বলেও পাঠায় নি যে সে আসছে।

প্রতিমা আরও অধিক রুক্ষস্বরে বলিল, আপনার কাছে ইভের অসুখ ঠাট্টা-তামাসার কথা হ'তে পারে, কিন্তু আপনারসামান্য একটু অস্বস্তি হলে ইভ চারিদিক 'অন্ধকার দেখে। আয় শৈল, খাবি আয়।

কথাটা বলিয়াই সে কক্ষত্যাগ করিতেছিল, শৈল তাহার পূর্ব্বেই ভিতরে ছুটিয়া গেল।

বিমলেন্দু প্রতিমাকে বাধা দিয়া বলিল, দাঁড়ান, একটা কথা বলে যাব, কথাটা বলবার জন্যই এসেছিলুম। বেশীক্ষণ সময় লাগবে না, মাত্র—১ মিনিট।

বিস্মিত নয়ন দুইটি তুলিয়া প্রতিমা বলিল, কি বলুন।

বিমলেন্দু কাতর-কণ্ঠে বলিল, ক্ষমা—আমার কৃতকর্ম্মের জন্য ক্ষমা। অজ্ঞান পশু আমি, না বুঝে পাপ করেছি, তারই জন্য তোমার কাছে ক্ষমা ভিক্ষে চাইছি। প্রতিমা, ততটুকু দয়াও করবে না কি?

প্রতিমা নতমুখে নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল।

বিমলেন্দু ঝড়ের বেগে আবার বলিয়া যাইতে লাগিল, এই বুক চিরে যদি দেখাবার হ'ত,তা হ'লে দেখাতুম কি অনুতাপের তুষানল এই বুকে জ্বলছে। প্রথমে বুঝতে পারি নি। দার্জ্জিলিঙ্গে দেখা হ'লেও বুঝি নি। কিন্তু ইভের ভালবাসাই আমার চোখ ফুটিয়ে দিয়েছে। ইভের প্রাণ দিয়ে সেবা আমাকে নারীর দেবীত্ব বুঝিয়ে দিয়েছে। আমি অধম পশু, সেই নারীমর্য্যাদা স্বেচ্ছায় ক্রোধের বশে পায়ে দলেছি। আমায় ক্ষমা কর, প্রতিমা, ক্ষমা কর।

প্রতিমা বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে ক্ষীণস্বরে বলিল, কেন ও সব কথা তুলছেন, ও সব ত ধুয়ে মুছে গেছে।

বিমলেন্দু উন্মত্তের মত বিকট হাসিয়া বলিল, কি ধুয়ে মুছে গেছে প্রতিমা! জান কি, কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গের পর যখন জাগরণ এল, তখন কি বৃশ্চিকের জ্বালা এই অন্তরে জ্বলতে লাগল? ধীকি ধীকি তুষানলের মত সে জ্বালার শিখা জ্বলছে। কেউ কি জান্‌তে পেরেছে? ধুয়ে মুছে যাবে? হাঃ হাঃ হাঃ! প্রতিমা, এই বুকের ভেতরে দেখ, তোমার জন্য কি সিংহাসন পাতা রয়েছে?

বিমলেন্দু সত্য সত্যই জ্ঞানহারা হইয়াছিল, প্রতিমার হাতখানি টানিয়া লইয়া নিজের বুকের উপর স্থাপন করিল। তখন বাহিরে ঝড়ের গর্জ্জন সমান তেজেই চলিতেছিল।

প্রতিমা প্রথমটা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়াছিল, কিন্তু সে ক্ষণিক। মুহূর্ত্ত পরেই সে সজোরে হাত ছাড়াইয়া লইয়া কঠোর ব্যঙ্গোক্তি করিয়া কহিল, দেখুন, ও সব থিয়েটারি এ্যাক্টিং পুরুষ মানুষের শোভা পায় না। আপনার কর্ত্তব্য ইভের অসুখ-শয্যার কাছে পড়ে রয়েছে জানবেন।

কথাটা বলিয়া প্রতিমা উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়া ঝড়ের বেগে কক্ষের বাহির হইয়া গেল।

বিমলেন্দুর মুখখানা পাংশুবর্ণ ধারণ করিল। সে প্রতিমাকে এত কঠোর এত নিষ্ঠুর বলিয়া মনে করে নাই।

বিমলেন্দুও দ্রুতবেগে ঘরের বাহিরে গিয়া প্রতিমার পথ আগুলিয়া দাঁড়াইল, বলিল, প্রতিমা, কি করলে তোমার প্রত্যয় হবে? যতদিন সাধ্য ছিল চেপে রেখেছি, আর পারি না, কথার জবাব দেবে না? বেশ, অনাহূত হলেও আমি অতিথি। অতিথিকে এই দুর্য্যোগে ঘর থেকে তাড়িয়ে দেবে?

প্রতিমার মুখে চোখে আগুন ছুটিতেছিল, সে আরও একটা কঠিন জবাব দিতে যাইতেছিল, কিন্তু ঠিক সেই সময়ে শৈল সেখানে ছুটিয়া আসিল, বলিল, বেশ ত মা, খাবার দিতে বলে বেশ ত বসে আছ?

শৈল বিমলেন্দুর হাত ধরিয়া বলিল, চলুন, খাই গিয়ে।

প্রতিমা শৈলকে লইয়া ভিতরে যাইবার সময়ে বলিয়া গেল, দেখুন, কঠিন হলেও আমায় অপ্রিয় সত্য কথা বলতে হবে। এর জন্যে আমায় দোষ দেবেন না। মনে রাখবেন, আপনি কথায় বা কাযে ইভের প্রতি অবিশ্বাসী হলে যত বড় পাপ করবেন, তার বাড়া পাপ জগতে নেই।

প্রতিমা আর অপেক্ষা করিল না, শৈলকে লইয়া চলিয়া গেল। বিমলেন্দু সেইখানে নীরব হইয়া কাষ্ঠ-পুত্তলিকার মত কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার চক্ষু রক্তবর্ণ, হস্ত দৃঢ় মুষ্টিবদ্ধ। এতটুকু দয়া নাই? এই কি কোমলা স্নেহপ্রবণা নারী!

টুপিটা মাথায় দিয়া বিমলেন্দু সেই ঝড়বৃষ্টির মধ্যে বাহির হইয়া গেল। তখন পথে কুকুর-বিড়ালও চলিতেছিল না। বহিঃপ্রকৃতির সেই তাণ্ডব নৃত্য মাথা পাতিয়া লইতে তখন সে একা। তাহার অন্তরের প্রকৃতিও সেই সঙ্গে তাণ্ডব নৃত্য করিতেছিল। বৃষ্টির জলে তাহার সর্ব্বাঙ্গ স্নাত প্লাবিত হইতেছিল, সে দিকে তাহার ভ্রূক্ষেপও ছিল না। সে যন্ত্রচালিত পুত্তলিকাবৎ সেই ভয়ঙ্করী রজনীর অন্ধকারের মধ্য দিয়া ক্লাবের অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল।

১৩

সেই কাল রাত্রিতে প্রায় রাত্রিশেষে যখন বিমলেন্দু একরূপ অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় ভিলায় ফিরিয়া আসিয়া বসিবার ঘরের দ্বাররুদ্ধ দেখিয়াছিল, তখন তাহার কোনরূপ অনুভূতিই ছিল না,—সে যে অবস্থায় আসিয়াছিল, সেই

অবস্থাতেই শয়ন কক্ষের শয্যায় শুইয়া পড়িয়াছিল। চৈতন্য-হারিণী সুরা তাহাকে সকল স্মৃতির জ্বালা হইতে অব্যাহতি দিয়াছিল। একবারও তাহার মনে পড়ে নাই, ইভ কোথায়, বাঁচিয়া আছে কি মরিয়াছে।

প্রকৃতি অকরুণ। পরদিন বেলা ১০টার সময়ে যখন বিমলেন্দুর চৈতন্য হইল,তখন জগৎখানা তাহার মানসনেত্রের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিয়া তাহাকে যন্ত্রণা দিতে লাগিল, তখন প্রকৃতি সূর্য্যালোকে হাসিতেছে, পূর্ব্বদিনের সে ঝড়বৃষ্টি আর নাই, আকাশ নির্ম্মল, সূর্য্য মেঘমুক্ত, যে যাহার কার্য্যে লাগিয়া গিয়াছে, কেবল একা বিমলেন্দু মর্ম্মবেদনায় শয্যায় পড়িয়া ছট্‌ফট্ করিতেছে।

চাকর চা আনিয়া ফিরিয়া গিয়াছে। সে আবার আসিল, সাহেব, চা খাবেন কি? বিমলেন্দু ধড়মড়িয়া শয্যায় উঠিয়া বসিল, বলিল, মেম সাহেব কোথায়?

চাকর বলিল, নিমন্ত্রণে গিয়েছেন, বলে গিয়েছেন, আজ আর আসবেন না, হয় ত রাত্রিতে ফিরতে পারেন।

চাকর চলিয়া গেল, বিমলেন্দু বিস্মিত হইল। ইভ ত কখনও না বলিয়া কোথাও যায় না, কোনও কায করে না। তবে কি, কাল রাত্রির কথা মনে করিয়া—লজ্জায় বিমলেন্দুর মাথা আপনি নত হইয়া আসিল। সে কি জানিতে পারিয়াছে তাহার মনের গোপন কথাটি? না, না, অসম্ভব। তবে কি সে মদ্যপায়ী হইয়াছে বলিয়া ঘৃণায় ইভ তাহার আদেশের প্রতীক্ষা না করিয়াই বাহির হইয়া গিয়াছে? ছিঃ ছিঃ, কি কুকার্য্যই করিয়াছে সে—সে ত কখনও এমন ছিল না। মদ্যপ হওয়া ত দূরের কথা, সে কদাচিৎ সুরা পান করিত।

বেলা ১১টার সময়ে বিমলেন্দু স্নান ও প্রাতরাশ সম্পন্ন করিয়া ইভের সন্ধানে বাহির হইল। মনটা তাহার উৎকণ্ঠায় ভরিয়া উঠিল, ইভ ত কখনও এমন করে না—কোথায় গেল সে?

যাইবার মধ্যে প্রতিমাদের বাড়ী, না হয় মিসেস বেলের বাড়ী। মিসেস বেল তাহার জননীর নিকটাত্মীয়া, পরন্তু জীবদ্দশায় পরম বন্ধু ছিলেন। তাঁহার স্বামী বর্ত্তমানে পুরীর পুলিস সাহেব। এই দুই বাড়ী ছাড়া আর কোথাও ত ইভের পুরীতে গতিবিধি ছিল না। তবে কি তাহার অজানিত ইভের কোন জানা লোক পুরীতে আসিয়াছে?

বিমলেন্দু দাঁড়াইল না, হন হন করিয়া চলিল। প্রথমেই সে প্রতিমাদের বাড়ী গেল। সেখানে বৈজনাথের কাছেই শুনিল, মেম সাহেব কালও আসেন নাই, আজও না। তাহার পর মিসেস বেলের বাড়ী। সেখানেও বিমলেন্দু কোনও আশার কথা পাইল না—ইভ সেখানে নাই। বিমলেন্দু ব্যস্ত হইয়া উঠিল। হন হন করিয়া ভিলায় ফিরিয়া আসিল, যদি ইতোমধ্যে ইভ ফিরিয়া আসিয়া থাকে। কিন্তু সেখানেও সে নিরাশ হইল। তখন তাহার ভয় হইল। তথাপি ভাবিল,হয় ত ইভ প্রত্যূষে উঠিয়া কোন সঙ্গী পাইয়া দূরে বেড়াইতে গিয়াছে। ইভের যে মিশুক স্বভাব, কাহারও সহিত আলাপ করিতে তাহার অধিকক্ষণ বিলম্ব হয় না। সমস্ত অপরাহ্নটা সে এই আসে এই আসে করিয়া নিতান্ত অস্থির হইয়া কাটাইল। বিবাহ হওয়া অবধি স্ত্রী-পুরুষে এ যাবৎ কখনও একদিন ছাড়াছাড়ি হয় নাই। তখন বিমলেন্দুর বুঝিতে বাকী রহিল না, ইভ তাহার কতখানি হৃদয় জুড়িয়া বসিয়াছে! সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে সে সমুদ্র-তটে গেল, যদি সেখানে ইভ বেড়াইতে গিয়া থাকে। কিন্তু কোথায় ইভ? সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বিমলেন্দু তটের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বহুবার যাওয়া আসা করিয়া ছট্‌ফট্ করিয়া বেড়াইল। শেষে সন্ধ্যার সময় সে সত্য সত্যই অস্থির হইয়া উঠিল। তাহার প্রাণটা ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিল। কোথায় ইভ?—কে বলিয়া দিবে, তাহার ইভ কোথায় লুকাইয়া রহিয়াছে!

বিমলেন্দু পাগলের মত ছুটিয়া আবার ভিলায় ফিরিয়া আসিল, মনটা কি জানি কেন হঠাৎ আশায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিল, নিশ্চয়ই ইভ সন্ধ্যার সময় বাসায় ফিরিয়াছে। সে ত সন্ধ্যার পর তাহার সঙ্গ না হইলে কোথাও যায় না। কিন্তু তখনও ইভ ভিলায় ফিরে নাই।

বিমলেন্দু আবার পথে বাহির হইল—উদ্দেশ্য আবার একবার প্রতিমাদের ও মিসেস বেলেদের বাড়ী যাইয়া ইভের সন্ধান করিবে। গত দিনের প্রকৃতির প্রলয়মূর্ত্তির চিহ্নমাত্র নাই, নীলাকাশ অসংখ্য তারকার হার গলে পরিয়া হাসিতেছিল,—তাহার মাঝে মাধবের বক্ষে কৌস্তভ রতনের মত নিশানাথ আপনার রূপের ছটায় চারিদিক উজ্জ্বল করিতেছিল। নাতিদূরে কয়েকজন দেশীয় লোক মাদল বাজাইয়া মনের আনন্দে গান করিতেছিল। বিমলেন্দুর মনের জ্বালায় সহানুভূতি প্রদর্শন করিবার কেহ নাই!

বিমলেন্দু সি ভিলা হইতে নির্গত হইবার অল্পক্ষণ পরেই ইভ তথায় ফিরিয়া যখন খবর লইয়া জানিল, বিমলেন্দু সারাদিন তাহার জন্য অপেক্ষা করিয়া এই কতক্ষণ তাহার সন্ধানে আবার বাহিরে গিয়াছে, তখন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া ঘরে গিয়া বেশ পরিবর্ত্তন করিল, হাতমুখ ধুইল, চা আনিতে বলিল।

পূর্ব্ব রাত্রি হইতেই তাহার মাথা টিপ টিপ করিতেছিল। তাহার উপর আজ সারাদিন সে রৌদ্রে ঘুরিয়াছে, এ জন্য তাহার জ্বরভাব হইয়াছিল। সে প্রত্যুষে রেলে অন্যত্র গিয়া সারাদিন রৌদ্রে ঘুরিয়া বিকালের গাড়ীতে পুরী ফিরিয়াছিল। আহারে তাহার স্পৃহা ছিল না, সারাদিন সে একরূপ অনাহারেই ছিল। এখন যেন তাহার সযত্নে পালিত দেহলতা এলাইয়া পড়িল।

ভিলায় প্রবেশ করিবার কালে প্রতি মুহূর্ত্তেই তাহার আশঙ্কা হইতেছিল, বুঝি বিমলেন্দুর সহিত সাক্ষাৎ হয়। সেই প্রথম সাক্ষাৎকে সে খুবই ভয় করিতেছিল। যতক্ষণ পর্য্যন্ত সে বাসার লোকজনের কাছে শুনিতে না পাইল যে, 'সাহেব' বাহির হইয়া গিয়াছে, ততক্ষণ কি শুনি কি শুনি করিয়া তাহার বুকে হাতুড়ির ঘা পড়িতেছিল। এইরূপে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এই প্রথম বিরাট ব্যবধান ভীষণ দৈত্যের মত মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতেছিল।

পাছে স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ হয়, এই ভয়ে সে প্রত্যুষেই ভিলার বাহির হইয়া গিয়াছিল। এখন আবার সেই আশঙ্কা ক্রমে মাথা তুলিতে লাগিল। কিন্তু উপায় নাই, দেখা ত হইবেই। তাহার দেহ আর বহে না, সে শয়ন-কক্ষে গিয়া লেপ মুড়ি দিয়া শুইয়া পড়িল। বসিবার কক্ষ ও শয়নকক্ষের মধ্যস্থ দ্বার রুদ্ধ করিবারও তাহার ক্ষমতা রহিল না। মুহূর্ত্ত পরেই অবসন্ন ক্লান্ত দেহে সে ঘুমাইয়া পড়িল।

কতক্ষণ সে তন্দ্রাবস্থায় ছিল জানে না, হঠাৎ তাহার স্বামীর কাতর-কণ্ঠে 'ইভ, ইভ, তুমি কি জাগিয়া আছ' শুনিয়া সে জাগিয়া উঠিল। বিমলেন্দু কক্ষে প্রবেশ করিয়াই আলোক জ্বালিয়া দিয়াছিল। সে তাড়াতাড়ি শয্যাপার্শ্বে নতজানু হইয়া বসিয়া ইভকে দুই হাতে জড়াইয়া ধরিয়া উচ্ছ্বাস করিয়া বলিল, "কি ভয়ই দেখিয়েছিলে ইভ! এমনই করে ভয় দেখাতে হয়?" তাহার কণ্ঠের বিকট হাসির সহিত তাহার চোখের কোণের অশ্রুবিন্দু কিন্তু একেবারেই খাপ খাইতেছিল না।

দুই হাতে স্বামীকে দূরে ঠেলিয়া ফেলিয়া ইভ ভীতি-ব্যঞ্জক স্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল, "আমায় ছুঁয়ো না, আমায় ছুঁয়ো না। তুমি যদি সরে না যাও, তা হলে আমিই ঘর ছেড়ে চলে যাব।"

বিমলেন্দুর মুখ শুকাইল। তাহার হাসি-কান্নার মধ্য হইতে বিস্ময়ের ভাব ফুটিয়া উঠিল, বলিল, কি বলছ ইভ, তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে?

ইভ তাড়াতাড়ি জবাব দিল,—তার চেয়েও বেশী। যাও, বসবার ঘরে গিয়ে বস।

বিমলেন্দু ব্যথিত কাতর হৃদয়ে আবার ইভকে বুকের উপর টানিয়া লইতে হাত বাড়াইল, ইভ ভীত-চকিত হইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, না, না, ছুঁয়ো না। মিনতি করে বলছি ও ঘরে যাও, না হলে আমি চেঁচিয়ে লোক জড় করব। বিমলেন্দু প্রসারিত বাহু সঙ্কুচিত করিয়া লইল—সে যে কেবল বিস্মিত হইল তাহা নহে, সে ক্ষুব্ধ অভি-মানাহত হইয়া কক্ষ ত্যাগ করিল। কি আশ্চর্য্য, এ কি তাহারই একান্ত-নির্ভর ইভ!

ইভ তখন ভাবিতেছিল, তাহার সহিত বিমলেন্দুর কি সম্বন্ধ? তাহারা বিবাহিত, এ কথা সত্য। কিন্তু আজ স্বামীর হস্তস্পর্শে সে সঙ্কুচিত শিহরিত হইয়া উঠে কেন? এ স্পর্শে সে যে পরপুরুষের স্পর্শানুভব করিতেছে! এ তাহার স্বামীর দেহধারণ করিয়া কে এই পরপুরুষ? এ ত তাহার স্বামী নহে। আত্মায় আত্মায় যে মিলন, যে বন্ধন, তাহা ত সে অনুভব করিতেছে না। তবে কেবল রক্ত-মাংসের এই সংস্পর্শে তাহার মন আকৃষ্ট হইবে কিসে? বিম-লেন্দু কক্ষে প্রবেশ করিয়া তাহার গাত্র স্পর্শ করিলেই ঘৃণায় তাহার সর্ব্ব শরীর শিহরিয়া উঠিয়াছিল কেন? তখন সে বুঝিতে পারে নাই, কেন তাহার মন স্বামীর প্রতি বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু কিছুক্ষণ চিন্তার অবসর পাইয়াই তাহার মনের অন্ধকার কাটিয়া গেল, সে দিব্যদৃষ্টিতে দেখিতে পাইল, এ ত তাহার স্বামী নহে, এ যে পরপুরুষ। এ লোক তাহার স্বামীর দেহধারী হইতে পারে, কিন্তু স্বামী নহে। তবে কি সে ইহার স্পর্শ সহ্য করিয়া ব্যভিচারিণী

হইবে? না, তাহা কখনই হইতে পারে না। তাহার সরল নিষ্পাপ মন বার বার বলিতে লাগিল, না, না, তাহা কখনই হইতে পারে না।

যেমন মনে এই সঙ্কল্পের উদয় হইল, অমনই ইভ দুর্জ্জয় বল পাইল, তাহার শরীরের সকল অবসাদ মুহূর্ত্তমধ্যে কাটিয়া গেল। সে ধড়মড়িয়া উঠিয়া বসিয়া সারা অঙ্গ একখানা মোটা চাদরে আবৃত করিয়া বসিবার ঘরে প্রবেশ করিল এবং চেয়ারে উপবিষ্ট বিমলেন্দুর বিস্ময় উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করিয়া তাহার সম্মুখস্থ একখানা চেয়ারে গিয়া বসিয়া পড়িল। বিমলেন্দু তাহার সান্নিধ্যে বাহু প্রসারণ করিয়া অগ্রসর হইতেছিল, কিন্তু ইভের মুখ দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল।

গুরুগম্ভীর স্বরে ইভ বলিল, বস।

বিমলেন্দু উপবেশন করিল। তাহার মুখ পাংশুবর্ণ ধারণ করিয়াছিল, হাত কাঁপিতেছিল, কি একটা অজানা ভয় ও উৎকণ্ঠায় তাহার চিত্ত ভরিয়া উঠিয়াছিল। কিছুক্ষণ কক্ষমধ্যে অসম্ভব গম্ভীরতা বিরাজ করিল।

তাহার পর—তাহার পর ধীরে, অতি ধীরে স্পষ্ট স্বরে ইভ জিজ্ঞাসা করিল, বলতে পার কেন আমায় বিবাহ করেছিলে?

বিমলেন্দুর প্রাণ উড়িয়া গেল। অকস্মাৎ বজ্রাঘাত হইলে লোক যেমন চমকিত হয়, তেমনই চমকিত হইয়া সে বলিল, এ কি কথা ইভ? বিবাহ করেছিলুম, তোমায় ভালবাসতুম বলে—

'মিথ্যা কথা!'—কথাটা শেষ করিতে না দিয়াই ইভ এমন জোরে বলিল 'মিথ্যা কথা' যে, ঘরটা যেন বিমলেন্দুর দৃষ্টিতে কাঁপিয়া উঠিল। সে ব্যথিত কণ্ঠে বলিল, মিথ্যা কথা? ইভ, এ কি বলছ?

'ঠিকই বলছি। প্রতারক! যদি টাকার জন্যই বিবাহ করে থাক, তা হলে আমায় বলনি কেন, অনেক টাকা দিতুম, তোমাকে ত আমার অদেয় কিছুই ছিল না।' ইভের শেষ কয়টি কথায় তাহার হৃদয়ের আকুল ক্রন্দনের সুর ভাসিয়া উঠিয়াছিল।

সম্মুখে নির্য্যাতিতের কাতর বেদনার সুর ভাসিয়া উঠিতে দেখিলেও যখন প্রতীকারের উপায় থাকে না, অথচ প্রতীকারের জন্য যখন মনটা আকুলি বিকুলি করিয়া উঠে, ঠিক তখন বিমলেন্দুর সেই অবস্থা হইয়াছিল। কিন্তু উপায় কি? সকল প্রণয়ীই অন্ধ। বিমলেন্দু যদি তখন কোন বাধা না মানিয়া ইভকে বুকে তুলিয়া লইত,তাহা হইলে এইখানেই এই উপন্যাস শেষ হইয়া যাইত। কিন্তু বিধিলিপি অন্যরূপ। ইভের মূর্ত্তি দেখিয়া বিমলেন্দুর সকল সাহস লোপ পাইল, সে জড়ের মত নিশ্চেষ্ট বসিয়া ভাবিতে লাগিল, কি অপরাধ করিয়াছে সে, যাহার জন্য ইভ তাহাকে আজ এই কঠিন শাস্তি দিল!

ইভ বিমলেন্দুর মুখের উপর স্থির দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিল, প্রতিমা তোমার কে?

ইভের মুখে চোখে এক বিন্দু দয়ার বা প্রেমের চিহ্ন ছিল না।

বিমলেন্দু এবারও চমকিত হইয়া বলিল, প্রতিমা? প্রতিমা?

ইভ ব্যঙ্গোক্তি করিয়া বলিল, হাঁগো হাঁ, প্রতিমা, এই যে দশবার বলছি প্রতিমা। শুনতে পেয়েছ নামটা?

যজ্ঞার্থ নীত পশুর কণ্ঠ হইতে যেমন কম্পিত স্বর নির্গত হয়, বিমলেন্দুর কণ্ঠস্বরও তেমনই কম্পিত হইল, সে বলিল, প্রতিমারা আমার আত্মীয়।

ঘৃণা ও ক্রোধে নাসারন্ধ্র স্ফীত করিয়া ইভ চীৎকার করিয়া উঠিল, ভণ্ড, মিথ্যুক! এখনও প্রবঞ্চনা? এখনও মিথ্যা? এই নাও পড়।

কথাটা বলিয়া ইভ নিমাইয়ের পত্রখানা বিমলেন্দুর বুকের উপর ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল। পথে হঠাৎ বিষধর সর্প দেখিলে পথিক যেমন চমকিত হইয়া উঠে, বিমলেন্দু তেমনই ভীত চমকিত হইল। তাহার দৃষ্টি পত্রের উপর নিবদ্ধ ছিল বটে, কিন্তু তাহার মনটা অন্যত্র চলিয়া গিয়াছিল। ইভ বলিয়া যাইতেছিল,—তুমি কি ভাব, তোমাদের মত আমাদেরও সমাজে নারী এমনই ক্রীতদাসী—একটা দুটো চারটে যটা ইচ্ছে তাদের ধরে ধরে নিজের সুখের জন্যে বিয়ে করে ঘরে পুরে রাখবে? জান, মনে করলে আজই তোমায় আমি বাইগামির অপরাধে পুলিসে ধরিয়ে দিতে পারি?

বিমলেন্দুর কম্পিত অঙ্গুলী হইতে পত্রখানা পড়িয়া গিয়াছিল, সেদিকে দৃষ্টি না রাখিয়া সে বিহ্বলচিত্তে বলিল, তাই কর ইভ, আমায় জেলে দাও, আমি মহা পাতকী—

ইভ বলিল, না, জেলে দেবো না, তা হলে তোমায়

শান্তি হবে না, আমার মত তুষানলে জলবে না, জেলে দেবো না।

বিমলেন্দু বলিল, তুষানল? ইভ, কি তুষানলে জলছ তুমি? এই বুকখানা যদি চিরে দেখাবার হত!

ইভ বলিল, থাক, আর অভিনয়ে কায নেই। এখন যা ব্যবস্থা করি শোন! তুমি যে ভাবছ, আমি বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলা এনে আমাদের বন্ধন ছিঁড়ে ফেলব, তা হবে না। আমায় এতটা বোকা ভেবো না। আমি তোমায় মুক্তি দেবো না—সমস্ত জীবন বন্ধনের ভেতরেই রাখবো। ভেবেছ কি বন্ধন ছাড়া পেলেই মনের লালসা চরিতার্থ করতে ছুটে যাবে? তা হবে না। আমি ইংরাজের মেয়ে, এত সহজে তোমায় নিষ্কৃতি দেবো না।

বিমলেন্দু বলিল, আমি নিষ্কৃতি চাই নি। চাইলেও পাই বা না পাই, তুমি যা মনে করছ তা হবে না। ভুল বুঝছো ইভ, প্রতিমা আমায় ঘৃণা করে।

ইভ বিস্মিত দৃষ্টি তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তুমি জানলে কি করে? আমি ত যতটা বুঝেছি, তাতে মনে হয়—

বাধা দিয়া বিমলেন্দু বলিল, না, না, তুমি জান না, আমি সব খুলে বল্‌ছি, ইভ, তা হলে সব বুঝতে পারবে।

ইভ বলিল, বুঝতে চাই নি। তোমাদের ভেতর যে সম্বন্ধই থাক, জানতেও চাই নি। আমার কথা এই, তোমায় আমায় যে সম্বন্ধ, তা বাইরে যেমন বজায় রয়েছে, তেমনই থাকবে, তবে ভেতরে তোমাতে আমাতে কেবল চেনা লোকের সম্বন্ধ রাখতে হবে, তার বেশী কিছু না। কেমন এতে রাজী আছ?

বিমলেন্দু এইবার কাতর কণ্ঠে বলিল, ইভ, ইভ! এত নিষ্ঠুর হচ্ছ কেন? মানুষের একটা অপরাধও কি ক্ষমার অতীত? আমি এই তোমায় ছুঁয়ে শপথ করছি, আমার সে নেশা কেটে গেছে। সত্যি বলছি, মোহ এসেছিল, কিন্তু যে মুহূর্তে প্রতিমা ঘৃণার সহিত প্রত্যাখ্যান করেছে, বলেছে তোমার কাছে বিশ্বাসঘাতক হলে আমার নরকেও স্থান হবে না, সেই মুহূর্ত হতে তার মোহ এই মন থেকে টেনে উপড়ে ফেলেছি। সে আমার সুখের শান্তি-প্রদীপ নয়—দুঃখের জলন্ত আগুন। ইভ আমায় ক্ষমা কর।

ইভ ক্ষণকাল বিমলেন্দুকে তাহার একখানা হাত ধরিয়া রাখিতে দিল, হয় ত তখন তাহার বাহ্যজ্ঞানও ছিল না। কিছুক্ষণ উদাস দৃষ্টিতে চিন্তার পর একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ইভ বলিল, কি বলছিলে, প্রতিমা তোমায় প্রত্যাখ্যান করেছে? তা হলে তুমি তার প্রণয় প্রার্থনা করেছিলে!

বিমলেন্দু নত মস্তকে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, হাঁ। আমি উন্মত্ত হয়েছিলুম।

ইভ সে কথা কানে না তুলিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিল, সে কি উত্তর দিলে?

বিমলেন্দু বলিল, বললুম ত সে বলেছিল, তোমায় ভালবাসতে, তোমার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করলে আমার নরকেও স্থান হবে না।

ইভ কেবল একটি ছোট্ট "হুঁ" বলিয়া গম্ভীর হইয়া রহিল। শেষে বলিল, ছি ছি, তুমি না পুরুষ মানুষ? এমন স্ত্রীকে ত্যাগ করেছ? ভণ্ড বিশ্বাসঘাতক! তুমি কি নারীকে ব্যথা দিতেই জন্মেছ? জান কি, কি শেল এই বুকে বিঁধেছে?

বলিতে বলিতে ইভ ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিয়া উঠিল! রুদ্ধ জল-স্রোত একবার নির্গমের পথ পাইলে সকল অন্তরায় ভাসাইয়া লইয়া চলিয়া যায়। ইভের সে কান্না আর থামে না। টেবলের উপর মুখ গুঁজিয়া সে কাঁদিতে লাগিল। সে কান্নার এক এক ফোঁটা জল যেন গলিত শীসকের মত বিমলেন্দুর হৃদয়ে গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। সে আর থাকিতে পারিল না। দুই হাতে ইভকে জড়াইয়া ধরিয়া অশ্রুবিগলিত নয়নে সকাতরে ডাকিল, "ইভ, ইভ!" কিন্তু সে কথা কেহ শুনিল না, বিমলেন্দু দেখিল, ইভ মূর্চ্ছিত হইয়া টেবিলের উপর লুটাইয়া পড়িয়াছে। আর যাহা দেখিল, তাহাতে ভয়ে তাহার প্রাণ উড়িয়া গেল। ইভের গাত্র হইতে আগুন ছুটিতেছিল, প্রবল জ্বরে ইভ আক্রান্ত হইয়াছিল।

[ক্রমশঃ।

প্রশান্ততটে প্রলয়-সূচনা

মহাচীনে বর্ত্তমানে যে সঙ্কট-সঙ্কুল অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে অনেকে অনুমান করিতেছেন যে, জগতের পরবর্ত্তী মহাযুদ্ধ দূর ভবিষ্যতে প্রশান্ত মহাসাগরে সংঘটিত না হইয়া অচির ভবিষ্যতে মহাচীনেই আরব্ধ হইবে। সাংহাই বন্দরে চীনা ছাত্র হত্যা ও তৎসম্পর্কে যে বিদেশী-বর্জ্জন কাণ্ড আরম্ভ হইয়াছে, উহাই সম্ভবতঃ এই প্রলয়-কাণ্ডের অনুসূচনা করিতেছে।

মহাচীনে সাধারণতন্ত্র শাসন প্রবর্ত্তিত হইবার পর হইতে এ যাবৎ চীনের সর্ব্বত্র শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয় নাই ; চীনের নানা বিভাগের শক্তিশালী সেনাপতিরা (War-lords) সার্ব্বভৌমত্ব লাভেচ্ছায় পরস্পর শক্তিপরীক্ষা করিয়া আসিতেছেন। উহার পরিচয়—পরলোকগত ডাক্তার সান-ইয়াত-সেন, চাঙ্গ-সো-লিন, উপেইফু, ফেঙ্গ-উসিয়াঙ্গ প্রভৃতি বিবদমান War lordদিগের পরস্পর সংঘর্ষেই পাওয়া যায়। এই সকল শক্তিশালী লোক চীনদেশে একটা নিত্য অশান্তি জাগাইয়া রাখিয়াছেন। সে সকল সংঘর্ষের পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

চীনের অশান্তির মূলে একটা বিষয় বিশেষ লক্ষ্য করিবার আছে। যখনই চীনের অভ্যন্তরে গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে, তখনই দেখা গিয়াছে, তাহার মূল সূত্র চীনের বাহিরে। আজ ৫০ বৎসর যাবৎ য়ুরোপীয় শক্তিরা চীনের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়া আসিতেছেন। বক্সার যুদ্ধের ফলে য়ুরোপীয়রা কিরূপে চীনে নিজ স্বার্থসিদ্ধি করিয়া লইয়াছিলেন, শান্তি প্রতিষ্ঠার ও ক্ষতিপূরণের ছলে তাঁহারা কিরূপে আত্মকলহের ফলে দুর্ব্বল চীনের বুকে ঝাঁকিয়া বসিয়াছেন, তাহা সকলে বিদিত আছে। গত ৩০ বৎসর যাবৎ মাঞ্চুরিয়া ও মঙ্গোলিয়া প্রদেশে রুসিয়া ও জাপান কিরূপে নিজ নিজ স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য Sphere of influence অর্থাৎ প্রভাবের ক্ষেত্র বর্দ্ধিত করিয়া আসিতেছেন, তাহাও কাহারও অবিদিত নহে। বর্ত্তমানে চীনে যে গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে, যাহাতে রুসিয়ান সোভিয়েটের সহিত চাঙ্গ-সো-লিনের মনোমালিন্য উপস্থিত হইয়াছে এবং যাহার ফলে অচির ভবিষ্যতে প্রশান্ততটে প্রলয় যুদ্ধের আশঙ্কা জাগিয়াছে, তাহারও মূলে মাঞ্চুরিয়া ও মঙ্গোলিয়ায় রুসিয়া ও জাপানের লোলুপ-দৃষ্টি নিহিত বলিয়া মনে হওয়া বিচিত্র নহে।

জেনারল চাঙ্গ-সো-লিন

প্রথমে চাঙ্গ-সো-লিনের সহিত রুসিয়ান সোভিয়েটের মনোমালিন্যের কথা বলা যাউক। চাঙ্গ-সো-লিন মাঞ্চুরিয়ার War-lord অথবা সর্ব্বেসর্ব্বা চীন সৈনিক-শাসনকর্ত্তা। পিকিনের খৃষ্টান Warlord ফেঙ্গ-উসিয়াঙ্গ যেমন ইংরাজের ঘোর বিপক্ষ,—ইংরাজ ব্যবসাদারকেই চীনের যত দুর্দ্দশার মূল বলিয়া মনে করেন, চাঙ্গ-সো-লিন তেমনই রুসিয়ান সোভিয়েটকে চীনের সর্ব্বনাশের মূল বলিয়া মনে করেন। এই হেতু ফেঙ্গ যেমন রুসিয়ার প্রিয়পাত্র, চাঙ্গ তেমনই ইংরাজের প্রিয়পাত্র। সুতরাং এই দুই চীন war-lord সম্পর্কে ইংরাজী বা রুসিয়ান কাগজে যে সমস্ত বিবরণ প্রকাশিত হয়, তাহা সকল সময়ে সত্যের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নহে—উভয় জাতির Propaganda work বা প্রচারকার্য্যের মধ্যে ধর্ত্তব্য। তবে মার্কিণ সংবাদপত্রের তথ্য এই সম্পর্কে অনেকটা বিশ্বাসযোগ্য, কেন না, মার্কিণ চীনের সম্পর্কে অনেকটা নিরপেক্ষ। তাহার কারণ, মার্কিণ চীনকে স্বাধীন রাখিতে চাহে ; রুসিয়া বা জাপান,—কেহ চীনের উপর প্রভুত্ব করে, ইহা মার্কিণের অভিপ্রেত নহে। ইহা মার্কিণের স্বার্থ, কারণ রুসিয়া—বিশেষতঃ জাপান প্রাচ্যে প্রশান্ত সাগরে প্রবল হয়, ইহা মার্কিণের অভিপ্রেত নহে। একখানা মার্কিণ কাগজে কিছুদিন পূর্ব্বে একটি ব্যঙ্গ-চিত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহার মর্ম্ম এইরূপ,—Uncle Sam (অর্থাৎ মার্কিণ) দুই হাত তুলিয়া আনন্দের সহিত বলিতেছে, কে কে চীনের স্বাধীনতা কামনা কর হাত তুল ; জন বুল (ইংরাজ), জাপান ও রুসিয়া,—সকলেই মুখ বাঁকাইয়া চোখ পাকাইয়া অপ্রসন্ন মুখে হাত নিম্নে রাখিয়া দাঁড়াইয়া আছে। এই ব্যঙ্গ-চিত্র হইতেই বুঝা যায়, মার্কিণের স্বার্থ, চীনের স্বাধীনতা রক্ষা করা।

যাহা হউক, মাঞ্চুরিয়া ও মঙ্গোলিয়ার দিকে রুসিয়া ও জাপান যে এতাবৎ পরদৃষ্টি দিয়া আসিয়াছে, তাহার প্রমাণের অভাব নাই। রুস জাপ যুদ্ধেই এসিয়ার প্রভুত্ব লইয়া রুসিয়া ও জাপানে বিবাদের অবসান হয় নাই। ঐ যুদ্ধের ফলে রুসিয়ার একটি বিরাট Pacific Empire প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন ভঙ্গ হইয়াছিল ; জাপান রুসিয়াকে দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়া হইতে স্থানচ্যুত করিয়াছিল, পরন্তু চীনের নিকট রুসিয়া লাওটাঙ্গ উপদ্বীপ এবং তত্রত্য রেলপথের যে পত্তনী লইয়াছিল, জাপান তাহার অবসান করিয়া দিয়াছিল। কিন্তু তাহা বলিয়া রুসিয়া কখনও মাঞ্চুরিয়ার অথবা প্রাচ্য-সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার আশা পরিত্যাগ করে নাই। রুসিয়ায় বিপ্লব হইল, রুসিয়ার জারের প্রভুত্ব ধ্বংস হইল, রুসিয়ায় সোভিয়েট প্রতিষ্ঠা হইল, কিন্তু এ সমস্ত পরিবর্ত্তনেও রুসিয়ার দৃষ্টি মাঞ্চুরিয়া হইতে কখনও ভ্রষ্ট হয় নাই। মার্কিণ প্রেসিডেণ্ট রুসভেল্ট এক সময়ে বলিয়াছিলেন,—"পোর্টসমাউথ সন্ধির ফলে কিছুকাল যুদ্ধ স্থগিত রহিল বটে, কিন্তু আমি ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া যাইতেছি যে, রুসিয়া আবার প্রশান্ত তটে ফিরিয়া আসিবে।" তাঁহার

ভবিষ্যৎ বাণী সফল হইয়াছে। বিশেষতঃ য়ুরোপের শক্তিপুঞ্জ রুসিয়াকে 'এক ঘরে' করিয়া রাখিয়াছেন, লোকার্ণো রফাতেও রুসিয়াকে স্থান দেন নাই, এই হেতু রুসিয়া প্রাচ্যে তাহার ভাগ্য অন্বেষণে আত্ম-নিয়োগ করিয়াছে, সমগ্র মধ্য এসিয়াকে তাহার বলশেভিক নীতিতে অনুপ্রাণিত করিয়াছে, এমন কি, চীনের খৃষ্টান সেনাপতি ফেঙ্গ-উসিয়াঙ্গকে বলশেভিক মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছে। প্রাচ্যে প্রবেশ-নীতি অনুসরণ করিয়া রুসিয়া সাইবিরিয়ার মরুপ্রান্তরেও ১ কোটির উপর রুসিয়ানকে বসবাস করাইয়াছে এবং আরও ১ কোটি রুসিয়ানকে বসবাস করাইবার সঙ্কল্প করিয়াছে।

অবশ্য ইহা বলাই বাহুল্য যে, জাপান রুসিয়ার এই প্রবেশ-নীতি আদৌ প্রীতির দৃষ্টিতে দেখে না। রুসিয়ার এই বিরাট জনসঙ্ঘ রুসিয়ান সোভিয়েটের সাহায্যে প্রাচ্য সমুদ্রোপকূল পর্য্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে, ব্যবসায়-বাণিজ্য হস্তগত করে, প্রসার প্রতিপত্তি লাভ করে, অথবা জলে স্থলে সামরিক শক্তি সঞ্চয় করিয়া প্রবল হয়,—জাপান তাহা আদৌ ইচ্ছা করে না। কাযেই টোকিও ও মস্কো সহরের প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনীতিকরা চীনের দাবার ছকে এ যাবৎ ক্রমাগত চাল ও প্রতিচাল দিয়া আসিতেছেন,—কে কাহাকে রাজনীতিক কৌশল-সমরে মাৎ করিতে পারেন। জার্ম্মাণ-যুদ্ধকালে জাপান, মার্কিণ ও অন্যান্য শক্তির সহিত একযোগে রুসিয়ার সাখেলিয়ান দ্বীপ ও ভলাডিভষ্টক বন্দর অধিকার করিয়া বৈকাল হ্রদ পর্য্যন্ত সমগ্র সাইবিরিয়া রুসিয়ার নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়াছিল। ইহা ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের ঘটনা। কিন্তু ১৯২০ খৃষ্টাব্দের বসন্তকালে মিত্র-শক্তিরা আপন আপন সৈন্য অপসারণ করিয়া লইলে পর রুসিয়ান সোভিয়েট আবার ধীরে ধীরে প্রাচ্যে আপন অধিকার পুনরুদ্ধার করিয়া লইল। এমন কি, রুসিয়ান সেনা মঙ্গোলিয়ার রাজধানী উর্গাও হস্তগত করিয়া লইয়াছিল।

তরবারি মুখে এতদূর অগ্রসর হইবার পর রুসিয়ান সোভিয়েট রাজনীতিক কৌশল অবলম্বন করিয়া চীনের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিল। তাহারা স্বীকার করিল যে, অতঃপর আর তাহারা জারের আমলের রুসিয়ান গভর্ণমেণ্টের অন্যায় দাবী পোষণ করিবে না, বরং—

(১) জারের আমলে অধিকৃত চীনের সমস্ত ভূমি তাহারা ছাড়িয়া দিবে,

(২) কোনও ক্ষতিপূরণ না লইয়া চীনের ইষ্টার্ণ রেল-লাইন চীনকে প্রত্যর্পণ করিবে,

(৩) বক্সার যুদ্ধকালে স্বীকৃত চীনের ক্ষতিপূরণের টাকার উপর দাবী ছাড়িয়া দিবে,

(৪) চীনের কোথাও রুসিয়ান প্রজার বিশেষ অধিকার রাখিবার জন্য জিদ করিবে না,

(৫) জারের রুসিয়ার সহিত চীনের যে সমস্ত অন্যায় সন্ধিসর্ত হইয়াছিল, অথবা চীনের বিপক্ষে জারের গবর্ণমেণ্টের জাপান বা অন্যান্য শক্তির সহিত যে সমস্ত গুপ্ত অন্যায় সন্ধি হইয়াছিল, সে সমস্ত সন্ধিই নাকচ করা হইবে,

(৬) রুসিয়া চীনের সহিত সকল বিষয়ে সমানের মত ব্যবহার করিবে।

চীন কখনও এতটা আশা করে নাই। বস্তুতঃ এতদিন তাহারা জাপান ও য়ুরোপীয় শক্তিপুঞ্জের নিকট যে ব্যবহার প্রাপ্ত হইয়া আসিয়াছে, তাহাতে এরূপ ন্যায়সঙ্গত, ধর্ম্মসঙ্গত সন্ধিতে সহসা বিশ্বাস করিতেই তাহার প্রবৃত্তি না হইবার কথা। কিন্তু যখন চীন দেখিল, রুসিয়ান সোভিয়েটের অভিসন্ধি ভাল, তাহাদের কথাও যে কাযও সে,—তখন চীন যথার্থই আনন্দে অধীর হইয়া রুসিয়ার সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিল—সে রুসিয়াকে যথার্থই তাহার মুক্তিদাতা বলিয়া মনে করিল। দেশ-প্রেমিক খৃষ্টান সেনাপতি ফেঙ্গ এই বন্ধুত্ব স্থাপনের প্রধান উদ্যোক্তা।

কিন্তু প্রাচ্যদেশ সমূহের দুর্ভাগ্যে কোথাও মীরজাফর জয়চাঁদের অভাব হয় না। পরশ্রীকাতরতা দেশ-প্রেমকেও ছাপাইয়া যায়। আমার দ্বারা যদি দেশ স্বাধীন না হয়, তাহা হইলে অপরের দ্বারা আমি হইতে দিব না,—এই নীতি প্রাচ্যে যতটা মান্য হইয়া আসিয়াছে, অন্যত্র বোধ হয় কোথাও তত হয় নাই। চাঙ্গ দেখিলেন, ফেঙ্গ যদি রুসিয়ান সোভিয়েটের সহিত এই ভাবে বন্ধুত্ব পাতাইয়া নিজের 'ঘর ছাইয়া লয়', তাহা হইলে দুই দিন পরে তিনি কোথায় থাকিবেন? তখনই তিনি সঙ্কল্প স্থির করিয়া ফেলিলেন। পূর্ব্ব হইতেই তিনি জাপানের সহিত 'বখরার' মাকুরিয়া ভোগ করিতেছিলেন। তিনি জানিতেন, জাপানের সহিত রুসিয়ার 'সদ্ভাব' কিরূপ; সুতরাং একবার জাপানকে ডাকিলেই হয়! জাপানও তাঁহার আহ্বানের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল। বলে,—'সেধো ভাত খাবি, না, আঁচাবো কোথা!' এইরূপে চীনের ভাগ্যাকাশে আবার এক বিরাট কলহের সূত্রপাত হইল।

জেনারেল ফেঙ্গ উসিয়াঙ্গ

জেনারল ফেঙ্গের দল কেন রুসিয়ার কথায় কর্ণপাত করিয়াছিলেন, তাহারও কারণ আছে। রুসিয়ার কথায় চীন কোনও কালেই আস্থা স্থাপন করে নাই, জাপান-চীন যুদ্ধ-কালে চীন রুসিয়াকে হাড়ে হাড়ে চিনিয়া লইয়াছিল। কিন্তু এ ক্ষেত্রে জারের রুসিয়া ছিল না, তাহার স্থানে এক নূতন রুসিয়ার উদ্ভব হইয়াছিল। এ রুসিয়া জগতে সকল জাতির সাম্যবাদ প্রচার করে,—প্রাচ্যজাতির সহিত সমানের মত ব্যবহার করে। অন্যান্য শ্বেতজাতি এমন নহে। মার্কিণের কথায় নাচিয়া চীন জার্ম্মাণ-যুদ্ধে জার্ম্মাণীর বিপক্ষে নামিয়াছিল—তাহার আশা ছিল, সন্ধির সময় তাহার কথাটাও শ্বেতবন্ধুরা ভাবিয়া দেখিবে, জার্ম্মাণ-অধিকৃত তাহার সাণ্টাং উপদ্বীপ তাহাকেই ফিরাইয়া দিবে। কিন্তু যুদ্ধাবসানে সন্ধির সময় যখন চীন দেখিল, তাহার শ্বেতবন্ধুরা যে যাহার নিজের কোলে সাধ্যমত ঝোল টানিয়া লইল, অথচ তাহাকে কিছু দিল না, বরং—

(১) সাণ্টাং জাপানকে দেওয়া হইল,

(২) তাহার দেশের অধিকৃত স্থানসমূহ যথাপূর্ব্ব শ্বেত জাতিরা দখল করিয়া রহিল,

(৩) বক্সার indemnity যথাপূর্ব্ব তাহার স্কন্ধে চাপিয়া রহিল,

(৪) শ্বেতগণের বিশেষ অধিকার, শ্বেত দূতাবাসের রক্ষিসেনা, শ্বেতগণের নিজস্ব ডাক, কাষ্টম, টারিফ রেট—এ সকলই যথাপূর্ব্ব বজায় রহিল। কাযেই রুসিয়া যখন চীনের সহিত সমানে সমানের ব্যবহারের কথা পাড়িল, তখন চীনা জনসাধারণ তাহাতে আনন্দিত না হইয়া পারে না।

রুসিয়া চীনের সহিত বস্তুতঃই সকল বিষয়ে সমানের ন্যায় ব্যবহার করিতে লাগিল। কিন্তু তাহা বলিয়া সে চীনের ইষ্টার্ণ

রেলের স্বত্ব চীনকে ছাড়িয়া দিলেও অপরের (অর্থাৎ জাপানের) তাহাতে কোনও অধিকার না থাকে, তাহা দেখিতে ভুলিল না। সুতরাং রুসিয়ান সোভিয়েট গভর্ণমেণ্টের পীড়াপীড়িতে চীন এ সম্বন্ধে একটা খোলাখুলি চুক্তি করিতে সম্মত হইল। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের ৩১শে মে তারিখে চীনের পররাষ্ট্র-সচিব বিখ্যাত রাজনীতিক মিঃ ওয়েলিংটন কু (খৃষ্টান চীনা) রুসিয়ার প্রথম সোভিয়েট দূত কারাখানের সহিত একযোগে একখানি সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করিলেন। এই সন্ধিপত্রের প্রধান সর্ত্ত দুইটি,—

(১) চীন সোভিয়েট গভর্ণমেণ্টকে রুসিয়ার প্রকৃত গভর্ণমেণ্ট বলিয়া স্বীকার করিলেন,

(২) রুসিয়া চীনের উপর তাঁহার সমস্ত দাবী ত্যাগ করার কথা পুনরপি পাকা করিয়া দিলেন।

কিন্তু এই দুইটি প্রধান সর্ত্ত হইলেও আসল সর্ত্ত হইল চীনের ইষ্টার্ণ রেল-লাইন লইয়া। স্থির হইল,—

(১) ৫ জন চীনা ও ৫ জন রুসিয়ান এই রেলের নিয়ামক Governing Board হইবেন,

(২) রেল পরিচালনের জন্য যে এক জন ম্যানেজার ও দুই জন সরকারী ম্যানেজার থাকিবেন, তাঁহাদের মধ্যে ম্যানেজার ও এক জন সহকারী ম্যানেজার রুসিয়ান থাকিবেন।

সুতরাং প্রকৃতপক্ষে রেল-লাইনের প্রভুত্ব রুসিয়ান সোভিয়েটের নিযুক্ত কর্ম্মচারীর হস্তেই ন্যস্ত রহিল।

জেনারল উপেইফু

অবশ্য পিকিংয়ের কর্ত্তৃপক্ষ জেনারল ফেঙ্গের পরামর্শমত এই সন্ধিপত্র সাক্ষর ও স্বীকার করিয়া লইলেন বটে, কিন্তু যে স্থানে এই ইষ্টার্ণ রেল-লাইন অবস্থিত, সেই মাঞ্চুরিয়ার পিকিংয়ের কর্ত্তৃত্ব ছিল না, সেখানে জেনারল চাঙ্গই সর্ব্বেসর্ব্বা। যখন তাঁহার নিজের মতের সহিত মিল হইত, তখন তিনি পিকিংয়ের কর্ত্তৃত্ব মানিতেন, অন্যথা পিকিংয়ের আদেশ অমান্য করিবার নিমিত্ত তাঁহার তরবারি সদাই উন্মুক্ত থাকিত। সুতরাং পিকিংয়ের বন্দোবস্ত মত তিনি মাঞ্চুরিয়ার রেল-লাইনে রুসিয়ার কর্ত্তৃত্ব মানিয়া লইতে চাহিলেন না। তাঁহার স্বার্থ জাপানের স্বার্থের সহিত জড়িত,—পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তিনি জাপানের creature, এইরূপ অনেকের সন্দেহ। মস্কো বা পিকিং কর্ত্তৃপক্ষ সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াও তাঁহাকে ঐ সন্ধি মানিয়া চলিতে বাধ্য করিতে পারিলেন না।

১৯২৪ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে চাঙ্গের সহিত পিকিংয়ের কর্ত্তৃপক্ষের যুদ্ধ বাধিল। একে জেনারল ফেঙ্গ প্রবল, তাহার উপর চাঙ্গের সহকারী সেনাপতি কুও সাঙ্গ-লিঙ্গ বিদ্রোহী,—কাযেই চাঙ্গ নরম হইয়া ঘোষণা করিলেন যে, অতঃপর তিনি তাঁহার মাঞ্চুরিয়া লইয়া থাকিবেন, পিকিংয়ের উপর লোভ করিবেন না। কিন্তু এ কথায় রুসিয়া ভুলিল না। রুসিয়া এই যুদ্ধকালে চাঙ্গের রাজত্বের উত্তর দিকে প্রভূত সৈন্য সমাবেশ করিল। চাঙ্গ দেখিলেন, সর্ব্বনাশ! দক্ষিণে ফেঙ্গের সেনা, উত্তরে রুসিয়ার সেনা, মাঝে পড়িয়া তিনি মারা যাইবেন। পরন্তু জাপানও সে সময়ে তাঁহাকে প্রকাশ্যে সাহায্য দান করিল না। কেন না, সে সময়ে রুসিয়ান সোভিয়েট গলাবাজী করিয়া সকল শক্তিকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছিলেন,—Hands off China! চাঙ্গ বিপদ বুঝিয়া মস্কোর সহিত পিকিংয়ের ইষ্টার্ণ রেল-সম্পর্কিত সন্ধি মানিয়া লইলেন।

জাপান নিশ্চেষ্ট ছিল না। সে যখন দেখিল, চাঙ্গের সব যায়, তখন সে ক্ষিপ্রগতি মাঞ্চুরিয়ার রাজধানী মুকডেন সহর অধিকার করিয়া বসিল। পাছে রুসিয়া মাঞ্চুরিয়ার রেল-লাইন দখল করে, এই জন্য জাপান এই চাল চালিল। মুকডেনে এখনও জাপ-সেনা বেশ পাকাপোক্ত আড্ডা গাড়িয়া বসিয়াছে। জাপানের এরূপ করিবার একটা কারণ পূর্ব্বেই বলিয়াছি। চাঙ্গের রুসিয়ার সহিত সন্ধিই ইহার মূল কারণ। কিন্তু ইহা ছাড়া আরও একটা বিশেষ কারণ ছিল। জাপান দেখিতেছিল যে, রুসিয়ান ভল্লুক ক্রমশঃ বন্ধুতার দোহাই দিয়া চীনে থাবা গাড়িয়া বসিতেছে। কেবল মাঞ্চুরিয়ায় নহে, মঙ্গোলিয়া প্রদেশেও রুসিয়ান সোভিয়েট আপনার কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে সোভিয়েট সেনা জার-পক্ষীয় রুসিয়ান সেনাপতি আঙ্গারেণের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া মঙ্গোলিয়ার রাজধানী উর্গা সহরে প্রবেশ করে। জার-পক্ষীয়রা পরাজিত ও বিধ্বস্ত হইবার পরেও কিন্তু সোভিয়েট সেনা মঙ্গোলিয়া ত্যাগ করে নাই। উর্গার রুসিয়ান-দূতাবাসে এক জন টাইপিষ্ট ছিল, তাহার নাম বোডো। এই বোডো তরুণ মঙ্গোলীয়গণকে লইয়া এক মন্ত্রিসভা গঠন করিল এবং মঙ্গোলিয়াকে চীন হইতে স্বতন্ত্র করিয়া এক সোভিয়েট সাধারণ-তন্ত্রে পরিণত করিল। বোডোকে গুপ্তভাবে সাহায্য করিবার কে রহিয়াছে, তাহা চীনের জানিতে বাকী ছিল না। রুসিয়ান সোভিয়েটের সেনা সহায় না হইলে বোডোর স্বাধীন মঙ্গোলিয়ান সোভিয়েট প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হইত না। কিন্তু চীন কি করিবে? তখন চীনের War-lordরা পিকিনের কর্ত্তৃত্ব লইয়া পরস্পর বিবাদে মত্ত। খৃষ্টান জেনারল ফেঙ্গ, তাঁহার উপরওয়ালা জেনারল উপেইফুকে পরাস্ত করিয়া তখন পিকিন অধিকারের জন্য ব্যস্ত। এ দিকে মাঞ্চুরিয়ার war-lord চাঙ্গ তাঁহাকে বাধা দিতে উদ্যত; কাযেই ফেঙ্গ 'সহজ' পথ ধরিলেন, রুসিয়ান সোভিয়েটের আশ্রয় লইলেন। মোটরকারে গোবী মরুভূমিতে যাত্রী পারাপার করা হইত। এখন যাত্রী পারাপার বন্ধ রাখিয়া ঐ সকল মোটর গাড়ীতে ক্রমাগত অস্ত্র শস্ত্র ও অন্যান্য রণসম্ভার রুসিয়ান সাইবিরিয়া হইতে জেনারল ফেঙ্গের সকাশে চালান হইতে লাগিল। কালগান এবং ডোলননগর নামক দুইটি সামরিক আড্ডায় এই সকল রণসম্ভার বাহিত হইতে লাগিল। চাঙ্গের পক্ষে এই সকল আড্ডা আক্রমণ করা সহজসাধ্য নহে বলিয়া ফেঙ্গ এই দুইটি আড্ডা মনোনীত করিয়াছিলেন। কেবল ইহাই নহে, রুসিয়ান সোভিয়েট মঙ্গোলিয়ায় ৫ হাজার রুসিয়ান সেনানীর অধীনে ৭০ হাজার মঙ্গোলিয়ান সেনাকে সুশিক্ষিত ও সুসজ্জিত করিতে লাগিলেন। উদ্দেশ্য, 'চাঙ্গ' ফেঙ্গকে আক্রমণ করিলেই মঙ্গোলিয়া হইতে এই সৈন্য সাহায্য অতি সত্বর প্রেরণ করা হইবে।

ক্যাণ্টনেও সোভিয়েটের প্রভাব বিস্তৃত হইতেছিল। সেখানে Congress of Chinese peasants অথবা চীন কৃষক সম্মেলন এক বিরাট প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছিল। তাহাদের মূলনীতি তাহাদের বড় বড় বিজ্ঞাপনে প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহাতে তাহাদের রুসিয়ান সোভিয়েট নীতির অনুকরণের পরিচয় ছিল।

সাংহাই সহরে যখন বিরাট চীন ধর্ম্মঘট হয়, তখন মস্কো সোভিয়েট, ধর্ম্মঘট কমিটিকে ৩০ হাজার রুবল মুদ্রা সাহায্যার্থ প্রেরণ করিয়াছিলেন।

জাপান এই সকল ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিতেছিল, সুতরাং যখন চাঙ্গ বাধ্য হইয়া সোভিয়েটের সহিত সন্ধি করিলেন, তখন জাপান নিজ স্বার্থরক্ষার জন্য মুকডেন অধিকার করিয়া বসিল।

কিন্তু চাঙ্গ সময়ের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। যে মুহূর্ত্তে তিনি আপনার ঘর গুছাইয়া লইয়া বিদ্রোহী জেনারল কুয়োকে পরাস্ত ও নিহত করিলেন, সেই মুহূর্ত্তে তিনি নিজ মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। এ বিষয়ে তাঁহার পরামর্শদাতারও অভাব ছিল না, কেন না, জাপান মুকডেন অধিকার করিয়া নিশ্চেষ্ট ছিল না। কাযেই চাঙ্গ পশ্চাতে সাহায্যের সাহস পাইয়া হঠাৎ চীনের ইষ্টার্ণ রেল-লাইন অধিকার করিয়া বসিলেন এবং রেলের রুসিয়ান জেনারল ম্যানেজার আই-ভ্যানফকে গ্রেপ্তার করিলেন। ইহার তলে তলে জাপান যে অবস্থান করিতেছিলেন, তাহা রুসিয়ার বুঝিতে বিলম্ব হয় নাই। কাযেই সোভিয়েট রুসিয়া রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া চাঙ্গকে সেই মুহূর্ত্তে আই-ভ্যানফকে মুক্তি দান করিতে আদেশ করিলেন, অন্যথা রুসিয়ান সোভিয়েট সেনা তদ্দণ্ডেই মাঞ্চুরিয়ায় প্রবেশ করিবে। চাঙ্গ দেখিলেন, এক দিকে তাঁহার শত্রু ফেঙ্গ তাঁহার সর্ব্বনাশ সাধনের জন্য প্রস্তুত হইয়া আছেন, অন্য দিকে রুসিয়ান সেনা মাঞ্চুরিয়া আক্রমণে উদ্যত। বোধ হয় জাপানও তাঁহাকে হঠাৎ রুসিয়ার সহিত যুদ্ধ বাধাইতে গোপনে নিষেধ করিল। কাযেই সকল দিক দেখিয়া-শুনিয়া চাঙ্গ আইভ্যানফকে মুক্তিদান করিয়াছেন। সোভিয়েট সরকার এখন চাঙ্গের নিকট দাবী করিয়াছেন, Exemplary satisfaction for a grave insult which is in unheard of violation of the agreement of 1924. চাঙ্গ কি satisfaction দেন, এখন তাহাই দেখিবার বিষয়।

ইহাই প্রাচ্যে প্রলয়ের প্রথম সূচনা। অবশ্য সোভিয়েটের সহিত চাঙ্গের এই বিবাদ আপোষে মিটিয়া যাইতে পারে, কিন্তু চিরদিনের জন্য এই বিবাদ মিটিবার নহে। রুসিয়া য়ুরোপে বাধা পাইয়া প্রাচ্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াছে, এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। আজ না হউক, দুই দিন পরে, পীতসাগরে রুসিয়ার ধ্বজ থাবা ডুবাইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই, কেন না, প্রাচ্য সমুদ্রে তাহার বাহির হওয়া চাই-ই। ভ্লাডিভষ্টক বন্দর বৎসরের প্রায় ৮ মাস কাল বরফ-সমুদ্রে আবদ্ধ থাকে, কাযেই দক্ষিণে পীত সমুদ্র ভিন্ন রুসিয়ার গতি নাই। রুসিয়া চীনকে সমান জ্ঞান করিয়া সকল অধিকার ছাড়িয়া দিয়াছে, চীনও এ জন্য কৃতজ্ঞ হৃদয়ে তাহাকে স্বরাজ্যে অনেক অধিকার দিতে পারে। কিন্তু চীন দিলে কি হয়, জাপান তাহা নীরবে সহ্য করিবে না, সে রুসিয়াকে প্রাচ্যে প্রবল হইতে দিতে পারে না। এ বিষয়ে ইংরাজ জাপানের সহায় হইতে পারেন। কিন্তু অন্য দিকে মার্কিণও জাপানকে প্রবল হইতে দিতে পারেন না। জাপান রুসিয়ান শক্তিকে খর্ব্ব করিয়া চীনে সর্ব্বেসর্ব্বা হয়, ইহা মার্কিণের অভিপ্রেত নহে, বরং মার্কিণ চীনকে স্বাধীন দেখিতে চাহেন। সুতরাং চীনের সমস্যা লইয়া অদূর ভবিষ্যতে জগতের প্রবল শক্তিপুঞ্জের যে ভীষণ সংঘর্ষ ঘটিবে, তাহার যথেষ্ট কারণ বিদ্যমান আছে।

জাপান যে মার্কিণকে প্রীতির দৃষ্টিতে দেখেন না, তাহার প্রমাণ বহুক্ষেত্রেই পাওয়া গিয়াছে। গত বৎসরের মাঝামাঝি মার্কিণের নৌবহর হাওয়াই দ্বীপে কুচকাওয়াজ করিয়াছিল, অষ্ট্রেলিয়ায় বন্ধুতা পাতাইয়া আসিয়াছিল। ইহাতে জাপানে কি বিরুদ্ধ সমালোচনাই না হইয়াছিল! তখন জাপানী সংবাদপত্র 'ককুমিন' বলিয়াছিল,—"It is a plot between two groups of the Anglo-Saxon race to weaken the fighting strength of the Japanese navy." এ কথা বলিবার হেতু যে একবারে ছিল না, তাহা নহে। সেই সময়ে কতকগুলি অষ্ট্রেলিয়ান সংবাদপত্র এই মার্কিণ নৌবহরের আগমনকে এমন বর্ণে চিত্রিত করিয়াছিল যে, তাহাতে জাপানের সন্দেহ না হওয়াই আশ্চর্য্য! একখানা অষ্ট্রেলিয়ান পত্রে এক চিত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। ঐ চিত্রে এক অষ্ট্রেলিয়ান সেনার পশ্চাতে এক প্রকাণ্ডকায় মার্কিণ গোলন্দাজ সেনাকে দণ্ডায়মান করান হইয়াছিল—সে যেন তাহার 'ছোট ভাইকে' রক্ষার্থ প্রস্তুত, আর উভয়ের সম্মুখে এক শত্রুকে অঙ্কিত করা হইয়াছিল,—তাহাকে দেখিলেই মনে হয় সে জাপানী! আর একখানা অষ্ট্রেলিয়ান কাগজে লেখা হইয়াছিল, "ইংরাজ যদি চীন সম্পর্কে জাপানের সহিত গুপ্তসন্ধি করেন, তাহা হইলে বড়ই অন্যায় করিবেন। ইহা দ্বারা ইংরাজ জাপানের হস্তে ক্রীড়নক হইবেন এবং কেবল যে মার্কিণ তাঁহাকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখিবেন তাহা নহে, অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা ও নিউজিলাণ্ডও দেখিবেন। জাপান চীনকে অধীন রাখিতে চাহে, মার্কিণ চীনকে স্বাধীন দেখিতে চাহে। এই হেতু ইংরাজের মার্কিণের পক্ষে যোগ দেওয়াই কর্ত্তব্য।" ইহার উপর অষ্ট্রেলিয়ার White Australia policy জাপান ও অন্যান্য এসিয়াবাসীর বহিষ্করণে যে সব আইন করিয়াছে, তাহাতে জাপান সহজেই সন্দেহ করিতেছেন যে, মার্কিণে ও অষ্ট্রেলিয়ায় জাপানের বিপক্ষে একই প্রকার বহিষ্করণ আইন দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, উভয়ের মধ্যে গোপনে জাপানের বিপক্ষে ষড়্‌যন্ত্র চলিতেছে।

সুতরাং সকল দিক দিয়া বিবেচনা করিলে বুঝা যায় যে, এখনই যে জাতিগত বিদ্বেষের ফলে জাপানে-মার্কিণে প্রশান্ত মহাসাগরে কালসংঘর্ষ উপস্থিত হইবে, এমন কিছু নিশ্চয়তা নাই; তবে চীনের নানা war-lordsএর স্বার্থসংঘর্ষের সংস্পর্শে জগতের প্রবল শক্তিপুঞ্জ আকৃষ্ট হইলে তখন প্রশান্ততটে যে প্রলয়াগ্নি জ্বলিয়া উঠিবে, তাহাতে জগৎ-সংসার ভস্মীভূত হইবে। সে সংঘর্ষের কথা মনে করিতেও আতঙ্কে শরীর শিহরিয়া উঠে—তাহার তুলনায় জার্ম্মাণ যুদ্ধ বালকের কলহ বলিয়া মনে হইবে। সে সংঘর্ষে জাতিসঙ্ঘের মধ্যে বোঝাপড়া হইয়া যাইবে—বহুকালের সঞ্চিত ক্রোধ, দ্বেষ, হিংসার মীমাংসা ঐখানেই হইয়া যাইবে। সে দিনের যে অধিক বিলম্ব আছে, তাহা ত মনে হয় না।

পুষ্পের মরণ

খসিয়া পড়িল যবে একটি কুসুম
নিভৃতে— দিবস শেষে—বিশ্রামের ঘুম
কাহার' ত আঁখি হ'তে টুটিল না হায়,
একটু বেদনা নাহি জাগিল ধরায়।
তখন জড়ায়ে ছিল শেষ গন্ধটুকু
তার ক্ষুদ্র বক্ষঃপুটে—যে আনন্দটুকু
বিলাত' সে ভালবেসে মর্ত্ত্যের মানবে—
প্রবলে দুর্ব্বলে নিত্য দেবতা দানবে।

ঐ কি দিগন্তে তার জ্বলিতেছে চিতা?
কিংবা নিখিলের কবি—বিশ্ব-রচয়িতা
লিখিছেন নিজ করে সুবর্ণ-অক্ষরে
পুষ্পের মরণ-গাথা অম্বরে অম্বরে!

—সে যে আজ চলে' গেছে, ফুটে আছে চুপে
স্রষ্টার চরণতলে শতদল রূপে!

শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়।

জাতিতত্ত্ব

২
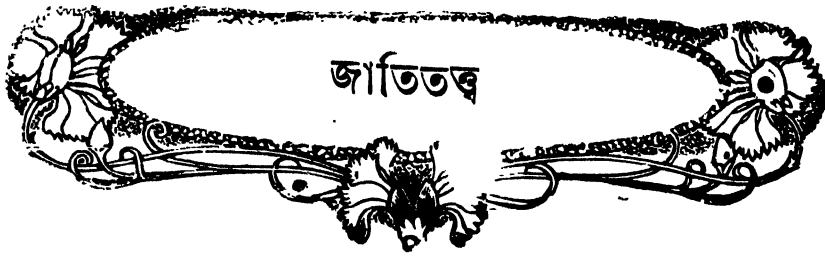
৫। বৈদ্য প্রশ্ন—(ক) "দ্বিজেষু বৈদ্যাঃ শ্রেয়াংসঃ" (মহা, উদ্,৫ অঃ) অর্থাৎ দ্বিজদিগের মধ্যে বৈদ্যগণই শ্রেষ্ঠ।

(খ) "অব্রাহ্মণাঃ সন্তি তু যে ন বৈদ্যাঃ" (ঐ ২৭ অঃ) অর্থাৎ বৈদ্যগণই প্রকৃত ব্রাহ্মণপদবাচ্য, অপর ব্রাহ্মণরা ব্রাহ্মণ নামের অনধিকারী।

(গ) "সর্ব্ববেদেষু নিষ্ণাতঃ সর্ব্ববিদ্যাবিশারদঃ। চিকিৎসাকুশলশ্চৈব স বৈদ্যস্ত্বভিধীয়তে ॥ বিপ্রান্তে বৈদ্যতাং যান্তি রোগদুঃখপ্রণাশকাঃ ॥" (উশনঃ-সংহিতা) অর্থাৎ সর্ব্ববেদজ্ঞ ও সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ ব্রাহ্মণ চিকিৎসায় নিপুণ হইলে বৈদ্য নামে অভিহিত হয়েন। যে বিপ্র রোগজনিত দুঃখ নাশ করেন, তিনিই বৈদ্য নাম পাইয়া থাকেন।

(ঘ) "স্বয়মর্জ্জিতমবৈদ্যেভ্যো বৈদ্যঃ কামং ন দদ্যাৎ" (গৌতম-সংহিতা) অর্থাৎ বৈদ্য অবৈদ্যকে স্বোপার্জ্জিত ধন দান করিবেন না।

(ঙ) "নাবিদ্যানান্তু বৈদ্যেন দেয়ং বিদ্যাধনং ক্বচিৎ" (কাত্যায়ন-সংহিতা) অর্থাৎ বৈদ্য কখনও বিদ্যাহীনকে বিদ্যার্জ্জিত ধন দান করিবেন না।

বক্তব্য—'প্রবোধনী'-লেখক বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্ব সমর্থনের জন্য প্রথমেই পূর্ব্বোক্ত শ্রৌত প্রমাণ দেখাইয়া, এই স্মার্ত্ত প্রমাণগুলিই দেখাইয়াছেন।

(ক) তিনি "অন্ধহস্তিন্যায়ে" মহাভারতীয় দুইটি শ্লোকের একাংশমাত্র তুলিয়া উহাদের অপরূপ অনুবাদ করিয়াছেন।

উদ্‌যোগপর্ব্বের প্রারম্ভেই আছে—শ্রীকৃষ্ণ প্রস্তাব করিলেন যে, পাণ্ডবদিগকে অর্দ্ধরাজ্য প্রত্যর্পণ করিবার জন্য ধৃতরাষ্ট্রের নিকট এক জন সুদক্ষ দূত প্রেরণ করা হউক। সেই কথা শুনিয়া দ্রুপদ রাজা যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছিলেন—আমার পুরোহিতকে ধৃতরাষ্ট্রের নিকট পাঠান এবং কি বলিতে হইবে, তাঁহাকে বলিয়া দিউন। এই বলিয়া দ্রুপদ স্বীয় পুরোহিতকে বলিলেন—

"ভূতানাং প্রাণিনঃ শ্রেষ্ঠাঃ প্রাণিনাং বুদ্ধিজীবিনঃ।
বুদ্ধিমৎসু নরাঃ শ্রেষ্ঠা নরেষ্বপি দ্বিজাতয়ঃ ॥
দ্বিজেষু বৈদ্যাঃ শ্রেয়াংসো বৈদ্যেষু কৃতবুদ্ধয়ঃ।
কৃতবুদ্ধিষু কর্ত্তারঃ কর্ত্তৃষু ব্রহ্মবাদিনঃ ॥
স ভবান্ কৃতবুদ্ধীনাং প্রধান ইতি মে মতিঃ।
কুলেন চ বিশিষ্টোঽসি বয়সা চ শ্রুতেন চ ॥
প্রজ্ঞয়া সদৃশশ্চাসি শুক্রেণাঙ্গিরসেন চ।
বিদিতঞ্চাপি তে সর্ব্বং যথাবৃত্তঃ স কৌরবঃ ॥"

—(উদ, ৬।১-৪)

নীলকণ্ঠের টীকা —"বৈদ্যাঃ বিদ্যাবন্তঃ। কৃতবুদ্ধয়ঃ সিদ্ধান্তজ্ঞাঃ।"

শ্লোকগুলির অনুবাদ—সমস্ত পদার্থের মধ্যে প্রাণীরা শ্রেষ্ঠ, প্রাণীদিগের মধ্যে বুদ্ধিমান্‌রা শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধিমান্‌দিগের মধ্যে মনুষ্যরা শ্রেষ্ঠ, মনুষ্যদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণরা শ্রেষ্ঠ, ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে বিদ্যাবান্‌রা শ্রেষ্ঠ, বিদ্যাবান্‌দিগের মধ্যে সিদ্ধান্তজ্ঞেরা শ্রেষ্ঠ, সিদ্ধান্তজ্ঞদিগের মধ্যে তদনুসারে কার্য্যকারীরা শ্রেষ্ঠ, উক্ত কার্য্যকারীদিগের মধ্যে ব্রহ্মবাদীরা শ্রেষ্ঠ। আপনি সিদ্ধান্তজ্ঞদিগের মধ্যে প্রধান, ইহা আমার জানা আছে। তদুপরি আপনি কুলে, বয়সে ও বিদ্যাতেও শ্রেষ্ঠ। আপনি বুদ্ধিতে শুক্র ও বৃহস্পতির সদৃশ। দুর্য্যোধনের যেরূপ চরিত্র, তৎসমস্তই আপনার জানা আছে।

পৌরোহিত্য অর্থাৎ যাজন কেবলমাত্র ব্রাহ্মণেরই কার্য্য (মনু, ১০।৭৫-৭৭); সুতরাং দ্রুপদ রাজার পুরোহিত ব্রাহ্মণই ছিলেন। এ বিষয়ে মহাভারতও পুনঃ পুনঃ সাক্ষ্য দিয়াছে। যথা :—

পূর্ব্বোক্ত শ্লোকগুলির পূর্ব্বে যুধিষ্ঠিরের প্রতি দ্রুপদের উক্তিতে আছে—

"অয়ঞ্চ ব্রাহ্মণঃ শীঘ্রং মম রাজন্ পুরোহিতঃ।
প্রেষ্যতাং ধৃতরাষ্ট্রায় বাক্যমস্মৈ সমর্প্যতাম্ ॥"

—(উদ, ৪।২৬)

ঐ পুরোহিত ধৃতরাষ্ট্রের সভায় তীব্র উক্তি প্রয়োগ করিলে, ভীষ্ম তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—

"ভবতা সত্যমুক্তন্তু সর্ব্বমেতন্ন সংশয়ঃ।
অতিতীক্ষ্ণন্তু তে বাক্যং ব্রাহ্মণ্যাদিতি মে মতিঃ॥"

—(উদ্, ২০।৪)

দ্রৌপদীস্বয়ংবরসভায় অর্জ্জুন কর্ত্তৃক লক্ষ্যবেধের পর পাণ্ডবরা স্বীয় আবাসে প্রস্থান করিলে, তাঁহাদের পরিচয় লইবার জন্য দ্রুপদ রাজা ঐ পুরোহিতকে পাঠাইয়াছিলেন। যুধিষ্ঠির ভীমকে তাঁহার যথাবিধি অভ্যর্থনা করিবার উপদেশ প্রদান করিলে,

"ভীমস্ততস্তৎ কৃতবান্নরেন্দ্র,
তাঞ্চৈব পূজাং প্রতিগৃহ্য হর্ষাৎ।
সুখোপবিষ্টন্তু পুরোহিতং তদা
যুধিষ্ঠিরো ব্রাহ্মণমিত্যুবাচ॥"

—(আদি, ১৯৩।২২)

অতএব "দ্বিজেষু বৈদ্যাঃ শ্রেয়াংসঃ" ইহা দ্বারা "দ্বিজদিগের মধ্যে বৈদ্যগণই শ্রেষ্ঠ" কিরূপে বুঝা গেল ?

(খ) যুদ্ধের উদ্‌যোগ দেখিয়া ধৃতরাষ্ট্রপ্রেরিত সঞ্জয় যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছিলেন—

আপনি পরম ধার্ম্মিক হইয়াও এবং কখনও কোনও অধর্ম্ম না করিয়াও, এক্ষণে রাজ্যলোভে স্বজন ও গুরুজনদিগের বিনাশরূপ ঘোর অধর্ম্মকার্য্যে কিরূপে প্রবৃত্ত হইতেছেন ? ইহাতে আপনাকে নিন্দাভাজন হইতে হইবে, ইহা কি বুঝিতেছেন না ? তদুত্তরে যুধিষ্ঠির বলিয়াছিলেন—আমি ধর্ম্ম করিতেছি, কি অধর্ম্ম করিতেছি, তাহা বিচারপূর্ব্বক বুঝিয়া, তাহার পর আমাকে তিরস্কার করিবেন। আপৎকালে ধর্ম্মাধর্ম্মের ব্যতিক্রম করা শাস্ত্রেরই উপদেশ। যথা :—

"মনীষিণাং সত্ত্ববিচ্ছেদনায়
বিধীয়তে সৎসু বৃত্তিঃ সদৈব।
অব্রাহ্মণাঃ সন্তি তু যে ন বৈদ্যাঃ
সর্ব্বোৎসঙ্গং সাধু মন্যেত তেভ্যঃ॥"

—(উদ্, ২৮।৬)

নীলকণ্ঠটীকা—"মনীষিণাং মনসো নিগ্রহং কর্ত্তুমিচ্ছতাং, সত্ত্ববিচ্ছেদনায় সত্ত্বস্য বুদ্ধিসত্ত্বস্য চিদাত্মনা সহ একীভূতস্য বিচ্ছেদনায়...পৃথক্করণায়, সৎসু সতাং গৃহেষু, বৃত্তিঃ জীবিকা শাস্ত্রে বিধীয়তে। আত্মান্বেষণায় সর্ব্বসন্ন্যাসপূর্ব্বকং ভিক্ষাচর্য্যবিধানাৎ তেষাং ব্রাহ্মী বৃত্তিঃ কস্যাপি ন নিন্দ্যা। যে তু অব্রাহ্মণা অপি বৈদ্যাঃ বিদ্যানিষ্ঠাঃ ন ভবন্তি, তেষাং ভিক্ষাচর্য্যস্য অবিধানাৎ, তেভ্যঃ তেষামর্থে সর্ব্বোৎসঙ্গং ··স্বধর্ম্মসংযোগম্ আপদনাপদোঃ উচিতং সাধু মন্যেত।"

সরলার্থ—যাঁহারা সর্ব্বত্যাগপূর্ব্বক চিদাত্মার সহিত চিত্তসংযোগ করিতে ইচ্ছুক, অনশনক্লেশে ঐ চিত্তসংযোগের পাছে বিচ্ছেদ ঘটে, তজ্জন্য তাঁহারা সৎ জাতির গৃহে ভিক্ষা করিতে পারেন। এই ভিক্ষারূপ ব্রহ্মচারিধর্ম্ম অবলম্বন করিলে, তাঁহারা কাহারও নিন্দনীয় হইবেন না। পরন্তু যাহারা অব্রাহ্মণ (অর্থাৎ ক্ষত্রিয়াদি) হইয়াও বৈদ্য (অর্থাৎ আত্মবিদ্যানিষ্ঠ) নহে, তাহাদের ভিক্ষাচর্য্যের বিধান না থাকায়, কি আপৎকালে, কি অনাপৎকালে স্বধর্ম্মপালন করা উচিত মনে করিবে।

এতাবতা "অব্রাহ্মণাঃ সন্তি তু যে ন বৈদ্যাঃ" ইহার অর্থ—"বৈদ্যগণই প্রকৃত ব্রাহ্মণপদবাচ্য; অপর ব্রাহ্মণরা ব্রাহ্মণ নামের অনধিকারী" কিরূপে দাঁড়াইল ?—ঐরূপ অর্থ হইলে শ্লোকটির পূর্ব্বাপর অর্থ-সঙ্গতি কিরূপে ঘটে ? সঞ্জয় বলিলেন,—"আপনি পরম ধার্ম্মিক হইয়া কিরূপে অধর্ম্ম করিতে যাইতেছেন ?" যুধিষ্ঠির তাহার উত্তর দিলেন,—"বৈদ্যগণই প্রকৃত ব্রাহ্মণপদবাচ্য, অপর ব্রাহ্মণরা ব্রাহ্মণ নামের অনধিকারী।" ইহা কি অবি-সংবাদিনী ব্যাখ্যা ? * বৈদ্যই যদি প্রকৃত ব্রাহ্মণপদবাচ্য, তাহা হইলে "ব্রাহ্মণ" বলিলে লোকে বৈদ্যকে বুঝে না কেন ? বৈদ্যরা নিজেই বা বুঝেন না কেন ? তাঁহারা আপনাদিগকে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিতে কেবল "ব্রাহ্মণ" না বলিয়া, তাহার পূর্ব্বে "বৈদ্য" বিশেষণ যোগ করেন কেন ? তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত "বৈদ্য-ব্রাহ্মণ-সমিতি"ই ত ইহার জাজ্বল্যমান উদাহরণ।

(গ) "সর্ব্ববেদেষু নিষ্ণাতঃ" ইত্যাদি উশনোবচনে ব্রাহ্মণ চিকিৎসকেরই লক্ষণ উক্ত হইয়াছে; বৈদ্যের লক্ষণ

* কেহ কেহ বলেন,—"যে মহাভারতে 'দ্বিজেষু বৈদ্যাঃ শ্রেয়াংসঃ' (ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে বৈদ্যগণই শ্রেষ্ঠ) এবং 'অব্রাহ্মণাঃ সন্তি তু যে ন বৈদ্যাঃ' (বৈদ্যগণই প্রকৃত ব্রাহ্মণ, অপর ব্রাহ্মণরা ব্রাহ্মণই নহে) আছে, সে মহাভারতে 'চাণ্ডালো ব্রাত্য বৈদ্যো চ' কথা থাকিতেই পারে না। উহা কাহারও কল্পিত।" তাঁহারা এখন কি বলিতে চাহেন ?—লেখক।

নহে। 'প্রবোধনী'-লেখকের স্বকৃত অনুবাদেই তাহা প্রকাশ পাইতেছে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, প্রাচীনতম কালে (যখন অম্বষ্ঠজাতির উৎপত্তি হয় নাই, তখন) ব্রাহ্মণরাই চিকিৎসক ছিলেন; বর্ত্তমান কালেও বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ চিকিৎসক আছেন।

(ঘ) অবৈদ্যকে ও মূর্খকে স্বোপার্জ্জিত ধন ও বিদ্যাধন দান করা বৈদ্যদিগের পক্ষে নিষিদ্ধ হওয়াতেই বৈদ্যরা ব্রাহ্মণ, এই কথাটা—অমুক স্থানের দাতব্য চিকিৎসালয়টা যখন কোনও অস্পৃশ্যজাতীয়ের টাকাতেই চলিতেছে, তখন সে জাতি অস্পৃশ্য হইতে পারে না,—এই কথারই অনুরূপ।

বৈদ্যরা কি এতই দাতা যে, আপামর সকলকে স্বোপার্জ্জিত ধন দান করিয়া সর্ব্বস্বান্ত হইবে ভাবিয়া, বৈদ্যেতর দেব-দ্বিজকেও এবং অনশনক্লিষ্ট দীনদরিদ্রকেও এক কপর্দ্দকও দিও না বলিয়া গৌতম তাঁহাদিগকে সাবধান করিয়া গিয়াছেন?

স্মার্ত্তমাত্রেই জানেন, গৌতমবচনের অর্থ—বৈদ্য (অর্থাৎ বিদ্যাবান্ ব্যক্তি) অবৈদ্যকে (অর্থাৎ বিদ্যাহীন দায়াদকে) স্বোপার্জ্জিত ধনের অংশ দিবে না।

(ঙ) "বৈদ্য কখনও বিদ্যাহীনকে বিদ্যার্জ্জিত ধন দান করিবেন না" কাত্যায়নবচনের এই অর্থ হইলে বুঝিতে হয় যে, বৈদ্য ভিন্ন আর সকলেই বিদ্যাহীনকে বিদ্যাধনের অংশ দিবে।—তাহাই কি ঠিক? মন্বাদি শাস্ত্রকারগণ ত সাধারণের জন্যই ব্যবস্থা করিয়াছেন—স্বোপার্জ্জিত ধনের ও বিদ্যালব্ধ ধনের বিভাগ নাই। যথা:—

"বিদ্যাধনন্তু যদ্ যস্য তৎ তস্যৈব ধনং ভবেৎ।"

—(মনু, ৯।২০৬)

"অনাশ্রিত্য পিতৃদ্রব্যং স্বশক্ত্যাপ্নোতি যদ্ধনম্।
দায়াদেভ্যো ন তদ্দদ্যাদ্ বিদ্যালব্ধঞ্চ যদ্ভবেৎ॥"

—(ব্যাস) ইত্যাদি।

"উপন্যস্তে তু যল্লব্ধং বিদ্যয়া পণপূর্ব্বকম্।
বিদ্যাধনন্তু তদ্ বিদ্যাদ্ বিভাগে ন নিয়োজয়েৎ॥"

ইত্যাদিরূপ বিদ্যাধনের লক্ষণ করিয়া, তার পরেই কাত্যায়ন বলিয়াছেন—

"নাবিদ্যানান্তু বৈদ্যেন দেয়ং বিদ্যাধনং কচিৎ।
সমবিদ্যাধিকানান্তু দেয়ং বৈদ্যেন তদ্ধনম্॥"

প্রাচীন স্মার্ত্তদিগের ব্যাখ্যানুসারে রঘুনন্দন দায়তত্ত্বে উহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন—

"তন্ত্রোচ্চারিতবিদ্যাপদম্ উভাভ্যাং সম্বধ্যতে। তেন সমবিদ্যাঽধিকবিদ্যানাং ভাগঃ, ন তু ন্যূনবিদ্যাঽবিদ্যয়োঃ। বৈদ্যেন বিদুষা।...এবমেব দায়ভাগমদনপারিজাতাদয়ঃ।"

অতএব উক্ত বচনের অর্থ—বিদ্যাবান্ ব্যক্তি অল্পবিদ্য ও বিদ্যাহীনকে বিদ্যাধনের অংশ দিবে না। পরন্তু সমবিদ্য ও অধিকবিদ্যদিগকে দিবে।

৬। **বৈদ্য প্রশ্ন**—বশিষ্ঠ, ধন্বন্তরি, চন্দ্র প্রভৃতি বৈদ্য ছিলেন। ইঁহারা যে ইদানীন্তন বৈদ্যগণের কুল ও গোত্রপ্রবর্ত্তক—তাহা বৈদ্যগণের সুবিদিত। যথা—

(ক) "ততঃ প্রকৃতিমান্ বৈদ্যঃ পিতুরেষাং পুরোহিতঃ।
বশিষ্ঠো ভরতং বাক্যমুত্থাপ্য তমুবাচ হ॥"

—(রামা, অযো, ৭৭ অঃ)

(খ) "ক্ষীরোদমথনে বৈদ্যো দেবো ধন্বন্তরির্হ্যভূৎ।
বিভ্রৎ কমণ্ডলুং পূর্ণমমৃতেন সমুত্থিতঃ॥"

—(গরুড় পুঃ)

(গ) চন্দ্রোঽমৃতময়ঃ শ্বেতো বিধুর্বিমলরূপবান্।
যজ্ঞরূপো যজ্ঞভাগী বৈদ্যো বিদ্যাবিশারদঃ॥"

—(বৃঃ ধর্ম্ম পুঃ)

বক্তব্য—যে-যে স্থানে যত বৈদ্য শব্দ আছে, সকলের অর্থই কি "জাতিবৈদ্য" ধরিতে হইবে? তাহা হইলে ত ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর—আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত—সকলকেই বৈদ্য বলিতে হয়। যে হেতু মহাদেবের "বৈদ্যনাথ" নাম ত প্রসিদ্ধ; তদুপরি তাঁহার সহস্রনামের মধ্যে আছে—

(ঘ) "উদ্ভিৎ ত্রিবিক্রমো বৈদ্যো বিরজো নীরজোঽমরুঃ।"

(মহা, অনু, ১৭।১৪৮)

(ঙ) বিষ্ণুসহস্রনামে আছে—

"বেদ্যো বৈদ্যঃ সদাযোগী বীরহা মাধবো মধুঃ।"

—(ঐ ১৪৯।৩১)

(চ) বটুকভৈরবের স্তবে তাঁহার অষ্টোত্তরশতনামের মধ্যে আছে—

"সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদো বৈদ্যঃ প্রভবিষ্ণুঃ প্রভাববান্।"

(ছ) পাণ্ডবদিগকেও বৈদ্য বলিতে হয়। যে হেতু,

কুন্তী স্বীয় পুত্রদিগের দুর্দ্দশায় দুঃখিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন—

"তে তু বৈশ্যাঃ কুলে জাত্বা অবৃত্ত্যা তাত পীড়িতাঃ।"
—(মহা, উদ্, ১৩২।২৭)

(জ) মহর্ষি বাল্মীকি আদিকবি, সুতরাং কবিরাজ। অতএব তিনিও বৈদ্য।

(ঝ) 'প্রবোধনী'-লেখকের মতে বশিষ্ঠ যখন বৈদ্য, তখন তাঁহার পুত্র শক্তি, শক্তির পুত্র পরাশর, পরাশরের পুত্র বেদব্যাসকে ত বীজপ্রভাবে খাঁটি বৈদ্যই বলিতে হয়।

(ক) ব্রহ্মার মানসপুত্র, সূর্য্যবংশের পুরোহিত বশিষ্ঠ জাতিতে বৈদ্য ছিলেন, এ কথা শুনিলে হাস্য সংবরণ করা যায় না। যাজনকার্য্যে ব্রাহ্মণ ভিন্ন আর কাহারও অধিকার নাই। যথা :—

"অধ্যাপনমধ্যয়নং যজনং যাজনং তথা।
দানং প্রতিগ্রহশ্চৈব ষট্ কর্ম্মাণ্যগ্রজন্মনঃ॥
ত্রয়ো ধর্ম্মা নিবর্ত্তন্তে ব্রাহ্মণাৎ ক্ষত্রিয়ং প্রতি।
অধ্যাপনং যাজনঞ্চ তৃতীয়শ্চ প্রতিগ্রহঃ॥
বৈশ্যং প্রতি তথৈবৈতে নিবর্ত্তেরন্নিতি স্থিতিঃ।
ন তৌ প্রতি হি তান্ ধর্ম্মান্ মনুরাহ প্রজাপতিঃ॥"
(মনু, ১০।৭৫-৭৮)

অধ্যয়ন, অধ্যাপন, যজন, যাজন, দান ও প্রতিগ্রহ—এই ছয়টি ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম। ক্ষত্রিয়ের পক্ষে তন্মধ্যে অধ্যাপন, যাজন ও প্রতিগ্রহ নিষিদ্ধ। বৈশ্যের পক্ষেও সেইরূপ।

অতএব বৈশ্য হইতে বৈশ্যাগর্ভজাত সাক্ষাৎ বৈশ্যেরই যখন যাজনবৃত্তি নিষিদ্ধ, তখন ব্রাহ্মণ হইতে বৈশ্যাগর্ভজাত বৈশ্যধর্ম্মা অম্বষ্ঠের এবং শূদ্র হইতে বৈশ্যাগর্ভজাত শূদ্রধর্ম্মা বৈদ্যের ত কথাই নাই। প্রাচীনকাল হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত কোনও অম্বষ্ঠ ও বৈদ্যকে যাজনকার্য্য করিতে কেহ কখনও দেখেও না ও শুনেও না।

বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণত্বলাভের জন্য কেন কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন, তাহা আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা প্রায় সকলেই জানে। মহাভারতীয় আদিপর্ব্বের ১৭৫ অধ্যায়ের বর্ণনা সংক্ষেপে উদ্ধৃত করিতেছি। ইহা পাঠ করিলেই জানিতে পারিবেন,—বশিষ্ঠ বৈদ্য ছিলেন, কি ব্রাহ্মণ ছিলেন।

বহু-সৈন্যসংবলিত বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের কামধেনু নন্দিনীকে পাইবার ইচ্ছায় তদ্বিনিময়ে এক অর্ব্বুদ ধেনু বশিষ্ঠকে দিতে চাহিয়াছিলেন। বশিষ্ঠ তাহাতে অসম্মতি প্রকাশ করিলে বিশ্বামিত্র তাঁহাকে বলিয়াছিলেন,—

"ক্ষত্রিয়োঽহং ভবান্ বিপ্রস্তপঃস্বাধ্যায়সাধনঃ।
ব্রাহ্মণেষু কুতো বীর্য্যং প্রশান্তেষু ধৃতাত্মসু॥"

আমি ক্ষত্রিয়, আপনি ব্রাহ্মণ; ব্রাহ্মণের প্রতি বল-প্রয়োগ কাহারও উচিত নহে।

কিন্তু আপনি যখন এক অর্ব্বুদ গাভী লইয়া একটি গাভী দিতে চাহিতেছেন না, তখন অগত্যা আমি স্বধর্ম্মানুসারে বলপূর্ব্বক উহা লইয়া যাইব। এই বলিয়া বিশ্বামিত্র হরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলে নন্দিনী কাতর নয়নে বশিষ্ঠের দিকে চাহিয়া রহিল। তখন বশিষ্ঠ তাহাকে বলিলেন,—

"হ্রিয়সে ত্বং বলাদ্ ভদ্রে বিশ্বামিত্রেণ নন্দিনি।
কিং কর্ত্তব্যং ময়া তত্র ক্ষমাবান্ ব্রাহ্মণোঽস্ম্যহম্॥"

বিশ্বামিত্র তোমাকে বলপূর্ব্বক লইয়া যাইতেছেন, আমি কি করিতে পারি। আমি যে ক্ষমাশীল ব্রাহ্মণ।

"ক্ষত্রিয়াণাং বলং তেজো ব্রাহ্মণানাং ক্ষমা বলম্।
ক্ষমা মাং ভজতে যস্মাদ্ গম্যতাং যদি রোচতে॥"

ক্ষত্রিয়ের তেজই বল, ব্রাহ্মণের ক্ষমাই বল। সেই ক্ষমা আমাকে আশ্রয় করিয়া আছে। তোমার ইচ্ছা হয়, তুমি গমন কর।

তখন নন্দিনী আপন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হইতে বহু সৈন্যের সৃষ্টি করিয়া তাহাদের দ্বারা বিশ্বামিত্রের অমিত সৈন্যকে পরাস্ত করাইল। ব্রহ্মতেজের এই আশ্চর্য্য প্রভাব দেখিয়া বিশ্বামিত্র বলিলেন,—

"ধিগ্ বলং ক্ষত্রিয়বলং ব্রহ্মতেজো বলং বলম্।"

ক্ষত্রিয়ের বলে ধিক্, ব্রহ্মতেজোরূপ বলই পরম বল।

এই বলিয়া তিনি রাজ্যৈশ্বর্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক কঠোর তপস্যার প্রভাবে,—

"ততাপ সর্ব্বান্ দীপ্তৌজা ব্রাহ্মণত্বমবাপ্তবান্।"

সর্ব্বলোককে তাপিত করিয়া ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

উক্ত শ্লোকে বশিষ্ঠের বিশেষণ যে বৈদ্য আছে, রামানুজ

তাহার অর্থ করিয়াছেন,—"বৈদ্যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ। সর্ব্বজ্ঞভিষজৌ বৈদ্যৌ ইতি কোষঃ।" (বৈদ্য-সর্ব্ববিদ্যাভিজ্ঞ)।

(খ) ধন্বন্তরি নামে অনেক ব্যক্তি ছিলেন—সমুদ্র-মন্থনে উৎপন্ন এক ধন্বন্তরি; কাশিরাজের পুত্র দীর্ঘতমাঃ, তৎপুত্র এক ধন্বন্তরি; বিক্রমাদিত্যের নবরত্নসভার এক ধন্বন্তরি; ইত্যাদি। তাঁহাদের মধ্যে কেহ জাতিতে বৈদ্য থাকিলেই বা তাহাতে ইষ্টোপপত্তি কি? পরন্তু গরুড়পুরাণ হইতে যে সমুদ্রমথনোদ্ভূত ধন্বন্তরির উল্লেখ করা হইয়াছে, তিনি নারায়ণের অংশ। যথা,—

"অথোদধের্ম্মথ্যমানাৎ কাশ্যপৈরমৃতার্থিভিঃ।
উদতিষ্ঠন্মহারাজ পুরুষঃ পরমাদ্ভুতঃ॥

* * * *

স বৈ ভগবতঃ সাক্ষাদ্ বিষ্ণোরংশাংশসম্ভবঃ।
ধন্বন্তরিরিতি খ্যাত আয়ুর্ব্বেদদৃগিজ্যভাক্॥"

(ভাগবত ৮।৮।৩১-৩৫)

তিনি ঐরাবতাদির ন্যায় অযোনিসম্ভব; সুতরাং জাতিতে বৈদ্য ছিলেন না। সমুদ্রগর্ভে ত আর বৈদ্য জাতির বাস ছিল না যে, তিনি তদ্বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া সমুদ্র হইতে উঠিয়াছিলেন। "রোগহারী" অর্থে গরুড়পুরাণে তাঁহাকে বৈদ্য বলা হইয়াছে।

(গ) বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে চন্দ্রস্তবে চন্দ্রকে যে বৈদ্য বলা হইয়াছে, তাহা ওষধির অধিপতি চন্দ্র ওষধি দ্বারা রোগ-প্রতীকারক বলিয়া (১ সংখ্যায় প্রদর্শিত "ওষধয়ঃ সংবদন্তে সোমেন সহ রাজ্ঞা" ইত্যাদি ঋক্ দ্রষ্টব্য)।

(ঘ) মহাদেবসহস্রনামে যে "বৈদ্য" শব্দ আছে, নীলকণ্ঠ তাহার অর্থ করিয়াছেন,—

"বৈদ্যঃ বিদ্যাবান্।"

(ঙ) বিষ্ণুসহস্রনামে বৈদ্য শব্দের শাঙ্কর ভাষ্য,—"সর্ব্ববিদ্যানাং বেদিতৃত্বাৎ বৈদ্যঃ।"

(চ) বটুকস্তবেও বৈদ্য শব্দের ঐরূপ অর্থ।

(ছ) মহাভারতে কুন্তী পাণ্ডবদিগকে যে বৈদ্য বলিয়াছিলেন, তাহার অর্থ নীলকণ্ঠের টীকায়—"বৈদ্যাঃ বিদ্যাবন্তঃ।"

অতএব দেখা যাইতেছে, তাঁহার উদ্ধৃত স্মার্ত্ত বচনগুলির মধ্যে কোনটিতেই বৈদ্য শব্দের অর্থ জাতিবৈদ্য নহে।

বৈদ্যদিগের শক্তি, বশিষ্ঠ প্রভৃতি গোত্র আছে বলিয়াই যদি তাঁহারা তত্তদ্‌গোত্রসম্ভূত ব্রাহ্মণ হন, তাহা হইলে কায়স্থদিগের গর্গ, গৌতম, ভরদ্বাজ ইত্যাদি এবং তেলী, তামলী, কামার, কুমার প্রভৃতিরও কাশ্যপ, শাণ্ডিল্য, ভরদ্বাজ ইত্যাদি গোত্র থাকায় তাঁহারাও কি ব্রাহ্মণ? বৈদ্যদিগের চন্দ্র গোত্র থাকায় তাঁহাদিগকে দেবতাও ত বলা যাইতে পারে। এই জন্যই বোধ হয় (চন্দ্র গগনচারী বলিয়া) "অম্বষ্ঠঃ খচরো বৈদ্যঃ" এই প্রবাদটা প্রচলিত আছে,—যাহাকে লক্ষ্য করিয়া 'প্রবোধনী'-লেখক লিখিয়াছেন,—"কেহ বা বৈদ্যগণকে 'জারজ' অথবা 'বর্ণসঙ্কর' কিংবা 'অজাত' বলিয়া গালি দেয়।" পরন্তু মহাভারতের প্রামাণ্যে (১ সংখ্যায় বৈদ্য শব্দের ৩য় অর্থ দ্রষ্টব্য) বৈদ্য বলিয়া যখন একটা জাতি আছে, তখন বৈদ্যকে 'অজাত' বলিয়া আমরাও স্বীকার করি না।

গোত্র সম্বন্ধে স্মৃতিনিবন্ধকারদিগের অভিমত নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে। রঘুনন্দন উদ্বাহতত্ত্বে লিখিয়াছেন,—

"বংশপরম্পরাপ্রসিদ্ধমাদিপুরুষব্রাহ্মণরূপং গোত্রম্। রাজন্যবিশাং প্রাতিস্বিকগোত্রাভাবাৎ পুরোহিতগোত্র-প্রবরৌ বেদিতব্যৌ। শূদ্রস্য তু, বৈশ্যবচ্ছৌচকল্পশ্চেতি মনুবচনে চকারসমুচ্চিতগোত্রেঽপি বৈশ্যধর্ম্মাতিদেশাৎ পুরোহিতগোত্রভাগিত্বং প্রতীয়তে।"

অর্থাৎ প্রত্যেক বংশের আদিপুরুষভূত ব্রাহ্মণকেই গোত্র বলে। সুতরাং ব্রাহ্মণ ভিন্ন আর কোনও বর্ণেরই গোত্র সম্ভবে না। অথচ বিবাহাদি-ধর্ম্মকর্ম্মানুষ্ঠানে সর্ব্ববর্ণেরই গোত্রোল্লেখ শাস্ত্রাদিষ্ট হওয়ায় ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের স্বস্ব গোত্রের অভাব হেতু পূর্ব্বপুরুষীয় পুরোহিতদিগের গোত্রই তাহাদের গোত্র জানিবে।

৭। বৈদ্য প্রঃ—আয়ুর্ব্বেদকে যখন পুণ্যতম বেদ বলা হইয়াছে (যথা,—"তস্যায়ুষঃ পুণ্যতমো বেদো বেদবিদাং মতঃ"—চরক, সূত্র, ১ অঃ), তখন এই বেদের ও অন্যান্য শাস্ত্রের অধ্যাপক ব্রাহ্মণ ভিন্ন কে হইতে পারে?

বক্তব্য—"প্রবোধনী"-লেখকের মতে আয়ুর্ব্বেদ যখন বেদ, বেদের অধ্যাপক যখন ব্রাহ্মণ ভিন্ন আর কেহ হইতে পারে না এবং বৈদ্যই যখন সেই আয়ুর্ব্বেদের অধ্যাপক, তখন বৈদ্য সুতরাং ব্রাহ্মণ।

পূর্ব্বেই (১ সংখ্যায়) দেখাইয়াছি, আয়ুর্ব্বেদ বেদ

নহে (উপবেদ)। সুশ্রুতেও আছে,—"ইহ খল্বায়ুর্ব্বেদো নাম যদুপাঙ্গমথর্ব্ববেদস্য।" সুশ্রুত ত্রৈবর্ণিককেই আয়ুর্ব্বেদের অধ্যাপক বলিয়াছেন এবং শূদ্রেরও আয়ুর্ব্বেদাধ্যয়নের বিধি দিয়াছেন (৪ সংখ্যায় দ্রষ্টব্য)। আয়ুর্ব্বেদ বেদ হইলে শূদ্রের অধ্যয়ন করিবার এবং তাহাকে তদধ্যয়ন করাইবার বিধি থাকিত না।

'প্রবোধনী'-লেখক নিশ্চিতই স্বয়ং বৈদ্য এবং বৈদ্য-শাস্ত্রের অধ্যেতা ও অধ্যাপক; কিন্তু ঐ শাস্ত্রে যে তাঁহার সম্যক্ ব্যুৎপত্তি জন্মে নাই, তাহার পরিচয় পাওয়া যাই-তেছে। ব্যুৎপত্তি জন্মিলে, "তস্যায়ুষঃ পুণ্যতমো বেদঃ" ইহার অর্থ "আয়ুর্ব্বেদ পুণ্যতম বেদ" কখনই লিখিতেন না। চরকে—

"হিতাহিতং সুখং দুঃখমায়ুস্তস্য হিতাহিতম্।
মানঞ্চ তচ্চ যত্রোক্তমায়ুর্ব্বেদঃ স উচ্যতে॥"

এইরূপ আয়ুঃ ও আয়ুর্ব্বেদের লক্ষণ করিয়া তৎপরেই বলা হইয়াছে,—

"তস্যায়ুষঃ পুণ্যতমো বেদো বেদবিদাং মতঃ।
বক্ষ্যতে যন্মনুষ্যাণাং লোকয়োরুভয়োর্হিতঃ॥"

"তস্য আয়ুষঃ বেদঃ বক্ষ্যতে"—সেই আয়ুর বেদ অর্থাৎ আয়ুর্ব্বেদ ("অর্থেদশমূলীয়"-নামক এই সূত্রস্থানের ত্রিংশ অধ্যায়ে) বলা হইবে।

সুশ্রুত আয়ুর্ব্বেদ শব্দের ব্যুৎপত্তি করিয়াছেন,—"আয়ুরস্মিন্ বিদ্যতে, অনেন বা আয়ুর্বিন্দতীতি আয়ুর্ব্বেদঃ" (সূত্রস্থান) যাহাতে আয়ুর বিষয় আছে বা যাহার সাহায্যে আয়ুর জ্ঞান হয়, অথবা দীর্ঘায়ু লাভ করে, তাহাকে আয়ুর্ব্বেদ বলে। 'প্রবোধিনী'-লেখকের "মহর্ষিকল্প গঙ্গা-ধর"ও ঐ শ্লোকের টীকায় লিখিয়াছেন,-"বিদ বিচারণে, বিদ লাভে, বিদ জ্ঞানে ইত্যেতেষু অর্থেষু বেদয়তি বিন্দতি বেত্তি বা অনেন অস্মিন্ বেতি বেদ ইতি সুশ্রুতানুসারিণঃ।" অতএব দেখা যাইতেছে, আয়ুর্ব্বেদকে বেদ কেহই বলেন নাই। উক্ত শ্লোকে বেদ শব্দের অর্থ,—সত্তা, বিচার, জ্ঞান বা লাভ ("বেদ" নহে)—আয়ুর্ব্বেদজ্ঞমাত্রেই ইহা জানেন। 'প্রবোধনী'-লেখকের সে জ্ঞানের অভাবই পরি-লক্ষিত হইতেছে।

৮। **বৈদ্য গ্রন্থ**—জয়ানন্দ চক্রবর্ত্তি-কৃত প্রাচীন বৈষ্ণবগ্রন্থ "চৈতন্যমঙ্গলে"ও লিখিত আছে,—

"বৈদ্যব্রাহ্মণ যত নবদ্বীপে বৈসে।
মহোৎসব করে সবে মনের হরিষে॥"

এখানে বৈদ্য ও ব্রাহ্মণ এইরূপ অর্থ করিলেও পূর্ব্বে বৈদ্যের উল্লেখ থাকায় বৈদ্যেরই শ্রেষ্ঠত্ব সূচিত হইতেছে। অদ্যাপি বহু স্থানেই বহু বৈদ্য-সন্তান "বৈদ্য ব্রাহ্মণ" বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়া থাকেন এবং অন্যান্য জাতিরা অনেক স্থলেই বৈদ্যগণকে "বদ্দি বামুন" বলেন।

বক্তব্য—'প্রবোধনী'-লেখক "অভ্যর্হিতঞ্চ" (দ্বন্দ্ব-সমাসে শ্রেষ্ঠপদার্থবোধক পদের প্রাগ্ভাব হয়) এই পাণিনীয় বার্ত্তিক সূত্র অনুসারে, "চৈতন্যমঙ্গলে" বৈদ্যব্রাহ্মণ থাকায়, বৈদ্যকে ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন। এইরূপ বলায় বৈদ্য ও ব্রাহ্মণের পার্থক্যই সূচিত হইতেছে; সুতরাং "বৈদ্য-গণই প্রকৃত ব্রাহ্মণপদবাচ্য, অপর ব্রাহ্মণরা ব্রাহ্মণ-নামের অনধিকারী" তাঁহার এই স্বীয় উক্তি ব্যাহত হইয়া পড়ি-তেছে। পরন্তু বাঙ্গালা ভাষায় সর্ব্বত্র সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম খাটে না। এইজন্যই কায়েত-বামুন, ধোপা-নাপিত, কাক-কোকিল, মুড়ি-মিছরি ইত্যাদি পদ বাঙ্গালায় বহুল প্রচলিত। সংস্কৃতেও উক্ত নিয়মের ব্যভিচার দেখা যায়। যথা,—

"গন্ধর্ব্বামরসিদ্ধকিন্নরবধূ" (বাল্মীকিকৃত গঙ্গাষ্টক) "ব্রহ্মেশগুহবিষ্ণুনাং" (চণ্ডী), "যাদোরত্নৈরিবার্ণবঃ" (কালিদাস) ইত্যাদি।

তজ্জন্যই "বাসুদেবার্জ্জুনাভ্যাং বুন্" এই পাণিনিসূত্রের ভাষ্যের উপর তত্ত্ববোধিনীকার লিখিয়াছেন,—

"তদপ্যনিত্যং শ্বযুবমঘোনামিত্যাদিলিঙ্গাৎ ইত্যবধেয়ম্।" অর্থাৎ যদিও ভাষ্যকার প্রসঙ্গক্রমে লিখিয়াছেন যে, অর্জ্জুন অপেক্ষা অভ্যর্হিত বলিয়া উক্ত সূত্রে বাসুদেবের প্রাগ্ভাব হইয়াছে, তথাপি ঐ সূত্রের কার্য্য অনিত্য জানিবে; যে হেতু সূত্রকার স্বয়ং "শ্বযুবমঘোনামতদ্ধিতে" এই সূত্রে প্রথ-মেই শ্বন্ (কুক্কুর), তার পর যুবন্ এবং তার পর মঘবন্ (ইন্দ্র) ধরিয়াছেন। অতএব শ্বন্-মঘবন্এর ন্যায় বৈদ্য-ব্রাহ্মণ বলাও চলিতে পারে।

"বহু স্থানেই বহু বৈদ্যসন্তান বৈদ্যব্রাহ্মণ বলিয়া আত্ম-পরিচয় দিয়া থাকেন" ইহা দ্বারা বুঝা যাইতেছে—সর্ব্বত্র

সর্ব্ববৈদ্য ঐরূপ আত্মপরিচয় দেন না। ইহাও বৈদ্যের ব্রাহ্মণেতরত্বের একটা কারণ নয় কি? পরন্তু আত্মপরিচয়-দান প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। যে হেতু, অনেক অন্ত্যজও ব্রাহ্মণ বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়া অনেকের বাটীতে রন্ধনকার্য্য করে।

ইতর লোক যাহার গলায় পইতা দেখে, তাহাকেই "বামুন" মনে করে। এই জন্য তাহারা ভাটবামুন, আচাজ্জি বামুন, ছেত্তিরবামুন, বদ্দিবামুন ইত্যাদি বলিয়া থাকে।

৯। বৈদ্য প্রঃ—মন্বাদি স্মৃতির মতে একমাত্র ব্রাহ্মণেরই উপনয়নে কার্পাসসূত্রময় উপবীত, মৌঞ্জী মেখলা, বিল্ব বা পলাশ দণ্ড ও কৃষ্ণসারচর্ম্ম ধারণের বিধি আছে (মনু, ২।৪২-৪৪)। বৈদ্যগণকে চিরদিন ব্রাহ্মণোচিত বিধি অনুসারেই উপনীত করা হয়। বৈশ্যোচিত মেষলোমের উপবীত বা শণতন্তুময়ী মেখলা প্রভৃতি দেওয়া হয় না। বৈদ্য ব্রহ্মচারী ভিক্ষাগ্রহণকালে অন্য ব্রাহ্মণ-বালকের মতই "ভবতি ভিক্ষাং দেহি" বলিয়া থাকেন। বৈশ্যোচিত উপনয়ন হইলে "ভিক্ষাং দেহি ভবতি" বলিবার ব্যবস্থা হইত (মনু, ২।৪৯)। অতএব ব্রাহ্মণোচিত উপনয়ন-সংস্কার দ্বারাও বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্বই প্রতিপন্ন হইতেছে।

বক্তব্য—(বৈদ্যরা অম্বষ্ঠ হইতে পৃথক্—পরে ১৪ সংখ্যায় 'প্রবোধনী'-লেখকের সিদ্ধান্ত দ্রষ্টব্য) অনুলোমজ বলিয়া অম্বষ্ঠের বৈশ্যোচিত উপনয়ন-সংস্কার আছে বটে; কিন্তু প্রতিলোমজ বলিয়া বৈদ্যের উপনয়ন-সংস্কারই নাই, ব্রাহ্মণোচিত কার্পাসোপবীতাদির কথা "শিরো নাস্তি শিরোব্যথা"র ন্যায়। বৈদ্যগণকে যে "চিরদিন ব্রাহ্মণোচিত বিধি অনুসারে উপনীত করা হয়," সে চিরদিনটা কত কাল হইতে?—আর্ষ যুগ হইতে, না রঘুনন্দনের সময় হইতে, অথবা "ঋষিকল্প গঙ্গাধর, উমেশচন্দ্র, প্যারীমোহন প্রভৃতি বৈদ্যকুলে আবির্ভূত" হইবার পর হইতে? বৈদ্য ব্রহ্মচারীকে ব্রাহ্মণোচিত "ভবতি ভিক্ষাং দেহি" বলিয়া ভিক্ষা করিবার ব্যবস্থা কে দিয়াছেন?—কোনও প্রাচীন স্মৃতিনিবন্ধকার, না "ঋষিকল্প গঙ্গাধর" প্রভৃতি কিংবা পত্রলেখক "স্মার্ত্তপ্রবর"গণ?

মনু ব্রাহ্মণের পক্ষেই কার্পাসোপবীত বিধান করিলেও সর্ব্বদেশের ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও অম্বষ্ঠগণ পুরুষানুক্রমে কার্পাসোপবীতই ধারণ করেন, ইহা সকলেরই প্রত্যক্ষ। তাঁহারা ব্রাহ্মণবৎ মেখলাদণ্ডাদিও ধারণ করিয়া থাকেন। যে হেতু, ত্রৈবর্ণিকের কার্পাসোপবীতাদিও শাস্ত্রবিহিত। যথা গোভিল—"অলাভে বা সর্ব্বাণি সর্ব্বেষাম্" অর্থাৎ ব্রাহ্মণাদি ব্রহ্মচারীর বসনাদি সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া যাহা যাহা বলা হইল, তাহাদের অপ্রাপ্তিতে সকলেই একপ্রকার বসনাদি ব্যবহার করিতে পারে। অতএব ইহা দ্বারা বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্ব সুপ্রতিপন্ন না হইয়া সুব্যাপন্নই হইতেছে।

১০। বৈদ্য প্রঃ—বৈদ্যের প্রতিগ্রহাধিকার। রামায়ণে দেখা যায়, ভগবান্ রামচন্দ্র ভরতকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—

"কচ্চিদ্ বৃদ্ধাংশ্চ বালাংশ্চ বৈদ্যমুখ্যাংশ্চ রাঘব।
দানেন মনসা বাচা ত্রিভিরেতৈর্ব্বিভূষসে ॥"
—(অযো, ১০০ সর্গ)

অর্থাৎ হে রাঘব, তুমি বৃদ্ধ, বালক ও শ্রেষ্ঠ বৈদ্যদিগকে অর্থদান, মঙ্গলজিজ্ঞাসা ও প্রিয়বাক্য দ্বারা সন্তুষ্ট রাখিতেছ ত?

ভূমিদান সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দান। ব্রাহ্মণ ভিন্ন আর কেহই ভূমিপ্রতিগ্রহ করিতে অধিকারী নহেন। পূর্ব্বকালের বৈদ্য পণ্ডিতগণকে প্রদত্ত বহু ব্রহ্মোত্তর জমী এখনও বহু স্থলেই বর্ত্তমান আছে।

বক্তব্য—রামচন্দ্রের ঐরূপ প্রশ্ন করাতেই যদি বৈদ্যের প্রতিগ্রহাধিকার সিদ্ধ হয় এবং ঐরূপ প্রতিগ্রহাধিকার থাকাতেই যদি বৈদ্য ব্রাহ্মণ হয়, তাহা হইলে উক্ত শ্লোকে সামান্যতঃ "বৃদ্ধান্" ও "বালান্" থাকায় সর্ব্বজাতীয় বৃদ্ধ ও বালককেও ব্রাহ্মণ বলিতে হয়। পূর্ব্বকালে বহু হিন্দু ভূম্যধিকারী তাঁহাদের বাটীতে দুর্গোৎসবাদি উপলক্ষে প্রতিমা গড়িবার জন্য কুমারকে, ফুল যোগাইবার জন্য মালীকে, পরিচর্য্যা করিবার জন্য নাপিতকে, ঢাক বাজাইবার জন্য মুচিকে এবং যাত্রা করিবার জন্য অধিকারীদিগকে জমী দিয়া রাখিয়াছেন। তাহাদের বংশাবলী অদ্যাপি ঐ সকল ভূমি ভোগদখল করিতেছে। তাই বলিয়া তাহারাও কি ব্রাহ্মণ?

ফলের তারতম্য থাকিলেও ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণ—আচণ্ডাল-সকল জাতিকেই দান করিবার বিধি আছে। যথা:—

"সমমব্রাহ্মণে দানং দ্বিগুণং ব্রাহ্মণব্রুবে।
প্রাধীতে শতসাহস্রমনন্তং বেদপারগে ॥"
—(মনু, ৭।৮৫)

(সম = সমফল অর্থাৎ যে দানের যে ফল উক্ত হইয়াছে, তাহাই)।

"সর্ব্বত্র গুণবদ্দানং শ্বপাকাদিষ্বপি স্মৃতম্।"

(বৃহস্পতি)

(গুণবৎ = ফলবৎ, শ্বপাক = চণ্ডাল)।

বস্তুতঃ উক্ত শ্লোকে যে "বৈদ্য" আছে, টীকাকারদিগের মতে তাহার অর্থ পূর্ব্ববৎ (৩ সংখ্যায় দ্রষ্টব্য) বিদ্যাবান্ বা চিকিৎসানিপুণ।

বনবাসকালে পাণ্ডবরা রাজর্ষি আর্ষ্টিষেণের আশ্রমে উপস্থিত হইলে, তিনি যুধিষ্ঠিরকে যে সকল প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তন্মধ্যেও ঐরূপ প্রশ্ন আছে। যথা :—

"কচ্চিৎ তে গুরবঃ সর্ব্বে বৃদ্ধা বৈদ্যাশ্চ পূজিতাঃ।"

—(মহা, বন, ১৫৯।৭)

নীলকণ্ঠের টীকা —"বৈদ্যাঃ বিদ্যয়া বিদিতাঃ॥"

[ক্রমশঃ।

শ্রীশ্যামাচরণ কবিরত্ন বিদ্যাবারিধি।

জেনারেল স্যারাইল

জেনারেল স্যারাইল

মেজর জেনারেল মরিস পল ইমানুয়েল স্যারাইল সিরিয়া দেশে ফরাসী হাই কমিশনার। ইনিই দামাস্কস-ধ্বংসে প্রধান নেতা। যখন জেনারেল ওয়েগাণ্ড ফরাসী হাই কমিশনাররূপে সিরিয়া শাসনে নিযুক্ত ছিলেন, তখন তিনি সিরিয়ার পার্ব্বত্য জাতিদিগের মধ্যে শান্তিপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই পার্ব্বত্য জাতিরাই ক্রমাগত ফরাসী অধিকারের মধ্যে আপতিত হইয়া বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করিতেছিল। তিনি ড্রুজ সর্দ্দার সুলতান পাশা আলট্রাসের সহিত সন্ধিস্থাপন করেন। জেনারেল ওয়েগাণ্ডের পূর্ব্ববর্ত্তী ফরাসী হাই কমিশনার ড্রুজ সর্দ্দার আলট্রাসকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। জেনারেল ওয়েগাণ্ড যখন আলট্রাসের সহিত সন্ধিস্থাপন করেন, সেই সময় তিনি উক্ত সর্দ্দারকে এইরূপ অঙ্গীকারে মুক্তি দেন যে, ভবিষ্যতে আলট্রাস তাঁহাদের সহিত শান্তিতে বাস করিবে। ইহা মাত্র এক বৎসর পূর্ব্বের কথা। তাহার পরই জেনারেল স্যারাইল হাই কমিশনার হইয়া আইসেন। জার্ম্মাণযুদ্ধকালে স্যারাইল সালোনিকায় ফরাসী সেনাদলে নেতৃত্ব করিয়াছিলেন, কিন্তু ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ফরাসী প্রধান মন্ত্রী ক্লিমেন্স তাঁহাকে পদচ্যুত করেন। জার্ম্মাণ-যুদ্ধের সমাপ্তি পর্য্যন্ত স্যারাইল কোনও সেনাদলে নেতৃত্ব করিতে পায়েন নাই। তাহার পর বার্দ্ধক্যের অজুহতে তাঁহাকে কর্ম্মক্ষেত্র হইতে অবসর দান করা হয়। হিরিয়ট গবর্ণমেণ্টের আমলে আবার তাঁহাকে সেনাদলে গ্রহণ করা হয়। জেনারেল স্যারাইল সিরিয়ায় উপস্থিত হইয়াই জেনারেল ওয়েগাণ্ডের প্রবর্ত্তিত শান্তিনীতির আমূল পরিবর্ত্তন করেন। ইহা হইতেই সিরিয়ায় যত গোলযোগের উদ্ভব হইয়াছে।

ড্রুজ সর্দ্দার সুলতান পাশা আলট্রাস

সুরধুনী

নমি সুরধুনী পতিতপাবনী তুমি সনাতনী সারাৎসারা
নমি মা অমলা, কমলাদয়িতচরণকমল-মধুর-ধারা।
তুমি তরলিত সৃজনকামনা, বিধি ভৃঙ্গার কুহর হ'তে,
কবে বাহিরিলে স্রষ্টার মহাযজ্ঞ ভস্ম ভাসায়ে স্রোতে।
সজীব রেখেছ পারিজাত বন, কনক রাজীব তোমাতে ফুটে
পুরন্দরের মন্দার বলি লভিলে ত্রিদিবে উর্ম্মিপুটে।
সুরললনার তনু-পরিমলে-সুরভি, শীতল বহিয়া বারি
মানবে তরিতে নেমেছ মহীতে বেদনা সহিতে দ্যুলোক ছাড়ি।
তুমি হরহরি-মিলন-মাধুরী ধারারূপ ধরি' মধুস্রবা
সুরলোক হ'তে পরিবহ পথে কল্লোলময়ী ক্ষণপ্রভা।
নারদ-বীণায় হরিনামামৃতে দর-প্রেমাশ্রু ধারায় পীনা
হরের অট্টহাস্যে ফেনিলা কভু বা পিঙ্গজটায় লীনা।
নীরস শুষ্ক সেই জটাজাল সরস করেছ হে রসময়ি,
বিনিময়ে নব তপোগৌরব লভেছ শিবের শীর্ষে রহি।
উমামুখ আর ললাট শশীর বিম্ব শতকে রচিয়া মালা
দুলালে হরের কণ্ঠে তরলা জুড়ালে তাহার গরল-জ্বালা।
শূলীর মৌলি-ফণীর মাণিকে সুষমা পেয়েছ কনক দেহে
হিমাচল তোমা পেলেছে বক্ষে শুভ্র মধুর তুষার স্নেহে।
পাষাণরাজের মর্ম্ম-উৎসে হরিয়া নিখিল বৎসলতা
তুমি বৎসলা জননী হয়েছ—বুঝিতে শিখেছ মোদের ব্যথা।
আছে দেবতার ধন্বন্তরি, তব মৃত্তিকা পেয়েছি মোরা
আমরা হারিনি পেয়েছি ও বারি, সুধার কলস ভরুক ওরা।

তুমি যোগধারা স্বর্গে মর্ত্তে, ইহ পরত্রে, দেবতা-নরে,
মহাপারাবারে মহামহীধরে, অমৃতে ও মৃতে আত্মাজড়ে
মুক্তিপথের সাধনা দিয়েছ ভারতে নিখিল বিরোধজয়ে
মহামিলনের নবীন স্বর্গ গড়েছ দ্বন্দ্ব সমন্বয়ে।
ভারত-দেহের প্রধান ধমনী, শোণিত-জীবন সঞ্চারিয়া
হৃদয়-পিণ্ড স্পন্দিত করি রেখেছ তাহারে সঞ্জীবিয়া
দু'টি বাহু-তট বিস্তার করি সৃষ্টির সেই আদিম প্রাতে
ভারতমাতার ইহসংসার গড়িলে হৃদয়-শোণিতপাতে।
কুশসঙ্কুল মরুদেশ হ'তে আর্য্যগণেরে আনিলে ডেকে
পালিলে ধাত্রী বটচূত ছায়ে মা'র মমতায় হৃদয়ে রেখে।
যোগায়েছ তুমি যজ্ঞের হবি, অমৃত অন্ন দিয়াছ হাসি
পরায়েছ ক্ষুমা-পট্টবসন, পূজায় দিয়েছ কুসুমরাশি।
তপোবন শত রচিয়াছ মাতঃ, হিমাচল হ'তে অঙ্গদেশ
তীর্থায়তনে মঠমন্দিরে ধরেছে অঙ্গে দণ্ডিবেশ।
শোভি শিলাতীর প্লক্ষ নমেরু শাল শাল্মলী খদির বটে
তুর্জ্জকাননে তুর্য্য-স্বননে ডেকেছ আর্য্যে আত্রতটে।
ভৃগু-ভার্গব অত্রিগালব চ্যবনসনক তাপসলোকে
হোমধূমে কেশ করিল সুরভি, ভস্মে কাজল পরাল চোখে,
কণ্ঠে তোমার বলাকার হার অলকের ভূষা তুষার মোতি,
হংস-মিথুন অঞ্চলে আঁকা, নয়নে তোমার উষার জ্যোতি।
মৃগমদোশীরসুরভি-শরীরা, কাশের চামরে বীজ্যমানা,
দেবদারু-বন ঘন কুন্তলে কুসুম-ভূষণ শোভিছে নানা।
সফেনোচ্ছল হাস্য তোমার অমৃতের সরনবীর মত
উল্লাস তব প্রপাতধারায় শিখর-নিকরে নৃত্যরত
আরতি তোমার মুক্ত জীবের চিন্তার আলোকে রাত্রিদিবা
ভারতী নিত্য নবীন সূক্তে বন্দনা গায় আনতগ্রীবা।

গিরীশজায়ার মুকুতার হার, স্তনকূট হ'তে ঝরিলে তুমি
সূত্র ছিঁড়িয়া সাগরাঞ্চলে, যার ধন সেই লইল চুমি'।
হরিপদাব্জ মৃণালিকা তুমি পঙ্কে পাবন করেছ নিজে,
ঊর্ম্মিপর্ণা মুক্তিলতিকা জনম তোমার ব্রহ্মবীজে।
তুমি কনখল মরুকঙ্কালে দিয়াছ পুণ্য নীলদ্যুতি
দক্ষরাজের রাজধানী যেথা মোক্ষ মিলায় যজ্ঞাহুতি।
জহ্নুর হোম-হবিতে পুষ্টা কপিলের কোপ প্রমার্জ্জনী,
তুমি অহল্যা-শাপ-পাপহরা, গৌতম-তপোবিবর্দ্ধনী।
দেশ দেশ হ'তে ভক্ত জনেরে মিলাইছ তুমি তীর্থঘাটে
কুম্ভমেলায় মিলালে ভুবন দেয়াসিনী তুমি প্রেমের হাটে,
ভরেছে তোমার দুই তীর পুনঃ বিহার চৈত্য সংঘারামে
জ্ঞানের কেন্দ্র ধ্যানের গুম্ফা রচিয়া রেখেছ ডাহিনে বামে।
মৃতকের শুধু নহ শরণ্যা, জাতকেরো দাও সম্ভাবনা
তোমারি চরণে লভে যে শরণ সন্তানকামে কুলাঙ্গনা।
কুশণ্ডিকার ভস্মে মিশিয়া চিতার ভস্ম তোমাতে হারা
তর্পণবারি দর্পণে তব প্রেতলোক হেরে বংশধারা।
কোশাকুশী ঘট তাম্রকুণ্ড, কুম্ভ সলিলে ভরিছে গৃহী
পিতৃলোকেরও বহিছ তাদের কুশপিণ্ডক তিল ব্রীহি।
এক কণা তব অমৃত-সলিল ও স্বর্গপথের পাথেয় জানি',
সিংহল হ'তে এসেছে যাত্রী পথের ক্লেশেরে ক্লেশ না মানি'।
শবসাধনায় বসালে অঙ্কে অঘোরপন্থী কৌল-বীরে
পাষাণে শ্মশানে বন্দী করিয়া রেখেছ ঈশানে তোমার তীরে।

কর্ণে তোমার মণিকর্ণিকা, কেশে তব হৃষীকেশের পাণি,
কটিতে পীঠের মেখলা শীর্ষে গঙ্গোত্তরী বসনখানি।
বঙ্গে তোমার দুই কূলে হরিকীর্ত্তনে প্রেম অশ্রু গলে
অঙ্গে তোমার হরিনামাবলী মালতী মল্লী তুলসীদলে।
হেরি ভগীরথে মানসনেত্রে হর্ষে প্রণত হরিদ্বারে,
বহু বরষের তপের সিদ্ধি করিতেছে শিরে করুণাসারে।
চণ্ডালবেশী লাঞ্ছিত নৃপে রাখিলে মা তুমি অঙ্কে তুলে।
ভীষ্ম তোমায় পূজে এক কূলে বাল্মীকি পূজে অন্য কূলে।
যুগ যুগ ধরি যজ্ঞ ভস্ম, দর্ভাঙ্কুরী বোধন ঘটে
মহাকাশ ভেদি রচিয়াছ বেদী সুকৃতি নিবিড় তোমার তটে।
যুগ যুগ হ'তে স্তবের মন্ত্র, শ্রুতির সূক্ত, তোমার জলে
চিরপুঞ্জিত প্রতিঝঙ্কারে আজো কলনাদ করিয়া চলে।
কোটি কোটি সুতে বক্ষে নাচাও অর্দ্ধোদয়ের মহোৎসবে,
তব মুমুক্ষু ডুবি আবক্ষ তব নীরে ধ্রুব দীক্ষা লভে।
কাব্য-পুরাণ-দর্শন গীতা সবাই মেনেছে বরদা বলি'
ঘোর মায়াবাদী গুরু শঙ্কর তোমার চরণে কৃতাঞ্জলি।
তব আহ্বানে দেবতারা নামে যুগে যুগে নরলীলার ছলে,
তোমারি সলিল-সেচনে তাদের সাধনা লতায় সিদ্ধি ফলে।
পরমহংস করিলেন কেলি তব কালীপদ কমলবনে,
হরিনামাবলী তিলক ভূষায় মণ্ডিলে তব নিমাই ধনে।
বৌদ্ধ জৈন শিখ পারসীক তব সৈকতে নোয়ায় মাথা,
'যবনো' রচেছে কাবর ছন্দে তোমার স্তবের স্তুতিগাথা

কমলাকান্ত রামপ্রসাদের শেষ গান গীত তোমারি কাণে
দাদু রঘুনাথ তুলসী কবীর ধাত্রী বলিয়া তোমারে মানে।
কত দেবতার আসন টলেছে কত বিগ্রহ ধূলায় লীন
স্থিরা ভক্তির মকর আসনে ধ্রুবা তুমি চির রাত্রিদিন।
ভীষ্মজননী, গ্রীষ্মহননী, ভস্মজীবনী পরমাগতি
দুঃখ দৈন্য দুরিত হারিণী, নমি দশহরা সত্যবতী।

পাতালে তুমি মা অতলা শীতলা কোটি কোটি কর্ণিকণার ছায়ে
ভুজগরাজের মৌলিমাণিকে হাজার নূপুর পরেছ পায়ে।
তুমি ভোগবতী, তুমি যোগবতী-ত্রিলোকে ত্রিপথে সঞ্চারিণী
অলোকনন্দা ত্রিলোকবন্দ্যা যোজনগন্ধা মন্দাকিনী।
তুমি যমুনার-তমোমালিন্য হরণ করেছ বক্ষে ধরি'
গণ্ডকী ঈশা তোমারি সকাশে শিখেছে সুনীতি শুভঙ্করী।
চির অমেধ্যা গোমতী, দেবী তোমার পরশে হয়েছে শুচি,
তোমার তীর্থসঙ্গমে গেছে আসবরুণার দ্বন্দ্ব ঘুচি'।
দিল কাঞ্চনজঙ্ঘা তোমায় কনক-পাথেয় কুশীর করে,
ঘর্ঘরা-ধনভাণ্ডার পেয়ে পাঠালে জননি শোণের ঘরে।
শোণেরে তুমি মা দিয়াছ শোণিমা, হেম ভুঞ্জ তার গিতব্রতী
তোমাতে আত্মবিলোপ করিয়া ত্রিবেণী রচেছে সরস্বতী।
তোমারি বিজয়ে নিজ জয় সঁপি জয় গান গায় অজয়-কবি।
ব্রহ্মে কর্ম্ম অর্পণ-সম দামোদর তার দিয়াছে সবি।
শ্রুতি-নিন্দিত শবরপুণ্ড্র, মগপুলিন্দ দেশে মা তুমি
পদ্মা সখীরে পাঠায়ে তারেও করেছ ধন্য-পুণ্যভূমি।

তুমিই গড়েছ কোশল মগধ অঙ্গ বঙ্গ গৌড় কাশী
কত যে রাষ্ট্র দুই কূলে তব গর্ভ হইতে উঠিল ভাসি'।
অলকাপ্রতিম পুরপত্তনে সৃজিলে মা কত অবনীতলে
ফেনিলোজ্জ্বল বুদবুদসম ভাঙিলে গড়িলে লীলার ছলে।
কত নৃপালের রাজ্যাভিষেকে আশিস্ সলিল ঢালিলে সতী
হে রাজপ্রসূতি, প্রজার ধাত্রী, চিরবৎসলা স্তন্যবতী।
রাজায় রাজায় দারুণ দ্বন্দ্বে বিচারিকা নিজে হয়েছ তুমি
আপনার দেহে গণ্ডী রচিয়া বিভাগ করেছ রাজ্যভূমি
আর্য্যাবর্ত্তে তুমি মা মর্ত্ত্যে অতুল করেছ শ্রীবৈভবে
তাই কালে কালে লুণ্ঠকদলে লুব্ধ করেছে ভোগোৎসবে।

গায় শ্রুতি-স্মৃতি গৌরব-গীতি সরস্বতী ও দৃষদ্বতী
পুরাণে তন্ত্রে ভক্তিমন্ত্রে ত্রিধারা তোমার শুদ্ধিমতী।
জাতিবিচারের রীতি আচারের সকল গণ্ডী দিয়াছ মুছি'
বহ্নির মত পুণ্য পরশে সবারে করেছ সমান শুচি।
ব্রহ্মবাদিনী পতিতপাবনী ভেদবুদ্ধি কি তোমার সাজে?
সত্য ব্রহ্ম প্রতিবিম্বিত তোমার অমল অম্বু মাঝে।
সব ভেদাভেদ বিদ্বেষ-ক্লেদ খরতরঙ্গে ভাসায়ে দিলে,
তোমার শরণে হরিস্মরণে বিশ্বাসে পরিশুদ্ধি মিলে।
তব তীরে তীরে কৃষ্ণসারেরা কুশ চর্ব্বণ করে না বটে,
কৃষ্ণে তুমি যে সার জেনে প্রেম-গোষ্ঠ রচেছ শ্যামল তটে।
হোমের বহ্নি তুমি নিভাওনি প্রেমে তবু বড় জান মা মনে,
স্থণ্ডিল হ'তে মন্দিরে তারে এনেছ প্রেমের আবেষ্টনে।
তপে আর জপে, সামে নাম গানে, শঙ্খে প্রণবে, যূপে ও ধূপে
ভক্তিসাধনে শক্তিবোধনে, মিলালে মা তুমি, ধ্যানে ও রূপে।
দ্রাবিড় আর্য্যে শবর ম্লেচ্ছে লিচ্ছবি শকে মিলালে ডাকি'
যোজন এলো লজ্জিয়া গিরি মঙ্গলডোরে পরিল রাখী।
শত বাহু দিয়ে আত্মীয় পরে বাঁধিলে বঙ্গে অঙ্গতটে,
যুগে যুগে অবগাহিকায় তব তাদের শোণিত-সঙ্গ ঘটে।

দেবতা ভূদেব ক্ষত্রই শুধু তোমার করুণা লভেনি দেবি
ধন-সম্পদে ঋদ্ধ হয়েছে বৈশ্যেরা তব চরণ সেবি'।
শূদ্রেও তুমি মর্য্যাদা দিলে উন্নীত করি' বৈশ্যপদে
কিরাত নিষাদো তোমার প্রসাদে বিরত পশু ও পক্ষী-বধে।
শস্য পুষ্প ফল সম্পদে বিদেহ অঙ্গ বঙ্গসম
কোন্ দেশ আছে বিশ্বমাঝে, কোন্ ভূমি হেন নয়নরম?
ক্ষীরদা, তোমার প্রসাদে আমরা কামধেনুসম গোধনে ধনী
তোমার গোমুখী-ক্ষরিত অমৃত, কূলের শষ্প, যোগায় ননী।
দেশ-বিদেশের কত যে পণ্য ভাসায়ে এনেছ মমতাস্রোতে
সিন্ধুতীরের সিন্ধু-নীরের ধন-সম্পদ্ ভরিয়া পোতে।
তোমার কূলের শ্রেষ্ঠী বণিক চীন কার্থেজে দিয়াছে পাড়ি
যোগাল তাদের পণ্যজীবন তোমারি শুল্ক, তোমার নাড়ী।
কাঞ্চী হইতে চন্দনভার সিংহল হ'তে মুক্তারাজি
আনিয়া দিয়াছ পাটলিপুত্রে, সে সব কল্প-স্বপ্ন আজি।

কোথা গেল সেই পাটলিপুত্র? কোথায় লুপ্ত সপ্তগ্রাম?
কোথায় কর্ণ সুবর্ণ আজি, সে সব বিশ্ব-ব্যাপ্ত নাম?
কোথায় গঙ্গা রাঢ়ের রাষ্ট্র কোথা গেল মা গো আজিকে উড়ে
যার নাম শুনি পাঞ্জাব হ'তে 'যবন'বিজয়ী যাইল ঘুরে।
কোথা সন্তোষ-ক্ষেত্র-সত্র তোমার কূলের কীর্ত্তি আজি?
কোথায় অশ্বমেধের হোতারা? কোথা সেই দিগ্বিজয়ী বাজি?
কোথায় মৌর্য্য? কোথা সে শৌর্য্য? কোথায় গ্রাসিলে গুপ্তভূপে?
দুই তীর তব সাজাল যাহারা মঠ-মন্দিরে যজ্ঞযূপে?
কোথা ভোজরাজ প্রতিহারকুল কোথায় তাদের দীপ্তিদাম?
মহাভারতীর আসন-অজ কোথায় কান্যকুব্জ ধাম?
কোশল চম্পা কাম্পিল্যের সম্পদ্ আজি কোথায় লীন?
পঞ্চগৌড় পৌরবর্গ আজি কি তোমার স্রোতের মীন?

রাজা রাজপথ রাজাসন রথ কিরীট ছত্র চামর সবি
তব সৈকতে ধ্বস্ত প্রোথিত হায় আজি চির সমাধি লভি'।
তোমারি গর্ভে সকল কীর্ত্তি শায়িত এখন অগাধ ঘুমে
রাজগৌরব, পুরবৈভব বিলীন আজিকে চিতার ধূমে।
তোমার পুলিনে রাজরাজেন্দ্র প্রেতরূপে আজি শ্মশানচারী
যুগে যুগে নর-রুধিরের ধারা বাড়ায়েছে শুধু তোমার বারি।
গিরি হ'তে এসে গৌরীর রূপে অরুণা হইয়া সাগরে গেলে
মশানের জবা ভাসায়ে চলিলে, গিরিম মকা বহিয়া এলে।
তোমার সাধের সংসার গেছে তুমি মা এখনো তেমনি আছ
এত স্মৃতি ব'য়ে এত ব্যথা স'য়ে জানি না মা তুমি কেমনে বাঁচো।
গোত্রভিদের ঐরাবতেরে ভাসাইলে তুমি যাত্রাপথে
বারিতে নারিলে, ধ্বংসবারিণি, কালের করাল ঐরাবতে।

এক কূল তুমি ভাঙো বটে মা গো আর কূলে তুমি গড়িয়া তোলো
কত দিন গেল এখনো তোমার ভাঙনের লীলা শেষ না হলো।
গড় মা আবার সকলি তেমনি যুগ-সংঘাতে যা হলো গুঁড়া
পুরজনপদ, রাজপরিষদ্, আশ্রমমঠ কনক-চূড়া।
গড় মা আবার মধুকর পোত ভর মা দেশের পণ্যভারে
শোভুক তোমার কটিতট পুনঃ মর্ম্মরময় সোপান-হারে।
মণ্ডিত কর তব তীর, নব পাটলিপুত্র সপ্তগ্রামে
নূতন সাকেত মায়া পাঞ্চালে, নূতন পঞ্চপ্রয়াগ ধামে।
সামসঙ্গীতে হরিনাম-গীতে স্তবের মন্ত্রে, শাস্ত্রপাঠে
স্পন্দিত হও, বন্দনা গা'ক রাজা ঋষি মিলে স্নানের ঘাটে।
তন্মে নবীন জীবন জাগাতে ভক্তের সাথে আসলে তবে,
দু'টি পুলিনের তন্ম শৈল নির্জীব জড় অসাড় রবে?

তোমার পুলিনে দাঁড়ায়ে আজি মা বন্দনা গাই কৃতাঞ্জলি,
বন্দনা-ছলে শুধু অতীতের রাজারাজ্যের কথাই বলি।
দীনদুখীদেরো অনেক কথাই বলিবার আছে তোমার পাশে
বিরাট ক্ষুদ্র বিপ্র শূদ্র সবে অন্তিমে হেথায় আসে।
তোমার শ্মশানে চেয়ে তোমাপানে না কেঁদে কি কেহ
থাকিতে পারে ?
মহাপথ তুমি তোমার কিনারে স্থির কে চিত্ত রাখিতে পারে ?
কত জন তব অনল অঙ্কে তুলিয়া দিয়াছে প্রাণের ধনে,
আহা তাহাদের শেষস্মৃতিটুকু তুমিই রেখেছ সংগোপনে।
পতিরে হারায়ে সীঁথির সিঁদূর মুছে যায় সতী তোমার তীরে
তনয়ে সঁপিয়া অনাথা জননী ডুবিতে চেয়েছে তোমার নীরে।
মায়েরে খুঁজিতে মা-হারা বালক তোমার শ্মশানে হারায় দিশা
প্রিয়তমা-হারা ফিরে ফিরে আসে তোমার কূলেই কাটায় নিশা।

সব ধুয়ে মুছে নিয়ে যাও, মিছে মরে সে প্রিয়ার ভস্ম খুঁজে
ভাঙা ঘট আর পোড়া কাঠ বুকে কাঁদে সে বালুতে মুখটি গুঁজে।
চিতাই জীবের নয় শেষ গতি—অমৃত লভে সে অশোক লোকে
মুক্তি দিয়াছ, তুমি জান তাই অনধীরা তুমি সবার শোকে।
জীবনের ধন তোমারে সঁপিলে অক্ষয় সে যে ধ্রুবের সাথে,
মূঢ় শিশু হায় সংশয়ে চায় খেলানাটি সঁপি মায়েরো হাতে ;
তার দশা হেরে হেসে কেঁদে তুমি মনে মনে বল 'অবিশ্বাসী
মম তরঙ্গ-সোপান সবারে করে যে রে হরিচরণবাসী'।
অজ্ঞান তারা, অগাধ ভক্তি বিশ্বাস বল কোথায় পাবে ?
ঐন্দ্রজালিকে অঙ্গুরী সঁপি চিরতরে গেল কেবলি ভাবে।

মন্ত্রদাত্রী তুমি বৈষ্ণবী মহাসাম্যের প্রবর্ত্তনে
তব সংসারে মানবে মানবে অন্তর কিছু জাগে না মনে।
বিপ্র-শূদ্রে ধনি দরিদ্রে মহৎ-ক্ষুদ্রে একই রথে,
তুমি চিরদিনই পাঠাও তারিণি একই সেই মহাযাত্রা-পথে।

যাদের মাঝারে হেথা চিরভেদ দন্ত-বর্ণ দ্বন্দ্ব ফলে,
ভস্ম তাদের মিলে তব নীরে প্রেম কীর্ত্তনে নাচিয়া চলে।
মৃত্যুরো পরে সমাধিলিপিতে যাদের দৃপ্ত প্রভেদ রটে
তারা দেখে যাক্ কি মহাসাম্য ভৈরবি ! তব শ্মশান-তটে।

তব কূলে আজি কল্পনা মম হেথা হ'তে ছুটে অন্তলোকে
ঘন চিতাধূম-আবছায়া ফাঁকে মহাপথ জাগে আমার চোখে।
পিতা পিতামহ পরিজনসহ সবে এই পথে গিয়াছে চলি'
শত শত পাণি দেয় হাতছানি ডাকে 'আয় আয় আয় রে বলি'।
অনাবিষ্কৃত পথরহস্য ভয়ে নিরাশায় আকুল করে,
তব আশ্বাস শীত নিশ্বাস ললাটের স্বেদ-বিন্দু হরে।
কল্পনয়নে হেরিতেছি আজি সজ্জিত মোর আপন চিতা
এ তনু অনলে আহুতি সঁপিতে আহূত স্বজন-বন্ধু-মিতা।
উঠে অবিরল হরি হরি বোল, রোদনের রোল আমায় ঘিরে
থাক্ মা সে কথা,—কত না চিন্তা উঠে মনে আজ তোমার তীরে।

পূর্ব্বপুণ্যে তোমার পুলিনে জনমেছি যবে বঙ্গভূমে,
আছে মা ভরসা এক দিন লবে অঙ্কে তুলি' এ দুলালে চুমে।
তবু জানি না মা ভাগ্যচক্রে যদি দূরে রই সময় হ'লে
ডাকিতে ভুলো না ভক্তে তোমার, মরণের আগে স্নেহের কোলে।
এত দিনকার লালিত এ তনু শিয়াল-কুকুরে ছিঁড়িতে রবে
এ কথা ভাবিতে শিহরে মা প্রাণ, তুমি কি এমনি নিঠুর হবে ?
তব সিকতায় মা'র মমতায় অনল-শয্যা পাতিয়া রেখ,
তারকব্রহ্ম নাম কানে দিও, জননি আমার শিয়রে থেক !
তোমার পাবন উর্ম্মি-কৃপাণে জন্ম-বন্ধ ছেদন করি'
পতিতপাবনী-নামে সার্থক করো মা, নারকী পতিতে তরি'।
দেহজকর্ম্ম ফলসহ মোর চিতার ভস্ম অর্ঘ্য নিও,
শরট-করটো লভে যে মুক্তি, আমারে তা' শেষে দিও মা দিও !

শ্রীকালিদাস রায়।

জিলাপী

মিষ্টান্নের রাণী তুমি জিলাপী রূপসি !
জিহ্বাসনে বিহ্বলে গো, আহ্বানি তোমায় ;
চর্ব্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় চতুর্ব্বিধ গুণে
তুষ্টিদাত্রী পুষ্টিময়ী, অবতীর্ণা তুমি
অবনীমণ্ডলে, কুলকুণ্ডলিনীরূপা,
জ্বলন্ত অনল কোলে ফুটন্ত কটাহে
চক্রে-বক্রে ভাসাইয়া আপন সুতনু
উলটি পালটি ! কি অসহ তাপ-জ্বালা
সহিলে সুন্দরি, দুরন্ত চর্ব্বণ আর—
দন্তের পেষণে, সুধারাশি সঞ্চারিতে
ভক্তের অন্তরে, প্রাণান্তেও ভ্রান্তিবশে
ভুলিব না কভু। সমর্পিয়া রসময়ি,—
সর্ব্বস্ব তোমার, তোষো তুমি নিরন্তর
যেই অজ্ঞ নরে, তারা কি না অকৃতজ্ঞ
শেষে তব প্রতি ? ঘোর কলি ! নরকুলে
কৃতজ্ঞতা—বাতুলের প্রলাপ এ কালে !
বৃথা লো, জিলাপী, তোর বিলাপে কি ফল ?

ভোজনান্তে আচমন করি সমাপন
কোন্ জন অকারণ করে নিরূপণ
কি কষ্টে মিষ্টান্ন-রাণী জনম লভিলা ?
ভ্রান্ত নর, না বুঝিয়া মহিমা তোমার,
ব্যঙ্গভরে নিন্দে তোমা, জিলাপী সুন্দরি,
কুচক্রীর সঙ্গে রঙ্গে রচিয়া উপমা,
আক্রমিয়া মধুময়ী সে পাপড়িগুলি
'প্যাঁচ' নামে অভিহিত—যাহা, নিদারুণ
নিয়তির কটাক্ষ-সম্পাতে ! শাস্ত্রবাক্য
মিথ্যা কভু নহে কদাচন ; প্রেমদান
অরসিকে নিষিদ্ধ বিধান, অভাগিনি !
সুধাংশুমণ্ডলে পশি জুড়াও এ জ্বালা,
মর্ত্ত্যলোক-অন্তরালে শান্তি লভি' সুখে ;
সুধাকর সযতনে সেবিবে তোমারে,
সেবে সাহিত্যিক যথা, সম্পাদকবরে
অনুকম্পা-অভিলাষী সুযশ-প্রয়াসী।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

ছানাবাড়ী

১২

অত্যন্ত আগ্রহান্বিত হইয়া আমি পরদিবস কোর্ট হইতে সটান গাঙ্গুলী মহাশয়ের আফিসে যথাসময়ে উপস্থিত হইলাম। কিন্তু ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, তিনি তাঁহার টেবলের পার্শ্বে উপবিষ্টা একটি সুসজ্জিতা যুবতীর সহিত কথোপকথনে[illegible]যুক্ত এবং ঐ রমণীর নিকটে একটি প্রবীণ পুরুষ আর একটি চেয়ারে বসিয়া স্থিরভাবে তাঁহাদের বাক্যালাপ শুনিতেছেন।

যুবতীটি দেখিতে অসামান্য সুন্দরী। চোখ দুটিতে বুদ্ধির বিশেষ প্রখরতা না থাকিলেও, কোমলতা ও প্রফুল্লতা যথেষ্ট ছিল। মুখের হাসিও বড়ই মধুর এবং সবটা মিলিয়া যে লোকের বিশিষ্টরূপে চিত্তাকর্ষক,তাহাতে সন্দেহ নাই। বয়স বোধ হয় পঁচিশের বেশী হইবে না। বেশ-ভূষা আজকালকার "উন্নত" ধরণের এবং খুব সৌখীন ও দামী। পায়ে মোজা, জুতাও ছিল। কিন্তু জুতা হইতে বাকি সমস্ত পোষাকেরই বর্ণ সাদা; এমন কি, শাড়ীর পাড় পর্য্যন্ত সাদা। আমার সে সময়ের জ্ঞানানুসারে আমি মনে করিয়াছিলাম যে, পোষাকের সমস্তটা ঐ রকম "একরঙ্গা" হওয়াই বোধ হয় হালের ফ্যাসান। কিন্তু পরে শুনিয়াছি যে, ঐরূপ সব সাদা পোষাক, বিলাতী-বাঙ্গালী মহিলাগণের মধ্যে না কি বৈষম্য-ব্যঞ্জক। যাহা হউক, রূপ ও পোষাকে, মোটের উপর তাঁহাকে কাচের "সো-কেসের" মধ্যে তুলিয়া রাখিবার উপযোগী মোমের পুতুলের ন্যায় অনেকটা বোধ হইতেছিল বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।

পুরুষটির বয়স প্রায় ৫৫ হইবে। কিন্তু তাহা হইলেও শরীরটি বেশ হৃষ্টপুষ্ট,—"নাদুস-নুদুস" গোছের। দাড়ি-গোঁফ-মুণ্ডিত মুখটির ভাব বেশ প্রসন্নতাময়; যেন বালকের ন্যায় জগতের দুঃখ-কষ্টের সহিত তাঁহার কোন পরিচয় নাই। তিনি মাথায় কিছু খর্ব্ব এবং তাঁহার পোষাক সম্পূর্ণ সাহেবী।

টেবলের অপর দিকে একটা চেয়ারে আমাকে বসিতে ইঙ্গিত করিয়া গাঙ্গুলী মহাশয় ঐ দুইটি আগন্তুকের সহিত আমার পরিচয় করিয়া দিলেন। তখন জানিলাম যে, পুরুষটির নাম কে, পি, সেন; এবং যুবতীটি তাঁহার কন্যা ও মৃত কুঞ্জবিহারী নন্দন নামীয় ব্যক্তির বিধবা পত্নী,—অন্ততঃ তাঁহাদের ঐরূপ ধারণা। পরিচয় দিবার সময় গাঙ্গুলী মহাশয় আমাকে বলিলেন যে, ইঁহার স্বামীর আসল নাম ছিল—বিহারীলাল ঘোষ।

আমি বসিবার পরে যুবতীটি প্রসন্নবদনে আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে আমি বড় খুসী হলাম, মিঃ দত্ত। মিঃ গাঙ্গুলী আমাকে এইমাত্র বল্‌ছিলেন যে, আপনি না কি আমার মৃত স্বামী মিঃ ঘোষকে জান্‌তেন।"

আমি বলিলাম, "আমি তাঁ'কে কুঞ্জবিহারী নন্দন নামেই জান্‌তাম।"

তিনি একটু হাসিয়া বলিলেন, "বাঃ, কেমন মজার নাম-বদল বলুন ত! তাঁ'র নাম ছিল বিহারীলাল ঘোষ, আর তাঁ'র দেশের বাড়ী ও বাগিচার নাম দিয়েছিলেন, 'নন্দন-কুঞ্জ।' তার পর ঐ নামগুলো উল্টে-পাল্টে নিয়ে নিজের নাম দাঁড় করিয়েছিলেন কি না, কুঞ্জবিহারী নন্দন!"

তৎপরে এক সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "কিন্তু এখন তিনি সব নামের বাইরে চ'লে গেছেন! উঃ, কি দুঃখ!" বলিয়া অতি সুন্দর ফুল-কাটা পাড়ওয়ালা একখানি সূক্ষ্ম রেশমী রুমাল দ্বারা চক্ষুর্দ্বয় আবৃত করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ঘরটা এক মৃদু সুগন্ধে আমোদিত হইল।

এই থিয়েটারী শোকাভিনয়ে আমার কিছু বিরক্তি জন্মিল। চক্ষু হইতে রুমাল অপসৃত হইলে, আরও বিরক্তির সহিত লক্ষ্য করিলাম যে, তাহার এক কণামাত্র স্থানও জলসিক্ত হয় নাই।

তখন সেন সাহেব কন্যাকে সান্ত্বনাচ্ছলে বলিলেন, "আর কেঁদে কি হ'বে মা? তিনি এতক্ষণে ভগবানের

গোচারণ-লীলা

বসুমতী প্রেস] [শিল্পী—শ্রীহরেকৃষ্ণ সাহা ।

কাছে গিয়ে শান্তি পেয়েছেন, তাই ভেবে মনকে সংযত করতে হ'বে। এখন এ সব কাযের জায়গায় এসে কাযের কথা বলাই ভাল। অ্যাঁ, কি বলেন মশায়?" বলিয়া বালকের ন্যায় আমার দিকে চাহিলেন।

আমি কি উত্তর দিব খুঁজিয়া না পাইয়া বলিলাম, "আশা করি, আমার এখানে উপস্থিতির জন্য আপনাদের কাযের কথায় কোন ব্যাঘাত হয়নি?"

যুবতী ব্যগ্রভাবে বলিলেন, "না,—না, মোটেই না। মিঃ গাঙ্গুলীর সঙ্গে এই সবেমাত্র গোটাকতক কথা হচ্ছিল, এমন সময় আপনি এলেন। আর সে কথাই বা কি? উনি দুই একটা বাজে সওয়াল করেছিলেন মাত্র।"

গাঙ্গুলী মহাশয় বলিলেন, "আপনার মতে বাজে হলেও আমার কাছে সেগুলা বিশেষ দরকারী। যা হোক, এখন বলুন দেখি, আপনি যে ঐ হত ব্যক্তির স্ত্রী, তা'র প্রমাণ কিছু দিতে পারেন কি?"

আমাদের দুই জনের দিকেই একটু সুমিষ্ট হাসি ছড়াইয়া তিনি বলিলেন, "তা'র আর প্রমাণ কি দিব, বলুন না? ঐ নাম পা'ন্টাই কি ক'রে হয়েছে, তা ত দেখলেন? তা বাদে আপনি কাগজে যে বিবরণ দিয়েছেন, সেটা আমার husbandএর চেহারার সঙ্গেই ঠিক মিল্‌ছে। একবার একটা পার্টিতে গিয়ে, দুর্ঘটনাক্রমে একটা গুলী লেগে তাঁর বাঁ-হাতের কড়ে আঙ্গুলের দুটা পাব খোয়া যায়; আর গালের উপর একটা লম্বা জখম হয়েছিল, তার দাগটা বরাবরই থেকে গিয়েছিল।" পরে তাঁহার পিতার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "কেমন, বাবুজি! তাই নয় কি?—তুমি সেই ফটোখানা এঁদের দেখাও না কেন? তা হ'লেই ত এঁরা বুঝতে পারবেন।"

সেন সাহেব বলিলেন, "হাঁ, ঠিক বলেছিস্, যমুনা।" বলিয়া তাঁহার একটা ছোট 'হ্যাণ্ড-ব্যাগ" হইতে একটা 'ক্যাবিনেট' আকারের ফটো বাহির করিয়া গাঙ্গুলী মহাশয়ের হাতে দিলেন।

১৩

আমি ও নলিনী বাবু উভয়েই ব্যগ্রতা সহকারে ছবিখানা পরীক্ষা করিলাম। ফটোখানা দেহের উপরার্দ্ধের; তাহাতে বাহুর নিম্নার্দ্ধটুকু নাই। কিন্তু মুখাবয়ব সম্পূর্ণ নন্দন সাহেবের মত দেখিতে। তখন পুলিস মৃতদেহের যে ফটোখানা তোলাইয়াছিল, নলিনী বাবু তাহা বাহির করিয়া তাহার সহিত এই ছবিটা মিলাইলেন। জীবন্ত ও মৃতাবস্থায় মুখাকৃতির যতটা পার্থক্য হওয়া সম্ভব, তাহা বাদ দিলে এ দুইটা ছবি যে একই লোকের, তাঁহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ দেখিলাম না। তথাপি মৃতের ছবির মুখখানা অপরটা অপেক্ষা একটু বেশী বোধ হওয়ায়, আমি সে বিষয়ে গাঙ্গুলী মহাশয়ের ও আগন্তুকদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিলাম।

যুবতী বলিলেন, "তা হ'তে পারে। আমাদের এ ছবিটা প্রায় দু'বছর আগেকার। তিনি বাড়ী ছেড়ে পালিয়ে যাবার পরে, বোধ হয়, তাঁ'র অসুখ বেড়ে শরীর কাহিল হয়ে গিয়েছিল। কি বল বাবুজী?"

সেন সাহেব বলিলেন, "হাঁ, তাই সম্ভব নিশ্চয়। একে ডায়াবীটিস্, তাতে মাথার অসুখ, তা'র উপর পান-দোষও যথেষ্ট ছিল। কাযেই শরীর কাহিল ত হবেই।"

আমরা উভয়েই কথাটা যথেষ্ট সম্ভবপর বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইলাম। পরে গাঙ্গুলী মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, "তিনি বাড়ী থেকে পালিয়ে এসেছিলেন কেন?"

যুবতী বলিলেন, "ওঃ, সে অনেক কথা। মোটের উপর বুঝতেই ত পারছেন যে, তাঁ'তে আমাতে বয়সের তফাৎ ছিল অনেক বেশী, কাযেই বনিবনাও ছিল খুব কম। আর এ কথাও বল্‌তে আমার আপত্তি নাই যে, তাঁ'র উপর আমার 'দিল্' কিছুই ছিল না। কেবল বাবুজীর জিদে আমি তাঁকে বিয়ে করেছিলাম। তবে, এ কথাও বল্‌তে পারি যে, আমি কোনকালে তাঁ'র তোয়াজ ছাড়া, বেহাল করিনি। কিন্তু তাঁ'র মেয়েটা বড় সয়তানী। সে আমাকে দুষ্‌মন ভাবত, আর বাপের মনভাঙ্গানী করবার চেষ্টা করত। শেষে তিনি মাঝে মাঝে পাগ্‌লার মত হ'তে লাগলেন। এক দিন সেই হালে, কা'কেও কিছু না ব'লে, সেরেফ বাড়ী ছেড়ে চ'লে গেলেন। তার পর বেমালুম গায়েব হয়ে রইলেন। অনেক তল্লাস করেও পাওয়া গেল না। তার পর আপনার এই বিজ্ঞাপনটা সে দিন বাবুজীর নজরে পড়ায়, চেহারার বেওরা মিলিয়ে তাঁর মজাদারী নাম পা'ন্টাই বেশ বুঝতে পেরে জানলাম যে, লোকটি মারা গেছেন।"

রমণীটির রূপ ও পোষাক দেখিয়া তাহাকে উচ্চদরের মার্জ্জিতা মহিলা মনে করিয়া, প্রথমে আমার তাহার প্রতি

যে সম্ভ্রম হইয়াছিল, পরে তাহার নাটুকে ঢংএ শোক-প্রকাশের প্রভাবে তাহা নষ্ট হইয়াছিল। ক্রমে তাহার কথাবার্ত্তার ভাব-ভঙ্গীতে তাহার উপর একটা অশ্রদ্ধা, এমন কি, ক্রোধ পর্য্যন্ত হইতে লাগিল। তাহা ছাড়া, পিতা-পুত্রীর বাক্যালাপ যথাসম্ভব বাঙ্গালায় লিখিলাম বটে, কিন্তু বাস্তবিক তাহা এত বেশী ইংরেজী ও হিন্দী কথা মিশ্রিত যে, তাঁহাদের ভাষা আনুপূর্ব্বিক যথাযথরূপে লিখিলে, বোধ হয়, পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিতে পারিত।

নলিনী বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি তাঁ'র যে মেয়ের কথা উল্লেখ করলেন, সে কি আপনার মেয়ে নয়?"

"আরে না,—না! আমার ত তাঁ'র সঙ্গে এই সে দিন বিয়ে হয়েছিল। তখন আমরা দার্জ্জিলিংএ। সেখানে ওনার সঙ্গে আলাপ হয়ে সেইখানেই বিয়ে হয়। সে আজ মোটে বছর দুইয়ের কথা। সে মেয়ে তখন প্রায় ১৪ বছরের ধাড়ী। সে মিঃ ঘোষের আগেকার স্ত্রীর। সে স্ত্রী অনেক দিন মারা গেছে। ও মেয়েটা বাপের বড় পেয়া-রের। সে এখন বর্ম্মায় তা'র মাসীর কাছে থাকে। আমার উপর রাগ ক'রে মাসীর সঙ্গে সেথা চ'লে গেছে। তা'র যাবার দু'এক মাস বাদেই মিঃ ঘোষও ঐ রকমে ঘর ছেড়ে পালিয়ে গেলেন।"

"সেটা এখন থেকে কত দিন হবে?"

"ওঃ! তা—বোধ হয় এক বছর হবে।"

সেন সাহেব বলিলেন, "না রে যমুনা, তুই সব বাড়িয়ে বলছিস্। এখন থেকে দশ মাসের বেশী হবে না।"

আমি বিস্মিত হইয়া বলিলাম, "সে কি? তিনি ত আমাদের পাড়ায় মোটে মাস ছয়েক ছিলেন। তা হ'লে আগেকার চার মাস কি অন্য কোথাও ছিলেন?"

যুবতী বলিলেন, "তা কি ক'রে জানবো? বলেছি ত যে, বাড়ী থেকে পালাবার পরে তার আর কোন পাত্তাই পাওয়া গেল না। কোথায় গেল, কোথায় থাকল, কোন খবরই পেলাম না।—সে কথা যাক। এখন আপনা-দের সব সওয়াল যদি শেষ হয়ে থাকে ত বলুন দেখি, আমার স্বামীর যে 'লাইফ-ইন্‌সিওরেন্স' (Life Insurance) আছে, সে টাকা আমি তা'র বিধবা স্ত্রী ব'লে পেতে পারি ত?"

গাঙ্গুলী মহাশয় বলিলেন, "ও কথার উত্তর ত আমি দিতে পারি না। আপনি সেই ইন্‌সিওরেন্স আফিসে দরখাস্ত করুন। আপনিই যে সে টাকা পাবার অধিকারী, তা তা'দের কাছে প্রমাণ করতে পারলেই টাকা পাবেন।"

"আঃ! আবার কি প্রমাণ? এই ত আপনাদের কাছে সব প্রমাণের কথাই বল্লাম!"

"আমরা আপনার ও সব প্রমাণে সন্তুষ্ট হ'লেও ইন্‌-সিওরেন্স আফিসও যে তাই হবে কি না, তা আমি বল্‌তে পারি না। তা ছাড়া আপনার স্বামীর উইল আছে কি না—"

"ওঃ, সে সব ঠিক আছে। উইল করবার আগে ত তাঁ'র সঙ্গে আমার বনিবনাও মন্দ ছিল না। ঐ ইন্‌সিও-রেন্সের ৮০ হাজার টাকা সমস্তই উইলে আমাকে দেওয়া আছে। আর দেশের সেই "নন্দনকুঞ্জ" নামের বাড়ী ও বাগিচা, আর জমীদারী ইত্যাদি সব কিছু সম্পত্তি ঐ মেয়ের। ঐ উইলের পর থেকে ক্রমেই তা'র মাথা খারাপ হ'তে লাগলো, ঝগড়া-কেজিয়াও খুব হ'তে থাকল।"

"উইলে যখন দেওয়া আছে, তখন আপনি উইলের 'প্রোবেট' নিলেই, ঐ টাকা পেতে পারবেন বোধ হয়। কিন্তু ও সব কথা নিয়ে মাথা ঘামাবার কায ত আমাদের নয়? আপনি হাইকোর্টের উকীলদের কাছে ও সব পরামর্শ করবেন এখন। আপাততঃ এই খুনের বিষয়ে আপনি কি জানেন, বলুন দেখি?"

"আমি ও কথার কিছুই জানি না। কি ক'রে জানবো বলুন? প্রায় এক বছর ত তাকে আমি চোখেই দেখিনি!"

"কে তাঁ'কে খুন করেছে, তা কি আপনি অনুমানও করতে পারেন না?"

"না, মশায়! তা কি ক'রে করব বলুন?"

"আপনি অবশ্য জানেন, তাঁ'র কোন শত্রু ছিল কি না?"

যুবতী অত্যন্ত অবজ্ঞাভরে বলিলেন, "তা'র আবার শত্রু কে হবে? ও রকম অপদার্থ নির্জ্জীব লোকের কি কখনও শত্রু থাকতে পারে? তা ছাড়া হালে ত তা'র মাথারই কোন ঠিকানা ছিল না!"

আমি বলিলাম, "অথচ তিনি ত আমাকে বলেছিলেন যে, তাঁ'র শত্রু আছে, আর তা'রা তাঁর অনিষ্ট চেষ্টা করে।"

সেন সাহেব বলিলেন, "হাঁ, কথাটা ঠিক আমার জামাইয়ের মতই বটে! দুনিয়ার প্রায় সকলেই তা'র শত্রুতা সাধবার চেষ্টায় ফিরছে, তা'কে সরিয়ে ফেলবার চেষ্টা করছে,—এই রকম একটা খেয়াল ইদানীং তা'র মনে জন্মেছিল। লোকটা এক রকম 'বেকুফ' গোছের হ'য়ে পড়েছিল। দেখুন না কেন, আমার যমুনার সঙ্গে সামান্য একটা মামুলী ঘরোয়া ঝগড়ার ফলে, সে কি না একেবারে বাড়ী ছেড়ে নিরুদ্দেশ হ'য়ে গেল! কিন্তু বাস্তবিক তা'র কোন শত্রু ছিল না।"

"কিন্তু অবশেষে খুনীর হাতেই ত তাঁ'র মৃত্যু হ'ল?"

"তা বটে, কিন্তু কে যে ও কায করলে, তা ত আমরা কিছুই ঠিক করতে পারিনি। আমাদের বড়ই তাজ্জব বোধ হচ্ছে।"

যমুনা বলিলেন, "কেন যে বাড়ী থেকে সে পালালো, আর কি করেই বা খুন হলো, আমি ত তা বুঝতেই পারি না!"

"কি উপায়ে তা'র মৃত্যু হয়েছিল, তা জানেন কি?

—হৃৎপিণ্ডে একটা ধারালো অস্ত্রাঘাতে সে খুন হয়েছিল।"

"হাঁ, কাগজে পড়েছিলাম বটে,—একটা ছোরার আঘাতে খুনটা হয়েছিল।"

"ঠিক সাধারণ ছোরা নয়। একটা ছোট সরু-গোছের ভোজালী।"

"অ্যাঁ! কি বল্লেন? সরু ছোট ভোজালী?" বলিতে বলিতে যুবতীর মুখখানা কিছু বিবর্ণ হইয়া গেল এবং তিনি ক্ষণেকের জন্য যেন সংজ্ঞাহীন হইয়া চেয়ারে ঢলিয়া পড়িলেন।

[ক্রমশঃ।

শ্রীসুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (এর্টর্নি)।

মিঃ হর্ণিম্যান

মিঃ হর্ণিম্যান দীর্ঘ সপ্তবর্ষকাল নির্ব্বাসন দণ্ড উপভোগ করিবার পর ভারতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। তিনি ইংরাজ, পূর্ব্বে 'ষ্টেটশম্যান' পত্রের সম্পাদক ছিলেন। তিনি বিদেশী ও বিধর্ম্মী হইলেও ভারত-প্রেমিক। তাঁহার ন্যায় উদারনীতিক হৃদয়বান ইংরাজ অতি অল্পই দেখা যায়। ভারতের মুক্তিমন্ত্রের তিনি প্রকৃত উপাসক। তাঁহার নানা রচনায় ইহা ব্যক্ত হইয়াছিল। ইহার জন্য তাঁহার সমাজে তাঁহার স্থান ছিল না এবং এই জন্য তাঁহাকে 'ষ্টেটশম্যানের' সম্পাদনভার ত্যাগ করিতে হইয়াছিল। তিনি পরে 'বোম্বাই ক্রণিকল' পত্রের সম্পাদনভার গ্রহণ করেন এবং নির্ভীক ভাবে এ দেশের আমলাতন্ত্র সরকারের স্বেচ্ছাচারমূলক কার্য্যের তীব্র প্রতিবাদ করিতে থাকেন। ফলে তিনি বোম্বাই সরকার কর্ত্তৃক নির্ব্বাসন দণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত হয়েন। তাঁহাকে তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে জাহাজে করিয়া বিলাতে পাঠাইয়া দেওয়া হয় এবং ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে নিষেধ করা হয়। বিলাতে থাকিয়াও মিঃ হর্ণিম্যান ভারতের মঙ্গলচিন্তা করিয়াছেন। কৃতজ্ঞ ভারতবাসী তাঁহাকে কখনও বিস্মৃত হয় নাই, তাঁহার দণ্ডাজ্ঞা রহিত করিবার নিমিত্ত বিস্তর আন্দোলন করিয়াছে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় নাই। সম্প্রতি তিনি ইংলণ্ড হইতে সিংহল যাত্রা করেন। সিংহলে তাঁহাকে প্রথমে জাহাজ হইতে অবতরণ করিবার পথে বাধা দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু পরে ঐ বাধা অপসারিত হয়। মিঃ হর্ণিম্যান অতঃপর মান্দ্রাজ হইয়া বোম্বাইয়ে পৌছিয়াছেন। ইহাতে তাঁহাকে বাধা দেওয়া হয় নাই। মান্দ্রাজ ও বোম্বাইয়ে তাঁহার বিপুল অভ্যর্থনা হইয়াছিল। তাঁহার প্রতি ভারতবাসীর শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস অসীম। 'ক্রণিকল' পত্রের কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাকে বিনা সর্ত্তে পুনরায় তাঁহাদের পত্রের সম্পাদনভার অর্পণ করিয়াছেন। যেভাবে ভারতবাসী আবার তাঁহাকে বক্ষে আশ্রয় দান করিয়াছে, তাহাতে মনে হয়, ভারতে জনমতের উপর তাঁহার প্রভাব কিরূপ অসামান্য। মুকুট মণ্ডিত কোনও রাজাও তাঁহার ন্যায় ভারতবাসীদিগের এমন শ্রদ্ধাপ্রীতি অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছেন কি না সন্দেহ। সুতরাং আমলাতন্ত্র সরকার ইহা হইতে নিশ্চতই বুঝিতে পারিবেন যে, ইংরাজ বলিয়া ভারতবাসীর কাহারও উপর ক্রোধ বা বিরক্তির ভাব নাই। যাঁহারা ভারতবাসীকে ভালবাসেন, তাহাদের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতি আন্তরিক সহানুভূতি প্রদর্শন করেন, তাঁহারা য জাতি যে ধর্ম্মীই হউন না কেন, তাঁহাদের প্রতি ভারতবাসীরাও আন্তরিক শ্রদ্ধাপ্রীতি প্রদর্শন করিয়া থাকে। মিঃ হর্ণিম্যান সম্প্রতি ভারতবাসী কর্ত্তৃক বোম্বাই মিউনিসিপ্যালিটির সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। ইহাতেও তাঁহার প্রতি ভারতবাসীর বিশ্বাস ও শ্রদ্ধাপ্রীতির পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

মিঃ হর্ণিম্যান

স্নেহের আতিশয্য

সুব্যবস্থা !
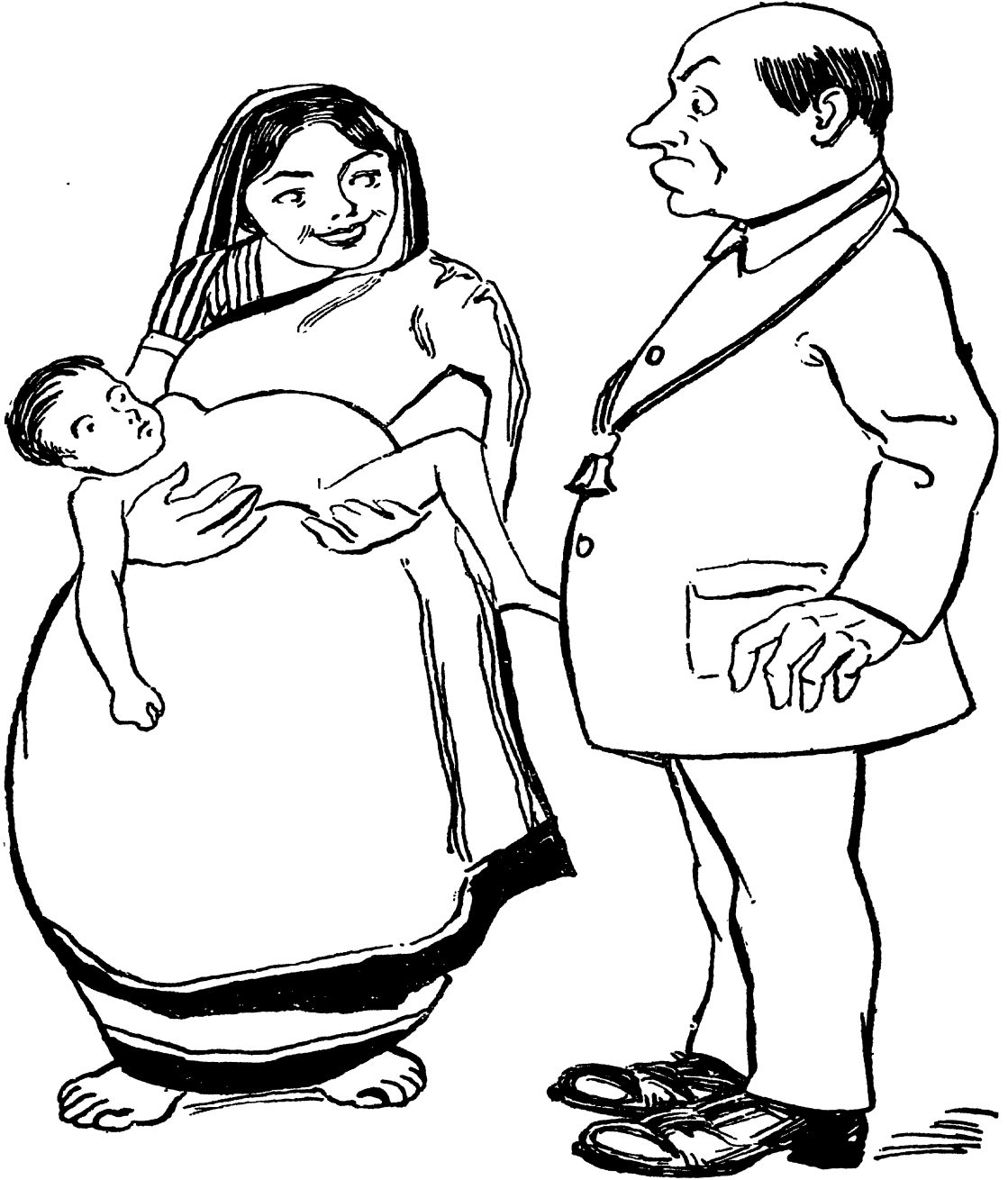
মা।—ডাক্তার বাবু, আজ খোকা ভাল আছে—প্রায় তিন সের দুধ খেয়েছে।
ডাক্তার।—বেশ ! বেশ !

মায়ের স্নেহ !

মা।—চুপি চুপি এটুকু খেয়ে ফেল বাবা, লুকিয়ে খেলে শুকিয়ে যাবে

গৃহিণীর সোহাগ।

কর্ত্তা।—তুমি কি আমাকে মারতে চাও?
গিন্নী।—এটুকু না খেলে আর বুঝবে কি ক'রে?

রুগ্নের পরিচর্য্যা !
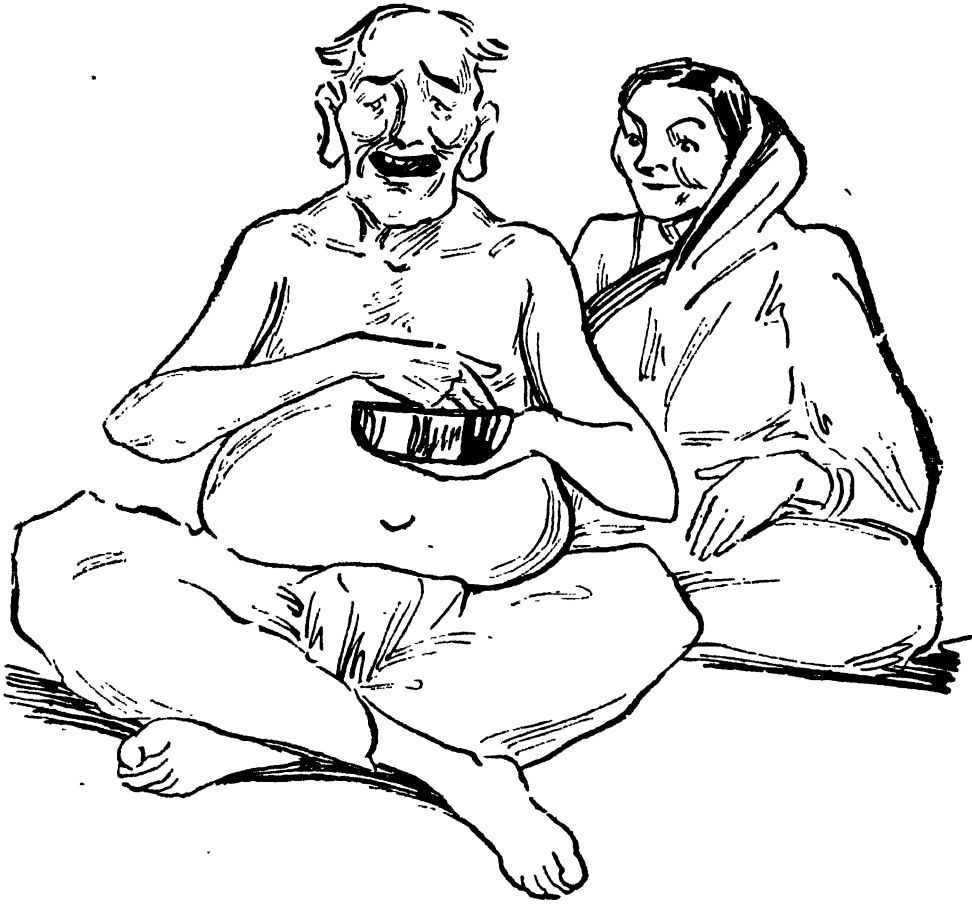
গিন্নী।—ঘন দুধটুকু খেয়ে ফেল।

রুগ্ন কর্ত্তা।—হ্যাঁ, "খেতে আমি বড় ভালবাসি।

জামাই আদর

দিদি-শাশুড়ী।—ও আর ফেলে রেখো না দাদা!

জামাই।—ও বাবা!

দমেভারী ছেলের আহার !

পিসীমা ।—খাও বাবা, এই সরটুকু খাও

[শিল্পী—শ্রীসতীশচন্দ্র সিংহ

টুকটুকে রামায়ণ

শ্রীনবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য প্রণীত; উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়-প্রতিষ্ঠিত বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির হইতে শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। দ্বিতীয় সংস্করণ, মূল্য ১।০ টাকা। অ্যান্টিক কাগজে সুরঞ্জে ছাপা—সুরঞ্জিত চিত্রময় রাজ-সংস্করণ।

অনেক দিন পূর্ব্বে শিশু-সাহিত্য রচনায় সিদ্ধহস্ত—শুধু সিদ্ধহস্ত কেন, অপ্রতিদ্বন্দ্বী—শ্রদ্ধেয় নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় "শিশুরঞ্জন রামায়ণ" প্রকাশিত করিয়া বাঙ্গালা শিশু-সাহিত্যে যে অতুল প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়াছিলেন, সে কথা এখনও মনে আছে,—মনে আছে, আমাদের বালকবালিকাগণ কত আনন্দে সেই রামায়ণের অতুলনীয় সুন্দর কবিতাগুলি আবৃত্তি করিত। তিনি কিছু দিন স্বর্গীয় প্রমদাচরণ সেন প্রবর্ত্তিত শিশু পাঠ্য "সখা" পত্রের সম্পাদন করিয়া, গদ্যে পদ্যে ও চিত্রে শিশু-সাহিত্যের যে সুন্দর আনন্দজনক আদর্শ দেখাইয়া দেন, তাহারই অনুসরণ করিয়া আজ আমাদের শিশু-সাহিত্য এরূপ সমৃদ্ধ, এ কথাও না বুঝি, এমন নহে। তাহার পর বহু দিন নবকৃষ্ণ বাবু, বলিতে গেলে, এক রকম নীরবই ছিলেন, মধ্যে মধ্যে শিশুপাঠ্য সাময়িক পত্রে দুই একটি কবিতা বা হিতোপদেশ-পূর্ণ গল্প লিখিয়াই তাঁহার কার্য্য শেষ হইয়াছে বলিয়া মনে করিতেন। তাহার পর অনেকের সাধ্যসাধনায় এই চির-অলস সাহিত্য-সেবকের জড়তা অপনীত হইয়াছিল, সেই সময় তিনি এই "টুকটুকে রামায়ণ"খানি লিখিয়াছিলেন। তাহার পর আবার তাঁহার সেই জড়তা, সেই নিশ্চেষ্টতা, সেই ঔদাসীন্য! প্রথম সংস্করণ "টুকটুকে রামায়ণ" নিঃশেষিত হইয়া গেল, দ্বিতীয় সংস্করণের আর নাম-গন্ধ নাই; কত প্রকাশকের আগ্রহ ব্যর্থ হইয়া গেল। অবশেষে অক্লান্তকর্ম্মা, বসুমতী-সাহিত্য-মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা পরলোকগত উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় নবকৃষ্ণ বাবুকে তাঁহার নিভৃত পল্লীভবন হইতে টানিয়া আনিয়া এই "টুক্‌টুকে রামায়ণে"র দ্বিতীয় সংস্করণে ব্রতী করিয়াছিলেন, কিন্তু সহসা পরলোকগত হওয়ায় তিনি আর এ দ্বিতীয় সংস্করণ দেখিয়া যাইতে পারিলেন না। তাঁহার উপযুক্ত পুত্র শ্রীযুত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় পিতার আরব্ধ কার্য্য শেষ করিয়া এই দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন। তাই এতকাল পরে আমরা এই সুন্দর রামায়ণখানি দেখিতে পাইলাম। ইহার জন্য গ্রন্থকার অপেক্ষা প্রকাশকই ধন্যবাদ-ভাজন।

এই "টুক্‌টুকে রামায়ণ"খানি সত্য সত্যই টুকটুকে,—এ নামকরণে একটুও অতিরঞ্জন নাই—টুক্ টুক্ করিয়া রামায়ণের সকল কথাই ইহাতে আছে। নবকৃষ্ণ বাবু সাত কাণ্ড রামায়ণ দুই শত পৃষ্ঠার মধ্যে শেষ করিলেও কোন ঘটনা বাদ দেন নাই, শুধু তাহাই নহে, স্থানে স্থানে তাঁহার বর্ণনা এই সীমাবদ্ধ দুই শত পৃষ্ঠার কথা ভুলিয়া গিয়াছে। একটা স্থান উদ্ধৃত করিয়া আমার কথা সপ্রমাণ করিতেছি। বিশ্বামিত্র রামলক্ষ্মণকে লইয়া যজ্ঞরক্ষা করিতে যাইতেছেন। পথে—

"রাত্রি এলে, নদীর তীরে করসা কাঁকা ছুঁয়ে।
তিন জনেতেই ঘুমাইলেন ঘাসের উপর শুয়ে॥"

তাহার পর,—

"রাত পোহালো, রাঙা হ'য়ে এলো পুবের দিক্।
জেগে উঠেন বিশ্বামিত্র সময় বুঝে ঠিক॥
আপ্‌নি জেগে জাগাইলেন দুই ভাইকে পরে।
আহ্নিক কাজ সেরে চলেন অরণ্য-পথ ধ'রে॥
অনেক রাস্তা হেঁটে হাজির হলেন অঙ্গদেশে।
এইখানে মিলেছে গঙ্গা সরযূতে এসে॥
দু'য়ে মিশে এক হ'য়ে গে' ছুটছে পাগলপারা।
কল্‌-কল্‌ কল্‌ ছল্‌-ছল্‌-ছল্‌ তিন দিকে তিন ধারা॥
আশে পাশে আর কিছু নেই—কেবল শ্যামল বন।
বনে বনে আশ্রম, আশ্রমে তাপসগণ॥"

বলিয়াছি ত, দুই শত পৃষ্ঠার মধ্যে সাত কাণ্ড রামায়ণ গাহিতে বসিয়াও স্বভাব-কবি নবকৃষ্ণ বাবু আশে পাশে 'শ্যামল বনে'র শোভায় মুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারেন নাই। এমন এবং ইহা অপেক্ষাও সুন্দর বর্ণনা যে এই রামায়ণখানির কত স্থানে আছে, তাহা দেখাইতে গেলে আমার এই ছোট কয়েকটি কথার দেহ বিপুল হইয়া পড়ে, তাই সে প্রলোভন সংবরণ করিতে অনিচ্ছাক্রমেও বাধ্য হইলাম।

তবুও আর একটা স্থান উদ্ধৃত করিয়া নবকৃষ্ণ বাবুর বর্ণনা-কৌশলের পরিচয় না দিয়াই পারিতেছি না। এটি সাগর-বর্ণনা। অতি সরল, সুললিত ভাষায় কবিবর সাগরের যে বর্ণনা দিয়াছেন, তাহা অতীব সুন্দর। বর্ণনাটি এই,—

"শেষে যখন হাজির হোলো মহেন্দ্র পর্ব্বতে।
সুনীল জলরাশি সাগর পড়লো নয়ন-পথে॥
বিশ্বে যেন আর কিছু নাই, সাগর একাই আছে।
ঢেউয়ের উপর ঢেউ তুলে সে তাণ্ডব নাচ নাচে॥
পাগলপারা এসে সে ঢেউ তটে আছাড় খায়।
চক্ষের নিমেষে ফেনার খৈ ফুটে যায় তায়॥"

কি সুন্দর! কেবল বালকবালিকাদিগের জন্য লিখিত গ্রন্থে কেন, পাঁচটি ছত্রের ভিতর এমন সহজ সরল এবং সম্পূর্ণ সাগর-বর্ণনা বাঙ্গালায় পড়িয়াছি বলিয়াই ত মনে হয় না।

এইখানে একটি কথা নিবেদন করার প্রয়োজন বোধ হইতেছে। আমি বর্ত্তমান ক্ষেত্রে রামায়ণের সৌন্দর্য্য-বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হই নাই, কোন প্রকার গুরু-গম্ভীর আলোচনা করাও আমার উদ্দেশ্য নহে। আমি এই ছোট কয়েকটি কথায় কবিবর নবকৃষ্ণ বাবুর অতুলনীয় কবিত্বশক্তির পরিচয়ই প্রদান করিতে চাহিয়াছি। তাই, তাঁহার এই "টুক্‌টুকে রামায়ণে" যেখানে যে রত্নের সন্ধান পাইয়াছি, তাহারই কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিয়া আমার কার্য্য শেষ করিতেছি। আর, সে রত্নগুলি এমনই উজ্জ্বল, এমনই ভাস্বর, যে, টীকা-টিপ্পনী করিয়া সেগুলির পরিচয় প্রদান করা নিতান্তই নিষ্প্রয়োজন মনে করিয়াছি।

শ্রীরামচন্দ্র পিতৃসত্য-পালনের জন্য বনে যাইতেছেন, এই কথা শুনিয়া পাগলিনীর মত মাতা কৌশল্যা বলিলেন,—

"বৃদ্ধ হ'য়ে বুদ্ধি গেলো, নারীর কথা শোনে।
এমন রাজার কথায় যেতে দিব না তো বনে॥"

মাতার এই কথা শুনিয়া সত্যসন্ধ, পিতৃভক্ত রামচন্দ্র বলিলেন,—

"রাম ক'ন মা পিতা তিনি, ন্যায় অন্যায় তাঁর।
পুত্র আমি বিচারে মোর নাইকো অধিকার॥
তোমারো হ'ন পূজ্য তিনি, মনে পেলেও তাপ।
তাঁর নিন্দা করা মা গো, তোমার পক্ষে পাপ॥
আমা হ'তে হবেন রাজা মুক্ত সত্য-দায়।
জেনো তুমি, হবেই আমার মঙ্গল, মা, তায়॥
আশীর্ব্বাদ এই কর শুধু আবার এসে ফিরে।
তোমার চরণ-কমল দু'টি ধরতে পারি শিরে।

বৃদ্ধ পিতা, দুঃখে শোকে বিগতপ্রায়-প্রাণ।
সেবা কর তাঁর, মা, যাতে কষ্ট না আর পান।"

এত অল্প কথায় এমন করিয়া মা'কে প্রবোধপ্রদান, তাঁহার কর্ত্তব্য-প্রদর্শন অতীব হৃদয়গ্রাহী। নবকৃষ্ণ বাবু নিজের ক্ষমতা দেখাইয়া বরাবর এইরূপ ভাবেই গ্রন্থের সংক্ষেপ করিয়াছেন মাত্র—আসল কোনও কথা বাদ দিয়া নয়।

তাহার পর সীতাদেবীর কথা। শ্রীরামচন্দ্র বনের বিভীষিকা বর্ণনা করিয়া সীতাদেবীকে বনগমনে নিরস্ত করিবার চেষ্টা করিলে সীতাদেবী বলিতেছেন,—

"রাম বুঝালেন অনেক ক'রে, সীতা বলেন তবু।
সঙ্গে যাবো আমি, আমায় ক্ষমা কর, প্রভু॥
সুখে দুঃখে পতির সেবা ধর্ম্ম নারীর হয়।
মিছে ও কি দেখাও আমায় বাঘ-ভালুকের ভয়॥
প্রাণের শঙ্কা আমার যেমন, তেম্নি তোমার আছে।
আমার চেয়ে তোমার প্রাণের মায়া আমার কাছে॥
হোক্ না কেন কণ্টকময় কঠিন বনভূমি।
কষ্ট হবে নাকো যদি সঙ্গে থাকো তুমি॥
ক্ষুধা তৃষ্ণা স'য়ে তুমি ঘুরবে বনে বনে।
রাজভোগেতে থাক্‌বো আমি, তাই ভেবেচো মনে?
গাছের তলায় বৃষ্টি-হিমে থাক্‌বে তুমি স্বামী।
অট্টালিকায় পালঙ্কেতে নিদ্রা যাবো আমি!
পত্নী কেবল পতির সুখের ভাগিনী ত নয়।
দুঃখের ভাগ বক্ষ পেতে অগ্রে নিতে হয়॥
রাজভোগে তাই দারুণ ঘৃণা হয়েচে মোর মনে।
দুঃখের ভাগ নিয়ে সুখী হবো গিয়ে বনে॥"

উপরি-উদ্ধৃত অংশের মধ্যে একটি পংক্তির তুলনা নাই,—"আমার চেয়ে তোমার প্রাণের মায়া আমার কাছে।" এই উপলক্ষে কবি কৃত্তিবাস সীতার মুখ দিয়া যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা কবিত্ব হিসাবে সুন্দর হইলেও, নবকৃষ্ণ বাবু যাহা বলিয়াছেন, তাহা অপেক্ষা অধিক হৃদয়স্পর্শী নহে—এ যেন হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে বাহির হইয়াছে।

এইবার গুহক চণ্ডালের সহিত শ্রীরামচন্দ্রের সাক্ষাৎ। কবি নবকৃষ্ণ বাবু এখানে একেবারে প্রাণ ঢালিয়া দিয়া এই দৃশ্যের বর্ণনা করিয়াছেন,—

"একটা মুখে তিনটে মুখের হাসি গুহ হেসে।
'রামা মিতে কৈ রে' ব'লে হাজির হলেন এসে॥"
"গুহ বলেন, 'আমার কুঁড়ে থাক্‌তে হেথা তাই।
গাছতলাতে বস্‌লি কেন, বল্ না মিতে ভাই॥
কইও কথা পরে মিতা, এনেছি মুই যা।
শুখানো মুখ দেখি তাঁহার, আগে তু সব খা'॥"

এমন সুন্দর, এমন প্রাণস্পর্শী চিত্র, এমন প্রাণ-ভোলানো কথা বঙ্গীয় কবির পবিত্র লেখনীতেই সম্ভব! ছবিখানি যেন আমরা চক্ষুর সম্মুখে জলন্ত দেখিতে পাইতেছি।

তাহার পর পঞ্চবটী বন। এই বনের চিত্র কল্পনা-নেত্রে দর্শন করিয়া কবি নবকৃষ্ণ সত্য সত্যই আত্মহারা হইয়া গিয়াছিলেন, তাই তাঁহার সার্থক লেখনী তাঁহার অজ্ঞাতসারে লিখিয়া ফেলিয়াছে,—

"পঞ্চবটী বনটি, মরি, কি মনোহর ঠাঁই।
বনটি দেখে ভাব্‌চি হেথা মনটি বা হারাই!
চন্দন শাল দেবদারু, খর্জ্জুর তাল তমাল তরু,
তুলে মাথা দেখ্‌চে আকাশ পায় কি না পায় তাই!
দুই দিকে নীল মেঘের মত, উঁচু পাহাড়—শোভাই কত,
বইচে নদী নিরবধি কল কল গাই॥
নানা জাতি পুষ্প ফুটে, প্রজাপতি আস্‌চে ছুটে,'
গুন্‌-গুন্‌-গুন্ গুঞ্জে অলি কুঞ্জে সর্ব্বদাই।
চী-চী-কু চী ডাক্‌চে পাখী, শীষ দেয় কেউ থাকি' থাকি',
বন যেন কয় মনের কথা—মনের বাসনাই॥
ময়ূর নাচে পেখম ধ'রে, মৃগ ছোটে হর্ষভরে,
শোভায় ভরা সকল ধরা যে দিক্ পানে চাই।
পদ্ম ফুটে আছে জলে, হংস চরে কুতূহলে,
পানকৌটি ডোবে ওঠে—তিলেক বিরাম নাই॥
শতদলের সুবাস লুটে' শীতল বাতাস বেড়ায় ছুটে,
জুড়ায় শরীর, মনের টুটে সকল হীনতাই।
শোভারূপে উঠ্‌ছে ফুটে ও কার মহিমাই!"

আর একটি কথা বলিলেই আমার বক্তব্য শেষ হয়। শ্রীযুত নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় এই "টুক্‌টুকে রামায়ণে" মহাকবি বাল্মীকির মূল সংস্কৃত রামায়ণের কেমন সুন্দর অনুগমন করিয়াছেন, তাঁহার সুললিত সরল ছন্দে কেমন অনুবাদ করিয়াছেন, একটিমাত্র স্থান উদ্ধৃত করিয়া তাহার পরিচয় দিতেছি। মহাকবি, সীতাদেবীর পাতালপ্রবেশের সময় তাঁহার মুখ দিয়া যে কথা বলাইয়াছেন, প্রথমে তাহাই উদ্ধৃত করিতেছি। সীতাদেবী বলিতেছেন,—

"যথাহং রাঘবাদন্যং মনসাপি ন চিন্তয়ে।
তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হতি॥
মনসা কর্ম্মণা বাচা যথা রামং সমর্চ্চয়ে।
তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হতি॥
যথৈতৎ সত্যমুক্তং মে বেদ্মি রামাৎ পরং ন চ।
তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হতি॥

নবকৃষ্ণ বাবু বলিয়াছেন,—

"রাম ছাড়া যদি অন্যে না থাকি ভাবিয়া মনে,
সেই পুণ্যে এই ভিক্ষা চাই।
ভিন্ন হও মা বসুন্ধরা, দাও মা কোলে ঠাঁই।
কায়মনোবাক্যে আমি যদি পুজে থাকি স্বামী,
সেই পুণ্যে এই ভিক্ষা চাই।
ভিন্ন হও মা বসুন্ধরা, দাও মা কোলে ঠাঁই॥
রাম ছাড়া নাহি জানি, যদি ইহা সত্য বাণী,
সেই পুণ্যে এই ভিক্ষা চাই।
ভিন্ন হও মা বসুন্ধরা, দাও মা কোলে ঠাঁই॥"

আমাদের বক্তব্য শেষ হইল। পাঠকগণ নিজে নিজে গ্রন্থখানি পড়িয়া ইহার রস গ্রহণ ও প্রয়োজন উপলব্ধি করেন, ইহাই আমাদের বিনীত অনুরোধ।

শ্রীজলধর সেন।

সুপ্রাচীন মূর্ত্তি

গ্রীক্ ঐতিহাসিক হেরোডোটসের বিবরণ পাঠে ব্যাবিলনের সম্বন্ধে যৎসামান্য পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু আব্রাহামের জন্মভূমি 'উর' সম্বন্ধে কোন কথাই গ্রীক্ ঐতিহাসিকের
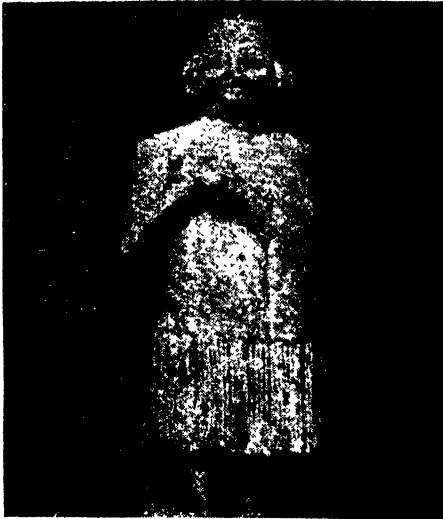
৪ হাজার ৭ শত ২৫ বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত মূর্ত্তি

বিবরণে লিপিবদ্ধ হয় নাই। সম্প্রতি প্রত্নতাত্ত্বিকগণ 'উর' প্রদেশের সন্ধান পাইয়াছেন। মেজর উলি অনুসন্ধান ফলে আব্রাহামের সমসাময়িক মন্দির ও হর্ম্ম্যমালার আবিষ্কার করিয়াছেন। স্তূপ ও ভূমি খনন করিয়া প্রত্ন-তাত্ত্বিকগণ ৪ হাজার বৎসরেরও পূর্ব্ববর্ত্তী অনেক দ্রব্য আবিষ্কার করিয়াছেন। বর্ত্তমান মূর্ত্তিটি ৪ হাজার ৭ শত ২৫ বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়াছিল। গবেষণাফলে স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, অন্য নগরের রাজশক্তি যে সময়ে উর দেশ শাসন করিতেছিল, এই মূর্ত্তি সেই যুগে নির্ম্মিত হইয়াছিল।

বিচিত্র ঘটিকাযন্ত্র

সুইজারলাণ্ডে ইণ্টারলেকেন্‌এ একটি বিচিত্র ঘটিকা-যন্ত্র স্থাপিত হইয়াছে। একটা 'টাইম্‌পিস্' ঘড়ী উদ্যানক্ষেত্রে—ভূমিতলে এমনভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে যে, সহজেই যে কেহ তাহা দেখিয়া সময় নির্ণয় করিতে পারে। ঘটিকাযন্ত্রের ডালার
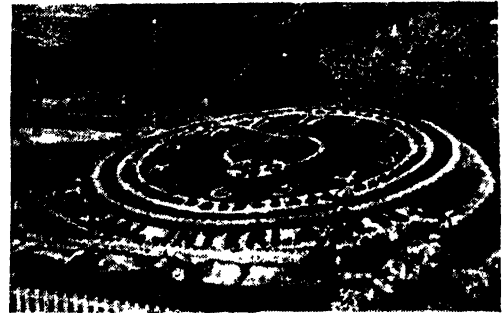
পুষ্পশোভিত ঘটিকাযন্ত্র

উপর পুষ্প-লতাসমূহ শৃঙ্খলার সহিত রোপিত। সময়জ্ঞাপক শ্বেতবর্ণের সংখ্যাগুলি, ঘড়ীর কৃষ্ণবর্ণ বক্ষোদেশে সুস্পষ্টভাবে মুদ্রিত। 'সেকেণ্ড'-জ্ঞাপক কাঁটাটি পর্য্যন্ত এই ঘড়ীতে সংলগ্ন আছে। এই পুষ্প-লতাশোভিত বিচিত্র ঘটিকাযন্ত্রটি নয়নানন্দ-দায়ক; ইণ্টারলেকেনের কোনও স্বাস্থ্যনিবাসের উদ্যানমধ্যে ইহা সংস্থাপিত হওয়াতে তত্রত্য রোগী এবং চিকিৎসকগণ এই ঘড়ী দেখিয়া সময় নিরূপণ করিয়া থাকেন।

তামাকপাতার কফিপাত্র

জর্জ্জিয়ার কোন মেলায় তামাকপাতার দ্বারা নির্ম্মিত একটি অভিনব কফিপাত্র প্রদর্শিত হইয়াছিল। শিল্পী অত্যন্ত কৌশলসহকারে এই পাত্রটি নির্ম্মাণ করিয়াছিল। প্রদর্শনী-ক্ষেত্রে পাত্রটি এমনভাবে রাখা হইয়াছিল যে, পাত্র হইতে যেন কফি ঢালা হইতেছে। ইহাতে দর্শকগণ আধারটির

তামাকপাতা-নির্ম্মিত·কফিপাত্র

প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল। তামাকপাতা ঐ প্রদেশেই উৎপন্ন হইয়াছিল।

নিন্-হার-সাগ্ মন্দিরস্থ ষণ্ড-মূর্ত্তি

টেল্-এল্-ওবিদ্ জনপদ প্রাচীন উরপ্রদেশের সন্নিহিত স্থানে অবস্থিত ছিল। প্রত্নতাত্ত্বিকগণের প্রচেষ্টার ফলে টেল্-এল্-ওবিদ্ আবিষ্কৃত হইয়াছে। তথায় নিন্-হার-সাগ্ নামক একটি প্রাচীন মন্দির ছিল। এই মন্দির স্তূপমধ্য হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। মন্দিরগাত্রে একটা শিলালেখ দৃষ্টে প্রত্নতাত্ত্বিকগণ স্থির করিয়াছেন যে, রাজা A-an ne pad-da (আন্নিপদ্ম) সেই যুগে উরদেশে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তিনি 'নিন্-হার-সাগ্' দেবীর উদ্দেশ্যে উল্লিখিত মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। শিলালেখ পরীক্ষায় স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, খৃষ্ট-জন্মের ৪ হাজার ৫ শত বৎসর পূর্ব্বে উক্ত শিলালিপি উৎকীর্ণ হইয়াছিল। উল্লিখিত মন্দিরে একটি ষণ্ড-মূর্ত্তি আছে। শুভ্রবর্ণের শঙ্খ অথবা
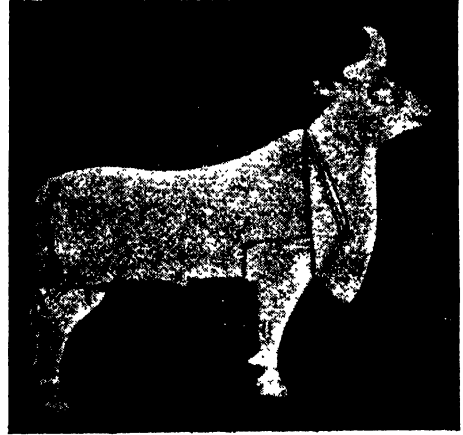
ব্যাবিলোনীয় প্রাচীন মূর্ত্তি

শুক্তি হইতে ষণ্ড-মূর্ত্তি ক্ষোদিত। সম্ভবতঃ পারস্যোপ-সাগর হইতে উক্ত শঙ্খ অথবা শুক্তি সংগৃহীত হইয়া থাকিবে। সুপ্রাচীন যুগের শিল্প-নৈপুণ্য এই ষণ্ড-মূর্ত্তিতে প্রকটিত। ৬ হাজার ৪ শত ২৫ বৎসর পূর্ব্বের মূর্ত্তি এখনও অভগ্ন অবস্থায় রহিয়াছে।

কোটি বৎসর পূর্ব্বের পদচিহ্ন

হোপাটকং হ্রদের সন্নিহিত প্রদেশে প্রসিদ্ধ আবিষ্কারক হড্-সন্ ম্যাক্সিমের জমীদারীতে খনন কার্য্য চলিতেছিল। সেই

হডসন্ ম্যাক্সিম ও ১ কোটি বৎসর পূর্ব্বের প্রাগৈতিহাসিক 'ডিনোসরে'র পদচিহ্নাঙ্কিত প্রস্তরখণ্ড

সময় প্রায় ৩০ ফুট ভূমির নিম্নে একটি নরম প্রস্তরের উপর প্রাগৈতিহাসিক 'ডিনোসর' জীবের পদচিহ্ন

আবিষ্কৃত হইয়াছে। পরীক্ষায় স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, এই পদচিহ্ন ১ কোটি বৎসরের পূর্ব্বে উল্লিখিত প্রস্তরের উপর পড়িয়াছিল।

ত্রিচক্র মোটর গাড়ী

বার্লিন সহরে ত্রিচক্র মোটর গাড়ী নির্ম্মিত হইয়াছে। উহাতে দুই জন আরোহী অনায়াসে উপবেশন করিতে পারে। পাশাপাশি না বসিয়া আরোহীরা একজন অপরের পশ্চাতে বসিয়া থাকে। গাড়ীখানি এলিউমিনিয়মের

ত্রিচক্র মোটর গাড়ী

দ্বারা নির্ম্মিত। সাধারণ মোটর গাড়ীর মত ইহাতে আলোক, বাতাস-নিবারক কাচ প্রভৃতির সমাবেশ আছে।

পাখীর সখ

আমেরিকার জনৈক ব্যক্তি অত্যন্ত পাখী ভালবাসেন। তাঁহার বাড়ীর সম্মুখে তিনি বড় গাছের উপর পক্ষীদিগের জন্য একটি কাষ্ঠনির্ম্মিত বহু কক্ষবিশিষ্ট বাসভবন নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। বৃক্ষের গুঁড়িটা তিনি টিনের দ্বারা এমন-ভাবে বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছেন যে, মার্জ্জারগণ সে বৃক্ষে আরোহণ করিয়া পাখীদিগের সর্ব্বনাশ করিতে পারে না। পক্ষিগণ নির্ভয়ে সেই বৃক্ষে আসিয়া বাসা বাঁধে অথবা খোপের মধ্যে থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া লয়। তাহারা

বৃক্ষকাণ্ডে পক্ষি-ভবন

সহজাত বুদ্ধির প্রভাবে বুঝিতে পারে, উক্ত বৃক্ষ মার্জ্জার দ্বারা আক্রান্ত হইতে পারিবে না, এ জন্য বহুসংখ্যক পক্ষী সেই বৃক্ষে ঋতু অনুসারে আসিয়া বাস করে।

শিল্পীর অভিনব মডেল

শিল্পীরা চিত্রাঙ্কন অথবা প্রস্তরের মূর্ত্তি প্রভৃতি নির্ম্মাণকালে 'মডেল' ভাড়া করিয়া আনিয়া থাকেন। একটা আদর্শ

চিত্রকর নির্জীব মডেলকে মনোমতভাবে দাঁড় করাইতেছেন

না পাইলে চিত্রাঙ্কণ প্রভৃতি কার্য্যের সুবিধা হয় না। জনৈক শিল্পী কয়েকটি সুন্দর মূর্ত্তি গড়িয়া তাহাদিগকে আদর্শ করিয়া চিত্র অঙ্কিত করিয়া থাকেন। ইহাতে তাঁহাকে সজীব মডেলের জন্য অর্থ ব্যয় করিতে হয় না। মূর্ত্তিগুলি এমনইভাবে নির্ম্মিত যে, তাহাদিগকে ইচ্ছামত অবস্থায় রক্ষা করা যায়। না জানিলে বুঝিতে পারা যায় না যে, মূর্ত্তিগুলি সজীব নহে। শিল্পী যে রকম অবস্থার চিত্র অঙ্কিত করিতে চাহেন, মূর্ত্তিগুলিকে ঠিক তেমনইভাবে রাখিবার সুবিধা ইহাতে অনেক বেশী। সজীব মডেল অনেক সময় এই নির্জীব মডেলের অবস্থান-ভঙ্গী দেখিয়া আপনাকে সংযত করিয়া রাখিতেও পারে। যে শিল্পী এইরূপ প্রাণহীন মডেলের সাহায্যে চিত্রাঙ্কন করিতেছেন, তাঁহার নাম হ্যারিসন্ ফিসার্।

বৈদ্যুতিক দীপশলাকা

চুরুট বা চুরুটিকা ধরাইয়া ধূমপানের প্রয়োজন হইলে দীপশলাকা নহিলে চলে না; কিন্তু বৈজ্ঞানিকগণের কৃপায় আমেরিকার বিলাসীদিগের বৈঠকখানা ঘরে দীপশলাকা রাখিয়া চুরুট প্রভৃতি ধরাইবার ব্যবস্থা পরিহার করা হইতেছে। নবনির্ম্মিত বৈদ্যুতিক অগ্নি-উৎপাদক যন্ত্র (চিত্র দেখিলেই বুঝা যাইবে) গৃহমধ্যস্থ যে কোনও বৈদ্যুতিক আলোকাধারের সকেটএ (Socket) সংলগ্ন করিয়া দিলেই যন্ত্রটি এমন উত্তপ্ত হইয়া উঠিবে যে, চুরুট বা চুরুটিকা ধরাইয়া লইতে মুহূর্ত্ত বিলম্ব হইবে না। বিলাসী, সৌখীন পুরুষদিগের পক্ষে এই ব্যবস্থা যে খুবই প্রীতিপ্রদ এবং আধুনিক সভ্যতাদ্যোতক, তাহা বলাই বাহুল্য। পুনঃ পুনঃ দীপশলাকা জ্বালিবার বালাই ইহাতে নাই। সৌখীন বন্ধুবর্গকে তৃপ্ত করিয়া আনন্দ অর্জ্জনের অবকাশও ইহাতে আছে।

চুরুট ধরাইবার বৈদ্যুতিক আলোক

অভিনব বন্ধনী

চেয়ার, টেবল, খাট, পালঙ্ক প্রভৃতি তৈজসপত্র কিছুকাল ব্যবহারের পর শিথিলপদ হইয়া পড়ে। পায়াগুলি যাহাতে দৃঢ় ও সুসংবদ্ধ থাকে, সে জন্য সম্প্রতি এক প্রকার বন্ধনী আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই বন্ধনী চেয়ারের ৪টি পায়ার কোণে আবদ্ধ থাকে। তাহাতে পায়াগুলি পরস্পরের দিকে আকৃষ্ট হয়। এই বন্ধনী টেবল, খাট প্রভৃতি পায়াবিশিষ্ট তৈজস-পত্রে সন্নিবিষ্ট করিলে, তাহাদের পায়া দীর্ঘকাল অটুটভাবে থাকিবে। বিশেষজ্ঞগণ বলিতেছেন যে, এই বন্ধনী ব্যবহার করিলে অতি অল্প

বন্ধনীযুক্ত চেয়ার

খরচে টেবল, চেয়ার প্রভৃতি দীর্ঘকাল অটুট অবস্থায় রাখা যাইবে। বন্ধনী কি প্রণালীতে চেয়ারে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, তাহা চিত্র দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে।

জেরুসালেমের প্রাচীনতম কীর্ত্তি

১৯২৬ খৃষ্টাব্দে ফিলাডেল্‌ফিয়া নগরে একটি প্রদর্শনী বসিবে। বাইবেলের বর্ণনা অনুসারে এবং অন্যান্য বিবরণ সংগ্রহ করিয়া, পণ্ডিতগণ রাজা সলোমনের নির্ম্মিত মন্দির, তাঁহার অন্যতমা পত্নী—কোনও ফারাও নৃপতির কন্যার জন্য নির্ম্মিত প্রাসাদ প্রভৃতি জেরুসালেম নগরে কি প্রণালীতে নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহা আবিষ্কার করিয়াছেন। সেই প্রাচীনতম যুগে মন্দির, প্রাসাদ প্রভৃতি জেরুসালেমের শোভা কি ভাবে বর্দ্ধিত করিয়াছিল, অভিজ্ঞগণ তাহার নক্সা প্রস্তুত করিয়াছেন। ফিলাডেল্‌ফিয়া প্রদর্শনীতে, রাজা সলোমনের প্রাচীন কীর্ত্তিকে সঞ্জীবিত করিয়া অভিজ্ঞগণ দর্শকদিগকে পরিতৃপ্ত করিবেন। ২ শত ৪০ ফুট উচ্চ একটি দুর্গের দ্বারা সলোমনের নগরকে সুশোভিত করা হইবে। এই ব্যাপারে প্রায় কোটি টাকা ব্যয়িত হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে।
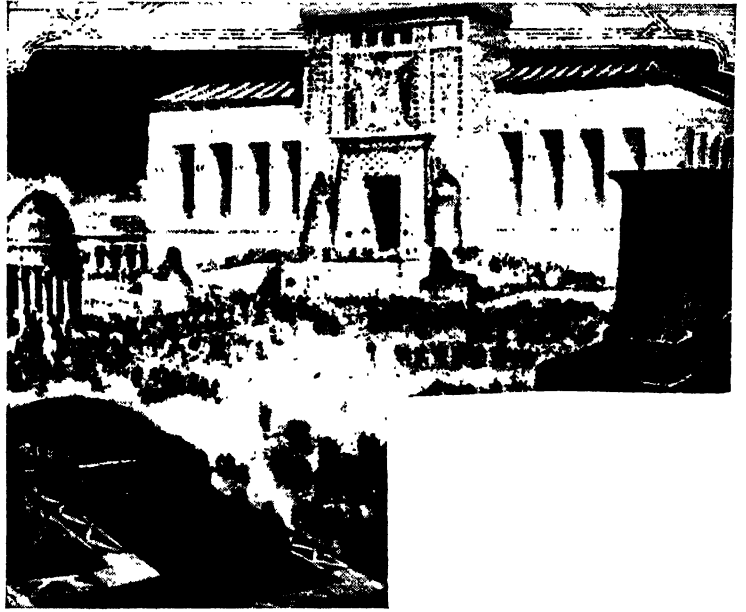
রাজপ্রাসাদের সম্মুখের তোরণ প্রভৃতির দৃশ্য

প্রাচীনযুগে সলোমনের সময় জেরুসালেম—২ শত ৪০ ফুট উচ্চ দুর্গ

জলনিমজ্জন ও বিষাক্ত বাষ্পে মৃত ব্যক্তিকে পুনরুজ্জীবিত করিবার উপায়

আমেরিকা যুক্তরাজ্যে প্রতি বৎসর গড়ে ১২ হাজার লোক বিষাক্ত বাষ্প, বৈদ্যুতিক আঘাত দ্বারা ও জলমগ্ন হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকে। বিগত বৎসরে শুধু জলে ডুবিয়া ৭ হাজার নরনারী মারা গিয়াছে। চিকাগো নগরের স্বাস্থ্যবিভাগের কমিশনার ডাক্তার হারমান্ বণ্ডসেন্ উল্লিখিত প্রকার অপমৃত্যুর আলোচনা করিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, এইরূপ আকস্মিক মৃত্যু হইলেই তাহার সম্বন্ধে হতাশ হইবার প্রয়োজন নাই। অনেক ক্ষেত্রে জীবন থাকিতেও,চেষ্টার অভাবে তাহাকে মৃতের দলে ফেলা হইয়া থাকে।

কৃত্রিম প্রণালীতে রোগীর দেহে শ্বাসপ্রশ্বাস ফিরাইয়া আনা হইতেছে। রোগীর মুখ আবৃত থাকিবে; উপর হইতে নীচের দিকে দুই হাতে মর্দ্দন করিবার কালে করতল চাপিতে হইবে

কৃত্রিম উপায়ে তাহার শ্বাসপ্রশ্বাসক্রিয়াকে ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা হইলে, তাঁহার মতে, অর্দ্ধেকসংখ্যক ব্যক্তিকে পুনরুজ্জীবিত করিতে পারা যায়। তিনি বলেন, বিষাক্ত বাষ্পপ্রভাবে বা জলমগ্ন হইয়া যাহাদের মৃত্যু ঘটে, তাহাদের প্রায় সকলকেই বাঁচাইতে পারা যায়। অনাবশ্যক বিলম্ব না করিয়া, আকস্মিক দুর্ঘটনার অব্যবহিত পরেই মৃত ব্যক্তির দেহে কৃত্রিম উপায়ে শ্বাসপ্রশ্বাসক্রিয়া ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করিতে হইবে। অন্যূন ৪ ঘণ্টাকাল ধরিয়া অবিশ্রান্তভাবে এই প্রক্রিয়া করা দরকার। ডাক্তার বণ্ডসেন্ বলেন, রোগীকে স্থানান্তরিত করিতে, বাতাস দিতে, জলপান করিবার অবকাশ দিতে বা তাহার বস্ত্র শিথিল করিতে অযথা বিলম্ব করা উচিত নহে। জলমগ্ন অবস্থায় মৃত্যু হইলে, তাহার উদর হইতে জল বাহির করিবার চেষ্টা না করিয়া কৃত্রিম উপায়ে শ্বাসপ্রশ্বাসক্রিয়া ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করিতে হইবে। যদি বৈদ্যুতিক আঘাতে কাহারও মৃত্যু ঘটে, সযত্নে তাহাকে তাড়িত প্রবাহের সংস্রব হইতে মুক্ত করিতে হইবে—এরূপ ক্ষেত্রে কাষ্ঠ, দড়ি, বস্ত্র বা রবার ব্যবহার করা প্রয়োজনীয়। তাহার তাড়িতাহত দেহকে সহসা স্পর্শ করা সঙ্গত নহে। বিষাক্ত গ্যাসে কাহারও মৃত্যু ঘটিলে, অবিলম্বে তাহার দেহ মুক্ত বায়ুতে লইয়া যাইতে হইবে; কিন্তু তাহাকে শীতার্ত্ত স্থানে রাখা বা হাঁটাইবার চেষ্টা করা আদৌ সঙ্গত নহে। সকল ক্ষেত্রেই মৃতদেহে কৃত্রিম উপায়ে শ্বাসপ্রশ্বাসক্রিয়া ফিরাইয়া আনিতে হইবে। স্বাভাবিক ভাবে শ্বাসপ্রশ্বাস বহিতে আরম্ভ করিলেও রোগীর প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। কারণ, অনেক ক্ষেত্রে পূর্ণ শ্বাসপ্রশ্বাসক্রিয়া প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্বেই রোগীর শ্বাস বন্ধ হইয়া যাইতে পারে। জ্ঞান ফিরিয়া আসিলেই কৃষ্ণাভ কফি রোগীকে পান করিতে দেওয়া দরকার। হুইস্কি কি ব্রাণ্ডি পান করান আদৌ কর্ত্তব্য নহে। মোটের উপর কখনও উত্তেজিত না হইয়া ধীরভাবে শুশ্রূষা করিতে হইবে।

ধীরে ধীরে মনে মনে ৪ পর্য্যন্ত গণনা করিবার পর হাত ছাড়িয়া দিতে হইবে। ফুসফুসকে বায়ু আকর্ষণ বিকর্ষণের সময় দিয়া আবার পূর্ব্ববৎ মর্দ্দন করিতে হইবে
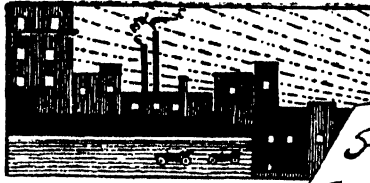
গ্রাম ও জাতি গঠন

এবার কংগ্রেসে গ্রাম ও জাতি গঠনের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছে। দেশের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল ও সঙ্ঘবদ্ধ স্বরাজ্যদলের উপর কংগ্রেস পূর্ণ আস্থা স্থাপন করিয়া দেশের কার্য্যের ভার ন্যস্ত করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহারা যে গ্রাম ও জাতি গঠনের কার্য্যকে দেশের কার্য্যের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া ধরিয়া লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবেন, এমন আশা করা অসঙ্গত বা অস্বাভাবিক নহে। এ যাবৎ তাঁহাদের কার্য্যপদ্ধতির কথা কাগজে বড় বড় হরফে ছাপা হইয়াছে, দেখা গিয়াছে। বাঙ্গালায় স্বরাজ্য-নেতাকে কোনও কোনও জিলায় গিয়া বক্তৃতা ও প্রচার-কার্য্যে ব্যস্ত থাকিতেও দেখা গিয়াছে, কিন্তু গ্রাম ও জাতি গঠনকার্য্য ইহাতে কতটা অগ্রসর হইয়াছে, জানিতে পারা যায় নাই, সে কার্য্যের কোথায় কিরূপ ভিত্তিপত্তন হইয়াছে, তাহাও জানা যায় নাই।

কেহ কেহ বলেন, এই প্রচারকার্য্যের মূলে আগামী কাউন্সিল নির্ব্বাচনের সংস্রব আছে। সকল রাজনীতিক দলই যে এ জন্য এখন হইতে গ্রামে গ্রামে কেন্দ্রে কেন্দ্রে সভাসমিতি করিতেছেন, আপনাদের কার্য্যপদ্ধতির ধারা ও প্রকৃতি জনসাধারণকে বুঝাইয়া দিতেছেন, তাহা দেখা যাইতেছে। এই কলিকাতা সহরেই কয়টা propaganda সভা হইয়া গেল। স্বরাজ্য দল সেইভাবে মফঃস্বলে প্রচার-কার্য্য চালাইতেছেন কি না, তাহাও বুঝা যাইতেছে না। যদি তাঁহারা তাঁহাদের সমস্ত শক্তি ইহাতে নিয়োজিত করিতেন, তাহা হইলে হাওড়া-চুঁচুড়া মুসলমান নির্ব্বাচন কেন্দ্র হইতে সার আবদর রহিমের মত জাতির অনিষ্টকারী মুসলমান নির্ব্বাচিত হইতেন না। সার আবদর আলিগড়ের বক্তৃতায় তাঁহার সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক স্বার্থের ও হিন্দু-বিদ্বেষের প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রদান করিয়াছেন; তিনি হিন্দু-মুসলমানের মিলনের পক্ষে ধূমকেতুর মত উত্থিত হইয়াছেন। এমন লোক এক শ্রেণীর স্বার্থপর ধর্ম্মান্ধ লোকের আদর্শ বন্ধু হইতে পারেন, কিন্তু দেশপ্রেমিক স্বরাজকামীর পরম শত্রু ব্যতীত কিছুই নহেন। সুতরাং এমন লোককে একরূপ নির্ব্বিবাদে নির্ব্বাচিত হইবার অবসর প্রদান করিয়া স্বরাজ্য দল তাঁহাদের অকর্ম্মণ্যতা ও মেরুদণ্ডের অভাবের পরিচয় প্রদর্শন করিয়াছেন। দেশবন্ধুর ব্যক্তিত্বের অভাব এই সময়ে যেরূপ অনুভূত হইতেছে, এমন বোধ হয় পূর্ব্বে হয় নাই। কাযেই বলিতে হয়, স্বরাজ্য দল নির্ব্বাচন-সমরের প্রচারকার্য্যেও তাঁহাদের দায়িত্ব পালন করিতে পারিতে-ছেন না, প্রকৃত গ্রাম ও জাতি গঠন করা ত দূরের কথা। বাঙ্গালায় স্বরাজ্যদলই সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী। এ জন্য আমরা তাঁহাদের আলস্য ও কর্ম্মশক্তির অভাব দেখিয়া বাঙ্গালার ভবিষ্যৎ অন্ধকারময় হইবে বলিয়া শঙ্কিত হইয়াছি।

সহযোগিতার উত্তরে সহযোগ করিবার নীতি গ্রহণ করিয়া যাঁহারা স্বরাজ্যদল ছাড়িয়া নূতন দল Responsive Co-operationist গঠন করিয়াছেন, তাঁহাদের কার্য্যপদ্ধতির ঘোষণায়ও বড় বড় কথা আছে। বোম্বাই সহরে এই দলের অন্যতম নেতা মিঃ কেলকার বলিয়া-ছেন,—"সহযোগের উত্তরে সহযোগ কথার অর্থ দ্বৈত-শাসনের গুণগান বা সমর্থন করা নহে। আমরা সংস্কার আইন ন্যায্য ও উপযুক্ত হইয়াছে বলিয়া সংস্কার আইন-মত কাউন্সিলে কার্য্য করিতে চাহিতেছি না। আমরা জনসাধারণের যাহাতে মঙ্গল হয়, এমনভাবে কাউন্সিলে কার্য্য করিতে যাইতেছি এবং এই সংস্কার আইন হইতে আরও সংস্কার-মধু নিঙড়াইয়া বাহির করিতে যাইতেছি। দৃঢ়মূল জমীর উপর দাঁড়াইয়া ব্যুরোক্রেশীর সহিত রাজ-নীতিক যুদ্ধ করিবার জন্য আমরা সংস্কার আইনকে আশ্রয় করিতেছি। যাহারা অলস বাধাপ্রদানকারী, আমরা তাহাদের অপেক্ষা ব্যুরোক্রেশীর অধিক ভয়ঙ্কর শত্রু।"

বোম্বাইয়ে যে সময়ে কাউন্সিল-কর্ম্মী নূতন দলের নেতা বুঝাইতেছেন,—"কাউন্সিল-কামী ভাঙ্গা দলের সহিত

তাঁহাদের নূতন দলের আদর্শের ও কার্য্যপদ্ধতির কোনও ঐক্য নাই," ঠিক সেই সময়ে কলিকাতায় এই নূতন দলের এলবার্ট হলের সভায় সভাপতি বুঝাইতেছেন,—"One Party must be our end, the mother-land must be our sole Goddess! স্বাধীন দেশেই দলাদলি শোভা পায়। আমাদের মত দেশকে এক প্রবল শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে হইতেছে, সুতরাং আমরা দলাদলির 'বিলাস' উপভোগ করিতে পারি না।"

এইরূপে বাক্য-সমর চলিতেছে, বক্তৃতা দ্বারা, প্রচার দ্বারা নিজ নিজ দলপুষ্টির চেষ্টা চলিতেছে ; কিন্তু গ্রাম বা জাতিগঠনের কোনও চেষ্টাই পরিলক্ষিত হইতেছে না। মহাত্মার প্রভাবের আমলে গ্রামে গ্রামে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, সে সমস্ত প্রতিষ্ঠান গ্রামে গ্রামে কেন্দ্রে কেন্দ্রে গ্রাম ও জাতি গঠনের কার্য্য করিত, গ্রামবাসী জনসাধারণের সহিত কংগ্রেসের সংস্পর্শ রক্ষা করিত। আজ সেগুলিকে বাঁচাইয়া তুলিবার কি চেষ্টা হইতেছে? বরং কাউন্সিলবিরোধী অসহযোগীরা সংখ্যায় অল্প হইলেও গ্রামে কায করিতেছেন। ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ ত্যাগী কর্ম্মীরা গ্রামে গ্রামে খদ্দর স্কন্ধে লইয়া লোকের দ্বারে দ্বারে বিক্রয় করিতেছেন, স্বাবলম্বনের মহামন্ত্রকে স্বকার্য্যে সজীব করিয়া তুলিতেছেন।

আর এক শ্রেণীর কর্ম্মীর কথা উল্লেখ করিতে পারি। তাঁহারা কোনও দলাদলির মধ্যে নাই, তাঁহারা নীরবত্যাগী কর্ম্মী, নিজের ঢাক পিটিয়া বেড়ান না। এই কর্ম্মিসঙ্ঘের নাম Bengal Health Association. এই নীরব কর্ম্মসমিতি যে ভাবে গ্রাম ও জাতি গঠন করিতেছেন, যে ভাবে নর-নারায়ণ-সেবায় আত্মনিয়োগ করিতেছেন, তাহাতে মনে হয়, তাঁহারাই গ্রাম ও জাতি গঠনে বাঙ্গালায় আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিবেন। মাত্র ২ বৎসরের মধ্যে তাঁহারা বাঙ্গালার ৭টি জিলায় ৩৫টি স্বাস্থ্যকেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন এবং ৩০ হাজারেরও অধিক কালাজ্বর-রোগাক্রান্ত ব্যক্তির চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাঁহারা সহস্র সহস্র বাঙ্গালীর প্রাণরক্ষা করিয়াছেন বলিয়া গর্ব্বানুভব করিয়া থাকেন। এ গর্ব্ব করা আমরা স্বাভাবিক বলিয়াই মনে করি। উৎকট ও দুরারোগ্য রোগে একটি প্রাণরক্ষাই কত বড় কথা, সহস্র প্রাণরক্ষার ত কথাই নাই। সমিতি যে কেবল কালাজ্বর ও ম্যালেরিয়া উচ্ছেদে যত্নবান্ হইয়াছেন, তাহা নহে, তাঁহারা আলোকচিত্র প্রদর্শন ও পুস্তকপুস্তিকা প্রচারের সাহায্যে বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে তাঁহাদের মহতী বার্ত্তা লইয়া যাইতেছেন। বাঙ্গালার বিশেষ রোগের নিদান নির্ণয়ে তাঁহারা গবেষণার বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়াছেন। রোগের সেবা-পরিচর্য্যায় তাঁহারা এক দল মহাপ্রাণ যুবককে স্বেচ্ছাসেবায় পারদর্শী করিয়া তুলিতেছেন। তাঁহাদের মূলমন্ত্র—লোকসেবা, উপায় ভগবানের আশীর্ব্বাদ ও স্বাবলম্বন। আশা করি, তাঁহাদের মহৎ উদ্দেশ্য সার্থক হইবে।

যদি এইভাবেও গ্রাম ও জাতি গঠন কার্য্য গড়িয়া তুলা যায়, তাহা হইলেও দেশের প্রভূত মঙ্গল। নতুবা কেবল কাকদ্বন্দ্ব ও দলাদলিতে শক্তির অপচয় হইবে মাত্র।

প্রবাসী ভারতীয় ও বৃটিশ সাম্রাজ্য।

ব্যবস্থা পরিষদে বড় লাট লর্ড রেডিং যে বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহাতে প্রবাসী ভারতীয়দিগকে কোনও আশা দিতে পারেন নাই। কেবল চেষ্টা হইতেছে,—আশাহত হইবার কারণ নাই বলিয়া আশ্বাস দিলে প্রকৃত কায হয় না। লর্ড রেডিং দক্ষিণ-আফরিকায় যে ডেপুটেশন প্রেরণ করিয়াছেন, সেই 'সরকারী ডেপুটেশনকেও' সেখানকার কর্ত্তৃপক্ষ আমল দেন নাই। এ অপমানটাও লর্ড রেডিং বেমালুম পকেটস্থ করিয়াছেন। দক্ষিণ-আফরিকার শ্বেতকায় কর্ত্তৃপক্ষ আপাততঃ "দয়া করিয়া" কোণঠেসা আইন স্থগিত রাখিয়াছেন বটে, কিন্তু সে আইন যে অদূরভবিষ্যতে বিধিবদ্ধ হইবে, তাহা তাঁহাদের ব্যবহারেই বুঝা যাইতেছে। এমন কি, সম্প্রতি তার আসিয়াছে যে, Action is being taken already in South Africa as if the Bill had become law of the land and renewals of licenses are being refused. সুতরাং মনে হয়, মহাত্মা গন্ধী সে দিন যাহা বলিয়াছেন, তাহাই সত্য হইবে। তিনি বলেন, হয় ত লর্ড রেডিং এই বিলের সামান্য অদলবদল (trifling alteration in detail) করাইতে সমর্থ হইবেন, কিন্তু এই বিলের হুলে যে বিষ থাকিবে, তাহার কিছুই করিতে পারিবেন না। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে যে

রফা হয়, সেই রফা অনুসারে ভারতীয় প্রবাসীদের যে সমস্ত অধিকার দেওয়া সাব্যস্ত হইয়াছিল, কোণঠেসা আইনে তাহা খর্ব্ব করা হইবে। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দ হইতে এ যাবৎ ক্রমশঃ সেই অধিকার নানারূপে খর্ব্ব করিয়া আনা হইতেছে। ইহার পর আইন বিধিবদ্ধ হইলে ভারতীয় প্রবাসীর পক্ষে দক্ষিণ-আফরিকায় বাস করা অসম্ভব হইবে। অথচ রফায় স্থির হইয়াছিল,—No more disabilities but steady improvement in the position of Resident Indian population after removal of fear for unrestricted immigration of Indians. নূতন ভারতীয় প্রবাসী অতিরিক্ত সংখ্যায় যাহাতে দক্ষিণ-আফ্রিকায় আসিতে না পারে,তাহার আশঙ্কা কি নানা আইনে দূর করা হয় নাই? এখন ত শুনা যায়, যাহারা বহুদিন যাবৎ ঐ স্থানে বাস করিতেছে, তাহাদেরই সেখানকার জন্মভূমিতে বাস করা দায় হইয়া উঠিয়াছে, নূতন প্রবাস-বাসেচ্ছু ভারতীয় ত দূরের কথা। তবে? বাসিন্দা ভারতীয়ের অবস্থার উন্নতিবিধান না করিয়া বরং অবনত করিবার চেষ্টা হইতেছে কেন? ইহা কোন্ ন্যায়ধর্ম্ম অনুমোদিত? লর্ড রেডিংই বা এই অন্যায়ের বিপক্ষে ডেপুটেশন পাঠাইলে সেই ডেপুটেশন অপমানিত হইলে নীরব থাকেন কেন?

গন্ধী-স্মাটস রফাটা দক্ষিণ-আফরিকায় উড়াইয়া দিবার চেষ্টা হইতেছে। সেখানকার 'কেপ টাইমস' পত্র লিখিয়াছেন, যে সময়ে ঐ রফা হইয়াছিল, তখনকার অবস্থানুসারে দক্ষিণ-আফরিকার কর্ত্তৃপক্ষ যে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, এখনকার কর্ত্তৃপক্ষ ভিন্ন অবস্থায় সেই রফা মানিয়া চলিবেন কেন? মিঃ প্যাট্রিক ডানকান নামক দক্ষিণ-আফরিকাবাসী বলিয়াছেন, The Bill does not interfere with the Gandhi-Sumtts Agreement. ইহা কেমন ন্যায়ধর্ম্মানুমোদিত যুক্তি? সুযোগ ও সুবিধা বুঝিয়া যদি রফা রদ-বদল করা যায়, তাহা হইলে রফার মূল্য কি? তাহা হইলে জগতে যত সন্ধি-সর্ত্ত হইয়াছে, তাহারই বা মূল্য কি? জার্ম্মাণ কাইজার বেলজিয়ামের নিরপেক্ষতা রক্ষার সম্বন্ধে সন্ধিকে 'চোতা কাগজ' বলিয়া অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন বলিয়া মহাযুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল, ইংরাজের বিবরণেই এইরূপ প্রকাশ। সে জন্য জার্ম্মাণ কাইজারকে দানা, দৈত্য, রাক্ষস, বর্ব্বর আখ্যায়ও ভূষিত করা হইয়াছিল। তবে আজ সুসভ্য ন্যায়ধর্ম্মপরায়ণ অপক্ষপাত ইংরাজ উপনিবেশ গন্ধী-স্মাটস রফাকে কালোপযোগী নহে বলিয়া উড়াইয়া দিতে চাহিতেছেন কেন? দক্ষিণ-আফরিকার শ্বেতাঙ্গরা না কি বড়ই ধর্ম্মভীরু,—তাঁহারা তাঁহাদের য়ুনিয়ন পার্লামেণ্টের কোন মরশুমী অধিবেশনকালে ভগবানের দয়া প্রার্থনা না করিয়া কার্য্যারম্ভ করেন না। তাঁহাদের ভগবান্ কোন্ ভগবান্? সে ভগবান্ কি কেবল দক্ষিণ-আফরিকার শ্বেতকায়ের ভগবান, আর কাহারও নহেন?

কেবল যে এসিয়াবাসীর বিরুদ্ধে শ্বেতকায়দের এই সঙ্কীর্ণ স্বার্থসমর, তাহা নহে, তাহারা Class Areas Bill ও Colour Bar Bill দ্বারা দক্ষিণ-আফরিকার আদিম কৃষ্ণাঙ্গ অধিবাসীদিগকেও 'নিজ বাসভূমে পরবাসী' করিবার চেষ্টা করিতেছেন। এ জন্য তাঁহাদের দলপতিরা ভারতীয় সমস্যাকেও নিজস্ব সমস্যা করিয়া লইয়া একযোগে এই সমস্ত অন্যায় বর্ব্বর আইনের প্রতিবাদ করিতে বদ্ধ-পরিকর হইয়াছেন। ইহার পরিণাম কি, তাহা এই মুষ্টিমেয় আফরিকান শ্বেতাঙ্গ সমাজ না জানিতে চাহিলেও সাম্রাজ্যবাদী ইংরাজ রাজনীতিকরা অবশ্যই বুঝেন। এই যে সারা জগৎময় উদ্ধত, গর্ব্বিত, সাম্রাজ্যবাদী শ্বেতাঙ্গের ব্যবহারে জাতিবিদ্বেষের হলাহল উত্থিত হইতেছে, ভবিষ্যতে ইহাতে কি জগতের শান্তি পর্য্যুদস্ত হইবে না?

লর্ড রেডিং আইনজ্ঞ কূট-রাজনীতিক, এইরূপই তাঁহার খ্যাতি আছে। তিনি 'আইন ও শৃঙ্খলার' এত স্তাবক হইয়া কিরূপে সাম্রাজ্যমধ্যে ভবিষ্যতে আইন ও শৃঙ্খলার অন্তরায়, অসন্তোষ ও অশান্তির বীজ অঙ্কুরিত হইতে দিতেছেন? আফরিকানরা মুখে যতই 'লম্বাই চৌড়াই' করুক, তাহারা ইহা বিলক্ষণ জানে যে, ইংরাজের সাহায্য ব্যতীত তাহাদের মত মুষ্টিমেয় জাতি জগতে এক দিন স্বাধীন থাকিতে পারে না। তাহাদেরই পার্লামেণ্টের এক সদস্য স্বীকার করিয়াছেন যে, ইংরাজের নৌবহর তাঁহাদের দেশ রক্ষা না করিলে তাঁহারা এক দিনও তিষ্ঠিতে পারেন না। যদি ইহাই হয়, তাহা হইলে সাম্রাজ্যের মঙ্গলের জন্য তাহাদিগকে ইংরাজ কি ভারতের প্রতি সমানের ব্যবহার করাইতে বাধ্য করিতে পারেন না? তাহারা স্বায়ত্ত-শাসিত, অতএব তাহাদিগের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা যায় না,—এ সব ভুয়া কথা বলিয়া লোক ভুলাইলে চলিবে

না। ও-সব কথা অনেক হইয়া গিয়াছে। এখন লর্ড রেডিং যদি আপনার ও ভারত সরকারের প্রতিপত্তি রক্ষা করিতে চাহেন, তাহা হইলে কথার আশ্বাস ছাড়িয়া কায ধরুন, যাহারা ক্ষুদ্র ও মুষ্টিমেয় হইয়া তাঁহার সরকারকে অপমান করিয়াছে, তাহাদের সমুচিত প্রত্যুত্তর দানের ব্যবস্থা করুন, অন্যথা তাঁহার 'আশ্বাসের প্যাসিফিক্' বহিলেও ভারতবাসীর মন ভিজিবে না।

লর্ড রেডিং কেবল এইটুকু স্মরণ রাখুন যে, যে বৃটিশ 'কমনওয়েলথের' মধ্যস্থ ভারতে তিনি 'ন্যায়বিচার' করিতে আসিয়াছেন, সেই ভারতের লোক দক্ষিণ-আফরিকায় উড়িয়া গিয়া জুড়িয়া বসে নাই। তাহারা শ্বেতাঙ্গদের আহ্বানেই সেখানে গিয়াছিল এবং পরিশ্রম ও অধ্যবসায় দ্বারা সেখানে জঙ্গলকে আবাদ করিয়াছে; পরন্তু তাহারা সেখানে পুরুষানুক্রমে বসবাস করিতেছে। তাহারা সে দেশকেই জন্মভূমি বলিয়া জানে, ভারতে তাহাদের অনেকের ঘর-বাড়ী নাই—আত্মীয়-স্বজনও নাই। তাহাদের বিপক্ষে প্রবাসী শ্বেতাঙ্গদের প্রধান অভিযোগ কি, তাহা বিশপ ফিসারের পুস্তিকা পাঠেই জানা যায়:—"ভারতীয়রা মদ্যপায়ী নহে। এ জন্য তাহারা যে

টাকা জমাইতে পারে, তাহারই জন্য তাহারা য়ুরোপীয়ের অপেক্ষা কম দরে মাল বেচিতে পারে। য়ুরোপীয়রা সরাপ ক্রয়ে যে টাকাটা উড়াইয়া দেয়, তাহাতে সংসারে মিতব্যয়ী হইয়া বাস করিতে পারে না। ঘোড়দৌড় ও অন্যান্য জুয়াখেলায়, ফুটবল, হকি ইত্যাদি খেলায়, নাচ-তামাসায় ও বিলাসে অতিরিক্ত ব্যয় হেতু য়ুরোপীয়রা জীবন-সংগ্রামে ভারতীয়ের নিকট হটিয়া যাইতেছে, এ জন্য ব্যবসায়ে প্রতিযোগিতায় পরাজিত হয়।" সুতরাং অপরাধটা ভারতীয়ের নহে, য়ুরোপীয়ের নিজের। সে অপরাধের জন্য দণ্ড পাইবে কি ভারতবাসী?

শ্রীশচন্দ্রের লোকান্তর

কলিকাতার প্রসিদ্ধ বাঙ্গালী কাগজ-ব্যবসায়ী শ্রীশচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় গত ৩রা মাঘ রবিবার তাঁহার কলিকাতার বাসাবাটীতে অকালে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। যে বয়সে অধুনা বাঙ্গালীর সচরাচর মৃত্যু হয়, শ্রীশচন্দ্র সে বয়সের সান্নিধ্য লাভ করেন নাই, এমন নহে, তবে সে বয়সেও তিনি পূর্ণ কর্ম্মক্ষম ও উৎসাহ উদ্যমশীল ছিলেন, ইহাই আমাদের শোকের কথা। আমরা তাঁহাকে মৃত্যুর দিনের মাত্র ২ দিন পূর্ব্বে 'বসুমতী সাহিত্য-মন্দিরে' সহাস্যাননে আমাদের সহিত রহস্যালাপ করিতে দেখিয়াছি; সুতরাং এত শীঘ্র যে তিনি এইরূপে এই পৃথিবী হইতে চিরদিনের জন্য বিদায় গ্রহণ করিবেন, তাহা মনে করিতে পারি নাই।

শ্রীশচন্দ্র গুপ্ত

শ্রীশচন্দ্র নিজের অধ্যবসায়গুণে 'বড়' হইয়াছিলেন। ইংরাজীতে যাহাকে বলে Self-made man, শ্রীশচন্দ্র তাহাই ছিলেন। কালনায় তাঁহার পৈতৃক নিবাস। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যায় তিনি যশঃ অর্জ্জন না করিলেও তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও ধীশক্তিসম্পন্ন ছিলেন, বিশেষতঃ তাঁহার বাল্যকাল হইতেই ব্যবসায়বুদ্ধি ছিল। যৌবনে কানপুরে ব্যবসায়-ক্ষেত্রে তিনি অশেষ উন্নতি-সাধন করেন। কানপুরে সে সময় তাঁহার প্রভাব অসীম ছিল, তাঁহার চেষ্টায় কানপুরে কংগ্রেসের অধিবেশন হইয়াছিল। তিনি কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া কাগজের ব্যবসায়ে উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। কাগজের কাযে তাঁহার বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল। তিনি স্বয়ং ইংরাজী ভাষায় তাঁহার একখানি জীবন-কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, সেখানি প্রকাশিত হয় নাই। আমরা উহা পাঠ করিয়া বুঝিয়াছি, কি গুণে শ্রীশচন্দ্র কাগজের ব্যবসায়ে প্রতিযোগিতায় বিদেশীয়গণকেও পরাস্ত করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে সাফল্য-গৌরবে মণ্ডিত হইয়াছিলেন। বাঙ্গালী যুবকগণের মধ্যে সেই [illegible]
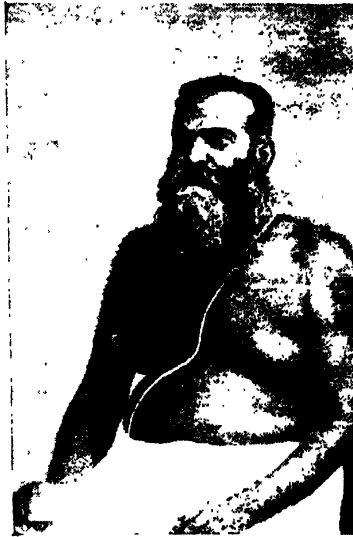
সম্যক্ আদর হইলে বাঙ্গালীও দেশে নিত্য নূতন ধনাগমের পথ নির্ব্বাচন করিয়া লইতে শিখিবে।

এক পুত্র-বিয়োগই শ্রীশচন্দ্রের বড় বাজিয়াছিল। প্রায় এক বৎসর হইতে চলিল, তাঁহার একটি কৃতী পুত্র যৌবনে ইহলোক ত্যাগ করেন। সেই পুত্রটি অশেষ গুণসম্পন্ন ছিলেন, এজন্য তিনি সকলেরই প্রিয়পাত্র ছিলেন। শ্রীশচন্দ্র সে আঘাতও কিরূপ অসাধারণ ধৈর্য্যসহকারে সহ্য করিয়াছিলেন, তাহা আমরা জানি। কিন্তু কৃষ্ণের অকাল-মৃত্যুর শোক ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির মত শ্রীশচন্দ্রের বুকের মাঝে অহরহ ধিকি ধিকি জ্বলিতেছিল। সেই অগ্নিই শেষে তাঁহাকে ভস্মীভূত করিয়াছে।

মৃত্যুর পূর্ব্ব-মুহূর্ত্ত পর্য্যন্তও শ্রীশচন্দ্র কার্য্য করিয়াছিলেন। সেই দিন সন্ধ্যার পর বক্ষোমধ্যে যন্ত্রণা অনুভব করেন এবং অতি অল্পক্ষণমধ্যেই ইহলোক ত্যাগ করেন।

শ্রীশচন্দ্র কালনায় গণ্যমান্য ছিলেন, তথাকার অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়াছিলেন। তিনি সদা সহাস্যবদন, রঙ্গরসপ্রিয়, মিষ্টভাষী, সদালাপী, সামাজিক লোক ছিলেন। তাঁহার বন্ধুভাগ্যও ভাল ছিল। তাঁহার মৃত্যুতে অনেকেই ব্যথা অনুভব করিয়াছেন। তাঁহার বিধবা পত্নী বিদুষী ফুলকুমারী গুপ্তা ও ভাগ্যহীন পুত্রগণ তাঁহার আত্মার মঙ্গল কামনা করিয়া শোকে সান্ত্বনা লাভ করুন, ইহাই কামনা।

তারকেশ্বর

ব্রাহ্মণসভার উদ্যোগে তারকেশ্বরের মোহান্তের বিপক্ষে হাই-কোর্টে যে মামলা চলিতেছিল, তাহার মীমাংসা হইয়া গিয়াছে। হাইকোর্ট সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, তারকেশ্বরের মন্দির, দেবসেবা ও বাজারের কর্ত্তৃত্ব এখন রিসিভারের হস্তে ন্যস্ত থাকিবে, যত দিন সে সম্বন্ধে শেষ মীমাংসা না হয়, তত দিন ঐ কর্ত্তৃত্ব অক্ষুণ্ণ থাকিবে; তবে মোহান্ত ইহা ছাড়া তারকেশ্বরের অন্যান্য সম্পত্তির মালিকান-স্বত্ব উপভোগ করিতে পারিবেন এবং তাঁহার প্রাসাদের একাংশে রিসি-ভারের কার্য্যালয় থাকিবে ও মোহান্ত অপরাংশ দখল করি-বেন। বলা বাহুল্য, হাইকোর্টের এই সিদ্ধান্ত হিন্দুসমাজের পক্ষে আদৌ সন্তোষজনক হয় নাই। ব্রাহ্মণসভা এই সিদ্ধান্তের বিপক্ষে প্রিভিকাউন্সিলে আপীল করিবার জন্য হাইকোর্টের অনুমতি চাহিয়াছেন। আপীলে যাহাই হউক, দেবত্র সম্পর্কিত বিষয়ের ব্যবস্থা যাহাতে নির্দ্দোষ হয়, সে জন্য হিন্দু সমাজের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। হাইকোর্টে যে মামলা হয়, তাহার পরিচালনকার্য্যে অনেক দোষ ছিল। মামলা-চালকরা হিন্দুর আচার-ব্যবহার ও ধর্ম্মকর্ম্মসম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, বিদেশী, বিজাতি, বিধর্ম্মী ব্যবহারাজীবের হস্তে মামলা পরি-চালনের ভার দিয়া বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়াছিলেন বলিয়া আমরা মনে করি না। তাহার উপর মহামান্য হাইকোর্টের বিচারকরাও যে হিন্দুর দেবত্র আইনসম্পর্কে হিন্দু ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণের শাস্ত্রসম্মত যুক্তিতর্কের সাহায্য গ্রহণ করিয়া এই মামলার বিচার-সিদ্ধান্ত করা সমীচীন বলিয়া মনে করেন নাই কেন, তাহা বুঝিয়া উঠা যায় না। 'কোম্পানীর আমলে' এই প্রথা বিদ্যমান ছিল। ইংলণ্ডের রাজবংশ ভার-তের শাসনদণ্ড কোম্পানীর নিকট হইতে স্বহস্তে গ্রহণ করি-বার পর মহারাণী ভিক্টোরিয়া তাঁহার বিখ্যাত ঘোষণাপত্রে এ দেশের লোকের ধর্ম্মসম্বন্ধে নিরপেক্ষতা অবলম্বন করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র সম্রাট সপ্তম এডোয়ার্ড এবং পৌত্র সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ এই প্রতিশ্রুতি এ যাবৎ পালন করিয়া আসিয়াছেন এবং আপ-নারাও এই প্রতিশ্রুতির পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন। সে ক্ষেত্রে হিন্দুর দেবত্র আইনসম্পর্কিত এমন জটিল মামলার বিচার-কালে শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের মতামত গ্রহণ করিয়া মামলার বিচার করিলে নিরপেক্ষতা অবলম্বনের মূল উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে, অন্যথা লোকের মনে সন্দেহ ও অসন্তোষ সঞ্জাত হইবার সম্ভাবনা। বিচারক যতই আইনজ্ঞ হউন না, এ দেশের শাস্ত্রসম্বন্ধে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞ না হইলে এ দেশের দেবত্র-সম্পর্কিত মামলার সুবিচার করিতে পারেন বলিয়া হিন্দুসমাজ নিঃসন্দেহ হইতে পারেন না। সুতরাং যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে, এখন আপীল শুনানীর সময়ে সরকার এ বিষয়ে দৃষ্টি রাখিয়া মামলার বিচারের ব্যবস্থা করিবেন, এমন দাবী অবশ্যই করা যাইতে পারে।

বিচারকালে আর একটা কথা লক্ষ্য করা কর্ত্তব্য। শুনা যায়, বর্ত্তমান মোহান্ত সতীশগিরি আয়কর হইতে অব্যাহতিলাভেচ্ছায় কোনও সময়ে স্বীকার করিয়াছিলেন যে, যেহেতু, তারকেশ্বর দেবত্র সম্পত্তি, সেই হেতু ঐ দেবত্র সম্পত্তির উপর আয়কর বসিতে পারে না। এ কথা

সত্য হইলে তাঁহাকে স্বীকার করিতে হয় যে, তারকেশ্বর দেবতার সম্পত্তি, তাঁহার বা অন্য কাহারও স্বোপার্জ্জিত বা উত্তরাধিকার-সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি নহে। আর একটা কথা, তারকেশ্বরে দেবতার পূজা, ভোগ, মানসিক আদি অর্থ হইতে তারকেশ্বরের সম্পত্তির উদ্ভব হইয়াছে, কেহ নিজের তহবিল হইতে অর্থ যোগান দিয়া এই সম্পত্তির সৃষ্টি করেন নাই। দেবতার জন্য সংগৃহীত অর্থ হইতে যে সম্পত্তির সৃষ্টি হয়, এবং তাহার উপস্বত্ব হইতে যাহা কিছু (কোটাবালাখানা জমীদারী ইত্যাদি) গড়িয়া উঠে, তাহাও দেবতার ; সুতরাং তারকেশ্বরের সম্পত্তি দেবতার না হইয়া অন্য কাহারও তাহাতে মালিকান-স্বত্ব কিরূপে সঞ্জাত হইতে পারে, তাহা শাস্ত্রজ্ঞ ও আইনজ্ঞ ব্যক্তিরাই বিবেচনা করিয়া দেখিতে পারেন।

১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে তারকেশ্বরের মোহান্ত সতীশ গিরি তদানীন্তন মোহান্ত মাধবচন্দ্র গিরির নিকট যে প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়া দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন, নিম্নে তাহার অবিকল নকল প্রদান করা হইল। সেই প্রতিজ্ঞা বা প্রতিশ্রুতি-পত্র ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের ২রা ফেব্রুয়ারী হুগলীর সদর সাব রেজিষ্টারী আফিসে রেজিষ্টারী করা হইয়াছিল। ইহা সেই খৃষ্টাব্দের ৭১৮ নম্বর হিসাবের ৪ নম্বর পুস্তকাবলীর প্রথম পুস্তকের ৩৫ পৃষ্ঠায় পাওয়া যাইবে। সেখানে সেই প্রতিশ্রুতিপত্র যে ভাষায় যে ভাবে রেজিষ্টারী করা হইয়াছিল, তাহাই অবিকল সেই ভাবে কোন প্রকার বর্ণাশুদ্ধি কিংবা ভাষাশুদ্ধির প্রতি লক্ষ্য না করিয়া সাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশিত হইল :—

"প্রতিশ্রুতি-পত্র

মহামহিম শ্রীযুত রাজা মাধবচন্দ্র গিরি মোহান্ত গুরু পিতা ৺রাজা রঘুচন্দ্র গিরি মোহান্ত জাতি সন্ন্যাসী, পেশা বৃত্তিভোগী, সাকিম জোৎশম্ভু ওরফে তারকেশ্বর পরগণে বালীগড়ি ষ্টেশন সব রেজিষ্টারী হরিপাল ডিষ্ট্রিক্ট হুগলী মহাশয় বরাবরেষু, লিখিতং শ্রীভেরারাম দুবে পিতা ৺ক্ষেমরাজ দুবে, জাতি ব্রাহ্মণ, পেশা কার্য্য ক্রিয়াদী, সাং দুবে ছাপরা, পরগণা বেলিয়া, থানা হুগলী, ডিষ্ট্রিক্ট বেলিয়া, হাল সাং তারকেশ্বর, বালীগড়ী ষ্টেশন ও সবরেজিষ্টারী হরিপাল ডিষ্ট্রিক্ট হুগলী।

কস্য একরার পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে আমার পিতা ও সহোদর ভ্রাতা ও ভগ্নী না থাকায় আমি স্বয়ং স্বাধীন থাকায় ইচ্ছা পূর্ব্বক অন্যের বা মহাশয়ের বিনানুরোধে সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করার আশায় মহাশয়ের চেলা হওন প্রার্থনায় প্রায় তিন বৎসর হইল মহাশয়ের বাটীতে থাকিয়া লেখাপড়া শিক্ষা করিতেছি। এক্ষণে আমার অভিভাবক বা কুটুম্বাদির নিরাপত্যে অত্র মঠের প্রথানুসারে মস্তক মুণ্ডন চেলা হইবার কারণ একরার লিখিয়া দিতেছি যে, রাজ আজ্ঞানুসারে অত্রস্থানে থাকিয়া মঠের রিত অনুসারে সচ্চরিত্রে কালযাপন এবং মহাশয়ের জিজ্ঞাসানুসারে সকল কার্য্য করিতে থাকিব। যদি আমার সচ্চরিত্রের কোন বৈলক্ষণ্য হয় অর্থাৎ সচ্চরিত্রে এবং মহাশয়ের জোতজার ও প্রথার কোন বিপরীত কার্য্য করি, তাহা হইলে মঠের রিত্যানুসারে আমাকে মঠ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবেন। তৎকালে আমি মহাশয়ের বা মঠের উপর কোন দাবী দাওয়া করিতে পারিব না এবং করিলেও তাহা সিদ্ধ হইবে না। ভবিষ্যতে আমার কেহ আত্মবর্গ আমার সন্ন্যাসধর্ম্ম লওন পথে কোন আপত্য উপস্থিত করেন, যখন আমি আপন ইচ্ছা পূর্ব্বক ও অন্যের ও মহাশয়ের বিনানুরোধে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক স্বয়ং সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করিতেছি, তখন যে শুরাৎ হউক, আমিই তাহাদিগের দাবী দাওয়া মীমাংসা করিয়া দিব। মহাশয়ের সহিত কোন এলাকা রহিবে না। আর প্রকাশ থাকে যে, আমি সচ্চরিত্রে থাকিলেও কেবল খোরাক পোষাক পাইব এবং যে মঠে যখন যাইতে আজ্ঞা করিবেন, তৎক্ষণাৎ যাইব। খোরাক জন্য আমি মহাশয়ের বর্ত্তমানে বা অবর্ত্তমানে মঠের উপর কোন দাবী দাওয়া করিতে পারিব না। এতদার্থে অত্র একরার পত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি সন ১২৯৪ বার শত চোরানব্বই সাল মোতাবেক তারিখ ১৩ই মাঘ, ইংরাজী ১৮৮৮ সাল, ১লা ফেব্রুয়ারী। নবিসিন্দা শ্রীকুঞ্জবিহারী লাল, সাং চক কেশব, শ্রীবরদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীলকুড়চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সর্ব্ব সাং ভঞ্জপুর, ইসাদী শ্রীমহিন্দ্রনাথ আচার্য্য হাং সাং তারকেশ্বর, শ্রীভোলানাথ ধারা সাং ভাটা, শ্রীতারিণীচরণ তর্কভূষণ হাং সাং তারকেশ্বর, শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র রায় সাং মালিগড়ী, শ্রীশশীভূষণ বল্লভ সাং তারকেশ্বর, শ্রীশ্রীকান্ত সিংহ রায় সাং সর্দ্দারপুর, শ্রীপাঁচকড়ি মুখোপাধ্যায় হাং সাং তারকেশ্বর, ৪৮৩ নং ইং সন ১৮৮৮ ১৭ই জানুয়ারী

খরিদদার ভেরারাম চুবে। জেলা গাজীপুর সাং চুবে ছাপরা, হাং সাং তারকেশ্বর। কওলা কারণ দাম ১৲ এক টাকা মাত্র। ভেণ্ডার উমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সাং হরিপাল।"

মোহান্ত মাধবগিরির নিকট সতীশগিরির এই প্রতিশ্রুতি প্রদানের কথায় কি বুঝা যায়? সন্ন্যাসগ্রহণ, সচ্চরিত্র থাকিয়া কালযাপন, অন্যথা মঠ হইতে বিদায়গ্রহণ, মঠের উপর তখন কোনওরূপ দাবী করিবার অধিকার বর্জন, কেবল খোরাকপোষাক পাইবার ইচ্ছাপ্রকাশ ও প্রতিশ্রুতি প্রদান,—এই প্রতিজ্ঞায় দেবত্র সম্পত্তিতে তাঁহার মালিকান-স্বত্বের কথা ঘুণাক্ষরে অনুস্থচিত হয় কি না, নিরপেক্ষ ব্যক্তিরা তাহা বিচার করিয়া দেখিতে পারেন। আমরা আশা করি, এ বিষয়ে আপীল শুনানীর সময়ে সকল পক্ষের মনোযোগ আকৃষ্ট হইবে।

লর্ড কার্ম্মাইকেল

বাঙ্গালার প্রথম গভর্ণর লর্ড কার্ম্মাইকেল ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। বঙ্গ-ভঙ্গ রদ করিয়া যখন দিল্লীর দরবারে রাজকীয় ঘোষণা প্রচারিত হয়, তখন লর্ড কার্ম্মাইকেল মাদ্রাজের গভর্ণর। সে সময়ে শাসনে তিনি সুনাম অর্জ্জন করিয়াছিলেন। ভাঙ্গা বাঙ্গালা যোড়া দিবার পর কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাকেই নূতন বাঙ্গালার গভর্ণরের মসনদে বসাইয়া দেন। সে সময়ে লর্ড কার্ম্মাইকেল অনেক উচ্চ আশা হৃদয়ে পোষণ করিয়া বাঙ্গালা শাসন করিতে আইসেন। বাঙ্গালার জলকষ্ট নিবারণ করার সঙ্কল্প তন্মধ্যে অন্যতম। ব্যক্তিগত হিসাবে লর্ড কার্ম্মাইকেল উদার ও উচ্চমনা, সামাজিক ও জনপ্রিয় ছিলেন, এ কথা বলা যায়। কিন্তু এ দেশের স্বেচ্ছাচার-মূলক আমলাতন্ত্র-শাসন ব্যাপারে যিনি নিজের ব্যক্তিত্বের প্রভাব ফুটাইয়া তুলিতে না পারেন, তিনি শাসনে সফলকাম হইতে পারেন না। এ হিসাবে লর্ড কার্ম্মাইকেল উচ্চাকাঙ্ক্ষায় ও উদারহৃদয় হইলেও failure রূপে পরিগণিত হইবেন সন্দেহ নাই। যে সিবিলিয়ান চক্রব্যূহ এ দেশের শাসককে ঘিরিয়া থাকে, তাহার প্রভাব হইতে লর্ড কার্ম্মাইকেল মুক্ত

কলিকাতা সাহিত্য-সম্মিলনে লর্ড কারমাইকেল

লর্ড কার্মাইকেল

[কলিকাতা রিভিউ হইতে।

হইতে পারেন নাই। এই হেতু তাঁহার বাঙ্গালায় সুপেয় পানীয় সরবরাহের চেষ্টা অঙ্কুরেই লয়প্রাপ্ত হইয়াছিল, পরন্তু তাঁহারই শাসনকালে বহু বাঙ্গালী যুবক রাজনীতিক বন্দিরূপে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। তবে লর্ড কার্মাইকেলের সৌভাগ্য এই যে, তিনি তাঁহার সৌজন্য ও 'স্বদেশীর' প্রতি অনুরাগ প্রদর্শনের গুণে বাঙ্গালীর বিশেষ অপ্রীতির উদ্রেক করেন নাই। তিনি বাঙ্গালা ভাষা ও শিল্পের প্রতি অনুরাগী ছিলেন, নিজেও বাঙ্গালাভাষা শিখিয়াছিলেন; পরন্তু তিনি এ দেশের কুটীরশিল্পজাত পণ্য ব্যবহার করিতেন। দোষেগুণে লর্ড কার্মাইকেল বাঙ্গালীর স্মরণীয় হইয়া থাকিবেন সন্দেহ নাই।

—

রাজা দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক

কলিকাতার স্বনামখ্যাত রায় দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক বাহাদুর সম্প্রতি রাজদত্ত রাজা উপাধি লাভ করিয়াছেন। অধুনা সরকারের প্রদত্ত উপাধির মূল্য কতটুকু, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। কিন্তু যে স্থলে সেই উপাধির দ্বারা যথার্থ গুণীর গুণমর্য্যাদা রক্ষিত হইতে দেখা যায়, সেই স্থলে সেই উপাধির নিশ্চিতই মূল্য আছে। রাজা দেবেন্দ্রনাথ যে গুণে এই সম্মান লাভ করিয়াছেন, সেই গুণ তাঁহার নাম স্মরণীয় করিয়া রাখিবে, কারণ, দাতা চিরজীবী হইয়া থাকেন। দেবেন্দ্রনাথ যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সেই বংশের দানের খ্যাতি আছে।

রাজা দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক

দেবেন্দ্রনাথের আদিবাস ত্রিবেণীতে। যে সময়ে সপ্তগ্রাম বাঙ্গালার সমৃদ্ধ বন্দর ছিল, যে সময়ে বাঙ্গালার জলপথের বাণিজ্য সপ্তগ্রামের মধ্য দিয়া বাহিত হইত, সেই সময়ে যে সকল সুবর্ণ-বণিক ব্যবসা-বাণিজ্যে তথায় উন্নতিলাভ করিয়াছিলেন, দেবেন্দ্রনাথের পূর্ব্বপুরুষরা তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। তাঁহারা ব্যবসা-বাণিজ্যে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া এবং দেশহিতকর নানা অনুষ্ঠানে আত্মনিয়োগ করিয়া দিল্লীর বাদশাহের নিকট 'মল্লিক' উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহাদেরই বংশের নিমাইচরণ মল্লিক কলিকাতায় আসিয়া বসবাস ও বাণিজ্যারম্ভ করেন। নিমাইচরণ দাতা ছিলেন। হাওড়ার 'নিমাইচরণ মল্লিকের স্নানঘাট', পুরী, বৃন্দাবন আদি তীর্থস্থানে 'যাত্রিনিবাস', নানাস্থানে দেবালয়-মন্দির ও ঠাকুরবাড়ী ইত্যাদির প্রতিষ্ঠায় তাহার পরিচয় পরিস্ফুট। দেবেন্দ্রনাথ তাঁহারই বংশীয় অদ্বৈতচরণ মল্লিক মহাশয়ের

দ্বিতীয় পুত্র। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে তিনি তাঁহার মাতামহ মহানুভব মতিলাল শীল মহাশয়ের ভবনে জন্মগ্রহণ করেন।

দানের প্রবৃত্তি মল্লিকদিগের বংশানুগত, পরন্তু দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ নিমাইচরণ এবং মাতামহ প্রাতঃস্মরণীয় মতিলাল শীল হইতে সেই প্রবৃত্তি সমধিক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বাল্যকাল হইতেই তিনি দরিদ্রের দুঃখমোচনে নিজের 'হাত-খরচ' হইতে ব্যয় করিতে অভ্যস্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার পিতা সুবর্ণ-বণিক দাতব্য-ভাণ্ডারের অবৈতনিক সহকারী সভাপতিরূপে ঐ প্রতিষ্ঠানকে চিরস্থায়ী করিবার মানসে প্রভূত পরিশ্রম করিয়া ৫০ হাজার টাকা মূলধন আদায় করিয়াছিলেন এবং উহা হইতে বহু দরিদ্র হিন্দু বিধবা ও অনাথদিগকে সাহায্যদান করিবার ব্যবস্থা করেন। দেবেন্দ্রনাথ ঐ সভার অবৈতনিক সম্পাদকরূপে ঐ অনুষ্ঠানের সর্ব্বাঙ্গীন সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত তিনি কয়েকটি ছাত্রকে ও কন্যাদায়গ্রস্তকে সাহায্যদান করিতে থাকেন। রামবাগানে সাধারণের সুবিধার জন্য পথনির্ম্মাণার্থ তিনি এক ভূখণ্ড দান করেন। পাতিপুকুর-দমদমায় কয়েক বৎসর তাঁহার দ্বারা একটি দাতব্য ঔষধালয় ও দরিদ্রপোষণের নিমিত্ত একটি সদাব্রত অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। ইহার পর ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে তিনি ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা ব্যয়ে বেলগাছিয়া মেডিক্যাল কলেজের জন্য একটি দাতব্য ঔষধালয়ের ইমারত নির্ম্মাণ করিয়া দেন এবং উহার পরিচালন জন্য ঔষধের ব্যয়স্বরূপ বার্ষিক ১২ শত টাকা দান করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত ১৮টি রোগীর শয্যার জন্য তিনি মাসিক ২ শত টাকা স্থায়ী দানের ব্যবস্থাও করিয়াছেন। কুষ্ঠরোগগ্রস্ত লোকের চিকিৎসা-সেবার জন্য তিনি মাসিক ২ শত টাকা স্থায়ী দানের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। এই সমস্ত দাতব্য কার্য্য যাহাতে চিরদিন সুশৃঙ্খলার সহিত সমাহিত হয়, তাহার জন্য তিনি সরকারী ট্রাষ্টির হস্তে ২ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা মূল্যের সম্পত্তির দানপত্র গচ্ছিত রাখিয়াছেন। মান্দ্রাজের কুষ্ঠাশ্রমনির্ম্মাণের জন্য তিনি ৬ হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

দেবেন্দ্রনাথ এবার নূতন বর্ষের প্রথম দিনে রাজা উপাধিতে ভূষিত হইয়াছেন। এতদুপলক্ষে তিনি দলপতি হিসাবে গত ১৭ই মাঘ সদাব্রত পালন করিয়া নিজ দলস্থ বহু ব্রাহ্মণকে ১ খানা করিয়া গিনি, পরিধেয় বস্ত্র ও শাল দান করিয়াছেন এবং নানা দরিদ্র ও আতুর আশ্রমের ছাত্রগণকে বস্ত্রদান করিয়াছেন ও পরিতোষরূপে ভোজন করাইয়াছেন।

যৌবনে দেবেন্দ্রনাথ স্বয়ং চা-ব্যবসায়ের সওদাগররূপে ডি, এন, মল্লিক এণ্ড কোং নামক কার্য্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করেন এবং ঐ আফিস হইতে বিলাতে ভারতের চা রপ্তানী করিবার বন্দোবস্ত করেন। প্রেসিডেন্সি জেনারেল হাঁসপাতালে এবং কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে তিনি চীনের চায়ের পরিবর্ত্তে এ দেশের চা ব্যবহারের প্রবর্ত্তন করেন। এ বিষয়টি উদ্যোগী বাঙ্গালী ব্যবসায়ীর অনুকরণযোগ্য সন্দেহ নাই।

কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ দানবীর বলিয়াই আজ তাঁহার নাম লোকমুখে খ্যাত। সুবর্ণ বণিকসমাজে দানবীরের অভাব নাই। মতিলাল শীল, সাগর দত্ত, রাজেন্দ্র মল্লিক প্রভৃতি প্রাতঃস্মরণীয় বাঙ্গালী এই সমাজেরই লোক। দেবেন্দ্রনাথ তাঁহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া কৃতিত্ব অর্জ্জন করিয়াছেন। তিনি দীর্ঘজীবী হইয়া দেশের ও দশের উপকার করুন, ইহাই কামনা।

পরলোকে মনোমোহন

গত ৬ই মাঘ বুধবার প্রাতে কলিকাতা কর্পোরেশনের 'চীফ ভ্যালুয়ার' ও সার্ভেয়ার, বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের নিষ্ঠসেবক, সাহিত্যসেবী মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মাত্র ৪৫ বৎসর বয়সে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার অকালে পরলোকগমন বাঙ্গালী সাহিত্যসেবিমণ্ডলকে মর্ম্মপীড়িত করিয়াছে সন্দেহ নাই। তিনি উদ্যোগী, উৎসাহী, কর্ম্মী পুরুষ ছিলেন। তিনি যে কেবল প্রসিদ্ধ এঞ্জিনিয়ার ছিলেন, তাহা নহে, ভারতীয় স্থাপত্যেও তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। তিনি উড়িষ্যার স্থাপত্য সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন, উহা সার উইলিয়ম হাণ্টার ও রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের গ্রন্থের পর বিশেষ প্রামাণ্য পুস্তক বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। বাঙ্গালার মাসিক পত্রিকায় তাঁহার বহু গবেষণামূলক প্রবন্ধও প্রকাশিত হইয়াছিল। সাহিত্যপরিষদের উন্নতি ও পুষ্টিকল্পে তিনি যে পরিশ্রম ও সময় নিয়োজিত করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার অভাব যে পরিষদে বিশেষরূপে অনুভূত হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সাহিত্য-পরিষদের 'রমেশ-ভবনে' তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। কলেজ স্কোয়ারে যে বৌদ্ধ বিহারের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, তাহার নক্সা তিনিই করিয়া দিয়াছিলেন। জাতীয়

বিদ্যা—মন্দিরের কার্য্যের সহিত তাঁহার সংস্রব ছিল। তিনি স্বামী বিবেকানন্দের অনুরক্ত ভক্ত এবং রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম কর্ম্মী ছিলেন। নানা কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়া তিনি অতিরিক্ত পরিশ্রম করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ ইহাই তাঁহার অকালমৃত্যুর কারণ। তাঁহার পিতামাতা এখনও বর্ত্তমান। মনোমোহন বাবু ৫ পুত্র ও ২ কন্যা রাখিয়া বৃদ্ধ পিতামাতার বুকে শেল হানিয়া অকস্মাৎ পরলোকযাত্রা করিয়াছেন। এ শোকে সান্ত্বনা দিবার ভাষাই নাই।
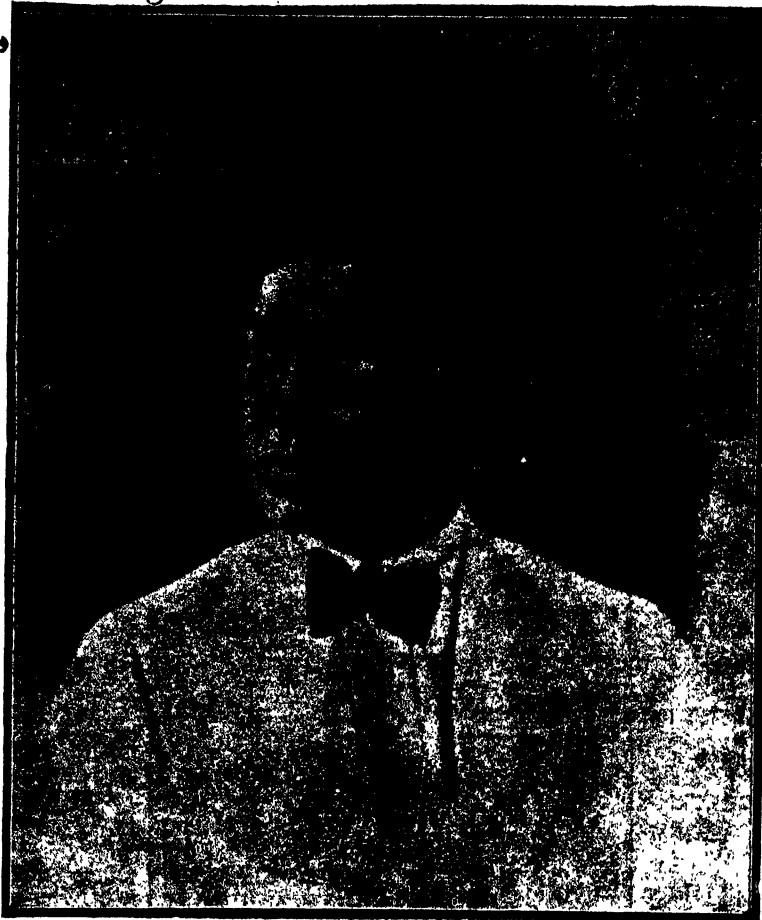
মিঃ বাওলা

হোলকার ও মমতাজের মামলা

বোম্বাই সহরে বাওলা-হত্যাকাণ্ড-সম্পর্কে নর্ত্তকী মমতাজ বিবি ও ইন্দোরের মহারাজা হোলকারের নামে যে সকল রোমাঞ্চকর রহস্যময় ঘটনার কথা প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা এ দেশবাসী এখনও বিস্মৃত হয় নাই। আদালতে প্রকাশ্য বিচারকালে অভিযোগ হইয়াছিল যে, মমতাজ বিবি মুসলমান নর্ত্তকীর কন্যা, মাত্র ত্রয়োদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকাল হইতে সে ইন্দোরের মহারাজা হোলকারের রক্ষিতা ছিল, তাহার একটি কন্যাসন্তান হয় ও সেই কন্যাটি গুপ্ত ভাবে নিহত হয়; পরন্ত মমতাজ পরে মহারাজার আশ্রয় হইতে স্বেচ্ছায় পলায়ন করে, কিন্তু তাহাকে পুনরায় ধরিয়া আনিবার জন্য নানা ষড়যন্ত্র ও অত্যাচার উৎপীড়ন হয়, মমতাজ মামলার বিচারের পর এই মর্ম্মে বড়লাটের নিকট দরখাস্ত করে। এইরূপে নানা ঘটনার মধ্য দিয়া মমতাজ বোম্বাইয়ের ধনকুবের মুসলমান যুবক বাওলার রক্ষিতারূপে জীবন যাপন করিতে থাকে, সেই সময়ে তাহাদের প্রাণনাশের আশঙ্কা জাগাইয়া কয়খানি পত্র আইসে; তাহার পর এক দিন বোম্বাইয়ের রাজপথে কয় জন লোক বাওলার মোটর ধরিয়া তাহাকে গুলী মারিয়া হত্যা করে, মমতাজও আহত হয়; সেই সময়ে চারি জন বৃটিশ সেনানী হঠাৎ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হওয়ায় মমতাজের প্রাণরক্ষা হয়। কয় জন আসামী ধৃত হয় এবং তাহাদের বিচার ও দণ্ড হয়।

এই ঘটনা উপলক্ষ করিয়া সম্প্রতি বড় লাট রেডিংয়ের সরকার কমিশন বসাইয়া এই ব্যাপারের সহিত মহারাজা হোলকারের কোনও সম্পর্ক আছে কি না, অবধারণ করিবার এবং তিনি দোষী কি নির্দ্দোষ বিচার করিবার নিমিত্ত সংকল্প করিয়াছেন এবং সেই মর্ম্মে ইন্দোর দরবারকে জ্ঞাপন

করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, ইহাতে ইন্দোরে এবং ভারতের অন্যত্র হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছে।

এইভাবে কমিশন বসাইয়া দেশীয় রাজন্যগণের বিচার আজ নূতন নহে। লর্ড নর্থব্রুকের শাসনকালে বরোদার মলহর রাও গাইকবাড়ের বিচার হইয়াছিল। তিনি বিষপ্রয়োগ দ্বারা বরোদার ইংরাজ রেসিডেন্টকে হত্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, ইহাই অভিযোগ ছিল। বিচারে তিনি দোষী সাব্যস্ত এবং সিংহাসনচ্যুত হয়েন। তাঁহার স্থলে গাইকবাড়-বংশীয় সায়াজীরাওকে সিংহাসন প্রদান করা হয়। তিনিই বর্ত্তমান গাইকবাড়। অধিক দিনের কথা নহে, নাভার মহারাজাকেও সিংহাসনচ্যুত করা হইয়াছে। বৃটিশ-রাজ ভারতের সার্ব্বভৌম শক্তি। দেশীয় মিত্র রাজন্যগণের সহিত তাঁহাদের যে সন্ধি আছে, তাহাতে তাঁহারা এইরূপ বিচার ও দণ্ডদান করিতে অধিকারী। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে মণ্টেগু রিফরমের ৩০৯ প্যারা অনুসারে কমিশন বসান হইয়াছে।

কথা উঠিয়াছে, হোলকার কমিশনের বিচার মানিয়া লইবেন কি না। যদি তিনি মানিতে স্বীকার না হন, তাহা হইলেই যে তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করা হইবে; এমন ভাবের কোনও ঘোষণা হয় নাই। না মানিলে বৃটিশসরকার তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধেও কমিশন বসাইয়া বিচার করিতে পারেন। যতটা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাতে হোলকার কমিশনের বিচার মানিয়া লইতে প্রস্তুত হইয়াছেন বলিয়াই মনে হয়। লর্ড রেডিংয়ের সরকার কমিশনে দুই জন দেশীয় রাজন্যকেও নিযুক্ত করিবেন বলিয়া শুনা যাইতেছে। প্রকাশ, বিকানীরের মহারাজা কমিশনের অন্যতম রাজন্য সদস্য হইতে সম্মত হইয়াছেন এবং মহীশূরের মহারাজারও অন্যতম সদস্য হইবার সম্ভাবনা আছে। এতদ্ব্যতীত এলাহাবাদ হাইকোর্টের বিচারপতি সার গ্রীমউড মিয়ার্শ ও কলিকাতা হাইকোর্টের এক জন বিচারপতি কমিশনে বসিবেন বলিয়াও শুনা যাইতেছে।

মমতাজ

বোম্বাইয়ের এডভোকেট জেনারল মিঃ কঙ্গ বাওলাহত্যার মামলা পরিচালনা করিয়াছিলেন; সম্ভবতঃ সরকার তাঁহাকেই মহারাজার বিপক্ষে মামলা চালাইবার জন্য নিযুক্ত করিবেন।

এ দিকে মহারাজা হোলকার তাঁহার দেওয়ান মিঃ নরসিংহ রাও এবং আইন-পরামর্শদাতা সার শিবস্বামী আয়ার ও সার তেজবাহাদুর সপ্রুর সহিত পরামর্শ করিয়া নিজ পক্ষসমর্থনের জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। এই সম্পর্কে তিনি ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ ব্যবহারাজীব সার জন সাইমন, সার এডোয়ার্ড মার্শাল ও মিঃ প্যাট্রিক হেষ্টিংসের পরামর্শ গ্রহণ করিতেছেন। সম্ভবতঃ বোম্বাইয়ের প্রসিদ্ধ ফৌজদারী ব্যবহারাজীব মিঃ ভেলিনকার মহারাজার পক্ষসমর্থনে নিযুক্ত হইবেন। বাওলাহত্যার মামলায় ইনিই বোম্বাইয়ের পুলিশকোর্টে ও হাইকোর্টে আসামীদের পক্ষসমর্থন করিয়াছিলেন।

সুতরাং এই মামলাটি বড় সাধারণ মামলা হইবে না। বর্ত্তমানকালে এত বড় মামলার বিচার আর হয় নাই

বলিলেও চলে। কাষেই এই দিকে আপামর সাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। বর্ত্তমানে দেশীয় রাজন্যগণের মধ্যে কেহ কেহ যে ভাবে প্রজার মঙ্গলামঙ্গলের দিকে মনোযোগ না দিয়া বিদেশে বিলাসব্যসনে দেশের অর্থ অপচয় করিয়া বেড়াইয়া থাকেন, তাহাতে তাঁহাদের প্রতি সাধারণের সহানুভূতির অভাব বিস্ময়ের বিষয় নহে। কাশ্মীরের বর্ত্তমান মহারাজা সার হরিসিং বিলাতে যে ধিক্কারজনক মামলার আসামী হইয়াছিলেন, তাহা আজিও এ দেশের লোক বিস্মৃত হয় নাই। অথচ তিনিই কাশ্মীরের গদী প্রাপ্ত হইয়াছেন। এমন আরও অনেক রাজার দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। কাযেই বাওলা-হত্যার রোমাঞ্চকর কাহিনী স্মরণ করিয়া জনসাধারণ হত্যার মূলসূত্র বাহির করিতে উদ্‌গ্রীব হইয়াছে। মহারাজা দোষী কি নির্দ্দোষ, বিচারে তাহা প্রকাশ পাইবে। কিন্তু যাহাই হউক, জনসাধারণ বাওলাহত্যার রহস্য উদ্‌ঘাটিত না হইতে দেখিলে সন্তোষ লাভ করিবে না। যাহারা এই ব্যাপারে জড়িত আছে, তাহারা যত বড়ই হউক, তাহাদের প্রত্যেককে ধৃত ও অভিযুক্ত করিলে সাধারণে সন্তুষ্ট হইবে। বোম্বাইয়ের মত স্থানে বাওলা-হত্যার ব্যাপারে যদি প্রকৃত অপরাধীরা ধৃত ও অভিযুক্ত না হয়, তাহা হইলে ভবিষ্যতে লোক সর্ব্বদা শঙ্কিত ও ত্রস্ত হইবে।

ইন্দোরের মহারাজা হোলকার

ইংরাজের ভাবনা

বিলাতে বেকারের সংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজের ভাবনা-বৃদ্ধি হইয়াছে। ভারতে বৃটিশ পণ্যের কাট্‌তি যত দিন সমান তেজে চলিতেছিল, তত দিন এ ভাবনা ছিল না। এখন জাপান, মার্কিণ প্রভৃতি জাতির সহিত প্রতিযোগিতায় ইংরাজ ব্যবসাদারকে হটিয়া যাইতে হইতেছে। সে দিন লর্ড এলমট বলিয়াছেন, "জাপান ল্যাঙ্কাশায়ারের কাপড়ের ব্যবসায়ের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়াছে; কাযেই কিরূপে এই প্রতিযোগিতায় ইংরাজ ব্যবসাদার জয়লাভ করে, তাহা ভাবিয়া দেখা ইংরাজ জাতির বিশেষ কর্ত্তব্য হইয়াছে।" এক দিন জার্ম্মাণীও নানা ব্যবসায়ে ইংরাজকে ভারতের বাজার হইতে হটাইয়া দিয়াছিল, জার্ম্মাণ যুদ্ধের ফলে ইংরাজের সে ভয় ঘুচিয়াছে। কিন্তু এখন নূতন জুজুর ভয় হইয়াছে। ব্রহ্মের ভূতপূর্ব্ব শাসনকর্ত্তা সার রেজিনাল্ড ক্রাডক কোনও ইংরাজী মাসিক পত্রে লিখিয়াছেন, "ভারতে বৃটিশ পণ্যের

কাটতি ক্রমশঃ কমিয়া যাইতেছে; এজন্য অন্যান্য দেশের পণ্যের উপর শতকরা ১১ টাকার পরিবর্ত্তে ২২ টাকা শুল্ক নির্দ্ধারণ করিয়া বৃটিশ পণ্যকে উহা হইতে অব্যাহতি দিলে ভারতে আবার বৃটিশ পণ্যের কাটতি বাড়িতে পারে। বিনিময়ে ভারতে যে বৃটিশ সেনা ভারত-রক্ষার জন্য রাখা হয়, তাহার অর্দ্ধেক খরচ বৃটিশ সরকার সরবরাহ করিলে পারেন।" ভারতকে এই 'উৎকোচ' দিয়া বৃটিশ পণ্য রক্ষা করিতে হইবে! আবার কেহ কেহ বলেন, ভারতের আশা ছাড়িয়া দিয়া পূর্ব্ব-আফরিকায় বৃটিশ পণ্যের কাটতি বাড়াইবার চেষ্টা করা উচিত। বিলাতের ঔপনিবেশিক সচিব মিঃ অরমস্‌বি গোর সে দিন বলিয়াছেন যে, "উনবিংশতি শতাব্দীতে ভারত যেমন বৃটিশ পণ্য কাটতির প্রধান বাজার ছিল, এখন তেমনই এই বিংশ শতাব্দীতে আমাদের পূর্ব্ব-আফরিকার সাম্রাজ্যকে বৃটিশ পণ্য কাটতির প্রধান বাজার করা উচিত।" অর্থাৎ যে উপায়েই হউক, বৃটিশ পণ্যকে বাঁচাইয়া রাখিতে হইবে। যদি অন্যান্য দেশের পণ্যের উপর শুল্ক দ্বিগুণ করিয়া ভারতের বাজার ইংরাজের পণ্যের কাটতির জন্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে হয়, তাহা করা হউক, না হয় নূতন সাম্রাজ্য পূর্ব্ব-আফরিকায় ইংরাজের পণ্য চালাইবার উপায়বিধান করা হউক। যে দিক দিয়াই দেখা যাউক, বিজিত পরাধীন দেশের উপর দিয়া বৃটিশ পণ্য কাটাইয়া লইতেই হইবে! অথচ ইংরাজ বলিয়া থাকেন, ভারতের মঙ্গলের জন্য তাঁহারা ভারত শাসন করিয়া থাকেন! কিমাশ্চার্য্যমতঃপরম্!

শিশু-মঙ্গল

লেডী রেডিং দিল্লীর "শিশু সপ্তাহ" অনুষ্ঠান উপলক্ষে যে বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহা প্রত্যেক ভারতবাসীর অবহিত-চিত্তে পাঠ করা কর্ত্তব্য। মাত্র তিন বৎসর লেডী রেডিংয়ের উদ্যোগে এ দেশে এই পরম মঙ্গলকর অনুষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। এই জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত রাজনীতির কোনও সম্পর্ক নাই, সুতরাং এ দেশের সকল শ্রেণীর লোকই এই প্রতিষ্ঠানসম্পর্কে পক্ষপাতশূন্য হইয়া সমালোচনা করিতে পারে। প্রতিষ্ঠানটি হইয়াছিল মূলতঃ দিল্লীর শিশু-মৃত্যু রহিত করিবার জন্য, কিন্তু ঐ প্রতিষ্ঠানটি বিস্তৃতি লাভ করিয়া ভারতের নানা প্রদেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। এ দেশে শিশু-মৃত্যু কিরূপ ভীষণ, তাহা বোধ হয় কাহারও অবিদিত নাই। প্রায় ২০ লক্ষ শিশু প্রতি বৎসর এই ভারতবর্ষে প্রাণত্যাগ করে! অথচ আশ্চর্য্য এই যে, চেষ্টার দ্বারা যে এই ভয়াবহ অকাল-মৃত্যু রোধ করা যায় না, তাহা নহে। ভারতের অদৃষ্টবাদী অধিবাসী এ যাবৎ এই অকাল-মৃত্যু দেখিয়াও যেমন বিনা প্রতিবাদে গতানুগতিক জীবন যাপন করিয়া আসিয়াছে, এখনও তেমনই করিতেছে। দৈবক্রমে এই হৃদয়বতী নারী এই মঙ্গলানুষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহাদের 'চোখ ফুটাইয়া' দিয়াছেন। এ জন্য তিনি যথার্থ ই এ দেশবাসীর ধন্যবাদের পাত্রী।

লেডী রেডিং বক্তৃতায় বলিয়াছেন, "আমরা আজ এই যে অজ্ঞতা, রোগ ও অপরিচ্ছন্নতার বিপক্ষে যুদ্ধ করিতেছি, আমার বিশ্বাস, ঐ যুদ্ধে আমরা কালে অবশ্যই জয়লাভ করিব।" তাঁহার বাণী সার্থক হউক। অজ্ঞতা, রোগ ও অপরিচ্ছন্নতা আমাদিগকে কিরূপে ঘিরিয়া ধরিয়াছে, তাহা বোম্বাই সহরের দৃষ্টান্ত দিলেই বুঝা যাইবে। বোম্বাইয়ের মত সমুদ্রবেষ্টিত সুন্দর সহরে হাজারকরা ৬ শত শিশু অকালে ইহকাল হইতে বিদায় গ্রহণ করে; অথচ নিউজিলাণ্ডের শিশু-মৃত্যু হাজারকরা মাত্র ৪২টি! ইহা কি ভীষণ অবস্থা নহে? সুতরাং লেডী রেডিং এই ভীষণ অবস্থার প্রতীকারের উদ্দেশ্যে শিশু-সপ্তাহ প্রতিষ্ঠান আমাদের চক্ষুর সম্মুখে ধারণ করিয়া সত্যই আমাদের উপকার করিয়াছেন। দিল্লী সহরে তাঁহার উদ্যোগে শিশুর অকাল মৃত্যু নিবারণকল্পে যে সকল কার্য্য হইয়াছে, তাহার ফল শুভ—এমন কি, আশাতীত হইয়াছে। অবশ্য ১৯১৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ভারতে মাতৃ ও শিশু-মঙ্গল প্রতিষ্ঠান অনুষ্ঠিত হইয়াছে। উহার পূর্ব্বে দিল্লীতে ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে হাজারকরা ৩ শত ৪৬টি শিশু-মৃত্যু হইয়াছিল। প্রতিষ্ঠানের উদ্ভবের দুই বৎসর পরে ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে ঐ সংখ্যা হ্রাস হইয়া হাজারকরা ২ শত ৬৪টিতে দাঁড়ায়। লেডী রেডিং যে ৩ বৎসর এই সদনুষ্ঠানে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, সেই তিন বৎসরে শিশু-মৃত্যু আরও কমিয়াছে। গত বৎসরে দিল্লীতে শিশুমৃত্যু হাজারকরা ১ শত ৮২টিতে নামিয়াছে। এই ভাবে কার্য্য চলিলে ভবিষ্যতে এ দেশে শিশুর অকাল-মৃত্যু ক্রমশঃ নিবারিত হইতে পারে।

লেডী রেডিং বলিয়াছেন,—অজ্ঞতা, রোগ ও অপরিচ্ছন্নতাই এই অকাল-মৃত্যুর কারণ। কিন্তু এই কয়টি কারণ ব্যতীত এ দেশের ভীষণ দারিদ্র্য ও আলস্যও যে শিশু-মৃত্যুর প্রধান কারণ, তাহা অস্বীকার করা যায় না। অজ্ঞতা দূর হইলে অনেক কুসংস্কারও দূর হইবার সম্ভাবনা। উহার ফলে অপরিচ্ছন্নতা ও ব্যাধিরও উপশম হইতে পারে। কিন্তু অজ্ঞতা দূর করিবার পক্ষে প্রয়োজনমত চেষ্টা হইতেছে না। তাহার উপর দারিদ্র্যের ভীষণ পাষাণভার প্রধান অন্তরায় হইয়া রহিয়াছে। এই দারিদ্র্য-নিবারণের উপায় কি? অনেক সময়ে দেখা যায়, দারিদ্র্যই রোগ ও অপরিচ্ছন্নতার কারণ। লোক আলস্য ও অমনোযোগিতা ত্যাগ করিলেও, ইচ্ছা থাকিলেও, অপরিচ্ছন্নতার ও রোগের প্রভাব হইতে মুক্ত হইতে পারে না। দারিদ্র্য হেতু লোক দুই বেলা পেট পুরিয়া খাইতে পায় না, শিশুর পুষ্টিকর খাদ্য যোগাইতে পারে না, অস্বাস্থ্যকর আলোক ও বায়ুহীন স্থানে বহুলোক একঘরে বাস করিতে বাধ্য হয়। বোম্বাইয়ে এমনও হয় যে, শিশুর জননী দিনমজুরী করিয়া উদরান্ন সংস্থানের জন্য শিশুকে অহিফেন সেবন করাইয়া কার্য্যস্থলে যাইতে বাধ্য হয়; শিশু-পালনের উপযুক্ত অবসর প্রাপ্ত হয় না। এ সকলের প্রতীকারের উপায় কি? লেডী রেডিংয়ের মত উদারহৃদয়া নারীরা শিশু ও মাতৃ-মঙ্গলের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহার উপর এ সকল সমস্যার সমাধান করা চাই। ইহা না হইলে এই বিরাট দেশে প্রকৃত মাতৃ ও শিশু-মঙ্গল সাধিত হইবার উপায় নাই।

মিস্ ম্যাডেলন শ্লেড

কুমারী ম্যাডেলন শ্লেড ইংরাজ-দুহিতা। তিনি বিলাতের বিলাসব্যসন বর্জ্জন করিয়া মহাত্মা গন্ধীর সবরমতী আশ্রমে আগমন করিয়া মহাত্মার মন্ত্র-শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছেন এবং আশ্রমের পাঁচ জনের এক জন হইয়া সেবা, পরিচর্য্যা এবং সংযম ও সাধন-ভজন কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। ইহার পরিচয় 'মাসিক বসুমতীতে' পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে। যাঁহারা কানপুর কংগ্রেসে যোগদান করিতে গিয়াছিলেন, তাঁহারা মহাত্মা গন্ধীর সেবা-পরিচর্য্যায় আত্মনিবেদিতা এই ইংরাজ-দুহিতাকে দেখিয়া আসিয়াছেন। তিনি অতীব বিনীতা, সুষ্ঠুভাষিণী এবং ভারতের আধ্যাত্মিক সাধনায় আস্থাবতী। সম্প্রতি বিলাতের কোন সংবাদপত্রে কুমারী শ্লেডের সম্পর্কে মহাত্মা গন্ধীকে আক্রমণ করিয়া এক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। উহাতে বলা হইয়াছে যে, মহাত্মা গন্ধী এক শ্বেতাঙ্গীকে শিষ্যারূপে প্রাপ্ত হইয়া মহা আনন্দিত হইয়াছেন এবং ঐ শ্বেতাঙ্গী বৃটিশ-সরকারের শত্রু চরমপন্থীদিগের সহিত সবরমতী আশ্রমে মিলামিশা করিতেছেন। কুমারী শ্লেড ইহার উত্তরে বলিয়াছেন যে,—"আমার হৃদয়ে ৩৩ বৎসর যাবৎ যে ভাব সুপ্ত ছিল, এই আশ্রমে আসিয়া তাহা স্ফূর্ত্তি লাভ করিয়াছে। আমি এই সুপ্রতিষ্ঠিত আশ্রমে উন্নত চরিত্রের ২ শত নরনারীর সহিত বাস করিয়া আনন্দ ও শান্তি লাভ করিয়াছি। মহাত্মা আমাকে ১ বৎসর বিবেচনার পর এখানে আসিবার অনুমতি দিয়াছিলেন। তাহার পর আমাকে শিষ্যা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। আমি এখানে যেন গুরু-গৃহে পরমসুখে ও শান্তিতে বাস করিতেছি।" অতঃপর মহাত্মা সম্বন্ধে নিন্দকের জিহ্বা সংযত হইবে, এরূপ আশা করা অসঙ্গত নহে।

মিস্ ম্যাডেলন শ্লেড
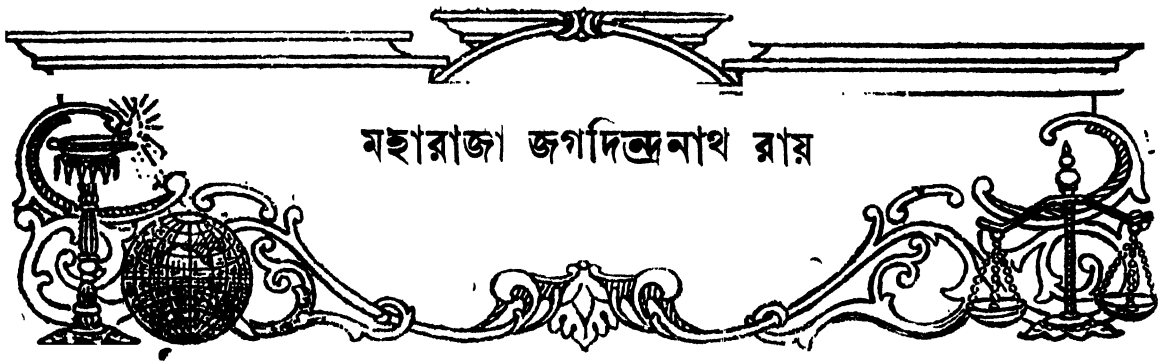
গত ২১শে পৌষ নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায় লোকান্তরিত হইয়াছেন। পক্ষ, মাস ও ঋতু যাহার বলয়, দিন যাহার অংশ, বর্ষ যাহার দণ্ড, ক্ষণ যাহার নীতি, স্পন্দন যাহার মধ্যভাগ সেই কালচক্রের অতর্কিত ও অপ্রত্যাশিত ক্রমপরিবর্ত্তনে তাঁহার আয়ু শেষ হইয়াছে। রাজপথে তিনি গতিশীল যানে আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন—কয়দিন পরে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। বাঙ্গালার অভিজাত-সম্প্রদায় উদয়াস্তভাস্করের করস্পর্শে সমুজ্জ্বল হেমকান্তি যে সকল চূড়ায় সুশোভিত ছিল, তাহারই একটি শৃঙ্গ ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে।

কিন্তু জগদিন্দ্রনাথের জন্য বাঙ্গালা ও বাঙ্গালী যে আজ শোকানুভব করিতেছে, সে নাটোরের মহারাজার মৃত্যুতে নহে; সে সুধী ও সামাজিক সাহিত্য-শিল্পরসিকের মৃত্যুতে—সে বাঙ্গালার একজন শ্রেষ্ঠ ভদ্রলোকের অকাল-মৃত্যুতে। জগদিন্দ্রনাথে যে জনগণের ও অভিজাত সম্প্রদায়ের সকল সদ্গুণ একীভূত হইয়াছিল, তাহার বিশেষ কারণ ছিল।

তিনি যে পরিবারের কুলদীপ ছিলেন, বাঙ্গালার ইতিহাসে সেই রাজপরিবারের পরিচয় নূতন করিয়া দিতে হইবে না। মহারাণী ভবানীর নাম "বঙ্গে যথা তথা।" ইনি "অর্দ্ধ-বঙ্গেশ্বরী" নামে পরিচিতা ছিলেন। তখন নাটোর রাজপরিবারের বার্ষিক রাজস্ব-পরিমাণ—৫২ লক্ষ ৫৩ হাজার টাকা। মহারাণী ভবানীর ধর্ম্মানুরক্তি যেমন প্রবল ছিল, বিষয়বুদ্ধিও তেমনই তীক্ষ্ণ ছিল। বঙ্গদেশে কিম্বদন্তী তাঁহার তীক্ষ্ণ বিষয়বুদ্ধির পরিচয় প্রচার করিতেছে। কি কৌশলে তিনি বিধবা কন্যাকে সিরাজদ্দৌলার লালসা-কলুষিত দৃষ্টি হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন, তাহার কথা বাঙ্গালায় সুপরিচিত। আর একটি কিম্বদন্তীকে নবীনচন্দ্রের কবিপ্রতিভা অমর করিয়া গিয়াছে। সিরাজদ্দৌলাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া বাঙ্গালার মসনদে ইংরাজকে বসাইবার মূল কারণ যে ষড়যন্ত্র, তিনি তাহাতে যোগ দেন নাই—তিনি চাহিয়াছিলেন, প্রকাশ্যভাবে যুদ্ধ করিয়া সিরাজদ্দৌলাকে পরাভূত করিতে। বাঙ্গালায় নানা মন্দিরে তাঁহার ধর্ম্মানুরাগ সপ্রকাশ। "পঞ্চক্রোশী" কাশীর সীমা তিনিই বহু অর্থব্যয়ে নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন। আবার সেই পরিবার সাধকের সাধনায় সমুজ্জ্বল হইয়াছে। মহারাজা রামকৃষ্ণ সাধন জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি বিষয়-বাসনাবিমুখ হইলে তাঁহার একটি করিয়া জমীদারী হস্তচ্যুত হইত, আর তিনি মহাসমারোহে "জয়কালীর" মন্দিরে পূজা দিতেন—"মা আমাকে বিষয়-বাসনামুক্ত করিতেছেন।" তিনি সর্ব্বদাই পারলৌকিক মুক্তির কামনা করিতেন। তিনি গাহিয়াছিলেন :—

"আমার মন যদি যায় ভুলে!
আমার বালীর শয্যায় কালীর নাম
দিও কর্ণ-মূলে।"

জগদিন্দ্রনাথ শৈশবে রাণী ব্রজসুন্দরীর দত্তক পুত্ররূপে সেই পরিবারে প্রবেশ করেন। সে পরিবারের তখন ভাবী মহারাজাকে তাঁহার পদোচিত গুণে—সামাজিক আচার-ব্যবহারে সুশিক্ষিত করিবার ব্যবস্থা ছিল। সে শিক্ষার পদ্ধতি কঠোরই ছিল; বালককে সভামধ্যে চাঞ্চল্য ত্যাগ করিয়া নির্দ্দিষ্টাসনে উপবিষ্ট থাকিতে হইত, লোক বুঝিয়া ব্যবহার করিতে হইত। সে শিক্ষায় জগদিন্দ্রনাথের ব্যবহার ও ভাব যে প্রভাবিত হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ পদে পদে পাওয়া যাইত। কিন্তু যেমন শুভ্র বস্ত্রই কুঙ্কুমরাগসিক্ত বারি হইতে সে রাগ গ্রহণ করিতে পারে, তেমনই যোগ্যতা ব্যতীত কেহ শিক্ষায় সুফললাভ করিতে পারে না। জগদিন্দ্রনাথ যে সে শিক্ষার অনুরঞ্জনে স্বীয় বৃত্তি রঞ্জিত করিতে পারিয়াছিলেন, সে কথা যেন আমরা বিস্মৃত না হই।

মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ রায়

[কলিকাতা রিভিউ হইতে।

তাঁহার এই অভিজাতসম্প্রদায়োচিত ভাবের নিম্নে, রাজবেশের অন্তরালে মানুষের হৃদয়ের মত, গণতান্ত্রিক ভাব ছিল। তাহার কারণ, দরিদ্র ভদ্র পরিবারে তাঁহার জন্ম। তিনি আত্ম পরিচয় দিয়াছেন—"রাজপ্রাসাদে আমার জন্ম হয় নাই এবং জন্ম উপলক্ষে দান, ধ্যান, পূজা, মহোৎসব সে সব কিছুই হয় নাই—দরিদ্র ব্রাহ্মণের পর্ণকুটীরে আমি জন্মিয়াছিলাম। আমি পিতামাতার একাদশ সন্তান—আমার জন্মে তাঁহারা আনন্দিত হইয়াছিলেন কি না এ কথা বলা কঠিন নয়।" কিন্তু দরিদ্রের পর্ণকুটীর হইতে নাটোরের প্রাসাদে নীত হইয়া তিনি এক দিনের জন্যও কুটীরের কথা ভুলিতে পারেন নাই; পরন্তু মনে হয়, তাঁহাকে যে কুটীর হইতে প্রাসাদে আসিতে হইয়াছিল, সে জন্য তাঁহার হৃদয়ে সাধারণ মানুষের একটু অতৃপ্ত পিপাসা ছিল। তিনি লিখিয়াছেন—"রাজধানীর জ্যোতির্ব্বিদ জগবন্ধু আচার্য্য আমার রাহু তুঙ্গী বলিয়া আমাকে এক মুহূর্ত্তে অভ্রভেদী রাজপ্রাসাদের তুঙ্গ শিখরে চড়াইয়া দিল। সেই অবধি স্নেহময়ী, সর্ব্বংসহা, শষ্পাস্তীর্ণা ধরিত্রীর সুখময় স্পর্শ হইতে আমি বঞ্চিত হইয়াই আছি। আজও তাঁহার সুধাশীতল অঙ্কে শুইয়া চক্ষু বুজিবার অবসর আমার হইল না।"

জনকের প্রতি তাঁহার ভক্তিও অসাধারণ ছিল। বাল্য কালে তিনি চক্ষু-রোগে আক্রান্ত হইয়া দৃষ্টিশক্তিহীন হইতে বসিয়াছিলেন। তখন তাঁহার জনকই জিলার ম্যাজিষ্ট্রেটকে ধরিয়া তাঁহাকে চিকিৎসার্থ কলিকাতায় পাঠাইবার ব্যবস্থা করেন। তাঁহার পুত্র ব্রজনাথ যখন বহু চিকিৎসায় এক চক্ষু হারাইয়া রোগমুক্ত হইয়া নাটোরে ফিরিলেন, তখন তাঁহার কি দুঃখ! ব্রজনাথ লিখিয়াছেন :—

"বাড়ী আসিলাম। বিদেশে যাইবার সময় যে সকল স্নেহশীল আত্মীয়স্বজনকে ছাড়িয়া যাইতে হইয়াছিল, তাঁহাদের সকলকেই আবার দেখিতে পাইলাম। কিন্তু আমার জনক যিনি সন্তানের প্রতি স্নেহাধিক্য প্রযুক্ত জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে বলিয়া আমার চিকিৎসার জন্য কলিকাতায় যাইবার বন্দোবস্ত, অনেকের মতের বিরুদ্ধে, করিয়া দিয়াছিলেন, যাঁহার নিঃস্বার্থ চেষ্টা ব্যতীত নবম বর্ষ বয়ঃক্রম হইতে আজ পর্য্যন্ত চির অন্ধতা লইয়া আমার দুর্ব্বহ জীবনভার আমাকে দুঃসহ দুঃখের মধ্যেই বহন করিতে হইত, একমাত্র যাঁহার প্রসাদাৎ এই বিভিন্ন সৌন্দর্য্য-সম্ভারে ঐশ্বর্য্যশালিনী বসুন্ধরার অপরূপ রূপ আজ আমার চক্ষুগোচর হইতে পারিতেছে, যাঁহার কৃপায় শৈল-সাগর-সরিৎ-শোভিতা বনকানন-কান্তারসমন্বিতা ধরণীর অপূর্ব্ব শারদ-সৌন্দর্য্য ও বাসন্তী সুষমা আমার নয়ন মনের তৃপ্তি বিধান করিতেছে, সেই প্রত্যক্ষ ভূদেবতা আমার স্নেহশীল পিতৃদেবকে আর দেখিতে পাইলাম না। তাঁহার হতভাগ্য সন্তান ব্রজনাথ যখন তাহার পুনঃপ্রাপ্ত চক্ষুর দ্বারা তাঁহার পাদপদ্মের সন্ধানে ইতস্ততঃ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেছে, তখন তাহার পরম স্নেহময়ী জননীর রিক্ত প্রকোষ্ঠ ও সাশ্রু নেত্র ব্রজনাথকে বলিয়া দিল যে, পিতৃপাদবন্দনার সৌভাগ্য তাহার চির।দনের জন্য অন্তর্হিত হইয়াছে।"

দরিদ্র পিতামাতার স্নেহের নাম "ব্রজনাথ" তিনি কোন দিন রাজৈশ্বর্য্যের মধ্যে ভুলিতে পারেন নাই; কোন কোন অন্তরঙ্গ বন্ধুকে পত্র লিখিবার সময় সেই নাম স্বাক্ষর করিয়া যেন পরম তৃপ্তি লাভ করিতেন। ব্রজের খেলা ফুরান যেন এই ব্রজনাথের পক্ষে কোন মতেই সুখের বলিয়া বোধ হয় নাই।

জগদিন্দ্রনাথকে বুঝিতে হইলে তাঁহার জীবনে গঙ্গা-যমুনার প্রবাহ-মিলনের মত দারিদ্র্য ও আভিজাত্যের এই সম্মিলন-কথা মনে রাখিতে হইবে। তিনি কোন দিন ভুলেন নাই—তিনি দরিদ্রের সন্তান। তিনি বলিয়াছেন—

"আমি নিজে দরিদ্রের সন্তান। আমার যে বংশে জন্ম হইয়াছিল, সে বংশ যে কতকাল ধরিয়া দরিদ্র, তাহা কুলজ্ঞের কুলশাস্ত্রও, বোধ করি, বলিতে পারে না। বংশ-পরম্পরাগত দারিদ্র্যের দোষগুণ আমার রক্তের সঙ্গে শিরায় শিরায় বহিতেছে, সুতরাং দেহে মনে আমি দরিদ্রেরই একজন। রাজকীয় আহার, আচার আমার আফিসের চোগা চাপকানের মত, প্রয়োজনের সময় উহা পরিয়া লই, প্রয়োজন সাঙ্গ হইয়া গেলে আমি সে ব্রজনাথ সেই ব্রজনাথ। জগদিন্দ্র আমি নই, উহা আমার সংজ্ঞা মাত্র—যিনি সংজ্ঞা লইয়া সুখী তিনি সংজ্ঞাসুখে মহেন্দ্র, দেবেন্দ্র সুরেন্দ্র, জগদিন্দ্র যাহা ইচ্ছা তাহাই হউন, আমি ব্রজনাথ থাকিয়াই চক্ষু মুদিতে পারিলে এ বারের মত বাঁচিয়া যাই।"

রাজসাহীতে জগদিন্দ্রনাথ স্কুলে প্রবেশ করেন।

ইংরাজী, ইতিহাস, সংস্কৃত ও বাঙ্গালা প্রভৃতি বিষয়ে তিনি শিক্ষাতৎপরতা দেখাইতেন—কেবল অঙ্ক শাস্ত্রে তাঁহার অনুরাগ ছিল না। সংস্কৃত তিনি ভালরূপই শিখিয়াছিলেন এবং তাঁহার বৈশিষ্ট্যবহুল বাঙ্গালা রচনা-পদ্ধতিতে সেই সংস্কৃত শিক্ষার ছাপ সুস্পষ্ট ছিল। তিনি এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন; কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের "শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠা পত্রখানি" লাভ করা তাঁহার ভাগ্যে ঘটে নাই—বাধ্য হইয়া তাঁহাকে কলেজ ছাড়িতে হয়।

কলিকাতায় আইসেন। নাটোরে তাঁহার উপযুক্ত সঙ্গীর অভাব, পরন্তু কুসঙ্গী জুটিবার সম্ভাবনা প্রবল বুঝিয়াই দুর্গাদাস বাবু তাঁহাকে কলিকাতায় আসিতে উপদেশ দেন। তদবধি জগদিন্দ্রনাথ একরূপ কলিকাতাবাসীই হইয়াছিলেন। কলিকাতায় আসিয়া তিনি চৌধুরী পরিবারের বাসস্থানের সান্নিধ্যে বাসা লয়েন। আশুতোষ তখন বিলাত হইতে ব্যারিষ্টার হইয়া আসিয়াছেন। তিনি ছাত্রাবস্থায় বিলাতে যশ অর্জ্জন করিয়াছিলেন এবং এ দেশে ফিরিয়া 'ভারতী'তে

ওরিয়েণ্ট ক্লাবে রবীন্দ্র-সম্ভাষণে মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ

পঠদ্দশাতেই তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে তিনি "মহারাজা" বলিয়া বৃটিশ সরকার কর্ত্তৃক অভিহিত হয়েন—তখন তাঁহার বয়স প্রায় ১০ বৎসর। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার বিবাহ হয়। তখন তাঁহার বয়স প্রায় ১৭ বৎসর।

সাবালক হইবার অল্পদিন পরেই জগদিন্দ্রনাথ কলিকাতায় আগমন করেন। শুনিয়াছি, সার আশুতোষ চৌধুরী মহাশয়ের পিতা দুর্গাদাস বাবুর পরামর্শেই তিনি

ইংরাজ কবিদিগের পরিচয়াত্মক সমালোচনা প্রকাশ করিতেছিলেন। আশুতোষের মধ্যম ভ্রাতা যোগেশচন্দ্র তখন, বোধ হয়, মেট্রোপলিটন কলেজে অধ্যাপনা করিতেছেন—অন্য ভ্রাতারা ছাত্র। আশুতোষ তখন স্বীয় প্রতিভাবলে দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম করিয়া সাফল্য লাভ করিতেছেন। যোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে তাঁহার বৈবাহিক সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আশুতোষের মধ্যস্থতায় ঠাকুর পরিবারের সহিত

জগদিন্দ্রের ঘনিষ্ঠতা জন্মে। তখন "ঠাকুরবাড়ী" কিরূপ ছিল, তাহা তাহার আজিকার অবস্থা দেখিয়া অনুমান করিবার উপায় নাই। দেবেন্দ্রনাথ তখন সাধনার সুবিধা হইবে বলিয়া স্বজনগণের নিকট হইতে দূরে পার্ক ষ্ট্রীটে বাস করিতেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ—সকলেই জোড়াসাঁকোয় বাস করেন। "ঠাকুরবাড়ী" তখন কলিকাতায় সঙ্গীতশিল্পসাহিত্যসৌন্দর্য্যচর্চ্চার অন্যতম প্রধান কেন্দ্র। সেই কেন্দ্রে জগদিন্দ্রনাথ আপনার প্রতিভা-স্ফুরণের অবসর পাইলেন এবং "রাজন" সেই কেন্দ্রের অন্যতম অন্তরঙ্গ হইয়া পড়িলেন। তখন 'সাধনা' রবীন্দ্রনাথের রচনার বাহন।

চৌধুরী পরিবার তখন ওয়েলিংটন স্কোয়ারের ধারে ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীটের উপর বাড়ীতে বাস করিতেন। জগদিন্দ্রনাথ স্কোয়ারের অন্যধারে ওয়েলিংটন ষ্ট্রীটের উপর বাড়ী ভাড়া করিলেন।

এই সময় তিনি সর্ব্বপ্রথমে সাধারণের সহিত পরিচিত হইলেন। সে দিনের কথা আমাদের মনে আছে। তখন সার চার্লস ইলিয়ট বাঙ্গালার ছোট লাট। তাঁহার নানা ব্যবস্থায় বঙ্গদেশ বিচলিত হইয়াছিল। মফঃস্বল মিউনিসিপ্যাল বিল সে সকলের অন্যতম। এই বিলে স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসনের মূল নীতির পরিবর্ত্তন-প্রচেষ্টা থাকায় দেশের লোক তাহার প্রতিবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। তাহাদের অগ্রণী সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়; তাঁহার সহকর্ম্মী —অম্বিকাচরণ মজুমদার। কলিকাতার এক প্রতিবাদ সভায় জগদিন্দ্রনাথ রাজসাহী জনসভার প্রতিনিধিরূপে সেই প্রস্তাবিত আইনের প্রতিবাদ করিয়া ইংরাজীতে এক বক্তৃতা পাঠ করিয়াছিলেন।

প্রায় এই সময়েই তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্ব্বাচিত হয়েন। তাহার পর ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে একবার ও তাহার পর আর একবার তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। কখন রাজপুরুষদিগের তুষ্টিসাধনের জন্য দেশবাসীর মতের বিরুদ্ধে কোন প্রস্তাবে তিনি ভোট দেন নাই। তবে সাহিত্যিকের মনোভাব লইয়া তিনি রাজনীতিক্ষেত্রে কখন কোনরূপে নেতৃত্বভার গ্রহণ করিয়া খ্যাতিলাভ করেন নাই।

তিনি যে মনে সত্য সত্যই দেশপ্রেমিক ছিলেন, তাহা তাঁহার পরিচিত ব্যক্তিদিগের অবিদিত ছিল না। কৃষ্ণনগরের মহারাজা শ্রীযুক্ত ক্ষৌণীশচন্দ্র রায় বাহাদুর বাঙ্গালার শাসন পরিষদের সদস্য মনোনীত হইলে তিনি তাঁহাকে অভিনন্দিত করিয়া এক সম্মিলনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। নাটোর ও কৃষ্ণনগর বাঙ্গালার এই দুই ব্রাহ্মণ রাজবংশে পুরুষপরম্পরাগত যে সম্বন্ধ আছে, তাহাতে জগদিন্দ্রনাথ জ্যেষ্ঠতাত, ক্ষৌণীশচন্দ্র ভ্রাতুষ্পুত্র। সে সম্মিলনে ক্ষৌণীশচন্দ্র উপস্থিত হইলে স্নেহবশে জগদিন্দ্রনাথ আশীর্ব্বাদী মাল্য তাঁহার কণ্ঠে পরাইয়া দিলে ভ্রাতুষ্পুত্র তাহাই তাঁহার চরণতলে রক্ষা করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করেন। সে সম্মিলনে যে চিত্তরঞ্জনের মত অসহযোগীও উপস্থিত ছিলেন, তাহাতেই সামাজিক হিসাবে জগদিন্দ্রনাথের সর্ব্বজনপ্রিয়তা প্রতিপন্ন হয়।

জগদিন্দ্রনাথ যখন কলিকাতা সমাজে সুপরিচিত হয়েন, তখন রাজনীতি সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতায় আবদ্ধ হয় নাই। কংগ্রেসের যে অধিবেশন কলিকাতায় প্রথম হয়, তাহাতে উত্তরপাড়ার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রভৃতি যোগ দিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথের দুইটি প্রসিদ্ধ সঙ্গীত কংগ্রেস উপলক্ষে রচিত—

"আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে"

"অয়ি ভুবন মনোমোহিনী…"

জগদিন্দ্রনাথও রাজনীতিক আন্দোলনে যোগ দিয়াছিলেন। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ১২ই জুন যে ভূমিকম্পে বঙ্গদেশ বিকম্পিত হইয়াছিল, তাহারই মধ্যে নাটোরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলনের অধিবেশন হয়। তাহার ২ বৎসর মাত্র পূর্ব্বে সম্মিলন পুনর্জ্জীবিত করিয়া যাযাবর করা হয়। যাযাবর সম্মিলনের প্রথম অধিবেশন বহরমপুরে; অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি বৈকুণ্ঠনাথ সেন, সভাপতি আনন্দমোহন বসু। তাহার দ্বিতীয় অধিবেশন কৃষ্ণনগরে; অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি মনোমোহন ঘোষ, সভাপতি তরুপ্রসাদ সেন। সেই অধিবেশনে শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় রাজসাহীর পক্ষ হইতে পর বৎসরের জন্য সম্মিলন আহ্বান করিয়া আসিয়াছিলেন। দিঘাপাতিরায় রাজা শ্রীযুক্ত প্রমদানাথ রায় ও মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ অতিথিসৎকারের ভার ভাগ করিয়া লইয়াছিলেন। এই দুই পরিবারে সম্বন্ধ বহু দিনের। দিঘাপাতিয়া রাজবংশের

বংশপতি দয়ারাম নাটোর রাজগৃহে সামান্য পরিচারকরূপে প্রবেশ করিয়া অসাধারণ প্রতিভাবলে সর্ব্বোচ্চ পদ লাভ করিয়াছিলেন। তিনি দাওয়ান ছিলেন এবং প্রভুর এরূপ বিশ্বাসভাজন হইয়াছিলেন যে, তিনিই প্রভুর পক্ষে ব্রাহ্মণদিগকে ব্রহ্মোত্তর প্রদান পর্য্যন্ত করিতেন। গল্প আছে, মহারাজকুমারী তারা যখন সম্পত্তি দেখিতেছিলেন, তখন তিনি দয়ারামের ছাড় দেখিয়া ব্রহ্মোত্তরে কোন ব্রাহ্মণের অধিকার স্বীকার করিতে অসম্মত হয়েন। তাহা শুনিয়া দয়ারাম তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "যদি আমার স্বাক্ষরে নাটোর সরকারের কায সম্পন্ন না হয়, তবে তোমারও এই সম্পত্তিতে কোন অধিকার নাই; কারণ, মহারাণী ভবানীর বিবাহের লগ্নপত্রে আমিই দাওয়ানরূপে স্বাক্ষর করিয়াছিলাম।" জগদিন্দ্রনাথ বরাবরই প্রমদানাথকে কনিষ্ঠ ভ্রাতার মত দেখিতেন।

নাটোরে প্রাদেশিক সম্মিলনের অল্পদিন পূর্ব্বে প্রথম ভারতবাসী সিভিলিয়ান সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর পেন্সন লইয়া আসিয়াছিলেন। তিনিই সে অধিবেশনে সভাপতি। পূর্ব্বে সম্মিলনে ইংরাজীতেই কার্য্য নির্ব্বাহিত হইত। কৃষ্ণনগরের অধিবেশনে অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি মনোমোহন ঘোষ সে নিয়মের সামান্য পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন। যত দিন সরকার না বুঝিবেন যে, দেশের জনগণ আমাদের সহগামী—তত দিন তাঁহাদিগের নিকট হইতে কোন অধিকার আদায় করা যাইবে না, বলিয়া তিনি নিয়ম করিয়াছিলেন, প্রত্যেক প্রস্তাবে এক জন বক্তা বাঙ্গালায় বক্তৃতা করিবেন। নাটোরের অধিবেশনের বৈশিষ্ট্য সেই নিয়ম আরও বিস্তৃত করিয়া বাঙ্গালাকেই প্রাধান্য প্রদান। জগদিন্দ্রনাথের ও সত্যেন্দ্রনাথের মূল অভিভাষণ ইংরাজীতেই লিখিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু জগদিন্দ্রনাথের অভিভাষণ তাহিরপুরের রাজা শশিশেখরেশ্বর রায় কর্ত্তৃক ও সত্যেন্দ্রনাথের অভিভাষণ রবীন্দ্রনাথ কর্ত্তৃক অনূদিত ও বিবৃত হইয়াছিল। জগদিন্দ্রনাথ তাঁহার অভিভাষণে এ দেশে জমীদারের সহিত জনসাধারণের সম্বন্ধের কথা তুলিয়া বলিয়াছিলেন, উভয়ের স্বার্থ অভিন্ন। অধিবেশনের দ্বিতীয় দিন বহরমপুরের বৈকুণ্ঠনাথ সেন, কৃষ্ণনগরের তারাপদ

উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনে মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ

সপরিবারে মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ

রাণী, পৌত্র—জয়ন্তকুমার, পুত্র—কুমার যোগীন্দ্রনাথ, পুত্রবধূ (ক্রোড়ে শিশু

বন্দ্যোপাধ্যায় ও কলিকাতার কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি বাঙ্গালায় বক্তৃতা করেন। তৃতীয় দিন অধিবেশনের মধ্যভাগে ভূমিকম্প হয়।

নাটোরে ভূমিকম্প প্রায় ৭ মিনিট ব্যাপী ছিল। স্থানে স্থানে জমী ফাটিয়া গর্ত্ত দেখা দেয় ও তাহার মধ্য হইতে জল উদগত হয়। সে দৃশ্য যে না দেখিয়াছে, তাহাকে বুঝান অসম্ভব। চারিদিকে বিপন্ন জনতার চীৎকার, পলায়নপর অশ্বের পদধ্বনি, ভীত হস্তীর বৃংহিত। অদূরে গগনে ধূলিরাশি উত্থিত হইল; বুঝা গেল নাটোরের প্রাসাদ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। সেই বিপন্ন অবস্থাতেও জগদিন্দ্রনাথ বিচলিত হয়েন নাই, পরন্তু পূর্ব্ববৎ যত্নে অতিথিদিগের সৎকার করিয়াছিলেন। পরদিন একখানি ট্রেণ আসিলে তিনি আসিয়া অতিথিদিগকে ট্রেণে তুলিয়া দেন। সেই ভূমিকম্পে জয়কালীর মন্দিরও ভগ্ন হইয়াছিল।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলনের এই অধিবেশনের পর জগদিন্দ্রনাথ রাজনীতিক্ষেত্রে সুপরিচিত হয়েন। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় কংগ্রেসের যে অধিবেশন হয়, তাহাতে তিনিই অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি হয়েন। তাহার পূর্ব্বে ৩ বার কলিকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন হইয়াছিল। সেই তিন অধিবেশনের অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি যথাক্রমে— রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র, মনোমোহন ঘোষ ও সার রমেশচন্দ্র মিত্র। জগদিন্দ্রনাথ বলেন, তাঁহারা যে আসন অধিকার করিয়া গিয়াছেন, সে আসনে উপবেশন করিতে তিনি যে দ্বিধা বোধ করেন নাই, এমন নহে; তবে যাঁহারা দেশের জন্য চিন্তা করেন ও কায করেন, তাঁহাদিগের দলে যোগ দিবার বলবতী বাসনাই তাঁহাকে এই পদ গ্রহণে প্রবৃত্ত করাইয়াছে। তিনি অভিজ্ঞতায় হীন হইলেও—আশায় ধনী; তিনি এত দিন বিশেষ কোন কায করিতে না পারিলেও, ভবিষ্যতে অনেক কায করিবার আশা রাখেন। অভিভাষণের শেষাংশে দ্বারবঙ্গের মহারাজা সার লক্ষ্মীশ্বর সিংহ বাহাদুরের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিবার প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছিলেন, ভূস্বামীরা কংগ্রেসে নানারূপ সাহায্য প্রদান করিয়াছেন এবং তাঁহারা যেন মনে না করেন; তাঁহারা দেশের জনগণ হইতে এক স্বতন্ত্র সম্প্রদায়।

কংগ্রেসের এই অধিবেশনের পর তিনি আর কোন অধিবেশনে উল্লেখযোগ্য প্রকাশ্যভাবে কোন কায করেন নাই বটে, কিন্তু কলিকাতায় কংগ্রেসের যে অধিবেশনে লালা লজপত রায় সভাপতি হইয়াছিলেন, সে অধিবেশনেও আসিয়াছিলেন।

যৎকালে তিনি অন্য নানা কাযে ব্যস্ত ছিলেন, সেই সময়েও তিনি সর্ব্বপ্রযত্নে শারীরিক বলচর্চ্চার পক্ষপাতী ছিলেন। ১৯০২ খৃষ্টাব্দে তিনি ক্রিকেট খেলোয়াড়দিগের এক দল গঠিত করিয়াছিলেন এবং স্বয়ং তাহাতে খেলা করিতেন। সে দল ভারতের নানা স্থানে যাইয়া খেলা করিয়া আসিয়াছেন—যশও অর্জ্জন করিয়াছেন। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সে দল বিদ্যমান ছিল।

১৯০৪ খৃষ্টাব্দে মহারাজা পুনরায় রাজনীতিক্ষেত্রে দেখা দেন। সে বার বহরমপুরে প্রাদেশিক সম্মিলনের অধিবেশন হয় এবং তিনিই তাহাতে সভাপতি নির্ব্বাচিত হয়েন। আমাদের মনে আছে, তাঁহাকে ধন্যবাদ দিবার সময় বৈকুণ্ঠনাথ সেন বলিয়াছিলেন, সে বার সভাপতি নির্ব্বাচনে তাঁহাকে বিশেষ কষ্ট স্বীকার করিতে হয় নাই। নৈশ গগনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে যেমন উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্কই সর্ব্বাগ্রে দৃষ্টিগোচর হয়, তেমনই রাজনীতিক্ষেত্রে দৃষ্টিপাত করিলে তাঁহার দৃষ্টি প্রথমেই মহারাজা জগদিন্দ্রনাথের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল। মহারাজা যে অভিভাষণ পাঠ করিয়াছেন এবং যে ভাবে অধিবেশনের কার্য্য পরিচালিত করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার আশা যে পূর্ণ হইয়াছে, তাহা বলাই বাহুল্য।

মহারাজার অভিভাষণ অপেক্ষাও তাঁহার ব্যবহার বহরমপুরবাসীদিগকে অধিক মুগ্ধ করিয়াছিল। তাঁহার ব্যবহারই যে তাঁহার বৈশিষ্ট্য-ব্যঞ্জক ছিল, তাহা তাঁহার পরিচিত সকলেই অনুভব করিয়াছেন। তিনি ঘনিষ্ঠতায় কখন কার্পণ্য করিতে জানিতেন না, তাহা তাঁহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল। কাহারও সহিত তাঁহার পরিচয় হইলে তাঁহার সম্বোধন যে কেমন ভাবে কখন "আপনি" হইতে "তুমি"র ব্যবধান ছাড়াইয়া ঘনিষ্ঠতাব্যঞ্জক "তুই"তে পরিণত হইত, তাহা যেন ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারা যায় না। তিনি যেন বন্ধুগণের মধ্যে কোনরূপ ব্যবধান রাখিতে জানিতেন না, পারিতেন না। সেই জন্যই প্রথমে চৌরঙ্গীতে 'মানসী' কার্য্যালয় ও পরে তাঁহার গৃহ

ছোট, বড়, মেজ, ধনী, নির্দ্ধন সকল প্রকার সাহিত্যিকের মজলিস হইয়াছিল। চৌরঙ্গীর 'মানসী' কার্য্যালয় ফটোগ্রাফের দোকানের একটা অংশমাত্র ছিল; সেই স্থানেই জগদিন্দ্রনাথ আসর গুলজার করিয়া বসিতেন, এবং যেমন "নানাপক্ষী এক বৃক্ষে" থাকে, তেমনই নানা সাহিত্যিক তথায় সমাগত হইতেন। সে আড্ডা ভাঙ্গিয়া গেলে বহু দিন ল্যান্সডাউন রোডে মহারাজা জগদিন্দ্রনাথের বৈঠকখানাই একটা বড় সাহিত্যিক বৈঠকখানা ছিল। এত দিনে সেই বৈঠকখানা শূন্য হইয়াছে "নিবেছে দেউটি।" আছে কেবল স্মৃতি।

জগদিন্দ্রনাথের নানা বিষয়ে অনুরাগের ও পারদর্শিতার কথা ইতঃপূর্ব্বে বলিয়াছি। কিন্তু তিনি প্রকৃতপক্ষে ছিলেন—সাহিত্যিক। যিনি ইচ্ছা করিলে অনায়াসে কেবল বিলাসে জীবন যাপন করিতে পারিতেন, তিনি যে পত্র-সম্পাদকের গুরু দায়িত্ব ইচ্ছা করিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, সে কেবল তাঁহার ধাতুগত সাহিত্যানুরাগহেতু। তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া 'মর্ম্মবাণী' পত্র প্রচার করেন এবং সেই 'মর্ম্মবাণী' কিছুদিনের মধ্যেই 'মানসীর' সহিত মিলিত হয়। জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তিনি 'মানসীর' সম্পাদক ছিলেন। তিনি নামে মাত্র সম্পাদক ছিলেন না; তাঁহার স্বাভাবিক সাহিত্যানুরাগ তাঁহাকে সেরূপ করিতে দিত না। প্রবন্ধ-রচনা, প্রবন্ধ-নির্ব্বাচন— এ সব তিনি করিতেন।

তাঁহার রচনায় যে বৈশিষ্ট্য ছিল, তাহা অনেক সাহিত্যিকের ঈর্ষ্যার উৎপাদন করিতে পারে। গদ্য ও পদ্য উভয়বিধ রচনাই তিনি রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি দুই বার বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের সভাপতির অভিভাষণ পাঠ করিয়াছেন এবং তাঁহার শেষ সভায় রচনাপাঠ—মুন্সীগঞ্জে সাহিত্য-সম্মিলনে। উত্তর-বঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলনে তিনি যে অভিভাষণ পাঠ করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি এমন ভাবও ব্যক্ত করিয়াছিলেন যে, বাণীর সেবকদিগের যে দারিদ্র্য কবিপ্রসিদ্ধি, সেই দারিদ্র্যক্লিষ্ট নহেন বলিয়া তিনি সাহিত্য-সম্মিলনে সভাপতিত্ব করিতে সঙ্কোচ অনুভব করিতেছিলেন;—

"বঙ্গসমাজের যে স্তরে আমি জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছি, সত্য হউক, মিথ্যা হউক, জনরব এই যে, সেই স্তরের কোন ব্যক্তিই বিশেষভাবে বাগ্দেবীর চরণ-চিন্তা করেন না এবং বিদ্বজ্জনানুষ্ঠিত কোন ব্যাপারেই প্রাণের সহিত যোগদান করিতে ইচ্ছুক নহেন। আরও বিশ্বাস এই যে, দারিদ্র্যের দারুণ কশাঘাত দিবারাত্র যাহাদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া না তুলে, তাহাদের বাণীমন্দিরে প্রবেশাধিকার নাই। সরস্বতীর শতদল-কাননের শোভা-সৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ হইয়া কোন পথভ্রান্ত লক্ষ্মীনন্দন যদি কখন এ পথে আসিয়া পড়েন, তবে পদ্মবনের পূর্ব্বাধিকারী ষট্‌পদবৃন্দের বিকট ঝঙ্কার ও বিষম হুলতাড়নায় তাঁহাকে অস্থির হইয়া পলায়নের পথ খুঁজিতে হয়। এরূপ বিপৎ-সঙ্কুল দুর্গম পথে অগ্রসর হইতে দুরূহ দুঃসাহসের আবশ্যক। * * * যদি বা বাগ্দেবতার চরণ-নিস্যন্দিমধুস্বাদে বঞ্চিত হই, তথাপি সারস্বত-কুঞ্জের বহির্দ্দেশে দাঁড়াইয়া সরস্বতীর চরণাশ্রিত পদ্মবনের দূরবাহিগন্ধে হৃদয়-মন পুলকিত করিবার আশায় আসিয়াছি।"

কিন্তু তিনি সত্য সত্যই মন্দিরের বাহিরে দণ্ডায়মান ছিলেন না। তিনি আপনার ভক্তিগুণে সেই মন্দিরে প্রবেশ করিয়া পূজারীর অধিকার লাভ করিয়াছিলেন।

এই অভিভাষণে তিনি নব্যবঙ্গের লেখকদিগের মধ্যে দুই জনের প্রতিষ্ঠায় অনাবিল শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন—বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ। বঙ্কিমচন্দ্রের সম্বন্ধে তাঁহার উক্তি এইরূপ;—

"বাঙ্গালার অন্ধকারময় কবি-নিকুঞ্জে মধুসূদন যে প্রথম ঊষার অরুণ-রশ্মিপাত আনিয়া দিয়াছিলেন, সেই আনন্দময় মঙ্গলালোকে চতুর্দ্দিক হইতে কলকণ্ঠ বিহঙ্গনিচয়ের আনন্দ-কূজনে নিস্তব্ধ বন-বীথিকা মধুচ্ছন্দে মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল। এমন সময় বঙ্গ-সাহিত্যক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের শুভ আবির্ভাব হইল। 'চন্দ্রোদয়ারম্ভ ইবাম্বুরাশিঃ' দেশের হৃদয় তখন কূলে কূলে পরিপূর্ণ হইয়া স্তম্ভিত অবস্থায় ছিল। সমুদ্রের বিশাল বারিরাশি যেমন চন্দ্রকরস্পর্শে দেখিতে দেখিতে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, সমগ্র দেশের হৃদয়স্থ আশা-ভরসা তেমনই আজ আনন্দে উল্লসিত হইয়া উঠিল। যেখানে যে শূন্য দৈন্য যাহা কিছু ছিল, সব পরিপূর্ণ হইয়া গেল; যেখানে স্তব্ধতা, সেখানে নৃত্য; যেখানে নিঃশব্দতা, সেখানে সঙ্গীত জাগিয়া উঠিল; পাঠশালার শুষ্ক সৈকত কোটালের বানে ভাসিয়া গেল। কুরুক্ষেত্রের মহাসমরশায়ী পিতামহের দারুণ পিপাসা-শান্তির জন্য অর্জ্জুন যেমন বাহুবল-নিক্ষিপ্ত

শরাঘাতে পাতালস্থ ভোগবতীর নির্ম্মল ধারা আনিয়া দিয়াছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্রের আনীত সাহিত্য-মন্দাকিনীর পূত-ধারায় সমগ্র দেশের সাহিত্যরসপিপাসা এক নিমেষে সেইরূপ তৃপ্তিলাভ করিল। এমন হইল কেন? কারণ, 'বঙ্গ-দর্শন' তখন যথার্থই বঙ্গদর্শনরূপে আমাদের সম্মুখে আসিয়া আবির্ভূত হইয়াছিল। বাঙ্গালাদেশ তখন আপনার সাহিত্যের মধ্য দিয়া আপনাকে দেখিতে পাইল, এবং আত্মদর্শন করিল বলিয়াই তাহার এই আনন্দ। এতকাল পরের লেখার উপর 'মকস' করিয়া কেবল পরকেই চোখের সামনে রাখিয়াছিল, আজ নিজের আনন্দ প্রকাশের পথ উন্মুক্ত দেখিয়া এক মুহূর্ত্তে তাহার হৃদয়ের বন্ধনদশা ঘুচিয়া গেল।"

জগদিন্দ্রনাথের তিরোভাবে বাঙ্গালার সাহিত্যক্ষেত্র হইতে এক জন সুরসিক সাহিত্য-প্রেমিকের তিরোভাব হইল। বিজ্ঞবর রাজনারায়ণ বাবু এক দিন দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন—এ দেশের নবীন সাহিত্যে যেন বিদেশী গন্ধ পাওয়া যায়। আজ সে দুঃখের কারণ আরও প্রবল হইয়াছে। কারণ, যখন তিনি সে কথা বলিয়াছিলেন, তখন বাঙ্গালীর ছেলে বাঙ্গালা কাব্য-পুরাণাদি পাঠ না করিলেও যাত্রা, গান, কথকতা—এ সকলের মধ্য দিয়া বাঙ্গালার ভাবধারা তাহার হৃদয় সরস করিত। আজ যেন তাহাও আর নাই। কৃত্তিবাসের রামায়ণ, কাশীরামের মহাভারত, কবিকঙ্কণের চণ্ডী, ঘনরামের শ্রীধর্ম্মমঙ্গল, ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল এ সকল আজকাল আর তেমন পঠিত হয় না। আবার দাশরথির পাঁচালী, মধু কানের ঢপ-সঙ্গীত, "গোপাল উড়ের টপ্পা"—এ সকলের আর আলোচনা হয় না। কাযেই বাঙ্গালার সাহিত্যের রসশ্রী আর বড় দেখা যায় না। জগদিন্দ্রনাথের রচনায় সেই রসশ্রী ছিল।

তিনি যে এত শীঘ্র আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া যাইবেন, তাহা কেহ মনেও করিতে পারে নাই। তাঁহার মৃত্যু অতর্কিত ও অপ্রত্যাশিত। অপরাহ্ণে তিনি ভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন—কিছু দূর পদব্রজে যাইয়া গাড়ীতে উঠিবেন। তিনি এত সাবধান ছিলেন যে, সোপান অবতরণ করিবার সময়ও এক জনকে অবলম্বন করিতেন। অথচ সে দিন তিনি রাস্তা পার হইতে যাইলেন—অদূরে অগ্রসর ট্যাক্সী লক্ষ্য করিলেন না! ট্যাক্সী তাঁহাকে আঘাত করিল—তিনি পড়িয়া গেলেন। কিন্তু আঘাতের গুরুত্ব তিনি উপলব্ধি করিতে পারিলেন না। ট্যাক্সী-চালককে পুলিসে দিবার প্রস্তাবে তিনি বলিলেন, সে যখন ইচ্ছা করিয়া তাঁহাকে আঘাত করে নাই, তখন তাহাকে দণ্ডিত করা তাঁহার অভিপ্রেত নহে। আঘাতের পর গৃহে আসিয়া তিনি ঘটনাটি সব বর্ণনা করিলেন। তাহার পর তাঁহার বাক্-রোধ হইল। কয় দিন সেই অবস্থায় থাকিয়া তিনি প্রাণ-ত্যাগ করিলেন।

তাঁহার মৃত্যুতে বাঙ্গালা সমাজ ও বাঙ্গালার সাহিত্যিক সমাজ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

হে তপস্বি! চিত ভরি' হেরেছ তাঁহারে
পরশ-রতন যিনি মানস-তিমিরে,
ভোগ-ভ্রান্তি-পূর্ণ এই বিচিত্র সংসারে,
নির্লিপ্ত রহিলে সব স্বার্থের বাহিরে।
তিমির-আচ্ছন্ন পথে জ্বালি সযতনে
সাধনার দীপখানি, জ্ঞানযোগ-বলে,
চলেছিলে দ্বিধাশূন্য অকম্পিত মনে
দেহের আঁধার যেথা মরে পলে পলে।

কোথা হ'তে পেলে এই সরল নির্ভর;
দুর্নিরীক্ষ্য যেই তেজে ভাস্বর তপন,
আত্মজয়ী, সেই তেজে করিলে গোচর
সর্ব্বত্র সুগম চির-আনন্দভুবন।
স্বপ্রতিষ্ঠ সত্যনিষ্ঠ সৌম্য দ্বিজবর,
লোকে লোকে পরিপূর্ণ তোমার চেতন।

শ্রীনলিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়।
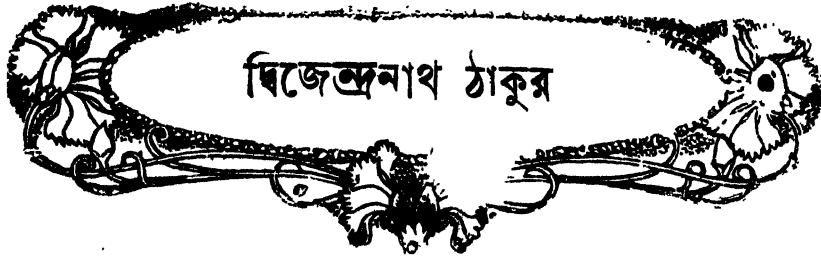
দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই পাঁচখানি ইংরাজী-বাঙ্গালা কাগজে তাঁর সম্বন্ধে যে সব কথা লেখা হয়েছে—তার চাইতে বেশী কিছু বলা আমার পক্ষে সম্ভব না।

তাঁর মনের চেহারার রেখাগুলি এতই পরিস্ফুট ছিল যে,যিনি তাঁর সঙ্গে এক দিন মাত্র পরিচিত হয়েছেন, তাঁর অন্তরেই সে চরিত্রের ছবি অঙ্কিত হয়ে গিয়েছে। সে চরিত্রের মধ্যে এমন কোনও লুকানো জিনিষ ছিল না—যা স্বল্প পরিচয়ে ধরা পড়ে না, কিন্তু তা হৃদয়ঙ্গম করা বহুদিনের ঘনিষ্ঠতা-সাপেক্ষ। আমাদের অধিকাংশ লোকের স্বভাবের দুটি মূর্ত্তি আছে। একটি আটপৌরে, অপরটি পোষাকী। বাইরের লোক আমাদের একরূপে দেখে—ঘরের লোক অন্যরূপ এবং অনেক ক্ষেত্রে এ দুটির ভিতর কোনটি আমাদের যথার্থ রূপ, বলা কঠিন। কেন না, অনেক ক্ষেত্রে তা আমরা নিজেই জানিনে।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

দ্বিজেন্দ্রনাথের মন ও ব্যবহারের ভিতর সদর ও মফঃস্বলের ভেদ ছিল না। ঘরে বাইরে তিনি একই লোক ছিলেন—তাই তিনি আত্মীয়-স্বজনের কাছে যা ছিলেন, বাইরের লোকের কাছেও ঠিক তাই ছিলেন। আমার অনেক সময়ে মনে হয় যে, ঘর ও বাহিরে যে দুটি আলাদা জগৎ—এ ধারণা তাঁর মনে কখনও স্থান পায় নি। তিনি পুরোমাত্রায় স্বগত ছিলেন এবং সেই কারণে পুরোমাত্রায় স্ব-প্রকাশ ছিলেন। আমার বিশ্বাস, যে মানুষ ষোল আনা individual, তিনিই হচ্ছেন ষোল আনা universal। আমরা অধিকাংশ লোক individual হ'তে জানিনে অথবা পারিনে বলেই আমাদের পাঁচ জনের খণ্ড সত্তা—সব জোড়াতাড়া দিয়ে আমরা জাতীয় চরিত্র ব'লে একটা মনগড়া জিনিষ তৈরী করি।

দ্বিজেন্দ্রনাথের প্রকৃতি যে এত সুস্পষ্ট ছিল, তার কারণ, তাঁর মন, তাঁর দেহের মতই একটা বড় ছাঁচে ঢালাই করা হয়েছিল। শরীর-মনের এ চেহারা সূক্ষ্ম রেখার অপেক্ষা রাখে না, আলো-ছায়ার অপেক্ষা রাখে না, কারণ, তা আগাগোড়াই আলোক-চিত্র।

ইংরাজীতে simple শব্দের বাঙ্গালা সরলও বটে, ঋজুও বটে। এই ঋজুতাই ও কথার মূল অর্থ। সরলতা নামক মনের ধর্ম্ম ঐ ঋজুতারই রূপান্তর অর্থ।

দ্বিজেন্দ্রনাথের দেহ ও মনের অসামান্য simplicity ছিল। simplicity কোনরূপ সাধনার ধন নয়, তিনি এগুলি নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তা হারান নি। ছবির ভাষায় রেখার আর একটি বিশেষণ আছে। চিত্রকররা কোন রেখাকে strong বলে, কোন রেখাকে weak।

দ্বিজেন্দ্রনাথের মনের চেহারার রেখাগুলি ছিল যেমন সরল, তেমনই সবল। simplicity এই দীর্ঘজীবনে মুহূর্তের জন্যই তিলমাত্র বিকৃত হয় নি। আর যে জিনিষ বাইরের চাপে অবিকৃত থাকে, তারই নাম অবশ্য strong.

ইংরাজী ভাষায় Child like কথাটা স্তুতিবাচক আর Childish কথাটা নিতান্ত নিন্দাবাচক। বাঙ্গালায় ঠিক এ দুটি বিভিন্ন বিশেষণের বিভিন্ন প্রতিবাক্য নাই। শিশুর মত স্বভাবকে আমরা আজও ভক্তির চোখে দেখতে

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শিখিনি। আমাদের বিশ্বাস, যে গুণ শিশুর পক্ষে শোভন, আমাদের পক্ষে তা শোভন নয়। কিন্তু যদি ধ'রে নেওয়া যায় যে, সর্ব্বপ্রকার কুটিলতার অভাবকেই আমরা শিশু-চরিত্র বলি, তা হ'লে চরিত্র যে আমাদের প্রীতি ও ভক্তির সামগ্রী হয়—সে বিষয়ে ত সন্দেহ নেই। ও গুণকে যে আমরা আদর করি নে, তার কারণ সামাজিক লোকের ভিতর ও গুণের সাক্ষাৎকার আমাদের ভাগ্যে বড় একটা জোটে না। আমরা বয়স্ক লোকের ভিতর শিশুসুলভ সরলতার পরিচয় পেলে সহজেই মুগ্ধ হই। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে যাঁর পরিচয় হয়েছে, তিনিই তাঁর অসামান্য সরলতায় মুগ্ধ হয়েছেন। মনের ও চরিত্রের সরলতা রক্ষা কর্বার একটি প্রধান উপায় হচ্ছে—সাংসারিক বিষয়ে নির্লিপ্ত হওয়া। আমরা অধিকাংশ লোক ও রকম নির্লিপ্ত হ'তে চাইনে, কেন না, হ'তে পারি নে। মনোজগতের কোনও একটি বিষয়ে তন্ময় হ'তে না পারলে মানুষ ব্যবহারিক জীবনকেও একমাত্র জীবন ব'লে মেনে নিতে বাধ্য।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মনের একমাত্র অবলম্বন

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র—শ্রীসুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পৌত্র—ঋতীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পৌত্র—সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

ছিল—সাহিত্য। লেখাপড়ার বাইরে জীবনের আর যে সকল কায আছে, সে সকল কায তাঁর মনকে কখনও স্পর্শ করে নি। তাঁর কাছে সাহিত্য-চর্চ্চা করাই ছিল জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। আর তিনি চিরজীবন এক-মনে ঐ সাহিত্যরই চর্চ্চা ক'রে গেছেন।

তিনি যে এক দিকে দর্শন আর এক দিকে কাব্যের চর্চ্চা করেছেন, তার কারণ, তিনি বাল্যকাল থেকে উপ-নিষদের আবহাওয়ার ভিতর বাস করেছেন। আর উপ-নিষদ্ যে একাধারে কাব্য ও দর্শন, তার প্রমাণ বহু য়ুরো-পীয় পণ্ডিত আজও ঠিক করতে পারেন নি যে, উপ-নিষদ—কাব্য, না দর্শন। এ রকম দ্বিধার কারণও স্পষ্টই—কাব্য ও দর্শনের ভিতর য়ুরোপে যে বিচ্ছেদ ঘটেছে, ভারত-বর্ষে সে বিচ্ছেদ কখনও ঘটেনি। এ দেশে আবহমানকালও দু'য়ের ভিতর একটি যোগসূত্র রয়ে গেছে।
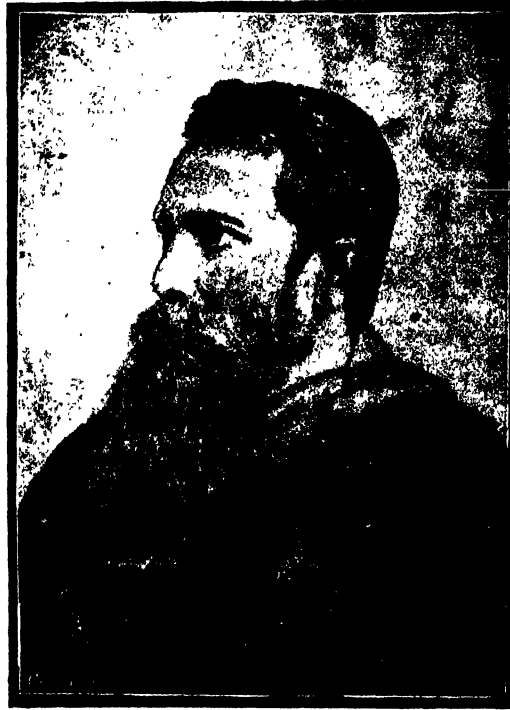
বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের সভাপতিরূপে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রনাথ সে দিন Philosophical Congressএ যে অভিভাষণ পাঠ করেছেন, তার আসল কথাটা হচ্ছে, কাব্য ও দর্শনের এই যোগাযোগ দেখিয়ে দেওয়া। রবীন্দ্রনাথের চোখ আমাদের শাস্ত্রেরই এই বিশেষত্বের উপরেই পড়েছে, তার কারণ, তিনিও বাল্যাবধি ঐ উপ-নিষদের আব-হাওয়াতেই বর্দ্ধিত হয়েছেন।

আমরা যে উপনিষদকে একমাত্র দর্শন হিসাবে আলোচনা করি, তার কারণ, আমরা স্কুল-কলেজের

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

আবহাওয়ার ভিতর বড় হয়েছি। কলেজী শিক্ষা ইংরাজী ভাষার মারফৎ য়ুরোপীয় শিক্ষা। আর য়ুরোপে সবাই জানেন, যে, কাব্য হয়েছে আর্টের অন্তর্ভুক্ত, আর দর্শন Scienceএর; সুতরাং আমরা কাব্য ও দর্শনকে সহজে এক

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর (যৌবনে)

ক'রে দেখতে পারিনে। যদিচ আমরা সবাই জানি যে, কাব্যের ভিতরও যথেষ্ট দর্শন আছে, আর দর্শনের ভিতরও কবিত্ব; তবুও আমরা শেলিকে দার্শনিক ও হেগেলকে কবি বলতে ভয় পাই।

দ্বিজেন্দ্রনাথের লেখা আমার বিচারাধীন নয়। তবুও আমি একটি কথা বলবার লোভ সংবরণ করতে পারছিনে। ফরাসী দেশে আজকাল কতকগুলি পুরানো বই নূতন ক'রে প্রকাশিত হচ্ছে। যে সব বই সাহিত্য-সমাজে রত্ন ব'লে গণ্য হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু নানা কারণে তা হয়নি; যে সব বইয়ের সৌন্দর্য্য পাঠকদের চোখ এড়িয়ে গেছে।

আমার বিশ্বাস, দ্বিজেন্দ্রনাথের "স্বপ্ন-প্রয়াণ" এই শ্রেণীর একখানি বই।

এ বইখানি যে লোকের চোখে পড়েনি, তার কারণ, আমি বহুকাল যাবৎ এ কাব্যের অস্তিত্বের বিষয়ও অজ্ঞাত ছিলুম, যদিচ ছেলেবেলা থেকে বাঙ্গালা বই পড়বার অভ্যাস আমার ছিল।

এ কাব্যের গুণ বর্ণনা করতে আমি যাচ্ছিনে, তবে এ কথা আমি নির্ভয়ে বলতে পারি যে, যিনি বাঙ্গালা ভাষা জানেন, তিনিই স্বীকার করতে বাধ্য যে, ভারতচন্দ্রের পরে তিনিই প্রথম কবি—যাঁর ভাষা ও যাঁর ছন্দ, সৌন্দর্য্য ও ঐশ্বর্য্যে ভারতচন্দ্রের অনুরূপ।

হেম নবীনের যুগে কোনও বাঙ্গালী কবির হাতে বাঙ্গালা ভাষা যে এমন সুন্দর ও সুঠাম মূর্ত্তি ধারণ করতে পারে, এ ধারণা আমার ছিল না। তার পরে আমি দ্বিজেন্দ্রনাথের যত লেখা পড়ি, ততই আমি আশ্চর্য্য হয়ে যাই। সংস্কৃতের সহিত বাঙ্গালা কথার এমন সহজ অথচ অপূর্ব্ব মিলন একমাত্র ভারতচন্দ্রে দেখা যায়।

সোমেন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রনাথের ভাষা ও ছন্দোবন্ধও অপূর্ব্ব। আমার বিশ্বাস, রবীন্দ্রনাথের লেখার উপর তাঁর বড় দাদার কাব্যের প্রভাব অনেকটা ছিল—কতটা ছিল, তা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই বলতে পারেন।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

দ্বিজেন্দ্রনাথ

বাঙ্গালার প্রাচীন ও নবীনের সন্ধিক্ষণ যাঁহারা আপনাদের জীবনের কর্ম্মপ্রতিষ্ঠার দ্বারা সজাগ রাখিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে আর এক ক্ষণজন্মা পুরুষ ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। তিনি কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ ঠাকুর-বংশের শীর্ষস্থানীয় দ্বিজেন্দ্রনাথ। গত ৫ই মাঘ মঙ্গলবার বোলপুরের শান্তিনিকেতনে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। দ্বিজেন্দ্রনাথ স্বনামখ্যাত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র, কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কনিষ্ঠ। পরিণত বয়সে পূর্ণ শান্তিতে দ্বিজেন্দ্রনাথ নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়াছেন; সুতরাং ইহাতে শোক করিবার কিছুই নাই। কিন্তু বাঙ্গালী ও বাঙ্গালা লেখক হিসাবে দ্বিজেন্দ্রনাথ যাহা ছিলেন, তাঁহার অভাবে সে স্থান পূর্ণ করিবার আর কেহ রহিল না, ইহাই দুঃখের কথা।
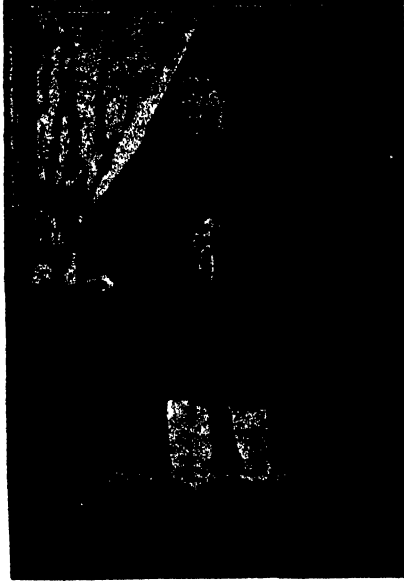
হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর

দ্বিজেন্দ্রনাথ বাঙ্গালীর জীবনের একটা যুগস্থান অধিকার করিয়া ৮৬ বৎসর কাল অতিবাহিত করিয়াছেন। তাঁহার সময়ে বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর জীবনে কত আবর্ত্তন-বিবর্ত্তনই না হইয়াছে,—কত পরিবর্ত্তনই না হইয়াছে। দ্বিজেন্দ্রনাথ সম্ভ্রান্ত ধনাঢ্য পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু বাণীর সাধনায় সিদ্ধি লাভও করিয়াছিলেন। তাঁহারই জগদ্বরেণ্য ভ্রাতার মত তিনি একাধারে কমলা ও বাণীর বরপুত্র হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

দ্বিজেন্দ্রনাথ সাধকের ন্যায় একাগ্রচিত্তে বাণীর আরাধনা—সেবা

বীরেন্দ্রনাথ ঠাকুর

কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (কৈশোরে)

করিতেন, প্রায় নিঃসঙ্গজীবনে নিভৃতে সাহিত্য, গণিত ও দর্শন শাস্ত্রের চর্চ্চা করিতেন। এ বিষয়ে পরীক্ষার্থী বালকের মত তাঁহার আজীবন উৎসাহ, উদ্যম, অধ্যবসায় ও একাগ্রতা ছিল। তাঁহার শ্রদ্ধেয় জনক তাঁহাকে বিপুল বিষয়-সম্পত্তি তত্ত্বাবধানের জন্য কত অনুরোধ, কত চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু বাণীর এই একনিষ্ঠ সাধকের মধ্যে বিষয়-বিতৃষ্ণা প্রচ্ছন্নভাবে দেখা দিয়াছিল, তিনি সে বিষয়ে কখনও অবহিত হইতে পারেন নাই। পিতার পরলোকগমনের পর দ্বিজেন্দ্রনাথ তাঁহার অংশের বিষয়ের স্থায়ী পত্তনী ভ্রাতৃবর্গের হস্তে অর্পণ করিয়াছিলেন, এবং উহা হইতে যে আয় হইত, তাহার ও তাঁহার সংসারের সমস্ত ভার পুত্র দ্বিপেন্দ্রনাথের হস্তে অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন। সংসারের এই সমস্ত দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া তিনি নিশ্চিন্তমনে নিভৃতে বাণীর সাধনা করিয়া পরমানন্দ উপভোগ করিতেন। এমন বাঙ্গালী কয় জন জন্মগ্রহণ করিয়াছেন? বিষয়ী ধনীর বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া বিষয়ের প্রতি মমতা তাঁহার এতই অল্প ছিল যে, তিনি অবিচারিতচিত্তে মুক্তহস্তে দান করিয়াছিলেন।

দ্বিজেন্দ্রনাথের প্রতিভা বহুমুখী ছিল—বৈচিত্র্যই তাঁহার প্রতিভার বৈশিষ্ট্য। তাঁহার কবিত্বশক্তি যেমন অনন্যসাধারণ ছিল, তেমনই গদ্যসাহিত্যেও তাঁহার প্রতিভা বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল। গণিতে ও দর্শনে তাঁহার প্রতিভা মূর্ত্তি লাভ করিয়াছিল। প্রথম যৌবনেই তিনি মাতৃভাষার সেবায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। 'স্বপ্নপ্রয়াণ' তাঁহার প্রথম কবিতা। ইহা রূপক। এই কবিতাই তাঁহাকে বাঙ্গালা ভাষার কবিগণের মধ্যে অতি উচ্চ আসন প্রদান করিয়াছিল। তিনিই সর্ব্বপ্রথমে বাঙ্গালা পদ্যে মহাকবি কালিদাসের 'মেঘদূত' কাব্য বাঙ্গালী কবিত্বরস-পিপাসুগণকে উপহার প্রদান করেন। ইহাতে তাঁহার শব্দবিন্যাসের চমৎকারিতা এবং ছন্দের উপর অসাধারণ অধিকার লোকলোচনে প্রতিভাত হইয়াছিল।
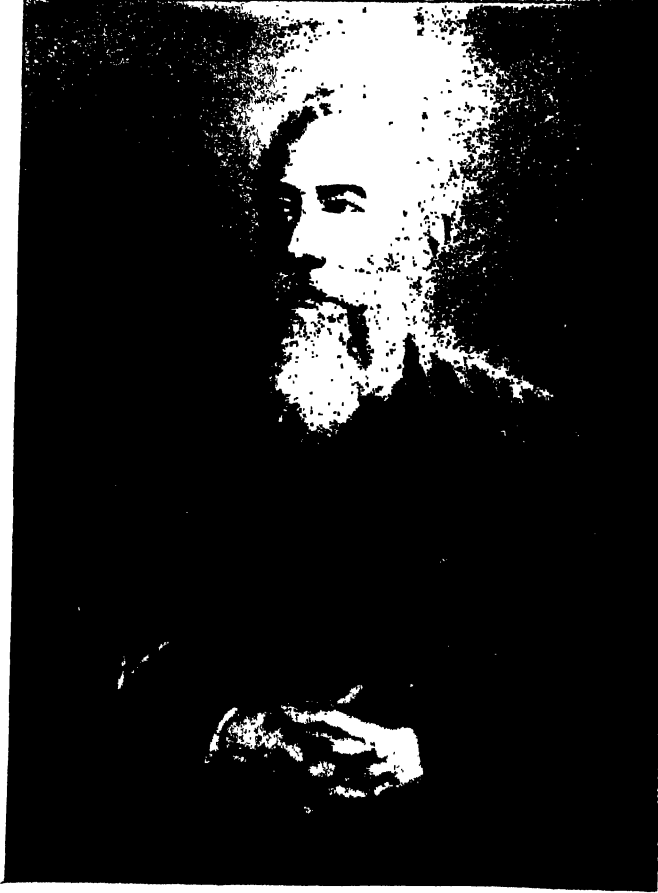
দ্বিজেন্দ্রনাথ গণিতের অনেক সমস্যা-সমাধানে আত্মনিয়োগ করিতেন—সে সময়ে তিনি তন্ময় হইয়া যাইতেন। তাঁহার Automatic paper-box সকলের বিস্ময় উৎপাদন করিত। তাঁহার শেষ রচনা "রেখাক্ষর বর্ণমালা।" ইঁহাই বাঙ্গালায় প্রথম সর্টহ্যাণ্ডের গ্রন্থ। অবশ্য, এ গ্রন্থ এখনও মুদ্রিত হয় নাই, তবে শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে বলিয়া শুনা গিয়াছে।

দ্বিজেন্দ্রনাথই প্রথমে 'ভারতী' পত্রিকা প্রবর্ত্তন করেন।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

অরুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর

দিব্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

পুত্রসহ সৌদামিনী দেবী

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর (যৌবনে)

তিনি 'আর্য্যাণী ও সাহেবিয়ানা' প্রভৃতি প্রবন্ধে বাঙ্গালীর বিদেশী ভাবের অনুকরণের বিপক্ষে তীব্র কশাঘাত করেন। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালায় যে স্বদেশীর ভাব-বন্যা আসিয়াছিল, দ্বিজেন্দ্রনাথ তাহার বহুদিন পূর্ব্বে 'হিন্দু মেলার' অন্যতম কর্ম্মকর্ত্তা ছিলেন। তাহার রচনার প্রায় অনেক স্থলেই জাতীয় ভাব পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। তিনি কয়েক বৎসর বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি ছিলেন এবং পরিষদে বহু সারগর্ভ প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। তাঁহার সভাপতির অভিভাষণে মৌলিকতা পরিলক্ষিত হইত। কলিকাতায় সাহিত্য-সম্মিলনের যে অধিবেশন হয়, তাহাতে তিনি সভানেতৃত্ব করিয়াছিলেন। দর্শনের আলোচনায়ও দ্বিজেন্দ্রনাথ নিজের মৌলিকতা দেখাইয়া গিয়াছেন। তাঁহার 'তত্ত্ববিদ্যা' প্রভৃত জ্ঞানের পরিচায়ক। 'ভারতী', 'তত্ত্ববোধিনী', 'বঙ্গদর্শন' প্রভৃতি পত্রে তাঁহার বহু রচনা প্রকাশিত হইয়াছিল।

গত ত্রিশ বৎসরাধিক কাল দ্বিজেন্দ্রনাথ তাঁহার বোলপুরের শান্তিনিকেতন আশ্রমের নিকটস্থ কুটীরে শান্ত উদ্বেগশূন্য জীবন যাপন করিয়াছিলেন। সে সময়ে তাঁহার শান্ত, তপোবনের ঋষির মত পবিত্র পূত জীবনযাপন যিনি দেখিয়াছেন, তিনিই মুগ্ধ হইয়াছেন। সামান্য আহার, সামান্য পরিধান, সামান্যভাবে শয়ন, ইহাই ছিল তাহার দৈনন্দিন জীবনের ধারা। তপোবনের পশুপক্ষীরা পর্য্যন্ত তাঁহার প্রতি এত আকৃষ্ট হইয়াছিল যে, তাহারা নির্ভয়ে তাঁহার হস্ত হইতে আহার্য্য তুলিয়া লইত। পৃথিবীর নানা প্রান্ত হইতে নানা বিদ্বান্ ও পণ্ডিত সজ্জন 'বিশ্বভারতী' পরিদর্শনে আসিয়া তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া মুগ্ধ হইয়া যাইতেন। তাঁহার শিশুসুলভ সরলতা, তাঁহার উদার অনাবিল হাস্য-পরিহাস, তাঁহার সৌজন্য, বিনয় ও দয়া মমতা সকলকেই তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট করিত। মহাত্মা গন্ধী আশ্রমে আসিলেই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ ও আলাপ করিয়া শান্তি ও তৃপ্তি লাভ করিতেন, তাঁহাকে 'বড়দাদা' বলিয়া সম্ভাষণ করিতেন। মহামতি রেভারেণ্ড এণ্ড্রুজও তাঁহাকে বড়দাদা

মনস্বী দ্বিজেন্দ্রনাথ (শেষ চিত্র)

[কলিকাতা রিভিউ হইতে]

শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী (যৌবনে)

দ্বারকানাথ ঠাকুর

বলিতেন। দ্বিজেন্দ্রনাথের মৃত্যু-সংবাদে মহাত্মা গন্ধী ব্যথা পাইয়া তাঁহার পত্রে মনের ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ প্রকৃত প্রস্তাবে কখনও রাজনীতিক ছিলেন না, তথাপি মহাত্মা গন্ধীর দেবোপম চরিত্রগুণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে আন্তরিক শ্রদ্ধা-ভক্তি করিতেন।

পরিণত বয়সে সজ্ঞানে পূর্ণ শান্তিতে ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ,—ইহা ত সুখেরই কথা, গৌরবেরই কথা। ভগবানের দয়ায় দ্বিজেন্দ্রনাথের অটল বিশ্বাস ছিল। ভগবানের নাম করিতে করিতে তিনি ইহজীবনের কর্ত্তব্য শেষ করিয়া অনন্তধামে চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার তিরোভাবে সমগ্র বাঙ্গালী জাতি যে অভাব অনুভব করিতেছে, তাহাই তাঁহার জীবনের সার্থকতা।

দ্বারকানাথ ঠাকুর

|

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

৺দ্বিজেন্দ্র ৺সত্যেন্দ্র ৺হেমেন্দ্র ৺বীরেন্দ্র ৺জ্যোতিরিন্দ্র ৺সোমেন্দ্র রবীন্দ্রনাথ সৌদামিনী সুকুমারী শরৎকুমারী স্বর্ণকুমারী বর্ণকুমারী

দ্বিপেন্দ্র অরুণেন্দ্র নীতিন্দ্র কৃতীন্দ্র সুধীন্দ্র ৺সরোজাসুন্দরী ৺উষাবতী

জাতিতত্ত্বের প্রতিবাদ

গত কার্ত্তিক সংখ্যার মাসিক বসুমতীতে শ্রীযুত শ্যামাচরণ কবিরত্ন বিদ্যাবারিধি মহাশয়ের লিখিত জাতিতত্ত্ব নামক প্রবন্ধে বঙ্গীয় বৈদ্য-জাতির উপরে অন্যায় আক্রমণ দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। প্রবন্ধটিতে প্রথমেই বৈদ্যদিগের উপর নানা মিথ্যা দোষারোপ করা হইয়াছে এবং অযথার্থ বচন উদ্ধার করিয়া গালি দেওয়া হইয়াছে।

প্রবন্ধ-লেখক প্রথমেই লিখিয়াছেন,—"যাঁহারা যথেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত, তাঁহারা ব্রাহ্মণ-প্রণীত শাস্ত্রের দোহাই দিয়াই স্বমত সমর্থন করিয়াও, ঈর্ষ্যাবশে সেই ব্রাহ্মণদিগের অবিসংবাদি শ্রেষ্ঠত্ব অসহমান হইয়া তাঁহাদিগকে অপমানিত করিতেছেন, সভাসমিতি প্রভৃতি সর্ব্বত্রই তাঁহাদের কুৎসা রটনা করিয়া গৌরব নষ্ট করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। তাহার কারণ, তাঁহাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হওয়ার প্রধান অন্তরায় ব্রাহ্মণ।" এই কথাটির কোন মূল্য নাই, কারণ, বৈদ্যরা কোন স্থলেই ব্রাহ্মণ জাতির বা প্রকৃত ব্রাহ্মণের অপমান বা কুৎসা রটনা করেন না। সেরূপ করিলে বৈদ্যরা নিজে ব্রাহ্মণ্যের দাবী করিতে অগ্রসর হইতেন না। বৈদ্যরা এ যাবৎ সাধারণ্যে কোন সভা-সমিতি করেন নাই, কোন পত্রিকাতেও সর্ব্বসাধারণের মধ্যে ব্রাহ্মণদিগের "কুৎসা রটনা করিয়া গৌরব নষ্ট করিতে প্রয়াসী" হয়েন নাই।

বিদ্যাবারিধি মহাশয় প্রথম পরিচ্ছেদের নাম দিয়াছেন,—"অম্বষ্ঠ বা বৈদ্য।" ইহার অর্থ এই যে, এই পরিচ্ছেদে বঙ্গীয় বৈদ্যজাতি বা অম্বষ্ঠ জাতির আলোচনা হইবে। এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া লেখক সহসা মধ্যস্থলে একটি বচন উদ্ধার পূর্ব্বক বৈদ্যকে "অতি নিকৃষ্ট জাতি" বলিয়া সন্তোষ লাভ করিয়াছেন। উহার ভাব এই যে, অতি নিকৃষ্ট বৈদ্য নামধারী কোন জাতি কৌশলক্রমে উচ্চ হইয়া বঙ্গসমাজের অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিল এবং এখনও করিয়া আছে।

লেখক প্রারম্ভে বলিয়াছেন,—"আমরা বাল্যে ও যৌবনে দেখিয়াছি, চিকিৎসাশাস্ত্রজ্ঞ প্রবীণ বৈদ্যগণ আপনাদিগকে বৈদ্য বলিয়াই পরিচয় দিতেন, কটিদেশে যজ্ঞসূত্র রাখিতেন এবং ১৫ দিন পূর্ণাশৌচ পালন করিতেন।" লেখক কটিদেশে উপবীতধারী একটা সমগ্র জাতিকে দেখিয়াছিলেন কি? কিন্তু কোথায় দেখিয়াছিলেন, তাহা প্রকাশ নাই।

লেখকের বাল্যে ও যৌবনে (৪০।৪৫ বৎসর পূর্ব্বে?) সংস্কৃত কলেজে ব্রাহ্মণের সহিত অধ্যয়ন ও অধ্যাপনাপর বৈদ্য ছাত্র ও অধ্যাপকগণ কটিতটে যজ্ঞোপবীত ধারণ করিতেন কি? যে যজ্ঞোপবীত অমেধ্য অঙ্গ স্পর্শ করিবে না, ইহাই বিধি, তাহা নাভি-নিম্নে মেখলার আকারে সংলগ্ন থাকিবে কেন? কোনও শাস্ত্রবিধানে কোনও উপবীতী জাতির জন্য যখন যজ্ঞোপবীতের তাদৃশ দুর্গতির উল্লেখ নাই, তখন ঐ প্রকার উপবীত ধারণ কোন জাতির জাতীয় বা সামাজিক রীতি, ইহা কখনই বলা যাইতে পারে না। আর যদি ঐরূপ ব্যবহার কাহারও কাহারও সত্যই দেখা গিয়া থাকে, তবে সমাজনিয়ন্তা গুরু-পুরোহিতগণ কি নিদ্রা যাইতেছিলেন, অথবা কোন নিগূঢ় উদ্দেশ্যে কোন কোন শিষ্যকে কেহ কেহ ধর্ম্মের নামে ঐরূপ মিথ্যাচার শিখাইতেছিলেন? বস্তুতঃ, প্রবীণ চিকিৎসাশাস্ত্রজ্ঞ বৈদ্যের ঐরূপ আচরণ হইতেই পারে না।

বহরমপুরের ঘটনাপ্রসঙ্গে বিদ্যাবারিধি মহাশয় লিখিয়াছেন,—"শ্রাদ্ধ-সভায় নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণগণের ন্যায় বৈদ্যদিগকেও সুপারির সহিত যজ্ঞোপবীত দেওয়া উচিত কি না, এ বিষয়ের মীমাংসায় সন ১৩১৮ সালের ৩২শে শ্রাবণ তারিখে বহরমপুরস্থ ব্রাহ্মণ-সভার বিশেষ অধিবেশনে বঙ্গের যাবতীয় প্রধান প্রধান অধ্যাপক এবং যাবতীয় গণ্যমান্য সুপ্রসিদ্ধ সামাজিক মহোদয়গণ একবাক্যে বৈদ্যদিগকে অব্রাহ্মণ, সুতরাং যজ্ঞোপবীত দানের অপাত্র বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন।" আমরা পাঠক মহোদয়কে এই অংশটুকু বিশেষভাবে পরীক্ষা করিতে অনুরোধ করি। আমরা অবগত আছি এবং এই উদ্ধৃত অংশ হইতেও ইহা পরিস্ফুট হইতেছে যে, নিমন্ত্রিত বৈদ্যগণকে ব্রাহ্মণজ্ঞানে সুপারি ও যজ্ঞোপবীত দানের প্রথা ঐ স্থানে প্রচলিত ছিল। ঐ সামাজিক রীতি বৈদ্য-সমাজের ভগ্নদশায় প্রবর্ত্তিত হয় নাই, প্রাচীন ব্রাহ্মণগণের সময়ে যে সামাজিক সদাচার প্রচলিত ছিল, বৈদ্যের ব্রাহ্মণ্যসূচক সেই আচার বর্ত্তমান কালের কোন কোন ব্রাহ্মণের সহ্য হয় নাই, সেই জন্যই উক্ত সভা হইয়াছিল।

বহরমপুরের ন্যায় ব্রাহ্মণ ও কায়স্থপ্রধান স্থানে ১৪ বৎসর পূর্ব্বেও সমাজে বৈদ্যদিগের যে চিরন্তন ব্রাহ্মণোচিত সম্মান প্রচলিত ছিল, সেই সম্মান অপহরণ করিয়া ব্রাহ্মণসমাজ বৈদ্যদিগের প্রতি কিরূপ মনোভাবের পরিচয় দিয়াছেন? এইরূপ মনোবৃত্তি লইয়াই সমালোচক বিদ্যাবারিধি মহাশয় এই সোজা কথাটা বুঝিতে পারেন নাই যে, উল্লিখিত বহরমপুরের ঘটনা হইতে বৈদ্যগণের চিরন্তন ব্রাহ্মণত্বই প্রমাণিত হয়।

বৈদ্যজাতির আভ্যন্তরীণ সমাজসংস্কার ও উন্নতিতে ব্রাহ্মণ-সমাজের কিছু ক্ষতি আছে কি? প্রত্যেক জাতিরই অপর জাতিকে উপযুক্ত গৌরব দান করিতে কুণ্ঠিত হওয়া উচিত নয়, তবে যদি কাহারও গুণাধিক্যবশতঃ উৎকর্ষ থাকে, অপরের মস্তক তাহার সম্মুখে আপনিই নত হইবে, তাহার জন্য কৃষ্ণসর্পাদি-সংবলিত বিকট অলঙ্কারবাক্যের ছড়াছড়ি, শাস্ত্রের অপব্যাখ্যা ও ভ্রান্ত বচন-বিন্যাসের প্রয়োজন কি?

সমগ্র ভারতবর্ষে বঙ্গদেশ ভিন্ন আর কোথাও "বৈদ্য" বলিয়া একটা পৃথক্ বিভাগ নাই। আয়ুর্ব্বেদবিদ্ পণ্ডিতদিগের সর্ব্বত্র যে বর্ণ, বঙ্গেও তাহাই হওয়া স্বভাবিক, ইহার ব্যতিক্রম কেনই বা হইবে? ভারতবর্ষের অন্যত্র যদি চিকিৎসক ব্রাহ্মণদিগকে বৃত্তি হিসাবেই "বৈদ্য" বলা হয়, "বৈদ্য" শব্দ জাতিবাচক হইয়া যদি কোন প্রদেশে ব্যবহৃত না হয়, বঙ্গেই বা কেন হইবে? বস্তুতঃ, যাঁহারা বৈদ্যজাতি বলিয়া এক্ষণে বঙ্গে বিদিত, তাঁহারা পঞ্চ ব্রাহ্মণের কান্যকুব্জ হইতে বঙ্গে আগমনের পূর্ব্বে বঙ্গের বাহিরে "গৌড় ব্রাহ্মণ" এবং বঙ্গে "ব্রাহ্মণ" বলিয়াই বিদিত ছিলেন। পঞ্চ ব্রাহ্মণের সন্তানরাও বৈদ্যদিগকে প্রাচীনতর গৌড়ব্রাহ্মণ বা বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ বলিয়াই জানিতেন। এখন যেমন হিন্দুস্থানী ও বাঙ্গালী ব্রাহ্মণে পানভোজন বিবাহাদি চলে না, আচার-ব্যবহার লইয়া খুঁটিনাটি হয়, তখনও নবাগত কান্যকুব্জ ও বাঙ্গালী ব্রাহ্মণদের মধ্যে সেইরূপ ছিল। এই দুই বিভিন্ন সম্প্রদায় বঙ্গভূমির ক্রোড়ে পরস্পরের সহিত জিগীষা পূর্ব্বক শাস্ত্রাদি আলোচনা করিত। ক্রমে "সেন" ব্রাহ্মণদের রাজত্বাবসানে, তাঁহাদের স্বজাতীয় ব্রাহ্মণগণ সাহিত্য ও চিকিৎসাশাস্ত্রে অধিকতর মনোনিবেশ পূর্ব্বক "কবিরাজ" এই উপাধি বংশগত করিয়া ফেলিলেন। কান্যকুব্জ-ব্রাহ্মণগণ যাগ-যজ্ঞাদির জন্য আসিয়াছিলেন, তাঁহারা ক্রিয়াকাণ্ড লইয়াই রহিলেন। স্মৃতি ও ন্যায়ের চর্চ্চাধিক্য বশতঃ তাঁহারা পণ্ডিত হইলেও "কবিরাজ" আখ্যা পাইলেন না, এ দিকে "কবিরাজ" মহাশয়রা চিকিৎসাবৃত্তি গ্রহণ করিয়া কালে বৈদ্য ব্রাহ্মণ বা "বৈদ্য" নামেই সর্ব্বত্র বিদিত হইলেন। এই জন্য তৎপূর্ব্ববর্ত্তী কালে রাজপদাধিষ্ঠিত "সেন" ব্রাহ্মণদিগের তাম্র-প্রশস্তি প্রভৃতিতে "বৈদ্য" বলিয়া উল্লেখ নাই।

পরবর্ত্তী কালের যাজকব্রাহ্মণরা মুসলমান-বিপ্লবে ধ্বস্তপ্রায় হিন্দু-সমাজকে পুনঃ সংগঠিত করিবার সময়ে বৈদ্যদিগের চিকিৎসাবৃত্তি দেখিয়া (স্মৃতিতে "অম্বষ্ঠ" জাতির চিকিৎসাবৃত্তি নির্দ্দিষ্ট থাকায়) তাঁহাদিগকে এবং তাঁহাদিগের স্বজাতীয় সেনরাজগণকে (সেন রাজবংশের সহিত বৈদ্যদিগের পূর্ব্বপুরুষদিগের কন্যার দান-প্রদান বৈদ্য-কুলজিগ্রন্থে যত্র তত্র উল্লিখিত আছে) অম্বষ্ঠ মনে করিয়া কোন কোন কুলজিগ্রন্থে সেনরাজগণের উল্লেখ প্রসঙ্গে তদ্রূপ বলিয়াছেন। কিন্তু ইহা তদানীন্তন ব্রাহ্মণ মহাশয়দিগের ভ্রম। সহস্র বৎসরব্যাপী বৌদ্ধ-প্লাবনে মূর্দ্ধাভিষিক্তাদি জাতির ন্যায় অম্বষ্ঠ জাতির পৃথক্ সত্তা ভারত-ক্ষেত্র হইতে মুছিয়া গিয়াছিল। তখন ভারতবর্ষের কুত্রাপি কোন্ জাতির দশ দিনের অধিক অশৌচ ছিল না। (অদ্যাপিও সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তে নাই); বঙ্গেও কোন জাতির তদধিক দিন অশৌচ হইত না। সুতরাং ঐ প্রাচীন গৌড়ীয় ব্রাহ্মণদিগের অম্বষ্ঠত্ব ও পঞ্চদশাহাশৌচিত্ব উভয়ই ভিত্তিহীন ও মিথ্যারোপিত। উহা পরবর্ত্তী যুগের নব্য স্মার্ত্ত মহাশয়দিগের কাণ্ড, তাঁহারাই বঙ্গে অশৌচের দশ, পনর, ত্রিশ, কোথাও বা কেবল দশ ও ত্রিশ এইরূপ দিনসংখ্যা নির্দ্দেশ করিয়া নানাজাতির মধ্যে নানাপ্রকার ব্যবস্থা চালাইয়া গিয়াছেন। ঐ সময়েই বৈদ্যদিগের অম্বষ্ঠত্ব এবং পঞ্চদশাহাশৌচিত্ব প্রথম প্রচলিত হয়। মোগল-পাঠানের যুদ্ধ হেতু দারুণ বিপ্লবে স্মৃতিশাস্ত্রের গ্রন্থলোপ ও চর্চ্চায় শৈথিল্য বশতঃ তদানীন্তন বৈদ্যরা গুরু-পুরোহিতের মনগড়া স্মার্ত্ত ব্যবস্থাকে ধর্ম্মমূলক ব্যবস্থা মনে করিয়া মানিয়া লইয়াছিলেন। স্মার্ত্ত মহাশয়রা ক্ষণেকের জন্যও চিন্তা করেন নাই যে, অম্বষ্ঠের বৃত্তি চিকিৎসা হইতে পারে, কিন্তু যেই চিকিৎসক, সেই যে অম্বষ্ঠ, তাহা নাও হইতে পারে। বিশেষতঃ যখন সেই সময়ে (এমন কি, পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বেও) বৈদ্যরা চিকিৎসা করিয়া ব্রাহ্মণোচিত ব্যবহার অখণ্ডিত রাখিবার জন্য তাহার মূল্য গ্রহণ করিতেন না, যখন এই দেশের অপামর জনসাধারণ "অম্বষ্ঠ" শব্দের সহিত পরিচিত নহে, কোন অপভ্রংশরূপেও যখন ঐ শব্দ বঙ্গভাষায় বিদ্যমান নাই, কোন প্রাচীন অভিধানে অম্বষ্ঠ ও বৈদ্যকে একার্থক দেখা যায় না, তখন বৈদ্যকে "অম্বষ্ঠ" বলিয়া পরিচিত করা ন্যায় ও যুক্তিসঙ্গত নহে। বৈদ্যজাতির সম্পূর্ণ ইতিহাস বলিবার স্থান ইহা নহে। অনুসন্ধিৎসু পাঠক বৈদ্য-ব্রাহ্মণ সমিতি হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী পাঠ করিয়া দেখিবেন। যাহা হউক, বৈদ্যজাতি যখন কাহারও কোন ক্ষতি করে নাই, আপনার জাতীয় সংস্কারেই মনোনিবেশ করিয়াছে, তখন কোন কোন অকর্ম্মা ব্রাহ্মণ মহাশয়ের তাহা সহ্য হয় না কেন?

বিদ্যাবারিধি মহাশয় লিখিয়াছেন,—'ব্রাহ্মণাৎ বৈশ্যকন্যায়াম্ অম্বষ্ঠো নাম জায়তে' এই মনুবচন অনুসারে অম্বষ্ঠের বর্ণসঙ্করত্ব প্রতিপাদিত হওয়ায় বৈদ্যরা অম্বষ্ঠ বলিয়া পরিচয় দিতে আর প্রস্তুত নহেন," এই উক্তির প্রথমাংশ ভ্রান্ত; দ্বিতীয়াংশ মিথ্যা। মনু কোথাও বলেন নাই যে, অম্বষ্ঠ বর্ণসঙ্কর। অনুলোম বিবাহকে অর্থাৎ উচ্চবর্ণের পুরুষের সহিত নিম্নবর্ণের স্ত্রীর বিবাহকে মনু-যাজ্ঞবল্ক্যাদি ঋষিরা বৈধ বা ধর্ম্মসঙ্গত বলিয়াছেন। সুতরাং ঐরূপ বিবাহজাত সন্তানকে বর্ণসঙ্কর বলা যায় না, ইহা মনুবচনে স্পষ্ট আছে, যথা—

> "ব্যভিচারেণ বর্ণানাম্ অবেদ্যাবেদনেন চ।
> স্বকর্ম্মণাং চ ত্যাগেন জায়ন্তে বর্ণসঙ্করাঃ॥" মনু (১০,২৪)

অর্থাৎ (১) বর্ণ সকলের মধ্যে অবৈধভাবে স্ত্রীপুরুষের মিলন হইতে, (২) অপরিণেয়া সগোত্রাদি বিবাহ হইতে এবং (৩) ব্রাহ্মণাদিবর্ণ স্বধর্ম্মোচিত কার্য্য পরিত্যাগ করিলে বর্ণসঙ্করের উৎপত্তি হয়।

নারদ পরিষ্কার করিয়া বলিয়াছেন—

> "আনুলোম্যেন বর্ণানাং যজ্জন্ম স বিধিঃ স্মৃতঃ।
> প্রাতিলোম্যেন যজ্জন্ম স জ্ঞেয়ো বর্ণসঙ্করঃ॥" (১০২)

অর্থাৎ অনুলোম-বিবাহজাতরা বর্ণসঙ্কর নহে, প্রতিলোমজাতরাই বর্ণসঙ্কর। যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন,"অসৎ সন্তস্তু বিজ্ঞেয়াঃ প্রতিলোমানুলোমজাঃ" (১।৯৫) অর্থাৎ অনুলোমবিবাহজাতরা সৎপুত্র, প্রতিলোমজাতরা অসৎপুত্র (বলা বাহুল্য, প্রতিলোমবিবাহের ব্যবস্থা বা মন্ত্রাদি কোন শাস্ত্রে নাই, অনুলোমবিবাহে সবর্ণবিবাহের সমস্ত মন্ত্র এবং কুশণ্ডিকাদি সকল বিধিই আছে)। আধুনিক লোকরা দুই বর্ণের মিশ্রণকেই বর্ণসঙ্কর মনে করে, কিন্তু শাস্ত্রে ঐ পারিভাষিক শব্দের ঈদৃশ অর্থ নহে, তাহা উপরে দেখান গেল। মোট কথা, অবৈধ সন্তানই বর্ণসঙ্কর বা বর্ণ-নিকৃষ্ট (সঙ্কর = নিকৃষ্ট, মিশ্রণ নহে)। আবার স্বকর্ম্ম ত্যাগ করিলেও বর্ণসঙ্কর হইতে হয়। যথা "জুতা বেচা" প্রভৃতি) (এই জন্য ভগবান্ বলিয়াছেন—"উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্য্যাম্ কর্ম্ম চেদহম্। সঙ্করস্য চ কর্ত্তা স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ"—গীতা ৩।২৪)। অতএব বৈধ সন্তান অম্বষ্ঠ, বর্ণসঙ্কর নহে। যে সময়ে প্রাচীন ভারতে অসবর্ণ বিবাহের চলন ছিল, তখন মূর্দ্ধাভিষিক্ত, অম্বষ্ঠ প্রভৃতি অনুলোমজাত বৈধসন্তানগণ পিতৃবর্ণভুক্ত হইত। তাহারা বর্ণমধ্যে নিকৃষ্ট হইবে কেন?

বৈদ্য ও ব্রাহ্মণগণের কলহ নূতন নহে এবং এই কলহে বৈদ্যের পরাজয়ে হিন্দুস্থানীর নিকটে বাঙ্গালীর পরাজয়ের নিদর্শন পাওয়া যায়। মহারাজ বল্লালসেন রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র বহু ব্রাহ্মণকে অব্রাহ্মণোচিত দোষে দূষিত দেখিয়া বঙ্গদেশ হইতে নির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন, কাহাকেও কৌলীন্য দান করায় এবং কাহারও মর্য্যাদা হরণ করায় বহু ব্রাহ্মণের তিনি চক্ষুঃশূল হইয়াছিলেন, এ সকল কথা ব্রাহ্মণ কুলজী গ্রন্থে বর্ত্তমান। সেই সময় হইতে কলহের সূত্রপাত হয় এবং পরে সামাজিক প্রাধান্য লইয়া ঐ কলহ প্রবলতর হইয়া উঠে। তখন বৈদ্যদিগের উপর প্রথমে অম্বষ্ঠত্ব আরোপিত হয়। পরে রঘুনন্দন মনুর—

> "শনকৈস্তু ক্রিয়ালোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ।
> বৃষলত্বং গতা লোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ" ॥ ১০।৪৩
> ["পৌণ্ড্রকাশ্চৌড্রদ্রবিড়াঃ কাম্বোজা যবনাঃ শকাঃ।
> পারদা পহ্লবাশ্চীনাঃ কিরাতা দরদাঃ খশাঃ" ॥ ১০।৪৪]

(অর্থাৎ পৌণ্ড্রকাদি ক্ষত্রিয় জাতি ক্রিয়ালোপ ও বেদত্যাগ হেতু ক্রমে ক্রমে শূদ্র জাতিতে পরিণত হইয়াছে। এই শ্লোকের প্রমাণ তুলিয়া রঘুনন্দন নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিকভাবে অম্বষ্ঠজাতির শূদ্রত্ব ঘোষণা করিয়াছেন! তদবধি রাঢ়ী, বারেন্দ্র প্রভৃতি ব্রাহ্মণ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ্য অটুট রহিল, আর অম্বষ্ঠরা (রঘুনন্দনের হুকুমে বৈদ্যরা) অর্থাৎ বৈদ্য শ্রেণীর ব্রাহ্মণরা এক ধাপ নীচে নামিয়া পড়িলেন।

সুবোধনীতে আছে—"বৈদ্য কথাটির ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ এইরূপ—"ত্রয়ী বৈ বিদ্যা ঋচো যজূংষি সামানি" (শতপথ ব্রাহ্মণ)। বিদ্যা শব্দের মুখ্য অর্থ বেদ। যাঁহারা সেই বেদ অধ্যয়ন করেন এবং বেদজ্ঞ, তাঁহারাই বৈদ্য। 'তদধীতে তদ্বেদ' এই পাণিনীর সূত্র দ্বারা বিদ্যা + অণ্ = বৈদ্য। মতান্তরে—বেদ + ষ্ণ্য = বৈদ্য।" পাঠক মহাশয় দেখুন, এ স্থানে দুইটি মত উল্লিখিত হইয়াছে, একটি পাণিনির মত, অপরটি অন্য ব্যাকরণের মত। অন্য ব্যাকরণের মতের মধ্যে পাণিনির সূত্র 'তদধীতে তদ্বেদ' অবশ্যই প্রবেশ লাভ করিতে পারে না। কিন্তু যেরূপে হউক, (মিথ্যার আশ্রয়ে) কতকগুলা দোষ ধরিয়া বাহাদুরি লইতে ত হইবে, তাই বিদ্যাবারিধি মহাশয় ইহার সমালোচনায় বলিতেছেন—"বেদ + ষ্ণ্য = বৈদ, এই ব্যুৎপত্তি ব্যাকরণসম্মত নহে; যেহেতু, 'তদধীতে তদ্বেদ' (তাহা যে অধ্যয়ন করে বা জানে) এই অর্থে ষ্ণ্য প্রত্যয়ের কোন সূত্র নাই।" ইহার উপর টীকা অনাবশ্যক! এখন যদি বলা যায় যে, তৃতীয় মতানুসারে বিদ্যায়-কুশলঃ ইতি বিদ্যা + ষ্ণ্য = বৈদ্য, তাহাতেও কি বিদ্যাবারিধি-মহাশয় পাণিনির স্কন্ধে আরোহণের চেষ্টা করিবেন? ষ ও ষ্ণ্য

প্রত্যয় পাণিনির ব্যাকরণে নাই, তাহাও কি সমালোচকের জানা নাই?

তৎপরে বিদ্যাবারিধি মহাশয় লিখিয়াছেন, বেদজ্ঞ বা বেদাধ্যায়ীকে বৈদ্য বলে, এমন কোনও শাস্ত্রে নাই এবং লোকব্যবহারেও নাই।" পুনশ্চ কিছু পরেই লিখিয়াছেন, "স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, বেদাধ্যায়ী বা বেদজ্ঞকে বৈদ্য বলে না।" এক্ষণে যে বাক্যটি দেখিয়া বিদ্যাবারিধি মহাশয়ের পিত্ত চটিয়াছে, সেই মহাভারতের বাক্য 'দ্বিজেষু বৈদ্যাঃ শ্রেয়াংসঃ' (উদ্যোগপর্ব্ব ৫অঃ) কিরূপে কালী সিংহের মহাভারতে বিশ জন পণ্ডিত অনুবাদ করিয়াছেন, পাঠক মহাশয় তাহা দেখুন। অনুবাদকর্ত্তারা লিখিয়াছেন—"ব্রাহ্মণের মধ্যে বেদজ্ঞ পুরুষেরাই শ্রেষ্ঠ"। বিদ্যাবারিধি মহাশয় কি বলিতে চাহেন, মহাভারতের অনুবাদক পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে কেহই শাস্ত্রমর্ম্ম অবগত ছিলেন না? যে কোন সংস্কৃত অভিধান খুলিয়া দেখুন, বৈদ্য শব্দের বেদজ্ঞ বা পণ্ডিত অর্থের সহিত চিকিৎসক অর্থ পাশাপাশি রহিয়াছে। বেদ যে মুখ্য বিদ্যা, তাহাতে সন্দেহ কি? মনু বলিয়াছেন,—

"যোঽনধীত্য দ্বিজো বেদমন্যত্র কুরুতে শ্রমম্।
স জীবন্নেব শূদ্রত্বমাশু গচ্ছতি সান্বয়ঃ॥" ২।১৬৮

অর্থাৎ যে দ্বিজ বেদপাঠ না করিয়া অন্য বিদ্যার আলোচনা করে, সে অচিরেই সবংশে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়। তবেই অন্য বিদ্যা জানুক বা না জানুক, বেদবিদ্যা জানা যে, দ্বিজের একান্ত কর্ত্তব্য, অন্যথা যোদ্বিজত্বই রক্ষা হয় না, তাহা দেখা যাইতেছে। এই জন্য বেদপাঠকেই ব্রাহ্মণের পরম ধর্ম্ম বলা হইয়াছে, অন্য ধর্ম্ম গৌণ ধর্ম্ম (মনু ৪।১৪৭)। অন্যত্র বিদ্যা অর্থাৎ স্পষ্ট ভাষায় 'বেদ' ব্রাহ্মণের শরণাগত হইয়াছিলেন, এ কথা মনু ও ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণে দৃষ্ট হয়—

'বিদ্যা ব্রাহ্মণমেত্যাহ শেবধিস্তেঽস্মি রক্ষ মাম্' অর্থাৎ বিদ্যা (বেদ) ব্রাহ্মণের নিকট গিয়া বলিয়াছিলেন, আমি তোমার নিধি, তুমি আমায় রক্ষা কর।" যে ব্রাহ্মণ বেদবিদ্যাকে আশ্রয় দিয়াছিলেন, তিনিই যে বৈদ্য, ইহা কি বিদ্যাবারিধি মহাশয় এতক্ষণে বুঝিলেন? শব্দকল্পদ্রুম কি বলিতেছেন দেখুন—"বৈদ্যঃ পণ্ডিতঃ। যথা কাত্যায়নঃ— নাবিদ্যানাং তু বৈদ্যেন দেয়ং বিদ্যাধনং কচিৎ।" 'পণ্ডিত' কাহাকে বলে? যাহার বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধি (পণ্ডা+ইতচ্) আছে, সেই ত পণ্ডিত? কিন্তু "পণ্ডিত" শব্দের আধুনিক অর্থ অন্যরূপ হইয়াছে বলিয়াই এত বিভ্রাট! যাহা হউক, প্রাচীন অর্থে পণ্ডিত, বিদ্বান্-বৈদ্য, বেদজ্ঞ যে একার্থক ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। শেষে চতুর্দ্দশ বিদ্যা, অষ্টাদশ বিদ্যা প্রভৃতিও গৌণভাবে বিদ্যাপদবাচ্য হইয়াছিল।

শেষে সিদ্ধান্তকথাটা একটু বলি। বৈদ্য শব্দের অর্থ বেদজ্ঞই হউক, আর সর্ব্ববিদ্যাকুশলই হউক, উহার পরিষ্কার অর্থ 'বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ', কিন্তু চিকিৎসক ব্রাহ্মণও ত মূর্খ নহে। অনেক শাস্ত্র শিক্ষা করিয়া তবে চিকিৎসক হওয়া যায় এবং (অধ্যাপনা ও যাজনের ন্যায়) কেবল ব্রাহ্মণই পুরুষানুক্রমে চিকিৎসা করিতে পাইতেন। এই কারণে প্রাচীনকালে ব্রাহ্মণজাতীয় চিকিৎসককেই 'বৈদ্য বলা' হইত। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য (ব্রাহ্মণ গুরু না পাওয়া যাইলে অর্থাৎ শিক্ষার্থীর আপৎকালে ব্রাহ্মণ শিক্ষার্থীকে অধ্যাপনা করিতে পারিতেন, কিন্তু পুরুষানুক্রমে বা স্বেচ্ছাক্রমে অধ্যাপনা ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যের বৃত্তি নহে, এবং ঐ জন্য 'উপাধ্যায়', 'আচার্য্য' প্রভৃতি শব্দ অব্রাহ্মণকে কখনও বুঝাইত না। যাজন ক্ষত্রিয়-বৈশ্যের পক্ষে নিষিদ্ধ, এজন্য 'ঋত্বিক্,' 'পুরোহিত' প্রভৃতি শব্দে ব্রাহ্মণকেই বুঝায়, অব্রাহ্মণকে বুঝায় না। "বৈদ্য" শব্দ ও তদ্রূপ।"

মুখ্যার্থে বৈদ্য শব্দ কুত্রাপি অব্রাহ্মণের প্রতি প্রযুক্ত হইত না। অবশ্য সমাজের অধঃপতিত অবস্থায় সম্যক বিদ্যাবত্তা না থাকিলেও বৈদ্য ব্রাহ্মণের সন্তানকে 'বৈদ্য' বলা হইত। কিন্তু প্রাচীনকালে শাস্ত্রানভিজ্ঞ চিকিৎসককে রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইতে হইত। ঐরূপ চিকিৎসক ও চিকিৎসাবিক্রয়ী হীন বৈদ্য স্মৃতিশাস্ত্রে (নট, গায়ন, আপণিক, ভৃতকাধ্যাপক, দেবল, শূদ্রযাজী, বহুযাজী ইত্যাদি বিবিধ নিন্দিত ব্রাহ্মণদিগের সহিত তুল্যভাবে) নিন্দিত ও শ্রাদ্ধে অপাংক্তেয় হইতেন। কিন্তু নিন্দার দ্বারা ভৃতকাধ্যাপকের বা বহুযাজীর ব্রাহ্মণত্ব খণ্ডিত না হইলে, চিকিৎসকেরই বা ব্রাহ্মণত্ব কেন খণ্ডিত হইবে? সুতরাং প্রাচীনকাল হইতে অদ্যাবধি যে বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় বা বিদ্বান্ চিকিৎসকসম্প্রদায় "বৈদ্য" নাম ধারণ করিয়া আসিতেছেন, তাঁহারা যে ব্রাহ্মণ, তাহাতে কেহই সন্দেহ করিতে পারেন না।

বিদ্যাবারিধি মহাশয়ের এক এই ভাবনায় চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে যে, বৈদ্য 'ব্রাহ্মণ' বলিয়া গণ্য হইলে তাহাদিগের সহিত ব্রাহ্মণদিগের পান-ভোজন ও বৈবাহিক আদান-প্রদান করিতে হইবে এবং তাহাতে ব্রাহ্মণের জাতি যাইবে। আমরা বলি, এরূপ ব্যবহারে বৈদ্যদিগেরও জাতি যাইবার ভয় আছে।

মহাভারতের "দ্বিজেষু বৈদ্যাঃ শ্রেয়াংসঃ" এই ঋষিবাক্য শুনিয়াও বিদ্যাবারিধিমহাশয় বিচলিত হইয়াছেন। কিন্তু ইহাতে বিচলিত হইবার কিছুমাত্র কারণ দেখি না। এই উক্ত প্রাচীন বৈদ্য বা বিদ্বান্ ব্রাহ্মণদিগের লক্ষ্য করিতেছে মাত্র। উহা দ্বারা ইহাই বুঝায় যে, বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ সাধারণ ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। 'বিপ্রাণাং জ্ঞানতো জ্যৈষ্ঠ্যম্' ইহা ত মনুই বলিয়াছেন। প্রাচীন বৈদ্যগণ অর্থাৎ বিদ্বান্ বিপ্রগণ আধুনিক ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য উভয় শ্রেণীরই পূর্ব্বপুরুষ, সুতরাং ঐ বাক্য হইতে দুই পক্ষই গৌরব অনুভব করিতে পারেন। "বৈদ্য" বশিষ্ঠ (রামায়ণ, অযোধ্যা, ১১) হইতে বশিষ্ঠ ও শক্তি গোত্রীয় বৈদ্য ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণগণের উৎপত্তি হইয়াছে, এতদ্বারাও ঐ দুই শ্রেণীর মধ্যে ভ্রাতৃত্ব সম্বন্ধ স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে। বৈদ্য ব্রাহ্মণ সমিতির সভাপতি মহামহোপাধ্যায় গণনাথ সেন শর্ম্মা সরস্বতী শক্তি গোত্রীয় বৈদ্য ব্রাহ্মণ। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বঙ্গে ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে এক শ্রেণী পুরুষানুক্রমে কেবল চিকিৎসাপরায়ণ হওয়ায় তাঁহাদের বৈদ্য নামটি পাকা হইয়া জাতিনামে পর্য্যবসিত হইয়াছে, আর অপর যাজক শ্রেণীর ব্রাহ্মণরা আজ পাঁউরুটী ও জুতার বা মদের দোকান অপেক্ষা ঔষধের দোকানে সুবিধা বেশী দেখিয়া চিকিৎসা বৃত্তি অবলম্বন করিতেছেন, কিন্তু তথাপি কেহই চিকিৎসক অর্থেও "বৈদ্য" বলিয়া আপনার পরিচয় দিতে চাহেন না। পশ্চিমে ত এরূপ ব্যবহার নাই, পশ্চিমে চিকিৎসক ব্রাহ্মণকে "বৈদ্যই" বলে।

শ্রীভবতারণ ভট্টাচার্য্য বিদ্যারত্ন।
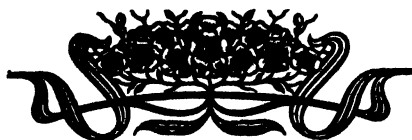
দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (যৌবনে)

দ্বিজেন্দ্রনাথের পত্নী—সর্ব্বময়ী দেবী

৺দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

(পূজনীয় বড়দাদা)

ওহে ভ্রাতঃ! আমার ত ছিলে না একার,
বিশ্বপ্রেমে বাঁধা তুমি দাদা সবাকার ;
যে এসেছে কাছাকাছি,
ছোট বড় নাহি বাছি,
আলিঙ্গিয়া ধরিয়াছ বক্ষের মাঝার।
পশু পক্ষী ভয় হীন,
তব বন্ধু চিরদিন,
চড়ে কোলে, ওঠে শিরে অপূর্ব্ব ব্যাপার।
ওহে দ্বিজোত্তম কবি,
কলি ধন্য তোমা লভি,
প্রণমি তোমারে স্মরি বার, বার, বার॥

স্বভাব সরল জ্ঞানী কি সৌম্য মূরতি ;
বরপুত্র কবিতার কল্পনার রথী।
'স্বপ্ন-প্রয়াণে' তব দেখালে কি অভিনব
অপরূপ ছন্দোময়ী বাণী মূর্ত্তিমতী॥
কুসুম দুলিল ছন্দে! বিহঙ্গ কুজিয়া বন্দে!
তরঙ্গ বিক্ষেপে তালে তাণ্ডব যতি!
মর্ত্ত্যে উঠে জয়কার!
চমৎকার! চমৎকার!!
রবি শশী স্বর্গে করে আনন্দ আরতি!!
তোমার মহিমা গানে, মনপ্রাণ ধন্য মানে,
লহ শোক-পুষ্পাঞ্জলি সাশ্রু প্রণতি॥

শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী

সম্পাদক—শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও ... বসু
কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, 'বসুমতী' বৈদ্যুতিক-রোটারী-মেশিনে ... মুখোপাধ্যায় মুদ্রিত ও প্রকাশিত
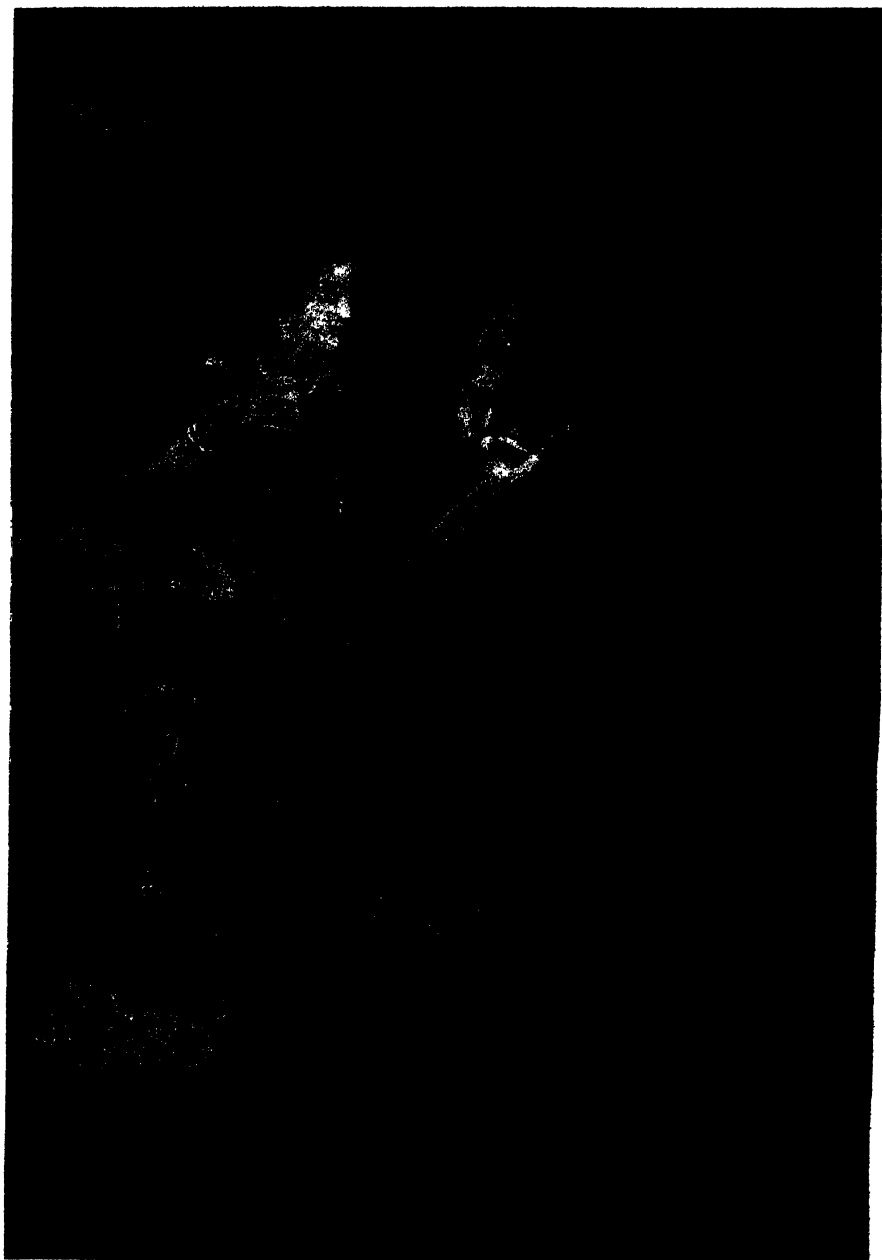
পেয়ালাটুকু ভরিয়ে নে লো, এতই কিসের চিন্তা তোর,
সময়টা সব কাটছে বৃথা ভাবনা কি তাই দিনটা ভোর ?
একটা কাল তো মরণপারে আসছে যে কাল তোমার আজ ;
তাদের কথা ভাববি বসে, এই ক্ষণিকের স্ফূর্তিবাজ।

—ওমর খৈয়াম।

বসুমতী প্রেস]　　[শিল্পী—শ্রীউপেন্দ্রনাথ ঘোষ দস্তিদার।

৪র্থ বর্ষ] ফাল্গুন, ১৩৩২ [৫ম সংখ্যা

রসশাস্ত্র

৪

ভাব কাহাকে বলে ?

ভরত মুনির নাট্যসূত্রে বিভাব, অনুভাব ও সঞ্চারী, এই যে তিনটি শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে,—ইহাদের স্বরূপ কি, তাহা বুঝিবার অগ্রে, কাহাকে স্থায়ী ভাব বলে, তাহা বুঝা আবশ্যক, এই কারণে অগ্রে স্থায়ী ভাবেরই কথা বলা যাইতেছে। মানবের মানসিক বৃত্তিগুলির মধ্যে দুই প্রকার বিভাগ দেখিতে পাওয়া যায়, কতকগুলি বৃত্তি ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সম্বন্ধ হইলেই উৎপন্ন হয়, যেমন চক্ষুর সহিত একটি গোলাপ ফুলের সম্বন্ধ হইবামাত্র আমাদের মন গোলাপের আকার প্রাপ্ত হয়। দার্শনিকগণ বলিয়া থাকেন, আমাদের মন যে বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ হয়, সেই বিষয়ের একটা ছাপ মনে পড়িয়া যায়। যেমন কর্দ্দমে পা পড়িলে তাহার উপর পায়ের ছাপ পড়ে এবং ঐ কর্দ্দম পায়ের আকার প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ তৈজস্ অন্তঃকরণে ইন্দ্রিয় দ্বারা বাহিরের কোন বিষয়ের সম্বন্ধ ঘটিলে মনেও ঐ বিষয়ের ছাপ পড়ে এবং মনও ক্ষণকালের জন্য সেই বিষয়ের আকারকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। মনে এই প্রকার বিষয়ের ছাপকেই আমরা মনের বাহ্যবস্তু-বিষয়ক বৃত্তি বলি। নৈয়ায়িক প্রভৃতি দার্শনিকের মতে ইহারই নাম বাহ্য প্রত্যক্ষ। রূপজ্ঞান, রসজ্ঞান, স্পর্শজ্ঞান, শব্দজ্ঞান ও গন্ধজ্ঞান প্রভৃতি বাহ্যবস্তু-বিষয়ক এই জাতীয় জ্ঞানকেই ত আমরা মানসিক বৃত্তি বলিয়া থাকি। এই প্রকার মানসিক বৃত্তিকে কিন্তু স্থায়ী ভাব বলা যায় না।

আমাদের আর এক শ্রেণীর মনোবৃত্তি আছে, সেগুলি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বাহ্যবিষয়ের সহিত মনের সম্বন্ধকে অপেক্ষা করে না, কিন্তু ইন্দ্রিয়ের দ্বারা মন বাহ্য যে সকল আকার প্রাপ্ত হইয়া থাকে, সেই আকার পাইবার পরে মনের যে অবস্থান্তর বা পরিণতিবিশেষ হইয়া থাকে, তাহাকেও দার্শনিকগণ মনোবৃত্তি কহিয়া থাকেন—সেই সকল মনোবৃত্তির মধ্যেই স্থায়ী ভাবও নিবিষ্ট হইয়া থাকে।

একটি ভাল ফুল ফুটিয়াছে দেখিয়া বা তাহার মনোহর সৌরভ আঘ্রাণ করিয়া সেই ফুলের প্রতি মনের এক প্রকার আসক্তি জন্মে, আবার তাহাকে দেখিবার জন্য বা তাহার সৌরভ আঘ্রাণ করিবার জন্য মনে অভিলাষ হয়, কেমন করিয়া সর্ব্বদা ঐ ফুল পাওয়া যাইতে পারে, তাহার চিন্তা হয়, না পাইলে মনে বিষণ্ণ ভাবের উদয় হয়, পাইবার জন্য ঔৎসুক্য হয়, পাইলে অপূর্ব্ব আনন্দময় চিত্তের প্রবীভাব

হয়, তাহাকে পাইবার পথে যে বিঘ্ন ঘটায়, তাহার প্রতি বিদ্বেষ জন্মে, তাহার বিষয় ভাবিতে পারিলে মন প্রসাদ লাভ করে, ইহা সকলেরই অনুভব-বেদ্য। এই যে ফুলের বা ফুলের গন্ধের প্রতি আসক্তি, অভিলাষ, চিন্তা, বিষাদ, ঔৎসুক্য ও উৎফুল্লতা এবং তাহার প্রাপ্তির প্রতিবন্ধের প্রতি বিদ্বেষ প্রভৃতি মানসিক বৃত্তিনিচয়, এই-গুলিকেই আলঙ্কারিকগণ ভাব বলিয়া থাকেন। এই ভাবসমূহের মধ্যে কতকগুলি অপর ভাবের অধীন। যে ভাবসমূহকে অবলম্বন করিয়া ঐ অধীন বা পরতন্ত্র ভাব-গুলি উৎপন্ন হয় বা অবস্থিতি করে, সেই প্রধান ভাব-গুলির মধ্যে বাছিয়া কয়েকটি ভাবকেই তাঁহারা স্থায়ী ভাব বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। একটি উদাহরণ দেখিলে ইহা স্পষ্ট বেশ বুঝিতে পারা যাইবে।

মহাকবি ভবভূতি-বিরচিত মালতীমাধব নামক নাটকে একটি শ্লোকে এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়,—

"ভূয়োভূয়ঃ সবিধনগরীরথ্যয়া পর্য্যটন্তং
সাক্ষাৎ কামং নবমিব রতির্ম্মালতী মাধবং যৎ।
দৃষ্ট্বা দৃষ্ট্বা ভবনবলভীতুঙ্গবাতায়নস্থা
গাঢ়োৎকণ্ঠালুলিতলুলিতৈরঙ্গকৈস্তাম্যতীতি ॥"

মাধব প্রতিদিন বার বার দেখিবার আশায় মালতীর বাস-গৃহের নিকটে সম্মুখস্থ পথে প্রায়ই পরিভ্রমণ করিয়া বেড়ায়, আর সাক্ষাৎ রতির ন্যায় অনবদ্যসুন্দরী মালতীও সেই গৃহের বারান্দার উপর গবাক্ষের পার্শ্বে বসিয়া ভূতলে অবতীর্ণ নূতন কামের ন্যায় সেই সুন্দরমূর্ত্তি মাধবকে বার বার দেখিয়া দেখিয়া—দিনের পর দিন চলিয়া যাইতেছে—আশা ত মিটে না, কেবল দেখিয়া ক্রমেই বিরহ-তাপে কৃশ হইয়া পড়িতেছে, তাহার কোমল কমনীয় ছোট ছোট হস্ত, পদ প্রভৃতি অঙ্গগুলি অন্তঃপ্রদীপ্ত গাঢ় উৎকণ্ঠারূপ অনলের অসহ্য তাপে যেন বিবশ হইয়া পড়িতেছে—তাহার মনে দারুণ সন্তাপ ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছে।

ইহাই হইল এই শ্লোকটির সংক্ষিপ্ত তাৎপর্য্য। এই শ্লোকে দেখা যাইতেছে, পিতৃ-গৃহ হইতে অধ্যয়ন করিবার জন্য পদ্মপুরে আসিয়া ব্রাহ্মণের পুত্র যুবক মাধব অধ্যয়ন ব্যাপারে এক প্রকার জলাঞ্জলি দিয়া বসিয়াছে। কোন এক দিন, কে জানে শুভ কি অশুভ কোন মুহূর্ত্তে, পথে বেড়াইবার সময় সে পথের ধারে এক প্রকাণ্ড ভবনের উপর-তলার বারান্দায় একটি সর্ব্বাবয়বানবদ্যা কিশোরীকে দেখিতে পাইয়াছিল। এই যে দেখা—ইহা তাহার পাঠাভ্যাস-নিরত স্থির জীবন-সমুদ্রকে তল হইতে উপরি-ভাগ পর্য্যন্ত এক ক্ষণের মধ্যে আলোড়িত ও বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিল, সে আলোড়নের—সে বিপর্য্যস্ততার পরিচয় তাহার নিজ মুখেই কেমন সুন্দরভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে,—

"জগতি জয়িনস্তে তে ভাবা নবেন্দুকলাদয়ঃ
প্রকৃতিমধুরাঃ সন্ত্যেবান্যে মনো মদয়ন্তি যে।
মম তু যদিয়ং যাতা লোকে বিলোচনচন্দ্রিকা
নয়নবিষয়ং জন্মন্যেকঃ স এব মহোৎসবঃ ॥"

ইহার তাৎপর্য্য :—যাহা দেখিলে মানুষের মন আনন্দ-মগ্ন হইয়া থাকে—সেই নবোদিত চন্দ্রকলা প্রভৃতি স্বভাব-মনোহর বস্তুনিচয় এ সংসারে বিজয়ী হইয়া চিরদিনই অব-স্থিতি করিতেছে,—ইহা সত্য হইতে পারে, কিন্তু এই জন-নয়নসমূহের অপূর্ব্ব চন্দ্রিকা কিশোরী আজ যে আমার নয়ন-পথের পথিক হইয়াছে, আমার মনে হইতেছে, আমার এই জন্মে ইহাই একমাত্র মহোৎসব, এমন মহোৎসব এ জীবনে আর কখনও ঘটে নাই—আর ঘটিবে কি না, তাহা কে বলিতে পারে?

এই দর্শনের পর একটা ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের প্রবল তৃষ্ণা তাহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল, গুরুগৃহে পাঠের কথা সে বিস্মৃত হইল, সেই সুন্দর মুখখানি আর একবার জীবনে কেমন করিয়া প্রাণ ভরিয়া দেখিবে, এই চিন্তায় ব্যাকুল হইয়া সে সেই পথে বার বার সেই গবাক্ষের দিকে নির্নিমেষ নয়নে চাহিয়া চাহিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। অনিন্দ্য-সুন্দর মন্মথপ্রতিম যুবার এই বার বার ভবন-সম্মুখে অকারণ পরিভ্রমণ ও নীলেন্দীবর সদৃশ বিশাল অনুসন্ধিৎসু নয়নযুগলের তাহারই শয়ন-গৃহের গবাক্ষের দিকে নির্নিমেষ দৃষ্টিপাত মালতীর পক্ষে সঙ্কোচের কারণ হইলেও একেবারে যে উপেক্ষণীয় হইয়াছিল, তাহা নহে, তাই সে-ও অবসর পাইলেই সেই গবাক্ষের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইত; দাঁড়াইত দেখা দিবার জন্য নহে, কিন্তু দেখা পাইবার জন্য। এমনই করিয়া দেখিয়া দেখিয়া মালতী শরতের প্রখর রবি-কিরণে মালতীকুসুমের ন্যায় ক্রমে শুষ্ক ও বিবর্ণ হইতে লাগিল।

পূর্ব্বরাগের এই প্রথমাবস্থার ছবি আঁকিতে যাইয়া মহাকবি ভবভূতি সেই কিশোরী ও নবযুবকের যে কয়টি মনের অবস্থা ব্যক্তভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে ঔৎসুক্য, চিন্তা, বিষাদ ও আবেগ, এ কয়টি ভাবই এই উদাহরণে আমাদের সমালোচ্য। কারণ, এই কয়টিকেই আলঙ্কারিকগণ সঞ্চারী ভাব কহিয়া থাকেন। এই কয়টি সঞ্চারী ভাব কিন্তু স্বতন্ত্র বা স্বাধীনস্থিতি নহে। মালতী-হৃদয়ে মাধবের প্রতি অনুরাগ এবং মাধব-হৃদয়ে মালতীর প্রতি অনুরাগ বা ভালবাসা যদি না থাকিত, তাহা হইলে এই ঔৎসুক্য প্রভৃতি সঞ্চারী ভাবগুলি উদিত হইত না এবং উদিত হইলেও তাহা রসের পরিপোষক হইতে পারিত না। এই সকল সঞ্চারী ভাব উদিত হইয়া সেই অনুরাগ বা ভালবাসাকেই পুষ্ট বা সমুজ্জ্বল করিয়া তুলিতেছে এবং সেই অনুরাগের সুধারসে রঞ্জিত হইয়াছে বলিয়া তাহারাও সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। এইরূপে সকল সঞ্চারী ভাবই রসানুকূল আস্বাদের কারণ হইয়া থাকে, কখনও ব্যক্তরূপে, কখনও বা অব্যক্তরূপে যে ভাবটি মানবের হৃদয়-রাজ্য সর্ব্বতোভাবে অধিকার করিয়া বসিয়া থাকে এবং সঞ্চারী ভাব প্রভৃতির সাহায্যে যাহা আস্বাদপ্রকর্ষ পাইয়া থাকে, সেই প্রধান ভাবকেই আলঙ্কারিকগণ স্থায়ী ভাব বলিয়া থাকেন; তাই এই স্থায়ী ভাবের লক্ষণ নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া আলঙ্কারিক আচার্য্য বলিয়াছেন,—

"অবিরুদ্ধা বিরুদ্ধা বা যং তিরোধাতুমক্ষমাঃ।
আস্বাদাঙ্কুরকন্দোঽসৌ ভাবঃ স্থায়ীতি সংজ্ঞিতঃ॥"

বিরুদ্ধ বা অবিরুদ্ধ মানসিক বৃত্তিনিচয় যাহাকে তিরোহিত করিতে পারে না, রসের আস্বাদরূপ অঙ্কুরসমূহের পক্ষে যাহা মূলস্বরূপ, তাহাকেই স্থায়ী ভাব বলা যায়।

বিরুদ্ধ বা অবিরুদ্ধ ভাব যাহাকে তিরোহিত করিতে পারে না, এই বিষয়টি বুঝিতে হইলে কাহাকে বিরুদ্ধ বা কাহাকে অবিরুদ্ধ ভাব কহে, অগ্রে তাহাই বুঝিতে হইবে। স্থায়ী ভাবনিচয়ের মধ্যে রতি বা অনুরাগ—যাহার নাম ভালবাসা—সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান। কারণ, শোক প্রভৃতি স্থায়ী ভাব হইতে যে রস উৎপন্ন হয়, তাহা অনুরাগ হইতে উৎপন্ন রস অর্থাৎ আদিরস হইতে অপকৃষ্ট। আদিরস যেরূপ পরিপূর্ণ ও সমুজ্জ্বলভাবে সামাজিকগণের আস্বাদ্য হয়, অন্যান্য রস সেরূপ হয় না। এই কারণে কোন কোন আলঙ্কারিক আচার্য্য এমনও বলিয়া থাকেন যে, আদিরসই প্রকৃত রস, অন্য রস-গুলি নামেই রস, প্রকৃতভাবে তাহারা পূর্ণরসলক্ষণসম্পন্ন হইতেই পারে না। কেন যে তাঁহারা এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহা রসস্বরূপের নির্ণয় প্রসঙ্গে ভাল করিয়া অনুশীলন করা যাইবে।

সেই আদিরসের স্থায়ী ভাব যে রতি, তাহার সহিত কিন্তু কতকগুলি মানসিক বৃত্তির বিরোধ দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন ঔদাসীন্য, আলস্য ও ঘৃণা বা জুগুপ্সা। অনুরাগ যে হৃদয়ে যাহার প্রতি উৎপন্ন হয় বা বহুকাল ব্যাপিয়া থাকে, সে হৃদয়ে সেই অনুরাগের পাত্রের প্রতি ঔদাসীন্য কখনও আসিতে পারে না। তাহাকে দেখিবার জন্য, পাইবার জন্য বা তাহার সেবা করিয়া ধন্য হইবার জন্য সে সর্ব্বদাই উৎসাহবান্ থাকে। তাহাকে দেখিবার, পাইবার বা সেবা করিবার সুযোগ ঘটিলে সে কখনও আলস্য বা উপেক্ষা করিতে পারে না। সে তাহার সেই ভালবাসার পাত্রকে কিছুতেই ঘৃণা করিতে পারে না। সুতরাং অনুরাগের বা ভালবাসার বিরুদ্ধভাব হইতেছে—ঔদাসীন্য, আলস্য বা ঘৃণা প্রভৃতি মানসিক বৃত্তি বা ভাব-নিচয়। কিন্তু সেই অনুরাগ যদি উৎকট অভিমানের বা ক্রোধের দ্বারা কিয়ৎকালের জন্য আবৃত হয়, তাহা হইলে সেই অভিমানের বা ক্রোধের প্রাবল্যের দশায় মানব-হৃদয়ে কখনও কখনও ঔদাস্য বা আলস্য বা ঘৃণা উৎপন্ন হওয়া অস-ম্ভব নহে; কিন্তু এই ক্ষণিক আলস্য, ঔদাসীন্য বা ঘৃণা উৎপন্ন হইয়াও সেই অনুরাগকে একেবারে তিরোহিত করিতে পারে না। প্রত্যুত পরক্ষণেই সেই অনুরাগকে আরও প্রদীপ্ত করিয়া তুলে। একটি উদাহরণ দেখিলেই ইহা বেশ স্পষ্ট বুঝা যাইবে।

"জ্বলতু গগনে রাত্রৌ রাত্রাবখণ্ডকলঃ শশী
দহতু মদনঃ কিংবা মৃত্যোঃ পরেণ বিধাস্যতি।
মম তু দয়িতঃ শ্লাঘ্যস্তাতো জনন্যমলান্বয়া
কুলমমলিনং ন ত্বেবায়ং জনো ন চ জীবিতম্॥"

কুলে জলাঞ্জলি দিয়া গৃহ হইতে বাহির হইলেই ত অনায়াসে মাধবের সহিত মিলিত হওয়া যাইতে পারে, এই চিন্তা ক্ষণকালের জন্য মনে উদিত হইবার পরই মালতী সখীকে ইহা বলিয়াছিল। ইহার তাৎপর্য্য এই,—

সখি! প্রতি রাত্রিতে পরিপূর্ণ-বিম্ব সুধাকর আজিকার রাত্রির ন্যায় প্রদীপ্ত বহ্নিপিণ্ডের আকারে আকাশে জ্বলুক, তাহাতে ক্ষতি কি? কাম এ হৃদয় পুড়াইতেছে, পুড়াক, তাহাতেই বা কি ক্ষতি? মরণের অধিক সে আর কি করিতে পারে? আমি পিতাকে বড়ই ভালবাসি, শুধু তাহাই নহে,তাঁহার ন্যায় পিতাকে সৌভাগ্য বশতঃ পাইয়াছি বলিয়া শ্লাঘা অনুভব করিয়া থাকি। সেইরূপ নির্ম্মল-কুল-প্রসূতা আমার জননী ও আমাদের নিষ্কলঙ্ক কুল আমার বড়ই প্রিয় ও শ্লাঘার বিষয়, কেবল সেই মানুষটি বা আমার এই জীবনই যে আমার একমাত্র প্রিয়, তাহা ত নহে।

মালতী-মাধব নামক সংস্কৃত দৃশ্যকাব্যে এই উদ্ধৃত শ্লোকটিতে মালতীর আভিজাত্যাভিমান প্রবল হইয়া মাধবের প্রতি তাহার যে অনুরাগ, তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়াছে, ইহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে এবং সেই কারণে মালতীর হৃদয়ে যে ক্ষণিক ঔদাসীন্যেরও উদয় হইয়াছে, সেই ঔদাসীন্য অনুরাগের বিরুদ্ধ ভাব হইলেও তাহা তাহার মাধবের প্রতি অনুরাগরূপ স্থায়ী ভাবকে একবারে তিরোহিত করিতে সমর্থ হয় নাই। কারণ, ঐ শ্লোকটির চতুর্থ চরণে সেই জনই যে "কেবল আমার প্রিয়, তাহা নহে" এই প্রকার মালতীর উক্তি দ্বারা তাহার মাধবের প্রতি অনুরাগ যে তখনও রহিয়াছে, তাহা বেশ বুঝা যাইতেছে। এই ভাবে বিরুদ্ধভাবের সমাবেশেও যে অনুরাগ নষ্ট হয় না, প্রত্যুত উৎকর্ষলাভই করিয়া থাকে, ইহাই অতি সুন্দরভাবে মহাকবি এই শ্লোকে ব্যক্ত করিয়াছেন। অবিরুদ্ধভাবের সমাবেশে এইরূপ অনুরাগের অভিব্যক্তি আরও সুন্দর হইয়া থাকে, যথা—

"মুগ্ধে মুগ্ধতয়ৈব নেতুমখিলঃ কালঃ কিমারভ্যতে
মানং ধৎস্ব, ধৃতিং বধান, ঋজুতাং দূরে কুরু প্রেয়সি।
সখ্যৈবং প্রতিবোধিতা প্রতিবচস্তামাহ ভীতাননা
নীচৈঃ শংস হৃদি স্থিতো হি নমু মে প্রাণেশ্বরঃ শ্রোষ্যতি॥"

নিতান্ত সরলপ্রকৃতি কোন কুলবধূ বার বার পতির অনুচিত ব্যবহারে মনে ব্যথা পাইলেও মানপরায়ণা হয় না, বা পরুষবাক্যপ্রয়োগাদি দ্বারা পতিকে শুধরাইবারও চেষ্টা করে না, ইহা দেখিয়া তাহার প্রিয়সখী তাহাকে এরূপ অবস্থায় তাহার পক্ষে কি করা উচিত,তাহাই উপদেশ দিতেছে, এবং সেই উপদেশ শুনিয়া সেই মুগ্ধা কুলবধূ কি বলিতেছে, তাহাই এই শ্লোকটিতে বলা হইতেছে। ইহার তাৎপর্য্য এই,—

"অয়ি সরলে! এমন করিয়া সরলতাময় ব্যবহারে এই দুর্লভ যৌবনরূপ কালটা নষ্ট করিতে বসিয়াছ কেন? মধ্যে মধ্যে একটু আধটু মান করিবে, হৃদয়ে ধৈর্য্য ধরিবে, প্রিয়তমের প্রতি এত সরলতা ভাল নহে, তাই বলি,অন্ততঃ কিছুকালের জন্যও ইহা দূর কর",—সখী যখন তাহাকে এইরূপে বুঝাইতে লাগিল, তখন তাহার সত্য সত্যই মুখে ভয়ের চিহ্ন প্রকটিত হইল,সে তখন সখীকে সভয়ে জানাইল, সখি! অত উচ্চ স্বরে এরূপ কথা আর বলিও না, হৃদয়ে ত প্রাণেশ্বর রহিয়াছেন। তুমি যেরূপ উচ্চ স্বরে ঐ কথাগুলি বলিতেছ, হয় ত তিনি তাহা শুনিতে পাইবেন।

এই শ্লোকটিতে মুগ্ধার প্রিয়তমের প্রতি গাঢ় অনুরাগ বড়ই সুন্দরভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাহার বিশ্বাস, তাহার হৃদয় জুড়িয়া তাহার প্রাণেশ্বর সর্ব্বদাই বিরাজ করিতেছেন, সুতরাং তাঁহার অপ্রিয় বাক্য এত উচ্চ স্বরে সখী যখন বলিতেছে,তখন নিশ্চয়ই তিনি তাহা শুনিতে পাইবেন, এবং শুনিয়া হয় ত ব্যথিত বা ক্রুদ্ধ হইবেন। তাই নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া সে সখীকে অমন করিয়া সেই প্রিয়তমের অপ্রিয় কথা কহিতে সনির্ব্বন্ধ নিষেধ করিতেছে। ইহা সখীর উপর টেক্কা দিয়া, তাহার মুখ বন্ধ করিয়া কোন প্রগল্‌ভার নর্ম্ম-পরিহাস নহে, ইহা সত্য সত্যই পতিগতপ্রাণা মুগ্ধ ললনার অনিষ্টসম্ভাবনায় ব্যাকুলিত প্রাণের মর্ম্মকথা। কারণ, তাহা যদি না হইত, তবে এই কথা বলিবার সময় মুখের উপর সেই আন্তরিক ভীতিজনিত এমন বিবর্ণভাব আসিল কোথা হইতে? এই শ্লোকে অনুরাগের অনুকূলভাব ভীতি সম্যক্‌-প্রকারে প্রকটিত হইয়া নিজের প্রাধান্য ফুটাইয়া দিতেছে বটে,কিন্তু তাই বলিয়া সেই সরলস্বভাবা কিশোরীর পতিগত গাঢ় প্রেম যে তিরোহিত হইয়াছে, তাহা নহে, প্রত্যুত ঐ ভীতিরূপ সঞ্চারী ভাব তাহার স্থায়ী ভাব প্রেমকে সামাজিক-গণের মানস-পটে আরও অধিক উজ্জ্বলভাবে অঙ্কিত করিয়া দিতেছে। তাই আলঙ্কারিক আচার্য্য ঠিকই বলিয়াছেন যে, বিরুদ্ধ বা অবিরুদ্ধ ভাব যাহাকে তিরোহিত করিতে পারে না, রসাস্বাদরূপ অঙ্কুরের মূলস্থানীয় সেই ভাবকেই স্থায়ী ভাব বলা যায়। এই স্থায়ী ভাব বা রসাস্বাদের মূলস্বরূপ

প্রধান মানসিক বৃত্তিনিচয় অলঙ্কারশাস্ত্রে আট ভাগে বিভক্ত হইয়াছে, যথা—

"রতির্হাসশ্চ শোকশ্চ ক্রোধোৎসাহৌ ভয়ং তথা।
জুগুপ্সা বিস্ময়শ্চাষ্টৌ স্থায়িভাবাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥"

অর্থাৎ—রতি, হাস,শোক,ক্রোধ,উৎসাহ,ভয়, জুগুপ্সা ও বিস্ময় এই আটটি প্রধান মনোবৃত্তিকে স্থায়ী ভাব বলা যায়।

রসের স্বরূপ-নির্ণয় করিবার সময়ে এই আট প্রকার স্থায়ী ভাবের বিশেষ আলোচনা করিলেও চলিবে, আপাততঃ আলম্বন, উদ্দীপন ও সঞ্চারী ভাবের স্বরূপ কি, তাহাই বলা হইবে।

[ক্রমশঃ।

শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ।

বৃন্দাবনে

মনে নাহি পড়ে কবে কোথা হ'তে
এসেছিনু মোরা নামি,
নয়ন মেলিয়া দেখিনু প্রথম
শুধু তুমি আর আমি।
সুমুখে যমুনা ধারা কলকল
উছলে দু'কূল ভরি,
কূল-বটমূলে বাঁশরী ব্যাকুল
গাহে রাধানাম স্মরি।
যশোদার স্নেহ সুবলের প্রীতি
গোপিকার প্রেমরাশি,
স্ফুট কদম্ব- ভরা মালঞ্চে
আলো আর গান হাসি।
রাস-অভিসার বিরহ-মিলন-
ভরা প্রেম-অঞ্জন,
নয়ন শ্রবণ পরিতর্পণ
মধুর বৃন্দাবন!
আরো কাছে এস, আরো কাছে বঁধু,
ওই শুন বাঁশী বাজে,
আখরে তাহার কত সুধাধারা,
ভুলায় সকল কাযে।
সেই এক কথা আদিকাল হ'তে,
কেঁদে গাহে উভরায়,—
যমুনার তটে বেলা প'ড়ে এল,
আয় আয় ত্বরা আয়!
শুক-সারী গেছে ফিরিয়া কুলায়
ধবলী গোষ্ঠে ছুটে,
মাঠের রাখাল ফিরেছে কখন,
জননীর বাহু-পুটে!
পূর্ণিমা-চাঁদ মল্লিকা-ভাতি,
উজ্জ্বল নিশীথিনী,
যমুনার তটে আয় ফেলে আয়,
দিবসের বিকিকিনি।

আয় ব্রজবাসি! আয় আয় আয়!
—ওই উঠে আলাপন;
জীবন মধুর প্রণয় মধুর,
মধুর বৃন্দাবন!
আরো কাছে এস বাহু-বন্ধনে
অধরে অধর চুমি;
তুমি আজ বঁধু আমি হয়ে গেছ,
আমি আজ বঁধু তুমি।
রসের সাগরে একটি বোঁটায়
আমরা কমল দুটি,
যুগ যুগ ধরি কত কাল গত—
এমনি উঠেছি ফুটি।
চিন্তামণির মণির আলোকে
হেরেছি দোঁহার মুখ,
দোঁহার মাঝারে করি অনুভব
দু'কূলের যত সুখ।
কল্প-কালের কল-কল্লোলে
আমরা শুনেছি গান,
ডুবিয়া মরিয়া অমর হয়েছি
হারায়ে পেয়েছি প্রাণ।
রাজার প্রাসাদ আমরা গড়েছি
আকাশে গাড়িয়া ভিত,
রবির কিরণে কুমুদ ফুটায়ে
করি রীত বিপরীত।
"মাটীর যখন ছিল না জনম
তখন করেছি চাষ,
দিবস রজনী ছিল না যখন
তখন গণেছি মাস!"
তুমি আর আমি আমি আর তুমি,—
মধুভরা ত্রিভুবন;
জনমে জনমে তুমি বঁধু মোর
ভুবন বৃন্দাবন!

শ্রীঅরীন্দ্রজিৎ মুখোপাধ্যায়।

কলিকাতা ও সহরতলী—৫৪ বৎসর পূর্ব্বে

২

চেতলা, কালীঘাট, ভবানীপুর প্রভৃতি অঞ্চল তখন একেবারে পল্লীগ্রাম ছিল। আমার মনে আছে, ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে গ্রীষ্মাবকাশের সময় আমি বাড়ী না যাইয়া চেতলায় এক আত্মীয়ালয়ে সপ্তাহখানেক অবস্থান করিয়াছিলাম। তখন মনে হইয়াছিল, যেন খাঁটি পল্লীগ্রামে রহিয়াছি। ইদানীং দুই এক বার চেতলা যাইতে হইয়াছে। তখন মনে হইয়াছে, এ কোথায় আসিলাম? কালীঘাটে ও ভবানীপুরের দক্ষিণ অঞ্চলের সব বাড়ীর চারিদিকে বড় বড় ডোবা ছিল—সকল প্রকার আবর্জ্জনায় ঐ সকল ডোবা পূর্ণ থাকিত। সহরের নিকটস্থ পল্লীগ্রামের মত দুর্দ্দশাপন্ন স্থান আর নাই। কেন না, সহরের সমস্ত আবর্জ্জনা ও অসুবিধার ভার ইহাদের স্কন্ধেই পতিত হয়। দেখিতে দেখিতে এই চেতলা, কালীঘাট ও আলিপুর কি আশ্চর্য্যরূপ বিস্তার লাভ করিয়াছে! জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট, উকীল, ব্যারিষ্টার, রাজা, মহারাজা, এইরূপ বহু সম্ভ্রান্ত অবস্থাপন্ন লোক অধুনা এই সমস্ত অঞ্চলে বাস করিতেছেন। খিদিরপুর আর বালীগঞ্জও আমাদেরই আমলে কিরূপ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে ও কত বড় আকার ধারণ করিয়াছে, তাহা প্রাচীনরা অনেকেই দেখিয়াছেন। ইহার অধিকাংশ বাড়ীই মাড়োয়ারী ও ইংরাজের হাতে। হরিশ মুখার্জ্জি ষ্ট্রীট ও রসা রোডের অনেক বাড়ী—সুখের বিষয়, এখনও বাঙ্গালীর হাতে আছে।

১৮৭০ খৃষ্টাব্দের সঙ্গে তুলনা করিতে গেলে একটা ভাবিবার বিষয় এই যে,তখন পল্লীগ্রামের জমীদার পল্লীগ্রামে থাকিয়া সন্তুষ্ট থাকিতেন,দেশের টাকা দেশে থাকিত। কিন্তু ক্রমে ক্রমে সহরে থাকা একটা রোগ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এখন বড় বড় জমীদার পল্লীগ্রাম ছাড়িয়া কলিকাতা আসিয়া বসবাস করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহারা একরূপ 'দেশছাড়া' বলিলেই হয়। ইহার কুফল অনেক। পল্লীশ্রী অন্তর্হিত হইয়া সহরশ্রীতে পরিণত হইয়াছে। আমি সমস্ত বাঙ্গালায় বোধ হয় গত আড়াই বৎসরে অন্ততঃ ৩০ হাজার মাইল ঘুরিয়াছি, তন্ন তন্ন করিয়া পল্লীগ্রামগুলি দেখিবার সুযোগ পাইয়াছি। দেখিয়াছি, বীরভূম ও বাঁকুড়া জিলা দুর্ভিক্ষের পীঠস্থান হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বাঁকুড়ায় প্রতি তিন বৎসর অন্তর দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুরে পূর্ব্বে এক রাজা ছিলেন। মারহাট্টাদের আক্রমণে আলীবর্দ্দী খাঁ যখন ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন, তখন বিষ্ণুপুরের রাজা ইহাদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন।

তাহার পর হইতেই বিষ্ণুপুরের রাজাদিগের দুর্দ্দশা আরম্ভ হয়। 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের' পর রাজা যখন লাটের খাজনা সরবরাহ করিতে পারিলেন না, তখন কুল-দেবতা মদনমোহনকে আনিয়া বাগবাজারের গোকুল মিত্রের বাড়ীতে রাখেন—তদবধি তাঁহাদের দুর্দ্দশার সূত্রপাত হয়। সমস্ত সম্পত্তি বর্দ্ধমানের মহারাজা পত্তনী লইলেন। সেই সময় হইতে বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুর শ্রীভ্রষ্ট হইল। বাঁধ-বন্ধীর দিকে আর নজর রহিল না।

এই সমস্ত বাঁধে আবশ্যকমত জল ধরিয়া রাখা হইত। আবার তন্মধ্যস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাঁধ কাটিয়া দিলে উপর হইতে জল নামিয়া আসিত। ঐ জল নানা পয়ঃপ্রণালীর মারফতে কৃষিক্ষেত্রে সরবরাহ করা হইত। ইহাতে প্রচুর ফসল হইত। সেচের এমনই সুব্যবস্থা ছিল। বর্ত্তমানে কৃষি-ক্ষেত্রের উন্নতির দিকে কাহারও দৃষ্টি নাই। বর্দ্ধমানের মহা-রাজা জানেন, পত্তনী তালুক "অষ্টমে গেলে" তিনি টাকা পাইবেন; পত্তনীদার ভাবেন, তিনি নালিশ করিলে নিম্ন দরপত্তনীদারের নিকট টাকা পাইবেন। এইরূপে জমী হস্তান্তরিত হইয়া থাকে। কেহ কাহারও জন্য চিন্তা করেন না। ইহাতেই সর্ব্বনাশ হইয়াছে। এখনও দেখা যায়, যাহাকে 'তালপুকুর' বলিত, বর্দ্ধমান বিভাগের বহু স্থানে

সেইরূপ অনেক তালপুকুর ভরাট হইয়া গিয়াছে; তথায় চাষ-বাস হইতেছে। জল ধরিয়া রাখিবার কোনও বন্দোবস্ত নাই। ময়মনসিংহ ও বরিশাল প্রভৃতি সমস্ত জিলারই জমীদারগণ পল্লী ছাড়িয়া সহর-বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহাদের অনেকে বৎসরে দুই এক মাসের জন্য সহর হইতে পল্লীতে ফিরিয়া যায়েন বটে, কিন্তু বড় বড় জমীদার বারমাসই কলিকাতায় থাকেন। ফল এই হইয়াছে যে, পূর্ব্বে জমীদার ও প্রজার মধ্যে যে মধুর সম্বন্ধ ছিল, তাহা লোপ পাইয়াছে। ইহা হইতে যদি জমীদাররা অত্যাচারী হইয়াও প্রজাদের মধ্যে বাস করিতেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে জমীদারীর মধ্যে বড় বড় দীঘি কাটাইতে হইত, পুরাতন পুষ্করিণীগুলির সংস্কারসাধন করিতে হইত, পথ-ঘাটের দিকে নজর রাখিতে হইত। কবি কালিদাস রঘুবংশের রাজাদিগের সম্পর্কে লিখিয়াছেন—"স পিতা পিতরস্তাসাং কেবলং জন্মহেতবঃ।" বাঙ্গালার জমীদার পূর্ব্বকালে বস্তুতই প্রজাগণের পিতার মত ছিলেন। অত্যাচারী জমীদার যদি প্রজার নিকট হইতে অর্থ শোষণ করিয়াও প্রজাদের মধ্যে সর্ব্বদা বাস করেন, তাহা হইলে সেই স্থানে 'বারো মাসে তের পার্ব্বণ' করিয়া এবং পুষ্করিণী খনন, পথ নির্ম্মাণ, বৃক্ষ রোপণ ইত্যাদি সদনুষ্ঠান করিয়া দেশের টাকা দেশেই ব্যয় করিবার সুযোগ পাইতেন। প্রজারাও সেই টাকার কতকাংশ প্রাপ্ত হইত। কিন্তু অধুনা জমীদাররা কলিকাতায় বা অন্যান্য সহরে বাস করিতে অভ্যস্ত হইয়াছেন। এক জমীদার কলিকাতার চৌরঙ্গী অঞ্চলে বসতবাটী নির্ম্মাণ করিলেন। অন্য জমীদার ভাবিলেন, ঐ জমীদার যদি ঐরূপ গৃহে বাস করেন, মোটরে চড়েন, খানা দেন, তাহা হইলে তিনিই বা করিবেন না কেন? এইরূপে প্রতিযোগিতা আরম্ভ হইয়াছিল, এবং ঐ প্রতিযোগিতা হইতেই সর্ব্বনাশের সূত্রপাত হইয়াছে। আমি নিজে দেখিয়াছি, বর্দ্ধমানের মহারাজার বাড়ীতে একটা "পার্টি" হইলে তথায় রোভার, রোল্‌স রয়েস প্রভৃতি বহুমূল্য মোটরের সমাগম হয়। এইরূপে বিলাসের নানা সাজসজ্জায় জমীদারের বহু অর্থ ব্যয়িত হয়। ইহার ফলে লক্ষ লক্ষ টাকা এ দেশ হইতে বিদেশে প্রেরিত হয়। রাজসাহী, বগুড়া অঞ্চলে দেখিয়াছি, পূর্ব্বতন পল্লীবাসী জমীদাররা তথায় শত শত বাঁধ, দীঘি ও পুষ্করিণী খনন করিয়া গিয়াছেন, সে জন্য তথায় জলকষ্ট কোন কালে অনুভূত হইত না। এখন দেখিতে পাই, দুই তিন শত বৎসর পূর্ব্বে প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী ভবানী যে সকল দীঘি ও পুষ্করিণী খনন করাইয়াছিলেন, সেগুলি সংস্কারাভাবে হাজিয়া মজিয়া গিয়াছে; যদি বা কোথাও কিছু জল থাকে, তাহাও বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে একেবারে কর্দ্দমাক্ত হইয়া যায়। সেই জলে বস্ত্র ধৌত করা ও তৈজসপত্র পরিষ্কার করা হয়, আবার সঙ্গে সঙ্গে সেই জল পানীয়রূপেও ব্যবহৃত হয়। ফলে ম্যালেরিয়া, কলেরা প্রভৃতি ভয়ঙ্কর ব্যাধির প্রাদুর্ভাবে দেশ একেবারে ধ্বংসের পথে যাইতে বসিয়াছে। গত ২৫ বৎসরের মধ্যেই এই সকল রোগের প্রকোপ অধিক হইয়াছে। আমাদের দুর্ভাগ্য যে, অধুনা পল্লীগ্রামে বাস করা অসভ্যতার পরিচায়ক। কলিকাতায় আসিয়া তথাকথিত সভ্যসমাজে বাস করাই এখন সকলের লক্ষ্য হইয়াছে।

হরিশ মুখার্জ্জি রোডে অথবা রসা রোডে এখন অনেক সঙ্গতিপন্ন লোকের বসতি হইয়াছে। এই বাঙ্গালী বাসিন্দার মধ্যে ইংরাজ, ভাটীয়া, মাড়োয়ারীও আসিয়া বসবাস করিয়াছে। কিন্তু বাঙ্গালীর সহিত ইহাদের কিছু পার্থক্য আছে। বাঙ্গালী ব্যতীত অন্যান্য সম্প্রদায়ের বাসিন্দারা ব্যবসাদার; প্রতিনিয়ত অর্থ উপার্জ্জন করিতেছে। আর বাঙ্গালীদের মধ্যে যাঁহারা আছেন, তাঁহাদের মধ্যে উকীল, ব্যারিষ্টার ও দুই চারি জন জজ ছাড়া আর কিছুই নাই। যে সমস্ত জমীদার মামলা-মোকদ্দমা করিয়া উৎসন্ন যাইতেছেন, তাঁহাদের অর্থ এই সমস্ত উকীল-ব্যারিষ্টারদের পকেট পূর্ণ করিতেছে। ইহাতে দেশে নূতন ধনাগম হইতেছে না; মাত্র দেশের এক স্থানের অর্থ অন্য স্থানে শোষিত হইতেছে।

আর এক কথা, অধুনা রেল ও ষ্টীমারে যাতায়াতের সুবিধা হইয়াছে বটে, কিন্তু ইহাদের মারফতে পল্লীগ্রাম হইতে সহরে তরিকরকারী, দুগ্ধ, মৎস্য প্রভৃতি নিত্য বাহিত হইতেছে বলিয়া পল্লীগ্রামে ঐ সমস্ত দ্রব্য দুর্ম্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে। অনেকে হয় ত অবগত নহেন যে, খুলনায় দুগ্ধের মূল্য আট আনা সের। পূর্ব্ব হইতেই ব্যাপারীরা পল্লী-মফঃস্বলে ঘুরিয়া দাদন দিয়া রাখে বলিয়া এই অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে। এমন কি, আবশ্যক হইলে উচ্চ মূল্যেও উপযুক্ত পরিমাণ দুগ্ধ, দধি, ঘৃত, মৎস্য অথবা

তরিতরকারী এখন আর পল্লীগ্রামে পাওয়া যায় না। এই শোষণক্রিয়াই পল্লীগ্রামের সর্ব্বনাশের মূল। রেল ও ষ্টীমারের কল্যাণেই পল্লীগ্রামের এই দুরবস্থা হইয়াছে। আমাদের রুচির পরিবর্ত্তন যে ইহার মূলে নিহিত, তাহাতে সন্দেহ নাই।

সে দিন দেখিলাম, বাঙ্গালা দেশে ৩ শত ৮০ কোটি টাকার মাল আমদানী-রপ্তানী হইয়াছে। কথাটা শুনিলে মনে হয়, বুঝি বা সপ্তাহে সপ্তাহে মাসে মাসে কলিকাতার ধন বাড়িয়া চলিতেছে। কলিকাতায় অবশ্য প্রভূত ধনের আদান-প্রদান হয়। কিন্তু আমাদের বাঙ্গালীর সহিত ইহার সম্পর্ক কি? এই টাকার শতকরা পাঁচ টাকাও বাঙ্গালীর কি না সন্দেহ। বাঙ্গালী কেরাণী, স্কুল-মাষ্টার, উকীল এবং দুই চারি জন মুন্সেফ-জজের সংখ্যা অঙ্গুলীর পর্ব্বে গণনা করা যায়। ইঁহারা ত অর্থের সৃষ্টি করেন না। আমি আজ ২৫ বৎসর যাবৎ দেশের তরুণদের নিকট বাঙ্গালীর মস্তিষ্ক ও তাহার অপব্যবহারের কথা বলিয়া আসিতেছি——দেশে রাসবিহারী ঘোষ কিংবা এস্, পি, সিংহ ২।৪ জনের অধিক নাই। এক এক মাড়োয়ারী অথবা ভাটীয়া বণিক এক দিনে যাহা রোজগার করে, বাঙ্গালী তাহা সংবৎসরেও করিতে পারে না। আমার এক ভ্রাতুষ্পুত্র ব্যবহারাজীব, তাহার নিকট শুনিয়াছি, আলিপুরে ৭ শত ৫০ জন এবং খুলনায় এক শত জন উকীল আছেন। তাহার উপর প্রতি বৎসর ১০।১৫ জন ওকালতীতে যোগদান করিতেছেন। বৎসর দুই পূর্ব্বে আমি বরিশালে গিয়া কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির নিকট শুনিয়াছি,তথায় এমন ২।৪ জন উকীল আছেন—যাঁহারা মাসিক ৫।৭ শত টাকা উপার্জ্জন করেন। অবশিষ্ট উকীলরা গড়পড়তায় মাসিক ১৫ টাকা পান কি না সন্দেহ। কেন না, যাঁহারা ঘরের পয়সা আনিয়া বাসাখরচ চালাইয়া থাকেন, তাঁহাদিগকেও ঐ সঙ্গে ধরিতে হয়। অথচ প্রতি বৎসর ২ হাজার ছাত্র আইন শিক্ষা করিতেছে! ইহা কি অর্থনৈতিক আত্মহত্যা নহে?

আরমেনিয়ান ষ্ট্রীটে ও এজ্‌রা ষ্ট্রীটে ইহুদী ও আরমানী জাতীয় বড় বড় বণিক আছেন। তাহার পর ইংরাজদের মহল্লা। তাহার পর ভাটীয়া, মাড়োয়ারী, দিল্লীওয়ালা ও পার্শী। এ সমস্ত ধনী বণিককে বাদ দিলে বাঙ্গালার ধন কোথায় থাকে? বাঙ্গালায় ৮১টি জুটমিল আছে,তন্মধ্যে মাত্র ২টি মাড়োয়ারীর। গত ৪।৫ বৎসরের মধ্যে বিরলা ব্রাদার্স ও হুকুমচাঁদ স্বরূপচাঁদ কোম্পানীর উদ্যোগে এই দুইটি মিল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অবশিষ্ট সমস্ত মিলই ইংরাজের। অবশ্য মিলে বাঙ্গালীর কিছু সেয়ার আছে। ইংরাজরাই মিলের ম্যানেজিং এজেণ্ট, তাহাদের মুষ্টির মধ্যেই সমস্ত ধন ন্যস্ত। আপনারা জানেন, সার ডেনিয়াল হেমিলটন, মেকিনন্ মেকেঞ্জির প্রধান অংশীদার। তিনি এক দিন কলিকাতা ইন্‌ষ্টিটিউট হলে বলিয়াছিলেন, "আমার বলিতে লজ্জা করে যে, আমার অনেক জুটমিলের সেয়ার আছে।" কিন্তু এই যে জুটমিলে লাভ হইতেছে, এই লাভ কাহারা ভোগ করিতেছে? যাহারা ম্যালেরিয়ায় কাঁপিতে কাঁপিতে ৮।১০ ঘণ্টা কোমর-জলে থাকিয়া পাট কাচে, তাহারা কি পায়? রেলি ব্রাদার্স, বার্কমায়ার ব্রাদার্স, ডেভিড কোম্পানী প্রভৃতি লাভের সমস্তটাই পায়। আমরা কিছু কিছু দালালী পাই বটে। অবশ্য কোন কোন সওদাগরী আফিসে বাঙ্গালী বড় বাবুর পদে অধিষ্ঠিত আছেন। ইংরাজ বণিকগণ কলিকাতার ব্যবসা-বাণিজ্যক্ষেত্রে অদ্ভুত প্রসার লাভ করিয়াছে। আমি ত খদ্দর খদ্দর করিয়া পাগল। গত বৎসরের যে তালিকা বাহির হইয়াছে, তাহাতে দেখি, ২৫ হইতে ৩৫ কোটি টাকার বিলাতী কাপড় এ দেশে আমদানী হইয়াছে। মহাত্মা গন্ধীর ও আমাদের চীৎকারের পুরস্কার যথেষ্ট পাইয়াছি। ব্যবসাক্ষেত্রে জাপান প্রতিদ্বন্দ্বী হওয়ায় বোম্বায়ের সর্ব্বনাশ হইয়াছে। আমরা সর্ব্বত্র বাঙ্গালার বৈশিষ্ট্যের কথা বলিয়া বেড়াই। কিন্তু বাঙ্গালীর মত অনুকরণপ্রিয় জাতি পৃথিবীতে আছে কি না সন্দেহ। বাঙ্গালী যুবক যেমন ব্যারিষ্টার হইল, অমনই হ্যাট্, কোট, কলার কি রকম করিয়া পরিতে হয়,কি রকমে টাই বাঁধিতে হয়, গলায় কলার আঁটিতে গিয়া কিরূপে খক্ খক্ করিয়া কাসিতে হয়, কিরূপভাবে কাঁটা-চামচ ধরিতে হয়—আর বেশী বলিব না।

কলিকাতা এক হিসাবে নরক হইতে এখন স্বর্গ হইয়াছে। চৌরঙ্গীতে প্রাসাদতুল্য ভবনশ্রেণী, সহরের সর্ব্বত্র বৈদ্যুতিক আলো, পাখা, ট্রাম, মোটর, প্রভৃতির সমাবেশ, অন্যান্য সুসভ্য দেশে এ সকল বিষয়ে যেরূপ উন্নতি হইয়াছে, এ দেশেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। তাই বলিয়া সক্রেটিস, প্লেটো—ইঁহারা কি অসভ্য ছিলেন?

ফল-মূল ভোজন করিয়া আজীবন নিভৃত অরণ্যে যাঁহারা কত জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাধনা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদিগকে কি অসভ্য বলিব? আধুনিক সভ্যতা যাহাকে বলে—সেটা সাম্য নিদর্শন মাত্র—বহির্ভাগ দুরস্ত রাখিতে পারিলেই আজকাল সভ্য আখ্যা পাওয়া যায়। আমরা মোটর চড়িতেছি, কিন্তু মোটর নির্ম্মাণ করিয়া বা পেট্রোল সরবরাহ করিয়া আমাদের দেশের লোক অর্থ উপার্জ্জন করে না। ফোর্ড, রক্‌ফেলার পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধনী। ফোর্ডের আয় বৎসরে ৩৩ কোটি টাকা। সমগ্র বাঙ্গালাদেশের রাজস্ব ৩১ কোটি টাকা। ইম্পিরিয়াল গবর্ণমেণ্টের দেয় রাজস্ব বাদ দিলে বাঙ্গালার ভাগ্যে ১০ কোটি টাকা পড়ে। এই যে সুজলা সুফলা বঙ্গভূমির রাজস্ব—একক ফোর্ডের আয় তদপেক্ষা বেশী। কথা এই, আমি যখনই ফোর্ডের মোটরে আরোহণ করি, অমনই সেই অর্থ হয় ফোর্ড নয় ত রোল্‌স্ রয়েস অথবা ওভারল্যাণ্ডের তহবিলে চলিয়া যায়। আমেরিকার প্রতি তিন জনের একখানা মোটরগাড়ী আছে। কিন্তু তাহাদের টাকা অন্যত্র যায় না, সেই দেশেই থাকে। আমাদের টাকাটা যদি আমাদের দেশেই থাকিত, তাহা হইলে কোনও আপত্তি ছিল না। কিন্তু এখন বাঙ্গালাদেশের সর্ব্বনাশ হইতেছে। জীবন-যাত্রার প্রত্যেক ব্যাপারে আমাদের মুখের গ্রাস বিদেশে যাইতেছে। রেল অথবা ষ্টীমারে চড়িলেই টিকিটের মূল্যের চৌদ্দ আনা বিদেশের তহবিলে চলিয়া যায়। যে দুই আনা আন্দাজ এই দেশে রহিল, তাহা ষ্টেশনমাষ্টার, খালাসী প্রভৃতি ভাগ করিয়া লয়। বৈদ্যুতিক শক্তি বিদেশীর হাতে—

"পর দীপ-মালা নগরে নগরে
তুমি যে তিমিরে, তুমি সে তিমিরে।"

আমরা যদি উৎপন্ন করিতে পারিতাম, তবে টাকাটা আমাদের হাতেই থাকিত। *

[ক্রমশঃ।

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়।

* ভ্রম সংশোধন—গত মাসের প্রবন্ধে লিখিত হইয়াছে যে, প্রেসিডেন্সী কলেজের ভিত্তিসংস্থাপনের সময় অধ্যক্ষ টনী উপস্থিত ছিলেন। সে সময় জেম্‌স্ সাটক্লিফ (James Sutcliff) প্রিন্সিপাল ছিলেন।

অভিমানে

আমায় কেন লিখ্‌ছ না ক' চিঠি?
বল ত আমি থাকি কেমন ক'রে?
বুকের ব্যথা—বুঝতে যদি সে'টি,
এমন ক'রে রইতে নাকো স'রে।
যে দিকে চাই, কেবল ফাঁকা লাগে,
কাযের মাঝে পাইনে আমি দিশা,
এক নিমেষের কায যা ছিল আগে
আজ তাহাতে কাটছে দিবা-নিশা।
—দু'টি অখর লেখ ওগো লেখ,
আজকে আমি কি হয়েছি দেখ।
সারাটি দিন কাটে কিসের টানে,
কি যে ভাবি—নিজেই নাহি বুঝি,
এখন যাহার জলের মত মানে
একটু বাদে তা'রি অর্থ খুঁজি!
কত কি যে ভাবনা এসে পড়ে,
অমঙ্গলের দেখছি ছায়া কত,
কায়া আমার উঠছে কেঁপে ডরে—
ঝড়ের আগে শুষ্ক পাখীর মত।
অনেক দিন যে আছি চিঠির আশায়,
অনেক যুগ তা' হচ্ছে আমার মনে;
সইছি যা' তার কথা নাইক ভাষায়,
অভিমানই জাগছে ক্ষণে ক্ষণে।
তুমিও আজ গেলে আমায় ভুলে—
এমনতর কেমন ক'রে হ'ল?
হৃদয় আমার উঠছে ফুলে ফুলে,
কেমন ক'রে রইলে তুমি বল?
পত্র তোমার—পত্র শুধু নয়,
শরীর দিয়ে—হৃদয় দিয়ে গড়া,
আমার সাথে কতই কি যে কয়,
মূর্ত্তি হয়ে দেয় যেন সে ধরা।
দেখলে তারে, তোমায় পড়ে মনে,
চুম্বনে তার—চুমি' তোমার মুখে;
বক্ষে তারে চাপি পরাণপণে—
মনে ভাবি, পেলাম তোমায় বুকে।
চুমো আমার রইল তোমার তরে,
একটি প্রণাম তুলিয়া লও পায়,
ভালবাসা—আমার হৃদয় ভরে—
বারেক তাহা মনে কোরো—হায়!

—রেণু।
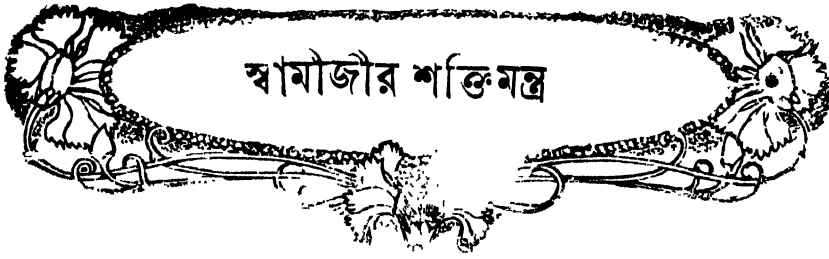
স্বামীজীর শক্তিমন্ত্র

ধর্ম্মবীর বিবেকানন্দ শক্তিসঞ্জীবনীমন্ত্রে মৃতকল্প হিন্দু-ধর্ম্মকে নবভাবে পুনরুজ্জীবিত করিয়া তুলিয়াছেন—দুর্ব্বল, শক্তিহীন, হীনবীর্য্য, চিরপরাধীন হিন্দুজাতির ভিতরে কর্ম্ম-যোগী বীর সন্ন্যাসী আজীবন শক্তিমন্ত্র প্রচার করিয়া গিয়াছেন—এই কথা বলিলে, বোধ হয়, সত্যের অপলাপ করা হইবে না। স্বামীজীর জীবনচরিত যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা অকুণ্ঠিতচিত্তে স্বীকার করিবেন যে, স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন অসামান্য তেজস্বী পুরুষ, অনন্ত শক্তির আধার, অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত "শক্তি"র উপাসক। "মিন্‌মিনে পিন্‌পিনে ঢোক গিলে গিলে কথা কয়, ছেঁড়া ন্যাতা সাত দিন উপবাসীর মত সরু আওয়াজ, সাত চড়ে কথা কয় না"—এই সমস্ত স্বামীজীর ধাতে আদৌ সহিত না, এইগুলিকে "তমোগুণ, মৃত্যুর চিহ্ন, পচা দুর্গন্ধ" জ্ঞানে তিনি বিষবৎ পরিত্যাগ করিতেন।

স্বামী বিবেকানন্দের বিশ্বাস ছিল যে, একমাত্র দুর্ব্বলতাই আমাদের দুঃখ-দুর্গতির মূল। তাই তিনি অহরহ বলিতেন যে, "ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ", দুর্ব্বলতা—তুচ্ছ হৃদয়-দৌর্ব্বল্য ত্যাগ কর—"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।" ধর্ম্মে-কর্ম্মে, আচারে-ব্যবহারে জীবনের যে কোনও কাযে দুর্ব্বলতা জিনিষটা এই বীর্য্যবান্ পুরুষসিংহের অতিশয় অসহ্য ছিল।

"পরিব্রাজক" কিংবা "ভারতীয় সন্ন্যাসী"র ছবিতেও এই শক্তিশালী পুরুষের অমিত তেজ—অনন্ত বীর্য্যের যথেষ্ট আভাস পাওয়া যায়। স্বামীজীর সমস্ত মুখাবয়ব এক অপূর্ব্ব ঐশী শক্তিতে সমুদ্ভাসিত, তীক্ষ্ণোজ্জ্বল চক্ষুর্দ্বয় হইতে খর জ্যোতিঃ—দিব্য তেজঃপুঞ্জ বিচ্ছুরিত হইতেছে, বিবেকানন্দের ভিতরের অলৌকিক প্রতিভা, অপরিমেয় বলবত্তা তাঁহার চোখে মুখে যেন ফুটিয়া উঠিয়াছে! স্বামীজীর ছবি দেখিবামাত্রই মনে হয়, যেন এই অসাধারণ পুরুষসিংহের সর্ব্বাঙ্গ হইতে তেজোধারা ফাটিয়া পড়িতেছে। বস্তুতঃ, এই জিতেন্দ্রিয় ব্রহ্মচারী আপনার অনন্ত শক্তির পরিমাণ পাইতেন না।

শক্তিমন্ত্রের সাধক স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতা এবং চিঠি-পত্রের প্রতি ছত্রেও অফুরন্ত তেজ, অদম্য অসীম শক্তির প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। "পত্রাবলী", "পরিব্রাজক", "প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য", "বর্ত্তমান ভারত", "স্বামিশিষ্যসংবাদ", "ভারতে বিবেকানন্দ" প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ করিয়া অতি দুর্ব্বল,ভীরু কাপুরুষও আপনাকে অনন্ত শক্তির আধার, অসামান্য তেজোমণ্ডিত মানুষ বলিয়া মনে করে—মেদিনী কাঁপাইয়া,সদর্পে বুক ফুলাইয়া, চলিবার সাহস লাভ করে। স্বামীজীর প্রত্যেকটি কথার ভিতর এমন প্রেরণা, এমন একটি ঐশী শক্তি আছে যে, তাহা আসিয়া আমাদের অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে আঘাত করে, আমরা তাহাতে নব ভাবে অনুপ্রাণিত হই, নব জীবন লাভ করি। বিবেকানন্দের অমোঘ বজ্রবাণীতে ধমনীতে যেন উষ্ণ শোণিতধারা প্রবাহিত হয়; আশা, আনন্দ এবং উৎসাহের আবেগে সমস্ত শরীরে রোমাঞ্চ উপস্থিত হয়; একটা সুতীব্র বৈদ্যুতিক শক্তিতে যেন আপাদ-মস্তক আলোড়িত হয়! মানুষকে আর সামান্য মানুষ বলিয়া ভ্রম হয় না। মনে হয়, সে যেন "অমৃতস্য পুত্র", "জ্যোতির তনয়", "ভগবানের তনয়।" স্বামীজীর লেখার এমনই সম্মোহনী শক্তি যে, বিবেকানন্দ-সাহিত্য পাঠ করিয়া স্থবির স্থিতিশীল, "অতীতহীন ভবিষ্যৎহীন আশাভরসাশূন্য" মানুষও অদম্য উদ্যমে—অসীম উৎসাহে নব বলে বলীয়ান্—নূতন আশায় অনুপ্রাণিত হইয়া উঠে।

ইহা অত্যুক্তি বা অতিরঞ্জন নহে। অনেক ক্ষেত্রে এইরূপ ঘটনা প্রত্যক্ষ করা গিয়াছে। স্বামীজীর প্রত্যেক কথাটি হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে ধ্বনিত—তাই উহা গাণ্ডীবীর শরসন্ধানের মতই অমোঘ, অব্যর্থ! স্বামী বিবেকানন্দের বাণী অন্তরে আঘাত

করে নাই, এমত মানুষ আজ পর্য্যন্ত আমার দৃষ্টিতে আইসে নাই।

স্বামী বিবেকানন্দ অন্তরে অন্তরে উপলব্ধি করিয়াছিলেন—"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।" তাই এই সর্ব্বত্যাগী পরিব্রাজক সন্ন্যাসীর মূলমন্ত্র ছিল—"উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত", "এগিয়ে যাও, এগিয়ে যাও, পিছন চেয়ো না।" স্বামীজীর গ্রন্থাবলী পাঠ করিয়া এই ধারণা জন্মিয়াছে যে, ক্ষাত্র-তেজোমণ্ডিত বিবেকানন্দের শিক্ষা এবং উপদেশের সার মর্ম্ম হইতেছে,—"বলবান্ হও, বীর্য্য প্রকাশ কর।"

আমরা দুর্ব্বল—বলহীন বলিয়া আঘাত পাইয়াও সে আঘাত ফিরাইয়া দিতে অক্ষম। তমোগুণে আচ্ছন্ন হইয়া আমরা ঐ অসমর্থতাকে ক্ষমা বলিয়া আত্মপ্রবঞ্চনা করি। তাই স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন যে, "অহিংসা ঠিক নির্ব্বৈর বড় কথা। কথা ত বেশ, তবে শাস্ত্র বল্‌ছেন, তুমি গেরস্থ, তোমার গালে এক চড় যদি কেউ মারে, তাকে দশ চড় যদি না ফিরিয়ে দাও, তুমি পাপ কর্‌বে। যে ব্যক্তি তোমার এক গালে চড় দিবে, তাহার দুই গালে চড় দিতে পারিলে তুমি মানুষ।" এই কথার তাৎপর্য্য হইতেছে যে, দুর্ব্বলের ক্ষমা ক্ষমাই নয়, সবলের ক্ষমাই প্রকৃত ক্ষমা; শক্তিমান্ পুরুষ যাহা করেন, তাহাই শোভা পায়। স্বামীজী আরও বলিয়াছেন যে, গৃহস্থের পক্ষে অন্যায় সহ্য করা পাপ, "তৎক্ষণাৎ অন্যায়ের প্রতিবিধান করতে চেষ্টা কর্‌তে হবে।" "ভগবান্ আছেন—আমি সহিলাম,ধর্ম্মে সহিবে না"—এই সব 'ন্যাকামিতে' স্বামীজীর আস্থা ছিল না, এই সব ধর্ম্মের ভাণ তাঁহার 'ধাতে' সহিত না, এই সমস্ত 'বুজরুকির' উপর তিনি হাড়ে চটা ছিলেন।

আমার বিশ্বাস, আমাদের এই লৌকিক ধর্ম্মানুষ্ঠানে স্বামী বিবেকানন্দের বড় বেশী প্রত্যয় ছিল না। বিবেকানন্দের ধ্যানধারণা ছিল যে, কি প্রকারে ভারতকে উঠাইতে পারিবেন, গরীবদের খাওয়াইতে পারিবেন, শিক্ষার বিস্তার করিতে পারিবেন, কি উপায়ে সামাজিক অত্যাচার, অন্যায়, অবিচার চিরতরে দূর করিতে পারিবেন। তিনি বলিয়াছেন যে, "ভারতমাতা অন্ততঃ সহস্র যুবক বলি চান, মনে রেখো, মানুষ চাই,পশু নয়,—যাহারা দরিদ্রের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হবে, তাহাদের ক্ষুধার্ত্ত মুখে অন্ন প্রদান কর্‌বে, সর্ব্বসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার কর্‌বে, আর তোমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের অত্যাচারে যারা পশু পদবীতে উপনীত হয়েছে, তাদের মানুষ করবার জন্য আ-মরণ চেষ্টা কর্‌বে।" তিনি জানিতেন যে, আমাদের প্রাত্যহিক অভাবই এত ভয়ানক যে, দৈনন্দিন অভাবের চাপে আমরা আর কিছু ভাবিবার অবসর পাই না। অন্নবস্ত্রের চিন্তা—দারিদ্র্যের উপর দারিদ্র্য; ধর্ম্মচিন্তার অবসর কোথায়? তাই স্বামীজী বলিতেন, "যে জাত সামান্য অন্নবস্ত্রের সংস্থান করতে পারে না, পরের মুখাপেক্ষী হয়ে জীবনযাপন করে, সে জাতের আবার বড়াই! ধর্ম্মকর্ম্ম এখন গঙ্গায় ভাসিয়ে আগে 'জীবন-সংগ্রামে অগ্রসর হ'।"

"মহা উৎসাহে অর্থোপার্জ্জন ক'রে স্ত্রী-পরিবার দশ জনকে প্রতিপালন, দশটা হিতকর কার্য্যানুষ্ঠান কর্‌তে হবে, এ না পার্‌লে ত তুমি কিসের মানুষ? গৃহস্থই নও—আবার মোক্ষ!" ইহাতে বুঝা যায় যে, আমাদের লৌকিক ধর্ম্মে কর্ম্মে স্বামীজীর বড় বেশী আস্থা ছিল না। "দেশশুদ্ধ প'ড়ে কতই হরি বল্‌ছি, ভগবান্‌কে ডাক্‌ছি, ভগবান্ শুনছেনই না আজ হাজার বৎসর। শুন্‌বেনই বা কেন? আহাম্মকের কথা মানুষই শোনে না—তা ভগবান্।"

স্বামীজী জানিতেন যে, আমাদের গোড়ার গলদ ঐ দুর্ব্বলতা। দুর্ব্বলতাই যত পাপের আকর। দুর্ব্বল বলিয়াই আজ কর্ম্মসংসারে প্রতি পদে আমাদের পরাজয়—এত লাঞ্ছনা এবং অপমান। এই সংসারে দুর্ব্বল ব্যক্তির কিছুতেই রক্ষা নাই, সে সবলের কবলে পড়িবেই পড়িবে, প্রবলের হাতে পথে-ঘাটে লাথিটা-চড়টা ঘুষিটা তাহার যেন প্রাপ্য। "যোগ্যতমের জয়" এ কথা স্কুলের ছেলেও জানে। দুর্ব্বলের উপর সবলের অত্যাচার ত অতি স্বাভাবিক, তাই টিকিয়া থাকিতে হইলে আমাদের এখন শক্তিসম্পন্ন হইতে হইবে। আমাদের এখন চাই শুধু শক্তির সাধনা—ভারতবাসী অতি দুর্ব্বল, নিস্তেজ, বীর্য্যহীন, তাই সমস্ত ভারত ব্যাপিয়া আবার শক্তির আরাধনা করিতে হইবে; নতুবা ভারতের কল্যাণকামনা বৃথা—ভিতরের শক্তির উদ্বোধন ব্যতীত আত্মপ্রতিষ্ঠ হওয়া কিংবা স্বরাজ লাভ করা আকাশকুসুম—কল্পনামাত্র। দেশমাতৃকা আজ শক্তিসম্পন্ন অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত মানুষ চাহেন—এমন মানুষ, যে মনের বলে মৃত্যুভয় অতিক্রম করিতে পারে; যে দেশের ও

দশের মঙ্গলের জন্য অক্লেশে, অকুণ্ঠিতচিত্তে মৃত্যুমুখে ঝাঁপ দিতে পারে; যে ন্যায়ের জন্য, সত্যের জন্য, স্বাধীনতার জন্য জীবন উৎসর্গ করিতে পারে; যে বুক ফুলাইয়া সদর্পে বলিতে পারে, "সহস্রবার মনুষ্যজন্ম গ্রহণ করিব এবং যদি দরকার হয়, সহস্রবার মানুষের মত প্রাণ বিসর্জন দিব—জন্ম-মৃত্যুকে বিন্দুমাত্র ভয় করি না।" এইরূপ আত্মত্যাগী অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত এক দল যুবকসম্প্রদায় গঠন করাই স্বামী বিবেকানন্দের মুখ্য লক্ষ্য ছিল।

স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন যে, আমাদের এখন প্রথম এবং প্রধান কায হচ্ছে দুর্ব্বলতা পরিত্যাগ করা—সব ভয়-ভীতি দূর করা। ভয় যখন ভূতের মত ঘাড়ে চাপিয়া বসে, তখন কি আর রক্ষা থাকে? "ডিভাইনা কমেডিয়াতে" দেখিতে পাই, দাঁতে স্বর্গ-নরক পর্য্যটনের পর্য্যাপ্ত শক্তির অভাব অনুভব করিয়া ভয়ে পশ্চাৎপদ হইতে চাহিতেছেন—ভার্জ্জিলকে বলিতেছেন যে, তাঁহার তেমন কোন পুণ্য নাই, তিনি নিজকে অনুপযুক্ত মনে করেন এবং তাঁহার স্বর্গ-নরক-পর্য্যটন ভুল-ভ্রান্তিতে পর্য্যবসিত হইবে,—

"Consider well, if virtue be in me
Sufficient, ere to this high enterprise
Thou trust me ..
Myself I deem not worthy, and none else
Will deem me. I, if on this voyage then
I venture, fear it will in folly end."

আর ভার্জ্জিল আত্মশক্তিতে অবিশ্বাসী ভীরু দাঁতেকে উত্তরে বলিলেন যে, তোমার কথার ভাবে বুঝিলাম যে, ভয়েতে তোমার মন আড়ষ্ট হইয়া গিয়াছে,—

"Thy soul is by vile fear assail'd, which oft
So overcasts a man, that he recoils
From noblest resolution, like a beast
At some false semblance in the
twilight gloom."

স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন যে, ভয়ের মত পাপ আর নাই, ভয়ই সর্ব্বাপেক্ষা কুসংস্কার। এই ভয় মানুষের মনুষ্যত্ব লোপ করে, মানুষকে পঙ্গু করিয়া পশু পদবীতে উপনীত করে। তাই সকলের আগে এই ভয়টাকে ভাঙ্গিতে হইবে—উপনিষদের ভাষায় "অভীঃ" হইতে হইবে। মহাত্মা গন্ধী বলেন যে, এই পৃথিবীতে তিনি একমাত্র ভগবান্ ব্যতীত অন্য কাহাকেও ভয় করেন না। স্বামী বিবেকানন্দও বলিয়াছেন,—

"Believe! Believe! Fear not, *for the greatest sin is fear.* Say not you are weak. The spirit is omnipotent. Say not man is sinner, tell him that he is a god."

"বিশ্বাস কর, ভয় করিও না, কারণ, ভয়ই হচ্ছে সর্ব্বাপেক্ষা পাপ। তুমি দুর্ব্বল, এ কথা মুখে আনিও না। মানুষের আত্মার শক্তি অনন্ত। মানুষ পাপী, এমন কথা মুখে আনিও না, তাহাকে ডাকিয়া বল যে, সে একটি দেবতা।" "সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রাণী" মানুষের অন্তর্নিহিত অনন্ত শক্তিতে স্বামীজী কত দূর আস্থাবান্ ছিলেন, তাহা তাঁহার আর একটি উক্তি হইতে বেশ স্পষ্টই বুঝা যায়। বিবেকানন্দ বলিয়াছেন যে, গরু মিথ্যা কথা কয় না, দেয়াল চুরি করে না, তবু তারা গরুই থাকে, আর দেয়ালই থাকে। মানুষ চুরি করে, মিথ্যা কথা কয়, আবার সেই মানুষই দেবতা হয়। স্বামীজী জানিতেন যে, দেবতা নিজকে খাটো করিয়া কখনও মানুষ হয়েন না, মানুষই নিজগুণে দেবত্বে উন্নীত হয় এবং মনুষ্যত্বের উপর এই অগাধ বিশ্বাস ছিল বলিয়া পরাধীন পরপদানত ভারতে আমরণ তিনি "শক্তিমন্ত্র" প্রচার করিয়া গিয়াছেন।

মহাত্মা গন্ধী যথার্থ ই বলিয়াছেন যে, বিশ্বাস করিয়া ঠকাও ভাল, তবুও অবিশ্বাস করা উচিত নয়—প্রতারণার ভয়ে শেষে আপনার উপরও মানুষ বিশ্বাস হারায়। সন্দেহ, অবিশ্বাস দূর না করিলে, আমাদের ভয়-ভাবনা ইহজীবনে ঘুচিবে না। আত্মশক্তিতে অবিশ্বাসী হইলে, নিজেদের উপর শ্রদ্ধাসম্পন্ন না হইলে, আমাদের অভাব-অভিযোগ মৌরসী পাট্টা করিয়া চিরতরে বর্ত্তমান থাকিবে। মহাত্মা গন্ধীর মত স্বামী বিবেকানন্দেরও তাই উদ্দেশ্য ছিল—মানুষের অন্তর্নিহিত অনন্তশক্তির উদ্বোধন করা। স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন যে, "আমরা জ্যোতির তনয়, ভগবানের তনয়, অমৃতস্য পুত্রাঃ।"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।"

আমাদের চাই অপরিমেয় বল, অফুরন্ত অদম্য শক্তিতে ভরপুর হওয়া। আপনাকে ভ্রমেও কখন দুর্ব্বল ভাবা

উচিত নয়। যে ব্যক্তি আপনাকে দুর্ব্বল ভাবে, সে যে অতিশয় দুর্ব্বল হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? মনীষী টুর্গেনিভ বলেন,—""If you call yourself a mushroom, you must go into the basket." "যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।" তাই স্বামীজী বলিতেন যে, যে ব্যক্তি আপনাকে সর্ব্বদা "দাস" ভাবে, স্বয়ং ভগবান্‌ও তাহার দাসত্ব মোচন করিয়া তাহাকে মুক্তি দিতে পারেন না। বুদ্ধ বা গন্ধীর মতই বিবেকানন্দ বিশ্বাস করিতেন যে, মানুষের মন লইয়াই সব—"আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ।"

"The mind is everything—what you think you become."

এই কথা ভগবান্ বুদ্ধদেব হইতে মহাত্মা গন্ধী সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন।

আমরা আপনাদিগকে দুর্ব্বল, অক্ষম, অসহায় ভাবি বলিয়া কর্ম্ম-সংসারে আজ আমাদের দুর্দ্দশা এবং দুঃখ-দুর্গতির অন্ত নাই। যে ব্যক্তি আপনাকে অধম ভাবে, অসম্মান করে, অন্য লোক যে তাহাকে সম্মান করিবে—এই আশা কি তাহার দুরাশা নহে? উদ্বাহু বামনের এই চাঁদ ধরায় বিশ্বাস করি না। এখন আমাদের সমস্ত দৃষ্টি অন্তর্ম্মুখী করিতে হইবে, আত্মশক্তি উদ্বোধিত করিতে হইবে, আপনাকে আপনার নির্ভরের দণ্ড হইতে হইবে। আপনার অন্তর্নিহিত শক্তির অনন্তত্ব অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া, আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বে ভগবান্ বুদ্ধদেব বলিয়াছিলেন,—"হে মানব, তুমি আপনি আপনার নির্ভরের দণ্ড হও, তোমার নির্ব্বাণ তোমারই হাতে, উহার জন্য অন্য কাহারও দরকার হইবে না।" মহাপরিনির্ব্বাণের সময় প্রধান শিষ্য আনন্দ শোকে অধীর হইয়া বুদ্ধদেবকে বলিয়াছিলেন যে, ভগবান্ তথাগতের অবর্ত্তমানে তাহাদের কি অবস্থা হইবে, ভিক্ষুসঙ্ঘ নেতৃহীন হইয়া পড়িবে, তখন তাহাদের উপায় কি হইবে? উত্তরে ভগবান্ বুদ্ধদেব আনন্দকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিয়াছিলেন,—"এ কি কথা বলিতেছ আনন্দ? আমি কখনও মনে করি নাই যে, আমি ভিক্ষুসঙ্ঘের নেতা কিংবা আমাকে উপলক্ষ করিয়া ভিক্ষুসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তোমরা প্রত্যেকে যে যাহার নিজ পথ অবলম্ব করিবে, তোমার পথিপ্রদর্শক প্রদীপ তুমি নিজেই; আত্মশরণ হও, অনন্যশরণ হও।"

বৌদ্ধ ত্রিরত্নের সঙ্ঘের সঙ্গে সঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ বুদ্ধদেবের এই আত্মনির্ভরের অমোঘ বাণী আত্মসাৎ করিয়াছিলেন। মহাত্মা গন্ধীও বুদ্ধদেবের এই আত্মনির্ভরের মন্ত্রে অনুপ্রাণিত। গন্ধীজীকে বুদ্ধের অবতার বলিলেও, বোধ হয়, বিন্দুমাত্র অত্যুক্তি করা হয় না। কারণ, এই বৌদ্ধপন্থী মহাত্মার মূলমন্ত্র প্রেম, অহিংসা, সত্য এবং স্বাবলম্বন। মহাত্মাজীও স্বামী বিবেকানন্দের মত পরমুখাপেক্ষিতা দেখিতে পারেন না, পরের গলগ্রহ হইয়া জীবন ধারণ করার অপেক্ষা মৃত্যুকে সহস্রগুণে শ্রেয়ঃ মনে করেন।

মহাত্মা গন্ধী আজ আমাদের "ক্ষুদ্র হৃদয়দৌর্ব্বল্য" ত্যাগ করিতে বলিতেছেন। "দুর্ব্বলতাই জগতের যাবতীয় দুঃখের মূল" আর "ভয়ই সর্ব্বাপেক্ষা কুসংস্কার। স্বামী বিবেকানন্দও ত বার বার এই কথাই বলিয়া গিয়াছেন—"ভয়ই পাপের মূল, দুর্ব্বলতা দূর করিতে হইবে। সবল হও, সাহসী হও, এই মুহূর্ত্তে স্বর্গ পর্য্যন্ত তোমাদের করতলগত হইবে।" "যদি তোমরা বাস্তবিক ভগবানের সন্তান বলিয়া বিশ্বাসী হও, তবে কিছুতেই ভয় পাইও না; ভয়ই মৃত্যু; ভয়ই মহাপাতক; কোন কিছুর অপেক্ষা রাখিও না, সিংহের মত কায করিয়া যাও, চিরজাগ্রত আমরা—আমাদের সমগ্র জগৎকে জাগাইতে হইবে।"

আমরা যে অমৃতস্য পুত্রাঃ—জ্যোতির তনয়, ভগবানের তনয়। আমাদের কি অলস কর্ম্মবিমুখ হইলে চলে? আমাদের যে কর্ম্ম করিয়া শুদ্ধচিত্ত হইতে হইবে, তাই আমাদের আজ অক্লান্ত চেষ্টা চাই, অসীম যত্ন চাই। একমাত্র উদ্যোগের অভাবেই যে মানুষের জীবনটা মাটী হইয়া যায়! "বড় দুঃখ, বড় ব্যথা, সম্মুখেতে কষ্টের সংসার"—তাই বলিয়া বিষাদমলিন ক্ষুব্ধ চিত্তে বিমর্ষভাবে বসিয়া থাকিলে কি লাভ হইবে? মানুষ যদি নৈরাশ্য, অবসাদ সব দূর করিতে না পারে, তবে সে সংসারের সুখ, জীবনের আনন্দ হইতে চিরতরে বঞ্চিত থাকিবে। তাই আজ চাই আশা, উৎসাহ, আর চাই বুকভরা বিশ্বাস। জড়তা ত্যাগ করিতে হইবে—আলস্য ত্যাগ করিতে হইবে। কাযে লাগিয়া গেলেই তবে আশার আলোক-রেখা খুঁজিয়া পাওয়া যায় এবং এই আশার আলোকেই মানুষ সত্যের

সন্ধান পায়, আর নৈরাশ্য-হতাশায় চিন্তায় চিন্তায় মানুষের শরীর ক্ষয় হইয়া যায়, মানুষ জীবনে কোন শান্তিই লাভ করে না। তাই নরকের দ্বারে দাঁতে লেখা দেখিয়াছিলেন—"All hope abandon, ye who enter here". সুতরাং স্বামী বিবেকানন্দ সর্ব্বদাই বলিতেন—"বাজে চিন্তা ত্যাগ কর্, মহা উৎসাহে উঠে প'ড়ে কাযে লেগে যা। কায কর্, কায কর্, কেবল কায কর্ কর্ম্মবন্ধন ক্ষয় হয়ে যাক্—বুক বেঁধে কাযে লেগে যা—"

প্রাতঃস্মরণীয় ছত্রপতি শিবাজীর মত স্বামী বিবেকানন্দও মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, "এই সংসার কর্ম্মভূমি, ইহা বিশ্রামের আগার নহে, কর্ম্ম করিতেই মানুষ এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে, কর্ম্মকুণ্ঠ অলসের স্থান এই সমরাঙ্গন সংসারপ্রাঙ্গণে নাই।" মনীষী কার্লাইলের মত এই কর্ম্মযোগী সন্ন্যাসীও বিশ্বাস করিতেন যে, "Man is born to expend every particle of strength that God Almighty has given him in doing the work he finds he is fit for; to stand up to it to the last breath of life and do his best.'

তাই এই অলস, কর্ম্মকুণ্ঠ, ভাবপ্রবণ, পরাধীন জাতির ভিতর শক্তিমন্ত্রের সাধক কর্ম্মবীর বিবেকানন্দ আজীবন কথায় ও কাযে কর্ম্মযোগই বহুলভাবে প্রচার করিয়াছিলেন। স্বামীজী জানিতেন যে, আমাদের "হা-হতোস্মিতে" কোন ফয়দা নাই, আমাদের ক্রন্দন এবং কাতর উক্তিতে কেহ কর্ণপাতও করে না—কত কাল ধরিয়াই ত কাঁদিতে কাঁদিতে শুধু শোকেরই বৃদ্ধি পাইয়াছে। তাই চোখের জল মুছিয়া এখন একবার আত্মশক্তিতে আস্থাস্থাপন করা উচিত—আবেদন-নিবেদনের থালা গঙ্গাজলে বিসর্জ্জন দিয়া আপনার মনুষ্যত্বের উপর নির্ভর করা দরকার। মহাত্মা গন্ধীর মত স্বামী বিবেকানন্দও হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত এই অমোঘ আত্মনির্ভরের বাণী প্রচার করিয়াছিলেন।

বিবেকানন্দ-সাহিত্য মনোযোগের সহিত পাঠ করিলেই আমাদের উক্তির যাথার্থ্য উপলব্ধি হইবে। স্বামীজী বরাবরই বলিয়াছেন যে, আলস্যের—আরামের শয্যা ত্যাগ করিয়া একবার মেরুদণ্ডের উপর ভর দিয়া সোজা হইয়া শক্ত মাটীর পৃথিবীর উপর দাঁড়াইতে হইবে। আজ ঘরের বাহির হইতে হইবে, 'দেশ-দেশান্তর-মাঝে যার যেথা স্থান, খুঁজিয়া লইতে হইবে করিয়া সন্ধান।' নিজের পায়ে ভর দিয়া খাড়া হইতে হইবে, খুব পরিশ্রমী এবং কষ্টসহিষ্ণু লোকের দরকার। "ছুটোপুটিতে কি কায হয়? লোহার দিল চাই, তবে ত লঙ্কা ডিঙ্গুবি? বজ্রবাঁটুলের মত হ'তে হবে। যাতে পাহাড়-পর্ব্বত ভেদ হ'তে চায়।" আমাদের এখন আবশ্যক—"লৌহ ও বজ্রদৃঢ় পেশী ও স্নায়ুসম্পন্ন হওয়া"— "Iron nerves with a well intelligent brain and the whole world is at your feet" "বজ্রপেশী এবং লৌহদৃঢ় বাহু চাই"—এই কথা স্বামী বিবেকানন্দ কতবারই না বলিয়াছেন। কারণ, স্বামীজী জানিতেন যে, দেশমাতৃকা মানুষ বলি চাহেন পশু নয়—সর্ব্বাঙ্গসুন্দর মানুষের মত মানুষ চাই, তবেই সমাজের কল্যাণ ও উন্নতি সম্ভবপর, নতুবা উহা সুদূরপরাহত।

স্বামীজী বলিতেন যে, "বীরভোগ্যা বসুন্ধরা"—এ কথা ধ্রুব সত্য। বীর হ', সর্ব্বদা বল্ "অভীঃ" "অভীঃ" "মা ভৈঃ।" হিন্দুর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতে আমরা দেখিতে পাই যে, যুদ্ধবিমুখ অর্জ্জুনকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—

"হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহাম্।
তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ॥"

"আমাদের সম্মুখেও কার্য্যক্ষেত্র ঐ প্রশস্ত পড়িয়া; সমরাঙ্গন সংসারপ্রাঙ্গণ এই; যে জিনিবে, সুখ লভিবে সেই।" সুতরাং আমাদেরও জীবন-যুদ্ধে "কৃতনিশ্চয়" হইয়া অগ্রসর হওয়া উচিত।

"কৃপাবিষ্ট, অশ্রুপূর্ণাকুললোচন, বিষাদযুক্ত" অর্থাৎ তমোগুণাচ্ছন্ন অর্জ্জনকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিয়াছেন,—

"কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতম্।
অনার্য্যজুষ্টমস্বর্গ্যমকীর্ত্তিকরমর্জ্জুন॥"

এই "অনার্য্যসেবিত, অধর্ম্ম্য ও অকীর্ত্তিকর" মোহে সময়ে সময়ে আমরাও অভিভূত হই। আমরা মোহাচ্ছন্ন হই বলিয়া এই সংসারটা একটা মায়া এবং মানবজীবনটা একটা স্বপ্ন বলিয়া ভ্রম হয়—তখন আমরা কাতর স্বরে বলিতে থাকি, "বৃথা জন্ম এ সংসারে" "দারা পুত্র পরিবার তুমি কার কে তোমার?" "কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ?"

কিন্তু যখনই ক্লৈব্য বা কাতরতা তুচ্ছ করিয়া, ক্ষুদ্র হৃদয়-দৌর্ব্বল্য ত্যাগ করিয়া বীরের মত গাত্রোত্থান করি, তখনই মনে হয়, "মানবজীবন সার, এমন পাব না আর, বাহ্য দৃশ্যে ভুল' না রে মন।" তখনই কবির মত আকুল কণ্ঠে প্রাণের আবেগে বলিয়া উঠি—

"মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে,
মানুষের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই॥"

তখন আর ভগবানের নিন্দা করিয়া এবং অদৃষ্টের দোষ ও মনুষ্যজন্মে ধিক্কার দিয়া, দুঃখবাদীর মত হতাশ অবসন্ন-চিত্তে কাল কাটাইতে পারি না; ভগবানের মঙ্গলময় বিধানে বিশ্বাস আইসে; ঈশ্বর যাহা করেন, সকলই মঙ্গলের জন্য, এই ধ্রুব বিশ্বাস আমাদের হৃদয়ে বদ্ধমূল হয়।

তাই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তমোগুণাচ্ছন্ন অর্জ্জুনকে প্রথমেই বলিলেন—"ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ।"—"ত্যজ ক্লৈব্য, উঠ পার্থ, তোমারে ত সাজে না ইহা" -"ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্তোত্তিষ্ঠ পরন্তপ।" কর্ম্মযোগী ধর্ম্মবীর বিবেকানন্দের মতে আমাদের "এখন উপায় হচ্ছে, ঐ ভগবদ্বাক্য শোনা। 'ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ।' 'তস্মাত্ত্বমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব'।" কারণ, আমরাও এখন সেই রথস্থ অর্জ্জুনের মত 'কশ্মল' অর্থাৎ তমোগুণাভিভূত হইয়া আছি—আমাদের হৃদয় দুর্ব্বল—মোহে আচ্ছন্ন, ভয়ে আড়ষ্ট, জড়তা আমাদের প্রতি পদে। আমাদের মত এই রকম নির্জ্জীব ভাব হস্তপদাদিসংযুক্ত মানুষের শোভা পায় না। যে জড়ভাবাপন্ন, সে ত জীবন্মৃত, "লৌহভস্ত্রেব শ্বসন্নপি ন জীবতি।" জড়তা—ক্লৈব্য ত্যাগ করিলে প্রাণ পাইব, সজীব হইয়া উঠিব। তাই শক্তিমন্ত্র-প্রচারক বিবেকানন্দের বাণী ছিল—"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত।" "জাগ্রত ভগবান্" নিদ্রিত জড়কে ত চাহেন না। তিনি চাহেন সজীব মুক্তিপথের যাত্রীকে। উপনিষদে বলা হইয়াছে যে, দেবগণ জাগ্রত প্রাণবান্‌কে চাহেন, শ্রমে অকাতর জাগ্রতকে চাহেন। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ তাই অর্জ্জুনকে ক্ষুদ্র হৃদয়-দৌর্ব্বল্যটুকু ত্যাগ করিয়া যুদ্ধের জন্য কৃতনিশ্চয় হইয়া উঠিতে বলিয়াছেন। আমাদেরও মনের দুর্ব্বলতাটা সকলের আগে দূর করা দরকার। বসিয়া বসিয়া ভাবিলে চলিবে না। আমরাও মানুষ, আমাদের হাত-পা আছে, প্রাণ আছে, আমাদের ভিতরেও ভগবানের অনন্ত শক্তি লুকান আছে, সেই নিদ্রিত কুল-কুণ্ডলিনীশক্তিকে জাগাইয়া তুলিতে হইবে। স্বামী বিবেকানন্দও জানিতেন যে, মনুষ্যত্ব-লাভের পথ শাণিত ক্ষুরধারের ন্যায় দুর্গম—"ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি।" কিন্তু তিনি ইহাও জানিতেন যে, "নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।" তাই "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত" উপনিষদের এই শক্তিমন্ত্রে স্বামী বিবেকানন্দ শক্তিহীন, হীনবীর্য্য, দুর্ব্বল, চিরপরাধীন হিন্দুজাতিকে উদ্বোধিত করিয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন।

দুঃখের নামে যাঁহারা ভয় পায়েন না, বিপদ্‌কে যাঁহারা গ্রাহ্য করেন না, তাঁহারাই যথার্থ মানুষ। দুঃখ-দৈন্যের দারুণ পেষণেই "কয়লার মানুষ" "হীরার মানুষে" পরিণত হয়। সোনাকে যত আগুনে পোড়ান যায়, ততই তাহা বিশুদ্ধ ও উজ্জ্বল হয়। দুঃখকষ্টের ভিতর দিয়াই ত মানুষ প্রকৃত মানুষ হয়। দুঃখ-দৈন্য এবং বিপদ্-আপদ্‌কে যাঁহারা তৃণজ্ঞানে পদদলিত করিয়া, অকুতোভয়ে ভবিষ্যৎ আশায় বুক বাঁধিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়াছেন, তাঁহাদের পদরজেই পৃথিবী পবিত্র হইয়াছে। আর যাঁহারা আরামের—আলস্যের সুকোমল শয্যায় শুইয়া, দর্পণে আপনাদের চন্দ্রবদন নিরীক্ষণ করিয়া, বিলাসব্যসনের গড্ডলিকা-প্রবাহে গা ঢালিয়া মরণের কোলে ঢলিয়া পড়েন, কই, কেহ তাঁহাদের নামটিও লয় না!

সুতরাং স্বামী বিবেকানন্দের উপদেশ অনুসারে আমাদের এখন নির্ভয়ে সম্মুখে অগ্রসর হইতে হইবে, পশ্চাতে চাহিতে পারিব না, কে পড়িল, তাহা দেখিতে যাইব না। নীচতা, হীনতা,সঙ্কীর্ণতা দুর করিয়া—অচলায়তনের গণ্ডী ডিঙ্গাইয়া, উন্মুক্ত নীলাকাশের মত উদার মুক্তির পথে অগ্রসর হইতে হইবে। বিশ্বের রাজপথে নিরুদ্দেশ যাত্রার নামে শিহরিয়া উঠিলে চলিবে না। সম্মুখে যে মুক্তির রাজপথ উন্মুক্ত রহিয়াছে, অকুতোভয়ে ভগবানের মঙ্গলময় বিধানে বিশ্বাস রাখিয়া তাহাতেই চলিতে হইবে। ভবিষ্যৎ আমাদের হাতে নয়—ফলাফলের বিধান-কর্ত্তাও আমরা নই,—কর্ম্মেই আমাদের অধিকার আছে—'মা ফলেষু কদাচন।' অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনায়, ভবিষ্যতে কি হইবে,না হইবে, তাহার ফলাফল গণনায় অনেক শুভ সুযোগ কিন্তু হেলায় নষ্ট হইয়া যায়। আর ভবিষ্যৎ বাজে চিন্তায় বৃথা কাল কাটান কি বিজ্ঞতার

পরিচয়—যুক্তিতর্কসম্পন্ন মানুষের লক্ষণ? 'বদর বদর' বলিয়া জীবনতরী সংসার-সমুদ্রে ভাসাইয়া দিতে যে দ্বিধা-সঙ্কোচ করে, তাহার নৌকাই ত আগে ডুবে। যুদ্ধক্ষেত্রে যে ব্যক্তি প্রাণের মায়া করে, 'মৃত্যুভয়ভীত সেই হতভাগ্য কাপুরুষই ত সকলের আগে প্রাণ হারায়। বিধাতার এমনই বিচিত্র বিধান যে, মৃত্যুকে যে ব্যক্তি শঙ্কা করে, ভয় করে, মৃত্যু সেই অভাগাকেই সকলের আগে আলিঙ্গন করে। এই সংসার "শক্তের ভক্ত, নরমের যম।" যাহার শক্তি আছে, এই সংসারে তিনিই শ্রেষ্ঠ।

তাই আমাদের এখন শুধু শক্তি সঞ্চয় করা আবশ্যক। শক্তির সাধনাই আমাদের এখন ধর্ম্ম হওয়া উচিত এবং তাই ধর্ম্ম জিনিষটা হইবে ক্রিয়ামূলক। স্বামীজীর কথায় ধার্ম্মিকের লক্ষণ হইতেছে—সদা কার্য্যশীলতা।" এই ধর্ম্ম কথাটা তাই মীমাংসকদের মতে ব্যবহার করা হইয়াছে। "অনেক মীমাংসকদের মতে বেদে যে স্থলে কার্য্য করতে বলছে না, সে স্থলগুলি বেদই নয়।" এই "ক্রিয়ামূলক ধর্ম্মই" মানুষকে শক্তিমান তেজোমণ্ডিত করিয়া তুলিতেছে। "power belongs to the workers". যাহারা কায করেন, প্রকৃত ক্ষমতা তাঁহাদেরই করতলগত। তাই স্বামীজী বলেন, "বুক বেঁধে কাযে লেগে যা, অনবরত কায কর্—কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে"—এবং কর্ম্মবীর বিবেকানন্দের অমিত তেজের বিকাশ দেখা যায় ক্ষাত্রবৃত্তিতে—কর্ম্মের অটল দৃঢ়তায়। অর্থাৎ কর্ম্মযোগের ভিতর দিয়াই স্বামীজীর শক্তিমন্ত্র সম্যক্ ফুটিয়া উঠিয়াছে। মহাত্মা গন্ধীও কর্ম্মযোগ আশ্রয় করিয়া ভারতে শক্তিমন্ত্র প্রচার করিতেছেন। কিন্তু স্বামীজী এবং মহাত্মাজীর মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য দৃষ্ট হয়—রাজনীতিক্ষেত্রে তিলক ও গন্ধীর ব্যবধানের মত কতকটা ব্যবধান লক্ষিত হয়। গন্ধী আত্মিক শক্তির (Soul force) উপরই যেন সব জোর দেন—দৈহিক শক্তিকে পাশবিক শক্তি (Brute-force) হিসাবে পরিহার করিতে চাহেন বলিয়া বোধ হয়। স্বামী বিবেকানন্দ কিন্তু এ বিষয়ে অনেকটা তিলকের মত; লোকমান্যও স্বামীজীর মত অসামান্য তেজস্বী পুরুষ ছিলেন। স্বামীজী তিলকের মত আত্মিক শক্তিকে আমল না দিয়া একটু এড়াইয়া চলিতে চাহিয়াছেন; এবং দৈহিক শক্তিটার উপর স্বামীজী সময় সময় এমন জোর দিয়াছেন যে, তাহাতে উহার প্রতি স্বামীজীর প্রবল টান অনুমান করা কিছু অস্বাভাবিক নহে। ক্ষাত্রতেজ—রাজসিক ভাব যে স্বামীজীর মধ্যে তিলকের মত প্রবল মাত্রায় বিদ্যমান ছিল, ইহা নিঃসন্দেহ বলিতে পারা যায়। আমার বিশ্বাস, ভক্তিযোগ বা জ্ঞানযোগ অপেক্ষা নিষ্কাম কর্ম্মযোগের প্রতি স্বামীজীর বিশেষ টান ছিল। তাই বোধ হয়, প্রাচীন ঋষিগণের প্রার্থনার সঙ্গে স্বামীজীর শক্তিমন্ত্রের বেশ মিল দেখিতে পাই। ঋষিগণ প্রার্থনা করিতেন—

"বলমসি বলং ময়ি ধেহি।
বীর্য্যমসি বীর্য্যং ময়ি ধেহি।
তেজোঽসি তেজো ময়ি ধেহি।
ওজোঽসি ওজো ময়ি ধেহি।"

স্বামী বিবেকানন্দের শক্তিমন্ত্র যেন উক্ত মন্ত্র কয়টির প্রতিধ্বনিমাত্র।

ঋগ্বেদের ঐতরেয় ব্রাহ্মণেও স্বামীজীর শক্তিমন্ত্রের পরিপোষক একটি অপূর্ব্ব উপাখ্যান দেখিতে পাই। রোহিত নামে এক নৃপতি পথে বাহির হইয়াছিলেন। পথশ্রান্ত রোহিত রাজা ক্লান্তির বশে ঘরে কায আছে মনে করিয়া বাড়ী ফিরিতেছিলেন। "সকল অভাবের পূরণকর্ত্তার" কথা তাঁহার মনে ছিল না। তাই দেবতা ব্রাহ্মণরূপ ধারণ করিয়া গৃহগমনোদ্যত রোহিত রাজার সম্মুখে হাজির হইলেন। ব্রাহ্মণ রোহিতকে প্রতিনিবৃত্ত করিলেন, সম্মুখে অগ্রসর হইতে উপদেশ দিলেন—"হে রোহিত, চলিতে থাক, পথে বাহির হও, গৃহে ফিরিও না।" বার বার রোহিত শ্রান্ত বলিয়া গৃহে ফিরিতে চাহিলেন, বার বার ব্রাহ্মণরূপী দেবতা রোহিতকে প্রতিনিবৃত্ত করিলেন—"হে রোহিত, চিরকালই শুনিয়াছি যে, চলিতে চলিতে যে ব্যক্তি শ্রান্ত হইয়াছে, তাহার শ্রীর—ঐশ্বর্য্যের আর ইয়ত্তা থাকে না। শ্রেষ্ঠ জনও যদি শুইয়া পড়িয়া থাকে, তবে সে তুচ্ছ হইয়া যায়। যে ব্যক্তি অনবরত চলিতেছে, স্বয়ং দেবতা তাহার বন্ধু হইয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে বিচরণ করেন। অতএব হে রোহিত, যাত্রা কর, পথে বাহির হও, চলিতে ক্ষান্ত হইও না, গৃহে ফিরিবার নাম লইও না।

"হে রোহিত, যে ব্যক্তি বিচরণ করে, শ্রমবশতঃ তাহার দৈহিক কান্তি বিকশিত কুসুমের ন্যায় সুষমাময়ী হইয়া উঠে, তাহার আত্মা দিন দিন বৃহৎ হইতে বৃহত্তর হইতে থাকে,

এবং সে নিত্যই বৃহত্ত্বের ফল লাভ করে। যে পথ সম্মুখে নিত্য উন্মুক্ত, সেই পথে যে বিচরণ করে, শ্রমের দ্বারা হতবীর্য্য হয়, তাহার সকল পাপ মরিয়া শুইয়া পড়ে। অতএব হে রোহিত, বিচরণ কর, বিচরণ কর।

"কে বলে দেবতা ভাগ্য দান করে? মুক্তপথে যে বাহির হয়, সে নিজের ভাগ্য নিজের হাতে সৃষ্টি করিতে করিতে চলে। কাহার সাধ্য যে, তাহার ভাগ্য স্পর্শ করিবে? যে বসিয়া থাকে, তাহার ভাগ্যও বসিয়া থাকে; যে উঠিয়া বসে, তাহার ভাগ্যও উঠিয়া বসে; যে শুইয়া পড়িয়া থাকে, তাহার ভাগ্যও শুইয়া পড়িয়া থাকে; যে চলিতে আরম্ভ করে, তাহার ভাগ্যও চলিতে আরম্ভ করে। অতএব হে রোহিত, যাত্রা কর, তুমি পথে বাহির হও, চলিতে থাক, তোমার ভাগ্যও চলিতে থাকিবে।

"যে ব্যক্তি মূঢ়, তাহারই নিত্য কলিযুগ। তাহার যুগ যে বাহির হইতে আইসে। যে ব্যক্তি মুক্তপথে যাত্রা করিয়াছে, তাহার কিসের ত্রেতা, কিসের দ্বাপর, কিসের কলি? সে আপনার সত্যযুগ আপনি গড়িয়া লইতে থাকে—

'কলিঃ শয়ানো ভবতি, সঞ্জিহানস্তু দ্বাপরঃ।
উত্তিষ্ঠংস্ত্রেতা ভবতি, কৃতং সম্পদ্যতে চরন্॥'

যে ব্যক্তি শুইয়া পড়িয়া থাকে, তাহার কলিযুগ লাগিয়াই থাকে। যে ব্যক্তি জাগিয়া উঠিয়া বসিল, তাহার দ্বাপর; যে ব্যক্তি উঠিয়া দাঁড়াইল, তাহার ত্রেতাযুগ উপস্থিত হইল আর যে ব্যক্তি মুক্তপথে যাত্রা করিল, সে সত্যযুগ সৃষ্টি করিয়া চলিল।"

ঐতরেয় ব্রাহ্মণের এই কয়েকটি অগ্নিমন্ত্র আজ ভারতের নগরে নগরে—পল্লীতে পল্লীতে উদ্‌ঘোষিত হওয়া আবশ্যক। হতাশ, অবসন্ন, বিষাদমলিন, ভবিষ্যৎ আশাভরসাশূন্য ভারতবাসীর আজ এই শক্তিমন্ত্রে দীক্ষা লওয়া ব্যতীত মুক্তির দ্বিতীয় উপায় নাই।

রামকৃষ্ণমিশন এবং বেলুড় মঠের প্রতিষ্ঠাতা কর্ম্মবীর ধর্ম্মপ্রচারক বিবেকানন্দ ঐতরেয় ব্রাহ্মণের ঐ অগ্নিমন্ত্রে জন্ম হইতে দীক্ষিত ছিলেন। তাই এই সর্ব্বত্যাগী পরিব্রাজক সন্ন্যাসী আমরণ অক্লান্ত কর্ম্মীর অপূর্ব্ব আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন। তাই এই কর্ম্মযোগী বীর সন্ন্যাসী অকুণ্ঠিত চিত্তে প্রচার করিয়া গিয়াছেন যে, "বীরভোগ্যা বসুন্ধরা, বীর্য্য প্রকাশ কর, সাম দান ভেদ দণ্ডনীতি প্রকাশ কর, পৃথিবী ভোগ কর, তবে তুমি ধার্ম্মিক। আর ঝাঁটা-লাথি খেয়ে, চুপটি ক'রে, ঘৃণিত জীবন যাপন করলে ইহকালেও নরকভোগ, পরলোকেও তাই।" সর্ব্বত্যাগী, সংসারবিরাগী, ব্রহ্মচারী, সন্ন্যাসব্রতাবলম্বী, জগদ্ধিতায় সেবাধর্ম্মে উৎসৃষ্ট-প্রাণ, স্বামী বিবেকানন্দের মুখে ভারতের গৃহস্থরা এই সব অদ্ভুত আশ্চর্য্য অভিনব বাণী শুনিয়া নূতন প্রেরণা লাভ করিয়াছে—নবভাবে উজ্জীবিত হইয়া উঠিয়াছে। আজ নানা দেশের নানা জাতির শত সহস্র লোক স্বামীজীর গ্রন্থাবলী পাঠ করিয়া নব ভাবে অনুপ্রাণিত—নব শক্তিতে উদ্বোধিত হইয়া আশা ও উৎসাহে বুক বাধিয়া অদম্য উদ্যমে জীবন-যুদ্ধে অগ্রসর হইতেছে।

"পশ্চাতে ফিরিও না, কেবল সাম্‌নে এগিয়ে যাও।" "ভগবানের মহিমা ঘোষিত হউক, আমরা সিদ্ধিলাভ করিবই করিব। তুচ্ছ জীবন, তুচ্ছ মরণ, তুচ্ছ ক্ষুধা, তুচ্ছ শীত, অগ্রসর হও—পশ্চাতে চাহিও না, কে পড়িল, দেখিতে যেও না, এগিয়ে যাও—সম্মুখে, সম্মুখে।"

"এস, মানুষ হও, নিজেদের সঙ্কীর্ণ গর্ত্ত থেকে বেরিয়ে এসে বাইরে গিয়ে দেখ, সব জাতি কেমন উন্নতি-পথে চলেছে। তোমরা কি মানুষকে ভালবাস? তোমরা কি দেশকে ভালবাস? তা হ'লে এস, আমরা ভাল হবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করি, পেছনে চেও না—সাম্‌নে এগিয়ে যাও।

"হে বীর, সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে বল—আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই। বল, মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই; তুমিও কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত হইয়া সদর্পে ডাকিয়া বল—ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্দ্ধক্যের বারাণসী। বল ভাই—ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ। আর বল দিনরাত—হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও; মা আমার দুর্ব্বলতা কাপুরুষতা দূর কর, আমায় মানুষ কর।"

শ্রীকলিঙ্গনাথ ঘোষ।

ভাদুড়ী মশাই

৯

সাতটি বন্ধু সখ ক'রে মধুপুরে বেড়াতে এসে আজ আড়াই মাস রয়েছেন। নববর্ষ না এলে নড়বেন না, নূতন হয়ে ফিরবেন, এই সঙ্কল্প। কেবল এক জনের আর নীচু দিকে নাম্‌বার গা নেই—উঁচু দিকে এগোবারই ইচ্ছা। সকলেই সকর্ম্মা, কেহ নিষ্কর্ম্মা নন। তবে তাঁদের বিচিত্রকর্ম্মাও বলতে পারেন। আবার সমষ্টিভাবে বলতে গেলেও বিশ্‌-কর্ম্মাও বলা চলে। আজকালের দিনে তাঁরা অস্বাভাবিক কিছু না হলেও, তাঁদের একটা সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া দরকার।

(১) অক্ষয় বাবু,—ইনি গুজরুটী গড়নের ঘন শ্যাম-

অক্ষয় বাবু

বর্ণ লোক। হাত বুলাবার মত ভুঁড়ি দেখা দিয়েছে। পঁয়ত্রিশেই বেশ প্রবীণ। এক মুখ দাড়ি,—এক বুক চুল। মুরুব্বী ভাবাপন্ন। মাষ্টারী করতেন, অধুনা বেকার। খুব দ্রুত দুর্ব্বোধ প্রবন্ধ সৃষ্টি ক'রে মাসিকে দিয়ে থাকেন। সম্পাদক মহাশয়রা "শক্তের তিন কুল মুক্ত" এই প্রাচীন বচনটির সম্মান রক্ষা ক'রে সেগুলিকে First place (প্রথম স্থান) দেন,—যাতে পাঠকরা সহজে টোপ্‌কে যেতে পারেন। লোকটি কর্ত্তা ব্যক্তি।

(২) কোরক রায়,—বয়স বাইশ। তা' হলেও ইনি এক জন প্রাচীন কবি, যেহেতু, স্কুলে যেতেন এবং বেতন দিতেন, কেবল কবিতা লেখবার জন্যে। পাছে মোটা হ'লে চেহারার পোইট্রি নষ্ট হয়, দুধ-ঘি খান না। সেই কারণে বা "যাদৃশী" ভাবনার আতিশয্যে, দেহটা উর্দ্ধগতি লাভ ক'রে চামর-শীর্ষ দেহদণ্ডে দাঁড়িয়ে গেছে। চাউনিটা ওর চেয়ে স্থির হলে এবং কাঁদবার লোক থাকলে, কান্না প'ড়ে যায়। এক পায়ে লপেটা, অন্য পায়ে মাত্র প্রিজার্ভার (অবশ্য সে দিন আমরা যা দেখেছি)।
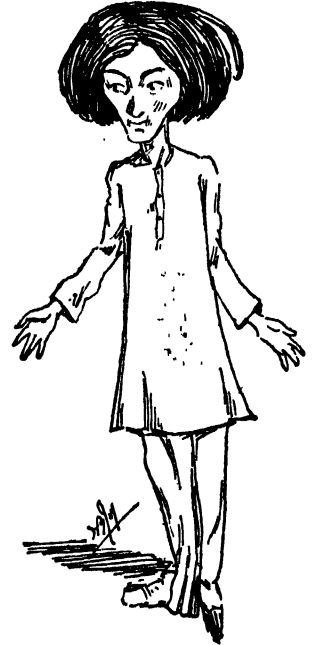
কোরক রায়

সর্ব্বসাকুল্যে মানুষটি যেন একটি Ladys'umbrella (মেয়ের ছাতা)। এঁকে দশ জনে দেশ-ছাড়া করেছে। যখন যে বিষয়টি লিখবেন ভেবেছেন, আশ্চর্য্য—কেহ না কেহ সেটি লিখে বসে। বাঙ্গালা দেশের কবিরা এমনই পরশ্রীকাতর

যে, তাঁর নির্ব্বাচিত ৫৭টি বিষয়ের একটিতেও তাঁকে হাত দিতে দেয়নি! তিনি প্রথম একটি তালিকা দেখিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন,—সকল বিষয়গুলির বুকেই কালির কসি টানা! তাই দেশ ছেড়ে সাঁওতাল পরগণায় এসেছেন। কাব্য-জগতে তাদের অকৃত্রিম সৌন্দর্য্যের কিছু রেখে যাবেন। নোট্ (notes) সংগ্রহ চলেছে। একটু আধটু লেখাও আরম্ভ করেছেন।

(৩) বিমানশশী,—গল্প লেখেন। কোন'টাই শেষ করেন না, পাঠকদের উপর ছেড়ে দেন। তাতে দেশের একটা খুব বড় কায করা হয়। পাঠকদের ভাবতে হয়,—মাথা খোলে। আবার একটি গল্প হাজারো রকমে শেষ হবার সম্ভাবনাও রাখে। তিনিও প্লটের পিত্তেশে পরদেশী। জড় করেছেনও অনেক, এখন লিখে উঠতে পারলেই হয়। একটা এমন দিক দেখিয়ে দেবেন, যা আজও অজ্ঞাত। একসঙ্গে দু'টি ফেঁদেছেন; প্রাতে লেখেন—"পাহাড়ী ময়না", রাতে লেখেন—"মহুয়ার মধু।" যে সব কথা ব্যাস ছেড়ে গেছেন, ইনি তা উপন্যাসের মধ্যে পূরণ করতে বদ্ধপরিকর।

বিমানশশী অব্যক্তকুমার

(৪) অব্যক্তকুমার,—গবেষণা নিয়ে থাকেন। এইমাত্র বৈদ্যনাথ হ'তে এলেন। দধীচির আশ্রম যে বৈদ্যনাথেই ছিল, তার প্রমাণও ভাঁড়ে ক'রে ফিরেছেন। বৈদ্যনাথের প্রসিদ্ধ "দধিই" তাঁকে প্রথম ইঙ্গিত দেয়। এক্ষণে চিঁড়ায় কি চিনির মধ্যে দধীচির "চি"টুকু আত্মগোপন ক'রে আছে, তাহাই মাত্র তাঁর প্রতিপাদ্য রয়ে গেছে। তাঁর পকেট থেকে ডজনখানেক ফাউণ্টেন্ পেন্ বেরুলো। সবগুলিই বে-কাম। চিন্তার চোটে অন্যমনস্কে চিবিয়ে ফেলেন। ওটা অভ্যাসদোষ কি মুদ্রাদোষ,—সে সম্বন্ধে তিনি আজও নিজেই নিঃসন্দেহ নহেন।

(৫) বেলোয়ারী বাবু,—স্বরলিপিতে সিদ্ধহস্ত। সম্প্রতি তেলেগু গানের স্বরলিপি নিয়ে পড়েছেন। ক্লারিওনেট্ বাজান,—এসরাজ শেষ ক'রে বিলিয়ে দিয়েছেন। কেবল হারমোনিয়ম্ ছোঁন না,—মেয়েদের জন্যে উৎসর্গ করেছেন। রোগা, লম্বা। শারীরিক সেরা সম্পত্তির মধ্যে মাথায় সের দুই চুল। ডাক্তারদের শঙ্কা, গলাটা যে রকম কৃশ—আর কিছু কম ফুট খানেক দীর্ঘ, কেশের ভারে নানা বিদ্যায় বোঝাই করা মাথাটা সহসা কোন্ দিন কেন্দ্রচ্যুত হ'তে পারে। টুঁটিটে সিগ্ন্যাল্ পোষ্টের পাখার মত ঠেলে বেরিয়ে আছে। মুখখানা ঘোড়ার আভাস দেয়।

বেলোয়ারী বাবু

কেহ কেহ তাঁকে কিন্নর ভাবেন, কেহ বা হয়গ্রীব বলেন। সমুদ্রে জাহাজের মাস্তুল সর্ব্বাগ্রে দেখা যায়, তাতে না কি প্রমাণ হয়—পৃথিবী গোল। তেমনি বেলোয়ারী বাবুর টুঁটিটা আগে দেখা দেয়, তাতে ক'রে প্রমাণ হয়—তিনি আসছেন। শরীরটে সামলে নিতে মধুপুরে আসা।

আলেখ্য

(৬) আলেখ্য,—চিত্রশিল্পী। সে এক আঁচড়ে সাঁওতাল পরগণার সজীব নির্জ্জীব ইস্তক মনোরাজ্য ফোটাবে, এই সঙ্কল্প নিয়ে বেরিয়েছে।

(৭) কিংশুক,—বড়লোকের ছেলে। কোষ্ঠীতে লেখা ছিল—যৌবনের পূর্ব্বেই পূর্ণ ভাগ্যোদয় হবে, তা হয়েছে। কোম্পানীর কাগজের সুদে আর বাড়ীভাড়ায় এখন তার বাৎসরিক আয় হাজার ষাটেক। কার্ত্তিকের মত চেহারা। হাসিটি কিন্তু ফিকে। B. Scর (বি, এস, সির) মাঝামাঝি—১৪ বৎসরের বাগ্‌দত্তা কস্তুরিকা মারা যাওয়ায় মোচ্‌কে গেছেন। গবাক্ষপথে সন্ধ্যার আবছায়ায় দু'দিন দেখেছিলেন, আর দু' কিস্তিতে সাড়ে সাত লাইন (নিক্ষিপ্ত) পত্রপ্রাপ্তি। এইতেই তাঁকে বৈরাগ্যের পাকে চড়িয়ে দিয়ে কস্তুরিকা চ'লে গেছেন। চুপ্‌ চাপ্‌ থাকেন, আর বৈরাগ্য মুখস্থ করেন। তবে থাকেন খুব ফিট্‌ফাট্‌। বৈরাগ্যের বেগ যে দিন প্রবল হয়, সে দিন শোক-সঙ্গীত লিখে ফেলেন। একশো হলেই "শোক-শতক" নামে প্রকাশ করবেন।

তাঁর উল্লেখযোগ্য গুণ দুটি,—মাংস খুব ভাল রাঁধতে পারেন, আর গলাটি খুব মিষ্টি। বাগ্‌দত্তা-বিয়োগে গান বাঁধাটাও এসে গেছে, এটা আকস্মিক স্ফুরণ। মেয়েমহলে "প্রেমের মাষ্টার" ব'লে তাঁর প্রসিদ্ধি। আজ কাল মাংস রেঁধে খাওয়ান, নিজে আর খান না, নিরামিষ ডিমেই সেরে নেন। নাকে দীর্ঘ নিশ্বাস, আর বুকে ভিজে টোয়ালে—এই নিয়ে থাকেন। গান গাওয়া বন্ধই করেছেন, কারণ, অক্ষয় বাবু বলেন,—"ভাই, পরিবার ছেলেপুলে ফেলে এসেছি, বাড়ীতে বৃদ্ধা মা। তোমার করুণ কণ্ঠে বৈরাগ্যের ভাষা দিন দিন আমাদের উদাস ক'রে দিচ্ছে। মানুষের মন না মতি, কোন্ দিন মোরিয়া হয়ে, তাদের পথে বসিয়ে দিয়ে বদ্‌রিনারায়ণের পথ ধ'রে বেরিয়ে পোড়্‌বো; জ্ঞান থাকতে থাকতে তুমি থামো ত' এখনও উপায় হয়, ও ভিটে ওড়ানো ভৈরবী আর ভেঁজ না।" তাই তিনি বাসায় আর বড় একটা গান না। ক্রমে এখন তাঁর মনের ভাব দাঁড়িয়েছে—"এস্‌পার কি ওসপার!" নয় ততোধিক লাভ (তাঁর ধারণা সেটা সম্ভবই নয়) না হয় ওপর পানে ঝুলে পড়া। তাই সাধু খুঁজতে বেরিয়েছেন, এক জনের পাত্তাও পেয়েছেন, যাতায়াতও চলেছে।

কিংশুক

* * * *

এঁরা যে বাংলাখানি নিয়েছেন, সেখানিকে মধুপুরের শোভা বলা চলে। সামনের বাগানও ফুলে ফুলে হাসছে। ফটকে সাইনবোর্ডে আলেখ্যের নিজের তুলিতে লেখা—"সপ্তর্ষিমণ্ডল।" পোষ্ট আফিসে সেটা জানানো হয়েছে। ঐ ঠিকানায় পত্রাদি আসে।

প্রত্যেকেই এক একখানি ডায়েরি খুলেছেন। রোজ রাত্রে তাতে নিজের নিজের দৈনন্দিন সঞ্চয়টা সংক্ষেপে

লিখে রাখেন। প্রভাতী চায়ের মজলিসে সে সব শোনাতে হয় এবং তা নিয়ে আলোচনাও চলে। সে আসরে অবগুণ্ঠন নেই, শিক্ষিতমাত্রেই যোগ দিতে পারেন।

অক্ষয় বাবুর ধারণা—একত্র এই নোট্গুলি যখন—"সপ্তর্ষিমণ্ডল" নাম নিয়ে, ছাপার অক্ষরে অ্যাণ্টিকে দেখা দেবে, তখন এর জন্যে জগতে একটা ভীষণ সাড়া প'ড়ে যাবে। ইতোমধ্যেই ভিতরে ভিতরে ইংরাজীতে তিনি তরজমা ক'রে চলেছেন। কারণ, এটা পাবার জন্যে বিলেতের লোকই বেশী ঝুঁকবে! যখন বিজ্ঞাপনে দেখবে, সাত জন শিক্ষিত লোকের বিভিন্ন শিল্পের সার এর মধ্যে রয়েছে, তখন সাত সমুদ্র পার থেকে তারা হাত বাড়াবে! বিজ্ঞানের চোখে দেখতে যে তারাই জানে, অথচ আমাদের লেখার মধ্যে কি থাকে, তা আমরাই বুঝি না। আমরা যেটাকে দেখি পাটের তাল, তারা সেটাকে দেখে কাশ্মীরী শাল।

* *

*

ডেপুটী সুবর্ণকান্তি বাবু পূজার বন্ধে ভাগলপুর ছেড়ে মধুপুরে এসেছেন। "সপ্তর্ষিমণ্ডলের" গায়েই তাঁর বাংলা। সঙ্গে স্ত্রী আর দুই কন্যা। মীরা ম্যাট্রিক পাস্ ক'রে I. Sc. (আই এস সি) পড়ছে, ইরাণী, এই বছর ম্যাট্রিক দেবে। মীরা স্বল্পভাষিণী, লজ্জাশীলা—শান্তদর্শনী সুন্দরী। ইরাণী হাস্যোজ্জ্বল, রহস্যপ্রিয়া, দীপ্তিময়ী। দুটি মেয়েই সুন্দরী, তবে ভিন্ন প্রকৃতির। এঁরা উন্নতিশীল হিন্দু পরিবার।

শুনলাম, এঁরা সারতে এসেছেন। দেখলুম, কারুর চেহারার কোনখানটাই ত সারবার অপেক্ষা রাখে না, সকলেরই নিখুঁৎ স্বাস্থ্য।

সুবর্ণবাবু বাংলার বারান্দায় ব'সে ষ্টেটস্‌ম্যান্‌খানা দেখছিলেন। পাশের ঘরে পত্নী মন্দাকিনী মেয়েদের বলছিলেন—"অত ঘন ঘন যাওয়া আমি পছন্দ করি না,—তাতে লোকের আগ্রহ জাগে না,—মামুলি আলাপের আল্‌পো জিনিষ হয়ে পড়তে হয়। ভাবে—আসবেই অখন। কারুর এ রকম ভাবাটা আমি অপমান ব'লে মনে করি।"

ইরাণী সহাস্যে বললে—"তুমি কি মা! এত কথা ভেবে লোকের সঙ্গে মেলা-মেশা! আমরা যাই ওঁদের ডায়েরি শুনতে। মানুষ ত দুনিয়াময়, কিন্তু ও জিনিষটা ওই "সপ্তর্ষিমণ্ডলেই" মেলে। তুমি পাগলাগারদ দেখতে যেতে না?"

মন্দাকিনী বলিলেন,—"এত পয়সা খরচ ক'রে মধুপুরে আসা ডায়েরি শুনতে!—পুরুষদের কাছে খেলো হ'তে! ওরা যদি বুঝে ফেলে, তোদের ডায়েরির নেশা ধরেছে, দেখবি—লেখা দিন দিন দৌড়ে চলেছে, আর তাতে সাত কুটি মিছে কথা ঢুকেছে। খবরদার, কিসে তোরা খুসী হোস—সেটা যেন কিছুতে না ধরা পড়ে। তোদের বাবা আজো তা—"

বারান্দায় First class Deputy (প্রথম শ্রেণীর ডেপুটী) চম্‌কে উঠলেন।

ইরাণী চোখে মুখে টান ধরিয়ে বললে—"তুমি বলো কি মা,—বাবার মত দেবতার সঙ্গে—"

মন্দাকিনী ধাঁ ক'রে বললেন,—"সীমা জানতে পারলে, দেবতার দেবত্বেও সীমা এসে যায়। ওঁর উন্নতির পথে বাধা দেই কেন।"

মীরার মুখে হাসির রেখাটা ভেতর পিঠেই ফুটলো।

সুবর্ণ বাবু হাসির ফিকে আবরণে গাঢ় বিষাদের আভাটা ঢাকতে পারলেন না। কাগজখানা কোল থেকে প'ড়ে গেল।

প্রগল্‌ভা ইরাণী হাসিমুখে ব'লে ফেল্‌লে—"উঃ, কি দয়া মা তোমার!" আরও কি বল্‌তে যাচ্ছিল, কিন্তু মায়ের তীব্র কটাক্ষ তাকে থামিয়ে দিলে। তিনি কঠিন কণ্ঠে বললেন,—"স্থাখ ইরা—আমি তোর পেট থেকে পড়িনি!"

ইরাণী গম্ভীর হয়ে বল্‌লে—"তুমি কি ক'রে জানলে, মা!"

শঙ্কিতা মীরা বল্‌লে—"শুনলে ত,—তুমি আবার ওর কথায় রাগ করছো! ওর কোন্ কথাটার মাথামুণ্ডু থাকে, মা?"

উন্মুখ হাসিটা চেপে,—মা নরম হয়ে বল্‌লেন—"সেটা কি ভালো,—এখন আর ছেলেমানুষটি নয়। মেয়েমানুষের 'রূপের' পরেই 'কথাবার্ত্তা'।"

এই সময় বাংলার সামনে দিয়ে একখানা বেশ বড় ঝকমকে সুন্দর মোটর গুরুগম্ভীর রেশ ছাড়তে ছাড়তে মন্থর গতিতে সপ্তর্ষিমণ্ডলে গিয়ে ঠেকলো।

দেখবার আগ্রহে, তিন মায়ে ঝিয়ে তাড়াতাড়ি দক্ষিণের বারান্দায় হাজির হলেন।

মোটর থেকে পয়লা নামলেন—আমাদের পরিচিত মতি বাবু। তাঁর পোষাক-পরিচ্ছদ আজ দ্রষ্টব্য।

ইরাণী মীরার কাঁধে এক টিপুনি দিয়ে কানের কাছে বল্‌লে,—"তোমার ফতি বাবু!"

—"পোড়ারমুখী।"

—"নাম করতে আছে না কি!"

—"দেখ না মা"—

মীরা—ঠাকুর টাকুর হবেন।

ইরাণী—ঠাকুর হবে কেন, (নীচু সুরে) একেবারে পুরুত সঙ্গে ক'রে এসেছেন।

মীরা মুখ ফিরিয়ে মায়ের ওপাশে গিয়ে দাঁড়ালো।

মন্দাকিনী বললেন—"তোরা ডায়েরি শুন্‌তে যাবিনি?"

মীরা বল্‌লে—"আমি আজ আর যাব না মা।"

মন্দাকিনী—সে কি! যাবে না কেন? যাও—সেই চাঁপা রংয়ের কাপড়খানা প'রে নাও গে। আর আমার হার ছড়াটাও গলায় দিও।—তুমি কি পরবে ইরা?

ইরাণী সহজভাবেই বল্‌লে—"আমি ত যাব না। রোজ রোজ যাওয়া আবার কি,—ও আমি পছন্দ করি না।"

মন্দাকিনী—দেখ ইরা, আমি তোর পেট থেকে পড়িনি!
ইরা—কি ক'রে জানলে মা?

তার পর নাম্‌লেন—আমাদের নবনী।

মন্দাকিনী ব'লে উঠলেন—"বাঃ—এ ফুটফুটে ছেলেটিকে ত দেখিনি। মতি বাবুরই কেউ হবে। ওদের বংশই দেখছি রূপবান্। পড়াশোনা কতদূর কে জানে!"

এইবার বেরুলেন আমাদের আচার্য্য। তিনিই মোটর চালাচ্ছিলেন,—সোফার পাশেই ব'সে ছিল।

মন্দাকিনী—ও মা—ফোঁটাকাটা এ আবার কে?

মন্দাকিনী ইরাণীর মুখে একদৃষ্টে চেয়ে বললেন—"ধন্যি মেয়ে বাবা,—আমি বলেছি কি না, 'পছন্দ করি না।' বেজায় বাপের ধাতটি পেয়েছে—"

ইরাণী—অর্থাৎ মন্দ। তোমাকে বাপ তুলতে হবে না ত।

মন্দাকিনী দাঁও ফস্‌কাতে চান না, মোলায়েম মেরে বললেন—"ও মা, তুই যে ঝগড়া আরম্ভ করলি! আমি

কি কাউকে মন্দ বলিছি, মীরা? যাবে বই কি—লক্ষ্মীটি, তুমি না গেলে কোন খবরই পাব না। তোর বাপকে বলিস্ না—মতি বাবুকে আর ওই ছেলেটিকে বেড়াতে আসতে বলেন।"

ইরাণী যাবার তরে প্রস্তুতই ছিল, তাই অল্প দু'চার কথায় মা'র সঙ্গে মিটমাট হয়ে গেল।

মা বললেন—"ঠিক যে বেড়াতে গিয়েছ—এটা জানতে দিও না। আমাদের শুভ্রা বেরালটাকে দু'দিন দেখতে পাচ্ছি না—তার খোঁজটাও ত নেওয়া দরকার।"

ইরা মা'র অলক্ষ্যে এমন কতকগুলা হাসির রেখা মুখে ফোটালে, যার অর্থ বাছাই ক'রে বলা কঠিন।

* * * * *

দুই বোনে বেশ-ভূষাটা একটু সেরে নিচ্ছিলো। মীরার কোনও উৎসাহ না দেখে, আর তাকে নীরব দেখে, ইরা বললে—"কানে একটু কম শোনেন, এই ত। তা ত শীগ্‌গিরই সেরে যাবে বলেছেন। আর না সারলেও আমি ত কোনো ক্ষতিই ভাবি না। আমাদের শাস্ত্র বলছেন—বিবাহ হলেই দুই ঘুচে এক হয়। তবে আবার কতকগুলো নাক-কান নিয়ে কি হবে!"

মীরার কোন কথা শুন্‌তে না পেয়ে ইরা তার দিকে চাইতেই দেখলে—তার পদ্মের মত চোখ দুটি জলে ভাসছে। সে অপ্রতিভ হয়ে তাড়াতাড়ি—"ও কি দিদি—আমার কথায়"—বল্‌তে বল্‌তে নিজের আঁচল দিয়ে মীরার চক্ষু মুছিয়ে দিতে লাগলো। মীরা তার গলা জড়িয়ে বললে—"তোর কথায় কি আমি কখনও কিছু মনে করি, ইরা।" এই ব'লে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেল্‌লে।

ইরাণী সমবেদনা অনুভব ক'রে বল্‌লে--"মা'র যে কি পছন্দ, জানি না; উনি আড়াইশো টাকা মাইনে, পাঁচশোর গ্রেড, আর এই বয়সেই রায় বাহাদুর হবার আশা আছে শুনে গ'লে গেছেন! মতি বাবু রূপবান্, তা অস্বীকার করছি না।"

মীরা বললে—"কিন্তু ওঁর চোখের মধ্যে একটা কি যে আছে, যা দেখে আমি শিউরে গেছি, ইরা। সে আমি কারুকে ত বোঝাতে পারবো না। আমায় কিন্তু—"

ইরাণী মীরাকে জড়িয়ে ধ'রে বললে—"না—না, সে হ'তে পারে না, মাকে বিশ্বাস করতে পারবে না, তাকে,—না না, সে হবে না। উনি নিজে কথাটা তুলেছেন বলেই মা'র এত আগ্রহ,—তার সঙ্গে কন্যা-গর্ব্বও ফুটেছে। যাক্, তুমি আর ভেব না দিদি,—ও আমি উল্‌টে দেবো অখন। বাবার কিন্তু সম্পূর্ণ মত নেই, সেটা আমি বুঝেছি।"

মীরা বললে—"ইরা, আমি বাপ-মা'র কাছে লজ্জাহীনা হ'তে পারব না, অবাধ্যও হ'তে পারব না, তাই আমার এত ভয়, বোন্।"

ইরা অভয় দিয়ে বললে—"তোমাকে কিছু করতে হবে না, সব ভার আমার রইলো। চলো—ও-চিন্তা একেবারে মুছে ফেলে দাও। ওখানে কিন্তু আর মিছে সঙ্কোচ-টঙ্কোচ রেখ না, বেশ সহজভাবে থাকবে।"

১০

তারিণী সামন্তর যথাসর্ব্বস্ব ভাদুড়ীমশার পাল্লায় ঝুলছে। তাঁকে সন্তুষ্ট করতে সে সাতসমুদ্রের জল এক ক'রে বেড়াচ্ছে। আচার্য্যের উপদেশমত কোথা থেকে একখানা নতুন মিনার্ভা মোটরও জোগাড় ক'রে দিয়েছে। বৈকালে ভাদুড়ীমশাই সহ মাতঙ্গিনী হাওয়াগাড়ী চ'ড়ে হাওয়া খান।

আজ একটা নতুন যায়গায় বেড়াতে যাবার প্রস্তাব মতি বাবু আচার্য্যের কাছে করেই রেখেছিলেন। সর্ত্ত ছিল—ভেজাল না থাকে, অর্থাৎ নবনী। কারণ, সে ছেলেমানুষ, কল-কব্জাই নেড়েছে, জ্যান্তো জিনিষের কদর এখনও শেখেনি। মহিলাদের সামনে আমাদের Awkward positionএ (খয়ে বন্ধনে) ফেলে দিতে পারে। তাকে কোন কাযে পাঠিয়ে ওঁরা মোটরে বেরিয়ে পড়বেন, এইটে ছিল মতিবাবুর গড়াপেটা মতলব; আচার্য্যের গোয়েবি চালে সেটা গেল গুলিয়ে।

মাঝ পথে নবনী রথে উঠে পড়লো।

মোটর সপ্তর্ষিমণ্ডলে সাড়া দিতেই ঋষিরা আসন ছেড়ে বারান্দায় বেরিয়ে পড়লেন। চুলে, চশমায় আর পাঞ্জাবীতে যেন বায়স্কোপের একটা খাড়া গুরুপ্ বেরিয়ে এলো। বেখাপ্ ছিলেন কেবল মাষ্টার অক্ষয় বাবু,—এক বুক চুলের ওপর ধপ্‌ধপে একখানা টার্কিশ টোয়ালে ঝুলছে। তিনি আগুয়ান হতেই মতি বাবু পা বাড়িয়ে গিয়ে বন্ধুসমাজের সংবাদ দিলেন। অক্ষয় বাবু সাদরে "আসুন, আসুন" ব'লে অভ্যর্থনা ক'রে আচার্য্য আর নবনীকে এগিয়ে

নিলেন। ঋষিরা আপোষে হাসির রেখা টেনে সুমিষ্ট অমায়িক আওয়াজে,—দালানমুখো ট্যাড়চা হাত টেনে "আসুন" ব'লে তাঁদের ঘরে তুলে ফেললেন। হল-ঘর হেসে উঠলো।

লম্বা টেবলটার চারদিকের চেয়ারগুলো গা-নাড়া পেয়ে ঘড় ঘড় শব্দে সকলকে স্থান দিলে।

মতি বাবুর সর্ব্বত্রই গতায়াতের সুমতি থাকায় ঋষিদের সঙ্গেও আলাপ ছিল। তিনিই উভয়পক্ষের পরিচয় ক'রে দিতে লেগে গেলেন।

এই সময় সুবর্ণ বাবু সহ দুহিতাদ্বয়—মীরা ও ইরাণী, এসে উপস্থিত হতেই, পাড়াগাঁয়ের প্রাইমারী স্কুলে সহসা যেন ইনেস্পেক্টর ঢুকলেন। চেয়ার ছেড়ে, সব হুড়মুড় ক'রে দাঁড়িয়ে উঠলেন। মতি বাবু তড়াক্ ক'রে তফাৎ হয়ে সুবর্ণ বাবুর পায়ের ধুলো নিলেন। থিতুতে তিন মিনিট কেটে গেল। নবনীর চোখ দুটো লক্ষ্যভেদের চাউনিতে মীরার মুখে স্থির হয়ে উদ্ধেই আটকে রয়েছে দেখে, মতি বাবুর মুখখানা হঠাৎ বদ রং মেরে গেল। তিনি চাপা গলায় চুপি চুপি আচার্য্যকে বললেন—"আমি কি সাধে বারণ করেছিলুম, দেখছেন একবার নবনী বাবুর ভদ্রতাটা,—ই-কি!"

আচার্য্য ভাবভঙ্গীতে জানালেন—"বড় ভুল হয়েছে, আপনি ঠিকই বলেছিলেন," সঙ্গে সঙ্গে নবনীর আস্তিনটায় একটু টান মেরে তাকে অবনীতে নামিয়ে আনলেন।

তখন মতি বাবু আবার তাঁর অসমাপ্ত পরিচয়ের পালা সুরু করলেন। আচার্য্য amendment (সাধের গুছি) এগিয়ে দিতে লাগলেন। নবনী যে রুড়কির নয়া পাশ করা এঞ্জিনিয়ার Medalist and Specialist (চাকৃতিধারী মাতব্বর) এবং এক জন Research Scholar (ঢুণ্ডুপন্থী) তাই ঢোঁড়াঢুঁড়ির কাযে মোটা মাসোহারায় তাঁর সরকারী ডাক পড়েছে, ইত্যাদি ইত্যাদি, আচার্য্য বেশ বিজ্ঞাপনের ভাষায় বাতলে দিলেন। তাতে সকলের প্রচণ্ড প্রশংসা আর খর দৃষ্টি পড়ায় নবনী বেচারার গ'লে যাবার মত অবস্থা হ'ল।

আচার্য্য সেটা বুঝতে পেরে বললেন—"বাবাজীর দোষের মধ্যে বড় লাজুক আর তেমনি নম্র,—আজকালের তুবড়ি নয়।"

নবনীর গৌরবর্ণে গোলাপী চড়ছিল। সে চাপাগলায় আচার্য্যকে বললে—"কি করছেন!"

আচার্য্য তার কানের কাছে মুখ নিয়ে বললেন—"তোমার (middle ম্যানি) ঘটকালী!"

"বাঃ বাঃ, এঁরাই দেশের দীপ্তি, বাঃ" ইত্যাদির মধ্যে সুবর্ণ বাবু বললেন—"আমাদের দেখেই আনন্দ।" অক্ষয় বাবু বললেন—"এখানে বড় একটা কারুর সঙ্গে দেখাই হয় না, এক মতি বাবুই দয়া ক'রে আসেন। আজ আপনাদের পেয়ে পরম লাভ মনে হচ্ছে।"

বেলোয়ারী বাবু বললেন—"এও মতি বাবুরই কৃপায়। অতি সজ্জন লোক। ভগবানের কি বিচার, কানে শুনতে পান না, কথাবার্ত্তায় সুখ নেই। ক্ল্যারিওনেটও পৌছায় না, এ কি কম আপশোস্!"

আচার্য্য বললেন—"ঠিক কথা, কানে শুনতে পেলে ওঁর জোড়া মিলত না। যে রকম ভাল লোক, ও সেরে যাবে দেখবেন।"

ইরাণী মীরার দিকেই চাইলে। মীরার তখন প্রতি শিরা-উপশিরা নবনীতে নিমজ্জিত। ইরা মনে মনে চমকে গেল, বিবাহিত হওয়াও ত বিচিত্র নয়! নিমেষে তার উজ্জ্বল মুখশ্রী কে যেন মলিন মস্‌লিনে ঢেকে দিলে। সমুজ্জ্বল কক্ষে ল্যাম্পটার শিখা সহসা যেন কে এক প্যাঁচ কমিয়ে দিলে। দিদিকে সাবধান করবার জন্যে সে চুপি চুপি বললে—"ভদ্রলোকের বাছার ওপর বুঝি অমন ক'রে দিষ্টি দেয়!" মীরা কেবল ধীরভাবে চক্ষু নত করলে।

ইরাণী তার দিদিকে উদ্দেশ ক'রে বললে—"শুভ্রার খোঁজ নিতে এসে খুব খোঁজ করছি ত!" পরে অক্ষয় বাবুর দিকে চেয়ে বললে—"দিদির শুভ্রাকে এ বাসায় দেখেছেন কি? দু' দিন সে যে কোথায় গেছে, দেখতে পাচ্ছি না, দেখলে অনুগ্রহ ক'রে ধ'রে রাখবেন, না হয় আমাদের খবর দেবেন। তাকে খুঁজতেই এলুম।"

কিংশুক বললে—"সে কি দু'দিন আসেনি! বলেননি কেন, আগে শুনলে আমরাই খুঁজতুম। আহা, কি সুন্দর দেখতে, তেমনই নম্র, আর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন।"

ইরাণী আধো-ফুটন্ত হাসিমুখে বললে—"দু'দিন হয়ে গেলে বুঝি আর খুঁজতে নেই?"

কিংশুক—"না, তা বলছি না। আচ্ছা, আলেখ্য বাবুর

কামরাটা একবার দেখে আসছি; এ বাসায় উনিই দুগ্ধপোষ্য।

সকলে হাসলেন।

কিংশুক সেই ফাঁকে উঠে গিয়ে ষ্টোভ জ্বেলে চায়ের জল চড়িয়ে এলেন।

সুবর্ণ বাবু শুভ্রার প্রসঙ্গ বাহাল রেখে বললেন—"তিনি যে যত্নে থাকেন, রোজ সাবান মেখে নাওয়া, গায়ে এসেন্স, আবার বর্ণানুযায়ী নামকরণও হয়েছে।"

মীরা বাপের উপর রোষ ও নিষেধ-মিশ্রিত আধখানি কটাক্ষে চাইতেই তিনি হেসে নীরব হলেন।

আচার্য্য সবিনয়ে প্রশ্ন করলেন—"তিনি মহিলা বুঝি?"

সকলে অবাক্ হয়ে তাঁর দিকে চাইলেন। ইরা হাসি-চাপা চোখে বললে—"শুভ্রা আমাদের বেরাল!"

আচার্য্য সহজ সুরেই বললেন—"তা ত বুঝেছি মা, তিনি মহিলা কি না, তাই জিজ্ঞাসা করছি। দু'দিন সংবাদ নেই, সেটা খুবই চিন্তার কথা কি না। সন্তান-সম্ভবা নন ত? ওঁরা আবার অবলা—"

সকলে হেসে উঠলেন। আচার্য্য মূঢ়ের মত চেয়ে রইলেন।

অক্ষয় বাবু আচার্য্যের কথার ভাব বুঝতে পেরে বললেন -"আপনি ভুল ঠাউরেছেন, ওঁরা সীতার বনবাসের পক্ষপাতী নন।"

আচার্য্য অতি গো-বেচারার মতই বললেন—"কি জানি মশাই, আমি ঠিক সেকেলেও নই, আবার একেলেও নই, অকেলে কি বিকেলে, তা বুঝতে পারি না; আমার সময়টাও সুবিধে নয়, কলকেতায় তবু পাঁচ জন ব্যারিষ্টার বিনি পয়সায় মেলে—"

অব্যক্ত বাবু গবেষণার বিষয় খোঁজেন, তিনি ভ্রূদ্বয়ের মাঝখানটা দু' আঙ্গুলের টিপে ছেড়ে দিয়েই গম্ভীরভাবে বললেন—"এরূপ আশঙ্কার অবশ্যই কোন গভীর কারণ থাকতে পারে, সেটা চাই কি ভাবনার জিনিষ হ'তে পারে এবং তার মধ্যে কোন সমস্যা আত্মগোপন করেও থাকতে পারে—"

"ইস্—চায়ের জল চড়িয়ে এসেছি যে," ব'লে কিংশুক ওঠবার মুখে সুবর্ণ বাবু তাঁকে থামিয়ে দিয়ে, "এই যে এরা দুজন রয়েছে, আপনাকে আর কষ্ট করতে হবে না, সেটা কি ভাল দেখায়" বলতেই ইরাণী মীরার হাত ধরে তাকে তুলে নিয়ে পাশের ঘরে চ'লে গেল।

অব্যক্ত বাবুর বক্তব্য তখনও ফুরোয়নি, তিনি এই ব'লে সেটা শেষ করলেন—"যাক্, নবনী বাবুর রিসার্চে হাত দিতে চাই না, তাঁর এখন নবোদ্যম, সেটা খেলাবার খেই দেওয়াই ভাল।"

আচার্য্য আশ্চর্য্য হয়ে বললেন—"বাঃ, আপনার উদারতা দেখে মুগ্ধ হলাম। এই ত চাই, দেশে এইটিরই অভাব। ধাঁ ক'রে কেউ কেড়ে ফেলে বসে। দেখুন না, কোন এক জন লেখক কত ভাবনা, চিন্তা, দর্শন, গবেষণা, (আর লেখক যখন তখন "অনশন" ত ছিলই) এই সব ক'রে কুমারীদের গণ্ডে কোন এক অবস্থায় রাঙ্গা রংয়ের আবিষ্কার করেন। কোন বিশেষ ভাবের কত ডিগ্রি সংঘর্ষে ঐ রংটা দেখা দেয়, চাই কি তিনি সেটা বার ক'রে ফেলতেন। তাতে ক'রে চাই কি কালে আমাদের 'কালা' নাম ঘুচে যেতে পারতো। কিন্তু মশাই, দেশটি তা নয়, হাজারো লেখক যেন হাঁ ক'রে ছিলেন; ভাবা নেই, চিন্তা নেই, প্রত্যেকের নায়িকা দেখবেন ৫৬ বার লাল হচ্ছেন! অত ঘন ঘন লালে যে কাল্‌চে মারে, সে দুর্ভাবনা কারও নেই। এতে এই হ'ল যে, আবিষ্কর্ত্তা আঘাত খেয়ে 'দূর কর' ব'লে ঝটিতি থেমে গেলেন, ক্ষতিটি হ'ল দেশের। চাই কি ক্রমের দ্বারাতে ক'রে নীল, সবুজ, ভায়োলেটের আভাযুক্ত ঈষৎ পীত প্রভৃতি দেখান ত অসম্ভব ছিল না, বহুরূপীর ত হচ্ছে এবং তাদের F. H. ও (ফারন্ হিট্‌ও) বাতলে দিতেন। কেবল পাঁচ জনে ফাঁকা তুরুপ মেরে কি ক্ষতিটে ক'রে দিলে বলুন দিকি। অবশ্য ভাষার দিক্ থেকে একটু লাভ হয়েছে, সেটা অস্বীকার করছি না। এত কাল কালিমাটাই ছিল, অধুনা "লালিমা" এসেছে। ভাষার শ্রীবৃদ্ধিকল্পে ডালিমা কি অ্যাপ্‌লিমাতেও কারুর আপত্তি নেই, বরং প্রকাশের পথ সুগম হবে।"

অব্যক্ত বাবু হাঁ ক'রে শুনছিলেন। একটা নিশ্বাস ফেলে পকেট-বুকখানা বার ক'রে তাতে "বহুরূপী" কথাটা নোট ক'রে রাখলেন।

সকলে অবাক হয়ে আচার্য্যের কথা উপভোগ করছিলেন! তাঁর অ-মানান মূর্ত্তিটা মণ্ডলের মধ্যে বেশ

বে-মালুম মানিয়েও এসেছিল। নোটান্তে অব্যক্ত বাবু মাথা তুলে বললেন—"উঃ, আপনি কি চিন্তাশীল!"

আচার্য্য সহাস্যে বললেন—"মা-বাপ ওইটাই দিয়ে গেছেন—ওইতেই বেড়ে উঠেছি। ওটা আমাকে চেষ্টা ক'রে পেতে হয়নি।"

কিংশুক "আসছি" ব'লে চায়ের চত্বরে ঢুকতে গিয়ে দেখেন, "দোনো বহিনই দ্বারের পাশে দাঁড়িয়ে!"

"বাঃ, বেশ চা পাকাচ্ছেন ত!"

"হয়ে গেছে। আপনার অপেক্ষাই করছিলুম। ক্ষমা করবেন, দুনিয়ায় আপনার ত আর নিজের জন্যে কিছু করবার নেই, আমাদের হয়ে কাপ আর পিরিচগুলো টেবলে সাজিয়ে দিয়ে যদি সাহায্য করেন। অত লোকের মাঝখানে দিদির হাত-পা আসবে না, সকলের মাথায় মাথায় না বসিয়ে আসেন।"

মীরা বললে—"ওর কথা শুনবেন না; সকলের পাশ দিয়ে হাত বাড়িয়ে বাড়িয়ে ঘোরা আমার কম্ম নয়, দাদা।"

কিংশুক—ঠিকই ত, ভাগ্যিস আমি এলুম।

ইরাণী বললে—"তাও ঠিক, আবার আমিও যে খুঁজছিলুম, তাও ঠিক।"

"সেই মহিলাটিকে ত?"

মীরা মুখে আঁচল দিলে, ইরা সহাস্যে মীরার ঘাড়ে গিয়ে পড়লো।

"উনি কে দাদা, বেশ কথা কন ত!"

"সেটা আমিও ভাল জানি না। কথাবার্ত্তা বেশ, জানা-শোনাও অনেক। চলুন, চা'-টা চ'লে গেলে গলা আরও খুলতে পারে।"

[ক্রমশঃ।

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

প'ড়ো বাড়ী

১

গাঁয়ের শেষে নদীর পাশে ভাঙ্গা কুটীরগুলি,
দাঁড়িয়ে আছে জীর্ণ দেহে আধেক মাথা তুলি'।
বাঁশের খুঁটি বৃষ্টি-ঝড়ে,
লুটিয়ে আছে ধরার 'পরে,
আশে পাশে জমছে ধীরে গাঁয়ের কাদা-ধূলি।

২

নগ্ন পায়ের দাগেই গড়া পথের রেখাটিরে,
দু'পাশ থেকে দুর্ব্বাঘাসে ফেল্‌ছে ক্রমে ঘিরে।
দুয়ার-বিহীন ভাঙ্গা ঘরে,
আপন মনে ছাগল চরে,
ঝিঁঝিঁর ঝাঁঝর উঠছে বেজে নীরব বাতাস চিরে।

৩

ভোরের আলোক না ছড়াতে পূবের গগন-ধারে,
ঘাটটি নদীর আর জাগে না কঙ্কণ-ঝঙ্কারে।
শিশুর মুখের কলস্বরে,
ভবন কে আর মুখর করে,
জীর্ণ পুরী জড়িয়ে আছে বিরাট হাহাকারে।

৪

হর্ষ-দুখের মিলন-রেখা ধূলায় আছে ছেয়ে,
গৌরবেরি চিহ্ন লুকায় করুণ-চোখে চেয়ে।
আপন জনায় হিয়ায় স্মরি,
নীরব ব্যথায় হৃদয় ভরি,
কুঁড়ের স্মৃতি মিলায় ধীরে বিদায়-গীতি গেয়ে।

শ্রীসতীপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী।

ভাষায় পরপ্রভাব

প্রত্যেক ব্যক্তিরই ভাষা পৃথক্ পৃথক্। কোনও ব্যক্তি-বিশেষের মনোমধ্যে যে ভাবে ভাব-সম্পর্ক হয় এবং যে ভাবে তাহার বাহ্য অভিব্যক্তি হয়, অন্য ব্যক্তির মনে তাহা ঠিক সেইভাবে হয় না। ভাবের সহিত ভাষার যে সম্পর্ক, তাহাতে ভাষাকে ভাবের বাহন বলা যায়। ভাষা বাহিরের বস্তু আর ভাব মানবের মনোরাজ্যে উদিত ও বিকশিত হইয়া ভাষাকে বিকশিত ও পরিচালিত করে। মানসিক ভাবের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই ভাষার বিকাশ ও ভাষার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই ভাব বা চিন্তাবৃত্তির বিকাশ হইয়া থাকে। শিশুর মনোবৃত্তির অনুরূপই তাহার ভাষা। ক্রমে ক্রমে বয়সের সঙ্গে যেমন তাহার চিন্তাবৃত্তির বিকাশ হয়, সেইরূপ তাহারই সঙ্গে তাহার ভাষার সম্পদও বাড়ে। এখানে মনে রাখিবার কথা এই যে, অন্য লোকের মনোবৃত্তির বিকাশের সহিত শিশুর মনোবৃত্তির বিকাশের কোনও সম্পর্ক নাই। তাহার সমাজের অন্য লোক যেরূপ চিন্তা করিতে বা ভাষার ব্যবহার করিতে পারে, সে সেরূপ পারে না। তাহাকে বাহ্য শক্তিপ্রভাবে সমস্ত শিখিয়া লইতে হয় ; বুদ্ধির প্রাখর্য্য ও জড়তা অনুসারে তাহার মনে জ্ঞান ও ভাষার বিকাশের তারতম্য দেখা যায়। তাহার সমাজে যাহা কিছু থাকুক না কেন, তাহাতে তাহার স্বত্ব নাই। যতক্ষণ না বাহ্য শক্তি শিক্ষার প্রভাবে সে সেই ভাষার অধিকাংশ সম্পদ দখল করিয়া লইতে না পারিবে, ততক্ষণ ভাষা তাহার নহে। এইরূপে প্রত্যেক ব্যক্তির মনের মধ্যে ভাব ও ভাষার বিকাশ হয়। কারণ, এক জনের মনের সহিত অন্য জনের মনের কোনও সম্পর্ক নাই, সে সম্পর্ক কেবল ভাষা-রূপ বাহ্য শক্তির উত্তেজনায় জাগিয়া উঠে। সুতরাং সমাজে যত লোক থাকিবে, ততগুলি পৃথক্ পৃথক্ ভাষার সত্তা স্বীকার করিতে হইবে। তাহাতেও আবার ভয়ঙ্কর প্রভেদ। একই ব্যক্তি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নরূপে চিন্তা করে ও বিভিন্নরূপ ভাষায়, বিভিন্ন উচ্চারণে তাহার অভিব্যক্তি হয়। এই ব্যক্তিগত ভাষাই প্রকৃত ভাষা। সমাজগত যেমন একটা কোনও মন নাই, সেইরূপ সমাজগত ভাষাও থাকিতে পারে না। কারণ, ভাষার আধার মন। আর মনের সত্তা সমাজে নহে, ব্যক্তিতে ; সমষ্টিতে নহে—ব্যষ্টিতে। সুতরাং কোনও সমাজে ভাষার সংখ্যা গণনা করিতে হইলে ব্যষ্টির সংখ্যা গণনা করিতে হইবে। সমাজগত ভাষা abstraction বা ভাব-নিষ্কর্ষ, ইহার প্রকৃত সত্তা নাই, অধিকাংশের মধ্যে প্রচলিত ভাষা-সমূহের গড় লইয়া সামাজিক ভাষা কল্পিত হয়।

সুতরাং সমাজে কোন একটা নির্দ্দিষ্ট কালে যতগুলি লোক থাকিবে, ততগুলি বিভিন্নমুখী শক্তি সেই সমাজের সেই কালের ভাষাকে বিভিন্ন দিকে আকর্ষণ করিতেছে বলিতে হইবে। এই বিভিন্নমুখ আকর্ষণ যদি অসংযতভাবে চলিতে থাকে, তাহা হইলে ভাষার একতা-রক্ষা দুরূহ ব্যাপার হইয়া পড়ে। কিন্তু যেমন জড়জগতে, তেমনই অধ্যাত্ম-জগতে প্রত্যেক শক্তিরই এক একটা প্রতীপ শক্তি বর্ত্তমান থাকে। সেই শক্তি ঐ সকল বিভিন্নমুখী শক্তিকে সংযত করিয়া একটা নির্দ্দিষ্ট পথে পরিচালিত করে। এই কারণেই নানা শক্তির আকর্ষণ ও বিকর্ষণের ফলে চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র আপন আপন নির্দ্দিষ্ট কক্ষে অনন্তকাল বিচরণ করে, কখনও মার্গভ্রষ্ট হয় না। ঘড়ীর মেন্ স্প্রিং ঘড়ীকে চলচ্ছক্তি দান করে, কিন্তু হেয়ার স্প্রিং বা পেণ্ডুলম সেই শক্তিকে সংযত করে। ভাষার বিভিন্নমুখ আকর্ষণও সেইরূপ পরস্পরের প্রভাবে বিকর্ষণ শক্তি প্রাপ্ত হয় ! মনুষ্যের উচ্চারণের বিভিন্নতা ও বৈশিষ্ট্য এত বেশী যে, স্বর শুনিয়াই আমরা লোক চিনিয়া থাকি। কিন্তু উচ্চারণের বিভিন্নমুখিতা সেই পর্য্যন্ত কার্য্যকরী হয়, যে পর্য্যন্ত অর্থবোধে বাধা উপস্থিত না হয়। কারণ, লোক বুঝিতে না পারিলে উচ্চারণ-শক্তিকে এমন কৌশল অবলম্বন করিতে হইবে, যাহাতে সহজে উচ্চারণের সহিত অর্থের সম্পর্ক রক্ষিত হয়। কারণ, তাহা না হইলে তাহার কায চলে না। তাই দশ জনের গড় লইয়া ভাষার একটা সাধারণ লক্ষণ বা Standard ঠিক করিয়া লওয়া সম্ভবপর হয়।

যে কয়জন লোক লইয়া সমাজ, তাহাদের সকলের সমান শক্তি নহে। শিক্ষা ও সভ্যতার তারতম্য অনুসারে ভাষার উপর ব্যক্তিবিশেষের প্রভাবেরও তারতম্য হইয়া থাকে।

যাঁহারা শিক্ষিত ও সভ্য এবং যাঁহারা রাজনৈতিক কারণে শক্তিমান সমাজের অন্তর্গত, অন্য সকলে তাঁহাদেরই অনুকরণ করিয়া থাকে। সভ্যতা বিষয়েও যেমন, ভাষা বিষয়েও তেমনই। আবার যাঁহারা প্রতিভাবান্ সাহিত্যিক, তাঁহাদের সাহিত্যে ব্যবহৃত শব্দ অশুদ্ধ ও অপ্রচলিত হইলেও নূতন সৃষ্টিরূপে ভাষার অঙ্গীভূত হইয়া পড়ে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বিদ্যাসাগর মহাশয় বঙ্গভাষায় 'উভচর' শব্দের প্রচলন করিয়াছেন। মাইকেল কবিতা লিখিবার অভিনব রীতির প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। 'তারাশঙ্করী' ও 'আলালী' রীতির সংগ্রামের ফলে বঙ্গভাষা মধ্যপন্থা অবলম্বন করিয়াছে।

ব্যক্তিবিশেষের ন্যায় স্থানবিশেষও সময়ে সময়ে সমগ্র ভাষার উপর অভিন্ন কারণে প্রভাব বিস্তার করে। নবদ্বীপ শিক্ষার কেন্দ্র ছিল বলিয়া এক দিন নবদ্বীপের ভাষা যেমন সমগ্র বঙ্গভাষার উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, এক্ষণে কলিকাতার ভাষাও বঙ্গভাষার উপর সেইরূপ প্রভাব ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। জগতের সর্ব্বত্রই চিরকাল এই ভাবেই ভাষার সহিত ভাষার সংগ্রাম চলিয়া আসিতেছে এবং অনন্তকাল এই সংগ্রাম চলিতে থাকিবে। সুতরাং পরপ্রভাববিহীন ভাষা পৃথিবীতে থাকিতে পারে না। কখন্ কোথায় কি ভাবে কোন্ মানব কোন্ মানবের সহিত শিক্ষা, শাসন বা বাণিজ্য ব্যপদেশে মিলিত হইয়াছে, তাহা যেমন বলা যায় না, কোন্ ভাষার উপর কোন্ ভাষার প্রভাব কখন্ কি ভাবে পড়িয়াছে, তাহাও তেমনই বলা যায় না। অথচ এ কথা খাঁটি সত্য যে, পৃথিবীর প্রত্যেক ভাষাই অল্পবিস্তর পরিমাণে পরপ্রভাবে পুষ্ট।

কিন্তু পৃথক্ পৃথক্ ভাষা কি ভাবে পরস্পরের উপর প্রভাবান্বিত হইতে পারে, তাহা ভাবিয়া দেখা আবশ্যক।

পরভাষার প্রভাবও ব্যক্তিগতভাবে আরম্ভ হয়। কারণ, ব্যক্তিগত সম্পর্ক ভিন্ন অন্য কোনও প্রকার সম্পর্কই প্রকৃত-পক্ষে থাকিতে পারে না। প্রত্যেক ব্যক্তি বা অন্ততঃপক্ষে অধিকাংশ ব্যক্তির মনে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে কোনও প্রভাব প্রতিষ্ঠিত না হইলে তাহা বিস্তৃত হয় না। সেইরূপ কোনও প্রভাব বিস্তার করিবার সময়েও প্রথমে একটিমাত্র মনে তাহা উদিত হয়। অথবা একসঙ্গে একাধিক মনেও এক ভাব ফুটিতে পারে। তবে সেই প্রথম উন্মেষিত ভাব পুনঃ পুনঃ উদিত ও পর-মনে বিস্তৃত হইলে তবেই তাহা তিষ্ঠিতে পারে। নতুবা অকস্মাৎ একবার আবির্ভূত হইয়া পুনরুদ্ভবের অভাবে তাহা সর্ব্বতোভাবে লোপ প্রাপ্ত হয়।

ভাষায় পরভাষার প্রভাবের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা অনুকূল অবস্থা তখনই উপনীত হয়, যখন কোনও ভাষাবিশেষের অধিকৃত দেশ বা ভৌগোলিক সংস্থাপনের মধ্যে লোক একাধিক ভাষায় কথা বলিতে পারে। বহু ভাষায় কথা বলিতে পারিলেই সর্ব্বাপেক্ষা অনুকূল অবস্থা উপস্থিত হয়; তবে মাতৃভাষা ভিন্ন অন্ততঃ আর একটি ভাষায় কথা বলিবার মত জ্ঞান না থাকিলে পরভাষার প্রভাব আসিতে পারে না। অন্ততঃপক্ষে পর-ভাষা হইতে গ্রহণ করিবার উপাদান সমূহ বুঝিবার শক্তি চাই—তা সম্পূর্ণভাবেই হউক, আর অসম্পূর্ণ-ভাবেই হউক। যদি বাঙ্গালাদেশবাসী পার্শী, ইংরাজী ভাষা কখনও না জানিত, তাহা হইলে বঙ্গভাষায় এই দুই ভাষার উপাদান দেখিতে পাওয়া যাইত না। বঙ্গভাষায় বহু পোর্টু-গীজ শব্দ দেখিয়া এককালে বিস্মিত হইয়াছিলাম; কিন্তু যখন জানিলাম, এক কালে বঙ্গদেশের অনেক লোক পোর্টুগীজ ভাষায় কথা বলিতে জানিতেন, তখন বিস্ময় কাটিয়া গেল।

দেশে যখন দ্বিভাষীর সংখ্যা বেশী হয়, তখন ভাষায় পরপ্রভাবের সূত্রপাত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। আমাদের দেশের বর্ত্তমান অবস্থাই ইহার পরিচায়ক। এখানে দেশের সর্ব্বত্রই শিক্ষিত সমাজে ইংরাজী কথার বুকনি দিয়াই কথোপকথন চলে এবং কলম ধরিয়া মাতৃভাষায় কিছু লিখিতে গেলে ভাবের ঠেলা থাকিলেও ভাষা সাড়া দেয় না। এইরূপ স্থলে, অর্থাৎ শিক্ষার প্রভাবে যে পরপ্রভাব আমাদের ভাষায় আবির্ভূত হয়, তাহা সাধারণতঃ শিক্ষিত সমাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে এবং পরভাষা মিশাইয়া মাতৃভাষায় কথা বলা শিক্ষা ও স্বাধীনতার পরিচায়ক বলিয়া গণ্য হয়। কিন্তু পরপ্রভাব শিক্ষিত সমাজে প্রবেশ করিলেই সমগ্র ভাষা ও সমগ্র জাতিকে গ্রাস করিয়া ফেলে। কারণ, সমাজের নিম্ন স্তরের লোক চিরকাল উচ্চ স্তরের আদর্শ মানিয়া চলে।

ভাষায় পরপ্রভাব দুই প্রকারের হইতে পারে;—(১) পরভাষার শব্দ-গ্রহণ, ও (২) নিজ ভাষার উপাদান দিয়া পরভাষার ছাঁচে ভাষার গঠন। শব্দ-গ্রহণ ব্যাপারে পর-প্রভাব প্রণালীর জটিলতা কিছুই নাই। কিন্তু বাক্যযোজনা

প্রণালী গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে শিক্ষা ও সভ্যতার দিক্ দিয়া পরভাষার সবিশেষ সমাদর হওয়া চাই। সাধারণতঃ সাহিত্যের ভাষাতেই এরূপ পরিবর্ত্তন আরম্ভ হয় এবং নিম্ন-শ্রেণীর লোক সেইরূপ সাহিত্যিক রচনার সহিত অপরিচিতই থাকিয়া যায়। কারণ, এই প্রকার পরিবর্ত্তন চিন্তা প্রণালীর পরিবর্ত্তন-সাপেক্ষ, শিক্ষা ও সংস্কার ব্যতীত সে পরিবর্ত্তন হয় না। বহু কালের পর সমাজের নিম্নস্তরেরও এই প্রভাব বর্ত্তিয়া যায়।

পরভাষার শব্দ গ্রহণের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা অনুকূল কারণ অভাব বোধ। গ্রহীতব্য শব্দটিতে যে ভাব বহন করে, সেই ভাব প্রকাশ করিবার জন্য শব্দ যদি ভাষায় না থাকে আর সেই ভাব প্রকাশ করিবার আবশ্যকতা যদি অনুভূত হয়, তাহা হইলে বিদেশী শব্দ ভাষায় গৃহীত হইবেই হইবে। 'টেবিল' 'চেয়ার' 'রেল' ইষ্টিশন' 'টিকিট' 'জেল', 'জজ' প্রভৃতি এই শ্রেণীর শব্দ। বিদেশীয় লোক বা স্থানাদির নাম সাধারণতঃ তাহাদের ভাষা হইতেই গৃহীত হয়। উত্তমাশা, লোহিত সাগর, পীত সাগর, কৃষ্ণ সাগর, ভূমধ্য সাগর, মহাবীর সিকন্দর প্রভৃতি কয়েকটি স্থলে ইহার ব্যভিচার দেখা গিয়াছে। কোনও স্থানের নিসর্গজাত বস্তুর নাম সেই বস্তুর সহিত সেই দেশ হইতেই গৃহীত হয়। এইরূপ স্থলে অতি অশিক্ষিত জাতির নিকট হইতে অতি শিক্ষিত ও সভ্য জাতিও শব্দ সংগ্রহ করে। আখরোট, আবলুস, আবীর, বেদানা, আঙ্গুর, নাসপাতি, কিসমিস, পেস্তা, মুসব্বর, মোনক্কা, সেলেট প্রভৃতি এই জাতীয় শব্দ। বিদেশজাত কৃত্রিম বস্তুর নাম গ্রহণ বিদেশী সভ্যতার অনুকরণ-সাপেক্ষ। হ্যাট, কোট, পেণ্ট, কটলেট প্রভৃতি এই জাতীয় শব্দ। শিক্ষা ও সভ্যতার উপকরণ সমূহের নাম-গ্রহণ শিক্ষা ও সভ্যতার গ্রহণ না হইলে হয় না। দর্শন-বিজ্ঞানাদির পারিভাষিক শব্দ এই জাতীয়। ইংরাজী ভাষা ও অন্যান্য য়ুরোপীয় ভাষায় এই শ্রেণীর বহু গ্রীক শব্দ গৃহীত হইয়াছে। গ্রীস দেশের জ্যোতিষ শাস্ত্রের প্রভাবে আমাদের ভাষাতেও হোরা, হেলি প্রভৃতি শব্দ আসিয়াছে। আবার যখন বিদেশীয় সভ্যতা ও বিদেশীয় ভাষা অত্যন্ত সমাদৃত হয় এবং আভিজাত্যের লক্ষণ বলিয়া পরিগণিত হয়, তখন বিদেশীয় ভাষা হইতে অবাধে শব্দ সংগ্রহ হয়।

বিদেশীয় ভাষার শব্দ গ্রহণ করিবামাত্রই তাহা ভাষার অঙ্গীভূত হয় না। নূতন সৃষ্টির সময় যেমন বক্তা তাহার বর্ত্তমান মুহূর্ত্তের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার জন্য নবসৃষ্ট শব্দের ব্যবহার করে, ভাষার মধ্যে সেই শব্দ প্রচার করিবার কোনও উদ্দেশ্য থাকে না এবং কোনও কালে যে সেই নবসৃষ্ট শব্দ ভাষায় সমাদর লাভ করিবে,সে জ্ঞানও থাকে না, বিদেশী শব্দ গ্রহণের সময়ও তাহাই হইয়া থাকে। ক্ষণিক উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য প্রথম বক্তা শব্দটির ব্যবহার করে এবং তাহার পর ভাবপ্রকাশের যোগ্যতার জন্য বহু লোক সেই শব্দের ব্যবহার করিলে তাহা সেই সমাজে মনোভাবপ্রকাশের সাধনরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এককালে বহু ব্যক্তিও নানা স্থানে ক্রমে শব্দটির প্রথম ব্যবহার করিতে পারে। কিন্তু সর্ব্বসম্মত শব্দটি ভাষায় গৃহীত হয় তখন, যখন বহুবারের অজ্ঞাতসারে ব্যবহারের পর সমাজে তাহার ভাবপ্রকাশের যোগ্যতা অনুভূত হইয়া পড়ে। কেবল তাহা হইলেই হয় না। বিদেশীয় শব্দের উচ্চারণ যদি দেশীয় উচ্চারণ-পদ্ধতির অনুকূল না হয়, অর্থাৎ যে সকল ধ্বনি উচ্চারণ করিতে তাহারা অভ্যস্ত, তাহা ছাড়া অন্য প্রকার ধ্বনি যদি এই শব্দের উপাদান হয়, তাহা হইলে শব্দটির উচ্চারণ বদলাইয়া যাইবে, ইহাকে দেশীয় উচ্চারণ-পদ্ধতির অনুকূল করিয়া লওয়া হইবে। কারণ, শব্দ উচ্চারণ করিবার জন্য বাল্যকাল হইতে তাহারা বাগ্‌যন্ত্রের যে সকল উপাদানের যে ভাবে সঞ্চালন করিতে শিখিয়াছে, যাহা অভ্যাস হইয়া পড়িয়াছে, তাহা ছাড়া অন্য কোনও প্রকারে বাগ্‌যন্ত্র-সঞ্চালনের নূতন পরিশ্রম কেহ করে না। ভাষা-শিক্ষায় অভ্যাস ত্যাগ করা যায় না। যাহা অভ্যাস নাই, তাহা রসনাও উচ্চারণ করিবে না,শ্রুতিও শুনিবে না। Stupid, School, Glass, Box প্রভৃতি শব্দ বাঙ্গালায় হইয়াছে ইষ্টুপিটু, ইস্কুল, গেলাস, বাক্স প্রভৃতি। স্থানবিশেষে মানসিক প্রক্রিয়া-বিশেষের সাহায্যে শব্দটির সংস্কার করিয়া লওয়া হয়; যেমন ফুট পাথর, উড়ো-প্লেন, শালটুন (Santonine) প্রভৃতি শব্দ। কিন্তু যে সকল শব্দের উচ্চারণে বিশৃঙ্খলা বা বিভিন্নতা নাই, সে সকল শব্দের অবিকল উচ্চারণ হয়। রেল, জেল, লাইন, কোট, নোট, হুক, টিন, পিন ইত্যাদি শব্দ এই জাতীয়। কিন্তু এখানেও যতি বা স্বর-গত প্রভেদ স্থানে স্থানে হইয়া পড়ে। একই দেশের প্রাচীন ভাষার শব্দ আধুনিক ভাষায় গৃহীত হইলেও তাহার ধ্বনিগত

পরিবর্ত্তন হয়। তাই আমার ভাষায় সংস্কৃত শব্দের দন্ত্য সকারের উচ্চারণ তালব্য শকারের ন্যায় হয়।

প্রত্যেক ভাষাতেই কালক্রমে শব্দের ধ্বনিগত পরিবর্ত্তন হয়। পরভাষা হইতে গৃহীত শব্দও এই প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তন এড়াইতে পারে না। সুতরাং শব্দের উচ্চারণ লক্ষ্য করিলে অনেক সময় আমরা পরভাষা হইতে ঐ শব্দটি গ্রহণের কালনির্ণয় করিতে পারি। 'স্তম্ভ' 'স্তবক' প্রভৃতি সংস্কৃত শব্দের স্থানে যখন বঙ্গভাষায় 'থাম,' 'থোপ' প্রভৃতি শব্দ পাওয়া যাইবে, তখন স্বাভাবিক অনুমান এই হইবে যে, যে কালে প্রাকৃত ভাষায় উষ্ম বর্ণের লোপে স্পর্শবর্ণের মহাপ্রাণতা হইত, সেই যুগের সৃষ্ট শব্দ এগুলি। কিন্তু স্পষ্ট, দর্শন, স্পর্শ প্রভৃতির স্থানে যখন পষ্ট, দরশন, পরশ প্রভৃতি পাইব, তখন বুঝিব যে, এ সকল শব্দের সৃষ্টি অন্য যুগে বা অন্য স্থানে হইয়াছে। স্পর্দ্ধা স্থানে 'আস্পর্দ্ধা' অতি আধুনিক। স্নেহ স্থানে নেহ, নেহা ও লেহা এই তিনটি শব্দ ধ্বনিব্যত্যয়ের তিনটি যুগের সাক্ষী।

পরভাষা হইতে শব্দ গৃহীত হয় বটে, কিন্তু প্রত্যয় গৃহীত হয়। সমগ্র শব্দ নূতন ভাষায় সংক্রমিত হয়। তবে যদি এক প্রত্যয়বিশিষ্ট বহু শব্দ ভাষায় গৃহীত হয়, তাহা হইলে স্বাভাবিক উপায়ে গঠিত শব্দসমূহের ন্যায় তাহাদের প্রত্যয়টিরও একটি অর্থ দাঁড়াইয়া যায়। তখন ঐ প্রত্যয়যোগে ভাষায় নূতন নূতন শব্দের সৃষ্টি হয়। আমাদের ভাষায় গুণবাচক বিশেষ্যের প্রত্যয় 'ই' বা 'আই' এই ভাবে পারস্য ভাষা হইতে আসিয়াছে। নবাব, বদমাইসি, জমীদারি, দোকানদারি প্রভৃতিতে এবং ডাক্তারি, ব্যারিষ্টারি প্রভৃতিতে ঐ 'ই' প্রত্যয় চলিয়াছে। এইরূপ 'বালাই' প্রভৃতির অনুকরণে 'ভালাই', 'বামণাই' 'খাড়াই, 'লম্বাই' প্রভৃতি চলিয়াছে। পারসী ভাষার আরও অনেক প্রত্যয় বঙ্গ-ভাষায় আছে। কিন্তু ইংরাজী ভাষার প্রত্যয় নাই। ভাল—ness, শিশু—hood, জমীদার—dom, চলে নাই। দুইটি ভাষার ভৌগোলিক সংস্থাপন যদি পাশাপাশি হয় আর সেই দুই জাতির মধ্যে ঘন ঘন মেলা-মেশা চলিতে থাকে, তাহা হইলে দুইটি ভাষাই পরস্পরের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়। হয় ত উভয় জাতিই পরস্পরের ভাষা শিখিয়া ফেলে। কিন্তু স্ব স্ব উচ্চারণভঙ্গী কেহই ত্যাগ করে না। সাঁওতালরা বাঙ্গালা শিখিলেও তাহাদের উচ্চারণবৈশিষ্ট্য ত্যাগ করে না। যেখানে দুইটি ভাষাই এক মূল ভাষা হইতে উদ্ভূত, সেখানে উভয় ভাষার মধ্যে প্রভেদ ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়ে। আর যদি সভ্যতার উৎকর্ষ প্রভৃতি কোনও এক ভাষাকে গ্রাস করিয়া ফেলিতে পারে, তবে একটা মিশ্রিত ভাষা এরূপ ভাবে উৎপন্ন হয় যে, তাহাতে উচ্চারণবৈশিষ্ট্য দুই প্রকার থাকে। আবার কখনও বা একটা সাহিত্যিক সাধারণ ভাষা আবির্ভূত হয়, যাহা ঐ ভৌগোলিক সংস্থানের কোনও অংশেই কথিতভাবে প্রচলিত থাকে না।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।

অভিনেতা

তোমারে চিনিবে কেবা চির-ছদ্মবেশী,
লুকাইয়া থাক চারু কাব্য-ইন্দ্রজালে,
তরুণ যুবার রূপ ধর বৃদ্ধকালে,
কখন মহেন্দ্র সাজ, রম্ভা মিশ্রকেশী
উর্ব্বশীর সহ নত তব পদতলে।
নবরসসিদ্ধ সুখী, কভু কাঁদ শোকে,
কভু ধ্যানমৌন ঋষি স্তব্ধ দেবলোকে,
মুখর প্রণয়ালাপে, প্রিয়া-বক্ষঃস্থলে।

কভু হাস্যরসময় সরস বচনে,
হর্ষের হিল্লোল তোল বিষণ্ণ হৃদয়ে,
খেল মিথ্যা সুখ-দুঃখ প্রেম-হিংসা লয়ে
ভাব-প্রতিবিম্ব ভাসে শ্রীমুখ-দর্পণে।

কবির হৃদয় তুমি—তোমার কৌশলে,
ফুটে নাট্য কলা-চিত্র নিত্য রঙ্গস্থলে।

মুনীন্দ্রনাথ ঘোষ

গজুর ভজন

গজুর মাসীর ছেলে-মেয়ে কিছুই হয় নি, আর হ'লেও তাদের ঘরে আপনাদের বা আমার কুটুম্বিতা কর্‌বার যখন কোনোরূপ সম্ভাবনা হবার কথা নয়, তখন তার কুলুজী ঘেঁটে কোনও ফল নেই।

পার্ব্বণ চৌধুরীর জীবদ্দশায় তার সঙ্গে তারিণী ঠাকরুণের মন্ত্রপড়া গাঁটছড়া বাঁধা হয়েছিল কি না, এ কথা নিয়ে লোকে কানাকানি কর্‌লেও পাশাপাশি পড়্‌শী, সমব্যবসায়ী বাসনবিক্রেতাগণ, এমন কি, ঠাক্‌রুণের গঙ্গাস্নানের আলাপী মেয়েরা পর্য্যন্ত তাঁর চরিত্রে কোনো খুঁৎ ধরতে পারে নি; বরং "মাগী যে মিন্‌ষেকে খুব যত্ন করে", এ কথা বেমল্‌ বাম্‌নী, ভবির পিসী, যাদু ঠাক্‌রুণ, ঝি-মণি প্রভৃতি পাড়ার ও গঙ্গার ঘাটের জগদ্বিখ্যাতা 'সমালোচিকারা' পর্য্যন্ত বল্‌তে বাধ্য হ'ত। বিশেষতঃ পার্ব্বণ কাঁসারির (বাসন বেচে লোকটি এই উপাধি পেয়েছিল) শেষ রোগশয্যায় তারিণী দাসীর সেবা দেখে পাড়ার মেয়েদের মধ্যে অনেকেই এ কথা বলেছিলেন যে, 'মাগী কেবল টাকাগুলি ফাঁকি দিয়ে লিখিয়ে নেবে ব'লেই এই তিন চার মাস ধ'রে রক্ত-পূঁয ঘাঁটছে আর খাওয়া-নাওয়া ছেড়ে মিন্‌ষের ঐ ওষুধের দুর্গন্ধভরা ঘরে দিনরাত প'ড়ে আছে, নইলে অত ক'রে আপনার হাতে কে আবার সোয়ামীর সেবা কর্‌তে যায়, ট্যাকা ত আছে, দুটো নোক রেখে দিলেই পারে।'

এই সার্টিফিকেটের অকাট্য প্রমাণ ও অপর কোনো জ্ঞাতি আদির আপত্তি-নামার দাখিল না হওয়ায় রাজু মোক্তারের সাহায্যে চৌধুরীর সমস্ত সম্পত্তির প্রোবেট প্রার্থনাকালে তার উত্তরাধিকারিণীকে বেশী বেগ পেতে হয় নি।

এই অপরিচিতা নারীর অকস্মাৎ এতটা বিভব লাভে পাঁচ জনে বেশী আশ্চর্য্য হ'ল না বটে, কিন্তু একটা "কে জানে কোথাকার কে" মেয়েমানুষের ভাগ্যে এক বেচারীর এত কালের গতরখাটানো টাকাগুলো গিয়ে পড়লো দেখে অনেকের মনেই বিধাতার সুবিচার সম্বন্ধে যেটুকুও সন্দেহ ছিল, তা দূর হয়ে গেল।

পাড়াপড়্‌শী মেয়ে-ছেলেরা, যারা দু' পাঁচ জন তারিণীর বাড়ীতে বেড়াতে টেড়াতে আসা-যাওয়া করতো, তারা আসা বন্ধ ক'রে দিলে। হাতের শাঁখা খুলে, থান্‌ প'রে তারিণী গঙ্গা নাইতে যায়, ধর্ম্মপ্রাণ অন্য মেয়েরা তার পানে চেয়ে মুখ ফিরিয়ে নেয়। বৈকালে ষষ্ঠীতলার চাতালে ব'সে যখন হর চক্রবর্ত্তী, সিধু পোড়েল, নেত্য হালদার, পাঁচু পাল প্রভৃতি শৈবগণ বাবাকে তুরিতানন্দ নিবেদন ক'রে থ্যান্‌, তখনও কাঁসারি 'মাগীর দেমাক্‌, অহ্মার, শুচিবাই' প্রভৃতি বহুবিধ সদ্‌গুণের উল্লেখ করেন। কেবল চন্নন বষ্টুমী তারিণীকে ত্যাগ কর্‌লে না, বরং সে আগে সময় সময় এসে চালটে-ডালটে বড়িটে-বেগুণটা, হ'ল দু' আনা এক আনা পয়সাও নিয়ে যেতো, আর চৌধুরীর ব্যামোর সময় মাঝে মাঝে ব'সে তারিণীর সঙ্গে রাতও জেগে গিছলো, এখন সে দিনের বেলা এ-দোর ও-দোর ঘরে বেড়ালেও রাত্রিতে তারিণীকে আগলাবার জন্যে তারই বাড়ীতে এসে শুতো।

বিধবার আচার ধ'রে তারিণীর প্রায় বছরখানেক কেটে গেছে; চন্নন দ্যাখে, তারিণীর মুখখানা যেন ক্রমে বেশী গোল হয়ে দাঁড়াচ্ছে, ঠোঁট দুখানা যেন মুড়ে আস্‌ছে, চোখের আল্‌সীতে যেন একটু একটু চিতে ধর্‌ছে, সামনের চুলগুলো যেন তাড়াতাড়ি বেশী পাক্‌ছে; যা খোরাক ছিল, তার অর্দ্ধেকও এখন আর নেই; বোষ্টুমীর প্রাণে কেমন একটু খট্‌কা লাগলো।

এক দিন একাদশী; তারিণী করেছেন নির্জ্জলা উপোস, আর চন্নন খানিকটে সাবু বেটে নিয়ে তাইতে খান্‌ আষ্টেক রুটি গ'ড়ে একটু একো গুড় দিয়ে খেয়ে দু'জনে একঘরে শুয়ে আছে, তারিণী তক্তাপোষের ওপর, চন্নন নীচে একটা বিছানা পেতে।

চন্নন। দিদি, ঘুম্ আস্‌ছে না ?

তারিণী। না; রাত এখনও বেশী হয় নি।

চন্নন। ও মা, সে কি, শয়ন-আরতির শাঁখঘণ্টা কখন্ বেজে গেছে, শুন্‌তে পাও নি ?

তারিণী। কে জানে, এদানী আমার সকাল সকাল ঘুম আসে না।

চন্নন। তা বুঝতে পারি; রাত্তির চারটের সময় ঘুম ভাঙলে আমি যখন মনে মনে "নাম" করি, তখনও বুঝতে পারি যে, তুমি জেগে আছ।

তারিণী। চন্নন, যদি কথা তুল্‌লি ত বলি; আমি যেন ঘুমিয়েই পড়েছি, আর বেশী ঘুমোবো কি, তাই শরীরটে যেন ছটফট করে।

চন্নন। তা হবে না, অত বড় শোকটা লাগলো।

তারিণী। শোক হ্যাঁ—তা—শোক বটে, কিন্তু শুধু তার জন্যে নয় বোন্; এই ধনকড়ি হাতে এসে আমার যেন এক জ্বালা হয়েছে।

চন্নন। ও মা, সে কি গো, ট্যাকাকড়ি থাক্‌লে ত লোকের বুক আরো দশহাত হয়।

তারিণী। চোখে দেখতে পাস না, তিনি গিয়ে অবধি কেউ আর আমার বাড়ী মাড়ায় না, ঘাটে গেলে পাঁচ জন মেয়ে যেন নাক সিঁটকে স'রে যায় ব'লে আমি গঙ্গা নাওয়া এক রকম ছেড়ে-ই দিয়েছি।

চন্নন। সে হিংসেয় দিদি, সে হিংসেয়। মরুক গে না পোড়া লোকে হিংসে ক'রে জ্ব'লে পুড়ে, তোমার তাতে কি ?

তারিণী। এ ট্যাকা নিয়ে আমার লাভ কি, পাঁচ জনের মন্নি কুড়োনো বই ত নয়; আমি ম'লে এ সব ভোগ করবে কে ? কোনো কুলে কেউ নেই।

চন্নন। কেউ নেই, দিদি ?

তারিণী। সে না থাকারই মধ্যে! একটা ভাই ছেল, একবার শুনেছিলুম সে না কি কল্‌কেতায় এসে থাকে, আর দিদি একটা ছেলে রেখে ম'রে গেছলো, তা আছে কি না কে জানে।

চন্নন। কিন্তু এক জন ত আছে—

তারিণী। এক জন ? কে সে ?

চন্নন। ভগবান্! আমি বলি, দিদি, তুমি বোষ্টম হও, বাড়ীতে একটি ঠাকুর পিতিষ্ঠে কর, তাঁর পুজো আচ্চার কাযে অন্যমনস্ক থাকবে, আর দশ জন গোঁসাই বোষ্টুমের সেবা ক'রে ট্যাকারও সার্থক হবে।

তারিণী কোনো উত্তর করলে না, চোখ বুজে শুয়ে রইলো।

* * * * *

প্রায় দেড়শত ঘর ধনবান্, সঙ্গতিসম্পন্ন ও মধ্যবিৎ অবস্থার শিষ্য-শিষ্যার নামের ফর্দ্দ, পাঁচ ছয়খানি ভাড়াটিয়া বাড়ী এবং নগদও প্রায় চল্লিশ পঞ্চাশ হাজার টাকা রেখে পিতা গোষ্ঠবিহারী গোস্বামী মহাশয় স্বধাম প্রাপ্ত হবার পর ব্রজগোপাল দিন কতকের জন্যে খুব বাবু হয়ে ওঠে। কল্‌কেতায় খাসা বাসাবাড়ী, মোসাহেবঠাসা জুড়ী গাড়ী, নেশার হুড়োহুড়ি আর এ-দোর ও-দোর নাড়ামাড়িতে নগদ টাকাগুলি বছর তিনেকের ভেতর নিঃশেষ হয়ে গেল। তার ওপর যখন দেড়াবাড়িতে লেখা পাঁচ সাত হাজার টাকার মাড়োয়ারী হুণ্ডির আখেরি দিন ঘুনিয়ে এল, তখন পূর্ব্বপুরুষের পুণ্যে ও শ্রীশ্রীমহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য-দেবের কৃপায় ব্রজগোপালের চৈতন্য হ'ল।

শিষ্যসেবকদের স্মরণ ক'রে গোস্বামিসুত ছোট ক'রে চুল ছেঁটে, টিকি রেখে, গোঁফ কামিয়ে, সাদা ধুতি, পিরাণ, উড়ুনি ও প্যানেলা জুতোর সরঞ্জামে নবদ্বীপের ধন নবদ্বীপে ফিরে গেলেন। সেখানে মাসখানেক বেশ ভালভাবে থেকে পৈতৃক ভদ্রাসনে প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীনিতাইচৈতন্যবিগ্রহের সেবায় সম্পূর্ণ মনোনিবেশ প্রভৃতি নানারূপ সদাচারের কার্য্য ক'রে আত্মীয় প্রতিবাসিগণকে ভাল ক'রে সন্তুষ্ট করলেন, পরে চার জন ছড়িদার ও দু'জন পরিচারক সঙ্গে প্রভু প্রবাসে বহির্গত হলেন। অধিকাংশ ধনবান্ শিষ্যের বাড়ী পূর্ব্বাঞ্চলে—শ্রীহট্ট, ঢাকা, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, পাবনা প্রভৃতি স্থানে; বাকুড়া, বীরভূম, মুরশিদাবাদ অঞ্চলেও ভাল ভাল শিষ্য ছিল; সুতরাং সকল স্থান ঘুরে আস্‌তে গোস্বামী মহাশয়ের এক বৎসরের অধিক সময় লাগলো।

বাল্যকালে ব্রজগোপাল বাড়ীতে সংস্কৃত ও স্কুলে কিছু ইংরাজী অধ্যয়ন করেছিল, প্রবাস হ'তে ফিরে আস্‌বার পর থেকে গোস্বামী অধিকাংশ সময় পণ্ডিতদের নিয়ে শাস্ত্রাধ্যয়ন ও আলোচনা করতেন; অনেক টোলেও

ব্রাহ্মণদের মাসিক কিছু কিছু বৃত্তিও দিতেন। তাঁর মুখে নবদ্বীপের মাহাত্ম্য শুনে অনেক পূর্ব্বদেশীয় ধনী শিষ্য মাঝে মাঝে নবদ্বীপ দর্শন করতে আসেন এবং সাত আট জন মহাজন ঐ পুণ্যতীর্থে অট্টালিকাও নির্ম্মাণ করেছেন এবং সেখানে মাঝে মাঝে বাসও করেন।

যত টাকার পৈতৃক সম্পত্তি নষ্ট করেছিলেন, পুনঃ সঞ্চয়ে আবার তার সঙ্কুলান করেছেন বটে, কিন্তু শুধরে যাবার পর থেকে নষ্ট সম্পত্তির শোকটা বুকে বড়ই লেগে আছে। সে জন্য অর্থপিপাসার ঠিক শান্তি হয় নি, তবে এ কথা স্বীকার করতে হয়, সেই কামনার সঙ্গে প্রবঞ্চনাদি নীচ বৃত্তি তাঁর চরিত্রকে স্পর্শ করে নি।

গোস্বামীর অনেক দীন দরিদ্র শিষ্যও ছিল, এদের মধ্যে চন্নন বোষ্টুমী এক জন। চন্ননের ভক্তিপূর্ণ নিবেদন শুনে প্রভুপাদ তারিণী দাসীকে প্রায়শ্চিত্ত করিয়ে মন্ত্রদীক্ষা দিলেন। কুঞ্জতারিণী নাম প্রভুপাদের-ই প্রদত্ত; এবং তাঁরই উদ্যোগে ও যত্নে কুঞ্জতারিণীর বাড়ী শ্রীশ্রীরাধাবল্লভ জীউর যুগল মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়; সমারোহে এই প্রতিষ্ঠা-কার্য্য সম্পন্ন হবার সময় থেকেই কুঞ্জতারিণীর অন্ধকার পুরী যেন আলোকিত হয়ে ওঠে। নিত্যসেবা হ'তে প্রায় বিশ পঁচিশ জন বৈষ্ণব-বৈষ্ণবী প্রত্যহ প্রসাদ পায়, গুটি আষ্টেক বৈষ্ণবী বাড়ীতেই থাকে, বৎসরে অন্ততঃ তিনবার মহোৎসব ও নগর-সঙ্কীর্ত্তন, এ সওয়ায় জন্মাষ্টমী, রাস, দোল, ঝুলন ও বৈষ্ণব-পর্ব্বদিনে ধুমধাম ত আছে-ই।

কুঞ্জতারিণীর মুখে আবার পূর্ব্বের ভাব ফিরে এসেছে; এখন সে লোকজনের সঙ্গে হেসে কথা কয়, দুঃস্থকে দয়া করে, কের্ত্তন শোনে, গান শোনে, কিন্তু চৌধুরীর মরার পর সাধারণ লোকের ব্যবহার দেখে তার মনে যে কালি পড়েছিল, সেটুকু একেবারে মুছে যায় নি। একমাত্র বৈষ্ণবদের দয়াতেই তার মনে শান্তি হয়েছে ভেবে ক্রমে সে ভয়ানক গোঁড়া বোষ্টুম হয়ে দাঁড়ালো। সে ছানাকে "বেধো" বলে, বিল্বিপত্তরকে বলে "তেফড়কার পাতা", লেখবার জন্যে সরকার যদি বলে "কালিটা আন্‌ছি", সে কানে আঙুল দেয়, কণ্ঠী গলায় না-থাকা সে' চুরির চেয়ে বেশী পাপ মনে করে, আর তিলকসেবা ক'রে যে রমণী তার কাছে আসে, তাকেই শুদ্ধ ভাবে। গোস্বামী বৈষ্ণব ছাড়া আর কাকেও কিছু দেওয়া সে বৃথা দান ব'লে জানে।

শ্রীগুরুপাদপদ্মে তার অচলা ভক্তি, ব্রজবল্লভ গোস্বামী মহাশয় আদেশ করলে সে সর্ব্বস্ব বিলিয়ে দিতে পারে, কিন্তু গোস্বামী কখনো কোনো শিষ্যকে "গো" এবং আপনাকে কখনো কোনো শিষ্যার "স্বামী" ব'লে মনে করেন নি, কুঞ্জতারিণীর সম্বন্ধেও তাই। তিনি ন্যায্য অন্যায্য বুঝে দান ও অন্যান্য সৎকার্য্য করান।

গুরুপ্রণামী বা গুরুপত্নী, গুরুপুত্রাদি-প্রণামীর জন্য প্রভুকে কখনো কোনো ইঙ্গিত করতে হয় নি, কুঞ্জ তা নিজে মনে মনে বুঝেই মাঝে মাঝে দেয়—এবং ভালই দেয়।

* * * * *

তালকুঁড়ে গ্রামের যুবকমণ্ডলী-স্থাপিত ড্রাগুণ থিয়েটারে রাখাল যখন মেঘনাদের পার্ট পায়, তখন একবার তাকে দেখা গেছলো জোরে রিহার্শাল দিতে। সকাল সন্ধ্যে দুপুর রাতদিন রাখালের রিহার্শাল চলছেই চলছে। রাখাল ভাত খেতে বসেছে, পিসীমা পরিবেশন করতে এসেছেন, রাখাল তড়াক ক'রে পিঁড়ির ওপর দাঁড়িয়ে পড়লো, ওঠবার সময় ডালের কাঁসিখানা তার মাথায় ঠেকে ডালটুকু পিসীমার কাপড়ে আর মাটীতে প'ড়ে গেল, রাখাল দুই হাত পাঞ্জাঞ্জলি ক'রে ব'লে উঠলো,—

"কি কহিলা ভগবতি! কে বধিল কবে
প্রিয়ানুজে? নিশারণে সংহারিনু আমি
রঘুবরে; খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিনু
বরষি প্রচণ্ড শর বৈরিদলে, তবে
এ বারতা, এ অদ্ভুত বারতা, জননি,
কোথায় পাইলে তুমি, শীঘ্র কহ দাসে।"

এক দিন রাখালের বউ রাত দুটোর সময় ঘরের খিল খুলে, মা গো বাবা গো করছে শুনে বাড়ীর লোক ছুটে গিয়ে দেখে, মশারির দুটো খুঁট ছিঁড়ে প'ড়ে গেছে, রাখাল তক্তাপোষের ওপর দাঁড়িয়ে এক হাত বুকে দিয়ে আর এক হাত তুলে চেঁচাচ্ছে,—

"ডাকিছে কূজনে,
হৈমবতী উষা তুমি, রূপসি, তোমারে
পাখীকুল! মেল, প্রিয়ে, কমললোচন!
উঠ চিরানন্দ মোর! সূর্য্যকান্তমণি
সম এ পরাণ, কান্তে, তুমি রবিচ্ছবি;—
তেজোহীন আমি তুমি মুদিলে নয়ন।"

আর এক দিন রাখাল মাধব মণ্ডলকে অশথতলায় না ধ'রে—তার দু কাঁধে দু হাত রেখে বল্ছে,

"এতক্ষণে—
জানিনু কেমনে আসি লক্ষ্মণ পশিল—
রক্ষঃপুরে! হায় তাত, উচিত কি তব
এ কাজ? নিকষা সতী তোমার জননী!"

একেই বলে রিহার্শাল, একেই বলে তন্ময়তা, একেই বলে ঘাত-প্রতিঘাত!

আর এই ক'বছর পরে আজ দেখা যাচ্ছে গজুর ভজন রিহার্শাল! আজ পনেরো ষোল দিন হ'ল গজু চারুর চণ্ডী-মণ্ডপে আশ্রয় পেয়েছে। চক্ষু না চাইতে চাইতে এক পক্ষ কেটে যায় বটে, কিন্তু কায করতে জান্লে আর বরাতে থাক্লে এক পক্ষে অনেক কায হয়। কালো আকাশের ওপর একটা একটা রূপলির আঁচড় পড়তে পড়তে এক পক্ষে একখানা পুরো চাঁদ আঁকা হয়ে যায়, আষাঢ়ের শেষ পক্ষ ফাটা চটা মাঠে জলের জোয়ার ভাঁটা খেলিয়ে দেয়, দিন পনেরো মাত্র প্রত্যহ একটু আফিং খেলে মৌতাতও জ'মে যায়, তেমনি এই পনেরো ষোল দিনের ভেতরই গজুর জীবনে একটা বেয়াড়া বিপ্লব ঘ'টে গেছে।

টাকা টাকা ক'রে গজু পাগল হয়ে উঠেছিল, তাই পৌছোবার পরদিন সকালে উঠেই সে চারুকে বললে, "Brother, barber call" নাপিত ডাকাও।—

চারু। কি, চুল ছাঁট্বে না কি?

গজু। ছাঁট্? না আগাগোড়া কাট্—একদম্ become নেড়া। গোঁপও লোপ; চুলও উঠবে, টিকি কেটে ফেল্লেই চুকে গেল। গোঁপেরও পুনঃপ্রবেশ হয়—কিন্তু টাকা—টাকা, মাসীর টাকা, বুঝেছ তো brother।

মুণ্ডিত-মুণ্ড গুম্ফশিখাধারী গজু দেখতে বড় মন্দ হয় নি; তার ওপর চারু তাকে বৃন্দাবনী ছোবার বহির্বাস পরিয়েছে, গলায় ত্রিকণ্ঠী দিয়েছে, বুকে তুলসীর মালা দুলিয়েছে, নাসায় তিলক-ফলক, সর্ব্বাঙ্গে হরেকৃষ্ণ নাম ছাপা। নেপথ্যাচারাভিজ্ঞ চারুর কারুকার্য্যে গজুর যা নবকলেবর হয়েছে, তা' দেখে কে না বলবে যে, গজেন্দ্র বৃন্দাবন-made patent বৈষ্ণব, দয়া ক'রে নবদ্বীপে শুভাগমন করেছেন। গজেন্দ্রজীবন বদলে চারু গজুকে ব্রজজীবন নাম দিলে। ছেলেবেলাটা গজুর পাড়াগাঁয়ে কেটে গেছে, সুতরাং লজ্জা ভয় ছেড়ে দিনে দুপুরে রাতে মাঠে ঘাটে চেঁচিয়ে অন্ধকার রাত্রিতে তেঁতুলতলা দিয়ে বাড়ী আস্তে ভূতের ভয়ে গলা ছেড়ে গান গেয়ে গেয়ে যদিও তার কানে সুর বা মাথায় তালবোধ ছিল না', তবু সে গান ধর্‌লে লোকে আঁৎকে উঠতো না, গলাটা নেহাৎ কর্ক'শ নয়। তার ওপর চারু তাকে আজ এ আখড়ায়, কাল ও আশ্রমে, পরশু—দের ঠাকুরবাড়ীতে নিয়ে গিয়ে কের্ত্তন-টের্ত্তন শোনাতো; এবং সে নিজেও তাকে দু' পাঁচটা দাশু রায় টাশু রায়ের গান শিখিয়ে দিয়েছিল; সেই সব গান আজকাল গজু ওরফে ব্রজজীবন বাবাজী কখনো বা গুন্ গুন্ ক'রে, কখনো বা উচ্চকণ্ঠে একা বা পাঁচ জনের সামনে গায়।

ধর্ম্মশাস্ত্রে বলে "নামমাহাত্ম্য", পণ্ডিতরা বলেন, "শব্দশক্তি"; মোদ্দা যাই হোক্, কথার প্রভাব যে মানুষের মনে এবং শরীরের ওপর পর্য্যন্ত একটা প্রত্যক্ষ কার্য্য করে, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই। কটুকাটব্য গালাগালি শুনলে যখন আমাদের শরীরাভ্যন্তরস্থ স্নায়ুর চাঞ্চল্যবৃদ্ধি, শোণিতচালনার সহজ গতির ব্যতিক্রমে মস্তিষ্ক উত্তপ্ত, হৃদয়ের দ্রুততর স্পন্দন, এরূপ নানা বিকৃতি ঘটে, ক্রোধ বা বিরক্তিতে মনের-ও শান্তভাব, বিচারপ্রবণতা দূরীভূত হয়, আবার তদ্বিপরীতে যখন আদর-আপ্যায়নে, স্নেহ-সম্ভাষণে হৃদয় স্নিগ্ধ, দৃষ্টি প্রফুল্ল, মন আনন্দযুক্ত হয়, তখন সর্ব্বদা ভগবানের নাম করতে করতে কেন না মানবের অন্তরে অনুরাগ, প্রেমপুলকাদি ভাবের স্ফূর্ত্তি পাবে!

প্রথম প্রথম গজু ভজন করত এই রকম:—

"হরি হরি হরিবোল্, হরি হরি হরিবোল্"—কি জানি সেখানে কি হচ্ছে, পাওনাদারগুলো—হরেকৃষ্ট হরেকৃষ্ট হরেকৃষ্ট—তা' মুদী কি উঠ্‌নো বন্ধ করেছে? বদী খেতে পাবে নিশ্চয়—জয় জয় হরিবোল্ হরিবোল্, জয় জয় মহা-প্রভু হরিবোল্—এঃ এই মাসী বেটী বোষ্টুম না হ'লে আবার টাকা দেবেন না, ঢং দেখ না—হরিবোল্ হরিবোল্ হরিবোল্—হাজার না হোক্ সাত আট্‌শো টাকা ফেলে দে না চ'লে যাই—(সুরে) কে যায় নদের বাজার দিয়ে! হরিবোল্ হরিবোল্ ব'লে কে যায় নদের বাজার দিয়ে! (আমার গৌর যায় কি নিতাই যায় ওরে!)

দিন আষ্টেকের পর গজুর ভজনের দাঁড়া দাঁড়িয়েছে:—

হরি হরি হরি হরি হরি! বল মাধাই মধুর স্বরে, হরিনাম কে এনেছে! এই চুলোর দেনা কটা না থাক্‌তো, আর বদী—না না রাধে রাধে, জয় জয় শ্রীরাধে, জয় জয় শ্রীরাধে (সুরে)

"কুঞ্জ হ'তে যান্ যখন কুঞ্জর-গামিনী।
ভূমে উদয় হয় যেন শত সৌদামিনী॥
হরিধ্বনি ক'রে সব ধনী হরি যায় দেখিতে।"

এর দু' এক দিন পরে গজু বাবাজী- শ্রীবিষ্ণু! ব্রজজীবন বাবাজী গঙ্গাস্নান ক'রে ফির্‌ছেন, এমন সময়ে সাম্‌নে পড়্‌বি ত পড়্—একেবারে গয়ারাম! গজুর মাথাটা হঠাৎ চড়াক্ ক'রে উঠ্‌লো; গয়ারাম গজুকে চিন্‌তে পারে নি, নবদ্বীপে বৈষ্ণব-মূর্ত্তি বিরল নয়, অম্‌নি অম্‌নি চ'লে যাচ্ছিল; এমন সময়ে কে যেন গজুকে সাম্‌লে দিলে, সে 'গয়ারাম' 'গয়ারাম ভাই' ব'লে তার পেছনে পেছনে গেল।

গয়ারাম। (ফিরিয়া) কি হে বাবাজী, আমায় চেন না কি, নাম জান্‌লে কোত্থেকে?

গজু। আমায় চিন্‌তে পারছ না—তুমি কবে এলে এখানে?

গয়া। আমরা আর্টিস্ মানুষ—আজ দিল্লী, কাল বাঁকুড়া—সে তুমি বুঝ্‌বে কি!

গজু। আমি যে সেই গজেন্দ্র।

গয়া। কে কোথাকার ব্রাজুন্দুর গাজুন্দুরে, তার খপর আমি রাখি নি। রোস, রোস,—তুমি বেশ গায়ে পেণ্ট টেণ্ট করেছ বটে, তোমার বাসা কোথায়—চল ত সিটিং দেবে, বেড়ে ক্যারিকেচিওর ছবি একখানা পাওয়া গেছে।

গজু। আমি যে সেই গজেন্দ্রজীবন হাইট্, এর মধ্যে ভুলে গেলে?

গয়া। বাবা, হাইট্, যে মেটামরফোবিয়া হয়ে গেছ, তা' তোমায় দেখে যমের ভুল হবে, আমি ত আমি! তা' পাখী উড়ে গেছে, এর মধ্যে খপর পেলে কোত্থেকে? মনের দুঃখে বোষ্টুম হয়ে পড়্‌লে?

গজু। কি বল্‌ছো—পাখী কি?

গয়া। ন্যাকা, জানেন না পাখী কে! তোমার সিষ্টার ওয়াইফ্, সিষ্টার ওয়াইফ্!

গজু। হ্যাঁ হ্যাঁ, কি হয়েছে?

গয়া। বেষ্ণ হয়েছে, বেষ্ণ হয়েছে—ধাত্রী হবে; আর তোমার ভাবনা নেই।

গজু। আর আমার ভাবনা নেই—আর আমার ভাবনা নেই। গুরুদেব! গুরুদেব! (গয়ারামের চরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম ক'রে) গয়ারাম, তুমি আমার গুরু, তুমি আমার গুরু!

গয়ারাম অবাক্! "ওঃ ম্যাড্, তা এতক্ষণ বুঝ্‌তে পারি নি!" ব'লে গয়ারাম নিজের কাযে চ'লে গেল। গজু দাঁড়িয়ে উঠে গান ধরলে—

"বলে—মাধবীতরুতলে দেখে এলাম কেশবে;
শুনে রাধার নয়ন ভাসে, কত মিনতি-ভাষে ভাষে
কায কি আর ও সম্ভাষে, ভাষে আর সব।
আর পাব কি দীন-বান্ধবে, ক'রে দীন বান্ধবে
গিয়ে ব'ধে মথুরার ধবে, পেয়েছেন বৈভব।
ল'য়ে ব্রজের শ্রীহরি, করেছেন শ্রীহরি,
আর কি আমার শ্রীহরি আসার সম্ভব।"

গজুর আর গান থামে না; লজ্জা অভিমান চিন্তা ভাবনা কিছু নেই, নাচ্‌তে নাচ্‌তে, গাইতে গাইতে চলেছে।

চারু বাড়ী ফিরে দেখে, উন্মত্তের মত দু' হাত তুলে গজু উঠোনময় ঘুরে ঘুরে নৃত্য করছে, আর গাইছে,—

"তুমি সে কালো চিন্‌লে না।
কি বস্তু জান্‌লে না!
সে কালোর তুলনা নাই ভুবনে।
যাঁর রূপে আলো করে,
হরের মন হরে,
হর শ্মশানে কাল হরে যাঁর কারণে।"

চারু। এ কি ভায়া, এ কি ভাব আজ—ড্রেস-রিহার্সাল না কি?

গজু। (চারুর চরণে পতিত হইয়া) তুমিই গুরু—তুমিই গুরু!

চারু। ওঠ, ওঠ, কি হয়েছে!

চারু বুঝ্‌তে পারলে, এ অভিনয় নয়।

* * * * * * * * * *

বাল্যকালে ব্রজগোপাল চারুর বাপের সঙ্গে এক্ স্কুলে

পড়েছিলেন, সেই সুবাদে চারু গোস্বামী প্রভুকে জ্যাঠা-মশাই ব'লে সম্বোধন করতো। তার প্র্যাক্‌টিক্যাল জোক্ যে এমন ক'রে গজুর মনের মাঝে চোখ ফুটিয়ে দেবে, তা' সে কখন-ও ভাবে নি; সুতরাং গজুকে নিজে গোস্বামী মশায়ের সঙ্গে পরিচয় ক'রে দেবার সম্বন্ধে যা' একটু খুঁৎ-খাঁৎ ছিল, তা আর রইলো না।

* * * * * * * * * *

নানা সন্ধ্যায় ক'রে কুঞ্জতারিণী আজ কয়েক বৎসর হ'ল কুঞ্জে বসেছেন, কিন্তু বোন্‌পো ব্রজজীবন বাবাজী আজ পর্য্যন্ত মাসীমার প্রতিষ্ঠিত ঠাকুরবাড়ীর সমস্ত সুশৃঙ্খলা, সমস্ত মঙ্গলধারা বজায় রেখে দীন দুঃখী ভক্তসাধারণের শ্রদ্ধা ও আশীর্ব্বাদ লাভ করেছেন।

কথার ক্ষণ আছে, অক্ষণ-ও আছে। শুভক্ষণে গজু তেদোর ধারে এক সন্ধ্যায় বলেছিল—**উপায় এক-মাত্র মাসী!**

শ্রীঅমৃতলাল বসু।

অগ্রহায়ণের সংখ্যায় গজুর নবদ্বীপ যাত্রার পথে গাড়ীর কামরা খালি হওয়ার প্রসঙ্গে "কাল্‌নার" পরিবর্ত্তে ভ্রমক্রমে "কাটোয়া ষ্টেশন" ব্যবহৃত হইয়াছিল।—লেখক।

ফুলের রাণী

[Tennyson হইতে]

জাগিয়ে দিও মা গো—
কাল যে মোদের সুখের দিবস নূতন বরষ-মাঝে
আমি হব ফুলের রাণী সাজব নানান সাজে;
সেথায় অনেক জনা
আস্‌বে তারা দেখতে মোরে ফুলের রাণীর বেশে;
মুক্ত-বেণী-কেশে—
আজকে যে মা সুখের দিবস মরণকালের মাঝে
সাজতে হবে দিও ডেকে কাল্‌কে এমন সাঁঝে।

গভীর ঘুমের মাঝে—
পড়েছিলুম রাতে মা গো ছিল না'ক সাড়,
দিস্ মা গো তুই ডেকে আমায় কস্ এ সমাচার
উঠব আমি জেগে—
কর্‌ব জোগাড় ফুলের মালা ছোট্ট বাগানেতে,
ফুলের আসন পেতে
সাজব আমি ফুলের রাণী নানান্ ফুলের মাঝে—
কালকে এমন সুখের মাঝে এম্‌নি ভরা সাঁঝে।

জাগিয়ে ও মা দিলে —
বরষ পরে দেখতে পাব নূতন তপন-'কাশে
সবই নূতন, নূতন বরষ, নূতন ঋতুর মাসে
দেখতে পাবে মোরে
মরণ পারের তরীর মাঝে ফুলের রাণী-বেশে।
সেজে আছি নানান্ সাজে মুক্ত-বেণী-কেশে।

গত বছর শেষে—
এম্‌নি সুখের মাঝে মোরা ফুলের সুখাসন!
আনন্দেতে কত
আমায় তারা সাজিয়েছিল শিউলী ফুলের রাণী।
ঐ শোন্ মা ভোরের আলো কর্‌ছে কানাকানি!—
ডাকিস্ মা গো তুই—
মরণ-সময় আস্‌ছে ঘনে' আর ত সময় নেই;
যদি না পাস্ সাড়া
চেঁচিয়ে বলিস্ শুনতে পাব স্বর্গপুরীর নীচে।
কাঁদিস্ কেন সুখের সময় কাঁদিস্ কেন মিছে!

রইল তোমার রেণু
বস্‌বে তোমার স্নেহের কোলে আমার মত মা গো—
বলিস্ তারে যেতে
গাছগুলো না শুকোয় যেন আমার বাগানেতে।
দেখিস্ মা গো তুই! ভুলিস্‌নে মা দিতে
একটু ক'রে জল!
অবশ হয়ে আস্‌ছে শরীর শিথিল হয়ে যায়
বিছিয়ে দে মা ক্লান্ত-দেহে তোর ও আঁচল বায়!

শ্রীমতী বিদ্যুৎপ্রভা দেবী

ভ্রান্তের আত্মকাহিনী

আমি আজ মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি। দৃষ্টিশক্তি দুর্ব্বল, কানও তাহার কায পূর্ণ-মাত্রায় করে না। শরীরে মাংস শিথিল হইয়া আসিয়াছে ও মাথায় যে কয়েকটি কেশ আছে, সবই সাদা। কিন্তু তাহা হইলেও আজ আমার কোন দুঃখই নাই।

বরং যখন চোখে দেখিতাম ঠিক্, কানে শুনিতাম পূর্ণ-মাত্রায়, আর শরীর ছিল নীরোগ, তখনই নিজের অজ্ঞাতে মহা দুঃখের সাগরের দিকে ছুটিয়াছিলাম। কেন না, তখন দেহে তারুণ্যের তপ্ত রক্ত উচ্ছ্বলভাবে বহিতেছিল; বুদ্ধি কোথায় আত্মগোপন করিয়াছিল, কে জানে?

দেবতার রুদ্রতম আশীর্ব্বাদে কি করিয়া এক দিনে আমার সেই মস্ত ভুল ভাঙ্গিয়া গেল, তাহারই সংবাদ আজ জগৎকে দিতে চাহি। যেন আমার মত ভুল আর কাহারও না হয়!

সংসারে সহ্যশক্তি আর ক্ষমা যাহার নাই, সে অভাগা। সে সংসারী হইবার অযোগ্য। শত অসুবিধা থাকিলেও অধ্যবসায় লইয়া যে সেগুলি জয় করিবার চেষ্টা না করে, অসুবিধা আছে বলিয়া নিজে অসুবিধা হইতে দূরে সরিয়া যায়, তাহার দ্বারা সংসার-রক্ষা হয় না। সে অসুবিধার সহিত সংগ্রাম করিয়া নিজের মনুষ্যত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে পারে না, কেন না, যে সংসারের সুখটুকু কামনা করে অথচ তাহার দুঃখটুকুর সহিত সংগ্রাম করিতে শঙ্কিত হয়, সংগ্রাম করা দূরে থাকুক, বরং অগণিত অদৃশ্য পাকে অসুবিধাই তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া শ্মশানের দিকে টানিয়া লইয়া যায়। ইহা প্রকৃত বিঘ্নবাধার কথা।

কিন্তু যাহার কোনও কষ্ট নাই, এমন অভাগাও দুই একটি দেখিতে পাওয়া যায়, যাহারা কল্পিত কষ্টের পীড়নে নিজের জীবন বিষময় করিয়া তুলে; যেমন এক জন আমি। আমার কোনও কষ্ট ছিল না, কিন্তু কপালদোষে সব কষ্টই আমি আমার জীবনে আহ্বান করিয়া আনিয়াছিলাম। কপালের দোষই বা দিই কেন,—নিজের—সম্পূর্ণ নিজের দোষে!

আমার সব ছিল। ছেলে ছিল, মেয়ে ছিল, জামাই ছিল, স্ত্রী ছিল; বাড়ী, টাকা, মোটামাহিনার চাকুরী, সবই ছিল। তখন তাহাদের অস্তিত্ব বুঝি নাই।

ছেলে ছিল, তাহার মুখ দেখিতাম না। মেয়ে-জামাই ছিল, তত্ত্ব লইতাম না। স্ত্রী ছিল, নিকটে রাখিতাম না। বাড়ী, টাকা, সবই যেন দানবীয় অট্টহাসিতে আমায় অহোরাত্র ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করিত।

ইচ্ছা হইত, সব একযোগে রসাতলে যাউক। কিন্তু আমার ইচ্ছায় জগৎ চলে না—তাই কেহই রসাতলে গেল না, আমিই দিন দিন নিজের আক্রোশে নিজে রসাতলে ডুবিতে লাগিলাম।

* * * * *

বিনা দোষে আমি এক দিন স্ত্রীকে তাড়াইয়া দিয়াছিলাম —'ভিক্ষে ক'রে খে গে যা' বলিয়া। আর তিনি আমার পদতলে মুখ রক্ষা করিয়া বলিয়াছিলেন—'ওগো, তুমি আমায় তাড়াইয়া দিলে আর আমার কে আছে জগতে?' আমি তাঁহাকে অজস্র ভৎর্সনা করিয়া পদাঘাতে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছিলাম, তাঁহার ভ্রাতা তাঁহাকে লইয়া গেল।

সেই 'শালা' না কি বলিয়াছিল, আমার নামে নালিশ করিয়া আদালত হইতে তাহার ভগিনীর ভরণপোষণের ব্যয় আদায় করিয়া লইবে। তাহার উত্তরে আমার স্ত্রীকে আমি বলিতে শুনিয়াছি—"দাদা, ও আমি কিছুতেই করতে দোবো না। তা হ'লে তোমার আদায়-করা খোর-পোষ খাবার আগে এক ভরি অন্য জিনিষ খাবো।" দাদা তদবধি ভগিনীর উপর অপ্রসন্ন! জগতে এক শ্রেণীর লোক আছে, যাহারা কাহারও উপকার করিতে না পারিলেও, অপকার করিবার সুবিধা পাইলে কোনমতে সে চেষ্টা ত্যাগ করিতে চাহে না। কেহ তাহাতে বাধা দিলেই তাহার অত্যন্ত কষ্ট হয়। বালকের দুষ্টামিতে বাধা দিলে সে যেমন নিষ্ফল আক্রোশে লম্ফ-ঝম্প করে, ঠিক তেমনই।

তাহার উপর সকলেরই সংসারে 'স্ত্রী' বলিয়া একটি মন্ত্রী থাকে। তাঁহার কায—গৃহস্থের কোন্ দিক দিয়া অপব্যয় হইতেছে, কে বসিয়া বসিয়া সংসারে খাইতেছে, কোন্ ব্যয়টা সংক্ষেপ করা যায়, কোন্ কুমড়োটা পচিতে আরম্ভ করিয়াছে, এই বেলা হাটে দিয়া আসা উচিত,—এই সব ছোটবড় নানা কাযে বুদ্ধিটুকু খরচ করা। বুদ্ধিমান্ রাজা

প্রায়ই মন্ত্রীর অধীন হয়েন এবং তিনি মন্ত্রীর হুকুম যতদুর সম্ভব কম সময়ের মধ্যে তামিল করিবার চেষ্টা করেন।

আমার শালার মন্ত্রীটিও দেখিলেন, আমার স্ত্রী বাড়ীর একটি অনাবশ্যক 'বাজে খরচ।' এমন কি, রাঁধুনী-ঝিয়ের কাযটাও তাঁহার দ্বারা করান চলে না; কেন না, তাহা হইলে 'বিন্দে পিসী' 'মেজগিন্নী' 'সেজদিদি' বলিবে কি? অতএব ইহাকে যে কোন প্রকারে হউক সরাইতে হইবে।

তবু না কি আমার স্ত্রী কায করিতে চাহিয়াছিলেন, বলিয়াছিলেন, 'পরের বাড়ীতে দাসীগিরি করা অপেক্ষা তোমার বাড়ীতে দুই একটা কায করিয়া দেওয়ায় অনেক অধিক সম্মান আছে।' উত্তরে শুনিলেন, "সে আমার বাড়ীতে হবে না, তা হ'লে অন্য কোথাও গিয়ে চেষ্টা দেখ গে।" তখন আমার স্ত্রী বলিলেন--"বৌ, তুমিই ত বল্লে, তাই আমি বল্‌ছি। পরের,—আর কার বাড়ী যাবো বল?" মন্ত্রী সরোষে উত্তর দিলেন, "বলেছি, বলেছিই। ভারী দোষ করেছি, না? আমার সঙ্গে আবার ন্যায়শাস্ত্র আউড়ে তর্ক করতে আসা। আমি ন্যায়ের যুক্তি-টুক্তি মানি না।" "তবে এই চুপ করলাম, তোমার কথার আর উত্তর দোবো না।"

গোলযোগ শুনিয়া মন্ত্রীটির রাজা ভিতরে আসিয়া বলিলেন, "বাপু, নিতি নিতি ঝগড়া-ঝাঁটি এ বাড়ীতে পোষাবে না। আর তোমাকে-ও ত বল্‌লে তুমি শুন্‌বে না; নিজের ভাল না বোঝো, ছেলে মেয়ে দুটোও ত আছে। সহজে না দেয়, নালিশ ক'রে তোমাদের ব্যবস্থা করছি বল্‌লাম—তাও কর্‌তে দেবে না। কে তোমাদের ঝক্‌কি পোয়াবে চিরদিন? নিজের লোক যদি তাড়িয়ে দেয়, পরে কি আর চিরকাল তোমাকে আর তোমার ছেলেমেয়েকে খাওয়াতে পারে? সবাইকার-ই ত সংসার আছে!"

এই খাঁটি তত্ত্বকথা শুনাইয়া দিবার পরও যখন আমার স্ত্রী কিছুতেই তাঁহার সুবুদ্ধি-প্রণোদিত উপদেশ অনুসারে খোর-পোষের নালিশ করিতে রাজী হইলেন না, তখন আর বিলম্ব না করিয়া আমার শ্যালক তাঁহার মন্ত্রী মহাশয়ের আদেশ কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টায় রহিলেন। এ রাজাটি বুদ্ধিমান্ ছিলেন।

* * * * * * * *

ছোট ছেলেটি ও মেয়েটির হাত ধরিয়া আমার স্ত্রী সেই পাড়ার 'বামুন মায়ের' বাড়ী গিয়া উঠিলেন। ঐ দুইটি 'পেছ্‌টান্' না থাকিলে তিনি এত দিন অন্য জগতে যাইবার ব্যবস্থা দেখিতেন—যেখানে অবলাকে অনাথা হইতে হয় না, সেই দেশে।

আজ আমার এই সুকৃতিগুলি মনে পড়িলে নিজের হৃৎপিণ্ড উপাড়িয়া ফেলিতে ইচ্ছা হয়। যদি জিজ্ঞাসা কর, 'তখন হয় নি কেন?'—তখন কি ছাই 'হৃদয়' বলিয়া কোনও বালাই ছিল? তখন আমি পাষাণ; উৎসন্নের পথ ধরিয়া পাপের সাথী হইয়া চলিতে আরম্ভ করিয়াছি।

আমায় যখন অধঃপতনের নিম্নস্তরে ফেলিয়া দিয়া পাপ বিদায় গ্রহণ করিল, তখন আমার চক্ষু ফুটিল -তখন আমার ভুল ভাঙ্গিল।

এত দিন কিন্তু জ্যেষ্ঠ পুত্রকে মাসে মাসে টাকা পাঠাই-তাম—সে 'বোর্ডিং'এ থাকিয়া 'ম্যাট্রিকুলেশন' দিয়া আমার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার মনে তখন পড়িবার প্রবল আগ্রহ। সে দিন হঠাৎ আমার সহচর-সহচরীরা আমায় পরামর্শ দিল—'যেখানে মা, সেখানে ছাঁ-টাকেও দাও পাঠিয়ে।' মনের ভিতর হইতে পাপ বলিয়া উঠিল, 'নিশ্চয়ই, এটা আর বোঝে না? তোমার গায়ের রক্ত জল করা টাকা, কেন অন্যে ভোগ ক'রে বড়লোক হবে?' তাহার পর মাথার মধ্যে ইন্দ্রধনুর সাত-রঙা ছবিটি নাচিয়া উঠিল; সম্মুখের গেলাসেও 'রাঙা রূপসী' দুলিয়া উঠিল; আমার কায আমি শেষ করিলাম। তখন সে কি স্ফূর্ত্তি!

বিষণ্ণ মলিন মুখে আমার পুত্র চলিয়া গেল।

* * * * * * *

"তোমার পতাকা যা'রে দাও বহিবারে দাও শকতি—"

ছেলে চলিয়া গেল; নিজের চেষ্টায় সে নিজের মাথা উন্নতই রাখিল। কৈশোরে যে শক্তি জাগিয়া উঠে, যৌবনে সে অক্ষয় অজয় হয়।

তাহার জননী ও ভ্রাতা-ভগিনীকে সে নিজের নিকট আনিয়া তাহাদের লইয়া একটি ছোট সংসার গড়িয়া সে যেন পাপকে উপহাস করিয়া চলিতে লাগিল। আমার অনাদর ও অবহেলা তাহার কিছুই করিতে পারিল না। এ দিকে পাপও আমাকে উৎসন্নের পথে একলা ফেলিয়া চলিয়া গেল।

আমার মধু ফুরাইয়াছিল, কাযেই কাছে আর মধুমক্ষিকা

থাকিবে কেন? তাই পাপের সহচর-সহচরীরাও আমায় ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

আমি তাহাদিগকে অনুনয় করিয়া ডাকিলাম, 'ওগো, আর একটু এগিয়ে দাও, ঐ ত নরকের দুয়ার দেখা যাচ্ছে; যদি দয়া ক'রে এতখানি পথ সঙ্গে নিয়ে এলে, আর শেষ বেলায় কেন একলা ফেলে দিয়ে যাও?' কিন্তু তাহারা বিকট হাস্যে চারিদিক মুখরিত করিয়া আপনাদের কৃতিত্বের পরিচয়টুকু রাখিয়া অবশিষ্ট সমস্ত লইয়া চলিয়া গেল।

* * * * *

ভীষণ ব্যাধিতে তখন আমার সর্ব্বাঙ্গ পূর্ণ। অর্থ-ভুক্ ভৃত্যরা আমাকে ফেলিয়া চলিয়া গিয়াছে। যে বায়সকে লইয়া আমি ময়ূর সাজাইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম, সে তাহার পালকগুলি আমারই অঙ্গে ফেলিয়া দিয়া আবার 'কা—কা' করিয়া নিজের দলে গিয়া মিশিল। তখন নিজের ভুল বুঝিলাম, কিন্তু তখন প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হইয়াছে।

সেই সময় মনে পড়িল, যাইবার সময় বড় দুঃখে স্ত্রী যখন আমার দিকে কাতর নয়নে চাহিয়াছিলেন, তখন তাঁহার মুখচক্ষু যেন বলিতেছিল,—

"দেখো, দিন আসবে—যে দিন এই অভাগীকে মনে পড়বে! যাকে তুমি ঘরে ঠাঁই দেবে ব'লে আমায় তাড়াচ্ছ, সে তোমার অসময়ে করবে না।" প্রকাশ্যে তিনি বলিয়াছিলেন, "অসুখে যদি কখনও অসহায় হও, এ বাঁদীকে স্মরণ কোরো।"

সে কথা তখন একটা "দূর হয়ে যা"র হুঙ্কারে ডুবিয়া গিয়াছিল। কষ্টের দিনের স্বপ্ন দেখিবারও মত মনের মধ্যে তখন এতটুকু স্থান ছিল না, সবটুকু মত্ততায় ভরিয়া গিয়াছিল। ভাবিয়াছিলাম,—আমি কি বাহাদুর। ঘরের লক্ষ্মীকে বিদায় করিয়া আঘাটার কুকুরকে সযত্নে দুগ্ধ অন্ন খাওয়াইয়া তাহার গলায় 'রাঙাঘণ্টা' ঝুলাইয়া ভাবিয়াছিলাম, বুঝি বা তাহাকে পোষই মানাইলাম! কিন্তু যখন দুগ্ধ অন্ন যোগান দিবার পয়সা ফুরাইল, ঘণ্টা খুলিয়া গেলে আর বাঁধিয়া দিবার মত মেজাজ রহিল না, তখন কুকুরটা আমার মুখের দিকে একবারও না তাকাইয়া আবার আঘাটায় ফিরিয়া গেল।

তখন সতীলক্ষ্মীর অভিশাপ বর্ণে বর্ণে ফলিতে আরম্ভ করিয়াছে।

আমার প্রতিবেশীরা আমায় বরাবরই ঘৃণা করিত। যখন আমার পাপের সঙ্গে আলাপ চলিতেছিল, তখন আমি বাটীর বাহিরে যাইতাম না। কাহারও খোঁজ লইতাম না। তাই আমারও গৃহদ্বার কেহ মাড়াইত না।

নিজের মনে তখন আমি ভাবিতাম—কি মস্ত কাযই না করিতেছি! কাহারও সম্পর্ক রাখি না, সমাজে মিশি না, অথচ আমি সমাজপ্রিয় সঙ্গপ্রিয় মানুষেরই এক জন! কিন্তু যদি কেহ তখন বজ্রকণ্ঠে আমায় বলিয়া দিত, "তুমি মানুষ নও, অ-মানুষ"!

যখন আমার রোগ প্রবল হইল, মুখে এক ফোঁটা জল দিবার কেহ নাই, 'এখন-মরি, তখন-মরি অবস্থা', তখন এক জন প্রতিবেশী দয়া করিয়া আমার পুত্রকে সে সংবাদ দান করিলেন।

* * * * *

স্বর্গসুখ তোমরা কেহ কখনও পাইয়াছ কি?

আমি এই মর্ত্তে বসিয়াই স্বর্গ-সুখ পাইয়াছি। যমের দরজায় আসিয়া ধাক্কা দিতেছিলাম, পাপের 'স্বর্গে' আমার স্থায়ী উচ্চাসন প্রস্তুত হইতেছিল, এমন সময় কাহারা আমায় ফিরাইয়া আনিল এই আনন্দময়, প্রাণময়, আশীর্ব্বাদের মধ্যে—কে তাহারা?

আমার লাঞ্ছিত, বিতাড়িত, নির্য্যাতিত স্ত্রী-পুত্র, আমায় স্বর্গের শান্তিময় ক্রোড়ে ফিরাইয়া আনিল, আমায় ধীরে ধীরে মৃত্যুর দ্বার হইতে টানিয়া আনিল,—সেবা করিয়া, সান্ত্বনা দিয়া, সাহস দিয়া, করুণা দিয়া। তাহারা ত আমায় ঘৃণা করিল না, তাহারা ত আমায় ফেলিয়া পলায়ন করিল না! জননীর মত সেবা, বন্ধুর মত স্নেহ, দেবতার মত ক্ষমা, ইহাই দিয়া তাহারা আমায় ফিরাইয়া আনিল।

আবার আমি পৃথিবীর আলোক দেখিলাম, আবার তাহার ভোরের গান শুনিলাম, সন্ধ্যার হাওয়ায় আবার তাহার সৌগন্ধ আমার নিকট ভাসিয়া আসিল। তেমন আলো, তেমন গান কখনও আমার ভাগ্যে ঘটে নাই!

* * * * *

আমার অসুখের সময় ন' বছরের সুশীল যখন আমার সামান্য একটু দরকারের জন্য হাসিমুখে ছুটাছুটি করিত, আমার ছোট মেয়েটি যখন 'বাবা-বাবা' বলিয়া তাহার ছোট দুইটি শীতল কোমল করপল্লব আমার তপ্ত ললাটে

বুলাইয়া দিত, যখন রোগশয্যায় ছট্‌ফট্‌ করিয়া আমি রোগের যন্ত্রণায় ক্রন্দন করিতাম, আর আমার স্ত্রী নিজে কাঁদিয়া আমার নয়নাশ্রু মুছাইয়া দিতেন, তখন কি স্বর্গ আমার দূরে ছিল? তেমন সুখ যে কখনও পাই নাই!

সে সুখের আস্বাদ আমি সেই প্রথম পাইলাম। পথের ভিখারীর কপালে এইবার কোহিনুর জুটিল।

* * * * *

শেষ বংশীধ্বনি এখনও বাজিয়া উঠে নাই; কিন্তু অদূরে আবার চির-বিশ্রামের দ্বার ধূম্রচ্ছায়ার অন্তরাল ভেদ করিয়া ভাসিয়া উঠিতেছে! আমার গৃহিণী আমার পূর্ব্বেই স্বর্গে গিয়াছেন, আমিও অপেক্ষা করিয়া বসিয়া আছি, কবে তাঁহার পার্শ্বে যাইবার ডাক পাইব! আজ ত আমার কোন কষ্টই নাই!

আজ অপূর্ব্ব শ্রীতে আমার বাড়ী হাসিতেছে! আজ আমার পৌত্রপৌত্রী আমায় 'বুড়ী' করিয়া লুকোচুরী খেলিতেছে!

* * * * *

কবে সেই দয়াময়ের রাজত্বে এমনই নিস্তব্ধভাবে থাকিবার ডাক আসিবে, সেই জন্য এ পারে বসিয়াই হাতটা 'মক্স' করিয়া লইতেছি।

শ্রীরামেন্দু দত্ত।

আর না

তোমার পানে ফিরাও আঁখি
তোমার পানে ফিরাও মন,
তোমার কাছে যাবার তরে
পাথেয় মোর নাইক ঘরে
দিবস নিশা আপনা ভুলে
যেন তারি অন্বেষণ
করতে পারি ও গো প্রভু,
শ্রান্ত যেন না হই কভু—
বুঝি যেন ভাল ক'রে
ধরার কেহ কারো নন।
এ সব বাঁধন আঁটাআঁটি—
দেখতে বটে পরিপাটী—
সবই মায়া ছায়াবাজি
করি যদি বিশ্লেষণ—
এবার হরি তোমার পানে
ফিরাও আঁখি, ফিরাও মন!
যাদের তরে খেটে মরি,
তারা মুখোস-পরা অরি,—
এ সব ভস্মে ঘৃত ঢালা
বুঝাও মোরে ভগবন্!
এত দিন ত ভূতের খেলায়
কাটিয়ে দিনু হাসি-খেলায়—
এবার ওগো তোমার পায়ে
করব আত্ম-নিবেদন;
যা' হবার তা' হবে প্রিয়,
তুমি যে পরমাত্মীয়—
এইটি যেন সবার আগে
ভাবতে পারি আমরণ
এবার হরি তোমার পানে
ফিরাও আঁখি, ফিরাও মন।
এই ধরণীর পান্থশালে
আসিয়াছি কোন্ সকালে
কোন্ সুদূরের যাত্রী আমি
ভুলে আছি সারাক্ষণ—
পৌঁছুতে যে হবে শেষে
তোমার কাছে—নিজের দেশে—
ভাবি না তা, করছি বৃথা
সুখের আশা আস্ফালন;
ঐ যে আঁধার নাম্‌ছে বাটে,
কখন্ তরী লাগবে ঘাটে—
নাইক আলো, নাই পাথেয়,
নাই কিছুরই আয়োজন—
আর না হরি তোমার পানে
ফিরাও আঁখি ফিরাও মন!

শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়।
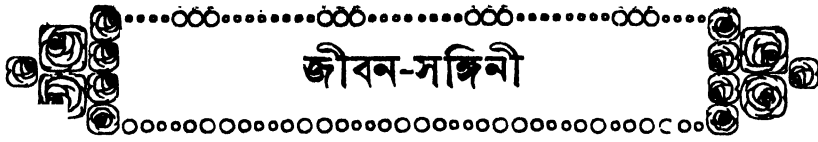
জীবন-সঙ্গিনী

ঘরে পাঁচ ছয় জন বসিয়া কেহ মাসিক বা সাপ্তাহিকের পাতা উল্টাইতেছিলেন; কেহ বা নীতি দুর্নীতি বিষয়ে জোর গলায় আলোচনা করিতেছিলেন; কেহ থিয়েটারের অভিনেতা বা অভিনয়-প্রণালীর নিন্দা ও সুখ্যাতি করিতেছিলেন।

কাহারও হাতে চা'র পেয়ালা, কাহারও হাতে গড়গড়ার নল। কেহ বা আপন মনে চুরুট ফুঁকিতেছিলেন। আড্ডাধারীদের মধ্যে কেহই চুপ করিয়া ছিলেন না। ঘুরিয়া ফিরিয়া সকলেই মেজাজ-মাফিক সব রকম আলোচনাতেই যোগ দিতেছিলেন।

বিমল ঘুরাইয়া ফিরাইয়া বার বার গাহিতেছিল,—

'মরিব মরিব সখী নিশ্চয়ই মরিব,
আমার কানু হেন গুণনিধি কারে দিয়ে যাব। সখী—'

আড্ডার কর্ত্তা আড্ডাধারী দাদা জানা-শুনা সকলেরই দাদা। কত লোক দাদার এখানে যায় আসে—একটিবার দাদার হাসিমাখা মুখখানি দেখিবার জন্য, দুইটা মুখের কথা শুনিবার জন্য। আরও একটা বড় মাদকতা আছে, সে বৌদির হাতের এক পেয়ালা মধুর চা!

আড্ডার কর্ত্তা দাদাকে কিন্তু প্রায়ই শয্যাশায়ী থাকিতে হইত। দাদার বয়স পঞ্চাশের কোঠায়—পঁচিশ বৎসরের সময় হইতে বাতে তাঁহার অধমাঙ্গ অবসন্ন। কখনও বাড়ীর মধ্যে এক আধটু চলা-ফেরা করিতে পারিতেন, রোগ বেশী হইলে তাহাও বন্ধ হইয়া যায়। শয্যাই তখন তাঁহার অবলম্বন হয়—আর এক প্রধান অবলম্বন বৌদি ত আছেনই।

দাদা বন্ধু-বান্ধবসহ আড্ডা দিতে বড় ভালবাসেন। এই অবস্থায়ও ঘরে বসিয়া তিনি সর্ব্বপ্রকার সমাজে যত পরিচিত, এমন বোধ হয় অল্প লোকই আছেন।

এমন দীর্ঘ ব্যাধির তাড়নাতেও দাদার হাসিলাবণ্য-ভরা উজ্জ্বল মূর্ত্তি—আর দরদী প্রাণের সহানুভূতির এতটুকুও হ্রাস করিতে পারে নাই। প্রাণের দরদ আর হাসির উচ্ছ্বাস স্ফুরন্ত পাইবার জন্যই বুঝি দাদার এত বন্ধু জুটিত।

তবু আড্ডার মাঝেও দাদা শ'বার বৌদিকে স্মরণ করিতেন। অন্তরঙ্গ আড্ডাধারীদের সঙ্গে দাদা অসঙ্কোচে বৌদি-সম্পর্কিত আলাপ করিতেন। সে আলাপে এতটুকু 'রাখি ঢাকি' ছিল না। উদার মহাদেবের মত আত্ম-ভোলা দাদা বৌদির নামে মাতিয়া যাইতেন। বাঁধা-ধরা নীতির নিয়ম ছাড়াইয়া তাহাতে তাঁহাদের সহজ সরল প্রাণের মিলন সম্পর্কের কথাও আসিয়া পড়িত।

এমনই ছিল দাদা-বৌদির সম্পর্ক। স্বামি-স্ত্রীতে মিষ্ট মধুর সম্পর্ক থাকা কিছু অস্বাভাবিক বা বিচিত্র নহে। কিন্তু যে স্ত্রী পঁচিশ বৎসরেরও উপরে রুগ্ন পঙ্গু স্বামীর আনন্দময়ী জীবনসঙ্গিনী থাকিয়া স্বামীকে সদা আনন্দে উচ্ছ্বসিত করিয়া রাখিতে পারেন, তাঁহার জীবনে একটু বৈচিত্র্য বোধ হয় কিছু আছে।

বিমলের 'মরিব মরিব সখী নিশ্চয়ই মরিব' গান তখনও থামে নাই। রাত্রি প্রায় সাড়ে দশটা বাজে, আড্ডাও পাতলা হইয়া আসিয়াছে।

অমল কহিল—"রেখে দে বিমল তোর প্যান-প্যানানি। মরিব মরিব—ও নারী জাতটারই একটা ধর্ম্ম। একটু কিছু হ'লেই চোখের জলে নাকের জলে একাকার। আর মলেই বাঁচি—এ ত যেন মুখে লেগেই আছে। ঘরেও মরিব মরিব শুনতে শুনতে অস্থির—দাদার ফূর্ত্তির আস্তানায় এসেও আর ও মরিব মরিব ভাল লাগে না, ভাই!"

সুরেশ কহিল—"সত্যি ভাই, ওই মরিব কথাটা মেয়েমাত্রেরই বড় প্রিয় দেখা যায়। ম'লে বাঁচি, হাড় জুড়োয়—এ কথা মেয়েদের মুখ থেকে যত শোনা যায়, এমন বুঝি আর কারও মুখ থেকে শোনা যায় না।"

গায়ক বিমল দার্শনিকের মত চক্ষু বিস্তৃত করিয়া ধীর সংযতভাবে কহিল—"যার জীবনে কোন লক্ষ্য না থাকে, সেই মরতে চায়। শ্রীরাধার জীবনের লক্ষ্য দূরে সরিয়া পড়িতেছিল, তাই অভিমানে মনোদুঃখে রাধা মরণ-কামনা করিতেছিলেন। কিন্তু যার অভাবে মরণ-কামনা, তাকে ছেড়ে যেতেই কি আর তাঁর প্রাণ চেয়েছিল? কবির নারী-হৃদয়ের অপূর্ব্ব বিশ্লেষণে তাই এ গান যুগে যুগে চির-জীবন্ত।"

অমল কহিল—"জীবন্তও বুঝি, সবই বুঝি। কিন্তু ভাই,

নিজে যখন সংসারের ঝড়-ঝঞ্ঝায় অতিষ্ঠ হয়ে পড়ি, তখন সহধর্ম্মিণীটিও যদি আর জীবন-সঙ্গিনী থাকতে না চেয়ে কেবলই জীবন ছাড়বেন ব'লে ভয় দেখাতে থাকেন, তা হ'লে তাতে মানসিক অবস্থা কি হয় বল দেখি! আমার পক্ষে ত তা একেবারে অসহ। এমনই ঘ্যান-ঘ্যানানি অসহ্য হওয়ায় আমি ত এক এক দিন বলেই ফেলি — তা বেশ, যদি এতই তোমার ইচ্ছা হয় ত মরলেই পার। মরবে, নিজের কপাল নিয়ে যাবে। কে আর তোমায় ফেরাতে যাচ্ছে বল।"

সুরেশ বলিল—"ওরে বাপ রে, এই কথা তুমি তোমার স্ত্রীকে বলতে পার,—তখন একেবারে কুরুক্ষেত্র বেধে যায় বুঝি! স্ত্রীকে যেচে মরতে বলা—এর মত অপরাধ যে কোন স্বামীর পক্ষে অমার্জ্জনীয় স্ত্রী-শাস্ত্র অনুসারে!"

অমল বলিল—"হ'তে পারে—কিন্তু এ ত যেচে বলা নয়—অতিষ্ঠ হয়ে বলা।"

গায়ক বিমলচন্দ্র কহিল—"যাই-ই হোক্, সে মরতে চাইলেই যে তাকে মরতে বলতে হবে, তার কোন মানে নাই। নারী অতি মানিনী—দুর্জ্জয় তার অভিমান। এ অভিমান ভাঙ্গতে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণকেও হাজার বার শ্রীরাধার পদতলে মাথা রাখতে হয়েছে। নারী এ অবস্থায় চায় সোহাগ, সান্ত্বনা। তাতে যদি তুমি চ'টে যাও—তবে ত পুরুষের পুরুষত্বই বিসর্জ্জন দিলে। নারী-চরিত্রের যথা-যোগ্য সম্মান দিয়ে তার অধিকারী ত হ'তে পারলে না। দুর্জ্জয় নারী তোমার কাছে চির-অবোধ্যই রয়ে গেল। কি দাদা, কি বলেন?"

দাদা এতক্ষণ নীরবে কথা শুনিতেছিলেন; বলিলেন, "দেখ ভাই, তোমার বৌদি বোধ হয় দোরের পাশে কল্কেটা রেখে গেলেন—নিয়ে এস উঠে,—"

সুরেশ উঠিয়া কল্কে আনিয়া গড়গড়ায় বসাইলে দাদা বলিলেন,—"মরিব মরিব সখী—এ নারী-হৃদয়ের অভিমানের উক্তি সন্দেহ নাই। কিন্তু সকল নারীই যে স্বামীকে রেখে মরতে চায়, তা নয়। অবশ্য সধবা মরা নারীর চির-আকাঙ্ক্ষিত, কিন্তু আদর্শ নারী সাবিত্রী ত মরতে চান নাই। বেহুলা স্বামীর জীবন-সঙ্গিনী থাকবার আশা-তেই তার মরণ-সঙ্গিনী হয়ে জীবন ফিরে পেয়েছিলেন। স্বামি-গৌরবে গরবিণী নারীর সধবা অবস্থায় মরণ কাম্য—কিন্তু নারীর এ কামনা স্বার্থ-বিজড়িত কামনা। স্বামীকে ছেড়ে গেলে স্বামীর যে কষ্ট হবে, সে তা ধারণার মধ্যেই আনলে না। সধবা অবস্থায় ম'রে নিজে ভাগ্যবতী নাম কিনলে। বিধবার কষ্ট ভুগলে না,—এই সে বড় ক'রে দেখলে; স্বামীর যে কি হবে, সেটুকু আর ভাবলে না। একে সত্যি প্রেমিকা বা জীবন-সঙ্গিনী কি ক'রে বলা যেতে পারে বল!"

অমল বলিল—"বেশ দাদা, একটু প্রেম-তত্ত্ব হোক না। দাদার মুখে প্রেমতত্ত্ব শুনে আনন্দ আছে।"

দাদা তামাকে দুইটা টান দিয়া বলিলেন—"প্রেমতত্ত্ব শুনবে?—সে প্রেম ছিল ব্রজের গোপীদের। শ্রীকৃষ্ণের সব চেয়ে প্রিয় ছিল ব্রজের গোপিকারা। এতে কৃষ্ণভক্ত দিব্যজ্ঞানী ঋষি নারদেরও ঈর্ষ্যা হয়েছিল। মহা ঋষি নারদের সব বিষয়ে দিব্যজ্ঞান এলেও প্রেম বিষয়ের ধারণা বা জ্ঞান বোধ হয় খুব কমই ছিল। তাই শ্রীকৃষ্ণ এক দিন নারদকে এ বিষয়ে কিছু শিক্ষা দেবার জন্য মহা অসুখের ভাণ করলেন। নারদ এসেছেন, শ্রীকৃষ্ণ মাথার যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ কচ্ছেন। শ্রীকৃষ্ণের মাথাধরা—নারদ ত অস্থির। কি করলে প্রভুর মাথার ব্যথা সারে—কি করলে তিনি সুস্থ হবেন!

শ্রীকৃষ্ণ বললেন—'নারদ, এ মাথাধরা ত সারবার নয়। সারতে পারে শুধু যদি মা, বাবা আর দাদা বলরামের পদধূলি ছাড়া আর কারও পদধূলি এনে আমায় দিতে পার, তবেই সারতে পারে।'

নারদ, ভাবলেন, এ ত সোজা কায। পৃথিবী জোড়া এত পা রয়েছে—নারদঋষি ঢেঁকী বাহনে এক দণ্ডে সহস্র পদের ধূলি কৃষ্ণচন্দ্রের জন্য এনে এখনই শ্রীকৃষ্ণের মাথাধরা ছাড়িয়ে দেবেন।

নারদ পদধূলি আনতে যাত্রা করলেন—কিন্তু হায়, জগতের নাথ কৃষ্ণচন্দ্রের জন্য পদধূলি পাওয়া ত; তত সহজ হ'ল না। ঢেঁকী অবিশ্রান্ত চলেছে—কত দেশ-বিদেশ, গ্রাম-নগর পার হয়ে পদধূলির প্রার্থী হয়ে ফিচ্ছেন। শ্রীকৃষ্ণের জন্য পদধূলি চাই, এ কথা শুনে সব পা গুটিয়ে নিচ্ছে! ওঃ বাবা, শ্রীকৃষ্ণকে পদধূলি দেব—কার এমন সাহস! কার এমন শক্তি! হায়, তবে কি কৃষ্ণের এ মাথাধরা সারবে না!

নারদ শ্রীকৃষ্ণমহিষী সত্যভামা, রুক্মিণী সবার কাছে

গেলেন, কত ঋষি, ঋষি-পত্নীর কাছে গেলেন— কেউ না, কেউ না—কেউ পদধূলি দিতে রাজী নয়!

ত্রিভুবন ঘুরে অবশেষে হতাশ হয়ে ফেরবার বেলায় নারদ গেলেন ব্রজের গোপীদের কাছে। নারদের ঢেঁকী আকাশপথে উড়ে আসতেই ব্রজাঙ্গনারা সব আকুল হয়ে ছুটে এল—প্রভু কৃষ্ণচন্দ্রের কি সংবাদ? প্রভু ভাল আছেন ত?

নারদ নীরস মুখে বললেন—'সংবাদ ভাল নয়। প্রভুর বড় মাথার যন্ত্রণা—ত্রিলোক ঘুরে মাথাব্যথার ওষুধ খুঁজে এলাম, কোথাও মিললো না।'

ষোল হাজার গোপী এককণ্ঠে ব'লে উঠলো—'কি ওষুধ—কি ওষুধ—প্রভুর মাথার যাতনা সারাতে কি চাই, বল দেবতা?'

পদধূলি!

ষোল হাজার গোপিকা একসঙ্গে পা বাড়াইয়া দিয়া বলিল—'ঠাকুর, এই নাও পদধূলি, আর কথা কইবার সময় নাই। এই পদধূলি দিয়ে আগে প্রভুকে সুস্থ কর।'

নারদ গোপিকাদের পদধূলি দিয়ে নারায়ণের মাথাধরা সারালেন।

প্রেম এমনই যে, জগৎ যা দিতে সাহস করে নাই, গোপিকারা কৃষ্ণকে তাই দিয়েছিল। নারদ বুঝলেন, কেন গোপিকারা নারায়ণের এত প্রিয় জীবনসঙ্গিনী।"

অমল বলিল—"দাদা, এ ত পৌরাণিক হ'ল। আধুনিক প্রেমতত্ত্বের কিছু বলুন।"

দাদা হাসিয়া বলিলেন—"কি আর বলবো? যুগ বয়ে গেছে, নূতন যুগ পড়েছে। তবে তোমার বৌদি আর আমার প্রেমের দু'টো কথাই বলি।

"আজ পঁচিশ বছর অক্লান্তভাবে হাসিমুখে সে আমায় টেনে নিয়ে আসছে। কোথাও যাওয়া আসা সে ছেড়ে দিয়েছে, আমারই জন্যে নানা অত্যাচারে নিজের অটুট স্বাস্থ্য খুইয়েছে—তোমাদের বৌদি আমার উদ্দাম যৌবন-লীলা প্রত্যক্ষ করেও সয়ে গেছেন। পাকা খেলোয়াড় যে ভাবে সুতো টেনে উচ্ছৃঙ্খলকে বশে আনে, ইনিও তেমনই কখনও রাশ আল্‌গা দিয়ে, আবার কখনও ক'সে টেনে আমায় ঘর-মুখ করেছিলেন। নইলে কি হ'ত কে জানে!

"হাঁ, তার পর নারীর মরিব মরিব ব'লে যে কথাটা হচ্ছিল, তোমাদের বৌদি কিন্তু এত সয়েও আমায় ফেলে মরতে একটুও রাজী নন। সে দিন ঐ পাশের ঘরে সব মেয়েরা সধবা-মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা জানিয়ে তাদের নারী-জীবনের সাধ ও সতীত্বের মহিমা প্রচার কচ্ছিলেন—তোমার বৌদি শুনলুম উল্টা গাইলেন—সকলে নিজ নিজ সাধ ব'লে ওঁকে নিজ সাধ ব্যক্ত করতে বলাতে উনি বললেন—'তোমরা আশীর্ব্বাদ কোরো, আমি যেন সধবা না মরি। আমি সধবা ম'লে ওঁর কি উপায় হবে? আজ ত্রিশ বছর আমি ওঁর সঙ্গে আছি—আমি—এই অবস্থা ওঁর—আমি ছেড়ে গেলে উপায় কি হবে! তেমন সধবার সাধ নিয়ে আমি স্বর্গে গিয়েও ত সুখী হ'তে পারবো না!'

"তবেই দেখছ, নারীও কেউ কেউ আছে—যারা স্বামীকে ছেড়ে মরতেও রাজী নয়। প্রেমতত্ত্বের কোন্ দিক বড়, তোমরাই বিচার ক'রে দেখ।"

বাহিরে চুড়ির রুণুঝুণু শোনা গেল। দাদা জানালা খুলিয়া বলিলেন, "ওহে, তোমাদের বৌদি বলছেন, পানটান যদি লাগে—" ঘড়ীতে ঢং করিয়া একটা বাজিতে সকলের চমক ভাঙ্গিল—ওঃ, এত রাত হয়ে গেছে! দাদার কাছে প্রেমতত্ত্ব শুনতে বসলে সব ভুলে থাকতে হয়!

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী।

শ্যাম

সে শ্যামচাঁদের মতন পিরীতি জানে কি গো আর কেহ?
পিরীতির রসে রসাইয়া বিধি গড়িলা যে তার দেহ!
তাহার নয়নে পিরীতির দিঠি—বয়ানে পিরীতি-হাস—
তার রসনায় বাণীসহ চির-পিরীতি করয়ে বাস।
নাসায় তাহার পিরীতির শ্বাস সৌরভ হয়ে ধায়—
চলন-ছন্দে পিরীতি-মাখান পিরীতি সকল গায়!
অধর-পরশে বাঁশের সে বাঁশী হইল পিরীতি-গড়া
পিরীতির রসে ডুবান তাহার শিখি-চূড়া পীতধড়া।
চরণ-সরোজে যে নূপুর বাজে তাহে সে পিরীতি গাথা
তাহার পিরীতে পড়েছে পিরীতি খাইয়া আপন মাথা!
দেবদাস কহে এ হেন পিরীতি যাহার কপালে ঘটে
সেই ত নেহারে ভিতরে বাহিরে পরম-পিরীতি-নটে!

শ্রীদেবকণ্ঠ বাগ্‌চী

কবিতার কাতরতা

খুলে নে' শিকল ও রে খুলে নে' শিকল,
বিকল বাঁধনে মম কমনীয় কায়,
বেঁধে গেছে কৃত্তিবাস, সাতবাসী কাশীদাস,
ধোপানী-চোপার ভয়ে গণ্ডী দেছে চণ্ডী
সমস্ত বাঁশীর রন্ধ্র, পরশি ভারতচন্দ্র,
সরস ছন্দের বন্ধে নাচালে আমায়।
লুকায়ে ছিলাম সুপ্ত, জাগালে ঈশ্বর গুপ্ত,
তপ্ত তেলে তপ্সে মাছ ভাজালে রাঁধিয়ে;
কাঁদায়ে রাঁধালে পাঁঠা, গোটা আনারস
ছাড়াইয়ে নিলে কি না বার ক'রে রস!
মিথ্যেবাদী মাইকেল, যদিও ফেরালে ভেল,
খুলেছি নিগড় ব'লে কবি' আস্ফালন,
অন্ত হ'ল অন্তে বটে, অক্ষরে অক্ষরে
মিত্রতা-বন্ধন; তবু সেই যতি সেই ছন্দ,
সেই অনুপ্রাস গন্ধ, নিন্দনীয় সান্ধ্য-সম্মিলনে।
হেমের প্রেমের ঢেউ, ভাল বলে কেউ কেউ,
চাটগেঁয়ে খালাসী, নবীনের পলাশী,
বিলাসী বীরের না কি বড়ই পছন্দ;
জাহাজের কাছি টানে, নাচে পদ্য মদ্যপানে,
বামুনে বন্দিতে বাঁধে পদে বেড়ি ছন্দ।
জোড়া গেল ভাঙা বুক, হাসি হাসি হ'ল মুখ,
রবির উদয় দেখি কবির আকাশে,
শিথিল কবরী গ'লে এলাইল চুল,
দুলিল অলকে মরি অচেনা কি ফুল,
ভিজে ভিজে ঘুম, চুপি চুপি চুম্,
কোকিল ঢুকিল নীড়ে, ডাকিল পাপিয়া।
স্বেচ্ছায় বেড়াই ছুটে, পিছনে আঁচল লুটে,
লাজ টুটে ফুটে উঠি ফিন্ জোছনায়;
দাঁড়াই পা দুই বাড়ায়ে গিয়ে,
না বাড়াতে এক পা—
কভু বোসে পড়ি ধাঁ;
আরামে বিরাম করি না আসিতে শ্রম;
যেথা কথা কম্ কথা কম্,
এই উঠি এই বসি,
খরপদে চ'লে যাই সোজা বিশ রশি।

আর কেবা রাখে দেবে,
স্বাধীন হয়েছি ভেবে,
বাজারে বেরুনু ছেবে পরিয়া গাউন্;
শেষে দেখি ডায়ার্কি,
মজাদার ইয়ার্কি,
ক্রিয়া যে কর্ত্তার কাছে; ইয়ার মিয়ার নাউন্।
দোরে খিল দিয়ে মিল,
ছন্দ হাসে খিল্ খিল্,
লুকায়ে লুকায়ে গতি,
মাঝে মাঝে আসে যতি,
মুখে এলে গ্রাস অনুপ্রাস ছাড়ে না ত রবি।
এঁরো সেই নাকে শোঁকা,
শ্রবণে কানের ধোঁকা,
নোখ্ দিয়ে এখনও তো দেখে নাকো কবি।
খুলে নে' শিকল ও রে খুলে নে' শিকল,
বাধনে বিকল মম কমনীয় কায়,
খুলে দে বন্ধন, মুছে দে চন্দন,
পায়স রন্ধনে নাই পিঁয়াজের গন্ধ;
পুরানো প্রাচীরে আর না রহিস্ বন্ধ।
এস নব নাট্যকার, পাঠ্যের পত্তনীদার,
লুকানো কোথায় আছ যুবা জমীদার;—
কোথায় রয়েছ ছদ্ম, মধ্যবিদ্যালয়পদ্ম,
কেন মিছে ভানো ধান, ত্যজিয়া চতুর্থ মান,
করাও সজোরে পান নব বঙ্গে মধু।
লেখ বিবাহের পদ্য, সদ্য শোকোচ্ছ্বাস,
ফেল নাবালক-দীর্ঘশ্বাস খাতার পাতায়;
বো'ঠান্ বো'ঠান্ ব'লে ধর ঘন তান,
ফুলের চুলের ঘ্রাণ নিক্ দুটি কান;
বেহাগ শ্রবণে হোক্ পাগল রসনা,
পশুক্ নাসার মাঝে বাসন্তী-বসনা,
সবাই স্বাধীন বঙ্গে সবাই স্বাধীন;
যে ক'দিন বাঁচি আমি কবিতা সুন্দরী—
কেন বা রহিব হয়ে নিয়ম অধীন।
খুলে নে' শিকল ও রে খুলে নে' শিকল,
দেখ কম কায়া মম বাঁধনে বিকল।

শ্রীঅমৃতলাল বসু

খেলনা-শিল্প

আমাদের দেশে এ পর্য্যন্ত খেলনা-শিল্প বলিয়া কোন স্বতন্ত্র ও সুপ্রতিষ্ঠিত শিল্প নাই। অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সহরে অথবা বর্দ্ধিষ্ণু গ্রামে সূত্রধর, মালাকার, কাঁসারী, কুম্ভকার প্রভৃতি শ্রেণীর লোকরা কয়েকপ্রকার খেলনা প্রস্তুত করে এবং সেগুলি গ্রাম্য মেলা ইত্যাদিতে দেখিতে পাওয়া যায়। বড় বড় সহরে অবশ্য খেলনা-প্রস্তুতকারী বিশেষ শিল্পী দুই চারি জন আছে; কিন্তু খেলনা-শিল্প অন্যান্য শিল্পে নিযুক্ত ব্যক্তিগণের একটি উপজীবিকা মাত্র। আবশ্যক কার্য্যের অবসরে এবং বিশেষ বিশেষ পূজা-পার্ব্বণ উপলক্ষে ইহারা পুতুল তৈয়ারী করিয়া যৎসামান্য রোজগার করে। আজকাল বঙ্গদেশের মধ্যে কেবলমাত্র বীরভূম জিলায় কাষ্ঠ ও ধাতব এবং নদীয়া জিলায় মাটার খেলনা ভূরিপরিমাণে প্রস্তুত হইতে দেখা যায়। কয়েক বৎসর হইতে 'কলিকাতা পটারী ওয়ার্কস্' প্রতিষ্ঠিত হইয়া এ দেশে পুতুল-শিল্পেরও অনেক উন্নতি হইয়াছে। রুচির পরিবর্ত্তনের সহিত পূর্ব্বকার ধরণের খেলনার চলন কমিয়া গিয়াছে এবং ইহাতে বিশেষ লাভ হয় না বলিয়াও, আগে যাহারা এ কার্য্যে লিপ্ত ছিল, তাহারা এ কায ছাড়িয়া দিয়াছে। কিন্তু সুশৃঙ্খলভাবে গঠন করিয়া তুলিতে পারিলে খেলনা-শিল্প যে বেশ লাভজনক হইতে পারে, তাহাতে সন্দেহের অবসর নাই। প্রতিবৎসর ভারতের বাজারে বিক্রীত অর্দ্ধ-কোটিরও অধিক টাকার বিলাতী খেলনা এ সম্বন্ধে অকাট্য সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

শিল্পের ভিত্তি

বলা বহুল্য যে, বালক-বালিকাগণের চিত্তবিনোদন করা ও তাহাদিগের সময়ক্ষেপণের সহায়তা করাই খেলনা প্রস্তুতের মূল উদ্দেশ্য। সুদক্ষ কারিগর দ্বারা প্রস্তুত হইলে খেলনা আরও একটি উচ্চতর উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইতে পারে—তাহা বালকদিগকে শিক্ষা প্রদান। বালক নিজের চতুর্দ্দিকে যাহা দেখিতে পায়, যে সামাজিক অবস্থার মধ্যে প্রতিপালিত হয়, তৎসমুদয় যদি খেলনায় প্রতিবিম্বিত হয়, তাহা হইলেই খেলনা চিত্তাকর্ষক হইয়া থাকে। বালক-বালিকার চরিত্রগঠনেও সেরূপ খেলনার সার্থকতা আছে। বস্তুতঃ সেই শ্রেণীর খেলনাকে 'সজীব' খেলনা বলিতে পারা যায়। অন্য কতকগুলি খেলনা একবারেই 'নির্জ্জীব'; সেগুলি শিশুগণকে আদৌ মোহিত করিতে পারে না; কেবলমাত্র কাষ্ঠ, ধাতু অথবা প্রস্তরখণ্ডের ন্যায় ব্যবহৃত হয়। স্থান, কাল ও পাত্র বুঝিয়া যে শিল্পী খেলনা প্রস্তুত করিতে সমর্থ, তাহার দ্রব্যই অচিরে বাজারে প্রাধান্য লাভ করে। আমাদিগের দেশে কতিপয় শ্রেণীর খেলনা যে ক্রমশঃ বিলোপ পাইতেছে, তাহার মূল কারণই বর্ত্তমান কালের পক্ষে তাহাদের অনুপযোগিতা। বিলাতী খেলনার প্রসারবৃদ্ধির কারণ—সেগুলির নূতনত্ব। কিন্তু এই শেষোক্ত শ্রেণীর খেলনার প্রসার দেশের পক্ষে খুবই ক্ষতিকর। উক্তরূপ খেলনার উত্তরোত্তর কাটতি-বৃদ্ধি শুধুই যে একটি দেশীয় শিল্পের উচ্ছেদসাধন করিতেছে, তাহা নহে; বিলাতী খেলনার ব্যবহারে আমাদিগের বালকবালিকাগণের কোমল হৃদয়ে অলক্ষিতভাবে এমন একটি বিজাতীয়তার ছাপ পড়িয়া যাইতেছে—যাহা তাহাদিগকে ভবিষ্যতে জাতীয়তার পথ হইতে বিচ্যুত করিতে পারে। সেই জন্যই যাহাতে ভারতীয় শিশুগণের উপযুক্ত খেলনা দেশেই প্রস্তুত হয় এবং তৎসমুদয় উৎকর্ষে ও মূল্যে বিদেশীয় সমশ্রেণীয় দ্রব্যের সমতুল্য হয়, সে বিষয়ে অবহিত হওয়া ভারতবাসীর একান্ত কর্ত্তব্য। এ সম্বন্ধে আরও একটি বিবেচ্য বিষয় এই যে, বর্ত্তমান অন্নসঙ্কটের সময় খেলনা প্রস্তুতস্বরূপ উপজীবিকা নষ্ট হইতে দেওয়া উচিত নহে। এত বিবিধরূপের খেলনা আছে যে, অবসরসময় এই সমুদয় প্রস্তুত করিয়া পুরুষ ও স্ত্রীলোক—সকলেই কিছু কিছু অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারেন।

খেলনার শ্রেণীবিভাগ

খেলনা নানা প্রকারের হইয়া থাকে। ইহার জন্য আবশ্যক উপাদান আদৌ দুর্লভ নহে। অবশ্য বিশেষ বিশেষ প্রকারের খেলনার জন্য বিশেষ বিশেষ উপাদানের কথা স্বতন্ত্র। সামান্য মৃত্তিকা হইতে আরম্ভ করিয়া চীনামাটী, প্রস্তর, কাঠ, বাঁশ, বেত, টিন, পিত্তল, তামা, লোহা, কাচ, নানাবিধ সূত্র ও বস্ত্র ইত্যাদি সমস্তই খেলনা প্রস্তুতে ব্যবহৃত হয়। বর্ত্তমান যুগে যে সমুদয় খেলনা প্রচলিত, সেগুলিকেকে মোটামুটি নিম্নলিখিত কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে পারা যায় :—

চীনামাটী ও কাচ ঃ—এই প্রকারের পুতুল প্রায়ই বিদেশ হইতে আমদানী হয়; ইহাদের চক্ষু কাচ দ্বারা প্রস্তুত। শুধু রঙ্গিন কাচের খেলনাও আছে; কিন্তু চীনামাটীর অনুপাতে কম।

কাষ্ঠপিণ্ড অথবা কাগজের খেলনা :— জাপান হইতে এই শ্রেণীয় খেলনা অল্পবিস্তর আমদানী হয়।

কাষ্ঠ ঃ—বহু পুরাকাল হইতে এতদ্দেশে কাঠের খেলনা চলিত আছে। কাঠ কুঁদিয়া অথবা কাঠের উপর চিত্র করিয়া এই সমুদয় খেলনা প্রস্তুত হয়; জর্ম্মণী এবং জাপান এই শ্রেণীর খেলনায় যেরূপ উন্নতিসাধন করিয়াছে, ভারত তাহার কিছুই পারে নাই। বঙ্গদেশে কিন্তু কাষ্ঠনির্ম্মিত সজ্জিত খেলনা প্রস্তুতে অনেকটা উন্নতি সাধিত হইয়াছে। তাহার একটি নমুনা এ স্থলে প্রদর্শিত হইল।

সজ্জিতা বালিকা

ধাতু-নির্ম্মিত খেলনা ঃ—পূর্ব্বে পিত্তলের অনেক প্রকার খেলনা প্রস্তুত হইত; এখনও উড়িষ্যার এবং যুক্তপ্রদেশের কতিপয় স্থানে এরূপ খেলনা দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু বঙ্গদেশে উহা প্রায় উঠিয়া গিয়াছে। তৎপরিবর্ত্তে বরং টিন ও সামান্যমাত্রায় ব্রোঞ্জের প্রস্তুত খেলনার চলন হইয়াছে। লোহা, পিত্তল ও কাষ্ঠ দ্বারা প্রস্তুত কয়েক রকমের খেলনা আজকাল দেখা যাইতেছে। তৎসমুদয়ে যে কারুকার্য্য ও শিল্প-নিপুণতা প্রদর্শিত

নানা প্রকারের খেলনা

হইয়াছে, তাহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, বাঙ্গালী শিল্পী সুযোগ ও উৎসাহ পাইলে উচ্চশ্রেণীর দ্রব্য প্রস্তুত করিতে পারে। কলিকাতায় শিল্পিগণের দ্বারা প্রস্তুত এইরূপ দুইটি খেলনা দেখিলেই তাহা সহজে বুঝিতে পারা যাইবে।

প্রস্তর-নির্ম্মিত খেলনা ঃ—শ্বেত ও নানাবিধ বর্ণের প্রস্তর খেলনা প্রস্তুতে নিয়োগ করা হয়। যুক্তপ্রদেশ ও পঞ্চনদের স্থানে স্থানে এই শ্রেণীর খেলনা প্রস্তুত হয় এবং বঙ্গদেশে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের ফিরিওয়ালাগণ তৎসমুদয় বিক্রয় করে। সাধারণতঃ এই শ্রেণীর খেলনার মূল্য কিছু অধিক।

যান ও যন্ত্রাদির প্রতিকৃতি ঃ—রেলের গাড়ী, মোটর গাড়ী, জাহাজ, ঘড়ী-সংযুক্ত মনুষ্য অথবা জীবজন্তুর আকৃতি ইত্যাদি এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। বিশেষজ্ঞ শিল্পী দ্বারা প্রস্তুত হইলে এই প্রকারের খেলনা শুধুই যে বালকগণকে আনন্দ

হাওয়ার বন্দুক

প্রদান করিতে পারে, তাহা নহে; এরূপ খেলার দ্রব্য হইতে কলকব্জা সম্বন্ধে তাহাদের একটা স্থূলজ্ঞানও জন্মিয়া থাকে।

কাপড় ও বনাতের খেলনা ঃ—এই শ্রেণীর সজ্জিত খেলনা সমুদায়ের চলন কিছু কম। কিন্তু অন্যান্য খেলনার অনুপাতে ইহাদের মূল্য অধিক।

সেলুলইড্ খেলনা ঃ—ইহা আধুনিক যুগের আবিষ্কার। সেলুলইডের বড় বড় পুতুল কলিকাতায় আজকাল অপরিচিত নহে। সেলুলইড্ মস্তক ও রবরের দেহ-সংবলিত পুতুলের চলনও ক্রমশঃ অধিক হইতেছে। এগুলি অধিকদিনস্থায়ী।

বৈজ্ঞানিক খেলনা ঃ—এই শ্রেণীর খেলনাই খেলনা-জগতে সবিশেষ উন্নতি এবং জর্ম্মণীতে ইহা বিশেষ পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছে। মনুষ্য ও পশ্বাদির প্রতিকৃতি এরূপ ভাবে প্রস্তুত করা হয় যে, সেগুলি তরুণ-তরুণীগণের পক্ষে যেমন চিত্তাকর্ষক, তেমনই শিক্ষাপ্রদ হইয়া থাকে। বাস্তব ও প্রাকৃত আকৃতির সহিত এরূপ খেলনার যথেষ্ট সামঞ্জস্য আছে এবং ইহাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি খুলিয়া লইতে ও আবশ্যকমত যোজনা করিতে পারা যায়। শুধু গ্রন্থপাঠে বালকগণ যে জ্ঞান লাভ করিতে না পারে, এইরূপ খেলনা দ্বারা তাহাদিগের ততোধিক জ্ঞান অর্জ্জন করা সম্ভবপর হয়।
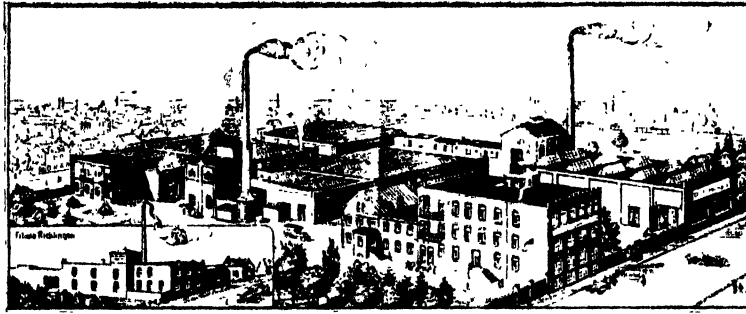
সেলুলইড খেলনা প্রস্তুতের কারখানা

বিদেশীয় খেলনা-শিল্প

জগতের সমস্ত উন্নতিশীল এবং সুসভ্য দেশেই খেলনা-শিল্পের অল্প-বিস্তর উন্নতি সাধিত্ হইয়াছে। কিন্তু এ বিষয়ে জর্ম্মণীই সর্ব্বাগ্রগণ্য এবং তৎপরেই জাপান। বিগত মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে জর্ম্মণীতে ১৪ কোটি মার্ক মূল্যের খেলনা উৎপাদিত হইত। যুদ্ধের সময় অবশ্য জর্ম্মণীর খেলনা ব্যবসায়ের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছিল এবং সেই সুযোগে জাপান জর্ম্মণীর অনেক ব্যবসায়ক্ষেত্র অধিকার করিয়া লয়। কিন্তু যুদ্ধের পর জর্ম্মণী আবার পূর্ণরূপে খেলনা-শিল্পের জীবন প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইয়াছে। তাহার প্রমাণস্বরূপ বলিতে পারা যায় যে, ১৯২০ খৃষ্টাব্দে জর্ম্মণী নিজ দেশে উৎপাদিত খেলনার শতকরা ৭৩ ভাগ বিদেশে চালান দিয়াছে; বিদেশে প্রেরিত খেলনার পরিমাণ ৬ লক্ষ ১৭ হাজার ১ শত ২৬ হন্দর। ইহাও এ স্থলে বলা আবশ্যক যে, ইংলণ্ডই জর্ম্মণ খেলনার সর্ব্বাপেক্ষা বড় খরিদ্দার। ফলতঃ এখনও জর্ম্মণীতে খেলনা-শিল্প পূর্ব্বের ন্যায় উন্নত অবস্থায় না আসিলেও, জর্ম্মণী নানারূপ প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে থাকিয়াও, জগতের বাজারে খেলনা বিক্রয় করিয়া অন্ততঃ ৫ কোটি টাকা লাভ করিতেছে। আমাদিগের দেশে খেলনা-শিল্প সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে জর্ম্মণীর খেলনা-শিল্পের সংগঠন ও বিক্রয়-প্রণালী সম্যক্‌রূপে হৃদয়ঙ্গম করা উচিত। যদিও জর্ম্মণীর প্রায় সর্ব্বত্রই খেলনা প্রস্তুত হইয়া থাকে, তথাপি খেলনা উৎপাদনের তিনটি প্রধান কেন্দ্র আছে;—সাক্সনী (Saxony), থুরিঞ্জিয়া (Thuringia) ও নুরেমবর্গ (Nuremberg)। প্রথমোক্ত দুইটি স্থানে খেলনা প্রস্তুত গৃহ-শিল্প বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। তাহার ফলে শিল্পিগণ এত দক্ষ হইয়াছে যে, সামান্য ব্যয়ে ভূরি-উৎপাদন (mass production) করিতে তাহারা সমর্থ। বিচিত্র খেলনা প্রস্তুত করাও তাহাদের বিশেষত্ব।

কুটীর-শিল্প হিসাবে জর্ম্মণীতে বহু পরিমাণ খেলনা প্রস্তুত হয়; তদ্ভিন্ন খেলনা প্রস্তুতের বড় বড় কারখানাও আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা এ স্থলে হানোভার নগরে ডাক্তার হুনিয়সের সেলুলইড্ খেলনা কারখানার উল্লেখ করিতে পারি। এই প্রসিদ্ধ ও বিপুল-কলেবর কারখানায় উৎপাদিত খেলনা-সমূহ আজকাল জগতের প্রায় সকল সুসভ্য দেশেই দেখা দিয়াছে। গোপিঞ্জেন

(Goppingen), জিঙ্গেন (Gingen on Brenz) ইত্যাদি নগরেও বিশাল কারখানা-সমূহ বিদ্যমান রহিয়াছে। আর এক শ্রেণীর কারখানা জর্ম্মণীতে কিছু দিন হইতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে—যাহাদিগের বিশেষত্ব মনুষ্য ও পশ্বাদির সঠিক প্রতিকৃতি প্রস্তুত করা। এই কারখানার মধ্যে মিউনিক (Munich) সহরের Zoo-Werkstaetten নামক কারখানা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। এখানে সিংহ, ব্যাঘ্র, কুকুর, বিড়াল, পাখী, বাঁদর প্রভৃতির আকৃতি বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিগণের design অনুসারে প্রস্তুত হয় এবং সেগুলির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমস্তই বৈজ্ঞানিক হিসাবে সঠিক। এ স্থলে প্রদর্শিত ছবি হইতে তাহার কতকটা আভাস পাওয়া যাইবে। বস্তুতঃ জর্ম্মণী বিজ্ঞানের সাহায্য গ্রহণ করিয়া, নানা দেশের লোকের চরিত্র অনুশীলন করিয়া এবং সঙ্ঘবদ্ধ-মাল-উৎপাদনের ব্যবস্থা করিয়া আজকাল জগতের খেলনার বাজারে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। বিগত মহাযুদ্ধের সময় ইংলণ্ড, মার্কিণ, জাপান প্রভৃতি অনেকেই খেলনার বাজারে যথেষ্ট প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন; কিন্তু এখন সকলকেই হটিয়া যাইতে হইতেছে।

সিম্পাঞ্জী দম্পতি

পিঞ্জরে পাখী

শিল্প সৃষ্টির উপায়

আমাদিগের দেশে বিভিন্ন সহরে যে তথা-কথিত Technical স্কুলসমূহ আছে, সেগুলি সংখ্যায়ও যথেষ্ট নহে এবং মধ্যবিত্ত গৃহস্থের উপযোগী কলাবিদ্যা উক্ত স্কুল-সমূহে উপযুক্তরূপে শিক্ষা দেওয়াও হয় না। খেলনা প্রস্তুত ত কোন স্থানেই শিক্ষা দেওয়া হয় না। কিন্তু যে খেলনা-শিল্প আজকাল দেশে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় লুপ্ত রহিয়াছে, তাহাকে শৃঙ্খলার সহিত সংগঠন পূর্ব্বক বিকশিত করিয়া তুলিতে হইলে উপযুক্ত শিক্ষাপ্রদান দ্বারা প্রথমেই শিল্পী প্রস্তুত করা আবশ্যক। জর্ম্মণী ইহা সম্যক্‌রূপে বুঝিতে পারিয়াই খেলনা-শিল্প শিক্ষা দিবার জন্য কয়েকটি স্কুল স্থাপন করিয়াছে। এইরূপ স্কুলের মধ্যে তিনটি প্রধান এবং উহাদের প্রত্যেকের সহিত এক একটি প্রাথমিক (Preparatory) স্কুল সংযুক্ত রহিয়াছে। বিভিন্ন শ্রেণীর খেলনা প্রস্তুতের জন্য আবশ্যক উপাদান পরীক্ষা ও নির্ব্বাচন, প্রতিকৃতি গঠনের আদর্শ-রচনা, কাঠের কায, কাচ চীনামাটী প্রভৃতির ব্যবহার, পুতুলের অঙ্গ-যোজনা ইত্যাদি বিষয় এই সমস্ত স্কুলে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। এতদ্দেশে এই প্রকারের স্কুল স্থাপন করা আবশ্যক হইলেও উহা কার্য্যে পরিণত করিতে কিছু সময়পাত অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু আপাততঃ যে সমস্ত টেক্‌নিক্যাল স্কুল আছে, তৎসমুদয়ে বিশেষভাবে খেলনা প্রস্তুত শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা সহজেই হইতে পারে। যদি প্রতি স্কুলে দেশীয় ও বিদেশীয় উৎকৃষ্ট খেলনা-সমূহের নমুনা রাখা হয় এবং ছাত্রদিগকে কোন্ কোন্ বিষয়ে বিদেশীয় খেলনার উৎকর্ষ আছে, তাহা স্পষ্টরূপে বুঝাইয়া দিয়া, কি প্রণালীতে কার্য্য করিলে উক্তরূপ উৎকর্ষ লাভ করিতে পারা যায়, তাহা দেখাইয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে সাধারণতঃ বুদ্ধিমান্ বাঙ্গালী বালক সহজেই ঐরূপ শিল্প-কৌশল (technique) আয়ত্ত করিতে পারে। এই প্রকারের কতিপয় সুদক্ষ খেলনা-শিল্পী প্রস্তুত

করিতে হইলে তাহাদিগের সাহায্যে গ্রামে অথবা নগরে অনেকে আবার খেলনা প্রস্তুত শিক্ষা করিতে পারে।

আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, জর্ম্মণীর কতিপয় স্থানে খেলনা প্রস্তুত সাধারণ গৃহস্থের একটি উপজীবিকা। আমাদিগের দেশে খেলনা-শিল্পের উন্নতিসাধন করিতে হইলে এই পথেই অগ্রসর হওয়া সমীচীন বলিয়া বোধ হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলিতে পারা যায় যে, সামান্য শিক্ষা পাইলে ভদ্র মহিলাগণ কাপড়ের, কাঠের অথবা বনাতের সজ্জিত পুতুল প্রস্তুত করিতে পারেন। কাঠের পুতুলের অবশ্য 'কাঠামো' অগ্রেই পাওয়া দরকার এবং অন্য পুতুলের এক একটি নমুনাও (Pattern) চক্ষুর সম্মুখে রাখা আবশ্যক। খেলনা-শিল্প পরিপুষ্টির উদ্দেশ্যে যদি একটি প্রচার-সমিতি গঠিত হয় এবং উক্ত সমিতি বাজার-চলিত খেলনার নমুনাসহ বঙ্গের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সহরে ও জনবহুল গ্রামে প্রচারক পাঠাইয়া খেলনা রচনাপ্রণালী শিক্ষা দেন, তাহা হইলে অপেক্ষাকৃত অল্পসময়ের মধ্যেই বঙ্গে খেলনা-শিল্প সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে।

এ স্থলে আরও বলা আবশ্যক যে, উক্তরূপ সমিতিকে দুইটি প্রধান কার্য্য করিতে হইবে ;—(১) খেলনা প্রস্তুতে আবশ্যক উপাদান যথাসম্ভব স্বল্পমূল্যে শিল্পিগণকে সরবরাহ করা এবং (২) প্রস্তুতীকৃত খেলনা যে বাজারে সর্ব্বোচ্চ মূল্যে পাওয়া যায়, তথায় বিক্রয় করা। এরূপ ব্যবস্থা না থাকিলে অন্ততঃ প্রথম অবস্থায় শিল্পিগণ উৎসাহের অভাবে কার্য্যে শিথিলতা প্রদর্শন করিবে। গৃহ, শিল্প-বিদ্যালয় অথবা কারখানাজাত সমস্ত খেলনা সম্বন্ধেই এই কথা বলিতে পারা যায়। নির্দ্দিষ্ট প্রকারের খেলনা লইয়া ও প্রধানতঃ বর্ত্তমান টেক্‌নিকাল স্কুলসমূহের উপর নির্ভর করিয়া খেলনা-শিল্প প্রতিষ্ঠার সূত্রপাত করিতে পারা যায়। এইরূপ সামান্য প্রারম্ভও যে নিষ্ফল হইবে, তাহা বোধ হয় না। কারণ, সচরাচর প্রদর্শনী ও দোকান প্রভৃতিতে যে খেলনার নমুনা দেখা যায়, সেগুলিতে বাঙ্গালী শিল্পীর কল্পনা ও শিল্প-নিপুণতার অভাব নাই। আবশ্যক কেবল ভূরি উৎপাদন দ্বারা খেলনার মূল্য সুলভ করা এবং এরূপ আদর্শে খেলনা প্রস্তুত করা—যাহাতে সেগুলি ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের বালক-বালিকাগণের রুচিসঙ্গত ও প্রীতিকর হইতে পারে। তাহা হইলেই মাল কাটতির কোন বিঘ্নই হইবে না। আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে খেলনা-সম্বন্ধীয় কারখানা শিল্পের আলোচনা করিতে বিরত থাকিলাম; কারণ, বর্ত্তমান অবস্থায় এতদ্দেশে সেরূপ কারখানা প্রতিষ্ঠার অনেক অন্তরায় রহিয়াছে।

শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত।

আবার ?

আবার কি প্রিয়, আসিবে গো তুমি
আমার কুটীর-দ্বারে ?
আবার কি কভু ফুটিবেক ফুল,
গা'বে ফুলে ফুলে ভ্রমরার কুল,
আবার কি কভু উঠিবে গো সুর
ছিন্ন বীণারই তারে ?
আসিবে কি প্রিয়, আসিবে আবার
আমারি কুটীর-দ্বারে ?

আবার কি পাখী গেয়ে' যাবে গান,
বসন্তের দূত তুলি' কুহুতান,—
ভরিয়া দিবে গো ব্যথিত এ প্রাণ
কোন্ সে অজানা সুরে!
হাসিবে কি প্রিয়, হাসিবে আবার
আমারি কুটীর-দ্বারে ?

আবার কি প্রিয়, এ নদীর কূলে,—
আসিবে গো তুমি, আসিবে কি ভুলে
ভাসায়ে তোমার সোনার তরণী
আকুল নদীর নীরে,
আসিবে কি প্রিয়, আসিবে কি তুমি
আমারি কুটীর-দ্বারে ?

হাসিবে কি প্রিয় হাসিবে কি তুমি,
উজল করিয়া নগ-নদী ভূমি ?
স্বরগের জ্যোতিঃ আনিবে মরতে
অমল কিরণ ধারে,
আবার কি প্রিয় আসিবে গো তুমি
আমারি কুটীর-দ্বারে ?

শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত।

ইতিহাস ও পুরাণ

আজকাল আমাদের দেশে ইতিহাসের চর্চ্চা আরব্ধ হইয়াছে। আমরা এই বিষয়ে নানা দিক্ দিয়া অগ্রসর হইতেছি। বাঙ্গালার সাহিত্য-সম্রাট স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়া গিয়াছেন,—"বাঙ্গালায় ইতিহাস চাই নহিলে বাঙ্গালার ভরসা নাই।" সেই হইতে সেই মহাত্মার মৃত-সঞ্জীবন মন্ত্রে যেন বাঙ্গালার ইতিহাসের আলোচনা নব-জীবন পাইয়াছে। এই অল্পকালের মধ্যে এই পথে বাঙ্গালী যতটা অগ্রসর হইয়াছে, তাহা আশাপ্রদ।

আমাদের দেশের প্রাচীন ইতিহাস নাই। য়ুরোপীয়রা অনেকে বলেন, হিন্দুরা ইতিহাস লিখিত না,—ইতিহাসের মর্য্যাদা বুঝিত না। আমরা এ কথা কোনমতেই স্বীকার করি না। ইতিহাস কথাটা নূতন প্রস্তুত হয় নাই। বৈদিক সাহিত্য হইতে পৌরাণিক সাহিত্য পর্য্যন্ত সর্ব্ব-সাহিত্যেই "ইতিহাস" শব্দের বহুল ব্যবহার দেখা যায়। আমরা এই প্রবন্ধে সে সকল কথার আলোচনা করিব। তাহার পর দুই একখানি আধুনিক ইতিহাস যে না পাওয়া গিয়াছে, তাহা নহে। কাশ্মীরের কহ্লন মিশ্র প্রণীত রাজ-তরঙ্গিণী, রাজপুতানার রাজপুতদিগের কাহিনী, চাঁদ-কবি প্রণীত পৃথ্বীরাজ-চরিত, বাঙ্গালার লঘুভারত, বল্লাল-চরিত প্রভৃতি হিন্দুদিগের শেষ আমলের কয়েকখানা বিক্ষিপ্ত ইতিহাস বা ইতিহাসের ন্যায় গ্রন্থ সম্পূর্ণ বা খণ্ডিত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে। তবে প্রাচীন অর্থাৎ বৌদ্ধ-যুগের পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ের হিন্দুদিগের ইতিহাস নাই; না থাকিবার অনেকগুলি প্রবল কারণ আছে। তন্মধ্যে একটি কারণের কথা সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ভিন্সেণ্ট স্মিথ অতি সুন্দরভাবে বিবৃত করিয়াছেন। আমরা এই স্থানে তাঁহার কথা কয়টি উদ্ধৃত করিয়া দিলাম,—

"A large part of the destruction of writings in India, which is always going on, must be ascribed to the peculiarities of the climate and the ravages of various pests, especially the white ants. The action of these causes can be Checked only by unremitting care, sedulous vigilance and eonsiderable expense, conditions never easy of attainment under Asiatic administration and wholly unattainable in times when documents have been deprived of immediate value by political changes (Akbar, page 3.)"

ইহার মর্ম্মার্থ এইরূপ,—"ভারতের অনেক পুথি-পত্র যে ধ্বংস হইয়া যাইতেছে, তাহার একটা মোটা কারণ এই, দেশের আবহাওয়া, আর নানা রকমের আপদবালাই। তন্মধ্যে উইপোকা একটা বিশেষ বালাই। বিশেষ সতর্ক না থাকিলে এবং অর্থ-ব্যয় না করিলে ঐরূপ উৎপাত হইতে পুথি-পত্র রক্ষা করা যায় না। আর যখন রাজনীতিক পরিবর্ত্তনের ফলে পুথি-পত্রের ও দলিল-দস্তাবেজের উপস্থিত প্রয়োজনীয়তা কমিয়া যায়, তখন উহা রক্ষা করাই অসম্ভব হইয়া পড়ে।"

ভিন্সেণ্ট স্মিথ মুখ্যতঃ আকবরের সময়ের পুথি ও দলিল-দস্তাবেজের কথা বলিয়াছেন। ৩ শত ২১ বৎসর পূর্ব্বে আকবরের মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তাঁহার কাগজপত্র সযত্নে রক্ষিত ছিল, কিন্তু এই ৩ শত ২১ বৎসরের মধ্যে তাহার অধিকাংশই লোপ পাইয়াছে। ভারতের ইতিহাসে ৩ শত বা ৪ শত বৎসর অতি অল্প সময়। এই অল্প সময়ের মধ্যে যদি এত প্রয়োজনীয় কাগজ-পত্রের অধিকাংশ নষ্ট হইয়া যায়, তাহা হইলে হাজার বা দেড় হাজার বৎসরেরও অধিক পুরাতন ইতিহাস গ্রন্থ যে একে-বারে নষ্ট হইয়া যাইবে, তাহাতে আর বিস্ময়ের বিষয় কি আছে? গত আড়াই হাজার বৎসরে ভারতে যে কত বিপ্লব হইয়া গিয়াছে, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। এই সকল বিপ্লবও পুস্তকাগার-ধ্বংসের ও ইতিহাসনাশের এক একটা প্রবল কারণ। মুসলমান অধিকারকালে বিহার এবং ওদন্তপুরে যে বিশাল পুস্তকাগার ধ্বংস হইয়াছিল,

তাহা হইতেই রাজনীতিক বিপ্লবে পুস্তকাদি ধ্বংসের সম্ভাবনা যে কত অধিক, তাহার একটা আভাস পাওয়া যায়।

ইতিহাসরক্ষার পক্ষে আর একটা অতি প্রবল অন্তরায় ছিল। কালের সহিত ইতিহাসের বিস্তৃতি বৃদ্ধি পায়; অর্থাৎ যত দিন যায়, ইতিহাস তত বিস্তৃত হইয়া পড়ে। তখন লোকের পক্ষে উহা সমস্ত মুখস্থ রাখাই কঠিন হইয়া উঠে। পূর্ব্বকালে মাগধ ও চারণগণই ইতিহাস মুখস্থ করিয়া তাহার আবৃত্তি করিতেন। তাঁহাদের পক্ষে সমস্ত ইতিহাস যখন মুখস্থ রাখা কঠিন হইত, তখন তাঁহারা, যে রাজ-বংশ যে প্রদেশে রাজত্ব করিতেন, সেই রাজবংশের ইতি-হাসই কীর্ত্তন করিতেন। কিন্তু অকস্মাৎ যদি অন্য বংশের রাজা বা কোন সেনাপতি আসিয়া কাহারও রাজ্য দখল করিতেন, তাহা হইলে রাজনীতিক কারণেই নবভূপতি মাগধ, চারণ প্রভৃতিকে রাজ্যচ্যুত রাজগণের গুণকীর্ত্তনে বা ইতিহাস গঠনে বাধা দিতেন। অন্ততঃ ঐ সকল পূর্ব্ববর্ত্তী রাজার ইতিহাস কীর্ত্তন করিলে মাগধ ও চারণগণের অর্থ-প্রাপ্তির বিশেষ সুবিধা থাকিত না। কাযেই তাঁহারা পূর্ব্বতন ইতিহাসপাঠ ছাড়িয়া দিয়া নূতন রাজগণের ইতিহাস-পাঠে মনোযোগী হইতেন। পুরাতন ইতিহাস পুথির মধ্যেই রুদ্ধ থাকিত। পরে কালবশে সেই সকল পুথি উইপোকার উদরে বা বৈশ্বানরের জঠরেই পরিপাক পাইত। এই প্রকারে অনেক ইতিহাস বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। চাঁদ কবি প্রভৃতি যে সকল ঐতিহাসিক গ্রন্থের বা নিবন্ধের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আভাস দিয়াছেন, তাহার কোনখানিরই কোন সন্ধান আজ পর্য্যন্ত মিলে নাই।

এখানে একটা প্রশ্ন হইতে পারে যে, বেদ, বেদাঙ্গ প্রভৃতি একবারে লোপ পাইল না, ইতিহাসই বা এমন ভাবে সমূলে লোপ পাইল কেন? ইহার উত্তর অতি সহজ। শ্রুতি, স্মৃতি, দর্শন, পুরাণ, তন্ত্র প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্র হিসাবে ব্রাহ্মণগণ পাঠ এবং রক্ষা করিতেন। উহার রীতিমত অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা চলিত। ঐ সকল অধ্যয়নের এক একটা ফলশ্রুতিও আছে। কাযেই ধর্ম্ম হিসাবে ও ধর্ম্মবিশ্বাসের বশে উহা পঠিত হইত। তাহা হইলেও উহার প্রত্যেকেরই কত অংশ যে এখন লোকচক্ষুর অন্তরালে আত্মগোপন করিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। বেদের বহু শাখার এখন সন্ধান মিলিতেছে না। সকল স্মৃতি গ্রন্থের যে সকল অংশ পাওয়া গিয়াছে, তাহা মনে হয় না। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র ত মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয়। রাষ্ট্রভঙ্গেও উহার আলোচনা বন্ধ হইবার নহে। কিন্তু সেই আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের এখন দুই খানিমাত্র প্রাচীন গ্রন্থ প্রচলিত আছে; তন্মধ্যে কেহ কেহ বলেন যে, একখানি অপেক্ষাকৃত অর্ব্বাচীন। কিন্তু ঐ গ্রন্থে আরও উনিশ কুড়ি জন ঋষি প্রণীত গ্রন্থের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রন্থগুলি আর মিলে না। নীতিশাস্ত্র মানব-সমাজের বিশেষ প্রয়োজনীয় গ্রন্থ। উহার আলোচনাও কখনই একবারে বন্ধ হয় নাই। কিন্তু তাহা হইলেও উহার বহু গ্রন্থ আর পাওয়া যাইতেছে না। ব্রহ্মা এক কোটি শ্লোকাত্মক একখানি নীতিগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন; উহা 'তর্ক বিস্তৃত' অর্থাৎ উহাতে প্রত্যেক সিদ্ধান্তের হেতুবাদ প্রদত্ত ছিল।* সে গ্রন্থ গেল কোথায়? শুক্রাচার্য্য লিখিয়াছেন যে, মানুষের আয়ুঃ ক্রমশঃ অল্প হইতেছে দেখিয়া, তিনি ব্রহ্ম-প্রণীত নীতিশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত-গুলিই শ্লোকাকারে তাঁহার নীতিশাস্ত্রে নিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, বশিষ্ঠ প্রভৃতি মহর্ষিরাও তাঁহার পূর্ব্বে উক্ত ব্রহ্ম-প্রণীত নীতিশাস্ত্রের সংক্ষিপ্ত-সার লিখিয়া গিয়াছেন। সে সকল গ্রন্থও আর নাই। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র ত সম্প্রতি পাওয়া গিয়াছে। এইরূপ অনেক গ্রন্থই বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। তবে অন্য শাস্ত্র অবশ্য-পাঠ্য বলিয়া তাহার কিছু কিছু আছে, ইতিহাসের প্রায় কিছুই নাই।

এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, প্রাচীনকালে ইতিহাস যে লিখিত হইত, তাহার প্রমাণ কি? প্রমাণ প্রাচীনকালের সাহিত্য। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, বৈদিক সাহিত্য হইতে পৌরাণিক সাহিত্য পর্য্যন্ত সকল সাহিত্যেই ইতি-হাসকে অতি উচ্চ স্থান দেওয়া হইয়াছে। তবে পৌরাণিক সাহিত্যের শেষের দিকে ইতিহাসের স্থানটি যেন বিশেষ

* কেহ কেহ মনে করেন যে, ব্রহ্মার প্রণীত কোন গ্রন্থই থাকিতে পারে না, কারণ, ব্রহ্মা এক জন কাল্পনিক ব্যক্তি। কিন্তু এ কথা বলিলে শুক্রাচার্য্য মিথ্যা কথা বলিয়াছেন বলিতে হয়। তাহা কখনই সম্ভব নহে। আসল কথা, ঐ গ্রন্থ বহু লোক দ্বারা ক্রমশঃ লিখিত এবং উহা ব্যক্তিবিশেষের লিখিত নহে বলিয়া উহা ব্রহ্মার নামে প্রচারিত হইয়াছিল। প্রাচীন লেখকরা এইরূপ করিতেন, এরূপ করিবার কারণ আছে। বিশেষতঃ এক জনের দ্বারা এক কোটি শ্লোকপূর্ণ গ্রন্থ রচনা অসম্ভব।

নামিয়া গিয়াছে দেখা যায়। ইহাতে অনুমান হয় যে, ঐ সময় ঐতিহাসিক সাহিত্যের বিলোপ হইয়াছিল বা হইতেছিল। বৈদিক সাহিত্যে যেখানে যেখানে ইতিহাসের উল্লেখ আছে, তাহা সমস্ত উদ্ধৃত করা সহজ নহে। তাহার উল্লেখ করিতেও অনেক স্থানের প্রয়োজন। সেই জন্য আমি কয়েকটির উল্লেখ করিলাম। যথা—অথর্ব্বসংহিতা (১১, ৬৪), জৈমিনীয় ব্রাহ্মণ (১, ৫৩), গোপথ ব্রাহ্মণ (১, ১০), শতপথ ব্রাহ্মণ (১৩৪, ৩, ১২, ১৩), তৈত্তিরীয় আরণ্যক (২, ৯)। ইহার সর্ব্বত্রই ইতিহাসকে অতি উচ্চ স্থান দেওয়া হইয়াছে। ইহা ভিন্ন তৈত্তিরীয় আরণ্যকের প্রথম প্রপাঠকের তৃতীয় অনুবাকে যে মন্ত্রটি দেখা যায়, তাহাতে স্মৃতি, প্রত্যক্ষ, ঐতিহ্য এবং অনুমান-চতুষ্টয়ের কথা আছে। এ স্থলে "ঐতিহ্য" অর্থে ইতিহাস, আখ্যান ও পুরাণ প্রভৃতি প্রাচীন কথা। শতপথ ব্রাহ্মণে চারি বেদে, ইতিহাস, পুরাণ, নারশংস ও গাথার উল্লেখ দেখা যায়। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে অথর্ব্বাঙ্গিরস ব্রাহ্মণ, ইতিহাস, পুরাণ, কল্প, গাথা, নারশংস প্রভৃতিকে স্বাধ্যায়ের বিষয় অর্থাৎ অবশ্য-পাঠ্য বলিয়া ধরা হইয়াছে। ঐতরেয় ও কৌষীতকী ব্রাহ্মণে "আখ্যানবিদ"দিগকে বিশেষ প্রশংসাও করা আছে। শতপথ ব্রাহ্মণের দ্বাদশ কাণ্ডে আখ্যান, অন্বাখ্যান ও উপাখ্যানের কথা আছে। এগুলি লৌকিক ইতিহাসেরই প্রকারভেদ। এরূপ অনেক আছে।

তাহার পর উপনিষদের কথা। উপনিষদের মধ্যে বৃহদারণ্যক উপনিষদই প্রাচীনতম, ইহাই পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মত। সেই বৃহদারণ্যক উপনিষদের দ্বিতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ ব্রাহ্মণে লেখা আছে—"যেমন প্রজ্বলিত ভিজা কাঠ হইতে একসঙ্গে পৃথক্ আকারে ধূম ও অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়, সেইরূপ পরমাত্মা হইতেই চারি বেদ, ইতিহাস, পুরাণ, বিদ্যা (দেবজনবিদ্যা fine arts), উপনিষদ শ্লোক সূত্র প্রভৃতি একসঙ্গে পৃথক পৃথকভাবে বাহির হইয়াছে। উহা পরমাত্মারই নিশ্বাস। এ স্থলে চারি বেদের পরই ইতিহাসের উল্লেখ করা হইয়াছে।

ছান্দোগ্য উপনিষদও অতি প্রাচীন। ইহাতে দেখা যায় যে, এক সময় দেবর্ষি নারদ সনৎকুমারের নিকট বিদ্যা শিক্ষা করিতে গিয়াছিলেন। সনৎকুমার নারদকে জিজ্ঞাসা করেন, তোমার কোন্ কোন্ বিদ্যা পড়া আছে? নারদ ঐখানে তাঁহার অধীত বিদ্যার এক লম্বা তালিকা দিয়াছিলেন। তন্মধ্যে চারি বেদের পরই ইতিহাস-পুরাণকে পঞ্চম বেদ বলা হইয়াছে এবং বাক্যো বাক্য (তর্কশাস্ত্র), একায়ন (নীতিশাস্ত্র), ব্রহ্মবিদ্যা, ভূতবিদ্যা রাশি (গণিত) প্রভৃতির উপরে ইতিহাসের স্থান দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং বেদের জ্ঞানকাণ্ডেও ইতিহাসকে উচ্চস্থান দেওয়া হইয়াছে।

তাহার পরে ম্যাক্সমূলার প্রভৃতির মতে সূত্রযুগ। এই সূত্রযুগে কল্প, গৃহ্য, শ্রৌত প্রভৃতি সূত্র রচিত হয়। আমরা দেখিতে পাই যে, শাঙ্খায়ন শ্রৌতসূত্র, আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্র প্রভৃতিতে বহু স্থানে ইতিহাসের উল্লেখ আছে, আর ইতিহাসের স্থানও উচ্চ দেওয়া হইয়াছে। ইহার পরই সংহিতার যুগ। মনুসংহিতাই সংহিতার মধ্যে শ্রেষ্ঠ। সেই মনুসংহিতায় বলা হইয়াছে যে, শ্রাদ্ধকালে ব্রাহ্মণদিগকে বেদ, ধর্ম্মশাস্ত্র, আখ্যান, ইতিহাস, পুরাণ অথবা খিল (শ্রীসূক্ত) শুনাইতে হয়। মনু এ স্থলে "ইতিহাসান্" এই বহুবচনান্ত পদ প্রয়োগ করিয়াছেন, ইহা দেখিয়া বুঝা যায়, তখন বহু ইতিহাস প্রচলিত ছিল।

তাহার পর পুরাণ। * পুরাণগুলির মধ্যে ব্রহ্মপুরাণই প্রাচীনতম। ব্রহ্মপুরাণে (১।১৬) লিখিত আছে যে, ঋষিরা সূতকে "আপনি পুরাণ, আগম, ইতিহাস, দেবদানব-চরিত্র, জন্ম ও কর্ম্ম সমস্তই জানেন" বলিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। এখানেও ইতিহাসকে একটা বিশিষ্ট ও অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিদ্যা বলিয়া ধরা হইয়াছে। অবশ্য এ স্থলে বেদের কথা নাই, কিন্তু ধীমান্ লোমহর্ষণ সূত বা শূদ্র বলিয়া তাঁহাকে বেদবিৎ বলা হয় নাই। এই পুরাণে পরাশর সূতকে ইতিহাস-পুরাণজ্ঞ, বেদ-বেদাঙ্গ-পারগ, সর্ব্বশাস্ত্রার্থ-তত্ত্বজ্ঞ প্রভৃতি বলা এবং বহু স্থানে ইতিহাস ও আখ্যানাদি জ্ঞানের প্রশংসা করা হইয়াছে। পদ্মপুরাণেও ইতিহাসের বিশেষ প্রশংসা আছে। বিষ্ণুপুরাণ, পদ্মপুরাণ প্রভৃতির মতে পদ্মপুরাণই দ্বিতীয় পুরাণ। এই পদ্মপুরাণে (৫।২।৫২) লিখিত আছে যে, ইতিহাস ও পুরাণ দ্বারা বেদের জ্ঞান উপচিত করিয়া লইতে হয়। তাহা যদি

* ইদানীন্তন মতে কাব্যযুগ পৌরাণিক যুগের পূর্ব্ববর্ত্তী। কিন্তু মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস মহাভারতে বলিয়াছেন যে, তিনি পুরাণ প্রণয়ন শেষ করিয়া মহাভারত রচনা করিয়াছেন। আমি এই হিসাবে পুরাণের কথা প্রথমেই বলিলাম। ইদানীন্তন মত যে একেবারে ভ্রান্ত নহে, তাহা পুরাণ-প্রসঙ্গে আলোচনা করা যাইবে।

না করা হয়, তাহা হইলে সেই অল্পবিদ্য লোকের নিকট বেদ 'আমাকে এই ব্যক্তি প্রহার করিবে' ভাবিয়া ভীত হইয়া থাকেন। * এখানে বলা হইয়াছে যে, ইতিহাস ও পুরাণ না জানিলে বেদের অর্থবোধই হয় না। এই শ্লোক এবং ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোক অত্যন্ত পুরাতন বলিয়া বোধ হয়। কারণ, ইহা তিনখানি পুরাণে অবিকল এক ভাবেই আছে। যথা—বায়ুপুরাণ (১।২০০-১), শিবপুরাণ (৫। ১।৩৫) এবং পদ্মপুরাণ। মহাভারতের আদিপর্ব্বের প্রথম অধ্যায়েও এই শ্লোকটি ঠিক এইরূপই আছে। সেই জন্য মনে হয়, এই অতি প্রাচীন শ্লোকটি অন্ততঃ তিনখানি পুরাণে ও মহাভারতে অবিকল গৃহীত হইয়াছে। ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকটিও পদ্মপুরাণে, বায়ুপুরাণে এবং শিবপুরাণে ঠিক একরূপই আছে, কিন্তু মহাভারতের আদিপর্ব্বের দ্বিতীয় অধ্যায়ে উহা একটু পরিবর্ত্তিতভাবে দৃষ্ট হয়। উক্ত শ্লোকে ইতিহাস পাঠের অতীব প্রয়োজনীয়তাই সূচিত হইয়াছে। এই পদ্মপুরাণের স্বর্গখণ্ডে (২৬।১৩৮) লিখিত হইয়াছে যে, অনধ্যায় দিনে বেদ অধ্যয়নই নিষিদ্ধ; কিন্তু বেদাঙ্গ ইতিহাস এবং পুরাণ বা অন্য কোন ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করা নিষিদ্ধ নহে। বিষ্ণুপুরাণেও বহু স্থানে ইতিহাসের উল্লেখ আছে। ইহাতে প্রথমেই পরাশরের পরিচয়ে তাঁহাকে অন্যান্য শাস্ত্রে অধিকারী বলার সহিত "ইতিহাস-পুরাণজ্ঞ" এবং রোমহর্ষণের পরিচয়ে বেদব্যাস ইঁহাকে ইতিহাস এবং পুরাণ (ইতিহাসপুরাণয়োঃ) শিষ্য করিয়াছিলেন বলা হইয়াছে (৩।৪।১০)। এ স্থানে দ্বিবচন প্রয়োগে উভয় বিদ্যার স্বাতন্ত্র্য সূচিত হইতেছে। কিন্তু যেখানে প্রজাপতি হইতে উদ্ভূত বিদ্যার কথা বলা হইয়াছে, সে স্থানে অষ্টাদশ বিদ্যার মধ্যে ইতিহাসের নাম-গন্ধও নাই। (৩।৬।২৮-২৯)। বায়ুপুরাণেও লিখিত হইয়াছে যে, ব্রহ্মা সর্ব্বপ্রথমে পুরাণ, পরে বেদ, বেদাঙ্গ, ধর্ম্মশাস্ত্র ও ব্রতনিয়মাদি স্মরণ করেন। মৎস্যপুরাণেও অনেকটা ঐরূপ কথাই বলা হইয়াছে (৩।২-৪)। গরুড়পুরাণে (পূর্ব্ব ২।৩২) "ইতিহাসান্যহং রুদ্র" অর্থাৎ আমিই রুদ্ররূপে ইতিহাস সমস্ত, এই কথায় ইতিহাস পদের বহুবচনান্ত প্রয়োগ দেখিয়া অনুমিত হয় যে, তখন অনেকগুলি ইতিহাস ছিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহাও লক্ষ্য করা আবশ্যক যে, বৃহদারণ্যক উপনিষদে ব্রহ্মা হইতে ইতিহাস এবং পুরাণ উভয়ের স্বতন্ত্র উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া কীর্ত্তিত, কিন্তু অধিকাংশ পুরাণেই, বিশেষতঃ শেষ আমলের পুরাণ ও উপপুরাণগুলিতে প্রায় ইতিহাসের স্বাতন্ত্র্য সূচিত নাই।

মহাভারতে ইতিহাসের কথা অনেক আছে। এমন কি, মহাভারতই ইতিহাস, এমন কথাও মহাভারতে দৃষ্ট হয়। সেই মহাভারতেই লিখিত হইয়াছে,—"বেদের মধ্যে যেমন আরণ্যক, ওষধির মধ্যে যেমন অমৃত, হ্রদের মধ্যে যেমন উদধি এবং চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যে যেমন গাভীই শ্রেষ্ঠ, সেইরূপ সমস্ত ইতিহাসের মধ্যে এই গ্রন্থই শ্রেষ্ঠ। শ্রাদ্ধকালে ইহার এক পাদও ব্রাহ্মণদিগকে শুনান কর্ত্তব্য।" ইহাতে বেশ বুঝা যায়, পূর্ব্বকালে বহু ইতিহাস ছিল, নতুবা সমস্ত ইতিহাসের মধ্যে মহাভারত শ্রেষ্ঠ, এ কথা বলার সার্থকতা কি? এই মহাভারতের কথা আমরা পরে বলিতেছি।

কৌটিল্যের নীতিশাস্ত্র পুরাতন গ্রন্থ। কৌটিল্য বা চাণক্য নন্দবংশ-ধ্বংসকারী চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী ছিলেন। খৃঃ পূঃ ৩২১ অব্দে চন্দ্রগুপ্ত নন্দবংশ ধ্বংস করেন। সুতরাং কিছু কম দুই হাজার আড়াই শত বৎসর পূর্ব্বে কৌটিল্য তাঁহার অর্থশাস্ত্র লিখিয়া গিয়াছেন। ইনি ইতিহাসকে ইতিহাসবেদই বলিয়াছেন এবং "রাজা যদি উৎপথপ্রতিপন্ন হয়েন, তাহা হইলে মন্ত্রী তাঁহাকে 'ইতিবৃত্ত' এবং পুরাণ দ্বারা সৎ পথে আনিবেন", এই উপদেশ দিয়াছেন। * তিনি আরও বলিয়াছেন যে, রাজা ও রাজপুত্রগণ অপরাহ্ণে অবশ্য অবশ্য ইতিহাস শ্রবণ করিবেন (১ম খঃ, ৫ম অঃ)। কৌটিল্য পুরাণ ও পৌরাণিকদিগের কথাও বলিয়াছেন।

সুতরাং প্রাচীনকালে যে ইতিহাস ছিল, তাহার সাক্ষী সমস্ত প্রাচীন সাহিত্য। এখন প্রশ্ন হইতেছে, তখনকার লোক ইতিহাস বলিতে কি বুঝিতেন? মনুর ভাষ্যকার মেধাতিথি ইতিহাস অর্থে মহাভারতাদি লিখিয়াছেন, আর টীকাকার কুল্লুক ভট্ট সেই ধ্বনিরই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন। কিন্তু একমাত্র মহাভারত ভিন্ন আর ইতিহাস বলা যাইতে পারে, এমন গ্রন্থ কি আছে? আছে—রামায়ণ। কিন্তু এই

* ঐ শ্লোকটি এই—
ইতিহাস-পুরাণাভ্যাং বেদং সমুপবৃংহয়েৎ।
বিভেত্যল্পশ্রুতাদ্বেদো মাময়ং প্রহরিষ্যতি।

* পঞ্চম খণ্ড, ষষ্ঠ অধ্যায়।

দুইখানিমাত্র গ্রন্থ সম্বল করিয়া "ইতিহাস" শব্দ প্রায় সর্ব্বত্র বহুবচনে প্রযুক্ত হইল কেন? মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠ আরও একটু গোলে পড়িয়া একটা হ য ব র ল করিয়াছেন। কাযেই আমরা অনুমান করি যে, এই সময়ে প্রকৃত ইতিহাস লোপ পাওয়াতে ইতিহাস-গর্ভ মহাভারতকেই ইতিহাস বলা হইয়াছে।

এখন প্রশ্ন হইতেছে, মহাভারতকে ইতিহাস বলা যায় কি? স্বয়ং মহাভারতকার কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসই ইহার উত্তর দিয়াছেন। তিনি যখন ব্রহ্মার নিকট লেখকপ্রার্থী হইয়া গমন করেন, তখন ব্রহ্মার নিকটেই তিনি বলিয়াছিলেন,—"আমি এইরূপ এক পরম পবিত্র কাব্য রচনা করিবার সঙ্কল্প করিয়াছি, যাহাতে বেদের নিগূঢ় তত্ত্ব, বেদ-বেদাঙ্গ, উপনিষদের ব্যাখ্যা, ইতিহাস ও পুরাণের প্রকাশ, বর্ত্তমান, ভূত ও ভবিষ্যৎ এই কালত্রয়ের নিরূপণ, জরা-মৃত্যু-ভয়-ব্যাধি, ভাব ও অভাবের নির্ণয়, বিবিধ ধর্ম্মের ও বিবিধ আশ্রমের লক্ষণ, বর্ণ-চতুষ্টয়ের নানা পুরাণোক্ত আচার-পদ্ধতি, তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য, পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র, তারা, যুগ-চতুষ্টয়-প্রমাণ, ঋক্, যজু ও সামবেদ, আত্মতত্ত্ব-নিরূপণ, ন্যায়, শিক্ষা, চিকিৎসা, দানধর্ম্ম, পাশুপত ধর্ম্ম ইত্যাদি বিষয় ত থাকিবেই, অধিকন্তু উহাতে পরব্রহ্মও প্রতিপাদিত হইবেন।" (মহাভারত আদিপর্ব্ব ১ম অধ্যায়)। ইহাতে বুঝা যায় যে, এই গ্রন্থে সর্ব্বশাস্ত্রের সমাবেশ দৃষ্ট হয়। সেই জন্য ব্রহ্মা বলিয়াছেন যে, তোমার প্রণীত ঐ গ্রন্থ "কাব্যই" হইবে। সুতরাং মহাভারত ইতিহাস নহে,—কাব্য, ইহা ব্রহ্মবাক্য। বেদব্যাস ইহাতে ইতিহাস আছে, এমন কথাও বলেন নাই; ইহাতে ইতিহাস ও পুরাণের প্রকাশ বা ব্যাখ্যা আছে, ইহাই মাত্র বলিয়াছেন। আবার মহাভারতের বক্তা সৌতি বলিয়াছেন, "এই মহাভারত অর্থশাস্ত্র, ধর্ম্মশাস্ত্র ও কামশাস্ত্র", অপরিমিতবুদ্ধি ব্যাসদেবই এই কথা বলিয়া গিয়াছেন (আদিপর্ব্ব ২য় অধ্যায়)। ইহা যে ইতিহাস, সৌতি এ কথা এইখানে বলেন নাই। কিন্তু তাই বলিয়া মহাভারতের কোন স্থানে যে এই গ্রন্থকে ইতিহাস বলা হয় নাই, ইহা মনে করা ঠিক নহে। আদিপর্ব্বের প্রথম অধ্যায়ে কথিত হইয়াছে—

"তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ ব্যস্য বেদং সনাতনম্।
ইতিহাসমিমং চক্রে পুণ্যং সত্যবতীসুতঃ॥"

সত্যবতীর পুত্র বেদব্যাস তপস্যা ও ব্রহ্মচর্য্যের প্রভাবে সনাতন বেদকে বিভক্ত করিয়া পরে এই পবিত্র ইতিহাস রচনা করেন। কিন্তু ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী কয়েকটি শ্লোকে এই গ্রন্থের লক্ষণ বা বিষয়-বর্ণনায় বলা হইয়াছে যে, ইহাতে কেবল ব্যাখ্যার সহিত ইতিহাস নহে, মানুষের জ্ঞাতব্য প্রায় সকল বিষয়ই কথিত হইয়াছে। সুতরাং ইহাকে নিছক ইতিহাস বলা যায় না।

কিন্তু পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, মহাভারতে এ কথাও বলা হইয়াছে যে, বেদের মধ্যে যেমন আরণ্যক, ওষধির মধ্যে যেমন অমৃত ইত্যাদি, ইতিহাসের মধ্যে তেমনই মহাভারত। এখানে মহাভারতকে ইতিহাসই বলা হইয়াছে। সুতরাং এক মহাভারতের মধ্যে একই স্থানে দুই প্রকার কথা পাওয়া যাইতেছে। ইহার কারণ কি?

প্রথমে মহাভারত ইতিহাসরূপে রচিত হয় নাই। প্রথমে ব্যাসদেব চব্বিশ হাজার শ্লোক দ্বারা ভারত-সংহিতা রচনা করেন। পণ্ডিতরা তাহাকেই ভারত-সংহিতা বা ভারত বলিয়া থাকেন। ইহাতে উপাখ্যানভাগ একেবারেই ছিল না। সুতরাং ইহা আদৌ ইতিহাস বলিয়া রচিত হয় নাই। পরে ইহাতে নানাবিধ শাস্ত্রের সহিত ঐতিহাসিক অংশ সংযোজিত হইয়াছে, এ কথাও ত মহাভারতে উক্ত রহিয়াছে। (আদিপর্ব্ব প্রথম অধ্যায়)।

এই পর্য্যন্ত আলোচনা করিয়া আমরা দেখিতে পাইলাম যে, বেদ, সংহিতা, নীতিশাস্ত্র এবং কতকগুলি পুরাণে ইতিহাসকে একটি স্বতন্ত্র এবং প্রধান বিদ্যা বলা হইয়াছে। পাণ্ডিত্যের পরিচয়েও ইতিহাসজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু পরে ইতিহাসকে পুরাণের মধ্যে ধরা এবং তাহার পর ইতিহাসকে একেবারে নগণ্য করা হইয়াছে। বিষ্ণুপুরাণে ব্যাসশিষ্য লোমহর্ষণের পরিচয়ে বলা হইয়াছে, "সূতং জগ্রাহ শিষ্যং স ইতিহাসপুরাণয়োঃ।" (৩।৪।১০) অর্থাৎ বেদব্যাস সূত রোমহর্ষণকে ইতিহাস আর পুরাণের শিষ্য করিয়াছিলেন। এখানে দ্বিবচনান্ত পদপ্রয়োগে উভয় বিদ্যার পার্থক্য সূচিত হইতেছে। আবার বায়ুপুরাণে সূত বলিতেছেন, "ইতিহাসপুরাণস্য বক্তারং সম্যগেব হি। মাঞ্চৈব প্রতিজগ্রাহ ভগবানীশ্বরঃ প্রভুঃ।" ভগবান্ দ্বৈপায়ন আমাকে ইতিহাস পুরাণশাস্ত্র শিক্ষা দিয়াছিলেন। এখানে একবচনান্ত পদপ্রয়োগে·

উভয়ের যেন একত্বই প্রতিপাদিত হইতেছে। ক্রমে মৎস্য-পুরাণাদিতে ইতিহাসের কথা ত দেখা যায় না। ইহাতে বুঝা যায় যে, এই সময়ে ইতিহাস বিলুপ্ত হইয়াছে বলিয়া আর ইতিহাসকে স্বতন্ত্র স্থান দেওয়া হয় নাই। মহাভারত এবং পুরাণ দ্বারা ইতিহাসের কায করাইবার চেষ্টা হইয়াছে।

এ স্থলে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, কোন্ সময়ে ইতিহাস বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে এবং মহাভারতাদির দ্বারা ইতিহাসের কায করাইবার চেষ্টা হইয়াছে? এ ক্ষেত্রে অনুমান ভিন্ন লিখা-পড়া প্রমাণ পাওয়া অসম্ভব। কারণ, ঐরূপ প্রমাণ এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। মিঃ সি, ভি বৈদ্য বলেন যে, খৃঃ পূঃ ২৫০ বৎসরে অর্থাৎ ম্যাগেস্থেনিসের পর ও অশোকের আমলের পূর্ব্বে মহাভারতকে সর্ব্বশেষবার সংস্কৃত করা হয়। কিন্তু ইদানীন্তন বহু পণ্ডিত সাব্যস্ত করিয়াছেন যে, খৃষ্টীয় চতুর্থ ও পঞ্চম খৃষ্টাব্দে যখন ভারতে হিন্দুধর্ম্মকে পুনরুজ্জীবিত করা হয়, সেই সময় মহাভারত, পুরাণ এবং অন্যান্য কতকগুলি শাস্ত্রের পুনঃ সংস্কার করা হইয়াছিল। সমুদ্রগুপ্ত এবং চন্দ্রগুপ্তের আমলেই এই কায হয়। সেই সময়ে দেখা যায় যে, বৌদ্ধ বিপ্লবে বহু শাস্ত্র লোপ পাইয়াছে। সুতরাং সে সময় নানা স্থানে অনুসন্ধান করিয়া শাস্ত্র সংগ্রহের ও রক্ষার চেষ্টা হইয়াছিল। অনেক পুস্তক পাওয়া গিয়াছিল—যাহা খণ্ডিত। নানা পুথি দেখিয়া উহার খণ্ডিত অংশ পূর্ণ করিবার চেষ্টাও হইয়াছিল। মহাভারতের এক লক্ষ শ্লোক ছিল, তাহা সমস্ত পাওয়া যায় নাই। এখন মহাভারতে আশী হাজারের অধিক শ্লোক পাওয়া যায় না। অনেক পুরাণে যত শ্লোক থাকিবার কথা, তত শ্লোক ছিল না। সম্ভবতঃ এই সময়ে দেখা যায় যে, প্রাচীন ইতিহাস আর নাই। রাজকীয় পুস্তকাগারে উহা বল্মীকূটে পরিণত অথবা আততায়ীর প্রদত্ত অগ্নিতে ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে। যাহা কিছু পাওয়া গিয়াছিল, তাহাও হয় ত এমন ভাবে খণ্ডিত যে, তাহা রক্ষা করিবার উপায় ছিল না, অথবা তাহা রক্ষা করিবার সময় বা প্রয়োজন বোধ হয় নাই, অথচ ধর্ম্মশাস্ত্রে ব্যবস্থা রহিয়াছে যে, শ্রাদ্ধকালে ইতিহাসপাঠ আবশ্যক। তখন অনুকল্প ব্যবস্থাকেই বড় করিয়া লইয়া শ্রাদ্ধকালে মহাভারত পাঠের এবং মহাভারতকে ইতিহাসের পর্য্যায়ে ফেলা হইয়াছিল। কারণ, মহাভারতের মধ্যে ইতিহাস আছে। সে ইতিহাস পুরাতনও বটে, লোকের বিশ্বাস উৎপাদনের জন্যই মহাভারতেই বলা হয় যে, "বেদের মধ্যে যেমন আরণ্যক, হ্রদের মধ্যে যেমন উদধি, চতুষ্পদের মধ্যে যেমন গাভী, ইতিহাসসমূহের মধ্যে সেইরূপ মহাভারত। ইহা শ্রাদ্ধকালে পাঠ করা কর্ত্তব্য।" সেই অবধি বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত শ্রাদ্ধে বিরাট পাঠ করা হইয়া আসিতেছে। বৌদ্ধ বিপ্লবেই ভারতের প্রাচীন ইতিহাস নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে, এরূপ অনুমান করিবার হেতু আছে। ইহা অনুমানমাত্র, তাহা স্বীকার করি, কিন্তু অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া মনে হয়, এই অনুমান একবারে মিথ্যা হইবে না।

শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায়।

বেলাশেষের গান

মউল সুবাস ছড়িয়ে গেছে
ফাগুন সাঁজের উতল হাওয়ায়;
কার তরে আজ পথ হারালেম
সেই সকালের তরী বাওয়ায়।
কার চোখের ঐ অভোল হাসি
রঙিন নেশায় বেড়ায় ভেসে,
হারিয়ে-যাওয়া স্মৃতির বেদন
ডুকরে ওঠে কোন্ বাতাসে!
পিয়াল বনের বুকের কাছে
ঘর-ছাড়া কে দাঁড়িয়ে আছে?
তার সাথে মোর ছিল চেনা
মিলন আঁখির ব্যাকুল চাওয়ায়।

শুধায় মোরে বকুল-হেনা
কোন্ কাঁকণের রিণিঝিনি,
নিদ্রাহারা সুরের কাঙাল
খেল্‌ছে প্রেমের ছিনিমিনি!
মোর ব্যথা আজ কেউ কি জানে?
আকাশ বলে—"জানে জানে",
মৌন-ব্যথা ছড়িয়ে গানে
মিছে মোরে কান্না পাওয়ায়।
একদা কোন সাঁঝের বেলায়,
ছায়ার কাঙাল জ্যোৎস্না যথায়—
কুড়িয়ে পাবে বিজন পথিক
পল্লীবালার আকুল গাওয়ায়!

পাপিয়া দেবী।

১৩

সিবিল সার্জ্জন ইভের জ্বর দেখিয়া ভয় পাইলেন। তিনি বলিয়াছেন, ইহা 'ব্রেণ ফিভার'। ইভের বয়সে এ রোগ সাংঘাতিক, শতকরা দুই একটা রোগী রক্ষা পায়। তিনি ইভকে য়ুরোপীয় হাঁসপাতালে স্থানান্তরিত করিতে উপদেশ দিলেন। তবে ইহাও বলিয়া গেলেন, তিন দিন যেন আদৌ নাড়াচাড়া করা না হয়, অধিকন্তু ইভের আত্মীয়স্বজনকে তার করা হয়।

পরদিন প্রাতঃকালে রোগী দেখিতে আসিয়া সিবিল সার্জ্জন রোগিণীর শয্যাপার্শ্বে ক্ষণেকের জন্য এক সুন্দরী বাঙ্গালী যুবতীকে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন।

রোগিণীকে দেখিয়া ডাক্তার যখন কক্ষের বাহিরে গেলেন, তখন বিমলেন্দু সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া গেল। বারান্দায় ডাক্তার বিমলেন্দুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ঐ মহিলাটি কে? বিমলেন্দু বলিল, ইভের বন্ধু।

বিমলেন্দু ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন দেখলেন?" ডাক্তার বলিলেন, "মন্দের ভাল। আপনি বললেন, ঐ ভারতীয় মহিলাটি মিসেস্ রায়ের বন্ধু। আপনাদের পর্দ্দা-নশীনদের সঙ্গে এমনভাবে মিসেস্ রায়ের বন্ধুত্ব আশ্চর্য্য হলেও খুবই সুখের বিষয় বটে।"

বিমলেন্দু বলিল,"ইভের বন্ধু পর্দ্দানশীন হলেও শিক্ষিত। হাঁ, আপনি বলেছেন, হাঁসপাতালে নিয়ে যেতে। ইভের বন্ধু জিজ্ঞাসা করছিলেন, এখানে রেখে কি চিকিৎসা করা যায় না?"

ডাক্তার বলিলেন, "যাবে না কেন, তবে সেবার সুবিধে হবে না। এ রোগে সেবাই সব।"

বিমলেন্দু বলিল, "যদি সেবার অভাব না হয়—ধরুন, যদি এঁরা সবাই সেবা করেন?"

ডাক্তার বিস্মিত হইলেন; হাসিয়া বলিলেন,"তা হয় না। এ রোগে দিন-রাত জেগে থেকে ঔষধ-পথ্যের ঘণ্টায় ঘণ্টায় ব্যবস্থা করতে হবে। এঁদের দ্বারা তা সম্ভব হবে না। বিশেষ, এ রোগে বড় ভুল-ভ্রান্তি এনে দেয়। শিক্ষিত নার্স না হ'লে, বিশেষ সতর্ক না হয়ে আর কেউ সেবা করতে পারে না। মিসেস্ রায়ের বন্ধু বালিকা, তাঁর পক্ষে এ কার্য্য করা অসম্ভব।"

বিমলেন্দু বলিল, "আপনি যা ভাল বোঝেন, তাই হবে। তবে হাঁসপাতালে পরের কাছে—তাই, তাই ইভের বন্ধু বলছিলেন—"

ডাক্তার হাসিয়া বলিলেন, "সে ভয় নেই মিঃ রায়। য়ুরোপীয় হাঁসপাতালে বাড়ীর চেয়েও রোগী বেশী সুখে থাকে, সেবা পায়। তা হোক, আমি কিন্তু এই হিন্দু মহিলার বন্ধুর প্রতি এই অনুরাগ দেখে বড় আনন্দিত হলেম। যদি এঁদের মত শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ভারতীয় মহিলাদের সঙ্গে আমাদের য়ুরোপীয় মহিলাদের সকল যায়গায় এমনই বন্ধুত্ব ঘটত, তা হ'লে কি সুখের হ'ত!"

ডাক্তার চলিয়া গেলে প্রতিমা ও বিমলেন্দু রোগীর কক্ষে আসিয়া বসিল। প্রতিমা সহজ সরল কণ্ঠে বলিল, "আমি সব বুঝে নিয়েছি। আপনি একটু বিশ্রাম নিন গিয়ে, সারারাত জেগেছেন।"

বিমলেন্দু বলিল, "সব শুনেছেন ত, রোগ কঠিন, সেবাও কঠিন।"

প্রতিমা বলিল, "হাঁ, শুনেছি সব। তা বেশী দিন ত না, মাত্র আজ আর কাল, তার পর ত হাঁসপাতালে নিয়েই যাবে।"

বিমলেন্দু বিহ্বলের মত বলিল, "হাঁসপাতাল! হাঁস-পাতাল!"

প্রতিমা নারীসুলভ দয়ার্দ্র কোমল কণ্ঠে বলিল, "ভয় কি? এমন কত রোগ হয়, আবার সেরেও যায়। সবই ভগবানের হাত।"

বিমলেন্দুর বুভুক্ষু অন্তর সহানুভূতির স্বাদ পাইয়া হা হা করিয়া উঠিল। সে গুমরিয়া বলিয়া উঠিল, "যদি ইভকে ফিরে না পাই—"

প্রতিমা বাধা দিয়া বলিল, "চুপ, চুপ, দেখছেন না, ইভের জ্ঞান ফিরে আসছে। এতক্ষণ আবিল্যিভাব ছিল, এইবার চোখ মেলেছে। যান, আপনি যান।"

যন্ত্রচালিতবৎ বিমলেন্দু কক্ষের বাহির হইয়া গেল। ইভ যেন তন্দ্রাঘোর কাটাইয়া চোখ মেলিয়া চারিদিকে চাহিল। ক্ষীণকণ্ঠে বলিল, "তুমি কি পরী? আমি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে দেখছিলুম, পরীতে আমায় নিয়ে যাচ্ছে। বল্‌লে, বিশ্বাসঘাতক প্রতারক—তার কাছে থেকো না। আবার নিয়ে যেতে এসেছ বুঝি?"

প্রতিমা বাধা দিয়া তাহার হাতখানি সস্নেহে ধরিয়া বলিল, "ছিঃ ভাই, কথা কয়ো না, তোমার যে কষ্ট হবে। এই দেখ কত হাঁপাচ্ছ"

ইভ তাহার দিকে মাথা ফিরাইয়া যথাসাধ্য শক্তি প্রয়োগ করিয়া তাহার হাতখানা চাপিয়া ধরিয়া বলিল,—"তুমি, তুমি, তুমি কে? দাঁড়াও, তুমি ত পরী না, তোমায় যে কোথায় দেখেছি। ঐ যা, ভুলে গেলুম!"

ইভ ধীরে ধীরে আবার চক্ষু মুদ্রিত করিল, পাশ ফিরিয়া শুইল। প্রতিমা দেখিল, কিছুকাল ইভ নীরবে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া শুইয়া রহিল। সে ভাবিল, ইভ ঘুমাইতেছে। তখন সে মাথায় বরফের ব্যাগ ধরিয়া রহিল। কিন্তু মুহূর্ত্ত পরেই শুনিল, ইভ চক্ষু মুদ্রিত করিয়াই আপন মনে বলিতেছে,—"নিষ্ঠুর! যদি আর এক জনকেই ভালবাস, তা হ'লে আমায় বিয়ে করেছিলে কেন? জানি, আমার চেয়ে সে তোমাকে ভালবাসতে পারবে না—কেউ পারবে না। ঐ যা, যাঃ, ডুবে গেল!"

প্রতিমার গায়ের রক্তচলাচল বন্ধ হইয়া গেল, সে ইভের কণ্ঠ জড়াইয়া ধরিয়া মিনতির স্বরে বলিল, "ছিঃ বোন্, লক্ষীটি আমার, চুপ ক'রে ঘুমোও।"

ইভ এবার চক্ষু উন্মীলন করিয়া বলিল, "ওঃ, তুমি, তুমি! তুমিই আমার ইন্দুকে ছিনিয়ে নিয়ে যেতে এসেছ? ওগো, তোমার পায়ে পড়ি, আর সব নাও, আমার ইন্দুকে আমায় ফিরিয়ে দাও!"

সে করুণ কাতর কণ্ঠে হৃদয়ের অন্তস্তলে কি গভীর প্রেমের সুর বাজিয়া উঠিল, তাহা প্রতিমার বুঝিতে বাকী রহিল না। সে আড়ষ্টের মত বসিয়া রহিল, তখন তাহার বুকের ভিতর যে হাতুড়ির ঘা পড়িতেছিল, তাহা জগতের সকলেই শুনিতে পাইতেছিল বলিয়া তাহার মনে হইতেছিল।

ইভ আবার বলিয়া যাইতে লাগিল, "ভাবছিলে, আমি বুঝতে পারিনি? খুব বুঝেছি। ঐ যে চিল্কায় সে ডুবে-গেল, তুমি পাগলের মত জলে ঝাঁপ দিয়ে বুকে ক'রে তুললে! উঃ উঃ! মাথা যায়—জল, জল!"

হাঁপাইতে হাঁপাইতে ইভ এইবার একবারে শয্যার উপর এলাইয়া পড়িল। প্রতিমা ভীত, উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিল। সে তাড়াতাড়ি ডাকিল, "ইভ, ইভ! বোন্‌টি আমার!" কে সাড়া দিবে? ইভ তখন মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিল, তাহার সংজ্ঞা লোপ পাইয়াছিল।

প্রতিমাও একরূপ জ্ঞানহারা ও ভয়ে দিশাহারা হইয়া পাগলের মত ছুটিয়া বাহিরে আসিল এবং বসিবার ঘরে বিমলেন্দুকে দেখিতে পাইয়া থরথর কম্পিত হস্তে তাহার হাত দুইখানা ধরিয়া ভয়ব্যাকুল স্বরে বলিল, "ওগো, শীগ্‌গির এস, ইভ কেমন করছে।"

'কি, কি হয়েছে,' বলিতে বলিতে বিমলেন্দুও একরূপ উন্মত্তের মত শয়নকক্ষের দিকে ছুটিয়া চলিল। তখন বাহ্যপ্রকৃতি বা পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রতি কাহারও দৃষ্টিপাতের অবকাশ ছিল না।

ইভের অবস্থা সঙ্কটাপন্ন হইল। তাহাকে লইয়া যমে-মানুষে টানাটানি আরম্ভ হইল, তাহাতে তাহাকে স্থানান্তরিত করা অসম্ভব হইয়া উঠিল। প্রতিমার এই ভিলাই এখন ঘরবাড়ী হইয়া উঠিল। রামপ্রাণ বাবু কলিকাতা হইতে ফিরিয়া আসিয়া রাতদিনের জন্য একখানা মোটর নিযুক্ত করিলেন, তাঁহারও ভিলাবাড়ী একরূপ ঘরবাড়ী হইয়া উঠিল। এ সময়ে প্রতিমা শৈলর খোঁজ-খবরও রাখিবার অবসর পাইত না।

মানুষ গড়ে এক, বিধাতা করেন অন্যরূপ। রামপ্রাণ বাবু জন্মে আর কখনও জামাতা বিমলেন্দুর সহিত সম্পর্ক বা সম্বন্ধ রাখিবেন না বলিয়া সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, কিন্তু

বিধাতার ইচ্ছায় ঘটনাক্রমে এমন অবস্থা উপস্থিত হইল যে, 'ত্যজ্য-জামাতা'র সহিত তাঁহাদের যে ঘনিষ্ঠতার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইল, তাহা ইহজন্মে লুপ্ত হইবার সম্ভাবনা ছিল না। ইহার নিমিত্তমাত্র—ইভ কি? কে জানে!

১৪

ইভের হাঁসপাতাল যাওয়া হইল না। যে দুই তিন দিন তাহাকে লইয়া যমে-মানুষে টানাটানি হইল, সে কয় দিন অহোরাত্র তাহার প্রবল জরের বিরাম হইল না—প্রায় সর্ব্বক্ষণই সে অচৈতন্য অবস্থায় রহিল ও বিকারের ঝোঁকে নানা কথা বলিল। সকল কথার মধ্যে সামঞ্জস্য না থাকিলেও একটা কথা সে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া প্রায়ই বলিত, কেন তাহাকে সত্য কথা বলা হয় নাই, তাহাকে প্রতারিত করা হইল কেন? আর একটা নাম প্রায়ই তাহার মুখে শুনা যাইত—সে বিমলেন্দুর অর্দ্ধ-নাম 'ইন্দু।' যখন সিবিল সার্জ্জনের প্রেরিত ভাড়া-করা নার্সরাও গভীর রাত্রিতে ইজি-চেয়ারের উপর তন্দ্রাঘোরে এলাইয়া পড়িত, তখন প্রতিমা একাগ্রচিত্তে শুনিত, প্রবল জ্বর ও তৃষ্ণায় কাতরা রোগিণী, 'ইন্দু 'ইন্দু' করিয়া ডাকিতেছে; কখনও হাসিতেছে, কখনও কাঁদিতেছে; কখনও তীব্র ভৎর্সনা করিতেছে, কখনও কাকুতি-মিনতি করিয়া ইন্দুর ভালবাসা প্রার্থনা করিতেছে। নিশীথে নির্জ্জনে বালিকার সেই মর্ম্মভেদী কাতরোক্তি সমস্ত ঘর ভরিয়া ফেলিত, প্রতিমা একাকিনী একান্তে তাহা শুনিয়া কাঠ হইয়া বসিয়া থাকিত, এক এক সময়ে তাহার হৃদয় অভাগিনী ইভের ভগ্নহৃদয়ের তীব্র যাতনায় ভাবাবেগে উদ্বেল হইয়া উঠিত—তাহার আয়ত নয়নকমল দুইটি অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া উঠিত, আবার কখনও কখনও সে ইভের অগাধ অপরিমেয় অনন্ত স্বামি-প্রেমের পরিচয় পাইয়া তন্ময় হইয়া যাইত—বিশ্ব-সংসার ভুলিয়া যাইত, ইভের প্রতি ভালবাসায় তাহার সমস্ত হৃদয়টা পূরিয়া উঠিত।

এক দিন রামপ্রাণ বাবু ইভকে দেখিয়া ফিরিবার সময় কন্যাকে বলিলেন, "এমন ক'রে আর ক'দিন চলবে? না খাওয়া না দাওয়া, ঘুম ত নেই-ই, শেষে কি মা, তুইও একটা শক্ত রোগে পড়বি?"

প্রতিমা মৃদু হাসিয়া বলিল, "আমার জন্য ভেবো না, বাবা, আমার কিছু হবে না। বরং ইভের দেখাশুনা করতে না পেলে আমি থাকতে পারবো না। জান না কি, তার এখানে কেউ নেই?"

রামপ্রাণ বাবু ব্যগ্রভাবে বলিলেন, "কেন, শুনেছি ত মিসেস বেল্‌রা প্রায়ই দেখতে আসেন।"

প্রতিমা বলিল, "হাঁ, তা আসেন বটে, কিন্তু সে ত কুটুম্বিতে রক্ষে করা। দেখাশুনা মানে ত তা নয়।"

রামপ্রাণ বাবু হাসিয়া বলিলেন, "ওঃ, তাই বল। তা আমার মেয়েটির মত ফার্ষ্ট ক্লাস সার্টিফিকেট পাওয়া অবৈতনিক নার্স ত আর সকলে হ'তে পারে না।"

কথাটা বলিবার কালে প্রতিমার মুখের উপর সস্নেহ দৃষ্টিপাতের সঙ্গে রামপ্রাণ বাবুর মুখে চোখে একটা আনন্দ-গর্ব্বের রেখা ফুটিয়া উঠিল। তিনি তাড়াতাড়ি আনন্দের অশ্রু চাপিয়া রাখিয়া বলিলেন, "হাঁ, ভাল কথা, শৈল ত তোমার কাছে থাকবার জন্যে বেজায় কান্নাকাটি আরম্ভ করেছে। আমি চললাম---"

বাধা দিয়া প্রতিমা বলিল, "কেন, রোজ ত দেখা হচ্ছে---তবে আবার কি?"

রামপ্রাণ বাবু বিস্মিত হইলেন। শৈলর উপর প্রতিমার তিনি যে টান দেখিয়াছিলেন, ইহাতে ত তাহার অভিব্যক্তি কিছুই হইল না। তবে কি ইভ একলাই তাহার এতখানি স্থান জুড়িয়া বসিয়াছে? না,—আর কিছু? কথাটা চিন্তা করিতেই তাঁহার মনটা আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল। তিনি একটু জোর করিয়াই বলিলেন, "দেখ, তুমি যা-ই বল, যখন দু দু'জন নার্স দেখছে, তা ছাড়া তার স্বামী রয়েছে, তখন তোমার এখানে এমন ক'রে রাতদিন প'ড়ে থাকা এখন আর ভাল দেখায় না। লোক কি মনে করবে? বিশেষতঃ ইভ যখন এখন একটু ভালর দিকেই যাচ্ছে। মাঝে মাঝে এসে দেখলেই হ'ল। কি বল?"

প্রশ্নটা জিজ্ঞাসা করিলেন বটে, কিন্তু উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়াই রামপ্রাণ বাবু চলিয়া গেলেন। প্রতিমা অচল নিস্পন্দ কাঠের মত সেখানে দাঁড়াইয়া কথাটা মনের মধ্যে তোলাপাড়া করিতে লাগিল। 'লোক কি বলবে?'—কেন, এ কথা উঠে কেন? পিতার মুখে এ কথা বাহির হয় কেন? লোকের বলার মত সে এমন কি কায করিয়াছে? বলিলই বা লোক, তাহাতে তাহার কি আইসে যায়? এই 'লোক'

জিনিষটার সহিত তাহার সম্পর্ক কি? প্রতিমা মনে মনে হাসিল, তাহার পর কি ভাবিয়া ইভের ঘরে গেল।

তখন এক জন নার্স বসিয়া ছিল। সে তাহাকে দেখিয়া বলিল,"এই যে আপনি এসেছেন, একটু বসুন, আমার একটা জরুরী কল আছে, ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই ফিরে আসছি।"

প্রতিমা জানিত, যে নার্স কাল রাত্রিতে খাটিয়াছে, সে আর আজ দিনে আসিবে না; সুতরাং দিনের অন্য নার্স আসিতে না আসিতেই এই নার্স ছুটী লইতেছে, ইহাতে সে বিস্মিত হইল। নার্স তাহার সে ভাব লক্ষ্য করিয়াছিল, তাড়াতাড়ি বলিল, "বড় জরুরী, বিশেষ একটা বড় খদ্দের হাতছাড়া হ'লে খুব ক্ষতি হবে, বিশেষ কাল রাত্রি থেকে মিসেস রায় যেন কতকটা ভালর দিকেই যাচ্ছেন—"

প্রতিমা তাহাকে আশ্বাস দিয়া বলিল, "থাক, আপনার কাযে যেতে পারেন, আমিই থাকব।"

নার্স প্রফুল্ল হইয়া বলিল, "বিশেষ আপনার হাতে রোগী রেখে নিশ্চিন্ত হ'তে পারব। ডাক্তার সাহেব ১০টার সময় আসবেন, আমি তার মধ্যেই আসব।"

নার্স চলিয়া গেল। তখন ইভ ঘুমাইতেছিল। প্রতিমা একবার তাহার কপোল স্পর্শ করিয়া পার্শ্বস্থ ইজি-চেয়ারে উপবেশন করিল এবং টেবলের উপর হইতে খবরের কাগজখানা লইয়া পড়িতে লাগিল।

কতক্ষণ সে পাঠে নিবিষ্ট ছিল, তাহা তাহার হুঁস ছিল না; হঠাৎ কাগজের আড়াল হইতে চোখ উঠাইতেই ইভের মুখের উপর তাহার দৃষ্টি পড়িল। সে বিস্মিত হইয়া দেখিল, ইভ পলকহীন দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া আছে। আরও আশ্চর্য্যের কথা, সে দৃষ্টি প্রশান্ত, নির্ম্মল, তাহাতে বিকারের চিহ্নমাত্র ছিল না। প্রতিমার বুকখানা গুরু গুরু কাঁপিয়া উঠিল। ইভের চোখে এ অসাধারণ দীপ্তি কেন? নির্ব্বাণের পূর্ব্বে দীপ জ্বলিয়া উঠিতেছে না ত! তাহার প্রাণ শিহরিয়া উঠিল।

তাড়াতাড়ি কাগজখানা ফেলিয়া সে ইভের শয্যাপার্শ্বে জানু পাতিয়া বসিয়া দুই হাতে তাহার গলাটা জড়াইয়া ধরিয়া স্নেহমৃদু কণ্ঠে ডাকিল, "ইভ, বোন্‌টি আমার, এখন ভাল বোধ কচ্ছ ভাই? আমায় কিছু বলবে?"

ইভ কথা কহিল না—তেমনই দীপ্ত দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। কেবল ঘাড় নাড়িয়া একবার সম্মতি জ্ঞাপন করিল।

প্রতিমা বলিল, "কথা কইলে যদি কষ্ট হয়, তা হ'লে কয়ে কায নেই, এর পর—"

বেশ স্পষ্টস্বরে তাহাকে বাধা দিয়া ইভ বলিল, "কষ্ট হলেও বলতে হবে, কেন না, সময় হয়ে আসছে, হয় ত আর বলবার অবসর পাব না।"

"ছিঃ ভাই, ও কি কথা বলছ? তুমি ত সেরে আসছ, আর দু'চার দিন বাদে তোমায় আমরা পথ্যি দিচ্ছি দেখ না।"

"হুঁ, সেরে একেবারেই যাব। প্রতিমা, ইন্দুকে তুমি কি আমার চেয়েও বেশী ভালবাস?"

প্রতিমা প্রথমে কথাটা ঠিক বুঝিতে পারে নাই, তাহার পর যখন সবটা তলাইয়া বুঝিল, তখন তাহার সমস্ত মুখখানা লাল হইয়া উঠিল, সে কি জবাব দিবে, ঠিক করিতে পারিল না।

ইভ হাসিয়া বলিল,"আকাশ থেকে পড়লে, না? ভাবছ, আমি কি ক'রে জানলুম? আমায় এত ভালবাস, আর তোমাদের সব কথাটা খুলে বলতে পার নি?"

প্রতিমা ইভের একখানা হাত লইয়া নাড়াচাড়া করিতে করিতে বলিল, "কি বলব? বলবার কি আছে?"

ইভ বলিল, "নেই? বলবার অনেক আছে। তোমাদের যে বিবাহ হয়েছিল—"

প্রতিমা কথা শেষ করিতে না দিয়াই বলিল, "সে বিবাহ ত নামমাত্র, হয়েই ভেঙ্গে গিয়েছিল, তার পর আমাদের ত আর কোনও সম্পর্ক ছিল না। আমরা ত পরস্পর দূরে থাকতেই চেষ্টা ক'রে এসেছি।"

ইভ হাসিল; বলিল, "হুঁ, তা করেছ বটে; কিন্তু মন কি কেউ ধ'রে বেঁধে রাখতে পারে? তোমায় যে ইন্দু কত ভালবাসে, তা আমি চিল্কায় জলে ডোবার দিনেই জেনেছি।"

প্রতিমা কাতর-স্বরে বলিল, "ছিঃ ভাই ইভ, এমন ক'রে মনে কষ্ট দিচ্ছ কেন? সে আমার কে, আমিই বা তার কে? সে ত তোমার, তোমার প্রতি অবিশ্বাসী হ'লে যে নরকেও তার স্থান হবে না। দেখ, কথাটা যখন পাড়লে, তখন সবই খুলে বলব। যখন আমাদের বিবাহ হয়েছিল, তখন আমি

ছেলেমানুষ, দুচার দিন দেখেছিলুম। তার পর একটা তুচ্ছ কথা নিয়ে বাবার সঙ্গে তার ঝগড়া হ'ল। ওরা বংশে খুব ভাল হলেও ছিল গরীব। বিবাহের সময় বাবা ওকে অনেক যৌতুক দিয়েছিলেন, বাড়ী-ঘর লেখাপড়া ক'রে দিয়েছিলেন। ওতে কিন্তু ওরা সন্তুষ্ট ছিল না, বরং অপমান মনে করত, ছেলেবেলা থেকেই বড় অভিমানী। এক দিন বাবাকে বললে বিলেতে পাঠিয়ে দিতে, সেখানে সিবিল সার্ভিস পরীক্ষা দেবে। বাবা চোটে আগুন। তিনি বল্লেন, তাঁর যা কিছু, সবই ত তাঁর মেয়ের, তবে বিদেশে গিয়ে পেটের ভাতের জন্যে লেখাপড়া শেখবার দরকার কি? তাঁর একটা মেয়ে—তার স্বামীকে তিনি চোখের আড়াল করবেন না। এতে ওরা খুব চটে উঠে বল্লে, তবে কি তাকে ঘরজামাই হয়ে থাকতে হবে? এমন জামাই হ'তে সে রাজী নয়। দু'চার কথায় খুব ঝগড়া বেঁধে উঠলো। রাগলে বাবার জ্ঞান থাকতো না, তাই তিনি খুব কড়া কথা শুনিয়ে দিলেন; ওরাও রাগ ক'রে সব সম্বন্ধ ঘুচিয়ে চ'লে গেল, চাকুরী ক'রে খেতে লাগলো। তার পর ৭।৮ বছর কেটে গেছে, কোন পক্ষে কোন মিটমাটের চেষ্টা হয় নি। কাযেই ওরাও আমাদের কাছে একবারে অজানা অচেনার মতই হয়ে আছে, আমরাও ওদের কাছে তাই। এই জন্য বলছি, তুমি যা ধারণা করেছ, তা আগাগোড়াই ভুল। যার কাছেই আমাদের কথা শুনে থাক, সে আর সব সত্যি বলতে পারে, কিন্তু শেষের দিকে যা বলেছে, তার মাথামুণ্ডু কিছুই নেই।"

ইভের চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল; বলিল, "সত্যি বলছ? আমায় সন্তুষ্ট রাখবার জন্য বলছ না?"

প্রতিমা সস্নেহে ইভের ললাটে হস্তাবমর্ষণ করিতে করিতে বলিল, "সত্যি বলছি ইভ, এর চেয়ে সত্যি আমি জানি না। এ জন্মে আমাদের সম্বন্ধ ঘুচে গেছে—সে এখন আমার কাছে পরপুরুষ—আমার বড় আদরের ভগিনীর স্বামী! তুমি সেরে ওঠ ভাই—তার পর তোমরা দুজনে সুখী হও, এর বেশী সুখের কামনা আমি করি না। আমি তোমায় সুখী দেখতে পেলে যে আনন্দ পাব, স্বর্গসুখও তার কাছে কিছু নয়। এই আমার আসল মনের কথা, বুঝলে ইভ?"

ইভ কোন জবাব না দিয়া প্রতিমার বক্ষে মুখ লুকাইয়া খানিকটা কাঁদিল, তাহার পর বলিল, "আমায় ক্ষমা কর, প্রতিমা, আমি তোমায় বুঝতে না পেরে অন্যায় সন্দেহ করেছি। তুমি যে কতখানি উঁচু, আমি ক্ষুদ্র হয়ে তা বুঝবো কেমন ক'রে?"

প্রতিমারও নয়নযুগল অশ্রুসিক্ত হইয়া আসিয়াছিল। সে তবুও আপনাকে সামলাইয়া লইয়া বলিল, "ছিঃ ভাই, কাঁদে না। তুমি ভাল না হ'লে আমার কিছু ভাল লাগে না—কেঁদো না ভাই।"

ইভ আরও খানিকটা ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিল, তাহার পর বলিল, "কাঁদতেই আমাদের জন্ম যে ভাই! পুরুষের কি? তারা কি বুঝতে পারে, এই এখেনে—এই বুকে কি শেল হানতে পারে? এই বুকটা দুই পায়ে দ'লে কি ক'রে চ'লে যায়, তারা কি তা একবারও ভেবে দেখে? উঃ, কেন বিবাহ করেছিলুম, কেন ডান হাতে ক'রে বিষ খেয়েছিলুম!"

ইভ ডুকুরিয়া কাঁদিয়া উঠিল। প্রতিমা কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া কেবল তাহাকে ধরিয়া বসিয়া রহিল। তাহার তখন মনে হইতেছিল, কি শাস্তি বিমলেন্দুর উপযুক্ত! বিমলেন্দুর প্রতি দারুণ ক্রোধে তাহার হৃদয়টা ভরিয়া উঠিল। সরলা, একান্তনির্ভরশীলা, পতিগতপ্রাণা এই বালিকা হৃদয়ের সর্ব্বস্ব দিয়া তাহাকে ভালবাসিয়াছিল, তাহার কি এই প্রতিদান? নীচ, প্রবঞ্চক, স্বার্থপর পুরুষ—নরকেও কি তোমাদের স্থান আছে!

প্রতিমা সস্নেহে ইভের চক্ষুর জল মুছাইয়া দিল, নিজের চোখ জলে ভরিয়া উঠিলেও তাহা লুকাইয়া ইভকে কত মিষ্ট কথায়—কত আশার কথায় সান্ত্বনা দিল। প্রতিমা বয়সে ইভের অপেক্ষা ছোটই ছিল, কিন্তু সংসারের অভিজ্ঞতায় সে তাহার অপেক্ষা অনেক বড় ছিল। ইভ সাংসারিক বিষয়ে যেন এই পৃথিবীর ছিল না, বড় সরল, বড় কোমল সে,—সংসারের একটু ঝড়-ঝঞ্ঝা সে সহিতে পারিত না। প্রতিমা এই বয়সে সংসারের ভীষণ আঘাত সহ্য করিয়া আসিয়াছে, কখনও সে জন্য আক্ষেপ প্রকাশ করে নাই, অথবা অপরকে সে জন্য কখনও অপরাধী করে নাই। তাহার সংযম—তাহার সহিষ্ণুতা অসাধারণ, তাহা এ দেশের মাটীতেই—এ দেশের জল-বায়ুতেই সম্ভব হয়। ইভ কোমল গোলাপকলিকা, সামান্য উষ্ণ বায়ুর সংস্পর্শেই একবারে

মোহন-বেণু

বসুমতী প্রেস]
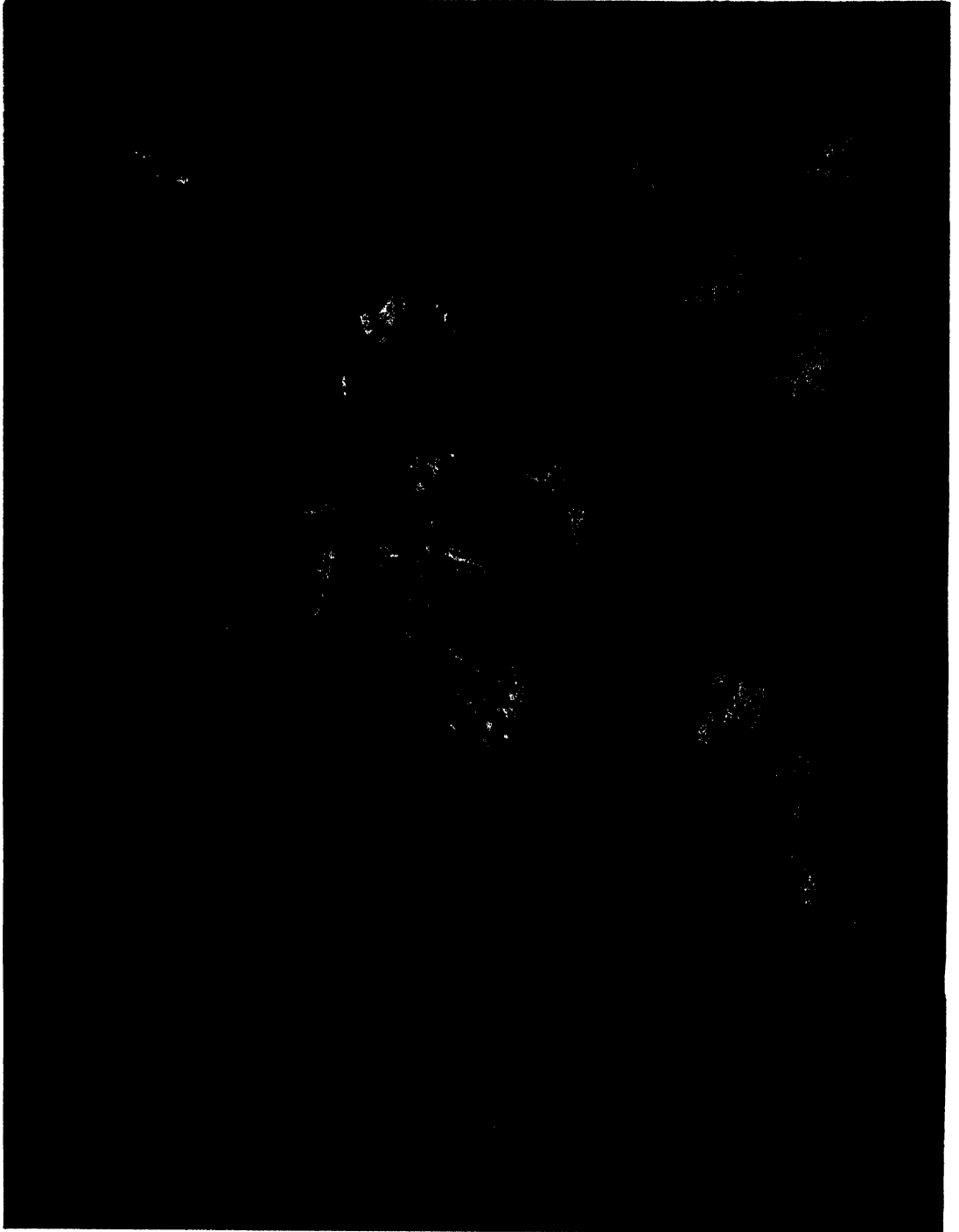
[শ্রীযুক্ত প্রদ্যুম্নকুমার মল্লিকের চিত্রশালা।

পরিম্লান হইয়া পড়িয়াছে। তাই এখন অসাধারণ ধৈর্য্য-শালিনী মূর্ত্তিমতী সহিষ্ণুতা প্রতিমাই তাহার সান্ত্বনার উৎস হইল। উভয়ে অনেক কথাবার্ত্তা হইল। ইভ প্রতিমার গলা ধরিয়া সর্ব্বশেষে অশ্রুপ্লুতনয়নে যে কথা বলিল, তাহা প্রতিমার শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত মনের মধ্যে অঙ্কিত হইয়া ছিল।

১৫

'আর এই ক'টা ধাপ,—বস্! তা হলেই শেষ,'—লিবঙ্গ হইতে দার্জ্জিলিংএর পথে ভুটিয়া বস্তীর প্রস্তর-সোপান অতিক্রম করিতে করিতে লেফটেনেণ্ট মরিস্ সিবরাইট তাঁহার সঙ্গিনীদিগকে উৎসাহভরে এই কথা বলিতেছিলেন। তাঁহার যে সঙ্গিনীটি অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্কা এবং যিনি সোপান অতিক্রম করিবার কালে অত্যন্ত হাঁপাইতে-ছিলেন, তিনিই আমাদের পূর্ব্ববর্ণিতা ইভ রায়; অপরা লেফটেনেণ্ট সিবরাইটের নিকট-আত্মীয়া মিস্ বেল।

ইভ শরীরে সামান্য বল পাইবামাত্র দার্জ্জিলিঙ্গে চলিয়া আসিয়াছে। এবার সে মিসেস্ বেলের এক অবিবাহিতা কন্যাকে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছে। বেল-পরিবার দরিদ্র; সুতরাং ইভের আমন্ত্রণে মিস্ বেল সানন্দে তাহার সঙ্গিনী-রূপে দার্জ্জিলিংএ আসিতে সম্মত হইয়াছেন। তিনি ইভ হইতে বৎসর তিনেক বড়, এ জন্য কতকটা অভিভাবিকার মত হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। এ বিষয়ে ইভও স্বয়ং তাঁহাকে কতকটা কর্ত্তৃত্ব অর্পণ করিয়াছিল। তাহার শূন্য হৃদয়ের হাহাকারের স্বর ডুবাইয়া রাখিবার জন্য মিস্ বেল নিতান্ত অল্প অবলম্বন ছিলেন না।

ইভের মনে সান্ত্বনা দিবার আর একটি উপায় জুটিয়া-ছিল,—তিনি লেফটেনেণ্ট সিবরাইট। মিস্ বেল দার্জ্জিলিঙ্গে আসিলেই এক দিন মরিসের সহিত তাঁহার পথে সাক্ষাৎ হইল। তদবধি এই সরল মুক্তপ্রাণ যুবক ইভের বাড়ীর একরূপ নিত্য যাত্রী হইয়া দাঁড়াইল। যদি কেহ জিজ্ঞাসা করিত, সেখানে তাহার প্রধান আকর্ষণ কি, তাহা হইলে বোধ হয়, তাহার উত্তর পাইতে বিশেষ কষ্ট হইত না। কারণ, এক পক্ষের মধ্যে মরিসের ধ্যানজ্ঞান হইয়া দাঁড়াইয়াছিল—ইভ। ইভ যে বিবাহিতা—সে যে অপরের, তাহা মরিস কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিত না। এত বালিকাবয়সে ইংরাজ-দুহিতা কিরূপে বিবাহিতা হইতে পারে—বিশেষতঃ একটা 'নেটিভ নিগারের' সঙ্গে, তাহা সে কল্পনাতেও আনিতে পারিত না। ইভ বার বার সতর্ক করিয়া দিলেও সে প্রাণান্তে তাহাকে মিসেস্ রায় বলিয়া সম্বোধন করিতে পারিত না, সে তাহাকে মিস্ রবিন্‌সন বলিয়াই ডাকিত।

ঘটনার দিন তাহারা লিবঙ্গ বেড়াইতে গিয়াছিল। ইভ তখন পূর্ণ স্বাস্থ্য লাভ করে নাই; পূর্ণ স্বাস্থ্যের কথা দূরে থাকুক, তাহার তখন অধিক দূর পদব্রজে গমন করি-বারও সামর্থ্য হয় নাই। তাই মরিস তাহার ও মিস্ বেলের জন্য দুইখানা রিক্সা ভাড়া করিয়াছিল। ভুটিয়া বস্তীর সোপানশ্রেণী রিক্সাতে অতিক্রম করা যায় না বলিয়া এইটুকু তাহারা পদব্রজেই অতিক্রম করিতেছিল। মিস্ বেল বস্তীর লোকজনের দিকে তাকাইয়া শিহরিয়া উঠিয়া বলিলেন, "কি ভীষণ এরা,—যেন নর-রাক্ষস। এদের দেখলে ভয় করে।"

ইভ হাসিয়া বলিল, "তবু মানুষ ত বটে।"

লেফটেনেণ্ট মরিস্ সিবরাইট বলিলেন, "তাও ঠিক বলা যায় না। যারা এইমাত্র কম্বল বেচতে এসেছিল, তাদের গায়ের গন্ধ কি জানোয়ারের মত না? এরা বছরে হয় ত এক দিন স্নান করে, নইলে জলের সম্পর্ক রাখে না।"

ইভ বলিল, "শুনেছি না কি এরা প্রথম যৌবনে যে কাপড় পরে, তা আর মরবার আগে ছাড়ে না। কথাটা কি সত্যি? আমার ত বিশ্বাস হয় না।"

মরিস্ বলিলেন, "হাঁ, তাই। আর তা ছাড়া এরা যে রাক্ষস, তার প্রমাণও আছে।"

ইভ ও মোনা বেল একসঙ্গে বলিয়া উঠিল, "প্রমাণ? কি রকম?"

ইভের দিকে তাকাইয়া মরিস তখন বেশ আসর জম-কাইয়া গল্প ফাঁদিলেন, "আপনারা এখানে আসবার মাস-খানেক আগে এরা একটা পোষ্ট-পিয়নকে জীবন্ত পুড়িয়ে খেয়ে ফেলেছিল। এ কথা শুনেছেন কি?"

উভয়ে চমকিত হইয়া বলিল, "কি সর্ব্বনাশ!"

মরিস পুনরায় বলিলেন, "ঘটনা সত্যি। পিয়নটা এই বস্তীতে চিঠি বিলি করতে এসেছিল। ভুটিয়ারা তার দেশ-ঘরের কথা জিজ্ঞাসা করায় সে বলে, গঙ্গার দেশে। তারা বুঝলে, কপিলাবস্তুর কাছে। জিজ্ঞাসা করলে,

'কপিলাবস্তুর কাছে?' পিয়নটা বাহাদুরী দেখাবার জন্যে বললে, 'হাঁ।' অমনি তারা তাকে ধ'রে জীবন্ত পুড়িয়ে মেরে তার দেহটা টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে সকলে মিলে খেয়ে ফেল্লে।"

ভয়ে ইভ ও মোনার মুখ শুকাইয়া গেল, তাহারা চারিদিকে ভয়চকিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। মরিস তাহা দেখিয়া হাসিয়া আশ্বাস দিয়া বলিলেন, "ভয় কি? আমাদের দেখলে ওরা যমের মত ভয় করে। বিশেষ আমার কাছে গুলীভরা পিস্তল রয়েছে, তা ওরা জানে।"

ইভ জিজ্ঞাসা করিল, "পিয়নটাকে খেয়ে ফেললে কেন?"

মরিস বলিলেন, "কেন বুঝলেন না? লোকটার বাড়ী বুদ্ধের দেশে গঙ্গার ধারে, কাযেই তার দেহটা পবিত্র। হাঃ হাঃ! এমন কুসংস্কার আপনারা এ দেশের যেখানে সেখানে দেখতে পাবেন।"

ইভ দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "তা কুসংস্কারই বলুন আর যা-ই বলুন, ওরা সরল বিশ্বাসেই ত মানুষটাকে মেরেছিল। ওদের মত সরল বিশ্বাস আমরা কবে ফিরে পাব?"

মোনা ও মরিস সবিস্ময়ে ইভের মুখের দিকে তাকাইল। এ কি অসম্ভব প্রলাপ বকিতেছে ইভ!

মোনা বেল বলিলেন, "আশ্চর্য্য! কি যে বল, তার মাথামুণ্ডু নেই। ওরা সরল হ'ল? অসভ্য জঙ্গলী নিগার?"

ইভ গম্ভীরভাবে জবাব দিল, "নাসিকা কুঞ্চন কোরো না। ওরা জঙ্গলী নিগার হ'তে পারে, কিন্তু মনের আসল কথা লুকিয়ে রেখে বাইরে অন্য ভাব দেখাতে জানে না। ওদের ভিতর বার এক। ওরা ত আমাদের মত জ্ঞানবৃক্ষের ফল খায় নি। আমাদের সভ্য শিক্ষিত সমাজে কেবল লুকোচুরি, কেবল ঢাক-ঢাক,—জঘন্য মিথ্যার আবরণে, কপটতার মোড়কে নগ্ন সত্যটাকে ঢেকে রাখার চেষ্টা!"

কথাটা বলিবার সময় ইভের মুখে চোখে একটা দারুণ ঘৃণা ও বিরক্তির ভাব স্পষ্ট ফুটিয়া উঠিল। মরিস্ ও মোনা বিস্মিত হইল, তাহারা ইভের মধুময় কোমল প্রকৃতির কথাই জানিত, এ ভাবটা কখনও দেখে নাই।

ইভ একটা সোপানের উপর বসিয়া পড়িয়াছিল। মরিস নতজানু হইয়া ব্যগ্র ও উৎকণ্ঠিতভাবে কাতর স্বরে বলিলেন, "মিস রবিনসন, কোন কষ্ট হচ্ছে কি? ইস, আপনাকে এতটা সিঁড়ি ভাঙ্গিয়ে আমি কি একটা পশুর মত কাযই করেছি!"

ইভ জবাব দিল না, কেবল তাঁহার বালকসুলভ আগ্রহোজ্জ্বল মুখের দিকে চাহিয়া একটু হাসিল; বলিল, "লেফটেনেণ্ট সবরাইট, বোধ হয়, আপনাকে এইবার নিয়ে আজ তিনবার স্মরণ করিয়ে দিতে হচ্ছে যে, আমি মিসেস রায়, মিস রবিনসন নই।"

মরিসের মুখখানা পাংশুবর্ণ ধারণ করিল। তিনি অপরাধীর মত বলিলেন, "আমায় তার জন্য সাজা দেবেন। তবে এটাও ব'লে রাখছি, আমার দ্বারা সর্ব্বদা আপনাকে মিসেস্ রায় বলা ঘ'টে উঠবে না।"

ইভও সঙ্গে সঙ্গে একটু গরম হইয়া জবাব দিল, "তা হ'লে বিশেষ দুঃখের সহিত বলতে হচ্ছে যে,ভবিষ্যতে আমাদের মধ্যে পরস্পর সম্বোধনের অবসর যতই বিরল হয়, ততই মঙ্গল।"

স্থানটায় একটা গভীরতা হঠাৎ দেখা দিল। মরিস্ এবার যথার্থ ই কাতর স্বরে বলিলেন, "তা হ'লে মিস রবিনসন কি আমায় তাঁর সঙ্গসুখ হ'তে বঞ্চিত করতে চান?"

এই সময়ে মিস মোনা বেল অবস্থাটার গুরুগম্ভীরতা নষ্ট করিয়া দিবার নিমিত্ত বলিলেন, "বাঃ, তোমরা ঝগড়া আরম্ভ ক'রে দিলে, এ দিকে বেলা যে প'ড়ে আসছে। মরিস, রিক্সাকুলীদের ডাক। এখনও কতটা পথ যেতে হবে মনে নেই কি?"

মরিস্ অপ্রতিভ হইয়া তীরবেগে উঠিয়া রিক্সাকুলীদের উদ্দেশে গেলেন। মোনা বলিলেন, "সত্যি ভাই ইভ, তোমার কথার ঝাঁঝে বেচারা মরিস জ্'লে পুড়ে উঠেছে। বুঝতে কি পার না, ও তোমায় কি ভালবাসে—তুমি যেখান দিয়ে চ'লে যাও, সেই মাটীটাকে ও পুজো করে।"

ইভ মুহূর্ত্তে চপলা বালিকার মত হইয়া উচ্চ হাসিয়া বলিল, "আমি পরের বিবাহিতা গৃহিণী,—আমার কাছে মরিস বালক, সে আমার কাছে মাতৃস্নেহ পেতে পারে, ভগিনীস্নেহ পেতে পারে, তার বেশী চাইতে যাওয়া তার পক্ষে অনধিকারচর্চ্চার ধৃষ্টতা ব'লে গণ্য হবে না?"

মোনা চোখ ঘুরাইয়া বলিলেন, "ওঃ, ভারী ত বিবাহ! একটা নেটিভ নিগার—"

মোনা আর অধিক অগ্রসর হইতে সাহসী হইলেন না।

ইভের চোখ-মুখের ভাব দেখিয়া হঠাৎ থামিয়া গেলেন। ইভ তখন দাঁড়াইয়া উঠিয়াছে, তাহার চোখ দিয়া অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতেছে। সে কঠোর স্বরে বলিল, "আশা করি, ভবিষ্যতে এ সব অনধিকারচর্চ্চা করবে না। তুমি আমার আমন্ত্রিত অতিথি, এ কথাটা যেন আমায় ভুলে যেতে দিও না। আমার স্বামী যা-ই হন, তিনি আমার স্বামী, এ কথাটা যেন সকল সময়ে মনে থাকে।"

কথাটা বলিয়াই ইভ ধীরগম্ভীর পাদবিক্ষেপ করিয়া পথে অগ্রসর হইল। তখন মরিসও রিক্সাওয়ালাদিগকে লইয়া সেই দিকে আসিতেছিলেন। পথে এক স্থানে বৃষ্টির জল জমিয়া কাদা হইয়াছিল। ইভ কাদাটা কিরূপে পার হইবে, সেই জন্য ইতস্ততঃ করিতেছিল। মরিস এক লম্ফে উপস্থিত হইয়া ইভকে নিষেধ করিবার অবসর না দিয়াই তাহাকে একবারে দুই হাতে তুলিয়া লইয়া কাদা পার করিয়া দিলেন। সেই বহনে কতখানি ভালবাসা জড়ান-মাখান ছিল, তাহা তাঁহার চোখের দৃষ্টিতে প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছিল। যেন একটি সুন্দর পালকের মত— যেন একটি প্রস্ফুটিত শতদলের মত ইভের দেহখানি মরিস বহিয়া লইয়া গেলেন। ইভের বিস্ময় অপনোদিত হইতে না হইতেই তিনি তাহাকে রিক্সায় বসাইয়া দিয়া এবং ভাল করিয়া 'রাগ' দিয়া সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া দিয়া কুলীদিগকে টানিতে আদেশ দিলেন। তখন তাঁহার গম্ভীর হুকুমে সেনানীর সগর্ব্ব কণ্ঠস্বর জাগিয়া উঠিয়াছিল। ইভ মরিস্‌কে কিছু বলিবার অবসর পাইল না। সে কেবল তাহার গভীর ব্যর্থ প্রেমের কথা ভাবিয়া মনে কষ্ট পাইতেছিল।

[ক্রমশঃ।

বিরহিণী

বিরহিণী মেয়ে রহিয়াছে চেয়ে পথের 'পরে।
প্রিয়তম তা'র আসিবে ফিরিয়া তাহার তরে।
সে যে কত দিন—কত কাল আগে
গিয়াছে চলিয়া মনে নাহি জাগে,
আজো সে তাহার আশার বাণীটি
হৃদয়ে ধ'রে
চেয়ে আছে দু'টি আঁখি-তারা তুলি
পথের 'পরে।

আকুলিত তা'র কেশপাশ সে যে বাসিত ভালো!
আজো সে যে হায়, তেমনি চিকণ, নিকষ-কালো।
মিলন-দিনের যত আভরণ
ল'য়ে সে করেছে দেহের বাঁধন,
বিধুর হৃদয়ে বাঁধন কোথায়?
নাহি যে আলো!
বিফল বাসনা; আসে না সে আর—
বাসে না ভালো।

রাজপথে কত ফিরিছে পথিক কাযের শেষে,
মিলন-আশায় চলিছে তাহারা সুদূর দেশে।
শুধু কি তাহারি বিফল পরাণ?
হৃদয়ে জাগিছে বৃথা অভিমান!
সমেঘ আকাশে শশী ভেসে যায়
মলিন হেসে—
গগন চুমিছে শ্যামলা ধরণী
বিরহ-শেষে!

কোথায় কে যেন গাহে গান দূরে করুণ সুরে!
গোপন ব্যথার দহনে দহনে পরাণ পুড়ে।
একাকিনী হায় কত রবে আর?
প্রিয় যে নিল না বেদনার ভার!
বেদন আজিকে রোদন জাগায়
বুকটি জুড়ে;
কোথা প্রিয়তম? তারি আশে মন
মরিছে ঘুরে।

যদি নাহি আসে, তথাপি সে হায়, রহিবে চেয়ে।
শ্বেতবাস পরি দিবস কাটাবে মলিনা মেয়ে।
হৃদয় জুড়িয়া আছে আশা তার,—
আসিবে আসিবে প্রিয় সুকুমার
মরণের বেশে চির-মিলনের
গানটি গেয়ে!
যদি নাহি আসে তথাপি সে হায়
রহিবে চেয়ে।

শীত-শেষে আজি পাতা ঝ'রে যায় পথের 'পরে,
ধরণী ধরেছে বিরহের বেশ বিরাগ-ভরে।
কালো কেশ হবে শুক্ল বরণ,
মলিন বয়ান, শিথিল চরণ—
তথাপি বসিয়া বাতায়ন-পাশে
প্রণয়-ভরে
জাগিয়ে রজনী চিরবিরহিণী
আঁধার ঘরে।

শ্রীহেমচন্দ্র বাক্‌চী
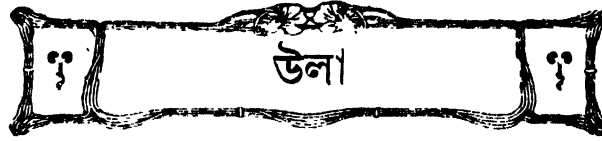
১

বঙ্গদেশের—বিশেষতঃ পশ্চিম-বঙ্গের ভদ্রলোকদিগের মধ্যে অনেকেই উলার নাম শুনিয়া থাকিবেন। উলা পূর্ব্বে সামাজিক ক্রিয়াকলাপের জন্য, অতিথিসৎকারের জন্য, বিশিষ্ট ভদ্রলোকের জন্য এবং "উলুই পাগলের" জন্য বিখ্যাত ছিল। বর্ত্তমানে ইহা নিবিড় অরণ্য, ভগ্ন দেবালয় ও অট্টালিকাদি এবং ম্যালেরিয়া রাক্ষসীর জন্য বিখ্যাত হইয়া আছে।

জিলা নদীয়ার রাণাঘাট থানার অধীন উলা, রাণাঘাট হইতে ২॥০ ক্রোশ উত্তরে, কৃষ্ণনগর হইতে প্রায় ৮ ক্রোশ দক্ষিণে ও শান্তিপুর হইতে প্রায় ৫ ক্রোশ পূর্ব্বে অবস্থিত। ইহার দূরত্ব কলিকাতা হইতে সার্দ্ধ ২৫ ক্রোশ। যাতায়াতে ট্রেণের সুবিধা আছে। ই, বি, রেলের রাণাঘাট-মুর্শিদাবাদ শাখার বীরনগর ষ্টেশনই উলার ষ্টেশন এবং ইহা উলা গ্রামের পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত।

পুরাকালে উলার পশ্চিম ও দক্ষিণ প্রান্ত দিয়া এবং আংশিকভাবে উহার পূর্ব্ব প্রান্ত দিয়া ভাগীরথী-গঙ্গা প্রবাহিত ছিল। তৎকালে গঙ্গার চরে—যথায় এক্ষণে উলার ধ্বংসাবশেষমাত্র বর্ত্তমান আছে—উলুবন ছিল। সেই উলুবনে প্রতিষ্ঠিত শিলারূপী চণ্ডীকে লোক "উলা চণ্ডী" বা "উলুই চণ্ডী" কহে এবং উলুবনাকীর্ণ গঙ্গার চরে স্থাপিত গ্রামকে "উলা" কহে। কেহ বলেন যে, উলা চণ্ডীর নাম হইতে উলা হইয়াছে, কেহ বলেন, পারস্য "আউল" অর্থাৎ "জ্ঞানী বা বুজরুক" অথবা আরব্য "উলা" অর্থাৎ "শ্রেষ্ঠ বা প্রথম" শব্দ হইতে উলার নামকরণ হইয়াছে।

হিন্দু রাজত্বকালে উলা গ্রাম মধ্যদ্বীপমধ্যে অবস্থিত ছিল। পাঠান ও মোগলদিগের রাজত্বকালে যে ৩১টি মহাল লইয়া সরকার সুলেইমানাবাদ গঠিত ছিল, উলা তাহার মধ্যে একটি। আইন-ই-আকবরীতে উল্লেখ আছে যে, বাদশাহ আকবরের রাজত্বকালে উলার দেয় রাজস্ব ৮৯২৭৭ দাম (৪০ হইতে ৪৮ দাম মূল্যে এক টাকার সমান বিবেচিত হইত) ধার্য্য ছিল। উলার পূর্ব্ব প্রান্তে পূর্ব্ব-পশ্চিমে দীর্ঘ একটি বৃহৎ দীর্ঘিকার শুষ্ক খাত পড়িয়া আছে, উহাকে লোক "পুরাতন দীঘি" কহে ইহা মুসলমান রাজত্বকালে মুসলমানদিগের দ্বারা খনিত হইয়াছে, এইরূপ জনশ্রুতি আছে।

খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সময়ে তাঁহার রাজ্য যে ৪৯টি পরগণায় বিভক্ত ছিল, উলা তন্মধ্যে একটি। তৎকালে কৃষ্ণচন্দ্রের জমীদারী চারিটি সমাজে বিভক্ত ছিল, যথা—উত্তর ভাগ অগ্রদ্বীপ সমাজ, মধ্যভাগ নবদ্বীপ সমাজ, দক্ষিণভাগ চক্রদ্বীপ সমাজ ও পূর্ব্বভাগ কুশদ্বীপ সমাজ ছিল। উলা তৎকালে চক্রদ্বীপ সমাজের অন্তর্গত ছিল।

কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে লিখিত আছে :—

> "বাহ বাহ বল্যা ঘন প'ড়ে গেল সাড়া।
> বামভাগে শান্তিপুর ডাহিনে গুপ্তিপাড়া ॥
> উলা বাহিয়া খিসমার আশে পাশে।
> মহেশপুর নিকটে সাধুর ডিঙ্গা ভাসে ॥"

উক্ত চণ্ডী গ্রন্থে লিখিত আছে যে, ধনপতি ও শ্রীমন্ত সওদাগর সিংহল যাইবার কালে উলার পার্শ্বদেশ দিয়া গঙ্গা বাহিয়া গমন করিয়াছিলেন। তৎকালে উলা, খিসমা ও ফুলিয়ার পার্শ্বদেশ দিয়া গঙ্গা প্রবাহিত ছিল। এক্ষণে গঙ্গা উলা হইতে ৪।৫ ক্রোশ দূরে ও ফুলিয়া হইতে প্রায় ১॥ মাইল দূরে সরিয়া গিয়াছে। ১৬৫৮ খৃষ্টাব্দের পরে এবং ১৭০৭ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে উলা হইতে গঙ্গা সরিয়া গিয়াছে।

একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, শ্রীমন্ত সওদাগর বৈশাখী পূর্ণিমার দিন যখন উলার পার্শ্ব দিয়া ডিঙ্গা করিয়া যাইতেছিলেন, সেই সময় অত্যন্ত ঝড়-বৃষ্টি হইতে থাকে। বাণিজ্য-তরণীগুলিকে ঝড়-জল হইতে রক্ষা করিবার জন্য তিনি আপন ডিঙ্গার নোঙ্গরের প্রস্তরখণ্ড তুলিয়া উলার প্রান্তভাগে নদীতীরে বটবৃক্ষমূলে স্থাপনা করিয়া চণ্ডীরূপে পূজা করিয়াছিলেন। সেই হইতে উলা-চণ্ডীর পূজা চলিয়া আসিতেছে। বৈশাখী পূর্ণিমা বা গন্ধেশ্বরী পূজার দিন আজিও প্রতি বৎসর মহা সমারোহে উলা-চণ্ডীর পূজা হইয়া থাকে। ইহাকে উলা-চণ্ডীর "জাত" বা "যাত্রা" বলা হয়।

প্রাচীন দলিলাদিতে উলার নাম পাওয়া যায়। ঔরঙ্গজেব বাদশাহের রাজত্বকালের অর্থাৎ ১১০১ সালের ১১ই কার্ত্তিক তারিখের একখানি পুরাতন আত্মবিক্রয়-পত্রে দেখা যায় যে, সনাতন দত্ত নামক এক ব্যক্তি সস্ত্রীক অনাহারক্লিষ্ট ও ঋণগ্রস্ত হইয়া উলার তদানীন্তন জমীদার ও মুস্তোফী-বংশের প্রতিষ্ঠাতা রামেশ্বর মিত্র মুস্তোফীর নিকট মাত্র ৯ নয় টাকা মূল্যে আত্মবিক্রয় করিয়াছিল এবং উহা কাজীর সম্মুখে রেজেষ্টারী হইয়াছিল।

কর্ত্তাভজা সম্প্রদায়ের মধ্যে এইরূপ একটি প্রবাদ আছে যে, উক্ত সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা আউলিয়া চাঁদকে ১৬১৬ শকাব্দের ১৬৯৩।৯৪ খৃষ্টাব্দের ফাল্গুনমাসে উলার মহাদেব বারুই তাহার পানের বরজের মধ্যে প্রাপ্ত হয়। আউলিয়া-চাঁদের বয়স তৎকালে ৮ বৎসর মাত্র। আউলিয়াচাঁদ মহা-দেবের গৃহে ১২ বৎসরকাল পুত্রনির্ব্বিশেষে লালিত-পালিত হইয়াছিলেন এবং মহাদেবের স্ত্রী তাঁহার নাম "পূর্ণচন্দ্র" রাখিয়াছিলেন।

উলার সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন গ্রন্থের নাম "গঙ্গাভক্তি-তরঙ্গিণী।" উহা উলার খড়দহপাড়ানিবাসী দুর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক রচিত।

উক্ত গ্রন্থে গঙ্গার গতিবর্ণনাস্থলে উলার সম্বন্ধে লিখিত আছে :—

"অম্বিকা পশ্চিম পারে শান্তিপুর পূর্ব্ব ধারে
রাখিল দক্ষিণে গুপ্তি-পাড়া,
উল্লাসে উলায় গতি বটমূলে ভগবতী
চণ্ডিকা নহেন যথা ছাড়া।
বৈশাখেতে যাত্রা হয় লক্ষ লোক কম নয়
পূর্ণিমা তিথিতে পুণ্যচয়;
নৃত্য গীত নানা নাট দ্বিজ করে চণ্ডীপাঠ
মানে যে, মান সিদ্ধ হয়।
কুলীন সমাজ নাম কিবা লোক কিবা গ্রাম
কাশী তুল্য হেন ব্যবহার।
দয়াধর্ম্ম বর্ত্তে যথা কিঙ্কব লোকের কথা
মুনি হেন হেন কুলাচার॥"

রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পূর্ব্বপুরুষ রাঘবেন্দ্র রায়ের সময় হইতে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র পর্য্যন্ত নদীয়ার রাজাদিগের নিকট উলা অতি প্রিয় স্থান ছিল। রাজা রাঘবেন্দ্র উলার 'মাঝের পাড়ায়' একটি দীর্ঘিকা কাটাইয়া উহার মধ্যস্থলে একটি জলবাটিকা প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। পরবর্ত্তী কালে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র কোন কোন বৎসর গ্রীষ্মকালে উলায় আসিয়া উক্ত জলবাটিকায় বাস করিতেন এবং ইষ্টদেবতার পূজা করিয়া নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণ ও অধ্যাপকদিগকে গুণানুসারে সম্মানিত করিতেন। উক্ত দীঘি "রাজার দীঘি" বলিয়া পরিচিত ছিল। আজিও উক্ত বৃহৎ দীর্ঘিকা "খাঁ দীঘি" নাম ধারণ করিয়া কোন প্রকারে বর্ত্তমান আছে। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র উলার ব্রাহ্মণদিগকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করিতেন। একবার কৃষ্ণচন্দ্র গুপ্তিপাড়া হইতে বানর-বানরী আনাইয়া লক্ষমুদ্রা ব্যয় করিয়া উহাদিগের বিবাহ দিয়াছিলেন এবং তদুপলক্ষে নদীয়া, গুপ্তিপাড়া, উলা ও শান্তিপুর প্রভৃতি স্থানের ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন।

উলার কুলীন "মুখুয্যেপাড়ার" কৃষ্ণরাম মুখোপাধ্যায় কৃষ্ণচন্দ্রের সভাপণ্ডিত ছিলেন এবং কৃষ্ণরামের জ্ঞাতি-ভ্রাতা মুক্তারাম উক্ত রাজসভার হাস্য-রসিক ছিলেন। বৈবাহিক সম্বন্ধ না থাকিলেও বিদ্রূপ করিবার সুবিধা হইবে বলিয়া রাজা মুক্তারামকে "বেহাই" বলিয়া ডাকি-তেন এবং সুবিধা পাইলেই নানাপ্রকার বিদ্রূপ করিতেন। এক দিন রাজা কহিলেন, "বেহাই, গত রাত্রে আমি এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিয়াছি; দেখিলাম যে, আমি পায়সের হ্রদে ও তুমি বিষ্ঠার হ্রদে পড়িয়া গিয়াছ।" সপ্রতিভ মুক্তা-রাম উত্তর দিলেন, "আমিও ঠিক ঐ স্বপ্নটি দেখিয়াছি, কিন্তু কিঞ্চিৎ পার্থক্য আছে। আমি স্বপ্নে দেখিলাম যে, আমরা উভয়ে হ্রদদ্বয় হইতে উঠিয়া পরস্পরের গা-চাটাচাটি করিতে লাগিলাম।"

আর একবার উলার কোন দুষ্ট লোক অপর এক ব্যক্তির স্ত্রীকে বিক্রয় করিয়াছিল। কৃষ্ণচন্দ্র এই সংবাদ শুনিয়া মুক্তারামকে কহিলেন, "বেহাই, তোমাদের ওখানে নাকি বৌ বিক্রয় হয়?" উত্তরে মুক্তারাম কহিলেন, "হাঁ মহারাজ, আমাদের ওখানে বৌ নিয়ে যাওয়ামাত্রই বিক্রয় হইয়া যায়।"

একবার মুক্তারাম কতকগুলি উৎকৃষ্ট মাগুর মাছ কৃষ্ণ-চন্দ্রকে খাইতে দিয়াছিলেন। "মাগুর" শব্দের শেষ অক্ষর বাদ দিলে স্ত্রী বুঝায় এবং উহার আদি ও অন্ত্যাক্ষর বাদ

দিলে যাহা হয়, রসিক পাঠক তাহা অনায়াসেই অনুমান করিতে পারেন। মাগুর মাছগুলি আহার করিয়া রাজা এক দিন কহিলেন, "মুখুয্যে, তুমি আমাকে যাহা দিয়াছিলে, তাহার অন্ত পাই নাই।" মুক্তারাম রাজার দুষ্ট অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া কহিলেন, "মহারাজ, আমরা উলার লোক, পাগল মানুষ, আমি আপনাকে যাহা দিয়াছিলাম, তাহার আদি ও অন্ত দুই ছিল না।"

উলার রাজার দীঘি বা খাঁ দীঘির পশ্চিম পাড়ের দৃশ্য

রাজা কৃষ্ণচন্দ্র উলার বহু ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ, বৈদ্য প্রভৃতিকে বহু বিঘা নিষ্কর ভূমি দান করিয়া গিয়াছেন। কেবল তাহাই নহে, তিনি উলার "দেওয়ান মুখোপাধ্যায়" বংশের সহিত ও দক্ষিণপাড়ার চট্টোপাধ্যায় বংশের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছিলেন।

ডাকাইত ধরার জন্য উলার নাম "বীরনগর" হইয়াছে। ইহা ইংরাজ দত্ত নূতন নাম। উলার রেল-ষ্টেশন, মিউনিসিপালিটী ও পোষ্ট আফিসে এই নূতন নাম ব্যবহৃত হইতেছে। এক্ষণে সরকারী কাগজপত্রে "উলার" পরিবর্ত্তে "বীরনগর" ব্যবহৃত হইতেছে। শতাধিক বর্ষ পূর্ব্বে উলার মুস্তৌফী-বংশের অনাদিনাথ মুস্তৌফী শিবেশনী নামক শান্তিপুরনিবাসী গোপ-জাতীয় জনৈক ডাকাইতকে স্বহস্তে ধৃত করেন। উক্ত ডাকাইতের দুই বাহু ছেদন করিলে উহার মৃত্যু হয়। সেই সময় একটি ছড়ার প্রচলন হইয়াছিল, যথা :—

"শিবেশনী মাগুল চোর,
ছোকরাতে করেছে পাকড়া, ধন্য উলা বীরনগর।"

ইহা উলার "বীরনগর" নামকরণ হইবার অন্যতম কারণ।

আর একবার ১৮০০ খৃষ্টাব্দে বিখ্যাত বামনদাস মুখোপাধ্যায়ের পূর্ব্বপুরুষ মহাদেব মুখোপাধ্যায়ের বাটীতে ডাকাইতী হয়। মহাদেব তখন রাণাঘাটের পাল-চৌধুরী-বংশের প্রতিষ্ঠাতা বিখ্যাত কৃষ্ণ পান্তির সহায়তায় ও নিজ অধ্যবসায়বলে দীন অবস্থা হইতে অর্থশালী হইয়া উঠিতেছেন। সে কালের বিখ্যাত ডাকাইত বদে বিশে (ভাল নাম বৈদ্যনাথ ও বিশ্বনাথ) এই ডাকাইত দলের সর্দ্দার ছিল। গ্রামবাসিগণের চেষ্টায় এই ডাকাইত দলের অনেক লোক ধরা পড়ে ও ইংরাজের বিচারালয়ে তাহাদিগের শাস্তি হয়। উলাবাসীদের বীরত্বের সম্মানের জন্য ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট ১৮০০ খৃষ্টাব্দে উলার "বীরনগর" নামকরণ করেন।

২

উলার উলাচণ্ডী ঠাকুরাণী ও বুড়াশিব নামক শিবলিঙ্গ গ্রামের সর্ব্বসাধারণের দেবতা। উলাচণ্ডীকে শ্রীমন্ত সওদাগর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। উলাচণ্ডী অতি জাগ্রত দেবতা। বহু দূরদেশ হইতে লোক আসিয়া দেবীর নিকট

উলাচণ্ডীতলা

উলার মুস্তৌফী-বাটীর চণ্ডীমণ্ডপে কাষ্ঠের উপর সূক্ষ্ম কারুকার্য্য
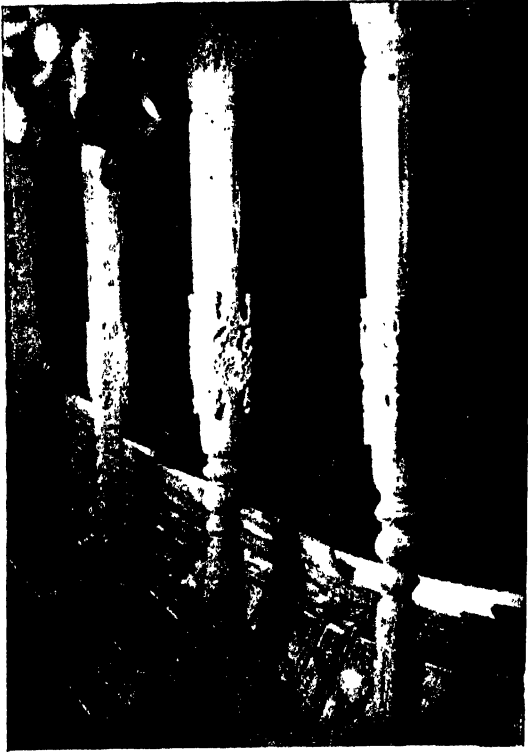
মনস্কামনাসিদ্ধির, পুত্রপ্রাপ্তির এবং রোগশান্তির জন্য দেবীর বটবৃক্ষের জড়ান ইষ্টকখণ্ড বাঁধিয়া মানসিক করিয়া যায়। মনস্কামনা সিদ্ধ হইলে বৈশাখী পূর্ণিমার দিন তাহারা সাধ্যমত দেবীর পূজা দিয়া থাকে। বুড়াশিব নদীয়ার রাজবংশ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত বলিয়া শুনা যায়। গ্রামের দক্ষিণপাড়ায় মুস্তৌফীদিগের পুরাতন বাটীতে ৬টি মন্দির এবং নূতন বাটীতে ১৭টি মন্দির বর্ত্তমান আছে। এত অধিকসংখ্যক মন্দির ও দেবতার স্থান নদীয়ার মহারাজা ব্যতীত নদীয়া জিলায় অন্য কাহারও নাই। এতন্মধ্যে পুরাতন মুস্তৌফী-বাটীর 'বাংলা' ঘরের আকৃতিবিশিষ্ট চণ্ডীমণ্ডপের কাঁঠালকাষ্ঠের স্তম্ভ ও উপরের কড়ি, বামনা ও তীরগুলিতে অতি সূক্ষ্ম কারুকার্য্য ও নানা প্রকার দেব-দেবীর মূর্ত্তি ও বিভিন্ন প্রকারের ভঙ্গিমাবিশিষ্ট পুত্তলিকা আছে। ইহার তিন দিকের ইষ্টকনির্ম্মিত দেওয়ালে ইষ্টকের উপরে নানা দেব-দেবীর মূর্ত্তি ও নক্সা ক্ষোদিত আছে। এই মণ্ডপটি বাদশাহ ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালে অনুমান ১৬০৬ শকাব্দে রামেশ্বর মুস্তৌফী কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। এই মণ্ডপটি বঙ্গদেশের প্রাচীন বাংলা ঘরের নিদর্শন। ইহার চালে পূর্ব্বে অভ্র, ময়ূরপুচ্ছ লাল ও কালবর্ণের বাঁশের শলা বা চিক এবং সূক্ষ্ম বেতের সূতার বন্ধনী দ্বারা কারুকার্য্য খচিত ছিল, ১২৭১ সালের আশ্বিনমাসের ঝড়ে চাল উড়িয়া যাওয়ায় কারুকার্য্য নষ্ট হইয়া গিয়াছে। কিন্তু কাষ্ঠের উপরে ও দেওয়ালের ইষ্টকে যে কারুকার্য্য আছে, তাহা আজিও পথিকের বিস্ময় উৎপাদন করিতেছে। এই মণ্ডপের কারুকার্য্য-খচিত কাষ্ঠগুলিকে এক্ষণে ভ্রমরবৃন্দ ফুটা করিয়া নষ্ট করিয়া ফেলিতেছে। পুরাকাল হইতে এ কাল পর্য্যন্ত বহু দূরদেশ হইতে জনমণ্ডলী এই মণ্ডপের অপূর্ব্ব গঠন-প্রণালী ও কারুকার্য্য দেখিতে আইসে। এরূপ চণ্ডী-মণ্ডপ বা গৃহ সমগ্র বঙ্গদেশে বিরল। মণ্ডপের সম্মুখস্থ উঠানের অপর পারে হোমের ঘর আছে। এই গৃহে একটি কূপ আছে, উহার মধ্যে প্রথম হইতে আজি পর্য্যন্ত মুস্তৌফী-গণ যতবার দুর্গোৎসব করিয়াছেন, তাহার (অর্থাৎ প্রায়

দক্ষিণপাড়ার অতি প্রাচীন বোধনের বিল্ববৃক্ষ ও দোলমঞ্চ

দক্ষিণপাড়া কৃষ্ণচন্দ্রের যোড়বাংলা মন্দির

জামাই-কোঠার উত্তরে মুস্তৌফী-দিগের বাংলা ঘরের আকৃতি-বিশিষ্ট ইষ্টকনির্ম্মিত যোড়বাংলা মন্দির আছে। মন্দিরমধ্যে রাধা-কৃষ্ণ-বিগ্রহ এবং কতকগুলি শাল-গ্রামশিলা ও বাণলিঙ্গ শিব আছেন। মন্দিরের সম্মুখদেশে ইষ্টকের উপর অতি সূক্ষ্ম নয়ন-বিমোহন কারুকার্য্য-খচিত দেব-দেবীমূর্ত্তি ও পুত্তলিকা আছে। এই প্রকারের কারুকার্য্যবিশিষ্ট যোড়বাংলা মন্দির বঙ্গদেশে অধিক নাই। বহু স্থানের লোক এই মন্দির দেখিতে আইসে। ইহা ১৬১৬ শকে নির্ম্মিত।
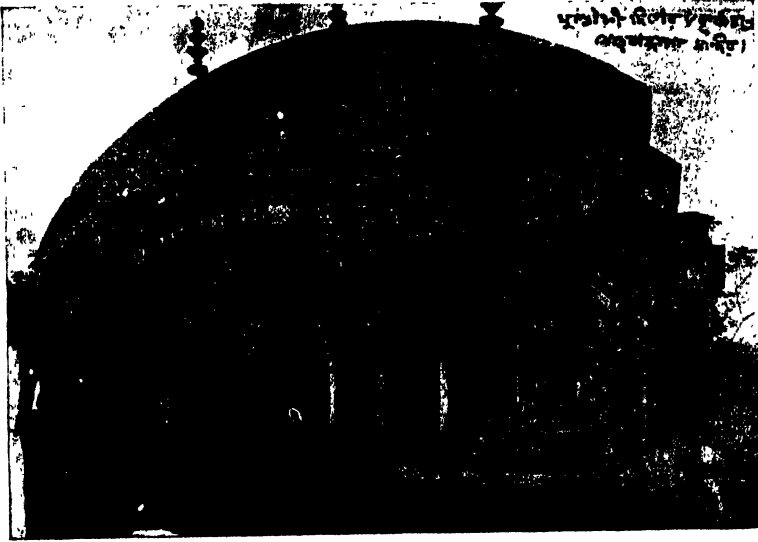
২৪২।৪৩ বৎসরের) হোমের ভস্ম সঞ্চিত আছে। নিম্ন-শ্রেণীর লোকের ধারণা এই যে, উক্ত চণ্ডীমণ্ডপ বিশ্বকর্ম্মা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত এবং এই হোমঘরে দুর্গাদেবী প্রতি রাত্রিতে রন্ধন করিয়া থাকেন। এই মণ্ডপের পূর্ব্বদিকে মুস্তৌফী-বাটীর সিংহদ্বারের সম্মুখে ইষ্টক দ্বারা বাঁধান একটি অতি প্রাচীন বিল্ববৃক্ষ আছে। ইহা মুস্তৌফীদিগের বোধনের বিল্ববৃক্ষ। মুস্তৌফীদিগের দুর্গোৎসব যত দিনের প্রাচীন, এই বিল্ববৃক্ষটিও তত দিনের পুরাতন। এরূপ প্রাচীন বিল্ববৃক্ষ সম্ভবতঃ বঙ্গ-দেশে আর একটিও নাই। এই বৃক্ষ-মূলে নায়িকাসিদ্ধ রঘুনন্দন মুস্তৌফী গভীর নিশীথে ইষ্টদেবীর আরাধনা করিতেন।

উক্ত চণ্ডীমণ্ডপের পশ্চিমদিকে মুস্তৌফীদিগের জামাই-কোঠার ভগ্নাব-শেষ আছে। পূর্ব্বে নবাবী প্রথানুসারে জামাতাকে অন্দরমহলে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইত না। জামাতা এই গৃহে থাকিতেন এবং রাত্রিকালে দাসীর সহিত কন্যাকে এই গৃহে পাঠান হইত।

মুস্তৌফী-বাটীর উত্তরদিকে এক স্থানে হরিশ্চপ্রাণ মুস্তৌফীর একজোড়া পঞ্চচূড় শিবমন্দির বনাকীর্ণ হইয়া আছে। মন্দির দুইটির গঠন অতি সুন্দর। ইহার কিঞ্চিৎ উত্তরদিকে বিখ্যাত ঈশ্বরচন্দ্র মুস্তৌফীর ঠাকুরবাটীর ১০টি একচূড়াবিশিষ্ট শিবমন্দির, একটি নবরত্ন কালীমন্দির এবং একটি অতি বৃহৎ দুর্গামন্দির ও তৎসংলগ্ন শাণবাঁধান ঘাটবিশিষ্ট কালিসাগর নামক পুষ্করিণী অযত্নে

দক্ষিণপাড়ার কৃষ্ণচন্দ্রের যোড়বাংলা মন্দিরের সম্মুখের কারুকার্য।

দক্ষিণপাড়া হরিশপ্রাণ মুস্তৌফীর জোড়া শিবমন্দির

নামক কৃষ্ণবিগ্রহের একটি মন্দির ছিল এবং তাঁহার বহির্ব্বাটীতে একটি দ্বিতলসমান উচ্চ সূক্ষ্ম কারুকার্য্য-খচিত* এবং নানা বিগ্রহ ও মূর্ত্তি-শোভিত কাষ্ঠের চালবিশিষ্ট একটি নাচ-ঘর বা চাঁদনী ছিল, এই দুইটি মহামারীর পরে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে।

পুরাতন মুস্তৌফী-বাটীর বহির্দ্দেশে উত্তর-পূর্ব্বদিকে একটি অতি প্রাচীন একচূড়, কারুকার্য্যখচিত, ইষ্টকনির্ম্মিত বিষ্ণুমন্দির আছে। ইহা ছোট মিত্র-বংশের কাশীশ্বর মিত্র অনুমান ১৬০৬ শকাব্দে নির্ম্মাণ করেন। উলায় যত

বনাকীর্ণ হইয়া ধ্বংসপথে চলিয়াছে। ঈশ্বর মুস্তৌফীর দুর্গা-মন্দিরটি সমগ্র নদীয়া জিলার মধ্যে অন্যতম বৃহৎ মন্দির। এই মন্দিরগুলি ১২২৫ হইতে ১২২৯ সালের মধ্যে নির্ম্মিত।

পুরাতন মুস্তৌফী-বাটীর পূর্ব্বদিকে সিদ্ধেশ্বরীতলায় মুস্তৌফীদিগের ৺সিদ্ধেশ্বরী কালীর তিনটি অতি প্রাচীন খিলান-করা ছাদবিশিষ্ট গৃহ, মঠবাটী-নামক স্থানে এক জোড়া শিবমন্দির এবং সিংহদ্বারের সম্মুখে কালীর কোঠা ও দোলমঞ্চের ধ্বংসাবশেষ প্রাচীন কীর্ত্তির সাক্ষ্য দিতেছে।

পূর্ব্বে ঈশ্বর মুস্তৌফীর অন্দরমহলে তাঁহার আনন্দ রায়
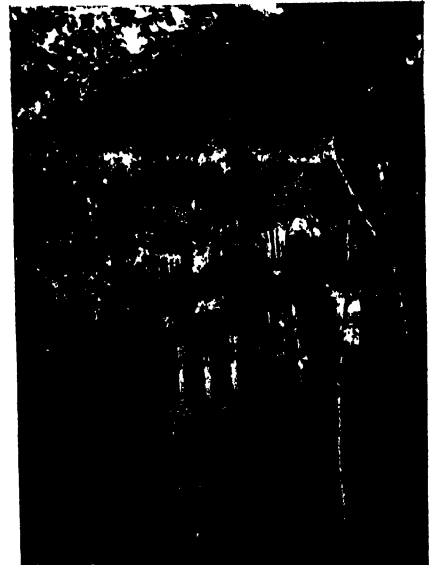
ঈশ্বরচন্দ্র মুস্তৌফী দীনদয়াময়ী কালীর নবচূড় ভগ্ন মন্দির

দক্ষিণপাড়ার কালীসাগর পুকুর—বর্ত্তমান নাম ডিস্পেন্সারী পুকুর

মন্দির আছে, তন্মধ্যে ইহা সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। মন্দিরের সম্মুখদেশে দেওয়ালে ইষ্টকের উপর অতি সূক্ষ্ম কারুকার্য্য, পুত্তলিকা ও দেব-দেবীর মূর্ত্তি আছে। ইহার কারুকার্য্য দেখিতে বহু দূরদেশ হইতে লোক আসিয়া থাকে।

মুস্তৌফী-বাটীর উত্তরদিকে ব্রহ্মচারীদিগের বাটী। ইঁহাদিগের উপাধি বন্দ্যোপাধ্যায়।

ঈশ্বরচন্দ্র মুস্তৌফীর দুর্গামন্দিরের সম্মুখভাগ

দক্ষিণপাড়া মঠবাটীর জোড়া শিবমন্দির

দক্ষিণপাড়া ৺সিদ্ধেশ্বরী কালীর ভগ্নবাটী

ইঁহাদিগের বহির্ব্বাটীতে একটি সুশ্রী পঞ্চচূড় শিবমন্দির আছে। উহার মধ্যে একটি বৃহৎ শিবলিঙ্গ, কৃষ্ণরাধিকা-বিগ্রহ, পিত্তলের দশভুজা ও নৃসিংহ-মূর্ত্তি আছেন। এই মন্দির ১২২৫ সাল হইতে ১২৪৫ সালের মধ্যে নির্ম্মিত বলিয়া অনুমিত হয়। এই মন্দিরের ৫০।৬০ হাত দূরে উত্তর-পশ্চিম কোণের দিকে একটি স্থানে গৃহের ভগ্নস্তূপ আছে। ঐ স্থানে ব্রহ্মচারিবংশের পূর্ব্বপুরুষ নন্দলাল ব্রহ্মচারী চণ্ডালের মৃতদেহ ও নরমুণ্ডাদি লইয়া সাধনা করিতেন। ঐ স্থানে যে গৃহ ছিল, উহার মধ্যস্থলে একটি যজ্ঞকুণ্ড ছিল; উহাতে তিনি আহুতি প্রদান করিতেন। অনুমান ১৭০৬ হইতে ১৭১৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে এই গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছিল।

দক্ষিণপাড়ায় কাশীশ্বর মিত্রের বিষ্ণুমন্দির

সরকারী পূজাবাটীর দুর্গা-পূজার দালানের ধ্বংসাবশেষ ও চাঁদনী আছে। ইহার কিঞ্চিৎ উত্তরদিকে ইহার পরবর্ত্তী কালে বামনদাস মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক নির্ম্মিত তাঁহার নিজস্ব ক্ষুদ্র পূজার দালানের ভগ্নাবশেষ বনাকীর্ণ হইয়া আছে। অনুমিত হয় যে, এইগুলি ১২৪৫ সালের পরে বা উহার নিকটবর্ত্তী সময়ে নির্ম্মিত হইয়াছে।

শেষোক্ত পূজাবাটী দুইটির পশ্চিমদিকে একটি একচূড় শিবমন্দির আছে। উহার মধ্যে একটি শ্বেতপ্রস্তরনির্ম্মিত শিবলিঙ্গ আছেন। এই মন্দিরের সম্মুখদেশে অতি সামান্য কারুকার্য্য আছে। এই মন্দিরটি বামনদাস মুখোপাধ্যায়দিগের পূর্ব্বপুরুষ মহাদেব মুখোপাধ্যায় ১৭১২ শকাব্দে ১১৯৬ সালে নির্ম্মাণ করেন। ইহার দক্ষিণপশ্চিমদিকে অন্নদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের স্তম্ভযুক্ত দ্বিতল বৈঠকখানা।

এই স্থান হইতে কিয়দ্দূর উত্তরদিকে বামনদাস মুখোপাধ্যায়দিগের বাটী আছে। এই বাটীতে দক্ষিণদিকের তোরণ-দ্বার দিয়া প্রবেশ করিলে দক্ষিণে শম্ভুনাথ মুখোপাধ্যায়ের সাত ফোকরের বৃহৎ পূজার দালানের উচ্চ স্তম্ভ ও দেওয়াল এবং অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ দণ্ডায়মান আছে দৃষ্ট হয়। শম্ভুনাথের পূজার দালান উলার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ছিল।

ইহার কিয়দ্দূর উত্তরদিকে রামনদাস মুখোপাধ্যায়দিগের

ব্রহ্মচারিবাটীর শিবমন্দির

মহাদেব মুখোপাধ্যায়দিগের এই বাটীর বহির্দ্দেশে দক্ষিণদিকে "দাওয়ান মুখোপাধ্যায়"দিগের বাটীর ধ্বংসাবশেষ আছে। ইঁহাদিগের পূজাবাটীর স্তম্ভগুলি আজিও নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে দণ্ডায়মান থাকিয়া পথিকের মনে অপূর্ব্ব ভাবের সঞ্চার করিতেছে।

"দাওয়ান মুখোপাধ্যায়"দিগের বাটীর কিঞ্চিৎ দক্ষিণদিকে "ছোট

কুচুই বনের দোলমন্দির

মিত্রদিগের” নূতন বাটীতে উলার অন্যতম বৃহৎ পূজার দালান আছে, ইহা মহামারীর অনেক পরে নির্ম্মিত।

গ্রামের মাঝের পাড়ায় সার্কুলার রোডের ধারে দুইটি ক্ষুদ্র একচূড় এবং একটি পঞ্চচূড় শিবমন্দির আছে। পঞ্চচূড় ক্ষুদ্র মন্দিরটি বাজারের মধ্যে অবস্থিত। মন্দিরমধ্যে একটি কৃষ্ণপ্রস্তরের শিবলিঙ্গ আছেন। এই মন্দিরটি তারাকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় কর্ত্তৃক ১৭৫৮ শকাব্দে—১২৪২ সালে নির্ম্মিত।

গ্রামের উত্তর প্রান্তে একটি মাঝারি আকৃতির একচূড় শিবমন্দির বনাকীর্ণ হইয়া ধ্বংসপথে চলিয়াছে। ইহা কমলনাথ ও উমানাথ মুখোপাধ্যায়দিগের মন্দির বলিয়া বিদিত। ইহার সম্মুখদেশে ইষ্টকের উপর সামান্য কারুকার্য্য আছে। ইহা ১২৩০ সাল হইতে ১২৫০ সালের মধ্যে নির্ম্মিত বলিয়া অনুমিত হয়।

এই মন্দিরের অদূরে খাঁদিগের অট্টালিকা-সমূহ দণ্ডায়মান আছে। খাঁদিগের বাটীর উত্তর-পশ্চিমদিকে “কুচুই বনের” দোলমন্দির অযত্নে দণ্ডায়মান আছে। এই প্রকারের কিন্তু অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র আর একটি দোলমন্দির গ্রামের বারুইপাড়ায় আছে।

এতদ্ব্যতীত গ্রামের দক্ষিণপাড়ায় একটি ও মাঝের পাড়ায় একটি বৃহৎ বারইয়ারীর ঠাকুরঘর ও চাঁদনী আছে। বৈশাখী পূর্ণিমায় উলাচণ্ডী-পূজার দিন হইতে দক্ষিণপাড়ায় মহিষমর্দ্দিনী ও মাঝের পাড়ায় বিন্ধ্যবাসিনীমূর্ত্তি গড়িয়া বারইয়ারীপূজা করা হয় এবং এতদুপলক্ষে দুই পাড়ায় ৩ দিন দিবারাত্রি যাত্রা, কীর্ত্তন ও কবি গান প্রভৃতি আমোদ-প্রমোদ চলিতে থাকে।

গ্রামের উত্তর অঞ্চলে তিন গুম্বজবিশিষ্ট একটি প্রাচীন মসজিদ জঙ্গলের মধ্যে আছে। উহা “কলুপাড়ার মসজিদ” বলিয়া বিদিত। ইহা ১৮০০ খৃষ্টাব্দের নিকটবর্ত্তী কোন সময়ে নির্ম্মিত। এতদ্ব্যতীত গ্রামের উত্তরপাড়ায় একটি দরগা ও দক্ষিণপাড়ায় একটি মসজিদের ভগ্নাবশেষ আছে।

এই সকল মন্দির ও মসজিদাদি ব্যতীত উলার বনের মধ্যে বহু ত্যক্ত পূজার দালান ও ভগ্ন অট্টালিকা

কলুপাড়ার পুরাতন মসজিদের পশ্চিমদিক

হিংস্র জন্তুর আবাসভূমি হইয়া আছে।

[ক্রমশঃ।

শ্রীসুজননাথ মিত্র মুস্তৌফী।
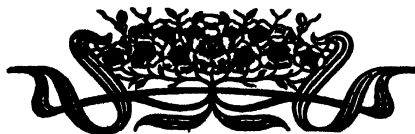
নারী

মাতৃজাতির মধ্যে জাগরণের যে একটা সাড়া পড়িয়াছে, অনেকে এই মন্তব্যটাকে আমল দিতে চাহেন না। তাঁহারা বলেন, কতকগুলি প্রগল্‌ভা মাসিকে, সাপ্তাহিকে, গল্পে-উপন্যাসে তাহাদের লেখনীর মুখ দিয়া শুধু বাচালতা প্রকাশ করিতেছে,—আর কতকগুলি স্ত্রীস্বভাববিশিষ্ট পুরুষ তাহাদের সেই নিষ্ফল স্পর্দ্ধাকে প্রশ্রয় দিয়া চলিয়াছে মাত্র। যাহারা প্রকৃত নারী বা পুরুষ, তাঁহারা নীরবেই আছেন,—অর্থাৎ নারীর মত নারী যিনি, তিনি তাঁহার নিজের অবস্থাতেই সন্তুষ্ট এবং পুরুষের মত পুরুষ যিনি, তিনি ঐ অস্থৈর্য্যের স্পন্দনকে গ্রাহ্যই করেন না। কিন্তু একটু যদি ভাবিয়া দেখা যায়, তাহা হইলে বুঝিতে বিলম্ব হয় না, এই আন্দোলন নিতান্ত হেলা-ফেলার নয়,— ইহার মধ্যে এমন একটা অখণ্ড সত্য নিহিত আছে—যাহাকে অস্বীকার করিবার কোনও উপায়ই নাই।

পুরুষের প্রাণশক্তি, যাহা স্ত্রীজাতির উপর এত দিন প্রভুত্ব চালাইয়া আসিয়াছে, তাহার অধিকাংশ কোথা হইতে পাওয়া গিয়াছে? জগতের যে সকল মনীষাসম্পন্ন ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়া জাতি বা সমাজকে গরিমান্বিত করিয়াছেন, তাঁহাদের ইতিবৃত্ত খুঁজিলে জানা যায়,—তাঁহাদের অধিকাংশই গর্ভধারিণীর নিকট হইতে প্রতিভার অধিকারী হইয়াছেন। অবশ্য পিতা বা অন্যান্য সংসর্গ হইতে তাঁহারা কেহই যে লাভবান্ হয়েন নাই, এ কথা বলিতেছি না। ফলতঃ, জাতিকে স্ত্রীজাতিই প্রসব করিতেছে, বাঁচাইয়া রাখিতেছে। জাতির ধ্বংসের মূলেও ঐ স্ত্রীজাতি। সুতরাং সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের মূলীভূতা যে নারী,—তাঁহাকে সামান্য ভাবিয়া উপেক্ষা করা যে কিরূপ নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচায়ক, তাহা সহজেই অনুমেয়। স্বভাবকোমলা বলিয়া তাঁহাদিগকে অবলা সংজ্ঞা দিয়া যতই ছোট করিয়া দেখুন না কেন, বুঝিতে হইবে- সেই কোমলতার মধ্যেই কঠোরতার পূর্ণশক্তি বিদ্যমান রহিয়াছে। জল বা বাতাস স্নিগ্ধতার নিদান হইলেও, যখন তাহাদের যে কোনও একটি রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করে, তখন সমস্ত জগৎটা ওলোট্‌-পালোট্ হইয়া যায়,—স্ত্রীজাতির চাঞ্চল্যও যে ঠিক সেই ভাবেই অনর্থপাতের সৃষ্টি করিতে পারে এবং করেও, ইতিহাসে তাহার ভূরি ভূরি নজীর আছে।

কিন্তু আমাদের বলিবার উদ্দেশ্য নহে যে, নারী একটু মাথা উঁচু করিলেই তাঁহারা প্রলয়ঙ্করী হইয়া উঠিবেন এবং জগৎ রসাতলে যাইবে। আমরা বলিতে চাই, পুরুষের জাতীয় প্রাণশক্তি স্ত্রীজাতির নিকট হইতে ধার করা; সুতরাং তাঁহাকে ছোট করিয়া দেখা পুরুষের পক্ষে অকর্ত্তব্য। আমাদের এই জাতীয় উত্থানের দিনে স্ত্রীজাতিকে জড় করিয়া রাখিলে, কাঁচা ভিতের উপর পাকা ইমারতের মত তাহা দীর্ঘকালস্থায়ী হইবে না। দীর্ঘদাসত্বের ফলে আমরা যে এত ভীরুভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছি, প্রতি পুরুষোচিত কার্য্যে যে অশোভন সঙ্কোচ আমাদিগকে জগতের কাছে অপদার্থ বলিয়া প্রতিপন্ন করিতেছে, শুধু পররাষ্ট্রের প্রভাবই তাহার একমাত্র কারণ নহে। আমাদের এ বিমূঢ়তার অন্যতম কারণ স্ত্রীজাতির উপর অযথা অত্যাচার,—মাতৃজাতির উপর নির্ম্মম নির্য্যাতন। মাতৃজাতিকে আমরা আমাদের বিলাসের ক্রীড়নকে পরিণত করিয়াই আমরা বিলাসপ্রিয় হইয়াছি,—মাতৃজাতিকে আমরা স্বাবলম্বনের সুবিধা না দিয়া তাঁহাদের ব্যক্তিত্বকে পঙ্গু করিয়া আমরা আমাদের স্বাবলম্বন ও ব্যক্তিত্ব হারাইয়া ফেলিয়াছি। যত দিন না আমরা তাঁহাদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে মুক্তি দিব, তত দিন আমাদেরও নিষ্কৃতি নাই।

মোটামুটি এইটুকু বুঝিলেই যথেষ্ট হয়, রুগ্না মাতার স্তন্য পান করিয়া শিশু কখনও স্বাস্থ্যবান্ হইতে পারে না।

এ কথার উত্তরে অনেকে বলিতে পারেন বটে, স্ত্রী-জাতির প্রতি পুরুষের অযথা নির্য্যাতনের কথা মধ্যে মধ্যে শুনা গেলেও, প্রকৃতপক্ষে এখনকার পুরুষ স্ত্রীরই অধীন, অন্ততঃ মুখ্যভাগ স্ত্রৈণ বলিলেই চলে; তাহাই যদি সত্য হয়, তবে স্ত্রীলোকের ব্যক্তিত্বে পুরুষ এখন আর কোথায় লগুড়াঘাত করিতেছে? পুরুষ যতই নির্ব্বীর্য্য হইয়া পড়িতেছে—দাসত্বের একটানা স্রোতে যতই তাহারা গা ভাসাইয়া দিতেছে, জলৌকার মত নারী ত ততই তাহার গায়ে জড়াইয়া যাইতেছে, আর পুরুষ নিস্পন্দ নিঃসংজ্ঞ হইয়া, তাহার সে শোষণক্রিয়ার কোনও প্রতীকার করিতে সমর্থ হইতেছে না। এ যুগে অবলাই প্রবলা, পুরুষ নারীর হাতের পুতুল; এক কথায় পুরুষই বরং নারীর পদতলে তাহার ব্যক্তিত্ব—মনুষ্যত্ব সবই বিসর্জ্জন দিতেছে। "দেহি পদ-পল্লবমুদারম্ই" এ যুগের মূলমন্ত্র। সুতরাং নারীকে পুরুষ মুঠার মধ্যে রাখিয়া তাহার অন্তর্নিহিত শক্তিকে বিধ্বস্ত করিতেছে—ইহা কি ঠিক?

বিরুদ্ধপক্ষের এ প্রতিবাদ বাহ্যতঃ সঙ্গত বলিয়া বোধ হইতে পারে, যেহেতু, ইদানীং সাধারণের মধ্যে—'স্ত্রীর বাধ্য' বদনামের টীকা বারো আনা, চাই কি চৌদ্দ আনা পুরুষের কপালে অঙ্কিত হইয়া আছে; কিন্তু বাধ্যতা বলিতে যাহা বুঝায়, ইহা তাহা নহে। মোহমূলক বাধ্যতা, যাহা মানুষের নৈতিক শক্তিকে স্তম্ভিত করিয়া রাখে, তাহাতে বাধক বা বাধিতের গৌরবের কিছুই নাই। নেশার জন্য এবং ঔষধার্থ যে সুরাপান, এই দুইটি এক জিনিষ নহে, কারণ, একে শরীরের ধ্বংসসাধন করে, অন্যে শরীরকে নীরোগ ও পুষ্ট করে। নেশার জন্য শরীরের উপর মদের যে অধিকার, তাহা লুণ্ঠনব্যবসায়ী দস্যুর স্বেচ্ছাচার সূচিত করে;—অপরপক্ষে ঔষধের খাতিরে শরীরের উপর মদের যে অধিকার, তাহা প্রজাবৎসল বিজয়ী রাজার করুণায় বিজিত সাম্রাজ্যের সৌষ্ঠবসাধক হইয়া উঠে। ফলতঃ, প্রকৃত নারীত্ব যে সকল নারীর হৃদয়ে অধিষ্ঠিত বা জাগ্রদবস্থায় আছে, তাঁহারা কখনও সে ভাবের হীনতা-কলুষিত অধিকারে সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন না। কেন না, তাঁহাদের কাছে উহা অধিকার বলিয়া গণ্য নহে;—যে ইন্দ্রজালে বশীকরণ ঘটে, তাহা পাপ, তাহা স্ত্রীজাতির কলঙ্কই ঘোষণা করিবে।

স্ত্রী-পুরুষ পরস্পরের অর্দ্ধাঙ্গ,—ইহা প্রাচ্য-প্রতীচ্য সব জাতিই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। তাই ইংরাজীতে স্ত্রীর প্রিয় অভিধান "Better Half" সংজ্ঞাটিকে দেখিলে বোধ হয়, পাশ্চাত্য সভ্যতায় স্ত্রী-জাতির আসন পুরুষের উপরে অধিষ্ঠিত এবং সে জন্যই বুঝি তাঁহারা স্ত্রীকে পুরুষের দক্ষিণ ভাগে উপবিষ্ট হইবার অধিকার নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু আমাদের শাস্ত্র এবং লোকাচারমতে পুরুষের বামে স্ত্রীর অধিষ্ঠান। পুরাকালের মুনি-ঋষিরা বিশেষ অবহিত হইয়া দেখিয়াছিলেন,—স্ত্রীজাতির বামাঙ্গ অধিক ক্ষমতাশালী,—আর পুরুষের দক্ষিণাঙ্গ অধিক ক্ষমতাশালী; সেই জন্য স্ত্রীলোকের অপর নাম বামা। তাঁহারা যাঁহাকে "শক্তিভূতা সনাতনী" বলিয়া অর্চ্চনা করিয়াছেন, তাঁহার বামহস্তে খর্পর। পূর্ণব্রহ্ম রামচন্দ্র যে হরধনুর্ভঙ্গ করিয়া সীতাদেবীকে বিবাহ করিয়াছিলেন—মহাবীর দশানন সেই গুরুভার ধনু উত্তোলন করিবার জন্য ব্যর্থ চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু সীতাদেবী উহা বামহস্তে অনায়াসে সরাইয়া রাখিতেন। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া বোধ হয়, প্রাচ্য স্ত্রীকে পুরুষের বামে স্থাপিত করিয়া তাঁহাকে যোগ্য সম্মানেই সম্মানিত করিয়াছে। মোট কথা, অবস্থিতি বামেই হউক আর দক্ষিণেই হউক, প্রত্যেক জাতির বৈশিষ্ট্য আছে;—এমন জিনিষ অনেক আছে, যাহা পুরুষে আছে, নারীতে নাই; আবার নারীতে আছে ত পুরুষে নাই। সুতরাং সেই উভয় বৈশিষ্ট্যের সমন্বয় না হইলে কোনও সার্থকতা আসিতে পারে না,—যেমন শুধু দক্ষিণ বা বাম হস্তের কর্ম্মঠতায় কোনও গুরুকার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হওয়া এক প্রকার অসম্ভব।

মানুষ সুখ চাহে। সেই সুখের চরম স্ফূর্ত্তি তাহার স্বাধীনতা, সুতরাং স্বাধীনতা জিনিষটা প্রতি নরনারীর বড় কাঙ্ক্ষিত বস্তু। তাই দেখিতে পাই, পুরুষ নারীকে দাবাইয়া রাখিতে বদ্ধপরিকর—নারীও পুরুষকে বাগে আনিতে সদাই উন্মুখ। পুরুষ নারীকে কুক্ষিগত করিয়া ভোগ করিতে চাহে—নারীও পুরুষকে স্ববশে রাখিয়া ভোগপিপাসা চরিতার্থ করিতে চেষ্টিত; কিন্তু ভগবানের এমনই লীলা, কেহ কাহাকে ধরা দিতে না চাহিলেও, তিনি

এই দুই জনের মধ্যেই এমন কতকগুলি দুর্ব্বলতা দিয়াছেন যে, সেই স্থানে আঘাত লাগিলেই দুর্য্যোধনের উরুভঙ্গ অভিনয় হইয়া যায়! কি মজা! পুরুষ নারীকেই চাহে এবং নারীকে যত চাহে, পুরুষকে তত চাহে না। অন্যপক্ষে নারী পুরুষকেই চাহে এবং পুরুষকে যত চাহে,—নারীকে তত চাহে না! উভয়ে উভয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়াও পরস্পর পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট। তাই বুঝি দ্বন্দ্ব অর্থে কলহ—আবার প্রেমালাপও! শব্দস্রষ্টার বাহাদুরী বটে! যাহা হউক, এখন বুঝিতে পারা যাইতেছে, স্বাধীনতা কাম্য—স্ত্রী-পুরুষ উভয়েরই। আরও কথা, সেই স্বাধীনতার স্পৃহাও তাহারা ভগবানের নির্দ্দেশমতই পাইয়া থাকে। কেন না, সেটা তাহাদের জন্মগত সংস্কার। আমরা দেখিতে পাই, শিশু সম্পূর্ণ দুর্ব্বল অবস্থাতেও কখনও পরমুখাপেক্ষী হয় না;—তাহার অঙ্গসঞ্চালন, তাহার ক্রন্দন,—তাহার মল-মূত্রত্যাগ, হাসি, খেলা সমস্তই যেন তাহার স্বেচ্ছানুযায়ী; সে জন্য কখনও সে কাহারও প্রতীক্ষা রাখে না—রাখিতে জানে না। ক্রমে সেই শিশু যখন ধীরে ধীরে জীবনের পথে অগ্রসর হয়, ততই তাহার হাতে কড়ি, পায়ে বেড়ী পড়ে! সুতরাং যখন স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই তাহাদের স্বাধীনতার বৃত্তি সহ ভূমিষ্ঠ হয়—তখন এক যাত্রায় পৃথক্ ফল হইবে কেন?

কেহ হয় ত উত্তর দিবেন,—যেমন উত্তর এখন আমরা সরকার বাহাদুরের কাছ হইতে পাইতেছি যে, স্বাধীনতার দাবী শুধু সেই করিতে পারে,—যে নিজের পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইতে শিখিয়াছে। শিশু যত দিন হাঁটিতে অপটু থাকে, তত দিন তাহাকে পরের অঙ্ক আশ্রয় করিয়া থাকিতেই হইবে। কথাটা ঠিক হইলেও আর একটি কথা আছে;—শিশু যত দিন হাঁটিতে অপটু হয়, তত দিন যদি সে শুধু কোলে কোলেই বেড়ায়, অপরকে হাঁটিতে দেখিয়া যখন তাহার অন্তরস্থ হাঁটিবার সুপ্ত ইচ্ছা আকুল আগ্রহে জাগিয়া উঠে, তখন যদি তাহার উদ্যম ব্যর্থ হইবে জানিয়া আশঙ্কা করিয়া তাহাকে বুকে আঁকড়িয়া ধরিয়া রাখা হয়, বা কোনও খেলানা দিয়া ভুলাইয়া যদি তাহার এই আত্ম-নির্ভরতার বৃত্তি-মূলে কুঠারাঘাত করা হয়, তবে তাহার অনিবার্য্য পঙ্গুত্বর জন্য দায়ী কে? সেই উৎকট শিশুবাৎসল্য শত্রুতার নামান্তর নহে কি? আমরা চীনাদের মত কাঠের জুতা পরাইয়া খোঁড়া করিয়া তাহাদের সৌন্দর্য্যের তারিফ করিব—খাঁচার মধ্যে রাখিয়া চুমকুড়ি দিয়া নাচাইয়া বাহবা দিয়া তাহাদিগকে চরিতার্থ করিব—আমরা তাহাদিগের পুকুরে ছাড়িয়া দিয়া চারের লোভ দেখাইয়া গালে বঁড়শী বিঁধাইয়া মজা দেখিব, আর বলিব 'মাছটা খুব খেলছে।' এ কেমন সভ্যতা, ইহা অপেক্ষা নিষ্ঠুরতা,—বর্ব্বরতা আর কি হইতে পারে?

স্নেহের সঙ্গে স্বার্থের কোনও সম্বন্ধই নাই, ইহা একটা মিথ্যা কথা। একটু গোড়া হইতে খুলিয়া বলি।—একই ভালবাসার ফলে, একই রক্ত-বীর্য্যের সম্মিলনে ভূমিষ্ঠ হয়,—ছেলে কিংবা মেয়ে। কিন্তু সেই ভাবী সন্তানের মাতা ও পিতা উভয়েই একবাক্যে ভগবানের কাছে আকুল নিবেদন জানান, শুধু তাঁহারাই বা কেন, মাসী-পিসী হইতে আরম্ভ করিয়া পাড়াপ্রতিবেশী, এমন কি, অতিথি-ভিখারী পর্য্যন্ত কামনা করেন,—"আহা, মেয়ে না হয়ে যেন একটা ছেলে হয়।" এই আগ্রহ এতদূর স্পর্দ্ধাসূচক যে, যদি তাহার ক্ষমতা থাকিত ত সে ভগবানের উপর কলম চালাইতে একটুও ইতস্ততঃ করিত না! যথাকালে ছেলে বা মেয়ে হইল, অমনিই শঙ্খধ্বনি;—সবাই সেই শঙ্খ-নাদের অঙ্ক গণনা করিয়া বুঝিয়া লইল, নূতন অতিথিটি কে! মেয়ের অভিনন্দনে মাত্র সাত বার শাঁখ বাজিল? আর ছেলের বেলায় একুশ বার! যদি মেয়ে হইল ত বাপের বুক দমিয়া গেল, প্রসূতি নীরবে প্রসবযন্ত্রণা সহিতে লাগিলেন। প্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজন তখনও বলিতে লাগিলেন, 'আহা! তবু যদি ছেলেটা হ'ত!' আর যদি ছেলে হইল, অমনই বাপের বুক একেবারে দশ হাত,—মা প্রসব-ব্যথা ভুলিয়া গেলেন, অন্যান্য মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীরা হৈ হৈ করিয়া উঠিলেন, "আহা, বেশ হয়েছে, বেঁচে থাক্!' অর্থাৎ মেয়ে হ'লে তার মরণই ভাল ছিল। জন্ম হইতে এই যে পার্থক্যের সূচনা, ছেলে ও মেয়ের বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহার পরিমাণও বাড়িতে লাগিল। ছেলে যাহা করে, তাহাই শোভন, যেহেতু, সে ছেলে; মেয়ের একটুতেই এতটা, যেহেতু, সে মেয়ে,—'মেয়ে—মেয়ে—মেয়ে তুস কর্‌লে খেয়ে!'

অনেকেই এ কথার উত্তরে বলিবেন, 'সব বাপ মা ত আর কিছু মেয়েকে তুচ্ছ-তাচ্ছীল্য করেন না, গরীবের মেয়েদেরই ঐ দুর্গতি—বড়লোকের নয়। গরীবের গাঁট,

গড়ের মাঠ ;—গাঁটের কড়ি দিয়ে কন্যাকে বিক্রী করতে হয় ব'লে মেয়ের বাপের গায়ে জ্বালা চড়ে, তাই মেয়েকে ঐরূপ নেক-নজরে দেখে।' আমরা বলিতে চাই, দেশে ধনী কয় জন, আর মধ্যবিত্ত, গরীবই বা কয় জন? এই যে বরপণ ভদ্রকুলকে পিষিয়া মারিতেছে, কত শান্তির সংসারকে অশান্তির আগুনে পুড়াইয়া মারিতেছে—এই যে নির্ম্মম নির্য্যাতনে বিধ্বস্ত হইতেছে বাঙ্গালার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ একটা সমাজ, এই নিষ্পেষণ—এই দাহন,—এই নির্য্যাতন ভোগ করিতেছে, ধনী বেশী, না দরিদ্র বেশী? দরিদ্রই যদি বেশী হয়, তবে তাঁহাদের আক্কেল হয় না কেন? হেতু তাহার কিছুই নয়,—আমরা পুরুষের পক্ষপাতী, তাই; আমরা মাতৃজাতির প্রতি সম্মান হারাইয়াছি, তাই; আমরা ঘৃণিত, অধঃপতিত জাতি, তাই। এই বরপণ প্রথায় ত গবর্ণমেণ্টের কোনও হাত নাই, এই বরপণ প্রথায় ত ধর্ম্মের কোনও অনুশাসন নাই—এই দান-ব্যবসায়ে ও সমাজে এক-ঘরে হইবার কোনও কড়াকড়ি নাই, তবে কেন এ কাল কু-প্রথার নেশায় আমরা দিশাহারা হইয়া আছি?

তাহার পর পিতাকে ঋণগ্রস্ত করিয়া, হয় ত বা উদ্বাস্ত করিয়া কন্যা বধূরূপে স্বামীর ঘর করিতে আসিলেন। বাপের বাড়ীতে যে স্বাধীনতাটুকু ছিল,—শাশুড়ী-ননদের কচ্‌কচানিতে, হয় ত গুণবন্ত স্বামীর দপদপানিতে অবরোধের আদব-কায়দায় তাহাও প্রায় শেষ হইয়া আসিল। অবশেষে "যাও ছিল রয়ে ব'সে, তাও নিল বর্গী এসে", পুত্র যদি ধনুর্দ্ধর হয়েন, তাঁহার মাতৃ-ভক্তির পরাকাষ্ঠায় আত্মারাম খাঁচাছাড়া হইয়া পলায়ন করিল! এই ত আমাদের নারীর প্রতি প্রীতি! সুতরাং আমরা যে নারীর প্রতি বিশ্বাস হারাইব, তাহাতে আর বৈচিত্র্য কি?

কিন্তু আমাদের ভাবিয়া দেখা খুবই উচিত যে, দীর্ঘ দাসত্বের পর আজ আমরা যেমন আত্মোন্নতির জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছি এবং এই ব্যাকুলতা যেমন শুভসূচক,—নারীজাতির মধ্যেও ঠিক সেইরূপই একটা আগ্রহের স্পন্দন সঞ্জাত হইয়াছে। তাহাতে মঙ্গল ভিন্ন অমঙ্গল হইতে পারে না। আমাদের উত্থানে ইংরাজের ক্ষতি হইবে, এইরূপ কেহ কেহ বলিয়া থাকেন এবং সেই জন্যই তাঁহারা না কি আমাদের চাপিয়া রাখিতে চেষ্টা করিতেছেন। সত্য কি মিথ্যা বলিতে পারি না, তবে এইটুকু আমাদের ধ্রুব বিশ্বাস, ইংরাজের আমলে যদি আমাদের উত্থান ঘটিয়াই যায় ত তাহাতে আমাদের গৌরব অপেক্ষা ইংরাজের গৌরবই বরং বেশী হইবে। সে যাহা হউক, নারীজাতির উত্থানে যে আমাদের কোনও ক্ষতি হইবে না, অধিকন্তু আমরা যে একটা সম্পূর্ণ জাতি হইয়া উঠিতে পারিব, সেটা খুব সত্য কথা। সুতরাং তাহাদের সেই জাগরণে আমাদের কর্ত্তব্য—তাহাদের চাপিয়া রাখা নহে, বরং তাহাদিগকে উৎসাহিত করিয়া সুষ্ঠু পথে পরিচালিত করা;—তাহারা দাঁড়াইতে চাহিতেছে, তাহারা যাহাতে আছাড় না খায়—সে দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা। দীর্ঘকাল অন্ধকারে অবস্থিতির পর সহসা আলোকে আসিয়া পড়িলে একটু ধাঁধাঁ লাগিয়া থাকে,—কিন্তু তাহার প্রতিষেধক, পুনরায় অন্ধকারের দিকে টানিয়া লইয়া যাওয়ার পরিবর্ত্তে তাহাকে সেই আলোকেই খানিকক্ষণ দাঁড় করাইয়া তাহার সে ধাঁধাঁকে ঘুচাইয়া দেওয়া। প্রতি পুরুষেরই সেজন্য চেষ্টিত হওয়া প্রকৃত পুরুষত্ব।

জাতিকে তুলিতে হইলে যথার্থ নারী চাই,—যে নারী বীরপুত্রের প্রসবিনী, বীর ভ্রাতার ভগিনী, বীর স্বামীর সহধর্ম্মিণী। আমরা রাস্তায়, হাটে, মাঠে হৈ-চৈ করিয়া বিশেষ কোন কাম করিতে পারিব না;—যত দিন না আমাদের অন্তঃপুরচারিণীগণের কণ্ঠে প্রেরণার বোধন বাদ্য বাজিয়া উঠিবে। আমাদের প্রতি অনুষ্ঠানে যত দিন না কল্যাণী নারীর মঙ্গল হস্ত নিয়োজিত হইতেছে, তত দিন আমাদের সার্থকতালাভ সুদূরপরাহত। যেমন দুইটি বিপরীতধর্ম্মী শক্তির সাহচর্য্যে বিদ্যুজ্জ্বালা বিকশিত হয়,—সেইরূপ আমাদের স্ত্রীপুরুষের সমবায়ে আমাদের আত্মপ্রতিষ্ঠার দীপ্তালোক প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠিবে,—ক্ষণপ্রভা নহে, স্থির শান্ত চিরভাস্বর প্রতিভায়। সুতরাং আমাদের ক্ষুব্ধ হইলে চলিবে না, আমাদের উৎকর্ষের সহিত আমাদের নারীজাতির উৎকর্ষসাধন করিতে হইবে এবং আমাদের উত্থানের বন্ধুর পথে ছুটিয়া চলিয়া যাইতে হইবে,—নারীর হাত ধরিয়া। নারীকে টানিয়া হিঁচড়াইয়া লইয়া গেলে চলিবে না, তাহাকে সমবেগে ছুটিবার সামর্থ্য দিতে হইবে।

আত্মগর্ব্বী আমরা,—প্রভুত্বকামী স্বার্থান্ধ আমরা,—আমরাই নারীকে অবলা অভিধান দিয়াছি। ফলতঃ নারী অবলা নয়। এক ধৈর্য্যের ঐশ্বর্য্যে নারী যে কতটা

শক্তিশালিনী, দৈনন্দিন জীবনযাত্রার মধ্যে আমরা তাহা প্রতিনিয়ত প্রত্যক্ষ করিতেছি। নারীর সহিষ্ণুতা পুরুষে নাই, নারী জননী; জনক-জননীতে পাতাল আর আকাশ পার্থক্য। নারীকে উপলক্ষ করিয়া সমাজ, নারীর জন্যই সাম্রাজ্য; সুতরাং যাহা লইয়া সংসার, স্বরাজ বা স্বাধীনতার এত আয়োজন, তাহাকে ঔদাস্তের আবর্জ্জনার মধ্যে ঠেলিয়া রাখিলে চলিবে কেন?

অতএব এস নারী,—শত ভ্রূকুটিকে উপেক্ষা করিয়া শত তাচ্ছীল্যকে উপহাস করিয়া, শত সংকীর্ণতার স্তূপ লীলায় এক প্রান্তে সরাইয়া দিয়া উঠিয়া এস। সতী-সাবিত্রী সীতা-দময়ন্তীর অংশরূপিণী তোমরা, সেই প্রাতঃ-স্মরণীয়া মহীয়সীগণের পতিপ্রাণতা লইয়া এই বিমূঢ় ভারতের অঙ্গনে আবার আসিয়া দাঁড়াও। জনা· সুভদ্রার ন্যায় বীরমাতা হইয়া, গার্গী-লীলাবতীর ন্যায় ধীশক্তিশালিনী হইয়া, ভবানী-শরৎসুন্দরীর ন্যায় পুণ্যানুষ্ঠানপরায়ণা হইয়া কর্ম্মদেবী দুর্গাবতীর ন্যায় দেশাত্মবোধ-সম্পন্না হইয়া প্রতি শুদ্ধান্তে বিচরণ কর। সেই মহিমময়ী মূর্ত্তির সম্মুখে সহস্র বাধা মূহ্যমান হইয়া পড়িবে, যেহেতু, দৈত্যদলনী শক্তির অধিকারিণী তোমরাই।

কিন্তু পুনঃ পুনঃ বলি,—প্রাচ্যের উন্নতিকল্পে প্রতীচ্যের আদর্শকে শ্রেষ্ঠ আসন দিলে চলিবে না। ভারতের মাতা, ভারতের পত্নী, ভারতের ভগিনী, ভারতের কন্যাকে আদর্শের প্রথম স্থানে বসাইয়া তাহার পরে পাশ্চাত্যের আদর্শকে বরণ করিয়া লইলে ক্ষতি নাই। মোট কথা, আমরা Joon De Arc চাই না, সে আমাদের ধাতে সহিবে না, তোমাদেরও না। তোমরা হিন্দুনারী, ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের মানসপ্রতিমা, তোমাদের বিকাশ সেইভাবেই শোভন। সমগ্র ভারতের বক্ষঃ দিয়া কি প্লাবনটাই না ছুটিয়া চলিয়াছে। সত্য কথা বলিতে কি, এত বিপ্লবের মধ্যেও নারী শুধু এখনও হিন্দুর নিষ্ঠাকে যাহা কিছু বজায় রাখিয়াছে, স্বেচ্ছাচার—ম্লেচ্ছাচারের মধ্যে, বৈঠকখানায় বা ড্রয়িংরুমে, কাঁটা-চামচের ঠুন্‌ঠুননির ভিতরেও, অন্দরে মাঝে মাঝে নারীর ফুৎকারেই শঙ্খধ্বনি উত্থিত হইতেছে; য়ুরোপীয়ের পাশ্চাত্য রুচির তুষ্টিসাধনের জন্য আমাদের নারীর পুণ্যাঙ্গে বিবিয়ানীর বিলাস-বাস শোভিত হইলেও এখনও স্থানে স্থানে হাতের লোহা ও সীঁথির সিঁদুর তোমাদের সাধ্বী সীমন্তিনী নামের সার্থকতা সম্পাদন করিতেছে। ব্রত-উপবাস, পূজা-পার্ব্বণ পণ্ডশ্রম ও বাজে ব্যয়ের সামিল হইলেও এখনও হিন্দু নারী সে সংস্কারকে সম্যক্‌রূপে ত্যাগ করিতে পারে নাই। তাই সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ, হিন্দু নারী,—হিন্দুনারী হইয়াই জাগিয়া উঠ। ক্ষীণধার হইলেও তোমাদেরই বক্ষোনিঃসৃত পীযূষ পান করিয়া এখনও তোমাদের সন্তানগণ নিদ্রিত অবসন্ন হইলেও জীবিত, সে অমিয়ধারা হইতে বঞ্চিত করিয়া কৃত্রিম স্তন্যে সন্তানের কৃশতা—মৃত্যু— সর্ব্বনাশ আনয়ন করিও না।

আর পুরুষ—একবার কৌলীন্যের মোহে অন্ধ হইয়া নারীকে কি নাকালই না করিয়াছ! বোধ হয়, সেই পাপে তাহার উত্থানের দিন এত পিছাইয়া পড়িয়াছে। আবার অর্থ-কৌলীন্যের প্রচলনে অনর্থকে প্রশ্রয় দিয়া নারীকে কাঁদাইতেছ, বিপথগামিনী করিতেছ, আত্মহত্যার পথে ঠেলিয়া দিতেছ। কেহ বা তাহাকে বিলাস-সঙ্গিনী করিতেছে, কেহ বা দাসীরও অধম করিয়া পদদলিত করিতেছে। ইহা কখনই সমর্থনযোগ্য নহে। ঐ যে পূর্ব্বাকাশে ঈষৎ অরুণচ্ছটা দেখা যাইতেছে, আবার হয় ত নিবিয়া যাইবে, মেঘে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিবে, এখনও সাবধান হও, পুরুষ! কুরুচি, কুপ্রথা, কুসংস্কার, কু-আদর্শরূপ কুগ্রহ হইতে মুক্তিলাভের জন্য এখনও শান্তি-স্বস্ত্যয়ন কর, প্রায়শ্চিত্ত কর, সংযত হও। স্থির জানিও, জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ নারী। যে জাতির মধ্যে যত বেশী আদর্শ নারী জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সে জাতি তত সম্পন্ন, তত পূর্ণ, তত ধন্য। সে নারীর অপমান শুভ নয়।

নারী বাল্যে সদ্যস্ফুট কুসুমকিঞ্জল্ক, তরল হাস্যময়ী, ক্রীড়ারতা গৌরী; কৌমার্য্যে দ্বাদশী-কৌমুদীময়ী, চাপল্য-ক্ষান্তা ব্রীড়ানম্রা উমা-প্রতিমা;—যৌবনে উচ্ছলজল-কল্লোলময়ী, অলকানন্দার ন্যায় পূর্ণাঙ্গী ষোড়শী ভুবনেশ্বরী; প্রৌঢ়ে স্নেহকরুণার পূতনির্ঝরিণী, বিশ্বপালিনী গণেশ-জননী এবং বার্দ্ধক্যে লোলচর্ম্মাবশেষা, পূর্ণতার সীমান্ত-দেশাতিক্রান্তা, বেদব্যাস-চিত্তবিভ্রমকারিণী জরতী ভীমা ধূমাবতী, সংক্ষেপতঃ এই নারীর স্বরূপ। যে দিন নারীতে এই রূপের খেলা নিরীক্ষণ করিবার সৌভাগ্য আবার আমাদের ফিরিয়া আসিবে, সেই দিন আমাদের সুদিনও আবার আসিবে, নচেৎ নহে, এটা খুব ঠিক কথা!

শ্রীযতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

রূপের মোহ

একাদশ পরিচ্ছেদ

চাঁদ সন্ধ্যার আকাশে হাসিতেছিল—সমুদ্রবক্ষে লক্ষ খণ্ডে বিভক্ত হইয়া তরঙ্গে তরঙ্গে সৈকতে ঝাঁপাইয়া পড়িতেছিল। ভৈরব গর্জ্জনে, উন্মদ উচ্ছ্বাসে তরঙ্গ ছুটিয়া আসিতেছিল। কোথা হইতে আসিতেছে, তাহা দেখা যায় না, বুঝা যায় না; মনে হয়, যেন অনন্ত রহস্যগর্ভ হইতে উত্থিত হইয়া, শীর্ষদেশে জ্যোৎস্নার মুকুট পরিয়া, তাহারা অট্টরোলে ছুটিয়া আসিতেছে। দৃষ্টি অধিক দূর অগ্রসর হয় না; নভোরেণুর স্বচ্ছ যবনিকা ক্রমশঃ গাঢ় হইয়া সমুদ্রকে যেন ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। বাতাস হু হু করিয়া অবিশ্রান্ত বহিয়া চলিয়াছে। কোন্ অজ্ঞাত রাজ্যের বার্ত্তা সে বহিয়া আনিতেছে?

রমেন্দ্রের মনে পড়িল, আজ সপ্তমী-পূজার রাত্রি। আজ বাঙ্গালার ঘরে ঘরে শারদ-লক্ষ্মীর শুভ আরতির শঙ্খঘণ্টা বাজিতেছে। মানসনেত্রে সে দেখিতে পাইল, গৃহপ্রাঙ্গণে দলে দলে গ্রাম্য বালক-বালিকা, নর-নারী মহামায়ার অর্চ্চনা দেখিতে আসিয়াছে। শুধু সে একাই আজ সে আনন্দ-উৎসব হইতে বহু দূরে আপনাকে নির্ব্বাসিত রাখিয়াছে! কিন্তু কেন?

বাতাস ও সমুদ্রগর্জ্জনে একটা উদাস গাম্ভীর্য্য ছিল। রমেন্দ্রের কবি-হৃদয় যেন সমুদ্রের অসীমতা অনুভব করিয়া শ্রান্ত হইয়া উঠিতেছিল—হৃদয়ের কোনও প্রান্তে শান্তির রেখামাত্রও যেন নাই! সন্ধ্যার পূর্ব্বেই সে একা সমুদ্র-কূলে আসিয়া বসিয়াছে। সরযূ, সুরেশ অথবা অমিয়া কেহই তখনও আসে নাই। অশান্ত মন লইয়া সে একাই অনন্তের কূলে ছুটিয়া আসিয়াছে। সৈকত-তটে দলে দলে বালক-বালিকা উৎসাহে ছুটাছুটি করিতেছে, নর-নারী ইতস্ততঃ বেড়াইতেছে। কোথাও বা দুই চারি জন একত্র বসিয়া আছে।

অপেক্ষাকৃত জনহীন প্রদেশে ম্লান চন্দ্রালোক-দীপ্ত তটভূমিতে বসিয়া রমেন্দ্র আত্মবিস্মৃতভাবে কি চিন্তা করিতেছিল?

সহসা সে চমকিয়া উঠিল। পৃষ্ঠদেশে কাহার অঙ্গুলি-স্পর্শের সঙ্গে সঙ্গে শুনিল, "এই যে রমেন, একা ব'সে কি ভাব্‌ছ?"

রমেন্দ্র ফিরিয়া সুরেশচন্দ্রকে দেখিতে পাইল—অদূরে সরযূ ও অমিয়া।

রমেন্দ্র তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল।

"কি রমেন বাবু, একাই চাঁদের আলোমাখা সাগরের শোভা দেখ্‌ছেন? একবার আমাদের ডাক্‌তেও নেই?"

সরযূর প্রশ্নে রমেন্দ্র যেন ঈষৎ লজ্জা অনুভব করিল। সে বলিল, "আপনারা কাযে ব্যস্ত ছিলেন, তাই একাই চ'লে এলাম। আজ সপ্তমী-পূজা না?"

সরযূ হাসিয়া বলিল, "আজ বাঙ্গালায় কি উৎসব! কিন্তু কই, এখানে ত বিশেষ সাড়া-শব্দ পাওয়া যায় না। তবে শুনেছি, মন্দিরের কাছে না কি অনেক পুতুল সাজিয়ে পূজো হবে।"

সুরেশচন্দ্র চুপ করিয়া কি ভাবিতেছিলেন। তিনি বলিয়া উঠিলেন, "শারদ-লক্ষ্মীর এই পূজা চমৎকার, আমার বড় ভাল লাগে। এই পূজার প্রচার যাঁরা করেছিলেন, প্রকৃতির সমস্ত তত্ত্বটা কি অভ্রান্তরূপেই না তাঁরা

বুঝেছিলেন ! শক্তির উদ্বোধনের প্রয়োজন হিন্দু-জাতি বুঝেছিল, তাই তারা এই রকমে মহাশক্তিকে গ'ড়ে পূজা করবার পদ্ধতি রেখে গেছে।"

অমিয়া এতক্ষণ পার্শ্বে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। সে ডাকিল, "দাদা!"

সুরেশচন্দ্র ভাবমগ্ন দৃষ্টি ফিরাইয়া বলিলেন, "অমি, তুই বুঝি আশ্চর্য্য হয়ে গেছিস্? হ্যাঁ, যত দিন ভারতবর্ষে ছিলাম, তত দিন কিছুই বুঝি নি। কিন্তু শক্তির লীলাভূমি বিলাতে যাবার পর এই অপূর্ব্ব তত্ত্বের আস্বাদ পেয়েছিলাম; তাও শুধু কল্পনায়! দেখ্ বোন্, গণ্ডী টেনে তার মধ্যে ব'সে থাক্‌লে জ্ঞান কোন দিন তার বিশাল রাজ্যে আমাদিগকে প্রবেশের অধিকার দেবে না। হিন্দু জাতটা কত বড় উদার ছিল, বিলাতের সংস্রবে আস্‌বার পরই তা বুঝ্‌তে শিখেছি।"

পরিহাসভরে সরযূ বলিল, "কিন্তু সুরেশ বাবু, আপনার এই মত শুনে আমাদের সমাজের লোকরা আপনাকে শ্রদ্ধার পুষ্পাঞ্জলি দেবে না। আপনি আমাদের প্রচলিত ধর্ম্মবিশ্বাসের বিরোধী মত প্রচার কর্‌ছেন।"

সুরেশচন্দ্র মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "লোকমত মেনে কোন দিন চল্‌তে শিখিনি। ভবিষ্যতেও নিজের উপলব্ধ বিশ্বাসের বিনিময়ে কোনও তথাকথিত সমাজ বন্ধনে নিজেকে ধরা দিতেও পারব না।"

রমেন্দ্র এ আলোচনায় তেমন মন দিতে পারে নাই। সে পুরোবর্ত্তিনী অমিয়ার দিকে মাঝে মাঝে চাহিয়া তাহার দেহের সৌন্দর্য্যের বিকাশ দেখিতেছিল। মৃদু জ্যোৎস্নালোক অমিয়ার পরিহিত বাসন্তী রঙ্গের বসনের উপর পড়িয়া ঝক্ ঝক্ করিতেছিল। রূপ-জ্যোৎস্নায় আকাশ-জ্যোৎস্নার তরঙ্গ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠায় অমিয়াকে এমনই বিচিত্র, অপূর্ব্ব বোধ হইতেছিল যে, রমেন্দ্র তাহার মুগ্ধ দৃষ্টি সহসা ফিরাইয়া লইতে পারিল না।

কিন্তু অমিয়া রমেন্দ্রের দিকে চাহিবামাত্র সে দৃষ্টি ফিরাইয়া লইল। অজ্ঞাতসারে একটা দীর্ঘশ্বাস অনন্ত বায়ু-প্রবাহে মিলাইয়া গেল। অমিয়া বলিল, "কবিতার উপাদান খুঁজছেন না কি, রমেন বাবু? সমুদ্রে চাঁদের ঝিকিমিকি নিয়ে একটা কবিতা লিখুন না?"

রমেন্দ্র মৃদুহাস্তে বলিল, "কথাটা মিথ্যে নয়। তবে অনন্ত সৌন্দর্য্যের কূলে ব'সে যদি সে সৌন্দর্য্যের উপলব্ধি না ঘটে, তবে তার মত দুঃখ আর নেই।"

সুরেশচন্দ্র রমেন্দ্রের পার্শ্বে বসিয়া পড়িলেন।

"বাস্তবিক এখন শুধু ব'সে ব'সে ভাব্‌তেই ভাল লাগে। অমিয়া, তোমরা ঐখানে ব সে পড়। আজকার রাতটা বড় চমৎকার, না রমেন?"

রমেন্দ্র বলিল, "নিশ্চয়ই। প্রকৃতির এমন রূপ কখনও দেখিনি। সমুদ্রে চন্দ্রোদয় যে না দেখেছে, সে কখনও এ সৌন্দর্য্যের কল্পনাও কর্‌তে পারবে না।"

অমিয়া ও সরযূ নিকটেই বসিয়া পড়িল। কয়েক মুহূর্ত্ত কেহ কথা কহিল না, নীরবে সেই বিচিত্র সৌন্দর্য্যাধার সমুদ্রের দিকে চাহিয়া রহিল। রমেন্দ্র একবার চকিতে অমিয়ার দিকে চাহিল। তাহার মনে হইল, অমিয়ার মুখে এমনই একটা বিষণ্ণ অথচ মধুর শ্রী ফুটিয়া উঠিয়াছে, যাহা সে পূর্ব্বে কখনও দেখে নাই। মৃদু জ্যোৎস্নালোকে সুস্পষ্ট দেখা যায় না—একটু যেন ছায়াচ্ছন্ন, অস্পষ্ট! রমেন্দ্র কি বুঝিল, সেই জানে; কিন্তু তাহার চিত্ত যে চন্দ্রালোক-সমুজ্জ্বল সমুদ্রেরই মত উদ্বেল, তরঙ্গমালী হইয়া উঠিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

সহসা সরযূ বলিয়া উঠিল, "মানুষের মনটা কি সমুদ্রেরই মত? রমেন বাবু, আপনি ত কবি, মানুষের মনের অনেক তত্ত্ব আলোচনা ক'রে থাকেন, এ বিষয়ে আপনার মত কি?"

"এ বিষয়ে মতবিরোধ বোধ হয় কা'রও হবে না। হ্যাঁ, সমুদ্রেরই মত, অতলস্পর্শ, অনন্ত—কখনও বিক্ষুব্ধ, ভীষণ, সংহারশক্তিসম্পন্ন; আবার কোন সময়ে স্থির, ধীর, সৌম্য—প্রশান্ত।"

উৎসাহিতা হইয়া সরযূ বলিয়া উঠিল, "সমুদ্রগর্ভে শুক্তি, শঙ্খ, মুক্তা পাওয়া যায়, সেটাও বলুন। তা ছাড়া হাঙ্গর, কুমীর প্রভৃতিও আছে। মানুষের মনও ঠিক এই রকম, কেমন, না রমেন বাবু?"

"বাস্তবিক!" বলিয়াই রমেন্দ্র চুপ করিল। উপমাটা বোধ হয় তাহার মনে লাগিয়াছিল।

অমিয়া এতক্ষণ একটিও কথা বলে নাই। সে চুপ-চাপ বসিয়া বসিয়া সমুদ্রের দিকে চাহিয়া কি যেন ভাবিতে-ছিল। চন্দ্রকিরণোচ্ছ্বসিত সমুদ্র-তরঙ্গে যে সুর, তাল ও

লয় ছিল, তাহার হৃদয়ের ভাবরাশির সঙ্গে সে কি তাহার ঐক্যের পরিমাপ করিতেছিল? তরঙ্গ কোন্ রহস্য-গর্ভ হইতে উঠিয়া প্রবল উচ্ছ্বাসে ছুটিয়া আসিতেছে, সৈকতে আহত হইয়া লক্ষ খণ্ডে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, সমুদ্র-গর্ভে পুনরায় মিলাইয়া যাইতেছে। ইহা ঠিক তাল ও সঙ্গতি রক্ষা করিয়াই হইতেছিল; অমিয়া কি তাহাই দেখিতেছিল?

অদূরে—রমেন্দ্রের দক্ষিণপার্শ্বেই অমিয়া বসিয়াছিল। অমিয়ার এমন স্তব্ধভাব রমেন্দ্র কখনও দেখে নাই। মুখের ঈষৎ চিন্তাক্লিষ্ট ভাবটি তাহার সৌন্দর্য্যকে আরও লোভনীয় করিয়া তুলিতেছে বলিয়া যেন রমেন্দ্রের বোধ হইতে লাগিল। সে বলিল, "তুমি যে আজ একটা কথাও বল্‌ছ না, অমিয়া?"

এই কয় দিনে অমিয়ার পুনঃ পুনঃ প্রতিবাদে রমেন্দ্র তাহাকে আপনি বলা ত্যাগ করিয়াছিল। চারি বৎসর পূর্ব্বে সে যেমন সহজভাবে অমিয়ার সহিত নানা আলোচনায় যোগ দিত, চেষ্টা করিয়া সেই অবস্থাটা ফিরাইয়া আনিবার আগ্রহ তাহার ছিল। কিন্তু ঠিক সেই অবস্থায় ফিরিয়া যাওয়া যে কিরূপ কঠিন কার্য্য, তাহা সে প্রতি পদেই বোধ করিতেছিল।

নিদ্রোত্থিতার ন্যায় অমিয়া বলিল, "এখানে এলে কথা আপনিই থেমে যায়। অনন্তবার্ত্তার ধ্বনি কান পেতে থাকলে প্রতি মুহূর্ত্তে যেখানে শোনা যায়, সেখানে কথা বল্‌তে ইচ্ছে হয় কি?"

রমেন্দ্র ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "বড় ঠিক কথা। সমুদ্রের ধারে এলে মনে হয়, অনন্তের সঙ্গে দেহের ভিতরকার মনটির কোন ব্যবধান নেই! তখন খালি ইচ্ছে করে, জলের সঙ্গে দেহটা মিশিয়ে দিই!"

সরযূ হাসিয়া বলিল, "কথাটা কবির মত হলেও এমন মনের ভাবটা বড় আশাজনক নয়, রমেন বাবু! সমুদ্র-তীরে এলে যদি আত্মহত্যা বা সংসারত্যাগের কল্পনা প্রবল হয়ে ওঠে, তবে শীঘ্র চলুন—স্থানত্যাগেন দুর্জ্জনঃ।"

পরিহাস-রসিকা সরযূর কথায় তিন জনই প্রাণ ভরিয়া হাসিয়া উঠিল। রমেন্দ্র বলিল, "আপনার মত সহজ, সরল, উচ্ছ্বাসভরা প্রাণটা যদি আমার হ'ত, মিস্ মিত্র!"

অমিয়া বলিল, "সে কথা মিথ্যা নয়, ভাই। তোমার মনে গভীর একটা চিন্তার ছাপ কখনও দেখলাম না। সবই যেন তোমার কাছে মধুর, সুন্দর, চমৎকার!"

সুরেশচন্দ্র বলিলেন, "রাত্রি অনেক দূর অগ্রসর হয়েছে, এখন মিস্ মিত্রের পরামর্শটা গ্রহণ করাই উচিত। চল রমেন, বাসায় যাওয়া যাক্। আবার নিশীথ রাতে তোমার কবিতা সুন্দরীর ধ্যান আছে!"

সকলেই উঠিয়া দাঁড়াইল। চলিতে চলিতে মন্থর-গামিনী অমিয়ার লীলায়িত দেহভঙ্গীর সৌন্দর্য্য দেখিয়া রমেন্দ্র আবার দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিল কি?

* * * *

প্রভাতে উঠিয়াই অমিয়া সুনীলচন্দ্রকে পত্র লিখিতে বসিল। সুনীলচন্দ্র লিখিয়াছিলেন, তাঁহার কায শেষ হয় নাই। যদি শেষ করিতে পারেন, তবে তিনি আসিয়া তাহাদের আনন্দের অংশ গ্রহণ করিবেন। অমিয়া স্বামীর এই শেষ পত্রের উত্তর লিখিতেছিল।

পত্রমধ্যে সে কখনও গভীর আবেগ প্রকাশ করিত না। কিন্তু আজ প্রভাতে উঠিয়া সমগ্র অন্তরের মধ্যে সে এমনই একটা ভাবের প্রবাহ অনুভব করিতেছিল যে, তাহাকে রোধ করিয়া রাখা যায় না। এমন অনুভূতি পূর্ব্বে তাহার কখনও হয় নাই। যেন হৃদয়ের তটমূলে অশান্ত ভাবের ঢেউগুলি আছাড় খাইয়া পড়িতেছে, আর তটভূমি যেন সে আঘাতে শিহরিয়া উঠিতেছে। এইরূপ অনুভূতির ফলে তাহার চিত্ত যেন সুনীলচন্দ্রের সান্নিধ্য ও আশ্রয়লাভের জন্য আরও ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল।

দীর্ঘ পত্রের শেষভাগে সে লিখিল, "ওগো, তুমি এস। তোমার অভাব আজ আমাকে যেন চারিদিক হইতে পীড়া দিতেছে! তুমি না আসিলে আমি শান্ত হইতে পারিতেছি না। মনের মধ্যে খালি কান্না পাইতেছে, কেন, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। কত দিনে তোমার বই শেষ হইবে? আর কত দিন তুমি শুষ্ক, নীরস বিজ্ঞানের বহি ও খাতার অন্তরালে নিজেকে নির্ব্বাসিত রাখিবে? তুমি শীঘ্র এস, তোমাকে দেখিবার জন্য প্রাণ অস্থির হইয়াছে।"

এমনই অনেক কথা লিখিয়া সে চিঠি ডাকে দিল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

বৈকালিক চা-পান ও জলযোগের পর ঘরের দরজা ভেজাইয়া দিয়া অমিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল। অকস্মাৎ তাহার মাথা ধরিয়া ভয়ানক যন্ত্রণা হইতেছিল। শয্যায় শুইয়া চোখ বুজিয়া, সে চুপচাপ পড়িয়া থাকিবার চেষ্টা করিল।

কিছুক্ষণ পরে দরজা ঠেলিয়া সরযূ ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ডাকিল, "বৌদি!"

ঈষৎ ক্লিষ্ট স্বরে অমিয়া বলিল, "কি?"

"তুমি অবেলায় এমন ক'রে শুয়ে আছ যে, অসুখ করেছে না কি?"

পাশ ফিরিয়া সরযূর দিকে চাহিয়া অমিয়া বলিল, "হঠাৎ বড় মাথা ধরেছে; বসতে পর্য্যন্ত কষ্ট হচ্ছে, ভাই।"

ধীর গতিতে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া সরযূ অমিয়ার ললাটে স্নিগ্ধ ও কোমল করপল্লব রক্ষা করিল। অমিয়াও আরামসূচক শব্দ প্রকাশ করিল।

তখন অপরাহ্ণ ঘনাইয়া আসিয়াছে। সরযূ পশ্চিমের রুদ্ধ জানালা খুলিয়া দিতেই শীকরসিক্ত পবনপ্রবাহ ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল।

সরযূর সদাপ্রসন্ন মুখখানিতে আশঙ্কা ও উদ্বেগের একটা ম্লান রেখা যেন দেখা দিল। সে বলিল, "তাই ত, বৌদি, তোমার আবার অসুখ হ'ল কেন?"

ননন্দার উদ্বেগ দর্শনে অমিয়ার মুখে মৃদু হাস্য উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে বলিল, "এর জন্য ভাবছ কেন, ভাই? দুপুরবেলা কাঁচা ঘুম ভাঙ্গাতেই মাথাটা খুব জোরে ধরেছে। কোন ভয় নেই, খানিক ঘুমুলেই সেরে যাবে।"

সরযূ বলিল, "এখনই লীলা বোধ হয় আসবে। তাদের বাড়ী তোমার ও আমার নিমন্ত্রণ আছে, তা ত জানই। তোমার যখন অসুখ, তখন ত আর যাওয়া চলবে না। তাকে বারণ—"

বাধা দিয়া অমিয়া বলিল, "তা হয় না, বোন্। আমরা দুজনই যদি না যাই, লীলার মা মনে বড় কষ্ট পাবেন। বিশেষতঃ কয়দিন ধ'রে আমাদের নিয়ে যাবার জন্য তিনি কি কষ্টই না করেছেন। লীলা নিজেই যখন নিতে আসছে, তখন অন্ততঃ তোমাকে যেতে হবে।"

ম্লান মুখখানি নত করিয়া সরযূ বলিল, "তোমাকে এ অবস্থায় রেখে আমিই বা যাই কি ক'রে?"

অমিয়া মাথার যন্ত্রণা সত্ত্বেও না হাসিয়া পারিল না। সে বলিল, "কেন, আমার হয়েছে কি? শুধু মাথা ধরেছে, এই না? এক যায়গায় গিয়ে যদি আমোদ-আহ্লাদে যোগ দিতেই না পারলাম, তবে সেখানে গিয়ে লাভ কি? এই জন্যই আমি যাচ্ছি না। মাথা ধরলে আমি মোটে ব'সে থাকতে পারি না; তা ত জান। এর পর আর এক দিন আমি যাব। তোমার যাওয়া কিন্তু চাই। লীলা তোমার সই। না গেলে বড় অন্যায় হবে। বিশেষতঃ, এর জন্য সম্ভবতঃ তাঁরা আয়োজনও ক'রে ফেলেছেন।"

সরযূ কি বলিতে যাইতেছিল, এমন সময় এক সুন্দরী কিশোরী ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল।

"সই!" বলিয়া সরযূ সহাস্যে নবাগতার দিকে অগ্রসর হইল। অমিয়াও শয্যার উপর উঠিয়া বসিল।

হাস্যময়ী নবাগতা বলিল, "বেশ! এখনও কাপড়-চোপড় পরা হয়নি? আমি একেবারে গাড়ী নিয়েই এসেছি। বৌদি, উঠুন!"

অমিয়া সংক্ষেপে তাহার অসুস্থতার কথা বলিল। নবাগতা কিশোরীর মুখখানি তাহাতে কিছু ম্লান হইয়া গেল: অমিয়া বুঝিতে পারিয়া বলিল, "সরযূ তোমার সঙ্গে যাচ্ছে, লীলা। আমি আর এক দিন নিজে যাব। মাকে প্রণাম জানিয়ে বলো, মাথার যন্ত্রণা অসহ্য না হ'লে আমি নিশ্চয়ই যেতাম।"

দুই হস্তে ললাট টিপিয়া অমিয়া শয্যায় শুইয়া পড়িল।

লীলা তখন সরযূকে তাড়া দিয়া বলিল, "তবে তুই শীঘ্র কাপড় প'রে নে।" তাহার পর অমিয়ার দিকে ফিরিয়া বলিল, "সরযূর ফিরে আসতে একটু রাত হয়ে যেতে পারে, তাতে ভাববেন না যেন, বৌদি! আমি নিজেই ওকে রেখে যাব। বাড়ীতে কিছু আমোদ-আহ্লাদের আয়োজন আছে। কিন্তু বৌদি, আপনি গেলেন না, বড় কষ্ট পেলাম।"

অমিয়া আবার তাহাকে বুঝাইয়া দিল যে, শিরঃপীড়া—মাথার যন্ত্রণা হইলে সে বড় অস্থির হইয়া পড়ে। কিছুই তখন ভাল লাগে না। এ অবস্থায় যদি সে যায় ত আমোদ-প্রমোদের সুখ সে মাটী করিয়া দিবে। তাহার অপেক্ষা বরং সে আর এক দিন যাইবে।

লীলা ও সরযূ একই বিদ্যালয়ে পড়িত। বাড়ীও তাহাদের পাশাপাশি ছিল। লীলার পিতা সংপ্রতি পুরীতে বদলী হইয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহার বাসা সমুদ্রতীরে নহে—সহরের মধ্যে। একদা সমুদ্র-স্নানের সময় সরযূ বাল্যসখীর পুরী অবস্থিতির সংবাদ জানিতে পারে। লীলা বিবাহিতা। তাহার পিতা হিন্দু হইলেও নিতান্ত বালিকা-বয়সে বিবাহ দেন নাই। একটু বড় করিয়াই দিয়াছিলেন:

প্রসাধনশেষে সরযূ লীলাকে লইয়া চলিয়া গেল।

পিসীমার সে দিন পালাজ্বর জ্বরের প্রকোপ সবে আরম্ভ হইতেছিল। তিনি কাঁথা জড়াইয়া ভ্রাতুষ্পুত্রীর কাছে আসিয়া বলিলেন, "তুই যে বড় গেলি না, অমি!"

অমিয়া বলিল, "বড় মাথা ধরেছে, পিসীমা। অসুখ নিয়ে লোকের বাড়ী যাওয়া ঠিক নয়। ওতে নিজেকেও যেমন বিব্রত হ'তে হয়, পরকেও ব্যতিব্যস্ত ক'রে তোলা হয়। তাই গেলাম না। আর তুমি ত জান পিসীমা, মাথা ধরলে আমি মোটে উঠতে পারি না!"

"তবে শুয়ে ঘুমো, বাছা! আমি দরজা ভেজিয়ে দিয়ে যাচ্ছি।"

পিসীমা ঘরে চলিয়া গেলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

"কি গো কবি, চল, একটু বেড়িয়ে আসা যাক্, বেলা ৫টা বেজে গেছে। আবার সন্ধ্যার পর আরম্ভ করো। এখন কবিতা সুন্দরীর ধ্যান বন্ধ কর, ভাই।"

মৃদু হাস্যে বন্ধুর দিকে একবার চাহিয়া রমেন্দ্র বলিল, "এটা শেষ না ক'রে উঠছি না, ভাই। তুমি এগোও, পথে দেখা হবে। কোন্ দিকে যাবে বল ত?"

সুরেশচন্দ্র ছড়ির মাথাটা রুমালে মুছিতে মুছিতে বলিলেন, "একবার সহরের ভিতরটা বেড়িয়ে আসব। বড় রাস্তা ধ'রে যাব। যেখানে হোক্ আমার দেখা পাবে। কোথাও না পাও, সোজা ষ্টেশনের দিকে যেও। আজ ত ওরা নিমন্ত্রণে গেছে, সুতরাং কেউ বেড়াতে যাবে না।"

সুরেশ অথবা রমেন্দ্র কেহই জানিত না যে, অমিয়া শিরঃপীড়ায় কাতর হইয়া ঘরে শুইয়া আছে। তাহারা ভাবিয়াছিল, লীলার সহিত উভয়েই নিমন্ত্রণ রাখিতে গিয়াছে। লীলা যখন আসিয়াছিল, তখন বন্ধুযুগল বাহিরের ঘরের দ্বার বন্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। সুতরাং কে রহিল, কে গেল, তাহা কেহ জানিতে পারে নাই। গাড়ী চলিয়া যাইবার পর সুরেশচন্দ্র বেড়াইতে যাইবার প্রস্তাব করিলেন।

খাতা হইতে মুখ না তুলিয়াই অন্যমনস্কভাবে রমেন্দ্র বলিল, "আচ্ছা।"

সুরেশচন্দ্র বেড়াইতে চলিয়া গেলেন।

রমেন্দ্র একাগ্রমনে "মানসী" কবিতাটিকে সমাপ্তির পথে লইয়া চলিয়াছিল। হৃদয়ের রক্ত দিয়া সে কবিতা রচনা করিতেছিল। কবিতাটি দীর্ঘ। নূতন ছন্দে, ললিত পদবিন্যাসে, ভাবের মাধুর্য্যে সে কবিতাটিকে সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর করিবার চেষ্টায় ছিল। সুতরাং দিনের আলো কখন্ নিবিয়া গিয়াছিল, সূর্য্য কখন্ সমুদ্র-গর্ভে আশ্রয় লইয়াছিলেন, এ সকল বিষয় লক্ষ্য করিবার সুযোগই তাহার ছিল না। সে তখন তাহার মানসী প্রতিমাকে পৃথিবীর সৌন্দর্য্যসম্ভারে ভূষিত করিয়া কল্পনানেত্রে তাহার রূপসুধা পান করিতেছিল। প্রাণের ভাষা, সেই বিজয়িনী মানসী রাণীর পূজায়, কবিতার আকারে কাগজের পৃষ্ঠে গড়িয়া উঠিতেছিল। মুগ্ধ কবি নিজের রচনায় নিজেই পুলকিত হইয়া উঠিতেছিল—সর্ব্বদেহে ভাবের আতিশয্যে শিহরণ, স্পন্দন অনুভূত হইতেছিল। কোন্ স্বপ্নলোকের রাণি! তুমি মূর্ত্তি ধরিয়া ধরায় নামিয়া আসিয়াছ? যদি আসিয়াছ, তবে শরীরে, মনে সর্ব্বত্র তোমার স্পর্শ পাই না কেন? তোমার মুগ্ধ দৃষ্টির উজ্জ্বল মধুর আলোক-রেখা আমার দৃষ্টিকে অনন্তকালের জন্য পবিত্র করিয়া দেয় না কেন? তোমার লোকাতীত, বর্ণনাতীত সৌন্দর্য্যের তরঙ্গে অনন্তকালের জন্য ডুবিয়া মরি না কেন? অনাদি-কাল হইতে আমি তোমারই পশ্চাতে ঘুরিতেছি। অয়ি রহস্যময়ি! তুমি কাছে আসিয়া ধরা দিতে দিতে আবার কোন্ সুদূর রাজ্যে পলাইয়া যাও—তোমাকে ধরিয়াও ধরিতে পারি না। অয়ি লীলাময়ি! এমন বিচিত্র লীলার পাকে আর কত কাল অভাগাকে ঘুরাইয়া মারিবে? সহিষ্ণুতার সীমা ক্রমেই অন্তর্হিত হইতেছে। এমন করিয়া ইন্দ্র-ধনুর খেলা দেখাইয়া, অনিশ্চিতের মায়ায় আর ভুলাইয়া

রাখিও না। এইরূপ উচ্ছ্বাসের ধারা রমেন্দ্রের কবিতায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছিল। আত্ম-বিস্মৃত কবি দেশ-কাল ভুলিয়া তাহাতেই মগ্ন হইয়া রহিল।

কবিতার শেষ ছত্র সমাপ্ত করিয়া পুলকভরে রমেন্দ্র খাতা মুড়িয়া রাখিল। সুরেশের কথা তখন মনে পড়ায় তাড়াতাড়ি উত্তরীয় স্কন্ধে করিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। দেখিল, অদূরে সমুদ্রের জল কালো হইয়া গিয়াছে। দিবার শেষ আলোকরেখা দিক্‌চক্রবালে কখন্ মিলাইয়া গিয়াছে। উপরে চাহিয়া দেখিল, নিবিড় মেঘপুঞ্জে দিগন্ত সমাচ্ছন্ন। বায়ুর প্রবাহমাত্র নাই। সমুদ্রতট প্রায় জনহীন। আসন্ন ঝটিকা ও বৃষ্টির আশঙ্কায় ভ্রমণার্থীর দল গৃহে ফিরিয়া গিয়াছে। যাহারা বাকী ছিল, তাহারাও দ্রুতপদে ফিরিয়া চলিয়াছে।

তাই ত, এখন সে কি করিবে? সুরেশকে কথা দিয়াছে, তিনি ত তাহার প্রতীক্ষা করিবেন!

দোলায়মান চিত্তে রমেন্দ্র ধীরে ধীরে পথে আসিয়া দাঁড়াইল। পুনঃ পুনঃ আকাশের দিকে চাহিয়া সে বুঝিল, এ সময় গৃহের আশ্রয় ছাড়িয়া পথে বাহির হওয়া বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে। অথচ বাড়ীতে একা বসিয়া থাকাও ত কষ্টকর। এখন ঘরে বসিয়া কবিতা রচনা অথবা পাঠে মন দেওয়ার উৎসাহও তাহার ছিল না।

কিয়দ্দূর সমুদ্রতীরে অগ্রসর হইবার পর, কি মনে করিয়া সে সহরের পথ ধরিল। কিন্তু কয়েক পদ যাইতে না যাইতেই শোঁ শোঁ শব্দ উত্থিত হইল। দূরে সিকতাভূমির উপর বালির ধ্বজা উড়িতে আরম্ভ করিয়াছে দেখিয়া সে বুঝিল, গৃহের বাহিরে থাকা আদৌ যুক্তিসঙ্গত নহে।

দ্রুতপদে সে বাসার দিকে ফিরিল। আকাশে মেঘ গর্জ্জন করিয়া উঠিল। নীরদপুঞ্জে মুহুর্মুহুঃ বিদ্যুৎ হাসিয়া উঠিতে লাগিল। বাড়ীর দ্বারে রুদ্ধনিশ্বাসে আসিবামাত্র প্রবলবেগে ঝটিকা গর্জ্জন করিয়া উঠিল।

তাড়াতাড়ি বাহিরের ঘরের বারান্দায় উঠিয়া দাঁড়াইতেই ভৃত্যের সহিত দেখা হইল। সে ঘরের মধ্যে আলো জালিয়া দিয়া চারিদিকের জানালা-দরজা বন্ধ করিয়া দিতেছিল।

সনাতন বলিল, "আজ আপনার বেড়ান হ'ল না, দাদাবাবু!"

"না, কই আর হ'ল।"

"আজ দেখছি, দাদাবাবু বড় কষ্ট পাবেন।"

"শুধু তিনি কেন, তোমার দিদিমণিদেরও ফিরে আসা মুস্কিল দেখছি।"

সম্মুখের দরজা বন্ধ করিতে করিতে সনাতন বলিল, "বড় দিদিমণি ত যান নি। ছোট দিদিমণিরই কষ্ট হবে!"

সবিস্ময়ে রমেন্দ্র বলিল, "অমিয়া নিমন্ত্রণে যান নি?"

"না, তাঁর মাথা ধরেছে শুনলাম। ছোট দিদিমণি একাই গেছেন।"

রমেন্দ্র চেয়ারে বসিয়া পড়িল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

সুরেশচন্দ্র বেড়াইতে বেড়াইতে অনেক দূরে চলিয়া গেলেন। জগন্নাথের মন্দিরমধ্যে তিনি অনেকবার গিয়াছেন। সকল মানবের সম্মিলনক্ষেত্র এই পবিত্র তীর্থটি তাঁহার বড় ভাল লাগিত। ধর্ম্মমত সম্বন্ধে সুরেশচন্দ্রের কোন গোঁড়ামি ছিল না। তিনি অন্ধ ধর্ম্মবিশ্বাসের বিরোধী ছিলেন। এ জন্য সমাজের অনেকেরই সহিত তাঁহার মতের সামঞ্জস্য ছিল না। যাহা মানুষের মনকে ধরিয়া রাখে, যাবতীয় নীচতা ও পাপ হইতে রক্ষা করে, তাঁহার কাছে তাহাই ধর্ম্ম। সুতরাং মত লইয়া মারামারি করার দিকে তাঁহার বিন্দুমাত্র সহানুভূতি ছিল না। যাহার যাহাতে সুবিধা, সে সেই পথ লইয়া থাকিবে। তাহা লইয়া এত হাঙ্গামাই বা কেন?

মন্দির প্রদক্ষিণ করিয়া সুরেশচন্দ্র সুপ্রশস্ত রাজপথ ধরিয়া উত্তরাভিমুখে চলিলেন। পথে কত লোক চলিয়াছে। অধিকাংশই ছিন্নবেশী, মলিনবদন ও কৃশতনু। ইহাই ত ভারতবর্ষের প্রকৃত রূপ! দেশের ঐশ্বর্য্য দেশবাসীর আকারেই প্রতিফলিত।

কঙ্কালসার বুভুক্ষু বালক আসিয়া সুরেশচন্দ্রের সম্মুখে হাত পাতিয়া দাঁড়াইল; উৎকল ভাষায় দারিদ্র্য-দুঃখ নিবেদন করিল। যুবক দ্বিধা না করিয়াই তাহার হাতে কিছু পয়সা দিলেন। বালক কৃতজ্ঞ-হৃদয়ে তাঁহার জয়গান করিতে করিতে চলিয়া গেল।

সুরেশচন্দ্র ভাবিলেন, এই যে ভারতবর্ষ, সুজলা সুফলা দেশ, এখানে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার উন্মুক্ত। তবু এ দেশের লোক খাইতে না পাইয়া মরে কেন? তিনি য়ুরোপ দেখিয়াছেন, আমেরিকার পল্লীতে পল্লীতে বেড়াইয়াছেন; কিন্তু এমন দারিদ্র্য ত কোথাও নাই! রাজপথে চলিতে চলিতে এমন একটি মূর্ত্তি দেখা গেল না, যাহাকে দেখিয়া মন প্রফুল্ল হইয়া উঠে! ঐ যে যুবক গরুর গাড়ী হাঁকাইয়া যাইতেছে, উহার বয়স পঁচিশও পার হয় নাই; কিন্তু উহার আননে যৌবনের স্বাস্থ্য, উৎসাহ, আশা ও প্রফুল্লতা কোথায়? এক জন পঁচিশ বৎসরের য়ুরোপীয় বা মার্কিণ যুবকের সহিত উহার তুলনা হয় কি? ঐ যে পথচারিণী রমণীরা চলিয়াছে, যুবতী, প্রৌঢ়া, বৃদ্ধা, বালিকা কাহারও আননে উৎসাহের দীপ্তি নাই কেন? সকলেই যেন উৎসাহহীন, স্বাস্থ্যহীন। যুবতীর দেহে যৌবনের প্রফুল্লতা, সহজ সরল গতিভঙ্গী নাই। যে দেশের জীবনযাত্রা অতি সহজেই নির্ব্বাহিত হইতে পারে, সেখানকার নরনারীকে দেখিলেই তাহাদিগকে মৃত্যুপথের যাত্রী বলিয়া মন নিরানন্দে পূর্ণ হইয়া উঠে কেন?

চিন্তার ভারে সুরেশচন্দ্রের ললাটদেশ রেখাঙ্কিত হইয়া উঠিল। তিনি অন্যমনস্কভাবে ক্রমেই অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ক্রমশঃ অট্টালিকা ও কুটীরশ্রেণীর সংখ্যা হ্রাস পাইয়া আসিতেছিল।

সহসা কাহার ডাকে তিনি থমকিয়া দাঁড়াইলেন। পার্শ্বে চাহিয়া দেখিলেন, একটি উদ্যানের সম্মুখবর্ত্তী ফটকের মাঝখানে গৈরিক-বসনধারী, মুণ্ডিতশীর্ষ মানব-মূর্ত্তি! মুহূর্ত্ত দৃষ্টিপাতে সুরেশচন্দ্রের আনন আনন্দালোকে সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল। দ্রুতপদে পথ অতিক্রম করিয়া তিনি সেই মূর্ত্তির দিকে অগ্রসর হইলেন। পরমুহূর্ত্তে তাঁহার মস্তক সন্ন্যাসীর চরণে লুণ্ঠিত হইল।

"আপনি এখানে?"

দুই হস্তে সুরেশকে তুলিয়া ধরিয়া সন্ন্যাসী প্রসন্ন হাস্যে বলিলেন, "হ্যাঁ, আজ দু' দিন এখানে এসেছি। তুমি কবে এলে?"

"আজ পাঁচ ছয় দিন এসেছি, স্বামীজী!"

চল, ভিতরে যাই। তোমার প্রেমানন্দও আছেন।"

উভয়ে উদ্যানের মধ্যবিসর্পিত পথে চলিলেন।

স্বামীজী বলিলেন, "পুরীর রাজা এই বাগানটা আমাদের জন্য ছেড়ে দেছেন। সমুদ্রের ধারে যে বাড়ীটা আমাদের আছে, সেটা বড় ছোট ব'লে আপাততঃ এখানেই আছি।"

সুরেশচন্দ্র যখন বোম্বাই অঞ্চলে ভ্রমণ করিতেছিলেন, সেই সময় স্বামীজীর সহিত প্রথম আলাপ হয়। সেই আলাপের ফলে তিনি তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু সে সংবাদ তাঁহার আত্মীয়-স্বজন বা বন্ধু-বান্ধবদিগের কেহই জানিতেন না। জানাইবার আগ্রহও সুরেশচন্দ্রের ছিল না। এই পরম পণ্ডিত, তত্ত্বদর্শী, মহানুভব স্বামীজীর সহিত আলাপ-আলোচনার পর তাঁহার জীবনে যে নূতন অধ্যায়ের সূচনা হইয়াছিল, তাহার ইতিহাস তিনি ছাড়া অন্য কেহ জানিত না।

গুরুর সহিত শিষ্য উদ্যানবাটীর বিস্তৃত হল-ঘরে পৌঁছিয়া সুরেশচন্দ্র অনেকগুলি ব্রহ্মচারীকে দেখিলেন, তন্মধ্যে তিন চারি জন তাঁহার সুপরিচিত। প্রেমানন্দ সুরেশকে আলিঙ্গনে বদ্ধ করিয়া ফেলিলেন। সকলের মধ্যেই এক অনাবিল আনন্দপ্রবাহ বহিতে লাগিল।

নানা বিষয়ে আলোচনার উৎসাহে সুরেশচন্দ্র স্থান, কাল ও পাত্র ভুলিয়া গেলেন। রমেন্দ্র যে তাঁহার সন্ধানে আসিতে পারে, সে কথা তাঁহার আদৌ মনে রহিল না। এ দিকে ঘটা করিয়া আকাশে জলদজাল ছড়াইয়া পড়িতেছিল। দেশের অবস্থা, রাজনীতি, সমাজ ও ধর্ম্মনীতির আলোচনায় সকলে যখন নিবিষ্টচিত্ত, তখন আকাশে মেঘ গর্জ্জিয়া উঠিল। দ্রুতবেগে ঝটিকা বহিতে লাগিল।

তখন সকলের চমক ভাঙ্গিল। সুরেশচন্দ্রের মনে পড়িল, বাড়ী ফিরিতে হইবে। কিন্তু যেরূপ প্রবল ঝটিকা বহিতেছিল, তাহাতে কাহার সাধ্য ঘরের বাহির হয়।

বঙ্গোপসাগরে—পুরী হইতে অন্যূন দুই শত মাইল দূরে সমুদ্রগর্ভে যে ঝটিকাবর্ত্ত কয়েক দিন পূর্ব্ব হইতেই পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছিল, কলিকাতার আবহবিভাগের—জলঝড়-সংক্রান্ত আপিস হইতে প্রচারিত দৈনিক সংবাদ-পত্রে যাহার আভাস দুই দিন পূর্ব্বে বাহির হইয়াছিল, সেই ঝটিকাবর্ত্ত দুর্জ্জয় দানবের ন্যায় বেগে দুস্তর জলধি-সীমা অতিক্রম করিয়া পুরীর উপর দিয়া প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করিয়াছিল।

সুরেশের ব্যস্ততা বুঝিতে পারিয়া স্বামীজী বলিলেন, "আজ তোমাকে এখানেই রাত্রিবাস করতে হবে দেখছি। এই ভীষণ ঝড়ে তোমায় ছেড়ে দিতে পারিনে। শীঘ্র যে দুর্য্যোগ থেমে যাবে, তাও ত মনে হয় না।"

চিন্তিতভাবে সুরেশ বলিলেন, "তাই ত দেখছি।"

বাসায় কে কে আছে, কথায় কথায় স্বামীজী তাহা জানিয়া লইলেন। সুরেশচন্দ্র ভাবিলেন, জল-ঝড়ে তিমি যেমন আটক পড়িয়াছেন, অমিয়া ও সরযূরও ঠিক সেই অবস্থা হইয়াছে। কারণ, সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গেই যখন ঝড় উঠিয়াছে, তখন নিশ্চয়ই তাহারা বাসায় ফিরিতে পারে নাই। ভাবনা শুধু পিসীমা ও রমেন্দ্রের জন্য। তা বাড়ীতে দাসদাসী সবই আছে, রমেন্দ্রের অসুবিধা হইবে না। তবে তাঁহার জন্য পিসীমা ও রমেন্দ্রের দুশ্চিন্তা হইবার সম্ভাবনা। উপায় কি? মানুষের কোন হাত ত নাই।

ঝটিকার প্রচণ্ড শব্দ, বজ্রের ভীম গর্জ্জন ক্রমেই ভীষণতর হইতে লাগিল। রাত্রি ৯টা বাজিয়া গেল, কিন্তু ঝড়-বৃষ্টির বিরামের কোন চিহ্ন দূরে থাকুক, বেগ ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। বাসায় ফিরিবার সঙ্কল্প তখন সুরেশকে সম্পূর্ণ ত্যাগ করিতে হইল।

স্বামীজীর কাছে বসিয়া সদালাপে সময় চলিয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু তাহাতেও বাধা। ঝটিকার প্রবাহ রুদ্ধ-দ্বার ও বাতায়নে প্রহত হইতেছিল, তাহাতে আলোচনা বাধা পাইতে লাগিল।

ঝটিকার বিরামের কোন সম্ভাবনা নাই দেখিয়া রাত্রির জলযোগ সারিয়া সুরেশচন্দ্র একখানি কম্বলের উপর আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

"মশায়, রমেন বাবু আছেন?"

পূজার বন্ধে অনেক ছাত্রই বাড়ী চলিয়া গিয়াছিল। যাহারা তখনও যাইতে পারে নাই, পূজার বাজার করিয়া তাহারা দেশে ফিরিবার আয়োজন করিতেছিল। এমনই এক দিন প্রভাতে এক প্রৌঢ় রমেন্দ্রের মেসে আসিয়া দাঁড়াইল।

প্রশ্নের উত্তরে জনৈক যুবক বলিল, "রমেন বাবু ত এখানে নেই।"

"নেই?—কোথায় গেলেন?"

"আজ ৩ দিন হ'ল, তিনি চ'লে গেছেন।"

আগন্তুক সবিস্ময়ে বলিল, "চ'লে গেছেন? কোথায় গেছেন, বলতে পারেন কি?"

যে যুবক উত্তর করিতেছিল, সে সহসা মুখ তুলিয়া আগন্তুককে দেখিয়া লইল, তাহার পর বলিল, "আপনি কোথা থেকে আসছেন?"

আগন্তুক মাধব। সে বলিল, "আমি তাঁর দেশের লোক। তিনি কোথায় গেছেন, জানেন কি?"

"তা ত জানি নে, হয় ত দেশে যেতে পারেন।"

মাধব বিস্মিত হইল। দেশে যাইবে না বলিয়াই রমেন্দ্র পত্র লিখিয়াছিল। পরে কি তাহার মনের গতির পরিবর্ত্তন হইয়াছে? তিন দিন পূর্ব্বে যদি সে চলিয়া গিয়াই থাকে, মাধব রওনা হইবার পূর্ব্বেই বাড়ীতে তাহার পৌছান উচিত ছিল। না, সে কখনই দেশে যায় নাই। তবে সে কোথায় গেল? মুহূর্ত্ত চিন্তা করিয়া সে বলিল, "আপনি বলতে পারেন, এখানে তাঁর কোন অন্তরঙ্গ বন্ধুর বাড়ী আছে?"

যুবক একটু ভাবিয়া বলিল, "হাঁ, তাঁর এক সহ-পাঠীর বাড়ীতে ইদানীং প্রায় যাওয়া-আসা করতেন।"

মাধব সাগ্রহে বলিল, "কোথায় বলুন ত?"

বাক্স গুছাইতে গুছাইতে যুবক বলিল, "সুরেশ বাবু ব'লে তাঁর এক বন্ধুর ওখানে প্রায় তিনি যেতেন।"

সুরেশ বাবু?—কোন্ সুরেশ বাবু?—অকস্মাৎ মাধব যেন একটা আলোকের সূত্র দেখিতে পাইল। সে বলিল, "তাঁর পুরা নাম ও ঠিকানাটা অনুগ্রহ ক'রে বলবেন কি?"

যুবক বলিল, "বাড়ীর নম্বরটা জানিনে। সুকিয়া ষ্ট্রীটে খানকয়েক বাড়ীর পরেই যে ফটকওয়ালা বাড়ীটা দেখবেন, সেই বাড়ীটা। এক দিন রমেন বাবুকে সেই বাড়ীতে যেতে দেখেছিলাম। তাঁর বন্ধুর নাম সুরেশচন্দ্র ঘোষ।"

মাধব আর দাঁড়াইল না, যুবককে নমস্কার করিয়াই মেস ত্যাগ করিল।

সুরেশচন্দ্রের নাম তাহার সুপরিচিত। এই যুবকের ভগিনী অমিয়াকে বিবাহ করিবার জন্য খোকা এক দিন কি পাগলই না হইয়াছিল! সুরেশ বাবুকে সে কোন দিন দেখে নাই, অমিয়ার সহিত প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটিবার অবকাশও তাহার কোন দিন হয় নাই, কিন্তু এক দিন তাহাদের সরল পল্লী-জীবনে যে অনর্থের সূত্রপাত হইয়াছিল, তাহার সংশ্লিষ্ট নরনারীর নামধাম সে কখনও বিস্মৃত হইবে না। রমেন্দ্রের মাতা কি বুদ্ধি-চাতুর্য্যের প্রভাবে সে যাত্রা পুত্রকে স্বধর্ম্মে রক্ষা করিয়াছিলেন, সব ইতিহাসই ত মাধব জানে। সে ব্যাপারে মাধবকে ত কম বেগ পাইতে হয় নাই!

পথ চলিতে চলিতে সব কথাই তাহার মনে পড়িতে লাগিল। তাহাদের বুকজোড়া মাণিক খোকা যখন এম্-এ পড়ে, সেই সময় অমিয়ার অসামান্য রূপলাবণ্যে সে মুগ্ধ হয়। সমাজ, ধর্ম্ম সর্ব্বস্বের বিনিময়ে সে তাহার নির্ব্বাচিতা সুন্দরীকে বিবাহের জন্য কি অধীরই না হইয়াছিল! কিন্তু অমিয়ার জ্যেষ্ঠ, রমেন্দ্রের সতীর্থ সুরেশচন্দ্র রমেন্দ্রের প্রস্তাব-মাত্রেই সম্মত হয়েন নাই। মাতার অনুমতি লইয়া যদি রমেন্দ্র বিবাহ করিতে পারে, তাহাতে তাঁহার আপত্তি ছিল না। পুত্রের পত্র পাইয়া মাতার মনের অবস্থা কিরূপ হইয়াছিল, তাহা কি মাধব ভুলিয়া গিয়াছে? তাহার পর নানা কৌশলে রমেন্দ্রকে দেশে লইয়া যাইতে কি কম বেগ পাইতে হইয়াছিল? মাতৃভক্ত সন্তান অবশেষে মায়ের চোখের জল ও মলিন মুখ দেখিয়া মনের উচ্ছৃঙ্খল অবস্থাকে সংযত করিয়া লইয়াছিল।

বায়স্কোপের ছবির মত সব ব্যাপারটা নূতন করিয়া যেন তাহার চোখের উপর ভাসিয়া উঠিল। দ্রুতপদে মাধব সুকিয়া ষ্ট্রীটের দিকে চলিল। জিজ্ঞাসা করিয়া সে স্বল্পায়াসেই সুরেশচন্দ্রের অট্টালিকার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু তাহাকে হতাশ হইতে হইল, কারণ, সে দেখিল, অধিকাংশ জানালা-দরজা রুদ্ধ। গেটের পার্শ্বেই দ্বারবানের গৃহ। সে তখন রন্ধনের আয়োজন করিতেছিল।

প্রশ্নের উত্তরে সে জানিতে পারিল যে, রমেন্দ্র বন্ধুর সহিত পুরী গিয়াছে। সঙ্গে বুড়া মাইজী এবং সুরেশচন্দ্রের ভগিনী ও তাহার ননন্দা গিয়াছেন। অমিয়ার বিবাহের সংবাদ মাধব জানিত না; সুতরাং সে বুঝিল, সুরেশ বাবুর ভগিনী বিবাহিতা।

সংবাদ শুনিয়া মাধবের মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। আইন পড়ার ব্যাঘাত হইবে বলিয়া যে রমেন পূজার সময় মা'র কাছে যাইতে পারিল না, সে কি করিয়া পুরী বেড়াইতে গেল? ইহাতে তাহার পড়ার ক্ষতি হইবে না? রমেন জননীকে কিরূপ ভক্তি-শ্রদ্ধা করে, ভালবাসে, তাহা ত মাধবের অগোচর নাই। তবে সেই মা'র চরণ-চ্ছায়ায় জুড়াইতে না গিয়া এমন গুপ্তভাবে সে পুরী পলাইল কেন? হ্যাঁ, ইহাকে পলায়ন ছাড়া আর কোন সংজ্ঞাই দেওয়া চলে না। ঘরে সুন্দরী যুবতী স্ত্রী—সে আকর্ষণই বা খোকা এড়াইল কি করিয়া? বিদ্যার্জ্জনের জন্য হয় ত অনেক কিছু করা যাইতে পারে, কিন্তু যখন সে প্রয়োজন না থাকে?

মাধব কোনমতেই মীমাংসা করিয়া উঠিতে পারিল না। পুরী যাওয়া দোষের নহে। কিন্তু পড়া ছাড়িয়া—বিশেষতঃ যে পড়ার ক্ষতি হইবে বলিয়া সে দেশে মা ও স্ত্রীর কাছে যাইতে পারিল না—সেই পড়ার ক্ষতি করিয়া সে আনন্দ-ভ্রমণে যাত্রা করিল? তার পর,—না, সে আর চিন্তা করিতে পারে না। পুরীর ঠিকানাটা জানিয়া লইয়া সে ষ্টেশনের দিকে ফিরিল। রাত্রির পূর্ব্বে আর কোনও ট্রেণ এখন নাই, নিকটের কোনও হোটেলে সে স্নানাহার সারিয়া লইবে।

রাত্রির গাড়ীতে মাধব দেশে ফিরিয়া চলিল। সারা-পথ দুর্ভাবনায় কাটিল। মা যখন দেখিবেন, সে একা ফিরিয়াছে, তখন কত ব্যথাই না তিনি পাইবেন! মা বলিয়া দিয়াছিলেন, "মাধব, রমেনকে না নিয়ে তুমি এস না।" এখন সে কি বলিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইবে? অবশ্য সে সোজা পুরী চলিয়া যাইতে পারিত; কিন্তু আজ পঞ্চমী, কাল ষষ্ঠী। মাকে সে বলিয়া আসিয়াছিল, ষষ্ঠীর সন্ধ্যায় সে রমেনকে লইয়া গৃহে ফিরিবে। পুরীতে গিয়া রমেন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া দেশে ফিরিতে পূজা শেষ হইয়া আসিবে। কোন সংবাদ না দিয়া যদি সে সোজা পুরী চলিয়া যায়, তবে মাতা নির্দ্দিষ্ট কালের মধ্যে তাহাদিগকে ফিরিতে না দেখিয়া ব্যাকুল ও অস্থির হইয়া পড়িবেন। কিংবা সে যদি তার করে অথবা পত্রযোগে সংবাদ পাঠায় যে, সে রমেন্দ্রকে আনিবার জন্য পুরী যাইতেছে, তবে অনির্দ্দিষ্ট আশঙ্কায় মা জননী আরও বিব্রত হইয়া পড়িবেন। সুতরাং

এ সকল যুক্তি তাহার নিকট সঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হইল না। মাকে সব বলিয়া সে কর্ত্তব্য অবধারণ করিবে। আজন্ম সে সেই শিক্ষাই পাইয়াছে। মাতার আদেশ ছাড়া তাহার অন্য কর্ত্তব্য নাই।

তাই মাধব যখন ষষ্ঠীর রাত্রিতে নিতান্ত অসহায়ের মত একা গৃহিণীর সম্মুখে দাঁড়াইল, তখন তাহার বলিষ্ঠ দেহও দুর্ব্বলতাভারে যেন কাঁপিয়া উঠিল। তাহাকে একা দেখিয়া রমেন্দ্রের মাতা অত্যন্ত বিস্মিতা হইলেন। তাঁহার চোখে মুখে একটা আতঙ্কের আর্ত্তনাদ যেন মূর্ত্তি লইয়া দাঁড়াইল।

কৌশলে মাতাকে একান্তে লইয়া গিয়া মাধব সব কথা বলিল। সমস্ত শুনিয়া কয়েক মুহূর্ত্ত তিনি প্রস্তর-মূর্ত্তির মত স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন। হৃদয়মধ্যে একটা সন্দেহের ঝটিকা যেন গর্জ্জন করিয়া উঠিল। কিন্তু প্রখর বুদ্ধি-শালিনী ও ধৈর্য্যবতী রমণী ঝড়ের প্রভাব আননে প্রতি-ফলিত হইতে দিলেন না। দৃঢ় চরণে, লঘুগতিতে নিজের কাযে ফিরিয়া গেলেন। তাঁহার মুখ দেখিয়া কেহই কিছু অনুমান করিতেও পারিল না।

সকলের আহারাদি শেষ হইলে, বধূকে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া মৃদুস্বরে গৃহিণী বলিলেন, "মা, আমায় একটি কথার সত্যি জবাব দিও, লজ্জা করো না।"

শ্বশ্রূমাতার বুকের স্পন্দন আজ কি দ্রুতই চলিয়াছে! বিস্মিতভাবে প্রতিভা তাঁহার উদ্বেগ-ব্যাকুল নয়নের দিকে চাহিয়া বলিল, "কি মা?"

"রমেন তোমায় চিঠি লেখে? সত্যি বলো, মা লক্ষ্মি! লজ্জা কি? মা'র কাছে মেয়ের কোন লজ্জা নেই।"

কিন্তু তথাপি লজ্জার অরুণ রাগে প্রতিভার আনন আরক্ত হইয়া উঠিল। ধীরে ধীরে তাহার মাথা নত হইল। মা'র যেমন কথা! ছিঃ, কি লজ্জা!

স্নেহ ও আগ্রহভরে পুত্রবধূর মুখ দুই হাতে তুলিয়া ধরিয়া শাশুড়ী বলিলেন, "এতে লজ্জা কি? সত্যি কথা বলো, রমেন তোমায় চিঠি লেখে?"

উত্তর না করিলে মা দুঃখিত হইবেন; অবাধ্য ভাবি-বেন। আবার সে কথা বলাও ত সহজ নয়! প্রতিভা মহা সমস্যায় পড়িল। তাহার বক্ষ ঘন ঘন স্পন্দিত হইতে লাগিল। কি লজ্জা! কি লজ্জা!

শ্বশ্রূমাতার তৃতীয়বার প্রশ্নে সে আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না। অস্ফুটগুঞ্জনে সে বলিল, "না!"

এই কয় বৎসরের মধ্যে একখানিও পত্র লিখে নাই? প্রতিভা লিখিয়াছিল? মাথা নাড়িয়া কোনও মতে সে জানাইয়া দিল যে, সে পত্র লিখিয়াছিল।

রমেন্দ্র উত্তর দেয় নাই? অবনত দৃষ্টি, ম্লান মুখের কোণে লজ্জা-নম্র সঙ্কোচ—নারীর বুঝিবার পক্ষে তাহাই যথেষ্ট নহে কি?

তথাপি গৃহিণী প্রদীপালোকে বধূর শান্ত, মধুর, সুন্দর মুখখানি তুলিয়া ধরিলেন। তাহার লজ্জা-কম্পিত নয়ন-পল্লব নিমীলিত হইয়া আসিল। অধরে ঈষৎ ম্লান হাস্য। গভীর স্নেহ ও সহানুভূতিতে শ্বশ্রূমাতা পুত্রবধূকে বক্ষে চাপিয়া ধরিলেন। সে আননে অনেক অলিখিত ইতিহাস কি মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছিল?

পরদিবস প্রভাতে মাধবকে ডাকিয়া গৃহিণী বলিলেন, "পূজার মানসিক আছে। আমরা পুরী যাব। সব ব্যবস্থা ক'রে ফেল।"

মাধব বুদ্ধিমান্। গৃহিণীর ইঙ্গিত বুঝিতে তাহার বিলম্ব হইল না। সে বলিল, "কবে যাবে, মা?"

মাতা বলিলেন, "আজই। আমাদের ত পূজো নেই, সুতরাং বাধা কি? আমরা সবাই যাব কিন্তু। রাধারাণী, বৌমাও সঙ্গে যাবেন।"

মাধব বলিল, "যে আজ্ঞে।"

সে যাত্রার আয়োজন করিতে গেল।

[ক্রমশঃ।

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ।

হিন্দুর বিবাহ

১৩৩৭ সালের শ্রাবণের প্রবাসীতে রবি বাবুর "ভারতবর্ষীয় বিবাহ" নামক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে রবি বাবু লিখিয়াছেন যে, প্রাচীনকালে হিন্দুরা ব্যক্তিগত সুখের জন্য বিবাহের ব্যবস্থা করেন নাই, সমাজের প্রতি কর্ত্তব্যপালন করিবার জন্য বিবাহের ব্যবস্থা ছিল। এই জন্য গান্ধর্ব, রাক্ষস, আসুর ও পৈশাচ বিবাহকে স্মৃতিশাস্ত্রে বিবাহ বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে বটে কিন্তু তাহাদের নিন্দা আছে, এবং ব্রাহ্ম বিবাহের প্রশংসা আছে; কারণ, ব্রাহ্ম বিবাহ ব্যতীত অপর প্রকার বিবাহে ব্যক্তিগত ইচ্ছার প্রাবল্যে মানুষ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিচার না করিয়া বিবাহ করিয়া থাকে। ব্রাহ্ম বিবাহ আধুনিক সৌজাত্য বিদ্যা-(Eugenics) সম্মত। এইরূপ বিবাহের ফলে উৎকৃষ্ট সন্তান হইবার সম্ভাবনা বেশী। রবি বাবু ইহাও বলিয়াছেন যে, পরস্পর ভালবাসার পর বিবাহ হয় না বলিয়া আমাদের বিবাহ প্রেমহীন নহে। অপর পক্ষে, খাঁটি এবং চিরস্থায়ী প্রেম পাশ্চাত্য দেশের বিবাহেও সুলভ নহে। বেশী বয়স হইলে নরনারীর ইচ্ছা প্রবল হইয়া উঠে, এ জন্য তাহার পূর্ব্বে অল্পবয়সেই হিন্দুদের বিবাহ হয়। হিন্দুরা বিবাহকে গৃহস্থের অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়াছেন বটে, কিন্তু বিবাহ করিয়া গৃহধর্ম্ম পালন করাকে জীবনের চরম উদ্দেশ্য বলিয়া স্বীকার করেন নাই। মুক্তির অন্বেষণে গৃহ পরিত্যাগ করিতে হইবে—এই ছিল তাঁহাদের আদর্শ। এই সকল কথা বলিয়া রবি বাবু প্রবন্ধটির উত্তরভাগে বলিয়াছেন যে, হিন্দুর বিবাহ এবং গৃহধর্ম্মের আদর্শ প্রাচীনকালের উপযোগী হইলেও আজকাল তাহা আর উপযোগী নহে। কারণ, আজকাল নূতন শিক্ষা, নূতন মত আসিয়াছে এবং অর্থাভাবে প্রত্যেক গৃহের সামাজিক পরিধি প্রতিদিন সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিতেছে।

কিন্তু রবি বাবু সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, আমাদের বিবাহ ও গৃহধর্ম্মের আদর্শ প্রাচীনকালে একটা বিশেষ অবস্থার উপযোগী ছিল এবং আজকাল আর উপযোগী নহে, ইহা যথার্থ বলিয়া মনে হয় না। আমাদের মনে হয় যে, এই আদর্শগুলি চিরন্তন সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, এবং সেগুলি প্রাচীনকালে যেরূপ উপযোগী ছিল, আজকালও সেইরূপ উপযোগী। বর ও কন্যা নিজ ইচ্ছা অনুসারে পাত্রী বা পাত্র নির্ব্বাচন করিবে, এই ব্যবস্থা অপেক্ষা পিতা, মাতা বা অন্য অভিভাবক সম্বন্ধ স্থির করিবেন, এই ব্যবস্থা উৎকৃষ্ট; এ জন্য আমাদের শাস্ত্রে ব্রাহ্ম বিবাহের প্রশংসা আছে। যৌবনে প্রবৃত্তিগুলি অত্যন্ত বলবতী থাকে, যাহা ভাল লাগে, তাহা করিতে বিশেষ আগ্রহ হয়, কোন্ পথ কল্যাণকর, তাহা বিবেচনা করিতে ইচ্ছা হয় না। যৌবনে সংসারের অভিজ্ঞতাও কম থাকে। যুবক-যুবতী পাত্রী বা পাত্র নির্ব্বাচন করিবার সময় শারীরিক সৌন্দর্য্যকে এবং গান গাহিবার বা সরস কথোপকথন করিবার ক্ষমতাকে অত্যন্ত বেশী মূল্য দিয়া থাকে। বংশাবলীর দোষগুণ সম্যক্ বিচার করে না। এ সকল কারণে তাহাদের নির্ব্বাচনে অনেক সময় গুরু ভ্রমপ্রমাদ থাকিয়া যায়। পিতামাতা স্বভাবতঃই পুত্র-কন্যার হিতাকাঙ্ক্ষী। তাঁহাদের অভিজ্ঞতা বেশী। যৌবনোচিত প্রবল প্রবৃত্তিসমূহ তাঁহাদের কর্ত্তব্য-নির্ণয়ে বাধা জন্মায় না। শারীরিক সৌন্দর্য্যকে তাঁহারা ন্যায্য সমাদর করিয়া থাকেন। বংশাবলীর দোষ-গুণও তাঁহারা উচিতমত বিচার করিয়া থাকেন। এই সকল কারণে তাঁহাদের নির্ব্বাচন শুভপ্রসূ হইবার সম্ভাবনা বেশী। তাঁহারা যে কখনও ভুল করিবেন না, তাহা বলা যায় না। কিন্তু যুবক-যুবতী স্বয়ং নির্ব্বাচন করিলে যত বেশী ভুল হইবে, পিতামাতা তদপেক্ষা কম ভুল করিবেন। ইহার মধ্যে এমন কোন কথা নাই, যাহা হইতে সিদ্ধান্ত করা যায় যে, এই বিবাহ-পদ্ধতি প্রাচীনকালের উপযোগী ছিল, আজকাল উপযোগী নহে।

রবি বাবু বলেন যে, পূর্ব্বকালে মুক্তির জন্য বৃদ্ধবয়সে গৃহত্যাগ করিবার আদর্শ ছিল, আজকাল সে আদর্শ নাই। এই প্রবন্ধেরই আর এক স্থানে কিন্তু বলিয়াছেন, "সন্তানেরা বয়ঃপ্রাপ্ত হ'লে আজও অনেক গৃহী গৃহ ছেড়ে তীর্থে বাস করে।" তাহা যদি করে, তাহা হইলে আদর্শটা যে আজকাল নাই, তাহা বলা যায় না। তবে আদর্শটা যে প্রাচীনকালে অনেক বেশী সমুজ্জ্বল ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। যদিই বা ইহা সত্য হয় যে, আজকাল সে আদর্শ নাই, তাহা হইলেও আমাদের গৃহধর্ম্মের আদর্শই কেন ছাড়া উচিত, রবি বাবু তাহা স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই। রবি বাবু বলেন, "আমরা এক দিন ঘর ছাড়ব বলেই ঘর বেঁধেছিলুম। আজ আমরা আর সমস্তই ছেড়েছি, কেবল ঘরখানাই আছে।" যদি যথার্থই আমরা আর সমস্ত ছাড়িয়া থাকি, তাহা হইলেও ঘর শুদ্ধ ছাড়িয়া দিলে আমাদের অবস্থা কিসে ভাল হইবে, তাহা ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। একটা আশ্রয়—ঘরটাও ত আছে। তাহা ছাড়িয়া দিলে যে একেবারে পথে দাঁড়াইতে হইবে।

আত্মার উন্নতির জন্য বৃদ্ধবয়সে গৃহত্যাগ করিবার আদর্শটা প্রাচীন কালে একটা ভাল আদর্শ ছিল, এইরূপ রবি বাবুর মত বলিয়া মনে হয়। এই আদর্শ যদি প্রাচীনকালে ভাল ছিল, তাহা হইলে আজ-কাল কেন ভাল বলা যাইবে না? অতএব রবি বাবুর যদি ইহাই মত হয় যে, বৃদ্ধবয়সে গৃহত্যাগ করিবার আদর্শ সমাজে সজীব থাকিলেই হিন্দুদের বিবাহপ্রথা সার্থক হয়, তাহা হইলে বিবাহ-প্রথাটি পরিবর্ত্তিত না করিয়া প্রাচীন আদর্শটি সমুজ্জ্বল করিবার চেষ্টা করাই কি উচিত নহে? রবি বাবু যদি এই দিকে তাঁহার প্রতিভা প্রয়োগ করেন, তাহা হইলে যথেষ্ট সুফললাভের আশা করা যায়, তাহা বলাই বাহুল্য।

রবি বাবু বলিয়াছেন যে, প্রাচীনকালে গৃহস্থাশ্রমরূপ নদী অতিক্রম করিবার জন্য বানপ্রস্থাশ্রম প্রভৃতি নৌকার বন্দোবস্ত ছিল। এ জন্য প্রাচীনকালে গৃহধর্ম্মের গভীরতাই গৃহধর্ম্মকে অতিক্রম করিবার পক্ষে অনুকূল ছিল। এখন বানপ্রস্থাশ্রম প্রভৃতি উঠিয়া যাওয়াতে গার্হস্থ্যাশ্রমের গভীরতা অনিষ্টকর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমাদের গার্হস্থ্যাশ্রমের গভীরতাটি কি, রবি বাবু তাহা স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই। স্মৃত্যুক্ত পঞ্চ মহাযজ্ঞ আজকাল নাই। আছে স্ত্রী-পুরুষের পরস্পর একনিষ্ঠতা, সন্তানবাৎসল্য, পিতৃমাতৃভক্তি। কিন্তু এ সকল বিষয়ে "গভীরতা"

ছাড়িয়া দিলে, কিরূপে আমাদের উন্নতির সহায় হইবে, তাহা বুঝিতে পারা যায় না।

রবি বাবু বলেন, "আজকাল ভারতে কোন বড় তপস্যা গ্রহণ করতে গেলে গৃহত্যাগ করা ছাড়া উপায় নাই। কারণ, গৃহ একটা গর্ত্ত হয়ে উঠেছে।" আমাদের কিন্তু মনে হয় যে, বড় কায করিবার জন্য গৃহ ছাড়িতেন এখনকার অপেক্ষা আগেকার লোক খুব বেশী। প্রাচীনকালের খুব বড় লোকদের মধ্যে গৃহত্যাগীর সংখ্যাই বেশী, যেমন বুদ্ধদেব, মহাবীর, শঙ্করাচার্য্য, রামানুজ, শ্রীচৈতন্য, রূপ, সনাতন প্রভৃতি। আজকালকার খুব বড় লোকের মধ্যে গৃহ ছাড়িয়াছেন কেবল রামকৃষ্ণ পরমহংস, বিবেকানন্দ ও অরবিন্দ। রামকৃষ্ণ পরমহংস ও বিবেকানন্দ আজকালকার যুগে গৃহধর্ম্মের কোন বিশেষ অনুপযোগিতা দেখিয়া গৃহ ছাড়িয়াছেন, তাহা বলা যায় না। তাঁহারা প্রাচীনকালে জন্মগ্রহণ করিলেও খুব সম্ভব গৃহ ছাড়িতেন। অরবিন্দ অনেকটা রাজনৈতিক কারণে গৃহ ছাড়িতে বাধ্য হইয়াছেন। কিন্তু আজকালকার আরও অনেক বড় লোকের নাম করা যায়—যাঁহারা বড় কায করিবার জন্য গৃহ ত্যাগ করা প্রয়োজন বোধ করেন নাই। যেমন রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র সেন, বাল গঙ্গাধর তিলক, চিত্তরঞ্জন দাশ, মহাত্মা গন্ধী, জগদীশচন্দ্র বসু, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভাণ্ডারকর, গোখ্‌লে, রাণাডে, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় গৃহস্থাশ্রম গ্রহণ করেন নাই বটে, কিন্তু বিজ্ঞান বা বিদ্যা-চর্চ্চার জন্য বিবাহ করেন নাই, এরূপ বড় পণ্ডিত পাশ্চাত্যদেশেও আছে, বোধ হয়, তাঁহাদের সংখ্যা আমাদের দেশ অপেক্ষা বেশী। বাস্তবিক আমাদের বিবাহপদ্ধতি এবং গৃহধর্ম্ম বড় সাধনার অন্তরায় না হইয়া বরং অনুকূল বলিয়া মনে হয়। কোর্টশিপ, বিফল প্রণয় এবং অবৈধ প্রণয়ে পাশ্চাত্যদেশে অনেক সময় এবং উদ্যম বৃথা নষ্ট হয়, সে ক্ষতি আমাদের দেশে হয় না। আজকাল জীবনসংগ্রাম তীব্রতর হওয়াতে অল্পবয়সে বিবাহের ফলে যৌবনেই অনেকে পুত্র-কন্যার ভারগ্রস্ত হয়েন সত্য, কিন্তু ইহা যেমন এক দিকে কষ্টকর হয়, অপর দিকে উদ্যমের উত্তেজক হইয়া শুভ ফল প্রদান করে। বিবাহের বয়স বাড়াইয়া দিলে এই কষ্ট কিয়ৎপরিমাণে লাঘব হয় সত্য, কিন্তু অনেকগুলি নূতন অসুবিধা আসিয়া পড়ে,—তাহাদের মিলিত গুরুত্ব আরও বেশী। আজকালকার জীবন-সংগ্রামের তীব্রতা সকলের সুবিদিত। যদি সমাজে স্ত্রী-পুরুষের বিবাহের বয়স অনির্দ্দিষ্টভাবে বাড়াইয়া দেওয়া হয় এবং বিবাহ সম্পূর্ণভাবে ব্যক্তিগত ইচ্ছার উপর নিভর করে, তাহা হইলে অনেক পুরুষই বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হইতে স্বীকৃত হইবে না। কারণ, বিবাহে যেমন এক দিকে সুখ আছে, সেইরূপ একটা দায়িত্বও আছে। আজকালকার আর্থিক অসুবিধার দিনে সে দায়িত্ব অনেক স্থলে খুব কষ্টকর হয়। প্রাচীনকালের ব্রহ্মচর্য্যের সাধনা এবং আদর্শও নাই। আধুনিক শিক্ষার ফলে কষ্টকর দায়িত্ব স্বীকার না করিয়া ফাঁকি দিয়া সুখ-সংগ্রহের চেষ্টাই খুব বেশী রকম দেখিতে পাওয়া যায়। এ জন্য পুরুষদের বিবাহ করিবার অনিচ্ছার ফলে এক দিকে সমাজে দুর্নীতির বৃদ্ধি হইবে, অপর দিকে অবিবাহিতা বয়স্থা কন্যার সংখ্যা বাড়িয়া যাইবে। অবিবাহিতা বয়স্থা কন্যার সংখ্যাবৃদ্ধি হইলে এক প্রধান অসুবিধা এই যে, পিতামাতার অবর্ত্তমানে এই সকল কন্যা জীবিকার জন্য অত্যন্ত বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া পড়েন—বিশেষতঃ আজকালকার আর্থিক অস্বচ্ছলতার দিনে। মেয়েরা অবশ্য লেখাপড়া শিখিয়া চাকরী করিতে পারেন। কিন্তু সকলের চাকরী পাওয়া কঠিন। অধিকন্তু চাকরীর জন্য পরের দ্বারস্থ হইলে আত্মসম্মান রক্ষা করা দুরূহ—পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের পক্ষে তাহা বেশী লজ্জার বিষয় এবং যাহা আরও আশঙ্কার বিষয়, চাকরীর উমেদার হইলে রমণীগণকে অনেক সময় প্রলোভনের মধ্যে পড়িতে হইবে।

রবি বাবু বলিয়াছেন,—"এখন সময় এসেছে, নূতন ক'রে বিচার করবার ও বিজ্ঞানকে সহায় করবার, বিশ্বলোকের সঙ্গে চিন্তার ও অভিজ্ঞতার মিল ক'রে ভাববার।" কিন্তু এই ভাবে বিচার করিলেও আমাদের বিবাহপদ্ধতি পরিবর্ত্তন করিবার যথেষ্ট কারণ পাওয়া যাইবে বলিয়া মনে হয় না। বিজ্ঞান সম্বন্ধে রবি বাবু এই প্রবন্ধেই বলিয়াছেন যে, আমাদের বিবাহপদ্ধতি আধুনিক Eugenics বা বিজ্ঞানসম্মত। "বিবাহে সুসন্তান হবে, এই যদি লক্ষ্য হয়, তা হ'লে কামনা-প্রবর্ত্তিত পথকে (অর্থাৎ পাশ্চাত্য প্রথাকে) নিষ্ঠুরভাবে বাধা না দিলে চলবে না।" সুসন্তান উৎপাদন করা যে বিবাহের প্রধান লক্ষ্য, ইহা রবি বাবু বোধ হয় অস্বীকার করিবেন না। আমাদের প্রথা যদি এই প্রধান লক্ষ্যের অনুকূল হয়, তাহা হইলে তাহা পরিবর্ত্তিত করিবার প্রয়োজন নাই। আমাদের বিবাহপ্রথা এবং স্ত্রী-পুরুষের অবাধে মেলামেশা করিবার সম্বন্ধে নিষেধ কেবল সুসন্তান উৎপাদনের পক্ষে অনুকূল নহে; ব্যক্তিগত সুখ, পারিবারিক শান্তি, আধ্যাত্মিক উন্নতি সকলের পক্ষে সহায়ক।

বিশ্বলোকের সঙ্গে চিন্তা ও অভিজ্ঞতার মিল করিয়া ভাবিবার কথা রবি বাবু বলিয়াছেন। তাহাতেও বিশেষ আপত্তি নাই। পাশ্চাত্য দেশে স্বাধীন প্রণয়ের বিবাহের ফল কিরূপ দাঁড়াইয়াছে, তাহা বিবেচনা করিলে তাহাদের প্রথা বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে হইবে না। স্বাধীন প্রণয় এবং অবাধে মেলামেশার ফলে অনেক স্থলে বিবাহের বন্ধন অত্যন্ত শিথিল হইয়াছে। Divorce বা স্বামি-স্ত্রীর বিচ্ছেদের সংখ্যা অনেক বাড়িয়াছে। সে দিন "Tribune" সংবাদপত্রে দেখিলাম, আমেরিকার যুক্তরাজ্যে প্রতি সাতটি বিবাহে একটি করিয়া ছাড়াছাড়ি হয়। পাশ্চাত্য সভ্যতা ভারতীয় সভ্যতার তুলনায় নবীন। এই অল্পদিনের মধ্যে তাহাদের বিবাহপদ্ধতির কুফল অত্যন্ত পরিস্ফুট হইয়াছে। দাম্পত্য অশান্তির বিষে সমাজদেহ জর্জ্জরিত, কিন্তু সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া আমাদের যে বিবাহপদ্ধতি চলিয়া আসিয়াছে, এত দিনেও তাহার বেশী খারাপ ফল কিছু দেখা যায় নাই। রবি বাবুর বোধ হয় চোখে কল্পনার বালি পড়িয়াছিল, তাই আমাদের "গার্হস্থ্যের আবর্ত্তে প্রতিদিন বড় বড় নৌকাডুবি" এবং অনেক "দুঃসহ ট্র্যাজেডি" দেখিয়াছেন। সমাজে শৃঙ্খলা এবং গৃহে শান্তির পক্ষে আমাদের পদ্ধতিই অধিক উপযোগী বলিয়া মনে হয়।

বিবাহপ্রথার আলোচনা করিয়া তাহার পর রবি বাবু হিন্দুসমাজের অবরোধ-প্রথার আলোচনা করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, হিন্দুসমাজে স্ত্রী-পুরুষের অবাধে মেলামেশা নাই বলিয়া হিন্দুসমাজ নির্জ্জীব হইয়া পড়িয়াছে। তিনি বলেন যে, বীরের বীরত্ব, কর্ম্মীর কর্ম্মোদ্যম, রূপকারের কলা-কৃতিত্ব প্রভৃতি সভ্যতার সব বড় বড় চেষ্টার পিছনে নারীপ্রকৃতির গূঢ় প্রবর্ত্তনা আছে। ভারতে প্রাচীনকালে অনেক বীর-পুরুষ নারীর গৌরব রক্ষা করিবার জন্য অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন—সেই সকল বীরত্বের কাহিনীতে রাজপুতানার ইতিহাস সমুজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে। অবরোধপ্রথা তখনও ছিল, সমাজে স্ত্রী-পুরুষ কখনই অবাধে মেলামেশা করিত না, তাহা সত্ত্বেও নারীর প্রভাব, বীরত্ব উদ্‌বুদ্ধ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। অতএব নারীগণ সম্মুখে আসিয়া প্রশংসা না করিলে যে পুরুষের চিত্তে বীরত্বের স্ফূর্ত্তি হইতে পারে না, তাহা নহে। ইস্‌লামের ইতিহাসে বীরত্বের দৃষ্টান্ত বিরল নহে, ইস্‌লামীয়দের মধ্যে অবরোধপ্রথা হিন্দুদের অপেক্ষাও কঠোর। নারীগণ প্রকাশ্যে আসিয়া বীরত্বের সংবর্দ্ধনা করিলে তাহাতে কিছু কুফলও হইতে পারে। কারণ, নারীর সংস্পর্শে পুরুষের চিত্তে যেরূপ বীরত্বের স্ফূর্ত্তি হইবার সম্ভাবনা আছে, সেইরূপ রূপলালসারও উদ্রেক হইবার আশঙ্কা থাকে। বিগত য়ুরোপীয় মহাসমরের জয়ঘোষণা করিবার জন্য ইংলণ্ডে যে উৎসব হইয়াছিল, তাহাতে নারীগণ

সৈনিকদের প্রশংসা কিছু অতিরিক্ত মাত্রায় করিয়াছিলেন—অনেক বৈদেশিক সে দৃশ্য দেখিয়া লজ্জায় অধোবদন হইয়াছিলেন। বায়রণ ভাল কবিতা লিখিতে রমণীগণের নিকট উৎসাহ পাইয়াছিলেন সত্য, কিন্তু সে উৎসাহটুকু সমাজকে যে অতিরিক্ত মূল্যে ক্রয় করিতে হইয়াছিল, তাহা কে অস্বীকার করিবে? য়ুরোপীয় কবি-সমাজে আধ্যাত্মিক কবি বলিয়া গেটের (Goethe) যথেষ্ট সুখ্যাতি আছে। তাঁহার জীবন-চরিত পাঠ করিলেও পাশ্চাত্য সমাজে স্ত্রী-পুরুষের অবাধে মেলা-মেশার কুফল অতিশয় সুস্পষ্টভাবে দেখা দেয়। কথা এই যে, দেব-ভাব এবং পশুভাব উভয়ের মিলনেই মানবপ্রকৃতি গঠিত হইয়াছে। প্রায় সকল লোকের চিত্তেই পশুভাব বিদ্যমান, কাহারও মধ্যে তাহা বেশী স্পষ্ট, কাহারও মধ্যে তাহা লুক্কায়িত বা সুপ্ত। যে সুন্দর যুবক ভাল কবিতা রচনা করিতে পারেন এবং গীত গাহিতে পারেন, তিনি যদি ধর্ম্মজ্ঞানবর্জ্জিত হয়েন, তাহা হইলে অবাধে স্ত্রীলোকের সহিত মেলামেশার সুযোগের অপব্যবহার করিয়া তিনি সমাজের যথেষ্ট সর্ব্বনাশ করিতে পারেন এবং করিয়াও থাকেন। অনেক যুবতী কুমারী মনে করিতে পারেন, ইনি সত্যই আমাকে ভালবাসেন এবং শীঘ্রই আমাকে বিবাহ করিবেন। মুগ্ধা রমণী ইহাও মনে করিতে পারেন যে, প্রেমের অত্যাচার এবং অসহিষ্ণুতা একটু সহ্য না করিলে চলিবে কেন? এই ভাবে পদে পদে অগ্রসর হইয়া অনেক রমণীকে গভীর পঙ্কে নিমগ্ন হইতে হইয়াছে। বেশী বিপদের কথা এই যে, এরূপ ক্ষেত্রে পুরুষ অনেক সময় মনে করেন, তিনি সৌন্দর্য্যের চর্চ্চা করিতেছেন বা যুবতী-হৃদয়ের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করিবার সুযোগ পাইয়াছেন। তিনি যে পরের সর্ব্বনাশ করিতে গিয়া আত্মপ্রবঞ্চনামাত্র করিতেছেন, তাহা নিজেও অনেক সময় বুঝিতে পারেন না। কলাবিদ্যা (Fine Arts) বা সৌন্দর্য্য-চর্চ্চার দোহাই দিয়া তথাকথিত সভ্যসমাজে কেবল ইন্দ্রিয়জ নিকৃষ্ট সুখ এবং রূপলালসাকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়—ঋষিকল্প টলষ্টয় এই যে গুরু অভিযোগ আনিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে অন্ততঃ এইটুকু সত্য নিশ্চয়ই নিহিত ছিল যে, য়ুরোপীয় সমাজে কবি, অভিনেতা, চিত্রকর প্রভৃতি শিল্পিগণ সমাজে রমণীগণের সহিত অবাধে মেলামেশা করিবার সুযোগের যথেষ্ট অপব্যবহার করিয়াছিলেন এবং শিক্ষিত রমণীগণ তাঁহাদের প্রতিভার সমাদর করিতেন বলিয়াই এরূপ আচরণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সমাজে দুর্নীতি যদি বাড়িয়া যায়, গৃহের পবিত্রতা, সুখ ও শান্তি যদি বিনষ্ট হয়, তাহা হইলে উৎকৃষ্ট কাব্য-নাটক-আলেখ্য লইয়া কি হইবে? কিন্তু ইহা কি যথার্থ যে, শিল্পকলার চর্চ্চা করিতে গেলে সমাজে দুর্নীতির প্রসার অনিবার্য্য? ভারতের অতীত ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে ইহা সত্য বলিয়া মনে হয় না। রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থ প্রচারের সহিত হিন্দুসমাজে ধর্ম্মভাব গভীরতা এবং বিশালতা লাভ করিয়াছিল। সাধনা যেরূপ হয়, সিদ্ধিও সেইরূপ হইয়া থাকে। প্রাচীন ভারতে কাব্য, ভাস্কর্য্য প্রভৃতির উদ্দেশ্য ছিল—শিল্পকলার লোভ দেখাইয়া মানব-মনকে ঈশ্বরের দিকে আকৃষ্ট করা, ফলও সেইরূপ হইয়াছিল। পাশ্চাত্য দেশে সুখের জন্যই শিল্পকলার চর্চ্চা হইয়াছে, এ জন্য অনেক স্থলে ধর্ম্ম এবং সুনীতিকে পরাভব করিয়া শিল্পকলা নিজের বিজয়-কীর্ত্তি ঘোষণা করিয়াছে।

কেবল রামায়ণ-মহাভারতের যুগে নহে, তাহার বহু শতাব্দী পরেও ভারতবর্ষের শিল্প-কলায় ধর্ম্মের আদর্শ অক্ষুণ্ণ রহিয়াছিল। তাহার ফলে কোটি কোটি অর্থ ব্যয় করিয়া ভারতবর্ষের আসমুদ্র হিমাচল অগণিত সুগঠিত দেবমন্দিরে সুশোভিত হইয়াছে। কালিদাস, ভবভূতি প্রভৃতি মহাকবিগণ মানবধর্ম্মী ঈশ্বরকেই নায়ক-নায়িকা সাজাইয়াছেন এবং সকল কাব্যে ধর্ম্মকে শ্রেষ্ঠ আসনে বসাইয়া কামের উপযুক্ত স্থান ধর্ম্মের নীচে এবং ধর্ম্মের অনুগত বলিয়াই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। স্ত্রী-পুরুষের অবাধে মেলামেশা তখনও সমাজে ছিল না, তথাপি অসংখ্য উৎকৃষ্ট কাব্য গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল, বিবিধ শিল্প যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ যে বলিয়াছেন,—"সভ্যতার সমস্ত বড় বড় চেষ্টার পিছনে নারীপ্রকৃতির গূঢ় প্রবর্ত্তনা আছে", এ কথা অন্ততঃ ভারতবর্ষের সভ্যতা সম্বন্ধে আমরা স্বীকার করিতে পারি না। আমাদের সভ্যতার—গৌরবের বস্তু উপনিষদ, দর্শনশাস্ত্র, গীতা, ভাগবত; ইহাদের মধ্যে নারীপ্রকৃতির গূঢ় প্রবর্ত্তনা আছে বলিয়া মনে হয় না। অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগে যে বৈষ্ণবধর্ম্মের তরঙ্গ নবদ্বীপ হইতে উত্থিত হইয়া বাঙ্গালাদেশ, আসাম ও উড়িষ্যা প্লাবিত করিয়াছিল, সুদূর বৃন্দাবনে যুগান্তর ঘটাইয়াছিল,—কাব্য, সঙ্গীত এবং স্থাপত্য-শিল্পের উৎস খুলিয়া দিয়াছিল, তাহার মধ্যেও নারীপ্রকৃতির গূঢ়-প্রবর্ত্তনা কিছু ছিল বলিয়া মনে হয় না। উত্তর-ভারতের একটি শ্রেষ্ঠ সম্পদ তুলসীদাসের রামায়ণ। ইহার মধ্যে নারীপ্রকৃতির প্রবর্ত্তনা ছিল, কিন্তু রবি বাবু যে অর্থে বলিয়াছিলেন, তাহার বিপরীত অর্থে। অর্থাৎ রমণীর মনোরঞ্জন করিবার জন্য তুলসী-দাস রামায়ণ লিখেন নাই, প্রত্যুত তাঁহার সহধর্ম্মিণী তাঁহার জ্ঞাননেত্র উন্মীলন করিয়া দিয়াছিলেন; দেখাইয়া দিয়াছিলেন যে, জগতে রমণীর প্রেম অতি অসার বস্তু। তাই ভারতবর্ষ এই মহারত্ন লাভ করিয়াছিল। তার পর এই সে দিন এক নিরক্ষর ব্রাহ্মণ দক্ষিণেশ্বরে যে ভক্তির প্রদীপ জ্বালিয়াছিলেন, যাহার সংস্পর্শে নিজ হৃদয়ে জ্ঞানের আলোক জ্বালিয়া বিবেকানন্দ কেবল ভারতবর্ষ নহে, পাশ্চাত্যজগৎও চমকিত করিয়া দিলেন, তাহার পিছনেও নারীপ্রকৃতির গূঢ় প্রবর্ত্তনা কিছু ছিল না। রবি বাবু অবশ্য শিশুকলাকে লক্ষ্য করিয়াই এই কথা বলিয়াছিলেন। কিন্তু মস্ত ভুল করিয়াছেন এই যে, "সভ্যতার সমস্ত বড় বড় চেষ্টাকে" শিশুকলার অন্তর্গত মনে করিয়াছিলেন। জগতের সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্মান্দোলনগুলি কি সভ্যতার বড় বড় চেষ্টার অন্তর্গত নহে? এই সকল ধর্ম্মান্দোলনগুলির মূলে যে নারীপ্রকৃতির গূঢ় প্রবর্ত্তনা ছিল না, ইহা বোধ হয় রবি বাবুও অস্বীকার করিবেন না। বুদ্ধ ও মহাবীর, যীশু ও মহম্মদ, শঙ্করাচার্য্য ও রামানুজ, ইঁহাদের চেষ্টার পশ্চাতে নারী-প্রকৃতির কোন গূঢ় প্রবর্ত্তনা ছিল কি?

রবি বাবু বলিয়াছেন, "আমাদের দেশে কামিনী-কাঞ্চনকে দ্বন্দ্ব-সমাসের সূত্রে গেঁথে নারীকে ইতর ভাষায় অপমান করতে পুরুষ কুণ্ঠিত হয় না।" নারীকে অপমান করে তাহারা,—যাহারা তাহাদের পশুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার উপায়রূপে নারীকে চিন্তা করে এবং যাঁহারা চিত্র আঁকিয়া বা কবিতা লিখিয়া পুরুষের এই পশুপ্রবৃত্তির ইন্ধন যোগাইয়া দেন। যাঁহারা চোখে আঙ্গুল দিয়া পুরুষের এই পশু-ভাব দেখাইয়া দেন এবং বলেন, "তোমরা এই পশুপ্রবৃত্তি ত্যাগ করিয়া নারীকে মাতৃভাবে দেখিতে চেষ্টা কর", তাঁহারা ত নারীকে অপমান করেন না। তাঁহারা নারীকে সংসারের পঙ্কিল আসন হইতে উত্তোলন করিয়া দেবীর আসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। কাঞ্চনের সহিত কামিনীর উল্লেখ করিবার কারণ এই যে, নারী এবং অর্থের প্রতি অন্যায় আসক্তি পুরুষের আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রবলতম অন্তরায়। এই দুইটি অন্যায় আসক্তি ত্যাগ করিতে বলিবার মধ্যে ইতর ভাব কোথায়? রবীন্দ্রনাথ যাঁহাদের বিরুদ্ধে নারীকে ইতর ভাষায় অপমান করিবার অভিযোগ আনয়ন করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান ব্যক্তি বোধ হয় রামকৃষ্ণ পরমহংস। যে সর্ব্বত্যাগী মহাপুরুষ জগতের যাবতীয় নারীর মধ্যে জগন্মাতার মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, তিনি কি কখনও নারীকে ইতর ভাষায় অপমান করিতে পারেন? রবি বাবু বলিয়াছেন, "(নারীকে) ত্যাগ করার দ্বারা সে (পুরুষ) যে আত্মহত্যা করে, তা সে জানেই না।" আমাদের ত মনে হয়, বুদ্ধদেব গোপাকে ত্যাগ করিয়া, শ্রীচৈতন্যদেব বিষ্ণুপ্রিয়াকে ত্যাগ করিয়া, পরমহংসদেব সারদা

দেবীকে ত্যাগ করিয়া আত্মহত্যা করেন নাই, অমর হইয়া গিয়াছেন। শুধু যে তাঁহারা অমর হইয়াছেন, তাহা নহে, তাঁহারা যাঁহাদিগকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারাও সত্য সত্যই দেবীভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন। গোপার শেষ জীবনে ধর্ম্মভাব সাতিশয় প্রবল হইয়াছিল। বিষ্ণুপ্রিয়ার কঠোর ধর্ম্মসাধনার কথা পাঠ করিলে চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত হয়। সারদা দেবীর পুণ্যকাহিনী শ্রবণ করিলে বুঝিতে পারা যায়, তিনি অধ্যাত্মজগতের কত উচ্চ স্তরে আরোহণ করিয়াছিলেন। পরমহংসদেব যে নারীকে ইতর ভাবে অপমান করেন নাই, সত্য সত্যই জগন্মাতৃরূপে পূজা করিয়াছিলেন, তাহার কি ইহাই প্রকৃষ্ট প্রমাণ নহে যে, তাঁহার স্ত্রী জগন্মাতৃভাব নিজহৃদয়ে যথার্থভাবে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন? কারণ, তুমি অপরকে গভীর শ্রদ্ধার সহিত যে ভাবে নিরীক্ষণ করিবে, তোমার উপর যদি তাহার বিশ্বাস থাকে, তাহা হইলে সে সত্যই সেই ভাবাপন্ন হইয়া যাইবে। ফলতঃ এ বিষয়ে রবি বাবুর মত কেবল হিন্দুধর্ম্মের বিরোধী নহে, ব্রাহ্মধর্ম্ম ব্যতীত বোধ হয় পৃথিবীর সকল প্রধান ধর্ম্মমতের বিরোধী।

রবি বাবুর এই প্রবন্ধটির কোন কোন অংশ পাঠ করিলে মনে হয়, যেন তিনি বিবাহ বিষয়ে পাশ্চাত্য প্রথাও যথেষ্ট উদার বলিয়া বিবেচনা করেন না, তাহাদের নিয়মবন্ধনগুলিও তিনি উঠাইয়া দিবার পক্ষপাতী। "সকল সমাজেই বিবাহ-প্রথা সেই কালের, যখন মানুষ জীবনের পার্লামেণ্টে নিরন্তর প্রকৃতির opposition bench অধিকার ক'রে নিজের কর্তৃত্ব জাহির করিবার চেষ্টা করত।" "মানুষের সব চেয়ে বড় দুঃখ-দুর্গতি, বড় অপমান ও গ্লানি নরনারীর এই বিবাহ সম্বন্ধেই।" "কিন্তু যাঁরা মানব-সমাজে, আধ্যাত্মিকতা বিশ্বাস করেন, তাঁরা বিবাহ সম্বন্ধকে পাশব বলের অত্যাচার থেকে মুক্ত ক'রে দিয়ে সমাজে প্রেমের শক্তিকে সত্যভাবে বিকীর্ণ করবার উপায় অন্বেষণ করবেন, তাতে সন্দেহ নাই।" "বিবাহ অনুষ্ঠানে এখনও সমস্ত প্রথায় অভ্যাসে ও আইনে আমরা বর্ব্বর যুগে আছি।" কথাগুলি খুব পরিষ্কারভাবে বুঝিতে পারিলাম না। শুনিতে পাই, আজকাল পাশ্চাত্যদেশের যে সকল লেখক খুব উন্নত ও অগ্রসর, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ এরূপ মত দিয়াছেন যে, বিবাহ-প্রথাটাই উঠাইয়া দেওয়া উচিত। কারণ, স্ত্রীপুরুষের মধ্যে একবার প্রেমের সঞ্চার হইলে যে চিরকাল প্রেম অক্ষুণ্ণ থাকিবে, তাহার কোন মানে নাই এবং পরস্পর প্রেম যদি না থাকে, তাহা হইলে বিবাহের বন্ধন বড় অনিষ্টকর। তাহাদের না কি মত এইরূপ, যে সময়েই যে কোন স্ত্রীপুরুষের মধ্যে ভালবাসা হইবে, তখনই তাহাদিগকে মিলিত হইতে দেওয়া উচিত, তাহাদের মিলনে কোনরূপ বাধা উপস্থিত করিবার সমাজের অধিকার নাই। রবি বাবু কি এই ধরণের মতের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন এবং জগতে এইরূপ স্বাধীন প্রেমের প্রচার আকাঙ্ক্ষা করিয়াছেন? ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে আমরা অত্যন্ত দুঃখিত হইব সন্দেহ নাই। সে যাহাই হউক, কথাটা রবি বাবু আর একটু স্পষ্ট করিয়া বলিলে ভাল হয়।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।

বর্গা-জমী সমস্যা

বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনের কোন কোন ধারার কিছু কিছু অদল-বদল ও সংযোগ-বিয়োগ করা হইবে, এই উদ্দেশে বাঙ্গালা সরকার হইতে উক্ত আইনের পরিবর্ত্তন ও পরিবর্জ্জনের ধারাগুলি কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে।

বিলটি বাঙ্গালা ব্যবস্থাপক সভার সভ্যগণ কর্তৃক বিচারিত হইয়া গ্রহণীয়গুলি গৃহীত ও বর্জ্জনীয়গুলি পরিত্যক্ত হইবে। সম্প্রতি ব্যবস্থাপক সভার নির্ব্বাচিত কয়েক জন সভ্যের মধ্যে এই বিলটি বিবেচনাধীন ছিল—পরে সাধারণ সভ্যদের দ্বারা বিচারিত হইবে।

বিলটির কিছু কিছু পরিবর্ত্তনে জমীদার ও প্রজা উভয়েরই কিছু কিছু সুবিধা-অসুবিধা হইবে। দেশের মঙ্গলের জন্য, সর্ব্বসাধারণের হিতের জন্য প্রজাস্বত্ব আইনের উন্নতিকর পরিবর্ত্তনে দেশের সর্ব্বসাধারণ মত দিবে। কিন্তু এই বিল দ্বারা কাহারও প্রতি অন্যায় বা পক্ষপাত না হয়, তাহাও বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

নিজের জমী-জমাতে অধিকারবৃদ্ধি বা অধিকারচ্যুতি সামান্য কথা নহে। প্রজার হিতার্থ বিল গঠন করিতে গিয়া বাঙ্গালার চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কোনরূপ রূপান্তর এ দেশের পক্ষে শুভকর কি না, তাহাও ধীরভাবে বিবেচ্য।

এ বিলের অন্য যে কোন ধারার অপেক্ষা দেশের বর্গা বা ভাগী জমী সম্বন্ধীয় চলিত ব্যবস্থার পরিবর্ত্তনের গুজবই দেশে বিষম উত্তেজনার সৃষ্টি করিয়াছে। বর্গা-জমীর অধিকার-স্বত্ব লইয়া ইতোমধ্যেই জমীর মালিক ও চাষীর মধ্যে নানা দ্বন্দ্বের সূত্রপাত হইয়াছে, বাঙ্গালার কোথাও কোথাও ইহা লইয়া দাঙ্গা-হাঙ্গামা পর্য্যন্ত চলিতেছে।

সব দেশের লোকই স্থিতি হইবার আশায় কিঞ্চিৎ ভূ-সম্পত্তি করিবার চেষ্টা করে। সব দেশের মত বাঙ্গালা দেশেও এ ব্যবস্থা চলিত আছে। বাঙ্গালার গৃহস্থ-সমাজের মাটীর টান অন্যান্য সব দেশের অপেক্ষা বোধ হয় বেশী, তাই বাঙ্গালার অধিকাংশ স্থানে ঘর-বাড়ী, জোতজমা-সমন্বিত স্থিতিশীল গৃহস্থ বেশী দেখা যায়।

বাঙ্গালার চাষী বা অচাষী গৃহস্থ প্রায় সকলেরই কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ জমী-জমা ও বাড়ী-ঘর আছে। আছে বলিয়াই বাঙ্গালার পল্লীতে এখনও বসবাস-সমস্যা ও অন্ন-সমস্যা অন্যান্য উন্নত সভ্য দেশের মত ভীষণ হয় নাই।

জমী-জমা ভদ্র গৃহস্থেরও আছে, চাষী গৃহস্থেরও আছে। জমী কিছু থাকিলেই যে তাহাকে হেলে-চাষী হইতে হইবে, এ নিয়ম কার্য্যক্ষেত্রে টিকিতে পারে না। জমী যাহার বেশী থাকে, জমী দ্বারা যাহার ভরণ-পোষণ স্বচ্ছন্দে চলিতে পারে, সে গৃহস্থ আপনা হইতেই চাষী গৃহস্থ হয়। যাহার সে উপায় নাই, হাল-চাষের হাঙ্গামা পোহাইবার সুবিধা নাই, তাহাকে বাধ্য হইয়াই জমী অপরকে দিয়া চষাইয়া লইতে হয়।

এই ভাবে যে গৃহস্থ নিজ জমী চাষী গৃহস্থকে আবাদের জন্য দেয়, সেই জমীকেই বর্গা-জমী কহে। এই অবস্থায় জমীর মালিক অর্দ্ধেক শস্য গ্রহণ করে—চাষী বর্গাদার অর্দ্ধেক শস্য পায়। কোথাও বা জমীর মালিক শস্যের বদলে মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়া তাহাই বর্গাদারের নিকট হইতে লয়।

এই প্রথা দেশে বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে এবং এ প্রথা দেশের পরম উপকারও সাধন করিয়াছে। কারণ, জমীর মালিক অর্দ্ধেক শস্য দিবার বদলে নিজেই দিন-মজুর রাখিয়া জমী চাষ করাইতে পারিত; কিন্তু তাহা না করিয়া সে নিজ শস্যপ্রসূ ভূমির অর্দ্ধেক ভাগ জমীর চাষীকে দিতেছে। চাষীদেরও অনেকের নিজের জমী থাকাতেও বর্গা-জমী হইতেই হাল রাখার খরচ পোষাইয়া যায়।

বর্গা-প্রথা এ দেশের অনেকটা ঘরোয়া প্রথা; এবং বিশ্বাসের উপরই বর্গা-প্রথা চলিতেছে। চাষী গৃহস্থ হাতে তুলিয়া যাহা দেয়, জমীর মালিককে তাহাই লইতে হয়। বর্গাদারদের মধ্যেও পূর্ব্বে এ বিশ্বাস খুবই ছিল যে, ঠকাইয়া দুই মুঠা শস্য বেশী লইলেও নরকভোগ করিতে হইবে।

বাঙ্গালার মধ্যবিত্ত ভদ্র গৃহস্থদের অনেকের এইরূপ কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ জমী-জমা আছে। আজকাল এই শিক্ষা ও সভ্যতার যুগে উপার্জ্জনের অবস্থা যাহা দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে 'বল মা তারা দাঁড়াই কোথা' বলিয়া শতকরা পঁচানব্বই জন শিক্ষিতেরই অন্তরাত্মা কাঁদিয়া উঠে।

দেশে এই জমী-জমাটুকুর ভরসাও যদি না থাকিত, তবে অনেক

ভদ্র পরিবারকে অনাহারে মরিতে হইত, ইহাতে সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নাই। আজ দেশের অবস্থায় একান্ত অনভিজ্ঞ অথচ দেশের হিতকামী ও প্রজা-হিতকামী বলিয়া আত্মগর্ব্বী কেহ কিংবা দেশের সরকারই যদি কোন ব্যবস্থা দ্বারা ভদ্র গৃহস্থদের মুখের আহার হইতে তাহাকে বঞ্চিত করিবার প্রয়াস পান, তবে তাহাকে কোন্ দিক দিয়া হিতকর বলা যাইতে পারিবে ?

দেশের সকলের পক্ষে চাষী হওয়া যেমন অসম্ভব, তেমনই চাষী মাত্রেরই জমীর মালিক হওয়া অসম্ভব। কারণ, জমী যাহারা নিজ হাতে চাষ করে, তাহাদেরও শতকরা নব্বই জন দিন-মজুর।

যে সব সমীকরণবাদী প্রজা-দরদী সাজিয়া এই সব বাণী প্রচার করিয়া আসর জমাইতে চাহিতেছেন, তাঁহারা এই ভাবে চাষী প্রজার কি উন্নতি করিতে সমর্থ হইবেন, তাহা বুঝা দুর্ঘট। তাঁহাদিগকে এ কথা বিশেষভাবে বলা যাইতে পারে যে, বাঙ্গালার এ প্রথা কৃষি-উন্নতির সহায়ক, ক্ষতিকর নিশ্চয়ই নহে।

নিজে চাষ কেহ করে না বলিয়াই তাহাকে নিজ অর্জ্জিত বা পিতৃ-পুরুষের জমী ছাড়িতে হইবে, এরূপ প্রস্তাব কোন্ নীতি অনুমোদন করিবে ? তবে ব্যাঙ্কে গচ্ছিত মুদ্রা এবং অপরাপর সর্ব্বপ্রকার ভূসম্পত্তিতেই যদি এইরূপ সমীকরণ আইসে, তবে কোন রকমে পেট-ভাতা যাহাদের জমী দিয়া চলিতেছে, তাহারাও না হয় এই মহানুভবতা দায়ে পড়িয়া দেখাইতে পারে !

কিন্তু সেরূপ কোন ব্যবস্থাও শুধু মুখে মুখে করিলে চলিবে না। ষ্টেট বা রাজশক্তিকে এই ভার লইতে হইবে। কোন্ রাজশক্তি সুস্থ-চিত্তে এ ভার লইতে আসিবেন ?

গতবার সরকার যখন প্রজাস্বত্ব-আইনের পরিবর্ত্তনের বিল উপস্থাপিত করিয়াছিলেন, তাহাতে এই বর্গা-জমীর ভাগ-ব্যবস্থার ও নূতন বিধি প্রবর্ত্তনের কথা ছিল। তখন বর্গা-জমীর ব্যাপার লইয়া দেশে বিপুল বিক্ষোভ আরম্ভ হইয়াছিল। গ্রামবাসীদের মধ্যেই এ ভয় বেশী হইয়াছিল। বৎসরের পেটের ভাত যাহা হইতে চলিবে, অনেক মধ্যবিত্ত লোক সেই জমীও ভয়ে বর্গা দিতে পারিতেছিল না। এ সম্বন্ধে নানা গুজব রটিয়াছিল। পল্লীবাসীদের ধারণা হইয়াছিল, গবর্ণমেণ্টই এই সমস্ত অনায়ের চাবিকাঠি নাড়িতেছেন। যাহা লইয়া দেশে এত আলোচনা, ভীতি, উৎকণ্ঠা, তাহার সত্য স্বরূপটা কি, সে সম্বন্ধে দেশের জনসাধারণ বিশেষ কিছুই বুঝিতে পারে নাই।

এবারকার বিল যতটা দেখিয়াছি, তাহাতে বর্গা-জমীর সম্বন্ধীয় ব্যবস্থার কোন পরিবর্ত্তনের কথা পাই নাই। তবে পশ্চিম-বঙ্গের কোন কোন স্থানে জমীদারকে খাজনা টাকায় দেওয়ার পরিবর্ত্তে উৎপন্ন শস্যের কতকাংশ দিবার ব্যবস্থা আছে। বর্ত্তমান বিলে শস্যের পরিবর্ত্তে খাজনা টাকায় রূপান্তরিত করিয়া লওয়ার বিধি আছে। খাজনা হিসাবে জমীদারের অর্থপ্রাপ্তিই বোধ হয় সুবিধাজনক। স্থানীয় অবস্থা বিবেচনায় ব্যবস্থা ধার্য্য হইবে। কিন্তু ইহাতে বর্গা-জমীর কোন কথা আইসে না। বর্গা-জমী খাজনা করিয়া প্রজাকে দেওয়া নহে—পরিশ্রমের মূল্য অর্থে না দিয়া শস্যে দেওয়া মাত্র। বর্গা-জমীর ব্যবস্থা সম্পূর্ণ অন্যরূপ।

গতবার এই বিল পরিত্যক্ত হইলে বুঝা গিয়াছিল, বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনের যে পরিবর্ত্তন হইবার কথা ছিল এবং যাহা লইয়া জমীর মালিকদের মধ্যে মহা আতঙ্কের সৃষ্টি হইয়াছিল, সে ভয় সংপ্রতি কাটিয়া গিয়াছে। এখন নিশঙ্ক অবস্থায় আবার জমীর মালিকরা বর্গাবিলি করিতে পারিবেন। যে চাষ করিবে, আইনের বলে সে-ই জমীর মালিক হইতে পারিবে না। আইনে এই ভাবে যে ব্যবস্থা হইবার কথা উঠিয়াছিল, তাহা পরিত্যক্ত হইয়াছে। দেশের একটা মহা দুর্ভাবনা ও চাঞ্চল্যের কারণ দূর হইল। এই সুব্যবস্থার কথা সরকারের দেশময় প্রচার করিয়া দিয়া দেশের বিক্ষোভ দূর করা কর্ত্তব্য। আপনাদিগের মধ্যে মারামারি-কাটাকাটি দাঙ্গা-মোকর্দ্দমার সদ্য কারণ সংপ্রতি দূর হইল।

আবার বর্ত্তমানে এই বিলের কথা উঠিতেই দেশময় এই বিক্ষোভ আরম্ভ হইয়াছে। জমীর মালিক ভয় করিতেছে, জমী চাষ করিতে দিলেই তাহা বর্গাদারের হইবে, বর্গাদার চাষী ভাবিতেছে, ফাঁকতালে এতগুলি জমীলাভ—মন্দ কি! জমীর লোভে কৃষাণ দাঙ্গাহাঙ্গামা মামলা মোকর্দ্দমা করিতে খুব কমই ভীত হয়।

বিধবা, অনাথা,—ইহাদের অনেকের সম্বল এইরূপ দুই চারিখানি জমী মাত্র। এমন অনেক লোক আমাদের দেশে আছে, তাহাদের জমী অনেক স্থলে এই আইন-পরিবর্ত্তনের গুজবে বর্গাদারের কবলে শক্তভাবে পড়িয়াছে।

অনেক জমীর মালিক জমী পতিত রাখিতেছে, তবু ভাগ চাষীকে দিতেছে না। এই ভাবে পরসম্পত্তিলোলুপ নহে, এমন অনেক বর্গাদারও চাষের জমী পাইতেছে না। দেশের পক্ষে এ অবস্থা সাংঘাতিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

প্রজাস্বত্ব আইনের পরিবর্ত্তন দিলে এমন অন্যায় ব্যবস্থা থাকিতে পারে না বলিয়াই আমাদের ধারণা। যদি তাহাই হয়, তবে সরকারের অবিলম্বে তাহা দেশময় প্রচার করিয়া এই বিক্ষোভ দূর করা উচিত।

পরসম্পত্তি অধিকারের স্বপ্ন বা নিজ সম্পত্তির অধিকারচ্যুতি ভীতি দেশের সর্ব্বত্র সংক্রামিত হইলে তাহার ফল বড় বিষময় হইবারই সম্ভাবনা।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী।

বাণী-মঞ্জুষা

মৈমনসিংহে রবীন্দ্রনাথ

মুক্তির জন্য মানুষ দুর্দ্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা পোষণ করিয়া আসিয়াছে। মানুষের সহিত পশুদের প্রভেদ এই স্থানে—মানুষ আত্মার বলে জয়ী হইতে চাহে। যে মানুষ তাহার আশা-আকাঙ্ক্ষাকে নির্দ্দিষ্ট সীমা ও সাময়িক-অভাবের মধ্যে আবদ্ধ রাখিতে চাহে, সে নিতান্ত দরিদ্র। যখন সে স্বার্থের ক্ষুদ্র গণ্ডীর প্রভাব অতিক্রম করে, তখনই সৌন্দর্য্য ও গৌরবে মণ্ডিত হয়। প্রাচীন ভারতের আধ্যাত্মিক দান স্বার্থত্যাগ। স্বার্থমুক্ত বিশ্বজনীন আত্মা প্রকৃত শক্তি প্রদান করে—পূর্ণতা আনয়ন করে। এক দিন ভারত এই শিক্ষা দিয়াছিল। আমাদিগকে এখন সেই শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হইতে হইবে।

অভয়াশ্রমে রবীন্দ্রনাথ

কোনও দেশে জন্মগ্রহণ করিলেই যে লোকের উহা স্বদেশ হয়, তা নহে, লোক নিজের জীবনের কার্য্য দ্বারা সেই দেশের উন্নতিকল্পে আত্মনিয়োগ করিলে উহা তাহার স্বদেশ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। আমরা যে ভারতের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারি না, তাহার কারণ এই যে, আমরা প্রত্যহ ভারতকে সুস্থ ও সবল করিবার জন্য প্রতি মুহূর্ত্তে ভারতকে গড়িয়া তুলিবার উপকরণ ও উপচার দান করিতে পারি নাই। দেশসেবার দ্বারা আমাদের আত্মানুভূতিকে আচ্ছন্ন করিয়া আমরা ভারতকে আপনার করিয়া লইতে পারি, অন্যথা নহে।

কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ

ঢাকায় রবীন্দ্রনাথ

মানুষ লক্ষ্য পথকে লক্ষ্য বলিয়া ধারণা করিয়াছে বলিয়া জগতে অমঙ্গলের সৃষ্টি হইয়াছে। এই ভ্রান্ত ধারণার জন্য মানুষ অর্থোপার্জ্জনের প্রবল আকাঙ্ক্ষা ও বিলাস-লালসার অনিষ্টকর প্রভাব হইতে মুক্ত হইতে পারে না। মানুষ ভুলিয়া যায় যে, অর্থের ভোগ শান্তি বা আনন্দ প্রদান করিতে পারে না, অর্থের সদ্ব্যবহারই যথার্থ আনন্দ প্রদান করে। মানুষ জীবরূপে যেমন ঐহিক অভাব অনুভব করে, তেমনই আধ্যাত্মিক অভাবও অনুভব করে। কিন্তু মানুষ ভুলিয়া যায় যে, ঐহিক অভাব-আকাঙ্ক্ষাকে আধ্যাত্মিক অভাব-আকাঙ্ক্ষার মুখাপেক্ষী না করিলে প্রকৃত আনন্দ পাওয়া যায় না। মানুষের মনোরথের সমাপ্তি নাই, তাই সে অর্থের উপর অর্থ সংগ্রহ করিতে উন্মত্ত হয়, কিন্তু সেই অর্থ সে তাহার আত্মার জন্য সদ্ব্যবহার করে না। তখন সেই অর্থ তাহার উপর অভিসম্পাতের মত বর্ষিত হয়, ফলে প্রয়োজনাতিরিক্ত অর্থের চাপে মানুষ অবসন্ন হইয়া পড়ে। লালসার ফলে তাহার অজীর্ণ রোগ দেখা দেয়। ঐহিক সুখ-সৌভাগ্য যতক্ষণ আধ্যাত্মিক শান্তি ও আনন্দের অনুযায়ী হয়, ততক্ষণই তাহার সার্থকতা ও মঙ্গলসাধনের ক্ষমতা থাকে। ইহার বাহিরে গেলেই উহা অনিষ্টকর হয়। আধুনিক জগতে এই সনাতন সত্য স্বীকৃত হয় না বলিয়াই আমরা অগাধ ধনের পার্শ্বে বিরাট দারিদ্র্য-দুঃখ-কষ্ট, অভাব-অভিযোগ দেখিতে পাই। মানুষ তাহার প্রভাবে দলিত পিষ্ট হইয়া যাইতেছে, আর প্রতীকারের জন্য বলশেভিকবাদের মত বিকৃত পন্থা গ্রহণ করিতেছে। ভারতবর্ষ বহুকাল হইতে এই সনাতন সত্য উপলব্ধি করিয়া আসিতেছে, কিন্তু বর্ত্তমানে পাশ্চাত্যভাবে আচ্ছন্ন হইয়া ভারতবাসী সেই সত্য হইতে ভ্রষ্ট হইতেছে। ফলে নূতন নূতন দুর্দ্দমনীয় ভোগ-বিলাসের আকাঙ্ক্ষার সৃষ্টি হইতেছে এবং তাহাদের অতৃপ্তি হেতু ভারতের আধ্যাত্মিক অবনতি ঘটিতেছে। ভারতের পরাধীনতার ইহাই চরম অনিষ্টকর ফল। ভারত অসুরের লালসা সঞ্চয় করিয়াছে, অথচ সেই লালসা তৃপ্তির অনুকূল পণ্য প্রস্তুত করিতে পারিতেছে না। এই পাপ ভীষণ রোগরূপে তাহার জীবনীশক্তি ক্ষুণ্ণ করিতেছে। ভারত পাশ্চাত্য জগৎ হইতে তুচ্ছ খেলানার আমদানী করিয়া শিশুর মত আনন্দ-কলরব করিতেছে। এ মোহ ঘুচাইতে না পারিলে আমাদের পুনর্জীবনলাভ অসম্ভব হইবে—আমাদের স্বরাজলাভের আকাঙ্ক্ষাও মরীচিকার মত মিথ্যা হইবে।

কনভোকেশনে লর্ড লিটন

আমি এ দেশের বিদ্যালয়সমূহ পরিদর্শনকালে দেখিয়াছি যে, এ দেশের ছাত্রগণকে নানা ভাষায় শিক্ষালাভ করিতে হয়, কিন্তু ইহার উপরে তাহাদের আর এক বিষম অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। যে সমস্ত বিষয়ে তাহাদিগকে শিক্ষালাভ করিতে হয়, তাহা তাহারা মাতৃভাষার সাহায্যে করে না, এক বিদেশী ভাষার সাহায্যে তাহাদিগকে শিক্ষালাভ করিতে হয়। আমার বিশ্বাস, ইহাতে তাহাদের উন্নতিলাভের পথে অত্যন্ত বিলম্ব ঘটে। এই হেতু যাহারা ইংরাজীর পরিবর্ত্তে বাঙ্গালা ভাষার সাহায্যে সকল বিষয়ে শিক্ষালাভের পক্ষপাতী, তাঁহাদের সহিত আমার সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে।

সত্যাগ্রহে মহাত্মা

দক্ষিণ-আফ্রিকার প্রবাসী ভারতীয়দিগকে উপদেশ দিয়া মহাত্মা গন্ধী 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' পত্রে লিখিয়াছেন,—আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা অসীম, জগতে উহার তুল্য আর কিছু নাই। যাহারা আপনাদিগকে সাহায্য করে, জগৎ তাহাদিগকে সাহায্য করে। বর্ত্তমানে আত্মনিয়ন্ত্রণের অর্থ আত্মনিগ্রহ। আত্মনিগ্রহই সত্যাগ্রহ। যখন কাহারও মর্য্যাদাহানির আশঙ্কা হয়, যখন কাহারও ন্যায্য অধিকার অন্যায় পূর্ব্বক কাড়িয়া লওয়া হয়, যখন কাহারও জীবিকার্জ্জনের পথে অন্যায় পূর্ব্বক বাধা প্রদান করা হয়, তখন তাহার সত্যাগ্রহে সম্পূর্ণ অধিকার আইসে।

বসন্ত-ব্যথা

কোকিল কুহরে ধরি কুহুতান,
মাতাল পবন মাতা'ল পরাণ,
ধরণী প'রেছে নববস্ত্রখান-যতনে—
কাননে কাননে ফুটেছে বকুল,
গুঞ্জরি সুখে ধায় অলিকুল ;
রমণী অঙ্গ ঢাকিয়াছে ফুল-রতনে।
শিহরি পবন বয় ধীরে ধীরে,
জ্যোছনা লুটিছে মাঠে ঘাটে নীরে
চাষী গেয়ে বলে বসন্ত ফিরে এসেছে।
পাষাণ-গাত্র বহি' জলধারা
ছুটেছে রঙ্গে প্রেমে মাতোয়ারা,
বিরহিণী প্রাণ পেয়ে প্রিয়-সাড়া হেসেছে।
ফাল্গুন বায় বয় উতরোল,
ফিরে ঘরে ঘরে বলে দ্বার খোল ;
"বিরহিণী তব বিরহী পাগল এলো লো !
বঁধুয়া দুয়ারে লও তারে ডাকি"—
"বউ কথা কও' পাখী থাকি থাকি,
ডেকে কয় "প্রিয়ে মানের ছলা কি ফুরালো ?
ওই হের দূরে তটিনী উছলে,
রঙ্গে ভঙ্গে নেচে নেচে চলে ;
নূপুর বাজায়ে গান গেয়ে বলে ভামিনী
"বসন্ত এল, ঘুমন্ত পুরী—
মেলি আঁখিপাতা জাগিল শিহরি",
অঞ্চল-বাস ফুলে নিল ভরি কামিনী।
আমি কি গো আজ চেয়ে রব শুধু
আসিবে না হায় মম প্রাণবঁধু ?
হৃদি-ফুল-ভরা যৌবন মধু ঝরি গো--
সিক্ত করিবে বসন-আঁচল,
আঁখি-কোলে রেখা টানিবে কাজল !
বিরহী তোমার বিরহে পাগল করি গো !
নিশার প্রদীপ নিভে এল প্রায়,
থেমে এল মোর ফাল্গুন-বায়,
মম বসন্ত কাঁদে শুধু হায় ফুকারি—
বৃথা ফল-ফুলে সাজাইনু থালা,
নিশার প্রদীপ মিছে হ'ল জ্বালা ;
মন্দির মম করিল না আলা মুরারি !

শ্রীপ্রভাবতী দেবী।

বসন্তে

বসন্ত আনিছে ফিরে যৌবন-স্বপন,
মনে পড়ে সে কাহার প্রেমমুখখানি,
চুম্বনে অধরে রুদ্ধ আধ সুধাবাণী,
কণ্ঠে পারিজাতমালা বাহুর বন্ধন।
সুখস্পর্শ রসাতুর হৃদয়ে হৃদয়ে,
মোহভরা নবপ্রেম স্পন্দিত ছন্দিত,
নয়নে নয়নে কথা, শ্বাস সমীরিত
সুমধুর মুখচ্ছবি—হাসির উদয়ে।
কত আশা, কত প্রীতি—বিহঙ্গের গানে,
ভ্রমর-গুঞ্জনে কত রাগিণী-মূর্চ্ছনা,
বিশ্ব যেন প্রেমকাব্য—জীবন-কল্পনা,
সুধাধারা ঝরে ছুটি পিপাসী পরাণে।
মাঝে মাঝে পবনের কোমল হিল্লোল ;
জাগাইছে সারা প্রাণে আনন্দ-আন্দোল।

মুনীন্দ্রনাথ ঘোষ।

বাসন্তী

আজি নিরমল মোহন প্রভাতে
বাসন্তী মোর দিয়াছে দেখা,
সেজেছে ধরণী শ্যামল শোভাতে
সুনীল আকাশে মাধুরী-লেখা।
সে আজি এসেছে লয়ে মধুহাসি
চরণে ফুটিছে ফুল রাশি রাশি—
সুরভি অলক ; আসিতেছে ভাসি
মধুর গন্ধ পবনে।
আজি কুসুম-ভূষণে বাসন্তী আমার
এসেছে কুঞ্জ-ভবনে।
কর্ণে তাহার মল্লিকা-কুঁড়ি
ফুল্ল বকুল নাকছাপি
বক্ষে দুলিছে মালতীর মালা
পদ্ম করেতে চাপি।
এসেছে সে আজি প'রে যূথিবালা
শ্যামল সুষমা ; বনভূমি আলা
চরণে নূপুর বাজে মঞ্জুলা
আমার গানের তালে
ও সুর বাজে যে গোপনে আমার
পরাণ-অন্তরালে।

শ্রীউমানাথ ভট্টাচার্য্য

আবাহন

এস আজি মধুমাস বঙ্গে !
উচ্ছলি' দশদিশি মন্দ মধুর হাসি'
এস গো অমল উষা-সঙ্গে।

কুঞ্জ-কাননে আজি বিকচ কুসুমদল—
মঞ্জু ভ্রমর তাহে গুঞ্জরে অবিরল,
মত্ত মাতন তানে লক্ষ্য সাগর পানে—
ধাইছে তটিনী বীচিভঙ্গে।
এস আজি মধুমাস বঙ্গে !

জোৎস্না-উজল নিশি হেরি যে গো তোমা-ময়,
অপরূপ তব রূপ হৃদিমাঝে জেগে রয়,
তপ্ত দিনের শেষে স্নিগ্ধ অনিল বেশে
মুগ্ধ কর গো সারা অঙ্গে।
এস আজি মধুমাস বঙ্গে !

শিশিরের নীহারিকা ঝ'রে গেছে সারা রাতি,
এবে কুহু কুহু তানে বনে বনে মাতামাতি ;
আম্রমুকুল-বাসে, পলাশ-গাঁদার রাশে,
ভেসে এস পুলক তরঙ্গে।
এস আজি মধুমাস বঙ্গে !

শ্রীচিত্তরঞ্জন সেন।

অনুনয়

বারেক করুণাভরে চাহিও আমার পানে,
শীতল করিও হৃদি অমিয় বচন দানে।
আমি প্রিয় তোমা লাগি,
র'ব সারা নিশি জাগি ;—
প্রভাতে দরশ দানে, পুলক জাগায়ো প্রাণে,
শ্রবণ জুড়াবো মোর তোমার মোহন গানে।

কেটে গেছে কত দিন কত রাতি দীর্ঘ মাস,
বুকেতে উঠেছে ভরি কত ব্যথা হা-হুতাশ !
আজি তোমা বার বার,
স্মরি প্রিয় হে আমার,
পুরাও করুণা করি' প্রাণের ব্যাকুল আশ,
বিরস বদনে সখা, ফুটাও বিমল হাস।

শ্রীদেবী মুখোপাধ্যায়।

বসন্ত-হোলী

আজি কার হোলী-খেলা ধরার বুকে !
ফাগুনেতে কেবা ফাগ দিয়েছে মেখে ?
ফুলবন-পথে আজি,
কেবা নবসাজে সাজি'
এল ধরাপরে হাসি মুখেতে মেখে ?
আজি কার হোলী-খেলা ধরার বুকে !

ঘন ঘন হিয়াখানি আজিকে দোলে !
মঞ্জুল মঞ্জরী শাখায় ঝোলে!
আজি দেখি লালে লাল
কার দু'টি ভরা গাল !
শ্যামল আঁচলখানি দিল কে খুলে ?
ঘন ঘন হিয়াখানি আজিকে দোলে !

আজি কার পরশন হিয়ায় জাগে ?
রাঙিছে অযুত হিয়া প্রেমের ফাগে !
আজি কার শিহরণ ?
এত মধু বরিষণ !
আকুল আবেগ কেন মলয়ে মাগে ?
আজি কার পরশন হিয়ায় জাগে ?

আজি কার সাড়া পেয়ে গাহিছে পাখী,
হাজারে হাজারে যেন উঠিছে ডাকি।
পাপিয়া পরাণ খুলি'
ধরেছে মধুর বুলি
বনেতে কুসুম-কলি মেলিছে আঁখি !
আ৷জ কার সাড়া পেয়ে ডাকিছে পাখী ?

আজি যেন হিয়াখানি ভ'রেছে রঙে !
শিথিল কবরী যেন লুটিছে অঙ্গে !
দখিণা বাতাস আসি'
ঢেলেছে ফুলের রাশি !
উঠেছে তুফান-রাশি প্রেমের গাঙে।
আজি যেন হিয়াখানি ভরেছে রঙে !

আজি কি ব্রজের হোলী এসেছে ফিরে ?
পাপিয়া বাঁশীর স্বর নেছে কি হ'রে ?
বনমালা বনচুড়ে,
আজি কি রয়েছে প'ড়ে ?
গেঁথেছে অযুত মালা থরে বিথরে !
আজি কি ব্রজের হোলী এসেছে ফিরে ?

অলি বুঝি ফুলে ফুলে নূপুর-রোলে !
শাখে শাখে পীতবাস আজিকে দোলে !
গাছগুলি ফাগ-মাখা,
লালে লাল ফুল ঢাকা !
হিয়াপরে রঙ্ মাখা সঘনে দোলে !
অলি বুঝি ফুলে ফুলে নূপুর-রোলে !

রাঙিছে অযুত হিয়া প্রেমের ফাগে !
আজি তাই মাতামাতি ফুলের বাগে !
ধরা'পরে আজি বিধু
ঢালিয়া দিয়াছে সীধু !
আজি তাই পরশন মলয়ে জাগে !
রাঙিছে অযুত হিয়া প্রেমের ফাগে !

শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত।

বসন্ত-সংবাদ

ওগো এই কি তুমি সেই মধুমাস—
বাণীর মনোমুগ্ধকর ;
এই কি সাধের সেই উপবন,
রক্ত-কমল সরোবর ?
এই কি তোমার চন্দনবাস—
মলয় হাওয়ার প্রথম দান,

এই কি ফাগুন ফুলবনে তোর
কণ্ঠে শ্যামার মিষ্টি গান ?
তোমার চারু অঙ্গে কোথায়
স্নিগ্ধ শ্যামল আঁচল ঢাকা,
আজ যমুনায় কোন্ বাঁশরী—
কোথায় ব'সে বাজায় বাঁকা ?
কৈ গো কবি বাল্মীকি, ব্যাস,—
• কৈ সে কালি-চণ্ডিদাস,
কৈ মোহিনী, মদন, রতি,
কৈ রজকীর প্রেমনিবাস ?
আজ ভারতের কোন্ প্রদেশে—
কুসুম হাসে বনে বনে,
কোথায় মধুপ আত্মহারা—
নিত্য মধুর অন্বেষণে ?
কোথায় ভোলা তপের ঝোলা —
দিচ্ছে ফেলে আনমনে,
রক্ত-রাঙ্গা লজ্জা সতীর—
ঘুচায় প্রেম-আলিঙ্গনে ?
কোথায় চাতক, "বউ কথা-কও",—
কোথায় শিখীর নৃত্য কেকা,
কোথায় ফাগুন আগুন তোমার,—
কোথায় ফাগের রক্ত-লেখা ?
আজ কি তোমার কুসুম ফোটে—
শূন্য ভারত-শ্মশান-ভূমে,
মিটায় রতি প্রেমের তৃষা—
মন্মথেরি শবকে চুমে ?
আজ কোথা সে সোনার ভূষণ,
মা যে আমার দিগম্বরী,
হায় কোথা সে জগদ্ধাত্রী,—
এ যে কালী ভয়ঙ্করী ?
যে দিন স্বাধীন ভারত ছিল
এই ধরণীর মুকুট-মণি,
ঋতুরাজের রত্ন-আসন—
সত্যি হেথায় ছিল মানি !
আজ পরাধীন, অন্ন-বিহীন,—
পরের দ্বারে কাঙ্গালী,
আমরা হীন ভারতবাসী,—
আমরা কালা বাঙ্গালী !
তাই কি দূরে গেছ স'রে—
সঙ্গে নিয়ে জয়-নিশান ?
ফাল্গুনে তাই কাল্-বোশেখীর—
ঝঞ্চা বাজায় এই বিষাণ ?
ভাঙ্গা-বুকে সয় না গো আর,—
আঁধার হলো দুই নয়ান,
আবার কবে সরস তোমার—
পরশ হবে দৃশ্যমান ?
মানস-নভে হাস্‌বে কবে—
মুক্তি-সুখ-চন্দ্রমা,
পুষ্পবনে ভ্রমর সনে—
গাইবে চারণ-চন্দনা ?
আবার কবে মধুর হবে—
আকাশ আলো বাতাস জল,
স্বচ্ছ তোমার প্রেমের ধারায়
সিক্ত হবে বঙ্গ-তল ?
ফাগুন্ তোমার কাল্‌গুণে আজ—
ভাব্‌ছি কতই আন্‌মনে !
অন্ধ-আশায় চেয়ে আছি—
দিগন্তের ঐ আস্‌মানে !

শ্রীঅমূল্যকুমার রায় চৌধুরী।

বসন্তের স্মৃতি

সবে গেছে চ'লে নববসন্ত
রেখে গেছে সুখ স্মৃতি ;
এখনও স্বচ্ছ সুনীল আকাশে
নিশীথের শশী তেমতি হাসে
শ্যামল কুঞ্জ-কানন ছাইয়ে
উঠে পাপিয়ার গীতি।
গেছে দূরে চলি রেখে গেছে হেথা
শুধু পদাঙ্ক-রেখা ;
পুষ্প-গন্ধে ভরিয়া ভুবন
বহে ত স্নিগ্ধ সান্ধ্য-পবন
সাদর আহ্বানে এখনও সে যেন
ডাকে বসন্ত-সখা।
আসিবে না ফিরে মিছে তারে আর
কাস নাই পাখী ডেকে, ;
নন্দন বনে সুরবালাগণে
লয়েছে তাহারে ধরিয়া যতনে
সেথা সবে ছিল তাহারি বিহনে
শীতের কুহেলী মেখে !
পুনঃ মধুমাসে নববেশে তুমি
এস ধরণীতে ফিরে ;
ভরি আনন্দে দিগ্ দিগন্ত
এস ফিরে এস নব-বসন্ত,
মুগ্ধা ধরণী কাটায় তোমার
স্মৃতিটুকু বুকে ধ'রে।

শ্রীমতী রমলা ঘোষ।

ব্যথিত

নিঠুর পীড়নে হিয়ার মাঝারে
বেদনা বাজিছে নিতি—
মরমে তোমার পশে না কি তার
একটি করুণ গীতি !
আলোকের লাগি প্রাণ তৃষাতুর
ঝরিছে নয়ন-লোর ;
কোন্ সুর দিয়ে বাঁধিব আবার
• জীবন বীণাটি মোর।
অন্ধ-নিয়তি ক্ষতি নাহি তায়
আশায় রয়েছি কবে—
বেদনার মাঝে মাধুরী তোমার
আপনি ফুটিয়া রবে।

শ্রীহরেন্দ্রকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

বসন্ত-বিরহী

সেবার আমি ব'সে ব'সে ভাব্‌তেছিলাম উন্মনা ;
ছিলাম যখন আন্‌মনা,
বসন্ত সে ফিরে গেছে মোর দ্বারে,
হায় অভাগা, এমন সময় খুঁজলে কি আর পায় তারে !
এবারও সে এসেছিল সব মাধুরী ছড়ায়ে,
গন্ধ-গানের উত্তরীটি উড়ায়ে,
গুঞ্জরণ আর মুঞ্জরণের মন্তরে,
পড়ছে মনে ঢুকতে যেন চেয়েছিল অন্তরে !
বনবীথির অশোক-পলাশ কৃষ্ণচূড়া ফুটায়ে,
যুঁই-চামেলী-মল্লিকা-বাস ছুটায়ে ;
কিশলয়ের কিশোর শ্যাম অঞ্চলে,
এসে মোরে মুগ্ধ হেরে' গেছে চ'লে কোন্ ছলে !
আত্মহারা চিত্ত রে মোর মত্ত হয়ে কোন্ ধ্যানে,
মন-পাতালে ছিলি রে কার সন্ধানে ;
কত আলোক সান্দ্র পলক গন্ধ রে,
হারিয়ে গেল হাতের পাশে এমনি ছিলি অন্ধ রে !
কোয়েল দোয়েল ফিঙে শ্যামা শালিকা পিক-চন্দনা,
কণ্ঠসুধায় গাইলে তাহার বন্দনা ;
এ কি মুখর ! কম ব্যথা,
নান্দীমুখে মূক র'লি তুই কইলিনেকো এক কথা !
দ্যুলোক-ভূলোক লুটে নিলে তার মাধুরী-সঞ্চিত,
মন-মধুকর রইলি শুধু বঞ্চিত ;
আজকে নিরাশ-ক্রন্দনে,
হায় দুরাশা, বাঁধবি তারে দুটি কথার বন্ধনে।

শ্রীগোপাললাল দে।

জ্যোৎস্নায়

আজি কোন কায নয়,
শুধু মোরা দু'জনে
কাটাব রজনী, সই
মধুকল কূজনে।
চেয়ে' রব মুখে মুখে
বুক রাখি বুকে বুকে,
প্রাণে প্রাণে সুগোপন
প্রণয়েরি পূজনে
মধুকল কূজনে।
ভেসে যাব, ভেসে যাব
নাহি জানি কোথা রে,
দুই জনা—বাহু-বাঁধা—
জোছনার পাথারে।
ধরণীর দুখব্যথা
খুঁটি-নাটি, কাতরতা,
ধুয়ে মুছে' একাকার—
সোহাগের সাঁতারে
জোছনার পাথারে।
নীলাকাশে নীলপরী
রত রঙ্‌ স্বপনে
মিশে যাব, মিশে যাব
ওরি' মাঝে গোপনে।
ওই বুকে রব মরে—
হিয়া বাঁধা চিরতরে—
যুগে-যুগে মিলনের
প্রিয়-সুখ-স্বপনে—
দুই জনা গোপনে।

শ্রীনলিনীভূষণ দাশ-গুপ্ত।

সেই মুখখানি তার

১

নবীন বসন্ত এল ফেনিল উচ্ছ্বাস-ভরা,
প্রভাতে জাগিয়া দেখি নবীন শ্যামল ধরা।
পাতায় পাতায় আলো, ফুলে হাসি খেলে যায়,
পুলকে শিহরে তনু দখিণা মলয় বায়।
গাইছে দোয়েল শ্যামা, পাপিয়ার মধু-গান,
কোকিলের কুহু-কুহু যেন বাঁশরীর তান ;
মুঞ্জরিত তরুশাখে, গুঞ্জরণ করে অলি,
গাইছে একটি পাখী, 'বউ কথা কও' বলি।
চঞ্চল হৃদয়খানি, শিহরিল বার বার,
জাগিয়া উঠিল মনে, 'সেই মুখখানি তার।'

২

দুপহরে ব'সে ব'সে চেয়ে দেখি বাতায়নে,
পথিকেরা পথ বেয়ে চলিতেছে একমনে।
চারিদিকে রোদ খেলে, মাঠেতে চরিছে ধেনু,
গাছের ছায়ায় বসি রাখাল বাজায় বেণু।
ঝিকমিক করিতেছে দীঘির সে কালো জল,
মরাল-মরালী খেলে শুভ্র তনু ঢল-ঢল।
ক্ষীণা তন্বী নদীখানি কে জানে কোথায় যায়,
নীল বারি-রাশি তার দুলিছে দখিণা বায়।
দেখিতেছি অপরূপ, ফাগুনের শোভা-ভার,
হঠাৎ পড়িল মনে, 'সেই মুখখানি তার।'

৩

ডুবিল তপন ধীরে, ব'লে গেল যাই যাই,
আঁধারে ছাইল সবি যেন আর কিছু নাই ;
কুলায়ে ফিরিল পাখী, গান শেষ হ'ল তার
শ্রান্ত-ক্লান্ত হিয়াগুলি রেখে এল কর্ম্মভার।
অসীম উদার নীল, নীরব গগনতলে,
ক্ষীণ প্রদীপের মত তারাগুলি যেন জ্বলে।
আঁধারের আলোকের অপরূপ মিশামিশি,
অবাক্ নয়নে হেরি বাতায়নপাশে বসি,
ধীরে ধীরে জেগে উঠে হাসিখানি চন্দ্রমার,
অমনি পড়িল মনে 'সেই মুখখানি তার।'

৪

নীরব নিশীথকালে নিদ্ নাহি দুনয়নে,
জাগিয়া বসিয়া থাকি উদাসীন আন্‌মনে।
ব্যাকুল বাসনা কাঁদে দখিণা মলয় বায়,
কুসুমের মালাগাছি অভিমানে ঝরে যায়,
কেশ বেশ আলু-থালু ঘুমে ঢুলে পড়ে আঁখি,
যদি এসে, চ'লে যায়, এই ভয়ে জেগে থাকি।
নীরব নিথর সবি চাঁদের আলোয় ভরা,
আমি কাঁদি, এস বঁধু বাহুপাশে দাও ধরা।
নিশি-শেষে ঝরে পড়ে ছিন্ন মালা লতিকার,
স্বপনে জাগিয়া উঠে 'সেই মুখখানি তার।'

শ্রীভূপেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী।

প্রলয়ের আলো

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ

গুপ্তসমিতির অধিবেশন

রাত্রি সাড়ে এগারটার ঘণ্টা বাজিবামাত্র জোসেফ পশু-লোমনির্ম্মিত শীতবস্ত্রে সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিয়া তাহার শয়ন-কক্ষ ত্যাগ করিল। সে প্রথমে সলোমন কোহেনের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চলিল। সে সেই কক্ষে রেবেকাকে দেখিতে পাইল না, সলোমন কোহেন অগ্নিকুণ্ডের নিকট বসিয়া ধূমপান করিতেছিল। জোসেফকে সেই কক্ষে প্রবেশ করিতে দেখিয়া সে বলিল, "তুমি প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছ? আব্রাহামের ঈশ্বর তোমাকে রক্ষা করুন। আমি জানি, তুমি কর্ত্তব্যপালনে কুণ্ঠিত হইবে না। আজ রাত্রিকালে আমরা যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিব, যদি তাহা নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হয়, তাহা হইলে সমগ্র জগৎ স্তম্ভিত হইবে। য়ুরোপের ইতিহাসের আমূল পরিবর্ত্তন হইবে।"

জোসেফ সলোমনের কথায় কর্ণপাত না করিয়া আগ্রহ ভরে বলিল, "রেবেকা এখানে নাই?"

সলোমন বলিল, "না, রাত্রি অধিক হইয়াছে, সে বোধ হয় শয়ন করিতে গিয়াছে। তাহাকে কি তোমার কিছু বলিবার আছে?"

জোসেফ তাচ্ছীল্যভরে বলিল, "না, আমার তেমন কিছু বলিবার নাই, কেবল তাহার নিকট বিদায় লইবার ইচ্ছা হইতেছিল।" রেবেকাকে শেষ দেখা দেখিবার জন্য তাহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিতেছিল, কিন্তু সে ভাব সে প্রকাশ করিল না। সে সলোমন কোহেনের নিকট বিদায় লইয়া পাষাণ-নির্ম্মিত সোপান অতিক্রম করিয়া বহির্দ্বারে উপস্থিত হইল। জোসেফ দেখিল, দ্বারের অর্গল মুক্ত। সে দ্বার খুলিয়া পথের দিকে দৃষ্টিপাত করিল, পথের আলোকে পরিচ্ছদাবৃত একটি নারী-মূর্ত্তি তাহার দৃষ্টিগোচর হইল। জোসেফ তৎক্ষণাৎ চিনিতে পারিল—সেই অবগুণ্ঠনবতী রেবেকা!

জোসেফ সবিস্ময়ে বলিল, "রেবেকা, এই গভীর নিশীথে তুমি এখানে কি করিতেছ?"

রেবেকা দ্বারের নিকট সরিয়া আসিয়া বলিল, "তোমার জন্য দ্বার খুলিয়া রাখিয়া, তোমার নিকট বিদায় গ্রহণের জন্য এখানে প্রতীক্ষা করিতেছি। তোমাকে সতর্ক করিবার জন্য দুই একটি কথা বলাও কর্ত্তব্য মনে হইতেছিল।"

রেবেকা যে স্থানে দাঁড়াইয়া জোসেফের সহিত কথা কহিতেছিল, সেই স্থানটি অন্ধকারাবৃত। জোসেফ হাত বাড়াইয়া রেবেকার হাত ধরিল এবং আবেগকম্পিত স্বরে বলিল, "আমার প্রতি তোমার অসাধারণ দয়া। আমি তোমার পিতার নিকট বিদায় লইতে গিয়াছিলাম, সেখানে তোমাকে দেখিতে না পাওয়ায় আমার মন ক্ষোভে ও নিরাশায় পূর্ণ হইয়াছিল, মনে হইয়াছিল—এ জীবনে আর বুঝি দেখা হইল না। এখানে অপ্রত্যাশিতভাবে তোমার সাক্ষাৎ পাওয়ায় আমার ক্ষোভ ও নিরাশা দূর হইয়াছে। রেবেকা! বিদায়দানের পূর্ব্বে আমাকে কি ভাবে সতর্ক করিবার জন্য তোমার আগ্রহ হইয়াছে, তাহা জানিতে পারিলে সুখী হইতাম।"

রেবেকা তাহার হাতের ভিতর হাত রাখিয়া গাঢ় স্বরে বলিল, "তুমি যে কার্য্যের ভার গ্রহণ করিতে যাইতেছ, তাহা অত্যন্ত বিপজ্জনক কার্য্য। এই কার্য্য কিরূপ ভয়াবহ, তাহা আমার অজ্ঞাত নহে। সকল দিক দিয়াই ইহাতে বিপদের আশঙ্কা আছে, মৃত্যু অপরিহার্য্য। সেই জন্য আমার অনুরোধ—প্রতি পদক্ষেপে তুমি সতর্কতা অবলম্বন করিবে। সকল দিকে দৃষ্টি রাখিয়া চলিবে, যদি বিপদ অতিক্রম করা সম্ভবপর হয়, তাহা হইলে ইচ্ছা করিয়া বিপদ আলিঙ্গন করিও না।"

জোসেফ নৈরাশ্যভরে হাসিয়া বলিল, "সতর্ক থাকিবার জন্য কেন আমাকে অনুরোধ করিতেছ? জীবন নিরাপদে রাখিবার জন্য চেষ্টা করিয়া কি ফল?"

রেবেকা ক্ষুব্ধস্বরে বলিল, "যাহারা তোমাকে ভালবাসে, তাহাদের মুখের দিকে চাহিয়াই তোমার জীবনরক্ষার চেষ্টা করা উচিত। তোমার জীবন-বিসর্জ্জনের সংবাদে তাহারা কিরূপ মর্ম্মাহত হইবে, তাহা কি তুমি বুঝিতে পারিতেছ না?"

জোসেফ বিমর্ষ স্বরে বলিল, "আমার মৃত্যুতে আমার পিতামাতা ভিন্ন অন্য কেহ অশ্রুত্যাগ করিবে না, আমার বিয়োগ-শোকে অন্য কেহ কাতর হইবে না।"

রেবেকা গাঢ়স্বরে বলিল, "আর এক জনও কাতর হইবে, তোমার বিয়োগ-বেদনায় মর্ম্মাহত হইবে—সে আমি। তুমি আমাকে তোমার ভগিনীর ন্যায় স্নেহ করিবে—অঙ্গীকার করিয়াছ। ভ্রাতার বিয়োগে ভগিনী কিরূপ কাতর, ক্ষোভে দুঃখে কিরূপ ম্রিয়মাণ হয়, তাহা কি তোমার বুঝিবার শক্তি নাই? তোমার জীবনরক্ষার জন্য অনুরোধ করিবার আমার অধিকার আছে।"

জোসেফ বলিল, "হাঁ, আমাকে তোমার ভ্রাতার ন্যায় স্নেহের পাত্র মনে করিয়া আসিতেছ। পৃথিবীতে ভ্রাতা অপেক্ষাও নারীর অধিকতর প্রীতির পাত্র আছে; আমি তোমার সেই প্রীতি লাভ করিতে পারিলাম না, ইহাই আমার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দুর্ভাগ্যের বিষয়।"

রেবেকা বলিল, "আমি তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তোমার এই আশা পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা নাই। তথাপি তুমি পুনঃ পুনঃ এই অনুরোধ করিয়া আমাকে মর্ম্মাহত করিতেছ!"

জোসেফ বলিল, "হাঁ, তুমি পুনঃ পুনঃ বলিয়াছ, আমার আশা পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা নাই; কিন্তু আমার আশা কি জন্য অসম্ভব, তাহা তুমি এ পর্য্যন্ত আমার নিকট গোপন রাখিয়াছ। আজ আমি জীবন ও মৃত্যুর সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া আছি; তথাপি তোমার ও রহস্য জানিতে পারিলাম না।"

জোসেফ মুহূর্ত্তকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিল, "বেশ, তাহাই হউক; জীবনোপান্তে দাঁড়াইয়া তোমার গুপ্ত রহস্য জানিবার জন্য আর আমি আগ্রহ প্রকাশ করিব না। এখন তোমাকে আমার একটি অনুরোধ আছে; আমার মৃত্যু-সংবাদ পাইলে তুমি আমার এই অনুরোধটি রক্ষা করিও। এখানে আমার যে সকল জিনিষপত্র থাকিল, তাহা আমার পিতামাতার নিকট পাঠাইতে ভুলিও না। আমার শয়ন-কক্ষে যে ছোট টেবলটি আছে, তাহার উপর আমার বাক্সটি দেখিতে পাইবে। তাহার চাবিটি তোমাকে দিয়া যাইতেছি। বাক্সের ভিতর আমার এক তাড়া চিঠি আর কয়েকটি তুচ্ছ জিনিষ দেখিতে পাইবে। আমার পিতার নাম ও ঠিকানা লিখিয়া বাক্সের ডালায় সেই কাগজখানি আঁটিয়া রাখিয়াছি। বাক্সটি সেই ঠিকানায় পাঠাইলেই চলিবে।"

রেবেকা বলিল, "তোমার কথা শুনিয়া মনে হইতেছে, তুমি আর ফিরিয়া আসিবে না স্থির করিয়াই আমাদের নিকট বিদায় গ্রহণ করিতেছ!"

জোসেফ শুষ্ক হাসি হাসিয়া বলিল, "ফিরিয়া আসিব কি না, কে বলিতে পারে? আমি যে কিরূপ বিপৎসঙ্কুল পথে অগ্রসর হইতেছি, তাহা তুমি জান; মৃত্যুর সম্ভাবনাই অধিক। সুতরাং সকল ব্যবস্থা শেষ করিয়া যাওয়াই বাঞ্ছনীয় নহে কি?"

রেবেকা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া অস্ফুট স্বরে বলিল, "হাঁ, সে কথা সত্য; আমি আর এখানে বিলম্ব করিতে পারিব না। এই দুষ্কর কর্ম্মে যতখানি পশ্চাতে সরিয়া থাকিতে পার, তাহার চেষ্টা করিবার জন্য তোমাকে অনুরোধ করিতে আসিয়াছিলাম। যদি সম্প্রদায়ের লোকগুলি কোন বিপজ্জনক কার্য্যে তোমাকে নেতৃত্বভার দিয়া, তোমার আড়ালে থাকিবার চেষ্টা করে, তুমি তাহাতে আপত্তি করিবে। তুমি তরুণ, বিশেষতঃ, এই সম্প্রদায়ে তুমি অল্প দিন যোগদান করিয়াছ, বহুদর্শী প্রবীণ লোক থাকিতে কঠোর দায়িত্বভার তুমি কেন গ্রহণ করিবে?"

জোসেফ বলিল, "এ সকল কথা লইয়া এখন তর্ক-বিতর্ক করিয়া কোন ফল নাই। আমার কল্যাণকামনার জন্য আমি তোমার নিকট কৃতজ্ঞ। এখন বিদায় দাও; আর তুমিও সতর্ক থাকিও। যদি এ যাত্রা আমার প্রাণ-রক্ষা হয়, তাহা হইলে পুনর্ব্বার সাক্ষাৎ হইবে, নতুবা এই শেষ—"

জোসেফ হঠাৎ রেবেকার মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া

তাহার মুখচুম্বন করিল। তাহার পর তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া তাড়াতাড়ি পথে বাহির হইল। রুসিয়ায় শীতকালের রাত্রিতে নক্ষত্রগুলি অত্যন্ত শুভ্র ও উজ্জ্বল হইয়া থাকে। আকাশে নক্ষত্রপুঞ্জ হীরকের ন্যায় শুভ্র কান্তি বিকাশ করিতেছিল।

জোসেফ কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া, পথের অন্যদিকে জীর্ণ ও মলিন পরিচ্ছদধারিণী, আহারাভাবে শুষ্কমুখ এক জন ভিখারিণীকে দেখিতে পাইল। দারুণ শীতে উপযুক্ত শীত-বস্ত্রের অভাবে সে থর-থর করিয়া কাঁপিতেছিল; জোসেফ তাহার দিকে অগ্রসর হইবামাত্র ভিখারিণীটা চলিতে আরম্ভ করিল। জোসেফ নিঃশব্দে তাহার অনুসরণ করিল। সে তাহার অনুসরণ করিতেছে কি না, ভিখারিণী তাহা একবার ফিরিয়াও দেখিল না। জোসেফ ভাবিল, এই নারী কি সত্যই অনশনক্লিষ্টা দরিদ্রা ভিখারিণী, না, ছদ্ম-বেশিনী কোন মহাসম্ভ্রান্ত বংশের কন্যা বা বধূ? কোন "ডচেস্" বা "কাউণ্টেস্"? সে সলোমন কোহেনের উপ-দেশ অগ্রাহ্য করিতে পারিল না।

স্ত্রীলোকটা একটা গলীর মোড়ে আসিয়া অন্ধকারে অদৃশ্য হইতেই এক জন লোক জোসেফের সম্মুখে আসিয়া দৃঢ়স্বরে বলিল, "কে যায়?"

জেসেফ ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিল, "স্বাধীনতা।" তৎক্ষণাৎ এক জন লোক তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া চলিল; তাহার পর প্রস্তর-সোপান দিয়া ভূগর্ভে অবতরণ করিতে লাগিল। কয়েক মিনিট পরে তাহার পথিপ্রদর্শক পাতালঘরের সম্মুখে আসিয়া তাহাকে নিম্নস্বরে বলিল, "এখানে অপেক্ষা কর।"

জোসেফ কি করিবে ভাবিতেছে, এমন সময় সেই পাতালঘরের দ্বার খুলিয়া গেল। গৃহমধ্যে একটা বাতী জ্বলিতেছিল। জোসেফের পথিপ্রদর্শক তাহাকে সঙ্গে লইয়া সেই গৃহে প্রবেশ করিল। সেই কক্ষ অতিক্রম করিয়া তাহারা আর একটি সুপ্রশস্ত কক্ষে উপস্থিত হইল। সেই কক্ষের মধ্যস্থলে কড়িকাঠে একটা ল্যাম্প ঝুলিতেছিল, তাহার মৃদু আলোকে সেই কক্ষের অন্ধকার যেন আরও প্রগাঢ় হইয়া উঠিয়াছিল।

জোসেফ সেই কক্ষে অনেকগুলি লোককে উপবিষ্ট দেখিল; কিন্তু ম্লানদীপালোকে কাহারও মুখ সুস্পষ্টরূপে দেখিতে পাইল না। যে ব্যক্তি তাহাকে সঙ্গে লইয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়াছিল, সে তাহার হাত ধরিয়া সকলের অগ্রভাগে উচ্চাসনে বসাইয়া দিল। সকলের দৃষ্টি জোসেফের মুখের প্রতি আকৃষ্ট হইল। এই অতিভক্তির পরিচয় পাইয়া জোসেফ অত্যন্ত কুণ্ঠা বোধ করিতে লাগিল। বুঝিতে পারিল, গুপ্ত সমিতির সদস্যরা তাহাকেই নায়কের দায়িত্ব-ভার প্রদানে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছে।

কয়েক মিনিট পরে সভাপতি গম্ভীর স্বরে বলিল, "জোসেফ কুরেট, তুমি আমাদের সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়াছ, এখন তুমি আমাদেরই এক জন। তুমি আমাদের বিশ্বাসের পাত্র, তাহার বহু পরিচয় পাইয়াছি, এই জন্য একটি কঠিন দায়িত্ব-ভার প্রদানের উদ্দেশ্যে তোমাকে আমাদের গুপ্ত সমিতির এই নৈশ অধিবেশনে আহ্বান করা হইয়াছে। তুমি জান, এই অধঃপতিত অভিশপ্ত দেশকে স্বেচ্ছাচারপূর্ণ বর্ব্বর শাসন-প্রণালীর কবল হইতে মুক্তিদানের জন্য আমরা লক্ষ লক্ষ লোক গোপনে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়াছি। আমরা স্বেচ্ছা-চারী সম্রাটের অত্যাচার দমনের জন্য, তাঁহার অবৈধ পৈশা-চিক প্রভাব খর্ব্ব করিবার উদ্দেশ্যে, প্রজাপুঞ্জের কল্যাণ-জনক শাসনসংস্কার প্রবর্ত্তনের অভিপ্রায়ে, বহুদিন যাবৎ চীৎকার করিয়া আসিয়াছি; কিন্তু তাহা অরণ্যে রোদনের ন্যায় নিষ্ফল হইয়াছে! যুক্তিসঙ্গত প্রার্থনায় যাহা লাভ করিতে পারি নাই, তাহা আমরা বাহুবলে অর্জ্জন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছি। প্রকাশ্য বিদ্রোহে আমরা প্রচণ্ড রাজ-শক্তিকে খর্ব্ব করিতে পারিব না, কিন্তু লক্ষ লক্ষ লোকের জীবনব্যাপী প্রাণপণ চেষ্টা আমাদের সাধু সঙ্কল্পকে সাফল্য-মণ্ডিত করিবে। আজ এই নিশীথকালে আমরা কি উদ্দেশ্যে এখানে সমবেত হইয়াছি, তাহা তুমি শীঘ্রই জানিতে পারিবে। আমরা যে দুষ্কর ব্রত সুসম্পন্ন করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছি, তাহা নির্ব্বিঘ্নে সংসাধিত হইলে য়ুরোপের ইতিহাস ভিন্ন আকার ধারণ করিবে; কিন্তু তুমিই উপযুক্ত পাত্র জানিয়া তোমাকেই এই যজ্ঞের পুরোহিতের পদে বরণ করিতেছি। তুমি কৃতকার্য্য হইতে পারিলে ইতি-হাসে তোমার নাম চিরস্মরণীয় হইবে, আর যদি এই চেষ্টায় তুমি মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে বাধ্য হও, তাহা হইলে কোটি কোটি লোকের দুর্গতি দূর করিবার জন্য তোমার অলৌ-কিক আত্মোৎসর্গ বীরেন্দ্রসমাজে তোমাকে অমর করিয়া

রাখিবে। কিন্তু যদি হঠাৎ ধরা পড়িয়া প্রাণভয়ে বিশ্বাস-ঘাতকতা করিতে প্রলুব্ধ হও, তাহা হইলে তোমার মৃত্যু অনিবার্য্য। তোমাকে কি কঠিন ভার প্রদান করা হইবে, তাহা শীঘ্রই জানিতে পারিবে।"

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

নিকোলাস্ ষ্ট্রোভিল

পূর্ব্ব-পরিচ্ছেদে বর্ণিত গুপ্তসভার সভাপতি অতঃপর একখানি খাতা খুলিয়া কতকগুলি নামের তালিকা বাহির করিল। সেই তালিকায় জোসেফের নাম ব্যতীত আরও ১১ জন সভ্যের নাম ছিল। সভাপতি সকল সভ্যের শ্রুতিগম্য স্বরে এক একটি নাম পাঠ করিলে, এক এক জন সভ্য তাহার আসন হইতে উঠিয়া গিয়া কিছু দূরে দাড়াইল। জোসেফ ও এই ১১ জন সভ্য এই ভাবে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইলে, সভাপতি তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া গম্ভীর স্বরে বলিল, "ভ্রাতৃগণ, আমাদের প্রধান পরামর্শ-সভার একটি অধিবেশনে তোমরা দ্বাদশ জন সভ্য সর্ব্বসম্মতিক্রমে একটি কঠিন দায়িত্বভার গ্রহণের জন্য নির্ব্বাচিত হইয়াছ। তোমাদের প্রতি কি কার্য্যের ভার অর্পিত হইয়াছে, তাহা বলিতেছি, শোন। আমাদের প্রধান পরামর্শ-সভায় রুসিয়ার জারের প্রাণদণ্ডের আদেশ মঞ্জুর হইয়াছে। এই অমোঘ আদেশ তোমাদিগকেই পালন করিতে হইবে। তোমরাই তাঁহাকে মৃত্যুমুখে নিপাতিত করিবে।"

নিহিলিষ্ট সম্প্রদায়ভুক্ত সকলেই জানিত, স্বেচ্ছাচারী জারের কঠোর শাসন-পাশ হইতে রুসিয়ার মুক্তিবিধানই তাহাদের জীবনের একমাত্র ব্রত এবং এই ব্রত উদ্‌যাপন করিবার জন্য রুসিয়ার জারকে কোন না কোন দিন হত্যা করিতেই হইবে, তথাপি সভাপতির আদেশ শুনিয়া সমাগত সভ্যগণের মধ্যে মৃদুগুঞ্জনধ্বনি আরম্ভ হইল, তাহাদের হৃদয় সবেগে স্পন্দিত হইতে লাগিল। জারের হত্যার ভার গ্রহণ করিতে হইবে শুনিয়া জোসেফ স্তম্ভিত হইল, তাহার মুখ শুকাইয়া গেল, তাহার মনে আতঙ্কের সঞ্চার না হইলেও আকস্মিক অবসাদে তাহার হৃদয় আচ্ছন্ন হইল। সে বুঝিতে পারিল, এই কঠোর কর্ত্তব্যপালনের পূর্ব্বেই তাহাদের সকলকে ধরা পড়িতে হইবে, তাহার পর তাহাদের প্রাণদণ্ড অপরিহার্য্য। কিন্তু জোসেফ এ জন্য প্রস্তুত ছিল, সে ধীরে ধীরে আত্মসংবরণ করিয়া সভাপতির মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিল।

সভাপতি কয়েক মিনিট নীরব থাকিয়া তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে জোসেফের ও অবশিষ্ট ১১ জন সভ্যের মুখের দিকে চাহিয়া পুনর্ব্বার গম্ভীর স্বরে বলিল, "ভ্রাতৃগণ, তোমাদের প্রতি যে ভার অর্পিত হইল, ইহা কিরূপ কঠিন, তাহা আমাদের কাহারও অবিদিত নহে। কিন্তু এই কঠোর কর্ত্তব্যসাধনে বিচলিত হইলে চলিবে না। আমরা জীবন-পণ করিয়া যে দুরূহ ব্রত গ্রহণ করিয়াছি, যেরূপেই হউক, তাহার উদ্‌যাপন করিতে হইবে। যে সকল স্বেচ্ছাচারী প্রজাপীড়ক নরপতি তাহাদের সুরক্ষিত সিংহাসনে বসিয়া নিরন্তর প্রজাপুঞ্জের হৃদয়-শোণিত শোষণ করিতেছে, তাহাদিগকে হত্যা করিতেই হইবে। রুসিয়ার জার সেইরূপ স্বেচ্ছাচারী প্রজাপীড়ক নরপতি, এই জন্য তাঁহার প্রাণদণ্ডের আদেশ হইয়াছে। ইহা সদা নিগৃহীত, চিরলাঞ্ছিত, অত্যাচার-জর্জ্জরিত এই বিশাল সাম্রাজ্যের কোটি কোটি অসহিষ্ণু প্রজার আদেশ। জারের ন্যায় প্রজাপীড়ক, স্বেচ্ছাচারী, দাম্ভিক নরপতি নিহত হইয়াছে শুনিলে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের যথেচ্ছাচারী, দর্পোদ্ধত, স্বার্থসর্ব্বস্ব নরপতিগণেরও চৈতন্যোদয় হইবে! যে দুর্নীতি, পাপ ও হীনতার পঙ্কে আমাদের এই অভিশপ্ত মাতৃভূমি নিমজ্জিত হইয়াছে, সেই মহাপঙ্ক হইতে তাহাকে উদ্ধার করিতেই হইবে। তাহার পর রুসিয়ায় নবযুগের আরম্ভ হইবে। নিবিড় অন্ধকারাচ্ছন্ন রজনীর অবসানে তরুণ-অরুণের লোহিত কিরণ রুসিয়ায় নব-জীবনের বার্ত্তা বহন করিয়া আনিবে, রুসিয়াবাসীরা যুগযুগান্ত পরে স্বাধীনতার অমৃত-রসের আস্বাদনে ধন্য হইবে। পৃথিবীর দূরতম প্রান্তের অধিবাসিগণ শুনিতে পাইবে, একটি বিশাল জাতি অধীনতার শৃঙ্খল-পাশ চূর্ণ করিয়া উন্নতি-পথে অগ্রসর হইয়াছে। যাহাদের দেহ ও মন চিরদিন দাসত্বভারে নিপীড়িত হইয়া অসাড় ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছে, তাহারা নব-জীবনের সহিত কর্ম্মশক্তি, উদ্যম ও উৎসাহের অধিকারী হইবে। রুসিয়ার কোটি কোটি মৃতপ্রায় অধিবাসী মৃত্যুমুখ হইতে উদ্ধার লাভ করিবে। ভ্রাতৃগণ, বন্ধুগণ! এই দুষ্কর কার্য্যসংসাধনই আমাদের

জীবনের ব্রত। এই ব্রতের পবিত্রতা ও গৌরব কে অস্বীকার করিবে? এরূপ সঙ্কীর্ণচেতা, স্বার্থপর কাপুরুষ কে আছে যে, মৃত্যু অপরিহার্য্য জানিয়াও এই ব্রতের উদ্‌যাপনের জন্য জীবন উৎসর্গ করা গৌরব ও গর্ব্বের বিষয় বলিয়া মনে না করিবে? স্বদেশের কল্যাণসাধনের জন্য কোন্ মূঢ় আত্মবিসর্জ্জনে বিমুখ হইবে?"

সভ্যগণ সভাপতির বক্তৃতায় মুগ্ধ হইল এবং সকলে অন্তরের সহিত তাহার সমর্থন করিল রুস-সম্রাটকে হত্যা করিতে পারিলেই রুসিয়ার সকল দুঃখ-কষ্টের অবসান হইবে, রুসজাতি দ্রুতবেগে উন্নতি-পথে অগ্রসর হইবে, এ বিষয়ে কাহারও বিন্দুমাত্র সন্দেহ রহিল না। জোসেফের ন্যায় যে সকল হতভাগ্য আশাভঙ্গজনিত মনক্ষোভে জীবন বিড়ম্বনা-পূর্ণ মনে করিয়া নিহিলিষ্ট সম্প্রদায়ে যোগ দিয়াছিল, তাহাদের সংখ্যা নিতান্ত অল্প ছিল না। তাহারা সভাপতির বক্তৃতায় বিলক্ষণ উৎসাহিত হইয়া উঠিল। জোসেফ প্রাণ-ভয়ে ব্যাকুল না হইলেও অত্যন্ত অস্বস্তি অনুভব করিতে লাগিল। রেবেকা কর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়া যদিও সে জীবনের প্রতি অধিকতর বীতস্পৃহ হইয়াছিল, তথাপি আশার অতি ক্ষীণ আলোকশিখা তাহার অন্ধকারাচ্ছন্ন হৃদয়-কন্দর আলোকিত করিতেছিল; কিন্তু এই দুরূহ ভার গ্রহণ করিয়া সে বুঝিতে পারিল, সেই আলোকশিখা সহসা নির্ব্বাপিত হইয়াছে, তাহার হৃদয়ের অন্তিম সম্বলটুকু অদৃশ্য হইয়াছে!—এখন জীবন ও মৃত্যু তাহার নিকট সমান; বরং মৃত্যুই অধিকতর প্রার্থনীয়, তাহাতে স্মৃতির দংশন হইতে সে মুক্তিলাভ করিতে পারিবে।

অতঃপর সভাপতি সকলকে নির্ব্বাক্ দেখিয়া জোসেফ ও তাহার সহকর্ম্মীদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "তোমাদের প্রতি যে গুরুভার অর্পিত হইয়াছে, তাহা গ্রহণে তোমাদের কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে সেই আপত্তির যুক্তি-সঙ্গত কারণ প্রদর্শন করিতে কুণ্ঠিত হইও না।"

কিন্তু কেহই আপত্তি প্রকাশ করিল না, সকলেই মৌন-ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

সভাপতি কয়েক মিনিট নীরব থাকিয়া, কেহ একটি কথাও বলিল না দেখিয়া পুনর্ব্বার গম্ভীর স্বরে বলিল, "ভ্রাতৃগণ, তোমাদের সঙ্কল্পের দৃঢ়তার পরিচয় পাইয়া আমি সত্যই মুগ্ধ হইয়াছি, তোমাদের আত্মত্যাগের পরিচয় পাইয়া আমার চোখে জল আসিতেছে। আজ তোমরা যে কঠিন ভার গ্রহণ করিলে, ইহা কার্য্যে পরিণত করিবার সময় তোমাদের জীবন বিপন্ন হইবার আশঙ্কা আছে। হয় ত তোমাদের দুই এক জন কোন কৌশলে পলায়ন করিতে পারিবে, কিন্তু সকলেরই পরিত্রাণলাভের আশা নাই। কিন্তু তোমরা মাতৃভূমির প্রিয় সন্তান, দেশ-মাতৃকার কল্যাণসাধনের জন্য তোমরা আত্মোৎসর্গ করিতে উদ্যত হইয়াছ, তোমাদের ত্যাগের আদর্শ সকল দেশের স্বদেশ-হিতৈষী মহাপ্রাণ মানবমণ্ডলীর অনুকরণীয়।"

সভাপতি নীরব হইলে নির্ব্বাচিত দ্বাদশ জন সভ্যের এক জন তাহার সম্মুখে অগ্রসর হইল। এই লোকটির বয়স প্রায় পঞ্চাশ বৎসর, লোকটি দীর্ঘকায়, বলবান্, সঙ্কল্পের দৃঢ়তা তাহার মুখে সুপরিস্ফুট, এবং ভাবভঙ্গীতে লোকটির ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য ও ঔদ্ধত্যের সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। সে সভাপতিকে লক্ষ্য করিয়া দৃঢ় স্বরে বলিতে লাগিল,—"সভাপতি মহাশয়, আমি জানিতে চাই, এতগুলি লোকের জীবন একসঙ্গে বিপন্ন করিবার কারণ কি? আমাদের প্রধান পরামর্শ-সভার সভ্যবৃন্দ একমতাবলম্বী হইয়া সম্রাটের প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রচার করিয়াছেন। উত্তম, এ সম্বন্ধে আমার কিছুই বলিবার নাই। যে উপায়ে হউক—সম্রাটকে হত্যা করা হউক। আমি পৃথিবীর সকল দেশের সম্রাট ও রাজগণকে ঘৃণা করি। রুস-সম্রাটের প্রতি আমার ঘৃণা আপনাদের কাহারও অপেক্ষা অল্প নহে, বোধ হয়, একটু বেশী। সকল দেশের নরপতিদেরই আমি পৃথিবীর অভিশাপ বলিয়া মনে করি। তাহারা এক জাতির সহিত অন্য জাতির যুদ্ধ বাধায়, অসঙ্কোচে প্রজাপুঞ্জের শোণিতপাত করে, এবং তাহাদের অনাবশ্যক আড়ম্বর ও বিলাসের ব্যয় বহন করিবার জন্য দেশের দরিদ্র প্রজাপুঞ্জ তাহাদের কষ্টোপার্জ্জিত অর্থরাশির অপব্যয় করিতে বাধ্য হয়। দেশের জনসাধারণের জীর্ণ পঞ্জর চূর্ণ করিয়া তাহাদের মূল্যবান্ শকটগুলি সবেগে ধাবিত হয়। সমাজের এই ঘৃণিত ব্যবস্থার বিলোপ-সাধন করিয়া, নানা দোষের আকর কলুষিত সমাজকে সুসংস্কৃত করাই আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য। যাহারা আইনের আশ্রয়ে বৈধ দস্যুবৃত্তির সাহায্যে দরিদ্র শ্রমজীবিগণকে প্রতারিত করিয়া বিপুল অর্থ সঞ্চয় করিতেছে, তাহাদের

সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া তাহা দরিদ্র শ্রমজীবিগণের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়াও আমাদের অন্যতম কর্ত্তব্য।"

তাহার এই বক্তৃতা শুনিয়া সভ্যগণ সোৎসাহে করতালি দিল, এবং মৃদুস্বরে তাহার উক্তির সমর্থন করিল। বক্তা ইহাতে অধিকতর উত্তেজিত হইয়া উঠিল, এবং কয়েক মিনিট নীরব থাকিয়া সকলে নিস্তব্ধ হইলে, রুমালে মুখ মুছিয়া পুনর্ব্বার বলিল, "আমরা যে দুরূহ কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছি, তাহা যে অত্যন্ত বিপজ্জনক, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। কিন্তু দুই তিন জন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, সাহসী ও চতুর লোক একত্র চেষ্টা করিলে এই কার্য্য সংসাধিত হইতে পারে, ইহাও অস্বীকার করা যায় না। এ অবস্থায় এই বারো জন স্বদেশবৎসল, একনিষ্ঠ ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ব্যক্তির জীবন বিপন্ন করিবার কারণ কি, তাহা কি আমাকে বুঝাইয়া দিবেন? আমি স্বয়ং এই ভার গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছি,কিন্তু এক জনের চেষ্টা নানাভাবে বিফল হইতে পারে, এই জন্য আমি আর এক জনের সহায়তা প্রার্থনীয় মনে করি। আপনাদের কেহ ইচ্ছা করিলে এই কার্য্যে আমার সাহচর্য্য করিতে পারেন। আমরা দুই জন একত্র এই দুরূহ কার্য্য সংসাধন করিব।"

বক্তার উক্তি সঙ্গত বলিয়াই সকলের ধারণা হইল, কিন্তু হঠাৎ কেহ তাহাকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইল না। বক্তা প্রত্যেকের মুখের দিকে সাগ্রহে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল; অবশেষে জোসেফ তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, দৃঢ়স্বরে বলিল, "আমি আপনার সঙ্গে যাইব।"

জোসেফের কথা শুনিয়া সমবেত সভ্যমণ্ডলী অস্ফুট স্বরে তাহার প্রশংসা করিতে লাগিল। তাহাদের গুঞ্জনধ্বনি নীরব হইলে সভাপতি বলিল, "তোমাদের সাহসের পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হইলাম। জোসেফ কুরেট, তোমার বয়স অল্প, আমরা এখনও তোমার কার্য্যদক্ষতার প্রমাণ পাই নাই, কিন্তু তোমার যোগ্যতায় আমরা নির্ভর করিতে পারি। আর তুমি ষ্ট্রোভিল, আমাদের সম্প্রদায়ের কার্য্যে প্রচুর অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছ; গত ২৫ বৎসর কাল ধরিয়া আমাদের মহদ্‌ব্রতের উদ্‌যাপনে যথাশক্তি সাহায্য করিয়া আসিয়াছ। সম্প্রদায়ের মঙ্গলের জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছ। বহুদিন পূর্ব্বে তুমি আমাদের যে উপকার করিয়াছিলে, তাহা আমরা কখন বিস্মৃত হইব না। সুতরাং তোমরা উভয়ে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া যে দায়িত্ব-ভার গ্রহণে উদ্যত হইয়াছ, তাহাতে তোমরা সাফল্য লাভ করিয়া বীরেন্দ্র-সমাজের বরণীয় আসন লাভ করিতে পারিবে, এ বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই; আশা করি, সভ্যগণ একবাক্যে তোমাদের এই সঙ্গত প্রস্তাবের সমর্থন করিবেন।"

সমাগত সভ্যগণ সকলেই ষ্ট্রোভিলের প্রস্তাবের সমর্থন করিল। তাহাদের অভিমত শুনিয়া সভাপতি বলিল, "ষ্ট্রোভিল, এই সভায় তোমার প্রস্তাব সমর্থিত ও গৃহীত হইল। জোসেফ কুরেট ও নিকোলাস ষ্ট্রোভিল, তোমরা উভয়ে আমাদের প্রধান পরামর্শ-সভার আদেশ পালন করিবে। জারের প্রাণসংহারের ভার তোমাদের হস্তেই প্রদত্ত হইল। তবে আমি অন্য যে দশ জনের নাম পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, তাহারা পশ্চাতে থাকিয়া তোমাদের সাহায্য করিবে।"

অতঃপর নিকোলাস ষ্ট্রোভিল জোসেফের হাত ধরিয়া উৎসাহভরে বলিল, "এস বন্ধু, আমরা উভয়ে একত্র গৌরব অর্জ্জন অথবা সেই চেষ্টায় দেহ বিসর্জ্জন করিব।"

কি উপায়ে রুস-সম্রাটকে হত্যা করিতে হইবে, এই প্রসঙ্গ লইয়া সভায় দীর্ঘকাল আলোচনা চলিল; যে স্থান হইতে যে ভাবে সম্রাটকে আক্রমণ করিতে হইবে, তাহার একখানি নক্সাও ষ্ট্রোভিলের হস্তে প্রদান করা হইল। রুস-সম্রাট কোন নির্দ্দিষ্ট দিনে উপাসনার জন্য একটি ভজনালয়ে যাইবেন; নিহিলিষ্টরা গোপনে এই সংবাদ সংগ্রহ করিয়াছিল। যে পথে সম্রাটের ভজনালয়ে যাইবার কথা ছিল, উক্ত নক্সায় সেই পথটি চিহ্নিত করা হইয়াছিল; সম্রাটের আততায়ী পথের যে স্থানে দাড়াইয়া বোমা নিক্ষেপ করিয়া সম্রাটের শকট চূর্ণ করিবার আদেশ পাইয়াছিল, সেই স্থানটিও লাল কালী দ্বারা চিহ্নিত করা হইয়াছিল। যে স্থান হইতে সম্রাটের শকটের উপর বোমা নিক্ষেপ করিবার কথা, সেই স্থান হইতে ভজনালয়গামী শকটের দূরত্ব কুড়ি গজের অধিক নহে। আততায়ী বোমা নিক্ষেপ করিয়া কোন্ পথে পলায়ন করিবে, নক্সাখানিতে তাহাও প্রদর্শিত হইয়াছিল। ঘটনাচক্রে আততায়ীর সেই পথে পলায়ন করা অসম্ভব হইলে, সে যাহাতে অন্য দিকে পলায়ন করিয়া

আত্মরক্ষা করিতে পারে,এই উদ্দেশ্যে নক্সায় আরও কয়েকটি পথ চিহ্নিত করা হইয়াছিল। আততায়ীর পলায়নে সাহায্য করিবার জন্য তাহার সহযোগিগণ কোন্ কোন্ স্থানে লুকাইয়া থাকিবে, তাহাও সেই নক্সায় বিভিন্ন প্রকার চিহ্ন দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। বস্তুতঃ আততায়ীকে পরিচালিত করিবার জন্য নক্সাখানি নিখুঁত হইয়াছিল।

কেহ মনে করিবেন না, এই নক্সাখানির কথা লেখকের কপোলকল্পিত। এই উপন্যাস-বর্ণিত কোন ঘটনাই কাল্পনিক নহে। রুস-সম্রাটের হত্যাকাণ্ড নির্ব্বিঘ্নে ও দক্ষতা সহকারে সুসম্পন্ন করিবার জন্য যে গুপ্ত সভার অধিবেশন হইয়াছিল, তাহার পূর্ব্বোক্ত বিবরণও কাল্পনিক নহে, সম্পূর্ণ সত্য। আমরা যে নক্সাখানির কথা বলিলাম, রুসিয়ার একটি যুবক এঞ্জিনিয়ার তাহা অঙ্কিত করিয়াছিল, এই নিহিলিষ্ট যুবক ধরা পড়িবার ভয়ে রুসিয়ার রাজধানী হইতে কোনও সুযোগে জেনিভা নগরে পলায়ন করিয়াছিল। কিছু দিন পরে জেনিভা নগরেই তাহার মৃত্যু হয়।

যাহা হউক, ষ্ট্রোভিল সেই নক্সাখানি হাতে লইয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিল; দেখিতে দেখিতে মৃদুহাস্যে তাহার ওষ্ঠপ্রান্ত অনুরঞ্জিত হইল। কয়েক মিনিট পরে সে নক্সাখানি ভাঁজ করিয়া পকেটে রাখিল। আরও কিছু কাল ধরিয়া অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে বাদানুবাদের পর সভাভঙ্গ হইল। শত্রুপক্ষের কোন গুপ্তচর সেই সুড়ঙ্গের বাহিরে বা পথের ধারে লুকাইয়া আছে কি না, পরীক্ষা করিয়া, সভ্যগণ একে একে নিঃশব্দে সভাস্থল পরিত্যাগ করিল; কিন্তু এক জন লোক পথিপ্রান্তে লুকাইয়া থাকিয়া প্রত্যেকের গতিবিধি লক্ষ্য করিতে লাগিল।

জোসেফ কুরেট শেষ পর্য্যন্ত সেখানে দাঁড়াইয়া ছিল; তাহাকে নিস্তব্ধভাবে দণ্ডায়মান দেখিয়া নিকোলাস ষ্ট্রোভিল তাহার সম্মুখে অগ্রসর হইল এবং তাহার হাত ধরিয়া মৌনভাবে সেই কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল; জোসেফও তাহাকে কোন কথা বলিল না। অবশেষে উভয়ে পথে আসিয়া দাঁড়াইলে, ষ্ট্রোভিল জোসেফকে বলিল, "আমার সঙ্গে চল, তোমার সঙ্গে গোটাকত জরুরী কথা আছে।"

[ক্রমশঃ।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

বীরাঙ্গনা

আজ ফাগুয়ায় ফাগুনমাসে চিতোরপুরের প্রাসাদমাঝে
রাজমহিষীর জন্মদিনে নহবোত্ আর শাণাই বাজে।
শতেক প্রিয়-সহচরী সবাই মিলি ঘিরে ঘিরে
মনের মত ফুল-পোষাকে সাজায় তাদের রাজ-রাণীরে।
কস্তুরী আর কুঙ্কুমেরই গোসবায়ে দিক আমোদ করে
গুগ্‌গুল আতর চন্দনের যে গন্ধে দিশি উঠ্‌ছে ভরে'।
মহোৎসবের ডঙ্কা বাজে শঙ্খ বাজে অন্দরেতে;
যুদ্ধ-কঠোর রাজপুতেরা উৎসবে আজ উঠল মেতে।
আবীর ফাগের রংমশালে রঙীন্ সারা চিতোরপুরী,
আনন্দেরই স্রোতের ধারা ছুটছে সারা চিতোর যুড়ি।
সবাই গাহে সবাই হাসে ভাবনা কারু নাইক মোটে;
বজ্রসম তূর্য্যনাদে হঠাৎ সবে চমকে ওঠে।
চিতোরপুরী উঠল কেঁপে ভয়ঙ্কর এক হট্টগোলে
শত্রু-সেনা ঘিরল পুরী হঠাৎ যেন মন্ত্রবলে।
ফাগের খেলা বন্ধ হ'ল থামল হঠাৎ শাণাই-বাঁশী
পিচ্‌কারী রং আবীর ফেলে অস্ত্র ধরে চিতোরবাসী।
তর্জ্জে ওঠে মত্ত অরি কামান-গোলা গর্জ্জে ছোটে;
পঞ্চশত রাজপুত-বীর নিমেষমাঝে ধরায় লোটে।
রাণার দোসর বুন্দি-পতির মৃত্যু হ'ল বর্শাঘাতে;
স্বয়ং রাণা বিক্রমজিৎ বন্দী হলেন শত্রু-হাতে।
ক্ষিপ্ত-অরি মত্ত-পাগল—জয়োল্লাসে অধীর সবে—
আকাশ ফাটে বাতাস কাঁপে বিকট তাদের "আল্লা" রবে।
আচম্বিতে চমকে তারা থমকে থামায় বিজয়-ধ্বনি;
রুদ্রতেজে ঘিরল তাদের শতেক চিতোর বীর-রমণী।
সবার আগে জব্'র বাঈ—চিতোর রাণার প্রাণ-প্রেয়সী;
ননীর দেহে বর্ম্ম আঁটা কোমল করে কঠোর অসি।
রাজমহিষী নামেন রণে উন্মাদিনী দেবীর মত;—
ভৈরবী সে মূর্ত্তি হেরি' স্তব্ধ অবাক শত্রু যত।
ঘণ্টাখানেক লড়াই হ'ল—মরল রাণীর সকল জনা
সবার শেষে ছিন্ন শিরে পড়ল লুটে বীরাঙ্গনা।

শ্রীসুনির্ম্মল বসু।

মার্শাল ফেঙ্গের স্বদেশ-প্রেম

বর্ত্তমানে চীনের খৃষ্টান জেনারল মার্শাল ফেঙ্গ-উসিয়াঙ্গ সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী বলিয়া মনে হয়। কেন না, চীনের বর্ত্তমান War-lordদিগের মধ্যে তিনিই কেন্দ্রশক্তি পিকিনের কর্ত্তৃত্ব বহুল পরিমাণে হস্তগত করিয়াছেন। এখন জগতের সকলের দৃষ্টি যখন প্রশান্ত-তটে চীনের দিকে নিবদ্ধ, তখন চীনের এই শক্তিমান পুরুষের মনোভাব কি, জানিতে সকলেরই ঔৎসুক্য হওয়া স্বাভাবিক। লোকের মনোভাব তাহার রচনার মধ্য দিয়া প্রায়শঃ ব্যক্ত হইয়া থাকে। সুতরাং মার্শাল ফেঙ্গের স্বরচিত প্রবন্ধাদি হইতে তাঁহার অভিমত উদ্ধৃত করিয়া দেখাইলে সেই কৌতূহল নিবৃত্ত হইতে পারে মনে করিয়া এই স্থানে তাহার এক অভিভাষণ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করা যাইতেছে। সম্প্রতি তিনি তাঁহার অধীনস্থ সামরিক ও বে-সামরিক কর্ম্মচারিগণের সম্মুখে এই অভিভাষণ পাঠ করিয়াছিলেন।

ইঁহার এক স্থানে মার্শাল ফেঙ্গ বলিতেছেন,—"আমরা চীনবাসীরা 'স্বদেশী' ও 'স্বজাতি' কথাটা ব্যবহার করিতে অভ্যস্ত হইয়াছি, 'সাম্য' কথাটাও প্রায় উচ্চারণ করিয়া থাকি। কিন্তু প্রকৃত কার্য্যক্ষেত্রে আমাদের দেশের প্রবল শক্তিমান পুরুষরা তাহাদের স্বজাতি ও স্বদেশী দরিদ্র দুর্ব্বলগণকে উৎপীড়ন করিয়া থাকেন। এইভাবে আমাদের দেশে দুর্ব্বলের উপর উৎপীড়ন, অত্যাচার, শোষণক্রিয়া অবাধে চলিতেছে। এমন অবস্থায় কিরূপে আমরা 'দেশবাসী' ও 'সাম্যের' কথা মুখে উচ্চারণ করিতে সাহসী হই? পরলোকগত ডাক্তার সানইয়াটসেনের 'কুয়োমিণ্টাঙ্গ' দল (হোমরুল পার্টি) এই নামের আবরণে নির্লজ্জভাবে নিজ নিজ স্বার্থসাধন করিতেছে; কেহ সিংহাসনের লোভ করেন, কেহ সরকারী বড় চাকুরীর কামনা করেন। কিন্তু ডাক্তার সানইয়াটসেনের কি এই নীতি ছিল? কখনই নহে। তাঁহার এক লক্ষ্য ছিল—জাতির জীবন রক্ষা করা। তিনি এ কথা বারবার বলিয়া গিয়াছেন, ইহা তাঁহার কপট কথা নহে, অন্তরের কথা। এখন কুয়োমিণ্টাঙ্গ দলের মধ্যে নানা মতবিরোধ ও স্বার্থদ্বন্দ্ব উপস্থিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু সানইয়াটসেনের অথবা তাঁহার দলের আদর্শ অন্যরূপ ছিল। তাঁহার মূলমন্ত্র ছিল—জনসেবা।

ডাক্তার সানইয়াটসেন

"এখন আমাদের কর্ত্তব্য কি? আমার মনে হয়, আমরা যাহাই ভাবি, যাহাই অধ্যয়ন করি,—সেই সকলের মধ্য দিয়া একটা আদর্শের প্রতি আমাদের লক্ষ্য রাখা বিশেষ কর্ত্তব্য। সে আদর্শ কি? চীনের ভাবধারার মধ্য দিয়া চীনের মূলনীতি অনুসরণ করিয়া চীন শাসন করা আমাদের আদর্শ হওয়া উচিত।

"মেঞ্চিয়াস (Mencius) বলিয়াছিলেন,—People the most precious জনমতই মূল্যবান্। আমাদের সাধারণতন্ত্র শাসনে মেঞ্চিয়াসের মত মান্য করিয়া জনমতকে আমাদের প্রভুপদে উন্নীত করিয়া আমাদিগকে প্রভুর সেবকে পরিণত করিলে আদর্শ অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

"কিন্তু প্রকৃত কার্য্যক্ষেত্রে কি দেখিতে পাই? প্রভু গাছের ছাল ও মূল খাইয়া জীবন ধারণ করিতেছে, আর সেবক রেশম ও সাটিনে দেহ আবৃত করিয়া, চর্ব্ব্য-চুষ্য-লেহ্য-পেয় উপভোগ করিয়া বিলাসময় জীবন যাপন করিতেছে।

"আমাদের প্রভুরা (জনসঙ্ঘ) ঠিক যেন রিক্সা-কুলীর মত। তাহারা যেন রিক্সা টানিয়া দৌড়াইতেছে, তাহাদের ললাট হইতে শ্রম-জল ঝরিতেছে, তাহারা ক্লান্ত-শ্রান্ত অবসন্ন দেহে যেন রক্তবমন করিতেছে এবং এইরূপে ইহলোক হইতে বিদায়গ্রহণ করিতেছে! আর আমরা সেবকরা কি করিতেছি? আমরা বড় বড় মোটর-গাড়ী চাপিয়া স্ফূর্ত্তির চরম করিতেছি। এ কি বিসদৃশ সাধারণতন্ত্র। আমাদের প্রভুরা পাশার জুয়া খেলিলে পুলিস তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিবে, সম্ভবতঃ তাহাদের জেল হইবে। অথচ আমরা সেবকরা স্বচ্ছন্দে প্রকাশ্যে 'মাজং' নামক জুয়া খেলিতে পারি,—হাজার হাজার টাকা বাজী রাখিয়া হারি বা জয় লাভ করি; তাহাতে কোনও অপরাধ হয় না, বরং পুলিস আমাদের দ্বারে প্রহরা দিয়া আমাদিগকে বাধা-বিঘ্ন হইতে রক্ষা করে! আমাদের প্রভু তাহার জননীর উদরের যন্ত্রণা হইলে যদি এক মাত্রা অহিফেন ক্রয় করে, তাহা হইলে তদ্দণ্ডেই পুলিসের হস্তে ধৃত হয়। অথচ সেবক মনের সাধ মিটাইয়া সারাদিন আরামে চণ্ডু টানিতে পারে! তাহাকে বাধা দিবার কেহ নাই। এ কি ভীষণ বিবেকবর্জ্জিত সাধারণতন্ত্র!

"প্রভু বলিতে কি বুঝায়? যে মানুষ স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের মধ্যে যোগাযোগ আনয়ন করে, সে-ই প্রভু। মানুষের মনুষ্যত্ব ও বৈশিষ্ট্য তাহাকে প্রভুত্ব আনিয়া দেয়। রাজতন্ত্র শাসনে রাজাই প্রভু, কেন না, তিনিই মানুষরূপে স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের যোগাযোগ করিয়া দেন। সাধারণতন্ত্র শাসনে জনমতই স্বর্গ ও মর্ত্ত্যে যোগাযোগ করিয়া দেয় বলিয়া সে প্রভু এবং শাসকরা তাহার ভৃত্য। কিন্তু আমাদের সাধারণতন্ত্রে আমরা কি করিতেছি? আমরা জনসঙ্ঘ হইতে এমন এক জন মানুষ খুঁজিয়া বেড়াইতেছি, যিনি জনসঙ্ঘ হইতে অনেক উচ্চে আছেন; তাঁহাকেই আমরা জনগণের প্রভুপদে বসাইতে চাহিতেছি। ইহা ঠিক নহে, ইহা অন্যায়। যথার্থ সাধারণতন্ত্রে জনসঙ্ঘের এক জন নহে, জনসঙ্ঘই প্রভু। সুতরাং আমাদের দেশে প্রকৃত সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা

করিতে হইলে জনসঙ্ঘকেই প্রভুপদে উন্নীত করিতে হইবে, সম্মান করিতে হইবে, গৌরবে ভূষিত করিতে হইবে। বর্ত্তমান চীনে ইহার বিপরীত হইতেছে, শাসকরা অত্যাচারী অনাচারী,—তাহারা জনসঙ্ঘকে প্রভুপদে না বসাইয়া তাহাদিগকে দাসত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে।"

মার্শাল ফেঙ্গ কিরূপ স্বদেশ ও স্বজাতিকে ভালবাসেন, শ্রদ্ধা করেন, সম্মান করেন, তাহা এই রচনা হইতেই জানা যায়। তবে বর্ত্তমানে রাজনীতিক্ষেত্রে Diplomatদিগের কথায় ও কাযে অনেক সময়ে সামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায় না। পাশ্চাত্য জগতেও জার্ম্মাণ-যুদ্ধকালে 'আত্মনিয়ন্ত্রণ', 'ক্ষুদ্র জাতির স্বাধীনতা' প্রভৃতি অনেক 'গালভরা' কথা শুনা গিয়াছিল। এখন সে সব কথা প্রেসিডেন্ট উইলসনের ১৪ পয়েন্টের মত আটলাণ্টিকের অতল তলে তলাইয়া গিয়াছে। মার্শাল ফেঙ্গ মুখে অনেক আশার কথা বলিতেছেন, কিন্তু শেষরক্ষা হইবে কি?

মার্শাল ফেঙ্গ এই স্থানেই ক্ষান্ত হয়েন নাই। তিনি ও তাঁহার মতাবলম্বী শাসকসম্প্রদায় অতি সাদাসিধাভাবে জীবনযাপন করিতেছেন,—merely trying not to waste people's money and the country's wealth প্রভৃতি ব্যাপারেও তাঁহার এইরূপ স্বার্থত্যাগ সর্ব্বথা প্রশংসনীয়।

কিন্তু ইহাতেও তাঁহার নিস্তার নাই। জনগণের প্রতি তাঁহার এই সহানুভূতি প্রদর্শন এবং সাদাসিধাভাবে জীবনযাপন নিন্দুকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে।

মার্শাল ফেঙ্গ স্বয়ং বলিতেছেন,—"আমরা এইরূপ আড়ম্বরহীন জীবনযাপন করিতেছি বলিয়া অনেকে আমাদিগকে রুসিয়ান 'রেড' বলশেভিকবাদের প্রভাবে প্রভাবান্বিত বলিয়া সন্দেহ করিতেছে। বর্ত্তমান কালে লোক সহজেই সন্দিগ্ধ হইয়া থাকে। আমি কয়েক দিন লয়াঙ্গে ছিলাম। তখন অনেকে সন্দেহ করিয়াছিলেন যে, আমি লয়াঙ্গের পক্ষপাতী। এইরূপে আমাকে কেহ কেহ প্যাওটিঙ্গফুর পক্ষপাতী, প্রেসিডেন্ট লিহুংচুয়ের পক্ষপাতী, সানইয়াটসেনের পক্ষপাতী, ফেঙ্গটিয়াঙ্গের পক্ষপাতীও বলিয়া সন্দেহ করিয়াছেন। আমি ইহাতে হাস্য সংবরণ করিতে পারি নাই। আমি তাহা হইলে কি? আমি কি ইহার মধ্যে একের পক্ষপাতী, না সকলেরই পক্ষপাতী? আমি বলিব, যিনি আর সকল চিন্তার উপরে চীনের মঙ্গল-চিন্তাকে হৃদয়ে স্থান দিয়াছেন, আমি তাঁহারই পক্ষপাতী; যে দেশের সর্ব্বনাশ করিয়া নিজের স্বার্থসাধন করিতে চায়, সে আমার শত্রু—যে আমার দেশকে শত্রুর হস্তে তুলিয়া দেয়, আমি তাহার শত্রু।

"আমাদের জাতীয় মানচিত্রে বিদেশীর দ্বারা অধিকৃত স্থানগুলি রক্তবর্ণে রঞ্জিত করিয়া রাখা হইয়াছে, উহা প্রতিদিন দেখিয়া আমরা আমাদের জাতীয় লজ্জার কথা, অপমানের কথা স্মরণ করি। কিন্তু তাহা বলিয়া কোন বিদেশী জাতির প্রতি আমাদের ঘৃণার ভাব নাই, সকলেই আমাদের বন্ধু। তবে ইহাও বলি যে, আমরা চীনের মুক্তির পক্ষপাতী। এই হেতু আমরা চীনের হস্তচ্যুত অংশগুলির জন্য প্রতি বৎসর আন্দোলন-আলোচনা করিয়া থাকি।"

মার্শাল ফেঙ্গ এইরূপে স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য আকুল আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার এই রচনা পাঠ করিলে মনে হয়, তিনি ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য, নিজহস্তে প্রভুত্ব গ্রহণ করিবার জন্য ব্যস্ত নহেন; যাহাতে তাঁহার জন্মভূমি বড় হয়, অন্য পাঁচটা শক্তির মত জগতে মান্যগণ্য হয়, তাহারই জন্য তিনি তরবারি গ্রহণ করিয়াছেন। চীনের বর্ত্তমান অবস্থায় এক জন শক্তিশালী দেশনায়কের বিশেষ প্রয়োজন। এ জন্য তিনি জনমতের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইলেও, সাময়িকভাবে নিয়ামকরূপে সকল দলকে এক কেন্দ্রের অন্তর্ভুক্ত করিবার প্রয়াস পাইতেছেন। এ সম্বন্ধে ইংরাজ-পরিচালিত 'নর্থ চায়না হেরাল্ড' পত্র লিখিতেছেন, "মার্শাল ফেঙ্গের সেনাদল বর্ত্তমানে চীনের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সুশিক্ষিত, শৃঙ্খলাবদ্ধ ও রণদক্ষ। চীনের যে স্থানে এই সেনার আড্ডা আছে, সেই স্থানের লোক তাঁহাকে তাহাদের অঞ্চলে তাঁহার সেনা রক্ষা করিতে অনুরোধ করে। তাহার কারণ এই যে, যেখানে ফেঙ্গের সেনা বিরাজ করে, সেখানে লোক শান্তিতে বাস করিতে পায়। মার্শাল ফেঙ্গ প্রায় বলিয়া থাকেন, চীনার বিপক্ষে চীনার যুদ্ধ দেশের পক্ষে সর্ব্বনাশকর। কিন্তু চীনের বর্ত্তমান অবস্থায় এই গৃহযুদ্ধ নিবারণ করিতে হইলে কাহারও মুখের কথায় সম্ভবপর হইবে না। এক জন শক্তিশালী হইয়া বলপূর্ব্বক এই গৃহ-বিবাদ সাঙ্গ না করিলে উপায় নাই বলিয়া ফেঙ্গ তাঁহার সৈন্যদলকে শক্তিশালী করিতেছেন, পরন্তু মস্কো হইতে রণসম্ভারও সংগ্রহ করিতেছেন। স্বার্থপ্রণোদিত হইয়া ফেঙ্গ একপ করিতেছেন না। এখন চীনে এক জন শক্তিশালী নিয়ামকের প্রয়োজন বলিয়া ফেঙ্গ এইরূপ করিতেছেন। তিনি কাহারও উপর অত্যাচারের উদ্দেশ্যে একপ করিতেছেন না, তবে যাহারা তাঁহার উদ্দেশ্যের (চীনের মুক্তির) পথে বিঘ্ন হইয়া দাঁড়াইবে, তাহাদের শাসনের জন্য এই ভাবে শক্তি সঞ্চয় করিতেছেন। দেশে শান্তি ও একতা প্রতিষ্ঠাই ফেঙ্গের লক্ষ্য ও আদর্শ। যদি ফেঙ্গের উদ্দেশ্য মহৎ না হইত, যদি তিনি কপট ও স্বার্থপর হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার সেনাদল তাঁহাকে আন্তরিক ভক্তিশ্রদ্ধা করিত না,—তাঁহার জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে পশ্চাৎপদ হইত না।"

ইংরাজের সম্পাদিত পত্র যখন এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিতেছে, তখন চীনের ভবিষ্যৎসম্বন্ধে হতাশ হইবার বিশেষ কারণ নাই। মার্শাল ফেঙ্গ যথার্থ দেশ-প্রেমিক কি না—তিনি স্বার্থপর ও ভণ্ড কি না, তাহা ভবিষ্যৎই বলিয়া দিবে।

সভ্যতার আলোক

পাশ্চাত্য জগতের শক্তিশালী জাতিরা আপনাদের সভ্যতাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করিয়া থাকেন এবং তথাকথিত অসভ্য জাতিদিগকে (Backward nations) তাঁহাদের সভ্যতার আলোক প্রদান করিয়া অন্ধকারের প্রভাব হইতে মুক্ত করিবার জন্য উৎসুক থাকেন। তাঁহারা মনে করেন, এক পরম কারুণিক বিধাতা তাঁহাদিগকে Chosen people অনুগৃহীত ও নির্ব্বাচিত জাতিরূপে সৃষ্টি করিয়া জগতের 'অসভ্য' জাতিদিগের অভিভাবক নিযুক্ত করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহারা অসভ্য জাতিদিগকে 'অন্ধকার হইতে আলোকে' আনয়ন করিয়া বিধাতার মঙ্গলময় উদ্দেশ্যই সাধন করিতেছেন।

কি ভাবে এই উদ্দেশ্য এ যাবৎ সাধিত হওয়া আসিয়াছে, উত্তর-আমেরিকার 'সেমিনোল' নামক রেড ইণ্ডিয়ান জাতির ইতিহাস হইতে বিশেষরূপে জানা যায়। মধ্যযুগে স্পেনীয় বিজেতা কর্টেজ কিরূপে মেক্সিকোর 'অসভ্য' রেড ইণ্ডিয়ানদিগকে অন্ধকার হইতে আলোকে আনয়ন করিয়াছিলেন, তাহা ইতিহাসই সাক্ষ্য প্রদান করে। যে 'ইনকা' জাতির স্থাপত্য-শিল্পের নিদর্শনসমূহ আজিও জগতের বিস্ময় উৎপাদন করে, আজ তাহারা কোথায়? পাশ্চাত্য সভ্যতার মঙ্গল-হস্ত-স্পর্শ লাভ করিবার সৌভাগ্য যে সকল অসভ্য জাতির হইয়াছে, মধ্যযুগের সে সকল জাতি এখন কি অবস্থায় রহিয়াছে?

সেমিনোল জাতি ৫০ বৎসর যাবৎ এই সভ্যতার আলোক হইতে দূরে থাকিতে চেষ্টা করিয়া আসিয়াছে। মার্কিণ যুক্তরাজ্যের সরকার কত চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়াছে—সেমিনোলরা কিছুতেই 'সভ্য' হইতে চাহে নাই।

মার্কিণ সরকার তাহাদের বিপক্ষে অবিরাম যুদ্ধ করিয়াছেন, বলপূর্ব্বক তাহাদিগকে দেশত্যাগী করিয়াছেন, ফলে তাহারা একরূপ

ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে, এখন সংখ্যায় তাহারা সর্ব্বসাকুল্যে ৫ শতের‌ও অধিক হইবে না, কিন্তু ১৫৩৯ খৃষ্টাব্দে ডিসোটো যখন টাম্প

পুত্রসহ সেমিনোল জাতীয় রেডইণ্ডিয়ান্ সর্দ্দার

উপসাগরের উপকূলে প্রথম অবতরণ করিয়া তাহাদের দেশ জয় করিতে আরম্ভ করেন, তখন তাহারা সংখ্যায় বহু সহস্র ছিল, পরন্তু এক শক্তিশালী জাতিও ছিল।

মার্কিণ যুক্তরাজ্যের ফ্লোরিডা প্রদেশের এভারগ্লেডস অঞ্চলে সেমিনোলদিগের বাস। এভারগ্লেডস অঞ্চল গভীর জঙ্গল ও জলায় আচ্ছন্ন। কলম্বস যখন আমেরিকা আবিষ্কার করেন, তখন সেই অঞ্চলের যে অবস্থা ছিল, এখনও তাহাই আছে। পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যগর্ব্বী জাতিরা যে দিন হইতে তাহাদের জন্মভূমিতে পদার্পণ করিয়া তাহাদিগকে জয় করিতে আরম্ভ করে এবং পরে তাহাদিগের পরমপ্রিয় দলপতি শূরবীর ওসিওলাকে ধৃত ও কারারুদ্ধ করে, সেই দিন হইতে তাহারা শ্বেতজাতির সকল সংস্পর্শকে পাপের মত পরিহার করিয়া আপনাদের জঙ্গল ও জলার মধ্যে কষ্টময় জীবন-যাপন করিতেছে—শ্বেতজাতির শত প্রলোভনেও তাহাদের 'সভ্যতার' আলোকে যাইতে চাহে নাই। ইহা শ্বেতজাতির 'সভ্যতালোক বিস্তারের' একটি প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

মার্কিণ সাম্যবাদী জাতি বলিয়া গর্ব্বানুভব করিয়া থাকেন। তাঁহারা মুক্তির উপাসক, স্বাধীনতার স্তাবক। তাঁহারা এই সেমিনোল জাতিকে নানা সাহায্য করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। কিন্তু ইহারা এমনই 'অসভ্য' এবং এমনই 'নির্ব্বোধ' যে, মার্কিণের এই স্বেচ্ছাদত্ত সাহায্য কিছুতেই গ্রহণ করিতে সম্মত হয় নাই, বরং বলিয়াছে,—"আমরা তোমাদের সাহায্য চাহি না, আমাদিগকে আমাদের জলা জঙ্গলের মধ্যে শান্তিতে থাকিতে দাও।"

আকোমা জাতীয় রেডইণ্ডিয়ান্ তরুণী

এই সেমিনোল জাতির লিখিত ভাষা নাই, কিন্তু তাহাদের আশ্চর্য্য স্মরণশক্তি আছে। তাহারা তাহাদের জাতির ইতিহাস বংশানুক্রমে স্মরণ করিয়া রাখে এবং ভবিষ্যবংশীয়গণকে 'সপ্ত বৎসরের' যুদ্ধের কথা স্মরণ করাইয়া শিক্ষা দেয়,—যে শ্বেতজাতি ওসিওলাকে কারারুদ্ধ করিয়াছে সেই শ্বেতজাতির সংস্পর্শে কখনও যাইও না! পিতা পুত্রকে বাল্যকাল হইতে এই শিক্ষা দেয়—পুত্র বড় হইয়া তাহার পুত্রকে এই শিক্ষা দেয়। এইরূপ শিক্ষাদান অদ্ধশতাব্দী ব্যাপিয়া চলিয়া আসিতেছে।

পুত্রসহ পিউটে জাতীয় রেডইণ্ডিয়ান্ সর্দ্দার

সেমিনোলরা কখনও শ্বেতজাতিকে অতিথিরূপে গ্রহণ করে না। কেবল উইলিয়াম (Old Bill) নামক এক মার্কিণ বণিক ইহাদের শ্রদ্ধাপ্রীতি অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। প্রথমে উহারা তাঁহাকে আপনাদের মধ্যে গ্রহণ করিতে চাহে নাই। কিন্তু তিনি নিজের স্নেহ, যত্ন, সত্যবাদিতা এবং সদয় ব্যবহারের গুণে ক্রমে তাহাদের শ্রদ্ধাপ্রীতি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। শেষে তিনি তাহাদের মধ্যে বহুকাল বসবাস করিলে এমন হইয়াছিল যে, তাহারা তাঁহাকে আপনার জন বলিয়া মনে করিত এবং এমন কি তাঁহার জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে প্রস্তুত হইত। সুতরাং বুঝা যায়, সেমিনোলরা স্বভাবতঃ হৃদয়হীন নহে, সদয় ব্যবহারের প্রত্যুত্তরে তাহারাও সদয় ব্যবহার করিতে জানে। কি ভীষণ ব্যবহার পাইয়া তাহারা শ্বেতজাতির প্রতি এত কঠিন হইয়াছে, তাহা সহজেই অনুমেয়।

উইলিয়াম সেমিনোলদের এক জন হইয়া তাহাদের চাষবাসে, মৎস্য ও পশুপক্ষী শিকারে সাহায্য করেন, তাহাদের রোগ শোক হইলে সেবাপরিচর্য্যা এবং সান্ত্বনা দান করেন। তাহারাও এই হেতু তাঁহার বিপদ আপদে প্রাণ দিয়া তাঁহার সেবা করে। তাহারা কৃতজ্ঞ হৃদয়ে তাঁহাকে তাহাদের জাতির অনেক গুপ্ত বিদ্যা শিখাইয়াছে। ইহার মধ্যে মৎস্যশিকার ও সর্পদংশনের চিকিৎসা অন্যতম। দুইটি উদ্ভিদের পাতার রস করিয়া তাহারা এক বালতি জলে মিশাইয়া দেয় এবং ঐ মিশ্রিত জল জলাশয়ে ফেলিয়া দেয়। মিশ্রিত জল জলাশয়ের জলে মিশিয়া যাইবামাত্র জলাশয়ের সমস্ত মৎস্য উপরে ভাসিয়া উঠে, তখন মৎস্যগুলি যেন অচৈতন্য অবস্থায় থাকে। তখন সেমিনোলরা ইচ্ছামত বাছিয়া বড় মাছগুলি সংগ্রহ করে, অপরগুলি ছাড়িয়া দেয়। কিছু পরে উদ্ভিজ্জ মাদকমিশ্রিত জলের প্রভাব নষ্ট হইলে জলাশয়ের মৎস্য আবার চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া জলগর্ভে পলায়ন করে। উইলিয়াম সেমিনোলদের নিকট সর্পদংশনের অব্যর্থ ঔষধও শিক্ষা করিয়াছেন। কিন্তু কি উপাদানে মৎস্য ধরা বা সর্পদংশন হইতে রক্ষা করা হয়, তাহা তিনি জানিতে পারেন নাই। মিষ্ট কথায়, উৎকোচ প্রদানে অথবা ভয় প্রদানেও এই গুপ্ত বিদ্যা তিনি আয়ত্ত করিতে পারেন নাই। তবে সর্পদষ্ট ব্যক্তিকে সেমিনোলরা সংবাদ পাইলে নিজে যাইয়া রক্ষা করিতে কখনও অসম্মতি প্রকাশ করে না। উইলিয়াম বলেন, "সেমিনোলরা অতি মহৎ জাতি। তাহারা অতীব চরিত্রবান্ ও ধর্ম্মপরায়ণ। তাহাদের জলা জঙ্গলে যদি কোন শ্বেতকায় রোগগ্রস্ত হইয়া পড়ে অথবা আকস্মিক দুর্ঘটনায় আহত হয়, তাহা হইলে তাহারা দয়ায় গলিয়া গিয়া প্রাণপণে তাহার সেবা করে। তাহাদের মত সন্তানবৎসল কর্ত্তব্যপরায়ণ পিতামাতা দেখিতে পাওয়া যায় না। তাহারা সকল বিষয়ে—বিশেষতঃ ব্যবসায়-বাণিজ্যে অত্যন্ত সাধু ও সত্যবাদী। আমাদের শ্বেতজাতি তাহাদের নিকট এ বিষয়ে শিক্ষালাভ করিতে পারে। শ্বেতজাতির সংস্পর্শে তাহারা আসিতে চাহে না, ইহাই তাহাদের একমাত্র দোষ।"

এমন সাধুপ্রকৃতির হৃদয়বান্ জাতি আজ কাহার জন্য পৃথিবী হইতে লোপ পাইতে বসিয়াছে? তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরাজী বলিতে পারে। যাহারা পারে, তাহারা তাহাদের শিশুদিগকে শিক্ষা দেয়,—"Paleface no good—all lies—অর্থাৎ শ্বেতকায় ভাল হয় না, উহাদের সব মিথ্যা।" কেন এমন হয়? পাশ্চাত্য সভ্যতালোকের দীপ্তি কি এমনই ভীষণ?

মার্কিণের অন্যান্য স্থানেও রেড ইণ্ডিয়ানদিগের প্রতি কি অমানুষিক অত্যাচার আচরিত হইয়া আসিয়াছে, মিঃ ফিলিপ আলেকজাণ্ডার ক্রস এক মার্কিণ পত্রে তাহার বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। সে বর্ণনা হৃদয়-বিদারক! উহা উদ্ধৃত করিতে গেলে প্রবন্ধের কলেবর অতিরিক্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

মার্কিণের কোনও শক্তিশালী শ্রেষ্ঠশ্রেণীর সংবাদপত্র কালিফোর্ণিয়া প্রদেশের ১৮টি, ড্যাকোটার সিউক্স নামক একটি এবং নিউইয়র্ক সহরের ৬টি রেড ইণ্ডিয়ান জাতির অধিকার সমূহ বলপূর্ব্বক পদদলিত হওয়াতে লিখিয়াছেন,—"রেড ইণ্ডিয়ানদের প্রতি যুক্তরাজ্যের লোকের ও সরকারের ব্যবহার যে জাতির কলঙ্ক,—তাহা অবিসংবাদিত সত্য। এই ব্যবহারের মধ্যে পাশব অত্যাচার, ভগ্ন-প্রতিশ্রুতি ও অমানুষিক ঘৃণার অবিচ্ছিন্ন পরিচয় পাওয়া যায়। কথাগুলি কঠোর হইল সন্দেহ নাই। কিন্তু মিঃ ফিলিপ আলেকজাণ্ডার ক্রসের রেড-ইণ্ডিয়ানদের প্রতি অন্যায় অত্যাচার সম্পর্কিত প্রবন্ধ পাঠ করিলে এই কঠোর মন্তব্য যে সত্য অতিক্রম করে নাই, তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে। এখন কংগ্রেস অতীতের এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করুন। যে গর্ব্বিত মহৎ জাতির বংশধরগণকে আমাদের পূর্ব্বপুরুষরা হৃতসর্ব্বস্ব ও ধরাপৃষ্ঠ হইতে লুপ্ত করিয়া আসিয়াছেন, তাহাদের প্রতি ন্যায় ও ধর্ম্ম অনুসারে সুবিচার করুন, আইন প্রণয়ন করিয়া তাহাদিগকে আমাদের গণতন্ত্র শাসনের সুফল লাভ করিতে দিন।" ইহার উপর মন্তব্য বোধ হয় প্রয়োজন হইবে না।

পর্দ্দার বাহিরে

যুরোপে একমাত্র তুরস্ক রাজ্যে পর্দ্দা-প্রথা প্রচলিত ছিল; গাজী মুস্তাফা কামাল পাশার সমাজ ও শাসন-সংস্কারের ফলে উহাও উঠিয়া গেল বলিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। পর্দ্দা ভাল কি মন্দ, সে বিচার এখানে অনাবশ্যক, কেবল এইটুকু জানিলেই যথেষ্ট হইবে যে, তুরস্কের মত মুসলমান রাজ্যেও পর্দ্দা বিসর্জ্জন সম্ভবপর হইল। ইহা কি কালের প্রভাব নহে? মানুষ যত বাধা-বিঘ্ন দিউক না কেন, কাল তাহার কার্য্য করিয়া যাইবেই। ইহাই প্রকৃতির নিয়ম। মুস্তাফা কামাল চিরদিনই বন্ধনের বিরোধী। প্রথমেই তিনি যুরোপীয় শক্তিপুঞ্জের প্রভাবের বন্ধন হইতে জন্মভূমিকে মুক্ত করিয়াছেন। ইহার জন্য তিনি প্রবল যুরোপীয় শক্তিপুঞ্জের স্বার্থের বিপক্ষে গ্রীসের সহিত সংগ্রাম করিতেও পশ্চাদপদ হয়েন নাই। অসিহস্তে স্বাধীনতা অর্জ্জন করিবার পর তুরস্কের এই যুগপুরুষ পৌরোহিত্য-পীড়িত শাসনপ্রথার সংস্কার-সাধনে মনোযোগ দিয়াছিলেন। ফলে শেখ-উল-ইসলামের নির্ব্বাসন এবং খিলাফতের অবসান। ইহা ভাল কি মন্দ হইয়াছে, সে বিচারের স্থল ইহা নহে। সে বিচার মুসলমান-জগৎ করিবার অধিকারী। যাহা ঘটিয়াছে, তাহাই বর্ণনা করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। তাহার পর জাতীয় মহাসম্মেলনে ফেজের পরিবর্ত্তে টপ হ্যাট ও যুরোপীয় পরিচ্ছদের প্রবর্ত্তন। মুসলমান-জগৎ ইহাতে চমকিত হইয়াছিল। ইহার ফলে তুরস্কে অন্যান্য যুরোপীয় শক্তির মত ধর্ম্মের প্রভাবরহিত শাসন-প্রথার প্রবর্ত্তন হইয়াছিল। কামাল পাশার শেষ সংস্কার—পর্দ্দা-বিসর্জ্জন। যে তুরস্কে নারী হারেমের মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া অসূর্য্যম্পশ্যা ছিল, সেই তুরস্কে পর্দ্দার তিরোধান অভিনব সংস্কার বটে। এখন তুরস্কের নারী বহির্জগতে বাহির হইতে আরম্ভ করিয়াছেন। অনেক নারী হাল ফেসানের প্যারীর পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া লোকলোচনের সম্মুখে দেখা দিতেছেন। এত দ্রুত প্রাচীন প্রথার পরিবর্ত্তন অন্য কোনও যুগে অন্য কোনও দেশে হইয়াছে কি না সন্দেহ।

কিরূপে তুরস্কের নারী পর্দ্দার আবরণ হইতে মুক্ত হইয়াছেন, তাহা মেলেক হানুমের জীবন-কাহিনী পাঠ করিলে কতক পরিমাণে জানা যায়। তাঁহার পিতা নুরি বে, সুলতান আবদুল হামিদের বৈদেশিক সচিব; কিন্তু তিনি জাতিতে তুর্ক নহেন। মেলেক হানুমের পিতামহ ফরাসী দেশের অভিজাত সম্প্রদায়ের এক জন। তাঁহার পদবী ছিল মার্কুইস ডি ব্লোসে ডি সাটুর্মুফ। তিনি ফরাসীর সম্ভ্রান্ত ফাবর্গ সিন জার্ম্মেণ বংশের সন্তান। ক্রুসেডের যুগে এই বংশ সারাসেনদিগের

কামাল পাশা

বিপক্ষে যুদ্ধে প্রভূত যশঃ অর্জ্জন করিয়াছিলেন। এখন মেলেক হানুম প্যারীর এক বিখ্যাত পরিচ্ছদ-বিক্রেত্রী হইয়াছেন।

কিরূপে এই অভাবনীয় পরিবর্ত্তন হইল, তাহার ইতিহাস উপন্যাসের ন্যায় চমকপ্রদ। মেলেক হানুমের পিতামহ পূর্ব্বপুরুষগণের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া সামরিক পেশা অবলম্বন করিয়াছিলেন। কোনও এক সামরিক গুপ্ত দৌত্যে নিযুক্ত হইয়া তিনি তুরস্ক যাত্রা করেন। তুরস্কে পদার্পণ করিয়াই তিনি 'ইয়ং তুর্ক' দলের প্রতি আকৃষ্ট হয়েন। এই আকর্ষণের ফলে তিনি অচিরে স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করেন। এতদর্থে তিনি তাঁহার ফরাসী পদবী ত্যাগ করিয়া রসিদ বে নাম ধারণ করেন। ইহার এক গূঢ় কারণও ছিল। তিনি এক সুন্দরী সার্কেশীয় মুসলমান মহিলার প্রেমে পড়িয়াছিলেন। এই হেতু তিনি মুসলমান হইয়া তাঁহার পাণিগ্রহণ করেন। তিনি মুসলমান-ধর্ম্মানুসারে চারিটি পত্নী গ্রহণ করেন এবং তাঁহার বংশ এত দ্রুত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল যে, অনেক সময়ে তাঁহার বিপুল বংশের সকলকে তিনি চিনিতে পারিতেন না। কিন্তু অন্য দিকে তিনি তুরস্কের অবনত অবস্থার সংস্কারসাধনে এবং প্রকৃত স্বাধীনতা অর্জ্জনে প্রাণপণে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। এ জন্য 'ইয়ং তুর্ক' দল তাঁহাকে অতিমাত্র সম্মান করিতেন। বর্ত্তমান তুর্ক আন্দোলনের তিনিই পারাক্কে জন্মদাতা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এ বিষয়ে সিনাসি নামক এক শিক্ষিত মার্জ্জিতরুচি তুর্ক তাঁহার প্রধান সহায় ছিলেন। সিনাসি প্যারী সহরে গিয়া রুসোর গ্রন্থাদি পাঠ করিয়া তাঁহার ভাবধারায় স্নাত প্লাবিত হইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং রসিদ বের সহিত একযোগে রুসোর স্বাধীনতামন্ত্র গোপনে তরুণ তুর্কদিগের মধ্যে প্রচার করিতে থাকেন। ইহার ফলে তরুণ তুর্ক দল ও বর্ত্তমান ন্যাশানালিষ্ট দলের উদ্ভব হইয়াছে।

মেলেক হানুমের পিতা নুরী বে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র। তাঁহার হারেমে মেলেক ও তাঁহার ভগিনী জেনেব বাল্য ও কৈশোর অতিবাহিত করেন। ইংরাজ, ফরাসী, জার্ম্মাণ ও ইটালিয়ান গভর্ণেসের নিকট তাঁহারা শিক্ষিত হয়েন। এইরূপে তাঁহারা পাঁচটি য়ুরোপীয় ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। এতদ্ব্যতীত নক্সা অঙ্কন, সঙ্গীত, চিত্রাঙ্কন, সূচিকার্য্য প্রভৃতিতেও তাঁহাদের শিক্ষালাভ হইয়াছিল। তাঁহাদের মাতা এ সকল ব্যাপারে একবারেই পারদর্শিনী ছিলেন না। তিনি তুর্কী ভাষা ভিন্ন অন্য কিছু জানিতেন না; পরন্তু ধর্ম্মপ্রাণ 'সেকেলে' মুসলমান ছিলেন। তাঁহার কন্যারা কিন্তু পিতার আদেশে পর্দ্দার অন্তরালে থাকিয়া পিতার অতিথিদিগকে (বৈদেশিক দূত আদিকে) গান শুনাইয়া তৃপ্ত করিতেন। জেনেব সুগায়িকা ছিলেন। কাইজার যখন কনষ্টাণ্টিনোপলে জয়যাত্রা করেন, তখন তিনিই কাইজারের অভিনন্দন-সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন। কাইজার তাঁহার গুণের পুরস্কার দিয়াছিলেন। এইভাবে শিক্ষিত করায় তাঁহার পিতা এক বিষম ভুল করিয়াছিলেন। কন্যারা যখন বিবাহিতা হইয়া পুরা মুসলমান মহিলারূপে হারেমে আবদ্ধ হইবেন, তখন তাঁহারা কিরূপে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবেন, তাহা তিনি একবারও ভাবিয়া দেখেন নাই। তাঁহার কন্যারা প্রাচীর আবদ্ধ জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ এবং য়ুরোপীয় মুক্ত জীবনের প্রতি অনুরক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন।

তাঁহাদের হারেমে বহু য়ুরোপীয় মহিলা পরিচ্ছদ-বিক্রেত্রী পরিচ্ছদ বিক্রয় করিতে আসিতেন, তাঁহারা স্বয়ং বাজারে যাইতেন না। এই অবগুণ্ঠনহীন মহিলাদিগকে দেখিয়া তাঁহাদের হিংসা হইত। মেলেক 'নিষিদ্ধ ফল' ভক্ষণ করিলেন—পোষাকের ব্যবসায় হারেমবাসিনীদিগের পক্ষে নিষিদ্ধ হইলেও তিনি গৃহে বসিয়া ঐ ব্যবসায় বিশেষ মনোযোগের সহিত শিখিতে লাগিলেন।

কিন্তু ঘরে বসিয়া শিক্ষালাভ ক্রমে তাঁহার পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিল। তিনি এক গ্রীক পরিচ্ছদওয়ালীকে বহু উৎকোচে বশীভূত করিয়া কয়েক ঘণ্টার জন্য বাহিরে এক পোষাকের দোকানে লুকাইয়া গিয়া শিক্ষালাভ করিতে লাগিলেন। এক খৃষ্টান ক্রীতদাসীর অপরিচ্ছন্ন পরিচ্ছদে দেহ আবৃত করিয়া প্রত্যহ কয়েক ঘণ্টা কালের

জন্য তিনি হারেমের বাহিরে যাইতেন। যদি ধরা পড়িতেন, তাহা হইলে রক্ষা ছিল না।

এই সময়ে এমন এক ঘটনা ঘটিল, যাহাতে মেলেকের জীবনে সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন ঘটিল। তাঁহার ভগিনী জেনেবের বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হইয়া গেল। বর সুপুরুষ, মিষ্টভাষী, শিক্ষিত ও উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী। পরে তিনি বৈদেশিক সচিবের পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। বিবাহকালে তিনি মেলেকের পিতার সেক্রেটারী ছিলেন। কিন্তু এত গুণ সত্ত্বেও জেনেব বিবাহের কথা শুনিয়া তাঁহাকে ঘৃণাভরে দেখিতে লাগিলেন, মেলেক তাঁহাকে ঘৃণা করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণের নিকট প্রাপ্ত বংশগত স্বাধীনতা বৃত্তি হেতুই হউক বা তাঁহাদের বাল্যের শিক্ষা-দীক্ষা হেতুই হউক, তাঁহারা এরূপে অস্থাবর সম্পত্তির মত আপনাদিগকে সারা জীবনের জন্য পরের—সম্পূর্ণ অপরিচিতের হস্তে বিলাইয়া দিবার ঘোর বিরোধী হইয়া উঠিলেন। এই ব্যাপার হইতেই তুরস্কে স্ত্রী-স্বাধীনতা প্রবর্ত্তনের সূত্রপাত হইয়াছিল, এ কথা মেলেক স্বয়ংই বলিয়াছেন।

তাঁহারা ভাবিলেন, দেশের বহুকালের পুঞ্জীভূত সংস্কারই ইহার জন্য মূলতঃ দায়ী। তাঁহাদের পিতা উদারনীতিক হইয়াও সংস্কারের প্রভাব এড়াইতে পারেন নাই। তখন তাঁহাদের সঙ্কল্প হইল, এই সংস্কারের বিপক্ষে সংগ্রাম করা। কিন্তু কি উপায়ে এই সংগ্রাম চালান যাইবে? তাঁহারা যদি এ সম্পর্কে আন্দোলন করিয়া প্রবন্ধ রচনা করেন, কে তাহা ছাপাইবে? এতদ্ব্যতীত গোপনে প্রবন্ধ লিখিয়া সংবাদপত্রে দিলেও পরে ধরা পড়িবার ভয় আছে। কিন্তু তাহা বলিয়া তাঁহারা একবারে নিরস্ত হইলেন না। এতদুদ্দেশ্যে তাঁহারা তাঁহাদের হারেমেই স্ত্রী-ভোজের ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। এই সকল মহিলা-মজলিসে তাঁহারা তাঁহাদের পক্ষের যুক্তি-তর্ক তুর্কী মহিলাদিগকে বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন। তাহাতে কিছু কায হইল বটে, কিন্তু

মেলেক হানুম্—এই তুর্কী মহিলাই সর্ব্বপ্রথম অবরোধের বাহিরে আসিয়াছেন

বহির্জগৎ তাঁহাদের গোপন-ব্যথা বুঝিতে পারিল না। সভ্য জগৎ যদি তাঁহাদের কথা শুনিতে না পায়, তাহা হইলে পুরাতন সংস্কারের বিপক্ষে কিরূপে আন্দোলন উঠিতে পারে?

এমনই সময়ে ভাগ্যক্রমে বিখ্যাত ফরাসী লেখক পিয়ার লোটী কনষ্টাণ্টিনোপলে আসিলেন। লোটী তুর্কী জাতিকে ভালবাসিতেন, তুর্কী-সভ্যতারও অনুরাগী ছিলেন; সুতরাং তাহার সহিত গোপনে সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে স্বমতে আনয়ন করিবার সঙ্কল্প তাঁহাদের মনে জাগিয়া উঠিল। তাঁহারা গোপনে লোটীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং তাঁহাকে ফরাসীভাষায় হারেমের অবস্থার কথা বর্ণনা করিয়া পত্র লিখিতে লাগিলেন। এই সমস্ত 'হারেমের ডায়েরী' তাঁহারা এক ফরাসী মহিলার দ্বারা সংশোধন করিয়া লইতেন। পরে ঐ সকল পত্রকে ভিত্তি করিয়া লোটী তাঁহার বিখ্যাত উপন্যাস "লে ডেসএনচাণ্টিস" প্রকাশ করেন। উপন্যাসের গল্পটি এই;—"জেনানি, মেলেক ও জেনেব তিনটি উচ্চবংশীয়া তুর্কী মহিলা। তাহারা য়ুরোপীয় গভর্ণনেসের নিকট শিক্ষিত হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে এক জনের প্রাচীন তুর্কী প্রথায় বিবাহ হইল। অথচ বিবাহিতা মহিলা পূর্ব্বে কখনও স্বামীকে দেখে নাই। কাযেই সে এই বিবাহে অসন্তুষ্ট হইয়া স্বামীকে ঘৃণা করিতে লাগিল। তাহাদের অভাব অভিযোগের কথা জগৎকে জানাইবার জন্য তাহারা এক ফরাসী ঔপন্যাসিকের সাহায্য গ্রহণ করিল। তাহারা পর্দ্দানশীনা তুর্কীরমণী, এই হেতু নানা গুপ্ত উপায়ে নানা গুপ্ত স্থানে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিল। মেলেক ইহলোক ত্যাগ করিল। জেনানি ফরাসী ঔপন্যাসিককে ভাল বাসিয়া আত্মহত্যা করিল। কেবল জেনেব বাঁচিয়া রহিল।" লোটী এই ভিত্তির উপর তাঁহার পরম সুন্দর উপন্যাস রচনা করিয়া জগৎকে চমৎকৃত করিলেন। কিন্তু জেনেব ও মেলেক যে ইহার মূল, তাহাতে সন্দেহ নাই। সুতরাং তাঁহাদিগকে তুর্কী স্ত্রী-স্বাধীনতার মূল বলিলেও

জেনেব হানুম্—মেলেক হানুমের ভগিনী

পীয়ার লোটী—তুর্কীবেশে

তাঁহাদিগকে অর্থ সাহায্য করিতেন বটে, কিন্তু বাহিরে বলিতেন, কন্যাদের সহিত আর তাহার কোনও সম্পর্ক নাই।

মেলেক পরে খৃষ্টানধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া এক সঙ্গীতজ্ঞ পোলজাতীয় অভিজাতবংশীয় যুবককে বিবাহ করেন। তাঁহার মাতা এই সংবাদে মর্ম্মাহত হইয়া ইহলোক ত্যাগ করেন। জার্ম্মাণ যুদ্ধকালে তাহার স্বামী সর্ব্বস্বান্ত হয়েন। কাযেই তাঁহাকে বাল্যের শিক্ষার সদ্ব্যবহার করিতে হইয়াছিল। তিনি প্যারী নগরীতে এক পরিচ্ছদের দোকান খুলিলেন। তুর্কীর সম্ভ্রান্ত রাজপুরুষের হারেমে বিলাসসম্ভোগে লালিত পালিত কন্যা আজ প্যারীর পরিচ্ছদ-বিক্রেত্রী! তিনি স্বয়ং লিখিয়াছেন,—ইহা তাহার কিসমৎ!

কিন্তু ইহাতে তিনি সন্তুষ্ট। তিনি বলেন, যদি আবার বিধাতা তাঁহাকে পূর্ব্বাবস্থায় নিক্ষেপ করেন, তাহা হইলে তিনি আবার এইরূপ পলায়ন করিবেন। কেন না, তাহাতে তাঁহার জীবনের মহৎ উদ্দেশ্য সাধিত হইয়াছে—তুর্কীর মহিলার অবগুণ্ঠন মোচনে তিনি অগ্রদূতরূপে বিধাতা কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। এখন তিনি পরিণত বয়সে তাঁহার বাল্যের স্বপ্ন সফল হইতে দেখিয়াছেন—তুর্কীমহিলা অবগুণ্ঠন ত্যাগ করিতেছেন। আবদুল হামিদের ভীষণ রাজত্বের অবসান হইয়া মুস্তাফা কামালের গণতন্ত্র শাসনে তুর্কী পরমানন্দ উপভোগ করিতেছে।

অত্যুক্তি হয় না। অবশ্য জেনানি বলিয়া কোনও তুর্কী মহিলা ছিল না, উহা জেনেব ও মেলেকের কল্পনাপ্রসূত। কিন্তু লোটী তাহার অস্তিত্বে আস্থা স্থাপন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার ফ্রান্সের রচফোর্টের আলয়ে জেনানির জন্য একটি সমাধিমন্দিরও প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। লোটী এখন আর ইহজগতে নাই। কিন্তু তিনি যত দিন জীবিত ছিলেন, তত দিন সত্যই জেনানির অস্তিত্বে আস্থাবান ছিলেন।

লোটী যখন তাঁহার গ্রন্থ প্রকাশ করিতে উদ্যত হইলেন, তখন মেলেকের সম্মুখে এক মহাসমস্যা উপস্থিত হইল। এই গ্রন্থ প্রকাশ হইলেই তাঁহাদের কীর্ত্তি প্রকাশ হইয়া পড়িবে, ইহা নিশ্চয়। অথচ গ্রন্থ প্রকাশ করিতে হইবেই, না হইলে তুরস্কের পর্দ্দা-সংস্কার হয় না। প্রকাশ হইবার পর তাহাদের ভাগ্যে কি শাস্তি হইবে—বিশেষতঃ আবদুল হামিদের ন্যায় স্বেচ্ছাচারী সুলতানের শাসনকালে—তাহা তাঁহারা বিলক্ষণ জানিতেন। কাযেই তাহারা স্থির করিলেন, স্বদেশ ও স্বগৃহ হইতে পলায়ন ভিন্ন উপায় নাই। তাঁহারা জানিতেন, ইহাতে বিপদ কিরূপ। কিন্তু ফ্রান্সে থাকিয়া তুর্কী মহিলাদের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করা তাঁহারা জীবনের ব্রত বলিয়া মনে করিয়া হারেমের নিশ্চিত আশ্রয় হইতে বাহিরে বিপদ-সমুদ্রে ঝম্পপ্রদান করিলেন। কিরূপে তাঁহারা তাঁহাদের গ্রীক ও আর্ম্মাণী ক্রীতদাসীদিগকে উৎকোচে বশীভূত করিয়া, পোলজাতীয়া সঙ্গীত-শিক্ষয়িত্রীর নিকট কিরূপে পাশ-পোর্ট সংগ্রহ করিয়া, কিরূপে জেনেবকে এক পোলজাতীয়া জননী সাজাইয়া এবং নিজে কন্যা সাজিয়া, কিরূপে অতি কষ্টে তুর্কী পুলিশের শ্যেনদৃষ্টি এড়াইয়া তাঁহারা য়ুরোপীয় বেশে তুর্কী সীমানা পার হইয়া বেলগ্রেডে এবং তথা হইতে শেষে প্যারী নগরীতে উপনীত হইলেন, তাহার বিস্তৃত বর্ণনা অনাবশ্যক।

তুর্কীর বাহিরে গিয়া অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিয়া বহির্জগৎ দেখিয়া তাঁহারা প্রথমে মুগ্ধ হইলেন। কিন্তু পরে মেলেক নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে, প্যারীতে নারীর অবস্থা দেখিয়া তাঁহার সমস্ত আশা আকাঙ্ক্ষার স্বপ্ন ভঙ্গ হইয়াছিল। তাঁহাদের স্বপ্নের ফরাসী রাজ্য যখন বাস্তবে পরিণত হইল, তখন তাহার ন্যক্কারজনক অবস্থা তাঁহাদিগের নবীন হৃদয়ের মুকুলিত আশা ধ্বংস করিয়া দিয়াছিল।

তাঁহাদের পিতার কিন্তু ইহা হইতেই অধঃপতন হইল। সুলতান আর তাঁহাকে বিশ্বাস করেন নাই। তিনি মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত গোপনে

পীয়ার লোটী—ফরাসীবেশে

১৪

ঘোষ-পত্নীর অসুস্থতা অল্পক্ষণই ছিল। তাঁহার ঐ প্রকার ভাব দেখিয়া তাঁহার পিতা ব্যাগ হইতে একটা "স্মেলিং-সল্টের" শিশি বাহির করিয়া তাঁহার নাকের কাছে ধরিতেই সামান্য যেটুকু সংজ্ঞালোপের উপক্রম হইয়াছিল, তাহা প্রশমিত হইয়া পুনরায় তাঁহার সম্পূর্ণ চৈতন্যলাভ হইল।

ইতোমধ্যে নলিনী বাবু এক গ্লাস শীতল জল আনাইয়া তাঁহাকে পান করিতে দিলেন। কিন্তু ঘোষ-জায়া তখন প্রকৃতিস্থ হইয়াছিলেন। জল পান না করিয়া বলিলেন, "না, না, ও কিছু নয়; আপনারা ব্যস্ত হবেন না। দুপুর-বেলার রৌদ্রে ট্রেণে আসা, তার পর এখানে ঐ সব খুন-খারাপির কথা-বার্ত্তায় মাথাটা কেমন ঘুরে গিয়েছিল মাত্র। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।"

ঘোষ-পত্নীর সহসা ঐরূপ অসুস্থতায় কিন্তু আমার মনে একটু সন্দেহ উপস্থিত হইল। অবশ্য তিনিই যে হত্যাকারী, তাহা মনে না হইলেও হয় ত তিনি ও সম্বন্ধে কিছু জানেন বা অন্ততঃ সন্দেহ করেন অথচ তাহা গোপন রাখিতে চাহেন, এইরূপ একটা সংশয় হইতে লাগিল। তিনি তাঁহার এই অসুস্থতার যে কারণ নির্দ্দেশ করিলেন, তাহা অসম্ভব না হইলেও উহাই যে ঠিক কারণ, তাহা আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস হইল না। কিন্তু এ বিষয়ে বিশেষ চিন্তা করিবার তখন অবসরও ছিল না; কারণ, পিতা-পুত্রী আর কোন বাক্যালাপ না করিয়া তখনই প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলেন। যাইবার সময় নলিনী বাবুর অনুরোধে সেন সাহেব তাঁহাদের কলিকাতার উপস্থিত বাসস্থানের ঠিকানা দিয়া এবং ঘোষ-জায়া আমার দিকে পুনরায় এক মিষ্ট-হাসিসংবলিত কোমল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

তখন নলিনী বাবু আমার দিকে সহাস্যে চাহিয়া ব্যঙ্গ-চ্ছলে বলিলেন, "তাই ত! অরুণ বাবুর সুন্দর ফুট-ফুটে চেহারাটি, মিসেস ঘোষের বেশ নেক-নজরে প'ড়ে গেছে দেখছি।"

আমি একটু বিরক্তিভরে বলিলাম, "ও রকম মেয়ে-মানুষদের বোধ হয় স্বভাবই তাই। ওরা ঐ রকম নেক-নজর রাস্তায় ছড়িয়ে বেড়ায়, নিজেদের রূপের পসরার দিকে লোকের নজর আকর্ষণ করবার জন্য। কিন্তু যাই বলুন মশায়, ওর ভাব-ভঙ্গী দেখে ওর ওপর আমার কিছু সন্দেহ হচ্ছে।"

"কি সন্দেহ? যে, ও-ই খুন করেছে?"

"অত দূর না হোক্, ও যে এ বিষয়ে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত, তা আমার মনে হয় না।"

"কেন, তাতে ওর লাভ কি?"

"লাভ? অন্য কিছু না হ'লেও ইন্‌সিওরেন্সের ঐ টাকাটা।"

"আর সেই সঙ্গে লোকসান, জমীদারী ও অন্যান্য সম্পত্তির ভোগদখলটা।"

"সে সব সম্পত্তি যে কত, তা ত আমরা জানি না। হয় তো আশী হাজারের কম। আর তা না হলেও ইন্‌-সিওরেন্সের ঐ আশী হাজার হস্তগত ক'রে নন্দন-বুড়োর মত আবার একটা নূতন 'টোপ' গাঁথতে পারলে মন্দ কি? ও যে শুধু টাকার জন্যই তা'কে বিয়ে করেছিল, তা'তে ত কোন সন্দেহ নাই। উইলটা করিয়ে নিয়েই তাঁর সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়ে, বেচারাকে অতিষ্ঠ ক'রে পাগল বানিয়ে তুলেছিল; শেষে বাড়ী-ছাড়া পর্য্যন্ত করেছিল।"

"সে বুড়ো ইচ্ছা করলে, উইলখানা পরে আবার বদ-লাতে ত পারতো? না, অরুণ বাবু, আপনি যা-ই বলুন, আমার ত মনে হয় না যে, ও রকম চপলস্বভাবের ছিবলে মাগীর দ্বারা ও'সব কায হ'তে পারে।"

"তা হ'লে সরু ভোজালীর নাম শুনে আঁৎকে উঠে ও রকম অজ্ঞানের মত হয়ে পড়লো কেন? শুনলেন ত ওদের বিয়ে দার্জ্জিলিঙ্গে? আর দার্জ্জিলিঙ্গ সব রকম

ভোজালীর আড়ৎ, তা ত জানেন? সব দিকে চেয়ে মত স্থির করা ভাল নয় কি?"

"ওটাতে মনে একটু খট্‌কা হ'তে পারে বটে, কিন্তু ও যে কারণ দেখালে, তাও ত সম্ভব? তা ছাড়া, ভোজালী কলকাতাতেও যথেষ্ট পাওয়া যায়।"

"তা হ'তে পারে। কিন্তু নলিনী বাবু, আমার সন্দেহটা এত সহজে যাচ্ছে না। আমার উপর ওর নেক-নজর পড়ুক আর না পড়ুক, আপনাদের 'সি, আই, ডি'-র একটু নেক-নজর ওর উপর থাকা দরকার বোধ হয়।"

"ওঃ! সে বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। আমি ওর গতি-বিধির উপর লক্ষ্য রাখতে ছাড়বো না জানবেন। দরকার হ'লে, ওকে ঠিক 'পাকড়াও' করতে পারবো। কিন্তু আমার মোটেই বিশ্বাস হয় না যে, ও মাগী এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট আছে। তা হ'লে সে বিজ্ঞাপন দেখে কখনই আমাদের ফাঁদে পা দিতে আসতো না। নাঃ অরুণ বাবু, আপনার ওটা সম্পূর্ণ বৃথা সন্দেহ।"

"সে আপনি বুঝুন মশায়, এখন সবই ত আপনার হাতে।"

এই বলিয়া আমি উঠিলাম। চলিয়া আসিবার সময় তাঁহাকে একটু শ্লেষ করিবার অভিপ্রায়ে বলিয়া আসিলাম, "আর, ও যে সত্যই নন্দনের স্ত্রী কি না, তারও একটু খোঁজ নেবেন।"

নলিনী বাবু প্রথমে একটু বিস্মিত হইলেন বোধ হইল; কিন্তু পরক্ষণেই উচ্চহাস্য করিয়া, যেন আমার কথাটা উড়াইয়া দিয়া তিনি আমায় বিদায় দিলেন।

১৫

এই ঘটনার কয়েক দিন পরে নলিনী বাবুর নিকট খবর পাইলাম যে, ঘোষ-পত্নী স্বামীর উইলের প্রোবেট পাইবার জন্য হাইকোর্টে দরখাস্ত করিয়াছেন, এবং সেই সঙ্গে ইনসিওরেন্সের টাকা পাইবার জন্য সেই অফিসের নিয়মানুযায়ী আবেদনপত্র দাখিল করিয়াছেন। ক্রমে আরও জানিলাম যে, বিহারীলাল ঘোষ যে মৃত, এ কথা সাব্যস্ত করিবার জন্য, ঐ ব্যক্তি এবং মৃত কুঞ্জবিহারী নন্দন যে একই লোক ছিলেন, তাহা সপ্রমাণ করিবার অভিপ্রায়ে, বিহারী ঘোষের বর্দ্ধমানের বাড়ীর দুই এক জন পুরাতন ভৃত্য, দুই এক জন প্রতিবেশী ও জমীদারীর নায়েব ও গোমস্তার সাক্ষ্য তলব হইয়াছে, এবং ফটোগ্রাফ মিলান করা ইত্যাদি বিষয় প্রমাণের জন্য নলিনী বাবুকে ও আমাকেও তলব হইবে। বাস্তবিক, পরে আমাকে হাইকোর্টে সাক্ষ্য দিতেও হইল। যাহা হউক, আদালতের এই সকল ব্যাপার যথারীতি সমাধা হইতে প্রায় দুই মাস কাটিল। অবশেষে শ্রীমতী যমুনা ঘোষ তাঁহার স্বামীর উইলের প্রোবেট লাভ করিয়া, তাহার বলে অনতিবিলম্বেই ইনসিওরেন্স আফিস হইতে সেই আশী হাজার টাকাও আদায় করিতে সমর্থ হইলেন।

ইহার প্রায় সপ্তাহখানেক পরে আমি ঘোষ-জায়ার এক চিঠি পাইলাম। তাহাতে তিনি আমাকে তাঁহার কলিকাতার বাসাবাটীতে পরদিন বৈকালে দেখা করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। আমি যথাসময়ে সে অনুরোধ রক্ষা করিলাম। নানারূপ বাক্যালাপে তিনি আমাকে যথেষ্ট আপ্যায়িত করিলেন। কথাপ্রসঙ্গে তাঁহার কাছে শুনিলাম যে, নলিনী বাবুর নিকট তিনি জানিয়াছেন যে, পুলিস এ পর্য্যন্ত হত্যাকারীর কোনই সন্ধান করিতে পারে নাই এবং এই কার্য্যে তাহাদিগকে একটু বেশী প্রবুদ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে তিনি নলিনী বাবুকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন যে, হত্যাকারীকে যে ধরিয়া দিতে বা তাহার সন্ধান করিয়া দিতে পারিবে, তাহাকে ৫ শত টাকা পুরস্কার দিবেন। তৎপরে আমি বিদায় লইবার উপক্রম করিলে তিনি বলিলেন, "এইবার কাকলীও ফিরে আসছে যে!"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কাকলী! তিনি আবার কে?"

"সে কি! আপনি তা জানেন না? সে যে মৃত ঘোষজা মশায়ের সেই প্রথম পক্ষের মেয়ে! আজ ২।৩ দিন হলো, বর্ম্মা থেকে তার মাসীর চিঠি পেয়েছি। লিখেছে যে, প্রায় মাস চারেক আগে তা'র স্বামীর খুব ভারী অসুখ হয়েছিল। একটু সারবার পরে ডাক্তারের পরামর্শে কয়েক মাস তারা সবাই সমুদ্রে ঘুরে বেড়িয়েছিল। হালে রেঙ্গুনে ফিরে এসে খবরের কাগজে ঘোষজার মৃত্যুর সব খবর আর তার উইল-প্রোবেটের খবরও পেয়েছে। আমিও কিছু দিন আগে কাকলীকে সব খবর দিয়ে একখানা চিঠি লিখেছিলাম। সেটাও সে এত দিনে পেয়েছে। এখন তারা সবাই এখানে শীঘ্রই আসবে লিখেছে। তার পরে হত্যাকারীর রীতিমত প্রকারে তল্লাস করাবে।"

"শুনে সুখী হলাম বটে, কিন্তু অনুসন্ধানের যে ফল কিছু হবে, তা ত আমার আশা হয় না।"

"আমারও তাই মনে হয়। পুলিসের লোকরা নেহাত নালায়েক। কিন্তু কাকলীও সহজে ছাড়বার বান্দা নয়। ছেলেমানুষ হ'লে কি হয়, সে ভারী জিদ্দী মেয়ে!"

ক্রমে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া যাওয়ায় আমি আর বিলম্ব না করিয়া ঘোষ-পত্নীর নিকট বিদায় লইয়া চলিয়া আসিলাম।

এক দিন নলিনী বাবুর সহিত পুনরায় দেখা করিতে গিয়া জানিলাম যে, তিনি স্বয়ং কয়েকবার বর্দ্ধমানে যাইয়া নানারূপ অনুসন্ধান করিয়া বিহারী ঘোষের পূর্ব্ব-বৃত্তান্ত জানিয়াছেন। লোকটি চিরকালই অধ্যয়নশীল; বিদ্যাচর্চ্চা লইয়াই থাকিতেন। প্রথমে পশ্চিমে কোন্ একটা কলেজে প্রোফেসার ছিলেন; পরে বর্দ্ধমাননিবাসী ধনী মাতামহের মৃত্যু হইলে তাঁহার অন্য কোন উত্তরাধিকারী অভাবে বিহারী প্রচুর বিষয়-সম্পত্তি পাইয়া, চাকরী ত্যাগ করিয়া বর্দ্ধমানেই বাস করিতে থাকেন। তিনি কিছু বেশী বয়সে বিবাহ করেন এবং কয়েকটি সন্তান হইয়া সবই শৈশবে মারা যায়। কেবল শেষ যে কন্যা হয়, সে-ই জীবিত আছে। কন্যার পাঁচ বৎসর বয়সে তাহার মাতৃবিয়োগ হয়। তখন বিহারীর বয়স প্রায় ৪০।৪২ বৎসর। মেয়েকে তাহার মাসী লালনপালন করিতে থাকেন এবং বিহারী স্ত্রীবিয়োগের শোক ভুলিবার জন্য বিলাত যান ও প্রায় তিন বৎসর পরে ফিরিয়া আইসেন। তখন বর্দ্ধমানের বাড়ী ও বাগান ইংরাজী ধরণে সাজাইয়া ও তাহার "নন্দন-কুঞ্জ" নাম দিয়া তাহাতে কন্যাকে লইয়া বিলাতী চালে বাস করিতে থাকেন। এক বর্ষীয়সী আত্মীয়াকে আনিয়া কন্যার পালিকারূপে বাড়ীতে রাখেন এবং তাহার বিদ্যার্জ্জনের জন্য এক জন প্রবীণ শিক্ষক ও এক ব্রাহ্মিকা সঙ্গীত-শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করেন।

এই ভাবে ৫।৬ বৎসর কাটিবার পর একবার তাঁহারা কয়েক মাস দার্জ্জিলিঙ্গে বাস করেন। সেখানে সেন সাহেব ও তাহার কন্যার সঙ্গে বিহারীর আলাপ হয় এবং বোধ হয়, ঐ নারীর রূপে মুগ্ধ হইয়া, নিজের কন্যার সম্পূর্ণ অনিচ্ছা সত্ত্বেও যমুনাকে বিবাহ করেন। বর্দ্ধমানে পুনরায় ফিরিয়া আসিবার পরে মাস ছয়েক এক রকমে কাটিয়াছিল; কিন্তু তাহার পরে বিহারীর ঐ নূতন স্ত্রীর এক পুরুষ বন্ধু প্রায়ই তথায় আসিয়া বাস করিতে থাকেন এবং তখন হইতেই স্বামি-স্ত্রীর মধ্যে মনান্তর ও নিত্যই কলহ হইতে থাকে। ক্রমে বিহারীর বোধ হয় কিছু মাথা খারাপও হইয়াছিল।

বিহারীর কন্যার সহিত যমুনার কখনও সদ্ভাব হয় নাই, এবং সে ঐ কন্যার উপর নানারূপ অত্যাচার করিত। অবশেষে কন্যার মাসী আসিয়া তাহাকে বর্ম্মায় লইয়া যান। ইহার ২।৩ মাস পরেই বিহারী গৃহত্যাগ করিয়া নিরুদ্দেশ হয়েন। কিন্তু রামপালের পোড়োতে আসিবার পূর্ব্বের চার মাস তিনি কোথায় ছিলেন, সে খবর, অথবা উহার সম্বন্ধে আর এমন কোন খবরই নলিনী বাবু সংগ্রহ করিতে পারেন নাই—যাহাতে তাঁহার হত্যাকারীর সন্ধান পাইবার কোন উপায় হইতে পারে।

তৎপরে নলিনী বাবুর সহিত ঐ হত্যাসম্বন্ধে সমস্ত বিষয় আনুপূর্ব্বিক বিচার করিয়া, আমরা উভয়েই স্বীকার করিতে বাধ্য হইলাম যে, আকস্মিক কোন দৈব সুযোগ না ঘটিলে, শুধু অনুসন্ধানের দ্বারা এই হত্যা-প্রহেলিকার মীমাংসা হইবার বা হত্যাকারীকে সন্ধান করিবার কোন সম্ভাবনাই আর নাই।

১৬

বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি যে, এই হত্যা ব্যাপারের অনুসন্ধানে সংশ্লিষ্ট থাকার জন্যই হউক বা অপর যে কোন কারণেই হউক, আমি ইদানীং সময়ে সময়ে কোর্টে কিছু কিছু কাযকর্ম্ম পাইতেছিলাম। 'ফী' অপেক্ষা কাযের প্রতি বেশী মনোযোগ দেওয়ায় মক্কেল মহাশয়রা উকীলকে ফাঁকি দেওয়ার সুখটা যে একটু বেশী উপভোগ করিতেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহাতে আমার আপাততঃ লাভ এইটুকু হইয়াছিল যে, কাযগুলা সম্পূর্ণ বা আংশিক 'বেগারের' হইলেও, সংখ্যায় তাহা ক্রমে একটু বাড়িতেছিল, এবং তাহার ফলে, আমার সাধের 'মক্কেল-ঘরে' সযত্ন-রক্ষিত বেঞ্চি ও চেয়ারগুলা আজকাল সপ্তাহের সাত দিনই যে সম্পূর্ণ খালি থাকিত না, তাহাতেই আমি যথেষ্ট আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেছিলাম।

অপর সাধারণের স্মৃতিপথ হইতে সেই হত্যাকাণ্ডটা ক্রমে অপসৃত হইলেও, আমাদের পাড়ার লোকের, বিশেষতঃ পিসীমার নিকট উহা এখনও একটা নিত্য আলোচনার

বিষয় ছিল। আর তাহা বিচিত্রও নহে। সম্মুখের ঐ ১০নং বাড়ীটা 'হানা'র উপর আবার 'খুনে' হইয়া পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর বীভৎস হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাহাতে আবার খুনী ও তাহার অস্ত্র যখন দুই-ই এমন আশ্চর্য্যরূপে অন্তর্হিত হইয়াছে যে, তাহাদের একটিরও স্থূল কলেবরের অস্তিত্বের কোন চিহ্ন পর্য্যন্ত এখনও পাওয়া যাইতেছে না, তখন এ হত্যা যে কখনই মানুষের দ্বারা হয় নাই, নিশ্চয়ই কোন অশরীরী প্রেতাত্মার দ্বারা কোন অপার্থিব উপায়ে সাধিত হইয়াছে, এই বিশ্বাস পাড়ার অনেকের এবং পিসীমারও মনে ক্রমে বেশ বদ্ধমূল হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। বলা বাহুল্য যে, তিনি আমাকেও তাঁহার মতাবলম্বী করিবার প্রয়াসী হইয়া ঐ বিষয়ে আমার সহিত যথেষ্ট আলোচনাও করিতেন, এবং তাঁহার নিকট শুনিয়াছিলাম যে, পুনরায় কেহ কেহ নাকি ঐ হানাবাড়ীতে রাত্রির অন্ধকারের মধ্যে এদিক্ ওদিক্ একটা আলোর চলাচল দেখিয়াছে বটে, কিন্তু তাহা ছাড়া খুনের পরে আর কোন নূতন রকমের ভূতের উপদ্রবের কথা কিছু শুনা যায় নাই।

আমি পূর্ব্বের ন্যায় এখনও পিসীমার ঐ সব 'ভূতুড়ে' মতের সম্পূর্ণ বিরোধী থাকায় তিনি আমার উপর বিরক্ত হইতেন বটে, কিন্তু ও বিষয়ে আমার সহিত আলোচনায় তাঁহার উৎসাহ কিছুমাত্র কমে নাই। সেই জন্য আমিও হত্যা সম্বন্ধে তদন্ত-সংক্রান্ত যখন যাহা ঘটিত, সে সমস্ত কথাই তাঁহাকে যথাসময়ে জানাইতাম এবং সেই প্রসঙ্গে ঘোষ-পত্নীর সহিত আমার শেষবার সাক্ষাতে যে সব কথাবার্ত্তা হইয়াছিল ও নলিনী বাবুর নিকটে মৃত নন্দন সাহেব বা বিহারীলাল ঘোষের পূর্ব্ববৃত্তান্ত যাহা কিছু শুনিয়াছিলাম, সে সমস্তই পিসীমাকে জানাইয়াছিলাম।

বিহারী ঘোষের বৃত্তান্ত সব শুনিয়া, প্রথমে পিসীমা বিস্মিতভাবে কিছুক্ষণ আমার দিকে চাহিয়া, পরে বলিলেন, "কি বল্লে? আবার বল ত!—বিহারী ঘোষ? পশ্চিমে প্রোফেসারী করতো? মাতামহের বিষয় পেয়েছিল? —ওঃ! একটি মেয়ে রেখে স্ত্রী মারা যায়? বটে? আর শ্যালী বর্ম্মায় থাকে? —ওঃ! অনসূয়ার বোন্ প্রিয়ম্বদা? যোগীন মিত্রের স্ত্রী?"

আমি বিস্মিত হইয়া বলিলাম, "তা' ত জানি না। আমি আপনার ও প্রশ্নের জবাব দিতে অক্ষম।"

"জবাব আবার কি দেবে? আমি জানি যে ওদের। ওরা যে আমাদের আপনার লোক গো! আমার ননদের যা'র আপনার মামাতো বোন্, তা জান না?—তা তুমিই বা কি ক'রে জানবে, বল? লেখাপড়া নিয়েই থাকতে, আমাদের দেশের বাড়ীতে ত কখনও যাওনি। ওরা আমাদের বাড়ীতে মাঝে মাঝে আস্তো। এ বাড়ীতেও বোধ হয় একবার এসেছিল। হ্যাঁ হ্যাঁ! বটেই ত! আমার আশুর (পিসীমার বড় ছেলের নাম আশুতোষ) ভাতের সময়, প্রিয়ম্বদা ছেলেপিলে নিয়ে এসেছিলই ত! তখন যে তারা কলকাতাতেই ছিল। আর—রোসো, রোসো, ছেলেদের সঙ্গে তার সেই মা-মরা বোনঝিটিকেও যে এনেছিল! আহা! মেয়েটি কি সুন্দরী! যেমন চেহারা, তেমনই রং! ঠিক যেন মেমেদের মেয়ে! একবার দেখ্লে আর চোখ ফেরানো যায় না। তখন তার বয়সই বা কত? বোধ হয় ছ'-সাত বছর হবে। তখনই তার চুলের কি বাহার! আহা, যেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মী ঠাকরুণটি! মুখখানি যেন এখনও আমার চোখের সাম্‌নেই রয়েছে! অথচ, হলোও ত কম দিন নয়? এই দেখ না, আশু ত দশে পড়েছে? তা হ'লে সে আজ প্রায় ন'বছরের কথা। উঃ! দিন যায় না জল যায়! দেখ্তে দেখ্তে ন'বছর কেটে গেছে! এর মধ্যে তাদের আর একবারও দেখিনি, কোন খবরও বিশেষ পাইনি। তারা শীঘ্রই আস্‌বে বল্লে না? আহা! আসুক, আসুক! অনেক দিন দেখিনি তাদের। এলে আমাকে খবর দিও ত বাবা, একবার গিয়ে দেখা ক'রে আসবো।"

আমি এতক্ষণ পিসীমার এই সব এক প্রকার স্বগত উক্তি নীরবে শুনিতেছিলাম। অবশেষে তাহা এইরূপ এক অপ্রত্যাশিত অনুরোধে পরিণত হওয়ায় আমি বলিলাম, "আমি নিজে খবর পেলে ত আপনাকে দেবো? কিন্তু আমি জান্‌বো কি ক'রে?—তাঁরা যদি রেঙ্গুনের জাহাজ থেকে সটান একেবারে পুলিস-কোর্টে নামেন ত, হয় ত, আমার জানা সম্ভব হ'তে পারে।"

"আহা! তোমার আর চালাকী করতে হবে না! পুলিস-কোর্টে তারা নামতে যা'বে কেন? যোগীন মিত্রের যে বাগবাজারে নিজের বাড়ী আছে! তুমি সেখানে মাঝে মাঝে গিয়ে খবর নিও যে, তারা এসেছে কি না।"

"তাঁদের বাড়ীর ঠিকানা কি?"

"তা কি আমার অত মনে আছে? তবে আমার কাছে নিমন্ত্রণের ফর্দ্দটা বোধ হয় আছে। তা দেখে তোমায় ব'লে দেব এখন।"

১৭

ইহার কিছু দিন পরে আমার বড়দিদির এক চিঠি পাইলাম। দুই ভগিনীর সঙ্গেই আমার পত্র ব্যবহার বেশ চলিত। তবে তাঁহারা যত ঘন ঘন ও নানা তথ্যপূর্ণ চিঠি লিখিতেন, আমার দিক হইতে সব সময় তত শীঘ্র বা তত বিশদ রকম চিঠি যাইত না, এরূপ অনুযোগ তাঁহাদের চিঠিতে মাঝে মাঝে দেখিতাম। আমি পিসীমা'র বাড়ীতে বাস আরম্ভ করিবার পর হইতে ভগিনীরা তাঁহাকেও সময়ে সময়ে চিঠি লিখিতেন ও যথাসময়ে উত্তরও পাইতেন। যাহা হউক, বড়দিদির এবারের চিঠিখানির শেষাংশটুকু আমার কিছু প্রহেলিকাময় বোধ হইল। কয়েকবার পড়িয়াও তাহার ভাল রকম অর্থবোধ করিতে পারিলাম না। সে অংশটা এইরূপ:—

"তোমার আজকাল কিছু কিছু প্র্যাকটিস্ হইতেছে জানিয়া বড়ই আনন্দিত হইলাম। আমার বরাবরই দৃঢ় ধারণা ছিল যে, ওকালতীতে তোমার পসার জমিতে বেশী দেরী হইবে না। সে ধারণাটা সত্যে পরিণত হইতে আরম্ভ হইয়াছে, ইহাতে আমার আরও আহ্লাদ। বিমলা পিসীও—(আমার জ্ঞাতি-পিসীর নাম বিমলা) এ বিষয়ে খুব তৃপ্তি জানাইয়া আমাকে চিঠি লিখিয়াছেন। তাঁহার সব চিঠিতেই যেমন তোমার সম্বন্ধে স্নেহপূর্ণ প্রশংসাবাদ থাকে, ইহাতেও তাহা যথেষ্ট আছে। তিনি যে তোমাকে আন্তরিক স্নেহ করেন ও নিজের ছেলের মত দেখেন, তাহা ত তুমি জান। তুমিও তাঁহার প্রতি পুত্রের ন্যায় ব্যবহার কর, তাহাও জানি। কিন্তু তবু তোমাকে বলিতেছি যে, তুমি সকল বিষয়েই তাঁহার বাধ্য হইয়া চলিলে আমরা সবাই বড় সুখী হইব। খুব গুরুতর বিষয়েও তাঁহার কোন অনুরোধ রক্ষা করিতে তুমি অন্যথা করিও না। কারণ, তিনি তোমার হিতৈষী।"

দুই এক দিন পরে আবার ছোটদিদির নিকট হইতেও প্রায় ঐ একই ভাবের চিঠি পাইলাম। ব্যাপারটা কি, ঠিক বুঝিতে না পারায় আমার কিছু অশান্তি বোধ হইতে লাগিল, এবং পিসীমা'র সঙ্গেই এ সম্বন্ধে একবার স্পষ্টতঃ কথা কহিব মনস্থ করিলাম। কিন্তু ও কথা তাঁহার নিকট উত্থাপন করার সুযোগ হইবার পূর্ব্বেই রেঙ্গুন হইতে যোগীন্দ্রনাথ মিত্রের নাম স্বাক্ষরিত এক চিঠি পাইলাম। চিঠিখানা ইংরাজীতে লিখিত। তাহার মর্ম্ম এই যে, পরবর্ত্তী 'মেল' জাহাজে তিনি সপরিবারে কলিকাতার জন্য রওয়ানা হইবেন। মৃত বিহারীলাল ঘোষের হত্যা-সম্বন্ধে তিনি আমার সহিত কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে ইচ্ছা করেন। কিন্তু এবারে অনেক দিন পরে দেশে আসিতেছেন বলিয়া প্রথম কয়েক দিন সম্ভবতঃ তাঁহাকে নানারূপে ব্যস্ত থাকিতে হইবে। সেই জন্য কবে কোন্ সময়ে তিনি আমার সহিত দেখা করিতে আসিবার সুযোগ পাইবেন, তাহা বলিতে পারেন না। অথচ যত শীঘ্র সম্ভব দেখা হওয়াও আবশ্যক। শেষে লিখিয়াছেন,—

"অতএব যদি ধৃষ্টতা না মনে করেন ত পর-সপ্তাহের রবিবার প্রাতে অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমার বাগবাজার ষ্ট্রীটস্থ— নং বাড়ীতে আসিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার অনুরোধ করিতে পারি কি?"

যথাসময়ে এই চিঠির মর্ম্ম পিসীমাকেও জানাইলাম। তিনি খুব আনন্দিত হইয়া বলিলেন, "তুমি ত যাবেই, আর আমি কবে দেখা করতে যাবো, সেটাও অমনি স্থির ক'রে এসো।"

আমার কিন্তু এ প্রস্তাবটা ভাল লাগিল না। বলিলাম, "না, পিসীমা, আমাকে যোগীন বাবু যখন ও রকম বিনীত-ভাবে তাঁর বাড়ীতে যেতে আহ্বান করেছেন, তখন অবশ্যই আমার যাওয়া উচিত। কিন্তু তা ব'লে আপনিও যে যেচে তাঁদের বাড়ীতে গিয়ে দেখা করবেন, তা হ'তে পারে না। তাঁরা যখন বিদেশ থেকে আসছেন, তখন তাঁদেরই উচিত, আত্মীয়-বন্ধু-বান্ধবদের বাড়ীতে এসে দেখা করা।"

"হাঁ, তা বটে। কিন্তু, তারা হয় ত অন্য পাঁচ কাযে ব্যস্ত থাকবে। এখানে এসে আমার সঙ্গে দেখা করতে হয় ত অনেক দেরী হ'তে পারে। অথচ আমার যে 'গরজ' বেশী!"

"কেন, এত কি গরজ যে, উপযাচক হয়ে আপনি আগেই তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে যাবেন? এত ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ও ত তাঁরা নন?"

প্রত্যাবর্ত্তন।

বসুমতী প্রেস]

[শিল্পী—এস, জে, ঠাকুর সিং

তা' সত্য, কিন্তু আমি যে শুধুই দেখা করবার জন্য যেতে উৎসুক, তা ত নয়। আমার নিজের একটা বিশেষ দরকার আছে, তাই।"

"এমন কি বিশেষ দরকার পিসীমা, যে, দুদিন দেরী হ'লে চলবে না?"

"না, বাবা, দেরী করতে আমি চাই না। কি জানি যদি ফস্‌কে যায়?"

এত দিন একত্র বাস করার ফলে পিসীমার বৈষয়িক অবস্থা এবং তাঁহার সাংসারিক সকল রকম খবরাখবরই আমি জানিয়াছিলাম। কারণ, তিনি ব্যবহারে যেমন অমায়িক, প্রকৃতিতেও তেমনই সরল। আমার কাছে কোন বিষয়ই গোপন করিতেন না এবং তাঁহার মত লোকের পক্ষে গোপনীয় কিছু থাকিতেও পারে না বলিয়া আমার ধারণা হইয়াছিল। সেই জন্য তাঁহার এইরূপ 'লুকোচুরি' ধরণের কথায়, আমি অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলাম।

আমার সেই নির্ব্বাক প্রশ্ন তিনি তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারিয়া, একটু হাসিয়া বলিলেন, "আমি একটা ফন্দী করেছি, বাবা! কিন্তু এখন তা' আমি তোমাকে জানাবো না। কাযটি উদ্ধার যদি হয় ত তখন সবই জান্‌তে পার্‌বে। এখন কেবল আমি যা বল্‌বো, তুমি বিনা আপত্তিতে তাই করবে, এই আমি চাই। কেমন? কর্‌বে ত, বাবা? রাগ করবে না?"

বড়দিদির সেই চিঠির কথাটা তখনই আমার মনে পড়িল। আবার সেই প্রহেলিকা! ব্যাপারটা কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। অথচ, এই 'ফন্দী'র মধ্যে দিদিরাও যে জড়িত, তাহা বেশ বুঝা গেল। কিন্তু বিরক্তিকর হইলেও পিসীমার অনুরোধ উপেক্ষাও করিতে পারিলাম না, কাযেই সম্মত হইলাম।

রবিবার সকালে বাগবাজারে যাইবার জন্য যখন প্রস্তুত হইতেছিলাম, তখন পিসীমা আসিয়া একটা শীলমোহর-করা মোটা খাম আমার হাতে দিয়া বলিলেন, "আমি প্রিয়ম্বদাকে এই চিঠিখানা লিখেছি। তুমি ওখানে গিয়ে এটা তার কাছে পাঠিয়ে দিও। তা হ'লে আমার সেখানে যাবার সম্বন্ধে কোন কথা তোমাকে আর কিছু বল্‌তে হবে না। এতেই সব লেখা আছে। যদি উত্তর কিছু দেয় ত নিয়ে এসো; না দেয়, তাতেও ক্ষতি নাই।"

আমি তথাস্তু বলিয়া প্রস্থান করিলাম। সেখানে পৌঁছিয়া চাকরের দ্বারা আমার আগমনবার্ত্তা ভিতরে বলিয়া পাঠাইলাম এবং তাহারই হাতে পিসীমা'র চিঠিখানাও পাঠাইয়া দিয়া বৈঠকখানায় বসিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। অনতিবিলম্বে এক জন সুশ্রী, দীর্ঘকায়, প্রবীণ পুরুষ ভিতর হইতে আসিয়া বৈঠকখানায় প্রবেশ করিলেন। যথারীতি সাদর সম্ভাষণের পর উভয়ে আলাপ হইলে জানিলাম, তিনিই যোগীন বাবু। তিনি এঞ্জিনিয়ার, বর্ম্মায় সরকারী চাকরী অনেক দিন করিয়াছিলেন, এখন স্বাধীনভাবে 'কন্‌ট্রাক্‌টারী' কার্য্য করিতেছেন। কার্য্যোপলক্ষে বর্ম্মার অনেক স্থানে তাহাকে থাকিতে হইয়াছে, কিন্তু সে দেশে তাঁহার আপাততঃ স্থায়ী আবাস মৌলমেন নগরে। সেইখানকার কাযকর্ম্ম এইবার প্রায় সবই গুটাইয়া ফেলিয়া দেশে আসিয়াছেন। বোধ হয় আর ফিরিয়া যাইবেন না।

তৎপরে মৃত বিহারী ঘোষের সহিত তাঁহার নিকটসম্পর্ক জানাইয়া যোগীন বাবু বলিলেন, "ঘোষজা মশায় শেষে এই বিয়েটা ক'রে নিতান্ত মতিভ্রমের পরিচয় দিয়েছিলেন বটে, কিন্তু সে জন্য তাঁর মেয়ের উপর তাঁর স্নেহের একটুও অভাব কখনও হয়নি। মেয়েটিও মাতৃহীন ব'লে সমস্ত মনটা দিয়ে বাপকে ভালবাস্‌তো। এই বিয়ের পরে বিমাতার গতিক দেখে নিজেকে সম্পূর্ণ বাপের সেবায় নিযুক্ত করেছিল। কিন্তু বিমাতার দুর্ব্ব্যবহার থেকে বাপকে ও নিজেকে রক্ষা করা ক্রমেই দুঃসাধ্য হয়ে দাঁড়াতে লাগ্‌লো। ঘোষজা মশায় যখন প্রথম উইল করেন, তখন নূতন স্ত্রীর উপর বিরক্তি বশতঃ তাকে সামান্যমাত্র একটা মাসহারা দিয়ে সমস্ত সম্পত্তি মেয়েকে দিয়েছিলেন। কিন্তু পরে মেয়ের জেদে সে উইল বদল ক'রে স্ত্রীকে লাইফ ইন্‌সিওরেন্সের সমস্ত টাকা এবং বাকী সব মেয়েকে দিয়েছেন! কিন্তু তা'তেও মাগীর মন সন্তুষ্ট হ'লো না ব'লে, সে দুর্ব্ব্যবহার এত বাড়িয়ে দিলে যে, মেয়ের ও বাড়ীতে আর বাস করা ভার হয়ে উঠ্‌লো। তা'র পরে, মাগীর আমেরিকা (না, আণ্ডামান) ফেরত এক পুরানো যুবা বন্ধু এসে ঐ বাড়ীতে জুটলো। ঘোষজার

সঙ্গে বিয়ে হবার অনেক পূর্ব্বে থেকেই না কি ঐ লোক-টার সঙ্গে মাগীর প্রণয় ছিল ; সেটা আবার নূতন ক'রে 'ঝালোনো' আরম্ভ হলো। তাই নিয়ে বাড়ীতে মাঝে মাঝে বেশ 'হাড়াই ডোমাই' চল্‌তে লাগলো। মেয়েটি তার মাসীকে সব খবরই মাঝে মাঝে লিখতো। শেষে উনি আর সহ্য করতে না পেরে, দেশে এসে মেয়েটিকে নিজের সঙ্গে বর্ম্মায় নিয়ে গেলেন। ঘোষজা মশায়কেও সঙ্গে আসবার জন্য অনেক অনুরোধ করা হয়েছিল, কিন্তু তিনি কিছুতেই এলেন না। ইদানীং তাঁর মাথা একটু খারাপ হয়েছিল। মেয়েকে জাহাজে তুলে দেবার সময় চুপি চুপি বলেছিলেন, বাড়ীতে যদি অশান্তি বেশী হয় ত তিনি আবার বিলেত চ'লে যাবেন। যা হোক, মেয়ে বর্ম্মায় আসার পর ঘোষজা মশায়ের চিঠিপত্র প্রথম কিছু দিন বেশ নিয়মিত এসেছিল, কিন্তু ক্রমে তা ক'মে গিয়ে শেষে একেবারে বন্ধ হয়ে গেল। আমার স্ত্রী ঐ মাগীকে চিঠি লিখে জান্‌তে পারলেন যে, ঘোষজা মশায় বাড়ী ছেড়ে নিরুদ্দেশ হয়েছেন। আমরা অত দূর থেকে তাঁর সন্ধানের কোন উপায়ই করতে পারলাম না। নিজেদের মনকে কোন রকমে প্রবোধ দিয়ে রাখলাম যে, হয় ত তিনি বিলেতেই চলে গিয়েছেন। তার পর গত ডিসেম্বর মাসে আমার হঠাৎ 'প্লুরিসি' হওয়ায় অনেক দিন ভুগেছিলাম। শেষে ভগবানের ইচ্ছায় সেরে উঠে, ডাক্তারের পরামর্শে সমুদ্রের হাওয়া খাবার জন্য প্রায় তিন মাস সপরিবারে সিঙ্গাপুর প্রভৃতি কয়েক যায়গায় বেড়িয়ে যখন আবার রেঙ্গুনে ফিরলাম, তখন মিসেস্ ঘোষের চিঠিতে ঘোষজা মশায়ের হত্যা ও তাঁর উইল প্রোবেটের কথা জান্‌তে পারলাম। পরে পুরানো সংবাদপত্রগুলা সংগ্রহ ক'রে হত্যা-সংক্রান্ত অনেক খবরই জান্‌তে পারলাম। কিন্তু খবরের কাগজের বৃত্তান্ত প'ড়ে সব কথা ভাল করে জানা যায় না। তবে, এটা বেশ বুঝা গেল যে, এই হত্যা-ব্যাপারের পূর্ব্বাপর সমস্ত সংবাদ আপনার কাছেই বিশদ-ভাবে জানা যেতে পারে। তাই শেষে ভেবে চিন্তে আপ-নাকে ঐ চিঠিখানা লিখেছিলাম। আপনি সে জন্য আমাকে ক্ষমা করবেন।"

আমি বলিলাম, "না, না, ও কথা বলবেন না। হত্যা-সম্বন্ধে সবিশেষ সংবাদ পাবার জন্য আপনাদের ঔৎসুক্য হওয়া ত খুবই স্বাভাবিক। আমি যা কিছু জানি, সবই আপনাকে এখনই বলবো। কিন্তু হত্যাকারীর কোন সন্ধান এখনও পাওয়া যায়নি, তা'ও বোধ হয় জানেন?"

"হাঁ, কাগজে ত তাই প'ড়েছি। কি অন্যায় বলুন দেখি? সহরের মধ্যে এত বড় একটা হত্যাকাণ্ড হয়ে গেল, অথচ আজ প্রায় চার মাস হ'তে চল্লো, এখনও তার কোনই নিরাকরণ হলো না!"

এই সময় একটি ৯।১০ বৎসরের বালক বাড়ীর ভিতর হইতে আসিয়া যোগীন বাবুর কানে কানে কি বলিয়াই প্রস্থান করিল। তিনিও তখন সৌজন্য সহকারে আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া ও আমাকে মুহূর্ত্তমাত্র অপেক্ষা করিতে বলিয়া অন্দরমহলে চলিয়া গেলেন। আমি সে দিনের সংবাদপত্রখানা সম্মুখে পাইয়া তাহাতেই মনো-নিবেশ করিলাম।

১৮

মুহূর্ত্তটা যখন প্রায় ১৫ মিনিটে পরিণত হইল, তখন যোগীন বাবু বাহিরের ঘরে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "মাফ করবেন, অরুণ বাবু! আপনাকে অনেকক্ষণ একলা বসিয়ে রেখেছি। কিন্তু আপনি ত বেশ লোক যা হোক। এখানে এসে অবধি একবারও আমাকে জানান্‌নি যে, আমাদের বিমলা দিদি আপনার সম্পর্কে পিসী হ'ন আর আপনি ঐ বাড়ীতেই থাকেন! বিমলা দিদি আমার স্ত্রীকে একখানা চিঠি লিখেছেন। সেই চিঠির কথা বলবার জন্যই এই-মাত্র বাড়ীর ভিতর থেকে আমার তলব হয়েছিল। তা থেকে জান্‌লাম যে, আপনি নদীয়ার মহেন্দ্র ডাক্তারের ছেলে!—তা হ'লে আমার নিজের দিক দিয়েও আপনার সঙ্গে একটু নিকটতর সম্পর্ক আছে। আপনার পিতামহ আমার মায়ের খুড়তুতো ভাই ছিলেন। আমার মা তা হলে মহেন্দ্র বাবুর পিসী ছিলেন, আর সে সম্পর্কে আপনি আমার ভাই-পো হন, তা জানেন?" বলিয়া তিনি হাসিতে লাগিলেন।

আমিও হাসিয়া বলিলাম, "না, সত্যই আমি এ সম্পর্ক-টার কথা আগে কখনও শুনিনি। দূরে থাকার জন্য নিকট-সম্বন্ধগুলাও এই রকমে অজানা থেকে যায়।"

"হাঁ, তা সত্য। যা হোক, এখন যখন জানা গেল, তখন এবার থেকে আমাদের মধ্যে আত্মীয়ের মতই আচরণ করতে হবে।—তা হলে এখন চলুন, একবার বাড়ীর

ভিতরে যেতে হবে। আমার স্ত্রী, আপনার কাকী হলেন ত? তিনি সেই সম্পর্কের বলে আপনাকে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে ডাক্‌ছেন।"

উপরোধ এড়াইবার কোন উপায় না থাকায় আমি তাঁহার সহিত অন্দরের দিকে চলিলাম। যাইবার সময় বলিলাম, "তা হলে আপনার আর আমাকে 'আপনি' 'মশায়' সম্বোধন করা চল্‌বে না।"

"তা ত বটেই, কিন্তু শুধু কথায় আত্মীয়তা করলেই ত হবে না। এখন থেকে তোমাকে ঠিক ঘরের ছেলের মত এখানে আসা-যাওয়া করতে হবে।"

কথা কহিতে কহিতে আমরা অন্দরে উপস্থিত হইলে, তিনি একটা ঘরে আমাকে বসাইয়া বাহির হইয়া গেলেন এবং অবিলম্বে এক গৌরাঙ্গী প্রবীণাকে তথায় সঙ্গে লইয়া আসিলেন ও তিনিই আমার নূতন কাকী বলিয়া পরিচিত করিয়া দিলেন। আমিও যথারীতি তাঁহার পদধূলি লইলাম। পরে সকলে বসিয়া বাক্যালাপ হইতে লাগিল। কাকী বেশ সরলভাবে আত্মীয়েরই মত আমার সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। অল্পক্ষণ পরেই তিনি দ্বারের দিকে মুখ বাড়াইয়া একটু উচ্চ স্বরে বলিলেন,"কৈ রে বুড়ী, এত দেরী কচ্ছিস্ কেন, মা?"

তাঁহার কথা শেষ হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই একটি অনিন্দ্যসুন্দরী ১৫।১৬ বৎসরের তরুণী নানা মিষ্টান্নপূর্ণ একখানা থালা লইয়া ঘরে প্রবেশ করিল। বিহারী ঘোষের ৬।৭ বৎসরের মেয়েটিকে দেখিয়া পিসীমার যেমন মনে হইয়াছিল যে, 'একবার দেখিলে আর চোখ ফিরাইতে ইচ্ছা হয় না,'—ইহাকে দেখিয়া আমারও ঠিক সেইরূপই মনে হইল। অথচ চাহিয়া থাকিতেও পারিলাম না;—কেমন একটা লজ্জা আসিয়া বাধা দিতে লাগিল। সে-ও প্রথমে একবার আমার দিকে চাহিয়াই সলজ্জভাবে চক্ষু নত করিয়া ধীরে ধীরে থালাখানি আমার পার্শ্বস্থিত একটা ছোট টেবলের উপর রাখিয়া প্রস্থানোদ্যত হইল। কিন্তু কাকী তাহাকে যাইতে নিষেধ করিয়া নিজের কাছে বসাইয়া বলিলেন, "তুই লজ্জা করিস্‌নি, মা! অরুণ আমাদের আপনার লোক, ঘরের ছেলেরই মত। কিন্তু আগে কি তা জান্‌তাম? চিরকাল বিদেশে থেকে সব আত্মীয়-স্বজনের কাছে একেবারে যেন 'পর' হয়ে গেছি। আজ বিমলা দিদির চিঠি পেয়ে পরিচয় পেলাম।—এইবার থেকে কিন্তু ঘরের ছেলের মত এখানে আসা-যাওয়া কোরো, বাবা!—কেমন?" বলিয়া আমার দিকে চাহিলেন। আমি মুখে কোন উত্তর না দিয়া শুধু সম্মতি-সূচক ঘাড় নড়িলাম।

পরে বালিকাকে দেখাইয়া কাকী বলিলেন, "এরই নাম কাকলী। বিমলা দিদির কাছে বোধ হয় এর কথা শুনেছ। আমরা একে 'বুড়ী' ব'লে ডাকি। এ আমার বোনঝি,—ঘোষজা মশায়ের মেয়ে। আহা, বাপের শেষ খবর পেয়ে অবধি বাছা একেবারে মনভাঙ্গা হয়ে গেছে! হবারই ত কথা! কি ভীষণ কাণ্ড বল দেখি? অথচ এত দিনেও খুনে লোকটার কোন সন্ধানই পাওয়া গেল না। কি আশ্চর্য্য কথা!"

তখন ক্রমে সেই খুনের ব্যাপার আলোচনা হইল। সকলেই উৎসুক চিত্তে এই আলোচনায় যোগ দিয়াছিলেন। কিন্তু কাকলী কিছু বেশী উত্তেজিত হইয়াছিল; শেষে সে যোগীন বাবুকে বলিল, "অনুসন্ধানের ফল কি হবে, তা' ভগবান্ জানেন। কিন্তু তা ব'লে নিশ্চেষ্ট হয়ে ব'সে থেকেই বা লাভ কি?—আবার একটু চেষ্টা ক'রে দেখলে হয় না?"

যোগীন বাবু এ কথার কোন উত্তর দিবার আগেই আমি বলিলাম, "বেশ, আমি তা'তে খুব প্রস্তুত আছি। আমার দ্বারা যত দূর সাহায্য হতে পারে, তা আমি করবো।"

আমার এই প্রতিশ্রুতি পাইয়া সকলেই বেশ সন্তুষ্ট হইলেন, বোধ হইল। তখন কাকী বলিলেন, "ও মা! আমার বুদ্ধি-শুদ্ধি সব লোপ পেয়েছে দেখছি! নিজেদের কথায় উন্মত্ত হয়ে তোমার জল খাবারটা যে প'ড়ে প'ড়ে শুকুচ্ছে, সে দিকে খেয়াল নেই। নাও, বাবা! একটু মিষ্টি-মুখ কর।"

আমি সকালে এরূপ জলযোগে অভ্যস্ত না হইলেও উপায়ান্তর অভাবে কিঞ্চিৎ 'মিষ্টিমুখ' করিতে বাধ্য হইলাম ও তৎপরে সে দিনের মত বিদায় লইলাম।

আসিবার সময় কাকী বলিয়া দিলেন, "বিমলা দিদিকে আমার প্রণাম জানিয়ে বোলো যে, তাঁর চিঠি প'ড়ে আমার বড়ই আহ্লাদ হয়েছে। কালই বিকালে তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রে সব কথা কইবো। সেই জন্য আর লিখে জবাব দিলাম না।"

[ক্রমশঃ।

শ্রীসুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (এটর্ণি)।

সমাজ ও শান্তিরক্ষা

কিছু দিন পূর্ব্বে এই সহর কলিকাতার বুকের উপর এক জন বাঙ্গালী ভদ্র গৃহস্থ মহিলার উপর এক রিক্সা গাড়ী-চালক পাশবিক অত্যাচার করিয়াছিল। এই মহিলা অল্প-বয়স্কা, রাত্রি প্রায় ৯ ঘটিকার সময়ে বহুবাজার হইতে বেলিয়াঘাটায় যাইতেছিলেন। সঙ্গে একটি বালক ছিল। শিয়ালদহের নিকটে বালকটি কোন কার্য্যে অল্পক্ষণের জন্য রিক্সা হইতে নামিয়া যায়। রিক্সা-ওয়ালা ইত্যবসরে দুই এক পা অগ্রসর হইতে হইতে একটা গলীর ভিতর তাঁহাকে লইয়া যায়। সেখানে তাঁহার সর্ব্বনাশ সাধিত হয়। আলিপুরের সেসন জজের বিচারে এই নরপশুর ৫ বৎসর কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে।

এ দণ্ড অপরাধের উপযুক্ত হইয়াছে কি না, সে বিষয়ে এই স্থলে আলোচনা করিব না। কেবল এই ঘটনা সম্বন্ধে সহরের শান্তিরক্ষা ও বাঙ্গালী হিন্দু-সমাজের সম্পর্কে কিছু বলিতে চাহি।

এমন ঘটনা বাঙ্গালার পল্লী-মফঃস্বলে নিত্য ঘটনা হইয়া দাঁড়াইয়াছে বটে, কিন্তু কলিকাতায় ইহা নূতন বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না। কলিকাতার মত জনাকীর্ণ সহরে মাত্র রাত্রি ৯ ঘটিকার সময়ে সহরবাসী সম্পূর্ণ সজাগ থাকে, সহরের রাজপথ আলোকিত থাকে এবং সহর-কোটালের শান্ত্রী প্রহরী সহরবাসীর ধনপ্রাণ রক্ষার জন্য সর্ব্বত্র প্রহরা দিয়া থাকে। শিয়ালদহের মোড়ে রাত্রি ৯টার সময়ে কিরূপ ভিড় ও জমজমা থাকে, তাহা সহর-বাসিমাত্রেই জানেন। এ হেন স্থানে একটা রিক্সা-ওয়ালা গৃহস্থ-বধূকে নির্জ্জন স্থানে লইয়া গিয়া কিরূপে তাঁহার সর্ব্বনাশসাধন করিল, তাহা ভাবিয়া উঠিতে পারা যায় না। সেসন জজ তাঁহার রায়ে যুবতীকে নির্দ্দোষ বলিয়াছেন। বিশেষতঃ তিনি যখন লোকলজ্জার আশঙ্কা সত্ত্বেও দুষ্কৃত-কারীর দণ্ডবিধানের নিমিত্ত আদালতে অভিযোগ করিয়া-ছেন, তখন বুঝিতে হইবে, তাঁহার অসম্মতিতে বলপূর্ব্বক তাঁহার প্রতি পাশব আচরণ করা হইয়াছিল। এ অবস্থায় এমন জনাকীর্ণ স্থানে কোন পথিক তাঁহাকে সাহায্যদান করে নাই, ইহা জানিলে কি বলিতে ইচ্ছা করে? উহা বরং সম্ভবপর হইতে পারে, কিন্তু শিয়ালদহের সান্নিধ্যে পুলিসপ্রহরী কি উপস্থিত ছিল না? পুলিসের শ্যেনদৃষ্টি গৃহস্থের ঘরের হাঁড়ীর উপরেও পতিত হইয়া থাকে বলিয়া শুনা যায়। তবে এত বড় একটা ভীষণ ব্যাপার পুলিসের দৃষ্টির অন্তরালে কিরূপে সংঘটিত হইল, তাহা ত বুঝিয়া উঠাই কঠিন। তবে এমন হইতে পারে, পুলিস রাজনীতিক অপরাধীর পশ্চাতে দৃষ্টিটা যেরূপ আবদ্ধ করিয়া রাখে, তাহাতে এ সব ছোটখাট ব্যাপারের জন্য অবশিষ্ট কিছু না থাকিতে পারে। কলিকাতার মত সহরে 'সন্ধ্যা' রাত্রিতে জনাকীর্ণ স্থানে অসহায়া নারীর সতীত্বরত্ন দুর্ব্বৃত্ত নর-পশু কর্ত্তৃক অপহৃত হয়, ইহা কি পুলিসের প্রভু সহর-কোটালের পক্ষে অথবা পুলিসের সাফাই-গায়ক আমলাতন্ত্র সরকারের কর্ত্তাদিগের কলঙ্কের কথা নহে? নাবালক জাতি বলিয়া যাহাদের সকল ভার তাঁহারা গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাদের ধনপ্রাণ রক্ষা কি এই ভাবেই সম্পাদিত হইবার কথা?

কেবল পুলিসকে এ বিষয়ে অপরাধী করিলে অবিচার করা হয়—হিন্দু-সমাজের কি এ বিষয়ে কোনও অপরাধ নাই? শুনিয়াছি, এই নির্য্যাতিতা যুবতীর স্বামী তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন। এই হৃদয়হীনতা যে লোকলজ্জা বা সমাজের শাসনের ভয়ে প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা নিঃস-ন্দেহে বলা যায়। আমাদের সমাজ এ সকল বিষয়ে খুবই 'হৃদয়ের' পরিচয় দিয়া থাকেন! পূর্ব্ববঙ্গের অভাগী মোক্তার-কন্যার শোচনীয় পরিণামের কথা বোধ হয় আজিও কেহ বিস্মৃত হয়েন না—উহা বিস্মৃত হইবার জিনিষ নহে। অভাগী শ্রীযুত কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয়কে হৃদয়ের অন্ত-স্তলের যে মর্ম্মবেদনার কথা নিবেদন করিয়াছিল, বোধ হয়, তাহাতে পাষাণও গলিয়া যায়;—কিন্তু আমাদের এই হিন্দু-সমাজ-নামধেয় চিজটি বুঝি পাষাণকেও ছাপাইয়া যায়!

কত ধর্ম্মকথা, কত পুথির কচকচি এ সব ব্যাপারে কহা হয়, কিন্তু সমাজের অন্যান্য দুষ্ট ব্রণ পুষিয়া রাখিতে কোনও দ্বিধা বোধ হয় না। এই নির্য্যাতিতা মহিলার পরিণাম কি হইবে, তাহা যেমন তাঁহার স্বামীর চিন্তা করিবার সাহস নাই, সমাজেরও তেমনই অবসর নাই! এইরূপে সমাজের অদ্ভুত শাসনে কত হিন্দু নারী হিন্দু-সমাজের বক্ষ হইতে খসিয়া যাইতেছে, তাহা কি চিন্তা করিয়া দেখিবারও সময় হয় নাই?

যে সমাজ এইরূপে নির্দ্দোষের দণ্ড-বিধান করিতে অণুমাত্র বিচলিত হয় না, সেই সমাজ অবলা নারীর রক্ষার কি উপায়বিধান করিয়াছে? একটা কথা উঠিয়াছে, নারীকে স্বাধীনতা দিতে হইবে, নারীকে তাহার ন্যায্য অধিকার দিতে হইবে। নারীকে পিঞ্জরাবদ্ধা অশিক্ষিতা ক্রীতদাসী করিয়া রাখিবার পক্ষপাতী এ যুগে কেহ আছেন কি না জানি না, কিন্তু তাহা বলিয়া স্বাধীনতার নামে স্বেচ্ছাচার দেওয়াও কি সঙ্গত? এই ভদ্র গৃহস্থ-মহিলাকে একাকিনী—মাত্র এক বালকের সহিত রাত্রিকালে অন্যত্র প্রেরণ করা হইয়াছিল কেন? যদি তিনি স্বেচ্ছায় এরূপ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি নিশ্চিতই নিতান্ত প্রয়োজনে পড়িয়া এরূপ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু অধুনা প্রায়ই দেখা যায়, মোটরে, রিক্সায়, ভাড়াটিয়া ছক্কড়ে দেশীয় মহিলারা অভিভাবকহীনা হইয়া সহরে যাতায়াত করিয়া থাকেন। এমন কি, আমরা বহু অল্পবয়স্কা গৃহস্থ বধূকে যোগে-যাগে পালে-পার্ব্বণে অথবা তিথিনক্ষত্র হিসাবে রাত্রিশেষে নির্জ্জন পথ দিয়া একরূপ অভিভাবকহীন অবস্থায় গঙ্গাস্নানে যাইতে দেখিয়াছি। সে সব পথে গুণ্ডা, বদমায়েস পশুপ্রকৃতি লোকের অসদ্ভাব নাই। এই সকল যুবতী বা কিশোরীর গৃহে নিশ্চিতই অভিভাবক আছেন। তাঁহারা এমনভাবে তাঁহাদিগকে যাইতে অনুমতি প্রদান করেন কেন? অনেকে দারিদ্র্যের অছিলা দেখাইবেন। কিন্তু তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে বয়স্ক শক্তিসম্পন্ন অভিভাবকরা সঙ্গে যায়েন না কেন? যে ভাবে এই সকল ভদ্র গৃহস্থ-মহিলা সহরে যাতায়াত করিয়া থাকেন, তাহাতে নিত্য রিক্সা-কুলীর মামলা হয় না কেন, ইহাই আশ্চর্য্য!

স্ত্রীস্বাধীনতা—নারীর প্রাপ্য ন্যায্য অধিকার—সে ত ভাল কথা। কিন্তু সেই স্বাধীনতা কাহাদের জন্য? স্বাধীন শক্তিশালী জাতির নারীর জন্য; পরাধীন, পরপদলেহী নির্ব্বীর্য্য ক্লীব জাতির নারীর জন্য নহে। যে জাতি আজিও মানকে প্রাণ অপেক্ষা বড় বলিয়া বুঝিতে শিখিল না, যে জাতি নিজের নারীর অপমানে আপনাকে অপমানিত বলিয়া মনে করে না, সে জাতি তাহার নারীর জন্য স্বাধীনতা চাহে কেন? নিজের নারীকে রক্ষা করিবার যাহার ক্ষমতা নাই, তাহার মুখে স্ত্রী-স্বাধীনতার কথা শোভা পায় না! যখন এমন দিন আসিবে, যে সময়ে জাতির একটি নারী নির্য্যাতিতা হইলে সমগ্র সমাজ হুহুঙ্কারে গর্জ্জিয়া উঠিবে এবং দুষ্কৃতকারীর সমুচিত দণ্ডবিধান করিয়া নির্য্যাতিতাকে বক্ষে তুলিয়া লইবে, তখন স্ত্রী-স্বাধীনতার আন্দোলন করিলে চলিতে পারে। সীমান্তপ্রদেশের কুমারী এলিসের সম্পর্কে ইংরাজ জাতির হুহুঙ্কারের কথা মনে আছে ত?

দেশের যাঁহারা শান্তি-বিধাতা, তাঁহাদিগকেও একটা কথা বলা প্রয়োজন। তাঁহারা প্রজার ধন-প্রাণের সঙ্গে সঙ্গে মানইজ্জৎ রক্ষা করিবার ভার লইয়াছেন বলিয়া থাকেন। এ জন্য তাঁহারা দেশের লোকের হস্ত হইতে অস্ত্র কাড়িয়া লইয়াছেন। তাঁহাদের স্বজাতীয় নরনারীরা যদৃচ্ছাক্রমে আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করিতে পায়, এ দেশীয়রা পারে না। ইহার ফলে এ দেশে শ্বেতাঙ্গী নির্ভয়ে যত্রতত্র বিচরণ করিতে পারে; দেশীয়া মহিলারা পারে না। শান্তিপালরা যদি এদেশীয় মহিলাদিগের মান-ইজ্জত রক্ষা করিতে অসমর্থ হয়েন, তাহা হইলে তাঁহারা শ্বেতাঙ্গীদের মত তাঁহাদিগকেও আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করিতে দিন। বর্ত্তমান অবস্থায় কেবল 'বাঁধিয়া মারা' হইতেছে ব্যতীত ত কিছু নহে! আমাদের দেশের নারীরা যদি এই অস্ত্র ব্যবহার করিতে শিখেন, তাহা হইলে নারী-নির্য্যাতনের কথা, কথার কথায় পর্য্যবসিত হইবে।

রাজবন্দীর জন্য চাঞ্চল্য

গত ১৬ই ফাল্গুন কলিকাতায় হরতাল হইয়াছিল। বঙ্গের সুসন্তান সুভাষচন্দ্র বসু প্রমুখ কয়েক জন রাজবন্দী মান্দালয় জেলে গত ১৫ই ফেব্রুয়ারী হইতে অনশনব্রত অবলম্বন

করিয়াছিলেন বলিয়া প্রকাশ পায়। ইহাই চাঞ্চল্যের কারণ। যাঁহারা জনপ্রিয়, তাঁহাদিগকে আমলাতন্ত্র সরকার যতই বে-আইনী আইনে আটক করিয়া কষ্ট দিন, তাঁহাদের দিকে লোক স্বতঃই আকৃষ্ট হইবে। যাঁহারা জনপ্রিয়, তাঁহারা অনশনে আছেন, ইহা শুনিলে জনমত চঞ্চল হইয়া উঠিবেই,—সর্ব্বপ্রকারে উহার কারণ নির্ণয় করিবার চেষ্টা করিবেই। একটা কারণ জানা গিয়াছে যে, যে হেতু বড়দিনের সময় য়ুরোপীয় খৃষ্টান কয়েদীদিগের জন্য পূজারাধনার ব্যয়বরাদ্দ আছে, অথচ ভারতীয়ের নাই, সেই হেতু ব্যবহারের এই তারতম্য শিক্ষিত মার্জ্জিতরুচি দেশপ্রেমিক যুবকগণ বিশেষরূপ অনুভব করিয়াছেন। তাঁহারা এই অবস্থার প্রতীকারের জন্যই অনশন-ব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া আরও অন্য ব্যাপারের জন্য তাঁহাদের দ্বারা অনশন-ব্রত অবলম্বিত হইতে পারে। সুভাষচন্দ্র প্রমুখ শিক্ষিত দেশপ্রেমিক বাঙ্গালী তরুণগণ বিনা কারণে এত দিন দণ্ডভোগের পর হঠাৎ এই কার্য্য করেন নাই, তাহা সকলেই বুঝিতেছে।

'ফরওয়ার্ড' পত্র কর্ণেল মালভ্যানীর রিপোর্ট সম্পর্কে যে বিচিত্র সংবাদ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে বুঝা যায়, এমন কারণ থাকা বিস্ময়ের বিষয় নহে। 'ফরওয়ার্ড' জেল-কমিটীর সমক্ষে কর্ণেল মালভ্যানীর সাক্ষ্য উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, কর্ণেল মালভ্যানী বলিয়াছেন,—"সকলেই জানেন, গত কয় বৎসর প্রায়ই রাজনীতিক বন্দীদিগের প্রতি কুব্যবহারের অভিযোগ সম্পর্কে সরকারকে যত বিব্রত হইতে হইয়াছে, তত আর কোনও ব্যাপারে হইতে হয় নাই। আবার ইহাও সকলে জানে যে, সরকার নিজের বিবরণ হইতে প্রমাণ করিয়াছেন যে, অভিযোগের কোনও মূল নাই। কিন্তু আমি বলিতেছি, অভিযোগের বিশেষ কারণ ছিল।"

এ কথা কি সত্য? সরকারী কমিটীর সমক্ষে সাক্ষ্যের কথা কিরূপে সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা এখানে বিচার্য্য নহে, দেখা উচিত, যেরূপেই ইহা সংগৃহীত হউক, ইহা সত্য কি না। যদি সত্য হয়, তাহা হইলে সরকারের পক্ষে বিষম কলঙ্কের কথা। সরকার যে অভিযোগ মিথ্যা বলিয়া প্রমাণ করিতেছেন, সরকারের নিযুক্ত কর্ম্মচারী কর্ণেল মালভ্যানী বলিতেছেন, সে অভিযোগ সত্য, উহার উপযুক্ত কারণ আছে! ইহা কি চমৎকার অবস্থা নহে? মালভ্যানী সাক্ষ্যে আরও যে সব কথা বলিয়াছিলেন বলিয়া 'ফরওয়ার্ডে' প্রকাশ, তাহাও অতি সুন্দর। তিনি দুই জন আসামীর সম্বন্ধে রিপোর্টে লিখেন, "উহাদিগকে যে ভাবে বন্দী করিয়া রাখিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তাহাতে উহাদের স্বাস্থ্যভঙ্গের সম্ভাবনা আছে; পরন্তু কারা-আইনের ও দেশের নিয়ম অনুসারে নির্জ্জন কারাদণ্ডের যে ব্যবস্থা আছে, তাহা অপেক্ষা উহাদের সম্বন্ধে নির্জ্জনবাসের দণ্ডের ব্যবস্থা আরও কঠোর করা হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত আইনে ও নিয়মে দণ্ডিতকে একাদিক্রমে ৭ দিনের অধিক নির্জ্জন কারাবাসে রাখা যায় না।"

কর্ণেল মালভ্যানী স্বয়ং এই রিপোর্ট দেওয়ার কৈফিয়ৎ দিয়া বলিয়াছেন যে, তিনি ইচ্ছা করিয়াই এই রিপোর্ট দিয়াছেন, তাহার কারণ এই যে, তিনি ঠিক করিয়াছিলেন, হয় ইহার কারণে তাঁহার চাকুরী যাইবে, না হয়, রাজবন্দীদিগের প্রতি ব্যবহারের প্রতীকার হইবে। কিন্তু তাঁহার চাকুরীও যায় নাই, অবস্থার প্রতীকারও হয় নাই; বরং জেলের ইনস্পেক্টর জেনারল তাঁহার রিপোর্ট ফিরাইয়া দিয়া মন্তব্য সম্বন্ধে পুনরায় বিচার-আলোচনা করিতে উপদেশ দেন। এই পত্রে কর্ণেল মালভ্যানীকে আভাষে বলা হইয়াছিল যে, তিনি বড় জোর এই পর্য্যন্ত লিখিতে পারেন যে, রাজবন্দীদিগকে নির্জ্জন কারাগারে রাখা হইয়াছে, তাহাদিগকে প্রতিদিন ব্যায়াম করিতে দেওয়া হয়, অভিযোগকারী ২ জন রাজবন্দী প্রফুল্লচিত্ত আছে, তাহাদের কাহারও স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ হয় নাই।

এ সকল কি আরব্য-উপন্যাসের কল্পনা-কথা? কর্ণেল মালভ্যানী যাহা বলিতেছেন, তাহাতে মনে হয়, তিনি যে যথার্থ রিপোর্ট দিয়াছিলেন, তাহা তাঁহাকে বদলাইয়া জেলের কর্ত্তৃপক্ষের মর্জ্জিমত তৈয়ার করিতে ইঙ্গিত করা হইয়াছিল। অতঃপর সরকারী রিপোর্টের উপর লোকের শ্রদ্ধা কিরূপ থাকিবে, তাহা সহজেই অনুমেয়। ইহার কি কৈফিয়ৎ দেওয়া হয়, তাহার জন্য জনসাধারণ উৎসুক হইয়া রহিল। মোটের উপর, এইটুকু বুঝা গেল যে, জেলে রাজবন্দীদের প্রতি ভাল ব্যবহার করা হয় না। কর্ণেল মালভ্যানী স্বয়ং জেল-কর্ম্মচারী

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল

তাঁহার প্রস্তাব ভোটের জোরে গৃহীত হয় বটে, কিন্তু সরকারপক্ষ সে বিষয়ে বাধা দিতে ত্রুটি করেন নাই। সার আলেকজাণ্ডার মুডিম্যান বুঝাইবার চেষ্টা করেন যে, কর্ণেল মালভ্যানীর সাক্ষ্য ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে জেল-কমিটীর সমক্ষে লওয়া হইয়াছিল; তখনকার অবস্থা আর এখনকার অবস্থায় অনেক প্রভেদ; বিশেষতঃ জেল-কমিটী কর্ণেলের সাক্ষ্য সত্ত্বেও রাজবন্দীদের প্রতি জেল-কর্ত্তৃপক্ষের ব্যবহারের সম্বন্ধে কোনওরূপ মন্দ মন্তব্য প্রকাশ করেন নাই।

সরকারের এ কৈফিয়তে বালকও সন্তোষ লাভ করিতে পারিবে না। যেহেতু, ১১ বৎসর অতীত হইয়াছে, সেই হেতু অবস্থা পরিবর্ত্তন হইয়াছে, ইহা অদ্ভুত যুক্তি বটে। ১১ বৎসর পূর্ব্বে এ দেশের শাসন-সিন্দুকের চাবিকাঠি যেমন ব্যুরোক্রেশীর মুঠার মধ্যে ছিল, এখনও কি তেমনই নাই? ১১টা বৎসর যাইতে পারে, শাসনের এঁটোটা

ছিলেন—সরকারের তিনি বড় চাকুরিয়া। তিনি যে জেলের প্রধান পুরুষ ছিলেন, পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল সেই জেলে কারাদণ্ড ভোগ করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্রের কথায় প্রকাশ, কর্ণেল মালভ্যানী কঠোর শাসনকর্ত্তা ছিলেন। সুতরাং তাঁহার মত উচ্চপদস্থ শ্বেতাঙ্গ সরকারী চাকুরিয়া 'এজিটেটারদের' মত সরকারের ক্ষতি করিবার বা সরকারকে অপদস্থ করিবার জন্য যে অকারণ এই সমস্ত কথা রচনা করিয়া সাক্ষ্য দিয়াছেন, তাহা স্থিরমস্তিষ্ক লোক কখনই বলিবে না। আর তাঁহার রিপোর্ট সত্য হইলে রাজবন্দীদের প্রায়োবেশনের মূল কারণ খুঁজিয়া লইতে বিলম্ব হয় না। যাঁহারা এ দেশের লোক হইয়া, এ দেশের সমস্ত কথা জানিয়া ব্যবস্থা-পরিষদে বে আইনী আইন (৩ আইন) রদের প্রস্তাবের বিপক্ষে ভোট দিয়াছিলেন, তাঁহারা কর্ণেল মালভ্যানীর এই সকল কথার পর কি বলেন, তাহা শুনিতে ইচ্ছা করে।

এই অনশন-ব্রতের কথা ব্যবস্থা-পরিষদেও উঠিয়াছিল। শ্রীযুক্ত তুলসীচরণ গোস্বামী কর্ণেল মালভ্যানীর সাক্ষ্যের কথা তুলিয়া এ বিষয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য পরিষদ ঐ দিন মুলতুবী রাখিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন।

শ্রীতুলসীচরণ গোস্বামী

কাঁটাটা হয় ত বুভুক্ষু কাঙ্গালদের লোলুপ নয়নপথে নিক্ষিপ্ত হইতে পারে, কিন্তু তাহা বলিয়া শাসনের 'শাঁস-জল' কি হাত-ছাড়া করা হইয়াছে, শাসন-নীতির কি এক-চুল 'নড়ন-চড়ন' হইয়াছে? লালা লজপৎ রায় পরিষদে সার আলেকজাণ্ডারের কথার উত্তরে বলিয়াছেন যে, "তিনি ভুক্তভোগী,রাজবন্দিরূপে তিনি দুই এক জন দয়ালু ও হৃদয়-বান্ জেল-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট হয় ত ভাল ব্যবহার পাইয়া থাকিতে পারেন, কিন্তু সাধারণ জেল-কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহা-দিগকে (রাজবন্দীদিগকে) ভয়ঙ্কর চরিত্রের লোক বলিয়া মনে করিত এবং নানা অব্যক্ত উপায়ে তাঁহাদের প্রতি নির্দ্দয় ব্যবহার করিত।"

ইহার পরেও কি সার আলেকজাণ্ডার বলিবেন যে, জেলে রাজবন্দীদের প্রতি সদয় ব্যবহার করা হয়? শ্রীযুক্ত তুলসীচরণ গোস্বামী সার আলেকজাণ্ডারের সাফাইয়ের উত্তরে বলিয়াছিলেন, কর্ণেল মালভ্যানীর কথা যে অবি-শ্বাস্য, এমন কথা জেল কমিটী তাঁহাদের রিপোর্টে কোথাও বলেন নাই। সুতরাং এ সব "ভাঙ্গা ঠেকোয় আটচালা দাঁড় করান" সরকারের পক্ষে সম্ভব হইবে না। সরকারের কোনও কোনও কর্ম্মচারী রাজবন্দীদের তেজ দমন করিবার জন্য ক্ষমতার অপব্যবহার করিয়া থাকেন; তাহা কি সর-কার অস্বীকার করিতে পারেন? সুতরাং মিথ্যা কথার আবরণে সত্য গোপন করিবার চেষ্টা না করিয়া এখন যদি রাজবন্দীদের ব্যবহারের বিষয়ে রীতিমত নজর রাখিবার চেষ্টা করা হয়, তাহা হইলে সকলের পক্ষেই উহা শোভন হয় না কি?

রাজবন্দী

শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ দত্ত বড়লাটের ব্যবস্থা-পরিষদে ৩ রেগুলেশান রদ করিবার উদ্দেশে একটি প্রস্তাব করিয়া-ছিলেন। নানা তর্ক-বিতর্কের পর গত ১৯শে ফেব্রুয়ারী শুক্রবার ৩টি ভোটের জোরে তাঁহার প্রস্তাব পরিত্যক্ত হই-য়াছে, বিলের পক্ষে ৪৬ এবং বিপক্ষে ৪৯ ভোট হইয়াছিল। যে বে-আইনী আইনে বিনা বিচারে মানুষকে আটক করিয়া রাখা হয়, এবং যাহার বিপক্ষে দেশের সকল সম্প্র-দায়ের সকল শ্রেণীর অধিকসংখ্যক লোক তীব্র প্রতিবাদ করিয়া আসিতেছে,—তাহা 'রিফরমড কাউন্সিলে' পরিত্যক্ত হইল না, ইহাতেই কি সংস্কৃত ব্যবস্থাপরিষদের স্বরূপ বুঝা যায় না?

ডাক্তার গৌর তর্ক-বিতর্ককালে বলিয়াছিলেন, "দমন-নীতিমূলক আইনের সম্পর্কে যে কমিটী (Repressive Laws Committe) বসিয়াছিল, তাহার রিপোর্ট অনুসারে কার্য্য করিতে সরকার ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ বাধ্য ছিলেন। কমিটী সরকারই বসাইয়াছিলেন। সুতরাং কমিটী নানা সাক্ষ্য-সাবুদ লইয়া, নানা বিচার-আলোচনা করিয়া যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন,তাহা যদি চোতা কাগজের আধারে নিক্ষেপ করা হয়, তাহা হইলে কমিটী কমিশন বসাইবার প্রহসন করার সার্থকতা কি?" সার হেনরী ষ্টেনিয়ন কমিটীর রিপোর্ট হইতে কতকাংশ উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন যে,কমিটী সম্পূর্ণ-রূপে ৩ রেগুলেশান রদ করিতে পরামর্শ দেন নাই। ভাল কথা। কিন্তু কমিটী এই রেগুলেশনের যতটুকু অংশ রদ করিতে পরামশ দিয়াছিলেন, তাহাও কি রদ করা কর্ত্তব্য ছিল না? এই যে কারেন্সি কমিশন, এগ্রিকালচার কমিশন ও ট্যাক্সেশান কমিটী বসান হইয়াছে বা হইতেছে, যদি ইহাদের সিদ্ধান্ত অনুসারে কার্য্য করা না হয়, তাহা হইলে এই সমস্ত কমিটী কমিশন বসাইয়া ফল কি? অনর্থক সর-কারী অর্থ অপব্যয় করা ব্যতীত ইহাতে কি মঙ্গল সাধিত হয়? লি কমিশনের সিদ্ধান্তমত কার্য্য করিতে বিলম্ব হয় নাই—হইলেও য়ুরোপীয় সমাজের চীৎকারে সরকার স্থির থাকিতে পারেন নাই। তবে কি বুঝিতে হইবে, দেশের জনমতের অনুকূল সিদ্ধান্তই কেবল উপেক্ষিত হইবে, আর উহার প্রতিকূল সিদ্ধান্ত সাদরে গৃহীত হইবে? তবে এ সকল প্রহসনের অবতারণা না করিয়া আমলাতন্ত্র সর-কার স্বেচ্ছামত কায করিয়া গেলেই ত পারেন।

রেগুলেশান কথাটার অর্থ কি? দেশের শাসক-সম্প্রদায় (Executive) ইচ্ছামত যে আইন বাঁধিয়া দেন, তাহাকে রেগুলেশান আখ্যা দেওয়া যায়। ইহা 'ল' বা আইন নহে। শাসক সম্প্রদায়ের হস্তে এই স্বেচ্ছাচার-মূলক আইন বানাইবার যদি অপ্রতিহত ক্ষমতাই থাকে, তাহা হইলে সংস্কৃত ব্যবস্থাপক সভার অস্তিত্বের প্রয়োজন কি? দেশের আইন করিবার জন্য দেশের প্রতিনিধি-গণের হস্তে প্রকৃত ক্ষমতা দেওয়াই যদি কাউন্সিল-সৃষ্টির উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে শাসক সম্প্রদায়ের হস্তে এই

স্বেচ্ছাচারমূলক আইন বানাইবার ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখিলে কি সেই উদ্দেশ্য সাধিত হয়? তবে কাউন্সিলসৃষ্টির উদ্দেশ্য কি, লক্ষ্য কি? আর সেই কাউন্সিল যদি এমনই ভাবে গঠিত হয় যে, উহাতে জনগণের প্রতিনিধিদিগের সমবেত অভিমত শাসক সম্প্রদায়ের স্বেচ্ছাচারমূলক আইন রদে সমর্থ না হয়, তাহা হইলে তাহাকে দায়িত্বমূলক সংস্কৃত ব্যবস্থাপরিষদই বা বলা হয় কেন?

১৯১৯ খৃষ্টাব্দের রিফরম আইন গৃহীত হইয়াছে, এ কথা সরকারপক্ষই স্বীকার করেন। যদি তাহাই হয়, তবে দেশের আইন-কানুন এই রিফরম আইন অনুসারে গঠিত ব্যবস্থাপরিষদই গঠন করিবেন, ইহাই ত আইনানুগ (constitutional) ব্যবস্থা। কানাডা ও অষ্ট্রেলিয়ায় যখন জনগণের প্রতিনিধিসভা গঠিত হয়, তখন ঐ সভা দুইটি পূর্ব্বে প্রবর্ত্তিত দেশের আইন-কানুন অনুমোদন (Ratified) করিয়াছিল, আর তাহা হইয়াছিল বলিয়াই পূর্ব্বের আইন-কানুন দেশের আইন-কানুন বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের রিফরম কাউন্সিল যদি অনুরূপ অধিকারে বঞ্চিত হয়, তবে তাহার মূল্য কি, সার্থকতাই বা কি? যদি সংস্কৃত ব্যবস্থাপরিষদের এই অধিকার না থাকে, তাহা হইলে তাহাকে প্রকৃত সংস্কৃত ব্যবস্থাপরিষদে পরিণত করিয়া সংস্কৃত ব্যবস্থাপরিষদ বলিয়া অভিহিত করা কি যুক্তিসঙ্গত নহে?

আর একটা কথা, যখন ৩ রেগুলেশান প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, তখন দেশে পিনাল কোড (দণ্ডবিধি আইন) ছিল না। এখন দেশে দণ্ডবিধি আইন পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত; সুতরাং দণ্ডবিধি আইন থাকিতে এই রেগুলেশান অক্ষুণ্ণ রাখা কিরূপ ন্যায় বা যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে? জাতির বিপৎকালে সাময়িকভাবে এইরূপ বে-আইনী আইন প্রবর্ত্তনের প্রয়োজন হইয়া থাকে, এ কথা সত্য। জার্ম্মাণ যুদ্ধকালে ইংলণ্ডে Defence of the realm আইন প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। কিন্তু উহা সাময়িক প্রয়োজন সাধিত করিবার উদ্দেশ্যে দেশের বিপৎকালে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। তাহা বলিয়া চিরদিন উহা দেশের সাধারণ আইন-পুস্তকের অঙ্গীভূত হইয়া যায় নাই। এ দেশেই বা এইরূপ বে-আইনী আইন কায়েম-মোকায়েম হইয়া দেশের সাধারণ আইনের অঙ্গে চাপিয়া বসিবে কেন? এ সম্বন্ধে সরকারপক্ষ এবং বে-সরকারী সদস্য-পক্ষ হইতে নানা যুক্তি দেওয়া হইয়াছে। মিঃ ডনোভান বাঙ্গালার সিভিলিয়ান। তিনি ব্যবস্থাপরিষদের সদস্যরূপে এই ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের ৩ রেগুলেশানের পূর্ণ সমর্থন করিবার কালে তাঁহার বহুকালের অভিজ্ঞতার দোহাই দিয়া বলিয়াছেন, (১) বঙ্গদেশের জনসাধারণ এই আইনের বিপক্ষ নহে, (২) কোনও মুসলমান যখন এই আইনে দণ্ডিত হয় নাই, তখন বুঝিতে হইবে, ইংরাজ শাসকের দোষে অসন্তোষ সৃষ্ট হয় নাই, সৃষ্ট হইলে মুসলমানরাও এই আইনে দণ্ডিত হইত, (৩) সার সুরেন্দ্রনাথ বাঙ্গালার যথার্থ মত ব্যক্ত করিয়াছিলেন; উহা ৩ রেগুলেশানের বিরুদ্ধ নহে, (৪) এ দেশের মুক্তিকামীরা যে আয়ারল্যাণ্ডের নজীর দেখাইয়া মুক্তিকামনা করে, সেই আয়ার্ল্যাণ্ডের স্বরাজ গভর্ণমেণ্টই বহু দেশীয় আইরিশকে এইরূপ আইনে আটক করিয়া রাখিয়াছেন।

৩ রেগুলেশান যখন বাঙ্গালার সম্পর্কে প্রযুক্ত হইয়াছে এবং বহু বাঙ্গালী যখন এই আইনের কবলে পড়িয়া বিনা বিচারে আটক আছে, তখন মিঃ ডনোভান বাঙ্গালার অভিজ্ঞ সিভিলিয়ান হইয়া এ সম্বন্ধে অবশ্যই নিজের মতামত প্রকাশ করিতে পারেন। তিনি ১৬ বৎসরের অভিজ্ঞতার দোহাই দিয়াছেন। এই দীর্ঘকালের মধ্যে বাঙ্গালার জনসাধারণের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতার কি সুযোগ হইয়াছিল, তাহা প্রকাশ নাই। এ দেশের বিদেশী সিভিলিয়ানদের দেশের জনসাধারণের সহিত মিলামিশার কতটুকু সুবিধা হয়, তাহা সকলেই জানে; যে প্রজা সামান্য চৌকীদার, পাহারাওয়ালার কাছে ঘেঁসিতে সাহস করে না, সেই প্রজা জিলার দণ্ডমণ্ডের কর্ত্তা সিভিলিয়ানের সহিত মিলামিশা করিয়া অকপটে তাহার মনের ভাব ব্যক্ত করিবে, এমন কথা মিঃ ডনোভান কিরূপে বলিতে পারেন? তবে তিনি কিরূপে জানিবেন যে, বাঙ্গালার জনসাধারণ এই আইনের বিরোধী নহে? তবে যে শ্রেণীর লোকের সহিত তাঁহার জানাশুনা হইবার সম্ভাবনা, সেই 'রায় বাহাদুর, 'খাঁ বাহাদুর' খয়েরখানের দল এ আইনের বিরোধী না হইতে পারেন। কিন্তু তাঁহারা বাঙ্গালার জনসাধারণ নহেন। মিঃ ডনোভানের যখন বাঙ্গালা সম্বন্ধে ১৬ বৎসরের অভিজ্ঞতা আছে, তখন অবশ্যই তিনি কৃষ্ণকুমার

মিত্র, অশ্বিনীকুমার দত্ত প্রমুখ ৯ জন নির্ব্বাসিতের কথা জানেন। তাঁহাদিগকে বিনা বিচারে নির্ব্বাসিত করা হইয়াছিল। কিন্তু পরে শাসকসম্প্রদায়ের মধ্যে কেহ কেহ বলিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে নির্দ্দোষ,—এ কথা কি মিঃ ডনোভান জানেন না? শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয় স্বয়ং বলিয়াছেন, তাঁহাকে শাসক সম্প্রদায়ের কোনও উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী নির্দ্দোষ বলিয়াছিলেন। মিঃ ডনোভান যদি এ কথা না জানেন, তবে তাঁহার অভিজ্ঞতার মূল্য কি? মিঃ ডনোভান অযথা সার সুরেন্দ্রনাথের নামে মিথ্যা কলঙ্ক প্রচার করিয়াছেন। সার সুরেন্দ্রনাথ কখনও এই বে-আইনী আইনের পক্ষপাতী ছিলেন না। সুরেন্দ্রনাথ তাঁহার জীবন-কথায় লিখিয়াছেন, "শাসক সম্প্রদায়ই এই আইন প্রবর্ত্তনের সময়ে মন্ত্রীদিগের সহিত পরামর্শ করেন নাই, An act of the Executive Government in regard to which they (Ministers) were not consulted." বরং সুরেন্দ্রনাথ ১৮৯৭ ও ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে এই বে-আইনী আইনের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, এ জন্য কমিটী গঠন করিয়া বিচার-আলোচনা করিতে বলিয়াছিলেন, বিনা বিচারে দণ্ড দানে লোকের মনে সন্দেহ হয়, এ কথাও বলিয়াছিলেন। তবে? মুসলমানরা দণ্ডিত হয় নাই, ইহার কারণও যথেষ্ট আছে। মুসলমানের মধ্যে হিন্দুর মত শিক্ষার বিস্তার এখনও যথেষ্ট পরিমাণে হয় নাই; সুতরাং রাজনীতিক কারণে তাঁহাদের মধ্যে অসন্তোষও যথেষ্ট পরিমাণে উদ্ভূত হয় নাই। এখন হইতেছে। সুতরাং তাঁহাদের মধ্যেও যে ক্রমে রাজনীতিক অপরাধ বিস্তারলাভ করিবে না, অথবা তাঁহাদের প্রতি যে ৩ রেগুলেশান প্রযুক্ত হইবে না, তাহা মিঃ ডনোভান নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারেন না। অসহযোগের যুগে বহু মুসলমান কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। বাদশা মিঞা, চাঁদ মিঞা প্রমুখ শীর্ষস্থানীয় মুসলমানগণও যে দণ্ডিত হইয়াছিলেন, তাহা কি মিঃ ডনোভান অস্বীকার করিতে পারেন? বহু মুসলমান যে এই আইনের কাউন্সিলে, সংবাদপত্রে ও বক্তৃতায় তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন, তাহাও কি মিঃ ডনোভান অস্বীকার করিতে পারেন? তাঁহার আয়ার্ল্যাণ্ডের নজীরও স্থান-কাল-পাত্রোপযোগী হয় নাই। আয়ার্ল্যাণ্ড মুক্তি পাইয়াছে, ভারত পরাধীন, সুতরাং উভয় দেশের মধ্যে তুলনা হইতে পারে না। ভারত স্বরাজ পাইলে কি করিবে না করিবে, তাহার মীমাংসা এখন হইতে পারে না। স্থান-কাল-পাত্র অনুসারে ভারত নিজের ঘরের ব্যবস্থা নিজে করিয়া লইবে। কিন্তু বিদেশী সরকারের অধীনে যখন বিনা বিচারে আটকের ব্যবস্থা হইয়াছিল, তখন আয়ার্ল্যাণ্ডও ভারতের মত তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিল। ম্যাকসুইনীর মত আইরিশ রাজনীতিকদিগের অসাধারণ আত্মত্যাগ তাঁহাদিগকে বিদেশী শাসকের হস্তে লাঞ্ছিত ও দণ্ডিত হইবার কারণ হইয়াছিল, মিঃ ডনোভান আইরিশম্যান হইয়াও কি তাহার ইতিহাস জানেন না?

সার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

মিঃ ডনোভান, ডি ভ্যালেরা ও ম্যাকসুইনীর দেশবাসী হইয়াও দমননীতির সমর্থন করিতেছেন, ইহাতে শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ দত্ত বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু সকল দেশেই এমন লোক আছেন। এ দেশেও জয়চাঁদ মিরজাফর ছিল।

সরকারপক্ষে সার আলেকজাণ্ডার মুডিম্যান বলশেভিক বিভীষিকার কথা তুলিয়া আইন সমর্থন করিয়াছিলেন। তিনি 'টাইমস্' পত্র হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছিলেন যে, অক্সফোর্ডের ভারতীয় ছাত্ররা বলশেভিকবাদ

দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছে। বে-সরকারী য়ুরোপীয়দিগের পক্ষ হইতে কর্ণেল ক্রফোর্ডও বলিয়াছেন, বলশেভিক বিভীষিকা দূর না হইলে এই আইন রদ করা যায় না। ইংরাজীতে কথা আছে, give a dog a bad name and hang it. যখন যুক্তিতর্কের হালে পানি পাওয়া যায় না, তখন এই ভাবের জুজুর ভয় প্রদর্শন করা আমলাতন্ত্র সরকারের ও তাহাদের পোঁধারীদের স্বভাব। শ্রীযুক্ত তুলসীচরণ গোস্বামী অক্সফোর্ড লেবার য়ুনিয়নের প্রেসিডেণ্টের বক্তৃতা উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন, ইংলণ্ডের ভারতীয় ছাত্রগণের বলশেভিকবাদ-প্রীতির কথা সর্ব্বৈব মিথ্যা। যদি যথার্থই ভারতীয় ছাত্রদিগের বিপক্ষে এই অপরাধের সাক্ষ্য-প্রমাণ থাকে, তাহা হইলে তাহাদিগের প্রকাশ্য বিচার হয় না কেন? আর বিলাতের মুষ্টিমেয় 'বলশেভিক-ভক্ত' ভারতীয় ছাত্রদিগের জন্য কি ভারতে এই বে-আইনী আইন কায়েম-মোকায়েম রাখিতে হইবে? এ কিরূপ যুক্তি? হরির অপরাধের জন্য শ্যাম দণ্ডভোগ করিবে, এ কিরূপ বিচার? আরও এক যুক্তি দেওয়া হইয়াছে যে, বহিঃশত্রুর এবং বাহিরের আন্দোলনকারীর প্রভাব হইতে ভারতকে রক্ষা করিবার জন্য এই আইন বিধিবদ্ধ রাখা প্রয়োজনীয়। এ যুক্তিও অদ্ভুত! দেশের মধ্যে দেশবাসীর অপরাধ প্রকাশ্য আদালতে সপ্রমাণ না হইলেও বাহিরের দুষ্ট প্রভাবের আশঙ্কায় বে-আইনী আইন বলবৎ রাখিতে হইবে এবং উহার সাহায্যে বিনা বিচারে দেশের লোককে আটক করিয়া রাখিতে হইবে। সুন্দর ব্যবস্থা!

সরকারপক্ষ আশ্বাস দিয়াছেন, এই বে-আইনী আইনে দণ্ডিত রাজবন্দীদিগের প্রতি যথাসম্ভব সদ্ব্যবহার করা হইতেছে। সে কিরূপ, তাহাও ব্যাখ্যা করা যাইতেছে। ব্যবস্থাপক সভায় শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকারের প্রশ্নে জানা যায়,—মান্দালয়, মেদিনীপুর, আলীপুর, বহরমপুর প্রভৃতি জেলে রাজবন্দীদিগকে প্রত্যহ খানাতল্লাস করা হয়; পরন্তু মাদ্রাজ ও মধ্যপ্রদেশের জেলের রাজবন্দীদিগকে খানাতল্লাস করিবার জন্য ঐ দুই সরকারকে বাঙ্গালা সরকার অনুরোধ করিয়াছেন। সরকার ইহার উত্তরে বলিয়াছেন, খানাতল্লাস করিবার অধিকার সরকারের আছে; পরন্তু অপর প্রদেশের সরকারকে এইরূপ খানাতল্লাস করিবার জন্য বাঙ্গালা সরকার বলিতে পারেন। এই ব্যবস্থা কি এক নম্বর সদ্ব্যবহারের দৃষ্টান্ত?

বাঙ্গালার শতাধিক রাজবন্দীর মধ্যে কাহারও কাহারও স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছে, কেহ কেহ শয্যাশায়ী, কাহাকেও কাহাকেও আত্মীয়দিগের সহিত দেখা-সাক্ষাৎ করিতে দেওয়া হয় না, আবার কাহারও কাহারও পরিবারবর্গকে যে মাসিক ভাতা দেওয়া হয়, তাহাতে ভরণপোষণ চলা দুঃসাধ্য। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ইনসিন জেলের হরিচরণ চক্রবর্ত্তী, বহরমপুর জেলের অনিলবরণ রায়, মেদিনীপুর জেলের সতীশচন্দ্র পাকড়াশী, বরহমপুর জেলের অমূল্যচরণ অধিকারী, তরণী সোম ও রণজিৎ রায়, মধ্যপ্রদেশের ডামা জেলের আশুতোষ কালী, উক্ত প্রদেশের কেটুল জেলের পঞ্চানন চক্রবর্ত্তী প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। ইঁহাদের প্রতি কিরূপ সদ্ব্যবহার করা হইতেছে, তাহা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে; সে সকলের বিস্তৃত বিবরণ অনাবশ্যক। কিন্তু যাহাদিগকে বিনা বিচারে কেবল পুলিসের গোয়েন্দার কথার উপর নির্ভর করিয়া সন্দেহবশে জেলে আটক করিয়া রাখা হইয়াছে, তাহাদিগকে মুক্তিপ্রদান না করিলেও অন্ততঃ তাহাদের অবস্থার অনুযায়ী ব্যবহার করাও ত মনুষ্যোচিত!

হোলকারের সিংহাসন ত্যাগ

সংবাদপত্রে প্রকাশ পাইয়াছিল যে, বাওলা-মমতাজ-ঘটিত ব্যাপার উপলক্ষ করিয়া লর্ড রেডিংয়ের সরকার ইন্দোর দরবারের মহারাজাধিরাজ রাজরাজেশ্বর সয়াই তুকোজী রাও হোলকারকে হয় কমিশনের সমক্ষে বিচারপ্রার্থী হইতে, না হয় সিংহাসন ত্যাগ করিতে বলিয়াছিলেন। বহু চিন্তা ও বিচার-আলোচনার পর হোলকার সিংহাসন ত্যাগ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার পুত্র যুবরাজ যশোবন্ত রাও তাঁহার স্থানে ইন্দোরের গদীতে বসিবেন। তিনি মাত্র অষ্টাদশবর্ষীয় যুবক। গত বৎসর তাঁহার বিবাহ হইয়াছে। কিন্তু বর্ত্তমান হোলকারও অতি অল্পবয়সে ইন্দোরের গদীতে আরোহণ করিয়াছিলেন।

ভারত সরকার এক ঘোষণায় জানাইয়াছেন যে, গত ২৭শে জানুয়ারী তারিখে মহারাজাকে তাঁহাদের সিদ্ধান্তের কথা জ্ঞাত করা হয় এবং ১৫ দিনের মধ্যে তাঁহার নিকট উত্তর প্রার্থনা করা হয়। মহারাজা ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ

যশোবন্ত রাও—বর্ত্তমান হোলকার

পর্য্যন্ত সময় প্রার্থনা করেন। সেই প্রার্থনামত কার্য্য করা হইয়াছে। মহারাজা যখন নিজে সিংহাসন ত্যাগ করিলেন, তখন আর বাওলা-মমতাজ-কাণ্ডের সম্পর্কে তদন্ত কমিশন বসান হইবে না।

মমতাজ-বাওলা-কাণ্ডের সম্পর্কে প্রকৃত অপরাধী ধৃত ও দণ্ডিত হয় নাই বলিয়া দেশের লোক চঞ্চল হইয়াছিল। সুতরাং বর্ত্তমান মহারাজা গদী ত্যাগ করিলেন বা না করিলেন, তাহার জন্য দেশের লোক ব্যস্ত ছিল না। আসল কথা, তাহারা এই মমতাজ-বাওলা-ব্যাপারের গুপ্ত রহস্য উদ্ঘাটন করিতে চাহে। লর্ড রেডিংয়েয় সরকার সে রহস্য উদ্ঘাটন না করিয়া কেবল মহারাজার গদীত্যাগ ব্যাপারেই এই ব্যাপারের যবনিকাপাত করিলেন কেন?

লর্ড রেডিংয়ের আমলে নাভার রাজারও গদীচ্যুতি ঘটিয়াছে, হোলকারেরও হইল। ইহাতে কি দেশের লোকের অসন্তোষের কারণ দূর হইল, না বৃদ্ধি পাইল? যদি বিচারে হোলকার দোষী বলিয়া সাব্যস্ত হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার দণ্ডে কাহারও আপত্তি থাকিত না। কিন্তু প্রকৃত রহস্য উদ্ঘাটিত হইল না, হোলকার স্বেচ্ছায় গদী ত্যাগ করিলেন—অন্ততঃ এইরূপই প্রকাশ। সে স্থলে জনসাধারণের সন্দেহ ত দূর হইল না। অবস্থাটা 'যবুথবু' হইয়া রহিল, এইরূপই মনে হইতেছে।

বিলাতের 'ডেলি হেরাল্ড' পত্র অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, ভারত সরকার এইরূপ কমিশন নিযুক্ত করিবার অধিকারী নহেন। কারণ, মহারাজা হোলকার স্বাধীন (?) নরপতি, তিনি ভারত সরকারের অধিকার ও আয়ত্তের সীমার মধ্যে অবস্থিত নহেন। তিনি বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের সহিত সন্ধির অধিকারে ভারতের বাহিরের সহিত সন্ধি-শান্তির সম্পর্ক রাখিতে পারেন না বটে, কিন্তু অন্য সকল বিষয়ে ভারত সরকারের আয়ত্তাধীন নহেন। কিন্তু ভারত সরকার বলিতে পারেন, চিরাচরিত প্রথানুসারে তাঁহারা এ যাবৎ সমস্ত দেশীয় রাজ্যের উপর একটা সার্ব্বভৌমিক কর্ত্তৃত্বাধিকার উপভোগ করিয়া আসিতেছেন এবং দেশীয় রাজন্যরাও এ যাবৎ সেই কর্ত্তৃত্বাধিকার স্বীকার করিয়া আসিতেছেন। এ বিষয়ে তাঁহারা বরোদার গুইকবাড় মলহর রাও হোলকারের বিচার ও দণ্ডের কথা নজীরস্বরূপ উদ্ধৃত করিতে পারেন। সে ব্যাপার লর্ড নর্থব্রুকের আমলে ঘটিয়াছিল। সুতরাং সে অধিকার আধুনিক নহে।

এই অধিকারবলে ভারত সরকার ইচ্ছামত দেশীয় রাজ্যের রাজা ভাঙ্গিয়াছেন গড়িয়াছেন; তাঁহাদের

মমতাজ বেগম

পদমর্য্যাদা হ্রাস বা বৃদ্ধি করিয়াছেন। কিন্তু দেশীয় রাজন্য-দিগের পক্ষ হইতেও বলা যাইতে পারে যে, যে দুই পক্ষ সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করেন, তাঁহাদের মধ্যে এক পক্ষ স্বেচ্ছা-পূর্ব্বক যদি সন্ধির সর্ত্ত ভঙ্গ করিয়া স্বেচ্ছাচারমূলক নীতি অবলম্বন করেন, তাহা হইলেও সন্ধির উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয় না।

১৮৯১ খৃষ্টাব্দে ভারত সরকার যে ঘোষণা করেন, তাহাতে বলা হইয়াছিল যে, ইংলণ্ডের রাণী (তখন সাম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া) ও ভারতের দেশীয় রাজন্যগণের মধ্যে আন্ত-র্জাতিক আইনের নীতি অনুসৃত হইতে পারে না; কারণ, রাজন্যরা সার্ব্বভৌম বৃটিশরাজের অধীন। কিন্তু দেশীয় রাজন্যরা বলিতে পারেন, এই ঘোষণা এক-তরফা; তাঁহারা এই ঘোষণায় স্বাক্ষর করেন নাই।

গত বৎসর বোম্বাই হাইকোর্ট কোনও এক মামলায় সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে, বেনারস ষ্টেটের বাসিন্দা বৃটিশ ভারতের প্রজা নহে, স্বতন্ত্র রাজ্যের বাসিন্দা (alien)। বেনারস ষ্টেট মাত্র ১৯১১ খৃষ্টাব্দে গঠিত হইয়াছে। তাহা হইলে প্রাচীন ইন্দোর ষ্টেটের কি হইবে? উহা কি বৃটিশ ভারতের অন্তর্গত, না স্বতন্ত্র রাজ্য? ইন্দোরের মহারাজা স্বতন্ত্র রাজ্যের রাজা বলিয়া ভারত সরকারের অধিকার ও আয়ত্তের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারেন না। কোন্ কোর্টই বা তাঁহার বিচারে বসিতে পারেন?

যদি ইন্দোরের মহারাজা ভারত সরকারের নিযুক্ত কমিশনের নিকট বিচারপ্রার্থী না হয়েন, তাহা হইলে ভারত সরকার কি করিবেন? তাঁহারা কি ইন্দোরে সৈন্য প্রেরণ করিয়া মহারাজাকে কমিশনের বিচার মানিতে বাধ্য করিবেন?

'ডেলি হেরাল্ড' যে সমস্যার কথা তুলিয়াছেন, তাহা ভাবিয়া দেখিবার বটে। তবে সুখের বিষয়, মহারাজা স্বয়ং গদী ত্যাগ করিয়া ভারত সরকারকে এই সমস্যার দায় হইতে উদ্ধার করিয়াছেন।

ইংরাজের সহিত হোলকারের কি সন্ধি হইয়াছিল,তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে হইলে হোলকার-বংশের একটু ইতিহাস দিতে হয়। খৃষ্টীয় ১৮শ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে যখন ভারতে মোগল শক্তির অধঃপতনের ফলে নানা স্বাধীন হিন্দু ও মুসলমান রাজ্যের অভ্যুদয় হয়, তখন দাক্ষিণাত্যে পঞ্চ মারাঠা শক্তিসঙ্ঘের (Confederacy) উদ্ভব হইয়াছিল। প্রাতঃস্মরণীয় শিবাজী মহারাজের বংশধরদিগের প্রধান মন্ত্রী পেশোয়াকে লইয়া এই শক্তিসঙ্ঘ গঠিত হইয়া-ছিল। বস্তুতঃ পেশোয়া বাজীরাও এই সঙ্ঘের প্রাণপ্রতি-ষ্ঠাতা। গোয়ালিয়রের সিন্ধিয়া (সিন্ধে), ইন্দোরের হোলকার (হুলকার), নাগপুরের ভোঁসলা এবং বরোদার গাইকবাড়,—এই চারিটি মারাঠা রাজবংশ এবং পুনার পেশোয়া, ইহাই মারাঠা শক্তিসঙ্ঘ।

হোলকার ইন্দোরের মারাঠা রাজবংশের নাম। মারাঠা ভাষায় হুলকারই ঠিক উচ্চারণ। বংশের প্রতিষ্ঠাতা মলহররাও হুলকার দাক্ষিণাত্যের নীরা নদীর তটে অবস্থিত হুল নামক গ্রামের আদিম নিবাসী ছিলেন বলিয়া তাঁহার বংশের পদবী হুলকার হইয়াছে। ১৬৯৩ খৃষ্টাব্দে মলহরের জন্ম। তিনি সামান্য কৃষককুলের সন্তান, কিন্তু নিজ প্রতিভা ও শৌর্য্যবলে জগতে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছিলেন। যৌবনে তরবারি ধারণ করিয়া ১৭২৪ খৃষ্টাব্দে পেশোয়ার সৈন্যশ্রেণীতে প্রবেশ করেন এবং মাত্র ৮ বৎসরের মধ্যে পেশোয়ার সেনাপতিপদে বরিত হয়েন। সেনাপতিরূপে তিনি বাহুবলে মোগল-সাম্রাজ্য হইতে মালবদেশ জয় করিয়া লয়েন। পেশোয়া কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ তাঁহাকে ইন্দোরের রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করেন। ইহাই হোলকার-বংশের আদি ইতিকথা।

মলহরের পৌত্র মালিরাও অথবা তাঁহার বিধবা পুত্রবধূ প্রাতঃস্মরণীয়া মহারাণী অহল্যা বাইয়ের রামরাজত্ব এবং পরে অহল্যা বাইয়ের সেনাপতি তুকোজীরাও ও তুকোজীর পুত্র যশোবন্তরাও হোলকারের ইতিকথা এ স্থলে অপ্রাস-ঙ্গিক। যশোবন্ত রাওয়ের সহিত বৃটিশ শক্তির সংঘর্ষ এবং লর্ড লেকের হস্তে তাঁহার আত্মসমর্পণ, তাঁহার উপপত্নী মহারাণী তুলসীবাই ও নাবালক পুত্র মলহর রাওয়ের রাজ্যশাসন, মারাঠা সর্দ্দারগণের হস্তে তুলসী বাইয়ের মৃত্যু, মেহিদপুরের যুদ্ধে বৃটিশ শক্তির নিকট হোলকারের সৈন্যের পরাজয়, ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে মণ্ডেশ্বরের সন্ধি,—এ সকল ব্যাপারও ইতিহাসপ্রসিদ্ধ হইয়া রহি-য়াছে। মলহর রাওয়ের পরে মার্ত্তণ্ড রাও, হরি রাও, খাণ্ডে রাও, তুকোজী রাও, শিবাজী রাও এবং বর্ত্তমান মহারাজাধিরাজ সয়াই তুকোজী রাও পর পর হোলকার হইয়া ইন্দোরের গদীতে বসিয়াছেন। ইঁহাদের

নিজ রাজ্যমধ্যে ২১ তোপ এবং বাহিরে ১৯ তোপের অধিকার আছে। ইঁহাদের সৈন্যসংখ্যা প্রায় ১০ হাজার। রাজ্যের লোকসংখ্যা ১০ লক্ষেরও উপর।

এখন জিজ্ঞাস্য, মেহিদপুরের যুদ্ধের পর ইংরাজ-রাজের সহিত তদানীন্তন হুলকারের কি সন্ধি হইয়াছিল এবং যে সন্ধিই হইয়া থাকুক, সেই সন্ধি এখনও বলবৎ কি না। যত দূর জানা যায়, সেই মণ্ডেশ্বরের সন্ধিই এ যাবৎ বলবৎ আছে। গ্রাণ্ট ডাফের ইতিহাসে আছে, ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে মেহিদপুরের যুদ্ধ হয় এবং ঐ যুদ্ধের পর মারাঠা শক্তি একবারে ধল্যবলুণ্ঠিত হয়। ইহার ফলে পেশোয়ার রাজ্য ইংরাজ-সরকারে বাজেয়াপ্ত হয়, শেষ পেশোয়া বাজী রাওকে (দ্বিতীয়) বাৎসরিক ৮ লক্ষ টাকা বৃত্তি দিয়া কানপুরের নিকট বিঠুর নামক স্থানে বাস করিতে দেওয়া হয়। নাগপুরে আপ্পা সাহেবের শোচনীয় মৃত্যুর পর ভোঁসলা পরিবারের এক শিশুকে নাগপুরের সিংহাসনে বসান হয়। আর হোলকারের সহিত মণ্ডেশ্বরের যে সন্ধি হয়, তাহাতে হোলকার ইংরাজের সহিত করদ মিত্ররাজরূপে করদ-রক্ষণ-নীতি (subsidiary system) অনুসারে বন্ধুতা-সূত্রে আবদ্ধ হয়েন। পরন্তু তাঁহাকে রাজপুতরাজ্য সমূহের উপর সমস্ত কর্তৃত্ব পরিত্যাগ করিতে হয়। করদ-রক্ষণ-নীতিটা গভর্ণর জেনারল লর্ড ওয়েলেসলিরই প্রবর্ত্তিত। এই নীতি অনুসারে দেশীয় রাজন্যগণকে স্ব স্ব রাজনীতিক স্বাধীনতা পরিত্যাগ করিয়া ইংরাজের সহায়তা ও আশ্রয়লাভের দ্বারা অপরের আক্রমণ হইতে নিস্তার পাইতে ইংরাজরাজ আহ্বান করিয়াছিলেন। এই প্রথা অনুসারে ইংরাজের সহিত সন্ধি করিলে (১) কোনও রাজা অতঃপর ইংরাজ-সরকারের বিনা অনুমতিতে অন্য কোন রাজার সহিত যুদ্ধ-বিগ্রহ বা সন্ধি করিতে, (২) রাজনীতিক বন্দোবস্ত করিতে অথবা (৩) কোন বিদেশীয়কে রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিতে পারিবেন না, এইরূপ স্থির হইয়াছিল। দেশীয় রাজন্যগণ এই সন্ধি-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া ইংরাজ সেনানীর অধীনে সৈন্য রাখিতে বাধ্য হইতেন এবং সৈন্যের ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য ইংরাজকে নিজ রাজ্যের কিয়দংশ দান করিতেন।

বর্ত্তমান হোলকারের পূর্ব্বপুরুষ মেহিদপুর যুদ্ধের পর ইংরাজের সহিত এই সন্ধিবন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। এই সন্ধির সর্ত্তে (১) ইংরাজকে সার্ব্বভৌম শক্তি বলিয়া স্বীকার করার, (২) ইংরাজের সহায়তা ও আশ্রয় লাভ করার, (৩) ইংরাজের বিনা অনুমতিতে অপরের সহিত সন্ধি বা যুদ্ধ না করার বা বিদেশীয় নিয়োগ না করার, (৪) ইংরাজ-সৈন্য নিজরাজ্যে রক্ষা করার কথা আছে বটে, কিন্তু কোথাও ইংরাজের নিকট হোলকারের অধীন-রূপে বিচারের জন্য দণ্ডায়মান হইতে বাধ্য হওয়ার কথা নাই। ইংরাজ হয় ত বলিতে পারেন, ইংরাজকে যখন হোলকার সার্ব্বভৌম (Paramount Power) শক্তি বলিয়া সন্ধিতে মানিতেছেন, তখন মানিয়াই লইয়াছেন যে, তাঁহাকে ইংরাজ অধীনরূপে বিচার করিতে পারেন; আর এরূপ বিচারে ইংরাজের বহু দিন হইতে prescriptive right বহুকাল উপভুক্ত অধিকার দাঁড়াইয়া গিয়াছে।

ইহা বড় সমস্যার কথা। এত বড় একটা জটিল আইনের কূট তর্কের মীমাংসা করে কে? দেশীয় রাজন্যগণ চরিত্রহীন, রাজকার্য্যে অমনোযোগী বা যথেচ্ছাচারী হয়েন, এরূপ কামনা কেহই করে না, বরং তাঁহাদিগকে এ বিষয়ে সংযত রাখিবার পক্ষে উপযুক্ত ব্যবস্থা হউক, ইহা জনমত ইচ্ছা করে। কিন্তু তাহা বলিয়া তাঁহাদের সহিত সন্ধির সর্ত্ত চোতা কাগজ বলিয়া উড়াইয়া দিয়া ভারত-সরকার ইচ্ছামত ব্যবহার করিবেন, ইহাও বাঞ্ছনীয় হইতে পারে না।

সালতামামী

ভারতের রাজস্ব-সচিব সার বেসিল ব্ল্যাকেট ব্যবস্থা-পরিষদে গত ১লা মার্চ্চ তাঁহার ১৯২৫-২৬ খৃষ্টাব্দের সালতামামী হিসাব পেশ করিয়াছেন। এই বার লইয়া সার বেসিলের চতুর্থ বার হিসাব পেশ করা হইল। তিনি যে বৎসর এ দেশে আইসেন, সেই বৎসর লইয়া তৎপূর্ব্বে অতীত ৪ বৎসর ভারতের আর্থিক অবস্থা মন্দ ছিল, এ কথা অস্বীকার করা যায় না, ৪ বৎসর কালই আয়-ব্যয়ে ঘাঁটতি পড়িত। সার বেসিলকে যখন বিলাতের 'ট্রেজারী' হইতে এ দেশের রাজস্ব-সচিবরূপে আমদানী করা হয়, তখন লর্ড রেডিং আশা করিয়াছিলেন যে, তাঁহার অভিজ্ঞতার ফলে ভারতের রাজকোষের আর্থিক অবস্থা হয় ত উন্নত হইলেও

হইতে পারে। সার বেসিল এই কয় বৎসরে সেই অবস্থার যে কতক উন্নতিসাধন করিয়াছেন, তাহা অস্বীকার করা যায় না। এ বৎসরেও তিনি যাহা আয়-ব্যয়ের পর উদ্‌বৃত্ত হইবে বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, তাহা হইতে অধিক অর্থ উদ্‌বৃত্ত হইবে, হিসাবে এইরূপই প্রকাশ।

সার বেসিল যখন প্রথম সালতামামী হিসাব পেশ করেন, তখন (১৯২৩-২৪ খৃষ্টাব্দে) গত ৪ বৎসরের ঘাঁটতির দুর্ব্বহ ভার তাঁহার স্কন্ধে পতিত। এক এক বৎসরে ৫ কোটি, ১৫ কোটি, ২৩ কোটি, ২৬ কোটি,—এমন কি, ২৭ কোটি পর্য্যন্ত ঘাঁটতি হইয়াছিল। এই সকল কারণে ১৯২৩-২৪ খৃষ্টাব্দে সার বেসিলকে লবণকর দ্বিগুণ করিতে হইয়াছিল। তাহার পর ক্রমে ক্রমে প্রতি বৎসরে উন্নতি পরিলক্ষিত হইয়াছে। লবণ-কর-বৃদ্ধির ফলে দরিদ্র প্রজাকে অবসন্ন করিয়া যে এই উন্নতি সাধিত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। গত বৎসর সার বেসিল সাধারণ সালতামামী হিসাব হইতে রেলের বাজেট পৃথক্ করিয়া ফেলিয়াছেন। ঐ বৎসর তাঁহার আনুমানিক উদ্‌বৃত্ত ৪ কোটির স্থলে ৫ কোটি ৬৮ লক্ষ টাকায় দাঁড়াইয়াছিল। সামরিক ব্যয় ৭০ লক্ষ টাকা হ্রাস করিবার এবং রেল হইতে ১ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা আদায়ের ইহাই ফল। এ বৎসর সার বেসিলের আনুমানিক হিসাবে আয় ১ শত ৩১ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা (পূর্ব্বের অনুমানের উপর ৬৭ লক্ষ টাকা অধিক) এবং ব্যয় ১ শত ৩০ কোটি ৫ লক্ষ টাকা হইবার সম্ভাবনা। সুতরাং সংশোধিত আনুমানিক হিসাবে ১ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা উদ্‌বৃত্ত হইবার সম্ভাবনা আছে। এই উদ্‌বৃত্তের মধ্যে ৫০ লক্ষ টাকা পুরাতত্ত্ব ও প্রাচীন স্মৃতিরক্ষা বাবদে ব্যয়িত হইবে বলিয়া ধার্য্য হইয়াছে। আগামী ১৯২৬-২৭ খৃষ্টাব্দের আনুমানিক আয় ১ শত ৩৩ কোটি ৪৩ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় ১ শত ৩০ কোটি ৩৮ লক্ষ টাকা হইবার সম্ভাবনা। সুতরাং আগামী বৎসরে ৩ কোটি ৫ লক্ষ উদ্‌বৃত্ত হইবার সম্ভাবনা করা যায়। উহার মধ্য হইতে বস্ত্র-শিল্পের অন্তঃশুল্ক রদ বাবদ ১ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা বোম্বাইয়ের কলওয়ালাদিগকে দেওয়া হইয়াছে, সুতরাং প্রদেশসমূহকে তাহাদের দেয় টাকার পরিমাণ কমাইয়া দেওয়ার অথবা প্রজার কর হ্রাস করিবার পক্ষে ১ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা থাকিবার কথা।

হিসাব খুবই আশাজনক সন্দেহ নাই, কিন্তু বর্ত্তমানের ব্যবস্থা আশাপ্রদ হইলেও ভবিষ্যতের আশার কি ব্যবস্থা করা হইতেছে, তাহা বুঝা যায় না। দেশের জাতীয় ঋণ কপর্দ্দক পরিমাণে কমাইবার কোনও ব্যবস্থা হয় নাই। প্রজার উপর গুরুভার কর হ্রাস করিবারও কোনও লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। প্রাচীন স্মৃতিরক্ষা বাবদে ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে, ইহাতে আপত্তির কথা না থাকিতে পারে, কিন্তু ঐ সঙ্গে প্রজার কর হ্রাস করার অথবা প্রাদেশিক তহবিলকে দেয় টাকার দায় হইতে কিছু কাটানছাড়ান দেওয়ার পক্ষে কোন বিশেষ আশাজনক উপায় অবলম্বন করা হইতেছে না। প্রাদেশিক ভাণ্ডারে অর্থের স্বচ্ছলতা না হইলে জাতি-গঠনমূলক কার্য্যের কখনও সুবিধা হইতে পারে না। পরন্তু প্রজার গুরু কর-ভার না কমিলে দরিদ্র প্রজার কষ্ট লাঘব হইবে না, সুতরাং অ্যাংলো-ইণ্ডিয়া যতই prosperity Budget বলিয়া উল্লাস ও আনন্দ প্রকাশ করুন না, সার বেসিলের বাজেটকে ঐ আখ্যায় ভূষিত করা যায় না। কেবল লবণ-কর নহে, ডাক-টিকিট, ষ্ট্যাম্প ইত্যাদির মূল্য হ্রাস না করিলে বাজেটকে 'উন্নতি বাজেট' বলা যায় না।

জার্ম্মাণ যুদ্ধের পূর্ব্বে প্রজার উপর কর যাহা নির্দ্ধারিত হইত, এখন তাহা অপেক্ষা বহু গুণ অধিক কর-ভার বর্ত্তমান রহিয়াছে। যদিও যুদ্ধের পূর্ব্বের অবস্থা একবারে আনয়ন করা সম্ভবপর না হয়, তাহা হইলেও ক্রমশঃ উহার পরিমাণ হ্রাস করা কর্ত্তব্য নহে কি? সার বেসিল বলিয়াছেন, কাষ্টমস শুল্কের আয়ে ভাণ্ডারে ৫৭ কোটি টাকা পাওয়া গিয়াছে। ইহাতে তিনি গর্ব্ব ও আনন্দ অনুভব করিয়াছেন, কিন্তু উহাতে গর্ব্ব বা আনন্দ প্রকাশ করিবার কিছু আছে বলিয়া মনে হয় না। কাষ্টম শুল্কবৃদ্ধির ফলে আমদানী পণ্যের মূল্য বাজারে অতিরিক্তরূপ বৃদ্ধি পাইতেছে। দেশের লোককে ঐ অতিরিক্ত টাকা বিদেশে যোগান দিতে হইতেছে। ইহা দেশের আর্থিক অবস্থার পক্ষে কিরূপে আশাজনক হইতে পারে?

বাঙ্গালী ছাত্র ও ব্যায়াম

বাঙ্গালার ব্যবস্থাপক সভায় শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রস্তাবে বাঙ্গালী ছাত্রদিগের ব্যায়াম বাধ্যতামূলক

করিবার কথা স্থির হইয়াছে। প্রস্তাবক বলেন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পর্কিত ছাত্র-মঙ্গল কল্পনা-প্রসূত রিপোর্টে দেখা যায়, বাঙ্গালার ছাত্রবর্গের মধ্যে শতকরা ৮ জন মাত্র সুস্থ ও সবলকায়; পরন্তু তাহাদের মধ্যে শতকরা ৫০ জনেরও অধিক দীর্ঘোন্নত নহে। মিঃ জেমস বলেন, ১৯২৫ খৃষ্টাব্দের রিপোর্টে দেখা যায়, বাঙ্গালার ছাত্রগণের মধ্যে শতকরা ৬৭.৫ জনের দৈহিক দৌর্ব্বল্য আছে। বস্তুতঃ রিপোর্ট না দেখিলেও সচরাচর চক্ষুর সমক্ষে যাহা দেখা যায়, তাহাতে মনে হয়, বাঙ্গালী জাতি ক্রমশঃ দুর্ব্বল ও অসুস্থ হইয়া পড়িতেছে। ইহার কারণ অনেক আছে। ম্যালেরিয়া, অজীর্ণ, অবসাদ, আলস্য, ভেজাল, —কত কি! সে সকলের চর্ব্বিতচর্ব্বণ আবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। অথচ প্রাচীনকালে এই ভারতেরই কোন গভর্ণর জেনারল বাঙ্গালী জাতিকে a manly race বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন। এ রোগের প্রতীকার কি? বাধ্যতামূলক ব্যায়াম প্রবর্ত্তন করা ভাল, কিন্তু ঐ সঙ্গে ভেজাল নিবারণের জন্য দেশের লোককে বদ্ধপরিকর হইতে হইবে। দেশে এখন যে স্বাস্থ্যোন্নতি-সমিতি সমূহের প্রতিষ্ঠা হইতেছে, তাহাদিগকে সর্ব্বান্তঃকরণে সাহায্য ও সমর্থন করিতে হইবে। সকলের উপর যুগপ্রবর্ত্তক মহাত্মা গন্ধীর প্রদর্শিত plain living and high-thinking নীতি অনুসরণ করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। এ জন্য প্রাচীনকালের সনাতন ভাবধারার পুনঃ প্রবর্ত্তন করিতে হইবে—যাহাতে ছাত্রজীবনে সংযমের আদর্শ অনুসৃত হয়, এমনভাবে জাতীয় শিক্ষার প্রবর্ত্তন ও প্রচার করিতে হইবে। নতুবা কেবল দৈহিক ব্যায়ামে যে বিশেষ উপকার হইবে, এমন ত মনে হয় না।

কৃষিকমিশন

দিল্লী সহরে যে ভারতীয় কমার্শাল কংগ্রেসের অধিবেশন হইয়াছিল, উহাতে সভাপতি লালা হরকিষণ লাল তাঁহার অভিভাষণে রয়াল এগ্রিকালচারাল কমিশনের সমর্থন করিয়া বলিয়াছিলেন, ভারতের মান্ধাতার আমলের কৃষি-পদ্ধতি লাভজনক নহে, সুতরাং আধুনিক বৈজ্ঞানিক কৃষি-পদ্ধতি অনুসরণ করা ভারতের কর্ত্তব্য। সমবায় সংঘটন, পশুপালন, বীজনির্ব্বাচন, জল সরবরাহ, বৈজ্ঞানিক হল-চালনা দ্বারা ভূমিকর্ষণ, উন্নত উপায়ে ফল-ফুল উৎপাদন ইত্যাদি কার্য্যে ভারতবাসীর এখন অবহিত হওয়া কর্ত্তব্য। এ বিষয়ে কৃষি কমিশন অনেক সাহায্য করিবে। লালাজীর সহিত আমরা একমত হইতে পারিলাম না। অবশ্য, আধুনিক উন্নত বৈজ্ঞানিক উপায়ে কৃষিকার্য্য করিলে ভারতবাসী যে লাভবান্ হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু সে জন্য কমিশন বসাইবার প্রয়োজন কি? ইহার বাবদে যে অর্থব্যয় হইবে, তাহা ত ভারতকেই বহন করিতে হইবে? অথচ এই অনর্থক অর্থব্যয়ের প্রয়োজন কি? বরং ঐ অর্থে ভারতের কৃষককুলকে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি ও বীজ সরবরাহ করিলে অনেক কায হইতে পারে। এক বৎসর পূর্ব্বে লর্ড ল্যামিংটন ইষ্ট ইণ্ডিয়া এসোসিয়েশনে বলিয়াছিলেন, "ভারতে উপস্থিত কৃষি-কমিশন বসাইবার প্রয়োজন নাই। যে সকল উন্নতিমূলক তথ্য জানা আছে এবং পরীক্ষা দ্বারা অন্যান্য সভ্যদেশে প্রমাণিত হইয়াছে, ক্রমে ক্রমে তদনুসারে এ দেশের কৃষির উন্নতিসাধন করাই কর্ত্তব্য।" আমাদের এই পরামর্শই সমীচীন বলিয়া মনে হয়।

আফ্রিকার রোডেশিয়া প্রদেশের কৃষি-সচিব সে দিন ঘোষণা করিয়াছেন যে, "স্থানীয় সরকার প্রথমে দেখিবেন যে, কোথায় চাষ-আবাদের উপযোগী জমী পড়িয়া আছে এবং সেখানে চাষ-আবাদের শিক্ষার কিরূপ সুবিধা আছে। এ রিপোর্ট সরকার ভূমির ইনস্পেক্টরগণের নিকট সংগ্রহ করিবেন। তাহার পর চাষবাসের ইচ্ছুক শিক্ষিত 'সেটলার'গণকে গোরেবীর Experimental farmএ পাঠান হইবে। তথায় তাহারা farmerগণের (চাষ-আবাদে দক্ষ কৃষিজীবিগণের) নিকট এক বৎসরকাল হাতে-কলমে শিক্ষা লাভ করিবে। তাহার পর শিক্ষা-নবীশগণকে চাষ-আবাদের জমী দেওয়া হইবে।"

এ দেশেও কমিশন না বসাইয়া সরকার এই ব্যবস্থা অনুসরণ করিলে পাবেন ত। এ জন্য বৃটিশ সরকার বাৎসরিক ৩০ লক্ষ পাউণ্ড রোডেশীয় সরকারকে কর্জ্জ দিবেন বলিয়াও আশা দিয়াছেন, অবশ্য যদি রোডেশীয় সরকারও স্বয়ং ৩০ লক্ষ পাউণ্ড নিজ তহবিল হইতে ব্যয় করেন। এই সুবিধা করিয়া দিবার পর বৃটিশ সরকার শিক্ষানবীশ settlerগণকে গ্রহণ করিবেন। যাহাদের অন্যূন দেড় হাজার পাউণ্ড মূলধন আছে, তাহাদিগকে

উহার বারো আনা ভাগ সরকারে জমা রাখিয়া settlementএর বন্দোবস্ত করিতে হইবে। এই জমা টাকার দরুণ তাঁহারা শতকরা ৫ পাউণ্ড সুদ পাইবেন। জমীর স্থায়ী উন্নতির জন্য সরকার settlerগণকে ৩ শত পাউণ্ড কর্জ্জ দিবেন।

এ সকল ব্যবস্থাও এ দেশের সরকার অনুসরণ করিতে পারেন।

প্রেসিডেণ্ট ও কাউন্সিল

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রেসিডেণ্ট ও কাউন্সিলের সদস্যগণের মধ্যে যে বিবাদের অভিনয় হইয়া গেল, তাহাতে আমরা হাসিব কি কাঁদিব, বুঝিয়া উঠিতে পারি না। বালকোচিত অভিনয়ে বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর সুনাম কতটুকু বর্দ্ধিত হইল, তাহা বোধ হয় বিবদমান পক্ষদ্বয় একবারও ভাবিয়া দেখিবার অবসর প্রাপ্ত হয়েন নাই।

নির্ব্বাচিত প্রেসিডেণ্ট কুমার শিবশেখরেশ্বর পদপ্রাপ্তির পর হইতে কয়েক ক্ষেত্রে যে যৌবনসুলভ ঔদ্ধত্যের পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। এ সম্বন্ধে পূর্ব্বে আমরা কঠোর মন্তব্য প্রকাশ করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। বর্ত্তমান ব্যাপারেও যে তাঁহার সেই ঔদ্ধত্য কতক পরিমাণে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, তাহাতেও সন্দেহ নাই। সদস্য অশ্বিনীকুমার নিম্নস্বরে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহার পুনরাবৃত্তি করিতে বলিয়া তিনি পদোচিত গাম্ভীর্য্য রক্ষা করিতে পারেন নাই। সদস্যের পর সদস্যকে সভা-গৃহ ত্যাগ করিতে বলিয়াও তিনি আপন পদমর্য্যাদার প্রয়োজনাতিরিক্ত সম্মান রক্ষার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

কিন্তু এ সকল অপরাধ সত্ত্বেও তিনি কাউন্সিলের প্রথম নির্ব্বাচিত প্রেসিডেণ্ট। কাউন্সিলাররা স্বয়ং নির্ব্বাচন করিয়া তাঁহাকে প্রেসিডেণ্টের পদে বসাইয়াছেন। ভাল হউক, মন্দ হউক, কাউন্সিলাররা কাউন্সিলকে গ্রহণ করিয়াছেন, কাউন্সিলে প্রবেশ করিয়া দেশের কায করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। সে ক্ষেত্রে কাউন্সিলের মর্য্যাদা রক্ষা করা তাঁহাদের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য ছিল। তাঁহারা বলিয়াছেন, কাউন্সিলারদের মর্য্যাদাও কি মর্য্যাদা নহে?—সুতরাং যে প্রেসিডেণ্ট কাউন্সিলারদের মর্য্যাদা রক্ষা করেন না, সে প্রেসিডেণ্টকে তাঁহারা চাহেন না। কিন্তু তাঁহাদেরই নির্ব্বাচিত প্রেসিডেণ্টকে অপদস্থ ও অপমানিত করিয়াও কি তাঁহারা কাউন্সিলের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন? তাঁহাদের এই ঘরোয়া যুদ্ধে কাহার আনন্দ—কে মজা উপভোগ করিতেছে, তাহা কি তাঁহারা বুঝিবার সামর্থ্যও অর্জ্জন করেন নাই?

প্রেসিডেণ্ট যাহা ruling দিয়াছিলেন, তাহা আইনতঃ দিতে পারেন। তবে ব্যাপারের লঘুত্ব বিবেচনা করিয়া তাঁহার কার্য্য করা উচিত ছিল, এ কথা সত্য। যে সংশোধন-প্রস্তাব তিনি পেশ করিতে অনুমতি দিয়াছিলেন, তাহা না দিলেই শোভন হইত, এ কথাও ঠিক। তাহা না করিয়া তিনি সার আবদর রহিমের মত 'ঘর-ভাঙ্গানীর' অন্যায় আব্দার রক্ষা করার অপরাধে অপরাধী বলিয়া দেশের লোকের নিকট প্রতিভাত হইয়াছেন। কিন্তু তাহা হইলেও তিনি যখন নির্ব্বাচিত প্রেসিডেণ্ট, তখন কাউন্সিলারগণের তাঁহাকে অপমানিত ও অপদস্থ করা কর্ত্তব্য হয় নাই। আমরা এমনও শুনিয়াছি যে, 'upstart' কথাও বিবাদকালে ব্যবহৃত হইয়াছিল। ইহা কি সত্য? যদি সত্য হয়, তাহা হইলে কি উহা কাউন্সিলের পক্ষে কলঙ্কের কথা নহে?

অধুনা এক শ্রেণীর তরুণগণের মধ্যে অধৈর্য্য ও অসংযমের পরিচয় নানা সভা-সমিতিতে পাওয়া যাইতেছে। অন্য পরে কা কথা, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও সভায় অপমানিত হইয়াছিলেন। কাউন্সিলাররা তাঁহাদের ধৈর্য্য ও সংযমের দৃষ্টান্ত দ্বারা দেশের তরুণগণের মধ্যে এই উচ্ছৃঙ্খল বৃত্তি সংযত করিবার চেষ্টা করিবেন, ইহাই কি বাঞ্ছনীয় নহে? তাঁহারা দেশের জনগণের প্রতিনিধিত্বের দাবী করেন। সুতরাং তাঁহাদের নিকট দেশ কতটা ধৈর্য্য ও সংযমের আশা করে, তাহা কি তাঁহারা বুঝেন না?

প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত। সুতরাং তিনি সরকারপক্ষ নহেন, ইহা মানিতেই হইবে। তবে তাঁহাকে অপমান করিয়া কি সরকারের অপমান করা হইয়াছে? সরকারের ইহাতে ক্ষতি কি? তাঁহারা ত তফাতে দাঁড়াইয়া হাসিতেছেন। তাঁহারা কি এই নজীর দেখাইয়া জগৎকে বুঝাইবেন না যে, এ দেশের লোক এখনও Parliamentary free institutionএর উপযুক্ত হয় নাই?

প্রেসিডেণ্টকে পদ হইতে অপসারণ করিবার প্রস্তাব

করিয়া কি কাউন্সিলাররা বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়াছেন ? তাঁহাদের এ ঘরোয়া বিবাদে সরকারের কি ক্ষতি ? যাঁহারা প্রেসিডেণ্টকে নির্ব্বাচন করিয়াছেন, তাঁহারাই তাঁহাকে সরাইবার প্রস্তাব করিয়াছেন। যদি ইহার ফলে প্রেসিডেণ্ট পদচ্যুত হইতেন, তাহা হইলে কাউন্সিলের গৌরবের বিষয় কি ছিল ? উহা দ্বারা কি তাঁহারা ব্যুরোক্রেশীর ক্ষমতার এক বিন্দুও ক্ষতি করিতে পারিতেন ?

কাউন্সিল-কামনার কুফল ক্রমশঃই ফলিতেছে। মহাত্মা গন্ধী অনেক চিন্তার পর কাউন্সিল বর্জ্জনের উপদেশ দিয়াছিলেন। যতই দিন যাইতেছে, ততই কাউন্সিলের ব্যর্থতা প্রতিপন্ন হইতেছে। এই সকল অনর্থক কাউন্সিল বিবাদে শক্তির ক্ষয় হইতেছে, একতা নষ্ট হইতেছে, জাতি-গঠন কার্য্য পিছাইয়া পড়িতেছে। মোহাচ্ছন্ন জাতির এই সত্য বুঝিবার এখনও বিলম্ব আছে।

কুলীহত্যার মামলা

সিমলা শৈলের আর্ম্মি ক্যাণ্টিন বোর্ডের কনট্রোলার এইচ ম্যানসেল-প্লেডেল, যোগেশ্বর নামক রিক্সা-কুলীকে গত ৩রা সেপ্টেম্বর তারিখে লাথি মারিবার ফলে যোগেশ্বরের মৃত্যু হয়, এ কথা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। আম্বালা ডিভিসনের সেসন জজ লেফটানেণ্ট কর্ণেল নোলিস এই মামলার বিচার করিয়া আসামীকে ১৮মাস সশ্রম কারাদণ্ডে এবং ৪ হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। যদি আসামী জরিমানা আদায় না দেয়, তাহা হইলে তাহাকে আরও ১ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে। যদি জরিমানা দেয়, তাহা হইলে ঐ টাকার একার্দ্ধ অর্থাৎ ২ হাজার টাকা এমন ভাবে সুদে খাটান হইবে, যাহাতে নিহত যোগেশ্বরের বিধবা পত্নীর গ্রাসাচ্ছাদন নির্ব্বাহিত হয়। এই মামলায় ৪ জন এসেসর ছিলেন। তাঁহাদের সহিত জজ একমত হইতে না পারিলেও এই দণ্ড দান করিয়াছেন।

এ দেশে শ্বেতাঙ্গের হস্তে এ দেশীয়ের হত্যা এই নূতন নহে ; কিন্তু এমন বিচার নূতন বটে। ফুলার মিনিটের সময় হইতে এ দেশে এমন অনেক ঘটনা হইয়া গিয়াছে। এই সে দিন আসামের চাবাগিচায় এইরূপ কুলী-হত্যা হইয়াছিল। তাহার বিচারফল যেমন অসন্তোষজনক হইবার, তেমনই হইয়াছিল। সে মামলার বিবরণ আমরা পূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছি। বলিজান চাবাগিচার শ্বেতাঙ্গ ম্যানেজার বিয়াটি, তেলু নামক কুলীকে হত্যা করার অপরাধে বিচারার্থ প্রেরিত হয়। আসাম উপত্যকা জিলার সেসন জজ ৪ জন য়ুরোপীয় ও ১ জন ভারতীয় জুরীর সাহায্যে বিচার করিয়া তাহাকে বেকসুর খালাস দেন। সম্প্রতি আসাম সরকার এই সিদ্ধান্তের বিপক্ষে কলিকাতা হাইকোর্টে আপীল করিয়াছেন। সিমলা কুলীহত্যার মামলার রায়ে সুতরাং অভিনবত্ব আছে। বিচারপতি তাঁহার রায়ে বলিয়াছেন,—"যদি কোন সদ্বংশজাত উচ্চপদস্থ ভারতীয় ভদ্রলোক কোনও ইংরাজ অথবা ভারতীয় কুলীর মৃত্যুর কারণ হয়েন, তবে তাঁহাকে আমি যেরূপ দণ্ড দিব, এ ক্ষেত্রে মিঃ ম্যানসেল প্লেডেলকেও আমি সেইরূপ দণ্ড দিয়াছি। প্রতিহিংসা লওয়া দণ্ডদানের উদ্দেশ্য নহে। যাহাতে অপরে ভবিষ্যতে অপরাধ না করে, তাহারই জন্য দণ্ড দেওয়া হইয়া থাকে। যদি আমার দণ্ডদান উচ্চ আদালতে বহাল হয়, তাহা হইলে আসামীর এই দণ্ড ব্যতীত আরও গুরু ক্ষতি হইবে, এ কথা আমি জানি। চারি জন এসেসরের ২ জন আসামীকে 'সন্দেহের সুবিধা' দান করিয়াছেন অর্থাৎ তাঁহার অপরাধ সম্বন্ধে সাক্ষ্য-প্রমাণে সন্দেহ আছে বলিয়া তাঁহাকে মুক্তি দান করিতে বলিয়াছেন। অপর দুই জন এসেসর তাঁহাকে ইচ্ছাপূর্ব্বক সামান্য আঘাত করার অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়াছেন। কিন্তু আমি তাঁহাদের চারি জনেরই মতে মত দিতে পারিলাম না। আসামীর অপরাধ সাব্যস্ত করিয়া তাহাকে দণ্ডিত করিলাম।"

এ দেশে এরূপ রায় এই নূতন বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। প্রায়ই দেখা যায়, কালা-ধলা-ঘটিত হত্যাকাণ্ডের মামলায় অপরাধী ধলা স্বজাতীয় জুরী বা এসেসরের কল্যাণে বে-কসুর খালাস পায়। ইহাতে অপরাধী ধলাদের 'বুক বলিয়া' যায়। তাহারা মনে করে, এ দেশীয়ের জীবনের মূল্য অকিঞ্চিৎকর। সে জীবন তাহারা যদি স্বহস্তে গ্রহণ করে, তাহা হইলে বড় জোর তাহাদের সামান্য দুই চারি টাকা জরিমানা হইবে। এই ভাবে দণ্ডের ভয় না থাকায় এইরূপ শোচনীয় কালা-হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইয়া থাকে। ইহাতে দেশে কিরূপ অসন্তোষের উদ্ভব হয়, তাহা সহজেই অনুমেয়।

বস্তুতঃ চিন্তা করিয়া দেখিলে বলা যায়, এ দেশের বৃটিশ বিদ্বেষের মূলে এই ভাবের কালাধলা-ঘটিত মামলার বিচার-প্রহসনের অস্তিত্ব যতটুকু, এত আর কিছু নহে। যদি সকল বিচারপতি লেফটানেন্ট কর্ণেল নোলিসের মত কর্ত্তব্যপরায়ণ ও নিরপেক্ষ হয়েন, তাহা হইলে দেশের বারো আনা অসন্তোষের জড় নষ্ট হয়। আমাদের লিখিবার পর এই রায়ের বিরুদ্ধে আপীল হইয়াছে। আপীলে সুবিচার হইলে আমরা সুখী হইব।

স্বরাজ্যদলের নিষ্ক্রমণ

গত ৮ই মার্চ্চ সোমবার দিল্লীতে ব্যবস্থা-পরিষদের সভা বসিয়াছিল। সভার পরিণামফল কি হয়, দেখিবার জন্য স্ত্রীদর্শকদিগের গ্যালারীতে ভারতীয় ও য়ুরোপীয় মহিলা-বৃন্দের সমাবেশও বিস্ময়কররূপে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। কানপুরে বিগত কংগ্রেসের অধিবেশনে স্থিরীকৃত হইয়াছিল যে, যদি সরকার জনমতের অনুকূলে সংস্কার-আইনের পুনর্গঠন না করেন, তাহা হইলে কংগ্রেসের অনুজ্ঞা লইয়া যাহারা পরিষদের সভ্য হইয়াছেন, তাঁহারা পরিষদ ত্যাগ করিয়া দেশের গঠনকার্য্যে আত্মনিয়োগ করিবেন-- দেশবাসীকে জনগত আইন অমান্য করিবার জন্য গড়িয়া তুলিবেন। অধিবেশনের ফলে স্বরাজ্যদল সভাক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহাদের এই নিষ্ক্রমণ ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবার যোগ্য। গভীর নিস্তব্ধতার মধ্যে স্বরাজ্যদল যখন দৃঢ়চরণে সভাক্ষেত্র পরিত্যাগ করিলেন, তখন কাহারও মুখ হইতে একটি জয়ধ্বনি উত্থিত হয় নাই, কোনও দিক হইতে একটি করতালি-শব্দও শ্রুত হয় নাই। সরকারপক্ষের সভ্যবৃন্দও তখন নির্ব্বাক হইয়াছিলেন।

সভারম্ভের পর মিঃ জিন্না প্রস্তাব করেন যে, আলোচ্য বিষয়গুলির মধ্যে ১৬ হইতে ২৭ দফা পর্য্যন্ত মুলতুবী রাখা হউক। তৎপরিবর্ত্তে ২৮ দফার অর্থাৎ বড় লাটের কার্য্যকরী সভার ব্যয়-বরাদ্দ বিষয়ের আলোচনা করিতে হইবে। এ বিষয়ে তিনি পূর্ব্বেই অর্থাৎ ৪ঠা মার্চ্চ তারিখে রাজস্ব-সচিবকে জানাইয়াছিলেন যে, সর্ব্বপ্রথমেই তিনি এই বিষয়ের আলোচনা করিবেন এবং সে জন্য স্বরাজ্যদলের তরফ হইতেও এ বিষয়ে আলোচনা করিতে তাঁহাকে ক্ষমতা প্রদান করা হইয়াছে। মিঃ জিন্নার প্রস্তাবের বিরুদ্ধে স্বরাষ্ট্র-সচিব বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন যে, এই প্রস্তাব চলিতে পারে না; কারণ, মিঃ জিন্নার প্রস্তাব অসঙ্গত। পূর্ব্বাবধি যে যে দফার আলোচনা যেরূপ পর্য্যায়ে হইবার কথা আছে, তাহা না হইলে কার্য্যের শৃঙ্খলা থাকিবে না। রেভারেণ্ড ম্যাক্‌ফেল্ বক্তৃতা করিতে উঠিয়া বলেন যে, কোনও দল সংখ্যায় প্রবল হইলেই যে সেই দলের নির্দ্দেশানুসারে কার্য্য নির্ব্বাহের প্রথা পরিত্যক্ত হইবে, ইহা আদৌ বাঞ্ছনীয় নহে।

প্রেসিডেণ্ট মিঃ ভি, জে, পেটেল মিঃ জিন্নার প্রস্তাবকে নিয়মানুগ নহে বলিয়া আদেশ জারী করেন। তখন সকলেই ভাবিয়াছিলেন, মিঃ পেটেল সরকারপক্ষকে সমর্থন করিতেছেন। তাহার পর সার বেসিল ব্লাকেট শুল্ক বিভাগের ব্যয় বরাদ্দ সম্বন্ধে প্রস্তাব উত্থাপিত করিলে মিঃ জিন্না উহার আলোচনা ও ব্যয় মঞ্জুর স্থগিত রাখিবার জন্য প্রস্তাব করেন। স্বরাজ্য দলপতি পণ্ডিত মতিলাল নেহরু বলেন যে, কোন্ দফার ব্যয় মঞ্জুর করা হইবে কি না হইবে, সে বিষয়ের আলোচনায় তাঁহার দল সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থাকিবেন। তাহার পর তিনি তাঁহার দলের উদ্দেশ্য বিবৃত করিয়া বলেন —গত ২ বৎসর ধরিয়া নিয়মানুবর্ত্তী পথে জনমতের সহিত সরকারের সংঘর্ষের ইতিহাস আলোচনা করিয়া তাহারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, তাঁহাদের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে, এখন স্বরাজ্যদলকে ব্যবস্থাপরিষদের সংস্রব ত্যাগ করিয়া যাইতেই হইবে। এই মর্ম্মে বক্তৃতা করিবার পর পণ্ডিত মতিলাল নেহরু সদলবলে সভাক্ষেত্র হইতে নিষ্ক্রান্ত হয়েন। সরকারপক্ষ হইতে বিদ্রূপাত্মক প্রশংসাধ্বনি করিবার চেষ্টা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছিল। স্বরাজ্যদলের ধীরগম্ভীরভাবে নিষ্ক্রমণে দর্শকদল পর্য্যন্ত স্তম্ভিত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

অতঃপর প্রেসিডেণ্ট মিঃ ভি, জে, পেটেল বলেন যে, স্বরাজ্যদল যখন সভাক্ষেত্র ত্যাগ করিয়াছেন, তখন সভায় আর কোনও বিষয়ের আলোচনা এখন চলিতে পারে না। পরদিবস পর্য্যন্ত সভা মুলতুবী রহিল। স্বরাজ্যদল সংখ্যায় অধিক এবং জনমতের প্রতিনিধি; সুতরাং তাঁহাদের অবিদ্যমানে কোনও প্রসঙ্গের আলোচনা সঙ্গত হইবে না এবং সংস্কার আইনমূলক ব্যবস্থা-পরিষদের প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে না। তিনি সরকারপক্ষকে এ কথাও স্মরণ

করাইয়া দেন যে, সরকারপক্ষ সভাক্ষেত্রে এমন কোনও দফার আলোচনা যেন না করেন, যে বিষয়ে বাদানুবাদের সম্ভাবনা আছে। কারণ, সংস্কার আইনে যে সকল ব্যবস্থা আছে, তাহার ব্যভিচার ঘটিতে দিতে তিনি অবকাশ প্রদান করিবেন না। যদি সরকারপক্ষ তৎসত্ত্বেও সেইরূপ প্রসঙ্গ উত্থাপিত করেন, তাহা হইলে ব্যবস্থা-পরিষদের প্রেসিডেণ্ট হিসাবে তাঁহার উপর যে অতিরিক্ত ক্ষমতা আছে, তাহার বলে তিনি সেই প্রস্তাবের আলোচনা অনির্দ্দিষ্ট কাল পর্য্যন্ত স্থগিত রাখিতে বাধ্য হইবেন।

মিঃ পেটেলের এইরূপ দৃঢ়তা দর্শনে সকলেই স্তম্ভিত হইয়াছিলেন। তাঁহার বক্তৃতা সভাক্ষেত্রে যেন বজ্রপাত করিয়াছিল। কেহ স্বপ্নেও ভাবেন নাই যে, মিঃ পেটেল সভাপতির কার্য্য যে ভাবে সম্পাদিত করিয়া আসিয়াছেন, তাহাতে সরকারপক্ষকে এখন এমন ভাবে বিপন্ন হইতে হইবে। এখন আর জনমতের সহিত ক্ষমতাদৃপ্ত সরকারের দ্বন্দ্ব নহে। নিয়মানুবর্ত্তী পথে প্রেসিডেণ্টের সহিত সরকারপক্ষের সংঘর্ষ। ইহার পরিণামফল দেখিবার জন্য দেশবাসী উন্মুখ হইয়া রহিয়াছে।

যাহা হইবার, তাহা ত হইয়া গেল। এখন স্বরাজ্যদল কি করিবেন? যুগপ্রবর্ত্তক, ভবিষ্যদ্দর্শী মহাত্মা গন্ধী মানস নেত্রে বহুদিন পূর্ব্বে সংস্কৃত ব্যবস্থাপক সভার এই পরিণাম দেখিয়া আসিয়াছিলেন। এ যাবৎ তিনি নানা যুক্তিতর্ক সত্ত্বেও ব্যবস্থাপক সভার কার্য্যকারিতায় আস্থা স্থাপন করিতে পারেন নাই। তথাপি দেশের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল রাজনীতিক দলকে তাঁহাদের মতানুযায়ী কার্য্য করিবার অবকাশ দিয়াছিলেন। এখন স্বরাজ্যদলপতি পণ্ডিত মতিলাল নেহরু স্বয়ং স্বীকার করিতেছেন যে, বিগত ৪ বৎসরের কাউন্সেল সংগ্রাম বিফল হইয়াছে। ইহাতে যে শক্তির অপব্যয় হইয়াছে, তাহাতে দেশ ও জাতিগঠনকার্য্য কতদূর অগ্রসর হইতে পারিত, তাহা কি তিনি একবার ভাবিয়া দেখিবেন? মহাত্মা পুনঃ পুনঃ বলিয়া আসিতেছেন, দেশের জনসাধারণকে জানাইতে না পারিলে কেবল কাউন্সিলের দ্বন্দ্বে প্রবল শক্তিসম্পন্ন ব্যুরোক্রেশীকে জনমতের অনুকূল করিতে পারা যাইবে না। পণ্ডিত মতিলাল ও তাঁহার মতাবলম্বীরা ঠেকিয়া শিখিয়া মহাত্মার উপদেশ এখন কি শিরোধার্য্য করিবেন? গ্রাম ও জাতিগঠন কার্য্যে তাঁহাদের সমগ্র শক্তিকে নিয়োজিত করিবেন? জনমতকে তাহাদের প্রকৃত অবস্থাজ্ঞানে উদ্বুদ্ধ করিবেন?—না, আবার কাউন্সিলের মোহে আকৃষ্ট হইয়া বৃথা শক্তির অপচয় করিয়া মুক্তির পথকে সুদূরবর্ত্তী করিবেন?

মহিলা 'জষ্টিশ্ অব্ দি পিস্'

ডাক্তার শ্রীমতী মালিনী সুকঠঙ্কর

ডাক্তার শ্রীমতী মালিনী সুকঠঙ্কর বোম্বাইয়ের জনৈক ব্যবহারাজীব শ্রীযুত বালচন্দ্র সুকঠঙ্করের বিদুষী পত্নী। এই হিন্দু মহিলা গৌড় সারস্বত ব্রাহ্মণ-সমাজভুক্ত। শ্রীমতী মালিনী সুকঠঙ্কর বহুদিন হইতে সমাজ-সংস্কারে আত্মনিয়োগ করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার এই সাধু প্রচেষ্টার ফলে তিনি সম্প্রতি 'জষ্টিশ্ অব্ দি পিস্' পদে বরিত হইয়াছেন। গৌড়-সারস্বত ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের মধ্যে ইনিই সর্ব্বপ্রথম মহিলা 'জষ্টিশ্ অব দি পিস্' হইলেন।

রবারের গোলাপগুচ্ছ

নবোদ্ভাবিত কোন কৌশলে অধুনা রবারের পুষ্পগুচ্ছ ও পত্র নির্ম্মিত হইতেছে। এই সকল নকল পত্র ও পুষ্পে স্বভাবজাত পত্র ও পুষ্পের স্বাভাবিক বর্ণ-বিন্যাস এমনই বিচিত্রভাবে অনুকৃত হইতেছে যে, তাহার কৃত্রিমতা বুঝিতে পারা কঠিন। রবারকে 'জেলি'র মত অবস্থায় আনয়ন করিয়া, অন্য কোনও দ্রব্যের সহিত মিশ্রিত করা হয়। তাহার পর মিশ্রিত পদার্থটাকে চাপিয়া চাপিয়া পাতলা কাগজের মত অবস্থায় পরিণত করা হয়। গোলাপের পাপড়ীর আকারে উহা কাটিয়া লইলে গোলাপ-ফুল নির্ম্মিত হইল। পত্র সম্বন্ধেও অনুরূপ ব্যবস্থা। একটা রবারের ডালে পত্র ও পুষ্প সন্নিবিষ্ট হইলে প্রস্ফুটিত পত্র-পুষ্প-সমন্বিত গোলাপগাছ বলিয়া তখন তাহাকে সকলেই বলিতে বাধ্য হইবে। এই উপায়ে যে কোনও প্রকারের পুষ্প নির্ম্মিত করা যায়। দীর্ঘকাল এই রবারের পত্র পুষ্প অবিকৃত অবস্থায় থাকে।

রবারের পত্র ও পুষ্প

ফাউন্টেন পেনের মধ্যে ডাকটিকিট

ফাউন্টেন পেনের প্রান্তদেশে ডাকটিকিট রাখিবার ব্যবস্থা উদ্ভাবিত হইয়াছে। পকেটের মধ্যে ডাকটিকিট রাখিলে অনেক সময় নষ্ট হইয়া যায়, জোড়া লাগে। এ জন্য জনৈক শিল্পী ফাউন্টেন পেনের প্রান্তদেশে একরূপ আধার প্রস্তুত করিয়াছেন। পাক দিলেই আধারমুক্ত ডাকটিকিট এক এক করিয়া বাহির হইয়া আসিবে, অথবা উল্টা পাক দিলে টিকিটগুলি ভিতরে যাইবে। একবার আধারমধ্যে প্রবিষ্ট হইলে পাক দিয়া না ঘুরাইলে কখনই পড়িয়া যাইবে না। ব্যবস্থাটি অতি চমৎকার।

ফাউন্টেন পেন হইতে পাক দিয়া ডাকটিকিট বাহির করা হইতেছে

মোটরগাড়ীতে ঔষধের দোকান

স্বাভাবিক অবস্থায় মোটরগাড়ী

আমেরিকার কোনও ঔষধবিক্রেতা মোটরগাড়ী করিয়া ঔষধবিক্রয়ের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই মোটরগাড়ী এমনই বিচিত্র কৌশলে নির্ম্মিত যে, ইচ্ছানুসারে ইহাকে বৃহদায়তন করিতে পারা যায়। মোটর সাহায্যে অথবা হস্ত দ্বারা ঘুরাইলে গাড়ীর দেহাভ্যন্তর হইতে উভয় পার্শ্বের আয়তন বাহির হইয়া পড়ে; উপরের অংশও ঊর্দ্ধে উত্থিত হয়। তখন আয়তন ৫×৭×৯ ফুট দাঁড়ায়। গাড়ীর মধ্যে ৭ হাজার বিভিন্ন প্রকারের দ্রব্য রাখিবার ব্যবস্থা আছে। গাড়ীর দ্বার পশ্চাদ্ভাগে, উহা রুদ্ধ থাকে। কারণ, দর্শকগণ পাছে গাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া ভীড় জমাইয়া তুলে। রাত্রিকালে বৈদ্যুতিক আলোকে মোটরগাড়ীর অভ্যন্তরভাগ আলোকিত করিবার ব্যবস্থা আছে। দিবাভাগে কব্জাযুক্ত বাতায়ন তুলিয়া দিলে আলোক প্রবেশ করে। গাড়ীর মধ্যে দুইখানি চেয়ার ও একটি ডেস্ক আছে।
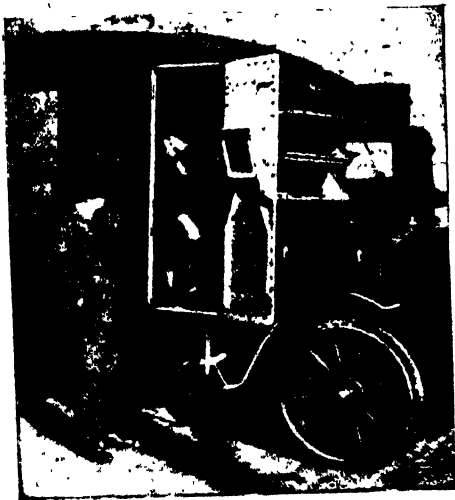
আয়তন বাড়াইবার পরবর্ত্তী অবস্থা

সুরক্ষিত ডাকগাড়ী

আমেরিকার ডাকবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ দস্যুর আক্রমণ হইতে চালক ও দ্রব্যাদি সুরক্ষিত রাখিবার জন্য এক প্রকার মোটরগাড়ী নির্ম্মাণ করাইয়াছেন। চালক যে কামরায় বসিয়া গাড়ী চালাইয়া থাকে, তাহার দুই পার্শ্বে সুদৃঢ় ও দুর্ভেদ্য দ্বার আছে। সম্মুখে বাতাসপ্রতিরোধকারী যে কাচ-নির্ম্মিত আবরণ আছে, বন্দুকের গুলী তাহা ভেদ করিতে অসমর্থ। পশ্চাদ্ভাগেও এমন আবরণ আছে যে, দস্যুগণ সহস্র চেষ্টা সত্ত্বেও তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিতে পারিবে না। উভয় পার্শ্বস্থ দ্বারে ক্ষুদ্র ছিদ্র আছে, প্রয়োজন হইলে, তাহার মধ্য দিয়া চালক হাত বাহির করিয়া পশ্চাতের গাড়ীকে থামাইবার জন্য ইঙ্গিত করিতে পারিবে। কর্ত্তৃপক্ষ এই প্রকার নবনির্ম্মিত সুদৃঢ় গাড়ীগুলি বড় বড় নগরে ব্যবহার করিবেন বলিয়া সঙ্কল্প করিয়াছেন।
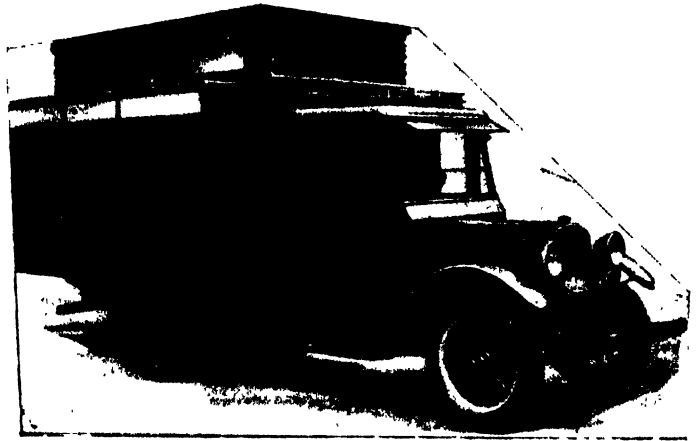
বর্ম্মাবৃত মোটরগাড়ী

অভিনব ছিপি
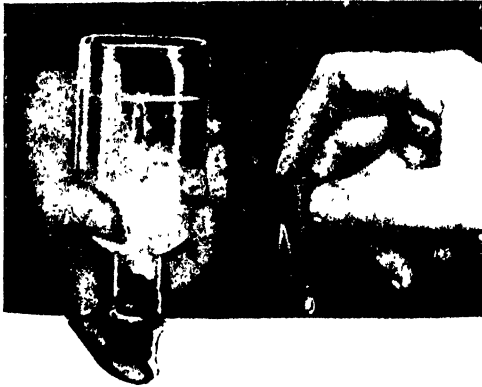
রবারের ছিপি ও 'ড্রপার'

বিন্দু বিন্দু করিয়া ঔষধ ঢালিবার প্রয়োজন হইলে কাচের 'ড্রপার' ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কিন্তু উহা সহসা ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে বলিয়া, আমেরিকায় শুধু রবারের 'ড্রপার' নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহা বোতলে ছিপির মতও ব্যবহৃত হয়। এই রবারের 'ড্রপার' দীর্ঘকাল স্থায়ী। চক্ষুর উপর ঔষধ নিক্ষেপের প্রয়োজন হইলে এই রবারের ড্রপারের দ্বারা সে কার্য্য নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়; অধিকন্তু কাচের ড্রপারের দ্বারা চক্ষুতে আঘাত লাগিবার সম্ভাবনা থাকে; ইহাতে সেরূপ কোনও আশঙ্কা নাই। একবার গরম জলে ডুবাইয়া লইলে রবারের ড্রপারের দোষও থাকিবে না।

পর্য্যটকের বিশ্রামাগার

ভাঙ্কুভার নামক স্থানে পর্য্যটকদিগের বিশ্রামার্থ একটি খিলান করা ঘর নির্ম্মিত হইয়াছে। এই খিলানের ঘরটি একটি বৃক্ষের তক্তা, কড়ি, ডাল প্রভৃতির সাহায্যে নির্ম্মিত, অন্য কোনও পদার্থ ইহাতে সন্নিবিষ্ট হয় নাই। গাছের গুঁড়ি হইতে যে স্তম্ভ বা থামগুলি নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহাদের উপরের ত্বক পর্য্যন্ত পরিত্যক্ত

বৃক্ষ-নির্ম্মিত বিশ্রামাগার

হয় নাই। ইহাতে স্বাভাবিক শোভা আরও বাড়িয়াছে। সমগ্র কাঠামোটি গ্রীসীয় মন্দিরের অনুকরণে নির্ম্মিত। একটি বৃক্ষের উপকরণে এই বিশ্রামাগার নির্ম্মিত হওয়ায় বুঝা যাইতেছে, বৃক্ষটি কিরূপ বৃহদায়তন।

সাবান-নির্ম্মিত মূর্ত্তি

আমেরিকার কোনও শিল্পমেলায়, ভাস্কর-শিল্পের প্রতিযোগিতাকালে, কোন শিল্পী সাবানের সাহায্যে হাস্যোদ্দীপক মূর্ত্তি গঠন করিয়া প্রদর্শনী-ক্ষেত্রে রাখিয়াছিলেন। এই মূর্ত্তির প্রতিপাদ্য বিষয়—জোরে বাতাস বহিতেছে, জনবহুল রাজপথে দুই জন নারী বহু দিন পরে অকস্মাৎ পরস্পরের সাক্ষাৎ পাইয়াছে, উভয়ে সুযোগমত একটু আলাপ করিতে ব্যস্ত। এই মূর্ত্তিটি এমন নিখুঁতভাবে গঠিত হইয়াছে যে, প্রস্তর-ক্ষোদিত মূর্ত্তিতে তাহা সম্ভবপর হইত না। সাবানের এই মূর্ত্তিটি বিশেষজ্ঞগণ পুরস্কারপ্রাপ্তির যোগ্য বিবেচনা করিয়াছেন।

সাবানের মূর্ত্তি

গুলী-নিবারক বর্ম্ম

আমেরিকার চিকাগো সহরের পুলিসবিভাগ হইতে গুলী-নিবারক এক প্রকার বর্ম্ম নির্ম্মিত হইয়াছে। এই বর্ম্ম

গুলীনিবারক বর্ম্ম

মোটর যানের দ্বার আপনা হইতে মুক্ত হইয়াছে

পদযুগল ব্যতীত সর্ব্বাঙ্গ সুরক্ষিত রাখে। পুলিসকর্ম্মচারীরা উহা বন্ধনীর দ্বারা স্কন্ধদেশে ঝুলাইয়া রাখে। বর্ম্মে একটি ছিদ্র আছে ; সেই ছিদ্রে গুলী-নিবারক কাচ সংলগ্ন। উল্লিখিত কাচের মধ্য দিয়া সমস্তই দেখিতে পাওয়া যায়— লক্ষ্য নির্ণয়েরও সুবিধা হয়। এই বর্ম্মটির ওজন প্রায় ১৫ সের হইতে পারে। অতি সহজে বর্ম্মটিকে সুবিধামত অবস্থায় পরিধান করা যায়। দস্যুদলকে বাধা দিবার সময় বর্ম্মগুলি দুর্গের মত দুর্ভেদ্য। পুলিসকর্ম্মচারীরা এই বর্ম্মের অন্তরালে থাকিয়া, আততায়ীর গুলীবর্ষণ হইতে অনায়াসে আত্মরক্ষা করিতে পারে।

বিচিত্র মোটরযান

চিকাগো সহরে যে সকল মোটরগাড়ী যাত্রী বহন করে, তাহাদের অনেকগুলিতে সম্প্রতি একরূপ দ্বার সংযোজিত হইয়াছে। এই দ্বার আপনা হইতে খুলিয়া যায় এবং আপনা হইতেই বন্ধ হয়। যতক্ষণ গাড়ীর গতি থাকিবে, দ্বার কোনও মতেই উন্মুক্ত হইবে না। যখন গাড়ী সম্পূর্ণরূপে থামিয়া যাইবে— দ্বার অমনই উন্মুক্ত হইবে। যাত্রিগণ যে পর্য্যন্ত গাড়ীর সোপানে দাঁড়াইয়া থাকিবে, ততক্ষণ দ্বার উন্মুক্ত থাকিবে, বন্ধ হইবে না। আরোহীদিগের শরীরের ভারে গাড়ীর অভ্যন্তরে পদতলস্থ পাটাতন দ্বারের কপাট মুক্ত করে, কিন্তু যতক্ষণ গাড়ী না থামিবে, ততক্ষণ দ্বার খুলিবে না। আরোহী নামিয়া গেলেই পাটাতনের উপরস্থিত ভার অন্তর্হিত হয় এবং দ্বার আপনা হইতেই আবার বন্ধ হইয়া যায়, সে জন্য কণ্ডক্টরকে ব্যস্ত হইতে হয় না। এই শ্রেণীর শতাধিক মোটর যান চিকাগো সহরে চলিতেছে। বায়ুর চাপের প্রভাবেই এইরূপ প্রণালীতে দ্বার রুদ্ধ ও উন্মুক্ত হইয়া থাকে।

রত্নখচিত কর্ণাভরণ

পাশ্চাত্যদেশের নারীগণের রুচিপরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। মার্কিণ মহিলারা কর্ণভূষার প্রতি অধিকতর মনোযোগ দিতেছেন। বিলাসিনীসমাজ স্থির করিয়াছেন, অতঃপর অন্যান্য অঙ্গের ন্যায় কর্ণকেও লোক-লোচনের বিষয়ীভূত করিবার প্রয়োজনীয়তা আছে। সুতরাং কর্ণে রত্নখচিত

অলঙ্কার-ধারণের 'ফ্যাসান' মার্কিণ মহিলারা আবার নবোদ্যমে প্রবর্ত্তিত করিতেছেন। অগ্রে কর্ণের নিম্নভাগে দুল অথবা অনুরূপ ক্ষুদ্র অলঙ্কার ধারণ করার প্রথা ছিল, কিন্তু তাহাতে সুন্দরীর সুঠাম সমগ্র কর্ণটি লোক-লোচনকে আকৃষ্ট করিত না। অধুনা-প্রবর্ত্তিত রত্নখচিত কর্ণাভরণ সমগ্র কর্ণটিকে উদ্ভাসিত করিবে। এই কর্ণভূষার মধ্যস্থলে একটি দীপ্তিমান রত্ন সংশ্লিষ্ট থাকিবে। এই অলঙ্কার ধারণ করিবার জন্য কর্ণে ছিদ্র করিবার প্রয়োজন নাই—শুধু কৌশলে কর্ণে সংলগ্ন করিয়া দিলেই চলিবে। অলঙ্কারটিও লঘুভার; সুতরাং সুন্দরীর কর্ণ তাহার ভারে পীড়িত

রত্নখচিত কর্ণাভরণ বা 'কান'

হইবে না। বাঙ্গালা দেশে এক সময়ে 'কান' নামক অলঙ্কারের প্রচুর প্রচলন ছিল; বঙ্গসুন্দরীরা উহা সমাদরে ব্যবহার করিতেন। প্রতীচ্যের অনুকরণে অধুনা তাহা বিলুপ্ত হইয়াছে। কিন্তু মার্কিণ বিলাসিনীদিগের অনুকরণে নবীনযুগের তরুণীরা হয় ত আবার 'কানের' মহিমায় মুগ্ধ হইবেন। তবে তখন যেখানে শুধু হেমের সমাদর ছিল, এখন সেই স্থলে দ্যুতিমান রত্নাবলীর সমাবেশ ঘটিবে।

ভারতীয় সঙ্গীতে য়ুরোপীয় মহিলা

মিস্ মড্ ম্যাকার্থি ইংলণ্ডের এক জন খ্যাতনামা গায়িকা। ইনি বেহালা বাদ্যযন্ত্রে অসাধারণ পারদর্শিনী। এই নারী

ভারতীয় সঙ্গীতে য়ুরোপীয় মহিলা

ভারতীয় সঙ্গীত-কলার বিশেষ অনুরাগিণী এবং এ বিষয়ে তাঁহার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার মত কোনও পুরুষ বা মহিলা য়ুরোপে নাই। ভারতীয় রাগ-রাগিণীর আলাপকালে মিস্ মড্ ম্যাকার্থি ভাবভঙ্গী সহকারে অত্যন্ত নিপুণতার সহিত সঙ্গীতের অভিব্যক্তি করিয়া থাকেন। মিঃ জন্ ফাউণ্ডস্এর সহিত তাঁহার পরিণয় হইয়াছে।

বালুকা-নির্ম্মিত মূর্ত্তি

জনৈক পদবিহীন ভাস্কর (যুদ্ধে এই ব্যক্তি পদযুগল হারাইয়াছেন) সমুদ্রতীরে বালুকার সাহায্যে নানাবিধ মূর্ত্তি গড়িয়াছেন। যুদ্ধসংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ের দৃশ্য তিনি বালুকার সাহায্যে এমন চমৎকারভাবে নির্ম্মাণ করিয়াছেন যে, দেখিবামাত্রই প্রত্যেকটি যেন সজীব বলিয়া অনুমিত হইবে। কয়েকটি সাধারণ যন্ত্র-সাহায্যে ভাস্কর মূর্ত্তিগুলি গড়িয়াছেন। সূর্য্যের রশ্মি, বাতাসের প্রভাব প্রভৃতি প্রাকৃতিক কারণেও মূর্ত্তিগুলি দীর্ঘকাল অক্ষত দেহে

বালুকা-নির্ম্মিত মূর্ত্তি

বিরাজিত। কোন কোন উপাদানের সাহায্যে বালুকাকেও তিনি সুদৃঢ় করিয়া লইয়াছিলেন।

বিরাট আলোক-স্তম্ভ

ফ্রান্সে একটি বিরাট আলোক-স্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বিমানপোতদিগকে নির্দ্দিষ্ট পথে চালিত
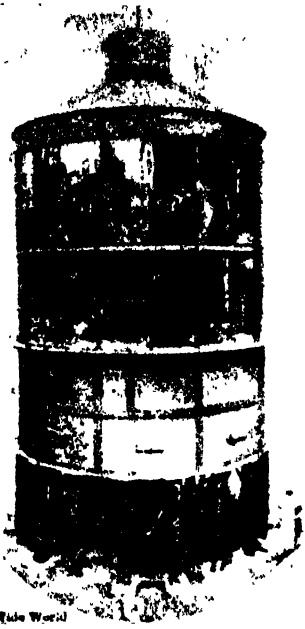
বিরাট আলোক-স্তম্ভ

করিবার জন্য এই আলোকস্তম্ভ নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহার আলোকরশ্মি ৩শত মাইল দূরবর্ত্তী স্থান হইতে দৃষ্টিগোচর হইবে। দক্ষিণ-ইংলণ্ড এবং ইটালীর উত্তর হইতে এই আলোকরশ্মি দেখিতে পাওয়া যাইবে।

বৈদ্যুতিক শক্তিপ্রভাবে রক্ত-সঞ্চারণ

কোনও সুস্থ দেহ হইতে রোগীর দেহে রক্ত সঞ্চারিত করিয়া তাহাকে বাঁচাইয়া তুলা যায়। চিকিৎসা-জগতের এই আবিষ্কার বহু রোগীর প্রাণদান করিতে সমর্থ হইয়াছে। বৈজ্ঞানিকগণ এই রক্ত-সঞ্চারণ প্রক্রিয়া ইদানীং বৈদ্যুতিক যন্ত্রের সাহায্যে অভ্রান্তভাবে নিষ্পন্ন করিতেছেন। ডাক্তার এ, এল্ সোরেসী (Soresi) [এই নূতন যন্ত্রের উদ্ভাবন করিয়াছেন। মোটর-তাড়িত পিচকারী সুস্থ দেহ হইতে

বৈদ্যুতিক শক্তিপ্রভাবে দেহান্তরে রক্ত সঞ্চারিত হইতেছে

রোগীর দেহে রক্ত অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সঞ্চারিত করিয়া দেয়। ব্রুকলিন্ হাঁসপাতালে এই নবোদ্ভাবিত যন্ত্রের পরীক্ষাকার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে।

রত্নখচিত বুদ্ধ-মূর্ত্তি

ইংলণ্ডের সাউথকেন্‌সিংটনস্থিত ভিক্টোরিয়া ও আলবার্ট মিউজিয়ামে সম্প্রতি অনেকগুলি প্রাচীন শিল্প-নৈপুণ্য-পূর্ণ মূল্যবান্ দ্রব্য সংগৃহীত হইয়াছে। তন্মধ্যে গিয়াংসি হইতে প্রাপ্ত অবলোকিত বোধিসত্ত্ব-মূর্ত্তি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই মূর্ত্তিটি বহু মূল্যবান্ রত্নখচিত। ষোড়শ শতাব্দীতে জনৈক নেপালী শিল্পী সন্ন্যাসাশ্রমে প্রবেশ করিয়া এই অপূর্ব্ব মূর্ত্তি নিৰ্ম্মাণ করিয়াছিল।

রত্নখচিত বোধিসত্ত্ব মূর্ত্তি
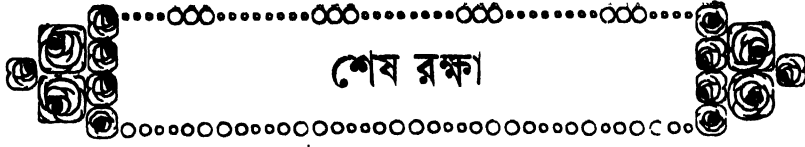
শেষ রক্ষা

এক অপরাহ্ণে চুঁচুড়া ষ্টেশনে এক পঞ্চবিংশতিবর্ষীয় যুবক একখানি কলিকাতাগামী প্যাসেঞ্জার ট্রেণ হইতে নামিল। নামিবার পূর্ব্বে একবার দেখিলেও নামিয়াই সে প্ল্যাটফরমের প্রান্তে চুঁচুড়া লেখাটা আর একবার দেখিয়া তবে নিশ্চিন্ত হইল। ভাবে বোধ হইল, যুবক এ ষ্টেশনে বড় বেশী বার আইসে নাই।

প্ল্যাটফরমে সব সময়ে কুলী পাওয়া যায় না। যুবক এক হাতে একটি বড় বেতের ব্যাগ, অপর হাতে একটি মাঝারী বোচকা তুলিয়া লইয়া গেটে টিকিট দিয়া বাহিরে আসিল।

আপ্ প্ল্যাটফরমে তাহার একটু আগে একখানি গাড়ী থামিয়াছিল এবং সেই গাড়ী হইতে দলে দলে আরোহী নামিয়া সম্মুখের রাজপথের উপর ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়াছিল।

'আসুন বাবু ঘোড়াবাজার', 'আসুন কাছারী' ইত্যাদি মৌখিক বিজ্ঞাপন দিয়া গাড়োয়ানরা গাড়ী আগাইয়া আনিল ও প্রত্যেক গাড়ীতে ৫।৬ জন করিয়া আরোহী লইয়া ঘোড়ার পিঠে চাবুক মারিয়া তাহাদের একটু ছুটাইতে চেষ্টা করিল। গাড়ী চালাইতে চালাইতে ইতস্ততঃ দেখিতে লাগিল, যদি গাড়ীর মাথায় বসিবার মত দুই এক জন আরোহী জুটিয়া যায়। এইরূপে এক এক করিয়া প্রায় সব গাড়ী ছাড়িয়া দিল। একখানি মাত্র গাড়ী অবশিষ্ট ছিল। যুবক গাড়ীখানার সম্মুখে আসিয়া সৌরভপুর যাইতে কত ভাড়া, গাড়োয়ানকে জিজ্ঞাসা করিল।

গাড়োয়ান যুবককে বেশ করিয়া নিরীক্ষণ করিয়া উত্তর করিল, "দেড় টাকা।"

যুবক বলিল, "দেড় টাকা কেন বাপু, বারো আনাই ত ছিল বরাবর।"

"সে সব দিনকাল চ'লে গেছে বাবু", বলিয়া গাড়োয়ান তাহার গাড়ী চালাইয়া দিল।

পিছন হইতে যুবক বলিল, "আচ্ছা চল, এক টাকা পাবে।"

গাড়োয়ান সে কথায় কান দিল না।

যুবক এক হাতে ব্যাগ ও অপর হাতে বোচকা লইয়া অগ্রসর হইল। খানিকটা অগ্রসর হইয়াই যুবক বা দিকের পথ ধরিল।

"এ বাবু, শুনে যান, বাবু, শুনে যান।"

পিছন ফিরিয়া যুবক দেখিল, গাড়োয়ান পুনরায় ডাকিতেছে। মোড়ের নিকট যুবক দাঁড়াইল। গাড়ী কাছে আসিল।

কোচবাক্স হইতে অপর একটি লোক নামিয়া পড়িয়া বলিল, "যান না বাবু, দুই টাকা ভাড়া ত মন্দ বলছে না!"

পশ্চিমাঞ্চলের লোক বাঙ্গালায় আসিয়া বাঙ্গালা শিখিয়াছে মনে করিয়া এইরূপ নির্ব্বিচারে বাঙ্গালা ব্যবহার করিয়া যাইতেছে!

বিস্মিত হইয়া যুবক বিশুদ্ধ হিন্দীতে গাড়োয়ানকে বলিল, "তুমি ত নিজ মুখে দেড় টাকা বলেছিলে, এ আবার নতুন কথা কেন বল্ছ?"

"দু' টাকাই ত বলেছিলুম বাবু" বলিয়া গাড়োয়ান নির্লজ্জভাবে হাসিতে লাগিল।

"তোমাদের ধরম ব'লে কোন পদার্থ আর নেই, একেবারে চ'লে গেছে। তোমার গাড়ী নেব না।"

অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া যুবক বাক্স ও বোচকা লইয়া পথ হাঁটিতে সুরু করিল।

মিনিট দশেক চলিবার পর যুবকের গতি মন্দ হইয়া আসিল, মনের উষ্ণতাও অনেকটা কমিল। বোঝা দুইটি হাত বদলাইয়া লইয়া যুবক ভাবিল, গাড়ীখানা ছাড়িয়া দেওয়া ভাল হয় নাই। সামান্য একটা ঝোঁকের বশে এতখানি কষ্ট ঘাড়ে না লইলেই ভাল হইত। অন্ততঃ অনেকটা আরামে যাওয়া যাইত।

যুবক একবার পিছনের দিকে চাহিল। ভাবিল, হইতেও পারে, গাড়োয়ান হয় ত তাড়াতাড়ি গাড়ী চালাইয়া আসিয়া দেড় টাকার যায়গায় পাঁচ সিকায় রাজী হইবে। তা সে যদি সত্যই আইসে, তাহা হইলে যুবকও উদারতা দেখাইতে কম করিবে না; দেড় টাকা ভাড়াই তাহাকে দিবে।

কিন্তু কোথায় গাড়ী? দুই দিকে বর্ষার জলস্রোত বহিয়া পরিখা লইয়া সুপ্রশস্ত রাস্তা সোজা চলিয়া গিয়াছে। কোথাও গাড়ীর চিহ্ন নাই।

বোঝা বহা অভ্যাস ছিল'না, কিংবা তাহার শরীর দুর্ব্বল ছিল, তাই যুবক বুঝিল, তাহার শরীর যে পরিমাণে ক্লান্ত হইয়া আসিতেছে, হাতের বোঝাও সেই পরিমাণে ভারী হইয়া উঠিতেছে।

এখন উপায়? আবার কি ষ্টেশনে ফিরিয়া যাইবে? না, ফিরিয়া যাওয়া আর হইতে পারে না। এক আশা, যদি পশ্চিমদিক হইতে কোন খালি গাড়ী আইসে ত তখনই তাহাতে চড়িয়া বসিবে। কিন্তু খালি গাড়ীর কোন লক্ষণই দেখা গেল না।

আরও খানিক চলিয়া যুবক ক্লান্ত হইয়া হাতের বোঝা পাশে রাখিয়া কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া লইল। যুবক বুঝিল, শুধু হাতে যদি সে আসিত, ইহার দ্বিগুণ পথ সে এতক্ষণ অনায়াসে চলিয়া যাইত; যদি গাড়ী পাইত, এতক্ষণে গন্তব্য স্থানে পৌছাইয়া যাইত।

গন্তব্য স্থানের কথা মনে হইতেই তাহার শরীরে যেন বলসঞ্চার হইল। দাঁড়াইয়া উঠিয়া বোঝা দুইটি তুলিয়া লইয়া সে আবার পথ চলা সুরু করিল।

অন্ততঃ একটা কুলী পাওয়া গেলেও চলিত। ১৭।১৮ বৎসরের একটি ছোকরাকে দেখিয়া যুবকের মনে হইল, অন্ততঃ একটি মোট বহিতে বলিলে এ রাজী হইতে পারে। ভাবে বোধ হইল, ছেলেটি কাহারও কৃষাণ হইবে। অনেক দিন দেশ ছাড়া বলিয়া চট করিয়া মোটের কথা বলিতে যুবকের সাহস হইল না। একটু ইতস্ততঃ করিয়া যুবক জিজ্ঞাসা করিল—"হ্যাঁ হে, এখানে এমন কোন লোক পাওয়া যায় না যে, এই দুটো নিয়ে আমার সঙ্গে যায়?"

'এখানে আর লোক কোথায় পাবেন?' বলিয়া ছেলেটি পার্শ্ববর্ত্তী জঙ্গলের দিকে অভিনিবেশ সহকারে চাহিতে লাগিল। হঠাৎ সে গান ধরিয়া দিল—

'সে যে রেখে গেছে চরণ-রেখা গো!'

সর্ব্বনাশ! কৃষক-পুত্রের মুখে এই গান! আর ইহাকেই সে মোট বহিতে বলিবার সংকল্প করিয়াছিল! তাহার অনুপস্থিতির মধ্যে বাঙ্গালা দেশটার কি পরিবর্ত্তনই হইয়া গিয়াছে!

ক্লান্তপদে চলিতে চলিতে যুবক কৃষক-পুত্রের অত্যন্ত সাধু ভাষায় রচিত গান শুনিতে লাগিল। ক্রমে আশে-পাশে বনের মধ্যে তাহার গানের সুর হারাইয়া গেল; আর শুনা গেল না।

আবার এক যায়গায় যুবক বোঝা নামাইয়া বিশ্রাম করিয়া ল ল। আবার উঠিল।

বামদিকে একটি ছোট বাড়ী। উঠানে ধানের গোলা। মাটীর ঘরের ছোট্ট জানালার ভিতর দিয়া দুই চারিটি কুতূহলী চক্ষু যুবকের এই ধীর ক্লান্ত গতি দেখিতে লাগিল। যুবক ভাবিল, এই ছোট বাড়ীটিই যদি তাহার গন্তব্য স্থান হইত, তাহা হইলে সে বাচিয়া যাইত।

বাড়ীর সম্মুখেই রাস্তার উপর একটি প্রৌঢ় লোক খালি গায়ে হুঁকা হাতে দাঁড়াইয়া ছিল। যুবককে লক্ষ্য করিয়া বলিল,—"আপনার দুটো হাত যোড়া, বড় অসুবিধা হচ্ছে ত!"

কষ্টের মধ্যেও যুবকের হাসি পাইল। কি গভীর সহানুভূতি! মুখ দিয়া এ কথাটি বাহির হইল না, "আহা, তোমার কষ্ট হইতেছে; চল, তোমার একটা বোঝা লইয়া তোমাকে একটু আগাইয়া দিই।" সবাই ফাঁকা আওয়াজ করিতে চাহে!

যুবক তখন একবার পথ চলে, একবার অপেক্ষা করে, আবার উঠে, এইরূপে পথ চলিতে লাগিল। ক্রমে পা অচল হইয়া আসিল। কাঁধে, ঘাড়ে ও হাতে বোঝা বদল করিয়া করিয়া সব কটা অঙ্গকেই আড়ষ্ট করিয়া ফেলিল। তখনও আধ মাইলের কিছু উপর পথ বাকী আছে।

ঝিঁঝিঁর ডাক যেন শুনা গেল। যুবকের মনে হইল, এ ঝিঁঝিঁর ডাক নহে। তাহার বোধ হয় শক্তি-লোপ হইতেছে, তাই কর্ণের মধ্যে ঐরূপ শব্দ হইতেছে। মাঠে কোন ছোট ফুল দেখিলেও হয় ত সে ভাবিত, চোখে সরিষার ফুল দেখিতেছে।

কষ্টে ও ক্ষোভে যুবকের চোখে জল আসিল। নিতান্ত অবসন্ন হইয়া সে সেই রাজপথে ধুলার উপর বসিয়া পড়িল।

এমন সময় কে বলিল—"আপনার কি বোঝা বইতে বড় কষ্ট হচ্ছে?"

২

"পথিক, তুমি পথ হারাইয়াছ," প্রশ্নে নবকুমার ইহার অধিক বিস্মিত ও তৃপ্ত হয় নাই। যুবক বিস্মিত হইয়া মুখ তুলিয়া দেখিল, এক যুবতী পথের উপর দাঁড়াইয়া তাহার দিকে সহানুভূতি-স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে। যুবতী সুন্দরী, দীর্ঘাকৃতি। মেঘাবৃত জ্যোৎস্নার মত মলিন বসন ও রুক্ষ কেশভার তাহার সৌন্দর্য্যকে একটু ম্লান করিয়াছিল; কিন্তু ইহাতে তাহার মনোহারিত্ব একটুও কমে নাই।

সেই প্রশস্ত রাজপথের সহিত দক্ষিণদিক হইতে একটি সংকীর্ণ পল্লীপথ আসিয়া মিশিয়াছিল। তরুণী হাতে কয়েকটি সূতার বাণ্ডিল ও গুটিচারেক ছোট জামা লইয়া সেই সংকীর্ণ পথ দিয়া এই বড় রাস্তায় পড়িবার সময়ে যুবককে এইরূপ বিপন্ন দেখিয়াছিল।

তরুণীর বয়স সতের কি আঠার বৎসর হইবে। ঐ বয়সের নারীর পক্ষে অপরিচিত এক যুবকের সহিত পথিমধ্যে কথা কহা উচিত কি না, তরুণী সম্ভবতঃ সামান্য ক্ষণের জন্য তাহা চিন্তা করিয়াছিল। শেষে নিতান্ত অসহায়ের মত যুবককে ধূলার উপর বসিয়া পড়িতে দেখিয়া তাহার বোধ হয় মায়া হইয়াছিল, তাই লজ্জা ত্যাগ করিয়া কথাটা জিজ্ঞাসা করিয়া ফেলিয়াছিল।

যুবক তরুণীর প্রশ্নে মুখ ফিরাইয়া দেখিতে পাইয়াছিল যে, তাহার মুখে ও চোখে কৌতূহল ছাড়া করুণা ও সাহায্য করিবার একটা ইচ্ছা ফুটিয়া আছে। যুবক বলিয়া ফেলিল, "হ্যাঁ, কষ্ট হচ্ছে।"

"আপনি কোথায় যাবেন?"

"সৌরভপুর। আর কত দূর আছে?"

"আর বেশী নেই; এসে পড়েছেন ব'লে। আচ্ছা, আপনি মোট দু'টি রাখুন দিকি মাটীতে; আমি খানিকটা বয়ে দিচ্ছি।"

তরুণীর দিকে কৃতজ্ঞ দৃষ্টিপাত করিয়া যুবক কেবল বোচকাটা মাটীতে রাখিয়া ব্যাগটা লইয়া উঠিল। বলিল, "একটা আমি বেশ পারব'খন্।"

যুবতী আর কিছু না বলিয়া বোচকাটা মাথার উপর ঘড়ার মত করিয়া বসাইয়া সংক্ষেপে বলিল, "আসুন।"

তরুণী তাহার লঘু ক্ষিপ্রগতিতে সংকীর্ণ পথ ধরিয়া আগে আগে চলিল।

যুবক বলিল, "সৌরভপুর যেতে এই বড পথ দিয়ে যেতে হয়, না?"

"এ পথেও যাওয়া যায়।"

তরুণী মুখ না ফিরাইয়াই চলিতে আরম্ভ করিল।

যে সাহায্য ইংর ভদ্র কোন পুরুষের নিকট পায় নাই, তাহা যে এক অপরিচিতা পল্লী যুবতীর কাছে পাওয়া যাইতে পারে, তাহা যুবক ভাবে নাই। চলিতে চলিতে একবার মাথা তুলিয়া যুবক দেখিল, যুবতী একই ভাবে চলিতেছে। একবার ফিরিয়াও দেখিতেছে না যে, সে কত দূর আছে।

ইহা যুবককে ঈষৎ আঘাত করিল, কিন্তু বলিবারও ত কিছুই নাই! অপরিচিত যুবকের সহিত অনাবশ্যক আলাপ করিবার আগ্রহ এই তরুণীর মধ্যে সে আশাই বা করিবে কেন?

মিনিট দশেক নীরবে যুবতীর অনুসরণ করিয়া যুবক জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার ত আবার ফিরে যেতে অসুবিধা হবে।"

যুবতী মুখ না ফিরাইয়াই বলিল, "না।"

অতি সংক্ষেপে এই উত্তর দিয়া যুবতী পূর্ব্ববৎ চলিতে লাগিল।

একটি মন্দিরের সম্মুখে আসিয়া যুবতী স্থির হইয়া দাঁড়াইল। যুবক নিকটস্থ হইতেই মন্দিরের বামদিকের পথ দেখাইয়া দিয়া বলিল, "আপনি এই পথে যাবেন।" সে বোচকাটি ভূতলে নামাইয়া যুবকের দিকে একটু আগাইয়া দিল।

এই যে বিশেষ ব্যবধান রাখিয়া চলা, ইহার বিরুদ্ধে তাহার কিছুই বলিবার ছিল না। ইহাই সঙ্গত, হয় ত বা স্বাভাবিকও, তথাপি যুবক উহাতে একটু দুঃখ অনুভব না করিয়া পারিল না।

যুবক বোচকাটা লইয়া মুখ তুলিয়া দেখিল, তরুণী পূর্ব্ব-পথ ধরিয়া অনেকখানি অগ্রসর হইয়া গিয়াছে।

একটা কৃতজ্ঞতার কথাও বলা হইল না। 'আপনি না থাক্‌লে' গোছের একটা অসম্পূর্ণ কথা মুখের কাছাকাছি আসিতেই যুবতীর দূরত্ব ও নিস্পৃহতার জন্য এতই বিসদৃশ

মনে হইল যে, কথা কয়টা তাহার কম্পিত ওষ্ঠাধরের এ পারে আসিবার ভরসা পাইল না।

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া যুবক মন্দিরের বামদিকের পথ ধরিল।

৩

আই-এস্-সি পাশ করার পর এক বৎসর মাইনিং পড়িয়া চারুর বিবাহ হয়। বিবাহের রাত্রিতে চারুর মনটা এতই দমিয়া গিয়াছিল যে, সে যে আর কখন পাশ করিবে বা জীবনে সুখী হইবে, সে আশা তাহার মন হইতে দূর হইয়াছিল।

বিবাহের রাত্রিতে সে এক মহাবিভ্রাট। চারুর শ্বশুর স্কুলমাষ্টার, তথাপি তিনি কন্যা কমলার বিবাহে সর্ব্বসমেত ১৫ শত টাকা দিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে নগদ দিবার কথা ছিল ৭ শত টাকা। বিবাহের সময় দেখা গেল, তিনি নগদ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন ৫ শত টাকা, বাকী দুই শত টাকার তখনও অভাব। বাকী টাকা কোথায় বলিতেই চারুর শ্বশুর হাত যোড় করিয়া বলিলেন যে, তিনি এত চেষ্টা করিয়াও বাকী টাকা সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। বাড়ী বন্ধক দিয়া পনের শত টাকা পাইবারই কথা ছিল, কিন্তু কার্য্যকালে তাহারা বারো শত টাকার বেশী দিল না; বলিল,—'এ বাড়ী বন্ধক দিয়া ইহার বেশী টাকা দেওয়া চলে না।' তখন অন্য স্থানে সংগ্রহ করিবার সময় ছিল না, কাযেই ঐ টাকাতেই স্বীকৃত হইতে হইল। তিনি আপাততঃ হ্যাণ্ডনোট লিখিয়া দিতেছেন, একটু সামলাইয়া উঠিয়াই বাকী টাকাটা দিয়া দিবেন।

চারুর পিতা যাহা মুখে আসিল, তাহাই বলিয়া ভাবী বৈবাহিককে সংবর্দ্ধনা করিলেন। বিবাহ না দিয়া পাত্র উঠাইয়া লইয়া যাইবেন, সে ভয়ও দেখাইলেন। শেষে অনেক ভদ্রলোকের অনুরোধে এবং ইহার অধিক মূল্য কোথাও পাইবেন না মনে বুঝিয়া, দুই শত টাকার পরিবর্ত্তে তিন শত টাকার একখানি হ্যাণ্ডনোট লিখাইয়া লইয়া, তবে বিবাহে অনুমতি দিলেন।

এই অপমানের অগ্নি সাক্ষী রাখিয়া, চারু ও কমলার বিবাহ সমাধা হইয়াছিল।

বিবাহের সময়েই কমলাকে লইয়া আসিয়া চারুর পিতা তিন মাস কাল কমলাকে আর পাঠান নাই। বৈবাহিকের কাতর অনুরোধ ও কমলার নয়নাশ্রু তাঁহাকে একটুও বিচলিত করিতে পারে নাই। চারু অনেক সময় ভাবিয়াছে, স্ত্রীর পক্ষ হইয়া পিতাকে অনুরোধ করিবে, কিন্তু সাহসে কুলায় নাই। শেষে কমলার পিতা একবার আসিয়া অনেক গালাগালি নীরবে সহ্য করিয়া ছয় মাসের মধ্যে সুদ সমেত সমস্ত টাকা পরিশোধ করিয়া দিবেন, এই অঙ্গীকারে কমলাকে লইয়া আসিয়াছিলেন। ৪ মাস যাইতে না যাইতে বৈবাহিকের কড়া তাগাদায় কমলার পিতার অত্যন্ত ভাবনা হইল। শেষে তিনি গত্যন্তর না দেখিয়া, মেয়ের দুইখানি গহনা বন্ধক দিয়া টাকার যোগাড় করিয়া বৈবাহিকের কাছে পাঠাইয়া দিলেন। আশা করিয়াছিলেন, এখনও কমলা কয়মাস থাকিবে। তাহারই মধ্যে যেমন করিয়া হউক, মেয়ের গহনা খালাস করিয়া আনিবেন। কিন্তু টাকা পাইবার কয়েকদিন পরেই চারুর পিতা কোন খবর না দিয়া, হঠাৎ এক দিন আসিয়া পড়িলেন ও নানাবিধ আপত্তি সত্ত্বেও কমলাকে লইয়া গেলেন। কমলার বিশেষ সাবধানতা সত্ত্বেও বাড়ী আসিয়াই তিনি জানিতে পারিলেন যে, যাহারই শিল ও নোড়া, উক্ত দ্রব্যদ্বয় দিয়া তাহারই দাঁতের গোড়া ভাঙ্গা হইয়াছে—অর্থাৎ তাঁহারই গহনা বন্ধক দিয়া তাঁহারই দেনা পরিশোধ করা হইয়াছে।

ক্রোধে অন্ধ হইয়া তিনি পুত্রবধূর সমস্ত গহনা কাড়িয়া লইয়া তাহাকে পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দিলেন। তখন কমলার বয়স পঞ্চদশ।

ঠিক ইহার পরদিন চারু বাড়ী আসিয়া এই সমস্ত শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল।

পিতার এই আচরণ, তাহার উপর সংসারে বিমাতা; চারু আর সহ্য করিতে পারিল না। মনের দুঃখে সে সেই রাত্রিতেই গৃহত্যাগ করিল।

প্রথমে চারু কলিকাতায় আসিয়া এক অর্দ্ধেক সন্ন্যাসী ও অর্দ্ধেক গৃহীর আশ্রয় গ্রহণ করিয়া সেখানে বৎসরখানেক ছিল। সেই আধুনিক সন্ন্যাসী গেরুয়া বসন ও 'ভেজিটেবল সু' পরিতেন, মাথায় বড় চুল রাখিতেন, তাহাতে ব্রহ্মচারীর নিষিদ্ধ তৈল না দিয়া সাবান মাখিতেন, অন্যের অসাক্ষাতে কেশপ্রসাধন করিতেন, প্রকাশ্যে চা পান করিতেন ও ধর্ম্মের নানা জটিল বিষয়ে বক্তৃতা দিতেন—যাহাতে বক্তৃতার বিষয় আরও কঠিন হইয়া তাঁহার মাহাত্ম্য আরও বাড়াইয়া

তুলিত। কীর্ত্তন তিনি করিতেন, কিন্তু তাঁহার কণ্ঠের সুরের চেয়ে মুখের হাবভাব অধিকতর মনোজ্ঞ হইত। তাঁহার স্ত্রী গিনি সোনার গহনার সঙ্গে বারোমাস রেশমী শাড়ী পরিতেন ;—অবশ্য এই সব গহনা ও শাড়ী তাঁহাদের ভক্তবৃন্দ যোগাইতেন। চারুর মন সময়ে সময়ে ভক্তিপথ হইতে বিচলিত হইয়া পড়িত। গুরুদেব কোন কৃচ্ছ্রসাধন বা জনসেবা না করিয়া দিব্য আরামে কাল কাটাইবেন আর কেন যে তাহারা তাঁহার হইয়া সমস্ত কার্য্য করিয়া দিবে, ইহার কারণ সে খুঁজিয়া পাইত না, বিশেষ করিয়া কষ্ট ছিল তাহারই মত কয়েক জন শিষ্যের, যাহারা এক বেলা তাঁহার অন্ন ভক্ষণ করিয়া বিনা বেতনে তাঁহাদের দুই জনের ও তাঁহার বহু ধনী ভক্তের পরিচর্য্যা করিত। যাহা হউক, সবই সহ্য করিয়া আসিয়াছিল, কিন্তু সে গুরুদেবের একটা আচরণ সহ্য করিতে না পারিয়া, হঠাৎ তাঁহার শিষ্যত্ব ছাড়িয়া চলিয়া গেল। ব্যাপারটা হইয়াছিল এই যে, তিনি এক নিরীহ শিষ্যের সুন্দরী ও যুবতী স্ত্রীকে এমন দুই একটা কথা কহিয়া ফেলিয়াছিলেন, যাহা তাঁহার সন্ন্যাসের সঙ্গে মোটেই খাপ খায় নাই এবং সে কথাগুলি মোটেই রাষ্ট্র হইত না—যদি না তাঁহার স্বর্ণালঙ্কারভূষিতা স্ত্রী দ্বিতীয় রিপুর বশীভূত হইয়া সব কথা প্রকাশ করিয়া ফেলিতেন।

চারু ও তাহার সমবয়স্ক আর এক জন যুবক কাহাকেও না জানাইয়া গুরু-সন্নিধি ত্যাগ করিয়াছিল।

কিন্তু সন্ন্যাসের দিকেই তাহাদের তখনও ঝোঁক ছিল, সে জন্য তারকেশ্বরের এক হিন্দুস্থানী সন্ন্যাসী তাহাদের দুই জনকে পাকড়াও করিয়া লইল।

এই সন্ন্যাসীর সঙ্গে চারু বিনা মাশুলে নানা দেশ পরিভ্রমণ করিয়া কাশীধামে আসিল। হঠাৎ তাহার গুরু সেখানে চাঁদা আদায় করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। চাঁদার উদ্দেশ্য নাকি গয়া জিলার এক স্থানে তিনি বাল-বৃদ্ধ-যুবা, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ ইত্যাদি সকলের জন্য কূপ নির্ম্মাণ করিতেছেন, তাই।

গয়া জিলায় কোন স্থানে কূপ নির্ম্মাণের কথা সে শুনে নাই—দেখা ত দূরের কথা। গুরুর এবংবিধ কল্পনা-কুশলতার পরিচয় পাইয়া তাহারা দুই জনেই গুরুর দল ছাড়িয়া দিল। কাশীতে চারুর কিছু দূর সম্পর্কের এক মামা ছিলেন ; তাঁহারই সাহায্যে বরাকরের কাছে কোন কয়লার খনিতে একটা চাকরী পাইয়া সেখানে চলিয়া গেল। ক্রমশঃ চাকরী হইতে কয়লার ব্যবসায়ের একটা অংশ পাইল। অনেকের সহিত চারুর পরিচয় হইল। দুই এক জন বন্ধুও জুটিল। তাহারা চারুর মুখ হইতে তাহার দুর্ভাগ্যের কথা ধীরে ধীরে বাহির করিয়া লইল। সকলে মিলিয়া পরামর্শ দিল—যাহা কিছু ঘটিয়াছে, তাহাতে কমলার বিন্দুমাত্র দোষ নাই ; কেবল পিতার দারিদ্র্য, শ্বশুরের ক্রোধ ও লোভ এবং স্বামীর বৈরাগ্য—এই সমস্ত বিষয়ের জন্য সে-ই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী কষ্টভোগ করিয়াছে ও করিতেছে। ইহা যে অত্যন্ত অবিচার হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই ; অতএব কমলার কষ্ট অবিলম্বে দূর করা উচিত। কিছু বেশী অর্থ হাতে করিয়া চারু শীঘ্রই শ্বশুরবাড়ী যাত্রা করিল। পথে চারু আসানসোলে কমলার জন্য জামা-কাপড় ও অন্যান্য কিছু কিছু উপহারের দ্রব্যাদি কিনিয়া লইয়া, বরাবর চুঁচুড়ায় আসিয়া নামিল।

বলা বাহুল্য, এই যুবকই সেই চারু, যে দুই হাতে দুইটি বোঝা লইয়া পথিমধ্যে বিপন্ন হইয়াছিল।

৪

খুঁজিয়া খুঁজিয়া চারু শ্বশুরবাড়ী পৌঁছিল। শুনিল, এক বৎসর হইল, শ্বশুর মারা গিয়াছেন। দশ বৎসরের একটি পুত্র ও শ্বশুরকুলের পরিত্যক্তা নিরাভরণা যুবতী কন্যা লইয়া তাহার শাশুড়ীর কষ্টের একশেষ হইয়াছে। অতি কষ্টে দিন চলে—না চলারই সমান। নিকটস্থ গ্রামে একটি মাইনর স্কুল আছে ; সেখানে ছেলেটি ঘরের খাইয়া বিনা বেতনে পড়িতেছে। মেয়ে ও মা চরকা কাটিয়া, সুতা বেচিয়া, ধনিকন্যাদিগের ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের জামা তৈয়ারী করিয়া দিয়া, কোনমতে দিন কাটাইতেছে। বাড়ী বিকাইয়া যাইবার মত হইয়াছে। ভদ্রাসনখানি বজায় রাখিবার জন্য চারুর শ্বশুর সমস্ত জমী-জমা বেচিয়া খরচ কমাইয়া ঋণের অধিকাংশ টাকা শোধ করিয়া গিয়াছিলেন—বাকী টাকা পরিশোধের আর সময় পান নাই। সুদ সমেত তাহা এখন পাঁচ শতে দাঁড়াইয়াছে।

কি কষ্টে তাহাদের দিন কাটিয়াছে, কি দুঃখ বুকে করিয়া তিনি স্বর্গে গিয়াছেন, এই সব কথা বলিতে বলিতে চারুর শাশুড়ী কতবার কাঁদিয়া ফেলিলেন। চারু

সজলনেত্রে সব শুনিতে শুনিতে ভাবিল, এ সমস্ত তাহারই কলঙ্কের কাহিনী।

শাশুড়ীর সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিয়া চারু ভিতরের একটি ঘরে বসিয়া, তাহার শ্যালকের সঙ্গে গল্প করিতে করিতে ভাবিতে লাগিল, তাহার স্ত্রী এত দিনে কত বড় হইয়াছে এবং তাহার সম্বন্ধে কি ধারণা করিয়াছে।

রাত্রিকালে আহারাদির পর চারু তাহার জন্য রচিত শয্যার উপর শুইয়া পড়িল। রান্নাঘরে তাহার শাশুড়ী ছাড়া আর একটি প্রাণী আছে, কেবল এইটুকুই চারু বুঝিতে পারিল। সব কায শেষ করিয়া, কমলা যখন আপনাকে সযত্নে অবগুণ্ঠিত করিয়া, চারুকে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইল, চারু যে কি বলিয়া স্ত্রীকে সম্ভাষণ করিবে, তাহা ভাবিয়া খুঁজিয়া পাইল না।

চারু জিজ্ঞাসা করিল—"ভাল আছ ?"

অবগুণ্ঠিতা কোন উত্তর দিল না। চারু তাহাকে শয্যায় আপনার পাশে বসাইয়া অবগুণ্ঠন খুলিয়া দিতে গেল। অবগুণ্ঠন খুলিবামাত্র চারু সবিস্ময়ে দেখিল, এ সেই পূর্ব্বদৃষ্টা যুবতী, যে আজ পথে বিপদের মধ্যে তাহাকে সাহায্য করিয়াছিল।

চারু কমলাকে বুকের কাছে টানিয়া আনিয়া বলিল,—"কমলা, তুমি! আমি তোমার ভার নিতে পারি নি; কিন্তু তুমি না বলতে আমার পথের অর্দ্ধেক ভার আপন হাতে নিয়েছিলে। আমায় ক্ষমা কর।"

কমলা নত হইয়া স্বামীর পদধূলি গ্রহণ করিল।

শ্রীমাণিকলাল ভট্টাচার্য্য।

পল্লী-বধূ

শিক্ষা-দীক্ষা পাননি তবু শুভকর্ম্মে কল্প মনে উঠেন এঁরা মাতি,
স্বার্থ-অন্ধ নয় গো কভু, 'শুকতারারি' মত নিত্য ফুটান গুণের ভাতি।
চান না কভু দালান-কোঠা, কুঁড়ে ঘরে দেন যে ঢেলে নিছক শান্তি-সুখ,
উপবাসে ক্লান্ত মেনে, কোনও দিনই বিষাদ-ক্লিষ্ট হয় না এঁদের মুখ।

ভোর না হ'তে 'গোময়-জলে',
কুটীর উঠান করেন এঁরা নিত্য পরিষ্কার,
মাঘের শীতে ডোবার জলে,
কাপড় কাচা বাসন মাজায় করেন না মুখ ভার!
দারুণ শীতে সামিজ-কামিজ,
পায় না এঁদের অনাদৃত গ্রাম্য দেহে ঠাঁই,
শাক-অন্নেই থাকেন তৃপ্ত,
পূজা ব্রত আচার নিষ্ঠা কিছুই যে বাদ নাই!
অন্ধ-আতুর ভিখারীর হায়,
আর্ত্তনাদে চিরদিনই কাতর এঁদের বুক,
রুক্ষ কথায় তাড়িয়ে তাঁদের
পান না এঁরা রসাল-ভোজে শান্তি তৃপ্ত সুখ।
'ধান ভেনে' আর 'বাটনা বেটে'
এঁদের দেহে হয় না কভু "অম্লপিত্ত" ভয়;
রোগীর পাশে রাতটা জেগেও,
'শিরঃপীড়া', 'হিষ্টিরিয়া' করেন এঁরা জয়!
শাক সব্জীর সমাবেশে
পঞ্চব্যঞ্জন রাঁধেন নিতি,—রসাল তারি তার,
পাচক চাকর ঝিয়ের হাতে,
দেন না সঁপে গৃহস্থালী রান্নাঘরের ভার।

শ্বশুর শাশুড়ী সাথে এঁদের হয় না কভু—'মুন্সীয়ানা' কথার বিনিময়,
পতির সাথে চান না এঁরা করতে কভু উপন্যাসের চিত্র অভিনয়!
পরনিন্দায় পর-কুৎসায়, সমুৎসুকে—কোন দিনই দেন না এঁরা কান,
দামীজ গয়না শাড়ীর তরে দেন না বিঁধে পতির বুকে চোখা কথার বাণ!
শয্যা ছেড়ে 'বাসি মুখে' দেন না গুঁজে গরম চা আর রুটী আলুর ঝোল,
'কটনা কুটেই' মুখ বাঁকিয়ে ছুটান না গো—গিন্নীপণার 'বক-বকম' বোল!
হাত্তা গল্পি নোড়া ছেড়ে,নভেল নিয়ে সকাল-বিকাল দেন না এঁরা কেটে,
আশ্রিতাদের করতে শাসন, তীব্র কথা কখনও না এঁদের মুখে ছোটে!

"গেঁয়ো" ব'লে নয় গো ঘৃণা,
এঁরাই খাঁটি পল্লী-রাণী, কর্ম্মে মূর্ত্তিমতী;
স্পর্শে এঁদের দৈন্য ঘুচে,—
ক্ষুদ্র তৃণে ফুটিয়ে তোলে দীপ্ত হীরক-জ্যোতি।
আচার ব্যাভার সাদাসিধা,
ছল-চাতুরী এঁদের কাছে পায় না কভু স্থান,
সভ্যতারই ভেজাল মেখে,
চান না নিতে, বিনিময়ে ওজন করা মান!
'বার-ফুটানি' চান না এঁরা,—
আসল যে গো 'তালির জোড়ে' রয় না কভু ঢাকা!
টানের 'পরে টান পড়িলে,
যায় যে ফেঁসে নিমেষমাঝে ভিতর যাদের ফাঁকা!
মোটা ভাত আর মোটা কাপড়
পেলেই তুষ্ট-চান না 'ফ্যান্সি' 'টেষ্টফুল' বা আর,
ধরণ-ধারণ নকল করে,
কোন দিনই ঘুচ্‌বে না যে অসীম দৈন্যভার!

গভীর তত্ত্ব করছে ব্যক্ত, সকল চিন্তা উধাও ক'রে অনাটনের মাঝে,
বিলাস-নেশার উচ্চ মাথা,
এঁদের পায়ে আপনা হ'তেই পড়ছে নুয়ে লাজে!
'গেঁয়ো'—সে যে মাতা ভগ্নী,—সাবিত্রী আর সীতা গৃহ করেন তপোবন,
নকল ভূষায়, বিলাস-নেশায় 'গরীব দেশে' আনেন নাকো দৈন্য বিড়ম্বন!

শ্রীসুরেন্দ্রলাল সেনগুপ্ত।

ট্রিপলি

ট্রিপলি ভূমধ্য সাগরের উপকূলবর্ত্তী উত্তর-আফ্রিকার একটি নগর। অধুনা ইহা ইতালীয়দিগের অধিকারভুক্ত একটি উপনিবেশ। এই শুভ্র নগরটি দেখিতে মনোরম, ইহার দীর্ঘ-চূড়াবিশিষ্ট গম্বুজগুলি সমুদ্রবক্ষ হইতে দেখিতে পাওয়া যায়। টিউনিস্ ও আল্‌জিয়ার্স উত্তর-আফ্রিকার অন্যতম নগর এবং ট্রিপলির সন্নিহিত হইলেও ট্রিপলি নগরে আফ্রিকার আবহাওয়া যেমন সুস্পষ্ট, অন্যত্র তেমন নহে।

সমুদ্রকূলবর্ত্তী ট্রিপলি নগরের দৃশ্য

১৯১১ খৃষ্টাব্দে নক্ষত্রখচিত অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি পতাকার পরিবর্ত্তে ইতালীয় পতাকা আবার ট্রিপলির বক্ষোদেশে উড্ডীন হইয়াছে। বহুপূর্ব্বে ট্রিপলিটানিয়া রোমের অধিকারভুক্ত ছিল। তৎপরে তুর্কী ও আরবের পতাকা পর্য্যায়-ক্রমে বিজয়গর্ব্বে ট্রিপলির বক্ষোদেশে স্ব স্ব প্রাধান্য ঘোষিত করিয়াছিল। এই নগরটি বহু প্রাচীন। ফিনিসীয়দিগের যুগ হইতে ট্রিপলির কথা ইতিহাসের পৃষ্ঠদেশ অলঙ্কৃত করিয়া আছে। ফিনিসীয়গণ এই নগরে ব্যবসায়-বাণিজ্য করিত, তখন হইতেই ট্রিপলি বন্দরের খ্যাতি ছিল। তখন ইহার নাম ছিল ওইয়া (Oea)। পরবর্ত্তী যুগে ত্রিপলি (ত্রিনগরী) নামে অভিহিত হয়।

ফিনিসীয়দিগের পরে ট্রিপলিটানিয়া কার্থেজের অধিকারভুক্ত হয়। জামারণক্ষেত্রে, খৃষ্টজন্মের ২ শত ২ খৃষ্টাব্দ পূর্ব্বে নিউমিডীয় ম্যাসিনিসা (Messinissa) ট্রিপলির সার্ব্বভৌমিকত্ব প্রাপ্ত হয়েন। তাঁহার উত্তরাধিকারীরাও ট্রিপলির উপর রাজত্ব করিয়াছিলেন। পরে ট্রিপলিটানিয়া রোমানদিগের একটি প্রদেশ-রূপে পরিণত হয়।

ট্রিপলি বন্দরের সন্নিহিত স্থানে প্রাচীন যুগের রোমক স্থপতিশিল্পের নিদর্শন এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। মার্কস্ অরিলিয়সের (Marcus Aurelius) রাজত্বকালে একটি খিলানযুক্ত অট্টালিকা নির্ম্মিত হইয়াছিল, সেই খিলান এখনও বিদ্যমান আছে। রোমকযুগের পর ভ্যাণ্ডাল, বাইজান্‌টাইন্, আরবগণ
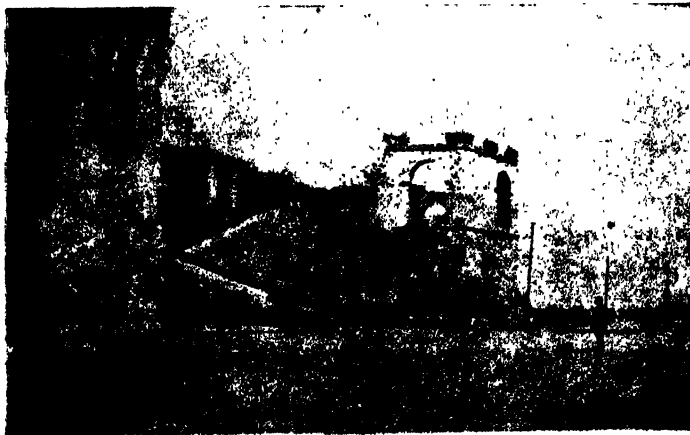
ট্রিপলির প্রাচীন দুর্গ

নগর তোরণ

পর্য্যায়ক্রমে ট্রিপলি অধিকার করিয়াছিল। সপ্তম শতাব্দীতে আরবগণ ট্রিপলির উপর আধিপত্য বিস্তার করে। তৎপরে ট্রিপলিটানিয়ার খাস অধিবাসীরা ট্রিপলিকে স্বাধিকার-সীমায় লইয়া আইসে। একাদশ শতাব্দীতে আরবগণ পুনরায় ট্রিপলি অধিকার করে।

১১৪৬ খৃষ্টাব্দে নর্ম্মানগণ ট্রিপলি দখল করিয়া দ্বাদশ বৎসরকাল তথায় স্বীয় প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিল। কিন্তু

মর্ম্মরপ্রস্তরনির্ম্মিত স্মৃতি-স্তম্ভের কয়েকটি খিলান

পরে মোসলেম বাহিনী উহা নর্ম্মানগণের নিকট হইতে কাড়িয়া লয়। স্পানিয়ার্ডগণ ১৫১০ হইতে ১৫৩০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ট্রিপলির শাসক ছিল। স্পেনের রাজা পঞ্চম চার্লস এই নগরটি মালটার খৃষ্টান যোদ্ধৃগণকে প্রদান করেন। তুর্কগণ ১৫৫১ খৃষ্টাব্দে মালটার Knightগণকে পরাজিত করিয়া ট্রিপলি অধিকার করে।

আরব সৈনিক

তুর্কীর জয়-পতাকা ক্রমশঃ সমগ্র ট্রিপলিটানিয়া প্রদেশে উড্ডীন হয়। ১৭১১ খৃষ্টাব্দে কারামান্‌লি নামক জনৈক তুর্কী সামরিক কর্ম্মচারী সম্রাটকে উৎকোচ দান করিয়া এবং ট্রিপলিস্থিত যাবতীয় সামরিক কর্ম্মচারীকে হত্যা করিয়া উক্ত প্রদেশের স্বাধীন নরপতি বলিয়া আপনাকে ঘোষণা করে। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কারামান্‌লির বংশধরগণ ট্রিপলি শাসন করিয়াছিল। কিন্তু পরে উহা পুনরায় তুরস্কের অধিকারভুক্ত হয়।

কারামান্‌লির রাজত্বের বহুপূর্ব্ব হইতেই ট্রিপলিতে জলদস্যুর অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। অন্যান্য যুরোপীয় রাজত্বের ন্যায় অলিভার ক্রমওয়েলও ১৬৫৫ খৃষ্টাব্দে আড্‌মিরাল্‌ রবার্ট ব্লেকের অধিনায়কতায় এক রণপোত বহর ট্রিপলিতে প্রেরণ করেন। বহু খৃষ্টান নরনারীকে জলদস্যুগণ হরণ করিয়া ট্রিপলিতে দাসরূপে বিক্রয় করিত। অলিভার ক্রমওয়েলের

উদ্দেশ্য ছিল, জলদস্যুগণকে ধ্বংস করিয়া খৃষ্টান দাসগণকে মুক্তি প্রদান। ওলন্দাজ, ফরাসী, ইংরাজ, আমেরিকান্ এবং সার্ডিনীয়গণ পর্য্যায়ক্রমে ট্রিপলি আক্রমণ করে। সকলেরই উদ্দেশ্য—জলদস্যুর অত্যাচার নিবারণ করা। কিন্তু তথাপি জলদস্যুর অত্যাচার উপশম প্রাপ্ত হয় নাই। উনবিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত জলদস্যুগণের অত্যাচার প্রায় সমভাবেই চলিয়াছিল।

দুর্গতোরণসম্মুখে সেনাদল

১৯১১-১২ খৃষ্টাব্দের যুদ্ধে তুর্কীর অধিকার হইতে ইতালীয়গণ ট্রিপলি অধিকার করে। তৎপরে ইতালীর জয়পতাকা সমগ্র লিবিয়ার বক্ষোদেশে

প্রাচীন রাজপথ—খিলান-করা ছাদ দ্বারা আবৃত

উড্ডীন করিবার উদ্দেশে ইতালীয় বাহিনী অভিযান করিতে থাকে। কিন্তু য়ুরোপীয় মহাসমরের প্রলয়-বিষাণ বাজিয়া উঠায় ইতালীয়গণ সমগ্র লিবিয়া-জয় বন্ধ রাখিতে বাধ্য হইয়াছিল। আবার এখন ইতালীয় সৈন্য পুনরুদ্যমে যুদ্ধ চালাইতেছে।

নানা ভাগ্যবিপর্য্যয়ের পর, ট্রিপলি এখন ইতালীয় অধিকারভুক্ত হইলেও, বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন শাসনশক্তির নানাবিধ স্মৃতি ট্রিপলিতে দেখিতে পাওয়া যায়। নগরের সমুদ্র-উপকূলবর্ত্তী অংশ এবং তাহার পরবর্ত্তী দুইটি বড় রাজপথ ব্যতীত ট্রিপলির সর্ব্বত্রই প্রাচীন যুগের নিদর্শন বিদ্যমান। নগরের মধ্যে প্রবেশ করিলেই প্রাচীন যুগের স্মৃতি আপনা হইতেই সুস্পষ্ট হইয়া উঠিবে। প্রসিদ্ধ রাজ-পথগুলির ধারে কাফিখানা, ব্যাঙ্ক, ডাকঘর, শাসন-কর্ত্তার প্রাসাদ, বিপণিশ্রেণী, কার্য্যালয়; তাহারই পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ উষ্ট্র বিশ্রাম করিতেছে; আবার মোটরযানগুলিও দ্রুতবেগে ধাবিত হইতেছে। আরব ও নিগ্রোগণ প্রাচীন যুগের সুপ্রাচীন পরি-চ্ছদে ভূষিত হইয়া রাজপথে বিচরণ করিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে খাকিবেশে ইতালীয়গণ চলিতেছে। আরব ও নিগ্রোরমণীরা সর্ব্বাঙ্গ বোরখায় আচ্ছন্ন করিয়া মাত্র একটি নয়ন অনাবৃত রাখিয়া পথ চলিতেছে। তাহাদেরই পার্শ্বে য়ুরোপীয় নারীর সহজ অবাধ গতি।

প্রস্তরখচিত সুদৃঢ় দুর্গের পার্শ্বদেশ দিয়া প্রধান

উৎসবকালে নিগ্রোদিগের পতাকা

সাহারা মরুভূমিনিবাসী অবগুণ্ঠনাবৃত পুরুষ

আরবদিগের অন্দরের ঘরগুলি বৃহৎ বাতায়ন-সংযুক্ত, সূর্য্যালোকিত এবং পরিচ্ছন্ন।

ট্রিপলির রাজপথে আরব রমণীকে কদাচিৎ দেখিতে পাওয়া যায়। মাঝে মাঝে শুধু ২।৩ জন বৃদ্ধা নিগ্রো রমণী অবগুণ্ঠনাবৃত অবস্থায় কোনও দোকানে জিনিষ-পত্র ক্রয় করিতে আসিয়া থাকে। নগরের এক অংশে ইহুদীদিগের বাস। কিন্তু বৈদেশিক সহসা তাহাদিগকে ইহুদী বলিয়া বুঝিতে পারিবেন না; কারণ, সকলেই মস্তকে রক্তবর্ণ তুর্কী ফেজ টুপী ব্যবহার করিয়া থাকে। এই পল্লীর দ্বার-দেশে সর্ব্বদাই অবগুণ্ঠনমুক্ত নারীর দলকে কোন না কোন বিষয়ের আলোচনায় নিযুক্ত দেখা যায়। ইহা হইতেই দর্শক অনায়াসে অনুমান করিতে পারেন যে, তাহারা

পথ-বিসর্পিত। দুর্গের প্রাচীর যেমন দৃঢ়, তেমনই উচ্চ। নগরের কোনও সৌধই উচ্চতায় দুর্গ-প্রাচীরের সমকক্ষ নহে। ১৯১১ খৃষ্টাব্দের যুদ্ধে দুর্গের অনেক স্থল ভগ্ন হইয়াছিল বটে; কিন্তু ইতালীয়গণ তাহার পুনঃ সংস্কার করিয়াছেন। প্রতি-দিন অপরাহ্ণে দুর্গের প্রধান তোরণসন্নিধানে ইতালীয়গণ অধুনা সৈন্যক্রীড়া প্রদর্শন করিয়া থাকেন।

রাজপথ অতিবাহন করিয়া নগরের মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেই দর্শক মনে করিবেন, তিনি যেন 'আরব্য রজনীর' বর্ণিত কোনও এক নগরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। বিংশ শতাব্দীর সভ্যতালোকদীপ্ত রাজপথের চিত্র যেন অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে। খিলান-করা ছাদযুক্ত পথের দুই ধারে নানাপ্রকার দোকান—কেহ তাঁতে কাপড় বুনিতেছে, কোনও দোকানে বিভিন্ন বর্ণের নানাপ্রকার কার্পেট বিক্রয়ার্থ সজ্জিত রহিয়াছে। বিক্রেতৃগণ আরামে খরিদ্দারের আশায় বসিয়া আছে।

আবৃত রাজপথ পরিত্যাগ করিয়া বাহিরের মুক্ত আকাশতলে বাহির হইলেই সম্মুখে ছোট ছোট গলী দেখিতে পাওয়া যাইবে; তাহার উভয় পার্শ্বে দ্বিতল, শুভ্র অট্টালিকা শ্রেণীবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান। অট্টালিকাগুলিতে জানালা নাই বলিলেই হয়—কদাচিৎ কোথাও অতি ক্ষুদ্র গবাক্ষ লোহরেলিং-বেষ্টিত। কোনও অট্টালিকার ঈষন্মুক্ত দ্বারপথে ভিতরের দৃশ্য দৃষ্টিগোচর হইলে বুঝা যায় যে,

লিবীয় মরুবাসিনী সুন্দরী

মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত নহে। তাহারা ইহুদী; খৃষ্ট-জন্মের সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ফিনিসীয়গণ যখন ট্রিপলিতে ব্যবসায়-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল, সেই সময় হইতেই এই ইহুদীদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ এখানে বসবাস করিয়া আসিয়াছে। এই সকল ইহুদীর গাত্রবর্ণ অত্যন্ত গৌর। বাল্য ও কৈশোরে এই ইহুদী নারীদিগের আকৃতি পরম রমণীয় থাকে, কিন্তু বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে স্থূলকায়া হইয়া পড়ায় সে সৌন্দর্য্য আর প্রায়ই থাকে না।

ট্রিপলির নাগরিকা—উৎসববেশে

অধুনা কোন কোন সম্ভ্রান্ত ইহুদী পরিবার য়ুরোপীয় বেশ-ভূষা ও আচার-ব্যবহার অবলম্বন করিয়াছে। এই অগ্রগামী দলের যুবতীরা বল-নৃত্যে যোগদান করিয়া সম্পূর্ণ য়ুরোপীয়ভাবে উৎসবক্রিয়া সম্পাদন করিয়া থাকে। কিন্তু এইরূপ ইহুদী নরনারীর সংখ্যা ট্রিপলিতে এখনও অধিক নহে। বেশীর ভাগই প্রাচীর অবলম্বিত পদ্ধতিতে চলিয়া থাকে। আচার-ব্যবহার, বেশ-ভূষা সবই প্রাচ্য ধরণের। রবিবার দিবসে বিবিধ বর্ণের পোষাক-পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া ইহুদী নরনারীরা পল্লীর গলীপথগুলিকেও সমুজ্জল করিয়া তুলে। ইহুদী নারীদিগের কেহ কেহ জুতা-মোজা ব্যবহার করিয়া থাকে। কেহ নগ্নপদে, কেহ বা শুধু চটিজুতা পায় দিয়া রাজপথে বহির্গত হয়।

ট্রিপলির মুসলমান মোল্লা বা ধর্ম্মযাজক

ইহুদী পুরুষগণও প্রাচ্যদেশীয় বেশভূষা ধারণ করিয়া থাকে। অনেক ইহুদীর বেশ দেখিয়া আরবদিগের সহিত তাহাদের পার্থক্য বুঝিতে পারা যায় না। ইহাদের পোষাকও বর্ণবৈচিত্র্যবহুল। ইহারা সন্তানগণকে সুশিক্ষিত করিবার পক্ষপাতী। ট্রিপলিতে অনেকগুলি ভাল ভাল বিদ্যালয়ও আছে। ইহুদী বালকগণ ইতালীয় সামরিক পরিচ্ছদধারী কর্ম্মচারীর ন্যায় পোষাকে সজ্জিত হইয়া স্কুলে গমন করিয়া থাকে।

সুদান হইতে যে সকল কাফ্রি ক্রীতদাস হিসাবে ট্রিপলিতে আনীত হইয়াছিল, বর্ত্তমান নিগ্রোগণ তাহাদেরই বংশধর। আরবগণের সহিত এই নিগ্রোদিগের ঘন ঘন বৈবাহিক সম্বন্ধের ফলে ক্রমশঃ ট্রিপলিতে নিগ্রোদিগের মুখাকৃতির পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। কিন্তু দেহের বর্ণ এবং কেশরাজির বৈশিষ্ট্যের বিশেষ কোন বৈলক্ষণ্য ঘটে

ট্রিপলির রুটী-বিক্রেতা

নাই। আরবদিগের বেশ-ভূষা ও আচার-ব্যবহার নিগ্রো-দিগের মধ্যে অন্তঃপ্রবিষ্ট হইলেও তাহারা কোন কোন উৎসবে সাহারা-মরুভূমিবাসী পূর্ব্বপুরুষদিগের কোন কোন রীতিনীতি এখনও বিস্মৃত হয় নাই; উৎসব-নৃত্যে এখনও তাহার আভাস পাওয়া যায়। নগরের নবনির্ম্মিত প্রাচীরের বহির্ভাগে নিগ্রো-দিগের ধর্ম্মমন্দির বিদ্যমান। তথায় তাহারা উৎসবক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া থাকে। নিগ্রো-রমণীরা স্বর্ণ ও রৌপ্যালঙ্কারে ভূষিতা হইয়া উৎসবে যোগদান করিয়া থাকে; দশ অঙ্গুলীতে অঙ্গুরীয় ধারণ করিয়া ঐশ্বর্য্যের পরিচয় প্রদান করে।

ট্রিপলিতে বহুসংখ্যক মসজিদ আছে। প্রত্যেক মস্‌জিদের চূড়া বিভিন্ন আকারের এবং দেখিতে সুন্দর। প্রত্যহ উপাসকগণ ৫ বার করিয়া নমাজ পড়িতে মসজিদে গমন করিয়া থাকে। প্রসিদ্ধ মস্‌জিদগুলি ট্রিপলির পূর্ব্বতন শাসক-সম্প্রদায়ের বংশধর-গণের অধিকারভুক্ত।

ইহুদীগণ নগরের যে অংশে বাস করে, তাহার সন্নিহিত স্থানে প্রাচীন নগরের প্রাচীর এখনও বিদ্যমান। পুরাতন ঐতিহাসিক স্মৃতি হিসাবে সেই প্রাচীরের অংশ এখনও সংরক্ষিত আছে। ইতালীয়গণ ট্রিপলি অধিকার করিবার পর নগররক্ষার জন্য চারিদিকে নূতন সুদৃঢ় প্রাচীর নির্ম্মাণ করিয়াছে। প্রাচীর-বেষ্টনীর মধ্যে একটি মরু-উদ্যান পর্য্যন্ত বিদ্যমান। কিন্তু নগর-তোরণগুলি অধুনা সর্ব্বদাই মুক্ত থাকে—রাত্রিকালেও রুদ্ধ করা হয় না। কারণ, দেশীয় ইতালীয় সৈনিকগণের বীরত্বে শঙ্কিত হইয়া এখন কেহ আর বিদ্রোহ করিতে সাহসী হয় না। মরুভূমির মধ্যেও ইতালীয়গণ অসঙ্কোচে মোটরে যাতায়াত করিতেছে, মরু-দস্যুগণ পর্য্যন্ত তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে ইতস্ততঃ করে। ট্রিপলি হইতে চ্যাডামেস্ ৩ শত ৬৬ মাইল দূরে। মধ্যে বিরাট মরুভূমি। ইতালীয়গণ এই ভীষণ বালু-সমুদ্রের মধ্য দিয়া উভয় নগরের গতায়াতের সহজ পথ আবিষ্কার করিতেছে।

ট্রিপলিবাসী ইহুদী

চ্যাডামেস্ মরুভূমির অন্তর্গত একটি শস্যশালী নগর। এখানে একটি উষ্ণ প্রস্রবণ আছে। শুনা যায়, এই উৎস-সলিল মানব-দেহের পক্ষে অত্যন্ত উপকারী এবং নানাপ্রকার ধাতব পদার্থের সন্ধান এই উৎসের সলিলমধ্যে পাওয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে চ্যাডামেস্‌এ

ট্রিপলির নিগ্রো উপনিবেশের সর্দ্দার

প্রায় ৬ হাজার অধিবাসী ছিল, কিন্তু সম্প্রতি উহার অধিবাসীর সংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাস প্রাপ্ত হইতেছে। ব্যবসা-বাণিজ্যের অসুবিধা ঘটায় অনেকে অন্যত্র চলিয়া যাইতেছে।

সমগ্র ট্রিপলিটানিয়ার অধিবাসীর সংখ্যা ৫ লক্ষ ৫০ হাজার। ইহার মধ্যে অধিকাংশই যাযাবর সম্প্রদায়ভুক্ত। ট্রিপলি নগরে ১৫ হাজার ইতালীয়, ২ হাজার মাল্টাবাসী, ৮ হাজার ইহুদী এবং ৩২ হাজার আরব, নিগ্রো প্রভৃতির বাস।

ইতালীয়গণ ট্রিপলিতে রেলপথ খুলিয়াছে। ট্রিপলি হইতে ৭৪ মাইল দূরবর্ত্তী সুয়ারা পর্য্যন্ত রেলপথ বিস্তৃত। কর্ত্তৃপক্ষ ক্রমশঃ রেলপথের বিস্তার ঘটাইতেছেন। শীঘ্রই টিউনিসিয়ার সীমান্ত পর্য্যন্ত রেলপথ বিস্তৃত হইবে।

ট্রিপলির উষ্ট্র বিক্রয়ের হাট

রোমকগণ ট্রিপলিতে প্রশস্ত রাজপথ সমূহ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। বর্ত্তমানে ইতালীয়গণও বড় বড় পথ নির্ম্মাণে অবহিত হইয়াছেন। একটি রাজপথ ৭৫ মাইল দীর্ঘ।

নগররক্ষাকল্পে নবনির্ম্মিত প্রাচীর

আজিজিয়ায় ১৯১৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তুর্ক ও আরবদিগের সহিত ইতালীয়গণকে সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল। এখন সে যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটিয়াছে। একটি ক্ষুদ্র পাহাড়ের উপর দুর্গ আছে। তথায় দেশীয়গণ কেহ বাস করে না, শুধু কতিপয় অসামরিক কর্ম্মচারী অধুনা বাস করিতেছেন, এক জন সৈন্যও এখন তথায় নাই।

ধর্ম্মসংক্রান্ত উৎসবকালে নিগ্রো বাদকদল

ট্রিপলিতে বসন্তকালে অপর্য্যাপ্ত পুষ্প পাওয়া যায়। এত বিভিন্ন বর্ণের পুষ্প যে, কেহ সংখ্যা নির্দ্দেশ করিতে পারে না। রাজপথের দুই ধারে যাযাবর সম্প্রদায় বার্লিক্ষেত্র প্রস্তুত করে—যত দূর দৃষ্টি চলে, শুধু বার্লিক্ষেত্র, বহুদূরে চিক্‌চক্রবালে বার্লির ক্ষেত্র মিশিয়া গিয়াছে!

ট্রিপলি অদ্রিমালা-সুশোভিত- পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম প্রান্ত পর্য্যন্ত শুধু গিরিশ্রেণী। এই গিরিশ্রেণী অতিক্রম করিয়া ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত রাজপথ আঁকিয়া-বাঁকিয়া চলিয়া গিয়াছে। গিরিশৃঙ্গে উঠিলে প্রাকৃতিক শোভায় দর্শকের চিত্ত অভিভূত হইয়া যাইবে। নিম্নে শস্যশ্যামল ক্ষেত্র—বার্লি, নানাবিধ শাক-সব্জী বক্ষে ধারণ করিয়া রহিয়াছে। কোথাও জলপাই-কুঞ্জ- এক একটি বৃক্ষ রোমক যুগের স্মৃতি লইয়া এখনও জীবিত। অসমতল মালভূমিতে

নগরবাসিনী আরব সুন্দরী

ঝাউ প্রভৃতি জাতীয় বৃক্ষ বহুল পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। পর্ব্বতগুলির মধ্যে আগ্নেয়গিরির অস্তিত্বও বিদ্যমান তবে এখন নিষ্ক্রিয়, নির্জীব।

ঘারিয়ান্ অঞ্চলে ৩০ হাজার লোকের বাস। এই অঞ্চলকে ট্রোগ্‌লোডাইট্ (Troglodytes) বা ভূগর্ভ-নিবাসীদিগের বাসভূমি বলিয়া অভিহিত করা হয়। অধিবাসীরা গুহায় বাস করে না, কিন্তু সমতল ভূমি খনন করিয়া ২০ হইতে ৩০ বর্গ-ফুট গর্ত্ত তৈয়ার করে। গভীরতায় এক একটি গর্ত্ত ৩০ হইতে ৪০ ফুট পর্য্যন্ত হয়। প্রত্যেক গর্ত্তের পার্শ্বে ঢালুভাবে সুড়ঙ্গ কাটিয়া গর্ত্তের তলদেশে মিশাইয়া দেওয়া হয়। পথের সম্মুখে মাটী খনন করিয়া ঘর নির্ম্মিত হয়, আলোক ও বাতাস আসিবার জন্য গহ্বরের মুখের উপরিভাগ খোলা থাকে। ঘরগুলির ছাদ ও পার্শ্ব এবং সুড়ঙ্গ অত্যন্ত আর্দ্র। উপরিভাগ হইতে প্রবেশের পথে দ্বার সংযুক্ত এবং উহার চতুষ্পার্শ্বে উত্তোলিত মৃত্তিকা আল দিয়া রাখা হইয়া থাকে। এই বিচিত্রদর্শন গৃহগুলি অতি স্বল্পমূল্যে নির্ম্মিত হয় এবং সামান্য ব্যয়ে সংস্কৃত করা চলে। গ্রীষ্মকালে গৃহগুলি অত্যন্ত আরামপ্রদ—শীতল; শীতকালে বেশ উষ্ণ।

ট্রিপলি হইতে কিছু দূরে খননকার্য্য আরব্ধ হইয়াছে। প্রাচীন যুগের প্রসিদ্ধ নগরী লেপটিস্ ম্যাগ্‌না (Leptis Magna) ভূগর্ভে সমাহিত হইয়া আছে। ইতালীয় সরকার উহার খননকার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন। রাজপথ ও সমুদ্রের মধ্যবর্ত্তী স্থানে একটা বালিয়াড়ি দেখিতে পাওয়া যায়। এই শুভ্র বালিয়াড়ির অভ্যন্তরে যে ফিনিসীয় যুগের নগরী সমাহিত হইয়া আছে, তাহা কেহ স্বপ্নেও অনুমান করিতে পারিত না।

ইদানীং খনিত্র সাহায্যে বালিয়াড়ি সরাইয়া প্রাচীন নগরীর কিয়দংশ আবিষ্কৃত হইয়াছে। সম্রাট সেপটিমিয়স্ সার্ভিয়সের প্রাসাদের কিয়দংশ, প্রাচীর এবং খিলান-করা তোরণ ও চত্বরবিশিষ্ট স্নানাগার আবিষ্কৃত হইয়াছে। ১২ শত বৎসর পূর্ব্বে এই নগরী এক দিন ধনৈশ্বর্য্যে সুপ্রসিদ্ধা ছিল। আজ দীর্ঘ ১২ শতাব্দী পরে আবার তাহাকে লোকলোচনের গোচরীভূত করা হইতেছে। রাজপ্রাসাদের মর্ম্মর-প্রস্তরনির্ম্মিত স্তম্ভগুলি এখনও অবিকৃত অবস্থায় স্থপতিশিল্পের নৈপুণ্য ঘোষণা করিতেছে।

লিবিয়ার যাযাবর বাদক

সমুদ্রকূলবাসিনী ট্রিপলি সুন্দরীর দল

ধ্বংসস্তূপ হইতে আবিষ্কৃত রোমান যুগের সাধারণ স্নানাগার

স্নানাগার আরও সুদৃশ্য। প্রাচীর কোন কোন স্থানে প্রায় ৩০ ফুট উচ্চ। বিবিধ বর্ণের মর্ম্মর-প্রস্তরের স্তম্ভ স্নানাগারের শোভা বৃদ্ধি করিতেছে। স্নানাগারের অবতরণিকা বা সোপানশ্রেণী এখনও অভগ্ন অবস্থায় বিদ্যমান। এই সকল বিস্ময়কর পদার্থ ৪০ ফুট বালুকার নিম্নে প্রোথিত ছিল। লেপ্‌টিস্ ম্যাগ্‌না পম্পী নগরীর সহিত প্রতিযোগিতায় সমর্থ। খননকার্য্য সম্পূর্ণ হইলে আরও বহু প্রাচীন কীর্ত্তি আবিষ্কৃত হইবার সম্ভাবনা।

প্রাচীন গুহা-গৃহ

নব কাননবর্ত্তী নিগ্রো কুটীর

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ।

৫ই আষাঢ়—

রেঙ্গুনে চলন্ত ট্রেণে গুণ্ডামী—ডাকাইতের সহিত ধস্তাধস্তিতে যাত্রী আহত। দেশবন্ধুর কন্যাদ্বয় কর্ত্তৃক চতুর্থী শ্রাদ্ধ—দেশবাসী সকলকে নিমন্ত্রণ। গুন্টুর নিকট ২৬খানি গ্রামে পিটুনী পুলিস। উত্তর-মেরুযাত্রীর লণ্ডনে প্রত্যাগমন। চীনে দেশব্যাপী ধর্ম্মঘট ও বিদেশী বর্জ্জনের চেষ্টা। দেশহিতকর কার্য্যে শোণপুরের মহারাজার ১০ লক্ষ টাকা দান।

৬ই আষাঢ়—

স্ত্রীহত্যা অপরাধে প্রেসিডেন্সী জেলে যোগেন্দ্রনাথ ঘোষের ফাঁসী। বোমা সম্পর্কে এলাহাবাদে বাঙ্গালী যুবক গ্রেপ্তার। সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের মূর্ত্তি-প্রতিষ্ঠা ভাণ্ডারের জন্য ফুটবল খেলা দ্বারা ৪ হাজার টাকা সংগ্রহ। তারকেশ্বর মামলায় পরামর্শ কমিটী গঠনের প্রস্তাব।

৭ই আষাঢ়—

মান্দালয় জেলে রাজবন্দী পূর্ণচন্দ্র দাসের সাংঘাতিক পীড়া। কাঁচড়াপাড়ায় জমীদার-গৃহে ডাকাইতি। সীমান্তে হিন্দুদের উপর দৌরাত্ম্যে চিফ কমিশনারের কথা।

৮ই আষাঢ়—

দেশবন্ধুর স্মৃতিরক্ষার জন্য বঙ্গবাসীর নিকট মহাত্মাজীর নিবেদন। মাদ্রাজে টি. প্রকাশমের স্বরাজ্য দলে যোগদান। রাজবন্দী সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র বহুমূত্র রোগে পীড়িত। দেশবন্ধু সম্পর্কে শ্রীযুত অরবিন্দ ঘোষের তার। পারস্যের সাহের স্বদেশে প্রত্যাগমন।

৯ই আষাঢ়—

দেশবন্ধুর স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা—মহিলা হাঁসপাতালের জন্য ১০ লক্ষ টাকা প্রার্থনা। চীনে গোলযোগ ঘনীভূত—নানা স্থান হইতে সৈন্য আমদানী। বন্দুকের গুলীতে জাপানীর মৃত্যুতে কন্সলের তীব্র প্রতিবাদ।

১০ই আষাঢ়—

জব্বলপুরে কালীপূজায় নরবলি। ভাইকম সত্যাগ্রহে স্বেচ্ছাসেবকদিগের পিকেটিং বন্ধ। কুচবিহার বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলায় রাণী ঈশারাণীর জয়লাভ, মাসিক ৪ শত টাকা ভাতা বরাদ্দ। মহীশূরের মহারাজার চরকামন্ত্রে দীক্ষাগ্রহণ। মুলতানে জোড়া খুন—৪ জন সিপাহী গ্রেপ্তার। কলিকাতা কর্পোরেশন হইতে শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসুকে অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য ছুটী প্রদান। মাদ্রাজে কংগ্রেসকর্ম্মী কৃষ্ণস্বামীর মৃত্যু। রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপের তিব্বত ও নেপাল গমনের সঙ্কল্প। সার বসন্তকুমার মল্লিক পাটনা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত। বোম্বায়ের ধনকুবের শ্রীযুত বোমানজির ফরাসী-মহিলা বিবাহ।

১১ই আষাঢ়—

দেশবন্ধুর মৃত্যুসংবাদে কেনিয়ায় হরতাল। শ্রীহট্টে উকীলে-হাকিমে আদালতমধ্যে চটাচটি। সার হরি সিংএর কাশ্মীরের গদি-প্রাপ্তির কথা। বাওলা হত্যার মামলার প্রিভি কাউন্সিলে আবেদনের আয়োজন। চীনে ফরাসী বণিক নিহত, বৃটিশ মহিলাদের ক্যাণ্টন ত্যাগ।

১২ই আষাঢ়—

পতিত জাতির উন্নতিকল্পে ইন্দোরের মহারাজার ৮০ হাজার টাকা দান। সার আলবিয়ন রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় গোয়ালিয়রের রিজেণ্ট নিযুক্ত। বর্ম্মা জঙ্গলে ভূপর্য্যটক পর্য্যটকগণের বিপদ। মাদ্রাজে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের চেষ্টা। ফ্রান্স হইতে ১১ জন চীনা নির্ব্বাসিত এবং বেলজিয়ম সীমান্তে ১৬ জন চীনা গ্রেপ্তার। গ্রীসে রাষ্ট্রবিপ্লব—নৌসেনাদলের বিপ্লবে যোগদান।

১৩ই আষাঢ়—

শিবপুরে ভীষণ কাণ্ড, পুলিসে-ডাকাতে লড়াই—১ জন পুলিস হত, ৫ জন আহত। ডেরা ইস্মাইলখানে অগ্নিকাণ্ডে হিন্দুদিগের দুর্দ্দশা, ডেপুটী কমিশনারের অদ্ভুত হুকুম। ভাগলপুরে হিন্দু-মুসলমানে মনোমালিন্য। শিয়ালদহ ডাকাইত দলের মামলার রায়—একসঙ্গে ১৯ ঘণ্টা শুনানী—সমগ্র রজনী বিচার, ৩১ জনের কারাদণ্ড, ১৬ জনের মুক্তি।

১৪ই আষাঢ়—

মুন্সীগঞ্জে পাট কাটায় ভীষণ দাঙ্গা। হুগলী গোঘাটে ডাকাইতি—৬ হাজার টাকা অপহৃত। দিল্লীতে হিন্দু জাঠ গ্রেপ্তার। এলাহাবাদে বকরিদে ১৪৪। যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর প্রাদেশিক স্বরাজ্য দলের সভাপতি নির্ব্বাচিত। মহাত্মা গন্ধীর পুত্র মণিলালের নেতৃত্বে দক্ষিণ আফ্রিকায় অসহযোগ।

১৫ই আষাঢ়—

'বিপ্লব ও ছাত্র সমাজ' সম্পর্কে প্রিয়নাথ গাঙ্গুলী ও অক্ষয়কুমার গুপ্তের কারাদণ্ড। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন। দিল্লীতে বিরোধাশঙ্কায় স্বামী শ্রদ্ধানন্দ। বিলাতে দেশবন্ধু শোক-সভা। দিল্লীতে প্রিন্সিপাল সুশীলকুমার রুদ্রের মৃত্যু। পুরীর গোবর্দ্ধন মঠের শঙ্করাচার্য্য স্বামী মধুসূদন তীর্থের তিরোধান।

১৬ই আষাঢ়—

খড়্গপুরে মহাত্মা গন্ধী। গুটীতে পিটুনী পুলিস। ঢাকায় নৌকাডুবী। বাঙ্গালোরে সার বেসিল ব্লাকেট। কনস্তান্তিনোপলে ৪৭ জন কুর্দ্দ বিদ্রোহীর প্রাণদণ্ড। মণিলাল গন্ধীর নেতৃত্বে দক্ষিণ আফ্রিকায় নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ।

১৭ই আষাঢ়—

বর্দ্ধমানের মহারাজার সভাপতিত্বে টাউন হলে দেশবন্ধু-শোক-সভা, গড়ের মাঠে জনসভা ও য়ুনিভারসিটী ইনিষ্টিটিউটে মহিলা-সভা। বিরাট সমারোহে দেশবন্ধুর শ্রাদ্ধ। দিল্লীতে সৈন্যসমাবেশ—সশস্ত্র সৈন্যের সহর পরিভ্রমণ। বিলাতে ভারতীয়দিগের সৈন্য দলে গ্রহণ সম্বন্ধে আলোচনা। শ্রীমতী বেসাণ্টের বিলাতযাত্রা। ভবানীপুর সেবক সমিতিতে মহাত্মাজী। চট্টগ্রামে স্বরাজ্য দলপতি যতীন্দ্রমোহনের সংবর্দ্ধনা। সরকার কর্ত্তৃক জি, আই, পি, রেল গ্রহণ।

১৮ই আষাঢ়—

খিদিরপুরে হিন্দু-মুসলমানে ভীষণ দাঙ্গা, ২ জন হত, ৩৭ জন আহত, ঘটনাস্থলে মহাত্মাজী ও মৌলানা আজাদ- পুলিস-কর্ম্মচারীও আহত। পেশোয়ারে ভীষণ বন্যা- দেড় লক্ষ লোক গৃহহীন। উত্তরপাড়ার কুমার ভূপেন্দ্রনারায়ণ কর্ত্তৃক চুঁচড়া মেডিকেল স্কুলে ৩০ হাজার টাকা দান। বম্বে ঝড়ে দুর্ঘটনা, ৭ জন হত ৯ জন আহত।

১৯শে আষাঢ়—

দিল্লীতে হিন্দু-মন্দিরে গোমাংস নিক্ষেপ। নূতন শাসনপদ্ধতির প্রতিবাদে অষ্ট্রিয়ায় হরতাল। খিদিরপুরে আবার দাঙ্গার আশঙ্কা। রায় বাহাদুর সুরেন্দ্রচন্দ্র সেনের মৃত্যু।

২০শে আষাঢ়—

কাঁঠালপাড়ায় বঙ্কিম-সাহিত্য সম্মিলন—সভাপতি শ্রীযুত জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত। বাওলা হত্যা মামলার আসামীদের প্রাণদণ্ড স্থগিত। মৈমনসিংহে বোমা লইয়া ডাকাইতি। হবিগঞ্জে সাবদিয়াল আলন। আলোয়ার দুর্ঘটনায় কংগ্রেস তদন্ত কমিটী নিয়োগের কথা। চীনে বৃটিশ সার্জ্জন আক্রান্ত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমবায় উৎসব। শ্রীমতী বেসাণ্টের ইংলণ্ডযাত্রা।

২১শে আষাঢ়—

খিদিরপুর ওয়াটগঞ্জে আবার দাঙ্গার সম্ভাবনা। উত্তর পশ্চিম রেল ধর্ম্মঘটের অবসান। মেদিনীপুরে মহাত্মা গন্ধী।

২২শে আষাঢ়—

রেঙ্গুনে ব্যারিষ্টার ম্যাকডোনেলের নামে মানহানির মামলা। নোয়াখালিতে নির্ব্বাচন গোলযোগে ৭ জনের কারাদণ্ড।

২৩শে আষাঢ়—

ফরাসী কর্ত্তৃক পণ্ডিচেরীতে সৈন্য সংগ্রহ। শিবসাগর জিলার চা-বাগানে হাঙ্গামা—৭ জন কুলী আহত। লাহোরে শ্বেতাঙ্গের হাতে কৃষ্ণাঙ্গ প্রহৃত। দ্বারভাঙ্গায় ৭ বৎসরের বালিকা হরণ। মৈমনসিংহে সি, আই, ডির অত্যাচার। লাহোরে পণ্ডিত মতিলাল নেহরু।

২৪শে আষাঢ়—

ভারতের শাসননীতি পরিবর্ত্তন সম্পর্কে লর্ড সভায় ভারত-সচিবের বক্তৃতা—অবস্থার পরিবর্ত্তনসাধনে অসম্মতি প্রকাশ। মহরমে এলাহাবাদে ১৪৪। কাঁথিতে মহাত্মা গন্ধী। তারকেশ্বর সত্যাগ্রহে মহাত্মাজীর উক্তি। উদয়পুরে কংগ্রেসকর্ম্মী পাটিকের আড়াই বৎসর কারাদণ্ড। পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর পীড়া। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আই, এ, পরীক্ষার ফল প্রকাশ।

২৫শে আষাঢ়—

মেদিনীপুরে মহাত্মা গন্ধী। গুরুদ্বার সমস্যার সমাধান, গভর্ণরের ঘোষণায় শিখ কয়েদীদিগের মুক্তিলাভ। দারিয়াবাদে মৌলানা সৌকত আলি। গ্লাসগোয় অগ্নিকাণ্ডে সাড়ে ৩৭ লক্ষ টাকা ক্ষতি।

২৬শে আষাঢ়—

রিসিভার কর্ত্তৃক তারকেশ্বর সম্পত্তি দখল। দিল্লীতে বকরিদে বিশেষ পুলিসের ব্যবস্থা। শ্রীযুত সতীশরঞ্জন দাশ ভারত-সরকারের আইন সচিব নিযুক্ত। রাজবন্দী সন্তোষকুমার মিত্রের এম, এ পরীক্ষা প্রদানের অনুমতিপ্রাপ্তি। নৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কলিকাতা আগমন। মরক্কোয় দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধের সম্ভাবনা।

২৭শে আষাঢ়—

লর্ড বার্কেনহেডের বক্তৃতায় পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর কথা। মহাত্মা গন্ধীর নওগাঁও ও সলপে গমন। মিঃ জি, পি, রায় ডাক ও তার বিভাগের ডিরেক্টার জেনারেল নিযুক্ত।

২৮শে আষাঢ়—

সিরাজগঞ্জে মহাত্মা গন্ধী। হুগলী জেলে রাজবন্দিগণের অনশনব্রত গ্রহণ। মাদারীপুরে গভর্ণর লর্ড লাটন। ঝাঁসীতে রিভলভার প্রাপ্তিতে ৩ জন কংগ্রেসকর্ম্মী গ্রেপ্তার।

২৯শে আষাঢ়—

কলিকাতা কর্পোরেশন কর্ত্তৃক মেয়র দেশবন্ধুর স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা। লাহিড়ী মোহনপুরে মহাত্মা গন্ধী। হাইকোর্টের বিচারে তারকেশ্বরে রিসিভার নিয়োগ স্থগিত। বরিশালে গভর্ণর।

৩০শে আষাঢ়—

মণিলাল কোঠারীর কলিকাতা আগমন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দৌহিত্রী হিরন্ময়ী দেবীর মৃত্যু। বোম্বায়ে কাপড়ের কলের মজুরদিগের বেতন হ্রাস ব্যবস্থা। মালাক্কায় শ্বেতাঙ্গ কর্ত্তৃক মজুর-কন্যার উপর পাশবিক অত্যাচার। যশোহরে মহাত্মা গন্ধী। মৌলানা মহম্মদ আলী ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত।

৩১শে আষাঢ়—

শিয়ালদহে দুই দল মুসলমানে দাঙ্গাহাঙ্গামা। দেশবন্ধু-গৃহে নিখিল ভারত স্বরাজ্যদলের সভা, চিত্তরঞ্জন দাশের নীতিতে অবিচলিত বিশ্বাস। কলিকাতা হইতে পদব্রজে রেঙ্গুন গমন—পরাগরঞ্জন দের কীর্ত্তি। অমৃতসরে ডাক্তার কিচলুর সভাপতিত্বে সকল দলের মুসলেম বৈঠক। অর্ডিনান্সে কুমিল্লায় ছাত্র গ্রেপ্তার। রাজবন্দী সন্তোষকুমার মিত্রের মুক্তি।

৩২শে আষাঢ়—

ফরাসীর রূঢ় পরিত্যাগ আরম্ভ। পিকিনে পুনরায় অন্তর্বিপ্লব—সন্ধির প্রস্তাবে আবদুল করিমের অসম্মতি। মাদারীপুরে মিউনিসিপাল নির্ব্বাচনে স্বরাজ্যদলের জয়লাভ।

১লা শ্রাবণ—

শ্রীযুত যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র নির্ব্বাচিত। কলিকাতায় স্বরাজ্য সম্মিলন—সূতাকাটা প্রাবেশিক পরিবর্ত্তনের ব্যবস্থা। ইরাক পার্লামেণ্টের প্রথম অধিবেশন। চীন সম্বন্ধে লণ্ডনে পরামর্শ বৈঠক। স্পেনের রাজাকে হত্যার ষড়যন্ত্র।

২রা শ্রাবণ—

রঙ্গপুর জেলায় ৪টি স্থানে নারী-নির্যাতন। ব্রহ্মবাসীর সমবেত প্রার্থনা—গভর্ণরকে চাই না। নবদ্বীপে ধীবরগণের উপর অনাচারের সংবাদ। নাভা জেল হইতে মার্কিণ সাহিদী জাঠের ৫০ জন আকালীর মুক্তি। আলিপুর আদালতে খিদিরপুর ডক হাঙ্গামার ৪৫ জন আসামীর বিচার আরম্ভ।

৩রা শ্রাবণ—

সাকরাইল (হাওড়া) ডাকাইতিতে ৭ জন গ্রেপ্তার। মরক্কোর যুদ্ধে রীফদিগের পরাজয়। পর্তুগালে বিদ্রোহে সামরিক আইন জারি।

৪ঠা শ্রাবণ—

বেঙ্গল ন্যাশানল ব্যাঙ্কের অংশীদারগণের সাধারণ সভা। মৈমনসিংহে সদর রাস্তায় বোমা বিস্ফোরণ। চিল্কায় ভীষণ জলপ্লাবন—বহু গ্রাম জলমগ্ন। পুণায় সন্তরণে ২ জন শ্বেতাঙ্গ জলমগ্ন। ফরাসীর রাইন পরিত্যাগ। রাজবন্দী পূর্ণচন্দ্র চৌধুরী স্বগৃহে আটক।

৫ই শ্রাবণ—

রাজবন্দী শচীন্দ্রনাথ সান্যালের বাঁকুড়ায় বিচার আরম্ভ। রাজবন্দী অমরেন্দ্রনাথ বসু, লালমোহন ঘোষ প্রভৃতি স্বগৃহে আটক এবং যতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি বহরমপুর জেল হইতে স্থানান্তরিত। মহাত্মা গন্ধীর আত্মদান—স্বরাজ্যদলের উপর কংগ্রেসের ভারার্পণ। কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কলিকাতা আগমন।

৬ই শ্রাবণ—

দুই বৎসর পর জৈঠোর গুরুদ্বার গঙ্গাসাগরে অখণ্ড পাঠ। গয়ায় হিন্দুসভার প্রচারকগণের উপর ১৪৪ জারি। নিখিল ভারত দেশবন্ধু স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা। মাদুরায় প্রলয় কাণ্ড—ভীষণ ঝড় ও বৃষ্টি। সাম্প্রদায়িক বিরোধে হায়দ্রাবাদে সংবাদপত্র-সম্পাদক অভিযুক্ত।

৭ই শ্রাবণ—

ইন্দোরে পুলিসের অত্যাচারে কংগ্রেসকর্ম্মীর প্রায়োপবেশন। আলোয়ার দুর্ঘটনার তদন্ত কমিটীর রিপোর্ট প্রকাশ। শ্রীহট্টে কুলী-নিগ্রহে য়ুরোপীয় চা-বাগান ম্যানেজারের বিচার। কানপুরে 'বর্ত্তমান' সম্পাদকের কারাদণ্ড, আপীল না-মঞ্জুর। স্বামী কুমারানন্দের কারামুক্তি। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের স্থানে শ্রীযুত বীরেন্দ্রনাথ শাসমল বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভাপতি নির্ব্বাচিত।

৮ই শ্রাবণ—

স্বত্বাধিকারীর সহিত মতান্তরে শ্রীযুত চিন্তামণির 'ডেলিমেল' পত্রের সম্পাদক পদত্যাগ। মাদারীপুরে বোমা ও বন্দুক লইয়া ডাকাইতি। লর্ড কার্জ্জনের উইল—দুইটি অট্টালিকা জাতিকে দান। রীফের নূতন চালে স্পেনের আশঙ্কা। কলিকাতা শ্বেতাঙ্গ সমাজে মহাত্মা গন্ধী। কৃষ্ণদাস পালের বার্ষিক স্মৃতি-সভায় মহাত্মা গন্ধী। গৌহাটীতে শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু।

৯ই শ্রাবণ—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শারীরিক ব্যায়াম শিক্ষার ব্যবস্থা। দেশের জন্য রাজপুত-মহিলা কলাবতীর কারাবরণ। বাঁকুড়া জেলে রাজবন্দী গণেশ ঘোষের নিগ্রহ। বর্দ্ধমান মঙ্গলকোঁটে রাজবন্দী বিনয়েন্দ্র চৌধুরী পীড়িত। গণ্ডালে ব্রাহ্মণ-বিধবা অপহরণ। আমেদাবাদে হিন্দু-বালক খুনে হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গা। ডাক্তার আনী বেসান্টের সম্রাট-দম্পতির সহিত সাক্ষাৎ।

১০ই শ্রাবণ—

সার তেজবাহাদুর সপ্রুর সভাপতিত্বে এলাহাবাদে মডারেট সভা। রাজবন্দী খগেন্দ্রনাথ দাসগুপ্তের চক্ষুরোগ।

১১ই শ্রাবণ—

পুনায় নূতন রেলষ্টেশন—গভর্ণর কর্তৃক দ্বারোদ্ঘাটন। কপূর্থলার মহারাজার আমেরিকা ভ্রমণ। শিলচরে মোটর চাপায় ২ জন শ্রমিক রমণীর মৃত্যু। কলিকাতায় খৃষ্টান ধর্ম্মযাজক সভায় মহাত্মা গন্ধী।

১২ই শ্রাবণ—

হাইকোর্টে তারকেশ্বর মোহান্তের মামলা—রিসিভার নিয়োগে আপত্তি। মাদ্রাজে কুড্ডাপা জিলায় হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গা। দ্বারভাঙ্গায় পায়রা শিকারে ১২ বৎসরের বালক হত্যা। হংকংএ ধর্ম্মঘটের অবসান। আমেদাবাদে নোট জালে এক পরিবারের সকল লোক গ্রেপ্তার।

১৩ই শ্রাবণ —

হাইকোর্টে তারকেশ্বর মোহান্তের পরাজয়, রিসিভার নিয়োগ বহাল। রাজবন্দী পূর্ণ আচার্য্য স্বগৃহে আটক। মাদ্রাজে গোদাবরী নদীতে বন্যা। বারাসতে ভীষণ ডাকাইতি। ভারতবাসী ইংরাজদিগের সভায় (কলিকাতায়) মহাত্মা গন্ধীর বক্তৃতা। বিলাতে শ্রমিক-সম্মিলনে শ্রীযুত যোশীর বক্তৃতা। উরগাঁও খনি দুর্ঘটনায় ৮ জনের জীবন্ত-সমাধি।

১৪ই শ্রাবণ—

কলিকাতা আলবার্ট হলে জনসভায় ভারত-সচিবের উক্তি আলোচনা। 'শতবর্ষের বাঙ্গালা' বাজেয়াপ্ত। কলিকাতার মেয়র নিয়োগে মহাত্মা গন্ধীর উপদেশ। অযোধ্যা সীতাপুরে হিন্দু-মুসলমানে বিরোধ।

১৫ই শ্রাবণ—

নোয়াখালি ও বরিশালের নানাস্থানে নোট জাল। কলিকাতায় তিলক স্মৃতি-সভা। উড়িষ্যার বন্যায় সরকারী ইস্তাহার। চীন কর্তৃক তিব্বত আক্রমণের উদ্যোগ। চিকিৎসকের পরামর্শ অনুসারে রাজা ফৈজুলের য়ুরোপ যাত্রা। যুবরাজের দক্ষিণ-আমেরিকা যাত্রা। পেশোয়ার খাইবারে ভীষণ বন্যা।

১৬ই শ্রাবণ—

মহরমে শোভাবাজারে হাঙ্গামা। কলিকাতায় ফুটবলের শিল্ডের শেষ খেলা, রয়াল স্কটের জয়। করাচীতে শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুর বক্তৃতা। সার বিপিনকৃষ্ণ বসু পুনরায় নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার নির্ব্বাচিত। পারস্য সৈনিক কর্তৃক মহামেরার প্রাসাদ আক্রমণে ১ শত আরব নিহত। লণ্ডনে পাতিয়ালার মহারাজা।

১৭ই শ্রাবণ—

মহাত্মা গন্ধীর দ্বারভাঙ্গার মহারাজার গৃহে গমন। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় দেশবন্ধু দাশের শোকপ্রকাশ প্রস্তাব আলোচনা বন্ধ। মহরম উপলক্ষে পাণিপথে গণ্ডগোল ও ধরপাকড়। ফেনীতে দুইটি স্থানে সশস্ত্র ডাকাইতি।

১৮ই শ্রাবণ—

ব্রহ্মদেশে বয়কট দল কর্তৃক ব্যবস্থাপক সভা বর্জ্জন। বিক্রমপুর সিদ্ধেশ্বরী কালীমন্দিরে পুলিস কর্ম্মচারীর অনাচারের সংবাদ। দিন দুপুরে হাজরা রোডে সশস্ত্র ডাকাতি। সিভিল সার্ভিসে মহিলা গ্রহণের ব্যবস্থা মঞ্জুর। করাচীতে মিউনিসিপালিটী কর্তৃক শ্রীমতী নাইডুর সংবর্দ্ধনা।

১৯শে শ্রাবণ—

ছাত্রীহরণে কলিকাতায় মাদ্রাজী গৃহ-শিক্ষকের কারাদণ্ড। ভাগলপুরে ২৫ লক্ষ টাকার জমীদারী লইয়া মামলা। কাবুলে দেশবন্ধু দাশের জন্য শোকপ্রকাশ। কলিকাতায় চন্দ্রগ্রহণে বিরাট বাবস্থা। ৬৯২ জন ভারতবাসী শ্রমিকের বৃটিশ গিয়ানা হইতে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন। আসামের গারো হিলে কয়লার খনি আবিষ্কার। অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায়ের প্রতিনিধির মহাত্মাজীর সহিত সাক্ষাৎ।

২০শে শ্রাবণ—

মান্দালয় জেলের রাজবন্দিগণ কর্ত্তৃক শ্রীমতী বাসন্তী দেবীর নিকট পত্র প্রেরণ। পদ্মায় নৌকাডুবীতে ৫ জনের মৃত্যু। মান্দালয় জেলে রাজবন্দী জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষের পীড়া। হাইকোর্টে প্রতাপ গুহরায়ের আপীলের বিচার আরম্ভ। বহরমপুরে মহাত্মা গন্ধী, আজিমগঞ্জ, জিয়াগঞ্জ, নশীপুর প্রভৃতি পরিদর্শন। ষ্টার থিয়েটারে কর্ণার্জ্জুনের দ্বিশততম অভিনয়োৎসব।

২১ শ্রাবণ—

কলিকাতা গেজেটে বি, এ, পরীক্ষার ফল প্রকাশ। অপরাহ্নে সার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু। বারাকপুরে বিরাট জনসমাগম। কার্পাসের অভাবে আমেদাবাদের কল বিপন্ন। বড় লাট লর্ড রেডিংএর ভারতে প্রত্যাগমন। বহু হজযাত্রীর দিল্লীতে প্রত্যাগমন।

২২শে শ্রাবণ—

মধ্যপ্রদেশে মন্ত্রিপদ গ্রহণের লোকাভাব। উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের দানে খড়দহে নূতন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা। বারাকপুরে সার সুরেন্দ্রনাথ-ভবনে মহাত্মা গন্ধী। সার সুরেন্দ্রনাথের মৃত্যুতে দেশের সর্ব্বত্র শোকপ্রকাশ।

২৩শে শ্রাবণ—

লর্ড লিটনের কলিকাতায় প্রত্যাগমন। কুমিল্লায় ভিক্টোরিয়া কলেজের ছাত্র নলিনীমোহন সরকার অর্ডিনান্সে গেপ্তার। জেমসেদপুরে মহাত্মা গন্ধী—শ্রমিকসঙ্ঘ সমস্যার সমাধান চেষ্টা। চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যালিটী কর্ত্তৃক মেয়র যতীন্দ্রমোহনের সংবর্দ্ধনা। সিরিয়ায় আরব-বিদ্রোহ, ফরাসীর ভাগ্য বিপর্য্যয়। মিনার্ভা থিয়েটারের নূতন গৃহ প্রতিষ্ঠা।

২৪শে শ্রাবণ—

আহিরীটোলা ক্লাবের বার্ষিক উৎসব। পনায় মুসলমান-শিক্ষা বৈঠক। কাকোরীতে প্যাসেঞ্জার ট্রেনে ভীষণ ডাকাইতি, বহু আরোহী হতাহত। বোম্বায়ে শ্রমিক চাঞ্চল্য—কাপড়ের কলে গণ্ডগোল। জেমসেদপুরে মহাত্মাকে টাকার তোড়া প্রদান।

২৫শে শ্রাবণ—

হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়ুর্ব্বেদ কলেজ প্রতিষ্ঠার আয়োজন। নাগপুরে প্রবল বন্যা, বহু পশুর প্রাণনাশ। ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় ও রায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরীর জাতীয় দলের সদস্যপদ ত্যাগ। সিরিয়ায় ফরাসী গভর্ণর বন্দী।

২৬শে শ্রাবণ—

কলিকাতার নিকট বৃদ্ধ বিপত্নীকের কীর্ত্তি, বিবাহ-সভা হইতে পলাইয়া গঙ্গাগর্ভে ঝম্প প্রদান। আসাম গভর্ণর সার জন কারের ইংলণ্ড যাত্রা। আসাম মাধবপুর চা-বাগানে ম্যানেজার কুলী-হত্যার মামলায় দায়রায় সোপর্দ্দ। মাদ্রাজ কর্পোরেশনে স্বরাজ্য দলের জয়। পিকিন দূতাবাসে ধর্ম্মঘট।

২৭শে শ্রাবণ—

কলিকাতা কর্পোরেশনে আবার পীরের সমাধি সমস্যার আলোচনা। জাতীয় আয়ুর্বিজ্ঞান কলেজে মহাত্মা গন্ধী। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন আরম্ভ, কুমার শিবশেখরেশ্বর রায় সভাপতি নির্ব্বাচিত। দৈনিক বসুমতীর দ্বাদশ বর্ষ আরম্ভ। ব্যারিষ্টার শ্রীযুত ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ "বেঙ্গলী" পত্রের সহযোগী সম্পাদক নিযুক্ত।

২৮শে শ্রাবণ—

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার দ্বিতীয় দিনের অধিবেশন ; নূতন সভাপতি কুমার শিবশেখরেশ্বর রায়ের কার্য্যভার গ্রহণ। চীনদেশে জনতার উপর গুলী বর্ষণে চাঞ্চল্য। হাইকোর্টের প্রবীণ উকীল মহেন্দ্রনাথ রায়ের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ। শিক্ষার বাহন সম্পর্কে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়।

২৯শে শ্রাবণ—

শ্রীরামপুর বয়ন বিদ্যালয়ে মহাত্মা গন্ধী। কলিকাতায় শ্রীযুত চিন্তামণি আলিগড়ে ভীষণ হিন্দু মুসলমানে দাঙ্গা। টাউন হলে সার সুরেন্দ্রনাথের শোক সভা। কোরিয়ায় ভীষণ বন্যা। ফ্রান্সে রেল দুর্ঘটনায় ৯ জনের মৃত্যু।

৩০শে শ্রাবণ—

লাহোরে ভীষণ জলপ্লাবন—সমগ্র সহর জলমগ্ন। কামালপাশার পত্নী ত্যাগ। চট্টগ্রামে লবণ ব্যবসায়ীর বিপদ, নীলামে লবণ বিক্রয়।

৩১শে শ্রাবণ—

২৪ পরগণা মহেশতলায় ডাকাতিতে গ্রামবাসীদিগের সহিত ডাকাত দলের লড়াই। মরিশসে ভারতীয় শ্রমিক সমস্যা সম্পর্কে মহারাজ সিংএর কথা। মণিরাম পুরে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রাদ্ধ। দক্ষিণ আমেরিকায় বৃটিশ স্বরাজ। শ্রীযুত তুলসীচন্দ্র গোস্বামীর বিলাত হইতে কলিকাতায় প্রত্যাগমন। ভারত সভা গৃহে জাতীয় মডারেট সংঘের অধিবেশন।

১লা ভাদ্র—

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন, বহু বেসরকারী বিলের আলোচনা। নবদ্বীপে মৎস্যজীবিগণের উপর খাজনা আদায়ের জন্য সরকার হইতে নোটীশ জারি। শ্রীযুত যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের চট্টগ্রাম গমন। কলিকাতা হাইকোর্টে রাজবন্দী শচীন্দ্রনাথ সান্যালের বিচার। কলিকাতায় কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। শ্রীযুত রাজেন্দ্রপ্রসাদের সভাপতিত্বে কাশী বিদ্যাপীঠের দ্বিতীয় বার্ষিক কনভোকেসন।

২রা ভাদ্র—

কলিকাতা রোটারী ক্লাবে চরকার উপকারিতা সম্বন্ধে মহাত্মা গন্ধীর বক্তৃতা। মহাত্মা গন্ধীর কটক যাত্রা। নবাব সুজাত আলি বেগের মৃত্যুতে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন বন্ধ। নূতন দিল্লী নগর প্রতিষ্ঠা কল্পে সম্রাটের ভারতাগমনের সঙ্কল্প। রেঙ্গুনে ডাকাতির অভিযোগে য়ুরোপীয় পুলিস কর্ম্মচারী অভিযুক্ত।

৩রা ভাদ্র—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক বঙ্গভাষা বাধ্যতামূলক করিবার চেষ্টা। হাতোয়ার শোভাযাত্রা সম্পর্কে হিন্দুমুসলমানে ভীষণ দাঙ্গা। ডাক্তার সুরাবর্দ্দী কর্ত্তৃক স্বরাজ্য দলের সদস্য পদ ত্যাগ। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন। চীন কর্ত্তৃক সন্ধির সর্ত্ত লঙ্ঘনে বৃটীশের সহিত যুদ্ধ সম্ভাবনা। খাঁ বাহাদুর খাজা মহম্মদ নুর বিহার ও উড়িষ্যা ব্যবস্থাপক সভার সভাপতি নির্ব্বাচিত।

৭ঠা ভাদ্র—

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন—সরকারের অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ। হুগলিতে জল সরবরাহ সমস্যায় মিউনিসিপ্যাল কর বন্ধের আন্দোলন। ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের উদ্বোধনে বড় লাটের বক্তৃতা দ্বৈতা শাসন সম্পর্কে স্পষ্ট কথা। সারণ মীরগঞ্জে হিন্দু মুসলমানে হাঙ্গামা।

৫ই ভাদ্র—

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় রাজবন্দী অনিলবরণ ও সত্যেন্দ্রচন্দ্রের কথা। বসরায় ভীষণ অগ্নিকাণ্ডে ১০ লক্ষ টাকা ক্ষতি। চীনে ধর্ম্মঘটে হংকং বন্দরে প্রত্যহ ২ লক্ষ পাউণ্ড ক্ষতি। বজ্র পতনে বৃটিশ প্রদর্শনীর একাংশ ভস্মীভূত। বহরমপুর ষ্টেশনে বহু এংলো ইণ্ডিয়ান গ্রেপ্তার।

৬ই ভাদ্র—

ডাক্তার আবদুল্লা সারওয়ার্দ্দীর স্বরাজ্য দল ত্যাগে মহাত্মা গন্ধী। ভাগলপুর জুবিলী কলেজে বিহারী ও বাঙ্গালী ছাত্রে মারামারি। বিলাতে পাচিকার সহিত লক্ষ পতির বিবাহ। শ্রীযুত ভি. জে. পটেল ব্যবস্থাপরিষদের সভাপতি নির্ব্বাচিত।

৭ই ভাদ্র—

কলিকাতায় বহু জুয়ার আড্ডায় পুলিসের হানা ২ শত জুয়াড়ী গ্রেপ্তার। স্বামী ওঙ্কারানন্দের কারামুক্তি। টিটাগড়ে হিন্দু মুসলমানে দাঙ্গা। পণ্ডিত গোপবন্ধু দাসের কলিকাতা আগমন।

৮ই ভাদ্র—

ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে পুরাতন সভাপতির বিদায় ও নূতন সভাপতির কার্য্যভার গ্রহণ, নোয়াখালিতে ভীষণ নৌকা ডুবী। ডাক্তার সার রামকৃষ্ণ ভাণ্ডার করের মৃত্যু। ওহাবিগণ কর্ত্তৃক মদিনা আক্রমণ মিশরে সর্দ্দার লীষ্টাকের হত্যাকারিগণের প্রাণদণ্ড।

৯ই ভাদ্র—

কবীন্দ্র রবিন্দ্রনাথ ঠাকুরের পীড়া। ভারতীয় রাষ্ট্রীয় পরিষদের অধিবেশন। অষ্ট্রেলিয়ায় বৃটিশ জাহাজ আটক। ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে ১৫টি নূতন বিলের আলোচনা। গঙ্গায় ভীষণ দুর্ঘটনা ও ৪ জনের মৃত্যু।

১০ই ভাদ্র—

মাদারীপুরে ভীষণ ডাকাতি, গ্রামবাসী কর্ত্তৃক ডাকাত গ্রেপ্তার। রাষ্ট্রীয় পরিষদে ৬টি সরকারী বিল পাশ। দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতবাসীর প্রতি অবিচার, স্ত্রী-পুত্র পরিবার বিতাড়িত। শ্যামবাজার নূতন পার্কে মহাত্মা গন্ধীকে মানপত্র প্রদান। ব্যবস্থা পরিষদে কতকগুলি বে সরকারী বিলের আলোচনা।

১১ই ভাদ্র—

চাঁদপুরে সশস্ত্র ডাকাতি, ৩ হাজার টাকা উধাও। বাঙ্গালী বালকের পদব্রজে মানস সরোবর যাত্রা। রাজবন্দী যতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যের পীড়া। ডুরুস বিদ্রোহীদের দামাস্কস আক্রমণ। চাইবাসায় মহাত্মা গন্ধী। বৈদ্যবাটীতে শোচনীয় রেল দুর্ঘটনা। মদিনা অপবিত্র হওয়ায় বোম্বায়ে হরতাল।

১২ই ভাদ্র—

মদিনায় গোলাবর্ষণ সম্পর্কে মৌলানা আবুল কালাম আজাদের ইস্তাহার। রাজবন্দী প্রভাতচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর দুরবস্থা। শ্যামবাজার পার্কে চরকা প্রদর্শনী। প্রসিদ্ধ ওস্তাদ যদুনাথ রায়ের মৃত্যু। কলিকাতা ওভারটুন হলে মহাত্মা গন্ধীর বক্তৃতা।

১৩ই ভাদ্র—

বিচারপতি পেজের বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা রুজু। ২২ মাইল সন্তরণ প্রতিযোগিতা। বোম্বায়ে জনসভায় পেলকৎ কমিটীর প্রতি অনাস্থা প্রকাশ। কাঁকিনাড়ায় শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা। বোম্বায়ে মুসলমান সভায় মৌলানা সৌকত আলির অপমান। অমৃতসরে ডাকাতে পুলিসে লড়াই।

১৪ই ভাদ্র—

আলবার্ট হলে ডাক্তার প্রতাপচন্দ্র গুহ রায়ের বিদায় অভিনন্দন সভা। লাহোরে বিরাট মুসলমান সভা। নোয়াখালি রামগঞ্জে ৭ জন ভদ্র যুবক গ্রেপ্তার। ১০ মাইল সন্তরণ প্রতিযোগিতা।

১৫ই ভাদ্র—

খুলনায় জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটের বিরুদ্ধে অভিযোগ। আমেদাবাদে হিন্দু মুসলমান সংঘর্ষ। বসরায় অগ্নিকাণ্ডে ৫০ হাজার পাউণ্ড মূল্যের সম্পত্তি নষ্ট। কাঁকিনাড়ায় শোভাযাত্রা উৎসবে হিন্দু মুসলমানে হাঙ্গামা—১২ জন আহত। মদিনায় ধর্ম্মমন্দির অপবিত্র হওয়ায় করাচীতে হরতাল।

১৬ই ভাদ্র—

ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে কতকগুলি সরকারী বিলের আলোচনা। মহাত্মা গন্ধীর বাঙ্গালা ত্যাগ। আইন অমান্য করায় রাজবন্দী পরমানন্দ দে অভিযুক্ত। এলাহাবাদে ছেলেধরা আতঙ্ক। সুকবি মুনীন্দ্রনাথ ঘোষের মৃত্যু।

১৭ই ভাদ্র—

রেঙ্গুণে বিরাট নাবিক ধর্ম্মঘট। দেওঘরে ডাকাতের দৌরাত্ম্য। দার্জ্জিলিংএ টাকার গোলমালে ডেপুটি পোষ্টমাষ্টার জেনারেল অভিযুক্ত। রাষ্ট্রীয় পরিষদে উত্তরাধিকার সংক্রান্ত আইন আলোচনা।

১৮ই ভাদ্র—

জুনাগড়ে শিবমূর্ত্তির সম্মুখে বলিদান। প্রেম বিভ্রাটে কলিকাতায় দুই জন এংলো ইণ্ডিয়ানের মল্লযুদ্ধ। বাঁকুড়া কলেজ হোষ্টেলে ছাত্রগণের প্রায়োপবেশন। বরিশাল বাজারে পিকেটিং আরম্ভ। ব্যবস্থা পরিষদে সহবাস সম্মতির আইনের আলোচনা।

১৯শে ভাদ্র—

গণপতি উৎসবে বুলদানায় হিন্দু মুসলমানে সংঘর্ষ। ১৬ বৎসর পরে যুক্তপ্রদেশ হত্যাকাণ্ডের আসামী গ্রেপ্তার। অষ্ট্রেলিয়ায় বৃটিশ সাম্রাজ্যের সংবাদপত্রসেবীদিগের সম্মিলন। ঢাকা ওয়াকফ সম্পত্তির মামলায় রহস্য প্রকাশ। দেরাদুনে স্বামী বিচারানন্দের উপর প্রস্তর বর্ষণ। সার্ভেণ্ট পত্রের পঞ্চম বার্ষিক উৎসব।

২০শে ভাদ্র—

মুন্সীগঞ্জে ভীষণ জলপ্লাবন। ভারতের প্রতি বিলাতের শ্রমিক দলের সহানুভূতি প্রকাশ। গ্লাসগোতে ভারতবাসী খুন। সিমলায় ধলার হাতে কালা কুলীর মৃত্যু। মদিনার প্রকৃত অবস্থা জানিবার জন্য ভারত হইতে প্রতিনিধির প্রেরণের ব্যবস্থা।

২১শে ভাদ্র—

দমদমার নিকট ডাকাতিতে পুলিসের উপর গুলী ২ জন লোক গ্রেপ্তার। আমেদাবাদে শ্রমিক সংঘের সহিত মহাত্মা গন্ধীর সাক্ষাৎ। মির্জ্জাপুর পার্কে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় কর্তৃক শুদ্ধ খদ্দর প্রদর্শনী উদ্বোধন।

২২শে ভাদ্র—

মরক্কোর যুদ্ধে রীফদিগের বলবৃদ্ধি। ঢাকায় অর্ডিনান্সে ৩ জন গ্রেপ্তার। শ্যাম পার্কে সার সুরেন্দ্রনাথের শোকসভা। সাহ এম-দাদুল হকের স্বরাজ্যদল ত্যাগ। ব্যবস্থা পরিষদে মুডিম্যান কমিটীর রিপোর্টের আলোচনা। কাঁকিনাড়ায় মুসলমান কর্ত্তৃক শিবমূর্ত্তি ভঙ্গ।

২৩শে ভাদ্র—

ভারতীয় ব্যবস্থাপরিষদে মুডিম্যান রিপোর্ট সম্পর্কে পণ্ডিত মতি লাল নেহরুর প্রস্তাব গৃহীত। হাওড়া পুলের জন্য টাকা প্রদানে ভারত সরকারের অসম্মতি।

২৪শে ভাদ্র—

মির্জ্জাপুর পার্কে লাঠিখেলা। ব্যবস্থা পরিষদে যে সরকারী বিলের আলোচনা। এলাহাবাদে অতি বৃষ্টি। পার্লামেণ্টে মিষ্টার সাকলাত ওয়ালার নির্বাচনে আপত্তি। আবদুল করিমের আড্ডায় বোমা নিক্ষেপ। বোম্বায়ে অভিনেত্রী গ্রেপ্তার।

২৫শে ভাদ্র—

শ্রীরামপুরে দারোয়ানে ছাত্রে হাঙ্গামা। মাদ্রাজ ব্যবস্থাপক সভায় দেবমন্দিরে বলি বন্ধের চেষ্টা। শোণ নদীতে ভীষণ বন্যায় রেললাইন ভগ্ন। ব্যবস্থা পরিষদে লী লঠ সম্বন্ধে আলোচনা। রাষ্ট্রীয় পরিষদে দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতবাসী সম্বন্ধে আলোচনা। এক দল গুরুকের বিনা টিকিটে ভ্রমণের ফলে নোয়াখালি ষ্টেশনে হাঙ্গামা।

২৬শে ভাদ্র—

বোম্বায়ে বেলজিয়ামের রাজদম্পতি। রাষ্ট্রীয় পরিষদে শ্রীযুত শেঠনার শাসন সংস্কার সম্বন্ধীয় প্রস্তাব পরিত্যক্ত। জেলে শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসুর ওজন হ্রাস। আসাম বেঙ্গল রেলের এজেণ্টের পদ-ত্যাগ। রঙ্গপুর কলেজে ছাত্রের অপমানে চাঞ্চল্য। মাদ্রাজ ব্যবস্থা-পক সভার সভাপতির মৃত্যু।

২৭শে ভাদ্র—

পুরুলিয়ায় বিহার প্রাদেশিক সম্মিলন; মহাত্মা গন্ধীর যোগদান। কলেজ সমূহে বাধ্যতামূলক বাঙ্গালা অধ্যাপনার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রস্তাব। গয়ায় শোভাযাত্রা বন্ধে ১৪৪ ধারা জারি। চট্টগ্রামে বন্যা। মরক্কোয় ফরাসী আক্রমণ। নারায়ণগঞ্জে যতীন্দ্র-মোহন সেনগুপ্ত।

২৮শে ভাদ্র—

রেঙ্গুণ জুবিলী হলে সভায় গণ্ডগোল, বক্তার প্রতি চেয়ার নিক্ষিপ্ত। নারায়ণগঞ্জে মিউনিসিপ্যাল নির্ব্বাচনে স্বরাজ্য দলের জয়। বিজয়ী শিখ বীরগণের পাঞ্জাব হইতে কলিকাতা প্রত্যাগমন। ঢাকায় পণ্ডিত শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী।

২৯শে ভাদ্র—

দামাস্কসে হরতাল। দার্জ্জিলিংএ মহারাজা ক্ষৌণীশচন্দ্র রায়ের সংবর্দ্ধনা। মার্কিণে মিষ্টার শাকলাতওয়ালার প্রতি তীব্র দৃষ্টি। পুরুলিয়ায় অস্পৃশ্য জাতির সভায় মহাত্মা গন্ধীকে মানপত্র দান।

৩০শে ভাদ্র—

বালী পাটকলে ধর্ম্মঘট। লক্ষ্ণৌ সিতারপুরে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গায় পুলিসের গুলী বর্ষণ, কয়েক জন হতাহত। বোম্বায়ে কাপড়ের কল-সমস্যা—১৪টি কল বন্ধ—৩০ হাজার শ্রমিকের ধর্ম্মঘট। ব্যবস্থা- পরি-ষদে ট্রেড ইউনিয়ন বিলের আলোচনা। শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু কানপুর কংগ্রেসের সভানেত্রী নির্ব্বাচিত। বরিশালে বোমার আতঙ্কে বহু বাড়ীতে খানাতল্লাস।

৩১শে ভাদ্র—

কলিকাতায় বেলজিয়ম রাজ-দম্পতি। দণ্ডিত ব্যক্তিদিগের ব্যবস্থাপক সভা প্রবেশ সম্বন্ধীয় প্রস্তাব ব্যবস্থা-পরিষদে গৃহীত। ঢাকায় যতীন্দ্র-মোহন সেনগুপ্ত, মিউনিসিপ্যালিটির অভিনন্দন প্রদান।

১লা আশ্বিন—

রাঁচীতে মহাত্মা গন্ধী। ভারতীয় রাষ্ট্রীয় পরিষদে বড় লাটের বক্তৃতা। স্বামী বিশ্বানন্দের বন্ধ্যাগমনে মণিপুর মহারাজার আপত্তি। ব্যবস্থা-পরিষদে কারখানা সংক্রান্ত আইনের আলোচনা—বস্ত্র-শিল্পের স্বদেশী শুল্ক সম্বন্ধীয় প্রস্তাব গৃহীত। মহাত্মা গন্ধীর সহিত বিহার মন্ত্রীর সাক্ষাৎ। লক্ষ্ণৌ সহর জলমগ্ন।

২রা আশ্বিন—

বোম্বায়ের অধ্যাপক শ্রীযুত বিনয়কুমার সরকার। আমেদাবাদ লাট অভিনন্দনে বাধা। জাপানে প্রিন্স জর্জ্জ। অতি বৃষ্টিতে দার্জ্জি-লিংএর রেলপথ লণ্ডভণ্ড, ট্রেণ যাতায়াত বন্ধ। মাদ্রাজে বারবনিতা দমন আইন।

৩রা আশ্বিন—

কলিকাতায় রাহাজানির অপরাধে জমীদার গেপ্তার। ঢাকায় ৪টি স্থানে খানাতল্লাস ও নরেন্দ্রমোহন সেন গ্রেপ্তার। দার্জ্জিলিংএ বেল-জিয়ামের রাজদম্পতি। শ্রীযুত সাকলাতওয়ালার টাটার চাকুরী ত্যাগ। গয়ায় মহাত্মা গন্ধী। তুরস্ক ও ইরাকের মধ্যবর্ত্তী স্থানে ৮ হাজার খৃষ্টান গৃহহীন।

সম্পাদক—শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু

কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, 'বসুমতী' বৈদ্যুতিক-রোটারী-মেসিনে শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত
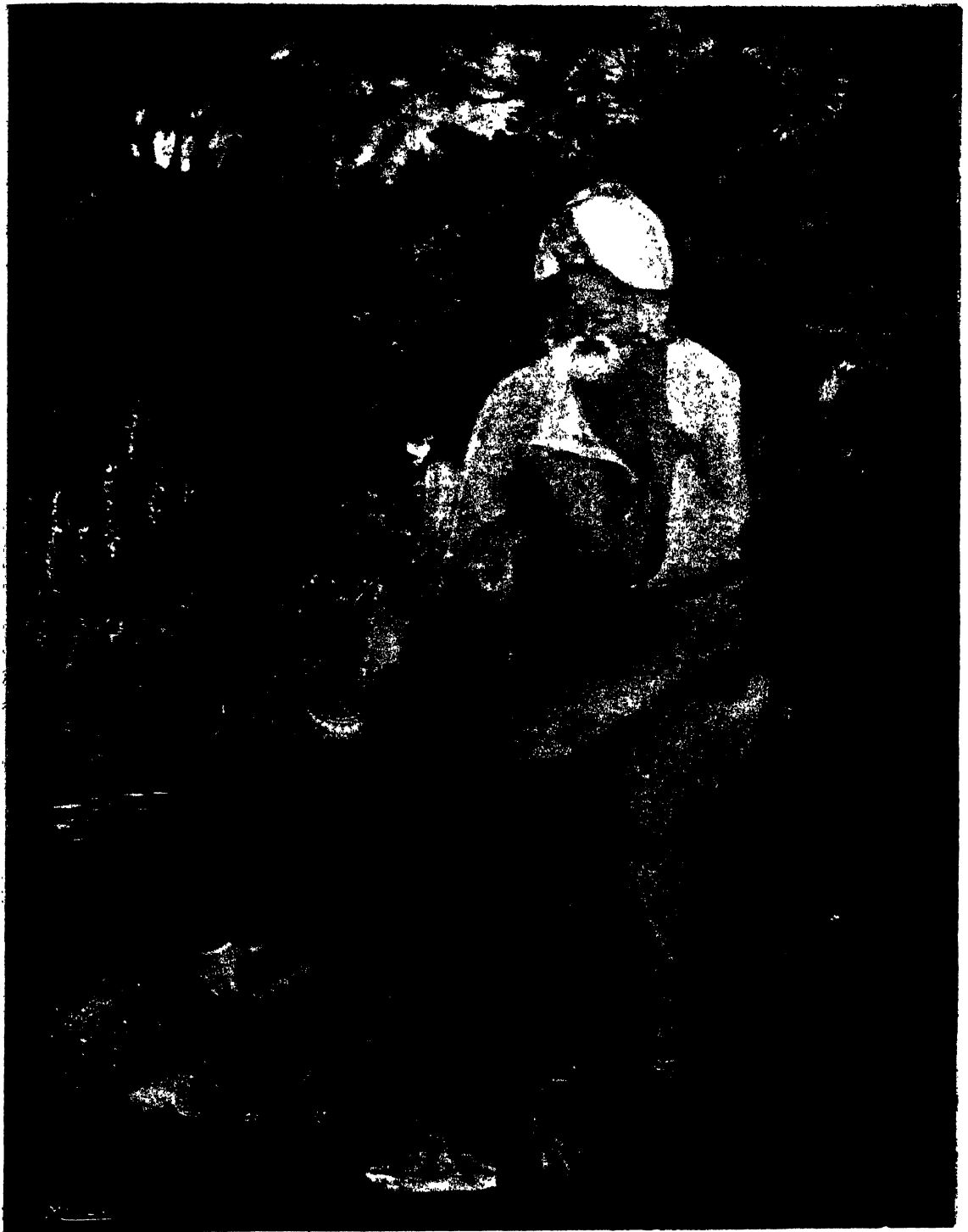
"দেখছ প্রিয়া—পূব গগনের স্বর্ণ-কিরণ চাঁদটি আজ,
দিচ্ছে উঁকি পাতার ফাঁকে মোদের মিলনকুঞ্জমাঝ।
তোমার কবি সেই যেদিনে ভুলবে ধরার মিলন-সুখ,
কার খোঁজে ওর পড়বে হেথায় অশ্রু-মলিন দৃষ্টিটুক।"

—ওমর খৈয়ম।

বসুমতী প্রেস] [শিল্পী—শ্রীউপেন্দ্রনাথ ঘোষ দস্তিদার

৪র্থ বর্ষ] চৈত্র, ১৩৩২ [৬ষ্ঠ সংখ্যা

গান ॥7৪৫ স্বাক্ষর

মাধবিকা

অনন্তের বাণী তুমি, বসন্তের মাধুরী উৎসবে
আনন্দের মধুপাত্র পরিপূর্ণ করি দিবে কবে?
বঞ্জুল নিকুঞ্জতলে
সঞ্চরিবে লীলাচ্ছলে,
চঞ্চল অঞ্চলগন্ধে বনচ্ছায়া রোমাঞ্চিত হবে॥

মন্থর মঞ্জুল ছন্দে মঞ্জীরের গুঞ্জন কল্লোল
আন্দোলিবে ক্ষণে ক্ষণে অরণ্যের হৃদয়-হিন্দোল।
নয়নপল্লবে হাসি
হিল্লোলি' উঠিবে ভাসি',
মিলন-মল্লিকা-মাল্যে সাজাইবে পরাণ-বল্লভে॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৮ ফাল্গুন
১৩৩২

সৃষ্টির মিলন

যে দেশের মানুষ আমরা, সে দেশ সম্বন্ধে বার বার নানা উপলক্ষ্যে নতুন ক'রে আমাদের চৈতন্য উদ্বোধিত হওয়া চাই। কোনো কোনো বিশেষ কালের বিশেষ সুযোগে যখন আমাদের হৃদয় পূর্ণচন্দ্রের উদয়ে সমুদ্রের মত উদ্বেল হয়ে উঠে, তখন আমাদের একটি মহৎ উপলব্ধি হচ্চে আপনাদের ঐক্যের নূতন উপলব্ধি। আজকের দিনে আপনারা যে সকলে মিলে আমাকে আপনার ব'লে গ্রহণ করলেন, তার মধ্যে থেকে আমি এই কথাটি পাচ্চি যে, আমার সাধনার ভিতরে পূর্ব্ববঙ্গ একটি ঐক্য অনুভব করচে। যে এক-ভাষার সূত্রে দেশের বর্ত্তমানের সঙ্গে ভাবী কালের, এক-প্রান্তের সঙ্গে আরেক প্রান্তের যোগ, আমার মধ্যে সাহিত্যের সেই যোগসূত্রকেই আপনারা সম্বর্দ্ধনা করলেন। বাণী-লোকে দেশের অন্তরতম ঐক্যের যে-রূপ আমাকে উপলক্ষ্য ক'রে এখনি আপনাদের সকলের অনুভবে প্রকাশিত, সেই সম্মিলিত অনুভূতির অপূর্ব্ব আনন্দ আমাকে স্পর্শ করেচে।

বাংলা দেশের মাঝখান দিয়ে এসে গঙ্গা সমুদ্রের সঙ্গ লাভ করলে। সেই আসন্ন মিলনের মুখে নদী পূর্ণ হয়েছে, উদার হয়েছে। নদীর এই পূর্ণতা বাংলা দেশের দুই তীরকেই বরদান ক'রে প্রবাহিত। নদী এ দেশকে বিচ্ছিন্ন করে নি, দুই মাতৃবাহুর মত দুই তীরকে পরস্পরের কাছে টেনে এনেছে। সর্ব্বাঙ্গে প্রসারিত বহুশাখায়িত নাড়ী যেমন এক চৈতন্যের ধারাকে অঙ্গে প্রত্যঙ্গে ব্যাপ্ত ক'রে দেয়, এই নদীরও সেই কাজ।

পৃথিবীর অধিকাংশ বড় বড় সভ্যতাই কোনো না কোনো নদীকে আপন বাহন করেচে। ঈজিপ্টে নীল নদ, পশ্চিম-এসিয়ায় ইউফ্রাটিস, পারস্যে অক্সাস, চীনে য়াঙ-সিকিয়াঙ। মাটির যে পথ, তার গতি নেই, জলের যে পথ, সে আপন গতির দ্বারা মানুষকে গতিবান করে; মানুষের চিন্তা ও কর্ম্মধারাকে তীর থেকে তীরে, দূর থেকে দূরে প্রসারিত ক'রে দিয়ে সমাজের ঐক্যসাধন করে। নদীতে নদীতে মিলে আপন পলিমাটি দিয়ে বাংলা দেশকে কেবল যে রচনা করেচে, আপন স্তন্য দিয়ে কেবল যে তাকে পালন করেচে, তা নয়, এখানকার মানুষকে মানুষের কাছে টেনেছে। তাই বহুযুগ থেকে যখন নদীবাহুবেষ্টিত বাংলার মৃণ্ময়ী মূর্ত্তি এক হয়ে গড়ে উঠচে, তার চিন্ময়ী মূর্ত্তিও ঐক্যলাভ করচে।

এই যেমন জলের একটি নদী, তেমনি আরেক নদী আছে, সে ভাষার নদী। ভাষার ঐক্য বাংলা প্রদেশে যেমন, মাদ্রাজ বোম্বাই প্রভৃতি অন্য প্রদেশে তেমন নয়। সে-দেশে কঠিন মাটির উপর দিয়ে পর্ব্বত-প্রান্তরের ব্যবধান ভেদ ক'রে মানুষ এখানকার মত এমন সহজে পরস্পরের কাছে চলাচল করতে পারে নি। বাংলা দেশে নিয়ত চলমান পথে ভাষা নিরন্তর সর্ব্বত্র প্রবাহিত হ'তে পেরেছে। এই-রূপে বাংলা দেশের নদী যেমন বাংলা ভাষাকে বহুবিস্তৃত করার দ্বারা বাঙালীর চিত্তকে ব্যাপকভাবে ঐক্য দেবার সুযোগ ক'রে দিয়েছে, তেমনি অন্নসচ্ছলতাকে এ প্রদেশে প্রসারিত ক'রে দেওয়াও এই নদীর দ্বারা ঘটেছিল। এই সচ্ছলতাই মানুষের আত্মীয়তাকে নিবিড় ক'রে দেবার প্রধান উপায়। উদ্বৃত্ত অন্ন ঘরে থাকলে মানুষ শ্রান্ত অতিথিকে, বুভুক্ষু অকিঞ্চনকে, দূরসম্পর্কীয় কুটুম্বকে দ্বার থেকে ফিরিয়ে দেয় না, অর্থাৎ যে-সমাজধর্ম্মে মানুষের প্রতি মানুষের দায়িত্বকে আত্মম্ভরিতার চেয়ে বড় ক'রে চর্চ্চা করতে বলে, সেই ধর্ম্ম স্বীকার করা সহজ হয় যদি ঘরে অন্নাভাব না থাকে। একদা সেই অন্নসচ্ছলতার দিনে বাংলার পল্লীতে পল্লীতে আত্মীয়তার বিস্তার অজস্রভাবে স্বাভাবিক হয়েছিল। তখনকার কালের বাঙালী-সমাজ নদীমাতৃকার পক্ষপাতে পরিপুষ্ট ছিল। এখন তার পরিবর্ত্তন ঘটেচে, এ কথা স্বীকার করতেই হবে। এমন নয় যে, আমাদের মাটির আর সফলতা নেই, বা নদীর ধারা গেছে শুকিয়ে; এখনো বর্ষে বর্ষে বর্ষায় বর্ষায় বাংলার প্রাঙ্গনে পলিপঙ্কের স্তর প্রকৃতি জননী লেপে দিয়ে যান; তবু পরিবর্ত্তন ঘটেচে। তার উপর কারো হাত নেই। এক দিন আমাদের আঙিনার চারিদিকে প্রাচীর তোলা ছিল; সেই প্রাচীরের মধ্যে দেশ আপনার সম্বলেই আপন ক্ষুধা মেটাত, প্রয়োজন জোগাত। আজ সমস্ত পৃথিবীর দাবী পৃথিবীর প্রত্যেক দেশের সাম্‌নে; সেই ভিড় এসেছে বাংলা দেশের দরজাতেও। নিজের প্রয়োজনের সামগ্রী একান্তভাবে সঞ্চয় ক'রে রাখবার আবরণটা আর রইল না। যে বৃহৎ

বাহির আমাদের হাটে ঘাটে মাঠে আজ জায়গা জুড়ে দাঁড়াল, তাকে ঠেকানো আর যায় না, দ্বার রোধ করতে গেলেও বিপত্তি। আমরা দুর্ব্বল ব'লে যে রোধ করতে পারিনে, তা নয়। যেমন পৃথিবীর বয়োবৃদ্ধির ভিন্ন ভিন্ন যুগে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার কারণে ভূস্তরসংস্থানের অনিবার্য্য পরিবর্ত্তন হয়েছে, তেমনি পৃথিবীব্যাপী মানবিক অবস্থার পরিবর্ত্তনে আমাদের সামাজিক নূতন ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন অনিবার্য্য। সে যদি আমাদের ইচ্ছাবিরুদ্ধ হয়, অভ্যাসবিরুদ্ধ হয়, তবু উপায় নেই। তাই যে-পরিমাণ ফলে ফসলে উৎপন্ন দ্রব্যে দেশের নিজের প্রয়োজন চ'লে যায়, আজ তাতে আমাদের দৈন্য দূর হ'তে পারে না। লোকালয়ের জীবন-ইতিহাসে আজ সকল হাটের মধ্যেই বিশ্বের বড় হাট, সেই হাটে সকল মানুষকে আমাদের ভাগ দিতে হবে। আগে যা ছিল বিল, এখন তা যদি নদী হ'য়ে যায়, তা হ'লে বাহিরের দিকে জলের টানের বিরুদ্ধে নালিশ ক'রে হবে কি? এখন নদীর সুযোগটা নেবার জন্য জীবনযাত্রাকে তারই অনুগত ক'রে তুল্‌তে হবে। সেইটে করতে পারার উপরেই আমাদের ঐশ্বর্য্যলাভ, আমাদের প্রাণরক্ষা নির্ভর করে।

একদা পল্লীতে পল্লীতে আত্মীয়তাজালে জড়িত যে-একটি স্নিগ্ধ সরস সংসারযাত্রা আমাদের ছিল, তার রস আজ গেছে শুকিয়ে। বহিঃপৃথিবীর সঙ্গে নূতন সম্বন্ধকে আমরা আয়ত্ত করতে পারি নি, তার খোলা দরজা দিয়ে যে-পরিমাণে আমাদের সম্বল বেরিয়ে যাচ্ছে, সে-পরিমাণে ভিতরে আমরা কিছু টেনে আনতে পারচিনে। এতে আমাদের সমাজে চিরাগত আত্মীয়তার মধ্যে কৃপণতা আপনিই এসে পড়চে। দেশের ঐশ্বর্য্য সকলে মিলে ভোগের দ্বারা যে সৌজন্য সম্বন্ধ অনেক দিন ব্যাপক হয়ে আমাদের মধ্যে বিরাজ করছিল, আজ তা নেই বল্লেই হয়। হৃদয়ের কোনো পরিবর্ত্তন হয়েছে, এমন কথা বলিনে। আমরা বাঙালী জাতি স্বভাবতই ভাব-প্রবণ,—আমরা সহজেই পরস্পরের আতিথ্যে আনন্দ পাই। আমাদের শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে বারবার দেখেছি, সেখানে বালকেরা যেমন ক'রে রোগীর সেবা, স্নিগ্ধভাবে পরস্পরকে যেমন ক'রে যত্ন করে, য়ুরোপ প্রভৃতি স্থানে এমন দেখা যায় না। য়ুরোপে নূতন ছাত্রদের প্রতি পুরাতন ছাত্রেরা যে অসহ্য দৌরাত্ম্য করে, যার থেকে কখনো কখনো প্রাণহানি পর্য্যন্ত ঘটে, আমাদের বিদ্যালয়ে তা আমরা কল্পনাই করতে পারি নে। দীর্ঘকাল-প্রচলিত সামাজিক অভ্যাসের দ্বারা বলপ্রাপ্ত ভাবপ্রবণতাই তার কারণ। আমাদের সেই মনোধর্ম্মটাই যে হঠাৎ উল্টে পাল্টে গেছে, তা বলা যায় না। আত্মীয়তার ক্ষেত্র উদার করবার জন্যে আমাদের চিত্তে আকাঙ্ক্ষা রয়েছে, কিন্তু উপায় নেই। সম্বলের অভাব ঘটাতে আমাদের অত্যন্ত মেরেছে। আমাদের কোমল মৃত্তিকার দেশে বহুদিন ধ'রে আমাদের যে স্বভাব লালিত হয়েছে, প্রবল হয়েছে, সেই স্বভাবটি আজ ক্লিষ্ট। রাষ্ট্রীয়সম্মিলন প্রভৃতি যে সকল সাধারণের কাজে আমরা মিলি, সে সব জায়গাতেও আমরা ব্যক্তিগত আত্মীয়তার আতিথ্য আয়োজন না দেখতে পেলে ক্ষুণ্ণ হই। অর্থাৎ ঘরকে বাইরেও খুঁজি। এই যে ঘরের ছাঁচে ঢালা আমাদের সমাজ, এ যখন সামাজিকতায় নিঃস্ব হয়ে যায়, তখন আমাদের আনন্দ থাকে না। তখন আমাদের যে বিকৃতি ঘটে, সেই বিকৃতি থেকে পরস্পরকে ঈর্ষ্যা করি, ভেদবুদ্ধি কথায় কথায় প্রবল হয়ে উঠে, পরস্পরকে ছোট করতে চাই, পরস্পরকে সহায়তা করবার জোর চ'লে যায়। এই বিকৃতির কালে আমাদের অন্তরের উপবাস ঘটে, তার ঔদার্য্য থাকে না। তাই আজ আমাদের স্বভাব তার আপনাকে প্রকাশ করবার বাধা পাচ্চে। সেই বাধাই আমাদের সকল মনোদৈন্যের মূলে। আমাদের শান্তিনিকেতনকে কেন্দ্র ক'রে পল্লীর যে-কাজ চল্‌চে, সেই উপলক্ষ্যে দেখতে পাই, গ্রামগুলি একেবারে দেউলে। তাদের চেহারা ভগ্নাবশেষের চেহারা। অর্থাৎ তাদের মধ্যে অতীতের মরা নদীর গহ্বরটা হাঁ ক'রে আছে, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের স্রোত নেই বল্লেই হয়। নিরানন্দ, নিরন্ন, মলিন সে সব গ্রামের মুখশ্রী। আমরা বাহির থেকে যার সোর-সরাবৎ অত্যন্ত ক'রে শুনতে পাই, সে হচ্চে সহর। দেশের সমস্ত ধন সেখানে পুঞ্জিত, জীবিকার সমস্ত আয়োজন সেখানে সংহত। আজ আমাদের কর্ত্তব্য-আলোচনা ও কর্ত্তব্যবুদ্ধিচালনার ক্ষেত্র সহর হওয়াতে সমস্ত দেশের চেহারাকে ভুল ক'রে দেখি। পৌরসভায় আমরা যখন দেশউদ্ধারব্রত গ্রহণ করি, তখন সেই সভার রূপটাকেই দেশের প্রতিরূপ ব'লে কল্পনা করি। একটা কল্পিত আত্মবোধকেই আমরা দেশাত্মবোধ ব'লে আপোষে ঠিক ক'রে রাখি। আমাদের বোধশক্তি দেশের এমন একটি অংশের মধ্যে লালিত ও অধিষ্ঠিত, সমস্ত দেশের সঙ্গে যার প্রকৃতির বৈসাদৃশ্য।

য়ুরোপের সভ্যতা সহরের মধ্যেই আপনাকে প্রকাশ করে। সেখানে বড় বড় দেশে প্রধান নগরীগুলি দেশের মর্ম্মস্থান অধিকার ক'রে থাকে। এই নাগরিক সভ্যতাকে আমি নিন্দা করি নে। সেখানে এটা মহৎ। কিন্তু সভ্যতার এই রকম বিকাশ প্রাচ্যদেশের প্রকৃতিগত নয়। উদাহরণ-স্বরূপে বলা যেতে পারে, চীনের সভ্যতা পোলিটিকাল নয়, সে সভ্যতা সামাজিক। পলিটিক্সে প্রাণপুরুষের পীঠ-স্থান রাজধানীতে, সমাজতন্ত্রে প্রাণ পরিব্যাপ্ত হয়ে থাকে পল্লীতে পল্লীতে। এই জন্য বার বার রাষ্ট্রবিপ্লব চীনের সাম্রাজ্যকে আঘাত করেছে, সমাজকে আঘাত করে নি। প্রাচীন গ্রীস নেই, কিন্তু প্রাচীন চীন আজও আছে। দেশের কোন এক অংশে সেই চীন সংহত নয়, সর্ব্বত্র সে পরিকীর্ণ। বাংলা দেশের কথাও ভেবে দেখ। ঢাকা সহর নবাবী আমলে একটি প্রধান স্থান ছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু এ কথা সত্য নয় যে, পূর্ব্ববঙ্গের সর্ব্বাঙ্গীন চৈতন্য এইখানেই একান্ত-ভাবে কেন্দ্রীভূত ছিল। তার প্রাণপ্রবাহ নদীর তীরে তীরে শ্যামল ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে বনচ্ছায়াস্নিগ্ধ গ্রামে গ্রামে হিল্লোলিত হয়েছিল। দেশের যারা পণ্ডিত, তাঁরা পল্লীতে পল্লীতে বিদ্যা দিয়েছেন, সমাজব্যবস্থা রেখেচেন, ধর্ম্মসাধনাকে বাঁচিয়েছেন, দেশের যাঁরা ধনী, তাঁরা পল্লীতে পল্লীতে অতিথিশালা স্থাপন করেছেন, দেবমন্দির নির্ম্মাণ করেছেন, জল দিয়েছেন, অন্ন দিয়েছেন, আনন্দ দিয়েছেন। এমনি ক'রে আমাদের দেশ কোনো একটি বিশেষ মশালে আপন আলো জ্বালায় নি, নিজের সর্ব্বাঙ্গের দীপ্তি তাকে দীপ্যমান ক'রে রেখেছিল। যদি বলি, আজ সেদিন নেই, আজ সহরেই আমাদের প্রাণ-নিকেতনের ভিৎ পত্তন করা চাই, তা হ'লে আমাদের স্বভাবের বিরুদ্ধে লড়তে হবে। য়ুরোপীয় আদর্শে আমাদের দেশের বাহিরের রূপ যেমন করেই তৈরী করি না কেন, তা কখনোই পাকা হবে না, ব্যাপকতায় ও গভীরতায় তা তুচ্ছ হয়ে থাকবে, খবরের কাগজের ভেঁপু তার মহিমা ঘোষণা করতে থাকলেও মহাকালের শৃঙ্গধ্বনিতে সে বারেবারে বিদীর্ণ বিলীন হয়ে যাবে। এই য়ুরোপীয় কারখানার মার্কা-মারা বাহিরের ঠাটটিকে গ্রামের মধ্যে নিয়ে যেতে চেষ্টা করি; সেখানকার চণ্ডীমণ্ডপে সে বিসদৃশ হয়ে থাকে। সেখানে যে ভাবে মানুষের জীবন গড়া, আমাদের মুখে তার ভাষা নেই, আমাদের সঙ্কল্প সেখানকার কর্ম্মক্ষেত্রে সাড়া না পেয়ে ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসে।

কলকাতার মত সহরে আল্‌গাভাবে নানা মৎলবে যেখানে বহু মানুষের ছড়াছড়ি, সেখানে সামাজিক আত্মীয়তা সহজ নয়। সেখানে সিনেমায়, থিয়েটারে, বক্তৃতাসভায় মানুষের সমাগম হয়, কিন্তু যথার্থভাবে মিলন সম্ভবপর হয় না। সহরে আপিস হ'তে পারে, কারখানা হ'তে পারে, প্রয়োজনসাধনের মোটা মোটা ব্যবস্থা হ'তে পারে। মানুষে মানুষে আত্মীয়তার জাল রচনা গ্রামেই সম্ভব। যদি সেই আত্মীয়তার শক্তি বাংলাদেশের পল্লীতে আবার উদ্বোধিত করতে পারি, তবে হিন্দুমুসলমানের মধ্যেও মিল হ'তে পারবে। আজ তাদের মধ্যে বিরোধ হয় কেন? অন্ন কমেছে, তাই কাড়াকাড়ি ঠেলাঠেলির দিন এল। কেউ কাউকে কিছু ছাড়তে চায় না, কাড়তেই চায়। নিজের মধ্যে প্রাণের অজস্রতা নেই, তাই আমরা পরস্পরকে মারি। গ্রামগুলি যে দিন প্রাণসম্পদে কানায় কানায় ভরে উঠবে, সে দিন তার সুযোগ কি কেবল হিন্দু পাবে, মুসলমান পাবে না? প্রাচুর্য্যের দিন যে উৎসবের দিন, সেই উৎসবের দিনে আমাদের স্বভাবে কার্পণ্য থাকে না। সেই উৎসবের দিনে আমাদের বিষয়বুদ্ধির সঙ্কীর্ণতা চ'লে যায়। সে দিন হিন্দু-মুসলমান মেলাবার জন্যে কৌশলের দরকার হবে না, কোনো পক্ষকে ঘুষ দেওয়া অনাবশ্যক হবে। বৈষয়িক সুবিধার যোগে মিল political alliance এর মত। প্রয়োজনের তাগিদে ইংরেজ ফ্রান্সকে বলচে বন্ধু, ফ্রান্সও ইংরেজকে বন্ধু ব'লে ঘোষণা করচে, সামান্য একটু ঘা পেলেই আল্‌গা গ্রন্থির যোগসূত্র টুকরো টুকরো হয়ে যায়।

আমি এই যে ঢাকায় এসেছি, এখানে হিন্দু-মুসলমান দুই ধারার সঙ্গমস্থল, এখানে মুসলমানকে এমন কথা বলতে লজ্জা হয় যে, তুমি যদি হিন্দুর সঙ্গে না মিলতে পার, আমাদের কোনো একটা বিশেষ দরকারে ব্যাঘাত হবে। প্রয়োজন আছে, অতএব মিলতে হবে, এ কথা বললেই কি অপর পক্ষে শুনবে? অনেক দিন ত শোনে নি। বলতে হবে, তোমাতে আমাতে বহুশত বছর ধ'রে এক মাটির অন্নে মানুষ, এক পাড়ায় বাস, তবু তুমি আমাকে ভালো বাসো না, আমি তোমাকে ভালো বাসিনে, এই বড় লজ্জা। বড়

লজ্জা যদি আমি তোমাকে ক্ষমা না করতে পারি, তুমি আমাকে ক্ষমা না কর। বিষয়কর্ম্মে তোমাতে আমাতে বখরা আছে, এমন কথা বারবার স্মরণ করিয়ে দিয়ে কি আত্মীয়বন্ধন পাকা হয়? কখনো না। যে আত্মীয়তা দুর্দ্দিনেরও ভাগ নিতে প্রস্তুত, অসুবিধারও বোঝা একসঙ্গে বহন করে, ঘুষ দিয়ে সুযোগের প্রলোভন দিয়ে কি তারি পত্তন করা সম্ভব? মাঝে মাঝে যখন গরজের দায়ে ঠেকি, তখন মুসলমানকে বলি, তোমাতে আমাতে ভাই, শুনে মুসলমান বলে, সুর ঠিক লাগচে না।

হঠাৎ একটা মুস্কিলের কথা মনে জাগতেই এক মুহূর্ত্তে সৌহৃদ্য জমিয়ে তোলবার চেষ্টা অন্তর্য্যামীকে ফাঁকি দেবার পরামর্শ। অথচ সদ্য সদ্যই পাকা রাস্তায় পলিটিক্সের জুড়ি হাঁকিয়ে চলব কি ক'রে, এমন কথা যদি জিজ্ঞাসা কর, তবে আমি বলব, আমি ত কোনো যাদুবিদ্যার কথা জানিনে। আমি এইটুকু জানি, যেখানে দুজনে মিলে প্রাণ দিয়ে একটি কোনো পরিপূর্ণতা সৃষ্টি করা হয়, সেইখানে দরদ স্বাভাবিক। বিধাতার সৃষ্টি যে দেশ, সেখানে আমরা যেমন আছি, অন্য জীবজন্তুও তেমনি আছে, তাদের সঙ্গে মিলনের ঐক্যক্ষেত্র বাইরে, তার কোনো মূল্য নেই। সেই দেশকে স্বদেশ করতে হ'লে তাকে আপন কায়মনপ্রাণ দিয়ে সৃষ্টি ক'রে তুল্‌তে হয়; তবেই তার উপরে আমাদের দরদ জাগে। সেই দরদের উপর আমাদের মিলন প্রতিদিন গভীর হ'তে থাকে। বিধাতার দরদ এই বিশ্বসৃষ্টির পরে, সেখানে যে তাঁর আত্মপ্রকাশ। আপন আত্মাকে যখন দেশে প্রকাশ করি, আর সেই প্রকাশে যখন হিন্দুমুসলমানের যোগ থাকে, তখন সেই যোগেই আমরা এক মহাজাতি হয়ে উঠি।

এ কথাটা পলিটিক্সের কোঠায় পড়ল কি না, তা বল্‌তে পারিনে, কিন্তু এটা ফাঁকা কথা নয়। এ সম্বন্ধে আমি কিছু কাজও ক'রে থাকি; তারই জোরে দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে কথাটা বলতে পারি।

আমাদের যেখানে কাজের ক্ষেত্র, সেখানে হিন্দু-পাড়াও আছে, মুসলমানপাড়াও আছে, আমাদের অনুষ্ঠানের দ্বারা তারা উভয়েই ঐক্যলাভ করেছে। সেখানে যে সব ছেলে পল্লী-সেবায় ব্রতী—যাদের আমরা ব্রতীবালক নাম দিয়েছি —তারা সেখানকার গ্রামেরই ছেলে। তারা কেউ হিন্দু, কেউ মুসলমান। তারা সেখানকার যে-জলবায়ুকে বিশুদ্ধ করচে, সে জলবায়ু মুসলমানপল্লীরও, হিন্দুপল্লীরও। তারা মুসলমানপল্লীরও আগুন নেবায়, হিন্দুপল্লীরও আগুন নেবায়। পরস্পরের নিরন্তর যোগে গ্রামের জীবনযাত্রা এই যে সম্পূর্ণ হয়ে উঠচে, এর মূল কথা এমন নয় যে, বর্ত্তমান কন্‌গ্রেসের এই হুকুম—এর মূল কথা এই যে, আমরা এক-দেশের লোক। ধিক্‌, যদি আমাদের কাজে এই সহজ কথাটির প্রমাণ না হয়। আমাদের সেখানে অনেককাল থেকে মুসলমানপল্লীর সঙ্গে সাঁওতাল-পল্লীর বিরোধ চ'লে আস্‌ছিল, মাথা ফাটাফাটি ও মামলার অন্ত ছিল না, আজ তাদের মাঝখানকার একটি কর্ম্মযোগে স্বভাবতই সে বিরোধ মিটে আস্‌চে। পলিটিক্সের উদ্দেশ্যসাধনে নয়, অহৈতুক কল্যাণের সম্বন্ধবন্ধনে তারা ভিতরের দিক থেকে মিলতে পারচে। তাদের আমরা এই বলি যে, তোমাদের কাছে বাইরের কোনো দাবী নেই; আমরা এইমাত্র চাই যে, তোমরা সুস্থ হও, সবল হও, জ্ঞানবান্‌ হও, তা হ'লে তারই মধ্যে আমরা সকলেই সার্থক হব, তোমাদের অপূর্ণতায় আমাদের সকলেরই অপূর্ণতা। কথা উঠবে, গ্রামের মধ্যে ত তেত্রিশ কোটি ভারতবাসী নেই; যে বিরাট-ধাক্কায় তেত্রিশ কোটিকে উপরে ঠেলে তোলা যাবে, এই গ্রামের মধ্যে তার প্রয়োগ হবে কেমন ক'রে?

আমার কথা এই যে, তেত্রিশ কোটি তো ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই, নিকটে ঘরের দ্বার থেকে সুরু ক'রে দূরে সমুদ্রতীর পর্য্যন্ত। তেত্রিশ কোটিকে পেতে গেলে তেত্রিশ জনকে পাওয়া চাই, সেই তেত্রিশকে ডিঙিয়ে তেত্রিশ কোটিতে পৌঁছতে পারে, এমন শক্তি কারো নেই। ফললাভের লোভটা বেশি প্রবল হলেই গোড়া থেকেই সেই ফলের আয়তন মাপতে সুরু করি, তখন বাহ্য পরিমাণকে আন্তরিক সত্যের চেয়ে দামী ব'লে মনে হয়। শক্তির মূল যেখানে সত্যে, সেখানে সে আপন সাধনাতেই সার্থকতা অনুভব করে। আপনাকে কর্ম্মে প্রকাশ না ক'রে তার চলে না বলেই তার কর্ম্ম; তার সাধনা আর সিদ্ধির মধ্যে কোনো ভাগ নেই, দুইয়ে মিলে অবিচ্ছিন্ন এক। আমাদের আত্মীয়তার ভিত্তির উপরেই আমাদের স্বরাজের একমাত্র নির্ভর, এ কথার কিছু-মাত্র সন্দেহ নেই; কিন্তু সেই স্বরাজকেই একমাত্র সিদ্ধি জেনে আত্মীয়তাকে তার সোপান কল্পনা করলেই বিপদ। গাছের পক্ষে একই সজীব সত্যের যোগে তার অঙ্কুর থেকে

ফল পর্য্যন্ত সমান মূল্যবান্; আসল কথাটি তার জীবনের সমগ্রতা। সেই সমগ্রতার মধ্যে তার গুঁড়ি, ডাল, ফল-ফুল সবাই স্বভাবত আপন স্থান পায়। আজ যে কারণেই হোক্, মনের মধ্যে বিশেষ একটা তাড়া লেগেছে, তাই পোলিটিকাল সিদ্ধি সদ্য হাতে হাতে পাবার লোভে সেই-টেকেই বিচ্ছিন্ন ক'রে দেখছি, জীবনের সমগ্রতার মধ্যে যথাস্থানে তাকে দেখচিনে, তাই এ কথা মনে করতে বাধচে না যে, গাছটাকে বাদ দিয়েও ফলের সাধনা করা যায়। বিশ্বপ্রকৃতি গাছকে চায় বলেই ফলকে পায়, মানুষ যদি একান্ত লোভের অধৈর্য্যে গাছের প্রতি মমতা না রেখেই ফলকে পাবার দাবী করে, তবে কেবলমাত্র চীৎকারের জোরে প্রকৃতি তার সে দাবী মঞ্জুর করে না।

তার একটা প্রমাণ দেখ। বাংলাদেশের বহু বিস্তৃত অধিবাসী নমঃশূদ্র; আমরা জীবনের ব্যবহারে তাদের বহু দূরে রাখব অথচ পোলিটিকাল সিদ্ধির কোঠায় তাদের সঙ্গে ঐক্যের ফাঁকা হিসাব ফাঁদব, কোনো প্রকার বুজ-রুকীর দ্বারায় এটা সম্ভবপর হ'তে পারে না। এতকাল ধ'রে প্রতিদিন দলে দলে তারা আমাদের সমাজ থেকে ভ্রষ্ট হয়ে যাচ্চে, সেটা হৃদয়ে কি সত্য ক'রে বাজল? বাজে যখন কন্‌গ্রেসে তারা চার আনা চাঁদা দিতে আপত্তি করে, বাজে যখন রাজপুরুষদের সঙ্গে বিরোধে তারা ক্ষতি স্বীকার করতে নারাজ হয়। তাদের সঙ্গে আমাদের আত্মীয়তাসূত্র যদি পোলিটিকাল সিদ্ধি লোভের সূত্র না হ'ত, তা হ'লে আমরা গোড়াতেই তাদের ডাকতাম, বলতাম, তোমরা সমাজ ছেড়ে গেলে তাতে আমাদেরই শূন্যতা। বহু কাল চ'লে গেল, কোনো দিন এই দরদের কথা বল্‌বার শক্তি পেলাম না। আজকের দিনে তাদের বলচি কি? না, তোমরা বিমুখ হও ব'লে আমাদের পলিটিক্সের আসর ষোল আনা জম্‌ল না। প্রতিদিনের স্নান-পান ও মলিনতা মার্জ্জ-নার জন্যেই যারা জলাশয়ের সমাদর করেছে, বিশেষ দিনে আগুন নেবাবার বেলাতেও জাদুকরের পথ চেয়ে তাদের ব'সে থাকতে হয় না। তাই আজ আমি নিবেদন করচি, পল্লীর যে শুষ্ক বক্ষ থেকে প্রাণের ধারা স'রে গেছে, সেখানে প্রাণ ফিরিয়ে আনবার জন্যে এখনকার কালের যে সব যুবকের মন উদ্দীপিত হয়েছে, স্বদেশবাসী মানুষের প্রতি এমন একটি সহজ প্রীতির টানেই যেন সে কাজে তাঁরা নিযুক্ত হন, যে প্রীতি সমগ্রভাবে দেশকে দেখতে জানে, কেবলমাত্র পোলিটিকালভাবে নয়।

আজকের দিনে যখন আমরা পল্লীর কথা ভাবি, তখন টুকরো ক'রে ভাবি। মনে করি, কৃষির উন্নতি ক'রে কৃষক-দের অবস্থা কিছু ভালো ক'রে দিলেই আমাদের কাজ সারা হ'ল। কিন্তু পল্লীর জন্যে পূর্ণ প্রাণের আনন্দের ব্যবস্থা না ক'রে দিয়ে কেবল দৈনিক দু চার আনা তার আয় বাড়িয়ে দিলেই তাকে উদ্ধার করা হ'তে পারে, এ কথা কখনই সত্য নয়।

ভারতে যে এক দিন বৌদ্ধধর্ম্মের জোয়ার লাগল, সে দিন সমগ্রভাবে তার চৈতন্যের উদ্বোধন হয়েছিল বলেই ভারতের ঐশ্বর্য্য প্রাণের সকল বিভাগেই পূর্ণ হয়েছিল। নির্ব্বিশেষভাবে সে নিজেকে পেয়েছিল বলেই বিশেষ বিশেষ ভাবে সে আপনার সকল শক্তিকেই কাজে খাটাতে পেরে-ছিল। তেমনি ক'রে মানব-ধর্ম্মের সমগ্রতার একটি বাণী যদি বড় ক'রে আমাদের দেশের কাছে আসে, তবেই তার প্রাণশক্তি সকল দিকে জাগ্রত হয়ে তাকে রক্ষা করতে পারবে। যদি বলি, গ্রামকে অন্ন দেব, বস্ত্র দেব, তবে তার মধ্যে যতই আমাদের দয়া থাক না কেন, তার ভিতরে ভিতরে একটা অশ্রদ্ধা লুকিয়ে থাকে। যদি বলি, গ্রাম যাতে আপনাকে আপনি সম্পূর্ণভাবে পায়, তার মধ্যে সেই জাগরণ সঞ্চার ক'রে দেব, তবেই তার প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধা প্রকাশ করা হয়। নববসন্তসমাগমে অরণ্যে গানও জাগে, ফুলও ফোটে, ফলেরও আয়োজন হয়, একই প্রাণের ধাক্কা পেয়ে তার বিচিত্র সার্থকতা সত্য হয়ে ওঠে। আমা-দের দেশের পল্লীতে তেমনি ক'রে নূতন প্রাণের নব বসন্ত আবির্ভূত হোক। সরকারী বারিকের কাছে ফৌজদের জন্যে ঘেরাও জলাশয় থাকে, আমাদের দেশের শিক্ষিত ভদ্রসাধারণের জন্য সুখ-সম্মান শিক্ষা-দীক্ষার তেমনি যদি রিজার্ভ টেঙ্ক থাকে, তবে তাই দিয়ে সমস্ত দেশকে শুকিয়ে মরা থেকে কেউ বাঁচাতে পারবে না। মানবাত্মার সমস্ত ক্ষুধা মেটাবার ব্যবস্থা সহরেই যদি থাকে আর গ্রামে যদি না থাকে বা অত্যন্ত কৃপণভাবে থাকে, তবে তাতে দেশের উপবাস ঘোচে না। তাই বিশ্বভারতী থেকে আমরা পল্লীর যে কাজ করচি, তার উদ্দেশ্য হচ্চে শান্তি-নিকেতনে উৎ-সারিত জ্ঞান ও রসের সকল ধারাই আমরা চারদিকে বিস্তীর্ণ ক'রে দেব,—রিজার্ভ টেঙ্কের বেড়া ক্রমে ক্রমে ভেঙে

দিতে হবে। আমাদের সেখানে গ্রামের কার্য্যে যাঁরা আছেন, তাঁরা সকলেই বাঙালী নন, অন্য প্রদেশেরও লোক আছেন, ইংরেজও আছেন—তৎসত্ত্বে সমস্ত গ্রামের লোক তাঁদের আপনার লোক বলেই সহজেই অনুভব করতে পারচেন। সেখানে ধনী দরিদ্র, শিক্ষিত অশিক্ষিত, হিন্দু-মুসলমানে মিলন চলেচে, বাক্যে নয়, কাজে। এ মিলন সৃষ্টিক্ষেত্রে সৃষ্টিকারদের মিলন, এই ত সব চেয়ে গভীর মিলন। এই মিলনের ভিতর দিয়ে দেশ আপনার ধন আপনি উৎপন্ন করুক, আপন বিরোধের আপনি সমাধান করুক, আপন প্রাণ-উৎসমুখের বাধা আপনি সরিয়ে দিক। দুটি একটি গ্রামেও যদি সার্থকতার সম্পূর্ণ রূপ দেখাতে পারি, তা হ'লে তে'ত্রিশ কোটির জন্যে ভাবতে হবে না। শিখা থেকে শিখা ধ'রে উঠবে, আলোক থেকে আলোক বিস্তীর্ণ হবে। অনেক বাহু, অনেক মুণ্ড নিয়ে রাক্ষসই ভীমগর্জ্জনে আস্ফালন করতে আসে, কিন্তু ভগবান সুকুমার বালক হয়ে দেখা দিতে লজ্জা পান না। তাঁর বিশটা বাহু দশটা মুণ্ডের দরকারই নেই, এই কথাটির প্রতি শ্রদ্ধা করবার সাহস যদি থাকে, তবে যথাস্থানে আমাদের পূজা নিবেদন করতে আমরা দ্বিধা করব না, কৃপণতা করব না। তাই কি উপায়ে অল্পকালের মধ্যে সমস্ত ভারতবর্ষকে স্বাধীন করা যেতে পারে, এই প্রশ্নটি পোলিটিকাল মেগাফোন যোগে যখন ধ্বনিত হয়, তখন তার উত্তরে আমি বলি যে, আমি জানিনে। আমি কেবল এই জানি যে, ভারতবর্ষের মধ্যে ক্ষুদ্র যেটুকু জায়গাতে সেই আমাদের সাধনা সর্ব্বাঙ্গীনভাবে সত্য হ'তে পারে, সেইটুকুর উপরে দাঁড়িয়েই সমস্ত ভারতবর্ষকে উদ্ধার করবার যথার্থ সূচনা হবে। *

* ঢাকা জগন্নাথ হলে সাধারণ সভায় প্রদত্ত বক্তৃতা।

কুঞ্জ-ভঙ্গ

মহাভারত ও ভারতবর্ষের ইতিহাস

৪

ভীষ্ম বৈমাত্রেয় ভ্রাতা বিচিত্রবীর্য্যের নিমিত্ত কাশিরাজের তিনটি কন্যা স্বয়ংবরস্থল হইতে হরণ করেন। রামায়ণে কৌশল্যা ছিলেন কোশলরাজ অর্থাৎ কাশিরাজের কন্যা, এই তিনটি কন্যাও কাশিরাজ-দুহিতা। কন্যাগুলির নাম অম্বা, অম্বিকা ও অম্বালিকা। দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, নামগুলির মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে, একটু চিন্তা করিলে এই তিনটি নামের গূঢ় অর্থ বুঝা কঠিন হইবে না। অম্বা হইল অ+ম+বা ; ম অর্থে মৃত্যু।

"দ্ব্যক্ষরস্তু ভবেন্মৃত্যুস্ত্র্যক্ষরং ব্রহ্ম শাশ্বতম্।
মমেতি চ ভবেন্মৃত্যুর্ন মমেতি চ শাশ্বতম্॥"
৩-১৩ অশ্বমেধপর্ব্ব।

মৃত্যু অর্থে প্রমাদ, আত্মজ্ঞানশূন্যতা।

"প্রমাদং বৈ মৃত্যুমহং ব্রবীমি তথা প্রমাদমমৃতত্বং ব্রবীমি।"
৪-৪২ উদ্‌যোগপর্ব্ব।

অম অর্থে বিদ্যা অথবা জ্ঞান, কিন্তু শেষে বা আছে, বা বিকল্পে। কবি এই বিকল্প অর্থাৎ দ্বিত্ব-ভাব সুন্দর-রূপে রক্ষা করিয়াছেন। অম্বার অর্দ্ধদেহ হইয়াছিল স্ত্রীরূপিণী, অপর অর্দ্ধদেহ হইয়াছিল নদীরূপিণী। এই অম্বার একবার নারীরূপ হয়, একবার পুরুষরূপ হয়, নারী-রূপে অম্বার নাম শিখণ্ডিনী হইল এবং পুরুষরূপে অম্বা শিখণ্ডী হইল। এই শিখণ্ডী ভবিষ্যতে ভীষ্মের বধের উপায় হয়।

দ্বিতীয় কন্যার নাম হইল অম+বি+কা=অম্বিকা। শেষের কা আমরা ছাড়িয়া দিতে পারি, স্বার্থে ক, পরে স্ত্রীত্বাৎ আপ্—তাহা হইলে বাকি রহিল অম+বি। এই বি হইল বিশ্রবণের বি সদৃশ, অর্থাৎ বিরুদ্ধ বা বিপরীত জ্ঞান অর্থাৎ অজ্ঞানতা। অজ্ঞানতার পুত্র হইল অন্ধরাজা ধৃতরাষ্ট্র। অজ্ঞানতার সহিত অন্ধতার সম্বন্ধ আমরা পরেও দেখিতে পাইব। তৃতীয় কন্যার নাম হইল অম্বালিকা, অর্থাৎ অম+বালিকা—যে জ্ঞান সম্বন্ধে শিশু সদৃশ। কবি এই শিশু-ভাবের পরিচয় যথেষ্ট দিয়াছেন, বালিকা-স্বভাব-সুলভ ভয়প্রযুক্ত অম্বালিকা ব্যাসকে দেখিয়া বিবর্ণা হইয়া-ছিলেন। বালিকা-বুদ্ধি হেতু অম্বিকা তাঁহার স্থানে ব্যাসের নিকট এক জন দাসীকে পাঠাইয়াছিলেন। জ্ঞানে শিশু এই ভাব ও কথা আমরা পরে পাইব।

মহাভারতে কুরু-পাণ্ডবদিগের যুদ্ধ হইল প্রধান ঘটনা। মহাভারতের যুদ্ধকে কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ কেন বলে? ইহা একটু চিন্তা করিবার বিষয়।

সম্বরণের পুত্রের নাম কুরু। ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুপুত্রগণ উভয়েই সম্বরণ-পুত্র কুরুর বংশজাত, দুর্য্যোধন প্রভৃতিকে কেন বিশেষ করিয়া কৌরব বলে। দুষ্মন্ত-পুত্র ভরতের বংশ হইতে জাত বলিয়া কুরু ও পাণ্ডব উভয়কেই ভারত বলিয়া সম্বোধন আছে, কৌরব ও ভারত কথা সম্বন্ধে যে রহস্য আছে, তাহা পরে বুঝিবার চেষ্টা করিব। তবে দ্যূতক্রীড়ার কথাটা প্রথমে বলা প্রয়োজন। প্রধানতঃ—দ্যূতক্রীড়ার ফলেই কুরু-পাণ্ডবদিগের মধ্যে বিরোধ হয়, সভাস্থলে দ্রৌপদীর অপমান এবং তাহার পরে পাণ্ডবদিগের সস্ত্রীক বনবাস, ইহাই হইল কুরু-পাণ্ডবদিগের মধ্যে যুদ্ধ বাধিবার একটি প্রধান কারণ ; গল্পটি এই—

ধৃতরাষ্ট্রের আদেশক্রমে দ্যূতক্রীড়ার নিমিত্ত এক বৃহৎ সভাগৃহ নির্ম্মিত হইল। সভাস্থলে ধৃতরাষ্ট্র, দ্রোণ, ভীষ্ম ও বিদুর প্রভৃতি কুরু-বৃদ্ধগণ উপস্থিত হইলেন; দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, শকুনি, কর্ণ, বিকর্ণ প্রভৃতি কুরুপক্ষীয়রা আসি-লেন। যুধিষ্ঠির ও তাঁহার চারি ভাই কৌরবদিগের সহিত ক্রীড়া করিতে উপস্থিত হইলেন। এতদ্ভিন্ন ব্রাহ্মণগণ ও অপরাপর ব্যক্তি ক্রীড়া দেখিতে সভায় সমাগত হইলেন। শকুনি পাশা খেলিতে লাগিল, যুধিষ্ঠির বাজি রাখিতে

লাগিলেন। প্রতিবারই শকুনির কপট ক্রীড়ার ফলে যুধিষ্ঠিরের হার হইতে লাগিল। এইরূপে যুধিষ্ঠির একে একে সমস্ত ধন, রত্ন, অশ্ব, রথাদি, দাসদাসী, রাজ্য প্রভৃতি তাঁহার যাহা কিছু সম্পত্তি ছিল, সকলই হারিলেন। পরে তিনি সহদেব, নকুল, অর্জ্জুন, ভীমকে পণ রাখিলেন; তাহাদিগকেও হারিলেন। শেষে নিজেকে পণ রাখিলেন, সে বারও তাঁহার হার হইল। শেষে শকুনির পরিহাস-উক্তিতে দ্রৌপদীকে পণ রাখিলেন, তাঁহাকেও হারিলেন। তখন দুর্য্যোধন সভাস্থিত সূত প্রাতিকামিন্‌কে বলিলেন যে, তুমি অন্তঃপুরে গিয়া দ্রৌপদীকে বল যে, তুমি এখন দাসী হইয়াছ, কুরু-মহিলাদিগের পরিচর্য্যা কর।

বিদুর এ কথায় তীব্র আপত্তি করিলেন। তিনি বলিলেন, যুধিষ্ঠির প্রথমে নিজেকে হারিয়াছেন, নিজে দাস হইলে তাঁহার দ্রৌপদীর উপর কোন অধিকার থাকে না। এ অবস্থায় তাঁহার পণে দ্রৌপদী কখন দাসী হইতে পারে না। দুর্য্যোধন তাঁহার কথা শুনিলেন না, প্রাতিকামিন্‌কে অন্তঃপুরে পাঠাইয়া দিলেন; সে গিয়া দ্রৌপদীকে দুর্য্যোধনের কথা জানাইল। দ্রৌপদী প্রাতিকামিন্‌কে বলিলেন, "তুমি সভায় গিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া এস, রাজা যুধিষ্ঠির অগ্রে আমাকে হারিয়াছিলেন, না অগ্রে নিজেকে হারিয়াছিলেন?"

প্রাতিকামিন্ সভাতে এই কথা বলিল, সভাস্থ কেহই কোন উত্তর দিলেন না। কিয়ৎক্ষণ বাগ্‌বিতণ্ডার পর দুঃশাসন স্বয়ং অন্তঃপুরে গিয়া দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক তাঁহাকে সভামধ্যে আনয়ন করিল। সভায় আসিয়া দ্রৌপদী ভীষ্মপ্রমুখ সভাসদ্‌দিগকে পূর্ব্বে প্রাতিকামিনের নিকট যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, সেই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন; কিন্তু কেহই কোন উত্তর দিলেন না। উপরন্তু দুঃশাসন, কর্ণ, দুর্য্যোধন তাঁহাকে অনেক উপহাসসূচক কথা বলিল।

দ্রৌপদী তখন একবস্ত্রা ছিলেন; দুঃশাসন তাঁহার বস্ত্র আকর্ষণ করিতে লাগিল, কিন্তু ধর্ম্ম অলক্ষিতভাবে থাকিয়া দ্রৌপদীকে বস্ত্র দিতে লাগিলেন। দুর্য্যোধন দ্রৌপদীকে অনেক কটু উক্তি করিলেন এবং নিজের বাম ঊরু তাঁহাকে প্রদর্শন করিলেন। ভীম তাহা দেখিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, তিনি যুদ্ধে দুঃশাসনের রক্তপান করিবেন ও দুর্য্যোধনের ঊরুভঙ্গ করিবেন। দ্রৌপদীর এই লাঞ্ছনায় সভাস্থিত সকলেই নীরব হইয়া রহিলেন; কেহই কিছু বলিলেন না; কেবল ধৃতরাষ্ট্রের বিকর্ণ নামে এক পুত্র দ্রৌপদীর প্রতি এইরূপ ব্যবহারে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া কৌরবদিগের আচরণের বিপক্ষে তীব্র প্রতিবাদ করিলেন। যখন দ্রৌপদীর প্রতি এইরূপ অত্যাচার হইতেছিল, তখন দুর্য্যোধনের অগ্নিহোত্র-গৃহে গোমায়ুগণের ক্রন্দনধ্বনি উঠিল; গর্দ্দভগণ চীৎকার করিয়া উঠিল; পক্ষিগণ তাহার প্রত্যুত্তর দিল। ধৃতরাষ্ট্র তখন দ্রৌপদীকে বলিলেন, "তুমি আমার নিকট বর প্রার্থনা কর।" দ্রৌপদী নিজের স্বামীদিগের দাসত্ব মোচন ও তাঁহাদের অস্ত্র পুনঃপ্রাপ্তি বর যাচ্ঞা করিলেন। ধৃতরাষ্ট্র তখন, পাণ্ডবরা যাহা কিছু হারিয়াছিলেন, সেই সকল প্রত্যর্পণ করিতে আদেশ করিলেন। পাণ্ডবরাও সস্ত্রীক ইন্দ্রপ্রস্থে যাত্রা করিলেন; এই হইল দ্যূতপ্রকরণ।

যখন ধৃতরাষ্ট্র দ্রৌপদীকে বর দান করিয়াছিলেন, তখন দুর্য্যোধন সভায় উপস্থিত ছিলেন না। তিনি সকল কথা জানিতে পারিয়া পিতার নিকট অনুরোধ করিলেন যে, পাণ্ডবরা পুনরায় সেই সভায় আসিয়া তাঁহার সহিত দ্যূতক্রীড়া করেন। এবার একটিমাত্র পণ থাকিবে। যে পক্ষ হারিবে, সেই পক্ষ দ্বাদশ বৎসরের নিমিত্ত অজিন-বল্কল পরিয়া বনে বাস করিবে এবং দ্বাদশ বর্ষ উত্তীর্ণ হইলে তাহারা এক বৎসর কোন স্থানে অজ্ঞাতবাসে থাকিবে। যুধিষ্ঠির এই অঙ্গীকারে সম্মত হইলেন। পুনরায় দ্যূতক্রীড়া হইল। এবারও যুধিষ্ঠির হারিলেন, তাহার ফলে যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পঞ্চপাণ্ডব ও দ্রৌপদী বনে গমন করিলেন। ইহার নাম অনুদ্যূতপ্রকরণ।

এই আখ্যায়িকার এখন রহস্য বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক। এই গল্পটি বাস্তবিক কি? এ সভা কি, এ দ্যূতক্রীড়া কি প্রকার, দ্রৌপদী এবং যুধিষ্ঠির প্রভৃতি ভ্রাতৃগণ কাহারা—দুর্য্যোধন প্রভৃতি ভ্রাতৃগণ বা কাহারা? ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ ইঁহারাই বা কে?

সভা কথার অর্থ—"ধর্ম্মাধর্ম্মবিচারস্থানং", এই বিচারস্থানে অক্ষক্রীড়া হইয়াছিল। তাহা হইলে অক্ষক্রীড়ার অর্থ কি? অক্ষপাদ গোতমমুনি হইতে এই অক্ষ কথা গৃহীত হইয়াছে।

"অন্তর্দ্ধৌ স বিশ্বেশো বিবেশ চ রসাং প্রভুঃ।
রসাং পুনঃ প্রবিষ্টঃ স যোগং পরমমাস্থিতঃ॥"

৫৪—৩৪৭ শান্তিপর্ব্ব।

এ স্থলে রসা কথা রসাতল শব্দের পরিবর্ত্তে বসিয়াছে। সেইরূপ কুরুক্ষেত্র স্থানে কুরু কথার প্রয়োগ হয় এবং সত্যভামা কথার স্থানে ভামা কথার প্রয়োগ হয়। সেই প্রকার অক্ষপাদ কথার স্থানে অক্ষ কথার প্রয়োগ হইয়াছে। অক্ষপাদমুনি হইলেন ন্যায়দর্শন-প্রণেতা; তাহা হইলে অক্ষক্রীড়া হইল বিচার বা তর্ক। আর একটু রহস্য আছে। অক্ষপাদমুনি এরূপ দয়ালুস্বভাব ছিলেন যে, পথে হাঁটিতে গেলে পাছে পিপীলিকা প্রভৃতি বিনষ্ট হয়, এই নিমিত্ত তাঁহার পায়ে চক্ষু হইয়াছিল। এই কারণে তাঁহার নাম অক্ষপাদ হয়। আর এক কথা, অক্ষপাদের নাম ছিল গোতম, গৌতম বুদ্ধদেবের নামান্তর।

সভাতে যে অক্ষক্রীড়া হইল, তাহার নাম কেবল অক্ষক্রীড়া নয়, তাহার নাম অক্ষদ্যূত। নল রাজা পুষ্করকে বলিতেছেন;—

"নচেদ্বাঞ্ছসি দ্যূতং তৎ যুদ্ধদ্যূতং প্রবর্ত্ততাম্।"

৮—৭৮ বনপর্ব্ব।

হে রাজন্, যদি দ্যূতক্রীড়া করিতে অভিলাষ না করেন, তবে দ্বৈরথবিধানে যুদ্ধদ্যূতে প্রবৃত্ত হউন।

এই ভাবে আমরা স্থানান্তরে দেখিতে পাই, যুদ্ধের নাম প্রাণদ্যূত। বনবাসকালে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন;—

"অতর্কিতবিনাশশ্চ দেবলেন বিশাম্পতে।"

৫—১৩ বনপর্ব্ব।

দ্যূতক্রীড়াতে অতর্কিত বস্তুরও বিনাশ হয়।

এ স্থলে তর্ক-কথার খেলায় সাহায্যে দ্যূতের সহিত বিচারের সম্বন্ধ স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। দ্যূত কথার আরও যে অন্য প্রকার অর্থ হইতে পারে, তাহা কবি স্থানান্তরে দিয়াছেন।

"দ্যূতমেতৎ পুরা কল্পে দৃষ্টং বৈরকরং নৃণাম্।
তস্মাদ্দ্যূতং ন সেবেত হাস্যার্থমপি বুদ্ধিমান্॥"

১৯—৩৭ উদ্‌যোগপর্ব্ব।

এই যে দ্যূতক্রীড়া হইল, ইহা পূর্ব্বকল্পে মানবগণের বৈরকর দৃষ্ট হইয়াছে। অতএব বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি পরিহাসের নিমিত্তও দ্যূতসেবা করিবে না।

বনবাসকালে যুধিষ্ঠির দ্রৌপদী ও ভ্রাতৃগণকে বলিতেছেন;—

"অহং হ্যক্ষানম্বপদ্যং জিহীর্ষন্ রাজ্যং সরাষ্ট্রং ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রাৎ।"

৩—৩৪ বনপর্ব্ব।

আমি ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রের নিকট হইতে রাষ্ট্রের সহিত রাজ্য হরণ করিবার নিমিত্ত দ্যূতক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হই। মহাভারতে রাষ্ট্র, রাজ্য, রত্ন, ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি কথা একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। প্রায় সকল স্থানেই এই কথাগুলির পশ্চাতে আধ্যাত্মিক ভাবের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। স্বারাজ্য কথা শ্রুতিমূলক; মোক্ষের সহিত ইহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। যুধিষ্ঠিরকে কবি সর্ব্বগুণের আধার বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন। তিনি যে রাজ্যলোভে সাধারণ লোকের ন্যায় জুয়া খেলিয়া রাজ্য হরণ করিবার চেষ্টা করিবেন, তাহা সম্ভব নহে।

আরও একটু কথা আছে। দ্যূতের নামান্তর পরিদেবন। পরিদেবন করার অর্থ বিলাপ। 'আননং লপনং', আমরা পুনরায় দশাননের দেখা পাই। দ্যূতের নাম গ্রহ; "র-লয়োঃ সাবর্ণ্যাৎ" গ্রহ ও গ্লহ একই কথা। বিগ্রহ কথার অর্থ বিবাদ। বিবিধ বেদ-বাদের নাম বিবাদ, বিপরীত বেদবাদকেও বিবাদ বলে। তাহা হইলে সভাতে যে কি প্রকার দ্যূতক্রীড়া হইয়াছিল, তাহার একটু ইঙ্গিত পাওয়া যায়। শেষ কথা—দ্যূতের নামান্তর দুরোদর। এ স্থলে পুনরায় আমরা মন্দোদরীর সাক্ষাৎ পাইলাম।

এখন যাঁহারা দ্যূতক্রীড়া করিতেছিলেন, তাঁহারা কে, তাহা বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক। পাণ্ডব কথার অর্থ কি? প্রথমতঃ ইহার আখ্যায়িকার অর্থ পাণ্ডুপুত্র। কিন্তু পাণ্ডব কথা পণ্ড হইতে নিষ্পন্ন হইতে পারে। মুনি-শাপে পাণ্ডু পুত্র-জনন সম্বন্ধে নিষ্ফল অর্থাৎ 'পণ্ড' হইয়াছিলেন। সেই কারণে তাঁহার পুত্রদিগের নাম হইল পাণ্ডব। এ স্থলে কবি ইঙ্গিত দিলেন যে, পাণ্ডবরা ক্লীবের পুত্র। আর একটু কৌতুকের কথা আছে। হরিণরূপী মুনি পাণ্ডুকে এই শাপ দিয়াছিলেন, হরিণ অর্থে পাণ্ডুর। পাণ্ডু নাম, ব্যাসের পুত্র সম্বন্ধে কেবল ব্যবহৃত হইত, তাহা নহে; যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পাণ্ডুপুত্রদিগকেও পাণ্ডু বলিত।

"পাণ্ডুরেব পাণ্ডবঃ, স্বার্থে তদ্ধিতঃ।"

২২—৯০ উদ্‌যোগপর্ব্ব।

সেইরূপ কুরুবংশীয়দিগকে কুরু বলিত ও ভরতবংশীয়-দিগকে ভরত বলিত; ইক্ষাকুবংশীয়দিগকে ইক্ষাকু বলিত। পাণ্ডু কথার এক অর্থ শ্বেতবর্ণ, আর এক অর্থ রক্তপীত-মিশ্রিত বর্ণ, তৃতীয় অর্থ পীতবর্ণ। অর্থাৎ শ্বেত এবং নানা-বিধ মিশ্রিত বর্ণকে পাণ্ডুবর্ণ বলে। বর্ণ কথার সাধারণ অর্থ রং; ইহার অন্য প্রকার অর্থও আছে। গুণ আরোপণ করিয়া নানাপ্রকার বর্ণ কল্পিত হইয়াছে, ইহাই হইল হিন্দুসমাজে বর্ণবিভাগের গূঢ় তাৎপর্য্য। যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পঞ্চ ভ্রাতাতে এই কল্পনা সুন্দররূপে রক্ষিত হইয়াছে। অর্জ্জুন কর্ত্তৃক বর্ণনায় যুধিষ্ঠির ও ভীম উভয়েই গৌরবর্ণ; এ স্থলে বর্ণ অর্থে রং। কিন্তু আরও একটু ভিতরকার কথা আছে। যুধিষ্ঠির হইলেন ধর্ম্মপুত্র, তিনি নিষ্পাপ অর্থাৎ শুক্লবর্ণ। ভীম বায়ুর পুত্র,—মরুদ্গণ বৈশ্যবর্ণ। অর্জ্জুন নর-নারায়ণের এক অংশ; বিষ্ণু ক্ষত্রিয়বর্ণ। নকুল-সহদেব শূদ্রবর্ণ অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের পুত্র। অর্থাৎ পাঁচ ভ্রাতাতে ভাল মন্দ উভয়ই মিশ্রিত ছিল। প্রথম তিন ভ্রাতা হই-লেন কুন্তীর পুত্র।

কুন্তী কল্পনাটি কি? এ সম্বন্ধে একটি অতিশয় কৌতুক-ময় রহস্য আছে। যখন যুধিষ্ঠির, ভীম এবং অর্জ্জুনের জন্ম হইল, তখন পাণ্ডু কুন্তীকে অনুরোধ করিলেন যে, তুমি আর একবার আর এক জন দেবতাকে স্মরণ কর, তাহা হইলে তোমার আর এক পুত্র জন্মিবে। কুন্তী পাণ্ডুর কথায় এক-কালে অস্বীকৃতা হইলেন। তিনি বলিলেন—

"নাতশ্চতুর্থং প্রসবমাপৎস্বপি বদন্ত্যত।
অতঃপরং স্বৈরিণী স্যাদ্বন্ধকী পঞ্চমে ভবেৎ॥"

৭৭—১২৩ আদিপর্ব্ব।

কুন্তী তাঁহাকে কহিলেন, ধর্ম্মবেত্তারা আপৎকালেও চতুর্থ প্রসব প্রশংসা করেন না। কারণ, চতুর্থ পুরুষসংসর্গে স্বৈরিণী হয় এবং পঞ্চম পুরুষসংসর্গ করিলে বেশ্যা হইয়া থাকে। কুন্তী তখন ভুলিয়া গেলেন, কর্ণ বলিয়া তাঁহার আর এক পুত্র ছিল; তিনি নিজেকে স্বামীর নিকট স্বৈরিণী বলিয়া পরিচয় দিতে কুন্ঠিত হইলেন। বলা বাহুল্য, এ সকল কথাগুলিই কল্পনা-প্রসূত। স্বৈরিণী ও বেশ্যা এই দুই শব্দের অর্থ লইয়া এই কৌতুকময় রহস্যটি গঠিত হইয়াছে।

কুন্তী কে? কু অর্থে পৃথিবী, কুন্তীর অপর নাম পৃথা, কুন্তী ধৈর্য্যের নিমিত্ত প্রসিদ্ধা। এ পৃথিবী কে?

"সর্ব্বভূতানাং জনয়িত্রী অবিদ্যা পৃথিবী।"

১০—১৯ শান্তিপর্ব্ব।

এ স্থলে আমরা অবিদ্যা অর্থাৎ বেশ্যা পাইলাম। বলা বাহুল্য, অবিদ্যা অর্থে মোহ। স্বৈরিণী কথার অর্থ কি?

"কৃষ্ণদ্বৈপায়নো রাজন্নজ্ঞাতচরিতং চরন্।
বারাণস্যামুপাতিষ্ঠন্মৈত্রেয়ং স্বৈরিণীকুলে॥"

৩—১২০ অনুশাসনপর্ব্ব।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন অজ্ঞাতচরিতরূপে বিচরণ করত বারা-ণসীতে মুনিমণ্ডলের মধ্যে মৈত্রেয়ের নিকট উপস্থিত হইলেন।

স্বৈরিণীর অর্থ হইল মুনিমণ্ডল।

স্বম্ ঈরয়তি ধর্ম্মায় প্রেরয়তি স্বৈরিণী মুনিশ্রেণী তস্যাঃ কুলে গৃহে। টীকাকার ঈরয়তি অর্থে প্রেরয়তি করিয়া-ছেন। আমার বোধ হয়, 'ধর্ম্মং' কথয়তি করিলে সমীচীন-তর অর্থ হয়। ঈরা, ইলা, পৃথিবী, গো, বেদ এ সকলই সমান অর্থবাচক। যাহা হউক, স্বৈরিণী কথার সহিত ধর্ম্ম কথার সম্বন্ধ পাওয়া গেল। এ সম্বন্ধের প্রয়োজন শীঘ্রই দেখিতে পাইব।

উদ্ধৃত শ্লোকে যে স্বৈরিণী কথা ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহার আরও একটু গূঢ় তাৎপর্য্য আছে। স্ব অর্থে স্বর্গ; স্বং ঈরয়তি অর্থে স্বর্গপ্রাপক; স্বর্গের সহিত যজ্ঞের সম্পর্ক মহাভারতে অসংখ্য স্থানে দেখিতে পাইব। এ স্থানে কুন্তীর সহিত স্বর্গের অথবা যজ্ঞপন্থার সম্বন্ধ পাইলাম। কাশীতে মুনিগণ ছিলেন, এ কাশী কথার গূঢ় তাৎপর্য্য পরে বুঝিতে পারিব।

পাণ্ডব কথার উৎপত্তি সম্বন্ধে বোধ হয় আরও কিছু বলা যাইতে পারে। পা+অণ্ড+ব এই ভাবে কথাটি নিষ্পন্ন করিলে আর এক প্রকার অর্থ হয়। পা অর্থে রক্ষা অথবা ধারণ অর্থাৎ 'ধর্ম্ম' যদি করা যায়, আর অণ্ড অর্থে যদি বীজ বা কারণ হয়, তাহা হইলে পাণ্ড কথার অর্থ ধর্ম্মের বীজ বেদ হইতে পারে। সেই ভাবে পাণ্ডব অর্থে 'পাণ্ডং বান্তি গচ্ছন্তি যে তে পাণ্ডবাঃ।' অর্থাৎ বৈদিক পন্থা অনু-সরণকারী। এই ভাবে কুশীলবা, কেশব প্রভৃতি কথা নিষ্পন্ন হইয়াছে। পাণ্ডব কথার অন্য প্রকার অর্থও হইতে পারে। সেই অর্থটি বুঝিতে হইলে আর একটি কথার সাহায্য লইতে হয়।

"শীর্ষপাষাণসংচ্ছন্নাঃ কেশশৈবালশাদ্বলাঃ।
অস্থিমীনসমাকীর্ণা ধনুঃশরগদোড়ুপাঃ॥"

৩০—৫২ কর্ণপর্ব্ব।

এ স্থলে উড়ুপা কথার অর্থে টীকাকার বলিতেছেন, ভাস্বরস্বাহুড়ুবন্নক্ষত্রসদৃশীঃ পাস্তীত্যুড়ুপাঃ ধনুরাদিবহুড়ুপঃ শোভা যাসাং তা ইতি বা।

এ স্থলে উড়ুপার কথা হইতে পা ও ভা এক কথা হইতে পারে বলিয়া মনে হয়। তাহা হইলে পাণ্ডং জ্যোতীরূপং অণ্ডং বাতি গচ্ছতি ইতি পাণ্ডবঃ; এ অর্থও হইতে পারে। এ সম্বন্ধে বিভাণ্ড কথা মনে হয়। পাণ্ডবদিগের সহিত ইন্দ্রের অর্থাৎ যজ্ঞাভিমানী দেবতার সম্বন্ধ নানাপ্রকারে দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহাদের রাজধানীর নাম হইল ইন্দ্রপ্রস্থ, তাঁহাদের ভৃত্যের নাম ছিল ইন্দ্রসেন।

যুধিষ্ঠির হইলেন ধর্ম্মের পুত্র, স্বয়ং ধর্ম্ম বিদুররূপে জন্মগ্রহণ করেন। আখ্যায়িকা হিসাবে ধর্ম্ম ও ধর্ম্মপুত্রের মধ্যে প্রভেদ থাকিতে পারে, কিন্তু গূঢ় তাৎপর্য্য বুঝিতে হইলে উভয় কথার প্রায় এক অর্থ হয়।

উপরে বলিয়াছি, পুত্র অর্থে স্বরূপ; 'আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ' যুধিষ্ঠির হইলেন ধর্ম্মের স্বরূপ।

"এষ বিগ্রহবান্ ধর্ম্ম।" ১০—৭০ বিরাটপর্ব্ব।

ইনি মূর্ত্তিমান্ ধর্ম্ম। ভীষ্ম এক স্থানে বলিতেছেন :—

"ত্যজেত সর্ব্বপৃথিবীং সমৃদ্ধাং যুধিষ্ঠিরো ধর্ম্মমথো ন জহ্যাৎ।"

৪৮—৬৯ সভাপর্ব্ব।

যুধিষ্ঠির সমস্ত পৃথিবী ত্যাগ করিতে পারেন, কিন্তু ধর্ম্ম ত্যাগ করিতে পারেন না। অন্যত্র যুধিষ্ঠির সম্বন্ধে কথিত আছে :—

"যস্য নাস্তি সমং কশ্চিৎ।"

৪—৫৫ শান্তিপর্ব্ব।

যাঁহার সমান কেহ নাই। যুধিষ্ঠিরকে সর্ব্বগুণসম্পন্ন করিবার বিশেষ কারণ আছে।

শরশয্যায় শয়ান ভীষ্ম সমবেত মুনিমণ্ডলী ও পঞ্চভ্রাতাকে ধর্ম্মের নিগূঢ় তাৎপর্য্য বলিতেছেন। শান্তিপর্ব্বকে মহাভারতের অমৃত বলে। যুধিষ্ঠির ধর্ম্ম সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতেছেন, ভীষ্ম উত্তর দিতেছেন।

"যুধিষ্ঠিরস্তু ধর্ম্মাত্মা মাং ধর্ম্মানমুপৃচ্ছতু।"

২—৫৫ শান্তিপর্ব্ব।

ভীষ্ম বলিলেন, আমি প্রহৃষ্ট অন্তঃকরণে ধর্ম্মকথা বলিব, কিন্তু কোন ধর্ম্মাত্মা আমাকে ধর্ম্ম বিষয়ে প্রশ্ন করুন, পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠির আমায় প্রশ্ন করুন। ধর্ম্মশিক্ষা বিষয়ে হিন্দুধর্ম্মের ইহা একটি মৌলিক বিধি। পবিত্র মনে অনুসন্ধান না করিলে তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় না। আর এক স্থলে দুর্য্যোধন যুধিষ্ঠির সম্বন্ধে বলিতেছেন যে, বেদান্ত ও যজ্ঞসাগরের পারদর্শী রাজেন্দ্রগণ যুধিষ্ঠিরকে উপাসনা করেন।

১—৫২ সভাপর্ব্ব।

বেদান্ত ও যজ্ঞ-সাগরের পারদর্শী এই দুইটি বিশেষণের উপযোগিতা শীঘ্রই বুঝিতে পারিব।

তবে সকল স্থানে যুধিষ্ঠির সম্বন্ধে এ ভাব রক্ষিত হয় নাই। দ্রোণাচার্য্যের বধের নিমিত্ত কবি যুধিষ্ঠিরকে মিথ্যা কথা বলাইয়াছেন। দুর্য্যোধনের রাজ্য হরণের নিমিত্ত যুধিষ্ঠির দ্যূতক্রীড়া করিয়াছিলেন; কর্ণের সহিত যুদ্ধে ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া যুধিষ্ঠির পলায়ন করেন। বলা বাহুল্য, এইরূপে যুধিষ্ঠিরকে অঙ্কিত করিবার বিশেষ কারণ ছিল। এই প্রকার গুটিকত স্থান ভিন্ন সকল স্থানেই যুধিষ্ঠিরকে ধর্ম্মের আদর্শ করিয়া চিত্রিত করিয়াছেন। দ্যূতক্রীড়াস্থলে ধর্ম্মের সহিত যুধিষ্ঠিরের কি সম্বন্ধ, তাহা এখনই দেখিতে পাইব।

ভীমের স্বরূপ একটু বুঝা কঠিন। দেহের বলের নিমিত্ত ভীম প্রসিদ্ধ। বায়ু তুল্য কেহ বলশালী নাই। যে কার্য্যে দেহের বলের প্রয়োজন, ভীম সেই স্থানেই আছেন। কুন্তীকে বহিতে হইবে, দ্রৌপদীকে বহিতে হইবে, ভীম তাহাই করিতেছেন। দ্রৌপদী বলিলেন, আমার জন্য পদ্ম লইয়া এস, ভীম তাহাই আনিতে গেলেন; তাহার ফলে যক্ষদিগের সহিত তাঁহার যুদ্ধ বাধে। ভীম হিড়িম্ব রাক্ষস, বক রাক্ষস বধ করেন। কুন্তী ভীমের দেহ অনুপাতে তাঁহাকে ভোজন করাইতেন। যখন পাঁচ ভাই ব্রাহ্মণ সাজিয়া পাঞ্চাল নগরে বাস করিতেছিলেন, তখন ভিক্ষালব্ধ অন্নের আধভাগ ভীম একা খাইতেন; বাকী আধভাগ আর সকলে মিলিয়া খাইতেন। ভীমকে তুবরক বলিলে ভীম মহা রুষ্ট হইতেন। তুবরক যে বলিত, তিনি তাহাকে বধ করিতে ছুটিতেন। তুবর ও তুপর একই কথা, ইহার অর্থ দাড়ি-গোঁপ-বিহীন; তদ্ভিন্ন উভয় কথার আর এক অর্থ আছে।

"অথোহজ··· ———মূঢ়ম্।"

৬৩—১৫৯ উদ্যোগপর্ব্ব।

এই সকল কথার গূঢ় অর্থ পরে দেখিব।

কবি ইহা অপেক্ষা ভীমকে কৃষ্ণতর বর্ণে চিত্রিত করিয়াছেন। ভীম দুর্য্যোধনকে অন্যায় যুদ্ধে নিপাতিত করেন, দুঃশাসনকে নিহত করিয়া তাহার শোণিত পান করেন। রক্ত পান করিয়া তিনি বলিলেন যে, এরূপ অমৃত পূর্ব্বে কখন আস্বাদন করেন নাই, অথচ লোকসমক্ষে প্রকাশ করিলেন যে, তিনি দুঃশাসনের রক্তপান করেন নাই, কেবলমাত্র ওষ্ঠ দিয়া রক্ত স্পর্শ করিয়াছিলেন। যুদ্ধের পর তাঁহারই নির্ম্মম বাক্যে পীড়িত হইয়া অন্ধ, পুত্রহীন ধৃতরাষ্ট্র হস্তিনাপুর ত্যাগ করিয়া গান্ধারীর সহিত বনে গমন করেন।

তবে ভীমকে অন্যরূপেও কবি চিত্রিত করিয়াছেন। বনবাসকালে এবং যুদ্ধের পর যখন পাঁচ ভাই ও দ্রৌপদী বসিয়া ধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন, তখন ভীমও তাঁহাদের সকলের সহিত সমভাবে নৈতিক ও দার্শনিক বিচার করিতেন। ভীমের এই প্রকার জ্ঞানী রূপের ইঙ্গিত তাঁহার একটি নাম হইতে বোধ হয় পাওয়া যায়। ভীম মরুতের পুত্র, মারুতি। মারুতি কথা হইতে ভীমের জ্ঞানের সহিত সম্বন্ধের বোধ হয় কিছু ইঙ্গিত আছে। মা অর্থে লক্ষ্মী; মাধব অর্থে লক্ষ্মীপতি; এ লক্ষ্মী কথার অর্থ কি? সচরাচর সম্পদ অথবা সৌভাগ্য-অভিমানিনী দেবতাকে লক্ষ্মী বলে। কিন্তু লক্ষ্মী কথার আর এক অর্থ আছে; লক্ষ্মী—স্ত্রীং-(লক্ষ+ঈ—কর্ত্তৃ) (নীতিমান্‌কে দেখে যে)। লক্ষ্মী কথার নামান্তর ক্ষীরাব্ধিতনয়া, ভার্গবী, দুগ্ধাব্ধিতনয়া; লক্ষ্মীমন্ত্র হইল 'সর্ব্বকামফলপ্রদ', বেদমাতা সুরভি হইলেন সর্ব্বকামদুঘা কামধেনু। লক্ষ্মী ক্ষীরসাগর-সম্ভূতা; বলা বাহুল্য, এ ক্ষীর সুরভি ধেনুর জ্ঞানরূপ অমৃত। আর একটু কথা আছে। লক্ষ্মী পদ্মালয়া, সরস্বতী পদ্মাসনা; উভয় কল্পনার মূলে একই ভাব রহিয়াছে। য়ুরোপীয়গণ মনুষ্য-হৃদয়কে তাসের হরতনের ছাপের মত অঙ্কিত করেন। প্রকৃতপক্ষে এই প্রকার ছাপের সহিত মনুষ্য-হৃদয়ের কোন সাদৃশ্য নাই। যাঁহারা আবরক ঝিল্লী-(পেরিকার্ডিয়ম) মধ্যে স্থিত মনুষ্য-হৃদয় ও সেই হৃদয় হইতে উত্থিত বৃহৎ বক্রাকার এয়োর্টা ধমনী দেখিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, সবৃন্ত প্রস্ফুটোন্মুখ পদ্ম-কোরক তাহার অবিকল অনুরূপ। ইহা হইতে পদ্মালয়া ও পদ্মাসনার কথার অর্থ অনুমান করা যায়। হৃদয়রূপ পুণ্ডরীক অর্থাৎ পদ্মে উঁহাদের আসন। ইহার অর্থ—মনে জ্ঞানের উদয় হয়। শুদ্ধচৈতন্য রামের ভ্রাতার নাম লক্ষ্মণ। আমার বোধ হয়, জ্ঞানের ভাব লইয়া লক্ষ্মণ কথাটি নিষ্পন্ন হইয়াছে।

"হুত্বা চাহবনীয়স্থং মহাভাগ্যে প্রতিষ্ঠিতাঃ।
অগ্রে ভোজ্যাঃ প্রসূতীনাং শ্রিয়া ব্রাহ্ম্যানুকল্পিতাঃ॥"

৯—৩৫ অনুশাসনপর্ব্ব।

এ স্থলে শ্রিয়া অর্থে বিদ্যয়া, তাহা হইলে লক্ষ্মী ও বিদ্যা একই অর্থবাচক হইল। তাহা হইলে মারুতি কথার অর্থ হইল—যাহার রু (রব) মা অর্থাৎ জ্ঞান সদৃশ; হনুমান্ ও ভীমসেন সেই মারুতি।

অর্জ্জুন কল্পনার মূল কি? যে যে শব্দে অর্জ্জুন বুঝায়, সেই সেই শব্দে অর্জ্জুনবৃক্ষ বুঝায়। অর্জ্জুনবৃক্ষের একটি নাম ইন্দ্রদ্রু।

"নদী সর্জ্জো বীরতরুরিন্দ্রদ্রুঃ ককুভোর্জ্জুনঃ।"

—অমরকোষ।

তাহা হইলে আমরা দেখিতে পাইলাম, একটি জড়-পদার্থ (অর্জ্জুনবৃক্ষ) অবলম্বন করিয়া অর্জ্জুন কল্পিত হইয়াছে। এই বৃক্ষের অপর নাম অর্জ্জুনদ্রু; দ্রু, দ্রুমঃ (অমরকোষ), যাহার নাম দ্রু, তাহার নাম দ্রুম। অর্জ্জুন-বৃক্ষ হইল ইন্দ্রদ্রুম; তৃতীয় পাণ্ডব হইলেন ইন্দ্রপুত্র। দ্বিতীয় কথা, অর্জ্জুন অর্থে শ্বেত, "সিতো গৌরো বলক্ষো ধবলোঽর্জ্জুনঃ।"—অমরকোষ।

পুনরায় আমরা সিত শুক্র নিষ্পাপ কথার ইঙ্গিত পাইলাম। তৃতীয় কথা ঋ—গতৌ। অর্জ্জুন শব্দ ঋ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইতে পারে। সর্ব্বে গত্যর্থা জ্ঞানার্থাশ্চ, সকল গত্যর্থ শব্দ জ্ঞানার্থবাচক। এ স্থলে আমরা অর্জ্জুনের সহিত শুভ্র নির্ম্মল জ্ঞানের সম্বন্ধ দেখিতে পাই। কবি এই ভাবটি এক স্থানে সুন্দররূপে প্রকাশ করিয়াছেন।

দুর্য্যোধন বলিতেছেন,—

"ভগবান্ দেবকীপুত্রো লোকাংশ্চেন্নিহনিষ্যতি।
প্রবদন্নর্জ্জুনে সখ্যং নাহং গচ্ছেঽস্য কেশবম্॥"

৭—৬৯ উদ্যোগপর্ব্ব।

দুর্য্যোধন বলিলেন, দেবকীপুত্র ভগবান্ কেশব যদি অর্জ্জুনের সহিত মিত্রতা স্বীকার করত সমস্ত লোক সংহার করেন, তথাপি আমি এক্ষণে তাঁহাকে প্রাপ্ত হইতে পারি না।

এ স্থলে টীকাকার অর্জ্জুন শব্দের অর্থ করিতেছেন, "অর্জ্জুনে বিশুদ্ধে কামক্রোধাদিমলশূন্যে সখ্যং বদন্ ভগবানস্তি।" তাহা হইলে অর্জ্জুন হইলেন বিশুদ্ধ নির্ম্মল। রামায়ণে শুক্লা নিষ্পাপা সীতা হইলেন শুদ্ধব্রহ্ম রামের অর্দ্ধাংশ। মহাভারতে কৃষ্ণার্জ্জুন অর্থাৎ নরনারায়ণকে দেখিতে পাইলাম। এ স্থলে নর, অর্জ্জুন হইলেন নারায়ণের অংশ। চতুর্থ কথা, অর্জ্জুন হইলেন ইন্দ্রপুত্র, ইন্দ্র স্বর্গের অধিপতি। যজ্ঞের সহিত স্বর্গের যে সম্বন্ধ, তাহা পরে দেখিব। ইন্দ্র হইলেন যজ্ঞাভিমানী দেবতা, অর্জ্জুন তাঁহারই পুত্র।

অর্জ্জুনের গাণ্ডীব কি? গাণ্ডীব কথা গাণ্ডি+ব এইরূপে নিষ্পন্ন হইয়াছে। গণ্ড+ই=গাণ্ডি; ইহার অর্থ গ্রন্থি. অর্থাৎ অর্জ্জুনের ধনুক গ্রন্থি অর্থাৎ পর্ব্বযুক্ত ছিল; ইহাই হইল এক প্রকার অর্থ। গ্রন্থি ও গ্রন্থ নদ ও নদী শব্দের ন্যায় এক অর্থবাচক, উহা পর্ব্বযুক্ত; এ গ্রন্থখানি কি?

"তচ্চ দিব্যং ধনুঃ শ্রেষ্ঠং ব্রহ্মণা নির্ম্মিতং পুরা।"

১৯—২২৫ আদিপর্ব্ব।

সেই শ্রেষ্ঠ ধনু যাহা ব্রহ্মা পূর্ব্বে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ব্রহ্মা বেদের কর্ত্তা, তাহা হইলে গাণ্ডীব ধনুর অর্থে বেদ। উপরে দেখিয়াছি, ধনু ও ধেনু একই কথা হইতে পারে। স্থানান্তরে অর্জ্জুন যাহা বলিতেছেন, তাহা হইতে এই অনুমান আরও দৃঢ়তর হয়।

"জানাসি দাশার্হ মম ব্রতং ত্বং
যো মাং ব্রূয়াৎ কশ্চন মানুষেষু।
অন্যস্মৈ তং গাণ্ডীবং দেহি পার্থ
যস্তত্তোঽস্ত্রাদ্বীর্য্যতো বা বরিষ্ঠঃ॥"

কর্ণপর্ব্ব।

অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন, হে বৃষ্ণিপ্রবর দাশার্হ কেশব, আমার এই নিয়ম তোমার বিদিত আছে, যে মনুষ্যমধ্যে যে কোন লোক আমাকে "পার্থ, যে ব্যক্তি তোমা অপেক্ষা অস্ত্রে বা বীর্য্যে শ্রেষ্ঠ, তুমি তাহাকে গাণ্ডীব প্রদান কর", এই কথা বলিবে, আমি তৎক্ষণাৎ তাহাকে বিনষ্ট করিব এবং ভীমেরও এই প্রতিজ্ঞা আছে যে, কেহ তাঁহাকে 'তুবরক' বলিয়া সম্বোধন করিলে তিনি তাহার প্রাণ সংহার করিবেন।

উপরের শ্লোকের নিগূঢ় অর্থ—যে কেহ তাঁহাদিগকে বেদবিরোধী বলিবেন অথবা তাঁহাদিগকে বেদ ত্যাগ করিতে বলিবেন, তাঁহারা তাহাকে বধ করিবেন। এইরূপ অর্থ কি করিয়া হইল, তাহা পরে দেখিব। অর্জ্জুনের রথ কপিধ্বজ, কপি অর্থে ধর্ম্ম; তাঁহার অশ্ব শ্বেতবর্ণ।

নকুল-সহদেব মাদ্রীর পুত্র। মাদ্রী স্বামীর সহিত চিতারোহণের সময় নিজের দুইটি শিশুপুত্রকে কুন্তীর হাতে সমর্পণ করিয়া দিয়া যান। কুন্তীও তাহাদিগকে নিজ পুত্রদিগের ন্যায় পালন ও স্নেহ করিতেন। বিশেষ করিয়া সহদেবকে তিনি অতিশয় স্নেহ করিতেন। ইহাদের রহস্য পরে বুঝিতে চেষ্টা করিব।

পঞ্চ পাণ্ডব হইলেন কুন্তীর পুত্র, অথবা পুত্রস্থানীয়। এক পক্ষে ইঁহারা হইলেন ধর্ম্ম প্রভৃতি দেবতা ও দিক্‌পালগণের পুত্র, অপর পক্ষে ইঁহারা হইলেন অবিদ্যা অর্থাৎ মোহের পুত্র। তাহা হইলে বুঝিতে পারা যায়, কেন ইঁহারা সময়ে সময়ে পাপে লিপ্ত হইতেন। পাণ্ডবদিগের এই ইন্দ্রিয়সেবী মোহজ রূপের কবি এক স্থানে অতি প্রশস্ত ইঙ্গিত দিয়াছেন। ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে বলিতেছেন:—

"শুদ্ধাভিজনসম্পন্নাঃ পাণ্ডবাঃ সংশিতব্রতাঃ।
বিহৃত্য দেবলোকেষু পুনর্মানুষমেষ্যথ॥"

৬৯—২৭৯ শান্তিপর্ব্ব।

তোমরা পাঁচ ভাই মৃত্যুর পর স্বর্গে গমন করিবে, তথায় পুণ্যক্ষয় হইলে পুনরায় পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিবে; পুনরায় তোমরা স্বর্গে যাইবে, পুনরায় পৃথিবীতে আসিবে। এইরূপে অগণিত বার তোমাদিগকে যাতায়াত করিতে হইবে। বাস্তবিক কবি পাঁচ ভাইকেই স্বর্গ নরক দেখাইয়াছেন। ভীষ্মের কথার নিগূঢ় তাৎপর্য্য আছে, যজ্ঞপন্থা হইল পুনরাবৃত্তি পন্থা, যজ্ঞপন্থার সহিত পাণ্ডবদের সম্বন্ধ শীঘ্রই দেখিতে পাইব।

[ক্রমশঃ।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

রূপের মোহ

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

ঝটিকা সে রাত্রিতে যেন মৃত্যুর বার্ত্তা বহন করিয়াই বহিতেছিল। এমন ভীষণ ঝড় রমেন্দ্র কখনও দেখে নাই। প্রতি মুহূর্ত্তেই মনে হইতেছিল, মত্ত দৈত্য সহস্র-বাহুর দ্বারা দ্বার-জানালা চূর্ণ করিয়া এখনই সকলকে উড়াইয়া লইয়া যাইবে। সন্ধ্যার সময় ঝড়ের অবস্থা দেখিয়া বাড়ীর সকলে সকাল সকাল আহারের হাঙ্গামা মিটাইয়া ফেলিয়াছিল। অন্য দিনের মত আজ অমিয়া রমেন্দ্রের আহারের সময় উপস্থিত থাকিতে পারে নাই। তাহার শিরঃপীড়া অনেকটা কমিয়া গেলেও ক্লান্তিবশতঃ সে তখনও শয্যাত্যাগ করে নাই।

সন্ধ্যার সময় হইতেই পিসীমার বাতিকের জ্বর বাড়িয়াছিল। এত যে ঝড় হইতেছিল, তাহাতেও তাঁহার হুঁস ছিল না। মাঝে মাঝে তাঁহার এমন জ্বর হইত। এক দিনের বেশী জ্বর থাকিত না। সাত আট ঘণ্টা বেহুঁস থাকিবার পর জ্বর ছাড়িয়া যাইত। পুরাতন পরিচারিকা সৈরভী পিসীমার ঘরে থাকিত, আজও সে তাঁহার শয্যা-পার্শ্বে বসিয়া ছিল।

সামান্য কিছু আহারের পর অমিয়া একবার পিসীমার সন্ধান লইতে গেল। তাঁহার জ্বরের জন্য কাহারও দুর্ভাবনা ছিল না, কারণ, সকলেই তাঁহার জ্বরের গতির সহিত পরিচিত ছিল। খানিক পিসীমার শয্যায় বসিয়া থাকিবার পর সৈরভীকে পিসীমা সম্বন্ধে সতর্ক থাকিতে বলিয়া অমিয়া ক্লান্তদেহে শয়নকক্ষে ফিরিয়া আসিল। তাহার মাথার যন্ত্রণা সম্পূর্ণ তিরোহিত হইয়াছিল। কিন্তু ক্লান্তদেহেও নিদ্রা আসিতেছিল না।

সে ছোট টেবলটির ধারে চেয়ারখানা টানিয়া লইয়া বসিল। জানালা-দরজা রুদ্ধ। ঝটিকার বেগ ও গর্জ্জন ক্রমেই বাড়িতেছিল। বৃষ্টির ধারা ও ঝটিকার প্রবাহ রুদ্ধ বাতায়নে প্রচণ্ডবেগে প্রতিহত হইতে লাগিল।

নিদ্রার স্পৃহা বিন্দুমাত্র নাই। বিপ্লবময়ী রজনীর সহিত তাহার হৃদয়ের কোনও যোগসূত্র আছে কি না, বসিয়া বসিয়া সে কি তাহাই ভাবিতেছিল?

সরযূর এ রাত্রিতে ফিরিবার আর কোন সম্ভাবনা নাই। এমন দুর্য্যোগে লীলার মা কখনই তাহাকে ছাড়িয়া দিবেন না; কেই বা দেয়? আর দাদা? তাই ত, তিনিই বা কোথায় আটক পড়িলেন? সম্ভবতঃ কোথাও তিনি আশ্রয় লইয়াছেন। এ রাত্রিতে ঘরে ফিরিয়া আসা তাঁহার পক্ষেও অসম্ভব। যদি ঝড় কমিয়া যায়, তাহা হইলে আসিতে পারেন। সহোদরের জন্য উদ্বিগ্নভাবে সে উঠিয়া একবার জানালা খুলিয়া প্রকৃতির অবস্থা দেখিবার চেষ্টা করিল। খোলা পথে উদ্দাম বায়ুপ্রবাহ এমনভাবে প্রবেশ করিল যে, তখনই অমিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দিল। মুহূর্ত্ত দৃষ্টিপাতে সে আকাশের যে অবস্থা দেখিল, তাহাতে বুঝা গেল, শীঘ্র এ দুর্য্যোগের অবসান ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। চিন্তিত মনে সে আবার চেয়ারে বসিয়া পড়িল।

টেবলের উপর দক্ষিণ কর রাখিয়া সে কি ভাবিতে লাগিল। প্রলয়ের বার্ত্তা লইয়াই যেন আজ এই ঝটিকা বহিতেছে! কি উদ্দাম ইহার বেগ, কি দুর্দ্দমনীয় ইহার প্রভাব! মানুষের মনের সঙ্গে কি ইহার তুলনা করা চলে না? ক্ষুদ্র হৃদয়েরও অন্তরালে সময়ে সময়ে নানাভাবে যে ঝঞ্ঝা বহিয়া থাকে, তাহাও ত এমনই প্রচণ্ড, এমনই প্রলয়কারী!

ভাবিতে ভাবিতে তাহার চিত্ত প্রবাসী স্বামীর দিকে ধাবিত হইল। এই ঝড়ের সময়ে তিনি কি করিতেছেন? পুরীর আকাশে যে বারিবিদ্যুৎভরা মেঘপুঞ্জ দেখা যাইতেছে, এলাহাবাদের আকাশেও কি তাহারা দলে দলে গিয়া পৌঁছে নাই—মত্ত বাতাস কি সেখানেও ক্ষুব্ধ শ্বাস ফেলিতেছে না? বঙ্গোপসাগরের অকূল জলধিগর্ভ হইতে উত্থিত লক্ষজটাশীর্ষ যে দানব ভীষণ হুঙ্কারে দিঙ্মণ্ডল কাঁপাইয়া, আকাশের নীলিমাকে আচ্ছন্ন করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে, তাহার করালমূর্ত্তি কি সুদূর পশ্চিমাঞ্চল পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় নাই? যদি সেখানেও এমনই দুর্য্যোগময়ী রজনীর আবির্ভাব ঘটিয়া থাকে, তবে তিনি এখন কি করিতেছেন? বিজ্ঞানের গভীরতম তত্ত্বালোচনা ঝটিকার গর্জ্জনে কি বাধা পাইতেছে না? স্বামীর স্বভাবের যতটুকু পরিচয় সে পাইয়াছে, তাহাতে সে বেশ জানে যে, পৃথিবীর কোনও আলোড়ন তাঁহার চিত্তের তন্ময়ত্বকে বিচলিত করিতে পারিবে না। বিজ্ঞানের আলোচনায় তাঁহার যত আনন্দ, এমন কিছুতেই নহে। যখন তিনি কোনও তথ্যের আবিষ্কারে নিমগ্ন থাকেন, তখন বিশ্বব্রহ্মাণ্ড উলট-পালট হইয়া গেলেও তিনি বুঝিতে পারেন না। তাহার বিবাহিত জীবনের চারি বৎসর ত এমনই ভাবে কাটিয়াছে। তাহাকে ভাল তিনি নিশ্চয়ই বাসেন; কিন্তু সে ভালবাসা পর্য্যাপ্তরূপে ব্যক্ত করিবার অবকাশ তাঁহার কোথায়? যৌবনের উদ্দাম বিলাস-লালসা সেই শান্তস্বভাব, সংযতচরিত্র ঋষিতুল্য সাধননিরত বৈজ্ঞানিকের সহিষ্ণুতাকে বিন্দুমাত্র টলাইতে পারে না। এ জন্য অমিয়া তাঁহাকে কি শ্রদ্ধাই না করিয়া থাকে! তিনি পরম সুন্দর যুবা, আর সে-ও নবীনা সুন্দরী। এ বয়সে অবাধ প্রেম-চর্চ্চায় রত থাকিলে কেহ দোষ দিতে পারে না। কিন্তু সাধনারত বৈজ্ঞানিক সে বিষয়ে উদাসীন। মনে মনে অমিয়া কি সে জন্য স্বামিগর্ব্ব অনুভব করে না?

চিন্তার ধারা সূত্রের পর সূত্র অবলম্বন করিয়া কোথা হইতে কোথায় গিয়া উপনীত হয়, তাহার কোনও ধারাবাহিক ইতিহাস এ পর্য্যন্ত মানব-মনোবৃত্তি শাস্ত্রেও লিখিত হয় নাই। অমিয়ার চিন্তাসূত্র তেমনই করিয়া সূক্ষ্ম জাল বয়ন করিতে করিতে যৌবন হইতে কৈশোর, কৈশোর হইতে বাল্য, আবার ঘুরিয়া ফিরিয়া বাল্য হইতে যৌবনের অতীত স্মৃতিকে বুনিয়া বুনিয়া কোথা দিয়া কোথায় যাইতে লাগিল, তাহা নিজেই সে বুঝিয়া উঠিতে পারিল না।

আকাশে কখনও তীব্র, কখনও মৃদুনাদে বজ্র ডাকিয়া উঠিতেছিল। জানালা ও দরজার সামান্য ফাঁক দিয়া দামিনীর চকিত দীপ্তিও মাঝে মাঝে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতেছিল। অমিয়া চাহিয়া দেখিল, টেবলের উপর স্থাপিত টাইমপিস্ ঘড়ীতে ১১টা বাজিয়া গিয়াছে। ঝটিকার বেগ তখনও বাড়িতেছিল। এবার অমিয়া সুরেশচন্দ্রের প্রত্যাবর্ত্তন সম্বন্ধে হতাশ হইল। তাঁহার কোন বিপদ ঘটে নাই ত? সে কথা ভাবিতেও তাহার সমগ্র অন্তর যেন তীব্র ব্যথায় ভরিয়া উঠিল।

চেয়ার ছাড়িয়া অমিয়া কক্ষমধ্যে পরিক্রমণ করিতে লাগিল। না, তাহার দাদা নির্ব্বোধ নহেন। ঝড়ের পূর্ব্বেই তিনি কোন গৃহস্থের বাড়ীতে নিশ্চয়ই আশ্রয় লইয়াছেন। তাহার মনের মধ্য হইতে কে যেন বলিয়া দিল, সুরেশের জন্য কোন চিন্তা নাই।

অপেক্ষাকৃত নিশ্চিন্ত মনে অমিয়া শয্যার উপর বসিল। শয়নের ইচ্ছা তখনও হইল না। টেবলের ধারে বসিয়া একখানা বই টানিয়া বাহির করিল। দুই চারি ছত্র পড়ার পর সে উহা মুড়িয়া রাখিয়া দিল। একখানা কাগজ লইয়া সে চিঠি লিখিতে বসিল। দুই চারি ছত্র লিখিয়া কি ভাবিয়া সে উহা ছিঁড়িয়া ফেলিল। আবার চেষ্টা করিল, পুনরায় ছিঁড়িয়া ফেলিল। লেখা কোন মতেই অগ্রসর হইতে চাহে না। মনের মধ্যে যে বিচ্ছৃঙ্খল ভাবরাশি জমা হইয়াছিল, তাহারা সকলে এক সময়েই যেন হুড়াহুড়ি করিয়া বাহিরে আসিতে চাহিল। কিন্তু ভাষাতে তাহাদিগকে ধরিয়া রাখা অসম্ভব।

হতাশভাবে সে দক্ষিণ করতলে মাথা রাখিয়া আবার ভাবিতে বসিল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

আর রমেন? সেই বিপ্লবময়ী রজনীতে নির্জ্জন কক্ষে রমেন্দ্র কি করিতেছিল? আহারশেষে আজ সে একটু গম্ভীরভাবেই শয়নকক্ষে ফিরিয়া আসিয়াছিল। সে কি তখন ভাবিতেছিল, ঝঞ্ঝার সহিত হৃদয়কে উড়াইয়া দিলে—সেই বজ্রবিদ্যুৎশিহরিতা প্রকৃতির বক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়িলে

কেমন হয়? সমুদ্রের তরঙ্গে মৃত্যু কি আজ মহানন্দে নাচিয়া উঠিতেছে না? মৃত্যুর মূর্ত্তি কেমন? এমনই ভৈরব-গর্জ্জনে সে কি অন্তরদেশে আবির্ভূত হইয়া থাকে? দেহকে অধিকার করিবার পূর্ব্বে মনকে সে কি অগ্রে অধিকার করিবার চেষ্টা করে না? দর্শনশাস্ত্র এ বিষয়ে অভ্রান্ত সত্যকে নির্দ্দেশ করিয়াছে কি?

কিন্তু অকস্মাৎ রমেন্দ্রের অত্যন্ত বিস্ময়বোধ হইল। মৃত্যুর কথাটা অতর্কিতভাবে আজ তাহার মনে জাগিয়া উঠিল কেন? যখন মানুষের মনে সুখ বা সুখের লালসা পরিপূর্ণভাবে রাজত্ব করিতে থাকে, তখন কি মৃত্যুর দুঃখময় চিন্তা তাহার চিত্তে বিন্দুমাত্র প্রভাব বিস্তার করিতে পারে? তবে—তবে কি তাহার আজ সেই চরম অবস্থা উপস্থিত? এই পরিপূর্ণ যৌবন, সুস্থ সবল দেহ, কল্পনাপূর্ণ হৃদয়, যশঃ ও কৃতিত্বলাভের দুর্দ্দমনীয় লিপ্সা—এ সকল বিদ্যমানেও তাহার প্রাণে মৃত্যুর চিন্তা জাগিয়া উঠিল কেন?

কেন?—তাহা ত রমেন্দ্র ভাবিয়া স্থির করিতে পারিল না। সে আবার ভাবিতে লাগিল। তাহার ত সবই আছে, অথচ এমন রিক্ততাবোধ কেন সে করিতেছে? খাঁটি সোনা, হীরা, মুক্তা, কিছুরই অভাব নাই। শুধু শিল্পীর নিপুণ হস্ত উপযুক্ত খাদ মিশাইয়া সোনাকে অলঙ্কারের উপযোগী করিয়া গড়িয়া তুলে নাই। কে সেই শিল্পী? কোথায় তাহার ঘর?—রমেন্দ্র নয়ন মুদ্রিত করিয়া দৃষ্টিকে অন্তরমধ্যে প্রেরণ করিল। কই, কিছুই ত লক্ষ্য করা যায় না!

অতীত জীবনের ঘটনাগুলি আজ আবার নূতন করিয়া মনে পড়িতে লাগিল। নিমীলিত নেত্রে রমেন্দ্র জীবনেতিহাসের অতীত অধ্যায়গুলি খুলিয়া খুলিয়া যেন পড়িতে লাগিল। সাধ, আশা, বাসনার কত রক্ত লেখাই না পৃষ্ঠাগুলিকে পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে!

ঘরের মধ্যে গাঢ় অন্ধকার—রমেন্দ্র দীপ নিবাইয়া দিয়াছিল। অন্ধকারে চিন্তা করার একটা মোহ ও উন্মাদনা আছে। চিন্তার রেখা আননে প্রতিফলিত হইলে তাহা অন্যের দৃষ্টিপথ হইতে শুধু লুকাইয়া রাখিবার সুবিধা হয় বলিয়া নহে; অন্ধকারে চিন্তার গভীরতা অধিক হয়। একাগ্রভাবে চিন্তার বিষয়কে ধারণা করিবার—উপভোগ করিবার সুবিধা ইহাতে যথেষ্ট। লোকচক্ষুকে এড়াইবার চেষ্টা অপেক্ষা আত্মবঞ্চনা করিবার চেষ্টা যাহাদের অধিক, অন্ধকারের আশ্রয় তাহাদের পক্ষে অধিকতর লোভনীয় নহে কি?

বাহিরের বিপ্লব ঘরের অন্ধকারে যেন আরও জমাট বাঁধিয়া রমেন্দ্রের অনুভূতিকে আরও উদগ্র করিয়া তুলিল। শয্যায় শয়ন করিয়া সে অর্থহীন নানাচিন্তার গোলকধাঁধার মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। নিদ্রা আজ কোনমতেই তাহার নয়নে আবির্ভূত হইবার লক্ষণ প্রকাশ করিল না।

অবশেষে রমেন্দ্র শয্যার উপর উঠিয়া বসিল। জানালা-দরজার ফাঁক দিয়া ঝটিকাপ্রবাহের প্রতিহত তরঙ্গ এক একবার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতেছিল। সহসা অন্ধকার ভেদ করিয়া কক্ষমধ্যে আলোকরশ্মির আবির্ভাব দেখিয়া সে চমকিয়া উঠিল। নিরীক্ষণ করিয়া সে দেখিল, সুরেশচন্দ্রের ক্যাম্পখাটখানা যে দিকে পাতা রহিয়াছে, সেই দিকের দ্বার ঈষন্মুক্ত। সেই ফাঁক দিয়া পার্শ্বস্থ কক্ষের দীপালোকশিখা তাহাদের ঘরের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে।

অমিয়াদের শয়নকক্ষ ও তাহাদের এই বাহিরের ঘরের মাঝের দরজাটা বন্ধই ত ছিল! উহা খুলিয়া গেল কিরূপে? বোধ হয়, কোনও সময়ে ভৃত্য ঘর পরিষ্কার করিবার কালে অর্গলমুক্ত করিয়া থাকিবে, পরে বন্ধ করিতে হয় ত ভুলিয়া গিয়াছে। এখন বাতাসের সাহায্যে অর্গলমুক্ত কপাট ফাঁক হইয়া পড়িয়াছে।

নিঃশব্দ-চরণে রমেন্দ্র দ্বার বন্ধ করিবার জন্য উঠিল। কিন্তু দরজার কাছে আসিয়াই সে সহসা স্তব্ধভাবে দাঁড়াইল। সে দেখিল, দীপ্ত আলোকাধারের সম্মুখে দক্ষিণ-করতলে মস্তক ন্যস্ত করিয়া অমিয়া বসিয়া আছে। তাহার মস্তকের ভ্রমরকৃষ্ণ কেশরাজি আলুলায়িত, পৃষ্ঠোপরি বিলম্বিত। মুখের কিয়দংশমাত্র দেখা যাইতেছিল। রমেন্দ্র বুঝিল, সুন্দরী গভীর চিন্তায় নিমগ্ন।

ঈষন্মুক্ত দ্বার আর বন্ধ করা হইল না। রমেন্দ্র নির্নিমেষ-লোচনে সেই ধ্যানমগ্না রমণীর দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কাযটা যে ভদ্রতাসঙ্গত নহে, নিতান্তই অবৈধ, তাহা রমেন্দ্রের সংস্কার তাহাকে জানাইয়া দিল, কিন্তু তথাপি সে আত্মদমন করিতে পারিল না। সেই রূপজ্যোৎস্নার আলোকে সে যেন মন্ত্রমুগ্ধ পতঙ্গবৎ আকৃষ্ট হইতে লাগিল। বক্ষের মধ্যে এ কি দ্রুততালে রক্তস্রোত চলাফেরা আরম্ভ করিয়াছে! রমেন্দ্র স্থান ও কাল বিস্মৃত হইল। যে সৌন্দর্য্যময়ী

নারীকে মানসীপ্রতিমারূপে কল্পনা করিয়া সে কবিতা রচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছে, যাহার স্মৃতি তাহার হৃদয়ের গোপন অন্তঃপুরে সদাই জাগ্রত, যাহার বিষয় চিন্তা করিতেও মন আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠে, সেই সুন্দরীকে বিপ্লবময়ী রজনীতে একাকিনী বসিয়া থাকিতে দেখিয়া তাহার সমগ্র চিত্ত যেন পাখা মেলিয়া সেই দিকে ধাবিত হইল।

অজগরের মুগ্ধদৃষ্টির সম্মুখ হইতে আকৃষ্ট জীব যেমন ইচ্ছাসত্ত্বেও অন্যত্র পলায়ন করিতে অসমর্থ হয়, রমেন্দ্রের অবস্থা ঠিক তেমনই হইল। চুম্বকশৈল যেমন লৌহকে আকর্ষণ করিতে থাকে, অমিয়ার নিশ্চল মূর্ত্তি ঠিক তেমনই ভাবে রমেন্দ্রকে আকর্ষণ করিতে থাকিল। অজ্ঞাতসারে দুই এক পদ করিয়া কখন্ যে রমেন্দ্র অমিয়ার অভিমুখে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিয়াছিল, তাহা সে বুঝিতেই পারিল না। স্বপ্নাবিষ্টের মত সে ধীরে ধীরে সেই দিকে চলিতে লাগিল।

ঝটিকার গর্জ্জন, বজ্রের নির্ঘোষ, কিছুই তখন রমেন্দ্রের কর্ণে প্রবেশ করিতেছিল না। তাহার দৃষ্টির সম্মুখে শুধু অমিয়ার মূর্ত্তি। মাতালের মত টলিতে টলিতে সে অমিয়ার কাছে গিয়া উপস্থিত হইল। অমিয়া তখন নিবিষ্টমনে কি ভাবিতেছিল। সে রমেন্দ্রের সান্নিধ্য আদৌ বুঝিতে পারিল না।

কয়েক মুহূর্ত্ত সেই নিশ্চল সৌন্দর্য্যপ্রতিমার পানে চাহিয়া চাহিয়া সহসা রমেন্দ্রের মস্তিষ্কের সমস্ত রক্ত যেন চঞ্চল হইয়া উঠিল। একটা প্রচণ্ড উন্মাদনার আতিশয্যে তাহার সমগ্র দেহ থরথর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। সংযমের বাঁধ এতক্ষণ যে বিপুল জলোচ্ছ্বাসের গতিরোধ করিয়া আহত হইতেছিল, সহসা তাহা ভাঙ্গিয়া প্লাবনস্রোত প্রবাহিত হইল।

মূঢ়ের ন্যায় রমেন্দ্র সহসা অমিয়ার শিথিল বামকরতল তাহার অগ্নিময় দক্ষিণ-করপুটে চাপিয়া ধরিল। অমনই তাহার সমস্ত দেহে যেন একটা অসহ্য বিদ্যুৎপ্রবাহ বহিয়া গেল। তাহার সমস্ত ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া যেন মুহূর্ত্তের জন্য স্তব্ধ হইয়া গেল—যেন একটা উল্কাপিণ্ড নিমেষমধ্যে তাহার বক্ষোদেশ আলোড়িত করিয়া মস্তিষ্কে প্রহত হইল।

সেই আকস্মিক স্পর্শে অমিয়ারও ধ্যান ভাঙ্গিয়া গেল। সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিতেই তাহার বাক্যও যেন স্তব্ধ হইয়া গেল। সেই স্পর্শের ঐন্দ্রজালিক প্রভাব কি তাহাকে মুহূর্ত্তের জন্যও অভিভূত করিয়াছিল?

রমেন্দ্র তখন উন্মত্তের ন্যায় অনর্গলভাবে যদৃচ্ছ বলিয়া যাইতে লাগিল। পর্ব্বতমুখ ভেদ করিয়া উত্তপ্ত গৈরিক-ধারা যেমন প্রচণ্ডভাবে চারিদিকে ছুটিয়া যাইতে থাকে, রমেন্দ্রের মুখ হইতেও তাহার এত দিনের রুদ্ধ ভাবপ্রবাহ তেমনই ভাবে প্রকাশ করিতে লাগিল। বাসনার সে কি দুর্দ্দমনীয় 'লাভা'-প্রবাহ! নতমুখে স্তব্ধভাবে অমিয়া বসিয়া রহিল।

রমেন্দ্রের বক্তব্য শেষ হইল। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে দিগন্ত আলোড়িত করিয়া বিভীষণ রবে নিকটে বজ্র গর্জ্জিয়া উঠিল।

দুঃস্বপ্ন-পূর্ণ নিদ্রাভঙ্গের পর মানুষ সভয়ে যেমন চমকিত হইয়া উঠে, অমিয়াও ঠিক তেমনই ভাবে সহসা উঠিয়া দাঁড়াইল। প্রবল আকর্ষণে সে রমেন্দ্রের কম্পিত মুষ্টি হইতে আপনার করপল্লবকে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইল। তাহার পর স্থিরদৃষ্টিতে রমেন্দ্রের দিকে চাহিয়া দৃঢ়,অকম্পিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "আপনি—রমেন বাবু, আপনি? --ছি!"

নারীর আননে অসন্তোষের তীব্র ভ্রূকুটী; কিন্তু কণ্ঠস্বরে বিন্দুমাত্র উত্তেজনা নাই। রমেন্দ্র বিহ্বলভাবে সেই আত্মস্থা রমণীমূর্ত্তির দিকে চাহিয়া দুই পদ পিছাইয়া গেল। তাহার কণ্ঠ রুদ্ধপ্রায়।

রাজ্ঞীর ন্যায় উন্নত মস্তকে দাঁড়াইয়া দৃঢ়কণ্ঠে অমিয়া বলিতে লাগিল, "আপনার উপর আমার যথেষ্ট বিশ্বাস ছিল। সেই আপনি এমন?—ছি!"

এই সংক্ষিপ্ত ধিক্কার রমেন্দ্রের মস্তকে যেন বজ্রাঘাত করিল। মুহূর্ত্তে সে যেন এতটুকু হইয়া গেল। সে বুঝিল, কি ভীষণ, অতলস্পর্শ গহ্বরমুখে সে দাঁড়াইয়া! কি অমার্জ্জনীয় অপরাধই না সে করিয়াছে! সে ভদ্র-সন্তান; সুশিক্ষাও সে পাইয়াছে। পরস্ত্রীর শয়নকক্ষে চোরের ন্যায় প্রবেশ করিয়া সে তাহার হস্তস্পর্শ করিয়াছে—জঘন্য বাক্য উচ্চারণ করিয়াছে। এই কি প্রেম? ভালবাসা? না জঘন্য লালসা, পূতিগন্ধময় কামনার অভিব্যক্তি?

রমেন্দ্র আর সহ্য করিতে পারিল না। মাতালের ন্যায় টলিতে টলিতে, বিবর্ণ মুখে, স্খলিত-চরণে যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি সে কক্ষ হইতে পলায়ন করিল।

পলাও রমেন্দ্র, পলাও! নারীর মর্য্যাদাকে বাক্য দ্বারাও যে পাপিষ্ঠ অপবিত্র করিতে চাহে, মনুষ্যসমাজে তাহার স্থান থাকিতে পারে না। যেখানে মানুষ আছে—যেখানে নারী স্বামিপুত্র প্রভৃতি সহ বাস করে, অথবা স্বামীর পবিত্র স্মৃতিকে উদ্যাপিত করিয়া জীবন ধারণ করিয়া থাকে, তেমন স্থানে তোমার মত হতভাগ্যের ছায়া যেন পতিত না হয়।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

পিষ্ট, অভিশপ্ত জীবের ন্যায় অবসন্নভাবে রমেন্দ্র বাহিরের ঘরে প্রবেশ করিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দিল। তাহার পর নির্জ্জীবভাবে শয্যার উপর পড়িয়া রহিল। বাহিরে তখন ঝটিকা সমানভাবেই বহিতেছিল। কিন্তু বাহিরের বিপ্লব রমেন্দ্রের মনের কোনও প্রান্তকে স্পর্শ করিতে পারিল না। তাহার অন্তরে তখন বিপুল গর্জ্জনে যে প্রলয়-ঝটিকা বহিতেছিল, প্রকৃতির বিপ্লব তাহার কাছে নিতান্তই তুচ্ছ।

এত দিন সে যেন হিমালয়ের উত্তুঙ্গ শৃঙ্গের উপর উন্নত শীর্ষে বসিয়াছিল। আজ এক মুহূর্ত্তে এ কোন্ অতলস্পর্শ অন্ধকারগহ্বরে সে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে! এত দিনের শিক্ষা, জ্ঞান, আভিজাত্যগর্ব্ব, শালীনতা— সবই কি মুহূর্ত্তের দুর্ব্বলতায় চূর্ণ হইয়া অণু-পরমাণুতে মিশিয়া যায় নাই? সে কবি? এই জঘন্য মনোবৃত্তি তাহার হৃদয়ের অন্তরালে থাকিয়া দিন দিন পুষ্ট হইয়াছে? সে অন্যের ধর্ম্মপত্নীর নিকট যে কথা ব্যক্ত করিয়াছে, তাহার প্রায়শ্চিত্তের বিধান কি কোনও ধর্ম্মশাস্ত্রে পাওয়া যাইতে পারে? সে নিজে বিবাহিত; তাহার পত্নী বিদ্যমান; কিন্তু সে এমনই পাপিষ্ঠ যে, সকল কথা ভুলিয়া, পবিত্র দাম্পত্যজীবনের কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইয়া, অন্যের দাম্পত্যজীবনে অভিশাপ বহন করিয়া আনিতেছিল! এত বড় অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত কি? সুরেশ তাহার বন্ধু, অমিয়া তাঁহার সহোদরা। এই অমিয়াকে প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিবার পর তাহাকে বিধিমত জীবনসঙ্গিনী করিতেও সে উদ্যত হইয়াছিল। তাহাকে আজ সে কোথায় নামাইয়া আনিতে গিয়াছিল? অন্তরের গোপনতম প্রকোষ্ঠে মানসী প্রতিমারূপে যাহাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সে এত দিন স্নেহ, প্রেম ও শ্রদ্ধার অর্ঘ্য দান করিয়া আসিয়াছে, আজ তাহাকে কি নির্ম্মমভাবেই না অপবিত্র করিতে উদ্যত হইয়াছিল! না, এমন মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত যে কি, তাহা সে খুঁজিয়া পাইতেছে না! সুরেশচন্দ্র জানিতে পারিলে কি মনে করিবে?—কাল সকালে সে মুখ দেখাইবে কি করিয়া?

সহসা রমেন্দ্র চমকিয়া উঠিল। কেহ জানিতে না পারিলেও তাহার এই অপবিত্র ব্যবহারের কাহিনী অনন্ত বিশ্বে লিখিত হইয়া যায় নাই কি? কোনও কার্য্য ত দূরের কথা, কোনও চিন্তাকে লুকাইয়া রাখিবার শক্তি কাহারও আছে কি? মনুষ্যসমাজ জানিতে না পারিলেও ইথরে ব্যোমে তাহা চিরমুদ্রিত হইয়া লোকলোকান্তরে সচল পদার্থের মত সঞ্চালিত হইতে থাকে না কি?

রমেন্দ্রের সর্ব্বশরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল। সে যাহা করিয়াছে, তাহা মুছিয়া ফেলিবার উপায় নাই—নাই! কি দুর্ভাগ্য! প্রবৃত্তি—হীন, কলুষিত মনোবৃত্তি তাহাকে কোন্ পঙ্কিল গহ্বরে নামাইয়া দিয়াছে? মনুষ্যত্বের স্বর্ণচূড় সৌধ মুহূর্ত্তের দুর্ব্বলতায় ধূলিসাৎ হইয়া গেল! এ মুখ সকলের কাছে সে কিরূপে দেখাইবে?

মানসিক যন্ত্রণা ও উত্তেজনার আতিশয্যে রমেন্দ্র উঠিয়া বসিল। কম্পিত হস্তে বাতী জ্বালিয়া সে তাড়াতাড়ি একখানা কাগজ টানিয়া লইল। তার পর সে লিখিল,—

"সুরেশ, আমার মন বাড়ীর জন্য অকস্মাৎ অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়াছে। তোমার ফেরা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে পারিলাম না। ভোরেই যে গাড়ী ছাড়িবে, তাহাতেই চলিলাম। আমার এই অতর্কিত গমনের জন্য যদি পার ত মার্জ্জনা করিও। ট্রাঙ্ক, বিছানা প্রভৃতি রহিল, কারণ, এ দুর্য্যোগে লোক পাওয়া যাইবে না। যদি পার ত আমার মেসে পরে পাঠাইয়া দিও। সকলে নিদ্রিত, বিদায় লওয়া হইল না। পার যদি আমাকে ক্ষমা করিও। ইতি— রমেন্দ্র।"

'স্নেহের' শব্দটা লিখিতে গিয়া কলমে বাধিয়া গেল। তাহার সমস্ত অন্তর বিদ্রোহী হইয়া যেন বলিয়া উঠিল, 'খবরদার, বন্ধুত্বের অভিনয় আর সাজে না!' সত্য কথা—বন্ধুত্বের যে পরিচয় সে দিয়াছে, ইতিহাসে তাহা চিরস্মরণীয় হইবার যোগ্য।

লিখিত পত্রখানা টেবলের উপর চাপা দিয়া রাখিয়া রমেন্দ্র তাহার গ্ল্যাডষ্টোন ব্যাগটা খুলিয়া ফেলিল। কয়েকখানা জামা-কাপড় এবং কবিতার খাতা উহার মধ্যে রাখিয়া

রমেন্দ্র মুদ্রাধারটি পরীক্ষা করিল। তিনখানি এক শত টাকার ও খানকয়েক দশ টাকার নোট ব্যতীত কয়েকটি খুচরা টাকাও আধারে ছিল।

কোট গায় দিয়া রমেন্দ্র ঘড়ীর দিকে চাহিল—৫টা বাজিয়া দশ মিনিট হইয়াছে। জানালা খুলিয়া দেখিল, ঝটিকার বেগ বহুল হ্রাস পাইয়াছে, বৃষ্টি প্রায় ধরিয়া গিয়াছে। ব্যাগটা হাতে লইয়া নিঃশব্দে দ্বার খুলিয়া সে বাহিরে আসিল।

সমুদ্রের ক্ষুব্ধ মূর্ত্তি সহসা তাহার দৃষ্টি আকৃষ্ট করিল। উদ্দাম, উত্তাল তরঙ্গ তীরদেশে প্রচণ্ড শব্দে আছাড়িয়া পড়িতেছিল। উষার প্রথম আলোক-রেখা মেঘমেদুর আকাশের ছিদ্রপথে আত্মপ্রকাশ করিতেছিল। সেই স্তিমিত আলোকে সমুদ্রের কালো বুকে ফেন-পুষ্পিত তরঙ্গের শোভা ভীষণ—ভয়াবহ!

সেই ভীষণে মধুরে মিলিত দৃশ্য দেখিবার মত মানসিক অবস্থা রমেন্দ্রের তখন ছিল না। সে পথে নামিয়া পড়িল। কদাচিৎ দুই এক ফোঁটা বৃষ্টি তখনও পড়িতেছিল, রমেন্দ্র তাহাতে ভ্রূক্ষেপ করিল না; তাহাকে পলায়ন করিতে হইবে—বাড়ীর কোনও লোক জাগিবার পূর্ব্বে বহু দূরে চলিয়া যাইতে হইবে। পথিমধ্যে সুরেশের সহিত দেখা হইবার যথেষ্ট আশঙ্কাও বিদ্যমান। সারা রাত্রি দুর্য্যোগ গিয়াছে—অবসর পাইবামাত্রই সে নিশ্চয় বাসার দিকে আসিবে। সুতরাং তৎপূর্ব্বেই তাহাকে ষ্টেশনে যাইতেই হইবে। সুরেশচন্দ্রকে সে কোনমতেই মুখ দেখাইতে পারিবে না।

প্রাণপণ বেগে রমেন্দ্র চলিতে লাগিল। সদর রাস্তা ছাড়িয়া সে বক্রপথ ধরিল। পথিমধ্যে অনেক স্থানে জল জমিয়াছে, কোথাও বা বড় বড় গাছ ধূলিসাৎ হইয়া রহিয়াছে। সে এখন কোনও দিকে চাহিতে পারিতেছিল না। অনেক স্থান কর্দ্দমাক্ত, পিচ্ছিল; কিন্তু বাহিরের কোন সুবিধা বা অসুবিধার দিকে তাহার কোন খেয়ালই ছিল না। সে শুধু সুরেশ, অমিয়া প্রভৃতির নিকট হইতে তখন দূরে থাকিতে চাহে। দূরে—বহু দূরে, যেখানে গেলে ইহারা তাহার কোন সন্ধান পাইবে না, এমন স্থানে সে যাইতে চাহে। যদি লোকালয় পরিত্যাগ করা সম্ভবপর হইত, তবে সে মনুষ্যসমাজেও আজ মুখ দেখাইত না।

তখনও রাজপথ অন্ধকারে ঢাকা। মেঘের ফাঁক দিয়া উষার মৃদু আলো অন্ধকারকে সামান্যরূপ সরাইয়া দিয়াছিল মাত্র। বাতাস তখনও সন্ সন্ শব্দে বহিয়া যাইতেছিল। পথের কোথাও মানুষ ত দূরের কথা, পশুপক্ষী পর্য্যন্ত নাই। সেই জনহীন পথে ঝড়েরই ন্যায় বেগে—মাতালের মত টলিতে টলিতে রমেন্দ্র চলিতেছিল।

ষ্টেশনে পৌঁছিয়া রমেন্দ্র দেখিল, প্ল্যাটফরমে এক জনও লোক নাই। একখানি মালগাড়ী একটু পরেই ছাড়িবে। ষ্টেশন-মাষ্টার গার্ডকে চার্জ্জ বুঝাইয়া দিতেছিলেন। জিজ্ঞাসায় সে জানিল যে, সাড়ে সাতটার পূর্ব্বে কোনও যাত্রিগাড়ী নাই। তাহাকে সে পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতেই হইবে।

রমেন্দ্র প্রমাদ গণিল। তখন প্রায় সাড়ে পাঁচটা। সেই সময় হইতে সাড়ে সাতটা পর্য্যন্ত ষ্টেশনে অপেক্ষা করিতে গেলে সুরেশ নিশ্চয় তাহার সন্ধানে এখানে আসিবেন। যদি অমিয়া আপাততঃ কোন কথা প্রকাশ না-ও করে, সুরেশচন্দ্র প্রশ্ন করিলে সে কি সঙ্গত উত্তর দিবে? শুধু বাড়ীর জন্য মন কেমন করিতেছে বলিয়া সে এমন ভাবে চলিয়া যাইতেছে, ইহা যে বালকও বিশ্বাস করিতে চাহিবে না। সুরেশচন্দ্র যদি তাহার কোনও ওজর না শুনিয়া তাহাকে আবার পুরীর বাসায় লইয়া যাইতে চাহেন, তবে কেমন করিয়া সে অমিয়ার সম্মুখে উপস্থিত হইবে? না—না—তাহা সম্পূর্ণ অসম্ভব।

মুহূর্ত্তের মধ্যে এই সকল চিন্তা বিদ্যুতের মত রমেন্দ্রের মস্তিষ্কে উদিত হইল। নৈরাশ্যভারে একটা আর্ত্ত চীৎকার যেন তাহার বুকের মধ্যে ধ্বনিত হইয়া উঠিল। দুই হস্তে বক্ষোদেশ চাপিয়া ধরিয়া সে প্ল্যাটফরমের উপর দিয়া চলিতে লাগিল। সহসা তাহার মাথায় একটা বুদ্ধি গজাইল। দ্রুতপদে বাঙ্গালী ষ্টেশন-মাষ্টারের কাছে গিয়া সে বলিল যে, সে বড় বিপদ্গ্রস্ত। সাক্ষীগোপালে তাহার এক বন্ধু আছেন। দেবদর্শন উপলক্ষে সেখানে গিয়া তাঁহার অসুখ হইয়াছে। সে কাল রাত্রিতে 'তার' পাইয়াছে। দুর্য্যোগে কাল যাওয়া হয় নাই। যাত্রিগাড়ী ছাড়িবার এখনও বহু বিলম্ব। মাল-গাড়ীতে যদি দয়া করিয়া যাইতে দেওয়া হয়, তবে সে বিশেষ উপকৃত হইবে, এ জন্য উপযুক্ত ব্যয় করিতেও সে সম্মত।

এতগুলা নির্জ্জলা মিথ্যা বলিতে তাহার অন্তরাত্মা ক্ষুব্ধ

হইয়া উঠিল; কিন্তু সে যুক্তির দ্বারা মনকে বুঝাইল, সুরেশচন্দ্রের সহিত সাক্ষাতের তুলনায় এমন মিথ্যা কথা বলিতে সে সহস্রবার প্রস্তুত আছে।

ষ্টেশন-মাষ্টার সবিস্ময়ে রমেন্দ্রের মুখের দিকে চাহিলেন। তাহার বেশ-ভূষা সম্ভ্রান্তজনোচিত, মুখে উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তার চিহ্ন। দেখিয়া তাঁহার মনটা একটু আর্দ্র হইল। ভদ্রভাবে তিনি বলিলেন, "মাল-গাড়ীতে যাত্রী যাবার নিয়ম ত নেই মশায়!"

রমেন্দ্র বলিল, "আজ্ঞে, তা আমি জানি। তবে আপনি যদি দয়া ক'রে আমায় যেতে দেন, তা হ'লে আমার বন্ধুটির জীবনরক্ষা হয়। আপনি বাঙ্গালী, আমার অবস্থা বুঝে আমায় দয়া করুন।"

"আচ্ছা, আপনি দাঁড়ান" বলিয়া ষ্টেশন-মাষ্টার দ্রুতগতিতে গার্ডের কাছে গেলেন। উভয়ে কয়েক মুহূর্ত্ত কি কথা হইল। তাহার পর তিনি ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "আপনি যেতে পারেন। আমি গার্ডকে ব'লে দিয়েছি। একখানা প্রথম শ্রেণীর টিকিটের দাম দেবেন, আর ওকে কিছু বক্‌সিস্ কর্‌বেন।"

কৃতজ্ঞভাবে রমেন্দ্র ষ্টেশন-মাষ্টারকে ধন্যবাদ জানাইল। তাহার পর একখানি দশ টাকার নোট বাহির করিয়া তাঁহাকে বলিল, "আপনার ছেলে-মেয়েদের কিছু খেতে দেবেন।"

যুক্ত-করে প্রতিনমস্কার করিয়া মৃদুহাস্যে ষ্টেশন-মাষ্টার বলিলেন, "মাপ করবেন। আমরা নানা রকমে টাকা নিয়ে থাকি সত্য; কিন্তু বিদেশে আপনি বাঙ্গালী, বিপন্ন। এ সময়ে আমাদের মত অর্থ-পিশাচও ওটা নিতে পারে না। ধন্যবাদ: আপনি গাড়ীতে উঠুন, এখুনি ট্রেণ ছেড়ে দেবে।"

রমেন্দ্র বুঝিল, লোকটি মনুষ্যত্ববর্জ্জিত নহে। সে আর পীড়াপীড়ি না করিয়া গার্ডের গাড়ীতে গিয়া উঠিল। গার্ড যত্ন পূর্ব্বক তাহাকে আসনে বসাইল।

পর-মুহূর্ত্তে বাঁশী বাজিয়া উঠিল, গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিল। রমেন্দ্র স্বস্তির নিশ্বাস ত্যাগ করিল।

ঠিক সেই সময় মুষলধারে বৃষ্টি নামিয়া আসিল।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

রীতিমত এক পশলা বৃষ্টির পর আকাশ পরিষ্কার হইয়া গেল। বেলা তখন প্রায় ৭টা। সূর্য্যের আলোকে আর্দ্র প্রকৃতি হাসিয়া উঠিল। সুরেশচন্দ্র নিরুপায় হইয়া এতক্ষণ সন্ন্যাসীদের কাছে বসিয়া গল্প করিতেছিলেন। প্রাভাতিক চা-পান যথাযোগ্যভাবেই হইয়াছিল। ব্রহ্মচারীরা চা ত্যাগ করেন নাই।

বৃষ্টি ধরিবামাত্র স্বামীজীকে প্রণাম করিয়া সুরেশচন্দ্র দ্রুতপদে বাসার দিকে চলিলেন। বাড়ীর অবস্থা জানিবার জন্য তাঁহার বিশেষ দুর্ভাবনাই হইয়াছিল। পথিমধ্যে চলিতে চলিতে তিনি বুঝিতে পারিলেন, গত রজনীর ঝটিকা বড় সাধারণ নহে। পথ জুড়িয়া বড় বড় গাছ পড়িয়া আছে, অনেক মাটীর ঘর ধূলিসাৎ হইয়াছে। সমুদ্রবক্ষে তখনও পর্ব্বতপ্রমাণ তরঙ্গ উঠিতেছিল। তীরভূমিতে দর্শকদলের মেলা আরম্ভ হইয়াছিল; কিন্তু অত্য অতি বড় দুঃসাহসিকও সমুদ্রস্নানে সাহস করিবে না। বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের ভীম সৌন্দর্য্য দেখিবার অবকাশ তখন সুরেশচন্দ্রের ছিল না। বাড়ীতে ফিরিয়া সকলের কুশল জানিতে না পারা পর্য্যন্ত তাঁহার মন স্থির হইবে না। দ্রুতপদে তিনি চলিলেন। সমুদ্রতীরবর্ত্তী অট্টালিকা যদি ঝড়ের প্রকোপ সহ্য করিয়া টিকিয়া থাকে, তবেই না মঙ্গল!

বাসার নিকটে আসিয়া সুরেশচন্দ্র স্বস্তির নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। অদূরে তাঁহাদের একতল গৃহ অটুটভাবেই দণ্ডায়মান। তখন নবোদিত সূর্য্যের আলোকতরঙ্গ ফেনপুষ্পিত উর্ম্মিশীর্ষ হইতে গড়াইয়া পড়িতেছিল।

সদর দরজার কাছে আসিয়া সুরেশচন্দ্র দেখিলেন, সনাতন ঝাড়ু লইয়া জঞ্জাল পরিষ্কার করিতেছে। তিনি সোজা পিসীমার ঘরের দিকে আগে চলিয়া গেলেন।

দ্বারের সম্মুখে পিসীমার পার্শ্বে অমিয়াকে দেখিয়া সুরেশ বলিয়া উঠিলেন, "তোমরা কখন্ এলে, অমি?"

রাত্রিশেষে পিসীমার জ্বরত্যাগ হইয়াছিল। তিনি বলিয়া উঠিলেন, "ও ত নেমন্তন্নে যায় নি। বড় মাথা ধরেছিল ব'লে যেতে পারে নি; সরযূ একাই গেছে।"

সুরেশচন্দ্র সস্নেহে ভগিনীর দিকে চাহিলেন। বাস্তবিক শিরঃপীড়ার কষ্ট ও তজ্জনিত অবসাদের চিহ্ন অমিয়ার

আননে সুস্পষ্ট দেখা যাইতেছিল। ভগিনী যে মাঝে মাঝে এই পীড়ার যন্ত্রণায় অত্যন্ত কষ্ট ভোগ করিয়া থাকে, তাহা তিনি জানিতেন। সস্নেহে সুরেশ বলিলেন, "বড় কষ্ট পেয়েছ তবে ?"

অমিয়া নত দৃষ্টিতে বলিল, "এখন ভাল আছি, দাদা।"

উত্তরটা সরাসেরি না হইলেও সুরেশচন্দ্র উহাতেই সন্তুষ্ট হইলেন। তাহার পর গত কল্যকার ঝড়ের কথা বলিতে লাগিলেন। সমস্ত রাত্রি সকলের জন্য কি দুর্ভাবনাতেই কাটিয়াছিল, তাহার আভাসও তিনি দিলেন।

অমিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "কাল তুমি কোথায় ছিলে, দাদা ?"

সুরেশচন্দ্র সংক্ষেপে বলিলেন যে, তাঁহার পরিচিত এক সন্ন্যাসীর আশ্রমেই তিনি রাত্রিবাস করিয়াছেন। সন্ন্যাসীর সহিত তাঁহার কি সম্বন্ধ, তাহার আভাসমাত্রও দিলেন না। শুধু এইটুকু জানাইলেন যে, তিনি সেখানে পরম যত্নেই ছিলেন।

বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তনের জন্য সুরেশচন্দ্র বাহিরের ঘরের দিকে গেলেন। ভৃত্য তখন ঘরটি ঝাড়িয়া মুছিয়া, জানালা খুলিয়া দিয়াছিল। সুরেশচন্দ্র ভাবিয়াছিলেন, রমেন্দ্রকে হয় ত ঘরের মধ্যেই কবিতা-চর্চ্চায় নিরত দেখিবেন। কিন্তু ঘর শূন্য দেখিয়া তিনি ভাবিলেন, হয় ত সে সমুদ্রতীরে বেড়াইতে গিয়াছে, এখনও ফিরিয়া আইসে নাই।

কাপড়-চোপড় ছাড়িয়া সুরেশ ধূমপানের জন্য ভৃত্যকে তাগিদ দিলেন। সারা রাত্রির মধ্যে আশ্রমে সে সুবিধা ঘটে নাই।

আলবোলার নলটি তুলিয়া লইয়া নিমীলিত নেত্রে সুরেশ তাম্রকূট-দেবতার ধ্যান করিতে লাগিলেন। ঘড়ীতে টং টং করিয়া ৮টা বাজিয়া গেল। তিনি চমকিয়া উঠিলেন। এত বেলা পর্য্যন্ত রমেন্দ্র কোন দিন ত বাহিরে থাকে না। তিনি নল ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সহসা তাঁহার দৃষ্টি একবার কক্ষের চারিদিকে ঘুরিয়া আসিল। পরিচিত গ্লাডষ্টোন ব্যাগটি ত নির্দ্দিষ্ট স্থানে নাই! অস্বচ্ছন্দ চিত্তে টেবলের ধারে আসিয়া দাঁড়াইতেই একখানা খোলা পত্র তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট করিল।

কৌতূহলবশে তুলিয়া লইয়া সুরেশচন্দ্র উহা পড়িয়া ফেলিলেন। রমেন্দ্রের অনুপস্থিতির কারণ তখন সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল, কিন্তু এত তাড়াতাড়ি চলিয়া যাইবার হেতু কি ?

খোলা জানালা দিয়া সমুদ্র বেশ দেখা যাইতেছিল। নিবদ্ধ দৃষ্টিতে সুরেশচন্দ্র সেই দিকে চাহিয়া কি ভাবিতে লাগিলেন। চিন্তা করিতে করিতে সহসা তাঁহার ললাট রেখাঙ্কিত হইয়া উঠিল।

একটা নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া সুরেশচন্দ্র পত্রখানি পকেটের মধ্যে রাখিয়া দিলেন। এমন সময় একখানা গাড়ী আসিয়া বাড়ীর সম্মুখে থামিল। হাস্যময়ী, সদাপ্রসন্নমূর্ত্তি সরযূ গাড়ী হইতে নামিয়াই সুরেশচন্দ্রকে দেখিতে পাইল। ক্ষুদ্র, কোমল করপল্লব-যুগল যুক্ত করিয়া একটি ছোট নমস্কার করিয়া সহাস্যমুখে সে তাড়াতাড়ি ভিতরে চলিয়া গেল। সুরেশচন্দ্রও মন্থরগমনে অন্তঃপুরের দিকে চলিলেন।

পিসীমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া সরযূ গত রজনীর দুর্য্যোগ ও সখীর বাড়ীর আতিথেয়তার গল্প করিতেছিল। অমিয়া সাগ্রহে তাহার বর্ণনা শুনিতেছিল। সুরেশচন্দ্রকে দেখিয়া সরযূ কণ্ঠস্বর অপেক্ষাকৃত কোমল করিয়া লইল।

কথা শেষ হইলে সুরেশচন্দ্র বলিলেন, "রমেন আজ ভোরেই দেশে চ'লে গেছে। সে আমার সঙ্গে দেখা না করেই চ'লে গেল কেন বুঝলাম না।"

বিস্মিতভাবে সরযূ বলিল, "কাকেও না বলেই রমেন বাবু চ'লে গেছেন ? কেন ? কি হয়েছে ?"

অমিয়াও তাহার দাদার দিকে প্রশ্নসূচক দৃষ্টিপাত করিল।

অন্যমনস্কভাবে সুরেশ বলিলেন, "আশ্চর্য্য ! চিরকালই সে খেয়াল লইয়া আছে !"

পিসীমা বলিলেন, "রমু চ'লে গেল, একবার বলেও গেল না ?"

কিয়ৎকাল নীরব থাকিয়া সরযূ বলিল, "কোন চিঠিও লিখে রেখে যান নি ?"

"হ্যাঁ, তা লিখেছে বটে, কিন্তু কারণটা নেহাৎ ছেলেমানুষী গোছের। হঠাৎ বাড়ীর জন্য মন খারাপ হয়েছে।"

পিসীমা বলিলেন, "তা হ'তে পারে, বাছা। মা'র কাছছাড়া হয়ে আছে কি না, কাল রাত্রিতে হয় ত মায়ের জন্য প্রাণটা কেঁদে উঠেছিল।"

সুরেশচন্দ্র কোন কথা না বলিয়া বাহিরের দিকে চলিয়া গেলেন।

অমিয়া একবার দৃষ্টি নত করিল। তাহার পর সরযুর দিকে চাহিয়া বলিল, "চল, কাপড়-চোপড় ছাড়বে।"

উভয়ে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল।

বিংশ পরিচ্ছেদ

রৌদ্র প্রখর হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু সুরেশচন্দ্রের সে দিকে ভ্রূক্ষেপ ছিল না। তিনি তখন সমুদ্রকূলের পথের উপর অন্যমনস্কভাবে পায়চারী করিতেছিলেন। স্নানের সময় তখনও হয় নাই। স্বর্গদ্বারে আজ স্নানার্থীর সমাবেশ ছিল না—সমুদ্রের আলোড়ন তখনও কম নহে।

"মশায় শুনছেন ?"

সুরেশচন্দ্র ফিরিয়া চাহিলেন। দেখিলেন, এক দীর্ঘাকার বলিষ্ঠ বাঙ্গালী তাঁহার দিকে দ্রুতপদে অগ্রসর হইতেছে। তাহার পরিধানে অর্দ্ধমলিন মোটা ধুতি, গায় একটা মোটা কাপড়ের মেরজাই—স্কন্ধের উপর থানের চাদর, পায় চটি-জুতা।

সুরেশচন্দ্র উৎসুকভাবে দাঁড়াইলেন। আগন্তুক কাছে আসিয়া তাঁহাকে নমস্কার করিল। সুরেশচন্দ্রও প্রতি-নমস্কার করিলেন। নবাগত বলিল, "রমেন বাবু এখানে কোন্ বাড়ীতে থাকেন বল্‌তে পারেন? স্বর্গদ্বারের কাছেই তাঁদের বাসা। অল্প কয়দিন হ'ল কলকাতা থেকে এসেছেন। তাঁর বন্ধু সুরেশ বাবুর বাসাতেই আছেন।"

সুরেশচন্দ্র একবার আগন্তুকের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন, "আপনি রমেন বাবুকে খুঁজছেন, কেন বলুন ত ?"

নবাগত বলিল, "আপনি তা হ'লে তাঁকে চেনেন? আমাদের বাড়ী এক দেশেই কি না! মহাপ্রভুকে দেখতে আসবার সময় শুনেছিলুম, তিনি এখানে আছেন, তাই একবার দেখা করতে এলাম। আপনার সঙ্গে তাঁর আলাপ আছে বুঝি ?"

স্বস্তির নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া সুরেশ বলিলেন, "তাকে খুবই জানি ; সে আমার ছেলেবেলার বন্ধু। আমারই নাম সুরেশ।"

সুরেশচন্দ্রের দিকে কৌতূহলভাবে চাহিতে চাহিতে আগন্তুক বলিল, "ওঃ, আপনিই সুরেশ বাবু? রমেন বাসায় আছে ত ? দেখা—"

বাধা দিয়া সুরেশ বলিলেন, "সে ত এখানে নেই। আজই ভোরের গাড়ীতে সে চ'লে গেছে।"

"চ'লে গেছে ?—" বিস্ময়বিমূঢ়ভাবে আগন্তুক কয়েক মুহূর্ত্ত চুপ করিয়া রহিল ; তাহার পর সহসা বলিয়া উঠিল, "কেন, এত শীঘ্র গেলেন যে ?"

সুরেশচন্দ্র আগন্তুকের কথার স্বরে যেন আশাভঙ্গের স্পন্দন অনুভব করিলেন। কিন্তু সে জন্য কোন কৌতূহল প্রকাশ না করিয়াই বলিলেন, "তা ঠিক জানি না ; তবে মন খারাপ হয়েছে ব'লে চ'লে গেছে।"

"কোথায় গেছেন, তা জানেন কি ?"

"বাড়ীর জন্য মন খারাপ হয়েছে, বোধ হয়, বাড়ীতেই গেছে।"

আগন্তুক ক্ষুদ্র একটা "হুঁ" শব্দ করিয়া কয়েক মুহূর্ত্ত চুপ করিয়া রহিল। তাহার পর বলিল, "ভেবেছিলাম দেখা হবে ; তা যখন হ'ল না, উপায় কি? আপনাকে কষ্ট দিলাম, ক্ষমা করবেন।"

সুরেশচন্দ্র কুণ্ঠিতভাবে বলিলেন, "সে কি কথা ; এতে ক্ষমার কি আছে? ভাল কথা—আপনারা কোথায় উঠেছেন ?"

আগন্তুক বলিল, "পাণ্ডার বাসাতেই আছি।"

সুরেশচন্দ্র বলিলেন, "রমেন আমার সহোদরের মত। তার দেশের লোক, আমার আপনার জন। যদি কিছু মনে না করেন, আমাদের বাসাতেই—"

বাধা দিয়া আগন্তুক সবিনয়ে বলিল, "আজ্ঞে, তার কোন প্রয়োজন হবে না। যেখানে উঠেছি, ভালই আছি ; কোন অসুবিধা হচ্ছে না। দু'এক দিনের জন্য আপনাদের ব্যস্ত করার ইচ্ছে নেই। নমস্কার।"

আগন্তুক দীর্ঘ দীর্ঘ পদবিক্ষেপ করিয়া চলিয়া গেল। সুরেশচন্দ্র কয়েক মুহূর্ত্ত স্থির দৃষ্টিতে লোকটির গতিশীল দীর্ঘমূর্ত্তির দিকে চাহিয়া বাসার দিকে ফিরিলেন।

এ দিকে আগন্তুক দ্রুতপদক্ষেপে সহরের দিকে ফিরিয়া চলিল। মন্দিরের কাছাকাছি আসিয়া আলোবাতাসবিহীন এক দ্বিতল অট্টালিকার সম্মুখে আসিয়া সে দ্বার খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। সোপান বাহিয়া উপরে উঠিয়া

সে একটি ঘরে প্রবেশ করিল। তথায় এক বর্ষীয়সী বিধবা বসিয়া ছিলেন। তাঁহার অনতিদূরে অর্দ্ধ-অবগুণ্ঠনাবৃতা এক নারী ট্রাঙ্ক খুলিয়া কাপড় বাহির করিতেছিল।

আগন্তুক ডাকিল, "মা!"

বর্ষীয়সী সাগ্রহে বলিলেন, "কে, মাধব? খবর কি? রমুর দেখা পেলে?"

উত্তরীয়খানা স্কন্ধ হইতে নামাইয়া মাধব বলিল, "না, মা, খোকা এখানে নেই।"

"নেই; কোথায় গেল?"

মাধব বলিল, "সুরেশ বাবুর সঙ্গে দেখা হ'ল। তিনি বল্লেন যে, আজ ভোরেই সে হঠাৎ দেশে চ'লে গেছে।"

মাতার মুখ গম্ভীর হইল। তিনি কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। তাহার পর বলিলেন, "তবে এখানে আর দেরী ক'রে কায নেই। আজই চল ফিরে যাই। রাত্রিতে গাড়ী আছে ত?"

মাধব ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "আজ যাওয়া হয় না মা। কয়দিনে পথের কষ্ট ত কম হয় নি। আজ বিশ্রাম ক'রে কাল সকালের গাড়ীতেই যাওয়া যাবে। খোকা আগে কলকাতায় উঠবে নিশ্চয়, তার পর দেশে রওনা হবে। সঙ্গে সঙ্গে আমরাও গিয়ে পড়ব।"

রমেন্দ্রের মাতা বলিলেন, "তবে তাই কর। আজ চল মহাপ্রভুকে দেখে আসি।"

মাধব বলিল, "বড়বৌ কোথায়? উনুনটুনুনগুলো ঠিক ক'রে রাখুক না।"

গৃহিণী বলিলেন, "রান্নার দরকার হবে না। এখানে প্রসাদ কিনতে পাওয়া যায়, পাণ্ডা ঠাকুর বলেছেন। তাতেই আমাদের চ'লে যাবে।"

মাধব তখন জামা খুলিয়া বলিল, "তবে তোমরা স্নান সেরে নাও। মহাপ্রভুকে এই বেলা দর্শন ক'রে পূজো দিতে হবে।"

অল্পক্ষণের মধ্যে স্নান সারিয়া সকলে দেবদর্শনে চলিলেন। পাণ্ডা সঙ্গে চলিল। এক দিনের মধ্যে যত দূর সম্ভব দেখাশুনা করিয়া লইতে হইবে।

জগন্নাথদেবের মন্দির-প্রাঙ্গণে দর্শনার্থীর ভিড় মন্দ নহে। মন্দিরের প্রহরীরা এক এক দল দর্শককে ভিতরে প্রবেশ করিতে দিয়া জনতা নিয়ন্ত্রিত করিতেছে।

শাশুড়ীর পশ্চাতে প্রতিভা চলিতেছিল। সে এক একবার বিস্ময়ে সেই সুবৃহৎ মন্দিরের চূড়া ও বৃহৎ মন্দির-প্রাঙ্গণের দিকে চাহিতেছিল। এই মন্দিরের বিবরণ তাহার অজ্ঞাত নহে। সে ইহার বর্ণনা অনেকবার পড়িয়াছিল, কিন্তু জনতার মধ্যে সকল বিষয় ভাল করিয়া দেখিবার সুযোগ ঘটে না।

ক্রমে মাধব ও পাণ্ডার সহায়তায় তিন জন নারী মন্দির-গর্ভে প্রবেশ করিল। প্রথমটা কিছু দেখা গেল না। দর্শনার্থীরা একটু সংযত হইলেই তাহাদের সম্মুখে দেবতার মূর্ত্তিগুলি দৃষ্ট হইল।

সসম্ভ্রমে প্রতিভা ত্রি-মূর্ত্তির দিকে চাহিল। দুই পার্শ্বে শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম, মধ্যে ভগিনী সুভদ্রা। এমন কল্পনার মূর্ত্ত প্রকাশ সমগ্র ভারতবর্ষের আর কোথাও নাই। হিন্দু সর্ব্বত্রই প্রকৃতি ও পুরুষকে স্বামী ও স্ত্রী কল্পনা করিয়া বিগ্রহ-মূর্ত্তি গড়িয়া রাখিয়াছে, কিন্তু ভ্রাতা ও ভগিনীকে দেবতার আসনে বসাইয়া পূজার পদ্ধতি এই শ্রীক্ষেত্র ছাড়া অন্যত্র ত নাই! প্রতিভা মুগ্ধ-বিস্ময়ে মূর্ত্তির দিকে চাহিল। শিল্পীর নিপুণ-চাতুর্য্য মূর্ত্তিত্রয়ে নাই, কিন্তু ভক্তের চিত্ত কবে বাহিরের রূপে মুগ্ধ হইয়াছে? শত শত বৎসর ধরিয়া কোটি কোটি ভক্ত এই বিগ্রহের চরণতলে ভক্তির অর্ঘ্য নিবেদন করিয়া আসিতেছে। তাহারা বাহিরের রূপে মুগ্ধ হইয়া কোন দিন আইসে নাই। অন্তর্নিহিত ভক্তিকে নিবেদন করিতেই আসিয়া থাকে।

প্রৌঢ়া বিধবা ধ্যানস্তিমিত নেত্রে জগন্নাথের মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া কি প্রার্থনা করিলেন, তাহা তিনিই জানেন, আর যিনি সকলেরই মনের কথা জানেন, তিনিই জানিলেন। প্রতিভা মুগ্ধ-বিস্ময়ে সেই ত্রি-মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার চারি পার্শ্বের দর্শকগণ উচ্চরবে ত্রিদিব-নাথের মহিমা ঘোষণা করিতেছিল। তাহারও অন্তরতম প্রদেশ হইতে সেই বাণী যেন ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিতে লাগিল। ক্ষুদ্র, কোমল করযুগল যুক্ত করিয়া সে সর্ব্বলোকেশ্বরের নিকট হৃদয়ের প্রার্থনা নিবেদন করিতেছিল। সেই নিবেদনের মধ্যে স্বামীর কল্যাণকামনা যে ছিল না, তাহা নহে, বরং আজ দেবতাকে প্রত্যক্ষ করিয়া সে সমস্ত সংশয় ও সন্দেহবিমুক্ত হৃদয়ে মনে মনে বলিয়া উঠিল, "ঠাকুর, তাঁকে সুখী করো, শান্তি দাও।"

প্রতিভার ক্ষুদ্র হৃদয় হইতে উত্থিত এই সংক্ষিপ্ত নিবেদন বিশ্বনাথের চরণতলে স্থান পাইল কি না, কে জানে। কিন্তু তাহার হৃদয় যেন অকস্মাৎ লঘু হইয়া গেল। সে সমগ্র প্রাণশক্তি নয়নে কেন্দ্রীভূত করিয়া কয়েক মুহূর্ত্ত দেব-মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া রহিল। শ্রীকৃষ্ণের ললাটে একখানি উজ্জ্বল হীরক দীপ্তি পাইতেছিল। সহসা আনন্দের শিহরণ তাহার সর্ব্বদেহে বহিয়া গেল। দেব-মূর্ত্তির আননে আনন্দের জ্যোৎস্নাধারা বহিয়া যাইতেছে কি ?

চারিদিক হইতে দর্শকের ঠেলাঠেলিতে মন একাগ্র হইতে পারে না। তাহারাও বেশীক্ষণ স্থিরভাবে দেবতার পূজা করিতে পারিল না। পাণ্ডার সাহায্যে মাধব রমণী-দিগকে বাহিরে লইয়া আসিল। মন্দির-প্রাঙ্গণে আসিয়া রাধারাণী হর্ষানন্দে বলিয়া উঠিল, "মাঠাকৃরুণ, বড় পুণ্যি করেছিলুম, তাই আজ মহাপ্রভুকে দেখতে পেলাম। শত জন্মের পাপ খণ্ডে গেল, মা !"

কথাটা প্রতিভার কানে পৌঁছিয়া প্রাণে গিয়া যেন বাজিল। তবে—তবে তাহার অনিচ্ছাকৃত, অজ্ঞেয় অপরিচিত পাপরাশি কি এই পুণ্য দর্শনের ফলে তিরোহিত হইয়া গেল ! সে আবার কাহার উদ্দেশ্যে দুই হাত তুলিয়া ললাটে স্পর্শ করিল।

মাধব-পত্নীর কথায় প্রৌঢ়া ঈষৎ হাসিলেন। তাঁহারও হৃদয় আজ যেন অনেকটা স্নিগ্ধ হইয়াছিল। শুধু মাঝে মাঝে রমেন্দ্রের কথা মনে করিয়া তাঁহার প্রাণে যেন একটা কাঁটা খচ্ খচ্ করিয়া বিঁধিতেছিল।

[ক্রমশঃ।

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ।

দৈত্য ও পরী

ভয় দেখিয়ে ভক্তি আদায় করা
দৈত্যমশায় কেমন ক'রে চলে,
ফুল ফোটানো বোঁটায় আঘাত দিয়ে
সফল কভু হয় কি ধরাতলে ?

এ যেন হায় পাখীর গলা টিপে
জোর করিয়ে গীতটি আদায় করা,
এ যেন হায় চাঁদকে ফুটা ক'রে
সুধার ধারায় শূন্য কলস ভরা।

সাপকে এবং বাঘকে সবাই ডরি
ক্ষেপা কুকুর—দেখলে পলাই যারে,
সম্মানী যে নয়কো অধিক তা'রা
জন্তু হউক বুঝ্‌তে সেটা পারে।

অপরকে যে কষ্ট দিতেই পটু
সেই যদি হয় সবার চেয়ে বড়,
এমন তীখণ কণ্টক হায় ফেলে
ফুলের আদর তোমরা কেন কর ?

শিষ্ট উই আর ইঁদুর দুটি ভায়ে
নিঃস্বার্থ হায় পরের অপকারে,
ভীমরুল আর বোল্‌তা দুটি সাধু
শাস্ত্র শুনেও কামড়াতে না ছাড়ে।

কই তাহারা পায় না ত কই পূজা,
তেমন বিশেষ সম্মানী ত নয়,
তবে কেন ভয় দেখায়ে শুধু
ভক্তি তুমি চাইছ মহাশয় !

দন্ত দেখায় উচ্চে ব'সে বানর
উড়ো বায়স অনেক ক্ষতি করে,
জেনে শুনে সুদূর অতীত থেকে,
আদর তা'দের কর্ল্লে না ত নরে।

পীড়ন করা কাযটা পুরাতন
তাতে কিসে তারিফ পাবে তুমি,
শিশুপাল ও কংসরাজের কথা
ভোলেনি যে আজও ভারত-ভূমি।

তাহার চেয়ে হও না ভালো নিজে
পশু-স্বভাব ত্যাগ করিয়া ফেলো,
অমৃতময় উঠবে হয়ে ধরা
গরল ভখেই প্রাণ যে তোমার গেল !

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

৩

৯১ বৈদ্য প্রশ্ন রাঢ়ীয় সমাজের অনেক বৈদ্যই শালগ্রাম-শিলা পূজা করিয়া থাকেন। এইরূপ দুর্গাপূজা ও কালীপূজা এবং চণ্ডীপাঠ প্রভৃতি অদ্যাপি অনেক বৈদ্য স্বয়ং করিয়া থাকেন। সেই সকল স্থলে বৈদ্যমহিলাদের পাক করা অন্ন ভোগও দেওয়া হয়।

বক্তব্য—ইদানীং সকলেই সকল কার্য্য করিতেছে। কিন্তু ক্ষত্রিয়-বৈশ্যাদির স্পর্শপূর্ব্বক শালগ্রাম-শিলা ও প্রতিমা-পূজা শাস্ত্রনিষিদ্ধ। এ সম্বন্ধে "প্রাণতোষণী"কার বিশদ বিচার করিয়াছেন। যথা :—

"নমু, ব্রাহ্মণঃ পূজয়েন্নিত্যং ক্ষত্রিয়াদিন্‌ পূজয়েৎ ইতি বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরবচনাৎ ক্ষত্রিয়াদীনাং শালগ্রামশিলা-মূর্ত্তিপূজন-নিষেধাৎ ক্ষত্রিয়াদিভিঃ শালগ্রামশিলামূর্ত্তিপূজনং কর্ত্তব্যং কথমিতি চেৎ ? ন, ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং ত্রয়াণাং মুনিসত্তম। অধিকারঃ স্মৃতঃ সম্যক্‌ শালগ্রামশিলার্চ্চনে॥ ইত্যাদি-পদ্মপুরাণাদিবচনৈঃ ক্ষত্রিয়াদীনাং শালগ্রামপূজাশ্রবণাৎ। এবঞ্চ সতি, ব্রাহ্মণস্যৈব পূজ্যোঽহং শুচেরপ্যশুচেরপি। স্ত্রীশূদ্রকরসংস্পর্শো বজ্রপাতাধিকো মম॥ ইতি লিঙ্গপুরাণ-বচনে ব্রাহ্মণস্যৈব ইত্যত্র অন্যযোগব্যবচ্ছেদপরেণ এবকারেণ ব্রাহ্মণমাত্রস্যৈব স্পর্শবৎ পূজায়ামধিকারো গম্যতে। ক্ষত্রিয়াদীনাং স্পর্শমাত্রং নিষিদ্ধমিতি। এবঞ্চ সতি ক্ষত্রিয়াদি-পূজানিষেধকবচনানাং স্পর্শমাত্রনিষেধপরত্বাৎ ক্ষত্রিয়াদীনাং শালগ্রামপূজাবিধায়কানি বচনানি স্পর্শহীনপূজাবিষয়ত্বেন যোজ্যানি।"

অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণই শালগ্রাম-শিলা পূজা করিতে পারেন। তন্মধ্যে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য স্পর্শ ব্যতিরেকে পূজা করিবেন। স্ত্রী ও শূদ্রের শালগ্রাম-শিলার স্পর্শে ও পূজায় অধিকার নাই। "একত্র দৃষ্টঃ শাস্ত্রার্থো বাধকং বিনা অন্যত্রাপি তথা" (এক বিষয়ে শাস্ত্রের যে বিধান আছে, বাধক বচন না থাকিলে অন্য বিষয়েও সেই বিধান) এই ন্যায়ে প্রতিমাপূজা বিষয়েও ঐ নিয়ম।

কলিতে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, অম্বষ্ঠাদি শূদ্র বলিয়া পরিগণিত। যথা :—

"ইদানীন্তন-ক্ষত্রিয়াদীনামপি শূদ্রত্বমাহ মনুঃ—শনকৈস্তু ক্রিয়ালোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ। বৃষলত্বং গতা লোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ॥ অতএব বিষ্ণুপুরাণম্—মহানন্দিসুতঃ শূদ্রাগর্ভোদ্ভবোঽতিলুব্ধো মহাপদ্মো নন্দঃ পরশুরাম ইবা-পরোঽখিলক্ষত্রিয়ান্তকারী ভবিতা। ততঃ প্রভৃতি শূদ্রা ভূপালা ভবিষ্যন্তীতি। তেন মহানন্দিপর্য্যন্তং ক্ষত্রিয় আসীৎ। এবঞ্চ ক্রিয়ালোপাদ্ বৈশ্যানামপি তথা। এবমম্ব-ষ্ঠাদীনামপি।"—(শুদ্ধিতত্ত্ব)

বাচস্পতি মিশ্রও ঐরূপ লিখিয়াছেন।

এই কারণে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও অম্বষ্ঠের শালগ্রামাদি পূজার ব্যবহার নাই। তাঁহাদিগের ব্রাহ্মণপুরোহিতরাই ঐ সকল কার্য্য করিয়া থাকেন।

এই "জাতিতত্ত্বে"র আলোচনা আমি বিদ্বেষবশে করিতেছি না, অপক্ষপাতেই করিতেছি। তবে এ পর্য্যন্ত তাঁহাদের স্বপক্ষে বলিবার কিছু পাই নাই। কিন্তু এখানে তাঁহাদের স্বপক্ষে বলিবার একটা কথা আছে—

মহামহোপাধ্যায় বাচস্পতিমিশ্রাদির ঐরূপ মীমাংসা প্রমাণরূপে গণ্য হইলেও আমাদের কিন্তু মনোরম হইতেছে না। যেহেতু, শূদ্র রাজা (অর্থাৎ ক্ষত্রিয়কর্ম্মকারী) হইবে বলিয়া ক্ষত্রিয়দিগকেও যে শূদ্র হইতে হইবে, এ কিরূপ যুক্তি! তাহা হইলে ম্লেচ্ছের রাজত্বে সকল ক্ষত্রিয়কেই আবার ম্লেচ্ছও হইতে হয়, এবং তাহা হইলে মহাভারতে (বন, ১৯০।৩৪) কলিযুগে "শূদ্রা ধর্ম্মং প্রবক্ষ্যন্তি" থাকায় সকল ব্রাহ্মণকেই শূদ্র হইতে হয়।

মনু উক্ত বচনে "ইমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ" (এই সকল ক্ষত্রিয়জাতি) বলিয়া পরবচনেই তাহাদের নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

"পৌণ্ড্রকাশ্চৌড্রদ্রবিড়াঃ কাম্বোজা জবনাঃ শকাঃ।
পারদাঃ পহ্লবাশ্চীনাঃ কিরাতা দরদাঃ খশাঃ॥" (১০।৪৪)

"ইমাঃ" বলিয়া ঐ সকল ক্ষত্রিয়ের প্রতি অঙ্গুলিনির্দ্দেশ এবং "বৃষলত্বং গতাঃ" এই অতীত কাল প্রয়োগ করায় তাঁহার সংহিতা প্রণয়নের পূর্ব্বে ঐ সকল ক্ষত্রিয়ই শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল, সমস্ত ক্ষত্রিয় হয় নাই, ইহা স্পষ্টই বুঝা

যাইতেছে। তাহা না হইলে পরশুরাম ত্রেতাযুগে অবতীর্ণ হইয়া একুশবার পৃথিবীকে যে নিঃক্ষত্রিয় করিয়াছিলেন, তখন তিনি ক্ষত্রিয় পাইলেন কোথায়? তাহাতেও প্রত্যেক বারেই নিঃশেষে ক্ষত্রিয়নাশ করিলে 'একুশবার' কিরূপে ঘটিল? তাঁহার সমকালে ও ত্রেতার শেষভাগেও সূর্য্য ও চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয়গণের অস্তিত্ব কিরূপে সম্ভব হইল? দ্বাপরে যদুবংশীয়, ভরতবংশীয় প্রভৃতি ক্ষত্রিয় কিরূপে রহিল? এবং কলিতে মহানন্দি পর্য্যন্ত ক্ষত্রিয়ই বা কোথা হইতে আসিল? মহাপদ্মনামা নন্দের অখিল-ক্ষত্রিয়ান্ত-কারিত্বও সেইরূপ। এতাবতা পরশুরাম ও মহাপদ্ম নিঃশেষে ক্ষত্রিয় বিনাশ করেন নাই, এবং ক্রিয়ালোপে অধিকাংশ ক্ষত্রিয়াদি শূদ্রত্বপ্রাপ্ত হইলেও সকল ক্ষত্রিয়, সকল বৈশ্য ও সকল অম্বষ্ঠ শূদ্র হইয়া যান নাই। কতক কতক প্রকৃত ক্ষত্রিয়, প্রকৃত বৈশ্য ও প্রকৃত অম্বষ্ঠ আছেন; বহু প্রদেশে তাঁহাদিগের অস্তিত্ব দেখাও যাইতেছে। এই কারণেই বঙ্গীয় অম্বষ্ঠগণের মধ্যে কতক উপবীতধারী ও কতক উপবীতবর্জ্জিত ছিলেন এবং এখনও অনেক আছেন (শেষোক্ত অম্বষ্ঠেরা শূদ্রধর্ম্মানুসারে ১ মাস অশৌচ পালন করিয়া থাকেন)। ইহাতে তাঁহাদের অম্বষ্ঠত্ব ও শূদ্রত্ব স্পষ্ট প্রতীয়মান হইয়া থাকে। কিন্তু এক্ষণে অনেকেই একাকার হওয়ায় তাঁহাদের পার্থক্য বুঝিবার উপায় নাই। সুতরাং সংশয়স্থলে সকল অম্বষ্ঠকেই শূদ্র বলিয়া মনে করিতে হয়।

অতএব কোনও বৈদ্যের এবং ইদানীন্তন কোনও অম্বষ্ঠেরও শালগ্রামশিলা ও প্রতিমা পূজায় অধিকার নাই। তবে যে সকল অম্বষ্ঠ পুরুষানুক্রমে উপবীতধারণাদি বৈশ্য-ধর্ম্ম পালন করিয়া আসিতেছেন, তাঁহারা (যজনে অধিকার না থাকায়) নিজের জন্য স্পর্শ ব্যতিরেকে ঐ সকল পূজা করিতে পারেন বটে; কিন্তু শালগ্রামের স্নপনান্তে গাত্র-মার্জ্জনাদি এবং প্রতিমার প্রাণপ্রতিষ্ঠাদি স্পর্শ বিনা করা যায় না বলিয়া তাঁহারাও স্বয়ং না করিয়া পুরোহিত ব্রাহ্মণের দ্বারাই করাইয়া থাকেন।

পরন্তু রঘুনন্দনের ঐ পঙ্‌ক্তি দেখিয়া আমাদের ইহাও মনে হয়, তাঁহার সময়ে বঙ্গদেশে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও অম্বষ্ঠগণ উপবীতবর্জ্জিতই ছিলেন। তদ্দর্শনেই তিনি তাঁহাদের শূদ্রত্বের কারণ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। সে সময়ে তাঁহাদের উপবীত থাকিলে তিনি কখনই ঐরূপ লিখিতেন না, এবং নবদ্বীপে বৈদ্যমণ্ডলীতে পরিবেষ্টিত থাকিয়া ঐরূপ লেখায় তাঁহাদের হস্তে তিনি নিস্তার পাইতেন না। ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, তৎকালে অম্বষ্ঠ বা বৈদ্যরা নিশ্চয়ই শূদ্রধর্ম্মা ছিলেন। তাঁহার ঐরূপ লেখায় চক্ষুরুন্মীলন হওয়ায় তাঁহার পরবর্ত্তী কালে তাঁহাদের অধিকাংশই উপবীত গ্রহণ করিয়া বৈশ্যধর্ম্মানুসারে ১৫ দিন অশৌচপালনাদি করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু সে উপবীত গ্রহণ বিধিপূর্ব্বক হয় নাই। যেহেতু, চারি পুরুষ উপনয়ন-সংস্কার-বর্জ্জিত হইলে, তাঁহাদের সন্তানের উপনয়ন হইতে পারে না (৫ম পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য)। এই জন্যই অবৈধ উপনয়ন বলিয়া তাঁহারা কটিদেশে যজ্ঞসূত্র রাখিতেন * (কটিদেশে যজ্ঞসূত্র রাখা শাস্ত্রে নিষিদ্ধ, এবং তাদৃশরূপে ধৃত যজ্ঞসূত্র উপবীতপদবাচ্যও নহে)। যাহা হউক, বৈদ্যদিগের প্রতি সৌহার্দ্দবশতঃ, অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া সে সকল কথা বলিতে আমি প্রস্তুত নহি।

স্নান, শ্রাদ্ধ, পঞ্চযজ্ঞ ভিন্ন কার্য্যে পুরাণপাঠে অধিকার থাকায় শূদ্রও যখন নিজের জন্য মার্কণ্ডেয়পুরাণান্তর্গত চণ্ডী পাঠ করিতে পারেন, তখন অম্বষ্ঠ ও বৈদ্যের তাহাতে বাধা নাই; কিন্তু অন্যের জন্য চণ্ডীপাঠ ব্রাহ্মণ ভিন্ন আর কেহই করিতে পারেন না। যথা :—

"ব্রাহ্মণং বাচকং বিদ্যান্নান্যবর্ণজমাদরাৎ।
শ্রুত্বান্যবর্ণজাদ্রাজন্ বাচকান্নরকং ব্রজেৎ॥"
(দুর্গোৎসবতত্ত্বে ভবিষ্যপুঃ)

ব্রাহ্মণ ভিন্ন বর্ণ দ্বারা পুরাণাদি পাঠ করাইলে ও তাহা-দের মুখে শুনিলে নরকে যাইতে হয়।

রঘুনন্দন দুর্গোৎসবতত্ত্বে লিখিয়াছেন—

"শূদ্রকর্ত্তৃকবৃষোৎসর্গাদৌ ব্রাহ্মণকর্ত্তৃকচরুবৎ ব্রাহ্মণ-দ্বারা পকান্ননৈবেদ্যাদি শূদ্রোঽপি দাতুমর্হতি।"

শূদ্র কর্ত্তৃক বৃষোৎসর্গাদিতে ব্রাহ্মণপক্ব চরুর ন্যায়, ব্রাহ্মণপক্ব অন্ন দ্বারা শূদ্রও দেবতার ভোগ দিতে পারে।

---

* মুর্শিদাবাদ-মির্জ্জাপুরনিবাসী শ্রীযুত দুর্গাদাস রায় মহাশয় লিখিয়াছেন—"আমাদের এ অঞ্চলে বহু বৈদ্যের বাস। আমি বাল্য-কালে দেখিয়াছি, তাঁহারা কোমরে পইতা রাখিতেন, ব্রাহ্মণের নিকট, শূদ্রবৎ ব্যবহার করিতেন এবং বয়ঃকনিষ্ঠ ব্রাহ্মণকেও প্রণাম করিতেন।

সুতরাং অম্বষ্ঠও ঐরূপ করিতে পারেন; কিন্তু স্বপক্ক অন্ন দ্বারা দেবতার ভোগ দিতে পারেন না।

"মত্তক্রুদ্ধাতুরাণাঞ্চ ন ভুঞ্জীত কদাচন।
... ...
চিকিৎসকস্য মৃগয়োঃ ক্রূরস্যোচ্ছিষ্টভোজিনঃ।
... .
পূয়ং চিকিৎসকস্যান্নং পুংশ্চল্যাস্ত্বন্নমিন্দ্রিয়ম্।"
(মনু ৪। ২০৭—২২০)

"চিকিৎসকস্য অম্বষ্ঠস্য"— (কুল্লূক)

অর্থাৎ অম্বষ্ঠের অন্ন খাইবে না। অম্বষ্ঠের অন্ন খাইলে পূয খাওয়া হয়।

"অমৃতং ব্রাহ্মণান্নেন দারিদ্র্যং ক্ষত্রিয়স্য চ।
বৈশ্যান্নেন তু শূদ্রান্নং শূদ্রান্নান্নরকং ব্রজেৎ॥"
(ব্যাস ৪। ৩৬)

ব্রাহ্মণের অন্ন অমৃত, ক্ষত্রিয়ের অন্ন দারিদ্র্যজনক, বৈশ্যের অন্ন শূদ্রান্নস্বরূপ এবং শূদ্রের অন্নভোজনে নরকে গমন হয়।

ইত্যাদি বচন দ্বারা অম্বষ্ঠের পক্কান্ন যখন সর্ব্ববর্ণের অভোজ্য এবং ব্রাহ্মণেতর জাতির পক্কান্ন যখন ব্রাহ্মণের অভোজ্য সুতরাং অস্পৃশ্য, তখন ব্রাহ্মণ ভিন্ন আর কোনও দ্বিজাতিরই পক্কান্নে দেবতার ভোগ হইতে পারে না। শূদ্রজাতীয়া "বৈদ্যমহিলাদের পাক করা অন্নভোগ" ত সুদূর-পরাহত।

এই স্থানে প্রসঙ্গক্রমে আরও তিনটি বক্তব্য এই যে—

(১) প্রোক্ত কারণে ব্রাহ্মণ ভিন্ন কোনও দ্বিজাতিই পক্কান্ন দ্বারা শ্রাদ্ধ ও পিণ্ডদান করিতে পারেন না (আমান্ন দ্বারা করিবেন)। যেহেতু, (ক) শ্রাদ্ধীয় অন্ন ব্রাহ্মণেরই ভোজ্য, (খ) অগ্নৌকরণে ব্রাহ্মণের পাণিতে অন্নপ্রদান করিবার বিধি, এবং (গ) পিণ্ডও ব্রাহ্মণকে দাতব্য। যথা :—

(ক) "গোভিলঃ ··ব্রাহ্মণানামন্ত্র্য ।ব্রাহ্মণানামন্ত্র্যেতি ব্রাহ্মণান্ নিমন্ত্র্য শ্রাদ্ধং কুর্য্যাৎ। ·ব্রাহ্মণাসম্পত্তৌ কুশময়-ব্রাহ্মণে শ্রাদ্ধমুক্তং শ্রাদ্ধবিবেকে—নিধায়াথ দর্ভচয়মাসনেষু·· ইতি তদ্ধৃতবচনাৎ, ব্রাহ্মণানামসম্পত্তৌ কৃত্বা দর্ভময়ান্ দ্বিজান্। শ্রাদ্ধং কৃত্বা বিধানেন পশ্চাদ্ বিপ্রেষু দাপয়েৎ॥ ইতি শ্রাদ্ধসূত্রভাষ্যকার-সমুদ্রকর-ধৃতবচনাচ্চ।"
(শ্রাদ্ধতত্ত্ব)

"শ্রোত্রিয়ায়ৈব দেয়ানি হব্য-কব্যানি দাতৃভিঃ।
অর্হত্তমায় বিপ্রায় তস্মৈ দত্তং মহাফলম্॥"
(মনু ৩। ১২৮)

(খ) "অগ্ন্যভাবে তু বিপ্রস্য পাণাবেব জলেঽপি বা॥"
(গ) "পিণ্ডাংস্তু গোঽজবিপ্রেভ্যো দদ্যাদগ্নৌ জলেঽপি বা॥"
(মৎস্যপুঃ)

শ্রাদ্ধধর্ম্মের অতিদেশ হেতু পূরকপিণ্ডদানও ব্রাহ্মণেতর দ্বিজাতির আমান্ন দ্বারাই কর্ত্তব্য।

(২) অম্বষ্ঠ ও বৈদ্য ব্রাহ্মণাদির নমস্য নহেন। তাঁহা-দিগকে নমস্কার বা অভিবাদন করিলে ব্রাহ্মণের প্রায়শ্চিত্ত কর্ত্তব্য। যথা :—

"ব্রাহ্মণ ইত্যনুবৃত্তৌ মিতাক্ষরায়াং হারীতঃ—ক্ষত্রিয়-স্যাভিবাদনেঽহোরাত্রমুপবসেদেবং বৈশ্যস্যাপি। শূদ্রস্যাভি-বাদনে ত্রিরাত্রমুপবসেদিতি। অত্র অহোরাত্রাদ্যুপবাস-শ্রবণাৎ মুন্যন্তরোক্তবিপ্রদশকনমস্কাররূপলঘুপ্রায়শ্চিত্তস্য প্রমাদবিষয়ং, ভ্রমকৃতনমস্কৃতিবিষয়ং বা। যথা মনুঃ—যদি বিপ্রঃ প্রমাদেন শূদ্রং সমভিবাদয়েৎ। অভিবাদ্য দশ বিপ্রাংস্ততঃ পাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥"
(মলমাসতত্ত্ব)

অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যকে অভিবাদন করিলে, অহোরাত্র উপবাস, এবং শূদ্রকে অভিবাদন করিলে ত্রিরাত্র উপবাস করিবে।—এই হারীতবচনে অহোরাত্র ও ত্রিরাত্র উপবাসরূপ প্রায়শ্চিত্তের বিধান থাকায়, অন্য মুনির মতে দশ জন ব্রাহ্মণকে নমস্কাররূপ যে লঘু প্রায়শ্চিত্ত বিহিত হইয়াছে, তাহা প্রমাদকৃত বা ভ্রমকৃত নমস্কারের পক্ষে। যেহেতু মনু বলিয়াছেন—ব্রাহ্মণ যদি প্রমাদ (অনবধানতা) বশতঃ শূদ্রকে অভিবাদন করে, তাহা হইলে দশ জন ব্রাহ্মণকে অভিবাদন করিয়া সেই পাপ হইতে মুক্ত হইবে।

এই জন্যই, ভ্রমপ্রমাদ বশতঃ নমস্কার করিয়া পাছে ব্রাহ্মণরা প্রায়শ্চিত্তার্হ হন, তাহা হইলে আপনাদিগকেও পাপভাগী হইতে হইবে, এই আশঙ্কায় পূর্ব্বে অম্বষ্ঠজাতীয় বৈদ্যরা কটিদেশে যজ্ঞোপবীত রাখিতেন বলিয়া মনে হয়।

অতএব যে সকল ব্রাহ্মণ-ছাত্র জ্ঞানপূর্ব্বক বৈদ্য অধ্যাপকদিগকে প্রণাম করিয়া থাকেন, তাঁহারা ত্রিরাত্র উপবাসরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া আর কখনও ঐরূপ গর্হিত কর্ম্ম যেন না করেন, (অসমর্থপক্ষে প্রত্যেক উপবাসের অনুকল্প ৮পণ কড়ি উৎসর্গ করিবারও বিধি আছে)।

(৩) ব্রাহ্মণও শূদ্রের সহিত এক পঙ্‌ক্তিতে ভোজন করিলে, ত্রিরাত্র উপবাস, স্নান ও পঞ্চগব্যপানরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পাপমুক্ত হইবেন (অঙ্গিরা)।

১২। বৈদ্য প্রশ্ন—ইতিহাসে দেখা যায়, খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে বঙ্গাধিপতি বৈদ্যনৃপতি মহারাজ বল্লাল-সেন চাতুর্ব্বর্ণ্যসমাজের কৌলীন্য সংস্থাপন করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণেতর কোনও রাজারই ব্রাহ্মণসমাজের উপর নেতৃত্ব করা বা বড়কে ছোট করা কখনই সম্ভবপর নহে। বল্লাল-সেন তাঁহার "দানসাগর"-নামক স্মৃতিগ্রন্থে সেনবংশকে "শ্রুতিনিয়মগুরু" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রুতি শব্দের অর্থ বেদ, শ্রুতিনিয়ম অর্থাৎ বেদবিহিত নিয়ম, তাহার গুরু ব্রাহ্মণ ব্যতীত আর কে হইতে পারে?

বক্তব্য—বল্লালসেন চাতুর্ব্বর্ণ্যের কৌলীন্য সংস্থাপন করেন নাই; কেবল আদিশূরানীত বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ-গণেরই করিয়াছিলেন। কুলজীগ্রন্থে বৈদ্যগণেরও কৌলীন্য-সংস্থাপন লিখিত আছে; তাহাতে সেন, দাস ও গুপ্তকে যথা-ক্রমে উত্তম, মধ্যম ও অধম কুলীন বলা হইয়াছে। বল্লালের মৃত্যুর বহুকাল পরে ঐ সকল গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল; সুতরাং বৈদ্যদিগের কৌলীন্যসংস্থাপন বল্লালের স্বকৃত, কি অনুরোধপরতন্ত্র ঘটক মহাশয়গণের কৃত, তদ্বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ হয় (৭র্থ পরিচ্ছেদে ১২নং দ্রষ্টব্য)। যাহাই হউক, বৈদ্যগণের এই পৃথক্ কৌলীন্যসংস্থাপনেও তাঁহাদের "প্রকৃত ব্রাহ্মণপদবাচ্যত্ব" নিরাকৃত হইতেছে।

হিন্দুনৃপতিমাত্রেরই শ্রুতিনিয়মগুরুত্ব এবং ব্রাহ্মণসমাজের উপরও নেতৃত্ব শাস্ত্রবিহিত ও ব্যবহারপ্রসিদ্ধ। যথা:—

"সম্যগ্‌ বেদান্ প্রাপ্য শাস্ত্রাণ্যধীত্য
সম্যগ্‌ রাজ্যং পালয়িত্বা চ রাজা।
চাতুর্ব্বর্ণ্যং স্থাপয়িত্বা স্বধর্ম্মে
পূতাত্মা বৈ মোদতে দেবলোকে॥"

(মহা, শান্তি, ২৫।৩৬)

রাজা সম্যগ্‌রূপে বেদজ্ঞান লাভ ও শাস্ত্রসমূহের অধ্যয়ন-পূর্ব্বক সম্যগ্‌রূপে প্রজাপালন এবং চাতুর্ব্বর্ণ্যকে স্বধর্ম্মে স্থাপন করিয়া পবিত্র হইয়া দেবলোকে সুখে বাস করেন।

এই জন্যই ক্ষত্রিয় রাজা পরীক্ষিৎ পরমধার্ম্মিক ও ব্রাহ্মণভক্তিনিষ্ঠ হইয়াও, তৃষার্ত্তকে পানীয় না দিবার অপ-রাধে স্বধর্ম্মানুরোধে, শমীক মুনির স্কন্ধে মৃতসর্প-সংযোজনরূপ দণ্ডবিধান করিয়াছিলেন।

গ্রন্থকারমাত্রেই গ্রন্থের নমস্ক্রিয়ারূপ মুখবন্ধে দেবতাকেই প্রণাম করিয়া থাকেন। মনুষ্যের মধ্যে কেবল পিতা, মাতা ও গুরুর প্রণাম কোনও কোনও গ্রন্থে দেখা যায়; কিন্তু কোনও জাতির প্রণাম কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। বল্লাল-সেন "দানসাগর" গ্রন্থের প্রারম্ভে কেবলমাত্র ব্রাহ্মণদিগকেই প্রণাম করিয়াছেন। যথা:—

"যে সাক্ষাদবনীতলামৃতভুজো বর্ণাশ্রমজ্যায়সাং
যেষাং পাণিষু নিক্ষিপন্তি কৃতিনঃ পাথেয়মামুষ্মিকম্।
যদ্বক্ত্রোপনতাঃ পুনন্তি জগতীং পুণ্যাস্ত্রিবেদীগির-
স্তেভ্যো নির্ভরভক্তিসম্ভ্রমনমন্মৌলি দ্বিজেভ্যো নমঃ॥"

যাঁহারা ভূতলে প্রত্যক্ষ দেবতা, যাঁহারা সকল বর্ণ ও সকল আশ্রমের শ্রেষ্ঠ, পুণ্যবান্ লোকরা যাঁহাদের হস্তে পরলোকের পাথেয় গচ্ছিত রাখেন (অর্থাৎ পরকালে স্বর্গাদি উৎকৃষ্ট লোকে যাইবার জন্য যাঁহাদিগের হস্তে ধনদান করেন), এবং যাঁহাদিগের মুখনিঃসৃত পবিত্র বেদধ্বনি ত্রিভুবনকে পবিত্র করে, সেই ব্রাহ্মণদিগকে সাতিশয় ভক্তি ও সম্মানের সহিত মস্তক অবনত করিয়া প্রণাম করি।

তৎপরে স্বীয় বংশ ও গুরুর পরিচয় দিয়া পুনর্ব্বার বলিয়াছেন—

"দুরধিগমধর্ম্মনির্ণয়-বিষমাধ্যবসায়সংশয়স্তিমিতঃ।
নরপতিরয়মারেভে ব্রাহ্মণচরণারবিন্দপরিচর্য্যাম্॥"

এই রাজা দুর্ব্বোধ-ধর্ম্মনির্ণয়রূপ বিষম অধ্যবসায়ে (অশক্য কর্ম্মে উৎসাহে) সংশয়ে জড়ীভূত হইয়া ব্রাহ্মণ-দিগের চরণারবিন্দ সেবা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন।

"শুশ্রূষাপরিতোষিতৈরবিরতং সম্ভূয় ভূদেবতৈ-
র্দত্তামোঘবরপ্রসাদবিশদস্বান্তস্খলৎসংশয়ঃ।
শ্রীবল্লালনরেশ্বরো বিরচয়ত্যেতং গুরোঃ শিক্ষয়া
স্বপ্রজ্ঞাবধি দানসাগরময়ং শ্রদ্ধাবতাং শ্রেয়সে।"

নিরন্তর সেই সেবায় পরিতোষ লাভপূর্ব্বক ভূদেবগণ মিলিত হইয়া, দয়া করিয়া যে অব্যর্থ আশীর্ব্বাদরূপ বর দিয়াছেন, তদ্দ্বারা চিত্ত নির্ম্মল ও সকল সংশয় দূরীভূত হওয়ায় গুরুর (অনিরুদ্ধভট্টের) শিক্ষায় এই নরপতি শ্রীবল্লালসেন শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তিগণের শ্রেয়োলাভের জন্য যথামতি এই দানসাগর রচনা করিতেছেন।

বল্লালসেন ব্রাহ্মণ হইলে, অত বড় রাজা হইয়া, ব্রাহ্মণের এত সম্মান, ব্রাহ্মণের নিকট এত হীনতা স্বীকার এবং এত বিনয় করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে প্রণাম করিতেন না।

বল্লালের মৃত্যুর বহুকাল পরে ঘটক-কারিকাবলী রচিত হইয়াছিল। তাঁহাদের 'সেন' উপাধি দেখিয়া ঐ সকল কারিকাবলীতে যদিও তাঁহাকে বৈদ্যবংশসম্ভূত বলা হইয়াছে, তথাপি তাঁহাদের বৈদ্যজাতীয়ত্বে সংশয় জন্মে। যেহেতু, মহাভারতে দেখা যায় (আদি, ১১১ অঃ) কুন্তীগর্ভজাত কর্ণের প্রকৃত নাম বসুসেণ, এবং তাঁহার পুত্রের নাম বৃষসেন। "বল্লালচরিতে" লিখিত হইয়াছে—ঐ বৃষসেনের পুত্র পৃথুসেন, তদ্বংশে বীরসেনের জন্ম, তদ্বংশীয় সামন্তসেন, তৎপুত্র হেমন্তসেন, তৎপুত্র বিজয়সেন, তৎপুত্র বল্লালসেন। "দানসাগরে"ও লিখিত হইয়াছে—হেমন্তসেনের পুত্র বিজয়-সেন, তৎপুত্র বল্লালসেন। এতাবতা ভীমসেনাদির ন্যায় "সেন" তাঁহাদের নামেরই অংশ বুঝা যাইতেছে (উপাধি নহে)। তাঁহারাও শাসনপত্রাদিতে কেবল চন্দ্রবংশোদ্ভব বলিয়াই আত্মপরিচয় দিয়াছেন; কুত্রাপি বৈদ্য বলিয়া পরিচয় দেন নাই (কলিকাতা সাহিত্যসভা হইতে প্রকাশিত মৎসম্পাদিত দানসাগরের ভূমিকায় সংগৃহীত কতিপয় শাসনপত্র দ্রষ্টব্য)।

দানসাগরের দ্বিতীয় শ্লোকে ঐ "শ্রুতিনিয়মগুরু"র পূর্ব্বে ও পরে "ইন্দোর্বিশ্বৈকবন্ধোঃ শ্রুতিনিয়মগুরুস্তু ক্ষত্রচারিত্রচর্য্যা-মর্য্যাদাগোত্রশৈলঃ ·· নিরগমদবনে-ভূর্ষণং সেনবংশঃ" লিখিয়া বল্লাল স্বয়ং তাঁহাদের সেনবংশকে (অর্থাৎ সেনান্তনামধারী ব্যক্তিবর্গের বংশকে) চন্দ্র হইতে উৎপন্ন ও ক্ষত্রিয়াচারী বলিয়াছেন; বৈদ্য বা ব্রাহ্মণ বলেন নাই। কর্ণ চন্দ্রবংশীয় ও ভবিষ্যতে চন্দ্রবংশীয় পাণ্ডুর পত্নীভূতা কুন্তীর গর্ভজাত হইয়াও, সূতজাতীয়া কন্যা বিবাহ করায় তাঁহার বংশ বর্ণসঙ্করত্ব প্রাপ্ত হওয়ায় উক্ত সেনবংশের কেহই স্পষ্ট করিয়া আপনাদিগকে ক্ষত্রিয়ও বলিতে পারেন নাই।

এই সমস্ত দেখিয়াই বোধ হয় 'প্রবোধনী'-লেখক বৈদ্যের 'চন্দ্র' গোত্র স্থির করিয়াছেন (৬ সংখ্যা); কিন্তু ব্রাহ্মণ ভিন্ন দেবতাদি আর কেহই যে 'গোত্র' হইতে পারেন না, তাহা (ঐ সংখ্যাতেই) বলিয়াছি।

১৩। বৈদ্য প্রশ্ন—"ব্রাহ্মণাদ্ বৈশ্যকন্যায়ামম্বষ্ঠো নাম জায়তে" (মনু ১০ অঃ) অর্থাৎ ব্রাহ্মণপরিণীতা বৈশ্য-কন্যার গর্ভে জাত বৈধ সন্তান 'অম্বষ্ঠ' নামে অভিহিত।

পঞ্চম বেদ মহাভারতে ভগবান্ বেদব্যাস বলিয়াছেন—"ত্রিষু বর্ণেষু পত্নীষু ব্রাহ্মণাদ্ ব্রাহ্মণো ভবেৎ" (অনু ৪৭।১৭) অর্থাৎ তিন বর্ণের পত্নীতে ব্রাহ্মণ হইতে ব্রাহ্মণই উৎপন্ন হয়।

পরে আরও স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন—"ব্রাহ্মণ্যাং ব্রাহ্মণাজ্জাতো ব্রাহ্মণঃ স্যান্ন সংশয়ঃ। ক্ষত্রিয়ায়াং তথৈব স্যাদ্ বৈশ্যায়ামপি চৈব হি॥" (৪৭।২৫) অর্থাৎ ব্রাহ্মণ হইতে ব্রাহ্মণীতে, ক্ষত্রিয়কন্যাতে ও বৈশ্যকন্যাতে জাত পুত্র ব্রাহ্মণই হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই।

মনুসংহিতাতেও স্পষ্ট বলা হইয়াছে—"সর্ব্ববর্ণেষু তুল্যাসু পত্নীষক্ষতযোনিষু। আনুলোম্যেন সম্ভূতা জাত্যা জ্ঞেয়াস্ত এব তে॥" (১০ অঃ) অর্থাৎ সকল বর্ণের মধ্যে বিবাহের পূর্ব্বে অক্ষতযোনি ও দ্বিজত্বসামান্যে তুল্যা পত্নীতে অনু-লোমজ সন্তান জাতিতে পিতৃবর্ণই হইয়া থাকে।

মহর্ষিকল্প গঙ্গাধর এই শ্লোকের এইরূপ অর্থ করেন—সর্ব্ববর্ণের মধ্যে জাতিসামান্যে তুল্যা নারীতে, সমানাসমান-বর্ণজা পত্নীতে এবং অনুলোমজা অক্ষতযোনি কন্যা অর্থাৎ কুমারীতে জাত সন্তান পিতৃবর্ণই হইয়া থাকে।

বক্তব্য—উক্ত মনুবচনের ঐ অর্থই প্রকৃত হইলে, উহার পরশ্লোক—

"স্ত্রীষনন্তরজাতাসু দ্বিজৈরুৎপাদিতান্ সুতান্।
সদৃশানেব তানাহুর্ম্মাতৃদোষবিগর্হিতান্॥"

অনন্তরজাতা স্ত্রীতে দ্বিজাতিদিগের উৎপাদিত পুত্রগণ মাতৃদোষে বিগর্হিত (অর্থাৎ মাতার হীনবর্ণত্ব হেতু হীন) পিতৃসদৃশ হয় (পিতৃজাতীয় হয় না)।

তাহার পরেই আবার—

"বিপ্রস্য ত্রিষু বর্ণেষু নৃপতের্ব্বর্ণয়োর্দ্বয়োঃ।
বৈশ্যস্য বর্ণে চৈকস্মিন্ ষড়েতেঽপসদাঃ স্মৃতাঃ॥"

ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা ও শূদ্রা স্ত্রীতে, ক্ষত্রিয়ের বৈশ্যা ও শূদ্রা স্ত্রীতে এবং বৈশ্যের শূদ্রা স্ত্রীতে উৎপন্ন—এই ছয় পুত্র নিকৃষ্ট।

"পুত্রা যেঽনন্তরস্ত্রীজাঃ ক্রমেণোক্তা দ্বিজন্মনাম্।
তাননন্তরনাম্নস্তু মাতৃদোষাৎ প্রচক্ষতে॥"

দ্বিজাতিদিগের অনন্তরবর্ণস্ত্রীজাত পুত্রেরা মাতৃদোষে (অর্থাৎ মাতার হীনবর্ণত্ব হেতু পিতৃজাতীয় না হইয়া) মাতৃজাতীয় হইয়া থাকে।—এই সকল বচনের সামঞ্জস্য কিরূপে রক্ষিত হয়?

সমানাসমানবর্ণজা পত্নীতে জাত সন্তান পিতৃবর্ণই হইলে, ব্রাহ্মণের শূদ্রাগর্ভজাত সন্তান নিষাদকেও ব্রাহ্মণ, এবং ক্ষত্রিয়ের বৈশ্যাগর্ভজাত সন্তান মাহিষ্যকেও ক্ষত্রিয় বলিতে হয়।

ব্রাহ্মণের অনন্তরজ অর্থাৎ ক্ষত্রিয়াগর্ভজাত পুত্র মূর্দ্ধাভিষিক্তই যখন মাতৃবর্ণ হইয়া থাকে, তখন একান্তরজ অর্থাৎ বৈশ্যাগর্ভজাত পুত্র অম্বষ্ঠ কিরূপে পিতৃবর্ণ হইতে পারে? অম্বষ্ঠ যদি পিতৃবর্ণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণই হয়, তবে তাহার 'অম্বষ্ঠ' এই পৃথক্ সংজ্ঞা কেন? অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণ হইলে, অম্বষ্ঠকন্যা সুতরাং ব্রাহ্মণকন্যা; তাহার গর্ভে ব্রাহ্মণোৎপন্ন আভীরও তাহা হইলে ব্রাহ্মণ হইতে পারে। যেহেতু মনুই বলিয়াছেন—

"ব্রাহ্মণাদুগ্রকন্যায়ামাবৃতো নাম জায়তে।
আভীরোঽম্বষ্ঠকন্যায়ামায়োগব্যান্তু ধিগ্বণঃ॥"

(১০।১৫)

"সর্ব্ববর্ণেষু তুল্যাসু" ইত্যাদি মনুবচনের টীকা—"ব্রাহ্মণাদিষু বর্ণেষু চতুর্ষ্বপি, তুল্যাসু সমানজাতীয়াসু (পত্নীষু) যথাশাস্ত্রং পরিণীতাসু অক্ষতযোনিষু, আনুলোম্যেন—ব্রাহ্মণেন ব্রাহ্মণ্যাং, ক্ষত্রিয়েণ ক্ষত্রিয়ায়াং, বৈশ্যেন বৈশ্যায়াং, শূদ্রেণ শূদ্রায়াম্ ইত্যনেন অনুক্রমেণ যে জাতাঃ, তে মাতাপিত্রোর্জ্জাত্যা যুক্তাঃ তজ্জাতীয়াঃ এব জ্ঞাতব্যাঃ।"

অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি বর্ণের যথাশাস্ত্র পরিণীতা অক্ষতযোনি সবর্ণা পত্নীতে উৎপন্ন পুত্রগণ মাতাপিতৃজাতীয়ই হয়—অর্থাৎ ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণীপত্নীর পুত্র ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয়াপত্নীর পুত্র ক্ষত্রিয়, বৈশ্যের বৈশ্যাপত্নীর পুত্র বৈশ্য, এবং শূদ্রের শূদ্রাপত্নীর পুত্র শূদ্র হইয়া থাকে।

এই অর্থই প্রকৃত; যেহেতু এই অর্থেই উক্ত সমস্ত বচনের সামঞ্জস্য রক্ষিত হইতেছে।

বিষ্ণুসংহিতাতেও এই কথা স্পষ্টরূপেই উক্ত হইয়াছে। যথা:—

"সমানবর্ণাসু পুত্রাঃ সবর্ণা ভবন্তি। অনুলোমাসু মাতৃবর্ণাঃ। প্রতিলোমাস্বার্য্যবিগর্হিতাঃ।" (১৬।১—৩)

মনু উক্ত বচনে "পত্নীষু" বলিয়া প্রত্যেক বর্ণের পরিণীতা সবর্ণা স্ত্রীকেই বুঝাইয়াছেন। যেহেতু "পত্যুর্নো যজ্ঞসংযোগে" এই পাণিনিসূত্র দ্বারা সহধর্ম্মচারিণী অর্থেই পতি শব্দের উত্তর ঙীপ্ প্রত্যয়ে 'পত্নী' হয়। অসবর্ণা স্ত্রীর সহিত ধর্ম্মাচরণ শাস্ত্রনিষিদ্ধ। এই জন্যই তিনি, এবং অন্য সংহিতাকারগণও অসবর্ণা স্ত্রীর স্থলে সর্ব্বত্রই ভার্য্যা শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন; কুত্রাপি 'পত্নী' বলেন নাই, এবং দ্বিজাতিদিগের অসবর্ণা অনুলোমজাতা কন্যার বিবাহ বিষয়ে 'ধর্ম্মতঃ' না বলিয়া "কামতস্তু প্রবৃত্তানাম্" (মনু ৩।১২) বলিয়া ব্যবস্থা দিয়াছেন, মহাভারতেও (অনু ৪৭।৪) এইরূপ বিবাহে "রতিমিচ্ছতঃ" আছে। অসবর্ণা বিবাহে পাণিগ্রহণেরও বিধান নাই; আছে কেবল—

"শরঃ ক্ষত্রিয়য়া গ্রাহ্যঃ প্রতোদো বৈশ্যকন্যয়া।
বসনস্য দশা গ্রাহ্যাঃ শূদ্রয়োৎকৃষ্টবেদনে।"

(মনু ৩।৪৪)

বর একটা বাণ ধারণ করিলে ক্ষত্রিয়া তাহার এক প্রান্ত গ্রহণ করিবে, বর প্রতোদ (পাঁচনী বাড়ি) ধরিলে বৈশ্যা তাহার এক প্রান্ত ধরিবে, এবং শূদ্রা বরের উত্তরীয় বস্ত্রের দশা (দশী) ধারণ করিবে।

এই জন্যই অমর পত্নীপর্য্যায়ে বলিয়াছেন—"পত্নী পাণিগৃহীতী চ দ্বিতীয়া সহধর্ম্মিণী।"

পাণিগৃহীতী—যথাবিধি যাহার পাণিগ্রহণ করা হইয়াছে। দ্বিতীয়া—যে ধর্ম্মাচরণের সহায়ভূতা (দোসর)। সহধর্ম্মিণী—"সস্ত্রীকো ধর্ম্মমাচরেৎ" এই ব্যবস্থানুসারে যাহার সহিত ধর্ম্মাচরণ করা যায়।

অতএব "সর্ব্ববর্ণেষু তুল্যাসু" বচনের ব্যাখ্যায় 'প্রবোধনী'-লেখকের "দ্বিজত্বসামান্যে তুল্যা **পত্নীতে**" লেখা এবং তাঁহার মহর্ষিকল্প গঙ্গাধরের "সমানাসমানবর্ণজা **পত্নীতে**" লেখাটাও অভিজ্ঞতার পরিচায়ক হয় নাই।

এই ত মনুবচনের সম্বন্ধে বলা হইল। এখন মহাভারতীয় দুইটি শ্লোকের সম্বন্ধে বলি :-

শাস্ত্রবাক্যের প্রকৃত অর্থ নির্ণয় করিতে হইলে তাহার প্রকরণ, উপক্রম, উপসংহার ও বচনান্তরের সহিত সামঞ্জস্য দেখিতে হয়। 'প্রবোধনী'-লেখক সে সকলের প্রতি দৃষ্টিপাত না করাতেই ঐ দুইটি শ্লোকের অন্যরূপ অর্থ বুঝিয়াছেন।

অনুশাসনপর্ব্বের ৪৭ অধ্যায়ে উক্ত শ্লোকদ্বয়ের উপক্রমে ভীষ্মের প্রতি যুধিষ্ঠিরের প্রশ্ন—

"চতস্রো বিহিতা ভার্য্যা ব্রাহ্মণস্য পিতামহ।
ব্রাহ্মণী ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা শূদ্রা চ রতিমিচ্ছতঃ॥
তত্র জাতেষ্ পুত্রেষ্ সর্ব্বাসাং কুরুসত্তম।
আনুপূর্ব্ব্যেণ কস্তেষাং পিত্র্যং দায়াদ্যমর্হতি॥"

(৪—৫)

ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণী, এবং রতীচ্ছায় ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা ও শূদ্রা এই চতুর্ব্বিধ ভার্য্যা বিহিত হইয়াছে (যথা মনু—"সবর্ণাগ্রে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্ম্মণি। কামতস্তু * প্রবৃত্তানামিমাঃ স্যুঃ ক্রমশোঽবরাঃ॥ শূদ্রৈব ভার্য্যা শূদ্রস্য সা চ স্বা চ বিশঃ স্মৃতে। তে চ স্বা চৈব রাজ্ঞশ্চ তাশ্চ স্বা চাগ্রজন্মনঃ॥" ৩।১২-১৩); তাহাদের পুত্রগণের মধ্যে যথাক্রমে পিতার ধনে কে কিরূপ অধিকারী হইবে?

ভীষ্মের উত্তর—

"লক্ষণং গোবৃষো যানং যৎ প্রধানতমং ভবেৎ।
ব্রাহ্মণ্যাস্তদ্ধরেৎ পুত্র একাংশং বৈ পিতুর্ধনাৎ॥
শেষন্তু দশধা কার্য্যং ব্রাহ্মণস্বং যুধিষ্ঠির।
তত্র তেনৈব হর্ত্তব্যাশ্চত্বারোঽংশাঃ পিতুর্ধনাৎ॥
ক্ষত্রিয়ায়াস্ত যঃ পুত্রো ব্রাহ্মণঃ সোঽপ্যসংশয়ঃ।
স তু মাতুর্বিশেষেণ ত্রীনংশান্ হর্ত্তুমর্হতি॥
বর্ণে তৃতীয়ে জাতস্য বৈশ্যায়াং ব্রাহ্মণাদপি।
দ্বিরংশস্তেন হর্ত্তব্যো ব্রাহ্মণস্বাদ্ যুধিষ্ঠির॥
শূদ্রায়াং ব্রাহ্মণাজ্জাতো নিত্যাদেয়ধনঃ স্মৃতঃ।
অল্পং চাপি প্রদাতব্যং শূদ্রাপুত্রায় ভারত॥"

(১১—১৫)

* কামতঃ কামবশাৎ (কুল্লুক)। ধর্ম্মার্থমাদৌ সবর্ণামূঢ়া পশ্চাৎ রিরংসবশ্চেৎ (পরাশরভাষ্যে মাধবাচার্য্য)।

অর্থাৎ ব্রাহ্মণ-পিতার সম্পত্তির মধ্যে যাহা যাহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট, তৎসমস্ত বিভাগ না করিয়া ব্রাহ্মণীর পুত্র একাই লইবে। অন্য সম্পত্তি ১০ ভাগ করিয়া তাহার মধ্যেও ঐ ব্রাহ্মণীর পুত্র ৪ অংশ, ক্ষত্রিয়ার পুত্র ৩ অংশ এবং বৈশ্যার পুত্র ২ অংশ লইবে। শূদ্রার পুত্র ('নিত্য-অদেয়-ধন') ধনাধিকারী নহে, তথাপি তাহাকে ১ অংশ দিবে।

ইহার পরেই বৈশ্যপ্রবোধনীতে উদ্ধৃত দুইটি শ্লোক—

"ত্রিষু বর্ণেষু জাতো হি ব্রাহ্মণাদ্ ব্রাহ্মণো ভবেৎ।" (১৭)
ব্রাহ্মণ্যাং ব্রাহ্মণাজ্জাতো ব্রাহ্মণঃ স্যান্ন সংশয়ঃ।
ক্ষত্রিয়ায়াং তথৈব স্যাদ্বৈশ্যায়ামপি চৈব হি॥" (২৫)

উপসংহারে যুধিষ্ঠিরের পুনঃ প্রশ্ন—

"কস্মাত্তু বিষমং ভাগং ভজেরন্ নৃপসত্তম।
যদা সর্ব্বে ত্রয়ো বর্ণাস্ত্বয়োক্তা ব্রাহ্মণা ইতি॥" (২৯)

আপনি যখন তিন বর্ণকেই (অর্থাৎ ব্রাহ্মণ হইতে ব্রাহ্মণীজাত, ক্ষত্রিয়াজাত ও বৈশ্যাজাত পুত্রকে) ব্রাহ্মণ বলিলেন, তখন তাহারা কি জন্য এরূপ অসমান অংশ প্রাপ্ত হইবে?

ভীষ্ম এ প্রশ্নের উত্তর দিয়া শেষে বলিয়াছিলেন—

"এষ দায়বিধিঃ পার্থ পূর্ব্বমুক্তঃ স্বয়ম্ভুবা।" (৫৮)

পূর্ব্বকালে ব্রহ্মা এইরূপ দায়ভাগের বিধি বলিয়াছিলেন।

ঐ অধ্যায়টার নাম "রিকৃথবিভাগ-কথন" (রিকৃথ = ধন)।

তার পরেই "বর্ণসঙ্করকথন"-নামক ৪৮ অধ্যায়ের প্রথমেই যুধিষ্ঠিরের প্রশ্ন—

"অর্থাল্লোভাদ্বা কামাদ্বা বর্ণানাঞ্চাপ্যনিশ্চয়াৎ।
অজ্ঞানাদ্বাপি বর্ণানাং জায়ন্তে বর্ণসঙ্করাঃ॥
তেষামেতেন বিধিনা জাতানাং বর্ণসঙ্করে।
কো ধর্ম্মঃ কানি কর্ম্মাণি তন্মে ব্রূহি পিতামহ॥"

(১—২)

অর্থ গ্রহণ, কন্যাপিতার সম্পত্তি পাইবার লোভ, রতীচ্ছা, বর্ণের অনিশ্চয় অথবা বর্ণ সম্বন্ধে অজ্ঞতা হেতু বর্ণসঙ্কর জন্মে। সেই বর্ণসঙ্করদিগের ধর্ম্ম কি, তাহা আমাকে বলুন।

এই স্থলে প্রসঙ্গক্রমে বক্তব্য এই যে—যুধিষ্ঠিরের ঐরূপ প্রশ্নে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, কেবল অসবর্ণা স্ত্রীতে উৎপাদিত সন্তানকেই বর্ণসঙ্কর বলে না; ঐ সকল কারণে সবর্ণ-স্ত্রীগর্ভজাত সন্তানও বর্ণসঙ্কর বলিয়া গণ্য হয়। অতএব যাঁহারা বরপণরূপ অর্থ লইয়া পুত্রের বিবাহ দেন, তাঁহারাও বর্ণসঙ্করের সৃষ্টি করিয়া থাকেন। গীতায় উক্ত হইয়াছে—

"সঙ্করো নরকায়ৈব কুলঘ্নানাং কুলস্য চ।
পতন্তি পিতরো হ্যেষাং লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ॥"
(১।৪১)

যাহারা বর্ণসঙ্কর উৎপাদন করে, তাহারা ও তাহাদের বংশ নরকগামী হয় এবং তাহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ জলপিণ্ডের বিলোপে পতিত হইয়া থাকেন।

পাছে বর্ণসঙ্করের কারণ হইতে হয়, এই ভয়ে স্বয়ং ভগবান্‌ও ভীত হইয়া বলিয়াছিলেন,—

"সঙ্করস্য চ কর্ত্তা স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ॥"
(গীতা ৩।২৪)

এখন প্রকৃত কথা বলি। যুধিষ্ঠিরের ঐ প্রশ্নের উত্তরে ভীষ্ম বলিতে লাগিলেন,—

"ভার্য্যাশ্চতস্রো বিপ্রস্য দ্বয়োরাত্মা প্রজায়তে।
আনুপূর্ব্ব্যাদ্দ্বয়োর্হীনৌ মাতৃজাত্যৌ প্রসূয়তঃ॥" (৪)

ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা ও শূদ্রা এই চতুর্ব্বিধ ভার্য্যার মধ্যে যথাক্রমে ব্রাহ্মণীগর্ভজাত পুত্র ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়াগর্ভজাত মূর্দ্ধাভিষিক্তও ব্রাহ্মণ (পূর্ব্বোক্ত মনুবচনের সহিত একবাক্যতায় 'ব্রাহ্মণসদৃশ'—নীলকণ্ঠও এইরূপ বলিয়াছেন), এবং বৈশ্যাগর্ভজাত অম্বষ্ঠ ও শূদ্রাগর্ভজাত নিষাদ নিকৃষ্ট ও মাতৃজাতীয়।

এতাবতা, স্থূলত্বাদি সম্বন্ধে সাদৃশ্য হেতু যেমন মনুষ্যকেও হস্তী বলা যায়, সেইরূপ ব্রাহ্মণধনে অধিকারিত্ব সম্বন্ধে তৎসাদৃশ্য হেতু ৪৭ অধ্যায়ের ১৭ ও ২৫ শ্লোকে দায়ভাগপ্রকরণেই মূর্দ্ধাভিষিক্ত ও অম্বষ্ঠকে ব্রাহ্মণ বলা হইয়াছে (তজ্জাতীয়ত্ব হেতু নহে); শূদ্রার পুত্র ধনাধিকারী নহে বলিয়া তাহাকে ব্রাহ্মণ বলা হয় নাই। এইরূপ ব্যাখ্যায় সর্ব্বসামঞ্জস্যই সুরক্ষিত হইতেছে। অন্যথা ৪৭ অধ্যায়ে অম্বষ্ঠকে ব্রাহ্মণ বলিয়া ৪৮ অধ্যায়ে তাহাকে মাতৃজাতীয় (অর্থাৎ বৈশ্য) বলা উন্মত্তপ্রলাপ হয়।

ইহা আমাদের মন-গড়া ব্যাখ্যা নহে। পূর্ব্বোক্ত "ব্রাহ্মণ্যাং ব্রাহ্মণাজ্জাতঃ" ইত্যাদি শ্লোকের টীকায় নীলকণ্ঠ যাহা সংক্ষেপে লিখিয়াছেন, তাহাই আমরা বিস্তর করিয়া লিখিলাম। তিনি লিখিয়াছেন,—"এতচ্চ দায়ার্থম্ অবধ্যত্বার্থঞ্চ উক্তং, বিপ্রাৎ বৈশ্যায়াং শূদ্রায়াঞ্চ জাতস্য মাতৃজাতীয়ত্বস্য বক্ষ্যমাণত্বাৎ।" অর্থাৎ এখানে অম্বষ্ঠকে যে ব্রাহ্মণ বলা হইয়াছে, তাহা দায়াধিকারের জন্য এবং রাজদণ্ডে অবধ্য হইবার জন্য; যেহেতু পরে অম্বষ্ঠকে মাতৃজাতীয় বলা হইবে।

১৪। বৈদ্য প্রশ্ন—বৈদ্যগণ অম্বষ্ঠ-জাতীয় নহেন। বৈদ্যগণ বৈদ্য বলিয়াই পরিচিত ও প্রসিদ্ধ, অম্বষ্ঠ বলিয়া নহে।

বক্তব্য—যাঁহারা বৈদ্য বলিয়া পরিচিত ও প্রসিদ্ধ এবং উপবীতধারী, তাঁহারা এত কাল আপনাদিগকে অম্বষ্ঠ বলিয়াই জানিতেন। তজ্জন্য এখনও, ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াও, অনেকেই ১০ দিন অশৌচ গ্রহণ ও পক্কান্ন দ্বারা শ্রাদ্ধ করিতে সাহস করিতেছেন না।* "অম্বষ্ঠানাং চিকিৎসিতম্" এই মনুবচনে অম্বষ্ঠের চিকিৎসাবৃত্তি বিহিত হওয়ায় এবং "ভিষগ্‌বৈদ্যৌ চিকিৎসকে" এই অমরোক্তিতে বৈদ্য শব্দের অন্যতম অর্থ 'চিকিৎসক' থাকায় অম্বষ্ঠরাই বৈদ্য নামে পরিচিত ও প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। সুচতুর জাতিবৈদ্যগণ তাঁহাদের বৃত্তি অবলম্বন ও তদ্বিষয়ে নৈপুণ্য লাভ করিয়া অন্যের অগোচরে কোমরে পইতা রাখিয়া ক্রমে ক্রমে তাঁহাদের দলে মিশিয়া গিয়াছেন। সেই জন্য সকল অম্বষ্ঠই চিকিৎসা-ব্যবসায় করেন; কিন্তু সকল বৈদ্য চিকিৎসা-ব্যবসায় করেন না; এবং সেই জন্যই অম্বষ্ঠ ও বৈদ্য জাতির উপাধিও এক হইয়াছে। এক্ষণে "প্রবোধনী"র প্রবোধনে ধর্ম্মের দিকে না চাহিয়া, ভূত ভবিষ্যৎ ও ইহকাল পরকাল না ভাবিয়া সকল অম্বষ্ঠই বৈদ্য নামে পৃথক্ জাতি হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। তবে অম্বষ্ঠ ও বৈদ্যের পার্থক্য

* এই প্রবন্ধ দুই অংশ প্রকাশের পর মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন মহাশয়ের বৈবাহিক-বিয়োগ ও স্ত্রী-বিয়োগ হইলে তাঁহাদের পুত্রেরা দশদিনে শ্রাদ্ধ করিয়াছেন—এ কথা বোধ হয় লেখক মহাশয়ের জানা নাই।—সম্পাদক।

কোথায়? অম্বষ্ঠরা বৈশ্যজাতীয় হইলে তাঁহাদের উপনয়ন-সংস্কার কোন্ প্রমাণে হয়? কোন্ প্রমাণে তাঁহারা—ব্রাহ্মণ হওয়া দূরে যাউক—দ্বিজাতিই বা হন? 'প্রবোধনী'-লেখক যে সকল প্রমাণে বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, তৎসমস্তই যে অকিঞ্চিৎকর, তাহা সকলকেই এখন অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। বৈদ্য শব্দের ব্যুৎপত্তিতে (১ম সংখ্যায়) দেখাইয়াছি,—মহাভারতে বৈদ্যকে বৈশ্যাগর্ভে শূদ্রোৎপন্ন বলা হইয়াছে। বর্ণশ্রেষ্ঠা কন্যার সহিত হীনবর্ণ পুরুষের বিবাহ শাস্ত্রনিষিদ্ধ। ব্রাহ্মণ-পরিণীতা বৈশ্যকন্যার গর্ভোৎপন্ন অম্বষ্ঠ বৈধ সন্তান (এ কথা 'প্রবোধনী'-লেখকও বলিয়াছেন—১৩ সংখ্যায়), ইহা আমরাও স্বীকার করি। কেবল মহাভারতে নহে, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণেও আছে—

"বৈদ্যোঽশ্বিনীকুমারেণ জাতস্তু বিপ্রযোষিতি।"

(ব্রহ্ম, ১০ অঃ)

অশ্বিনীকুমার হইতে ব্রাহ্মণীর গর্ভে বৈদ্যের জন্ম।

মহাভারতে অশ্বিনীকুমারকে শূদ্র বলা হইয়াছে। যথা—

"আদিত্যাঃ ক্ষত্রিয়াস্তেষাং বিশস্তু মরুতস্তথা।
অশ্বিনৌ তু স্মৃতৌ শূদ্রৌ তপস্যুগ্রে সমাহিতৌ॥
স্মৃতাস্ত্বঙ্গিরসো দেবা ব্রাহ্মণা ইতি নিশ্চয়ঃ।
ইত্যেতৎ সর্ব্বদেবানাং চাতুর্ব্বর্ণ্যং প্রকীর্ত্তিতম্॥"

(শান্তি ২০৮।২৩-২৪)

দেবতাদিগের মধ্যে আদিত্যগণ ক্ষত্রিয়, মরুদ্গণ বৈশ্য, অশ্বিনীকুমারদ্বয় শূদ্র এবং অঙ্গিরোগণ ব্রাহ্মণ। দেবতাদিগের এইরূপ চাতুর্ব্বর্ণ্য উক্ত হইয়াছে।

এতাবতা বৈদ্য—ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের মতে চণ্ডালস্থানীয় এবং মহাভারতের মতে তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট আয়োগবস্থানীয়। পরন্তু ব্রহ্মবৈবর্ত্ত অপেক্ষা মহাভারতের প্রামাণ্যই অধিক।

ব্যাসসংহিতায় (১।৮) উক্ত হইয়াছে—

"অধমাদুত্তমায়াস্তু জাতঃ শূদ্রাধমঃ স্মৃতঃ।"

নিকৃষ্টবর্ণ পুরুষ হইতে উৎকৃষ্টবর্ণা স্ত্রীতে উৎপন্ন পুত্র শূদ্র। এতদবস্থায় বৈদ্য ব্রাহ্মণ হওয়া ভাল, কি অম্বষ্ঠ-বৈশ্য থাকাই ভাল—ইহা ধীর ও স্থির চিত্তে বিবেচনা করিয়া দেখিতে ধর্ম্মভীরু কৃতবিদ্য বৈদ্য মহোদয়গণকে অনুরোধ করি।

শ্রীশ্যামাচরণ কবিরত্ন বিদ্যাবারিধি।

কুড়ানো সম্পদ

আনমনে একা একা পথ চলিতে
দেখিলাম ছোট মেয়ে ছোট গলিতে,
হাসিমাখা মুখখানি চির-আদুরী,—
ঝ'রে-পড়া স্বর্গের রূপ-মাধুরী!

ফণিনীর মত পিঠে বেণী ঝুলিছে
চঞ্চল সমীরণে দুল দুলিছে,
মঞ্জরী-ধ্বনি বাজে চল-চরণে
মিহি নীল-ধুপছায়া শাড়ী পরণে।

বস্ত্রের আবরণ-কারা টুটিয়া
অঙ্গের হেম আভা পড়ে লুটিয়া,
মিষ্টি মধুর আঁখি, দৃষ্টি চপল
বঙ্কিম ক্ষীণাধর, রক্ত-কপোল।

চ'লে গেল পাশ দিয়ে ক্ষিপ্রপদে,—
বিজুলীর ছোট রেখা নীল নীরদে!
ছুঁয়ে দিনু কেশপাশ হাত বুলায়ে
নেচে নেচে গেল সে যে দুল দুলা'য়ে!

শিহরিয়া উঠিলাম ঘন পুলকে
হারাইয়া গেনু কোথা কোন্ দ্যুলোকে!
ভ'রে গেল সারা প্রাণ এ কি হরষে!
এতখানি সম্পদ্ মৃদু পরশে!

পথ-মাঝে কুড়াইয়া পেনু যে হরষ,
দাম তার লাখ টাকা—একটু পরশ!

গোলাম মোস্তফা, বি-এ, বি-টি।

উলা

৩

মহামারীর পূর্ব্বে শঙ্খ-ঘণ্টা-রবে উলা কাশীতুল্য প্রতীয়মান হইত। গ্রামে বারো মাসে তের পার্ব্বণ উপলক্ষে আমোদ-প্রমোদ ও ফলাহারের নিমন্ত্রণ লাগিয়া থাকিত। প্রায় ২ শত দুর্গোৎসব ও ১২।১৩ শত দীপান্বিতা-শ্যামা-পূজা হইত। বামনদাস মুখোপাধ্যায়ের বাটীতে রথ ও স্নানযাত্রায়, পুরাতন মুস্তৌফী-বাটীতে দুর্গোৎসবে এবং ঈশ্বরচন্দ্র মুস্তৌফীর নূতন বাটীতে জগদ্ধাত্রীপূজায় বিশেষ সমারোহ হইত। এমন দিন ছিল যে, উলার মুচি এবং বারবনিতাগণও সমারোহে দুর্গোৎসবাদি করিয়াছে। উলা-চণ্ডীপূজার দিন উলা-চণ্ডীতলায় এত ছাগ ও মহিষ বলি হইত যে, রুধিরের স্রোত দেখিয়া অনেক লোক অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া যাইত।* গ্রামে ছয়খানি বারইয়ারী পূজা হইত, তন্মধ্যে মাঝের পাড়ার ও দক্ষিণপাড়ার বারইয়ারীতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ও নানাবিধ তামাসা হইত। এ সকল উৎসবের অধিকাংশ বহু দিন পূর্ব্বেই বন্ধ হইয়া গিয়াছে। উৎসবের আনন্দ-কোলাহলের পরিবর্ত্তে এক্ষণে ক্রন্দনের রোল উঠিতেছে। উলাচণ্ডী-পূজায় আর সে মহা-সমারোহ ও অসংখ্য জীবহত্যা নাই, পূর্ব্বের ন্যায় লোকসমাগম হয় না। আজিও গ্রামে তিনখানি বারইয়ারী হইয়া থাকে, তন্মধ্যে দুইখানি বারইয়ারীতে পূর্ব্বের ন্যায় না হইলেও আমোদ-প্রমোদ হইয়া থাকে। সাময়িক পূজাপার্ব্বণ গ্রাম হইতে একপ্রকার উঠিয়া গিয়াছে। কেবলমাত্র পুরাতন মুস্তৌফীবাটীর প্রাচীন পূজাপার্ব্বণগুলি কোন প্রকারে সম্পন্ন হইতেছে, কিন্তু পূর্ব্বের সমারোহ আর নাই।

বামনদাস মুখোপাধ্যায়দিগের বাটীতে স্নানযাত্রা ও রথের সমারোহের পরিবর্ত্তে এক্ষণে রথের সময় রথটি টানা হয় মাত্র। গ্রামে যে সামান্য লোকসং.. আছে, তাহাদিগের অধিকাংশ ভগ্ন-স্বাস্থ্য ও অর্থ-হীন। তাহারা জীবন্মৃত হইয়া আছে। এরূপ লোকের পক্ষে বিলাস-ব্যসনে অর্থব্যয় সম্ভবপর নহে। ক্রিয়াহীন উলাবাসীর মন্ত্রহীন পূজারী অর্থশূন্য পূজার অভিনয় করিয়া অন্নের সংস্থান করিতে পারিতেছে না।

উলা ব্রাহ্মণ-প্রধান গ্রাম ছিল। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সময় উলার প্রায় ৭২ সহস্র লোকের বাস ছিল বলিয়া শুনা যায়; তন্মধ্যে কেবল ফুলিয়া ও খড়দহ মেলের আড়াই হাজার ঘর ব্রাহ্মণ ছিলেন। এই আড়াই হাজার ঘরের মধ্যে ৫ শত ঘর নৈকষ্য কুলীন ছিলেন। গ্রামে ফুলিয়া মেলের বহু স্বভাব ও ভঙ্গকুলীন ছিলেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের বহু পরে, মহামারী দ্বারা উলা ধ্বংস হইবার পূর্ব্বে বহু রাঢ়ী ও সামান্য বারেন্দ্র ও শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণের বাস ছিল। কোন ক্রিয়াকর্ম্ম উপলক্ষে প্রায় ৩ সহস্র ব্রাহ্মণ একসঙ্গে পংক্তি
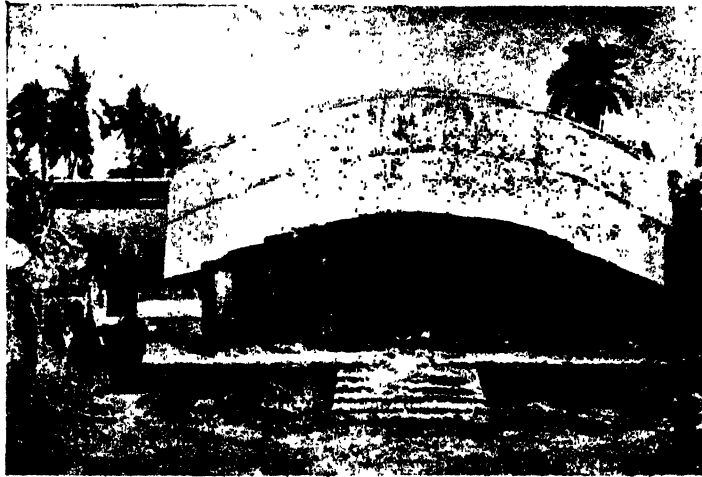
দক্ষিণপাড়ার মুস্তৌফীদের চণ্ডীমণ্ডপ টীন আচ্ছাদিত হওয়ার পরের দৃশ্য
(প্রতিষ্ঠাতা রামেশ্বর মুস্তৌফী। প্রতিষ্ঠার শকাব্দা ১৬০০ খৃঃ)
বামদিকে একটি ভগ্ন দেয়ালে জামাই-বারিকের তিনটি দরবার খিলান

* ঐ দিন উলার রাস্তায় হস্তী ও মহিষের যুদ্ধ হইত। গৃহস্থগণ আপন আপন গৃহের উপর হইতে উহা দেখিত।

ভোজনে বসিতেন। উলায় ব্রাহ্মণদিগের একটি প্রধান সমাজ ছিল। উলার ব্রাহ্মণগণ শুধু ব্রাহ্মণ নহে, উলাবাসী-মাত্রেই—বক্তৃতাবাগীশ, সুরসিক ও উপস্থিতবুদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন। অন্য স্থানের ব্রাহ্মণগণ উলার ব্রাহ্মণকে ভয় করিতেন, মহামারী দ্বারা উলা ধ্বংস হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে উলার ব্রাহ্মণ, তথা সকল সমাজের মধ্যে নানাবিধ অনাচার ও পাপের স্রোত বহিতেছিল। পাপস্রোত একবার বহিলে সহজে উহার গতিরোধ করা যায় না। আজিও এই অভিশপ্ত গ্রামকে ইহার ফলভোগ করিতে হইতেছে।

উলা কৃষ্ণরাম মুখোপাধ্যায়ের বাটীর ভগ্নাবশেষ

উলার ব্রাহ্মণবংশগুলির মধ্যে মুখুয্যেপাড়ার কৃষ্ণরাম ও মুক্তারাম মুখোপাধ্যায়দিগের বংশ সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ও কুলগর্ব্বে গরীয়ান্। এতদ্ব্যতীত মাঝের পাড়ার মহাদেব মুখোপাধ্যায়ের, দেওয়ান মুখোপাধ্যায়দিগের, গঙ্গোপাধ্যায়দিগের, জজ ভট্টাচার্য্যদিগের ও কৃষ্ণনগরের রাজবংশীয় রায়দিগের বংশ, দক্ষিণপাড়ার গড়ের চট্টোপাধ্যায়দিগের ও ব্রহ্মচারীদিগের বংশ এবং উত্তরপাড়ার মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি কয়েকটি বংশ বিশেষ বিখ্যাত।

ব্রাহ্মণ ব্যতীত গ্রামে বহুকাল হইতে অনেকগুলি কুলীন, মৌলিক ও বাহাত্তুরে কায়স্থ এবং বৈদ্যের বাস ছিল। কায়স্থদিগের মধ্যে মাঝের পাড়ার মিত্র ও দত্তবংশ উলার প্রাচীন অধিবাসী। দক্ষিণপাড়ার মুস্তৌফীবংশ প্রাচীন ও বিখ্যাত। দক্ষিণপাড়ার বাজারে বসুর বংশ, রামসন্তোষ বসুর বংশ ও মধুসূদন বসুর বংশ এবং ছোট মিত্রদিগের বংশগুলি প্রাচীন এবং মুস্তৌফীদিগের সহিত আত্মীয়তায়
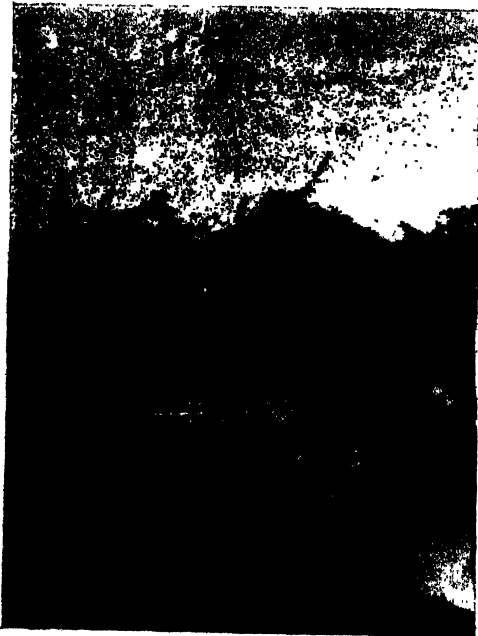
মুখুয্যেপাড়ার সরকারী বাটীর রাধাবল্লভের ভগ্ন বনাকীর্ণ গৃহ

উলার মুখুয্যেপাড়ার কর্ত্তার বাটীর পূজার দালান

আবদ্ধ। বৈদ্যদিগের মধ্যে ঈশ্বর কবিরাজের ও রায়দিগের বংশ বিশেষ খ্যাত।

নবশাকদিগের মধ্যে "খাঁ" উপাধিধারী তিলি-জাতীয় "কুণ্ডু"গণ বিখ্যাত।

মহামারীর অব্যবহিত পূর্ব্বে উলায় প্রায় ৫০ সহস্র লোকের বাস ছিল, তন্মধ্যে বহু গোপ, কর্ম্মকার, কৈবর্ত্ত, তন্তুবায়, সূত্রধর, নাপিত, মালাকর, স্বর্ণকার, কুম্ভকার, ময়রা, সুবর্ণবণিক, কাঁসারী, বারুই, সদ্গোপ, ছুলিয়া, বাইতি, বাগ্দী, হাড়ি, মুচি, ডোম ও মুসলমানের বাস ছিল। ইহাদিগের অধিকাংশ এক্ষণে লোপ পাইয়াছে। যাহা এখনও অবশিষ্ট আছে, তাহা প্রতিবৎসর দ্রুত কমিয়া যাইতেছে।

৪

এক কালে উলায় নানাবিধ দ্রব্য প্রস্তুত হইত। স্বর্ণকারগণ স্বর্ণ, রৌপ্য ও জড়োয়া অলঙ্কার গড়িত। সমগ্র বঙ্গদেশের মধ্যে উলার আচার্য্য ব্রাহ্মণগণ সর্ব্বপ্রথম ডাকের সাজ প্রস্তুত করেন। কুম্ভকারগণ উৎকৃষ্ট প্রতিমা ও মৃন্ময় 'তৈজসপত্রা'দি গড়িতে পারিত। কর্ম্মকারগণ দেবপূজার জন্য লৌহদণ্ডনির্ম্মিত কারুকার্য্যবিমণ্ডিত বৃহৎ বাতীদান, মহিষ-বলির খড়্গ ও গৃহস্থের নিত্য ব্যবহার্য্য অস্ত্রাদি প্রস্তুত করিত এবং বলিদানে দক্ষ ছিল। মালাকরগণ নানাবিধ ফুলের সাজ ও অলঙ্কার, আতসবাজী, ফুলের ছড়, অভ্রের বাতীদান ও ঝাড় প্রভৃতি প্রস্তুত করিত। সূত্রধরগণ কাষ্ঠের উপরে অতি সূক্ষ্ম কারুকার্য্য ও নানাবিধ মূর্ত্তি প্রভৃতি বানাইত—যাহার অপূর্ব্ব নিদর্শন মুস্তোফীবাটীর চণ্ডীমণ্ডপে বর্ত্তমান আছে। রাজমিস্ত্রীগণ বিবিধ প্রণালীতে মন্দির, মস্জিদ ও অট্টালিকাদি প্রস্তুত করিত, ইহার নিদর্শন গ্রামের মুস্তোফীবাটীর যোড়-বাংলা মন্দিরে, ছোট মিত্রদিগের বিষ্ণুমন্দিরে ও গ্রামের অন্যান্য মন্দির, মস্জিদ ও অট্টালিকাদিতে দেখিতে পাওয়া যায়। তন্তুবায়গণ সূক্ষ্ম এবং মোটা বস্ত্রাদি প্রস্তুত করিত। এক শ্রেণীর লোক ছিল, তাহারা রঞ্জনবিদ্যা জানিত; ইহারা জলচৌকী ও খাট প্রভৃতির পায়াতে স্থায়ী লাল, নীল ও কাল রং করিয়া দিত। পটুয়াগণ উৎকৃষ্ট কুচো পুতুল, খেলনা প্রস্তুত করিতে এবং ছবি ও দশ্পপট অঙ্কিত করিতে পারিত। এক শ্রেণীর লোক ছিল, তাহারা কড়ির আল্না ও সিন্দুরচুপড়ি প্রভৃতি প্রস্তুত করিত। কবিরাজগণ ও যুগীগণ রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা নানাবিধ ঔষধ প্রস্তুত করিত। আর এক শ্রেণীর লোক ছিল, তাহারা তুলট কাগজ প্রস্তুত করিত। কাঁসারীগণ গৃহস্থের নিত্য ব্যবহার্য্য নক্সা-করা ও মূর্ত্তিবিমণ্ডিত বাসন এবং নৌকার সম্মুখ ও পশ্চাদ্দেশের জন্য ও পাল্কীর ডাণ্ডার প্রান্তভাগের জন্য নানাপ্রকার জীবজন্তুর অবয়ব প্রস্তুত করিয়া দিতে পারিত। মুচিগণ মোটা-মুটি জুতা প্রস্তুত করিতে জানিত। এক শ্রেণীর লোক ছিল, ইহারা ধনীর গৃহে খানসামার কার্য্য করিত এবং প্রসাধনের নানাবিধ অভিনব পদ্ধতি জানিত। ময়রাগণ উৎকৃষ্ট মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিত; ইহাদিগের সুয়া-তোলা মোণ্ডা, সন্দেশ, রসগোল্লা ও ঘৃতসিক্ত অভিনব বীরখণ্ডী অতি বিখ্যাত। উলা আজ শিল্পিশূন্য হইয়াছে। একমাত্র মিষ্টান্ন ব্যতীত উল্লেখযোগ্য কোন দ্রব্যই এখন আর উলায় হয় না। পূর্ব্বে উলায় উৎকৃষ্ট আকের গুড় ও নীল উৎপন্ন হইত, বহু পূর্ব্বে তাহা উঠিয়া গিয়াছে।

ভগ্ন জামাইকোঠার সম্মুখে সমবেত ম্যালেরিয়াক্লিষ্ট বালক-বালিকাগণ

উলার স্ত্রীলোকগণ অবসরকালে সুশ্রী দড়ির শিকা, কারুকার্য্যবিশিষ্ট কন্থা, কড়ির দ্রব্য প্রস্তুত করিতেন, সূতা কাটায় তাঁহাদের দক্ষতা ছিল এবং বিবিধ টোটকা ঔষধের ব্যবহারও জানিতেন। আলিপনা দিতে এবং "লক্ষ্মীর গাছ" চিত্রিত করিতে তাঁহারা বিশেষ পারদর্শিনী

ছিলেন। এক্ষণে আলিপনা ব্যতীত আর বিশেষ কিছুই তাঁহারা জানেন না।

উলার প্রাচীন শিল্পসম্ভারের নিদর্শন আজিও গ্রামের বিভিন্ন ব্যক্তির গৃহে আছে।

একটি বনাকীর্ণ মন্দির

৫
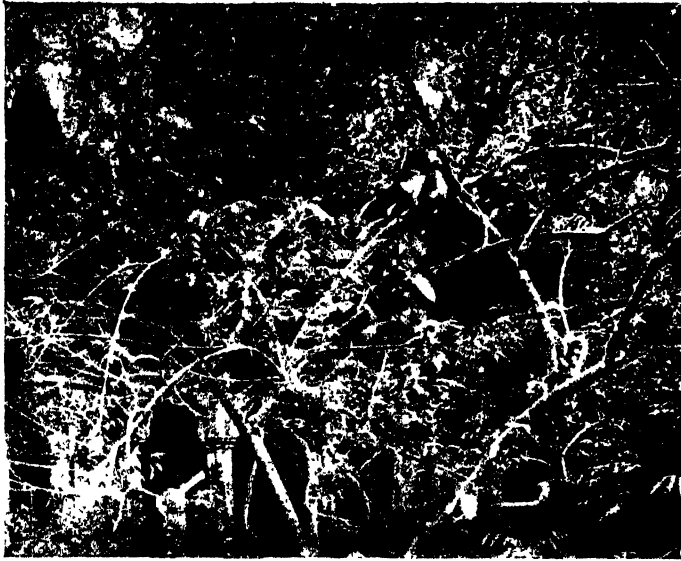
এক সময় গ্রামে বিবিধ প্রকারের আমোদ-প্রমোদ ও ব্যায়ামের চর্চা ছিল, ঘরে ঘরে কালোয়াতি ও বৈঠকী গান, পাড়ায় পাড়ায় হরিসঙ্কীর্ত্তন, রামায়ণ গান ও কথকতা হইত। নিম্ন শ্রেণীর লোকদিগের মনসার ভাসানের সখের দল এবং অবস্থাপন্ন লোকদিগের সখের পাঁচালীর ও কবির দল থাকিত। এক দলের সহিত অপর দলের প্রতিযোগিতা হইত এবং বিজেতা পুরস্কৃত হইত। কথিত আছে যে, ঈশ্বরচন্দ্র মুস্তৌফীর বাটীতে জগদ্ধাত্রীপূজা উপলক্ষে কবির লড়াই হইত এবং তিনি বিজেতাকে মূল্যবান্ শাল আপন অঙ্গ হইতে খুলিয়া পারিতোষিক দান করিতেন।

মহামারীর পূর্ব্বে উলার গায়কদিগের মধ্যে "গানবিলাস" মহাশয়, তৎপুত্র হরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মোহন দত্ত, কাণা কানাই চট্টোপাধ্যায় (জন্মান্ধ) এবং ব্রজ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি বিখ্যাত ছিলেন। মহামারীর পরে শশী মুখোপাধ্যায় ও ঘনশ্যাম মিত্র, কৈলাস ও জগবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায়, কানাই চট্টোপাধ্যায় ও হরি মুখোপাধ্যায় ভাল গায়ক ছিলেন।

মহামারীর পূর্ব্বে ও পরে অনেকগুলি ভাল 'বাজিয়ে' ছিলেন। অন্ধ ব্রহ্মচন্দ্র রায় এবং কেবলকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (বা বন্দ্যোপাধ্যায়) বিখ্যাত 'পাখোয়াজী' ছিলেন। শুনা যায় যে, কেবলকৃষ্ণের ৩৷৷০ হাত দীর্ঘ এক পাখোয়াজ ছিল, তিনি তাহাই বাজাইতেন এবং নিমন্ত্রিত হইয়া বহু দূরদেশে পাখোয়াজ বাজাইতে যাইতেন। ইঁহাদিগের পরে নীলরতন, অনুকূল ও যদুকুল মুখোপাধ্যায়, কেদারনাথ বসু, বঙ্কুবিহারী চট্টোপাধ্যায় এবং রাজেন্দ্রনাথ ও নীলকণ্ঠ বন্দ্যোপাধ্যায় বাঁশী বাজাইয়া সুনাম অর্জ্জন করিয়াছিলেন। উলায় অনেক বারবনিতা ছিল, ইহারা ভাল বাজাইতে ও নৃত্য-গীত করিতে জানিত। তারা নাম্নী কোনও পেশাকর ইহাদিগের মধ্যে বিশেষ বিখ্যাত ছিল।

উলার বন

মহামারীর পূর্ব্বে কয়েক জন হরবোলা ও ভাঁড় ছিলেন, তন্মধ্যে শ্রীমোহন মুখোপাধ্যায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তিনি ইংরাজ আদালতের বিচারের প্রহসন ও বিভিন্ন ব্যক্তির ও পশুপক্ষীর স্বর অনুকরণ করিতেন। দক্ষিণপাড়ার বারইয়ারীতলায় মহিষ-বলিদানের সময় তিনি মহিষের পৃষ্ঠের উপর উঠিয়া হস্তীর ন্যায় ঘন ঘন বৃংহিত ধ্বনি করিতেন। হস্তী তাহার পৃষ্ঠের উপর উঠিয়াছে

ভাবিয়া মহিষ কিঞ্চিৎ শান্ত ভাব ধারণ করিলে এক খড়্গাঘাতে তাহার মুণ্ডচ্ছেদ করা হইত। তিনি রাত্রিকালে দেয়ালের উপরে হস্তের ছায়া পাতিত করিয়া অঙ্গুলি ও হস্তসঞ্চালন দ্বারা নানাবিধ পশুপক্ষীর অবয়ব দেখাইতে পারিতেন।

শ্রীমোহন অনেক রাজবাড়ীতে আপন কৃতিত্ব দেখাইয়া অন্নসংস্থান করিতেন। একবার তিনি দিনাজপুরের রাজ-বাটীতে কৃতিত্ব দেখাইয়া সমবেত ভদ্রমণ্ডলীর নিকট হইতে বহু প্রশংসা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি যখন অভিনয় সাঙ্গ করিয়া রঙ্গমঞ্চের এক পার্শ্বে বিশ্রাম করিতেছেন, সেই সময় পশ্চিমদেশ হইতে আগত এক জন হিন্দুস্থানী ভাঁড় আপন কৃতিত্ব দেখাইবার জন্য একগাছি রজ্জু হাতে লইয়া রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইল। সে যেন পলাতক অশ্বের সন্ধানে বাহির হইয়াছে, এইরূপ ভাণ করিয়া, শ্রীমোহন যে স্থানে বসিয়া বিশ্রাম করিতেছিলেন, তথায় আসিয়া কহিল, "আরে মেরি ঘোড়ি! তুম্ হিয়া হায়?" এই বলিয়া সে শ্রীমোহনের গলদেশে রজ্জু দিতে উদ্যত হইল। শ্রীমোহন তৎক্ষণাৎ ঘোড়ার ন্যায় উপুড় হইয়া হস্তদ্বয়ের উপর শরীরের সমুদায় ভার দিয়া পদদ্বয় দ্বারা উক্ত ব্যক্তির বক্ষোদেশে এমন "চাট" মারিলেন যে, সে দূরে নিক্ষিপ্ত হইয়া ধরাশায়ী হইল। পরবর্ত্তী কালে উলার খোদাবক্স নিকারী নামক এক মুসলমান বিভিন্ন স্থানের মেলায় দলবল সহ যাইয়া ম্যাজিক দেখাইয়া অর্থোপার্জ্জন করিত।

গ্রামের শাণাইদার পাড়ায় মুসলমানজাতীয় ভাল শানাইদার ছিল, তাহাদিগের নাম—খাতির, চরণ, হেলা, প্রতাপ ও বেণী প্রভৃতি। বাইতিপাড়ায় ভাল ঢুলী ছিল, অন্য পাড়াতেও ছিল; ইহাদিগের নাম—হরে, দীনে, এককড়ি, পেশা ও ছিরে প্রভৃতি।

উলার নিকারীপাড়ার দরগা

১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের নিকটবর্ত্তী কোন সময় দক্ষিণপাড়ায় কালীকুমার মিত্রের বাড়ীতে সর্ব্বপ্রথম সখের থিয়েটারের দল গঠিত হয়। ইঁহারা "মেঘনাদের" পালা আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু দলের লোকদিগের মধ্যে মনোমালিন্য হওয়ায় অভিনয় হয় নাই। তৎপরে ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে খাঁপাড়ায় "বাসন্তী থিয়েটার" নাম দিয়া একটি সখের থিয়েটারের দল গঠিত হয়। ইঁহারা "বিল্বমঙ্গল", "নরমেধ যজ্ঞ" ও "তরুবালা" প্রভৃতি নাটক দক্ষতার সহিত অভিনয় করেন। কালক্রমে এই থিয়েটার বন্ধ হইয়া যায় এবং ১৯০৩-৪ খৃষ্টাব্দে "উলা বাসন্তী ড্রামাটিক ইউনিয়ান" নাম দিয়া আর একটি দল গঠিত হয়। এই দলে পূর্ব্ববর্ত্তী দলের অধিকাংশ অভিনেতা ছিলেন। এই শেষোক্ত দল "হরিশ্চন্দ্র", "বিল্বমঙ্গল", "রিজিয়া" ও "সংসার" প্রভৃতি অভিনয় করেন। উঁহারা কেবল নাটক অভিনয় করিতেন না; পরন্তু দুঃস্থকে সাহায্য, রোগীর সেবা, মৃতের সৎকার ও কন্যাদায়গ্রস্তকে কন্যাদায় হইতে উদ্ধার করিতেন। অভিনেতাদিগের মধ্যে ভিখারীলাল মুখোপাধ্যায়, হরিপদ গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, সতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুত সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুত উমানাথ মুস্তৌফী ও শ্রীযুত প্রকাশচন্দ্র মুস্তৌফী বিভিন্ন ভূমিকায় অতি দক্ষতার সহিত অভিনয় করিয়াছেন। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে শ্রীযুত প্রকাশচন্দ্র মুস্তৌফী বিলাতে যাইয়া লণ্ডন সহরে পর্য্যন্ত অভিনয়ের দ্বারা সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়া আসিয়াছেন। তিনি কলিকাতার ও পশ্চিম-বঙ্গের বিভিন্ন স্থানের সখের থিয়েটার-সম্প্রদায়ের ড্রামাটিক ডিরেক্টার ও অবৈতনিক শিক্ষক। উলার শেষোক্ত থিয়েটারের দল ভাঙ্গিয়া যাওয়ার বহু দিন পরে গত ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে একটি নূতন দল গঠিত হইয়াছে, কিন্তু অর্থাভাবে ইহার উন্নতি হইতেছে না। ইঁহারা দুঃস্থ

গ্রামবাসীদিগের সেবা করিবার মহৎ উদ্দেশ্য লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

এক কালে গ্রামে যথেষ্ট ব্যায়াম-চর্চ্চা ছিল। বহু কুস্তীগির ও লাঠিয়াল ছিল। সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগের গৃহে সেকালে হিন্দুস্থানী দ্বারবান্ ও ডাকাইতের সর্দ্দার এবং বিখ্যাত লাঠিয়ালগণ রাত্রিকালে প্রহরায় নিযুক্ত থাকিত। লাঠিখেলা, তরবারিখেলা, ধনুর্ব্বাণ দ্বারা লক্ষ্যভেদ করা ও কুস্তী প্রভৃতি নানাপ্রকার ব্যায়াম-ক্রীড়ার চর্চ্চা ছিল। গ্রামের ষষ্ঠীতলা-পাড়ায় ষষ্ঠী সরকার নামক কায়স্থজাতীয় এক জন বিখ্যাত পালোয়ান ছিলেন। তাঁহার খ্যাতি শুনিয়া কাশ্মীর হইতে খাওয়াইতে থাকুন।” ইহা বলিলে উক্ত কাশ্মীরী পালোয়ান সেই বটবৃক্ষের ডাল ধারণ করিলেন এবং ষষ্ঠী স্বীয় হস্ত উক্ত ডাল হইতে অপসারণ করিলেন। ষষ্ঠী ডাল ছাড়িয়া দিবামাত্র সেই বৃহৎ ডাল কাশ্মীরী পালোয়ানকে লইয়া সবেগে উর্দ্ধে উত্থিত হইয়া তাহাকে দূরে নিক্ষেপ করিল। ইহাতে কাশ্মীরী পালোয়ান ভাবিল, ষষ্ঠীর চেলার যখন এত শক্তি, না জানি ষষ্ঠীর কত শক্তি আছে। ইহা ভাবিয়া সে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিল। সেকালের লোক কহিত যে, ষষ্ঠী ব্রহ্মদৈত্যের সহিত লড়িয়া শক্তি প্রাপ্ত হইয়াছিল। মহামারীর দ্বারা উলা ধ্বংস হইবার পরেও ষষ্ঠী জীবিত ছিলেন। তখন তাঁহার

শম্ভুনাথ মুখোপাধ্যায়ের ভগ্ন পূজার দালান

কমলনাথ মুখোপাধ্যায়দিগের ত্যক্ত শিবমন্দির

এক জন বিখ্যাত পালোয়ান তাঁহার সহিত বল পরীক্ষা করিবার জন্য উলায় আসিয়াছিল। এক দিবস ষষ্ঠী সরকার যখন এক বৃহৎ বটগাছের ডাল নুয়াইয়া ধরিয়া স্বীয় ছাগলকে উহার পাতা খাওয়াইতেছিলেন, সেই সময় উক্ত কাশ্মীরী পালোয়ান তাঁহার নিকটে আসিয়া, ষষ্ঠী সরকার কোথায় আছেন জিজ্ঞাসা করিল। ষষ্ঠী আগন্তুকের পরিচয় ও আসিবার কারণ জানিয়া লইয়া কহিলেন, “আমি ষষ্ঠী সরকারের শিষ্য। আমি তাঁহাকে ডাকিয়া দিতেছি। আমি যতক্ষণ না ফিরিয়া আসি, আপনি ততক্ষণ অনুগ্রহ করিয়া এই বটগাছের ডালটি ধরিয়া আমার ছাগলকে পাতা বার্দ্ধক্য অবস্থা এবং গাত্রচর্ম্ম লোল হইয়া গিয়াছে, কিন্তু সে সময়েও তিনি ইচ্ছা করিলে দেহের মাংসপেশী এরূপ কঠিন করিতে পারিতেন যে, বালকরা তন্মধ্যে সূচ বিদ্ধ করিতে সমর্থ হইত না। বিখ্যাত ভোজনবিলাসী “মুনকে রঘুনাথের” অন্যতম পুত্র ভূষণ ভট্টাচার্য্য সমসাময়িক লোক ছিলেন এবং তিনিও এক জন পালোয়ান ছিলেন। জন্মাষ্টমীর দিন প্রভাতে দক্ষিণপাড়ায় বুড়া শিবতলার নিকটে পালোয়ান-দিগের ও বালকদিগের কুস্তী ও ব্যায়াম-ক্রীড়া হইত। উহা দেখিতে বহু লোকসমাগম হইত। খেলোয়াড়গণ “জয় নন্দলালকি” বলিয়া মল্লভূমিতে প্রবেশ করিত।

ইহার বহুকাল পরে ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে গ্রামের খাঁপাড়ায় একটি "রীডিং এণ্ড স্পোর্টিং ক্লাব" স্থাপিত হয়, উহার নেতা ছিলেন শ্রীযুত যতীন্দ্রনাথ ও সুজনেন্দ্রনাথ খাঁ (কলিকাতার "খাঁ এণ্ড কোংএর) এবং শ্রীযুত অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি যুবকগণ। ইঁহাদিগের সখের থিয়েটার ছিল, লাইব্রেরী ছিল এবং ব্যায়াম-চর্চ্চা ছিল। প্রতি বৎসর বৈশাখী পূর্ণিমার পরের দিন বারইয়ারী-পূজার সময় খাঁ-দীঘির পূর্ব্বপাড়ে ইঁহাদিগের স্পোর্টস্ বা ব্যায়ামের প্রতিযোগিতা হইত। পূর্ব্বোক্ত খাঁ মহাশয়গণ ও শ্রীযুত অনুকূলচন্দ্র মিত্র (কলিকাতার ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের নির্ম্মাণকালে মার্টিন কোম্পানীর পক্ষে ইনি রেসিডেণ্ট এঞ্জিনিয়ার থাকাকালে যোগ্যতার পরিচয় দিয়া "রায় বাহাদুর" হইয়াছেন) ও যজ্ঞেশ্বর কুণ্ডু প্রভৃতি যুবকগণ এই ক্লাবের ভাল খেলোয়াড় ছিলেন।

ঠিক এই সময় গ্রামের দক্ষিণপাড়ার ও মাঝের পাড়ার যুবকগণ শ্রীযুত নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (বর্ত্তমানে ইনি আলীপুরের পাবলিক প্রসিকিউটার এবং কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটীর কমিশনার) পরিচালনাধীনে "উলা এথলেটিক ক্লাব" নাম দিয়া আর একটি ক্লাব গ্রামের দক্ষিণপাড়ায় প্রতিষ্ঠিত করেন। শরীর-গঠন, ব্যায়াম-চর্চ্চা ও সেবা এই ক্লাবের লক্ষ্য ছিল। প্রতি বৎসর উলাচণ্ডী-পূজার দিন মিউনিসিপ্যাল আপিসের নিকটে ইঁহাদিগের ক্রীড়ার প্রতিযোগিতা হইত। এই ক্লাবে শ্রীযুত উষানাথ মুস্তৌফী, শ্রীযুত যতীন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুত তারাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুত হিরণকুমার দাশগুপ্ত প্রভৃতি বিখ্যাত খেলোয়াড় ছিলেন।

এই উভয় ক্লাবের বাৎসরিক উৎসবে বা ক্রীড়া-প্রতিযোগিতার দিনে নানা স্থানের বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়া ক্রীড়া, উলাচণ্ডীপূজা ও বারইয়ারী একসঙ্গে সকলই দেখিয়া যাইতেন। অনুমান ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে এই দুইটি ক্লাব উঠিয়া গিয়াছে। এক্ষণে স্কুলের বালকদিগের ফুটবল ক্লাব আছে বটে, কিন্তু উহাতে আর পূর্ব্বের ন্যায় প্রাণ নাই। অর্থাভাব ও স্বাস্থ্যহানি ইহার কারণ।

গ্রামে দুই জন ভাল শিকারী ছিলেন। তাঁহাদিগের নাম যতীন্দ্রনাথ মুস্তৌফী এবং আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। যতীন্দ্রনাথ পলায়মান জন্তু এবং অন্ধকার রাত্রিতে কেবলমাত্র শব্দ লক্ষ্য করিয়া শিকার করিতে পারিতেন। আশুতোষ অনেক সময় গোবরডাঙ্গার বিখ্যাত শিকারী জ্ঞানদাপ্রসন্ন রায়ের সহিত নানাস্থানে শিকার করিতে যাইতেন। বর্ত্তমানকালে উলায় এক জন শিকারী আছেন। ইঁহার নাম শ্রীযুত হিরণকুমার দাশগুপ্ত। ইনি প্রতি বৎসরেই দুই একটি ব্যাঘ্র বধ করিতেছেন।

উলার স্কুল

১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণপাড়ায় কালিকুমার মিত্রের বাটীতে গ্রামের সর্ব্বপ্রথম লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠিত হয়, কিন্তু অল্পকাল পরে উহা উঠিয়া যায়।

১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে খাঁপাড়ায় একটি লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠিত হয়। সভ্যগণের নিকট হইতে প্রাপ্ত অর্থ দ্বারা ক্রীত পুস্তকাদি বাদে ইহাতে মুখুয্যেপাড়ার সুরেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রায় ১ হাজার গ্রন্থ দান করিয়াছিলেন। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের পরে এই লাইব্রেরী উঠিয়া গেলে ইহার পুস্তকাদি সেই স্থানেই পড়িয়া রহিল। উলার বর্ত্তমান লাইব্রেরী স্কুল-গৃহে প্রতিষ্ঠিত আছে। ইহা ১৯২২ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হইয়াছে। মিউনিসিপ্যালিটী হইতে ইহাকে কিঞ্চিৎ সাহায্য দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে।

[ক্রমশঃ।

শ্রীসুজননাথ মিত্র মুস্তৌফী।

প্রলয়ের আলো

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

প্রাণদণ্ড অথবা সাইবেরিয়া

মধ্যরাত্রিতে রুসরাজধানীর রাজপথে শীতের প্রাখর্য্য কিরূপ দুঃসহ, তাহা ধারণা করা আমাদের সাধ্যাতীত; শীতের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য নিকোলাস্ ষ্ট্রোভিল ও জোসেফ কুরেট পথে আসিয়া গলাবন্ধ দিয়া কণ্ঠদেশ আবৃত করিল, পশুলোমাবৃত টুপী টানিয়া ভ্রূ পর্য্যন্ত নামাইয়া দিল, এবং চর্ম্মনির্ম্মিত দস্তানা-পরিবেষ্টিত হাত দুইখানি ভারী কোটের প্রশস্ত পকেটে রাখিয়া গন্তব্য পথে অগ্রসর হইল। কিন্তু তুষারাচ্ছন্ন নদীর উপর দিয়া যে শীতল বায়ু প্রবাহিত হইতেছিল, তাহা তাহাদের অনাবৃত মুখে করাতের দাঁতের মত বিঁধিতে লাগিল। রাজপথে তখন জনমানবের সাড়াশব্দ ছিল না; আলোকস্তম্ভশিরে নীলাভ আলোকের দীপগুলি জ্বালাইয়া রাখিয়া সুদীর্ঘ রাজপথ যেন গভীর নিদ্রায় মগ্ন হইয়াছিল।

তাহারা উভয়ে চলিতে লাগিল; তাহাদের নিকটে বা দূরে অন্য কেহ আছে, ইহা তাহারা বিশ্বাস করিতে না পারিলেও, এক জন লোক অতি সতর্কভাবে ছায়ার ন্যায় তাহাদের অনুসরণ করিতেছিল। ষ্ট্রোভিল ও কুরেট সভাস্থল পরিত্যাগ করিয়া পথে আসিলে সে একটি গুপ্ত স্থান হইতে বাহির হইয়া তাহাদের অনুসরণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। এই ব্যক্তি কোন কৌশলে গোপনে তাহাদের সভায় উপস্থিত হইয়া সভাপতির সকল কথাই শুনিয়াছিল; তাহার পর ষ্ট্রোভিল ও জোসেফ কুরেট রুস-সম্রাটকে হত্যা করিবার ভার গ্রহণ করিলে, নিঃশব্দে সভাস্থল ত্যাগ করিয়া পথে আসিয়াছিল; এবং পথ-প্রান্তবর্ত্তী একটি সাঁকোর রেলিং-সন্নিহিত স্তম্ভের আড়ালে দাঁড়াইয়া তাহাদের প্রতীক্ষা করিতেছিল।—ষ্ট্রোভিল ও কুরেট মুহূর্ত্তের জন্যও তাহার দৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারিল না।

তাহারা চলিতে চলিতে শুনিতে পাইল, অদূরবর্ত্তী গীর্জ্জার ঘড়ীতে তিনটা বাজিয়া গেল। তাহারা চলিতে চলিতে আর একটি পথে উপস্থিত হইল; সেই পথের দুই ধারে বৃক্ষশ্রেণী থাকায় সুশীতল সমীরণ-প্রবাহ তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে পারিল না। সেই পথে শীতের তীব্রতাও যেন কমিয়া আসিল; এ জন্য তাহারা কতকটা স্বস্তি বোধ করিতে লাগিল।

ষ্ট্রোভিল চলিতে চলিতে হঠাৎ থামিয়া জোসেফকে বলিল, "জোসেফ কুরেট, তুমি কে? কোথা হইতে আসিয়াছ?"

অন্য কোন নব-পরিচিত ব্যক্তি এরূপ প্রশ্ন করিলে, তাহা শিষ্টাচারবিরুদ্ধ মনে করিয়া জোসেফ হয় ত রাগ করিত; কিন্তু ষ্ট্রোভিলের প্রশ্নে সে বিরক্তি প্রকাশ করিল না, সহজ-স্বরে বলিল, "আমি? আমি সুইটজারল্যাণ্ডের জুরিচ হইতে আসিয়াছি। আমি কে?—আমি—কেহই নহি!"

ষ্ট্রোভিল গম্ভীর স্বরে বলিল, "তুমি কেহ হও বা না হও, তোমার অস্তিত্বটুকু যে শীঘ্রই বিলুপ্ত হইবে, এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ; কারণ, জারকে নিহত করিয়া আমাদের নিষ্কৃতিলাভের আশা নাই; আমাদিগকেও নিশ্চয়ই নিহত হইতে হইবে।"

জোসেফ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল, কোন কথা বলিল না।

ষ্ট্রোভিল জোসেফের দীর্ঘনিশ্বাসের শব্দ শুনিতে পাইল; সে জোসেফের মুখের দিকে তীব্র দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল; "তোমার ঐ এক দীর্ঘনিশ্বাসেই বুঝিলাম, তোমার হৃদয় আমার হৃদয়ের মত পাষাণে পরিণত হয় নাই।"

জোসেফ অবজ্ঞাভরে বলিল, "হইতে পারে; কিন্তু জীবনটাকে আপনি যেরূপ উপেক্ষার বস্তু বলিয়া মনে করিতেছেন, আমার জীবনকে আমি যে তাহা অপেক্ষা অল্প উপেক্ষা করি, এরূপ ভাবিবেন না।"

ষ্ট্রোভিল বলিল, "কুরেট, তুমি তরুণ যুবকমাত্র; যৌবনকালে সকলেরই হৃদয় আশায় ও আনন্দে পূর্ণ থাকে। তোমার হৃদয় স্বচ্ছ, ঠিক কাচের মত স্বচ্ছ; এই জন্য আমি তাহা দেখিতে পাইতেছি; তোমার মনের ভাব স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছি। আমার মত তোমার হৃদয়ও স্ত্রীলোক দ্বারা চূর্ণ হইয়াছে; সকল আশা, আকাঙ্ক্ষা, সুখ, শান্তি নষ্ট হইয়া গিয়াছে!"

জোসেফ সবিস্ময়ে বলিল, "এ কথা আপনি কিরূপে জানিতে পারিলেন?"

ষ্ট্রোভিল ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "কিরূপে জানিতে পারিলাম? আমি কি তোমাকে বলি নাই—তোমার হৃদয় কাচের মত স্বচ্ছ, আমি তাহাতে তোমার মনের ভাব সুস্পষ্টরূপে প্রতিফলিত দেখিতেছি? কিন্তু এখন সে সকল কথার আলোচনার প্রয়োজন নাই। আমি তোমাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিয়াছি; আমাদের জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত এই বন্ধুত্ব-বন্ধন অক্ষুণ্ণ থাকিবে; হয় ত ইহ-জীবনের অবসানেও সেই বন্ধন বিচ্ছিন্ন হইবে না। মৃত্যুর পর কি ঘটিবে, কে বলিতে পারে? যাহারা ধর্ম্মপ্রচার উপলক্ষে নরকের কথা লইয়া আলোচনা করে, তাহারা বলিতে ভুলিয়া যায় যে, নরক ইহলোকেই বর্ত্তমান। আমি এই জীবনেই নরকভোগ করিয়াছি; অন্য কোন নরকে আমাকে আর কখন যাইতে হইবে না। আমার বিবেক দুঃসহ নরকযন্ত্রণা ভোগ করিয়াছে; আমার হৃদয় ক্ষত-বিক্ষত হইয়াছে।"

ষ্ট্রোভিলের কথা শুনিয়া জোসেফ বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। ষ্ট্রোভিলের কথাগুলি অর্থহীন প্রলাপ বলিয়াই তাহার সন্দেহ হইল; সে ভাবিল, ষ্ট্রোভিল কি বিকৃত-মস্তিষ্ক?

জোসেফের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া ষ্ট্রোভিল ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "বন্ধু, তুমি আমাকে পাগল মনে করিতেছ! আমি হয় ত সত্যই পাগল; কারণ, আমি আপনাকে পাগল মনে করি না। শুনিয়াছি, কোন পাগলই আপনাকে পাগল মনে করে না। আমার মস্তিষ্ক বিকৃত হয় নাই, যদি কিছু বিকৃত হইয়া থাকে—সে আমার হৃদয়। হাঁ, আমার মস্তিষ্ক সম্পূর্ণ সুস্থ আছে, আমরা আজ রাত্রিকালে আমাদের গুপ্ত সমিতির অধিবেশনে যোগদান করিয়াছিলাম। যে নক্সাখানি আমাকে দেওয়া হইয়াছে, তাহা আমার পকেটেই আছে। আমরা উভয়ে সাম্প্রদায়িক কর্ত্তব্যের আহ্বানে একই বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছি। আমরা যে কঠিন কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়াছি—তাহা সুসম্পন্ন হইলে সমগ্র পৃথিবীর লোক বিস্ময়ে অভিভূত হইবে। আমাদের নাম সভ্য জগতের সকল লোকের কণ্ঠে ধ্বনিত হইবে। সমগ্র জগতে আমাদের খ্যাতি প্রসারিত হইবে। হয় ত কেহ কেহ আমাদের খ্যাতির পূর্ব্বে 'অ' উপসর্গ যোগ করিতে চাহিবে। কিন্তু মানুষের প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝিতে অনেকে প্রায়ই ভুল করে। আমাদের সম্বন্ধেও যদি কেহ ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করে, তাহাতেই বা আমাদের ক্ষতি কি? তখন আমরা নিন্দা-প্রশংসার সীমা অতিক্রম করিব। জীবিত ব্যক্তির কোন মন্তব্য মৃত ব্যক্তির আত্মার বিরক্তি উৎপাদন করিতে পারে না।"

ষ্ট্রোভিলের কথায় জোসেফ বিন্দুমাত্র উৎসাহ প্রকাশ না করিয়া বিমর্ষভাবে বলিল, "আমরা যে কঠিন কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়াছি, তাহা সফল হউক না হউক, আমাদের মৃত্যু যে অপরিহার্য্য, ইহা আমিও স্বীকার করি; কিন্তু সে কথা লইয়া অতটা আস্ফালন করিবার প্রয়োজন দেখি না।"

ষ্ট্রোভিল সোৎসাহে বলিল, "এস, পথে এস! তোমার কথাতেই তুমি ধরা পড়িয়া গিয়াছ বন্ধু! জীবনটাকে তুমি এখনও আঁকড়িয়া ধরিয়া রাখিতে উৎসুক। তোমার হৃদয় এখন আমার হৃদয়ের মত পাষাণে পরিণত হয় নাই। আমার বিষাদময় জীবন-কাহিনী শুনিবার জন্য তোমার আগ্রহ হইয়াছে কি? না, না, তোমার আতঙ্কের কোন কারণ নাই; আমি তোমার ধৈর্য্যে আঘাত করিব না; আমার সেই কাহিনী দীর্ঘ নহে। একটিমাত্র শব্দে তাহা নিঃশেষে বলা যাইতে পারে; সেই শব্দটি—নারী!"

ষ্ট্রোভিলের জীবন-কাহিনী শ্রবণের জন্য জোসেফের কৌতূহল হইল। সে সহানুভূতিভরে বলিল, "আপনার শোচনীয় অবস্থার জন্য আমার বড়ই দুঃখ হইতেছে;

আপনি বোধ হয়, আপনার প্রণয়িনী দ্বারা প্রতারিত হইয়াছেন ?"

ট্রোভিল উত্তেজিত স্বরে বলিল, "প্রতারিত ? হাঁ, তোমার অনুমান সত্য ; প্রতারণা ভিন্ন তাহাকে আর কি বলিতে পারি ? কিন্তু প্রতারণাই হউক, আর প্রত্যাখ্যানই হউক, যে দিন আমার সুখের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, আমার সকল আশা চূর্ণ হইয়াছে, সেই দিন হইতে আমি ইহজীবনেই নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি। আমার চেহারা দেখিয়া তুমি বুঝিতে পারিয়াছ—আমি তেমন সুপুরুষ নহি ; প্রশস্ত ললাট ও প্রকাণ্ড মস্তকও আমার নাই ; তাহার উপর ব্যবসায়ে আমি সামান্ত দরজী ছিলাম। কিন্তু ব্যবসায় দেখিয়া মানুষের মনুষ্যত্বের বিচার করা সঙ্গত নহে। আমার হৃদয় খুব উদার ছিল ; আমার মস্তিষ্কও বিলক্ষণ উর্ব্বর ছিল। কিন্তু আমি স্বপ্নঘোরে আচ্ছন্ন হইয়াছিলাম ! আমার ধারণা হইয়াছিল—মানুষমাত্রই সমান। কিন্তু ইহা ভ্রান্ত ধারণা, এরূপ ধারণা নির্ব্বোধের পক্ষেই স্বাভাবিক ; এইরূপ ভ্রান্ত ধারণার বশীভূত হইয়া নির্ব্বোধরা আমার মতই শাস্তি ভোগ করে। আমি একটি বৃহৎ কারখানায় চাকরী করিতাম, সে বহুদিন পূর্ব্বের কথা। সেই কারখানার মালিকরা রথচাইল্ডস্‌দের মত ধনবান্‌। তাঁহাদের এক জনের একটি কন্যা ছিল ; আমি তাহাকে ভালবাসিয়া ফেলিলাম ! দেখিলাম, সে-ও আমাকে ভালবাসিয়াছে। সে আমার নিকট অঙ্গীকার করিল—আমাকে জীবনে ভুলিবে না ; কখন অবিশ্বাসিনী হইবে না। কিন্তু আমাদের এই গুপ্তপ্রেমের কথা গোপন রহিল না ; কিছু দিন পর তাহার অভিভাবকরা সকল কথাই জানিতে পারিল। আমি খেঁকী কুকুরের মত পদাঘাতে সেই কারখানা হইতে বিতাড়িত হইলাম। তাহার পর আমার প্রিয়তমার সহিত অন্য একটি যুবকের বিবাহ হইল। আমি হতাশ হৃদয়ে সুইটজারল্যাণ্ডে প্রস্থান করিলাম। তাহার পর আমি কি ভাবে জীবনের দিনগুলি কাটাইতে লাগিলাম—তাহা বলিবার প্রয়োজন দেখি না। ইহাই আমার জীবনের—আমার ব্যর্থ প্রেমের ইতিহাস। আমার জীবন এইরূপে ব্যর্থ হইয়াছে ; আমি কি ছিলাম, আর কি হইয়াছি ! আমার এই অদ্ভুত পরিবর্ত্তনে আমিই বিস্ময়ে অভিভূত হই। পৃথিবীর কোন সামগ্রী আর আমাকে আনন্দ দান করিতে পারে না ; কাহারও প্রতি আমার শ্রদ্ধা নাই, মনুষ্য-সমাজকে আমি অন্তরের সহিত ঘৃণা করি। আমি দরিদ্র ও নির্ব্বান্ধব বলিয়া লাঞ্ছিত হইয়াছি ; সমাজ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছি। কিন্তু অন্য সকলের মত আমার হৃদয় আছে এবং দেহে যদি আত্মা বলিয়া কোন পদার্থ থাকে, তাহাও আছে। আমার মস্তিষ্কও অন্য লোকের মস্তিষ্ক অপেক্ষা কোন অংশে হীন বা অকর্ম্মণ্য নহে। তথাপি আমি কুকুরের মত বিতাড়িত হইয়াছি ; কুষ্ঠরোগীর ন্যায় অবজ্ঞাত ও পরিত্যক্ত হইয়াছি ! এই জন্যই এখন আমি জানি, এই যুদ্ধে আমার পরাজয় অবশ্যম্ভাবী ; কিন্তু তাহাতে কি যায় আইসে ? জীবনের প্রতি আমার বিন্দুমাত্র মায়া-মমতা নাই ; আমার জীবন-ভার দুর্ব্বহ হইয়াছে। পদদলিত হইবার লোভে কে আশাহীন, শান্তিহীন, বিড়ম্বনাপূর্ণ জীবনের ভার বহন করিবে ? যে কার্য্যে উদ্দীপনা আছে, বিপদ আছে, মৃত্যুর সহিত সংগ্রাম করিবার সম্ভাবনা আছে, সেইরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারিলে আমার মন আনন্দে পূর্ণ হয়। জানি, ইহার ফলে মৃত্যুকে বরণ করিতে হইবে ; কিন্তু তাহাতে ক্ষতি কি ? মৃত্যুর পর শান্তি লাভ করিতে পারিব কি না, কে বলিতে পারে ? কিন্তু এ জীবনে আমার সকল সুখ, সকল শান্তির অবসান হইয়াছে। পৃথিবীতে আমার আর কিছুই প্রার্থনীয় নাই ; আমি এখন কেবল বিস্মৃতির প্রার্থী। আমার বিশ্বাস—মৃত্যু সেই প্রার্থনা পূর্ণ করিতে পারিবে।"

জোসেফ স্বীয় ব্যর্থ প্রেমের কাহিনীর সহিত এই কাহিনীর সাদৃশ্যে অত্যন্ত বিস্মিত হইল। সে বুঝিতে পারিল, তাহাদের উভয়ের অবস্থা অভিন্ন। জোসেফ ট্রোভিলের করমর্দ্দন করিয়া আবেগভরে বলিল, "আপনি আমার আন্তরিক সহানুভূতি গ্রহণ করুন। আমার তুচ্ছ জীবনের কাহিনীও আপনার এই কাহিনীর ন্যায় শোচনীয়, এইরূপ বিষাদময়। এই জন্য আমিও আপনার ন্যায় উদ্দেশ্যহীন, শক্তিহীন, আশাহীন জীবন বহন করিতেছি ; আশা আছে, মৃত্যুর অনুগ্রহে বিস্মৃতি লাভ করিব।—জীবনে যতক্ষণ কোন আশা থাকে, কোন কামনা থাকে, কোন কামনা পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা থাকে, তখন তাহা তৃপ্তিদায়ক ও উপভোগ্য ; কিন্তু যাহার সকল আশা ফুরাইয়াছে, সকল কামনা ব্যর্থ হইয়াছে—তাহার জীবন দুর্ব্বহ

আন্‌মনে

বসুমতী প্রেস]

[শিল্পী—শ্রীযুক্ত ভবানীচরণ লাহা ।

ভারমাত্র; সে ভার নামাইতে পারিলেই সকল কষ্টের অবসান হয়।"

ষ্ট্রোভিল মাথা নাড়িয়া গভীর সহানুভূতিভরে বলিল, "আহা বেচারা! তোমার অবস্থা ভাবিয়া আমার বড়ই দুঃখ হইতেছে। তুমি এখনও তরুণ যুবক; আমার বয়স তোমার বয়সের প্রায় দ্বিগুণ। আমার জীবনের সকল রস শুকাইয়া গিয়াছে; কিন্তু তোমার হৃদয় এখনও বোধ হয় কিঞ্চিৎ সরস আছে। এই জন্যই তোমার হৃদয় এখনও আমার হৃদয়ের ন্যায় নীরস, কঠিন পাষাণে পরিণত হয় নাই। আমার ইচ্ছা, তুমি বাঁচিয়া থাক।"

জোসেফ বলিল, "আপনি অদ্ভুত প্রকৃতির লোক। আঘাতের পর আঘাতে আমার হৃদয় কিরূপ অসাড় হইয়া উঠিয়াছে, তাহা বুঝিতে পারিলে আপনি এখনও আমাকে জীবনধারণের লোভ দেখাইতেন না।"

ষ্ট্রোভিল মুহূর্ত্তকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার বন্ধু-বান্ধব নাই কি?"

জোসেফ বলিল, "প্রকৃত বন্ধু যে দুই এক জন নাই, এ কথা বলিতে পারি না। কিন্তু তাহাদের সহিত এখন আর আমার কোন সংস্রব নাই।"

"তোমার ভাই-ভগিনীও নাই কি?"

"না।"

"পিতামাতা?"

জোসেফ কুণ্ঠিতভাবে বলিল, "হাঁ, আমার পিতামাতা উভয়েই জীবিত আছেন।"

ষ্ট্রোভিল দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "এ সংসারে পিতামাতাই মনুষ্যের প্রধান বন্ধন। তাঁহাদিগকে হারাইলে মানুষ পৃথিবীতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বান্ধবে বঞ্চিত হয়। অন্ততঃ তাঁহাদের মুখ চাহিয়াও তোমার বাঁচিয়া থাকা উচিত। রাজা বা সম্রাটদিগকে হত্যা করিতে যাওয়া অত্যন্ত বিপজ্জনক কায; আমাদের মত যে সকল হতভাগ্যের সংসারে আপনার বলিতে কেহ নাই, যাহাদের মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া কেহই শোক করিবে না, যাহারা জীবন বিড়ম্বনাজনক বলিয়াই মনে করে এবং জীবন বিসর্জ্জন করিতে মুহূর্ত্তের জন্য কুণ্ঠিত বা ভীত হয় না, এ সকল কাযের ভার সেই সকল লোকের হস্তে অর্পণ করিয়া তোমার মত লোকের দূরে সরিয়া যাওয়াই উচিত।"

পিতামাতার কথা স্মরণ হওয়ায় জোসেফ অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িল। বৃদ্ধ পিতামাতার প্রতি পুত্রের কর্ত্তব্য অসম্পন্ন রাখিয়া সে তাঁহাদের অজ্ঞাতসারে দূরদেশে চলিয়া আসিয়াছে—ইহা অত্যন্ত গর্হিত হইয়াছে বুঝিয়া তাহার মনে অনুতাপের সঞ্চার হইল। সে মনে মনে বলিল, "দেশত্যাগের পর পিতামাতাকে পত্র না লিখিয়া বড়ই অন্যায় কায করিয়াছি; তাঁহাদের মুখের দিকে না চাহিয়া চলিয়া আসিয়াছি, বৃদ্ধবয়সে তাঁহাদিগকে সুখী করিবার জন্য কোনও দিন চেষ্টা করি নাই। কিন্তু আর সে সুযোগ নাই; এখন আর আক্ষেপ করিয়া কোন ফল নাই।"

কিন্তু ষ্ট্রোভিলকে এ সকল কথা না বলিয়া জোসেফ দৃঢ়স্বরে বলিল, "না, আমার সঙ্কল্প পরিবর্ত্তিত হইবার নহে; আপনি বোধ হয় এখনও আমাকে চিনিতে পারেন নাই। আমি আপনারই মত অসমসাহসী ও নির্ভীক। জীবনের অতীত ঘটনার কথা চিন্তা করিয়া লাভ নাই; ভবিষ্যৎ জীবনও অন্ধকার-সমাচ্ছন্ন। যদি প্রাণরক্ষা হয়, ভবিষ্যতে কখন আমরা বিচ্ছিন্ন হইব না, আর যদি মরিতেই হয়, উভয়ে একত্র মরিব।"

ষ্ট্রোভিল হাসিয়া বলিল, "এখন চল, একত্র পানানন্দে বিভোর হইয়া সকল দুশ্চিন্তা কিছু কালের জন্য ভুলিয়া থাকি।"

রুসিয়ার প্রধান প্রধান নগরে কতকগুলি ভোজনাগার সন্ধ্যা হইতে প্রভাত পর্য্যন্ত খোলা থাকে। তাহারা এই শ্রেণীর একটি ভোজনাগারের সম্মুখে উপস্থিত হইলে ষ্ট্রোভিল বলিল, "এই ভোজনাগারের মালিকের সহিত আমার পরিচয় আছে, লোকটি সরলপ্রকৃতি, খাঁটি মানুষ। তাহার সাহস থাকিলে তাহাকে আমাদের দলে টানিয়া লইতে পারিতাম; কিন্তু তাহার সাহসের বড়ই অভাব। আমরা এখানে আশ্রয় লইয়া পানাহারের পর কিছুকাল ঘুমাইয়া লইব, তাহার পর আমাদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে আলোচনা করিলেই চলিবে।"

তাহারা উভয়ে সেই ভোজনাগারে প্রবেশ করিল। তাহারা একটি সুপ্রশস্ত কক্ষে উপস্থিত হইয়া অত্যন্ত আরাম বোধ করিল; কারণ, ঘরটি বেশ গরম এবং গদীআঁটা স্প্রিঙের চেয়ারগুলি অত্যন্ত আরামদায়ক। তাহারা কোট খুলিয়া ফেলিয়া বিশ্রাম করিতে বসিল এবং এক এক

পেয়ালা লেবুর রস-মিশ্রিত চা এবং রুটী, বাঁধা কপির ডালনা ও চাটনী আনিতে আদেশ করিল।

আহারের পর তাহারা প্রফুল্লচিত্তে ধূমপানে প্রবৃত্ত হইল। সেই সময় আরও তিন চারি জন লোক সেই কক্ষস্থিত বেঞ্চির উপর শয়ন করিয়া নিদ্রাসুখ উপভোগ করিতেছিল; কারণ, ভোজনাগার হইলেও সেখানে রাত্রি-যাপনের ব্যবস্থা ছিল। রুসিয়ার অনেক গৃহহীন দরিদ্র আশ্রয়াভাবে বৃক্ষমূলে রাত্রিযাপন না করিয়া, এই সকল ভোজনাগারে আশ্রয় গ্রহণ করে; কয়েক আনা পয়সা দিলেই উক্ত কক্ষে রাত্রিবাস করিতে পায়।

সেই সুপ্রশস্ত কক্ষের অন্য প্রান্তে কেহ শয়ন করে নাই দেখিয়া ষ্ট্রোভিল জোসেফকে সঙ্গে লইয়া সেই দিকে শয়ন করিতে চলিল। তখন আর রাত্রি অধিক ছিল না; সেই অসময়ে অন্য কোন 'খদ্দেরের' দোকানে আসিবার সম্ভাবনা নাই বুঝিয়া আর্দ্দালী 'ষ্টোভে'র সন্নিহিত কোণটিতে শয়ন করিয়া কয়েক মিনিটের মধ্যেই নাসিকাগর্জ্জন আরম্ভ করিল।

কেহ তখনও জাগিয়া আছে কি না, বুঝিতে না পারিয়া ষ্ট্রোভিল একটা লম্বা টেবলের উপর 'কাত' হইয়া বসিয়া হাতে মাথা রাখিয়া নিঃশব্দে চুরুট টানিতে লাগিল; অবশেষে যখন সে বুঝিতে পারিল, সকলেই ঘুমাইয়াছে, তখন জোসেফের পাশে শয়ন করিয়া, তাহার কানের কাছে মুখ রাখিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "দেখ জোসেফ, আমরা যে ভয়ানক কঠিন কাযের ভার লইয়াছি, তাহা সুসম্পন্ন করিবার জন্য মনের বল, ধীরতা ও কৌশল অপরিহার্য্য। কোন কারণে আমাদের চেষ্টা বিফল না হয়। তবে আমাদের চেষ্টা সফল হউক আর নিষ্ফল হউক, আমরা ধরা পড়িবই; তাহার পর আমাদের প্রাণদণ্ড হইবে, এ বিষয়েও আমি নিঃসন্দেহ। কিন্তু বোমা নিক্ষেপের পর ভীষণ শব্দের সঙ্গে সঙ্গে যখন সম্রাটের শকটখানি চূর্ণ হইবে, সেই সময় নিশ্চয়ই একটা বিষম হৈ-চৈ আরম্ভ হইবে; সেই সুযোগে আমাদের পলায়ন করা অসম্ভব না হইতেও পারে। কিন্তু স্মরণ রাখিও, আমাদের এইরূপ সুযোগলাভের আশা নিতান্ত অল্প। তবে যদি কোন কৌশলে পলায়ন করিয়া একবার রুসিয়া ত্যাগ করিতে পারি, তাহা হইলে আর আমাদের ধরে কে? রুসিয়ার বাহিরে যাইতে পারিলেই আমরা নিরাপদ হইব।"

জোসেফ বলিল, "আপনার কথা শুনিয়া বুঝিলাম, আপনি পলায়নের সুযোগ পাইলে ইচ্ছা করিয়া ধরা দিবেন না।"

ষ্ট্রোভিল বলিল, "ইচ্ছা করিয়া ধরা দিব? না, আমি সেরূপ পাগল নহি। পলায়নের সুযোগ পাইলে আমি নিশ্চয়ই তাহা ত্যাগ করিব না। তবে এ কথাও সত্য যে, আমি পলায়নের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিব না। বিশেষতঃ চেষ্টা করিলেই যে আমরা কৃতকার্য্য হইব, এ কথা দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি না। যদি পলায়ন করিতে পারি, তাহা হইলে বুঝিব, দৈবক্রমেই তাহা সম্ভব হইয়াছে।"

জোসেফ আর কোন কথা না বলিয়া অন্য কথা ভাবিতে লাগিল। তাহার মনে হইল, সে রুসিয়ান নহে, রুস-সম্রাটও তাহার শত্রু নহেন; রুসিয়ার শাসন-প্রণালীর সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ নাই, তাহার পরিবর্ত্তনেও তাহার ক্ষতিবৃদ্ধি নাই; এ অবস্থায় সে রুস-সম্রাটকে হত্যা করিবার ভার কেন গ্রহণ করিল? বিশেষতঃ, রুস-সম্রাটের মৃত্যুর পর রুসিয়ার শাসনপ্রণালীর সংস্কার হইবে, রুসিয়ার প্রজাপুঞ্জের দুঃখের নিশার অবসান হইবে, তাহারই বা নিশ্চয়তা কি? সে চেষ্টা করিলে সুখে না হউক, কতকটা শান্তিতে অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করিতে পারিত, তাহার সম্মুখে খ্যাতিলাভের অনেক পথ উন্মুক্ত ছিল। নিজে সুখী না হউক, অর্থোপার্জ্জন করিয়া বৃদ্ধ পিতামাতাকে প্রতিপালন করিতে পারিত; তাহার চেষ্টা-যত্নে বার্দ্ধক্যে তাহারা সুখী হইতে, শান্তি লাভ করিতে পারিত। সেরূপ চেষ্টা না করিয়া সে নিহিলিষ্টদের দলে মিশিল, তাহাদের নিকট দাসখত লিখিয়া দিল; তাহাদের দলে সহস্র সহস্র লোক থাকিতে তাহাকেই তাহারা বিপদের মধ্যে ঠেলিয়া দিল। মরিতে হয়, ঐ নির্দ্দোষ বিদেশীটাই মরুক, ইহাই ত তাহাদের উদ্দেশ্য! ইহাই কি নিহিলিষ্ট দলপতিদের সুবিচার? অথচ যদি সে এই আদেশ-পালনে অবহেলা করে, কর্ত্তব্যসম্পাদনে তাহার কোন ত্রুটি লক্ষিত হয়, তাহা হইলে তাহারা তাহাকে হত্যা করিতে মুহূর্ত্তের জন্য কুণ্ঠিত হইবে না!

এই সকল কথা চিন্তা করিয়া জোসেফের হৃদয় বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া তাহার মনে অনুতাপের সঞ্চার হইল; জোসেফ দীর্ঘকাল নীরব থাকিয়া অবশেষে মনের ভার লঘু করিবার জন্য ষ্ট্রোভিলকে সংক্ষেপে

এই সকল কথা বলিল। কয়েক ঘণ্টার পরিচয়েই সে ট্রোভিলকে তাহার হিতৈষী ও বিশ্বাসী বন্ধু বলিয়া মনে করিয়াছিল; তাহার ধারণা হইয়াছিল, ট্রোভিলের নিকট অকপট চিত্তে মনের ভাব প্রকাশ করিলে তাহার অপকারের আশঙ্কা নাই।

ট্রোভিল নিস্তব্ধভাবে তাহার কথা শুনিয়া গম্ভীর স্বরে বলিল, "আমি তোমাকে বলিয়াছিলাম, তোমার হৃদয় আমি স্বচ্ছ দর্পণের ন্যায় দেখিতে পাইয়াছিলাম, তোমার মনের ভাব আমি স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াছিলাম। আমরা যে কঠিন কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়াছি, তুমি তাহার উপযুক্ত নহ। যাহার হৃদয় পাষাণে পরিণত না হইয়াছে, এরূপ কার্য্য তাহার অসাধ্য। তোমার হৃদয় আমার হৃদয়ের মত পাষাণময় হইতে এখনও বিলম্ব আছে। কিন্তু এ কথাও জানিও যে, আমার হৃদয় পাষাণে পরিণত হইলেও আমি এখনও সম্পূর্ণরূপে মনুষ্যত্ব বিসর্জ্জন দিতে পারি নাই, আমি পুনর্ব্বার তোমাকে বলিতেছি, যদি জীবন রক্ষা করিবার জন্য তোমার আগ্রহ থাকে, তাহা হইলে আমি তোমাকে আমার সঙ্গে মৃত্যুকে বরণ করিতে দিব না। তুমি আমাকে বল, জীবিত থাকাই তোমার প্রার্থনীয়, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই তোমার জীবন রক্ষা করিব।"

জোসেফ উত্তেজিত স্বরে বলিল, "কিরূপে?"

ট্রোভিল বলিল, "আমাদের প্রধান মন্ত্রণাসভা হইতে জারকে হত্যা করিবার জন্য যে দিন ধার্য্য হইয়াছে, এখনও তাহার চারি দিন বিলম্ব আছে। যদি তোমার বাঁচিবার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে আমি তোমাকে সঙ্গে না লইয়া একাকী এই কায শেষ করিব এবং তাহার পূর্ব্বেই তোমাকে দেশান্তরে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিব। এই প্রস্তাবে তুমি সম্মত কি না বল।"

জোসেফ কি উত্তর দিবে, তাহাই ভাবিতে লাগিল; প্রথমেই পিতামাতার কথা তাহার মনে পড়িল; তাহারা কত কষ্টে কত যত্নে আশৈশব তাহাকে প্রতিপালিত করিয়াছে; সেই ঋণ-পরিশোধে সে কি বাধ্য নহে? বার্দ্ধক্যে তাহারা কি তাহার নিকট সেবার আশা করিতে পারে না? —কিন্তু পরক্ষণেই বার্থা ও রেবেকার কথা স্মরণ হওয়ায় সে মর্ম্মাহত হইল; তাহার মনে হইল, জীবন-ধারণ করিয়া সে সুখী হইতে পারিবে না। মরণেই তাহার সুখ, তাহাতেই তাহার শান্তি। চিরজীবন স্মৃতির অনলে দগ্ধ হওয়া বড়ই কষ্টকর বলিয়া তাহার মনে হইল। এই জন্য অবশেষে সে মাথা নাড়িয়া বলিল, "না, আমি আপনার প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারিলাম না। আমি যে অঙ্গীকারপাশে আবদ্ধ হইয়াছি, তাহা আমাকে পালন করিতেই হইবে। আমরা উভয়ে হয় বাঁচিব, না হয় মরিব। আপনাকে ত্যাগ করিয়া আমি প্রাণভয়ে পলায়ন করিব না। পলায়ন করিয়াই বা আমার জীবনের আশা কোথায়? নিহিলিষ্টদের ক্রোধ হইতে আপনি আমাকে রক্ষা করিতে পারিবেন না। প্রতিজ্ঞাভঙ্গজনিত অপরাধের শাস্তি মৃত্যু, ইহা আমার স্মরণ আছে।"

ট্রোভিল বলিল, "উত্তম; তোমার সাহস, তোমার দৃঢ়তা প্রশংসনীয়। তুমি আমার যোগ্য সহযোগী। আমার আর কিছুই বলিবার নাই। রাত্রি শেষ হইয়া আসিয়াছে, এখন কিছুকাল ঘুমাইয়া লও।"

তাহারা সেই টেবলের উপর পাশাপাশি শয়ন করিয়া অবিলম্বে নিদ্রামগ্ন হইল।

সেই সময় দ্বাদশ জন অস্ত্রধারী পুলিসপ্রহরী সেই ভোজনাগারের বাহিরে আসিয়া নিঃশব্দে শ্রেণীবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান হইল; দলপতির ইঙ্গিতে প্রত্যেকে পরিচ্ছদের ভিতর হইতে এক একটি পিস্তল বাহির করিল এবং কোষমুক্ত তরবারি বাম হস্তে গ্রহণ করিল। দলপতির দ্বিতীয় ইঙ্গিতে তাহারা পদাঘাতে ভোজনাগারের দ্বার ভাঙ্গিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। অতঃপর দলপতি সেই কক্ষ পরীক্ষা করিয়া, ট্রোভিল ও জোসেফ যে স্থানে শয়ন করিয়াছিল, সেই স্থানে আসিয়া দাঁড়াইল এবং তাহার অনুচরগণকে আদেশ করিল, "এই দুই জনকে গ্রেপ্তার কর।"

গোলমাল শুনিয়া পূর্ব্বেই ট্রোভিলের নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছিল; সে লাফাইয়া উঠিয়া জোসেফকে জাগরিত করিবার জন্য তাহার হাত ধরিয়া টানিল। তাহার পর আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে পিস্তল বাহির করিবার জন্য পকেটে হাত পূরিল; কিন্তু সে পকেট হইতে পিস্তল বাহির করিবার পূর্ব্বেই পাঁচ ছয় জন প্রহরী তাহাকে ধরিয়া ফেলিয়া, বাঁধিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। ট্রোভিল তাহাদের কবল হইতে মুক্তিলাভের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিল; কিন্তু ছয় জনের বিরুদ্ধে একাকী সে কি করিবে? তাহার উভয়

হস্ত দেহের সহিত দৃঢ়রূপে রজ্জুবদ্ধ হইল; তাহার হাত নাড়িবারও সামর্থ্য রহিল না। জোসেফ বিনা চেষ্টায় তাহাদের হস্তে আত্মসমর্পণ করিল। সে হতাশভাবে বলিল, "আমার আত্মরক্ষার চেষ্টা বৃথা। আমি পরাজয় স্বীকার করিলাম। ইহার ফল হয় প্রাণদণ্ড, না হয় সাইবেরিয়ায় নির্ব্বাসন। আমার প্রতি কোন্ দণ্ডের ব্যবস্থা হইবে?"

প্রহরীরা তাহার প্রশ্নের উত্তর না দিয়া তাহাকে ও ষ্ট্রোভিলকে সেই কক্ষের মধ্যস্থলে টানিয়া আনিল এবং দ্বাদশ জন প্রহরী তাহাদিগকে পরিবেষ্টিত করিয়া, হস্তস্থিত তরবারি তাহাদের মস্তকে উদ্যত করিল। ইত্যবসরে প্রহরীদের দলপতি ষ্ট্রোভিলকে ও জোসেফকে সুদৃঢ় রজ্জু দ্বারা একত্র বন্ধন করিল এবং তাহাদের জানাইয়া দিল, যদি তাহারা পলায়নের চেষ্টা করে, তাহা হইলে সেই মুহূর্ত্তে তাহাদিগকে হত্যা করিতেও কুণ্ঠিত হইবে না। অনন্তর প্রহরীরা রজ্জুবদ্ধ ষ্ট্রোভিল ও জোসেফকে সঙ্গে লইয়া ভোজনাগার ত্যাগ করিল। তাহারা যখন রাজপথ দিয়া তাহাদের গন্তব্য স্থানে যাত্রা করিল, তখন পূর্ব্বাকাশ উষালোকে লোহিতাভ হইয়াছিল। জোসেফ ও ষ্ট্রোভিল উভয়েই স্ব স্ব চিন্তায় বিভোর হইয়া প্রহরিদলে পরিবেষ্টিত হইয়া চলিতে লাগিল।

জোসেফ মনে মনে বলিল, "কোন্ গুপ্তচরের সাহায্যে ইহারা আমাদিগকে গ্রেপ্তার করিল? আমার বিশ্বাস, গোয়েন্দা মিঃ কোহেনের সেই বিশ্বাসঘাতক হিসাবনবীশটা। সে আমাকে যে ভয় প্রদর্শন করিয়াছিল, তাহা মিথ্যা নহে। রেবেকা, রেবেকা! তুমি কিরূপে আত্মরক্ষা করিবে? কিরূপেই বা তোমার পিতার মান ও প্রাণ রক্ষা করিবে?"

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ

কে জিতিল?

জোসেফ কুরেটের গ্রেপ্তারের দিন প্রভাতে রেবেকা কোহেন কফি পান করিতে গিয়া তাহার পিতাকে প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিল, "জোসেফ ফিরিয়া আসিয়াছে কি?"

সলোমন অত্যন্ত গম্ভীরভাবে বলিল, "না, এখনও ফিরিয়া আসে নাই।"

রেবেকা কফি পান করিতে করিতে বলিল, "বেলা যে ১০টা বাজে বাবা! এখনও কি তাহার ফিরিয়া আসা উচিত ছিল না?"

সলোমন বলিল, "হাঁ, এতক্ষণ তাহার আসা উচিত ছিল।"

রেবেকা কফির পেয়ালা নামাইয়া রাখিয়া বলিল, "তবে এখনও তাহার না আসিবার কারণ কি?"

সলোমন বলিল, "আমি ত তাহা বুঝিতে পারিতেছি না।—হয় ত কোন জরুরী কাযে সে কোথাও আটক পড়িয়া গিয়াছে—এ জন্য তাহার ফিরিতে বিলম্ব হইতেছে।"

রেবেকা তাহার পিতার উত্তরে সন্তুষ্ট হইতে পারিল না; সলোমনের ভাব-ভঙ্গী দেখিয়া সে বুঝিতে পারিল, জোসেফের অদর্শনে তাহার পিতাও অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত; এই জন্য রেবেকা জোসেফের প্রসঙ্গে আর কোন কথা বলিল না।

কফি-পান শেষ করিয়া সলোমন রেবেকাকে বলিল, "একটা জরুরী কাযে আমাকে এখনই বাহিরে যাইতে হইবে, মধ্যাহ্নের পূর্ব্বে বোধ হয়, বাড়ী ফিরিতে পারিব না।"

জোসেফের অদর্শনে রেবেকা অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া উঠিল, দুশ্চিন্তার যথেষ্ট কারণ ছিল—তাহাও সে জানিত। সে অন্যমনস্ক হইবার জন্য নানা কার্য্যে ঘণ্টাখানেক ধরিয়া ব্যাপৃত রহিল বটে, কিন্তু তাহার মানসিক চাঞ্চল্য দূর হইল না। জোসেফ হয় ত কোন বিপদে পড়িয়াছে, এই আশঙ্কায় সে ব্যাকুল হইয়া পড়িল।

মধ্যাহ্নকালে রেবেকা তাহার পিতার উপবেশন-কক্ষে বসিয়া জোসেফের কথা চিন্তা করিতেছিল, সেই সময় তাহার পিতার হিসাব-নবীশ আলেকজান্দার কালনকি সেই কক্ষের দ্বার ঠেলিয়া কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। কালনকি প্রভু-কন্যার অনুমতির অপেক্ষা না করিয়া এই ভাবে হঠাৎ সেই কক্ষে প্রবেশ করায় রেবেকা বিস্মিত হইল, তাহার একটু রাগও হইল। কালনকি পূর্ব্বে কোন দিন এই প্রকার ধৃষ্টতা-প্রকাশে সাহসী হয় নাই! বিশেষতঃ সলোমন কোহেনের অনুমতি না লইয়া তাহার কোন কর্ম্মচারীর সেই কক্ষে প্রবেশের অধিকার ছিল না।

রেবেকা কালনকিকে সম্মুখে দণ্ডায়মান দেখিয়া সক্রোধে বলিল, "এখানে কি জন্য আসিয়াছ?"

কালনকি প্রভু-কন্যার ক্রোধে বিন্দুমাত্র বিচলিত না হইয়া সহজ স্বরে বলিল, "কাযের জন্য আসিতে হইল।"

রেবেকা বলিল, "বাবা এ ঘরে বসিয়া তাঁহার

কর্ম্মচারীদের সঙ্গে কাযের কথার আলোচনা করেন না, বিশেষতঃ, এখন তিনি বাড়ীতেও নাই।"

কালনকি গম্ভীর স্বরে বলিল, "ঐ দুইটি বিষয়ই আমার জানা আছে।"

রেবেকা অধিকতর উত্তেজিত হইয়া বলিল, "যে সকল কাযের সহিত তোমার কোন সম্বন্ধ নাই, যাহার আলোচনা তোমার পক্ষে অনধিকারচর্চ্চা—সেই সকল বিষয়ের আলোচনায় তোমার তৎপরতা দেখিয়া মনে হয়, গোয়েন্দাগিরিই তোমার লক্ষ্য, চাকরীটা উপলক্ষ মাত্র!"

কালনকি অবিচলিত স্বরে বলিল, "হাঁ, গোয়েন্দাগিরি এক আধটু করিয়াছি বৈ কি; সে কথা গোপন করিবার প্রয়োজন দেখি না।"

রেবেকা কালনকির স্পর্দ্ধায় অধিকতর বিস্মিত হইয়া বলিল, "তুমি এতই ইতর যে, কোন জঘন্য কায করিতে কুণ্ঠিত নহ; এমন কি, গোয়েন্দাগিরির মত নীচ কাযেও তোমার অরুচি নাই!"

কালনকি রেবেকার এই কঠোর তিরস্কারেও বিচলিত না হইয়া বলিল, "আমার অনধিকারচর্চ্চার বা কুরুচির পরিচয় পাইয়া যদি তোমার মনে বিরক্তির সঞ্চার হইয়া থাকে, তাহাতে আমার বিস্ময়ের কারণ নাই, তোমার ক্রোধেও আমি ভীত বা বিচলিত হই নাই; তবে আমি দুঃখিত হইয়াছি বটে। সকলেই জানে, তোমার হৃদয় অত্যন্ত কোমল; কটূক্তি করিয়া কাহারও মনে কষ্ট দেওয়া তোমার স্বভাববহির্ভূত। এ অবস্থায় আমার প্রতি দুর্ব্যবহারের পরিচয় পাইয়া আমার ধারণা হইয়াছে, জোসেফ কুরেট তোমার হৃদয়ের সবটুকু প্রেম অধিকার করিয়া আমার জন্য খানিক বিষ ঢালিয়া রাখিয়াছে; তুমি সেই বিষই উদ্গিরণ করিতেছ!"

রেবেকা মনের ভাব গোপন করিতে অসমর্থ হইয়া উত্তেজিত স্বরে বলিল, "জোসেফকে যদি আমি ভালবাসিয়াই থাকি, তাহাতে কাহার কি ক্ষতি?"

কালনকি বলিল, "হাঁ, আমার তাহাতে ক্ষতি আছে বৈ কি! ক্ষতি কেবল আমার একার নহে, তোমারও যে ক্ষতি হইবে, জীবনে তাহা পূরণ হইবে কি না সন্দেহ।"

রেবেকা বলিল, "তুমি নিতান্ত কাপুরুষ; এই জন্য আমাকে ভয় দেখাইতে তোমার লজ্জা হইতেছে না!"

কালনকি রেবেকার এই কটূক্তিতে বিচলিত না হইয়া বলিল, "তোমার বুঝিবার ভুল! আমি তোমাকে ভয় দেখাইতে আসি নাই, একটা নূতন সংবাদ দিতে আসিয়াছি।"

রেবেকা বলিল, "কি সংবাদ বল, বাজে কথায় আমার সময় নষ্ট করিও না।"

কালনকি বলিল, "ইহাও তোমার আর একটা ভুল; আমার বাজে কথা বলিবার অভ্যাস নাই। আমি তোমাকে জানাইতে আসিয়াছি, তুমি যাহাকে প্রাণমন সমর্পণ করিয়াছ, তোমার প্রণয়ী সেই জোসেফ কুরেটকে পুলিস গ্রেপ্তার করিয়াছে।"

এই সংবাদে রেবেকার মস্তকে যেন বজ্রাঘাত হইল, সে অবসন্নভাবে চেয়ারে ঠেস দিয়া মস্তক অবনত করিল।

কালনকি দেখিল, সেই লাবণ্যময়ী তরুণীর ফুল্ল কমলবৎ সুন্দর মুখ দেখিতে দেখিতে ম্লান ও বিবর্ণ হইল এবং উদ্গত অশ্রুরাশি তাহার নয়নপ্রান্তে টল টল করিতে লাগিল। কালনকি বুঝিল, তাহার সন্দেহ অমূলক নহে, রেবেকা সত্যই জোসেফকে ভালবাসে; সেই হতভাগ্য যুবককেই তাহার প্রাণমন সমর্পণ করিয়াছে। নিদারুণ ঈর্ষ্যায় কালনকির হৃদয় জলিয়া উঠিল; রেবেকার মুখের দিকে চাহিয়া সে স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

রেবেকা কঠোর স্বরে বলিল, "এ তোমারই কায! তোমারই গোয়েন্দাগিরির ফল।" তাহার অশ্রু-প্লাবিত নেত্র হইতে যেন বিদ্যুৎশিখা নির্গত হইল।

কালনকি ধীরভাবে বলিল, "হাঁ, ইহা আমারই কায—এ কথা অস্বীকার করি না। আমিই তাহাকে গ্রেপ্তার করাইয়াছি।"

রেবেকা ক্রোধে জলিয়া উঠিয়া বলিল, "তুমি কাপুরুষ; তুমি ইতর, স্বার্থপর, হেয়, হীন, জঘন্য প্রকৃতির গোয়েন্দা, বিশ্বাসঘাতক, তুমি সর্পের অপেক্ষাও খল।"

কালনকির ধৈর্য্য অসাধারণ, রেবেকার এই তীব্র তিরস্কারেও সে বিন্দুমাত্র বিচলিত না হইয়া সহজ স্বরে বলিল, "তুমি তোমার প্রিয়তম প্রণয়ীর বিপদে দিশেহারা হইয়া আমাকে অত্যন্ত কঠোর দুর্ব্বাক্য বলিলে বটে, কিন্তু তিরস্কার যতই কঠোর হউক, তাহাতে কেহ মারা পড়ে না।"

রেবেকা বলিল, "বাক্যের সেই শক্তি থাকিলে আমি সুখী হইতাম।"

কালনকি বলিল, "কিন্তু পরমেশ্বর সে ব্যবস্থা করেন নাই, বোধ হয়, তাঁহার বিবেচনাশক্তি অল্প। আহা! গালাগালিতে যদি মানুষ মরিত, তাহা হইলে আমরা কত সহজে শত্রু নিপাত করিতে পারিতাম! তবে আমার আক্ষেপ এই যে, তোমার সুন্দর মুখ হইতে এ রকম এক রাশি অশ্রাব্য কদর্য্য কথা বাহির হইল! এ যেন গোলাপের ভিতর বিষ!"

রেবেকা আর সহ্য করিতে না পারিয়া অধীরভাবে বলিল, "তোমার অশ্রাব্য ভাঁড়ামো বন্ধ কর। যদি কোন কাযের কথা থাকে, বলিয়া আমার সুমুখ হইতে চলিয়া যাও।"

কালনকি বলিল, "আমি ভাঁড়ামি করি নাই, ভাঁড়ামিটাকে আমি অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা করি। আমি সত্য কথাই বলিয়াছি। আমার আরও কয়েকটা কথা বলিবার আছে, তাহা বলিয়াই চলিয়া যাইব, তোমার আদেশের অপেক্ষায় থাকিব না।"

রেবেকা বলিল, "তুমি চতুর ও হিসাবী খল! তোমার মত স্বার্থপর ও হিংসুক দুনিয়ায় আর কেহ আছে কি না জানি না।"

কালনকি বলিল, "রেবেকা, তোমার নিষ্ঠুর ব্যবহারেই আমার এই পরিবর্ত্তন।"

রেবেকা বলিল, "মিথ্যা কথা, আমি কোন দিন তোমার প্রতি নিষ্ঠুরাচরণ করি নাই। ইহার কোন প্রয়োজনও ছিল না।"

কালনকি দৃঢ়স্বরে বলিল, "হাঁ, নিশ্চয়ই করিয়াছ। আমি তোমাকে ভালবাসি, প্রাণাপেক্ষা অধিক ভালবাসি।—কি এক প্রচণ্ড অদৃশ্য শক্তি দ্বারা আমি তোমার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছি, সেই শক্তিতে বাধা দেওয়া আমার সাধ্যাতীত। প্রবল স্রোতে ভাসমান তৃণের ন্যায় আমি নিরুপায়! আমি আশা করিয়াছিলাম, তুমি আমাকে বিবাহ করিবে, আমার জীবন সফল ও ধন্য হইবে, কিন্তু তুমি আমাকে বলিয়াছিলে, আমার এই আশা পূর্ণ হওয়া অসম্ভব, আমার সহিত তোমার বিবাহ হইতে পারে না। তোমার কথা শুনিয়া আমি হতাশ হইয়াছিলাম, আমার হৃদয় ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, কিন্তু সকল কষ্ট ও যন্ত্রণা আমি ধীরভাবে সহ্য করিতেছিলাম, তোমার কাছেও আমি আর একটি দিনও সে জন্য আক্ষেপ করি নাই, অনুযোগও করি নাই। শেষে দেখিলাম, জোসেফ কুরেট তোমার প্রতি আসক্ত হইয়াছে এবং তুমিও তাহাকে ভালবাসিয়াছ! তখন আমার ধৈর্য্যধারণ করা কঠিন হইল, আর আমি স্থির থাকিতে পারিলাম না; আমি অধীর হইয়া পড়িলাম।"

রেবেকা সদর্পে বলিল, "মিথ্যা কথা, তোমার অনুমান সত্য নহে।"

কালনকি বলিল, "আমি সত্য কথাই বলিয়াছি, আমার অনুমান অভ্রান্ত। শোন রেবেকা, সত্য গোপন করিয়া আমাকে প্রতারিত করিবার চেষ্টা করিও না, আমি শিশু বা নির্ব্বোধ নহি, আমাকে অন্ধও মনে করিও না। কোন পুরুষ কোন নারীকে ভালবাসিয়া তাহার প্রণয়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতা সহ্য করিতে পারে না। প্রণয়ের প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রতি তাহার বিন্দুমাত্র দয়া বা সহানুভূতি থাকে না। জোসেফ কুরেট তোমার প্রণয়ী কি না, এ কথা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, কিন্তু সরলভাবে উত্তর না দিয়া সে আমার সঙ্গে বচসা করিয়াছিল, তাহার পর আমাকে প্রহার করিয়াছিল।"

রেবেকা বলিল, "কেবল দুই এক ঘা দিয়াই তোমাকে ছাড়িয়া দিয়াছিল? তুমি তাহার হাতে পঞ্চত্ব লাভ করিয়াছ শুনিলে আমি বড়ই খুসী হইতাম!"

কালনকি বলিল, "কিন্তু যাহা হয় নাই, সে জন্য আক্ষেপ করিয়া লাভ নাই। তুমি নিজের কথায় ধরা পড়িয়া গিয়াছ; তুমি যে জোসেফকে ভালবাস, তোমার কথাই তাহার অকাট্য প্রমাণ!"

রেবেকা বলিল, "যদি সত্যই তাহাকে ভালবাসিয়া থাকি, সে জন্য আমি আমার পিতার কোন ভৃত্যকে কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য নহি।"

কালনকি বলিল, "কিন্তু তুমি তোমার পিতার আর এক জন ভৃত্যকে ভালবাসায় তাহার প্রতি তাহার প্রতিদ্বন্দ্বীর যেরূপ ব্যবহার করা স্বাভাবিক ও সঙ্গত, আমি ঠিক সেইরূপ ব্যবহারই করিয়াছি। আমি জানি, তাহার আশা ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেই আমাকে তুমি ভালবাসিবে, কিন্তু আমার প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ

হইয়াছে, ইহাতেই আমি সুখী। শত্রু নিপাত করিয়া আজ সত্যই আমার বড় আনন্দ হইয়াছে।"

রেবেকা ক্রুদ্ধস্বরে বলিল, "উঃ, তুমি কি নরপিশাচ! মনুষ্যদেহে সয়তান!"

কালনকি বলিল, "তা হইতেও পারি, কিন্তু আমরা নিজের বুদ্ধি-বিবেচনা অনুসারেই অন্যের বিচার করি। অন্যের প্রতি ব্যবহারও আমাদের বুদ্ধি-বিবেচনা-সাপেক্ষ। তোমার রূপে আমি মুগ্ধ; আমার মাথা ঘুরিয়া গিয়াছে। আমি তোমাকে লাভ করিতে পারিব না, আর কোথাকার কে একটা হাঘরে ছোঁড়া আসিয়া তোমাকে লুফিয়া লইয়া যাইবে, এ চিন্তা অসহ্য! বিশেষতঃ, সেই হতভাগা আমাকে প্রকাশ্য রাজপথে প্রহার করিয়াছিল; তাহাকে শাস্তি দিতে না পারিলে আমার আর পৌরুষ কি? আমি ইচ্ছা করিলে সেই সময় তাহাকে হত্যা করিতে পারিতাম, কিন্তু তাহা অনাবশ্যক মনে হইয়াছিল; কারণ, আমি জানিতাম, সে আমার মুঠার ভিতর আছে—ইচ্ছা করিলেই তাহাকে চূর্ণ করিতে পারিব।"

রেবেকা কালনকির সয়তানীর পরিচয় পাইয়া ক্ষণকাল স্তম্ভিতভাবে বসিয়া রহিল; তাহার পর অচঞ্চল স্বরে বলিল, "কিরূপে তাহাকে মুঠার ভিতর পূরিলে?"

কালনকি বলিল, "তাহাকে গ্রেপ্তার করাইবার সুযোগ পাইয়াছিলাম।"

রেবেকার বুক দুরুদুরু করিয়া উঠিল; সে অতি কষ্টে আত্মসংবরণ করিয়া বলিল, "সুযোগটা জুটিল কিরূপে?"

কালনকি বলিল, "সে কথাও তোমাকে বলিতে আপত্তি নাই। আমি নির্ব্বোধ নহি, অন্ধও নহি; চারিদিকের অবস্থা দেখিয়া আমার সন্দেহ হইয়াছিল—তোমার পিতার এই বাসভবন কোন গুপ্তরহস্যের আধার! দীর্ঘকাল গোপনে লক্ষ্য করিয়া আমি বুঝিতে পারিলাম, তোমার পিতার বাহিরে এক মূর্ত্তি, ভিতরে আর এক মূর্ত্তি! আর জোসেফ তোমার পিতার যে কাযেই নিযুক্ত থাক, তাহার এখানে আসিবার প্রকৃত উদ্দেশ্যও ভিন্নপ্রকার। কিন্তু এ কথা তোমাকে প্রথমেই বলিয়া রাখা ভাল যে, তোমার পিতা গোপনে যাহাই করুন, আমি কোন দিন তাঁহার অনিষ্টচিন্তা করি নাই!"

কালনকির কথা শুনিয়া রেবেকা ভয়ে ও দুশ্চিন্তায় ঘামিয়া উঠিল; কিন্তু মনের ভাব যথাসাধ্য গোপন করিয়া তাচ্ছীল্যভরে বলিল, "তুমি খুব লম্বা গল্প ফাঁদিয়া বসিয়াছ। তোমার এই উদ্ভট গল্প ধৈর্য্য ধরিয়া শুনা কঠিন।"

কালনকি বলিল, "আমি যে সকল কথা বলিলাম, তাহা আরও সংক্ষেপে বলা যাইত কি না, জানি না; যাহা হউক, বাকী কথাগুলি সংক্ষেপেই শেষ করিব। আমি তোমার পিতার ও জোসেফের গতিবিধি লক্ষ্য করিতে লাগিলাম; সৌভাগ্যক্রমে আমার চেষ্টা বিফল হয় নাই। দুই রাত্রি পূর্ব্বে তোমার পিতা একাকী নিঃশব্দে জোসেফের শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিয়া তাহার সহিত যে সকল গুপ্ত কথার আলোচনা করিয়াছিলেন, তাহা আমি শুনিয়াছি।"

"তাঁহাদের গুপ্ত পরামর্শ তুমি কিরূপে শুনিলে?"

কালনকি বলিল, "জোসেফের শয়ন-কক্ষের দরজায় কান পাতিয়া শুনিয়াছি।"

রেবেকা ঘৃণাভরে বলিল, "তোমার মত ইতর গোয়েন্দার উপযুক্ত কায বটে!"

কালনকি বলিল, "কাযটা ইতরের মত হইলেও তোমাদের সকলকেই বশীভূত করিবার জন্য আমি ইহা করিয়াছিলাম। কিন্তু আমি এই ভাবে যে শক্তি লাভ করিয়াছি, তাহার অপপ্রয়োগ করিব না। অন্ততঃ, তোমার পিতাকে ও তোমাকে বিপন্ন করিবার দুরভিসন্ধি আমার নাই। আমি জোসেফকে সরলভাবে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম—সে তোমাকে ভালবাসা জানাইয়াছিল কি না, এবং তুমি তাহার প্রতি অনুরক্ত কি না? আমি স্বীকার করি, ঈর্ষ্যার বশীভূত হইয়াই আমি তাহাকে এ কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। আমার ঈর্ষ্যা না হইবে কেন? আমি তোমাকে ভালবাসি, এ কথা শুনিয়া তুমি বলিয়াছিলে, আমাকে অথবা অন্য কাহাকেও বিবাহ করা তোমার পক্ষে অসম্ভব। তথাপি আমি তোমার আশা ত্যাগ করিতে পারিলাম না। আমার মনের দুঃখ চাপিয়া রাখিয়া নিঃশব্দে কাযকর্ম্ম করিতে লাগিলাম। কিন্তু যখন দেখিলাম, কুরেট তোমাকে ভালবাসিয়াছে, আর তুমিও তাহার পক্ষপাতিনী হইয়া উঠিয়াছ, তখন আমার ধৈর্য্যধারণ করা কঠিন হইল। যাহা হউক, জোসেফ আমার

সহিত ভদ্র ব্যবহার করিলে, রাস্তায় ধরিয়া আমাকে পিটাইয়া না দিলে তাহার ফল অন্যরূপ হইত; কিন্তু তাহার মত একটা নগণ্য লোক ঐ ভাবে আমার অপমান করায় আমার রক্ত গরম হইয়া উঠিল, আমি আর আত্ম-সংবরণ করিতে পারিলাম না। জোসেফ তখন পর্য্যন্ত জানিতে পারে নাই যে, আমি তাহাকে মুঠায় পুরিয়াছি। আমি জানিতাম, তাঁহাকে নিহিলিষ্টদের গুপ্ত বৈঠকে যোগ-দান করিতে হইবে; সেই বৈঠকে আমাদের সম্রাটকে হত্যা করিবার পরামর্শ স্থির হইবে—এইরূপ কথা ছিল। যথাসময়ে জোসেফ সেই বৈঠকে উপস্থিত হইয়াছিল। বৈঠক ভাঙ্গিলে সে এক জন নিহিলিষ্টের সঙ্গে নগরে ফিরিতেছিল; সেই সময় আমি তাহাদের অনুসরণ করিলাম। আমার বিশ্বাস ছিল, জোসেফ গত রাত্রিতে এখানেই আসিবে; কিন্তু এখানে না আসিয়া তাহারা গভীর রাত্রিতে একটা হোটেলে আশ্রয় লইল। সেই স্থানেই আমি তাহাদিগকে ধরাইয়া দিলাম।"

রেবেকার মন তখন সংযত হইয়াছিল, উদ্বেগ ও আশঙ্কার ধাক্কা সে সামলাইয়া লইয়াছিল। সে বুঝিতে পারিল, কালনকির ন্যায় মহাশত্রুকে কপট ব্যবহারে বশী-ভূত না করিলে তাহাদের সর্ব্বনাশ হইবে। রাজরোষে তাহারা বিধ্বস্ত হইবে। কালনকির সহিত বিরোধ করা আর উদ্যতফণা বিষধর সর্পের লাঙ্গুলে পদাঘাত করা সমানই কথা! এই সকল কথা চিন্তা করিয়া রেবেকা হঠাৎ সুর বদলাইয়া ফেলিল; শান্তভাবে কালনকিকে বলিল, "তুমি যাহাকে তোমার প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বী বলিয়া সন্দেহ করিয়াছিলে, তাহার প্রতি তোমার ব্যবহার যতই অশোভন হউক, অসঙ্গত হইয়াছে, এ কথা বলিতে পারি না। অন্ততঃ তুমি ভণ্ড নও, ইহা বুঝিতে পারিলাম।"

কালনকি দাঁত বাহির করিয়া একটু হাসিল এবং সম্মান প্রদর্শনের ভঙ্গীতে মাথা নোয়াইয়া বলিল, "ধন্যবাদ! তুমি যে আমার অতটুকুও প্রশংসা করিলে, ইহাতেই আমি সুখী।"

রেবেকা বলিল, "তোমার 'মনগড়া' প্রতিদ্বন্দ্বীকে তুমি ত জেলে পুরিয়াছ—তাহার ফাঁসীই হউক, আর সে নির্ব্বা-সিতই হউক, তাহার ভাগ্যে যাহা আছে, হউক। ইহাতে তোমার মন ঠাণ্ডা হইয়াছে ত?"

কালনকি বলিল, "তা একটু হইয়াছে বৈ কি! শত্রুকে জব্দ করিতে পারিলে কাহার মনে আনন্দ না হয়?"

রেবেকা মৃদুস্বরে বলিল, "শত্রুকে জব্দ করিবার জন্যই এ কায করিলে? না কোন লাভের আশায় এরূপ নিষ্ঠু-রের কায করিলে?"

কালনকি বলিল, "এখন তোমার এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিব না; ঘটনাস্রোতে আমার জন্য অনেক মহার্ঘ্য সামগ্রী ভাসিয়া আসিতেও পারে। তবে যদি তোমার অনুগ্রহ লাভ করিতে পারি, তাহা হইলে আমার জীবন ধন্য হইবে। যদি তুমি জোসেফ কুরেটকে ভালবাসিয়া না থাক, তাহা হইলে তাহার ভাগ্যে যাহাই ঘটুক, সে জন্য তোমার ক্ষুব্ধ হইবার কারণ নাই; আর এ কথা সত্য হইলে ভবিষ্যতে আমার আশা পূর্ণ হইতেও পারে।"

রেবেকা বলিল, "জোসেফ আমার হৃদয় অধিকার করিয়াছে, ইহা তোমার ভুল ধারণা।"

কালনকি বলিল, "তাহা হইলে কোন দিন হয় ত আমার আশা পূর্ণ হইবে।"

রেবেকা বলিল, "হাঁ, অসম্ভব যদি কখন সম্ভব হয়, তাহা হইলে তোমার আশা পূর্ণ হইতেও পারে।"

রেবেকার কথা শুনিয়া কালনকির মুখ হঠাৎ গম্ভীর হইয়া উঠিল। সে আরও কি বলিতে উদ্যত হইয়াছে, এমন সময় সেই কক্ষের দ্বার খুলিয়া রেবেকার পিতা কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। সলোমন কোহেন তাহার উপবেশনকক্ষে কালনকিকে তাহার কন্যার সম্মুখে দণ্ডায়মান দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইল। সে তীব্র দৃষ্টিতে প্রথমে কালনকির ও পরে রেবেকার মুখের দিকে চাহিয়া নীরসস্বরে বলিল, "এ কি ব্যাপার?"

কালনকি অচঞ্চল স্বরে বলিল, "আপনার কন্যাকে আমার কয়েকটা কথা বলিবার প্রয়োজন ছিল; উহাকে সেই কথাগুলি বলিতেছিলাম। সে সকল কথা আপনা-কেও বলিতে আপত্তি ছিল না, কিন্তু আপনি তাহা আপনার কন্যার কাছেই শুনিতে পাইবেন; সুতরাং আমার আর এখানে থাকা নিষ্প্রয়োজন। এখন আমি আমার কাযে চলিলাম।" [ক্রমশঃ।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

কাব্যে কারুণ্য

অনেকের ধারণা, যে কবিতায় কারুণ্যের ঝরণা ঝরে এবং পাঠকের নয়নে করুণার ঝরণা ঝরায়, তাহাই উৎকৃষ্ট কবিতা। এ কথার সমর্থনচ্ছলে Shellyর "Our sweetest songs are those that tell of saddest thoughts."—এই পংক্তি উদ্ধৃত করা হয়। কিন্তু খেয়াল থাকে না যে, যাহা কিছু করুণ, তাহাই Sweetest নয়। ঘুরাইয়া বলিলে দাঁড়ায় কতকগুলি করুণরসাত্মক রচনা মধুরতম। কারুণ্য সহজে চিত্ত বিগলিত করে—সহসা মনের ভাবান্তর আনয়ন করে—নয়নে অশ্রু ফুটায়, এ জন্য কারুণ্য-গুণোপেত কবিতাকেই সাধারণ পাঠক শ্রেষ্ঠ স্থান দিতে চায়। করুণ কবিতা Sweetest হইতে পারে, Best না-ও হইতে পারে,—যাহা কিছু সুমিষ্ট, তাহাই উৎকৃষ্ট নহে। রাতভিখারী ছন্দ করিয়া সুর করিয়া ভিক্ষা করে, তাহাতে হৃদয় সকলেরই বিগলিত হয়, সে জন্য তাহার করুণ চীৎকার কবিতা নহে। অনেকে কীর্ত্তনের গৌর-চন্দ্রিকার খচমচ ও অস্পষ্ট সুর শুনিয়াই কাঁদিয়া ভাসাইয়া দেন, তবু উহা কবিতাই নহে—উৎকৃষ্ট সঙ্গীতও নহে। সহজে হৃদয় বিগলিত হওয়া না হওয়া সম্পূর্ণ হৃদয়ের গঠনের উপর নির্ভর করিতেছে। একটি করুণ রসের কবিতা শুনিয়া এক জনের চিত্ত সামান্যমাত্র উদ্বেল হইতে পারে, কাহারও বা নেত্রে বন্যা ছুটিতে পারে, তাহা হইতে কবিতাটি কেমন হইয়াছে, ঠিক করা যায় না। এরূপ পরিবর্ত্তনশীল, চঞ্চল, ভিত্তিহীন ও অনিশ্চিত আদর্শের দ্বারা কবিতার সৌন্দর্য্য পরিমাপ করা যায় না। যিনি অত্যন্ত বিচলিত হন, তিনি বলিবেন—এমন রচনা হয় না; যিনি একেবারেই বিচলিত হন না, তিনি বলিবেন,—ইহা ব্যথার বিলাসমাত্র। তা ছাড়া আমরা 'করুণ সুরের' জন্য অনেক সাধারণ সঙ্গীতকে কাব্যাংশেও শ্রেষ্ঠ গণ্য করি; আবৃত্তি-ভঙ্গীতে কারুণ্য ও সহানুভূতির উদ্দীপকতা লক্ষ্য করিয়া অকবিতাকেও উৎকৃষ্ট কবিতা মনে করি; কবির জীবনের কোন শোকাবহ ঘটনার সহিত বিজড়িত বলিয়াও অনেক সময় নিকৃষ্ট শ্রেণীর কবিতাকে উৎকৃষ্ট মনে করি। এ জন্য কবির পত্নীবিয়োগ, পুত্রবিয়োগ, দারিদ্র্য ইত্যাদি অবলম্বনে রচিত কবিতা সহজেই কাব্যাংশে উৎকৃষ্ট না হইলেও লোককান্ত হইতে পারে। যাহাকে ভালবাসি, তাহার বিয়োগে বা বিশেষ কোন বেদনাকে আশ্রয় করিয়া যাহা কিছু লেখা হউক, তাহাই উৎকৃষ্ট বলিয়া মনে হইতে পারে। পাঠক আপন মনের কারুণ্য মিলাইয়া সেগুলিকে এত করুণ করিয়া তুলে—আপন মনের মাধুরী মিশাইয়া আপনার মনে উহাদিগের পুনর্বিরচন করে। অনেক কবিতাতেই পাঠককে আপন মনের মাধুরী মিশাইয়া লইতে হয়, এ কথাও সত্য, কিন্তু কবি অপেক্ষা পাঠকের কৃতিত্ব অধিক হইলে চলিবে না। মাধুর্য্য বা সৌন্দর্য্যের অধিকাংশই যেখানে পাঠকের মন হইতে প্রাপ্ত, সেখানে কবির শ্রেষ্ঠতা কোথায়? মাধুর্য্যের বা সৌন্দর্য্যের অধিকাংশই কবিকে দিতে হইবে। এ সকল কবিতার বিচারে লক্ষ্য করিতে হইবে—কবিতা দ্বারা পাঠক-চিত্তে যে রসের সৃষ্টি হইতেছে, তাহার কতটা বা কবির দেওয়া, কতটা বা পাঠকের দেওয়া। যে চিত্ত কিণাঙ্ককঠিন বা পক্ষাঘাতগ্রস্ত, সে চিত্ত এ শ্রেণীর কবিতার বিচারক হইতে পারে না। যে চিত্তে মনোবেগের সংযম বা ভাবোচ্ছ্বাসের শাসনবল্গা নাই, সে চিত্ত চিত্তই নহে। যে চিত্ত রসময়, কোমল ও ললিত অথচ সংযত, ধীর ও প্রশান্ত, সেই চিত্ত এই শ্রেণীর কাব্যবিচারে প্রকৃত অধিকারী। বিষয় বস্তুটির প্রতি কোন বিশেষ কারণে আপনার ভালবাসা থাকিলে সেটিকে তৎকালের জন্য ভুলিয়া কেবলমাত্র কাব্যাংশের সৌষ্ঠব ও রসোদ্দীপকতার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া পাঠকের এ শ্রেণীর কবিতার বিচারে অগ্রসর হওয়া উচিত।

রচনার অবস্থিত ভাবোচ্ছ্বাসই কাব্য নহে—ঐ উচ্ছ্বাসকে কবি সুপরিচালিত, সংযত, সংহত ও সুনিয়ন্ত্রিত করিয়া যখন কাব্যের অন্যান্য উপাদানে সমৃদ্ধ করিয়া প্রকাশ করেন, তখনই প্রকৃত কবিতা হয়। সে হিসাবে এই করুণ কবিতাও কেবলমাত্র কারুণ্যের বলেই শ্রেষ্ঠ হইবে না—কবিতাও হওয়া চাই—উচ্ছ্বাসের আতিশয্যে উৎকৃষ্ট কবিতার রীতি-পদ্ধতি, শৃঙ্খলা ও সৌষ্ঠবের সীমা ও বন্ধন অতিক্রম করিলে চলিবে না। যে কোন রস বা যে কোন ভাবকে অবলম্বন করিয়া কবির কলা-কোশলগুণে

একটি রচনা উৎকৃষ্ট হইতে পারে। কারুণ্যরসের এ বিষয়ে পৃথক্ একটা বিশিষ্ট অধিকার বা মর্য্যাদা নাই। তবে কারুণ্যরসকে আশ্রয় করিয়া উৎকৃষ্ট কাব্য-রচনা অপেক্ষাকৃত সহজ। একটি কবিতাকে সম্পূর্ণাঙ্গ করিবার জন্য পাঠক-মনের যে আনুকূল্য ও পরিপূরকতা কবি প্রার্থনা করেন, তাহা অন্য শ্রেণীর কবিতার পক্ষে সহজে এবং সর্ব্বত্র না মিলিতেও পারে, কারণ, সকল প্রকার ভাব ও রস সকল চিত্তে সুলভ নহে এবং যে চিত্তে তাহার সন্ধান মিলে, সে চিত্তেও প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় না। "শৈলে শৈলে ন মাণিক্যং মৌক্তিকং ন গজে গজে।" কিন্তু কারুণ্যরস মানব-চিত্তের সাধারণ সম্পত্তি—চন্দ্রের জ্যোৎস্নার ন্যায়—"নোপসংহরতে জ্যোৎস্নাং চন্দ্রশ্চণ্ডাল-বেশ্মনি।" সকল চিত্তেই কিছু না কিছু ঐ রস, হয় ফল্গুর মত, নয় পাগলা ঝোরার মতই বর্ত্তমান। অধিকাংশ চিত্তেই প্রচুর পরিমাণেই, বিশেষতঃ এই বাঙ্গালা দেশের হৃদয়গুলিতে আরও প্রচুর পরিমাণে বর্ত্তমান। কাযেই কবি যতটুকু চা'ন, তাহা অপেক্ষা অনেক বেশীই পাইয়া থাকেন। কবির করুণবাণী সে জন্য সহজেই বাঙ্গালী পাঠকের চিত্তে ঘন ঘন প্রতিধ্বনি লাভ করে। কবি বলিয়াছেন—

"একাকী গায়কের নহে ত গান গাহিতে হবে দুই জনে,
গাহিবে এক জন ছাড়িয়া গলা আর এক জন গা'বে মনে।
তটের বুকে লাগে জলের ঢেউ তবে ত কলতান উঠে,
বাতাসে বনসভা শিহরি কাঁপে তবে ত মর্ম্মর ফুটে।"

কিন্তু সকল ঢেউ-ই তটের বুকে সহজে কলতান তুলে না, সকল বাতাসই বনসভায় সহজে মর্ম্মরধ্বনি ফুটায় না। অশ্রুর ঢেউ সহজেই আমাদের চিত্তে কলতান তুলে, দীর্ঘশ্বাসের বাতাসই সহজেই আমাদের মর্ম্মে মর্ম্মরধ্বনি ফুটাইতে পারে। অনেক সময় কবি পাঠক-চিত্তের এই সহজ মাধুর্য্যের সুযোগটি উপভোগ করিবার জন্য প্রলুব্ধ হইয়া পড়েন এবং পাঠক-চিত্তের ঐ প্রকার তরলতা ও অসংযমের উপর নির্ভর করিয়া করুণ রচনায় শ্রেষ্ঠ কাব্যের প্রধান উপাদানগুলির সংযোগ বিষয়ে উদাসীন হইয়া পড়েন—সে জন্য অনেক করুণ কবিতা যথেষ্ট জনপ্রিয়, কিন্তু কাব্যাংশে উৎকৃষ্ট নয়।

কারুণ্যরসের ন্যায় অন্যান্য ভাব বা রস সুলভ এবং প্রচুর নহে। পাঠকের চিত্তে সহজেই পরিপূর্ণতা লাভ করে না বলিয়াই তাহারা কারুণ্য অপেক্ষা নিকৃষ্ট নহে। বরং সরলতা ও প্রাচুর্য্যের যে অনিবার্য্য ফল, তাহা কারুণ্য-রসের ভাগ্যেই ঘটিয়াছে—উচ্চ শ্রেণীর কবিরা ঐ রসের প্রতি অনেকটা উদাসীন হইয়া পড়িয়াছেন। তাই 'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমে'র মত চমৎকার গ্রন্থেরও ভক্ত অনেক কমিয়া আসিয়াছে। করুণরস বিগলিত হইয়া অশ্রুতে ঝরিয়া পড়ে, উহা তরল অগভীর—সাময়িক উত্তেজনা-প্রসূত এবং অপেক্ষাকৃত অস্থায়ী, উহা মানব-জীবনের গভীরতম প্রদেশে স্থায়ী আসন লাভ করে না—মানব-চিত্তের অঙ্গীভূত হইতে দেয় না। আনন্দ মানব-চিত্তের সাধনার ধন, পরম কাম্য—মানব-চিত্তের সিংহাসনই তাহার লক্ষ্য, বেদনা তাহার অরাতি—প্রতিদ্বন্দ্বী, তাহাকে সে তাই চিত্তে স্থায়িভাবে বাস করিতে দেয় না। কারুণ্য যত বশীভূতই হউক, তাহাকে সে সন্দেহ করে, সে জন্য যত শীঘ্র তাহাকে চিত্ত হইতে দূর করিতে পারে, ততই সে নিশ্চিন্ত হয়। তাহা ছাড়া এত বেশী ব্যথা-দুঃখের সহিত তাহার নিত্য সংগ্রাম করিতে হয় যে, নূতন কোনও ব্যথা সত্যই হউক আর কাল্পনিকই হউক, তাহার রাজ্যে প্রবেশ করিলে তাহাকে অধিকক্ষণ তিষ্ঠিতে দেয় না। তরল অগভীর সাময়িক হাস্য-ফেনিল উল্লাসেরও চিত্তে স্থায়ী আসন নাই। যে আনন্দ চিত্তে স্থায়ী, নিশ্চিত ও ধ্রুব আসন প্রতিষ্ঠা করিতে চাহে, তাহা সংযত চিন্তাময় ও গভীর,—তাহা উচ্ছৃঙ্খল, চপল, অসহিষ্ণু ও প্রমত্ত উল্লাসকে চিত্তে স্থান দেয় না, স্থান দিলে তাহার নিবিষ্ট সাধনায় ব্যাঘাত ঘটে। তাই কান্নার গান ও হাসির গান করুণ কবিতা উভয়েরই সুধীচিত্তে স্থায়িত্বলাভ সম্বন্ধে একই অবস্থা। তাই বলিয়া যে উহাদের প্রয়োজন নাই, তাহা বলিতেছি না। আমাদের গভীর চিন্ময় মূল জীবনধারার উপরের স্তরে আমাদের দৈনিক ও প্রাহরিক জীবনের উপধারা আছে। তাহার কতকগুলি অশ্রুর, কতকগুলি হাস্যের। বাহির হইতে ঐরূপ হাসি-কান্নার যোগান না পাইলে সেগুলি শুকাইয়া যাইবে। তখন আমাদের দৈনিক জীবন নীরস ও কঙ্কালময় হইয়া উঠিবে। সে জন্য কারুণ্য ও কৌতুকরসের প্রয়োজনীয়তা যথেষ্টই আছে। কিন্তু যে সকল ভাবরস গভীর ও নিবিড়, ফল্গুধারার ন্যায় হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশে যাহাদের নিভৃত প্রবাহ, তাহা

সুলভ নয়, প্রচুরও নয়; বাহির হইতে তাহাদের যোগান আমাদের চিন্ময় জীবনগঠনে সাহায্য করে, সহজেই তাহা চিন্ময় জীবনের অঙ্গীভূত হইয়া আমাদের চিত্তে স্থায়িত্ব লাভ করে, গভীর আনন্দের রাজ্যবিস্তারে তাহার সাহায্য করে। সে সকল কবিতা এই অতীন্দ্রিয় অনুভূতিকে অবলম্বন করিয়া রচিত, তাহারা তাই উচ্চশ্রেণীর। ঐ সকল কবিতার পাঠক অল্প, কিন্তু উহাদের আয়ুষ্কালও অতি সুদীর্ঘ, এমন কি চিরন্তন; কাজেই নিরবধিকালে ও বিপুলা পৃথ্বীতে সমানধর্ম্মা নিতান্ত অল্প জুটে না, এবং পাঠক-সংখ্যা অল্প হইলেও তাহাদের জীবনগঠনের উপাদান কিন্তু ঐ কবিতাগুলি। শুধু নিবিড়তা ও গভীরতার প্রাপ্য লাভ করিয়াই উহারা বিজয়ী নহে—দুর্লভতা ও স্বল্পতার যে প্রাপ্য, তাহাও তাহারা লাভ করে। কারুণ্য কাব্যসরস্বতীর নয়নে ফুটিয়া মুক্তার সহিত উপমিত হইয়া ঝরিয়া পড়ে—শ্রীও বাড়ায়, কিন্তু ঐ নিবিড় রস গজমৌক্তিকের মত চিরদিন তাঁহার কণ্ঠের হারে স্থান পাইয়া বক্ষেই বিরাজ করে।

করুণ রসের কবিতা যে উৎকৃষ্ট শ্রেণী হইতে পারে না, এ কথা বলিতেছি না। আমার বক্তব্য, কেবলমাত্র কারুণ্যের বলেই কোন কবিতা শ্রেষ্ঠ হইতে পারে না। কারুণ্যকে আশ্রয় করিয়া কাব্যের অন্যান্য উপাদানের সমবায়ে অনেক প্রথম শ্রেণীর রচনাই সম্ভব হইয়াছে। কারুণ্যের অন্তরালে একটি উচ্চতর রসের ও গভীরতর ভাবের সমাবেশ করিয়াও অনেক উৎকৃষ্ট কবিতার জন্ম হইয়াছে। কারুণ্যের উচ্ছ্বাসকে সৌন্দর্য্যসৃষ্টির অপরাপর উপাদান বা গভীরতর অনুভূতি সেগুলিকে সংযত, সংহত ও শৃঙ্খলিত করিয়াছে। বাধাবন্ধহীন অবন্নিত কলাসৌষ্ঠবহীন করুণ-রসোচ্ছ্বাস কেবলমাত্র পাঠকের সহজ সরল সহানুভূতির বলে ও আনুকুল্যে শ্রেষ্ঠ কবিতার গৌরব লাভ করিতে পারে না। কালিদাসের অজবিলাপ, রতিবিলাপ ও যক্ষ-বিলাপ কেবল যদি করুণরসের উচ্ছ্বাসমাত্র হইত, তবে বিলাপমাত্র হইয়া এত দিনে বিলোপ পাইত, রসালাপ হইয়া উঠিত না। মহাকবি পাঠকের করুণার ভিখারী নহেন, পাঠকের চোখে সুলভ অশ্রু ঝরাইয়া সহজে কৃতিত্ব লাভ করিতে চাহেন না, তাঁহার উদ্দেশ্য সৌন্দর্য্যসৃষ্টি, শোককে অবলম্বন করিয়া সরস সুন্দর শ্লোকরচনা। ঐ সকল কাব্যাংশে এমন অনেক কথাই আছে, যাহা সাধারণ বিলাপের পক্ষে স্বাভাবিক নহে, কাব্যের অন্যান্য সৌষ্ঠবের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া পদে পদে কবি কারুশৃঙ্খলার দ্বারা উচ্ছ্বাসকে সংযত করিয়া সাধারণ বিলাপ হইতে স্বাতন্ত্র্য দান করিয়াছেন, তাই উহা কাব্যের বিলাপ হইয়া অমরতা লাভ করিয়াছে। উহাদিগকে স্বাভাবিক করিয়া তুলিতে হইলে, সাধারণ বিলাপকারীর ন্যায় অনেক অসংবদ্ধ অসম্বদ্ধ কথা বলাইতে হইত, আরও করুণ করিয়া তুলিতে হইত। কিন্তু তাহাতে কাব্য হইত না। কাব্যের স্বভাব আর প্রাকৃত জনের স্বভাব এক নহে, প্রাকৃত জনের স্বভাব অনুকরণ করিতে হইলে কাব্যের স্বাভাবিকতা নষ্ট হইয়া যাইত। "সাহিত্য ঠিক প্রকৃতির আরশি নহে। কেবল সাহিত্য কেন, কোনো কলাবিদ্যাই প্রকৃতির যথাযথ অনুকরণ নহে। প্রকৃতিতে প্রত্যক্ষকে আমরা প্রতীতি করি, সাহিত্য এবং ললিত কলায় অপ্রত্যক্ষ আমাদের কাছে প্রতীয়মান। অতএব এ স্থলে একটি অপরটির আরশি হইয়া কাজ করিতে পারে না। এই প্রত্যক্ষতার অভাববশতঃ সাহিত্যে ছন্দোবদ্ধ ভাষাভঙ্গীর নানাপ্রকার কলবল আশ্রয় করিতে হয়। এই-রূপে রচনার বিষয়টি বাহিরে কৃত্রিম হইয়া অন্তরে প্রাকৃত অপেক্ষা অধিকতর সত্য হইয়াছে" (রবীন্দ্রনাথ)। 'ঐ ছন্দোবদ্ধ ভাষাভঙ্গীর নানাপ্রকার কলবল' সম্পূর্ণাঙ্গ না হইলে উৎকৃষ্ট কবিতা হইবে না। করুণরসের কবি অনেক সময় এ সত্যটি লক্ষ্য করেন না, অতিরিক্ত অশ্রুপাতের লোভে প্রাকৃত শোকের স্বাভাবিক অনুকরণ করেন,—সরলহৃদয় পাঠকগণ অশ্রুপাতের প্রাচুর্য্যের পরিমাণ অনুসারে কাব্যের চমৎকারিতা নির্দ্ধারণ করেন। সাহিত্যের সত্য কৃত্রিমতাকে উপেক্ষা করে না, প্রকৃত কবি তাই করুণরসাশ্রিত কবিতায় কারুণ্যকে উচ্ছ্বাসময় ও ব্যক্তিগত করিয়া তুলেন না, কারু-কৌশলের সাহায্যে তাহাকে বিশ্বজনীন, রহস্যময় ও শান্তরসের সান্ত্বনা-বারি বর্ষণে সংযত সংহত করিয়া তুলেন, প্রাকৃত শোকদুঃখের স্বাভাবিক অভিব্যক্তির স্থলে তাঁহারা ব্যঞ্জনার কৌশল প্রয়োগ করেন, হাহাকার হা-হুতাশকে প্রশ্রয় না দিয়া ইঙ্গিত ও মিতবচনের আশ্রয় গ্রহণ করেন। অশ্রু তাহাতে বহির্ম্মুখী না হইয়া অন্তর্ম্মুখী হয়, তাঁহাদের কবিতাপাঠে এক বিন্দু অশ্রুও বহির্গত না হইতে পারে, সমস্তটুকুই ভিতরদিকে গড়াইয়া মর্ম্মকোষকে সিক্ত করিয়া তুলে। কবির কথায়

বলিতে গেলে, এ ভাবকে Too deep for tears বলা যাইতে পারে এবং এ ভাব কেবল কারুণ্যে কেন, একটি তুচ্ছতম ফুল, একটি ধূলিকণা মানুষের কৃতজ্ঞতা, ভগবানের মহিমা, প্রকৃতির শোভা-বৈচিত্র্য দর্শনেও জানিতে পারে। নাট্যাভিনয় ও যাত্রার গীতাভিনয়ে প্রাকৃত দুঃখেরই অনুকরণ চলে, তাহাতে শ্রোতৃবৃন্দ কাঁদিয়া আকুল হয়, কিন্তু যে রচনা অবলম্বন করিয়া এই অশ্রুবন্যার সৃষ্টি হয়, তাহাকে সুধীগণ সৎকাব্যশ্রেণীর মধ্যে গণ্য করেন না। সে জন্য তাঁহাদের অভিমন্যু-বিলাপ, সীতার বনবাস, গান্ধারীর খেদ অপেক্ষা মাইকেলের সীতা-সরমার উপাখ্যান, অক্ষয়কুমারের এষা, চন্দ্রশেখরের উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম এবং রবীন্দ্রনাথের বিদায় অভিশাপ ইত্যাদি রসসংযত ভাবসংযত রচনা কারুণ্যময় কাব্যের হিসাবে উৎকৃষ্টতর। ভবভূতির উত্তরচরিতের স্থানে স্থানে ও কালিদাসের শকুন্তলা-বিদায়ের ৪র্থ অঙ্কে করুণরসাত্মক অত্যুৎকৃষ্ট কাব্য সম্ভব হইয়াছে। এই দুই ক্ষেত্রে কারুণ্যরসের অন্তরালে একটি গভীরতর অনুভূতি ও নিবিড়তর রস প্রচ্ছন্ন আছে, তদ্ব্যতীত কাব্যের অন্যান্য উপাদানও শোভনাঙ্গ লাভ করিয়াছে। কেবলমাত্র কারুণ্যের জন্যই উহা এত উৎকৃষ্ট নয়, কারুণ্যও যাহা আছে, তাহা এমনই সংযত, ধীর ও উদার যে, হৃদয়কে উদ্বেল ফেনিল করিয়া তুলে না, বরং প্রশান্ত ও প্রসন্ন করে।

রবীন্দ্রনাথের মধ্যে যে কারুণ্য আছে, তাহাকে প্রশ্রয় দিলে তিনি দেশকে কাঁদাইয়া ভাসাইয়া দিতে পারিতেন, তাঁহার মধ্যে যে কৌতুকরস আছে, তাহার বন্যা মুক্ত করিলে দেশকে হাসাইয়া মাৎ করিয়া দিতে পারিতেন, কিন্তু তাহা হইলে এত বড় কবি হইতে পারিতেন না। রবীন্দ্রনাথের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবিতাগুলি করুণরসাত্মকই নয়, করুণরস অপেক্ষা অধিকতর স্থায়ী, গভীর ও নিবিড় রসে অভিষিক্ত। তাঁহার মধ্যম শ্রেণীর অনেক কবিতায় কারুণ্য সংযতবেগ হইয়া ফল্গুর মত প্রবাহিত। কবি ধনীর দুয়ারে কাঙালিনীকে অনেকক্ষণ করুণ বিলাপ করাইতে পারিতেন, অদৃষ্টকে অনেক ধিক্কার দেওয়াইতে পারিতেন, কিন্তু তাহাতে তাহার ম্লান মুখখানি চিরদিনের জন্য আমাদের মনে থাকিয়া যাইত না। কারুণ্যের তারল্যকে নিবিড় করিয়া দিয়া শেষ করিয়াছেন, 'মাতৃহারা-মা' যদি না পায়, তবে আজ কিসের উৎসব, তবে মিছে সহকার-শাখা তবে মিছে মঙ্গল-কলস'। 'পুরাতন ভৃত্য' একটি কৌতুকাবহ কবিতা, কারুণ্যে শেষ হইয়াছে। যেখানে কারুণ্য আরম্ভ হইল, কবিও সেইখানেই শেষ করিলেন। 'দুই বিঘা জমী'কে উচ্চ শ্রেণীর কবিতায় পরিণত করিবার জন্য তাহার সুলভ ও সহজ কারুণ্যকে মাঝে মাঝে রসান্তরের রশ্মিতে সংযত করিয়াছেন। এ কারুণ্য আমাদের কাঁদায় না, আমাদিগকে ভাবায়, গভীরতর ভাবে আবিষ্ট করিয়া দেয়।

রবীন্দ্রনাথের 'স্মরণে' ও 'লোকালয়ের' অধিকাংশ কবিতা, পতিতা, বধূ, গানভঙ্গ, যেতে নাহি দিব, দেবতার গ্রাস ইত্যাদি কবিতায় কারুণ্যের সহিত কাব্যের উপকরণগুলি পূরামাত্রায় আছে বলিয়া এগুলি এত সুন্দর। কেবলমাত্র অশ্রুদ্গমই ইহাদের উদ্দেশ্য নহে, অন্যান্য গভীর ও নিবিড় অনুভূতির কবিতা পাঠকের চিত্তে যে আন্দোলন ঘটায়, এগুলিও তাহাই। জীবনের এক একটি সমস্যা ইহার সঙ্গে বিজড়িত; পাঠক-চিত্তকে কারুণ্যময় আহ্বানে সেই সকল সমস্যার দিকে লইয়া যায়। করুণ বলিয়াই এত সুন্দর নহে, ভাবঘন বলিয়া এত সুন্দর। দর্শনেন্দ্রিয়কে বাষ্পাকুল করে বলিয়া এত মধুর নয়, অতীন্দ্রিয় অনুভূতি জাগায় বলিয়া এত মধুর। তাঁহার করুণ কবিতাগুলির বৈশিষ্ট্য তাঁহার কথাতেই বলা যাইতে পারে,—

"করুণ চক্ষু মেলে ইহার মর্ম্মপানে চাও,
এই যে মুদে আছে লাজে, পড়বে তুমি এরি ভাঁজে,
জীবনমৃত্যু রৌদ্র-ছায়া ঝটিকার বারতা।"

শ্রীকালিদাস রায়।

নারীর মাতৃত্ব

নারী যদি নারীর মত মাতৃ-হৃদয় নিয়ে তার,
আপন তেজে দাঁড়ায় আসি' হাতে নিয়ে কর্ম্মভার;
পরশে তার বিপুল বেগে লুপ্ত চেতন উঠবে জেগে'—
ঘুচ্‌বে ধরার বিঘ্ন-বিষাদ কান্নারোল আর হাহাকার।

শ্রীমতী কাননবালা দেবী

পেট্রোলিয়াম-প্রসঙ্গ

৩

দেশ-বিদেশের খবর যাঁহারা রাখেন, তাঁহারা অবশ্যই জানেন, অধুনা পেট্রোলিয়াম তৈল রাজনীতিক্ষেত্রে একটি প্রধান বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সকল দেশের রাজনীতিকগণই তৈলক্ষেত্রে স্ব স্ব অধিকার বিস্তার ও তাহা অক্ষুণ্ণ রাখিতে কতই না চাল চালিতেছেন। বর্ত্তমান রাজনীতি তৈলের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত। তৈল-সম্পদই অনেক পরিমাণে জাতির ভাগ্যনিয়ন্ত্রণ করিতেছে ও করিবে। জাতিতে জাতিতে যুদ্ধবিগ্রহ, দেশে দেশে প্রীতি ও শান্তি, সকলের মূলেই পেট্রোলিয়াম তৈল-সমস্যা নিহিত রহিয়াছে। পৃথিবীর সর্ব্বত্রই তৈল-ঘটিত ব্যাপার রাজনীতিক সমস্যাকে জটিল করিয়া তুলিয়াছে। কোন জাতি অন্য জাতিকে তৈল-সম্পদে সম্পন্ন হইতে দেখিলেই অমনই সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়া হাঙ্গামা বাধাইতেছে। নানা দিকে নানাপ্রকার ত্যাগ ও ক্ষতি স্বীকার করিয়াও আজ জাতিবৃন্দ তৈলক্ষেত্রের জমীদারী খরিদ করিতেছে। কারণ, গত মহাযুদ্ধে তাঁহারা বেশ করিয়া উপলব্ধি করিয়াছেন—তৈল কি বস্তু!

দিন দিন মোটর, বিমানপোত, রণতরী, কলকারখানার সংখ্যা দ্রুত বাড়িতেছে—আর ইহাদের জন্য তৈল একান্ত আবশ্যক। সুতরাং দেখা যাইতেছে, আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার জন্য তৈলের বিশেষ প্রয়োজন।

এসিয়া মাইনরে তুরস্কের জয়লাভ হেতু তত্রত্য তৈলক্ষেত্রের সমস্যা অত্যন্ত জটিল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তুর্কীকে যুরোপ হইতে বিতাড়িত করিবার এত চেষ্টা যে কেন, তাহাও এখন জগতের সমক্ষে উত্তমরূপে প্রকটিত হইয়াছে।

অদূর প্রাচ্য (Near East) নামক ভূভাগ তৈল-সম্পদে সম্পন্ন। ফ্রান্স ও গ্রেট বৃটেনের তৈল-সম্পদ অতীব অল্প। অথচ প্রয়োজনের পরিমাণ তাহাদের অত্যন্ত বেশী। বৃটেনের শতকরা ৯০টি রণপোত তৈল-সাহায্যে চলে। দূরদর্শী ইংরাজ তাই সরাসরি বা স্বজাতীয় কোম্পানীর মারফতে পূর্ব্ব হইতেই মিশর, পারস্য, থ্রেস্, ম্যাসিডোনিয়া, লোহিতসাগরের চতুর্দ্দিকস্থ ভূখণ্ড, মেসোপটেমিয়া প্রভৃতি দেশের তৈল-ক্ষেত্রগুলিতে জাতীয় অধিকার ও কায করিবার স্বত্ব পুরামাত্রায় কায়েম করিয়া বসিয়াছেন। তৈলনীতিতে অনভিজ্ঞ ফ্রান্সও গত যুদ্ধে ঠেকিয়া শিখিয়া পোক্ত হইয়া বৃটেন, মার্কিণ, পারস্য, তুরস্ক প্রভৃতি জাতির সহিত রফা করিয়া তৈলক্ষেত্রে নূতন জমীদারী কিনিতে আরম্ভ করিয়াছে। ভাগ্যক্রমে আলসাস্ প্রদেশও জার্ম্মাণীর হস্তচ্যুত হইয়া ফ্রান্সের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। এখানে তৈলক্ষেত্র রহিয়াছে।

গ্রেট বৃটেনের তৈল-সংগ্রহে তৎপরতায় মার্কিণ, ফ্রান্স প্রভৃতি জাতি সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছে। মার্কিণের নিজস্ব তৈল-সম্পদ পৃথিবীতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। কিন্তু দূরদর্শী ইংরাজ বুঝিয়া লইয়াছে যে, সমুদ্রে একাধিপত্য করিতে হইলে, উহাকে তৈলের জন্য মার্কিণের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিলে চলিবে না। ইংরাজের নিজের প্রচুর তৈলের উৎস থাকা চাই। বিগত যুদ্ধের পরেই বিশেষরূপে ইংরাজ তাহার তৈল-ক্ষেত্রে প্রভাব ও অধিকার বিস্তার করিয়া লইয়াছে। কাযেই মার্কিণ যে তৈলের কলকাঠী হাতে লইয়া কখনও ইংরাজকে কাবু করিবে, সে সম্ভাবনা আর নাই। যুদ্ধের পূর্ব্বে তুরস্কের তৈলক্ষেত্রে জার্ম্মাণীর যে অংশ ছিল, যুদ্ধের পরে তাহা উহার হস্তচ্যুত হওয়ার পর তাহার স্বত্ব লইয়া ইংরাজ, ফরাসী ও মার্কিণে অনেক দিন ধরিয়া সলাপরামর্শ ও মন-কষাকষি চলিয়াছে।

যাহা হউক, অধুনা উত্তর-পারস্যের তৈলক্ষেত্রে মার্কিণের অর্থ ও লোকজন খাটিতেছে। তবে দক্ষিণ-পারস্যে ইংরাজের একচেটিয়া অধিকার। অনেক বিশেষজ্ঞের মতে মস্থলের পূর্ব্বদিকে মেসোপোটে-মিয়ায় যে তৈলক্ষেত্রগুলি রহিয়াছে, সেগুলি পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। সেখানকার অধিবাসী অধিকাংশই তুর্ক। এঙ্গোরার জাতীয় সমিতি বলিতেছেন, খনিগুলির স্বত্ব একমাত্র তাঁহাদেরই নিজস্ব; অন্যের ইহাতে কোনও অধিকার নাই।

রুসিয়ার নিজের প্রচুর তৈলখনি আছে। এ জন্য তাঁহাদিগকে কাহারও মুখাপেক্ষী হইতে হইবে না বা কোনও চিন্তা করিবার মত কিছুই নাই।

স্বদেশের স্বার্থরক্ষার্থ অসঙ্গতভাবে পৃথিবীর যাবতীয় তৈলক্ষেত্র-গুলির উপর প্রভাব বিস্তার করিতেছে বলিয়া ইংরাজের একটা দুর্নাম আছে। লর্ড কর্জ্জন সে দুর্নাম অপনোদন করিবার নিমিত্ত বলিয়া-ছিলেন:—"এক যুক্তরাজ্য ছাড়া পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় গ্রেট বৃটেনের অধিক তৈলের প্রয়োজন। রণপোতগুলির শতকরা ৯০টি তৈল ব্যবহার করে, অনেকগুলি বাণিজ্যপোতও তাহা করে। অথচ ব্যয়ের তুলনায় বৃটেনের খনিজ উৎপন্ন তৈলের পরিমাণ নগণ্য। এই প্রয়োজনের তাড়নাতেই ইংরাজকে পৃথিবীর নানা স্থানে তৈল খুঁজিয়া বেড়াইতে হইতেছে। কাযেই প্রায়শ্চিত্ত করিবার মত অপরাধ ইহাতে কিছুই নাই।"

দেখা যাইতেছে, প্রায় সকল জাতিরই কম-বেশী তৈল-সম্পদ আছে। সাধারণ প্রয়োজন হয় ত তাহাতেই চলিয়া যাইতে পারে। কিন্তু আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ হইতে হইলে বা অপরকে তৈল-সম্পদের প্রভাবে মুঠার ভিতর রাখিতে হইলে প্রায়োজনিক পরিমাণে সন্তুষ্ট থাকিলে চলিবে না। তৈলক্ষেত্রগুলিতে একটা মোটা রকম বখরা থাকা চাই।

এই অবস্থায় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশগুলির তৈল-সম্পদের ও তাহাদের তুলনামূলক তালিকার কথা জানিতে পাঠকগণের কৌতূহল হইতে পারে। সেই কৌতূহল কতক পরিমাণে চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত নিম্নে তালিকাগুলি লিপিবদ্ধ করা গেল,—

বিভিন্ন দেশ হইতে গ্রেটবৃটেনে আমদানী কেরোসিন তৈলের পরিমাণ-তালিকা

দেশের নাম	১৯০১ খৃষ্টাব্দ	১৯০২ খৃষ্টাব্দ	১৯০৩ খৃষ্টাব্দ	১৯০৪ খৃষ্টাব্দ
	ব্যারেল	ব্যারেল	ব্যারেল	ব্যারেল
আমেরিকা	২,৬১৯,২৮৩	২,৫১৫,০৫১	২,০৮৩,৬২৭	২,০২৭,৩৯৮
রুসিয়া	১,২০০,৩১৬	১,৭৩২,৪৯৩	২,২০২,১২০	২,০২৯,৯১৯
রুমেনিয়া	৫১,৪৯২	৬৫,০০০	৩১,০০০	১২৮,০০০
মোট	৩,৮৭১,০৯১	৪,৩১০,৮৪৪	৪,৩১৬,৭৪৭	৪,১৮৫,৩১৭

বিভিন্ন দেশে উৎপন্ন কাঁচা তৈলের (crude petroleum) পরিমাণ-তালিকা

খৃষ্টাব্দ	রুসিয়া—(১) পুড (Poods)—	অষ্ট্রীয়া (গ্যালিশিয়া) (২) মেট্রিক্ টন্	জার্ম্মাণী—মেট্রিক্ টন্
১৯০১		৪,৫২২,০০	৪৪,০৯৫
১৯১৩	৫২৩,৪১০,১৯১	১০,৮৭২,৮৬	১২০,৭৫৮
১৯১৪	৫৫৮,২৮০,৯৪৪	*৭,০০০,৭০	১১০,১৮৪
১৯১৬	৬০৬,৪৩৩,২৪৬	৮,৯৮৬,৭০	৯২,৮২২
১৯১৮	*৩৩৭,০০০,০০০	৭,৭৭৬,৪০	৮৯,২২০

(১) এক পুড—৩৬ পাউণ্ড বা ১৮ সের।
(২) এক মেট্রিক্ টন্—প্রায় ২৭ মণ।
* আনুমানিক।

খৃষ্টাব্দ	কানাডা	ইতালী	হাঙ্গেরী	গ্রেট বৃটেন	ট্রিনিডাড	রুমেনিয়া
১৯০১	ব্যারেল(১) ৭৫৬,৬৭৯	২২৪৬ টন্	৩২৯৬টন্	৮ টন্	ব্যারেল(২)	টন্ ২৩৩,১০০
১৯১৩	২২৮,০৮০,	৬৫৬৪ "	....	......	৫০৩,৬১৬	১,৮৮৫,২২৫
১৯১৪	২১৪,৮০৫	৫৫৪২ "	....	......	৬৪৩,৫৩৩	১,৭৮৩,৯৪৭
১৯১৬	১৯৮,১২৩	৭০৩৫ "	....	......	৯২৮,৫৪৯	১,২৪৪,০৯৩
১৯১৮	৩০৪,৭৪১	*৫০০০ "	....	......	২,০৮২,০৬৮	*১,২১৪২১৯

* আনুমানিক — এক ব্যারেল—৪২ আমেরিকান গ্যালন
(২) আমেরিকান্ গ্যালন হিসাবে। — =৩৫ ইম্পিরিয়াল গ্যালন
(১) ইম্পিরিয়াল গ্যালন হিসাবে।

গ্রেটবৃটেনে ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে—২১৬ টন ও ১৯২০ খৃষ্টাব্দে ৩৭৫ টন তৈল উৎপন্ন হয়। রাজকীয় মিউনিশন্ বিভাগে ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে ৫৪৬৭ টন ও ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে ২২১১ টন তৈল ক্যানেল কয়লা (cannel কয়লা) হইতে প্রস্তুত করা হয়।

আমেরিকার যুক্তরাজ্য

খৃষ্টাব্দ	মোট উৎপন্ন কাঁচা তৈল (Crude Petroleum)—গ্যালন	মোট রপ্তানী কাঁচা তৈল গ্যালন	রপ্তানী করা তৈলের মূল্য ডলার
১৮৮১	১,১৬১,৭৭১,৯৯৬	৫১৪,৫৬১,৭১৯	৪৮,৫৫৬,১০৩
১৮৯১	২,২৮০,২৯১,৫১০	৬৭৩,৯০৫,৫৭৭	৪৬,১৭৪,৮৩৫
১৯০১	২,৯১৪,৩৪৬,১৪৮	১,০৭৯,০৭৪,৫১৯	৭২,৭৮৪,৯১২
১৯১৩	১০,৪৩৪,৭৪১,৬৬০	২,১৩৬,৪৬৫,৭২১	১৪৯,৩১৬,৪০৯
১৯১৪	১১,১৬২,০২৬,৪৭০	২,২৪০,০৩৩,৬৫২	১৩৯,৯০০,৫৮৭
১৯১৬	১২,৬৩২,২২০,৬৩৬	২,৬০৭,৪৮২,৩৬৬	২০১,৭২১,২৯১
১৯১৮	১৪,৯৪৮,৯৬৪,০৭২	২,৭১৪,৬১৯,৭৪৬	৩৪৪,২৬৫,৫০০

এক গ্যালন প্রায় সাড়ে তিন সেরের সমান। এক ডলারের মূল্য প্রায় ৩/৵০

খৃষ্টাব্দ	পারস্য	আর্জেণ্টাইন্	মিশর	ভেনিজুলিয়া
১৯০১	....	....	....	....
১৯১৩	২১,৮৯৬,৭১৪, গ্যালন*	১৯,০৫০ টন	১২৬১৮ টন	....
১৯১৪	৭৪,১৫৫,১৪১ "	৪০,৫৩০ "	১০৩,৬০৫ "	....
১৯১৬	১২১,৭৮৫,৮০৮ "	১১৬,০০০ "	৫৪,৮০০ "	....
১৯১৮	২৪৩,১৯৬,০৫০ "	১৯২,৬১২ "	২৭৭,৩০০ "	৫০,৭১০ টন

* ইম্পিরিয়াল।

খৃষ্টাব্দ	মেক্সিকো	জাপান	পেরু
১৯০১	১,৫৪৪ টন	৩৯,০২৫,১০০ গ্যালন (১)	....
১৯১৩	৩,৮৫৫ ২৬৭ "	৬৭,২৩৫,২০৫, "	২,১৩৩,২৬১ ব্যারেল(২)
১৯১৪	৩,৯১২,৭৩২ "	৯৫,১১৪,৬৮৯ "	১,৯১৭,৮০২ "
১৯১৬	৬,০৫৯,৫৮৯ "	১০৪,০৯৬,৩৮১ "	২,৫৫০,৬৪৫ "
১৯১৮	৭,৫০৬,২৮৯ "	৮৫,২৬৬,৪৬৯ "	২,৫৩৬,১০২ "

(১) ইম্পিরিয়াল্। (২) আমেরিকান্।

ইষ্টার্ণ আর্কিপেলেগো

খৃষ্টাব্দ	সুমাত্রা	জাভা	বোর্ণিও	মোট তৈলের পরিমাণ
১৯০১	*৩৫৭,৬৬৫ টন	৮৮,৫৯৭ টন	৮৫,৫৫৪ টন	৫৩১,৮১৬ টন
১৯১৩	৫২৯,৯৪৭ "	২০৭,১৩৫ "	৭৯৭,০৫৯ "	১,৫৩৪,২২৩ "
১৯১৪	৪৭৫,৪২৩ "	২২৬,৫৯০ "	৯৩১,৯০৩ "	১,৬৩৪,৪০৩ "
১৯১৬	৫২৬,০৮০ "	২৪৩,৪৪২ "	১,০৪৭,৪৬২ "	১,৮২০,২৪৭ "
১৯১৮	৫১৯,৯৮৯ "	২৪১,২১২ "	১,০৭২,১৪০ "	১,৮০৬,৯১৪ "

* আনুমানিক।

বৃটিশ-ভারতবর্ষ

খৃষ্টাব্দ	আসাম — তৈলের পরিমাণ	আসাম — মূল্য	ব্রহ্মদেশ — পরিমাণ	ব্রহ্মদেশ — মূল্য	পঞ্জাব — পরিমাণ	পঞ্জাব — মূল্য	মোট — পরিমাণ	মোট — মূল্য
১৯১৩	৪,৬৮৮,৬২৮	১৫,৪৬৬	২৭২,৮৬৫,৩৯৭	১,০১৯,১০৭	১২০০	১৩	২৭৭,৫৫৫,২২৫	১,০৩৪,৫৮৬
১৯১৪	৪,৬৮৮,৫৪৩	১৫,৪৬৬	২৫৪,৬৫২,৯৬৩	৯৪৩,০৮৬	১২০০	১৩	২৫৯,৩৪৩,৭১০	৯৫৮,৫৬৫
১৯১৬	৫,২৩৬,৮৯০	১৭,২৭৪	২৯১,৭৬৯,০৮৩	১,১০০,৯০১	১৮৩,৮১৪	১২৩০	২৯৭,১৮৯,৭৮৭	১,১১৯,৪০৫
১৯১৮	১০,৯৯৯,৬৪৮	৪৫,৭৬৭	২৭৪,৮৩৪,৫৫৬	১,০৮১,১২৮	৭৫০,৪৯২	৫০০৯	২৮৬,৫৮৫,০১১	১,১৩১,৯০৪
১৯২০	১৩,৩৫৮,১৭২	৫৭,৯৩২	২৭৯,৭০৭,১৭০	৫,২৪৪,৫০৯	৫১,৪৯২	৬৫৭	২৯৩,১১৬,৮৩৪	৫,৩০৩,০৮৯
১৯২১	৯,৫৩০,৯৩৪	৩৯,০৩০	২৯৬,০৯২,০৫৭	৫,৫৬৪,২০৯	৬০,২৩৬	১০০৬	৩০৫,৬৮৩,২২৭	৫,৬০৩,৯৭৫

পরিমাণ—গ্যালন হিসাবে। মূল্য—পাউণ্ড হিসাবে। (এক পাউণ্ড—১৫৲)

এই তালিকা দৃষ্টে দেখা যাইতেছে, ১৯২০ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে প্রায় ৮ কোটি টাকার ও ১৯২১ খৃষ্টাব্দে প্রায় সাড়ে আট কোটি টাকার পেট্রোলিয়াম তৈল উৎপন্ন হইয়াছে এবং ইহার প্রায় পোনের আনাই হইয়াছে ব্রহ্মদেশে।

সমগ্র পৃথিবীতে উৎপন্ন কাঁচা পেট্রোলিয়াম তৈলের পরিমাণ-তালিকা

দেশের নাম	১৯০২ খৃষ্টাব্দ গ্যালন	মোট পরিমাণের উপর শতকরা অংশ
১। যুক্তরাজ্য	৩,১০৫,৯৭২,১৪২	৪৮·১৪৭২
২। রুসিয়া	২,৭৮১,২৩৭,৭০৭	৪৩·১২৮৮
৩। ইষ্টার্ণ আর্কিপেলেগো	২০৫,০৪১,৫৭২	৩·১৭৮৪
৪। গ্যালিসিয়া	১৫০,২৯৫,০৩৩	২·৩২৯৮
৫। রুমেনিয়া	৭৪,৩০৮,৬৭৫	১·১৫১৮
৬। ভারতবর্ষ	৫৬,৬০৭,৬৮৮	·৮৭৭৫
৭। জাপান	৪২,০৮২,০০০	·৬৫২৩
৮। ক্যানাডা	১৮,১৯৪,৫৭৫	·২৮২০
৯। জার্ম্মাণী	১২,৩৭৫,১২৫	·১৯১৮
১০। পেরু	২,০৭৪,০০২	·০৩২১
১১। হাঙ্গেরী	১,০৬৪,৮৩১	·০১৬৫
১২। ইতালী	৭২৫,৫৯৫	·০১১২
১৩। গ্রেটবৃটেন	৬,২২২	·০০০০
মোট	৬,৪৫০,৯৮৬,১৩৭	৯৯·৯৯৯৪

১৯০৩ খৃষ্টাব্দে মোট উৎপন্ন হয়—৬,৮১৫,৬১৬,১৪৬ গ্যালন।
১৯০৪ " " " "—৭,৬৪৯,১৭৬,৬০০ "

উভয় খৃষ্টাব্দেই তালিকায় গ্রেটবৃটেনের কোন স্থান ছিল না। এই দুই খৃষ্টাব্দে যুক্তরাজ্যের যথাক্রমে ৫১·৫৭৫১ ও ৫৩·৫৪৯১ ভাগ তৈল ছিল। রুসিয়ার ছিল ৩৮·৩১৯৬ ও ৩৫·৫১২৫ ভাগ।

দেশের নাম	১৯১৮ খৃষ্টাব্দ গ্যালন	শতকরা ভাগ
১। যুক্তরাজ্য	১২,৪৫২,৪৮৭,০৭২	৬৭·৬৮১
২। মেক্সিকো	২,৩৮১,৫৬৪,৯৫৩	১৩·৫৫৭
৩। রুসিয়া	*১,৪১৫,৪০০,০০০	৭·৮৮০
৪। ইষ্টার্ণ আর্কিপেলেগো	৪৭০,৮৯৫,৫৩০	২·৬২০
৫। রুমেনিয়া	৩১৪,৯২৮,৩১৯	১·৭৩২
৬। পারস্য	* ২৯০,০০০,০০০	১·৫৮৬
৭। ভারতবর্ষ	২৮৬,৫৮৫,০১১	১·৫৩৯
৮। গ্যালিশিয়া	১৯৯,৩৪৯,১২৬	১·১০৯
৯। পেরু	৮৮,৭১৮,২৪৭	·৪৮২
১০। জাপান ও ফরমোসা	৮৫,৫৮৮,০৭৯	·৪৬৫
১১। ট্রিনিডাড	৭২,৮৪৩,২৩১	·৩৯৬
১২। মিশর	৬৮,৬৯০,৬৮৬	·৩৯৫
১৩। আর্জেন্টিনা	৪৪,৬৯৮,৬০০	·২৭৫
১৪। জার্ম্মাণী	২২,১০০,৭১৯	·১২৭
১৫। ভেনিজুলিয়া	১২,৮৫০,১৬০	·০৭২
১৬। ক্যানাডা	১০,৬৬৫,৯৩৫	·০৬২
১৭। ইতালী	১,৩৭৭,৮৮৫	·০০৭
১৮। হাঙ্গেরী	৫১২,৭০৩	·০০৩
১৯। অন্যান্য দেশ	২,৫৬৩,৫১৪	·০১৪
মোট	১৮,২২১,৮২৯,১৯৪	১০০·০০

১৯১৬ খৃষ্টাব্দে মোট উৎপন্ন—১৬,৪৪৯,৪১৬,৭৫০, গ্যালন।
১৯২০ " " " —৬৮৮,৭৪৭,২৫১ ব্যারেল।

* আনুমানিক।

এই তালিকাগুলির বিচার করিলে দেখা যায়—১৯১৮ খৃষ্টাব্দে পৃথিবীর মোট উৎপন্ন তৈলের পরিমাণ ১৯০২ খৃষ্টাব্দের পরিমাণের প্রায় তিন গুণ। ১৯০২ খৃষ্টাব্দের তুলনায় ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে যুক্তরাজ্যে উৎপন্ন তৈলের পরিমাণ প্রায় চারি গুণ বাড়িয়া গিয়াছে। অথচ ফ্রান্স, গ্রেট বৃটেন প্রভৃতি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতিগুলির স্থান উক্ত তালিকাগুলিতে নাই। রুসিয়ায় ১৯০২ খৃষ্টাব্দে ৪৩·১২৮৮ ভাগ, ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে ১৫·৭ ভাগ, ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে ১৩·৮৪৮ ভাগ ও ১৯২০ খৃষ্টাব্দে ৪·৩৬ ভাগ তৈল উৎপন্ন হইয়াছে। সুতরাং দিন দিন রুসিয়ার তৈল-সম্পদ কমিয়া যাইতেছে। মেক্সিকোতে ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে ৯·৫৭৫ ভাগ, ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে ১১·৯৮২ ভাগ ও ১৯২০ খৃষ্টাব্দে ২৩·২ ভাগ তৈল উৎপন্ন হইয়াছে। দেশটি অতি দ্রুত উন্নতি লাভ করিয়াছে। ভারতবর্ষে ১৯০২ খৃষ্টাব্দে ·৮৭৭৫ ভাগ, ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে ১·৫৩৯ ভাগ তৈল উৎপন্ন হইয়াছে। পারস্যের উন্নতিলাভ অতি দ্রুত হইয়াছে। ১৯০২-৩-৪ খৃষ্টাব্দের তালিকায় উহার কোন স্থান ছিল না; ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে ·৯৭৬ ভাগ ও ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে ১·৫৮৬ ভাগ তৈল এ দেশে উৎপন্ন হইয়াছে। অন্যান্য দেশেও কম-বেশী পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে।

বিদেশ হইতে ভারতে আমদানী তৈলের পরিমাণ।

১৯১৩-১৪ খৃষ্টাব্দে—৬৮,৮৫০,০০০ গ্যালন।
১৯১৯-২০ " —৯৪,১৩৫,০০০ "
১৯২০-২১ " —৫৭,১৯২,০০০ "

পৃথিবীতে ভূগর্ভোত্থিত মানুষের ব্যবহৃত "গ্যাসে"র মূল্য-তালিকা।

খৃষ্টাব্দ	যুক্তরাজ্য	কানাডা
১৮০৬	৪৬,৮৭৩,৯৩২ ডলার মূল্যের	৫৮৩,৫২৩ ডলার মূল্যের
১৮০৮	৫৪,৬৪০,৩৭৪ " "	১,০১২,৬৬০ " "
১৯১৬	১২০,২২৭,৬৬৮ " "	৩,৯২৪,৬৩২ " "
১৯১৮	১৫৩,৫৫৭,৫৬০ " "	৪,৩৫০,৯৫০ " "

এতদ্ব্যতীত ইতালী, হাঙ্গেরী, গ্রেটবৃটেন, ইষ্টার্ণ আর্কিপেলেগো প্রভৃতি দেশেও গ্যাস প্রচুর পরিমাণে উত্থিত ও ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

যুক্তরাজ্যে ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে ১৪,৩৩১,১৪৮ ডলার মূল্যের, ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে ৪০,১৮৮,৯৫৬ ডলার ও ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে ৫০,৩৬৩,৫৩৫ ডলার মূল্যের "গ্যাসোলিন" ব্যবহৃত হইয়াছে।

উৎপন্ন ওজোকেরাইটের (Ozokerite) মূল্য-তালিকা

খৃষ্টাব্দ	অষ্ট্রিয়া	রুসিয়া
১৯০৩	১৮১,১০৭ পাউণ্ড মূল্যের	১৯০২ খৃষ্টাব্দে ৭৩১৬ পাঃ মূল্যের
১৯০৪	১৯৬,৯৪২ " "	১৯০৩ " —২১৪১ " "
১৯০৫	১৭২,০০৫ " "	১৯০৬ " —৪৭৪৬ " "
১৯১১	১০৮,৮৪৬ " "	... ...
১৯১৩	৯৯,৩১১ " "	... ...

পৃথিবীতে উৎপন্ন এসফালটের (Asphalt) মূল্য-তালিকা

(পাউণ্ড মূল্যে)

খৃষ্টাব্দ	অষ্ট্রীয়া	বারবাডোজ	কিউবা	ফ্রান্স	জার্ম্মাণী	হাঙ্গেরী	ইতালী	জাপান
১৯০১	১৬১১	৯৩৯৪	....	....	৩৩৭৫০	১২৫৭৩	৫২৩৫২	....
১৯০৩	২২৪৮	৬৫০৮	৭১১১	....	৪০৬০০	১০৬০৩	৪৯৩৩৩	৯৮
১৯১০	১৭৯৫	১৩০৬	২৮১২	৩৭৫০০ টন	৩১৩৫০	২০৭৪৭	৯৩০৬৭	৫৯৬০
১৯১২	৬০৪৩	১৭৪১	১৭৯৮০	৩১৫৩৫ টন	৪১২৫০	২৮১১৭	১২০৪৯৪	৬৬৮২

খৃষ্টাব্দ	যুক্তরাজ্য	রুসিয়া	স্পেন্	ট্রিনিডাড	ভেনিজুলিয়া
১৯০১	১১৪,৫০২	২৬,৬১২ টন	৩৯৫৫ টন	১৫৯,৮০১	....
১৯০৩	২০৭,৩০৮	১৫,৫৭৭ ”	৬২৭৭ ”	২০১,১৬২	....
১৯১৬	১,৪৬১,৩৫৪	২৩৯২৪ ”	৭৩১৬ ”	* ১৩১,০৯৯ টন	৪৪৬১২ টন *
১৯১৮	১,৬৯০,৫১৮	....	৮১৯৫ ”	* ৭১,০৭০ ”	৪২৯২১ টন *

* রপ্তানী।

পৃথিবীতে উৎপন্ন শে’লের (shale) মূল্য-তালিকা

খৃষ্টাব্দ	গ্রেটবৃটেন	নিউ সাউথ ওয়েল্স	নিউজিল্যাণ্ড	ফ্রান্স
১৮৭৩	২৬২,০৪৭ পাউণ্ড মূল্যের	৫০৪৭৫ পাউণ্ড মূল্যের	....	....
১৯০১	৫৮৯,১৬২ ” ”	৪১৪৮৯ ” ”	৬০২৪ পাউণ্ড মূল্যের	৭৪৫৯৮ পাঃ মূল্যের
১৯১৬	১,০৩২,২৯৪ ” ”	১৭৭৯৬ ” ”	১৯১০ ” ”	৫৬৯৮৩ ” ”
১৯১৮	১,৫২৮,৫৮৪ ” ”	৩৯৭২৯ ” ”	১৯১২ ” ”	১৮৬৫৭ ” ”

পরিশিষ্ট—(ক)

ভারতবর্ষ ঃ—ভারতবর্ষে দুইটি বিশেষ অংশে পেট্রোলিয়াম তৈল পাওয়া যায়। পূর্ব্বদিকে আসাম, ব্রহ্মদেশ ও আরাকান অঞ্চলে যে সকল সরস তৈলখনি রহিয়াছে, তাহাদের শাখা-প্রশাখা সুমাত্রা, জাভা, বোর্ণিও প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জের তৈলক্ষেত্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত। পশ্চিমে পঞ্জাব, বেলুচিস্তান প্রভৃতি অঞ্চলের তৈলস্তর আরও পশ্চিমে পারস্যের উৎকৃষ্ট তৈলক্ষেত্রগুলি পর্য্যন্ত প্রসারিত। এই দুইয়ের মধ্যে পূর্ব্বাঞ্চলই সমধিক উর্ব্বরা। ব্রহ্মদেশে যে সকল উৎকৃষ্ট তৈলক্ষেত্র রহিয়াছে, তন্মধ্যে Yennangyaungই বয়সে সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন ও তৈলদানে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

ব্রহ্মদেশ ঃ—বোয়ারহাভেস (Boerhaaves) বলেন, প্রায় ২ শত বৎসর পূর্ব্বে (১৭২৪ খৃষ্টাব্দে) পেট্রোলিয়াম তৈল অতি মহার্ঘ্য বস্তু ছিল। এ দেশে রাজা-মহারাজারাই শুধু তাহা ব্যবহার করিতেন এবং সামান্য পরিমাণে য়ুরোপেও ইহা রপ্তানী হইত। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে এখান হইতে প্রচুর পরিমাণে তৈল উৎপন্ন হইয়া নানা দেশে প্রেরিত হইত। তিনি আরও বলেন, ১৭৯৭ খৃষ্টাব্দে এক Rainnaghong জিলাতেই ৫ শত ২০টি কূপ ছিল ও তাহা হইতে বৎসরে ৪০০,০০০ হগসহেড (এক হগসহেড ৫২॥ গ্যালন) তৈল উৎপন্ন হইত। বহু পূর্ব্বে এ দেশে হাতে কূপ খনন করিয়াও তৈল উত্তোলিত হইত। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে উত্তর-ব্রহ্মও বৃটিশ ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে আধুনিক মতে কূপখনন আরম্ভ হয়।

বর্ম্মা অয়েল কোম্পানী ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে Yenangyat স্থানে ও ১৯০১ খৃষ্টাব্দে Singn নামক স্থানে কূপ খনন আরম্ভ করেন। এ দেশের কূপগুলি সাধারণতঃ ২ শত ৫০ ফুট গভীর। তৈল উত্তোলন উত্তরোত্তর উন্নতিলাভ করিতেছে। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে—৪,০০০,০০০ গ্যালন, ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে—১৩,০০০,০০০ গ্যালন, ১৯০১ খৃষ্টাব্দে ৫০,০০০,০০০ গ্যালন ও ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে ৮৫,০০০,০০০ গ্যালন তৈল এ দেশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে এক Singn হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে, পঞ্চাশ লক্ষ গ্যালন তৈল, ১৯০৭-৮ খৃষ্টাব্দে হইয়াছে ৪ কোটি ৩০ লক্ষ ও ১৯১২ খৃষ্টাব্দে ৫ কোটি ৬৫ লক্ষ গ্যালন তৈল। ভারতবর্ষের তৈল-ক্ষেত্রগুলির মধ্যে Yennangyaung সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং Singn দ্বিতীয়।

আরাকান ঃ—আরাকান অঞ্চলের কয়েকটি দ্বীপেও তৈলখনি আছে, কিন্তু তাহাদের মূল্য সম্বন্ধে অধিক সংবাদ জানা নাই। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে পূর্ব্বে Barongo দ্বীপ হইতে ২০,০০০ গ্যালন ও Ramrie দ্বীপ হইতে ৩৭,০০০ গ্যালন তৈল পাওয়া গিয়াছিল। Minbu নামক স্থানে ১৯১০ খৃষ্টাব্দে প্রথম কূপ খনন করার পর সে বৎসর পাওয়া যায় ১৮৩২০ গ্যালন তৈল। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে এখান হইতেই পাওয়া গিয়াছে প্রায় ৪০ লক্ষ গ্যালন।

আসাম ঃ—১৮২৫ খৃষ্টাব্দে লেফটেনেণ্ট উইলকক্স (Lieutenant Wilcox) নামক এক ব্যক্তি ডিহিং নদীর ভিতর দিয়া অভিযানকালে সুপকং নামক স্থানে মাটীর ভিতর হইতে তৈল উত্থিত হইতে দেখিতে পান। ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে ব্রুস ও ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে হোয়াইট নামক দুই ব্যক্তি নামরূপ নদীর নিকটে তৈলের ঝরণা দেখিতে পান। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে মেডলিকট নামক এক ব্যক্তি উত্তর-আসামের তৈল-ঝরণাগুলির একটা হিসাব প্রস্তুত করেন। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে মাকুম্ (Makum) নামক স্থানে কূপ খনন করা হয়। কিন্তু ১৯০২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত উহার অবস্থা বিশেষ ভাল ছিল না। Assam Railway & Trading কোম্পানীই এ ক্ষেত্রটির উন্নতিসাধন করিয়াছেন। বৎসরে ২৫ হইতে ৪০ লক্ষ গ্যালন তৈল এখান হইতে উৎপন্ন হয়। Assam Oil Syndicate নামক কোম্পানী ডিগবয় নামক তৈলক্ষেত্রের উন্নতিসাধন করিয়াছেন। অধুনা আসামের তৈলক্ষেত্রগুলির দ্রুত উন্নতি ঘটিয়াছে। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে ১৬৭০০০ গ্যালন, ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে ৫৯৮,০০০ গ্যালন, ১৯০০ খৃষ্টাব্দে ৭৫৩০০০ ও ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে ২৫০০,০০০ গ্যালন তৈল এখান হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। আজকাল বদরপুর হইতেও প্রচুর তৈল উৎপন্ন হয়।

পঞ্জাব ঃ—কাশ্মীর ও কাবুলের মধ্যবর্ত্তী স্থানেই ক্ষেত্রগুলি অবস্থিত। দৈর্ঘ্যে উহারা ১ শত মাইল ও প্রস্থে প্রায় ৯০ মাইল। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে এ প্রদেশে প্রথম কূপ-খনন আরম্ভ হয়। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে ১৮১২ গ্যালন ও ১৯০২ খৃষ্টাব্দে ১৯৪৯ গ্যালন তৈল এখানে উৎপন্ন হইয়াছে। সোলেমান পর্ব্বতের মোগলকোট নামক স্থানে কতকগুলি অতি সরস তৈল-ঝরণা আছে। সিন্ধুতীরে হোরী নামক স্থানে তৈলক্ষেত্র আছে। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে এখানে প্রথম কূপ-খনন হয়।

বেলুচিস্থান ঃ—খাতান নামক স্থানে ১৮৮৪—৫ খৃষ্টাব্দে টাউওসেন নামক এক ব্যক্তি এখানে কূপ-খনন আরম্ভ করেন। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে ২১৮,৪৯০ গ্যালন তৈল উৎপন্ন হয়। কিন্তু মাটীর স্তরের অবস্থা-বৈগুণ্যে এখানকার তৈলক্ষেত্রের উন্নতিসাধন-চেষ্টা বিফল হইয়াছে।

পরিশিষ্ট (খ)

গত মহাযুদ্ধে পেট্রোলিয়ামের স্থান

১৯১৪ খৃষ্টাব্দে গত মহাযুদ্ধের প্রারম্ভেই অভিজ্ঞ ও দূরদর্শী রাজনীতিকগণ বুঝিয়াছিলেন যে, বিজয়-লক্ষ্মীর কৃপালাভ করিতে হইলে মিত্রপক্ষকে প্রভূত পরিমাণে পেট্রোলিয়াম ও তজ্জাতীয় দ্রব্য-সম্ভারের আয়োজন করিতে হইবে। জার্ম্মাণীও ইহা ভাল করিয়াই উপলব্ধি করিয়াছিল। যুদ্ধের পূর্ব্বে ইহাদিগকে তৈলের জন্য প্রধানতঃ মার্কিণ যুক্তরাজ্য ও রুমেনিয়ার উপর নির্ভর করিতে হইত। কিন্তু যুদ্ধারম্ভের পর উক্ত দেশসমূহ হইতে তৈল আমদানী বন্ধ হওয়ার পর এক অভিনব উপায়ে উহারা তৈল সংগ্রহ করিতে লাগিল। নরওয়ে, ডেনমার্ক প্রভৃতি নিরপেক্ষ দেশগুলিও জার্ম্মাণীর ন্যায় তৈলের জন্য যুক্তরাজ্য প্রভৃতি দেশের উপর নির্ভর করিত। তাহারা এইক্ষণে উক্ত দেশ হইতে প্রচুর পরিমাণে তৈল আমদানী করিয়া গোপনে তাহা জার্ম্মাণীর নিকট বিক্রয় করিতে লাগিল। এইরূপে কিছুদিন চলিল। আমেরিকাও এই ষড়যন্ত্রের বিষয় না জানিয়া নিঃসন্দেহে তৈল রপ্তানী করিতে লাগিল। কিন্তু বৎসরের হিসাব-নিকাশের পর যখন নিরপেক্ষ দেশগুলিতে প্রেরিত তৈলের পরিমাণ-তালিকা প্রকাশিত হইল, তখন তাহার অসম্ভব ও অহেতুক বিশালতা-বৃদ্ধি চিন্তাশীল ব্যক্তিদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। তাঁহারা বুঝিলেন, এ ব্যাপারের কোথাও একটা বিরাট গলদ আছে। ইংলণ্ডের "পেট্রোলিয়াম টাইম্‌স" নামক পত্রের সম্পাদক Mr. Albert Lidgett বিশেষভাবে এ বিষয়ে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। Mr. Winston Churchill অনতিবিলম্বে এ বিষয়ে অবহিত হয়েন ও অল্পদিনের ভিতরেই কয়েকটি তৈলবাহী জাহাজ আটক করিয়া গোপনে তৈল-সরবরাহের পথ রুদ্ধ করেন! নতুবা যুদ্ধের ফলাফল কি হইত কে জানে!

১৯১৪ খৃষ্টাব্দে মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট কিন্তু যুদ্ধে বা শান্তির দিনে তৈলসম্পদের উপকারিতা তেমন উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। যুদ্ধারম্ভের অব্যবহিত পূর্ব্বে ইঁহারা Anglo-Persian Oil কোম্পানীতে ২০ লক্ষ পাউণ্ড নিয়োজিত করেন। জাতি হিসাবে বৃটিশরা বরাবরই বিদেশাগত পেট্রোলিয়ামের উপরেই নির্ভর করিয়া আসিয়াছে। নানাদেশ হইতে ইচ্ছা ও প্রয়োজনমত তৈল আমদানী হইত। আর হইত বলিয়াই কোনও দিন যে আমদানী বন্ধ হইয়া বিপদ ঘটিতে পারে, এ ভাবনা অনেকেরই মনে আইসে নাই। কিন্তু যুদ্ধারম্ভের সঙ্গে সঙ্গেই দার্দ্দানেলীস (Dardanelles) প্রণালী বন্ধ হওয়ার পর তাঁহারা দেখিতে পাইলেন, পূর্ব্বের ন্যায় রুসিয়া ও রুমেনিয়া হইতে তৈল আমদানী করা সম্ভবপর নহে। পরন্তু সুদূর প্রাচ্য দেশ হইতেও সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া প্রয়োজন ও নিয়মমত তৈল-আমদানী করার আশা সুদূরপরাহত। সৌভাগ্যের বিষয়, মার্কিণ মুল্লুক এ বিবাদের দিনে স্বেচ্ছায় তৈল সরবরাহ করিয়া বৃটেনকে যথাসাধ্য সাহায্য করিয়াছে। মেক্সিকোও তাহার অফুরন্ত তৈল-ভাণ্ডার হইতে অপরিমেয় তৈল বৃটেনে প্রেরণ করিয়াছিল।

গত যুদ্ধে তৈলের স্থান ও প্রয়োজনীয়তা নির্দ্দেশ উপলক্ষে Mr. Albert Lidgett বলেন,—

"To say that petroleum-products have played a highly important part in the conduct of the War, is but to underestimate facts. The importance of their part has been equal to the supply of guns and shells .... had there been at any time a dearth of any classification of petroleum products than the vast naval and army organisations, both on and across the water, would immediately lose its balance, and our great fighting units would automatically have become useless. Just think of it for a moment."

পরিশিষ্ট (গ)

পৃথিবীর কয়েকটি বিখ্যাত তৈল-কোম্পানীর পরিচয়-তালিকা

১। সর্ব্বপ্রধান বলা যাইতে পারে মার্কিণ যুক্তরাজ্যের New Jersy প্রদেশান্তর্গত Standard Oil কোম্পানীকে। প্রায় ৩৬ বৎসর পূর্ব্বে Mr. John D. Rockefeller (ইনিই বিশ্ববিশ্রুত দানবীর রক ফেলার) তাঁহার Samuel Andrews নামক এক অংশীদার সহযোগে তিনি এই কোম্পানীর প্রতিষ্ঠা করেন। ইহার মূলধন ১০ কোটি ডলার। গত ১২ বৎসরে এই কোম্পানী অংশীদার-দিগকে শতকরা ৪ শত ডলার লভ্যাংশ (dividend) ও নগদ শতকরা ৪০ ডলার দিয়াছে (১ ডলার ৩৷৵০)।

২। নিউইয়র্কের Standard Oil কোম্পানী আর একটি বিরাট প্রতিষ্ঠান। ইহার মূলধন সাড়ে ৭ কোটি ডলার।

৩। ক্যালিফোর্ণিয়ার Standard Oil কোম্পানীটিও খুব উন্নতিশালী। ইহার মূলধন ১০ কোটি ডলার। Point Richmond নামক স্থানে ইহার যে শোধনাগার (refinery) আছে, তাহা পৃথিবীতে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। প্রত্যহ এখানে ৬ হাজার ৫ শত ব্যারেল তৈল শোধিত করা হয়। প্রায় ১ হাজার মাইল দীর্ঘ লোহার নলপথে, ইহার তৈল কেন্দ্রীয় শোধনাগারে আইসে।

৪। Shell Transport and Trading কোম্পানীর হেড আফিস লণ্ডনে। সুবিখ্যাত তৈল-বিদ্যাবিশারদ Sir Marcus Samuel ইহার সভাপতি। সুদূর প্রাচ্যদেশের সহিত তৈল-ব্যবসা করিবার নিমিত্ত প্রায় ২০ বৎসর পূর্ব্বে এই কোম্পানীটি স্থাপিত হইয়া দিন দিন উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। প্রায় ১০ বৎসর পূর্ব্বে এই কোম্পানী Royal Dutch Petroleum কোম্পানীর সহিত একাঙ্গীভূত হইয়াছে। এই যুক্ত কোম্পানীর মূলধন দেড় কোটি পাউণ্ড। ইহারা প্রায় শতকরা ৩ শত পাউণ্ড ডিভিডেণ্ট দিয়াছে।

এই কোম্পানী অধুনা রুসিয়া, রুমেনিয়া, ক্যালিফোর্ণিয়া, মেক্সিকো, ভেনিজুয়েলা, ট্রিনিদাদ্ প্রভৃতি দেশের বিরাট তৈল-ক্ষেত্রগুলিতে অধিকার বিস্তার করিয়া রহিয়াছে।

Anglo Saxon Petroleum কোম্পানী (মূলধন ৮০ লক্ষ পাউণ্ড) ও Asiatic Petroleum কোম্পানী (মূলধন ২০ লক্ষ পাউণ্ড) নামক এই কোম্পানীরই দুইটি শাখা সমুদ্রপথে তৈল আমদানী-রপ্তানীর কার্য্য করিয়া থাকে।

৫। মেক্সিকোর অফুরন্ত তৈল-ক্ষেত্রগুলিকে উপলক্ষ করিয়া অনেকগুলি কোম্পানী গড়িয়া উঠিয়াছে। লণ্ডনের সুবিখ্যাত পিয়ার্সন এণ্ড সন্স নামক কোম্পানীর কর্ত্তা Lord Cowdray (পূর্ব্বে Sir Weetman Pearson) এর চেষ্টায় Mexican Eagle Oil কোম্পানীটি গড়িয়া উঠিয়াছে, ইহার মূলধন ৬১ লক্ষ ২৫ হাজার পাউণ্ড।

৬। মেক্সিকো হইতে ইংলণ্ডের বাজারে তৈল আমদানী করিবার নিমিত্ত ২০ লক্ষ পাউণ্ড মূলধনে Anglo Mexican Petroleum কোম্পানীটি গঠিত হইয়াছে। Lord Cowdrayর পুত্র অনারেবল্ পি, সি, পিয়ার্সন এই কোম্পানীর সভাপতি।

৭। পৃথিবীর আর একটি উন্নতিশীল কোম্পানী হইতেছে Burma

Oil Company; ইহার মূলধন ৩৫ লক্ষ পাউণ্ড। ইহারা শতকরা ৪ শত পাউণ্ড হারে ডিভিডেণ্ট দিয়াছে।

৮। Anglo Persian Oil কোম্পানীর মূলধন ৫০ লক্ষ পাউণ্ড। অতি অল্পদিনের ভিতর ইহা জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। এই মূলধনের ২০ লক্ষ পাউণ্ড দিয়াছে—বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট। ৫ লক্ষ বর্গ-মাইল স্থান ব্যাপিয়া ইহার তৈলক্ষেত্র বিস্তৃত।

৯। Anglo American Oil কোম্পানীর মূলধন ৩৫ লক্ষ পাউণ্ড। ইহা আমেরিকা হইতে ইংলণ্ডে তৈল-সরবরাহ করিয়া থাকে।

১০। রুসিয়ার তৈলক্ষেত্রগুলির উন্নতিকল্পে Nobel Brothers প্রভৃত পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন।

১১। Late Mr. John William Gate মার্কিণ দেশের Texas Oil Company স্থাপন করিয়া গিয়াছেন।

১২। গ্যালিশিয়া দেশের Boryslaw-Tustand তৈলক্ষেত্র পৃথিবীর প্রথম শ্রেণীর অন্যতম খনি। লণ্ডনের বিখ্যাত বণিক M. E. T. Boxallএর তত্ত্বাবধানে কয়েকটি কোম্পানী (মূলধন ২০ লক্ষ পাউণ্ড) এখন তৈল উত্তোলন ও রপ্তানী করিয়া থাকে। *

শ্রীযোগেন্দ্রমোহন সাহা।

* এই প্রবন্ধের প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ যথাক্রমে ১৩৩১ সালের 'মাসিক বসুমতী'র পৌষ ও মাঘ সংখ্যায় বাহির হইয়াছিল।

চৈতন্য ও সুবুদ্ধি রায়

ভারতের অঙ্কক্ষেত্রে আজ এসেছেন ভিখারী দেবতা,
লোকমুখে ছেয়ে গেছে তাঁর অন্তহীন প্রেমের বারতা।
ডুবাইয়া বিশাল নগরী উঠিতেছে কীর্ত্তনের রোল—
শিবক্ষেত্র বিষ্ণুক্ষেত্র আজ দ্বিজে দেয় আচণ্ডালে কোল।
রবিকর অস্তমিতপ্রায় দিনমান হ'ল অবসান,
কলনাদে অনন্ত উদ্দেশে ভাগীরথী গেয়ে চ'লে গান।
দিবসের কীর্ত্তনের শেষে মুগ্ধমনে নদী-তটে বসি
দেখিছেন নদীয়ার শশী কোলাহলময়ী বারাণসী।
ধূলি-মাটী ভেদিয়া অঙ্গের আভা পায় কাঞ্চন-বরণ,
ঝরঝিছে অমৃতের ধারা করুণায় উজ্জ্বল নয়ন।
মুখপানে উন্মুখ চাহিয়া ভক্তবৃন্দ বসি চারিপাশে,
ধূপ-গন্ধ মেদুর আকাশে সন্ধ্যাছায়া ঘনাইয়া আসে।
হেনকালে দ্বিজ এক আসি প্রণাম করিল তাঁর পায়
অতি ব্যস্ত গৌরাঙ্গ উঠিয়া প্রতিনতি করিলেন তাঁয়।
দ্বিজ কহে, "অভাজন আমি সদা পুড়ি পাপের আগুনে,
আমারে প্রণাম করি দেব বাড়াইলে পাপ শতগুণে!"
হাসিয়া গৌরাঙ্গ ক'ন, "তুমি আমি কেন ভাব দূর—
আমাদের দু'জনারি প্রাণে রয়েছেন প্রাণের ঠাকুর।"
জিহ্বা কাটি কহে বিপ্র, "হেন কথা ব'ল না সন্ন্যাসী,
অধম পতিত আমি অপ্রমেয় মোর পাপরাশি।
আমি হে সুবুদ্ধি রায় নদীয়ায় ছিলাম বিদিত,
ছিল যশঃ মান অর্থ ব্রাহ্মণের কুলে প্রতিষ্ঠিত।
সবলে ধরিয়া মোরে যবনে খাওয়ালে ছোঁয়া জল,
গেল কুল জাতি মান সমাজেও হইনু অচল।
গলিত-কুষ্ঠের মত সেই দিন সকলে ত্যজিল,
আপনার অন্তরঙ্গ যারা শিহরিল, অশুচি মানিল।
ভারতের যত দেবালয় রুদ্ধ হ'ল আমার সম্মুখে,
মোর অন্নে যাহারা পালিত, ফিরে গেল ঘৃণাভরা মুখে।
সমাজের অধ্যাপক যারা তুষানল করিল বিধান,
প্রাণপাত নহিলে এ পাপে প্রায়শ্চিত্ত নহে সমাধান!
সেই হ'তে শৃগালের মত দেশে দেশে বেড়াই ঘুরিয়া,
স্পর্শ কেহ করে না'ক আসি—আমি যেন রয়েছি মরিয়া।
লোক-মুখে শুনিলাম পথে তুমি নাকি দয়াল ঠাকুর,
তাই তব চরণের তলে আসিয়াছি হাঁটি বহু দূর।
তুমি মোরে কহ হে দেবতা! প্রায়শ্চিত্ত থাকে যদি আর,
প্রাণপাত নহিলে কি প্রভু এ পাপের নাহিক নিস্তার?"

নীরবিল ব্যাকুল ব্রাহ্মণ—ঝর্ ঝর্ ঝরিল নয়ন,
ভক্তবৃন্দ উঠিল শিহরি ইতিহাস করিয়া শ্রবণ।
কিছুক্ষণ থাকিয়া নীরব চৈতন্য কহেন ধীরে ধীরে—
অমৃতের উৎসধারা সম কথাগুলি ধ্বনিল সমীরে—
"শুন হে সুবুদ্ধি রায়! অকারণ খেদ কর দূর,
মানুষের প্রাণের দেবতা জেন নহে এমনি নিঠুর।
মানুষের রচিত-সমাজ লঘু পাপে গুরু দণ্ড করে,
মানুষের দেবতার বুকে করুণার সুধা-উৎস ঝরে।
লঘু পাপে নিঠুর সমাজ তোমারে করিয়া দেছে দূর,
দেবতায় মানুষের সহ বন্ধ নহে এমনি ভঙ্গুর।
কিসে তব গুরু অপরাধ; কেন তুমি ত্যজিবে জীবন?
প্রাণনাশ তমোধর্ম্ম সার তাহে শুধু মিথ্যা আচরণ।
যবনের জল করি পান চক্ষু তব অন্ধ কি হয়েছে?
যবনের জল করি পান শ্রুতি তব স্তব্ধ কি হয়েছে?
উৎসবের রজনীর সমা রূপ-রস-গন্ধময়ী ধরা
আপনার সরবস্ব লয়ে তোমা পানে এখনও তৎপরা।
এ অসীম উদার আকাশ এ অনন্ত পুণ্য জলরাশি
ধরণীর এই ফুলবন বাতাসের এই মধু বাঁশী,
এখনও কি প্রাণে তব না জাগায় বিপুল আভাস,
অন্তরের নিত্য দেবতায় এখনও কি করে না প্রকাশ?
তাই যদি হয় মতিমান্! কিসে তুমি হইলে পতিত,
কি লক্ষণে জানিলে যে তুমি বিশ্বদেব-করুণা-বঞ্চিত?"
সন্ন্যাসীর করুণার স্বর ক্রমে ক্রমে হইল গভীর,
স্নিগ্ধনেত্রে উঠিল জ্বলিয়া রুদ্রতেজ উদগ্র অধীর।
শাস্ত্র সে ত মানুষের তরে বাড়াইতে মানুষের মান,
সেই শাস্ত্র দলিবে মানুষ অত্যাচার, এ নহে বিধান!
মূর্খ যেই মানুষের হতে গ্রন্থরাশি বড় করি বলে—
মসীলিপ্ত তালপত্র তার ফেলে দাও এই গঙ্গাজলে।
হে সুবুদ্ধি! খেদ কর দূর লুপ্ত তীর্থ বৃন্দাবনে যাও,
যমুনার নীলতটে বসি ব্রজলীলা নিত্য লীলা গাও।
শুষ্ক স্মৃতি-বিধানের চাপে মানুষ হয়েছে প্রাণহীন,
নৈয়ায়িক তর্কমায়া রচি' দেবতারে করিছে বিলীন,
মানুষ সে জীবন্ত স্বাধীন অত্যাচার কভু নাহি সবে,
এক দিন রুদ্ধ কারা ভাঙ্গি নিজ হাতে মুক্তি গড়ি লবে,
সেই দিন ভেসে যাবে যত মিথ্যা তর্ক মিথ্যা শাস্ত্ররাশি
পবিত্র করিয়া জীবলোকে নিত্য প্রেম উঠিবে বিকাশি।"

শ্রীঅরীন্দ্রজিৎ মুখোপাধ্যায়।

ভ্রমরের প্রতি ফুল

১

এখন আসিলে বঁধু,
ফুরায়ে গিয়াছে ছিল যা' আমার
অন্তর-ভরা মধু।
নাহি সে মাধুরী, নাহি সে গন্ধ,
নাহি সে মুরতি নয়নানন্দ,
শিথিল নিবিড় জীবন-বন্ধ
শোভাহীন আজি বধু।
তুমি এখন আসিলে বঁধু!

২

কোথা ছিলে এত দিন?
প্রভাতে যে দিন উঠেছিনু ফুটি'
বেজেছিল মনোবীণ্।
ছিঁড়িয়াছে আজি সে বীণার তার,
নাহি বাজে আর—গত ঝঙ্কার,
শত ধারে আজি বহে আঁখি-ধার,
জীবন-মরণ ক্ষীণ।
তুমি কোথা ছিলে এত দিন?

৩

এখন আসিলে স্বামী,
কত আশা বুকে করি' কাটাইনু
শত শত দিন-যামি।
বঞ্চিত হিয়া জ্বলিয়া জ্বলিয়া
চলিয়াছে আজি শ্রীহরি বলিয়া,
জীবন দলিয়া সন্ধ্যা ঢলিয়া
চলিয়া আসিল নামি,
তুমি এখন আসিলে স্বামী!

৪

টুটিল জীবন-ডোর,
দুয়ারে এসেছে তিমির-সন্ধ্যা
আতুর নয়নে মোর।
বিফল বাসনা গুমরি' গুমরি'
উঠে মন ভরি' আজি হা-হা করি'
তবু হরষিত তব মুখ হেরি,
হে বঁধু, হে মনোচোর!
আজি ক্ষম অপরাধ মোর।

শ্রীগোপেন্দ্রনাথ সরকার।

মরণে

কোন্ পথে প্রিয়া হারায়েছে আজি চঞ্চল দু'টি আঁখি।
সাগরের মায়া, নীলিমার ছায়া, কে দিয়েছে তাহে মাখি
অধরের পাশে আনিয়াছি মুখ,
দুরু দুরু তবু কাঁপে না যে বুক,
কপোল ঘিরিয়া লাজ-অরুণিমা ফুটিয়া উঠিবে নাকি?

দিঠির আড়ালে যে ছবির সাথে,
হয় নাই পরিচয়।
বুকের দুয়ারে ক্ষণে ক্ষণে আজ
সে যে কত কথা কয়।

অধরের কোণে যে হাসির রেখা,
তুহিন-তুলিতে হয়ে আছে লেখা,
তারি মাঝে যত ছলনার কথা গেলে কেন বল রাখি।

পড়ে না যে মনে ললাটে এঁকেছ
কবে পরাজয়-টীকা।
দেখিয়াছি তবু হৃদয়ে জ্বেলেছ
আরতির দীপ-শিখা।

সৃষ্টি পুলক,—মরণের আগে, ব্যর্থ-প্রয়াসে মিছে কেন জাগে,
শীত-সন্ধ্যার ফাঁকে বসন্ত দিয়ে গেল আজ ফাঁকি।

মোহাম্মদ ফজলুর রহমান চৌধুরী।

ভরা যৌবনে

যৌবন যবে মুঞ্জরি ওঠে অপূর্ব্ব রূপ-গৌরবে;
বাঞ্ছিত হয় জীবন তখন মনোরঞ্জন সৌরভে!
তুচ্ছ তখন বন্ধন শত, বিদ্রূপ ভীতি গঞ্জনা;
তুচ্ছ তখন দুঃখ-দহন, রোগ-দারিদ্র্য-বঞ্চনা;
শুধু সঙ্গীত সমুচ্ছ্বসিত রঙ্গ দিবস-শর্ব্বরী;
শুধু মিলনের আলিঙ্গনের স্মৃতিটুকু রয় ঘর ভরি'!
নাহি ভগবান্,—বৃথা সম্মান, বন্দনে, কহ লজ্জা কি?
যৌবন-মদে অলক্ষ্মী-পদে ঢালো চন্দন গব্য ঘি!
চারু কেশপাশ, বসন-সুবাস, চারু কর-পদ পঙ্কজ;
প্রগল্ভতায় কেন তবে হায় মিথ্যা কুণ্ঠা সঙ্কোচ?
সকল দর্প হ'লেও খর্ব্ব সংসার-মায়া-দর্পণে,
কেটে যায় দিন, লজ্জাবিহীন, পঞ্চশরের তর্পণে!

শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু

পতিতা

[গাথা]

গেছে ধর্ম্ম, গেছে প্রেম, গেছে সব সুখ,
উপেক্ষিত পিতৃস্নেহ আজি' অভিশাপ,
শেলসম বাজে বুকে মা'র স্নেহ-মুখ
কি ঔষধে ঘুচিবে এ অন্তর-সন্তাপ ?

শয্যামাঝে লীনাঙ্গিনী কাঁদিছে সুন্দরী,
পুণ্যহারা প্রাণ দগ্ধ অতি তীব্র শোকে,
বালিসে লুকায়ে মুখ কাঁদিছে গুমরি'
দুর্ব্বল কপোলে ধারা আঁকা দীপালোকে।

এ যেন আতপ-ক্লিষ্ট যূথিকার মালা,
হিমগৌর তনুলতা লুটায় শয়নে,
পিঠে মুক্ত কেশরাশি, সর্ব্ব-অঙ্গে জ্বালা
প্রহর যেতেছে বহি' বিনিদ্র নয়নে।

স্রোতে যেন একে একে পদ্ম ভেসে আসে,
একে একে মনে পড়ে শৈশবের স্মৃতি,
মাতার হৃদয় মগ্ন সুধাস্নেহোচ্ছ্বাসে
পূজান্তে পিতার দীর্ঘ দীপ্ত দেবাকৃতি।

সেই খেলা, সখীজন, সেই তরুতল,
স্নিগ্ধ নারিকেলচ্ছায়া—অঙ্গন চিত্রিত,
সেই দীঘি, নীলজল স্বচ্ছ সুশীতল,
বেণুবন পল্লীপথ চির-চিত্রার্পিত।

সেই তুলসীর তলে পাটল সন্ধ্যায়,
অগুরু সুগন্ধ ব্যাপ্তি সন্ধ্যাদীপ জ্বালা,
সাজান ধানের গোলা শোভে গায় গায়
ঝিল্লীরবমুখরিত ধূম্র গাছপালা।

গরদের সাড়ী-পরা মরতে কে দেবী
জপে আন্দোলিত মৃদু পৃথু বাহুলতা,
মধুরা বধুর সাথে পাদপদ্ম সেবি
কান ভ'রে প্রাণ ভ'রে শোনা 'রূপকথা'।

আর কি যায় না ফেরা স্নেহের সে ঘরে,
পাওয়া কি যায় না খুঁজে সে সুখের কণা ?
সাঙ্গ পিতৃ-গৃহবাস, অমৃত-সাগরে—
নাহি পিপাসার'বারি, অসহ্য কল্পনা !

জ্বলিছে শোকাগ্নি প্রতি পঞ্জরে পঞ্জরে,
অনুতাপে অবিরত ফাটিতেছে বুক,
দুই হাতে চাপি বক্ষ তীব্র ব্যথাভরে,
উঠিয়া বসিল গৌরী শোকশীর্ণ মুখ।

হিমধৌত শতদল হেমন্ত-প্রভাতে,
কাতর করুণ-মুখে কুহেলিকা-ছায়া,
সুবর্ণ-বলয় দু'টি শোভিছে দু'হাতে
স্ফুট সৌন্দর্য্যের মাঝে যৌবনের মায়া।

দীপালোকে দীর্ঘচ্ছায়া চিত্রিত প্রাচীরে,
কহিল কম্পিত কণ্ঠে ব্যথা-তীব্র স্বরে,
"সব অন্ধকার মোর, ডুবেছি তিমিরে
স্মৃতিশক্তি-শেল বিদ্ধ—কাঁদি সকাতরে।"

তীর্থযাত্রী পিতা মোর পরম আশ্রয়,
পিত্রালয়ে ভ্রাতৃজায়া ভ্রাতা পাঠরত,
বন্ধুবেশে গৃহে রুষ্ট রাহুর উদয়,
কুল-অন্তরালে ফণী যুবা দেবব্রত !

"কত কাব্যকথা কত পুণ্য ইতিহাস,
চিত্রকলা শিল্পকলা সৌন্দর্য্য দর্শন,
বুঝিনিক' অভাগীর বিষ নাগপাশ,
ব্যাধের বাঁশরী-ধ্বনি—বধিতে জীবন।"

"তার পর তার পর রূপ-উপাসনা,—
প্রেম-উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কত স্তুতি-স্তব,
লজ্জা-শিহরিত তনু, আকুলা উন্মনা
কম্পিত অন্তর, কিন্তু কণ্ঠে নাহি রব।"

"মনে পড়ে সেই সন্ধ্যা, প্রেমের প্রস্তাব
সহস্র শপথে সিদ্ধ বিবাহের পণ,
কুলত্যাগ, পরবাসে মাদক-প্রভাব,—
ছলমুক্ত লম্পটের চিত্র কি ভীষণ !"

রক্তে-মাংসে বিদ্ধ সেই অপমান-স্মৃতি,
তার চিন্তা অগ্নিশিখা, স্পর্শ যেন বিষ,
কুটিল রাক্ষস কেন পায় দেবাকৃতি
কোমল মেঘের কোলে পালিত কুলিশ ?"

মুখে চোখে স্ফুরে জ্যোতি কাঁপে বাহুলতা,
আয়ত নয়নযুগে ক্ষীণ অশ্রুরেখা ;
কাঁপিতে লাগিল কোপে সর্ব্ব-আশাহতা,
সপ্ত দিবানিশি গৃহে—একা—একা—একা !

হায় রে যৌবন কাম-কুসুমিত দেহ,
আপনার মৃত্যু নিজে আনে সে টানিয়া,
হারায় ক্ষণিক ভ্রমে দেবতার স্নেহ
নিয়ে যায় অধঃপাত-নরকে টানিয়া।

পুরুষপৌরুষহীন, তারে ভালবাসি
প্রেম হয় অভিশাপ—জীবন নরক,
আত্মার অমৃত প্রেম বুঝে কি বিলাসী,
নারীত্বে দেবীত্বে কভু দেখে কি বঞ্চক ?

যে কেঁদেছে পদতলে—সে দলিছে পায়,
হা পতিতা উপেক্ষিতা হতাশ কাতর,
লুপ্ত সুখ-মরীচিকা লুণ্ঠিতা ধুলায়,
বুকে যেন বিঁধে আছে বিষমাখা শর !

আবেগে অধীর হৃদি চাপিয়া দু'হাতে,
কাঁদিতে লাগিল বালা গুমরি' গুমরি'
বিষবৃষ্টিপাত যেন দেহ-পারিজাতে
ঘুচাবে কি পাপ-স্মৃতি শোকাশ্রু-লহরী ?

অকস্মাৎ শয্যা ছাড়ি দাঁড়াইলা বালা,
তিলফুল-শুভ্র মুখ, নাহি রক্তরেখা,
দন্তে দন্ত ন্যস্ত কোপে চোখে তীব্রজ্বালা,
এ সংসারে সঙ্গহারা—শান্তিহারা একা !

মুক্ত করি হস্ত হ'তে সুবর্ণ-বলয়,
ক্ষোভে রোষে মর্ম্মাহতা ফেলাইল দূরে,—
"যা রে অভিশাপ-চিহ্ন প্রবঞ্চনাময়,
এই শাপ পাপরাশি দলিব অঙ্কুরে।"

নিবে গেল ম্লান দীপ স্তব্ধ গৃহমাঝে,
অন্ধকারে ফেলিল সে ব্যথামুক্ত শ্বাস,
আপন দুর্ব্বুদ্ধি স্মরি অবনতা লাজে,
বাহিরিলা রাজপথে, শোকার্ত্ত হতাশ।

তার পর? তার পর পথে একাকিনী
কাঁপে দীপ-স্তম্ভালোক প্রাচীরে পাষাণে,
চলিতেছে দৃঢ়পদে পথ চিনি চিনি,
উদ্দাম বিদ্যুৎ-ঝঞ্ঝা অশান্ত পরাণে।

দেহ যেন বহ্নিরাশি স্মৃতি যেন বিষ,
পাপ-স্মৃতি-শোক হ'তে চাহে সে পলাতে,
কোথায় আশ্রয়, শান্তি, সদা অহর্নিশ
কোটে পাপচিত্র, শান্তি নাহি অশ্রুপাতে।

মানমন্দিরের ছবি ছায়া মায়াময়,
বেণীমাধবের ধ্বজা সুদূর গগনে,
চিতাচুল্লী হিল্লোলিত বহ্নিশিখাচয়,
মণিকর্ণিকার ঘাটে দুলিছে পবনে।

"এর চেয়ে কি গৌরব চাহ গো সুন্দরি,
লক্ষপতি কুলবধূ হয় কি বিধবা?
ধন্য মান তুমি মোর সঙ্গ সুখ স্মরি'
স্বর্ণ-পদ্ম সমকক্ষ কবে রক্তজবা?"

সে ধিক্কার ক্রূর হাসি গর্ব্বিত বচন,
শেষ বজ্র অভাগিনী যুবতীর বুকে,—
চমকে বিদ্যুৎ-শিখা, মেঘের গর্জ্জন,
সজল আকুল নেত্রে চাহিল সম্মুখে।

দূরে গঙ্গা কলকল—পবন-স্বনন,
কাছে সারি সারি গৃহ কৃষ্ণ ছায়াচ্ছবি,
রুক্ষ শিলাদলে গাঁথা মূক নিশ্চেতন,
এ দুর্যোগে বারাণসী সেজেছে ভৈরবী।

ললাটে বহিল বায়ু, রুক্ষ মুক্তকেশে,
সহসা আনত মুখে মুদিল নয়ন,
কে যেন কহিল তারে শোক-স্বপ্নাবেশে,
"মরণ মরণ শান্তি—মরণ মরণ!"

কার অতি দীর্ঘচ্ছায়া পড়িল সম্মুখে,
কে যেন হাসিল দূরে ঘোর অট্টহাসি,
"পতিতপাবনী মা গো!" বলি অধোমুখে
পড়িল সংবিৎহারা সৌন্দর্য্যের রাশি।

মুনীন্দ্রনাথ ঘোষ।

লাভ

বায়ু— ছোঁয়া লেগেই ঝ'রে গেলি
হায় গো বকুল হায়,
এ যে আমার বড়ই পরিতাপ,—
বকুল— বুকের বোঝা তুলে নিলি—
ওগো দখিন বায়ু,—
সেই যে আমার সবার সেরা লাভ।

আবুল হাসেম।

পূজা

তব মন্দিরে এনেছি সাজায়ে
ব্যথিত হিয়ার অর্ঘ্য-দানি—
বালিকা আমি পূজিতে তোমায়
আপনার মনে সরম মানি!

না জানি কার আসারি বারতা
শিহরি উঠে প্রভাত-বায়ে,
কার আশা-পথ চেয়ে আছে আঁখি,
না জানি পরাণ কারে যে চাহে।

সন্ধ্যা যখন আসিবে নামিয়া
ধূলায় ধূসর ধরার 'পরে,
তখনো এই দীনা পূজারিণী
রবে পথ চেয়ে দুয়ার ধ'রে!

দিন শেষ হ'ল সবে চলি গেল
নাই তবু প্রভু তোমার দেখা,
ফুলের গন্ধে উদাস হৃদয়
মন্দির-তলে রহিনু একা;

আঁখি-জল আর বাধা সে মানে না
ক্লান্ত হৃদয়-মন—
ব্যথায় আহত হৃদয় তোমায়
করিনু সমর্পণ!

শ্রীমতী ফুল্লরাণী সিংহ।

নাম

[কলেরিজ হইতে ভাবাবলম্বনে রচিত]

কাগজ কলম হাতে লয়ে কবি
কহে গৃহিণীকে ডাকি,—
"কি নামে তোমার রচিলে কবিতা
হবে প্রিয়ে! তুমি সুখী?
'উষা', 'হাসি', 'হেলা', 'সীতা', 'সতী', 'বেলা',
'গোলাপ', 'টগর', 'বেলী';—
কিবা আর কিছু ভালবাস যাহা
দাও গো আমারে বলি।"

কবি-সোহাগিনী কহিল হাসিয়া,—
"নাম দিয়ে হ'বে বা কি?
ভালবাসা বিনে নামের বাহার
শুধু প্রতারণা,—ফাঁকি।
ডেকো মোরে 'বেলা', ডেকো মোরে 'হেলা',
ডেকো 'উষা', ডেকো 'উষী',
'সীতা', 'সতী', 'বেলী', 'বেহুলা', 'চামেলী',
অথবা যা তব খুসী।

কবিতা মিলাতে যাহা দরকার
প্রিয়, তাই ব'লে ডেকো;
(শুধু) নামের প্রথমে, আমি যে তোমার,
এ কথাটি লিখে রেখো।"

শ্রীকুলভূষণ চক্রবর্ত্তী।

রিক্তের বেদন

ওগো কেমনে রয়েছ ঢাকা !
সবই হেথায় তোমারি কথার স্মৃতি দিয়ে যেন আঁকা !
শূন্য আধেক শয়ন-শিথান
ঝালরের ঘেরা ওই উপধান,
পোড়া আরশীতে এ মুখ হেরিতে
মুগধ পরাণ ফাটে.
এই পোড়া চোখে নাই ঘুম আর
নিশীথে একেলা কাটে ।

করি গৃহকায সব তাড়াতাড়ি
দিনরাত খাটি তবু নাহি পারি,
মনে হয় যেন দীরঘ রজনী
হয়েছে শুধুই ভার ।
পড়শীরা কয়,—'বউটি কেন গো
রোগা ?—কি হয়েছে তার !'

সেই পালঙ্ক শূন্য শয্যা,
ঘরে ঢুকা বেলা কত না লজ্জা,
আবেশে বিভোরা বাধ বাধ ভাব,
ঘোমটার আড়ে হাসি ;
চুমোর জোয়ারে অধর রাঙিয়া
কে সুধাবে নিতি আসি ।

সরস কৌতুক শুনাতে আমারে
নিয়ত ঘুরিতে কত ছল করে,
বৌদিদিদের চোখে পড়ে কত
মরমে মরিয়ে গিয়েছ ;
(তবু) রান্নাঘরের কানাচেতে গিয়ে
প্রাণের কথাটি কয়েছ ।

মিলনের ভীতি পুলক বক্ষে
পা টিপি টিপি কাছে আসা,
ছোট ক'রে হাসা গুরুজনভয়ে
চোখে চোখে সে নীরব ভাষা ।

দিবানিশি থাকি অন্তরে-বাহিরে,
রাগিতাম আমি মিছে ছল ক'রে,
"ওগো যাও না ও দিকে স'রে,"—
শুনিতে গো শত গালি,
অকারণে হ'ত মনে অভিমান
(সে যে) জীবনের সুখ ঢালি !

এ যে অহরহ বেঁচে থেকে ম'রে যাওয়া
লাগে নাক' ভাল মোর,
ব্যথা-ভরা রাঙা বুকে সহে না গো
অভিশপ্ত জীবন-ডোর !

মনে হয়—ফুরায়েছে এ জীবনে
সব-সেরা সুখ, ক্ষণিক মিলনে
স্মৃতির সৌরভে ভরপুর হয়ে
জীবন জড়ায়ে আছে !
ওগো পরবাসী, দয়িত সুন্দর
এস এ বুকের কাছে !

পাপিয়া দেবী ।

নববধূ

মস্‌গুল্‌ ফাগুন্‌ মধুর মাসে,
টুক্‌টুকে বধূ এল রাণীর বেশে !
কুমকুম্‌-ফাগে গোলা রঙ-বাহারে,
টুল্‌ টুল্‌ মুখখানি মধু-ভরা রে !
ঝিল্‌মিল্‌ 'বেণারসী' চেলী-পরণে,
চঞ্চল অঞ্চল রাঙা-বরণে !
মখমল ঝল্‌মল্‌ শোভে যে গায়ে,
ঝম্‌-ঝম্‌ বাজে মল কমল-পায়ে !
রিণ্‌ রিণ্‌ চুড়ি বাজে কনক-হাতে,
ঝুন্‌ ঝুন্‌ হিরণের রুলির সাথে !
জ্বল্‌ জ্বল্‌ জ্বলে টিপ্‌ উজল ভালে,
চিক্‌মিক্‌ মতি-দুল কানে যে দোলে !
ঢুলু ঢুলু আঁখি দু'টি সুখ-স্বপনে,
ফিস্‌ ফিস্‌ মিঠে বোল অতি গোপনে !
চুপ চাপ ধীরে ধীরে কত মরমে,
লাজ-ভরা নতমুখে রত করমে !
ফিট ফাট্‌ পরিপাটী কত কাসেতে
ঝকমক্‌ গৃহখানি নব-সাজেতে !
ঝল্‌ মল্‌ 'শতদল' আলো যে করে,
ফুট্‌ ফুট্‌ ফুটে আছে বাড়ীটি জুড়ে !

শ্রীতপনেন্দ্রচন্দ্র সিংহ

হস্তলিপি

কবিতার মোর খাতার ভিতরে গোপনে
কবে যে গিয়াছ নামটি তোমার লিখিয়া,
এত দিন তাহা পড়ে নি আমার নয়নে
(আজ) পুলকে পরাণ নাচিতেছে সেটি দেখিয়া ।

বাঁকা বাঁকা ছাঁদে শোভিছে কিবা সে লেখা
যেন শস্তের বীথিকা কাঁপিছে পবনে !
সাদা কাগজের উপরে কালো সে রেখা
ভ্রমরের পাঁতি যেন গো কমল-কাননে !

খাতারে করেছ ধন্য ও নাম দিয়ে,
কবে আমারে করিবে ধন্য বুকে'তে নিয়ে ?

শ্রীঅমূল্যচরণ চক্রবর্ত্তী ।

চিত্রকর

চিত্রকর বলি এত দিন ধরি,
বড়ই গর্ব্ব ছিল ;
কে যে আজিকে অন্তরে পশি'
সে ভাব ঘুচায়ে দিল ।

বুঝিলাম আজি আমি গো তুচ্ছ
তুমিই সবার সার ;
ওগো চিত্রকর, তোমার চিত্র
বুঝিবে সাধ্য কার ।

শ্রীরাধামোহন বটব্যাল ।

শেষ চাওয়া

কি যে চাই—জানি না ত! শুধু খুঁজে ফিরি,
মরু-পথ প্রান্তর কত নদী-গিরি!
প্রভাতের আলো এসে ডেকেছিল কবে
তারি সাথে বাহিরিনু, বুঝিনি কি হবে।
গোধূলির রাঙ্গা মেঘে ফিরে যায় বেলা
তবু শেষ হ'ল না এ খেয়ালের খেলা!
কত পথ চলেছি যে,—তবু আছে আরও,
চাওয়া না ফুরালে শেষ হবে নাক তারও।
কত কি যে কুড়ায়েছি,—দেখেছি যা কিছু
ভেবেছি এ ক্ষুধা বুঝি ছুটে তারই পিছু।
বহু থলি ভরিয়াছি বহু দিক হ'তে—
পথেরই ত ধূলা, তারে রেখে এনু পথে।
শেষ থলি ভরে নাই আছি তারই আশে,
শেষ তৃষা মিটাইতে যাব কার পাশে!
ওই আলো নিভে যায় আঁখি আসে ঘিরি,
কি যে চাই—জানি না! শুধু খুঁজে ফিরি!

শ্রীপাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়।

বৃথা

কুসুম-জনম বৃথা যাহে নাহি হায় মধু-বাস—
বৃথা সে বিজুরী, যার কালো মেঘে ঘেরা নহে হাস!
বৃথা সে সরসী যার কালো জলে না শোভে নলিন,
বৃথা সে নলিনী, যার হিয়া নহে মধুপ-বিলীন!
বৃথা সেই ফণী হায় শিরে যার নাহি শোভে মণি,
মতি যার নাহি মাথে সেই গজে বৃথা বলি গণি!
রমণী-যৌবন বৃথা নহে যার রূপময় অঙ্গ,
বৃথায় রমণী-রূপ নাহি মিলে প্রেমময় সঙ্গ!
জীবন বৃথায় তার না জানে যে পিরীতের স্বাদ,
দ্বিজ দেবদাস কহে, পিরীতি সে জীবনের সাধ!

শ্রীদেবকণ্ঠ সরস্বতী।

সন্ধানে

আমি চলেছি চোখের জলে সন্তরি'
তোমার পায়ের চিহ্ন-আঁকা পথ ধরি।
যেখানে ঐ পথের বাঁকে,
কোকিল ডাকে বকুল-শাখে,
গামের বধূ কলসী কাঁখে আনমনে যায় গুঞ্জরি!
সেখানে কি ঘর বেঁধেছ সাজিয়ে নবীন মঞ্জরী?
(তোমার) এক তারাটির তীব্র তারে,
কি রাগ জাগে বঙ্কারে,
আজিকে এই অন্ধকারে কোথায় ফির সঞ্চরি!
আমি যে চলেছি শুধু চোখের জলে সন্তরি॥

শ্রীঅনিলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

পল্লী-লক্ষ্মীর প্রতি

যতনে হেম-অঞ্চল-ছায়ে
লহ তুলি শ্যামবরণি!
প্রবাস হইতে এনু নিজ বাসে
(স্নেহ) পীযূষ-ক্ষরণী ধমনি!

দিন-শেষে আজি সন্ধ্যাবেলায়
তব নদীতটে আসি' নিরালায়
বাঁধিয়াছি মোর তরণী।
তব মধু-বাণী পাখী-কলভাষে
মৃদুল পবনে শ্রুতি-পথে আসে,
সুরভি-জড়িত করুণ পূরবী
উন্মাদ, মনোহরণি!

শ্রান্তি ভুলায়ে আনিছ শান্তি
মায়া-ডোরে বাঁধি ভাঙিলে ভ্রান্তি,
কেহ দেখিল না ও দেহ-কান্তি,
ক্লান্ত-অলস-চরণি!
দিকে দিকে ঘেরি কত চারু শোভা,
পরিচিত তব তনু মনোলোভা,
জননি, তুমি যে যুগে যুগে মম
ব্যথিত-হৃদয়-সরণি!

শ্রীসন্তোষকুমার সরকার।

মানা

দুয়ার যদি বন্ধ কর আমি ঠেল্‌বো না,
পথে যদি দাও গো বাধা আমি যাব না।
চাইলে যদি সরম লাগে আমি চাব না,
কইলে যদি কও না কথা আমি কব না।
কাছে এলে যাও গো চ'লে আমি আস্‌বো না,
চুমু দিলে মুখ ফিরালে আমি দেবো না।
মানবো আমি সকল মানা একটি মানবো না,
প্রাণের ভিতর বাস্‌তে ভাল আমি ছাড়বো না।

শ্রীচারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

পরী

জোছনা দিয়ে তৈরী আমার পাখা
সুরভি দিয়ে রচিত আমার কেশ,
কবির সুখ-কল্পনা দিয়ে আঁকা
আমার মুরতি, আমার মোহন বেশ;

শুকতারা আর সন্ধ্যা-তারায় ডাকি
গড়েছে কবি আমার উভয় আঁখি,
আমার কণ্ঠে শুন কুহরিছে
শত বসন্তের পাখী।

শ্রীউমানাথ ভট্টাচার্য্য।

পাঠাগারের ইতিহাস *

সাধারণতঃ বঙ্গভাষায় য়ুরোপীয় শব্দ "লাইব্রেরী" অর্থে পুস্তকালয় বা পুস্তকাগার বুঝায়। এক্ষণে কথা হইতেছে যে, এবম্প্রকারের পাঠাগারের উদ্দেশ্য কি? নানা-প্রকারের শিক্ষণীয় পুস্তক যাহা ব্যক্তিবিশেষের কাছে থাকা সম্ভব নহে তাহা সাধারণের ব্যবহারের জন্য পাঠাগারে সংগৃহীত থাকে, উদ্দেশ্য সাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার করা। বিদ্যা লোকসমাজে নানা-প্রকারে বিস্তারিত হয়, উহা কেবল বিদ্যালয়ের গৃহমধ্যে আবদ্ধ থাকে না। বিদ্যার প্রধান উদ্দেশ্য হইতেছে যে, শিক্ষার্থী নিজের জীবনের সমস্ত কর্ম্মকে কেবল গ্রাসাচ্ছাদনের উপায় স্বরূপ না ভাবিয়া সর্ব্বাঙ্গীণ ভাবে দেখিতে পারে। বর্ত্তমানের বিদ্যালয়-সমূহে, বিশেষতঃ এদেশে যে শিক্ষা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাতে একদর্শিত্ব প্রাপ্ত হইতে হয়, জীবনের সর্ব্বদিককে দেখাইবার পন্থা নাই।

অতএব বিদ্যাপীঠে যাহা প্রাপ্ত হওয়া যায় না বা লাভ করা সম্ভব নহে, অন্যত্র তাহা পরিপূরণ করা প্রয়োজন। এ জন্য উচ্চশিক্ষা বিস্তার হেতু এমন প্রকারের গ্রন্থাসমূহ লোক-সমাজে প্রচারের প্রয়োজন, যাহাতে উক্ত প্রকারের অভাব পরিপূরিত হইতে পারে। সাধারণের ব্যবহারের জন্য পাঠাগার এবম্প্রকার একটি পন্থা। পাঠাগারের শিক্ষার্থীকে উহার বিদ্যা সম্পূর্ণ করিবার জন্য তথায় যাইয়া নিজের শক্তি,হয় ত অর্থ এবং সময় নিয়োজিত করা প্রয়োজন। তাহার নানা-প্রকারের উচ্চ-চর্চ্চার পুস্তক পাঠ করার প্রয়োজন, পৃথিবীর নানা-প্রকারের সংবাদ অবগত হওয়া প্রয়োজন। ইহার ফলে, তাহার মন উন্নত হইবে এবং নিজের কর্ম্মকে বোধগম্য করিতে পারিবে।

এক্ষণে এ স্থলে বিবেচ্য, পাঠাগার অর্থাৎ "লাইব্রেরী" কাহাকে বলে? ইহা কেবল পুস্তক ও সংবাদপত্র পাঠের স্থল নহে। ইহার পুস্তকাবলী, যথায় তাহা রক্ষিত হয়, যে তাহার হিসাব রাখে,—ইমারত এবং কর্ম্মাধ্যক্ষ অর্থাৎ "লাইব্রেরিয়ান" এই সকলের সমষ্টিকে পাঠাগার বা লাইব্রেরী বলে। এ বিষয়ের শেষ বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, পাঠাগারের ভিত্তি হইতেছে সাধারণের ব্যবহারের জন্য পুস্তকাবলী। কিন্তু কথা হইতেছে, পুস্তক কাহাকে বলে? ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, যাহাতে মনের চিন্তা নানা প্রকারের শব্দের দ্বারা লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে, তাহাই পুস্তক; পুস্তক দ্বারা উচ্চ-চর্চ্চা, বিজ্ঞান আবিষ্কার প্রভৃতির সংবাদ লোকগোচরীভূত হয়। এই উপায়ে উচ্চশিক্ষা লোকমধ্যে প্রচারিত হয় এবং সভ্যতাও বিস্তৃতিলাভ করে।

এই জন্য পাঠাগারের বা সংগৃহীত পুস্তকাবলীর আগার—আবহমান সভ্যজাতিসমূহের মধ্যে স্থাপিত হইয়াছে ও খ্যাতি লাভ করিয়াছে।

সাধারণের শিক্ষার জন্য এবম্প্রকারের পাঠাগার স্থাপন প্রথা অতি প্রাচীন। কিংবদন্তী অনুসারে এই তথাকথিত প্রাচীন পাঠাগার নানা প্রকারের—যথা—দেবতাদের—আদমের পূর্ব্বে ও তাহার সমসাময়িক পাঠাগার; জলপ্লাবনের পূর্ব্বের জননায়কদের পাঠাগার; এবং আমাদের প্রাচীন চলমান পাঠাগার—বেদ। এবম্প্রকারের তথাকথিত ও কল্পিত প্রাচীন পাঠাগারের বিস্তৃত তালিকাও বাহির হইয়াছে। পূর্ব্বে আদম হইতে নোয়া পর্য্যন্ত যত জননায়ক আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের সময়ের তথাকথিত পাঠাগার সমূহ "প্রাচীন" নামে অভিহিত হইত, কিন্তু বর্ত্তমানে তুলনামূলক মনস্তত্ত্ব (Comparative psychology) ও তুলনামূলক প্রাচীন গল্প (Comparative mythology) সমূহের মধ্যে অনুসন্ধান করার ফলে স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, আদমের পূর্ব্বেও এই প্রকারের পাঠাগার ছিল। ব্রহ্মা, ওডিন (Odin), থথ্ (Thoth) এবং যে সব দেবতা জ্ঞানস্বরূপ বা শব্দস্বরূপ বলিয়া প্রথিত হইয়াছেন, প্রাচীন গল্পে তাঁহাদের অনেক সময়ে পাঠাগারের প্রতিমূর্ত্তি বলিয়া কল্পিত করা হয়।

দেবতাদের মধ্যে ব্রহ্মা ও ওডিনের পাঠাগার বিশেষ বিখ্যাত। ব্রহ্মার পাঠাগার বেদ ছিল বলিয়া কিম্বদন্তী আছে। ইহা নাকি সর্ব্বজ্ঞাতা ব্রহ্মার স্মৃতিতে প্রথমে আবদ্ধ ছিল। মনস্তত্ত্বের বিচারের রাস্তা দিয়া আমরা স্মরণশক্তির উৎপত্তিস্থলে পৌঁছাই এবং ইহাই মানবের স্মৃতি। পুস্তক ও স্মৃতি পাঠাগারের যথার্থ তথ্য শিক্ষা করিতে সাহায্য করে। আবার এই রাস্তা দিয়াই আমরা সঙ্কেত ভাষার প্রকৃতি বুঝিতে সমর্থ হই। এই সঙ্কেতই হস্তলিখিত পুস্তকের উৎপত্তিস্থল।

এই প্রকারের বিচারে আমরা জ্ঞানের উৎপত্তি স্থলে উপনীত হই। জ্ঞানকে বিকীর্ণ করিবার জন্য পুস্তক হইতেছে তাহার আধার। সর্ব্ব দ্রব্যেরই প্রারম্ভ অতি ক্ষুদ্র অবস্থায় সংঘটিত হয়, পরে অতি উৎকৃষ্ট ও উচ্চদ্রব্য স্বভাবতঃই অতি জটিলাকার ধারণ করে। জীবজগতের সঙ্কেত ভাষা অভিব্যক্তি দ্বারা মানবের উচ্চশ্রেণীর ভাষায় পরিণত হয় এবং একটি কোন ভাষায় তৎভাষীদের সর্ব্বপ্রকারের অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ হইয়া তাহাদের সভ্যতার নিদর্শন প্রকট করে।

পুঞ্জীকৃত মানব-অভিজ্ঞতা হইতেছে সভ্যতার মেরুদণ্ড স্বরূপ। এই পুঞ্জীকৃত মানব-সভ্যতার একটি প্রকৃষ্ট নিদর্শন হইতেছে সাহিত্য। যে ভাষায় যত প্রকারের মানব-অভিজ্ঞতার বিষয় লিপিবদ্ধ আছে, সেই জাতির কীর্ত্তির নিদর্শন ততই প্রকৃষ্ট। এই লিপিবদ্ধ মানববুদ্ধির কীর্ত্তির বিবরণী যথায় বসিয়া পাঠ করা হয়, তাহাকেই পাঠাগার কহে। পাঠাগারের ইহাই গৌরবের বিষয় যে, সভ্যতার উন্নতির জন্য এই প্রকারের প্রতিষ্ঠানগুলি তাহার অত্যাবশ্যক যন্ত্রস্বরূপ কার্য্য করে।

---

* মদনমোহন লাইব্রেরীর পঞ্চম বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণ।

এই জন্যই সভ্য মানবজাতিসমূহ চিরকাল পাঠাগারের সমাদর ও স্থাপনা করিয়া আসিয়াছে। ইতিহাস সাক্ষ্য দিতেছে, যে জাতি যত পাঠাগার স্থাপন করিয়াছে, সে জাতির সভ্যতার দাবিও তত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। প্রাচীন বাবিলনের ইষ্টকে লিখিত পুস্তকের পাঠাগার, মিশরে টলেমীদের জগদ্বিখ্যাত পাঠাগার ও তৎপরে গ্রীস ও রোমের এবম্প্রকারের প্রতিষ্ঠানগুলি, মধ্যযুগে মুসলমান দেশসমূহের পাঠাগারগুলি, প্রাচীন চীনের হানরাজবংশের পাঠাগার—এই সব তৎতৎ জাতির সভ্যতার মাপকাটিরূপে ইতিহাসে সাক্ষ্যদান করিতেছে। আর আমাদের ভারতবর্ষও এ বিষয়ে পশ্চাৎপদ ছিল না। নালন্দা ও ওদন্তপুরীর পাঠাগারের সংবাদ ইতিহাসে পাওয়া যায়। কিন্তু এবম্প্রকারের বহু সংখ্যক পাঠাগার—যাহার দ্বার বিদ্যার্থীদের জন্য উন্মুক্ত ছিল—নিশ্চয়ই এদেশে ছিল। তৎপরে জয়পুর, ত্রিবাঙ্কুর প্রভৃতি রাজ্যে এমন অনেক সংস্কৃত পুস্তকের পাঠাগার আছে, যাহাতে মোক্ষমূলারের অনুমানে ১৫ হাজার পর্য্যন্ত পুস্তক সংগৃহীত হইয়া রহিয়াছে।

পাঠাগারের উৎপত্তি ও উদ্দেশ্যের বিষয় এতক্ষণ আলোচিত হইল। কিন্তু পাঠাগার কি প্রকারে পরিচালিত হইবে, তাহা বৈজ্ঞানিক গবেষণার বিষয়। একটি ঘর ভাড়া করিয়া, কতকগুলি পুস্তক সংগ্রহ করিয়া খাতা খুলিয়া বহি পড়িতে দিলেই পাঠাগারের উদ্দেশ্য ও কর্ত্তব্য সফল হয় না। কি প্রকারের বহি সংগ্রহ করিতে হইবে ও তাহা কোন শ্রেণীভুক্ত করিতে হইবে ও কি উপায়ে তাহা তালিকাভুক্ত করিতে হইবে, ইহা সহজ কর্ম্ম নহে। বর্ত্তমান জগতের বড় বড় পাঠাগারের পরিচালকরা অতি বিদ্বান ব্যক্তি বলিয়া শিক্ষিত মণ্ডলীমধ্যে পরিজ্ঞাত আছেন। যথা নিউইয়র্কের সাধারণ পাঠাগারের পরিচালক যিনি, তিনি মহাপণ্ডিত ব্যক্তি। তৎপরে একটি বড় পাঠাগারের বিভিন্নবিভাগে তৎবিভাগীয় চর্চ্চার বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত ব্যক্তি কর্ম্মাধ্যক্ষরূপে নিযুক্ত আছেন —যথা বার্লিনের সাধারণ পাঠাগার। এই বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতরা অনেক স্থলে অধ্যাপকরূপে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাদান করেন। যথা বার্লিন পাঠাগারের, সংস্কৃত বিভাগে সংস্কৃত অধ্যাপক Dr Nobel এবং আরবী বিভাগে আরবীভাষাবিৎ Dr. Weir এবং ইতিহাস বিভাগে এবম্প্রকারের এক জন লোক নিযুক্ত আছেন। পাঠার্থী তাঁহাদিগের নিকট যাইলে তাহার কোন্ বিষয়ের পাঠের জন্য কি পুস্তক পাঠ করিতে হইবে এবং এ বিষয়ে নূতন কি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে, এই প্রকারের নানাবিধ সংবাদ তাঁহাদিগের নিকট প্রাপ্ত হয়েন। তৎপর পুস্তকসমূহকে তালিকাভুক্ত করাও বৃহৎ ব্যাপার। এ বিষয়ে আমেরিকায় দুই প্রকারের রীতি প্রচলিত আছে, তথায় পুরাতনটি Decimal Systemরূপে নূতন প্রথাটি Alphabetical order Systemরূপে অভিহিত হয়। আবার জার্ম্মাণী সুইডেন প্রভৃতি দেশে একই পাঠাগারে দুই প্রকার উপায়ে পুস্তককে তালিকাবদ্ধ করা হয়; যথা, প্রথমে একটি পুস্তককে তাহার বিষয়ানুযায়ী বিশেষে তালিকায় উল্লিখিত করা হয়, ইহাকে fact catalog এবং আবার নামানুসারে alphabetical হিসাবে উল্লিখিত করা হয়। জার্ম্মাণীর এই প্রথাতে পুস্তক সহজেই বাহির করা যায়।

সর্ব্বশেষে পাঠাগারের কর্ম্মকে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে পরিচালনার জন্য আমেরিকায় "Library school" সংস্থাপিত হইয়াছে। তথায় যাঁহারা পাঠাগার পরিচালনার কর্ম্মকে অথবা সেই প্রতিষ্ঠানের কোন কর্ম্মকে অর্থোপার্জ্জনের উপায় স্বরূপ গ্রহণ করিতে চাহেন, তাঁহারা তাহা বৈজ্ঞানিক উপায়ে শিক্ষা করেন। এই পাঠাগার বিদ্যালয়রূপ প্রতিষ্ঠান বিগত শতাব্দীর শেষ চতুর্থাংশে সৃষ্ট হয়। তথায় কি প্রণালীতে লাইব্রেরী Research অর্থাৎ পাঠাগারের সংগৃহীত পুথিসমূহ পাঠ করিয়া তাহার ব্যাখ্যা বা অনুবাদ করিতে হয়, তাহার শিক্ষা দেওয়া হয়।

ইহাই হইল মোটামুটি পাঠাগার-তত্ত্ব। এক্ষণে কথা হইতেছে, পাঠাগারের উদ্দেশ্য কি করিয়া সফল করা যায়? প্রথমেই উক্ত হইয়াছে যে, জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞানের প্রচার করাই পাঠাগারের মুখ্য উদ্দেশ্য। ইহার জন্য নানা প্রকারের পুস্তকাবলীর সংগ্রহ প্রয়োজন এবং তাহা যাহাতে সহজ উপায়ে লোকমধ্যে পাঠ্যসাধ্য হয়, তাহার চেষ্টার প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য বিভিন্ন উপায় উদ্ভাবন করা হইয়াছে। প্রথম উপায় যাহা য়ুরোপ ও আমেরিকায় নিয়োজিত হইয়াছে, তাহাতে প্রত্যেক বড় সহরে একটি করিয়া বৃহৎ পাঠাগার সংস্থাপন, লোক তথায় গিয়া বহি ও সংবাদপত্রাদি বসিয়া পাঠ করিতে পারে অথবা জামিন দিলে পুস্তক গৃহে আনিতে পারে। য়ুরোপের এই সব পাঠাগার, শাসন বিভাগ দ্বারা স্থাপিত এবং অনেক দেশে ইহা প্রায়ই বিশ্ববিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট; অন্যদিকে ধনী-প্রধান আমেরিকাতে আন্‌দ্রুকারনেগির ন্যায় নাগরিকের বদান্যতায় প্রত্যেক সহরে সাধারণের পাঠার্থ এবম্প্রকারের একটি করিয়া পাঠাগার স্থাপিত হইয়াছে। এই সব পাঠাগার বিশ্ববিদ্যালয় বা গভর্ণমেণ্ট সংশ্লিষ্ট নহে। এইরূপ পাঠাগারে স্বদেশীয় ভাষায় অনূদিত সর্ব্ববিষয়ের ও সর্ব্বদেশের সাহিত্য প্রাপ্ত হওয়া যায়। ফলে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বাহিরে যাঁহারা থাকেন, তাঁহারাও অবসর মত এই সব স্থান হইতে বিভিন্ন পুস্তকাদি লইয়া পড়িতে পারেন ও নিজের জ্ঞানভাণ্ডার বৃদ্ধি করিতে পারেন।

ইহা ব্যতীত য়ুরোপের মহাদেশে প্রত্যেক সহরের পল্লীতে ও ক্ষুদ্র গ্রামেও ছোট ছোট পাঠাগার আছে, তথায় কিঞ্চিৎ টাকা জমা দিয়া লোক পুস্তক গৃহে আনিয়া পড়িতে পারে। অবশ্য এই সব পাঠাগারে সাহিত্য সম্বন্ধীয় পুস্তকই থাকে। উল্লিখিত এই দুই প্রকারের পাঠাগারকে ইংরাজীতে Circulating Library বলে, তৎপরে এই সঙ্গে আর একটি পদ্ধতি প্রচলিত আছে, ইহাকে Travelling Library System বলে। এই পদ্ধতি ইংলণ্ডে, স্কটলণ্ডে একশত বৎসর অগ্রে প্রচলিত হয়, আমেরিকায় ৩০।৩৫ বৎসর পূর্ব্বে প্রচলিত করা হয়; নিউইয়র্ক ষ্টেট সাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের জন্য সর্ব্বপ্রথমে এই পদ্ধতি গ্রহণ করে, পরে সর্ব্বত্রই তাহা প্রচলিত হয়। এক্ষণে এই পদ্ধতি প্রচলনের বিষয় আমেরিকা সর্ব্বপ্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে। আর ভারতবর্ষের মধ্যে বরদারাজ্যে আমেরিকার নকল করিয়া তাহা প্রচলিত করা হইয়াছে। এই পদ্ধতি অনুসারে একটি বড় সহরের কেন্দ্র পাঠাগার হইতে পুস্তক বিভিন্ন গ্রামে লোকের পাঠের জন্য ধার দেওয়া হয়। কোন গ্রামের কোন ক্লাব বা প্রতিষ্ঠান বা স্থানীয় ক্ষুদ্র পাঠাগার আবশ্যক পুস্তক ধারের জন্য বৃহৎ কেন্দ্রস্থলে কোনও বিশ্বাসী লোকের জামিন দিয়া আবেদন করিলে একটি বাক্সে ২৫—৩০খানি পুস্তক পুরিয়া পাঠাইয়া দেওয়া হয়। ইহার দ্বারা অতি দূর ও ক্ষুদ্র গ্রামের লোকের মধ্যেও শিক্ষা-বিস্তারের সহায়তা করে। বরোদা রাজ্যের পাঠাগার বিভাগ ১৯১১ খৃষ্টাব্দে এই পদ্ধতি প্রচলন করে। বরোদারাজ পাশ্চাত্যদেশের পাঠাগার-পদ্ধতির উপকারিতা প্রদর্শন করিয়া এক পাঠাগারের Mr. Wiliam Alanson নামে কোনও বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিকে এই প্রতিষ্ঠান-সংস্থাপনের জন্য স্বরাজ্যে আনয়ন করেন। এক্ষণে ভারতের কোন কোনও সমিতি এই Traveling Libraryর উপকারিতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাহা প্রচলিত করিতেছে। এই পদ্ধতি প্রত্যেক শিক্ষিত সামাজিক কর্ম্মীর নিকট আদৃত হয়। কারণ, এই সস্তা ও সহজ উপায়ে দূরস্থিত লোকের নিকট শিক্ষার উপকরণ উপনীত করা যায়। তৎপর আরও দুই প্রকার পাঠাগার আছে, যথা—Free Library System যাহা সকলেই ব্যবহার করিতে পারে। পূর্ব্বোক্ত আন্‌দ্রুকারনেগি প্রতিষ্ঠিত আমেরিকার সাধারণ পাঠাগারগুলি এই শ্রেণীভুক্ত। আর দ্বিতীয়টি Aided Library System য়ুরোপের বৃহৎ পাঠাগারগুলি এই শ্রেণীভুক্ত। এই পাঠাগারগুলি ষ্টেটের সাহায্য লইয়া চলে।

বরোদাতেও ষ্টেটের সাহায্য লইয়া মফঃস্বল,সহর,গ্রামে সর্ব্বত্র পাঠাগার প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে।

এবম্প্রকারে পৃথিবীর সর্ব্ব সুসভ্য দেশে জনসাধারণের জ্ঞানের ভাণ্ডার বৃদ্ধি করিবার জন্য পাঠাগার প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। মানবজাতি যে প্রকারে প্রাকৃতিক অবস্থা হইতে সভ্যতার উচ্চস্তরে উঠিতেছে, তাহার সভ্যতাও যে প্রকারে জটিলাকার ধারণ করিতেছে, তদ্রূপ চর্চ্চার অধিনায়কত্বও দুই এক জনের হস্ত হইতে বহুলোকের হস্তে যাইতেছে। প্রাচীন কালে ও মধ্য-যুগে বিদ্যাচর্চ্চা জনকতক মনোনীত ব্যক্তির হস্তে ন্যস্ত ছিল। ভারতের তপোবনে ঋষিরা বিদ্যার চর্চ্চা করিতেন। শাস্ত্র, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতির চর্চ্চার অধিকারী কেবল তাঁহারাই ছিলেন। তপোবনের বাহিরে যে বিপুল জনসঙ্ঘ ছিল, তাহারা সে অমৃতের অধিকারী ছিল না। ব্রহ্মবিদ ও শাস্ত্রজ্ঞ লোক সমাজের মধ্যে জনকতক ছিল, আর সমস্ত দেশ তমসাচ্ছন্ন ছিল। প্রাচীন মিশরেও এবম্প্রকারের বিদ্যাচর্চ্চার অধিকার মন্দিরের পুরোহিতদের মধ্যে আবদ্ধ ছিল। আর গ্রীসেও তদ্রূপ। তথাকার দর্শন ও বিজ্ঞানচর্চ্চা, তাহা Stoa এবং Academyর প্রাচীরের মধ্যে গণ্ডীভূত ছিল। জগৎ সক্রেটিস্ প্লেটো এরিষ্টটলের নাম শুনিয়াছে ও তাঁহাদের জ্ঞান-চর্চ্চাকে গ্রীসের সভ্যতার মাপকাটিরূপ জানিতে শিখিয়াছে, কিন্তু গ্রীসের জনসাধারণ কি অজ্ঞতা ও বর্ব্বরতা সহ দিনযাপন করিত, তাহার সংবাদ কয় জন রাখেন? তৎপরে মধ্যযুগের জ্ঞানচর্চ্চা য়ুরোপের সাধুদের মঠমধ্যে নিবদ্ধ ছিল। তৎকালের জ্ঞানচর্চ্চা Cluny এবং Clavairanty নামক মঠ (monastry) প্রভৃতির অভ্যন্তরে সঞ্চিত হইত এবং সেই সব স্থান হইতে যে কিঞ্চিৎ জ্ঞানের রশ্মি বাহিরে আসিতে পারিয়াছিল, তাহারই প্রভাবে বর্ত্তমান য়ুরোপের সভ্যতার উৎপত্তি হয়। আমাদের ভারতে বৌদ্ধযুগেও তদ্রূপ বৌদ্ধ-জ্ঞানচর্চ্চা সঙ্ঘাবাসের ভিতর নিবদ্ধ থাকিত এবং যখন নানা কারণে সঙ্ঘাবাসগুলি বিনষ্ট ও বিলুপ্ত হইল, তখন বৌদ্ধ-চর্চ্চাও ভারত হইতে অন্তর্হিত হইয়া গেল। বাঙ্গালায় মধ্যযুগে অর্থাৎ মুসলমান আধিপত্যের কালে জ্ঞান মিথিলা, নবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানের টোলের মধ্যে গণ্ডীভূত থাকিত। জ্ঞান এই উপায়ে গণ্ডীভূত হওয়ার জন্য তাহা লোকমধ্যে সভ্যতা-বিস্তারের অন্তরায়স্বরূপ কার্য্য করে। উনবিংশ শতাব্দীতে মানবজীবনে ও মানসিক ক্ষেত্রে এক বিপুল বিপ্লব সাধিত হয়। মানব সর্ব্বপ্রকারের পুরাতন গণ্ডী ও অন্তরায় বলপূর্ব্বক ভগ্ন করিয়া নূতন জীবন ও নূতন আলোক প্রাপ্ত হইবার জন্য লালায়িত হয়।

এই নবযুগের নবীন বার্ত্তা ঘোষণা করিল, সকল মানবই সমান, সকলেরই সমান অধিকার। এই নবীন বাণী প্রচার করিল যে, সভ্যতা ও জ্ঞানালোক সকলকারই গৃহে সমানভাবে পৌঁছাইয়া দিতে হইবে। সকলকে সমানভাবে বাড়িতে দাও, ধর্ম্মের, জ্ঞানের, সমাজের, রাজনীতি-ক্ষেত্রের আভিজাত্য ভাঙ্গিয়া দাও—অগ্রসর হও।

এই নবীনাদর্শে মাতিয়া নবীন য়ুরোপ টলটলায়মান হইয়াছিল। পুরাতন সমাজ ভাঙ্গিয়া নূতন সমাজ গঠিত হইল। পূর্ব্বে যাহা মুষ্টিমেয় মনোনীত ব্যক্তির অধিকাররূপে নিবদ্ধ ছিল, তাহা সকলের সম্পত্তি করিয়া দিবার চেষ্টা করা হয়। এই জন্যই Free Primary Education, Public Libraries, University extension lecture series Circulating Free Scientific Libraries প্রভৃতি নানা লোকশিক্ষাকর অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি হয়। এই প্রকারে জ্ঞান-চর্চ্চা দুই এক জনের মধ্যে নিবদ্ধ না থাকিয়া সাধারণের সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হওয়ার জন্য লোকমধ্যে তাহা প্রচার হওয়ায় সভ্যতা বিস্তৃতি লাভ করে।

বিংশ শতাব্দী উনবিংশ শতাব্দীর আদর্শের পূর্ণতা সাধন করিবার চেষ্টা করিতেছে। এ যুগের বাণী বলিতেছে যে, মানবকে কেবল রাজনীতিক সাম্য দিয়া ক্ষান্ত হইলেই চলিবে না। তাহাকে সামাজিক ও অর্থনীতিক সাম্য দিতে হইবে।

এই বাণী বলিতেছে, মানবকে পূর্ণ মুক্তি দাও। জ্ঞানের ভাণ্ডার সকলের দ্বারে সমানভাবে উপনীত কর, সকলকে সমানভাবে বাড়িতে ও জীবনযাপন করিতে দাও। এক দেশে এক জাতির মধ্যে কতকগুলি জ্ঞানী, ক্ষমতাশালী ও বর্দ্ধিষ্ণু ও কতকগুলি নিরাশ্রয়, অজ্ঞ, ক্ষমতাবিহীন লোক থাকা সমাজের ও মানবের অকল্যাণকর।

যে জাতি যত জ্ঞানালোকে আলোকিত, সে জাতি সভ্যতাস্তরে ততই উন্নীত হইয়াছে। বর্ত্তমানে সভ্যতার মাপকাঠী সঙ্ঘাবাস বা মঠ বা Academyর ভিতর নিহিত নহে। একটি জাতির Culture অর্থাৎ চর্চ্চা তাহার ভাবুকগণের জ্ঞানস্বরূপ, তাহা দ্বারা সেই জাতির ভাবুকতার উচ্চতা মাত্র পরিমিত হয়; তাহা সেই জাতির সর্ব্বসাধারণের সভ্যতার মাপকাঠী নহে। কিন্তু যখন ভাবুকদের সেই জ্ঞান সর্ব্বসাধারণের কল্যাণকল্পে নিয়োজিত হয়, অর্থাৎ যখন ভাবুকদের জ্ঞানকে সমাজের কর্ম্মে নিযুক্ত করা হয় ও তাহার ফলে সাধারণের বিদ্যা, জ্ঞান, স্বাচ্ছন্দ্য, স্বাস্থ্য, ঐশ্বর্য্য ও সর্ব্বপ্রকারের কল্যাণ ও উন্নতি সাধিত হয়, তখন সমাজের কর্ম্মে নিয়োজিত সেই জ্ঞানকে, সেই জাতির Civilisation বা সভ্যতা বলে। এক কথায় জ্ঞানচর্চ্চাকে মানবের সেবায় নিযুক্ত করাকে সভ্যতা বলে।

মানব-মস্তিষ্ক-প্রসূত জ্ঞানরাশিকে মানবের দৈনিক জীবনের উপকারিতার জন্য তাহার সেবায় নিযুক্ত করিতে হইবে। এক্ষণে কথা হইতেছে, তাহা কিরূপে করা যায়? এ কথার উত্তরে বলা যায় যে, তাহার প্রথম উপায় হইতেছে যে, সর্ব্বসাধারণের মধ্যে নানাপ্রকারে জ্ঞান প্রচার করা কর্ত্তব্য। বিদ্যালয়ের কতিপয় পুস্তক পাঠ করিলেই বিদ্যা বা জ্ঞান হয় না। জ্ঞানকে নানা স্থান হইতে নানাভাবে আহরণ করিতে হইবে এবং জ্ঞান দ্বারা প্রকৃতিকে স্বীয় সেবায় নিয়োজিত করিতে হইবে। সাধারণের পক্ষে সহজ ও অল্পব্যয়ে জ্ঞানসঞ্চয়ের একটি উপায় হইতেছে পাঠাগার। যে দেশে পাঠাগারের অস্তিত্ব যত পরিমাণে বিদ্যমান, সেই দেশে শিক্ষাও তত পরিমাণে বিস্তৃত। পাঠাগারের বিস্তৃতি বর্ত্তমান সময়ের কোন একটি জাতির শিক্ষার মাপকাঠি। কিন্তু কেবল পাঠাগার স্থাপন করিলেই হইবে না, মনোনীত পাঠ্যপুস্তক-সমূহ সংগ্রহ করিতে হইবে। শুধু কতকগুলি নাটক বা নভেল পড়িলেই জ্ঞানলাভ হয় না। উচ্চাঙ্গের সাহিত্য, বিজ্ঞান, ভ্রমণ, ইতিহাস, মানবাভিজ্ঞতার পুস্তকসমূহও পাঠ করিতে হইবে। পরলোকগত শ্রদ্ধাস্পদ অধ্যাপক Lester, F. Ward—যাঁহাকে আমেরিকায় Father of American Sociology বলে—তিনি বলিয়াছেন যে, মানবকে উন্নীত করিবার জন্য তাঁহার মস্তিষ্কে বাল্যকাল হইতে বৈজ্ঞানিক সংবাদসমূহ প্রবেশ করাইয়া দাও। যুগযুগান্ত ধরিয়া মানবের অভিজ্ঞতা-সংবাদের মর্ম্ম সাধারণের মস্তিষ্কে প্রবেশ করাইয়া দেওয়া প্রয়োজন। মাথার Brain Cell সমূহের মধ্যে সর্ব্বপ্রকারের সংবাদ ঢুকাইয়া দেওয়া দরকার।

এই জন্য আমাদেরও জাতীয় দৈনিক জীবনে সভ্যতার সুফল ভোগ করিবার জন্য তদনুরূপ ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। আমাদের আর ধর্ম্ম-প্রধান জাতি এবং ধর্ম্ম ও নীতির আদর্শস্থল বলিয়া অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া কূপমণ্ডুকের ন্যায় ঘরে বসিয়া থাকিলে চলিবে না। হিন্দু জাতি মরিতে আরম্ভ করিয়াছে, জাতীয় সভ্যতার নিম্নস্তরে পড়িয়া রহিয়াছে। যদি ভারতীয় জাতিকে বাঁচিতে হয়, তাহা হইলে তাহাকে নূতন আদর্শে ও নূতনভাবে গঠিত হইতে হইবে। কিন্তু এ বিষয়ের একটি প্রধান অন্তরায় আমাদের ঘোর অজ্ঞতা। আমরা ঘোর তিমিরাচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছি। আমাদের মন অন্ধকারে পরিপূর্ণ।

শিক্ষার দ্বারা মনকে উন্নত করিতে হইবে। জ্ঞানচর্চ্চাকে বাস্তব

ব্যবহার দ্বারা দৈনিক জীবনের সেবায় লাগাইতে হইবে, এবং জাতীয় সভ্যতাকে উচ্চাবস্থায় আনয়ন করিতে হইবে। বিদ্যালয়ের বিদ্যায় শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না; বিশেষতঃ ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের বিদ্যা অতি সঙ্কীর্ণ। এই সঙ্কীর্ণ বিদ্যার পূর্ণতা লাভ করিবার জন্য বাহির হইতে জ্ঞানসঞ্চয়ের প্রয়োজন। উচ্চ-চর্চ্চার শিক্ষার্থীর এ বিষয়ে বড়ই অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। দুঃখের বিষয়, উচ্চ-চর্চ্চা (Research) করিবার জন্য সমগ্র ভারতবর্ষে একটি বড় ভাল লাইব্রেরী নাই।

অবশ্য ইহার উত্তর এক কথায় দেওয়া যাইবে যে, আমরা নাচার, আমাদের হস্তে ষ্টেট নাই। কিন্তু তাহা বলিলেই যথেষ্ট হয় না। কথা এই যে, আমরা এ বিষয়ে কি করিতেছি? আমেরিকার Cornell বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক Prof. Jenks ও Columbiaর নৃ-বিজ্ঞানের অধ্যাপক Prof. Boas তৎস্থানের ভারতীয় ছাত্রদিগকে বলিয়াছিলেন যে, তোমাদের Race capacity কোথায়, তাহা দেখাও? চীন, জাপান দেখাইতেছে, তোমাদের সে শক্তি ও গুণ কোথায়? আর আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি, তুর্কী কি ভাবে পুনরুত্থান করিতেছে। কথাটা সত্য, আমাদের নিজেদের চেষ্টায় বড় হইতে হইবে, পরে করিয়া দিবে না ও হাহুতাশ করিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না, নিজেদের যদি শক্তি থাকে, তাহা হইলে বাধাবিঘ্ন অন্তরায়রূপে কার্য্য করিতে পারে কি? আমাদের মুক্তি আমাদের হস্তে রহিয়াছে। এই সম্পর্কে উপস্থিত ক্ষেত্রের বিচার্য্য জনশিক্ষা। ইহার জন্য আমেরিকার মধ্যপশ্চিমের ও পশ্চিমের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি সাধারণের জন্য অবৈতনিকভাবে উন্মুক্ত রহিয়াছে। তদ্ব্যতীত তথায় সাধারণের বিনা-ব্যয়ে শিক্ষার জন্য University Extension Lecture, Night School, Summer School, নানা পাঠাগার ও বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। আমাদের দেশে এই সব ব্যবস্থার উপায় উপস্থিত ক্ষেত্রে না হইলেও অনেক বিষয়ের ব্যবস্থা করা আমাদের হাতের ভিতর আছে।

ক্ষুদ্র বরোদারাজ্যে যে পদ্ধতি প্রচলিত আছে, তাহাও আমাদের সাধ্যায়ত্ত। চাই আমাদের চারিদিকে Circulating Library স্থাপন, চাই Travelling Library স্থাপন, চাই Free Library সমূহ স্থাপন; এবং এই সব পাঠাগারকে পরস্পরের সহিত সম্মিলিত করিয়া তাহাদের মধ্যে পুস্তকের আদান-প্রদানের ব্যবস্থা করা। আর এই সব পাঠাগারে উৎকৃষ্ট দরের সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ক পুস্তক সংগ্রহের প্রয়োজন এবং স্বদেশী ভাষায় নানাপ্রকারের বৈজ্ঞানিক, ঐতিহাসিক পুস্তকের প্রচলন প্রয়োজন, যদ্দ্বারা সকলেই জগতের আবহাওয়া ও সংবাদ জানিতে পারে।

কিন্তু ইহার জন্য অর্থের প্রয়োজন। হয় ত চারিদিকে State aided Library স্থাপন বর্ত্তমান অবস্থায় সম্ভব নহে, কিন্তু আমাদের দেশের ধনবান্‌গণের দ্বারা সে অভাব কতক পরিমাণে পরিপূর্ণ হইতে পারে। আমেরিকায় ধনীরা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিতেছে, নানাপ্রকার বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিতেছে, Carnegi Joundation Institute, Rockfeller Institute প্রভৃতি ঐ সব ধনী দ্বারা স্থাপিত হইয়া মানবহিতার্থ কত বৈজ্ঞানিক উপায় উদ্ভাবন ও আবিষ্কার করিতেছে। য়ুরোপেও তদ্রূপ। আমাদের দেশের ধনবান্‌গণ দেশের দিকে দৃষ্টিপাত করুন, লোকের হিতার্থ মুক্তহস্ত হউন। যদি আমরা আমাদের Race-capacity না দেখাইতে পারি, নিজেদের মুক্তির উপায় নিজেরা না উদ্ভাবন করি, তাহা হইলে এ জগতে বাঁচিব কি প্রকারে?

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দত্ত।

সংগঠনের সদুপায়

মানুষের ক্ষুধা ও খোরাকীর কথা

মানুষের ক্ষুধা দ্বিবিধ;—(ক) মানসিক ক্ষুধা ও (খ) দৈহিক ক্ষুধা। এই দ্বিবিধ ক্ষুধার তাড়নাতেই অহোরাত্র মানুষ অতি কঠোর জীবন-সংগ্রামে লিপ্ত থাকিতে বাধ্য হইতেছে। মানুষের জীবন-সংগ্রামে জয়লাভের অর্থই উক্ত দ্বিবিধ ক্ষুধার পরিতৃপ্তি-সংসাধন। এই উদ্দেশ্য সাধনের উপায়সমষ্টির নামই মানুষের সভ্যতা।

(ক) দয়ামায়া, স্নেহমমতা, প্রীতি-প্রেম, আর হিংসা, দ্বেষ, ক্রোধ, অসূয়া, লোভ, কামাদি সু ও কুপ্রবৃত্তিগুলির পরিতৃপ্তিসাধন জন্য মনের যে আকাঙ্ক্ষা, তাহাই মানসিক ক্ষুধার লক্ষণ। এই মানসিক ক্ষুধার পরিতৃপ্তিসাধনটা প্রতিকূল ঘটনাবশতঃ সময়সাপেক্ষ হইলেও মানুষের জীবনধারণ বিষয়ে বিশেষ কোনও অসুবিধা ঘটে না। ইহা আত্মিক ব্যাপার, বক্ষ্যমাণ প্রসঙ্গে আমাদের সবিশেষ আলোচ্য নহে।

(খ) মানুষের দৈহিক ক্ষুধার ও তৎপরিতৃপ্তির জন্য যথাযোগ্য খোরাকীর বিষয়ই বর্ত্তমান প্রসঙ্গে আমাদের সবিশেষ আলোচনার বিষয়। দৈহিক ক্ষুধাটা মানুষের প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত,—

(১) বুভুক্ষা ও তৃষ্ণা; খোরাকী তাহার অন্ন ও জলাদি পানীয়।

(২) লজ্জা ও শীতাতপ-বোধ; খোরাকী তাহার বস্ত্র, আচ্ছাদন ও যোগ্য বাসস্থান।

(৩) রোগ ও ভোগ; খোরাকী তাহার আরোগ্য, বল ও স্বাস্থ্য-প্রদ ঔষধ ও পথ্য।

এতদ্ব্যতীত মানুষ আরও একটি ক্ষুধার তাড়নায় নিপীড়িত হয়, তাহাকে উপক্ষুধা বলা যাইতে পারে, তাহা মানস হইতে উৎপন্ন হইয়া প্রধানতঃ দৈহিক ক্ষুধার পরিতৃপ্তিসাধনোপযোগী উপাদানেই স্বকীয় তৃপ্তির পূর্ণতা-সাধন করিয়া থাকে। মানুষের এই উভয়লক্ষণাক্রান্ত মিশ্র উপক্ষুধাই বিলাসিতা নামে অভিহিত।

এই উপক্ষুধা মানুষের দৈহিক ক্ষুধার সঙ্গে বর্ত্তমানে এমনই ওতপ্রোতভাবে জড়াইয়া গিয়াছে যে, ইহাকে বাদ দিয়া বর্ত্তমান সময়ে দৈহিক ক্ষুধার বিষয় স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করাই চলে না। কাযেই এই উপক্ষুধার ও তাহার খোরাকীর বিষয়ও বিশেষভাবে এ প্রসঙ্গে আমাদের আলোচনা করিতে হইবে।

মানুষের দৈহিক ক্ষুধা ও উপক্ষুধার পরিতৃপ্তির জন্য খোরাকীর প্রয়োজনীয় উপাদান সংগ্রহের কথা

জীবমাত্রেরই দৈহিক ক্ষুধার তাড়না ও প্রেরণা কাল-নিরপেক্ষ। এই ক্ষুধার উদ্রেক হইলে পর ঠিক নির্দ্দিষ্ট সময়মধ্যে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ প্রয়োজনীয় খোরাকীর যোগান না দিলে, ইহা অতি উগ্র ও ভয়ানক হইয়া উঠে, ফলে দেহযন্ত্র ক্রমে বিকল ও অচল হইয়া জীবন-সংশয় উপস্থিত হয়। স্ব স্ব জীবনকে দেহ-প্রকোষ্ঠে রক্ষা করিয়া রাখিবার জন্য প্রকৃতির তাড়নাতে জীবমাত্রেই তাই আমরণকাল আহারের সন্ধানে ও সংগ্রহে ব্যাপৃত থাকিতে বাধ্য হয়।

সহজ বুদ্ধি ও সহজ সরল দৃষ্টিতে প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিলে বেশ বুঝিতে পারা যায়, একমাত্র তথাকথিত সভ্য-সমাজের অন্তর্ভুক্ত মানুষ ছাড়া অন্য আর সব জাতীয় জীবই প্রকৃতি-প্রদত্ত স্বাভাবিক অপক্ব, কাঁচা বা অবিকৃত খাদ্যাদি দ্বারাই উদরপূর্ত্তি করিয়া স্ব স্ব জীবন রক্ষা করিয়া চলিতেছে। সভ্য মানুষরাই মাত্র বিকৃত ও অস্বাভাবিক গ্রাসাচ্ছাদনের উপর নির্ভর করিয়া জীবনধারণে বাধ্য হইতেছে। মানুষের ইহা সৌভাগ্য কি দুর্ভাগ্যের পরিচায়ক, তাহার বিচারস্থল ইহা নহে। তবে অবস্থা যে ঐরূপ দাঁড়াইয়া গিয়াছে, ইহা প্রত্যক্ষ সত্য;

আর এই অস্বাভাবিক অবস্থা পরিহার করিয়া মানুষ যে সহজে ও অল্পকালে পুনঃ অন্যান্য জীবের মত তাহার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া যাইবে, তাহারও কোনরূপ আশু সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না। সুতরাং অস্বাভাবিক হইলেও মানুষের বর্ত্তমান এই জীবনপ্রণালীর ধারাটাকেই সত্যস্বরূপ মানিয়া লইয়া এতৎসম্পর্কিত আলোচনাতে আমাদিগকে লিপ্ত হইতে হইবে।

সভ্য নামে সুপরিচিত মানবসমাজ উক্তরূপ অস্বাভাবিক ও বিকৃত জীবনযাপন-প্রণালীর ধারাটাকে অব্যাহতরূপে চালাইয়া লইবার জন্যই (ক) কৃষি, (খ) শিল্প, (গ) বাণিজ্য প্রধানতঃ এই তিনটি বিষয়েরই সৃষ্টি ও পুষ্টিসাধনে তৎপর রহিয়াছে। উক্ত বিষয় তিনটি হইলেও, তাহারা পরস্পর সাপেক্ষধর্ম্মী। মূল কৃষি খনি ও প্রকৃতিজ উপাদান, শাখা—শিল্প; আর ফুলফলাদি বাণিজ্য। শিল্পের উপাদান আংশিকরূপে প্রাণী খনি ও প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন হইলেও প্রধানতঃ চাষাবাদমূলক কৃষি হইতেই সমুৎপন্ন হয়, এই কৃষিজ শিল্পপণ্যের বিনিময়ব্যাপার লইয়াই বাণিজ্যব্যাপার পরিচালিত হয়।

বিনিময়মূলক এই বাণিজ্যব্যাপারকে অপেক্ষাকৃত সহজ ও সরল পন্থায় পরিচালিত করিয়া ইহাকে কাল ও দেশপ্রসারী করিবার জন্য সভ্য মানুষ স্বীয় বুদ্ধিবৃত্তি খাটাইয়া অর্থনীতির বা বার্ত্তাশাস্ত্রের সৃষ্টি করিয়াছে। অতীতকালের কথা বলি না, বর্ত্তমান যুগের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া মনে হয়, উক্ত অর্থনীতিমূলক বাণিজ্যনীতিকে সম্প্রদায়বিশেষের স্বার্থসংরক্ষণ উদ্দেশ্যে চির-অব্যাহত রাখিবার জন্যই যেন সামরিক শক্তিমূলক যত সব বিভিন্ন দেশীয় রাজনীতির উদ্ভব হইয়াছে।

সে যাহাই হউক, সভ্য মানুষের জীবনধারণের প্রধান দুই উপায়—কৃষি ও শিল্প। এই কৃষি ও শিল্পের মূলভিত্তি মানুষের মানসিক শ্রম ও প্রধানভাবে দৈহিক শ্রম। আর কৃষি ও শিল্পের সাধনার জন্য মানুষের প্রয়োজন প্রধানভাবে ভূমি, গৃহ, স্থানীয় অনুকূল আবহাওয়া, প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ইত্যাদি। উক্তবিধ সব অবস্থার অনুকূলতায় মানুষ স্বীয় শ্রমসহযোগে কৃষি ও শিল্পকার্য্য দ্বারা সভ্যসমাজের নিত্য-নৈমিত্তিক প্রয়োজনীয় যে সব পণ্যের উৎপাদন, আহরণ, রূপান্তরসাধন করে, বাণিজ্যব্যপদেশে সে সকলের যথোপযুক্তরূপ বিনিময় জন্য বণিক্‌সঙ্ঘেরও বিশেষ প্রয়োজন।

কথিতরূপ কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যনীতি যে দেশীয় মনুষ্যসমাজে যতটা সুনিয়ন্ত্রিত ও সুপরিচালিত, জীবনসংগ্রামে তাহারা ততটাই জয়ী, সভ্যতার হিসাবে তাহারাই বর্ত্তমান যুগে ততটা সমুন্নত বলিয়া স্বীকৃত; আহারে বিহারে তাহারাই ততটা সুখী। সুতরাং উহাই এখন সভ্যতার মাপকাঠীরূপে পরিগণিত। মানুষমাত্রেই এখন উক্ত অবস্থাটাকে আদর্শরূপে লক্ষ্য করিয়া, তৎপ্রতি ধাবিত হইতেছে বা ধাবিত হইতে চাহিতেছে।

ভারতের বর্ত্তমান অবস্থার কথা

কালচক্রের আবর্ত্তনে ভারতবর্ষও উক্তরূপ জৈত্র যাত্রায় যোগদান করিয়া স্বীয় সভ্যতার খোরাকীর সংস্থান পূর্ব্বক আত্মরক্ষার প্রয়াস পাইতেছে। উপস্থিত আন্দোলনে এই প্রচেষ্টাই বিশেষভাবে আত্মপ্রকাশ করিতেছে। ইহা স্বাভাবিক। মানুষের দৈহিক খোরাকী যোগানের পথে যখন বিঘ্ন ও বাধা নিপতিত হয়, ফলে যখন অভাব ও অনটনের প্রকট ঘটিয়া তাহার জীবন-গ্রন্থিচ্ছেদনের উপক্রম ঘটে, অভাবের তাড়নাতেই তখন সেই বুভুক্ষু মানুষের সর্ব্বসমাজ জুড়িয়া বিষম এক আন্দোলন উপস্থিত হয়। ভারতের বর্ত্তমান আন্দোলনও ঠিক এই স্বাভাবিক নিয়মের অনুপ্রেরণাতেই আরম্ভ হইয়াছে। ভারতবাসীকে জীবন ধরিয়া বাঁচিয়া থাকিতে হইলে, উপস্থিত এই আন্দোলনকে যেরূপেই হউক, সাফল্যের গৌরবে সমুজ্জ্বল করিয়া তুলিতেই হইবে। এতদ্ব্যতীত রক্ষার আর অন্য উপায় নাই।

স্ব-শ্রমজাত উপাদান-পুষ্ট ভারতের আজ সর্ব্ববিধ দৈহিক খোরাকীরই দারুণ দৈন্য সমুপস্থিত। ফলে ভারতীয় মনুষ্য-সমাজের মৃত্যুও সন্নিকটবর্ত্তী বলিয়া অনুমিত হইতেছে, তাহা হইবেই; কারণ, দৈহিক খোরাকীর ক্রমিক অপচয় ও অভাব-অনটনে কোনও দেশীয় মানবসমাজই ধরাপৃষ্ঠে টিকিয়া থাকিতে পারে না। কাযেই ভারতবাসী মানুষও প্রয়োজনীয় খোরাকীর বন্দোবস্ত করিয়া উঠিতে না পারিলে, আর বেশী দিন টিকিয়া থাকিতে সমর্থ হইবে না। এখন প্রশ্ন এই, এত বড় দীর্ঘ-কালবিজয়ী যে ভারতবর্ষীয় মনুষ্য-সমাজ, তাহার আজ এই দারুণ দুর্দ্দশা সমুপস্থিত কেন?

ভারতবাসীর বর্ত্তমান দুর্দ্দশার কারণের কথা

কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য,—সভ্যসমাজ-সৌধের এই যে তিনটি প্রধান স্তম্ভ, বিদেশীয় সভ্যসমাজের সংঘর্ষসঙ্ঘাতে এ দেশীয় মনুষ্য-সমাজের উক্ত ত্রিস্তম্ভই আজ শিথিলমূল হইয়া পতনোন্মুখ। ফলে এ দেশবাসীর সর্ব্বনাশ আসন্নপ্রায়। তাই বর্ত্তমান চাঞ্চল্যসূচক আন্দোলনের উৎপত্তি। ভারতের শিল্প আর বাণিজ্য ত বিলুপ্তপ্রায়। কৃষিই এ দেশবাসীর বর্ত্তমানে একমাত্র জীবনসম্বল। কৃষিজাত পণ্যের বিনিময়লব্ধ অর্থেই সমগ্র ভারতবাসী আজ কোনও ক্রমে কায়ক্লেশে কথঞ্চিৎরূপে বাঁচিয়া আছে। এই যে কৃষিজ পণ্য বা কাঁচা মাল, তাহারও বহুলাংশ বিদেশীয়রা বাণিজ্যের সূত্রাবলম্বনে স্ব স্ব দেশে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। দেশ শিল্পশূন্য, বাণিজ্যসূত্র বিদেশীদের হস্তগত, কৃষি ক্রমাবনত, কৃষিজ পণ্য অপসারিত,—এই সব কারণেই ভারতীয় মনুষ্যসমাজ আজ ধ্বংসোন্মুখ।

মূল ব্যাধি ত ঐ। উপসর্গও বড় কম নয়। বর্ত্তমান সভ্য জগতের অতি কূট কুটিল বাণিজ্যনীতির ফলে, ভারতের কৃষিজ পণ্যের বিনিময়ে প্রাপ্ত সামান্য অর্থও অতিমাত্র কৌশলসহকারে বিদেশী বণিকদেরই হস্তগত হইতেছে। উপসর্গের অবস্থাটা দাঁড়াইয়াছে এইরূপ ;—

"সভ্যসমাজে মানুষের জীবনধারণের জন্য যে সকল প্রয়োজনীয় পণ্যের দরকার, ভারতে তাহার সমস্তেরই সম্পূর্ণ যোগান-ভার বিদেশী শিল্পী এবং বণিকসম্প্রদায় গ্রহণ করিয়াছে, এবং করিতেছে। ভারতের বিরাট বাজারে ভারতবাসীরা কেবল ক্রেতা, আর বিদেশীরা বিক্রেতা। এইরূপ অসঙ্গত ও অস্বাভাবিক ব্যবস্থার ফলে, ভারতীয় কর্ম্মীদের শ্রমমূলক কর্ম্মের পথ একেবারে রুদ্ধ হইয়া যাইবার মত অবস্থায় আসিয়া উপনীত হইয়াছে। বৈজ্ঞানিক যন্ত্রজাত পণ্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় ভারতের হস্তজাত উটজ শিল্পোৎপন্ন পণ্য পরাজিত হইয়া ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে এবং হইতেছে। সুযোগ ও সুবিধার অভাবে শিল্পী ও ব্যবসায়ী কর্ম্মীরা স্ব স্ব বৃত্তি বন্ধ করিয়া অকর্ম্মা হইয়া পড়িতেছে। ইহার ফলে ভারতের বিরাট কর্ম্মশক্তি পঙ্গুপ্রায় হইয়া নষ্ট হইবার পথে গিয়া বসিয়াছে। কর্ম্মীদের কর্ম্মশক্তির এই যে পঙ্গুত্ব, ইহাই দারিদ্র্য, দৈন্য বা অর্থহীনতার সর্ব্বপ্রধান কারণ। বিদেশী বণিকদের চাল-বাজিতেই ভারতের আজ এই আর্থিক দুর্ভিক্ষ সমুপস্থিত। ইহার ফলে বিদেশীদের বাণিজ্যেও আজ ভাঙ্গন ধরিয়াছে। বিদেশী মাল গুদামে স্তূপীকৃত ও পুঞ্জীভূত হইতেছে। বাজারে অবশ্য ক্রেতার অভাব নাই, খরিদের আকাঙ্ক্ষা বা ইচ্ছারও অভাব পরিলক্ষিত হয় না, তবু কিন্তু মাল আশানুরূপ ভাবে বিকাইতেছে না। ইহার একমাত্র কারণই হইতেছে ক্রেতার অর্থের অভাব। আর ক্রেতার এই আর্থিক অভাবের উৎপাদিকা ঐ বিদেশী বণিকদের অনুসৃত অতি অসঙ্গত বর্ত্তমান বাণিজ্যনীতি।"

"ক্রেতাকে যদি বিক্রেতা পণ্য উৎপাদন জন্য কোনও কায-কর্ম্মের সুযোগ বা সুবিধা প্রদান না করে, প্রয়োজনীয় সব পণ্যই যদি একমাত্র বিক্রেতাই উৎপাদন করে, তবে ক্রেতার হাতে বিনিময়যোগ্য অর্থই বা

আসিবে কিরূপে? কোথা হইতে? আর অর্থ না হইলে ক্রেতা বা বিক্রেতার নিকট হইতে আবশ্যক সব পণ্য খরিদই করিবে কিরূপে?" এই যে দারুণ উপসর্গ—ইহার একটা আশু প্রতীকার না হইলে বা না করিলে ক্রেতা বিক্রেতা, কাহারও মঙ্গল নাই—মঙ্গল হইতেও পারে না।

এই ত গেল এক উপসর্গের কথা। আর এক উপসর্গ বর্ত্তমান যুগের 'ফ'ড়েদের' চালিত দোকানদারী। ইহাতেও ভারতবাসী সাধারণ প্রজাদের সর্ব্বনাশ বড় কম হইতেছে না। জুয়াখেলা প্রায় চাল-বাজিতে পরিপূর্ণ, বর্ত্তমান কালের দোকানদারীর ফলে ভারতবাসী কর্ম্মীদের শ্রমোৎপন্ন বিক্রেয় পণ্যের মূল্য তাহারা নামমাত্র প্রাপ্ত হয়। আর প্রয়োজনীয় ক্রেয় পণ্যের বিনিময়ে মূল্য তাহাদের দিতে হয় অতি অস্বাভাবিক রকমে বেশী। ইহার ফলে এ দেশবাসীর আয় যেমন অতি দ্রুতগতিতে কমিয়া যাইতেছে, অন্যদিকে ব্যয় তেমনই অতি দ্রুতগতিতে বাড়িয়া চলিতেছে। আয়ের সঙ্গে ব্যয়ের একটা সামঞ্জস্য কোনও মতেই হইয়া উঠিতেছে না। এই অবস্থার পরিবর্ত্তন না ঘটিলে তাহা হইতেও পারে না।

এ দেশবাসীর বিক্রেয় পণ্য অসংখ্য 'ফ'ড়ে' বা দালালের হাত ঘুরিয়া শেষ স্থানে যায় বলিয়া স্বভাবতঃই মূল উৎপাদক কম মূল্য পাইতে বাধ্য হয়, পুনঃ তাহার প্রয়োজনীয় পণ্যও মূল উৎপত্তিস্থান অসংখ্য দালাল বা বেপারীর হাত ঘুরিয়া প্রত্যেককে কিছু কিছু লাভ প্রদান পূর্ব্বক তাহার নিকট আসে বলিয়া বাধ্য হইয়াই তাহাকে অস্বাভাবিক অধিক মূল্যে তাহা খরিদ করিতে হয়।

ইহা ছাড়া বড় বড় ধনী ব্যবসায়ীদের একচেটিয়া ব্যবসায়নীতিও মূল্য-বৃদ্ধির অন্যতম কারণ।

উৎপাদকের অভাব আর ক্রেতার আধিক্য, বাজারের চাহিদারূপ পণ্যের অভাব,—এ সবও মূল্যাধিক্যের হেতু।

উক্ত সব কারণ-পরম্পরায় ঘূর্ণাবর্ত্তে পড়িয়াই ভারতবাসী আজ এমন শোচনীয়রূপে বিপন্ন ও দুর্দ্দশাগ্রস্ত।

উপরে নির্ণীত নিদানমতে যথাযোগ্য ভেষজ ও পথ্য-প্রয়োগে চিকিৎসার ব্যবস্থা না করিলে, ভারতীয় মনুষ্য-সমাজের এই নিদারুণ ব্যাধি দূরীভূত হইবে বলিয়া মনে হয় না। বর্ত্তমানে আমরা সেই চিকিৎসারই ব্যবস্থা-বিধানে তৎপর হইতে প্রয়াস পাইব।

[ক্রমশঃ।

শ্রীকালিকাপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য।

ধূলোট।

"এই হইতে পরিপূর্ণ বিদ্যার বিলাস।
সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভের হইল প্রকাশ।" চৈঃ ভাঃ।

প্রেমের ঠাকুর আজ ভাবাবেশে যেন আপন-হারা। নয়নে ও কথনে—পঠন-পাঠনে, সর্ব্বত্রই সেই নন্দনন্দনের স্ফূর্ত্তি। এ দিব্যোন্মাদনা শুধু জীব-শিক্ষার জন্য। তিনি যে মানুষের কাছে আসিয়াছিলেন ঠিক মানুষেরই মত হইয়া। কোনও ঐশ্বর্য্য লইয়া নয়, কোনও অভিমানবত্তা লইয়া নয়। তাই ত তাঁহাকে আমরা ধরিতে পারিয়াছিলাম—অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে গ্রহণ করিতে পারিয়াছিলাম। এইখানেই তাঁহার বিশেষত্ব। জীব যখন প্রেম-ধর্ম্মের রসশূন্য হইয়া শুষ্কপ্রাণ, তখনই তাঁহার আবির্ভাব। আর্ত্তের আকুল আহ্বানে তিনি আসিয়াছিলেন—দুই হস্তে দিবেন এই সঙ্কল্প লইয়া। ধীরে ধীরে তাহাদের প্রস্তুত করিয়া লইতেছিলেন। এ যেন একখানি নাটকের অভিনয় (climaxএর) পূর্ণতার দিকে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। গয়া হইতে শ্রীচৈতন্যদেব ফিরিয়াছেন। পিতৃশ্রাদ্ধ সমাপ্ত হইয়াছে—শ্রীমৎ ঈশ্বর পুরীর নিকট দীক্ষালাভও ঘটিয়াছে। নবদ্বীপে আসিয়া আবার টোলে বসিয়াছেন, কিন্তু প্রতি অক্ষরে 'শ্রীকৃষ্ণ' অর্থ করিতেছেন। ছাত্রগণের বিস্ময়ের অন্ত নাই, সকলেই ভাবিতেছেন, এই কি সেই দিগ্বিজয়ী নিমাই পণ্ডিত! তখনও তাঁহারা বুঝেন নাই যে, এ এক নূতন অঙ্ক আরম্ভ হইয়াছে। ছাত্রগণ বলিলেন—"সব কথাতেই যদি শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন অন্য অর্থ না হয়, প্রভু, যদি প্রতি শাস্ত্রেই 'শ্রীকৃষ্ণ' এই শব্দ ভিন্ন অন্য কিছু ব্যক্ত না হ'ল, তবে আর কি অধ্যয়ন করিব, দেব?" শ্রীমন্মহাপ্রভু যেন অতি লজ্জিত হইয়া বলিলেন—"কি করি বল, আমার বুদ্ধিভ্রংশ হইতেছে, সর্ব্ব-বিষয়েই যে তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতেছি, সেই শ্যামকিশোর যেন সর্ব্বদাই আমার চোখে চোখে ঘুরিতেছেন, তোমরা সব অন্য অধ্যাপকের নিকট যাও, আমার দ্বারা বুঝি আর অধ্যাপনা হইল না।" কিন্তু যে একবার তাঁহার চরণ-প্রান্তে স্থান পাইয়াছে, আর কি সে অন্য আশ্রয় প্রার্থনা করে? ছাত্রগণ একবাক্যে বলিলেন—"তোমায় ছাড়িয়া আর কোথায় কে যাইবে, প্রভু, আর কিই বা পড়িবে? আমাদের আর অধ্যয়নের প্রয়োজন নাই।" এই বলিয়া তাঁহারা নিজ নিজ গ্রন্থে ডোর দিলেন।

চতুর্দ্দিকে অশ্রুযুক্ত হৈল শিষ্যগণ।
সদয় হইয়া প্রভু বলেন বচন॥
"পড়িলাম শুনিলাম এত কাল ধরি।
কৃষ্ণের কীর্ত্তন কর পরিপূর্ণ করি॥"
শিষ্যগণ বলেন "কেমন সঙ্কীর্ত্তন?"
আপনি শিখায় প্রভু শ্রীশচীনন্দন॥
"হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন॥"
দিশা দেখাইয়া প্রভু হাতে তালি দিয়া।
আপনি কীর্ত্তন করে শিষ্যগণ লৈয়া॥
আপনি কীর্ত্তন-নাথ করয়ে কীর্ত্তন।
চৌদিকে বেড়িয়া গায় সব শিষ্যগণ॥
আবিষ্ট হইয়া প্রভু নিজ নাম-রসে।
গড়াগড়ি যায় প্রভু ধূলায় আবেশে॥
'বোল বোল' বলি প্রভু চতুর্দ্দিকে পড়ে।
পৃথিবী বিদীর্ণ হয় আছাড়ে-আছাড়ে॥
গণ্ডগোল শুনি সব নদীয়ানগর।
ধাইয়া আইলা সব ঠাকুরের ঘর॥
নিকটে বসয়ে যত বৈষ্ণবের ঘর।
কীর্ত্তন শুনিয়া সবে আইল সত্বর॥
প্রভুর আবেশ দেখি সর্ব্ব-ভক্তগণ।
পরম অপূর্ব্ব সবে ভাবে মনে মন॥
পরম সন্তোষ সবে হইলা অন্তরে।
"এবে সে কীর্ত্তন হৈল নদীয়া নগরে॥
এমত দুর্ল্লভ-ভক্তি আছয়ে জগতে।
নয়ন সফল হয় এ ভক্তি দেখিতে॥
যত উদ্ধত্যের সীমা এই বিশ্বম্ভর।
প্রেম দেখিলাম নারদাদির দুষ্কর॥
হেন ঔদ্ধত্যের যদি হেন ভক্তি হয়।
না বুঝি কৃষ্ণের ইচ্ছা এবা কিবা হয়॥"
ক্ষণেকে পাইলা বাহ্য বিশ্বম্ভর রায়।
সবে প্রভু 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বোলয়ে সদায়॥
বাহ্য হইলেও বাহ্য-কথা নাহি কহে।
সর্ব্ব-বৈষ্ণবের গলা ধরিয়া কান্দয়ে॥
সবে মিলি ঠাকুরেরে স্থির করাইয়া।
চলিলা বৈষ্ণবগণ মহানন্দ হৈয়া॥

কোন কোন পড়ুয়া সকল প্রভুসঙ্গে।
উদাসীন পথ লইলেন প্রেমরঙ্গে॥
আরম্ভিলা মহাপ্রভু আপন প্রকাশ।
সকল ভক্তের দুঃখ হইল বিনাশ॥ *

এইরূপে এই জগন্মঙ্গল হরিনাম কীর্ত্তনের প্রকাশ্যরূপে প্রচার হইল। কিন্তু এই মহদনুষ্ঠান কোন্ শুভ তিথি হইতে আরম্ভ হইল, কেহই তাহা সুস্পষ্টরূপে নির্দ্দেশ করেন না। বর্ণিত সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভু দ্বিতীয়বার দার-পরিগ্রহ করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রথমা পত্নী শ্রীমতী লক্ষ্মী দেবী, দ্বিতীয়া পত্নী শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর জন্মতিথি শ্রীপঞ্চমীতে, তাহা বোধ হয় অনেকেই অবগত আছেন। শ্রীচৈতন্যদেব কর্ত্তৃক এই নব ভক্তিরসের উৎসব এই তিথি হইতেই সমারব্ধ হয় বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

মহাপ্রভুপাড়া রোড—(১) শ্রীমন্মহাপ্রভুর মন্দির
(২) শ্রীশ্রীঅদ্বৈত প্রভুর মন্দির—(৩) শ্রীশ্রীগুপ্ত বৃন্দাবন পঞ্চতত্ত্ব মন্দির

শ্রীচৈতন্যদেব যে পর্য্যন্ত শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর সহিত মিলিত হয়েন নাই, সে পর্য্যন্ত তিনি কেবলমাত্র নিমাই পণ্ডিত। শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর সহিত মিলিত হওয়ার পরে তাঁহার গয়ায় গমনাদি এবং গয়া হইতে প্রত্যাগমনান্তে এই জীবোদ্ধার-ব্রত আরম্ভ ও পতিতের বন্ধুরূপে তাঁহার প্রকাশ। বৈষ্ণবশাস্ত্রে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর স্থান অতি উচ্চে। "শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকা"য়—যিনি মূল ভূ-শক্তি, তিনিই সত্যভামা এবং যিনি সত্যভামা, তিনিই বিষ্ণুপ্রিয়া; "শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়" নাটকানুসারে—যিনি শ্রীরাধা, তিনিই সত্যভামা; শ্রীচৈতন্যভাগবতে—যিনি মহাবৈকুণ্ঠের লক্ষ্মী ও শ্রীকৃষ্ণলক্ষ্মী অর্থাৎ শ্রীরাধা, তিনিই বিষ্ণুপ্রিয়া; শ্রীভক্তমাল গ্রন্থও ঐরূপ বলিলেন—

"পূর্ব্বে বিষ্ণুপ্রিয়া মাতা সত্যভামা হ'ন,
পৃথিবী যাহার অংশ বেদে করে গান;"

"শ্রীবংশীশিক্ষা" বলিলেন—

"লক্ষ্মী অন্তর্ধান কৈলে সনাতন-কন্যা,
পৃথিবীর অংশরূপা রূপেগুণে ধন্যা,
তব লীলাধারা তেঁই ভক্তিস্বরূপিণী,
সর্ব্বগুণে বরীয়সী আনন্দরূপিণী।"

কলিজীবের প্রধান অবলম্বন জগদুদ্ধারকারী এই হরিনামকীর্ত্তন কোন্ শুভক্ষণে আরম্ভ হইলে ক্রমবিকাশে মানবকুল পবিত্র হওয়া সম্ভব, তাহা শ্রীমন্মহাপ্রভু ব্যতীত আর কেহই স্থির করিতে পারিতেন না। সেই শুভতিথি যে ভক্তিস্বরূপিণী শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর জন্মদিনেই হইতে পারে, তাহা শ্রীমন্মহাপ্রভুই সাব্যস্ত করিলেন।

ইহা শ্রীচৈতন্যদেব-প্রবর্ত্তিত সেই প্রায় চারি শত বৎসর পূর্ব্বে প্রকাশ্যরূপে সঙ্কীর্ত্তনপ্রচারের (anniversary) বার্ষিক উৎসব। ইহা এক্ষণে দীর্ঘ দ্বাদশ দিনকাল শ্রীধাম নবদ্বীপে অনুষ্ঠিত হইয়া ভক্তিরস-পিপাসুগণকে প্রেমধর্ম্মের দিকে উন্মুখ করিয়া থাকে। শ্রীবাস-অঙ্গন,
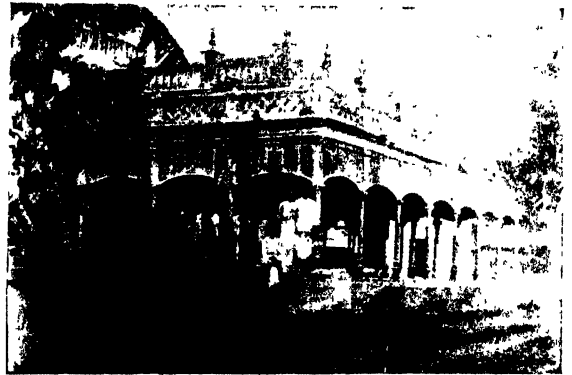
নবদ্বীপের বড় আখড়ার বর্ত্তমান নাট্যমন্দির

প্রভৃতি বহু দেবালয়ে শ্রীপঞ্চমীতে আরম্ভ হইয়া কৃষ্ণা তৃতীয়ায় ধুলোট হয় এবং বড় আখড়া প্রভৃতি স্থানে মাকরী সপ্তমীতে অধিবাস হইয়া কৃষ্ণা চতুর্থীতে ধুলোট হয়। বড় আখড়ার আচরিত প্রথা অবিশুদ্ধ। কোনও সময়ে কোনও অদ্বৈত-পরিবার গোস্বামী দ্বারা এই মাঘী সপ্তমীতে অধিবাস হইয়া থাকিবে। কারণ, তাঁহার মতে অদ্বৈত প্রভুর জন্মতিথি মাঘী সপ্তমীই প্রকৃষ্ট তিথি বলিয়া অনুমিত হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু সেরূপ ব্যতিক্রমপ্রয়াসী হইলে নিত্যানন্দ প্রভুর জন্মতিথি মাঘী শুক্লা ত্রয়োদশীতে এই উৎসব আরম্ভ হইলেও পারিত।

সঙ্কীর্ত্তনের দুইটি প্রকারভেদ আছে, যথা—লীলা ও নাম। এ সময়ে দুই প্রকার কীর্ত্তনই হইয়া থাকে। পূর্ব্বকালে বহুল পরিমাণে ভগবন্নামেরই কীর্ত্তন হইত, এক্ষণে লীলা-কীর্ত্তনই অধিক পরিমাণে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। লীলা-কীর্ত্তনের আরম্ভ 'পূর্ব্বরাগ' হইতে, তাহা 'মিলনে' সমাপ্ত হয়। শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইবার পর্য্যায় অনুসারে পূর্ব্বরাগের স্তর। এইরূপে অনুরাগাদি চৌষট্টি প্রকারের ক্রমসংগীতকে লীলারস কীর্ত্তন কহে। শ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলনের পর 'কুঞ্জ ভঙ্গ' হইয়া এই উৎসবের অবসান ও ধুলোট হইয়া থাকে।

রজে গড়াগড়ি দেওয়া বৈষ্ণবগণের মধ্যেই প্রধানতঃ দৃষ্ট হয়। ইহজগতে যে ব্যক্তি যাহা উৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচনা করে, সে তাহার

* শ্রীচৈতন্যভাগবতের মধ্যখণ্ডে শ্রীসঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ বর্ণন।

আত্মীয়বন্ধুগণকে তাহাই প্রদান করিয়া থাকে। ভগবল্লাভের চির-পরিপন্থী অভিমানাদিকে দূরে পরিহার করিয়া, কীর্ত্তন অবসানে ভক্তগণ সেই নামযজ্ঞস্থলে ভূলুণ্ঠিত হইতেন এবং তাহা আবার শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরণস্পৃষ্ট পূতপবিত্রজ্ঞানে ভক্তিপ্রীতি সহকারে স্নেহ-প্রণয়ের পাত্রগণকে মাখাইয়া দিতেন। এই প্রকারে এই পর্ব্ব 'ধুলোটোৎসব' নামে কীর্ত্তিত হইয়া থাকে।

নবদ্বীপের শ্রীবাস অঙ্গনের ধুলোট অবসান (বিংশতি-বর্ষ পূর্ব্বে গৃহীত)

বহুপ্রকারের ধর্ম্মবিপ্লবের আঘাত সহ্য করিয়া, শক্তি-উপাসক ও তান্ত্রিকগণের নিদারুণ লাঞ্ছনা ও অত্যাচারে লক্ষ্যভ্রষ্ট না হইয়া প্রায় চারি শত বৎসরকাল বৈষ্ণব-সমাজ যে এই উৎসবটি রক্ষা করিয়া আসিতেছেন, ইহা তাঁহাদের ভক্তির নিদর্শন। এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে ইহার সমারোহের হ্রাস-বৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী হইলেও, ইহা যে লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল, এরূপ বিবরণ অতি-বৃদ্ধগণের দ্বারাও উক্ত হয় না। তবে দেবালয়বিশেষের মধ্যে অনেক সময়ে আড়ম্বরের ন্যূনাধিক্য ঘটিয়াছে।

বড় আখড়ার * যাহা কিছু (Sanotity) পবিত্রতা ও 'নাম-গাম', তাহা প্রধানতঃ শ্রীমৎ তোতারাম দাস বাবাজীর নামের সহিত জড়িত থাকারই জন্য। তোতারামদাস বাবাজী † যে স্থানে পঠন পাঠন ও ভজন-পূজনাদি করিতেন, তাহাই উত্তরকালে 'ভাবুক' ‡ বৈষ্ণব-সমাজের কেন্দ্ররূপে প্রসিদ্ধি লাভ করে। স্মরণকাল মধ্যে সেই স্থানে এই অনুষ্ঠানের প্রধান সহায়করূপে কলিকাতা পটলডাঙ্গার প্রসিদ্ধ ধনী মাধবচন্দ্র দত্ত মহোদয়ের খ্যাতি আছে। অনুমান ১২৫০ সালে তিনি যখন শ্রীমন্মহাপ্রভু দর্শনে এখানে সমাগত হন, সেই সময়ে বড় আখড়ায় পশ্চিমে সুপরিসর এই ভূখণ্ডে তিনি এই কীর্ত্তন সুচারুরূপে সম্পন্ন করিবার তাবৎ ব্যয়ভার বহনে স্বীকৃত হয়েন। তিনি বড় আখড়ার মহান্তগণেরই অনুগত ছিলেন, এই কারণে এ স্থানের প্রতিই তাঁহার অধিকতর আকর্ষণ ছিল। তিনি যখন ব্রজমোহনের আখড়ায় আসিয়া এই অনুষ্ঠানের সমৃদ্ধি সংরক্ষণের জন্য অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সময়ে অম্বিকা-কালনার সন্নিকটস্থ মুগুগ্রামের নিত্যানন্দ গোস্বামী মহোদয়ও তন্নিকটস্থ স্থানে বসবাস করিতেছিলেন। এই গোস্বামী মহোদয়ের পরামর্শমতেই অদ্বৈত প্রভুর জন্মতিথি মাকরী সপ্তমী হইতে বড় আখড়ার ধুলোটোৎসব আরম্ভ হইল কি না বলা যায় না। যাহা হউক, পরিণামে মাধব বাবুর বংশধরগণ বড় আখড়ার এই সাহায্য বন্ধ করিয়া দেন। তথায় কিছুকাল যাবৎ বেলিয়াটার জগন্নাথ বাবু এ বিষয়ে অর্থানুকূল্য প্রদান করেন। তৎপরে নবদ্বীপের রতনমণি কুণ্ডু মহাশয় এবং কিছুকাল গুরুদাস বাবুর পুত্র নৃসিংহপ্রসাদ দাস মহাশয়ের দ্বারা এই উৎসবের ব্যয়ভার নির্ব্বাহ হয়। তৎপরে ভাগাকুলনিবাসী গোপীমোহন ও কিশোরীমোহন কুণ্ডুবাবুদিগের দ্বারাও কয়েক বৎসর উহা সম্পন্ন হয়।

যতদূর অবগত হওয়া যায়, তাহাতে ময়নাডালের প্রসিদ্ধ মিত্র-ঠাকুরবংশীয়গণ দ্বারাই বর্ত্তমানকালে বঙ্গদেশে কীর্ত্তন-গান-বাদ্য প্রচারিত করা হয়। নবদ্বীপের মাধবদাস, নিত্যানন্দদাস, হরিদাস, গোপাল-দাস ও দামোদরদাস প্রভৃতি অতি প্রাচীন কীর্ত্তনীয়া ছিলেন। তৎপরে ভরতদাস, অদ্বৈতদাস, গিরিধারীদাস, গোবিন্দদাস, নন্দদাস (ছোট), গোপালদাস (কালো), হৃদয়দাস, বেণীদাস, আউলদাস (জামাতা), হৃদয়দাস, বিপিনদাস, নবীনদাস, হরিদাস, বিষ্ণুদাস, রসিকদাস ও রাধিকা সরকার প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। ইঁহাদের মধ্যে অদ্বৈত-দাস পণ্ডিত বাবাজী এবং গিরিধারীদাস বাবাজী মহাশয়দ্বয়ই বিশেষ অভিজ্ঞ ও প্রধান বলিয়া গণ্য হইতেন। তাঁহারা সকলেই শ্রীরাধা-গোবিন্দ-লীলা-কীর্ত্তনে প্রেম-ভক্তিরসে বৈষ্ণব জগৎকে অভিষিক্ত করিয়া স্বধাম প্রাপ্ত হইয়াছেন।

বৈষ্ণবসমাজের উৎসবগুলির মধ্যে এই ধুলোট উৎসব একটি প্রধান উৎসবের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। বসন্তসমাগমের পূর্ব্বে আমন ধান্যে 'গোলা' সকল পরিপূর্ণ করিয়া গৃহস্থ যখন সানন্দে 'নবান্ন' শেষ করিয়াছে, সেই সময়ে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের শ্রেষ্ঠ ধাম এই নবদ্বীপ নগরীতে স্বনামখ্যাত গণেশচন্দ্র দাস প্রভৃতি প্রসিদ্ধ কীর্ত্তনীয়াগণের কণ্ঠনিঃসৃত সুললিত শ্রীকৃষ্ণপদাবলী শ্রবণের এই যে সুযোগ,

---

* নবদ্বীপের ইতিহাসের সহিত বড় আখড়ার ও তথাকার নাটমন্দিরের ইতিহাস বিশেষভাবে জড়িত। কথিত আছে যে, তোতারাম দাস বাবাজীর পরেও তথায় সামিয়ানার নিম্নে কীর্ত্তনাদি হইতেছিল। মাধব দত্ত মহোদয় প্রথমে একখানি খড়ের আটচালা নির্ম্মাণ করাইয়া দেন, পরে তথায় ইষ্টকনির্ম্মিত নাটামন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। এই মাধব বাবুর 'সমাজ' ব্রজমোহনের আখড়া হইতে এক্ষণে নাটামন্দিরের দক্ষিণে নীত হইয়াছে। মাধব বাবুর কৃত নাটামন্দির জীর্ণ হইয়া গেলে টাঙ্গাইলের মহেরানিবাসী শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রকুমার রায় নামক জনৈক ধনী ব্যক্তি বহুব্যয় দ্বারা উহা সুন্দরতররূপে পুনর্নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছেন।

† কথিত হয় যে, পূর্ব্বকালে নবদ্বীপের শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিগ্রহকে সুড়ঙ্গের মধ্যে লুক্কায়িত রাখিয়া তান্ত্রিকগণের অত্যাচার হইতে রক্ষা করা হইত। কৃষ্ণনগরাধিপ গিরীশচন্দ্রের সন্তুষ্টিবিধান করিয়া এই শ্রীবিগ্রহের প্রকাশ্যভাবে সেবা-পূজার আদেশ তোতারাম দাস বাবাজীর দ্বারা আনীত হয়। উক্ত বাবাজী মহাশয় শ্রীমন্মহাপ্রভু-বিগ্রহের সেবাপূজাদির সুব্যবস্থা করিয়া দিয়া মহাপ্রভুর অঙ্গন হইতে বড় আখড়ায় প্রত্যাগমন করিলে বড় আখড়ার ধুলোটোৎসবের সমারোহ বৃদ্ধি পায়।

‡ সংসারত্যাগী, শিক্ষিত ও সাধু যে কয়টি বৈষ্ণব পূর্ব্বকালে নবদ্বীপে বাস করিতেন, তাঁহারাই ভাবুক নামে খ্যাত হইতেন। দিবা তৃতীয় প্রহরে 'মাধুকরী' [(দেবালয় হইতে প্রাপ্ত] প্রসাদী অন্নব্যঞ্জন ভিক্ষা) দ্বারা তাঁহারা এক সন্ধ্যা ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতেন মাত্র এবং কীর্ত্তন-ভজনের দ্বারাই দিবারাত্রির অধিকাংশ সময় ব্যয় করিতেন।

ইহা যেন বাঙ্গালার প্রতি বৈষ্ণবের প্রাণেই একটা সাড়া—একটা আকাঙ্ক্ষা জাগরিত করিয়া দেয়। নবদ্বীপ যেন এই সময়ে উভয় বঙ্গের মিলন-ভূমিতে পরিণত হয়। কারণ, গায়কগণ অধিকাংশই রাঢ়দেশীয় এবং শ্রোতৃগণ প্রায়ই পূর্ব্ববঙ্গবাসী। দলে দলে গৃহস্থগণ স্ত্রী-পুত্র আত্মীয়-স্বজনকে লইয়া প্রায় ১ পক্ষ কালের জন্ম যেন ইহসংসারের যত কিছু অবসাদ, চিন্তা, দুঃখ বিস্মৃত হইতে এই পুণ্যতীর্থে ছুটিয়া আইসেন। গৌর-গঙ্গার দর্শন-স্পর্শনাদি ব্যতীত প্রিয় ও পরিচিত সকলে বেষ্টিত হইয়া বৎসরান্তে এই আনন্দ-সম্ভোগের আশায়, পথকষ্ট উপেক্ষা করিয়া—হুলুধ্বনিসহ—বস্ত্রে বস্ত্রে গ্রন্থি দিয়া সহাস্তবদনে যখন এই তীর্থযাত্রিগণ সমাগত হয়েন, তখন তাঁহাদের আগ্রহ ও ধর্ম্মপ্রবণতা দেখিয়া স্বতই মুগ্ধ হইয়া যাইতে হয়। সামাজিক হিসাবেও ইহা একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় অনুষ্ঠান। দূর-দুরান্তরে কত অপরিচিত, সত্ত-পরিচিত এবং 'ধর্ম্মবন্ধু' ও আত্মীয়গণের পারমার্থিক মনোভাব এবং অনাবিল আনন্দের মধ্যে প্রতি বর্ষে তাহাদের পবিত্র তীর্থে মিলিত হওয়ার এই যে সুযোগ, তাহার মূল্য যে কত অধিক, তাহা ইতঃপূর্ব্বে রেল-ষ্টীমার যখন অতি বিরল ছিল, তখন যেরূপ বুঝা যাইত, এখন ততটা উপলব্ধি না হইলেও অনেকটা বেশ বুঝিতে পারা যায়। ইহা যেন সেই প্রাচীন সমাজের একখানি প্রকৃত প্রতিচ্ছবি। সেকালে সুবৃহৎ জনসঙ্ঘে বৈষ্ণব সঙ্গীতের কি ভাবে কীর্ত্তন হইত, তাহার একটি হুবহু চিত্র। ইহাদের সংস্পর্শে নবদ্বীপের প্রাণও যেন আনন্দের তালে তালে নাচিয়া উঠে। বৃহৎ মেলার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম রোগ-মৃত্যুতেও যেন সে ধারা বিক্ষুব্ধ হয় না। সম্প্রদায়ের পর সম্প্রদায় দিবারাত্রি কীর্ত্তন করিয়া যাইতেছেন, কিন্তু 'আসরে' সকলেই যেন তন্ময় হইয়া বসিয়া আছেন—আহার-নিদ্রার চিন্তা পর্য্যন্ত তিরোহিত হইয়া গিয়াছে। যেন শ্রোতা ও গায়কের প্রাণে প্রাণে একটা সংযোগ আনিয়া দিয়াছে। এই আনন্দকোলাহল দেখিয়া মনে হয়—"মরেনি এ জাতটা।" তবে কিসে তাহাদের অন্তর এতটা উন্মুখ হয়, তাহার সংবাদ কি দেশের দলপতিরা রাখেন? ধর্ম্মের সোনার কাঠীর স্পর্শ তাহাদিগকে সচেতন করিতে পারে। ধর্ম্মের রস-গন্ধের ভিতর দিয়াই ইহাদের জাগরণ সম্ভব। তবে ইহারা (fanatic) ধর্ম্মের নামেও হিতাহিতজ্ঞানশূন্য নয়—ইহারা (sentimental) ভাব-প্রবণ। দেশে আর কোনও অশোক-চন্দ্রগুপ্ত নাই, হইবার আশাও নাই। কিন্তু ভাবের আদান-প্রদান, সামাজিক ধারা ও ধর্ম্মের একতা রক্ষা করিতে এরূপ সম্মেলনের একান্ত প্রয়োজন। বৈষ্ণব-সমাজের সৌভাগ্য যে, শ্রীচৈতন্যদেবের প্রেরণায় যেন আপনা হইতেই এরূপ সম্মেলন সম্ভবপর হইতেছে। ইহার আনুকূল্য করা প্রত্যেক বঙ্গবাসীরই কর্ত্তব্য। বিভিন্ন দিনে ধূলোট হওয়ায় এখনও যেটুকু আনন্দের ধারা ক্ষুণ্ণ করা হয়, আশা করা যায়, অদূর-ভবিষ্যতে তাহার মীমাংসা হইয়া যাইবে।

শ্রীজনরঞ্জন রায়।

বর্ত্তমান ভারত

শতকরা নব্বই লোক যে গো অন্ধ,
আজো চোখ ফোটে নাই কারাগারে বন্ধ;
কংগ্রেসে খিলাফতে গলা কাটে বক্তার,
এল্-এ, বি-এ কয়টি?—উকীল ও ডাক্তার।
কেরাণীর দল যে গো ক্ষুব্ধ ও খিন্ন,
বুকে লেখা রহে নিতি প্রভু-পদ-চিহ্ন,
এই নিয়ে গর্ব্বে ফেটে-পড়ে বুকটা
দুই এক খেলাতেই হেসে ওঠে মুখটা।

পল্লী যে মরুভূমি—ভিটা-মাটী-শূন্য,
আজি তার এই দশা—করেছে কি পুণ্য!
শিক্ষার অভাবেতে—মূক কালা অন্ধ,
চিরদিন যে গো তার সব দিক বন্ধ।
সমাজেতে উঁচু নীচু—ভাই ভাই ভিন্ন,
বিকারের রোগী এ যে মরণের চিহ্ন!
হাড়ি মুচি ডোম আদি আমি জন শূদ্র,
তারা যে গো ভারতের ঘৃণ্য ও ক্ষুদ্র।

খনা, গোপা, গার্গী আজি তারা অন্ধ,
হেঁসেলের কোণে যে গো চিরতরে বন্ধ,
খ'সে পড়ে পুঁজ ঝরে—ক্ষত সারা অঙ্গ
সমাজের পচা গায়ে,—অপরূপ রঙ্গ!
বাঁদরের হাব-ভাব নিয়ে তোর কল কি?
বেদ, গীতা, কোরাণের বল চেয়ে বল কি?
হিন্দু আর মোসলেম দুই ভাই ভিন্ন
'ঘর-ভাঙ্গা' কথাতেই মরণের চিহ্ন!

ব্যাবিলন, এসেরিয়া ছিল কভু মর্ত্তে?
আজি তারা স্বপ্ন যে—বিস্মৃতি-গর্ত্তে!
ভারতের ভাগ্য কি হবে চির-লুপ্ত?
বেদ-গীতা ধরা-বুকে হবে চির-গুপ্ত?
শ্রুতি, স্মৃতি, রামায়ণ, ব্রাহ্মণ ও তন্ত্র,
জগতের কানে দেবে মুক্তির মন্ত্র;
রীতিনীতি ধর্ম্মেও গর্ব্বিত বিশ্ব,
হবে হবে এক দিন ভারতের শিষ্য।

ঐ দেখ পূরবেতে উঠে না সূর্য্য,
সাজ সাজ বাজা তোরা বিজয়ের তূর্য্য,
ভাঙ্গ ভীতু ভেঙ্গে ফেল মোহ-কারা দুর্গ,
আজো কি গো রবি তবে অন্ধ ও মূর্খ,
ক্রন্দন রেখে দিয়ে আঁখি কর রুদ্র,
অপমান করে যাঁরা হবে তারা ক্ষুদ্র;
জগতের তুই যে গো কোহিনুর রত্ন,
বিশ্বের মুকুটেতে তোর হবে যত্ন।

শ্রীশচীন্দ্রমোহন সরকার.

৮৩

ইভকে ষ্টেশনে গাড়ীতে চড়াইয়া দিয়া প্রতিমা যখন পিতার সহিত বাসায় ফিরিয়া আসিল, তখন তাহার মনটা যেন একটা বিরাট শূন্যতায় ভরিয়া উঠিল। সে বুঝিল, এই কয় মাসে ইভ তাহার হৃদয়ের কতখানি স্থান অধিকার করিয়াছিল। মায়াবিনী ইভ—তাহার কি মোহিনী আকর্ষণী শক্তি!

প্রতিমার আর পুরী ভাল লাগিতেছিল না। শৈল সমুদ্রতীর বড় ভালবাসিত বলিয়া পুরী ছাড়িবার নাম করিলেই কান্নাকাটি করিত, এই হেতু প্রতিমা আরও কিছু দিন পুরীতে রহিল। কিন্তু সে থাকা যেন ঔষধ-সেবনের মত। প্রাণ যাহা চাহে না, তাহা জোর করিয়া গ্রহণ করিলে কেমন লাগে?

এক দিন প্রতিমা ইভের একখানা সুদীর্ঘ পত্র পাইল। পত্র ইংরাজীতে লিখা। প্রতিমা পত্রখানি বার বার বহুবার পাঠ করিয়াও তৃপ্তি পাইল না—সে যেন পত্রের প্রতি ছত্রে ইভকে মূর্ত্তিমতী হইয়া অধিষ্ঠান করিতে দেখিল। পত্র-খানির মর্ম্ম এই:—

"দার্জ্জিলিঙ।

প্রিয় ভগিনি,

তোমার মধুময় সঙ্গ ছাড়িয়া আসাতে যে কষ্ট পাইয়াছি, সে কষ্ট বড় কি আমার মনের দারুণ আঘাতের কষ্ট বড়, তাহা এখনও ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। প্রথম প্রথম তোমার অভাবের কষ্টটাই আমার মনের সমস্ত স্থানটা জুড়িয়া বসিয়াছিল। কিন্তু যতই দিন যাইতেছে, অন্য কষ্টটা আর সব অনুভূতিকে সরাইয়া দিয়া যেন ক্রমেই বিরাট দৈত্যের মত আবার মাথা ঝাড়া দিয়া উঠিতেছে, বুঝি সে আমাকে শেষ না করিয়া সঙ্গছাড়া হইবে না।

বোন্, তোমাদের সমাজে বা ধর্ম্মে বিবাহ কি ভাবে গ্রহণ করা হয়, জানি না। আমাদের সমাজে স্ত্রী বা পুরুষের জীবিতকালে বিবাহ একের অধিক হয় না। পুরুষের একের অধিক স্ত্রী আমরা কল্পনাও করিতে পারি না। সুতরাং পূর্ব্বে আমার স্বামী বিবাহ করিয়া-ছেন ও সেই স্ত্রী জীবিতা আছেন, এ কথা আমি কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছি না—আমার জীবনান্ত পর্য্যন্ত পারিব কি না, জানি না।

আমার কথা লইয়া তোমায় জ্বালাতন করিতেছি জানি, কিন্তু বোন্, তোমার সহিষ্ণুতা, তোমার অসাধারণ ত্যাগ আর আমার প্রতি তোমার অকৃত্রিম ভালবাসাই তোমায় জ্বালাতন করিবার অধিকার আমায় দান করিয়াছে। তোমায় আমি আমার মনের কোনও কথা গোপন করি নাই—তোমায় মনের কথা জানাইলে সান্ত্বনা পাই; সুখ পাই, তাই তোমার বিরক্তিকর হইলেও জানাইতেছি। আশা করি, তোমার মধুর স্বভাব আমার এই আব্দারও সহ্য করিবে।

মানুষ সমাজবদ্ধ জীব, তাই সমাজে থাকিতে হইলে তাহার কতকগুলা অধিকারও যেমন আছে, তেমনই দায়িত্ব ও কর্ত্তব্যও আছে, না থাকিলে সমাজে শৃঙ্খলা থাকিত না। এক জন অপরের পত্নীর রূপে আকৃষ্ট, কিন্তু তাহা বলিয়া সমাজের প্রতি কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব এড়াইয়া সে অপরের পত্নীকে দাবী করিতে পারে না,—করিতে গেলে সে সমাজের শাসনদণ্ডে নিয়ন্ত্রিত হয়। তেমনই পরের দ্রব্যে লোভও দণ্ডনীয়। সমাজ মানুষের জন্য যে সব আইন-কানুন বাঁধিয়া দিয়াছে, তাহা মানা না মানা মানুষের ব্যক্তিগত ইচ্ছাধীন হইতে পারে না। আজকাল য়ুরোপে ও মার্কিণে যে free thought, free love বলিয়া কথা উঠিয়াছে, তাহার অর্থ আমি খুঁজিয়া পাই না!

যাঁহারা আজকাল sex-psycholgy লইয়া নাড়াচাড়া করিয়া প্রকাণ্ড মনস্তত্ত্ববিদ আখ্যায় ভূষিত হইতেছেন, তাঁহারা দেহ ও মনকে পৃথক্ করিয়া ফেলিয়া তাঁহাদের রচনায় সমাজের নানা শৃঙ্খলাহীন দৃশ্যের অবতারণা করিতেছেন এবং দেখাইবার চেষ্টা করিতেছেন যে, ঐ সকল চিত্র natural, উহা অঙ্কিত করাই art—রচয়িতা situationটা পাঠকের সম্মুখে ধরিয়া দিবেন মাত্র, উহার পাপ-পুণ্যের দিক ফুটাইবার জন্য গুরুমহাশয়গিরি করিবেন না। আমি এই ভাবের রচনাগুলাকে পাপ বলিয়া মনে করি, কেন না, উহা দ্বারা ভবিষ্য বংশধরদিগের দ্বারা সমাজে শৃঙ্খলা নষ্ট করিবার ভিত্তি পত্তন করিয়া দেওয়া হয়। ঠিক এই হিসাবে বিবাহিত পুরুষকে বিবাহ করাকেও আমি পাপ বলি। তুমি হয় ত বলিবে, প্রথম বিবাহ যখন নামমাত্র, তখন ইহাতে পাপ নাই। কিন্তু আমি তাহা বলি না। আমার মতে পুরুষের বিবাহিতা পত্নী জীবিত থাকিলে সে বিবাহ নামমাত্র হইলেও তাহার সহিত অন্য নারীর বিবাহ করা পাপ। হয় ত আমার এই ধারণার জন্য আমায় সেকেলে অন্ধ বিশ্বাসী বলিবে। বল, তাহাতে ক্ষতি নাই।

আমার মনের গতি যখন এইরূপ, তখন আমার স্বামীর সহিত—মিঃ রায়ের সহিত আমার কি সম্বন্ধ, তাহা নিশ্চিতই বুঝিতে পারিতেছ। তোমায় যখন সব কথাই খুলিয়া বলিব বলিয়া প্রস্তুত হইয়াছি, তখন কিছুই লুকাইব না। মিঃ রায় ও আমি একত্র বাস করি বটে, কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত। পরিচিত বন্ধু-বান্ধব বা আত্মীয়-স্বজন যেমন একত্র বাস করে, আমাদের একত্র বাসও ঠিক সেই প্রকৃতির। দু'জনে কাছে থাকিয়াও আমরা দু'জনে দু'জন হইতে বহু দূরে আছি, এমন দূরে বোধ হয় তোমাতে ও মিঃ রায়েতেও নাই।

তবে আমাদের এই মিলনের মধ্যে বিচ্ছেদের কথা ঢাক পিটিয়া জানাইতেছি না—সে প্রবৃত্তিও নাই। বাহিরের লোক এখনও জানে না,—কি দুর্ভেদ্য প্রাচীরের ব্যবধান আমাদের দুই জনের মধ্যে মাথা 'ঝাড়া' দিয়া উঠিয়াছে!

কিন্তু—কিন্তু কি বলিব, কথা ত ফুরায় না! মিঃ রায়—আমার স্বামী, তাঁহাকে যতই দূরে রাখি, যতই পরিচিত বন্ধুর মত তাঁহার সহিত ব্যবহার করি,—চেষ্টা করিয়াও ত তাঁহাকে ভুলিতে পারি না। মনে করি, হৃৎপিণ্ডটা উপাড়িয়া ফেলি, কিন্তু সে মূর্ত্তি যে উহার সহিত জড়ান-মাখান। এ আমার কি সর্ব্বনাশ করিয়াছি! আপনাকে একবার বিলাইয়া দিলে আর যে ফিরাইয়া পাওয়া যায় না, তাহা ত জানিতাম না!

সর্ব্বনাশ! এক একবার মনে হয়, যথার্থই সর্ব্বনাশ। কিন্তু পরক্ষণেই ভুলিয়া যাই যে, উহা সর্ব্বনাশ। এ সর্ব্বনাশেও যে এত সুখ, এত সান্ত্বনা, তাহা ভুক্তভোগী হইয়াও বুঝিতেছি। আত্মায় আত্মায় যে দেখা-শুনা, মিলা-মিশা, ভালবাসা, তাহার সঙ্গসুখ যে সর্ব্বনাশের মধ্যেও তৃপ্তি, শান্তি আনিয়া দেয়, তাহার তুলনায় এ জগতে কি আছে?

দুই দিকে দুই সূত্র আমার জীবনের গতির উপর আকর্ষণের প্রভাব বিস্তার করিতেছে,—কোন্ দিকে যাই? বলিয়া দাও ভগিনি, এ সঙ্কটে আমার কর্ত্তব্য কি? মন যাহা আঁকড়িয়া ধরিতে চাহে, বিবেক তাহা দূরে ফেলিয়া দিতে চাহে; বলিয়া দাও, আমার কর্ত্তব্য কি?

যে অবস্থায় আছি, যে সংশয়-দোলায় দুলিতেছি, তাহাতে হয় ত আর অধিক দিন তোমার ভগিনী তোমায় প্রশ্ন তুলিয়া জ্বালাতন করিবে না। ঘোর অন্ধকার, পথ নির্ণয় করিতে পারিতেছি না, কত বিপথে গিয়া মন ক্ষত-বিক্ষত হইতেছে, তাহা কি জানাইব? মন ক্ষত-বিক্ষত হইলে দেহ ভাল থাকিবে কিরূপে? অন্ধকার সমুদ্রে সাঁতার দিতেছি, হাবুডুবু খাইতেছি, কূল পাইতেছি না। যেমন সমাজের আর পাঁচ জনে করে, তেমনই করিয়া ভিতরে আঘাতের উপর আঘাত খাইয়াও প্রাণপণে মুখে হাসি ফুটাইবার চেষ্টা করিতেছি—আমার ভিতর ও বাহিরকে পৃথক্ করিয়া ফেলিয়াছি। যাহা পূর্ব্বে আমি অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতাম, তাহাই জীবনে অভ্যাস করিতেছি। আমাদের society paperএ প্রায়ই পড়ি, অমুক লোক পত্নী থাকিতেও আরও তিন চারিটি নারীর সঙ্গভোগ করে, অথচ সমাজ জানিয়া শুনিয়াও চক্ষু মুদ্রিত করিয়া থাকে,—প্রকাশ্য সমাজের শৃঙ্খলা ভঙ্গ না করিলেই হইল! তোমাদের সমাজেও শুনিয়াছি, লোক হোটেলে খানা খায়, সমাজ তাহাকে কিছু বলে না, কিন্তু প্রকাশ্যে সেই লোক বিদেশযাত্রা করিলে তাহার জাতি যায়।

অর্থাৎ আবরণ রাখিয়া যাহা কর, তাহাই সমাজে চল্, আর সব অচল্। আমিও তেমনই আবরণ দিতে শিখিতেছি। প্রাণ পুড়িয়া খাক হইয়া গেলেও আর স্বামীর সহিত পূর্ব্ব-সম্বন্ধ রাখিব না, কিন্তু সব চুপে চুপে—আবরণের অন্তরালে, বাহিরের জগৎ যেন ঘুণাক্ষরে কিছু না জানিতে পারে।

বুঝিলে কি বোন্, কত দূর নামিয়াছি? এক পাপ পুষিয়া রাখিতে গেলে তাহার মূল্য কত দিতে হয়, তাহা এখন বেশ বুঝিতে পারিতেছি।

আশা করি, তোমরা ভাল আছ। তোমার শ্রদ্ধেয় পিতা ও আদরের শৈল বেশ মনের সুখে আছেন ত? তুমি পুরীতে আর কত দিন থাকিবে? তোমার কথামত আমি তোমার ঠিকানা আর কাহাকেও জানাইব না। যেখানেই থাক, আমায় জানাইও, আর কেহ জানিতে পারিবে না। যে দিন জগতের দেনা-পাওনা মিটাইয়া চলিয়া যাইব, তাহার বোধ হয় অধিক বিলম্বও নাই—সেই দিন তোমায় আমার বড় দরকার। তাই তোমার ঠিকানা জানাইও, কি জানি কখন্ দরকার হয়। ভগিনি, তোমার ভালবাসার ইভের এই একটিমাত্র অনুরোধ রক্ষা করিও, যেন পরপারে যাইবার আগে একটি বার তোমায় আমায় দেখা হয়। ইতি

অভাগিনী ইভ।"

প্রতিমা বহুক্ষণ ধরিয়া চিত্রপুত্তলিকাবৎ পত্রখানি করপুটে ধারণ করিয়া বসিয়া রহিল। সে তখন কত কি ভাবিতেছিল, তাহা কে বলিবে? সে যখন বাহিরের জগতে ফিরিয়া আসিল, তখন শুনিল, শৈল বলিতেছে, মঠের মা ঠাকুরুণ আসিয়াছেন, তাহাকে ডাকিতেছেন।

প্রতিমা ত্রস্তে উঠিয়া শৈলর অনুসরণ করিল, মাতাজীর সমীপবর্ত্তিনী হইয়া নতমস্তকে তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিয়া পার্শ্বে উপবেশন করিল। স্বর্গদ্বারে এক মঠে মাতাজীর সহিত তাহার পরিচয় হইয়াছিল। তাঁহার মধুর চরিত্রে ও উপদেশে প্রতিমা কিছু দিন হইতে মুগ্ধ হইয়াছিল।

মাতাজী সহাস্যাননে বলিলেন, "কি দোষ করেছি মা, আজ ক'দিন আমার ওখানে একবারও যাওনি?"

প্রতিমা সলজ্জভাবে বলিল, "বড় ঝঞ্ঝাটে প'ড়ে গেছলুম মা, ইভকে পাঠিয়ে দিয়ে তবে একটু হাঁফ ছাড়তে পেরেছি।"

"ইভ কে? ওঃ, সেই ইংরেজের মেয়েটি বুঝি? আহা, খুব ভাল মেয়ে। আমি বলছি, ও শাপভ্রষ্ট হয়ে ওদের ঘরে জন্মেছে। তবে এও ব'লে রাখছি, ওর অদৃষ্টে সুখ নেই।"

"কেন মা, এখন দিন কতক রোগে ভুগছে ব'লে কি ওর অদৃষ্টে ভবিষ্যতেও সুখ নেই?"

"না মা, তার জন্যে নয়, ওর ক'টা লক্ষণ দেখে বুঝেছি, এই অল্পবয়সেই ওকে বড় মনঃকষ্ট পেতে হবে, দেহও ভাল থাকবে না। কি করবে বল, যার যা লেখা আছে।"

"হাঁ, মা, আমাদের যা যা হবে, তা যদি আগে থাকতেই লেখাপড়া থাকে, তা হ'লে মানুষ হয়ে চেষ্টা করবার দরকার কি—যা আছে কপালে ব'লে গা ভাসিয়ে চ'লে গেলেই ত হয়, আর তা হ'লে পাপ-পুণ্যেরও ধার ধারতে হয় না।"

"ছি মা, এত বুদ্ধিমতী হয়ে তুমি বিধাতার বিধানটাকে এমনই সোজা কথায় উড়িয়ে দিতে চাও? ও বিষয়ে কথা কইতে গেলে অনেক তর্ক আছে। সে এক দিন অবসর বুঝে হবে। আপাততঃ একটা কথা ব'লে রাখি। বিধাতা বিধান দিয়েছেন, সঙ্গে সঙ্গে মানুষকে হিতাহিত-জ্ঞান দিয়েছেন—দুটোর মধ্যে দেনা-পাওনা ঠিক ক'রে নিয়ে কায ক'রে যাও, ইহজন্মে ত ভাল হবেই, পরকালেরও কায গুছুতে পারবে। যাক্, তুমি আমার মঠের সদাব্রতের কি ব্যবস্থা করলে মা? আমি যে তোমার মুখ চেয়ে রইছি।"

"কেন মা, তার জন্যে ভাবনা কি? সে সব ত ঠিক হয়েই আছে। আপনি যে দিন ইচ্ছে করবেন, সদাব্রতের জন্যে ঘর-দুয়োর আরম্ভ ক'রে দিতে পারেন। আর মাসে মাসে যা খরচা, তার জন্যে আপনার নামে ব্যাঙ্কে টাকা ত দিয়েই রেখেছি।"

"বেঁচে থাক মা! জন্ম-এয়োস্ত্রী হও, মাথার সিঁদুর, হাতের নোহা অক্ষয় থাকুক। কি মা, অমন ক'রে বিমর্ষ হয়ে রইলে কেন? ভাবছো, বুড়ী যা বলছে, তোমার মন যোগাবার জন্যে বলছে। তোমার কাছে দাঁও মেরে খোসামোদ করছে? না মা, তা না! এই বুড়ী যে তোমার ভবিষ্যৎ সব চোখের সামনে জলজীয়ন্ত দেখতে পাচ্ছে। সব ফিরে পাবে মা, সব ফিরে পাবে, তবে দু'দিন আগে আর পিছে।"

"সব ত জানেন, মা!"

"জানি। জানি ব'লেই বল্‌ছি, সব ফিরে পাবে, তোমার মত সতীলক্ষ্মীর মনে ভগবান্ কি চিরদিন কষ্টের রেখা টেনে দিয়ে রাখবেন? মনেও ভেবো না।"

"ইভ ত সতীলক্ষ্মী।"

"পাঁচ শ বার। কিন্তু ওর পূর্ব্বজন্মের যতটুকু সুকৃতি, তার বেশী ফলভোগে ত ওর অধিকার নেই। এ জন্মে যে কায ক'রে গেল, আসছে জন্মে আবার তার ফল উপভোগ করবে। এমন যাওয়া-আসা অনেকবার করলে পরে ওর কাম্য-ফলও মুঠোর মধ্যে পাবে। তখন একে আর অতৃপ্ত বাসনা নিয়ে অকালে চ'লে যেতে হবে না।"

প্রতিমা চমকিত হইয়া বলিল, "কি বল্‌ছেন মা? ইভ, ইভ, আমার বড় আদরের ইভ—"

মাতাজী হাসিয়া বলিলেন, "আদরের জিনিষটিকে কি কেউ ধ'রে রাখতে পারে? সময় হ'লে রাজার বেটাকেও ডাকে সাড়া দিতে হয়—সব আদর ছেড়ে ত তাকে যেতে হয়। ইহজন্ম পরজন্ম মান ত? তুমি হিঁদুর মেয়ে, তোমাকে বোঝাতে হবে না। তোমার প্রথম জীবনের এই কষ্ট কি পূর্ব্বজন্মের ফল নয়? না হ'লে এ জন্মে তুমি এমন কিছু করনি—যাতে এই জ্বালা তোমায় সইতে হচ্ছে।"

প্রতিমা হঠাৎ অশ্রুমোচন করিয়া মাতাজীর পা দুইখানি জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "মা গো, আমায় আপনার পায়ে নিন—"

মাতাজী বিস্মিত হইলেন। স্বভাবতঃ গম্ভীরপ্রকৃতি প্রতিমা ত সহজে কাঁদে না। তাহার মাথায় সস্নেহে হাত বুলাইয়া বলিলেন, "সময় হলেই নেব। তোমার যে সংসারে এখনও অনেক কর্ত্তব্য রয়েছে মা। এক দিন স্বামি-পুত্র নিয়ে আমারই আশ্রমে কত আনন্দে পূজো দিতে আসবে।"

প্রতিমা আবার গম্ভীর হইয়া বলিল, "না মা, আমি সে সুখ চাই না। ইভের সুখ বলি দিয়ে আমার স্বার্থ যে দিন সাধতে ইচ্ছে হবে, তার আগে যেন আমার মৃত্যু হয়।" দরবিগলিত ধারে প্রতিমার দুই চক্ষু দিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িল।

মাতাজী উঠিলেন, প্রতিমার মাথাটা বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন, "এই গুণেই ত আমার এত বশ করেছিস্ মা। আশীর্ব্বাদ করি, তোর সাধনা সফল হোক। আর আশীর্ব্বাদ করি, যেন বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে তোরই মত মেয়ে জন্মগ্রহণ করে।"

মাতাজী চলিয়া গেলেন। প্রতিমা বহুক্ষণ তাঁহার চলন্ত মূর্ত্তির দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকিয়া অন্যমনে কি ভাবিতে লাগিল। তাহার পর দুরন্ত শৈল যখন বাহির হইতে খেলা ফেলিয়া ভিতরে আসিয়া ডাকিল, 'চল না মা, বেলা হয়নি, নাবে খাবে না? তখন সে উঠিয়া স্নান করিতে গেল, কিন্তু তখনও তাহার মনের মধ্যে মাতাজীর একটা কথা খুব জোরেই তোলাপাড়া করিতেছিল—"সব ফিরে পাবে মা, সব ফিরে পাবে।" অসম্ভব, অভাবনীয়, অচিন্ত্যনীয় এ কথা! গোড়া কাটিয়া আগায় জল ঢালিলে গাছ কি কখনও আর প্রাণ পাইয়া থাকে?

১৭

"এর জন্যে এই শাস্তি—চিরজীবনই এই শাস্তি বইতে হবে? ইভ, এর চেয়ে আমার মৃত্যুদণ্ড দাও না কেন,—" অত্যন্ত কাতরস্বরে বিমলেন্দু ইভকে এই কথা কয়টি বলিল।

ইভ মনে যাহাই ভাবুক, প্রকাশ্যে কঠিন পাষাণের মত নিশ্চল হইয়া বসিয়া রহিল, কোন জবাব দিল না।

বিমলেন্দু আবার বলিল, "ক্ষমাও কি নেই? ইভ, তুমি এত নিষ্ঠুর হ'তে পার, তা ত আমার জানা ছিল না।"

ইভও ঠিক ওজনে বলিল, "তুমিও যে এত বড় ভণ্ড প্রতারক হ'তে পার, তাও ত আমার জানা ছিল না।"

"ও কথা ত অনেকবার হয়ে গেছে। বলেছি ত, আমার অপরাধ হয়েছে, ক্ষমা কর। এই তোমার হাতে ধ'রে বার বার মিনতি ক'রে বল্‌ছি, আমায় ক্ষমা কর।"

"কেন, ক্ষমা ত করেছি, তোমায় আমায় যে সম্বন্ধ, তা ত অক্ষুণ্ণ রেখেছি।"

"কি সম্বন্ধ অক্ষুণ্ণ রেখেছ, ইভ? আমায় কি ব'লে ভোলাচ্ছ?"

"কেন, দেহের সম্বন্ধ না রাখলে কি মানুষের সকল সম্বন্ধ ভেঙ্গে যায়?"

"তুচ্ছ দেহের সম্বন্ধ—সে ত ইতর পশুপক্ষীর মধ্যেও ক্ষণে হচ্ছে, ক্ষণে ভেঙ্গে যাচ্ছে। আমি তার কথা বলছি না।"

"তবে, তবে কিসের কথা বলছ? কি শাস্তি দিয়েছি আমি?"

"যার অধিক শাস্তি জগতে নেই। তুমি মন থেকে আমায় বিদায় দিয়েছ। যে আত্মার ক্ষুধার চেয়ে বড় ক্ষুধা নেই, তাই তুমি আমার মধ্যে অহরহ জাগিয়ে রেখেছ—সামনে সুধার সমুদ্র অথচ তা হ'তে আমায় নির্ব্বাসিত ক'রে রেখেছ। এর চেয়ে আমায় কি শাস্তি দিতে পার? দিনে দিনে পলে পলে এমন ক'রে মারার চেয়ে আমায় একবারে মৃত্যুদণ্ড দিলে কি ভাল করতে না?"

ইভ তখনও কঠিন, তখনও পাষাণ। যথাসম্ভব কণ্ঠ দৃঢ় করিয়া বলিল, "কেন, দুজনে আমাদের মেলামেশার কিছু অভাব হয়েছে কি? কেউ কি ঘুণাক্ষরে বুঝতে পেরেছে যে, আমাদের মধ্যে কোন ব্যবধান জেগে উঠেছে? তবে?"

বিমলেন্দু এইবার সত্যই ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিল। সে দুই হাতে ইভের একখানা হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "ইভ—ইভ—সত্যই কি তুমি আমার জীবনের স্বপ্ন ইভ? না, আর কেউ ইভের রূপ ধ'রে আমায় ছলনা করছে? উঃ, এত কঠিন, এত নির্দ্দয় তুমি হ'তে পার? আমি কি বুঝি না, আমি কি জানি না—তোমার কি পরিবর্ত্তন হয়েছে? ইভ, ইভ! তুমি যে আমায় বই জানতে না—তোমার প্রতি কথায়, প্রতি অঙ্গভঙ্গীতে যে আমার প্রতি ভালবাসা ফুটে উঠত। তুমি কি ছলনা ক'রে আমায় ভুলিয়ে রাখবে?"

বিমলেন্দু বালকের মত ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল; বলিল, "ইভ, ইভ! আমার যথেষ্ট শাস্তি হয়েছে, আর কষ্ট দিও না। বল, কি করলে আবার যেমন ছিল, তেমনই হয়?"

ইভের সমস্ত শরীরটা কাঁপিয়া উঠিল, চক্ষু ছল-ছল করিল, তখন তাহার দৃষ্টির মধ্যে এমন একটা সর্ব্বস্ব-দেওয়া আপনহারা ভালবাসার ভাব ফুটিয়া উঠিল যে, যদি বিমলেন্দু সেই মুহূর্ত্তে তাহার ক্রোড়ে মাথা গুঁজিয়া পড়িয়া না থাকিত, তাহা হইলে নিশ্চিতই তাহা দেখিতে পাইত এবং দেখিতে পাইলেই বলপূর্ব্বক ইভকে বক্ষে চাপিয়া ধরিত, আর তাহা হইলেই এইখানেই আখ্যায়িকা শেষ হইয়া যাইত। কিন্তু বিধিলিপি অন্তরূপ, ইভের সেই আপনাকে হারাইয়া দেওয়া বিমলেন্দু লক্ষ্য করিল না—মিলনের মহা সুযোগ মুহূর্ত্তে অতীত হইয়া গেল।

তথাপি কথা কহিবার সময়ে ইভের কণ্ঠ ভাবাবেশে বাষ্পরুদ্ধ হইয়া উঠিল, সে গদ্‌গদকণ্ঠে বলিল, "কি চাও ইন্দু? এই দেখ—ক্ষীণ দেহলতা, এই দেখ—শীর্ণ হাত, শীর্ণ পা, এই অকর্ম্মণ্য দেহ নিয়ে তুমি কি করবে? তার চেয়ে আমার মৃত্যু প্রার্থনা কর—তার ত বেশী দিন নয়? তার পর তোমারও মুক্তি, আমারও মুক্তি! তখন ত তোমায় কেউ জ্বালাতন করতে আসবে না।"

বিমলেন্দু তীরবেগে উঠিয়া কঠোর পরুষকণ্ঠে বলিল, "তা হ'লে ক্ষমা করলে না? ভিক্ষে চাইলুম, দূর ক'রে দিলে? বেশ, তাই হোক। জান ইভ, তোমার জন্যে আমি আমার জীবনের মূলনীতিতেও পদাঘাত করেছি? এক দিন যার জন্যে আমি নির্দ্দোষ পত্নীকে প্রত্যাখ্যান ক'রে নিষ্ঠুর বর্ব্বরের মত চ'লে এসেছি, তোমার জন্যে আমি তাও বিসর্জ্জন দিয়েছি, আমি আত্মসম্মানকে ধুলোয় লুটিয়ে দিয়ে তোমার অন্নদাস হয়ে বাস করছি—এর চেয়ে আমার অধঃপতন আর কি হ'তে পারে? কেন করেছি, জান কি? তোমায় ভালবাসি ব'লে। তুমি আমার জন্যে অনেক ত্যাগ করেছ, তাই আমিও তোমার জন্যে প্রতিদানে এই ত্যাগ করছি, তা নয়, যথার্থই তোমায় ভালবাসি ব'লে। আমিও ত তোমায় স্পষ্টই বলেছি, আমার পূর্ব্বের নেশা কেটে গেছে। ইভ, তাই তোমায় বলতে এসেছিলুম, এখন তোমায় হারাবার ভয় আমার সব চেয়ে বড় ভয় হয়েছে। প্রতিমার প্রতি অবিচার করেছি, তার জন্যে অন্তরে তুষানল জ্বলেছে। কিন্তু তার প্রতীকারের উপায় নেই। তার উপরে তোমার ভালবাসা হ'তে যদি বঞ্চিত হই, তা হ'লে আমার বেঁচে সুখ কি?"

ইভ কথাগুলি বেশ মনোযোগ দিয়া শুনিল, তাহার পরে ব্যঙ্গের স্বরে বলিল, "তোমাদের বাঙ্গালী পুরুষরা কথায় কথায় এত মরবার অভিনয় করে কেন, বলতে পার? যেন মেয়েমানুষের মত! কথায় কথায় বেঁচে সুখ নেই। এটা কি পুরুষের যোগ্য কথা হ'ল? প্রতিমার প্রতি অবিচারটা যাতে শুধরে নিতে পার, তার উপায়ই ত করছি। এর জন্যে বরং আমায় ধন্যবাদ দেবে, না উল্টে অনুযোগ করছ? বাঃ, বেশ ন্যায়বিচার ত!"

বিমলেন্দু ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া বলিল, "না, আমি যা বলব, তার অন্য অর্থ করবে, এ অবস্থায় আমার কোন কথাই

মাপা যায় না, সেই ভালবাসার জোরে। ইভ, জান না কি, বুঝতে পার না কি, তোমায় আমি কত ভালবাসি? আমি যখন তোমার ঐ সুন্দর চোখে কাতরতা দেখি, যখন তোমার ঐ সদ্যঃপ্রস্ফুটিত গোলাপের মত সুন্দর মুখখানিতে বিষাদের রেখা ফুটে উঠতে দেখি, তখন আমার বক্ষ বিদীর্ণ হয়ে যায়। কি করলে তুমি সুখী হও—তোমার ঐ মধুমাখা মুখে আবার হাসি ফুটে ওঠে!" আগ্রহের আতিশয্যে মরিস্ আবার ইভের হাতখানি চাপিয়া ধরিল।

ইভ প্রথমটা সামান্য একটু অভিভূত হইয়াছিল বটে, কিন্তু সে মুহূর্ত্তকাল মাত্র। তাহার পর আবার হস্ত মুক্ত করিয়া বলিল, "লেফটানেণ্ট সিবরাইট! ভুলে যাচ্ছেন কি, কাকে কি সম্বোধন কচ্ছেন? ভুলে যাচ্ছেন কি, আমি অপরের বিবাহিতা পত্নী? ভুলে যাচ্ছেন কি, আপনি ভদ্রসন্তান, ইংরাজ সেনানী? যদি ভুলে গিয়ে থাকেন এ সব, তা হ'লে আমাকেও অতিথির সম্মান ভুলে যেতে হবে, হয় ত বাধ্য হয়ে এই মুহূর্ত্তে আপনাকে এই বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিতে হবে। সে অশিষ্টাচার হ'তে আমায় রক্ষা করবেন কি? অন্ততঃ এক জন ভদ্রলোকের কাছে আমি এ আশা করতে পারি।" ইভের চোখে মুখে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতেছিল।

মরিস এতটুকু হইয়া গেল। তাহার ললাটে সেই পাহাড়ের শীতেও স্বেদবিন্দু ঝরিয়া পড়িল, সমস্ত শরীর গভীর উত্তেজনাবশে আগুনের মত গরম হইয়া উঠিল। সে কিছু বলিবার মত খুঁজিয়া পাইল না। তখন ইভ তাহার অবস্থা দেখিয়া, দুঃখিত হইয়া মধুর কণ্ঠে বলিল, "মরিস, ভাই, বন্ধু! তোমার বন্ধুত্ব হ'তে আমায় বঞ্চিত কোরো না। আমরা সকলেই নিজ নিজ অদৃষ্ট নিয়ে এসেছি—তার ফল ভোগ করতেই হবে। আমার কথাটা কিছু কঠিন হয়েছে, তার জন্যে ক্ষমা চাইছি। কিন্তু,—কিন্তু তুমিও এখন থেকে বিবাহিতা নারীর সম্ভ্রম রেখে কথা কইতে অভ্যাস কোরো। ক্রমে তোমার মহত্ত্ব আরও বাড়বে। তুমি মহৎ, তা জানি, তাই মিনতি ক'রে বলছি, যাকে তুমি আসল ব'লে মনে করছ, সেটা তোমার ভ্রম,—দুদিন পরেই তার নেশা কেটে যাবে। মাঝে থেকে আমাদের বন্ধুতার হানি কর কেন? আর একটা কথা বলেই শেষ করব। পাহাড়টার পায়ের তলায় কুয়াসা গাঢ় হয়ে ঘটা ক'রে দেখা দেয়, কিন্তু ওপরের দিকে নির্ম্মল উজ্জ্বল আকাশ শোভা পায়। যাকে তুমি আদিহীন অন্তহীন ভালবাসা বলছিলে, তার নীচের দিকে হয় ত তুমি কুয়াসা দেখে থাকতে পার, কিন্তু উপরের দিকে যে নির্ম্মল আকাশ আছে, তা দেখনি। যদি তা দেখতে পেতে বা বুঝতে পারতে, তা হ'লে স্বামি-স্ত্রীর তুচ্ছ মনোমালিন্যে প্রকৃত ভালবাসার অন্ত দেখতে না।"

ইভ ধীরমন্থরগমনে কক্ষান্তরে চলিয়া গেল। মরিস অবাক্ হইয়া সেই নারীত্বের—পত্নীত্বের গর্ব্বে মহিমময়ী নারীমূর্ত্তির দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার অন্তর জ্বলিয়া পুড়িয়া খাক হইয়া যাইতেছিল বটে, তথাপি নারীত্ব-মর্য্যাদার প্রতি তাহার মস্তক আপনিই শ্রদ্ধায় অবনত হইয়া আসিতেছিল। আর বিমলেন্দুর প্রতি তাহার অন্তর বিস্ময়-জড়িত শ্রদ্ধায় ভরিয়া উঠিল। কোন্ পুণ্যে সে এই অগাধ অপরিমেয় ভালবাসার অধিকারী হইয়াছে?

[ক্রমশঃ।

সে

সাঁঝের বাতাস এসেছিল যবে দূর হ'তে ভেসে গগনে,—
পরিচিত তার মুরলীর তান পশেছিল এসে শ্রবণে।
জানালার পাশে পুলকে বিহ্বল ভাবে ভোর তনু অমনি—
অলস স্বপনে পড়িল ঘুমায়ে, নামিল চাঁদিনী রজনী।
স্বপনেতে যেন শুধু একবার পেয়েছিনু দেখা তাহারি!
ভাঙেনি সে রাতে তন্দ্রার ঘোর—সুখের স্বপন আমারি।
প্রভাতে যখন লুকাতে তারকা যুগল নয়ন মেলিনু,
এ দিকে ও দিকে চারিদিকে চেয়ে কারে নাহি সেথা দেখিনু।

দেখিলাম শুধু সাড়াহীন দিশি, নীরবতা রাজে বিজনে,
প্রভাত-প্রকৃতি মুখরি তোলেনি প্রভাতের পাখী-কূজনে।
বাহিরে চাহিতে দেখিনু তাহার মালিকা-কুসুম চারিটি,
খ'সে প'ড়ে আছে বাতায়ন-পাশে মেখে শুধু তার হাসিটি।
দেখিলাম শুধু কি এক সৌরভে রহিয়াছে ঘর ভরিয়া,—
তবে কি সে আসি নীরব নিশীথে গেছে হৃদি মোর চুমিয়া!
সত্য কি তবে সে মধু নিশির সাধের স্বপন আমারি—
ওগো সে আমারে পারে কি ভুলিতে? আমি যে সদাই তাহারি।

শ্রীবিজয়মাধব মণ্ডল।

হর-গৌরী

বসুমতী প্রেস] [একখানি প্রাচীন চিত্র হইতে।

একাদশ পরিচ্ছেদ

য়ুরোপের বৈপ্লবিক দলে যোগদান

স্বদেশপ্রেমের লীলাভূমি ফ্রান্সের মার্সেলস্ বন্দরে পৌঁছে, সাম্যমৈত্রী স্বাধীনতার প্রতীক, যা দেখে এক দিন ভারতীয় দেশাত্মবোধের জন্মদাতা রাজা রামমোহন আনন্দে বিহ্বল হয়েছিলেন, সেই ত্রিবর্ণ পতাকাকে তখনকার মনোভাব অনুযায়ী শ্রদ্ধাবনত মস্তকে নমস্কার কর্‌লাম। সেই বন্দরে চার পাঁচ দিন অপেক্ষা করতে হয়েছিল। এক ফরাসী ভদ্রলোককে বিনা পারিশ্রমিকে "গাইড"রূপে পেয়েছিলাম। সে কোন রকমে ইংরাজীতে কথা কইতে পার্‌ত। আমার মত কালা আদমীর ওপর তার এত কৃপার কিন্তু কোন কুমৎলব শেষতক্‌ও ধর্‌তে পারি নি।

এই ভদ্র লোকটির সাহায্যে অনেক কিছু জেনেছিলাম এবং দেখেছিলাম; তার মধ্যে "সাতুদ'ইফ" (Chateau-d'-f) নামক একটা পুরানো কেল্লার বিষয় এখানে কিছু লিখলে নেহাৎ অপ্রাসঙ্গিক হবে না ব'লে মনে করি। সে কালে ফরাসী জাতির রাষ্ট্রনৈতিক বন্দী বা বিপ্লবপন্থীরা ধরা পড়লে, তাদের যে ভীষণ পরিণাম হ'ত, তার সঙ্গে আমাদের দেশের সেই অপরাধে ধৃত বন্দীদের অবস্থার তুলনাটা বোধ হয় কাযে লাগতেও পারে।

এই "ইফ" নামক প্রস্তরময় ক্ষুদ্র দ্বীপের ভগ্ন দুর্গটা বহুকাল যাবৎ ফরাসী রাষ্ট্রনৈতিক অপরাধীদের জন্য কারাগাররূপে ব্যবহৃত হ'ত। বর্ত্তমানে দর্শনী বা fee নিয়ে সাধারণকে তা দেখান হয়; বিস্তর লোক প্রতিদিন দেখতেও যায়। প্রবেশের দ্বারে টিকিটের সঙ্গে একটুখানি মোমবাতী দেয়। তা জ্বেলে মেঝের নীচে, পাথর কেটে কেটে বন্দীদের থাকবার জন্যে যে কি রকম ভীষণ অন্ধকার গুহা আর সুড়ঙ্গ তোয়ের করা হয়েছিল, তাই দেখতে হয়। স্বনামধন্য বিশেষ বিশেষ বন্দীরা যে সকল গুহাতে ছিলেন, তাতে তাঁদের বিবরণ লিখিত আছে।

সে রকম চির-অন্ধকারময় ঠাণ্ডা স্যাঁতসেঁতে ক্ষুদ্র গর্ত্তে সুদীর্ঘ পঁচিশ বছরেরও অধিককাল, এই আমাদেরই মত জীব, কি ক'রে যে জ্যান্ত থাক্‌তে পেরেছিল, তা ভেবে তখন একেবারে অবাক্ হয়ে গেছলাম। এ ছাড়া তাদের ভাগ্যে আরও কত উৎকট রকমের লাঞ্ছনা যে জুটেছিল, তা সহজেই অনুমেয়। এর পরে অবশ্য মানুষের ওপর মানুষ যে কি রকম ভীষণ নির্য্যাতন করতে পেরেছিল, তার আরও বিকট নিদর্শন চোখে পড়েছিল প্যারিস, রোম ও নেপলসে।

এক দিন উক্ত "ইফ"এর চাইতে অনেক অধিক বিকট-দর্শন—'সকোত্রা' দ্বীপে আমাদের জন্যও যে এই রকমই গুহাবাসের ব্যবস্থা হবে, এ আশঙ্কা তখন মনে জেগে ওঠাতে, আতঙ্কে আমার জ্ঞানলোপ হওয়ার যোগাড় হয়েছিল। মাত্র কয়েক দিন আগে জাহাজে যাওয়ার সময় দেখেছিলাম,—এডেনের দক্ষিণে কোন রকম উদ্ভিদের লেশমাত্র নাই, কেমন যেন দাঁত-বারকরা কেবল কাল পোড়া পাথরের প্রকাণ্ড দ্বীপটা জলন্ত উনুনের ওপর তপ্ত খোলার মত রোদে দাউ দাউ কর্‌ছে। তখুনি মনে হয়েছিল, যদি ধরা পড়ি, আর ফাঁসীটা যদিই ফস্‌কে যায়, তবে ঐ সকোত্রাতে অথবা আন্দামান দ্বীপের ঐ রকম কোন স্থানে নিশ্চিত নির্ব্বাসিত হ'তে হবে। চির-বসন্ত-বিরাজিত চির-শ্যামল-বনরাজি-শোভিত আনন্দ-বন নামের অপভ্রংশ আন্দামান সম্বন্ধে তখন আমার এই রকম একটা ভীষণ ধারণাই ছিল।

আমার প্রথম ফরাসী বন্ধুর নিকট সে কালের ফরাসী রাজনীতিক বন্দীদের হৃদয়-বিদারক কাহিনী শুন্‌তে শুন্‌তে হোটেলে ফিরে এসেছিলাম। এও তার কাছে শুনেছিলাম, ঐ রকম বন্দীদের স্মৃতিকে সে দেশের সাধারণ লোক ঘৃণার বদলে ভক্তির চোখে দেখে থাকে।

যাই হোক, এখন মনে হচ্ছে, এ দেশের রাজনীতিক বন্দীদের সৌভাগ্যক্রমে, এ রকম নৃশংসভাবে কারাভোগের সম্ভাবনা এখন আর নাই। যে সময়ের কথা লিখছি, তখন বৃটিশরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করবার অপরাধে ধৃত বিপ্লবপন্থীর ভাগ্যে ঠিক কি রকম কারাভোগ জুটতে পারে, তার কোন রকম আন্দাজ করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব ছিল। সে কালে হিন্দু-মুসলমান নরপতিদের আমলে এর চেয়েও নাকি আরও অধিকতর অমানুষিক দণ্ডের ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু এ কালে য়ুরোপের একটি সভ্য জাতি যে রকম দণ্ডের ব্যবস্থা কিছু দিন আগেও স্বজাতির ওপর অবারিতভাবে সংঘটিত হ'তে দিয়েছিল, সে রকম, চাই কি ততোধিক ব্যবস্থা যে আর এক য়ুরোপীয় সভ্য জাতি অর্থাৎ কি না ইংরাজ জাতি সর্ব্বতোভাবে অধীনস্থ' কালা আদমীদের প্রতি করবে না, এ কথা কিছুতেই তখন বিশ্বাস করবার সাধ্য হয় নি।

এ রকম নিদারুণ দণ্ড কি ক'রে সহ্য করা যেতে পারে, তখন চিন্তা করতে গিয়ে ক্ষেপে যাবার যোগাড় হয়েছিলাম। তাই বিপ্লবরূপ আপদকে ইস্তফা দিয়ে, চিত্রকলা বা অন্য কোন শিল্প শেখবার খেয়ালও প্রাণে দেখা দিয়েছিল। দিন কয়েক এই দোটানা চিন্তার পর পূর্ব্বোক্ত কারা-সঙ্কটের হাত হ'তে অব্যাহতিলাভের আর একটা খেয়ালও মাথায় এসেছিল। সেটা হচ্ছে আত্মহত্যা। কিন্তু প্রথমে জেলের মধ্যে ঢুকেই আত্মহত্যার তোড়-জোড় মেলাও যে মুস্কিল, তা তখন জানতাম না। আন্দামানে নির্ব্বাসিত হওয়ার প্রায় বছরখানেক পরে, যাই হোক, লণ্ডনের "উইমেন সাফ্রেজেট্স"রা (অর্থাৎ পার্লামেণ্টের সভ্য-নির্ব্বাচনে নারীদের ভোট দেওয়ার অধিকারপ্রাপ্তির জন্য আন্দোলনকারিণী মহিলারা) একটা ভারী সহজ উপায় বাৎলে দিলেন। সেটা হচ্ছে প্রায়োপবেশন অর্থাৎ hunger strike (যার মানে না খেয়ে জেলখানাকে আত্মহত্যার ভয় দেখান)।

যাক্, তার পর গণতন্ত্রের আদর্শ রাষ্ট্র সুইজারল্যাণ্ড হয়ে প্যারিসে গেলাম। দেশ ছেড়ে প্রায় তিন সপ্তাহ পরে পথে একটি স্বদেশী ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। প্রথমে তিনি আমার জন্য অনেক কিছু করবেন ব'লে আমায় নেহাৎ বাধিত ক'রে ফেলেছিলেন। আমিও গোঁড়া ভক্তটির মত তাঁর সযত্ন-প্রদত্ত একর্কাড়ি উপদেশ একবারে হজম ক'রে ফেলেছিলাম। শক্তি-সাধনার মন্ত্র (মনে নাই) দিয়ে, "হনুমান" আদি পঞ্চ প্রকার আসন যথাশাস্ত্র শুদ্ধভাবে অভ্যাস করিয়ে ছেড়েছিলেন। বিদায়ের কালে প্রত্যাশিত অনেক কিছু আনুকূল্যের বদলে প্যারিসের এক জন বিশিষ্ট ভদ্রলোকের বরাবর একখানা পরিচয়পত্রমাত্র পেয়েছিলাম।

প্যারিসে ঐ ভদ্রলোকের বাড়ী উঠে তাঁর আদর-আপ্যায়নে মুগ্ধ হয়েছিলাম। তাঁকে আমার বিদেশগমনের আসল মৎলব সম্বন্ধে আঁচ দিলাম এবং প্যারিসে আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে কি না জানতে চাইলাম। দিন কয়েক অনেক গবেষণার পর তিনি যা বলেছিলেন, তার মর্ম্ম যতখানি মনে পড়ছে, তা এই :—আমার missionএর ওপর তাঁর নিজের না কি সম্পূর্ণ সহানুভূতি ছিল। যদিচ তাঁদের ভারত উদ্ধারের অবলম্বিত প্রথা ছিল, না কি, সম্পূর্ণ পৃথক্। প্রথমতঃ, যুদ্ধবিদ্যা শেখার সুযোগ, তাঁর বিবেচনায়, ভারতবাসীর পক্ষে কোথাও মেলা প্রায় অসম্ভব। দ্বিতীয়তঃ, এনার্কিষ্টদের দলে ঢুকে পড়তে পারলে বৈপ্লবিক দল সংগঠন-প্রণালী, বিপ্লবতত্ত্ব, বোমা গুলীগোলা আদি যুদ্ধের উপকরণ প্রস্তুতপ্রণালী শেখার, আর যুদ্ধের যাবতীয় অস্ত্র-শস্ত্র গোপনে চালান দেওয়ার সুবিধা না কি অন্য স্থান অপেক্ষা প্যারিসে বেশী হলেও হ'তে পারে। তিনি আশা দিলেন, দু'তিন মাস থাকলেই ফরাসী ভাষা নিশ্চয় আয়ত্ত হ'তে পারে। তখন আমাকেই সব কিছু খুঁজে পেতে নিতে হবে। তাঁরা ও সব কিছু পারবেন না। ইত্যাদি।

পূর্ব্ব-পরিচ্ছেদে উল্লেখ করেছি, এক জন বাঙ্গালী ভদ্রলোক আমার য়ুরোপযাত্রার দুতিন মাস আগে এই উদ্দেশ্যে আমেরিকা গেছলেন। এই ক মাসে, এ ব্যাপারের তিনি সেখানে কি রকম সুবিধা মনে কচ্ছেন, আমায় জানাবার জন্য তাঁকে লিখেছিলাম। তাঁর উত্তর না পাওয়া পর্য্যন্ত প্যারিসে থাকাই স্থির করলাম।

কয়েক দিন পরে নিউইয়র্ক থেকে তিনি আমার চিঠির লম্বা-চওড়া উত্তর দিলেন। আমেরিকায় তখন যে সকল ভারতবাসী ছিলেন, তাঁদের কারুরই ভারত উদ্ধারকল্পে গুপ্ত সমিতির খেয়াল না কি ছিল না। অন্য দেশীয়দের দ্বারা গঠিত বৈপ্লবিক দলে ঢুকবার আশাও সেখানে নাই।

কারণ, সেখানে তিনি তাঁর কালো চামড়া নিয়ে বড়ই বেগোছে ঠেকেছিলেন। তাই তিনি লিখেছিলেন, প্যারিসে কালো চামড়া সাদা করবার কোন ব্যবস্থা যদি থাকে, তবে তিনি প্যারিসে চ'লে আস্‌বেন।

সুতরাং আমেরিকার আশা ছেড়ে দিয়ে প্যারিসে মাস কয়েক থেকে একবার চেষ্টা ক'রে দেখবার সঙ্কল্প স্থির ক'রে ফেললাম।

প্যারিসে তখন প্রায় পঁচিশ কি ছাব্বিশ জন ভারত-বাসী ছিলেন। তার মধ্যে মাত্র দুজন পঞ্জাব প্রদেশের। বাকী সকলেই বম্বে প্রেসিডেন্সির ব্যবসায়ী। অনেকে সপরিবারে থেকে ভারতীয় ছুতমার্গের সনাতন কায়দা-কানুন বিশুদ্ধভাবে রক্ষা করতেন।

এঁদের মধ্যে কয়েক জন মিলে "প্যারিস ইণ্ডিয়ান সোসাইটী" নামক একটি সমিতি গঠন করেছিলেন। সপ্তাহে প্রায় একবার যে অধিবেশন হ'ত, তাতে প্রবাসী ভারত-মহিলারাও যোগ দিতেন। এ সমিতির উদ্দেশ্য ছিল—স্বদেশের হিতসাধন।

স্বদেশপ্রীতি ব'লে জিনিষটার সেখানে মানব-মনের উপর এমনই প্রভাব যে, স্বদেশের মঙ্গলের জন্য কিছু কর-বার, অন্ততঃ ভাণ যে না করেছে, তাকে তাচ্ছীল্যের ভাগী হ'তে হয়। উক্ত সমিতির সভ্যদের মধ্যে তিন চার জন ছাড়া বাকী সকলে বোধ হয় ঐ কারণে কখন কখন ঐ সমিতিতে যোগ দিতেন। দেশের জন্য যে কজনের সত্যি-কার একটু টান ছিল, তার মধ্যে শ্রীযুক্ত এস, আর রাই, বি, এ, ব্যারিষ্টার সাহেব এক জন। ইনি ইংলণ্ডে ব্যারিষ্টারী পাশ ক'রে প্যারিসে মোতি ও অন্যান্য জহরতের ব্যবসায়ে বেশ সমৃদ্ধিশালী হয়েছিলেন। য়ুরোপে থেকে রাষ্ট্রনীতি শেখবার জন্য অনেক শিক্ষার্থীকে ইনি বৃত্তি দিতেন।

এঁদের সঙ্গে লণ্ডনের ভারতীয় সমিতির যোগ ছিল। ঐ সমিতির কর্ত্তা ছিলেন গুজরাতবাসী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্যামাজী কৃষ্ণ বর্ম্মা এম, এ। পূর্ব্বে ইনি কোন কোন করদ রাজ্যে মন্ত্রী ছিলেন। চাপেকার ভ্রাতাদের দ্বারা বম্বে সহরে ডাঃ র‍্যাণ্ডের হত্যার পরে,* অনুমান ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে ভারত ত্যাগ ক'রে ইংলণ্ডে যান। বোধ হয়, ওখানে কোন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম, এ, উপাধি লাভ ক'রে সংস্কৃত অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন। এঁর পাণ্ডিত্যের সুনাম ছিল ব'লে শুনেছিলাম।

প্রায় ১৯০২ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের কোন একটি বিশ্ব-বিদ্যালয়ে বাইবেল পড়ানর বিরুদ্ধে এক তুমুল আন্দোলন সুরু হয়েছিল। এই উপলক্ষে প্রতিবাদস্বরূপ ট্যাক্‌স দেওয়া বন্ধ এবং সে জন্য সম্পত্তি ক্রোক নীলাম আদি হ'লে, নির্ব্বিরোধ বা নিষ্ক্রিয়ভাব অবলম্বন করিবার ব্যবস্থা ছিল। এই ব্যবস্থাকে "passive resistance আন্দোলন" নামে অভিহিত করা হয়েছিল।

এই পন্থা আগে না কি কাউণ্ট টলষ্টয় অবলম্বন করে-ছিলেন। এ ছাড়া সপ্তদশ খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগে বৃটিশরাজ দ্বিতীয় চার্লসের রাজত্বকালেও ঐ রকম বোষ্টমী আন্দো-লন ঘটেছিল। তা "non-resistance movement" নামে অভিহিত হয়েছিল।

যাই হৌক, ইংরাজের কবল থেকে ভারত উদ্ধারের সহজসাধ্য পন্থারূপে "প্যাসিভ রেজিস্‌ট্যান্‌স" আন্দোলনের ব্যবস্থা, এই প্রকারে প্রথমে বোধ হয় এসেছিল পণ্ডিতজীর মাথায়। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে তিনি "হোমরুল লিগ" নামে একটি লিগ গঠন ও তার মুখপত্রস্বরূপ 'ইণ্ডিয়ান সোসিও-লজী' নামক এক ছোট্ট খবরের কাগজ বের করেন। মোটা-মুটি তাঁদের পলিসিটা এই ছিল যে, বৃটিশরাজের অধীন "হোমরুলই" ভারতবাসীর পক্ষে আদর্শ শাসনপ্রণালী। আইনসঙ্গত আন্দোলন অর্থাৎ আবেদন-নিবেদন আদি মামুলী কংগ্রেসী পন্থায়, ইংরাজের হাত থেকে ভারতবাসীর জন্য সুবিধামত কোন অধিকার আদায় করা যে অসম্ভব, তা কংগ্রেসের বিশ বছরের চেষ্টাতে প্রমাণিত হয়েছে। তার পর ইংরাজের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে কিছু আদায় করাও ভারত-বাসীর পক্ষে আরও অসম্ভব। তাই পণ্ডিতজী বোধ হয়, অনা-য়াসলভ্য সোজা উপায়ের জন্য আকুল হয়ে উঠেছিলেন। হেন কালে বিলাতে পূর্ব্বোক্ত প্যাসিভ রেজিস্‌ট্যান্‌স্ সুরু হ'ল, আর অমনই পণ্ডিতজী, অকূল পাথারে উপায় স্বরূপ, ভাসমান একগাছি তৃণ অবলম্বনের মত, ভারত উদ্ধারের জন্য উক্ত প্রকার আন্দোলনকে প্রকৃষ্ট পন্থা ব'লে গ্রহণ করেছিলেন। তাই ভারতে বিনামূল্যে প্রেরিত তাঁর "ইণ্ডিয়ান সোসিয়ালজীর" মারফৎ ইংরাজের কাছ থেকে ভারতের "হোমরুল" আদায়ের প্রকৃষ্ট পন্থাস্বরূপ "প্যাসিভ

রেজিস্ট্যান্সের" বাণী বিলোতে আরম্ভ করেছিলেন। তাঁর এই বাণীর প্রসাদাৎ যে ভারতে—বিশেষতঃ বাঙ্গালা দেশে তৎকালীন স্বদেশী (কার্য্যতঃ যার মানে না কি "প্যাসিভ্ রেজিস্ট্যান্স্") আন্দোলন সম্ভব হয়েছে, তা ব'লে পণ্ডিতজী বেশ তৃপ্তি অনুভব করতেন।

তাঁর "প্যাসিভ্ রেজিস্ট্যান্সের" স্বরূপটা দু' এক কথায় একটু প্রকাশ ক'রে বলি। য়ুরোপে গিয়ে রাষ্ট্র-নীতি শেখবার জন্য প্রতি বছর কয়েক জন ভারতীয় যুবককে তিনি তিন বছরকাল স্থায়ী মোটা বৃত্তি দিতেন। শিক্ষা শেষ হ'লে ভারতে এসে তাঁর এই আদর্শ প্রচার ক'রে ক্রমে সমস্ত দেশকে এমনভাবে প্রস্তুত করবে যে, এক নির্দ্দিষ্ট সু-প্রভাতে সমস্ত ভারতময় বিলাতজাত দ্রব্য-বর্জ্জন, রেল, পোষ্ট, টেলিগ্রাফ, ব্যাঙ্ক প্রভৃতি ইংরাজ সরকারের আর ইংরাজ বণিকদের যে কোন আফিস, আদালত, সৈন্য-বিভাগ, পুলিস-বিভাগ ইত্যাদির দেশীয় কর্ম্মচারী, এমন কি, সাহেবদের খানসামা বাবুর্চি পর্য্যন্ত কায বন্ধ ক'রে দেবে, অর্থাৎ কি না সর্ব্বাঙ্গসুন্দর গুজরাতী হরতাল সুরু ক'রে দেবে। অধিকন্তু রেল-লাইন, টেলি-গ্রাফের তার আদিও কেউ উড়িয়ে দেবে। তা হলেই ইংরাজ সরকার এমনই কাবু হয়ে যাবে যে, ভারতবাসীকে "হোমরুল" না দিয়ে আর বাঁচবার উপায় থাকবে না।

ঠিক ঐ সময় কলকাতা কিংবা রাণীগঞ্জে মেসার্স বার্ণ কোম্পানীর কারখানার এবং ই, আই, রেলওয়ে ষ্টেসনের বাঙ্গালী কর্ম্মচারীরা যে ধর্ম্মঘট করেছিল, তা না কি পণ্ডিত-জীর উক্ত বাণীরই প্রভাবে। তিনি এই ঘটনাকে তাঁর আদর্শ অনুযায়ী কার্য্যসিদ্ধির নিশ্চয়াত্মক পূর্ব্বলক্ষণ বলেই ধ'রে নিয়েছিলেন। তিনি যে রকম কঞ্জুস ছিলেন, তাতে নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, তাঁর উদ্ভাবিত পন্থা অনুযায়ী ভারতীয় "হোমরুল"-প্রাপ্তি সম্বন্ধে তাঁর প্রগাঢ় বিশ্বাস না থাকলে তিনি কখনও বছর বছর এত টাকা বৃত্তি দিতে পারতেন না। এ বিশ্বাস যেমনই হোক, ভারতের অন্যতম নেতাদের মত অনর্থক ত্যাগের চটক না দেখিয়ে, চাঁদার খাতার ওপর খাতা না খুলে, খালি বচনে চাঁদ হাতে দেওয়ার প্রবঞ্চনা না ক'রে নিজের আদর্শকে কাযে পরিণত করবার জন্য নিজের অর্জ্জিত অর্থ যে ঢেলে দিতে পেরেছিলেন, স্বদেশ-প্রীতির ইহা বড় কম আদর্শ নয়। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় এই যে, তাঁর প্রদত্ত বৃত্তিভোগী বোধ হয় এক জনও, আমরা যতদূর জানি, তাঁর আশা একটুও পূর্ণ করেন নি। বরং বেশীর ভাগ বৃত্তিভোগীরা শেষে তাঁর প্রতিকূলাচরণ করেছিলেন।

যাই হোক, এ হেন নেতার দক্ষিণ হস্তস্বরূপ এক জন প্রধান কর্ম্মী বা উপনেতা ছিলেন, বম্বে প্রদেশের নাসিক সহরনিবাসী শ্রীযুক্ত বিনায়ক দামোদর সাভারকার। ইনি বম্বে থেকে বি, এ, পাস ক'রে ব্যারিষ্টারী পড়বার জন্য ঐ (১৯০৬) খৃষ্টাব্দের বোধ হয় জুন মাসে বিলাত গেছলেন। পূর্ব্বোক্ত রাণা সাহেবের বৃত্তিভোগীদের মধ্যে বোধ হয় ইনিও এক জন।

লণ্ডনে উক্ত পণ্ডিতজীর কয়েকটা নিজস্ব বাড়ী ছিল। তার মধ্যে "হাইগেটের" বাড়ীতে ভারতীয় শিক্ষার্থীদের কম খরচে থাকবার জন্য তিনি একটা হোটেল খুলেছিলেন। এ হোটেলের নাম ছিল "ইণ্ডিয়া হাউস।" সাভারকার এই হোটেলেই থাকতেন। তখন তাঁর বয়েস মাত্র বাইশ কি তেইশ বছর।

বিনায়কের দাদা শ্রীযুক্ত গণেশ দামোদর সাভারকার এই সময়ের চার পাঁচ বছরের আগে ঢাকার অনুশীলন সমিতির ধাঁচে "মিত্রমেলা" নামক একটি সমিতি নাসিকে স্থাপন করেন। তার প্রকাশ্য উদ্দেশ্য ছিল, যুবকদিগের শারীরিক শক্তির অনুশীলন অর্থাৎ কুস্তী, লাঠিখেলা ইত্যাদি! আর গুপ্ত উদ্দেশ্য বোধ হয় এই ছিল যে, সময় হ'লে ইংরাজের সঙ্গে লড়াই করবার মত মনোভাব হিন্দুদের মধ্যে জাগিয়ে তোলা। দেশে থাকতে বিনায়-কেরও এই মেলার সঙ্গে যোগ ছিল।

"গণপতি উৎসব", "শিবাজী উৎসব"-আদিও এই মেলার অঙ্গ ছিল। এতে ক'রে সহজে অনুমেয়, অহিন্দু এবং ইংরাজ-বিদ্বেষ মারহাট্টিদের মধ্যে জাগাবার চেষ্টা বোধ হয় হ'ত।

বিনায়কের বিলাত যাওয়ার মাস কতক আগে "মহাত্মা শ্রীঅগম্য গুরু পরমহংস" নামক এক জন পরিব্রাজক বিনায়-কের নেতৃত্বে পুনা সহরে এক সমিতি গঠন করেন। এই সমিতির একমাত্র প্রধান কায ছিল না কি চাঁদা আদায় করা।* অবিশ্যি অন্য কায বোধ হয় "পরে বক্তব্য" ছিল।

* রাউলাট কমিশন রিপোর্ট দ্রষ্টব্য।

যাই হোক, এ থেকে বুঝা যায়, বিনায়ক বিলাত যাওয়ার আগেই রাষ্ট্রনৈতিক ব্যাপারে নেতৃত্বের তালিম পেয়েছিলেন। তাই লণ্ডনে গিয়েই গুপ্ত সমিতি গঠন করতে উঠে প'ড়ে লাগলেন। ইহাই বোধ হয় ভারতের বাহিরে প্রথম ভারতীয় বৈপ্লবিক গুপ্ত সমিতি। বাঙ্গালায় গুপ্ত সমিতির সুরুতে যেমন ঘটেছিল, এঁদেরও তেমনই প্রধান কায ছিল চাঁদা আদায় করা, সভ্যসংখ্যা বাড়ান, ইংরাজ সরকারের প্রতি বিদ্বেষভাব প্রচার করা, আর সেই উদ্দেশ্যে প্যামপ্লেট্ ছেপে ভারতের নানা স্থানে পাঠান।

সুপুরুষ বল্‌তে যা বুঝায়, ইনি তাই ছিলেন। মুখের ভাবটি খুব তীক্ষ্ণবুদ্ধির পরিচায়ক। এই মুখের একটা এমন আকর্ষণী শক্তি ছিল যে, প্রথম দৃষ্টিতে লোককে আপন জন ক'রে ফেলতে পারতেন। দু' চার কথায় লোকের মনোরঞ্জন করবার বিদ্যাও তাঁর আয়ত্ত ছিল। আমাদের বারীনের মত, মুখে যা আসে, তাই ব'লে মুহূর্ত্তের মধ্যে ভক্ত ক'রে নিতে তাঁর অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। "ইণ্ডিয়া হাউসে" আমার সঙ্গে প্রথম দর্শনেও তিনি তাঁর ক্ষমতার পরিচালনা করেছিলেন। দু' চার কথার পরেই আমায় মন্ত্র পড়িয়ে দীক্ষিত করতে চেয়েছিলেন; কিন্তু ইতোমধ্যেই তাঁর দু' এক জন বন্ধু তাঁকে যে বি, বি, (Big bluff) উপাধি দিয়েছিলেন, তা আমি জান্‌তাম। তাঁর মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছিলাম কি না মনে নাই, কিন্তু তথাপি তাঁর ভক্ত হয়েছিলাম।

বিনায়ক যদিও রাষ্ট্রনৈতিক ব্যাপারে পণ্ডিতজীর দক্ষিণ-হস্তস্বরূপ ছিলেন, তথাপি পণ্ডিতজী অপেক্ষা এঁর রাজনীতিক মত অপেক্ষাকৃত অনেক গরম ছিল ব'লে তখন মনে করতাম। পণ্ডিতজীর মতামত পূর্ব্বে কিছু উল্লেখ করেছি।

বিনায়কের ঠিক যে কি মত ছিল, তা বলা দুরূহ। কারণ, তিনি লোক বুঝে, যে যেমন, তার কাছে তেমন ধরণের মত প্রকাশ করতেন। য়ুরোপে থাকার সময়ে যা জানতে পেরেছিলাম, আর তাঁর হিন্দুভাবাপন্ন এক জন মুসলমান ভক্তের সঙ্গে প্যারিসে প্রায় আট নয় মাস একত্র থাকবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল, সেই অনিসন্ধিৎসু ভদ্রলোকের কাছে যা শুনেছিলাম, তার যতটুকু এখন মনে পড়ছে, মোটামুটি তা এই যে, ভারতের সাধারণ লোকের মধ্যে ইংরাজ-বিদ্বেষ অতিরিক্ত মাত্রায় জাগাতে পারিলে, নানা ঘটনাচক্রে দাঙ্গা-হাঙ্গামা হ'তে সুরু ক'রে ক্রমে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের সিপাহী-বিদ্রোহের মত দ্বিতীয় বিদ্রোহের উদ্ভব হবে। আজকালের উচ্চশিক্ষিত (অর্থাৎ বোধ হয় বিলাত-ফেরত) নেতাদের মত বিচক্ষণ নেতা ছিল না বলেই ৫৭র চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল। এখন কিন্তু সে রকম নেতার অভাব একেবারে নাই। তখন ভারতের সর্ব্বত্র বৈপ্লবিক ভাব প্রচারের চেষ্টা হয় নি; এখন সমস্ত ভারত গুপ্ত সমিতিতে ছেয়ে ফেল্‌তে হবে। এই সমিতিগুলির প্রধান কায হবে, নতুন নতুন বৈপ্লবিক সাহিত্যের সৃষ্টি ক'রে এবং অন্য নানা উপায়ে আপামর জনসাধারণকে বিদ্রোহের ভাবে মোরিয়া ক'রে তোলা।

তখনকার বিদ্রোহে হিন্দু মুসলমান একযোগে ইংরাজের বিরুদ্ধে লড়েছিল; এখন যে সকল মুসলমান হিন্দুর সঙ্গে একযোগে ইংরাজের বিরুদ্ধে লড়বে অথবা হিন্দুকে সাহায্য করবে, অথচ হিন্দুর ধর্ম্ম মেনে নেবে, তারা নব অর্জ্জিত স্বাধীনতার ভাগ পাবে, নচেৎ ইংরাজের মত শত্রু ব'লে পরিগণিত হবে। এইরূপে আবার ভারত হিন্দুর দেশে পরিণত হ'লে আমাদের ভারতীয় রাজাদের মধ্যে যে বিশেষ ক'রে এই ভারতীয় স্বাধীনতা-সমরে সাহায্য করবে, সে, সার্ডিনিয়ার রাজা দ্বিতীয় ইমান্থয়েল যেমন সমগ্র ইতালীর রাজা হয়েছিলেন, তেমনই ভারতে একচ্ছত্র সম্রাট হবে। অন্যান্য রাজ্য ও প্রদেশগুলি তাদের সুবিধামত ঐ সম্রাটের অধীন গণতান্ত্রিক প্রদেশ (Republican States) অথবা আপন আপন প্রাদেশিক রাজার অধীন রাজ্যে (Monarchical States) পরিণত হয়ে মজা লুটবে।

দুনিয়ার বর্ত্তমান অবস্থার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে হ'লে যতদূর সম্ভব হয়, ততখানি সংস্কার ক'রে, সনাতন আর্য্যসভ্যতা অর্থাৎ ব্রাহ্মণ সভ্যতার (বোধ হয় মনুসংহিতার মোতাবেক) পুনঃ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। অবিশ্যি জাতি (Caste) ভেদ থাকবে না; কিন্তু চতুর্ব্বর্ণ থাকবে। ব্রাহ্মণই থাকবে দেশের শাসনদণ্ডের শিরোমণি। অন্যান্য বর্ণগুলিও যথাবিধি আপন আপন কায করতে থাকবে। উজ্জয়িনী হবে রাজধানী, আর ভাষা হবে হিন্দী, অক্ষর হবে নাগরী। আজকালকার অতি বড় নেতাদের পরিকল্পিত ভারত,

উদ্ধারের প্ল্যান অপেক্ষা এটা নেহাৎ অসম্ভব হলেও, আমাদের মত সাধারণ লোকের পক্ষে সহজবোধ্য ছিল।

পণ্ডিতজী ঐ গুপ্তসমিতির বেশী কিছু খবর রাখতেন ব'লে মনে হয় না। তবে ভারতীয় সকল নেতার মত ইংরাজের প্রতি বিদ্বেষ প্রচারই ছিল তাঁরও প্রধানতম পন্থা। হিন্দু-মুসলমান-সমস্যার সমাধান সম্বন্ধে তাঁর কি মত ছিল, তা ঠিক বুঝতে পারি নি। ভারতের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে পূর্ব্বেই বলেছি, "হোমরুলই" ছিল তাঁর একমাত্র আদর্শ শাসনপ্রণালী।

কিন্তু ১৯০৭ খৃষ্টাব্দের প্রথমে তিনি এক হাজার কি ঐ রকম কিছু টাকার একটা পুরস্কার ঘোষণা করেছিলেন। ভারত স্বাধীন হ'লে তার শাসন-প্রণালী কি রকম হওয়া উচিত, সে সম্বন্ধে যে ভারতীয় লেখকের প্রবন্ধ উৎকৃষ্ট হবে, তিনি সেই পুরস্কার পাবেন। ঐ সকল প্রবন্ধের ভালমন্দ বিচারের ভার ছিল একটি কমিটীর ওপর। তার কর্ত্তা ছিলেন স্বয়ং পণ্ডিতজী। তার সভ্য অর্থাৎ বিচারক দশ বারো জন ছিলেন। তাঁদের অধিকাংশেরই এ বিষয় বিচারের অযোগ্যতা সম্বন্ধে এইমাত্র বললে যথেষ্ট হবে যে, তার মধ্যে ছিল এই লেখকও এক জন।

বোধ হয়, সাতটিমাত্র প্রবন্ধ সারা ভারত থেকে পাঠান হয়েছিল। তার মধ্যে বিশিষ্ট দু'জন প্রবন্ধ-লেখকের নাম মনে পড়ছে। এক জন শ্রীল শ্রীযুক্ত প্রিন্স আগাখান; * তিনি এক সুদীর্ঘ প্রবন্ধ পুস্তকাকারে সুন্দররূপে ছেপে পাঠিয়েছিলেন। এক কথায়, তার বোধ হয় তাৎপর্য্যটি ছিল, ভারতের পক্ষে চিরকালের জন্য অর্থাৎ যাবৎ চন্দ্র-দিবাকর একমাত্র বর্ত্তমান শাসনপ্রণালীই বিধেয়। বিধেয় হোক বা না হোক, যত দিন এই অপ্রতিবিধেয় হিন্দু-মুসলমান-সমস্যা বিদ্যমান থাকবে, আর যত দিন জাতি (caste) অথবা বংশগত বর্ণভেদের ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত এই ধর্ম্মতন্ত্র হিন্দুদের মধ্যে অটুট থাকবে, তত দিন জনসাধারণের সুবিধাজনক অন্য কোন রকম শাসনপ্রণালী যে অসম্ভব, যাঁরা সেকালের তথাকথিত অতিরঞ্জিত বৃথা গৌরবে গৌরবান্বিত হওয়ায় তৃপ্তিজনিত নেশাটাকে অথবা অন্যকে এই তৃপ্তি দেওয়ার ব্যবসাকেই স্বদেশপ্রেমিকতার একমাত্র নিদর্শন না ক'রে, ভারতের বর্ত্তমান ভীতি-উৎপাদক সমস্যাগুলির উপায় চিন্তা করতে গেলে যে রক্ত ঠাণ্ডা হওয়ার অবস্থা আসে, তা বাস্তবিক (আধ্যাত্মিক নয়) উপলব্ধি করেছেন, তাঁদের এই মর্ম্মন্তুদ ধারণা না এসে পারে নি।

আর এক জন ছিলেন কলকাতার শ্রীযুক্ত বি, সি, মজুমদার, যাঁর নাতিদীর্ঘ সুচিন্তিত প্রবন্ধ সকলের মতে শ্রেষ্ঠ ব'লে বিবেচিত হ'লেও কেবল মনঃপূত হয় নি পণ্ডিতজীর। এ জন্য এবং প্রবন্ধের সংখ্যা নিতান্ত কম ব'লে সে বছরের মত পুরস্কার স্থগিদ রেখে আরও প্রবন্ধের জন্য আবার বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল।

আমাদের প্রায় সকল বড় নেতা নেহাৎ দায়ে না ঠেক্‌লে অন্যের মতামত বিচারসঙ্গত হ'লেও তদনুযায়ী নিজের মতের সংস্কার বা পরিবর্ত্তন করতে পারেন না। এই গোঁ পণ্ডিতজীর বড় একটা ছিল না। অন্য অভিজ্ঞদের সঙ্গত মতামত গ্রহণের জন্য তাঁর চেষ্টার কিছুমাত্র ত্রুটি ছিল না। তথাপি "হোমরুল" নামক কবন্ধ তাঁর ঘাড়ে রীতিমত চ'ড়ে বসেছিল ব'লে ঐ সাতটিমাত্র প্রবন্ধে বোধ হয় সেই কবন্ধের গন্ধ না পেয়ে পুরস্কার স্থগিদ রেখেছিলেন ব'লে তখন মনে হয়েছিল।

যে বৈপ্লবিক নেতার নাম, যশ, লোকপূজা আদি লাভের বাসনা ক্রমে বলবতী হয়, সে নেতার ডবল রাষ্ট্রনৈতিক মতের দরকার হয়ে পড়ে। একটা আত্মপ্রকাশের জন্য প্রকাশ্য মত; আর একটা গুহ্য, যা আত্মত্যাগের চরম নিদর্শন। প্রকাশ্য মতটা হয় প্রথমে লোকমত সংগ্রহের অছিলামাত্র। ক্রমে এই লোকমত সংগ্রহ হয়ে দাঁড়ায় লোকপূজা। আর লোকপূজার স্বাদ একবার পেলে বা লোকপূজার নেশা একবার জমলে তখন কিছুতে তা ছাড়ে না। অন্য দিকে গুহ্য যেটা, সেটা আইনের চরম বিরোধী ব'লে বিপৎসঙ্কুল; নাম, যশ, লোকপূজার সম্ভাবনা তাতে সুদূরপরাহত। তাই এটা ক্রমশঃ তুচ্ছ ও ত্যজ্য হয়ে যায়। এই দু মতওয়ালা নেতারা যে শুধু বিপ্লবসমিতি নাশের কারণমাত্র হয়ে দাঁড়ান, তা নয়; লোকপূজার লালসায় এমনই হ্যাংলা হয়ে উঠেন যে, বৃথা লোক তৃপ্তির জন্য দেশের অনিষ্টকর এমন অকার্য্য কুকার্য্য নাই, যা এঁরা করতে পারেন না। যাই হোক, পণ্ডিতজী

* তখন ইনি কোন উপাধি লাভ করেন নি।

কিন্তু এ হেন দু' মতওয়ালা নেতা ছিলেন না। অনেক ঘটনার মধ্যে দুটির এখানে উল্লেখ ক'রে তা দেখাব।

মাস চার পাঁচ প্যারিসে থাকবার পরও যখন সেখানকার কোন বৈপ্লবিক সমিতি কিংবা এনার্কিষ্টদের কোন তথ্য সংগ্রহ করতে পারলাম না, তখন কোন কেমিষ্টের কাছে মাইনে দিয়ে একসপ্লোসিভ কেমিষ্ট্রী শেখবার প্রবৃত্তি জেগে উঠল। এক পাকা ফ্রেঞ্চ কেমিষ্ট জুটেও গেলেন। কিন্তু প্রথমে ক্লোরেট অব পটাশের একটা অতি সাধারণ বিস্ফোরক দেখিয়ে দিয়ে তিনি ব'লে বসলেন, এর চেয়ে আর নাকি সাংঘাতিক জিনিস তয়ের হয় না। তার পর দাবী করেছিলেন, শিখিয়ে দিলে পাঁচ শ ফ্রাঙ্ক। যাই হোক, তাঁকে বুঝিয়ে দিয়েছিলাম, ও সব চলবে না। দু'খানা বই (nitro explosives এবং modern high explosives) দেখালাম। পরে মঃ বার্থোলোর একখানা বইও জোগাড় করা হয়েছিল। তার পর বন্দোবস্ত হ'ল, আমরা একটা ছোট্ট ল্যাবরেটারী করব। তাতে এক দিন অন্তর সপ্তাহে তিন দিন ঐ বই দুখানার আলোচ্য প্রত্যেক একসপ্লোসিভটা হাতে কাষে তয়ের ক'রে দেখিয়ে দিতে হবে। তার দরুণ প্রতি দিন বিশ ফ্রাঙ্ক দিতে হবে। ছয় মাসের জন্য তাঁকে নিযুক্ত করা হয়েছিল।

কিন্তু এত টাকা আসে কোথা থেকে? এইটেই মস্ত এক সমস্যা হয়ে দাঁড়াল। পণ্ডিতজীকে ধরাই স্থির করলাম। তখন তিনি লণ্ডনে। আমার পূর্ব্বোক্ত পরিচয়-পত্র সমেত নিবেদন ক'রে পাঠালাম যে, টাকার অভাবে কোন বিশেষ কাষ হচ্ছে না। তিনি উত্তর দিলেন, প্যারিসে এসে টাকা দেবেন। কয়েক দিন পরে এলেন; ষ্টেসন থেকে তাঁর বোঁচকা বয়ে এক হোটেল পর্য্যন্ত নিয়ে গেলাম। খুব আপ্যায়িত করলেন। এই প্রথম দর্শন। তাই বড় আশা হ'ল, এই একটা লোকের মত লোক পেলাম। তাহার পরদিন গিয়ে টাকার কি হবে, তা যখন খুলে বললাম, তখন তাঁহার চক্ষু একবারে চড়কগাছ। বললেন, খবরদার, যেন ও সব কাষ কেউ না করে। করলে তাঁর বড় সাধের 'হোমরুল' না কি ফসকে যাবে।

এর কয়েক সপ্তাহ পরে শুনলাম, উক্ত "ইণ্ডিয়া হাউসে", ম্যানেজার আর পাচক, এই দুই কাষে এক জন লোক দরকার। আবেদন পাঠালাম; মঞ্জুর ক'রে ডেকে পাঠালেন। লণ্ডনে গিয়ে শুনলাম, পণ্ডিতজীর মতন তেমন কঞ্জুস ও খিট্‌খিটে লোক না কি ভূ-ভারতে আর একটিও জন্মায় নি। যাহাই হউক, আদেশমত পুরান ম্যানেজার-পাচকের সঙ্গে দুই দিন কায করলাম। কায পছন্দ হ'ল; কিন্তু য়ুরোপের কোন বৈপ্লবিক দলে যোগ দেওয়ার চেষ্টাতেই লণ্ডনে গেছলাম জেনে অনেক অপ্রীতিকর ঝগড়াঝাটির পর "ইণ্ডিয়া হাউস" থেকে আমার প্রতি অর্দ্ধচন্দ্রের ব্যবস্থা করেছিলেন।

এই থেকে বুঝা যায়, পণ্ডিতজীর মতের প্রকাশ্য আদর্শ "হোমরুল" ছাড়া অন্য গুপ্ত মতলব কিছুই ছিল না।

যাই হোক, বিলাতে ভারতীয় কংগ্রেসের বড়কর্ত্তা নৌরজীর সঙ্গে তখন তাঁহার ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলছিল। যেহেতু, বৃদ্ধ নৌরজী ছিলেন কংগ্রেসী মডারেট; আর পণ্ডিতজী নিজেকে ঘোরতর একষ্ট্রিমিষ্ট ব'লে জাহির করতেন।

তাঁর চেহারা বেশ লম্বা-চওড়া জমকাল রকমের ছিল; বয়েস তখন পঞ্চাশের উপর। ভূতপূর্ব্ব সম্রাট্ সপ্তম এডওয়ার্ডের ছবির সঙ্গে এঁর চেহারার অনেকটা সামঞ্জস্য ছিল। তিনি স্পষ্ট বক্তা অথচ সন্দিগ্ধচিত্ত ছিলেন। তাঁর ধর্ম্মের বা আধ্যাত্মিকতার কোন রকম গোঁড়ামী অথবা ভণ্ডামী ছিল না। জগতের কৃতকর্ম্মা রাষ্ট্রনৈতিক ধুরন্ধরদের মত তিনিও ধর্ম্ম, আধ্যাত্মিকতা ইত্যাদিকে ঐহিক স্বার্থ-সাধন-উপায়স্বরূপ গণ্য করতেন। ঐহিক উন্নতিই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। তাঁর রাষ্ট্রনৈতিক কার্য্যাধ্যক্ষ বিনায়কও তখন কতকটা বোধ হয় এই মতাবলম্বী ছিলেন।

অর্থ ছিল তাঁর বিপুল। হিন্দু স্ত্রী তাঁর সঙ্গে থাকতেন, সংসারে না কি তাঁর আর কেউ ছিল না। তিনি বলতেন, তাঁর সমস্ত অর্থ স্বদেশের কাষে ব্যয় করবেন। ভারতীয় নেতার প্রধানতম বিদ্যা অর্থাৎ স্বদেশী কাষের নামে অন্যের কাছ থেকে টাকা আদায়ের শক্তি ছিল তাঁর যথেষ্ট, কিন্তু গরীবের পকেটে বড় একটা হাত দিতেন না, লক্ষপতিরই স্কন্ধে আরোহণ করতেন। অনর্গল বচন দিয়ে তড়িঘড়ি ভক্ত বানিয়ে ফেলতে খুব পারতেন; কিন্তু অন্য নেতাদের মত অন্ধ ভক্তবাৎসল্যটা সুবিধামত ছিল না ব'লে ভক্তরাই শেষে তাঁর আপদ হয়ে দাঁড়াত।

অনেক বিষয়ে তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল না কি অগাধ। ম্যাজিনীর সঙ্গে তাঁর তুলনা করলে এবং পণ্ডিতজী ব'লে ডাকলেও ভারী খুসী হতেন; তাই আমরা তাঁকে পণ্ডিতজী বলেই উল্লেখ করলাম।

আর এক জন ভারতীয় ভদ্রলোক সেখানে ছিলেন; তাঁর জহরতের কারবার সেখানকার ভারতবাসীদের মধ্যে সব চেয়ে ছিল ক্ষুদ্র রকমের; কিন্তু তাঁর প্রাণটি ছিল বোধ হয় সব চেয়ে বড়। তাঁর সহানুভূতিতে সুদূর বিদেশে ঘরে আছি বলেই মনে হ'ত। অনেকের কাছে বিমুখ হয়ে, শেষে তাঁরই কৃপাতে একটি ছোট ল্যাবোরেটারী হয়ে গেল। পূর্ব্বোক্ত কেমিষ্টকে দিয়ে এক্সপেরিমেণ্ট সুরু ক'রে দিলাম। আর এক জন ভারতীয় সহকর্ম্মীও জুটিয়ে নিলাম।

এই সময়ে এক দিন একখানা খবরের কাগজে পড়লাম, "এনার্কী" নামক পত্রিকার এডিটার, এনার্কীজমের ধুরন্ধর নেতা মঃ শিবার্ত্তার কি একটা আইন অমান্য করার জন্য সাত দিন কারাবাসের সৌভাগ্য হয়েছে। সেই পত্রিকাতে তাঁর ঠিকানা ছিল। সাত দিন পরে তাঁর সঙ্গে দেখা করলাম এবং সাদরে গৃহীত হলাম। এখানে ব'লে রাখি, তখন আমি কায-চালান গোছ ফরাসী ভাষা বলতে ও বুঝতে পারতাম। তিনি আমার বক্তব্য শুনে এমন সহানুভূতি দেখিয়েছিলেন, আর এমন সব কথা বলেছিলেন, যা থেকে সে দিন আমি মনে করতে পেরেছিলাম, এঁদের দ্বারা আমার সকল আশাই পূর্ণ হবে। কিন্তু তখনও এনার্কীজম্ জিনিষটি কি, তার বিন্দু-বিসর্গও জানতাম না। রেভলিউসনারী পার্টি আর এনার্কীষ্ট পার্টি, একই ব'লে তখন ধারণা ছিল।

যাই হোক, এই সর্ত্তে তাঁদের দলের এক জন হ'তে পেরেছিলাম যে, সপ্তাহে দুই দিন তিন চার ঘণ্টা ক'রে তাঁদের আড্ডার কোন কিছু কায ক'রে দিতে হবে, অথবা অন্য কোথাও কাযে নিযুক্ত থাকলে সপ্তাহে কিছু কিছু অর্থ-সাহায্য করতে হবে। আমাদের দেশের গুপ্ত সমিতির দলভুক্ত হবার ব্যবস্থা এর ঠিক বিপরীত, অর্থাৎ কাযকর্ম্ম সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে, ভরণপোষণটা সমিতির ঘাড়ে চেপে করবার মত অবস্থা না হ'লে দলভুক্ত হবার যোগ্যতা জন্মায় না। যাই হোক, আমরা সপ্তাহে দু'দিন তিন চার ঘণ্টা ধ'রে "এনার্কীর" প্রেসে কায ক'রে দিয়ে আসতাম। এই কর্ম্মভোগ করেছি ছ'মাসেরও অধিক।

এনার্কীজম্ জিনিষটা যে কি, দু'চার কথায় এখানে তা বলবার চেষ্টা করি। এঁদের মতে রাষ্ট্রীয় শাসনের, ধর্ম্মের, সমাজের, অথবা অন্য কোন কিছুর আইন-কানুন, বিধি, নিষেধ ইত্যাদির দ্বারা মানুষকে চালিত করা, এবং এই সকল লঙ্ঘনে দণ্ড, পালনে কিছু না, কিন্তু অন্যকে পালনে বাধ্য করানতে পুরস্কার ইত্যাদি নেহাৎ অস্বাভাবিক, আত্মমর্য্যাদা-হানিকর, জনসাধারণের উন্নতির অর্থাৎ মনুষ্যত্ববিকাশের অন্তরায়, মানুষের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ, এবং বেশীর ভাগ মানুষের উপর মাত্র জনকয়েকের প্রভুত্ব রক্ষার উপায় ভিন্ন আর কিছুই নয়। এ থেকে মানবজাতিকে মুক্তি দেওয়াই হচ্ছে এনার্কীজমের উদ্দেশ্য। এদের আদর্শ, মানুষমাত্রেই "যার যা খুসী, সে তাই করবে।" এই যা খুসী তা করবার মত অবস্থায় মানুষকে আনতে হ'লে, মানুষ না কি এমন উন্নত রকমের কর্ত্তব্য-বিশিষ্ট হবে যে, নিন্দা, স্তুতি অথবা দণ্ড-পুরস্কারের অপেক্ষা না ক'রে অন্যের অনিষ্টজনক কিছু কেউ করবে না—অন্যের বাৎলে দেওয়ার বা হুকুম করার অপেক্ষা না রেখে আপন আপন কর্ত্তব্য নিক্তির ওজনে পালন করতে পারাই হবে মানুষের পক্ষে চরম আনন্দদায়ক।

এ শুনতে বেশ উচিত কথা বলেই মনে লাগে; কিন্তু এ আদর্শে পৌঁছাবার পথ খুঁজে দেখতে গেলে, আমাদের নেতাদের আদর্শের অনুযায়ী আধ্যাত্মিক স্বরাজে পৌঁছবার পথের মত কেবলই অন্ধকার।

এঁদের মধ্যেও মতভেদ আছে; আদর্শের তারতম্য আছে; অত্যাচারী রাজা বা রাজকর্ম্মচারীকে গুপ্ত হত্যার দ্বারা দণ্ড দেওয়ার ব্যবস্থা আছে; আর আছে সমিতি বা আড্ডা-ঘরের ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে এনার্কীজমের আদর্শে স্বাধীনতার লীলা প্রকট। সেখানে free loveএর অভিনয় হয়; স্বামি-স্ত্রী সম্বন্ধ ব'লে কিছু নাই; আর না কি আত্মপর ভেদও নাই। এঁদের মধ্যেও বড় বড় দার্শনিক পণ্ডিত, কবি, লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক আদি আছেন। নাইট স্কুল, সুলভ সাহিত্য, সংবাদপত্র, ব্যঙ্গচিত্র, বক্তৃতা, সভাসমিতি আদি দ্বারা প্রচারকার্য্য ও লোকশিক্ষার চেষ্টা করা হয়।

প্যারিসের অলিতে গলিতে বিস্তর সমিতি আছে। শুধু প্যারিসে নয়, সমস্ত য়ুরোপে না কি এই রকম। আমরা অনেকগুলি সমিতিতে যোগ দিয়েছি। এর সভ্যদের মধ্যে যাদের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল অথবা যাদের সম্বন্ধে কিছু জান্‌বার সুবিধা হয়েছিল, তাদের প্রায় অনেকেরই একটু না একটু মাথার গোলমাল ছিল ব'লে তখন মনে হয়েছিল। পনের আনা এদের স্বল্পশিক্ষিত বা অশিক্ষিত শ্রমজীবী শ্রেণীর লোক। মঃ লিবার্ত্তা কিন্তু এক জন বড় দরের নেতা, বক্তা ও চতুর লোক। ইনি ছিলেন খোঁড়া; কাণা খোঁড়া একগুণ বাড়া হয়েই থাকে।

এই দলে ঢুকে আমার প্রথম অনুসন্ধানের বিষয় হয়েছিল—এদের মধ্যে কোন ইংরাজ আড্ডাধারী ছিল কি না। প্রায় সব দেশের লোক অল্পবিস্তর ছিল; কিন্তু এক জনও ইংরাজ খুঁজে পাই নি। কারণ অনুসন্ধান ক'রে যা জেনেছিলাম, তার আসল তথ্যটা এই যে, ইংরাজের অতি দুঃস্থও বর্ত্তমান বৃটিশ শাসনপ্রণালীর উপর বেশী বীতশ্রদ্ধ নয়। এইটেই ইংরাজ শাসনের মাহাত্ম্য।

যাই হোক, মাসখানেক পরে আবিষ্কার করলাম, আমাদের অনুষ্ঠিত বিপ্লববাদের জন্য কিছুই এদের কাছে শেখবার মত নাই। গুপ্ত সমিতি-গঠনপ্রণালী সম্বন্ধেও শেখবার কিছুই ছিল না; কারণ, এদের সমিতিগুলোকে গুপ্ত সমিতি ব'লে মনে করবার কিছুই দেখতে পাইনি। কাযেই ক্রমে সেখানে যাতায়াত বন্ধ ক'রে দিলাম।

[ক্রমশঃ।

শ্রীহেমচন্দ্র কানুনগোই।

ভাবের অভিব্যক্তি

(উমেদারী)

[অভিনেতা :—শ্রীসুশীলকুমার রায় চৌধুরী]

উমেদার :—আজ্ঞে এবারে আর এ গোলামকে বিমুখ করবেন না, গয়না বেচে যা' পেয়েছি, হুজুরের চরণে দিতে এসেছি—

সাহেব :—তা বেশ করেছিস্, ঐখানেই রেখে দে'—। পরশু দিন এসে দেখা করিস্—বুঝলি?

কলিকাতা য়ুনিভারসিটি কোরের শিবির

গত ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের ক্যাম্পের পর কাপ্তেন হাইড ছুটীতে বিলাত যাত্রা করিয়াছেন। নূতন নূতন অনেক কাপ্তেন, এমন কি, মেজর পর্য্যন্ত 'অফিসিয়েটিং' করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে কাপ্তেন 'মোলস্ওয়ার্থ' অনেক দিন ধরিয়া কায করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রথামত ব্যায়ামের জন্য খুব কুচকাওয়াজ চলিতে লাগিল। ইহার মধ্যে আমাদের পল্টনের সার্জ্জেণ্ট মেজর 'লিউরী' পেন্সন পাওয়ায় দেশে চলিয়া গিয়াছেন। তিনি আমাদের কোরের জন্য কত কায করিয়াছেন, তাহা এক কথায় বলিতে হইলে তাঁহাকে আমাদের কোরের মেরুদণ্ড ছাড়া অন্য কিছু বলা যায় না। তাঁহার অভাব আমরা এখন বেশ ভাল করিয়া বুঝিতে পারিতেছি। এ ধারে আমিও ছুটীতে কারসিয়ং ভ্রমণে যাইলাম। নভেম্বর মাসে এক চিঠিতে জানিতে পারিলাম যে, আমাদের পুরাতন কাপ্তেন হাইড কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াছেন। কাযেই আর কারসিয়ংএ বেশী দিন থাকা হইল না। কারণ, ক্যাম্প ১৯২৫ খৃষ্টাব্দ ১৮ই ডিসেম্বর তারিখ হইতে আরম্ভ হইবে। কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া শুনিলাম, আর নিজেরও অনুভব হইল, শীতটা যেন হিমালয় হইতে এই সহরে সমান তেজে আগমন করিয়াছে। এ দিকে আবার কাপ্তেন হাইড ছাত্রদিগকে একেবারে পাকড়াও করিয়া আনিবার জন্য কলেজে কলেজে প্রিন্সিপালদের কাছে ষ্টানডিং অর্ডার পাঠাইয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে 'ষ্টানডিং অর্ডার' সকলকে জানাইয়া দিল যে, ১৮ই ডিসেম্বর বেলা ১১টার সময় ক্যাম্পে হাজিরা দিতে হইবে। যাঁহারা নূতন 'রেক্রুট' হইয়াছিলেন, তাঁহাদেরও স্ফূর্ত্তি দেখা দিয়াছিল। কি কি জিনিষ সঙ্গে লইয়া ক্যাম্পে যাইতে হইবে, তাহার তালিকা সংগ্রহ করা হইল, কিন্তু যাঁহারা সেকেণ্ড ও কোর্থ ইয়ারের ছাত্র, তাঁহারা বলিলেন, "কিরূপে ক্যাম্পে যেতে পারা যায় ?" কারণটা আর কিছুই নহে,—'টেষ্ট একজামিন।' প্রিন্সিপ্যালদের কাছে সে কথা বলিতেই তাঁহারা নোটীশ দিলেন যে, যাহারা ক্যাম্পে যাইবে, তাহাদের টেষ্ট একজামিন ত দিতে হইবে না, পরন্তু তাহাদের একেবারে 'ফাইন্যাল' পরীক্ষায় পাঠান হইবে।

এখন সকলের কি স্ফূর্ত্তি! এই যে ক্যাম্প ট্রেণিং, ইহাতে আনন্দ উপভোগ করিবার জিনিষ যথেষ্ট আছে। একটা নূতন আমোদ উপভোগ করিবার জন্য রেক্রুটদের মন মাতিয়া উঠিল, আর তাঁহাদের সঙ্গে আমার মনটা যে উৎসাহিত না হইল, তাহা কেমন করিয়া বলিব ? কারণ, ক্যাম্প ট্রেণিংএর আনন্দটা আমি পূর্ব্বেই উপভোগ করিয়াছি।

১৮ই ডিসেম্বর শুক্রবার দিন প্রত্যূষে নিদ্রাভঙ্গের পর মনে পড়িল, সরকারের হুকুম, ১১টার মধ্যে আজ ক্যাম্পে যাইতে হইবে। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি যথাসময়ে ট্রাঙ্কে ভর্ত্তি করিয়া লইয়া প্রস্তুত হইলাম। মনে হইতে লাগিল, ঘড়ীর কাঁটাটা যেন খুব জোরে চলিয়াছে। ইহারই মধ্যে বেলা ৯টা! যাউক, কোন রকমে দু'টি ভাত খাইয়া লইয়া 'ভেতো বাঙ্গালীর' নাম বজায় রাখিলাম। ইতোমধ্যে বন্ধুবর সার্জ্জেণ্ট জিতেন্দ্রনাথ ঘোষ ও প্রাইভেট গোলাম মুস্তাফা উপস্থিত হইয়া শীঘ্র রওনা হইবার জন্য তাড়া দিলেন। কাযেই আর বিলম্ব না করিয়া একখানি গাড়ী ভাড়া করিয়া যাত্রা করিলাম। পথে বন্ধুদের মাল তুলিয়া লওয়া হইল। ঠিক সময়েই ময়দানে পৌঁছিলাম। কেহ ট্যাক্সীতে, কেহ ঘরের মোটরে, কেহ গাড়ীতে, কেহ বা হাঁটিয়া মুটের মাথায় বোঝা চাপাইয়া ঠিক ১১টার মধ্যে যে যাহার নিজের দলের (প্লেটুন)এর কাছে আসিয়া হাজির। সকলেই ভাবিতেছেন যে, ১৫টা দিন কি করিয়া কাটান যাইবে।

ময়দানের দৃশ্য তখন অপূর্ব্ব। এ দৃশ্য দেখিয়া মনে হয়, যেন আমরা কোথাও যুদ্ধ করিতে যাইতেছি। বীরশ্রেষ্ঠ আলেকজাণ্ডার যেমন তাঁহার সৈন্য-সামন্ত লইয়া সিন্ধুতটে তাঁবু ফেলিয়াছিলেন, আজ 'এডজুটেণ্ট' হাইড আমাদের লইয়া যেন ঠিক তেমনই ভাবে ভাগীরথী-তটে সম্মিলিত হইয়াছেন।

ক্রমে বেলা বাড়িতেছে। সকলেরই প্রায় ঘাম পড়িতেছে। বোধ হয়, তখন তাঁহারা ভাবিতেছিলেন, কখন্ ছুটী পাইয়া নিজের নিজের তাঁবু দখল করিবেন। এমন সময় কাপ্তেন হাইড আমাদের ডাকিয়া বলিয়া দিলেন, কাহারা কোথায় থাকিবে। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মত মহাপ্রভুদের কণ্ঠস্বর সকলকে জানাইয়া দিল,—'ফল ইনটু র‍্যাঙ্কস'! সকলে ঠিকমত কায করিবার পর বলিয়া দেওয়া হইল, কে কোথায় থাকিবে। অমনই তাঁহারা নিজ নিজ বিছানা, ট্রাঙ্ক ইত্যাদি লইয়া নিজ নিজ তাঁবু দখল করিলেন।

য়ুনিভারসিটি কোর এখন একটি 'ব্যাটালিয়ন।' ইহা চারি ভাগে বিভক্ত। এক একটি ভাগকে এক একটি 'কম্পানী' বলে। এক একটি কম্পানীকে এক একটি নামে ডাকা হয়, যেমন ১ম ভাগকে 'এ' কম্পানী, ২য় ভাগকে 'বি' কম্পানী। এক একটি কম্পানী আবার ৪ ভাগে বিভক্ত। এই এক একটি ভাগকে 'প্লেটুন' বলা হয়। প্লেটুন আবার ৪ ভাগে অর্থাৎ ৪টি 'সেক্সনে' বিভক্ত। প্রতি সেক্সনে ১১ জন লোক ও ১ জন 'সেক্সন কম্যাণ্ডার' থাকে।

স্কটিশ চার্চ্চ কলেজের ২টি প্লেটুন, রিপণ কলেজের একটি, আর বঙ্গবাসী কলেজের ১টি, মোট এই ৪টি প্লেটুন লইয়া 'বি' কম্পানী। কম্পানীর কম্যাণ্ডার হইলেন মিঃ জে, এফ, ম্যাকডোনাল্ড। ইনি স্কটিশ চার্চ্চ কলেজের ইংরাজীর প্রফেসর, পরন্তু জর্ম্মণ-যুদ্ধ-ফেরত। এখন ইনিই আমাদের কোরে প্রথম লেফটেনাণ্ট। ইঁহার মত ভদ্রলোক খুব কম দেখা যায়। সকলকে খুব স্নেহ ও যত্ন করেন। আমাদের রিপণ কলেজের অস্থায়ী প্লেটুন কম্যাণ্ডার হইলেন লেফটেনাণ্ট এস, এন, ঘোষ মল্লিক। আর আমাকে কর্ত্তাদের হুকুমানুযায়ী প্লেটুন সার্জ্জেণ্ট হইতে হইল। মিঃ ঘোষ মল্লিকের কাছে ছেলেরা কোন দিন একটিও কড়া কথা শুনে নাই।

বেলা প্রায় ১টার সময় আদেশ হইল, ফোর্ট উইলিয়মের 'ষ্টোর' হইতে আমাদের কম্বল, সতরঞ্চ, ওভার কোট ইত্যাদি দরকারী জিনিষ আনিতে হইবে। তাই 'লেপ্ট, রাইট' করিতে করিতে মার্চ্চ করিয়া যাওয়া গেল। সৈনিকরা সব ক্লান্ত হইয়া জিনিষপত্র লইয়া ফিরিয়া আসিল। বিছানাপত্র গুছাইয়া লওয়া গেল। এক একটি তাঁবুতে ৮ জন করিয়া লোক থাকিবার হুকুম হইয়াছে। তাহাই করা

৭নং প্লেটুন

পূর্ব্বে সার্জ্জেন্ট মেজর, প্লেটুন সার্জ্জেন্টদিগকে (আমাদিগকে) ডাকিলেন ও পরদিবস কি 'রুটিন' বলিলেন।

অর্ডারলি আফিস হইতে ফিরিয়া আমি আমার সেক্সন কম্যাণ্ডারদিগকে কায বুঝাইয়া দিলাম। তাঁহারাও তাঁহাদের প্রাইভেটদিগকে বুঝাইয়া দিলেন, কি কি কায করিতে হইবে। ৮৷১০ মিনিটের সময় খাবার পরিবেষণকারীদিগের 'আহ্বান' বিউগিল বাজিল। পরিবেষণকারীরা তাহাদের সব প্লেটুনের খাবার ইত্যাদি ঠিক করিয়া গুছাইয়া লইবে। ৮৷৹টার সময় আহারের 'বিউগিল' বাজিল। পরিবেষণ করিবার ডিউটি পূর্ব্বেই ঠিক করিয়া দেওয়া হয়। তাহারা সকলকে খাওয়াইবার পর আহার করেন। ভাত, ডাল, তরকারী, ভাজা, মাংস, চাটনী ইত্যাদি একে একে পাতে পড়িল। প্রথম দিনের আহার ভালমন্দে শেষ করা গেল। এখানে অনেক রকম মেজাজের লোক আসিয়াছেন, কিন্তু কাহারও 'টুঁ' শব্দটি করিবার উপায় নাই। বাড়ীতে যাঁহারা পান হইতে চুণ খসিলেই প্রলয় কাণ্ড করিতেন, এখানে তাঁহারা একেবারে মাটীর মানুষ। এখানে ত আর 'এটা খাও ওটা খাও' বলিয়া উপরোধ করিবার কেহ নাই।

আহারকাণ্ড শেষ হইল। সকলে যে যাঁহার তাঁবুতে ফিরিয়া গেলেন। তাঁবুর সমস্ত বিছানা হিমে বরফের মত ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে। সরকারের দেওয়া খড় বিছাইয়া, তাহার উপর কম্বল পাতিয়া, নিজের শয্যা রচনা করা গেল। তাঁবুর নিম্নে যেখানে যেখানে ছোট ছোট ছিদ্র, তথায় গরম গ্রেট কোটের দ্বারা আড়াল করিয়া দিলাম। রাত্রি ১০টার পরে আবার বিউগিলে সঙ্কেত হইল যে, আর ২০ মিনিট পরে সব আলো নিবাইয়া দিতে হইবে। নির্দ্দিষ্ট সময়ে পুনরায় বিউগিলের সঙ্কেতধ্বনি শুনিয়া প্রত্যেকেই আলো নিবাইয়া নিঃশব্দে শুইয়া পড়িল। কারণ, অর্ডারলি অফিসার রোঁদে বাহির হইবেন। যদি তিনি কোনও তাঁবুতে আলোক দেখিতে পান, অথবা কেহ কথা কহিতেছে শুনিতে

গেল। প্রথম দিনেই 'এ' কম্পানীকে 'কোয়াটার' ও 'নাইট গার্ড' দিতে হইল। গার্ড কম্যাণ্ডার এক জন লান্স সার্জ্জেন্ট অথবা করপোরাল। কোয়াটার গার্ডে ৯ জন প্রাইভেট, তাহার মধ্যে ৩ জন রাইফেল গার্ড। নাইট গার্ড কম্যাণ্ডার ১ জন লান্স করপোরাল, ইনি কোয়াটার গার্ড কম্যাণ্ডারের অধীন। নাইট গার্ডে ৯ জন প্রাইভেট, তাহার মধ্যে ১ জন অর্ডারলি। নাইট গার্ডরা সন্ধ্যা ৫৷৹টা হইতে ভোর ৬টা পর্য্যন্ত পাহারা দেয়। আর কোয়াটার গার্ডরা সন্ধ্যা ৫৷৹টা হইতে পরদিন বৈকাল ৫৷৹টা পর্য্যন্ত এই ২৪ ঘণ্টা পাহারা দেয়। যুদ্ধক্ষেত্রের নিয়মানুযায়ী এই গার্ড-পদ্ধতির প্রচলন। হঠাৎ বাহির হইতে কোন শত্রুপক্ষ যাহাতে আক্রমণ করিতে না পারে, তাহারই উদ্দেশ্যে চারি ধার সশস্ত্র প্রহরী (সেন্‌ট্রি) দ্বারা সুরক্ষিত রাখা হয়। কোয়াটার গার্ড কম্যাণ্ডারেরই কায বেশী। নাইট গার্ড কম্যাণ্ডারকে কোয়াটার গার্ড কম্যাণ্ডারের আদেশানুযায়ী জিনিষপত্র জমা লওয়া-দেওয়া, চিঠি বিলি করান, পলায়িত বা অপরাধীদের কোয়াটার গার্ডে বন্দী করিয়া রাখা ইত্যাদি সবই করিতে হয়। এই গার্ড ডিউটির সময় যে কেহই হউক, অন্যায় করিলে তাহাকে শাস্তি দিতে হইবে। ডিউটি ছাড়িয়া কোথাও যাইবার উপায় নাই। এমন কি, আপনার লোক দেখা করিতে গেলে তাঁহার সঙ্গে দাঁড়াইয়া কথা কহিবারও অবসর নাই—এমনই ডিউটি।

সন্ধ্যার পূর্ব্বেই সকলকে ক্যানটিন (Restaurant) স্নান করিবার স্থান, প্রিভি কাউন্সেল (পায়খানা) সব দেখাইয়া আনিলাম। পায়খানাগুলি সব 'সামনা সামনি' ও খোলা। কাপ্তেন সাহেব বাঙ্গালীর অবস্থা বুঝিতে পারিয়া এক একখানি চটের পর্দ্দা সম্মুখে টাঙ্গাইয়া দিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ক্যানটিনে চা,চপ, কাটলেট, বিস্কুট, চুরুট, সিগারেট, কেক, ফল, কলা, লেবু, পান পর্য্যন্ত নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ পাওয়া যায়। রাত্রি ৮টার

কম্যাণ্ডার জে, এক ম্যাক্‌ডোনাল্ড ও নন্‌কমিশণ্ড অফিসারগণ

পান, তবেই কৈফিয়ৎ তলব হইবে। সকলেই চুপ—নিদ্রাদেবীও সময় বুঝিয়া এই পরিশ্রান্ত সৈনিকদিগকে শান্তি দিবার জন্য তাঁহার স্নেহমাখা কোমল করপল্লব সকলের নয়নে বুলাইয়া দিলেন।

১৯শে ডিসেম্বর শনিবার ভোর ৬টার সময় Revellitে বিউগিল বাজিল। সঙ্গে সঙ্গে গার্ডের বিকট চীৎকার Open your flaps, make yourselves ready, আবার সঙ্গে সঙ্গে সদ্যোজাগ্রত সৈনিকদিগের কণ্ঠনিঃসৃত সঙ্গীতের এক একটা চরণ—আর তাহার পর এই মাঠের দারুণ শীত! ফাঁকা মাঠ, হু হু করিয়া শিশিরসিক্ত বাতাস বহিতেছে। সূর্য্যদেব তখন উদয়-অচলে দেখা দেন নাই—বিলম্ব আছে। তখনও প্রিন্সেপ ঘাটের ও তাহার আশে-পাশের রাস্তায় গ্যাসের আলো যেন ঘুমঘোরে—নিদ্রালসভাবে মিট মিট করিয়া জ্বলিতেছিল।

হুকুম হইয়াছে—৭টার সময় আলস্য ও শীত দূরীভূত করিবার জন্য Physical Training হইবে। আমি নিজে ও আমার সহকারী বন্ধুদ্বয় L. Cpls, বীরেশ্বর সেন ও বিভূতিভূষণ বসু সেই সময়ের মধ্যে চা পান করিয়া প্রস্তুত হইয়াছি।

৭টা বাজিবার ৫ মিনিট পূর্ব্বে Fall in করিবার জন্য হুইসিল বাজাইলাম। আমার ৭নং প্লেটুন তাহাদের নির্দ্দিষ্ট স্থানে ঠিক সময়েই Fall in করিল। প্রথমে সকলেরই একটু কষ্ট হইল—অনভ্যস্ত কি না, কিন্তু ডবল মার্চের ও Physical Drillএর পর বিশ্রাম পাইয়া মোজা, পট্টি, বেল্ট পরিয়া ড্রিল করিতে হইবে। কথায় যাহা, কাযেও তাহাই। মিলিটারী কি না! ১২টা পর্য্যন্ত প্যারেড। মধ্যে মধ্যে বিশ্রাম। প্যারেড শেষ হইলে সকলকে জানাইয়া দেওয়া হইল—শীঘ্র স্নান করিয়া আহারের জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। ১টার সময় খাওয়ার পর 'এ' কম্পানীর পর 'বি' কম্পানীকে রাইফেল আনিতে কোর্টে যাইতে হইবে। ঠিক সময়ে না গেলে আর খাবার পাওয়া যাইবে না। ইচ্ছায় অনিচ্ছায় সকলে তাড়াতাড়ি কোন রকমে আহার শেষ করিয়া হাজির।

বিউগিল বাজিল। Fall in for meal—হাতে গেলাস ও থালা লইয়া সকলে শ্রেণীবদ্ধভাবে দাঁড়াইল। আহারের স্থানে যাইবার সঙ্কেতধ্বনি হইল। খাওয়া মন্দ হইল না—ডাল, ভাজা, 'মুন্সিপাল মার্কেট' ঘাঁট, মাছের ঝোল ইত্যাদি যথেষ্ট পরিমাণে পাইয়া সকলেই খুসী; আহারের পর কোর্টে গিয়া রাইফেল পরিষ্কার, জুতায় কালী লাগান, বাণ্ডোলিয়ার, বেল্ট লাগান ও তাহার পিতলগুলি পালিশ দিয়া ঘষিয়া চকচকে ঝকঝকে করিতে হয়। যাঁহারা খাওয়া-দাওয়ার পর কায পরে করা হইবে বলিয়া ফেলিয়া রাখিতেন—তাঁহাদেরই ঠকিতে হইত। কিন্তু সকলেই কায শেষ করিয়া ও না করিয়া একটু গড়াইয়া লইত। কতক আবার তাস খেলিত আর কেহ কেহ গান করিত। বিকালবেলা কিন্তু অনেকেই ছুটী লইয়া, অনেকে ছুটী না লইয়াই বায়স্কোপ ও কিংকারনিভাল দেখিতে যাইতেন।

প্যারেডের পর শিবিরে প্রত্যাবর্ত্তন

জানু পাতিয়া বসিয়া লক্ষ্যভেদ

সকলেই বলিয়া উঠিলেন, "আঃ, বেশ হাওয়া ত," কারণ, তখন তাঁহাদের ঘাম ছুটিতেছে। তিন কোয়ার্টার ড্রিল—তাহার পর প্রাতরাশ। বড় বড় ৪ টুকরা মাখন লাগান পাঁউরুটী, দুইটি করিয়া সিদ্ধ নিষিদ্ধ ডিম্ব আর চা—যে যত পারে। যাঁহারা ডিম খান না, তাঁহাদের দুইটি ডিমের পরিবর্ত্তে ৪ টুকরা রুটী অতিরিক্ত দেওয়া হয়। শ্রেণীবদ্ধভাবে নিজের নিজের নির্দ্দিষ্ট যায়গায় গিয়া বসিয়া প্রাতরাশ শেষ করা গেল। এ দৃশ্য ঠিক যেন জেলের কয়েদীদিগের প্রাতরাশ—লপসি খাইতে যাওয়ার মত। প্রায়ই সকলের হাতে কলাইকরা গ্লাস অথবা ঘটি। আমাদের মত জীবের কায সকলকে খাওয়াইয়া পরিবেষণকারীদিগের সহিত আহার করা। সব দিকেই নজর রাখিতে হয়। কে খাইল, কে খাইল না, কেহ কম বা বেশী লইল কি না, ইত্যাদি। এমনও অনেকে আছেন, যাঁহারা সতর্ক দৃষ্টি রাখার মধ্যে পংক্তি হইতে বাহির হইয়া অন্য যায়গায় বসিয়া ৪ খানা রুটীর বদলে ৮ খানা, দুইটি ডিমের বদলে অতিরিক্ত ৪টি লইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন ও লইয়াও ছিলেন। তাঁহাদের ধারণা, সরকারী মাল যত পার খরচ কর। জিনিষ লইয়া ভক্ষণ করিলে ত কাযে লাগে, তাহা না করিয়া জিনিষগুলি লইয়া খেলাও হয়। ৮।০টার সময় সার্ট, প্যাণ্ট, বুট, অপরাহ্ণ ৫।০টার পাহারা বদল হয়। প্রত্যহ ভোরে এক জন করিয়া ব্যাটালিয়ন অর্ডারলি সার্জ্জেণ্ট হয়। তিনি নূতন গার্ড Fall in করাইয়া অর্ডারলি অফিসরকে সেলাম দিয়া বলেন, সব ঠিক। তখন অর্ডারলি অফিসার নূতন গার্ডদিগকে পরিদর্শনের ও কাযের ভার দিবার পর পুরাতন গার্ডদিগকে বিদায় দেন। এ সময় দর্শকের সংখ্যা খুব বেশী হয়—অবশ্য আমাদের মধ্যেই বেশী।

সন্ধ্যার পর আজ আর পূর্ব্বের মত আমোদ-প্রমোদ হইল না। তবে পরে হইয়াছিল—এ জন্য আমরা Y, M, C, A ও Mr. P, L, Royকে অনেক ধন্যবাদ দিতেছি। Y, M, C, A ও Mr P, L, Roy এবার আমাদের ক্যাম্পে শীতবস্ত্র ও মুষ্টিযুদ্ধের জন্য অনেক বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। এই প্রমোদ-বৈঠকে হারমোনিয়াম, বাঁশী, গ্রামকোন সকলই থাকে। অনেকে কৌতুক অভিনয়ের দ্বারা সকলকে মোহিত করেন। আজ আমাদের ঠাকুর্দ্দা Lance Corporal রমণীমোহন সিংহের কথা মনে পড়ে। ইনি খুব ভাল কৌতুক অভিনয় করিতেন, ইহা ছাড়া তিনি সকলের সহিত অসঙ্কোচে মিলামিশা করিতেন। ঠাকুর্দ্দা না হইলে আর সকলের তৃপ্তি হইত না। আমাদের Adjutantও তাঁহাকে Grand-father বলিয়া ডাকিতেন। তিনি

অনেক দিন এই কোরে ছিলেন বলিয়াই তাঁহাকে ঠাকুর্দ্দা বলিয়া ডাকা হইত।

যদিও তিনি আমাদের দল হইতে চলিয়া গিয়াছেন, তবুও তিনি আমাদের মায়া কাটাইতে না পারিয়া 'বিজলীর' মত এক দিন ক্ষণেকের জন্য দর্শন দিয়া আমাদিগকে সুখী করিয়াছিলেন। তাঁহার অভাব আমরা ভাল করিয়া বুঝিতে পারিতেছি। আর এক জন আমাদের খুব ভালবাসিতেন—হেমন্ত দা (Reg. No 8, Sgt, হেমন্তকুমার সেন) এখন তিনি কলিকাতা পুলিসের সবইনেসপেক্টার, বহুবাজার থানায় আছেন। এবার কাযের ভিড়ে আর আমাদিগকে দেখিতে আসিতে পারেন নাই।

এই আমোদ-প্রমোদের সময় কাপ্তেন, লেপ্টন্যাণ্ট, ষ্টাফ, এন সি ও, প্রাইভেট সকলেই উপস্থিত থাকেন। তখন প্রত্যেকেই প্রত্যেকের বন্ধু। সময়টা যে কোথা দিয়া চলিয়া যায়, তাহা ঠিক করা যায় না। রাত্রি ৮টার সময় বিউগিল সঙ্কেতে খাইতে যাইবার জন্য সকলে তৈয়ার হয়েন। ইহার মধ্যে আবার আমাদের ডাক পড়িল। রেজিমেণ্টাল সার্জ্জেণ্ট মেজরের কাছে পরের দিনের কাযের রুটিন লইতে হইবে।

রাত্রিতে ভাত, ডাল, ভাজা, মাংস, আর চাটনী। নিরামিষ-ভোজীদের ঘি, দই, ভাজা, ও একটা নিরামিষ তরকারী (ডালনা) ইত্যাদি দেওয়া হয়। এই সকল আহার্য্য দ্রব্যের ব্যবস্থা করিবার জন্য মেস কমিটী আছে। তাহাতে খগেন্দ্র ঘোষ, বিধুভূষণ সরকার প্রভৃতি আছেন। ইঁহারা প্রায় সকলেরই কাছে পরিচিত। তাঁহাদের সংগঠনের ক্ষমতাও বেশ আছে। সব ভারই প্রায় তাঁহাদিগকে দেওয়া হয়। আমাদিগকে ঠিক নিজের ভাইয়ের মত স্নেহ ও যত্ন করেন আর অনেক আব্দারও সহ্য করে না আমরা কিসে ভাল ভাবে থাকি ও আমোদ পাই, তাহার জন্য সদাই ব্যস্ত। এই রকম সুখ দুঃখের অবকাশে কয়টা দিন কাটিয়া গেল।

২০ ডিসেম্বর রবিবার। ছেলেরা জানিত যে, রবিবার প্যারেড বন্ধ; কিন্তু তাহা হইল না, এক্সমাসএর দিনে ছুটী পাওয়া যাইবে। আমরা এ খবর আগেই পাইয়াছি। তবে এই ছুটীর সু-খবরটা আগে তাঁহাদিগকে দিই নাই। তাহার কারণ, হঠাৎ সু-খবরটা দিয়া তাঁহাদিগকে একটু বেশী সুখী করিব। এত বড় সৌভাগ্য-সূচক বাণী হঠাৎ বিশ্বাস যোগ্য নয়; কিন্তু সকলে যখন দেখিলেন, সত্যই ছুটী, তখন তাঁহারা মনের আনন্দে পরস্পরকে আলিঙ্গন করিলেন। হুকুম আসিল যে, আমাদের কর্ণধার সার মেজর র‍্যানকিন বেলা ৭॥টার সময় আমাদিগকে দেখিতে আসিবেন। আর আমরা যেন সব নির্দ্দিষ্ট যায়গায় ঠিক সময় মিলিত হই। সার মেজর র‍্যানকিন আমাদিগকে উৎসাহ দিলেন।

২৫শে ডিসেম্বর। মিলিটারী ডিপার্টমেণ্টের সকলেই এই X'masএ খুব স্ফূর্ত্তি করেন। হুকুম হইল, যাঁহারা বাড়ী যাইতে ইচ্ছা করেন, আবেদন করিলেই ছুটী পাইবেন। তবে রাত্রি ৮টার মধ্যে যেমন করিয়াই হউক ফিরিয়া আসিয়া তাঁবুতে হাজিরা দেওয়া চাই। আমাদের কম্পানী কম্যাণ্ডার Lt. J. F. Macdonald সকলকেই প্রায় এক রকম ছুটী দিলেন।

২৬শে তারিখে হুকুম আসিল; ৭টা হইতে ৭টা ৪৫ মিনিট Physical Training, ৭টা ৪৫ মিনিট হইতে ৮টা ৩০ মিনিট পর্য্যন্ত চা-পানের ছুটী। ৮টা ৩০ মিনিট হইতে ৮টা ৪৫ মিনিট জামা, প্যাণ্ট, গুলী বহন করিবার থলে, বন্দুক ইত্যাদি পরিষ্কার আছে কি না, পর্য্যবেক্ষণ করা হইবে। ৮টা ৪৫ মিনিট হইতে ৯টা ৩০ মিনিট Proclamation paradeএর জন্য রিহার্শাল প্যারেড, ১০টা ৩০ মিনিট হইতে ১১টা ১০ মিনিট কাপ্তেন সাহেব প্যারেড করাইবেন।

২৭শে তারিখে টুপীর flash বদলাইবার আদেশ আসিল। ইহার মধ্যে আমাকে ব্যাটালিয়ন অর্ডারলি সার্জ্জেণ্টএরও duty দিতে হইয়াছে। বেশ স্ফূর্ত্তিতে ছেলেদের লইয়া দিনগুলি কাটিতে লাগিল। ইতোমধ্যে এক দিন খবর আসিল যে, য়ুনিভারসিটি কোরকে ১লা জানুয়ারীতে proclamation প্যারেডে যোগদান করিতে হইবে। অতএব রিহার্শাল প্যারেড প্রত্যেক দিন হইবে। কয়েক বৎসর ধরিয়া য়ুনিভারসিটি কোর প্রক্লেমেশন্ প্যারেডএ যোগদান করিবার সৌভাগ্য পাইয়া আসিতেছে। এই নূতন বৎসরের বিরাট উৎসবে ভারতের অধিকাংশ রেজিমেণ্ট যোগদান করে। দর্শক স্বয়ং 'ভারতেশ্বর' আর তাঁহার পার্শ্ব-সহচর 'বঙ্গেশ্বর'। কিছু দিন প্যারেডের পর, অফিসার কম্যাণ্ডিং Lt, Col এর অধীনে প্যারেড ময়দানে (ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালএর পাশে) রিহার্শাল দিয়া আসা গেল। আরও অন্যান্য রেজিমেণ্টও সেখানে আসিয়াছিল, সে দিনকার রিহার্শাল প্যারেড দেখিয়া সকলেই সন্তুষ্ট। প্রথানুযায়ী 'এ' কম্পানী আগে দাঁড়াইবে। কম্পানীর কম্যাণ্ডার হইলেন বিকাশ ঘোষ বি, এ। বিকাশদাদা ছেলেদের খুব স্নেহ করেন ও আমাদের খেলাধূলার জন্য খুব উৎসাহ দেন। আমাদের 'বি' কম্পানী 'এ' কম্পানীর পিছনে দাঁড়াইবে ও কম্পানীর কম্যাণ্ডার J, F, Macdonald Second Lt, সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ মৌলিক এম, এ, সি কম্পানীর কম্যাণ্ডার, সুশীলকুমার চৌধুরী এম্, এস, সি। সৈনিক হইতে অল্পসময়ের মধ্যেই ইনি যেমন উন্নতিলাভে সমর্থ হইয়াছেন, এ পর্য্যন্ত কোনও বাঙ্গালী যুবক তাহা পারেন নাই। ইনি শুধু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরব নহেন, বাঙ্গালীর—বাঙ্গালার

গবর্ণর লর্ড লিটন 'গার্ড অব অনার' পরিদর্শন করিতেছেন

গৌরব। ইনিই প্রথমে ভারতবর্ষীয় টেরিটোরিয়াল ফোর্সে কমিশন পাইয়াছেন। ইঁহার মত লেপ্টন্যাণ্ট আর কাহাকেও দেখা যায় না। 'ডি' কম্পানীর কমাণ্ডার আশুতোষ কলেজের প্রফেসর মিঃ অজিতকুমার ঘোষ এম্-এ, বি-এল্। ইঁহার কাছে আমার রেক্রুট অবস্থায় শিক্ষালাভ। অতি ভাল মানুষ—প্রফেসর হইলে যে সমস্ত গুণ থাকা দরকার, তাঁহার সবগুলিই আছে। আমাদের কোরে এ বৎসরে আরও ২ জন নূতন লেপ্টন্যাণ্ট হইয়াছেন, (১) মিঃ গুপ্ত শিবপুর কলেজের প্রফেসর, (২) মিঃ ঘোষাল প্রেসিডেন্সী কলেজের লেক্চারার ও ডিমনষ্ট্রেটার।

আজ আমাদের আবার খেলা ২॥০টার সময় বেঙ্গল জিমখানা। সামান্ত রকমের খেলাধুলা ও পারিতোষিক বিতরণ হইবে। অনেকেই নিমন্ত্রিত হইয়াছেন—সেন্ট্রাল গুইমিং ক্লাবের সেক্রেটারী মিঃ পি, সি, মিত্র মহাশয়ও আমাদের এখানে আসিয়া যোগদান করায় আমরা বিশেষ আনন্দিত।

সৌভাগ্য-লক্ষ্মী আমাদের প্রতি কৃপাদৃষ্টিপাত করিয়াছেন, তাই 'বি' কম্পানীর অধিকাংশ ছাত্রই প্রাইজ গ্রহণে সমর্থ। বেশ স্ফূর্ত্তিতে দিনটা চলিয়া গেল।

ইতোমধ্যে প্যাণ্ট-কোট ভাল করিয়া কাচাইয়া ইস্ত্রী করিয়া লওয়া হইল। বোতাম, জুতা, বেণ্ট সব পরিষ্কার চক্চকে ঝক্ঝকে করিয়া রোসনাইয়ে বৃটিশ আর্মিকেও হার মানাইয়াছিলাম।

১লা জানুয়ারী ক্যাম্পের শেষ, ৭টা ২০ মিনিটের সময় ব্যাটালিয়ন ময়দানে কম্পানীর পর কম্পানী fall in হইল। পরে মার্চ্চ করিয়া প্যারেড ময়দানে যাওয়া গেল। যখন সব ঠিক, তখন proclamation parade groundএ যাইবার হুকুম হইল।

সব পথ জনতায় আর লাল পাগড়ীতে পরিপূর্ণ। যে দিকে তাকান যায়, সেই দিকেই মাথার সমুদ্র। যখন সব রেজিমেণ্ট আসিয়া উপস্থিত, তাহার কিছু পরেই ঘোড়ায় চড়িয়া 'ভারতেশ্বর' ও 'বঙ্গেশ্বর' আসিলেন। পরে একে একে ৩১ বার তোপ-ধ্বনি করিয়া তাঁহাদের অভ্যর্থনা করা হইয়াছে। তার পরই পটাপট্ করিয়া রাইফেলে ফাঁকা আওয়াজ করা হইল।

এইবার মার্চ্চ পাষ্ট। ইহা দেখিবার জন্য সারা সহরের লোক আজ মাঠে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। 'ভারতেশ্বর' ও 'বঙ্গেশ্বর' দলবল সহ 'ইউনিয়ন জ্যাক' পতাকার কাছে দাঁড়াইলেন। একে একে সমস্ত দল মার্চ্চ করিয়া চলিয়া গেল। এইবার ইউ, টি, সি'র পালা।

মিলিটারী ব্যাণ্ড বাজিয়া উঠিল। আমরাও সেই বাজনার তালে তালে পা ফেলিয়া মার্চ্চ করিতে লাগিলাম। দর্শকরা আমাদের মার্চ্চ দেখিয়া খুব উৎসাহ দিলেন।

এই বাঙ্গালী সেনাদল বৃটিশ সৈন্যদলের তুলনায় কোন প্যারেড ময়দানে নামান দেখেন নাই। বাঙ্গালীর বীর্য্য, বাঙ্গালীর শৌর্য্য, বাঙ্গালীর বল, বুদ্ধি, ভরসা আর অসীম সাহসের পরিচয় ভারতসরকার সে দিন পাইয়াছিলেন, যে দিন বাঙ্গালী মান, অপমান, শত লাঞ্ছনা, কষ্ট ভুলিয়া সুদূর মেসপোটেমিয়ার বুকে নিজের রক্ত ঢালিয়া দিয়া চিরগৌরবের বিজয়-নিশান উড়াইয়া আবার তাহার বাঙ্গালা মায়ের শীতল কোলে ফিরিয়া আসিল। বাঙ্গালী যখন শত্রুপক্ষের অজস্র গোলাবর্ষণকে পুষ্প-বর্ষণের মতই মাথা পাতিয়া বরণ করিয়া লইয়াছিল, তখন গর্ব্বিত, স্তম্ভিত বৃটিশরাজ দেখিলেন, বাঙ্গালী শুধু 'ভেতো বাঙ্গালী' নহে—বাঙ্গালী মানুষ—বাঙ্গালী বীর!

১৯১৭ খৃষ্টাব্দে এই ইউ, টি, সি স্থাপিত হয়। এখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ ছাত্রদের চতুর, দক্ষ ও বেশ সমরকুশল করিবার জন্য ইংরাজসৈনিকদিগকে যে উপায়ে যেরূপ যত্নসহকারে ও নিয়মে শিক্ষা দেওয়া হয়, ইহাদেরও ঠিক সেই পদ্ধতিতে শিক্ষা দেওয়া হয়। শিক্ষার স্থান—সেণ্ট জর্জ্জ গেট ফোর্টউইলিয়ম। সেখানে যাওয়া-আসার ট্রামভাড়ার খরচ ও পোষাক-পরিচ্ছদ সমস্তই সরকার বাহাদুর দেন। তা ছাড়া বৃটিশ-সেনারা যে সব পদ বা সম্মান ও অধিকার পায়, ইউ, টি, সি সে সবই পায়।

যদিও ইহা 'রেগুলার আর্মি' নয়, মাহিনাও নাই, তাহার পরিবর্ত্তে যথেষ্ট ভদ্রতা, সদ্ব্যবহার আর সম্মান পাওয়া যায়। সব ছাত্রেরই উচিত এই শিক্ষা গ্রহণ করিয়া নিজের নিজের দেশের কাযে সাহায্য করা। এই শিক্ষায় আমরা সমস্ত গুণ Discipline শিক্ষা করিতে পারি,—যাহা আমাদের দেশে অতিশয় প্রয়োজনীয়। সমস্ত বঙ্গের ১০।১২ হাজার ছেলে কলেজে ভর্ত্তী হয়, তাহাদের মধ্যে যদি ৫ হাজার করিয়াও ইউ, টি, সি-তে শিক্ষা গ্রহণ করে, তবে ১০ বৎসরের মধ্যে বাঙ্গালার অবস্থা অনেক পরিবর্ত্তিত হয়। ভারতরাজও আমাদের উপযুক্ত দেখিয়া মিলিটারী ডিপার্টমেণ্টে কিছু কিছু কর্তৃত্ব দিতে পারেন। আশা করি, এবার রিক্রুটিংএ যাঁহারা সমর্থ, এমন ছাত্ররা উক্ত কোরে যোগদান করিয়া নিজের দেশের কল্যাণসাধন করিবেন।

সার্জ্জেণ্ট শ্রীক্ষেত্রনাথ দত্ত।

সবার চেয়ে

সবার চেয়ে আপন তুমি
সবার চেয়ে পর;
হৃদয়-মাঝে গোপন তুমি,
হৃদয়-মাঝে ঘর।

সবার চেয়ে ভালবাস,
আমার সুখে মৃদু হাস,
কাছে তবু না এসে রও,
নয়ন-অগোচর,
সবার চেয়ে আপন তুমি,
সবার চেয়ে পর।

নয়ন-কোণে আছ আমার,
পাইনে তোমার দেখা;
সঙ্গী তুমি, বন্ধু তুমি,
তবুও আমি একা।

কাঁদে আমার মন যে পোড়া,
অন্ধ হ'ল নয়ন-জোড়া,
ফিরেও তবু চাও না কভু,—
ওগো প্রাণেশ্বর!
সবার চেয়ে আপন তুমি,
সবার চেয়ে পর।

শ্রীবিমলকৃষ্ণ সরকার।

বাঙ্গালার গীতিকাব্য—বৈষ্ণবকাব্য

বাল্যলীলার পদাবলী

বৈষ্ণবকাব্য-সমূহে শ্রীকৃষ্ণ ও চৈতন্যদেবের বাল্যলীলার বিষয়ে যে সকল পদ আছে, কখন তাহার আলোচনা হয় নাই। বৈষ্ণব কবি বলিতে সচরাচর বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসকে মনে পড়ে এবং বৈষ্ণবকাব্যের সমালোচনা করিতে হইলে উঁহাদেরই কথা লইয়া নাড়াচাড়া করা হয়। আর কোন কবির বিস্তারিত কিংবা সংক্ষিপ্ত সমালোচনার কোন প্রয়াস হয় না। এই দুই কবি এবং মিথিলার কবি গোবিন্দদাস চৈতন্যদেবের পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহাদের তিন জনের কেহই শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলার কোন পদ কিংবা গীত রচনা করেন নাই। ইঁহাদের মধ্যে বিদ্যাপতি নানা রসের বহুসংখ্যক পদ রচনা করেন। বয়ঃসন্ধি অথবা কৈশোর অবস্থা হইতে আরম্ভ করিয়া মাথুর ও ভাবোল্লাস পর্য্যন্ত তিনি কীর্ত্তন করিয়াছেন। চণ্ডীদাসের পদাবলীতে বয়ঃসন্ধিরও বিস্তারিত বর্ণনা নাই, একবারে কিশোর ও কিশোরীর পরস্পরের প্রতি অনুরাগ হইতে আরম্ভ। এই দুই কবি শুধু মধুর রসের অবতারণা করিয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতকে যদি শ্রীকৃষ্ণলীলার মূলগ্রন্থ মানিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে তাহাতেও বাল্যলীলার প্রচুর উল্লেখ আছে, কিন্তু বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস শ্রীকৃষ্ণের বাল্যকালের কোন উল্লেখই করেন নাই। যে কবিরা বাল্যলীলার পদাবলী রচনা করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই বাঙ্গালী আর প্রায় সমস্ত পদই বাঙ্গালা ভাষায় লেখা। অনেক পদ কবিত্বপূর্ণ, শিশুর লীলার হৃদয়গ্রাহী চিত্র, কিন্তু সেগুলিকে স্বতন্ত্রভাবে বাঙ্গালা সাহিত্যে কখন দেখান হয় নাই। বৈষ্ণব কাব্যের এই অংশ বলিতে গেলে বাঙ্গালা সাহিত্যে অজ্ঞানিত, অপরিচিত, বৈষ্ণবকাব্যের অরণ্যে অজ্ঞাতবাস করিতেছে।

বৈষ্ণব কাব্যে শিশু সম্বন্ধীয় এই শ্রুতিমধুর শিশুপ্রেমপূর্ণ কবিতা-নিচয় যত্ন পূর্ব্বক আলোচনা করা কর্ত্তব্য।

কৃষ্ণলীলায় গোপীভাবের যে মধুর রস, কালিদাস হইতে আরম্ভ করিয়া সকল কবিই তাহারই উল্লেখ করিয়াছেন। চৈতন্যদেবের জীবনে ও লীলায় বাৎসল্য ও সখ্য রসের প্রভাব বাঙ্গালা দেশে সর্ব্বত্র অনুভূত হয় ও বৈষ্ণব কবিদিগের কাব্যে তাহার বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণের কৈশোরলীলা শ্রীমদ্ভাগবতের ভাষায় তেজস্বীর ক্রিয়াকলাপ, তাহাতে দোষ হয় না, তেজীয়সাং ন দোষায় বহ্নেঃ সর্ব্বভুজো যথা। * কিন্তু তাহার অধিক ভাগ মানুষী। বাল্যলীলা অধিকাংশ অলৌকিক ও অমানুষী। শিশু শ্রীকৃষ্ণ যেমন অপর শিশু মাটী খায়, সেই রকম মাটী খাইতেন এবং মা যেমন ছেলের মুখ খুলিয়া মাটী বাহির করিয়া দেন, যশোদাও সেইরূপ বালকের মুখ খুলিয়াছিলেন, কিন্তু শিশুর মুখে মাটী না দেখিয়া বিশ্ব-জগৎ দেখিতে পাইয়াছিলেন। দুরন্ত ছেলেকে অনেক মায়ে বাঁধিয়া রাখে, কিন্তু উদূখল টানিয়া যমলার্জ্জুন নামক দুইটি বৃক্ষ সমূলে উৎপাটন করা দামোদর ছাড়া আর কোন্ শিশু পারে? এই উদরবন্ধনে তাঁহার দামোদর নাম সার্থক হইয়াছিল। পূতনা-বধ হইতে আরম্ভ করিয়া শিশু শ্রীকৃষ্ণের প্রায় সকল লীলাই অলৌকিক। শকটভঞ্জন ও তৃণাবর্ত্ত-বধ, বৎসাসুর ও বকাসুর-বধ, অঘাসুর-বধ, ধেনুক-বধ, কালিয়-দমন, দাবাগ্নি পান করিয়া নির্ব্বাপণ, প্রলম্ব-বধ, গোবর্দ্ধন-ধারণ এই সকল শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা। সাধারণ শিশুর ন্যায় লীলারও উল্লেখ ভাগবতে আছে,—

> "যদি দূরং গতঃ কৃষ্ণো বনশোভেক্ষণায় তম্।
> অহং পূর্ব্বমহং পূর্ব্বমিতি সংস্পৃশ্য রেমিরে॥
> কেচিদ্বেণূন্ বাদয়ন্তো ধ্মান্তঃ শৃঙ্গাণি কেচন।
> কেচিদ্ভৃঙ্গৈঃ প্রগায়ন্তঃ কূজন্তঃ কোকিলৈঃ পরে॥†
> বিচ্ছায়াভিঃ প্রধাবন্তো গচ্ছন্তঃ সাধু হংসকৈঃ।
> বকৈরুপবিশন্তশ্চ নৃত্যন্তশ্চ কলাপিভিঃ॥" ‡

কৃষ্ণ বনশোভা দর্শন করিবার নিমিত্ত দূরে গমন করিলে

* শ্রীমদ্ভাগবত, ১০ম স্কন্ধ, ৩৩ অধ্যায়।

† বৈষ্ণব কবি অনন্তদাস অবিকল এই ভাব গ্রহণ করিয়াছেন,—
কোটি কোকিল সম গরজয়ে কুহু কুহু।
কোটি ময়ূর সম নৃত্য রসাল॥

‡ দশম স্কন্ধ।

(সকল বালক) "আমি অগ্রে" "আমি অগ্রে" এই বলিয়া তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া ক্রীড়া করিতে লাগিল। কেহ কেহ বংশীবাদন, কেহ কেহ শৃঙ্গবাদন, কেহ কেহ ভৃঙ্গদিগের সহিত গান, অপররা কোকিলের সহিত কূজন আরম্ভ করিল। কেহ কেহ উড্ডীয়মান বিহগগণের ছায়ার সহিত দৌড়িতে লাগিল, কেহ বা মরালগণের সহিত সুন্দররূপে চলিতে লাগিল। কেহ কেহ বকসমূহের সহিত বসিয়া রহিল, কেহ কেহ ময়ূরবৃন্দের সহিত নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল।

বৈষ্ণব কবিগণ চৈতন্যের বাল্যলীলা বর্ণনা করিবার সময় শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলাও স্মরণ করিতেন। শৈশবকালে নিমাই অসুর বধ করেন নাই, কোন অলৌকিক কার্য্যও করেন নাই। যেমন অপর শিশু খেলা-ধূলা করে, তিনিও সেইরূপ করিতেন। বৈষ্ণব কবিগণ শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলাও এই সাধারণভাবে বর্ণনা করিয়াছেন এবং সেই কারণেই এই সকল কবিতা মধুর ও চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। চৈতন্যের বাল্যলীলার একটি পদ প্রথমে উদ্ধৃত করিয়া দেখাই,—

"শচীর আঙ্গিনায় নাচে বিশ্বম্ভর রায়।
হাসি হাসি ফিরি ফিরি মায়েরে লুকায়॥
বয়ানে বসন দিয়া বলে লুকাইনু।
শচী বলে বিশ্বম্ভর আমি না দেখিনু॥
মায়ের অঞ্চল ধরি চরণে চরণে।
নাচিয়া নাচিয়া যায় খঞ্জন গমনে॥
বাসুদেব ঘোষ কহে অপরূপ শোভা।
শিশুরূপ দেখি হয় জগমনোলোভা॥"

গৌরাঙ্গের বাল্যলীলার পদ-সমূহ প্রায় শ্রীকৃষ্ণের লীলার অনুবৃত্তি, সুতরাং কাব্যাংশে কৃষ্ণের বাল্যলীলার পদ সকল শ্রেষ্ঠ। তাহারই কয়েকটি চয়ন করিতেছি ;—

দেখসি রামের মা গো দেখসি নয়ন ভরি
গোপাল নাচিছে তুড়ি দিয়া।
কোথা গেয়ো নন্দরাজ, দেখহ আনন্দ আজ
দেখহ কি উঠে উছলিয়া।
চিত্র বিচিত্র নাট চরণে চাঁদের হাট
চলে যেন খঞ্জনিয়া পাখী।
সাধ করিয়া মায় নূপুর দিলা রাঙ্গা পায়
নাচিয়া নাচিয়া আইল দেখি॥
প্রতি পদ-চিহ্ন তায় পৃথক পড়িয়া গায়
ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ তাহে সাজে।
অবাক রামের মায় বিস্মিত হইয়ে চায়
বলে এ কি চরণে বিরাজে॥

* * * *

মরি বাছা যাদুমণি ছাড় রে বসন।
কলসী উলায়ে তোমা লইব এখন॥
মরি তোর বালাই লইয়া আগে আগে চল ধাইয়া
নূপুর কেমন বাজে শুনি।
রাঙ্গা লাঠি দিব হাতে খেলিও শ্রীদাম সাথে
ঘরে গিয়া দিব ক্ষীর ননী॥
মুই রৈনু তোমা লইয়া গৃহকর্ম্ম গেল বৈয়া
কি করি কি হবে উপায়।
কলসী লাগিল কাঁখে ছাড় রে অভাগী মাকে
হের দেখ ধবলী পিয়ায়॥
মায়ের করুণাভাষ শুনিয়া ছাড়িল বাস
আগে আগে চলে ব্রজরায়।
কিঙ্কিণী কাছনি ধ্বনি অতি সুমধুর শুনি
বলে রাণী সোনার বাছা যায়॥
ভুবন মোহিত হেরে অঙ্গুলে নখ নিকরে
সোনার বান্ধান খোঁপা মাথে।
ধাইয়া যাইতে পিঠে বার বার পড়ে লুটে
কতই আনন্দ উঠে তাতে॥

মিথিলা ভাষায় বাল্যলীলার পদের সংখ্যা অল্প। একটি এই,—

"বিহরহ নন্দক দুলাল।
শৃঙ্গ মুরলি করে গলে গুঞ্জাবলি
চৌদিকে বেড়ি ব্রজবাল॥
নিরমল জমুনা জল মাহা
হেরই অপন তনু ছাহে।
দশনহি অধর নয়ন করি বঙ্কিম
কোপ করএ পুনু তাহে॥
খনে তিরিভঙ্গ ভঙ্গি করতহি
খনে খনে বেনু বজাই।
খনে তরুবর হিলন দএ
রঙ্গহি রঙ্গিম চরণ দোলাই॥"

অর্থ,—নন্দের দুলাল বিহার করিতেছেন, হাতে মুরলী ও শিঙ্গা, গলায় কুঁচের মালা, চারিদিকে ব্রজবালকগণ বেড়িয়াছে। যমুনার নির্ম্মল জলের মধ্যে আপনার দেহের ছায়া দেখিতেছে, অধর দংশন করিয়া দৃষ্টি বাঁকা করিয়া তাহার (ছায়ার) প্রতি কোপ প্রকাশ করিতেছে। কখন ত্রিভঙ্গভঙ্গী করে, কখন কখন বেণু বাজায়। কখন বৃক্ষে অঙ্গ হেলাইয়া রঙ্গে রাঙা চরণ দোলায়।

আর একটি পদ জ্ঞানদাসের রচিত,—

"গিরিধর লাল গিরি পর খেলন
তরু হেলন পদপঙ্কজ দোলনিয়া।
অতি বল সুবল মহাবল বালক
কান্ধে ছান্দ করে ভাণ্ড দোহানিয়া॥
গিরিবর নিকট খেলত শ্যাম সুন্দর
ঘূর্ণিত নয়ন বিশাল।
নৌতুন তৃণ হেরিয়া যমুনাতট
চঞ্চল ধায় গোপাল॥
সখাগণ সঙ্গে রঙ্গে নন্দনন্দন
উপনীত যমুনাতীর।
পাঁচনি বেত্র বাম কক্ষে দাবই
অঞ্জলি ভরি পিয়ে নীর॥
প্রিয় শ্রীদাম সুদাম মধুমঙ্গল
তীরে রহি হেরত বঙ্গ।
শ্যামল সুন্দর মুরতি মনোহর
হেরি যমুনা অতি বাঢ়ল তরঙ্গ॥
জ্ঞানদাস কহ পরিমল সুন্দর
কুসুম ষট্পদ জোর।
যমুনাক তীর রমণ অতি সুবড়
সুরস রসের ওর॥"

ব্রজের বাল্যলীলায় শ্রীকৃষ্ণের সখাদের মধ্যে মধুমঙ্গল এক জন। মধুমঙ্গল গোপবালক নয়, ব্রাহ্মণবটু। স্বভাব কতকটা সংস্কৃত নাটকের বিদূষকের মত। মধুমঙ্গলের বর্ণনাতে তাহা বুঝিতে পারা যায়,—

"আওত রে মধুমঙ্গল ভালি।
হেরি সখাগণ দেয় করতালি॥
চলইতে চরণ পড়য়ে তিন বঙ্ক।
ভাবে কলঙ্কিত কালিন্দী পঙ্ক॥
কহই বদনে করত কত ভঙ্গ।
নাচত সঘনে বাজাওত অঙ্গ॥
ভোজন সরবস সব অনুবন্ধ।
অবিরত প্রাতে লাগাওত দ্বন্দ্ব॥
মধু গুড় লোভিত বাঁউল চিত।
বন্ধক দেওউল যজ্ঞোপবীত॥
কতিহুঁ না পেখিয়ে ঐছন চালি।
করইতে প্রীত দেই দশ গালি॥
গোবিন্দ দাস শুনি অছু গুণগাম।
দ্বিজ পায়ে করল লাখ পরণাম॥"

বাল্য ও গোষ্ঠলীলার পরেও মধুমঙ্গলের দেখা পাওয়া যায়। ভক্তমাল গ্রন্থে রাধাকৃষ্ণের পাশাখেলায় বর্ণিত আছে, কৃষ্ণ মধুমঙ্গলকে পণ রাখিয়া হারিয়া গেলেন। মধুমঙ্গল বেগতিক দেখিয়া পলায়ন করিবার চেষ্টা করেন, এমন সময় ললিতা "গলায় বসন দিয়া ধরিলা বটুরে।" তাহার পর,—

"বটু কহে মোরে বান্ধ করি কি বিচার।
কৃষ্ণ মোরে বেচিবেক কি শক্তি উহার॥
উহায় বা কে মানে ও তো গোয়ালিয়া।
মুঞি বিপ্র মোরে পুজে আদর করিয়া॥"

বাঁশী বাঁধা রাখিয়া কৃষ্ণ মধুমঙ্গলকে খালাস করাইয়া লইলেন। তখন বটুর তর্জ্জন,

"কৃষ্ণেরে ভৎর্সয়ে তবে শ্রীমধুমঙ্গল।
কর চালাইয়া মহা হইয়া চঞ্চল॥
তোঁহার সহিত আর কোথাও না যাব।
কালি হৈতে গৃহমধ্যে বসিয়া থাকিব॥
খেলায় করিয়া পণ বান্ধাও আমারে।
কোন্ দিন কোথায় বেচিয়া যাবে মোরে॥"

মায়ের উপর রাগ করিয়া কানাই কোথায় গিয়াছেন, নন্দরাণী তাঁহাকে খুঁজিয়া না পাইয়া কাঁদিয়া অস্থির,—

"ঘরে ঘরে উকটিতে চিহ্ন দেখি পথে পথে
সকরুণ নয়নে নেহারে।
আহা মরি হায় হায় মুরছিয়া পড়ে তায়
কান্দে পদচিহ্ন লইয়া কোলে॥"

পদচিহ্ন কোলে করিয়া কাঁদা কেমন? মাতৃস্নেহের এমন কল্পনা কোথায় আছে?

শ্রীদাম ডাকিয়া রুষ্ট গোপালকে শুনাইয়া বলিতেছেন,—

"মায়েরে করেছ রোষ সঙ্গিয়ার কিবা দোষ
কোথা আছ বোল ডাক দিয়া।
যদি থাকে মনে রোষ ক্ষেম ভাই সব দোষ
যশোদা মায়ের মুখ চায়া॥"

গোচারণে যাইবার জন্য শিশু কৃষ্ণের আব্দার,—

"গোঠে আমি যাব মা গো গোঠে আমি যাব।
শ্রীদাম সুদাম সঙ্গে বাছুরী চরাব॥
চূড়া বান্ধি দে গো মা মুরলী দে মোর হাতে।
আমার লাগিয়া শ্রীদাম দাঁড়াঞা রাজপথে॥
পীত ধড়া দে গো মা গলায় দেহ মালা।
মনে পড়ি গেল মোর কদম্বের তলা॥"

বনে যাইবার অনুমতি দিতে জননীর আশঙ্কা,—

"বলরাম তুমি না কি আমার পরাণ
লৈয়া বনে যাইছ।
যারে চিয়াইয়া দুধ পিয়াইতে নারি
তারে তুমি গোষ্ঠে সাজাইছ॥
বসন ধরিয়া হাতে ফিরে গোপাল সাথে সাথে
দণ্ডে দণ্ডে দশবার খায়।
এ হেন দুধের ছাওয়াল বনে বিদায় দিয়া
দৈবে মরিবে বুঝি মায়॥
জনম ভাগ্য করি আরাধিয়া হরগৌরী
তাহে পাইলাম এ দুঃখ পসরা।
কেমনে ধৈরজ ধরে মা কি বলিতে পারে
বনে যাউক এ দুধ কোঙরা॥"

অসুর-নিধনে যত না আনন্দ, কানাই বলাই দুই ভাইয়ের বন-বিজয়ে অর্থাৎ বনে গমন করিতে তাহার অপেক্ষা অধিক আনন্দ।

"আজু বন-বিজয়ী রামকানু।
আগে পাছে শিশু ধায় লাখে লাখে ধেনু॥
সমান বয়েস বেশ সমান রাখাল।
সমান হৈ হৈ রবে চালাইছে পাল॥
কারু নীল কারু পীত কারু রাঙ্গা ধড়ি।
সুরঙ্গ চতুনা মাথে বিনোদ পাগুড়ি॥
কারু গলে গুঞ্জা গাঁথা কারু বনমালা।
রাখালের মাঝে নাচিছে চিকণ কালা॥
নূপুরের ধ্বনি শুনি মুনি-মন ভুলে।
ঝাঁপিল রবির রথ গোখুরের ধূলে॥"

এই সকল অপূর্ব্ব দৃশ্যের সাক্ষী যমুনা এখনও প্রয়াগ-সঙ্গমের অভিমুখে প্রবাহিত হইতেছে,—

"ভাগ্যবতী যমুনা মাই।
যার এ কূলে ও কূলে ধাওয়াধাই॥
শ্বেত সাঙল দোন ভাই।
যার জলে দেখ আপনার ছাই॥"

যমুনা-পুলিনে রাখাল বালকদিগের খেলা,—

"রাখালে রাখালে মেলা খেলিতে বিনোদ খেলা
অতিশয় শ্রম সভাকার।
ননীর পুতলী শ্যাম রবির কিরণে ঘাম
স্রবে যেন কত মুকুতার হার॥
শ্রীদাম আসিয়া বোলে বৈসহ তরুর তলে
কানাই হইবে মাঠে রাজা।
যমুনা-পুলিনে ভাই কংসের দোহাই নাই
কেহ পাত্র মিত্র কেহ প্রজা॥
বনফুল আন যত সপত্র কদম্ব শত
অশোক-পল্লব আম্র-শাখা।
শুনি শ্রীদামের কথা সকল আনিল তথা
নবগুঞ্জা গুচ্ছ শিখিপাখা॥
গাথিয়ে ফুলের মালে কদম্ব তরুর তলে
রাজপাট করি নিরমাণ।
এ উদ্ধব দাসে ভণে কক্ষতালি ঘনে ঘনে
আবা আবা বাজায় বয়ান॥"

প্রাতে কানাইয়ের বিলম্ব দেখিয়া সখারা আসিয়া ধমক-চমক করিতেছে, অথচ ছাড়িয়াও যাইতে পারে না,—

"গোপাল যাবে কি না যাবে আজি গোঠে।
এক বোল বলিলে আমরা চলিয়া যাই
গোধন চলিয়া গেল মাঠে॥

উচ্চণ্ড দেখিয়া বেলা ডাকিতে আইনু মোরা
যতেক গোকুলের রাখ জান।
একেলা মন্দিরমাঝে আছ তুমি কোন্ কাজে
এ তোমার কোন্ ঠাকুরাণ ॥
যদি বা এড়িয়া যাই অন্তরেতে ব্যথা পাই
যাইতে কেমতে প্রাণ ধরি।
না জানি কি গুণ জান সদাই অন্তরে টান
তিল আধ না দেখিলে মরি ॥
মাথাতে ছাঁদন দড়ি হাতেতে কনক লড়ি
বার হইলা বিহারের বেশে।
সকল বালক লৈয়া যমুনার তীরে যাইয়া
জ্ঞানদাস ছিল তার পাশে ॥"

যশোদা কানাইকে অন্য বালকদের সঙ্গে বনে পাঠাইতে ভয় পাইতেছেন, এ ভাবের একটি পদ উদ্ধৃত হইয়াছে। রায় শেখরের রচিত আর একটি পদ সেই সঙ্গে মনে আসে,—

"হিয়ায় আগুনি ভরা আঁখি বহে বসুধারা
দুখে বুক বিদরিয়া যায়।
ঘর পর যে না জানে সে জনা চলিল বনে
এ তাপ কেমনে সবে মায় ॥
ও মোর যাদব দুলালিয়া।
কিবা ঘরে নাহি ধন কেনে বা যাইবে বন
রাখালে রাখিবে ধেনু লৈয়া ॥
আগে পাছে নাহি মোরা হাপুতীর পুত মোরা
আন্ধল করিয়া যাবি মোরে।
দুধের ছাওয়াল হৈয়া বনে যাবে ধেনু লৈয়া
কি দেখি রহিব যাইয়া ঘরে ॥
ননী জিনি তনুখানি আতপে মিলায় জানি
সে ভয়ে সঘন প্রাণ কাঁপে।
বাড়ব অনল পারা বিষম রবির খরা
কেমনে সহিবে হেন তাপে ॥
কুশের অঙ্কুশ বড় শেলের সমান দড়
শুনিতে সিঙ্গিয়া পড়ে গায়।
শিরীষ কুসুম দল জিনিয়া চরণতল
কেমনে ধাইবে হেন পায় ॥
মায়ের করুণা-বাণী শুনিয়া গোকুলমণি
কত মত মায়েরে বুঝায়।
বিষাদ না কর মনে কিছু ভয় নাই বনে
ইথে সাখী এ শেখর রায় ॥"

সন্ধ্যার সময় ব্রজবালকরা ফিরিয়া আসিতেছে,—

"বন সঞে আওত নন্দ-দুলাল।
গোধূলি ধূসর শ্যাম কলেবর
আজানুলম্বিত বনমাল ॥
ঘন ঘন সিঙ্গা বেণু রব
শুনইতে ব্রজবাসিগণ ধায়।
মঙ্গল থারি দীপ করে
বধূগণ মন্দির-দ্বারে দাঁড়ায় ॥
পীতাম্বরধর মুখ জিনি বিধুবর
নব মঞ্জরী অবতংস।
চূড়া ময়ূর শিখণ্ডক মণ্ডিত
বায়ই মোহন বংশ ॥
ব্রজবাসিগণ বাল বৃদ্ধ জন
অনিমিখে মুখশশী হেরি।
ভুলিল চকোর চাঁদ জনি পাওল
মন্দিরে নাচয়ে ফেরি ॥
গোগণ সবহু গোষ্ঠে পরবেশল
মন্দিরে চলু নন্দলাল।
আকুল পন্থে যশোমতী আও
মোহন ভণিত রসাল ॥"

ঘরে আসিলে পর যশোদা দুই ভাইকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—

"কোন্ বনে গিয়াছিলে ওরে রাম কানু।
আজি কেন চান্দমুখের শুনি নাই বেণু ॥
ক্ষীর সর ননী দিলাম আঁচলে বান্ধিয়া।
বুঝি কিছু খাও নাই শুখায়াছে হিয়া ॥
মলিন হইয়াছে মুখ রবির কিরণে।
না জানি ভ্রমিলা কোন্ গহন কাননে ॥
নব তৃণাঙ্কুর কত ভুঁকিল চরণে।
এক দিঠ হৈয়া রাণী চাহে চরণ পানে ॥

না বুঝি ধাইয়াছ কত ধেনুর পাছে পাছে।
এ দাস বলাই কেনে ও দুখ দেখেছে ॥"

গোষ্ঠলীলা শেষ না হইতেই কৈশোরলীলা আরম্ভ। গোষ্ঠেই তাহার সূচনা। সখাদের সঙ্গে কানাই গোষ্ঠে গাভী দোহন করিতে গিয়াছেন, কিশোরী রাধা সখীদিগকে লইয়া সেইখানে গিয়া দাঁড়াইলেন। তখন,—

"রাধা বদন-চান্দ হেরি ভুলল
শ্যামরু নয়ন চকোর।
ছন্দ বন্ধ বিনু ধবলী ধাওত
বাছুরী কোরে আগোর ॥
শূন্যহি দোহত মুগধ মুরারি।
ঝুটহি অঙ্গুলী করত গতাগতি
হেরি হসত ব্রজনারি ॥
লাজহিঁ লাজ হাসি দিঠি কুঞ্চিত
পুন সেই ছান্দন ডোর।
ধবলীক ভরমে ধবল পায়ে ছান্দল
গোবিন্দ দাস পহুঁ হেরি ভোর ॥"

বৈষ্ণব কাব্যের টীকা

বাল্যলীলার সমুদয় পদ সঙ্কলন করিয়া পুস্তকাকারে ছাপাইলে শিশু সম্বন্ধীয় একখানি অতুলনীয় কাব্যগ্রন্থ হয়। বাঙ্গালা সাহিত্যে শিশুর বিষয়ে করিতার সংখ্যা অল্প, তাহার মধ্যে বাঙ্গালী বৈষ্ণব কবিদিগের বিরচিত কবিতাগুলি সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট। চৈতন্যদেবের ভক্তিমার্গের কয়েকটি রসের মধ্যে বাৎসল্য ও সখ্যরস অতি মধুর, শিশু চৈতন্য ও শিশু কৃষ্ণ এবং তাঁহার সখাগণকে অবলম্বন করিয়া সেই রস কাব্যে পরিণত হইয়াছে। যেমন ভাষার সরলতা, কোমলতা ও লালিত্য, তেমনই ভাবের মাধুর্য্য। পর্ব্বত হইতে ঝরণা যেমন স্বতঃ নিঃসৃত হয়, বৈষ্ণব কবিদিগের লেখনী হইতে এই সকল কবিতা সেইরূপ সহজে প্রসূত হইয়াছে। যদি আমরা বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্যের সমাদর করিতে জানি, তাহা হইলে এই গীতি-কবিতাসমূহেরও সমুচিত সমাদর হইবে। এই সকল কবিতার এখন কোনরূপ স্বাতন্ত্র্য বা বিশিষ্টতা নাই। বটতলার অশুদ্ধ ও কদর্য্য ছাপার নিন্দা করা সহজ, কিন্তু সেখানে মুদ্রিত না হইলে এই সকল গ্রন্থ কোথায় পাওয়া যাইত? এখন না হয় এই সকল প্রাচীন অমূল্য গ্রন্থ অন্যত্র মুদ্রিত হয়, কিন্তু তাহাতে কি উন্নতি হইয়াছে? সঙ্কলন গ্রন্থসমূহ হয় ত কিছু ভাল কাগজে ভাল অক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে সাহিত্যের অথবা পাঠকের কি লাভ হইয়াছে? পদকল্পতরু কিংবা পদসমুদ্র যখন সঙ্কলিত হয়, সে সময় মুদ্রাযন্ত্র ছিল না, ভক্ত বৈষ্ণব অথবা কবি নিজের জন্য অনেক পরিশ্রম করিয়া পদ সংগ্রহ করিয়া তালপাতার পুথিতে লিখিয়া রাখিতেন। বংশাবলীক্রমে এই সকল পুথি তাঁহাদের গৃহে রক্ষিত হইত। তুলটের কাগজ ও মুঠ কলমও বড় বেশী দিনের নয়। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস তালপাতার পুথিতেই লিখিতেন। বিদ্যাপতির স্বহস্তলিখিত শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থের এখনও ফুলচন্দন দিয়া পূজা হয়।

পদকল্পতরু, পদসমুদ্র প্রভৃতি সঙ্কলন গ্রন্থ পুনর্মুদ্রিত হইলেও তাহা হইতে স্বতন্ত্র খণ্ড-কাব্য প্রকাশিত হওয়া উচিত। বাল্যলীলার পদসমূহ স্বতন্ত্র, গৌরচন্দ্রিকা স্বতন্ত্র, রাধাকৃষ্ণ পদাবলীর ভিন্ন ভিন্ন কবির রচনা স্বতন্ত্র পুস্তক হওয়া আবশ্যক। বাঙ্গালী বৈষ্ণব কবিদিগের মধ্যে রায়শেখরের রচনার কখন বিশেষ সমাদর হয় নাই অথচ ভাষার গৌরবে এবং রচনার কৌশলে তিনি এক জন প্রধান কবি। এরূপ যাহাও বা চেষ্টা হইয়াছে, তাহা প্রশংসাযোগ্য নয়। স্বতন্ত্র করিতে গিয়া কবিদিগের রচনার সংখ্যা অসম্পূর্ণ রহিয়া গিয়াছে, ভুলও সংশোধিত হয় নাই। টীকার পাট নাই বলিলেই হয়, যাহাও বা আছে, তাহা এত প্রমাদপূর্ণ যে, দেখিলে লজ্জা হয়, দুঃখও হয়। বিদ্যাপতির কথা না হয় ছাড়িয়া দিলাম, কারণ, যাঁহারা বিদ্যাপতির ভাষা না জানিয়া, না শিখিয়া, বিদ্যাপতির পদাবলীর ভূরি ভূরি অশুদ্ধ পাঠ অবলম্বন করিয়া শব্দের ও পদের অর্থ করিয়াছেন, তাঁহাদের ভ্রমপ্রমাদ হওয়া অনিবার্য্য, কিন্তু চণ্ডীদাস এবং অপর বাঙ্গালী কবিদের দশাই বা কি হইয়াছে? এক চণ্ডীদাস ছাড়া আর কোন কবির রচনাবলী টীকা সমেত স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিতই হয় নাই। চণ্ডীদাসের টীকা করিতে গিয়াও কেহ কেহ অনবরত ভুল করিয়াছেন। প্রাচীনকালে এই ভারতে যে সকল টীকাকার জন্মিয়াছিলেন, তাঁহাদের সমকক্ষ আর কোনও দেশে দেখিতে পাওয়া যায় না। মল্লিনাথ কালিদাসের তুল্য প্রথিতযশা,

গীতা, ভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থের টীকাকাররা কিরূপ পরিশ্রম করিতেন, তাহা তাঁহাদের টীকা পড়িলেই বুঝিতে পারা যায়। পূর্ব্বেকার মহাকবিদিগের তুলনায় প্রাচীন বাঙ্গালী কবিগণ কিছুই নহেন এবং তাঁহাদের রচনার টীকার জন্য অতি অল্প পরিশ্রমের প্রয়োজন হয়, কিন্তু সেটুকু পরিশ্রম করিতেও অনেকে সম্মত নহে।

যে সাহিত্যে প্রাচীন লেখক ও গ্রন্থের সম্মান ও সমাদর নাই, সে সাহিত্য যথার্থ সাহিত্যই নয়। কোন বাঙ্গালী গ্রন্থকার যশস্বী হইলে বাঙ্গালী জাতির আনন্দের ও গৌরবের কথা; কিন্তু যে জাতি প্রাচীনকে সম্মান ও রক্ষা করিতে জানে না, সে নবীনের যথার্থ মর্য্যাদা কি জানিবে? প্রাচীনের স্মৃতি, প্রাচীনের কীর্ত্তি লইয়াই আমরা স্পর্দ্ধা করি; কিন্তু প্রাচীনদের কোন্ গুণ আমাদের আছে? শ্রুতি, স্মৃতি, দর্শনশাস্ত্রের যখন সৃষ্টি হয়, তখন অক্ষর বা লেখা কেহ জানিত না, কণ্ঠে কণ্ঠে এই সকল বৃহৎ ও দুরূহ গ্রন্থ সহস্র বৎসরাবধি রক্ষিত হইত। বাঙ্গালা সাহিত্যের জন্ম ৬ শত বৎসরের অধিক নয়, ইহারই মধ্যে এক জন আদি কবির রচনা আমরা নষ্ট করিয়া বসিয়া আছি। বিদ্যাপতির পরিচয় পর্য্যন্ত আমরা ভুলিয়া গিয়াছি, তাঁহার রচনা অশুদ্ধ করিয়া অর্থশূন্য করিয়াছি, তাঁহার ভাষা ভুলিয়া গিয়া, জোর করিয়া তাঁহার রচনার যথেচ্ছ ভ্রমপূর্ণ অর্থ করি। কখন হয় ত তাকিয়া ঠেসান দিয়া বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসকে তুলনা করিয়া, চণ্ডীদাসকে বিদ্যাপতির অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কবি প্রতিপন্ন করিয়া সূক্ষ্ম সমালোচকের গরীয়ান্ পদের প্রসাদ অনুভব করি।

বাঙ্গালা ভাষায় নিত্য পরিবর্ত্তন হইতেছে, ভাষার প্রসার বাড়িতেছে, নূতন স্তর গঠিত হইতেছে। এমন অবস্থায় নূতন ও পুরাতনে অবিচ্ছিন্ন নিত্য সম্বন্ধ থাকা কর্ত্তব্য। বাঙ্গালা গদ্যে যত পরিবর্ত্তন হইয়াছে ও হইতেছে, বৈষ্ণব কাব্যের সহিত এখনকার কবিতার ভাষা তুলনা করিতে গেলে পদ্যে তত পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয় না। লিখিত ও কথিত ভাষায় প্রভেদ যত কমিয়া আসিবে, ভাষার ততই পুষ্টি ও উন্নতি হইবে। বাঙ্গালা ভাষায় সেই সুলক্ষণ দেখা দিয়াছে। প্রসাদগুণ ভাষার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুণ, বৈষ্ণব কাব্যে সেই গুণ সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়। বৈষ্ণব কাব্যের তেমন অধিক চর্চ্চা না থাকাতে অনেক শব্দ ও ভাষার ভঙ্গী লুপ্ত হইয়া আসিতেছে। সে সকল শব্দ ও ভাষার কৌশল প্রাচীন বলিতে পারা যায় না, পাঠের অভাবে আমরা বিস্মৃত হইতেছি। যে আকারে এখন ঐ সকল গ্রন্থ পাওয়া যায়, তাহাতে বহুল প্রচলন হওয়াও কঠিন। পক্ষান্তরে, বৈষ্ণব কবিদিগের রচনা যত্নপূর্ব্বক না পড়িলে আমরা বঞ্চিত হই, সাহিত্যের অনুশীলনেও বিশেষ ক্ষতি হয়।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

ব্যর্থপ্রয়াস

লয়ে মালাগাছি এসেছ গো অ জি কিসের তরে,
কাল রজনীতে ভুলেছি তোমায় যতন ক'রে।
যে ব্যথা দিয়েছ,—সব ভুলে গেছ একটি রাতে,
তাই কি আজিকে উছলে সোহাগ নয়ন-পাতে।
তাই কি তোমার রিণি-ঝিণি বাজে কাঁকন দু'টি,
অধরের কোণে চুম্বন-রাগ উঠিছে ফুটি।
তাই কি তোমার বাঁকান ভুরুর কোলের কাছে,
চকিতের লাগি বাসনা সোহাগ উলসি নাচে।
কাল রজনীতে হেসেছিল চাঁদ ভুবন জুড়ে,
বাঁশরীর হিয়া গেয়েছিল গান হৃদয়-পুরে।
রজনীগন্ধা কয়েছিল কথা মলয়-কানে,
মুগ্ধা ধরণী চাহিল উদাস অসীম পানে।
তরুণ যুথিকা মেলেছিল তার করুণ আঁখি,
দরদী পরা'ণ দয়িতের হাতে বেঁধেন রাখী।
সুদূর শূন্যে ছড়াল পাপিয়া সুধার রাশি,
নিরালা শয়নে স্বপনে বিরহী উঠিল হাসি'।

প্রণয়ী প্রিয়ারে গোপনে কহিল প্রেমের বাণী,
ছিল নাকি শুধু তোমারি হিয়ার দরদখানি।
অধরে তোমার ফোটেনি ত বাণী সোহাগ-ছলে,
তোমার গলার মালাখানি ছিল তোমারি গলে।
আজি এ প্রভাতে কি লাগি এনেছ কুসুমমালা,
গত রজনীর নিরালা ঘরের বেদনা-ঢালা।
অঞ্চল তব উড়িছে আকুল প্রভাত-বায়,
কঙ্কণ তব গত রজনীর কাহিনী গায়।
নয়নের জলে হৃদয়ে আমার দিতেছ দোলা,
হায় রে পাগল দাগা পেয়ে পুন যায় কি ভোলা।
আমিও বিদায় লভিনু তোমার চরণ-তলে,
নিশার স্বপন মুছিলাম এই নয়ন-জলে।
কাল রজনীর আমি নাহি আর আমার মাঝে—
মিছে কথা বঁধু এই ধরা দিনু, তোমারি কাছে!

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ রায়, (মহারাজকুমার নাটোর)।

২০

পরদিন কোর্ট হইতে আসিয়া, বৈকালিক চা-পান করিতে করিতে দুই একটি মক্কেলের সহিত সামান্য কিছু কাযের সম্বন্ধে বাক্যালাপ করিতেছিলাম, এমন সময় যোগীন বাবু সস্ত্রীক কাকলীকে লইয়া উপস্থিত হইলেন। মক্কেল মহাশয়দিগকে তৎক্ষণাৎ বিদায় দিয়া, অভ্যাগতগণকে উপরে পিসীমার কাছে লইয়া গেলাম। এত দিন বাদে প্রথম সাক্ষাতে পিসীমার বৈধব্যে শোকপ্রকাশের পর তাঁহারা নানারূপ বাক্যালাপ করিতে লাগিলেন। পরে পিসীমা সকলকে জলযোগ করাইয়া, আমার শয়নঘরে বসাইলেন, এবং অনতিবিলম্বে তাঁহার বন্ধু প্রিয়ংবদাকে লইয়া ভিতর মহলে চলিয়া গেলেন। যাইবার সময় একটু হাসিয়া বলিয়া গেলেন, "আমরা একটু ঘর-সংসারের কথা কই গে;—তোমরা ততক্ষণ খুনের বিষয়ে পরামর্শ কর।"

আমরা সত্যই ঐ বিষয়ের কথা পূর্ব্বেই আরম্ভ করিয়াছিলাম। কারণ,—আমার শয়নকক্ষ হইতে সেই হানাবাড়ীটা সম্মুখেই দেখা যায়; এবং আমি তাহা যোগীন বাবু ও কাকলীকে দেখাইতেই খুনের গল্প আরম্ভ হইয়াছিল। ক্রমে ঐ সম্বন্ধে প্রায় সমস্ত কথারই পুনরাবৃত্তি এবং অনুসন্ধান ব্যর্থ হইবার কারণগুলার আলোচনা হইল।

কাকলীও এই সব আলোচনায় যোগ দিয়াছিল। তাহার নিকট হইতে তাহার পিতার নূতন বিবাহ ও পরে বর্দ্ধমানের বাড়ীতে বিমাতার সহিত একত্র বাস করার সম্বন্ধে যে সকল বৃত্তান্ত শুনিলাম, তাহাতে জানা গেল যে, তাহার বিমাতার পিতা করালীপ্রসাদ সেন দেখিতে নিরীহ বালকের মত হইলেও তাঁহার প্রকৃতি ঠিক তদনুরূপ নহে। তিনি যথেষ্টই 'ফন্দিবাজ' লোক। যে কোন উপায়েই হউক, অর্থার্জ্জনই তাঁহার মূলমন্ত্র। সামান্ত অবস্থা হইতে নানা উপায়ে অর্থসংগ্রহ করিয়া তিনি য়ুরোপ ও আমেরিকা ঘুরিয়া আইসেন এবং যান্ত্রিক-পূর্ত্তবিদ্যায় (Mechanical Engineering) পারদর্শিতা সম্বন্ধে দুই একটা প্রশংসা-পত্র যোগাড় করিয়া দেশে ফিরিয়া নানা স্থানে বিবিধ প্রকারে বেশ অর্থ উপার্জ্জন করেন। পরে পশ্চিমপ্রবাসী কোন এক বাঙ্গালীর অনুগৃহীতা এক পঞ্জাবী রমণীর কন্যার রূপে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে বিবাহ করেন এবং যমুনা সেই বিবাহের ফল। পশ্চিমেই তাঁহারা অনেক বৎসর বাস করেন। যমুনা বড় হইলে তাহার অসামান্য রূপ সত্ত্বেও বংশকালিমার দোষে তাহাকে সৎপাত্রে বিবাহ দেওয়া সে অঞ্চলে দুর্ঘট হইয়া পড়ে। এই অবস্থায় হঠাৎ বিসূচিকা রোগে সেন সাহেবের পত্নী-বিয়োগ হওয়ায় তিনি কন্যাকে লইয়া আবার নানা স্থানে ঘুরিয়া শেষে দার্জ্জিলিং অঞ্চলে এক চা-বাগানে কিছুকাল চাকরী করেন। সেই সময় পার্শ্ববর্ত্তী আর একটা বাগানের এক জন অবিবাহিত যুবা কর্ম্মচারীর সহিত তাঁহাদের আলাপ হয়; এবং সে তাঁহাদের সঙ্গে নিয়ত মেলা-মেশা করিয়া আলাপটা বেশ ঘনিষ্ঠ করিয়া তুলে। তাহার সহিত যমুনার বিলক্ষণ হৃদ্যতা জন্মিয়াছিল; এবং উভয়ের মধ্যে বিবাহের প্রস্তাবও হইয়াছিল। কিন্তু যমুনার মাতার ন্যায় এ লোকটাও বর্ণসঙ্কর; তাহার পিতা বাঙ্গালী খৃষ্টিয়ান ও মাতা এক 'লেপচা' রমণী। তাহার পিতা তাহার বিদ্যার্জ্জনের জন্য চেষ্টা ও অর্থব্যয় করিয়াছিলেন; কিন্তু সে বিশেষ কিছু শিখে নাই। একবার নাকি কৃষি-রসায়ন শিখিবার ছলে আমেরিকায় কিছু দিন থাকিয়া সাহেব হইয়া আসিয়াছিল মাত্র; এবং নিজের 'এডউইন্ বাহাদুর লাল সাধু খাঁ' নামটাকে সাহেবী ধরণে 'ই, বি, এস, কান্ (E. B. S. Kahn) রূপে দাঁড় করাইয়াছিল। লোকটা খুব ধূর্ত্ত ও সেন সাহেবের মতই অর্থলোভী। পিতৃবিয়োগ হওয়ায় তাহার আর্থিক অবস্থা বড়ই মন্দ হইয়া পড়ে এবং সেই চা-বাগানে চাকরী ছাড়া অন্য উপায় কিছু ছিল না। এই সব কারণে তাহার সহিত কন্যার বিবাহ দিবার প্রস্তাবে সেন সাহেব মোটেই সম্মত হইতে পারেন নাই।

সেন সাহেব চা-বাগানের কর্ম্মোপলক্ষে মাঝে মাঝে যমুনাকে লইয়া দার্জ্জিলিঙ্গে যাইতেন এবং একবার সেখানে অনেক দিন বাস করেন। তখন 'কান' সাহেবও সেখানে গতায়াত করিতে থাকেন। সেই সময় বিহারী ঘোষও নিজের কন্যাকে লইয়া দার্জ্জিলিঙ্গে আইসেন এবং তথায় সেন সাহেব ও তাহার কন্যা যমুনার সঙ্গে তাঁহাদের আলাপ হয়। ক্রমে যমুনার প্রতি ঘোষ মহাশয়ের মোহ-মত্ততা দেখিয়া সেন সাহেব ঘোষের আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া পরম পরিতৃপ্ত হইলেন এবং নিজেই সম্পূর্ণ উদ্যোগী হইয়া কন্যার অনিচ্ছা, কান সাহেবের ক্রোধ ও কাকলীর আপত্তি,—এ সমস্তই অতিক্রম করিয়া এই বিবাহ সম্পন্ন করাইলেন।

বিবাহের সময় সেন সাহেব ও তাঁহার নিমন্ত্রিত অতিথি-গণের নিকট নবদম্পতি যে সকল উপঢৌকনের সামগ্রী পাইয়াছিলেন, তন্মধ্যে কারুকার্য্য-খচিত রূপার বাঁটযুক্ত একটা সৌখীন ও স্বল্পায়তন ভোজালীও ছিল। তাঁহারা দেশে ফিরিবার পর সেটিকে ঘোষজা মহাশয়ের পাঠাগারে গৃহ-সজ্জা-স্বরূপ একখানা বড় ছবির নীচে দেওয়ালের গায়ে ঝুলাইয়া রাখা হইয়াছিল।

কাকলীর কথাবার্ত্তায় বেশ বুঝা গেল যে, তাহার দৃঢ় বিশ্বাস যে, তাহার বিমাতাই এই হত্যাকাণ্ডের মূল। প্রথম যখন যমুনার সঙ্গে আমার আলাপ হয়, তখন আমারও যে ঐরূপ একটা সন্দেহ হইয়াছিল, তাহা আমি বলিলাম। কিন্তু পরে অনুসন্ধানে সে সন্দেহের কোন ভিত্তি পাওয়া গেল না বলিয়া, আমি ইন্‌সপেক্‌টার গাঙ্গুলী মহাশয়ের সহিত এ সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোচনা করিয়া শেষে ও সন্দেহটা ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম, তাহাও জানাইলাম। কিন্তু যমুনা ও তাহার সেই কান্‌-সাহেব, কোন না কোন প্রকারে যে এই হত্যাব্যাপারে সংশ্লিষ্ট ছিল, এ বিশ্বাস কাকলীর মন হইতে দূর হইল না।

২৯

হত্যা সম্বন্ধে আমাদের আলোচনা শেষ হইবার পূর্ব্বেই পিসীমা ও যোগীন বাবুর স্ত্রী আমাদের নিকট ফিরিয়া আসিয়া তাহাতে যোগ দিলেন। আরও কিছুক্ষণ কথা-বার্ত্তার পর যোগীন বাবু আমাকে বলিলেন, "আচ্ছা, তোমরা এ পর্য্যন্ত যে সব অনুসন্ধান করেছ, তা থেকে তোমাদের বিবেচনায় বিশেষ কিছু ফল হয় নি বলছো। কিন্তু অনুসন্ধানগুলা সবই ত পুলিসের লোকে করেছে? তুমি নিজে বোধ হয় বিশেষ কিছু অনুসন্ধান কর নি? তা ছাড়া যা কিছু তদন্ত হয়েছে, তা যে একটা কোন বিশিষ্ট সন্দেহের ভিত্তি ক'রে করা হয়েছে, তা বোধ হয় না। তখন আমাদের বুড়ী যে যমুনাকেই সন্দেহ করছে, সেটা ছেলে-মানুষী ভেবে উড়িয়ে না দিয়ে যদি এটার উপরেই লক্ষ্য রেখে আমরা পুলিসের সাহায্য না নিয়ে নিজেরাই একটু অনুসন্ধান ক'রে দেখি, তাতে কোন ক্ষতি আছে কি?—অবশ্য তোমার এতে অনেক সময় নষ্ট ও কাযের ক্ষতি হবে হয় ত?"

"আমার উপস্থিত যে রকম কাযের ভীড়, তাতে 'সময় নষ্ট' বা 'কাযের ক্ষতি' এই কথাগুলার মানে বোঝবার এখনও তেমন অবকাশ পাই নি। 'এ রকম একটা অনুসন্ধানে লিপ্ত থাক্‌লে বোধ হয় সেটা বুঝতে পারবো।" বলিয়া আমি হাসিলাম। যোগীন বাবুও হাসিতে যোগ দিলেন।

কাকী বলিলেন, "কেন? আজকাল ত, তোমার বেশ 'প্র্যাক্‌টিস্‌' হচ্ছে শুনলাম। আমরা আজ যখন এখানে এলাম, তখনও দেখলাম, কাদের সঙ্গে কি সব মামলার কথা কইছিলে। কিন্তু সে যাই হোক, অনেক কায থাকলেও ইচ্ছা করলে তুমি এ বিষয়ে যে একটু আধটু সময় দিতে পারবে না, তা আমি মনে করি না। তা ছাড়া, এখনকার সম্পর্ক হিসাবে, তোমার উপর আমাদের একটা জোরও ত আছে? পরে হয় ত জোরটা আরও বেশী কায়েমী হয়ে দাঁড়াতেও পারে,—কি বল?"

আমি শেষের এই প্রশ্নের তাৎপর্য্যটা বুঝিতে পারিলাম না। কিন্তু ঠিক এই সময়ে আমার দৃষ্টিটা হঠাৎ কাকলীর উপর গিয়া পড়ায় দেখিলাম, সে-ও সেই মুহূর্ত্তে আমার দিকে চাহিল এবং একটু ব্রীড়ান্বিত হইয়া মুখ নত করিল।

সে যাহা হউক, আমি যোগীন বাবুর স্ত্রীর কথার উত্তরে বলিলাম, "আমি প্রথম থেকেই এ ব্যাপারে যে রকম লিপ্ত হয়ে পড়েছি, তাতে আমার বোধ হয় যে, এর মীমাংসা না হওয়া পর্য্যন্ত আমি নিজেই নিশ্চেষ্ট থাকতে পারবো না। সেই জন্য ত আমি আগেই আপনাদের ব'লে রেখেছি যে, আমার দ্বারা যা কিছু সাহায্য হ'তে পারে, তা আমি সর্ব্বদাই করতে প্রস্তুত আছি।"

যোগীন বাবু বলিলেন, "আচ্ছা, তোমার কাছে যে সব বৃত্তান্ত শুনলাম, তাতে বোধ হয়, সেই একবারমাত্র রাত্রি-কালে ঘোষজা মশায়ের সঙ্গে তুমি ঐ হানা-বাড়ীর ভিতরের অংশটা দেখেছিলে। তার পরে আর কখনও সেটা ভাল ক'রে দেখনি বোধ হয়?"

"হাঁ,—খুনের দিন, সকালে পুলিসের দারোগা মশায়ের সঙ্গেও আর একবার দেখেছিলাম। তা ছাড়া ইন্‌স্পেক্টার গাঙ্গুলী মশায় বলেছেন যে, তিনিও স্বতন্ত্রভাবে একবার বাড়ীটার সমস্তই দেখেছিলেন।"

"তা হ'লেও, নিজেরা ধীরে-সুস্থে ঐ বাড়ীটা আর একবার ভাল ক'রে দেখলে হয় না? লাভ কিছু না হ'লেও ক্ষতিই বা কি?"

আমি উত্তর দিবার পুর্ব্বেই পিসীমা ব্যস্তভাবে বলি-লেন, "ও মা! একে ত বাড়ীটা হানা, তাতে আবার খুনের পর থেকে ওটা বন্ধই থাকে;—কেউ ও-বাড়ীর কাছেও যায় না। ওখানে কি ঢুকতে আছে?"

কাকীও ঐ কথার সমর্থন করিয়া বলিলেন, "সত্যি, বিমলা দিদি! কায কি বাপু? হয় ত কিছু অকল্যাণ হ'তে পারে।"

আমরা বাকী কয় জনে তাঁহাদের এই অযথা আশঙ্কা হাসিয়া উড়াইয়া দিলাম। তৎপরে সকলের পরামর্শে স্থির হইল যে, যত শীঘ্র সম্ভব, আমি বাড়ীওয়ালার সহিত বন্দো-বস্ত করিয়া যোগীন বাবুকে সংবাদ দিলে তিনি নির্দ্দিষ্ট সময়ে আসিয়া আমার সঙ্গে বাড়ী পরিদর্শন করিবেন।

শেষে আরও কিয়ৎক্ষণ অন্যান্য কথাবার্ত্তার পর যোগীন বাবুরা সে দিনের মত বিদায় হইলেন।

পরদিন সকালেই আমি হানা-বাড়ীর মালিকের সহিত দেখা করিলাম। এখন হইতে এই হত্যা-সংক্রান্ত তদন্তের বিষয়ে আমার এই নূতন উদ্যমের মধ্যে একটা যেন বিশেষ প্রেরণা অনুভব করিতে লাগিলাম। কেন, তাহা ঠিক বলিতে পারি না। তবে এ কথাও সত্য বটে যে, এই প্রেরণার পশ্চাতে একটি শান্ত সুন্দর তরুণীর অস্পষ্ট ছবি আমার মানস-পটে মাঝে মাঝে প্রতিফলিত হইতে লাগিল।

বাড়ীওয়ালা নিকটেই থাকিতেন। এ অঞ্চলের অনেক-গুলি বাড়ীই তাঁহার সম্পত্তি। তাঁহার সহিত আলাপে বুঝিলাম যে, ঐ হত্যাকাণ্ডের পর হইতে ১০ নং বাড়ীর জন্য আর ভাড়াটে জুটিতেছে না বলিয়া তিনি বড়ই ব্যথিত এবং যাহাতে উহা শীঘ্রই আবার ভাড়া হয়, তজ্জন্য নিতান্ত ব্যগ্র। তাঁহার নিকট ঐ বাড়ীর কথা উত্থাপন করিবা-মাত্র আমি ভাড়া লইবার প্রস্তাব করিতেই আসিয়াছি মনে করিয়া তিনি প্রথমে বড় উৎফুল্ল হইয়াছিলেন। পরে আমার উদ্দেশ্য জানিতে পারিয়া তিনি একটু হতাশভাবে বলিলেন, "বাড়ীর চাবি আমি এখনই আপনাকে দিচ্ছি; আপনি যখন ইচ্ছা দেখতে যাবেন। তবে খুনীর কোন সন্ধান যে পাবেন, তা বোধ হয় না। লোকটা যেন আমারই উপর শক্রতা সাধবার জন্যে অমন ভাল ভাড়াটে বেচারাকে খুন ক'রে একেবারে সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয়ে পড়লো! যা হোক, এখন ঐ বাড়ীতে আবার ভাড়াটে কি ক'রে বসানো যায়, বলতে পারেন? বড়ই লোস্‌কান হ'তে লাগলো, মশায়!"

বাড়ীটাতে বিনা ভাড়ায় কিছু দিন কাহাকেও থাকিতে দিলে ভাল হয়,—বাড়ীওয়ালা মহাশয়কে এই পরামর্শ দিয়া আমি চাবি লইয়া চলিয়া আসিলাম এবং সেই দিনেই যোগীন বাবুকে ডাকে সংবাদ দিলাম যে, পরদিন বৈকালে ৪টার সময় আসিলে বাড়ী দেখাইবার জন্য প্রস্তুত থাকিব।

২২

পরদিন কোর্টে সামান্য দুই একটা দরখাস্তের কায সারিবার পরে এক জন লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকীলের শ্রীচরণে অনেক দিন তৈলদানের ফলে একটা বড় মামলায় সেই দিন হইতে তাঁহার সহকারিরূপে নিযুক্ত হইয়া প্রথমেই এক নম্বর 'মুলতুবী'র ফী অর্জ্জন করিলাম। "ফী"-টা নগদ হস্তগত না হইলেও যথারীতি আমার 'নোট-বহি'র অন্তর্গত হইল। তৎপরে হৃষ্টচিত্তে সকাল সকাল বাড়ী ফিরিলাম।

কোর্টের 'ধড়া-চুড়া' ছাড়িয়া পিসীমার নিকটে বসিয়া চা-পান করিতে করিতে তাঁহাকে এই সুসংবাদটা দিলাম। পিসীমা ক্রমশঃ আমার মনে তাঁহার মাতৃত্ব এতই বিস্তার করিয়াছিলেন যে, আমার ভাল মন্দ সব খবরগুলাই তাঁহার গোচর না করিলে যেন আমার তৃপ্তিবোধ হইত না।

আমাদের কথাবার্ত্তা শেষ হইবার পুর্ব্বেই যোগীন বাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং কাকলীকে তাঁহার সঙ্গে দেখিয়া আমার মনটা উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। আনন্দটা

বোধ হয় মুখেও যথেষ্ট প্রতিফলিত হইয়াছিল। কেন না, যোগীন বাবু আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "অরুণ বাবাজীর আজ বড় প্রফুল্ল ভাব দেখছি যে! কোর্টে বুঝি বিশেষ কিছু লাভ হয়েছে?"

"হাঁ, আপনাদের আশীর্ব্বাদে আজ বেশ একটা কাষ পাওয়া গেছে। তাতে আজই নগদ বিশেষ কিছু না হ'লেও পরে দু' পয়সা লাভের আশা আছে।"

"বাঃ! বেশ, বেশ! দিন দিন এই রকম আরও হৌক, এই প্রার্থনা। আর এটাও সুখের বিষয় যে, আমাদের বুড়ীর এই কাযটি হাতে নিয়ে তোমার নিজের কাযের ক্ষতি না হয়ে বরং সঙ্গে সঙ্গে একটা লাভ হয়ে গেল!—তোমার সম্বন্ধে তা হ'লে আমাদের এই বুড়ী-মা'র বেশ 'পয়' আছে দেখছি! কি বল?"

কথাটা বলিয়া তিনি হাসিলেন; আমিও হাসিলাম। কিন্তু 'বুড়ী' যে কেন অতি সলজ্জভাবে "যাঃ!" বলিয়া অবনতমুখে পিসীমার নিকটে গিয়া বসিল, তাহা ভাল বুঝিতে পারিলাম না। আবার পিসীমা যখন গম্ভীরভাবে দুই হাতে তাহাকে নিজের কোলের দিকে টানিয়া লইয়া বলিলেন, "আহা, তা'ই হোক মা! ভগবান্ করুন, যেন তোমার কল্যাণে আমাদের অরুণের দিন দিন এই রকমই শ্রীবৃদ্ধি হয়!" তখন ব্যাপারটা আমার পক্ষে আরও দুর্ব্বোধ হইয়া পড়িল।

কিন্তু কাকলীর মুখ এবারে আরক্তিম হইয়া উঠিল। কথাগুলা তাহার পক্ষে হয় ত বেশী পীড়াদায়ক হইতেছে মনে করিয়া আমি এ প্রসঙ্গটা একেবারে চাপা দিবার অভিপ্রায়ে যোগীন বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কৈ, কাকী এলেন না?"

তিনি বলিলেন, "না; কাল সকালে আমরা সবাই বর্দ্ধমানে যাব ব'লে স্থির করেছি। তারি জন্য সব আয়োজন করতে আজ তিনি মহা ব্যস্ত।" পরে পিসীমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "সেখানকার বাড়ীটা সব সু-বিলি হয়ে গেলেই কিন্তু আপনাদের সকলকে সেখানে গিয়ে কিছু দিন থাকতে হবে, বিমলা দিদি!"

পূর্ব্বের কথাটা সম্পূর্ণ চাপা পড়িয়া যাওয়ায় কাকলী এইবারে বেশ প্রফুল্ল মুখে বলিল, "হাঁ, বিমলা-মাসী, যাবেন নিশ্চয়, কেমন?"

পিসীমা সম্মতি জানাইবার পর আমি বলিলাম, "এ দিকে বেলা যাচ্ছে; আর দেরী ক'রে কায নাই। চলুন, এখন আমরা হানাবাড়ীর ভূতের সন্ধানে যাই।"

পিসীমাকে ও কাকলীকে আমরা যাইতে নিষেধ করিলাম। পিসীমা সহজেই সম্মত হইলেন; কারণ, ও বাড়ীতে পদার্পণ করিতে তাঁহার নিজেরই আপত্তি ছিল। কিন্তু কাকলীর এ বিষয়ে এতই উৎসাহ হইয়াছিল যে, তাহাকে নিবৃত্ত করা গেল না। পিসীমার পরামর্শে আমরা তাঁহার পুরাতন ভৃত্য 'গুপে'কেও সঙ্গে লইলাম।

বাড়ীওয়ালা-প্রদত্ত চাবির সাহায্যে আমরা সকলে ১০নং বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিয়া গুপের দ্বারা প্রত্যেক ঘরের জানালা-কপাট খোলাইয়া সমস্ত বাড়ীটা উত্তমরূপে পরিদর্শন করিলাম। নন্দন সাহেবের ব্যবহৃত ঘর দুইটার যেরূপ সাজ-সরঞ্জাম ছিল, সে সব প্রায় একই ভাবে রহিয়াছে দেখিলাম। তবে এখন বাড়ীর অপরাপর স্থানের ন্যায় এগুলাও ধূলি ও আবর্জ্জনাময় হইয়াছে। আমরা হত্যাকারীর কোন একটা চিহ্ন বা নিদর্শন পাইবার আশায় আসবাবগুলার ভিতর বাহির সমস্তই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করিলাম এবং ঘরের যে সব স্থানে বেশী আবর্জ্জনা ছিল, তাহা সম্মার্জ্জনী সাহায্যে পরিষ্কার করাইয়া দেখিলাম। কিন্তু পূর্ব্বের ন্যায় এবারেও কোথাও কিছু দেখিতে পাইলাম না। বাড়ীর সর্ব্বত্র এই ভাবে অনুসন্ধান করিয়া অবশেষে উঠানের কোণে প্রাচীর-সংলগ্ন সেই ছোট ঘরটায় উপস্থিত হইলাম।

সে ঘরে কতকগুলা ভাঙ্গা-চোরা সামগ্রী ও অন্যান্য আবর্জ্জনাও যথেষ্ট ছিল এবং ঘরের যে দিকটা প্রাচীর-সংলগ্ন, সেই দিকের দেওয়ালের মাঝামাঝি স্থানে একটা কাঠের অত্যুচ্চ 'গাছ-সিন্দুক' ছিল। গুপের সাহায্যে ভাঙ্গা জিনিষগুলা বাহির করাইয়া এবং তাহাকে অন্যান্য আবর্জ্জনা পরিষ্কার করিতে বলিয়া আমরা উঠানে অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে সে তাহার কার্য্য সমাধা করিয়া ঘর হইতে এক ঝুড়ি জঞ্জাল বাহির করিয়া উঠানের কোণে রাখিল। সেই সময় দেখিলাম, তাহার কোমরের পার্শ্বদেশ হইতে, নীল মখমলের উপর জরির কায-করা একটা পাড়ের ফিতা ঝুলিতেছে। ফিতাটা প্রায় এক হাত লম্বা ও দুই আঙ্গুল চওড়া এবং তাহা দেখিতে এত উজ্জ্বল ও সুন্দর,

যে, ধূলি-প্রভাবে এখন মলিন হইলেও দূর হইতেই আমাদের সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। কিন্তু কাকলী সেটা দেখিয়াই অত্যন্ত উত্তেজিতভাবে বলিয়া উঠিল, "ও কি! ওটা গুপের কাছে কোথা থেকে এলো?" এবং সে উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই ছুটিয়া গিয়া গুপের কোমর হইতে ফিতাটা টানিয়া লইয়া দেখিতে লাগিল। আমরাও অবিলম্বে তাহার নিকটে উপস্থিত হইয়া, ব্যাপার কি, জিজ্ঞাসা করিলাম।

২৩

কাকলীর ঐ ফিতাটার প্রতি ঐরূপ আগ্রহাতিশয্য দেখিয়া গুপে বোধ হয় প্রথমটা বিস্ময়ে নির্ব্বাক্ হইয়াছিল। এখন আমাদিগকে নিকটে দেখিয়া বলিল, "ও আমি দিব না, বাবু! আমি ওডারে ঐ ঘরের মদ্দি পাইছি;—সেই উঁচা সিন্দুকের পাছে দেয়ালের গায়, ধূলার মদ্দি প'ড়ে ছিল। ঝাঁটার টানে বা'র হয়ে আসলে, আমি চেক্‌নাই দেখে ওডারে তুলে নিয়ে, টেঁকে গুঁজে রাখলেম। এখন ওডা আমার জিনিষ হইছে। আপনিরা ওডারে লয়ে কি কর্‌বেন বাবু? আমি ওডা খুকুরাণীরে খেল্‌তি দেবো।"

কিন্তু কাকলী তাহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া বলিল, "দেখুন, আমার বড়ই আশ্চর্য্য বোধ হচ্ছে। এ ফিতাটা বোধ হয় আমারই জিনিষ। আমার মায়ের একটা পুরানো রেশমী সাড়ীতে ঠিক এই রকম পাড় বসানো ছিল। সাড়ীখানা পোকায় কেটে ফেলেছিল ব'লে বাবা আমাকে একখানা নূতন রেশমী কাপড় কিনে দিয়ে, তাতে সেই পুরানো পাড় বসিয়ে নিতে বলেছিলেন। আমার সাড়ী লম্বায় ছোট ব'লে ছদিকের পাড় একটু একটু বেঁচেছিল। আমি সেই বাড়তী টুকরা দুটা যত্ন ক'রে তুলে রেখেছিলাম। তার পরে, আমরা যখন দার্জ্জিলিং থেকে ফিরে এলাম, তখন বাবার সেই উপহার পাওয়া রূপার বাঁটওয়ালা ছোট ভোজালীখানা, সেই পাড়ে একটা টুকরায় বেঁধে বাবার পড়বার ঘরে ঝুলিয়ে রেখেছিলাম। এই টুকরাটা ঠিক সেই ফিতা বলেই আমার বোধ হচ্ছে। এ রকম পাড়ের ফিতা আমি আর অন্য কোথাও দেখিনি।"

আমি ও যোগীন বাবু অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া ঐ পাড়ের টুকরাটা উত্তমরূপে পরীক্ষা করিলাম। উহা দ্বারা পূর্ব্বে কোন দ্রব্য যে বাঁধা হইয়াছিল, তাহা অনুমান করা দুঃসাধ্য হইল না। কারণ, ঐরূপ মোটা পাড়ে গেরো দিলে স্থানে স্থানে যেরূপ মুড়িয়া যায়, ইহার মধ্যস্থলে ও দুই প্রান্তে সেইরূপ মুড়িয়া যাওয়ার দাগ রহিয়াছে দেখিলাম।

তখন আমরা ঐ বিষয় আলোচনা করিয়া সাব্যস্ত করিলাম যে, পাড়ের যে অংশে ভোজালীর বাঁটটা বাঁধা ছিল, তাহা হয় ত কোন রকমে আল্‌গা হইয়া যাওয়ায় হত্যাকারীর অনবধানতা বশতঃ পাড়টা ভোজালী হইতে খুলিয়া পড়িয়া গিয়াছিল, এবং সেই সূত্রে যমুনাই যে এই হত্যাকাণ্ডের কর্ম্মকর্ত্রী, সে বিষয়ে অন্ততঃ কাকলীর মনে আর কোন সন্দেহই রহিল না।

কিন্তু আমি বলিলাম, "এ বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত করবার আগে আমাদের প্রথমে নিশ্চিত জানা উচিত যে, এই পাড়ের টুকরাটা সত্যই সেই ভোজালী-বাঁধা পাড় কি না।"

কাকলী বলিল, "সে ত আমি কালই জান্‌তে পারবো। বর্দ্ধমানের বাড়ীতে যদি ফিতা-বাঁধা ভোজালীটা যথাস্থানে ঝুলানো থাকে, তা হ'লে অবশ্য আমার অনুমান মিথ্যা হবে; নইলে আমার কথাই ঠিক ব'লে প্রমাণ হবে ত?"

আমি বলিলাম, "কতকটা হবে বটে; কিন্তু তা হ'লেও তোমার বিমাতাই যে খুন করেছে, তা ত প্রমাণ হবে না! অন্য কোন লোকও ত, বর্দ্ধমানের ঐ বাড়ী থেকে ভোজালীখানা আত্মসাৎ ক'রে এখানে এসে খুন ক'রে যেতে পারে?"

"হাঁ, অন্য আর এক জনও হ'তে পারে; সে ঐ কান্ সাহেব। এরা দুজন ছাড়া আমার বাবাকে মারবার আর কোন লোকের কোনই স্বার্থ ছিল না। ওরা দুজনে ষড়যন্ত্র ক'রে এই কায করেছে,—এ আমি নিশ্চয় বল্‌ছি।"

"কিন্তু ওরা কি ক'রে এখানে এলো, আর গেলই বা কি ক'রে,—সেটা ত কিছু বুঝা গেল না? খুনটা হ'লো উঠানের ওদিকে শোবার ঘরে, আর ভোজালীর ফিতাটা পড়লো এসে উঠানের এই কোণের ঘরের ভিতরে সিন্দুকের পিছনে! এরই বা মানে কি?—এখান দিয়ে ত বাইরে যাবার কোন পথ নাই!"

"সে আপনি আর একটু ভাল ক'রে অনুসন্ধান করলে বোধ হয় বার করতে পারবেন। কিন্তু আজ ত তার আর সময় নাই। সন্ধ্যা যে হয়ে পড়লো।"

বাস্তবিক্ ততক্ষণে সন্ধ্যা এত দূর অগ্রসর হইয়াছিল যে, সেই ছোট ঘরের ভিতরে ছাদের উপর একটা আলোক-পথ

(sky-light) থাকা সত্ত্বেও ঘরটা প্রায় সম্পূর্ণ অন্ধকার হইয়া গিয়াছিল। কাযেই আমরা সে দিনের মত বাড়ীর সমস্ত জানালা-কপাটগুলা আবার বন্ধ করিয়া ও সদরে তালা লাগাইয়া আমার বাসায় ফিরিয়া আসিলাম। গুপে যোগীন বাবুর নিকট একটি চকচকে রজত-মুদ্রা পাইয়া সে দিনের পরিশ্রমের ক্লান্তি এবং 'চেক্‌নাই' ফিতার শোক ভুলিয়া গেল।

তৎপরে স্থির হইল যে, কাল কাকলী বর্দ্ধমানের বাড়ীতে ফিতা-বাঁধা ভোজালীর অনুসন্ধান করিয়া তাহার ফলাফল আমাদিগকে শীঘ্রই চিঠি লিখিয়া জানাইবে এবং আমি পুনরায় হানা-বাড়ীতে গিয়া কিরূপে ঐ পাড়ের ফিতা ওখানে আসিল, তাহা নির্ণয় করিবার চেষ্টা করিব।

তাহার পর যোগীন বাবু কাকলীকে লইয়া প্রস্থান করিলেন। [ক্রমশঃ।

শ্রীসুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (এটর্ণী)।

লুকালে কোথায় ?

১

মানস-আকাশে মোর—ক্ষণিকের তরে—
উজলিয়া অকস্মাৎ—মহিমার ভরে,
　নিবিড় প্রেমের মেঘে,
　চপলার মত বেগে
ধাঁধিয়া নয়ন-মন রূপের তৃষায়,
দেখা দিয়া এবে বল লুকালে কোথায় ?

২

হে সুন্দরি ! প্রেম কি গো ! তড়িতের রেখা ?
এই যদি ছিল মনে, কেন দিলে দেখা ?
　কত নব আশা দিয়ে
　প্রাণ-মন কেড়ে নিয়ে,
যাদুকরী ললনার মোহ ছলনায়—
সহসা এমন ক'রে লুকালে কোথায় ?

৩

মেঘশূন্য নীলাম্বর—অনন্ত উদার—
তবু কেন চমকিয়া উঠি বারবার ?
　চপলা গগনে নাই,
　এ দিকে ও দিকে চাই,
মনের অতৃপ্ত সাধ মনে রয়ে যায়—
ফাঁকি দিয়ে—হা নিঠুরে ! লুকালে কোথায় ?

৪

ছড়ায়ে রজত-রশ্মি, অমল কিরণ,
হাসিছে বিমল হাসি কুমুদ রঞ্জন—
　অই জোছনায় তার,
　চারুরূপ আপনার,
আবার দেখ গো এসে শারদ-শোভায়—
কোন্ গগনের কোণে, লুকালে কোথায় ?

৫

চাঁদের উজ্জ্বল আলো মাখিয়া সুন্দরি !
প্রতিমার মত শান্ত শুভ্র রূপ ধরি—
　শুভক্ষণে দেখা দিয়ে,
　মম মন ভুলাইয়ে,
গরল ঢালিয়া শেষে, সরল হিয়ায়—
পাষাণি ! পাষাণ হয়ে লুকালে কোথায় ?

৬

সেই চাঁদ—সে আকাশে হাসিছে আবার—
সে হাসিতে কেন নাই, সুধার জোয়ার ?
　কেন ও উজ্জ্বল আলো,
　এ চ'খে লাগে না ভালো,
জোছনা আঁধারে ঢাকে, না হেরে তোমায়,
এখন আমারে ফেলে, লুকালে কোথায় ?

৭

প্রভাতে চাহিয়া দেখি সরসীর পানে—
কমল ফুটিয়া আছে—সহাস বয়ানে—
　সে বিনোদ ফুল্লাধর,
　চুমিতেছে মধুকর,
গুন্ গুন্ স্বরে প্রেম আবেগে জানায়—
আমি ভাবি হায় ! তুমি লুকালে কোথায় ?

৮

সারানিশি—নিরখিয়ে রূপের স্বপন—
পূরব-গগনে অই উদিল তপন—
　রবি মোর ব্যথা বুঝে,
　তোমারে বেড়ায় খুঁজে
আঁখি তাঁর রেঙে ওঠে ঘোর নিরাশায়—
বল না এমন ক'রে, লুকালে কোথায় ?

৯

কাননে ফুটেছে কত সুষমার ফুল—
প্রকৃতির মেয়েগুলি সৌরভে অতুল—
　কতই আনন্দভরে,
　ডাকে মোরে সমাদরে,
অভিমানে ঝ'রে পড়ে—মলিন ধূলায়,
আমি কাঁদি—তুমি হায় ! লুকালে কোথায় ?

১০

এত আশা—ভালবাসা ভুলেছ সকলি !
ভাঙিলে দীনের বুক, পদতলে দলি'।
　খুঁজে খুঁজে হই সারা,
　তবু ত পাই না সাড়া—
এমন কঠিনা তুমি, জানি নি ত হায় !
প্রাণ সঁপি—এ কি জ্বালা ! লুকালে কোথায় ?

শ্রীচারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

সভাপতির সূচনা-বচন

বীরভূমস্থ সজ্জন-সমাজ !

আপনাদের এই প্রাচীন জনপদ যে এক সময়ে বীরের আবাসভূমি ছিল, ইহার বীরভূম নাম-ই তাহা প্রকৃষ্টরূপে প্রমাণ করিয়া দেয়। কিন্তু বর্ত্তমান কালে বাঙ্গালীর বীরত্ব ফৌজদারী পিয়াদার চক্ষে অপরাধ বলিয়া নির্ণীত হইলেও আপনাদের অন্তরস্থ বীরত্ব-যন্ত্র যে একেবারেই তন্দ্রিত হইয়া জন্মভূমির গৌরবপূর্ণ নামের সার্থকতা নষ্ট করে নাই, তাহা বীরভূমবাসীদিগের অদ্যকার আচরণ দৃষ্টে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের সে সম্মানের আসন ষোড়শ বর্ষকাল সার্ব্বলৌকিক পণ্ডিত, বন্দিত জননায়ক বা রাজ-শ্রীমণ্ডিত মনীষিগণের অধিষ্ঠানে অলঙ্কৃত হইয়া আসিয়াছে, সেই আসন গ্রহণের জন্য আমার ন্যায় এক জন অচিহ্নিত অনধিকারীকে আহ্বান করার সাহস অতি বড় বীরের হৃদয়েই সম্ভবে।

আপনাদের এই দান আমি আনন্দে গ্রহণ করিলাম। যে আনন্দে যশস্বী পুত্র বা পৌত্র-প্রদত্ত অকালে প্রাপ্ত দুষ্প্রাপ্য কোন সুমিষ্ট ফল স্নেহোজ্জ্বল-সজল নয়নে গ্রহণ করিবার জন্য প্রাচীন পিতা বা পিতামহ কম্পিত হস্ত বাড়াইয়া দেন, সেইরূপ দু'হাত বাড়াইয়া আমার চক্ষে এই সাত রাজার ধন কুড়াইয়া লইয়া বুকে জড়াইয়া ধরিলাম।

কিন্তু হে বীরভূমবাসী! আপনারা নিজের শক্তির তুলাদণ্ডে আমার শক্তি তুলনায় পরিমাণ করিয়া এ দীনকে বড় বিপদে ফেলিয়াছেন। নিজের রচনা নিজের হাতে লেখা প্রায় আমার অভ্যাস নাই, কোন না কোন স্নেহশীল যুবকের অবসরমত লেখনীর সাহায্যের জন্য আমাকে সতত অপেক্ষা করিতে হয়; তার পর প্রতিমাসে, বিশেষতঃ এই চৈত্র-শেষে আমার কাছে অন্যান্য কিছু কিছু লেখার জন্য আদরের আদেশ আসে; সুতরাং এরূপ স্থলে এই মহান্ সারস্বত-যজ্ঞে পৌরোহিত্য গ্রহণের পক্ষে মাত্র সপ্তাহকাল অতি সামান্য সময়, তা বোধ হয় স্বীকার করিতে কেহ-ই আপত্তি করিবেন না।

সামাজিক কার্য্যে এমন ঘটনা একেবারে বিরল নয় যে, কখন কখন বিবাহের নির্দ্ধারিত লগ্নে অশৌচ, অসুস্থতা বা পণের 'ব্যবস্থা'-বিভ্রাটে মনোনীত পাত্র উপস্থিত হইতে না পারিলে, কন্যা-কর্ত্তা কুলাচারের প্রত্যবায় ভয়ে প্রতিবেশী যে কোন অনূঢ় মূঢ়কে ঘুম ভাঙাইয়া তুলিয়া আনিয়া হরিদ্রা-লিপ্ত-গাত্র পাত্রীকে সম্প্রদান করেন, এ ক্ষেত্রে আমার অবস্থা-ও কতকটা তদ্রূপ। গায়ে হলুদ নাই, উপবাস নাই, নান্দীমুখ নাই, টোপর পরিয়ে পিঁড়িতে দাঁড় করালেন, আমি-ও দাঁড়ালুম, হাত বাড়াতে ব'ল্লেন, বাড়ালুম, সম্প্রদান করতে হয় করুন, গয়না-ও দিতে পারব না,—পণও নোব না।

নানা জনপদ হইতে সমাগত বিদ্বজ্জনমণ্ডলীর প্রতি আমার কৃতাঞ্জলি নিবেদন যে, আমি সভাপতির যথাকর্ত্তব্য নিরপেক্ষভাবে পালন করিতে যথেষ্ট সচেষ্ট হইব, অর্থাৎ সভার নির্দ্দিষ্ট কার্য্য যাহাতে সুনিয়মে ও সুশৃঙ্খলায় নির্ব্বাহিত হয়, তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিব এবং আপনাদের শিষ্টসাহায্যে সুসম্পন্ন করিতে সমর্থ হইব, এইরূপ আশা আছে। কিন্তু অভিভাষণরূপ সাহিত্য-সম্পদ উপহার দিবার শক্তি আমার নাই। আমি এখানে শিখিতে আসিয়াছি, শিখাইতে আসি নাই; শিক্ষা দিবার উপযুক্ত ক্ষমতা বা বিদ্যা প্রকা-শের ধৃষ্টতাও আমার নাই।

আমাদের সাহিত্যের ধারা কোন্ দিকে যাইতেছে বা কোন্ দিকে যাওয়া উচিত, এই কথা লইয়া নিত্য-ই নূতন নূতন মত বিজ্ঞজনেরা ব্যক্ত করিতেছেন। আমি কিন্তু সাহিত্যের প্রকৃত রূপ দেখি সরস্বতীর প্রতিমায়, সরস্বতীর ধ্যানে, সরস্বতীর প্রণামে। হিন্দুর দেবদেবীর মূর্ত্তি-কল্পনার মধ্যে সরস্বতীর প্রতিমায় যে শুভ্রোজ্জ্বল সৌন্দর্য্য, যে কুসুম-কমনীয় লাবণ্যচ্ছটা আছে, তাহা আর কোনও দেবী-প্রতি-মায় নাই। মা আমার স্বচ্ছ বিলেপমাল্যবসনধারিণী, সুধাঢ্য-কলস-বাহিনী, বীণাবাদ্যবাদিনী, তরল-সরসী-সলিল-শোভন-কমলদল-বাসিনী। মা যেন নিজের বিশ্ব-মনো-মোহন রূপ দেখাইয়া মানবকে বলিতেছেন, "তোমার কাব্য যেন আমার-ই বর্ণের ন্যায় পবিত্রতায় শুভ্র হয়; আমার বসন-বিলেপনের ন্যায় কাব্যের অর্থবোধ যেন স্বচ্ছ হয়; তোমার বিজ্ঞান, দর্শন, পুরাণ, ইতিহাস, কাব্য সবই যেন

পদ্মদলের সুরভিতে পরিপূর্ণ হয়, আর ঐ পদ্মের মধু যেন তোমার জ্ঞানচক্ষুর দৃষ্টি-দোষ নষ্ট করে; তোমার কথা-সাহিত্য যেন শ্রোতার কর্ণে বীণাঝঙ্কারের মিষ্টতা বৃষ্টি করে। আমার প্রতিমার প্রতি তুমি যেমন সতৃষ্ণ বিহ্বল দৃষ্টিতে চাহিয়া আছ, উঠি উঠি করিয়া উঠিয়া যাইতে পারিতেছ না, তেমনই তোমার রচিত গ্রন্থের ছত্রহারের প্রতি-ও বিদ্যার্থী যেন ঐরূপ আনন্দের দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকে।"

কিন্তু বিদ্যাভ্যাসের ব্যায়ামক্ষেত্রে আমরা মা'কে কি পরিবর্ত্তিত মূর্ত্তিতে-ই না প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি! কর্কশ-কজ্জলে মা'র উজ্জ্বল নয়নযুগলে কুটিলতার কৃষ্ণ ছায়াপাত করিয়া দিয়াছি,—কদর্য্য গাম্ভীর্য্যের কালিমা মাখাইয়া মা'র অধরের মৃদুমধুর হাসিটুকু মুছিয়া দিয়াছি; স্বচ্ছ-বিলেপ-মাল্যবসন কাড়িয়া লইয়া মা'র অঙ্গ লৌহ-বর্ম্মে আবৃত করিয়া দিয়াছি, কমলদল দলিত করিয়া মা'কে তুলিয়া কেতকী-বনে বসাইয়াছি; আর বীণা—আসুন, আমার সঙ্গে একবার একটা বিদ্যালয়ে প্রবেশ করি, দেখাই, বীণাপাণি আজ কেমন করাৎকরে ঘরে ঘরে ঘুরিয়া বৃষকেতু-বধ করিতেছেন।

হায়, যে শিশু শতবার শ্রুত শিয়ালের গল্প শুনিবার জন্য আব্দারে মা'র গলা জড়াইয়া ধরে, সে শিশুকে ধমক দিয়া পড়িতে বসাইতে হয় কেন? পড়িবার ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিবেন, কত বালকের পাঠ্যপুস্তকের নীচে এক-খানি বাজারে উপন্যাস খোলা আছে, পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে যদি সে উপন্যাসের মাধুর্য্য ও আকর্ষণী শক্তি অনুভব করিতে পারে, তবে কি তাহার ঐ সাহিত্যিক কদন্ন ভোজনে প্রবৃত্তি হয়? সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠায় ত নিত্য সাহিত্য-রথী, সাহিত্য-পদাতিক, সাহিত্য-ঘোড়সওয়ারদের বীরত্বের কাহিনী পাঠ করি। কিশোর-পাঠ্য, বিদ্যালয়-ব্যবহার্য্য, চরিত্র-গঠনোপযোগী উপন্যাস রচনা করিতে ত কাহাকেও দেখিলাম না। রবিনসন্ ক্রুশোর আদর্শে বাঙ্গালী-জীবনের জাতীয় কাহিনী লিখিবার জন্য কি এক জন লোক-ও নাই?

নীরস নীতিকথার আভিধানিক অর্থবোধ করিয়া কবে কাহার নীতি সংস্কৃত হইয়াছে?

ধর্ম্মনীতি, রাজনীতি, রণনীতি, সমাজনীতি, গার্হস্থ্য-নীতি প্রভৃতির ব্যাখ্যা এক মহাভারতে যত আছে, বোধ হয়, পৃথিবীর অন্য কোন-ও গ্রন্থে তত নাই, কিন্তু উপন্যাসের বিচিত্রবিন্যাসে ঐ নীতি প্রীতিপ্রদ না হইলে বিশ্বের পঠন-পিপাসা মিটাইতে কি আজ মহাভারত কখনও সমর্থ হইত!

এই ত গেল প্রবেশিকা-পাঠ-সংক্রান্ত পুস্তকের কথা। স্বর্গীয় সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের শুভাশীর্ব্বাদে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ অধুনা বাঙ্গালা ভাষাকে সম্মানের চক্ষে দেখিতে প্রস্তুত হইয়াছেন; কলেজ-পাঠ্য বাঙ্গালা পুস্তকগুলি সঙ্কলনমাত্র এবং সে সঙ্কলন নিন্দনীয় নহে, কিন্তু পরীক্ষার্থী অনেক ছাত্র-ই সঙ্কলিত অংশগুলি প্রায় মূলগ্রন্থে পূর্ব্বেই পাঠ করিয়া রাখিয়াছে, সুতরাং কলেজে অধ্যয়ন-কালে পাঠ্য-পুস্তকের প্রতি মনোযোগ দিবার জন্য কোনরূপ নূতন ঔৎসুক্যে তাহাদের চিত্ত উদ্দীপ্ত হয় না। মূলগ্রন্থ পূর্ব্বেই পাঠ করিয়াছে বলিলাম, কোথায় পাঠ করিয়াছে? সাধারণ পাঠাগারে বা প্রচারণ পুস্তকাগারের সাহায্যে। ইদানীং প্রায় বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র পল্লীতে পল্লীতে পাঠাগার বা Circulating লাইব্রেরী কি না প্রচারণ-পুস্তকাগার স্থাপিত হইয়াছে, বালকবালিকা, যুবক-যুবতী কি প্রৌঢ়-প্রৌঢ়ারা-ও আপন আপন সুবিধামত কেহ পাঠাগারে যাইয়া বা কিঞ্চিৎ মাসিক চাঁদা দিয়া ঐ সকল স্থান হইতে পুস্তক আনিয়া বাটীতে পাঠ করেন। ১৮৬৯এর শেষ বা ৭০ খৃষ্টাব্দে যখন ইংরাজী-পড়া ছেলেদের মনে বাঙ্গালা পুস্তক পড়িবার প্রবৃত্তি জাগরণের জন্য ঐরূপ এক পুস্তকালয়ের প্রথম প্রতিষ্ঠা হয়, তাহার সহিত আমার এক সময়ে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল এবং তাহার পরে এই দীর্ঘকালের মধ্যে আমি কলি-কাতা ও মফঃস্বলে অনেক পুস্তকালয়-সম্বন্ধীয় সভায় উপস্থিত হইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি; সকল স্থানেই বক্তাদের মুখে একটা অভিযোগ শুনি, লাইব্রেরীর 'প্রচার পুস্তক' দৃষ্টে বুঝা যায় যে, পড়িবার জন্য নাটক-নভেলই প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়, অন্যান্য পুস্তকের জন্য আবেদনের সংখ্যা নিতান্ত অল্প। জিজ্ঞাসা করি, সম্ভাবিত প্রশ্নের উত্তর লিখিয়া পরীক্ষায় পাশরূপ 'শাক-বাছা' পরি-শ্রান্ত মনকে শান্তি দিতে বা সংসার-চিন্তা হইতে সময় চুরী করিয়া চিত্তবিনোদন করিতে লোকে কি বাড়ীতে বসিয়া পড়িবার জন্য যাদব চক্রবর্ত্তীর Algebra, স্বাস্থ্য-সোপান বা বাস্তু-বিচার গোছ বইগুলি আদরে অন্দরে লইয়া যাইবে?

সত্য বটে, অনেক পুরাণ গ্রন্থ এক্ষণে বঙ্গভাষায় অনূদিত হইয়াছে, কিন্তু বহু ক্ষেত্রেই সে বাঙ্গালা ভাষা না বাঙ্গালা

বীরভূম সাহিত্য-সম্মিলনের সভাপতি শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু

না সংস্কৃত ; মূল শ্লোকগুলিকে যেন অনুস্বার-শূন্য করিয়া এবং 'হইয়া' 'করিয়া' 'লইয়া' প্রভৃতি বাঙ্গালা ক্রিয়ার সহযোগে কনট্রাক্টারের কাছ থেকে কাজ আদায় করা গোছ যেন এক একটা ধর্ম্মশালার পাঁচীল তোলাইয়া লইয়াছে। পূজনীয় শিশিরকুমার ঘোষ যেমন শ্রীশ্রীমহাপ্রভু চৈতন্যদেবের জীবনী লইয়া অমিয়-নিমাই-চরিত লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, সেই আদর্শে বা তাহারও উৎকর্ষ-সাধন করিয়া মূল শ্লোকের মর্ম্মমাত্র গ্রহণ করতঃ যদি শিক্ষিত জনগণের মধ্যে কেহ কেহ পুরাণ-বর্ণিত বিষয়গুলি সুললিত, সুবোধ্য, স্বচ্ছ বাঙ্গালায় লিখিয়া প্রচার করেন, তাহা হইলে কালে বোধ হয় তাঁহারা এবং বাঙ্গালী জাতিটা লাভবান্ হইতে পারে। দীনেশ বাবু প্রভৃতি প্রণীত প্রাচীন বা বাঙ্গালা পৌরাণিক গল্পগুলি শিশুরঞ্জন হইলেও পাঠের তৃষ্ণায় লোকে এখন এত কাতর যে, প্রৌঢ় লোকেরাও ঐ সকল পুস্তকপাঠে আসক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকেন। নিখিল রায়ের পন্থানুসারী ঐতিহাসিক কাহিনী-লেখকগণের পুস্তকগুলিও সংস্করণের পর সংস্করণ বিকাইয়া যায়। স্থানীয় ইতিহাস—লেখকগণের মধ্যে সকলের লেখনী তেমন সরস না হইলেও ক্রেতার অভাবে কোনখানিই পোকায় কাটে না। আহ্নিক, সাপ্তাহিক, মাসিক প্রভৃতি পত্রিকার জন্ম-তালিকা দেখিয়া বুঝা যায় যে, পাঠের পিপাসা বাঙ্গালী নরনারী, বাঙ্গালী ইতর-ভদ্রের মনে কত তীব্রভাবে জাগিয়া উঠিয়াছে। তৃষ্ণার প্রকোপে তাঁহারা গঙ্গার জল না পাইলে খালের জল, পুকুরের জল, বিলের জল, ডোবার জল, এমন কি, পঙ্কিল পয়ঃপ্রণালীর জল পর্য্যন্ত পান করিয়া ফেলিতেছে। পানীয় জলের জন্য যেমন আমাদের বাঙ্গালাদেশ এই নিদাঘের তাপে হা হা করিয়া উঠে, অভাবের প্রখর তাপতপ্ত জীবনে বাঙ্গালী-ও তেমনই আকুল পিপাসায় সাহিত্যের সুধারসে শুষ্ককণ্ঠ সরস করিবার জন্য অতি কাতর হইয়া উঠিয়াছে।

এই সভাস্থলে সমাগত বা অনাগতদের মধ্যে এমন বিদ্বান্, এমন চিন্তাশীল, এমন ভাব-প্রবণ সরস-হৃদয় সুধী অনেকেই আছেন—যাঁহারা একটু ঔদাস্য, একটু অভিমান, একটু যা হোক্ হোগ্‌গে ভাব পরিত্যাগ করিলে বাঙ্গালার সাহিত্য, বাঙ্গালার কাব্য, বাঙ্গালার বিজ্ঞান,বাঙ্গালার দর্শন, বাঙ্গালার ইতিহাস ভাষার মাধুর্য্যে, ভাবের ঐশ্বর্য্যে ভূষিত করিয়া তৃষ্ণাতুর বাঙ্গালীকে মিষ্ট পানীয় প্রদান করিতে অনায়াসে সমর্থ হয়েন। তরুণ মনোরঞ্জন অদ্ভুত গল্পের ছলে 'জুলভার্ণ' যেমন বিজ্ঞানের ছবি কবির আসনে বসিয়া লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, নিশ্চয়ই আমার দেশের মধ্যে তেমনই প্রতিভাসম্পন্ন লোক বিদ্যমান আছেন। কিন্তু হয় তাঁহাদের মনে এ কথা উদয় হয় নাই, নয় অগ্রাহ্য করিয়া এই সত্য দেশ-হিতসাধনে অগ্রসর হয়েন নাই। আজ যদি রামেন্দ্রসুন্দর জীবিত থাকিতেন, আমি তাঁহার পায়ে মাথা লুটাইয়া বলিতাম, "বাবা, তোমার প্রাণ আছে, শক্তি আছে, ভাব আছে, ভাষা আছে, আমাদের ছেলেদের জন্য একখানা বই দিয়ে যাও—যাহাতে তাহারা রূপকথা শুনিতে শুনিতে বিজ্ঞান শিখিয়া লইতে পারে।"

যদি উপন্যাসের মত উপন্যাস হয়, তবে ঐ এক উপন্যাস-পাঠ হইতেই কিশোর-কোমল মনে ভূগোল, ইতিহাস ও বিবিধ বিজ্ঞান পাঠের প্রবৃত্তি জাগ্রত হয়। 'ডুমার' নভেল পাঠ করিয়াই প্রথমে ফ্রান্সের ইতিহাস, তাহা হইতেই ইংলণ্ডের ইতিহাস, রোমের ইতিহাস, ভারতবর্ষের ইতিহাস প্রভৃতি পাঠ করিবার আগ্রহ আমার মনে জন্মিয়াছিল। চন্দ্রশেখর পাঠ করিয়া-ই আমি যে একূলা দুষ্প্রাপ্য সায়ের মুতাক্ষরীণ ক্রয় করিবার উদ্দেশ্যে অন্বেষণে পাগল হইয়া উঠি, তাহা নহে, বঙ্কিমবাবু ও রমেশবাবু প্রণীত উপন্যাস পাঠ করিয়া তখনকার বহু বাঙ্গালী যুবকের মনে ইতিহাস পড়িবার প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠে।

যেমন সুশিক্ষিতা মাতা কড়িগাছের গল্প বলিতে বলিতে সমগ্র শঙ্খ-শাস্ত্রের আভাসটা নিজ ক্রোড়স্থ শিশুর প্রাণে প্রবেশ করাইয়া দিতে পারেন, তেমনই নিপুণ গ্রন্থকার একটি কুলীন ব্রাহ্মণ-কন্যার গল্প ফাঁদিয়া সমস্ত সেন-বংশের ইতিহাসটা পাঠককে ফাঁকি দিয়া শুনাইয়া দিতে পারেন; 'দত্তদের বাঁশঝাড়ে একটা যে বেহ্মদত্যি ছিল, সে রোজ দুপুর রাত্রে খড়ম পায়ে দিয়ে'—ব'লে আরম্ভ ক'রে একটা ভূতের গল্পের ছলে কৌশলী লেখক পাঠককে বংশের উদ্ভিদতত্ত্ব, উপকারিতা এবং বংশ-শিল্পের সাহায্যে কৌটা হইতে কাগজ পর্য্যন্ত প্রস্তুত করিয়া নিজের অন্নার্জ্জনের ও দেশের ধন-বৃদ্ধির পথ দেখাইয়া দিতে পারেন।

ভাষা কিরূপ হওয়া উচিত, এ তর্কের মীমাংসা এখনও হয় নাই এবং শেষ মীমাংসা যে কখনও হইতে পারে, এমনও

মনে হয় না। আজ যাহা নূতন, কাল তাহা পুরাতন; আজ যাহা যথেষ্ট, কাল তাহা অকিঞ্চিৎ; আজ যাহা যৌবনের ছটা-ঘটায় মনোমোহিনী, বৎসর কয়েক পরেই তাহা জরার জীর্ণ আধার। আবার অতি ব্যবহারে ভাষার মৌলিক গৌরব হ্রাস হইয়া যায়; অতি সরল, সহজ, নির্দ্দোষ কথা-ও নষ্ট-শিষ্টতা ইতরত্ব প্রাপ্ত হয়। রমণীয়, মহামহিম, অলৌকিক, বিরাট প্রভৃতি বাঙ্গালা কথার এখন আর কোনও মূল্য নাই। সম্রাট্ শব্দটিও ক্রমে হিংচে-কল্মী-শড়শড়ির মত পান্তাভাতের সঙ্গে মিশিয়া মাথার মুকুট হারাইতে বসিয়াছে।

যে বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষা-জ্যোৎস্না-জলে স্নান করিয়া বাঙ্গালী কয়েক বৎসরমাত্র পূর্ব্বে স্বর্গের স্নিগ্ধতালাভে পুলকিত হইত, সেই বঙ্কিমের ধারার প্রতিও নব্যবঙ্গের অনুরাগ যেন ক্রমে কমিয়া আসিতেছে।

কৃষককুটীরে ও গৃহস্থের অন্তঃপুরে মুদ্রিত পুস্তক প্রবেশ করার কারণ ভাষাসুন্দরীকেও কতকটা গয়নাগাঁটী খুলিয়া মোটা শাড়ী পরিয়া এ জিলা ও জিলা ঘুরিতে হয়; পাঠক-পাঠিকার সহজ বোধগম্য হইবে বলিয়া তাঁহাকে কোথায় বা বলিতে হয় "চাহিদা", কোথায় 'ক'র্লুম', কোথায় 'বল্ল', কোথায় 'চল্লাম', কোথায় বা 'ঝাঁটা', কোথাও বা 'পিছে।'

আর এক মুস্কিলে পড়া গেছে, সাহিত্য-জীবনে অন্নপ্রাশন হবার পরেই কতকগুলি লেখকের মনে এম্নি এক রকম হয়ে যায় যে, তাঁরা রবি-বাবু-টাবু গোছ এম্নি একটা কি হয়ে পড়েছেন; "তাঁদের দলিতা ঘরের মধ্যে প্রবেশ ক'রে ঝড়ের বেগে, লুটিয়ে তার লজ্জামাখা আঁচলখানি জোছনার ফাঁকটুকুতে।" "তাঁদের যতী ছুম্ ছুম্ ক'রে সিঁড়ি কটা নেবে গিয়ে বোঁঠানের পায়ের কাছে ধুপুৎ ক'রে ব'সে প'ড়ে সেই মাতৃমাখন-মাখানো মু'খানি পানে ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে চেয়ে থাকে, অবাক্ হয়ে, দেখে না সে চোখ্ নামিয়ে যে, সাম্‌নে র'য়েছে বাটী—দুধের।"

রবিবাবু ক-য়ে দীর্ঘ-ঈকার দিয়ে কি লিখলেন, অম্নি কত লোকের কলম চল্লো বাঁয়ে রোখ্‌কে। কাব্যজগতে রবিবাবুকে দেবাবতার ব'লে তোষামোদ করা হয় না। অবতারেরা লীলা করেন, লীলা করিবার তাঁহাদিগের অধিকার আছে, লীলা খালি ক-য়ে দীর্ঘ-ঈকারেই শেষ হয় না; জগৎ-জাগানো জীবনীশক্তি যাঁর পদাবলীতে আছে, একটা ইকার উকারের হ্রস্বদীর্ঘের জন্য ব্যাকরণের চরণে তিনি নাই বা লুটাইলেন, যখন অবতারের শক্তিতে একটা ক'ড়ে আঙুলে গোবর্দ্ধন গিরি ধারণ করিতে পারিবে, তখন বস্ত্রহরণ করিতে আসিও, দেবতা জ্ঞানে অন্দরের দ্বার তোমার জন্য খুলিয়া দিব; নইলে রবিবাবু ক-য়ে দীর্ঘ ঈ দিলেন বলিয়া আমিও যদি তাই দিতে যাই, তাহা হইলে লোকে যে ছ-য়ে দীর্ঘ ঈকার দিয়া আমাকে ছী ছী করিবে। ভাষার সৌন্দর্য্য রাখ, স্বচ্ছতা রাখ, অঙ্গসৌষ্ঠব বজায় রাখ, তার পর শক্তি থাকে, তাকে যেমন সাজে সাজালে মানায়, তেমনি সাজে সাজিয়ে সমাজে বার কর, নইলে পিঠে কুঁজ চড়িয়ে, গাল বেঁকিয়ে দিয়ে, হাত-পা সিঁটকে একটা নূতন কিছু কল্লেই নূতন করা হয় না। আমি জানি না, নিজেও হয় ত কত সময়ে এই দোষে দোষী হয়েছি, হয়ে থাকি, আপনারা নিশ্চয়ই আমার কান ম'লে দিতে পারেন।

আর একটি বিষয়ে গুটিকতক কথা বলিয়াই আমি আপনাদিগকে যন্ত্রণা হইতে মুক্তি দিব। ফৌজদারী মাম্‌লায় অভিযুক্তের উকীল নিজের মক্কেলের রক্ষার্থ যেমন alibi (স্থানান্তরে অবস্থিতি) ও insanity (উন্মাদ অবস্থা) রূপ দুইটি ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করিতে প্রয়াস পান, সেইরূপ আজকাল কোন পুস্তকের শ্লীলতার অভাব সম্বন্ধে নালিশ রুজু হইলে ঐ লেখকের উকীলগণ art (কলা) বা Psychology (মনস্তত্ত্ব) রূপ আপত্তিনামা আদালতে দাখিল করেন। এই art রূপ মহৌষধিটি অনুপানভেদে ভিন্ন ভিন্ন ধাতুতে ভিন্ন ভিন্ন রোগে ভিন্ন ভিন্ন ফল প্রদান করে। যে আর্টএর শক্তি সুচারু লিপিকর প্রস্তুত করে, সেই আর্টের কৌশলেই আবার জালিয়াৎ তৈয়ার হয়, চব্‌সের চাবি বেমালুম খুলিয়া লোহার সিন্দুক হইতে অলঙ্কার অপহরণ করিবার যন্ত্র যে মহাপুরুষ সৃষ্টি করিতে পারে, সে বড় সোজা আর্টিষ্ট নহে। যে বায়ুর অবস্থান আলোকের প্রাণ, সেই বায়ু একটু জোরে বহিলে প্রদীপ নিভাইয়া দেয়, আবার ওই বায়ুর স্রোতই যন্ত্রসাহায্যে অধিকতর বলে প্রয়োগ করিয়া কর্ম্মকার লোহা গলাইয়া লয়। আর্টের শক্তি সকলের ধাতুতে সমান মাত্রায় সহ্য হয় না বলিয়াই বড় বড় চিত্রকরেরা তাঁহাদের ষ্টুডিয়োকে

Sanctum Sanctorum করিয়া রাখেন; বাহ্যাভ্যন্তর-শুচিসম্পন্ন লোক ভিন্ন অন্য কেহ তাঁহাদের সেই পূজাগৃহে প্রবেশ করিতে পায় না। কাব্যকার, চিত্রকর, ভাস্করাদির কলাশক্তি বিকাশের চরম উদ্দেশ্য—সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি; কিন্তু রক্ত-মাংসের দেহ লইয়া কয় জন পুরুষের এত শক্তি আছে যে, যুবতীর অনাবৃত অবয়বের সৌন্দর্য্যের প্রতি লালসাশূন্য নয়নে ভক্তিবিহ্বলচিত্তে চাহিয়া থাকিতে পারে? অধিকাংশ লোকই পারে না, তাই যে পয়োধর শব্দ গর্ভ-ধারিণী জননীর সন্তান-পোষণকারী প্রত্যঙ্গের প্রতি মাত্র প্রযুজ্য, বিলাসীর করে সেই পয়োধরের অবমাননা দেখিয়াই শিষ্ট সাহিত্যিকগণ অধুনা ওই শব্দের ব্যবহার প্রত্যাহার করিয়াছেন; পুরুষের মানসিক দৌর্ব্বল্যই মা'কে বুকে কাপড় টানিয়া দিতে শিখাইয়াছে। যাঁহারা দেবতার নৈবেদ্যের কলাকে বিলাসের বেশে সাজাইয়া বাজারে বাহির করেন, তাঁহারা-ও পয়োধর নিতম্বাদি কথা কেহ মুদ্রিত অক্ষরে প্রকাশিত করিলে তাহা রুচি-বিরুদ্ধ বলিয়া থাকেন।

শুনিয়াছি, বড় বড় কলাবিদেরা বলেন, সৌন্দর্য্য সৃষ্টি তাঁহাদের সাধনা, তাঁহাদের জীবনের ব্রত, নীতির সহিত তাঁহাদের কোন সম্পর্ক নাই। ইহার উত্তরে আমি এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, যিনি সুস্থ, সবল, তীব্র জারক শক্তি যাঁহার জঠরের অনলকে জাগাইয়া রাখিয়াছে, তিনি তাঁহার নিজের বাড়ীতে বসিয়া বিবিধ অন্নপদার্থের সাহায্যে যত দূর ইচ্ছা রসনার তৃপ্তিসাধন করিতে পারেন; কিন্তু কাসুন্দী চাটিতে চাটিতে হাঁসপাতালের জ্বরগ্রস্ত রোগীর বিভাগে বেড়াইবার তাঁহার কোন অধিকার নাই। দেহ-বোধ-বিহীন শ্রীমৎ পরমহংস তৈলঙ্গ স্বামীকেও কেহ কখন বারাণসীর চকের পথে নগ্ন মূর্ত্তিতে দর্শন দিতে দেখে নাই।

সমাগত সজ্জনগণ! আমার আজিকার এই বাচালতা ক্ষমা করিবেন; অজ্ঞতার দৌর্ব্বল্য, বিচার-বুদ্ধির দোষ, পরামর্শ দিবার অভিমান আপনাদিগের মহত্ত্বগুণে সহিষ্ণু হইয়া সহ্য করিবেন; বিশ্বাস করিবেন, এই প্রাচীনের অভি-সন্ধি মন্দ নহে; আর বিশ্বাস করিবেন যে, সাহিত্যের শক্তির সম্মুখে তরবারি অবনত, বারুদ শক্তিহারা, কামানের গোলা নিস্ফল—রাজার মুকুটও সাহিত্যের শক্তির সম্মুখে নত হইয়া পড়ে। বঙ্গ-বিজয় ইংরাজ পলাশী-ক্ষেত্রে করেন নাই; ইংরাজের কাছে বাঙ্গালী পরাজিত হইয়াছিল হিন্দু কলেজের হলে। *

শ্রীঅমৃতলাল বসু।

* বীরভূম বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের সপ্তদশ অধিবেশনে পঠিত।

সুপ্তির সৌন্দর্য্য

প্রিয়া শুয়ে আছে—দেহ-বল্লরী
অঞ্চল দিয়ে ঢাকা,
তন্দ্রা-অলস আঁখি-পল্লব
স্বপন-কুহেলি-মাখা।
হাস্য-জড়িত গোলাপী অধর
আধেক রয়েছে খোলা,
দাড়িম ফেটেছে;—দানাগুলি তার
হয় নি এখনো তোলা!
কুঞ্চিত ঘন এলো-কেশদাম;
নবনীত তনু-পাশে,
হাজার বাতির ঝলকিছে আলো;
নয়ন ধাঁধিয়া আসে!

অন্তর শীধু-ভরা, ভাদরের
ফল্গু নদীর ধার;
উছলিত ঢেউ টুটে লুটে পড়ি
বুকে মুখে বার বার।
বাতায়ন-পথে তরল জ্যোছনা
কখন এসেছে চুপে!—
হরণ করিতে প্রিয়ারে আমার
ভুবন-ভোলানো রূপে!
জড়ায়ে গিয়েছে অঙ্গে অঙ্গে
খুলিতে পারে না আর,
রূপ বাঁধা দেখি অপরূপ মাঝে!—
এ কি রে চমৎকার!

শ্রীঅজিতনাথ লাহিড়ী।

অর্থের সদ্ব্যবহার

মার্কিণ দেশে ধনবানের সংখ্যা যত অধিক, বোধ হয়, জগতে তত কোথাও নাই। মার্কিণ দেশের ধনকুবেরদিগের মধ্যে কেহ Oil king, কেহ Steel king, কেহ Lumbers king, কেহ Railroad king, এইরূপ এক এক ব্যবসায়ের এক এক রাজা। মার্কিণদিগের মধ্যে অর্থোপার্জ্জনের স্পৃহা ও আকাঙ্ক্ষা যত বেশী, বোধ হয়, জগতে অন্য কোনও জাতির মধ্যে তত নাই। তাই জগতের লোক মার্কিণ জাতিকে Almighty Dollar বা ধনের উপাসক বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকে।

কেবল সঞ্চয়ের জন্য ধন উপার্জ্জন করিলে মার্কিণ ধনকুবেরগণের এই নামে অভিহিত হওয়ায় আশ্চর্য্যের কথা নাই, কিন্তু মার্কিণ ধনকুবেরগণের মধ্যে কেহ যে ধনের সদ্ব্যবহার করেন না, এমন নহে। তাঁহারা দেশের ও দশের মঙ্গলের জন্য অনেক ক্ষেত্রে মুক্তহস্ত হইয়া থাকেন। জগতের হিতার্থ অর্থব্যয়ে অর্থোপার্জ্জনের যে সার্থকতা আছে, তাহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে।

একটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিলে কথাটা খোলসা হইতে পারে। মিঃ লিওপোল্ড সেপ নিউইয়র্ক সহরের এক বিখ্যাত ধনকুবের। তাঁহার বয়স এক্ষণে ৮৩ বৎসর। এই দীর্ঘ জীবনে তিনি প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছেন এবং সে অর্থের সদ্ব্যবহারও করিয়াছেন। তাঁহার জীবন উপন্যাসের ন্যায় রোমাঞ্চকর। ৬৫ বৎসর পূর্ব্বে মাত্র অষ্টাদশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে মিঃ সেপ নিউইয়র্ক সহরের রাজপথে দিয়াশলাই বিক্রয় করিতে আরম্ভ করেন। তখন তাঁহার মূলধন মাত্র ১৮ সেণ্ট। এই সামান্য ব্যবসায় হইতে তিনি কিছু কিছু সঞ্চয় করিয়া ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে নারিকেল ও নারিকেল-দুগ্ধের ব্যবসায় আরম্ভ করেন এবং ঐ ব্যবসায় হইতে ১ কোটি ডলার অর্জ্জন করেন।

এই অর্থের তিনি যথেষ্ট সদ্ব্যবহার করিয়াছেন। তিনি তাঁহার অল্পবয়স্ক কর্ম্মচারিগণের চরিত্র-সংশোধনের উদ্দেশ্যে মুক্ত-হস্তে দান করিয়াছেন। তিনি প্রথমে কর্ম্মচারিগণের মধ্যে ২২ হাজার ৯ শত ডলার বণ্টন করেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, তাঁহার কার্য্যালয়ের এক বালক কর্ম্মচারী উহা হইতে ৫ শত ডলার, এক দ্বারপাল রুগ্না স্ত্রীর জন্য ৭ শত ডলার এবং প্রধান ষ্টেনোগ্রাফার ৩ হাজার ডলার প্রাপ্ত হয়।

ইহার পর মিঃ সেপ এক সঙ্কল্প করেন। তাঁহার কার্য্যালয়ের অল্পবয়স্ক কর্ম্মচারীরা যাহাতে সচ্চরিত্র হইয়া দেশের মঙ্গলবিধানের উপযোগী নাগরিকে পরিণত হইতে পারে, তাহার জন্য তিনি ২৫ লক্ষ ডলার ব্যয় করিতে প্রস্তুত হয়েন। এতদুদ্দেশ্যে তিনি নানা স্কুল সমূহ হইতে বালক আমদানী করিয়া নিজের কারখানায় কায দিতে লাগিলেন। কায দিবার সময় বালকদিগকে এইরূপে প্রতিশ্রুতি করাইয়া লইতে লাগিলেন যে, তাহারা মন্দ স্বভাব পরিহার করিবে, মদ্যপান করিবে না, দেশের আইনকানুন মানিয়া চলিবে, অন্যান্য বালকের প্রতি সদয় ও উদার ব্যবহার করিবে, কোন সভায় বা ক্লাবে অশিষ্টতা, উচ্ছৃঙ্খলতা বা অবাধ্যতা প্রদর্শন করিবে না, পরন্তু দশের মঙ্গলসাধনে অনুপ্রাণিত হইয়া, যাহাতে তাহারা ভবিষ্যতে আদর্শ স্বামী ও গৃহস্থ হইতে পারে, সেইরূপে কার্য্য করিতে অভ্যস্ত হইবে। যদি তাহারা এই প্রতিশ্রুতি পালন করে, তাহা হইলে তাহাদের দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইয়া অন্যান্য বালকও তাহাদের মত হইবার চেষ্টা করিবে। যদি ২ বৎসর কাল বালকরা এই প্রতিশ্রুতি বর্ণে বর্ণে পালন করে, তাহা হইলে মিঃ সেপ প্রত্যেক বালককে কোনও এক ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করিবার সুযোগস্বরূপ ১ শত হইতে ২ শত ডলার মুদ্রা সাহায্য করিবেন। যদি এই সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত হয় এবং কয়েক জন বালকও প্রতিশ্রুতিপালনে সাফল্য লাভ করে, তাহা হইলে তিনি সাহায্যের মাত্রা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত করিয়া দিবেন।

মিঃ সেপ এই বালকসমাজের নাম দিয়াছেন, Endeavour-Society অর্থাৎ চেষ্টা সমিতি। বালকের চরিত্র-গঠনের উদ্দেশ্যে এরূপ উদ্যম অভিনব বলিলে অত্যুক্তি হয় না। প্রত্যেক দেশের ধনিসম্প্রদায়ের মধ্যে যদি এইরূপ দুই চারি জন মিঃ সেপ থাকেন, তাহা হইলে দেশের ও সমাজের কত উপকার হয়! আমাদের দেশে তথাকথিত 'শিক্ষিত' সম্প্রদায়ের মধ্যে কত বালকই যে কার্য্যাভাবে বে-কার বসিয়া আছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। কে বা তাহাদের তত্ত্ব রাখে, কে বা তাহাদের সাহায্য ও সুযোগ প্রদান করে! এ দেশে রায় বাহাদুর, খাঁ বাহাদুর হইবার লোভে সরকারের মারফতে 'চ্যারিটির' খাতায় নাম লিখাইবার লোকের অভাব হয় না, কিন্তু যাহাতে দেশের দরিদ্র বে-কার অর্দ্ধশিক্ষিত বালকগণের জীবন-সংগ্রামে প্রকৃত সুযোগ ও সহায়তা দান করা হয়, এমন ভাবে কার্য্য করিতে কোন দাতাকর্ণকে দেখা যায় না।

তুর্কী ও মসুল

মসুল অঞ্চল লইয়া তুর্কী ও ইংরাজে যে মনোমালিন্যের উদ্ভব হইয়াছিল, তাহা জাতিসঙ্ঘের সিদ্ধান্তের ফলে দূর হইয়াছে বলিয়া যাঁহারা অনুমান করেন, তাঁহাদের ধারণার যুক্তিযুক্ত মূল্য আছে বলিয়া মনে হয় না। সত্য বটে, জাতিসঙ্ঘের বিচারে মসুলের অধিকার নব-গঠিত ইরাক রাজ্যকে দেওয়া হইয়াছে। (আর ইরাককে দেওয়া হইলেই ইরাকের প্রকৃত ভাগ্য-নিয়ন্তা ইংরাজকে দেওয়া হইল)। সত্য বটে, বর্ত্তমানে মসুল সম্বন্ধে তুর্কীর কোনও আপত্তির কথা রয়টারের তারের সংবাদে প্রকাশিত হইতেছে না, কিন্তু তাহা বলিয়া কেহ যেন মনে না করেন যে, মসুলের ব্যাপারে যবনিকাপাত হইয়াছে। এটনা বা বিসুবিয়স কখনও কখনও তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করে বলিয়া তাহাদের অগ্নি-গর্ভ অভ্যন্তর হইতে যে কখনও অতর্কিতভাবে গৈরিক নিঃস্রাব অমিততেজে নির্গত হইবে না, তাহা কেহ নিশ্চিত বলিতে পারে না।

এ সম্পর্কে তুর্কীর বর্ত্তমান ভাগ্যনিয়ন্তাদিগের মতামত অথবা তুর্কী সংবাদপত্র সমূহের মতামত আলোচনা করিলেই প্রকৃত অবস্থা জ্ঞাত হওয়া যাইতে পারে।

জাতিসঙ্ঘ আগামী ২৫ বৎসর কালের জন্য ইরাকের ভাগ্য-নিয়ন্ত্রণের ভার (Mandate) ইংরাজের উপর অর্পণ করিয়াছেন। ইরাকের মধ্যে মসুল বিলায়েৎ অবস্থিত, সুতরাং প্রকৃতপক্ষে মসুলের উপর যে আগামী ২৫ বৎসর কাল ইংরাজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত থাকিবে, উহা বলাই বাহুল্য। মসুলের তৈলের খনি মহামূল্যবান্। উহার লোভ কোনও জাতি সহজে ছাড়িতে চাহে না। বিশেষতঃ আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রথায় যুদ্ধে তৈলের প্রয়োজন অত্যন্ত অধিক। যে জাতি যত তৈলের মালিক, সেই জাতি সেই পরিমাণে শক্তিশালী বলিয়া পরিগণিত হয়। এই হেতু তুর্কী সহজে মসুল ছাড়িবে বলিয়া মনে করা যায় না। তুর্কীর মনের কথা কি ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা কয়টি দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইতেছি।

তোয়েফিক রসীদ বে তুর্কীর এক জন বড় রাজপুরুষ। তিনি তুর্কীর বৈদেশিক সচিবের কার্য্যও করিয়াছেন। তিনি বেলগ্রেডের 'সার্ব' পত্র 'ভ্রিমি'র কোনও প্রতিনিধিকে বলিয়াছেন,—"আমরা মসুলের অধিকার কিছুতেই ছাড়িতে পারি না। আমি বলিতেছি, আমরা ঐ অধিকার ছাড়িতে চাহি না, আমি বলিতেছি, আমরা ঐ অধিকার ছাড়িতে পারি না। যাহাতে মসুলের উপর আমাদের সার্ব্বভৌমত্ব অক্ষুণ্ণ থাকে এবং ইংরাজের সহিত আমাদের এ সম্বন্ধে বিবাদের অবসান হয়, এমন উপায় আছে। আমরা প্রস্তাব করিয়াছিলাম, মসুলের জনগণের মতামত লওয়া হউক,—তাহারা ইংরাজের অধীনে যাইতে চাহে, কি আমাদের অধীনে থাকিতে চাহে, তাহা অবধারণ করা হউক, কিন্তু আমাদের সে প্রস্তাব অগ্রাহ্য হইয়াছে। এ প্রস্তাব যদি পছন্দ না হয়, তাহা হইলে অপরপক্ষ এ বিবাদের মীমাংসার অন্য পন্থা নির্দ্দেশ করুন। আমরা বলিয়া দিতেছি, আমরা মসুলের উপর আমাদের সার্ব্বভৌমত্ব কখনই ত্যাগ করিব না। ইংরাজের সহিত আমাদের বিবাদের এক মসুল ছাড়া আর অন্য কারণ নাই, সুতরাং যাহাতে শান্তিতে এই বিবাদের মীমাংসা হয়, তাহাই করা উভয় পক্ষেরই কর্ত্তব্য।"

'জামহুরিয়েৎ' নামক তুর্কী সংবাদপত্র জাতিসঙ্ঘকে ইংরাজের আজ্ঞাবাহী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এই সংবাদপত্র বলিতেছেন,—"জাতিসঙ্ঘ ইংরাজকে মসুলের কর্তৃত্বভার প্রদান করিয়া পরিচয় দিয়াছেন যে, তাঁহারা ন্যায়, ধর্ম্ম বা সুবিচারের মুখ চাহেন না। তাঁহারা যে বলবানের অনুগত সেবক, তাহা এই মসুল সিদ্ধান্তেই প্রকাশ পাইয়াছে। তাঁহারা আন্তর্জাতিক ন্যায়বিচারের মর্য্যাদা রক্ষা করেন নাই। যে পর্য্যন্ত জাতিসঙ্ঘ তুর্কীকে তাহার ন্যায্য অধিকার দিতে না পারেন, সে পর্য্যন্ত তাঁহাদের সিদ্ধান্তের কোনও মূল্য নাই বলিয়া তুর্কী বিবেচনা করিবে। যখন আমরা আমাদের জাতীয় সম্মানরক্ষার্থ সঙ্গীন ধারণ করিয়া যুদ্ধ করিয়াছিলাম এবং যুদ্ধের ফলে আদানা, ব্রুসা, স্মার্ণা ও কনষ্টাণ্টিনোপলের উদ্ধারসাধন করিয়াছিলাম, তখনও যেমন অবস্থা, এখনও তাই। এখনও আমরা তুর্ক মসুলদেশ তুর্কী সঙ্গীনের দ্বারা উদ্ধার করিতে প্রস্তুত আছি। এই হেতু আমরা জাতিসংঘের সিদ্ধান্ত মানিয়া লইব না।"

কনষ্টাণ্টিনোপলের এই সংবাদপত্র পরে বলিয়াছেন, "এখন হয় ত ইংরাজ মনে করিতেছেন, মসুলের ব্যাপার মিলনান্ত নাটকে পরিণত হইয়াছে, কিন্তু তাঁহারা শীঘ্রই দেখিতে পাইবেন যে, উহা বিয়োগান্ত নাটকে পরিণত হইবে। যদি ইংরাজ জনসাধারণ অন্ধের মত তাহাদের রাজনীতিকগণের নির্দ্দেশ সমর্থন করেন, তাহা হইলে শীঘ্রই তাহারা এক ভীষণ হত্যার ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিতে বাধ্য হইবেন। ইংরাজ জনসাধারণ তাঁহাদের রাজনীতিকগণের ষড়্‌যন্ত্রের মন্ত্র বুঝিতে পারিতেছে না, ইহা বড়ই পরিতাপের বিষয়।"

কনষ্টাণ্টিনোপলের 'হাকিমিয়েৎ' নামক সংবাদপত্র বলিয়াছেন,—"অন্য সকল জাতিকে মেষপালের মত ইংরাজের নিকট মস্তক অবনত করিতে হইবে, না হয় জগতের শান্তি সর্ব্বদাই বিপৎসঙ্কুল হইয়া থাকিবে। আমরা আমাদের ন্যায্য অধিকার চাহিতেছি। ক্রমাগত প্রতীচ্যের দ্বারা ন্যায্য অধিকারে বঞ্চিত হইয়া প্রাচ্যের প্রাণ জ্বালাতন হইয়া উঠিয়াছে। আমরা আর পররাষ্ট্রলোলুপ শক্তিগণের ক্রীড়নক হইয়া থাকিতে চাহি না। যখন সময় হইবে, তখন আমরা আমাদের কর্ত্তব্য স্থির করিয়া লইব এবং এক মুহূর্ত্তও আমাদের সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিতে বিলম্ব করিব না।"

কনষ্টাণ্টিনোপলের আর একখানি তুর্কী পত্র বলিয়াছেন, "ইংরাজ ষড়্‌যন্ত্রকারীরা অতর্কিতভাবে প্রাচ্যে এক নূতন সংগ্রাম বাধাইবার চেষ্টা করিতেছে। এই হেতু আমাদের তুর্কী সরকার নিরাপদ হইবার অভিপ্রায়ে রুসিয়ার সহিত এক সন্ধি করিয়াছেন। ইংরাজ জাতিসঙ্ঘের বিচারে নিজের মনের মত সিদ্ধান্ত লাভ করিয়াছেন। এ দিকে সফল হইয়া তাঁহারা এখন আমাদিগের সহিত একটা রফার চেষ্টা করিতেছেন। এই সম্পর্কে তাঁহাদের প্রথম উদ্যম,—আমাদিগকে ১ কোটি পাউণ্ড মুদ্রা কর্জ্জ দেওয়া ; অবশ্য যদি আমরা ইংরাজের পণ্য ক্রয় করি। কিন্তু তুর্কী ইহাতে ভুলিবে না। ইংরাজ এক দিকে যেমন আমাদের সহিত সদ্ভাব রক্ষা করিবার ভাণ করিতেছেন, অন্য দিকে তেমনই মসুল অঞ্চলে গোলযোগ ঘটাইবার চেষ্টা করিতেছেন। এ বিষয়ে তুর্কীর স্কন্ধে সকল অপরাধের বোঝা চাপাইয়া দিবার চেষ্টা চলিবে। এক দিন প্রাচ্যে যে একটা ভীষণ রক্তারক্তি কাণ্ড সংঘটিত হইতে পারে, তাহা অসম্ভব নহে। যদি ইংরাজ আমাদের ক্রোধের উদ্রেক করিবার মত কার্য্য করেন, তাহাতে আমরা বিস্মিত হইব না। ইংরাজ আমাদের সীমানায় ভাড়া-করা সৈন্য প্রেরণ করিয়া গোলযোগ বাধাইবার চেষ্টা করিতে পারেন। হয় ত সেই দস্যুদলের বিপক্ষে তুর্কী সেনাও প্রেরিত হইবে। অমনই তাহার পরদিন ইংরাজ বৈদেশিক সচিব আমাদের স্কন্ধে সকল দোষ চাপাইয়া জগতের লোককে আমাদের বিপক্ষে উত্তেজিত করিবার চেষ্টা করিবেন।"

রুসিয়ার সহিত তুর্কীর সন্ধির কথা যে সত্য, তাহা রুসিয়ার বৈদেশিক সচিব চিচেরিণ জর্ম্মণীর 'বার্লিনার টাগে ব্লাট' পত্রে লিখিয়াছেন। তাঁহার প্রবন্ধ হইতে কতকাংশ উদ্ধৃত করিতেছি,—"তুর্কী যে যুদ্ধ করিতে চাহে না, ইহা স্বাভাবিক। কিন্তু মসুল সম্পর্কে তুর্কী সকল প্রকার ত্যাগ স্বীকার করিতে প্রস্তুত। জাতিসঙ্ঘ মসুল সম্পর্কে বিবাদের অবসান না করিয়া এক নূতন সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছেন। রুসিয়া জাতিসঙ্ঘে যোগদান করে নাই, তাহার কারণ এই যে, রুসিয়া বুঝিয়াছে, জাতিসঙ্ঘ শান্তির আকর নহে, বরং নূতন ষড়্‌যন্ত্রের লীলাক্ষেত্র। এই হেতু রুসিয়ার সহিত তুর্কীর যে সন্ধি হইয়াছে, তাহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। প্রাচ্যের জাতিরা তাহাদের আত্মরক্ষার জন্য যে পরস্পর সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইবে, ইহা স্বাভাবিক। কেন না, প্রতীচ্যের জাতিরা লোকার্ণোর সন্ধি স্বাক্ষর করিয়া আপনাদের আত্মরক্ষার উপায়বিধান করিয়াছে।"

সুতরাং মসুল ব্যাপারের যে শেষ যবনিকাপাত হয় নাই, তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে। স্বার্থ ও পররাজ্যলিপ্সা সাম্রাজ্যবাদী জাতিদিগের অস্থিমজ্জাগত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। জগতে যত দিন এ অবস্থার অবসান না হইবে, তত দিন শত লোকার্ণো সন্ধি ও জাতিসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠায় শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে না।

জার্ম্মাণী ও মাসোলিনি

লোকার্ণোর আপোষ কথাবার্ত্তায় কোন কায হইল না, জার্ম্মাণীকে 'জাতে তুলিয়া' লওয়া হইল না। জার্ম্মাণী মিত্রশক্তি সমূহের নির্দ্দেশমত 'গোবর গঙ্গাজল' দ্বারা তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছে, অতএব তাহাকে জাতিসঙ্ঘের ১০ জনের এক জন করিয়া লইবার কথা

উঠিয়াছিল। সবই ঠিকঠাক, শক্তিপুঞ্জের বড় দাদারা (Big brothers) তাহাকে জাতিসঙ্ঘের পংক্তিতে বসিয়া ভোজনে অনুমতি দিবেন বলিয়া স্থির করিলেন, এমন সময়ে হঠাৎ দক্ষিণ-আমেরিকার এক নগণ্য দেশ (ব্রাজিল) বলিয়া বসিলেন,—না, তাহা হইতে পারে না, জার্ম্মাণীর হাতের জল এখনও শুদ্ধ হয় নাই, উহাকে 'জাতে তুলিয়া' লওয়া হইবে না। জাতিসঙ্ঘের আইনে বলে, যদি সদস্যদের মধ্যে এক জনও মত না দেন, তাহা হইলে কোন সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত হইতে পারিবে না। কাযেই জার্ম্মাণীকে জাতে তুলিয়া লওয়া হইল না, লোকার্ণোর 'প্যাক্ট' ভাঙ্গিয়া গেল।

দক্ষিণ-আমেরিকার এই ক্ষুদ্র রাজ্য হঠাৎ 'বড় দাদাদের' অবাধ্য হইয়া এমন বাঁকিয়া দাঁড়াইল কেন, এ বিষয় লইয়া অনেক জল্পনা-কল্পনা চলিল। শেষে জানা গেল, খোঁটার জোরে মেড়া লড়িতেছে। ব্রাজিলের পশ্চাতে 'বড় দাদাদের' এক জন ছিলেন। তাঁহার ইঙ্গিতে ব্রাজিল বাঁকিয়া দাঁড়াইয়াছে। কে তিনি? প্রকাশ পাইয়াছে, ইনি ইটালীর ডিক্‌টেটার সিনর মাসোলিনি। ইঁহার হেতু আছে। দক্ষিণ-টাইরল প্রদেশ লইয়া জার্ম্মাণীর সহিত ইটালীর মাসোলিনির মনোমালিন্য ঘটিয়াছিল। ইটালীয়ান চেম্বারে (পার্লামেণ্টে) মাসোলিনি এক দিন জলদগম্ভীরনাদে ঘোষণা করিলেন,—"Two eyes for an eye and a whole set of teeth for a tooth,—জার্ম্মাণী এক গুণ দিলে ইটালী দশ গুণ ফিরাইয়া দিতে প্রস্তুত থাকিবে।"

মাসোলিনির এই রক্তচক্ষুর কারণ কি? যুদ্ধ স্থগিত হইবার পর হইতেই এই দক্ষিণ-টাইরল প্রদেশের প্রভুত্ব লইয়া জার্ম্মাণী ও ইটালীর মধ্যে মন-কষাকষি চলিয়া আসিতেছে। এই টাইরল প্রদেশ যুদ্ধের ফলে ইটালীর হস্তগত হইয়াছে। অথচ এই প্রদেশে বিস্তর জার্ম্মাণ-ভাষাভাষী লোকের বাস। এই হেতু সকল জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের আইনের দাবী করিয়া জার্ম্মাণী জাতিসঙ্ঘের দরবারে তাহার প্রতি এ বিষয়ে সুবিচার প্রার্থনা করিয়াছিল। এই সূত্রে জার্ম্মাণ সংবাদপত্র সমূহে খুবই আন্দোলন হইয়াছিল। মাসোলিনি ইহাতে ক্রোধে ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া বলিয়াছিলেন, "জার্ম্মাণীর যেন মনে থাকে, ইটালী তাহার জাতীয় পতাকা তাহার বর্ত্তমান সীমানার বাহিরে লইয়া যাইতেও প্রস্তুত, কিন্তু সীমানা হইতে নিজের অধিকারের দিকে এক চুল উঠাইয়া আনিতে সম্মত নহে।"

মাসোলিনির এই সদম্ভ উক্তিতে জগৎ চমকিত হইয়াছিল। ইটালী জাতিসঙ্ঘের দশ জনের এক জন, সুতরাং জাতিসঙ্ঘের অনুমতি গ্রহণ না করিয়া প্রতিবেশীকে এরূপে ভয়প্রদর্শন করায় সকলের চমকিত হইবার কথা। জাতিসঙ্ঘ তাহা হইলে প্রহসন ব্যতীত কিছুই নহে, তাহার অন্তর্ভুক্ত সদস্যরা যদি স্বেচ্ছামত তাহার নির্দ্দিষ্ট শান্তির সর্ত্ত না মানে, তাহা হইলে জাতিসঙ্ঘের নির্দ্দেশের মূল্য কি, তাহার অস্তিত্বেরই বা প্রয়োজন কি? পরন্তু ইটালী শক্তিশালী ও পূর্ণরূপে সশস্ত্র; জার্ম্মাণী বর্ত্তমানে তাহা নহে, তাহার নখদন্ত ভগ্ন করিয়া দেওয়া হইয়াছে। সে জাতিসঙ্ঘের দরবারে বিচারপ্রার্থী হইয়াছিল, ইটালীর বিপক্ষে যুদ্ধঘোষণা করে নাই, তবে হঠাৎ ইটালীর ডিক্‌টেটারের এরূপ আস্ফালনের কি প্রয়োজন ছিল? সাম্রাজ্য-গর্ব্ব যে ইহার মূল, তাহাতে সন্দেহ নাই। জাতিসঙ্ঘ, লোকার্ণো, হেগ ট্রাইবিউন্যাল, ডিসার্ম্মামেণ্ট,—যত বড় বড় গালভরা কথাই আবিষ্কৃত হউক না, যত দিন এই সাম্রাজ্য-গর্ব্বের অস্তিত্ব অক্ষুণ্ণ থাকিবে, তত দিন জগতে শান্তি স্থাপিত হইবে না।

এই সাম্রাজ্য-গর্ব্বের জন্য য়ুরোপে শান্তিপ্রতিষ্ঠা সম্ভবপর হইল না, জার্ম্মাণীকে পাংক্তেয় করিয়াও করা হইল না; ইটালী এক ক্রীড়নকের মারফতে জাতিসঙ্ঘের শান্তিপ্রতিষ্ঠার বাসনা বিফল করিয়া দিল। ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। জাতিসঙ্ঘ অর্থেই Big Brothers বুঝায়। কেন বুঝায়, তাহা তুর্কী ও রুসিয়ার রাজনীতিকদিগের অনেক বক্তৃতায় প্রকাশ পাইয়াছে। মসুল সম্পর্কে তুর্কীর মতামতের কথা অন্যত্র উদ্ধৃত হইয়াছে। তাহা হইতেই বুঝা যায়, তুর্কী জাতিসঙ্ঘকে বিশ্বাস করে না—উহাকে প্রবল শক্তিশালী ইংরাজের ক্রীড়নক বলিয়া মনে করে। রুসিয়াও জাতিসঙ্ঘকে শান্তির অন্তরায় বলিয়া মনে করে। তাই মস্কো সহরের রুসিয়ান পত্র 'ইসভিয়েসটিয়া' বলিয়াছেন, "রুস-তুর্কী সন্ধি জাতিসঙ্ঘের লোকার্ণো প্যাক্টের বিরুদ্ধেই করা হইয়াছে। এই সন্ধির ফলে জগতে যুদ্ধের কারণ দূর হইবে, শান্তির মূল সুদৃঢ় হইবে। কেন না, লোকার্ণো প্যাক্টের দ্বারা প্রতীচ্যে যে প্রবল শক্তি-সম্মেলনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা হইতেছিল এবং যাহার কল্যাণে জগতে অন্যান্য জাতির অধিকার ও স্বার্থ পদদলিত হইবার সম্ভাবনা ছিল, তুর্কী-রুসিয়া-সন্ধির ফলে তাহার ভয় দূর হইবে। তুর্কী, রুসিয়া, চীন ইত্যাদির সমবায়ে এক বিরাট United States of Asia অথবা এসিয়ার যুক্তরাজ্য গঠিত হইয়া উঠিবে, সুতরাং সহজে প্রতীচ্যের শক্তিসঙ্ঘ অপরের প্রতি অন্যায়াচারণ করিতে সাহসী হইবে না।"

এই পত্র পরে স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন,—"জাতিসঙ্ঘের বাহিরে, জাতিসঙ্ঘের ইচ্ছার বিরুদ্ধে এবং জাতিসঙ্ঘের অস্তিত্ব সত্ত্বেও রুসিয়ার সোভিয়েট য়ুনিয়ন প্রাচ্য জাতিসমূহের সহিত মিলিত হইতেছে। তাহাদের উদ্দেশ্য, কাহারও স্বার্থের বা অধিকারের বিরুদ্ধে শক্তিপ্রয়োগ করা নহে, জগতের সভ্যতা ও উন্নতির অনুকূল শান্তিরক্ষা করাই তাহাদের উদ্দেশ্য। যে জাতিসঙ্ঘ আন্তর্জাতিক দস্যুতা এবং প্রবলের দ্বারা দুর্ব্বলের উপর অত্যাচার আচরণ অনুমোদন করিতেছে, তাহার বিপক্ষে প্রাচ্যের এই জাতি-সম্মেলন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।"

তুর্কীর 'খাল্ক' নামক পত্রও ঠিক এই ভাবের অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। এই পত্রও বলিতেছেন,—"যে সময়ে য়ুরোপ প্রাচ্যের বিপক্ষে জাতিসঙ্ঘের মারফতে একযোগে কার্য্য করিতে প্রস্তুত হইতেছে, সেই সময়ে রুসিয়া-তুর্কী-সন্ধির সর্ত্ত স্বাক্ষরিত হইয়াছে। ইহা জাতিসঙ্ঘের অন্যায় নীতির প্রতিবাদরূপে করা হইয়াছে।"

ফল কথা, যে উদ্দেশ্যে জাতিসঙ্ঘ গঠিত হইয়াছে, তাহা বিফল হইয়াছে। জগতে সকল জাতি আত্মনিয়ন্ত্রণ করিতে পারে, সকল জাতির প্রতি সুবিচার হয়,—ইহা দেখিবার জন্য জাতিসঙ্ঘ সৃষ্ট হইয়াছিল, কিন্তু জাতিসঙ্ঘ যে ভাবে এত দিন Mandate বা অনুজ্ঞাপত্র বণ্টন করিয়া আসিয়াছেন এবং যে ভাবে দুর্ব্বল ও প্রবলের মধ্যে তারতম্য রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন, তাহাতে জাতিসঙ্ঘের সুবিচার ও শান্তিপ্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে দুর্ব্বল জাতিদিগের আস্থা না থাকিবারই কথা। যখন প্রবল মাসোলিনি গ্রীসকে চোখ রাঙ্গাইয়া শাসাইয়াছিলেন,—"আমাদের ঘরোয়া কথায় বাহিরের কাহাকেও (অর্থাৎ জাতিসংঘকে) হস্তক্ষেপ করিতে দিব না," যখন মিশরের ব্যাপারে বৃটিশ-সিংহ গুরুগম্ভীরনাদে গর্জ্জন করিয়াছিল,—"মিশরের ঘরোয়া কথায় কাহাকেও থাকিতে দিব না", তখন জাতিসঙ্ঘ বেত্রাহত জীবের মত ঘরের কোণে লুকাইয়া ছিল। এখন মাসোলিনির চালে জার্ম্মাণী জাতিসঙ্ঘের মধ্যে স্থান লাভ করিতে পারিল না, ইহাতেও জাতিসঙ্ঘের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইল। এ প্রকাণ্ড শ্বেতহস্তী পুষিয়া কি ফল হইতেছে, য়ুরোপীয় শক্তিপুঞ্জ তাহা বিলক্ষণ জানেন।
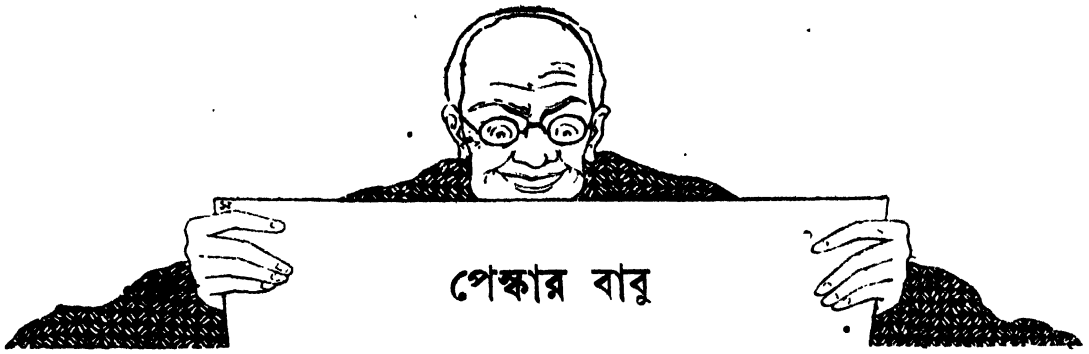
পেস্কার বাবু

চৌধুরী জমীদারদের ডিহি সুলতানপুরের নায়েব জনার্দ্দন মিত্র ওরফে 'মিত্তিরজা' মনিব সরকারের তহবিল তস্‌রুফ্‌ করিয়া বেকার অবস্থায় যখন গোবিন্দপুরের পৈতৃক বাড়ীতে আসিয়া 'গ্যাট' হইয়া বসিলেন, তখন তিনি সময় কাটাইবার অন্য কোন উপলক্ষের অভাবে অহিফেনের শরণাপন্ন হইলেন। কিন্তু 'কাঁচা'তে তাঁহার মন ডুবিল না; এ জন্য তিনি 'পাকা'র অর্থাৎ গুলীর পক্ষপাতী হইয়া উঠিলেন। কিন্তু এই 'পাকা' জিনিষটি এরূপ মজলিসি পদার্থ যে, ইহা একাকী ঘরের কোণে বসিয়া উপভোগ করিলে তৃপ্তিলাভ হয় না। পাঁচ সাত জনে আড্ডা করিয়া এই অপূর্ব্ব রসের আস্বাদন গ্রহণ করিতে করিতে অর্দ্ধ-নিমীলিত নেত্রে আকাশে কেল্লা নির্ম্মাণ করিতে না পারিলে, শুনিয়াছি, ইহার সম্যক্ মাধুর্য্য উপলব্ধি হয় না। বুদ্ধিমান্ মিত্তিরজা মুহূর্ত্তমাত্র চিন্তা না করিয়া, যে স্থানে মৌতাতের আড্ডা স্থাপন করিলেন, তাহা আমাদেরই বাসভবনের পশ্চাৎস্থিত একখানি ক্ষুদ্র খড়ের কুটীর। আমাদের বাড়ী হইতে তাহার দূরত্ব দশ গজের অধিক নহে।

শ্যামাচরণ ঘোষ নামক একটি বৃদ্ধ গোপ গোবিন্দপুরের গোয়ালাপাড়ায় বাস করিত; সে সঙ্গতিপন্ন চাষী গৃহস্থ ছিল। চন্দুরী ঘোষাণী তাহার পাঁচটি কন্যার অন্যতমা। সে দশ বৎসর বয়সে বিধবা হইয়াছিল। তাহার রঙ্গ কালো হইলেও একটু রূপ ছিল। শ্যামাচরণের মৃত্যুর পর সংসারে এক মা ভিন্ন চন্দুরীর অন্য কোন অভিভাবক ছিল না। তাহার অন্যান্য ভগিনীরা সধবা; গ্রামেই তাহাদের বিবাহ হইয়াছিল, তাহারা স্বামিগৃহে থাকিত। কেবল বিধবা চন্দুরী মাতৃগৃহে থাকিয়া দুধ-দৈয়ের ব্যবসায় করিত। প্রথম যৌবনেই তাহার নানা প্রকার কলঙ্ক প্রচারিত হইয়াছিল। অবশেষে এক দিন সহসা সে গোবিন্দপুর হইতে নিরুদ্দেশ হইল। তাহার অন্তর্দ্ধানের পর তাহার সম্বন্ধে অনেক জনরব শুনিতে পাওয়া যাইত; তাহার কতখানি সত্য ও কতটুকু মিথ্যা, কাহারও তাহা নির্ণয় করিবার সামর্থ্য ছিল না। কিন্তু বছর পাঁচেক পরে দেখা গেল—চন্দুরী ঘোষাণী দুই বৎসরের একটি পুত্র ক্রোড়ে লইয়া গ্রামে ফিরিয়া আসিল এবং গোবিন্দ মিত্তিরও চাকরী হারাইয়া তাহার দুই দিন অগ্রে বা পরে বাড়ী আসিয়া বসিলেন।

আমরা উপরে যে কুটীরখানির কথা বলিয়াছি, সেই কুটীরে রামী বোষ্টুমী বাস করিত। সে তাহার ভগিনীর সহিত বৃন্দাবনে যাইবার সময় কুটীরখানি মিত্তিরজার নিকট বিক্রয় করিয়া গিয়াছিল। চন্দুরী ঘোষাণী এই কুটীরেই সপুত্র আশ্রয়লাভ করায় কার্য্যকারণসম্বন্ধ স্থির করিতে কাহারও সংশয়ের অবকাশ রহিল না।

আমাদের বয়স তখন নিতান্ত অল্প। আমরা এক এক দিন অপরাহ্ণে চন্দুরীর কুটীরের সম্মুখস্থ কুঠুরীর পিছনদিকের জানালা খুলিয়া দেখিতাম—মিত্তিরজা, তাঁহার বন্ধু শশী ঘোষ, হারু মজুমদার, রাধু দত্ত সহ চক্রাকারে সেই কুটীরের দাওয়ায় বসিয়া 'মেরুদণ্ডে'র সহিত প্রেমালাপে মত্ত হইয়াছেন। তাঁহাদের মজার মজার গল্প শুনিয়া আমাদের এতই আমোদবোধ হইত যে, দাণ্ডাগুলী-খেলাও তাহার নিকট তুচ্ছ; এমন কি, আমার পরম আদরের ঘুড়ী ও নাটাই অনাদরে কাঠের সিন্দুকের এক পাশে উপেক্ষায় পড়িয়া থাকিত!

কিন্তু এক এক দিন এই গুলীর আড্ডার রসালাপ তুমুল কলহে পরিণত হইত। মিত্তিরজা ও শশী ঘোষ পরস্পরের প্রতিবেশী; উভয়ের বাড়ী মুখোমুখী; দুই বাড়ীর আঙ্গিনার মধ্যে কোন প্রাচীর বা বেড়া ছিল না

এক দিন অপরাহ্ণে গুলীর আড্ডা বেশ সরগরম হইয়া উঠিয়াছিল; পাঁচ সাতটি প্রবীণ গুলীখোর নেশায় মস্গুল। শশী ঘোষ ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ শব্দে খানিক ধুম গলাধঃকরণ করিয়া, অর্দ্ধ-নিমীলিত নেত্রে ভারী গলায় মিত্তিরজাকে বলিল, "দেখ মিত্তিরজা, কাল শেষ রাত্তিরে ভারী এক মজার স্বপ্নোন দেখিছি! আমার ছেলে সাতকড়ি গোয়াড়ীতে চাকরীর উমেদারীতে গিয়েছে কি না। সে যেন রাজার 'মুক্তার' বিপিন সরকারের সেরেস্তায় মুহুরীগিরি চাকরী পেয়েছে; বেশ দশ টাকা কামাচ্ছে। শেষ রাত্তিরের স্বপোন, ও কি মিথ্যে হবার যো আছে? আমি দিয়া শশী ঘোষের মুখের দিকে আরক্ত নেত্রে চাহিয়া সক্রোধে বলিলেন, "তোমার আক্কেলখানা কি রকম ঘোষজা! তোমার পাইখানা করবে কি আমার রান্নাঘরের ঠিক সাম্‌নে? ওখানে আমি তোমাকে পাইখানা করতে দিচ্ছিনে, আমার জান্ কবুল।"

মিত্তিরজার কথায় শশী ঘোষ চটিয়া উঠিয়া বাজখাই আওয়াজে বলিল, "আলবৎ দেবে। তোমার ঘাড় দেবে! আমার জমীতে আমি একটার যায়গায় দশটা পাইখানা করবো; তুমি তাতে বাধা দেবার কে হে? এই দেখ— আমি পাইখানার পত্তন দিলাম, তোমার যা ক্ষ্যামতা

দুজনেই মাটীতে পড়িয়া গড়াগড়ি

মাসখানেকের মধ্যেই এক লাখ ইট পুড়িয়ে পাকা ইমারত আরম্ভ ক'রে দিচ্ছি।" সে তৎক্ষণাৎ গুলীতে আগুন ধরাইবার চিম্‌টা দিয়া চন্দুরী ঘোষাণীর দাওয়ার উপর ঘরের নক্সা আঁকিতে আরম্ভ করিল; সঙ্গে সঙ্গে বলিল, "এই হ'লো আমার শোবার ঘর; এই দরদালান; পাশে এই সাতকড়ির শোবার ঘর, এই রান্নাঘর, আর এইটে হ'লো পাইখানা।"

মিত্তিরজার নেশাও তখন পাকিয়া আসিয়াছিল। তিনি তাঁহার লম্বা নলে কয়েকটা টান দিয়া ধোঁয়া গিলিয়া স্তব্ধভাবে বসিয়া রহিলেন। তাহার পর ধোঁয়াটুকু ছাড়িয়া থাকে কর।" বলিয়াই সে ইট গড়িবার ভঙ্গীতে সেই স্থানে এক কিল মারিল। মিত্তিরজা রুখিয়া উঠিয়া বলিলেন, "তোমার পাইখানার পত্তন ভাল করেই লওয়াচ্ছি।" মিত্তিরজা ঘোষজার গালে বিরাশী সিক্কা ওজনের এক চড় মারিলেন; তখন ঘোষজা তাহার হুঁকার লম্বা নলটা খুলিয়া লইয়া মিত্তিরজাকে নির্দ্দয়ভাবে ঠেঙ্গাইতে আরম্ভ করিল। শেষে দুই জনেই মাটীতে পড়িয়া গড়াগড়ি ও জড়াজড়ি।

চন্দুরীর ছেলেটা 'বাবাকে মেরে ফেল্লে' বলিয়া কাঁদিয়া উঠিল। চন্দুরী তাড়াতাড়ি আঁস্তাকুড় হইতে মুড়ো

ঝাঁটা আনিয়া ঘোষজার অঙ্গসেবা করিতে লাগিল, তখন ঘোষজা বাড়ী অসমাপ্ত রাখিয়াই উঠিয়া পলায়ন করিল।

ইহার পর তিন দিন তাহাকে চন্দুরীর বাড়ীর আড্ডায় দেখিতে পাই নাই। কিন্তু তিন দিন পরে সে আবার গুলীর আড্ডায় যোগদান করিল। মিত্তিরজার সহিত কিরূপে তাহার সন্ধি স্থাপিত হইল, তাহা জানিতে পারি নাই।

২

মিত্তিরজা চন্দুরী ঘোষাণীর পুত্রকে আদর করিয়া 'কেলে-সোনা' বলিয়া ডাকিতেন। তাহার দেহের বর্ণ আল্-কাতরার মত উজ্জ্বল কৃষ্ণবর্ণ বলিয়া তাহার এই নাম, কি মিত্তিরজা তাহাকে স্বর্ণের ন্যায় মূল্যবান্ মনে করিতেন বলিয়া এই নামে তাহাকে অভিহিত করিতেন, তাহা আমরা কোন দিন জানিতে পারি নাই; কিন্তু গুলী সেবনের পর তিনি কোন কোন দিন কেলে সোনাকে কোলে লইয়া অটল ময়রার দোকানে উপস্থিত হইতেন, এবং নিজের জন্য দুই পয়সার 'গুড় ছোলা' বা গুড়ে মুড়কি সংগ্রহ করিয়া, কেলে সোনাকে একটি রসগোল্লা বা এক পয়সা দামের দু'খানি তেলে ভাজা জিলিপী কিনিয়া দিতেন। সেই সময় যদি কেহ বলিত, ছেলেটির নাম কি মিত্তির মশায়! মিত্তিরজা তৎক্ষণাৎ সগৌরবে উত্তর দিতেন, "ওর নাম—সৃষ্টিধর। কালে ও মহা কুলীন কায়েত ব'লে নিজের পরিচয় দিতে পারবে। যার 'আজাই' (মাতামহ) শ্যামাচরণ ঘোষ আর ঠাকুরদাদা হরিনারায়ণ মিত্তির, সে যদি লেখাপড়া শিখে কায়েত না হয়, তা হ'লে দিনও মিথ্যে, রাতও মিথ্যে! লেখাপড়া শিখিয়ে ছিষ্টিধরকে মানুষ ক'রতে পারলে কালে ও হাকিম হবে—তা কিন্তু তোমরা দেখে নিও।"

ছিষ্টিধরের বয়স যখন পাঁচ বৎসর, সেই সময় মিত্তিরজা গুলী সেবনের পরিণামস্বরূপ রক্ত-আমাশয় রোগে মোক্ষ লাভ করিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর গতযৌবনা চন্দুরী ঘোষাণীর ঘরের গুলীর আড্ডা উঠিয়া গেল; কারণ, আড্ডাটি বজায় রাখিতে হইলে চন্দুরী ও তাহার কেলে-সোনার অশন-বসনের ভার গ্রহণ করিতে হয়। মিত্তিরজা তাঁহার গৃহস্থালীর তৈজসপত্রাদি বিক্রয় করিয়াও এই দুইটি প্রাণীর ও আড্ডার ভার শেষ দিন পর্য্যন্ত বহন করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার কোন ইয়ার-বন্ধু এই ভার গ্রহণ করিল না। এ জন্য চন্দুরী বড়ই বিপন্ন হইয়া পড়িল। গ্রামের বিধবা ঘোষাণীরা ভিন্ন গ্রাম হইতে দুধ কিনিয়া আনিয়া, এক সের দুধে আধ সের জল মিশাইয়া 'নির্জ্জলা' দুধ বলিয়া গৃহস্থদের জোগান দিত, কেহ ছানা কাটিয়া ময়রা-দোকানে বিক্রয় করিত; কেহ ক্ষীর ও 'চাঁচি' করিয়া এক টাকার দুধে দশ বারো
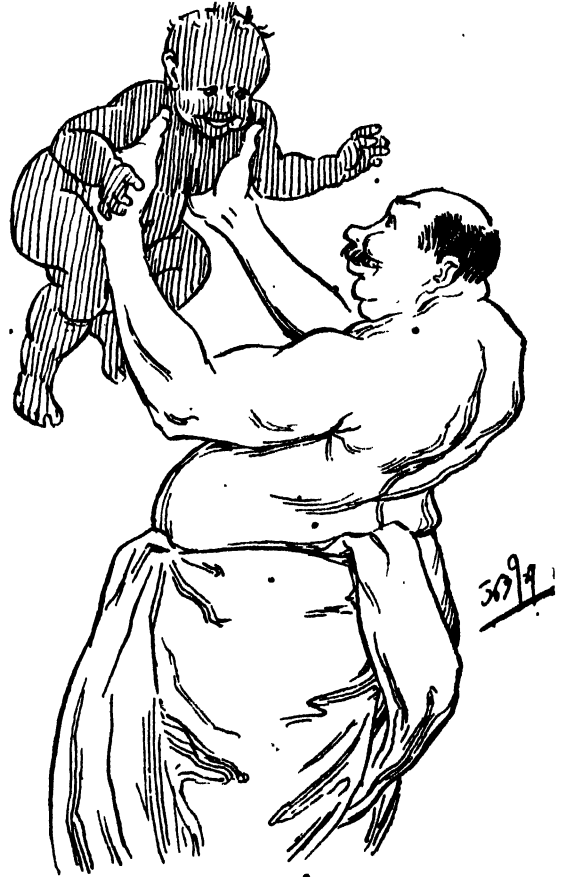
ছিষ্টিধর—কালে হাকিম হবে

আনা লাভ করিত; কিন্তু চন্দুরী মিত্তিরজার গুলীর আড্ডার আড্ডাধারিণী বলিয়া খ্যাতি লাভ করায় ঘোষাণীর দলে মিশিয়া সে ব্যবসায় করিবার সুযোগ পাইল না। বিশেষতঃ শিশু পুত্রটিকে লইয়া সে এরূপ অসুবিধায় পড়িল যে, তাহাকে ছাড়িয়া উপার্জ্জনের চেষ্টায় বাহির হইবে, তাহারও উপায় ছিল না। অবশেষে সে জীবিকা-নির্ব্বাহের উপায়ান্তর না দেখিয়া দাস্যবৃত্তি অবলম্বন করিল। গ্রামের এণ্ট্রেন্স স্কুলের হেডমাষ্টার

কুবের পাল মহাশয়ের পত্নী গতযৌবনা চন্দুরী ঘোষাণীকে তাঁহার অন্তঃপুরে পরিচারিকার কার্য্যে নিযুক্ত করিতে শঙ্কাবোধ করিলেন না, যদিও তিনি পতি-দেবতাকে তেমন বিশ্বাস করিতেন না!

হেড-মাষ্টারের ছেলেদের কাছে থাকিতে থাকিতে ছিষ্টিধর দুই মাসের মধ্যে প্রথমভাগখানি শেষ করিল। তাহার পাঠানুরাগের পরিচয় পাইয়া হেড-মাষ্টার মহাশয় তাহাকে আর দুই তিনখানি কেতাব কিনিয়া দিলেন; কয়েক মাসের মধ্যেই সে সেগুলি কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিল। কুবের পাল মহাশয় বুঝিতে পারিলেন, লেখাপড়া করিবার সুযোগ পাইলে ছিষ্টিধর মানুষ হইতে পারিবে। চন্দুরীও তাহার প্রভুপত্নীর নিকট আবদার আরম্ভ করিল—তাহার কেলেসোনাকে ইস্কুলে ভর্ত্তি করিয়া লওয়া হউক। কুবের পাল মহাশয় পত্নীর অনুরোধ বা আদেশ উপেক্ষা করিতে পারিলেন না; তিনি স্কুলের সম্পাদককে ধরিয়া ছিষ্টিধরকে বিনা বেতনে স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া লইলেন। ছিষ্টিধর প্রতি বৎসর বাৎসরিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া উচ্চতর শ্রেণীতে 'প্রোমোশন' পাইতে লাগিল। অবশেষে এণ্ট্রেন্স পরীক্ষায় সে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইলে, চন্দুরী ঘোষাণীর আশা হইল, কালে হয় ত মিত্তিরজার দৈববাণী সফল হইবে; কেলেসোনা বাঁচিয়া থাকিলে নিশ্চয়ই হাকিম হইবে। চন্দুরীর যে চারিটি সহোদরা ভগিনী ছিল, তাহারা দুগ্ধ ও ছানা-ক্ষীর বিক্রয় করিত এবং তাহাদের পুত্রেরা কেহ গরুর গাড়ীর গাড়োয়ানী করিত, কেহ কোন উকীল-মোক্তারের বাড়ী খানসামাগিরি করিত, কেহ বা কোন গৃহস্থের কৃষাণ হইয়া লাঙ্গল দিয়া জমী চষিত। তাহারা যখন শুনিল, চন্দুরীর পুত্র ছিষ্টিধর লেখাপড়া শিখিয়া পাশ করিয়াছে এবং অদূর-ভবিষ্যতে তাহার হাকিম হইবার সম্ভাবনা আছে, তখন তাহাদের মনে বিলক্ষণ ঈর্ষার সঞ্চার হইল। ছিষ্টিধরের মাস্‌তুতো ভাইগুলি সন্ধ্যাকালে সাঁজালের আগুনের কাছে বসিয়া তামাক টানিতে টানিতে বলাবলি করিত,—"মিত্তিরজা হ'ল ওর বাপ; লেখাপড়া শিখবে না ত কি আমরা শিখবো? আমাদের বাপদাদা যে বিদ্যের লায়েক ছিল, আমরাও সেই বিদ্যে শিখেছি। ছিষ্টিধর এখন ভদ্দোর লোক, আমাদের সঙ্গে উঠতে বসতে নজ্জায় ওর মাথা কাটা যায়।"—চন্দুরীর ভগিনীরা ছানার হাঁড়ি লইয়া ময়রার দোকানে যাইবার সময় বলাবলি করিত, "দিদির কি অদেষ্ট; ও যখন 'বেরিয়ে যায়', তখন আমরা তাকে নিত্যি কালামুখী ব'লে গাল দিয়েছি; ঘরে উঠতে দিই নি। আর তার ছেলে কি না আর দু'বছর পরে হবে হাকিম! বেরিয়ে গিয়ে ওর ত ভারী 'খেতি' হয়েছে! আর আমরা সতী-গিরি ফলিয়ে ত ভারী লাভ করেছি। ছিষ্টেটা মানুষ হ'লে আমাদের কখন মাসী ব'লে সুদোবেও না; আর আমাদের ছেলেরা কি তার পায়ের কড়ে আঙ্গুলেরও 'যুগ্যি' হবে? না, তার কাছে বস্‌তে পারবে? কুলের মুখে নুড়ো জ্বেলে দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে দিদির ত ভালই হয়েছে! সতীগিরির মুখে আগুন।"

৩

'এণ্ট্রেন্স পাশ' করিয়া এল, এ, পড়িবার জন্য ছিষ্টিধর বড়ই ব্যাকুল হইয়া উঠিল; কিন্তু সহরে যাইতে না পারিলে এল, এ, পড়িবার ব্যবস্থা হয় না, এবং কলেজের বেতন ও ব্যয়ভার বহন করা তাহার দরিদ্রা জননীর অসাধ্য। অগত্যা চন্দুরী ঘোষাণী তাহার ছেলের হাকিম হইবার আশা ত্যাগ করিল, এবং তাহার ভগিনী ও ভগিনীপুত্রেরা কতকটা আশ্বস্ত হইয়া বলিল, "হাঁ, ছিষ্টে আবার হাকিম হবে, যা নয় তাই! ওর তাঁতিকুল বোষ্টম-কুল দুই-ই গ্যালো!"

এই সময় হেড-মাষ্টার কুবের পাল হঠাৎ তিন দিনের জ্বরে 'হার্টফেল' করিয়া প্রাণত্যাগ করায় চন্দুরী ঘোষাণীর চাকরীটুকুও গেল। চাকরী হারাইয়া সে আমাদের বাড়ীর পাশের সেই ক্ষুদ্র ও জীর্ণ কুটীরে আশ্রয় লইল বটে, কিন্তু চাকরীর চেষ্টায় ক্রমাগত ঘুরিতে লাগিল। কয়েক সপ্তাহ পরে ছুটীর পর গোবিন্দপুরে তিন বৎসরের পুরাতন মুন্সেফের পরিবর্ত্তে এক জন নূতন মুন্সেফ আসিয়া আদালতের এজলাস অধিকার করিলেন। চন্দুরী ঘোষাণী তাঁহার বাসায় পরিচারিকা নিযুক্ত হইল।

মুন্সেফ ভবতারণ বাবুর তিনটি পুত্র; সকলেরই তখন বয়স অল্প। তিনি কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াই ছেলে তিনটিকে গোবিন্দপুরের এণ্ট্রেন্স স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। তাঁহার ছেলেদের জন্য এক জন গৃহশিক্ষকের প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়া অল্প বেতনে একটি অভিজ্ঞ শিক্ষক সংগ্রহ করিবার জন্য তিনি নূতন হেড-মাষ্টারকে অনুরোধ করিলেন। চন্দুরী ঘোষাণী এই সুযোগ ত্যাগ করিল না; সে মুন্সেফ-গৃহিণীকে

প্রতীক্ষায়

বসুমতী প্রেস]

[শিল্পী—শ্রীহরেকৃষ্ণ সাহা

ধরিয়া বসিল—তাহার ছেলেকে এই চাকরী দিলে সে ছেলে তিনটিকে খুব যত্ন করিয়া পড়াইবে। অল্পবেতনে বাহিরের লোক দিয়া তেমন ফল পাওয়া যাইবে না। পরিচারিকার পুত্র তাঁহার ছেলেদের গৃহশিক্ষক হইবে শুনিয়া মুন্সেফ-গৃহিণী মুখ বাঁকাইলেন, এবং পরিচারিকার এই ধৃষ্টতার কথা স্বামীর নিকট বলিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলেন না; কিন্তু তাহার ফল অন্যরকম হইল।

ভবতারণ বাবু তাঁহার ছেলেদের জন্য একটি 'প্রাইভেট টিউটার' সংগ্রহের জন্য চেষ্টার ক্রটি করেন নাই। ছেলে তিনটির শিক্ষার প্রতি তাঁহার দৃষ্টিপাতের অবসর ছিল না। আদালতে তিনি যে সকল মামলা করিতেন, সকালে ও রাত্রিতে সেই সকল মামলার রায় লিখিতেন; ছেলে তিনটির পাঠ কখন্ বলিয়া দিবেন?—অথচ তিনটি ছেলেকে সকালে বা সন্ধ্যার পর দুই ঘণ্টা মাত্র পড়াইতে কেহই মাসিক পনের টাকার কম বেতনে রাজী হয় না! এরূপ অধিক বেতন দিয়া মাষ্টার নিযুক্ত করা অসাধ্য মনে করিয়া তিনি হতাশ হইয়াছিলেন; এমন সময় গৃহিণী তাঁহার দাসীর ধৃষ্টতার পরিচয় দিলে তিনি কোন মন্তব্য প্রকাশ করিলেন না; পরদিন প্রভাতে ছিষ্টিধরকে ডাকিয়া তাহার যোগ্যতা পরীক্ষা করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

মুন্সেফ-গৃহিণী স্বামীর মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া তাঁহার বাঁশীর মত নাসিকা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর সঙ্কুচিত করিয়া বলিলেন, "ও মা, কি ঘেন্নার কথা! ঐ গয়লা মাগীর ছেলে আমার ছেলেদের মাষ্টারী করবে? তুমি ক্ষেপেছ না কি?"

মুন্সেফ বাবু হাসিয়া বলিলেন, "অত খাপ্পা হচ্ছ কেন? 'দৈবায়ত্ত কুলে জন্ম,'—কত ইতর বংশের ছেলে যে এখন ডেপুটী মুন্সেফ হচ্ছে। ছোঁড়া যদি পড়াতে পারে, বুঝে সুজে তাকেই ও কাযে বাহাল করবো। আরও দেখ, অন্য লোক পনের টাকার কমে রাজী হচ্ছে না; আর ছোঁড়া যদি ৪।৫ টাকা নিয়ে সকালে ও রাত্রিতে চার পাঁচ ঘণ্টা পড়ায়, তাতে আপত্তি কি?"

পনের টাকার স্থলে চারি পাঁচ টাকায় মাষ্টার পাওয়া যাইবে শুনিয়া মুন্সেফ-পত্নীর নাসিকা স্বাভাবিক অবস্থা পুনঃপ্রাপ্ত হইল; মাসে দশ এগারটি টাকা বাঁচিয়া যাইবে বুঝিয়া তাঁহার সকল আপত্তি মুহূর্ত্তে অন্তর্হিত হইল।

পরদিন প্রভাতে ছিষ্টিধর মুন্সেফ বাবুর আহ্বানে তাঁহার সহিত দেখা করিল। ভবতারণ বাবু তাহাকে দুই চারিটি প্রশ্ন করিয়া বুঝিতে পারিলেন, তাহার দ্বারা কায ভালই চলিবে। স্থির হইল, সে মুন্সেফ বাবুর ছেলে তিনটিকে সকালে আড়াই ঘণ্টা ও রাত্রিকালে তিন ঘণ্টা পড়াইবে; দুই বেলা তাঁহার বাসায় খাইতে পাইবে এবং মাসিক চারি টাকা বেতন পাইবে। ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া ছিষ্টিধর এই প্রস্তাবে সম্মত হইল, এবং প্রতিমাসে বেতন পাইলে মায়ের উপদেশে বিবাহের জন্য সে তিন টাকা হিসাবে 'সেভিংস ব্যাঙ্কে' জমাইতে লাগিল।

এক বৎসর পরে মুন্সেফ বাবুর তিনটি ছেলেই বাৎসরিক পরীক্ষায় উচ্চস্থান অধিকার করিয়া উচ্চতর শ্রেণীতে 'প্রমোশন' পাইল। মুন্সেফ বাবু ছিষ্টিধরের শিক্ষকতা কার্য্যের সাফল্য দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "ছিষ্টিধর, তুমি কি বকশিস্ চাও, বল।"

ছিষ্টিধর হাত যোড় করিয়া বলিল, "হুজুর! দয়া ক'রে আমাকে আদালতের একটি আমলাগিরি দিলে এ গরীবের বড়ই উপকার হয়। আমার ত চাকরী-বাকরী নেই; হুজুর ভিন্ন আমার মুরুব্বীও নেই। হুজুরের আশ্রয়েই আছি, হুজুর যা করেন।"

মুন্সেফ বাবু জানিতেন, তাঁহার আদালতে কোন আমলাকে বাহাল-বরতরফ করিবার অধিকার তাঁহার নাই, সে অধিকার জজ সাহেবের। বিশেষতঃ তখন আদালতে কোন চাকরী খালি ছিল না এবং খালি হইলেও বাহিরের লোককে সেই কাযে নিযুক্ত করিবার নিয়ম ছিল না। চাকরী খালি হইলে আদালতের 'এপ্রেণ্টিস্'-গণই জজ সাহেবের আদেশে সেই পদে নিযুক্ত হইত। এ জন্য মুন্সেফ বাবু জজ সাহেবকে লিখিয়া ছিষ্টিধরকে তাঁহার আদালতে 'তায়েন-নবীশ' (এপ্রেণ্টিস্) নিযুক্ত করিলেন।

আদালতে মামলা-মোকদ্দমা বেশী হইলে 'নকল সেরেস্তা'য় কায করিবার জন্য মধ্যে মধ্যে অতিরিক্ত নকলনবীশ লওয়া হইত। সেরেস্তাদার মুন্সেফ বাবুর ইঙ্গিতে সুযোগ পাইলেই ছিষ্টিধরকে নকলনবিশী করিতে দিতেন। এই কার্য্যে ছিষ্টিধর পনের কুড়ি টাকা এক মাসেই উপার্জ্জন করিত। ছিষ্টিধরের মা দেখিল, ছেলে হাকিম না হউক, হাকিমের কাছাকাছি গিয়াছে! তাহার আনন্দের সীমা

রহিল না। ছিষ্টিধরও দ্বিগুণ উৎসাহে মুন্সেফ বাবুর ছেলেদিগকে বিদ্যাদান করিতে লাগিল।

এক বৎসর পরে গোবিন্দপুরের মুন্সেফী আদালতে নায়েব-নাজীরের পদ খালি হইল। ভবতারণ বাবু জানিতেন, জজ সাহেবের নাজীর যে নোট দিবেন, তাহার উপর নির্ভর করিয়াই সদর ও মফস্বলের আদালতের এপ্রেণ্টিসের দল হইতে এই পদের জন্য লোক লওয়া হইবে। জজের নাজীরটি মুন্সেফ ভবতারণ বাবুর আত্মীয় ছিলেন; এ জন্য নাজীর বাবুর 'নোটে' ছিষ্টিধরই এপ্রেণ্টিস্‌গণের মধ্যে যোগ্যতম প্রার্থী বলিয়া প্রশংসিত হইল।

জজ সাহেবের আদেশে ছিষ্টিধর গোবিন্দপুরের মুন্সেফী আদালতে 'নায়েব-নাজীরে'র পদে নিযুক্ত হইল। এই সংবাদে গোবিন্দপুরের গোয়ালাদের মধ্যে মহা আন্দোলন উপস্থিত হইল। ছিষ্টিধরের মাসীরা বলিতে লাগিল, "চন্দুরীর কি অদেষ্ট! যদি সে বিধ্‌বে হয়ে ঘরে থাক্‌ত, তা হ'লে আমাদের মতন গতর খাটিয়ে, দুধ-ছানা বেচেই হাড় কখানা মাটী করতো। ভাগ্যে সে মিত্তিরজার সুনজরে পড়েছিল, তাই ছেলে হত্‌কে সুখের মুখ দেখ্‌লে। এখন সে ঠ্যাংএর ওপর ঠ্যাং দিয়ে বস্তে রাজার হালে ব্যাটার রোজগার খাবে। আর আমরা কি অদেষ্ট নিয়েই এসেলাম! নিত্যি তিন কোরোশ থেকে দুধের কেঁড়ে বইতে বইতে জান্‌টা গ্যালো! যাদের প্যাটে ধরেলাম, তারা মানুষ হ'ল্যো দুঃখু ছিল কি?"

ছিষ্টিধরের মাসতুতো ভাই ন্যাপ্‌লা তাহার মাতার আক্ষেপ শুনিয়া বলিল, "হঃ, ছিষ্টি হাকিম হ'তে না পারুক, হাকিমের নাজীর হয়েছে ত! সুমুন্দির ঠ্যাকার কতো! আমাদের সঙ্গে কতা কইতে ঘেণ্ণা হয়। বেজাতক কি কখন ভদ্দোর নোক হয় মা! তা আমরা করি কৃষাণী, চরাই গরু, আর ছিষ্টে মানুষ চরায় ওর গিদের ত হতেই পারে।"

ছিষ্টিধর নায়েব-নাজীরের চাকরীতে বাহাল হইয়াছে শুনিয়া তাহার মা চন্দুরী ঘোষাণী যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইল! ছিষ্টিধর বড় মাতৃভক্ত। সে প্রথম মাসের বেতন কুড়ি টাকা পাইয়া মায়ের পায়ের কাছে টাকাগুলি রাখিয়া তাহাকে প্রণাম করিল। মিত্তিরজা তত দিন বাঁচিয়া থাকিলে বোধ হয় মনের আনন্দে কুড়ি 'ছিটে' গুলী এক আসনে বসিয়া টানিতেন এবং গ্রামের সকল গুলীখোরকে নিমন্ত্রণ করিয়া পেট ভরিয়া গুলী খাওয়াইতেন; কিন্তু বহু দিন পূর্ব্বে তাঁহার মৃত্যু হওয়ায় এই উপলক্ষে অনেকগুলি পেয়ারাগাছ নিষ্পত্র হইবার সুযোগে বঞ্চিত হইল!

ছিষ্টিধরের মা টাকাগুলির সদ্ব্যবহার করিল। সে জোড়া পাঁঠা ও জোড়া ঢাক দিয়া সর্ব্বমঙ্গলার পূজা করিল। নাজীর জানকী বাবুর বাসায় প্রসাদী পাঁঠার মাংসের সহিত পলান্নের ব্যবস্থা হইল। ছিষ্টিধর মুন্সেফী আদালতের সকল আমলাকে মহামায়ার প্রসাদ গ্রহণের জন্য নিমন্ত্রণ করিল; কেহই তাহার নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিল না। এমন কি, তাহার মুরুব্বী মুন্সেফ বাবুও প্রসন্নমনে সেই রাত্রিতে নাজীর বাবুর গৃহে পদার্পণ করিয়া ছিষ্টিধরকে ধন্য করিলেন। ছিষ্টিধরও বুঝিল, একটু চেষ্টা করিলেই সে গ্রামের ভদ্রসমাজে 'সচল' হইতে পারিবে।

অতঃপর ছিষ্টিধর তাহার মাতার পর্ণ-কুটীর ত্যাগ করিয়া একটু দূরে বিঘা দুই জমী মৌরুসী করিয়া লইল এবং সেখানে ছয়-চালা একখানি বাঁশের ঘর ও দু' চালা একখানি রান্নাঘর তুলিল। সে তাহার মাকে বলিল, "দেখ মা, আমি এখন চাকরী করছি, আমি আদালতের আমলা; আদালতের পেয়াদাগুলা পর্য্যন্ত আমাকে দুই হাতে সেলাম করে! তোমার আর দাসীগিরি করা ভাল দেখায় না; তুমি চাকরী ছেড়ে দাও; আমিই তোমাকে প্রতিপালন করতে পারবো।"

চন্দুরী ঘোষাণী বলিল, "তা কি হয় বাবা! এই হাকিমের দয়াতেই তোর চাকরী। আমি তাঁর চাকরী ছেড়ে দিলে তিনি আমাকে 'নেমখারাম' মনে করবেন। হাকিম ত আর ছ মাস পরেই বদ্‌লী হবেন; তিনি চ'লে গেলেই আমি চাকরী ছেড়ে দেব। তুই বিয়ে-থাওয়া ক'রে গেরস্ত হ। আমার 'মনিষ্যি জন্মের' সাধ মিটুক। তার পর একবার কাশী, গয়া, ছিক্ষ্যাত্তোরে যদি নিয়ে যেতে পারিস্‌, তা হ'লে বুঝবো, তোকে পেটে ধরা আমার সাথক হয়েছে!"

ছিষ্টিধর হাসিয়া বলিল, "সে আর শক্ত কি মা! সব হবে। তোমার আশীর্ব্বাদে যদি পেস্কারীটে পাই, তা হ'লে কি ক'রে পয়সা লুট্‌তে হয়, তা তুমি দেখ্‌তেই পাবে। ও রকম মজার চাকরী কি আর আছে? বাঁ হাত বাড়ালেই হাতে টাকার বিষ্টি! ওর কাছে হাকিমী চাকরী কোথায় লাগে?"

৪

তিন বৎসর পূর্ণ হওয়ায় মুন্সেফ ভবতারণ বাবু গোবিন্দপুর হইতে নোয়াখালী জিলায় বদলী হইলেন। ছিষ্টিধরের মা তাঁহার চাকরী ছাড়িয়া দিয়া বাড়ী আসিয়া বসিল। পাড়ার স্ত্রীলোকদের সঙ্গে ঝগড়া করিয়া তাহার দিনগুলি বেশ শান্তিতেই কাটিতে লাগিল। কলহে কেহই তাহার সমকক্ষ ছিল না।

ছিষ্টিধর নায়েব-নাজীরের পদে নিযুক্ত হইবার পর দুই বৎসরের মধ্যে তাহাকে জিলার অন্য কোন মহকুমায় বদলী হইতে হইল না। সে মধ্যে মধ্যে ছুটী উপলক্ষে সদরে গিয়া জজ সাহেবের সেরেস্তাদার ও নাজীরের পূজা করিয়া আসিত; এ জন্য তাঁহারা ছিষ্টিধরকে কিঞ্চিৎ 'স্নেহ' করিতেন। গোবিন্দপুর কোর্টের নাজীর একবার কয়েক মাসের ছুটী লইলে ছিষ্টিধর সেই পদে 'একটিনি' করিতে লাগিল। ছিষ্টিধর দুই বৎসরের মধ্যেই বেশ গুছাইয়া লইল এবং নাজীরের পদে 'একটিনি' করিতে করিতে বিবাহ করিয়া ফেলিল।

নাজীর হইলেও ছিষ্টিধরের বংশগৌরব কাহারও অজ্ঞাত ছিল না; এ অবস্থায় কিরূপ পাত্রীর সহিত তাহার বিবাহ হইল, তাহা জানিবার জন্য পাঠকগণের কৌতূহল হইতে পারে। ছিষ্টিধরের বিবাহে যাঁহারা বরযাত্রী হইয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে মুন্সেফী আদালতের অনেক উচ্চবংশীয় আমলা ত ছিলেনই, গোবিন্দপুরে যাঁহাদের আভিজাত্যের খ্যাতি ছিল এবং যাঁহারা জনসাধারণকে অবজ্ঞা করিতেন, তাঁহাদেরও কেহ কেহ 'নাজীর বাবু'র বিবাহে বরযাত্রী সাজিয়া জনসমাজকে চমৎকৃত করিয়াছিলেন! ছিষ্টিধরের নববিবাহিতা পত্নীর কৌলীন্যগর্ব্ব ছিষ্টিধরের কৌলীন্যগর্ব্বকে ম্লান করিয়াছিল।

এক দিন সকালে আমি কার্য্যোপলক্ষে আমার বন্ধুস্থানীয় উকীল শিবচন্দ্র বাবুর সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছি, এমন সময় দেখিলাম, গোবিন্দপুরের তিন ক্রোশ দূরবর্ত্তী কোন গ্রামনিবাসী একটি প্রৌঢ় ব্রাহ্মণ শিবচন্দ্রের উকীলখানায় প্রবেশ করিলেন। ভদ্রলোকটির নাম পূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম,—সেইবার তাঁহাকে দর্শন করিবার সুযোগ হইল। তিনি রাঢ়ী শ্রেণীর কুলীন ব্রাহ্মণ; তাঁহার মস্তকে সুদীর্ঘ শিখা, ললাটে রক্তচন্দনের ফোঁটা; কণ্ঠে রুদ্রাক্ষের মালা, মধ্যে মধ্যে সোনার দানা। কণ্ঠে শুভ্র উপবীত। তিনি তাঁহার গ্রামের জমীদার এবং ভগবদ্ভক্ত সাধু পুরুষ, ইহা তাঁহার ভাব-ভঙ্গীতেই সুপরিস্ফুট। তাঁহাকে দেখিয়া শিবচন্দ্র ভক্তিভরে প্রণাম করিলেন এবং একখানি চেয়ারে বসিতে দিলেন। তিনি শিবচন্দ্রের মক্কেল। সেই দিন মুন্সেফী আদালতে তাঁহার একটি মামলা ছিল, সেই মামলার তদ্বিরের জন্য তিনি শিবচন্দ্রের সহিত পরামর্শ করিতে আসিয়াছিলেন। অন্যান্য কথার পর তিনি শিবচন্দ্রকে বলিলেন, "আমার মামলার স্থূল বিবরণ বোধ হয় আমার জামাই বাবাজীর কাছেই শুনতে পেয়েছেন?"

তাঁহার জামাই বাবাজী! শিবচন্দ্র যেন আকাশ হইতে পড়িলেন; কারণ, সেই নিষ্ঠাবান্ পরম ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণের কোন 'জামাই বাবাজী'র সহিত শিবচন্দ্রের জানাশুনা আছে, ইহা তিনি স্মরণ করিতে পারিলেন না! শিবচন্দ্র কিঞ্চিৎ কুণ্ঠিতভাবে বলিলেন, "আপনার জামাই? আপনি কার কথা বল্‌ছেন, বুঝতে পারছি নে।"

মক্কেলটি হাসিয়া বলিলেন, "বিলক্ষণ! আমার জামাইকে আপনি চেনেন না? সে যে আপনাদেরই আদালতের এখন একটিনি নাজীর। ছিষ্টিধর দাস মোহান্তকে আপনি চেনেন না? সে যে আমারই জামাই।"

ছিষ্টিধর কয়েক মাস পূর্ব্বে হরিদাস বাবাজী নামক আগড়াধারী বৈষ্ণব-চূড়ামণি মোহান্তের কৃপায় ভেক লইয়া ও মচ্ছব দিয়া বৈষ্ণব হইয়াছিল—এ সংবাদ শিবচন্দ্রের অজ্ঞাত ছিল না। কিন্তু ভেক লইয়া 'বোষ্টম' হইলে কি করিয়া নিষ্ঠাবান্ কুলীন ব্রাহ্মণের কন্যার পাণিগ্রহণ করা সম্ভবপর হয়, শিবচন্দ্র তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। প্রকৃত রহস্য জানিবার জন্য তাঁহার অত্যন্ত কৌতূহল হইল।

শিবচন্দ্র সবিস্ময়ে বলিলেন, "ছিষ্টিধর আপনার জামাই? এ যে বড়ই অসম্ভব কথা! ব্যাপারখানা কি, খুলিয়া বলুন। ছিষ্টিধর মচ্ছব দিয়া 'বোষ্টম' হইয়াছে শুনিয়াছি, তাহার জন্মবৃত্তান্তও আমার অজ্ঞাত নহে। আপনি তাহাকে কন্যা সম্প্রদান করিলেন,—এ কি রহস্য?"

উকীলের প্রশ্নে তাঁহার সম্ভ্রান্ত মক্কেলটি যেন কিঞ্চিৎ বিব্রত হইয়া পড়িলেন, তাহার পর আমার মুখের দিকে চাহিয়া কুণ্ঠিতভাবে বলিলেন, "দেখুন উকীল বাবু, আপনি আমার ঘরের উকীল, মামলা-মোকর্দ্দমাই বলুন, আর বৈষয়িক শলা-পরামর্শই বলুন, সকল কাযেই আপনার কাছে

আসতে হয়, আপনার কাছে কোন কথাই গোপন করলে ত চলে না; আর এ কথাটা তেমন গোপনীয়ও নয়, পুরুষ-মানুষের পক্ষে তেমন লজ্জার কথাই বা কি? আমার প্রথমা স্ত্রী অল্পবয়সেই 'গতো' হন। তাঁর মৃত্যুর পর আমার মন কেমন উদাস হয়ে পড়লো, কিছুই ভাল লাগে না, এক এক সময় ইচ্ছা হ'তো, লোটা-কম্বল সম্বল ক'রে সন্ন্যেসী হয়ে, এক দিকে বেরিয়ে পড়ি; কিন্তু পাঁচ জনে সেটি ঘটতে দিল না। সকলেই বলে —আর একটা বিয়ে কর। পিতৃ-পুরুষের জলগণ্ডুষ ত বজায় রাখা চাই। কিন্তু সোনার পৃতিমে বিসর্জ্জন দিয়ে কি আবার বিয়ে করতে পৃবিত্তি হয়? না গেরস্ত—না উদাসী—এই ভাবে পাঁচ সাত বছর কেটে গেল। শেষে কন্দর্প ঠাকুর বল্লেন—'র, তোরে মজা দেখাচ্ছি, তোর 'দপ্প চুন্ন' করছি।' মশায়, এক দিন সন্ধ্যেবেলা রাধাগোবিন্দজীকে প্রণাম ক'রে বাড়ী ফিরছি —দেখলাম, একটি পরমা রূপবতী নধর যুবতী একটা বুড়ীর সঙ্গে সেই পথ দিয়ে যাচ্ছে। আঃ, কি তার রূপ! ঐ যে ডি, এল, রায়ের একটা গানে আছে না।—

'এম্‌নি ক'রে চেয়ে গেল
ক'রে মন চুরি—
আর বুকের মাঝে এইখানেতে
মেরে গেল ছুরি।'

আমার অবস্থাটাও ঠিক সেই রকম হ'লো। আমি সন্ধান নিয়ে জানতে পারলাম—সে রামকান্তপুরের সনাতন নাপিতের মেয়ে, দু'দিনের জন্যে তার মাসীর বাড়ী বেড়াতে এসেছে। আমি শেষে তার মাসীকেই মুরুব্বী পাক্‌ড়ালাম, টাকায় কি না হয়? সৌরভীকে অনেক টাকা-কড়ি, গয়নাটয়নার লোভ দেখিয়ে নিয়ে এলাম; ছুঁড়ী বিধবা কি না, তেমন কোন বেগ পেতে হ'ল না। নদীর ধারে আমার যে কামরা আছে, সেখানেই সে বাস করতে লাগলো। বছরখানেক পরে তাহার গর্ভে একটি মেয়ে হ'লো। তার পরে আমি আবার 'বিয়ে-থাওয়া' ক'রে সংসারী হয়েছি; ছেলে-মেয়েও হয়েছে। কিন্তু সৌরভীর মেয়ের ত একটা গতি করা চাই; তা তার উপযুক্ত পাত্র কোথায় পাই? শেষে ঐ ছিষ্টিধরের সঙ্গেই

এম্‌নি ক'রে চেয়ে গেল ক'রে মন চুরি

তার বিয়ে দিয়েছি। সৌরভীও ভেক নিয়ে বোষ্টম হয়েছে। মেয়েটি বেশ সৎপাত্রেই পড়েছে, কি বলেন?"

বিবাহের পর ছিষ্টিধরের সামাজিক প্রতিষ্ঠা আকাশগামী হাউয়ের গতির মত বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তাহার ভাগ্যগগনও ক্রমেই রজতচন্দ্রের আলোকে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

৩

মুন্সেফী আদালতের আমলাদের বদলী জিলার জজ সাহেবের মর্জ্জি অথবা খেয়ালের উপর নির্ভর করে। কোন আমলার বিরুদ্ধে উপর্য্যুপরি কয়েকবার বেনামী দরখাস্ত পড়িলেও সেই আমলাকে জিলার অন্য মহকুমায় বদলী করা হয়। 'মরা গরু ঘাসে পড়িলে' তাহার যে অবস্থা হয়, মুন্সেফী আদালতে উপরিলাভের সুপ্রশস্ত ক্ষেত্রে পড়িয়া ছিষ্টিধরের অবস্থাও সেইরূপ হইয়াছিল। অল্পদিন চাকরী করিয়া 'উপরি' আদায়ের যে সকল ফন্দী-ফিকির সে আবিষ্কার করিল, তাহা দেখিয়া অনেক বুড়ো আমলারও তাক্ লাগিয়া যাইত! বহুদর্শী ও উৎকোচগ্রহণে সিদ্ধহস্ত অনেক প্রবীণ আমলা পরস্পর বলাবলি করিতেন, "ছিষ্টিধর ভারী 'কেবর বয়'; এই বয়সেই ও যে রকম ফন্দী-ফিকিরে পয়সা উপার্জ্জন করে, দশ পনের বছর চাকরীর পর ছোঁড়াটা দশ পনের হাজার টাকা জমিয়ে ফেল্‌বে, তার আর সন্দেহ নেই।" বস্তুতঃ মুন্সেফী আদালতের নাজীরী করিয়া কেহ কেহ যে দশ বারো হাজার টাকা সঞ্চয় করিয়াছে, ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ বর্ত্তমান। আমরা জানি, কোন 'নাজীর সাহেব' পুনঃ পুনঃ সেরেস্তাদারের পদও প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন! সেরেস্তাদারী মুন্সেফী আদালতের আমলাদের সর্ব্বোচ্চ পদ হইলেও, সেরেস্তাদারের উপরি পাওনা অপেক্ষা নাজীরের উপরি পাওনা অনেক অধিক। অবশ্য, দৈত্যকুলেও প্রহ্লাদ আছে; অনেক নাজীর আদৌ 'উপরি' গ্রহণ করেন না।

যাহা হউক, বেনামী দরখাস্তের ফলেই হউক, আর জজ সাহেবের খেয়ালেই হউক, ছিষ্টিধরকে তিন বৎসর পরে গোবিন্দপুর মহকুমা হইতে বদলী হইয়া অন্য একটি মহকুমায় যাইতে হইল। সেখানে তাহার নায়েব-নাজীরী খসিয়া গিয়া, তাহাকে ডিগ্রীজারীর সেরেস্তার মুহরী হইতে হইল। দেওয়ানী আদালতের কাযকর্ম্ম সম্বন্ধে যাঁহাদের অভিজ্ঞতা আছে, তাঁহারা জানেন—নায়েব-নাজীর অপেক্ষা এই সেরেস্তার আমলা অনেক অধিক উৎকোচ লাভ করিয়া থাকে।

ইহার পর সাত আট বৎসরের মধ্যে ছিষ্টিধরের আর গোবিন্দপুরে বদলী হইয়া আসিবার সুযোগ হয় নাই। তবে সেকালে ষষ্ঠী-সুবচনী-পূজা উপলক্ষেও দেওয়ানী আদালত বন্ধ থাকিত; সুতরাং আদালত দুই এক দিনের জন্য বন্ধ হইলেও সে বাড়ী আসিত। সেই সময় তাহার ভুঁড়ির পরিধি ও পোষাকের আড়ম্বর যে পরিমাণে বর্দ্ধিত হইতেছিল, তাহা দেখিয়া সকলেই বুঝিতে পারিত, তাহার উপরি উপার্জ্জন ভালই চলিতেছে। গোবিন্দপুরের ডাকঘরে তাহার টাকা জমা দেওয়ার হিড়িকে দুইখানি 'পাশ বহি' ভরিয়া গিয়াছিল!

বছর আষ্টেক পরে গোবিন্দপুরে যিনি মুন্সেফ হইয়া আসিলেন, তাঁহার নাম বরদাচরণ ভট্টাচার্য্য। তিনি গোবিন্দপুরের মুন্সেফী আদালতের 'তক্ত্‌তাউস' অধিকার করিবার পূর্ব্বে সেই জিলারই অন্য এক মহকুমার 'এডিসনাল মুন্সেফ' ছিলেন। ছিষ্টিধর তাঁহারই 'এডিসনাল কোর্টে' পেস্কারের কার্য্যে নিযুক্ত ছিল। ছিষ্টিধর উৎকোচ আহারে যতই নৈপুণ্য প্রকাশ করুক, পেস্কারের কার্য্যে সে এরূপ দক্ষতার পরিচয় দিয়াছিল যে, তাহার কার্য্যদক্ষতায় বরদাচরণ বাবুর অর্দ্ধেক পরিশ্রমের লাঘব হইয়াছিল।

বরদাচরণ বাবু গোবিন্দপুরে মুন্সেফী পদে প্রতিষ্ঠিত হইবার তিন মাস পরেই তাঁহার পেস্কার রামনিধি সরকার অসুস্থতা বশতঃ 'মেডিকেল সার্টিফিকেট' দাখিল করিয়া ছয় মাসের ছুটী প্রার্থনা করিল। রামনিধির 'পেন্সন' লইবার সময় হইয়াছিল; সে মুন্সেফ বাবুকে জানাইয়া রাখিল, ছুটীর শেষে সে চির-বিদায় গ্রহণ করিবে। এ সংবাদে মুন্সেফ বাবু অসন্তুষ্ট হইলেন না; কারণ, সে কথায় কথায় হাকিমের সহিত তর্ক করিত, এবং তাহার হাত চলিত না বলিয়া সেরেস্তার অনেক কায মুলতুবী থাকিত। রামনিধির ছুটী মঞ্জুর হইলে বরদাচরণ বাবুর অনুরোধে জজ সাহেব ছিষ্টিধরকে তাঁহার পেস্কার পদে বাহাল করিয়া গোবিন্দপুরে পাঠাইলেন।

মুন্সেফী আদালতের উকীল ও মক্কেলদিগের নিকট পেস্কার বাবুর কিরূপ খাতির, তাহা অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের অজ্ঞাত নহে; ছিষ্টিধর মুন্সেফের পেস্কার হইয়া যখন এজলাসে গিয়া মুন্সেফের সম্মুখস্থ আসনে বসিত, তখন তাহার পরিচ্ছদের ঘটা ও দেহের স্থূলতা দেখিয়া তাহার অপরিচিত কোন লোক বুঝিতে পারিত না, কোন্‌টি হাকিম, কোন্‌টি তাঁহার পেস্কার! আদালতের পক্ককেশ বুড়া উকীলরা ছিষ্টিধরের জন্মবৃত্তান্ত জানিতেন; এ জন্য তাঁহারা

তাহাকে তেমন আমোল দিতেন না বটে, কিন্তু নব্য উকীলরা 'ছিষ্টিধর বাবু'র বিলক্ষণ তোয়াজ করিতেন, এবং তাঁহার প্রসন্নতালাভের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেন। নব্য উকীলদের মধ্যে কাহারও বাসায় প্রীতিভোজ বা কোন ক্রিয়াকর্ম্ম উপস্থিত হইলে ছিষ্টিধর সেখানে নিমন্ত্রিত হইয়া পরম সমাদরে আহূত হইত; আহারের সময় বসিবার স্থান লইয়াও বড় বাছ-বিচার চলিত না। ছিষ্টিধর এই ভাবে ধীরে ধীরে সমাজের বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া বসিল। তাহার মা চন্দুরী বোষ্টমী (এখন সে আর ঘোষাণী নহে) প্রতিদিন অপরাহ্ণে একখানি গরদের থান পরিয়া, হরিনামের ঝুলি হাতে লইয়া, তাহার ভগিনীদের বাড়ী ও গোয়ালাপাড়ার প্রত্যেক গোয়ালাবাড়ী ঘুরিয়া জানাইয়া আসিত—"তাগার ছিষ্টিধর হাকিম হইতে না পারিলেও 'ছোট হাকিম' হইয়াছে; এবং এমন দিন নাই—যে দিন সে পনের কুড়ি টাকা লইয়া বাড়ী ফিরিয়া না আইসে! ছিষ্টিধর শীঘ্রই মাটীর ঘর ভাঙ্গিয়া পাকা ইমারত আরম্ভ করিবে।" ইত্যাদি।

বস্তুতঃ, ছিষ্টিধরের গর্ভধারিণীর এই সকল কথা অত্যুক্তি নহে। মুন্সেফ বরদাচরণ বাবু সাক্ষীদের জবানবন্দী ও রায় লিখিবার ভার স্বহস্তে রাখিয়া অধিকাংশ কার্য্যভার ছিষ্টিধরের হস্তেই অর্পণ করিয়াছিলেন। ছিষ্টিধর তাহার এই ক্ষমতার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করিত। কোন উকীলের মক্কেলের এক মাস সময়ের প্রয়োজন। ছিষ্টিধর দশ দিনের অধিক সময় দিতে নারাজ। সে দক্ষিণ হস্তে সেরেস্তার কায করিত, বামহস্তখানি টেবলের নীচে প্রসারিত থাকিত; উকীল বাবু তাহার সেই হাতে দুইটি টাকা গুঁজিয়া দিতেন। ছিষ্টিধর পনের দিন সময় দিতে রাজী হইত; উকীল বাবুর এক মাস সময় চাই, তিনি নিরুপায় হইয়া অগত্যা তাহার হাতে আরও তিন টাকা গুঁজিয়া দিয়া এক মাস সময় লইতেন। এইরূপ নানা উপায়ে সে প্রত্যহ পনের কুড়ি টাকা উপরি পাইত। মুন্সেফ বাবু তাহার গুণের এতই পক্ষপাতী ছিলেন যে, এ সকল তিনি দেখিয়াও দেখিতেন না! গোবিন্দপুরের যে সকল আভিজাত্যগর্ব্বিত যুবক সাধারণ ভদ্রসন্তানদের পিপীলিকাবৎ ক্ষুদ্র ও নগণ্য মনে করিতেন, তাঁহাদের কাঁধে হাত দিয়া ছিষ্টিধর সায়ংকালে গোবিন্দপুরের বাজারে বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইত; তখন বাজারের সকল লোক সবিস্ময়ে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া মনে মনে বলিত, "চন্দুরী ঘোষাণীর বেটা ছিষ্টের কি বরাত! আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ!"

গোবিন্দপুরে থাকিয়াই ছিষ্টিধর এক লাখ ইট কিনিয়া এক প্রকাণ্ড অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিল। তাহার পর মহাসমারোহে তাহার কন্যার বিবাহ দিল। ব্যাণ্ড, রৌসনচৌকী, ব্যাগপাইপ, জগঝম্প, চড়বড়ে, রাইবেশে প্রভৃতির আবির্ভাবে গ্রামে যেন ভূমিকম্প আরম্ভ হইল! রোসনাই ও আতসবাজীতে রাত্রিকে দিন বলিয়া ভ্রম হইতে লাগিল।

সে দক্ষিণ হস্তে কায করিত ও বাম হস্তখানি টেবলের নীচে প্রসারিত থাকিত

গ্রামের বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি নিমন্ত্রিত হইয়া পেস্কার বাবুর গৃহে পদধূলি দান করিলেন। সকলেই তাহার গৃহে পাত পাড়িলেন; কেবল দুই এক জন কুসংস্কারান্ধ প্রাচীন ব্যক্তি বিবাহসভা হইতেই পাশ কাটিলেন।

ছিষ্টিধরের জামাইটি রূপবান্ যুবক; উপার্জ্জনক্ষম। শুনিলাম, সে কোন এক জন বড় কণ্ট্রাক্টরের সরকার। ছেলেটি জাতিতে 'বোষ্টম।' তাহার বংশপরিচয় লইয়া জানিতে পারিলাম—তাহার পিতা বৈদ্য, মাতা রজকিনী!

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

শ্রীরামকৃষ্ণমঠ ও মিশন-সম্মেলন

সভাপতি শ্রীমৎ শিবানন্দ স্বামীর অভিভাষণ

শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্তানগণ,

শ্রীরামকৃষ্ণমঠ ও মিশনের এই প্রথম মহাসম্মেলনে আমাদের ভারত ও ভারতেতর দেশের প্রতিনিধিগণকে আমাদের মূলকেন্দ্র বেলুড়মঠে সমবেত দেখিয়া আজ আমি প্রাণে অপার উল্লাস অনুভব করিতেছি। শ্রীরামকৃষ্ণমঠ ও মিশনের ইতিহাসে এইরূপ মহাসম্মেলন এই প্রথম। আমার দৃঢ় বিশ্বাস—এই মহাসম্মেলনে তোমরা যে সকল বিভিন্ন আশ্রমের প্রতিনিধি হইয়া আসিয়াছ, সেই আশ্রমসমূহ হইতে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন কার্য্যাবলী সম্বন্ধে পরস্পরকে পরিচিত করিতে ও পরস্পর ভাবের আদান-প্রদান করিয়া নিজ নিজ আশ্রমের কার্য্যাবলীর পরিপুষ্টিসাধনে সমর্থ হইবে আর ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের যে কয় জন সাক্ষাৎ শিষ্য এখনও স্থূলশরীরে বর্ত্তমান রহিয়াছেন, তাঁহাদের মুখ হইতে শ্রীরামকৃষ্ণদেব নিজ জীবনে যে আধ্যাত্মিক আদর্শ দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহাও শুনিতে পাইবে—ঐ আদর্শের সহিত বিশেষভাবে পরিচিত হইবার ফলে এই সঙ্ঘের মধ্যে যে উদ্দেশ্যের একতানতা, সাহচর্য্য ও সহযোগিতার বিশেষ প্রয়োজন—তাহা দিন দিন বর্দ্ধিত হইবার অনেক পরিমাণে সহায়তা করিবে।

আজ যদি স্বামীজী জীবিত থাকিতেন, তবে নিশ্চিতই তিনি তোমাদিগকে সোৎসাহে সাদর অভ্যর্থনা করিতেন এবং তোমাদের আলোচনার ফলে যাহাতে এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য যথার্থ সিদ্ধ হয়, তদুদ্দেশ্যে হৃদয়ের সহিত আশীর্ব্বচন বর্ষণ করিতেন। আজ এই প্রসঙ্গে আর এক মহাত্মার কথা স্মরণ হইতেছে, যাঁহাকে শ্রীরামকৃষ্ণদেব আধ্যাত্মিকতত্ত্ব উপলব্ধির অধিকারী হিসাবে স্বামী বিবেকানন্দের ঠিক নিম্নেই স্থান দিতেন। আমি স্বামী ব্রহ্মানন্দের কথা বলিতেছি। শ্রীরামকৃষ্ণদেব যেমন স্বামীজীকে সমগ্র জগতে তাঁহার ভাব প্রচারার্থ নির্ব্বাচিত করিয়াছিলেন, তদ্রূপ স্বামী ব্রহ্মানন্দকেও তাঁহার ধর্ম্মসঙ্ঘের বড় কম দায়িত্বপূর্ণ ভারগ্রহণের জন্য নির্ব্বাচিত করেন নাই। প্রকৃতপক্ষে যাহা বরাহনগর মঠে সামান্য বীজাকারে মাত্র বিদ্যমান ছিল, শ্রীরামকৃষ্ণমঠ ও মিশনের প্রথম সভাপতি রাজা-মহারাজের নেতৃত্বে তাহা এখন সুবিশাল ছায়াসমন্বিত প্রকাণ্ড মহীরুহে পরিণত হইয়াছে। পিতা যেমন সন্তানকে প্রতিপালন করিয়া তাহাকে অসহায় শিশু অবস্থা হইতে সংসারসংগ্রামে সমর্থ, শিক্ষিত, যুবকরূপে পরিণত করিয়া তুলেন, মঠের সংগঠন ও বিস্তারের জন্য তিনিও তাহা করিয়াছেন। আজ এখানে সমবেত হইয়া আমরা ইঁহাদেরই বা বলি কেন, স্বামী প্রেমানন্দ, স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ এবং আরও অনেকের অভাব বিশেষভাবে অনুভব করিতেছি। মঠ ও মিশন ইঁহাদের নিকটও কম ঋণী নহে—মঠ-মিশনের বর্ত্তমান প্রসার, সংগঠন ও উন্নতির জন্য ইঁহারাও কম করেন নাই; আজ এই শুভ মুহূর্ত্তে এই সম্মেলনের উপর ইঁহাদের সকলের, সর্ব্বোপরি আমাদের গুরুমহারাজের মঙ্গলাশিস্ বর্ষণ হউক, আমি কায়মনোবাক্যে সর্ব্বাগ্রে ইহাই প্রার্থনা করিতেছি।

আমি তোমাদের নিকট কিরূপে এই মহাসম্মেলনের মূল উদ্দেশ্য—অর্থাৎ কিসে সমুদয় আশ্রম ও প্রতিষ্ঠান সমূহের মধ্যে সহযোগিতা ও সদ্ভাব বর্দ্ধন হয়, তৎসম্বন্ধে খুঁটিনাটি বিচার করিয়া একটা কার্য্যপ্রণালী নির্দ্দেশ করিতে চাহি না। আমি আমার জীবনের অধিকাংশকাল মঠ-মিশনের সম্পর্কে থাকিয়া যাহা বুঝিয়াছি, আমার সেই সামান্য অভিজ্ঞতা হইতে সাধারণভাবে দুই চারি কথা বলিব এবং তোমাদের আলোচনা ও ভাবের আদান-প্রদানের ফলে যাহাতে এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য অন্ততঃ কতকটাও সাফল্যমণ্ডিত হয়, তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎও সহায়তা করিতে পারিলে নিজেকে ধন্য মনে করিব।

ত্রিশ বর্ষ পূর্ব্বে যখন ভারত ও ভারতেতর দেশের রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের নানাবিধ কার্য্যাবলী ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত ছিল, যখন লোক শুধু এইটুকুমাত্র জানিত যে, স্বামী বিবেকানন্দ এক জন হিন্দুধর্ম্মের প্রচারক আর তিনি চিকাগোর ধর্ম্মমহাসভায় সনাতন ধর্ম্মের জয়পতাকা উড়াইয়াছেন, তখন হইতেই স্বামীজী ক্রান্তদর্শী ঋষির দিব্যদৃষ্টিতে দেখিয়াছিলেন, সমগ্র জগতে যুগচক্র পরিবর্ত্তনের সময় আসিয়াছে এবং তাঁহার শ্রীগুরুর মহাশক্তিশালী উপদেশবাণী সমগ্র মানবজাতির উপর এক অপূর্ব্ব প্রভাব বিস্তার করিয়া এই যুগচক্র পরিবর্ত্তনে বিশেষভাবে সহায়তা করিবে। যে দিন তাঁহার অপূর্ব্ব ভাবাবেশে বিভোর হইয়া, তাঁহার দিবারাত্রি সমাধিতে বিভোর হইয়া থাকিবার প্রার্থনার উত্তরে বলিয়াছিলেন,'সমাধি ত ছোট কথা—জগৎ দুঃখে, শোকে, পাপে কাতর, মলিন—আর তুই সমাধির সুখে বিভোর থাক্‌বি? নে—দ্বাদশবর্ষ কঠোর সাধনা ক'রে যা উপলব্ধি করেছি, আজ তোকে তা সব মুক্তহস্তে দিয়ে ফকির হলাম!'—এইরূপে যে দিন শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার উপযুক্ত শিষ্যকে তাঁহার সমগ্র সাধনার ফল প্রদান করিয়া তাঁহাকে জগতের ইতিহাসের এক মাহেন্দ্রক্ষণে সমগ্র জগতে ধর্ম্মরত্ন বিলাইবার যন্ত্রস্বরূপে নিযুক্ত করিয়াছিলেন—কেবল শ্রীভগবানকে সর্ব্বভূতে দর্শন করিয়া 'বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়' জীবন উৎসর্গ করিতে, সমগ্র জগতের সুখের জন্য নিজ ব্যক্তিগত সুখশান্তি বিসর্জ্জন দিতে শিখাইয়াছিলেন—সেই চিরস্মরণীয় দিনের কথা তাঁহার হৃদয়ে সর্ব্বদা জাগরূক ছিল।

স্বামীজী তাঁহার শ্রীগুরুর মহাসমাধির কিছুকাল পরেই সমগ্র জগতের সর্ব্ববিধ কল্যাণের উদ্দেশ্যে—কালবশে নানা আবর্জ্জনাস্তূপের চাপে নির্জ্জীবপ্রায় সহস্রযুগসঞ্চিত উহার অপূর্ব্ব ভাবরাশিতে নবপ্রাণ সঞ্চারের উদ্দেশে—তাঁহার দেশবাসীর জন্য এক নূতন ভাবধারার উৎস ছুটাইলেন। তাঁহার নিজ জীবনে যে নানারূপ অভূতপূর্ব্ব অনুভূতি ও অভিজ্ঞতারাশি সঞ্চিত হইয়াছিল—ঐ উৎস সেই সঞ্চিত ভাবধারার স্বাভাবিক উচ্ছ্বাস। কোন্ কোন্ বিশেষ শক্তিপ্রভাবে তাঁহার দৃষ্টি এক অপূর্ব্ব নবীন দিব্যজগৎ দেখিতে সমর্থ হইয়াছিল, তাহার বিচারে প্রবৃত্ত হইলে আমরা এই কয়েকটি বিষয় দেখিতে পাই :—(১) তাঁহার শ্রীগুরুর তাঁহার সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী, (২) তাঁহার নিজের বহুবর্ষব্যাপী শিক্ষা ও কঠোর সাধনা এবং তল্লব্ধ উপলব্ধিসমূহ, (৩) তাঁহার পাশ্চাত্যদর্শন ও ইতিহাসে এবং সংস্কৃত শাস্ত্রগ্রন্থে তুল্য ব্যুৎপত্তি, (৪) শ্রীগুরুর অলৌকিক জীবনের অহরহঃ অনুধ্যান এবং উহার দিব্যালোকে ব্যক্তিগত জীবনের সমস্যাসমূহের সমাধান ও শাস্ত্রসমূহের সত্যতা প্রত্যক্ষীকরণ, এবং (৫) নিজ মাতৃভূমির সর্ব্বত্র ভ্রমণের ফলে প্রাচীন ভারতের সহিত বর্ত্তমান ভারতের তুলনা—বর্ত্তমান ভারতের নরনারী কিরূপে জীবনযাপন করে, তাহাদের আচারব্যবহার, তাহাদের অভাব, তাহাদের চিন্তাপ্রণালী তন্ন তন্ন করিয়া পর্য্যবেক্ষণ। রাজা-প্রজা,

সাধু-পণ্ডিত সকলের সঙ্গে সমভাবে মিশিয়া তিনি সমগ্র ভারতকে এক সমষ্টিরূপে উপলব্ধি করিলেন আর দেখিলেন, তাঁহার শ্রীগুরুর জীবন যেন এই মহাভারতের একটি পুঞ্জীকৃত, ঘনীভূত, ক্ষুদ্র প্রতীকমাত্র। স্বামীজীর জীবনে ও কার্য্যে তাই এই গুরু, শাস্ত্র ও মাতৃভূমি—এই তিন বিভিন্ন সুর মিলিত হইয়া যেন এক অপূর্ব্ব সম্মিলিত স্বরলহরীর সৃষ্টি করিয়াছে। তাই তিনি সমগ্র জগৎকে এই তিন রত্ন বিলাইতে উদ্যোগী হইলেন।

পূর্ব্বকথিত অভিজ্ঞতাসমূহ অর্জ্জনের ফলে তিনি বুঝিতে পারিলেন—জগতের মধ্যে কোন্ কোন্ বিরোধসাধক ভেদকর কার্য্য করিতেছে—যাহার বিনাশ-সাধন করিয়া সমন্বয়সাধনের জন্য এ যুগে অবতারের আবির্ভাবের প্রয়োজন হইয়াছিল। জগতের বিভিন্ন ধর্ম্মের ভিতর যে ভীষণ গোঁড়ামি প্রবেশ করিয়াছে, সেই দিকেই তাঁহার দৃষ্টি প্রথমে আকৃষ্ট হইল—শুধু তাহাই নহে, তিনি দেখিলেন, লোকের ধর্ম্ম জিনিষটা সম্বন্ধেই অতি সঙ্কীর্ণ ধারণা। প্রাচীন ঋষিগণ বিভিন্ন ধর্ম্মমতকে এক সত্য উপলব্ধির বিভিন্ন পথমাত্র বলিয়া মনে করিতেন—তিনি দেখিলেন, আজকাল এক ধর্ম্মাবলম্বী লোক অপর ধর্ম্মমতের সহিত যেন সদাসর্ব্বদা যুদ্ধ ও বিরোধ করিতে উদ্যত হইয়া আছে। কূপমণ্ডুকের মত এক সম্প্রদায়ের লোক নিজেদের সঙ্কীর্ণ গণ্ডী ছাড়া আর কোন দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছে না। দ্বিতীয়তঃ—ধর্ম্ম সম্বন্ধে লোকের ধারণাও অতি সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে—ধর্ম্ম যেন অন্য সর্ব্ববিধ প্রচেষ্টাকে উহার সীমা হইতে বহিষ্কৃত করিয়া নিজেই শিক্ষিত ও উদারহৃদয় ব্যক্তিগণের দৃষ্টিতে একটি অবজ্ঞার বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বর্ত্তমানে লোকের ধারণা হইয়া গিয়াছে যে, ধর্ম্মের সঙ্গে বাস্তব জগতের—আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের—কোন সম্পর্ক নাই; সুতরাং উহা কেবল অরণ্যবাসী সমাজত্যাগী সন্ন্যাসীরই অনুষ্ঠেয়। লোক ভাবিতেছে, বেদান্তের উচ্চতম উপদেশের সহিত কর্ম্মের সমন্বয় একেবারে হইতেই পারে না।

মহা সম্মেলনের সভাপতি শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ

কর্ম্ম ও উপাসনা—ত্যাগ ও সেবাধর্ম্মের ভিতর একটা আকাশ-পাতাল ব্যবধানের সৃষ্টি হইয়াছে, আর এই ভ্রান্ত ধারণার ফলেই প্রধানতঃ আমাদের জাতীয় অবনতি ঘটিয়াছে। এইরূপ সঙ্কটমুহূর্ত্তে জগতে এমন এক ব্যক্তির আবির্ভাবের বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছিল, যিনি জগতের সমক্ষে এমন ধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিবেন, যাহা বিজ্ঞানসঙ্গত হইবে এবং এমন বিজ্ঞানের প্রচার করিবেন, যাহা আধ্যাত্মিকভাবে অনুপ্রাণিত হইবে।

স্বামী বিবেকানন্দ স্পষ্টই দেখিলেন, তাঁহার শ্রীগুরুদেবই এইরূপ আদর্শ মানব। তাঁহার জীবনে সর্ব্বপ্রকার বিরুদ্ধ ভাবের অপূর্ব্ব সমন্বয় হইয়াছে। আপাত-বিরুদ্ধ বিভিন্ন ধর্ম্মমতসমূহের অদ্ভুত মিলন তিনি তাঁহাতেই দেখিলেন। প্রথমতঃ, শ্রীরামকৃষ্ণদেব সাক্ষাৎ নিজ জীবনে উপলব্ধি করিয়া প্রমাণিত করিলেন যে, যে আদর্শ সর্ব্বপ্রকার দার্শনিক মতবাদের পারে অবস্থিত, তাহাতে উপনীত হইতে দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, অদ্বৈত—এই ত্রিবিধ প্রধান ভারতীয় দার্শনিক মতবাদেরই ব্যবহারিক উপযোগিতা আছে। তার পর প্রচলিত বিভিন্ন ধর্ম্মমতের অর্থাৎ সনাতন ধর্ম্মের শাক্ত, বৈষ্ণবাদি কয়েকটি শাখা এবং মুসলমান ও খৃষ্টান ধর্ম্ম সাধন করিয়া একই লক্ষ্যে উপনীত হইয়া প্রমাণ করিলেন যে, বিভিন্ন প্রকৃতির উপযোগী এই সকল বিভিন্ন ধর্ম্মমতই সত্য ও প্রত্যেকটিরই সার্থকতা আছে। প্রাচীন যুগে বৈদিক ঋষিগণ যে 'একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি' (সত্য একমাত্র—পণ্ডিতগণ সেই সত্যকেই নানাভাবে বলিয়া থাকেন)—এই মহামন্ত্র দিব্য দৃষ্টিতে দর্শন করিয়াছিলেন, লোকে তাহা এত দিন ভুলিয়া গিয়াছিল। আজ শ্রীরামকৃষ্ণজীবনে সেই সনাতন সত্যের পুনঃ সাক্ষাৎ পাইয়া তাহারা ধন্য হইল। জ্ঞান, ভক্তি, যোগ, কর্ম্ম—এই আপাত অত্যন্ত বিরোধী ভাবগুলির শ্রীরামকৃষ্ণজীবনে অপূর্ব্ব সমন্বয় দেখিয়া লোক কৃতার্থ হইল। নির্ব্বিকল্প সমাধি যাঁহার মুষ্টির ভিতর—যিনি মনে করিলেই যখন তখন

সমাধিস্থ হইয়া পড়িতে পারিতেন, তিনি আবার শ্রীভগবানের নাম-মাত্র উচ্চারণে কাঁদিয়া বিহ্বল হইতেন। যিনি যোগমার্গের জটিল পথাবলম্বনে সত্যের সাক্ষাৎকার পাইয়াছিলেন, তিনি আবার তাঁহার অপূর্ব্ব সাধনার ফল উপযুক্ত অধিকারীকে বিতরণ করিতে যাইয়া কঠোর কর্ম্মব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং ঐ ব্রতের উদ্‌যাপনে নিজ জীবনকে তিলে তিলে আহুতি দিয়াছিলেন। এই সর্ব্বতোমুখী প্রতিভাসম্পন্ন নরদেবের সাক্ষাৎ পাইয়া তাঁহার উপযুক্ত শিষ্যের হৃদয় তাঁহার প্রতি প্রবলভাবে আকৃষ্ট হইল, তিনি স্পষ্টই দেখিলেন, স্পষ্টই বুঝিলেন, সমগ্র জগতে তাঁহার শ্রীগুরুর প্রতিভার দৃঢ় ছাপ পড়িলেই ভবিষ্যতে উহা নবীন জীবন লাভ করিবে—উহা পুনরায় জাগিয়া উঠিবে।

প্রাচীন ভারতের বৌদ্ধ-সঙ্ঘের কথা স্মরণ করিয়া এবং বর্ত্তমান উন্নতিশীল পাশ্চাত্য জগতে বহু ভ্রমণ করিয়া তথাকার আশ্চর্য্য সঙ্ঘবদ্ধ কার্য্য-প্রণালী অবলোকনের ফলে হয় ত শ্রীগুরুর উপদেশাবলী কর্ম্ম-জীবনে প্রয়োগ করিবার উপযুক্ত ক্ষেত্রস্বরূপ মঠ ও মিশনের কল্পনা স্বামীজীর মনে জাগিয়া থাকিবে—তিনি হয় ত ভাবিয়া থাকিবেন, যদি কতকগুলি সুনির্দ্দিষ্ট সাধনপ্রণালী ও নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করা যায়, তবে এমন এক কর্ম্মক্ষেত্র গড়িয়া উঠিবে, যাহা তাঁহার শ্রীগুরুদেবের জীবনের ছায়া-স্বরূপ একটি বিরাট প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইবে। স্বামী বিবেকানন্দ এক দিকে যেমন উচ্চদরের এক জন ভাবুক ছিলেন, তদ্রূপ ঐ ভাবরাশিকে কর্ম্মজীবনে কিরূপে প্রয়োগ করিতে হয়, তাহারও কৌশল তিনি জানিতেন — সুতরাং পাশ্চাত্য দেশ হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের অব্যবহিত পরেই এমন এক মঠরূপ আদর্শ নির্ম্মাণের কল্পনা করিলেন, যাহাতে ভবিষ্যতে নরনারীগণ শ্রীরাম-কৃষ্ণদেবের জীবন ও চিন্তার অবিকল প্রতিবিম্ব দর্শন করি-বেন। এই কল্পনায় তাঁহার মনের মৌলিকতা ও সাহসিকতারই পরিচয় দেয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের সহকারী সভাপতি—শ্রীমৎ স্বামী অখণ্ডানন্দ

১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে বেলুড় মঠ স্থাপনার অব্যবহিত পূর্ব্বেই তিনি 'মঠের নিয়মাবলী' নাম দিয়া তাঁহার যে ভাবরাশি লিপিবদ্ধ করেন, তাহার প্রথমেই আমরা এই কথাগুলি দেখিতে পাই,—

"শ্রীভগবান্ রামকৃষ্ণ-প্রদর্শিত প্রণালী অবলম্বন করিয়া নিজের মুক্তি-সাধন করা ও জগতের সর্ব্বপ্রকার কল্যাণসাধনে শিক্ষিত হওয়ার জন্য এই মঠ প্রতিষ্ঠিত হইল। স্ত্রীলোকদিগের জন্যও ঐ প্রকার আর একটি মঠ স্থাপিত হইবে।"

ইহাই তাঁহার মঠ-স্থাপনার আদর্শের প্রথম ও মূল কথা। কথাগুলি অতি সামান্য বোধ হইতে পারে, কিন্তু গভীর প্রণিধান করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়, কথাগুলি অতি সারগর্ভ। মঠ ও মিশনের অঙ্গগণ যেখানে যেরূপে যতরূপ কার্য্য করিতেছেন, সেই বিরাট বিশালায়তন সমগ্র শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের—সমগ্র শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রতিষ্ঠানের—ইহাই মূল ভিত্তি—উহার একমাত্র অবলম্বন স্তম্ভ।

কথাগুলি আর একটু তলাইয়া দেখা যাউক্। প্রথমেই দেখিতেছি, স্বামীজী এই একটিমাত্র বাক্যে নিজ মুক্তিসাধন ও জগতের কল্যাণ-সাধন—এই আপাতবিরুদ্ধ দুইটি ভাবকে একত্র গ্রথিত করিয়াছেন। লোক সাধারণতঃ মনে করে—ত্যাগ ও সেবা—কর্ম্ম ও উপাসনা কখন একত্র থাকিতে পারে না—একটি অপরটির বিরোধী—একটির প্রাবল্য অপরটির বিকাশের বিঘ্ন হইবে, কিন্তু স্বামীজী এই মঠ-প্রতিষ্ঠা দ্বারা এই দুই আপাতবিরোধী ভাবিদ্বয়ের সমন্বয়সাধনের চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার মতে ব্যক্তিগত মুক্তিসাধনের চেষ্টা কখনও সমগ্র মানবজাতির সেবার বিরোধী হইতে পারে না—আবার সেবা জিনিষটাকে সাধারণ ভাবে না দেখিয়া যদি সেবার চরমাদর্শের কথা ভাবা যায়, তবে যে ব্যক্তি আমাদের আত্মারূপ সত্য-সূর্য্যের উপর পতিত ক্ষুদ্র যবনিকা-বরণ ভেদ করিতে বদ্ধপরিকর, তাঁহার ভাবের সঙ্গে আদর্শ সেবকের ভাবের কোন পার্থক্য করা যায় না। যদি শ্রেষ্ঠতম জ্ঞানের অর্থ হয়—জীবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে সর্ব্বপ্রকার ভেদের বিলোপসাধন—আর যদি নিজ আত্মার সহিত সকল সর্ব্বভূতে অবস্থিত ব্রহ্মের ঐক্যসাধনই উহার চরম লক্ষ্য হয়, তবে ইহা স্বভাবতঃই বুঝিতে পারা যায় যে, সাধক যখন উচ্চতম আধ্যাত্মিক অনুভূতি লাভ করেন, তখন তাঁহার সর্ব্বভূতের সেবায় কায়মনোবাক্যে সর্ব্বান্তঃকরণে আত্ম-সমর্পণ ছাড়া আর অন্য গতি হইতে পারে না। অজ্ঞানপ্রসূত ক্ষুদ্রভাব অতিক্রম করিয়া তিনি সমগ্র জগৎকে প্রেমের সহিত আলিঙ্গন করেন। ইহাই তাঁহার চরম দিব্য আত্মত্যাগ। স্বামীজী চাহিতেন, তাঁহার মঠের অঙ্গগণ তাঁহার কার্য্য-সিদ্ধির জন্য শ্রীভগবানের হস্তে স্বেচ্ছায় যন্ত্রস্বরূপ হউক—যখন তাঁহার কার্য্য শেষ হইবে, তখন তাহারা দিব্যজ্ঞানজনিত পরমানন্দলাভের ভাগী হইবেই হইবে। শ্রীরামকৃষ্ণদেবও বারংবার আমাদিগকে বলিয়া গিয়াছেন, "নিজে মিষ্টি আমটি খেয়ে মুখ মুছে ফেলা অপেক্ষা অপর পাঁচ জনকে বিলি ক'রে খাওয়া ঢের ভাল।"

আবার সাধারণভাবে দেখিলেও আমরা দেখিতে পাই—স্বামীজী এমন এক সঙ্ঘের—এমন এক প্রতিষ্ঠানের আদর্শ চিত্রিত করিতেছেন;

যাহার অঙ্গ পূর্ণাবয়ব সমগ্র একটা ভাবসিদ্ধির যতদূর সম্ভব সুযোগ পায়—তাঁহার এই সঙ্ঘের আদর্শের মধ্যে এতটুকু অসম্পূর্ণতা নাই, উহা সর্ব্বপ্রকার ভাবসম্পদে সমৃদ্ধ। তাঁহার চিত্রিত এই সঙ্ঘের আদর্শের কথা ভাবিলে যথার্থই মনে হয়, আমাদের স্বামীজী এক জন কত বড় আচার্য্য ছিলেন। তাঁহার মতে তাঁহার মঠের প্রত্যেক সাধককে জ্ঞান, ভক্তি, যোগ ও কর্ম্ম—এই প্রসিদ্ধ সাধনচতুষ্টয়কেই নিজ নিজ জীবনে সমষ্টিভাবে সার্থক করিতে হইবে—অবশ্য রুচি ও অধিকারবিশেষে যাঁহার যে দিকে স্বাভাবিক ঝোঁক, তিনি সেই দিকে একটু বেশী জোর দিবেন—এই মাত্র। ইহাদের মধ্যে কোনটিকেই বাদ দিলে চলিবে না—তাহা হইলে সাধনা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। তৎপ্রণীত মঠের নিয়মাবলী পাঠে আর একটু অগ্রসর হইয়াই দেখিব, তিনি মঠের অঙ্গগণকে এক দিকে যেমন ধ্যান, ধারণা, উপাসনা করিতে উপদেশ দিতেছেন, অপর দিকে তদ্রূপ তাঁহাদের জন্য বিদ্যাচর্চ্চা ও কর্ম্মেরও ব্যবস্থা করিতেছেন। তৎকথিত সাধনপ্রণালীসমূহের মধ্যে এই দুইটি ভাবের অপূর্ব্ব সমন্বয়সাধনের চেষ্টা সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়। স্বামীজীর মতে মঠের কার্য্যাবলী যে সঙ্কীর্ণ সীমায় আবদ্ধ না থাকিয়া উদার ও ব্যাপকভাবে বহুবিধ কল্যাণকর পথে প্রধাবিত হওয়া উচিত, তাহা উক্ত নিয়মাবলীতে উল্লিখিত স্বামীজীর নিম্নলিখিত কথাগুলিতে স্পষ্টভাবে নির্দ্দেশ করিতেছে:—

"এই প্রকার মঠ সমস্ত পৃথিবীতে স্থাপন করিতে হইবে। কোন দেশে আধ্যাত্মিক ভাবমাত্রেরই প্রয়োজন—কোন দেশে ইহজীবনের কিঞ্চিৎ সুখ-স্বচ্ছন্দতার অতীব প্রয়োজন। এই প্রকারে যে জাতিতে বা যে ব্যক্তিতে অভাব অত্যন্ত প্রবল, তাহা পূর্ণ করিয়া সেই পথ দিয়া তাহাকে ধর্ম্মরাজ্যে লইয়া যাইতে হইবে। ভারতবর্ষে প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য—নীচ শ্রেণীর লোকদিগের মধ্যে বিদ্যা ও ধর্ম্মের বিতরণ। অন্নের ব্যবস্থা না করিতে পারিলে ক্ষুধার্ত ব্যক্তির ধর্ম্ম হওয়া অসম্ভব। অতএব তাহাদের নিমিত্ত অন্নাগমের নূতন উপায় প্রদর্শন করা সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান ও প্রথম কর্ত্তব্য।"

বোষ্টন বেদান্ত-সমিতির অধ্যক্ষ—শ্রীমৎ স্বামী পরমানন্দ

স্বামীজীর এই সুস্পষ্ট বাক্য হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায়, তিনি মঠের অঙ্গগণের জন্য যে সকল আধ্যাত্মিক সাধনার নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, জীবরূপী নারায়ণের সেবা তন্মধ্যে অন্যতম প্রধান সাধন। শ্রীরামকৃষ্ণভক্তগণ স্বামীজীকে তাঁহার জীবন ও উপদেশের ব্যাখ্যাতারূপে স্বীকার করিলে কেবল ধ্যান-ধারণা-সহায়ে ইহজীবনেই ভগবৎসাক্ষাৎকারপ্রয়াসী সাধকগণ যে কার্য্যগুলিকে তাঁহাদের জীবনযাত্রা-প্রণালীর সম্পূর্ণ বহির্ভূত বলিয়া মনে করেন, এত দিন যে কার্য্যাবলী সাংসারিক কার্য্যমাত্র বলিয়াই বিবেচিত হইত, সেই ভাবের কার্য্য তাঁহাদিগকেও অবশ্যই অবলম্বন করিতে হইবে। শ্রীগীতা বলেন, শুধু কর্ম্মের মানুষকে উন্নত বা অবনত করিবার কোন শক্তি নাই—কি ভাবে মানুষ কার্য্য করিতেছে, তাহার দিকে দৃষ্টি করিতে হইবে এবং ঐ ভাবানুসারেই কর্ম্ম তোমাকে হয় বন্ধন ও অবনতির দিকে অথবা উন্নতি ও মুক্তির দিকে লইয়া যাইবে। আরও দেখ—এ কথাও যুক্তিসঙ্গত যে, যদি ভক্তি ও প্রেমের সহায়তায় সাধক শুধু একটি প্রতিমার মধ্যে ভগবৎসত্তার উপলব্ধি করিতে পারে, তবে সেই পরিমাণ সরলতা, ভক্তি ও প্রেম-সহায়ে যদি মানুষের উপাসনা করা যায়—চেতন মানুষ অবশ্য জড়বস্তু হইতে শ্রেষ্ঠ—তবে নিশ্চিতই সে আরও সহজে তথায় ভগবৎ উপলব্ধি করিতে পারে। মানুষই যে ভগবানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রতীক এবং নর-নারায়ণের উপাসনাই যে জগতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপাসনা—তাহাতে আর কি সন্দেহ থাকিতে পারে?

এই ত স্বামীজীর সাধনার আদর্শের মূল সূত্র। এই মূল সূত্র অবলম্বনে আরও কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া স্বামীজী মঠের কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে একটি কথা বলিতেছেন—তাঁহার মতে নিম্নোক্ত কার্য্যপ্রণালী ধীরে ধীরে অবলম্বন করিতে পারিলে তাঁহার ভাব অনেকটা কার্য্যে পরিণত হইতে পারে। স্বামীজী বলিতেছেন,—

"এখন উদ্দেশ্য এই যে, এই মঠটিকে ধীরে ধীরে একটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বিশ্ব-বিদ্যালয়ে পরিণত করিতে হইবে। তাহার মধ্যে দার্শনিক চর্চ্চা ও ধর্ম্ম-চর্চ্চার সঙ্গে সঙ্গে একটি পূর্ণ টেক্নিকাল ইনষ্টিটিউট করিতে হইবে। এইটি প্রথম কর্ত্তব্য। পরে অন্যান্য অবয়ব ক্রমে ক্রমে সংযুক্ত হইবে।"

কি প্রকাণ্ড বিরাট্ কল্পনা!

প্রাচীন গতানুগতিক ধর্ম্মের আদর্শ এই যে, উহাতে কর্ম্মের একেবারে স্থান নাই—কই,এখানে ত ঐ আদর্শের সহিত আপোষ করিবার চেষ্টার বিন্দু-মাত্র চিহ্নও দেখা যাইতেছে না। স্বামীজী তাঁহার স্বদেশবাসীকে যে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন, এখানেই তাহার বিশেষত্ব। প্রাচীন কালে এইরূপ প্রতিষ্ঠানগুলির যে অনিবার্য্য শোচনীয় পরিণাম দাঁড়াইয়াছে, মঠেরও যাহাতে সেই অধোগতি না হয়, তজ্জন্য স্বামীজী ইহার অধ্যক্ষগণকে এই বলিয়া সাবধান করিতেছেন:—

"অতএব এই মঠে যাঁহারা এক্ষণে অধ্যক্ষ আছেন বা পরে অধ্যক্ষ হইবেন, তাঁহারা সর্ব্বদা যেন এইটি মনে রাখেন যে, এই মঠ কোন মতেই বাবাজীদিগের ঠাকুরবাটীতে পরিণত না হয়।"

"ঠাকুরবাটী দ্বারা দুই চারি জনের কিঞ্চিৎ উপকার হয়, দুই দশ জনের কৌতূহল চরিতার্থ হয়। কিন্তু এই মঠের দ্বারা সমগ্র পৃথিবীর কল্যাণ সাধিত হইবে।"

স্বামী বিবেকানন্দ এই পূর্ব্বোক্ত ভাবকে ভিত্তি করিয়াই এই মঠ স্থাপন করিয়াছিলেন।

যে মঠ এইরূপ উচ্চাদর্শরূপ ভিত্তির উপর স্থাপিত, যাহাতে ইহার ইষ্টদেবতা ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন প্রতিফলিত, তাহা যে উদারতার মূর্ত্ত বিগ্রহস্বরূপ মাত্র, তাহাতে কি আর কিছু সন্দেহ থাকিতে পারে? সমগ্র মানবজাতি জ্ঞান, ভক্তি, যোগ ও কর্ম্মের অপূর্ব্ব সমন্বয়স্বরূপ শ্রীরামকৃষ্ণজীবনের ন্যায় একটি জীবন আর দেখে নাই। সুতরাং যাঁহারা শ্রীরামকৃষ্ণ-চরিত্রের পূর্ণ আদর্শের ছাঁচে নিজেদের চরিত্রগঠনে

সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহারাই কেবল মঠের ভাবে ভাবিত বলিয়া বুঝিতে হইবে। সেই কারণেই স্বামীজী বলিতেছেন :—

"জ্ঞান, ভক্তি, যোগ ও কর্ম্মের সমবায়ে চরিত্র গঠিত করা এই মঠের সাধন বলিয়া পরিগৃহীত হইবে।"

তাই তিনি দৃঢ়তার সহিত বলিতেছেন :—

"অতএব সকলেরই মনে রাখা উচিত যে, এই সকল অঙ্গের যিনি একটিতেও ন্যূনতা প্রদর্শন করেন, তাঁহার চরিত্র রামকৃষ্ণরূপ মূষায় প্রকৃষ্টরূপে দ্রুত হয় নাই।"

"আরও ইহা মনে রাখা উচিত যে, নিজের মুক্তিসাধনের জন্য যিনি চেষ্টা করেন, তদপেক্ষা যিনি অপরের কল্যাণের জন্য চেষ্টা করেন, তিনি মহত্তর কার্য্য করেন।"

ইহাই এই মঠের বিশেষত্ব।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাবের পূর্ব্বে লোক মনে করিত, একপ্রকার সাধনপ্রণালীই মঠবিশেষে অনুষ্ঠিত হইতে পারে—লোক শুধু যে ইহা স্বাভাবিক ভাবিত, তাহা নহে—ইহা অনিবার্য্য বলিয়া বিবেচিত হইত। কিন্তু দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও অদ্বৈত—এই ত্রিবিধ প্রধান ভারতীয় দার্শনিক তত্ত্বকেই এক অনন্ত ব্রহ্মসত্তারই ত্রিবিধ বিভিন্ন অনুভূতিরূপে উপলব্ধি করিয়া ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেব অতীন্দ্রিয় আধ্যাত্মিক অনুভূতির বজ্রদৃঢ় ভিত্তির উপর এমন এক মঠপ্রতিষ্ঠা সম্ভবপর করিয়াছেন, যথা হইতে চরম নিরপেক্ষ সত্যের উপলব্ধির উপায়স্বরূপ এই ত্রিবিধ দার্শনিক মতেরই সমান সার্থকতা সাহস সহকারে উচ্চকণ্ঠে ঘোষিত হইতে পারে। এক দিকে বেশী ঝোঁক দিবার ফলে মঠের ভিতর কতকগুলি দোষ প্রবেশ করা অনিবার্য্য—তাহা যাহাতে না ঘটে, তদুদ্দেশ্যে স্বামীজী মস্তিষ্ক, হৃদয় ও হস্ত—ইহাদের পরিচালনার উপর সমান জোর দিতেন। তিনি জানিতেন, যদি কর্ম্মের ভিতর ধর্ম্মভাবের প্রেরণা না থাকে, যদি ঐ সঙ্গে ধ্যানধারণা, সদসদ্বিচার ও অন্যান্য আধ্যাত্মিক সাধন অনুষ্ঠিত না হয়, তবে ঐ কর্ম্ম প্রাণহীন সমাজসেবা কার্য্যে মাত্র পর্য্যবসিত হয়। উচ্চ ভাব ও আদর্শের সহিত অসংবদ্ধ এইরূপ প্রাণহীন জড়যন্ত্রের ন্যায় কার্য্যের দ্বারা কেবল বন্ধনের পর বন্ধনই আনয়ন করে। যখন আমাদের হৃদয় নির্ম্মল হয় এবং হৃদয় তাহার পূর্ণতম বিকাশের অবকাশ পায়, তখনই হাত প্রকৃত লক্ষ্যের উদ্দেশ্যে কার্য্য করিতে পারে। সেইরূপ কেবল বিচার ও শাস্ত্রচর্চ্চা শুষ্ক-অসার বুদ্ধির ব্যায়ামে মাত্র পরিণত হয়, যদি না তজ্জনিত সিদ্ধান্তসমূহ কর্ম্মজীবনে প্রকাশ পায়। সেইরূপ যদি ভক্তির সহিত বিচার ও কর্ম্মের যোগ না থাকে, তবে উহা নিরর্থক ও অনেক সময় মহা অনিষ্টকর ভাবুকতামাত্রে পর্য্যবসিত হয়। সত্যকে জানা, অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে উঁহার অস্তিত্ব অনুভব করা এবং জীবনের সর্ব্বাবস্থায়, সর্ব্বকার্য্যে উঁহার প্রকাশ উপলব্ধি করাই সর্ব্বোচ্চ ব্রহ্মোপলব্ধি—প্রকৃতপক্ষে উহা সেই একই অনুভূতির তিনটি প্রকারভেদ মাত্র। তাঁহার মতে তিনিই আদর্শ সন্ন্যাসী, যিনি যখন ইচ্ছা, গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হইতে সমর্থ হইবেন, আবার পরমুহূর্ত্তে শাস্ত্রের জটিল অংশের ব্যাখ্যা করিতে প্রস্তুত হইবেন। সেই সন্ন্যাসীই আবার সমান উৎসাহে বাগানের কায করিবেন এবং তদুৎপন্ন দ্রব্য মাথায় লইয়া বাজারে গিয়া বিক্রয় করিয়া আসিবেন।

সম্মেলনের বক্তা—ডাঃ দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র

মঠের কার্য্য কি ভাবের হওয়া উচিত, তৎসম্বন্ধে স্বামীজীর নিম্নলিখিত স্পষ্ট উপদেশ রহিয়াছে,—

"বিদ্যার অভাবে ধর্ম্মসম্প্রদায় হীনদশা প্রাপ্ত হয়। অতএব সর্ব্বদা বিদ্যার চর্চ্চা থাকিবে।

"ত্যাগ এবং তপস্যার অভাবে বিলাসিতা সম্প্রদায়কে গ্রাস করে; অতএব ত্যাগ এবং তপস্যার ভাব সর্ব্বদা উজ্জ্বল রাখিতে হইবে।

"প্রচারের দ্বারা সম্প্রদায়ের জীবনীশক্তি বলবতী থাকে, অতএব প্রচারকার্য্য হইতে কখনও বিরত থাকিবে না।"

আবার—

"সঙ্কীর্ণ সমাজে ধর্ম্মের গভীরতা ও প্রবলতা থাকে, ক্ষীণবপু জলধারা সমধিক বেগশালিনী। উদার সমাজে ভাবের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে গভীরতা ও বেগের নাশ দেখিতে পাওয়া যায়।

"কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, সমস্ত ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত উল্লঙ্ঘন করিয়া এই রামকৃষ্ণশরীরে সমুদ্র হইতেও গভীর ও আকাশ হইতেও বিস্তৃত ভাবরাশির একত্র সমাবেশ হইয়াছে।

"ইহার দ্বারা প্রমাণ হইতেছে যে, অতি বিশালতা, অতি উদারতা ও মহাপ্রবলতা একাধারে সন্নিবিষ্ট হইতে পারে এবং ঐ প্রকারে সমাজও গঠিত হইতে পারে। কারণ, ব্যষ্টির সমষ্টির নামই সমাজ।"

অবশ্য শ্রীরামকৃষ্ণের ন্যায় বিশাল ও উদারভাবাপন্ন পুরুষ জগতে দুর্লভ। কিন্তু যদি মঠের বিভিন্ন অঙ্গগণ শ্রীরামকৃষ্ণকে তাঁহাদের আদর্শস্বরূপ রাখেন এবং তাঁহাদের বিভিন্ন প্রকৃতি অনুযায়ী বিভিন্ন সাধনপথ অবলম্বন করিলেও তাঁহাদিগের প্রত্যেককে শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের অত্যাবশ্য অঙ্গরূপে বিবেচনা করা হয় এবং সকলকেই তাঁহাদের ব্যক্তিগত উন্নতি ও ভাবপ্রকাশের সমান সুবিধা করিয়া দেওয়া হয়, তবে এই অভাব অনেকটা পূর্ণ হইতে পারে এবং মঠেরও অখণ্ড ও সঙ্ঘবদ্ধ ভাব অনেকটা রক্ষা করা যাইতে পারে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব এক্ষণে স্থূলদেহে বর্ত্তমান না থাকিতে পারেন, কিন্তু যত দিন এই উদারভাব অক্ষুণ্ণ থাকিবে, তত দিন মঠ নিশ্চয়ই তাঁহার সান্নিধ্য অনুভব করিবে। স্বামীজীও বলিয়াছেন,—

"এই সঙ্ঘই তাঁহার অঙ্গস্বরূপ এবং এই সঙ্ঘেই তিনি সদা বিরাজিত। একীভূত সংঘ যে আদেশ করেন, তাহাই প্রভুর আদেশ। সঙ্ঘকে যিনি পূজা করেন, তিনি প্রভুকে পূজা করেন এবং সঙ্ঘকে যিনি অমান্য করেন, তিনি প্রভুকে অমান্য করেন।"

এইরূপ উদারভাবের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত সঙ্ঘের ভিতর বিশ্লিষ্ট হইবার—বিরোধ বাধিবার কতকগুলি উপাদান থাকিতে পারে—ইহা আপাত দৃষ্টিতেই বোধ হইবে। আর মনের অমিল পূর্ব্বে হইলেই বাহিরে বিরোধ বাধে এবং ঐ অমিল যত বাড়িতে থাকে, বিরোধও ততই বাড়িতে থাকে। এই কারণেই স্বামীজী উদ্দেশ্যের একতাই সঙ্ঘের অখণ্ডতারক্ষার পক্ষে—ঐক্যবন্ধনের পক্ষে প্রধানতম উপায় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মঠের সকল অঙ্গেরই স্বামীজীর মঠের অখণ্ডতা সম্বন্ধীয় এই ভাবটির কথা পুনঃ পুনঃ চিন্তা ও আলোচনা করা এবং নিজের ব্যক্তিগত জীবনে উহা কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। স্বামীজী বলিয়াছেন,—

"প্রীতি, অধ্যক্ষদিগের আজ্ঞাবহতা, সহিষ্ণুতা ও একান্ত পবিত্রতাই ভ্রাতৃবর্গের মধ্যে একতারক্ষার একমাত্র কারণ।"

বাস্তবিকই যদি আমরা স্বামীজীর আদেশপালনের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করি, তবে আমাদের মঠমিশনের মধ্যে দলাদলি ও বিরোধরূপ বিপৎপাতের কোন আশঙ্কা নাই।

সম্মেলনের বক্তা—রায় চুনিলাল বসু বাহাদুর

তার পর দেখা যায়, অন্যান্য বিষয়ে উচ্চপ্রকৃতি হইলেও মানযশের আকাঙ্ক্ষারূপ দুর্ব্বলতা ছাড়াইয়া উঠা বড় কঠিন—মহাজনগণও উহার প্রলোভনে অনেক সময়ে কর্ত্তব্য-ভ্রষ্ট হইয়া থাকেন। এই মানযশের আকাঙ্ক্ষায় পরস্পরের প্রতি ঈর্ষাভাব জাগিয়া উঠে—ইহাতেই অবশেষে সঙ্ঘ ভাঙ্গিয়া যায়।

তাই স্বামীজী বলিতেছেন,—

"আমাদের ঠাকুর মানের জন্য আসেন নাই, আমরা তাঁহার দাস, আমরাও মান-ভোগের আকাঙ্ক্ষী নহি। কেবল নিজে পবিত্র থাকিয়া অন্যকে পবিত্রতা শিক্ষা দিয়া তাঁহার আজ্ঞা পালন করাই আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য।

"এই মঠের প্রত্যেক অঙ্গেরই ভাবা উচিত যে, তাঁহার প্রত্যেক কার্য্যে তিনি যেন শ্রীভগবানের মহিমা প্রকাশ করেন। তিনি যেখানেই যান বা যে অবস্থাতেই থাকুন, তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিনিধি; এবং লোকে তাঁহার মধ্য দিয়াই শ্রীভগবান্‌কে দর্শন করিবে।

"এই ভাবটি সদা মনে জাগরূক থাকিলে আর বেচালে পা পড়িবে না।"

স্বামীজীর উপরি-উক্ত আদেশ প্রাণপণে পালনের চেষ্টা করিলে মঠের বিভিন্ন অঙ্গ ও মঠভুক্ত বিভিন্ন আশ্রম ও সমিতিসমূহের মধ্যে উদ্দেশ্যের একতা সাধিত হইবে এবং তাহাতেই পরস্পরের মধ্যে সহানুভূতি, সদ্ভাব ও সহযোগিতা বর্দ্ধিত হইবে। যে মহাতরঙ্গের প্লাবন সমগ্র মানবজাতির মধ্যে বর্ত্তমান গভীর অবসাদ ও অবনতি মুছাইয়া ফেলিতে ছুটিয়াছে, সেই তরঙ্গের শীর্ষদেশে ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেব অবস্থিত। আমরা সর্ব্বাবস্থায় সকল কার্য্যে যেন তাঁহার সর্ব্ববিরোধ-সমন্বয়কারী, মহামিলনসাধক পূতচরিত্র সদা-সর্ব্বদা অনুধ্যান করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হই।

সমগ্র মঠের ভিতর অধ্যক্ষ ও সেবকগণের মধ্যে প্রগাঢ় প্রীতির সম্বন্ধ থাকা উচিত। সেবকগণের উচিত—সর্ব্বদা অধ্যক্ষগণের আদেশপালনে প্রাণপণে প্রস্তুত থাকা; তদ্রূপ অধ্যক্ষগণ যেন প্রাণে প্রাণে বুঝেন, আমরা অধ্যক্ষ নহি, আমরা এই সেবকগণের—কর্ম্মিগণের সেবকমাত্র, তাঁহাদের আজ্ঞাবহ ভৃত্যমাত্র। অধ্যক্ষের গুণপণার উপরই সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিষ্ঠানবিশেষের সাফল্য ও সিদ্ধি অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। আমাদের প্রকৃতিতে সঙ্ঘবদ্ধভাবে কার্য্য করিবার শক্তির একান্তাভাব। ইহাই আমাদের জাতীয় প্রকৃতির বিশেষত্ব হইয়া

দাঁড়াইয়াছে। সম্পূর্ণ ঈর্ষাহীনতাই কিন্তু সংঘবদ্ধভাবে কার্য্য করিয়া তাহাতে সফলতা লাভ করিবার গূঢ় সঙ্কেত। অধ্যক্ষ বা নেতার সর্ব্বদা তাঁহার অনুবর্ত্তী ও সহযোগী সেবকগণের মতামত গ্রহণ করিয়া তদনুসারে নিজ কার্য্যপ্রণালী নিয়মিত করা এবং সর্ব্বদা সকলের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া চলা কর্ত্তব্য; স্বামীজী অধ্যক্ষগণকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়াছিলেন, "কর্ত্তৃত্ব করিতে কখনও যাইও না—যে সকলের সেবায় প্রস্তুত, সেই যথার্থ কর্ত্তৃত্ব করিবার উপযুক্ত। 'শিরদার ত সর্দ্দার।' অপরকে পরিচালিত করিতে, অপরের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে, মার্কিণরা যাহাকে bossing বলে, তাহা করিতে যাইও না। সকলের দাস হও। তুমি যদি নেতার আসন গ্রহণ করিয়া আপনাকে একটা মস্ত বড় নেতা বলিয়া দেখাইতে চেষ্টা কর, তবে কেহ তোমার সাহায্যার্থে আসিবে না। যদি কোন বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে চাও, তবে আগে নিজের অহংকে নাশ করিয়া ফেল। আবার কোন কাযে সফল হইবার একটা উপায়—প্রথমেই বড় বড় কাযের মতলব না করা—ধীরে ধীরে আরম্ভ কর—দেখ, কতটা কাযে অগ্রসর হইতে সমর্থ হইতেছ—তার পর আরও অগ্রসর হও।"

প্রত্যেক সেবককে কি ভাবে অধ্যক্ষের আদেশ পালন করিতে হইবে, তৎসম্বন্ধে স্বামীজী একটি সুন্দর কথা বলিয়াছেন, —"যদি অধ্যক্ষ আদেশ করেন—ঐ কুমীরটাকে ধর গিয়া—তবে আগে গিয়া উহাকে ধর, তার পর তর্ক করিও।" স্বামীজী গভীর দুঃখের সহিত বলিয়াছিলেন—আজকাল ভারতে যদি কোন গুরুতর পাপ রাজত্ব করিতে থাকে, তবে তাহা আমাদের দাসসুলভ প্রকৃতি—সকলেই চায় হুকুম করিতে—হুকুম তামিল করিবার লোকের অভাব। আর প্রাচীন যুগে যে অদ্ভুত ব্রহ্মচর্য্যপ্রথা ছিল, তাহার অভাব হইয়াছে বলিয়াই এটি ঘটিয়াছে। প্রথমে হুকুম তামিল করিতে শিখ। সর্ব্বদাই গোড়ায় আজ্ঞাবহ ভৃত্যের কায করিতে শিখ, তবেই ঠিক ঠিক প্রভু হইতে পারিবে। সেবককে জীবনের মমতা পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়া সর্ব্বদা অধ্যক্ষের আজ্ঞাপালনে প্রস্তুত থাকিতে হইবে।

স্বামীজীও বলিয়াছেন—

"আজ্ঞাবহতাই কার্য্যকারিতার প্রধান সহায়। অতএব প্রাণভয় পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া আজ্ঞা পালন করিতে হইবে। সকল দুঃখের মূল ভয়। ভয়ই মহাপাপ। সেই ভয় একেবারে ছাড়িতে হইবে।"

রায় শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর

মঠের অঙ্গগণের মধ্যে ও মঠের বিভিন্ন শাখার মধ্যে পরস্পর সহযোগিতা বর্দ্ধনের জন্য স্বামীজী আরও কতকগুলি সুন্দর কথা বলিয়া গিয়াছেন :—

"অপরের নামে গোপনে নিন্দা করা ভ্রাতৃভাব-বিচ্ছেদের প্রধান কারণ। অতএব কেহই তাহা করিবে না। যদি কোন ভ্রাতার বিরুদ্ধে কিছু বলিবার থাকে ত একান্তে তাহাকেই বলা হইবে।

"তাঁহার সেবক বা সেবকের সেবকদের মধ্যে কেহই মন্দ নহে। মন্দ হইলে কেহ এখানে আসিত না। অতএব কাহাকেও মন্দ ভাবিবার অগ্রে 'আমি মন্দ দেখি কেন?' প্রথম ভাবা উচিত।"

সঙ্ঘবিশ্লেষণপ্রয়াসী মঠের অঙ্গের উদ্দেশে স্বামীজীর সাবধানবাণী এখনও আমাদের কর্ণে প্রতিধ্বনিত হইতেছে :—

"সংহতিই অভ্যুত্থানের প্রধান উপায় ও শক্তি-সংগ্রহের একমাত্র পন্থা। অতএব যে কেহ কায়, মন ও বাক্যের দ্বারা এই সংহতির বিশ্লেষণ করিতে চেষ্টা করিবেন, তাঁহার মস্তকে সমস্ত সঙ্ঘের অভিশাপ নিপতিত হইবে এবং তিনি ইহপরলোক উভয় হইতে ভ্রষ্ট হইবেন।"

এবার অন্য একটি প্রসঙ্গের অবতারণা করিতে চাই। আজকাল রামকৃষ্ণসঙ্ঘের কার্য্য রামকৃষ্ণ মঠ বা আশ্রম ও রামকৃষ্ণ মিশন—এই দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া অনুষ্ঠিত হইতেছে। ইহাতে অনেকের মনে একটা গোলমাল ঠেকে—আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, মূলতঃ রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনে কোন পার্থক্য নাই—কার্য্যের সুবিধার জন্যই এই দুইটি পৃথক্ নামের সৃষ্টি করা হইয়াছে। সাধারণতঃ অনেকের বিশ্বাস—মঠ ধ্যান-ধারণা, অধ্যয়ন-অধ্যাপনাদির স্থান আর সেবা-কার্য্যটা মিশনের ভিতর ঠেলিয়া দেওয়া হইয়াছে। কার্য্যতঃ, অনেক ক্ষেত্রে সেইরূপ হইয়াছে বটে, কিন্তু এ সম্বন্ধে যে কতকগুলি ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হইয়াছে—সেইগুলি দূর করা আবশ্যক।

আমি ইতঃপূর্ব্বেই স্বামীজী মহারাজের কথিত মঠের আদর্শ ও কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে যে কথা বলিয়াছি, তাহা স্মরণ করিলে বুঝিবে, তাঁহার মতে মঠে যেমন এক দিকে ভক্তি, পূজা, উপাসনা, তদ্রূপ অপর দিকে কর্ম্মেরও স্থান আছে; এক দিকে যেমন ধ্যান-ধারণা, অধ্যয়ন-অধ্যাপনার স্থান আছে, অপর দিকে সমাজ-সেবারও তদ্রূপ স্থান আছে। পূর্ব্বেই আমি দেখাইয়াছি,

স্বামীজী বেলুড় মঠকে একটি সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করিতে চাহিয়াছিলেন—তাহাতে ধর্ম্ম ও দর্শনচর্চ্চার সঙ্গে সঙ্গে একটি 'টেক্‌নিক্যাল ইনষ্টিটিউট' করিবার কথা বলিয়াছেন। তিনি জীবিত থাকিতে এই সঙ্ঘকে মঠ ও মিশন নাম দিয়া দুইটি বিভাগ করিবার কোন প্রয়োজন হয় নাই। তাঁহার আদর্শাবলী কর্ম্মজীবনে প্রয়োগ করিবার জন্য তিনি প্রথম বার আমেরিকা হইতে ফিরিবার কিছু পরেই ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ১লা মে তারিখে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের গৃহী ও সন্ন্যাসী শিষ্যগণকে লইয়া একটি সমিতি স্থাপন করেন; উদ্দেশ্য—সমগ্র মানবজাতির কল্যাণের জন্য সকলে মিলিয়া একটা সঙ্ঘবদ্ধ চেষ্টা। ঐ সমিতির তিনি নামকরণ করেন রামকৃষ্ণ মিশন। ক্রমে ইহার উন্নতি ও কার্য্যের প্রসার হইতে লাগিল এবং নানা শাখা-প্রশাখা বাড়িতে লাগিল—পরিশেষে কার্য্যের সুবিধার জন্য ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে ইহাকে ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের

সৎ হও এবং অপরকেও সৎ হইবার জন্য সাহায্য কর। আর আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তিনি এই আদর্শটি কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য জ্ঞান, ভক্তি, যোগ ও কর্ম্ম—এই চতুর্ব্বিধ প্রচলিত সাধনমার্গ সম্মিলিত-ভাবে সাধন করিতে হইবে, ইহাই উপদেশ করিয়া গিয়াছেন—অবশ্য প্রকৃতিভেদে যে সাধকের যে দিকে বিশেষ ঝোঁক, সেই দিক্‌টাই প্রধান ভাবে অবলম্বন করিবার অনুমতিও দিয়াছেন। সুতরাং মঠ ও মিশনের আদর্শের মধ্যে বিরোধের কোন অবকাশ নাই। রাহু ও তাহার শির প্রকৃতপক্ষে এক বস্তু হইলেও কেবল বাক্যবিন্যাসের ফলে যেমন একটা কাল্পনিক পার্থক্যের ভাব আমাদের মনে আনয়ন করে—মঠ ও মিশনের মধ্যে ভেদ আবিষ্কারের চেষ্টাও তৎসদৃশ। সুতরাং এই সঙ্ঘের মধ্যে যাহারা সেবাকার্য্যে নিযুক্ত আছে, তাহারাও হিমালয়ের গুহায় থাকিয়া তপস্যায় নিযুক্ত সঙ্ঘের অঙ্গগণ হইতে কোন

বেলুড় মঠ

২১ আইন অনুসারে রেজিষ্টারি করা হইল। তদবধি কেবল আইন বজায় রাখিবার জন্য রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ভিতর একটা নামমাত্র পার্থক্য রাখা হইতেছে। প্রকৃতপক্ষে ধরিতে গেলে সাধারণের সুবিধার জন্য এই মঠেরই একটি অংশবিশেষের নাম রাখা হইয়াছে রামকৃষ্ণ মিশন। শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের প্রত্যেক অঙ্গই—তিনি যে কোন কার্য্যক্ষেত্রে থাকিয়াই কর্ম্ম করুন না কেন—স্বামীজী যাহাকে প্রকৃত পক্ষে রামকৃষ্ণ মঠ বলিয়া মনে করিতেন, তাহারই অঙ্গীভূত। সুতরাং বর্ত্তমান মঠ ও মিশনের কার্য্যাবলীর ভিতর একটা কাল্পনিক ব্যবধানের সৃষ্টি করিবার চেষ্টা স্বামীজীর ভাবের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ এবং সেই হেতু ঐ ধারণার ভিত্তিই ভ্রমপূর্ণ ও যত দিন উহা আমাদের মন হইতে সমূলে উৎপাটিত না হয়, তত দিন আমাদের কল্যাণ নাই। মঠ ও মিশনের আদর্শের মধ্যে পার্থক্য দেখিবার চেষ্টাই অন্যায় ও দূষণীয়—উহাতে অনেক বিপদ আছে। মঠের সকল অঙ্গেরই প্রতি স্বামীজীর আদেশ এই—নিজে

অংশে কম নহে—অবশ্য যদি সকলেই স্বামীজীকথিত আদর্শটিকে স্বীকার করিয়া লয়। যাহারা কিছুকালের জন্য কর্ম্মজীবন হইতে একেবারে অবসর লইয়া কেবল ধ্যান-ধারণা স্বাধ্যায়াদিতে নিযুক্ত থাকিয়া আপনাদিগকে কর্ম্মজীবনের অধিকতর উপযোগী করিয়া গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করে, তাহাদিগকেও আমরা মঠের বিশেষ মূল্যবান্ অঙ্গ বলিয়া ভাবিয়া থাকি—সঙ্ঘের উন্নতি ও জীবনীশক্তি অব্যাহত রাখিবার জন্য এইরূপ সর্ব্বকর্ম্মত্যাগী সাধকেরও বিশেষ প্রয়োজন আছে। মঠ যেন একটি সুন্দর পুষ্পগুচ্ছ—জ্ঞান, ভক্তি, যোগ ও কর্ম্মরূপ নানা বর্ণের সুগন্ধি পুষ্প দ্বারা উহা নির্ম্মিত—এই বিভিন্ন বর্ণের সমবায়ে উহা সৌন্দর্য্যে সমৃদ্ধ হইয়াছে।

বন্ধুগণ, তোমাদিগকে আমার যাহা বলিবার ছিল—সব বলিলাম। হে শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্তানগণ, আমার যে সামান্য অভিজ্ঞতা আছে, তাহা হইতে তোমাদিগকে বলিতেছি, যত দিন আমাদের এই সঙ্ঘ ভগবদ্ভাবে

অনুপ্রাণিত থাকিবে, তত দিনই ইহা টিকিবে। প্রীতি, উদারতা, পবিত্রতা ও নিঃস্বার্থতাই আমাদের সঙ্ঘের ভিত্তি। যদি স্বার্থপরতা ইহার মজ্জায় প্রবেশ করে, তবে মানুষের প্রণীত আইন-কানুনে ইহাকে ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করিতে পারিবে। এই মঠ তোমাদিগকে সেই আদর্শ পূর্ণতা লাভ করিবার জন্য সর্ব্বপ্রকার সুবিধা করিয়া দিতেছে এবং সর্ব্ববিধ সুবিধা করিয়া দিতে সদা প্রস্তুত। তোমরা যদি মঠের সম্পূর্ণ অধীন থাকিয়া সকলেই ঐ পূর্ণতালাভের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা কর, তবেই তোমরা এই সঙ্ঘের জীবনকে দীর্ঘতর ও স্থায়ী করিবার সহায়তা করিবে। স্বামীজী মঠের জন্য বুকের রক্ত দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার আত্মা এখনও এখানে বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই মঠ শ্রীরামকৃষ্ণের স্থূল দেহ। যে সকল মহাত্মা আমাদের পূর্ব্বেই ইহলোক হইতে চলিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা এখনও সূক্ষ্ম শরীরে বর্ত্তমান থাকিয়া আমাদিগকে সর্ব্ববিধ উপায়ে সাহায্য করিতে প্রস্তুত রহিয়াছেন। আমাদিগকে এখন সব পালগুলি তুলিয়া দিতে হইবে। শ্রীভগবানের কৃপাবায়ু সদা বহিতেছে—পালগুলি সব তুলিয়া দিলে ঐ কৃপাবায়ু অচিরেই আমাদিগকে আমাদের গন্তব্য সেই চরম লক্ষ্যে নিশ্চিত লইয়া যাইবে।

ধর্ম্মসাধনাই ভারতের মহান্ জীবনব্রত। জগৎকে আমাদের যদি কিছু দিবার থাকে, তবে একমাত্র এই ধর্ম্মধন। স্মরণাতীত কাল হইতে আধ্যাত্মিক ভাবের বন্যা এই ভূমি হইতেই প্রবাহিত হইয়া সমগ্র জগতের সভ্যতার গতি-নির্ণয়ে সাহায্য করিয়াছে। আমাদের এই হতভাগ্য জাতির উপর বিগত দশ শতাব্দী ধরিয়া নানা দুর্দ্দৈবরূপ ঝঞ্ঝা বহিয়া যাইলেও যে আমরা বাঁচিয়া আছি, তাহার কারণ, ধর্ম্মই আমাদের জীবনের মেরুদণ্ডস্বরূপ। আমাদের ব্যক্তিগত বা সঙ্ঘবদ্ধ জীবনে আমরা যত প্রকার বিভিন্ন আদর্শ ও কার্য্য লইয়া থাকি না কেন—শ্রীভগবান্ই আমাদের সকল কার্য্যের মধ্যবিন্দুস্বরূপ। এখানে প্রকৃত মহত্ত্ব ধর্ম্মের মানদণ্ডেই তুলিত হইয়া থাকে। শ্রীভগবান্ গীতায় তাঁহার অবতারের যে কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন—যখনই ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, তখনই তাঁহার আবির্ভাব হইয়া থাকে, এই যে অব্যর্থ নিয়মের ইঙ্গিত করিয়াছেন—সেই নিয়মেই শ্রীভগবান্ এই যুগে ধর্ম্মের লুপ্ত আদর্শ পুনরুদ্ধারের জন্য আবার আবির্ভূত হইয়াছেন। তাঁহার পূর্ব্বেও শত শত অবতার ও যুগাচার্য্য অন্ধকারের মধ্যে আলোক দেখাইতে, জাতীয় অবসাদ দূর করিয়া আমাদিগকে তুলিতে আসিয়াছেন। কিন্তু যে তম-অমানিশা আমাদিগকে বর্ত্তমান যুগে ঘেরিয়াছে, তত্তুলনায় পূর্ব্ব পূর্ব্ব অন্ধকারগুলিকে—যাহা দূর করিতে পূর্ব্ব পূর্ব্ব অবতারগণের আগমন প্রয়োজন হইয়াছিল—আলোকই বলা যাইতে পারে। স্বামীজী বেলুড় মঠ স্থাপনার কিছু পূর্ব্বে 'হিন্দুধর্ম্ম কি?' নামক যে ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রকাশ করেন, তাহাতে বলিতেছেন,—

"কিন্তু ঈষন্মাত্রযামা গতপ্রায়া বর্ত্তমান গভীর বিষাদরজনীর ন্যায় কোনও অমানিশা এই পুণ্যভূমিকে সমাচ্ছন্ন করে নাই। এ পতনের গভীরতায় প্রাচীন পতন সমস্ত গোষ্পদের তুল্য।"

তাই বলি, আমাদিগকে এবং সমগ্র জগৎকে তমোময়ী জড়া শক্তির দৃঢ় বন্ধন হইতে মুক্ত করিবার জন্য শ্রীভগবান্ তাঁহার অপার করুণাবশে আবার পূর্ণভাবে আবির্ভূত হইয়াছেন।

প্রথমবার আমেরিকা হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে কলিকাতাবাসিগণ স্বামীজীকে যে অভিনন্দন প্রদান করেন, তদুত্তরে তিনি তাঁহার শ্রীগুরুদেবের উদ্দেশে এক স্থলে বলিতেছেন,—

"আমরা জগতের ইতিহাসে শত শত মহাপুরুষের জীবনী পাঠ করিতেছি। এখন আমরা যে আকারে সেই সকল জীবনী পাইতেছি, তাহাতে শত শত শতাব্দী ধরিয়া শিষ্যপ্রশিষ্যগণের পরিবর্ত্তন-পরিবর্দ্ধনরূপ কলম চালানোর পরিচয় পাওয়া যায়। সহস্র সহস্র বর্ষ ধরিয়া ঐ সকল প্রাচীন মহাপুরুষগণের জীবনচরিতকে ঘসিয়া মাজিয়া কাটিয়া ছাঁটিয়া মসৃণ করা হইয়াছে, কিন্তু তথাপি যে জীবন আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি, যাঁহার ছায়ায় আমি বাস করিয়াছি, যাঁহার পদতলে বসিয়া আমি সব শিখিয়াছি, সেই রামকৃষ্ণ পরমহংসের জীবন যেরূপ উজ্জ্বল ও মহিমান্বিত, আমার মতে আর কোন মহাপুরুষের তদ্রূপ নহে।"

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাবে যে ধর্ম্মবন্যা জগৎকে প্লাবিত করিয়াছে, উহা প্রবলবেগে সমাজের উপর পতিত হইবার পূর্ব্বে সমাজের সর্ব্বত্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলাবর্ত্তের আবির্ভাব দেখা গিয়াছিল। যখন ঐ মহাবন্যা আসিতেছিল, তখন উহার অস্তিত্বই কাহারও চক্ষুতে পড়ে নাই, উহাকে কেহ ভাল করিয়া দেখে নাই, উহার গূঢ়শক্তি সম্বন্ধে কেহ স্বপ্নেও ভাবে নাই—কিন্তু উহা ক্রমশঃ একটু একটু করিয়া বাড়িতে লাগিল—ক্রমে প্রবলকায় হইয়া সেন অন্য ক্ষুদ্রতর জলাবর্ত্তগুলিকে গ্রাস করিয়া ফেলিল—নিজ অঙ্গে মিলাইয়া লইল। এইরূপে সুবিপুলকায় ও প্রবল হইয়া মহাবন্যারূপে পরিণত হইল এবং সমাজের উপর এত প্রবল বেগে পড়িল যে, কেহই উহার গতিরোধ করিতে পারিল না।

সেই শ্রীরামকৃষ্ণ—সেই বিরাট্ পুরুষ—জগৎ যাঁহার ন্যায় মহান্ পুরুষ আর দেখে নাই—তিনি তোমাদের পশ্চাতে রহিয়াছেন। আমাদের পূর্ব্বপুরুষরা মহৎ মহৎ কর্ম্ম করিয়াছিলেন—তোমাদিগকেও আরও মহত্তর কার্য্য সব করিতে হইবে। আমাদের প্রত্যেককে বিশ্বাস করিতে হইবে যে, জগতের অবশিষ্ট সকলে তাহাদের কার্য্য করিয়া চুকিয়াছে—জগতের পূর্ণতাসাধনের জন্য যেটুকু কায বাকী রহিয়াছে, তাহা আমাকেই করিতে হইবে। এই দায়িত্বভার আমাদের স্কন্ধে লইতে হইবে।

প্রাচীন বৌদ্ধ মঠসমূহ সঙ্ঘবদ্ধ চেষ্টা দ্বারা জগতের কল্যাণসাধনের জন্য অন্তরের সহিত চেষ্টা করিয়াছিলেন—তাঁহারা তাঁহাদের উদ্দেশ্যসাধনে অনেকটা সফলকামও হইয়াছিলেন। লিপিবদ্ধ ইতিহাসের যুগ হইতেই দেখা যায়, বৌদ্ধ সন্ন্যাসিগণ তাঁহাদের সঙ্ঘসমূহের সাহায্যে মানবকল্যাণের জন্য যতদূর করা সম্ভব, তাহা করিয়াছেন। যদি বর্ত্তমান প্রধান কতকগুলি ধর্ম্মসম্প্রদায়ের ও দর্শনশাস্ত্র সমূহের অজ্ঞাত ইতিহাস কখনও লিখিত হয়, তবেই জগৎ জানিবে যে, এই নির্ভীক বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ ইহাদের উন্নতি ও পরিপুষ্টিসাধনে কতদূর সহায়তা করিয়াছেন। যত দিন এই সমস্ত বৌদ্ধমঠে শ্রীবুদ্ধের সময়ের আদর্শ পবিত্রতা ও ত্যাগের ভাব অক্ষুন্ন ছিল, তত দিন এই বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ যেখানেই গিয়াছেন, তথায়ই তাঁহাদের প্রভাবের গতি কেহ রোধ করিতে পারে নাই। কিন্তু যখন তাঁহাদের সেই পবিত্রতা ও ত্যাগের ভাব হ্রাস হইয়া আসিল, তখনই শ্রীবুদ্ধের ধর্ম্মে অবনতির চিহ্ন দেখা যাইতে লাগিল,—ইতিহাস হইতে আমাদের এই প্রথম শিক্ষা লইতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ, ভারতের পরবর্ত্তী ইতিহাসে আমরা সময়ে সময়ে দেখিতে পাই, কোন ব্যক্তিবিশেষ আধ্যাত্মিক উন্নতির চরম শিখরে আরূঢ় হইয়া সিদ্ধাবস্থা লাভ করিয়াছেন, কিন্তু তিনি তাঁহার প্রতিবেশী জনগণের জন্য কখনও ভাবেন নাই। তিনি নিজে যে একটা মহান্ আদর্শ উপলব্ধি করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু সেই আদর্শ সামাজিক জীবনে প্রতিফলিত হইবার সুযোগ্য আধার না পাওয়াতে তাঁহার অন্তর্দ্ধানের পর কয়েক বর্ষ গত হইতে না হইতে উহা লুপ্ত হইয়া গেল। ইতিহাস হইতে আমাদিগকে এই দ্বিতীয় শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে। আবার, গত কয়েক শতাব্দীর ভিতর আমাদের দেশে বহুসংখ্যক মঠ ও আশ্রমের অভ্যুদয় দেখা যায়। যদিও উহারা অতি অল্পসংখ্যক সংসারত্যাগী পুরুষকে তাঁহাদের উপকারসাধন করিয়াছে, কিন্তু উহারা সমগ্র সমাজের কোন কল্যাণসাধনে সমর্থ হয় নাই, কারণ, সমগ্র মানবজাতির সেবাধর্ম্মকে উহারা তাহাদের আধ্যাত্মিক সাধনপ্রণালীর অন্তর্ভুক্ত করে নাই। ইহাই ইতিহাসের তৃতীয় শিক্ষা।

স্বামীজী তাঁহার মঠের আদর্শ দিবার পূর্ব্বে ইতিহাসের এই পূর্ব্বোক্ত তিনটি শিক্ষাই উত্তমরূপে অনুধাবন করিয়াছেন। করিয়া—

তিনি 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ'—নিজ আত্মার মুক্তিসাধন এবং জগতের কল্যাণসাধনরূপ সর্ব্বোচ্চ আদর্শের জন্য জীবন বিনিয়োগ—ইহাই আমাদের করিতে বলিয়া গিয়াছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ সন্তানগণ, তোমরা সর্ব্বান্তঃকরণে উক্ত উচ্চ আদর্শ জীবনে পরিণত করিবার চেষ্টা করিতেছ—তোমাদের সকলের উপর আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে। তোমরা এই আদর্শ কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য নিজেদের ব্যক্তিগত সুখস্বাচ্ছন্দ্যের প্রলোভন যতই প্রবল হউক, সমুদয়কে মন হইতে সবলে অপসারিত করিতে এতটুকু ইতস্ততঃ করিতেছ না। আর আমি দিব্যদৃষ্টিতে দেখিতেছি, ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ যিনি আমাদের জীবনের আলোক ও পথিপ্রদর্শক—তিনি তোমাদের পশ্চাতে থাকিয়া তোমাদের মধ্য দিয়া কায করিতেছেন। তোমরা যাহা কিছু করিতেছ, তাহার পশ্চাতে তাঁহার মঙ্গল হস্ত রহিয়াছে। কেবল তাঁহার কৃপায়ই এত অল্পকালের মধ্যে তোমাদের কার্য্য এত সফলতা লাভ করিয়াছে। যত দিন তোমাদের তাঁহাতে বিশ্বাস থাকিবে, যত দিন তোমরা আপনাদিগকে তাঁহার হস্তের যন্ত্রস্বরূপ ভাবিবে, ততদিন জগতের কোন শক্তিই—তাহা যত বড়ই হউক না কেন, তোমাদিগকে তোমাদের স্থান হইতে এতটুকু হঠাইতে পারিবে না। আমাদের প্রভুতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া তোমাদের প্রত্যেকেই বলিতে পার—"আমি আমার ভাবে দৃঢ় থাকিয়া আমার নির্দ্দিষ্ট স্থানে অস্খলিতপদে দাঁড়াইয়া সমগ্র জগতের ভিতর একটা নাড়াচাড়া দিব।" আমি তোমাদিগকে সর্ব্বান্তঃকরণে খুব দৃঢ়তার সহিত এই কথা বলিতেছি যে, সাময়িক অসিদ্ধিতে বিচলিত বা নিরুৎসাহ হইও না। বার বার অকৃতকার্য্যতা চরম সিদ্ধির সোপানপরম্পরা মাত্র। সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে সমভাব অবলম্বন করিয়া তাঁহার উপর অবিচলিত বিশ্বাসের সহিত কার্য্য কর, পরিণামে তোমাদের জয় নিশ্চিত। আমি কেবল প্রার্থনা করিতেছি, তাঁহার উপর যেন তোমরা সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হইতে পার। ধনু হইতে নিক্ষিপ্ত বাণের মত, নেয়াইএর উপর নিক্ষিপ্ত হাতুড়ির মত, লক্ষ্যনিক্ষিপ্ত তরবারির মত অব্যর্থসন্ধান হও। বাণ যদি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়, সে কখনও অসন্তোষ প্রকাশ করে না—হাতুড়ি উহার উদ্দিষ্ট স্থানে না পড়িলে বিরক্ত হয় না, তরবারিও যদি যোদ্ধার হস্তে ভাঙ্গিয়া যায়, সেও বিলাপ করে না। কিন্তু তথাপি নির্ম্মিত, ব্যবহৃত ও ভগ্ন হইবার সময় একটা আনন্দ আছে—আবার উহাদের ব্যবহার ফুরাইলে অব্যবহার্য্য বস্তুরূপে পরিত্যক্ত হইবার কালেও সেই একই রূপ আনন্দ।

আমি তোমাদের সকলের উপর ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিতেছি—যেন তিনি তোমাদিগকে এই জীবনেই সত্য উপলব্ধির জন্য উপযুক্ত বল ও সাহসসম্পন্ন করেন।

এই মহাসম্মেলনের বাতাসে প্রেম ও শুভেচ্ছার স্রোত খেলিতে থাকুক। এক্ষণে ভারতের প্রাচীন মহর্ষিগণ-উচ্চারিত বেদবাণীর প্রতিধ্বনি করিয়া আমার বক্তব্যের উপসংহার করিতেছি :—

মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ
মাধ্বীর্নঃ সন্ত্বোষধীঃ মধু নক্তমুতোষসো
মধুমৎ পার্থিবং রজঃ মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা
মধুমান্নো বনস্পতির্মধুমাঁ অস্তু সূর্য্যঃ মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ
ওঁ মধু ওঁ মধু ওঁ মধু।

হোক বায়ু মধুময়— নদী যেন মধু বয়,
ওষধিরা হোক মধুময়।
নিশি দিবা মধুময়, ধূলি যাহা ভূমে রয়—
দ্যৌপিতা হোন মধুময়।
মধুমান্ বনস্পতি হোক আমাদের প্রতি
মধুমান্ হোন দিবাকর।
আমাদের গাভীগণ মাধ্বী হোক সর্ব্বক্ষণ
মধু হোক সর্ব্ব চরাচর।
ওঁ মধু ওঁ মধু ওঁ মধু।

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীমৎ সারদানন্দ স্বামীর অভিভাষণ

যখনই কোন নূতন আন্দোলনের সূত্রপাত হয়, তখনই দেখা যায়, সমাজ এবং সমগ্র মানবজাতি উহার মূল তত্ত্বগুলি মানিয়া লইবার পূর্ব্বে প্রথমে লোক উহার বিরুদ্ধে দাঁড়ায়, শেষে তৎসম্বন্ধে উদাসীনতা অবলম্বন করে। কোন নূতন আন্দোলনকে এই দুইটি অবস্থার ভিতর দিয়া যাইতেই হয়—ইহা যেন প্রকৃতির অব্যর্থ নিয়ম। আর যখন মানবপ্রকৃতি সর্ব্বত্রই সমান, তখন কি প্রাচ্য, কি পাশ্চাত্য জগৎ, সর্ব্বত্রই এই নিয়মের প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। সমাজ, নীতি, রাজনীতি বা ধর্ম্ম—যে কোন ক্ষেত্রেই বল না কেন, যদি নূতন কোন সংস্কার করিতে চাও, নূতন কোন ভাবধারা আনয়ন করিতে চাও, তবে দেখিবে, তোমার চারিপাশের লোক তোমার বিরুদ্ধে লাগিবে। আর তোমার প্রবর্ত্তিত সংস্কার-আন্দোলনের ভাবগুলি প্রচলিত ভাব হইতে যতই নূতন হইবে, ততই বাধা প্রবলতর হইবে। লোক বলিবে, উক্ত আন্দোলনের মূলে যে ভাবরাশি—যে আদর্শ বিদ্যমান, তৎপ্রভাবে বর্ত্তমান সমাজে যাহা কিছু ভাল ও প্রয়োজনীয় বিষয় আছে, তাহার ভিত্তি পর্য্যন্ত চূরমার করিয়া ফেলিবে। কিন্তু যদি ঐ আন্দোলনের ভিতর যথার্থ জীবনীশক্তি থাকে, যদি উহা মানব-প্রকৃতির ও উহার বিভিন্ন অঙ্গ ও কার্য্যাবলীর পরিচালক সার সত্যসমূহের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে বাধা সত্ত্বেও উহার বিনাশ না হইয়া বরং উত্তরোত্তর উহার প্রভাব বাড়িতে থাকিবে এবং ক্রমে মানবহৃদয়ে উহা স্থায়িভাবে তাহার শিকড় গাড়িয়া বসিবে। এই বাহিরের বাধা হইতেই ঐ আন্দোলনকে নিজ শক্তিরাশি একমুখী করিতে এবং যে মূল সত্যসমূহের উপর উহা প্রতিষ্ঠিত, সেইগুলিকে ব্যবহারিক জীবনে প্রকাশ করিতে সাহায্য করিয়া থাকে—সুতরাং প্রকৃতপক্ষে সকল দিক বিবেচনা করিয়া দেখিলে উহাকে মন্দ বলিতে পারা যায় না।

কিছুকাল পরে এই বাধা আপনা আপনি ধীরে ধীরে চলিয়া যায়—উদাসীনতা আসিয়া তাহার স্থান অধিকার করে—যাহারা প্রথমেই উহার বিরুদ্ধে লাগিয়াছিল, তাহারাই বলিতে থাকে—দেখ, এই যে আন্দোলন দেখিতেছ, ইহাতে আর নূতনত্ব কি আছে? ইহারা যে সকল তত্ত্ব প্রচার করিতেছে, আমাদের প্রাচীন গ্রন্থে ও শাস্ত্রে অমুক অমুক শ্লোকে সেই কথাগুলিই যে রহিয়াছে। ইহাতেই যথেষ্ট প্রমাণিত হইতেছে যে, আমাদের পূর্ব্বপুরুষরা বহুকাল পূর্ব্বেই এ সকল কথা জানিতেন এবং বহুকাল পূর্ব্ব হইতেই এগুলি করিয়া আসিতেছেন। অতএব এগুলি লইয়া অধিক মাথা ঘামাইবার আবশ্যক নাই। এই দ্বিতীয় অবস্থায় বাধা অপসারিত হওয়ায় ঐ আন্দোলন বহুদূরে বিস্তৃত হইয়া পড়ে এবং কালে সমাজের লোক যখন উহার অস্তিত্ব ও উপকারিতা স্বীকার করিয়া লয়, তখন উহা সমাজে একটা স্থান অধিকার করিয়া বসে—উহাকে বাধা দিবার—উহার বিরুদ্ধে লাগিবার আর কেহ থাকে না।

সুতরাং এই দ্বিতীয় পর্য্যায়ের শেষে সর্ব্বসাধারণের সম্মতিক্রমে উহা সমাজে পরিগৃহীত হইয়া থাকে আর এইরূপে সমাজে পরিগৃহীত ও আদৃত হইবার উপযুক্ত বলিয়া প্রমাণিত হওয়াতে তখন হইতে দলে দলে উহাতে লোক প্রবেশ করিতে থাকে। তবে ঐ আন্দোলনের উন্নতির ইতিহাসে উহা এইরূপ সর্ব্বসম্মতিক্রমে পরিগৃহীত হইলেই ঐ আন্দোলন উন্নতির চরম শিখরে উঠিয়াছে, তাহা মনে করা উচিত নহে। কারণ, বাধাহীন অবস্থায় পৌঁছিয়া—প্রথম অবস্থার উৎসাহ ও উদ্যমে যেন একটু ভাঁটা পড়ে আর প্রথমাবস্থায় উক্ত আন্দোলনের প্রবর্ত্তকগণের মধ্যে যে ভাবের গভীরতা ও উদ্দেশ্যের একতা ছিল, হঠাৎ বিস্তারের সঙ্গে তাহা কমিয়া যায়। সুতরাং তখন বাহিরের বাধার স্থলে উহার অঙ্গগণের বিভিন্ন মতামতের ফলে অন্তর্বিরোধের সৃষ্টি হয় এবং পরে প্রথমাবস্থায় খাঁটি সত্যের জন্য যে একটা স্বার্থত্যাগের ভাব ছিল, তৎস্থলে খাঁটি সত্যের সঙ্গে সত্যাভাসের আপোষ করিয়া—সমাজে একটা প্রতিপত্তিলাভের চেষ্টা এবং যথার্থ ভিতরের জিনিষটার পরিবর্ত্তে বাহিরের চাকচিক্যের দিকে—দেখাইবার চেষ্টার দিকে একটা ঝোঁক হয়—যাহারা সত্যের জন্য কোনরূপ স্বার্থত্যাগ বা কষ্ট স্বীকার না করিয়া আরামে জীবন কাটাইতে চায়, তাহাদের স্বভাবতঃই এই দিকেই প্রবৃত্তি হয়। আর যদি আন্দোলনের নেতৃগণ সতর্ক দৃষ্টিতে জাগরিত না থাকেন অথবা ঐ সকল দোষের উৎপত্তিতে বাধা দিবার জন্য—উহাদিগকে সমূলে বিনাশের জন্য কোনরূপ প্রতীকারের উপায় আবিষ্কার করিয়া ঐ অবস্থাটাকে সামলাইয়া লইবার চেষ্টা না করেন,তবে তাহার ফলে যে কি হয়, তাহা সহজেই অনুমেয়। প্রথমতঃ এবং প্রধানতঃ যতই স্বার্থের ভাব প্রবেশ করিতে থাকে, ততই যে প্রেমের সূত্রে এত দিন সকলে একত্র ও গ্রথিত ছিলেন, তাহা কমিতে থাকে এবং সঙ্ঘের অঙ্গগণ সমগ্র সঙ্ঘের উন্নতি ও কল্যাণের জন্য যে উদার ব্যাপক দৃষ্টির প্রয়োজন, তাহা ভুলিয়া পৃথক পৃথক্ এক একটা দল হইয়া সমগ্র সঙ্ঘের সহিত কোন সম্বন্ধ না রাখিয়া উহার পৃথক্ পৃথক্ এক একটা অংশের উন্নতিবিধান ও উহার স্থায়িত্বসাধনের ভাব লইয়া কার্য্যে অগ্রসর হন। এইরূপে সঙ্ঘের ভিতর বিশ্লেষণের ভাব এই সঙ্কীর্ণ প্রণালীর মধ্য দিয়া প্রবেশ করিয়া সমস্ত সঙ্ঘটিকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলে। আর কালবশে গুরুজনের অবাধ্যতা, অহঙ্কার, আলস্য ও অন্যান্য শত শত দোষ সঙ্ঘের ভিতর প্রবেশ করিয়া চিরদিনের মত উহার সর্ব্বনাশসাধন করে।

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি—শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণকে কেন্দ্র করিয়া যে আন্দোলন প্রবর্ত্তিত হয়, তাহাও ইহার প্রধান প্রবর্ত্তক ও নেতা স্বামী বিবেকানন্দের অন্তর্দ্ধানের কয়েক বর্ষ পূর্ব্বেই এইরূপ বাধা ও উদাসীনতারূপ সোপানদ্বয় অতিক্রম করিয়াছিল—তিনি তাঁহার তিরোভাবের পূর্ব্বেই রামকৃষ্ণ মিশন নাম দিয়া ইহাকে একটা কার্য্যোপযোগী গঠন দিয়াছিলেন ও সঙ্ঘবদ্ধ করিয়াছিলেন। তাহার পর হইতেই ইহা প্রায় ত্রিশ বর্ষ ধরিয়া তৎপ্রদর্শিত পথে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া বর্ত্তমানে এমন এক অবস্থায় পৌঁছিয়াছে, যখন ইহা ভারত ও ভারতেতর কয়েকটি দেশের লোকের হৃদয়ে আদর ও স্থান পাইয়াছে। প্রথমে ইহা প্রধানতঃ বঙ্গদেশের একটি ক্ষুদ্র নগণ্য সঙ্ঘমাত্র ছিল—এক্ষণে এই অল্পকালের মধ্যে উহা ভারতের সকল প্রদেশে, শুধু ভারতে কেন, ব্রহ্মদেশ, সিংহল, যুক্ত মালয় রাজ্য, এমন কি, সুদূর পাশ্চাত্য দেশ যথা আমেরিকা, ইংলণ্ড এবং য়ুরোপেও কতক কতক অংশে বিস্তৃত হইয়াছে। বন্ধুগণ, তোমরা এবং তোমাদের সহযোগী কর্ম্মী ভ্রাতৃগণ সঙ্ঘের এই গৌরবময় পরিণাম আনয়নের উদ্দেশ্যে স্বেচ্ছায় শ্রীপ্রভুর হস্তের যন্ত্রস্বরূপ হইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছ। তোমরা একমাত্র শ্রীভগবানের উপর নির্ভর করিয়া বারাণসী, কনখল ও বৃন্দাবনে জনহিতকর সেবাকেন্দ্রসমূহ স্থাপন করিয়াছ—তোমাদের ভবিষ্যদ্দর্শী নেতা তাঁহার কতকগুলি বক্তৃতায় যে বলিয়াছেন, অর্থবলে বলী ব্যক্তি নহে, কিন্তু চরিত্রবল ও দৃঢ় ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন এবং একটা মহৎ উদ্দেশ্যের প্রতি তীব্র অনুরাগরূপ অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত মানুষই এইরূপ কার্য্যকে স্থায়ী ও সাফল্যমণ্ডিত করিতে পারে, তাঁহার সেই বাক্য জনসাধারণের নিকট প্রমাণিত করিয়াছ। তোমরা মান্দ্রাজ, ব্যাঙ্গালোর ও দাক্ষিণাত্যের অন্যান্য অনেক প্রদেশে এবং ইদানীং নাগপুর, বোম্বাই, কুয়ালালামপুর ও রেঙ্গুনে প্রচার ও শিক্ষাকেন্দ্র সমূহ স্থাপন করিয়াছ—ঐ সকল স্থানের জনসাধারণ

তোমাদের কার্য্য দেখিয়া তোমাদের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া তোমাদের সহযোগিতা আরম্ভ করিয়াছে। আর তোমরা সমগ্র ভারতের দুর্ভিক্ষ ও বন্যাপীড়িত এবং অগ্নিদাহে ক্ষতিগ্রস্ত বিপন্ন নরনারীর সাহায্যকল্পে পুনঃ পুনঃ সেবাকেন্দ্র খুলিয়া সমগ্র দেশবাসী জনসাধারণের হৃদয়ে রামকৃষ্ণ মিশনের উপর এখন যে লোকের একটা বিশ্বাস দাঁড়াইয়াছে, তাহা জাগাইতে সাহায্য করিয়াছ। তোমরা অদ্ভুত ধৈর্য্য ও অধ্যবসায় সহকারে তোমাদের নিজ নিজ কর্ম্মক্ষেত্রে ২০ বৎসর বা ততোধিক কাল ধরিয়া সমানে লাগিয়া আছ, কোন কোন স্থলে আবার সমগ্র জীবন একটা স্থানে কামড়াইয়া পড়িয়া আছ, কারণ, তোমাদের অবসর দিয়া তোমাদের স্থলে বসাইবার উপযুক্ত লোক পাওয়া যায় নাই।

সত্যই, আমাদের প্রভু এবং তাঁহার মনোনীত আমাদের সঙ্ঘের মূলনেতা তোমাদেরই মধ্য দিয়া দরিদ্র ভারতে এবং অন্য অধিকতর সৌভাগ্যশালী দেশসমূহে অদ্ভুত কার্য্য সাধন করিয়াছেন, কিন্তু উহাপেক্ষা বড় বড় কায এখনও বাকী পড়িয়া রহিয়াছে। আর আমাদের প্রভু ও স্বামীজী সময়ে তোমাদেরই মধ্য দিয়া উহা সাধন করিবেন, যদি তোমরা তাঁহাদের পবিত্রতা, সঙ্কল্পের একনিষ্ঠতা, তাঁহাদের স্বার্থত্যাগ এবং যাহা কিছু সত্য, যাহা কিছু শুভ, যাহা কিছু মহৎ—তৎসমুদয়ের উপর আত্মসমর্পণরূপ তাঁহাদের জীবনের মহান্ গুণরাশির অনুকরণ করিতে পার এবং এত দিন যে বিনয় ও নম্রতার সহিত তাঁহাদের পদানুসরণ করিয়াছ, যদি এখনও তাহাই করিয়া যাইতে পার। কারণ, যদি আমরা তাঁহাদের কার্য্য করিতে অন্য ভাব লইয়া অগ্রসর হই, এবং তাঁহাদের কার্য্য করিতে নির্ব্বাচিত হইয়া এত দিন উহা করিতে পাইয়াছি বলিয়া যদি আমরা অহঙ্কারে ফুলিয়া উঠি, তবে আমরা—সেই কর্ম্মক্ষেত্র হইতে একেবারে অপসারিত হইয়াছি এবং আমাদের স্থানে কার্য্য করিবার জন্য অপরে নির্ব্বাচিত হইয়াছে—দেখিয়া শীঘ্রই আমাদিগকে শোকের অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে হইবে। বাইবেলে উল্লিখিত তথাকথিত ঈশ্বর-নির্ব্বাচিত ইস্রায়েলিটদের কথা স্মরণ কর—তাহারা—শ্রীপ্রভুর কথা এবং 'প্রভু অতি সামান্য ধূলিকণা হইতে পর্য্যন্ত তাঁহার কার্য্য করিবার লোক গড়িয়া তুলিতে পারেন'—তাঁহার এই সাবধনবাক্যে কর্ণপাত করে নাই এবং তাহার ফলে তাহারা কি দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছিল—ভাবিয়া দেখ। এই প্রসঙ্গে ভারতে এক সময়ে আমাদের কতকগুলি প্রবল সম্প্রদায়ের দুর্গতির কথাও স্মরণ রাখিও।

অতএব বিগত ত্রিশ বর্ষ ধরিয়া আমাদের মিশন যেরূপ বিস্তারলাভ করিয়াছে, ইহা ভাবিতে গেলে যদিও আশ্চর্য্য হইতে হয়, ঐ সঙ্গে সঙ্গে গভীরভাবে এ প্রশ্নটিও আপনা আপনি আসিয়া পড়ে যে, এই বিস্তারের ফলে কি আমাদের আন্দোলনের প্রথমাবস্থায় যে প্রবল ত্যাগের ভাব ও আদর্শের উপর প্রবল অনুরাগ ছিল, তাহা অনেকটা কমিয়া গিয়াছে, অথবা যে কার্য্য আমরা প্রথমে আদর্শের উপর তীব্র অনুরাগবশে ঐ আদর্শের জয়ঘোষণার জন্য করিতাম, তাহা বর্ত্তমানে আমাদের নামযশোলিপ্সা, ক্ষমতাপ্রিয়তা ও নিজ নিজ পদগৌরবের প্রতি অতিরিক্ত আসক্তিবশতঃ দাসত্ব ও বন্ধনে পরিণত হইয়াছে! সত্যই এক্ষণে এই সকল গুরু প্রশ্নের বিচার, চিন্তা ও সমাধানের—খাঁটি শস্য হইতে তুষ এবং বিশুদ্ধ ধাতু হইতে খাদ বাছিয়া পৃথক্ করিবার সময় আসিয়াছে।

এই বর্ত্তমান মহাসম্মেলন তোমাদিগকে এই সুযোগ দিবার জন্য আহূত হইয়াছে। ইহাতে সমবেত হইবার ফলে তোমরা তোমাদের অনেক বয়োজ্যেষ্ঠ বা তোমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী সহকর্ম্মীদিগের সহিত এবং গুরুজনদিগের সহিত মিলিত হইবার এমন সুযোগ ও সৌভাগ্য লাভ করিয়াছ, যাহা সচরাচর ঘটে না। এই মহাসম্মেলনে যোগ দিয়া তাঁহাদের অভিজ্ঞতা হইতে তোমরা অনেক শিক্ষা পাইবার সুযোগ পাইবে—সমগ্র মিশনের কল্যাণের জন্য তাঁহাদিগের সহিত মিলিত হইয়া ভবিষ্যৎ কার্য্যপ্রণালী বিষয়ে আলোচনা করিয়া একটা স্থির করিতে এবং আমাদের সঙ্ঘের এই সঙ্গীন অবস্থায় সর্ব্বসাধারণ কর্তৃক উহার প্রচারিত ভাবরাশি পরিগৃহীত হইবার ফলে যে সকল বিপদ্ ও দোষ প্রবেশ করে বলিয়া ইতঃপূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, তাহা হইতে নিজেদের দূরে রাখিবার অবকাশ পাইবে। আমি তোমাদিগকে অনুরোধ করিতেছি, তোমরা সকলে অকপট ও সরলভাবে এই মহাসম্মেলনে যোগ দিয়া ভাল করিয়া তন্ন তন্ন করিয়া আমাদের অনুষ্ঠিত সমুদয় কার্য্যগুলি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখ, তোমরা এই অদ্ভুত বিস্তারের জন্য যাহা কিছু প্রয়োজন, সেগুলি করিতে যাইয়া আমাদের সেই গৌরবময় আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছ কি না। আদর্শটিকে দৃঢ়ভাবে ধরিয়া থাক, কারণ, সেই আদর্শের ভিতরই প্রত্যেক আন্দোলনের সঞ্চিত শক্তি—কুণ্ডলিনী—নিহিত থাকে। নিজেকে ও অপরকে ইহারই তীব্র আলোকে বিচার করিয়া লও। ইহা যদি করিতে পার, তবেই তোমরা আমাদের কার্য্যের ভবিষ্যৎ স্থায়িত্ব ও উন্নতিসাধনের সহায়তা করিয়া এই মহাসম্মেলনকে সাফল্যমণ্ডিত করিবে।

এইরূপ সম্মেলন ভারতের ইতিহাসে নূতন নহে—ইহা যেন স্মরণ রাখিও—এইরূপেই আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী সঙ্ঘসমূহের উন্নতিসাধনের চেষ্টা হইয়াছিল—আমরাও সেই প্রাচীন, বারংবার পরীক্ষিত পথে ভ্রমণ করিবার জন্যই তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছি। প্রাচীনকালে বৌদ্ধগণ কয়েকবার এই প্রণালী অবলম্বন করিয়া তাঁহাদের সঙ্ঘের উন্নতিবিধানের চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইহার ফলে তাঁহাদের সঙ্ঘ খুব বিস্তৃতিলাভ করিয়াছিল এবং সুদীর্ঘকাল ধরিয়া তাঁহাদের মহৎ কর্ম্মের সর্ব্বনাশ বা বিলোপসাধন ঠেকাইয়া রাখিয়াছিল। যীশুখৃষ্ট ও মহম্মদের শিষ্যগণও তাঁহাদের সঙ্ঘজীবনের প্রাচীন যুগে সময়ে সময়ে স্ব স্ব সম্প্রদায়ের উন্নতিবিধানার্থ এই প্রণালী অবলম্বন করিয়াছিলেন। সুতরাং এই কার্য্যপ্রণালী কিছু নূতন নহে—কিন্তু যাঁহারা এক্ষণে নিজেদের বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ইহা প্রয়োগ করিতে যাইতেছেন, তাঁহাদের অকপটতা ও লক্ষ্যের একতানতার উপরই এই প্রণালীপ্রয়োগের সফলতা সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে। অতএব তোমরা স্বেচ্ছায় যে কার্য্যসাধনে উদ্যোগী হইয়াছ, তাহা শ্রীপ্রভুর কৃপায় যত দিন না সমাপ্ত হইতেছে, তত দিন প্রাণপণে খাটিতে থাক—আমাদের নেতা আচার্য্য স্বামী বিবেকানন্দের প্রিয় 'উঠো, জাগো, যত দিন না লক্ষ্যে পৌঁছিতেছ, তত দিন অনলসভাবে অগ্রসর হইতে থাক', এই কথাগুলি বলিয়া আমি তোমাদের প্রত্যেককে উহাতে নিযুক্ত হইতে আহ্বান করিতেছি। বন্ধুগণ, ভ্রাতৃগণ, সন্তানগণ, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আদর্শপ্রচাররূপ কর্ম্মক্ষেত্রে সহকর্ম্মিগণ, আমি আমাদের প্রভু শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পবিত্র নাম লইয়া, আমাদের জগদ্বিখ্যাত নেতা স্বামী বিবেকানন্দের নাম লইয়া এবং আমাদের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি আমাদের প্রভুর প্রিয়তম অন্তরঙ্গ স্বামী ব্রহ্মানন্দের নাম লইয়া—তোমাদের সকলকে স্বাগতসম্ভাষণ করিতেছি।
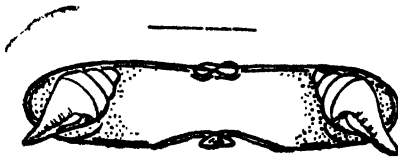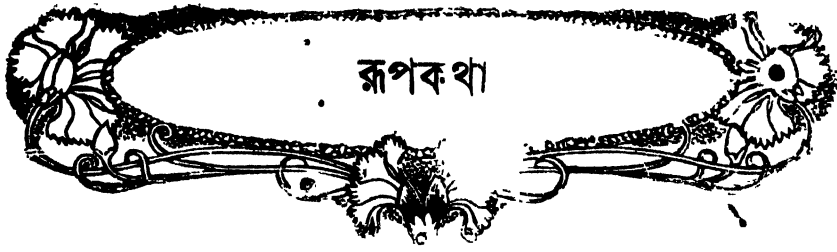
বর্ত্তমানে সুখের স্বপ্নে আমাদের এই বাঙলাটুকুকে নিয়ে কত লোকে কত রকম ক'রে মনে মনে গড়ছে। কেউ গড়ছে বীরের বাঙলা, কেউ সোনার বাঙলা, কেউ স্বাধীন বাঙলা, কেউ স্বরাজ বাঙলা। আমার কিন্তু বড় ভাল লাগে সেই রূপকথা-রাজ্যের কল্পনার বাঙলা। আজ এই চৈত্রের চাঁদনী রাতে, চালাঘরের দাওয়ায় বসন্তের হাওয়ায় শুয়ে, মা'র কোলে মাথা রেখে, বেলফুলের গন্ধ মেখে, কচি আম নুণ দে' চেখে, সহজ বাঙলার সেই রূপকথার রাজ্যে ফিরে যাবার বড় সাধ হয়েছে।

আয় রে ফিরে সেই সুখের শৈশবকাল, সেই তরল নিশ্বাস, সরল বিশ্বাস, সেই জীবনের সত্যযুগ, যখন বইতে বাছার সকল ভার, বরাৎ নোয়া ছিল মা'র, ক্ষিদের আগে দিতেন মুখে খাবার, ঘুম পাড়াতেন কোলে শুলে, মাসী-পিসীকে ডেকে ছুলে ছুলে।

যখন এই বাঙলা দেশে, ছেলে ধরতো বর্গী এসে; কড়ি-গাছে কড়ি ফল্‌তো, শ্যাল-কুকুরে বিয়ে চল্‌তো; পক্ষি-রাজ সব ছিল ঘোড়া, রাক্ষস ছিল মুখোস্‌-মোড়া; কাঠের অশ্ব খেতো পানি, যেতো বনবাসে দুয়োরাণী, আরো কত কত গল্প, মনে পড়ে অল্প অল্প; যেমন:—এক নগর ছিল দে-গঙ্গায়, সেথায় রাজা ছিলেন মাণিক রায়। সে কি যে-সে রাজা, তার পেরতাপে বাঘে-গরুতে এক ঘাটে জল খেতো। সে রাজার কি ঐশর্য্যি, দেখে আশ্চর্য্যি হ'ত চন্দর-সূর্য্যি। মেয়েরা নাইতে গেলে সরোবরে, ছেলেরা যেতো আঁচল ধোরে, কুমোর-বাড়ীর পোণে পোড়া, কাঁকালে সব সোনার ঘড়া, বাড়ী ফিরে দেখতো অন্নপূর্ণা, আপনি দেছেন চড়িয়ে রান্না; মা'র পিঠে এক ঢাল চুল, ভাত ফুটছে যেন মল্লিকে ফুল; রান্না হয়েছে ডাল-ডালনা শাক্‌-সড়সড়ি, থোড়ের কড়ি বড়ী চচ্চড়ি। পাতা পেতে সব খেতে ব'সে গেলো, খেয়ে উঠে কেউ শুলো, কেউ ঘুমুলো, কেউ খেল্‌তে বস্‌লো দশ-পচিশ;—"কি রে ঘুমচ্ছিস, হুঁ দিবি, তবে গল্প বল্‌বো, নইলে ঘুমো।". "হুঁ হুঁ হুঁ ঘুমুই নি, তুমি বল।"

সে এক দিন ছিল রে দিন ছিল; দেনা ছিল না, পাওনা ছিল না, ঘরে হ'ত না চাল বাড়ন্ত, ছিল না সুখের অন্ত, টেক্স ছিল না, খাজনা ছিল না—কোনো বালাই ছিল না। কখনও একটু চুরী-ফুরী হ'লে কোটাল চোরকে ধ'রে নিয়ে গে' শূলে দিতো, রাজা তিন দিন উপোস করতেন—বাস্‌, সব চুকে যেতো।

* * * * * *

রাজবাড়ীর ছিল মস্ত একটা ইটের ফটক, তার ভেতর দিয়ে হাওদাশুদ্ধ হাতী গ'লে যেতো, ফটকের মাথায় দুধারে দুটো বৃহৎ বৃহৎ মৎসি আর পাশের পিল্‌পের দুদিকে দুই সবুজ নীল সেপাই। সাম্‌নেটা ইটের পাঁচীল, রাম-রাবণের যুদ্ধ আর মহিষাসুর-বধের ছবি আঁকা, আর চারদিকে বাঁশের বেড়া। কেল্লাও ছিল একটা মস্ত বাঁশের কেল্লা, তার ভেতর শত্রুপক্ষের মক্ষিটি পর্য্যন্ত প্রবেশ করতে পারতো না।

রাজা বস্‌তেন এক প্রকাণ্ড চণ্ডীমণ্ডপে, আধ হাত পুরু উলু দিয়ে ছাওয়া, বেড়ায় সব শেতলপাটী মোড়া, তার ওপর মাঝে মাঝে অস্তর বসানো, ভেতরে কাশ্মীরী শালের চাঁদোয়া, তাতে জরীর ঝালর, ঝাড়-লাণ্ঠান সব ঝুলছে; পেছনে অন্দর, রাণীদের সব এক একটা গোলপাতার মহল, চালের ওপর সব সোনার কলস, রূপোর কলস।

প্রভাত হয়েছে, রাজা সকালবেলার একটু পূজো-আচ্ছা সেরে সভায় বার দিয়ে বসেছেন; সাত আট পুরু গদীর ওপর যোড়াসন হয়ে বসেছেন রাজামশাই; কার্ত্তি-কের মত বাব্‌রি চুল, তার উপর সোনার কাজ-করা তাজ, দুকানে দুই পান্নার মুক্তোর বীরবৌলী; গোঁফ যোড়াটি যেন তুলি দিয়ে আঁকা, কপালে চন্দন, দু'হাতে দুই হীরের বাজুবন্ধ আর সোনার কঙ্কণ, বুকযোড়া মুক্তোর হার, তার

মাঝখানে তুলসীর মালা, পরণে গঙ্গাজলি গরদের যোড়। রাজার ডানদিকে কাশীর গালচে পাতা, সেখানে বসেছেন সব ব্রাহ্মণপণ্ডিতরা, বাঁ-দিকে কত রকম রঙের চিত্তির বিচিত্তির করা মেদিনীপুরে মাছুর, সেখানে বসেছেন পাত্তর মিত্র সভাসদ্। রাজার পিছনে শ্বেত ছত্তর ধ'রে দাঁড়িয়ে আছে রাজবাড়ীর সেই বুড়ো ভৈরব চোপদার, দুপাশে দুটি অষ্টম বর্ষের মেয়ে চাঁমর করছে, বাইরের রকে প্রজারা সব হাত যোড় ক'রে ভূমিষ্ঠি হয়ে প্রণাম কচ্ছে। কোন ব্রাহ্মণ পুরাণ পাঠ কচ্ছেন, কেউ বা পাঁজী দেখছেন, এক জন খাঁ শোলোক উত্তরী ক'রে এসে রাজাকে শোনাচ্ছেন। এমন সময়ে বাইরে একটা কলরব উঠলো, সকলে চেয়ে দেখে যে, দশ বারো জন গাঁটা-গোঁটা গলায় পৈতে ব্রাহ্মণ, চার জন চৌকীদারকে বেঁধে মারতে মারতে রাজসভায় এনে উপস্থিত কল্লে। রাজা শশব্যস্ত, মন্ত্রী মশাই সন্ত্রস্ত, সভায় ব'সে ছিলেন যে বামুন-ঠাকুররা, তাঁরা একেবারে খড়্গহস্ত, ভটচার্য্যি মশাইদের এ কষ্ট কে দিয়েছে! রাজা হুকুম দিলেন, পাকেরা গিয়ে চৌকীদারদের ধল্লে। মন্ত্রীমশাই যোড়হস্ত হয়ে বামুনদের অভ্যার্থনা ক'রে সভায় বসিয়ে পাখা করতে লাগলেন।

ব্যাপার কি! আজ একাদশী—দানবাড়ীতে রাজ্যের যত বামুন আজ আধসের ক'রে চালের মুঠি পাবে; ঠাকুররা এ ওকে ঠেলে হুড়োমুড়ি ক'রে ভেতরে ঢোক্‌বার চেষ্টা কচ্ছিলেন, চৌকীদারদের মানাও শোনেননি—তাই একটা গোঁয়ার চৌকীদার নীলমণি চক্রবর্ত্তীর গায়ে হাত দিয়ে একটু সরিয়ে দেয়, তাতে অন্য সব বামুনরা রাগত হয়ে চারটে চৌকীদারকে ধ'রে রাজদরবারে এনে হাজির করেছে। সর্ব্বনাশ! এ রাজ্যে পাপ ঢুকেছে। ব্রাহ্মণের গায়ে হাত!

রাজার বুড়ো পিসে মশাই কমলনারাণ বাবু হচ্ছেন রাজ্যের সেনাপতি, তাঁর তাঁবে প্রায় আড়াই শো তিন শো ভোজপুরী ব্রজবাসী ঢাল-তরোয়াল সড়কী বেঁধে রাজ্যি রক্ষা করে। রাজা কমলনারাণ বাবুকে ডেকে বল্লেন, "পিসে-মশাই, বিচার-ভার আপনার ওপর, চৌকীদারদের যাতে বিশেষ শাস্তি হয়, তা দেখবেন।" মন্ত্রী উমাচরণ বক্সী ব'লে দিলেন যে, সেনাপতি মশাই, বিশেষ বিবেচনা ক'রে বিচার করবেন, স্মরণ রাখবেন যে, রাজ্যে পাপ ঢুকেছে, ব্রাহ্মণের গায়ে হস্তার্পণ করেছে, এর জন্য স্বয়ং মহারাজকে পক্ষিণী অশৌচ গ্রহণ ক'রে স্বত খেয়ে থাকতে হবে, আর একান্ন কাহন কার্যাপণ দিয়ে প্রাশ্চিত্তি করতে হবে।

নিত্যি নিত্যি এম্‌নি সভা হয়। এখনকার মত আইন, ফ্যাসাদ, মোকর্দ্দমা, কোন আপদ নেই, প্রজারা খায়-দায় সুখে-স্বচ্ছন্দে থাকে; রাজা পূজো-আচ্ছা, পুরাণপাঠ নিয়ে, গো-ব্রাহ্মণ রক্ষা ক'রে মনের সুখে রাজ্য করেন। বার-বেলা, কালবেলা, অশ্লেষা, মঘা, যাত্রা নাস্তি, সব শুভকর্ম্মের ওপর বেশ লক্ষ্যি।

রাজার দুই রাণী;—সুয়ো আর দুয়ো। সুয়ো রাণীর নাম চঞ্চলা, দুয়ো রাণীর নাম গোবিন্দমণি। সুয়ো রাণীর মস্ত ঘর—চিত্তির বিচিত্তির করা খাট, পালঙ, সিন্দুক, প্যাঁটরা, কড়ির আল্‌না, কড়ির ঝালর, রূপোর পিলসুজ, সোনার পিদ্দিম। চঞ্চলা পান চিবিয়ে পিচ ফেলেন সোনার ডাবরে, মুখ মোছেন নেতের গামছায়, পঞ্চাশ ব্যঞ্জন-ভাত খান সব সোনা-রূপোর বাসন ছড়িয়ে। একটা ঝি চুল বেঁধে দেয়, একটা দেয় পা মুছিয়ে—এম্‌নি কত ঝি! এক একটা ঝিয়ের গায়েই বা কত গয়না! রূপোর পঁইচে-বাউটীর ভারে আর অম্বারে মাগীরা মাটীতে যেন পা দিয়ে চলে না—গজেন্দ্রগমন। আর দুয়ো রাণী গোবিন্দমণির কুঁড়েঘরখানি সেই কুয়োতলার পাশে। মাথায় নেই তেল, গায়ে খড়ি উঠছে, পরণে মলিন বসন, কাঁথায় থাকেন শুয়ে, পাথর পেতে খান পান্তা ভাত, রাজা একবার ভুলেও মুখপানে চান না। এক ইচ্ছে ব'লে বুড়ো ঝি মাইনে-টাইনে না নিয়ে রাণীর সেবা-শুশ্রূষা করে।

* * * *

রাজ্যির মধ্যে এক জন গণ্যি-মান্যি বড় লোক ছিলেন, বিশ্বম্ভর বদ্দি, সবাই তাঁকে রাজবদ্দি বলতো। কবরেজ মশাইয়ের হাতযশের কথা বেহ্মাণ্ডের লোকে জানতো; রুগী লুকিয়ে কুপথ্যি কল্লে তিনি নাড়ীতে হাত দিলে-ই টের পেতেন, রোগ তাঁর ডাক শুনতো, ওষুধ তাঁর কথা কইতো; তিনি যা তেল তৈরী করতেন, তা পায়ের তেলোয় মাখালে বেহ্মতেলো দিয়ে চুঁইয়ে বেরোতো। চণ্ডীমণ্ডপের সামনের উঠোনে সব বড় বড় জালা পোতা থাকতো, কোন জালায় এক শো বছরের ঘি, কোনটায় দেড় কুড়ি

বছরের পুরানো তেঁতুল, কোনটায় রামরাবণের কালের গুড়, কোনটায় বা দেড় শো বছরের আমানী, সে আমানীর কি গুণ, এক ঝিনুক খাইয়ে দিলে গঙ্গাযাত্রা-করা গিন্নীণী রুগী বাড়ী ফিরে আস্‌তো।

কবরেজ মশাই কারুর কাছে হাত পাততেন না ; রাজ-বাড়ীর মাসোহারা বরাদ্দো ছিল, জমীজমাও দেওয়া ছিল ; রাজার খরচায় সোনা রূপো হীরে মুক্তো গুঁড়িয়ে পুড়িয়ে ওষুধ তৈরী হতো, কবরেজ মশাই তা রাজ্যিশুদ্ধ রুগীকে বাঁটতেন। কিন্তু সবাই তাঁকে এত ভক্তি-শ্রদ্ধা করত যে, যার বাড়ী যেটি হবে, আগে যাবে কবরেজ মশায়ের বাড়ী। ক্ষেতের ভাল ধান, বরজের পান, মাচার লাউ, চালের কুম্‌ড়ো, গাছের আঁব, কাঁঠাল, গাই বিওলে দুধ, মাছ ধরালে রুই, সব মাথায় ক'রে নিয়ে গিয়ে কবরেজ মশায়ের বাড়ী দিয়ে আস্‌তো।

পূজোর সময় তরী-তরকারী, ফলমূল, চাল, ডাল, গুড়, বাতাসা, দই, দুধ, ডোমসজ্জা, কুমোরসজ্জা এত জমতো যে, বদ্দিবাড়ীর পূজোয় অঢের কুলিয়ে আরও দশখানা বামুনের বাড়ীর পূজো সম্পন্নি হ'ত ; আর কি খাওয়ানটাই খাওয়া-তেন কবরেজ মশাই। অত বড় মানুষ, কিন্তু নিজে যোড় হাত ক'রে বাড়ী বাড়ী ব'লে আসতেন যে, কারু ঘরে তিনটি দিন যেন হাঁড়ী না চড়ে।

নিশিকান্ত ব'লে একটি ছেলে বই কবরেজ মশায়ের আর কোন সন্তান-টন্তান হয় নি। হবে না হবে না ক'রে কবরেজ-গিন্নীর বেশী বয়সে এই ছেলেটি হওয়ায় বাপ মা দুজনেই তাকে চোখের আড়াল করতে পারতেন না ; ঘরেই এক জন গুরুমশাই রেখেছিলেন, সেই তালপাতে কলাপাতে লেখাতো। নিশি নামটি বড় একটা যে সে জান্‌তো না ; ছেলেবেলা থেকেই মা বাপ যে কোকন কি না খোকা ব'লে ডাকৃতেন, আটগণ্ডা বয়স পেরিয়ে গেলেও দেশশুদ্ধ লোক বিশুবদ্দির ছেলেকে 'কোকন বাবু' 'কোকন বাবু' ব'লেই ডাকৃতো।

অত বড় বাপের ব্যাটা, কিন্তু এই আদরে আদরে লেখাপড়া কিচ্ছুই হ'ল না। জাত্‌-ব্যবসা শেখাবার জন্যে বড় কবরেজ মশাই অনেক সময় ছেলেকে ডেকে কাছে বসাতেন বটে, কিন্তু দেখতেন সমসকোঁকৃতো বলতে কোকনের চোয়ালে ব্যথা হয়, আর বড়ী-তেলের গন্ধে বাছার গা এড়িয়ে ওঠে, তাই তখনই বল্‌তেন, "যাও কোকন্‌ বাবু, একটু বাগানে বেড়িয়ে এস।"

বিয়ে হয় নি ব'লে কোকনের কিন্তু কোন ভাবনা ছিল না। তার স্বভাব-চরিত্তিরটি ছিল খুব ভাল, কারুর দিকে উঁচু নজরটিতে চাইতো না, আর তার জানা ছিল যে, বাপের তার দৈবী বিদ্যে, শুধু প'ড়ে শুনে অমন চিকিৎসা করতে কেউ পারে না ; তাই মনে করতো, এক দিন না এক দিন তার বাপ তার কানে কানে দৈবী বিদ্যেটা শিখিয়ে দেবে।

ক্রমেই কবরেজ মশার বৈদ্ধ অবস্থা হ'ল ; চার কুড়ি বছর পার হবার পর দু একগাছা চুল শেনি সাদাও হ'ল, দাঁত দিয়ে ছাড়িয়ে খেতে গেলে আকের এঁশোগুলো যেন দাঁতের ফাঁকে ঢুকে যেতো, তাই এনানী টিক্‌লি ক'রে খেতেন। আর কেউ কেউ বলে যে, সন্ধ্যের পর ছুঁচে সুতো দিতে হ'লে কোকনকে কাছে ডাকৃতেন।

সে কালের লোক সঞ্চয় করতে জান্‌তো না, কি মেয়ে কি পুরুষ পাঁচ জনকে ডেকে তাদের পাতে ভাত বেড়ে দিতে পাল্লেই আহ্লাদে আটখানা হ'ত। এই পাঁচ জনকে দিয়ে বেঁটে সেটে খাওয়া আর তার ওপর যদি একটু পূজো-আচ্ছার বন্দোবস্ত থাকতো, তা হ'লে লোকের সুখের সীমা-পরিসীমা থাকৃতো না, আর সেই জন্য কবরেজ মশাই ছেলেটার জন্যে এক একবার একটু একটু ভাবতেন।

এক দিন বিশু বদ্দির একটু সর্দ্দির মত হ'ল ; কট-ফলের নস্যি নিলে-ও যাঁর নাক সঁড়সড় করতো কি না সন্দ, তিনি কি না গেল রেতে পাঁচ ছ বার আপনা আপনি হেঁচেছেন। দেশের বুড়ো-বুড়ীরাও কেউ মনে ক'রে বল্‌তে পারে না যে, তারা কবরেজ মশায়ের কোন ব্যামোর কথা কখনও শুনেছে কি না। আর কবরেজেরই বা অসুখ করবে কেন? যে নিজের ব্যামো সামলাতে পারে না—সে পরের রোগ তাড়াবে!

তিন কুড়ি বছর ধ'রে সন সন যে মা'র প্রতিমের পায়ে ফুল-গঙ্গাজল দিয়েছেন, সেই মা এ্যাদ্দিন পরে তাঁকে নিজের কাছে ডেকেছেন ব'লে কবরেজ মশায়ের মনটায় বড় আনন্দ হ'ল। তবু রক্তমাংসর টান যাবে কোথায়? কোকনের ভাবনাটা—। গিন্নীকে বললেন, "একবার ওকে ডাকো ত।"

সোয়ামীর মুখ দেখে সতী সাবিত্রীও ভেতরে ভেতরে সব বুঝেছেন, এক পাত সিঁদুর আর তাঁর লুকোনো বিয়ের চেলীখানি বারটার ক'রে ঠিক ক'রে রেখেছেন, যেন আবার ক'নে সেজে নতুন শ্বশুরবাড়ী যাবেন; এখন স্বামীর কথা শুনে বাইরে বেরিয়ে গেলেন, ছেলে এসে ঘরে ঢুকলো।

একখানি বালাপোষ গায়ে জড়িয়ে, তাকিয়ায় একটু বেশী হেলান দিয়ে কবরেজ মশাই পা ছড়িয়ে বসেছিলেন, ছেলেকে দেখে ইসারায় পুথির দিকে একটা আঙ্গুল বাড়ালেন। ছেলে প্রথমেই যে পুথিখানির ওপর হাত পড়লো, সেইখানিই ঝেড়ে আন্‌লে, আর বাপের মুখের ভাব বুঝে পুথি খুলে পড়তে লাগলো :—

"কদাচিৎ কুপিতা মাতা, নোদরস্থা হরীতকী" নিশি আরও পড়তে যাচ্ছিল, কবরেজ মশাই হাত তুলে নিষেধ ক'রে যেন ঐ শোলোকটাই আবার বল্‌তে বল্লেন। নিশি বার আষ্টেক "কদাচিৎ কুপিতা মাতা, নোদরস্থা হরীতকী" বল্‌তে বল্‌তে মুখ তুলে দেখে যে, বাপ দুটি চক্ষু মুদ্রিত ক'রে তাকিয়ায় মাথা রেখে শুয়েছেন আর বুকের কাছটা যেন একটু ঠেলে ঠেলে উঠছে;—মা ব'লে কেঁদে উঠে ডাকৃতেই মা ঘরে ঢুকে দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে সোয়ামীর পা দুখানি কোলে তুলে নিয়ে বস্‌লেন।

* * * * *

"আজ ঘুমো, কাল তখন বাকীটুকু বলবো" "বাঃ আমার এখনও ঘুম পায় নি, কবরেজ মশায়ের ছেরাদ্দ হোক্—কের্ত্তন—লুচীসন্দেশ—; "আ হাবা ছেলে, সে কালে কি লুচী-সন্দেশ ছিল? কেবল চিঁড়ে, দই, দুধ, ক্ষীর—" "আচ্ছা, তাই, তাই, তুমি বল,—"

"অ, পাগল, অত বড় ছেরাদ্দ, সে কি এক দিনের কায, রোস, চিঁড়ে কোটা হোক্—দই পাতা হোক্— "

[ক্রমশঃ।

শ্রীঅমৃতলাল বসু।

চৈত্র

১

ওগো চৈত্র, শেষ বসন্ত
বরষের শেষ মাস
তুমি মৃত্যু-পরশ-পাণ্ডু অধরে
জীবনের শেষ শ্বাস।

২

দ্বাদশ দলের বরষ-পদ্ম
তুমি তার শেষ দল;
আপনারে তুমি নিঃশেষ করি
বিলাইছ পরিমল।

৩

চারু মালিকার অশেষ গাঁথনি
তুমি তার শেষ ফুল;
তুমি পারাপার শেষ খেয়া তরী
ছেড়ে যাও যেন কূল।

৪

তুমি কামিনীর কোমল কণ্ঠে
যেন কোন গাওয়া গান!
থেমে গেছে তার সুর ঝঙ্কার
আছে গুঞ্জন তান।

৫

তুমি পূর্ণিমা শেষ যামিনীর
ম্লান কৌমুদী ধারা;
উষার আকাশে সঙ্গিবিহীন
উজ্জ্বল শুকতারা।

৬

মধু উৎসবে শেষ দূত তুমি
কি বারতা তব কও?
বসন্ত-মধু পেয়ালায় তব
ভরি লও, ভরি লও।

৭

এখন যে কলি ফোটে নাই তার
দাও আঁখি পাতে চুম,
তোমার মলয়-প্রণয়-পরশে
ভাঙ্গাও তাদের ঘুম।

৮

ওগো বাঞ্ছিত বঞ্চনা কারে
কোরো না বিদায়-বেলা,
বেদনা বিষাদে তিক্ত কোরো না
শেষ মিলনের মেলা।

৯

নিঃশেষ করি দাও যত আছে
বরষের বেচা-কেনা,
নব বর্ষের নূতন খাতায়
রেখ না পাওনা-দেনা।

শ্রীবনবিহারী গোস্বামী

এক রাজা যাবে পুন অন্য রাজা হবে
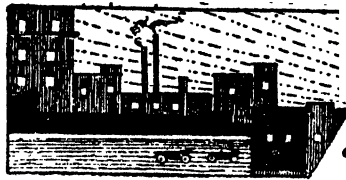
ভারতের বড় লাট লর্ড রেডিংয়ের কার্য্যকালের অবসান হইল, লর্ড আরউইন তাঁহার স্থানে এ দেশের শাসনদণ্ড গ্রহণ করিলেন। আমাদের বিলাতের ভাগ্য-বিধাতাদিগের বিধানে এমনভাবে বহুকাল যাবৎ এক জন যাইতেছেন এবং তাঁহার স্থানে আর এক জন আসিতেছেন। কিন্তু সে পরিবর্ত্তনে শাসন-নীতির কোনও পরিবর্ত্তনের লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। এ ক্ষেত্রেও যে যাইবে না, তাহা অস্তমিত ও উদীয়মান দুই রাজপুরুষের কথার আভাসেই বুঝিতে পারা যায়।

লর্ড রেডিং যখন এ দেশে প্রথম পদার্পণ করেন, তখন বলিয়াছিলেন, তিনি এ দেশে ন্যায়বিচারের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে আসিয়াছেন। তিনি ইংলণ্ডের প্রধান বিচারপতি ছিলেন, তাঁহার মুখে সে জন্য এ কথা খুবই শোভন হইয়াছিল। ভারতের লোক বহুবার কথার প্রতিশ্রুতি পাইয়া পরে আশাহত হইয়াছিল, এ কথা সত্য; কিন্তু তথাপি লর্ড রেডিংয়ের মুখে আশ্বাস-বাণী পাইয়া তাহারা মনে করিয়াছিল, হয় ত বা ইংলণ্ডের প্রধান বিচারপতি তুলাদণ্ডে ন্যায়বিচার করিবেন, কালা-ধলার মধ্যে কোনও তারতম্য রক্ষা করিবেন না, ভারতবাসীর ন্যায্য অধিকারে ভারতবাসীকে বঞ্চিত করিবেন না।

লর্ড রেডিং

কিন্তু পাঁচ বৎসরের অভিজ্ঞতায় আজ ভারতবাসী আবার আশাহত হৃদয়ে, অসন্তুষ্ট চিত্তে তাঁহাকে বিদায় দিতেছে। রাষ্ট্রীয় পরিষদে ভারতের elders (অতিবৃদ্ধগণ) শিষ্টাচার ও রাজভক্তির খাতিরে যতই তাঁহার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হউন, বিদায়ী বক্তৃতায় স্বয়ং লর্ড রেডিং ভারত-প্রীতির এবং ভারতের মঙ্গলে আপন কৃতিত্বের যতই পরিচয় দিউন, এ কথা নিশ্চিত যে, ভারত বলিতে যাহা বুঝায়, সেই ভারতের বিরাট জন-সাধারণ দীর্ঘ পঞ্চ বৎসরের শাসনে তাঁহার ন্যায়বিচারের কোনও পরিচয়ই প্রাপ্ত হয় নাই, অপ্রিয় সত্য হইলেও এ কথা নিরপেক্ষ সমালোচককে বলিতেই হইবে।

লর্ড রেডিং গত ২৫শে মার্চ্চ রাষ্ট্রীয় ও ব্যবস্থা-পরিষদের সম্মিলিত সম্মেলনে যে শেষ বিদায়ী বক্তৃতা দিয়াছেন, তাহাতে প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, তিনি তাঁহার পাঁচ বৎসর শাসনকালের মধ্যে ভারতের আইনানুগ শাসন-সংস্কারের সাফল্যসাধনের জন্য

ক্রমাগত চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, এই সময়ের মধ্যে ভারতে দায়িত্বপূর্ণ শাসননীতির ভিত্তি সুদৃঢ় হইয়াছে।

কিন্তু সত্যই কি তাই? আমাদের মনে হয়, তিনি যদি ইহার পরিবর্তে বলিতেন যে, তাঁহার শাসনকালে প্রত্যেক বিষয়ে জনমত পদদলিত করিয়া ভারতে বৃটিশ প্রাধান্যের মূল সুদৃঢ় করা হইয়াছে, তাহা হইলে তিনি প্রকৃত অবস্থা বর্ণনা করিতেন। জনমতের তীব্র প্রতিবাদ সত্ত্বেও জনসাধারণের সাধারণ অধিকার কাড়িয়া লইয়া অসাধারণ আইন জারি করাকে যদি ভারতের রাজনীতিক উন্নতি-সাধনের সোপান বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে লর্ড রেডিং সে উন্নতিসাধনের চেষ্টায় কার্পণ্য প্রকাশ করেন নাই।

লর্ড রেডিং বলিয়াছেন, ভারতের রাজনীতিকগণের সহিত তাঁহার ও তাঁহার বিলাতের প্রভুদিগের ভারতের শাসন-সংস্কার সম্বন্ধে কার্য্যপ্রণালীর অথবা সময়ের সম্পর্কে মতের পার্থক্য থাকিতে পারে, কিন্তু উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্যের কোনও প্রভেদ নাই। অর্থাৎ সোজা কথায় লর্ড রেডিং বা তাঁহার বিলাতের প্রভুরা তাঁহাদের হুকুম ও মর্জ্জি-মত যে ভাবে ভারতবাসীকে সহযোগের হস্ত প্রসারণ করিতে বলিয়াছেন এবং যে সময়ের সর্ত্ত বাঁধিয়া দিয়াছেন, তাহার অনুযায়ী হইয়া চলিলে হয় ত ৪।৫ শত বৎসর পরে ভারতকে প্রকৃত স্বায়ত্তশাসনের পথ তাঁহারা দয়া করিয়া দেখাইয়া দিলেও দিতে পারেন, কেন না, লক্ষ্য তাঁহাদের ভারতবাসীদেরই মত স্বায়ত্তশাসনাধিকারলাভ! কিন্তু লর্ড রেডিং একটা মস্ত ভুল করিয়াছেন। তিনি ভুলিয়া গিয়াছেন, এখনকার রাজনীতিক্ষেত্রে কথায় আর চিঁড়া ভিজে না। কথার ওস্তাদীতে ভারতবাসীকে ভুলাইয়া রাখা যে সময়ে সম্ভব ছিল, সে যুগ বহুকাল অতীত হইয়াছে।

লর্ড রেডিং বলিয়াছেন, উপর্য্যুপরি ৫ জন প্রধান মন্ত্রীর আমলে তিনি ভারতশাসন করিয়াছেন, কিন্তু এত পরি-বর্ত্তনেও তাঁহার শাসননীতি কেহ অগ্রাহ্য করেন নাই। নানা মন্ত্রীর পক্ষে নানা ভাবের রাজনীতি অনুসরণ করাই সম্ভব। অথচ ভিন্নমতাবলম্বী মন্ত্রীরা পর পর পাটে বসিয়া তাঁহার কোনও ব্যবস্থাই নাকচ করেন নাই। ইহাতে বুঝা যায়, বিলাতের জনসাধারণ ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের প্রবর্ত্তিত শাসন-সংস্কারনীতি হইতে কণামাত্র বিচলিত হইবে না।

ইহাতে কি প্রতিপন্ন হয় না যে, পৃথিবী ওলটপালট হইয়া গেলেও ভারত সম্পর্কে বিলাতের রাজনীতিক দল-সমূহের নীতির তিলমাত্র পরিবর্ত্তন হইবে না? শ্রমিক সরকারও ইস্পাতের কাঠাম সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন, বিনাবিচারে বে-আইনী আইনে ধরপাকড় ও নির্ব্বাসনের ব্যবস্থা অনুমোদন করিয়াছিলেন। সুতরাং এ বিষয়ে লর্ড রেডিংয়ের নূতন কথা বলিবার বা গর্ব্ব প্রকাশ করি-বার কিছুই নাই। আমরা জানি, ভারতবাসীর বন্ধু কেহ নাই, ভারতবাসীই ভারতবাসীর বন্ধু। যত দিন না ভারত-বাসী ভারতবাসীর প্রকৃত বন্ধু হয়, তত দিন শত শ্রমিক গভর্ণমেণ্ট ভারতের মুক্তিসাধন করিতে পারিবেন না।

লর্ড রেডিং নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে, শাসন-সংস্কার আইন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নহে, উহার অনেক পরি-বর্ত্তন-পরিমার্জ্জন আবশ্যক। তবে তিনি তাহা করিবার পরামর্শ দিলেন না কেন? তিনি বলেন, যে সর্ত্তে সেই পরিবর্ত্তন-পরিমার্জ্জন করা যায়, সে সর্ত্ত এখনও ভারত-বাসীরা পালন করে নাই, অর্থাৎ ভারতবাসীরা তাঁহার ও তাঁহার বিলাতী প্রভুদের কথা বেদবাক্য বলিয়া মানিয়া লইয়া কায়মনোবাক্যে সংস্কৃত কাউন্সিল সফল করিবার চেষ্টা করে নাই!

কিন্তু সত্যই কি তাই? সংস্কৃত কাউন্সিলের প্রথম ৩ বৎসর পূর্ণ সহযোগই ত দেওয়া হইয়াছিল। যাঁহারা সে সময়ে এই সহযোগ প্রদান করিয়াছিলেন, তাঁহারাও সংস্কার আইনের পরিবর্ত্তন কামনা করিয়া নিজ নিজ অভি-মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। শাস্ত্রী, সপরু, চিন্তামণি প্রভৃতি সহযোগকামীরা বার বার এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন। কত মন্ত্রী বলিয়াছিলেন, বর্ত্তমান অবস্থায় সংস্কার আইন unworkable. তাহার কি ফল হইয়াছিল? তাহার পর বাঙ্গালা ও মধ্যপ্রদেশ ব্যতীত অন্যান্য প্রদেশে ত বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও সংস্কৃত কাউন্সিল অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। অন্য সকল প্রদেশের কথা ছাড়িয়া দিলেও মাদ্রাজে ত সংস্কৃত কাউন্সিলের কার্য্য ব্যুরোক্রেশীরও মতে smoothly চলিয়া আসিয়াছে। তবে সেই প্রদেশকেও পুরস্কারস্বরূপ দায়িত্ব-পূর্ণ প্রকৃত স্বায়ত্তশাসনাধিকার দেওয়া হয় নাই কেন?

সুতরাং লর্ড রেডিং কথার খেলায় প্রকৃত অবস্থাকে ঢাকিয়া রাখিতে পারিবেন না।

লর্ড রেডিং আরও বলিয়াছেন যে, তিনি তাঁহার শাসন-কালে সর্ব্বদা ভারতের স্বার্থরক্ষার চেষ্টা করিয়াছেন। ইহা কি সত্য? তিনি কি ভারতের স্বার্থরক্ষার জন্য

(১) মুডিম্যান কমিটীর ভারতীয় সদস্যদিগের নির্দ্ধারণে কর্ণপাত করেন নাই?

(২) দক্ষিণ-আফরিকার প্রবাসী ভারতীয়ের অপমানের প্রতিশোধকল্পে দক্ষিণ-আফরিকার কয়লা লইতে নিষিদ্ধ হইয়াও কয়লা না লইয়া ভারতীয়ের স্বার্থরক্ষা করিয়াছেন?

(৩) ভারতের চাকরীতে ভারতীয় নিয়োগের সুবিধার জন্য লী কমিশনের নির্দ্দেশমত কালবিলম্ব না করিয়া শ্বেতাঙ্গ চাকুরীয়াদের বেতন, ভাতা ইত্যাদি বাড়াইয়া দিয়াছেন?

(৪) নানা কমিটী কমিশন নিয়োগ করিয়া তাহাদের নির্দ্ধারণ শিকায় তুলিয়া রাখিয়াছেন?

(৫) ভারতীয়ের অর্থে লাট-বেলাটের বিলাত যাইবার ছুটীর ব্যবস্থা করাইয়া লইয়াছেন?

আসল কথা, যে দিক দিয়াই দেখা যাউক, লর্ড রেডিংয়ের শাসনকাল নূতনত্ব-বর্জ্জিত সার ভ্যালেণ্টাইন চিরলের কথায় a bureaucratic atmosphere is generally deadening. আমলাতন্ত্র স্বৈরশাসনের আবহাওয়ায় কোন ভাল উদ্দেশ্যই গজাইয়া উঠিতে পারে না। লর্ড রেডিং সেই আবহাওয়ার মধ্যে আসিয়া যাহা কিছু সদুদ্দেশ্য লইয়া আসিয়াছিলেন, হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন।

তিনি তুর্কী সমস্যা ও খিলাফৎ সমস্যার সমাধান করিয়া ভারতীয় মুসলমানগণের সন্তোষবিধান করিয়াছেন, অশান্ত ভারতকে শান্ত করিয়াছেন, অর্থ-কষ্টের পরিবর্ত্তে ভারতের তহবিলে অর্থস্বচ্ছলতা আনয়ন করিয়াছেন, এই কথা বলিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছেন; অন্ততঃ তিনি স্বয়ং সমস্তটা না করুন, তাঁহার স্তুতিবাদকরা করিয়াছেন। কিন্তু এ সকল কার্য্যের জন্য আংশিক সুখ্যাতি তাঁহার প্রাপ্য হইলেও ভারতবাসী ভুলিতে পারিবে না যে, তাঁহারই শাসনকালে ভারতের দেশপ্রেমিক নেতৃবর্গ কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন, কর্ম্মী তরুণগণ বিনা বিচারে নির্ব্বাসিত হইয়াছেন, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন প্রমুখ দেশনেতৃগণ বার বার প্রীতির হস্ত সম্প্রসারণ করিয়াও প্রত্যাখ্যাত হইয়াছেন। সুতরাং লর্ড রেডিংয়ের শাসনকাল স্মরণীয় হইয়া থাকিবার মত যে কোনও যোগ্যতাই অর্জ্জন করে নাই, তাহা নিরপেক্ষ সমালোচকমাত্রকেই বলিতে হইবে।

লর্ড আরউইন

লর্ড আরউইন এ দেশে নূতন আসিয়াছেন। তিনিও এ দেশে আসিবার পূর্ব্বে বিদায়ী ভোজের বক্তৃতায় অনেক আশার কথা বলিয়াছেন। সংস্কার আইন সফল করিবার কথা, ভারতের কৃষির উন্নতিবিধানের কথা, ভারতের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিবিধানের চেষ্টার কথা, ভারতীয় ও ইংরাজের মধ্যে প্রীতির বন্ধন ও এক-যোগে ভারতের মঙ্গল-সাধনের কথা,—কত কথা বলিয়াছেন।

লর্ড আরউইন একটা কথা বলিয়াছেন,—"ভারতের জীবন-নদীতে যে প্রবাহ প্রাচীনতার পর্ব্বত হইতে জন্মগ্রহণ করিয়া অজানা ভবিষ্যতের সমুদ্র অভিমুখে অবিরাম ছুটিতেছে, ভারতের বড় লাটের ক্ষণস্থায়ী ব্যক্তিগত জীবন তাহার মধ্যে একটি সামান্য জলবিন্দুর মত।" কথাটা একটু তলাইয়া বুঝিলে অবস্থাটা বেশ পরিষ্কার হইয়া যায়।

পোষ্ট কার্ডের মূল্য

রাষ্ট্রীয় পরিষদে লালা রামশরণ দাস পোষ্ট কার্ডের মূল্য ৴১০ পয়সা হইতে ৴৫ পয়সা এবং জোড়া পোষ্ট কার্ডের মূল্য ৴০ হইতে ৴১০ পয়সা হ্রাস করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। বাণিজ্য বিভাগের সেক্রেটারী মিঃ লে ইহার

প্রতিবাদ করিয়া বলেন, (১) ইহাতে ৮৭ লক্ষ টাকা রাজস্ব কমিয়া যাইবে, (২) লোক খামে চিঠি না দিয়া পোষ্ট কার্ডে দিবে, সুতরাং উহাতে খাম হইতে আয়ও অনেক কমিয়া যাইবে। সুতরাং উভয় দিক হইতে সর্ব্বসাকুল্যে ১ কোটি টাকা আয় কমিয়া যাইবে। এই আয়-হ্রাস রোধ করিতে হইলে হয় নূতন করবৃদ্ধি করিতে হইবে, না হয় প্রাদেশিক বৃত্তির পরিমাণ কমাইয়া দিতে হইবে।

এই যুক্তির বিরুদ্ধে কোন কোন সদস্য বলিয়াছিলেন, সরকারের ডাক বিভাগ ত ব্যবসায়-বাণিজ্যের বিভাগ নহে যে, উহাতে আয়বৃদ্ধির দিকেই সর্ব্বদা নজর রাখিতে হইবে। এই বিভাগ সাধারণের উপকারার্থ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ৩০ কোটি লোকের উপকারের জন্য পোষ্ট কার্ডের মাশুল হ্রাস করা কর্ত্তব্য; মাশুল কমাইলে পোষ্ট কার্ডের চাহিদাও বাড়িবে সন্দেহ নাই। সুতরাং আয়-হ্রাসের সম্ভাবনা নাই।

কিন্তু এ সব যুক্তি-তর্ক ফলপ্রদ হয় নাই। ভোটে লালা রামশরণ দাসের প্রস্তাব পরিত্যক্ত হইয়াছে। হইবারই কথা। যে রাষ্ট্রীয় পরিষদ লর্ড রেডিংয়ের শাসনকালের সুখ্যাতির কথায় পঞ্চমুখ হইতে পারেন, সেই পরিষদের নিকট ইহার অধিক প্রত্যাশা করাই অন্যায়। সরকারপক্ষে মিঃ লে বলিয়াছেন, পোষ্ট কার্ডের মূল্যহ্রাসের ফলে যে আয় কমিয়া যাইবে, তাহার পূরণ করিতে হইলে হয় নূতন কর ধার্য্য করিতে হয়, না হয় প্রাদেশিক সরকারসমূহের 'বরাদ্দ বৃত্তির পরিমাণ হ্রাস করিতে হয়। কেন? তাহা না করিয়া সামরিক ব্যয় অথবা গোয়েন্দা পুলিসের বাবদে ব্যয় কিছু কমাইয়া দিলে কি উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না? 'কিন্তু ও দিকে হাত দিবার যো নাই,' যাহা বরাদ্দ করা হয়, তাহা settled fact, তাহার এক চুল এদিক ওদিক হইলে ভারত রক্ষা করা চলে না। সেইরূপ শৈল-বিহার, নূতন দিল্লী-নির্ম্মাণ, লাট-বেলাটের সফর ও ছুটী, ইস্পাতের কাঠামোর পেন্সন, ভাতা, রাহা ইত্যাদিও ঠিক সমান ওজনে বজায় রাখা চাই। কেবল দরিদ্র প্রজার লবণ-কর বা ডাক-মাশুল কমাইতে হইলেই পৃথিবী ওলটপালট হয়!

সার ব্রাডফোর্ড লেসলি

যে হাওড়া সেতু পুনর্নির্ম্মাণ প্রস্তাব লইয়া বর্ত্তমানে এত আন্দোলন হইতেছে, সার ব্রাডফোর্ড লেসলি সেই হাওড়া সেতুর প্রাণপ্রতিষ্ঠাতা ছিলেন, তিনি ৯৫ বৎসর বয়সে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। সার ব্রাডফোর্ড বহুকাল এ দেশে সরকারী চাকরী করিয়াছিলেন, হাবড়ার হুগলী ও বাঙ্গালার আর কয়টি সেতুর নক্সা প্রস্তুত ও তত্ত্বাবধান করিয়াছিলেন। আজ তাঁহার পরলোকগমনে অনেক কথা মনে পড়িতেছে। যখন প্রথম যৌবনে ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে সার ব্রাডফোর্ড গার্ডেন রিচে জাহাজ হইতে অবতরণ করেন, তখন হাওড়া ও কলিকাতায় পারাপারের জন্য একমাত্র ডিঙ্গি-পান্সীই অবলম্বন ছিল। তখন হাওড়া সেতুর কল্পনাও হয় নাই। যে দিন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে ভারতের শাসনভার হস্তান্তরিত করেন, সেই দিন সার ব্রাডফোর্ড এ দেশে পদার্পণ করেন। সে আজ কত দিনের কথা! তাহার পর কত যুগ অতীত হইয়া গিয়াছে। প্রায় পঞ্চাশৎ বৎসর পূর্ব্বে সার ব্রাডফোর্ড হাওড়া সেতু সাময়িকভাবে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। যত দিন না পাকা সেতু নির্ম্মিত হয়, তত দিন ঐ ভাসমান সেতুর দ্বারা কার্য্য চালান হইবে, তখন কর্ত্তৃপক্ষের এইরূপই সঙ্কল্প ছিল। কত বড় বড় এঞ্জিনিয়ার ভয় দেখাইয়াছিলেন যে, ঐ সেতু কায়েম হইবে না, গঙ্গায় বড় বান ডাকিলে সেতু ভাসিয়া যাইবে, অথবা ভাঙ্গিয়া চুরিয়া যাইবে। কিন্তু সার ব্রাডফোর্ডকে কেহই সঙ্কল্প হইতে টলাইতে পারেন নাই। তিনি হাওড়া সেতুর পরমায়ু যত দিন কল্পনা করিয়াছিলেন, সেতু তাহাপেক্ষা অনেক অধিক কাল বর্ত্তমান রহিয়াছে। মৃত্যুর মাত্র ৯ মাস পূর্ব্বেও তিনি ভাসমান সেতুর পক্ষে যুক্তি-তর্ক দেখাইয়া প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। লর্ড মেও তখন বড় লাট, সার ব্রাডফোর্ডের বিদ্যায় ও অভিজ্ঞতায় তাঁহার প্রগাঢ় আস্থা ছিল। যখন ভাসমান সেতুর উপর দিয়া লোক-চলাচল আরম্ভ হয়, তখন বাঙ্গালায় কত ছড়া কত গানই না রচিত হইয়াছিল! সেই এক দিন, আর আজ এক দিন!

বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন

ইষ্টার পর্ব্বের অবকাশকালে বীরভূমের সিউড়ি সহরে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের সপ্তদশ অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। প্রবীণ সাহিত্যিক রস-রাজ অমৃতলাল বসু মহাশয় এতদুপলক্ষে সভানেতৃত্ব করিয়াছিলেন। শ্রীমতী সরলা দেবী সাহিত্য-শাখার সভানেত্রী হইয়াছিলেন, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ দর্শনশাস্ত্রের, শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিহাস-শাখার, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাস গুপ্ত বিজ্ঞানশাখার নেতার আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। বাঙ্গালার মধ্যযুগের সাহিত্য-সেবিগণের মধ্যে বর্ত্তমানে এক কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত প্রসিদ্ধ নাট্যকার অমৃতলালের মত প্রাচীনতার দাবী করিবার অন্য কেহ আছেন বলিয়া জানা নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এ যাবৎ বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের সভাপতিপদে তাঁহাকে বরণ করিবার কথা সম্মিলনের উদ্যোক্তৃবর্গের স্মৃতিপথেই উদিত হয় নাই। এবার রবীন্দ্রনাথের অসুস্থতা নিবন্ধন শেষ মুহূর্ত্তে যে অমৃতলালের মত 'সেকেলে সাহিত্যিককে' সম্মানের আসন প্রদান করিবার সঙ্কল্প তাঁহাদের মনে উদিত হইয়াছে, এ জন্য আমরা তাঁহাদিগকে অশেষ ধন্যবাদ দিতেছি। যে স্থান বহু দিন পূর্ব্বে অমৃতলালের ন্যায্য প্রাপ্য ছিল, তাহা দৈবের খেলায় তিনি যে জীবনের সায়াহ্নেও প্রাপ্ত হইলেন, ইহা তাঁহার 'সৌভাগ্যের' কথাই বলিতে হইবে।

শ্রীমতী সরলা দেবী

'শেষ মুহূর্ত্তে' কর্ত্তব্যের বোঝা অমৃতলালের স্কন্ধে চাপাইয়া দিয়া সম্মিলনের কর্ম্মকর্ত্তারা তাঁহার নিকট হইতে বিশেষ অমৃত আহরণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, এমন ত মনে হয় না। উপযুক্ত অবসর ও সুযোগ পাইলে অমৃতলাল সুদীর্ঘ পঞ্চাশৎ বৎসরের বাঙ্গালা সাহিত্যের অভিজ্ঞতার ফল আমাদিগকে দিয়া যাইতে পারিতেন বলিয়াই মনে হয়। তবে অতি অল্পসময়ের মধ্যেই তিনি যে তাঁহার বৈশিষ্ট্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, এ কথা আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিব। অমৃতলাল তাঁহার অমৃতময়ী লেখনীর সাহায্যে তাঁহার অভিভাষণে আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যের যে অননুকরণীয় ব্যঙ্গচিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা বস্তুতঃই

শ্রীযুত কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়

যিনি সাহিত্যে নূতন সম্পদ দিয়া যান, যাঁহার প্রতিভায় সোনার কাঠির স্পর্শে সাহিত্যের ভাষা ও ভাবের মরা গাঙ্গে জোয়ার আইসে, তিনি যে ভাষাতেই তাঁহার মনোভাব ব্যক্ত করুন না, তাহা দেশের সাহিত্যানুরাগিমাত্রেই পরম দান বলিয়া মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিবে। রবীন্দ্রনাথ যে ভাষাতেই মনের ভাব ব্যক্ত করুন না, তাহা দেশের সাহিত্য-সম্পদ বৃদ্ধি করিবেই। কিন্তু তাহা বলিয়া অপরে যদি ভাবদৈন্য লইয়া কেবল তাঁহার ভাষার অনুকরণ করিয়া তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে যান, তাহা হইলে তাহাতে সাহিত্যের

শ্রীযুত হেমচন্দ্র দাসগুপ্ত

উপভোগ্য। বঙ্কিমচন্দ্রের সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার ফলে বাঙ্গালা সাহিত্য যে অমূল্য ভাবসম্পদ, শব্দবিন্যাস-চাতুর্য্য ও চরিত্র-চিত্র আদি দ্বারা শোভাসম্পন্ন হইয়াছিল, তাহা আধুনিক অপূর্ব্ব খিচুড়ী ভাষা ও বৈদেশিক, বিজাতীয় ভাববিভঙ্গে কিরূপ অভিনব আকার ধারণ করিয়াছে, তাহা অমৃতলাল সামান্ত দুই একটি উদাহরণ দ্বারা যেরূপ সুস্পষ্ট করিয়া তুলিয়াছেন, তাহা তাঁহাতেই সম্ভবে। বঙ্কিমচন্দ্র ও সুরেশচন্দ্রের নির্ভীক কশাঘাতের অভাবে আধুনিক রচনায় কিরূপ উচ্ছৃঙ্খলতা উপস্থিত হইয়াছে, তাহা অমৃতলাল প্রকৃত মঙ্গলকামীর ন্যায় নির্ম্মম অথচ ন্যায়বান্ সমালোচকের আসনে বসিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন।

ক্ষতি ব্যতীত লাভ নাই। এই ব্যর্থ অনুকরণ-প্রিয়তা বাঙ্গালা সাহিত্যে ঘৃণাজনক আবর্জ্জনার স্রোত আনয়ন করিয়াছে। অমৃতলাল এই স্রোতের বিপক্ষে তাঁহার তীব্র সমালোচনার বাঁধ দিয়া দেশের ও জাতির যে পরম উপকারসাধনের চেষ্টা করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

জাতিতত্ত্ব প্রবন্ধের বাদ-প্রতিবাদ

মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন সরস্বতী প্রমুখ কৃতবিদ্য বৈদ্যমণ্ডলী বৈদ্য-ব্রাহ্মণ-সমিতি প্রতিষ্ঠা করিয়া 'বৈদ্যপ্রবোধনী' নামে একখানি পুস্তক প্রচার করিয়া বৈদ্যগণকে প্রকৃষ্ট ব্রাহ্মণ প্রমাণ করিবার প্রয়াস পাইতেছেন।

কাশীবাসী প্রবীণ শাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিত, বহু শাস্ত্রগ্রন্থপ্রণেতা শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ কবিরত্ন মহাশয় "জাতিতত্ত্ব" প্রবন্ধ লিখিয়া তাঁহাদের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তাঁহার "জাতি-তত্ত্ব" প্রবন্ধটি 'মাসিক বসুমতী'তে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইতেছে। এরূপ বিচারপদ্ধতি ভারতের প্রাচীন যুগ হইতে চলিয়া আসিতেছে। প্রবন্ধের প্রারম্ভেই কবিরত্ন মহাশয় প্রতিবাদের আশা করিয়াছেন। তাঁহার ভ্রম প্রদর্শন করিতে পারিলে তিনি সানন্দে ত্রুটি স্বীকার করিবেন, এমন কথাও স্পষ্ট করিয়া লিখিয়াছেন। তাঁহার বক্তব্য শেষ না হইবার পূর্ব্বে কাহাকেও প্রতিবাদে প্রবৃত্ত না হইবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। কিন্তু এই প্রবন্ধ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে অনেকেই প্রবন্ধটির উদ্দেশ্য না বুঝিয়া, এমন কি, কেহ কেহ প্রবন্ধটি নিজে আদৌ না পড়িয়া, পরমুখে শুনিয়া, 'বসুমতী' বৈদ্য-বিদ্বেষ প্রচার করিতেছে, এমন কথা অবাধে প্রচার করিতেছেন। জাতীয় মিলনই 'বসুমতী'র কার্য্য—সেই মিলন-মন্ত্রই 'বসুমতী' চিরদিন প্রচার করিয়া আসিয়াছে—জাতিবিদ্বেষ প্রচার কোনমতেই 'বসুমতী'র মত উদারনৈতিক নিরপেক্ষ পত্রিকার উদ্দেশ্য হইতে পারে না। কবিরত্ন মহাশয়ও সত্যনির্ণয় ব্যতীত যে বিদ্বেষ-প্রণোদিত হইয়া এ বিচারে প্রবৃত্ত হয়েন নাই, ইহাও আমরা বিশেষভাবে জানি।

বৈদ্য মহাশয়গণ কিন্তু এ কথা না বুঝিয়া কবিরত্ন মহাশয়ের বক্তব্য শেষ হইবার পূর্ব্বেই প্রতিবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। অনেকগুলি প্রতিবাদ আমাদের হস্তগত হইয়াছে। বৈদ্য-সম্প্রদায় ব্যথিত হইয়াছেন—প্রতিবাদ প্রকাশের জন্য ব্যাকুল হইয়াছেন—এমন কি, বৈদ্য-সম্মিলনীর প্রেরিত প্রতিবাদ মুদ্রিত করিবার জন্য তাঁহারা মুদ্রণব্যয় লইবার জন্যও আমাদিগকে অনুরোধ করিয়াছেন; কিন্তু সে প্রস্তাব সসম্মানে প্রত্যাখ্যান করিয়া তাঁহাদের আকুল আগ্রহ প্রশমিত করিবার জন্য কবিরত্ন মহাশয়ের বক্তব্য শেষ হইবার পূর্ব্বেই বৈদ্য-সম্মিলনী-প্রেরিত শ্রীযুক্ত ভবতারণ ভট্টাচার্য্যের প্রতিবাদ মাঘ-সংখ্যায় প্রকাশ করিয়াছি। অন্যান্য যে সকল প্রতিবাদ আসিয়াছে, তাহার সবগুলিই যুক্তিযুক্ত ও বিচারসঙ্গত নহে এবং সকলগুলি প্রকাশ করিবার স্থান সঙ্কুলান হওয়াও সম্ভব নহে।

আশা করি, বৈদ্য-সম্মিলনীর প্রতিবাদেই প্রতিবাদকারী মহাশয়গণের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। প্রতিবাদ মুদ্রিত করিয়া যে বসুমতীর নিরপেক্ষতার পরিচয়, আশা করি, এ বিষয়ে কাহারও সন্দেহের অবকাশ নাই।

এরূপ একটি সিদ্ধান্তের মীমাংসার জন্য শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত-মণ্ডলীকে লইয়া মহতী সভা আহ্বান করিয়া, বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া, বোধ হয় ভারতের প্রাচীন যুগ হইতে এ কাল পর্য্যন্ত চলিয়া আসিতেছে। বৈদ্য-সম্মিলনীর এই নূতন সিদ্ধান্তের যথাযথ বিচার করিতে হইলে ঐরূপ একটি সভায় শাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিতমণ্ডলীকে আহ্বান করিয়া বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হইতে হয়। কিন্তু আপাততঃ তাঁহাদের ও ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের সেরূপ সভা আহ্বানের অবসর বা সুবিধা নাই। এরূপ সভা আহ্বান করা সময় ও ব্যয়সাধ্যও বটে। এই জন্যই কবিরত্ন মহাশয়ের বিচার আমরা 'মাসিক বসুমতীতে' প্রকাশ করিয়া কৃতবিদ্য সুধীজনকে সত্যনির্ণয়ের সুবিধা প্রদান করিয়াছি, সঙ্গে সঙ্গে বৈদ্য-সম্প্রদায়কেও বাদানুবাদে এ সিদ্ধান্ত মীমাংসার অবসর প্রদান করিয়াছি। 'মাসিক বসুমতী' তাঁহাদের তর্কের সভা। ইহার বাদানুবাদের সহিত 'বসুমতী'র কোনরূপ সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ—লাভ-ক্ষতি—ব্রাহ্মণ্যগৌরব-প্রচার বা স্বার্থহানির কোন যুক্তিযুক্ত কারণই নাই। তবে তর্কসভায় বাক্‌যুদ্ধে প্রবৃত্ত পণ্ডিত-মণ্ডলী উত্তেজনার আধিক্যে ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া বাক্‌সংযম হারাইয়া পরস্পরকে আক্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হইলে—সভায় আসীন ভদ্রমণ্ডলী যেমন কর্ত্তব্যবোধে উভয় পক্ষকে সংযত হইতে অনুরোধ করেন, আমরাও তেমনই সম্পাদকের কর্ত্তব্য অনুসারে উভয় পক্ষ যাহাতে সংযতবাক্ হইয়া বাদানুবাদ করেন, উত্তেজনার প্রাবল্যে পরস্পরকে অযথা আক্রমণ করিয়া মনোমালিন্য না ঘটান, সে বিষয়ে যথাসাধ্য প্রয়াস পাইব। জাতিতত্ত্বের প্রতিবাদের উত্তর এখানে স্থানাভাবে মুদ্রিত হইল না—বৈশাখ-সংখ্যায় মুদ্রিত হইবে।

আশা করি, এ কৈফিয়তের পর আমরা বিদ্বেষ-প্রণোদিত হইয়া "জাতিতত্ত্ব" প্রকাশ করিতেছি, এমন কল্পনা সহৃদয় পাঠক মহাশয়গণের মনে স্থান পাইবে না।

কলিকাতায় সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ

সাম্প্রদায়িক স্বার্থ-দ্বন্দ্বের ফলে ভারতের মুক্তির পথ বিঘ্ন-কণ্টকিত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ভারতের প্রধান দুইটি সম্প্রদায়—হিন্দু মুসলমান, ইহাদের পরস্পরের স্বার্থদ্বন্দ্ব নূতন নহে। এই স্বার্থদ্বন্দ্বের ফলে বাঙ্গালার বাহিরে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে একাধিকবার ভীষণ সংঘর্ষ সংঘটিত হইয়াছে। বঙ্গদেশ বঙ্গভঙ্গের যুগে এই সংঘর্ষে আলোড়িত হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহার পর বহু দিন যাবৎ এই স্বার্থ-দ্বন্দ্বের ফলে হলাহল উত্থিত হয় নাই। গত ইষ্টার পর্ব্বের সময়ে কলিকাতার আর্য্যসমাজীদিগের এক শোভাযাত্রা উপলক্ষে আবার যে হলাহল উত্থিত হইয়াছে, তাহা নীলকণ্ঠরূপে কে গলদেশে ধারণ করিবে, তাহা বাঙ্গালার ভাগ্যবিধাতাই বলিতে পারেন।

কাহার দোষে বাঙ্গালায় এই সর্ব্বনাশের বীজ উপ্ত হইল, তাহার আলোচনার এখনও সময় উপস্থিত হয় নাই। আর্য্যসমাজীদের পক্ষের কথা, তাঁহারা পুলিসের অনুমতি লইয়া শোভাযাত্রা করিয়াছিলেন এবং মসজেদের সম্মুখে বাদ্য বন্ধ করিয়াছিলেন, পরন্তু অপর এক মসজেদের সম্মুখে তাঁহাদের এক বাদ্যকর সকলের অজ্ঞাতে বাদ্যযন্ত্রে আঘাত করিবার পর তাঁহাদের উপর লোষ্ট্র নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। মুসলমানরা বলিতেছেন, আর্য্যসমাজীরা নিষিদ্ধ হইয়াও দ্বিতীয় মসজেদের সম্মুখে বাদ্য করিয়াছিল এবং পুনরায় নিষেধ করিতে গেলে মসজেদের উপর লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিয়াছিল। দুই বিবরণের কোন্‌টি সত্য, তাহার বিচারের সময় এখনও আইসে নাই। তবে এই সম্পর্কে এইটুকু বলা যাইতে পারে যে, আর্য্যসমাজীদের সহিত সংঘর্ষের জন্য মুসলমানরা কেন হিন্দুর শিবমন্দির অপবিত্র করিলেন, তাহা আজিও হিন্দু বুঝিতে পারে নাই। যদি আর্য্যসমাজীদিগের উপর প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করা তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল, তাহা হইলে শিবমন্দিরের লিঙ্গমূর্ত্তি ভগ্ন করিয়া অথবা মন্দিরে অগ্নি প্রদান করিয়া তাঁহাদের সেই উদ্দেশ্য সফল হয় নাই, কেন না, আর্য্যসমাজীরা তাঁহাদেরই মত প্রতিমা-উপাসক নহেন। তবে মুসলমানদিগের এই অকারণ হিন্দু-দেবমন্দিরের বা বিগ্রহের উপর আক্রোশ কেন?

হ্যারিসন রোডের দাঙ্গা-সূচনায় মস্‌জেদ

সুতরাং বুঝা যাইতেছে, মুসলমানদিগের ক্রোধ বা আক্রোশের লক্ষ্য ছিল, হিন্দুসমাজ ও হিন্দুধর্ম্ম। হঠাৎ উত্তেজনাবশে যে এই ক্রোধ সঞ্জাত হইয়াছিল, তাহা নহে, এই ক্রোধের বা আক্রোশের মূল খুঁজিতে হইলে বহু দূর যাইতে হয়। কোহাট, সাহারাণপুর, দিল্লী, পানিপথ, লক্ষ্ণৌ, এলাহাবাদ—এ সকলের মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায়, ফল্গুর ধারার মত একটা প্রচ্ছন্ন বিদ্বেষবহ্নির নিরবচ্ছিন্ন স্রোত প্রবাহিত হইতে দেখা যায়। কেন এ ক্রোধ, কেন এ আক্রোশ?

আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের আড্ডায় শিবমন্দির

ক্যাকরিয়া ষ্ট্রীটের ভগ্ন শিবমন্দির

এক দিকে গো-হত্যা, সরকারী সম্মান ও চাকুরী, অন্য দিকে শুদ্ধি, সংগঠন ও তাঞ্জিম। এই সকলের যোগাযোগে যে বহু দিন হইতে হলাহল উত্থিত হইয়াছে, তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না। তাহার উপর অগ্নিতে ইন্ধন যোগান দিবার লোকেরও অভাব নাই। এক শ্রেণীর জীব আছেন, যাঁহারা দেশহিতকামীর মুখোস পরিয়া উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে স্বার্থক্যের বেড়াটা জাঁকাইয়া তুলিয়া পরস্পরকে পরস্পর হইতে স্বতন্ত্র রাখিতে প্রাণপণ প্রয়াস পাইতেছেন। ভাষায়, ভাবে, আচারে, ব্যবহারে, সকল বিষয়ে উভয় সম্প্রদায়কে পরস্পর পৃথক্ রাখাই তাঁহাদের যেন জপমালা হইয়াছে। তাঁহারা নানা রচনায় ও বক্তৃতায় সে কথা ব্যক্ত করিতে লজ্জা বা কুণ্ঠা বোধ করেন নাই। ইহার ফল কি হইতে পারে, তাহা সহজেই অনুমেয়।
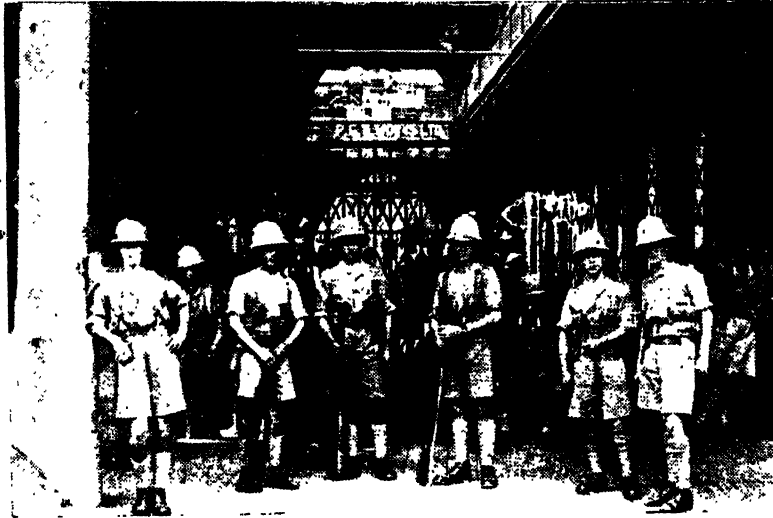
মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটের মিলিটারী পাহারা

বাবুঘাটের লুণ্ঠিত থানা

এই সকল কারণে বহু দিন পূর্ব্বেই জমী প্রস্তত হইয়াছিল। বারুদের স্তূপ সজ্জিত হইয়া থাকিলে তাহাতে মাত্র একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নিক্ষেপ করিলে প্রলয়াগ্নি জ্বলিয়া উঠে। কলিকাতায় তাহাই হইয়াছে।

১৯২১ খৃষ্টাব্দে খেলাফৎ ও পঞ্জাবের অনাচারের ভিত্তির উপর যে পবিত্র হিন্দু-মুসলমান-মিলন-মন্দির গড়িয়া উঠিয়াছিল, আজ তাহা উভয় সম্প্রদায়েরই স্বার্থ-সংঘর্ষের ফলে ভগ্নচূড় হইয়াছে। ভবিষ্যদর্শী যুগপ্রবর্ত্তক মহাত্মা গন্ধী কারামুক্তির পর দেশের তদানীন্তন অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দিব্যদৃষ্টিতে সেই পরিণাম দেখিতে পাইয়াছিলেন। কথার আড়ম্বরে এই পরিণামের কথা যতই লুকাইয়া রাখা যাউক না, এ কথা অবশ্যই স্বীকার্য্য যে, হিন্দু মুসলমানে—অন্ততঃ অশিক্ষিত নিরক্ষর হিন্দু-মুসলমানে মনোমালিন্য অতিমাত্রায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে।

এই মনোমালিন্যের ফলে কলিকাতায় উভয় সম্প্রদায়ের

রয়্যাল মেলের পাঞ্জাবী চালকের শবযাত্রা

মধ্যে যে ধর্ম্মগত সংঘর্ষ হইয়া গেল, তাহার পরিণাম-ফল কাহারও পক্ষে শুভ হইতে পারে না। ইহার প্রভাব কত কাল পর্য্যন্ত বিস্তৃত রহিবে, তাহা বলা যায় না। সুখের বিষয়, উভয় সম্প্রদায়ের নেতৃবর্গ শান্তিপ্রতিষ্ঠার জন্য প্রাণপণ প্রয়াস পাইতেছেন। তাঁহাদের চেষ্টা ফলবতী হউক, ইহাই কামনা।

কিন্তু উপরে সাময়িক প্রলেপ দিয়া ভিতরের ভীষণ ক্ষত শুষ্ক করা যায় না। ইহার জন্য অস্ত্রোপচার চাই। উহা আপাততঃ যতই যন্ত্রণাদায়ক হউক না, উহার পরিণাম-ফল শুভ—প্রভাবও চিরস্থায়ী। এই হেতু সাময়িক শান্তি-প্রতিষ্ঠার উপরে উভয় সম্প্রদায়কে আরও কিছু করিতে হইবে।

ঠনঠনিয়ার কালীবাড়ীতে আক্রমণ-প্রতীক্ষায় পাহারা
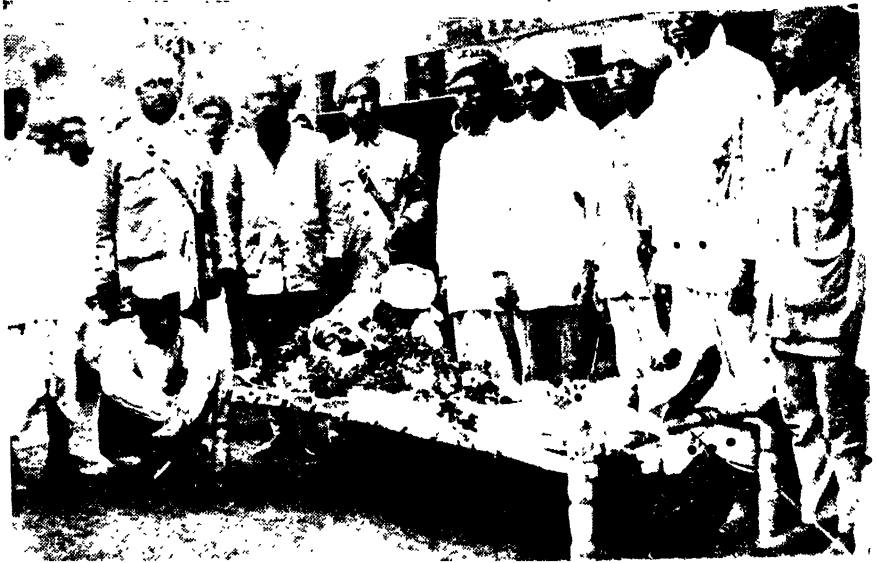
পরস্পর পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইতে হইলে উভয়কেই তুল্য শক্তিশালী হইতে হইবে। ইহা সাধারণ নিয়ম। এই যে মন্দির ও মসজেদ্ অপবিত্র ও ভগ্ন হইল, এই যে বহুসংখ্যক হিন্দু-মুসলমান হতাহত হইল, এই যে কলিকাতা সহরে কয়েক দিন ধরিয়া গুণ্ডার রাজত্ব ও অরাজকতা বিরাজ করিল, এই যে পল্লীতে পল্লীতে উভয়

নিমতলার আক্রান্ত মসজেদ

সম্প্রদায়ের লোক প্রাণ হাতে লইয়া চলা-ফিরা করিতে বাধ্য হইল,—ইহার মূলে কি ছিল? যেখানে যে দল প্রবল হইয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, সেই স্থানে অপর দল ধর্ষিত হইয়াছে। এক দল যদি অপর দলকে দুর্ব্বল বলিয়া বুঝিতে পারে, তাহা হইলে তাহাদের উপর অত্যাচার করে। কিন্তু যদি উভয় দলই বুঝে যে, উভয় দলই শক্তিসম্পন্ন, তাহা হইলে কেহ কাহারও উপর অত্যাচার করিতে সাহসী হয় না। চিরদিন পরের শান্তিরক্ষকের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিলে জাতি কখনও শক্তিসম্পন্ন বা উন্নত হইতে পারে না। এই হেতু উভয় দলেরই শক্তি সঞ্চয় করা প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য। হিন্দুরা যদি সংগঠন দ্বারা তাহা করিতে পারেন, তাহাই করুন—মুসলমানের উহাতে বাধা দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। মুসলমানরা যদি তাঞ্জিম দ্বারা উহা করিতে পারেন, তাহা হইলে তাহা করুন, হিন্দুর উহাতে বাধা দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। আমরা চাহি, উভয়েই উভয়ের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হউন, তাহা হইলেই প্রকৃত মিলন সম্ভবপর হইবে, অন্যথা শত Unity Conference এ উহা সম্ভবপর হইবে না।

এই সংঘর্ষ উপলক্ষে কয়টি বিষয় বিশেষ লক্ষ্য করিবার আছে। বহু হিন্দু বিপন্ন মুসলমানকে আশ্রয় দিয়াছেন, রক্ষা করিয়াছেন, বহু মুসলমান বিপন্ন হিন্দুকে রক্ষা করিয়াছেন। পুনশ্চ হিন্দু তরুণগণ প্রাণকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া তাঁহাদের ধর্ম্ম ও আত্মসম্মান রক্ষা করিয়াছেন। মুসলমান তরুণগণও তাঁহাদের ধর্ম্ম ও আত্মসম্মান প্রাণ দিয়া রক্ষা করিয়াছেন। যে জাতি আত্মসম্মান প্রাণাপেক্ষা অধিক জ্ঞান করিয়া কাপুরুষতা বর্জ্জন করিতে পারে, সেই জাতি স্বরাজলাভের যোগ্য। এই সাম্প্রদায়িক হলাহল হইতে এই অমৃত উদ্ভূত হইয়াছে।

স্বর্গীয় রামচন্দ্র মিত্র

কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব সরকারী উকীল রামচন্দ্র মিত্র, সি, আই, ই গত ৫ই এপ্রিল তারিখে তাঁহার বেচু চাটার্জ্জী ষ্ট্রীটস্থ ভবনে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন।

বর্দ্ধমান জিলার গোদা গ্রামে ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে রামচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন এবং পরে নিজ প্রতিভাবলে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যাশিক্ষা সম্পূর্ণ করিয়া ওকালতী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েন। হাইকোর্টে ওকালতী করিবার কালে তাঁহার প্রসার ও প্রতিপত্তি ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়াছিল। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে তিনি সহকারী সরকারী উকীল নিযুক্ত হয়েন এবং ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে কবি হেমচন্দ্রের স্থানে তিনি সিনিয়র সরকারী উকীলের পদে সমাসীন হয়েন। তদবধি বহুকাল পর্য্যন্ত তিনি সসম্মানে এই দায়িত্বপূর্ণ কার্য্য সম্পাদন করিয়া আসিয়াছেন।

রামচন্দ্র কলিকাতার মিউনিসিপ্যাল কমিশনার এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। এ সকল ক্ষেত্রে তাঁহার সাধারণের সেবার অনেক সুযোগ ঘটিয়াছিল। তিনি তীক্ষ্ণধী, বহুদর্শী, বিজ্ঞ, সামাজিক লোক ছিলেন। তাঁহার ন্যায় সামাজিক বাঙ্গালীর সংখ্যা ক্রমেই বিরল হইয়া আসিতেছে।

তাঁহার বর্ষীয়সী পত্নী জীবিত আছেন। বহুকালের সঙ্গজনিত প্রীতির বন্ধন-ছেদনের শোক তাঁহাকে বড়ই বাজিয়াছে সন্দেহ নাই। তাঁহার ছয়টি পুত্র বর্ত্তমান। সকলেই কৃতী। জ্যেষ্ঠ শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র মিত্র হাইকোর্টের সিনিয়র বেঞ্চ ক্লার্ক; তৃতীয় শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রকুমার মিত্র সরকারের উচ্চপদস্থ চাকুরীয়া এবং অন্যতম পুত্র যতীন্দ্রনাথ ডাক্তার। পরিণতবয়সে পুত্র-পৌত্রাদি রাখিয়া রামচন্দ্র পরলোকগমন করিয়াছেন, ইহাই তাঁহাদের শোকে সান্ত্বনা।

পরলোকে রায় যতীন্দ্রনাথ

টাকীর বিখ্যাত মুন্সীবংশীয় জমীদার রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী গত ২৪শে চৈত্র অকস্মাৎ ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যু এত অতর্কিতভাবে দেখা দিয়াছে যে, সহসা উহাতে আস্থা স্থাপন করিতেই প্রবৃত্তি হয় না। তিনি দীর্ঘ রোগভোগ করেন নাই। মৃত্যুর দিন বেলা ২টার সময় তিনি হঠাৎ সন্ন্যাস রোগে আক্রান্ত হয়েন এবং ৫ ঘণ্টার মধ্যেই তাঁহার আত্মা নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়া যায়। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৬৪ বৎসর হইয়াছিল।

যতীন্দ্রনাথ মহৎ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। যতীন্দ্রনাথ টাকীর বিখ্যাত কালীনাথ মুন্সীর ভ্রাতা মথুরানাথের দত্তক পুত্র। একাধারে কমলা ও বাণীর বরপুত্ররূপে যতীন্দ্রনাথ বংশের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের এম, এ ও বি, এল, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি দেশের সাহিত্য ও রাজনীতিক্ষেত্রে, পরন্তু সর্ব্ববিধ

সার কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত

সাধারণ কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং সাহিত্যসেবী ও সাহিত্যরসপিপাসু ছিলেন, পরন্তু সাহিত্যের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিকামনায় নানারূপে শক্তি নিয়োজিত করিয়াছিলেন। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের প্রতিষ্ঠায় যতীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব সামান্য নহে। বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের সভাপতিরূপেও তিনি তাঁহার সাহিত্যানুরাগ প্রদর্শন করিয়াছিলেন এবং দেশবাসীও তাঁহাকে ঐ পদে বরণ করিয়া তাঁহার গুণের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুতে যে সাহিত্য-পরিষদ এবং বাঙ্গালার সাহিত্য বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

রাজনীতিক্ষেত্রেও যতীন্দ্রনাথ নির্ভীকভাবে দেশের ও দশের সেবা করিয়াছিলেন। জমীদারশ্রেণীকে এ জন্য সরকারের কিরূপ বিরাগভাজন হইতে হয়, তাহা কাহারও অবিদিত নহে। অথচ যতীন্দ্রনাথ কর্ত্তব্যপালনে সে বিরাগের ভয়ে পশ্চাৎপদ হয়েন নাই। আজ তাঁহাকে হারাইয়া বাঙ্গালার দেশকর্ম্মীরা এক জন পুরাতন কর্ম্মী ও উপদেষ্টার উপদেশ ও সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত হইলেন।

আমরা তাঁহার বিয়োগ-ব্যথায় ব্যথিত হইয়াছি এবং তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

স্যর কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত

আর একটি অতীত যুগের বাঙ্গালী ইহলোক ত্যাগ করিলেন। যে সকল মনীষী বাঙ্গালী গত যুগে বিদ্যা, বুদ্ধি ও জ্ঞান-গরিমায় বাঙ্গালার মুখ উজ্জ্বল করিয়াছিলেন, সার কৃষ্ণগোবিন্দ তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। কিছু দিন হইতে তিনি রোগে ভুগিতেছিলেন। মধ্যে যে ভাবে তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গের কথা প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাতে তাঁহার আত্মীয়-স্বজন তাঁহার জীবনের জন্য শঙ্কান্বিত হইয়াছিলেন। প্রায় মাসাবধি রোগভোগ করিবার পর তিনি তাঁহার বালিগঞ্জ ষ্টোর রোডস্থ ভবনে দেহত্যাগ করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৭৫ বৎসর হইয়াছিল। কেওড়াতলা ঘাটে তাঁহার দেহ চিতানলে ভস্মীভূত হইয়াছে।

১৮৫১ খৃষ্টাব্দের ২৮শে ফেব্রুয়ারী তারিখে ঢাকা জিলার ভাটপাড়া গ্রামে কৃষ্ণগোবিন্দের জন্ম হয়। ময়মনসিংহ গবর্ণমেণ্ট স্কুলে তাঁহার বিদ্যারম্ভ, পরে ঢাকা কলেজে ও লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় কালেজে তিনি উচ্চাঙ্গের বিদ্যাশিক্ষা সম্পূর্ণ করেন। সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া তিনি ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে সরকারী চাকুরী গ্রহণ করেন এবং দক্ষতার সহিত ক্রমশঃ পদোন্নতি লাভ করেন।

এক সময়ে তাঁহার সরকারী কার্য্যের সিনিয়রিটি হিসাবে বাঙ্গালার শাসকপদে সমাসীন হইবার সম্ভাবনা হইয়াছিল। কিন্তু আমলাতন্ত্র সরকারের চিরাচরিত ব্যবস্থা অনুসারে তাঁহাকে কেবল বর্ণবৈষম্যের জন্য সরকারী মৎস্য-বিভাগে সরাইয়া দেওয়া হয়। এই কার্য্যে নিযুক্ত থাকার সময়ে ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে য়ুরোপ ও আমেরিকায় গিয়া মৎস্য-চাষ ও ব্যবসায়-সম্পর্কে অনুসন্ধান-কার্য্যে ব্রতী হইতে হয়।

১৯০৭ খৃষ্টাব্দে তিনি ইণ্ডিয়া কাউন্সিলের অন্যতম সদস্যরূপে মনোনীত হয়েন। যে দুই জন ভারতবাসীর ভাগ্যে সর্ব্বপ্রথমে এই পদলাভ ঘটিয়াছিল, তিনি তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম।

কৃষ্ণগোবিন্দ ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে ব্যারিষ্টারীও পাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রতিভা অনন্যসাধারণ ছিল। যদিও সরকারী কার্য্যে তিনি আজীবন আত্মনিয়োগ করিয়া সরকারের সহিত সহযোগের মনোবৃত্তিতে অভ্যস্ত হইয়াছিলেন, তথাপি দেশের জন্য স্বায়ত্ত-শাসন লাভের আকাঙ্ক্ষায় তিনি কাহারও পশ্চাৎপদ ছিলেন না। ভারতের সামরিক বিভাগে যাহাতে অধিক পরিমাণে ভারতীয় নিয়োগ হয়, তাহার জন্য তিনি বহু আন্দোলন করিয়াছেন। অবশ্য তাঁহার রাজনীতির সহিত দেশের লোকের মতের অনৈক্য ছিল। কিন্তু তাহা হইলেও তিনি যে তাঁহার বিবেক ও ধারণা অনুসারে দেশকে ভালবাসিতেন, তাহাতে সন্দেহ ছিল না।

স্বাধীন দেশে জন্মগ্রহণ করিলে কৃষ্ণগোবিন্দ তাঁহার অনন্যসাধারণ প্রতিভা ও দেশসেবার নিশ্চিতই যোগ্য পুরস্কার প্রাপ্ত হইতেন। কিন্তু আমলাতন্ত্র সরকারের স্বৈরশাসনের বন্ধনের মধ্যে পড়িয়া তাঁহার প্রতিভা সম্যক্ স্ফূর্ত্তিলাভ করিতে পারে নাই। বিজিত পরাধীন দেশের ইহাই প্রকৃত অভাব। তাঁহার বর্ণ কৃষ্ণ না হইলে তাঁহার প্রতিভাগুণে তিনি দেশের সর্ব্বোচ্চ শাসকের আসন অলঙ্কৃত করিতে পারিতেন। আমলাতন্ত্র শাসনের ইস্পাতের বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে না পারিলে সে অবস্থা কখনও সমুদিত হইবে না।

বিচিত্র বেত্রদণ্ড

আমেরিকার সবই বিচিত্র। আমোদ-প্রমোদের জন্য কত বিচিত্র জিনিষই না উদ্ভাবিত হইতেছে। জনৈক শিল্পী বেত্রদণ্ডের মধ্যে তাসক্রীড়া করিবার উপযুক্ত টেবল পর্য্যন্ত রাখিবার উপায় আবিষ্কার করিয়াছেন। এই টেবল ছাতার আকারবিশিষ্ট। সমগ্র টেবলটি একটি বেত্রদণ্ডের অভ্যন্তরে

তাস খেলার টেবল ও তাহার আধার বেত্রযষ্টি

অনায়াসে রাখিতে পারা যায়। এই ভ্রমণ-যষ্টিটি আবার এমন ভাবে নির্ম্মিত যে, প্রয়োজন না থাকিলে তাহাকে মুড়িয়া পকেটের মধ্যে রাখিতে কোনও অসুবিধা হয় না। টেবলটি সুদৃশ্য এবং তাহার উচ্চতাও বসিয়া ক্রীড়া করিবার উপযোগী।

অভিনব মোটর-গাড়ী

উদ্যানমধ্যে মোটরে চড়িয়া অশ্বারোহণের আনন্দ উপভোগের জন্য পাশ্চাত্য দেশে অভিনব মোটরগাড়ী নির্ম্মিত হইয়াছে। এই গাড়ীর সম্মুখভাগ চলিতে চলিতে ঘোড়ার মত লম্ফ দিয়া উর্দ্ধে উত্থিত হয় এবং পশ্চাতের চাকা গাড়ীকে বহন করিয়া ভূমির উপর দিয়া ধাবিত হয়।
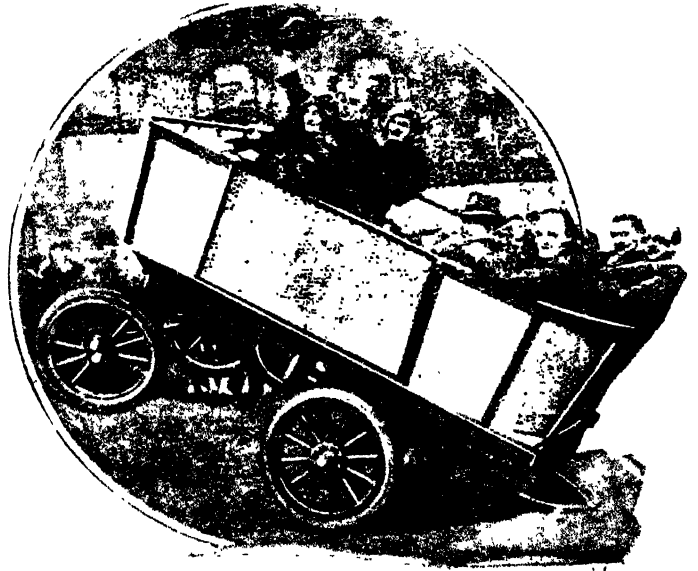
ঘোড়ার ন্যায় পা তুলিয়া মোটর-গাড়ী চলিতেছে

এই গাড়ীতে একসঙ্গে অনেকগুলি নরনারী বসিতে পারে। উদ্যানমধ্যস্থ পথের উপর দিয়া যখন গাড়ীখানি সম্মুখভাগ উন্নত করিয়া চক্রাকারে ঘুরিতে থাকে, তখন আরোহী ও দর্শক উভয় সম্প্রদায়ই অত্যন্ত আমোদ অনুভব করিয়া থাকে।

অঙ্গুলী-সাহায্যে ফুটবল ক্রীড়া

লণ্ডন সহরে ইদানীং ঘরের মধ্যে টেবলের উপর অঙ্গুলি-সাহায্যে ফুটবল ক্রীড়ার বহুল প্রচলন হইয়াছে। অনামিকা ও মধ্যমা এই দুই অঙ্গুলীতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বুট সংলগ্ন করিয়া খেলা আরম্ভ হয়। দুই, চারি অথবা ৬ জন ব্যক্তি

টেবলের উপর ফুটবল ক্রীড়া

একসঙ্গে এই খেলায় যোগ দিতে পারে। টেবলের উভয় পার্শ্বে 'গোল' (goal) স্থাপিত হয়। এই খেলার নিয়মাবলীও আছে। তদনুসারে ক্রীড়া নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। প্রমোদ উপভোগের ব্যবস্থা পাশ্চাত্য দেশে নানা ভাবে আত্মপ্রকাশ করিতেছে।

রুস-সম্রাটের রত্ন-মুকুট

রুস-সম্রাট যে মণিময় মুকুট ধারণ করিয়া বিরাট রুসসাম্রাজ্য পালন করিতেন, এক্ষণে রুসিয়ার সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট তাহা বিক্রয় করিবেন। এই রত্নখচিত মুকুট বহু কালের প্রাচীন এবং অত্যন্ত মূল্যবান্। সম্রাট-পরিবারের অন্যান্য রত্নালঙ্কারও বিক্রীত হইবে। তন্মধ্যে এই মুকুটের ঐতিহাসিক মূল্য অত্যন্ত অধিক।

রুস-সম্রাটের রত্ন-মুকুট

রাজা ডেভিডের প্লেট

রাজা ডেভিডের প্লেট

রাজা ডেভিডের একখানি মূল্যবান্ প্লেট ছিল। উহা ৪ হাজার বৎসরের পুরাতন। ন্যাশনাল মিউজিয়ম বা যাদুঘরে এই প্লেটটি এখন রক্ষিত আছে। রাজা ডেভিড উহা ব্যবহার করিতেন।

বরফের উপর চলিবার যান

জনৈক অসামরিক কর্ম্মচারী বরফের উপর দিয়া চলিবার জন্য এক প্রকার যান নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ইহা অনেকটা বিমান-পোতের আকার ও গুণবিশিষ্ট। অর্থাৎ প্রয়োজন

নৌকাকৃতি বরফ-যান

হইলে এই যান আকাশ-পথেও ধাবিত হইতে পারে। সামরিক বিভাগে এই উভচর যানের প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হইয়াছে। এই নবোদ্ভাবিত যান বরফের উপর দিয়া ঘণ্টায় ৯০ মাইল পথ অতিক্রম করিতে সমর্থ। বিমান-পোতের মত ইহার এঞ্জিন প্রভৃতি বিদ্যমান। জলের উপর দিয়াও এই পোত চালাইবার সরঞ্জাম আছে। এই নৌকা-কৃতি যানের তলদেশ জলনিবারক। বরফের উপর দিয়া প্রধাবিত হইবার সময় যদি কোথাও বরফ গলিয়া গিয়া থাকে, তাহা হইলে নৌকাখানি তিন জন আরোহীকে লইয়া অনায়াসে জলের উপর ভাসিয়া থাকিতে পারিবে।

শয়নাবস্থায় বিমানপোত পরিচালন

যান-পরিচালক শয়নাবস্থায় পোত পরিচালিত করিতেছে

জর্ম্মণীতে এক প্রকার ক্ষুদ্র বিমানপোত নির্ম্মিত হইয়াছে; ইহার পরিচালক শায়িত অবস্থায় উক্ত যান পরিচালিত করিয়া থাকে। এই বিমানপোতের ওজন মাত্র দেড়মণ। চালক শায়িত অবস্থায় এই পোত পরিচালনের সময় কোনও প্রকার অসুবিধা যাহাতে অনুভব করিতে না পারে, সে ব্যবস্থাও এই ক্ষুদ্র পোতে বিদ্যমান।

মূল্যবান মুক্তার মালা

ম্যাডাম ফিয়ার্শ একটি বহুমূল্য মুক্তার মালা গলদেশে ধারণ করিতেন। এই মুক্তার মালার মূল্য ৪৫ লক্ষ টাকারও অধিক। ১ শত ৫৩টি সুদৃশ্য মুক্তা এই মালায়

বহুমূল্য মুক্তার মালা

গ্রথিত আছে। একখানি উৎকৃষ্ট হীরক এবং চুণিও বন্ধনীর কাছে সংলগ্ন। এইরূপ মূল্যবান মুক্তার মালা পৃথিবীতে অল্পই আছে।

কসাকদিগের নৃত্য-নৈপুণ্য অসাধারণ। সম্প্রতি লণ্ডনে কসাক সেনাদলের প্রদর্শনী উপলক্ষে নৃত্য-নৈপুণ্যের পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছিল। কয়েক জন কসাক সৈনিক অশ্বারোহণ করিয়া একখানি কাষ্ঠের বৃহৎ আসনকে ঊর্দ্ধে রাখিয়া দ্রুত-বেগে ধাবিত হইয়াছিল। তাহার উপর অপর দুই জন

কসাকদিগের নৃত্য-নৈপুণ্য

নিপুণ নৃত্যবিদ্ কসাক তাহাদের নৃত্য-নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছিল। যে দণ্ডগুলির সাহায্যে কাষ্ঠাসনটি ঊর্দ্ধে স্থাপিত হইয়াছিল, সেগুলি অশ্বারোহীদিগের রেকাবের সহিত দৃঢ় সন্নিবিষ্ট ছিল এবং অশ্বারোহীরা দণ্ডগুলি হস্ত-দ্বারা ধারণ করিয়াছিল। অশ্বগুলি দ্রুতবেগে ধাবিত হই-লেও কাষ্ঠাসনটি কোনও দিকে হেলিয়া পড়িতে পারে নাই।

রেশম ও পুঁথিনির্ম্মিত আলেখ্য

আমেরিকার জনৈক অবসরপ্রাপ্ত সামরিক কর্ম্মচারী রেশম ও পুঁথির সাহায্যে আমেরিকার রাষ্ট্রপতি কুলিজের এক প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এই প্রতিমূর্ত্তি তৈয়ার করিতে হাজার গজ রেশম ও ১ লক্ষ ১৪ হাজার পুঁথি লাগিয়াছিল। শিল্পী প্রতিদিন কয়েক ঘণ্টা পরিশ্রম করিয়া ৬ মাসে উহা সমাপ্ত করেন। মার্কিণ পতাকার
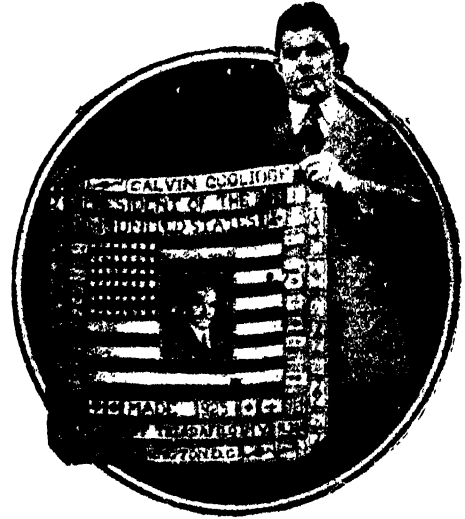
প্রেসিডেণ্ট কুলিজের রেশম ও পুঁথি বিনির্ম্মিত চিত্র

অনুকরণে চিত্রের চারিপার্শ্ব সুশোভিত করিয়া শিল্পী মধ্যস্থলে রাষ্ট্রপতির মূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়াছেন।

বিচিত্র টেবল-ল্যাম্প
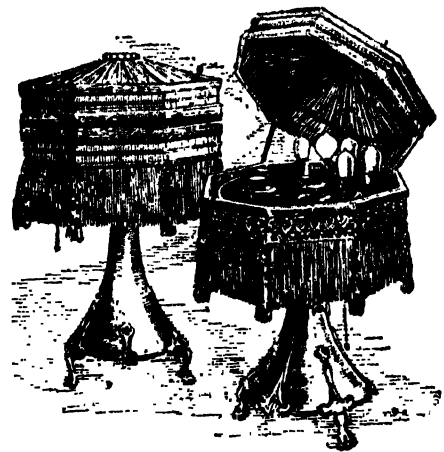
আলোকাধারের আকারবিশিষ্ট 'রেডিও রিসিভার' বা বেতার যন্ত্র

টেবল-ল্যাম্পের আকারবিশিষ্ট রেডিও যন্ত্র নির্ম্মিত হই-য়াছে। এই ল্যাম্পের নিম্নভাগে 'হরন্' বা শৃঙ্গ এমন ভাবে অবস্থিত যে, কেহই তাহা দেখিয়া বুঝিতে পারে না যে,

উহার মধ্য হইতে শব্দ নির্গত হইতে পারে। ল্যাম্পের ঢাক্‌নি বা উপরিভাগ খুলিয়া ফেলিলে উহার অভ্যন্তরে একটি তিন নলবিশিষ্ট রিসিভার বা শব্দযন্ত্র দেখিতে পাওয়া যাইবে। ল্যাম্পটি তাম্রনির্ম্মিত—তাহার সোনালী বা রূপালী কায আছে। ঢাক্‌নি বন্ধ করিয়া দিলে কেহই অনুমান করিতে পারে না যে, উহা 'রেডিও রিসিভার'। সকলেই উহাকে একটি আলোকাধার বলিয়া ভ্রম করিবে।

জীবনরক্ষার অভিনয় উপায়

অগ্নিকাণ্ড উপস্থিত হইলে অনেক সময় অগ্নিবেষ্টিত অট্টালিকা হইতে নর-নারীকে নামাইয়া আনিবার উপায় থাকে
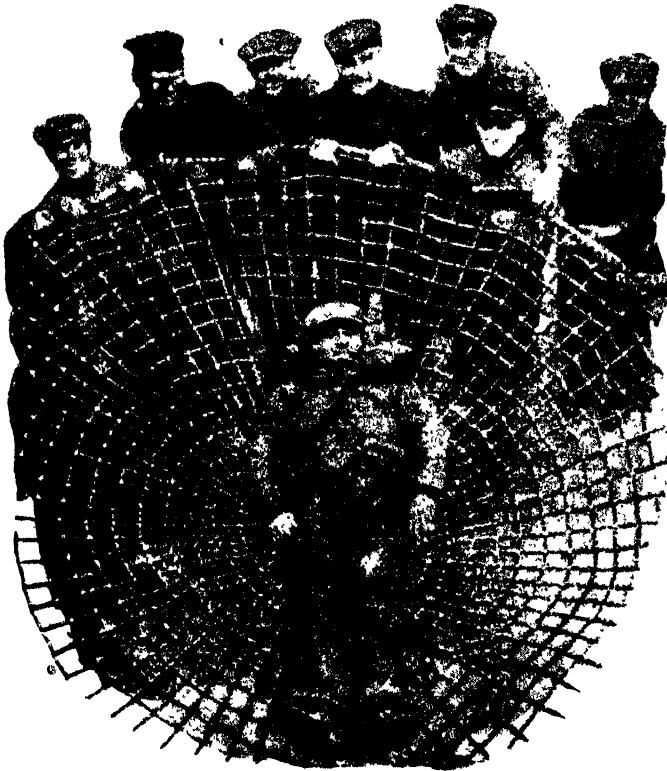
ঊর্ণনাভজালের আকারবিশিষ্ট জাল

না। কোনও অগ্নিবেষ্টিত অট্টালিকার অধিবাসী যদি ছাদ হইতে লম্ফ প্রদান করিয়া আত্মরক্ষা করিতে চাহে, তাহা হইলে অনেক সময় ভূমিতলে পড়িয়া চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যায়। এ জন্য ফিলাডেলফিয়ায় অগ্নিভয় হইতে নরনারীকে রক্ষা করিবার বিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠিত আছে। তথায় শিক্ষার্থীদিগকে অগ্নিকাণ্ডের আক্রমণ হইতে মানুষ রক্ষা করিবার জন্য বিবিধ প্রকার শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। জীবন-রক্ষাকল্পে সুদৃঢ় রজ্জুনির্ম্মিত ঊর্ণনাভজালের আকার-বিশিষ্ট জাল নির্ম্মাণ করিয়া, কিরূপে তাহা ব্যবহার করিতে হয়, সে বিষয়ে এই বিদ্যালয়ে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। অনেকগুলি লোক এই গোলাকার জাল এমন ভাবে ধরিয়া রাখে যে, উপর হইতে কেহ সেই জালের উপর লাফাইয়া পড়িলে তাহার দেহে কোনও প্রকার আঘাত লাগে না।

প্রাচীন যুগের শিলালেখ

পেন্‌সিলভেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ হইতে প্যালেষ্টাইনে ভূমি খনন করিয়া প্রাচীন যুগের ঐতিহাসিক কীর্ত্তিসমূহের পুনরুদ্ধার করা হইতেছে। খননব্যপদেশে নানা পুরাতন জিনিষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। তন্মধ্যে অষ্টরথ (Ashtaroth) মন্দিরের নানা অংশবিশেষ উল্লেখযোগ্য। বাইবেল গ্রন্থে এই মন্দির সম্বন্ধে বর্ণনা আছে। খননকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া প্রত্নতাত্ত্বিকগণ ফারাও নৃপতি প্রথম সেতি'র (Seti I) রাজত্বকালের অনুশাসন-লিপিসমন্বিত একখানি প্রস্তর আবিষ্কার করিয়াছেন। এই শিলালেখখানি ভবিষ্য যুগের ইতিহাস প্রণয়নে যথেষ্ট সাহায্য করিবে। ইহার এক পার্শ্ব সামান্যরূপ ভগ্ন হইলেও এই শিলালিপির পাঠোদ্ধারের কোন অসুবিধা হইবে না। ইহার ঐতিহাসিক মূল্য অত্যন্ত অধিক।

প্রাচীন যুগের শিলালিপি
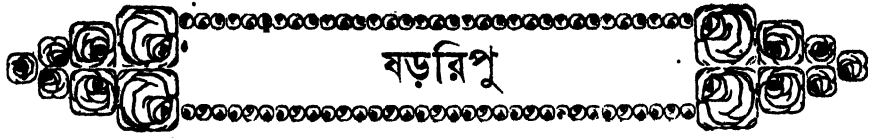
কাম—বাবু

ফুলের গ'ড়ে গলায় দেখে গায়ে বুটিদার,
মূর্চ্ছা যা'য়ে মা'য়ে লোক করে হাহাকার।

ক্রোধ—বড় বাবু

Currencyতে দুটো R কেন দাওনি ছোক্‌রা ব'লে,
একটা বই দিইনি আমি, তাই সাহেব গেল জ্ব'লে।

লোভ—নায়েব

নায়েবগিরি ক'র্ত্তে ক'র্ত্তে দুবেবো গজায় হাড়ে,
ডান হাতেতে কুড়িয়ে কড়ি বাঁ হাতখানা নাড়ে

মোহ—সমাজ-সংস্কারক

মিছি মিছি চাঁদার মোহে ঘুর্‌ছি নিয়ে খাতা,
মোটর চ'ড়ে না বেরোলে দান দেয় না দাতা।

মাৎসর্য্য—কেরাণী

হাতে ক'রে কাজ শিখ্‌লুম্ ক'র্ত্তে চিঠি ডকেট্,
(এখন) ওর মাইনে আশী টাকা আমার খালি পকেট।

মদ—জমীদার

দেখালুম্ আট আঙ্গুলে আট আংটী, বাপ্-পিতেমোর ভুঁড়ি,
হাল্ আমলের ছোঁড়াগুলো উড়িয়ে দিলে হেসে দিয়ে তুড়ি।

সম্পাদক—শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু
কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, 'বসুমতী' বৈদ্যুতিক-রোটারী-মেসিনে শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত